মাসিক বসুমতীর সূচীপত্র

৪৮ বর্ষ ১৩৭৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত [১ম

বার্ষিক সূচীপত্র

উলঙ্গ আত্মা ।। বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী — ৯·০০

অবক্ষয়িত সমাজ ও সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আছে আপনার? যদি থাকে তবে এ-বই পড়তেই হবে এবং অন্যকে পড়তে অনুরোধও করতে হবে। 'উলঙ্গ আত্মা'র প্রতিটি পৃষ্ঠায় জীবন ও যৌবনের অন্ধকারের হাহাকার ও প্রতিটি ছত্রে মাটি ও মানুষের আলোর তৃষ্ণা। এ-বইকে কেন্দ্র করে হয়তো পরস্পরবিরোধী মতের আলোড়ন জাগবে। কেউ বলবেন—অসহ্য সত্য : কেউ বা বলবেন—সুন্দর সৃষ্টি। তবে একটা কথা বোধহয় সকলকেই স্বীকার করতে হবে—'উলঙ্গ আত্মা' বর্তমান শতাব্দীর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ চিত্র। বিগত দিনের বহু প্রতীক্ষিত ও আগামী দিনের বহু আলোচিত সদ্য প্রকাশিত দুঃসাহসিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস —'উলঙ্গ আত্মা'॥

কালপুরুষ ।। মিহির মুখোপাধ্যায় — ৮·৫০

পূর্ববঙ্গের একটি সুপ্রাচীন অভিজাত পরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। দেশ বিভাগের ফলে এদের ঐতিহ্যময় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ভিত্তিটি কিভাবে ভেঙে গেল, কিভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল পারিবারিক সম্পর্ক ও সংস্কারের মধ্যে—জীবন্ত রেখার আঁচড়ে সেই ছবিটি অঙ্কিত। 'কালপুরুষ' নিঃসন্দেহে বাংলা-সাহিত্যে চিরায়ত উপন্যাসরূপে চিহ্নিত হবে॥

মহাপ্রেম ।। শ্রীপারাবত — ৭·০০

'নারায়ণ গৌরবেশে এল নদীয়ায়......শান্তিপুরে ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়'। সুরধুনী তীরে সঞ্চরমাণ সেই 'অভিনব হেমকল্পতরু'র দিব্য জীবনকথা বাঙালীর নিত্যকালের প্রিয় প্রসঙ্গ। ভক্তের আকুতি, ঐতিহাসিকের তথ্যচেতনা ও ঔপন্যাসিকের রসসৃষ্টি—এই তিনটি বিরল সমন্বয় 'মহাপ্রেম' উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করেছে॥

চেনা-অচেনা ।। চতুর্মুখ — ৫·০০

লালদিঘীর আয়নায় প্রতিবিম্বিত ডালহৌসী স্কোয়ার এক চলমান জীবনপ্রবাহের ছবি। সেই ছবি ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। নানা ফুলে গাঁথা একখানি মালা 'চেনা অচেনা' কেরাণী পাড়ার চিরায়ত মহাকাব্য॥

সামনে সমুদ্র ।। রামপদ মুখোপাধ্যায় — ৬·০০

'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে' তার মনের গভীরে ডুব দিয়ে মুক্তো তুলে এনেছেন লেখক। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের অ্যালবামে অবিস্মরণীয় কয়েকটি নতুন মুখ উপহার দিয়েছেন॥

পরস্পর ।। বিমল কর — ৪·০০

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত এই উপন্যাসে বিবাহিত জীবনের এক উষ্ণ নিবিড় অন্তরঙ্গ আলেখ্য উন্মোচিত হয়েছে। কিশোর প্রেমের উজ্জ্বল মধুর ছবি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত লেখক তাঁর 'পরস্পর' উপন্যাসে পরিণত প্রেমের তীব্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন॥

প্রতিলিপি ।। মানবেন্দ্র পাল — ৩·৫

একটি কঠিন বিস্ময় প্রশ্নের আশ্চর্য সমাধান এই উপন্যাস। কাহিনীর উত্থান পতনে ও জটিল মানস বিবর্তনে মনস্তত্ত্বনির্ভর 'প্রতিলিপি' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস॥

ভারত আমার — ৩·০০
অমরনাথ রায়
বঙ্গ আমার — ৩·০০

দুটি গ্রন্থই ইউনেস্কো পুরস্কারপ্রাপ্ত। ভারতের ও বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়, আদিবাসী, স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাজধানী, ভাষা ও লিপি, সাহিত্য, বিজ্ঞান সাধনা, তীর্থক্ষেত্র, দর্শনীয় স্থান ও বস্তু, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য এবং আরো অনেক কিছু। দুটি গ্রন্থই মূল্যবান স্বদেশ পরিচয়॥

● ইতিহাস ও প্রবন্ধ

K. G. Ghosh
THE ROLL OF HONOUR
Rs. 30·00

[দুশো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরপেক্ষ ইতিহাস। শতাধিক দুষ্প্রাপ্য চিত্রসম্বলিত ৮৫০ পৃষ্ঠায় নতুন মহাভারত।]

বিপিনবিহারী গুপ্ত
পুরাতন প্রসঙ্গ — ১৫·০০
[উনবিংশ শতাব্দীর অন্দরমহলের চলচ্চিত্র 'পুরাতন প্রসঙ্গ'। বহুকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থের নতুন শোভন সংস্করণটির সম্পাদনা করেছেন বিশু মুখোপাধ্যায় এবং ভূমিকা লিখেছেন প্রমথনাথ বিশী।]

বিমলকুমার দত্ত
ভারত শিল্প — ৬·০০
[৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী মূল্যবান আর্টপ্লেট ও অসংখ্য খণ্ড চিত্র-শোভিত। শিল্পী ও চিত্ররসিকদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ]

*** উপন্যাস ***

পরিতোষ মজুমদার
সায়াহ্ন-আকাশ — ২·৫০

নিখিল চট্টোপাধ্যায়
অন্তরঙ্গ — ২·৫০

মানবেন্দ্র পাল
প্রতিলিপি — ৩·৫০

বিমল কর
পরস্পর — ৪·০০

রামপদ মুখোপাধ্যায়
সামনে সমুদ্র — ৬·০০

চতুর্মুখ
চেনা অচেনা — ৫·০০

শ্রীপারাবত
মহা প্রেম — ৭·০০

মিহির মুখোপাধ্যায়
কালপুরুষ — ৮·৫০

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী
উলঙ্গ আত্মা — ৯·০০

*** কিশোর গ্রন্থ ***

অমরনাথ রায়
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ — ১·৭৫
মনীষী আশুতোষ — ২·০০
ভারত আমার — ৩·০০
বঙ্গ আমার — ৩·০০

*** কৃষি-বিজ্ঞান ***

শুধু মশালে নয় — ১·৫০
মোহিত রায়
[ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত]

বিদ্যা ভারতী
৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা—৯
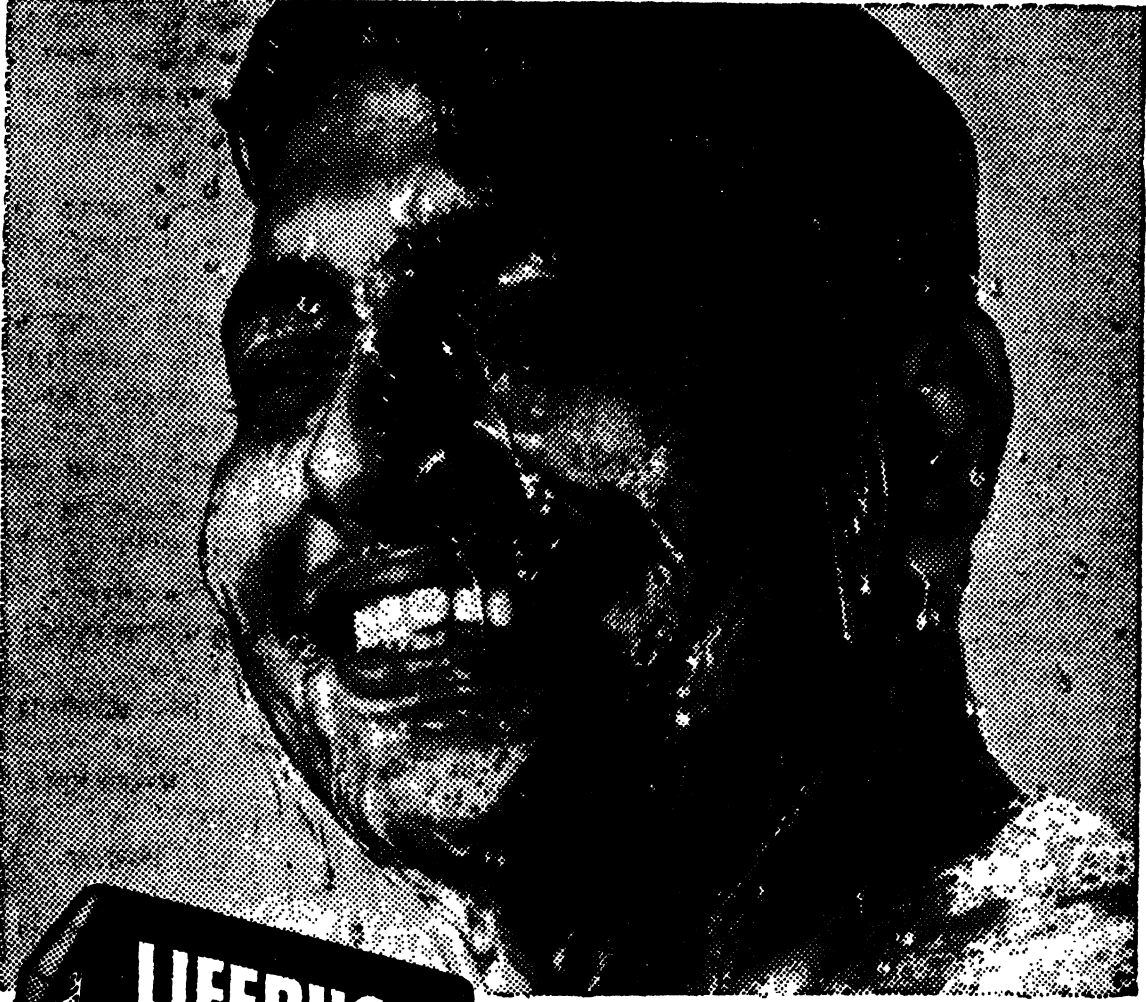
লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন। এই
চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের
সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে!

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজানু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

লিনটাস-L. 51-140 BG

॥ ৪৮ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৭৬ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ॥

ব্রহ্ম

সদাশিব বলেছেন—

'একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারমনুপাগমাৎ।
ধ্যানার্থং স্বাত্মভক্তানাং সৃষ্ট্যাদৌ পঞ্চমূর্তিভিঃ
সূর্যো গণপতির্বিষ্ণুর্মহেশো ভগবত্যপি।
পঞ্চৈতা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রুতিভিঃ ব্রহ্মমূর্তয়ঃ ॥'

এই একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ ধ্যানের সুবিধার জন্যই শিবাদি পঞ্চদেবতাকে ব্রহ্মমূর্তি বলেন। এই সর্বত্র বিরাজমান একমাত্র নিরাকার নির্গুণ পরমাত্মা সাধকের নিরতিশয় আগ্রহে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য ও গণপতি রূপে (শিবাদি পঞ্চদেবতারূপে) সগুণ বা সাকার দেবতাকারে আবির্ভূত হন। তাই শাস্ত্রে বলেছেন—

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো মূর্তিকল্পনা ॥'

উপাসকগণের সিদ্ধিলাভের জন্য চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল (অখণ্ড), অশরীরী ব্রহ্মের মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে—ব্রহ্ম নিজেই সেই কল্পনা করেছেন।

এই পঞ্চদেবতার উপাসকগণই শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, আর গাণপত্য বলে পরিচিত। ক্রমোন্নত সাধনার ফলে এ'রাই জ্ঞানলাভ করে অদ্বৈত নির্গুণ সত্তারূপ ব্রহ্মসাগরে বিলীন হতে পারেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছেন—'দ্বে ব্রহ্মণোরূপে মূর্তং চামূর্তং চ'—মূর্ত এবং অমূর্ত ভেদে ব্রহ্মের দুটি রূপ; মূর্তরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অমূর্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই দুই রূপেই তিনি বিরাজ কচ্ছেন। এর যে কোনটির আশ্রয় নিলেই মুক্তি হতে পারে—ইহাই শিববাক্য।

যোগশাস্ত্র বলেছেন—মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি এবং সহস্রারে সদাশিব সতত অবস্থান কচ্ছেন। এই উভয়ের ঐক্যসাধন ॥ একত্র মিল করার নামই ব্রহ্মতত্ত্ব। প্রকৃতি ও পুরুষের এই ঐক্য বা একাত্মতা একমাত্র সমাধিতেই অনুভূত হয়; তাই সমাধিস্থ যোগী ছাড়া অন্য কারুই ব্রহ্ম স্বরূপ বা ব্রহ্ম জ্ঞান বোধ হয় না। যাঁরা সর্বত্র সমদর্শী, অর্থাৎ রাগ দ্বেষ, প্রেম ঘৃণা-রূপ উভয় ভাব বর্জিত—শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে নির্লিপ্ত, সংকল্প বিকল্পহীন, অহঙ্কার মানাপমানহীন—তাঁরাই সমাধিস্থ হয়ে এই ব্রহ্ম স্বরূপ উপভোগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়; এইরূপ 'নেতি নেতি' বিচার করতে করতে মন যখন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়—তখন ঠিক ধারণা হয় ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এসব স্বপ্নবৎ। নেতি নেতি করে বিচার করতে করতে আমি টামি আর কিছুই থাকে না—প্যাঁজের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে যেমন ভেতরে আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে নিজের আমিই খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে কিরূপ হয়, কে বলবে? একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবে?

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ-টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলে বোধ হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (The Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। একজন বলেছিল—সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। রামগীতায় আছে, —কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বলা যায়, যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর আছে এই কথা বলে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।

কথামৃত
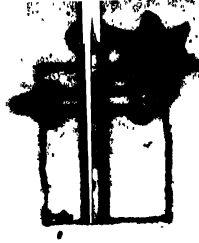
"তিন গুণই তাঁতে আছে—কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। যেমন বায়ু : সুগন্ধ দুর্গন্ধ বায়ুতে সবই আসছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। বেদে পুরাণে আছে—'তিনি আনন্দ স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। তিনি বাক্য মনের অতীত।' কিছু বুঝতে পারলে? সাগর দেখে এসে কেউ যদি বলে—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল, কল্লোল!'—তাতে সাগরের কি বুঝবে?

"তিনি অচল, অটল। নিষ্ক্রিয়, বোধ স্বরূপ। এই নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই ব্রহ্ম বলে কই। যখন সক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এই সব কাজ করেন—তখন শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা ; জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা।

"বেদে আছে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম একও নয়, দুইও নয়। এক-দুয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তবে অস্তি-নাস্তির মধ্যে। তাঁতে সব সম্ভবে। চিল শকুনি যত উপরে উঠুক না কেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না। যদি জিজ্ঞাসা করো, ব্রহ্ম কেমন, তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হলেও মুখে বলা যায় না। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম, আর কিছু নাই। তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তাঁর ইতি নাই, শেষ নাই।

"ন্যাংটা উপদেশ দিতো—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ। যেমন অনন্ত সাগর—ঊর্ধ্বে, নীচে, ডাইনে, বামে, জলে জল, কারণ সলিল। জল স্থির—কার্য হল তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য। আবার বলতো, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায়, সেই-ই ব্রহ্ম। যেমন কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।

"জ্ঞানী বলেন,—শব্দই ব্রহ্ম ; অনাহত শব্দ। এই শব্দের যিনি প্রতিপাদ্য, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই বাচ্য, তিনিই বাচক। তিনিই একমাত্র সৎ—এইটি জানার নাম জ্ঞান।

"জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাকেই আত্মা বলে, ভক্তেরা তাকেই ভগবান বলে। যেমন একই ব্রাহ্মণ—যখন সে পূজা করে তখন তার নাম পূজারী, আর যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন।

"সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম) যেন অনন্ত জলরাশি। ঠাণ্ডা দেশে মহাসাগরের জল যেমন বরফ হয়ে যায়, তেমনি ভক্তি হিমে সেই সচ্চিদানন্দ (সগুণ ব্রহ্ম) ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন—তাঁর সংগে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শরীর 'ভাগবতী তনু' দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়।

"আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙমনসোগোচর : অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর ; তাঁর স্বরূপ মুখে বলা যায় না ('যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ')। এখানে মন মানে বিষয়াসক্ত বৈষ্ণব চরণ বলতো, 'তিনি বিষয়াসক্ত মনের অগোচর বটে, [...] শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।' সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গ[...] উপদেশ, এ সকল দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে তখন তাঁর দর্শন হ[...]

"সাত দেউড়ির পর রাজা। প্রত্যেক দেউড়িতে এ[...] মহাবীর্যবান পুরুষ বসে আছেন। প্রত্যেক দেউড়িতে [...] জিজ্ঞাসা করছে—এই কি রাজা? গুরু বলছেন—না ; [...] নেতি। সপ্তম দেউড়িতে গিয়ে যা দেখলে, একেবারে অব[...] আনন্দে বিহ্বল। আর জিজ্ঞাসা করতে হলো না : [...] সংশয় চলে গেল।

"ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। [...] অগ্নির কোন রঙ্ নাই ; অগ্নিতে যে রঙ্ ফেলে দেবে [...] রঙ্ দেখাবে। ব্রহ্মও তেমনি শক্তিতে নানা হয়েছেন। [...] তিন গুণেরই অতীত। নেতি নেতি করে যা বাকী থাকে, যেখানে আনন্দ,—সেই ব্রহ্ম। যেখানে ঠিক ব্রহ্ম জ্ঞান সে[...] চুপ্।

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে। জ্ঞা[...] ভক্তি আছে, আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে ; সৎও আছে, অস[...] আছে ; ভালও আছে, মন্দও আছে ; সুখ আছে, আবার দুঃ[...] আছে। এ সবই জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম অলেপ। তিন গু[...] তাঁতে আছে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, বি[...] অবিদ্যা—এসব জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না—যে[...] বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুই-ই পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা [...] করছে—প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের উপরও আলো দি[...] আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।

"যতক্ষণ তাঁর লীলার মধ্যে থাকা যায় ততক্ষণ দুটো ব[...] বোধ হয়। জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে তিনি যা তাই! [...] হ্যায়, সো হ্যায়!

"নিরাকার ব্রহ্মও সাক্ষাৎকার হয়। তবে বড় কঠিন। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে—রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—সমস্ত ত্যাগ হলে—মনের লয় হলে, ত[...] অনুভবে বোধে বোধ হয়। আর অস্তি মাত্র জানা যায়।

"তাই বলে—ব্রহ্মবস্তু দুর্জ্ঞেয় ; জাগতিক জ্ঞানের অতীত তিনি নিত্য, সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত।"

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ (ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়, জীবজগৎ, এ সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে [...]
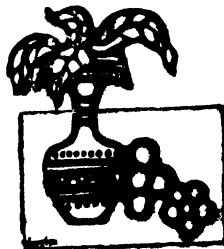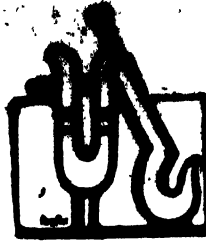
সব স্বপ্নবৎ ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু ; শক্তিও স্বপ্নবৎ—অবস্তু।

"কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। শক্তিমান আর তার শক্তি। একটি মানলেই আরেকটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি ; সূর্য আর তার রশ্মি ; মণি আর তার জ্যোতি ; সাপ আর তার তির্যগ গতি ; জল আর তার হিম শক্তি। এদের একটিকে ছেড়ে অন্যটিকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না।

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। তিনিই কৃষ্ণ। একই বস্তু—মূল এক ; তাঁরই সমস্ত খেলা, লীলা। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। একই সচ্চিদানন্দ, শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানা রূপ।

"যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপর দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না—যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় না ; বাদ্যকে ছেড়ে বাজনা হয় না। শক্তি বললেই ব্রহ্ম আছেন বুঝা যায়।

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

'প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ নারে মন ঠারে ঠারে॥'

'আমি তত্ত্ব করি যারে'—অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মেরই তত্ত্ব করছি ; তাঁরেই 'মা' 'মা' বলে ডাকছি। রামপ্রসাদ আরো বলেছেন—'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি ; পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী। জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল। সাপ এঁকেবেঁকে চললেও জল সাপ, আবার চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ।

"যতক্ষণ আমি আছে—ভেদবুদ্ধি আছে—ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এই সগুণ ব্রহ্মকেই আদ্যাশক্তি বা কালী বলেছে। কালী আর কেউ নয়—যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। ব্রহ্ম, আর কালী—আদ্যাশক্তি অভেদ।

"সীতা হনুমানকে বলেছিলেন—'বৎস, আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি ; একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী ; একরূপে ব্রহ্মা, একরূপে ব্রহ্মাণী ; একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী হয়ে আছি'। লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর হনুমান রামকে স্তব করেছেন—'হে রাম, তুমিই পরব্রহ্ম, আর সীতা তোমার শক্তি ; কিন্তু তোমরা দুজনে অভেদ।"

ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট (এঁটো) হয় নাই

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল আজ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই ; সে বস্তুটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই। তাঁকে দর্শন হলে মানুষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়—চুপ হয়ে যায় ; খবর কে দেবে? আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না—যার হয়েছে সে জানে।"

ব্রহ্মগ্রন্থি

মনের বাস কপালে (মনশ্চক্রে), কিন্তু দৃষ্টি সাধারণত নিম্নের দিকে—গুহ্য, লিঙ্গ এবং নাভিতে (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরে) ; অর্থাৎ ভোগবাসনা চরিতার্থতার জন্য সংসারে এবং কামিনীকাঞ্চনেই মন ঘুরে বেড়ায়। সেজন্য মণিপুর এবং তন্নিম্নস্থ কেন্দ্রেই মনের তৎকালীন বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায়। তখন মনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না। সাধনা দ্বারা ঊর্ধ্বদৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মন এই নিম্নস্থ কেন্দ্রগুলিতেই অবস্থান করে। জীবাত্মা ও নিদ্রিত কুণ্ডলিনী মূলাধারেই পড়ে থাকে।

মূলাধার থেকে মণিপুর পর্যন্ত যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক বর্তমান। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী এই তিন স্থানের অধিপতি। ইহাই সাধনার মূলভূমি। এখান থেকেই যম নিয়মাদি যোগসাধনার সৃষ্টি বা সূত্রপাত হয়। গুরুর উপদেশানুসারে কুণ্ডলিনীর জাগরণ জন্য যোগিসাধক মণিপুরেই প্রথম ক্রিয়া সুরু করেন—নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় নাভিকুণ্ডে (মণিপুর চক্রে) মনের সংযোগ করেন।

বাঁশের যেমন গ্রন্থি বা গাঁট আছে, যেগুলি ভেদ না করলে বাঁশের ভিতর দিয়ে কিছুই নেওয়া যায় না, আমাদের শরীরে সুষুম্নাবর্ত্মেও তেমনি তিনটি প্রধান সন্ধিস্থল বা গাঁট (গ্রন্থি) আছে। এই গ্রন্থিগুলি ভেদ না করে জীবাত্মা এবং কুণ্ডলিনী সুষুম্নাবর্ত্মে ঊর্ধ্বমুখে এগুতে পারে না। এই গ্রন্থিভেদ করতে জীবকে অক্লান্ত সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই গ্রন্থি তিনটির প্রথমটি হচ্ছে ব্রহ্মাণীর অধিকারভুক্ত মণিপুর চক্র বা নাভিকুণ্ড। ব্রহ্মাণীর এলাকা বলে এই মণিপুর চক্রটিকে ব্রহ্ম-গ্রন্থি বলা হয়। অপর দুটি গ্রন্থির মধ্যে একটি হচ্ছে বিষ্ণু-গ্রন্থি ; ইহাই অনাহত ক্ষেত্র। আর একটি হচ্ছে রুদ্রগ্রন্থি ; ইহা আজ্ঞা চক্রে অবস্থিত। এই গ্রন্থিগুলি ভেদ হলে ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্মসংস্কার বিনষ্ট হয়।

মণিপুর চক্রের ঊর্ধ্বে কুণ্ডলিনীসহ মনকে এবং জীবাত্মাকে তুলতে হলে এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করতে হয় এবং ভেদ করার সঙ্গে সর্বনিম্ন ভূমি অন্নময় কোষ বা স্থূল-শরীর রূপ কর্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্রকে অতিক্রম করতে হয়। এই কুরুক্ষেত্র 'মিশ্রতম ও মিশ্র রজোগুণ-প্রধান'। ইহা দ্বারা কেবল লৌকিক ও তপাদি কর্মসমূহ সিদ্ধ হয়। এই মণিপুর কেন্দ্রে সাধনের ফলে ব্রহ্মাগ্নির বাহ্য বিকাশ হয়ে এই চক্রের সিদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়ে আত্মতত্ত্ব পরিস্ফুট হয়।

ব্রহ্মচারী ও হিংস্র সর্প

শ্রীরামকৃষ্ণ—"একটা মাঠে একটা খুব বিষধর সাপ থাকতো। তার ভয়ে সকলে খুব সাবধানে সে মাঠে যেতো। একদিন এক ব্রহ্মচারী সে মাঠের দিকে যাচ্ছেন দেখে রাখালরা দৌড়ে এসে বললে—ঠাকুরমশাই, ওদিকে যাবেন না; ওখানে একটা খুব বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বললেন—'বাবা, তা থাক; আমি মন্ত্র জানি'। এই বলে ব্রহ্মচারী সেদিকেই গেলেন। রাখালরা ভয়ে কেউ সংগে গেল না। সত্যিই একটা সাপ ফণা তুলে দৌড়ে আসছে দেখে ব্রহ্মচারী মন্ত্র পড়লেন, অমনি সেই সাপটা কেঁচোর মত পায়ের কাছে পড়ে রইল। তখন ব্রহ্মচারী সাপটাকে বললেন—'তুই কেন হিংসে করে বেড়াস, আর তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপলে আর তোর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সাপটাকে মন্ত্র দিয়ে বললেন—'এ মন্ত্র জপ কর, আর কারুও হিংসা করিস নয়; আমি আবার আসবো।' এই বলে ব্রহ্মচারী চলে গেলেন।

"কিছুদিন পরে রাখালরা লক্ষ্য করলো যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না—এমন কি ঢিল মারলেও কিছু বলে না। যেন কেঁচোর মত হয়ে গেছে। তাই দেখে একটা রাখাল তার ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো—অচৈতন্য হয়ে গেল। মরে গেছে মনে করে রাখালরাও চলে গেল।

"অনেক রাত্রে চেতনা হলে সে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে গর্তের ভিতরে গেল। অস্থিচর্মসার হয়ে ভয়ে দিনের বেলা আর বেরুত না—রাত্রে একবার আহারের চেষ্টায় বাইরে চরতে আসতো। আর হিংসা করত না; মাটি, পাতা, ফল, পাকা খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

প্রচ্ছদ পরিচিতি

কার্ল মার্ক্স

রাজনৈতিক জগৎ সম্বন্ধে যাঁরা কিয়ৎ-পরিমাণেও ওয়াকিবহাল মার্ক্সবাদ’ কথাটি তাঁদের কাছে অতি পরিচিত। যাঁর নাম এই কথাটির সঙ্গে যুক্ত সেই কার্ল মার্ক্সের উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে রত্নপ্রসূ জার্মানীর এক বিশিষ্ট, উজ্জ্বল উপহার। অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক নতুন চিন্তাধারার জনক ও ধ্যান-ধারণার উদ্ভাবক কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সারা পৃথিবীর সুধীজনের মনকে আন্দোলিত করে তুলেছে। এক স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সমাজ-চিন্তার জন্মদাতা মার্ক্স যদি আজ আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতেন তা হলে তাঁর বয়স দেড় শ’ বছর পূর্ণ হয়ে যেত।

মোসেল নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন জার্মান নগর ট্রায়ারের এক বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন মার্ক্সের বাবা। সমগ্র পরিবারটি উদার নীতির অনুসারী ছিলেন। জার্মানী এবং ফ্রান্সের সীমান্তের খুব নিকটবর্তী স্থানে এই স্থানটি অবস্থিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের রেশ তখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। সে দেশের এবং পরিবারের এই পরিবেশের মধ্যেই পুষ্ট হতে থাকেন মার্ক্স। আঠার বছর যখন বয়েস হল তখন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র হিসাবে যোগ দিলেন। আইনের পাঠ নিলেও তাঁর আসল অনুরাগ ছিল ইতিহাস ও দর্শনে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই মহান দার্শনিক হেগেলের সংস্পর্শে আসার পরই তাঁর চিন্তাধারায় সম্পূর্ণরূপে পটপরিবর্তন হয় এবং তা সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার বাসনাও ছিল মার্ক্সের কিন্তু আদর্শের ব্যাপারে সে ইচ্ছাও তাঁর পূরণ হয়নি। কলোনে গেলেন মার্ক্স। সেখানে উদারপন্থী নাগরিকদের প্রতিষ্ঠিত 'রিনিশ জিটাং' পত্রিকায় কর্ম নিলেন, পরে ঐ কাগজেরই প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হলেন তিনি। তাঁর রচনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করল পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে।

বিপ্লবের জন্মভূমি বৈপ্লবিক চেতনার লীলাক্ষেত্র পারীতে অবস্থানকালে তাঁর ভিতর কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার ছাপ পাওয়া যেতে লাগল। ১৮৪৫ সালে তৎকালীন জার্মান সরকার ফরাসী সরকারকে সম্মত করালেন এই তরুণ চিন্তানায়ককে পারী ত্যাগের নির্দেশ দিতে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করার ফলে সে স্থানও অতঃপর তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। আবার ফিরে গেলেন কলোনে, সেখানে 'নু রাইন জেটাং' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকরূপে বৃত হলেন। শেষ জীবন তাঁর কাটল লণ্ডনে।

তাঁর 'কাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল ১৮৬৭ সালে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ তিনি জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি। জেনী ফন ওয়েস্টফলেনকে তিনি জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ সালে ৬৫ বছর বয়সে এই চিন্তানায়কের তিরোধান হয়।

প্রথম যৌবনেই পৃথিবীর এক বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনার আভাস পেয়েছিলেন মার্ক্স। যুগান্তরের পদধ্বনি তাঁর কানে গিয়েছিল। নতুনের সঙ্গে তাল রেখে—তার উপযোগী সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন তিনি—সেই পটভূমিতে তাঁর সমাজ-চিন্তা ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা রূপ নিয়েছিল।

একথা যদিও আজ অনেকেই বলে থাকেন যে আজকের মার্ক্সবাদ তাঁর মূলমন্ত্র থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছে তথাপি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং এক স্বতন্ত্র ধারণার মন্ত্রোদ্গাতা হিসাবে তাঁর গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব কেউ খণ্ডন করতে পারবে না।

দশমহাবিদ্যা

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।'

—শ্রীচণ্ডী

১। কালী	৬। ছিন্নমস্তা
২। তারা	৭। ধূমাবতী
৩। রাজরাজেশ্বরী	৮। বগলামুখী
৪। ভুবনেশ্বরী	৯। মাতঙ্গী
৫। ভৈরবী	১০। মহালক্ষ্মী

'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি
নমোঽস্তুতে।
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্বস্যার্তি হরে দেবি নারায়ণি
নমোঽস্তুতে।'

—শ্রীচণ্ডী। ১১।৯, ১০, ১১

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি-
সংক্ষয়ম্।'

—শ্রীচণ্ডী। ১১।৫৫

॥ ভূমিকা ॥

[পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে দেবীর দশরূপের বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশরূপের বর্ণনা থাকিলেও তাহাকে দশমহাবিদ্যা বলা হয় নাই। কালী কৈবল্যদায়িনী নামক পুস্তকে প্রথমে 'দশমহাবিদ্যা' এই কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা বঙ্গদেশে যে দশমহাবিদ্যার পূজা করি তাহা কালী কৈবল্যদায়িনীর মতানুসারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রদত্ত দেবীর দশটি নামের সহিতও ইহার কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

এখানে দশমহাবিদ্যার যে কথা বলা হইবে তাহা ভরতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' নামক পুস্তকের অবলম্বনে। হেমচন্দ্র যদিও এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক পৌরাণিক আখ্যান ও বিবরণের সহিত মেলে না। হেমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

'দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি---'

যদিচ দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুল প্রচলিত মতটি যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে তবুও পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ মানসে হেমচন্দ্র প্রদত্ত অন্য মতটিও নিম্নে দেওয়া হইল—

মহাদেব সতী-বিরহে আত্মবিস্মৃত হইয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় যখন বিলাপ করিতেছিলেন সেই সময় নারদ সেখানে উপস্থিত হন। নারদের সঙ্গীত শ্রবণে মহাদেব তাঁহার স্বস্থভাব ফিরিয়া পান এবং সতীকে সম্মুখে বিরাজ করিতে দেখেন। নারদ সতীকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব মায়াবলে এক মহাকাশ সৃষ্টি করেন। সেই মহাকাশের উপর এক রাশিচক্র স্থাপিত হয়। সেই রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী বিভিন্ন মূর্তিতে বিরাজ করিতে থাকেন। নারদ দেবীকে আরও নিকটে পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহাদেব তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করেন এবং তিনি সেই দশ কক্ষে যথাক্রমে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী ও কমলা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার দশপ্রকার লীলা দেখিতে পান। (হেমচন্দ্র বিরচিত 'দশমহাবিদ্যার' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

এখানে এইটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে ভরতচন্দ্রের প্রদত্ত নামের সহিত হেমচন্দ্র প্রদত্ত নামের কিছু পার্থক্য আছে।]

শ্রীঅমলচন্দ্র দে

[illegible] তন্ত্রানুসারে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবিকা এইরূপ ঃ

কথিত আছে যে মহাদেব ভৃগু-ঋষির যজ্ঞে তাঁহার শ্বশুর দক্ষরাজকে অভিবাদন করেন নাই। কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ দক্ষের মনঃপূত হয় নাই। শিবের বেশ, ভূষণ, আচার, আচরণ, সঙ্গী, সহচর এবং সর্বশেষে তাঁহার বয়স শ্বশুরের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনায় তাঁহার মন্দীভূত ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। শিবকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে শিব ভিন্ন সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ জানান।

সেই যজ্ঞ দেখিবার মানসে সতী পতিসকাশে পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ত্রিকালজ্ঞ মহাদেব অবশ্যই জানিতেন সতীর পিতৃগৃহে যাওয়ার মধ্যে কি অমঙ্গল নিহিত আছে।

সুতরাং তিনি সতীকে বারবার এই বলিয়া ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করেন যে, পতির নিমন্ত্রণ ব্যতীত স্ত্রীর কোন আমন্ত্রণে যাওয়া অত্যন্ত অসম্মান-জনক এবং সমাজবিরুদ্ধ---এমন কি পিতৃগৃহে পর্যন্ত।

বালিকা-বধূ স্বভাবত এই চিন্তাই করেন যে কন্যা পিতৃগৃহে যাইবে তাহার মধ্যে সামাজিক প্রথায় নিমন্ত্রণ করার কি প্রয়োজন। বহু উপরোধ, অনুরোধ এবং যুক্তির অবতারণা করিয়াও সতী শিবকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে অসমর্থ হন। তখন ক্রোধে-অভিমানে সতী দশমূর্তি ধরিয়া

শক্তিকে ভীত, চমকিত, শঙ্কিত ও মুগ্ধ করিতে প্রয়াসী হন।

সতীর সেই দশমূর্তিই দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং বিভিন্ন মাতৃসাধক তাঁহার সংস্কারের অনুকূলে এই দশমূর্তির একটিকে আপনার আরাধ্য ইষ্টজ্ঞানে পূজা করিয়া দেবীকৃপা লাভে সমর্থ হন।

সতী যে বিভিন্ন দশরূপ ধারণ করিয়া শিবসকাশে প্রকটিত হ'ন সেই দশমূর্তির মধ্যে প্রতিটির সহিত অন্যের বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মূর্তির বর্ণ, হস্ত, আয়ুধ, আসন, কেশ, বেশ, ভূষণ, নয়ন, দেহ, অবস্থান, জিহ্বা, শিরোভূষণ ইত্যাদি পৃথক পৃথক।

নিম্নে সেই পার্থক্যগুলি দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে—

কালী

মেঘবর্ণা, চতুর্ভুজা (দুই বাম হস্তে যথাক্রমে রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড ও উদ্যত খড়্গ; দক্ষিণ দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা); শিবারূঢ়া, মুক্তবেণী, অস্থিবসনা, মুণ্ডমালাবিভূষণা, ত্রিনয়নী, যৌবনসম্পন্না, শ্মশানবাসিনী, লোলজিহ্বা, ঘোরদংষ্ট্রা মুকুটধারিণী, দিগম্বরী, রক্তালিপ্তা; নৃত্যপরা, হসন্মুখী, ভূতপ্রেত পরিবৃতা, ভ্রূকুটি কুটিলাননা, পীনোন্নত পয়োধরা ইত্যাদি।

তারা

নীলবর্ণা, চতুর্ভুজা (দুই বাম হস্তে কাতি ও খর্পর এবং দুই দক্ষিণ হস্তে নীলপদ্ম ও উদ্যত খড়্গ), শিবারূঢ়া, জটাযুক্তা, উর্ধ্বাজ উন্মুক্ত এবং পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, সর্পভূষণভূষিতা, ত্রিনয়নী, খর্বদেহা, লোলজিহ্বা, লম্বোদরী, যৌবনসম্পন্না, দণ্ডায়মানা, সর্পমুকুটশোভিতা।

রাজরাজেশ্বরী

রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা (বাম দুই হস্তে ধনু ও অঙ্কুশ এবং দক্ষিণ দুই হস্তে শর ও পাশ), শিবের নাভিজাত পদ্মোপরি উপবিষ্টা, উন্মুক্তকেশা, রত্নালঙ্কারভূষিতা, [illegible], ত্রিনয়না, যৌবনসম্পন্না, স্মিতমুখী, মুকুটধারিণী, ভালে চন্দ্রশোভিতা। দেবীর মঞ্চের নিম্নে বিধি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, মহেশ ও রুদ্রের অবস্থান।

ভুবনেশ্বরী

রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা (বামে পাশ ও অভয় এবং দক্ষিণে অঙ্কুশ ও বরমুদ্রা), পদ্মাসনা (বামপদ অম্বুজে স্থাপিত), আলুলায়িত ও কুঞ্চিত কুন্তলা, বস্ত্র পরিহিতা, নানালঙ্কারশোভিতা, ত্রিনয়নী, স্মেরমুখী, তুঙ্গকুচা, মুকুটধারিণী।

ভৈরবী

রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা (বামে পুঁথি ও অভয় এবং দক্ষিণে অক্ষমালা ও বরমুদ্রা), তড়াগস্থ পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা, আজানুলম্বিত দীর্ঘকেশ, বস্ত্র পরিহিতা, গলে মুণ্ডমালা তথা অঙ্গে নানা ভূষণ, যৌবনসম্পন্না, স্মিতমুখী, মুকুটধারিণী।

ছিন্নমস্তা

দ্বিভুজা। দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা নিজের মস্তক খণ্ডিত করিয়া বাম হস্তে তাহা ধারণ করিয়াছেন। ছিন্নগ্রীবা হইতে তিনটি রক্তের ধারা উদগত হইয়া একটি নিজ হস্তস্থিত ছিন্নমুণ্ডের মুখগহ্বরে পতিত হইতেছে, অপর দুইটি রক্তধারা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ডাকিনী ও যোগিনীর মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। দেবী বিপরীত-রতিকাম আসনে দণ্ডায়মানা, উন্মুক্ত কেশা, দিগম্বরী, অস্থিমালা এবং নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, ত্রিনয়নী, পীনোন্নতপয়োধরা, ষোড়শী, মহাঘোরা এবং রজ-সত্ত্ব-তম রেখা দ্বারা যোনিমণ্ডল শোভিতা। ডাকিনী ও যোগিনী সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী, মুক্তকেশী ও বিলম্বিত স্তনযুক্তা।

টিপ্পনী—

দেবী ছিন্নমস্তার একটি রূপক ব্যাখ্যা আছে। দেবীকৃপা বা ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিতে হইলে সমস্ত ঐন্দ্রিক ও জাগতিক সুখের বিসর্জন দিতে হয়—এ কথা সর্বশাস্ত্রসম্মত। ইহা ব্যতীত [illegible] সুখের আস্বাদনে মগ্ন থাকে। জাগতিক সমস্ত সুখের পরাকাষ্ঠা হইতেছে রমণসুখ। দেবী সেই আপাতমধুর সুখকে পদদলিত করিয়া নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। সুতরাং সাধককেও এইভাবে সমস্ত জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখকে পদদলিত করিয়া সাধনার শীর্ষমার্গে উঠিতে হইবে, তবেই সে সেই বিমলানন্দের আস্বাদন পাইবে।

এখানে মুণ্ডচ্ছেদের অর্থ হইতেছে অহংকারের মুণ্ডচ্ছেদ। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে অহংত্ব ও মমত্ব বোধ আছে ততক্ষণ আমাদের অন্তরাস্থিত আনন্দময় সত্তা আবরিত থাকে। সাধক যে মুহূর্তে আপনার অহংভাব নষ্ট করে সেই মুহূর্তেই তাহার অন্তর হইতে রুদ্ধ আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই আনন্দধারায় আপ্লুত হইয়া সাধক ভূমা সুখের আস্বাদনের অধিকারী হয়। সে শুধু নিজে আনন্দধারা পানে তৃপ্ত হয় না। যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসে, সাধকের সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা হেতু আগন্তুকের সত্ত্বগুণ অন্তত তৎকালিক বৃদ্ধি পায় এবং আগন্তুকও সেই সাধনলব্ধ আনন্দধারা পানে তৃপ্ত হ'ন। দেবী পার্শ্বস্থিতা ডাকিনী ও যোগিনী —যাহাদের মুখে দেবীর দুইটি রক্তধারা প্রবেশ করিতেছে তাহারা এই আগন্তুকবৃন্দের প্রতীক।

ধূমাবতী

ধূম্রবর্ণা, দ্বিভুজা (বার্ধক্যজনিত এক হস্ত কম্পমান এবং অন্য হস্তে কুলা), কাকধ্বজরথারূঢ়া, কর্তিত কেশ, স্খলিতবসনা, নিরাভরণ বিধবার বেশ, ক্ষুধাতুরা, অতিবৃদ্ধা, স্থূলাঙ্গী, স্তনলম্বমানা।

টিপ্পনী

ধূমাবতী সম্বন্ধেও একটি আখ্যায়িকা আছে। কথিত আছে, পার্বতী একদিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া শঙ্করের নিকট আহার্য প্রার্থনা করেন। শঙ্করের বিলম্ব হওয়ায় দেবী ক্রোধবশত তাঁহাকে গ্রাস করেন। ইহার ফলে

দেবীর দেহ ... ভক্ষণ করিয়া দেয়। ... মহাদেব তখন দেবীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন—'যখন তুমি আমাকে গ্রাস করিয়াছ তখন তোমাকে বিধবার বেশ ধারণ করিতেই হইবে। তবুও তুমি আমার অমোঘ আশীর্বাদে কুরূপা বৃদ্ধা হইয়াও ধূমাবতী রূপে জগৎপূজ্যা হইবে।

বগলামুখী *

পীতবর্ণা, দ্বিভুজা (এক হস্তে অসুরের জিহ্বা ধারণ এবং অন্য হস্তে উদ্যত মুদগর), রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা, পীতবস্ত্র পরিধানা, ত্রিনয়নী, ভালে অর্ধচন্দ্র শোভিতা।

মাতঙ্গী

বর্ণশ্যামা, চতুর্ভুজা (খড়্গ, চর্ম, পাশ ও অঙ্কুশ), রত্ন পদ্মাসনে স্থিতা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, ত্রিলোচনা।

মহালক্ষ্মী

স্বর্ণকান্তি, চতুর্ভুজা (দুই হস্তে পদ্ম ও অন্য দুই হস্তে বরাভয় মুদ্রা)। দেবীর চারিপার্শ্বে চারিটি শ্বেত হস্তী জলকেলিরত। রত্নঘট শুণ্ডে ধারণপূর্বক তাহারা দেবীর অভিষেক করিতেছে। দেবী অপ্রসন্ননয়না, অম্বুজ-আসনা, অতিসুন্দরী, প্রশান্ত মুখচ্ছবি ও রমণীয়া।

●

দশমহাবিদ্যার দশদেবী মূর্তির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়—

হস্ত—

কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী—চতুর্ভুজা।

ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী ও বগলামুখী—দ্বিভুজা।

... কালীর ... হস্তে ..., ... দুই হস্তে কাটারি ও খড়্গ; রাজরাজেশ্বরীর চারি হস্তে ধনু, অঙ্কুশ, শর ও পাশ; ভুবনেশ্বরীর দুই হস্তে অঙ্কুশ ও পাশ; ছিন্নমস্তার এক হস্তে খড়্গ; ধূমাবতীর এক হস্তে কুলা; বগলার এক হস্তে মুদগর, মাতঙ্গীর চারি হস্তে খড়্গ, চর্ম, পাশ ও অঙ্কুশ।

মুদ্রা—

কালী, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী ও মহালক্ষ্মীর দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা।

অবস্থান—

কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতী দণ্ডায়মানা।

রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী উপবিষ্টা।

কেশ—

সকল দেবীরই মুক্তকেশ; তবে ধূমাবতীর কর্তিত, তারার জটাযুক্ত এবং ভৈরবীর অতিদীর্ঘ।

বস্ত্র—

কালীর ঊর্ধ্বাঙ্গ বস্ত্রশূন্য ও নিম্নাঙ্গ অস্থিমালায় আবৃত। তারার ঊর্ধ্বাঙ্গ বস্ত্রশূন্য ও নিম্নাঙ্গে বাঘছাল পরিহিতা; ছিন্নমস্তা ও তদীয়া দুই সখী উলঙ্গিনী, ধূমাবতী স্খলিতবসনা স্তন দৃশ্যমানা;

রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলামুখী, (পীতবস্ত্র), মাতঙ্গী (রক্তবস্ত্র) ও মহালক্ষ্মী সকলেই মনোরম বস্ত্রে আচ্ছাদিতা।

জিহ্বা ও আনন—

কালী ও তারার লোলজিহ্বা; কালী—হসন্মুখী; রাজরাজেশ্বরী—স্মিতমুখী; ভুবনেশ্বরী—স্মেরমুখী; ভৈরবী—স্মিতমুখী; ছিন্নমস্তা—ভয়ঙ্করী; ধূমাবতী—কুরূপা বৃদ্ধা; মহালক্ষ্মী—প্রশান্তবদনা। অন্য দেবীর উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না।

... কালী—মেঘবর্ণা; তারা—নীলবর্ণা; রাজরাজেশ্বরী—রক্তবর্ণা; ভুবনেশ্বরী—রক্তবর্ণা; ভৈরবী—রক্তবর্ণা; ধূমাবতী—ধূম্রবর্ণা; ছিন্নমস্তা—মসীবর্ণা; বগলামুখী—পীতবর্ণা; মাতঙ্গী—শ্যামা; মহালক্ষ্মী স্বর্ণবর্ণা।

ভূষণ—

কালী—মুণ্ডমালা-বিভূষিতা; তারা—সর্পভূষণ-ভূষিতা; ভৈরবীর অঙ্গে অলঙ্কার কিন্তু গলায় মুণ্ডমালা; ছিন্নমস্তা—মুণ্ডাস্থিমালা শোভিতা; ধূমাবতী—নিরাভরণা; অন্য দেবীগণ সালঙ্কারা।

মুকুট—

সকল দেবীরই মস্তক মুকুটশোভিত। শুধু তারার সর্পমুকুট ও ধূমাবতী বিধবার বেশে মুকুটশূন্যা।

আসন—

কালী—শিবারূঢ়া; তারা—শিবারূঢ়া; রাজরাজেশ্বরী—পদ্মাসনা; ভুবনেশ্বরী—অম্বুজ-আসনা; ভৈরবী—পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা; ছিন্নমস্তা—বিপরীত-রতিকামের উপর দণ্ডায়মানা; ধূমাবতী—কাকধ্বজ রথোপরি দণ্ডায়মানা; বগলামুখী—রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা; মাতঙ্গী—রত্নপদ্মাসনে আসীনা; মহালক্ষ্মী—অম্বুজ-আসনা।

●

দেবীর বিভিন্ন দশমূর্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহারই অনুসারে নিম্নলিখিত দশটি স্তব দেওয়া হইল।

কালী

মুণ্ডমালা গলে শোভে, লোলজিহ্বা, দিগম্বরী,
শিবারূঢ়া, চতুর্ভুজা, ঘোরদংষ্ট্রা মহেশ্বরী ॥ ১
কটিদেশে অস্থিবাস, রুদ্ররূপা ভয়ঙ্করী,
নৃত্যপরা, রক্তলিপ্তা, শিরাসাথী, নিশাচরী ॥ ২
বামহস্তে খড়্গ-মুণ্ড, দক্ষিণে চ বরাভয়,

---

* দেবীসূক্ত পাঠ নিয়মের মধ্যে এইরূপ বর্ণনা আছে—চণ্ডী দ্রষ্টব্য।

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীত বর্ণাম্। পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং দেবীং স্মরামি ধৃত মুদগর বৈরি জিহ্বাম্ ॥

১, মহাকালী, শ্মশান
যস্যা আলয় ॥ ৩

মুক্তবেণী, ত্রিনয়নী, কালী করালবদনী,
ভীমরূপা, মহাদেবী, চণ্ডমুণ্ড
বিনাশিনী ॥ ৪

রোষে কম্পমান দেহ, জ্বলে বহ্নি ত্রিনয়নে,
রক্তবীজ শোণিতপায়ী,
ভ্রূকুটি কুটিলাননে ॥ ৫

বাহিরে নিষ্ঠুরা দেবী, অন্তরে চ মধুস্করা,
জগদ্ধাত্রী, বিশ্বহন্ত্রী, বিশ্ববন্দ্যা,
পরাৎপরা ॥ ৬

যৌবন-সম্পন্না দেবী, পীনোন্নত পয়োধরা
সংহাররূপিণী মাতা,
চকিতাশ্চ বসুন্ধরা ॥ ৭

অট্টাট্টহাসিনী দেবী, ভূতপ্রেত পরিবৃতা,
ভয়ঙ্করী মহাকালী, দেবাসুরৈশ্চ
পূজিতা ॥ ৮

কালী, কালী, মহাকালী, কালিকে
ভক্তবৎসলা,
অনিত্যেষু চিরনিত্যা,
চঞ্চলেষু অচঞ্চলা ॥ ৯

তারা

খর্বদেহী, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃতা,
নীলবর্ণা, লোলজিহ্বা, তারারূপে
জগন্মাতা,
চতুর্ভুজা, মুক্তবেণী, সর্পভূষণ ভূষিতা,
শিবারূঢ়াং নমস্তভ্যং, তারারূপী
জগন্মাতা
ঊর্ধ্ব হস্তে খড়গ, কাতি, অধোঃ
পদ্ম চ খর্পর,
ত্রিনয়নী, জটাযুক্তা, ভয়ভীত চরাচর।

রাজরাজেশ্বরী

রক্তবর্ণা, ত্রিলোচনা, ভালে শোভে সুধাকর
চতুর্হস্তে শোভে মা তোর পাশাঙ্কুশ
ধনুঃশর,
শিবনাভিজাত পদ্ম তদুপরি অবস্থান,
স্মিতমুখী, মুক্তকেশী, শান্ত করে ভক্ত প্রাণ
সালঙ্কারা, ত্রিনয়নী, বস্ত্রাভরণ ভূষিতা,
যৌবনসম্পন্না মহাদেবী
শিরমুকুট শোভিতা ॥
দেবী মঞ্চ অধোস্থিত, রুদ্রাদি পঞ্চদেবতা,
বিধি, বিষ্ণু, ঈশ্বরৈশ্চ দেবী
নিত্য পূজিতা ॥

ভুবনেশ্বরী

অম্বুজ আসনে বসি, একপদ পদ্মে রাখি
রক্তবর্ণ। শোভে মাতা ভুবন-ঈশ্বরী।
পাশাঙ্কুশ, বরাভয় চারি হস্তে শোভা পায়,
তুঙ্গকুচা, স্মেরমুখী ভক্তের প্রহরী।
রত্ন, অলঙ্কার, বেশ সবই সুশোভন,
কুঞ্চিত সে কেশদাম, গম্ভীর আনন॥

ভৈরবী

চতুর্ভুজা, দীর্ঘকেশা, মুণ্ডমালা গলে,
দাঁড়াইয়া আছে দেবী রক্ত শতদলে,
দুই হস্তে বিতরিছে ভক্তে বরাভয়,
অক্ষমালা, পুঁথি তার করে শোভা পায়,
রক্তবর্ণা, স্মিতমুখী, সুন্দর নয়ন,
হস্ত, দেহ, শিরে শোভে বিবিধ ভূষণ॥

ছিন্নমস্তা

রতি কামে অধোরাখি, ঊর্ধ্বে অবস্থান,
নিজ মুণ্ড ছিন্ন করি রক্ত করে পান;
উদগত রক্তের ধারা নিজ মুখে ধায়,
ডাকিনী, যোগিনী, মুখে দুই ধারা যায়;
মুক্তকেশী, দিগম্বরী, দ্বিভুজা জননী,
ভীমরূপা, উলঙ্গিনী, ডাকিনী, যোগিনী;
অস্থিমালাধরা দেবী, মুণ্ডমালা গলে,
নাগযজ্ঞোপবীত তার অঙ্গোপরি দোলে;
ষোড়শবর্ষীয়া দেবী, বক্ষপীনোন্নত,
রজ-সত্ত্ব-তমো রেখা যোনি সুশোভিত।

ধূমাবতী

অতিবৃদ্ধা, ধূম্রবর্ণা, বিধবার বেশ,
শিথিলাঙ্গ, রথারূঢ়া, স্বল্প তার কেশ;
বার্ধক্যের বশে তার হস্ত কম্পমান,
এই কি সে সেই সতি! চিত্ত সন্দিহান্;
স্থূলাঙ্গী হয়েছে দেবী, স্তন লম্বমান,
ভূষণরহিতা দেবী, পরিধানে থান;
এক হস্তে শোভে কুলা, ক্ষুধায় কাতর,
কাকধ্বজা শোভে তার রথের উপর ॥

বগলামুখী

অঙ্গে ধরি পীতবস্ত্র, রত্ন সিংহাসনে,
পীতবর্ণা শোভে দেবী প্রফুল্ল আননে;
অসুরের জিহ্বা দেবী এক হাতে ধরি
ভীমকায় মুদগরেরে উত্তোলন করি;
বগলারূপেতে সতী আবির্ভূতা হয়,
ও রূপ দেখিয়া শিব মনে পায় ভয়।

মাতঙ্গী

খড়্গ, চর্ম, পাশাঙ্কুশ চতুর্ভুজে ধরি,
শ্যাম অঙ্গে রক্তবস্ত্র পরিধান করি,
রত্ন পদ্মাসনে শোভে দেবী ত্রিলোচনা,
মাতঙ্গী রূপেতে মাতা, দেবী সুলোচনা,
ভক্তবাঞ্ছা, কল্পতরু, প্রফুল্ল আননে,
চমকিত, ভয়ভীত, শিব মনে মনে॥

মহালক্ষ্মী

স্বর্ণকান্তি দেহচ্ছটা, অম্বুজ আসন,
দুই হস্তে করে দেবী কমল ধারণ;
অন্য দুই হস্তে করে বরাভয় দান,
সালঙ্কারা শান্তমূর্তি স্নিগ্ধ করে প্রাণ,
চারিদিকে শোভে তার চারি শ্বেত করি,
জলসিক্ত অভিষেকে রত্নঘট ধরি।

বাঙালীর মাতৃপূজা

পরিশেষে একথা বলিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বাঙালী মাতৃসাধকের মাতৃ-আরাধনার পথ ও প্রণালী একটু ভিন্ন এবং তাহার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মাতৃপূজা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বিভিন্ন নামে সেই সকল স্থানে দেবীর পূজা হয়।

যথা—সিংহলে দেবযোহিনী এবং সিন্ধুতে মরুতীর্থ হিংলাজ। ভারতের মধ্যে বিমলা (পুরুষোত্তমে), বিরজা (উড়িষ্যায়), কামাখ্যা (আসামে), কালিকা (বঙ্গদেশে), মহেশ্বরী (অযোধ্যায়), অন্নপূর্ণা (বারাণসীতে), গয়েশ্বরী (গয়াক্ষেত্রে), ভদ্রকালী (কুরুক্ষেত্রে), কাত্যায়নী (বৃন্দাবনে), মহামায়া (দ্বারকায়), মহেশ্বরী (মথুরাতে), কন্যাকুমারী (কুমারিকা অন্তরীপে) ইত্যাদি।

কিন্তু যতদূর জানা যায় এই সকল স্থানেই অন্য দেবতার পূজার ন্যায় মাতৃপূজায়ও উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ বর্তমান। মাতৃভাবে দেবীকে চিন্তন ও পুত্রসুলভ ব্যবহার বোধ হয় বাঙলার একান্ত নিজস্ব ভাবধারা। তাই দেখি খ্যাত নামা বাঙালী মাতৃসাধকগণ, যথা—বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, অন্নাক্ষ্যাপা,

রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, অন্নদা ঠাকুর, নিগমানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ—পুত্র যেমন গর্ভধারিণী মায়ের কাছে আবদার করে, অভিমান করে, সময়ে ক্রোধ প্রকাশ করে, সেইভাবে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ভাবের ঘোরে মাকে গালি এমন কি প্রহার করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। মায়ের মুখে হাতে করিয়া প্রসাদ দেওয়া, কখনও বা উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত প্রদান করা আর কোথাও দেখা যায় না।

ইহার কারণ যে সেইসব সাধকগণ অন্তর হইতে বিশ্বাস করিতেন যে মা কখনও পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না। শাস্ত্রবিহিত পূজার আচারবিধি তাঁহারা অনেক সময় উপেক্ষা করিয়াছেন, এই বিশ্বাসে যে মা অন্তর দেখেন, বাহিক লোকাচার যাই হোক না কেন। প্রাণের আকূতি দিয়া 'মা-মা' ডাকে তাঁহারা আরাধ্যা দেবীকে বিগলিত করিয়াছেন।

এখনও সেই গুরুপরম্পরা-প্রদর্শিত ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহু বাঙালী সাধক মায়ের পূজা করেন। মাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করা, কখন গালি-ভর্ৎসনা করা, আবার দরবিগলিত চক্ষে আলিঙ্গন ও চুম্বনে ভরিয়া দেওয়া আর কোথাও তো দেখা যায় না। ইহা কোন তুলনামূলক আলোচনা নহে। এক সাধকের সহিত অন্যের তুলনা করার মতন মূর্খতা আর নাই। এ শুধু দেখান বাঙালী কি ভাবে মাকে একান্ত ঘরোয়াভাবে আরাধনা করে।

বাঙালীর কয়েকটি বলবার আছে যথা 'মায়ামুখো, মায়ের আঁচলধরা' ইত্যাদি। তাই দেখি ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে যখন বাঙালী কর্মসূত্রে ভারতের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে তখন সে হয়ত তার গর্ভধারিণী মাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু সুদূর পেশোয়ার, সিমলা, দিল্লী, মিরাট ইত্যাদি যেখানেই কয়েক ঘর বাঙালী একত্রিত হইয়াছে সেইখানেই একটি কালীবাড়ীর পত্তন করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে যে চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত তাহা ছাড়িয়া বাঙালী বাঁচিবে কি করিয়া? প্রবাসের এই কালীবাড়ী-গুলি গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপেরই নামান্তর —মায়ের সঙ্গে যে তার নাড়ীর সম্বন্ধ।

ভারতদর্শন

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জার্মানীর কৌতূহল এবং শ্রদ্ধা আজকের নয়—সোপেন-হাউয়ার ম্যাকসমূলার থেকে সুরু করে যে ভারত পথিকবৃন্দ 'ভারতদর্শন' যাত্রা করেছিলেন, তা' আজও অব্যাহত আছে।

ভারতের সঙ্গে জার্মানীর আত্মিক সম্পর্ক নিবিড়।

শ্রীমতী ক্লারিসা লিফার ভারতস্থ জার্মান দূতাবাসে পাঁচ বছর ছিলেন। নতুন দিল্লীর সুন্দরনগরে সুদীর্ঘকাল বাসকালে তিনি ভারতকে ভালবেসেছেন। নতুন ও পুরাতনের অপরূপ সংমিশ্রণ আধুনিক ভারতবর্ষ—সুপ্রাচীন মন্দির ও সর্বাধুনিক হর্ম্যরাজি, পবিত্র দেব-বিগ্রহবাহী শকট ও আধুনিক যান-সমূহ, গঙ্গোদক ও কোকাকোলার সহাবস্থান, হস্তরেখাবিচার ও সমাজতন্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস, এমন অপরূপ সমাহার বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও 'পাবে নাক তুমি।'

শ্রীমতী লিফার একখানি বই লিখেছেন, নাম 'মেমসাহেব ইন সুন্দরনগর'। এতে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর 'আবিষ্কার' লিপিবদ্ধ করেছেন জার্মান ভাষায়। হিউয়েন সাং-এর আমল থেকে যুগ যুগ ধরে রহস্যময়ী ভারতবর্ষ বিদেশীকে আকর্ষণ করেছে মোহিনী মায়ায়, যে এসেছে সে কোন দিন ভুলতে পারেনি; শ্রীমতী লিফারও ভুলতে পারছে না—কাজেই লিখতে এক রকম বাধ্য হয়েছেন।

ইনি বিদেশিনী হয়েও ভারতবর্ষের প্রেমে পড়ে গেছেন। এঁর বই পড়ে হয়তো অনেক জার্মানবাসী আসবেন স্বপ্নের ভারত দেখতে, হয়তো এর ফলে উভয় দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে। তখন শ্রীমতী লিফার হয়তো অন্য কোন দেশে থাকবেন। তবে, যেখানেই থাকুন তিনি, ভারতকে তিনি যে ভুলতে পারবেন না, এ কথা একরকম নিশ্চিত।

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিপ্লববাদের ঋত্বিক অরবিন্দ ঘোষ। ইংরিজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র বঙ্গ-সাহিত্যের দান। আর দৈনিক পত্রিকাটির মন্ত্র, ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ানস, ভারত শুধু ভারতবাসীর জন্যে, সেটিও বাঙালির উদ্ভাবন।

তুমি বিদেশী, বিজাতি, এদেশে তোমার কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই। এ দেশ তোমাকে কেউ ইজারা দেয়নি, কেউ বন্ধক রাখেনি তোমার কাছে। তুমি সামান্য অনুমতিসূত্রেও দখলিকার নও। তুমি একদম উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। তোমার প্রবেশ অনধিকার-প্রবেশ। তুমি সরে পড়ো, অপসৃত হও। যে সভ্যতার বড়াই করছ সে সভ্যতারই দাবি অন্যের বুকের উপর তুমি পাথর হয়ে চেপে বসতে পারো না। সুতরাং নেবে পড়ো, পিছু হটো।

এই মন্ত্রের থেকেই মহাত্মা গান্ধির যুদ্ধনাদ—কুইট ইণ্ডিয়া। কথাটি 'কুইট'—একটি আইনের বচন। তোমার যখন কোনো মৌল স্বত্ব নেই তখন তোমার দখলের অধিকার নেই। সুতরাং আইনের নির্দেশেই তুমি এবার পথ দেখ।

বন্দেমাতরম্-এর একটা প্রবন্ধ রাজদ্রোহাত্মক এই ওজুহাতে সরকার মামলা করল। প্রবন্ধটা যে অরবিন্দের লেখা তাই প্রমাণ করতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় সম্পাদক-প্রধান বিপিন পালের ডাক পড়ল। বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করল। আদালত-অবমাননার দায়ে তার ছ'মাস জেল হয়ে গেল।

প্রবন্ধে আছে কী? আছে সরল সত্যকথা, ইংলণ্ড ইংরেজদের জন্যে এ বলা যদি অপরাধ না হয়, তাহলে ভারত ভারতবাসীদের জন্যে এ বলা অপরাধ হবে কেন?

রথীকে বিলেতে রবীন্দ্রনাথ স্টেটসম্যান পাঠাতেন, এখন থেকে তার বদলে 'বন্দেমাতরম' পাঠাতে লাগলেন।

আর অরবিন্দের উদ্দেশে লিখলেন তাঁর 'নমস্কার।' এ নমস্কার শুধু অরবিন্দকে নয়, নমস্কার বিশ্ব-বিধাতাকে, ইতিহাস-পুরুষকে।

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
তারপরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে;
যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।

নানা ঘটনা ঘটে গেল একে-একে। চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই দলের সংঘর্ষে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা চরমপন্থী, সে তার উদার আদর্শের বেদী থেকে ধুলোয় নেমে এসে নরমপন্থী-দের সঙ্গে কলহে নিযুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, আমাদের নষ্ট করতে তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের দরকার হবে না, আমরা নিজেরাই পারব। এই আত্মহননে এই-টুকুই শুধু বৈশিষ্ট্য থাকবে যে হানাহানির সময় দুই দলই রণধ্বনি তুলব—বন্দেমাতরম্।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের ডাক এল সভাপতি হতে। উগ্রপন্থীরা ভাবল রবীন্দ্রনাথ নরমপন্থী, ইংরেজকে তারস্বরে গাল দেবেন না। তাই তারা বেনামী চিঠি পাঠাতে লাগল, যদি আপনি সভাপতিত্ব করেন তাহলে সভা চলতে দেব না, সব

তবুও করে দেখ। রবীন্দ্রনাথ ভয় পেলেন না, যেহেতু তিনি সত্যপন্থী—তিনি জানেন, 'যেটা সত্য সেটা ভালোও নয়, মন্দও নয়, সেটা সত্য'—তাই তিনি নিমন্ত্রণে রাজি হলেন।

একটা নতুন কাণ্ড করলেন। সম্মেলনে বাঙলায় ভাষণ দিলেন। এ পর্যন্ত ইংরিজি ভাষণই রেওয়াজ ছিল, রবীন্দ্রনাথ নতুন পথ দেখালেন। শুধু পথপ্রদর্শক নন, পথিকৃৎ হলেন। মাতৃভাষাকেই মহত্তর মূল্য দিলেন। তিরিশ বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে যখন পৌরোহিত্য করতে ডাকা হল, তিনি সেই বাঙলাতেই ভাষণ দিলেন। ভুললেন না ভগবানের কাছে তাঁর কী প্রার্থনা ছিল।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক
হে ভগবান।

এদিকে বোমায়-বারুদে বাঙলায় বিপ্লববাদ সশব্দ হয়ে উঠল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস-ফোর্ডকে মারতে গিয়ে ভুল করে মজঃফরপুরে মিসেস কেনেডি ও তার মেয়েকে খুন করা হল। যে-গাড়িতে বোমা ফেলা হয়েছিল সেটা কিংস-ফোর্ডের বটে কিন্তু আরোহী কিংসফোর্ডের বদলে মা-কন্যা মিসেস কেনেডি। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল আর প্রফুল্ল ধরা পড়বার আগে আত্মহত্যা করল।

সমস্ত দেশ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। কতকটা বা আনন্দে হতবাক।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, বাঙালির মনে এ আনন্দ স্বাভাবিক বহু দিন থেকে বাঙালি জাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করে নতশিরে হয়ে রয়েছে। তাই এই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার ঠাঁই পাচ্ছে না। ও সব বিচার অতিক্রম করে শুধু অপমান মোচনের তৃপ্তিই তাকে ভরপুর করে রাখছে।

সাহস ও শৌর্য, উচ্চতম আদর্শের জন্যে আত্ম-বলিদানের মহত্ত্ব—বিপ্লবী যুবকদের চরিত্রকে মনে-প্রাণে তিনি অভিনন্দিত করলেন কিন্তু গুপ্তহত্যাকে সমর্থন করতে পারলেন না। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট। বললেন, বলদর্পিত ইংরেজের গায়ের জোরের মূঢ়তার থেকে মুক্তির প্রয়োজন কে অস্বীকার করবে, কিন্তু সে প্রয়োজন মেটাতে হবে প্রশস্ত পথ দিয়ে, কোনো সঙ্কীর্ণ স্বল্প পথ দিয়ে নয়।

এ উক্তিরই সমর্থন করলেন গান্ধি। প্রাপ্তিকে মহৎ করতে হলে পদ্ধতিকেও মহৎ করতে হবে।

কর্মবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধিকে মেলাতে হবে। বললেন রবীন্দ্রনাথ, ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়লে ক্ষুরের মতো ধার, কর্মের বিরাম থাকে না, আর কর্ম অস্থির হলে ফল শুভাবহ হয় না। ধর্মের পথ দুর্গম। ঐ পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, এর পাথেয় সংগ্রহ করতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে—এর সাফল্য অন্যকে পরাস্ত করে নয়, নিজেকে পরিপূর্ণ করে।

বিপ্লবের অগ্নুদগারের মধ্যেও ঈশ্বরকে মনে রাখতে হয়, মাথায় রাখতে হয়। নচেৎ ঈশ্বর ক্ষমা করেন না।

নির্বরিণী সরকারকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ:

নিশ্চয়ই মনে রাখবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে পরিবারকে লঙ্ঘন করলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেও পাপকে আশ্রয় করি তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। দেশের যে দুর্গতি দুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করে আসছি তার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হয়ে আছে— গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করে আমরা সেকারণ দূর করতে পারব না, আমাদের পাপের বোঝা কেবল বেড়েই চলবে। এই ব্যাপারে যে সব অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হচ্ছে তাদের জন্যে হৃদয় ব্যথিত না হয়ে থাকতে পারে না—কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদের এই বেদনা দিলেন, কারণ বেদনা ছাড়া পাপ দূর হবার নয়।

দেশের লোক রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝল। আরো ভুল বুঝল যখন তিনি পূর্ব-পশ্চিমে মিলন ঘটাতে চাইলেন। লিখলেন, ইংরেজ বিধাতৃ-প্রণোদিত হয়ে তার উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাতে এসেছে, সফল না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হবে না। সে সফলতা পুব ও পশ্চিমের মিলনে বিরোধে নয়। আমাদের সকল দাবিই আমাদের জয় করে নিতে হবে, হীনতা দিয়ে নয়, মহত্ত্ব দিয়ে মনুষ্যত্ব দিয়ে ত্যাগের পথে শ্রেয়কে বরণ করে নিয়ে।

লোকেরা বিরূপ হোক কিন্তু ধর্মকে উচ্ছেদ করে দিয়ে শত্রুকে উচ্ছেদ করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ তো সাময়িক নন, তিনি সামগ্রিক। তাই তিনি অন্যায়ের প্রতিকারে অন্যায়কে উত্তেজিত না করে জাতীয়তার গণ্ডির উর্ধ্বে মহামানবের মৈত্রীর ক্ষেত্রে দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। লিখলেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন অহিংস প্রতিরোধের মহত্ত্ব।

রাজ্যটা কি একমাত্র রাজার? আমরা প্রজা, রাজত্ব কি আমাদেরও নয়? আমরা না থাকলে রাজা কোথায়? আমরা জীব, আমরা না থাকলে ঈশ্বর

কোথায়? আমরা আছি বলেই তো তাঁর এই রাজত্ব এত ঢাকঢোল। তিনি কৃপার ভাণ্ডার নিয়ে কী করবেন যদি ঢালবার জন্যে কৃপাপাত্র না থাকে? তাই অহিংস সত্যাগ্রহের প্রতিমূর্তি ধনঞ্জয় বৈরাগী গেয়ে উঠল :

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

নিশ্চয়ই—আমরা সবাই ঈশ্বরের প্রতিভাস। রাজায় প্রজায় তাই আর ভেদ নেই! সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অবিদ্বেষ। এক-এক করে সকলকে মিলিয়ে যোগফলও সেই এক।

আমরা বসব তোমার সনে
তোমার শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।

রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগীই বুঝি মহাত্মা গান্ধির অগ্রদূত।

রাজা গর্জে উঠল : তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয় বৈরাগী বললে, খেপাই বই কি, নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই যে আমার কাজ।

আবার ধনঞ্জয়কেও কেউ খেপিয়ে বেড়ায়।

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন খেপা সে,
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন বাতাসে।
গেল রে গেল বেলা
পাগলের কেমন খেলা
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন হুতাশে।

সে পাগলের থেকে মন্ত্র নিয়েছে বলেই তো ধনঞ্জয় শক্তিশালী, ধনঞ্জয় অপরাভূত।

রাজা বললে, মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয় স্পষ্ট জবাব দিলে, না মহারাজ, দেব না।

দেবে না। এত বড়ো স্পর্ধা।

যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

আমার নয়?

আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

রাজা হুঙ্কার ছাড়ল : তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয় প্রশান্তস্বরে বললে, হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না, পেয়াদার ভয়ে সবই দিয়ে ফেলতে চায়। আমি বলি, এমন কাজ করতে নেই, প্রাণ দিবি তাকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যায় অপরাধী করিসনে।

দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয় হাসিমুখে বললে, যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি, মহারাজ, সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক।

'যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।'

ধনঞ্জয় জেলে গেল, জেলে আগুন লাগল, ধনঞ্জয়ও ছাড়া পেল। এল রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা জিজ্ঞেস করল, এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয় বললে, রাস্তায়।

বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয় গম্ভীরস্বরে বললে, মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক, আমরা কোথায় লাগি?

রাজ্যও পথ—তপোবনের পথ। যে রাজা হবে সেও নিরাসক্ত হবে। ঈশ্বর শুধু ভবের হাটে বা শ্মশানঘাটেই নয়, তিনি রাজ্যপাটেও সমাসীন।

তাই তো ধনঞ্জয় গান ধরল :

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বলো ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে
ধন্য হরি রাজ্যপাটে
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।

যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি সে বুঝি? কত আর মারবেন? যন্ত্রণাকে হয় জীবন দিয়ে সহ্য করব, নয় মৃত্যু দিয়ে স্তব্ধ করব। দেখি কত তিনি কাঁদাতে পারেন, কতক্ষণ ধরে। যদি আমার কান্নার শেষ নেই তাঁর করুণারও শেষ নেই।

আরো আরো প্রভু আরো আরো
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই।
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥

কিন্তু যত মারবেন ততই তো তাঁর স্পর্শ দেবেন, যত কাড়বেন ততই তো দেবেন তাঁর আচ্ছাদন। প্রহারের চিহ্নগুলিই তো তাঁর দেওয়া অলঙ্কার হবে

শোভা পাবে। তিনি দুঃখ দিচ্ছেন, কিন্তু আমি আনন্দে সেই দুঃখের ঋণ শোধ করব। আমিও তাঁরই মত বিধাতা, দ্বিতীয় বিধাতা, আমি দুঃখের থেকেই আনন্দকে সৃষ্টি করি। ক্ষণিকের খেলাঘরকে স্বর্গ করে তুলি।

দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

দুঃখ ছিল বলেই তো আনন্দে অধিকার। ঋণ ছিল বলেই তো ঋণশোধের শক্তি, ঋণশোধের ঐশ্বর্য। প্রকৃতি নিজের মধ্যে যে অমৃতশক্তি পেয়েছে তাই সে বিচিত্র রূপে-রসে শোধ করছে। আমাদের জীবনে যে এত প্রেম তাও তো ঈশ্বরের কাছ থেকেই ঋণ নেওয়া—সেই ঋণ অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই শোধ করতে হবে।

এই সময়েই শারদোৎসব লেখা।

শারদোৎসবের ঠাকুরদাদা আরেক ধনঞ্জয়। তাকে সন্ন্যাসী বলছে, 'আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা সায় দিল: 'একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবল ঢেলেই দিচ্ছেন, আর এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি তাই এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী আবার বললে, 'যেখানে আলস্য যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেখানে সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।'

'সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে চায় না।'

লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন,' বললে সন্ন্যাসী 'তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন। তাঁর এই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন—শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে।'

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।
দেখরে চেয়ে আপন-পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি পাই॥
হল না তার ফুটে ওঠা
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা
মর্ত কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথারে নাই॥

দুঃখের পর দুঃখ—কেবল দুঃখ। মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যুর পর তার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনেক দিন বিবাহ করেনি; রবীন্দ্রনাথই উদ্যোগী হয়ে পাথুরেঘাটার সতীন্দ্র ঠাকুরের মেয়ে ছায়ার সঙ্গে সত্যেন্দ্রের বিয়ে দেন। বিয়ের তিন মাস পরেই সত্যেন্দ্র মারা যায়। রবীন্দ্রনাথ আবার শোকের সম্মুখীন হন, বিশেষত ছায়া তাঁর মনে একটি বিষাদের ছায়া হয়ে লেগে থাকে।

কিন্তু শোক কোথায়? শমী যখন চলে গেল তখনই বা তিনি কী দেখেছিলেন, কী পেয়েছিলেন?

নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রালোক
অস্তিত্বের এত বড় শোক
নাই মর্তভূমে।

বিশ্বজুড়ে আছেন শুধু তিনি আর তাঁর জগৎ-জনতা। তিনিই প্রথম তিনিই একমাত্র। বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে, তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে।'

তাই যিনি শোক দিচ্ছেন তিনিই আবার নিয়ে আসছেন সান্ত্বনা। ভক্তির সান্ত্বনা, শরণাগতির সান্ত্বনা

'দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।'

গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়িনীর বালিকা কন্যা প্রতিমারও স্বামী মারা গেল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিমাকেই তাঁর পুত্রবধূ করে নিলেন।

যত দুঃখ থাক তার উপরে আছে 'নক্ষত্রের শান্তিক্ষেত্র অসীম গগন।' 'আকাশের এক বিন্দু নীলে, তোমার পরাণ জুড়াইবে, শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।' দুঃখের পটেই তো আনন্দের আলিম্পন। 'বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা'

ক'দিন পরেই আবার খবর এল তাঁর আকৈশোর বন্ধু শ্রীশ মজুমদার মারা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, অনেক দিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে বসেছি। সে সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেই জন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে, কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনো রকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না, তার চেয়ে অসাধ্য কিছুই হতে পারে না।

তবে কী করা কর্তব্য?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে। তবেই নতুন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে। এটা বেশ করে জানতে হবে, যে জীবন আমার ছিল সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্র ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পর এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে জেনেছিলুম, একটি একটি করে, একটু একটু করে, তার থেকে মরতে হবে। এসো মৃত্যু এসো —এসো অমৃতের দূত, এসো—

এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত
এসো গো অশ্রু সলিলসিক্ত
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত
এসো গো চিত্তপাবন;
এসো গো পরম-দুঃখ নিলয়
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এসো সংগ্রাম এসো মহাজয়
এসো গো চরণসাধন।।'

দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে কান্তকবি রজনীকান্ত কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় উপস্থিত হলেন

দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের পরিচয় —প্রথমে পত্রযোগে পরে প্রত্যক্ষে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন:

প্রিয়বরেষু,

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কী হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণকর্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।

পরিষদের সভা হচ্ছিল নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে। দোতলা গৃহ, উপরে নিচে দু জায়গায় সভা হচ্ছে। উপরের সভায় সভাপতিত্ব করছেন সারদাচরণ মিত্র, নিচের সভায় রবীন্দ্রনাথ। রজনীকান্ত নিচের সভাতেই আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হলেন।

রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন, এবার তবে গান শোনান।

রজনীকান্ত তাঁর সদ্যলিখিত দুখানি গান গাইলে। একটি 'সৃষ্টির বিশালতা'—'লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ নীল গগন-গর্ভে'—আরেকটি 'সৃষ্টির সূক্ষ্মতা'—'স্তূপীকৃত গণনরহিত ধূলি সিন্ধুকূল।'

গান শুনে সমস্ত সভা অভিভূত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন।

পরদিন সকালে দীনেশচন্দ্রকে নিয়ে রজনীকান্ত গেলেন জোড়াসাঁকো। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে গান দুখানি আবার গেয়ে শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।'

এর পর রজনীকান্ত যখন কণ্ঠ-ক্যান্সারে ভুগছেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন রবীন্দ্রনাথ এলেন দেখা করতে।

রজনীকান্তের স্বর তখন লোপ পেয়েছে, যা বলবার লিখে প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথকে দেখে লিখলেন: 'আর কথা কইতে পারি না। একবার আপনাকে দেখতে বড় সাধ ছিল, নইলে হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হত। সে দেখা আমার হল। আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। মহাপুরুষ, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান। বলুন, শিবা মে পন্থানঃ সন্তু'।

রজনীকান্ত আরো লিখলেন, রাজসাহিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে রাজার পার্ট করেছেন। লিখলেন: 'আর একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতাম। অমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে।'

রজনীকান্তের ছেলেমেয়ের রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই লিখা গান গেয়ে শোনাল :

বেলা যে ফুরায়ে যায়
খেলা কি ভাঙে না হায়
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি।
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায় ?

রোগের অসহ্য কষ্ট উপেক্ষা করে রজনীকান্ত উঠে বসে হার্মোনিয়ম বাজাতে লাগলেন।

যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে বললেন, 'আপনাকে পূজা করতে ইচ্ছা করে।'

তাঁর মৃত্যুশয্যার দিনলিপিতে রজনীকান্ত লিখলেন 'আজ রবিঠাকুর আমাকে বড় অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে তিনি বললেন, আপনাকে পূজা করতে ইচ্ছা করে। শুনে আমি লজ্জায় মরি।'

সেই দিনই রজনীকান্ত নতুন গান লিখলেন— 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব করিতে চুর।' গানটি পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখলেন :

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি মাংস স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না। ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

'এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য যত দুর্গ যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?'

ঐ কথা হইতেই আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখবেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধা তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।...

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতাতো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে —অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারেই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন তাহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবনসঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[ক্রমশ।

দখিনা বাতাস

জয়ন্তকুমার মি[illegible]

পার হ'য়ে সুদূরের
নীবিল সাগর—
কোন্ দেশ হ'তে এলে
অজর অমর ?
অন্তরে জাগাও তুমি
প্রেয়সী শিমুলে—
তোমার চুম্বনে তার
রাঙা কর্ণমূলে।

সজীব তারুণ্যে ভরা
সাধনীতে তোমার,
বৃক্ষ গাছ ফিরে পায়
সবুজে কোমার।
কিশোর সখা গো বুকে
দাও আলিঙ্গন,
ফিরে যাও তবু বেঁধে
রাখে মোর মন।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

উৎসবমুখর বাঙলাদেশ ঃ প্রায় সারা-বছরই তার আকাশ বাতাস ভরে থাকে উৎসবের আনন্দে। লৌকিক পার্বণ, পূজার্চনা প্রভৃতি মাতিয়ে রাখে বাঙালীর জাতীয় জীবন। জীবনে দুঃখ আছে, আছে বঞ্চনা, আছে ব্যথা, ঘরে অভাব অনটন নিত্য লেগে আছে কিন্তু তবু বাঙালী লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান, পালপার্বণে সাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। ধর্মীয় শাস্ত্রীয় আচার-অর্চনায় নিজেকে মিলিয়ে দিতে তার ভিতর এতটুকু কার্পণ্যের চিহ্ন মেলে না।

এই অসংখ্য উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যেই অনেকগুলি ধর্ম ও শাস্ত্রকেন্দ্রিক ধর্মচেতনা থেকে বহু অনুষ্ঠানের উদ্ভব ও ব্যাপক প্রসার। ইতিহাসের আলোয় দেখা যায় প্রতি যুগে বাঙালীর উপর কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, কত বিপর্যয় তার মধ্যে ওলোটপালোট এনে দিয়েছে, কত সর্বনাশ আপন ভয়ালভীষণ স্বাক্ষর রেখে গেছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, তবু তার হৃদয়ের গভীরে যে আধ্যাত্মিক প্রবণতা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিয়ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার অবিরাম ধারা কোন প্রতিকূলতাই রুদ্ধ করতে পারল না।

শত শত শক্তিসাধকের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে বাঙলাদেশ, পুণ্য হতে পুণ্যতর, হয়ে উঠেছে বাঙলার মাটি। বাঙলার বিভিন্ন ধর্মীয় পূজানুষ্ঠানের মধ্যে শ্যামাপূজা একটি প্রধান। শ্যামাপূজা সাধকের পূজা। অমাবস্যার ঘোর নিশীথে অন্ধকার তাবৎ তমহন্ত্রী জগজ্জননীর পায়ে পূজার অঞ্জলি দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। সকলে যে সময় ঘুমে অচেতন, সমস্ত অঞ্চল তখন নিথর নিঝুম কালিকার ধ্যানমন্ত্রোচ্চারণের সেই প্রকৃষ্ট মুহূর্ত। ক্লান্তির অথৈ-অতল-অন্তহীন সাগরে মানুষ যখন নিমজ্জমান, সকল শক্তির উৎস দেবীমাতৃকার আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করার সেই তো প্রকৃষ্ট অবসর।

বাঙলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্যের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক এবং বাঙালীর শক্তিসাধনার এবং আধ্যাত্মিক আকুলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে শ্যামা[illegible], আজ সারা বাঙলার এবং বহির্বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচলিত এবং এক মুখ্য জাতীয় কৃত্য—এ দেশে সেই পূজার প্রথম প্রবর্তন যিনি করলেন তিনি পরমপূজ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

জর্জ এ্যালেন

সেকালের বাঙলা দেশ তার শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার জন্য যে বিপুল খ্যাতি, প্রসিদ্ধি এবং সর্বোপরি সম্মান-স্বীকৃতি লাভ করছিল, যে বাঙলার খ্যাতি দেশ দেশান্তরে, দিকে দিগন্তরে ব্যাপ্ত, পরিব্যাপ্ত, প্রসারিত হয়েছিল, যে বাঙলার গৌরব এককথায় ছিল গগন-চুম্বী সেই বাঙলার সে-সব অঞ্চলগুলির অবদানে এসব সম্ভবপর হয়েছিল, নবদ্বীপ তার মধ্যে একটি বিশেষ নাম। সেদিন ধর্মচর্চায় শাস্ত্রানুশীলনে কঠোর দুর্গম সাধনায় নবদ্বীপের খ্যাতি চরমে উঠে চতুর্দিকে বাঙলার গর্ব ও গৌরব বহুগুণ বিবর্ধিত করেছিল।

শক্তিসাধনা এবং বিষ্ণু-উপাসনার এই দুটি ভিন্নমুখীন সাধনার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটছিল নবদ্বীপে। শক্তি-সাধকের নাদগম্ভীর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক কন্ঠের মাতৃমন্ত্র আর বিষ্ণু-উপাসকের হৃদয় উজাড় করা, দরদ ঢালা ঐকান্তিক আকুলতায় ভরপুর প্রেমগান একই সঙ্গে একই মুহূর্তে মূর্ছনা জাগিয়ে তুলেছিল নবদ্বীপের আকাশে বাতাসে, একই সঙ্গে আলোড়িত করে তুলেছিল সারা নবদ্বীপ। সমগ্র নবদ্বীপে এনে দিয়েছিল এক অভূতপূর্ব আলোড়ন।

শক্তিসাধনার এবং বিষ্ণু-উপাসনার নবযুগের দুই নব ভগীরথ একই সময়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দুই প্রণম্য পথিকৃৎ, প্রবর্তক এবং পথপ্রদর্শক একই সময়ে নবদ্বীপে বাস করে আপন আপন সাধনায়, ভাবধারায়, প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন। একজন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, অন্যজন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপের আকাশে সেদিন এক সঙ্গে সূর্য আর চন্দ্রের পাশাপাশি অবস্থান দেখা গিয়েছিল।

পূর্বপুরুষরা বাস করতেন উত্তর-বঙ্গে। মণ্ডলযোনির মিত্ররূপে এঁদের এককালে প্রসিদ্ধির অন্ত ছিল না। এই বংশের মহেশ্বর ভট্টাচার্য নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ এবং বিদগ্ধসমাজে এবং ভক্তিমার্গে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর বিরাট এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, এবং তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অনন্যসাধারণ জ্ঞান সমগ্র সমাজে তাঁকে এক বিরাট শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করেছিল।

কৃষ্ণানন্দ এই বিরাট মানুষটিরই বড় ছেলে। ছোটবেলা থেকেই মনে মনে যেন অতৃপ্ত কৃষ্ণানন্দ। ভিতরে একটা নিঃশব্দ আকুলতা যেন উত্তরোত্তর দানা বেঁধে উঠতে থাকে। কোথায় যেন একটা ফাঁক। যত দিন যায় কৃষ্ণানন্দকে সেই চিন্তা ততই উন্মনা করে তোলে।

কিসের এই অতৃপ্তি, কি চায় কৃষ্ণানন্দ কি হলে তাঁর সকল উৎকণ্ঠার অবসান হয় বাঙলা দেশে তথা ভারত-বর্ষে যতরকম সাধনা আছে তার মধ্যে তন্ত্রসাধনার স্থান অতি উচ্চে, তন্ত্র-সাধনা যেমনই দুরূহ তেমনই জটিল আবার যেমনই বিরাট তেমনই গুরুত্ব-সম্পন্ন, এই সাধনায় যিনি অংশ নেবেন

তাঁকে সবার আগে এর জন্যে নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত এবং যোগ্যতা-সম্পন্ন করে তুলতে হবে। এ পথ সহজ পথ নয় বা অনায়াসে এর সুফল মিলবে না। অতি অভিনিবেশ, সতর্কতা এবং স্থির লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে, চিত্তচাঞ্চল্যের এখানে স্থান নেই, ঐকান্তিকতা তো আছেই। সেই সঙ্গে পবিত্রতাও সবার আগে প্রয়োজন। শক্তি সহযোগে এই সাধনায় এগোতে হয়। পরকীয়া গ্রহণের প্রয়োজন হয় কিন্তু এ-ক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য এসে যায়, তা হলেই সর্বনাশ সাধক তখনই ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন, সিদ্ধির জগত থেকে তাঁর চিরনির্বাসন। পুনরুত্থানের পথ একপ্রকার রুদ্ধ বলা চলে। অর্থাৎ এখানে তিলমাত্র ত্রুটি, অসতর্কতা, অপবিত্রতার স্থান নেই, তা হয়েছে কি ভয়ানক শাস্তি সুনিশ্চিত এ বিধানের কোনরকম নড়চড় নেই।

এই তন্ত্রসাধনায় বাঙলা দেশের খ্যাতির তুলনা নেই। কিন্তু মধ্যযুগে কয়েকজন তন্ত্রসাধক এর ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করতে লাগলেন নিজেদের দুষ্কৃতির দ্বারা। তন্ত্রকে শিখণ্ডীর মত রেখে সাধনার নাম করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হলেন। চিত্ত-চাঞ্চল্যকে অবদমন করা তাঁদের শক্তিতে কুলালো না। ফলে সমগ্র সাধনাজগত ভিন্নরূপ ধারণ করল। তান্ত্রিক ব্যভিচারে গোটা দেশ কেঁপে উঠল। সামগ্রিকভাবে তন্ত্র সেদিন মানুষের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। তন্ত্রের নামে লোকে ভয়ে দরজা দিতে আরম্ভ করল। বাড়ীর অন্দরমহলে তান্ত্রিক সাধকদের দৃষ্টি পড়তে লাগল।

এতবড় একটা সাধনা এত বিরাট একটি শাস্ত্র লোকচক্ষে আজ এই পরিণতি লাভ করে থাকবে, মানুষের মনে তার স্বরূপ সম্বন্ধে এই হীন ব্যাখ্যা বদ্ধমূল হয়ে থাকবে, এবং ধীরে ধীরে তা লোপ পেয়ে যাবে---এই চিন্তাই বেদনার কালো মেঘ ঘনিয়ে তোলে কৃষ্ণানন্দের মনের আকাশে। কি করে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করা যায় তন্ত্রশাস্ত্রকে, কি করে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলে তার পূর্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনা যায়, একমাত্র এই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন কৃষ্ণানন্দ।

মনে মনে বাসনা করেন মায়ের পূজার প্রচলন করে জাতিকে মাতৃমুখীন করে দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধারসের প্রাবল্য ঘটাতে হবে তার স্রোতস্বিনীধারা মানুষের বিরূপ মনোভাব ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দেবে। মায়ের পূজা করতে হবে।

ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। মায়ের অলৌকিক কৃপা। সন্তানের বুকফাটা আর্তি করুণাময়ী জননীর চরণে গিয়ে পৌঁছেচে। আদেশ পেলেন কৃষ্ণানন্দ। দেবী নির্দেশ দিলেন তাঁর বিগ্রহের পূজা সুরু করতে—তারই ফলে একদিন সারা বাঙলা দেশ তাঁর প্রবর্তিত পূজা তার জাতীয় জীবনে গ্রহণ করে নেবে। দেবী বললেন তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করতে এবং তার একটি সঙ্কলন গ্রন্থ রচনা করতে।

ভক্তের কান্না শেষ হল। ওষ্ঠাধরে ফুটল হাসি, মনের আকাশ থেকে পুঞ্জীভূত মেঘ সরে গিয়ে সেখানে দেখা দিল ম্লানিমামুক্ত মালিন্যবিহীন প্রসন্ন সূর্যালোক কিন্তু তখনও প্রশ্ন থেকে যায়, ভক্তচিত্ত তখনও জিজ্ঞাসামুক্ত নয়। ভক্তের মনে তখন জিজ্ঞাসা যে কোন মূর্তিতে, কোন ভঙ্গিমায় তোমার বিগ্রহ হবে, যে বিগ্রহ আমি পূজা করব, যার পূজা ঘরে ঘরে হবে। আমার ধ্যানের মূর্তি ধ্যানে থাক। বাস্তবের মূর্তি আমায় দেখিয়ে দাও মা।

জননীর কাছ থেকে আবার প্রত্যাদেশ আসে অমাবস্যার নিবিড় নিশ্ছিদ্র ঘনান্ধকারে আবৃত মহাশ্মশানে—দেবী ইঙ্গিত দিলেন পরের দিন সকালে প্রথম যে নারীকে যেভাবে, যে ভঙ্গিমায় কৃষ্ণানন্দ দেখবেন সেইভাবে তাঁর বিগ্রহ রূপ নেবে। মানবী দেহের মাধ্যমে দেবী তা দেখিয়ে দেবেন।

জননী প্রসন্না, সন্তান পরিপূর্ণ। পরের দিন সকালে পথ চলতে চলতে দেবীর নির্দেশের বাস্তবরূপ হাতে হাতে পেলেন। যাকে কেন্দ্র করে অথচ তার সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতসারে এই দৈব ঘটনাটি ঘটল সে এক শ্যামাঙ্গিনী গোপবালা। এই গোপদুহিতা জানতেও পারল না যে তারই আধারে মা কতবড় কাজটি করালেন।

কৃষ্ণানন্দের জীবন একটি ভিন্ন পর্বে এবার উপনীত হল। বিচিত্র ভাবধারায় তাঁর পূজা। প্রতিদিন সকালে নিজ হাতে মূর্তি তৈরী করেন আবার প্রতিদিনই পূজান্তে তা নিজ হাতে গঙ্গায় বিসর্জন দেন। সাধক কৃষ্ণানন্দের পূজা যে কত উচ্চমার্গের তা একটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। শোনা যায় মাকে কৃষ্ণানন্দ যে ভোগের নৈবেদ্য নিবেদন করতেন মা মূর্তির খোলস থেকে বেরিয়ে জীবন্ত কায়া অবলম্বন করে সেই ভোগ গ্রহণ করতেন। অসাধারণ সাধক না হলে এ কাজ সাধারণ সাধকের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

নিবেদিত সন্তানের চরিত্রের চিন্তা ধারণার যদি পরিবর্তনযোগ্য কিছু থাকে মা-ই তা করিয়ে দেন। কৃষ্ণানন্দ যেখানে শক্তিসাধনায় বিভোর তাঁরই সহোদর সহস্রাক্ষ বৈষ্ণব প্রেমে তখন মাতোয়ারা। কৃষ্ণানন্দ ও মহাপ্রভু সমকালীন এবং একই সময়ে একই অঞ্চলে বাস করেছেন কিন্তু এ যে একেবারে একই ছাদের তলায় অবস্থান। এক সংসার। এক অন্ন, এক রক্ত, এক পরিচয়। সহস্রাক্ষ মনপ্রাণ দিয়ে করে চলেন বালগোপালের পূজার্চনা।

বাড়ীর গাছে ফল ফলেছে। কৃষ্ণানন্দ মনে মনে বাসনা করে আছেন সেই ফল নিবেদন করবেন জগন্মাতার শ্রীচরণে, এদিকে তার পূর্বেই সহস্রাক্ষ তা নিবেদন করে দিয়েছেন তার বালগোপালকে। অত্যন্ত নিরাশ হলেন কৃষ্ণানন্দ। আসলে বালগোপালকে কোনদিনই তিলমাত্র স্বীকৃতি তিনি দেন নি।

আবার অলৌকিক লীলা। রাত্রে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কৃষ্ণানন্দ প্রত্যক্ষ করলেন সেই ফল বালগোপালকে

মুদ্রণের ইতিবৃত্ত

সভ্যতার নানা অঙ্গ। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা মার্জিত ও উন্নত জীবনচর্যা। যাদের মাধ্যমে তার অপ্রতিহত জয়যাত্রা এবং ব্যাপক বিকাশ প্রমাণিত হচ্ছে মুদ্রণ শিল্প তাদের মধ্যে একটি। আজকের দিনে বিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ যখন অতিক্রান্ত হয়-হয়, সভ্যতার এই ব্যাপক জয়-যাত্রার দিনে যদি আমাদের চোখের সামনে থেকে মুদ্রণযন্ত্রগুলি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, তার ফলে মানুষের অধ্যয়ন যদি ব্যাহত হয়, তাহলে সভ্যতার সঙ্গে তাল রাখা যে কতখানি কষ্টসাধ্য, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু, ছিল সেই দিন, যেদিন এ আড়ালেই থাকত, প্রচুর বিত্তবান ব্যক্তি ছাড়া এ বস্তু সহজে কেউ দেখতে পেতেন না—অর্থাৎ সে যুগে এ বোটেই সহজলভ্য জিনিসের পর্যায়ভুক্ত ছিল না।

উত্তাপ দ্বারা কঠিন করা কাদামাটির উপর, পাপিরাসের উপর, পার্চমেন্টের বস্ত্র সচরাচর লোকের চোখের উপর দিয়ে তখন কোন কিছু লিপিবদ্ধ করার কাজ চলত। তাই প্রচুর ধনী ব্যক্তি ছাড়া তাকে অধিকারভুক্ত করার ক্ষমতা সাধারণ লোকের ছিল না। সেই জন্যেই অক্ষর পরিচিতের সংখ্যা তখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারেনি।

হাওয়া বদলে দিলেন জোহানেস গুটেনবার্গ। জার্মানীর মেনজ শহরের বাসিন্দা। ছাপাখানা থেকে বই বার

গুটেনবার্গ

করার স্বপ্ন তিনি দেখলেন। বুঝতে পারলেন এতে মানুষের পাঠস্পৃহা অনেক বেশী বাড়বে, মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার আলোকে স্নাত হবে, দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি হবে যথেষ্ট পরিমাণে। নতুন ইতিহাসের পৃষ্ঠার উন্মোচন করলেন গুটেনবার্গ।

১৪০০ সালে তাঁর জন্ম। দীর্ঘকাল কেটেছে তাঁর সাধনায়। মানুষের সমাজে ব্যাপকতা বক্তব্যের প্রসার ঘটাতে হবে। গ্রন্থ তার একটি মস্ত বড় মাধ্যম। হাতে লিখে সে কাজ হয় না। অতএব যন্ত্রের সাহায্য চাই। প্রায় কুড়ি বছর পর সিদ্ধির মুখোমুখি হলেন। সাধারণের সাধুবাদ ঝরে পড়ল তাঁর উদ্দেশে। ১৪৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫০০ সালের মধ্যে সারা ইয়োরোপে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটে গেল। জনসমাজে বক্তব্য প্রচারের বিরাট সহায়ক হিসাবে তার গুরুত্ব অনুভব করল সেদিন প্রতিটি উন্নতিকামী মানুষ। ১৬৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছাপাখানার সৃষ্টি হল। ভারতবর্ষে মুদ্রণ শিল্পের প্রচলন আরম্ভ হয়ে গেছে তার থেকে তিরাশি বছর আগে ১৫৫৬ সালে যে বছর মাত্র চোদ্দ বছর বয়সের একটি বালকের অধিকারে চলে গেল মোগল সিংহাসন—ইতিহাস যাকে স্মরণ করে মহামতি আকবর নামে।

—অনুসন্ধানী

কোলে বসিয়ে মা নিজে হাতে তাকে খাইয়ে দিয়েছেন। শ্যাম আর শ্যামা যে মূলত অভেদ স্বয়ং জগজ্জননীই যে একজন শ্রেষ্ঠ নারায়ণী এইভাবে তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তকে।

বালগোপাল সম্বন্ধে কৃষ্ণানন্দের সমগ্র ধারণা সেদিন থেকে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সাধকজীবনে তিনি কৃপালাভ করেছিলেন মহাসাধক যোগীশ্রেষ্ঠ জটাধারী পরমহংস বা জটিয়া বাদুর। তাঁর কাছ থেকে তিনি সাধন পথের বহু জটিল রহস্য অবগত হন এবং সাধনার বহু দুরূহ পদ্ধতি আয়ত্তে আনেন।

'তন্ত্রসার এবং শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামক কৃষ্ণানন্দের দুটি গ্রন্থ আজও সাধক ও অনুসন্ধিৎসু সমাজে যথেষ্ট পরিমাণ সমাদর লাভ করে আসছে। এই গ্রন্থ দুটির গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব তুলনাহীন।

নবদ্বীপের আগমেশ্বরীতলা এখনও এই মহাসাধকের বাঙলা দেশের তন্ত্রসাধনার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারকারীর বাঙলায় শ্যামাপূজা প্রবর্তনের ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের জন্মদাতার পবিত্র স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে আছে।

অতীত প্রাচ্যে ইতিহাস চেতনা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকালে ভারতীয় মনীষা বহুধা বিভক্ত হয়ে বহু শাখা আশ্রয় করেছিল, আর সৃষ্টি হয়েছিল নানা ধরণের সাহিত্য। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, গদ্য-সাহিত্য, গল্প-সাহিত্য, চম্পূকাব্য, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে ভারতীয় মনীষীদের অতুলনীয় প্রতিভা সঞ্চরণ করেছিল। কিন্তু ইতিহাস রচনায় তাঁদের সৃষ্টিপ্রতিভা অতিমাত্রায় মন্থরতা অবলম্বন করেছিল। ভারতীয় সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি পর্যালোচনায় এ কথাই মেনে নিতে হয় যে রচনার বিষয়বস্তুরূপে 'ইতিহাস' প্রাচীন ভারতীয় কবিদের বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে নি। এমন কি একমাত্র বাণভট্ট ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোনও কবি তাঁদের রচনায় নিজেদের আবির্ভাব কাল বা অন্যান্য তথ্যাদি সম্বন্ধে কিছুই লিখে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ফলে, আমরা কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক প্রমুখ মহান কবিদের সম্বন্ধে কোনও জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে পারি না। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা যে বহু পরিমাণে অবহেলিত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের এই যে অবহেলা, ইতিহাস রচনার এই যে শোচনীয় অভাব তার জন্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ও ভারতবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমত প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখনই ইতিহাস রচনার পক্ষে অনুকূল হয় নি। খৃস্টপূর্বাব্দ যুগে বেশ কয়েক শ' বছরের মধ্যে ভারতবাসীদের মনে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ হয় নি। অথচ এই জাতীয়তাবোধ-ই ইতিহাসরচনার পক্ষে সবচেয়ে সাহায্যকারী উপকরণ।

পারস্পরিক অন্তর্যুদ্ধে লিপ্ত প্রাচীন ভারতের রাজগণ কখনই বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সংহতভাবে রুখে দাঁড়াবার জন্য আন্তরিক প্রেরণা অনুভব করেন নি। এই কারণেই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়---যখন তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য একটা সংহত প্রচেষ্টার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল---তখন একমাত্র পুরু ছাড়া আর কোনও ভারতীয় নৃপতি তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। পরবর্তীকালেও ভারতবর্ষে আরও অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে---সবগুলিই প্রায় অন্তর্যুদ্ধ। জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সবক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ভারতবাসীদের কাছে কখনোই সর্বাঙ্গীণ ক্ষতি বলে প্রতিভাত হয় নি। এই জাতীয়তাবোধের অভাবই ইতিহাস রচনার অভাবের কারণ।

এই প্রসঙ্গে এ বি কীথ তাঁর 'এ হিস্ট্রি অব সংস্কৃত লিটারেচার' গ্রন্থে বলেছেন--

"It may be that India failed to produce historians because the great political events which affected her during the period upto A.D. 1200 did not call forth popular action in the sense in which the repulse of the Persian attacks on Greece evoked the history of Herodotos. . .The Mahomedan invaders found India without any real national feeling; their success were rendered possible largely because the chiefs disliked one another far more than they did the Mleccha."

দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসরচনার ব্যাপারে ভারতীয়গণকে নিরুৎসাহ করেছে। ইতিহাস ইহলোকের ইতিবৃত্ত। ইহ-সর্বস্ব না হলে ইহলোকের কোনও বিশেষ ঘটনাকে চিরস্থায়ী করার প্রয়াস আসে না। এই 'ইহ'কে ভারতবাসী কখনোই বড় করে দেখে নি। ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ জাতি। এই ধর্মই তাদের ইহলোককে তুচ্ছ করে পরলোকের চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করতে প্ররোচিত করেছে। ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন জগৎকে মিথ্যা এবং ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্যবস্তুরূপে প্রতিপাদিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ভারত-বাসীর মনকে শৈশব থেকেই আচ্ছন্ন করে থাকার ফলে পরলোকে সুখশান্তি লাভ করার জন্য সে আজীবন উন্মুখ হয়ে থেকেছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই যা কিছু করণীয় তাই করেছে। তাছাড়া ভারতবাসী ভাগ্যনির্ভর জাতি। যা কিছু পার্থিব ঘটনা তার পিছনে ভাগ্যের ফলাফল কল্পনা করা ভারতবাসীর চিরন্তন প্রবৃত্তি। ফলে, জাগতিক ঘটনার পিছনে কোনও ঐতিহাসিক কারণ নির্দেশ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সব কিছুই দৈবপ্রসূত—এই ছিল তার বিশ্বাস। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই দেশ ও জাতির ইতিহাসের প্রতি কোনও ঔৎসুক্য তাদের জাগে নি।

তৃতীয়ত, যথার্থ ইতিহাস রচনার জন্য যে 'বৈজ্ঞানিক কার্যকারণমূলক অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন', ভারত-বাসিগণের সে দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল না। কর্মবাদ ও অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাস ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল ছিল। তারা জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদকে স্বীকার করে জগতে ঘটমান সব বিষয়ের মূলে দৈবী ও এক অতিপ্রাকৃত শক্তিকে

কারণরূপে স্থাপন করেছে। এই কারণেই ইতিহাস রচনার কাজে তাঁদের কোনও অনুপ্রেরণা ছিল না। তাই কোনও কোনও সময়ে যখন ভারতীয় কবিরা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কাব্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন, সে সব ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, তাঁদের রচনা ইতিহাসের পরিবর্তে শুধুমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দেশিত মহাকাব্যে বা খণ্ডকাব্যে পরিণত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডঃ উইণ্টারনাইজ-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"What the Indians lacked in was not, however, taste for history, but taste for criticism and for historical truth. And reason of this is that the writers of history were generally either court poets or religious-minded persons."

রামায়ণ ও মহাভারত—এই মহাকাব্য-দুয়ের কাহিনীর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব ভারতবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিধৃত। এই মহাকাব্যদ্বয়ের প্রধান পুরুষ চরিত্র-সমূহের মধ্যে তারা জাতির নায়কের সন্ধান পেয়েছে। ফলে, বাস্তবক্ষেত্রে দেশ ও জাতির চরম দুর্দিনে যাঁরা জাতির নায়কত্বের মহান দায়িত্ব বহন করেছেন, তাঁদের কীর্তিকে অমর করে রাখবার জন্য ভারতীয় কবিদের মন উদ্বুদ্ধ হয় নি। যদিও বা কখনো এ বিষয়ে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন, বর্ণনীয় ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দ অজ্ঞাতসারেই রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের আদর্শে রূপায়িত হয়েছেন।

ডঃ সুশীলকুমার দে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Even if an historical personage is taken as the central figure, he may be magnified and surrounded with all the glory and glamour of a legendary hero like Rama or Yudhisthira, who is to these writers, as real and perhaps more interesting than the petty rulers of their own day ...."

প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করার অভাবের জন্য এটিও একটি কারণ।

প্রকৃত ইতিহাস রচনার পক্ষে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের সামনে আর একটি প্রধান যে অন্তরায় ছিল তা হল 'নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব'। বহু ক্ষমতাশালী কবির আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও, প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করার সহজসাধ্য উপায় তাদের সামনে ছিল না। থাকলেও তা খুঁজে নেওয়ার মত মানসিকতা তখনকার মানুষের মনে জাগরূক ছিল না।

এত সব কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কবিদের অনেকেই তাঁদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতেই তাঁদের সাহিত্য-কৃতির মধ্যে ইতিহাসের ছাপ রেখে গেছেন। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে বহু উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট আছে। এক একটি উপাখ্যানের শেষে বলা হয়েছে 'ইতি হ আস' অর্থাৎ 'ইহা এইরূপই ছিল'। অবশ্য এসব জায়গায় ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচার করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল না। 'ইতিহাস' শব্দটির উৎপত্তি এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে।

ইতিহাসের উপকরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ পাওয়া যায় পুরাণ সাহিত্যে। পুরাণগুলির মধ্যে তৎকালীন ধর্মীয় চিত্র ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণগুলির আলোচ্য বিষয় হিসাবে পাঁচটি লক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল—

'সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥'

সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (এক সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার পর নূতন সৃষ্টির বিস্তার), বংশ (দেবতা ও ঋষিদের বংশের বর্ণনা, মন্বন্তর (বিভিন্ন মনুর শাসনকাল) ও বংশানুচরিত (রাজাদের বংশবর্ণনা)।

এই পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে পঞ্চম যে লক্ষণটির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ রাজাদের বংশতালিকা সংরক্ষণের পদ্ধতি—এর মধ্যেই ভারতীয় কবি-প্রতিভা প্রথম জাতির ইতিহাস সংরক্ষিত করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। পুরাণে বর্ণিত রাজাদের বংশাবলীর এই বিবরণে অবাস্তব কাহিনীর বিস্তার ও অতিশয়োক্তি থাকলেও সতর্কভাবে বিচার করলে তার মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এফ ই পার্জিটার পুরাণগুলিকে 'ক্ষাত্রধারার বাহক' বলে মনে করেছেন এবং তাঁর মতে বৈদিক সাহিত্যের চেয়ে ইতিহাসের উপাদান পুরাণগুলিতেই বেশী আছে।

রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এই দুই গ্রন্থে আমরা যে সামাজিক আচার-ব্যবহার, ভৌগোলিক বিবরণ, রাজা ও রাজপুরুষদের বিভিন্ন কার্যকলাপের পরিচয় পাই, প্রকৃত ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সেগুলির মূল্যও অস্বীকার করা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধকবিরা যে কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছিলেন তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ৫ম খৃস্টাব্দে মহানামন্ নামে বৌদ্ধ পণ্ডিত রচিত 'মহাবংশ' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সমস্ত লেখকদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা যতটা ছিল ইতিহাস-চেতনা ততটা ছিল না। কারণ উক্ত গ্রন্থে অশোকের মত বিরাট পুরুষকে ধর্মপ্রচারক হিসাবে যতটা বড় করে দেখানো হয়েছে, তাঁর রাজ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপ সে পরিমাণে অতি নগণ্যভাবে অঙ্কিত। জৈন সাহিত্য-গুলিও একই পথ অনুসরণ করেছে। এই গ্রন্থগুলি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ সাহিত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, শুধু ধর্মকেই বড় করে দেখেছে। সেই কারণে চন্দ্রগুপ্তের মত ঐতিহাসিক পুরুষও জৈন-সাহিত্যে ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁর রাজনৈতিক সত্তা অবলুপ্ত।

ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রামাণ্য তথ্য খৃস্টজন্মের আগে ও পরের অনেক শতাব্দীর মধ্যে রচিত শিলালিপি-গুলিতে পাওয়া যায়। রাজাদের দানপত্র দান করার জন্য মহনীয় কোনও রাজার উদ্দেশ্যে প্রশস্তিপত্র ও কোনও

ধর্মোপদেষ্টা দ্বারা প্রচারিত ধর্মের বাণী শিলালিপিগুলিতে ক্ষোদিত করা হত। সুতরাং বহু ক্ষেত্রেই শিলালিপিগুলি সঠিক তথ্যাদি জ্ঞাপনে সাহায্য করে। এ গুলির মধ্যে গুপ্তযুগের শিলালিপি-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এ গুলি থেকে উদ্ধার করা যায়। এইসব শিলালিপিতে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট, অন্যদিকে আবার এগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যগুণের আধার। কয়েকটি প্রস্তরলিপি ইতিহাসের উপকরণের আড়ালে সুন্দর খণ্ডকাব্যের লক্ষণ সূচিত করে।

এই লিপিগুলির মধ্যে ১৫০ খৃস্টাব্দে লিখিত মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি, ৩৫৩ খৃস্টাব্দে হরিষেন রচিত এলাহাবাদের কাছে অবস্থিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি, বীরসেন রচিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রশস্তি ও ৪৭৩ খৃস্টাব্দে মন্দাসোর মন্দিরগাত্রে চুয়াল্লিশটি শ্লোকে বৎসভট্টি রচিত শিলালিপি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত ৬৩৪ খৃস্টাব্দে রচিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির কাহিনী সমন্বিত আইহোল শিলালিপি কাব্য গুণমণ্ডিত একটি ঐতিহাসিক বিবরণ। এই শিলালিপিটির রচয়িতা রবিকীর্তি। এই শিলালিপিগুলির বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক, নানা রকম রাজনৈতিক ঘটনা ও রাজাদের মহনীয় কীর্তিকলাপ এগুলির উপজীব্য। কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণের আড়ালে প্রতিটি কবির কবিসত্তার অস্তিত্বও বর্তমান। ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষানৈপুণ্য ও প্রাকৃতিক বর্ণনার সমাবেশ অতি সুষ্ঠুভাবে শিলালিপিগুলির মধ্যে উপস্থাপিত।

ক্লাসিকাল সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের যুগে কয়েকটি সংস্কৃত নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। কালিদাসের 'মালাবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকটিতে সামান্য ইতিহাসের স্পর্শ আছে। রাজা অগ্নিমিত্রের (খৃস্টপূর্ব ১৮০) কাহিনী এর বিষয়বস্তু।

কালিদাসের সমসাময়িক কালে রাজা শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে তৎকালীন সমাজ-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে রাজদ্রোহিতা কেমন রূপ ধারণ করত তারও নিখুঁত বিবরণ আছে নাটকটিতে।

বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটিতে মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য কেমন করে নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষসকে স্বদলভুক্ত করেছিলেন তারই বিবরণ। সপ্তম খৃস্টাব্দে বিজ্জকা (অথবা, বিজয়া) নামে একজন মহিলা কবি 'কৌমুদী মহোৎসব' নামে একটি নাটক লিখিছিলেন মগধের রাজা কল্যাণবর্ম (৩৪০ খৃস্টাব্দ) কেমন করে তার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন তারই বিবরণ আছে নাটকটিতে। গুপ্তরাজাদের রাজপ্রাসাদের মধ্যে বহু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কাহিনীও নাটকটির মধ্যে উপস্থাপিত।

খৃস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে রচিত বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত গদ্যকাব্য। কাব্যটিতে বাণভট্ট তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের রাজত্বকালের বিবরণ বর্ণনা করেছেন, যেহেতু হর্ষবর্ধন ঐতিহাসিক পুরুষ, স্বাভাবিকভাবেই 'হর্ষচরিত' ঐতিহাসিক গ্রন্থ হওয়া উচিত এবং কিছু পরিমাণে এই উদ্দেশ্য সাধিতও হয়েছে।

তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চিত্র গ্রন্থটির মূল্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। হর্ষবর্ধনের সময় হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল তার নিখুঁত ছবি বাণভট্ট উপস্থাপিত করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কি পরিমাণ উদ্বেলিত করেছিল তারও বর্ণনা বাণভট্টের লেখনী দ্বারা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত। ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসাবে এগুলির মূল্য খুব কম নয়, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় ঐতিহাসিক বাণভট্ট কবি বাণভট্টের কাছে পরাজিত হয়েছেন, তাঁর কবিপ্রতিভা অনিবার্যভাবে তাঁকে গদ্য কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করেছে।

'হর্ষচরিত' পাঠে একথাই মনে হয়, মহারাজ হর্ষবর্ধনকে নায়করূপে কল্পনা করে সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে একটি কাব্য রচিত হয়েছে। প্রকৃত ইতিহাসের সম্ভাবনা গ্রন্থটিতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট এবং বর্ণনাপ্রাচুর্য, অলঙ্কার-বাহুল্য, অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা প্রভৃতি ইতিহাসের ক্ষীণতম সূত্রটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত না হলেও ৭৫০ খৃস্টাব্দে কনৌজেশ্বর যশোবর্মণের সভাকবি বাকপতিরাজের প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'গৌড়বহো' ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। যশোবর্মণের হাতে গৌড়েশ্বরের পরাজয়ই কাব্যটির বিষয়-বস্তু। কাব্যটির কোথায়ও গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয় নি। ১২০০টি শ্লোকে রচিত এই কাব্যে তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জার ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের নিখুঁত বর্ণনা আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের সুন্দর বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়েছে। গ্রন্থটিতে একটি কালীমন্দিরের উল্লেখ আছে এবং সেখানে কিভাবে নরবলি দেওয়া হত তার ভীতিকর বর্ণনা করা হয়েছে।

১০০৫ খৃস্টাব্দে পদ্মগুপ্ত (বা পরিমল) রচিত 'নবসাহসাঙ্কচরিত' ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে আর একটি কাব্য। গ্রন্থটিতে তৎকালীন বহু ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাপঞ্জীর সমাবেশ করা হয়েছে। সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক কর্তৃক নাগরাজ্য আক্রমণ এবং রাজকুমারী শশিপ্রভার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও বিবাহের কাহিনী কাব্যটির উপজীব্য বিষয়বস্তু। কাব্যধর্মী গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে। সমালোচকের মতে পদ্মগুপ্তের এই কাব্যটি—

'An historical essence remains in narration of the myth.'

একাদশ শতকের প্রথম দিকে কাশ্মীরের কবি বিহ্লন রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত। চালুক্য রাজাদের ইতিহাস কাব্যটির অবলম্ব বিষয়। এই রাজবংশের উৎপত্তির কাহিনী নিয়ে গ্রন্থের সূচনা। গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় রাজা প্রথম সোমেশ্বর, দ্বিতীয় সোমেশ্বর এবং বিশেষ করে বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবন মল্ল প্রমুখ বিখ্যাত যোদ্ধাদের যশোগাথা গ্রন্থটিতে বহু অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে কীর্তিত। এঁদের রাজত্বকাল ১০৭৬ থেকে ১১২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে বিক্রমাদিত্যের দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধযাত্রা, চোলদের সাথে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশ গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। বিহ্লনের বর্ণিত ঘটনাগুলি যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় চালুক্যবংশীয় রাজাদের শিলালিপিগুলি থেকে। কারণ সেখানে উল্লিখিত বর্ণনাগুলির সাথে বিহ্লনের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বিহ্লনের রচনাতেও বাস্তব ঘটনাগুলি অলৌকিকতার আবরণে আচ্ছন্ন। তাই ড: উইণ্টারনিট্জ বলেন,—

"The work too goes to show that poets in India have had always the fancy for dressing even historical events in mythical garb."

কবি হিসাবে বিহ্লন তাঁর সময়ে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণের ফলে দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও হয়েছিল প্রচুর। তাঁর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁকে 'বিদ্যাপতি' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

উল্লিখিত কাব্যগুলির মধ্যে পূর্বাক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রাধান্য এবং কাব্যের প্রাধান্যই বড় হয়ে উঠেছে। একমাত্র যে সংস্কৃত কাব্যটিতে কবি-প্রতিভার নৈপুণ্যের সাথে ঐতিহাসিক দায়িত্ব-সচেতনতার সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে হল কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী।' কহ্লণের বাবা ছিলেন কাশ্মীর-রাজ হর্ষের (১০৮৯-১১০১) মন্ত্রী। কহ্লন নিজেও কাশ্মীরের রাজাদের সভাকবি হয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক অলক দত্তের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস-রচনায় আগ্রহী হন। মহারাজ জয়সিংহ (১১২৭-১১৫৯) যখন কাশ্মীরের রাজা, কহ্লন তখন তাঁর সভাকবি ছিলেন এবং ১১৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজতরঙ্গিণী রচনা আরম্ভ করেন। কহ্লন যে 'ইতিহাস' লিখতে উদ্যত হয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখেছেন—

"কোঽন্যঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং
প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ।
কবি প্রজাপতিংস্ত্যক্ত্বা রম্যনির্মাণশালিনঃ॥

—ব্রহ্মা যেমন সুন্দর সৃষ্টি সম্পাদন করেন সেই রকম অতীতকালে ঘটিত ঘটনাসমূহ কবি ছাড়া আর কে মানুষের দৃষ্টিগোচর করতে পারে?

ঐতিহাসিক কবির আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতঃ।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥'

সেই কবি-ই পূজ্য ও গুণশালী যিনি অতীত কাহিনী বর্ণনাবিষয়ে আসক্তি ও দ্বেষবহির্ভূত। যেমন, প্রধান বিচারপতি রায় দেওয়ার সময় হবেন পক্ষপাতশূন্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কহ্লন রাজতরঙ্গিণী লিখেছিলেন। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের প্রথম দিকে কহ্লন বলেছেন যে, এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের রচিত এগারখানি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। তা ছাড়া নীলকণ্ঠ পুরাণ, বিভিন্ন লিপি ও প্রশস্তি মুখে মুখে প্রচলিত নানা রকমের কাহিনী—এই সব তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অশোক, প্রবর সেন, মুক্তাপীড়, ললিতাদিত্য প্রমুখ রাজাদের সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন, তা পরবর্তী ঐতিহাসিকদের গবেষণার দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সে যুগের খাদ্যমূল্য, করপ্রথা, তৎকালীন দুর্ভিক্ষের ঘটনা ও অন্যান্য সামাজিক অবস্থার নিখুঁত চিত্রাঙ্কণে কহ্লন বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অর্থলোলুপ সৈন্য, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত, বিশ্বাসঘাতক অমাত্য প্রভৃতির জীবন্ত বিবরণ রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। তৎকালীন কাশ্মীরের কদর্য রাজনীতি সম্বন্ধে কহ্লন তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। হিংস্র প্রকৃতির মহিলা দিদ্দা যখন কাশ্মীরের অধীশ্বরী তখন রাজ্যের যে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা চলছিল, কহ্লন তাকে তাঁর গ্রন্থে বাস্তবায়িত করেছেন। কহ্লনের মধ্যে কবিত্বশক্তির সাথে ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার দুর্লভ সমন্বয় হয়েছিল। স্বদেশবাসীর দোষগুণ তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন। কাশ্মীরের রাজা হর্ষের মৃত্যুর পর কাশ্মীরে যে রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার নির্ভরযোগ্য তথ্য কহ্লনের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

একাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামপালচরিত' ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কৈবর্তরাজ ভীমের কবল থেকে রামপাল কিভাবে পালবংশের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন, সেই কাহিনীই এই কাব্যের উপজীব্য। কাব্যটি অদ্ভুত কৌশলপূর্ণ উপায়ে রচিত। কাব্যটির প্রত্যেকটি শ্লোক দ্ব্যর্থক। একটি অর্থ পালবংশীয় রামপালের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অপরটি রামায়ণের রামচন্দ্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দুটি কাহিনীকে একত্রে গ্রথিত করার এই অসামান্য নৈপুণ্য খুব কম কবিই দেখাতে পেরেছেন।

জৈন আচার্য হেমচন্দ্রের 'কুমার

পাল চরিত' গুজরাটের অন্তর্গত আন্হিলবিদের রাজাদের কাহিনী এবং বিশেষ করে কুমারপালের জীবনী অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থটির প্রথম ২০টি সর্গ সংস্কৃতে এবং শেষ ৮টি সর্গ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। দুটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে বলে কাব্যটিকে দ্ব্যাশ্রয় কাব্য বলা হয়। প্রাকৃত অংশটি প্রাকৃত ব্যাকরণের জটিল সূত্রগুলির উদাহরণ হিসাবে রচিত। দ্বাদশ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে গ্রন্থটি রচিত হয়।

ঐ একই সময়ে কহ্লন নামে জনৈক কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত 'সোমপাল-বিলাস' নামে একটি অর্ধ ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। কাশ্মীরের কাছে রাজপুরী নগরীর রাজা সোমপালের জীবনের ঘটনাবলী এই কাব্যের বিষয়-বস্তু। কাশ্মীরের রাজপুত্র সুশশাল-এর বিরুদ্ধে রাজা সোমপালের যুদ্ধকাহিনী কাব্যটিতে প্রধান স্থান পেয়েছে।

সোমেশ্বরদেবের 'কীর্তিকৌমুদী গুজরাটের বাঘেলারাজ বংশের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। ১১৭৯ থেকে ১২৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সোমেশ্বরদেব বর্তমান ছিলেন। ইনি ছিলেন গুজরাটরাজের প্রধান পুরোহিত। ইনি অনেক প্রস্তরলিপিও রচনা করেছিলেন তাঁর রচিত '[illegible]' নামে একটি রোমাণ্টিক মহাকাব্য গুজরাট অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ছিল।

কেবলমাত্র যে রাজা ও শাসকদের কীর্তিকাহিনী নিয়েই এই ধরণের কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল তা নয়। অনেক গ্রন্থে সাধারণ অনৈতিহাসিক ব্যক্তিও তাঁর কোনও মহনীয় কীর্তির জন্য ঐতিহাসিক চরিত্রের মতই প্রাধান্য পেয়েছে। চতুর্দশ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে সর্বানন্দ রচিত 'জগড়ু-চরিত' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কাব্যটির নায়ক জগড়ু নামে একজন ধনী বণিক। গুজরাটের কাছে একটি শহরের অধিবাসী ছিলেন ইনি। নিজের দেশের উন্নতির জন্য ইনি অনেক জন-কল্যাণমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। দেশে একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু তাঁর প্রচুর অর্থসাহায্যের ফলে মানুষের কষ্টের অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। এই সব ঘটনা অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে জগড়ুচরিতে। Buhler এই কাব্যটিকে 'historical romance' বলে বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চদশ শতকে জৈন ন্যায়চন্দ্র রচিত 'হম্মীর কাব্য' আর একটি অর্ধ-ঐতিহাসিক কাব্য। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হম্মীরের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং তাঁর নিষ্ঠুর মৃত্যু কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থটিতে লেখকের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। হম্মীরের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী ও কন্যাদের আগুনে আত্মাহুতির বর্ণনায় করুণরসের অবতারণায় পাঠকদের মনকে বিচলিত করে।

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক কাব্য লিখিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলি আজও অপ্রকাশিত। ঐতিহাসিক কাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র রাজতরঙ্গিণী ছাড়া অন্যগুলি ইতিহাসের আবরণে ঢাকা কাব্য মাত্র। এর প্রধান কারণ হিসাবে যা বলা হয়েছে তা হল—তৎকালীন লেখকদের ইতিহাসচেতনা ও ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টির অভাব, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ সব লেখকেরা কাব্যিক বর্ণনা কৌশলের আড়ালে যে সমস্ত তথ্য রেখে গিয়েছেন, উপযুক্ত গবেষণা দ্বারা সেগুলো থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এবার ইস্পাতের পোশাক

অকৃত্রিম কাপড়, কৃত্রিম কাপড়, কাঁচের কাপড়, কাগজের কাপড় সব গেল, এবার ইস্পাতের কাপড় বেরিয়েছে এবং তা দিয়ে একটি বধূকে ব্রাইডাল ড্রেস তৈরি করেছে একজন ইটালিয়ান ওস্তাগর। যে কারখানা এই বিশেষ ইস্পাত তৈরি করেছে, তারা আশা করছে যে এবার তারা সারা দুনিয়ার ফ্যাশন ডিজাইনারদের কাছ থেকে তাদের ইস্পাতের জন্যে অঢেল ফরমাশ পাবে।

অমরুশতক

ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

[অমরু-শতক কাব অমরুর লেখা সংস্কৃত লিরিক্ বা গীতি-কাব্য। এর বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটি শ্লোক স্বয়ংসম্পূর্ণ—কতকটা ফার্সি রুবাইয়াতের মতো। তবে গীতিকাব্য না ব'লে চিত্রকাব্য বললে এর স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রেমের তথা প্রেমিক-প্রেমিকার মানসিক অবস্থার বিচিত্র রূপ বর্ণনা করাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি কবিতা রসসিক্ত শব্দচিত্র—সূক্ষ্ম কারুকার্যময় রাজপুত বা মুঘল আলেখ্যের মতো। অমরুর জীবনকাল সম্ভবত সপ্তম খৃস্টাব্দ, কাজেই প্রাচীন যুগের বিরহ-মিলন কথার একটি চিত্রপঞ্জী এতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেম মুখ্যত দেহধর্মী —কালিদাস ভবভূতিপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ মহাকবির কাব্যে এর ব্যতিক্রম যদিও আছে। অমরু কবির কাব্য লঘু রসের মাধুর্যে মণ্ডিত—যৌবনের চাপল্য এর প্রধান উপজীব্য। দেহাতীত সৌন্দর্যের ইঙ্গিত এতে নাই—এমন কি বিরহজাত গভীর মহান্ দুঃখও এতে স্থান লাভ করে নি। কিন্তু যা সেই তা নিয়ে দুঃখ করে কী হবে? তরল রসের শব্দচিত্র কোথাও কোথাও কোমল মুকুলের স্নিগ্ধ মাধুর্য, কোথাওবা মাণিক্যের স্থির দীপ্তি, স্থান বিশেষে বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো প্রভা, এমন কি দু' একটি শ্লোকে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণদ্যুতি স্ফুরণ করছে আমার অক্ষম অনুবাদ যদি কাব্যের সেই বর্ণোজ্জ্বল রূপ প্রকাশ করতে না পেরে থাকে—তার জন্য কাব্যস্রষ্টাকে দায়ী করা যাবে না।

অমরু-শতকের নানা পুঁথিতে কমবেশী একশোটি কবিতা আছে। তার মধ্যে কোন্‌গুলি অমরু কবির রচিত এবং কোন্‌গুলি প্রক্ষিপ্ত তা' নির্ধারণ করা নিতান্ত দুরূহ। পণ্ডিতদের সঙ্গে এই বিতণ্ডায় যোগ না দিয়ে আমি নিজের পছন্দ মতো একশোটি শ্লোক নির্বাচিত ক'রে অনুবাদের মাধ্যমে রসজ্ঞদের কাছে পরিবেশন করছি। অনুবাদ মোটের ওপর মূলানুগ ক'রতেই চেষ্টা করেছি—তবে কোনো কোনো স্থলে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। ছন্দ বা রুচির খাতিরে সামান্য অদল-বদল করতে হয়েছে, আশা করি তাতে চিত্রের বিবৃতি বা মূল সুরের তালভঙ্গ হয় নি। আর বলা দরকার যে, এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রায় ১০ বছর আগে, এবং আমি যতোদূর জানি তখন পর্যন্ত বাংলায় অমরু-শতকের কোনো অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি।

অমরু-শতকের যুগ ও বর্তমান কালের মধ্যে রুচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে দেহধর্মী প্রেম আবার সাহিত্যে নিজের পূর্বতন স্থান প্রায় ফিরে পেয়েছে। কাজেই সময়ের বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও হয়তো অমরু-শতকের রুচি এখন আর নীতিবাগীশের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হবে না। অন্তত সাহিত্যরসিকরা হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করবেন না। বস্তুত শ্লীলতা ও অশ্লীলতা বিচারের মাপকাঠি চাণক্য শ্লোক নয়—বিদগ্ধ রসজ্ঞের সংস্কৃত রুচি। যা' কিছু স্থূল, বিকলাঙ্গ ও কষ্টকল্পিত—সাহিত্যের বিচারে তাই অশ্লীল। পক্ষান্তরে বাস্তবানুগ হয়েও বাচনভঙ্গীর শালীনতার জন্য রচনা সাহিত্য পদবাচ্য হয় এবং তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। সাহিত্য বিচারের সুরুচি-সম্মত নিরিখ—রসস্নিগ্ধতা ও প্রকাশসৌষ্ঠব: রস কাব্যের চিরন্তন আত্মা এবং সাবলীল ভাষাশৈলী তার রম্য তনু; সার্থক সাহিত্যে তাদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। অন্য কোনো মাপকাঠি এখানে বাহ্য অবান্তর।]

তন্বী উমার মৃণালপাণি পুষ্প-ধনু যখন গড়ে,
শুভ্র নখের অংশুকলাপ মধু দিঠি বিলোল করে;
এত ভ্রমর গুঞ্জরি ধায় কর্ণফুলের পরাগ লাগি;
'সংহরো বাণ'-ক'ন স্মরজিৎ, সেই শরেরই শরণ মাগি।

প্রেমিকের উক্তি

॥ ১ ॥

লাক্ষা-নিষেবিত পদ—পল্লবেরি তুল,
শিঞ্জিনী বাজালো মোর অন্তর শিহরি,
লাঞ্ছনা করিলো পেয়ে অর্চনাতে ভুল
ঝঙ্কারে —'তা'ই বক্ষে ল'য়ে মরি!

॥ ২ ॥

লজ্জা-কাতর মদির দু'টি আঁখি
পাপড়ি খোলে মুকুলসম, রাণী।
রাঙ্ ছো যখন তাকাও আমার পানে,
এক নিমিষে লুকাও যুগল বাণে;
ইঙ্গিতে আজ কইলে কানে কানে
মরম তলে গুঞ্জরে যে-বাণী।
পুণ্য আমার অল্প ছিলো বাকি,
তোমার সনে তাইতো দেখা-জানি॥

॥ ৩ ॥

কিশলয় সম অঙ্গুলি দিয়ে লিখিছে কী-যেন ভুমে,
তরলিত চারু অক্ষিতারকা সারা দেহ মোর চুমে।
লাজ নত মুখে শব্দ এসেও স্ফুরেনা ওষ্ঠাধরে,
অকথিত সেই আহ্বান আজি দহে মন অন্তরে॥

॥ ৪ ॥

মুচকি হেসে আঁকড়ে কেশে
ঘুরিয়ে দিনু প্রিয়ার মুখে;
নয়ন বুজে শিথান খুঁজে
রাখ্‌লো মাথা আমার বুকে।
ক্ষণেক থাকি' মেল্‌লো আঁখি,
পদ্ম হেসে পাপড়ি খোলে;
স্তন-শিখরে মুক্তা ঝরে,
তাই দেখে কি দুঃখ ভোলে?

॥ ৫ ॥

সে বালিকা—কিন্তু আমি হয়েছি চপল,
অবলা সে—বিহ্বলতা অন্তরে আমার;
ও'র তনু দেহ 'পরে কলসী যুগল,
আমি হ'নু মন্দগতি—অদ্ভুত ব্যাপার!

॥ ৬ ॥

মদির নয়না মিছে মান ক'রে
আসে না নিকটে দিবসে কি সাঁঝে;
নিয়তি কি দিলো অভিশাপ মোরে,
বিরহ বেদনা হৃদয়েতে বাজে।

ঘুম ভেঙে যায় ভোরের বেলা-ই,
প্রেয়সীর তবু দেখা নাহি পাই;
মুকুরে তাকা'তে উঠি যে শিহরে'
রাঙা আলিপন মোর ভালে রাজে।

॥ ৭ ॥

পান করিনু যেদিন আমি প্রিয়ার অধর সুধা,
তৃষ্ণা বাড়ে সেদিন থেকে—ঘুচলো কেবল ক্ষুধা।
চিত্ত মাঝে হর্ষরাশি জোয়ার সম আসে;
মোর পিপাসা লবণ জলে কেমন্ ক'রে নাশে।

॥ ৮ ॥

রাগ যদি ক'রে থাকো—আমি নিরুপায়,
তোমার যা' অভিরুচি করো সখি তা'ই;
গভীর আশ্লেষ দাও ফিরিয়ে আমায়,
মোর দেওয়া চুমোটিও ফিরে পাওয়া চাই।

॥ ৯ ॥

মান ভাঙাতে চরণ ধরি—
এই ভয়ে সে আঁচল খোঁজে;
পূর্বরাগ আজ স্মরণ করি'
চাপতে হাসি—দু' চোখ বোজে।
কইলে কথা—সখীর সাথে
একমনে সে গল্প করে;
ভাবনা আমার অল্প তা'তে—
ছদ্ম বিরাগ বর্ম হরে।

॥ ১০ ॥

কেলি-শয়নের স্পর্শ বাঁচিয়ে ব'সে আছে উষাকালে,
তাই দেখে হেসে মাগিনু অধর মধু;
শোণিমা ছড়ায় পাণ্ডু কপোলে, গুণ্ঠন টানি' ভালে
কুণ্ডল-তালে শির নাড়ে নববধূ।

॥ ১১ ॥

কৌতুক হাসে আঁখিতারা দু'টি
উদাসীন ভাব কোথা?
মৌনীর ছলে এইটুকু ত্রুটি—
অধরে গুমরে কথা!
বৈরাগে যদি অভিলাষ হেন,
পুলকের ধায় অঙ্গেতে কেন?
পটু অভিনয় সরলার নয়,
কথা কও, ধ্যানরতা!

॥ ১২ ॥

কোপভরে প্রিয়া সাঁঝের বেলায়
বাঁধে মোর দেহ লোল বাহুপাশে;
লতিকার ডোর শূণ্য করা দায়,
মোর দশা দেখে সখীজন হাসে।
অবসর খুঁজি পালাবার তরে,
'ঘটিবে বিপদ'—কয় মৃদুস্বরে;

অব্যর্থ বাণ হয়ে বুঝি প্রায়,
ব্যাধিনী কাঁদিছে—মৃগ সুখে ভাসে ॥

॥ ১৩ ॥

রক্ত করজ কপোল 'পরে স্পর্শ করে তোমায় বধূ!
নিঃশ্বাসেতে সোহাগ ভরে পিইছে সে-যে অধর মধু।
বাহুলীরে কণ্ঠ খুঁজি ছোঁয় সে আকুল উরোজদলে;
ক্রোধকে বধ ক'রলে বুঝি—কান্ত লোটায় চরণতলে ॥

॥ ১৪ ॥

বক্ষে আমার নখর চিহ্ন হেরি
ঈর্ষাবশে পালায় মদির-আঁখি;
'যাচ্ছো কোথায়' শুধাই আঁচল ধ'রে,
মুখ ফিরালো অশ্রুতে চোখ ভ'রে;
দারুণ রোষে দংশি' অধর 'পরে
বলল—'ছাড়ো, চলবে না আর ফাঁকি!'
অর্থটি তা'র বুঝতে না হয় দেরী,
প্রাণ গেলেও ভুলতে পারি তা' কি?

॥ ১৫ ॥

বরষা আসিলে নব জলধর মেদুর গগনে চুমে;
কয় প্রিয়তমা সজলনয়না—'প্রবাসে যেয়ো না চলি'
আলুলিত কেশ পড়ে মুখ'পর,—আঁচড় কাটিয়া ভূমে
তারপর যাহা করিলো ললনা—কেমনে তোমায় বলি?

॥ ১৬ ॥

আনমনা হ'য়ে কার লাগি করি
প্রেয়সীর কাছে অপর বালার;
শরম ভুলিতে—তুলিকাটি ধরি'
আঁকিতে চাইনু যে কোনো আকার।
জানি না কেমনে ফুটিলো সে-পটে
সেই তরুণীর অবয়বই বটে;
তাই দেখে প্রিয়া আরো বেশি চটে,
রাঙা গালে ঝরে অশ্রুর ধার।
গদগদভাষে কইলো মানিনী—
'এমন স্পর্ধা হেরিবো ভাবি নি';
হঠাৎ সরোষে বাজায়ে কিঙ্কিনী
বাম পদ হানে মস্তকে আমার ॥

দৃষ্টিতে পড়ে বন্দন মালা—
নহে তো ইন্দীবরে;
হাস্য বিথারে অর্চন ডালা,
কেন সে কুন্দে পোছে?
কুম্ভ চাহে না—স্তন স্বেদধারা
মঙ্গল বারি ধরে;
কান্তা সুচারু অর্ঘ্যপসরা
অঙ্গ মাঝারে রচে।

॥ ১৮ ॥

'আজ তোমার কবে হ'লো ক্ষীণ পাণ্ডুর মুখশশী?'
কান্তাকে মোর পুছিনু যখনি আদরে চিবুক নাড়ি।
'শীর্ণ ক্যাকাশে আমি চিরদিন'—ফুকারিলো নিঃশ্বসি',
পক্ষ্ম পলাশ ছাপিয়ে তখনি ঝরিলো নয়নবারি।

॥ ১৯ ॥

রাগে বাঁকাতো না ভুরুর লিখন
আঁচল টানিলে আগে;
কবরী শিথিল করিনু যখন
দশন হানে না ঠোঁটে।
চকিতে জড়ালে দেহে বাহুপাশ
বিরাগ কভু না জাগে;
আজ হেরি হায় নব রোষাভাস,
প্রেয়সীর তনুপটে ॥

॥ ২০ ॥

কণ্ঠ ছাড়িয়া মণিহার যদি
দয়িতার পদতল বেদীতে লোটায়,
মন্মথ দাস যেবা নিরবধি,—
সে-দীনের গতি আজ জানিনে কোথায়!

॥ ২১ ॥

চাঁদ তারা হাসে সুনীল গগনে,
গৃহে মম জ্বলে বাতি;
প্রাণ সখী আঁখি মুদিলো শয়নে—
ধেয়ে আসে কালো রাতি।

॥ ২২ ॥

মোর পানে চাও মুখটি তুলে,
মিথ্যে গুজব যাওনা ভুলে';
পূর্বরাগে মুগ্ধে প্রিয়ে মৌন হেলায় ক'রছো দুখী।
ভাবছো দোষী সত্যি যদি,
সন্তাপেরি নেই অবধি;
ইচ্ছামতো শাস্তি দিয়ে—হও মানিনী আজকে সুখী ॥

॥ ২৩ ॥

প্রবাস যখন গিয়েছিনু, সখে,—
বাঁধে নাই প্রিয়া দীর্ঘ অলকে;
ম্লান হলো তা'র চারু মুখশশী,
পাণ্ডুর তনু কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।
ফিরে এসে গেহে দেখিনু পলকে—
প্রতি রোমকূপ শিহরে পুলকে;
চুম্বিতে মুখ উঠিলো উল্লাস',—
তৃপ্তি আমার বোঝাবো কেমনে!

॥ ২৪ ॥

নিশ্চিত তুমি যাবে চলি', সখি,—
কিবা প্রয়োজন ত্বরাতে?
রম্য ও-মুখ খানিক নিরখি,
দাঁড়াও হোথায় তফাতে।

উত্তাপ লেগে ... পাষাণ,
প্রাণ ছোটে কত চাহে!
সংশয় তা'ই—আবার তোমার
পাবো কি না মোর জীবনে!

॥ ২৫ ॥

মোর ঘরে আছে সে-ই, বাইরেও দেখি তায়!
শয্যায় কভু হেরি, কভু দেখা আঙিনায়;
সামনে আসিলো যেই—পিছনেও আছে জানি।
অন্তর মাঝে পশে—মোর রূপ পেলো তা'ই,
বিশ্ব মাঝারে খুঁজি' মিল্‌লো-যে সব ঠাঁই;
অদ্বৈতবাদ এই—নিশ্চয় আমি মানি॥

প্রেমিকার কথা

॥ ১ ॥

সাম্‌নে এসে কান্ত যখন
কান শুধালো কুশল-বাণী।
মোর সমুদয় অঙ্গ তখন
কর্ণ নয়ন সাজ্‌লো—জানি।

॥ ২ ॥

মুখ লুকানু ওড়নাতলে
চাইলো যবে আমার পানে।
একটি কথা যেমনি বলে—
অঙ্গুলি দেই নিজের কানে।
রাগ দেখাতে মুদ্‌নু আঁখি,
রক্ত কপোল করে ঢাকি;
হায় সখীজন—আমার মরণ
চিত্ত যেহ্‌'শ শঠের ধ্যানে।

॥ ৩ ॥

আমার্ত শুনিলে যার—সর্ব অঙ্গে সঞ্চারে পুলক,
মুখেন্দু নেহারি' প্রেম চন্দ্রকান্ত মণিসম ক্ষরে।
চুম্বিয়া চরণ পুনঃ অঙ্গুলিতে জড়ালে অলক,
কতক্ষণ ছদ্মরোষ রাখি, সখি, সেই বঁধু 'পরে।

॥ ৪ ॥

সব সখী কয় — আমার লাগি'
বল্লভ আজি হয় বিবাগী।
প্রেম লুকিয়ে উতল বুকে;
বুঝলে সে তো মাত্‌বে সুখে।
হায় বিধি—মোর লজ্জা ভারি
ইঙ্গিত ও যে ক'রতে নারি!

... ...
বঁধু, তোমার প্রেমে রইলো না ভরসা,
আশ্লেষ-পাশ তব শিথিল হ'লো সহসা,
প্রাঙ্গণ কোণে কার কিঙ্কিণী শুনিয়া।
কণ্ঠে তোমার তাই অমৃত-মাধুরী,
মিশ্রিত কূট-মধু নির্ঘৃণ চাতুরী।
তীব্র গরলে পড়ে সঙ্গিনী চলিয়া।

॥ ৬ ॥

মান ক'রে যেই রই নিরালায়—
কতোই চাটু প্রেমিক শোনায়;
আশ্লেষে বাঁধি' লাখ চুমো খায়,
চরণতলে ফের লোটালো।
কিন্তু যখন আদর জানাই—
এমন সোহাগ মিলতো না, ভাই।
সত্যি এখন ভাবছি যে তাই
রাগ অনুরাগ কোন্‌টা ভালো।

॥ ৭ ॥

দৃষ্টি যদি লো ধৃষ্টতাবশে তা'র পথপানে চলে,
চঞ্চল হ'য়ে কাঞ্চী যদিবা লোটে মোর পদতলে,
স্ফুরিত কুচের কম্পনে যদি বক্ষো বসন স্খলে,
অন্তর টুটে যাতনায় সখি—তবু না ডাকিবো খলে।

॥ ৮ ॥

প্রেম নিপুণা সখীর কাছে
মানের রীতি শেখাই আছে;
কপট রোষে বাঁকিয়ে ভুরু—মুদ্‌নু সজল আঁখি।
দশন দিয়ে অধর চেপে,
শরম ভরে ঈষৎ কেঁপে,
ওড়না জড়াই উরোজ 'পরে—বস্ত্রে চরণ ঢাকি।
প্রিয়ের লাগি ব্যাকুল চিত
যতনে করি শৃঙখলিত;
নাইকো ত্রুটি সাধনে মম—সিদ্ধি আজো বাকি।

॥ ৯ ॥

ভাবনা কোথায় অন্তর মাঝে
কাঁপেনি বক্ষ কলিকা;
পুলক না জাগে অঙ্গেতে লাজে—
আননে ঘর্ম কণিকা।
চকিতে আসিলো প্রাণবল্লভ,
হরিলো নিমিষে তনু মন সব;
কহ লো ভামিনি, — কেমনে মানিনী
সাজিবে মুগ্ধা বালিকা।

[ক্রমশ

হাসপাতালে সমাজ-সেবক বা সমাজ-সেবিকার ভূমিকা

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই সাহায্য ও সেবা কার্যের একটি সামাজিক মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে। এই সামাজিক মনোবৃত্তির উৎস ধর্ম থেকেই এসেছে। রাজা অশোকের সময় রোগীকে চিকিৎসা ও সেবার জন্য প্রথম হাসপাতাল খোলা হয়। গোপাদের নিযুক্ত করা হতো আজকের দিনের সমাজ-সেবিকাদের মতোই। খৃস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা বৃদ্ধদিশার সময় এবং খৃস্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষের সময় হাসপাতাল স্থাপিত হয়। কিন্তু আধুনিক হাসপাতালের গোড়া পত্তন হয় খৃস্ট-পূর্ব বারোশ' শতাব্দীতে রাজা পরাক্রমবাহুর সময়। তিনি অনেকগুলি কামরাযুক্ত একটি বাড়ী, স্ত্রী ও পুরুষ রোগীদের জন্য পৃথকভাবে স্থাপন করেন। প্রত্যেক রোগীর জন্য স্ত্রী ও পুরুষ আলাদাভাবে একজন করে রক্ষীও নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত রক্ষীরা ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। রাজা সপ্তাহে একবার করে হাসপাতাল পরিদর্শন করতেন এবং যে সব রোগী আরোগ্য হবার পর চলে যাবেন তাঁদের কাপড়, যাতায়াতের খরচ প্রভৃতি দান করতেন।

মুসলমানদের সময় সমাজ-সেবার রূপটা গরীব, দুঃস্থ, অনাথ, ভ্রমণকারী ও ভিক্ষুদের মধ্যেই সীমায়িত ছিল। ধার্মিক মুসলমানেরা তাঁর উপার্জনের দশভাগের এক ভাগ 'জাকত' বা দানের জন্য ব্যয় করতেন।

বর্তমান সমাজ সেবার রূপ স্থাপিত হলো বৃটিশ যুগে--যদিও ছিল একটু বিক্ষিপ্ত। ১৯৩৬ সালে স্যার ডোরাবজী টাটা গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব্ সোসিয়াল ওয়ার্কস স্থাপনের মাধ্যমেই সমাজ-সেবাকে প্রথম জীবিকা হিসাবে মূল্য দেওয়া হলো। বর্তমানে ইহা টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্স নামে পরিচিত।

চিকিৎসা বলতে আমরা বুঝি শয্যাগত রোগীকে পরীক্ষা করে এবং রাসায়নিক পরীক্ষা-গৃহের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করা। প্রেসক্রিপ্‌শন বা ব্যবস্থা-পত্র সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া। উদ্দেশ্য রোগীকে আরোগ্য করা। আধুনিক

ডাঃ রমেশচন্দ্র আচার্য
(সহ-স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ)।

চিকিৎসায় এই ধরণের রোগনির্ণয় এবং ব্যবস্থা-পত্র ছাড়াও আরো কিছু করবার আছে, কেন না রোগীকে তার পরিবার বা সমাজ থেকে পৃথক করে রাখা সম্ভব নয়। আধুনিক চিকিসার উদ্দেশ্য

লেখক

হচ্ছে রোগীকে আরোগ্য করা, রোগীর দেহ থেকে কোন ছোঁয়াচ বা ইন্‌ফেকশন অন্য পরিবারবর্গের বা পাড়ার লোকের দেহে যেন কোন প্রকারে প্রবেশ না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা এবং রোগী যাতে তার স্বাভাবিক কর্মশক্তি ফিরিয়ে পায় তার চেষ্টা করা।

বর্তমানে আধুনিক ঔষধে অনেক রোগের উপশম হলেও হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। শারীরিক বা মানসিক যে-কোন রোগই হোক না কেন ইহা সামাজিক কারণের সঙ্গে জড়িত। রোগীর বাড়ীর এবং অর্থনৈতিক অবস্থা না জেনে রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা সম্ভব নয়।

আধুনিক চিকিৎসার সমস্ত বিষয় একা ডাক্তারবাবুর পক্ষে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই হাসপাতালে ডাক্তারবাবুর সহকারী হিসেবে সমাজসেবীদের দরকার হয়ে পড়েছে। স্বর্গীয় ডাঃ সৌরেন ঘোষ, বিখ্যাত যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ, সর্বপ্রথম এই সমাজ-সেবিকা নিযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম সমাজ-সেবিকা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁদের কোন-ট্রেনিং ছিল না। ১৯৪৫ সালে 'ভোর কমিটি' ট্রেনিংপ্রাপ্ত সমাজসেবীদের হাসপাতালে নিযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৪৬ সালে বোম্বাই হাসপাতালে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সমাজ সেবক নিযুক্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও সমস্ত হাসপাতালে সমাজসেবীদের নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪২০ জন সমাজ-সেবী রাজ্য, জেলা, মহকুমা এবং ব্লক হাসপাতালে কাজ করছেন। এই সমস্ত সমাজসেবকদের কাজ হলো যে সমস্ত রোগী হাসপাতালে আসেন, তাঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে এবং নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা করা।

এই সমস্ত সমাজসেবীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ১৯৫৭ সাল থেকে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাণ্ড বিজিনেস ম্যানেজমেণ্ট এ একটি দু'বছরের কোর্স খোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগ এই সমস্ত সমাজ-সেবীদের ট্রেনিং এবং চাইল্ড

গাইডেন্স ক্লিনিক-এর জন্য প্রতি বছর ৯০ হাজার টাকা উক্ত ইন্‌স্টিটিউট-কে মঞ্জুর করে আসছেন। সমাজ-সেবীদের শতকরা ৮০টি সিট রিজার্ভ রাখা হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের ইন সার্ভিস ট্রেনিং-এর জন্য। তা' ছাড়া সমাজ-সেবীদের চাকুরীতে নিযুক্ত করেই হেড্‌কোয়ার্টারে স্কুল হেল্‌থ এ্যাণ্ড হেল্‌থ এডুকেশন সেশন থেকে একমাসের একটি ইনসার্ভিস ট্রেনিং দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সমাজসেবীদের কাজের মান এবং জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যই ট্রেনিং-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সামাজিক কারণগুলি, যাহার মধ্যে অসুস্থতার কারণ থাকতে পারে অথবা চিকিৎসার অন্তরায় হতে পারে, সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

অর্থনৈতিক অনুসন্ধান

হাসপাতালের আউটডোর-এ ডাক্তারবাবু একজন রোগীকে পরীক্ষা করে ঔষধ বা ইনজেক্‌শান এবং পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা দিলেন যা' বেশ ব্যয়সাধ্য। রোগী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম [illegible]---আয়ও বেশী নয়। তার পক্ষে ঔষধ বা পথ্য হয়ত কেনা সম্ভব নয়। এমন রোগীও আছেন যিনি যাতায়াত খরচের অভাবে নিয়মমত হাসপাতালে রোগ পরীক্ষার জন্য আসতে পারেন না। মাঝে মাঝে দেখা যায় অসুস্থ মা নিজের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একটা ব্যবস্থা না করে হাসপাতালে আসতে পারছেন না। এই সব ক্ষেত্রে সমাজসেবীরা কিভাবে এই সব রোগীদের সাহায্য করতে পারেন, তা চিন্তা করবার সময় এসেছে। সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই বিষয়গুলির যথাসম্ভব সমাধান করা সমাজসেবীদের একটি কাজ।

সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান

শহর অঞ্চলে এবং শিল্প-অঞ্চলে দিনের দিনই মানুষের সমস্যা বেড়ে চলেছে। অনেক সময় পারিবারিক কারণে রোগীর রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব ঘটে। রোগীর রোগ উপশমের জন্য---বাসস্থান, পরিবেশ, পরিবারের জন-সংখ্যা, গার্হস্থ্য সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষাগত মান ইত্যাদি জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমাজসেবী এই ব্যাপারে ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করেন। রোগীর বাড়ী গিয়ে রোগীর সমস্ত ইতিহাস যোগাড় করা, রোগী কোথায় এবং কি কাজ করেন, পরিবেশ কেমন, পাড়া-পড়শী এবং বাড়ীর সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ইত্যাদি সংগ্রহ করা সমাজসেবীর কাজ।

আলাপ-আলোচনা

মানুষ তার নিজের দুর্বলতার কথা অন্যকে সহজে বলতে চায় না। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে তাকে কেউ নিঃস্বার্থভাবেই সাহায্য করতে প্রস্তুত তখন সে সহজেই এগিয়ে আসে। সমাজসেবীকেও এই বিশ্বাসটুকু রোগীর মনে উৎপাদন করতে হবে। সমবেদনার সহিত রোগীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। হাসপাতালে থাকা কালে রোগীর আত্মীয়-স্বজন এলে তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের যদি কিছু বলবার থাকে তা' জেনে নিয়ে ডাক্তারবাবুকে জানাতে হবে। সমাজসেবীর কাজ হবে, রোগীর পরিবার ও হাসপাতালের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ গড়ে তোলা।

ধৈর্যসহকারে শোনা

প্রত্যেক রোগীই চান---ডাক্তারবাবু তাঁর রোগের কথা সময় দিয়ে এবং মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কিন্তু ডাক্তারবাবুর একার পক্ষে সমস্ত কথা শোনা সম্ভব নয়। তাই ডাক্তারবাবুর এই কাজটি সমাজ-সেবীকেই করতে হবে---রোগীর মানসিক চিন্তা লাঘবের জন্য। রোগী যেন উপলব্ধি করেন---এর আগে এত মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা আর কেউই শোনেনি----। এতে রোগী সমাজসেবীর উপর নির্ভর করবেন। ফলে রোগীর অবস্থার নির্ভুল বিশদ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সব নির্ভুল বিবরণ ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করতে পারে।

আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা

সমাজ-সেবী ইচ্ছা করলে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন। রেডিও, বই পড়া, ঘরে বসে খেলাধুলা, কবিতা বা গল্প লেখা, ছবি আঁকা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই সমস্ত আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে মানসিক অশান্তি দূর হয় এবং রোগ তাড়াতাড়ি সারে। সব রকমের রোগী এমন কি শয্যাগত রোগীকেও কিছুক্ষণের জন্য আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখা উচিত।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

অনেক রোগী আছেন ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মানতে চান না কিংবা রোগের একটু উপশম হলেই ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। অনেকে আবার ভয়ে বা অজ্ঞতার জন্য ডাক্তারবাবুর পরামর্শ শুনতে চান না। সমাজ-সেবীদের কাজ হলো সেই সব রোগীর অজ্ঞতা দূর করে যথাযথ চিকিৎসা করার জন্য উপদেশ দেওয়া এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা করা। যক্ষ্মা রোগীর শতকরা ২৫ ভাগ এবং যৌন ব্যাধির শতকরা ৫০ ভাগ কিছুদিন ঔষধ ব্যবহার করতে চান না। রোগের লক্ষণগুলি দূর হলেই রোগ নিরাময় হয় না। এই জন্যই আমাদের দেশে অনেক রোগ বিশেষ করে এই দু'টি রোগ এত ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজসেবীদের কাজ হবে এই সমস্ত রোগীরা নিয়মমত ঔষধ খাচ্ছেন কি না তা সন্ধান নিয়ে নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

রোগ অনুসরণ কার্য

যৌন-ব্যাধি, যক্ষ্মা, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ হাসপাতালের বহির্বিভাগে পরীক্ষা করিয়ে বাড়ীতে চিকিৎসা করা হয় সেই সব

হবক্ষেত্রে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অনুসন্ধান করা সমাজ-সেবীদের একটি প্রধান কাজ। নিয়মিত চিকিৎসা না হলে ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবার পর অনেক রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হয়—কিছুদিন সপ্তাহে একবার করে শরীর পরীক্ষার জন্য বহির্বিভাগে আসতে। অনেক সময় দেখা যায় রোগীরা ২।১ সপ্তাহ এসে আর আসেন না। ফলে পুনরায় রোগ আক্রমণ করে। ডাক্তারবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রেও সমাজ-সেবীদের অনুসন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। সমাজসেবীরাই ডাক্তারবাবুকে রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর সরবরাহ করবেন।

রোগ প্রতিরোধ

সমাজ-সেবীর অন্যতম কাজ হলো রোগ প্রতিরোধ করা। বাড়ীতে রোগী থাকলে যাতে রোগীর ছোঁয়াচ বা ইনফেক্শন অন্য কাহারও শরীরে ক্রিয়া না করে সে বিষয়ে সকলকে উপদেশ দেওয়া। প্রয়োজন হলে প্রতিষেধক টিকা যেমন—বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড্, ট্রিপল এন্টিজেন, পোলিও, বি সি জি প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দেওয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সকলকে সজাগ করতে হবে। কোনখানে সংক্রামক রোগ নজরে পড়লে তৎক্ষণাৎ জন-স্বাস্থ্য বিভাগে খবর দিতে হবে। প্রথম অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে সহজেই সমস্ত রোগ সেরে যায় এবং রোগ ছড়াতে পারে না।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

সমাজ-সেবীরা সহজেই জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারেন। হাসপাতালের বহির্বিভাগে তাঁরা বহু রোগীর সংস্পর্শে আসেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরেও তাঁরা বহু পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন। কাজেই তাঁরা সমাজের প্রয়োজন সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। স্বাস্থ্যের স্বরূপটি জনগণের মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিতে হবে যে-রোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা, রোগ প্রতিরোধ করা, রোগ হলে প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা—সকলেরই কর্তব্য।

গবেষণা

সমাজ-সেবী তাঁর অঞ্চলের কোন বিশেষ রোগের বিষয় অনুসন্ধান নিয়ে মেডিকেল অফিসারের সঙ্গে গবেষণা করতে পারেন। জনগণের অর্থ-সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, মানসিক সমস্যা, পুনর্বাসন সমস্যা প্রভৃতির গবেষণা করতে পারেন। তিনি পল্লী অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য মেডিকেল অফিসারকে পরামর্শ দিতে পারেন।

পুনর্বাসন

অনেক সময় দেখা যায় রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেলেও, কর্মশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে আসে না। ফলে এই সমস্ত লোক-সমাজের ভারস্বরূপ হয়ে পড়েন। কখন কখন সমাজ-সেবীরা শিল্প-সংস্থার মাধ্যমে কর্মশক্তি অনুযায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিল থেকেও মাঝে মাঝে গরীবদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে ছোটখাট ব্যবসা করবার জন্য মাঝে মাঝে ২৫০ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। অবিবাহিত মাতা এবং তাঁর নবজাত শিশুর জন্য সমাজ-সেবীরা কোন অনাথ আশ্রমের ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রচুর। সুতরাং রিহেবিলিটেশন ওয়ার্কশপ অথবা ওয়ার্ক হাউস প্রতিষ্ঠা করা দরকার যেখানে অকর্মণ্য অথবা অর্ধ-অকর্মণ্য লোকদের শিক্ষা দিয়ে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। এ-বিষয় আমি সদাশয় শিল্প-পতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ছাত্র স্বাস্থ্য

ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক সমাজের মেরুদণ্ড। কাজেই তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা সকলেরই কর্তব্য। জেলা হাসপাতালে সমাজ-সেবীরা স্কুলের অসুস্থ ছেলে-মেয়েদের প্রতি যত্ন নিয়ে থাকেন। ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া প্রত্যেক সমাজসেবীর একটা অন্যতম কাজ।

সমাজ-সেবক অথবা সমাজ-সেবিকারা বর্তমানে হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সমাজ-সেবী তাঁর কাজের দ্বারাই তাঁর মূল্য প্রতিষ্ঠা করবেন। রোগ নিরাময় এবং নিরোধে সমাজ-সেবীর ভূমিকা আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান। তিনি হলেন রোগীর উপদেষ্টা, বন্ধু এবং সমব্যথী। তাঁকে রোগীদের ভালবাসা অর্জন করতে হবে, এবং তাঁর কাজকেও মেডিকেল অফিসারের সুদক্ষ পরিচালনায় অপরিহার্য করে নিতে হবে।

তাপ্তী তীরে সূর্যাস্ত

[গুজরাটী কবিতা]

জয়ন্ত পাঠক

দূরে পশ্চিমের দিগন্ত সাগরে
ভাসে একটি নৌকা শান্ত জলের উপর ;
বসে সেথা রাত্রি সম কৃষ্ণাঙ্গ ধীবর
ফেলেছে বঁড়শি জলে, সুতো নিয়ে হাতে।
(মাছ একটা ধরেছে হয়ত......
টানছে কে সুতো অকস্মাৎ
জলের ভেতরে।)

ধীবর টানলো সুতো ধীরে, অতি ধীরে—
চঞ্চল তরঙ্গ মাঝে শুধু ঝলমল
একটি সোনালী মাছ......
দেখা দিতে না দিতে সে খসে গেল হায়,
শান্ত হলো সব চঞ্চলতা।

অনুবাদিকা : সুজাতা প্রিয়ংবদা

মাতৃ-বন্দনা

স্মরণ করি সেই শুভলগ্ন, যে শুভ লগ্নে মা'র আদরের সন্তান ৺মেহারের সেই বিশেষ চিহ্নিত জীনবৃক্ষমূলে মা'র প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেছিলেন—সাধক সর্বানন্দ, সন্তানকুলের মুকুটমণি, প্রণাম করি সেই সাধকচূড়ামণিকে। ধন্য তাঁর বংশধরগণ। বিগত প্রায় ছয়শত বৎসরকালের ব্যবধানেও তিনি চির উজ্জ্বল—ভাস্বর।

কিন্তু 'মহাসিদ্ধিদিবস' স্মরণ করাই তো কর্তব্যের অবসান নয়, তাঁর নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে তাঁর প্রত্যক্ষদৃষ্টা সেই মহাশক্তি মহামায়ার করুণালাভে সচেষ্ট হতে হবে।

সন্তানমাত্রেই জানে তার পিতামাতার পরিচয়, স্বরূপ চিনতে পারে তার জন্মদাতা বা জন্মদাত্রীর। সন্তান জানে মাতৃক্রোড়ই তার পরম নির্ভয়ের আশ্রয়স্থল। জন্মসূত্রে এ তার অধিকার, এ অধিকারে বঞ্চিত করে এমন কেউই নেই।

তাই আজিকার হিংসা হানাহানি দুঃখজর্জরিত সন্তানদল সমবেত কণ্ঠে মাকে ডাকতে পারলে মা অবশ্যই ছেলেদের দুঃখের অবসান করবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্' (চণ্ডী)। সেই মহাশক্তি পুরুষাকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। সন্তানের নিকট 'মা'র এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে।'

শব্দটিই অপার সান্ত্বনা, সর্বদুঃখে, সর্বসুখে তাঁকেই আমরা স্মরণ করি সর্বাগ্রে। তিনি সন্তানের সর্বমঙ্গলদায়িনী। সোহাগে, শাসনে, ললিতে-কঠোরে ভাবীকালের জন্য প্রস্তুত করেন তাঁর সন্তানকে। কিসের এ প্রস্তুতি—সন্তান চিনতে পারুক তার মাকে, ভাবতে শিখুক্ তার মায়ের কথা, যোগ্য হউক্ তার জন্মদাত্রীর। মহাশক্তি, মহামায়া আমার মা, আমি দীন-হীন নহি, দুর্বল নহি। অনন্ত শক্তিরূপিণীর আমার মা, অতএব ভয় কাকে?

'মা' আমার আদ্যাশক্তি স্বরূপ-স্বতে আপনি বিকশিতা। সৃষ্টির প্রাক্কালে 'নারায়ণ' অগাধ সলিলোপরি শায়িত। সেই 'নারায়ণ' আমার 'মা'য়ের সৃষ্টি। সে অগাধ জলরাশি আমার মায়েরই প্রসূত—প্রথম প্রসব।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সর্ববিদ্যা

পণ্ডিতেরা তর্ক করুন, মহাপ্রকৃতি মা আমার, সর্ববস্তুর স্রষ্টা যিনি, তিনি পুরুষ কি নারী। আমি বুঝি শক্তির জাত বিচার হয় না। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে তড়িৎশক্তির জাতবিচার কবে কে করেছে, এ শক্তির ধর্ম তমোনাশ করা, আলোর প্রকাশ করা—'মা' আমার তমোহন্তা, সন্তানের অজ্ঞানতারূপ তম তিনিই নাশ করেন।

সৃষ্টির বীজ সঞ্চিত রয়েছে মা'র বক্ষে। তিনি ইচ্ছা করলেন, এ বীজ হতে সৃষ্টি করবেন বিচিত্ররূপ। এ যেন 'মা'র আমার দর্পণে নিজ মুখছবি দেখার সাধ—মহামায়ার লীলা—সৃষ্টির আরম্ভ। তাই তিনি ইচ্ছাময়ী—কিন্তু বিনা মন্থনে অমৃতলাভ হয় না। তাই সৃষ্টির প্রকাশের নিমিত্ত মা পুরুষাকার-রূপ পরিগ্রহ করলেন। উপযুক্তক্ষেত্রে নির্দিষ্টকাল, বীজের অঙ্কুরোদ্গম্ অবধি গোপনে বীজের সংরক্ষণের জন্য 'মা'র আরেক রূপ—মা কৃষ্ণবর্ণা।

কালে মা যাকে প্রসব করলেন সে তো মায়ের অঙ্গেরই অংশীদার, সেই মহাশক্তির বীজ লুক্কায়িত রয়েছে তারও বক্ষে। তাই স্রষ্টা মা, তিনিই পিতা, আর তাঁর সন্তান অভিন্ন। সেই অধিকারে আমরা পাঠ করি 'সোহং' মন্ত্র। সন্তানের সেই সুপ্ত শক্তির বিকাশ করাই মাতৃ-সাধনা, যিনি সেই শক্তির বিকাশে সক্ষম হয়েছেন, সন্তানকুলে তিনিই ধন্য।

সাধক সর্বানন্দ 'মা'র তেমন সন্তান।

অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবকুল তারস্বরে প্রশ্ন করে—যিনি লোকাতীতা সেই পরমাশক্তি শাক্ত কি বৈষ্ণবী? শাক্তের সাধনার পথ—ভোগের পথ, ভোগের অন্ত না হলে, বৈরাগ্যের ত্যাগের ধর্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। ব্যতিক্রম বাহ্যত কখনও দৃষ্ট হলেও সন্তানের ভোগাকাঙ্খা অচরিতার্থতার রূপ সাধনায় বিঘ্নস্বরূপা হয়। সন্তানের এ আত্মপ্রবঞ্চনায় 'মা'র প্রসন্ন দৃষ্টিলাভ সম্ভব নয়।

শাক্তের চূড়ান্ত সার্থকরূপ বৈষ্ণবরূপ। সাধিকার যিনি যথার্থ বৈষ্ণব তিনি সর্বাগ্রে শাক্ত। তাই মহামায়া বৈষ্ণবী-রূপিণী।

নিরাকার মহাশক্তি সমস্ত আকারেরই প্রতীক্। নির্দিষ্ট বা বিশেষ ধরণের স্বতন্ত্র কোন আকার তাঁর নেই। বৈজ্ঞানিক বা বৈয়াকরণিকের সংজ্ঞায় তাঁকে বর্ণনা করা যায় না।

মা যদি পিতৃরূপে, অথবা মাতৃরূপে নিরাকার, তবে 'মা' বলে ডাকি কেন? দৈনন্দিন সংসারজীবনে আমরা তো মাকে ডেকেই সুখ দুঃখ জানাই, পাই সান্ত্বনা, পাই ভরসা। সমস্ত সুখ আমার মাকেই করে পূর্ণসুখী। সকল আনন্দবেদনার আসল অংশীদারতো 'মা'ই, অজ্ঞানাচ্ছন্ন সন্তানের নিরাকার 'মা'র সাধনা সম্ভব নয়। তাই 'মা' আমার অবলম্বন। এ সিঁড়ি ছাড়া ওপরে যাবো কি করে।

এতো হলো মা'র কথা, তবে মার

দশমহাবিদ্যারূপ কেন? দশমহাবিদ্যা কি? দশমহাবিদ্যা কেন? সেটা বুঝি, সৃষ্টি হতে লয় পর্যন্ত পৌঁছাতে মধ্যপথে, অষ্টদলে 'মা'র পুজো করতে করতে শেষ অর্ঘ্যদান পর্যন্ত পথের নিশানা দেওয়াই মায়ের ইচ্ছা।

কিন্তু দশমহাবিদ্যা কি? এ প্রশ্নের জবাব অজ্ঞান সন্তান কি দেবে? যিনি সঠিক দিতে পারেন, তিনি মাতৃবক্ষে লয় প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী। বিভিন্ন-কালে সেবক সন্তানগণ মা'র দশমহা-বিদ্যা সম্পর্কে বলেন, 'মা' কুমারী-রূপিণী, সৃষ্টির বীজ তাঁর বক্ষে গুপ্ত রয়েছে, তাই মহাশক্তি কুমারী 'মা'ও ঘটে। তিনি সৃষ্টিকারিণী। যে নবরূপ নারায়ণরূপ হতে সৃষ্টির সূচনা, সেই নারায়ণের স্রষ্টা আমার 'মা', তবে 'মা'র স্রষ্টা কে? কেন বীজ। বীজভিন্ন সৃষ্টি-সম্ভাবনা কি বীজ লুক্কায়িত ছিল আমার 'মা'রই বক্ষে তবে আর প্রশ্ন চলে না। কুমারী কন্যা, মাতৃশক্তি তথা সৃষ্টিশক্তির অধিকারিণী, বীজধাত্রী—কালী।

তিনি নারীস্বভাবসুলভা বামপদ অগ্রচারিণী, ঈষৎ চঞ্চলা, উগ্রস্বভাবা বুঝিবা কৈশোরহেতু কুটিল স্বভাবা তারারূপিণী।

দেখতে দেখতে কৈশোর অতিক্রান্তা, রূপ পরিগ্রহ করলেন নবযৌবনসম্পন্না, সন্তানের জন্মদানে সক্ষমা রূপময়ী ষোড়শীরূপিণী।

মা সন্তান প্রসব করলেন, এবারে প্রসবান্তদশাপ্রাপ্তা, ক্ষীণা, মলিনা সন্তানের লালনপালনে মত্ত তাই, ভুবিন্দু, মা তাই ভৈরবী।

কিন্তু 'মা'র এই সৃষ্টি বড় আনন্দের, বড়ই আগ্রহের হলে ও ছেদন ভিন্ন সৃজন সম্ভব নয়। সন্তান মাতৃদেহ হতে ভূমিষ্ঠ হতে মা'র দেহ হতে সন্তান তো ছিন্নই হয়। স্ব-শির স্বীয় হস্তে ছেদন করে সন্তানের প্রতীক্ নিজশির নিজ-হাতে ধারণ করলেন। সেই ছিন্নশির মাতৃরুধিরই পান করছে। গর্ভবাস কালে যেমন মা'র দেহ হতে সন্তান আহার্য পায়, তার পরবর্তীকালেও মা'ই সন্তানের আহার্য দিয়ে থাকে। ব্যবচ্ছেদ্ সন্তানের নাড়ী ছেদনের প্রতীক্ তাই 'মা' আবার নবরূপ গ্রহণ করলেন ছিন্নমস্তারূপিণী।

সন্তান পালনে মা'র কোন অবস্থাই সন্তানের কল্যাণকামনায় বিরত করতে পারে না। অনাথা, বৈধব্য যন্ত্রণার ক্লিষ্টা সর্বকারণিকা মা ধূমাবতীরূপিণী।

সংগ্রামই জীবন। তাই অষ্টাদশী সংগ্রামকারিণী জীবনের প্রতীক্-স্বরূপা, রূপময়ী, জিহবা এ রূপবর্ণনা করতে অক্ষম। তাই 'মা' আপনহাতে জিহবা-ছেদনকারিণীরূপা বগলা-রূপা।

জীবের জঠরজ্বালা নেভে না। তাই সন্তানের ক্ষুদ্রশক্তির আয়ত্তাতীত জঠরজ্বালা নির্বাণের পূর্ণ দায়িত্ব মা'ই গ্রহণ করলেন। মা মাতঙ্গীরূপা।

'কমলাত্মিকা' মা। স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল ত্রিপর সৃষ্টিকারিণী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপী একই অঙ্গে পূর্ণ শক্তির পরি-পূর্ণ প্রকাশ মহামায়া।—

পর্যায়ক্রমে অষ্টদলে মাতৃপূজার অন্তে, মায়ামোহের অবসান হলে সৃষ্টি-শক্তি ও লয়শক্তির মহামিলন ঘটে, স্রষ্টা অর্ঘ্য দেয় লয়কর্তার পদতলে। এ মহামিলন, জীবাত্মার পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্তি, ইহাই মোক্ষ—সন্তানের ইহাই কাম্য। এরই জন্য সাধনা। সাধনার সর্বশেষ প্রাপ্তি এই মাতৃপ্রাপ্তি। অতঃপর চাইবার বা পাইবার আর কি রইলো?

এই লয় প্রাপ্তির বা মহামিলনের স্থলস্বরূপ মাতৃবক্ষ, সন্তানের জন্মক্ষেত্রও বটে, এই গোপনক্ষেত্র বর্ণাতীত। সে বর্ণ নিরূপণ বিশেষ ধরণের রঞ্জন-রশ্মি দ্বারাই সম্ভব। এ রঞ্জনরশ্মি মাতৃদত্ত দিব্যদৃষ্টি—তৃতীয় নয়নের উন্মেষ, যাহা লাভ করতে প্রয়োজন মাতৃমন্ত্রের সাধনাও সিদ্ধি।

অপার করুণাময়ী, সন্তানের মঙ্গল-দাত্রী, বরাভয়া, চিন্ময়ী 'মা' সন্তানের আকুল আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দেবেন।

মদ্‌গুরু জগদানন্দ
বুদ্ধানন্দ জগৎপতে
নিয়তঃ সচ্চিদানন্দঃ
সর্বানন্দ নমোঽস্তুতে।
সর্বস্বং মাতৃচরণং
সর্বৈশ্বর্য প্রদায়িনী
মাতৃ পাদোদকং পীত্বা
সর্ব দুঃখ বিনাশিনী।

জীবন পান্থ

সুধীর বেরা

জীবনে চাওয়ার শেষ নাই।
পাওয়া সে তো অল্পমাত্র লাভ।
চাওয়া পাওয়ার
এই ব্যবধান—
হয় নি ক্ষয়, হয় নি শেষ।

জীবনে শান্তির জল
নিদাঘের মধ্যাহ্ন স্বপন।
ব্যথায় নীল হ'য়ে যায়
না পাওয়ার বাসনা।

মনের যে আশাগুলি
কুঁড়ি হয়ে, ফুল হয়ে
ফুটে উঠে নিত্য নব রঙে
—সেগুলি কেমন ক'রে
ঝরে যায়
ফুটবার আগেই।

কতবার চেয়েছি দাঁড়াতে
ঘায়ে ঘায়ে জর্জর দেহ নিয়ে
পারি নি
পড়ে গেছি।

আবার চেয়েছি
আবার পড়েছি।
এ চেষ্টার শেষ নাই,
নাই এ যাত্রার বিরাম।

পান্থশালা হ'তে পান্থশালা
চলে পান্থ—
অনন্ত পথের ধারে
যদি থাকে পদচিহ্ন তার
থাক,
যদি মুছে যায়, যাক।

পথের মায়া কান্না নিয়ে
দেয় না দেখা।
আসমান উদার
সেখানে সীমানা নাই
নাই কোন দিশা।

অসীম চলার পথে পান্থের দিশারী
এ আকাশ,
এর এত রঙ॥

বেলা শেষে

-পরিমল ঠাকুর

পা পা চলি চলি

—তড়িৎ দে

মাসিক বসুমতী।

বৈশাখ / '৭৬

বিস্ময়!

—এম আর দত্ত

নতমুখী

আমার দেশ

—চিত্রজিৎ ঘোষ

(৩য় পুরস্কার)

নর্ত্তকী

—রমা কুণ্ডুচৌধুরী

বাহক ও বাহন

—আশুতোষ সিংহ

—কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
(২য় পুরস্কার)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

বিষয়বস্তু

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়
পোর্ট্রেট

* * *

আষাঢ় সংখ্যায়
বিচিত্র পোষাকে

* * *

শ্রাবণ সংখ্যায়
হাসি

* * *

১ম পুরস্কার
কুড়ি টাকা

২য় পুরস্কার
পনেরো টাকা

৩য় পুরস্কার
দশ টাকা

প্রতিযোগিতার ছবি পাঠানোর শেষ
তারিখ বাঙলা মাসের ১৫ই

॥ আমার দেশ ॥

—বিনোদ রক্ষিত

আমার দেশ

—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১ম পুরস্কার)

চব্বিশ পরগণা

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রীতিকর গ্রাম
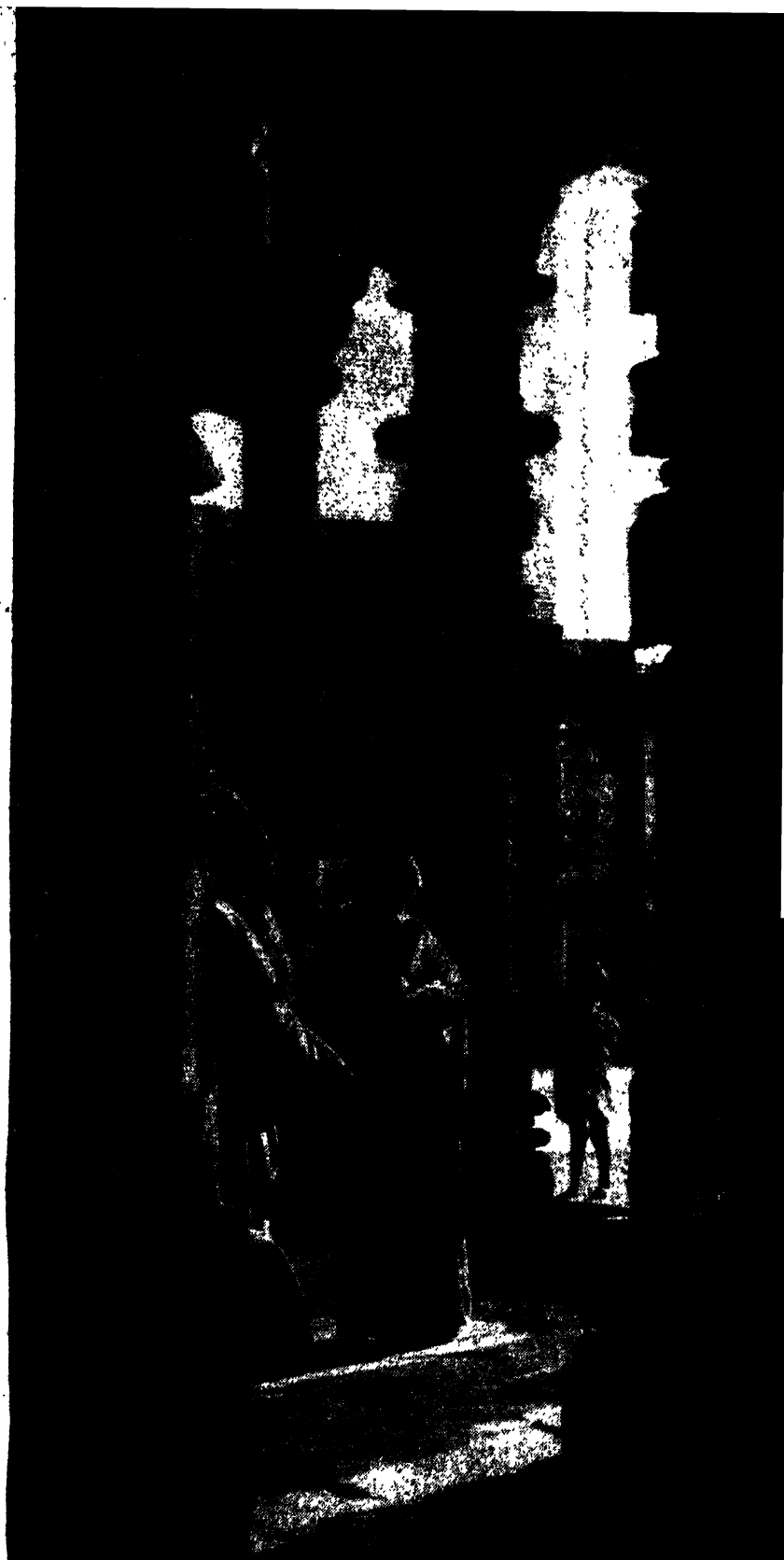
এই জেলার বহু গ্রাম বা স্থান বহু কাল হতে নানা দিক্ দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সবগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তার মধ্যে কতকগুলি স্থানের উল্লেখ করা হল।

আলিপুর

এই জেলার সদর মহকুমা। এর প্রাচীন নাম আলিনগর। সিরাজ-উদ্দৌল্লা ইংরেজদের হাত থেকে কলকাতা কেড়ে নেবার পর ইংরেজরা আবার ইহা উদ্ধার করে। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের আলিনগরে সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ-সংস্কার ও ট্যাকশাল বসিয়ে বাদশাহের নামে সিক্কা টাকা তৈরী করার অনুমতি পায়। ভৌগোলিক হিসেবে কলকাতা এই জেলায় অবস্থিত হলেও শাসনকার্য হিসেবে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত নয়। কলকাতা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হল না। বর্তমানে আলিপুরে চিড়িয়াখানা, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি, প্রেসিডেন্সী জেল, হাওয়া অফিস ও কোর্ট আছে।

এইখানেই খিদিরপুরের কাছেই ভূ-কৈলাসের রাজবাটী। এর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কিছুকাল কর্ম করেন ও দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি পান। এই স্থানের কাছে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ চৌধুরী কালীঘাটের মন্দির তৈরী করেন। এঁদের কাছ থেকেই কোম্পানী কলিকাতা ক্রয় করে। বড়িষার কাছে রাজা প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায়ের রাজধানী ও রায়গড় দুর্গ ছিল। ফলতা বাজারের কাছে দক্ষিণ দিকে দামোদর সঙ্গমে এক পরিত্যক্ত দুর্গ আছে। ১৭৫৬ সালে সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করলে ইংরেজরা এই দুর্গে আশ্রয় লয়। এখানে আচার্য জগদীশ বসুর 'মায়াপুরী' নামে বাগান আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য অনেক উদ্ভিদ এখানে আছে।

পানিহাটি

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি পবিত্র স্থান। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট ও সমাধি আছে। সাতশ বছরের পুরানো একটি বটগাছ আছে। এখানে 'গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে' অনেক স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষিত আছে।

খড়দহ

এটিও বৈষ্ণব তীর্থ, কলকাতা থেকে ১২ মাইল। নিত্যানন্দ প্রভু সস্ত্রীক এই স্থানে এসে বসবাস করেন। নিত্যানন্দ বংশীয়রা এখানে বাস করেন। এখানকার বিশ্বাস বংশও প্রসিদ্ধ। এই বংশের শিবচন্দ্র দাস মুর্শিদাবাদ নবাবের সহকারী মুন্সী ছিলেন। নবাব কর্তৃক বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। এই বংশীয় প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ছিলেন।

ব্যারাকপুর

অন্যতম মহকুমা। কলকাতা থেকে ১৪ মাইল। ১৭৭২ খৃঃ এখানে সেনানিবাস হয়। এর পূর্বে নাম ছিল চাণক। ব্রিটিশ আমলের বড়লাটের প্রাসাদ-উদ্যান এখানে আছে।

নৈহাটি

কেউ বলেন এখানে কুমার পালের হট্ট বা হাট ছিল। রাজা দনুজমর্দনের ছেলে পদ্মনাভ রাজধানী ত্যাগ করে নৈহাটিতে বাস করেন। পদ্মনাভের ছেলেরা রূপ ও সনাতন। তাঁরাও এখানে কিছুকাল বাস করেন। এখানে বহু বিদ্বানের বাস।

দমদম-ক্যান্টনমেন্ট

কলকাতা থেকে ৭ মাইল। এখানে ইংরেজদের সেনানিবাস ছিল, বর্তমানে বন্দিনিবাস। এখানে লর্ড ক্লাইভের পল্লীভবন এখনও আছে। এশিয়ার বৃহত্তম বিমান-বন্দর। এখানে এক সময়ে দমদম বুলেট নামে এক বিশেষ গুলি তৈরী হয়েছিল।

বারাসাত

অন্যতম মহকুমা। কলকাতা থেকে ১৪ মাইল। এর ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নীলগঞ্জে বাঙলার প্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয়।

দেগঙ্গা

এটি একটি প্রাচীন স্থান। কলকাতা থেকে ২১ মাইল। দেগঙ্গা শব্দটি দেবগঙ্গা, দীপগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গার অপভ্রংশ। দেগঙ্গার কাছে বহু ধ্বংস-স্তূপ আছে। কেউ বলেন এটি দেউলিয়ার (বা বালাণ্ডার) রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতুগড় আবিষ্কৃত হয়েছে। দেগঙ্গার কাছে বালাণ্ডাও একটি প্রাচীন স্থান।

বসিরহাট

অন্যতম মহকুমা। কলকাতা থেকে ৩৫ মাইল। শহরটি ইছামতীর দক্ষিণ তীরে। বাণিজ্যকেন্দ্র।

টাকী

এখানের জমীদারেরা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের বংশধর।

হাসনাবাদ

বিখ্যাত গঞ্জ।

বজবজ

পূর্বে মুসলমান যুগে এখানে এক দুর্গ ছিল। বর্তমানে কেরোসিন ও পেট্রোল বন্দর। এটি কলকাতা ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

ঘুটিয়ারি শরিফ

কলিকাতা হতে কুড়ি মাইল এটি মুসলমান তীর্থস্থান।

ক্যানিং

মাতলা নদীর তীরে। এর উত্তরে বিদ্যাধরী নদী। লর্ড ক্যানিং-এর সময় পোর্ট ক্যানিং-এর সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য স্থান। মাতলা ও বিদ্যাধরীর মোহনায় প্রতাপাদিত্যের দুর্গ ছিল।

গোসাবা

স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের আদর্শ কৃষি-উপনিবেশ ছিল।

জয়নগর-মজিলপুর

প্রাচীন গ্রাম। কলকাতা থেকে ৩১ মাইল। এখানকার দত্তবংশ প্রসিদ্ধ বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রকেতু দত্ত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। যশোর রাজ্যের পতনের পর এঁরা এই মজিলপুর গ্রামে বাস করতে থাকেন। এই বংশের কালিদাস দত্ত সুন্দরবনের বহু প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার করেন।

ছত্রভোগ

জয়নগর মজিলপুর হতে ৫।৬ মাইল দক্ষিণে। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রাকালে এখানে এসেছিলেন। এখানকার গঙ্গা শতমুখী হয়ে প্রবাহিতা হত। এখানে শিবদেহ জাহ্নবীদেহে প্রতীভূত হওয়ার, এই স্থানের ঘাট 'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ। এর কাছেই সাগর-সঙ্গম।

ডায়মণ্ডহারবার

অন্যতম মহকুমা। দেশীয় নাম হাজিপুর। কলকাতা থেকে ৩৭ মাইল। পূর্বে বন্দর ছিল। নদীর তীরে একটি পরিত্যক্ত দুর্গ দেখতে পাওয়া যায়। উহা চিংড়িখালি গড়। কলকাতাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে তৈরী হয়েছিল।

গঙ্গাসাগর

ডায়মণ্ডহারবার থেকে গঙ্গাসাগর ৪০ মাইল।

ভাটপাড়া

সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র।

হালিসহর-কাঁচরাপাড়া

প্রাচীন পল্লী।

গোবরডাঙ্গা

প্রাচীন নাম কুশদহ বা কুশদ্বীপ।

জগদ্দল

রাজা প্রতাপাদিত্যের দুর্গের ধ্বংসস্তূপ আছে।

গঙ্গাসাগরে গরু, ভেড়া ও বলদদের প্রদর্শনী

শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্র

গোলাবারুদের কারখানা (ইছাপুর), রেল কোম্পানীর বড় কারখানা (কাঁচড়াপাড়া), কাগজের কারখানা (টিটাগড়, কাঁকিনাড়া), জল সরবরাহের বিরাট কারখানা (পলতা), জুতোর কারখানা (বাটানগর, নঙ্গী), চালের ব্যবসা কেন্দ্র (মগরাহাট), মাছের ব্যবসা (ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার), গঞ্জ বাণিজ্য কেন্দ্র (বনগ্রাম, হাসনাবাদ, কলতা, বসিরহাট), পেট্রোল ও কেরোসিন তেলের ডিপো (বজবজ), চক ও খড় পোতাশ্রয় (খিদিরপুর), তাঁতের কাপড় (বাদুড়িয়া, বারাসাত), মাদুর বা মছলন্দের জন্য বিখ্যাত ছিল বালাণ্ডা, পাট বা পাটের ও শোনের দড়ি (ব্যারাকপুর, দমদম, তিলজলা, মোল্লাহাট, সাপুর, দুর্গাপুর, গোপালপুর, ট্যাংরা), তালা-কুলুপ (বরাহনগর, দত্তপুকুর), গামছা, ছিটের কাপড়, মশারী, লেপের কাপড় (বারাসাত, একবালপুর), কাঁসার বাসন (ডায়মণ্ডহারবার), কাঠের খেলনা, বেতের ঝুড়ি ও বাক্স (নারায়ণপুর, কামারপাড়া, বরাহনগর), খইয়ের মোয়া ও পয়রা গুড় (জয়নগর-মজিলপুর), চামড়ার ব্যাগ, সুটকেশ (ব্যারাকপুর, দমদম), এছাড়া রাসায়নিক ওষুধ, লোহা ঢালাই, ইঞ্জিনীয়ারিং, হোসিয়ারী, বেকারী, রবার দ্রব্য, কাচ, গ্রামোফোন রেকর্ড, রং বার্নিস, লাক্ষা প্রভৃতির শিল্প এই জেলার ঐতিহ্যের কথা জানিয়ে দেয়।

মেলা-মন্দির ও দরগা

দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির। রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত। শ্যামসুন্দর মন্দির, ২৪টি শিবমন্দির, রাসমঞ্চ—খড়দহে। রাসযাত্রা, দোলপূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমায় বিশেষ সমারোহ হয়।

মদনলাল বিগ্রহ—সাঁইবনে। মাঘী পূর্ণিমায় মেলা।

কালীমন্দির ও আদালতেশ্বর— বারাসাত।

শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির—বহড়ু।

মহাকালী মন্দির—ময়দা গ্রামে।

ত্রিপুরাসুন্দরীর পীঠ, অষ্টধাতু মূর্তি—গড়িয়া।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির—ছত্রভোগে।

বদরিকানাথ শিবমন্দির, সঙ্কেত মাধব বিষ্ণুমূর্তি—ছত্রভোগে।

কেদারেশ্বর মন্দির—মন্দির বাজার, ছত্রভোগের কাছে।

জটার দেউল—(৫০।৬০ হাত উচ্চ), বিরিঞ্চির মন্দির, ভরত রাজার মন্দির—লক্ষ্মীকান্তপুরে।

নবরত্ন মন্দির ও জোড় বাংলা—ইছাপুর গ্রামে। কাষ্ঠনির্মিত ধর্মঠাকুরের মন্দির, অষ্টভুজা (গোবরডাঙ্গার কাছে)।

চণ্ডীমূর্তি, ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি—বেহালায়।

পতিতপাবনী মন্দির, শিবমন্দির—ছুকৈলাসে।

শ্যামসুন্দর মন্দির—বোরোয়।

পোক্তারাম শিবের মন্দির, দুর্গেশ্বর মহাদেব কষ্টিপাথরে ৬ ফুট উঁচু ও ব্যাস দু বাহুর বেশী, রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির—রাজপুরে।

বিশালাক্ষী মন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির—টিটাগড়ে।

ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির—(প্রতিষ্ঠাতা গোপীমোহন ঠাকুর)—মূলাজোড়ে।

বিজয়রাধাবল্লভ জীউ—কাঁঠালপাড়ায় (বঙ্কিমভবনে)।

শ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহ—কাঁচড়াপাড়া। রথের মেলা।

জয়চণ্ডী দেবী—মাদরালে।

শিবমন্দির—বোলসিদ্ধি গ্রামে।

পীরগাজি মোবারক আলির দরগা ও সমাধি—আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে দুটি মেলা।—ঘুটিয়ারিশরীফে।

ওলাবিবির দরগা—গৈপুরে। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি মেলা।

পীর গোরাচাঁদ ও গোরাই গাজির সমাধি—১২ই ফাল্গুন মুসলমানদের বৃহৎ মেলা।

পীর একদিল সাহেবের আস্তানা—পৌষে মেলা—বারাসাত কাজিপাড়ায়।

পীরের আস্তানা—তারাপুকুরে। ১লা মাঘ সপ্তাহব্যাপী মেলা।

চীনাদের মন্দির—মাঘ ফাল্গুন মাসে চীনাদের সমাবেশ—আচিপুর (বজবজ)।

চৈতন্য স্মরণ-উৎসব—পানিহাটিতে কার্তিক মাসে। সপ্তাহব্যাপী মেলা।

রাসমেলা—নবাবগঞ্জে।

পঞ্চম দোল উৎসব—জয়নগর মজিলপুরে। ১০ দিন ব্যাপী।

গোষ্ঠবিহার মেলা—গোবরডাঙ্গায় ১লা বৈশাখ।

গঙ্গা-যমুনা মেলা—মাঘী পূর্ণিমায় দেয়াড়াগ্রামে।

বুড়োশিবের মেলা—জলেশ্বরে চৈত্র-সংক্রান্তিতে।

গঙ্গাসাগর মেলা—কপিল মুনির আশ্রম—গঙ্গাদেবী, ভগীরথ প্রভৃতির মূর্তি আছে। সাগরদ্বীপে পৌষ-সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাবেশ হয়।

ফুলিয়ার পাটে অপরাধ ভঞ্জনের পাট মেলা—কাঁচড়াপাড়ায় পৌষ মাসে।

দোলযাত্রার মেলা, রথের মেলা—কাঁচড়াপাড়া ঘোষপাড়ায়।

করুণাময়ীর মেলা—নামডাঙ্গায় পৌষ মাসে।

চড়কের মেলা—জয়নগরে।

কৃষ্ণরামপুরের (বিষ্ণুপুর থানা) মেলা, গোঠের গাজন—সংয়ের প্রতিযোগিতা আষাঢ় মাসে।

দক্ষিণ রায় বা দক্ষিণেশ্বর মন্দির—ধপধপি।

রাসযাত্রা ও রথের মেলা—বারুইপুরে।

মহাপ্রভু বাটি—আটিসারা (ঐ)—বৈশাখ মাসে পক্ষস্থায়ী মেলা।

গোড়ের মন্দির (গঙ্গার অপর তীরে)—স্নেহময়ী বালিকা মূর্তিতে মহামায়া (১৭২১ শকাব্দ)।

মদনমোহন মন্দির—ধান্য-কুড়িয়ায়।

ফকির আবদুল্লা আস্তাসের দরগাহ্, নাখোদা মসজিদের দরগা—মল্লিকপুরে।

মণিবিবির কবর বা কুলপী প্যাগোডা—কুলপী গ্রামে।

দুই সহোদরা—ওলা ও ঝোলার বিগ্রহ

প্রচলিত দোল-দুর্গোৎসবাদি দেব-দেবীর পূজো ছাড়াও এই জেলায় কয়েকটি বিশেষ দেবতার পূজোর প্রচলন আছে।

দক্ষিণরায় বা দক্ষিন্দর—এঁর অপর নাম কালু রায়। সাধারণত ইনি ব্যাঘ্রদেবতা বলে প্রচলিত। এই দেবতার পূজো সাধারণত সুন্দরবনের কাছাকাছি বসতিতে হয়ে থাকে। সুন্দরবনের অধিবাসীদের সর্বাপেক্ষা ভয় বাঘকে। তাদের গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা বাঘের পূজোর প্রচলন করে। শুধু সুন্দরবনে নয়—চব্বিশ পরগণার সমস্ত দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা-পার্বণ আজও হয়ে থাকে। দক্ষিণরায়ের মূর্তি—মানুষের মূর্তি, মুখাবয়ব বিরাট, চ্যাপ্টা, বড় বড় চোখ, ঠোঁট, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত বিস্তৃত। ধারাল দাঁত, আর ঘন গোঁফ, পরিধানে যোদ্ধার বেশ, সঙ্গে ঢাল, তরোয়াল, টাঙ্গি, তীর-ধনুক, কাঠের বন্দুক ইত্যাদি।

কোনও কোনও স্থানে দেখা যায় ইনি বাঘের ওপর বসে, আবার কোনও জায়গায় পাশে ব্যাঘ্রমূর্তি থাকে। মূর্তিটি মাটির পাত্রের আকারে করা হয়, মাথায় মুকুট থাকে। মুকুট সাধারণত মুখের চেয়ে বড় হয়। যেন পানের মত। মূর্তিটি আঁকা হয় খার গোলার প্রলেপ দিয়ে। তার ওপর কাল ও লাল রং দিয়ে। চোখ, ভ্রূ, গোঁফ কাল রঙের আর ঠোঁট, নাক লাল রঙের, মুকুট লাল ও কালও হয়।

দক্ষিণরায়ের পূজো সাধারণত মাঘ মাসে হয়। কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই। দিনেও হয় রাত্রিতেও হয়। চাল, কল, মূল দিয়ে পূজো হয়। ছাগবলি, হাঁস বলিও হয়। সাধারণত বাঘেরা শীতকালের রাত্রেই বেশী দেখা দেয়। সেই কারণে শীতের রাত্রে সকলে জড়ো হয়ে ঢাক, ঢোল পিটিয়ে চীৎকার করতে থাকে, যেন পূজোর সময় বাঘ সেদিকে না আসতে পারে। পূজোর স্থানে একটি মূর্তি ছাড়া বহু মূর্তিও পূজো হয়। পূজোর স্থানের আশপাশে মনসাগাছের সারি পোঁতা হয়।

এই ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিন্দরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিংবদন্তী আছে—গণেশের জন্ম-সময়ে মাঝা শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডটি উড়ে যায়। তার বদলে তাকে হাতির মুখ দেওয়া হয়। সেই গণেশের হারানো মুখটিই হচ্ছে দক্ষিন্দর। আবার কেহ বলেন, যশোহরের কোন রাজা ছিলেন দক্ষিণ রায়। তিনি সুন্দরবনে বহুবার বাঘ শিকার করতে এসে বহু বাঘ ধরে নিয়ে যান। তাঁর আগমনে বাঘেদের ভীতি হত বলেই তিনি ব্যাঘ্র-দেবতা। কেহ বলেন—শিবের এক অনুচর এই দক্ষিন্দর।

প্রাচীন যুগে কৃষিকাজ আরম্ভ হলে এই ব্যাঘ্রদেবতা শস্যরক্ষক ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন।

দক্ষিণরায়ের স্থায়ী স্থান—এই জেলায় ধপধপি, মটীপুর, মহেশপুর—এখানে দক্ষিণরায়ের স্থায়ী থান বা মন্দির আছে। শনি ও মঙ্গলবার পূজোর বিশেষ দিন।

ওলাইচণ্ডী, ওলাইবিবি, ওলা, ঝোলা ও বনবিবি—চব্বিশ পরগণার কোনও কোনও স্থানে দেখা যায়—ধান-ক্ষেতের কাছে খোলা মাঠে ছোট ছোট জায়গা নিয়ে মাটির বেদী করে পাতা ডালপালা দিয়ে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে করা হয়। সেই ঘরের মধ্যে বেদীর ওপর দুটি মূর্তি রাখা হয়—মূর্তি দুটি দু' বোন ওলা আর ঝোলা। তাদের লাল কাপড় পরান হয়, তাদের হাতের চেটোয় ঘন লাল রঙ মাখান হয়। উভয় মূর্তির ডান হাত ওপরে তোলা, বাঁ হাত বেঁকিয়ে রাখা। যেন পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ী নিয়ন্ত্রণ করছে। পুরুতমশাই পূজো করেন, পূজো দিন-দুপুরে বিধি। মাটির প্রদীপ জ্বালা হয়, অনেক স্থলে ছাগবলি হয়। ফুল-ফল দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়। ছাগমাংস বিতরণ করা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পূজো করেন। হিন্দুর ওলাইচণ্ডী, মুসলমানের ওলাইবিবি। রাতে বহুসংখ্যক প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়।

কেহ বলেন ওলাইচণ্ডী—ওলা-উঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কেউ বলে ওলা আর ঝোলা দু' বোন—ঝোলা বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাধারণত মাঘ মাসে এই পূজো হয়। যাঁরা পূজো দিতে আসেন, তাঁরা সকালে সব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে দুপুরে পূজো দেন। তারপর এখানে বনভোজন করে বিকেলে বাড়ী ফেরেন। মাঘ মাস শেষ হলে কুঁড়েঘর ভেঙ্গে ফেলা হয়। বনবিবি—বনদেবী অর্থাৎ ইনি জঙ্গলের হিংস্র জন্তু হতে রক্ষা করেন। ওলাই-দেবীর স্থায়ী মন্দির আছে কলকাতার উপকণ্ঠে বেলগেছিয়ায় ও মধ্য কলকাতায় বৌবাজার-নেবুতলায়, গৈপুরে ওলাবিবির দরগা।

মকর পূজা—মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে এই পূজো হয়ে থাকে। পৌরাণিক মতে মকরের বর্ণনা—মাথা ও সামনের পা কৃষ্ণসার মৃগের মত, আর দেহ ও লেজ মাছের মত। ইনি গঙ্গা-দেবীর বাহন। এই জেলায় বহু স্থানে এই মকর পূজো হয়ে থাকে। সাধারণত নদীর ধারে খোলা মাঠে এর মূর্তি তৈরি করা হয় ও ঐ স্থানেই পূজো হয়। মূর্তিটি কুমীরের মূর্তি হয়।

মনসা পূজা—সর্প দেবী বিশেষ। কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা বলে এঁর নাম মনসা হয়। নাগরাজ বাসুকির ভগিনী ও জরৎকারু মুনির ইনি পত্নী। এঁর পুত্র আস্তিক। এই জেলায় সর্পভীতি খুব প্রবল থাকায় মনসা দেবীর পূজোর প্রচলন এখানে খুব বেশী।

বর্তমানে লোকবসতি বেড়ে যাওয়ায়, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে বহু পরিবার এই অঞ্চলে বসবাস করছেন। বর্তমানকালে বনজঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার হয়ে পাকা রাস্তা হয়ে যাতায়াতের সুবিধে হয়েছে। বিভিন্ন লোকবসতির সংস্পর্শে বহু পূজো-পার্বণ বন্ধ হয়ে গেছে।

সাধক, প্রাজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

চব্বিশ পরগণার প্রাচীনকালের মনীষীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মুসলমান আমল হতে আমরা কিছু কিছু জানতে পারি। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র খড়দহে বাস করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর বংশীয়েরা এখনও খড়দহে বাস করেন। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম নামে যে চারজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত সরস্বতীকেও পরাভূত করতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত এই জেলার পুঁড়া গ্রামের ও বলরাম হালিশহর কুমারহট্টের অধিবাসী ছিলেন। এই হালিশহর হতেই ভক্ত রামপ্রসাদের প্রাণারাম সঙ্গীতলহরী সমস্ত বাঙলা দেশ প্লাবিত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরকে পবিত্র করেছিলেন। ভাটপাড়া চিরদিনই নবদ্বীপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছে। এখানে যে কত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন—তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। এই জেলায় কিছু কিছু মনীষীদের নাম ও গ্রামের নাম উল্লেখ করছি। ঈশ্বরপুরী, শ্রীবাস পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, ভক্ত রামপ্রসাদ সেন, আজু গোঁসাই, রাণী রাসমণি, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়—হালিশহরে। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, মহাম: রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহাম: শিবচন্দ্র সার্বভৌম, হলধর তর্কচূড়ামণি, স্যর কে জি গুপ্ত (কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত)—ভাটপাড়ায়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মাণিক্য তর্কভূষণ, তারাকুমার ন্যায়চঞ্চু, মহাম: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিপ্লবী ব্যারিস্টার পি মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র)—নৈহাটিতে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি শিবানন্দ সেন—কাঁচড়াপাড়ায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ মুরারিপুরে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মণিরামপুরে। ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে—আড়িয়াদহে। কবি মনোমোহন বসু—ছোট জাগুলিয়া। কালিকামঙ্গল ও রায়মঙ্গল প্রণেতা কৃষ্ণরাম দাস—নিমতায়। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের শেষ জীবন—মূলাজোড়ে। দেওয়ান রামকমল সেন, ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেন—গৌরীভা বা গরিফা। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—খড়দহে। রাজনারায়ণ বসু—বোড়াল গ্রামে (গড়িয়া)। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারাচরণ কবিরত্ন, ডা: চুনীলাল বসু—চাংড়িপোতায়। শিবনাথ শাস্ত্রী, হরানন্দ বিদ্যাসাগর, হারানচন্দ্র রক্ষিত, মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রত্নবিদ্ কালিদাস দত্ত—জয়নগর-মজিলপুরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পিতৃভূমি—কোদালিয়া গ্রামে। গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী হরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর জন্ম—মাইনগরে। মহিলা কবি বনলতা দেবী—বরাহনগরে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দক্ষিণেশ্বরে। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়—পুঁড়া গ্রামে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—রাহুতা গ্রামে। ভরত শিরোমণি—লাঙ্গলবেড়িয়া। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উখরা - নারায়ণপুরে। সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যকার বৈকুণ্ঠনাথ বসু—বহড়ু গ্রামে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বারাসাতে - নবকুঁড়া গ্রামে। কবি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, কবি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন, পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, অশোকনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক কালিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—হরিনাভি গ্রামে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী—নারায়ণপুরে। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বসিরহাট ভ্যাবলা গ্রামে। বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বসিরহাট যশাইকাঠি গ্রামে। মুজিবর রহমন চৌধুরী—নীল-মণিপুরে। নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—চারঘাট গ্রামে। শাহাদাৎ হোসেন—পণ্ডিতপোলে। নারদীয় লোকনাথ ব্রহ্মচারী (ঘোষাল)—চৌরাশি চাকলা। প্রমুখ অনন্তরাম পণ্ডিত, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী—খাটুরা গোবরডাঙ্গায়। ক্ষেত্রপাল ভট্টাচার্য, ডা: জগবন্ধু বসু—দণ্ডীরহাট (টাকী), নেপালে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো প্রচলনকারী কামান, মেসিনগান নির্মাণক কৃতী ক্যাপ্টেন রাজকৃষ্ণ কর্মকার—হাবড়া দফরপুর। কবিওয়ালা মহেশ কানা—বারাসাতের কাছে মহেশপুরে। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মণিখালি—কৃষ্ণনগরে। বিষ্ণুভক্ত অনন্ত পণ্ডিত—আটঘরা (বারুইপুর)। অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—গৈপুরে। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—রাজপুরে; কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু—নিতাড়া গ্রামে (ডায়মণ্ডহারবার)। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—বেহালায়। পঞ্চানন ঘোষাল—মন্দরাল। বরেন্দ্র বসু—আড়বেলিয়া। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—ইছাপুর নবাবগঞ্জে। তিতুমীর—হায়দারপুরে।

এছাড়া কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশ এই জেলার ঐতিহ্য বহন করেছে।

ভূকৈলাস রাজবংশ—মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইনি সাড়ে তিন হাজারী মনসবদার ছিলেন।

সুঁড়ার রাজবংশ—প্রতিষ্ঠাতা সত্যভাম মিত্র। এঁরা বঙ্গশের মিত্র বংশ। এই বংশীয় রামরাম মিত্র মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান ছিলেন। রাজা পীতাম্বর ডা: মিত্র তিন হাজারী মনসবদার। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদ্যোৎসাহী ও প্রত্নতাত্ত্বিক।

টাকীর মুন্সীবংশ—মুসলমান আমল থেকেই এই বংশের প্রসিদ্ধি। রায় রামাকান্ত গুহ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুন্সীরূপে কাজ করেন বলেই মুন্সী বংশ। কালীনাথ মুন্সী, সূর্যকান্ত রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ভূতপূর্ব হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ডা: সনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ এই বংশীয়।

মজিলপুরের দত্তবংশ—প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রকেতু দত্ত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত এই বংশ্য।

রাজপুরের কর-চৌধুরী বংশ—প্রতিষ্ঠাতা দুর্গারাম কর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিমকমহলের কর্মী।

বারাসাতের মিত্র বংশ—প্রতিষ্ঠাতা রামসুন্দর মিত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনায় আফিং কারখানার দেওয়ান। এই বংশীয় মোহনলাল মিত্র, রসিকলাল মিত্র, শ্যামলাল মিত্র শ্যামবাজারের।

রাজারহাট বিষ্ণুপুরের মিত্রবংশ—নদীয়ার কালেক্টর কালীপ্রসাদ মিত্র এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জাস্টিস রমেশ চন্দ্র মিত্র এই বংশ্য।

গোবরডাঙ্গার মুখার্জি বংশ—প্রতিষ্ঠাতা খেলারাম মুখোপাধ্যায় সেরেস্তাদার ছিলেন। এই বংশীয় সারদাপ্রসন্ন উদারস্বভাব জমিদার ছিলেন।

জগদ্দলের সেনবংশ—দে-গঙ্গার শম্ভুরাম সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দেওয়ান ফকিরচন্দ্র সেন কানপুরে কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন।

বোড়োর বসুবংশ—প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র বসু ওরফে মত্ত বসু কাশিম বাজার কান্তিবাবুর ম্যানেজার ছিলেন। পত্র নন্দকুমার সিল্ক কোম্পানীর দেওয়ান ও পরে কাস্টম হাউসের দেওয়ান।

খড়দহের বিশ্বাস বংশ—শিবচন্দ্র দাস মুর্শিদাবাদের নবাবের কালেক্টারেটের সহকারী মুন্সী ছিলেন। বিশ্বাস উপাধি পান। এই বংশীয় রামহরি চট্টগ্রামে নিমকমহলে কর্ম। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এই বংশ্য।

খড়দহের গোস্বামী বংশ—এঁরা শ্যামসুন্দরের সেবাইৎ। বারুইপুরের চৌধুরী বংশ।

ধান্যকুড়িয়ার বল্লভ-সাউ-গায়েন বংশ—শ্যামাচরণ বল্লভ, উপেন্দ্রনাথ সাউ পাটের ব্যবসায়ে প্রচুর ধনের অধিকারী। এই বংশ বহু জনহিতকর কার্য করেছেন।

নৈহাটির ঘোষ-মজুমদার, মুন্সী ও ভট্টাচার্য বংশ—সামন্তরাজা ভীম সেন (দে-সরকার) যখন নবাব কর্তৃক শাসক নিযুক্ত হন—তখন এই এলাকার শান্তি রক্ষিত হওয়ায় কিছু লোক হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান থেকে এখানে এসে বসবাস করেন। নৈহাটিতে প্রথম এসে-ছিলেন ঘোষমজমদার বংশ। এঁদের আদিবাস ছিল হুগলী আকনায়। মহাদেব ঘোষ নবাব সরকার থেকে মজুমদারদের দৌহিত্র বংশ্য। তারপর দত্ত বংশ। তারপর ভট্টাচার্য বংশ। পণ্ডিত মাণিক্য—তর্কভূষণ মহান হর-প্রসাদ শাস্ত্রীর নৈহাটির আদিপুরুষ। সামন্ত ভীম সেন (দে-সরকার) পৌত্র কমললোচন থেকে মুন্সী বংশ বলে পরিচিত।

মহাকাশের ঘড়ি

মঙ্গল গ্রহে ক'টা বাজে এবং কোন তারিখ জানতে চান? আমেরিকার হ্যামিলটন ওয়াচ কোম্পানীর তৈরী 'মহাকাশ ঘড়ি' আপনাকে তা বলে দেবে মুহূর্তে। অবশ্য, মঙ্গলগ্রহে দিনের দৈর্ঘ্য বিশাল—পৃথিবীর হিসাবে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট এবং ১২ সেকেণ্ডে তাঁর একদিন হয়; এই পরিমাণ দিনের ৫৬ দিনে মঙ্গল গ্রহের এক মাস।

কাজেই ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঘটে। বিশেষজ্ঞ ছাড়া উপলব্ধি হওয়াও কঠিন। কিন্তু আজ যখন মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে, তখন এ ধরণের ঘড়ির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই ফিলা-ডেলফিয়ার ফ্রাংকলিন ইনস্টিটিউট-এর ডঃ লেভিট উপরোক্ত 'মহাকাশ ঘড়ি' আবিষ্কার করেছেন এবং প্রয়োজনীয় হিসাবপত্রও করেছেন। তাঁরই নির্দেশানুসারে হ্যামিলটন ওয়াচ কোম্পানী এই ঘড়ি প্রস্তুত করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময়-নির্দেশক ঘড়ি তো আজকাল সহজলভ্য; প্রয়োজনবোধ থেকেই এর উদ্ভব। বর্তমানে মাটির মানুষ মাটির টান ছাড়িয়ে গ্রহ-উপগ্রহে—এমন কি তারাতেও যাত্রার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চলেছে, কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে 'মহাকাশ ঘড়ি' আবিষ্কার হয়েছে।

হয়তো এমন দিন আসছে, যখন খবরের কাগজে দেখবো:

"মঙ্গল গ্রহ—৩৫৩৩ অব্দ:

———— ————

"আজ ২৪-৩০ মিঃ সময়ে ৪৭০ নং খালে নৌদুর্ঘটনায় চন্দ্রলোকবাসী দুই-জন পর্যটকের মৃত্যু হইয়াছে — তাহাদের নাম ————"

অসম্ভব কিছু নয়—হাসবেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে।

গাড়ী থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এসেই অসীমের চোখে যেন সরষের ফুল ফুটতে লাগল। ভুরু কুঁচকে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে সে একবার ভাবল, আজ পয়লা এপ্রিল নয় তো! তবে? মনোজের বিয়েতে আর সব অতিথিরাই বা কোথায়? আমাকে একাই নিমন্ত্রণ করেছে নাকি?

চারিদিকের জনশূন্য থমথমে ভাব দেখে কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হয়ে সে ভাবল কি করি। সোজা ফিরেই যাবো নাকি?

সিগারেট ধরাতে ধরাতে ধীরে ধীরে একটু এগিয়ে সামনের গাছতলায় একটামাত্র রিক্সাওয়ালাকে সে ডাকলো, এইটে কদমপুর তো হে? মিস্ত্রিরপাড়া কতদূর বলতে পারো?

—মিস্ত্রিরপাড়া তো জানি না বাবু? আপনাকে কি বলে দিয়েছে?

—স্টেশন থেকে মাইলখানেক পশ্চিম দিকে গিয়ে শিবমন্দিরর পাশ দিয়ে একটু গেলেই মিস্ত্রিরপাড়া। সেখানে আজ একটা বিয়ে।

—পুরনো বাসিন্দা —হুজুর?

—না, তেমন পুরনো নয়। খুব জোর বছরখানেক। নতুন বাড়ী—

—তাই চিনতে পারছি না হুজুর। চলুন, পথে জেনে নেব'খন। শিবমন্দির তো সবাই জানে—

অসীম সাইকেল রিক্সায় পা তুলেছে এমন সময় পিছন থেকে শব্দ ভেসে এল। এই রিক্সা, দাঁড়াও একটু—

নিকটে অন্য আর কোন রিক্সা ছিল না। উদ্যত পা নামিয়ে নিয়ে অসীম আর একবার চোখে সরষের ফুল দেখল।

সোনালী স্যাণ্ডেলের শব্দ করতে করতে দ্রুতপদে নিকটে এসেই সুশ্রী ও সুবেশিনী তরুণীটি ভীষণ চমকিয়ে যেন

হেমেন্দ্র মল্লিক

হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে বলে উঠলেন—এখানে কি আর রিক্সা নেই? গেল কোথায় সব?

সরষের ফুলগুলি এইবার অসীমের চোখের সম্মুখেই যেন পূর্ণাবয়ব ফলের আকারে টপ্ টপ্ করে মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। তার মানসিক চাঞ্চল্য অকস্মাৎ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে উদ্যত হয়ে পরক্ষণেই যেন বাতাসহীন বেলুনের মতই সহসা শীর্ণাকৃতি ও শান্ত হয়ে পড়ল।

রিক্সাওয়ালা বললে, না দিদিমণি। গাড়ী এখন আর পাওয়া যাবে না। এই ট্রেনটার জন্যেই আমি ছিলাম। আবার সকালের ট্রেনে—

—তার মানে? কদমপুর স্টেশনে কি একটাই রিক্সা?

সাইকেলে চড়তে উদ্যত হয়ে সে বলল, দুটো গাড়ী থাকে। অন্য গাড়ীটা আগেই চলে গেছে---

আপন নীরবতা ভঙ্গ করে অসীম এইবার গম্ভীর শান্তস্বরে বলল, উপায় যখন নেই, আমি প্রস্তাব করছি, আপনি এই গাড়ীতেই আমার সঙ্গে চলে আসুন। ফিরে যাবার কোন ট্রেনও আজ আর নেই—

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে তরুণীটি বলে উঠলেন,—তা হয় না, কিছুতেই হয় না। আউট অব কোশ্চেন।

শান্ত-শীতল কণ্ঠে অসীম বললে, কি বলচেন বুঝতে পারচেন?

আরও অধৈর্য স্বরে তরুণীটি বলে উঠলেন, তার মানে? আপনি বলতে চান আমি না বুঝেই কথা বলছি?

ধীর সংযত স্বরে অসীম বলল, তাই তো দেখা যাচ্ছে। ফেরার জন্য কোন ট্রেন নেই, দ্বিতীয় কোন রিক্সা নেই—এ কথার অর্থ বুঝতে পারলে—এখন কি করা উচিত তা-ও বুঝতে পারতেন। চড়বেন তো চলে আসুন, না হলে আমি চললাম। সারারাত থাকবেন এই খোলা প্লাটফর্মে, গুণ্ডা, বদমায়েস আর শিয়াল-কুকুরের হেফাজতে—

অসীমের শেষের কথাগুলিতেই

তখন হয় তরুণীটির যথার্থ বুদ্ধির উদয় হল। বিস্ময়জনক নরম সুরে বললেন, কে কোনদিকে যাবো—তার ঠিক নেই—

—বেশ তো। আপনাকে আগে পৌঁছে দিয়ে তবে আমরা যাবো। কিম্বা ঠিকানা দূরে হলে আমাকেই না হয় ফেলে যাবেন আপনারা।

রিক্সাওলা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট ভাবে বলে উঠল, ভাড়া কিন্তু বেশী পড়বে বাবু। একজনের ভাড়ায় দুজন সোয়ারী টানতে পারব না। আগেই বলে রাখছি—

রিক্সায় উঠতে-উঠতে তরুণীটি মৃদু ঝঙ্কার দিলেন,—তুমি তো বাপু একই রাস্তা যাবে?

সন্তর্পণে পাশে বসতে বসতে অসীম বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, একটু বেশীই দেওয়া যাবে হে। দিদিমণির কথা ধোরো না তুমি—এ-সব ব্যাপার ভাল বোঝেন না তো।

স্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে গ্রামের মেঠো পথে অগ্রসর হয়ে লোকটা বললে—শিবমন্দিরের পথেই যাচ্ছি বাবু—

পকেটে হাত দিয়ে অসীম বলে উঠল, একটুখানি থামো ভাই, এক-মিনিট। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে—

লাফ দিয়ে পথে নেমে সামনের দোকানের কাছে এসে অসীম বলল, সিগারেট আছে—?

প্রবীণ বয়স্ক দোকানী সিগারেটের সারিতে হাত রেখে বলল, কি সিগারেট বলুন? এদিকে কোথায় যাবেন বাবু? সঙ্গে মেয়েছেলেও আছে দেখছি—

—শিবমন্দিরের গা দিয়ে খানিকটা দূরে মিত্তিরপাড়ায় একটা বিয়ে আছে, সেইখানেই যাচ্ছি—

গম্ভীর ও সন্দিগ্ধভাবে সিগারেট দিতে দিতে দোকানী বলল,—কে বলছে ওদিকে মিত্তির পাড়া আছে? কাদের বাড়ীতে বে? কখন বে? আমরা তো জানি না কি?? লোকটাও তো দেখছি ভালই পেয়েছেন! যান, তাড়াতাড়ি যান। সন্ধান না পেলে আলোয় আলোয় এখানে চলে আসবেন। এইখানেই আমরা থাকি। পাশেই স্টেশন বাবুদের ঘর। ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। ব্যাটা আবার তাকিয়ে আছে। যান—এই যে বাবু খুচরোটা—

—থাক। ফিরে আসবার সময় নেব'খন। হয়ত এইখানেই থাকতে হবে আজ—চললাম—

●

মিনিট পাঁচ সাত পরে—

মাঝারি গতিতে সাইকেল-রিক্সা ছুটে চলেছে...

দুই পাশে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। দূরে দূরে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পাড়া ও বসতি।

তরুণীটি মুখ খুললেন একটু পরে, শিবমন্দিরের রাস্তায় কোথায় যাচ্ছেন আপনি, জিজ্ঞাসা করতে পারি?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অসীম বললে, খুব পারেন। একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে—মিত্তিরপাড়ায়—

—কি বললেন? মিত্তিরপাড়ায়! মনোজবাবুর বিয়ে কি?

—আপনি কি করে জানলেন?

—আমিও তো সেইখানেই যাচ্ছি! কিন্তু আর কোন লোককে নিমন্ত্রণ করেন নি মনে হচ্ছে যেন—

—আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল একটু আগে—

ঝিরঝিরে বাতাসের বেগটা এই সময়ে বেড়ে উঠতে আরম্ভ করল। তরুণীটির মূল্যবান শাড়ীর আঁচল বার বার উড়ে এসে অসীমের মাথায়-গায়ে পড়তে লাগল। অবাধ্য আঁচল টান-টান করে কটিদেশে জড়িয়ে গুঁজতে গুঁজতে তিনি বলে উঠলেন, ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে...

আকাশের দিকে চোখ তুলে অসীম হালদার বলল, কেবল ঝড়ের উপর দিয়ে গেলেও তো বাঁচা যায়, বৃষ্টি না হয়—

হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে সে বলে উঠল—শিবমন্দির আর কতটা হে? আকাশ একটুও ভাল নয়—ফিরেই চল বরং—

গাড়ী পূর্বাপেক্ষা জোরে চালাতে আরম্ভ করে রিক্সাওয়ালা বলল, এসে গেছি তো বাবু। শিবমন্দির এই সামনের বাঁকে। বৃষ্টির এখনও ঢের দেরী—হয় কি না হয়—

সন্দিগ্ধস্বরে তরুণী বললেন, ফিরতে চান কেন অসীমবাবু? আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?

—তা একটু একটু হচ্ছে। ভারী বিশ্রী সন্দেহ —আস্তে কথা বলুন, ব্যাটা কান খাড়া করে আছে—

আরও ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করে এবং মাথাটা ওর দিকে হেলিয়ে দিয়ে তরুণীটি বললেন, কি সন্দেহ?

—অনেক। প্রথমত বিয়েতে অন্য নিমন্ত্রিতরা কই? দ্বিতীয়ত কেবল আপনাকে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করার, বিশেষত হাতে লেখা কার্ডে—এর উদ্দেশ্য কি? তৃতীয়ত এখানে মিত্তিরপাড়া বা মনোজের বিয়ের কথা কেউ কিছু জানে না কেন? আর—কি হে থামলে কেন?

—এই যে বাবু, এক্ষুণি আসছি। পথটাও জেনে নেব। ঐ তো আপনার শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে—

কোথায় মন্দির?

হাত তুলে একদিকে নির্দেশ করে সে বলল, ঐ তো বাবু গাছপালার আড়ালে,—ঐ যে—।

রিক্সা থেকে নেমে এসে লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে অসীম বলে উঠল, ও তো পুরনো পড়ো মন্দির হে? জঙ্গলে ভরা—ওখানে পথ কই?

আছে বাবু—পাশ দিয়ে আছে রাস্তা—এ কি কলকাতা শহর বাবু—একটু দাঁড়ান—

দেখতে দেখতে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অগ্রসর হয়ে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তভাবে রিক্সা থেকে নেমে এসে মেয়েটি বললেন, আপনার পরের সন্দেহটা কি অসীমবাবু? কি বলতে যাচ্ছিলেন— ?

—এই গুণ্ডাটা। মিত্তিরপাড়া বলে কিছু নেই তাও বেটাচ্ছেলে জানে। জেনেশুনেও এই জঙ্গলের পথে নিয়ে চলেছে কেন আমাদের? মুদী লোকটাও সেই সন্দেহই দেখালো তখন। তাই ফিরে যাবার কথা বলে উঠলাম।

চিন্তিতভাবে তরুণীটি বললেন,

আমারও তাই মনে হচ্ছে এখন। চলুন ফিরেই যাই—এখনও অন্ধকার হয়নি, জোরে গেলে—

ও ব্যাটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না দেখলেন তো? ওটা কি বলুন তো? সীটের তলা থেকে মুখ বার করে আছে?

নিকটে এসে সীটের গদীটা তুলে ফেলতেই দেখা গেল একটি ঝক্‌ঝকে ধারালো ছোরা—

ছোরাটা হাতে নিয়ে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অসীম হালদার সঙ্গী তরুণীটির দিকে। তিনি হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, তাড়াতাড়ি রেখে দিন ওটা। এক্ষুণি এসে পড়তে পারে লোকটা—

মুহূর্তের মধ্যে অসীম হালদারের সমস্ত সত্তার মধ্যে একটা পরিবর্তনের সাড়া পড়ে গেল। কঠিন মুখভাব করে সে বলল, না, ওটা হাতছাড়া করা হবে না মিস বোস, আপনার ব্যাগের মধ্যে রাখুন। আমার ব্যাগ থাকলে আমিই রাখতাম। আমার খুব সন্দেহ, যে, ও ব্যাটা এখানে দলের কাউকে খবর দিতেই গেছে। এবারে এলে ওকে ফিরে যেতেই বলব। অন্ধকার রাত্রে আরও জঙ্গলের মধ্যে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে আমার একটুও ইচ্ছা নেই, মিস বোস, চলুন উঠে বসি। ওভাবে দেখলে সন্দেহ করতে পারে—

পুনরায় দুইজনে রিকসায় বসার পরে গাঢ় নিম্ন স্বরে তরুণীটি বললেন, আমাকে আর মিস বোস বলতে হবে না অসীমবাবু। নাম ধরে ডাকুন, তুমিও বলতে পারেন—আমি কিছু মনে করব না—

স্নিগ্ধস্বরে অসীম বলল, অশেষ ধন্যবাদ। এই কন্‌সেশনের কোন দরকার নেই মিস বোস। কোন অসুবিধাই আমার হচ্ছে না। শাড়ি এঁটে নিন ভাল করে। শক্ত হয়ে বসুন। আসছে না কেন ব্যাটা? কি হল আপনার?

মাথা নেড়ে তরুণীটি বললেন, কিছুই হয় নি আমার। আপনি এত রেগে আছেন কেন অসীমবাবু?

রাগের কোন কথা এটা নয় মিস বোস। আপনার সম্বন্ধে যেন আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অন্য রিক্সা ছিল না বলেই এই প্রকার বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি। বিপদ কি না এখনও জানি না, হলে প্রাণপণ লড়বোই। ঐ যে—ব্যাটা আসছে—এ কি?

আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে নিকটে এসে রিক্সাওলা বললে, এই যে বাবু, এই লোকটা চেনে আপনাদের সেই বাড়ীর ঠিকানা। এদিকে অনেকদিন থেকেই আছে। ঐ ভাড়াই দিয়ে দেবেন ওকে। —যাও ভাই, দেখেশুনে নিয়ে যাও—

সঙ্গের লোকটা আরও দীর্ঘাকৃতি এবং ভাবভঙ্গিও আরও রুক্ষ ও গুণ্ডা প্রকৃতির। সন্দেহ গোপন রেখে অসীম বলে উঠল সে কি কথা। তোমার সঙ্গে কথা হল—অর্ধেক পথ নিয়েও এলে, এখন একজন অচেনা লোকের হাতে গাড়ী ছেড়ে দিলে হবে কেন? তোমার অসুবিধা কি?

নূতন লোকটি রিক্সার কাছে এসে বলল, আপনাদের তো যাওয়া নিয়ে কথা। পথটা ওর ভালো জানা নেই বলেই আমাকে বলল। দেরী করলে আরও অন্ধকার হয়ে যাবে----

মিনিট সাত-আট পরে—আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া---

ভাঙ্গা শিবমন্দির বহুক্ষণ পূর্বে ছেড়ে আসা হয়েছে। মাইল দেড়-দুই অতিক্রম করার পরে এখন যেন কৃষিক্ষেত্রে শেষ হয়ে গিয়ে ক্রমেই একটু একটু বন-জঙ্গলের ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাতাসের বেগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তবে গাছপালার ওপরেই তার অধিক দাপট চলেছে।

তরুণীটি আর একবার মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকালো। ম্লান হাসি হেসে অসীম বলল, দেখতে হবে না মিস বোস, আমিও লক্ষ্য করেছি। সে ব্যাটাও পিছনে পিছনে আসচে সাইকেলে চড়ে।

ভীতস্বরে ফিসফিস করে মিস বোস বললেন, তাহলে? আমাদের কি আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত? আরও অন্ধকারে এই জঙ্গলের মধ্যে—

পথের দুই ধারের গাছপালার দিকে দৃষ্টি রেখেছিল অসীম হালদার কিছুক্ষণ যাবৎ। এইবার উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ সে বলে উঠল, থামাও তো ভাই একটু গাড়ীটা—থামাও এখানে—

রিক্সাওয়ালা যেন একটু চমকে উঠে গাড়ীর গতি কমিয়ে দিল, কিন্তু কি ভেবে পুনরায় জোরে চলতে চলতে বলল, এই তো এসে গেছি বাবু—এখানে থেমে কি হবে—?

—থামাও একবার এখানে। মানি ব্যাগ পড়ে গেছে—

রিক্সাওলা গাড়ীটি সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দিল গজগজ করতে করতে। গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমেই অসীম বলল, টর্চ আছে আপনার—? আনুন তো দেখি একবার—

—হ্যাঁ, আছে টর্চ—গাড়ী থেকে নেমে দুজনেই আট-দশ হাত পিছনে এগিয়ে গেল। অসীম চুপিচুপি বলল, টর্চটা বার করুন চট্ করে। শুনে ব্যাটা রিক্সার গদী তুলে সেটা খুঁজছে—এই যে পেয়েছি। পথের ধারে একটা বাঁশের টুক্‌রো দেখেই অসীম তার মতলব ঠিক করেছিল। সেটা হাতে নিয়েই সে নিঃশব্দে ছুটে গেল—

রিক্সাওলা গুণ্ডাটা তখনও সামনে ঝুঁকে গদীর নীচের ফাঁকে তন্নতন্ন করে ছোরাটা খুঁজছে। কলকাতার এমন ভদ্রলোক প্যাসেঞ্জার যে সে বস্তু চুরি করে লুকিয়ে রাখতে পারে—সে সন্দেহ তার মোটেও হবার কথা না। সুতরাং একেবারে নিকটে পদশব্দ শুনে যখন সে চমকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো—তখন খুবই দেরী হয়ে গেছে। হকি খেলায় অভ্যস্ত হাতে অসীম সেই বংশখণ্ডটি ঘুরিয়ে এনে গুণ্ডাটার ঠিক থুতনির ওপরে বসিয়ে দিল সজোরে।

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল যে, এতটাও হয়ত দরকার ছিল না। ছোরা খুঁজে না পেয়ে সে এমনিতেই বেশ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল,

তারপর সেই ভদ্রলোকই এমন ধারা "গুণ্ডামী' করবেন এ তার স্বপ্নেরও অতীত। হাঁটুতে তীব্র আঘাত না পেলেও হয়ত কেবল চমকের আঘাতেই সে পড়ে যেতো মাটিতে। তবে জখম হত না এবং সঙ্গে সঙ্গেই উঠেও পড়ত।

এরপর অবশ্য অসীম হালদারের বুদ্ধি-বৃত্তি আরও ক্ষিপ্রগতি স্বচ্ছ হয়ে উঠল। হাঁটুর আঘাতটা পরখ করার জন্য সে গুণ্ডাটার হাত ধরে সামনে হঠাৎ টান দিতেই একটা পা আগিয়ে দিতে গিয়েই সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। তাই দেখে অসীম বলে উঠল, গাড়ীতে উঠে পড়ুন মিস বোস—শীগগির। সে ব্যাটাও এসে পড়ল বলে—যা চেঁচাচ্ছে হতভাগা—

বাক্যব্যয় না করে হতচকিত মৃন্ময়ী বসু দ্রুত রিক্সায় উঠে বসে একপাশে সরে গেলেন এবং মুখ তুলে আরও বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, আরে—ও কি করছেন আপনি—?

মিস বসুর পায়ের কাছে বাঁশের টুকরোটি ফেলে দিয়ে অসীম রিক্সায় চেপে বসে গাড়ী চালাতে আরম্ভ করে বলে উঠল, কোন ভয় নেই, সামনে আলো দিন টর্চ জেলে। সাইকেল রেসে বহু প্রাইজ পেয়েছি আমি কলেজে—

গাড়ী এবার তীব্রগতিতে ফেরার পথে চলতে লাগল। পিছনে হাঁটুভাঙ্গা শয়তানটা প্রাণপণে গালমন্দ ও চীৎকার করতে লাগল - - -প্রায় মাইলখানেক যাওয়ার পরে সহসা উত্তেজিত অস্বাভাবিক কণ্ঠে মৃন্ময়ী বসু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, ঐ যে, ঐ তো সেই রিক্সাওলাটা! দেখতে পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ পাচ্ছি। ব্যাটা এখন বোধ হয় ফার্স্ট এড্ দিতে যাচ্ছে পার্টনারকে। শক্ত হয়ে বসে থাকুন আপনি—

টর্চের আলো অসীমের সম্মুখের পথে প্রতিফলিত করে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত-ভাবে মৃন্ময়ী বসু এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলো।

●

পাঁচ-সাত মিনিট পরে - - - -

তৃতীয়বার আগাছার জঙ্গল থেকে রিক্সাটাকে পথের ওপরে ঘুরিয়ে এনে অসীম হালদার বলে উঠল, আর নয়, হার মানলাম।

পিছন থেকে মৃন্ময়ী বসু বলে উঠলেন—কি হল অসীমবাবু! কোথাও লাগল নাকি?

সাইকেল থেকে নেমে পড়ে অসীম বলল, না লাগে নি। মনে হচ্ছে অন্ধকারে ভুল পথেই চলেছি কিছুক্ষণ থেকে। সামনে রিক্সা যাওয়ার পথ আর দেখাই যাচ্ছে না।

টর্চ হাতে রিক্সা থেকে নেমে এলেন মিস বসু। চারিদিকে আলো ফেলে তিনি বললেন, হাঁটা পথ তো পাওয়া যেতে পারে? পারে না? মাইল দেড়-দুই তো এলাম—

সিগারেট ধরাতে ধরাতে অসীম বলল, তা তো পারে। কিন্তু যাবো কোনদিকে? কোনদিকে স্টেশন? সেই দিকে যেতে হবে তো? আচ্ছা—দেখাই যাক—একটুখানি আস্তে আস্তে গিয়ে, যান, চড়ে বসুন—

—সিগারেটটা খেয়েই নিন, অসীম-বাবু—

—না, আর দেরী করা ঠিক হবে না। বসে বসে দিব্যি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যাবো—যান, বসুন উঠে।

অসীম হালদার সীটে চড়ে বসল। কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গে মৃন্ময়ী বসুও রিক্সায় উঠে বসলো। টর্চের উজ্জ্বল আলোয় ধীরগতিতে সাইকেল চলতে লাগল। মিনিট কয়েক পরে সহসা অস্ফুট একটা শব্দ করে অসীম গাড়ী থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, নিভিয়ে দিন টর্চ!

ভীষণ চমকিয়ে উঠে মৃন্ময়ী বসু কম্পিত কলেবরে রিক্সা থেকে নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো অসীম হালদার। হাত বাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে অসীমের বাহু আঁকড়ে ধরে মৃন্ময়ী বসু চুপিচুপি বললেন, কি হয়েছে—কিছু দেখতে পেয়েছেন?

ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অসীম হালদার চাপাস্বরে বলল, জিনিষগুলো তুলে নিয়ে আমাদের এখন গাড়ীটা ছেড়ে দূরে যেতে হবে। আমি ওদের গলার আওয়াজ পেয়েছি। টর্চের আলোয় ওদের সুবিধা হচ্ছিল খুব। আসুন আমার সঙ্গে সঙ্গে—ভয় নেই।

রিক্সা থেকে নিজের প্যাকেট এবং বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে অসীম বলল, দিন আপনার ব্যাগটাও আমার কাঁধে গলিয়ে দিন। শুধু টর্চ হাতে চলতে পারবেন তাহলে। অন্ধকারেই যেতে হবে এখন - - - - - - - -

দ্রুতগতিতে এবং নিঃশব্দেই ওরা পিছন দিকেই চলতে লাগল। মৃন্ময়ীর হাত ধরে রাখলো অসীম নিজের হাতে—দ্রুত নিয়ে যাওয়ার জন্য, আন্দাজ মিনিট পাঁচেক এইভাবে গিয়ে মৃন্ময়ী হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন, একটু থামুন অসীমবাবু—একমিনিট।

অন্ধকারের মধ্যেই পায়ে চলার পথের একধারে গাছপালার আড়ালে মৃন্ময়ী বসুকে নিয়ে এসে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে অসীম বলল, এইখানে বসুন একটু—ওরা এইখানেই আছে আশেপাশে - - -

অসীম বসে পড়ল ঘাসের ওপরে এবং মৃন্ময়ীর হাত ধরে একটু টান দিতেই সেও প্রায় গায়ে গায়ে ঘেঁসেই মাটিতে বসে পড়ল। তারপর কানে মুখ ঠেকিয়ে বলল, ওরা কয়জন? কিছু বুঝতে পারছেন নাকি?

—জন দু'তিন হবে। মনে হয়, রিক্সাটা উদ্ধার করতেই এসেছে। ইস—বড্ড ভুল হয়ে গেল - - -

আরও কাছে ঘেঁসে এসে মৃন্ময়ী বসু বললেন, কি ভুল?

সামনের দিকে হাত তুলে অসীম বলে উঠল চাপাকণ্ঠে, দেখতে পাচ্ছেন? ঐ যে—? রাস্তার ওধারে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে—?

—কই না তো? কি দেখা যাচ্ছে?

—ছোট টর্চের আলো? হাতের আড়াল করে চারিদিকে ওরা খুঁজছে আমাদের। ঐ তো—দেখলেন এবার?

কিঞ্চিৎ স্বস্তির সঙ্গে মৃন্ময়ী বসু বললেন, দূরের দিকেই যাচ্ছে —না?

—তাই তো মনে হচ্ছে। এইবারে ভুলটা শুধরে আসি—কি বলুন?

—কি ভুল অসীমবাবু।

ছোরাটা দিন। ওদের রিক্সার টায়ার দুটো কেটে দিয়ে আসি। আমাদের এত কষ্ট দেওয়া ওদের বার করছি - - -

আকুলভাবে অসীম হালদারকে জড়িয়ে ধরে মৃন্ময়ী বসু বলে উঠলেন, কোথাও যেতে পাবেন না আমাকে একা ফেলে। আমি ভয়েই মরে যাবো—সত্যি বলচি।

মৃন্ময়ীর হাত ধরে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে অসীম বলল, আসুন, দুজনেই যাই—গাছের আড়াল দিয়ে যাওয়াই ভাল। সেই বাঁশটা—?

—এই তো, আমি নিয়েছি সঙ্গে। বাব্বা, খুব মারামারি করতে পারেন যা হোক—

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে এবং একটা বড় গাছের আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে অসীম বলল, চুপ - - আসবে ওরা - - - আসবে - - ছাড়ুন একটু - - -

একটু দূর থেকে স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—শিবমন্দিরের রাস্তায় চল।—সেই দিকেই ওরা যাবে—

—তোর মুণ্ডু। পথ ভুলে ওরা এইদিকেই হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে শিবমন্দিরের পথে যায় নি। বোধহয় আমাদের সাড়া পেয়েই চুপ মেরে আছে - - -

অসীম হালদার প্রমাদ গণলো - - - তার গা-ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ী বসু এমন তীব্রভাবে কাঁপতে আরম্ভ করলেন যে, মনে হল, যে-কোন মুহূর্তেই তিনি হয়ত আতঙ্কে চীৎকার করে উঠবেন। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সাইকেলের টায়ার কেটে দেওয়া অথবা লাঠিটার সাহায্যে আচমকা আরও দুই একজনকে ঘায়েল করার সমস্ত উচ্চ কামনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে দুই হাতে মৃন্ময়ী বসুকে নিজের কাছে টেনে আনল এবং তাকে নিয়েই সেইখানে ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। অবশ ও আড়ষ্টভাবে মৃন্ময়ী বসু তার কোলের মধ্যে চলে পড়লেন। বিস্ময়াহত অসীম দেখল যে, ঘামে তাঁর সমস্ত ব্লাউজ একেবারে ভিজে গেছে। আতঙ্কে ও উত্তেজনায় তাঁর উন্নত বক্ষঃস্থল প্রবল বেগে ওঠা-নামা করছে - - -

একটা অব্যক্ত মমতায় তার সমস্ত মন যেন মুহূর্তে মধ্যে মথিত ও প্লাবিত হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত দুর্যোগে পতিত এই দুর্বল সাথীটির জন্য সহসা তার সমস্ত অন্তর যেন সমবেদনায় মুখর হয়ে উঠল। অন্ধকারের মধ্যেই মৃন্ময়ী বসুর টান-টান ব্লাউজের বোতামগুলো একে একে খুলে দিয়ে অসীম সস্নেহে বলল, লজ্জার কোন দরকার নেই—কিছুই দেখতে পাচ্ছি না; একটু শান্ত হোন কেবল। বুকের ধড়ফড়ানিটা ঠাণ্ডা করুন। - - - কেন যে ওরা এমন-ধারা কার্ড দিল বেছে বেছে আমাদেরই—কিছুই বুঝতে পারচি না। - - -

ব্যগ্রব্যাকুল হাতে অসীমের হাত নিজের বুকের ওপরে চেপে ধরে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে মৃন্ময়ী বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি অনেকক্ষণ। ওঁরা আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। তবে, এতখানি বিপদের কথা কেউ ভাবতে পারেন নি—

—তাই নাকি! আচ্ছা—পরে শুনবো সুযোগ হলে। এবারে উঠুন—আবার এগোনো যাক। শুনলেন তো—শিব-মন্দিরের পথ বেশী দূরে নয়।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মৃন্ময়ী বসু বললেন, এখনই সেই পথের খোঁজে যাবো নাকি আমরা? ওরা যদি দেখে ফেলে—?

—ওরা ওদিকে যাবে না শুনলেন না? তবে—আগে রিক্সাটা দেখতে হবে বৈকি—চলুন।

●

শিবমন্দিরের বাঁক ঘুরে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার একটা রাস্তা পেয়ে অসীম হালদার বলে উঠল, এইবার এতক্ষণে বোধ হয় আমরা বিপন্মুক্ত হলাম।

পিছনের সীট থেকে মৃন্ময়ী বসু বললেন, এখনও তো বেশ অনেকটাই যেতে হবে আমাদের। গাড়ীটা এইখানে কোথাও রেখে গেলে হয় না?

—কেন হবে না। বাকী পথটা অন্ধকারে হাঁটতে হবে আমাদের। পথে শিয়াল-কুকুর তো আছে—

কিছুক্ষণ চুপচাপ রিক্স চলল —আঁধার এখনো গাঢ়।

আকাশের একদিকে মেঘের সমাবেশ ও বিদ্যুৎ চমকের পালা আরম্ভ হয়েছে। মনে হচ্ছে—ঝড় থামলেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। অসীম নীরবেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে—কোন প্রকারে বৃষ্টির আগে সেই কদমপুর স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছানোটাই তার এখন লক্ষ্য।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এইবার কয়েকটা আলো দেখা গেল।

সহসা অপূর্ব কোমলস্বরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত মৃন্ময়ী বসু ডেকে উঠলেন, অসীমবাবু—অসীমবাবু—

গাড়ীর গতি কমাতে কমাতে অসীম হালদার বলল, কি হল আবার? এই তো এসে গেছি—

—না থামুন একটু—প্লিজ—শুনুন—

গাড়ী থেকে নেমে নিকটে এসে অসীম বলল,—ব্যাপার কি? মিস বোস—কিছু দেখেছেন নাকি?

—এইখানে একটু বসুন—আমার খুব খারাপ লাগছে। কি রকম মনে হচ্ছে যেন—

ব্যস্ত ও সন্ত্রস্তভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে অসীম বলল, তাহলে নেমে আসুন বরং। এখানে ঘাসের ওপরে বসলে অনেকটা ভাল লাগবে। এই যে, ধরুন হাত—

অসীমের হাত ধরে গাড়ী থেকে নেমেই মৃন্ময়ী বসু সহসা যেন ককিয়ে উঠল, ধরুন, আমাকে—উঃ!

বিব্রত বোধ করলেও অসীম রাগ করতে পারল না। স্পষ্টই সে বুঝতে পারল যে, আজকের এই তীব্র অভিজ্ঞতাটি যে-কোন তরুণীর সহন-শীলতা ও গ্রহণ ক্ষমতার পক্ষে অতিরিক্ত। এতক্ষণের মধ্যে মৃন্ময়ী যে ভয়ে চীৎকার করে ওঠেনি অথবা

অজ্ঞান অচেতন হয়ে যায়নি—এটা কেবল তার স্বাস্থ্য ও সহনশক্তি উন্নত ধরনের বলেই।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে মাটিতে বসে বসে মৃন্ময়ী বসু নীরবেই কাঁপতে লাগলেন। কিছুমাত্র বাধা না দিয়ে অসীমও তাঁর পাশে বসে বসে নীরবে সিগারেট টানতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময়ীর পিঠে হাত রেখে সে বলল স্নেহসিক্তস্বরে, একটু শুনুন মিস বসু মাথাটা তুলুন একবার। রিক্সাটা একটু দূরে গাড়পালার আড়ালে আমি রেখে আসছি। ডিনিসগুলো নামিয়ে আপনার কাছে রাখছি এখানে। স্টেশনের কাছেই আমরা আছি এখন ভয় পাবার কিছু নেই—বুঝতে পারছেন?

ব্যাকুলভাবে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মৃন্ময়ী বসু—না না, কোথাও যাবেন না আপনি। আমি মরে যাবো ভয়ে। বাঁচবো না—

স্নেহ-কোমল অনুযোগের স্বরে অসীম বলল, অমন ধারা করছেন কেন? এখন আর ভয় কিসের। একটু শান্ত হবার চেষ্টা করুন না—

অবিকতর অসহায় ও আর্তভাবে হাত বাড়িয়ে অসীমের দুটি হাত চেপে ধরে মৃন্ময়ী বসু যেন এবারে ফেটে পড়লেন, আর কত মারবেন আমাকে অসীমবাবু? আপনি কত নিষ্ঠুর—কি রকম পাষাণ? আপনার কি হৃদয় নেই, দয়ামায়া নেই? উঃ, এ আমার কি করলে ঈশ্বর—আর কত সহ্য করব আমি?

অসীম হালদার যেন কি রকম বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা অব্যক্ত সমবেদনা ও মমতার দোলায় তার সংযত ও শক্তিমান অন্তর যেন সহসা কোমল ও কাতর হয়ে উঠলো। হাঁটু পেতে কাছে বসে এবং মৃন্ময়ীর একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সে বলল, মিছিমিছি অনেক কষ্ট আপনাকে আজ ভোগ করতে হয়েছে—আমাকেও হয়েছে। কিন্তু—এ জন্য তো আমি দায়ী নই—মিস বোস? সমস্ত কষ্ট ও হাঙ্গামার দায়িত্ব আমার মাথায় চাপিয়ে দেবেন না যেন। সেটা ন্যায্য হবে না—কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যও হবে না। যতদূর জানি, আপনার প্রতি কোনপ্রকার নিষ্ঠুরতা করা দূরে থাক—সাধ্যমত যত্ন ও সতর্কতাই আমি দেখিয়ে এসেছি। এতটা করেও আমাকে এখন আপনি নিষ্ঠুরতার দোষে দোষী করছেন—শহরে ফিরে গিয়ে যে কি করবেন—তা ভাবতেও আমার শঙ্কা হচ্ছে।

আঁচলে চোখ মুখ মুছতে মুছতে মৃন্ময়ী বসু সংযত স্বরে বললেন, সময়ে সময়ে পুরুষেরা এত অন্ধ ও নির্বোধ হয়ে যায় কি করে—বুঝতেই পারি না। আপনি তো একটুও নির্বোধ নন—অসীমবাবু, এ-সব কথা তবে কি করে বলছেন?

—আমার মনে হয়—নির্বোধের মত কিছু করে বা বলে থাকলেও—সেকথা আপনার মুখে সাজে না। অন্য যে-কোন পরিস্থিতিতে যে-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি কিছুতেই যেতে চাইতাম না, আজ কয়েকটা গণ্ডমূর্খ ও তথাকথিত বন্ধুর কোঁপর-দালালির ফলে তা ভোগ করতে হয়েছে। আমার কেবলই মনে হয়েছে—তাদেরই এই নিরেট মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেওয়াই আমার আজ একমাত্র ও চরম নির্বুদ্ধিতা হয়েছে। এখানে মাত্র একটা রিক্সা ছিল, আগে তাতে একা চলে গেলেই হত—তাতে কোন হাঙ্গামা হত কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ নির্বোধ আমি আজ হয়েছি—কিন্তু সেটা আপনার প্রতি অহেতুক সুবিচার ও অতি ভদ্র ব্যবহারে, মিস বসু। তার যথাসাধ্য ধন্যবাদই আপনি দিচ্ছেন।

প্রথমে বিস্মিত ও পরে অপমানিত ভাবে মৃন্ময়ী বসু মাথা নীচু করে অসীমের সমস্ত কথা শুনে গেলেন। শেষকালে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, এই-ই আমার কপাল। এই পুরুষই আমাদের হর্তা-কর্তা—বিধাতা। এঁদের কাছেই আমাদের জীবন যাপন করার বিধিলিপি। আমি কি বললাম—আর উনি কি বুঝলেন। উল্টে আমাকেই অপমান করলেন। আপনার সমস্ত কথা খাঁটি সত্য—অসীমবাবু। আমার আচরণের জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন। যান—ওদের রিক্সা কোথায় রাখবেন রেখে আসুন। আর শুনুন—আমার ব্যাগের মধ্যে ওদের সেই ছোরাটা আছে এখনও—

—দোহাই মিস বসু—ওটা এখনও হাতছাড়া করার সময় আসেনি, সেই লাঠিটাও নয়। কাল সকালে ট্রেনে উঠে তখন যা-হয় করা যাবে। বসুন একটু—আসছি এখনি - - -

●

কিন্তু রিক্সায় চড়ে কিছুদূরে এসে অসীমের মনে হল—এক্ষুণি ফিরে গিয়ে পুনরায় সেই অস্বস্তিকর পরিবেশে প্রবেশ করার আগে একটা সিগারেট খাওয়া দরকার। অহঙ্কারী সোসাইটি গার্ল মৃন্ময়ী বসুর জন্য অতীতে কোনদিন তার দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল সত্য—কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে দুর্বলতাটুকুর প্রায় সবটাই এতদিনে অদৃশ্য হয়ে এসেছিল। আজ অপ্রত্যাশিত ও একান্ত অভিনব এই পরিস্থিতির নাটকীয় আবহাওয়ায় মৃন্ময়ী বসুর মনের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা জাগরণ ঘটে থাকলেও সমস্ত পূর্বকথা বিস্মৃত হওয়া এবং পূর্ব-মনোভাবে ফিরে যাওয়া তার নিজের পক্ষে সম্ভব নয়।

অহঙ্কারী মেয়েরা, রূপসী মেয়েরা এবং বহু পুরুষের কামনার পাত্রীরা প্রায়ই জীবনে সুখী হয় না এবং আপনার জনদেরও সুখী করে না—এই রকম ধারণা অসীম হালদারের ছিল। মৃন্ময়ীর প্রতি যত আকর্ষণ-ই থাকুক না কেন—এই স্থির সিদ্ধান্তটিকেই সে নিজের জন্য পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তার মত মেয়েকে পাশে নিয়ে সে গর্বিত বোধ করলেও সংসারে সুখী হয়ে সুস্থ হয়ে জীবন যাপন করতে সে পারবে না। ঝলমলে নিয়ন লাইটের আলো যত উজ্জ্বল এবং যত মনোহর হোক না কেন—তার শান্ত স্নিগ্ধ নিরালা গৃহকোণের জন্য মাটির প্রদীপই যথেষ্ট।

ধীরে ধীরে আরামের সঙ্গে সিগারেটটি

শেষ করল অসীম হালদার। আর একটি ধরাবার ইচ্ছা হচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ টর্চের শক্তিশালী আলোকরশ্মি তার ওপরে প্রতিফলিত হতেই সে চমকে উঠে মাটিতে নেমে পড়ল। আর একবার টর্চের ফোকাসে সে স্পষ্টই দেখলো—চার-পাঁচ গজ দূরে গাছের আড়ালে একজন কে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে মাঝখানে রেখে সে ধীরে ধীরে পুনরায় স্টেশনের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। গাছের আড়ালে দাঁড়ানো লোকটা—সম্ভবত আসল রিক্সাওলা—হঠাৎ কি করবে ঠিক করতে না পেরে হুড়মুড় করে তেড়ে এল তার দিকে - - -

কিন্তু অন্ধকারের জন্য দুইজনেই একই সঙ্গে সুবিধা এবং অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেল। অসীম সতর্কতার সঙ্গে রিক্সাটাকে দুইজনের মধ্যস্থলে রাখতে চেষ্টা করল। ফলে রিক্সাওলা গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েও প্রায় তার গায়ের ওপরই পড়ে গেল - - -

অসীমের হাত এখন খালি। লোকটার হাতে কিছু আছে কিনা সে জানে না, তথাপি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পা তুলে তার পিঠের ওপরে প্রাণপণে চেপেধরে সে পর পর কয়েকটা ঘুঁসি বসিয়ে দিল তার নাকে ও মুখে। আর বন্ধ করলেই সে উঠে পড়ে প্রত্যাক্রমণ করবে একথা অসীম জানতো। হঠাৎ লোকটা বিকট চীৎকার করে প্রাণপণে লাফিয়ে উঠল—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অসীম হালদার আর একবার ভীষণ চমকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তেই অস্পষ্টভাবে লোকটার হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা লক্ষ্য করে শেষ চেষ্টার মত সতর্কতার সঙ্গে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হতে গিয়ে সে দেখল—মৃন্ময়ী বসু নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এক হাতে প্রজ্বলিত বড় টর্চ এবং অন্য হাতে সেই বাঁশের লাঠিটা - - -

রাত্তির প্রায় এগারোটা—

কদমপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি একটামাত্র নড়বড়ে বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে অসীম হালদার ও মৃন্ময়ী বসু।

একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অসীম বলল, একটু হাঁটা যাক এবার। মাত্র এক টাকায় নন্দ দোকানী এত ভাল খাওয়ালো কি করে সে-ই জানে। ভাল মানুষটাকে আমরা আগাগোড়া প্রবঞ্চনা করলাম—এইটুকুই যা আমার আফশোষ থাকল—

—কি প্রবঞ্চনা করলাম আবার?

—করলাম না? দিব্যি স্বামি-স্ত্রীর অভিনয় করে ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে 'তুমি' 'ওগো' 'নাগো' করা হল। ও-সব প্রবঞ্চনা নয়?

আকাশে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী-অষ্টমীর চাঁদ উঠেছিল। সেই দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে মৃন্ময়ী বলল, অভিনয় কে বলল? যা সত্যি—তাই-ই তো বোঝানো হয়েছে লোকটাকে। রিক্সাওলা সুকু মিস্ত্রিও গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে দেখল, তুমি কেমন করে জাপটিয়ে ধরে আমাকে - - - - প্রবঞ্চনা আবার কোথায়?

সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে অসীম বলল, ওহো বুঝেছি। হঠাৎ লাঠিটা নিয়ে এসে প্রাণরক্ষা করার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্নটাকে তাহলে বুঝি ঐরকম বুঝে নিয়েছো তুমি? কিন্তু নন্দ দোকানীর সামনে তুমি তো বললে ওর বউকে যে—এই চার-পাঁচ মাস হল বিয়ে হয়েছে? কে তোমাকে অমন মিথ্যাকথা বলতে বলল?

—কে আবার বলবে? সারকামস্ট্যান্স বলল। আর কি বলতে পারতাম শুনি?

—কেন? ভাই-বোন বললেও তো খুব মিথ্যা হত না?

—দূর। কি যে বলো।

—কেন? এত দুঃখ কিসের তোমার—শুনি? প্রবঞ্চনা-প্রবঞ্চনা বলে এত আফ্‌শোষ জীইয়ে রাখতেই বা কে তোমাকে দিব্যি দিয়েছে? আসল কথাটা আমাকে বলবে?

—আসল কথাটা তুমি ভালই জানো মৃন্ময়ী। তোমাকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করার যোগ্যতা আমার নেই একথা অনেকদিন আগেই আমি বুঝতে পেরেছি। যারা সামাজিক ও পারিবারিক রীতি রক্ষার জন্য বিবাহ করে এবং তারপরে অন্যদের সঙ্গে বাইরে বাইরে সময় কাটায় এবং যে-সব সোসাইটি মহিলারা ঘরে থেকে পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে রিসিভ করে এবং সুযোগ, সুবিধা ও মেজাজ অনুযায়ী মেলামেশা ও ফ্লার্ট করে—আমি সেই সমাজভুক্ত নই। আমি যাকে বিয়ে করব সে আমার যথার্থ স্ত্রী হবে, ঘর সাজানো ঝলমলে জ্যান্ত ফার্নিচার হবে না। পরের স্কুটারে বসে সন্ধ্যার পরে কলকাতার বাইরে যাবে না বা এম্পায়ারে মিড্ নাইট শো দেখে শেষ রাত্রে বাড়ী ফিরবে না।

শুষ্ক ও নীরস কণ্ঠে মৃন্ময়ী বলল—তাহলে তোমার চিঠি?

—হাঁা। সাত-আট মাস আগে তোমাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম—সেই-ই আমার পরম দুর্বলতা ও ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু—তুমি তার জবাব তো দাওইনি উপরন্তু—

—কি বল? উপরন্তু—

—আমাকে দেখিয়ে দেখিয়েই বিজু মিত্তিরের স্কুটার-পুচ্ছ হয়ে তোমার উত্তরটা জানিয়ে দিতে কসুর করনি। তুমি ভাল ভ্রমণ-সঙ্গিনী, তুমি এক্সপার্ট সোসাইটি-গার্ল, তুমি চার্মিং স্কুটার কম্প্যানিয়ান—কিন্তু—আমার বিবেচনায় তুমি ভাল স্ত্রী নও মৃন্ময়ী। সেই জন্যেই তোমার প্রতি একটা মমতা থাকলেও সেই দুর্বলতাটা আমার আর নেই। তুমি অনুগ্রহ ও কনসেশান দিতে প্রস্তুত থাকলেও ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে আমার কোন আগ্রহ জাগছে না। বুঝতে পারছো না—আমরা একই রকম পরিবেশে বড় হইনি। আমাদের বন্ধন পাকা হওয়া শক্ত। তোমার স্ট্যাটাস-এর বাইরে কারো সঙ্গে বিবাহে মত দিয়োনা মৃন্ময়ী—এই আমার আন্তরিক উপদেশ। তুমি তাতে দুঃখী না হলেও সে বেচারীর

জীবনান্ত হয়ে যাবে। বিজু মিত্তির-ই তোমার উপযুক্ত পাত্র। তার পয়সা আছে, টেস্ট আছে। সখ আছে—অনেক গার্ল ফ্রেণ্ড আছে---আমি সত্যি-ই তোমার যোগ্য নই। আজকের এ ব্যাপারটা স্রেফ্ অ্যাক্সিডেণ্ট। স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন জীবনে এর কোন স্থায়ী মূল্য নেই— থাকা সম্ভবই নয়। চল এবারে একটু বসি। বিশ্রামের দরকার মনে হচ্ছে। কি হল তোমার ? আর একটা কথা বলি শেষে, তুমি রীতিমত উচ্চশিক্ষিতা, দয়া করে আমাকে ভুল বুঝো না, অবিচার কোরো না ---

আর একবার চাঁদের আলোর দিকে মুখ তুলে মৃন্ময়ী ম্লান হাসি হেসে বলল, না, ভুল বুঝি নি। তোমার সমস্ত কথা-ই ঠিক ও সত্য---কেবল একটি ছাড়া—

—তাই নাকি ? যথা---? আরে ভয় কি ? ওটা তো একটা শেয়াল ছুটে যাচ্ছে ---

ভীতভাবে অসীমের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ী ফিসফিস করে বলল, তুমি একটা মিথ্যাকথা বলেছো। আমার প্রতি তোমার একবিন্দুও মমতা নেই। আমাকে ভালভাবে জানবার চেষ্টা না করেই তুমি আমার সম্বন্ধে রায় লিখে বসে আছো। তুমি আমাকে ঘৃণা করো এবং আমার সম্বন্ধে খুব নিম্ন ধারণা পোষণ করো—তুমি —ছাড়ো বলছি—

মৃন্ময়ীর মুখে হাত চাপা দিয়ে অসীম ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল— না, না, আর বোলো না মৃন্ময়ী ; তুমি ইচ্ছে করেও জোর করে আমাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করছ। তুমি জানো— আমি একটাও মিথ্যে কথা বলি নি, তুমি জানো আমি সত্যিই তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করি, তোমার জন্য যথেষ্ট মমতা আমি পোষণ করি। এতে কিছু মিথ্যে নেই মৃন্ময়ী—খাঁটি সত্যকথা বিশ্বাস করো---

নিজের মুখ থেকে অসীমের হাত সরিয়ে দিয়ে এবং একটু দূরে সরে গিয়ে সম্মুখের অবারিত জ্যোৎস্না-মাখা মাঠের দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বগতোক্তির মতই মৃন্ময়ী বসু বলতে লাগল---একটুও মমতা থাকলে স্নেহ থাকলে এতখানি নিষ্ঠুর নাকি কেউ হতে পারে। এত হৃদয়হীনভাবে কষ্ট দিয়ে কথা বলত পারে। কেন আমি বিজু মিত্তিরের স্কুটারে চড়তাম ? কেন তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে চড়তাম ? তোমাকে জাগাবার জন্যেই তো। প্রেমে পড়লে মেয়েরা এইরকম কেন আরও বেশী উদ্ভট আচরণ করে— জেলাসী সৃষ্টি করার জন্যে। বিজু মিত্তির বিবাহিত —সে কথা তোমার জানা নেই তা আমি জানতাম। তোমার চিঠির উত্তর দিইনি তো কি ? মেয়েরা কাউকেই ফস করে হাতের লেখা দেয় না। নিশ্চিত না হলে একাজ করা কখনও নিরাপদ-ও নয়। জানাজানি হলে সমস্ত সুনাম নষ্ট হয়ে যায়। যা সত্য নয় এমন কথাও হিংসাহিংসি করে মেয়েরাই রটিয়ে দেয়। সাজসজ্জা দেখে আর কথাবার্তা শুনে মেয়েদের তোমরা যতখানি অগ্রসর ও স্বাধীন মনে কর, প্রকৃতপক্ষে তার অর্ধেকও তারা নয়।---

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে সে পুনরায় পূর্ববৎ বলে চলল, তোমার না হয় এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট, ব্যস—তুমি খালাস। আমার কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল আজ—তা জেনে রেখো। কোথাও মুখ দেখাতে পারব নাকি আর ? মমতা থাকলে স্নেহ থাকলে এ সব তুমি বুঝতেই —আমাকে বলতে হত না। তোমার জন্যে যা কিছু করেছি আমি—তাই-ই আজ আমার বিপক্ষ হয়ে উঠল---মিথ্যে বিয়ের নেমন্তন্ন দিয়ে ওরা আমার এমন সর্বনাশ করবে জানলে---

অসীম হালদার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অচেনা চাপাস্বরে বলল, তোমার ঐ ব্যাগে কি মনোজের জন্য কোন উপহার আছে মৃন্ময়ী ? কি এনেছ।

—মনোজবাবুর জন্যে ধুতি আর চাদর। উনি তো সর্বদা-ই ট্রাউজার পরেন—তাই। কেন, ভাল হয় নি ?

—খুব ভাল হয়েছে। আমার প্যাকেটে একটা বেনারসী আছে ওর বউ-এর নামে। আমি মন ঠিক করলাম। বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া না হোক— বিয়েটা কেন বাদ যায় ? বেনারসীটা তুমি পরে নাও এক্ষুণি। ধুতিটা বার করে দাও আমায় শীগগির।

ফ্যালফ্যাল করে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃন্ময়ী বসু বলল, তার মানে ? বলছ কি তুমি ?

—বলব আবার কি ? আমি কাজের মানুষ। নাও চটপট করো। নন্দ মুদীর বউকে মিথ্যা বলার দোষ কাটিয়ে নিতে হবে না ? শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের প্ল্যান সফল করতে হবে না ? যে ঘরটা আমাদের থাকবার জন্য ওরা ছেড়ে দিল—সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করতে— রাত কাটাতে হবে না ? যা বলছি করো এবার---

বিকল—বিহ্বল ভাবে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজের শাড়িটা ছেড়ে রেখে অসীমের বেনারসীটা জড়াতে জড়াতে মৃন্ময়ী উতলা আনন্দের সুরে বলল, কি মানুষ গো তুমি। এইখেনে এত রাতে---

নতন ধুতি ও চাদর সজ্জিত অসীম হালদার নিকটে এসে বেনারসী মোড়া মৃন্ময়ীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো।

পর্ণার বিয়ে ঠিক হয়েছে। পাত্র অপর্ণার বন্ধু নীনার দাদা অপরেশ। সেও প্রথম থেকেই একজন ক্যাণ্ডিডেট ছিল কিন্তু শীতাংশু প্রথমেই প্রস্তাবটা করে ফেলায় সে আর অগ্রসর হয় নি। শীতাংশু চলে যাবার পরে ওপন ফিল্ড পেল এবং ক্লিয়ার করে ফেলল অল্প সময়ের মধ্যেই। অপর্ণার বিবর্ণ মুখে রং ফেরাবার সবটা কৃতিত্ব নিয়ে যখন অপরেশ এসে একটু ভূমিকার পর বক্তব্য পেশ করল, একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা না করেই অজয় সম্মতি দিলেন। অবস্থা ভাল, ভাল চাকরী। গাড়ী-বাড়ী এবং আভিজাত্যে কোনো ত্রুটি নেই। তারপর মস্ত বড় কথা, শীতাংশুর দেওয়া আঘাত সে নিঃশেষে অপর্ণার মন হতে মুছে দিয়েছে।

অনলের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে বললেন গড়গড়া টানতে টানতে। আমাকে খাবার দেবার জন্য তাড়াও দিলেন একবার। ভাবলাম সুস্থই হয়ে গিয়েছেন। হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। যাক গে। তিলক বলছে নীহারিকা ছেড়ে দিলে ধারের টাকাটা বাদ দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা দেবে।

—মোটে?

—তা আর কি হবে। বাবা নীহারিকা মর্টগেজ রেখে সত্তর হাজার টাকা নিয়েছিলেন। সুদটুদ নিয়ে নাকি দেড় লাখের মত দাঁড়িয়েছে এখন। তাই আমি আর আপত্তি করলাম না।

—নীহারিকার জিনিসপত্র?

—ও সবশুদ্ধই দিয়ে দিচ্ছি, কেবল ছবিগুলো আনাব।

— তিরিশ হাজার টাকায় অপির বিয়ে হয়ে যাবে?

—ইস, বাবা, তুমি অপিকে ভীষণ বেশী রকম ইম্‌পর্টেন্স দিচ্ছ। ওর মাটিতে পা পড়বে না এর পরে। অপি বাড়ী থাকে কতক্ষণ যে বিয়ে হলে বাড়ী খালি লাগবে? আমার তো মনে হবে ইউনিভারসিটি, বন্ধুর বাড়ী, নয় তো গানের ক্লাশে —আছে কোনো এক জায়গায়।

—আহা! আর খাবার সময় ঝগড়া করবে কার সঙ্গে?

—সেটা অবশ্য একটা কথা। আচ্ছা বাবা, বিয়ের পরে অপরেশ এ-বাড়ীতেই এসে থাকুক না। কি বলিস অপি?

—যাঃ!

—যাঃ কেন? ভাল তো। সম্মানে লাগলে আমরা নয় তো তোর পেইং গেস্ট হয়ে থাকব।

সরবালা সামনে দাঁড়িয়ে খাবার

ধারাবাহিক উপন্যাস

অহল্যা রাত্রি

নমিতা চক্রবর্তী

সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইলেন অজয়। ছেলের মত জানা দরকার বৈষয়িক ব্যাপারে।

—অনু, অপরেশ অপিকে বিয়ে করতে চাইছে।

—অপরেশ মল্লিক? তা বেশ তো। কিন্তু অপি কি—?

—অপির মত আছে।

—মত আছে; তবে আর কি, লাগিয়ে দাও বিয়ে। কিন্তু টাকা?

—টাকা কিছু দরকার হবে। ভাবছি নীহারিকা ছেড়ে দেব। তিলক চাইছে। রেনোভেট করে ও একটা সিনেমা হল করবে।

—নীহারিকার সিনেমা হল? যা তোমার ভাল মনে হয়। বড়দা কেমন?

—ভাল আর কোথায়। গত সপ্তাহে আমি গেলাম তো শান্তিনগরে। প্রথমে বেশ ভাল মানুষ, আগের মতই কথা

—তা হয়ে যাবে একরকম করে। গয়না-টয়না আছে বোধ হয় অনেক। মায়ার বিয়ের কথাও হচ্ছে।

অনল হাসল। খুশী হ'ল বোনের বিয়ের খবরে। অপর্ণার দিকে ফিরে তাকাল।

—কি রে, বৈশাখ পার হতে দেবে না এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছে নাকি অপরেশ?

—আ দাদা। লাল হ'ল অর্পণা।

—আর দাদা। কতটা ঘাড় ভাঙবে এখন তাই বল। কি চাই?

—চাই? চাই একটি বৌদি। কি বল বাবা, ঠিক চাই নি?

—অত্যন্ত বেশী রকম ঠিক। অনু, তুইও একটি বউ নিয়ে আয়। অপি চলে গেলে একদম ফাঁকা লাগবে বাড়ী।

দেওয়া দেখছিল। আদত কথাটা যদিবা উঠল, আবার অনুর দৃষ্টিতে চাপা পড়ছে দেখে কথা বলল: সত্যি জামাইবাবু, এবার অনুর বিয়ে দিতে হবে। আপনি ঘটক লাগান।

—ঘটক? ঘটক দিয়ে কি হবে? ওরা ভারি মিছে কথা বলে। তার চেয়ে নিজেরা দেখে-টেখে—, কি বলিস অপি?

—কত মেয়ে আছে জানা-শোনা। অপর্ণা উৎসাহিত হ'ল। —দাঁড়াও, আজই আমি ক্লাবে বলব। দাদার মত ছেলে, কত ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে।

—একটা বিজ্ঞাপন লিখে নোটিশ-বোর্ডে আটকে দিস। হাসতে হাসতে উঠে পড়ল অনল।

●

বিজ্ঞাপন নয়, বাড়ীতে চা-য়ের নিমন্ত্রণে বন্ধুদের ডাকল অপর্ণা। খাবা

থাকতে পারবেন না। কলেজের পরে মিটিং। দাদা? দাদাকে থাকতেই হবে। একজনও না থাকলে চলে বুঝি!

চায়ের নিমন্ত্রণটা হঠাৎ কোনো ব্যাপার নয়। মাঝে মাঝেই বন্ধুদের বাড়ীতে আনে অপর্ণা। বাবা-দাদা খুশী হয়ে যোগ দেন আসরে। সুতরাং অনলের আপত্তির কিছু নেই। সরবালা এবারের উদ্দেশ্যের অভিনবত্বে বেজায় খুশী হয়ে ঠাকুরকে ধমকে ধমকে ম্রিয়মাণ করে ফেলল। নিজেও খাটল বেলা তিনটে পর্যন্ত।

মেয়েদের ঝলমলে শাড়ী, চকচকে চোখ আর খিলখিল হাসিতে সেদিনের সন্ধ্যা উত্তাল হল। অনেক গান-গল্পের শেষে বন্ধুরা ন'টার পরে বিদায় নিলে অপর্ণা গর্বিত মুখে দাদার ঘরে এসে ঢুকল।

—কি দাদা, কাকে পছন্দ বল এবার।

এতক্ষণ অর্থশূন্য গল্প আর উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে কাটিয়ে একটু শ্রান্ত হয়েছিল অনল। খাটে শুয়ে মশারীর চালচিত্র দেখছিল সে। চোখ না ফিরিয়েই বলল : কাকে মানে? সব ক'টিকেই ভীষণ পছন্দ আমার।

—সত্যি! কি যে সুন্দর দেখতে সবা, না দাদা?

—অপূর্ব! সাদা, কালো, গোলাপী সব ক'টা রং-এর কি অপূর্ব কম্বিনেশন। কি অভ্রভেদী কেশচূড়া, কি অবারিত-দৃষ্টি পরিচ্ছদের লাবণ্য। কি হাসির সারগম বিস্তার, কি মস্তক ঘূর্ণনকারী বাক্‌বিন্যাস।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থাম এবার। বেড়াতে এসেছে, সাজবে না, হাসবে না। গল্প করবে না!

—আলবৎ করবে, নিশ্চয়ই করবে। না হ'লে ওদের মূল্যায়ন হবে কি করে?

আঃ, দাদা, একটু সিরিআস হও। দরকারী কথা বলব। অলকা গাঙ্গুলী কেমন? ঐ যে বাঁদিকে বসেছিল, পিয়ানো বাজালো সবার শেষে, ভীষণ স্মার্ট। বাবাকে বলব ওর কথা, বুঝলে?

—খুব বুঝেছি। এখন তুই যা, আমি অলকার ধ্যান করি। তুইও ভেবে ভেবে অপরেশের জন্য বাছা বাছা বচন শানিয়ে রাখ। আজ অনুপস্থিত হ'ল কেন, আসলেই সেই কৈফিয়ৎ চাইবি।

—ভীষণ খারাপ ছেলে তুই দাদা। প্রায় রাগ করল অপর্ণা।

পরের দিন রবিবার। বাবা-দাদা দু'জনকেই একসঙ্গে ধরল অপর্ণা।

—বাবা অলি গাঙ্গুলীকে দাদার বউ করা হবে। অপূর্ব মেয়ে।

—দাদা কি বলে? ছেলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন অজয়।

—দাদা আবার কি বলবে! বোঝে তো ভারি! তুমি দেখলে তো সরমাসি, খুব সুন্দর নয় অলকা?

জোরে জোরে মাথা নাড়ল সরবালা। খুব সুন্দর। অপি যখন বলছে, নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে মেয়েটা। সরবালা ভাল বুঝতে পারে না। সব মেয়েগুলোই প্রায় একরকম দেখতে। ঠোঁট লাল, ঘুনচি খোঁপা, গায়ে এক-চিলতে জামা আছে কি নেই আর আঁচল খসে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। সাজটা বিদঘুটে মনে হয়। কিন্তু যে কালের যে রেওয়াজ। অপিও তো অমনি সাজই করে। তা ব'লে সে কি আর দেখতে সুন্দর, খুব ভাল মেয়ে নয়।

অপর্ণা কিন্তু হতাশ হ'ল। মত বদলাতে হ'ল তার অলি গাঙ্গুলীর অ্যাকমপ্লিশমেন্ট সম্বন্ধে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি, বি-এস লক্ষ্য নয় অলির। ওদের চলাচল যেমন হাই সোসাইটিতে, তেমনি পাত্র চাই। দু'তিন জনের সঙ্গে ডেটিং হচ্ছে, কিন্তু মন ঠিক ক'রে উঠতে পারে নি এখন পর্যন্ত। পল্টা হালদার মন্দ নয়। কলকাতায় চারখানা বাড়ী, গাড়ীও চারটে। তিন ফ্যামিলি মেম্বারের তিনখানা, একখানা থাকে গ্যারেজে অতিথি আপ্যায়নের জন্য। মস্ত বড় ব্যবসা ওদের। পড়াশুনো? এই ফিলদি ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটির ডিগ্রির প্রতি মোহ নেই পল্টার। অত্যন্ত উঁচু নজর। অলির বার্থডে-তে প্রেজেন্ট করেছে পাঁচ হাজার টাকা দামের জড়োয়া নেকলেস।

ম্যানিকিয়োর করা নখে সরু থুতনি আলগোছে ঠেকিয়ে বন্ধুকে জ্ঞানদান করল অলকা। বড় বড় টাকার অঙ্ক আর গাড়ী-বাড়ীর সংখ্যাধিক্যের মধ্যে অপর্ণার অত্যন্ত গর্বের দাদা, তাদের মাত্রই তিনতলা বাড়ী আর সিক্সটি মডেলের অ্যাম্বাসাডার একেবারে কিছু না হয়ে গেল।

মনটা খারাপ হ'ল বটে, কিন্তু খারাপ লাগবার মত বেশী সময় নেই অপর্ণার হাতে। সামনেই বৈশাখ। শাড়ীর রং, ব্লাউজের কাট, গয়নার ক্যাটালগ, ফার্নিচারে হাই পলিশ, বাড়ীতে রং ইত্যাদি ইত্যাদি বিরাট ব্যাপারের মধ্যে অনলের বিয়ের প্রসঙ্গ তলিয়ে গেল।

ভুলছি না মোটেই মনে মনে বলল অপর্ণা। এটা মিটে যাক, তারপর লাগব দাদার জন্য মেয়ে বাছতে। ম্যারেড মেয়েদেরই তো এসব মানায়, সুবিধেও অনেক।

৬

আলো সানাই অনেক নিমন্ত্রিত। শান্তিনগরের মেয়ের মতই মহাসমারোহ ক'রে বিয়ে হল অপর্ণার। দু মাস কাটল উৎসবের জের মিটতে। তারপর অজয় একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন : এবার তোর পালা অনু, একটুও ভাল লাগছে না বাড়ীটা।

—ভাল লাগছে না? কিন্তু তুমি তো চলেই যাচ্ছ বাবা জুলাইয়ের শেষের দিকে তিন বছরের জন্য। আমিও ভাবছি—।

—তুইও ভাবছিস? তা গেলে মন্দ হয় না। এফ-আর-সি-এসটা দিয়ে আসবি।

—তা আর না। রাগ করল সরবালা। বাপ-ছেলে দু' জনেই দেশান্তরী। বাড়ী-ঘর চুলোয় যাক, গুমরে মরুক

মেয়েটা। কি যে কাঁচা বুদ্ধি আপনার জামাইবাবু, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

—ঠিকানা নেই, না সরবালা? আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছি, বুদ্ধিটা পাকলো না কেন এখন পর্যন্ত।

—পাকবে কি করে কেবল পুঁথি-পত্র নিয়ে জন্ম কাটালে?

—ঠিক বলেছ সরবালা কেবল পুঁথি-পত্র নিয়ে পড়ে থাকাটা কিছু নয়। আমি একটু ঘুরে আসি ওদেশ থেকে, ফিরে অনুর বিয়ে দেব। ও তখন বউ নিয়ে চলে যাবে, এটা কিন্তু খুব পাকা বুদ্ধির কথা বলেছি, না সরবালা?

কত ভাল! মনে মনে বলল সরবালা। ঘর-সংসার ফেলে বাপ-ছেলে কেবল এদেশ-ওদেশ করে বেড়াবে।

—আমার কি মনে হয় জানিস অনু, নিজের সঙ্গী নিজে বেছে নেওয়াই ভাল। অপি পেরেছে, তুইও পারবি।

ছেলের দিকে গভীর চোখে তাকালেন অজয়।

একলা ঘরে রাতের বিছানায় শুয়ে বাবার কথা একটু ভাবল অনল। এবার তার পালা, সঙ্গিনী যোগাড় করতে হবে। বাবা প্রকারান্তরে তার কাঁধেই চাপিয়ে দিলেন বৌ আনবার দায়টা। কিন্তু কি যে মুস্কিল সেটা! চমৎকার ছিল আদিম বন্য জীবন। গায়ে জোর আর কয়েকটা ছুঁচালো পাথরের মালিক হতে পারলেই খাদ্য এবং সঙ্গিনী—জীবনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা দুটোর সমাধান হয়ে যেত। পশু-পাখীদের ব্যবস্থাও ভাল। কেশর কিম্বা পেখম নাড়াতে পারলেই সঙ্গিনী মুগ্ধ। মানুষের অনেক জ্বালা আজকের দিনে। রূপ, বিত্ত, মান অনেক কিছুই চাই। বউ বেছে নেওয়াও কি সোজা! হাসি রূপ-লাবণ্যের মিছিল চলেছে। একটিকে বেছে নিতে হবে। কে সেই একটি? মণিকা, শিপ্রা, কেতকী, রেবতী? অনেক দূরে একটি মেয়ের ঝাপসা মুখ। ধীরে ধীরে সব মেয়ের মিছিল সরে গেল, স্পষ্ট হলো মেয়েটি তারও রং করা মুখ, সেও নাচছে, গাইছে, হাসছে কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? জল! দূর, ওদের চোখ দিয়ে কখনো তো জল বের হয় না। গ্লিসারিন, চোখের ভুল। পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল অনল।

॥ সতেরো ॥

হাত নেড়ে ছেলে-মেয়ের কাছে থেকে তিন বছরের জন্য বিদায় নিলেন অজয়। অপর্ণা কাঁদল। প্রচুর বোঝালো অপরেশ, অনল চেয়ে চেয়ে দৃশ্যটা দেখল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অপর্ণা, তার আনত সুন্দর পিঠটির উপর আস্তে আস্তে হাত বোলাচ্ছে অপরেশ। ওরও মুখ ম্লান, চোখ ভারী। কেন? অজয় দূরে চলে যাচ্ছেন, প্রিয়-জনবিচ্ছেদে অপরেশের মনও ব্যাকুল হয়েছে? কই অনল তো অমন অস্থির হয় নি! তবে কি অনলের চেয়ে অপরেশ বেশী ভালবাসে বাবাকে! দূর, তা কেন অপি যে কাঁদছে, অপি দুঃখ পেয়েছে, তাই অপরেশের দুঃখ। কিন্তু অপিই বা অমন আকুল হয়ে কাঁদছে কেন! ওকি বাবাকে এতই ভালবাসে যে তাঁকে ছেড়ে থাকবার দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। এই তো দু'মাস মুসৌরীতে কাটিয়ে এল, তখন তো কাঁদে নি। বাবাই বরং একদিন হেসে বলেছিলেন —অপির কাণ্ড দেখছিস, এক পৌঁছন-সংবাদের পর আর খবর নেই। বাবা হাসলেও তাঁর মুখটা কেমন যেন মলিন দেখেছিল। আজ তবে এমন ক'রে কেঁদে ভেঙে পড়েছে কেন অপি? এও কি সুখেরি একটা ম্যানিফেস্টেশন? যে সুখ আজকাল অপর্ণার চলা-বলা হাসিতে প্রকাশ পায়, তাই কি ঝরছে চোখের জলের মুক্তো হয়ে? অনল অপরেশ ঘিরে না থাকলে এতক্ষণ ধ'রে এমন সুন্দর করে কি কাঁদতে পারত অপর্ণা? অনলের মনে পড়ল একটা বোবা কান্না। একটি আঠারো বছরের মেয়ের সমস্ত শরীরের রেখায় অনুচ্চারিত এক তীব্র কান্না। সে কান্না কেউ দেখে নি। অনল? অনল দেখেছিল মর্মচ্ছেদী সেই তীব্র কান্না।

—অপি, আমি এবার যাই?

—দাদা! অনলের হাত ধ'রে তার মধ্যে মুখ গুঁজল অপর্ণা। চোখের জলে হাত ভিজে যাচ্ছে অনলের, কিন্তু বুকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছে নাতো! অপরেশের বুকেই কি সে কান্না বাজছে? তা'হলে অমন লুব্ধ দৃষ্টি ফেলে সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, মেম সাহেবের দোদুল গতি-ছন্দ উপভোগ করছে কি করে! চট করে একবার হাতের ঘড়িটাও দেখে নিল অপরেশ। অপর্ণার কান্নাকে তোয়াজ করবার জন্য কতটা সময় দিতে পারবে সেটা বুঝে নিল আর কি।

●

বাবা বিদেশে, [illegible] আছে অপির কাছে তাকে [illegible] দেবার জন্য। জন্ম হতে চেনা বাড়ীর মধ্যে একটা বোহেমিয়ান ভাব অনুভব করল অনল।

ঠাকুর এসে ছুটি চাইল। তার মেয়ের বিয়ে, নাকি নিজেরই বিয়ে—বিয়ে—কারণটা ঠিক ভাল বুঝল না অনল। ঠাকুরের ছুটি মঞ্জুর করে ডাকল পুনিয়াকে।

—পুনিয়া!

—জি! এক ছুটে পুনিয়া উপরে এল।

—ঠাকুরকে ছুটি দিয়েছি, তুই রান্না করতে পারবি?

—জরুর। উ মহারাজসে হাম আচ্ছা খানা পাকানে সেক্তা। লেকিন মউসী—

সরবালাকে ভয় পাচ্ছে পুনিয়া।

—আরে মউসীর আসতে এখনো অনেক দেরী। কি পাকাতে জানিস তুই?

—যো বাতায়েঙ্গে আপ।

—এই সেরেছে। আমাকে বাতাতে হবে? তুই নিজে জানিস না কিছু?

—হা, হামভি জানে কুছু কুছু।

—সেই কুছুটা কি?

—এক ডহরকা দাল, দো ভাজি—

—ব্যস্, ব্যস্, ওতেই হবে। তুই ডাল আর ভাজি বানাগে, আমি একটু ঘুরে আসি।

—মছলি?

—মাছ? মাছ রাঁধতে জানিস তুই?

—হাঁ দাদা, হাম মছলি পাকানে ভি সেক্তা।

ঝি পুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে এসেছিল, শুনছিল পুনিয়ার কথা। মাছের প্রসঙ্গে এবার ঝঙ্কার দিল।

—সেক্তা সেক্তা তো করছিস, শেষে রেঁধে রাখবি মাথামুণ্ড। আপনি বাজারের টাকা দিন দাদা, ও মাছ নিয়ে আসুক, আমি রান্না দেখিয়ে দেব।

—তু দেখাবি? তুতো কেবল জানিস ডাঁটাকে চরচরিয়া।

—তোর মাথা।

কথা কাটাকাটি চলত। নীচে থেকে জলদ হাঁক দিল।

—কইহে পুনিয়াবাবু, ডাক্তার-সাহেব বাসায় আছেন নাকি? তানরে কও একবার, জলদ আইছে দেখা করতে।

পুনিয়াকে কিছু বলতে হ'ল না। নীচে নেমে এল অনল।

—বোসো জলদ, ব্যাপার কি?

—আইজ্ঞা বেপার একেবারে ঘোরতর। একটা বিশেষ রকম কথা আছে।

অর্থাৎ গোপন কথা আছে জলদের। পুনিয়াকে বাজারের টাকা দিয়ে বিদায় করল অনল, ঝি গেল নিজের কাজে।

—বল এবার।

—হ, কই। মেঝের উপর ভাল ক'রে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসল জলদ।

—বরই মুস্কিলে পড়ছি আমি ডাক্তারবাবু। এই বিপদে আপনে ছাড়া উদ্ধার করবার কেউ নাই।

—বিপদ আবার কি হ'ল?

—হ, বিপদই। বিপদ ছাড়া আর কি কমু অখন। কথাটা হইল বাবু টাকা-পয়সা লইয়া। ঝুমরার এক হাজার সতের টাকা বার আনা গচ্ছিত আছে আমার কাছে। সেতো মরছে, বাচছে সগল কষ্ট হইতে। টাকাটা লইয়া আমি পড়ছি মুস্কিলে।

—ঝুমরা? সেই খোঁড়া ভিখিরী? মরে গিয়েছে?

—হ, মরছে। মরছে গাড়ী চাপা পইরা এই কয় মাস হইল। দ্যাশে যাইব বইলা সগল ঠিক ঠাক করছে, রাত্র পরভাতে রওনা দিব। দেখতে গেল নমনারে। সেই পোড়াকপালীর তো বিশ্ব-সংসারে কেহ নাই, ঝুমরা বড়ই সেনেহ করত মাইয়াটারে। সেই খানেই গাড়ী চাপায় জীবন দিছে। ওতো গেছে, বিপদে পড়ছি আমি টাকা লইয়া। অনেক কষ্টে ঠিকানাখান পাইছি এতদিন অর বউর। আপনে যা হয় একটা বিহিত ব্যবস্থা কইরা টাকাটা পাঠাইয়া দেন। এই থলিতে টাকা আছে।

একটা মস্ত ভারী থলি অনলের পায়ের কাছে রাখল জলদ।

—আরে, আরে! টাকা আমার কাছে কেন? ব্যস্ত হ'ল অনল।

—আর কারে কই বলেন? থাকি একটা ভাঙা চালের তলে, নিজের মনও এতগুলা টাকার লোভে ছোক্ ছোক্ করে। কোন্ সময় চোরে বা নিজেই সব্বনাশ করি তার ঠিক নাই। আপনে টাকাটা রাখেন, এমনভাবে ঝুমরার বউরে পাঠান, যেন খোয়া না যায়।

—সে পাঠানো যাবে, এখন টাকাটা তোমার কাছেই থাক।

—না বাবু, গরীবের কাছে টাকা, যেমন বাঘের কাছে ছাগলের ছাও। শরীলে আর বল নাই, রিক্সা টানতে পারি না তেমন। মন না মতি, কোন্ দিন দুর্মতি হইব, টাকাটা আত্মসাৎ করুম নিজে। রক্ষক হইয়া ভক্ষক হমু। রসিদ নাই, পত্তর নাই, একেবারে সব্ব-নাশ হইব ঝুমরার বউ-পোলাপানের।

—রিক্সা টানছ না আজকাল?

—টানি। কিন্তু কষ্ট হয়, বুকে হাপ লাগে।

—আমার এখানে কাজ করবে জলদ?

—আপনের কাছে কাম? কি কাম বাবু?

—আমাদের বাড়ীর সামনের বাগানটা একটু দেখবে, মালীর কাজ।

—হঃ, বুঝছি। এই এক চিলতা জমিতে দুইটা ফুল গাছ, তার জইন্য আবার মালী। বাবুর বড় দয়ার শরীল, এই বুড়াটারে দয়া করতে চান। ভগবান আপনের মঙ্গল করুক। কিন্তু আমরা বাবু মাছ-মারার সন্তান। কাঁথায় শুইয়া ঘরে কোকাইয়া মরণ আমাগো লজ্জার কথা। তারপর কালবৈশাখীর তুফানে আমরা ডিঙি ভাসাইয়া যাই পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরীর বুকে। অন্য কাম পছন্দে আসে না।

—কিন্তু রিক্সাটানাও-তো মাছ ধরা নয় জলদ। তবে অন্য কাজ করবে না কেন?

—এইটা বাবু ঠিকই কইলেন। রিক্সা টানন আর নৌকা বাওন এক কাম না। কিন্তু মনের কথা কই। দুফর রৌদ্রে লম্বা লম্বা সড়কগুলি মনে লয় যেন নদীর সোতা। রিক্সা টানন, যেন লগির খোঁচা মারন।

টাকা রেখে জলদ চলে গেল। বাইরে বেরিয়েও কোনো কাজে মন দিতে পারল না অনল। বার বার কানে বাজছে জলদের কথা। বুড়ো নিঃসম্বল জলদ লোভের শিকার হতে চায় না, চায় না কাঁথায় শুয়ে ঘরে মরতে। ক'লকাতার পীচ ঢালা রাস্তায়ই ওর কাছে পদ্মা মেঘনা হয়ে গিয়েছে।

●

সাউ কেমিকেলের লেডি রিপ্রে-জেণ্টেটিভ হিমিকা। তার অলিখিত চুক্তি আছে, ব্রিজমোহনের বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়িত করবে সে। ফ্রিনজে সাউ সাহেবের বিশেষ অতিথি ত বটেই, কোম্পানীর স্বার্থও খানিকটা জড়িয়ে আছে। ফ্রিনজের খুশী হবার সঙ্গে। ইণ্টার ন্যাশনাল ট্রেড ইউ-নিয়নের মস্ত বড় কর্মচারী আর এস ফ্রিনজে। তার মর্জির উপর সাউ ইণ্ডাস্ট্রীজের ভালমন্দ অনেক নির্ভর করে। সুতরাং এখানে দাঁড়াবার মত জোর

না পেলেও হিমিকাকে ভার নিতে হল অতিথিকে কলকাতার খানা-খন্দ ঝোপ-ঝাড় দেখাবার। ক্রিনজে আবার কলা-রসিক। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা শিবপুরের বাগানে তার মন নেই। সে চায় বাংলা দেশের আদি অকৃত্রিম গ্রাম্য পরিবেশ দেখতে আর গাঁয়ের মেয়েদের দু'চারখানা ছবি তুলতে। শহরের মেয়ের গ্রাম্য সাজলে চলবে না। খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে চাই। সোনারপুর, লক্ষ্মীপুরে অনেক অনেক চেষ্টা করা হল কিন্তু সাহেবের হাতে ক্যামেরা উঠতেই কৌতূহলী মেয়েরা ঘরে ঢুকে গেল। তাদের পুরুষরাও ঘাড় নাড়ল। না, বৌদের কলসী কাঁখে ছবি তোলা হবে না। অনেক বুঝিয়ে ক্রিনজেকে রাজী করিয়ে হিমিকাই মাত্র একখানা শাড়ী জড়িয়ে জলে নামল। ডুব দেওয়া, সাঁতারকাটা অনেক ভঙ্গির ছবি তোলা হ'ল। কলসী-কাঁখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঙালী মেয়েদের জল আনবার ছবিও নিল সাহেব করেকটা। কিন্তু এত করেও ক্রিনজেকে খুশী করতে পারল না হিমিকা। বিজয়মোহন অসন্তুষ্ট হলেন।

—মাই'ও দ্যাট হিমি, তুমি আপন খেয়ালে চললে আমার কাজ নষ্ট হবে। ক্রিনজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

—কিন্তু আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করি নি সাহেব।

—চেষ্টা। গাড়ী ক'রে ঘুরবার জন্য তোমাকে পাঠাইনি আমি। সে তো ড্রাইভারই পারত। তুমি নিজের গোঁ নিয়ে রইলে। ক্রিনজে ড্রিংক অফার করল, তুমি বিক্রিটিক্স করলে, নাচলে না ওঁর সঙ্গে। একদম কোল্ড টেস্টলেস নাইট কাটিয়ে গিয়েছেন।

হিমিকা চুপ করে রইল। কি বলবে সে। ক্রিনজে অসন্তুষ্ট হয়েছে আর অতিথি অসন্তুষ্ট হ'লে—সাউ সাহেবের কাজে না লাগলে তিনিও অসন্তুষ্ট হবেন। সে অসন্তুষ্টির ফল ভাল নয়।

হিমিকাকে নীরব দেখে গলার স্বর বদলালেন বিজয়মোহন।

—ওয়েল, তোমার শরীর ভাল নেই আমি জানি। যা হবার হয়েছে, কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই আসবে আখতার খাঁ, তাকে যদি খুশী না করতে পার, তোমাকে আমার অন্য কথা বলতে হবে।

অন্য কথা বলবেন সাউসাহেব। হিমিকা জানে সেটা কেমন কথা। সাউ সাহেবের প্রীতির অনেক চিহ্ন দেখেছে সে, আবার দেখেছে ঠাণ্ডা নির্মম নিষ্ঠুর চোখ। সেই চোখের ইসারায় কত মেয়েকে হোটেল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। অন্ন-সংস্থানের জন্য তাদের দাঁড়াতে হয়েছে ল্যাম্প-পোষ্ট ঘেঁষে, নিতে হয়েছে মুসলমান পিম্পদের সাহায্য। হিমিকার জন্য সাউসাহেব অনেক করেছেন। সে নাচগান শিখেছে, প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে হ্যাপিনুকের। বিনা প্রতিবাদে নানা অতিথিদের সঙ্গ দিয়েছে। কেউ তার চুক্তি মেনে নিয়েছে, কেউ বা অধৈর্য হয়েছে। কত জন চিমটি দিয়ে

তার গায়ের মাংস তুলে নিয়েছে, সিগারেট পেটে ধরে ফোসকা তুলেছে শরীরে। একা ঘরে বালিশে মুখ চেপে কত কেঁদেছে হিমিকা প্রথম প্রথম, তারপর সব সহ্য হয়ে গিয়েছে, আজও সহ্য হ'ল। সাউ কেমিকেলের অফিস হ'তে বেরিয়ে এল।

চৌরঙ্গীর উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে সন্ধ্যা। নিপুণ প্রসাধিতা নগরীকে দেখে কে বলবে ওর বুকের তলায়, এখানে ওখানে কত কান্না কত অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে। ঠিক হিমিকাদের মত। ওরা যখন ফ্লোরে নাচে, হেসে হেসে ফ্লাইং কিস ছুড়ে দেয় দর্শকদের উদ্দেশ্যে তখন কি কেউ বুঝতে পারে ওদের বুকের মধ্যে একটা মস্ত বড় কান্না গুমরে মরছে। বাজনা দিয়ে, হাসি আলো দিয়ে ঢাকা আছে সব যন্ত্রণা। একবার কেউ মুখোসটা ছিঁড়ে খুলে ফেলে দিত, আকাশ ফাটিয়ে হা-হা ক'রে চারদিকে তাহলে সেই কান্না ছড়িয়ে পড়ত। রামধনুর রং ছিটানো আলোর ফানুস, জাজ ব্যাণ্ডের কানে তালা লাগানো বাজনা শরীরে ঢেউ তুলে নাচ সব বন্ধ হয়ে যেত।

চৌরঙ্গীর পথে হাঁটছিল অনল। মনের বিপর্যস্ত অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনবার জন্য সে একটা ছবিঘরে ঢুকেছিল। অসহ্য লাগতে বেরিয়ে পড়েছে, হাঁটছে অলস পায়ে। একটু হেঁটেই কিন্তু থামতে হ'ল তাকে। ওদিক দিয়ে হিমিকা আসছে। একটু দ্রুত হেঁটে মুখোমুখি হ'ল তার সঙ্গে অনল।

হ্যাপিবুকে ফিরছিল হিমিকা। ক্লান্ত, অবসন্ন। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল, হঠাৎ অনলকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়াল। সন্ধ্যা হয়েছে, পশারিণীর দোকান খুলবার সময়। ব্রিজমোহন সতর্ক করে দিয়েছেন—আর খেয়াল চলবে না। এবার হাটে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে। একেবারে নিঃশেষ ক'রে, না হ'লে নেমে আসতে হবে পথে। সঙ্গীহীন, স্বজনহীন দীর্ঘ দুস্তর পথ। এমন সময় কোথা হতে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল অনল। মনে পড়ল বিষবিদ্ধ শেষ সন্ধ্যাটির কথা। অনলকে বিষাক্ত কথার তীর ছুঁড়েছিল হিমিকা। সহ্য করতে না পেরে ছটফট্ ক'রে পালিয়েছে সে। কিন্তু অমন কথা কেন বলেছিল হিমিকা? কতবার নিশীথ রাতের একক শয্যায় শুয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে মধুর কথা দিয়ে যাঁর আরতি করেছে হিমিকা, তাঁকে কটু বলল কেন। অনল যে তাকে হারলট—গণিকা বলেছিল। সব চেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর তিরস্কার। অনল কি জানে তাকে গণিকা বানাবার জন্য শত শত প্রলোভন, অসহ্য দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের কি ভয়ানক চক্রান্ত। তাকে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করতে হয়। রাতের ঘুমে ও সে নিজেকে সতর্ক হয়ে পাহারা দেয়। হিমিকা হেসেছে নেচেছে, অবসর-সঙ্গিনী হতে কত অত্যাচার সহ্য করেছে তবু গণিকা হয় নি। একটি গণ্ডী দিয়ে সে নিজের চারদিক ঘিরে রেখেছে, পরেছে কৌমার্যের অচ্ছেদ্য বর্ম। অনলের কথায় তাই যাতনায় ছট্‌ফট্ ক'রে উঠেছিল হিমিকা। দুঃখের অন্ধ বিবরে যে নাগিনী জন্মেছে, সে ফণা বিস্তার করে বিষ ঢেলেছিল। মৃত্যুর মত ঘন নীল বিষ।

জীবনের সেই চরম দুর্যোগের রাত কখনো ভুলতে পারে না হিমিকা। অনলের বিবর্ণ মুখে সে প্রত্যক্ষ করেছিল নিজের সর্পিণী মূর্তি। নিজেকে দেখেছিল আর কেঁদেছিল হিমিকা। ভেবেছিল এবার মরে যাবে। মরা তো কত সহজ এখন তার কাছে। কিন্তু মরতে পারে নি সে। হাত ভরা ঘুমের বড়ি, জলের গ্লাস নিয়ে বসেছে, তবু সেই নিশ্চিন্ত ঘুমের ওষুধ খেতে পারে নি হিমিকা। হিমিকার যে একটি কথা বলবার আছে। কিন্তু ওর তো কেউ নেই, ও মরে গেলে সে কথাটি তো কেউ বলবে না অনলকে। বলবে না—তুমি ভুল বুঝেছ, হিমিকা গণিকা নয়, তুমি যে ওকে ভালবেসেছিলে। ও নষ্ট হ'লে যে নষ্ট হ'ত তোমার সেই ভালবাসা। তুমি হেরে যেতে, তাইতো হিমিকা গণিকা হতে পারে নি, ওর বুকের সবটুকু তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তোমার ভালবাসা।

আজকে সন্ধ্যাবেলায় এল কি সেই কথাটি বলবার সময়। অনল এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে আলোর ঝরনা, সুরের নিমন্ত্রণ, আনন্দের মেলা। এখন কি চোখের জলে ভেজা দুঃখের কথা বলবার সময়, অনল কি সে কথা শুনতে পাবে? বুঝবে যে ব্রিজমোহন শেষ কথা বলে দিয়েছেন, হিমিকার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। ওর বুকের মধ্যে মাথা কুটছে আর্তনাদ—পারলাম না, পারলাম না আমার সাত রাজার ধন মাণিকটিকে ধরে রাখতে।

—তোমার নাকি খুব অসুখ ছিল? কেমন আছ এখন? অনল বলল।

—ভাল আছি। অস্ফুট কথায় উত্তর দিল হিমিকা। নীরবে হিমিকার সঙ্গে দু'এক পা হাঁটল অনল।

—আপনি এদিকে—সহজ হবার চেষ্টা করল হিমিকা।

অনল হাসল। —একটা ছবি দেখতে বসেছিলাম, ভারি বিশ্রী লাগল। ভীষণ খিদে পেয়েছে, কিছু খাব। চল তুমিও। সামনের রেস্টুরেন্টের দরজায় থামল অনল।

—আমি না।

—তুমি যাবে না? কেন, খিদে পায় নি? বেশ অল্প খেয়ো।

এবার ভয় পেল হিমিকা। রেস্টুরেন্টে ঢুকবে সে অনলের সঙ্গে। কেউ চেনা দেখলে কি ভাববে অনলকে। রাতের আলোতেও হিমিকার পাংশু মুখ দেখল অনল।

—কি ব্যাপার?

—এখানে, এখানে অনেকেই চিনবে আমাকে।

—,-হুঁ এসো। সিঁড়িতে পা দিল অনল। বিপন্ন মুখে হিমিকাকেও অনুসরণ করতে হ'ল। অফুরন্ত আলো, বাজনা বাজছে। সন্ধ্যার আসর এখনো জমে ওঠে নি। তবু অনেকেই

হিমিকাকে দেখে ঠোঁটের কোণে হাসল, অতি সাহসী কেউ কেউ তাকে উইশ করল, ঘাড় নেড়ে প্রতিদান দিতে হ'ল হিমিকাকে।

—তুমি যে দেখছি একেবারে বিখ্যাত হয়ে উঠেছ। খেতে খেতে অনল বলল।

—বিখ্যাত! কুখ্যাত বলুন।

—ও একই ব্যাপার, খ্যাতিটাতো আছে ঠিকই। কিন্তু তুমি একটু খাও নইনী, একা খেতে ভাল লাগে না।

তন্দুরী চিকেন মুখে ফেলল অনল।

—আ:! চমৎকার! পুনিয়াটা এমন রাঁধে, বুঝলে মুখে দিলেই খাবার ইচ্ছে চলে যায়।

—পুনিয়া রাঁধছে? আশ্চর্য হ'ল হিমিকা।

—ঠাকুর? সরমাসি?

—আর বল কেন দু:খের কথা। ঠাকুর বিয়ে করতে গিয়েছে। সরমাসি? আরে তুমি তো আমাদের কোনো খবরই রাখ না। অপির বিয়ে হয়ে গিয়েছে গত মে মাসে। বাবা ফিলাডেলফিয়া ইউনিভারসিটির নিমন্ত্রণে আমেরিকা গিয়েছেন সেদিন। অপি দিন-রাত নাকে কাঁদছে। অপরেশ—অপির স্বামীর কাজকর্ম মাথায় উঠেছে, তাই সরমাসি ওদের বাড়ী গিয়েছে অপিকে সামলাতে। বাড়ীতে আমি একেবারে অদ্বিতীয় হয়ে বিরাজ করছি। পুনিয়া ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবার ফাঁকে ফাঁকে রান্নাটা সেরে নিচ্ছে আর নিজেই মুগ্ধ হচ্ছে তার স্বাদ-গন্ধে। আমি সবাইকে সেধে বেড়াচ্ছি নিমন্ত্রণ করবার জন্য। তোমাকেও অফার দিলাম, দেখ ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে পুণ্য অর্জন করতে চাও কি না।

অনেকখানি ইতস্তত ক'রে হিমিকা বলল:

—আপনি খাবেন?

—নিশ্চয়ই খাবো। কিন্তু হোটেলের খাবার নয়, নিজের রান্না মাছের ঝোল-ভাত।

—আমি নিজে রাঁধবো।

—অতি উত্তম প্রস্তাব। এখন চল গাছগুলোর কাছে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই শ্রুতিসুখকর প্রস্তাবটি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

—চুপ কেন নইনী? হাঁটতে হাঁটতে বলল অনল, হিমিকার হাত ধরল। আবার তিন বছর আগের আদরের ডাক। হিমিকার চোখ বেয়ে জল নামল, ফোঁটা পড়ল অনলের হাতে।

—নইনী কেঁদো না। হিমিকার পিঠে হাত রাখল অনল। নিজেকে সামলাবার চেষ্টাই করছিল হিমিকা, কিন্তু অনলের আদরের ডাক, স্নেহের স্পর্শ তার সব ধৈর্য ভেঙে দিল। মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল হিমিকা।

অন্ধকার গাছের তলায় একটু সময় চুপ ক'রে দাঁড়াল অনল।

—নইনী!

—বড় কষ্ট।

কান্না-ভরা গলার দু'টি শব্দ তীরের মত পৌঁছল অনলের বুকের মধ্যে। রক্তাক্ত হ'ল মর্মমূল। জীবনে প্রথম একজনের কাছে নিজের অসহ্য যন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করল হিমিকা। কথা নিজের কানে পৌঁছতেই শিউরে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে কান্না বন্ধ করল সে।

●

প্রায় সমস্ত রাত জেগে কাটাল অনল। হর্ন বাজিয়ে গাড়ী গেল, পথে ডাকল কুকুর ঘেউ ঘেউ, শোনা গেল পাহারাওয়ালার লাঠি ঠুকবার ঠক্ ঠক্ শব্দ। ঘুমতে পারল না অনল। মনে হচ্ছে এই বাড়ী-ঘর, সমস্ত কলকাতা শহর—রাতের আকাশ—সব জোর করে একটা কান্না চাপছে, বলতে চাইছে বড় কষ্ট।

কষ্ট। কষ্টের কথা কি জানে অনল। ও কি বুঝবে কত যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে হিমিকা, হিমিকার মত আরো কত মেয়ে! কেউ কি বুঝবে সব হাসি গান নাচের উল্লাসে চাপা আছে দু'টি মর্মন্তুদ কথা—বড় কষ্ট। জানলে বুঝলে কেউ আর পকেটের টাকা বাজিয়ে হাসিখুশী কিনতে যেত না রাতের বাজারে।

কষ্ট জানেনা ব'লেই তো অনল বারে বারে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অনল দেখেছে টাকা আর ব্যভিচার, দেখে নি কান্নার সমুদ্র, রক্তাক্ত অনুভূতি। কত নিরাশ্রয়ত্ব, কত অসহায়ত্ব। অনল বোঝে নি কিন্তু ঝুমরা জল ওর তো বুঝেছিল। শুনেছিল পৃথিবীর বুকচাপা কান্না। দেখেছিল দীন আর্ত দুই চোখ মেলে আবেদন জানাচ্ছে অসহায় মেয়ে, অন্ধকার ঝড়ের রাতে পথে নেমে এসেছে। তাকে গ্রাস করবার জন্য পিছনে ছুটেছে পাপ ভয়াল কঠিন দুই বাহু বিস্তার করে। খোঁড়া ভিখারী তাকে পথ চিনিয়েছে, জলদ পৌঁছে দিয়েছে অনলের কাছে।

অনলের কাছে। নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে এল অনলের। ও তো পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে নি বরং বিষাক্ত কথায় হিমিকাকে ছিন্নভিন্ন করেছে, বাড়িয়ে দিয়েছে অত্যাচারের শক্তিকে। বিদ্যুৎ বর্ণা অসহায় মেয়ে নারী মাংস লুব্ধকের গ্রাস হতে পালিয়ে এসেছে। বলেছে বড় কষ্ট তার। কই। কিন্তু অনলের কই সেই দীপ্ত পৌরুষ, খড়্গের মত নাক, বিশাল বুক। সে কি আদিত্যমণ্ডল হতে শক্তি সংগ্রহ করে মহাশক্তিমান হয়ে উঠেছে যে তাকে দেখে পাপ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পালিয়ে যাবে। অনল হেরে গিয়েছে। হিমিকাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার শক্তি তার নেই। মনেরও অগোচরে হয়তো একদিন চেয়েছিল হিমিকাকে স্ত্রী নয়, রক্ষিতা ক'রে রাখবে। শান্তিনগরের রক্ত, বংশের রক্ত হয়তো তাকে এই প্রবৃত্তিতেই প্ররোচিত করেছিল। কেবল প্রেমের একটা মুখোস পরে নিজের কামনার বীভৎস রূপটা নিজের কাছেও ঢেকে রেখেছিল অনল।

বংশের রক্ত!! নিজের চিন্তা তীরের মত আঘাত করল অনলকে। ছটফট ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সামনে প্রশস্ত লাইব্রেরী। দেয়ালে টাঙানো

হৈমন্তী দেবীর তৈলচিত্র। ভোরের প্রথম আলোর রেখাটি এসে পড়েছে চিত্রময়ীর মুখের উপর। মেঝেতে উপুড় হয়ে প্রণাম করল অনল। ওগো আমার আদি জননী হৈমন্তী, হেমন্তের শস্য-পূর্ণা বসুন্ধরা তুমি রক্ষা করেছো অনলকে। কোষে কোষে সঞ্চার করেছ রৌদ্রস্নাত নির্মল সতেজ রক্তধারা।

সকাল হয়েছে। সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেটে গিয়েছে অনলের। দিনের প্রসন্ন মুখে অনল দেখল নিজের প্রসন্ন ভাগ্যকে।

সকাল হ'ল হ্যাপিনুকে। আলোর দাক্ষিণ্যভরা মধুর প্রভাত। কিন্তু একি কেমন নিত্য নিয়মের একটি রাত্রির অবসান? এ প্রভাত কি মধ্যাহ্নে অপ-রাহ্নে সায়াহ্নে পৌছে আবার ঢেকে যাবে রাতের অন্ধকারে? আবার আলো জ্বলবে, নগ্নদেহে নাচবে হিমিকা, কামার্তের দৃষ্টি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে তাকে? না না, আর রাতকে আসতে দেবে না সে। যেমন ক'রে ঠেকিয়েছে সুরেশ্বর বিজমোহনকে, তেমনি ক'রেই রাতকেও ঠেলে রাখবে হিমিকা।

সারারাত মেঝের উপর হাতে মাথা রেখে শুয়েছিল হিমিকা। সকালে উঠে সমস্ত ঘর নির্মল ক'রে মুছে নিল। স্নান ক'রে পরল সদ্য কিনে আনা লালপাড় শাড়ীটি। সমস্ত দিন উপোস ক'রে আজ রান্না করবে হিমিকা। কিন্তু রান্না। চোখ ফেটে হিমিকার জল এল। রাঁধতে তো সে জানে না। ও শিখেছে কেমন ক'রে শরীরকে কমনীয় লোভনীয় ক'রে তোলা যায়, ফক্সট্রট নাচের কৌশল কি, কেমন ক'রে পা মেলাতে হয় বাজনার সঙ্গে, আন্দোলিত হতে হয় গানের তালে তালে, অনাবৃত করতে হয় শরীরকে আলোর রশ্মি মেখে মেখে।

কাশেম ঘরে এল চা নিয়ে। মেম-সাহেব কাঁদছে।

—চা এনেছি মেমসাব।

—চা। আজ আমি কিছু খাব না কাশেম। চোখের জল মুছল হিমিকা। একটা উপায় মনে হয়েছে তার।

—তুমি রাঁধতে জান কাশেম? আমাকে দু'একটা রান্না শিখিয়ে দেবে?

—জী না হুজুর। আমি রসুই করতে জানি না। আমার বিবি জানে। তার রান্না মাছের ছালুন খেলে আপনি আর অন্য জিনিস মুখে দিতেই চাইবেন না।

—কি করি বলত? আজ আমার ঘরে মেহেমান আসবেন, আমাকে রান্না করতে হবে।

—মেহেমান? তার জন্য ভাবনা কি মেমসাব। আমি এক্ষুণি গিয়ে স্টুয়ার্ডকে বলে একটা হ্যাপিনুক স্পেশালের অর্ডার বুক করে আসছি।

—না কাশেম, তিনি হোটেলের রান্না খাবেন না।

—খাবেন না? ও হাঁদুদের বামুন-ঠাকুর বুঝি? তবে জগুকে ডেকে আনি। ও খুব ভাল বাংলা রান্না জানে।

জগু বাংলা রান্না জানে। মাছের ঝোল, মুগের ডাল, সুক্তো পর্যন্ত জানা আছে তার। হিমিকার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বাজারে চলে গেল জগুয়া। কেরোসিনের চুলা, কিছু বাসন আর বাজার করে আনবে।

স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল সমস্ত দিন। সন্ধ্যার আগেই রান্না শেষ। মেঝেতে নতুন কেনা আসন বিছিয়ে হিমিকা একটা সুগন্ধি ধূপকাঠি জেলে দিল। হঠাৎ সমস্ত শরীর অবশ ক'রে মনে পড়ল—আজ রবিবার। রবিবার রাত দশটার নিত্য অতিথি হিমিকার ঘরে বিজমোহন সাউ। নিশ্চয়ই আজো আসবেন তিনি। হয়তো বলবেন—এসেছে সুজন সিং, আখতার খাঁ, তোমার সবচেয়ে ঘোর রং নাইলনের স্বচ্ছ শাড়ী পরা স্বল্প অন্তর্বাসের উপর। চল মজলিশে। হাসিখুশী হয়ে, নাচ দেখিয়ে শরীর দেখিয়ে ওদের খুশী করতেই হবে তোমাকে। না হ'লে বেহাত হবে মস্ত বড় অর্ডার। হিমিকাকে যেতেই হবে।

ও যে পতিতার মেয়ে। ধনী পুরুষ, কামী পুরুষকে তৃপ্তিদান ওর বৃত্তি। বিজমোহনের আদেশে সজ্জা-কারিণী এসে হিমিকার শরীর হতে লালপাড় কোরা শাড়ী খুলে নেবে। নিভিয়ে দেবে ধূপ-প্রদীপের আলো। সন্ধ্যার সব মাধুর্যকে খান্ খান্ ক'রে ভেঙে দেবে ঝমঝমে বাজনা। ওরা হিমিকাকে দাঁড় করিয়ে দেবে তীক্ষ্ণ আলোয় উজ্জ্বল নির্লজ্জ আসরের মাঝ-খানে। বলবে—রান্না, গঙ্গাজল, ধূপের ধোঁয়া ওসব তোমার জন্য নয়। তুমি নাচো। ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে উন্মোচন কর নিজের লাবণ্য। নিরাবরণ কর শরীর। আমরা খুশী হই। খুশী হোক তোমার মনিব। কোটিতে পৌঁছাক তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। তোমাকেও খুশী হলে তিনি তখন বকশিস্ করবেন আসল মুক্তোর তিন লহরী।

পায়ের শব্দ। বুক কেঁপে উঠল হিমিকার। অনল এসেছে।

—বাঃ, একেবারে রেডি, এ যে প্রচুর বন্দোবস্ত। নুন-টুন সব ঠিক আছে তো? আমি পুনিয়াকে বলে দিয়েছি রান্নায় নুন দেবে না, দরকার-মত আমি নিজে নেব। তাতে কিছুটা টলারেবল্ হয়েছে খাওয়া। পাছে আমি নেমকহারামী করি সেই ভয়ে ব্যাটা দরাজ হাতে নুন দিচ্ছিল শয্যায়। ভাতে পর্যন্ত।

—ভাতে নুন?

—মনে হচ্ছে ভাতেও নুন, না হলে শুধু মাখন মেখেও ভাত খেতে পার-ছিলাম না কেন। এটা কি। মুগের ডাল। ফার্স্ট ক্লাস। তুমি? তুমি খাবে না? পরে? কেন? কম কম রেঁধেছ নাকি, না ভাল জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে?

বেশ ভাল ক'রে খেল অনল এলাচ মুখে দিল। দরজায় কাশেম।

—নইনী, দেখ কে এসেছে।

পিছন ফিরে হিমিকা আসন তুলে রাখছিল। কাশেমকে দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সাউসাহেব খবর পাঠিয়ে-ছেন, ঠিক সাড়ে দশটার সময় আসবেন। পারল না, রাতকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না হিমিকা। অন্ধকার, বন বন পার হয়ে পৌঁছতে পারল না পুজোর

ধরে। পঞ্চপ্রদীপ চন্দনগন্ধী দেব-পাত্রের সামনে কালো পায়ে আছড়ে পড়ে জ্বলতে পারল না হিমিকা—আমাকে রক্ষা কর।

আজো আসবেন সাউসাহেব, আজো হিমিকাকে তাঁর গ্লাসে পানীয় ঢেলে দিতে হবে, নাচতে হবে, হাসতে হবে পাশে বসে। পারবে? পারতেই হবে, না হলে যে কোনো উপায় নেই ওর। মৃদু আর্তনাদ বেরিয়ে এল হিমিকার ওষ্ঠ ভেদ ক'রে। অনল কাছে উঠে এল।

—কি বলে গেল লোকটা?

—সাউসাহেব আসবেন ঠিক সাড়ে দশটার সময়। উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল হিমিকা।

—সাড়ে দশটায়? এখনো তো দেরী আছে, মোটে ন'টা বেজেছে। সহজ গলায় কথা বলল অনল।

—চল একটু ঘুরে আসবে।

ঘরের বাইরে পা দিল অনল, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল হিমিকা। সমস্ত দিনের রুক্ষ চুল, মলিন শাড়ীর আঁচল উড়তে লাগল। ত্রস্তে পা বাড়াল হিমিকা। এক্ষুণি হয়তো দরওয়ান ওকে ধরে ফেলবে। সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেবে, বলবে—হুকুম নেই বাইরে যাবার।

পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল হিমিকা। অনল তার একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সামনে দীর্ঘ অফুরান পথ। সারারাত ধরে হাঁটবে কি অনল, পৌঁছে দেবে হিমিকাকে উষার উদয়াচলে। বলবে—দেখ দিনের আলো। ভয় নেই, চেয়ে দেখ দিনের আলো। রাত্রি আর অভিশাপ হয়ে কোনোদিন নামবে না তোমার জীবনে। তোমাকে আমি আরতির দীপশিখা করে দিলাম। তুমি জ্বলবে পূজার ঘরে, নববধূর বাসর-ঘরে। তোমার আলোয় পথ চিনে নেবে অন্ধকারের অন্ধপথিক।

দু'ধারে গাছের সারি, ঘুমের ঘোরে ডানা ঝাপটালো পাখী, রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টগুলো তাদের আলোর চোখ দিয়ে দেখতে লাগল পথিক দু'টিকে। ওরা কি কার খোঁজে পালাচ্ছে, না ঠিক ঠিকানায় পৌঁছবার জন্য যাওয়া হয়েছে!

গঙ্গার ধারে এসে বসল অনল।

—বসো।

হিমিকা বসল। আকাশের ছায়া পড়েছে জলে, তারার ছবি নাচছে ঢেউয়ের দোলায়।

—কি সুন্দর জল। হিমিকার মৃদু-কণ্ঠ শোনা গেল।

—সুন্দর। জান হিমি, পৃথিবীর সব জল একদিন জমে গিয়েছিল। তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরছিল জীবন, একফোঁটা জল নেই, সব জমানো হিম। পৃথিবী কেঁদে উঠেছিল—রক্ষা কর, বাঁচাও আমাকে শুষ্ককঠিন জলের অভিশাপ থেকে। তখন কি হ'ল বলতো?

—কি? ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল হিমিকা।

তখন সবাই গিয়ে উপস্থিত হ'ল আগুনের কাছে। বলল:—এসো,

তোমার তাপ দিয়ে গালিয়ে তরল ক'রে দাও কঠিন হিমকণাকে। জীবন রক্ষা হোক, পৃথিবী ভ'রে উঠুক ফল-ফুল, ঘাস-পাতায়। আগুন এল। বড়বানল হয়ে সে জলতে লাগল হিমের বুকের মধ্যে, না হ'লে আবার যে জমাট বেঁধে যাবে জল। পৃথিবীতে থাকবে কেবল রাশি রাশি বালি—মরুভূমি।

দু'হাত বাড়িয়ে হিমিকাকে নিজের একান্ত কাছে নিয়ে এল অনল।

—আমাকে বিয়ে করবে হিমিকা?

—না, না, না। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল হিমিকা।

—আমি কারোর বউ হতে পারি না, আমার ডাক পড়ে মজলিশের আসর সাজাতে।

—সেই আসরই তো সাজাব। সপ্তর্ষি কত আলো দিল, অরুন্ধতী চেয়ে রয়েছে। মুখ-চন্দ্রিকা হ'ল আমাদের আকাশের তলায়। কত দীর্ঘ পথ হেঁটে সপ্তপদী হয়েছে। এখন বলছ বিয়ে করবে না।

—না, না, আমি ভীষণ খারাপ মেয়ে। আমার সামনে পিছনে একটুও ভাল কিছু নেই।

—ভাল। একটু সময় চুপ করে রইল অনল। হিমিকার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে দুই নারী। তাদের চক্ষে কটাক্ষ নেই, শরীরে নেই লাস্যের আভাস। দুঃখিনী ব্যথাতুরা দু'টি রমণী, তাদের চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল পড়ছে।

—হিমি, আমার কথা শোনো, মুখ তোলো।

—না, আমার মুখ দেখলেই আপনার দয়া হবে, তখন নিজের সর্বনাশ করে ফেলবেন।

—হিমিকা, আমার সর্বনাশ যদি এমন সুন্দর সেজে এসেই থাকে, তাকে আমি ফেরাতে চাইনে।

—আমি চাই। আমি আপনাকে আপনার সর্বনাশ করতে দেব না।

—কেন দেবে না হিমি? কথা বল, উত্তর দাও। এক্ষুণি বললে তুমি খুব খারাপ মেয়ে। এমন ভীষণ খারাপ হয়ে আমার ভাল করতে চাও কেমন করে?

—আমি—, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি তাই। আমার জাত নেই, কুল নেই। ধর্ম-চরিত্র কিছুই নেই। আমাকে বিয়ে করলে আপনি সবার কাছে, নিজের কাছেও অনেক ছোট হয়ে যাবেন।

অনলের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হিমিকা।

—কেবল শ্রদ্ধা? সম্মান? কখনো আমাকে ভালোবাসনি হিমি?

ভালোবাসেনি। তোলপাড় ক'রে উঠল হিমিকার বুক। তার শরীরের প্রতিটি অণু আকুল হ'ল ভালবাসার আবেগে। সেই ভালবাসাই মুখ চেপে ধরল হিমিকার। কি দাম পতিতা মেয়ের ভালবাসার। কোনোদিন কেউ কি শুনেছে হিমিকারা ভালবেসেছে। পুঁথি-পত্রে পাতা ভ'রে লেখা হয় ওদের কাহিনী, কেমন ক'রে দেহ-ব্যবসায়িনী পুরুষকে দেউলে করে দেয় সেই কথা। আজ যদি হিমিকা অনলের কথায় সম্মতি দেয়, নতুন একটি সংযোজন হবে ইতিহাসের পাতায়। অনলের বংশের দলিলে লেখা থাকবে ছলনায় একটি অভিজাত পুরুষকে একেবারে ধ্বংস করেছিল এক পতিতা নারী। কত বিষ সরবালার জিহ্বায়, কত ঘৃণা অপর্ণার চোখে, গভীর বিস্ময় অজয়ের মুখে, ধিক্কার দেবে পরিচিত বন্ধু স্বজনের দল।

না, না, না। তা হয় না। কেন এ দুর্মতি হ'ল হিমিকার, কেন এল সে হ্যাপিনুক ছেড়ে। সে কি কুহকিনী সে কি আলেয়ার আলো, বিভ্রান্ত ক'রে প্রাণ-বায়ু শুষে নেবে অনলের। ভালবাসার দাম আদায় করে নেবে রক্তাক্ত দীঘল নখে অনলের ধমনী ছিঁড়ে নিয়ে।

নিজেকে কঠিন ক'রে রাখতে চাইল হিমিকা। কিন্তু কি মধুর—সকল দুঃখহরণ প্রলোভন তার সামনে ধরেছে অনল। কি নিষ্ঠুর হিমিকার নিয়তি। মুখের সামনে পূর্ণপাত্র ধরেছে। বলছে,

—নাও, পান কর, অমর হও অমৃত পান করে। তোমার প্রিয়, জীবনাধিক প্রিয়তম নিজের জীবন বাজি রেখে অমৃত এনেছে। তোমার ওষ্ঠাধর অমৃতে ভিজিয়ে দিয়ে, ও আকণ্ঠ বিষে নীল হয়ে যাবে। মৃত্যুর ঘন কালো বিষাক্ত নীল।

—আমাকে একটুও ভালোবাস না তুমি। অনল বলল।

—ব'লো না। এমন কথা ব'লো না। আর্তস্বর বেরিয়ে এল হিমিকার কণ্ঠ হতে।

—তবে বিয়েতে রাজী হচ্ছ না কেন?

—সবাই যে তোমাকে একেবারে ছোট করে দেবে তাহ'লে।

—ছোট করে দেবে? পৃথিবীর রং বদলে গিয়েছে হিমি। কেউ আর কাউকে ছোট করতে পারছে না। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে নিজে।

—তুমি তো জান না কত নীচে নেমেছি আমি। চার বছর ধ'রে প্রতি রাতে—

—ছি, এমন ক'রে কাঁদে না। সব আমি জানি। কিন্তু চেয়ে দেখ, রাত তো আর নেই হিমি।

●

রাত নেই। চোখের জলে ভেজা চোখ মেলে চাইল হিমিকা। পূবের আকাশে আলোর রেখা, ঠাণ্ডা নরম ভোরের বাতাস। হঠাৎ একটা ঝাপটা এল, কণা কণা গঙ্গার জল ভিজিয়ে দিল হিমিকার মুখ-মাথা, সমস্ত শরীর। একবার শিউরে উঠল হিমিকা। তারপর অনলের পায়ের উপর ভেঙে পড়ে নিজেকে একেবারে সমর্পণ করল। সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ল হিমিকার কালো চুলের অরণ্যে, লালপাড় কোরা শাড়ী মাখামাখি হ'ল লাল আলোয়। অনলের প্রশস্ত কপালে ত্রিপুণ্ড্র এঁকে দিল সেই আলো। ভোর হয়েছে।

। সমাপ্ত ॥

নোনতা রক্ত

অরবিন্দ ঘোষ

আকাশের দিকে চেয়ে রইলো ঋত্বিক। ভাবলো দু'একটা কথা। কোয়ার্টার্সের সামনে ছোট বেড়াটুকু ডিঙিয়ে চোখ দুটো চলে গেল।

সংক্ষিপ্ত করে দেখলে আর কতটুকু। সারাদিন চাকরী। তারপর ফিরে এসে স্নান করে কোয়ার্টার্সের সামনে ছোট করে নিজের হাতে তৈরী করা বাগানের সামনে দুটো ইজি-চেয়ার পেতে দু'জন বসা। অল্প জায়গা। দু' একটা মরশুমী ফুলের গন্ধে সারাদিনের কর্ম-কুটিলতার মধ্য থেকে নিজেকে সুগন্ধে ফিরিয়ে আনা।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একই রকম চিন্তা। সে চিন্তার তারতম্যে কখনও কখনও ব্যাঘাত ঘটে মনটা চলে যায় সেই আর একটা জীবনে। মনে হয় বাবার কথা। ছোট আর বড় ভাই-বোনদের কথা। মার কথা কিন্তু মনে পড়ে না। মনে পড়ে নীতিন, মলিন আর মৈনাককে। সব চেয়ে মনে পড়ে দাদাকে। যে সেই ছোটবেলা থেকে খেলার সঙ্গী। বড় হয়ে একই সঙ্গে দু' ভাই-এ হাজারীবাগ আর নেতারহাটের জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে রাইফেল আর বন্দুক নিয়ে। একটা করে শিকার করেছে আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে।

—তুমি কি ভাবছ—। ছোট করে অনুযোগ করে উত্তরা।

চমকে ওঠে ঋত্বিক। অন্যমনস্ক ছিল। খানিকটা পরে নিজেকে সামলে নিল।

—কই কিছু না তো।

—না, সত্যি তুমি কিছু ভাবছ। উত্তরা আবার অনুযোগ করল।

হাসলো ঋত্বিক।—তোমার মত দিনরাত অযথা চিন্তা করি না।

উত্তরা ক্ষুণ্ণ হ'ল। ঋত্বিক নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছে। কি জানি ঋত্বিক হয়ত সুখী নয়। উত্তরা নিজেকে বিচার করে দেখছে। ভাবছে ভাবনার চিন্তাসূত্রগুলো বিশ্লেষণ করে দেখছে সেই গিনিপিগের ডিসেকসনের মত। হার্ট, ভেন, কিডনি—আস্তে আস্তে আলাদা করার মত।

●

উত্তরা ডাট। ডায়াসেসনে পড়া মেয়ে। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পর বেথুনে জুলজিতে অনার্স নিয়ে পড়ছিল। ডাক্তার হবে। শেষ পর্যন্ত উত্তরার বি-এস-সি পাশই করা হল না।

কটা দিন আগের কথা। এখনও দুটো বছর পার হয়নি। ঋত্বিকের মনের মধ্যে একটা ভাঙন ধরেছে। সেই স্বপ্নের দিনগুলো চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। মাঝে মাঝে উত্তরার মনে হয় এই জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া সহজ। তবু মনে হয় এরই মধ্যে মিলে মিশে থাকতে হবে। একটা সমতা বজায় রাখতে হবে। এই মানিয়ে নেওয়ার মাঝে হয়ত একদিন জীবনসূত্রের যোগাযোগের ছিন্ন সুতোর খুঁটটা খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।

●

অসহ্য গরমের পর দুদিন বৃষ্টি হয়েছে। মাটি থেকে একটা গন্ধ উঠছে। কেন্দ গাছে ছোট ছোট ফল ধরেছে। আর কয়েক দিন পরে বৃষ্টির জল পেয়ে ফলগুলো পাকবে। দিন দুপুরে দুষ্টু ছেলের দল পাথর ছুড়বে। দুপুরে একটুখানি শুয়ে নির্জন অন্ধকার ঘরে ভেন্টিলেটারের মধ্য দিয়ে গাছের ছায়া দেখতে দেখতে কিছুতেই ঘুমুতে পারবে না উত্তরা।

ভারি ভালো লাগে ছেলেদের দুষ্টুমি। সেই সঙ্গে ভাবতে ভালো লাগে আকাশের কথা। পাখীর কথা। গাছের কথা। বাবার কথা।

বাবা। রেভারেণ্ড এইচ কে ডাট। পুরো নাম হিমাদ্রিকুমার ডাট। শান্ত, সৌম্য মানুষ। জীবনে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছেন। ধর্মের গভীরে গেছেন। বাবার আছে বসে উত্তরা বাইবেলের গল্প শুনতে শুনতে কতদিন ছোটবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা বুকে তুলে নিয়ে কত আদর যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন।

চার পুরুষ আগে ঠাকুর্দার বাবা ক্রীশ্চান হয়েছিলেন। তখন ধর্মের চেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদ ছিল সব চেয়ে বেশী। সেই জীবিকার অন্বেষণ করতে গিয়ে জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন।

আত্মীয় পরিজনরা এখনও আছেন সেই সুতানুটির দত্ত বংশের কুলতিলকের অংশ বিশেষ আজ এই ডাট পরিবার। গোঁড়া ক্রীশ্চান। তবু উত্তরার নিজের নামের কথা ভাবলে নিজেরই অবাক লাগে।

বিয়ের সময় কলেজের বাংলায় অনার্সের মেয়ে আরতি বলছিল: অদ্ভুত মিল হয়েছে। অন্য কোন দিক থেকে না হলেও নামের দিক থেকে। এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রতিবাদ ভেসে উঠল বন্ধুমহল থেকে। মনের মিল না হলে কি ঋত্বিক মহাশয় পরাণের যুগ থেকে খৃস্টের যুগে উঠে এসেছেন। হাসিতে ফেটে পড়েছিল সবাই। আরতি অপ্রস্তুত হয়েছিল। বাধা দিয়ে কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। নববধূর সাজে কালো মেয়ে উত্তরা কালো হরিণ চোখে চেয়েছিল আরতির দিকে।

ঋত্বিক। ছোট্ট নাম। কিন্তু

মানুষটা ছোট নয়। লম্বা সাড়ে ছ' ফুট। দীর্ঘ বুক। পেশল হাত। দীর্ঘ চোখের চাউনিতে একটা লজ্জা জড়ানো অথচ উদ্ধত ভাব। ছোট ছোট করে কাটা মাথার চুল।

দিদির বাড়ী থেকে ট্রেনিং নিচ্ছিল ঋত্বিক। পাশাপাশি বাড়ি। দিদির সূত্র ধরেই আলাপ উত্তরার সঙ্গে। সেই আলাপটাই শেষ পর্যন্ত আজকের পরিণতি।

ভারি অস্থির প্রকৃতির মানুষ। বিয়ের আগে পর্যন্ত অদ্ভুত ভাল ব্যবহার করত। কিন্তু কি জানি কেমন বদলে গেল ঋত্বিক বুঝতে পারে না উত্তরা। উত্তরার মনের মধ্যে যে স্মৃতি প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকিয়েছিল তা ভ্রূণ থেকে অবয়বে রূপান্তর হওয়ার সময় পেল না। দানা হওয়ার আগের মুহূর্তে ঝড়ে একাকার হয়ে গেল। জেদ ধরলো ঋত্বিক। এপ্রিল আসার আগেই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু জানুয়ারীর প্রথমে বলেছিল এপ্রিলে। হঠাৎ চিঠি এলো—৫ই ফেব্রুয়ারী বিয়ে। অন্যথায় কোন সম্পর্ক নেই।

ঋত্বিক ভাবছিল। আকাশের তারা দুটো সন্ধ্যে রাতে মিটিমিটি করে জ্বলছে। চোখের সামনে থেকে আকাশের কোল থেকে একটা তারা খসে পড়ল। মনে হল ঋত্বিকের তারাটা আকাশ থেকে দ্রুত নামছে। সেই গতির সামনে চোখ রাখতে রাখতে হারিয়ে ফেলল তারাটা এক সময়। সেই যেমন করে শৈশবেই মাকে হারিয়েছিল।

মা অদ্ভুত একটা মিষ্টি নাম। কত ছোট তখন ঋত্বিক। চার বছর বয়স। ছোট ভাইটা হওয়ার সময় মা মারা গেলেন। মা না থাকায় জীবনের সমস্ত মাধুর্য যেন হারিয়ে গেল। উত্তরার মার স্নেহ—মা হারানোর দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

বাবা রাধিকাপ্রসাদ বসু বিহারের দুঁদে পুলিশ অফিসার। জীবিকার জন্য নানান জায়গায় ঘুরেছেন। ছোট বেলায় ঋত্বিক সিপাইদের কোলে কোলে ঘুরেছে। রাইফেল আর বন্দুকের নল পরিষ্কার করেছে, রাম সিং-এর কাছে কুস্তি শিখেছে। ছোট বয়সে স্কুল আর পাড়ার ছেলেদের ধরে মেরেছে। সব কিছু জড়িয়ে ঋত্বিকের মনের হিংস্রতা বেড়েছে।

মার-পিঠের মধ্যে গতখানি উত্তেজনা ছিল পড়াশুনার মধ্যে তত নয়। সিনিয়র কেম্ব্রিজের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল কিন্তু চৌকাঠ পের হতে পারেনি ঋত্বিক।

প্রথম প্রথম বাবার সঙ্গে ঋত্বিক শিকারে যেত। সেই অভ্যাস বড় হয়ে দাদার এবং বন্ধুদের সঙ্গে যাওয়া নেশার মত হয়ে গিয়েছিল।

বাবার পদোন্নতি ঘটলো। শেষ পর্যন্ত ডি-এস-পি হয়েছিলেন। ঋত্বিক পড়াশুনা করছে না দেখে একদিন বললেন; এবার চাকরীর চেষ্টা করা উচিত, বড় হয়েছ। রাতদিন শিকার আর হৈ হৈ করা শুধু উচিত হবে না নয়—শোভন নয়।

ঋত্বিক কথাটা শুনলো। উত্তর দিল না। ভেবে পেল না সে কি করবে। খুব ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ল। বড় হলে সে রাম সিং-এর মত সেপাই হবে। মনে হল মন্দ কি। সার্জেণ্ট হওয়ার জন্য সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করা চাই। সে তো আর এ জীবনে হবে না।

শেষ পর্যন্ত বাবাই একটা চাকরী জুটিয়ে দিলেন সদ্য গড়ে ওঠা একটা বেসরকারী উদ্যোগে সিকউরিটি ডিপার্টমেণ্টে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে। নামমাত্র ইণ্টারভিউ হল। কারণ বাবার সুপারিশ-পত্রের সঙ্গে একটা সুগঠিত চেহারা ছিল।

নতুন পরিবেশ। লাক্ষা চাষের জঙ্গল কেটে বসত তৈরী হয়েছে। মানুষ জন তেমন আসেনি। কনস্ট্রাক-সনের কাজ চলছে অতি দ্রুতগতিতে উৎপাদন সুরু হতে মাস আষ্টেক দেরী। প্রথম প্রথম ভীষণ খারাপ লাগতো ঋত্বিকের। মাঝে মাঝে হায়নার ডাক তার শিকারের নেশাকে বাড়িয়ে দিত।

দু' মাসের মধ্যে কলকাতায় এলো ঋত্বিক ফায়ারের স্পেশাল ট্রেনিং-এ। ট্রেনিং-এ পাশ করে কৃতীপত্র হাতে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে নিয়ে গেল উত্তরার মনকে।

সদ্য বন্ধুত্ব হওয়া বিনয়ের কাছে গল্প করল উত্তরার। না, রামায়ণ, মহাভারত কিছু পড়া নেই। উত্তরার সম্পর্কের কথার সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারতের কোন যোগসূত্র থাকতে পারে ভেবে পেল না। বিনয়ের কথার খেই ধরতে পারল না ঋত্বিক। একটা মেয়ে জীবনকে নানাভাবে ভাবতে শেখায়। উত্তরাকে পাওয়ার আগে বিভোর হয়ে থাকে ঋত্বিক। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে না পাওয়ার জন্যে ছটফট করে। এ যেন সেই শিকারী জীবন। যতক্ষণ পর্যন্ত শিকার নিজের হস্তগত হচ্ছে ততক্ষণ নিস্তার নেই। শিকার শেষের মত বিয়ের পর উন্মাদনা রইলো। ছ' মাস মাত্র। আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল। ক্লান্তি এলো। বার-বার বাবার কথা মনে পড়ল।

বাবা। জীবনে একধারে মা আর অপরদিকে বাবা হয়ে মানুষ করেছেন। ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল ঋত্বিকের সঙ্গে। বিবাহে তিনি আপত্তি তুলেছিলেন। ক্রীশ্চান মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর ছেলের বিয়েতে যে আপত্তি বড় হয়ে উঠেছিল তা নয়। তিনি চেয়েছিলেন ঋত্বিক মেয়েটিকে আরও কিছু দিন দেখুক। অন্তত পক্ষে আরও দু'বছর। বেশ মনে পড়ে বাবা বলেছিলেন: জীবনের বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে দু' বছর পরেও যদি মিলতে পারো ঋত্বিক তা হলে আমি সানন্দে রাজী হবো। তার আগে নয়।

উদ্ধত ঋত্বিক মেনে নিতে পারে নি বাবার আদেশ। তার মনে হয়েছিল বাবা তার কোন অধস্তন কর্মচারীকে হুকুম করছেন। সীমাবদ্ধতার জন্য বিদ্রোহ করল ঋত্বিক। বলল: আমি

এই ফেব্রুয়ারীতে বিয়ে করছি। মতামতের প্রয়োজন নেই।

সেই যে বাড়ী থেকে চলে এসেছিল তারপর আর কোন যোগাযোগ নেই। দাদা প্রথম প্রথম চিঠি দিতেন। ঋত্বিক উত্তর দেয়নি। বিদ্রোহের প্রকাশ দেখাতে চেয়েছিল।

সেই সমস্ত ঘটনা মনের মাঝে হানা দেয়। বিবেক দংশন করে। মনটা হিংস্র শ্বাপদের মত হয়ে ওঠে। মনে হয় উত্তরা এর জন্যে দায়ী। ওর শ্বাসনালীটা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে। ওর চোখের সামনে নেবে আসবে অতলান্ত অন্ধকার। পৃথিবীর সমস্ত আলো সরে যাবে উত্তরার স্বপ্নের আর সাধের সংসারটা এইভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তারপর বাবার স্নেহের পাখনার মধ্যে ফিরে যেতে বাধা নেই ঋত্বিকের।

ঋত্বিকের মনে হয় বাবা একবার কাছে ডাকুন। তাহলে সে অকপটে সমস্ত দোষ স্বীকার করার সুযোগ পায়। বন্ধুদের মাধ্যমে বাড়ীর খবর মাঝে মাঝে পায়। নীতিন, মলিন আর মৈনাক এসেছিল বিয়ের পর। খুব হৈ হৈ করে কেটেছিল ক'দিন।

ছোটবেলা থেকে একমাত্র চিন্তা ছিল আত্ম-সুখ। সেটা এখন মনের চার-পাশে ঘুরছে। চাইছে সকলকে। চিন্তাটা আরও পাকিয়ে উঠল, যখন উত্তরা বলল—সংসারে সংযোজন ঘটতে চলেছে। কথা বলতে বলতে উত্তরা আপন সুখের অনুভূতিতে থরখর করে কেঁপে উঠল। ঋত্বিকের সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে তখন ভাবছে দাদার ছেলের কথা। বাবার নাতিকে আদর করার কথা।

মনের মধ্যে জট পাকাতে লাগলো। সব সময়ই বাড়ির কথা মনে হয়।

অশান্তিটা চরমে উঠল সেদিন যখন উত্তরা বলল: নবজাতককে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করবে।

ঋত্বিক তার কাঠিন্য দিয়ে বলল: না।

উত্তরা অশান্তিটা আরও চরমে নিয়ে গেল সেই রাত্রের ট্রেনে বাবা-মার কাছে ফিরে গিয়ে। যাবার সময় অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না।

ঋত্বিকের জেদ বাড়লো। উত্তরার কাছে পরাজয় কিছুতেই মেনে নেবে না। মনের হিংস্রতা চরমে উঠল। উত্তরাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল। ধর্মের গোঁড়ামীকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না ঋত্বিক।

আত্ম-সুখের জন্য—উত্তরাকে পাওয়ার জন্যে ক্রীশ্চান হয়েছিল সে। ধর্মান্তর হয়েছে এ কথা সে মনে করে না। প্রয়োজনের জন্য রূপান্তর কিন্তু মনে ঘটিয়েছিল মাত্র, প্রাণে নয়। তাই সে চায় আত্মজ বা আত্মজা আপন ধর্মকে মেনে নেবে তার আপন অধিকারে

অপেক্ষা--- আরো অপেক্ষা--- আরো---আরো---ট্রেনটা বড় লেট। হ্যাঁ, একসময়ে সিগন্যাল পাওয়া গেল। যাত্রীদের চোখে আশার আলো। যে-সব যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা উঠলো ধড়ফড় করে। ট্রেন আসছে। দূরে কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে। আকাশটা বেশ কালচে হয়ে পড়েছে। কালচে আকাশটা আরো কাছে এসে পড়েছে। আরও কাছে ---আরও ---তার সঙ্গে ইঞ্জিনের আওয়াজ। সে বুকফাটা আওয়াজ। যেন কোন দৈত্য ফুঁসছে রাগে। সকলেই ব্যস্ত জায়গা নিতে। মনের মত জায়গা।

ইঞ্জিনের একনাগাড়ের আওয়াজ হকারদের চীৎকার। চা-পিপাসুদের ছোটাছুটি। বিনা-টিকিট যাত্রীদের সতর্ক দৃষ্টি। গার্ডসাহেব র সবুজ পতাকা নাড়ানো। ক্ষণে ক্ষণে বাঁশির আওয়াজ। একটা একটানা রব। সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে, যা শুধু উপভোগের জন্যে, বর্ণনা করা দু:সাধ্য।

ময়ূরকুমার ট্রেনের নির্দিষ্ট জায়গায় বসলো। ট্রেন চলতে লাগলো ঝিকিয়ে-ঝিকিয়ে। ক্রমে ক্রমে গাড়ীর গতি দ্রুত-তর হল। কখন কখন হ্যাঁচকা টান। আর ইঞ্জিনের গর্জন। সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। তারই সোনালী আলোটা কখন যে ময়ূরকুমারের মুখে পড়েছে খেয়াল করে নি সে। ময়ূরকুমার একবার পাগড়ি ঢাকা সূর্যের পানে তাকালে। তারপর ছড়ানো মাঠের পানে। তারপর নিজের বইয়ে। অনুবাদ কবিতার বই। হাইনের কবিতা। সূর্যটা অতলতলে হারিয়ে গেল। কামরার আলো কখন জ্বলে গেছে টেরই পায়নি ময়ূরকুমার।

ময়ূর যে কামরায় বসেছিল, সেখানে আর একটিমাত্র যাত্রী ছিল। হিন্দুস্থানী। সে রামধুন গান গেয়ে চলেছে। ময়ূর সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে বইয়ে মনটা আটকে রাখলে। লোকটির গলা করুণ চড়তে লাগলো। ময়ূর মনে করবে কিছু বলবে। কিন্তু বলবার প্রবৃত্তি হল না।

এ কামরায় বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। এই নির্জন কামরাটা পেয়ে ওর মনটা কিই-না আনন্দে নেচে উঠেছিল। কবিতা পড়ার একটা পরিবেশ ছিল। ঐ পাপটি ছাড়া। বইটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলে। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। জমাট অন্ধকারে ঢাকা বাইরেটা। কালো অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠেছে একটা আলোর বিন্দু। বোধ হয় গরুর গাড়ী। আকাশে

সন্মিত ঘোষ

চাঁদ নেই। হোক অন্ধকার; কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। ময়ূরকুমার ভাবতে লাগলো। সে সারা-জীবন আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই ভালোবেসেছে আর এই অন্ধকারই তার সারাজীবনটাকে ঘিরে ধরেছে। ছন্নছাড়া মানুষ ময়ূর। অন্ধকারের পানে তাকিয়ে অতীতের অন্ধকার বিবরে ডুব দিলে ময়ূর। অন্তত কিছু-ক্ষণ ভেতরের প্রলয়গীত থেকে বাঁচা যাবে।

একটা বড় স্টেশনে গাড়ী থামলো এবং এখানে অনেকক্ষণ থামবে। ময়ূর খুঁজতে লাগলো একটা কামরা—একটা জায়গা—মনের মত জায়গা।

হঠাৎ তার চোখ থেমে গেল এক ভদ্রলোকের দিকে। জানলার ধারে বসে যেন বড় চেনা-চেনা এবং আত্মীয়ও বটে। হ্যাঁ, ঠিক সেই লোক। ময়ূর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আরো কাছে সরে এল। আশ্চর্য, ভদ্রলোক কোন কথাই বললেন না। চিনতে পারার কোন লক্ষণই তাঁর মুখে নেই। তবে কি—অথচ একেবারে চেনা, অতি পরিচিত মুখ। বললে, কিছু মনে করবেন না, আপনি কোথায় থাকেন?

পাটুলী।

না, ওরই ভুল। ওর আত্মীয়টি কোলকাতা বাসিন্দা। হেসে বললে, আমার এক আত্মীয় আছেন, একেবারে আপনার মত দেখতে। অবিকল। তবে তিনি কোলকাতায় থাকেন। অবশ্য থাকতেন। অনেক দিন তাঁর কোন খবর পাই নি।

আমার বাড়ীও তো কোলকাতায়। তবে এখন কাজের খাতিরে কাটোয়া-পাটুলী - নবদ্বীপ করে মরছি। ভদ্র-লোক তীক্ষ্ণ চোখ দুটো দিয়ে ওকে যেন বেঁধাতে লাগলেন।

ও: তাই বলুন। আপনি কি হরিদাস পাল লেনে—আপনার নামটা?

কায়ারাম বোস।

আশ্চর্য, আপনি আমায় চিনতে পারলেন না?

আপনি!

ময়ূর - ময়ূর - ময়ূরকুমার - কি আশ্চর্য—

আরে ময়ূর তুমি।

এতক্ষণে চিনতে পারলেন তিনি।

ময়ূরকুমার ভাবলে, বরং ওর নিজেরই না চেনবার কথা। কায়ারাম বাবুর মুখের কাঠামোটা বজায় আছে বটে, কিন্তু পরিবর্তন তাঁর কম হয় নি। আরো রোগা। চোখ দুটো ঢুকে গেছে দুটি গর্তে। খোঁচা-খোঁচা ক'গুচ্ছ ছাগল-দাড়ি মুখের নীচে ঝুলছে। ওর মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কায়ারামের। যে কায়ারাম ময়ূর বলতে একসময়ে অজ্ঞান ছিল সেই কায়ারাম চিনতে পারলে না। কি আশ্চর্য।

কায়ারাম উঠে দরজার সামনে এলো। কিন্তু দরজাটা ঠিক খোলা যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে গাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছে। ময়ূর বললে, পরের স্টেশনে দেখা হবে। আপাতত পাশের কামরায় আছি।

গাড়ী জোর চলেছে। এ কামরাটায় যাত্রী অনেক। বসবার জায়গা নেই। না থাক, ক্ষতি নেই। ময়ূর দাঁড়ালো একেবারে দরজার সামনে; ওর ওখানে দাঁড়াতে ভালো লাগছিল। বাইরের পানে তাকিয়ে অন্ধকার অতীতের পানে একপলক চাউনি দিতে পারবে আর তো সময় পাওয়া যাবে না।

কায়ারামবাবু। আশ্চর্য, চিনতে পারলে না ওকে। সে কি ইচ্ছে করে? তাই বা কেন। যদি নিজেকেই লুকোনোর উদ্দেশ্য ছিল তবে নিজের নামটাই বা কেন জানাবে। তাহলে? ব্যর্থতার জ্বালা? নৈরাশ্য? বদমায়েসি? ওঁকে বোঝা ভার।

ওর মামাতো বোন কপোলা মিত্তিরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কায়ারামের। অল্পবয়সী মেয়ে তখন কপোলা। চোদ্দ বছর। কিন্তু রাজ্যের কাছে ওর স্বামীরা অমন জুতসই পাত্র পেয়ে হাতছাড়া করতে চাইলে না। পাত্র ভালো চাকরী করে। তদুপরি বেশ রসিক ও আমুদে। কোলকাতায় অভিজাত পাড়ায় থাকে। আর খাওয়া-দাওয়া পোষাক-আষাকে উচ্চরুচির পরিচয় দিয়েছে।

তারপর কপোলা কায়ারাম একসঙ্গে কতবার এসেছে ইয়ত্তা নেই। নিকট, অল্পদূর, দূর, ততদূর, বহুদূর শালাশালীদের নিয়ে গেছে সিনেমায়। গেছে চিড়িয়াখানায়। গেছে সার্কাস দেখাতে। কায়ারামের জয়গান দিকে দিকে। অমন জামাই আর হয় না। অমন জামাইবাবু আর হয় না। তারপর একবছর ঘুরলো। একটা বাচ্চা এলো কপোলার কোলে।

এমনি করে কাটলো চার-পাঁচটি বছর। আর বছরগুলোকে পাল্লা দিয়ে এক একটি সন্তানও আসে। কপোলা যখন হাসপাতালকে ঘর আর ঘরকে হাসপাতাল করে ফেলেছে হঠাৎ এই সময় কায়ারাম পালালো। অনেক খোঁজা হল। কিন্তু সবই নিষ্ফল। সকলে মনে করলেন, সংসারের প্রতি বিরাগ আগায় বুদ্ধদেবের মত কায়ারাম কোন মহৎ উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেছেন।

কপোলা ফিরে এলো বাপের বাড়ীতে। চোখের জল চেপে রেখে মুখে হাসি এনে বাপের বাড়ীকেই আপন গৃহ করে নিলে।

এমনি একসময়ে কায়ারাম কোথা থেকে হাজির। বাড়ীতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। কায়ারাম এই সমস্যার যুগে কোলকাতা থেকে চলে এল মফস্বল শহরে। জিনিষপত্রের দামও কিছু সস্তা আর বাড়ীভাড়াও। কপোলা-কায়ারামের জীবনে আবার আনন্দ-লগ্ন নেমে এল। ওরা দুজন দুজনকে নতুন করে চিনলে যেন। শত অভিমান, শত বেদনায় কপোলার চোখের জলে বেরিয়ে এল। কপোলা যেন একমুহূর্তও তার স্বামীকে ছাড়তে চায় না।

এমনি করে একমাস কবে কোথা দিয়ে চলে গেল। এদিকে ধারদেনায় ব্যস্ত কায়ারাম। ধার করতে যত না ওস্তাদ সে, ধার শোধ করতে ততখানি আনাড়ি। কায়ারামের এই গুণটা এত বেশিমাত্রায় প্রচার হয়ে পড়েছিল যে কেউ ওকে ধার দিয়ে দু:সাহসের কাজ করতো না।

তারপর একদিন কায়ারাম সেখান থেকেও উধাও এবং চাকরীটাও ছেড়েছে। কেন ছেড়েছে কেউ আর জিজ্ঞাসা করলে না। কিন্তু সকলেই জানতে পারলে কায়ারামবাবু উত্তমর্ণদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালিয়েছে। এ সবই ময়রকুমার শুনেছে।

●

আজ বহুদিন পরে কায়ারামবাবুকে দেখে অবাক না হয়ে পারলে না ময়ূরকুমার। মুখটা অনেক পাল্টিয়েছে। আরো শীর্ণ। আরো কালো। দাড়ি কামায় নি অনেকদিন। কয়েকগোছা দাড়ি রামছাগলের মত নীচের দিকে নেমেছে। চুলগুলো এলোমেলো, গায়ে খড়ি উঠছে।

পরের স্টেশনে গাড়ী থামলো। পাশের কম্পার্টমেণ্টে সবেমাত্র উঠেছে গাড়ীও ছেড়ে দিল। হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে হাজির টিকিট-চেকার। চারিদিকে একটা চাপা রব—মামা। মামা।

চেকার সমস্ত লাইন ঘুরে দাঁড়ালো কায়ারামের কাছে। টিকিট?

পিকপকেট হয়ে গেছে। সোজা উত্তর। কণ্ঠ কোনরকম কাঁপলো না। এমনভাবে বললে যেন সত্যি সত্যি টিকিটটা পিকপকেট হয়ে গেছে।

কোথায় যাবেন?

হাওড়ায়।

দিন আট টাকা আশি।

একটি পয়সা থাকলে তো। দেখুন না পকেটটা। সবাই দেখলেন সত্যি পকেটটা কাটা। ওর চোখ দুটিতে চাপ-চাপ বেদনার অভিব্যক্তি। অনেক টাকা মার যাওয়ার শোক যেন সহজে ভুলতে পাচ্ছে না। চেকার বুঝলে এর পকেট থেকে সত্যি সত্যি কিছু বেরুবে

না। কিংবা ওর শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। চেকার চলে গেল।

কায়ারাম একটু সরে বসে ময়ূরকে জায়গা দিলো। ময়ূর সমবেদনা জানালো। কায়ারাম জানালে, মরুক গে চাকরি গেলে আবার আসবে। এর জন্যে দুঃখ করি না আমি। তার চেয়েও কি লজ্জা জানো ময়ূর, তোমায় দেখেও চিনতে পারলুম না। কি লজ্জার কথা বল দিকি। এ লজ্জা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। যাক, গাড়ি থেমেছে। এখানে গাড়ি তো বেশ কিছুক্ষণ থামবে। নীচে চল। এখানে বড়, গরম, রুমাল আছে? জায়গাটা রিজার্ভ না রাখলে কোন শালা আবার জায়গা 'অকপাই' করবে।

ওরা দুজনে প্লাটফর্মে দাঁড়ালো। কায়ারাম ওকে চিনতে না পারার জন্যে এখনও আপশোষ করে চলেছে। আপাত তুচ্ছকথা নিয়ে বারবার চিন্তা করতে বারণ করে ময়ূর। কায়ারাম বলে,, কি জানো ময়ূর, আমার মাথায় যেন রাশি রাশি সমস্যা পাথরের চাঙড়ের মত চেপে বসেছে। সমাধান করতে পাচ্ছিনে। ময়ূর পাগল হবার যোগাড়। হ্যাঁ, তুমি তো বিদেশে কাজ কর। এর মধ্যে কোনদিন মামার বাড়ি গেছ?

ময়ুরকুমার যখনই বাড়ি যায়, তখনই একবার ওর মামার বাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু এখন সব লুকিয়ে গেল। বললে, প্রায় বছরখানেক মামার বাড়ী যাওয়া হয় নি। যাবো যাবো করেও কিন্তু---

কপোলার কথা জানো? চাপা কণ্ঠ। মুখের সঙ্গে চোখেও কথা।

না---কি আবার হল তার?

জানো, এখন ওর কি পরিণতি হয়েচে। ওর চরিত্র বিষয়ে কোন খোঁজ রাখো? ছ্যা ছ্যা, ওর চরিত্র বলে কোন কিছু আছে নাকি। ঘেন্না ধরিয়ে ছাড়লে। একটা ভালগার মেয়ে। ডিস্‌গাইজড প্রস্‌---

চুপ করে রইল ময়ূর। কায়ারামের পানে তাকিয়ে রইল এক-দৃষ্টে। [illegible] এই [illegible], যাত্রীদের ব্যস্ততা, জনকোলাহল, সব কিছু ওর কাছে মনে হল নীরব নিথর।

জানো তো, দু' বছরের ওপর বাবলার তাগিদে ঘুরচি। ওদের বাড়ীর ছায়াও মাড়াই নি। তবু শুনলাম ওর একটা ছেলে হয়েছে। কায়ারাম হাসতে লাগলো। দাঁত বার করে, বিকট শব্দ করে।

গেলুম একদিন। তোমার বোনটি ছেলেটাকে দেখিয়ে বললে, এই দ্যাখ তোর বাপ এয়েচে। নেহাৎ এখন টাকা দিতে পারি না তাই, নইলে মা-ব্যাটাকে শেষ করে দিয়ে আসতুম।

হাঁপাচ্ছে কায়ারাম। ও যেন আরো কিছু বলতে চায়। ওর বলা যেন এখনও শেষ হয় নি।

বোসেদের বাড়ীর একটা সুনাম আছে। দুগ্গা পুজোয় একসময়ে একশোটা মোষ বলি হোত, আজ নয় কোলকাতায় ভাড়া বাড়ীতে থাকি। কিন্তু আভিজাত্য? সে কি মিত্তির বাড়ীর চেয়ে কম কিছু। সেইদিনই আমার ইচ্ছে হচ্ছিল--- দাঁত দুটো খিঁচিয়ে মুখটা অসম্ভব বিকৃত করে ঐ কথাটাই পুনরাবৃত্তি করলে, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটাকে গলা টিপে---না থাক, আমি বড় অধৈর্য হয়ে পড়েচি। কপালটা চেপে ধরে কায়ারাম।

ট্রেন আবার চলতে সুরু করেছে। ওর গর্জনটা ক্রমে বাড়ছে। আবার সেই অন্ধকার প্রকৃতি। কামরার আলোটা আবছা আবছা জ্বলছে। গাড়ী ছুটেছে। আর মাঝে স্টপেজ নেই। সেই একেবারে ব্যাণ্ডেল জংশন। ময়ূরকুমার আলাদা কামরা দেখে নিয়েছে। এতক্ষণ কায়ারামের কাছে থাকলে পাগল হয়ে যেতো ময়ূর। ওর বকবকানির যেন শেষ নেই। আগে কি তাহলে কায়ারামকে চেনে নি? ময়ূর ভাবলো। যা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, হোক। আর নয়। জংশনটা এলে বাঁচা যায়। তারপর তো একটা স্টেশন। চুপি চুপি নেমে যাবে। একটা প্রকাণ্ড গ্রহের হাত থেকে বাঁচা যাবে।

একটা বাঙ্ক খালি হল। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ময়ূর সটাং শুয়ে পড়লো। যেন পরম শান্তি এখানে। বেশ কিছুক্ষণ এখানে চিন্তা করতে পারবে।

হ্যাঁ কপোলার কথা---কপোলা। কপোলার কথা আজ ভাবতে ওর ভালো লাগছে। কপোলা ওর ছেলেবেলার সঙ্গী। সে সব ছবি। ছোট্ট ছোট্ট ছবি। তখন বোঝে নি পৃথিবীটা এত জটিল হয়ে পড়তে পারে। কপোলার সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি, ভেউ ভেউ করে কান্না, মান-অভিমান---ময়ূরের হাসি পেয়ে যায়। কপোলা---সেদিনকার কপোলা সত্যি সত্যি মরে গেছে। আজ কপোলাকেও ওর বাজে লাগে। ভাগ্য খারাপ হলে যা হয়। অথচ সেদিন কচি সবুজ মন নিয়ে সবুজ পাতা কুচিয়ে হাঁড়িতে চাপিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রান্না করতো কপোলা। আগুন নাই বা রইল---রান্না ঠিক সময় হয়ে যেতো। ঠিক সময় ময়ূরকে ভাত দিয়ে তবে কপোলার শান্তি। আশ্চর্য, সেইদিনগুলো আর ফিরে আসে না। কপোলা এখন মা। বেশ কয়েকটি সন্তানের জননী।

জংশনে গাড়ী থামলো। কোনকিছু চিন্তা করলে কি সময়গুলো আপনি বয়ে যায়।

কায়ারাম নিশ্চয় ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ময়ূর মুখ লুকিয়ে থাকলো। শ্বশুরবাড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগের পালা শেষ হয়নি। কপোলাকে নিয়ে সংসার না করার যে ভালো কারণ আছে, তা শ্বশুরবাড়ীর সবাই জানুক আর না জানুক, ময়ূরকে জানিয়ে রাখা ভালো।

এই ময়ূর---

বাঙ্ক থেকে উঁকি মেরে দেখে সামনে মূর্তিমান। যা ভেবেছিল তাই।

কি বলছেন?

শোনা শোনা। বাইরে এসো।

বিরক্ত হল ময়ূর। মুখটা বাড়িয়ে দেয়। কোন কুক্ষণে যে পরিচয় দিতে গিয়েছিল। বেশ তো, চিনতে পারেনি [illegible] মিটে গেল।

হাঁ করে কি দেখছো ময়ূর। নীচে এসো।

কি দেখছে হাঁ করে তা বলতে পারেনি ময়ূর। তবে ওকে দেখবারই মত। ময়ূর একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। কায়ারামকে যেন আগের চেয়ে আরো নিষ্ঠুর আরো কর্কশ লাগছে। ওর চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেন বিষ লুকিয়ে রয়েছে। যেন সব সময়ে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র করার ছলে ছলে ঘুরছে। আর ঐ ছাগল-দাড়ি। আধা অন্ধকার কামরায় কায়ারামের ঐ দাড়িওলা দীর্ঘ দেহটাকে মনে হচ্ছে মিশরের কোন ফারাওয়ের মমি। কায়ারাম হাসছে। যেন কাছের কোন পিরামিড থেকে বেরিয়ে আসা মমিটা হাসছে। ময়ূরের গায়ের লোম সজীব হয়ে উঠেছে। ওর মনে হচ্ছে না যে, এই কামরায় ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ আছে। কায়ারাম ওর হাতটা বেশ চাপ দিয়ে ধরলে। ও আস্তে আস্তে নেমে পড়লো। কায়ারাম আগে আগে, পেছনে পেছনে ময়ূর। প্রতিটি সিঁড়িতে পাও দিতে হল না। কোন শক্তিতে যে ওকে টেনে নিয়ে চলেছে ওর অজানা। ট্রেনকে ফেলে একেবারে প্ল্যাটফর্মের কোলে এসে দাঁড়ালো কায়ারাম।

কিছু বলবেন?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঐ জন্যেই তো এখানে আনলুম।

বলুন।

সামান্য ভূমিকা করতে হবে।

ময়ূরকুমার অপেক্ষা করতে লাগলো।

তোমায় যেটা অনুরোধ করবো, সেটা কিন্তু তুমি কাউকে বলতে পারবে না। তোমার মা-বাবাকে, ভাই-বোনকে, এমন কি মামা-মামীকেও নয়।

কি ব্যাপার বলুন তো।

সেটা বলবার জন্যেই তো এখানে এসেচি।

কথা দিলুম। ময়ূর বুঝতে পারলে না কায়ারাম কি ফাঁদে ফেলবে। ওকে কি এড়ানো যাবে না?

ক'টা টাকা ময়ূর—পাঁচটা হলেই হবে-ধ—ার চাইচি। দিতেই হবে। কালই তোমার মামার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো। দেখলে তো সব পিকপকেট হয়ে গেল—ময়ূর, না দিলে বড় বিপদে পড়বো।

মুহূর্তে কায়ারামের সমস্ত ছবিটা ফুটে উঠলো। অতীতের কত ছবি। শক্ত হল ময়ূরকুমার। না, আমার কাছে নেই।

দিতেই হবে। দেখলে না কি বিপদে পড়েচি। তুমি পাথর নাকি?

টাকা আমার নেই। মাইনে পাইনি এখনো।

তাহলে চার টাকা দাও।

তাও নেই। আমায় মাপ করবেন আপনি।

দু' টাকা। প্লিজ ময়ূর, আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ।

টাকা না থাকলে কি করে দেবো। আপনি চাইলে আমি দেবো না, সে হয় না কি।

একটাকাও নেই তোমার? অথচ চাকরী করচো।

সত্যি বিশ্বাস করুন, দেবার মত আমার একটাকাও নেই। আচ্ছা আমি চললুম।

দাঁড়াও। এককাপ চা খেয়ে যাও। এই চা—

না, চা খাই না।

রাগ করলে ময়ূর?

বরং লজ্জা হচ্ছে আপনাকে দিতে না পারায়। আমায় ক্ষমা করবেন। চললুম।

পা বাড়ায় যত তাড়াতাড়ি পারে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখে, তখনও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কায়ারাম। ময়ূরকুমার যাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেছে। আর দেখতে পাবে না কায়ারাম। আশ্চর্য, কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে। দূরে একটা কালো মূর্তি। ওর বিড়িটা জ্বলছে। ধিকধিক করে।

ঘণ্টা পড়লো। ট্রেনটা কেঁপে উঠলো। হাতের গোড়ায় যে কামরাটা পেল উঠে পড়লো।

শান্তি। শান্তি। এর পরের স্টপেজে ও নামবে। কায়ারামের হাত থেকে মুক্তি পাবে একেবারে। ময়ূর নিজের বদ্ধিকে তারিফ করলে। আরেকটু হলেই বলে ফেলেছিল আর কি। ভাগ্যি শেষ পর্যন্ত নিজেকে রুখতে পেরেছিল সে। কায়ারাম ভেবেছে জগৎটা বুঝি কপোলার দলেই ভরা। সবাই যেন কপোলা, কপোলার বাবা মা আর টিকিট চেকার। ময়ূর হাসতে লাগলো।

এতক্ষণ লক্ষ্যই করে নি। বাইরে থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে কামরার মধ্যে যেই রেখেছে, দেখতে পেলো তারই সামনে বসে রয়েছে এক বর-বধূ। বিয়ে করে বর নিয়ে চলেছে তার বধূকে। মেয়েটির মুখটা ভারী সুন্দর। পেন্ট করে আরও সুন্দর লাগছে। চন্দনের ফোঁটাগুলো ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। মাথার মুকুটটাও ভারি চমৎকার। পাশে বর। রজনীগন্ধার মালাটি এখনও গলায়—ফুলভার আজকের দিনে না লাগারই কথা। তার মুখটিতে হাসি টইটুম্বুর করছে। বরযাত্রীদের রসের কথায় বরটিও চোকালো কয়েকটি রসের বাণ তাদের ছুড়ে দিচ্ছে নববধূর পানে দুষ্টু চোখে তাকিয়ে।

ময়ূরকুমারের মনে পড়লো কপোলার ফুলশয্যার রাতটির কথা। খেয়েদেয়ে কপোলার বাপের বাড়ীর সবাই ফিরে যাবে বলে দাঁড়িয়েছিল দরজার গোড়ায়। কপোলার মা বলেছিল তার জামাইকে, বাবা, তোমার হাতে আমার মেয়ের ভার দিলুম। ওকে তুমি অযত্ন কোরো না।

কায়ারাম হেসে জানিয়েছিল, সে কি হয় মা।

কায়ারামের সেদিনের হাসিটির সঙ্গে আজকের এই বরের হাসিটির বেশ মিল আছে। আর ফিরে তাকালো বধূটির পানে। ওর শূন্যগর্ভ দৃষ্টি যেন ভবিষ্যতকে মিথ্যে খুঁজে মরছে। ময়ূরকুমার দেখতে লাগলো। হাঁা, কপোলাও তাই চেয়েছিল। বধূটির পানে চেয়ে থাকতে থাকতে আতঙ্কে চোখ দু'টো বুজে আসে ওর।

চিত্রে সংবাদ

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের নিকট থেকে শিক্ষাদান বিষয়ে নেহরু-পুরস্কার নিচ্ছেন ডঃ শ্রীমতী ওয়েলথি ফিসার

মাসিক

বসুমতী

বৈশাখ, ১৩৭৬

ভারত সভা হলে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যুক্তফ্রন্টের মহিলা এম-এল-এ ও মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণরত সমবায় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী

বিধান সভায় পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও এ্যালবার্ট জর্জ ডিউককে অভিনন্দন জানাচ্ছেন পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। পার্শ্বে রয়েছেন পরিষদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী ও ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়

ললিতকলা আকাদেমির প্রেক্ষাগৃহে সারা ভারত চর্মবিজ্ঞানী সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন পঃ বঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য

মাসিক

বসুমতী
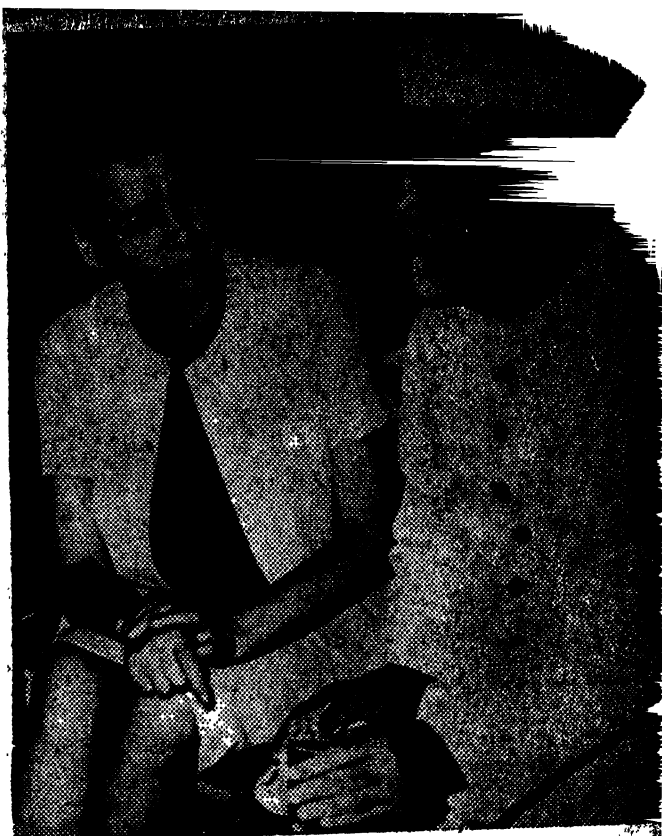
বৈশাখ / '৭৬

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন সকাশে সোভিয়েট সংস্কৃতি-মন্ত্রী শ্রীমতী ফুর্তসেভা

৯-এর অবতরণ—আটলান্টিকের বুকে
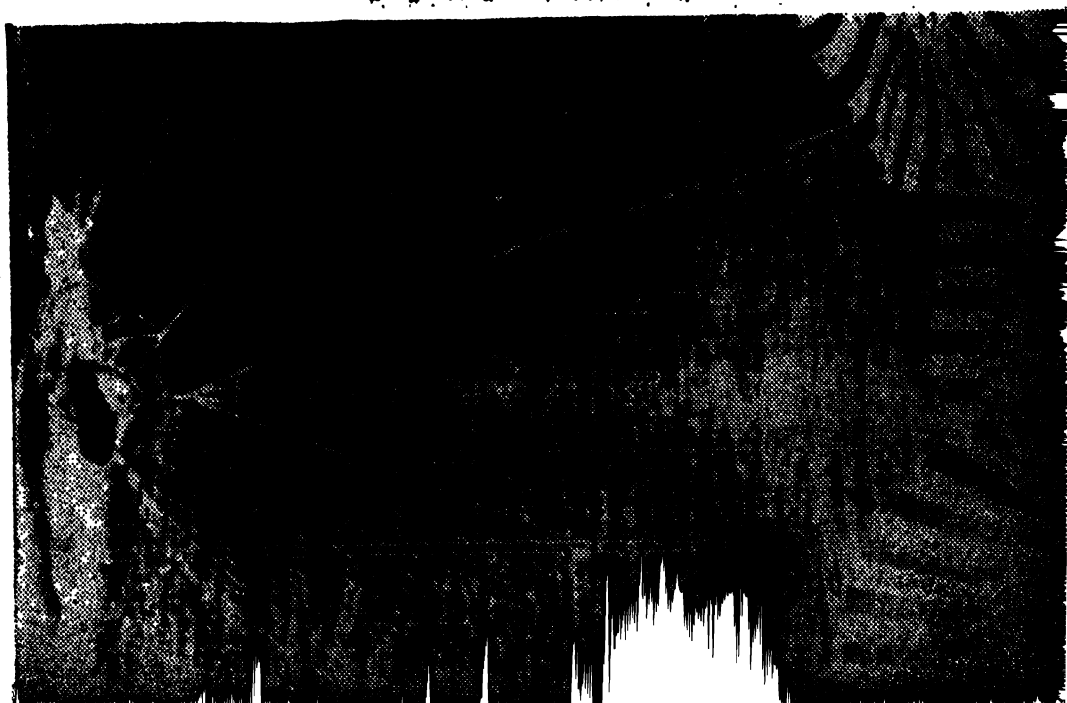
যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মহিলারা

মাসিক বসুমতী, বৈশাখ / '৭৬

কলকাতার পাক-দূতাবাসের সামনে আয়ুবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত যুব সঙ্ঘের ছাত্ররা

মহামানব শঙ্করাচার্য

স্বামী তত্ত্বানন্দ
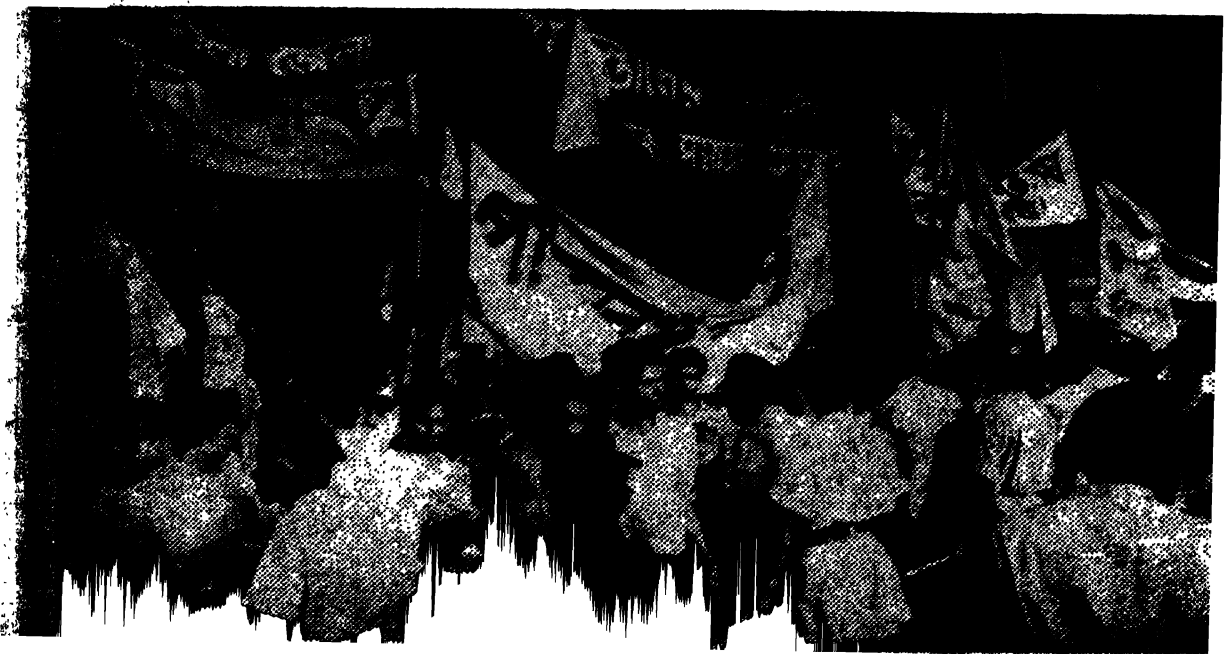
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যে মহিলার দয়ায় বিশিষ্টাদেবী জীবন রক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহার ধাবস্থা হইল, তিনি প্রাণপণ সেবার বিনিময়ে বিষয় পাইলেন। কিন্তু লোভ ছাড়িয়াও আত্মীয়দের রেহাই মিলিল না। বেদ পাঠে বঞ্চিত থাকার চেয়ে কঠোর অভিশাপ ব্রাহ্মণের আর কিছু হইতে পারে না। বেদজ্ঞানের জন্যই ব্রাহ্মণের মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, এই অধিকারে বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের জাতি, কুল, মান, সব হারাইতে হইবে। নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া আত্মীয়গণ শঙ্করের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের অনুতপ্ত দেখিয়া এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অভিশাপ অনেকটা মোচন করিলেন, তাঁহাদের বেদ পাঠের অধিকার থাকিবে, সন্ন্যাসীও তাঁহাদের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন কিন্তু কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অপর অভিশাপ রহিয়া গেল। এখনও নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের গৃহে কোন ব্যক্তি মৃত হইলে তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজেদের উঠানে সৎকার করিতে হয়।

শঙ্করের এখন আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়াছে। হাঙ্গামা চুকিয়া গিয়াছে, মাতার জন্য পুত্রের কর্তব্য শঙ্কর তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তাঁহার শেষ বন্ধন দূরীভূত হইয়াছে, আর কোন প্রতিবন্ধক নাই, পথ পরিষ্কার।

শঙ্কর আবার শৃঙ্গেরী ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিনের মধ্যে আবার সশিষ্য বেদান্ত প্রচারে বাহির হইলেন, তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে বিশেষ সম্মান পাইতেন, দলে দলে লোক তাঁহার অনুগামী হইতেন এবং তাঁহার মতবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। দেশের দুর্দিনে যখন সমাজে এবং ধর্মে বিপর্যয় দেখা দিল, একখণ্ড কালো গাঢ় মেঘ আকাশকে ছাইয়া ফেলিল, ভারতীয় সংস্কৃতি বিনাশের আবর্তে ঘুরপাক খাইতে লাগিল সেই সময়ে একজন উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন, প্রতিভাশালী, স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী, সংগঠন-নিপুণ শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন ছিল—যিনি দেশ, ধর্ম এবং সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব নিতে পারেন এবং বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বেদান্তের সার্বজনীন ভাব সমাজের স্তরে স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়া হিন্দুতে সংস্কৃতির গৌরব রক্ষা করিতে পারেন।

মহামানব ব্যতীত এই গুরু-দায়িত্ব পালনের ভার সাধারণের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। শঙ্করের আবির্ভাবে সে অভাব পূর্ণ হইয়াছিল। উপযুক্ত পাত্রে যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য এই ত্যাগবীর যে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার জন্য অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং অজস্র শ্রদ্ধা আনিয়াছিল এবং তাঁহাকে সকলের জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার প্রচারের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবু যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব সংগঠন ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানের গভীরতা জানা যায়।

রামেশ্বরধাম হিন্দুদের মহাতীর্থ, সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই ধাম যেমন মনোরম তেমন স্বাস্থ্যপ্রদ, বিরাট মন্দির। শিবই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা. অধিকাংশ অধিবাসী শৈব, সশিষ্য শঙ্কর এখানে বেদান্তের ধর্ম প্রচার করেন, পরে তুলা ভবানী আসিয়া ভবানী, মহালক্ষ্মী সরস্বতী এবং শক্তি উপাসকদের মধ্যে তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন। শাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচলিত পদ্ধতি শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী সাজাইয়া তাহাতে প্রাণস্পর্শী এবং ভক্তি ও জ্ঞানমূলক পদ্ধতি যোজনা করিলেন, তিনি যে শুধু উপরি-উক্ত উপাসকগুলীর মধ্যে তাঁহার প্রচারকার্য সীমিত রাখিয়াছিলেন তা নয়। তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যেও তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদের মধ্যে বহু বিভাগ আছে। বিষ্ণুশর্মা মতাবলম্বী বুদ্ধগুপ্তমতাবলম্বী, ভাগবত, পঞ্চরাত্র, বৈখানস, কর্মহীন বৈষ্ণব ইত্যাদি বিভিন্ন দলের মধ্যে পদ্ধতি এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে পৃথক মত আছে। তত্ত্ব সম্বন্ধে মতের পার্থক্য থাকিলেও তিনি তাহাদের ভক্তিমূলক উপাসনা পদ্ধতির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই বরং সেগুলি যাতে প্রাণস্পর্শী হয়, তাহার জন্য খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনমত পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিয়া শাস্ত্রীয় বিধির মর্যাদা রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম বৈষ্ণবদের বিখ্যাত তীর্থস্থান। রঙ্গনাথ এখানে মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, বৈষ্ণবদের আচার-নিষ্ঠা এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হয়। শঙ্কর এখানে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে নূতন প্রেরণা আনিয়াছিলেন। শৈব এবং বৈষ্ণব ব্যতীত তিনি অন্যান্য উপাসক যথা হিরণ্যগর্ভের উপাসক,

কৃষ্ণের উপাসক, সূর্যের উপাসক এবং গণপতির উপাসকদের মধ্যেও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার সঙ্গে প্রকাশ্য শাস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কেহ তাঁহার মতবাদ খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। অনুভব, শ্রুতি এবং যুক্তিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি সকলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়া-পূর্ণাঙ্গরূপে অদ্বৈত বেদান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা করিতে গিয়া কখন কখন তাঁহার প্রাণসংশয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

এইভাবে নানা স্থানে বেদান্তের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়া তিনি কাঞ্চীতে আসেন। কাঞ্চীকে দক্ষিণ দেশের বারাণসী বলিলেও চলে, এত মন্দির, দেবদেবী, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিশাল ক্ষেত্র অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না। কাঞ্চিতে দুইটা ধর্মের ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। একটা শৈব-চিন্তার ধারা অন্যটি বৈষ্ণব-চিন্তার ধারা কাঞ্চি দুই ভাগে বিভক্ত, শিবকাঞ্চি এবং বিষ্ণুকাঞ্চি। শিব-কাঞ্চিতে শিবের প্রাধান্য। নিকটেই শাক্ত পীঠ, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাক্ষী। বিষ্ণুকাঞ্চিতে বৈষ্ণবদের প্রাধান্য, উপাস্য পৃথক হইলেও উভয়ের উপাসকগণ ভক্ত, শাস্ত্রে বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান, শুধু উপাসনার পদ্ধতি বিভিন্ন।

সশিষ্য শঙ্কর এখানে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া উভয় উপাসকদের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণা জাগাইলেন এবং উভয় স্থানেই নিজ নিজ পদ্ধতিকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী সংস্কার করিতে সাহায্য করিলেন। শিব-কাঞ্চিতে কামাক্ষী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া শক্তি উপাসনার উদ্বোধন করিলেন। ইহার পর তিনি ভেঙ্কটাচলম আসিলেন, ইহার অপর নাম তিরুপতি। এখানে মন্দিরের দেবতা লইয়া বিভিন্ন উপাসকদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ চলিতেছিল। কাহারও মতে উহা বৈষ্ণব [illegible] নয়। [illegible] লক্ষণ শাস্ত্রীয় যুক্তি অবতারণা করিয়া শঙ্কর তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। অবশ্য পরে আবার উহা বৈষ্ণবদের মন্দির বলিয়া দাবী করা হয়, সেই অবধি উহা বৈষ্ণবদের মন্দির বলিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং তাঁহাদের বিধি অনুযায়ী পূজা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতেছে।

এইদিকে প্রচারকার্য শেষ করিয়া তিনি কর্ণাটক হইয়া উজ্জয়িনীতে গেলেন। উহা হিন্দুদের মহাতীর্থ। মহাকালেশ্বর শিব এখানকার মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। খ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নিকটেই শিপ্রা নদী। এখানে বার বৎসর অন্তর কুম্ভ হয়। এই উপলক্ষে বহু দূর দূর দেশ হইতে সন্ন্যাসী, বৈরাগী, গৃহী ভক্ত আসিয়া থাকেন। এবং স্নানের বিশেষ বিশেষ দিনে শিপ্রা নদীতে স্নান এবং মহাকালেশ্বর শিব দর্শন করিয়া ধন্য হন।

এখানকার আবহাওয়া এবং পরিবেশ উত্তম, সশিষ্য শঙ্কর এখানে নদীতে স্নান, মহাকালেশ্বর শিব দর্শন এবং অন্যান্য মন্দির দর্শন করিলেন। এই অঞ্চলে প্রচারকালে তিনি বহু সম্প্রদায়ের উপাসকদের সংস্পর্শে আসিলেন। শাক্ত, কাপালিক, জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পান। শঙ্করের ব্যক্তিত্বে এবং তাঁহার মতবাদের গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অধিকাংশই নিজ নিজ মতের সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, তাঁহার মত গ্রহণ করেন।

এইভাবে বহু ধর্মের লোক, যাঁহারা অন্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা পুনরায় হিন্দু তথা বৈদিক ধর্মে ফিরিয়া আসিলেন। এই অঞ্চলে প্রচারকার্য শেষ করিয়া শঙ্কর সশিষ্য পুরীতে আসিলেন। পুরী হিন্দুদের প্রধান তীর্থস্থান। চারিধামের অন্যতম। জগন্নাথ এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। ইহা প্রধানত বৈষ্ণবতীর্থ হইলেও শৈব শাক্ত প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু লোক এখানে আসিয়া থাকেন এবং জগন্নাথ ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিয়া ধন্য হন।

প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার রথ খুব জাঁকজমকের সহিত বাহির করা হয়, এই উপলক্ষে দেশ-দেশান্তর হইতে অগণিত যাত্রীর সমাগম হয়, বার বৎসর অন্তর জগন্নাথের কলেবর পরিবর্তন হয়। সশিষ্য শঙ্কর যখন এখানে আসেন তখন মন্দির এবং তীর্থের দুরবস্থা। বৌদ্ধদের প্রভাব খুব বেশী। অত্যাচারীদের ভয়ে মন্দিরের পুরোহিতগণ জগন্নাথের রত্নপীঠক বহু পূর্বে সরাইয়া নিয়াছিলেন কিন্তু তাহা উদ্ধার করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উহা কোথায় কি অবস্থায় আছে কাহারও জানা ছিল না।

শঙ্করের আগমনে হিন্দুদের মনে আশার সঞ্চার হইল। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে শঙ্কর লুপ্ত রত্নপীঠক উদ্ধারের সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিপদের সময় পুরোহিতগণ রত্নপীঠক চিলকাহ্রদে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। হ্রদের যে স্থানে উহা পড়িয়াছিল শঙ্কর যোগশক্তির প্রভাবে নির্দেশ করিয়া দিলেন। উড়িষ্যার রাজার সাহায্যে তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া মন্দিরে উহা প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

পুরী এবং অন্যান্য স্থানে প্রচার শেষ করিয়া সশিষ্য শঙ্কর মগধপুর হইয়া পুনরায় প্রয়াগে আসিলেন। পূর্বেও কুমারিল ভট্টের সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু কুমারিল ভট্ট তুষানলে আত্মাহুতি দেওয়ার পর তিনি কুমারিল ভট্টের শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে বিচার করিবার জন্য নর্মদা তীরবর্তী মাহিষ্মতী নগরে চলিয়া যান। দ্বিতীয়বার এখানে আসিয়া দেখেন ইন্দ্রের উপাসনা, বায়ুর উপাসনা, পৃথিবীর উপাসনা, আকাশের উপাসনা ইত্যাদি বহু দেবতার উপাসনা বিদ্যমান। শঙ্কর এই উপাসকদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি

প্রবর্তন করিয়া তাঁহাদের পদ্ধতিকে নূতনভাবে চালিয়া সাজাইলেন। ইহা ব্যতীত বিচারে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্য এবং বৈশেষিকদের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্তের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এলাহাবাদ অঞ্চলে প্রচারকার্য শেষ করিয়া তিনি সশিষ্য বারাণসীতে আসিলেন। বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার পীঠস্থানে বেদান্তের সাধনা, শাস্ত্রালোচনা যথেষ্ট হইলেও অন্যান্য মতাবলম্বী যথেষ্ট ছিল। চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, পিতৃপুরুষ, অনন্তদেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বেতালাদি দেবতার উপাসনা বিদ্যমান ছিল। শঙ্কর উক্ত উপাসকদের মধ্যে উচ্চ আদর্শের প্রেরণা যোগাইয়া তাঁহাদের প্রণালীতে আমূল পরিবর্তন আনিলেন।

বারাণসীতে প্রচারকার্য শেষ করিয়া তিনি সশিষ্য অবন্তী অভিমুখে গমন করেন। এখানে বিখ্যাত প্রতিভাধর ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অদ্বৈত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। অতঃপর তিনি সশিষ্য সৌরাষ্ট্র, গিরনার, গুজরাট, সোমনাথ, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ঐ সকল স্থানে বেদান্ত প্রচার করেন। দ্বারকাধামে প্রচলিত পঞ্চরাত্র পদ্ধতি পুনরায় চালিয়া সাজাইলেন। ইহার পর সিন্ধুদেশ, গান্ধার, বল্মীকদেশ প্রভৃতি স্থানে জৈন, মাধ্যমিক বৌদ্ধ, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।

এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচারকার্য শেষ করিয়া তিনি সারদায় আসেন। চির তুষারাবৃত হিমালয়ের অন্তর্গত এই স্থান প্রকৃতির রম্যভূমি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পীঠস্থান। সারদা (সরস্বতী) এখানকার মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মহিষকর্ণ নামক জনৈক বিদ্বান এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মহান রাজা বহুকাল পূর্বে এখানে মন্দির নির্মাণ করিয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। বহুকাল হইতে এ অঞ্চলে লোকদের মনে একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সারদা দেবীর অনুমোদন ব্যতীত কেহ সর্বজ্ঞ হইতে পারে না, এ অঞ্চলের অদ্ভুত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আলোচনা করিয়া এ ধারণার পশ্চাতে যে সত্য নিহিত ছিল তাহা অনুমান করা যায়।

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মাধ্যমিক যোগাচার, শ্রৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, শূন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এবং শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদের ধুরন্ধর পণ্ডিতগণ তক্ষশীলা এবং পাশাপাশি অঞ্চলে বাস করিতেন। শাস্ত্র বিচারে তাঁহাদের পরাজিত করিতে না পারিলে কেহ সর্বসত্ত্ব লাভের আশায় সারদা দেবীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইতেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেবীর অনুমোদন ব্যতীত কেহই সর্বজ্ঞ হইতে পারিতেন না। উপরি-উক্ত মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়া শঙ্কর সারদা দেবীর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পাইলেন। অর্চনাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিলেন।

শঙ্করের সর্বজ্ঞত্ব অনুমোদনের পূর্বে দেবী তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা এবং বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতীর সঙ্গে কামশাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য শঙ্কর যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া মৃতরাজা অমরকের শরীরে প্রবেশপূর্বক ঐ শাস্ত্রের রহস্য অবগত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দেহ অপবিত্র হইয়াছে এবং যাঁহার দেহ অপবিত্র তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব অনুমোদন করা চলে না ইত্যাদি আপত্তি উত্থাপিত হইলে শঙ্কর তাহা এই বলিয়া খণ্ডন করিলেন যে, শাস্ত্রমতে অপবিত্রতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। জ্ঞানলাভের পর জন্মান্তরের কর্ম মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না; সুতরাং শঙ্করের পবিত্রতা এবং জ্ঞানের গভীরতায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব অনুমোদন করিলেন।

দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শঙ্কর কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে আসিলেন, ডাল হ্রদের তীরে পাহাড়ের উপর শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন। শিবের নামানুসারে উহা শঙ্কর পর্বত নামে পরিচিত। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি আনন্দলহরী প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থ জ্ঞান ও ভক্তির খনি, কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে তিনি তক্ষশীলায় গমন করেন। এইস্থান শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। একসময়ে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের সুযোগ লাভ করিবার জন্য বহু দূর দেশ হইতে মেধাবী ছাত্র আসিত।

ইহার পর তিনি সশিষ্য জ্বালামুখী আসেন। ইহা শিবালিক অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে মন্দিরে দেবীর কোন মূর্তি নাই কিন্তু সর্বদা একটা শিখা নির্গত হয়। এই শিখাতেই দেবীর ভোগ নিবেদন করা হয়:

এখান হইতে তিনি নৈমিষারণ্যে আসেন, এককালে ইহা ঋষিদের প্রধান শাস্ত্রচর্চা এবং শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। রামচন্দ্রের স্মৃতির সহিত জড়িত এই তীর্থে এখনও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখান হইতে তিনি রামের জন্মস্থান অযোধ্যায় আসেন এবং সরযুতে স্নান এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখিয়া নালন্দায় আসেন।

নালন্দা শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। ঐতিহাসিক এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে জানা যায় যে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় তখন পৃথিবীর কোন স্থানে গড়িয়া উঠে নাই। ঐ খানে দশ হাজার ছাত্রের বিনা বেতনে আহার, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য দেড় হাজার অধ্যাপক ছিলেন। উহা বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হইলেও হিন্দু সংস্কৃতি অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল।

শঙ্কর এই অঞ্চলে ও প্রচার করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধ

মতাবলম্বীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই স্থান হইতে বৌদ্ধ এবং জৈনদের প্রধান কেন্দ্র রাজগৃহে প্রচার কার্য শেষ করিয়া প্রধান তীর্থ গয়াধামে যান। বিষ্ণুপাদপদ্ম এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখিয়া বাংলা দেশে আসেন। তখনকার দিনে বিখ্যাত বন্দর ও সংস্কৃতির কেন্দ্র তাম্রলিপ্ত, ত্রিবেণী (হাওড়া হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত তীর্থস্থান) দর্শন করিয়া পূর্ববঙ্গে লাঙ্গল বন্ধ তীর্থে যান। পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন বলিয়া পুরাণে পাওয়া যায়।

ইহার পর তিনি সশিষ্য আসাম অভিমুখে রওনা হন। কামাখ্যা এখানকার প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্রহ্মপুত্রের গায়ে পাহাড়ের উপরে দেবীর মন্দির আছে ইহা বিখ্যাত শক্তিপীঠ। প্রসিদ্ধ একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে তান্ত্রিকদের প্রভাব খুব বেশী। বিখ্যাত তন্ত্র শাস্ত্রবিৎ অভিনব গুপ্ত তন্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর শৈব-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা অভিনব গুপ্ত নন। তান্ত্রিক নেতা অভিনব গুপ্ত শঙ্করের নিকট তর্কে পরাজিত হন। অদ্বৈত বেদান্তের প্রাধান্য স্বীকার করিলে তান্ত্রিক ধর্ম লোপ পাইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি শঙ্করের প্রাণ-নাশের জন্য তাঁহার উপর অভিচার করিলেন। ফলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ দেখা দিল, বহু চিকিৎসাতেও অসুখ সারিল না প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিল।

বহু চেষ্টাতেও গুরুর রোগের উপশম হইল না দেখিয়া প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদ স্বীয় ইষ্ট নৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার কৃপায় যখন জানিতে পারিলেন যে অভিনব গুপ্ত কর্তৃক অভিচার প্রয়োগই রোগের কারণ তখন তিনি গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থ অভিনব গুপ্তের উপর প্রতি অভিচার প্রয়োগ করিলেন। ভগবৎ কৃপায় শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হইল। রোগমুক্তি ঘটিল। অন্য পক্ষে অভিচার প্রয়োগকারী অভিনব গুপ্ত নিজ কৃত-কর্মের ফল ভোগ করিলেন। তাঁহার দল বাঁচাইবার সঙ্কল্প পূর্ণ হইল না। নিজকৃত অভিচারে তাঁহার প্রাণ গেল। এইভাবে শঙ্কর আসামে বেদান্তের পতাকা উড়াইলেন।

কামরূপ অভিযান শেষ করিয়া তিনি সশিষ্য আবার গৌড় দেশে আসিলেন। বাংলা দেশের অপর নাম গৌড় দেশ। কথিত আছে এখানে তাঁহার পরম গুরু গৌড়পাদের সঙ্গে দেখা হয়। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা লিখেন, তাহার উপর শঙ্কর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহা অদ্বৈতবাদের প্রধান স্তম্ভ।

গৌড়পাদ শঙ্করের মুখে কারিকার ভাষ্য শুনিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং তাঁহাকে খুব আশীর্বাদ করেন।

বিজয় অভিযান শেষ করিবার পূর্বে শঙ্কর একটি প্রধান কীর্তি রাখিয়া যান। ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ যথা দ্বারকাধামে সারদা মঠ, পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামে যোশী মঠ এবং মহীশূর রাজ্যে শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠগুলি এখনও পর্যন্ত বৈদিকধর্মের পতাকা উড়াইয়া হিন্দু-সংস্কৃতির গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত তিনি আরও কীর্তি রাখিয়া যান।

তাহার পূর্বে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলেও অধ্যাত্ম বিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমাজের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য তিনি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া নূতনভাবে চালিয়া সাজাইলেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে—(১)তীর্থ, (২)আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্বত, (৭) সাগর, (৮) সরস্বতী, (৯) ভারতী এবং (১০) পুরী।

যে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রত্যেকের অন্তর্গত ধাম, দেবতা, তীর্থ, ঋষি, সম্প্রদায়, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক বেদের পৃথক মহাবাক্য আছে। যে সম্প্রদায় যে বেদের অন্তর্গত সেই সম্প্রদায়কে সেই বেদের মহাবাক্য অনুসরণ করিতে হয় অবশ্য প্রত্যেক মহাবাক্যের তাৎপর্য ব্রহ্মানু-বোধ। পরবর্তী কালে ত্যাগের আদর্শকে উজ্জ্বল রাখিয়া সম্প্রদায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনটি আখর যথা—(১) নির্বাণী, (২) নিরঞ্জনী, (৩) জুনা, সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক আখরার মহামণ্ডলেশ্বর আছে। তাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ত্যাগী, সাধু সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হন। কালক্রমে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে বহু গলদ দেখা দিলেও ঐ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। এ সকল সম্প্রদায় হইতে শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়, তাঁহারা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, যথা দণ্ডী, পরমহংস, নাগা, আলেকিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, উর্ধ্ব বাহু, আকাশমুখী, নখী, ঠারেশ্বরী, উর্ধ্ব মুখী, অওঘর, গুদ্দর, রক্কর, কুক্কর, অবধূতানী, ঠিক্‌করনাথী, স্বরভঙ্গী, ত্যাগী, আতুর সন্ন্যাসী, মানস সন্ন্যাসী, অন্ত সন্ন্যাসী, ক্ষেত্র সন্ন্যাসী, ডোপা, দশনামী ভাট, যোগী, মাচ্ছন্দ্রী, ভর্তৃহরি, সরঙ্গী বাহার, চুরিহার যোগিনী, সংযোগী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের নাম শুনা যায় তাঁহাদের নিয়মাদি স্থান কাল পাত্র ভেদে পৃথক হইলেও তাঁহারা মূল চারিটি মঠের আদর্শ অনসরণ করিবার চেষ্টা করেন।

বিজয় অভিযান শেষ করিবার পর তিনি তান্ত্রিকপ্রধান দেশ নেপাল হইয়া বদ্রীনাথে উপস্থিত হইয়া পূর্ব-পরিচিত ভক্ত ও অনুগামীদের সাক্ষাৎ-লাভ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন। কিছু-কাল এখানে বাস করিয়া তিনি সশিষ্য চির-তুষারাবৃত শিবক্ষেত্র কেদারনাথে আসেন। মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা শিবকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া তিনি প্রচারকার্যের ফলাফল ইষ্টকে সমর্পণ করিলেন, তাঁহার উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাহা তিনি সুষ্ঠুভাবে শেষ করিয়াছেন, বৈদিকধর্মের ভিত্তি

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন হিমালয়ের কোলে বরাবরের জন্য আশ্রয় নেওয়ার সময় উপস্থিত। তাঁহার জীবন-প্রদীপের তৈল ফুরাইয়াছে। আট, ষোল এবং আরও ষোল বৎসরের মেয়াদও ফুরাইয়াছে। জ্যোতিষীর গণনা সত্য প্রমাণিত হইবার সময় আসিয়াছে। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মে ডুবিয়া থাকিবার প্রেরণা পাইলেন। শিষ্যদের নিকট মহাপ্রয়াণের আভাস দিলেন।

সঙ্কল্প ত্যাগের জন্য পদ্মপাদ এবং অন্যান্য শিষ্যেরা বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। তাঁহার দেহত্যাগের পর আরব্ধ কার্য কিভাবে চলিবে, শিষ্যগণ কিভাবে জীবন যাপন করিবেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংঘ কিভাবে চলিবে, বৈদিক হিন্দুধর্মকে স্থায়ী করিবার জন্য কোন পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে, ত্যাগের আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আভাস দিতেন, শিষ্যগণ উহা নোট করিয়া রাখিতেন। তাঁহার নির্দেশ-মত সন্ন্যাসী সংঘের নিয়মাবলী গঠিত হইল, তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে। সময় নিকট বুঝিয়া শঙ্কর শঙ্করের স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার সমাধি আর ভাঙ্গিল না। উহা মহা সমাধিতে পরিণত হইল। হিমালয়ের দেবতাত্মা অসীমে মিলাইয়া গেল। মৌন স্তব্ধতা বিরাজ করিল, শিষ্যগণ তাঁহার দেহের যথাবিধি ব্যবস্থা করিলেন। শঙ্কর চলিয়া গেলেন, রাখিয়া গেলেন ত্যাগের আদর্শ।

সত্যের নিশান, সমন্বয়ের বাণী, উদার হৃদয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সবল চিন্তাধারা, আধ্যাত্মিক বিষয়ে গবেষণার খোরাক, বৈদিকধর্মের ঐতিহ্য, ঐক্যের সেতু নির্মাণের বৃহৎ পরিকল্পনা, বিশ্ব-ধর্মগঠনের মূল্যবান মালমশলা, মানব ধর্মের সুন্দর ছাঁচ, অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং সুরেশ্বর পদ্মপাদ প্রভৃতির ন্যায় গুরুভক্তিপরায়ণ অদ্ভুত প্রতিভাধর ও বিদ্বান শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ, যাঁহারা গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া শ্রুতির টীকা, বার্তিকাবাদ রচনা করিয়া ভারতের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য আত্মাহুতি দিয়াছেন এবং জগৎ সভ্যতায় ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বিশ্ব-সংস্কৃতিতে ভারতের অবদান অপরিমেয়।

মধ্যযুগে যে বৈদিক তথা হিন্দু সংস্কৃতির সম্যক পুনরভ্যুদয়ের সূচনা হয় উহার মূলে আচার্য শঙ্কর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি মহামানব, বৈদিক ধর্ম এবং ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহ। যে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অস্তগামী সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া তিনি ভারতীয় ধর্মের মধ্যে নূতন ভাবে প্রাণসঞ্চার করেন। উপনিষদ এবং বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বকে অনুভূতি এবং শ্রুতির কষ্টিপাথরে ঘষিয়া উহাতে নতন রূপ দান করিয়া বিদ্বৎ সমাজে তুলিয়া ধরেন, তিনি যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা অদ্বৈতবাদ বিবর্তবাদ উহার প্রকৃষ্ট রূপ, উহা দ্বারা বেদান্তের দুইটি বিপরীতমুখী চিন্তা-ধারার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ আচার্য গৌড়পাদের অজাতবাদ এবং ঔড়ুলোমীর পরিণামবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব। নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগতের সত্তা, স্বপ্ন, মায়া প্রভৃতির প্রভাব বিলোপ হইলেও জাগ্রত অবস্থায় জগতের ব্যবহারিক সত্তার স্বীকৃতি দ্বারা তিনি অদ্বৈত তত্ত্বের নূতন মূল্যায়ন স্থির করিয়াছেন, ইহা দ্বারা তিনি একদিকে যেমন বৌদ্ধ দর্শনের চারিটি প্রসিদ্ধ নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন করিয়া উহাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন অন্যদিকে সকল রকম আস্তিক্য দর্শনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা-দের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এবং পরবর্তী যুগে যত আস্তিক্য দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে তাহা-দের সকলের প্রেরণা যোগাইয়াছেন। তাঁহার গীতা, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থের প্রতি ছত্রে অদ্বৈত তত্ত্বের স্ফুরণ বিশেষ-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

অদ্বৈত অনুভূতির জন্য যে রকম সাধনাদির প্রয়োজন তাহা তিনি অতি বিশদভাবে সুললিত ভাষা এবং ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নির্দেশ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে যে অত্যন্ত মূল্যবান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁহার বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা, বিচার-পদ্ধতি বিশ্লেষণের ভঙ্গী, প্রখর চিন্তাধারা সবই অদ্ভুত, তাঁহার তুলনা মিলেনা।

শঙ্করের গ্রন্থ ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব, বিশ্ব-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। ইহার তুলনা মিলে না। যিনি এ রত্নের সন্ধান জানেন তিনি ভাগ্যবান সন্দেহ নাই আর যিনি ইহা হইতে বঞ্চিত তিনি ইহার মূল্য জানেন না। পূর্বে বলা হইয়াছে এ পর্যন্ত তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে উপদেশ গ্রন্থ ৫৪, স্তবস্তুতি গ্রন্থ ৭৫, ভাষ্যগ্রন্থ ২২, মোট ১৫১খানি গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহার গ্রন্থ এমন সরল ও মধুর যে ক্ষণকালের জন্যও জগৎ ভুল হয়, দুঃখ দূর হয়, ব্রহ্মাত্মবোধ আসে, ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করে।

তাঁহার গ্রন্থে বৈদিক ধর্মের তাৎপর্য সুস্পষ্ট, পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত, রাজ আনু-কূল্যে অবৈদিক ধর্ম মস্তক উত্তোলন করিলে বৈদিক সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হয়। শঙ্করের পূর্বেও বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র, বিক্রমাদিত্য প্রমুখ রাজন্যবর্গ এবং বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, প্রশস্তপাদ, শবর, পতঞ্জল, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রমুখ মনীষীরা অবৈদিক ধর্মভাবের প্রতিকারকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবৈদিক ধর্মের সূক্ষ্ম বিচারপদ্ধতি এবং অভিনব দুর্ভেদ্য দুর্গ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহারা ভবিষ্যতের পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া ছিলেন।

প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্ট তাঁহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ধ্বংস করিয়া বৈদিক ধর্মের পথ অনেকটা সুগম করিয়া তুলিলেন। শঙ্কর উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের লুপ্ত-গৌরব

উদ্ধার করিলেন, ব্যাসকাণ্ডির মোক্ষ বৃদ্ধি করিলেন। বৈদিক ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সবই পাওয়া যায়। তবে শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভব সবই অদ্বৈতবাদের পক্ষে প্রবল অদ্বৈতবাদ শঙ্কর কর্তৃক প্রবর্তিত হয় নাই। তাঁহার পূর্বেও তিনি একজন আচার্য এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 'বেদান্ত' ভারতীয় জ্ঞান গবেষণাগারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জাতীয়-জীবনের মূলাধার, জাতির সকল চেষ্টা, চিন্তা, ধর্ম, ভাবে বেদান্তকে মূল করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। বেদান্তের ধ্বংসে জাতির-জীবন ধ্বংস, অধ্যাত্ম মীমাংসাই বেদান্ত। দর্শনের বিশেষত শঙ্কর দর্শনের প্রধান বিষয়, মায়াবাদ তাঁহার বিশেষত্ব। গৌড়পাদ আচার্যের মাণ্ডুক্য-কারিকায় এবং উত্তর গীতায় মায়াবাদের যে অঙ্কুর দেখা যায় শঙ্কর-ভাষ্যে তাহার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। সংশয় থাকিলে মীমাংসার প্রয়োজন। তাই আত্ম-অনাত্ম বিচার দরকার। দেহাদিতে আত্মবোধ অধ্যাস বা ভ্রান্তির ফল, দেহাদি সংঘাতে আত্মাভিমানো অবিদ্যাত্মক (গী: ভা: ১৮।৬৬)।

আমি বা আত্মা প্রকাশক, দেহাদি প্রকাশ্য। প্রকাশক এবং প্রকাশ, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক নয়, পৃথক। অনাত্ম বস্তু কল্পিত, যাহা তিনকালে অবাধিত তাহা সত্য; যাহা বাধিত হয় তাহা মিথ্যা। এক বস্তুতে অন্য বস্তু দেখা মিথ্যা জ্ঞান, অনাত্মক আত্মা, অবস্তুতে আত্মবোধ অজ্ঞান, অজ্ঞানই মায়া। যতক্ষণ অজ্ঞান আছে ততক্ষণ তাহার মূলও আছে এইজন্যে মায়ার সত্তা স্বীকার করিতে হয়, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান থাকে না সুতরাং মায়া সৎ কিম্বা অসৎ কোনটা বলা চলে না। ইহা অনির্বচনীয়, মায়া সর্বজন প্রত্যক্ষ জ্ঞান-অজ্ঞানের আশ্রয় বটে কিন্তু জ্ঞানে অজ্ঞান নাই, অজ্ঞান অধ্যাসের ফল, অধ্যাস দুই রকম গৌণ এবং মুখ্য। পুত্র-ভার্যাদিতে আত্মবুদ্ধি গৌণ, শরীর ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি মুখ্য, অনাদি কাল হইতে প্রচলিত এই অধ্যাসের জন্য কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্যই ব্রহ্ম-বিচার, আত্ম বিচার আত্মা চ ব্রহ্ম (ব্র:সূ: ১।১-১) শাস্ত্রের তাৎপর্য অবিদ্যা নিবৃত্তির সহায়ক, কিন্তু শাস্ত্র জড়, জ্ঞাপক: হি শাস্ত্র: ন কারকং, আত্মার প্রকাশে শাস্ত্রের প্রকাশ, শাস্ত্র আত্মাকে প্রকাশ করে না। নেতি নেতি বিচার দ্বারা নিষেধ মুখে আত্মাকে প্রতিপন্ন করে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানে অবিদ্যার নাশ হয়, ব্রহ্ম দোষ রহিত তাই নিত্যশুদ্ধ। জড়ধর্মরহিত তাই নিত্যবুদ্ধ, অসীম তাই নিত্য মুক্ত এবং সকলের আত্মা। ব্রহ্ম তর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। শ্রুতি গুরু এবং অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রুতি এবং গুরুবাক্য অনুভূতির সহায়ক, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি সম্ভব হয়। অনুভূতি জ্ঞানজা শ্রুতি অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা বলবৎ, স্বত: প্রমাণ অপৌরুষেয় ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ। সৃষ্টি মায়িক, ব্রহ্ম মায়ার আধার। সৃষ্টি মায়াময় হইলেও ইহাতে শৃঙখলা বিদ্যমান। আকাশাদি অপঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে জগতের উৎপত্তি।

বিষয় নানা, বোধ এক, জ্ঞান, অখণ্ড, বস্তুতন্ত্র, যাথার্থ্য জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। অন্যথাবোধ। মিথ্যা জ্ঞান। উপাসনাদি সহায়কারী মুখ্য কারণ নয়।

উপাসনাদি কর্ম, কর্ম অবিদ্যার বিষয়। অবিদ্যাবিষয়: কর্ম (গী: ভা: ১৮।৬৬) কর্মদ্বারা নি:শ্রেয়স লাভ হয় না। ন কর্মণোঽস্তি নি:শ্রেয়স সাধনত্বম্ (গী: ভা: ১৩।২৪), ন হি মোক্ষাধানি কর্মাণি সিদ্ধম্ (ব্র: সূ, ৩ ভা:) কর্মে প্রবৃত্তি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। কর্ম প্রবৃত্তে জ্ঞান প্রতিকূলতা সর্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। (ব্র: সূ: ৪।৮।১৫), শাস্ত্র কর্মে প্রবর্তনা দেয়। বিধি এবং নিষেধ কর্মের প্রবর্তক। কর্ম, চঞ্চল, কর্মের তারতম্য আছে, অধিকারীর তারতম্য আছে। কর্ম জড় স্পন্দন, ক্রিয়া এবং অজ্ঞানের ফল কর্ম পরুষতন্ত্র। ক্ষয়ধর্মী, কৃতস কারিত্বাৎ (ব্র: সূ: ১।৩।১৫), অজ্ঞানীদের জন্য কর্মপ্রশস্ত অজ্ঞানাদেব হি কর্মযোগো ন জ্ঞানিনাম্ (গী: ভা: ৩।৫), শাস্ত্রবিহিত কর্মও বন্ধনের হেতু। শাস্ত্র বিহিত কর্মমার্গ: বন্ধহেতু: (গী: ভা: ১৭।৩০), কর্মের দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হয় না। ন হি কর্মকাণ্ডেন পর আত্ম প্রকাশ্যতে (ব্র: সূ: ৪।৪।২২), কর্মের ফল এবং জ্ঞানের ফল বিভিন্ন ব্রহ্ম জ্ঞানে মুক্তি, সদ্যো মুক্তিকারণম্ আত্মজ্ঞানম্ (ব্র: সূ: ভা: ১।১।১২)। ইহা সকল উপনিষদের সিদ্ধান্ত (ছা: ২।২৩) জ্ঞান স্থির, চৈতন্য, অচঞ্চল। চৈতন্যে ক্ষয় নাই। জ্ঞানের প্রকাশে জড়ের প্রকাশ, কর্ম জ্ঞানের প্রকাশ্য। কর্ম নানা, জ্ঞান এক, আত্মা সৎ, চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ, আকাশবৎ সর্বব্যাপী, নিত্য মুক্ত, কূটস্থ নিত্য, অসঙ্গ নিষ্ক্রিয়, সংসার-ধর্ম রহিত, অপরিণামী শাশ্বত, সনাতন। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব রহিত।

উপাধির যোগে কর্তৃত্বাদি প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরই জগতের কারণ, মায়া তাঁহার আশ্রিত, মায়ার নিবৃত্তিতে জীব শিব হয়, জগৎ পরিচ্ছিন্ন, মূর্ত, বিনাশধর্মী, ঈশ্বর জগতের কারণ, উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ উভয়ই তিনি, ঈশ্বর এবং জীব অভিন্ন, ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ, উভয়ই সগুণ ভাবে লীলা, সৃষ্টি কর্তৃত্ব, তখন তিনি জীবের খেলার সাথী, হৃদয়ের সখা, স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, প্রেমে পাগল, যুদ্ধে স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ কোনটাই নাই, ভক্তি জ্ঞানের সহকারী, আত্মতত্ত্ব তথা স্ব স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি।

ভক্তিতে ভগবান ও ভক্ত অভিন্ন হয়। এরূপ অভিন্ন বোধে বিরহ নাই, শোক নাই, নিত্য মহামিলন, ভক্তি সাধনেও অজ্ঞান থাকে, ভক্তি কর্মের অঙ্গ, উপাসনায় ভক্তিতে উপাস্য ভেদ থাকে। ভেদ অজ্ঞানের কারণ ভেদে ভয়, দ্বৈতে ভয়ং ভবতি। উপাসনার ফলে অভ্যুদয় স্বর্গলাভ হয়। উপাসনা চিত্তশুদ্ধির কারণ, ক্রমমুক্তির সোপান। উপাসনা তিন প্রকার—(১) অঙ্গাজ, (যেমন যজ্ঞের

অংশাবশেষে ব্রহ্মবোধ), (২) প্রতীক অবলম্বন (যেমন মনে, আদিত্যে, শালগ্রাম শিলায় ব্রহ্মবোধ, শিবলিঙ্গে শিববোধ, প্রতিমায় বিষ্ণুবোধ), (৩) অহংগ্রহ (যেমন আত্ম প্রতীক)—উপাসনা নানা প্রকার হইলেও উপাস্য এক, প্রতীক জড়, জড়কে ব্রহ্ম ভাবিলে জড়ত্ব লোপ পায়, সচেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অহংগ্রহ উপাসনা শ্রেষ্ঠ, অন্য উপাসনারও মূল্য আছে। জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই উপাসকের আছে। ঈশ্বরার্থ কর্মই নিষ্কাম কর্ম, ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠা হয়।

কর্ম জ্ঞানের কারণ নয়, ন হি জ্ঞানস্য কর্ম সাহায্যাপেক্ষা (গীঃ ভাঃ ১৮।৬৬), জ্ঞানই মুক্তির কারণ। কর্ম এবং জ্ঞানের সমুচ্চয় সম্ভব নয়। ন জ্ঞান নিষ্ঠা কর্ম সহিতো পদ্যতে(গীঃ ভাঃ ১৩।৬৬)। ক্রম সমুচ্চয় সম্ভব, শাস্ত্রে অনেক কর্মের বিধান পাওয়া যায়, তাহার বেশীর ভাগ প্রবৃত্তিমার্গের সাধকদের জন্য বিহিত। যানি কর্মানি শাস্ত্রেন বিধিয়ন্তে অন্যাপি অবিদ্বো বিহিতানে (গীঃ ভাঃ ১৩।২৩)। কর্ম জড়, ফলে দাতৃত্ব গুণ নাই, ঈশ্বরই ফলদাতা। সগুণ উপাসনায় নিরতিশয় মুক্তি হয় না। গমনাগমন থাকে। গুণ থাকলে অজ্ঞান থাকে। অজ্ঞান থাকিলে দুঃখ অনিবার্য, ভেদ থাকিলে ক্রিয়া হয়, জীব ব্রহ্মে অভেদ হইলে ভেদ, ক্রিয়া, দুঃখ, অজ্ঞান থাকে না। অভেদ অবস্থাই ব্রহ্মাত্মবোধ, মুক্তি, তখন অবিদ্যার অন্ত হয়। স্ব স্বরূপে অবস্থিতি মুক্তি, আত্মজ্ঞানই অমৃতত্ব, আত্মাই ব্রহ্ম। মুক্তি উৎপাদ্য, বিকার্য, আপ্য কোনটাই নহে। মুক্তি নিত্যসিদ্ধ, নিষ্কলং, নিরঞ্জনং, শান্তং, নিরবদ্যং।

[illegible] তাঁহার জীবনে বেদান্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি, তাঁহার সাধনা, তপস্যা এবং গবেষণা বিশ্বদর্শনের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার অপূর্ব সমন্বয় ভাবের মধ্যে সমুদয় দর্শনের সারতত্ত্ব নিহিত।

শঙ্কর নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সেই জন্য অনেকে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আপত্তির মূল কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মে কর্ম ও উপাসনার স্থান নাই, আর কর্ম এবং উপাসনাকে হেয় মনে করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বাহিরের দৃষ্টিতে বিচার করিলে এই আপত্তি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই আপত্তি অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী হইলে যে পূজাপাঠ, স্তবস্তুতি, উপাসনা সব ত্যাগ করিতে হয় তা নয় বরং এগুলির যে বিশেষ মূল্য আছে তাহা বুঝা যায়। কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্মের প্রয়োজন, উপাসনার ফল একাগ্রতা, একাগ্রতা লাভের জন্যই উপাসনার বিধি, [illegible] উভয়ের ফল, দৈবকৃপায় জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দূর হয়। সুতরাং কর্ম এবং উপাসনা উভয়ের প্রয়োজন স্বীকৃত। তবে কর্ম উপাসনা এবং জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না। তাহাদের ক্রম-সমুচ্চয় সম্ভব হইতে পারে। যতদিন জ্ঞান দৃঢ় না হয় ততদিন ব্যবহার থাকে, ব্যবহার থাকিলেই কর্ম উপাসনা উভয়েরই প্রয়োজন থাকে। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী গৃহস্থ হইলেও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। তিনি কর্মীও হইতে পারেন, [illegible] জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী হইলেও ব্যবহার থাকে, তবে তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় আবদ্ধ হন না। তাঁহার কর্ম ভর্জিত বীজবৎ, দগ্ধ বীজের ন্যায় অঙ্কুর উৎপাদন করে না। দেহান্তে তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত। সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর পক্ষে স্তবস্তুতি দূষণীয় নয়। উহা দূষণীয় হইলে তাঁহার আহারাদিও দূষণীয়, দেহ থাকিলে আহারাদির প্রয়োজন, দেহ বিনষ্ট করা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। দেহ থাকিলেই অন্যকে জ্ঞান-লাভে সাহায্য করা সম্ভব হয়। নইলে নয়, সুতরাং আপত্তি অমূলক।

যতদিন অজ্ঞান ততদিন দুঃখমিশ্রিত সুখ, এই সুখ লোকাদি কামনার চরম সীমা, ইহা ক্রমমুক্তির পথ, কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞান সদ্য মুক্তির পথ, এখানেই অদ্বৈত তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। ক্রমমুক্তিতেও শেষে অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দূর হয়।

অদ্বৈত জ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই উপযোগী, এই মতে কর্মী শ্রেষ্ঠ কর্মী হন, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হন, ভক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত হন, ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইলে ব্রাহ্মণ মনে করেন তপস্যার জন্যই তাঁহার জীবন। ক্ষত্রিয় শত্রুসংহারে অগ্রসর হন, নির্ভয়ে প্রাণ দিতে পারেন, বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি করিতে পারেন, শূদ্র শিল্পের উন্নতিতে তৎপর হন, কেহ ভয়গ্রস্ত হন না। ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য, তখন অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া নিজেও অভয় প্রাপ্ত হন।

(ক্রমশ)

জনশ্রুতি

পরেশ মণ্ডল

চেতনার লৌকিক রাজ্যে
এরকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যাবে
কল্পনা করি নি।
চড়া রোদ, ট্রামের আওয়াজ, কতো কি
চলন্ত রং..
কাঙাল [illegible]

নিরত হাসির মধ্যে সর্বনাশ
কিংবা
যাই বলে যাওয়া আর হলো না
কারণ
মাধ্যাকর্ষণ থেকে অন্য কিছু ইদানীং
বড় ভয়ঙ্কর।

পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর

ফটোগ্রাফ অথবা শিল্পীর আঁকা ছবি থেকে ব্লক তৈরী করে সাধারণ কাগজের উপর -সেগুলিকে মুদ্রণ করার উপায়টি আবিষ্কৃত না হলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বেশ বড় রকমের একটি ফাঁক থেকে যেত। আজ যাঁরা সংবাদপত্রের আগ্রহী পাঠক, তাঁরা একদিকে যেমন নিত্য নতুন সংবাদের জন্য আকুলভাবে প্রতীক্ষা করেন, অপর দিকে চান সেই সব সংবাদ চিত্রের মাধ্যমে তাঁদের কাছে পরিবেশন করা হোক। মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম করে চন্দ্রলোকে পাড়ি দিতে পেরেছে এই সংবাদটিই পাঠকের কাছে যথেষ্ট নয়। এরই সাথে সে দেখতে চায় চাঁদের না-দেখা পৃষ্ঠের আলোকচিত্র। অর্থাৎ সব সংবাদই নিখুঁতভাবে পরিবেশন করতে হলে কেবলমাত্র ছাপার হরফের সাহায্যে তা আজ আর করা যায় না। তার জন্য ছবিও একান্ত প্রয়োজন। আর এই ছবি সাধারণ কাগজের উপর ছাপতে হলে চাই 'হাফটোন স্ক্রিন।'

হাফটোন ব্লকের 'নেগেটিভ' তৈরী করার সময় ক্যামেরার ভিতর যেখানে ফোটোগ্রাফিক প্লেটটি থাকে ঠিক তার সামনে, আড়াআড়িভাবে রুলটানা যে কাঁচের পর্দা লাগানো হয় তাকেই বলে 'হাফটোন স্ক্রিন।' এই প্রসঙ্গে শ্রীসুবিনয় রায়চোধুরীর একটি প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছিলেন—

'এই রুল বা লাইন অতি সূক্ষ্ম—ইঞ্চিতে ৪০ থেকে ২০০ পর্যন্ত লাইন সচরাচর ব্যবহার করা হয়। রুলকরা কাচের মধ্যে দিয়ে ছবি তোলায় যে 'নেগেটিভ' হয় তার আগা-গোড়াই লাইন আর ছোট ফুটকি। এই নেগেটিভ থেকে তামা বা দস্তার ফলকে তুলে, খোদাই করে 'হাফটোন ব্লক' তৈরী হয়।'

লাইন বা রেখা দিয়ে যে-সব ছবি আঁকা হয় তাতে সাদা আর কালো ছাড়া মাঝামাঝি কোন রঙ থাকে না। কিন্তু 'হাফটোন ব্লকের' দ্বারা মুদ্রিত ছবিতে, সাদা-কালোর মাঝামাঝি সর্বপ্রকারের রঙের আঁচ বা আমেজ ফুটে ওঠে। কিন্তু লাইন ব্লকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এই স্ক্রিন ফোটো লিথোগ্রাফির কাজকেও আজ বহুল

দীপঙ্কর সেন

পরিমাণে সার্থক করে তুলেছে। 'হাফটোন' ব্লকের ছবি ঠিক ফটোগ্রাফের মত। কুচকুচে কালো থেকে ধবধবে সাদার মাঝামাঝি সর্বপ্রকার রঙের আঁচ বা আমেজ এতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ভাবলে খুবই আশ্চর্য লাগে যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও কিছু আগে 'হাফটোন স্ক্রিন' সম্পর্কে সফলভাবে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনটি যাঁর প্রাপ্য, সেই উপেন্দ্রকিশোর রায় ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক। উপেন্দ্রকিশোরের পৈতৃক বাসস্থান ছিল পূর্ববঙ্গের মৈমনসিং অঞ্চলে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করে তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন।

উপেন্দ্রকিশোর

এর পরে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সামান্য ক'টা দিন এই মানুষটি বেঁচেছিলেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তিনি বিদেশে কোনদিন যান নি, কিন্তু এরই মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানগুলির কথা ছেড়ে দিলেও—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুদ্রণের জন্য তিনি যা করে গিয়েছেন সেই স্তরের সৃষ্টিমূলক কাজ আজ পর্যন্ত অপর কোন ভারতীয় করতে পারেন নি। অথচ আজ আমাদের দেশে তথাকথিত 'বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত' মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির জন্য কত সরকারী ও বেসরকারী জল্পনা-কল্পনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে তারও ইয়ত্তা নেই। অবশ্য এর মূল কারণটি খুঁজে বের করা মোটেও কঠিন নয়। উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা ছিল, যে জিনিসটির অভাবে মানুষ কেবলমাত্র চাকরী অথবা ব্যবসাসর্বস্ব একটি জীবনকে আঁকড়ে ধরে কোনমতে প্রাণ ধারণ করে। ইংরেজিতে একে বলে —'ভেজিটেবল একজিসটেন্স'।

পরাধীন ভারতবর্ষে এমন কিছু লোক জন্মেছিলেন যাঁদের প্রতিভা শিল্প এবং বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে আমরা দেখেছি। আবার এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরই ছিলেন সবচেয়ে সার্থক শিল্পী যাঁর মনের গঠনটি ছিল পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। সেই কারণেই সমকালীন য়ুরোপীয় এবং মার্কিন গবেষকদের তুলনায় হাফটোন স্ক্রিন সংক্রান্ত তাঁর সমস্ত গবেষণাই ছিল অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত। এই প্রসঙ্গে প্রতিটি চিন্তাশীল ভারতীয়ের যে কথাটি মনে করে গর্বে বুক ভরে ওঠে তা হল উপেন্দ্রকিশোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্লক তৈরীর প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ য়ুরোপ

থেকে অনেক দূরে থেকেও আমাদের এই পরাধীন দেশে একক প্রচেষ্টায় তাঁর সমস্ত গবেষণা করে গিয়েছেন।

কেমন করে উপেন্দ্রকিশোর 'হাফ-টোন স্ক্রিনের' কাজে হাত দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস জানতে হয়ত অনেকেই আগ্রহী। তা সত্যিই বিস্ময়কর। শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য রচনার জন্য বাঙালী পাঠকের কাছে উপেন্দ্রকিশোরের স্থান যে সবার উপরে একথা অনেকেই স্বীকার করেন। তাঁরই সম্পাদিত সন্দেশ পত্রিকায় নিজের লেখা প্রকাশ করবার সময় ছবি ছাপতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর মর্মাহত হয়েছিলেন। সেসময় যেভাবে চিত্র মুদ্রণ করা হত তার ফলাফল মোটেও সন্তোষজনক ছিল না।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর 'ফোটো এনগ্রেভিং' সংক্রান্ত গবেষণা সুরু করে দেন। বহুদিন ধরে, বহু ব্যয় করে তিনি তাঁর একক সাধনা চালিয়ে যান। প্রায় দশ বছর পরে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা সফল হয়। তাঁর স্ক্রিনের দূরত্ব নির্ধারণ করার যন্ত্র, ক্যামেরার 'ডায়াগ্রাম' (মধ্যচ্ছদা) এবং ষাট ডিগ্রি স্ক্রিন যে কি পরিমাণ উন্নত সেকথা দ্ব্যর্থহীনভাবে দেশে ও বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

বৃটিশ জার্নাল অব ফোটোগ্রাফি পত্রিকায় (১৯০৪ খৃস্টাব্দে) একটি প্রবন্ধে একজন লেখক মন্তব্য করেছিলেন - - - 'হাফটোন' কাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য নানাপ্রকার ডায়াগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করার সময় আজ এসেছে এবং এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মকুশলী হিসাবে যাঁকে আমি জানি, তিনি কলকাতার ইউরে। ইনি এ জিনিসটিতে গাণিতিক নির্ভুলতা আরোপ করতে পেরেছেন।'

হাওয়ার্ড ফ্রেমার রয়েল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবার সময় বলেছিলেন— 'উপেন্দ্রকিশোর প্রসেসের (ব্লক তৈরীর) কাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। তিনি 'পিন হোল থিয়োরিটি' যেরূপ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন তারপর তা সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করবে এ অতি স্বাভাবিক কথা।'

দুঃখের বিষয় এই যে উপেন্দ্রকিশোরের এই অবদানের জন্য সম্পূর্ণ স্বীকৃতি তিনি লাভ করেন নি। পেনরোজ অ্যানুয়ালে (১১ সংখ্যা—১৯০৫-'৬ খৃস্টাব্দ) তিনি লিখেছিলেন—১৮৯৯ খৃস্টাব্দে পেনরোজ অ্যাণ্ড কোম্পানীর মাধ্যমে আমি মিঃ লেভিকে আমার নির্দেশমত একটি স্ক্রিন তৈরী করে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হন নি। এরূপ একটি স্ক্রীন তৈরী করে নেওয়া যে বেশ কঠিন কাজ তা নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। তবে এ কথাও উপলব্ধি করেছিলাম যে, কঠিন হলেও কাজটি একেবারে অসাধ্য ছিল না। স্ক্রিণ প্রস্তুতকারকরা আমার কথামত স্ক্রিনটি তৈরী করাতে রাজী না হওয়ায় আমি বাধ্য হয়ে মিঃ লেভিকে একটি ষাট ডিগ্রি ক্রশলাইন স্ক্রিন তৈরী করবার নির্দেশ দিলাম। এর কিছুদিন পরেই আমি খবর পেলাম যে তিনি সেটি নিজের নামে পেটেণ্ট করিয়ে নিয়েছেন।

'বৃটিশ ফেয়ারনেসের' এই সুন্দর দৃষ্টান্তটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—To the craft it matters little who gets the credit for a particular invention. What directly concerns them is the addition of a valuable resource to the equipment.

অর্থাৎ কোন একটি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি নতুন কিছু আবিষ্কার করে কে সুনাম অর্জন করল সেটি বড় কথা নয়। ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির সাথে আরও একটি মূল্যবান জিনিস সংযোজিত হল এটিই আসল কথা।

আমাদের স্বাধীন দেশে নিরপেক্ষভাবে ইতিবৃত্ত রচনার সময় যেদিন আসবে অর্থাৎ রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে সৃজন এবং মননের জগতে ভারতীয় মনীষীদের অবদানের কথা চিন্তা করার সময় যেদিন হবে, সেদিন আমাদের নতুন করে কতকগুলি কথা পৃথিবীর মানুষকে জানাতে হবে। সেদিন যেন আমরা সাহসের সাথে বলতে পারি মার্কনীর চেয়ে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব অনেক বেশী, উপেন্দ্রকিশোরের অবদান পাশ্চাত্যের তৎকালীন সমস্ত মুদ্রণ-বিশারদগণের চেয়েও অনেক বড়।

সত্য প্রেম

সুকুমার ভৌমিক

অনেক দিয়েছ তুমি
রিক্ত মোর ঝুলিখানি ভরে
তাই বারে বারে
তোমাকেই মনে পড়ে শুধু!
জানি আমি,—হারাবে না তোমার মধুর
স্মৃতি;
আমার হৃদয় হতে কোনদিনও সে সুধা
ভাণ্ডার—
যাবে না ফুরায়ে!
হে বন্ধু আমার!

হয়তো হবে না আর কোন কথা বলা
তোমার পরশ নিয়ে—
হয়তো হবে না এই জীবনের দীর্ঘপথ চলা!
তবু জানি হারাবে না,
প্রাণভরা সত্য ভালবাসা!
অনন্ত কালের বুকে নিত্য নিত্য তাহা
সোনার স্বর্গ শুধু করিবে রচনা!
প্রেম সত্য, মৃত্যুহীন, অনন্ত, সুন্দর,
ক্ষণিকের ব্যর্থতার কঠিন আঘাতে
সে তো কভু নহে হারাবার!

চিত্র : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

চির-আরাধ্যা সারদা মা

সুচরিতা সেনগুপ্তা

নর ও নারীর জীবনধারণের প্রয়োজন অভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন তারা দৈহিক গঠনে। মানসিক ও চারিত্রিক দিক দিয়েও কিছুটা বিভিন্নতা অনস্বীকার্য। নারীদের মাধুর্যে তারা মধুরা, কোমলা। মাতৃত্বের গৌরবে মহিমান্বিতা, মমতাময়ী। যে নারীপ্রাণ, মাতৃহৃদয় সকলের জন্য সমভাবে ব্যাকুল হয়, যিনি সেবাভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন তিনি নারীসমাজের আদর্শ, মানুষজাতির গৌরব। শ্রীসারদা মা ছিলেন এমনই একজন নারীশ্রেষ্ঠা।

সংসার অনিত্য। জীবন ক্ষণস্থায়ী। যৌবন ভঙ্গুর। সেকথা অবগত হলেও স্বার্থান্বেষী মানুষ ভোগস্পৃহায় সতত ব্যাকুল, মদমত্ত। ষড়রিপুর দাসানুদাস মানুষেরা মায়া ও স্বার্থের মোহে জীবনের সত্য ও শুভ্রতাকে ভুলে থাকে। বিশুদ্ধজ্ঞান ও প্রেমের অনন্ত অমৃতত্বের আস্বাদ থেকে বিরত হয়ে তারা বহু জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করতে থাকে। ঈশ্বর স্বরূপ মহাসত্য, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেমের নাগাল পায় না। দ্বন্দ্ব, হানাহানি ও অশান্তি-ভোগ,—তাদের প্রায় সকল কর্মেরই এই পরিণাম। এদের সুবুদ্ধি দান, ভালবাসা সহজ কর্ম নয়। স্বার্থত্যাগ ও সংযম প্রয়োজন। চিত্তের জাগরণ, ধর্মজ্ঞান ও সহনশীলতা থাকা চাই।

যিনি এহেন দুরূহকর্মে ব্রতী হয়ে সাফল্যলাভ করেন তিনি নির্দ্বিধায় অসাধারণ। তিনিই প্রকৃত মানুষ। সাধারণ অসাধারণে এই তফাৎটুকু স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ হয় বলেই আমরা তাঁকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়ে অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা জানাই। জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা করি। তাতে উপকার হয়। মানুষ বুদ্ধিজীবী। উপযুক্ত শিক্ষায় মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন শ্রীসারদামণি। নারীর জীবনে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় আর কিছুই নেই। রোমাঁ রোঁলা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন—

'The pilot and the guide for the needs of the new age.'

লৌকিক জীবনে এহেন জগদ্বিখ্যাত সাধক পতির পত্নীরূপ সারদামণির প্রয়োজন ছিলো। শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত সহধর্মিণী হবার ক্ষমতা আর কোন নারীর পক্ষেই সম্ভব হতো না। সারদামণি ছিলেন নারীশিরোমণি। ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়—

'To me it has always appeared that she is Sree Ramkrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood.'

কামিনী-কাঞ্চনে নিরাসক্ত সাধক-স্বামীর সম্মতিতেই তাঁর সম্মতি। স্বামীর ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা, চির আনন্দময়ী সারদা কামনা-আসক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত ছিলেন। ভোগবিরতির মহানির্বাণ বেদীমূলে প্রশান্তচিত্তা সাধিকা। নহবৎখানার নির্জন কুঠরিখানিই ছিল তাঁর দিবাযামিনী যাপনের সন্ন্যাসাশ্রম। স্বামীর আদেশ—'তুমি ওখানে থেকেই সাধনভজন করবে। তাতেই আমাকে লাভ করবে।'

সারদা শিরোধার্য করলেন দেহধারী দেবতার এই বর, আশীর্বাদ। সেখানে তিনি নিত্যানন্দের অমৃতসাগরে ডুবে থাকেন। ধ্যানে, মননে, নিদ্রায়, জাগরণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন—

ঠাকুর কীর্তন করতেন, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। হাত জোড় করে পেন্নাম করতুম। কি আনন্দই ছিল! দিনরাত লোক আসছে আর ভগবানের কথা হচ্ছে।'

মন না মত্তহস্তী। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়, খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্যে। দক্ষিণেশ্বরে কে বাঁশী বাজাতো। শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো! মনে হতো সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছিল—অমনি সমাধি হয়ে যেতো! আহা। বেলুড়েও কেমন ছিলুম। কি শান্ত জায়গাটি! ধ্যান লেগেই থাকতো।---

কামনাময় জগতে কামনা-বিরতি, দেবদুর্লভ সংযম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার চরম ও পরম অভিব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু—সংসার ভোগ করলেন না। যে কামিনী হতে পারতো সে হয়ে দাঁড়ালো জ্যোতিম্ময়ী জগদ্ধাত্রী। রতির পৃথিবীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন মূর্তিমতী বিরতিকে।—তিনি সারদামণির মধ্যে দেখেছেন চরাচরব্যাপ্তা ব্রহ্মময়ী মাকে, সারদা স্বামীকে দেখেছেন 'সর্বসারাৎসার পরমগুরু, ইষ্টসখা স্বামিরূপে।' ভক্তি ও শক্তির অপূর্ব মিলন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি। সারদামণি তাঁর পরমাশক্তি। এই সত্য উপলব্ধি করেই তিনি বলেছিলেন, 'ও সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে।' যে শিক্ষা দ্বারা অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা দূর করা যায়, তাই সরস্বতী, শক্তি। সারদা সেই শক্তির আধারস্বরূপা। সুতরাং তিনিই সে সরস্বতী। নিবেদিতার ভাষায়—

'In her own sees realised that wisdom and sweetness to which the simplest of women may attain. And yet, to myself the stateliness of her country and her great open mind are almost as wonderful as her sainthood.'

সারদা-যুগ বঙ্গনারীর পক্ষে কোনদিক দিয়েই অনুকূল ছিল না। 'পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে'। অবরুদ্ধতার যতগুলি গুরুতর প্রতিক্রিয়া সবই সে-সময় নারী-সমাজকে বিশেষভাবে জড়পীড়িত করে রেখেছিলো। অশিক্ষা এবং কুসংস্কার তার মধ্যে অন্যতম। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকন্যা এবং বধূ হয়েও তিনি কুসংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। স্বামীর শিক্ষায় শিক্ষিতা তপস্বিনী রমণীর তপস্যা সর্বাংশেই সফল হয়েছিলো। কন্যা-স্নেহার্তা মলিনমুখী ম্লেচ্ছা নারীকে গভীর স্নেহভরে কাছে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করেছেন 'তোমার কন্যার মঙ্গল হোক'।

সারদা মা

অল্প দিনের মধ্যেই কন্যাটি আরোগ্যলাভ করে ওঠে। 'নরেনের মেয়ে নিবেদিতা' তাঁর কাছে পরম আদরের ধন,—'একটি শুভ্রকুসুম,—যা দিয়ে শুধু দেবসেবাই করা চলে।'

সমদর্শিনী সারদা মা। গুণাগুণ বিচার করে অনুগ্রহ করেন নি। মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। তাঁর কর্মের জগৎ ছিল করুণারসের ধারায় অভিসিঞ্চিত। তাতে অবগাহন করেছে ত্রিতাপে জর্জরিত সংসারী মানুষ। তাদের সবার মা তিনি। অভয়দাত্রী সারদা মা। কাঠিন্য নেই, কপটতা নেই, নেই প্রবলতা। নির্মল নির্ঝরিণী-ধারায় ধৌত হয় সর্বকলুষগ্লানি। পাপাচারিণী রমণীর কণ্ঠবেষ্টন করে মধুর ভাষণে স্নিগ্ধ আশ্বাসে অনুতাপের জ্বালা ধুয়ে দিয়েছেন 'তোমার এই গ্লানির অশ্রু দিয়েই পাপতাপ ধুয়ে মুছে যাবে মা। দুঃখ করো না।'

ঠাকুর বলেছেন 'পাপকে ঘরে দেখো, পাপীকে নয়।' ঘরের মধ্যে সারদামায়ের কণ্ঠস্বর আবেগরুদ্ধ হয়ে উঠতো। ভক্ত শিষ্যের করুণ আকৃতির উত্তরে তাঁর অবিকম্প কণ্ঠ শোনা গেছে—'বাবা, ঠাকুর তোমার সন্ন্যাস রক্ষা করুন। তাঁকে সর্বদা স্মরণ করো। তিনি তোমার মনের সমস্ত ময়লা দূর করে দেবেন। ভয় কি।' দুলে বাগদীর মনের দুঃখ দূর করে দিয়েছেন মিষ্টবাক্যে, সহাস্যে, আহার্য দিয়ে। দরদভরা কণ্ঠে বলে উঠেছেন—'ওরে আমার হৃদয়ে যিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও যে তিনি! সমভাব ছাড়া অন্তর শুদ্ধ হয় না। দীনভাব ছাড়া গতি নেই।' বিতাড়িত ভিক্ষুককে অঞ্জলিভরে আহার্য দিয়েছেন মায়ের মমতায়। কোমল উপদেশ দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন 'কাউকেই বিমুখ করতে নেই। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।'

সারদা অভয়া। দস্যুতস্করে তাঁর ভয় নেই। বরঞ্চ তারাই মায়ের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছে। কৃপাভিক্ষা করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপাপাত্র গিরিশ সারদামায়ের মুখাবলোকন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আমার পাপনেত্র। মায়ের শুধু পাদবন্দনা করবো। মূর্তিদর্শন করার অধিকার আমার নেই।' প্রণামরত গিরিশের ভক্তি অশ্রুজলে মা সারদার পা দু'টি ভেসে গিয়েছিলো। ভারত-পথিকৃৎ মহাশক্তিধর পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তিনি 'জ্যান্ত দুর্গা মা'।

সারদা অদ্বিতীয়া। তার জীবন স্বামীর জীবনেরই পরম প্রকাশ। উভয়ের হৃদয় অভিন্ন। কর্ম ও চিন্তাধারা এক। সারদা মা স্বামীরই প্রতিচ্ছায়া প্রতিনিধি। মায়ের সকল আদেশ, উপদেশ, বাণী, উক্তি—শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিধ্বনি। 'পরম পুরুষের এক-একটিবাক্য বেদবাণী'। তাঁর সহধর্মিণী সারদা সেই বাণীর প্রতিধ্বনি—সর্বলোকব্যাপক ওঁকারের মত।

স্বর্গীয়, সমাহিত, মধুর ও ছন্দোময়। শাশ্বত এবং অবিনাশী। তাই তিনি বিবেকানন্দের জ্যান্ত দুর্গা মা। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। আমাদের চির-আরাধ্যা সারদা মা।

সেই দুপুর…সেই সন্ধ্যা…সেই রাত্রি

(শেষাংশ)

বিজনের রেখে যাওয়া সিঁদুরের প্যাকেটটা বাক্সে তুলে, ছোট আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায় মায়া, এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে চুলটা সরায়।

ঘুমে, জাগরণে সোনার স্বপ্ন তরণীতে ভেসে কেটে গেল প্রায় একটা সপ্তাহ। ব্যস্ত হোয়ে যতীর মাও দিনক্ষণ দেখাচ্ছেন, শ্রাবণ মাসের দিন তো আর বেশী নেই। সেদিন সকালে বাড়ীতে এসে দাঁড়ালেন বড় গোঁসাই। ছুটে গিয়ে মোড়াটা এনে পেতে দেয় যতী তাঁকে বসতে। বসেন না তিনি।

গম্ভীর হুঙ্কারে বলেন,—মা কোথায়?

সাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসছিল যতীর মা, মঙ্গলাও।

আবার হুঙ্কার তোলেন,—আর ডাকো সেই সর্বনাশী পিসীকেও।

যতীর মা আর মঙ্গলা ঘোমটা টেনে এসে কাছে বসে।

তাদের দেখেই তিনি দুর্জয় ক্রোধে ফেটে পড়েন,—কোথায় সে সর্বনাশী, রাক্ষুসী? আমার ছেলে খাবার সাধ, বামন হোয়ে চাঁদ ধরতে চায়?

আধঘোমটায় মুখ ঢেকে ক্ষীণ-কণ্ঠে যতীর মা বলে,—কে বাবা, মায়া? কি কোরেছে সে?

গর্জন তোলেন বড় গোঁসাই,—করার বাকি কি? আমার সে জাত কুল খেতে চায়। আমার অমন বংশগৌরব হীরের টুকরো ছেলে, তাকে এমন কোরে রূপ দেখিয়ে ভুলিয়েছে যে, সে আমায় চিঠি দিয়েছে যে ও ছাড়া আর কাকেও সে বিয়ে কোরবে না, ও না হোলে জীবন তার ব্যর্থ হোয়ে যাবে? অতো বড় ডাক্তার, যার মেয়ের জন্যে আমার পায় ধরে সাধছে। আর ওই কলঙ্কিনী সর্বনাশীর এত বড় স্পর্ধা ও তার পানে হাত বাড়ায়? তোমরা না তার অভিভাবক, ঘুমিয়ে থাক না এ ষড়যন্ত্র তোমাদেরও?

ঘরের ভেতর ঝাঁট দিচ্ছিল মায়া, ঝাঁটা ফেলে বিছানায় বসে পড়ে,—চিঠি দিয়েছে তবে বিজন, তাই এ অগ্নিকাণ্ড।

এর পর সবাইকে জড়িয়ে যা অকথ্য গালিগালাজ বর্ষিত হোতে থাকে অজস্র ধারায়, মায়ার কানে তা তপ্ত সীসা ঢালে। দু'হাতে সে কান চাপে।

স্তব্ধ স্তম্ভিত হোয়ে থাকে সামনের তিনটি প্রাণী।

খোকা চৌধুরী

যতীশের পানে তীব্র চোখে চান বড় গোঁসাই,—যত আঁস্তাকুড়ের ময়লা এনে জড়ো কোরেছ ঘরে, আজই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো, নইলে তার শাস্তি থেকে তুমিও বাদ যাবে না। আজই যদি ও পাপ না বিদেয় করো, জেনে রেখো কাল সকালে তোমাকেও এখানের বাস তুলতে হবে। আমি বড় গোঁসাই,—জেনো কেউটের ল্যাজে পা মাড়িয়ে প্রাণে বাঁচা যায় না।

ধীরস্বরে যতীশ বলে,—বিজনকে আপনি চেনেন, সে যদি ইচ্ছে করে ওর সাধ্যি কি বাধা দেয়।

গর্জে ওঠেন বড় গোঁসাই,—'সাধ্যি কি? যাদুকরী ছোট থেকে মায়াজাল বিছিয়েই তো গ্রাস কোরেছে ছেলেটাকে। ওকে আজই তাড়াও।

আবার শান্ত নম্রকণ্ঠে যতীশ বলে, ওর কেউ নেই, ছেলেমানুষ কোথায় যাবে?

চুলোয়, ও সব মেয়ে যেখানে যায়।

একটু চিন্তা করুন, অসহায়কে দয়া করুন, আপনি বুঝিয়ে বলুন বিজনকে।

যতীশের কণ্ঠে মিনতি ঝরে।

দয়া কোরব, আজ রাতের মধ্যেই বিয়ে কোরে চলে যাক, যদি যাবার স্থান কোথাও না থাকে, আমার বাড়ীর সরকার তিনকড়ি দাস, আমি বলছে এখুনি রাজি হবে।

চমকে ওঠে যতীশ,---এ ঐ বুড়ো হাঁপানী রোগী---

ভেংচে ওঠেন বড় গোঁসাই, ও ছোঁড়া নইলে বুঝি ওঁর ঘর করা চলবে না? তবে পথে তাড়াও অনেক ছোঁড়া লুফে নেবে।

হাউ হাউ কোরে কেঁদে যতীর মা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে,—আমরা কিছুই জানি না বাবা, বিজন যে এমন কোরবে—ছোট থেকে ভালবাসি মেয়েটাকে, ভেবেছিলাম ছেলের বউ কোরে নেবো, এমন হবে কিছু জানি না।

এবার যেন কিছু প্রকৃতিস্থ বড় গোঁসাই, মোড়াটায় বসে নামাবলীতে কপালের ঘাম মোছেন,—তবে তাই কোরেই নাও, সত্যি, হাতের কাছে যতীই তো ছিল সে কথা মনে হয়নি, সেই সবচেয়ে ভাল হবে। তবে বিয়ে হবে আজ রাতেই। ও ছোঁড়া লিখেছে তিন দিনের মধ্যে আমার উত্তর না পেলে, ও এসে ওকে নিয়ে চলে যাবে, তখন ওকে আটকাবার পথ থাকবে না। আর বামুনের জাত-কুল খেয়ে তোমরাও অভিশপ্ত হবে।

ক্ষীণকণ্ঠে যতীর মা বলে, আপনি যা বোঝেন তাই হোক।

তোমরা তবে প্রস্তুত থেকো; রাত দশটায় বিয়ের সব আয়োজন নিয়ে আসবো, আমিই পুরোহিত হোয়ে বিয়ে দিয়ে যাব।

●

আদেশ ঘোষণা কোরে চলে গেলেন তিনি।

সারাদিন বিছানায় পোড়ে রইল মায়া, হতচেতন, যেন এ জগতে নেই সে। মুখে জল দিলে না একবিন্দু।

আলো হাতে কে যেন ঘরে ঢোকে। দীর্ঘ ছায়াটা গায়ে পড়তে চমকে উঠে বসে—কে?

আমি।

নীচু গলায় সাড়া দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় যতীশ।

মুখ ফিরিয়ে নেয় মায়া, কি চাও? খাঁচা এনেছো, বিদেয় কোরতে?

সারাদিন কিছু খাও নি, একটু সরবত এনেছিলাম।

ফেলে দাও, বিয়ের দিনে উপোস দিতে হয়।

কঠিন রুক্ষ কণ্ঠ মায়ার।

বড় গোঁসায়ের কথা তো সবই শুনেছো, এতে রাজি তুমি?

না।

তবে তুমিও বিজনকেই---?

হাঁ।

ওঃ, এ বিয়ে তবে তোমার সত্যিই ---বিজন একাই শাস্তি পাবে না?

সমস্ত হৃদয় কণ্ঠে এসে কাঁপছে যতীশের মায়ার উত্তরের তীক্ষ্ণতায়।

তোমার কি তা একেবারেই অজানা? তবু এ লোভ ছাড়া আর কি বলব?

তার জ্বলন্ত চোখ থেকে মুখ ফেরায় যতীশ,--- লোভী ভাবছো? ভাগ্যহীন আমি, সামনে প্রলোভন ধরলে যদি লুব্ধ হই সেটা কি খুব বেশী অপরাধ? কেন, তা কি একটুও ভেবে দেখবে না? কিন্তু আমি যদি হাত সরিয়েই নিই, তুমি বাঁচবে কি কোরে? মুখ যে ফিরিয়ে।

স্বামীর স্ত্রীকে কেউ জোর কোরে ছিনিয়ে নিলে মৃত্যুই বন্ধু তার, গোঁসাই-পুকুর ভরসা আছে।

বিজনের স্ত্রী তুমি হওনি এখনও, তবু সব দিক বাঁচাতে আমায় বিয়ে কোরতে হোলে তুমি মরবে, তবু—

তবু ব্যভিচারিণী হওয়া যায় না।

মায়া---

হ্যাঁ, ভগবান সাক্ষী রেখে সে যে তার সীলমোহর ছেপে রেখে গেছে, একে কি মোছা যায়? দেখো তার কীর্তি?

হু-হু কোরে কেঁদে ফেলে চুলটা সরিয়ে দেয় মায়া, দেখা যায় বিজনের আঁকা রক্তরেখা। বিমূঢ় যতীশ আবিষ্ট চোখে একমুহূর্ত চেয়ে থাকে অপলকে।

পরক্ষণে ব্যাকুলকণ্ঠে বলে, এখন উপায়, সে ছাড়া কে আর তোমার বাঁচাবে তবে?

বাঁচাবে তুমি।

আমি-- ?

দু'হাতে তার হাতখানা চেপে ধরে মায়া, হ্যাঁ, তুমি শুধু আমায় তার কাছে পৌঁছে দাও যতীশ, তারপর যা করার সেই করুক।

সেই ভাল, যা করার সেই করুক, কিন্তু তাহলে এখুনি ওঠো, সাড়ে সাতটায় ট্রেন, স্টেশনে হেঁটে যেতে হবে তিন মাইল।

উঠে দাঁড়ায় মায়া,---'হেঁটে না, তোমার সাইকেলে, যদি বলো ছেলে হোয়ে যেতে পারি।

এত ভয়ে দুঃখেও মৃদু হাসে যতীশ,---সাইকেলে? অনেক দিন পরে।

রাতের অন্ধকারে, এক বস্ত্রে নিঃশব্দে পালালো ওরা, দুটো সংসার-অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে, শ্বাপদ-তাড়িত হরিণের মত সভয় ক্ষিপ্রতায়।

●

কোলকাতার বড়বাজারে মশলার দোকান সিদ্ধেশ্বর দত্তের, যতীশের পিসতুতো ভগ্নীপতি। দুটি ছেলে রেখে পিসতুতো দিদি মারা গেছে অনেক দিন। ছেলেরা বড় হোয়েছে, তাদের এখন বউ ছেলেমেয়ে, সিদ্ধেশ্বরের বয়েস প্রায় ষাট, দেশে যায় মাঝে মাঝে, বেশীর ভাগ এখানেই থাকে। সামনে দোকান, পিছনে একখানা ঘরে নিজে রেঁধে খায়, থাকে। যতীশকে খুব ভালবাসে। সে কলেজে পড়ত এই ভগ্নীপতির কাছে থেকেই।

মায়াকে এখানে এনেই তুললো সে, সিদ্ধেশ্বরকে খুলে বলল সব। সঙ্গে সঙ্গে মায়াকে বিজনের কাছে নিয়ে যেতে সাহস হোল না। পালিয়ে আসায় গোলমাল একটা হবেই। চতুর বড় গোঁসাই নিশ্চয় বুঝবে তারা কোথায় কার আশ্রয়ে ছুটেছে। তখন এতক্ষণ সে ছেলের বাড়ীর কাছে চর পাঠিয়েছে ঠিক, তারা গেলেই ধরা পড়বে। কাজেই দুটো দিন গা ঢেকে থেকে, সুযোগ বুঝে তার কাছে যেতে হবে।

মায়াও তাই রাজি হোল, সিদ্ধেশ্বরও বলল।

রাত্রি দশটায় এসে সব জানলেন বড়গোঁসাই। বুঝলেন কার ডানার তলায় আশ্রয় নিতে এ পলায়ন। তৎক্ষণাৎ এক চিঠি লিখে বিশ্বস্ত এক অনুচর পাঠালেন ছেলের কাছ, দিলেন আরও কিছু ইঙ্গিত।

পিতার চিঠিতে জানলো বিজন--তার ও মায়ার বিয়ের কথা বলতে যতীর মার কাছে সেদিন রাত্রে তিনি গেছলেন। গিয়ে শোনেন, তার কিছু আগেই যতীশ আর মায়া গোপনে পালিয়েছে কোথায় কেউ জানে না। খোঁজ করছেন, সন্ধান পেলে উপযুক্ত

নওই দেবেন। তবে পেলেও তাকে গৃহলক্ষ্মী কোরে তো আর ঘরে তুলতে পারেন না। মনে যাদের এই পাপ ছিল, সেটা বিয়ের পরে না হোয়ে যে আগেই ঘটেছে সেজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ।

যে লোক এসেছিল সে সালঙ্কারে শোনাল তাদের পলায়ন-কাহিনী, দেশের হৈ-চৈ-এর কথা। কে জানে বিজন শুনলো কি শুনলো না—তার বর্ণনা বকে বকে শেষে বিদায় নিলে। তারপর? তারপর এলো সেই রাত্রি, কালোর কালো কোরে সারা বিশ্বভুবন। বাপের চিঠি পড়ে সেই যে সিঁদুর-রাঙা মুখে দু'হাতে চুল মুঠো কোরে বসে রইল বিজন, সারাদিন তাকে ওঠাতে বা কিছু মুখে দেওয়াতে পারলে না তার চাকর নন্দ। একটা দু'কামরা ঘর ভাড়া কোরে এই চাকর নিয়ে থাকতো বিজন।

পরের সারাটা দিনও কাটলো সামান্য কিছু মুখে দিয়ে, বিছানায় পড়ে। সন্ধ্যেয় পড়েছিল বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হোয়ে।

পিঠে হাতের ছোঁয়ায় চমকে চেয়ে, তীরের মত উঠে বসে,—কে?

বিছানেতেই বসে যতীশ,—খবর পেয়েছো বাড়ী থেকে নিশ্চয়ই, খুব ভাবছো তো?

তুমি,—তুমি এসেছো আমার কাছে? আমার এত বড় সর্বনাশ কোরে সামনে এসেছো কোন লজ্জায়?

সর্বনাশ হয় নি বিজন, তবে হোত, মায়াকে এনেছি, এবার যা করার তুমি করো।

ওঠে বিজন,—তীব্র চিৎকারে কোরে আমি কে, যা কোরেছ তুমি তাই করো গে। আমার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হোল না নির্লজ্জ?

কি বলছো বিজন, কি শুনেছো? আগে শোন আমার কথা।

না, না, না, একটা কথাও শুনতে চাই না তোমার। এক্ষুণি চলে যাও, জীবনে আর ওমুখ দেখিও না আমায়। যদি দ্বিতীয়বার দেখি, তোমায় আমি—আমি— হাঁকিয়ে বিজন থেমে যায়।

শান্তকণ্ঠে যতীশ বলে,—কি তুমি কোরবে বিজন?

তোমায় হত্যা কোরব। তুমি যাবে কি না, না পুলিশ ডাকতে হবে?

চোখে জল আসে যতীশের,—না, নিজেই যাচ্ছি, কিন্তু মায়া, তার কি হবে? সে যে নিঃশ্বাস বন্ধ কোরে অপেক্ষা কোরছে, কতক্ষণে তোমার কাছে এসে নির্ভয় হবে। একটিবার তাকে আসতে দাও তোমার কাছে, দুটো কথা শোন তার।

না, যে নরকে শয্যা পেতেছে কলঙ্কিনী, তাই তার অক্ষয় হোক।

তুমি কোন কথাই শুনবে না? তোমার বাবা—

চুপ, সে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নাম ওমুখে উচ্চারণ কোর না শয়তান, জিভ ছিঁড়ে ফেলবো।

এর জন্যে তোমায় দুঃখ পেতে হবে বিজন।

আজকের চেয়ে বেশী নয়।

তা হলে মায়ার জন্যে কোন ন্যায় বিচারই কোরবে না তুমি; সে যে তোমার জন্যেই সব আশ্রয় ছেড়েছে।

আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে। দু'দিনেই এত অরুচি ধরে গেল, তাই নিজের পাপ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে সাধু সাজতে এসেছো? দূর হও কাওয়ার্ড, স্কাউণ্ড্রেল।

আবির ঢালা আরক্ত মুখ, মুষ্টিবদ্ধ হাতে জ্বলতে থাকে বিজন।

লাথি-খাওয়া কুকুরের মত কালি-ঢালা মুখে যতীশ ফিরে এলো মায়ার কাছে। সিদ্ধেশ্বরের ঘরে।

ছুটে কাছে আসে মায়া,—আমার বুঝি ও এখুনি যেতে বলেছে যতীশ, তাই তোমার এত মন খারাপ হোয়ে গেল?

না, তোমায় চিরদিনের মত বিদায় দিয়েছে সে।

চমকে ওঠে সিদ্ধেশ্বর—তার মানে?

কম্পিত শরীরে বিবর্ণমুখে মাটিতে বসে পড়ে মায়া।

ধীরে বলে যতীশ, বিজনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার।

মায়ার চোখের জলে মাটি ভেজে, অনেকক্ষণ কেটে যায় স্তব্ধ নীরবতায়।

নিঃশ্বাস ফেলে সিদ্ধেশ্বর বলে,—এবার তবে কোন নরকে যাবে তোমরা?

যতীশ বলে,—আপনার ঘাড়ে আর কতদিন চলবে, অন্তত বাঁচার মত একটা কিছু কাজ তো জুটিয়ে নিতে হবে আমায়, দেশে ফেরার পথ তো আর আমারও রইল না? তারপর মাকে, মায়ার পিসীকে আনবো, মায়া যেমন ছিল তেমন আমাদের কাছেই থাকবে।

মাথা নাড়ে মায়া,—না, আর তেমন হয় না যতীশ। অপরাধ তুমি তো কিছু করো নি। তুমি সংসার কোরে সুখী হও, আমি তাতে আর আগুন জ্বালবো না।

তীব্রকণ্ঠে যতীশ বলে,—আর তুমি, তুমি কি কোরবে, মরবে? কার জন্যে, ওই ইতরটার জন্যে, কেন? যে তোমার জন্যে বিন্দুমাত্র ভাবলো না, কলঙ্কের বোঝা মাথায় দিয়ে স্বচ্ছন্দে সরে দাঁড়াল, তার দেওয়া ওই রাঙা গুঁড়োটার মোহ তুমি ছাড়তে পারবে না কেন, কেন নতুন কোরে তা পরবে না?

ঝরঝর কোরে চোখের জল ঝরে পড়ে মায়ার,—তুমি তা বুঝবে না যতীশ, তুমি মেয়ে নয়। রাঙা গুঁড়োর সংস্কার যদি ছেড়েও দিই, এ দেখ আমি তুলে দেবো কার হাতে বলো, এতে যে তার স্পর্শ লেগে আছে, তাকি মুছতে দিতে পারি?

স্তব্ধ নির্বাক দু'টি পুরুষ, এ অসহায়তার যন্ত্রণায়।

সিদ্ধেশ্বর বলে,—অভিনয় কোরতে পারবে মায়া?

অভিনয়?

হ্যাঁ, তোমায় আশ্রয় দিয়ে আমার ঘরেই রাখতে পারতাম, কিন্তু—

পায়ের ওপর উপুড় হোয়ে পড়ে মায়া,—তাই একটু দিন জামাইবাবু, আপনার ঘরে কাজের লোকেরও তো

দরকার হয়? নইলে পথ ছাড়া কোথায় আমার গতি? সে পথও যে আমি চিনি না।

অমন সোজা পথে হোলে তোমায় তা বলতে হোত না, তাই বলছিলাম অভিনয় কোরতে পারবে? কি বলব আমার লজ্জার কথা, আমার বড় ছেলে মাতাল, চরিত্রহীন। বউমার আমার বড় দুষ্ট। সইতে পারি না তাই এখানে পড়ে থাকি। তাই বলছিলাম, যতীশের সম্পর্ক ধরে তো জামাইবাবুই ডাকছো। যদি মনে না ধরে কথাটা বলে ক্ষমা কোর। যদি অভিনয় কোরতে পারো—

স্থিরস্বরে মায়া বলে,—বলুন।

চলো আমার ঘরে এই ষাট বছরের বুড়োর স্ত্রী সেজে, আমার ছেলেদের মা হোয়ে। ছেলেদের কাছে, দেশের-দশের কাছে তোমার আশ্রয় হবে নিরাপদ, অধিকার হবে সম্মানের। ভগবানের নামে শপথ, এ বুড়ো হোতে তোমার কোন ভয় নেই। শুধু দুটো ভাত-জল দিয়ে কিছুদিন বুড়োটাকে বাঁচিয়ে রেখো যাতে তোমায় আগলে রাখতে পারি। চুলের পাশের সিঁদুর তোমার অক্ষয় থাক ভাই, কেবল লোক-চক্ষে ফাঁকি দিতে সাজানো সিঁথেয় একটু সিঁদুর নিজের হাতে লাগিয়ে নিও।

পায়ের ওপর মাথা রাখে মায়া অজস্র চোখের জলে ভেসে,—জানলাম পৃথিবী থেকে আজও দয়া ফুরিয়ে যায় নি জামাইবাবু, অসীম দয়া আপনার।

কি হে যতীশ, চুপ কেন, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিলাম ভাবছো?

ম্লান হাসে যতীশ,—আপনাদের সিদ্ধান্তের মাঝে আমার স্থান তো কোথাও নেই আর।

আহা রাগ কোর না হে, বুড়ো হলে দয়া কোর। বিপদে ডাকলে যেন সাড়া পাই। চলো মায়া কালই আমরা কৃষ্ণনগরে রওনা হই।

সেই রাতে ক্ষোভে, রোষে, ঘৃণায় ক্ষিপ্ত বিজনের জগৎ থেকে মুছে গেল যতীশ-মায়া।

পরদিন সকালে চিঠি পোস্ট কোরল বাবাকে,—ডাঃ ভট্টাচার্যের মেয়েকে বিয়ে কোরতে আপত্তি নেই আমার, যদি তিনি সাতদিনের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা কোরতে পারেন আর—আর একমাসের মধ্যে বিলেত যাবার। বিয়ে কিন্তু আমার কোলকাতায় হবে, দেশে নয়।

হাতে স্বর্গ মিললো উভয়পক্ষেরই, সবই হোল তার ইচ্ছেমত।

●

দেশে আর পদার্পণ করেনি বিজন। বিলেত থেকে ফিরে বুকজোড়া নাম আর দেশজোড়া খ্যাতি, ঘরভরা ঐশ্বর্য নিয়ে কাটতে লাগলো বছরের পর বছর।

বছর দুই আগে তার সূর্যৈশ্বর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে, পুত্রের গৌরবে গর্বান্বিত পিতা, বলে গেলেন তাকে নিজের মৃত্যুশয্যার পাশে ডেকে মায়াকে তাড়াবার তাঁর চাতুর্যের কথা। তাই তো আজ বিজনের এত নাম, এত সুখ? বুকের চিতা চিরদিনই জ্বলেছে, তবু তার মাঝেও ছিল নিজের পৌরুষের একবিন্দু অহঙ্কার—বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধু আর কলঙ্কিনী প্রেয়সীর উচিত প্রাপ্যই সে দিয়েছে। কিন্তু এর পর আর রইলো না তার মুখ লুকোবার একবিন্দু স্থানও এই বিশাল পৃথিবীতে, বিষ হোয়ে গেল সমস্ত জীবন। কোলকাতার সব ঐশ্বর্য ফেলে পালিয়ে এলো এখানে, এই ছোট্ট শহরে।

দিন পনের আগে কোথা থেকে একটা লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল। নাম-ঠিকানা ছিল না, স্বাক্ষরের জায়গায় লেখা ছিল,—যতীশের পিসতুতো মৃত দিদির স্বামী। আর ভেতরে লেখা ছিল, সেই মর্মান্তিক রাত্রে বিজনের কাছ থেকে অপমানিত যতীশের ফিরে আসা থেকে, মায়ার তার কাছে আশ্রয় পাওয়ার সমস্ত কাহিনী অকপটে।

শেষে ছিল লেখকের একটুখানি বক্তব্য,—পঁচাশী বছর প্রায় বয়েস আমার—রুগ্ন, মৃত্যুশয্যায়। আবার মায়াকে অসহায় অবস্থায় ফেলে যাচ্ছি। যদি পারে এখানে থাকতে তার ব্যবস্থা আমি কোরেছি। যদি না পারে তুমি শুধু তার কোথাও একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা কোরে দিও। মায়ার নিষেধে নাম-ঠিকানা দিলাম না। আমার মৃত্যুর পর যদি দরকার হয় যতীশই তা জানাবে তাকে অনুরোধ কোরেছি। তোমার জিনিষ তোমারই রইল ভাই, আমি শুধু গচ্ছিত রেখেছিলাম। আর তোমায় বলি ভাই,—হায় বাইশ বছরের যৌবন, দেখো কি কোরেছ।

বিজন?

কি বোলছে মায়া বলো, দাও কি দণ্ড দেবে আমায়, এই তো আমি তোমার কাছে এসেছি?

কেমন কোরে ভুলে গেলে বিজন সেই দুপুর—সেই সন্ধ্যা—সেই রাত্রি? আমি কেন পারলাম না? দেখেছো,—ভাল কোরে দেখেছ নিষ্ঠুর দেব আমার কৌমার্য বরন কোরছে আজও যে তোমারি জন্যে। যে কলঙ্ক তুমিই দিয়েছিলে, আজ তা মোচন হোল তোমারই হাতে। আর যে পারছি না বিজন, তোমার অকল্যাণ কোরে আমার শাঁখা, সিঁদুরগুঁড়া জোর কোরে কেড়ে নিচ্ছে। আমার প্রাণ থাকতে তা দেবো না। জামাইবাবুর বড় ছেলের যত লোভ ছিল আমার 'পরে, পূর্ণ হয় নি তা বাপের ভয়ে, আজ—উঃ, আজ সে আক্রোশ হোয়ে ঝরে পড়ছে কিল, চড়, লাথিতে—ওই যা, ভেঙ্গে গেল ডান হাতের শাঁখাটা—পারছি না—আর পারছি না, বিজন আমায় রক্ষে করো,—উঃ, কি ভীষণ লাথিটা পড়ল পেটে—কি যেন ফেটে গেল, লিভার কি—?

থেমে গেছে জল ঝড় অনেকক্ষণ, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে চলেছে চাঁদের লুকোচুরি। আর কতক্ষণ অপেক্ষা কোরবে ভিখু?

●

দোর ঠেলে উঁকি দেয়, কাছে আসে। তার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় হাসপাতালে।

ছুটে আসে ডাঃ গোস্বামীর দু'জন সহকারী ডাক্তার, নার্সেরা, ভেঙে

আসে সমস্ত হাসপাতাল,—কি হোল, কেন হোল, হঠাৎ অজ্ঞানের কারণ কি ? স্ট্রোক, না আর কিছু ?

নানা প্রশ্ন সবার মুখে। এলো মনীষাও।

টেবিলে শায়িত ডা: গোস্বামীর পরীক্ষিত এক বিচ্ছিন্ন নারীদেহ, শাড়ীর আঁচলটা টেনে চাপা দেওয়া।

তারই পাশে টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে, ডা: গোস্বামী। ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে যায় ডা: রায়।

ভয়ে, বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ কোরে ওঠে,—হি ইজ ডেড। ডঃ গোস্বামী মৃত। তিনি কব্জির শিরা কেটে দিয়েছেন।

এতক্ষণে সবার দৃষ্টি পড়ে পাশের মেঝেটায়,- - - হাত থেকে ঝরে পড়া রাঙা রক্তের ঢেউ খেলছিল সেখানে, এখন জমাট বেঁধে কালচে হোয়ে এসেছে। মৃত্যু হোয়েছে অনেকক্ষণ।

॥ সমাপ্ত ॥

কফি
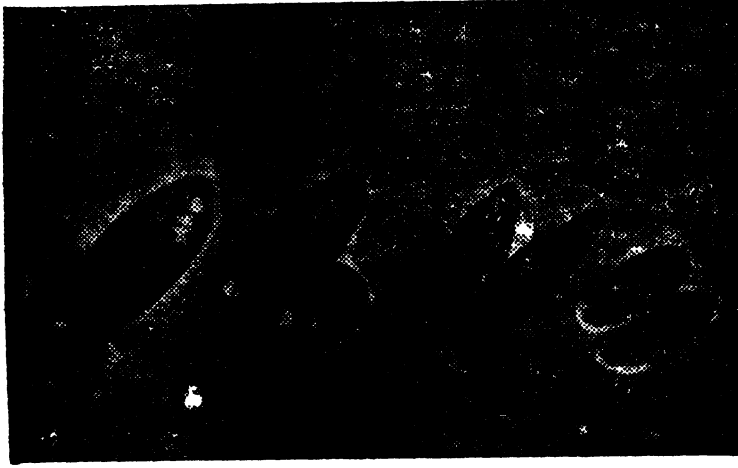
কফির বীজ

পানীয় হিসাবে কফির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত কিন্তু এর উৎপত্তি বা ইতিহাস এসব অনেকের কাছেই অজানা। কফি কিন্তু পানীয় হিসাবে আবিষ্কার হয় নি, হয়েছিল খাদ্যহিসাবে। প্রাচীনকালে মানুষ কফির বীজগুলি গুঁড়ো করে চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে পিঠে তৈরী করে খেতো। অনেকে বলেন কফির উৎপত্তি নাকি নবম শতাব্দীতে—আরবীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে। অনেকের মতে কফির প্রচলন ছিল আরো আগে মিশরীয়দের মধ্যে। ভারতবর্ষে অবশ্য এর প্রচলন হয়েছে ১৬০০ খৃীস্টাব্দে। এ সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। বাববুদান নামে জনৈক মুসলমান তীর্থযাত্রা শেষ করে মক্কা থেকে ফেরার পথে অনেক যত্ন করে সাতটি বীজ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এই বীজ থেকে যে গাছ হয় তা' থেকে নাকি খাদ্য ও পানীয় দুইই পাওয়া যেতে পারে—দেশে ফিরে বীজগুলো তিনি যত্ন করে রোপণ করেন নিজের বাড়ীতে। এগুলো নাকি কফিরই বীজ।

কফির গাছগুলো ১০ থেকে ১৫ ফুট লম্বা হয়। তবে সময়মত ছেঁটে দিয়ে গাছগুলোকে ৬ ফুটের বেশী লম্বা হতে দেওয়া হয় না। পাতাগুলো

উদিতা চৌধুরী

৩ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা। কফির ফুলগুলো ছোট ছোট সাদা রঙ-এর। ফুল থেকে ফল হয়। প্রত্যেকটি ফলের মধ্যে থাকে দুটি বীজ। বীজগুলো একদিকে গোল আরেকটা দিক চ্যাপটা।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই কফি ভালো হয়। এর জন্যে দরকার গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া—বৃষ্টিপাত বছরে গড়ে অন্তত ৬০ থেকে ৮০ ইঞ্চি। উঁচু পাহাড়ী এলাকায় কফি ভালো জন্মে। বড় গাছের ছায়ায় চারাগুলো প্রথমে রোপণ করা হয়। মার্চ ও এপ্রিল—এই দুই মাস বৃষ্টিপাত অবশ্যই দরকার। ভারতবর্ষ ছাড়াও ব্রাজিল, কলম্বিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, মেক্সিকো, কোস্টারিকা, মাদাগাস্কার প্রভৃতি যায়গায় প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ কফি উৎপন্ন হয় তার ৭০ শতাংশ আসে ব্রাজিল থেকে, ২৫ শতাংশ আসে আফ্রিকা থেকে, আর ভারতবর্ষ থেকে আসে ১ থেকে ১৷৷ শতাংশ। ভারতবর্ষের মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরালা—এইসব অঞ্চলেই বেশীর ভাগ কফি উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে মহীশূরই প্রধান। ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩২০ হাজার একর জমিতে কফির চাষ করা

কফির ফুল

হত—উৎপাদন ছিল বছরে ৭৩ হাজার টন।

মার্চ ও এপ্রিলে বৃষ্টি হয়ে যাবার পর কফির ফুলগুলো ফুটতে সুরু করে। সাত মাসের মধ্যেই ফুল থেকে ফল হতে আরম্ভ করে। ফলগুলো পেকে হয় টকটকে লাল হয়ে এলে তুলে আনা গাছ থেকে। কফি তৈরী দু'ভাবে হয়ে থাকে। 'আর্দ্র পদ্ধতি' বা ওয়েট প্রসেস আর 'শুষ্ক পদ্ধতি' বা ড্রাই প্রসেস।

ফলগুলোকে জলে সিদ্ধ করে মণ্ড তৈরী করা হয় তারপর শুকিয়ে গেলে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। 'শুষ্ক পদ্ধতিতে' কফির ফলগুলো রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নেওয়া হয়। তারপর বীজগুলো আলাদা করে নেওয়া হয়। কফি বীজের মধ্যে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, তেল ও চর্বি জাতীয় উপাদান, প্রোটিন ও কিছু ভিটামিন। তা ছাড়া উত্তেজক পদার্থ ক্যাফিনও রয়েছে এর মধ্যে। এককাপ কফির মধ্যে ক্যাফিন রয়েছে প্রায় ১॥ গ্রেন। কাঁচা অবস্থায় কফিতে কোন গন্ধ নেই। বীজগুলোকে ভাজার পর কিছুটা লালচে রঙ হয়ে এলে তা থেকে কফির গন্ধ পাওয়া যাবে। তাপ প্রয়োগের ফলে এর মধ্যে একটা জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে—যার ফলে এ থেকে কতকগুলো উদ্বায়ী গ্যাস বেরিয়ে আসে, আর এই হোল মূল কারণ কফির সুন্দর মনমাতানো গন্ধের জন্য।
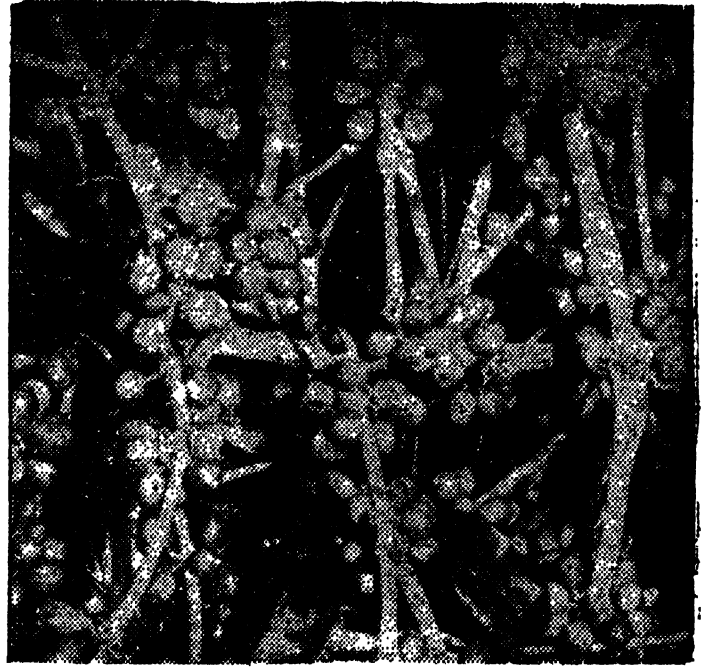
কফির ফল

বাল্মীকি-রামায়ণ প্রশস্তি-

আশালতা সেন

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥
রাম রামেতি রামেতি কূজন্তং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্॥

●

রাম রঘুবর যিনি লক্ষ্মণ অগ্রজ সীতাপতি
ককুৎস্থের বংশধর, কৃপাময়, সুন্দর মূরতি।
গুণনিধি, বিপ্রপ্রিয় ধর্মশীল সতত যে জন,
রাজেশ্বর সত্যসন্ধ, শান্তমূর্তি শ্যামল বরণ॥
বন্দি সে লোকাভিরাম দশরথ নৃপ তনয়েরে,
বন্দি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাবণ-অরাতি রাঘবেরে॥
রাম, রাম, রাম রবে কবিতা শাখায় বসি যাঁর।
মধুর কূজন, সেই বাল্মীকি কোকিলে নমস্কার॥

বাল্মীকি-রামায়ণ

আদিকাণ্ড সারাংশের অনুবাদ

বাল্মীকি ও নারদ

(সর্গ—১)

তপস্যা স্বাধ্যায়রত শ্রেষ্ঠতম সর্ববেদবিদে
বাল্মীকি তাপসবর সুধালেন দেবর্ষি নারদে,
সদ্‌গুণেতে ভূবিখ্যাত গুণি-শ্রেষ্ঠ হন কোনজন
ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ যিনি, দৃঢ়ব্রত সত্যপরায়ণ॥
সর্বভূত হিতে রত সতত উদার ব্যবহার
কে সে প্রিয়দরশন, কে বদান্য বীরত্ব আধার॥
ক্রোধজয়ী কে মহান্ ধৈর্যশালী অসূয়া রহিত
রোষাবিষ্ট হলে কেবা দেবতাও হন ভয়ে ভীত॥
ত্রিভবন সংরক্ষণে কে সমর্থ, কেবা সে উদার
প্রজা-অনুগ্রহে রত গুণ আর সম্পদ আধার॥
আশ্রিতা সমগ্র রূপে কার লক্ষ্মী, কে নর-প্রধান
অনিল - অনল - সূর্য - ইন্দু - ইন্দ্র - উপেন্দ্র সমান।
দেবর্ষি, বাসনা মম তব পাশে শুনিতে সে কথা
শকতি রয়েছে তব জানিবারে তাঁহার বারতা॥
বাল্মীকির বাক্য শুনি ত্রিকালজ্ঞ নারদ তখন
কহিলেন প্রত্যুত্তরে বাল্মীকিরে করি সম্বোধন
বহু সুদুর্লভ গুণ-কীর্তন করিলে তুমি এবে

দুর্লভ এ নরলোকে এত গুণ একাধারে ॥
দেবতাগণেও নাহি এত গুণ করি নিরীক্ষণ
আছেন তবুও নরচন্দ্রমা এ হেন একজন ॥
মহাদ্যুতিময় আর এতাধিক গুণে গুণবান
ইক্ষ্বাকু বংশেতে জন্ম, গুণাধার রাম তাঁর নাম ॥
সংযতাত্মা মহাবলী, ধৃতি-দ্যুতি-বুদ্ধি-ঋদ্ধিমান
সর্বজনবশকারী শত্রুহন্তা, বাগ্মী, রূপবান্ ॥
মহাস্কন্ধ, মহাবাহু, মহাহনু, মহাধনুর্দ্ধর
কম্বুগ্রীব, দৃঢ়জানু, শত্রুহন্তা, তেজেতে ভাস্কর ॥
সুরূপ আজানুবাহু, বলবান, সত্যপরাক্রম,
সমদর্শী, স্নিগ্ধবর্ণ, সুবিভক্ত-অঙ্গ, বীরোত্তম ॥
পীনবক্ষ, সুলক্ষণ, লক্ষ্মীবান, বিশাল নয়ন
জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, ধর্মবেত্তা, সত্যপরায়ণ ॥
যশস্বী, বিক্রমশালী, সুপবিত্র, মহাজ্ঞানবান,
সর্বলোক সংরক্ষক, সর্বধর্ম রক্ষক মহান ॥
সর্বশাস্ত্র বিশারদ, সুপণ্ডিত বেদবেদাঙ্গেতে
অর্থশাস্ত্রে সুনিপুণ, নীতিমান, বিখ্যাত জগতে ॥
সর্বলোকপ্রিয় সাধু, মহাত্মা বেষ্টিত সতত
সাধুজনে, বহু নদী পরিব্যাপ্ত সাগরের মত ॥
সত্যবাক্, সমদর্শী, সৌম্যদৃষ্টি, প্রিয়দর্শন,
সর্বগুণাধার রাম কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন ॥
গাম্ভীর্যে সমুদ্রসম, স্থৈর্যে যেন গিরি হিমবান,
বীর্যেতে বিষ্ণুর সম, সৌন্দর্যেতে চন্দ্রের সমান ॥
কালাগ্নিসদৃশ ক্রোধে, পৃথিবীর তুল্য ক্ষমাগুণে,
কুবেরের সম ত্যাগে, অনুপম সত্য সংরক্ষণে ॥
করি রাম মনোরম হেন বহু উদার গুণেতে,
রঞ্জন প্রজার মন রাম নামে বিখ্যাত জগতে ॥
হেন গুণবান বীর জ্যেষ্ঠ পুত্রে পিতা মহাত্মা
দশরথ, করিলেন অভিষিক্ত করিতে বাসনা
যৌবরাজ্যে, রামের সে অভিষেক তরে আয়োজন
কেকয় বংশজা রাণী করিলেন যবে নিরীক্ষণ
যাচিলেন নৃপ হতে পূর্বদত্ত বরেতে তখন
ভরতের অভিষেক, রামের অরণ্যে নির্বাসন ॥
সত্যবাক্য রক্ষা তরে হয়ে ধর্ম পাশেতে সংযত
প্রিয় পুত্র রামে নৃপ করিলেন বনে নির্বাসিত ॥
গেলেন বনেতে পিতৃবাক্যে, প্রতিজ্ঞা তাঁহার
রক্ষিবারে, কৈকেয়ীর প্রিয়কার্য সাধিবারে আর ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অনুগামী হলেন তখন
বিনীত অনুজ তাঁর বীর্যবান ধীমান লক্ষ্মণ ॥
গেলেন সঙ্গেতে আর নারী মাঝে সর্বোত্তমা সীতা,
সর্বসুলক্ষণা সতী, বিদেহনন্দিনী শুভব্রতা ॥
সদাচার - রূপ - শীল - যৌবন - মাধুর্য - সমন্বিতা
চন্দ্রমার জ্যোৎস্নাসম হলেন রামের অনুগতা ॥
গেলেন সঙ্গেতে পিতা দশরথ আর পৌরজন
কিছুদূর;—করি ক্রমে শৃঙ্গবের পুরে আগমন
গঙ্গাকূলে, সারথিরে বিদায় দিলেন রঘুবর,
ধর্মাত্মা নিষাদপতি গুহপাশে আসি অনন্তর
প্রিয়মিত্র গুহসনে লয়ে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণে
গঙ্গাপার হয়ে রাম পশিলেন গহন কাননে ॥
পশি' তথা অতিক্রমি, বহু নদ-নদী-সরোবর,
গেলা চলি' চিত্রকূটে ভরদ্বাজ বাক্যে রঘুবর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে রচি' তথা সুরম্য আবাস,
বল্কল আবৃত দেহে সীতাসহ করিলেন বাস ॥
সমাগমে সে সবার চিত্রকূট হলো সুশোভিত
শঙ্কর, কুবের, লক্ষ্মী সমাগমে সুমেরুর মত ॥
চিত্রকূটে গেলে রাম পুত্রশোকে হয়ে হতজ্ঞান,
বিলাপ করিয়া বহু দশরথ ত্যজিলেন প্রাণ ॥
মাতুল আলয় হতে আসি গৃহে, রাম নির্বাসন
জনকের মৃত্যু আর, শুনিলেন ভরত যখন
কাতর বিলাপ বহু করিলেন দুঃখেতে তখন ॥
রাজত্ব গ্রহণ তরে বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ যত
কহিলেন ভরতেরে, ভরত হলেন অসম্মত ॥
পিতৃ বিয়োগেতে প্রাপ্ত রাজ্যলোভ করি বিসর্জন,
ভরত হেরিতে রামে করিলেন অরণ্যে গমন ॥
শুদ্ধমনা রামে তথা সাধিলেন নিতে রাজ্যভার,
স্মরি' মনে পিতৃ-আজ্ঞা রাজ্য ইচ্ছা হল না তাঁহার
পাদুকাযুগল নিজ দিয়ে রাজ্য শাসনের তরে
ফিরে যেতে ভরতেরে কহিলেন রাম বারে বারে ॥
স্থাপিলেন নন্দীগ্রামে ব্যর্থকাম ভরত তখন
রাজ্য সে পাদুকা লয়ে, করি' বাঞ্ছারাম আগমন ॥
গেলেন দণ্ডকবনে চিত্রকূট ত্যজি' অনন্তর
পৌরজন আগমন শঙ্কা পুনঃ করি' রঘুবর ॥
বিরাধ রাক্ষসে তথা বধি' রাম হেরিলেন বনে,
অগস্ত্য, সুতীক্ষ্ণ আর শরভঙ্গ আদি মুনিগণে ॥
অগস্ত্য-বচনে লভি' অক্ষয় সায়ক তূণ আর
ইন্দ্রদত্ত ধনু, রাম লভিলেন সন্তোষ অপার ॥
মুনিগণ হতে লয়ে বিদায়, বন্দিয়া অনন্তর
অনসূয়া তাপসীরে, পঞ্চবটি-বনে রঘুবর
হয়ে উপনীত তথা করিলেন আবাস নির্মাণ,
করিলেন বনে যত বনচর সহ অবস্থান ॥
নিলেন সেথায় আসি রক্ষভয়ে ভীত ঋষিগণ
বাণ খড়্গধনুর্ধারী ইন্দ্রসম রামের শরণ ॥
ভ্রাতাসহ তথা রাম করিলেন জনস্থানে স্থিত
কামরূপা সূর্পণখা রাক্ষসীরে আকারে বিকৃত ॥
সূর্পণখা বাক্যে সেথা আসিল রাক্ষসকুল যত ॥
ত্রিশিরা, দূষণখর, চতুর্দশ সহস্র যে আর
রাক্ষস সেনায় রাম করিলেন সংগ্রামে সংহার ॥
শুনি' হেনরূপ যত জ্ঞাতিকুল বধ বিবরণ
ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত রক্ষবীর নামেতে রাবণ
কামরূপী মহাবল রাক্ষসকুলের অধীশ্বর
হলো মহা ক্রোধবশে হতজ্ঞান [illegible]' অনন্তর

রাক্ষস মারীচ পাশে সহায়তা যাচিল তাহার,
মারীচ রাবণে বহু নিষেধ করিল বারবার ॥
কহিল সে অনুচিত বিরোধিতা করা দশানন
বলবান সনে. সেই বাক্য তার না শুনি' রাবণ
রামের আশ্রমে তারে লয়ে সঙ্গে করিল গমন।
রাম ও লক্ষ্মণে আর করিল সে দূরেতে প্রেরণ
মায়াবলে মারীচের। অনন্তর করি' আগমন
সুবস্মৃতা সমতুল সীতা পাশে রক্ষেন্দ্র রাবণ
হরিল রামের ভার্যা. করি' যুদ্ধে জটায়ু নিধন ॥
হেরি' হত গৃধ্ররাজে অপহৃত হেরি' ভার্যারে
করিলেন রাম বহুবিলাপ গভীর শোকভরে ॥
জটায়ুর দাহকার্য অনন্তর করি সমাপন
করিলেন দনপুত্র মহাবল কবন্ধে দর্শন ॥
ক্রোধে রাম বধি' তারে করিলেন কাষ্ঠেতে দাহন
দিব্য দেহ অনন্তর করিল সে কবন্ধ ধারণ ॥
তাপসী শবরী কথা শুনায়ে সে কহিল তখন
যাও রাম ধর্মশীলা শবরীরে করিতে দর্শন ॥
কবন্ধের বাক্য শুনি' লক্ষ্মণেরে লয়ে অনন্তর
গেলেন আশ্রমে সেই শবরীর রাম রঘুবর ॥
শবরীর পূজা প্রাপ্ত হয়ে রাম গেলেন তখন
পম্পাতীরে, হলো তথা হনুমান সহ সম্মিলন ॥
হনুমান বাক্যে হয়ে সুগ্রীব সমীপে সমাগত
কহিলেন সবিস্তারে আপনার বিবরণ যত ॥
শুনি' সে রামের বাক্য কহিলেন সুগ্রীব তখন
কপীশ্বর বালি সনে আপন শত্রুতা বিবরণ ॥
করি নিজ দুঃখ যত সুগ্রীব রাঘবে নিবেদন
বালির বিক্রম যাহা করিলেন বর্ণনা তখন ॥
বালিরে বধিতে রাম করিলেন শপথ গ্রহণ
সুগ্রীব হলেন ভাবি' বালি-বীর্য শঙ্কাকুল মন ॥
অবিশ্বাস বুঝি' তার করিলেন পায়েতে তখন
নিক্ষেপ দুন্দুভি দেহ দূরে রাম শতেক যোজন ॥
সপ্ত শালবৃক্ষ আর করি' ভেদ একমাত্র শরে
গিরি রসাতল সহ করিলেন বিস্মিত তাহারে ॥
রাঘবের হেনরূপ হেরি কার্য সুগ্রীব তখন
হলেন পরম প্রীত, হর্ষে আর হলেন মগন ॥
মিত্রতা বন্ধনে বদ্ধ অনন্তর হয়ে দুইজন
একে অপরের প্রতি করিলেন বিশ্বাস স্থাপন।
প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হয়ে রাম আর সুগ্রীব দোঁহায়
গেলেন গুহার মাঝে অবস্থিত পুরী কিষ্কিন্ধ্যায় ॥
করিলেন মেঘসম গর্জন সুগ্রীব অনন্তর,
হলেন নির্গত শুনি' গর্জন সে, বালিকপীশ্বর ॥
বালিরে নিধন করি সুগ্রীবের বাক্যেতে তখন
যুদ্ধে রাম, রাজ্য তাঁর করিলেন সুগ্রীবে অর্পণ ॥
রাম অনুমতি লভি' সুগ্রীব প্রবেশি' কিষ্কিন্ধ্যায়
বরিষার চারি মাস করিলেন যাপন সেথায় ॥

আহ্বানি' বহু অন্তে কপিরাজ-যত কপিগণে
পাঠালেন সে সবারে চারিদিকে সীতা অন্বেষণে ॥
অনন্তর পারাবার সুবিস্তীর্ণ শতেক যোজন,
সম্পাতির বাক্যে বীর হনুমান করিল লঙ্ঘন ॥
লঙ্কাপুরে রাবণেরে পশি শেষে হেরিল সেখানে,
রামের ধ্যানেতে মগ্ন বৈদেহীরে অশোককাননে ॥
বারতা নিবেদি' তাঁরে, অভিজ্ঞান করি' প্রদর্শন,
লয়ে প্রতি অভিজ্ঞান, করিল সে রাক্ষস নিধন ॥
বধি' পঞ্চ সেনাপতি পঞ্চমন্ত্রী পুত্র রাবণের
বধি তার পুত্র অক্ষে হলো বদ্ধ বন্ধনে অস্ত্রের ॥
স্মরি' ব্রহ্মাদত্ত বর অস্ত্র হতে করি আপনারে
মুক্ত সে, রাক্ষসদত্ত যন্ত্রণা সহিল অকাতরে ॥
দগ্ধ করি' অনন্তর লঙ্কাপুরী, করি বৈদেহীরে
আশ্বাস প্রদান, পুনঃ রাম পাশে আসিল সে ফিরে ॥
রামের সম্মুখে আসি, করি তাঁরে প্রদক্ষিণ আর
কহিল মারুতি 'আমি দরশন লভেছি সীতার ॥'
সুগ্রীবের সহ আসি অনন্তর সাগরের তীরে
সূর্যপ্রভ শরে রাম করিলেন ক্ষুব্ধ জলধিরে ॥
সাগর দিলেন আসি' নিজরূপে দেখা রঘুবরে,
সমুদ্রের বাক্যে তথা সেতু নল বাঁধিল সাগরে ॥
সেতুপথে পশি' লঙ্কা, যুদ্ধে করি রাবণে নিধন,
বিভীষণে রঘুবর দিলেন লঙ্কার সিংহাসন ॥
রামের মহৎ কর্মে ইন্দ্র আদি দেবগণ আর
দেবর্ষিরা হয়ে তুষ্ট করিলেন অর্চনা তাঁহার ॥
দেবগণ হতে রাম পূজা প্রাপ্ত হয়েও তখন
কহিলেন বৈদেহীরে সভা মাঝে পরুষ বচন ॥
অসহ্য সে বাক্যে সীতা পশিলেন প্রদীপ্ত অনলে
পবন বহিল বেগে, হলো দৈববাণী হেনকালে ॥
দুন্দুভি নিনাদ আর পুষ্পবৃষ্টি হলো অবিরাম,
অগ্নির বাক্যেতে সীতা শুদ্ধাবলি জ্ঞাত হয়ে রাম
গুরুজন বাক্যে করি' সুনির্মলা সীতারে গ্রহণ
হলেন সন্তাপহীন হলেন যে কৃতার্থ তখন ॥
সকল দেবতা হতে লভি' বর, লভি' আর রাম
বৈদেহীরে, আরোহিয়া পুষ্পকে গেলেন নন্দীগ্রাম।
তথায় ছেদন করি' ভ্রাতাগণ সহ, জটাভার,
সীতাসহ রঘুবর রাজ্য প্রাপ্ত হলেন আবার ॥
রাবণে বিনাশ করি' যজ্ঞ বহু করি' সম্পাদন
সীতাসহ আনন্দেতে রহিলেন শ্রীরাম তখন ॥
অযোধ্যা নৃপতি রাম, দশরথ নৃপতি নন্দন
করিলেন প্রজাকুলে পিতৃসম সতত পালন ॥
হৃষ্টপুষ্ট হলো লোক, হলো তুষ্ট হলো ধর্মপ্রাণ।
রোগ শোক দুর্ভিক্ষের ক্লেশ হতে লভি' পরিত্রাণ ॥
যে সব গুণের কথা হে বাল্মীকি, সুধালে আমারে,
সর্বগুণশালী রাম বিভূষিত তাহে একাধারে ॥

: ক্রমশঃ

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সত্যেন্দ্রনাথের এই জাতি-চেতনা হিন্দুমেলার পূর্ব থেকেই সদাজাগ্রত ছিল, হিন্দুমেলায় তার প্রকাশ ঘটে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। আমৃত্যু সেই সুমহান জাতিচেতনাই তিনি প্রচার করে গেছেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথের দেহান্তর সম্পর্কিত প্রতিবেদনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখে—

'সত্যেন্দ্রবাবু জাতীয়ভাব হইতে কিছুমাত্র পরিভ্রষ্ট হন নাই। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য অন্যতর সহায় হইয়াছিল। এই হিন্দুমেলা উপলক্ষে তাঁহার রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' জাতীয় সঙ্গীত কোন্ বঙ্গবাসী না জানেন?'

মহর্ষিদেবের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় মেলার একজন নীরব কর্মী ছিলেন, মনে হয়। জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান বিবরণীর মাত্র একটি স্থানে তাঁর নামের উল্লেখ আছে, এই কারণে তিনি যে তার থেকে দূরে ছিলেন তা মনে করার কারণ নেই। তাঁরও চরিত্রের মধ্যে একটি সদাদীপ্ত স্বাদেশিক-চেতনা বিরাজিত ছিল মাতৃভাষা 'বাংলা'কে কেন্দ্র করে। হেমেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। শুধু তাই নয় শারীরিক ব্যায়ামচর্চা বিষয়েও তিনি উৎসাহী ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের স্বদেশচর্চা এই সবকিছুর মধ্যে বহুধা সংক্রমিত থাকলেও তা একটি বিষয়ে বিশেষভাবে সোচ্চার ছিল, সেটি হল বাংলা ভাষার পরিচর্যা। হেমেন্দ্রনাথের মানসবৈশিষ্ট্যে মাতৃভাষার প্রতি যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিত্যজাগর ছিল হেমেন্দ্রনাথের কর্মের জগতে তা সংক্রমিত হয়েছিল স্বাদেশিক আবেদন নিয়ে। বাড়ীর ছেলেমেয়ে নববধূ সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা শিক্ষা দিতেন হেমেন্দ্রনাথ।

তাঁর বাংলা-ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ এবং শিক্ষাদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।—প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলচ্ছক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার (হেমেন্দ্রনাথ) উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।' —দ্রঃ জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্রনাথ।

প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়ীতে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে চর্চা শুরু হয় তার সূচনা করেছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। মনে রাখতে হবে, হিন্দুমেলার বহুমুখী উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলা ভাষার উন্নতি এবং ব্যায়ামচর্চায় উৎসাহ দান। হেমেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও চেতনায় আমরা এই দুটি বিষয়কেই গভীরভাবে অনুশীলিত হতে দেখি। সুতরাং হেমেন্দ্রনাথ যে হিন্দুমেলার স্বাদেশিক কর্মের সঙ্গে গভীরভাবেই অন্বিত ছিলেন একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) হেমেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে পাঠের উদ্দেশ্যে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'উদ্বোধন' কবিতাটি দৃপ্তগম্ভীর কণ্ঠে জনসমক্ষে পাঠ করেন।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে, 'সেবারকার মেলায় শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী), অক্ষয় চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিনজনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রকণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন।'

হিন্দুমেলার সহিত হেমেন্দ্রনাথের যোগাযোগ সম্পর্কিত আর কোনও লিখিত প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি। তথাপি জাতীয় মেলার নানাবিধ দেশাত্মমূলক কর্মের সঙ্গে তিনি যে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঠাকুরবাড়ীর স্বাদেশিকতার আঙিনায় বিশেষ ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন মহর্ষির পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫ খৃঃ)। জ্যোতিরিন্দ্রের স্বদেশচর্চার ক্ষেত্র ছিল বহু বিস্তৃত, বহু পরীক্ষিত এবং বহু বিচিত্র। মহর্ষিদেবের শান্ত ধ্যাননিমগ্ন তাঁর সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের যৌবনের খরদীপ্তিময় স্বদেশ-চেতনা তাঁর জীবনে আশ্লিষ্ট হয়েছিল। সেই সঙ্গে গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের নিরত-উৎসাহ তাঁর যৌবনকে জাতীয় চেতনার তরঙ্গে তরঙ্গে উত্তালিত করে তুলেছিল। জাতীয়ভাবোধের সর্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা যৌবনের উদাত্ত আহ্বান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্মে এই সঞ্জীবনী বাণীর আহ্বান গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর অনিবার্য ফলরূপেই হিন্দুমেলার আঙিনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল।

কলকাতায় যখন (১৮৬৭) জাতীয় মেলার উদ্বোধন-আয়োজন চলছিল সেই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেজদাদা

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রবাসের কর্মস্থলে। দ্বিতীয় অধিবেশনের কিছুকাল পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং মেলার পরিচালনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় মেলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন নব্য স্বাদেশিকতার মন্ত্রগুরু রাজনারায়ণের কাছে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে রাজনারায়ণ ঠাকুরবাড়ীর যুবকদের নিয়ে যে 'স্বাদেশিকদের সভা' স্থাপন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম প্রধান সক্রিয় সদস্য। এই স্বাদেশিকদের সভা'র অস্ফুট চেতনা পরিণতি লাভ করে জাতীয় মেলায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দ্বিতীয় অধিবেশনকাল থেকে শেষ অধিবেশনকাল পর্যন্ত জাতীয় মেলার কর্মাবলীর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে বাংলা দেশে নব্য জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। জাতীয়মেলাকে উপলক্ষ করে জাতীয় সঙ্গীত রচনার যে প্রবণতা এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। মেলার দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনের জন্য তিনি তার বিখ্যাত ভারতসঙ্গীত 'উদ্বোধন' রচনা করেন। ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনও কবিতা রচনা করেন নি। কিন্তু স্বাদেশিকতার প্রেরণা তাঁর গভীর অন্তর-জগৎ হতে সুপ্ত কবিত্বকে প্রকাশ করেছিল দেশমুক্তিকামনার সুরলোকে। জ্যোতিরিন্দ্রের জীবনস্মৃতি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি। জীবনীকার বসন্তকুমার লিখছেন,—

'নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এসময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি রচিত হইবামাত্র, নবগোপালবাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু সেখানে গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে, গণেন্দ্রবাবু 'বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়তে হবে' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী—), শ্রীযুক্ত অক্ষয় চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিনজনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া, 'হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন।'

জ্যোতিরিন্দ্রের প্রথম রচনা হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, 'উদ্বোধন' কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে তার দেশাত্মবোধ এবং জাতিচেতনার মহান আদর্শ-সংসক্ত সুস্পষ্ট স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ,

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব কীর্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্মসার;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদারি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড!
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিত মনে?

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিকতম 'জাতীয় সংহতি'র (ন্যাশানাল ইন্টেগ্রেশন শ্লোগান) শতবর্ষ পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হিন্দুমেলার জন্য রচিত ভারত সঙ্গীত ও নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস'---কাব্য ত্রয়ের মধ্যেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত স্মরণীয় পংক্তি,—

'স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড
সর্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।'
মনে রাখার মত।

ইংরাজ-শাসন ভীরু ভারতবাসীর কাছে জ্যোতিরিন্দ্র হতমানিতা ক্রন্দনপরা ভারতমাতার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তৎকালীন ভারত-চিন্তার বিচারে তা বিস্ময়কর ঘটনা,—

"ওঠ রে ভারতবাসি! কি ভয়, কি ভয়!
ওই শোনো, ওই শোনো, কি কহে জননী!
ক্রমশ বাড়িছে দেখি ক্রন্দনের ধ্বনি—
ওরে নিদারুণ বিধি, বিতরিয়া রূপনিধি
কেন মোর সর্বনাশ ঘটালে বল না?
তস্করে আনিলে ডাকি, আর কি রাখিলে বাকি,
রাণী হয়ে হ'নু দাসী, ছি ছি কি লাঞ্ছনা!"

কেবলমাত্র ভারতমাতার দুর্দশার চিত্রই অঙ্কন করে জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর কর্ম শেষ করেন নি, গৌরবময় ভারতের অতীতকে স্মরণ করেছেন---ভারতের পরাধীনতারূপ দুঃখনিশার অবসান আশা করেছেন:

"দেখ! কুহকিনী আশা, পশি কারাগারে
বুঝাইছে নানামতে ভারতমাতারে—
"শান্ত হলো প্রিয় সখি—মুছ অশ্রু-নীর,
পোহাইবে দুঃখনিশা—হয়ো না অধীর।'

জাতীয় মেলার স্বাদেশিকতার যজ্ঞভূমিতে উচ্চারিত এই জাতীয়মন্ত্র যে তৎকালীন স্বদেশ-সচেতন মানুষের হৃদয়াবেগে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার নব্য স্বাদেশিকতার চারণ-কবি ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখেছেন,—

'জ্যোতিবাবু ভারতের প্রাচীন শৌর্য-বীর্যের স্মৃতি জাগাইয়া স্বদেশবাসীদিগকে এই নবযুগের নূতন শৌর্য-বীর্যের সাধনায় প্রবৃত্ত করেন।'

—দ্রঃ বাংলার নবযুগের কথা। বঙ্গবাণী ১ম বর্ষ; দ্বিতীয়াধ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৯।

১৮৭৪ খৃঃ পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার অষ্টম অধিবেশনের সাধারণ সভায় পরবর্তী বৎসরের (১৮৭৫) জন্য অবৈতনিক পরিচালকবর্গের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্যতম সংশ্লিষ্ট সম্পাদক মনোনীত হন। ১৮৭৫-এর অধিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ছিল বালক রবীন্দ্রনাথের

সাধারণ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ। এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। মূলকথা হলো হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিয়ত প্রেরণায় ফলেই তরান্বিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী (কাদম্বরী দেবী) দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রই রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুমেলার অধিবেশনে নিয়ে যান। জাতীয়মেলার একাদশ অধিবেশনে (১৮৭৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে তাঁর হিন্দুমেলার জন্য রচিত দ্বিতীয় কবিতা পাঠ করেন।

জাতীয় মেলার কর্মনির্বাহক সংস্থা জাতীয় সভার নিয়মিত সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনানুসারে ১৮৭৪ খৃঃ জুন মাসের অনুষ্ঠিত অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শিশিরকুমার ঘোষের প্রস্তাবক্রমে নড়াইলের বাবু রাইচরণ রায়কে ব্যাঘ্রশিকারে বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য স্বর্ণপদকের দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের ইচ্ছানুসারে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকরূপে (১৮৬৯-১৮৮৫)কাজ করতে শুরু করেন। তাঁর স্বদেশভক্তির সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দেশও সমাযুক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা এবং জাতিচেতনা নিয়ত নবসৃষ্টির জগতে পরিব্যাপ্ত ছিল। যে স্বদেশ-ভাবনার দ্বারা প্রাণিত হয়ে তিনি স্বাদেশিকের সভা এবং জাতীয় মেলার সংগঠনে নিজেকে যুক্ত করেছেন, সেই স্বাদেশিক প্রেরণার বশেই তিনি বিদ্বজ্জন সমাগম সভা (১৮৭৪।এপ্রিল), সঞ্জীবনীসভা (১৮৭৭), সারস্বতসমাজ (১৮৮২), 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী সংস্থার এবং পত্রিকাদির প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ বোধ করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা তার স্বদেশপ্রেমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা' প্রতিষ্ঠায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুচিন্তিত পরামর্শও লাভ করেছিলেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে রাজনারায়ণ-নবগোপাল এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার মধ্যে একটি যৌবনসুলভ দাহিকা-শক্তি নিয়ত সচেতন ছিল। জাতীয় মেলার অতিবিস্তৃত কর্মসূচীতে সেই দাহিকা-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য হিন্দুমেলায় অশ্বচালনাশিক্ষা, ব্যায়াম অনুশীলন এবং পাখীশিকারের ছলনায় বন্দুক চালনা শিক্ষা সব কিছুই সেই নব্য জাতীয়তাবাদেরই অভিব্যক্তি ছিল।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ প্রমুখ সম্ভবত আরও সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত কোনও বিপ্লবের কথা চিন্তা করেছিলেন। (সে যুগের বিচারে যদিও তা আশাতীত ছিল)। তাছাড়া এই সময়ে ইতালীর-স্বাধীনতা বিপ্লব এবং ম্যাৎসিনীর দেশপ্রেমের উত্তেজনা এ দেশের শিক্ষিত মানুষের স্বাধীনতা-কামনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনে 'কার্বোনারী' নামে যে গুপ্তসভার প্রতিষ্ঠা হয়—তার কাজকর্ম চলতো অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে ও সাঙ্কেতিক ভাষায়। এই কার্বোনারীই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণকে 'সঞ্জীবনী সভা' বা 'হামচুপামুহাফ' নামক গুপ্তসভার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সঞ্জীবনী সভার আদর্শ ও স্বরূপ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি—তথাপি পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।' (দ্রঃ আমার জীবন: রবীন্দ্রনাথ), 'মড়ার মাথার খুলি' ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। 'টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু-কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত-ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন; বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। (দ্রঃ রবীন্দ্রজীবনী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) এই দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে তলোয়ার দিয়ে বুকচিরে রক্তাক্ষরে শপথ গ্রহণ করতে হতো, 'ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।'

সঞ্জীবনী সভার এই যে গুপ্তসংস্থা ও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এটিকে হিন্দুমেলার কার্যাবলীর থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা ভুল হবে। বলা যেতে পারে হিন্দুমেলার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শাখারূপেই সঞ্জীবনী সভার জন্ম হয়।

কিন্তু সঞ্জীবনী সভাতেই শেষ নয়, হিন্দুমেলার নব্য স্বাদেশিকতার প্রেরণা, স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি, স্বদেশীয় সবজনীন পোষাক ব্যবহারের অভিনবত্বে এবং দেশীয় বস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম মমতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে দেশলাই কল এবং কাপড়ের কল স্থাপন করেছিলেন তাঁরা। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন—

'মহেন্দ্রবাবু (ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী) তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। একটা তাঁত তিনি প্রস্তুত পর্যন্ত করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে যেন মহেন্দ্রবাবুর এই নূতন তাঁত হিন্দুমেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।—শুনিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই কাঁচের তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া

হিন্দুমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোক মনে মাতিয়াছিলেন। তাহা অসম্ভব নহে; কারণ তখন নবগোপাল-বাবু ও তাঁহার সঙ্গীরা নূতন স্বদেশী-ভাবে একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিলেন।'

—দ্রঃ বঙ্গবাণী ১ম বর্ষ, ১৩২৯।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে তাঁরা স্বদেশ-চর্চার ক্ষেত্রে একটি 'খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার' মধ্যে ছিলেন এবং তাঁদের 'প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো'।

কথাগুলিকে অগভীর চিন্তার দ্বারা এড়িয়ে দেওয়া যায় না। জাতীয় বিপ্লব চিন্তার সঙ্গে যৌবনের দুর্বার শক্তির সম্মিলন যে 'খ্যাপামির তপ্ত হাওয়া'র জন্ম দেয় কালে কালে তার শক্তি নিত্য নব সংগঠনের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে চলে। জ্যোতিরিন্দ্রের জীবনে এই 'খ্যাপামি' ছিল পুরোমাত্রায় এবং এই 'খ্যাপামি'ই ছিল তাঁর স্বদেশচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই স্বাদেশিক উত্তেজনার বশেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নীলের চাষের লভ্যাংশ বিদেশে যাতে না যায় তার জন্যে নিজে নীল চাষ শুরু করেন।

১৮৮৪ খৃঃ তে খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত স্টীমার চালনার বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রের সেই স্বাদেশিক আত্মপ্রেরণাই ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এমন কি তাঁর স্টীমারগুলির নামকরণের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। চারিটির মধ্যে তিন-টিরই নাম ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'স্বদেশী' ও 'ভারত'। জাহাজ-চালন ব্যবসায়ে স্বদেশীয়রা তাঁকে আর্থিক দিক দিয়ে 'দেউলিয়া' করেছিল সত্য,—তথাপি একথাও উল্লেখ্য, 'বাঙ্গালীর জাহাজ-চালনায় তখন বরিশালের ছাত্রসমাজ এবং নব্য দলের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।'

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তরঞ্জন।

জ্যোতিরিন্দ্রের স্বদেশ-ভাবনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল জাতীয় নাট্যশালার জন্য নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে। এবং এ বিষয়েও হিন্দুমেলার স্বদেশবোধই তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন, 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ-প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকের ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশীয় ঐতিহ্যাশ্রিত তাঁর প্রথম নাটক 'পুরু-বিক্রম' রচনা করেন ১৮৭৪ সনে। সে সময় তিনি হিন্দুমেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক,—বলা যায় জাতীয় উন্মাদনার উত্তুঙ্গ শিখরে তখন তিনি। সঞ্জীবনী প্রতিষ্ঠার প্রাক্-মুহূর্ত। জাতীয় সভার দ্বিতীয় অধিবেশনকাল থেকেই তিনি জাতীয় সংহতির স্বপ্ন দেখেছেন। গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির অভাব—বিভিন্ন জাতীয় সংস্কার মধ্যে অনৈক্য—দেশ ও জাতির আত্মবিস্মৃতি। কিন্তু ইংরাজকে পরাহত করতে হলে প্রয়োজন একজাতিত্ববোধ। 'পুরু-বিক্রম' নাটকে পুরুরাজের বাণী জ্যোতি-রিন্দ্রের সেই বিশ্বাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। তিনি লিখেছেন—

'ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে একপ্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥
স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে শত ধিক্ তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥
যায় যাক্ প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্,
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলোয়ার
ঐ শোন ঐ শোন শত্রুদের রব।

'পুরুবিক্রম' নাটকের মাধ্যমে এবং সম্ভবত সমকালীন সরকারের আইনের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'বৃটিশের' স্থলে 'যবন'কে আনা হয়েছে। সমকালীন সকল নাট্যকার ও কবিই এই পন্থায় কাব্যে সঙ্গীতে দেশপ্রেমের প্রচার করেছিলেন। জ্যোতি-রিন্দ্রের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে (১৮৮২) 'দিল্লী দরবার' বিষয়ক যে দীর্ঘ কবিতাটি আছে সেটির মধ্যে দিয়েও এই উগ্র-দেশপ্রেমের বাণী বিঘোষিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রের নাটক 'বেঙ্গল থিয়েটার' ও 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' (১৮৭৪) অভিনীত হয়। 'সরোজিনী' নাটকের মধ্যেও জাতীয় গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। জাতীয় আন্দোলনের চারণ-কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন একান্তে পূর্ণায় বশে। এরও মূল সুর জাতিভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাতৃমুক্তির সন্ধিৎ প্রস্তুত। সঙ্গীতটির কয়েকটি পংক্তি এইরূপ :

"চল্ রে চল্ সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
* * *
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন
* * *
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান;
একপথে একসাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।"

উপনিষদের শুদ্ধরসে লালিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সুযুক্তিবদ্ধ মান-সিকতার অধিকারী ছিলেন, জাতীয় মেলায় স্বাদেশিকতার নবামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি সেই মানসধর্মকেই কাজে লাগিয়েছিলেন। হিন্দুমেলার প্রকল্প-কারক রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে অসীম প্রীতির সম্পর্কে অন্বিত ছিলেন তিনি।

পরবর্তীকালে নবগোপাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন, 'তিনি (নবগোপাল) এত করিলেন অথচ এখন তাঁহার

মাত্রও কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এ দেশে তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্মবীরের একটা স্থায়ী-চিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় আত্মবিস্মৃত বাংলা দেশ শুধু নবগোপালকেই নয়—জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তিভূমি হিন্দুমেলাকেও ভুলে গেছে—জ্যোতিরিন্দ্রও সেই বিস্মৃতির স্রোতে হারিয়ে গেছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ বসু জ্যোতিরিন্দ্রের চোখে এক মহাঋষিপুরুষের প্রজ্বলন্ত অগ্নির সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই কারণে প্রতিটি গুপ্ত স্বাদেশিক সংস্থার কাজে তাঁকেই তিনি তন্ত্রধারকের গুরুভার দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের পলিভূমি তখনও পর্যন্ত বিপ্লব-উর্বরা হয়ে উঠেনি,—অভাব ছিল শিক্ষার, ঐক্যের ও মানসিক ঔদার্যের। তাই খুব স্বাভাবিক নিয়মেই জাতীয় মেলার যজ্ঞভূমি থেকে যে অগ্নিগর্ভ বজ্রের জন্ম হয়েছিল দেশ তাকে কাজে লাগাতে পারেনি।

ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার ধারায় জ্যোতিরিন্দ্রের নামের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৭-১৮৮১) নাম। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং জাতীয় মেলার বিশেষ সক্রিয় পুরুষ গণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথ নানান স্বাদেশিক সংস্থা ছাড়াও হিন্দুমেলার সংগঠনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।

১৮৭২ খৃঃ রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরের বাগানে অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলার সাধারণ সভার কার্যনির্বাহক কমিটিতে কোষাধ্যক্ষরূপে কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বাচিত হন। এই সময় জাতীয় মেলার সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। হীরালাল শীলের নৈনানের বাগানে অনুষ্ঠিত সপ্তম অধিবেশনে (১৮৭৩ খৃঃ) দেশজ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের এক বিভাগীয় প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী উৎসবে বিচারক ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নীলকমল মুখোপাধ্যায়।

—দ্রঃ জাতীয়তার নবমন্ত্র, প্রস্তুয়মান সংস্করণ : যোগেশচন্দ্র বাগল।

কেবলমাত্র জাতীয় মেলার বিভিন্ন কার্যেই নয়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরবাড়ীর নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একজন নিত্য সঙ্গী ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে গণেন্দ্রনাথের উৎসাহে যে জাতীয় নাট্যান্দোলন শুরু হয় জ্যোতিরিন্দ্র এবং গুণেন্দ্র ছিলেন তার প্রধান তন্ত্রধারক। জাতীয় নাট্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ক কার্যনির্বাহের জন্য গঠিত 'পঞ্চায়েত সভার' (কমিটি অফ্ ফাইভ) অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্র ও গুণেন্দ্রের প্রচেষ্টায় জোড়াসাঁকোয় যে বিদ্বজ্জন সমাগম সভার প্রতিষ্ঠা হয় তার কোন কোন অধিবেশন বসত গুণেন্দ্রনাথের বসতবাটীতে। তাঁর গৃহে ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ শতাধিক সাহিত্যিকের সমাগম হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সভায় বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি পাঠ করেন।

জাতীয় মেলার শেষ বছরে (?) গুণেন্দ্রনাথ নিতান্ত অল্পবয়সে মারা যান। তথাপি সেই স্বল্প স্থায়ীজীবনে ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশচর্চার ধারাকে তিনি অব্যাহত রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুমেলার স্বাদেশিক মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন গুণেন্দ্রনাথ—তাঁর দেশাত্ম-চেতনা সর্বোপরি হিন্দুমেলার সকল স্বাদেশিক কর্মে সক্রিয় ছিল। পিতার স্বাদেশিকতার আদর্শ পুত্রদের রক্তেও সংক্রামিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গুণেন্দ্রনাথের দুই পুত্র ভারত শিল্পের দুই নিবিষ্ট পূজারী, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের শিল্পকর্মে সেই স্বাদেশিক আদর্শই সঞ্চারিত হয়েছিল।

হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথ মাত্র ছয় বৎসরের বালক। কিন্তু সেই স্বল্পবয়স থেকেই অনুকূল স্বাদেশিক আবহাওয়া তাঁর মানসগঠনকে স্বদেশ-নিষ্ঠ করে তুলছিল। হিন্দুমেলার আদর্শ কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে সাধনাশ্রয়ী ও আদর্শ-পুষ্ট জাতীয় চেতনার জন্ম দিয়েছিল। জীবনযাত্রার ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই তাঁর মনোজগতে অধিষ্ঠিত স্বদেশাত্মার নিত্যজাগর অমলিন মূর্তি তাঁর তারুণ্য-প্রাণিত অনিষ্টাকে স্বদেশমুখী করেছিল।

উত্তরকালে, সেই বালককালে লব্ধ স্বাদেশিক আদর্শের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি নানান রাষ্ট্রবিমথনকারী উপপবের দিনে তাঁর লেখনীকে বিদেশী [illegible]গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কাজে [illegible], জাতির অন্তরে স্বদেশাত্মার বাণী [illegible] দিয়েছেন, বহু বিচিত্র কল্যাণমুখী ও স্বাদেশিক কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। স্বদেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই আশ্লেষ-প্রবণতা নিঃসন্দেহে হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার কর্মাদর্শের সফল পরিণতি। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাই তিনি হিন্দুমেলার কথা স্মরণ না করে পারেন নি,—

'আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।'

[ক্রমশ]

এখনই সময়

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

কিছু মনে হ'লে
ব'লে ফেলা ভালো;
এখনই সময়।

রোদের সোহাগ-মাখা নদী কল্লোলে
বাজে প্রশ্রয়!
নিবে গেলে এই স্বচ্ছ আলো,
সব কথা গোপন গুহায়

র'য়ে যাবে—হয়তো হবেনা বলা
কোনদিন আর!
মনের কথাটি বলো—মন যদি চায়;
এখনই সময় মন মেলে ধরবার॥

ডাঃ [illegible] সেখানেও তাঁর অবাধ গতি। কেশোরামজীর পত্নীকে কথাটা বলতে তিনি জিব কেটে বললেন—শেঠজী নিজে যে টাকা দিয়েছেন তা হাত পেতে নেব—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

বন্ধু কথায় কথায় স্বীকার করলেন—তিনিই কর্তাকে বলে এ কাজ করিয়েছেন সুতরাং টাকা ফেরত দিতে গেলে শেঠজী অসন্তুষ্ট হবেন।

স্বয়ং শেঠজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে সামান্য হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে ভরসা পেলেন না ডাঃ বোস।

ঠিক একই রকম ঘটেছিল উপেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের ছাপাখানার যন্ত্রপাতির টাকা মেটাবার বেলায়। তাঁরা ডাঃ বোসকে বলে বসলেন—বলি খব তো টাকা দেখাতে এসেচ, আমরা কি তোমায় মেসিন বিক্রি করেছি—যে দাম চুকাতে চাইছ। আমরা প্রেস দিয়েছি 'স্বাস্থ্য সমাচার' কাগজখানি ভালোভাবে চালাবার জন্য, ওটার দাম টাকায় পাবো এই আশায় তো দিই নি। কাগজখানা যদি ভালোভাবে চলে তবেই তো প্রেসের উদ্দেশ্য সফল হল।

স্নেহের সে দান ডাঃ বোসকে মাথা পেতে নিতে হয়েছিল।

॥ সাতাশ ॥

লেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়বার পর ডাঃ বোস একটি ফার্ম করেন। তার নাম ছিল—ইণ্ডিয়ান ড্রাগস লিমিটেড। [illegible] এবং বৃহত্তাবে প্রতিষ্ঠ। ইণ্ডিয়ান ড্রাগস্ হতে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় ভেষজ বিষয়ে এমন গবেষণা করতে যাতে তার ফল ব্যাপক ও কল্যাণপ্রসূ হয়।

ইণ্ডিয়ান ড্রাগস লিঃ পরে ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরী লিমিটেড্-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। ডাঃ বোস তাঁর নিজের বাড়িতে কাজের সুবিধার জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বিবিধ ভারতীয় গাছগাছড়া

সঞ্জয়

জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা চালানো হত তার ফলেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফার্মাকোপিয়া ইণ্ডিকা' ডাঃ বোস লিখতে পেরেছিলেন। ঐ ল্যাবরেটরিতে ওষুধ তৈরীর কাজও সুরু হল এবং যাতে বিশেষ ফলপ্রদ পেটেণ্ট মেডিসিন বের করা যায় তার জন্য ডাঃ বোস একসঙ্গে দুজন তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের আলোচনা ঘটিয়ে তার ফলাফল নিয়ে তবে ওষুধ করতেন। তখন স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় এলেট্রিস কর্ডিয়েল নামক বিলাতি ওষুধটি বিশেষ প্রচলিত ছিল। ডাঃ বোস এর একটি বিকল্প ওষুধ তৈরী করতে চাইলেন।

দেশীয় ভেষজের মধ্যে অশোক আয়ুর্বেদমতে নারীরোগের চিকিৎসায় সর্বগুণসম্পন্ন। তিনি তাই অশোক গাছটি অবলম্বন করে কিছু করা যায় কি না চিন্তা করছিলেন।

নিজে পণ্ডিত ভবতারণ শাস্ত্রীর কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করলেও জটিল বিষয়ের আলোচনার জন্য ডাঃ বোস সব সময় মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতীর সঙ্গে আলোচনা করতেন। গণনাথও কার্তিককে খুবই ভালোবাসতেন।

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে এক ঘরোয়া আমন্ত্রণে খেতে বসে আলোচনাটি উত্থাপিত হল। কবিরাজ গণনাথ ব্যতীত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এলোপ্যাথদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বোস স্বয়ং এবং খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়।

এঁদের সমবেত আলোচনার সূত্র ধরে ডাঃ বোস যে ফর্মুলা তৈরী করেন তদনুসারে 'অশোক কর্ডিয়েল' নামে বোসেস ল্যাবরেটরির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ওষুধটি তৈরী হয় এবং স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত উপকারী বলে সর্বভারতে সুনাম অর্জন করে। অশোক কর্ডিয়েল-এ পরে ভিটামিন এবং হরমোন সংযুক্ত করে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে।

এখন বাজারে অশোক কর্ডিয়েল নামে একাধিক কোম্পানীর ওষুধ আছে। কাছাকাছি নামের অনুকরণও অনেকে করেছেন। কিন্তু ডাঃ বোসের ফর্মুলার উপকারিতা সর্বাধিক তাই একমাত্র

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
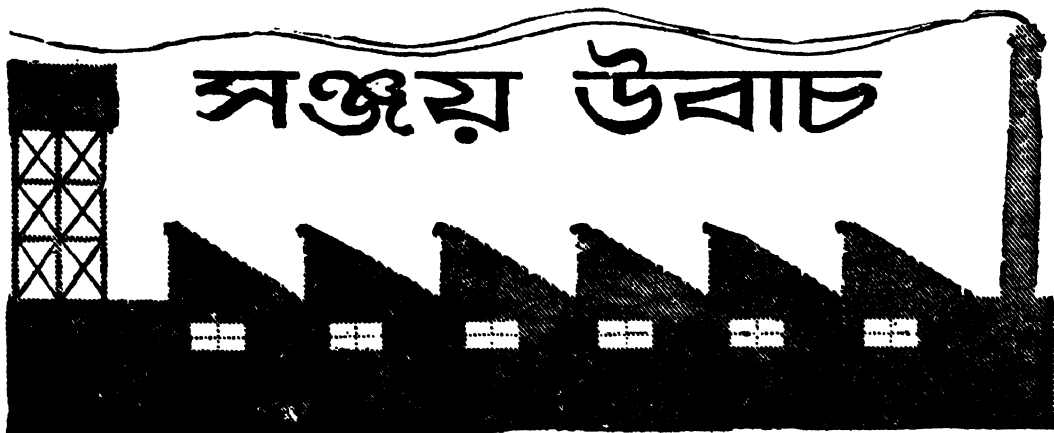
এই একটি ওষুধ বিক্রয় করেই বোসেস ল্যাবরেটরী দাঁড়িয়ে যায়। আজও তাদের অশোক কর্ডিয়েলের চাহিদা সর্বাধিক তা তো তোমরা জানোই।

বেঙ্গল কেমিক্যাল যেমন শুরু হয়েছিল যোয়ান জল আর বাসক সিরাপ দিয়ে, ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরির প্রথম ওষুধ বেরুল অশোক কর্ডিয়েল, টাইকো-সোডা ট্যাবলেট, নানালা ট্যাবলেট আর এলিকসার ডাইটো গ্লিসারোফস এবং হেমাটো সাইপ্যারিলা এই পাঁচটি নিত্য ব্যবহার্য ওষুধ দিয়ে।

অশোক কর্ডিয়েলের কাহিনীটা তো বললাম। টাইকোসোডা হল যোয়ান এবং সোডি বাইকার্ব ঘটিত একটি চমৎকার হজমের ওষুধ। বদহজমের রোগী শতকরা নব্বইভাগ লোক। তাই এ ওষুধটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

'নানালা' নামটিরও একটু ইতিহাস আছে। একটি এস্পিরিন ঘটিত বেদনাহর বটিকা তৈরী করে নাম সম্বন্ধে ভাবছিলেন ডাঃ বোস। সেইদিন একজন বার্মিজ মেয়ে তাঁকে চোখ দেখাতে এলো। তার চোখে বেদনা হয়েছে। বেদনাকে বর্মি ভাষায় হয়তো 'নালা' বলে। তাকে ঐ সদ্যতৈরী বড়ি খেতে দিলে সেই রোগিণী বললে—'না—নালা ?' অর্থাৎ এ ওষুধে কি বেদনা থাকবে না ?

শব্দটি অদ্ভুত, ডাঃ বোসের কানে লাগল। রোগিণী চলে গেলে নতুন তৈরী ওষুধটির নাম রাখলেন—'নানালা'।

আমার উপর যখন এই ওষুধটির বিজ্ঞাপন রচনার ভার পড়ে তখন লিখেছিলাম—

বেদনা
নাশিতে
জ্বালা জুড়াইতে
—নানালা।

উপর থেকে না না লা শব্দ তিনটি তিন লাইনে তৈরী হরফ দিয়ে বৈচিত্র্য করেছিলাম, আর একটু ছন্দের দোলা থাকায় ডাঃ বোসের খুব ভালো লেগেছিল বিজ্ঞাপনটি। বিজ্ঞাপন-বিষয়ক একখানি বাংলা বইতেও ঐ বিজ্ঞাপনটি উদধৃতও হয়েছিল বলে পড়ে।

এলিকসার ডাইটো গ্লিসারোফস একটি গ্লিসারোফসফেট ঘটিত উৎকৃষ্ট টনিক।

কবিরাজি স্বর্ণবল্লীকষায় বা শান্তিরস সালসার মত আর একটি উপাদেয় ওষুধ—হেমাটো সার্সাপ্যারিলা, সুন্দর কাজ করে, রক্ত পরিষ্কার করে, দেহে বল দেয়।

একটার পর একটা ওষুধ বের করেছেন ডাঃ বোস, আর তা নিজের রোগীদের উপর বিনামূল্যে প্রয়োগ করে ফলাফল দেখে তবে তা বাজারে ছেড়েছেন। ফলে প্রত্যেকটি ওষুধ ফলপ্রদ।

এতটা যত্ন নিয়ে একেকটি ওষুধ তৈরী করেছিলেন বলে আজও প্রত্যেকটি ওষুধ কাজে আসে। এখন স্ট্রেপটোমাইসিন টেরামাইসিন-এর যুগেও এইসব সনাতনধর্মী ওষুধগুলি কি আশ্চর্য ফল দেয় তা ব্যবহার না করলে বোঝা যায় না, কারণ ঢাক পেটাবার মালিক এখন তারাই যাদের হাতে প্রচুর পয়সা আছে। বিদেশী এবং কার্টেলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থার সুমুখে এইসব দেশীয় ওষুধের ক্ষীণপ্রাণ বিজ্ঞাপন লোকের নজরেই আসে না। তবু যে তারা আজও টিকে আছে তা কেবল তার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাগুণে। ডাঃ বোস ওষুধের এই কর্মক্ষমতার উপরেই নির্ভর করতেন বেশী।

॥ আটাশ ॥

রক্তচাপজনিত অসুখ আধুনিক সভ্যতার এক অভিশাপ। আগে এ রোগের কোন সত্যকার ফলপ্রদ ওষুধ ছিল না। ডাঃ বোস দেশীয় গাছগাছড়ার মধ্যে রক্তচাপ সাম্য করবার ওষুধ খুঁজে বের করলেন।

আয়ুর্বেদে যে-সব গাছগাছড়ার গুণ বর্ণিত আছে তার মধ্যে কিছু সংখ্যকের অ্যালকালয়েড তৈরী করে তা জীবদেহে প্রয়োগ করে ফলাফল দেখে রিপোর্ট তৈরী করা—এ কাজ ডাঃ বোসের ল্যাবরেটরীতে বরাবর হয়ে [illegible] হয়েছে। বুলবুলের উপর অর্জুনের ছালের কার্য কি প্রতিক্রিয়া আনে তার পরীক্ষা করেন চোপরা আমাদের এখানে ল্যাবরেটরীতে ব্যাঙের হার্টের উপরে দেখে গেছেন। আমরা জানি, কাঁচা বেল উদরাময়ের পক্ষে উপকারী। ডাঃ বোস তা থেকে ওষুধ বানালেন—বেল-এ.-ইন্দ্র যব লিকুইড। একজন বিদেশী মেজর কোথাও কোথাও সে ওষধ ব্যবহার করে উপকার পান। তারপর থেকে তিনি আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত কিনতেন।

ডাঃ বোসের যে আয়ুর্বেদীয় গবেষণাটি সর্বাধিক পরিচিত সেটি হল রক্তচাপজনিত রোগের চিকিৎসায় সর্পগন্ধার প্রয়োগ। সর্পগন্ধার ইংরাজি নাম—রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা, এই মূল ওষুধটি থেকে এখন রক্তচাপ সাম্যকরণের বহুবিধ বাজারে বেরিয়েছে।

ডাক্তার বোসের নিজস্ব ফর্মুলা তৈরী হয়েছিল—'ভ্যাসোডিন' ট্যাবলেট। ওষুধটি ব্যবহার করে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন ডাক্তার বোসকে একখানি পত্র লেখেন। দেশীয় ওষুধের পক্ষে তেমন প্রশংসাপত্র তার আগে কেউ পেয়েছে কি না সন্দেহ।

ডাক্তার বোসের মৃত্যুর পর আমেরিকার একটি ওষুধ প্রতিষ্ঠান রাউলফিয়া সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান গবেষণার স্বীকৃতি দিতে তাঁর জীবনকথা জানতে আসে এবং ডাক্তার বোসের একখানি ছবি নিয়ে যায় তাদের পত্রিকায় ছাপবে বলে।

রাউলফিয়া বা সর্পগন্ধার মত কত ভেষজ আমাদের দেশে আছে যা নিয়ে এখনও কাজ করা হয় নি। ডাক্তার বোসের পথ ধরে এদিকে কাজ করলে শুধু দেশীয় ভেষজ-শিল্প সমৃদ্ধ হবে তাই নয় সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ হবে।

॥ উনত্রিশ ॥

১০ই ভাদ্র, ১৩৩৬। ইংরাজি [illegible] আগস্ট, [illegible]। কার্তিক তখন [illegible] [illegible] [illegible] উয়ারের

ছাত্র। সেদিন কলেজ থেকে বিকেলে পথে বেরিয়ে দেখা গেল, হকারেরা হৈ-হৈ করে হাঁকছে—সাপ্তাহিক বসুমতী বেরিয়েছে।

নতুনের আকর্ষণ তো ছিলই, তার উপর সাপ্তাহিক বসুমতীর সঙ্গে যোগ ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠানের এবং এমন একজন ব্যক্তির যা সে সময়ে শিক্ষিত সমাজকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল।

শীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহী শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁকে বিশেষ ভালোবাসতেন। সর্বদর্শী ঠাকুর নিজ মুখে বলেছিলেন—'নরেন আর উপেন প্রচারের কাজ করবে। নরেন লেকচার দেবে, উপেন ছাপাখানা করবে।'

সেই উপেন বের করলেন সাপ্তাহিক বসুমতী।

শোনা যায় দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর উপেন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—'যা, তোর দরজা বড় হবে।' তাই-ই হয়েছিল। কালক্রমে বসুমতী মহামহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

আরও শোনা যায়, ঠাকুরের তিরোধানের পর তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় উপেন্দ্রনাথ শবদেহ বহন করতে করতে সর্পদষ্ট হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৈববাণী শুনতে পান—'সাপটাকে মারিস নে, আজ হতে তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন।'

বিনা চিকিৎসায় উপেন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ নিজেই যে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করেছিলেন তাই নয়, তাঁর বিধবা মা এবং যে মাসিমার কাছে তিনি ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছিলেন, সেই মাসিমাও ঠাকুরের আন্তরিক স্নেহলাভ করেছিলেন। এমন কি উপেন্দ্রনাথের পত্নীও ছিলেন ঠাকুরের পরম স্নেহের পাত্রী। তাঁর পিত্রালয় ছিল শ্রীশ্রীসারদা মায়ের গ্রামে এবং গ্রাম সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথের শ্বশুর মহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুর খুড়োমশাই বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে উপেন্দ্রনাথের পত্নীর নামও তিনি রেখেছিলেন—'ভবতারিণী'। শেষ জীবনে তাঁকে অনেকে 'বসুমতী-মা' বলে পরিচয় দিতেন।

উপেন্দ্রনাথ দরিদ্রের সন্তান, অধিকন্তু শৈশবেই পিতৃহীন হয়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছিলেন। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি বটতলায় ছোট একখানি বই-এর দোকান করেন। পরে যখন বিডন স্ট্রীটের কলিকাতা প্রেস-এর অংশীদার হন তখন সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশ করেন।

অবশ্য তারও আগে তিনি 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিকপত্র ১২৯৬ সালে প্রকাশ করেন। পরে ঐ পত্রিকাটিই শুধু 'সাহিত্য' নামে ১২৯৭ সালে সুরেশ সমাজপতির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করে। শিক্ষিত সমাজে রামকৃষ্ণভক্ত হিসাবে এবং প্রকাশক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ী হিসাবে উপেন্দ্রনাথ সুপরিচিত ছিলেন।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সে যুগে এক নামধেয় ব্যক্তিদের মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব ঘটত এবং তাঁরা পরস্পরের 'মিত্র' বা 'মিতা' হতেন। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথের নিকট কার্তিকের ঘন ঘন যাতায়াত ছিল সে কথা আগেই বলেছি। সেখানেই রামকৃষ্ণ-ভক্ত উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে কার্তিকের পরিচয় ঘটে।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা সবে বেজে উঠেছে। সাংবাদিকদের মাথার টনক নড়ল। সেদিন কলুটোলার কবিরাজখানায় দুই উপেন যখন একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন, ভাগ্যক্রমে কার্তিকও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ কার্তিকচন্দ্রকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালেন, তারপর বললেন,—উপীনকে চেন তো, আমার মিতা উপীন মখুজ্জে। এই যে তোমার পাশেই বসে আছে।

কার্তিক মৃদু হেসে বললেন—বিলক্ষণ চিনি। ওঁকে না চেনে কে। ওঁর সাপ্তাহিক বসুমতী নিয়মিত পড়ি। আমার ছাত্র অবস্থা থেকেই পড়ছি।

কবিরাজ তখন কার্তিকচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন—উপীন এখন দৈনিক বাংলা বসুমতী করতে চায়, তাতে তোমার সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

কার্তিক সম্মত হলেন। ১৯১৪ সাল—তখন তাঁর নিজস্ব ডা: বোসের ল্যাবরেটরী লিমিটেড-এর বয়স ছয়

বছসর উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দুইদিন পরে ৬ই আগস্ট ১৯১৪ তারিখে দৈনিক বসুমতী প্রকাশিত হল। বাংলা সংবাদপত্র-জগতে দৈনিক বসুমতী এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দৈনিকের প্রথম সম্পাদক ছিলেন শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। কার্তিকচন্দ্র নানাভাবে এই দৈনিক পত্রিকাটির জন্য উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। তবে তিনি কখনই নিজেকে প্রকাশ করেন নি।

উপেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই রামকৃষ্ণ-ভক্তদের অনেকের সঙ্গে ডাঃ বোসের পরিচয় এবং হৃদ্যতা হয়। বিদেশ থেকে সারা বিশ্ববাসীর অভিনন্দন লাভ করে স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছালেন সেদিন রেল স্টেশনের অভূতপূর্ব জন-উদ্দীপনা দেখবার সৌভাগ্য ডাঃ বোসের হয়েছিল। তিনি জীবনে পূজার্চনা এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ করবার সময় পান নি। দেবতার শ্রদ্ধা দিতেন তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবকে এবং মেডিক্যাল কলেজের তাঁর সময়ের প্রিন্সিপ্যালকে। কিন্তু এই নিরীশ্বর-বাদীর চোখেও স্বামী বিবেকানন্দের জনসেবার মহত্ত্ব প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিল, তাই দীর্ঘদিন তিনি রাম-কৃষ্ণপন্থীদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কতবার দুর্গতদের সেবার জন্য এই সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হাতে হাজার হাজার টাকার ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন। কাশীর একটি বাড়িও তিনি একজন সন্ন্যাসীর হাতে দিয়ে যান—যাতে ঐ বাড়িটি থেকে যে টাকা উপায় হবে তা জনসেবায় ব্যয়িত হয়।

শুনেছি 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর' প্রভৃতির সুযোগ্য সহকারী-সাংবাদিক, শক্তিশালী লেখক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে ডাঃ বোস বসুমতীতে উপেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সমগ্র জীবন বসুমতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উপেন্দ্রনাথের পুত্র সতীশচন্দ্রের অকালবিয়োগের পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ বসুমতীর পরিচালনায় থাকায় প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা পায়। বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী ভবতোষ ঘটক সতীশবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরে নিকট আত্মীয় হন। তিনিও এই দুঃসময়ে বসুমতীর সহায়তায় অগ্রসর হন।

ডাঃ বোসের তিরোধানের পর একটি স্মৃতিসভার সভাপতির ভাষণে হেমেন্দ্রপ্রসাদ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বাংলার সাংবাদিকতার সহায়তায় ডাঃ বোসের অলিখিত দানের কথা উল্লেখ করেন।

একসময়ে রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলি' পত্রি-কার দপ্তর স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে ডাঃ বোস তাঁর ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীটের গৃহের দক্ষিণাংশের বৃহৎ হল ছেড়ে দিতে চান। হলটি দৈনিক পত্রিকার পক্ষে নেহাৎ মন্দ হত না।

ডাঃ বোসের বড় ভাই প্রবোধচন্দ্র ছিলেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, জেলাজজ। তাঁদেরই বসতবাড়িতে রাজদ্রোহ প্রচারক দৈনিক পত্রিকার দপ্তর বসলে তাঁর পক্ষে ইংরাজ সর-কারের চাকুরি বজায় রাখা কঠিন হবে বলে ডাঃ বোস এই পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু প্রকাশ্যে রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব না রাখলেও তিনি গোপনে দেশসেবার ও সমাজ-সেবার কাজে কোন-প্রকার সাহায্য করবার সুযোগ পেলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতেন। মাণিক-তলার ষড়যন্ত্রে তিনি প্রকাশ্যে জড়িয়ে পড়েন নি তাই দেশের লোক জানতে পারেনি যে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরও অগোচরে তাদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য বেনামিতে পাঠাতেন। এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ সাংবাদিকের মুখে এই ঘটনার কথা শুনেছি যিনি এখনও বেঁচে আছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি পুরাতন কাহিনী মনে পড়ছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ডাঃ বোসই একসময়ে এগিয়ে গিয়ে-ছিলেন। এবারে বলছি সেই কথা।

ডাঃ বোস তখন কলকাতার একজন সেরা চিকিৎসক। অধিকন্তু তিনি একজন খ্যাতনামা শিল্পপ্রবর্তক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ব্যক্তিগত মোটা আয় আজও তাঁর কোম্পানীর প্রচুর জনবল তাঁকে চিকিৎসক সমাজে একজন লক্ষণীয় ব্যক্তি করে তুলেছিল। ফলে একদিন স্যার নীলরতন সরকারকে দলপতি করে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ বোসের বাড়ি এসে তাঁকে জানালেন—সেবারের বিধানসভার নির্বাচনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা ডাঃ বোসকে দাঁড় করাবেন মনস্থ করেছেন।

ডাঃ বোস জোড়হস্তে অনুনয় করে বললেন,—তিনি কোন প্রকার রাজনৈতিক কাজ করতে সময় পাবেন না। ডাক্তার-দের মধ্য হতেই যদি যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন করতে হয় তবে তার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র হবেন—বিধান রায়।

বিধান তখন হ্যারিসন রোডে থাকেন। প্র্যাকটিসও জমে উঠছে। বিলাতফেরত অত বড় ডিগ্রীধারী ডাক্তা-রের সংখ্যাও তখন নেই বললেই চলে তার উপরে রাজনীতিতে তিনি আন্ত-রিকভাবে আগ্রহী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্নেহভাজন।

টাকা দিয়ে, লোকজন দিয়ে, সর্ব-প্রকারে ডাঃ বোস ডাক্তারদের প্রার্থীকে ভোটযুদ্ধে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার-দের সঙ্গে গিয়েছিলেন বিধানবাবুর চেম্বারে—তাঁকে অনুরোধ জানাতে।

ডাঃ রায় সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি দাঁড়ালেন এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটযুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে নিজে সক্রিয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিধান রায় আর কেবল সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি হয়েই রইলেন না, হলেন তাঁর প্রিয় বাংলা দেশের এক স্মরণীয় পুরুষ, স্বাধীন বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী।

এই ঘটনার পর সুদীর্ঘকাল অতীত হয়েছে, তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। জীবনের অন্তিমকালে ডাঃ বোস আবার পরিচয় পেলেন—ডাঃ রায় তাঁর প্রতি অন্তরে অন্তরে কত কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ডাঃ বোসের পৈতৃক বাস্তভিটা চাংড়িপোতা গ্রামের বাড়িতে তিনি জীবনের শেষ সঞ্চয়টুকু ব্যয় করে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত বাড়িটা তৈরী করা ছাড়া হাসপাতালের আর সব ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। তখন তিনি সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগকে জানালেন, হাসপাতালের বাড়িটি তিনি সরকারের হাতে তুলে দিতে চান—যাতে তা স্থানীয় অধিবাসীদের সেবায় লাগে।

সরকারি ফাইলের শম্বুক গতি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। ডাঃ বোস তাঁর আবেদনের দু-তিনটি স্মারক-পত্র পাঠালেন, তারও কোন উত্তর পেলেন না। তখন একদিন দুপুরে তিনি তাঁর প্রাচীন ঘোড়ার গাড়িখানিতে চড়ে লালদীঘির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর নিচের তলায় সহিসের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি পৌঁছুলেন এবং একখানি কাগজের স্লিপে নিজের কাঁপা হাতে লিখলেন—

'ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বোস, উইশেস টু সী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।'

স্লিপটি লোকের হাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের কামরায় পাঠিয়ে দিয়ে ডাঃ বোস তাঁর হাতের ভাঙ্গা লাঠির উপর ভর করে ঝিমুতে লাগলেন। তাঁর গাড়ির সহিসটি বসে রইল অদূরে।

পায়ে তালতলার চটি, পরনে সাদা থান আর সাদা টুইলের শার্ট। মাথার চুলগুলি সাদা এবং খুব ছোট করে ছাঁটা। ওষ্ঠ দুটির দিকে প্রথমেই নজরে পড়ে, কারণ দাঁতের আংশিক বিরলতায় উপর-ওষ্ঠটি কিছুটা ঝুলে পড়েছে, নীচের ওষ্ঠটির গঠন পুরু, এখন বয়সের প্রবীণতায় আরও বিকৃত হয়ে পড়েছে। হাতে একখানি মাথা-ভাঙ্গা লাঠি—তার উপর থুতনি রেখে বৃদ্ধ ঝিমুচ্ছেন। কে এই বৃদ্ধ তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান নি। সেদীয় সার্জেন্টরাও নিজেদের পদগাম্ভীর্যে বৃদ্ধকে সম্মান মনে করেন—এ বৃদ্ধকেও তাঁরা গ্রাহ্য করেন নি।

সহসা বৃদ্ধের ঝিমুনিতে ছেদ পড়ল। খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দে সার্জেণ্টরা নিজেদের জুতার গোড়ালি ঠুকে উঠে দাঁড়িয়ে কাউকে স্যালুট করলে—সেই শব্দে তাঁর তন্দ্রা কেটে গেল। তিনি দেখলেন—ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন শালপ্রাংশু দীর্ঘদেহী ডাক্তার রায় স্বয়ং। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর এই বিশেষ ঘরটিতে কোনদিনই আসবার প্রয়োজন হয় নি তাঁর। সহসা তাঁকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখে প্রহরারত কর্তব্যপরায়ণ সার্জেণ্টগণ সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্যালুট করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সেদিকে লক্ষ্য না করে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন—ডাঃ বোস কোথায়?

বলতে বলতে ঘরের কোণে উপবিষ্ট ডাঃ বোসের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল এবং নিজেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

ডাঃ বোসের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—আপনি এখানে এত কষ্ট করে না এসে আমায় আপনার বাড়িতে ডেকে পাঠালেন না কেন?

ডাঃ বোস বললেন—তা হয় না বিধান। তুমি কত কাজে ব্যস্ত। তোমায় ডেকে পাঠাবার তো দরকার হয় না, পটলকে দেখতে তো তুমি নিজেও যাও. আজ এসেছি আমার দরকারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা দরবার জানাতে।

পটল অর্থাৎ ডক্টর পঞ্চানন বোস এম ডি ডাঃ বোসের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর কাহিনী তো ভুলবার নয়। বলব পরে। তাঁকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বছরে ন মাস থাকতেন শিলং-এর ডাউ হিলের উপর একটি বাড়িতে। শীত পড়লে কলকাতায় কাটাতেন এবং মাস তিনেক থেকে আবার শিলং ফিরে যেতেন।

পটলবাবু কলকাতায় এলেই ডাঃ রায় তাঁকে দেখতে আসতেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও কিছুক্ষণ সব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেতেন।

সেদিন ডাঃ বোসকে ডাঃ রায় নিজে সঙ্গে করে মন্ত্রীদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ লিফটে চড়িয়ে তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনে অবিলম্বে হাসপাতালটি সরকারের হাতে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ডেকে বলে দেন—এই ব্যাপারে আর যেন তাঁর ছুটাছুটি করতে না হয়। যা যা করবার আমাদের পক্ষ হতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে করিয়ে আনবে।

বলা বাহুল্য—হাসপাতাল হস্তান্তরে আর কোন অসুবিধা ঘটে নি।

সেদিন লালদীঘি থেকে ফিরে ডাঃ বোস খুব প্রফুল্লচিত্তে আমাকে বলেছিলেন—কত যুগ আগে বিধানের ইলেক্‌সনের জন্য খেটেখুটে সুরেন বাঁড়ুজ্জের বিরুদ্ধে প্রধানত আমরা ডাক্তারেরাই তাঁকে খাড়া করেছিলাম। বিধান মনে রেখেছে সে কথা। না হলে দেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সে কি না দশজন লোকের সুমুখে স্পষ্ট বললে—নিজে না এসে আমায় বাড়িতে ডেকে পাঠালেন না কেন? ওহে, বিধানের মত অত বড় মন কটা মানুষের হয়। বিলেত থেকে অত বড় ডাক্তার হয়ে এসেও আমাদের মত সিনিয়রদের কত সম্মান করে চলত।

তারপর বললেন—যেদিন তাঁরা ডাক্তারেরা বিধানবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন—ভোটযুদ্ধে নামবার প্রস্তাব নিয়ে সেদিনের কাহিনী।

[ক্রমশঃ।

ব্রাইটনের সেই মেয়েটি

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রেমিকা ছিল ব্রাইটনের সেই মেয়েটি, তবু তার নাম হয়ত এখনও অনেকেরই অজানা।

সত্যি বলতে কি আজ পর্যন্ত তার পরিচয় সম্বন্ধে অনেকটাই ঔৎসুক্য রয়ে গেছে মানুষের মনে, ফরাসীদেশে কুমারী হওয়ার্ড নামে পরিচিতা ছিল সে।

এতদিন বাদে সে এল সাধারণের চোখের সামনে। শ্রীমতী সাইমন জাঁয়ে ম্যায়ো একটি পুস্তক রচনা করলেন তাকে কেন্দ্র করে, রচনাটির নাম 'সম্রাট ও কুমারী হওয়ার্ড'।

এই ফরাসী মহিলাই সর্বপ্রথম পৃথিবীকে জানালেন যে, কুমারী হওয়ার্ড নামের আড়ালে যে মানুষটি ছিল তার আসল পরিচয় সম্পূর্ণ আলাদা, আসলে সে ছিল এলিজাবেথ হ্যারিয়েট, ব্রাইটনের এক মুচির মেয়ে।

ইংল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের সভাসদদের জুতো প্রস্তুত করার ভার পেয়ে ক্রমেই ধনী হয়ে উঠলো মুচি হ্যারিয়েট, টাকাকড়ি গুছিয়ে নরফোকে গিয়ে বাসা বাঁধলো সে।

কন্যা এলিজাবেথের চোখ পড়লো রঙ্গজগতের ওপর।

স্বভাবতই তার বাবা-মার এতে সায় ছিল না, কিন্তু লণ্ডন থেকে এক ধনী ব্যক্তি তাদের বাড়ী বেড়াতে আসায় অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটে গেল তার, রঙীন স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার।

ধনী বন্ধু তাকে নিয়ে এলেন লণ্ডনে থিয়েটারে নামবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, মঞ্চে এলিজাবেথ হওয়ার্ড নামে সে আত্মপ্রকাশ করলো।

এর বিনিময়ে তার যৌবন উপভোগ করতেও অবশ্য দ্বিধা করেন নি ওই ধনী ব্যক্তিটি, সাদা কথায় এলিজাবেথ হল তাঁর মিসট্রেস বা প্রণয়িনী।

অভিনেত্রী হিসাবে একেবারে ব্যর্থ হলেও শেষোক্ত ভূমিকায় এলিজাবেথ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেছিল।

ঐ ধনী বন্ধুর কাছ থেকে আরও ধনী এক ব্যক্তির আশ্রয়ে সে চলে গিয়েছিল এবং তার এই নতুন প্রণয়পাত্রটি অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন তার জন্য।

সেণ্ট জন উডে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা বানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এলিজাবেথের জন্য।

সম্ভ্রান্ত সমাজে এঁরই কল্যাণে প্রবেশাধিকার ঘটে তার।

এই বদান্য বন্ধুটির ঔরসে একটি পুত্রসন্তানও লাভ করেছিল এলিজাবেথ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সমাজে যাতায়াত সুরু করেছিল সে এই সময় থেকেই এবং সেই সূত্রেই তার ভাগ্যের চাকা আর একবার ঘুরে গেল।

এলিজাবেথ দেখা পেল সেই মানুষের যে নাকি তাকে হাত ধরে নিয়ে এসে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দেবে।

বিষাদমাখা দুটি বড় বড় চোখ, বলিষ্ঠ দেহ ও খুব ছোট পায়ের অধিকারী মানুষটির সামনে উপনীতা হয়ে অবনত মস্তকে অভিবাদন করলো এলিজাবেথ, তাঁর নাম প্রিন্স লুই নেপোলিয়ান—সেই স্মরণীয় মহান বোনাপার্টের তিনি ভাইপো।

১৮৪৬ খৃস্টাব্দ সুরু হয়েছে সবে, প্রিন্স স্বদেশে দুবার রেভলিউসানের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে, নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন তখন ইংল্যাণ্ডে।

তিনি তখন কপর্দকহীন।

কিন্তু এলিজাবেথের আর্থিক অবস্থা তখন তুঙ্গে, শীঘ্রই ভাগ্যহীন রাজকুমারকে দেখা গেল তার বাড়ীতে এসে উঠতে।

এই নতুন প্রেমিকের কাছে অকপটে নিজের জীবনের কথা ব্যক্ত করলো এলিজাবেথ, প্রতিদানে প্রিন্সও সোচ্চার হলেন।

ফ্রান্সে বন্দী-জীবন যাপন করার সময় নাকি কারাধ্যক্ষের কন্যার উপর তাঁর চোখ পড়েছিল ; মেয়েটির শিক্ষকতার ভার নিয়েছিলেন তিনি, সে পড়তে আসতো রোজ তাঁর কাছে, এর ফলে মেয়েটির মানস জগতে কতটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তার সঠিক খবর কারুর অজানা না থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই তার শরীর জগতে পরিবর্তনের কথাটা সকলেই জানতে পেরেছিল।

দুটি শিশু নেপোলিয়নের মা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল মেয়েটি পর পর দু'বছরে।

প্রেমিকের স্বীকারোক্তি খুব উদারতার সঙ্গেই গ্রহণ করলো এলিজাবেথ, এমন কি তাঁর অবৈধ সন্তান দুটির লালন পালনের ভারও নিতে চাইলো সাগ্রহে।

তার নিজের ছেলের সঙ্গেই তারা মানুষ হতে থাকলো।

এইভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে বছর দুই কেটে যাওয়ার পর, সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল, প্রিন্স লুই নেপোলিয়ান ব্যস্তভাবে ফিরে গেলেন ফ্রান্সে, এলিজাবেথ তাঁর সঙ্গিনী হল।

ফ্রান্সে নির্বাচনী সংগ্রাম সুরু হবার পর, প্রেমিকের নির্বাচনী কার্যকলাপের অনুকূলে অকাতরে অর্থব্যয় করেছিল

এলিজাবেথ, প্রিন্স নির্বাচনী সমরে জয়ী হয়ে ফ্রান্স রিপাবলিকের প্রধানের পদে বৃত হলেন।

প্রিন্সের আসনের পাশে এলিজাবেথের আসনও শোভা পেতে লাগলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের সময় জাতীয় কনভেনসনের পক্ষ থেকে প্রিন্সকে মনোনীত করা হল না, অসন্তুষ্ট প্রিন্স পদাধিকার ছাড়লেন কিন্তু আশা ছাড়লেন না।

আবার দ্বার খুলে গেল এলিজাবেথের সিন্দুকের, পুলিশকে ঘুষ খাওয়ানো হল প্রচুর পরিমাণে, সেনাবাহিনীকেও হাতে রাখা হল। ১৮৫১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক হিমশীতল প্রভাতে এ্যাসেম্বলীর সমস্ত সদস্যদের আকস্মিকভাবে গ্রেফতার করা হল আর এলিজাবেথের নায়ক এবার আর শুধু রিপাবলিকের প্রধান হয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন না, তৃতীয় নেপোলিয়ান নাম ধারণ করে ফ্রান্সের রাজমুকুটটি মাথায় চড়িয়ে নিলেন।

এলিজাবেথের সহায়তায় প্রিন্স [illegible] [illegible] করলেন, কিন্তু সে নিজে [illegible] [illegible] প্রেমিকাকে।

সম্রাটের উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হল এবং সে প্রয়োজন মেটাতে একটি সম্রাজ্ঞীর প্রয়োজনও তো অনস্বীকার্য।

আগে আভাস ইঙ্গিত দিয়ে থাকলেও এখন তাকে আর সম্রাজ্ঞী পদের উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে মেনে নিতে পারলেন না সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান

এলিজাবেথের কালিমাময় অতীতকে তো আর ভোলা সম্ভব নয়।

অতএব একদিন বিশেষ রাজকার্যব্যপদেশে এলিজাবেথকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে হল, দেশের মাটিতে পা দিয়েই রাজকুমারী ইউজেনী দ্য মন্টিজোর সঙ্গে ফরাসী সম্রাটের আসন্ন বিবাহ সংবাদ জ্ঞাত হল সে।

ত্বরিৎগতিতে প্যারিসে ফিরে গেল ঐ হতভাগিনী নারী।

নিজের বাসস্থানে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে, সম্রাটের লেখা প্রেমপত্রগুলিরও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

আশাভঙ্গের দারুণ বেদনা বুকে বয়ে নিজের পল্লী আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করলো এলিজাবেথ।

এর পর যে ক'টা দিন সে বেঁচে ছিল, সেই নির্জন পল্লী কুটিরেই তা যাপিত হয়েছিল।

পালিত পুত্রদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল তার কাছ থেকে, তার নিজের সন্তানও শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিল তাকে।

মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে হতাশাক্লিষ্ট ঐ নারী নিঃসঙ্গ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

লুই নেপোলিয়ানের অপরাধী হৃদয় কি মুহূর্তের জন্যও চঞ্চল হয়েছিল স্মৃতির দংশনে?

এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস দেয়নি, তবে ব্রাইটনের সেই মেয়েটির জন্য ভবিষ্যতের মানুষের মনে হয়ত বা দেখা দিতে পারে একবিন্দু করুণা, সহানুভূতির সুগন্ধে সিঞ্চিত হয়ে।

—শ্রীমতী রেবা দেবী

বজ্রকঠিন কাচ

কাচকে আজ আর ক্ষণভঙ্গুর বলে অপবাদ দেওয়া যায় না—বুলেট-প্রুফ কাচ তো আকচার ব্যবহার করা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। ঢিল মারলে আর কাচ ভাঙে না।

কাচের তৈরী রাস্তা, পোল এবং কাচের বাড়ী—এ সব হচ্ছে অদূর-ভবিষ্যতের স্বপ্ন; বাস্তবে রূপায়িত হবার আর বেশী দেরী নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে, এ পর্যন্ত কাচের ব্যবহারিক ক্ষমতার মাত্র শতকরা একভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে—বাকি ৯৯ ভাগই অনাবিষ্কৃত রয়েছে। তাঁরা আরো বলছেন যে, শতকরা দশ ভাগ মতন কাজে লাগাতে পারলে ইস্পাতের চাইতে অনেক কঠিন অথচ হালকা কাচ মানুষের অসংখ্য উপকারে আসবে।

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে থাকেন। স্বপ্ন দেখা অবশ্য তাঁদের কাজ—তা' না হলে জগতের বহু রহস্যই আজও তিমিরাবৃত থাকত। কাচ নিয়েও তাঁদের স্বপ্নের অন্ত নেই, তাঁরা ভাবছেন যে, ভবিষ্যতে (এবং খুব সম্ভবত অদূর-ভবিষ্যতেই) কাচ দিয়ে তাঁরা অনেক ভেলকী দেখাবেন। যথা—

১। কাচ দিয়ে মোটর গাড়ি তৈরী করা।

২। শত শত মাইলব্যাপী কাচের টিউবের মধ্য দিয়ে কমপ্রেসড বাতাসের সাহায্যে অতি দ্রুতবেগে রেল গাড়ী চালান;

৩। কাচের তৈরী মহাকাশযান;

৪। বিশেষ ধরণের আবহাওয়ার থেকে মানুষকে রক্ষা করে বাসযোগ্য শহর তৈরী করা বিশাল কাচনির্মিত গম্বুজাকৃতি আবরণের মধ্যে—যেমন, মেরুপ্রদেশে বা মরুভূমির মধ্যে, যেখানে নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া না হলে মানুষ টিকতে পারবে না।

কাচের ক্ষমতাও এত!

বিলাতের চিঠি

॥ দুই ॥

ঝিরঝির করে তুলোর মত গায়ের উপর ছোট্ট ছোট্ট বরফের কুচি এসে পড়ছে আর তার মধ্যে দিয়েই হেঁটে চলেছি। পায়ের Winter Boot চার ইঞ্চি বরফের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে—একটু অন্যমনস্ক, বোধ হয় দেশের কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ গায়ের উপর একটা কী এসে পড়াতে চমকে মুখ তুলেই দেখি পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে এ্যানেট গ্রাহাম্ হাতে বরফের বল নিয়ে আমার দিকে আবার তাক্ করছে। সে আমারই প্রতিবেশী মার্গারেটের মেয়ে—এই বছরেই ইনফ্যাণ্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যালো। মিস্ গ্রাহাম্, তুমি স্কুলে যাও নি? এই বেলা বারটার সময় বরফের উপর দাঁড়িয়ে দুষ্টুমি করছ?'

ছোট্ট একটুকরো মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে স্বচ্ছকণ্ঠে সে আমাকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, বলল, 'সে কী, তুমি জান না? আমাদের প্যান কেক্ (Pan Cake) খাবার জন্য যে মিসেস্ গাইডার তিনদিন ছুটি দিয়েছে।' অবাক হলাম,—প্যান কেক্ খাবার জন্য, সেটা আবার কী ব্যাপার? ততক্ষণে এ্যানেট শুরু করে দিয়েছে—

"Make a Pan Cake,
Fry a Pan Cake,
And toss' it in the air."

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই এ্যানেট আবার ঘাড় দুলিয়ে আরম্ভ করে দিল—

"Pat a Cake, pat a cake
Baker's man
Bake me a cake as fast as
you can.
Pat it and Prick it
And mark it with "B"
Pat in the oven for baby
and me."

বুঝলাম সবই ওর স্কুলের শিক্ষা। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, আঠারই ফেব্রুয়ারী-কে এরা বলে 'প্যান কেক্ ডে'—আমাদের দেশে পৌষপার্বণে পিঠে ভেজে খাওয়ার মত এরা প্যান কেক ভেজে খায়।

এদেশে বাচ্চাদের স্কুলের বয়স আরম্ভ হয় চার বছর বয়স থেকে। ইংল্যাণ্ডের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জানি না অন্য দেশে এটা কতখানি মেনে চলা হয়—বয়স মেনে চলা। অর্থাৎ চার পূর্ণ হবার আগে

ভারতী মুখোপাধ্যায়

বাচ্চারা যেমন স্কুলে ভর্তি হতে পারে না, ঠিক তেমনই আঠারর আগে এদেশে College Education আরম্ভ হয় না। শিক্ষা-পদ্ধতিকে এদেশের শিক্ষা-অধিকর্তারা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। ১। চার বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত ইনফ্যাণ্ট স্কুল, ২। আট বছর থেকে এগার পর্যন্ত জুনিয়র স্কুল, ৩। বার থেকে সুরু হয় সেকেণ্ডারী বা গ্রামার স্কুল। তারপর G. C. E বা তদনুরূপ মানের কোন পরীক্ষা পাশ করে এরা কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে ঢোকে। কিন্তু জুনিয়র স্কুলের পর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিভাগ হয়ে যায়। আমাদের দেশের উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর মত উত্তম ছেলে-মেয়েরা গ্রামার স্কুলে পড়ে G. C. E পরীক্ষা দেয়, তারও প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগের মত 'A' level, 'O' level আছে। আর যারা মধ্যম শ্রেণী তাদের মধ্যে কেউ যায় গ্রামার স্কুলে, আর কেউ আসে সেকেণ্ডারী স্কুলে। অধম শ্রেণীদের মধ্যে সকলেই সেকেণ্ডারী স্কুলে আসে কিন্তু তারা কেউই প্রায় সেকেণ্ডারী স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয় না—উত্তম শ্রেণীর কিছু ও মধ্যম শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা সাধারণত এই পরীক্ষায় বসে, তবে তাদের মধ্যেও কিছু না-কিছু তফাৎ থাকে।

যাই হোক, এইবার এ্যানেট গ্রাহামের স্কুল অর্থাৎ ইনফ্যাণ্ট স্কুলের কথায় চলে আসি। আমার সৌভাগ্য-বশত এদেশের একটা ইনফ্যাণ্ট স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করার সুযোগ এসেছিল। সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কিছু কিছু টুকরো তুলে নিয়ে আপনাদের উপহার দেবার চেষ্টা করছি—

এদেশের ইনফ্যাণ্ট স্কুল সম্বন্ধে যে ক'টা বই আমি পড়েছি—তার কোনটাই আমার হাতের কাছে নেই। তবে যতদূর আমার মনে পড়ছে, দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ পর্যন্ত দেশের বালক-বালিকাদের শিক্ষা পুরাতন পদ্ধতিতেই চলত। অর্থাৎ খুব ছোট বাড়ীতে যেখানে কোন খেলার মাঠ নেই—বাচ্চাদের হেসেখেলে বেড়াবার মত যথেষ্ট প্রসারিত জায়গা নেই, সেই ধরণের বাড়ীতে ইনফ্যাণ্ট স্কুলের কাজ চলত। এমন কী বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য করা হত, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এখন ইনফ্যাণ্ট স্কুলের P. E. (Physical Education) অর্থাৎ শারীরিক শিক্ষার ক্লাসে ছেলে ও মেয়ে উভয়ে একটিমাত্র অন্তর্বাস শরীরে রেখে নির্দেশকের নির্দেশমত শারীরিক অঙ্গ পরিচালনা করে। কিন্তু সেই সময় এই ধরণের শারীরিক শিক্ষার ক্লাসের প্রবর্তন করা হয় নি। এই কারণে যে নগ্নগাত্রে ছেলে-মেয়েরা একটিমাত্র অন্তর্বাস পরিধান করে একসাথে খেলাধূলা করবে, ইনফ্যাণ্ট স্কুলেও সেটা নীতি বিরুদ্ধ ছিল। যাই হোক, ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা অধিকর্তারা

সকল প্রতীক্ষা

—আশুতোষ সিংহ

মাসিক

বসুমতী

বৈশাখ / ১৩৭৬

দিনের শেষে

—অশোক গুপ্ত

পরিবহন

—অধ্যাপক পবিত্র সেন

দোলনা

—ডিটি ঘোষ

প্রাথমিক শিক্ষার যে পরিবর্তন সাধন করেছেন, তার মধ্যে বর্তমানে বিশেষ করে এই ক'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয়—

১। বাচ্ছাদের শুদ্ধভাবে ইংরাজী কথা বলতে ও শিখতে শেখান। ২। নূতন পদ্ধতিতে গণিত সম্বন্ধে তাদের মধ্যে ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া। ৩। সাহিত্যের মধ্যে ছোট ছোট কবিতা, ছড়া-জাতীয় পদ্য, দেশের ও বিদেশের উপকথা, নিজের দেশের ঐতিহ্যমূলক গল্প, বাইবেলের ঘটনা এবং বাচ্ছাদের মনোহরণকারী হাসির গল্প বা কমেডি জাতীয় ঘটনা। ৪। যাদের আঁকার দিকে ঝোঁক আছে, তাদের মধ্যে সে সম্বন্ধে উৎসাহ ঢুকিয়ে দেওয়া। ৫। সঙ্গীত-শিক্ষা এবং ৬। শারীরিক শিক্ষা।

সকাল ন'টায় এদেশের ইনফ্যাণ্ট স্কুল হয় সুরু—বারটা পর্যন্ত চলে একটানা পড়াশুনা বা অন্যান্য ক্লাস। তারপর দেড়টা পর্যন্ত এই দেড় ঘণ্টা-কে বলা হয় 'ডিনার টাইম'। এ দেশে মধ্যাহ্নভোজকে এরা অধিকাংশই বলে 'ডিনার।' আমাদের দেশে ইংরাজ জাতির খাওয়া সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল—তাতে আমরা জানতাম, সকাল আটটায় 'ব্রেকফাস্ট', দুপুর একটায় 'লাঞ্চ' বিকাল চারটায় 'টি' এবং রাত আটটায় 'ডিনার', কিন্তু এদেশের অধিকাংশ পরিবার দুপুরের খাওয়াটাকেই প্রধান বলে ধরে অর্থাৎ সেই সময়ই তারা পেট ভরে খেয়ে নেয় এবং 'টি' খায় দুপুর তিনটায় আর সন্ধ্যা সাতটায়, যে খাওয়াটা খায় সেটা হল সাপার (Supper)। এই সময় চা, কফি, স্ন্যাক্স (Snacks) জাতীয় খাদ্যই তারা গ্রহণ করে। যাই হোক ডিনার টাইম বা দুপুর দেড়টায় পর আবার স্কুল সুরু হয়, একেবারে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। তবে মাঝখানে দুবার বিরতি—একবার সকাল দশটায় পনের মিনিটের জন্য। বাচ্ছারা যেই সময় দুধ খায়। আর একবার দুপুর আড়াইটা-র সময়ও পনের মিনিটের জন্য। সেই সময় তারা মাঠে ইচ্ছামত খেলে ঘুরে আসে।

সাধারণত চার থেকে সাত পর্যন্ত বয়সের বাচ্ছারা ইনফ্যাণ্ট স্কুলে থাকে। ছয় বছর বয়সের অধিকাংশ বাচ্ছাই লিখতে বা পড়তে জানে না মুখে মুখে তাদের যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, সেটুকুই দেওয়া হয়।

তাদেরই মধ্যে যাদের মাথা একটু পরিষ্কার কিংবা যারা বাড়ীতে মা-বাবার সাহায্য পায়, তারা অবশ্য নিজেদের নাম লিখতে পারে কিম্বা এক থেকে দশ গোনা অথবা a, b, c, d, পড়াও তাদের দ্বারা মাসে মাসে সম্ভব হয়। কিন্তু ইনফ্যাণ্ট স্কুলের সাত বছরের বাচ্ছারা অর্থাৎ যারা এবার জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করবে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই লিখতে বা পড়তে জানে। সাধারণত পাঁচ, ছয়, সাত এই বয়সে বাচ্ছারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মোটামুটি প্রতি ক্লাসে ষোল থেকে কুড়ি জন বাচ্ছা থাকে, আর এক-একটা ক্লাসের ভার এক-একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার হাতে থাকে।

আমি যে স্কুলটিতে শিক্ষকতা করতাম, তার নাম 'ভিক্টোরিয়া ইনফ্যাণ্ট স্কুল।' বিরাট ঘাসে ঢাকা মাঠের মধ্যে একটি ছোট্ট সুন্দর কাচের একতলা বাড়ী। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় না—ভিতরে অত বড় বড় চার-পাঁচটি ঘর আছে

যেদিন প্রথম প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিসেস পিয়ারসন আমাকে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, আমাকে নিয়ে এলেন পাঁচ বছরের বাচ্ছাদের ক্লাসে যেটা আমিই পরিচালনা করব।

ঢুকতেই কচি কচি সুন্দর মুখগুলি অবাক হয়ে আমার শাড়ী আর চুলের দিকে তাকিয়ে রইল, হঠাৎ একটি বাচ্ছা এগিয়ে এসে বললো,—'তুমি কি রেড ইণ্ডিয়ান? তোমাদের দেশে হাতি পাওয়া যায়?'

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বই কী, কিন্তু মিসেস পিয়ারসন আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। বললেন, 'মার্টিন, মিসেস মুখার্জী তোমাকে পরে হাতির গল্প বলবেন।' সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে নিজের কাজে চলে গেল। বলতে ভুলে গেছি-আমার নাম তাঁরা উচ্চারণ করতে পারতেন না, তাই বলতেন মিসেস বারাটি (ভারতী) মুকারজী (মুখার্জী) কী আর করব, এই নামটিই মেনে নিয়ে ছিলাম।

আমার ক্লাসে ষোলজন বাচ্ছা ছিল। ঘরটি বেশ বড় আকারের—একটি বড় টেবিল, চেয়ার ও আলমারী টিচারের জন্য। বাকী সব ছোট ছোট চেয়ার টেবিল, আলমারী, নানা রকমের বই, বহু নূতন ধরণের খেলনা, আঁকা সরঞ্জাম দিয়ে ঘরটি সাজান এক কোণে 'Shopping Centre' যেখানে বাচ্ছারা নিজেরাই তাদের বাড়ী থেকে খালি কৌটা-বাক্স আনে ও দোকান সাজায়। সেখানে আছে দাঁড়ি পাল্লা, ছোট ছোট পেনি শিলিং আর পাউণ্ডের নিদর্শন। বাচ্ছাদের মধ্যে কেউ সাজে ক্রেতা, কেউ বা বিক্রেতা—টিচারের দায়িত্ব হল লক্ষ্য রাখা যে, সুশৃঙ্খলভাবে ঐ কাজটি করছে কি না। আর তারই মাঝে মাঝে পাউণ্ড, শিলিং পেন্স এবং ওজন সম্বন্ধে ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া। ঘরের আর এক কোণে 'Book Corner' ছোট ছোট ছয়টি চেয়ার, পাশে র‍্যাকে নানা ধরণের বই। বাচ্ছারা ইচ্ছামত বই নিয়ে, কেউ বা পড়ে, কেউ বা ছবি দেখে, কেউ বা শুধুই তাকিয়ে থাকে। শিক্ষিকা লক্ষ্য করেন, তাদের মাঝখানে গিয়ে বসে তাদের কোন প্রিয় গল্প পড়ে শোনান অথবা কবিতা আবৃত্তি করেন। বাচ্ছারাও মাথা দুলিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়।

ঘরের আর এক দিকে 'Nature Corner' অর্থাৎ প্রকৃতির দান সেখানে সাজান। নানারকমের ফুল, লতা, পাতা, ফল, মূল, তরিতরকারী ইত্যাদি সাজান। আমাদেরই অবশ্য সেগুলি সংগ্রহ করে প্রত্যেকটি বস্তর

পাশে ছোট ছোট পিচবোর্ডে সেগুলির নাম লিখে সাজিয়ে রাখতে হত। আর সময়মত বাচ্চাদের ডেকে নিয়ে সেগুলি চেনাতে হত। তাদেরকেও বলা হত যেন, তারাও সুবিধামত প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি এনে টেবিলে সাজায়।

বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের হারভেস্ট টাইম (Harvest Time) অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের প্রথমে নানা রকম ফল ও শস্য সংগ্রহ করতে সত্যিই আমাদের মাঝে মাঝে গলদঘর্ম হতে হ'ত।

ঘরের আর এক দিকে মেয়েদের খেলার জন্য একটি বিরাট নকল বাড়ী সাজান, ঘরে ঘরে পুতুল শুয়ে আছে—আর সাংসারিক জিনিষেও বাড়ীটি ভর্তি। আর আছে ডাক্তার, নার্স এবং পরীর পোষাক। বাচ্চারা সেগুলি পরে কাউকে নকল রুগী সাজিয়ে তার উপর খবরদারী আরম্ভ করে দেয়। তবে এর কতকগুলি মুস্কিলের দিকও আছে। নকল রুগী হতে হতে কেউ কেউ মাঝে মাঝে সত্যি রুগীই হয়ে যেত। ডাক্তারই হয়ত তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে নাকে মেরে দিয়েছে এক ঘুষি। তা ছাড়া আছে লুকানো, লুডো ইত্যাদি জাতীয় হাজার হাজার রকমের খেলার সরঞ্জাম।

এবার শিক্ষিকার কাজের কথায় চলে আসি। সকাল পৌনে ন'টায় আমাদের উপস্থিত হতে হত। ন'টায় বড় হলে সারা স্কুল জমা হয়ে প্রার্থনা-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কাজ হত আরম্ভ।

ইংরাজী লিখতে শেখানর জন্য এদেশে নতুন পদ্ধতি মেনে চলা হয়। অর্থাৎ প্রথমেই বর্ণ-পরিচয় মুখস্থ করিয়ে মাথায় দাগা বোলান নয়। বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার ইত্যাদির ছবির তলায় তাদের নাম লিখে সারা ঘরে সেই ছবি ঝুলিয়ে শব্দ চেনানর মাধ্যমে বাচ্চাদের অক্ষর চেনানো হয়। অর্থাৎ-

'The Cat', 'The Dog', 'There is a house with a tree' এইভাবে শব্দকে ছবি করে অক্ষরের ছবি তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। ঠিক সেইভাবেই সংখ্যা চেনোনো। এক থেকে এক'শ মুখস্থ করান নয়—

"How many Boys are in Your Class ?"

শিক্ষিকা প্রশ্ন করে নিজেই গুণে দেখিয়ে দেবেন—

'9', "And how many Girls are in your class ?"—'7'. "Which is the larger number ?" —'9'. "That means '9' is after '7'

অর্থাৎ কোন অক্ষর ভারী আর কোন অক্ষর হালকা এইটা তাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে যোগ বিয়োগ শেখান। কিংবা ক্লাসের সব থেকে লম্বা ছেলেটি ও সব থেকে ছোটখাট মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে তাদের পাশে কাঠের ইঁট দিয়ে তাদের মাপা হত। তারপর ঘরের এক দিকের দেওয়ালের কাগজে তাদের ছবি এঁকে লিখে দেওয়া হত—

"Stuart is 16 bricks high. Carol is 12 bricks high."

—এইভাবে অক্ষরের ছবি এঁকে তাদের অক্ষর চেনানো। তাদের নাম লিখতে শেখান হয় এই পদ্ধতির মাধ্যমে। যেমন আবার ক্লাসে ষোলটি ছেলেমেয়ে—ষোলটি কার্ড নিয়ে প্রত্যেকটিতে বড় বড় অক্ষরে এক এক জনের নাম লেখা থাকত। বাচ্চারা ইচ্ছামত নিজেদের নামের কার্ড বেছে নিয়ে একটি সাদা কাগজে তার থেকে দেখে দেখে লিখত। সব সময় যে নামই লিখত—তা নয়, ব্যাঙের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাংও হত; কিন্তু এভাবেই তাদের হাতের জড়তা কাটত।

এই কারণেই ইনফ্যাণ্ট স্কুলে পেণ্টিং-এর উপর এত জোর দেওয়া হয়। বাচ্চারা ইচ্ছামত তুলি আর রং নিয়ে কাগজে রং-এর ছোপ বোলাতে থাকে—কিন্তু শিক্ষা, অধিকর্তারা মনে করেন, এইভাবে আজে বাজে ছাপ আঁকতে আঁকতেই তাদের হাতের জড়তা চলে যাবে। সেই জন্য যে বাচ্চা একেবারে লিখতে পারে না, তাকে এইভাবে রং-তুলি ধরিয়ে কাগজের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে এরা বাচ্চাদের লেখার সুবিধার জন্য ইংরাজী অক্ষর ও সংখ্যাকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে গঠন করেছেন। পাঠক-পাঠিকারা নিজের বাচ্চাদের উপরও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। এতে অনেক সুবিধায় হাতের অক্ষর বেরিয়ে আসে। প্রতিটি অক্ষর ও সংখ্যা গোলক বা Cricle (0) ও সমান লাইন বা Straight line (1, —)-এর উপর গঠিত।

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Il, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0—

সেই জন্য আমাদের যে কথাই ঐ ইনফ্যাণ্ট স্কুল লিখতে হ'ত তার সব অক্ষরই এই ভাবে লেখা হত। বাচ্চাদের শুদ্ধভাবে কথা বলান-র জন্য এবং জিভের জড়তা কাটাবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা হল পরস্পরের মধ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আলোচনা। অর্থাৎ সারাদিনের মধ্যে তিনবার যে বিরতি—একবার সকাল দশটা, তারপর বারটা ও শেষে দুপুরে আড়াইটা —এই প্রতিটি বিরতির আধ ঘণ্টা আগে হয় 'tide off time' অর্থাৎ বাচ্চারা নিজেরাই শিক্ষিকার সহযোগিতায় ক্লাসের সমস্ত ছড়ান জিনিষপত্র গুছিয়ে চেয়ার টেনে শিক্ষিকাকে ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে, আর তিনি গল্প বা কবিতা পড়ে শোনান। মাঝে মাঝে তারই জের টেনে কাউকে কিছু অভিনয় করতে বলেন— কাউকে বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই ভাবে কথোপকথনের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে যেমন একটি অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয় তেমনি বাচ্চাদের জড়তা কেটে গিয়ে তারা আরও সহজ সপ্রতিভ হয়ে ওঠে।

বাচ্চাদের শারীরিক শিক্ষার জন্য প্রতি সপ্তাহেই কিছু সময় নির্দিষ্ট থাকে। সেই সময় নির্দেশকের আদেশে

ভারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে অথবা নানাভাবে দৌড় ঝাঁপ করে নিজেদের সতেজ রাখে। ঠিক সেই-ভাবে সঙ্গীত-শিক্ষার ক্লাসেও তারা প্রার্থনা-সঙ্গীত এবং খৃস্টমাস্ ক্যারোল আয়ত্ত করে। মাসে মাসে অতটুকু বাচ্চারাই অদ্ভুত সুন্দর থিয়েটার করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। তা' ছাড়া প্রতি স্কুলেই প্রায় টেলিভিশন এবং টেপ রেকর্ডার ও রেকর্ড প্লেয়ার আছে। মাসে মাসে যেগুলিতে যখন বাচ্চাদের জন্য ভাল ভাল অনুষ্ঠান থাকে—তাদেরকে সেগুলি দেখান হয়।

একবার ঐ স্কুলেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। সৌভাগ্যবত আমিই ঐ স্কুলের প্রথম বিদেশী শিক্ষয়িত্রী এবং ঐ শহরটাতেও খুব কম বিদেশীর আস্তানা, তাই বাচ্চারা আমার পোষাক ইত্যাদির প্রতি খুব আকর্ষণ অনুভব করত। তাই, আমি যখন হলে উপস্থিত ছিলাম প্রায় সকলেই আমাকে ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছিল। অত-টুকু বাচ্চাদের মনেও অন্য দেশ ও তার চালচলন সম্বন্ধে অত বিভিন্ন ধরণের জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তারা আমার সব কথাই প্রায় টেপ করে রেখেছেন—এগুলি নাকি ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীদেরও কৌতূহল মেটাবে।

স্কুলের খাদ্য অর্থাৎ বাচ্চাদের দুধের জন্য কোন মূল্য লাগে না এবং তাদের শিক্ষাও সম্পূর্ণ ফ্রী। শুধু ইন-ফ্যান্ট নয়, সমস্ত স্কুল-জীবনের শিক্ষাতেই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া মাইনে লাগে না। তবে দুধের সঙ্গে বিস্কুটের জন্য প্রত্যহ তিন পেনী এবং 'ডিনারে'র জন্য প্রত্যহ দু' শিলিং—২ পেনী করে লাগে। তবে যে পরিমাণ ডিনার দেওয়া হয়, তার কাছে এই মূল্য কিছুই নয়। প্রতি মঙ্গলবার বাচ্চারা দুই অথবা চার শিলিং করে আনে 'সেভিংস স্ট্যাম্প' (Savings Stamp) কেনার জন্য। এইভাবে ছোট থেকেই তাদের সঞ্চয়ের দিকে আকর্ষণ করান হয়।

আমি যে স্কুলটিতে কাজ করতাম, সেখানে প্রতি বৎসর হয় দুটি উৎসব। একটি mothers day (মাতৃ দিবস) ও আর একটি খৃস্টমাস পার্টি। মাতৃ-দিবস হয় তাদের গরমের ছুটি বা 'Summer Vacation'-এর আগে জুন মাসে। বাচ্চাদের মায়েরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন. মিলিত হন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে। আলোচনা হয় কি ভাবে পড়াশুনার মান উন্নয়ন করা যায়। শিশুমনগুলি আরও সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। খৃস্টমাস পার্টি কেবল বাচ্চাদের জন্য। খৃস্টমাসের দিন সাতেক আগে সাধারণতঃ এটি হয়ে থাকে। সারা স্কুল কাগজের মাল ফানুস, বল আর খৃস্ট সম্বন্ধে নানা রকম ছবি দিয়ে সাজান হয়। খৃস্টমাস ডিনারের (এ সম্বন্ধে পূর্ব সংখ্যায় আলোচনা করেছি) পর আরম্ভ হয় এই পার্টি। বাচ্চারা সকলেই সেদিন তাদের পার্টি ড্রেস পরে স্কুলে আসে—মাথায় কাগজের টুপি পরে সকলেই হলে মিলিত হয়ে আরম্ভ করে খৃস্টমাস ক্যারোল আর নানারকমের Funny Game বা মজার খেলা।

ঠিক আড়াইটার সময় আসেন 'খৃস্টমাস ফাদার'। সাধারণতঃ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বা এই জাতীয় কোন ব্যক্তি ঝুলি ঝাপ্পা পরে ফাদারের সাজে সেজে বাচ্চাদের মধ্যে উপস্থিত হন ও তাঁর তরফ থেকে সকলকেই কিছু না কিছু উপহার দেওয়া হয়। তিনটার সময় আরম্ভ হয় পার্টি—নানা রকমের কেক্, বিস্কুট, প্যাটিস আর চা (বাচ্চাদের জন্য কমলা লেবুর রস) সহ জলযোগ। সেদিনটি বাচ্চাদের ক্ষুদ্র জীবনে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকে।

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা,
সব শিশুদের অন্তরে।"

—এই কথাটার সার্থক রূপায়ণ এদেশের ইনফ্যান্ট স্কুল। যদিও এর পিছনে ইংল্যাণ্ডের উন্নত অর্থনৈতিক দিকটির অবদান কম নয়—তবুও শিশুদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের প্রতিটি ছন্দ যাতে সুন্দর হয়, তার প্রতি এদেশের শিক্ষা-অধিকর্তারা সতর্ক নজর রেখেছেন। শিশুর দায়িত্ব তবু মা, বাবা একলাই বহন করেন না, স্টেট বা সরকার তার একটি বড় দিকের ভার নিয়েছেন।

একটা জাতির উন্নতির মেরুদণ্ড হচ্ছে তার শিক্ষার মান। যে দেশে প্রতিটি সংসারের মা, বাবা কাজে বেরিয়ে যান—সে দেশের বাচ্চারাও সুন্দর শিক্ষা উপযুক্ত সময়েই পেয়ে থাকে—তাদের শিক্ষার মান অন্য যে-কোন দেশের শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী উঁচ। তার কারণ কী ? এদেশে Education-কে নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা হচ্ছে, তার পিছনে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে কী ভাবে তার মানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই শিক্ষারই প্রথম সোপান ইনফ্যান্ট স্কুল। গাছের বীজ পরিপুষ্ট না হলে, সে গাছ টিকে থাকতে পারে না। তাই সেই ছোট্ট বীজকেই মহীরুহে পরিণত করার জন্য যে চিন্তা ও গবেষণা তা দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।
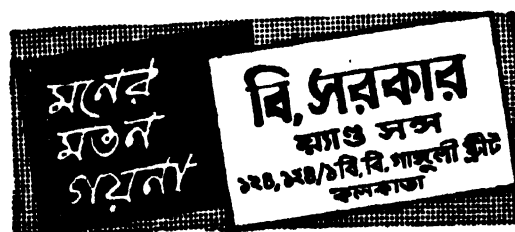
তুমি আমায় ফেলে রেখে যেও না।'

একী অলংঘ্য ভাষা।

বিজয়ার ওই রুক্ষ কঠিন স্থূল সোচ্চার স্বনের কোন্ গভীরে লুকোনো ছিল এ ভাষা?

সরোজাক্ষ এখন কী করবেন?

সরোজাক্ষ একটা ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক পদক্ষেপে মীনাক্ষী নামের ওই দুরূহ বিপদকে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিচ্ছিলেন, কিন্তু সরোজাক্ষ এই আবেদনের বিপদের সামনে থতমত খেলেন। সরোজাক্ষ বলতে পারলেন না 'ঠিক আছে, চ'লো।'

সরোজাক্ষ যেন বোবা দেয়ালের কাছে উত্তরের আশ্রয় খুঁজলেন।

সরোজাক্ষ সে আশ্রয় পেলেন না।

সরোজাক্ষ ধূসর গলায় বললেন, 'তুমি। তুমি কেমন করে যাবে?'

বিজয়া মুখ তুললেন।

নিশ্চিত গলায় বললেন, 'যেমন করে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যায়।'

তবু সরোজাক্ষর কুণ্ঠিত ধূসর গলা আর একটা কথা উচ্চারণ না করে পারলো না, 'কিন্তু তোমার ওই সব ঠাকুর টাকুর—'

'সে ভাবনা আমার।'

সরোজাক্ষ দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন।

সরোজাক্ষ তাঁর ভবিষ্যতের ছবির দিকে তাকালেন সেখানে বুঝি একটুকরো আলোর আয়োজন হচ্ছিল সেখানে নিয়তির লোমশ কালো হাতের থাবা দেখতে পেলেন। সে থাবা চিরদিনের জন্যে কবলিত করে রেখেছে সরোজাক্ষকে। ওর থেকে মুক্তি নেই সরোজাক্ষর।

অতএব সরোজাক্ষকে এই চিরপরিচিত জায়গাটা ছেড়ে অজানা অপরিচিত কোনো এক পরিবেশে বিজয়াকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাততে হবে।

বিজয়ার এই আবেগ, এই ব্যাকুলতা এই আত্মনিবেদনের মূল্য অবশ্যই চিরদিনের নয়, বিজয়া সেই নতুন পরিবেশে আবার সোচ্চার হবেন, বিজয়া হয়তো সেখানে মীনাক্ষীকে নিয়ে বহু মিথ্যার জাল রচনা করতে বসবেন।

সরোজাক্ষ যখন মীনাক্ষী নামের বিপদটাকে মাথায় তুলে নেবার সাহস করেছিলেন, ভেবেছিলেন ডাক্তার আর টাকা এই দুটো জিনিস হাতে থাকলে পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্রহীন হয়েও কোনো অবস্থাকে আয়ত্তে আনা যায়।

কী ভাববে আশপাশের লোক।

যা ইচ্ছে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

তবু কেউ এসে সরোজাক্ষর জীবনের জায়গায় উঁকি দিতে আসতে সাহস করবে না। ভেবেছিলেন তাই। কিন্তু বিজয়া সেই নিশ্চিন্ততার ছবিতে মোটা তুলির একটা কালির পোঁচ বসিয়ে দিলেন। বিজয়া গেলেই সে জানলার কবাট ভেঙে পড়বে, আর বিজয়া বানানো কথার জাল বুনে বুনে তাকে আবৃত করবার হাস্যকর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

এই মুহূর্তে—

এতো স্পষ্ট আর পরিষ্কার করে কিছু ভাববার ক্ষমতা হয়তো হয়নি সরোজাক্ষর, তবু নিয়তির সেই লোমশ থাবার পিছনে এমনি অনেক ছায়াছবির মিছিল যেন সরোজাক্ষকে ব্যঙ্গ কটাক্ষ করে গেল।

তবু সরোজাক্ষ সেই থাবার মধ্যেই আত্মসমর্পণ করলেন।

বললেন, 'বেশ চলো। তোমার যদি অসুবিধে না হয়—'

'অসুবিধে হবে কেন?'

কিন্তু অসুবিধেই তো হবার কথা বিজয়ার। বিজয়া কি তাঁর ওই 'বিগ্রহের' সংসারটিকে নিয়ে যেতে পারবেন তাঁর নতুন সংসারে?

যাঁদের গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস করে 'ঘাম' শুকিয়ে দিতে হয়, আর শীতকালে গায়ে গরম চাদর টেনে দিতে হয়, যাঁদের ভোরে ঘুম ভাঙাতে হয়, আর রাত্রে ঘুম পাড়াতে হয়, এবং ক্ষণে ক্ষণে ভোগ দিতে হয়, তাঁদের কী ব্যবস্থা হবে সেখানে?

না, সেখানে আর কী করে কী ব্যবস্থা হবে? ওই 'ঠাকুরের সংসারটি'কে বিজয়া পুরোহিত-বাড়িতে রেখে যাবেন?

বিবেকের দংশন?

না, তাতেই বা দংশিত হতে যাবেন কেন, বিজয়া? উচিত মত 'সেবা'র জন্য মোটা প্রণামীর ব্যবস্থা করে যাবেন।

সরোজাক্ষ চলে গেলে বিজয়া ওই ছবি আর পুতুলগুলো নিয়ে করবেন কী? শত্রুপক্ষ বিদায় নিলে যুদ্ধের হাতিয়ার কোন্ কাজে লাগে?

●

গ্রামের নাম 'মৌচুরী'।

কে জানে কী তার অর্থ, অথবা সেটা কোন কথার অপভ্রংশ। কোন সূত্রে যে কোন নাম গড়ে ওঠে গ্রামের, শহরের, পল্লীর।

হয়তো বা ভাষাটা আদিবাসীর।

কারণ গ্রামটা একটা আদিবাসী পল্লীর গা ঘেঁসা।

গ্রামের কোল দিয়ে বয়ে যাওয়া

নাকের ঝিরি ঝিরি একটা নদী আছে, ছোট ছোট টিলি টিলি পাহাড়ের মতোও আছে একেবারে গ্রামের কিনারে।

বাংলার গ্রাম হলেও, মাঠে মাঠে গাছে পালায় যেন বেহারের রুক্ষতার আদল।

এইখানে সারদাপ্রসাদের পিতৃভিটে।

কতোদিন আগে ছেড়ে যাওয়া এই গ্রামটার পথে হঠাৎ একদিন সারদাপ্রসাদকে দেখা গেল। একে ওকে জিগ্যেস করছে 'আচার্যি বাড়িটা' কোনদিকে।

ঠিকানা অবশ্য জানা আছে সারদাপ্রসাদের। জ্ঞাতিরা মাঝে মাঝে তার ভাগের জমিজমার উপস্বত্বস্বরূপ কিছু পাঠাতো।

বিবেকের তাড়নায় পাঠাতো না অবশ্যই, পাঠাতো বোধকরি পাছে হঠাৎ কোনোদিন এসে হাজির হয়ে নিজের 'ভাগ' বুঝে নিয়ে চেঁচে টেচে দিতে আসে। সেটা বড় ঝামেলা। তার চাইতে 'মুষ্টিভিক্ষা' একটু দিয়ে রাখা ভালো।

তা' তার জন্যে তো সারদাপ্রসাদের কখনোই কিছু এসে যায়নি। ন'মাসে ছ'মাসে যদি কিছু আসতো, চট করে বেশ কিছু লেখার সরঞ্জাম কিনে ফেলতো।—কাগজ-কালি ব্লটিং পেপার আলপিন, এটা ওটা।

নিজের অন্য প্রয়োজন?

সেকথা কোনোদিন ভেবে দেখেনি লোকটা।

জামা ছিঁড়ে গেলে অম্লানবদনে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে, কাপড় পরতেও সেপটিপিন দিয়ে আটকে রেখে পরতেও দ্বিধা করেনি। তবে আশ্চর্য, সরোজাক্ষর মতো অন্যমনস্ক প্রকৃতির মানুষেরও কেমন করে যেন ওই ঘাড়ছেঁড়া শার্ট, কিম্বা সেপটিপিন্ আটকানো ধুতি চোখে পড়ে যেতো। তবে তেমন অবস্থাটা সহজে হতো না, সরোজাক্ষর জামা কাপড় [illegible] প্রেস্টিজের সঙ্গে সারদাপ্রসাদেরও আসবে এই নিয়মটাই সরোজাক্ষর বাবার আমল থেকে বলবৎ ছিল।

যা দেখে বিজয়ার বাপের বাড়ির লোকেরা গালে হাত দিতেন, 'জামাই মরে গেছে, তবু বুড়ো জামাই পুষছে! ধন্যি বাবা।'

কিন্তু সে থাক, সে জীবনে তো ইতি পড়ে গেছে।

এ এক নতুন সারদাপ্রসাদ তার পিতৃভিটেয় ফিরে এসেছে, জীবনের আর একটা নতুন অধ্যায়ের পাতা ওল্টাতে।

একে ওকে তাকে জিগ্যেস করতে করতে পাড়াটা স্মৃতির পটে ফুটে উঠতে থাকে।

শহরের রাস্তা নিত্য পরিবর্তনশীল।

আজ যেখানে মাঠ, কাল সেখানে বৃহৎ ইমারৎ, আজ যেটা নীচু ছোট একতলা বাসা কাল সেটা বিরাট তিনতলা প্রাসাদ। আজ যেখানটা সৌখিন ব্যক্তির বাড়ির সামনের

জুলোদা।ন, কাল সেখানটা সারি সারি দোকানঘর।

গ্রামের চেহারা এমন দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। সেখানে হয়তো বড়লোকের ভেঙে যাওয়া দালান কোঠাটা দশ বিশ বছর ধরে ভাঙতে ভাঙতে ভূমিসাৎ হয়, হয়তো গ্রামদেবতার মন্দিরের মাথার হেলে যাওয়া চড়োটা ধীরে ধীরে আর একটু হেলে, শানবাঁধানো চকচকে নাটমন্দিরটায় অলক্ষ্যে কখন ফাটল ধরতে থাকে, কাকচক্ষু পুকুরটা তিলে তিলে পানায় মজতে থাকে।

আর কি?

বড়জোর কেউ ভিটের সংস্কার সাধন করতে ইঁটবারকরা দেওয়ালের গায়ে ব্যঙ্গহাসির মতো একট চন লেপে, হয়তো বা কেউ রান্নাঘরের পড়ে যাওয়া ছাদটার কড়ি বরগা ইঁট রাবিশ ফেলে দিয়ে দুখানা নতুন করোগেট টিন বসায়। বহু ইতিহাসে সাক্ষী পুরনো পুরনো বৃহৎ গাছগুলো ঝড়ে পড়ে যাওয়া নতুনত্বের কোনো ছাপ নেই এই 'মৌটংরী'র মতো গণ্ডগ্রামে।

রেল স্টেশনের ধারে কাছে যে সব গ্রাম, তাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। সেখানে 'ছাইকেল রিশকার' দেখা মেলে, সেখানে ঘরে ঘরে 'বাইসাইকেল' তরুণ সমাজের পরণের ধুতি অপসারিত, সেখানে প্যান্টের একাধিপত্য রাজত্ব। সেই প্যান্টের পকেট হাতড়ালে প্রায় প্রত্যেকের পকেটেই একটা করে টর্চ পাওয়া যাবে, মাঝে মাঝেই কোনো অবস্থাপন্নের ছাওয়ালের পকেটে 'ট্রানজিস্টা'।

রেল স্টেশনের ধারে কাছের গ্রাম থেকে চটকরে দু'একটা স্টেশন পার হয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া যায়, মনের মতো জামা জুতো শাড়ী ব্লাউস কিনতে যাওয়া যায়, হাই-ইস্কুল এবং সরকারি হাসপাতালের সুবিধেও মেলে।

মৌটুংরী রেল স্টেশন থেকে অনেক মাইল দূরে। এখানে সাইকেল রিকশার টুংটাং সুদূর স্বপ্নের ছায়া। নিজের পা আর গরুর পা, এইমাত্র ভরসা এখানে। তবে বালকেবাই গরুর গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনির কামাই নেই। কত খানি যেন গুঁড়িয়ে কোন প্রান্তসীমার পারের পথে মহাজনদের 'লরী গাড়ী' যায় গ্রামের অন্ন লুঠ করে নিয়ে যেতে, ওই গরুরগাড়ী কাজে লাগে সেই মঠের মালগুলো পৌঁছে দিতে।

তেমনি একখানা মালবওয়া গাড়ীর ফিরতি ক্ষেপের সুযোগে রেল স্টেশন থেকে গ্রামের মধ্যে ঢুকে এসেছে সারদাপ্রসাদ গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাব জমিয়ে।

ওই গাড়োয়ানরা বেশীরভাগই দেহাতি বেহারী, আচার্যি বাড়ির ঐতিহ্যের খবরের ধার ধারে না, কাজেই তাদের কাছে হদিস মেলেনি, গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে, জিগ্যেস করে করে আর চিনে চিনে এসে দাঁড়িয়েছে আচার্যিবাড়ির ভিটের উঠোনে।

তা' ভিটেটা না হয় চিনে বারকরা গেছে, কিন্তু পাতলা লম্বা শ্যামবর্ণ, আর সুকুমার মুখ এই আধাবয়সী মানুষটাকে চিনবে কে? কার দায় আছে তাকে চিনে ফেলে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করবার?

পরিচয় দিয়ে তবে চেনাতে হবে।

কিন্তু সেই পরিচয়টাই বা কাকে দিতে বসবে সারদাপ্রসাদ? নিজেই কি সে চেনে কাউকে? তাছাড়া ধারে কাছে আছেই বা কে?

তবু মনিঅর্ডারের কুপনের স্বাক্ষর স্মরণ করে গলা ঝেড়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাক দেয়, 'শ্যামাপ্রসাদবাবু আছেন?'

যদিও ওই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি সম্পর্কে ভাইপো, তব বাবুই বলে সারদাপ্রসাদ।

সারদাপ্রসাদ যদি কিছুদিন আগেও পিতৃভিটে দেখবো বলে বেড়াতে আসতো, সারদাপ্রসাদের কণ্ঠে অন্য সুর বাজতো।

উল্লাসের সুর, প্রত্যাশার সুর, অকুণ্ঠিতের সুর।

কিন্তু সারদাপ্রসাদ একটা মারখাওয়া পশুর মতো ছুটে চলে এসেছে আর কোনো জায়গায় কথা মনে পড়েনি বলে। আর সারদা এই সামান্য ক'দিনেই অনেকখানি বয়েস বাড়িয়ে এসেছে এসেছে পৃথিবী সম্পর্কে যেন অনেকখানি অভিজ্ঞতা নিয়ে।

আগে হলে সারদাপ্রসাদ নিশ্চয়ই ভাবতো, এতোদিন পরে এলাম আমি, আমায় দেখে আনন্দে দিশেহারা হবে এরা। ভাবতো কি জানি বাবা ছাড়তে চাইবে কি না।

কিন্তু বয়েস বেড়ে যাওয়া সারদাপ্রসাদ তা ভাবছে না। বরং ভাবছে চিনতে চাইবে তো? জায়গা ছেড়ে দেবে তো?

ওই 'বাবু' ডাকের মধ্যে সেই সংশয়ের দ্বিধা।

বারদুই ডাকের পর, সামনের দালানের একটা ভেজানো দরজা খুলে গেল, একটা ছিটের ইজের পরা ছোট ছেলে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলো, 'কে?'

'আমাকে তুমি চিনবে না—' সারদাপ্রসাদ আর একটু এগিয়ে এলো, 'তুমি শ্যামাপ্রসাদবাবুর ছেলে?

ছেলেটা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলো, 'পিসি, দেখো কে এসেছে—'

এবার দেখা গেল এক মলিনবসনা বিধবা মহিলাকে। চেহারায় বয়সের থেকে অনেক বেশী জীর্ণতার ছাপ। দরজাটাকে এক হাতে শক্তকরে চেপে ধরে প্রায় রূঢ় গলায় প্রশ্ন করে 'কাকে চান?

সারদাপ্রসাদের 'বয়েস বেড়েছে' তবু সারদাপ্রসাদ বুঝতে পারে না এই অকারণ রূঢ়তার অর্থ কি?

এরা যে অপরিচিতকে দেখলেই সন্দেহ করে, আর সন্দেহ করে বলেই প্রথম থেকেই শক্ত হয়, সেটা জানা ছিল না সারদাপ্রসাদের। তাই রূঢ়তায় আরো বিষণ্ণ হলো সে।

আস্তে বললো, 'শ্যামাপ্রসাদবাবু আছেন? মানে আমি তাঁর কাকা, সারদাপ্রসাদ। কলকাতা থেকে এসেছি।'

বিধবা মহিলা এবার কিঞ্চিত সহজ কণ্ঠে বলেন, 'ও, বুঝেছি। নতুন ঠাকুর্দার ছেলে। আমি শ্যামার দিদি। তা' আপনি এখনই এলেন বুঝি?'

কণ্ঠস্বর ততটা স্নান না হলেও আনন্দে অধীর নয়। বরং অপ্রসন্নতার আভাস।

সারদাপ্রসাদ এ প্রশ্নে অবাক হয়।

'এখনই এলেন', এমন একটা বাহুল্য প্রশ্নের হেতু কি? সারদাপ্রসাদের কি এখানে অন্য আস্তানা আছে যে, সেখানে নেমে ধীরে সুস্থে সানাহার সেরে জ্ঞাতি গোত্রের বাড়িতে দেখা করতে এসেছে?

সারদাপ্রসাদ সেই অবাক অবাক অসহিষ্ণু গলায় বলে, 'এখন নয়তো কখন? এই তো আসছি। বাবা যা ধুলো, গলা শুকিয়ে গেছে। জল দেখি দিকি একগ্লাশ।'

তুমি 'আপনি' বাঁচিয়ে এই প্রার্থনা।

মহিলাটি কিন্তু ওই আবেদনেও বিশেষ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন না, সেই ছেলেটার মতই ভিতরে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে কাকে যেন উদ্দেশ করে বলেন, 'এই এক গেলাশ জল আনতো।'

মহিলাটির কণ্ঠে জেলার 'টান্।' সেই বিশেষ একটি টান সম্বলিত ভঙ্গীতেই তিনি আবার প্রশ্ন করেন, 'এখুনি এলেন তো সঙ্গে জিনিসপত্তর কই?'

সারদাপ্রসাদ চকিত হয়।

ওঃ তাই ওই বাহুল্য প্রশ্ন।

অন্যখান থেকে এলেই মানুষের সঙ্গে কিছু না কিছু থাকে। নিদেন একটা হাতব্যাগও।

সারদাপ্রসাদের সঙ্গে কিছু নেই।

সারদাপ্রসাদ তার সমস্ত অন্তরটার মতোই শূন্য দু'খানা হাত নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কেন?

সারদাপ্রসাদের হাত একেবারে শূন্য কেন? কিছু তো থাকবার কথা। সারদাপ্রসাদ তো তার 'বাকি খাতার' বোঝা সরিয়ে নিয়েছিল বিজয়ার ঘর খালি করে দিতে।

সারদাপ্রসাদের সেই আজীবনের ফসল সোনার ধানের বোঝার খানিক অংশ নাহয় হৈমবতীর কাছে পড়ে রইলো, কিন্তু বাকিগুলো সারদাপ্রসাদ করলো কি?'

কিন্তু সেই বোঝা নিয়ে করবেই বা কি সারদাপ্রসাদ? প্রিয়জন যতই প্রাণপ্রিয় হোক, তার মৃতদেহটা কে বয়ে নিয়ে বেড়ায়? তার শেষ সমাপ্তি তো হয় আগুনে নয় জলে।

সারদাপ্রসাদের ওই 'প্রাণপ্রিয়' খাতাগুলোর তো এখন মৃত্যু ঘটেছে, অতএব তাদের ওই দুটোর কোনো একটায় ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কি করবে?

তারপর এই চির অবহেলিত পিতৃভিটেয় এসে দাঁড়িয়েছে একান্ত প্রিয়জনকে পুড়িয়ে আসা শ্মশানপ্রত্যাগতের মূর্তি নিয়ে।

কিন্তু তেমন মূর্তি কে পছন্দ করে?

ঝকঝকে সুটকেস হাতে মটমটে চেহারার শহুরে আত্মীয় হঠাৎ গ্রামে এসে দাঁড়ালে, জ্ঞাতিরা তাকে সমীহর দৃষ্টিতে দেখে, এমন সর্বস্বান্তের মূর্তিকে আদৌ নয়।

তাই শ্যামাপ্রসাদের দিদি জলের আদেশ দিলেও পিপাসার্তের জন্য তটস্থ হল না। খাতির করে বসতেও

জানেন না, বরং উত্তর না পেয়েও আবার প্রশ্নের গামছা ছাঁকা দিয়ে খবরের চুনো-পুঁটি সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

'কখনো তো আসতে দেখি না, এতোদিনে বুঝি দেশকে মনে পড়লো?'

'এই আর কি আসা হয়ে ওঠে না—' সারদাপ্রসাদ অন্যমনস্কের মতো এদিক ওদিক তাকায় কোনো একটা বসবার আসনের প্রত্যাশায়। কোথাও কিছু নেই, শুধু ওই উঁচু দাওয়ায় ওঠবার ইঁটের কোন ভাঙা বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়িগুলো ছাড়া।

তা' সেও তো ধূলিধূসরিত।

সারদাপ্রসাদ ক্লান্ত গলায় বলে, 'শ্যামাপ্রসাদ কখন আসবে?'

'তার আসতে দেরী আছে। কই রে অটল জল আনলিনে?'

এতক্ষণে অটল নামধারী একটা একটু বড় ছেলে ঝকঝকে করে মাজা একটা ঘটিতে একঘটি জল নিয়ে আসে, তার সঙ্গে অপর হাতে ঝুলিয়ে আনে একটা জলচৌকী।

শ্যামাপ্রসাদের দিদি অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুই এই ভারীটা বয়ে আনলি? রাখাল কী করছে?

'সে তো গরু ছাড়তে গেছে।'

'দিন ভোর গরু ছাড়ছে?' মহিলা বেজার গলায় যেন অনুপস্থিত রাখালের ফাঁকি দেওয়ার সমস্ত দোষটা সারদা-প্রসাদের ঘাড়েই চাপিয়ে বলেন 'নিন বসুন কাকা, শ্যামা বাড়িতে থাকতে এলে আপনাকে এতো অসুবিধের পড়তে হতো না।

না না অসুবিধে কি?

সারদাপ্রসাদ দাওয়ায় উঠে জল-চৌকীতে বসে ঘটির সব জলটুকু খেয়ে শেষ করে একটা নিশ্বাস ফেলে গলায় বুকে ছিটিয়ে পড়া জলের ধারা মুছতে থাকে কোঁচার কাপড় তুলে তুলে। ঘটিতে জল খাওয়ার অভ্যাসতো নেই।

শ্যামাপ্রসাদের দিদি মনে মনে বলেন, 'শহুরে ভূত। চুমুক দিয়ে ঘটিতে জল খাচ্ছে।'

মুখে বলেন, 'তা আপনি হাতমুখ ধোবেন তো?'

সারদাপ্রসাদ বোকার মতো গলায় বলে, 'হাতমুখ? কেন স্নানের সুবিধে হবে না?'

'ওমা শোনো কথা। চানের আবার অসুবিধে কি? পুকুরে কি জল নেই? তবে আপনার কাপড় গামছা তো দেখছি নে'—।

শ্যামাপ্রসাদের দিদি বেজারই থাকেন। অনেক মালপত্র নিয়ে এসে-পড়া আত্মীয়ও যেমন ভীতিকর দীর্ঘ স্থায়িত্বের সম্ভাবনার ইসারায়, একেবারে শূন্যহাত আত্মীয়ও তেমনি ভীতিকর বৈকি। হয়তো তদপেক্ষাও। চান করতে উদ্যত হয়েই তো ও প্রথমে চাইবে তেল গামছা, তার পর চাইবে কাপড়।

এ আবার কী মুস্কিল। সেই মুস্কিলের চিহ্ন ফুটে ওঠে তার মুখে। সারদাপ্রসাদ চকিত হয়।

সারদাপ্রসাদ যেন তার কোন এক অগতির গতির ভরসায় এসেছে।

তাই সারদাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বলে, 'তবে থাক, তবে থাক, শ্যামাপ্রসাদ এলেই হবে অখন। জিনিসপত্তর আনা হয় নি। মানে হঠাৎ চলে এলাম কি না—'

শ্যামাপ্রসাদের দিদি এই হঠাৎ-এর কারণ নির্ণয় করতে পারেন না। সেই একই ভাবে বলেন, 'তবে বসুন। শ্যামা আসুক। তবে এভাবে একবস্ত্রে আসা আপনার উচিত হয়নি কাকা।'

ভাইঝি আর একবার কাকাকে উপদেশ অমৃত দান করে বলেন, 'একটা বেলা থাকলেও, মানুষের একখানা ধূতি গামছা লাগে।'

ভিতরে ঢুকে যান তিনি, দরজাটি বন্ধ করতে ভোলেন না।

সারদাপ্রসাদ একা বসে সেই অদেখা, বা ভুলে যাওয়া ভাইপোর আশাপথ চেয়ে। যেন সেই শ্যামাপ্রসাদই বুঝবে তাকে।

হয়তো বুঝতো শ্যামাপ্রসাদ।

যতই হোক রক্তের সম্পর্ক।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তার থেকে অনেক বেশী বোঝে টাকা পয়সা। সেটা না কি গায়ের রক্তেরও অধিক।

তাই শ্যামাপ্রসাদ এসেও আহ্লাদে অধীর হয় না কাকাকে দেখে।

কি করেই বা হবে?

সারদাপ্রসাদের বাপের দিকের ভিটের অংশটা শ্যামাপ্রসাদের 'খামার-বাড়ি' হয় নি কি? নিজের রান্নাঘরটা পড়ে যাওয়া ইস্তক—সারদাপ্রসাদের দিকের ভাঁড়ার ঘরটায় রান্নার কাজ চালাচ্ছেন না? আর শ্যামাপ্রসাদের নিজের পাতকুয়ায় বালি ওঠা ইস্তক, সারদাপ্রসাদের দিকের পাতকুয়োটাই ব্যবহার করছে না কি? তাছাড়া বাগান পুকুর সবইতো। তবে?

'এই মানসিক উদ্বেগের অবস্থায় কে পারে 'কাকা কাকা' করে গড়িয়ে পড়তে? অন্তত শ্যামাপ্রসাদ পারবে না। এই রুক্ষমাটির বক্ষ থেকে ক্ষুধার অন্ন আহরণ করতে হয়।

শ্যামাপ্রসাদ যদি একবার তার জ্ঞাতি কাকাকে তার নিজস্ব অধিকারের জায়গাগুলো চিনিয়ে দেয় রক্ষে আছে?

তাই সারদাপ্রসাদ যখন নেহাৎই স্মৃতির সৌরভ মন্থন করে জিগ্যেস করে, 'আচ্ছা কোনদিকে যেন আমরা থাকতাম? সেই বড় একটা টানা বৈঠক-খানায় বাবা বসতেন, আরো সব কারা আসতো, দাবা খেলতো—'

তখন শ্যামাপ্রসাদ একটি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'সেই টানা বৈঠক-খানা? হায় অদৃষ্ট! সে তো কবে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। ভিটেবাড়ি না দেখলে যা হয়। তুমি তো শুনতে পাই এখেনে ইস্কুলের পড়া সাঙ্গ করেই কলকাতায় মামারবাড়িতে থেকে কলেজে পড়েছো, তার পর বড় লোকের বাড়ি বে' করে ঘরজামাই থেকেছো, এযাবৎ আর এমুখোও হওনি। মানুষকে যেমন ভাতজল দিতে হয়, ভিটেবাড়িকেও তেমনি 'ভাতজল' দিতে হয়। তা সেকথা আর মানলে কবে? এখনো যে তোমার সেই বাড়ি-ঘরের চেহারা মনে আছে, এইটাই অবাক কথা।'

সারদাপ্রসাদ তার প্রায় সমবয়সী

ভাইপোর এই 'অবাকে' নিজের মনে থাকার লজ্জায় মরমে মরে। বাস্তবিক তো মনে থাকাটা উচিত হয় নি তার। প্রশ্ন করাটা আরো গর্হিত হয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না এমনি হঠাৎ স্মরণে এলো। সত্যিই তো থাকবে কেন? যাবেই তো পড়ে।'

শ্যামাপ্রসাদের বুক থেকে পাহাড় নামে।

তারপর ভাবে, ভাগ্যিস খামারবাড়িটা পাঁচীল দিয়ে ঘিরে নিয়েছি। নচেৎ চোখে পড়ে যেতো।

তবে পাড়ায় 'নয় নয়' করেও কুটিল বুড়ো দু'চারটে আছে তো? তারা একা পেলেই ঠিক ওর কানে তুলবে। কে জানে কতোদিন থাকবার মতলবে এসেছে, জিনিসপত্তর যখন কিছু আনেনি, বেশীদিন থাকবে না বলেই মনে হয়। কিন্তু একেবারে এতো শূন্য হয়ে কি লোকে একবেলার জন্যেও আসে?

ভগবান জানে রাস্তায় বাক্স স্যুটকেস খোওয়া গিয়েছে কি না—মুখের চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। যাই হোক চোখে চোখে রাখতে হবে।

পাড়ার লোকের সঙ্গে একবারও একা মিশতে দেওয়া হবে না। যে ক'দিন থাকে, একটু ইয়ে হয়ে থাকলেই—তবে আদরযত্ন আদৌ নয়। আদর যত্ন পেলে আর রক্ষে থাকবে না। 'এসে লক্ষ্মী, যাও বালাই।' আমি তো বাবা এই সার বুঝি?'

●

তা ক অক্ষর গোমাংস, গাঁইয়া সারটা যা বুঝলো তাই করলো।

বাড়ির ভিতরের যে মহিলাটি ছেলের হাত দিয়ে জলের সঙ্গে জল-চৌকী পাঠিয়ে দিয়েছিল, ভিতরে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ তাকে চাপা তর্জনে শাসিয়ে আসে, 'তোমায় অতো সর্দারী করতে কে বলেছিল, অ্যাঁ কে বলে ছিল। খবরদার। বেশী 'লাই' দিতে যেতে হবে না। মানে মানে বিদেয় করার চেষ্টা করতে হবে।

তা' সেই চেষ্টাটাই কি করতে হয়েছিল সারদাপ্রসাদের জন্যে?

নাঃ।

সারদাপ্রসাদ নিজেই বিদায় নিয়েছে।

সারদাপ্রসাদ তার ভাইপোর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছে, এসেছি যখন, তখন দু'দিন থেকে যেতে বলছো? তা' থাকতে পারলে তো আমারও ভাল লাগতো, কিন্তু থাকার উপায় কোথা?'

শ্যামাপ্রসাদের মুখ থেকে উদ্বেগের পাথর সরে গিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ এরপর তার কাকার এতোদিন প'রে দেশে এসে দুটো দিন থাকতে না পারার জন্যে অনেকখানি বড় একটা নিশ্বাস ফেলে আক্ষেপ করেছিল।

সারদাপ্রসাদ চুপ করে তাকিয়ে থেকেছিল সামনের তেঁতুল গাছটার দিকে।

যেখানে ঝিরিঝিরি পাতার এক পরম সৌন্দর্যের খেলা।

প্রকৃতির ঘরে এমন কতো ঐশ্বর্য, কতো সৌন্দর্যের সঞ্চয়। যাদের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপ করে তাকিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

অথচ সারদাপ্রসাদ কোনোদিন এই বিনামূল্যে বিকোনো অফুরন্ত ঐশ্বর্যের দিকে ফিরে তাকায়নি। সারদাপ্রসাদ দশফুট বাই বারোফুট একখানা ঘরের মধ্যে নিজেকে কবরিত করে ফেলে—একটা মূর্খের স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছে বসে বসে।

প্রকৃতির এই অফুরন্ত ঐশ্বর্যের রাজ্যে কোথাও একটুকরো জায়গা কি জুটবে না সারদাপ্রসাদের? শ্যামাপ্রসাদের উদ্বেগ হয়ে এই মৌচুংরী গ্রামে থাকবার ইচ্ছে নেই সারদাপ্রসাদের।

কিন্তু আরো তো হাজার হাজার
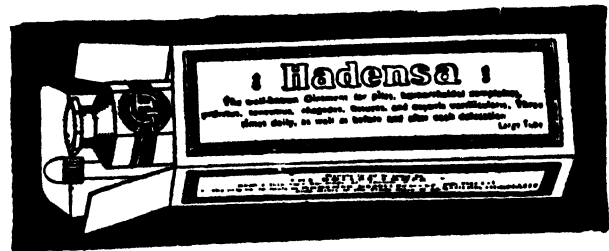
গ্রাম আছে বাংলাদেশে। সবই তো সারদাপ্রসাদের মাতৃভূমি।

তা' সেদিন কি সারদাপ্রসাদ স্নান আহার কিছুই না করে বিদায় নিয়েছিল তার সাত পুরুষের ভিটে থেকে?

না না তাই কি হয়?

শ্যামাপ্রসাদ তাই ছাড়ে কখনো?

স্নানটা না হোক আহারটা হয়েছিল বৈকি।

স্নানের জন্যেও প্রস্তাব দিয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ। বলেছিল, 'তোমার কাপড়-জামাগুলো পরে স্নান করে এসে ওগুলো মেলে দিয়ে ততক্ষণ না হয় আমার একখানা ধুতি টুতি পরে খাওয়া দাওয়া করো, শুকিয়ে গেলে নিজেরটা পরে নিও। দেরী হবে না, রোদের জোর আছে।'

রোদের জোর আছে।

রোদের যে জোর আছে, সে খবর টের পাচ্ছিল বৈ কি সারদাপ্রসাদ, শরীরের প্রত্যেকটি অণুপরমাণু থেকে টের পাচ্ছিল। দু'দিন স্নান হয়নি। স্নানটাই একমাত্র বিলাস ছিল সারদাপ্রসাদের।

যার জন্যে বিজয়া রেগে রেগে বলতেন, 'জামাই বাবু, চৌবাচ্চার সবটুকু জল নিজের গায়ে ঢালছেন, আর যেন কারুর কাজ নেই।'

তা' বিজয়ার কথা বাড়ির কেউই গায়ে মাখতো না, সারদাপ্রসাদও না। কথা গায়ে মাখার অভ্যাসই ছিল না তার।

হঠাৎ কেমন করেই যেন তার অভ্যাসের জগৎটা আমূল পালটে গেল।

তাই সে ওই জোরালো রোদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'না: থাক এতো বেলায় আর স্নান-টান করবো না।'

অতএব হাতে মুখে জল দিয়েই খেতে বসেছিল সারদাপ্রসাদ। আর সেই সাজিয়ে দেওয়া 'অন্নব্যঞ্জনে কোনো এক অন্তরালবর্তিনীর শ্রদ্ধা-ভক্তির স্পর্শ পেয়েছিল যেন।

খাকবে না, চলে যাবে।

এতে এতো প্রীত হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ যে ভিতরে গিয়ে বলেছিল, 'পোস্তর বড়া টড়া দু'খানা করে দাও না। আর যদি ওবেলার জন্যে মাছ থাকে তো না হয় তার থেকে—।

শ্যামাপ্রসাদের বৌ বলেছিল থাক তোমায় আর বুদ্ধি দিতে আসতে হবে না। বাড়ির মানুষ বাড়িতে এসেছেন, দুটো যত্নের ভাত পাবেন না? শ্বশুর যে কেমন বস্তু তাতো চক্ষে দেখিনি, কাকাকে দেখে ইচ্ছে হচ্ছে গিয়ে পায়ের ধুলো নিই।'

'থাক ইচ্ছেময়ীর আর অতো ইচ্ছেয় কাজ নেই।' শ্যামাপ্রসাদ সন্দেহের গলায় বলেছিল, 'দেখলে কখন?'

'বা: সমানেই তো বসেছিলেন দালানে। এই জানলা থেকে দেখতে পাওয়া যায় না।'

থাকবে না।

চলে যাবে।

এই মন্ত্রের জোরে এতো সব প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়তে পারে শ্যামাপ্রসাদ। নচেৎ ওই জানলা দিয়ে দেখা নিয়েই লেগে যেতো ধুন্ধুমার।

পড়ন্তবেলাতেই বিদায় নিলো সারদাপ্রসাদ।

শ্যামাপ্রসাদের দিদি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কাকাকে বিদায় দিতে গিয়ে অভিযোগ করলো 'এক বেলার জন্যে শুধু মায়া বাড়াতে এলে কাকা। এতোকাল পরে সেই যখন এলেই, দুটো দিন অন্তত থাকলে হতো। আত্মজন একটু খবরই পেলো না। কারুর সঙ্গে দেখা হল না।'

সারদাপ্রসাদ সেই তেঁতুলপাতার ঝিরিঝিরিনির দিকে চোখ রেখেই মৃদু হেসে বললো, 'দেখা হলেও যা না হলেও তা। আমায় আর কে চেনে?

'নাই বা চিনলো। নতুন ঠাকুর্দার নামেই চিনতো।'

'সেকালের কেউ তো আর বেঁচে নেই।'

'আছে, কেউ কেউ আছে—'

শ্যামাপ্রসাদ সাবধানে বলে, 'নাম করলে চিনতে পারবার লোকও আছে কিছু কিছু।'

সাবধানে না বললে?

আগ্রহের অভিনয়টা যদি বেশী জোরালো হয়ে যায় তো লোকটার মন ঘুরে যেতে পারে। তার থেকে ওই সাবধানতাটুকু ভালো।

'আমি জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি।' সারদাপ্রসাদ মনে মনে বলে, 'তবু যেতে হবে' এইটাই হচ্ছে আসল কথা।'

এবেলা আর গরুর গাড়ির সুবিধে নেই, দ্রুতপায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল সারদাপ্রসাদ। যাচ্ছিল আদিবাসীদের গ্রামের দিকে। ওই ছোট ছোট মাটির কুটিরগুলি দূরে থেকে বড় সুন্দর লাগছে।

ওখানে যেতে হবে।

হয়তো এখনো 'সরলতা' নামের বস্তুটা ওখানেই কিছু পাওয়া যেতে পারে। হয়তো ওখানেই বাকি জীবনটা কেটে যেতে পারে, শুধু গাছের পাতার ঝিরিঝিরির দিকে তাকিয়ে।

প্রকৃতির ওই সবুজের ভাণ্ডার বিষে নীল হয়ে যায়নি, সে তার চির সত্তার নিয়ে চিরকাল অপেক্ষা করে আছে, থাকবে। বিষে নীল হয়ে যাওয়া মানুষ যদি কখনো আবার ফিরে তাকিয়ে দেখে।

অনেকটা পথ পার হয়ে আসার পর হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালো সারদাপ্রসাদ। 'দাদু!' দাদু বলে কে কাকে ডাকছে?

সকালের সেই জল এনে দেওয়া ছেলেটা। হাতে তার একটা কাঁচা শালপাতায় মোড়া খাবারের পুঁটলী। সাধ্যের অতিরিক্ত ছুটে ছুটে এসেছে বেচারা। তাই কথা বলতে দেরী লাগে। হাঁপাতে থাকে।

সারদাপ্রসাদ সস্নেহে বলে, 'কীরে?'

ছেলেটা কথা বলার ক্ষমতা পেয়ে বলে, 'দাদু, মা বললো, তুমি তো রাত্তিরে থাকলে না, তোমার রাত্তিরের খাবার।'

সারদাপ্রসাদ মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে বলে, 'আমি যে তোর দাদু হই, একথা কে বললে রে?'

'মা। মা বললো, তোমার বাড়িঘর সব নিজে নিয়ে বাবা তোমায় তাড়িয়ে দিলো, থাকতে দিলো না।'

সারদা মৃদু ভর্ৎসনার গলায় বলে, 'ছিঃ ও কথা বলতে নেই। আমি পাগল ছাগলা মানুষ, কোনোখানে কি স্থির হয়ে বসতে পারবো? ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। ইস কত ছুটে এসেছিস তুই।'

'আসবো না হি। মা বললো না? মা গুরুজন না?'

'তাই তো সত্যিই তো।'

সারদাপ্রসাদ আস্তে ওর মাথায় একটা হাত রাখে। বলে বেঁচে থাকো দাদু, সুখে থাকো। কিন্তু এ কত্তো খাবার ভাই, বিরাট ভারী মনে হচ্ছে। তুমি কিছু খাও।'

'ধ্যেৎ' ছেলেটা হেসে ওঠে, 'তোমার জন্যে আনলাম! নাড়ু পরোটা আর ছোলা-চচ্চড়ি আছে, খেয়ো কিন্তু। আর শোনো, মা বলেছে তোমায় পেন্নাম জানিয়েছে।'

সারদাপ্রসাদ সহসা অন্য দিকে তাকায়। সারদাপ্রসাদের কোনোখানে একটু বসে পড়তে ইচ্ছে করে। সারদা-প্রসাদ একটুক্ষণ পরে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ দিলাম ভাই, বোলো। আর বোলো খাবারটা পেয়ে বেঁচে গেলাম। নৈলে হয়তো উপোসেই কাটাতে হবে।'

দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে সারদা-প্রসাদ। পিছুন দিকে আর তাকায় না। তবু অনুভব করে, ছেলেটা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

সারদাপ্রসাদ অনুভব করে, একটি আধময়লা শাড়ীপরা নেহাৎ সাধারণ গ্রামের মেয়ে ওর পিছনে কোথাও কোন খোলা দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যার কোন অন্যায়ের প্রতি-কারের ক্ষমতা নেই, তবু সে ন্যায়-অন্যায় সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্ব কবে বেদনা অনুভব করে।

সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সারদাপ্রসাদ।

। আগামীবারে সমাপ্য।

ফটো: চিত্রজিৎ ঘোষ

লোকমাতা নিবেদিতা

সুধাংশু গুপ্ত

ভারত থেকে দূরে—বহুদূরে আয়র্ল্যাণ্ড। সেখানে মায়ের কোল আলো করে একটি শিশু জন্ম গ্রহণ করলো ১৮৬৭ সনের ২৮শে অক্টোবর শরতের সোনালি প্রভাতের আলো ঝলমল দিনে। বাবা ধর্মপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ধর্মযাজক। নাম স্যামুয়েল নোবেল। মাতার নাম মেরী। দিনে দিনে মেয়েটি বেড়ে উঠতে লাগলো। মুখে-চোখে ফুটে বেরোলো এক অজানা আলোর সুষমা।

বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন মার্গারেট। ঠাকুরমা'ও তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন—তার সঙ্গে মন-প্রাণের কথা বলতেন। মেয়েটা ও নানা প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো তাঁকে। ঠাকুরমা নাতনীর ওই অতি অল্প বয়সে অনুসন্ধিৎসা দেখে তাঁর ছেলেকে বলতেন : স্যামুয়েল আমি বলে রাখলাম, দেখবি তোর এই মেয়ে একদিন বংশের সুনাম শুধু রাখবে না—সমস্ত পৃথিবী ওর যশোনামে মুখরিত হয়ে উঠবে।

বাবা কথা শুনে হাসতেন। মার্গারেট বাবাকে নানা প্রশ্ন করতেন।

সে একদিন বাবাকে অদ্ভুত এক প্রশ্ন করলো : আচ্ছা বাবা, ভারতবর্ষ এখান থেকে কতদূর? ধর্মযাজক হ্যানদুখে সামনে রাখা একটি পৃথিবীর মানচিত্র দেখিয়ে বললেন : এই দেখ ইণ্ডিয়া—এখানে হাত রাখ। ভারতবর্ষ অতি সুন্দর দেশ। এখানে কত লোকের বাস। আর জান মা, সবাই একে 'দি ল্যাণ্ড অফ্ দি হোলীজ' বলে থাকে—অর্থাৎ ওই দেশ সাধুসন্তদের বাসস্থান।

বাবার কাছে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ছিলো তার অসীম। বাবা ও মেয়েকে জবাব দিতে বিরক্ত বোধ করতেন না—বরং যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তার কৌতূহল মেটাবার জন্য।

নিবেদিতা

ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় আয়ারল্যাণ্ড বাসীরা সে সময় শান্তিতে ছিলেন না তাঁরা স্বাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন। একদল লোক উঠে পড়ে লাগলো দেশবাসীর মনে আত্মীয়তা-বোধ ও স্বাধীনতার আন্দোলন জাগ্রত করার জন্য। মার্গারেটের মনের কোণে সেই আগুনের শিখা এসে পৌঁছুল—সেও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এর কয়েকমাস পরে বাবা সপরিবারে চলে এলেন ইংল্যাণ্ডে। আয়র্ল্যাণ্ডের মায়া কাটিয়ে এখানে স্থায়িভাবে বাস করতে লাগলেন। মার্গারেট কিন্তু সক্রিয় যোগাযোগ রেখেছিলেন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে থেকেও। ইংল্যাণ্ডে এসেই মার্গারেট রীতিমত লেখাপড়া সুরু করে দিলো। তারপর শিক্ষা শেষ করে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। এবং তাতে শিক্ষিকার বৃত্ত গ্রহণ করে নিজেকে

সর্বদা নিমগ্ন রাখলেন। এর মধ্যে মার্গারেটের বাবা মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে সে ভয়ানক মুষড়ে পড়লো। যাঁর সঙ্গেই দেখা হতো মার্গারেট তাঁকে প্রশ্ন করে বসতো: মৃত্যু জিনিষটা কী? কী ভাবে তাকে আটকানো যায়। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার কী পরিণতি।

কেউই কিন্তু ওই সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারতো না।

মার্গারেটও নিজে নিজে গভীর-ভাবে চিন্তা করে তার কোন কূল-কিনারা পেতো না। এ-সময়ে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন এক সৌম্য প্রশান্ত সন্ন্যাসী ইংলণ্ডে। তিনি সেখানকার এক উপাসনা-গৃহে বক্তৃতা দেবেন লোকমুখে শুনতে পেয়ে ছুটে গেলো সে-জায়গায়। ওই সন্ন্যাসীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিলো ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও হিন্দু-ধর্ম। তাঁর বলবার ভঙ্গী ও ভাষা এত প্রাণস্পর্শী যে, তা শুনে মার্গারেট হলো মুগ্ধ। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলো না সে। ছুটে এলো সাগর পাড়ি দিয়ে বাবার কাছে শোনা দি ল্যাণ্ড অব দি যোগীজ—ভারতবর্ষে। এসেই সন্ধান করলো সেই পরিব্রাজক বিবেকানন্দের। সে তার মনের বাসনা ব্যক্ত করলো তাঁর কাছে। স্বামীজী বোঝালেন তুমি কী পারবে। ও-সব কাজ সোজা নয়। আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ কুসুমাচ্ছাদিত নয়—খুবই কণ্টকাকীর্ণ। তা ছাড়া তুমি আজন্মের সংস্কার ছেড়ে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিতে পারবে তো।

মার্গারেট সাহসে ভর করে বললেন: আমি মন স্থির করেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাকে আপনি দীক্ষা দিন। আমি ভারতবর্ষ থেকে আর কোথাও যাব না। আমি মনে প্রাণে, চিন্তায় শয়নে ভারতমাতার কল্যাণময়ী মূর্তিই মানসচোখে দেখতে পাচ্ছি।

স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটের কথা শুনে খুশি হলেন। তিনি একদিন তাঁর গুরুমা সারদামণির কাছে নিয়ে এলেন। তাঁকে সব কথা খুলে বললেন—মার্গারেটের মনের বাসনা ব্যক্ত করলেন। মা তখন কী করলেন? তিনি মার্গারেটকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাঁচজন ভক্তের কাছে বললেন: ওরে তোরা ভাল করে চোখ খুলে দেখ। নরেন পশ্চিম থেকে শ্বেত পদ্ম নিয়ে এসেছে—ঠাকুরের চরণে অর্পণ করার জন্য।

ভক্তরা মুগ্ধ বিস্ময়ে সে দৃশ্য দেখলো পরে এক শুভদিনের পুণ্য লগ্নে মার্গারেটকে দীক্ষা প্রদান করা হলো। তখন তার নামকরণ হলো ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতা এবার নিজেকে সমর্পণ করলেন ভগবানের চরণে। সন্ন্যাসী ভাইদের সঙ্গে নানা কল্যাণ-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। দুঃস্থ আর্তের সেবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় খুললেন। তারা শতমুখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো। স্বামীজীর কাছ থেকে তিনি মহৎ কর্মের প্রেরণা পেয়ে অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতি গৃহে গৃহে ভিক্ষা করতে লাগলেন। একশ্রেণীর মানুষ তাঁর এই সাধু উদ্দেশ্যের জন্য এগিয়ে আসলেন। অর্থ ও নিজেদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনিভাবে গড়ে উঠলো একটি বালিকা বিদ্যালয়। যার আজকাল নামকরণ হয়েছে নিবেদিতা স্কুল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতার দান কম নয়। তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন। ঋষি অরবিন্দের বিপ্লব আন্দোলনে তিনি নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। অরবিন্দ যখন বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে বন্দী হয়ে কারাগারে ছিলেন তখন তাঁর অসমাপ্ত কাজ অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্পন্ন করেছিলেন তিনি।

ভগিনী নিবেদিতা পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দের আশীর্বাদ ও স্নেহে ধন্য ছিলেন তিনি।

এই কল্যাণকামী সত্যদ্রষ্টা বিদেশী মহিলার অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলো--- তাই কিছুদিনের জন্য হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে 'বিজ্ঞানলক্ষ্মীর বরপুত্র জগদীশচন্দ্রের হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য। সেখানে ১৯১১ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

গত বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ভারতবর্ষে। ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা, ধর্ম, স্বাধীনতা ও সর্বোপরি দরিদ্রনারায়ণের ও জনগণের সেবার যে প্রদীপ্ত শিখাটি লোকমাতা নিবেদিতা জ্বালিয়ে গেছেন তা চিরকাল থাকবে অনির্বাণ।

শিল্পী: বাসব ভট্টাচার্য

বোশেখী দুপুর

গৌর মোদক

মাস বোশেখে গ্রীষ্মকালে,
শালিক কিচায় গাছের ডালে।
সূর্য জ্বলে মাঝ আকাশে,
তপ্ত হাওয়া বয় হুতাশে।
ঝরছে ঝড়ে আমের গুটি,
ছেলেরা করে হুটোপুটি।
নিঝুম দুপুর, রৌদ্র ঝরে,
দুপুরে জোয়ার যে যায় ঘরে।
জলের খোঁজে ঘুরছে কুকুর
রৌদ্রে পোড়ে বোশেখী দুপুর।
খেত খামার করছে ধূ ধূ,
কেবল ডাকে ক্লান্ত ঘুঘু।
ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ছে ধুলো
ছায়ায় ঘেঁষে গরুগুলো।
ক্লান্তি নামে শরীর জুড়ে,
ঘুমের দেশে মন যে ওড়ে।

যুকিগুনির লেখক—

শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত

'যুকিগুনি' বইখানা লিখেছেন জাপানের লেখক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। যুকিগুনির বাংলা মানে বরফের দেশ। 'দি স্নো কান্ট্রি' নামে বইটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। ইয়াসু-নারি কাওয়াবাতা এই 'যুকিগুনি' বইটির জন্যেই ১৯৬৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। 'যুকিগুনি' কাওয়াবাতার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

১৮৯৯ সালের জুন মাসে জাপানের ওসাকায় ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার জন্ম। তাঁর জন্মলগ্ন নিশ্চয়ই শুভ ছিল না। কাওয়াবাতার যখন তিন বছর বয়স, বাবা হঠাৎ মারা যান। মায়ের কাছে তিনি মানুষ হতে থাকেন। একটা বছর কাটল। মা খুব অসুখে পড়লেন। চারবছর বয়সে কাওয়াবাতা মাকে হারালেন, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা তখন বেঁচে। এক বছরের ব্যবধানে পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যু তাঁদের বুকে চরম আঘাত হানল। তবু তাঁরা নাতির মুখ দেখে দুঃখ ভুললেন। ঠাকুর্দা ঠাকুমার কাছে কাওয়াবাতা মানুষ হতে লাগলেন। কাওয়াবাতা ঠাকুমার স্নেহ বেশীদিন পেলেন না। তাঁর যখন আট বছর বয়স, ঠাকুমা মারা গেলেন।

বিধাতাপুরুষ বোধহয় সূতিকাঘরে কাওয়াবাতার কপালে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, তুমি জীবনে আপনজনের স্নেহ বেশীদিন পাবে না। তিনবছর বয়সে কাওয়াবাতার বাবা মারা গেলেন, চার বছর বয়সে মা, আট বছরে ঠাকুমা, আর ষোলো বছর বয়সে প্রিয় ঠাকুর্দাও তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। কাওয়াবাতা তখন স্কুলে পড়ছেন। স্কুলের পড়া শেষ হতে আর দু'বছর বাকী। কাওয়াবাতা দেখলেন, পৃথিবীটা কত নির্মম আর সংসার কতখানি নিষ্ঠুর। ঝকঝকে নীল শূন্যতায় ভরা আকাশের নীচে মাটির পৃথিবীর ওপর তিনি একা। কিন্তু ভাগ্যহীন কাওয়াবাতা বিধাতার করুণা পেয়েছেন, শুধু করুণাই পান নি, পেয়েছেন তাঁর পরম আশীর্বাদ।

১৯১৭ সালে কাওয়াবাতা স্কুলে পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকলেন। ১৯২০ সালে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেন। কাওয়াবাতা কলেজে পড়তে পড়তে লিখতে সুরু করেন। কলেজের কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা পত্রিকা বার করেন। সেই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গল্প লেখেন। তার পর তিনি তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতে থাকেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। পাঠকমহলে সাড়া পড়ে যায়। সকলেই স্বীকার করেন, লেখক নূতন বটে, কিন্তু রচনা বলিষ্ঠ। ১৯৩৫ সালে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'যুকিগুনি' একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

কাওয়াবাতা লিখেছেন প্রচুর। তাঁর অনেক বই ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। তিনি ভাল ছবি আঁকতে পারেন। দাবা খেলা তাঁর বড় প্রিয়।

একটি অজ্ঞাত বিপ্লব কাহিনী

প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

বিহার প্রদেশের ভাগলপুরের ঘটনা।—

সন্ধ্যে হয় হয়।—রাজুর সাথে আড্ডার মজলিশে যথারীতি দেখা হলো ন্যাড়ার। রাজু বললো, শুনেছিস কিছু?

কি। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো ন্যাড়া।

মাস্টার মশাইকে মেরেছে।

কে?

এক মাতাল সাহেব।

এতো বড় স্পর্ধা। মাস্টার মশাইর অপরাধ?

কিছুই নয়। সাহেব মদ খেয়ে টমটমে যাচ্ছিল। মাস্টারমশাই অতর্কিতে তার গাড়ীর সামনে পড়ে গেছলেন। ব্যস্, তাইতেই সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে মাস্টারমশাইকে চাবুক মেরেছেন। মাস্টার মশাই এখন শয্যাশায়ী।

একটা চাপা আর্তনাদ করে ন্যাড়া বললো, চলো দেখে আসি মাস্টার মশাইকে।

না। দৃঢ়স্বরে বাধা দিল রাজু। থমথম করে উঠলো তার মুখ। লাল লাল হয়ে উঠলো চোখ। দাঁতে দাঁত রগড়ে বললো, জানিস ন্যাড়া, অত্যাচারিতকে সান্ত্বনা দেবার লোকের অভাব হয় না। অভাব হয় অত্যাচারীকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার লোকের।

তবে চলো, পুলিশে খবর দিই। বললো ন্যাড়া।

দূর বোকা। ধমকে দিল রাজু। পুলিশ কাদের? পুলিশ তো ওদেরই। ওরা শাসকের জাত। তাই ওদের সাতখুন মাপ। যত শাস্তি হয় আমাদের। আমরা যে নেটিভ।

কথাগুলো বলতে বলতে রাজুর চোখে জ্বলে উঠলো আগুন। কোমর থেকে একটা মস্ত দড়ি বের করে ন্যাড়ার হাতে দিয়ে বললো, যদি সাহস থাকে, যদি বীরত্ব থাকে, তবে চলে আয় আমার সাথে।

বলেই হনহন করে হাঁটতে লাগলো রাজু। নীরবে তাকে অনুকরণ করলো ন্যাড়া।

পিচবাঁধানো রাস্তা। রাস্তার দুধারে দুটো গাছ।—থমকে দাঁড়ালো রাজু। এই তো মনের মতো জায়গা। এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে বললো রাজু, ন্যাড়া, ওদিকের গাছে শক্ত করে দড়িটা বাঁধ। এদিকের গাছে আমি

রয়েছে। এই পথেই সাহেব আসবে। যে হাতে ও মাস্টার মশাইকে মেরেছে সেই হাতটা ওর ভেঙে দিতে হবে।

ওপর পাটির দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে আস্তে আস্তে বললো রাজু, খুব শক্ত করে বাঁধিস, ন্যাড়া। সাহেব-গুলো যেমনি বজ্জাত। ওদের ঘোড়া-গুলোও তেমনি। দড়ি ছিঁড়ে পালাতে পারে। পারিস তো দড়িটা ধরেও রাখিস।

রাজুর কথা শেষ না হতেই আওয়াজ উঠলো। টক্ টক্—টক্ টক্—টক্ টক্—

পথের দুইধারে দুই বাঙালী কিশোর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওঁৎ পেতে রইল শয়তানকে শায়েস্তা করতে।

টক্ টক্—টক্ টক্—টক্ টক্—আওয়াজটা ক্রমেই কাছে আসতে লাগলো। টক্ টক্—টক্ টক্—টক্ টক্—

ঠকাস্ ঠক্। দড়িতে পা জড়িয়ে থমকে দাঁড়ালো ঘোড়াটা। অমনি তীরের মতো রাজু ছুটে গেলো গাড়ীতে। সাহেবের হাত থেকে চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে মারতে লাগলো—সপাং সপাং—

আর্তনাদ করতে লাগলো সাহেব।

দাঁত কড়মড় করে বললো রাজু, জানিস ন্যাড়া, এমনিভাবে আমাদের মাস্টার মশাইও কেঁদেছিলেন, কিন্তু এই সাহেবও এমনিভাবেই আমাদের মাস্টার মশাইকে মেরেছিল। বলে আবার সপাং সপাং চাবুক মারতে লাগলো।

মার খেয়ে পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়লো সাহেব।

ন্যাড়া বললো, ওর হাতটা ভেঙ্গে দাও, রাজুদা। যাতে না আর কখনো নিরীহ ভারতবাসীর গায়ে হাত তুলতে পারে।

ব্যাটা, পাজিনচ্ছার—ওঠ—দাঁড়া। বলে জামার কলার ধরে সাহেবকে টেনে তুললো রাজু।

সাহেব ভয়ে মাথা নীচু করে রইল।

ধমক দিল রাজু, মাথা তোল্ শীগগির।

সাহেব ভয়ে ভয়ে মাথা তুললো।

রাজু বললো, বল্—আমার মাতৃ-ভাষাতেই বল্—হে নিরীহ ভারতবাসী, আর কখনো তোমাদের গায়ে হাত দেবো না। এবারের মত তোমরা আমায় ক্ষমা করো।

হাত জোড় করে সাহেব মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলো কথাগুলো।

তৃপ্ত হলো রাজু। বললো, ন্যাড়া, এবারের মতো ব্যাটাকে রেহাই দিই—কি বলিস?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ন্যাড়া।

তার পর দুজনে চ্যাংদোলা করে সাহেবকে তুলে দিল গাড়ীতে।

দড়িটা খুলে নিয়ে অন্ধকারে ছুটে চললো বাঙলা মায়ের দুই বীর সন্তান—রাজু আর ন্যাড়া।

গ্রামের একটা ভাঙা কুঁড়েঘরে তারা হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ঢুকলো। চোখেমুখে তাদের জয়ের উল্লাস। রাজু ডাকলো, মাস্টারমশাই—

কে রাজু?—ভেতরে আয়—উঃ বড্ড ব্যথা। বিছানায় শুয়ে গোঙাতে লাগলেন বৃদ্ধ মাস্টারমশাই।

ন্যাড়ার চোখ ছলছল করে উঠলো।

কঠিনস্বরে রাজু বললো, মেরেছি, মাস্টারমশাই।

কাকে রে? ভয়াতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন মাস্টারমশাই।

সেই সাহেবকে। বুক ফুলিয়ে বললো রাজু।

ন্যাড়া বললো, যে চাবুক দিয়ে আপনাকে মেরেছিল সেই চাবুক দিয়েই আমরা তাকে মেরেছি।

অ্যাঁ, মেরেছিস! আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মাস্টারমশাই। শরীরে যেন তাঁর আর কোন বেদনা নেই। খাট থেকে নেমে দু'হাত তুলে চীৎকার করতে লাগলেন, বেশ করেছিস—বেশ করেছিস। তোদের জয় হোক, বাবা। ওদের দেমাক এমনি করে গুঁড়িয়ে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিবি। এমনি করে ওদের চাবুক দিয়েই ওদের মেরে জানাবি—ভারতবাসী কেবল মার খায় না—মার দিতেও জানে। আয় বাবা, তোরা কাছে আয়। আমার আর কোন কষ্ট নেই। আঃ কী শান্তি!

বৃদ্ধ মাস্টারমশাইর বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়লো বাংলার দুই বীর সন্তান। রাজু আর ন্যাড়া।*

*এই ন্যাড়াই হচ্ছেন আমাদের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছেলেবেলার ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। আর রাজু হচ্ছেন ভাগলপুরের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার রামরতন মজুমদারের ছেলে রাজেন মজুমদার। এই রাজু হচ্ছেন শরৎ-সাহিত্যের ইন্দ্রনাথ।

শিল্পী: বাদল ভট্টাচার্য

চাষী আর মহাজন

সুখেন্দু দত্ত

এক গাঁয়ে ছিল এক গরীব চাষী। রোজ সকালে উঠে একথালা বাসী ভাত খেয়ে চাষী তার লাঙল কাঁধে নিয়ে যেত মাঠে। একদিন তার সেই কাঠের লাঙল গেল ভেঙে।

বেচারার একখানাই মাত্র লাঙল ছিল। আর নেই, কিনবার সামর্থ্যও নেই। চাষীর তাই দুর্দশার এক হল। ক্ষেতে লাঙল দেবার কাজ তার সেবার প্রায় হলই না।

ক্ষেতের ফসল উঠল না, রোজই তাই এদিক ওদিক থেকে ধার কর্জ করে চাষীর দিন যায়। কিন্তু এমনি করে কি আর সংসার চলে? পড়শীদের অবস্থাও যে তারই মত। ক'দিন আর তারা ধার দেবে?

শেষে চাষী তার বউকে ডেকে বলল, 'দেখ, ধার করে হোক আর যাই করে হোক একটা লাঙল না কিনলে আর নয়। গাঁয়ে কার কাছে আর ধার পাব, মহাজনের কাছেই যাই। হাজার হোক, প্রতিবেশী তো।' বলে চাষী মহাজনের বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

মহাজন তখন তার গদিতে বসে আছে। বয়স তার পঞ্চাশের উপর, চোখে চশমা, গলায় তুলসীর মালা, গায়ে লংক্লথের ফতুয়া। পেটটা বড় বলে ফতুয়ার নিচের দুটো বোতাম আর লাগান হয়নি। গুটি গুটি পায়ে চাষী তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, 'লাঙলটা ভেঙে গিয়ে চাষ-আবাদ সব বন্ধ হুজুর। আমার কুঁড়ে ঘর আর উঠোনটা বন্ধক রেখে কুড়িটা টাকা যদি ধার দেন। ছ' মাসের মধ্যে হুজুরের দেনা শোধ করে বাড়ী আর জমি আমি খালাস করে নেব। আর তা যদি না পারি তবে বাড়ী-জমি সব হুজুরের হবে।'

মহাজন তার চশমার ফাঁক দিয়ে চাষীর দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'তা, ধার দেওয়ার পক্ষে তুমি লোক খারাপ নও। খাটিয়ে মানুষ বলে তোমার নাম আছে আর আমার পাওনাও তোমার কাছে পড়ে থাকবে না। টাকা আমি তোমাকে দিতে পারি।'

চাষী খুশি হয়ে বলল, 'হুজুরের বড় দয়া।'

মহাজন তার চশমাটা খুলে বলল, 'তা, দেখ বাপু, ঐ কুড়িটা টাকা নিয়ে তোমার কি হবে তাও তো বুঝতে পারছি না। যে আকাল পড়েছে। শুধু লাঙল হলেই তো চলবে না, বীজ সার এ সবও তো তোমার চাই। আমি বলি কি, ঐ দু'কুড়ি টাকাই তুমি নিয়ে যাও। চাষ আবাদ সুরু করে দেও ভাল করে।'

চাষীর মনে হল, ভগবান এতদিন তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। মহাজনের কাছে আরও আগে কেন আসে নি ভেবে তার আপশোষ হল। বিনয়ে গলে গিয়ে সে বলল, 'হুজুরের যেমন দয়া, তা, বন্ধকী কাগজপত্র কি আজই'—

মহাজন বলে উঠল, 'আরে না, না। ও সব কিছু লাগবে না। তুমি শুধু এই কাগজটায় একটা টিপসই দিয়ে দাও।' বলে মহাজন তার হাতবাক্স থেকে একটা সাদা কাগজ বের করল।

চাষী কাগজটায় তার বুড়ো আঙুলের একটা ছাপ দিল। মহাজন তখন বলল, 'আর একটা কথা তোমাকে আগেই বাকতেই বলে রাখি বাপু তোমার ফসলের লোকসান এখন আমারও লোকসান। তাই যখনই দরকার মনে হবে তোমার ওখানে গিয়ে তোমার

মিষ্টি-মুখ চিত্র : শংকর ভট্টাচার্য

কাজের দেখাশোনা করব আমি। এই নিয়ে পরে আবার গোল কর না যেন। বুঝতেই তো পারছ, আজ থেকে তোমার ভাল মন্দ আমারও ভালমন্দ।'

হাতজোড় করে চাষী বলল, 'ঠিক কথাই তো হুজুর।'

দু কুড়ি টাকা নিয়ে চাষী বেরোল মহাজনের বাড়ী থেকে। তার মনে আনন্দ আর ধরে না। তার দুঃখ এবার ঘুচলো সেই টাকায় সে লাঙল কিনল, বীজধান কিনল, জমির সাড় কিনল। তারপর সুরু করে দিল চাষ-আবাদ।

দিন কয়েক পরেই মহাজনের বাড়ীতে চাষীর ডাক পড়ল। চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মহাজন বলল, 'দেখ বাপু, তোমার জমির পূব দিকের ঐ শিমুল গাছ ক'টা কেটে ফেলতে হবে। তবে কিছু ভেব না, আমার করাত কলের জন্য তোমার ঐ গাছগুলো আমি উচিত দামে কিনে নেব।'

মহাজন যখন এতটা উপকার করেছে, তখন এই সামান্য ব্যাপারে তাকে আর না বলে কি করে চাষী। রাজী হয়ে সে বাড়ী ফিরল।

দিন কয়েক গেল। মহাজনের বাড়ীতে আবার একদিন ডাক পড়ল চাষীর। চোখ তুলে তাকিয়ে মহাজন বলল, 'বলি হ্যাঁ হে, তোমার বাড়ীতে নাকি তিন তিনটে গাই রেখেছ? তা দেখ বাপু, একটা কথা তোমাকে বলি। তোমার বাপ-ঠাকরদা যেভাবে চলে এসেছেন তোমারও সেইভাবে চলা উচিত। আমি বলি কি, তোমার ঐ গাই তিনটে আমার কাছে বেচে দাও। দুধের দরকার যদি তোমার হয় তো আমার কাছ থেকেই কিনতে পারবে।'

কাজেই চাষীর গরুগুলো গেল। মন খারাপ করে চাষী বাড়ী ফিরল। দিন কয়েক পরে আবার একদিন তার মহাজনের বাড়ীতে ডাক পড়ল। যেতে যেতে চাষী ভাবল, না জানি বরাতে আবার কি আছে।

তাকে দেখেই মহাজন বলল, 'দেখ বাপু, বাড়ীতে গাই-বাছুর যখন নেই তখন তো তোমার ঘাসের জমিরও আর দরকার নেই। ওগুলো রেখে আর লাভ কি? ও জমিগুলো বরং আমি কিনে নি।'

চাষী ঘাড় চলকে বলব, 'আজ্ঞে, সে কি কথা?'

কিন্তু আর কিছু সে বলতে পারল না। মন খারাপ করে চাষী বাড়ী ফিরল।

এর মধ্যে ক্ষেতের ফসল ঘরে উঠলে চাষীর অবস্থা একটু ফিরল। হাটে ফসল বিক্রি করে দু'পয়সা এল চাষীর।

দেখে মহাজনের চোখ টাটাল। পাইক পাঠিয়ে চাষীকে সে তলব করল। আবার কি ফ্যাসাদ হল কে জানে। চাষী ভয়ে ভয়ে মহাজনের কাছে হাজির হলে মহাজন বলল, 'শুনলাম, এই

জায়গা থাকতে তুমি নাকি লালগঞ্জের হাটে তোমার সওদা পাঠাও?'

চাষী ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে, লালগঞ্জের হাটে দরটা ভাল। দুটো পয়সা ওখানে বেশি পাওয়া যায়। তাই'—

মহাজন বিরক্ত হয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা তোমায় বন্ধ করতে হবে বাপু। লালগঞ্জের হাটে তোমার যাওয়া চলবে না। ঐ হাটের মালিক হরেন্দ্র চৌধুরীদের সঙ্গে আমাদের তিন পুরুষদের বিবাদ।'

চাষী ঘাড় চুলকোতে লাগল। মহাজন তখন আবার বলল, 'আর অত দূরে তোমার যাবারই বা দরকার কি? ইচ্ছে করলে আমার কাছেই তো তুমি তোমার জিনিষ বেচতে পার।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। চাষী এবার মহাজনের মুখের দিকে তাকাল। মহাজন তখন বলল, 'তোমার যা বেচবার সব আমি কিনে নেব। আর তোমার যা দরকার সবই আমার কাছে কিনতে পাবে। ভেবে দেখ এত তোমার কতটা সুবিধা। তোমার ঘরে কোন জিনিষ বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকবে না। আর তোমারও যা দরকার সবই আমার কাছে পাবে. আর কোথাও ছুটতে হবে না।'

শুনে চাষী মুখ কালো করে বাড়ী ফিরল। মাঠের ফসল সে আর হাটে নিয়ে যেতে পারে না, গাঁয়েই মহাজনের কাছে কম দামে সব বেচে দিতে হয়। আবার কিনতেও হয় তার কাছ থেকে চড়া দামে সব কিছু। কাজেই টান ধরল। অভাবের মাত্রা তার আরও বেড়ে গেল। খাওয়ার পরিমাণ কমল, পরণের কাপড় ছিঁড়ল।

এদিকে মহাজনের বাড়ীর সুমুখ দিয়েই চাষীর পথ। যখন তখন তার মহাজনের সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তায় ঘাটে, বাড়ীর সামনে। চাষী ভয়ে ভয়ে রোজ পথ দিয়ে হাঁটে, কে জানে মহাজন আবার কখন কি বলে বসে। দিনকয়েক পরে মহাজন একদিন চাষীকে পথে পেয়ে বলল, 'অনেক দিন তোমায় দেখি না। আছো কেমন?' চাষী সরল মনে বলল, 'চলছে একরকম।'

মহাজন তখন বলল, 'দেখ বাপু, একটা কথা অনেক দিন থেকেই তোমায় বলব মনে করছি। তোমার গরুগুলো যখন নেই তখন ঐ গোয়াল ঘরেরই বা আর দরকার কি? তোমার গোয়ালঘরের মাঝখান দিয়ে আমার জমিতে যাওয়ার একটা রাস্তা করে দাও। নইলে বুড়ো বয়সে আমাকে আবার এই কাঠফাটা রোদ্দুরে কতখানি পথ ঘুরে নিজের জমিতে যেতে হয়।'

চাষী ঘাড় চলকে বলল, 'কিন্তু কর্তা, তালে আমার তো---'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মহাজন বলল, 'তোমার জমিটা এতে দু'ভাগ হয়ে যাবে তা অবশ্য বুঝি। কিন্তু আমার যে ভারি সুবিধে হয়। বিপদের দিনে তোমায় দেখেছিলাম, এখন তুমি যদি আমার জন্য এটুকুও না কর---'

ঘাড় নিচু করে চাষী বলল, 'আজ্ঞে কর্তা, যা ভাল বোঝেন করেন।'

মহাজন খুশি হয়ে বলল. 'এই ভালমানুষের মত কথা।'

বাড়ী ফিরতে ফিরতে চাষী ভাবল, একে একে সবই তো গেল। তা যাক, তব যদি এবার মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবানকে ডেকে সে বলল মহাজনের হাত থেকে আমায় বাঁচাও ঠাকুর

কিন্তু ভগবানের কি একটা কাজ! এত বড় পৃথিবী তাকে দেখতে হচ্ছে, সব কিছু চালাতে হচ্ছে। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই তাঁর. চাষীর কথায় কান দেবেন কখন? তাই দিন কয়েক পরেই আবার মহাজনের বাড়ীতে তার ডাক পড়ল। চাষী গিয়ে দেখল, মহাজন মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে। আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল তার।

চাষীকে দেখে মহাজন বলল, 'দেখ বাছা, তুমি আমার পর নও। একটা কথা তোমাকে আজ না বলে পারলাম না।'

মহাজন কবে থেকে আবার তার আপন জন হয়ে উঠল ভেবে তো চাষীর বুক শুকিয়ে গেল। মহাজন তার দিকে তাকিয়ে বলল. 'শুনলাম, তোমার পড়শী যদুর ছেলের সঙ্গে নাকি মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছ?'

চাষী খুশি হয়ে বলল, 'হাঁ কর্তা, আশীর্বাদ করুন। জানেন তো, আমার ঐ একটাই মেয়ে। আমাদের দিন তো এমনি করেই গেল, এবার মেয়েটা যদি একটু সুখের মুখ দেখে। নিজের হাল-বলদ আছে যদুর আর ওর ছেলেটিও খাসা।'

'থাম, থাম।' মহাজন রাগে ফেটে পড়ল, 'ছোঁড়াটাকে চিনতে আমার বাকি নেই। সেবার চাষীদের শুধু শুধু খেপিয়ে তুলল তো ঐ ছোকরাই। তোমাকে আমি একটা সোজা কথা বলে দিচ্ছি। শোন। যদুর পরিবারের সঙ্গে তোমাদের মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে। আর ওর ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়াও চলবে না। মেয়েটার সর্বনাশ তো আমি হতে দিতে পারি না।'

চাষী আর কোন কথা না বলে বাড়ী ফিরল। কিন্তু বাড়ী ফিরে সে রাত্রিতে তার ঘুম হল না। সারা রাত শুয়ে শুয়ে সে শুধু ভাবল আর ভাবল। তারপর শেষ রাত্রিতে বিছানা ছেড়ে উঠে সে ডাকতে লাগল, 'বউ, ও বউ।'

বউ ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, 'কি বলছ?'

চাষী বলল, ওঠ, উঠে পড়। এ-গাঁয়ে আর থাকা চলল না। এই বেলা উঠে পড়, মেয়েটাকেও ডাক। রাত থাকতেই রওনা দিতে হবে, নইলে মহাজন আবার আটকাবে।'

চাষীর কথা শুনে বউ উঠে পড়ল। মেয়েটাকেও ডেকে তুলল। তারপর ঘরে তাদের শেষ সম্বল যেটুকু ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে পুঁটলিতে বেঁধে চাষী তার বউ আর মেয়ের হাত ধরে শেষ রাতের অন্ধকারে পথে এসে দাঁড়াল

আধো অন্ধকারে নদীর ওপারে অচেনা দিগন্তের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল তারা। আবছা সবুজ গাছপালায় ঘেরা দূরের গ্রামগুলো, আকাশটা সে দিকে কেমন নিচু হয়ে গেছে। কে জানে কোন দেশ আছে ওদিকে।

॥ বাইশ ॥

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর বাবা বললেন, 'এবার কী করবি বুড়ন?'

আমি বললাম, 'তুমি যা করতে বল।'

'দেশের অবস্থা তো বেশ ভালই হয়ে গেছে। আর গোলমাল হবে বলে মনে হয় না। গ্রাম ছেড়ে যাবারও আর দরকার নেই।'

'হ্যাঁ।'

'তাই ভাবছি, এবার সেই ব্যবস্থাটা করে ফেলি।'

'কোন্‌টা?' আমি উন্মুখ হলাম।

বাবা বললেন, 'কলকাতায় তো মাসখানেকের মতো ছিলি; এর ভেতরেই ভুলে গেলি?'

এবার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তুমি কি সোনারঙ স্কুলে মাস্টারির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।' বাবা বললেন, 'তুই রাজী থাকলে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করে ফেলি।'

'কর।'

দিন কয়েক পর সোনারঙ স্কুলে আমার চাকরি হয়ে গেল।

দেশে ফেরার পর কলকাতার স্মৃতি আমার কাছে ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। এমনিতেই কলকাতা দূরের শহর। আমতলির আকাশ-বাতাস, গাছপালা, ফসলের মাঠ, জলপূর্ণ নদী, শালিক—ঘুঘু-মোহনচূড়া পাখির ঝাঁক, ঝিল্লিস্বর এবং আত্মীয়ের মতো চারপাশের মানুষগুলি—সব একাকার হয়ে কলকাতাকে যেন আরো অনেক দূরে সরিয়ে দিতে লাগল। প্রায় সবাইকেই ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগলাম। পারলাম না শুধু দুজনকে—মালতী আর অমলকে।

মাঝে মাঝে অমলকে চিঠি লিখি। মালতীকে তো আর সোজাসুজি লেখা যায় না; তাই শিশির মুখুটিকে লিখতে হয়।

চিঠি পেলেই অমল উত্তর দেয়। এখনও টালিগঞ্জের সেই বস্তিটা তার ঠিকানা। সেখানে থেকেই ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করে চলেছে সে। শ্রমিকের হিতে শ্রমিক কল্যাণে অমলের জীবন উৎসর্গ করা।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বাতাসে প্রতিধ্বনি

প্রফুল্ল রায়

প্রথম প্রথম শিশির মুখুটি উত্তর দিতেন। এখনও কাজ-টাজ কিছু জুটিয়ে উঠতে পারেন নি। রিহ্যাবিলিটেশনের লোনও পান নি। বাগবাজারে ভায়রার বাড়িতে এতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে বোঝার মতো চেপে আছেন।

একদিন কলকাতার একখানা চিঠি পেয়ে আমি অবাক। অমল কিংবা শিশির মুখুটির হাতের লেখা আমি চিনি। কিন্তু গোল গোল মেয়েলি ছাঁদের এ হস্তাক্ষর একেবারে অচেনা। কে এ চিঠি লিখতে পারে? আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেও ভেবে পেলাম না। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি চিঠির তলার দিকে তাকালাম। [illegible] পর মালতীর নামটা রয়েছে।

মালতী আমাকে চিঠি লিখতে পারে; এ ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। যা কোনদিন ভাবিনি আশা করি নি, তাই যদি ঘটে যায়—বিহ্বল হতবাক হয়ে যাবার কথা। কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থেকে পড়তে সুরু করলাম।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, দিন কয়েক আগে আপনার চিঠি এসেছে।' অন্যান্য বার আপনার চিঠি এলে বাবাই উত্তর দান এবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে জবাব দিতে বলেছেন।'

'আমাদের অবস্থা সেই একই রকম। দেশ থেকে যে সোনাদানাটুক নিয়ে এসেছিলাম তা কবেই ফুরিয়ে গেছে। মেসোমশায়রা অত্যন্ত ভালো মানুষ—সহৃদয়, স্নেহপ্রবণ, মমতাময়। আমাদের সব দায়-দায়িত্ব ওঁরাই নিয়েছেন। দু-চারদিনের ব্যাপার হলে কথা ছিল না। কিন্তু চিরকাল কি করে যে এভাবে চলবে?'

'অকল্যাণে ঘুরে ঘুরে বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কোন রকম সুরাহাই হচ্ছে না। বাবা একেক সময় ঠিক করে ফেলেন, দেশেই ফিরে যাবেন দেশের অবস্থা তো এখন ভালই। পরক্ষণেই সিদ্ধান্তটা নাকচ করে দ্যান। দেশে কোথায় ফিরবেন? জমিজমা বাড়িঘর বেচে দিয়ে, চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসেছেন। দেশে ফিরলে আমাদের নিয়ে কোথায় থাকবেন? কী খাবেন? সংসারই বা কিভাবে চলবে?'

'সে যাই হোক, আপনার কথা বাবা খুব বলেন। সামান্য দিনের পরিচয় তবু আপনাকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেছে। বলেন, 'চিরঞ্জীববাবু থাকলে আমি জোর পেতাম।' আমরা দেশও হারালাম, এখানে এসে পায়ের তলায় মাটিও পেলাম না। গলগ্রহের মতো অন্যের করুণার ওপর আছি।'

আমাদের কথা থাক। আপনার কথা কিছু? প্রায় লেখেন নি। আপনার কথা বাবার খুব জানতে ইচ্ছা করে; দেশের কথা জানতে ইচ্ছা করে। পরের চিঠিতে নিজের খবর আর দেশের খবর দেবেন। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

ইতি—মালতী।'

সংক্ষিপ্ত চিঠি। এক রকম বাবার জবানীতেই লিখেছে তব মনে হল, আমার কথা জানবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে মালতী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা যতবার ভাবলাম, বুকের ভেতর শিহরণের মতো কী যেন খেলে যেতে লাগল।

এরপর থেকে মালতীই আমাকে চিঠি লিখতে লাগল; আমিও শিশির মুখুটির বদলে তার নামে চিঠি পাঠাই।

মালতীর প্রতিটি চিঠির বক্তব্যই প্রায় এক। এখনও কিছু হয় নি; জীবন-ধারণের জন্য কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। বাকিটা জীবন হয়তো অন্যের গলগ্রহ হয়েই থাকতে হবে।

যত দিন যেতে লাগল, মালতীর চিঠিগুলোতে ততই নৈরাশ্যের সুর বাজতে লাগল। এই জগতের ওপর সে যেন ক্রমশ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে কোন চিঠিতে সে জানায়, 'বাবার শরীর এমন ভেঙে পড়েছে যে দেখলে আর চিনতে পারবেন না। উৎসাহ উদ্যম, সব কিছু তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে। বার বার বিমুখ হয়ে, বার বার হতাশ হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আজকাল আর তিনি ঘরের বার হতে চান না ঘরের ভেতর বসে দিনরাত ভাবেন; লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেনও। আমি যে কী করব?'

কোন চিঠিতে মালতী লেখে, 'আমার ভাইদুটোকে তো দেখেছেন? নীপু আর হারু? দেশে থাকতে ওরা কত ভালো ছিল, কত বাধ্য ছিল। লেখাপড়ায় বরাবর চমৎকার রেজাল্ট করত। কলকাতায় এসে ওরা কি হয়ে গেল। এত অবাধ্য এত অসভ্য হয়ে উঠেছে যে ভাবাই যায় না। কথায় কথায় এখন তর্ক করে: নানা রকম বাঁদরামো ইতরামো শিখেছে। আমরা যে গলিতে থাকি তার শেষ মাথায় একটা চায়ের দোকান দেখেছেন তো। ওখানে বসে রাজ্যের বখাটে ছেলেদের সঙ্গে দিনরাত আড্ডা দেয়; মেয়েদের দেখলে সিটি মারে। আমার এত রাগ হয় যে, একেক সময় ভাবি ওদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলি। পরক্ষণেই মনে হয়, ওদের কী দোষ। কলকাতায় আসবার পর স্কুলে পাঠানো হয় নি। একেই মেসোমশাইর অভাবের সংসার। খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন। তার ওপর পড়াশোনার কথা বলতে সাহস হয় না। লেখাপড়া ছেড়ে নীপু আর হারু করে কী? অসৎ-সঙ্গে পড়ে ওরা শেষ হয়ে গেল। ওদের বাঁচবার কোন পথই খোলা নেই।'

আরেক চিঠিতে মালতী লিখল, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। মেসোমশাইর বদলির চাকরি; হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তাঁকে গোরখপুর ট্র্যান্সফার করেছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব না। দু'চার দিনের ভেতর উনি চলে যাচ্ছেন তারপর যে কী হবে, কে জানে।'

মালতীর এটাই শেষ চিঠি; পেয়েই উত্তর দিয়েছিলাম। তার জবাব এল না। ক'দিন দেখে টেলিগ্রাম করলাম; উত্তর নেই। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু এতদূরে পূর্ব বাংলার এই অখ্যাত নগণ্য গ্রামে বসে বিচলিত হয়ে আমি কী-ই বা করতে পারি।

দিনের পর দিন যেতে লাগল।

যোগাযোগ বন্ধ; তবু করুণ বেদনার মতো মালতীর মুখখানা আমার স্মৃতির ভেতর থেকেই গেল। তার কথা মনে পড়লেই অন্যমনস্ক হয়ে যাই; আমাকে ঘিরে সীমাহীন বিষাদ ঘন হতে থাকে।

সেই যে কলকাতা থেকে চলে এসেছিলাম, তারপর বছর দুই ভালই কাটল। দুর্গাপুজোয় নীলপক্ষোয় আবার ঢাক বেজে উঠল। কিশোরীদের কাঁচা কাঁচা মিষ্টি গলার মঙ্গলগুলের ছড়া শোনা গেল। গোঁসাইদাস সাহার বাড়িতে অষ্টপ্রহর কীর্তনের আসর বসল। সব চাইতে বড় কথা, ফাল্গুন মাসে দোলের দিনে আমতলি গ্রামের অন্তঃপুরিকারা পিচকিরি হাতে ভিন-দেশী পুরুষদের আক্রমণ করল।

এ সব ছাড়া সারি ছারি আর গুণাই বিবির গানের সুরও কানে আসতে লাগল। দাড়িয়াবান্ধা এবং কপাটি চলতে লাগল বিপুল উৎসাহে। গান আর খেলার আসরে সাহাদের পাশে, বারুইদের পাশে, বামুন-কায়েত-যুগীদের পাশে নিকারীরা - যুগীরা - ভুইয়ারা ঘাঁ ঘেঁষাঘেষি করে বসতে লাগল।

মোট কথা, আমতলি গ্রামে সেই মনোরম দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে সেই মধুর প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ। মাঝখানে দুঃস্বপ্নের মতো ভয় অবিশ্বাস ঘৃণা একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, গ্রামের প্রতিটি মানুষ পাশাপাশি আপনজনের মতো বাস করবে; একজন আরেক জনকে অপার মমতা দিয়ে ঘিরে রাখবে,—আমার বাবা চিরদিন এরই ধ্যান করে এসেছেন। এরই জন্য নিজের জীবন, নিজের বলতে সব কিছু উৎসর্গ করেছেন। একলা বাবা নন রাজেক কাকার জীবনও এরই জন্য উৎসর্গ করা।

আমতলি আবার স্বাভাবিক হয়েছে আবার তার শান্তি ফিরে এসেছে, তাকে ঘিরে যে সংশয়ের মেঘ জমেছিল সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর জন্য যারা সব চাইতে আনন্দিত তাঁরা হলেন বাবা আর রাজেককাকা।

❦

দুটো বছর চমৎকার কাটবার পর আবার ভাল কাটল। একদিন সন্ধ্যেবেলা হারাণ সাহা আমাদের বাড়ি এসে হাজির।

বাবা বাড়িতেই ছিলেন, আমিও ছিলাম।

হারাণ সাহা ভীত চাপা সুরে বলল, 'খবর শুনছেন বাড়ুইজ্জা (বাঁড়ুজ্জে) কত্তা?'

বাবা বললেন, 'কী খবর হারাণ?'

আইজ দুফারে হাটে গেছিলাম। ঢাকা থিকা দুইটা লোক আসছিল; মানুষ—ক্ষেপাইয়া বক্তিতা (বক্তৃতা) দিয়া গেল। ইণ্ডিয়ায় না কী হইছে, তার প্রিতিকার চাই। চাইর দিক গরম হইয়া উঠছে।'

খবরটা হাওয়ায় হাওয়ায় কানে এসেছিল। চিন্তিত মুখে বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা শুনেছি।'

হারান সাহা আকুল হয়ে উঠল, 'আবার এই কী হইল বাড়ইজ্জা কত্তা। দুইটা বছর বেশ ভাল আছিলাম। আবার এইসগল গণ্ডগোল ক্যান? ইণ্ডিয়ায় যদি কিছু হইয়া থাকে, সেই-খানে গিয়া বোঝো। এইখানে কী? আমরা তো কোন অন্যায় করি নাই।' বাবা উত্তর দিলেন না।

গোঙানির মতো একটানা শব্দ করে হারান সাহা বলে যেতে লাগল, 'এইবার আর বুঝি রক্ষা নাই বাড়ইজ্জা কত্তা। হয় পরাণ যাইব, নাইলে ভিটা-মাটি ছাইড়া চইলা যাইতে হইব।'

বাবা এবারও চুপ।

হারাণ সাহা বলল, 'তরাসে বুক কাপে। কী যে হইব? কপালে কী কে আছে? হা ভগবান।'

মা বাড়ির ভেতরে ছিলেন। যে-ভাবেই হোক হারান সাহার কিছু কিছু কথা তাঁর কানে গিয়ে থাকবে। উদ-ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী হয়েছে মা-মশায়, কী হয়েছে?'

বাবা চঞ্চল হলেন। সব কথা জানতে পারলে মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়বেন। বাবা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কিছু হয় নি; কিছু না—'

মা বললেন, 'আমার কাছে লুকোতে চেও না। কী হয়েছে, খুলে বল। ঘরে জলছড়া দিতে দিতে কানে এল সা-মশায় তোমাকে কী বলছে—'

'কি আশ্চর্য, কিছু না হলেও বলতে হবে। যাও, তুমি ভেতরে যাও—'

মা এবার আর বাবাকে কিছু বললেন না। হারান সাহার দিকে ফিরে শুধোলেন, 'কিছু হয়নি সা-মশায়?'

হারান সাহা একবার মায়ের দিকে আরেকবার বাবার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'হইছে মা-জননী—'

'কী?'

বাবা হারান সাহাকে চোখের ইসারা করলেন। ইসারাটা সে বুঝল কি না, কে জানে। বুঝলেও কাজ হল না। নিজের বুকের ভেতর যে ভয়টা জমাট হয়ে আছে সেটাই তাকে বলিয়ে ছাড়ল। কিছুই বাদ দিল না হারান; হাটে যা-যা ঘটেছে আদ্যোপান্ত বলে গেল।

সব শুনে মা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রাজেককাকা এসে পড়লেন। উঠোন থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঠাকুর ভাই (দাদা) ব্যাপার শুনছেন?'

বাবা বললেন, 'শুনেছি।'

রাজেককাকা উঠোন থেকে দাওয়ায় উঠতে উঠতে উত্তেজিত সুরে বলতে লাগলেন, 'এ আমি সহ্য করুম না, কিছুতেই না। এইখানে থাইয়া মানুষ ক্যাপান চলব না। মাথা একে বারে ছেইচা দিমু—'

মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'পারবেন না—'

রাজেককাকা কাতে গিয়ে থমকে গেলেন, 'কী পারুম না বৌ-ঠাইন (বৌ-ঠাকরুণ)?'

'গণ্ডগোল থামাতে।'

'কে কইল পারুম না?'

'আমি বলছি।'

'কী কইরা বুঝলেন?'

'কী করে বুঝলাম?' মা বলতে লাগলেন, 'এর আগের বারও তো গণ্ডগোল হয়েছিল। গুণ্ডা-বদমাসদের তখনও কি ঠেকাতে পেরেছিলেন?'

একটু চুপ করে থাকলেন রাজেককাকা। তারপর বললেন, 'আগের বারের কথা ছাড়ান দ্যান বৌ-ঠাইন। এইবার জানও যদি যায়, তবু আমতলিতে গোলমাল বাধাইতে দিমু না। বুঝাইয়া দিমু রাজেক মৃধা অখনও মরে নাই।'

মা আর কিছু বললেন না; আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হল না, রাজেককাকার কথায় খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছেন।

মা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর রাজেককাকা ডাকলেন, 'ঠাকুরভাই—'

বাবা কী ভাবছিলেন, মুখ তুলে তাকালেন।

'একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হইব।'

চিন্তিত মুখে বাবা বললেন, 'হুঁ—'

রাজেককাকা বলতে লাগলেন, 'দেরি করণ যাইব না। যা করনের আইজই করতে হইব।'

'কী করতে চাও তুমি?'

'গেরামের সগলের অপানের এইখানে ডাইকা আনি। তারপর 'পীস-কমিটি বানানো হউক।'

'বেশ।'

বাবার মুখ থেকে কথাটি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন রাজেককাকা। দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে নামতে বললেন, 'আপনে বাড়িতই থাকেন; আমি সগলেরে লইয়া আইতে আছি।'

বাবা বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব?'

'না।' দু পা গিয়ে পেছন ফিরলেন রাজেককাকা, 'বুড়ন বরং আমার লগে চলুক—'

আমি উঠে পড়লাম।

হারান সাহা ওধার থেকে বলে উঠল, 'আমিও তোমার লগে যাইতে পারি।'

রাজেককাকা বললেন, 'তুমি বুড়া হইয়া গেছ; আন্ধারে রাইতে আর যাইতে হইব না। ঠাকুরভাইয়ের কাছে বইসা থাকো।'

এত দুর্ভাবনার মধ্যেও হারান সাহা একটু রসিকতা করল, 'তুমি য্যান (যেন) আমার থিকা কত জয়ান (যুবক) আছ।'

'তা আছি। দশ জনেরে জিগাইয়া (জিজ্ঞেস করে) দেইখো।'

হারান সাহা আবার কি বলতে যাচ্ছিল; বলতে পারল না। তার আগেই আমাকে নিয়ে রাজেককাকা বাড়ির বাইরের অন্ধকার রাস্তায় এসে পড়লেন।

*

ঘণ্টাখানেকের ভেতর গোটা আমতলি গ্রামখানাকে আমাদের বাড়িতে এনে হাজির করলেন রাজেককাকা। সবাইকে হুঁশিয়ার করে বললেন এখানে কোনরকম বাঁদরামি বরদাস্ত করা হবে না। বংশ-পরম্পরায় যারা এখানে বসবাস করছে তাদের কোন অপরাধ নেই। অপরাধ যখন নেই, কেন তাদের ক্ষতি করা হবে? কেউ যদি গোলমাল বাধাতে চেষ্টা করে, গ্রামের সবাই মিলে তাকে বাধা দিতে হবে। চোখের সামনে নিরীহ মানুষের যদি ক্ষতি হয়, তার চাইতে বড় গুনাহ্ আর কিছু নেই।

গলা তুলে জনতার উদ্দেশে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রাজেককাকা বলতে লাগলেন, 'তোমাগো কাছে একখান সাফ কথা আমি জানতে চাই—'

জনতা সমস্বরে জানতে চাইল, 'কী, কী?'

'বাইরের কেউ যদি এই গেরামে হামলা করতে আসে তাগো তোমরা রুখবা কি না?'

'রুখুম।'

'জান কবুল?'

'জান কবুল।'

এর পর গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর শ্রেণীর লোককে নিয়ে 'পীস কমিটি' তৈরী হল। স্থির হল, সকাল এবং সন্ধ্যায়—দিনে দু'বার করে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবার মনে শক্তি যোগাবে; শান্তি অক্ষুণ রাখবে।

*

রাজেককাকা আর বাবার এত চেষ্টা, পীস-কমিটির এত ঘোরাঘুরি—কিছুতেই কিছু হল না। ঢাকার সেই লোকগুলো আজ এ গ্রামে কাল ওগ্রামে মানুষ ক্ষেপিয়ে যেতে লাগল। সেই আগের বারের মতো আমাদের বাড়ি, যুগীদের বাড়ি, বারুইদের বাড়ি—গ্রামের প্রায় সব বাড়িতে ঝাকে ঝাকে বেনামী চিঠি আসতে লাগল। চিঠিগুলোতে একইরকম শাসানি থাকে—যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা যেন আমতলি ছেড়ে চলে যাই; নইলে রক্ষা নেই। আগের বারের মতো রাতের অন্ধকারে ঘরের চালে ঢিল পড়তে লাগল, রাতারাতি মাঠের ফসল উধাও হতে লাগল। একটা সন্ত্রাসের ছায়া চারদিকে হানা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

সময়টা ছিল আশ্বিন মাস। এবার যা অবস্থা তাতে আর দুর্গাপূজো হল না। সারি-জারি এবং রয়ানি গানের আসর আর বসল না। শান্ত গ্রামখানা উদ্বেগে অস্থিরতায় দোল খেতে লাগল।

আগের বারের মতো সন্ধ্যে হলেই ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভালো করে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। একদল মানুষের মুখ থেকে হাসি মুছে
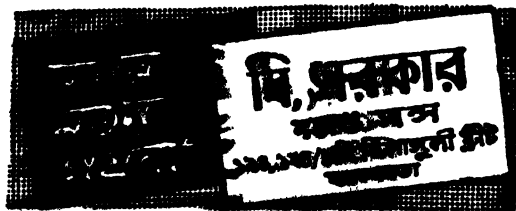
গেল ; ভয়ার্ত বিহ্বলতার মধ্যে তারা যেন নিদারুণ কিছুর প্রতীক্ষা করছে।

বেনামী চিঠি, রাত্রিবেলা ঢিল ছোঁড়া—এটুকুর মধ্যেই উত্তেজনাটা থেমে থাকল না। হারান সাহার ঘাড়ে একদিন রাম দায়ের কোপ পড়ল ; এককোপেই ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিটকে গেল তার। যুগীপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন আগুন লাগল ; কুমোর পাড়ার তিন-চারটে যুবতী মেয়েকে আরেকদিন পাওয়া গেল না।

ফল হল এই গ্রামে ভাঙন শুরু হয়ে গেল। প্রথমে যুগীপাড়ার লোকেরা, তারপর কুমোররা, তারও পর সোনা-রুরা—বামুনরা—কায়েতরা—সবাই শাত-পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি জমাতে লাগল।

দেখেশুনে মা অস্থির হয়ে উঠলেন, 'একদণ্ড আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না। সবিতার দিকে তাকিয়ে বুক কাঁপছে। যা হোক একটা ব্যবস্থা এখনই করতে হবে।'

অগত্যা সোনারঙ স্কুলের চাকরি ছেড়ে আবার আমি কলকাতায় রওনা হলাম। একটা চাকরি যোগাড় করে সবাইকে কলকাতায় নিয়ে যাব—এই হল ইচ্ছা। চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে রাজেককাকা এবং বাবা আমাকে নারায়ণগঞ্জে স্টীমারে তুলে দিয়ে এলেন।

একদিনের পথ পাঁচদিনে পাড়ি দিয়ে শরতের এক ভোরে আবার আমি কলকাতায় এলাম। শিয়ালদা স্টেশনে সেই পরিচিত দৃশ্য। প্ল্যাটফর্মে ইঁট দিয়ে সীমানা ঘিরে পূর্ব-বাঙলার উদ্বাস্তুরা ঘর-সংসার পেতেছে। ওরা কি চিরকাল এখানে থাকবে ?

আসার আগে পিসেমশাইকে চিঠি দিয়েছিলাম ; আমি ওঁর ওখানেই যাচ্ছি। স্টেশনে কারোকে পাঠাবার দরকার নেই। শিয়ালদা থেকে আমি নিজেই চলে যেতে পারব।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এক সময় রাস্তায় এসে যাদবপুরের বাস ধরলাম।

[ক্রমশ।

বন্যা

শিল্পী : [illegible]

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, এন এন কল্যাণী, নদীয়া—

একে নাম প্রকাশ চান না। তার ওপরে আত্মীয়ের বিষয় প্রশ্ন। তাও রোগের বিষয় নয়—যে বিষয়ে লিখেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ২ : আমার বয়স ৩২, মুখে খয়েরি রং-এর spot ও মেচেতা, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, আগের তুলনায় রং কালো হচ্ছে। কোলের সন্তান বেশ বড় হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যও ভাল নয়।

উত্তর : দেহের কতকগুলো অংশ আছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে শিথিল হয়। সেজন্য চিন্তা না করে যাতে স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে, তার চেষ্টা করলে, সব সমস্যার সমাধান হবে। আপনি দৈনিক খাবারের সঙ্গে একটু বেশী করে ঘি মাখন খাবেন ; উপসর্গ কমে যাবে।

● এস কে দেব, সি-এম-ই-আর, আই, দুর্গাপুর-৯—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। অত বড় দীর্ঘ চিঠির আলোচনা এই বিভাগে করা সম্ভব নয়, তাই যে প্রশ্ন দুটি দিয়েছেন, তারই উত্তর সংক্ষেপে দিচ্ছি।

প্রশ্ন ১ : এ ভাবে আমাকে কি সারাজীবন ওষুধ খেতে হবে?

উত্তর : দীর্ঘদিন না হলেও, অনেক দিন খেতে হবে। অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর।

প্রশ্ন ২ : এ রোগ কি সারে না?

উত্তর : অনেক সময়ে সেরে যায়, তবে দীর্ঘদিনের চিকিৎসায়।

● কুমারী রুণু পাল, চন্দননগর—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে—

● শ্রীনরেশচন্দ্র দাস, নারকেলডাঙ্গা, কলি-২১—

আপনি উপসর্গগুলি লিখে পাঠাবেন। যথাসাধ্য চিকিৎসার কথা লিখে জানানো হবে।

● শ্রীএস চৌধুরী, অশোকনগর, ২৪ পরগণা—

আপনার লেখা পোস্টকার্ড পড়লাম। আপনি বিনা দ্বিধায় রোগিণীর উপসর্গ

লিখে পাঠাবেন। কি করতে হবে অথবা কোথায় গেলে সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা পাবেন, সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হবে।

● শ্রীমতী সুচেতা ব্যানার্জী, কলি-৫০—

প্রশ্ন : আমার ঠিক সময়ে ঋতু হয় না—কোন কোন সময় প্রতি মাসেও হয় না। বয়স ২৫।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

উত্তর : প্রথমত কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। দ্বিতীয়ত সারকোফেরল অথবা ফেরাডল চা-চামচের দু'চামচ করে দু'বেলা খাবার পর খাবেন। তিনমাস ধরে। রোজ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে, বিছানা ছাড়ার আগে নীচের ব্যায়ামটি করবেন—

চিৎ হয়ে শক্ত বিছানায়। স্প্রীং বা ডানলোপিলো নয়। শুয়ে হাত মাথার ওপর তুলে দিয়ে সেই হাত দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবেন। হাত কানের সামনে আসবে না, হাঁটু ভাঁজ হবে না।

● শ্রীমতী মেহেরুন্নেসা, মেহেরমঞ্জিল, মিয়াবাজার, মেদিনীপুর—

প্রশ্ন ১ : জন্ডিস রোগের উৎপত্তি মানুষের শরীরে কি কারণে ঘটে? তার নিরাময় কোন চিকিৎসায় হওয়ার সম্ভাবনা?

উত্তর : যকৃৎ-এর মধ্যে পিত্তরস (Bile) তৈরী হয়। সেই পিত্তরস পিত্তথলিতে (Gall bladder) জমা হয়, তারপর পিত্তনালী দিয়ে পিত্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় এইভাবে পিত্তরস হজমের কাজ করে। তাছাড়াও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। যদি কোন কারণে পিত্তনালীর পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না, এবং পিত্ত রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। পিত্তের রঙ হলদে, তাই পিত্ত রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে, সারা দেহ হলদে হয়ে যায়। আর এই হলদে হয়ে যাওয়াকেই ইংরেজীতে জণ্ডিস্ বলা হয়। অতএব জণ্ডিস কি কারণে হয়েছে, না জেনে চিকিৎসার কথা বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২ : আমার এক আত্মীয়ের জংঘা থেকে হাঁটুর গোড়ালি পর্যন্ত সায়াটিক্ পেন্ মাঝে মাঝে দেখা দেয়—

উত্তর : তাঁকে মাঝে মাঝে Neurobin ইনজেকশন নিতে বলবেন চিকিৎসককে দিয়ে—

● শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলি-১২—

আপনাকে ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয়েছে—

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বয়স ১৭, জামসেদপুর—

আপনি যে প্রশ্ন দুটি করেছেন, কোনটাই রোগ নয়। ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পড়াশুনা করুন।

● মিসেস বসু, বুক ই, নিউ-আলিপুর—

আপনার কন্যার বিষয় যে প্রশ্ন করেছেন, তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। প্রথম ওর কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। রোজ ভাতের সঙ্গে বেশি করে শাক খেতে দিন ; তাছাড়া রাতে ইসবগুলের ভূষির সরবৎ দিন। এ ছাড়া হজমের জন্য রোজ খাবারের সঙ্গে Sioplex Enzyme ২ চামচ করে দুবার খেতে দিন। বিকেল বেলায় একটু

খেলাধুলা করতে দেবেন। তিনমাস এইভাবে দেখুন, তাতে যদি না কমে, তাহলে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

● শ্রীমতী বেলা মুখার্জী, কল্যাণী, নদীয়া—

প্রশ্ন ১ : আমার বড় মেয়ে ৯ বছর ৫ মাস, ছোট মেয়ে ৫ বছর ৫ মাস, ও আমার মাথায় দারুণ খুস্কি সেই থেকে চুল উঠে যাচ্ছে।

উত্তর : স্নানের পর Pragmatar মলম মাথায় ঘষবেন, এবং Hijol Hair oil মাখবেন। এ ছাড়া multivitamin বড়ি দুবেলা খাবার পর ২টি করে খাবেন ; অন্তত চারমাস।

প্রশ্ন ২ : ছোট মেয়ে ২ মাস ধরে রক্ত আমাশয়ে ভুগছে, কখনো ভাল, কখনো খারাপ।

উত্তর : আমার মনে হয় দূষিত জল থেকে হচ্ছে। আপনি জল ফুটিয়ে খেতে দেবেন, এর মধ্যে stool পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসককে দিয়ে ভালভাবে চিকিৎসা করিয়ে নিন।

● শ্রীচপলকুমার দাস, কলি—১০।

আপনার সমস্যা চিঠিতে মেটানো সম্ভব নয়। আপনি কোন চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তাঁকে সবকথা বলে, চিকিৎসা করান, সেরে যাবেন।

● শ্রীতাপসকুমার বসু, গারুলিয়া, দক্ষিণপাড়া, ২৪ পরগণা—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রাণতোষ রায়, বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী—

ভালভাবে খাওয়া দাওয়া করুন এবং ওসব চিন্তা ছেড়ে দিন। দেখবেন উপসর্গ কমে যাবে।

● শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, কোরাপুট, উড়িষ্যা—

আপনি Hijol Hair Oil ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

● রবি, বালুঘাট, এলাহাবাদ—

অবাঙালী ছেলের বাংলা লেখা দেখে সত্যিই মুগ্ধ। আপনি যে বিষয়ে লিখেছেন, তা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। সপ্তাহে একবার হলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না।

● পাঁচু, বাঁকুড়া—

প্রশ্ন ১ : আমার ছোটভাই খুব রোগা।

উত্তর : আগে চিকিৎসককে দেখিয়ে ঠিক করে নিন, কোন রোগ আছে কি না ; তারপর যদি কোন রোগ না থাকে Tonomalt জাতীয় কোন ওষুধ খেতে দিন।

প্রশ্ন-২ : আমার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে।

উত্তর : আঙুল দিয়ে দাঁত মাজবেন। দুবেলা একটি করে Vitamin C 500 mg বড়ি খাবেন অন্তত একমাস। শক্ত জিনিস চিবিয়ে খাবেন। প্রথম কয়েকদিন বেশি রক্ত পড়বে, তারপর দেখবেন সেরে গেছে।

● শ্রীমতী চায়না সিংহ, উদয়পুর, কলিকাতা-৪৯—

আপনি যে বড়ি খাচ্ছেন, ঠিকই খাচ্ছেন। প্রতিমাসে ওইভাবে দশদিন করে খাবেন। এ ছাড়া খাবার আগে দুবেলা চা চামচের দুচামচ করে Sioplex Enzyme অথবা Takacombex খাবেন।

● শ্রীমতী শঙ্করী লাহিড়ী, ভট্টাচার্য পাড়া, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া—

আপনি ভাল আছেন জেনে আনন্দিত। ওই ওষুধই ব্যবহার করে যান, অন্তত তিনমাস। দাঁতের বিষয়ে একবার চিকিৎসককে দেখিয়ে নিন। আপনার ভাইয়ের পায়খানা পরিষ্কার হচ্ছে না?

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

● শ্রীপ্রণবকুমার চ্যাটার্জী, শ্যালপুর—

ব্যক্তিগত চিঠি লিখে পোস্ট করে দেওয়া হয়, আপনি পেলেন কি না বলা মুস্কিল, সে বিষয়ে আমরা দায়িত্ব নিতে অক্ষম। আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনার প্রত্যেক চিঠিই মাসিক বসুমতীতে আলোচনা করতে পারি।

● এ কে, কলিকাতা।

এই ছদ্মনামে বুঝবেন তো? আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর Aminozyme খাবেন চারমাস ধরে—। কোন ভয় নেই।

● চড়ামণি ঘোষ, হাওড়া—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীশিলাদিত্য ঘোষ, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলি-৩৬—

আপনার সন্তানের কোন অসুখ আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি এ বিষয়ে কোন শিশু চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করুন।

● আর কে রায়, আগরতলা, ত্রিপুরা—

এ ধরণের Depression মাঝে মাঝে প্রত্যেকের জীবনেই আসে। এ নিয়ে চিন্তিত হতে নেই। কোন ওষুধ না খেয়েই দেখবেন, কিছুদিন পরে আপনা থেকেই সেরে গেছেন।

● শ্রীনীলিমা দেবী (ছদ্মনাম) কলিকাতা—

আপনি ওষুধটি দে'জ মেডিকেল স্টোর্স-এ খোঁজ করে দেখুন। না পাওয়া গেলে জানাবেন। তখন পরবর্তী চিকিৎসার কথা বলে দেব।

● শ্রীবিশ্বনাথ হাজরা, হাওড়া—

আপনি একদিন অন্তর Liver Extract Injection আর একদিন অন্তর Placenta Extract Injection নিন, দশটি করে। Amicline বড়ি একটি করে দিনে তিনবার করে দশদিন খাবেন।

● শ্রীপ্রতাপকুমার পাল, জি টি রোড, কোন্নগর, হুগলী—

আপনি Calcinol চা চামচের ২ চামচ করে দুবেলা ভাত খাবার পর খাবেন তিনমাস ধরে।

● শ্রীঅসীমকুমার রায়, কালীতলা, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন ১: আমার বয়স ৩৭ বৎসর। শরীর খুব রোগা। যাহাতে মেদবৃদ্ধি হয় এমন টনিক নির্বাচন করিয়া দিবেন।

উত্তর: আপনি দুবেলা ভাতখাবার আধঘণ্টা আগে ১ চামচ করে Neogodine খাবেন, আর ভাত খাবার পর ২ চামচ করে Palynix খাবেন।

● শ্রীমতী সুমিতা দাস, দমদম, কলিকাতা-৩০—

আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, তার চিকিৎসা কোন ওষুধে সম্ভব নয়। আপনি এ বিষয়ে কোন চিকিৎসকের মত নিন।

● শ্রীমতী আলেয়া খাতুন বিশ্বাস, আসানসোল, বর্ধমান—

আপনি Tofranil বড়ি সকালে ১টি রাতে শোবার সময় ১টি ১৫দিন খাবেন।

● শ্রীপ্রদীপ রায়, যাদবপুর, কলি-৩২—

প্রশ্ন ১: আমার বয়স ১৮ বছর, কিন্তু লম্বায় মাত্র ৫'৫"। আমি কি আর লম্বা হব?

উত্তর ২: ১ বছর পর্যন্ত লম্বা হতে পারেন, তবে লম্বা হবার জন্যে এত ভাবছেন কেন? পৃথিবীতে অনেক নমস্য পুরুষ মাথায় খর্ব ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বে সবাই মাথা নত করতেন।

প্রশ্ন ২: আমার শরীর তেমন ভাল না।

উত্তর: আমার মনে হয় আপনার পরিশ্রম বেশি হয়ে যাচ্ছে। আপনি ব্যায়াম খেলাধুলা কমিয়ে, লেখাপড়ায় মন দিন, দেখবেন স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।

● রত্না, নৈহাটি, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন ১: আমার বয়স ২০। গান আমার খুবই প্রিয় এবং গাইও। কিন্তু আমার গলার জন্যে গাইতে ব্যাঘাত হয়, বিশেষ করে শীতকালে। গলার ভিতর দিকে লাল লাল গোটামত হয়।

উত্তর: আপনি Calciostilein B^{12} ইনজেকশন নিন। তাছাড়া

নিয়মিত ভাবে গরম জলে Gargle করুন।

প্রশ্ন ২: মোটামুটি স্লিম ফিগার, একটু মোটা হতে চাই।

উত্তর: খাওয়া দাওয়া যা করছেন করুন, তারসঙ্গে Sharkoferrol চা চামচের দু চামচ করে দুবেলা খাবার পর খাবেন দুমাস ধরে।

● শ্রীজীতেন লালা, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ—

আপনাকে ব্যক্তিগত চিঠি দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীরণেন দত্ত (ছদ্মনাম), ন্যায়রত্ন লেন, কলি-৪—

আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর ১টি করে Nevrovitamin 4 (adult) বড়ি একমাস ধরে খাবেন।

● শ্রীসুবিনয় রায়, কুলীনপাড়া, খড়দহ—

আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Aminozyme খাবেন, দুমাস ধরে।

● শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পুরোকায়েৎ, হোতার ২৪ পরগণা—

আপনি সকাল সন্ধ্যা ২ চামচ করে Pulmocod (plain) খাবেন একমাস।

● শ্রীশঙ্কর বিশ্বাস, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা—

ও জাতীয় বই আর না দেখাই ভাল। আপনি সকালে ১টি রাতে শোবার সময় ১টি করে Nevrovitamin 4 (adult) বড়ি খাবেন, দুমাস।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, হাজরা রোড, কলি-২৬—

আপনি উল্লিখিত স্থানে Scabalcid লাগাবেন দিনে দুবার করে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বৈদ্য, ভি সি দি হোস্টেল, বগুড়া—

আপনি সকালে ১টি রাতে শোবার সময় ১টি Tofranil বড়ি খাবেন একমাস ধরে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক—

আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর ২ চামচের ২ চামচ করে Aminozyme খাবেন, একমাস ধরে।

শ্রীকানচন্দ্র সরকার, হরিহরপুর, বারাসত—

এ বিভাগ তো রবিবারের বসুমতীতে প্রকাশিত হয় না। মাসিক বসুমতীতেই হয়। আপনি সকালে ১টি, রাতে ১টি Tofranil বড়ি খাবেন আর দুবেলা ভাতখাবার পর ১টি করে Nevrovitamin বড়ি খাবেন, একমাস ধরে।

শ্রীরামচন্দ্র গোয়ালা, আর্যপট্টি, শিলচর, কাছাড়—

প্রশ্ন ১: অনেকদিন যাবৎ পুরনো আমাশয়ে ভুগিতেছি।

উত্তর: আপনি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি করে Stoversol বড়ি ৭দিন খান। এ ছাড়া একবার Emetine ইনজেকশন নেবার ব্যবস্থা করুন।

প্রশ্ন ২: ঝাল মোটেই খেতে পারি না।

উত্তর: আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Aminozyme ওষুধ খাবেন।

প্রশ্ন ৩: আমার পুরুষাঙ্গের অগ্রের যে লাল মণিটি আছে, তাহা এখনও Cover মুক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসে নাই। ভিতরে যন্ত্রণা হয়।

উত্তর: অপারেশন করিয়ে চামড়াটি কাটিয়ে ফেলুন, যত তাড়াতাড়ি হয়।

প্রশ্ন ৪: মাথায় খুস্কি হইয়াছে।

উত্তর: খুস্কি নিয়ে সংখ্যায় আলোচনা হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের নিকট বিনীত প্রার্থনা

বহু প্রয়োজনীয় ওষুধ বর্তমানে বাজারে নেই। খোঁজ করলে শোনা যায় Import Restriction -এর জন্য পাওয়া যায় না। সরকার যে সমস্ত ওষুধ ইমপোর্ট করবার অধিকার দেন, তার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ওষুধগুলি যাতে যুক্ত হয় এবং নিয়মিত পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আই এম এর সঙ্গে আলোচনা করে একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করি।

কেশবিন্যাস

পশ্চিমে যেমন মরশুমে মরশুমে পোশাক-পরিচ্ছদের ধারা বদলায়, তেমনি আবার তার সঙ্গে তাল রেখে কেশ প্রসাধনের ঢেউ লেগেছে। সন্ধ্যায় সেজেগুজে বেরুবার সময় তরুণীরা আজকাল খুব লম্বা চুল ব্যবহার করছে, আর ছোট ছোট মেয়েরা এমনভাবে চুল বাঁধছে, যাতে তাদের চুল বেশী লম্বা দেখায়।

রামায়ণ কাহিনী / রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম।

জগতের মহাকাব্যসমূহের অন্যতম হল মহর্ষি বাল্মীকি কৃত রামায়ণ। এই রামায়ণ এক অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ, কত যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, রামায়ণের স্বাদ এখনও যেন অম্লান। মূল রামায়ণ অবলম্বনে সরল ভাষায় সংক্ষেপে লিখিত এই রামায়ণ কাহিনীটি বালক-বালিকাদের হাতে তুলে দেওয়ার উপযুক্ত সর্বাংশে। বাংলা শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ভাণ্ডারে, আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বামী অমলানন্দ, প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৫৬, দাম—ছাত্র সংস্করণ—একটাকা ষাট পয়সা, বোর্ড বাঁধাই—দুই টাকা।

মহাভারত কাহিনী / রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম

ঋষি কবি বেদব্যাস রচিত মহাভারত গ্রন্থটি হিন্দুর তথা ভারতীয়ের অন্যতম জাতীয় সম্পদ। আলোচ্য গ্রন্থটি মূল রচনা অবলম্বনে, বালক-বালিকাদের উপযুক্ত করে লিখিত। লেখকের শৈলী সহজ ও সুন্দর, রচনার ভাব বিকাশে বিশেষ সহায়ক। বইটি হাতে পেয়ে ছোটরা তো বটেই, তাদের অভিভাবকবৃন্দও যে খুশী হয়ে উঠবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—স্বামী অমলানন্দ, প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৫৬, দাম—ছাত্র সংস্করণ—দু'টাকা, বোর্ড বাঁধাই—দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ব্রহ্মসূত্র / বেদান্তদর্শন

হিন্দু বৈদিক ধর্মের ভিত্তি ষড়দর্শন এবং এই ষড়দর্শনেরই অন্যতম হল ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শনটি পরম চেতন ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞাপক এবং তার জগৎ-কর্তৃত্বের প্রতিপাদক। ব্রহ্মসূত্রের অপর একটি নাম শারীরিক মীমাংসা শাস্ত্র, এই দেহের

নাম শরীর, আর এই শরীরধারী জীবাত্মার নাম শরীরী বা শারীর এবং এই জীব বা শারীরকে আনন্দদায়ী ব্রহ্মের নাম শারীরক। এই ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব বিষয়ে মতানৈক্যের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্তক আচার্য কর্তৃক বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থটি তেমনই এক আচার্য শ্রীমৎ ভগবৎ রামানুজ কৃত বেদান্ত-ভাষ্য। বেদান্ত শাস্ত্র বা ব্রহ্মসূত্রের সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে এই ভাষ্যে, পাঠ করলে বোদ্ধা পাঠকের মনে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে। অনুবাদকের শাস্ত্রীয় জ্ঞানও যথেষ্ট এবং অনুবাদকর্মের ঔজ্জ্বল্য বর্ধনে সহায়ক। আমরা এই মহতী গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য, প্রকাশক—শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, পোঃ, অঃ—বলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা, দাম—ছয়টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দাস গোস্বামী

পরম বৈষ্ণব, পরম ভাগবত ঠাকুর হরিদাসের কৃপালব্ধ কাম, পরম বৈষ্ণব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনায়ন করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। মহাপ্রভুর অন্যতম মহাভক্ত ও অনুগামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন উপন্যাসের ন্যায় আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলীর ধারক। গ্রন্থকার প্রভূত আন্তরিকতার সঙ্গে এই মহাপুরুষের বিচিত্র জীবন-কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, ভক্ত বৈষ্ণবের অন্তর্নিহিত সাধনার ভাবরূপটিকে। বৈষ্ণব সাধনার মর্মবাণী তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রেম ও ভক্তির রসে সিঞ্চিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভক্ত বৈষ্ণব ও বোদ্ধা এই উভয় শ্রেণীর পাঠক সমাজই যে বর্তমান গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। সংকলক—রামকিঙ্কর দাস, মুদ্রণ—শ্রীশ্যামসুন্দর প্রেস, ৫৭, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫।

মহাপুরুষ সন্নিধানে / ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য গ্রন্থটির কিয়দংশ স্মৃতিচারণমূলক, কিয়দংশ আত্মকাহিনী আবার দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তির। প্রথমাংশ কথিত শ্রীমতী নির্মাল্যবাসিনী দেবীর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয়াংশ বা বা শেষাংশ গ্রন্থকারের স্বমুখ-নিঃসৃত। নির্মাল্য বাসিনীর ভাষায় অধ্যাত্ম জীবনের মূল প্রশ্নগুলি যথাসম্ভব আলোচিত ও বিশ্লেষিত; শেষাংশে সাধক লেখকের আত্মোপলব্ধির বর্ণনা। বিষয়বস্তুর ভাষ্যকার বিভিন্ন হলেও মূল কথাটা একই—শ্রেয় কাকে বলে, এই মহাসত্যেরই সন্ধান করেছেন তাঁরা বর্তমান রচনার মাধ্যমে। প্রার্থিত লাভের সাধনা ও তার অন্তরঙ্গ ভাষ্যে সব দেশ ও যুগের মানুষেরই স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, অধ্যাত্ম জীবনও যুগ যুগ ধরেই মানুষের প্রার্থিত বস্তু, সুতরাং এই জীবন-সন্ধানী মানুষের সাধনা ও সন্ধানের ইতিহাসও কখনও পুরোনো হয় না, আলোচ্য রচনাতেও পাওয়া যায় সেই নবীনতার আস্বাদ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন, লেখক—স্বামী উমানন্দ, প্রকাশনা—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ৬।১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

Mothers And Sons / [illegible] পাবলিকেশনস্ (প্রাঃ লিঃ)

বাংলা কথা-সাহিত্যের [illegible] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুন করে পরিচয় দেওয়াটা অনাবশ্যক, যতদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকবে, শরৎচন্দ্র সমাদৃত থাকবে [illegible] হয়ে। শরৎ-সাহিত্যের দুটি উজ্জ্বল [illegible] ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে, অনুবাদক শুধু ভাষাবিদ্ পণ্ডিতই নন, স্বয়ং একজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যকারও বটেন, তাই তাঁর অনুবাদকর্মও মণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে নতুন [illegible] সাহিত্য রসে। অনূদিত রচনাদ্বয়ের নাম যথাক্রমে 'নিষ্কৃতি' ও 'রামের সুমতি', 'নিষ্কৃতি' অনূদিত হয়েছে 'ডেলিভারেন্স' নামে এবং 'রামের সুমতি'র ভাষান্তরকরণ ঘটানো হয়েছে 'দি [illegible] প্রডিগ্যাল' নামের আশ্রয়ে। প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে অনুবাদক বিশিষ্ট ভাষাবিদ্, ভাষার ওপর তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকারের ফলে অনুবাদে আড়ষ্টতা নেই বললেই চলে, শরৎচন্দ্রের রচনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য [illegible], অনুবাদকর্ম দুটিতেই বিশেষভাবে উপস্থিত। নিষ্কৃতির প্রধান চরিত্র গিরিশ বিদেশী ভাষার খোলসের মধ্য থেকেও সমান উজ্জ্বল, সমান ভাস্বর হয়েই দেখা দিয়েছেন পাঠকের মনে, আবার 'রামের সুমতি'র রাম ও নারায়ণী কেউই কম মহিমা-মণ্ডিত নয়। বাঙালীকে শরৎচন্দ্র চিনতেন বুঝতেন নিবিড়ভাবে, বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের নিগূঢ় বাণী তাঁর রচনায় সর্বদাই ঝঙ্কৃত, সেই ঝঙ্কারের রেশ বিদেশীর কানেও পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন অনুবাদক আলোচ্য অনুবাদকর্মদ্বয়ের মাধ্যমে, একথা অসন্দিগ্ধ চিত্তেই স্বীকার করা যায়; আর এটাই তাঁর কৃতিত্বের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম সার্টিফিকেট। আমরা এই অনুবাদ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য-কামী। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুবাদক—দিলীপকুমার রায়, [illegible] পাবলিকেশন্স্, ২৪৯, দাদাভাই নৌরোজী রোড, বোম্বাই—১, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

জেনানা ফাটক / নূতন সংস্করণ। প্রকাশ ভবন

আলোচ্য গ্রন্থটি ইতিপূর্বে একবার প্রকাশ করেছিল এবং তখনই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশেষ ভাবে, সুতরাং প্রবর্ধিত এই গ্রন্থের নূতন শোভন সংস্করণটি হাতে পেয়ে আমরা সত্যই আনন্দিত। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে লেখিকা কারাবরণ করেছিলেন, এই রচনা তাঁর সেই অভিজ্ঞতারই ইতিহাস। বৃটিশ আমলে নারী-কয়েদীদের অবস্থা কি রকম ছিল তার একটি পরিচ্ছন্ন পরিচয় বিধৃত বর্তমান রচনায়, রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে মাথা ঘামান নি লেখিকা বিশেষ, তাঁর মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ। সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নারী-কয়েদীদের বিচার করেছেন লেখিকা এবং সেজন্যই খুনী আসামী মিছিরন, [illegible], রাধা প্রভৃতিকে আমরা দেখতে পাই ঘরকন্নার মায়ায় জড়িতা নিতান্ত সাধারণ স্নেহশীলা কয়েকটি নারী হিসাবেই। বস্তুত সমগ্র রচনাটির প্রাণসত্তাই এই মানবিকতা বোধ, মনুষ্যত্বের জয়গানই যেন ধ্বনিত রচনার ছত্রে ছত্রে। লেখিকার অন্তর্নিহিত শিল্পিসত্তার ছোঁয়ায় রচনা স্বাদে ও গন্ধে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা এই রচনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শিল্পসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—রাণী চন্দ, প্রকাশক—প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২, দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

যুগের [illegible] / [illegible] গোড়ার কথা

আজকের দিনে মার্কসবাদ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজনীয়, কারণ একথা অনস্বীকার্য যে, কমিউনিজম্ আজ আর একটা কথার কথা মাত্র নয়। সমস্ত দুনিয়া জুড়েই এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি। কমিউনিজমের প্রধান ভাষ্যকার কার্ল মার্ক্স যা বলেছেন সে সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। প্রায়শই দেখা যায় যে, কমিউনিজম বিরোধী ও কমিউনিজমের সরিক বা পৃষ্ঠপোষক, এতদুভয়ের কারুরই কমিউনিজম সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন কোন ধারণা নেই, এ অবস্থা শুভ স্বাস্থ্যপ্রদ নয় এবং এজন্যই এই ধরণের রচনার প্রকাশ ও প্রচার হওয়াটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমান রচনায় মার্কসবাদের মূল বক্তব্যকে আন্তরিকতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে, লেখকের প্রচেষ্টা সযত্ন অনুশীলনসাপেক্ষ ও তথ্যনিষ্ঠ, রচনাটি পাঠ করলে কমিউনিজম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সমস্ত তথ্যই পাঠকের মানস গোচরে আসে। আমরা বর্তমান গ্রন্থটি পড়ে সুখী হয়েছি এবং এর বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—অনল রায়, প্রকাশক—মৈত্র প্রকাশনী, ২৬।২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, দাম নয় টাকা।

চোরাগুহার [illegible] / উর্বশী

পৃথিবীর আদিমতম বৃত্তি পতিতা বৃত্তি, যুগ যুগান্ত ধরে যেসব মেয়েরা এই বৃত্তি অবলম্বন করে আসছে তাদের বলা হয় পতিতা কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে পুরুষ তাদের প্রধান অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও তাদের কেউ বলে না পতিত। কেন এই বৈষম্য? কেন এই প্রভেদ? পতিতাকে ঘৃণা করে তথাকথিত সামাজিক মানুষ শুধু ভেবে দেখে না যে কেন কাদের প্রয়োজনে পতিতার সৃষ্টি হয়েছে? আলোচ্য উপন্যাসে এই তথাকথিত [illegible]

দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি স্নেহজীবিনী মেয়ের জীবনায়ন করেছেন লেখিকা বর্তমান কাহিনীর মাধ্যমে, সুমিতা, লক্ষ্মী, শিখা ও অনামিকা, সুখে দুঃখে গড়া নীড়ের স্বপ্ন ছিল যাদের বুকে, তারা কেন নেমে গেল ঘর থেকে পথে? গৃহের সান্ধ্যপ্রদীপ কেন জ্বললো পথের আলোয়? পুরুষের পাপ, পুরুষের রক্তকামিতার, পুরুষের ছলনার মাধ্যমে যাদের জন্ম, আজীবন ধরে তারাই শুধু জ্বলবে, জ্বালাবে না? অত্যন্ত দরদ দিয়ে লেখনী চালিয়েছেন লেখিকা, তাঁর আন্তরিকতায় হতভাগিনী এই নারী-সম্প্রদায় যেন উজ্জ্বল রেখায় আঁকা এক মহান শিল্পসৃষ্টিরই মত সোচ্চার হয়ে উঠতে পেরেছে। লেখিকার শৈলীও বিশেষরূপেই স্বচ্ছন্দ ও মধুর। আমরা বর্তমান গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—বাণ ভৌমিক, প্রকাশনা—উর্বশী, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭, দাম—তিন টাকা।

দিল্লী নব নব রূপে / দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ।

আলোচ্য গ্রন্থটি এক অনুবাদ কর্ম, 'দিল্লীমে দশ বর্ষ' নামে মূল গ্রন্থের নতুন নামায়ন করা হয়েছে ভাষান্তরণের সময়। বিষয়-বস্তুর পটভূমিকায় উপস্থিত আমাদের রাজধানী দিল্লী, বস্তুত ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ এর মধ্যে পরিবর্তনশীল বিশ্ব-জগতের সঙ্গে তাল রেখে রাজধানী দিল্লীতেও বয়ে গিয়েছে যে পরিবর্তনের ধারা—আলোচ্য রচনার মাঝে তাকেই রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। দিল্লী কি ছিল আর কি হয়েছে, ছবির পর ছবি এঁকে তা দেখিয়েছেন লেখক, ১৯৪০-এর দিল্লী ছিল কেতাদুরস্ত ফিটফাট ছিমছাম এক সরকারী উপনিবেশ, সিমলা-দিল্লী সরকারী চাকুরিয়াদের জীবনযাত্রা, কার্যধারার তালে-তালে স্পন্দিত হত তার নাড়ী, তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেল, দেশ বিভাগ হল, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করল, দিল্লীর পূর্বতন গৌরব কিন্তু অচল রইল, অখণ্ড ভারতের মত খণ্ডিত ভারতেরও রাজধানী হল দিল্লী। সব পরিবর্তন সব বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েও দিল্লীর পূর্বতন মহিমা আজও অটুট আজও উজ্জ্বল। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নাড়ীর স্পন্দন আজও অনুভূত হয় দিল্লীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্বপ্রথম। ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই নগরীর ভাবরূপটিকে আঁকতে চেয়েছেন ছোট ছোট রচনার মাধ্যমে, তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। অনুবাদকের কাজও বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ শিল্প-শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—রাজেন্দ্রলাল হাণ্ডা। অনুবাদক—অজিত দত্ত। পরিবেশক—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রাইভেট লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা।

প্রথম কুঁড়ির গান / বেঙ্গল কনফারেন্স সাহিত্য সমিতি

বাঙালী খৃস্টিয়ানদের এক বৃহৎ সমাজের অস্তিত্ব থাকলেও এ বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে কমই, অর্থাৎ এই বিশেষ সমাজ নাকি বিশেষভাবেই শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অচেতন। আলোচ্য গল্প গ্রন্থটির লেখক এই অভাব দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প, তিনি খৃস্টিয়ানদের নিয়ে লিখেছেন এবং খৃস্টিয়ানদের জন্যই লিখেছেন বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িক-ভাবে শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করাতেই আত্মনিয়োগ করেছেন, মথি লিখিত সুসমাচারই তাঁর রচনার আদর্শ নয়। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপায়ণকেই বলা হয় সাহিত্য, সেই সঙ্গে যদি থাকে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি তাহলেই সে রচনাকে শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্যরূপে মেনে নেওয়া হয়ে থাকে এবং এদিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে, আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলি শিল্পোত্তীর্ণ। জীবনকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন লেখক আলোচ্য গল্পগুলির মাধ্যমে, এবং তাঁর সে প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। মোট সতেরোটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এতে যার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। লেখকের শৈলীও বেশ সাবলীল। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—হিমাংশু সরকার, প্রকাশনায়—বেঙ্গল কনফারেন্স সাহিত্য সমিতি, ৭২।২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

পুষ্পের গান / শ্রীভারতী পাবলিশার্স

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্যসঙ্কলন। বেশ কয়েকটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে এতে, আধুনিক কবিতার প্রচলিত রীতি অনুসারে লিখিত নয় এগুলি, ছন্দ ও মিলের ব্যঞ্জনায় এরা ভরপূর। কবিতাগুলি পড়তে ভালই লাগে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীমৃন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশক—শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন-টাকা।

প্রগতির পথে / আনন্দ পাবলিশার্স

প্রগতি কথাটি সকলের মুখে মুখে ফিরলেও এর সত্যকার তাৎপর্য অনেকেরই অজানা, কাজেই প্রগতির মূল সূত্রগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন আছে। বর্তমান গ্রন্থে সেই আলোচনাই করা হয়েছে সতর্কভাবে। প্রগতির বৃদ্ধি ও বিনাশ দুইই যে সম্ভব হতে পারে প্রগতিরই নামে, তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে লেখক প্রমাণ করেছেন তাহা। [illegible] পাঠকের কাছে আলোচ্য গ্রন্থটি সমাদর পাবে বলেই মনে হয়। গভীর চিন্তাশীলতার ছাপ আছে এই রচনার ছত্রে ছত্রে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অমূল্য দত্ত। প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

দেবতার রোষ / ডি এম লাইব্রেরী

উত্তরবঙ্গের বন্যার প্রলয়ঙ্কর প্রাবল্যে তছনছ হয়ে যাওয়া জীবনগুলির ছবি তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে আলোচ্য নাটকের মাধ্যমে। নাট্যকারের আন্তরিকতায় কাহিনী হয়ে উঠেছে মুখর ও হৃদয়স্পর্শী।' বন্যাপীড়িত মানুষগুলির দুর্দশা যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে পাঠকের মনের চোখের সামনে। নাটকের গতি সীমিত, কোথাও আতিশয্য নেই। বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের জন্য সমস্ত নাটকটিই বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ঠেকে। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—কার্তিকচন্দ্র মল্লিক, প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা।

প্রতিবিম্ব। বিবেক ভারতী

আলোচ্য গ্রন্থটি রম্যরচনামূলক প্রবন্ধ সংকলন। লেখকের শৈলীতে একটা সহজ মাধুর্য থাকায়, প্রবন্ধগুলি পড়তে ভালই লাগে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—আশীষ বসু। প্রকাশক—বিবেক ভারতী ; ৫৭, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। দাম—দু-টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

যুগে যুগে ওপারে কালে / দে বুক স্টোর

বহু প্রকার সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে, লেখকের প্রধান বক্তব্য মানব সমাজের ক্রমোন্নতির শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার বিজ্ঞান হলেও, ধর্ম ও শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কল্যাণপ্রদ হতে পারে না। অর্থাৎ এককথায় ধর্মসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই শুধু আদর্শ সমাজ গড়ে তোলাটা সম্ভব, এ যেন সোনার পাথরবাটির মতই সম্পূর্ণ অবাস্তব এক পরিকল্পনা, কারণ যে-কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবেন যে, জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই বা থাকতে পারে না। যাই হোক নিজের মতের স্বপক্ষে লেখক বহু যুক্তি-তর্কেরই অবতারণা করেছেন যার ফলে কাহিনী অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক বরং কিছুটা কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, বঙ্কিমান, মীনা প্রভৃতি চরিত্র বেশ উজ্জ্বল হয়েই ফুটেছে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নিমাইকুমার ঘোষ, পরিবেশক বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা।

বিশ বছর মামলা মোকদ্দমার পর

লুকাস ক্যানাখের অঙ্কিত (১৪৭২-১৫৫৩) শিশু ক্রোড়ে মেরী ছবিটি ওয়ালরাফ রিচার্টজ মুজিয়াম কিনেছিল ১৯৩৭ সনে কিন্তু ছবিটি কোলোনে পৌঁছুলে স্থানীয় বার্গোমাস্টার সেটি হেরমান গোয়েরিংকে উপহার দেন। যুদ্ধ শেষ হলে ছবির মালিকানা নিয়ে মামলা বাঁধে। দীর্ঘ বিশবছর মামলা মোকদ্দমা চলার পর আদালত মুজিয়ামের স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন। ছবিটির মূল্য দেড় লক্ষ মার্ক।

কি যে বলছো না

সম্প্রতি একটি কলেজের ছাত্রর সংগে পুরো একটা বেলা কাটাতে হয়েছিল। সে চেয়েছিল বলতে, শোনার উৎসাহ আমারও কিছু কম নয়। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদেই আমি হাল ছেড়ে দিলাম। বাধ্য হলাম। না, তার চিন্তা-ধারা বা বাক্য সংগতিহীন নয়. আসলে সে যে কি বলল আমি বুঝতে পারলাম না, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। কান পেতে ছিলাম —অথচ শব্দগুলো যেন দূরাগত ধ্বনির রেশমাত্র; বুঝি শব্দরোধী কোন দেয়াল গলে আসা ক্ষীণ অনুরণন।

বিচিত্র! ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত স্বগতোক্তিতে পর্যবসিত হল। সে বক্তা; আমি অবোধ শ্রোতা। শব্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, অর্থহীন শব্দর জোয়ার—উত্তাল অথচ অর্থহীন।

কিছুদিন পরে কলেজ-শিক্ষক এক বন্ধুকে ব্যাপারটা বলায় সে উত্তর দিল, ‘বুঝছিস্ না, আজকাল এরা কথা বলার জন্য মুখ খোলে না। কেবল তো-তো করে। এটা সর্বাধুনিক ফ্যাশন। তা ছাড়া, এটা-সেটায় এত মত্ত যে পড়ার সময় পায় না বললেই চলে। বলারও তাই বিশেষ কিছু থাকে না। এই জন্যই বোধ হয় এদের য়ুরো-আমেরিকা-য় বলছে মূক প্রজন্ম। আরে বাপু, বলতে হলে জানা চাই তো ঠিক কী বলা উচিত, জানতে হলে পড়া এবং চিন্তা অপরিহার্য। এখন অবস্থা যা- - -।’

এটি কিন্তু আজকালের সমস্যা মাত্র নয়।

মনে পড়ে ছোটবেলায় ভাই-বোনদের সংগে ভাবের আদান-প্রদান করতাম বিচিত্র শব্দাবলীর সাহায্যে। আমরা পরস্পরকে বুঝতাম। বাবা একদিন বললেন অনেক অনেক চেষ্টা করেও তিনি আমাদের বক্তব্য ঠিক ধরতে পারেন না। ‘কী যে বলছো

বল্‌বন্ধ্

না।’ তিনি কিছুটা বিরক্তি এবং কিছুটা শংকামিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘তোমাদের কথা ধরাই মুশকিল, বোঝা ত শিবেরও অসাধ্য।’

আমাদের জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন। তাঁর কাজ আমাদের ঠিকমত উচ্চারণ শেখানো। আমরা উত্তেজিত আশংকিত। এবং শেষে বিরক্ত। বাবা কিন্তু অটল।

সারাজীবন বাবা আমাদের তো-তো করা নিয়ে অভিযোগ করে গেছেন। পণ্ডিতমশাইকে তিনি একদিন বললেন: ‘বাবলার কথা বলার ব্যাপার নিয়ে ভাবছি আপনার সংগে আলোচনা করবো। ও স্পষ্ট করে কথা বলে না, তা ছাড়া গোড়ায় এক নিঃশ্বাসে এক ঝুড়ি কথা বলার বদ অভ্যাস ওর গড়ে উঠেছে। দেখুন, যদি আদৌ কিছু করতে পারেন। আমার ধারণা ছিল এর মূলে রয়েছে দৈহিক ত্রুটি কিন্তু ডাক্তার বলেছেন আমার ধারণা ভুল।’

সে থাক্। ধারাল বক্তাদের মতই অস্পষ্ট বচন বহুবিস্তৃত—দ্বিতীয়টা বেশি খারাপ; কারণ, টাইপ করে খারাপ লেখা সুবোধ্য করা যায়, অস্পষ্টোক্তি স্পষ্টীকৃত করার কোনও যন্ত্র এখনও অনাবিষ্কৃত। এর মূলে রয়েছে কুঁড়েমী এবং উদ্ভট এক সংকোচ। উদ্ভট এজন্য যে, শ্রোতাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে একরকম বাধ্য করা হচ্ছে —ভাবটা এই যেন একবারে বুঝে ফেললে গুরুত্ব কমে যায়। অভদ্রতা, নিঃসন্দেহে।

বার তিন—চার জিজ্ঞেস করার পর যদি বুঝতে পারা যায় যে, বক্তা কেবল নিজের উপস্থিতির ঘোষণা করেছেন? কিংবা তার তৃষ্ণার কথা?

আসলে এ-ব্যাপারে ঠিক কী যে করণীয় আমি বলতে অক্ষম। আর, আজকাল কেন যে এটি সমস্যার আকার নিয়েছে, সে সম্পর্কে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বাবলী শোনার ধৈর্যও আমার নেই। তবে হ্যাঁ, এ নিয়ে পণ্ডিতরা মাথা ঘামাতে পারেন, ঘামালে ভাল হয়। ততক্ষণ আমরা শৈশবের যে ছড়া আওড়াতাম —কিংবা বিড়বিড় করতাম—সেইটা সকলে গলা ছেড়ে নতুন করে আওড়াতে থাকি:

যদু আর মধু দুই ভায়ে
গলা ছেড়ে খাসা গান গাহে।
সোনা ব্যাঙ আটকাল
তোর হেঁড়ে গলা?
থাক্ থাক্ আজ তবে
তোর কথা বলা।

• সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই •

প্রেমিক ॥ মনোজ বসু ॥ ৬.০০

অশিক্ষিত, অমার্জিত, স্থূল প্রকৃতির যাযাবর এক মানুষ—যার একাধিক পত্নী বর্তমান ও যে সন্তানের জনকও, এবং যখনই সে পৃথিবীর যে দেশে গেছে তখনই সে দেশে একই সঙ্গে পত্নী ও উপপত্নী সংগ্রহ করেছে নির্বিকারভাবে, একদিন দেখা গেল অনবদ্য এক অনুভূতি সে বোধ করছে তার অন্তরে এক সম্ভ্রান্ত ও বিদুষী মহিলার প্রতি। এই যে নিরুচ্চার, কামগন্ধহীন আত্মোৎসর্গ এবং ত্যাগধন্য এক অচিন্ত্য অনুভব, এর নামই কি প্রেম? তা হলে "প্রেমিক" সেই প্রেমেরই হৃদয়স্পর্শী উপাখ্যান॥

সাগিনা মাহাতো ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ ৪.০০

সাগিনা মাহাতো শ্রমিক। সারা জীবন সে লড়ে গিয়েছে অত্যাচার, অবিচার আর কায়েমী স্বার্থের শোষণের বিরুদ্ধে। কিন্তু সে ভাবতেও পারেনি একজন শ্রমিক হিসাবে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং মানুষ হিসাবে তার মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য তাকে শেষ সংগ্রাম করতে হবে তার পার্টিরই বিরুদ্ধে। ফলস্বরূপ তার বিরাট বিশাল মৃতদেহটা একদিন পাওয়া গেল পাহাড়ী রেলের ছোট্ট লাইন দুটোর ওপর।...তপন সিংহ পরিচালিত এবং দিলীপকুমার অভিনীত "সাগিনা মাহাতো" এই কাহিনীরই চিত্ররূপ॥

কালসন্ধ্যা ॥ বুদ্ধদেব বসু ॥ ৩.০০

"কালসন্ধ্যা" কাব্যনাট্যের কাহিনীর অংশ মহাভারতের মৌষল পর্ব থেকে আহৃত। যদুবংশের ধ্বংস অবলম্বন করে ইতিহাসের একটি আদি সত্যকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন. তাই এটি আমাদেরই সমকালীন কোনও ঘটনা বলে অনুভূত হয়। "কালসন্ধ্যা"য় কাব্যের গুণ ও নাটকের গুণ সমভাবে বিদ্যমান। এটি মনোযোগী পাঠকের পক্ষে যেমন হৃদয়গ্রাহী, মঞ্চাভিনয়ের পক্ষে তেমনি উপযুক্ত॥

অসংলগ্না ॥ বনফুল ॥ ৩.০০

"অসংলগ্না" নতুন রীতিতে লেখা এক অভূতপূর্ব উপন্যাস। চমকপ্রদ কোনও কাহিনীবৃত্ত রচনা নয়, উজ্জ্বল কতকগুলি চরিত্রসৃষ্টিও নয়—বিমূর্ত কতকগুলি ভাব ও কল্পনাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে সেগুলি অবলম্বনে সৃষ্ট এই উপন্যাস তাঁর সৃজনশক্তির প্রাচুর্যের দিকটিই শুধু নির্দেশ করবে না, বাংলা উপন্যাসের জগতে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টিরও মর্যাদা লাভ করবে॥

নুনের পুতুল সাগরে ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ ১০.০০

পঞ্চাশ বছরের উৎসবমুখর জন্মদিনে হঠাৎ সাহিত্যিক অনাদিপ্রসাদের কেন যেন মনে হল : সাহিত্যসাধনার নামে এতদিন তিনি যা করেছেন তা সব মেকী—বাস্তবজীবনের স্পর্শরহিত মনোরম কল্পনাবিলাস শুধু। অতঃপর বিভ্রান্ত এবং বিচলিত অনাদিপ্রসাদের শুরু হল এক নতুন পরম্পরা। জীবনজিজ্ঞাসায় পীড়িত এক সৎ সাহিত্যিকের আত্মানুসন্ধানের এক মহান আলেখ্য এই উপন্যাস॥

অরণ্যের দিনরাত্রি ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৪.০০

ভিন্ন স্বভাবের, ভিন্ন মেজাজের চারটি যুবক—চার বন্ধু। ক্লিষ্ট তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যর্থতার গ্লানিতে। তাই তারা একদিন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল অজানা অচেনা এক অরণ্যে। সেখানে উন্মোচন চেয়েছিল তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত অনাবৃত সত্তাটির। আত্মবিকাশের —— উন্মুখতায় জর্জর যৌবনের পূর্ণতার পথটি অনুসন্ধানের এক অনবদ্য কাহিনী "অরণ্যের দিনরাত্রি"। সত্যজিৎ রায় কাহিনীটির চলচ্চিত্ররূপ দিচ্ছেন॥

ক্রিকেটের আইনকানুন ॥ মতি নন্দী ॥ ৫.০০

বর্তমান গ্রন্থে ক্রিকেট খেলার মূল আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রত্যেকটি আইন সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য ও বিভিন্ন জ্ঞাতব্য অসংখ্য ডায়াগ্রাম ও ইলাস্ট্রেশন সহ পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া এতে আছে : রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি ও কোচবিহার ট্রফি—ভারতের এই তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতার বিশেষ নিয়মকানুনসমূহ এবং ইণ্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সের ইতিবৃত্ত॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৬৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

সজ্জিত

—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মাসিক
বসুমতী
বৈশাখ
১৩৭৬

হি-হি-হু-হো!

এবার ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে সে। কে তার নাকের মধ্যে কিছু একটা দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়েছে।

'এ কি ধরণের ঠাট্টা……!' খাটিয়ার উপর উঠে বসে সে বলে। চাপা হাসির একটা অস্ফুট ধ্বনি বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আর ক্ষীণ একটা পদশব্দ সিঁড়ি বরাবর অনুভূত হয়। হালকা বাদামী রংয়ের ওড়না এবং রেশমী পাজামা পরিহিত একটি ছায়ামূর্তি দ্বারতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'আরে…!' নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখ থেকে বিস্ময়বোধক এই অব্যয়টি বেরিয়ে পড়ে। নতুন ভাড়াটে জামিলা বেগমের মেয়ে সইদা বলেই তো মনে হলো।—

মাহমুদ দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে খাটিয়ায় বসে একটা সিগারেট ধরায়।

ওদের বাড়িটা এককালের আভিজাত্য এবং বাড়বাড়ন্তের নিদর্শন। কালের গতিতে এত বড় বাড়িটা আজ প্রায় জনমানবহীন, খাঁ-খাঁ করছে। এ বাড়ির পুরানো বাসিন্দা, তার আপনার জনদের মধ্যে অনেকেই দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানকে নিজেদের দেশ বলে বেছে নিয়েছেন। বাকীদের মধ্যে কেউবা আল্লার রাজত্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন আবার অনেকে ঘরছাড়া হয়েছে বা রুজি রোজগারের ব্যাপারে অন্য শহরে বাস নিয়ে ওরা মাত্র তিনজনই অবশিষ্ট আছে—ওর মা শমীম আরা বেগম, দাদা হামিদ আর ও নিজে—তাই বাড়িটাকে বড় খালি খালি মনে হয়। ভাড়াটে বাড়ির সন্ধানে এসে জামিলা বেগম বলেছিলেন 'বোন আপনার বাড়ির একটি কোণ হলেই আমার যথেষ্ট। সুবিধা-অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই। সইদার বাপের শেষ ইচ্ছাটি আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। তিনি বলেছিলেন,—মেয়েকে আমার অশিক্ষিত করে রেখো না—ও অন্তত বি-এ পাশটা করুক এ আমার বহুদিনের আশা।' তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক—এই শুধু আমি চাই। শহরে এসেছিও ওই একটিমাত্র কারণে। বাড়ির কিছুটা অংশ যদি আমায় ভাড়া দেন তাহলে চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।'

শমীম আরা বেগম তৎক্ষণাৎ তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন।

আমার কোন আপত্তি নেই, দিদি। অনায়াসে থাকতে পারেন। মুখ দেখলেই মানুষ চেনা যায়। বাড়ির যে দিকটা পছন্দ সেই দিকটাই বেছে নিন।

মা-বেটি আর এক মামা নিয়ে মোট তিনটি প্রাণীর তো সংসার-এর মধ্যে বাছা-বাছির কী আছে বোন? আপনাদের ঘরের কাছাকাছি যে-কোন একটা জায়গা দিন তাহলেই হবে। আলাদাও হবে আবার কাছা-কাছিও থাকা যাবে। আপনার ছেলেদের সুবিধা-অসুবিধাও তো দেখা দরকার।

যা বলেছেন দিদি। আমিও অমনটিই চাই। আমার ছেলেদুটি তার লাজুক। তাদের সামনে পর্দানশীন থাকবেন কি দিদি, তারাই দেখবেন আপনাদের চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে। মাথা নীচু করে ওরা বাড়িতে ঢোকে আবার মুখ না তুলেই বেরিয়ে যায়। আল্লার কৃপায় কোন অভি-যোগের সুযোগই ওদের দিক থেকে আপনি পাবেন না। মাহমুদের কাছে তার মায়ের কথার সম্মান ছিল অসাধারণ। তাই সে ভুলেও কখনো সইদার মুখের পানে চেয়ে দেখত না। একই বাড়িতে থাকার ফলে সুযোগের অভাব ছিল না। কিন্তু মা বড় গলায় যে কথা বলেছেন সেটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে সে সর্বদা অত্যন্ত সংযত থাকত।

(উপন্যাস)

—মূল রচনা—

জিয়া আজিমাবাদী

সন্ধানী ছলনাময়ী

অথচ কিন্তু সে অপর পক্ষের অযাচিত আমন্ত্রণ পেয়েছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাড়িশুদ্ধ সবাই ঘুমোচ্ছে, সেও কলেজ থেকে ফিরে তার এই দোতালার ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। সইদা পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত মাহমুদের সুগঠিত তীক্ষ্ণ নাসায় নিজের ওড়নার একটি প্রান্ত ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। পালিয়েছে বটে কিন্তু রেখে গেছে প্রথম এবং অস্পষ্ট দর্শনের আবেগভরা অনুভূতি, অনুসন্ধিৎসা। যুবজনোচিত আগ্রহের সংগে তাই সে, জানালার ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে নবীনা অভিসারিকার সন্ধানে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয়। আহা, কি অপূর্ব লাবণ্যভরা মূর্তি। স্বচ্ছ ওড়নাটা খসে কাঁধের উপর এসে পড়েছে। গলা এবং কাঁধ ঘাড়ের উপরের গোলাপী অংশের অত্যুজ্জ্বলতার চাঁদের মতো মুখের বাহার। কোঁকড়ানো চুলের রাশি মুখের সুষমাকে হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। রাঙা ঠোঁটে হাসির দুরন্ত রেখা আর মায়াময় চোখদুটি উপর তলার দিকে সন্ধানী হয়ে আছে। মাহমুদও যুবক। হাসি-ঠাট্টার মর্ম সেও যে না বোঝে তা নয়। কিন্তু এ যেন কেমন কেমন ঠেকছে না। খাটের কাছে সরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আবার সে একটা সিগারেট ধরায়।

'আজ তাহলে বাছাধনকে বেশ চক্করে ফেলে দিয়ে এসেছিস বল।' ওদিক থেকে হাসির শব্দ মাহমুদের কানে আসে। সে উৎকর্ণ হয়, ব্যাপারটা ক্রমেই তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে আসে। পাশের বাড়ির পেশকার সাহেবের কন্যাটিও তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে সইদার সহযোগিনী। ওরা একসঙ্গে পড়ে।

উঠে গিয়ে সে আবার তার নজরটাকে আলসের ছিদ্রপথে চালিয়ে দেয়। ভক্তের সন্ধানে খোদাও যখন গ্রেফতার হতে বাধ্য তখন মাহমুদ কোন ছার। সে তার সহপাঠিনীকে খুব গর্বের সংগে তখন বলে চলেছে, 'ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেই নি মিয়াকে। নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি দিয়ে ঢুক করে পালিয়ে এসেছি। হঠাৎ কী ঘটল তা নিয়ে বেচারা এতক্ষণে নির্ঘাত মহা সমস্যায় পড়ে গেছে।'

'ছেলেদের ঠিক ওইভাবে জব্দ করা উচিত। দেখিস না সবসময় কী রকম আমাদের পেছনে লাগে, এমনভাবে চেয়ে থাকবে যেন আস্ত গিলে খেতে চায়।'—পেশকার কন্যা হবিবা সোৎসাহে মন্তব্য করে।

'আসলে আমরাও লাই দিয়ে ওদের মাথায় তুলেছি। এতবড় ওদের দুঃসাহস যে বোরখার আড়ালে আমাদের মুখগুলো কত সুন্দর হতে পারে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে—পায়ের চটি দেখে মুখের আদল বুঝতে চায়। একদিন ওদের আচ্ছাসে জব্দ করে দিতে পারলে আবার ভবিষ্যতে আমাদের জ্বালিয়ে মারে বাছাধনেরা।' সে যাই হোক, তুই কিন্তু আজ বেজায় মতে করেছিস। সবাইকে ছেড়ে একেবারে বাড়িওয়ালার ছেলেকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়েছিস।'—ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটিয়ে হবিবা বলে।

'ছোটরা বাড় থেকেই তো সব কিছু শেখে।'

'তুই তাহলে ছোট্ট খুকীটিই আছিস এখনো?'

'তা নয়ত কি, এই দেখনা দুধের দাঁত এখনো পড়ে নি। মুখের শোকেসে রাখা মোতির দানাগুলিকে বের করে সইদা তার সখীকে দেখায়।'

'আহা-হা, ঢং দেখে মরে যাই! আজ বিয়ে দিলে কালই খোকার মা হবেন তাঁর আবার খুকী হবার সাধ। হবিবার সোহাগের ধাক্কায় হাসতে হাসতে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে সইদা বলে—' যাই বলিস, আজ যে একটা মস্ত বড় কাজ করেছি তা তোকে মানতেই হবে।

'সত্যিই বড় কাজ হতো যদি তুই বড়টিকে ওই রকম করতে পারতিস।'

বড়টিকে করতে আমার দায় ঠেকেছে। গোমড়া মুখ দেখলে পিত্তি চটে যায়। বড় মসজিদের মোল্লাকে চাঁদা আদায়ের ভার দিলে তাঁর মুখখানা যেমন তোলা হাঁড়ি হয়, ঠিক তেমনি। ও লোকটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি—'

'চোখ ফুটেছে তাহলে তোর?'

'তা ফুটেছে বৈকি। তবে বড়টির ওপর যে তোর নজর পড়েছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।—তুই স্বীকার না করলেও কিছু এসে যায় না।'

'নজর পড়েছে না হাতী! আমি তোর মতো অমন ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াই না। পাশাপাশি এতদিন আছি, অহরহ দেখছি কিন্তু মনে কোনদিন একটু দাগ পড়ে নি। আর তুই তো দু'দিন ভাড়া এসেই তিনদিনের দিন পেছনে লেগে গেছিস!' হবিবা তাকে চটিয়ে দেবার জন্য বলে।

'মনে মনে ছটফট করে মরছিস আর মুখে বড় বড়াই!'

'দ্যাখ, বাজে বকিস না, থাপ্পড় খাবি কিন্তু।'

'মার না দেখি,—সুঠাম হাতখানিতে কেমন বল আছে দেখা যাক!'—গোলাপী গালটিকে সহপাঠিনীর দিকে এগিয়ে দেয় সইদা। হবিবা হাত তোলার সংগে সংগেই বিদ্যুৎগতিতে সরে গিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে পড়ে সে। তার এই ত্রস্ত গতিটা মাহমুদের বড় ভাল লাগে। যৌবনের অপর নাম চাঞ্চল্য। যৌবনে মানুষের দৃষ্টিও মনগ্রাহী হয়ে ওঠে।

দাদা অফিসে, মা ঘুমিয়েছেন আর আমিনা বেগম। জেগে নেই। তবে হ্যাঁ, সইদা জেগে আছে। অকারণে দালানে ঝাড়ু দিয়ে চলেছে সে। মাহমুদের দিকে নজর পড়তেই জিভ বের করে ভেংচি কেটে সইদা এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে থাকে, ভাবটা যেন এই যত ইচ্ছা দ্যাখো, কিন্তু এ বড় শক্ত ঘাটি, সুবিধা হবে না এখানে।

তার এই ব্যবহারে মাহমুদ বেশ খানিকটা ঘাবড়ে যায়। এমন বেহায়া মেয়ে সে ইতিপূর্বে কখনো দেখে নি। মুহূর্তের জন্য কেমন যেন এক বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে তার মন।

'বেহায়া ধিঙ্গি!' আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে সে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরায়।

'হায় আল্লা! ঠেলাগাড়ির ভেতরের মেয়েগুলি একসংগে আঁৎকে ওঠে।'

'ভাল করে ধরে বসো। গাড়ীর ব্যালেন্স বিপর্যস্ত হতে দেখে ঠেলাওয়ালা বলে। কিন্তু ওরা কবেই বা ভাল করে না ধরে বসে? গাড়ির ওই স্বল্প পরিসরে তিন তিনটে ইঁদুরের যদি যুগপৎ আক্রমণ ঘটে তাহলে নবীনা মহলে ভারসাম্য থাকা কি সম্ভব? ইঁদুর তিনটি অবশ্য সজীব নয় রুমালজাত!

কোলটার এর ঝকঝকে রাস্তা ধরে তাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছিল। ইতিমধ্যে মাহমুদ তার হস্তশিল্পজাত ইঁদুর বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালিয়েছে। গাড়ির পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে উঁকি মারতেই অঘটনের ঘটক মানুষটি সইদার নজরে পড়ে যায়।

'ওঃ আপনি তাহলে!' মনে মনে এই কথা বলে সে তার সহপাঠিনীদের লক্ষ্য করে ধমক দেয়—'তোরা আচ্ছা তো,—নাহক হুল্লোড় করায় ওস্তাদ সব!'

'এ যে দেখছি উল্টো রাজার দেশ। নিজে কাকে আঁচলে বেঁধে পিছু পিছু নিয়ে এসে এখন আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়ছেন—'

'বাজে বকিসনে। আমি আবার কাকে আনতে যাব?'—সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

'উচিত কথায় যে বন্ধু বিগড়ায় তা আর কে না জানে?

—ঠেলার পা ঘেঁসে সাইকেলে প্যাডেল মারতে মারতে চলমান মাহমুদের কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে ওঠে।

'শুনলি তো,—যাকে এনেছিস সেই আমাদের কথা প্রমাণ করে দিল।' গাড়ির অন্যান্যরা সমস্বরে বলে ওঠে। সইদার মুখ লজ্জার সংগে বিবর্ণ হয়ে যায়। দুষ্টামির প্রবণতা তার প্রকৃতিগত হলেও বদনামের ভয় তার পুরো মাত্রায় আছে। শরীর খারাপ

ভাগ্যে ভাগ্য দিদিমণি আজ সঙ্গে আসেন নি। তাহলে কী যে হতো, ভাবতেই সইদার বুক শুকিয়ে ওঠে।

মেয়েদের নিয়ে গাড়ি এসে স্কুল-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢোকে। 'কী হলো, আজ তোমাদের এত লেট কেন?'—দূর থেকেই একজন দিদিমণি ঠেলাওয়ালার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন হানেন।

'আমি কী করবো, মেমসাহেব, মেয়েরা রাস্তায় ভারি গোলমাল করছিল।' ঠেলাওয়ালা দায়িত্বমুক্ত হতে চায়।

'তোমরা গোলমাল করছিলে?'

'আমাদের কোন দোষ নেই, দিদি।'

'তবে কার দোষ?'

'সইদার।'

হ্যাঁ, ও সাইকেলে চড়িয়ে একটা ছেলেকে সঙ্গে এনেছিল। সেই ছেলেটা রুমাল দিয়ে ইঁদুর বানিয়ে আমাদের গাড়ির মধ্যে ছুঁড়তে আমরা ভয় পেয়েছিলাম।'

'এ তো বড় লজ্জার কথা সইদা। চলো, প্রিন্সিপালের কাছে চলো।' সইদা দিদিমণির পিছু পিছু চলল এবং এর পরের দৃশ্য খুবই করুণ।

নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় সইদার মন ভরে ওঠে। কেন সে ওই ছোকরার পেছনে লাগতে গেল? এখন যদি প্রিন্সিপ্যাল তাকে স্কুল থেকে বের করে দেন তবে কী হবে? বি-এ পাশ করাবেন বলে বড় আশা করে তার মা তাকে শহরে নিয়ে এসেছেন। তাঁর সেই আশাকে তার কুকর্মের দ্বারা ধূলিসাৎ করে দিতে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাঙ্গালী দিদিমণিটির কৃপায় প্রিন্সিপ্যালের রোষের হাত থেকে সে মুক্তি পেল। ক্লাসটিচার এই দিদিমণিটি তার মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই তাকে শেষ বারের মত সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হলো। শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেলেও ক্লাসে এসে সে আর মুখ উঁচু করে সহপাঠিনীদের কাছে বসতে পারল না। সবাই ফিস ফিস করে তার সম্বন্ধে আলোচনা করে চলেছে। ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় সে কাউকে মুখ দেখাতে পারছিল না। মাহমুদের ওপর থেকেই তার মনে রাগ আর বিতৃষ্ণার বন্যা বইছিল।

রিসেসে মুখ নীচু করে ক্লাস রুম থেকে সইদা বেরিয়ে এলো।

'কী খাবি?'—হবিবা তাকে জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না—'

'আচ্ছা, আমি কী করলাম বলত, যে তুই আমার ওপর রাগ করছিস। আমি ত তোদের গাড়ীতে পর্যন্ত ছিলাম না।'

'কিন্তু তোরা সবাই [illegible] দল।'

'কেন বিচার দেখছিস তো। একজন দোষ করল আর দোষী হয়ে গেলাম আমরা সবাই।'

'হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই সবার খবর জানা যায়।'

'তোর মাথাটাই আজ খারাপ হয়ে গেছে। যে চিরকাল তোর পেছনে লাগে আজও দিদিমণিকে লাগিয়েছে সে-ই। আর আমি যা বলি শোন—বদনাম হলে নামও সঙ্গে সঙ্গে হয়।'

'তোর অমন নামের কাঁথায় আগুন।'

'কেন? অমন মুখ গোমড়া না করে তোর তো হাসিমুখে পাওয়া উচিত ছিল—পয়মার কিম্বা তো ভরলা কম?'

'দ্যাখ হবিবা, মস্করা সব সময় ভাল লাগে না। মানুষের মুডের কথা খেয়াল করা উচিত।'

'ওঃ! ভারী এসেছেন আমাদের মুড-ওয়ালী! অরে পাগলী, কোনো বুদ্ধিমতী কি "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত হয় কমল তুলিতে?" —অ্যা?'

'কিন্তু আমার যে বিশ্রী লাগছে তা তোকে কী করে বোঝাবো। সকলের সামনে কী দারুণ অপমান—'

'ভালবাসার খবরটা কখনো অপমানের হতে পারে না। এ সুযোগ কেবলমাত্র সৌভাগ্যবতীদেরই হয়ে থাকে। চল, আমার সঙ্গে চল।' হবিবা তাকে টানতে টানতে লনের একধারে নিয়ে যায়।

'যা হবার হয়ে গেছে,—ওসব কথা ভুলে যা এখন।' হবিবাকে তুষ্ট করার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসতে হয় সবাইকে। মুখের হাসির তলায় মনের জ্বালা তখনও অব্যাহত। ক্লাসে ফিরে গিয়ে মুখ নীচু করে বসে থেকে বাকী সময়টা কাটিয়ে দেয় সে। স্কুলের শেষে আর সব মেয়েদের সঙ্গে ঠেলায় বসে সেও তার বাড়ীর দিকে যাত্রা করল, মাহমুদ ছোকরা আবার এসে বেফাঁস কিছু একটা না করে বসে এই ভয় সারা পথ জুড়ে তাকে পেয়ে বসেছিলো।

যাই হোক, পথে তেমন কিছু আর ঘটল না। খোদার নাম স্মরণ করতে করতে সইদা শেষ পর্যন্ত তার বাড়ীর সামনে এসে পড়ল। তারপর ঠেলা থেকে লাফিয়ে পড়েই বোরখার সামনের দিকটা এক হাতে সাপটে তুলে ধরে পড়ি-কি-মরি করে ত্রস্তপদে এগিয়ে চলল সে।

'গোলাম আপনারই প্রতীক্ষায় কাল যাপন করছে।'—সিঁড়ির মুখে অপেক্ষমাণ মাহমুদ নাটকীয় ভঙ্গীতে কথাটা সইদাকে লক্ষ্য করে প্রয়োগ করে। রাগে সারা শরীর মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে যায় সইদার।

'চটাস!' সরু সরু আঙ্গুলগুলিকে আলগা করে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দেয় সে অপ্রস্তুত মাহমুদের গালে। আহত মাহমুদের মুখের অমন হলুদ রঙ সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠে গেল।

আর ঠিক এই অবসরে মাবিকা বিবি নামাজ পড়তে অগ্রসর হন।

আঘাতটা খুবই গুরুতর হয়েছিল। ডান গালটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছিল আর মাহমুদকে সেটার ওপর রুমাল চাপা দিয়ে সন্তর্পণে ঘোরা ফেরা করতে হচ্ছিল।

সেদিন ছিল রবিবার। শমীম আরা বেগম দালানে বসে সীমুই বানাচ্ছিলেন। মাহমুদ সেই সময় ওপর থেকে নীচে নেমে এলো—

'তোমার গালে কী হয়েছে বাবা?'—আমিনা বেগম জিজ্ঞেস করলেন। মায়ের প্রশ্ন শুনে সইদার বুকে দুরু দুরু করে উঠল। অবশেষে ছোঁড়াটা সত্যি কথা না বলে বসে! অপর পক্ষ থেকে কী উত্তর আসে তারই অপেক্ষায় উদ্বেগের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তকে গুণে চলে সে। মাহমুদ কিন্তু মৃদু হেসে বলে—

'ছুঁচোয় কামড়েছে মাসিমা।'

'তা ছুঁচো তোমার গালের ওপর উঠল কী করে?'

'আপনি তো গালের কথা বলছেন, পারলে ওরা মাথায় চড়ে নাচে।'

'তুমি কেমন মরদ তা খোদাই জানেন,—একটা ঝটকা পর্যন্ত দেওয়া গেলনা।—'

'কী বলব মাসিমা, তখন আমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম'— মাহমুদ হেসে জবাব দেয়। নজর কিন্তু তার দালানের ওদিককার পর্দার দিকে ন্যস্ত।

'কী আস্পর্ধা দ্যাখো, আমায় কিনা ছুঁচো বানিয়ে ছাড়লো।—কিন্তু তুমি নিজে কী জবাব?'—কথাগুলি সইদার জিভের ডগায় এসেও আটকে গেল। আমিনা বেগম বললেন—'সে যাই হোক, ওটা এমনি ফেলে রেখো না—গরম জলের সেঁক দিয়ে দাও, চট্ করে ভাল হয়ে যাবে।'

'কে অত ঝামেলা পোহায়।'

'ঝামেলা তো কিছু নেই এর মধ্যে। এখানে এসে আমার দিকে পিঠ করে বসো, সইদা এক্ষুণি গিয়ে জল গরম করে আনছে,—বরিক তুলো দিয়ে এক নিমিষের মধ্যে সেঁকে দিচ্ছি।'

'তাতে আমার আপত্তি নেই।' এই কথা বলে সে এসে তাঁর সামনে পিঠ রেখে বসে পড়ে। আহা! পিছন দিকে তার যদি দুটো চোখ থাকতো তাহলে সইদার বুকের উত্থান-পতনের দৃশ্যটা সে প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারতো এ-সময়।

'সইদা মা, যাওতো, চট করে একটু জল গরম করে নিয়ে এসো।

'যাই মা।'

'ওকে আমার কষ্ট দিচ্ছেন কেন, সামনেই পরীক্ষা, পড়াশুনো করছে বোধ হয়।'

এমন কিছু কাজ নয় যে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, পড়াশুনোর কথা ওঠায় মনে পড়ল। আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হিন্দী আর ইংরেজী নিয়ে সইদা আমার বড় অসুবিধায় পড়েছে—বাকীটা বলতে গিয়েও জামিলা বেগম থেমে গেলেন।

'হ্যাঁ মাহমুদ! তোমার দাদার তো অফিসের কাজের জন্য এক-দণ্ডও সময় নেই,—তুমিই সইদা মাকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও।'

শমীম আরা বেগম তাঁর অপূর্ণ কথার মাঝেই প্রস্তাব দিলেন।

'পর্দার ব্যাপারটা চিন্তা করেছেন আপনারা?'

'এক সংগে থেকে পর্দা রাখা চলে না, আর উচিতও নয়।' ভালমন্দ সব কিছুই মানুষের মনের জিনিষ। পর্দা দিয়ে ওর কোনটাকেই ঢাকা যায় না।'

'যা বলেছেন দিদি!'

ঠিক সেই মুহূর্তে গরম জলের ডেকচিটা এনে সইদা তার মায়ের সামনে নামিয়ে রাখল।

আমার বাক্স থেকে একটু তুলো নিয়ে আয়তো মা, অত লজ্জা কিসের রে? এবার থেকে মাহমুদই তো তোকে পড়াবে।'—হাসি মুখে জামিলা বেগম সইদাকে বলেন।

'মেয়ের আমার ভারি লজ্জা। স্কুলে গিয়েও ওর ওই সলজ্জ ভাবটা কাটলো না।'

মাহমুদ কী একটা বলতে যাবে এমন সময় সইদা তুলো নিয়ে ফিরে আসায় সেটা আর বলা হলো না।

'এই নাও।'

'সব সময় ঘোড়ার পিঠে জিন দিয়ে থাকলে হবে না। এদিকে এসো, কাপড়ের একটা দিক তুমি ধরো, তা না হলে আমি এক হাতে নিংড়াবো কী করে?'

'এ আপনার ভারি অন্যায়। ওইটুকু মেয়ে, ও-কি এসব কাজ পারে। দিন, আমি ধরছি,'—শমীম আরা বেগম তাঁর কাজ ফেলে উঠে আসার উদ্যোগ করেন।

এমন কিছু পাথর ভাঙা কাজ নয়। এখন থেকে এসব কাজে হাত না লাগালে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে গালাগাল খেতে হবে।'

শ্বশুরবাড়ীর প্রসংগে কুমারী সইদা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—মাথাটা আপনি নীচু হয়ে আসে লজ্জায়।

রে পড়বে কেন দিদি? শমীম আরা সোহাগ প্রকাশ করেন।

একই বাড়ীর বাসিন্দা এই দুটি পরিবারের মধ্যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আত্মীয়তার একটা গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে যেন।

'হ্যাঁ, এই তুলোটা একটুখানি গালের ওপর চেপে ধরে থাকো যাতে কিছুক্ষণ অন্তত হাওয়া না লাগে।'—জামিলা বেগম মাহমুদকে বললেন।

দেখেছিস মাহমুদ, মেয়েটাকে তুই কী কষ্টই না দিলি। আগুনের আঁচে, ওর মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে।—দেখেছিস,'

'কই দেখি।' বলে মাহমুদ তার মুখটা ঘোরাতেই সইদা তার ওড়নার আঁচলটা কোন মতে সামলে নিয়ে ভোঁ দৌড়।

'আচ্ছা, জ্ঞানগম্যি কি তোর কোন দিনই হবে না? এই শুনেছিস-নে, মাহমুদের কাছে আজ থেকে তোকে পড়তে হবে আর ওমুখ ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড় দিলি? ওসব লাজলজ্জা শিকেয় তুলে রেখে বই পত্র নিয়ে এসে আজই মাহমুদের কাছে পড়তে বসবি কিন্তু।'

'আহা, পড়বে এখন। অত জোরজার তাড়াহুড়োর কী আছে?'

শুভ কাজে দেরি করতে নেই। বাবা মাহমুদ, বিসমিল্লা করে দাও আজ থেকেই আর এই নাও মিষ্টি মুখ করার জন্য—পার্স থেকে দশ টাকার একখানি নোট এগিয়ে দিয়ে জামিলা বেগম বলেন।

'ও কী করছেন দিদি?' শমীম আরা বাধা দিতে চান।

'আপনি এর মধ্যে নাক গলাচ্ছেন কেন? আমার ছেলে, ওকে আমি যা ইচ্ছে দিতে পারি'—মাহমুদও অম্লান বদনে নোটখানি জামিলা বেগমের হাত থেকে নিয়ে পকেটস্থ করে।

গরমকালের অসহ্য দুপুরগুলি নিঃসন্দেহে দীর্ঘ। তবে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা এখানে সত্যই উপভোগ্য।

রাত্তিরের খাওয়াও শেষ হলো আর ঘড়িতেও ন'টা বাজল। উঠানের একদিকে গিয়ে সইদা তার বইপত্র খুলে বসল। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে শমীম আরা এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। হামিদ উপর তলায় শোয়। বাড়ী তাই নিস্তব্ধ নিঝুম। সকলে যাতে শুয়ে পড়ে, তারই জন্য মাহমুদ আজ একটু দেরী করেই ফিরল। বাড়ীতে ঢুকেই আস্তে আস্তে সইদার তক্তাপোষটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। তার বসবার জন্য একখানি চেয়ার আগেই এনে রাখা হয়েছিল। চেয়ারে বসে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে চাপা গলায় সে বলল—'ভদ্র ঘরের রীতি অনুসারে পাঠ আরম্ভের আগে গুরুকে প্রণাম করার প্রথাটা বোধ হয় তোমার জানা নেই?'

'আজ্ঞে না, আমার বেশ ভালভাবেই জানা আছে।'

'তবে আমায় প্রণাম করলে না কেন?'

'করলাম না এই জন্য যে আমি আপনাকে গুরু বলে স্বীকার করি না।'

'কিন্তু আমি তো আসলে তোমার গুরুই।'

'তা আমার মনে হয় না—আমার গুরু আপনি হতেই পারেন না।'

'কেন?'

'কারণ আপনি নির্বোধ।'

'নির্বোধ?'

'আর তুমি কী?'

'আপনি যা দেখছেন তা-ই।'

অর্থাৎ ছুঁচো - মাহমুদের এই কথায় সইদার ভ্রূ-ভঙ্গীতে পরিবর্তন এলো।

'আবার আপনি আমায় ছুঁচো বললেন?'

'যে মানুষ দেখলেই কামড়াতে আসে তাকে ভাল আর কী বলা যায়?'

'আপনি চলে যান, আমি পড়বো না।'

'পড়তে তোমাকে হবেই।'

'দেখেছেন এটা?' থাপ্পড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সুন্দর একখানি হাত শাসানোর ভঙ্গীতে সে তুলে দেখায়। মাহমুদ একটু ঘাবড়ে যায় এবং প্রসংগ পরিবর্তন করে বলে—

'ওসব বাজে কথা বাদ দিয়ে—বই খোল।'

'বেশ, একটা কবিতার দুটি ছত্রের অর্থ আগে আপনি করে দিন'—

এই কথা বলে গালিবের দুটি ছত্র সে গড়গড় করে আবৃত্তি করে যায়।

'এর মানে তো খুবই সোজা।'

'ওই সোজা মানেটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি আমার কাছে পড়বে না আমার পরীক্ষা নেবে?'

'আপনার বিদ্যার দৌড় কতদূর না জানা পর্যন্ত আপনার কাছে পড়ি কি করে?'

তোমার কার্যকলাপ একেবারে পাগলীদের মতো।'

'আর আপনাকেও উন্মাদ বলে মনে হয়।'

'তোমাকে দেখে উন্মাদ না হয়ে কারো উপায় আছে?'

—মাহমুদের এই কথায় সইদা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। মুখে কোন কথা যোগায় না, তার হাতের কাছে যে দু-একখানা বই ছিল তাই তুলে সে ছুঁড়ে মারে।

জামিলা বেগম এবং শমীম আরার ঘুম ভেঙে যায়।

'কী হলো—?'

'কিছু না, বিড়াল লাফিয়ে পড়ল—এই কথা বলতে বলতে মাহমুদ উপরে চলে গেল। আর সইদা তার বইপত্র গোছানোয় মনোনিবেশ করল।

খোদা মহব্বৎ এবং মহব্বতই খোদা।

সুতরাং প্রেমের সার্বজনীনতাকে কে অস্বীকার করতে পারে? প্রেমই যে মানবমনের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ তা না মেনে উপায় নেই। ভালবাসার টান না থাকলে বিশ্বের বৈচিত্র্য বিবর্ণ হতো। ভালবাসার কারণেই শূন্য ঘর আনন্দময় হয়ে ওঠে—জীবন ভরে ওঠে হাসি-খুশী, আবেগে উৎসাহে।

মাহমুদ এবং সইদার খুন-সুটিতে ওদের মায়েরাও কৌতুক অনুভব করতেন। কিন্তু যেহেতু আসল কথা কখনো গোপন থাকে না, বিশেষত বর্ষীয়সী মহিলাদের কাছে, সেই হেতু ওদের দু-জনের মধ্যকার প্রেমের প্রবণতা সহজেই জামিলা বেগম এবং শামীম আবার কাছেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

মাহমুদের মা একদিন সাহস করে সইদার মাকে বললেন, 'আমাদের ছেলে-মেয়েদের ভাবগতিক দেখে, দিদি, আমার তো মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় সত্যি সত্যিই এক পরিবারের লোক হতে চলেছি।'

আমারও তাই মনে হচ্ছে। আল্লা বোধহয় সেইজন্যই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

অর্থপূর্ণ হাসিতে বর্ষীয়সী দুই মহিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বসন্ত-বর্ষা কবে চলে গেছে। শীতের আমেজ এসেছে আবহাওয়ায়। সইদা উঠোনে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল। তার এবং মাহমুদের মা কাছেই কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে গেছেন। মাহমুদও বাড়ি নেই। হামিদ অবশ্য উপরে তার নিজের ঘরে রয়েছে।

হামিদ মিতভাষী এবং চিন্তাশীল মানুষ। বয়সে সে চল্লিশের কোঠাকে অতিক্রম করে এসেছে। চুলে পাকও ধরেছে। মুখে পড়েছে পরিণত বয়সের ছাপ। চোখের দৃষ্টিতে এসেছে স্থিরতা।

ভাইকে নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই, ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আজও সে বিয়ে করে নি। বিয়ে-থা করে সংসারী হ'লে হয়ত বা মাহমুদের পড়াশুনার ব্যাপারে গাফিলতি আসতে পারত। মনটা উদাস হ'লে, একাকিত্বের কষ্টকে লাঘব করার জন্য সে মাঝে মাঝে দু'-এক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করে থাকে অথবা গল্প লেখার চেষ্টা করে।

কিন্তু আজ কেন জানি না, কোন কিছুই তার মনের চঞ্চলতাকে শান্ত করতে পারল না। সইদার কোমর পর্যন্ত দোলায়িত এলো-চুলের রাশি তার মানসিক ভাবের আকাশে ঘনমেঘের আকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জানালা বন্ধ করে কেদারার কোলে নিজেকে সঁপে দেয় সে। সিগারেট ধরায় একটা। ধোঁয়ার আবরণে শূন্যতাকে ভরে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু জানি না, সইদাকে নিকট থেকে দেখার নেশা কেন আজ তাকে পেয়ে বসেছে! সইদা আজ দীর্ঘদিন হলো এ বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এতদিনে একবারের জন্যও ভাল করে তাকে দু'চোখ ভরে দেখে নেবার ফুরসতও হয় নি।

আয় কম, খরচ বেশি। তাই উদয়াস্ত খাটতে হয় তাকে। রাত্তিরে ফেরার পর আর কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহও থাকে না তার। মাহমুদের সুখসুবিধার কোন ত্রুটি যাতে না হয় তারই জন্য সে এই রকম গাধার খাটুনি খেটে যায়। আদরের ভাইটিকে সে যেমন করে হোক বিলেতে পড়তে পাঠাবেই। কিন্তু সুন্দরী নারীর আকর্ষণ সব কিছুকে ওলটপালট করে দেয়। সবসময় না হলেও কোন কোন সময় তো বটেই। আর মানুষের জীবনে দুর্বলতম মুহূর্তও একাধিকবার আসতে পারে। সইদা একটু বাঁকাভাবে দাঁড়িয়েছিল। ঝুঁকে পড়ে চুল শুকোচ্ছিল সে। রোদের সোনালী রেখা এসে পড়েছে তার চাঁদের মতো মুখে। হামিদের মনে পড়ে যায় 'জিগরে'র দুটি ছত্রঃ—

দূর জাকর দেখতে, নজদিক আকর দেখতে,
হামসে তো সাফ তা তো হাম
তুমকো বরাবর দেখতে।

অজানা এক আকর্ষণের টানে সে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের জানালা খুলে নীচের দিকে চেয়ে দেখে। বাড়িতে আর কেউ নেই। হামিদ কেমন যেন আত্মহারা হয়ে ওঠে। তার দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বিদ্যুতের ধারা বয়ে যায়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে একতলার দিকে নামতে থাকে সে। তার পায়ের শব্দে সইদা চমকে ওঠে। মাত্র সালোয়ার আর জামা ছিল তার পরণে। ওড়নাটা খাটের ওপর পড়েছিল। চক্ষের নিমিষে ওড়নাটাকে তুলে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখে—

—'হামিদ ভাই'—নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে যায়। পা টিপে টিপে তার কাছে একমাত্র মাহমুদই তো আসতে পারে! বাড়ি নির্জন, মাহমুদ হলে এক্ষেত্রে অনেক কথাই তার সঙ্গে হতো।

'আমি আসায় তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম, আপনিও বোধহয় সবার মতো বাইরে গেছেন—'

'বাইরে কোথাও যেতে আমি একেবারেই উৎসাহ বোধ করি না।'

'ও!'—বিব্রত হয়ে দ্রুতপদে সইদা গিয়ে তার নিজের ঘরে ঢোকে।

হামিদের সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠল। লজ্জায় মাথাটা আপনা থেকেই নেমে এলো তার। নিজের ঘরে ফিরে এসে আরাম-কেদারাটার গা এলিয়ে দেয় সে। জীবনে এই প্রথমবার তার পা দু'টি টলে উঠেছে। এমন কেন হলো?—এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর সে তার মনের দিক থেকে খুঁজে পায় না। সইদার মা যদি তার এই বেচালের কথা জানতে পারেন তাহলে কী ভাববেন?

তার নিজের গর্ভধারিণীর সম্মানটাই বা থাকবে কোথায়? মাহমুদের কানে গেলে সে নিশ্চয় বলবে—'নিজের বয়সের কথাটাও দাদা একবার ভেবে দেখল না!' বাড়ির লোকেদের সামনে কী করে সে মুখ দেখাবে?. সুন্দরী নারী সে ইতিপূর্বেও অনেক দেখেছে। অফিসে, রেস্তরাঁয়, পথে, সর্বত্র। তবে বাড়ীতে, নিজের ঘরের এত সান্নিধ্যে সইদার মতো নবযৌবনের আবির্ভাব এই প্রথম। তাই দিনে দিনে, ধীরে ধীরে মেয়েটির অনন্য রূপ তার মনের গভীরে ছাপ রেখেছে। ক্রমে কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে একাকিত্বের অনুভূতি তাকে পেয়ে বসতে থাকে। এইভাবে নিজের অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে তাদের বাড়ির নবাগতটি তার মনের অবচেতনে কিছু আশা, কতকগুলি আকাঙ্ক্ষার সুপ্তিকে আস্তে আস্তে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তার আজকের এই অভিসারকে কোনক্রমেই আকস্মিক বলা চলে না। তাই সে আজ গিয়ে সইদাকে বলতে চেয়েছে—'আমি তোমায় ভাল বেসে ফেলেছি।' কার্যকালে কিন্তু মুখ দিয়ে ওই ধরণের একটি কথাও বেরোয় নি। কোনো মতে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে সে। রবিবারের ছুটির দিন। অফিস নেই। সারাদিন চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে রইল সে। মা বাইরে থেকে ফিরতেই সে বলল—'ওই ভাড়াটেদের বাড়ি খালি করে দিতে বলে দিও মা!'

'কী বললি?'

'বলছি যে বাড়িতে আর কতকাল ভাড়াটে থাকবে?'

'কিন্তু ওরা থাকায় তোর এমন কী ক্ষতি হচ্ছে।

'না হলেও লাভই বা কী?'

'লাভ নেই?—কিছু না হলেও ট্যাক্সের টাকাটা তো আসছে।'

'কিন্তু খোদার কৃপায় কিছুই যখন আটকাচ্ছে না তখন ট্যাক্সের জন্যও আটকাবে না।'

'দুটি মেয়ে ছেলেকে না হক ঘর ছাড়া করাটা কি ঠিক হবে?'

'সে যাই হোক, আমি চাইনা যে ওরা থাকুক।'

'এ তোর বড় অন্যায় বাপু!'

'হোক অন্যায়!'

'কিন্তু হঠাৎ এ মতলব তোর মাথায় এলো কেন?'

'এমনিতেই।'

'তবু সব জিনিষেরই একটা কারণ থাকে।'

'অনেক কিছুরই কোন কারণ থাকে না।'

'অবস্থায় তো মজা হয় মা!'

'আমার মজে হয়।'

'তাই যদি হয় তা হলে ওকথা তুই-ই মুখেই দিয়ে বলো।'

'কেন?'

'অমন কথা আমার মুখে দিয়ে বেরুবে না।'

'বেশ, তবে আমি নিজেই বলব।'

এবং সে দৃঢ়সংকল্প হয়েই সইদাদের দরজার দিকে চলল। জামিলা বেগম শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং সইদা বইপত্র ছড়িয়ে পাটিগণিতের একটা অঙ্ক মেলাবার চেষ্টায় ছিল। হামিদকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে সে তার ওড়নাটা সামলে নিল।

'এসো বাবা হামিদ—' সইদার মা তাকে স্বাগত জানালেন।

'এমনিতেই আপনাদের এখানে এলাম একটু।'

'বেশ তো বেশ তো, এলেই যখন, তখন দণ্ডদণ্ড বসে যাও।'

একটা টুল এগিয়ে দিয়ে জামিলা বেগম বললেন, হামিদের এই আকস্মিক আবির্ভাবটা সইদার কাছে ভাল মনে হলো না।

'অঙ্কটা মিলছে তোর?'

'না।' আস্তে করে উত্তর দিল সে।

'তবে হামিদ ভাইয়ের কাছে দেখিয়ে নে না।'

'কী অঙ্ক দেখি?'

'এখন থাক—ও কিসে যাবেখন।'

'কিন্তু দেখিয়ে নিতে দোষ কি মা?'

'এখন আর ভাল লাগছে না।' সইদা এড়িয়ে যেতে চায়। তার দৃষ্টিতে হামিদ হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। 'থাক না মাসিমা, মন ভাল না থাকলে জবরদস্তি করা ঠিক নয়।'—একটা পান মুখে দিতে দিতে হামিদ মন্তব্য করে।

'কিন্তু এরকম করলে চলবে কেন—সামনেই পরীক্ষা।'

'সময় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আজ যে অঙ্ক মিলল না তা কি কাল এমনিতেই মিলে যাবে?'

'চেষ্টায় কি-না হয়' বলতে বলতে হামিদ উঠে দাঁড়ায়।'

'বলে কিনা, চেষ্টায় কী না হয়'—ভ্রূ বাঁকিয়ে সইদা তার দিকে বক্রকুটিল দৃষ্টি হেনে শোবার তোড়জোড় লেগে গেল।

হামিদের মধ্যে অনেক গুণই অনুপস্থিত। তাকে দেখে মেয়েদের মনে আগ্রহের ভাব উদ্দীপিত হয় না। তার চাহনিও ভাবপূর্ণ নয়। চুলে পাক ধরেছে। আর কথাবার্তায় চাল-চলনে চটুলতার বদলে এসেছে পরিণত বয়সের ছাপ। সুতরাং সইদা তার ঘরে গিয়ে বিরক্তি করতে থাকে—

'ভারি এসেছেন আমার সঙ্গে কথা বলতে!— লজ্জাও করে না!' যৌবন মানুষকে খানিকটা অন্ধও করে দেয় বটে। নতুবা চল্লিশোর্ধ হামিদের মধ্যেও আকর্ষণীয় বস্তুর অভাব নেই। তার দেহের গঠনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সুচনা বর্তমান। তার কার্যকলাপে উচ্চস্তরের মানবতা বোধের প্রকাশ যে-কোন অনুভূতিপ্রবণ মনকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

কিন্তু সইদা যে মাহমুদের ভালবাসায় অন্ধ। অন্য কারো দিকে চেয়ে দেখার মতো তার অবসর কই?

মেঘের আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি চলছে। পশ্চিমদিকের ছাদের একপ্রান্তে শুয়ে শুয়ে সইদা আধুনিক গানের একটি কলি গুণগুনোচ্ছিল। 'তুমি যে এমন সুকণ্ঠী গায়িকা তা আজ আমি এই প্রথম জানলাম।'

'কী!'—হামিদকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বিব্রত বোধ করে।

'এভাবে আসা আমার পক্ষে ঠিক হয় নি কিন্তু তোমার গানের যাদু আমাকে এখানে টেনে এনেছে।'

সইদা তার এই কথার জবাব দেয় না।

'তুমি সাপুড়েদের দেখেছ নিশ্চয়। ওদের বাঁশির সুরে সাপের মতো জীবও যখন নেচে উঠতে পারে তখন গান শুনে আমার মতো জীব যে মুগ্ধ হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?'

'কিন্তু আপনার এই স্তাবকতা আমাকে আদৌ খুশী করতে পারলো না!'—হামিদের খোশামোদ আর সহ্য হয় না তার।

'কেন?'

'তা বলা আমার পক্ষে মুস্কিল।'

'এখন ছোট আছো তাই সব বোঝ না, বড় হলে সব বুঝতে পারবে।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি বড় হলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়!'

—তাক করে তীর ছুঁড়ে তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচের নেমে যায় সে।

সইদা আজ বড্ড রেগে গেছে। এর আগে হামিদ যেদিন তার সঙ্গে আলাপ জমাবার আশায় তার কাছে এসেছিল সেদিন সে রুষ্ট হলেও ভেবেছিল—হামিদ ভাই কখনো অতখানি নীচ হতে পারে না।' কিন্তু আজ তার ভুল ভেঙেছে। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে সে নীচের দিকে ছুটে চলেছে—হঠাৎ কার সঙ্গে যেন সজোরে ধাক্কা লেগে যায়।

'মেয়েরা সত্যি সত্যি আজকাল মাথায় চড়তে আরম্ভ করেছে। দিনদুপুরে পুরুষ মানুষকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলেছে—'

'সরে যান। সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।' মাহমুদকে আবিষ্কার করে রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে। ওদের ভাইয়ে ভাইয়ে মিলের কথাটা হঠাৎ মনে এসে না গেলে সে তার কাছে হামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন অবশ্যই করত। কিন্তু ছিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনার কথাটা মনে হওয়ায় সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—

'সরুন পথ ছাড়ুন।'

'কিন্তু মহাশয়া কোন্ পর্বতশৃঙ্গ অভিযানে ছুটেছেন তা জানতে না পারা পর্যন্ত তো কিছু করা যাচ্ছে না। আমাদের সরকার চীনের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষার আপনাকে ভারতীয় নারীসমাজের নেত্রী নির্বাচিত করেছেন?'

'দেখুন, সব সময় ঠাট্টা-তামাশা ভাল লাগে না।'

'কিন্তু বলুন দেখি, আপনারা মেয়েরা মূর্তিমতী তামাশা ছাড়া আর কী?' গতকালই আপনাদের একটা মিছিল বেরিয়েছিল, চলমান সেই তামাশা দেখার জন্য শহরের পুরুষমহলে সে কী ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি!'

'কেন বের করবো না? আমরা কি আপনাদের মুখাপেক্ষী?'

'আলবৎ। আমাদের সাহায্য ছাড়া একপাও চলার ক্ষমতা তোমাদের নেই।'

'আমরা হলাম ইস্পাত—খাঁটি ইস্পাত!—এখন বাজে কথা ছেড়ে সরে দাঁড়ান তো।'

'তোমরা যে মূর্তিমতী তামাশা একথা স্বীকার না করা পর্যন্ত সরে আমি দাঁড়াচ্ছি না। শীতকালের রাতে সবাই যখন ঘুমুচ্ছে তখন যারা এক জায়গায় জড় হলেই স্থান-কাল-পাত্র ভুলে শুরু করে দেয়—'শুনেছেন দিদি, অমুকের মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে!—রহিমনের ঠাকুমার দিদিমা রক্ষিতা ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি' তারা সমাজের তামাশা নয়ত কী?'

মাহমুদকে মেয়েদের পরচর্চার প্রসঙ্গকে নকল করতে দেখে সইদার হাসি পেয়ে যায়।

'মাফ করবেন, আমি আপনার ওইসব খাণ্ডার মহিলাদের দলের লোক নই।'

'তবে তুমি কোন্ দলের লোক?'

'কী বলব আপনাকে—'

'বলতেই হবে।'

'বলব না।'

'না বললে ছাড়বোও না।'

'দেখুন আমাকে ওরকম বিরক্ত করবেন না বলে দিচ্ছি।'

'বেশ করবো। কী করবে তুমি?'

'চেঁচিয়ে সারা বাড়ী মাথায় তুলব।'

'তবে তো ভালই হবে। চারদিক থেকে লোকজন সব ছুটে আসবে মজা দেখতে।'

'এ তো মহা মুস্কিলে পড়া গেল। এখন কী করলে আপনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি বলুন ত?'

'এ অবস্থায় পরিত্রাণ পাবার কোনো প্রশ্নই তো উঠতে পারে না—শোন নি, সেদিন তোমার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের কী কথা হয়— —

'—সহর্ষা মাহমুদের,

মাহমুদ সইদার!'

সইদার দেহমন আবেশে জর্জর হলো। অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটি ভাষাই স্বতোৎসারিত হতে চাইলো—'আহা, তাই হোক!' দীঘলচোখ দুটি তার মুহূর্তের মধ্যে মায়াময় হয়ে উঠল। মাহমুদের মুখের পানে চেয়ে দেখল সে। তারও চোখে মুখে আবেগের ভাব, আবেশের ভাষা। দুজনেরই অজানিতে এক সময় ওরা পরস্পরের হাত দুটিকে নিজের নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নেয়।

'সইদা!'

'মাহমুদ!!'

দুটি অস্ফুট—ধ্বনি বায়ুমণ্ডলকে তরঙ্গায়িত করে অসীমে মিলিয়ে যায়।

'এ আমার কী রোগে ধরল। দায়িত্বশীল লোক আমি। প্রেমের খেলায় মেতে ওঠা আমার সাজে না।'

—সইদার ভাবনাকে মন থেকে দূর ক'রে দিয়ে স্বস্তিতে একটু ঘুমোবার চেষ্টায় হামিদ এপাশ-ওপাশ করে চলে। কিন্তু বৃথাই তার এ চেষ্টা। উদ্বেগ ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

প্রথম প্রথম মা যখন তার বিয়ের কথা তুলতেন তখন সে প্রসঙ্গটাকে নানাভাবে পাশ কাটিয়ে যেত।

'আমাদের মাহমুদের বিয়ে হবে। তাহলেই যথেষ্ট।'

'আর তুই চিরকুমার থাকবি?'

'তাতেই বা ক্ষতি কি আম্মাজান। তোমার বৌ চাই তো? সে তো মাহমুদ আনলেই হবে।'

'কিন্তু আমি যে তোর বউকে দেখবো রে।'

মায়ের এই মমতাময় কথায় কোন জবাব সে দিতো না। ছেলের বয়স অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে দেখে প্রতিবেশিনীদের পরামর্শ অনুসারে মা একদিন তাকে জোর করে চেপে ধরতে সে বলল—

'বিয়ে করতে আমার ভয় হয়।'

'কেন?'

'কারণ বৌয়ের ভালমন্দের ওপর সংসারের শান্তি-অশান্তি নির্ভর করে। বিয়ের পরে শাশুড়ী-বৌয়ের ঝগড়া শুরু হলেই তো সর্বনাশ। সেক্ষেত্রে আমিই যে আজকে থেকে বদলে যাবো না তা-ই বা বলি কী করে?'

কথাগুলো খুবই সত্য। শমীম আরা বেগমেরও মনে লেগেছিল। তিনি সেদিন আর অগ্রসর হন নি। এই কারণেও সইদার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার প্রসঙ্গ এখন আর মায়ের কাছে ওঠান যায় না, তার ওপর আবার মাহমুদকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। স্বল্পালোকিত নির্জন ঘরে নিজের যৌবন-কালের ধূলোমাখা ছবিটার দিকে চেয়ে উদাস-উন্মন হামিদ গালে হাত দিয়ে বসে আছে। সুঠাম তেজী চেহারা। সুন্দর মুখ, চোখভরা দুষ্টামি! হামিদের চোখে জল এসে যায়। পাশেই আয়না। সেদিকে চেয়ে নিজের আপাদ-মস্তক ভাল করে একবার দেখে নেয় সে। চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখের চমক আর নেই। হতাশায় যেন ভেঙে আসে মন। খাটের কোলে গা এলিয়ে দেয় সে।

ধীর পদক্ষেপে রাত্রি এগিয়ে আসে। তারারা ঝিকিয়ে ওঠে আকাশে। চাঁদ দিগন্তের কোলে ঢলে পড়ে। ঘুম নেই তার চোখে। সারাদিনে আজ তার চোখের পাতা পড়ে নি।

প্রভাতের প্রতিহার মোরগেরা ডাক ছাড়ে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে মসজিদ থেকে রব ওঠে—'আল্লা হো আকবর!' আড়মোড়া ভেঙে বারান্দায় বেরিয়ে আসে হামিদ। তার মা এবং জামিলা বেগম। ঝি এসে উনানে আগুন দিয়েছে। মাহমুদ এখনো বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে।

হামিদ নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। ধীরে ধীরে নীচের নেমে এলো।

সইদার নমাজ পড়া তখন শেষ হয়েছে। সমানে খক্ খক্ করে কেসে চলেছে সে।

'বারবার বলছি ওষুধ খা, তবু তুই আমার কথা কানে নিবি না।'

'খাবোখন!' চোরা চাউনী দিয়ে হামিদের দিকে চেয়ে সইদা আস্তে করে জবাব দেয়। ইদানীং এই মিয়া সাহেবটি যে প্রায়ই চুপি-সাড়ে সময় নেই অসময় নেই তার সামনে আবির্ভূত হন, এই ঘটনাটা সে লক্ষ্য করেছে। একবার কথা প্রসঙ্গে মাহমুদকে এ-সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে সে প্রয়াসও পেয়েছিল।

'আপনার দাদার মধ্যে ইদানীং কিছুটা চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে।'

'তোমার রূপের গুণে বোধহয়।'

'আপনি তো আমার পিছনে লাগার জন্য সব সময় মুখিয়ে আছেন। দোহাই আপনার ওভাবে পিছনে লাগবেন না।'

'তবে কীভাবে লাগব?'

এইভাবে দাদার প্রসঙ্গটাকে ভাইটি সেদিন মোটেই আমল দেয় নি। মাহমুদের সঙ্গে সইদার কথাবার্তা, রস-রসিকতা সবই পড়ানোর অজুহাতে বাড়িতেই একপ্রস্থ হয়ে থাকে। আজকাল আর শুধু বাড়ির সীমিত সুযোগে পোষাচ্ছে না। তাই প্রায়ই কোনো-না কোন কারণ দেখিয়ে বেশীক্ষণ বাইরে থাকার ব্যবস্থা সইদা করে নেয়। ফলে বাইরে মেলামেশার সুযোগটা ওরা পেয়েছে।

আজও ওইরকমের একটা প্রোগ্রাম ওদের আছে। সইদা তার মাকে বলল,—

'আম্মা, চীনের সঙ্গে যে লড়াই হচ্ছে তাতে আমাদের, মেয়েদেরও ডাক পড়েছে।'

'তোবা করো মা! তেমন দিন আল্লা যেন না আনেন।'

'তুমি দেখছি ভয় পেয়ে গেলে! লেডিজ পার্কে মেয়েদের একটা মিটিং আছে। আমাকে সেখানে যেতেই হবে।'

'যেতে হলে যাবে! কিন্তু ফিরবে কখন?'

'সব কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা হবে।'

'মিটিং-এ সবাই যেতে পারে?'

'সবার জন্য হলে তো আমি তোমাকেও নিয়ে যেতাম। মিটিংটা হচ্ছে কেবল স্কুলের মেয়েদের জন্য।'

'তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করো।' মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে জামিলা বেগমের অগাধ আস্থা। বেশি গভীরতার মধ্যে যাবার মতো ধুরন্ধর মহিলা তিনি নন। আর তা হ'লেও তিনি যাবেনই বা কেন? তবে হ্যাঁ, মেয়েটির মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হামিদ ঠিক আঁচ করেছে—

ব্যাপার কিছুটা যেন গোলমেলে।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

অনুবাদক—মোস্তফা বিশ্বনাথ

লেখা

সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কতই পাতা ভরিয়ে দিলাম লিখে;
আমার একটি দিনের অবচেতন মনে
ছড়িয়ে তাহা গেল দিকে দিকে।

পাও যদি গো খুঁজে কভু কেহ,
তাহার মাঝে লাগবে যাহা ভালো;
চলার পথে ক্ষণিক থেমে
কুড়িয়ে তাহা নিও।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[দেশবরেণ্য সঙ্গীতনায়ক]

পশ্চিম বাঙলার নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত এবং ললিতকলার সামগ্রিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব অবদান আছে, এমন গুণী ব্যক্তিকে পশ্চিম বাঙলার অ্যাকাডেমী অফ ড্রামা, মিউজিক এ্যাণ্ড ফাইন আর্টস্ প্রতি বছর অ্যাকাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রসিক-সমাজের আনন্দবর্ধন করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম এই সম্মান যাঁর উদ্দেশে এগিয়ে দেওয়া হল—সঙ্গীতের উন্নয়নের ইতিহাসে তাঁর কালজয়ী সাধনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁর দুশ্চর সাধনা ভাবীকালের সুর-সাধকদের যাত্রাপত্রের এক প্রধান প্রেরণা। এই বয়োবৃদ্ধ মনীষার নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অভাবনীয় অবদান দেশবিশ্রুত। এ-পরিবারের নতুন করে পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। এ-বংশের এক একটি সন্তান সঙ্গীত-জগতের এক-একজন দিকপালরূপে ভারতজোড়া প্রসিদ্ধির অধিকারী। এই পরিবারের ঐতিহ্য এবং গৌরব যাঁদের সাধনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই তালিকায় একটি স্মরণীয় নাম।

স্বনামধন্য সঙ্গীতবিদ্ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ও সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ সঙ্গীত রত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৮৬ সালে। বর্তমানে তাঁর বয়েস তিরাশী চলছে। শৈশবেই বাবা-মাকে হারান সুরেন্দ্রনাথ। অগ্রজ স্বনামপ্রসিদ্ধ রাম-

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বাল্যকালেই সঙ্গীতের দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেল। যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় সঙ্গীতেই পাঠ নিতে থাকেন সুরেন্দ্রনাথ। নাড়াজোলের মহারাজার সভাগায়ক ছিলেন সেদিন রামপ্রসন্ন। নাড়াজোল দরবারে প্রথম প্রকাশ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সুরেন্দ্রনাথ। বয়স তখন ষোলও পুরো হয় নি। সুরবাহারে এই কিশোর-গুণীর আলাপ শুনে মুগ্ধ হয়ে নাড়াজোলরাজ তাঁর নিজের সুরবাহারটি উপহার দিয়ে গুণীর উৎসাহবর্ধন করে আপন গুণগ্রাহীমনের পরিচয় দিলেন।

বর্ধমানরাজের সভাগায়ক থাকাকালে অগ্রজ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন সুরেন্দ্রনাথ। এই সময়ে তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল এবং সেই সঙ্গে সুরবাহার, সেতার-ইত্যাদি আয়ত্তে আনতে থাকেন।

কুড়ি বছর বয়সে কলকাতায় এলেন সুরেন্দ্রনাথ। অন্যতম সভাগায়ক হলেন পঁচাত্তর বছর বয়স্ক স্মরণীয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। দু' বছর পর ১৯০৮ সালে সাতাত্তর বছর বয়সে দেশপূজ্য গুণগ্রাহী ও স্বয়ং গুণী মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের লোকান্তরের পর বাইশ বছরের তরুণ সুরেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ত্রিশ বছরকাল এই আসন তিনি সগৌরবে অলঙ্কৃত করে এসেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এঁর সঙ্গীত-প্রতিভাবে যথেষ্ট পরিমাণ সমাদর ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। এঁর অনবদ্য প্রতিভা সম্বন্ধে কবিগুরুর আস্থা ছিল অতুলনীয়।

সুরেন্দ্রনাথের নিকট গান শিক্ষা করেছেন এ-ধরণের একটি তালিকায় বহু উল্লেখযোগ্য নাম মিলবে—যেমন অমলা দাস, সাহানা দেবী, মালতী ঘোষাল, ডঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ। আরো দুটি বরেণ্য নাম এই তালিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। সে দুটি নাম লেডী অবলা বসু এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

বর্তমানে বিষ্ণুপুরের রামশরণ মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষের আসনটি তাঁর অধিকারভুক্ত।

শ্রীআশুতোষ ন্যায়াচার্য

[নব্যন্যায়চর্চার ইতিহাসে একালের মহানায়ক]

নব্যন্যায়ের উৎপত্তি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। মৈথিলী পণ্ডিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ রচনা করে প্রথম পত্তন করেন। বাংলার সুসন্তান বাসুদেব সার্বভৌম (শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক) উপাধ্যায় সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করে তৎপরে বাংলা দেশে এর চর্চার সূত্রপাত করলেন। সার্বভৌম মহাশয়ের শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি 'তত্ত্বচিন্তামণি' কণ্ঠস্থ করে এনেছিলেন আগে কিশোর বয়সে 'পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'। পক্ষধর বা জয়দেব মিশ্র ছিলেন মিথিলার দিগ্বিজয়ী ন্যায়শাস্ত্রবিদ। তাঁকে পরাজয় করে রঘুনাথ ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িকরূপে খ্যাত হলেন। অর্থাৎ 'বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকট পরি।'

নব্যন্যায়ের চর্চার যে ভোগবতী এতকাল প্রবহমাণ ছিল, বর্তমানে তা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শৈবালদামে রুদ্ধস্রোতা—অতি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত এই শীণধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টায় যে কয়জন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত নিমগ্ন আছেন; তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রীআশুতোষ ন্যায়াচার্য।

ভারতের পরম পুণ্যতীর্থ---শাশ্বত সনাতন সভ্যতা ও মর্মবাণীর প্রাণকেন্দ্র শিবলোক বারাণসীতে তাঁর জন্ম ১৩০৯ সালে। অর্থাৎ সেই বছরে আজ তাঁর বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

বারো বছর বয়সে কলকাতায় পাণিনি এবং বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ হল। গুজরাটি নাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রণবীর দত্তশাস্ত্রীর কাছে বেদ পড়েছেন আশুতোষ। জনশ্রুতি শোনা যায় যে, এই নাগর ব্রাহ্মণরা আসলে গ্রীক কুলোদ্ভব। জন্মস্থান কাশীতে ন্যায় অধ্যয়ন করলেন। এ বিষয়ে তাঁর দিশারী হলেন কাশী সংস্কৃত মহা-

শ্রীআশুতোষ ন্যায়াচার্য
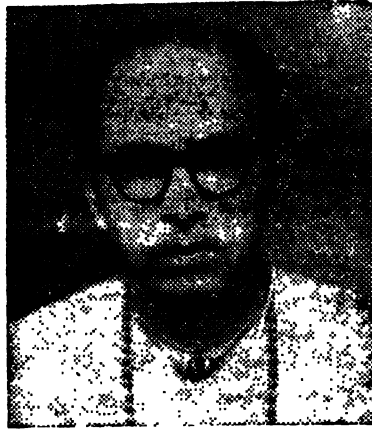
বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য।

কর্মজীবন সুরু হল ১৯৩১ সালে। কর্মক্ষেত্র হল বোম্বাই। সেখানকার গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের আসনে ঐ সময় থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অধিরূঢ় ছিলেন। দেওঘর বালানন্দ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন ১৯৪৫ থেকে '৪৬ পর্যন্ত। তারপর ১৯৫৩ পর্যন্ত ছিলেন কলকাতার দয়াল আশ্রমের ন্যায় বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৫৪ সালে নবদ্বীপের সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এ আসনে তাঁর স্থিতি ঘটে ছিল ১৯৬৫ পর্যন্ত। ১৯৬৭ সালে কলকাতার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর (মহাচার্য) বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন।

প্রখর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার অধিকারী শ্রদ্ধেয় সুধিবর ন্যায়াচার্য মহাশয়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে চক্ষুষপ্রাপ্যকারিত্বম, সৎসন্ধতত্ত্ববিমর্ষ, জৈনদর্শনে বৈদিকদর্শন সাম্যম, অদ্বৈত, পাকপরিণামবাদ (সাংখ্য বৈশেষিকের পরমাণুতত্ত্বের আলোচনা) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র বাঙলা দেশে 'ন্যায়াচার্য'-এর সংখ্যা আজ বোধহয় মাত্র তিনে এসে ঠেকেছে। ভারতেও এর সংখ্যা মুষ্টিমেয় অথচ নব্যন্যায়ের চর্চা ও অনুশীলনে এ দেশের খ্যাতিগৌরব ও প্রসিদ্ধি দেশকালের সীমা একদিন অতিক্রম করেছিল।

সেই অবলুপ্ত গৌরবের শেষ সাক্ষ্য হিসাবে আজও যাঁরা আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন এবং যাঁদের দুর্লভ সাধনা নবন্যায়ের একদা স্রোতস্বিনী অধুনা ক্ষীয়মাণ ধারাটিকেও বাঁচিয়ে রেখেছে আশুতোষ ন্যায়াচার্য তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম। তাঁর মত দিকপাল গুণী যত অধিক দিন আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকেন ততই জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মঙ্গল।

ডাঃ মণি ছেত্রী

[প্রখ্যাত চিকিৎসক]

বাঙলা দেশের চিকিৎসা-জগতে আজ যে দিকপালদের কল্যাণে, কর্মে এবং সাধনায় বহুল উন্নতি এবং অগ্রগতি ঘটে চলেছে, তাঁদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য নাম ডাঃ মণি ছেত্রী। বাঙলার প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক এবং ব্যাধিবিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটি পুরোভাগের আসন তাঁর জন্যে আজ সসম্মানে সংরক্ষিত। দেশের সমাজ-জীবনে যে অনন্য সেবা-পরায়ণতার পরিচয় তিনি দিয়ে চলেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

বাঙলা দেশে তিন পুরুষের বসবাস। আদিবাস উত্তর প্রদেশে। পিতামহ কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন। পেশায় তিনিও ছিলেন একজন চিকিৎসক। বাবা স্বর্গত পদমলাল সিং ছেত্রী ছিলেন চা-বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত। ১৯২০ সালের ২৩শে মে তিস্তা ভ্যালী টি এস্টেটে তাঁর জন্ম।

দার্জিলিং মিউনিসিপ্যাল স্কুল এবং মিশনারী স্কুলের পর সরকারী প্রধান বিদ্যালয়। সমগ্র জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে জেলা স্কলারশিপ লাভ করলেন। গণিতশাস্ত্র এবং মেকানিকসে একশোর মধ্যে তিনি একশোই পেয়েছিলেন। সেন্ট পলস কলেজের ছাত্র হিসাবে পদার্থ এবং রসায়নে নিলেন ডিস্টিংশন।

ছ' বছরের নির্ধারিত সময়সীমায় ডাক্তারী পড়ার সময় প্রতি বাৎসরিক পরীক্ষায় তাঁর স্থান থাকত প্রথম দশ জনের মধ্যে এবং প্রতি বছরই তিনি স্কলারশিপ পেয়েছেন। চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্র হিসাবে সর্বসমেত মোট বারোটি স্বর্ণ পদক তিনি লাভ করেছেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ভারতীয়দের মধ্যে সেদিন চিকিৎসা বিদ্যায় সর্বপ্রথম অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ মণি দে। ডাঃ দে'র অধীনেও তিনি চিকিৎসা বিদ্যা সম্যকভাবে অনুশীলন করতে থাকেন এবং এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত শিক্ষালাভ করেন। এবং

ডক্টর মণি ছেত্রী

এ-সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণায় লিপ্ত হন। ১৯৪৮ সালে থিসিস পেশ করলেন। ১৯৪৯ সালে এম-ডি উপাধি তাঁর অধিকারে এল। ঐ বছরই চিঠি লিখলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। অনুরোধ জানালেন মেডিক্যাল কলেজে রেসিডেণ্ট্যাল ফিজিসিয়ানসের পদ প্রবর্তনের। ১৯৫০ সালে যোগ দিলেন 'শিশু নিবাস'-এ আর, এম, ও হিসাবে। পরের বছর রেসিডেণ্ট্যাল ফিজিসিয়ান হলেন দু'বছরের জন্য। ১৯৫৩ সালে ঐ পদেই যোগ দিলেন নবনির্মিত বাঙ্গুর হাসপাতালে।

কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ক্যানাডা পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু ক্যানাডায় তিনি যান নি। কেন্দ্রীয় সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে গেলেন যুক্তরাজ্যে ১৯৫৪ সালে। পরের বছর হলেন এম-আর-সি-পি। তার পরের বছর ফিরে এলেন ভারতবর্ষে।

১৯৫৭ সালে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে আর-এম-ও হলেন। ১৯৫৮ সালে কারনানী হাসপাতালে (অতীতের পি-জি হাসপাতাল) যোগ দিলেন ডাঃ ছেত্রী। চিকিৎসা-বিভাগের তিনি প্রধান এবং অধ্যাপক-পরিচালক।

মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক-মণ্ডলীর তিনি একজন সদস্য। এ্যামেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির তিনি একজন সদস্য।

১৯৫৬ সালে শ্রীমতী বীণা ছেত্রীর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

[বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী, সুদক্ষ প্রশাসক]

'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম
মদায়ত্তং তু চারিত্রম্'

মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত ঈষৎ পরিবর্তিত কর্ণের ওই বাক্য এ-কালের যে জীবন-পথিকরা জীবনের পথপরিক্রমণের মূলমন্ত্র হিসাবে অবলম্বন করেছেন—বিদগ্ধ সাহিত্যসেবী ও সুদক্ষ প্রশাসক ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য তাঁদেরই একজন।

কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, কি কর্মক্ষেত্রে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যে অভাবনীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় তিনি দিয়েছেন এককথায় তা অতুলনীয়।

শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত সুরানন্দ নামক পল্লীতে এক নিষ্ঠাবান সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবারে তাঁর জন্ম তিনি মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। ১৩২৩
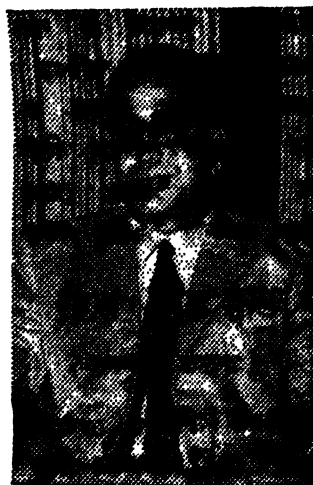
ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সালের ১৬ই ফাল্গুন (১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী) তাঁর জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালা থেকে বৃত্তি নিয়ে মৌলবীবাজার সরকারী হাইস্কুলে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে প্রথম শ্রেণী স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করলেন ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৫ সালে শ্রীহট্টে মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আই-এ ও ১৯৩৭ সালে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স এব রাজনীতি ও অর্থনীতি আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে স্নাতক হলেন। দুই পরীক্ষাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনি প্রথম হলেন। এই যুগ্ম কৃতিত্ব ঐ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর আগে বা পরে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। আই-এতে প্রথম শ্রেণীর

বৃত্তি ছাড়াও ডাফ স্কলারশিপ ইত্যাদি পান। বি-এতে দুখিনি স্কলারশিপ ইত্যাদি পান। ১৯৩৯ সালে ইণ্ডিয়ান অডিট ও এ্যাকাউণ্টস সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়ে সংস্কৃতে সর্বোচ্চ সংখ্যা পান। ১৯৪০ সালে আই, সি, এস পরীক্ষায় ইংরাজী রচনা, সাধারণ জ্ঞান ও-মনস্তত্ত্বে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। কিন্তু দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য চাকুরি পেলেন না। ঐ বছরেই দর্শনে প্রথম শ্রেণীর প্রথম—পরবর্তী স্থানটি অধিকার করে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ ও ১৯৪৭ সালে তাঁকে যথাক্রমে সৈন্যবাহিনীর গেজেটেড অফিসারের ও আই, সি, এস-এর চাকুরি দেওয়ার প্রস্তাব হয়। প্রথমটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং দ্বিতীয়টির প্রকল্প বানচাল হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালে আই-এ-এস এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ আসে এবং তিনি তা গ্রহণ করেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত সেণ্ট পল্‌স কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ডঃ ভট্টাচার্য। ঐ মধ্যবর্তী সময়ে তিনি গ্রিফিথ প্রাইজ, মোয়াট মেডেল, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ এবং ডি-লিট্‌ উপাধি-লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি দ্বিতীয়বার গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। আই-এ-এস-এ যোগদানের আগে যদি তিনি ডি-লিট্‌ প্রাপ্তির সংবাদ পেতেন তা হলে হয়তো তিনি কাজে যোগ দিতেন না।

কর্ম-জীবনে বহু সম্মানসূচক ও গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁর অধিকারে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ শরণার্থী পুনর্বাসন অধিকারের মুখ্য আধিকারিক, অর্থ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় শ্রম-মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গের পশু পালন ও মৎস্য দপ্তরের সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশানের প্রথম চেয়ারম্যান, কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান, দুর্গাপুর পরিবহন বোর্ডের কর্ণধার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্ণধার (শেষোক্ত তিনটি সংস্থার তিনিই সর্বপ্রথম একক অধ্যক্ষ) প্রভৃতি আসনগুলিতে সমাসীন থেকে দায়িত্বভার সগৌরবে তিনি পালন করেছেন। মোটর কর্মীদের আইন বিধির খসড়া রচনা, চা ও খনির মজুরদের নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক অধিকাংশ আইন-বিধির সংস্কারে হস্তক্ষেপ, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে জমার হার ৬¼কে ৮-এ পরিবর্তিত ও প্রিমিয়ামহীন বীমা পরিকল্পনা (পৃথিবীর অন্য কোন দেশে যা নেই) প্রবর্তন, স্বল্প-বিত্ত নাগরিকদের দুগ্ধ বিতরণের জন্য মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গবাদি উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা তাঁর কর্ম-জীবনের এক-একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়েই রত্নাকর নাটক ও রূপদীপালি কাব্য প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে এ দেহ মন্দির, স্বপ্ন-সংহার, সুরা ও সাকী (ওমর খৈয়াম), রামফড়িং এর ছড়া (শিশু সাহিত্য), পরমদূত (অনুবাদ), Logic, Value of Reality Casuality in Science and reality (যন্ত্রস্থ), কবি কালিদাসের নাটক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৩ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ আসে কিন্তু সে আহ্বানে তিনি সাড়া দিতে পারেন নি।

বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবী তাঁর সহধর্মিণী। তাঁদের একমাত্র সন্তান বৈজয়ন্তী বর্তমানে এম-এ পাঠরতা।

শান্তশীল দাশ

কাছের মানুষ তুমি, কত না কাছের;
রোজ আস, রোজ যাও, দেখি চেয়ে চেয়ে।
দেখি রোজ ওই মুখ, শুনি কত কথা—
তুমি আস, তুমি রোজ দেখা দিয়ে যাও।

কত না কাছের তুমি, কত না কাছের;
তবু কেন মনে হয় মাঝে মাঝে, তুমি
অনেক দূরের লোক, অনেক অনেক :
তোমাকে চিনি না আমি, তোমাকে চিনি না।
দেখলাম ওই মুখ আজকে নতুন,
দেখিনিক কোনদিন, আর কোনদিন!

তোমাকে তো রোজ দেখি, তবুও কেন যে
এমন অচেনা লাগে তোমাকে বুঝি না!
রোজ দেখি, রোজ আস, রোজ কথা শুনি,
তবু কী নতুন তুমি, কত না নতুন।

বৈশাখ মাসের
॥ ফলাফল ॥

Praise be to Allah,
the Lord of creation,
The merciful,
the compassionate
Ruler of the Day of
Judgment
Help us, lead us in the
path.

—*Mahomet, Koran,* 1.

ভৃগু-আচার্য

অনন্ত দুঃখ ও কষ্ট পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে আমাদের অন্তরে, অনেক আশা-আকাঙক্ষা ব্যর্থ হয়েছে বাস্তবের নির্মম নিষ্ঠুর কশাঘাতে, আমরা কাউকে শান্তি দিতে পারি নি নিজেরাও পাই নি। হিংসা দ্বেষ ও অহমিকা-জর্জর দেহ ও মনে ক্রোধকেই আশ্রয় করে আত্ম-প্রবঞ্চনায় মগ্ন হয়েছি।

অতীতের দিনগুলো ভুলে নববর্ষকে আমরা জানাব স্বাগত প্রার্থনা। নববর্ষের আগমনীতে আমরা করব বৈদিক শান্তি পাঠ—

'ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বি নাবধীত-মস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি:॥'

(পরমব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন ও উভয়কে সমভাবে বিদ্যাফল প্রদান করুন; আমরা যেন সমভাবে (বিদ্যালাভের) সামর্থ্য অর্জন করতে পারি; আমাদের উভয়ের বিদ্যা সফল হোক; আমরা যেন পরস্পরের বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।)

হে পরমব্রহ্ম আমাদের নববর্ষ শান্তিময় হয়ে উঠলে আমরাও শান্তিময় হয়ে উঠব। প্রতি মানবের অন্তরে ভ্রাতৃত্বের মিলন-গীতি উচ্চকিত হয়ে উঠুক—কেনোপনিষদের এই শান্তি পাঠ সার্থক সুন্দর হয়ে বিশ্বমৈত্রীর দ্বার পবিত্র থেকে পবিত্রতম করে তুলুক।

সত্যই জীবন, সত্যই ধর্ম। বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোও তাঁর 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থে বলেছেন—

'গড ইজ ট্রুথ এ্যাণ্ড লাইট হিজ স্যাডোজ।'

এই সত্যই আমাদের বন্দনীয় হয়ে উঠুক।

আমরাই ত' নববর্ষ। আমাদের মধ্যেই ত' নববর্ষের বিকাশ। আসুন, সম্মিলিতভাবে আমরা প্রার্থনা করি সর্ববিধ ভেদাভেদ ভুলে একনিবিষ্ট চিত্তে, সর্বশেষে।

এবার কুম্ভরাশি ও মেষ লগ্ন থেকে নতুন বর্ষের প্রভাতোদয় হলো। এই নতুন বর্ষের জন্মকুণ্ডলীতে রবি, বুধ ও শনি অশ্বিনী নক্ষত্রে, বৃহস্পতি ও কেতু উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, মঙ্গল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে এবং রাহু ও শুক্র উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে অবস্থান করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ মাঝে মাঝে অস্বচ্ছ হয়ে উঠবে কিন্তু সবিশেষ ক্ষতি হবে না কেন না সে ক্ষেত্রে সিংহিকা পুত্র কেতু অবস্থান করছেন—বৃহস্পতিসহ। যদিও বৃহস্পতি দুঃখিত তথাপি কেতু ও বৃহস্পতি এ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাকারক ও শক্তি-মান। অষ্টমে মঙ্গল থাকায় এবং ১৩ই বৈশাখের পর বক্রী হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাষ বুঝায়। স্থানে স্থানে বিদ্রোহ, হত্যাকাণ্ড, পুলিশের উপর অত্যাচার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্নভাবে দোষা-রোপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইংরাজী ১৯৬৯ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে ১লা বৈশাখ আরম্ভ হয়েছে।

গ্রহাদির সঞ্চার

৩রা বৈশাখ দং৩৪।৫৬ পলে বুধ ভরণী নক্ষত্রে, ৬ই ২৯।২৬ পলে শীঘ্র বুধ পশ্চিম দিকে উদিত হবেন এবং ১১ই ৪৯।৫৭ পলে বুধ ৩ কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাবেন। ১২ই বৈশাখ ২২।১৫ পলে শুক্র বক্রত্যাগ করবেন। ১৩ই বৈশাখ ৪৮।৭ পলে মঙ্গল বক্রী হবেন। ১৪ই বৈশাখ ৭।১৩ পলে বুধ বৃষরাশিতে অবস্থান করবেন। ২২শে বৈশাখ ২৬।১২ পলে বুধ রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান করবেন। ২৫শে বৈশাখ ৪০।১৭ পলে শনি পূর্বদিকে উদিত হবেন। ২৮শে বৈশাখ ৩৭।৪০ পলে শুক্র ২৭ রেবতী নক্ষত্রে অবস্থান করবেন

অতঃ অশান্তি ত' থাকবেই কিন্তু এই অশান্তিকে দমন করতে হবে আত্মশক্তির বলে। এই রাশির অধিপতি দেব-সেনাপতি কুমার মঙ্গল। আত্মবিশ্বাস—

ছাই শুধু অদম্য আত্মবিশ্বাস। এই মাসে যতই বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হোক আত্মবিশ্বাসের বলেই তা বহুলাংশে খণ্ডিত হবে। স্বাস্থ্য ৩রা বৈশাখের পর সবিশেষ শুভ যাবে না। উদরসংক্রান্ত পীড়াদির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ৩রা থেকে ১৪ই বৈশাখ অবধি দিনগুলোতে আহারে-বিহারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। আর্থিক যোগাযোগ মন্দ যাবে না। শিল্পপতি ও কারখানা মালিকদের ব্যবসায় ১০ই থেকে ১৮ই বৈশাখ অবধি ভাল যাবে না। চিত্রতারকা, ডাক্তার ও সম্পাদকদের আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ৭ই থেকে ১৮ই বৈশাখের মধ্যে পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধু ও আত্মীয় স্থান এ মাসে বড় বিশেষ শুভসূচক নয়। অর্থকড়ির ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। কনিষ্ঠ পুত্রের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয় ১০ই থেকে ২৪শে বৈশাখের মধ্যে। শত্রুরা যতই ক্ষতি করতে চেষ্টা করুক না কেন, সফলকাম হতে পারবে না। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। নিশ্চিত বিবাহের যোগাযোগ অতি তুচ্ছ কারণে বাতিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের আশা কম। প্রাপ্য টাকা আদায় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ মাসে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। মেষলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা, ভ্রাতাদের কুটিল ব্যবহার, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে গোলযোগ ও পত্নীর অশোভন ব্যবহার ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ১৪ই থেকে ২২শে বৈশাখের মধ্যে কর্মাদি বিষয়ে কোনরূপ নিশ্চিত মতামত প্রদান করা উচিত নয়।

বৃষঃ সাংসারিক ঝামেলা একের পর একএসে উপস্থিত হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা পরিবেশের অবসান ঘটে নি। আর্থিক চিন্তায় মন বিব্রত। সাংসারিক জীবন দুঃসহ হয়ে উঠছে। গুপ্তশত্রুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কর্তব্যে দৃঢ় ও অনড় থাকা বাকসংযমতার বলেই উক্ত অসুবিধাগুলো দূরীভূত করতে পারবেন। স্বাস্থ্য ৮ই থেকে ১৪ই বৈশাখ অবধি সুখকর নয় বৃষরাশির শনির সাড়ে সাতি সুরু হলো বলে ভয়ের আদৌ কারণ নেই. শনি ভ্রমণভাবে আড়াই বছর, মিত্র গৃহে (উদার ও আশ্রিতবৎসল গুরু শুক্রাচার্যের) শুক্র গৃহে বৃষে আড়াই বছর এবং মিথুনে আড়াই বছর (মিত্র গৃহে)—এভাবে সাড়ে সাতি বিচারে

বৃষ রাশির সবিশেষ ক্ষতি না হয়ে বরং উন্নতিই হবে। দূর ভ্রমণ, প্রতিষ্ঠালাভ এবং গৃহাদি স্থাপনাদি উক্ত সময়ের মধ্যেই হবে অনেকের। মেষ থেকে মকর রাশির দশম গৃহ দৃষ্টিসম্পন্ন, বৃষ থেকে মকর ও কুম্ভ—নবম ও দশম (কুম্ভ দৃষ্টিসম্পন্ন) এবং মিথুন থেকে কুম্ভ নবম গৃহ শনি দেবের। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত বিচারে বৃষ রাশির উক্ত সাড়ে সাতি উন্নতিসূচক। অবশ্য কোষ্ঠির অন্যান্য গ্রহবল বিচার্য আর্থিকস্থল ধীরে ধীরে শুভ হয়ে দেখা দিবে ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয় - বন্ধুদের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে অশুভকর বলে মনে হবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও সাংবাদিকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। ৫ই থেকে ৭ই বৈশাখের মধ্যে পত্নীর ব্যবহার আশ্চর্যজনকভাবে অশোভন বলে মনে হবে। বৃষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে এ মাস আদৌ শুভসূচক নয়। নিশ্চিত বিবাহের যোগ্‌ ভঙ্গ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১১ই বৈশাখের পর বৃষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের সময়টা একটু ভালর দিকে যাবে। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। পত্নীর যানবাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন।

মিথুন : আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পবিত্র হয়ে উঠবে মন কখনো, কখনো মন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে চাইবে মান প্রতিষ্ঠা এবং যশের দিকে। চিন্তাগুলো স্নেহাই দিচ্ছে না যেন কোনক্রমেই। সাংসারিক চিন্তা রয়েছে তদুপরি। আত্মীয়-স্বজনদের ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ। স্বার্থপরতার বীজ ছড়িয়ে রেখেছে। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিও চলছে এ অবস্থায় ধর্মই আপনার প্রথম ও প্রধান অস্ত্র। স্বাস্থ্য ৮ই থেকে ১৪ই বৈশাখ অবধি ভাল যাবে না। আহার-বিহারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। অর্থস্থান মোটামুটি বলা যায়। বিশেষ কোন কাজে কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করতে হতে পারে। ১০ই থেকে ১৮ই বৈশাখের মধ্যে হঠাৎ কোন শুভ-সংবাদে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে। চিত্রশিল্পী, চিত্রতারকা, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের এ মাসে আয়ের পথ বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ভ্রাতাদের বা ভ্রাতৃস্থানীয়দের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে নানাবিধভাবে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাথে গোলযোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য শুভসূচক নয়। ৫ই থেকে ৮ই বৈশাখের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতা বা পিতৃস্থানীয়দের কারো না-কারো হঠাৎ রোগ ভোগ যোগ দৃষ্ট হয়। মিথুন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রের ঝঞ্ঝাট অনেকটা কমে আসবে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। আর্থিক বিষয়ে মন প্রায় ক্ষেত্রেই চঞ্চল থাকবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কেউ না-কেউ কোন না কোন শ্বেতকায় বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। ১২ই থেকে ২০শে বৈশাখের মধ্যে হঠাৎ আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট: মন চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্রমোত্তর। সংসারের আবহাওয়াও শুভসূচক নয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম লাভে ব্যাঘাত ঘটাবে। স্ত্রীর ব্যবহার মাঝে মাঝেই অশোভন বলে মনে হবে সংসারের অধিকাংশ দায়িত্ব ধীরে ধীরে এসে পড়বে। এ অবস্থায় শান্তভাবেই কর্ম করে যাওয়া উচিত। স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভ যাবে না। শ্লেষ্মা ও উদর সংক্রান্ত ব্যাপারে কষ্ট ভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ১৪ই থেকে ১৮ই বৈশাখ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। আর্থিক ব্যাপারে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃ: হয়। ব্যবসামূলক ব্যাপারে ভবিষ্যতে আর্থিক উন্নতি হবে এই আশায় অর্থব্যয় করা সমীচীন নয়। কোন বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। মানসিক উন্নতিকল্পে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতৃপক্ষ থেকে বিষয়-সম্পত্তি ব্যাপারে মানসিক অশান্তির সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ভ্রাতার দূর ভ্রমণের যোগাযোগ সফল হয়ে দেখা দিতে পারে। ২০শে থেকে ২৬শে বৈশাখের মধ্যে বহু দিনের প্রাপ্য টাকা আকস্মিকভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পঞ্চমে মঙ্গল থাকায় ফোঁড়া-পাঁচড়াদিতে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রে গুপ্তশত্রুতা বৃদ্ধি পারে। মামলা মোকদ্দমার ফল শুভসূচক। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে নৈরাশ্য যোগ দৃষ্ট হয়। অনেক দিনের পুরানো প্রেমের বিচ্ছেদে যবনিকার যোগ দৃষ্ট হয়। ধর্মোপলক্ষে গৃহে পুণ্যকর্মাদির যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রমণ যোগ দৃষ্ট হয় ১২ই থেকে ২২শে বৈশাখের মধ্যে। কর্মস্থানে সামান্য ভুলের জন্য বড় রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ই থেকে ২০শে বৈশাখের মধ্যে কোন না-কোন সৎ বন্ধুলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্কট লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্মস্থানে নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই অশুভ থাকবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মাথায় বা পায়ে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ই থেকে ১৬ই বৈশাখের মধ্যে ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়।

সিংহ: সত্যিই দুশ্চিন্তা নিয়ে চলেছেন। অষ্টমে রাহু, নবমে শনি এবং চতুর্থে মঙ্গল। স্বাভাবিক বিচারে স্বাস্থ্যের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি প্রদান না করলে বিশেষ করে আহার-বিহারে সবিশেষ যত্ন না দিলে আকস্মিকভাবে উদর সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। ১০ই থেকে ১৮ই বৈশাখ অবধি দিনগুলো বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। নবমস্থ শনি রবিযুক্ত থাকায়

হঠাৎ ভাগ্যের অবনতি ঘটবে বা গুরুতুল্য কোন ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে। ৮ই থেকে ১২ই বৈশাখের মধ্যে কর্মক্ষেত্রের ঝামেলা অনেকাংশে তিরোহিত হবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার মোটামুটি বলা চলে। আত্মীয়-স্বজনদের ব্যবহার অপ্রীতিকর বলে বোধ হবে। সাংসারিক শান্তি অনেকাংশে ব্যাঘাত হবে। পুত্র ও কন্যাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদিতে সাফল্যের সূচনা করে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। পত্নীর স্বাস্থ্যের দিকে যত্ন দেওয়া কর্তব্য। যাঁদের বহুদিন যাবৎ পুত্র ও কন্যাদি হয়নি, তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ সন্তান লাভের আশা করতে পারেন। নিশ্চিত বিবাহের যোগাযোগ যা একবার ভেঙ্গে গিয়েছে সে বিবাহের যোগাযোগ কার্যকরী হয়ে দেখা দিতে পারে। যাঁদের বছরের সীমা ৬০ থেকে ৬৫ বছরের কাছাকাছি তাঁদের নিধনস্থান (বিশেষ করে আয়ুস্থান) শুভ নয়। ১০ই থেকে ২০শে বৈশাখ অবধি দিনগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা প্রযোজন। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রমণমূলক ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। আশ্রিত কোন ব্যক্তির দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের বিভিন্ন দিকে পথ থাকলেও প্রকৃত আয় লাভের সম্ভাবনা কম। সিংহ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্মস্থান, ভাগ্যস্থান এবং আয়স্থান সবিশেষ শুভপ্রদ থাকবে না। বিবাহাদির ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা রয়েছে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কনট্রাকটর, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা : রাশিস্থ বৃহস্পতি কেতুযুক্ত হয়ে নাশস্থভাবে থাকলেও বৃহস্পতি কন্যা রাশির জাতক ও জাতিকাদের বিপদ ঝঞ্ঝাট একের পর এক দেখা দিয়েছে কিন্তু সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হয় নি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথম থেকেই লীভারের দিকে যত্ন দেওয়া কর্তব্য। নিয়মিত আহারাদি গ্রহণ করা কর্তব্য। ৬ই থেকে ১২ই বৈশাখ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। আকস্মিকভাবে পিঠে কিংবা কোমরে ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। ধনস্থানের অবস্থা সবিশেষ শুভ যাবে না। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি হবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। শত্রুভাবাপন্ন ভ্রাতার ব্যবহার স্বচ্ছ সুন্দর হয়ে দেখা দিতে পারে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ এমন কি কর্মহীনতার যোগ দৃষ্ট হয়। বিষয় সম্পত্তিমূলক পরিবেশ থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব মুক্ত রাখা সমীচীন। কোন মতামত প্রদান করা উচিত নয়। আত্মীয় ও বন্ধুস্থান মোটামুটি বলা চলে। ৮ই থেকে ১৬ই বৈশাখের মধ্যে ব্যবসায়মূলক কোন কর্মাদিতে আর্থিক লেনদেন করা

সমীচীন নয়। কোন সন্ধ্যু ... যোগ দৃষ্ট হয়। বন্ধুর সহায়তায় ছোটখাট ভ্রমণ যোগ দৃষ্ট হয়। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। কোন শত্রুর ব্যবহার মিত্ররূপে দেখা দিতে পারে। পত্নীর ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই রূঢ় ও অশোভন বলে বোধ হতে পারে। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে যতটা সম্ভব নিজেকে মুক্ত রাখাই সমীচীন। বিবাহ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা প্রথম থেকেই সুষ্ঠু সুন্দর-ভাবেই করা সমীচীন নতুবা সামান্য ত্রুটির ফলে বিবাহ যোগ ভেঙ্গে যেতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মাসের শেষের দিকে ভাল থাকবে না। পেটের অসুখ, লীভার সংক্রান্ত রোগ ও মাথাধরা ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হতে পারে ২রা থেকে ৮ই বৈশাখের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক-দের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। কনট্রাক-টারদের বড় রকমের যোগাযোগ আসার লক্ষণ রয়েছে। গৃহে ধর্মানুষ্ঠান যোগ দৃষ্ট হয়। কন্যা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। মামলা-মোকদ্দমার ফলাফল আশানুরূপ হবে না। ৮ই থেকে ১২ই বৈশাখের মধ্যে পা কিংবা মাথায় আঘাতপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে।

তুলা : বৃহস্পতিযুক্ত চন্দ্র না হওয়া অবধি তুলা রাশির মানসিক অবস্থা ভাল যাবে না। সুতরাং এ মাসেও সে কথা প্রযোজ্য। চারদিকেই পড়ে রয়েছে অনেক অসমাপ্ত কর্মাদি, গুছিয়ে আনাও কষ্টকর---এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিশ্রমের দরকার। উক্ত পরিশ্রম স্বাস্থ্যের সাথে তাল মিলিয়ে করাই প্রয়োজন। নিয়মিত আহার ও নিয়মিত শয্যা গ্রহণাদির প্রয়োজন কেন না ৬ই থেকে ১০ই বৈশাখ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। ধনস্থানে মঙ্গল এবং উক্ত মঙ্গল রাহু কর্তৃক দৃষ্ট থাকায় ধনস্থান মোটামুটিই থাকবে। নিশ্চিত ধনোপার্জনে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। ভ্রাতা ও ভগ্নীস্থান মোটামুটি। কৃষ্ণকায় কোন বন্ধুকে বিশ্বাস করা সমীচীন নয়। আর্থিক ব্যাপারে যথেষ্ট সংযমতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মন্দ যাবে না তবে ২৪শে থেকে ২৮শে বৈশাখ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। তা ছাড়া কোন আঘাতপ্রাপ্তির ফলে রক্তক্ষরণও অসম্ভব নয়। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। কোন শ্বেতকায় বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। নিশ্চিত বিবাহের যোগ ভঙ্গ হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির সামান্য ভুলের জন্য বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। প্রকাশক, সাংবাদিক, চিত্রতারকা, ডাক্তার ও সাহিত্যিকদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রে সামান্যতম ভুলের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ব্যবহার সৌজন্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আয়ের পথ ১৮ই বৈশাখ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। উপহারস্বরূপ ছোটবড় প্রাপ্তিযোগও অসম্ভব নয়। তুলা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে একের পর এক নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত পত্নীর হঠাৎ মৃত্যুযোগ আসাও অসম্ভব নয়। ব্যবসায় বাণিজ্যে ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট চলেছে একের পর এক। মানসিক অবস্থাও ভাল নয়। চারদিকেই বিক্ষিপ্ত রয়েছে কর্মের দায়িত্বগুলো। স্বাস্থ্যেরও অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। ১০ই থেকে ১৮ই বৈশাখ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় বিশেষ শুভ যাবে না। আর্থিকস্থল মোটামুটি চলবে। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগা-যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীস্থানের উপর শনির কুপিত দৃষ্টি বর্তমান থাকায় ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট হতে মানসিক অশান্তি আসা অসম্ভব নয়। আত্মীয় ও বন্ধুস্থান শুভই বলা চলে। কোন কৃষ্ণকায় বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ দৃষ্ট হয় ৮ই থেকে ১৮ই বৈশাখের মধ্যে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। পুত্রের প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। যানবাহনা-দিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। কোন স্ত্রীলোক দ্বারা অপপ্রচারের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম-প্রীতি ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য, যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই সমীচীন। ২রা থেকে ১৪ই বৈশাখের মধ্যে বিবাহাদির ব্যাপার নিয়ে পাত্রপক্ষ থেকে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পায়ে বা কোমরে হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। ১০ই থেকে ১৬ই বৈশাখের মধ্যে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভ হবে বলে আশা করা যায় আয়ের বিভিন্ন যোগাযোগ ঘটবে। প্রকাশক, চিত্রশিল্পী, ডাক্তার ও ইঞ্জিনী-য়রদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। বৃশ্চিক লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা বড় বিশেষ শুভ যাবে না অর্থপ্রাপ্তির যোগ আকস্মিকভাবে আশা করতে পারেন। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। পত্নীর ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অশোভন বলে মনে হবে পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ১০ই থেকে ১৮ই বৈশাখ অবধি শুভ যাবে না। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হবে।

ধনু : চারিদিকের পরিবেশ ক্রমে ক্রমে অস্বচ্ছ হয়ে দেখা দিচ্ছে। মনের অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই খারাপ থাকবে। পারিবারিক অবস্থা ভাল যাবে না। সাংসারিক পরিবেশটাও অনেকটা এলোমেলো। স্বাস্থ্য ৮ই বৈশাখ থেকে

১২ই বৈশাখ অবধি শুভ যাবে না। পেটের গোলযোগ, আমাশয় এবং শ্লেষ্মাজাতীয় পীড়ায় কষ্টভোগ যোগ দৃষ্ট হয়। ফোঁড়া-পাঁচড়াদিতে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। আর্থিক যোগাযোগ ১৪ই বৈশাখের পর ধীরে ধীরে শুভ হয়ে দেখা দেবে। কর্মক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। কর্ম পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের স্থান মোটামুটি বলা চলে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার চাকুরীস্থলে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ই থেকে ১৬ই বৈশাখের মধ্যে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর ব্যবহার শত্রুবৎ হয়ে দেখা দিতে পারে। পুরাতন কোন বন্ধুর সহায়তায় কোন না-কোন ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে পারেন। মাতুলস্থানীয় কোন ব্যক্তিকে ব্যবসায়মূলক কোন ব্যাপারে অর্থসাহায্য করা সমীচীন নয়। ১০ই থেকে ২০শে বৈশাখ অবধি আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ১২ই থেকে ১৮ই বৈশাখের মধ্যে আকস্মিক-ভাবে কোন না-কোন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত বা অপমানিত হতে পারেন। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। যাদের বিবাহবিষয়ক মামলা-মোকদ্দমা চলছে তাদের অনেকেরই জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সতর্ক থাকাই সমীচীন। গুপ্তপ্রেম থেকে সতর্ক থাকাই সমীচীন। বিবাহবিষয়ক ব্যাপারে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। ধর্মোপলক্ষে গৃহে পুণ্য কর্মানুষ্ঠানে অর্থব্যয়ের যোগ দৃষ্ট হয়। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, প্রকাশক ও জ্যোতির্বিদ্‌গণের আয়ের পথ পূর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। কর্মক্ষেত্রে টুকিটাকি ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হলেও ভয়ের কারণ নেই। ধনুলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্যের দিকে সবিশেষ যত্ন নেওয়া কর্তব্য। ৮ই থেকে ১৬ই বৈশাখের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ রয়েছে। পারিবারিক অবস্থা ক্রমোত্তর জটিল হয়ে দেখা দিতে পারে। ছোট-খাটো ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

মকর ঃ কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অন্যায় জুলুম প্রকাশ, পারিবারিক পরিবেশের তিক্ত আবহাওয়া, আর্থিক বিষয়ে দুশ্চিন্তা এই সমস্যাগুলো একের পর এক উপস্থিত হলেও ভয়ের কারণ নেই। নির্ভয় চিত্তে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। যতই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক না কেন, বাক্‌সংযমতাই সর্ববিধ বিপদ থেকে রক্ষা করবে। স্বাস্থ্য মোটামুটিই থাকবে তবে ২৬শে থেকে ৩০শে বৈশাখ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে সবিশেষ শুভ যাবে না। গুহ্যদেশে পীড়াদির সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক স্থল মোটামুটি। আয়ের বিভিন্ন পথের সৃষ্টি হলেও প্রকৃত অর্থোপার্জনে বাধার সৃষ্টি হবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার স্বার্থপর বলেই প্রায় ক্ষেত্রে মনে হবে। বিষয়-সম্পত্তি ব্যাপারে নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। ভূসম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়াদির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা কর্তব্য। কোন পরিচিত ব্যক্তি—সে বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তি হলেও ৪ঠা থেকে ৮ই বৈশাখ অবধি তাঁকে বিশ্বাস করা সমীচীন নয়। পুত্র ও কন্যাস্থান মোটামুটি। পুত্রের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের বিদেশ গমনের পথ অনেকটা সহজ হয়ে দেখা দিতে পারে। গুপ্তশত্রুতার সৃষ্টি হতে পারে। শত্রুরা যতই বিরুদ্ধাচরণ করুক

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

মাসিক রাশিফল

নাম------------------------------------

ঠিকানা--------------------------------

মাসিক বসুমতী

...কেন, ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ১২ই বৈশাখ থেকে ১৬ই বৈশাখ অবধি শুভ যাবে না। বিবাহবিষয়ক আলাপ-আলোচনায় যথেষ্ট সংযমতার প্রয়োজন। ১০ই থেকে ১৮ই বৈশাখ অবধি দিনগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের পক্ষে শুভসূচক নয়। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। অনেক দিনের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকাশক, সাহিত্যিক, চিত্র-তারকা ও চিত্রশিল্পীদের নির্দিষ্ট আয়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। মকর লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের যানবাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। মানসিক ও আর্থিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

কুম্ভ : স্বাভাবিকভাবে জীবন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে না। একের পর এক বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। সম্মুখে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। ভ্রাতাদের ব্যবহার অশোভন বলেই বোধ হচ্ছে। বন্ধু ও আত্মীয়স্থান মোটামুটি। কোন খর্বকায় শ্বেতবর্ণের বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই চলবে তবে ১৪ই থেকে ২২শে বৈশাখের মধ্যে বুকের বাঁ পাশে ব্যথা বা বেদনার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ঋতু পরিবর্তনে লীভার বা উদরসংক্রান্ত রোগে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। আর্থিকস্থল মোটামুটি। কর্মক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপার নিয়ে যে-সব অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল তা অনেকটা অনুকূলের দিকে ফিরে আসবে। ব্যবসায়ীদের নূতন করে কোন ব্যবসায় আরম্ভ না করাই সমীচীন। কোষ্ঠির অন্যান্য গ্রহবলাদি লক্ষ্য করে ব্যবসায়াদি আরম্ভ করা সমীচীন। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভ যাবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার আকস্মিকভাবে কঠিন রোগের সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১২ই থেকে ১৮ই বৈশাখের মধ্যে কোন বন্ধুর সহায়তায় ভাগ্যের মোড় ফিরে যেতে পারে বা কোন-না-কোন কর্মের সুবিধার্থে সাহায্যাদি করতে পারে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভ যাবে না। কনিষ্ঠ পুত্রের ডান হাতে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা মাঝে মাঝে অনিষ্ট করতে চেষ্টা করলেও সফলকাম হতে পারবেন না। ১৮ই থেকে ২৬শে বৈশাখের মধ্যে যে-কোন ঝামেলায় জড়িত হয়ে পড়তে পারেন। পতি বা পত্নীস্থান মধ্যম। প্রেম-প্রীতিতে সাফল্য-লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। অনেকদিনের অসমাপ্ত কর্ম সফল হয়ে দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে, সুতরাং কথায় বার্তায় যথেষ্ট সংযমতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, সাংবাদিক ও প্রকাশকদের আয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। কুম্ভ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আর্থিকস্থান সবিশেষ সুখের হবে না। এ মাসে কর্মক্ষেত্রে একের পর এক নানাবিধ ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে তবে তা ক্ষতিকারক হবে না। এ মাসে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১৮ই থেকে ২৪শে বৈশাখের মধ্যে ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়।

মীন : সাংসারিক বিশৃংখলতা চলেছে, চলেছে কারো না-কারো বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ, চলেছে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্ব। মনে দ্বিধা অথচ একটা সুন্দর সমাধান না হ'লেও নয়। এ অবস্থায় নীরব মনোবলই আপনাকে রক্ষা করবে। স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভ থাকবে না। আহার-বিহারে যথেষ্ট সংযমতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। ১০ই বৈশাখ থেকে ১৮ই বৈশাখের মধ্যে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হতে পারেন। আর্থিক ব্যাপারে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে গোলযোগের সূত্রপাত হতে পারে। কোন বন্ধুদ্বারা ১০ই থেকে ১৮ই বৈশাখের মধ্যে উপকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভ যাবে না। লীভার বা উদর সংক্রান্ত ব্যাপারে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই নানাবিধ উপায়ে ক্ষতি করতে চেষ্টা করলেও সফলকাম হবে না। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে চলা কর্তব্য। কোন মহিলার দ্বারা অপবাদ প্রচারের সম্ভাবনা রয়েছে। মামলা-মোকদ্দমায় পরাজয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। গৃহ নির্মাণাদির ব্যাপারে বিঘ্নের সূচনা করে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র ও প্রকাশকদের মধ্যে অনেকেরই আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। আকস্মিকভাবে কারো না-কারো বিদেশ ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। ১৮ই থেকে ২৪শে বৈশাখের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই চাকরীলাভের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের ঝামেলা বহুলাংশে তিরোহিত হবে। পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের শারীরিক অবস্থা সবিশেষ শুভ যাবে না। উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে না থাকলে দীর্ঘস্থায়ী কঠিন রোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। কোন সম্মান লাভের যোগ রয়েছে। মীন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের বিশেষ করে স্বাস্থ্যের দিকে সবিশেষ যত্ন নেওয়া কর্তব্য। ৪ঠা থেকে ৮ই বৈশাখ অবধি দিনগুলোতে আহার-বিহারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কেউ না-কেউ কর্মলাভের আশা করতে পারেন এ কথা বলাও সমীচীন নয়। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। দূর ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়।

● পত্রোত্তর ●

● কল্যাণী বসু, (আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি)—(১) বিবাহ মোটামুটি ভালই হবে, (২) স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ● অসীম দাস, (রহড়া, ২৪ পরগণা)—(১) পিতামাতার মত মেনে চলুন। ● পূর্বা দাস, (রঘুপুর, পুরুলিয়া), (১) শত্রু আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (২) ৬ থেকে ৮ রতির মধ্যে সম্ভব হলে একটু কালচে আভাযুক্ত শ্বেতমুক্তা বা ১০ থেকে ১২ রতি চন্দ্রকান্তমণি রূপায় বাঁ হাতের মধ্যম অঙ্গুলিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● বিভাসচন্দ্র মিত্র, (সার্কুলার রোড, হাওড়া-৩)—শিক্ষাযোগ ভালই বলা চলে। স্বাস্থ্যের জন্য ৬ থেকে ৮ রতি গোমেদ বা ৮ থেকে ১০ রতি রক্তপ্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। গোমেদ হ'লে ডান হাতের মধ্যমাতে আর প্রবাল হ'লে অনামিকাতে ধারণ করাই বিধেয়। ● সোনালী, (সোমহানী, বর্ধমান —(১) মোটামুটি বিচারে বিংশোত্তরী বুধের ও অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির দশা, সম্ভব হলে ৮ থেকে ১০ রতির মধ্যে রক্তপ্রবাল অনামিকাতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীমতী জয়া দেবী, (যশোহর রোড, পাতিপুকুর)—ধৈর্য ধরুন, ৩ বছর আরো অশুভ যাবে। ব্যবসায়ের যোগ রয়েছে। ● শ্রীচন্দ্রনাথ, (তারাগুনিয়া, ২৪ পরগণা)—লেখাপড়ার যোগ রয়েছে। বর্তমান সময় থেকে ২ বছরের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রী প্রকাশে বিমুখ, (তারাগুনিয়া, ২৪ পরগণা)—আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে, শিক্ষকতার চেষ্টা করুন। ● শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য, (জাফরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ)—কোন ব্যক্তিগত ও দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীপাপিয়া ঘোষ, (শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা), পড়াশুনা আরম্ভ করুন, হবার যোগ রয়েছে। ৬ থেকে ৮ রতির মধ্যে গোমেদ রূপায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● বাবু গুপ্ত, (কলিকাতা-৫১), পরীক্ষার পাশ ও ফেলের খবর বলা স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও সম্ভবপর কি না জানা নেই। শ্রীঅলোক রায়চৌধুরী, (বর্ধমান), বৃহস্পতির জন্য পীত পোকরাজ (বৃহস্পতির ধ্যানেই তা পাবেন) এবং মূল বৃদ্ধযষ্টি। ● আরতি গুপ্ত, (রসা রোড (সাউথ) কলিকাতা—৩৩), হঠাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, ঋণমুক্ত হতে পারেন। ● শ্রীপ্রভাতী রায়, (মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা—২৯), সুখী হবেন। চেষ্টা করুন। ● মিতালী, (বিরাটি, কলিকাতা—৫১), ২৫ বছরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। ৬ থেকে ৮ রতির মধ্যে পীত পোকরাজ বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীবিকাশকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, (আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬), হলদে পোকরাজ ৬ রতি থেকে ৮ রতি সোনায় অনামিকাতে এবং ৪ থেকে ৬ রতি শ্বেতমুক্তা রূপায় অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী দীপালি দত্ত, (বসন্তবাবু রোড, কাঁচড়াপাড়া), ৩৫ বছরের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। বেশ কিছুকাল আপনাকে চাকুরী করতে হবে। বছর দশেক করলেই ভাল হয়। ● রমলা গুপ্তা, (শ্যামনগর, ২৪ পরগণা), যতটা সম্ভব পিতামাতার আদর্শ ও আদেশ পালন করা যায় ততটা সম্ভবই শুভ। চেষ্টা করে দেখুন। ● শ্রীসুভাষচন্দ্র রায়, (সুরি লেন, কলিকাতা-১৪), ৬ রতি শ্বেতমুক্তা এবং ৮ রতির কাছাকাছি রক্তপ্রবাল যথাক্রমে রূপায় মধ্যমা ও অনামিকাতে ধারণ করা সমীচীন। ● শ্রীসুভাষচন্দ্র দত্ত, (পোদ্দারপার্ক, কলিকাতা-১৫), ৬৯ সাল থেকে ৭০ সালের মধ্যে আশা করতে পারেন। ● অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ, (কলিকাতা-২৬), সম্ভাবনা রয়েছে, দেখে যেতে পারবেন। ● বিজয় সেন, (কবীর রোড, কলিকাতা-২৬), মাতার স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে পারে। পরিবর্তন ও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীশিলাদিত্য ঘোষ, (কলিকাতা-৩৬), ২৮ বছর অবধি স্বাস্থ্য গোলমেলে থাকবে। ১০ থেকে ১২ রতির মধ্যে চন্দ্রকান্তমণি রূপায় মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীমলয় রায়চৌধুরী, (গৌহাটি, আসাম), ৬৯ থেকে ৭১ সালের মধ্যে হবে। ● শ্রীপরিচয় গুপ্ত, (কসবা রোড, কলিকাতা-৪২), তিন বছরের মধ্যে যোগ রয়েছে। উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীকৃষ্ণ, (কসবা রোড), সম্ভাবনা রয়েছে। বিদেশযাত্রার যোগ রয়েছে। ● শ্রীমতী, (কসবা রোড), উভয় ক্ষেত্রেই জাতিকার শুভ যোগ রয়েছে। ● শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, (বুড়ো শিবতলা রোড, নবদ্বীপ), অসতর্ক হয়ে চলবেন না। ● শ্রীঅলকানন্দা, (কলিকাতা-৪২), মঙ্গলময়ের প্রার্থনা করুন। ৭০-৭২ বছরের কাছাকাছি। ● শ্রীভদ্রেশ্বর মল্লিক, (দুরমেশগড়), চাকুরী হবে, ৬-৮ রতির মধ্যে গোমেদ রূপায় মধ্যমাতে ধারণ করা বিধেয়। ● রঘুনাথ বীজ, (কোতলহাটি, বর্ধমান), ৩ বছরের মধ্যে হবে। ● শ্রীমতী মমিতা বর্মণ, (জি টি রোড, শেওড়াফুলী), চেষ্টা করে দেখুন। ৩৩ বছরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীকানাইলাল চক্রবর্তী, (কামারপাড়া লেন, বরাহনগর), ধীরে ধীরে ঋণমুক্ত হবেন। ভূ-সম্পত্তি হবে। ● এস চ্যাটার্জী, (বার্নপুর, বর্ধমান), শীঘ্রই হবার যোগ রয়েছে। উন্নত ধরণের হবে বলেই মনে করা যায়। ● রঞ্জিৎকুমার গুহ, (২৪ পরগণা), ৬ রতি থেকে ৮ রতি গোমেদ রূপায় ও ৮ থেকে ১০ রতি রূপায় রক্তপ্রবাল যথাক্রমে মধ্যমা ও অনামিকাতে ধারণ করা বিধেয়। ● শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বসু, (বোম্বাই), ভালই হবে। ● শ্রী এস মিত্র মুস্তাফী, (দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা—১৪), ৩৮ বছরের মধ্যে প্রচুর উন্নতির যোগ রয়েছে। গোমেদ ৬-৮ রতি সোনায় বা রূপায় মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● শ্রীদেবব্রত হাজরা, (বর্ধমান), ইন্দ্রনীল ৬-৮ রতি রূপায় মধ্যমাতে ও মুক্তো ৪ থেকে ৬ রতি রূপায় অনামিকাতে ধারণ করে দেখুন। ● ছন্দা চৌধুরী, (সাঁতরাগাছি, হাওড়া), ৮ থেকে ১০ রতির মধ্যে রক্তপ্রবাল

সোনার বা রূপার অনামিকাতে ধারণ করুন। ●শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, (গোলমুড়ী, জামসেদপুর), ২ বছরের মধ্যে আশা করতে পারেন। শ্বেতমুক্তা ৪ থেকে ৬ রতি রূপায় মধ্যমাতে ও রক্তপ্রবাল ৬-৮ রতি রূপায় অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী, (কলিকাতা-৩৬), সম্ভাবনা রয়েছে। চেষ্টা করুন। ● সুনন্দা, (ভদ্রেশ্বর,হুগলী),সম্ভব হয়ে দেখা যেতে। সামান্য দেরী আছে, অপেক্ষা করুন। ● শ্রীরবীন্দ্রনাথ ধর, (গিরিবাবু লেন, কলিকাতা—১২), ৬ থেকে ৮ রতির মধ্যে গোমেদ রূপায় মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। সম্ভাবনা রয়েছে। ●কমলা দেবী, (নৃপেন মিত্র রোড, কলিকাতা-১৭) ধৈর্য ধরে 'শ্রীশ্রীদুর্গা' এক লক্ষবার লিখুন তা'হলেই দেখবেন সব কিছুই আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। ● অজয়কুমার বসু, (বি, টি, রোড, ২৪ পরগণা), পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ●শ্রীশঙ্করকুমার ঘোষ, (গজেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৪), ধৈর্য ধরে চেষ্টা করে যান। ● শ্রীমতী, (রায়পাড়া), উত্তর পাত্রেই পাত্রস্থ হবেন। চিন্তার কোন কারণ নেই। ● শ্রীশুভজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, (চন্দননগর), ৬ রতি পান্না সোনার অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● এ সে (কোন্নগর, হুগলী), ডাক্তারিটাই আপনার পক্ষে ভাল মনে হচ্ছে। ● শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (দুর্গাপুর-৫), উন্নতি ও পরিবর্ত্তন দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে। ● কে আর চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ গণি, (বারাণসী), বেশী দেরী হবে না। স্থায়ী হবে। ● শ্রীসুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (সত্যেন রায় রোড্, বেহালা —৩৪), ৮ রতি রক্তপ্রবাল রূপায় অনামিকাতে ও ৬ রতি গোমেদ রূপায় মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন, শুভই হবে। ● লীলাবতী দত্ত, (চিত্তরঞ্জন), বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীশতঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, (বিবেকানন্দ পল্লী, দার্জিলিং), ছাড়াটা উচিত হবে না। বিশেষ নেই, উন্নতি হবে। শ্বেত মুক্তো ৬ রতি কিংবা ১০ থেকে ১২ রতি চন্দ্রকান্তমণি রূপায় মধ্যমাতে ধারণীয়। ● এ কে মালাকার, (মিডল রোড, কলিকাতা-৩২,) পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ● শ্রীচিত্তরঞ্জন ধর, (তামিল পাড়া, হুগলী), মেষরাশি, অশ্বিনী নক্ষত্র, দেবগণ, সকল বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ●কুমারী লীলাবতী দত্ত, (চিত্তরঞ্জন), বৃষরাশি, রোহিণী নক্ষত্র, নরগণ, পিতা-মাতার মতামত মেনে নেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। ● কুমারী দীপ্তি বিশ্বাস, (শ্যামনগর, ২৪ পরগণা), মেষরাশি, মিথুন লগ্ন, চেষ্টা করুন। ● শ্রীদিলীপকুমার নাগ, (উত্তর হাবড়া, ২৪ পরগণা) বৃষরাশি, রোহিণী নক্ষত্র, মিথুন লগ্ন, রাশি বিচারে শ্বেত প্রবাল ৬-৮ রতি সোনায় অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, (রাজধরপুর, শ্রীরামপুর), ১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র বুধবার। ● শ্রীস্বপনকুমার আদক (হাওড়া-১), কুম্ভরাশি, নরগণ, বৃশ্চিক লগ্ন, হয়তো হতে পারে, চেষ্টা করুন। ● শ্রীদেবীদাস দেবসরকার, (কাসুন্দিয়া, হাওড়া), ধনুরাশি, নরগণ, কুম্ভলগ্ন, সমস্ত গ্রহের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ●শ্রীমতী উষা রায়, (জয়গোপাল রোড্, কল্যাণী), মাস তিনেকের মধ্যেই চাকুরীর যোগ রয়েছে, ৬ থেকে ৮ রতির মধ্যে শ্বেতপ্রবাল রূপায় অনামিকাতে ধারণীয়।

মির্জা গালিব স্মরণে

আবদুল মজিদ

শতবর্ষ পরে আজো অবক্ষয় যন্ত্রণার যুগে
তোমার গজলে খুঁজি গূঢ় প্রেম হে কবি বিরাট
জীবনের অর্থ যেন ভুলে গেছি যক্ষের হুজুগে,
তাই কি নির্জনে করি অমর দীওয়ান তব পাঠ।
উজ্জ্বল নক্ষত্র তুমি চিরন্তন কাব্য-সৌরলোকে,
অমিয় নির্মল দ্যুতি নীলিমায় আজিও অম্লান।
মোগলের শবযাত্রা দেখেছিলে তুমি নিজ চোখে
সাম্রাজ্যবাদীর হাতে মানুষের তীব্র অসম্মান।
কাব্য-বিহঙ্গ তব দেশ-কাল-জরার পিঞ্জর
ছেড়ে মিশে গেছে কল্পনার দূর নীলাঙ্গনে।
মানব পূজারী কবি, তাই তুমি আজিও অমর,
দেশে দেশে নন্দিত, বন্দিত আমাদের মনে।
এ যুগে যখন দেখি চতুর্দিকে ব্যভিচার ছাতা,
গালিব, স্মরণে তব আমাদের শ্রদ্ধানত মাথা।

*১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ উর্দু কবি সম্রাট মির্জা গালিবের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে

([illegible])

॥ ভূমিকা ॥

যুগপ্রারম্ভে জীব, জন্তু ও অন্যান্য সব পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয়, পুনর্বার উৎপত্তি ও স্থিতি, এইরূপে সংসারচক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে। উৎপত্তি ও স্থিতিকালের মধ্যে মানুষ লোকসংগ্রহার্থ নিয়ত কর্মসম্পাদন করিয়া থাকে। সনাতন ধর্মের চাতুর্বর্ণাদি ব্যবস্থা, প্রকৃতির গুণভেদ অনুসারেই হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের, যাহার যে কর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই তাহার স্বভাবজ বা স্বভাবনিয়ত কর্ম বা স্বধর্ম। প্রত্যেকেই স্বধর্ম পালন না করিলে ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হয় না। অবশ্য কর্মমাত্রই দোষযুক্ত। কর্ম করিলেই তার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ফলত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না।

জীবনে দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই সমাধানও রহিয়াছে। ব্যক্তি-জীবনে যেমন রিপু বর্তমান, তেমনি রাষ্ট্রীয় বা সমাজ-জীবনেও শত্রুর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। উভয় শত্রুর প্রাধান্য বিস্তৃতি লাভ করিলেই সমাজদেহে পাশবপ্রবৃত্তি উগ্র হইয়া দেখা দেয়। এই আসুরিক শক্তিবিনাশের জন্য ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করেন, 'তোমরা ভূমির ভারহরণ ও অসুরদিগের অনিষ্টসাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে ভূতলে জন্মগ্রহণ কর' এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করিয়া বলেন, 'তোমরা নরলোকে যাইয়া উদ্ভূত হও।' অনন্তর দেবগণ অসুরবিনাশ আর প্রজাগণের হিতসাধনমানসে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কেহ ব্রহ্মর্ষিবংশে কেহ বা রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তখন নূতন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

সেই সংগ্রামের পটভূমিকায় কামপ্রবৃত্তি যেমন মানুষ এবং দেবতাকেও

দণ্ডপাণি

দৈহিক সুখের জন্য প্রতারণা করে তেমনি লোভের প্রবৃত্তিতেও তাঁরা ভোগ-বাসনায় প্রতারিত হইয়া থাকেন।

দেহের ধারণ হইলেই রিপুর অবস্থান অবধারিত। সেই জন্যই আত্মনিষ্ঠা বা আত্মশুদ্ধির জন্য রিপুদমন ও আত্মসংযম যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য কঠোর সংগ্রামও অনিবার্য। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই মর্ত্যের মানুষ জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ক্রমাগত মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়। সংগ্রাম ব্যতীত যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির কখনও অবসান ঘটিতে পারে না। ইংরাজীতে এই পরিণতিকেই 'প্রসেস অব এলিমিনেশন' বা ক্রমিক অবলুপ্তি বলা হয়। আসুরিক শক্তির অবস্থান হেতু ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিদ্রোহও প্রকট হইয়া দেখা দেয়। একমাত্র কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারাই সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই কৃচ্ছ্রসাধনই জীবনের আসল রূপ। আপাতদৃষ্টিতে ইহা অভিশপ্ত জীবন বলিয়া মনে হয়।

বর্ণবিদ্বেষজনিত সামাজিক প্রতারণার ফলে ব্যক্তিজীবন গভীরভাবে প্রবঞ্চিত হইতে থাকে। ব্যক্তির সত্তা তখন কঠোর বিদ্রোহিরূপে দেখা দেয়। জীবনের যে-কোন স্তরেই সে অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, সৎ ও দুষ্ট যে-কোন পক্ষেরই যে সমর্থক হউক না কেন, তাঁহার অবহেলিত মর্যাদা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য সে উন্মাদ হইয়া উঠে। ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইলেও ব্যষ্টির স্বার্থসংরক্ষিত প্রয়াস। তাই মহাকাব্যের যুগে মহর্ষি বেদব্যাস রচিত কর্ণচরিত্র একটি মহান সৃষ্টি। যাহা যুগ-যুগান্তব্যাপী অবিসংবাদিত রূপে সমাজবিপ্লবের দিকে ন্যায়নীতির স্বাক্ষর বহন করিয়া চলিয়াছে সেই মহান চরিত্রই আমার জীবনের গভীর অনুপ্রেরণা।

উপক্রমণিকা

আর্যসভ্যতার প্রথম হইতেই ভারতে একমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়াই বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন—

পুরাণের যোগ

' ধাতুর 'ন্যৎ' প্রত্যয় যোগে 'আর্য' শব্দ। 'ঋ' ধাতু অনুমিত গমনে। সুতরাং 'আর্য' শব্দের অর্থ 'অগ্রগামী'। প্রাচীনকালে একই আর্যগোষ্ঠিভুক্ত মানুষ বিভিন্ন দেশে আগমন করিয়া বিভিন্ন কৃষ্টি ও সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল। এই কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রসারলাভের বিরুদ্ধে আদিম অধিবাসীরা প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

মহাকাব্যের যোগ

অনার্যদের সাথে আর্যদের দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ইহা দেবাসুর সংগ্রাম নামে পুরাণে কথিত আছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই যে সংযোগ ও মিলন, তাহার ফলেই হিন্দু-সভ্যতার বিকাশ লাভ হয়। অযোধ্যায় ভারতের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। আবার শ্রীকৃষ্ণের নায়কতায় গঠিত যুধিষ্ঠিরের মহাভারতীয় ধর্মরাষ্ট্র প্রবর্তন-প্রচেষ্টায় ঘোরতর সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল

ঐতিহাসিক যুগ

দেড় হাজার বৎসরের কালপ্রবাহে ধর্মরাষ্ট্র খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। দেশময় কুশাসনের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থান ও আচার্য চাণক্যের সুদূরদর্শী রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে মৌর্য-সাম্রাজ্য আদর্শ রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়। তারপর প্রায় হাজার বৎসর অতিক্রান্ত আবার ভারত বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। হিন্দু রাজন্যবর্গ ধ্বংসকর আত্মকলহে লিপ্ত হয়। এ সময়েই ভারতে ইসলামের প্রসার। কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায় সামাজিক সঙ্ঘর্ষের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখে। অপর দিকে পাঠান ও মোঘল বিরোধের মধ্যে অর্ধ-শতাব্দীর অবসান ঘটে। মহারাষ্ট্র-গুরু রামদাস ও শিখ-গুরু গোবিন্দ সিংহের সমাজসংগঠন ও ধর্মরাষ্ট্র স্থাপনের সংকল্প ও পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। রামদাস-শিষ্য শিবাজী ও গোবিন্দ সিংহ-শিষ্য মহারাজা রণজিৎ সিংহ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী হন।

মধ্যযুগ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভ হয়। ফলে পাঁচশত বৎসরের শাসন ও শোষণে ভারতবর্ষ এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ইহাই ছিল মন্দের ভাল। কিন্তু বৃটিশ শাসন ও কদাচারসমূহের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সমর অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান যুগ

স্বাধীনতা সমর ব্যর্থ হওয়ার পর ১৮৮৫ সাল হইতে ভারতে মুক্তি-আন্দোলনের নূতন অধ্যায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বৈতধারা প্রকাশমান হয়। একটি ধারার লক্ষ্য হ'ল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ। তারপর ধীরে ধীরে শাসন-ব্যবস্থায় দেশবাসীর চরম অধিকার প্রতিষ্ঠা। অপর ধারাটির উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা বিদেশী শাসনের অবসান। আবেদন নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক পথে কংগ্রেসের আন্দোলন চলিতে থাকে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব দৃষ্ট হয়। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দলের প্রকাশ ও বৈপ্লবিক নীতি গৃহীত হয়। ইংরাজ বাঙালী জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়। তাহাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীক উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ফলে দেশে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯০১ সালে বিপ্লবী দল সংগঠিত হয়। 'বন্দেমাতরং' মন্ত্র অবলম্বনে বিলাতী পণ্য বর্জন নামে 'স্বদেশী আন্দোলন' প্রসার লাভ করে। ফলে ইংরাজ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে'—তাহার জন্য নূতনভাবে প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। অচিরেই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর বাঁধিয়া যায়। এই সুযোগে ১৯১৬-১৭ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সর্ব ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্যোগ-আয়োজন চলে। দুর্ভাগ্যবশত তা আপাতদৃষ্টিতে কৃতকার্য হয় নাই। ভারতের ধনবল ও জনবল সহযোগে ইংরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু বিনিময়ে একটি ঠুঁটো শাসন-সংস্কার দিতে চেষ্টিত হয়, তাহা ভারতের পক্ষে কোনক্রমেই গ্রহণ-যোগ্য ছিল না। তারপর ১৯২১ সাল হইতে ধারাবাহিকভাবে দশ বৎসর অন্তে আরও তিনটি আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ১৯৪৭ সালে ইংরাজের সঙ্গে আপোষ রফা ও দেশ বিভাগজনিত স্বরাজলাভ ঘটে। গণ-পরিষদের মাধ্যমে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতবর্ষকে স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন সংগ্রহ করে নেয়।

ভারতীয় বিপ্লবদর্শনে রহস্য
(অহিংসনীতি ও ধর্মযুদ্ধ)

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জুন
জ্ঞাতং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥

শ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোক দুটি গান্ধীজীর বড়ই প্রিয় ছিল। ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা ও গীতার্থ সারতত্ত্ব উপদেশ এই শ্লোক দুটিতে দেওয়া হইয়াছে। সুখ-দুঃখ, মান - অপমান, শীত-গ্রীষ্ম সবভূতে সমবুদ্ধি লক্ষণই হইতেছে সম্যক জ্ঞান। তারপর ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি। লোক সংগ্রহার্থ নিয়ত কর্মসম্পাদন। এই তিনটি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু শেষ শ্লোকের 'নির্বৈর' শব্দটির অর্থ বুঝা দুরূহ। তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—নির্বৈর হইতে বলা হইতেছে—ইহাই যদি গীতার সারকথা হয়, তবে 'যুদ্ধ কর' 'যুদ্ধ কর' এ সব কথা কেন? নির্বৈর হইলে আবার যুদ্ধ হয় কিরূপে?

'নির্বৈর' শব্দের অর্থ কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না। যিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, অহংজ্ঞান যাঁহার নাই, সর্বভূতে যাঁহার সমত্ববুদ্ধি জন্মিয়াছে—যাহার আত্মপরে, পাত্র-মিত্রে ভেদবুদ্ধি নাই, তাহার মনে বৈরভাব আসিবে কিরূপে। এইরূপ সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন, শুধু অন্তঃকরণে নির্বৈর হইয়াও যুদ্ধ করা চলে। ইহাই ভগবানের নির্দেশ।

তারপর অষ্টাদশ অধ্যায়ে, সমগ্র গীতা শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই প্রধানতঃ বর্ণনা করা হইয়াছে। সবশেষে ভগবান বলিতেছেন, শাস্ত্রাদিতে মোক্ষলাভের নানা পথ উপদিষ্ট হইয়াছে। নানা প্রকারের বিধিনিষেধও রহিয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন পথের গণ্ডগোলে না পড়িয়া, নানাধর্মের নানারূপ বিধি-নিষেধের বাধ্য-বাধকতা ত্যাগ করিয়া তুমি সর্বতোভাবে আমার স্মরণ লও। আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। ভয় নাই।' ধর্মযুদ্ধের এই যে যুক্তি তা জাতীয় পরাধীনতার বা রাষ্ট্রীয় কুশাসনের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য। বিপ্লব দর্শনের মূল কথাই এই।

ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ ও তার পরিণতি

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে জাতিকে দ্রুত আত্মবিকাশের পথে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন—রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিম, হেম, রঙ্গলাল, নবীন, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার, গিরিশচন্দ্র এবং আরও অগণিত সাহিত্য-সাধকরা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনার পথে বিপ্লবপ্রচেষ্টা ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণশক্তির গতিবেগ সঞ্চারের মূলে সম-সাময়িক সাহিত্যের প্রেরণা ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভারতকে ভৌগোলিক রাষ্ট্র না ভাবিয়া জগজ্জননী দেবী দুর্গারূপে চিনিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ত্রিংশকোটি জনতা একদিন বন্দনাগান গাহিয়াছিল—'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

বিবেকানন্দও রাষ্ট্রকে চিন্ময়ী দেবীস্বরূপা জানিয়া বলিলেন—'ভারতমাতাই তোমার আরাধ্য দেবী। দেবী বলি চান—মনে রেখো পশু নয় মানুষ। গীতাপাঠ ছেড়ে দিয়ে এখন ফুটবল খেল।'

বিদ্রোহী কবি নজরুল তরুণদের উদ্দেশ্যে বললেন—'বল বীর চির উন্নত মম শির।'

১৯০১—২ সালে বাংলা দেশে বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি নিখিল ভারত বৈপ্লবিক সমিতির অঙ্গ। ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গিয়া অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগের পরেই বাংলা দেশে সক্রিয় বিপ্লব আন্দোলন গড়ে উঠে। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বাংলার বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সভাপতি হন। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন এক কেন্দ্রীভূত সংস্থারূপে গড়িয়া উঠে।

তখন কলিকাতায় কানাই ধর লেনের সাতাশ নম্বর বাড়ী হইতে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হইত। রাজনৈতিক আলোচনা এড়াইয়া চলিবার জন্য সেই সময় 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিত্র মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হন। এই 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতিরই অঙ্গ।

১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রথম নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতেই ভারতে সক্রিয় মুক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত (ফ্রিডম মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া)। এই সালেই 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশনবিষয় নিয়ে মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে দলের অন্যান্যদের কিছুটা মতবিরোধ ঘটে। পরবৎসর ১৯০৭ সালে সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ইহার পর হতেই সক্রিয় আন্দোলনের প্রস্তুতিকার্য চলিতে থাকে। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে ইহার কার্যকারিতা দেখা যায়। ১৯১১-১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ও ১৯১৬-১৭ সালে বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের আপাতদৃষ্টিতে অকৃতকার্যতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৯২১-২২ সালে যদিও গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'অসহযোগ আন্দোলন' আরম্ভ করা হয় তথাপি এই আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস অসহযোগরূপে চলিতে পারে নাই। তাই এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু বিপ্লববাদীদের চিন্তাধারায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৩১-৩২ সালের অহিংস সত্যাগ্রহরূপী 'আইন অমান্য আন্দোলন' একই ভাবে পরিণতি লাভ করে।

১৯৪১-৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনও বাস্তবিকপক্ষে দেশের অভ্যন্তরে হিংসাত্মক বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণত হয়। অপর দিকে বাহির হইতে নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর 'দিল্লী চলো' অভিযান ভারতবাসীর মনে অনির্বাণ সংগ্রামে শিখা জাগিয়ে তোলে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ ও ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে।

॥ খেলাধূলা ॥

বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী এ্যাথলেট অল ওয়ের্টার

জীবনে বহুবার বহু বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে, নানান সম্ভাবনাপূর্ণ একটি জীবনের উপর বিঘ্ন এসে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ শারীরিক আঘাতের দরুণ জগৎ-জোড়া নামের অধিকারী হতে বঞ্চিত হতে চলেছেন কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করে অভীষ্ট লাভের পথে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং মনের জোরকে কতখানি যে কাজে লাগান যেতে পারে ডিসকাস ছোড়ার বিশ্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট আমেরিকার অল ওয়েটার তার প্রমাণ।

১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে ডিসকাস ছোড়ার ইভেণ্টে অনেকেই আশা করেছিলেন এবারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ওয়েটার-এর সঙ্গে আমেরিকারই অপর এক এ্যাথলেট জয় সিলভেসটার-এর ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে যিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। এদিকে পূর্ব জার্মানী সহ আরো কয়েকটি দেশও আশা করেছিলেন ডিসকাস-এর স্বর্ণপদকটি এবার তাদের ঘরে যাবে। ওয়েটার তাঁর খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন না। কিন্তু সকলের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

মাত্র বিশ বছর বয়সে ওয়েটার যখন প্রথম মেলবোর্ন অলিম্পিকে যোগ দিলেন তখন তাঁর রেকর্ড-দূরত্বের পরিমাপ ছিল ১৮৪ ফুট ১১ ইঞ্চি। ৪ বছর পরে রোম অলিম্পিকে তিনি তাঁর পূর্বতন রেকর্ড ভেঙ্গে দূরত্বকে বাড়িয়ে দিলেন ১৯৪ ফুট ২ ইঞ্চিতে। ১৯৬৮ সালে টোকিও অলিম্পিকে যখন যোগ দিলেন তখন তাঁর বয়স ২৮। এবারও ২০০ ফুট ১½ ইঞ্চি ছুঁড়ে ওয়েটার তৃতীয় অলিম্পিকে রেকর্ড স্থাপন করলেন। অথচ প্রতি বারই একজন না-একজনকে নিয়ে ওয়েটার শঙ্কিত হয়ে পড়তেন। ফরচন সাজিয়েন চেকোশ্লোভাকিয়ার লুডাভক ডানেক স্বদেশের প্রতিযোগী ডেভ উইল ও জে সিলভেস্টারকে নিয়েই তার চিন্তা হোত। কিন্তু চিন্তা যতই বাড়তো মনের শক্তি বেড়ে যেতো সেই পরিমাণে। এই প্রসঙ্গে ওয়েটার বলেন, আমার ভয় হোত শেষ পর্যন্ত অন্য প্রতিযোগী হয়তো আমাকে মেরে বেরিয়ে যাবে। তাই আমি শরীর ও মনের শক্তিকে

ক্রীড়ারসিক

একসঙ্গে করে প্রতিপক্ষকে মারবার জন্য বদ্ধপরিকর হতাম। সবচেয়ে মারাত্মক রকমের ব্যাপার হয়েছিল টোকিও অলিম্পিকে ফাইন্যালের কিছুদিন আগে ওয়ের্টারের পাঁজরের কার্টিলেজ ছিঁড়ে যায়। ডাক্তার তাঁকে উপদেশ দেন বিশ্রাম নিতে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে—না হলে তাঁরা একথাও জানিয়ে দিলেন ওয়েটারকে হয়তো চিরদিনের মত এ্যাথলেট জগৎ থেকে বিদায় নিতে হতে পারে।

ডিসকাস ছোড়ার বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টিকারী আমেরিকার স্বর্ণপদক বিজয়ী অল ওয়ের্টার

'না — না' ওয়ের্টার চীৎকার করে উঠেছিলেন যে কোনদিনই হতে পারে না। আপনারা এমন একটি কিছু করে দিন যাতে আমি অলিম্পিকে আসন নিতে পারি। বলা বাহুল্য এ কথার পর ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টায় সেরে উঠলেন ওয়েটার। ঘাড়ের নিচে বেদনা তাঁর যেন যায় না। ওই নিয়েই তিনি অলিম্পিকে যোগ দিলেন। আর তাই নিয়েই এমন অবিশ্বাস্য রকমের খেলা দেখালেন, যা কেউ কোনদিন কল্পনাই করতে পারে নি।

অলিম্পিকের মাঠে যখন বিভিন্ন রকমের বাজনা বেজে উঠল উত্তেজনায় ঠাসা চারিদিকে লক্ষ লক্ষ দর্শক ওয়েটার তখন ভুলে গেলেন শরীরের ব্যথার কথা। মনকে চাঙ্গা করে হাতের সবটুকু নৈপুণ্য নিয়ে ডিসকাসটি ছুঁড়ে দিলেন। ফিতে ঘুরিয়ে মাপ এসে গেল ২০০ ফুট ১ ১/২ ইঞ্চি। পুনরায় এসে দাঁড়ালেন বিজয়মঞ্চের উঁচু চূড়োয় মেক্সিকো অলিম্পিকে আরো কৃতিত্ব দেখালেন ওয়ের্টার। বয়স যদিও তাঁর এরি মধ্যে চার বছর বেড়ে গেছে কিন্তু শক্তি এবং মনের দিক থেকে তিনি তখনও পূর্বের মত রয়ে গেছেন বরং তা আরো বেড়েছে বলা চলে। কারণ তিনি অতীতের সব রেকর্ড ম্লান করে নূতন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন ২১২ ফুট ৬ ১/২ ইঞ্চি ছুঁড়ে এবং এককালে যে ডানেক (চেকো:) ওয়ের্টার-এর কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অধিকার করেছেন তৃতীয় স্থান। তাঁর দূরত্ব ছিল ২০৬ ফু: ৫ই:। অসাধারণ অধ্যবসায় আর অনুশীলনই আজ ওয়েটারকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। খুলে দিয়েছে জয়ের স্বর্ণদুয়ার। ১৯৭২ সালে যোগদান তিনি করবেনই কিন্তু তাতে ব্রোঞ্জপদক পেলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

সঙ্গীতাচার্য

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কুশল চৌধুরী

সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র

রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে আরও একটি ইন্দ্রপতন ঘটল। বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন।

শিক্ষিত ও রসজ্ঞ শ্রোতামাত্রই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অধিকাংশ গানই রাগাশ্রয়ী। 'ধ্রুপদী-বন্দেজই' তার মূল কথা। রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্ট খেয়াল, ঠুংরি, ধ্রুপদ ও টপ্পা আজ অনেকেই ভুলতে বসেছে। উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এ পর্যন্ত যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন রমেশ বন্দ্যো-পাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বাংলা দেশের মার্গসঙ্গীত ও ধ্রুপদী সঙ্গীতকলার অনুরাগী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রমেশচন্দ্রের জন্ম ১৯০৫ সালে বাংলার সঙ্গীত-তীর্থ বিষ্ণুপুরে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ যদু ভট্টর দেশ এই বিষ্ণুপুর। রমেশচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষেরাও ছিলেন সঙ্গীত ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। প্রপিতামহ ছিলেন একজন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। আর পিতামহ অনন্তলাল ছিলেন সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম।

বাংলার জনসাধারণের কাছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে মার্গ-সঙ্গীতকে যাঁরা পরিচয় করিয়ে দেন তাঁদের মধ্যে অনন্তলালই ছিলেন অগ্রগণ্য। অনন্তলাল তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছিলেন তখনকার দিনের ওস্তাদ গুরুপ্রসাদ মিশ্র, শিবনারায়ণ মিশ্র, নুলেগোপাল প্রমুখ গুণিজনের কাছ থেকে সঙ্গীত সংগ্রহ করে।

অনন্তলালের যথার্থ উত্তরাধিকারী হলেন পুত্র গোপেশ্বর। বাংলা দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমেশচন্দ্র পিতার সাধনাকেই নতুন এক সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চললেন। সে সাধনা খেয়াল গান-এর। রমেশচন্দ্রের শিক্ষা ও সাধনা বিশেষ করে খেয়াল-এরই। যদিও ধ্রুপদ ও অন্যান্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও ছিলেন তিনি সমান পারদর্শী। রবীন্দ্র-নাথের জীবিতকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই সকালে গান-বাজনার আসর জমত। অবশ্যই মধ্যমণি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই আসরে আবার কখনও কখনও সাহিত্য আলোচনাও হত। রবীন্দ্রনাথ গোপেশ্বরবাবুর একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে গোপেশ্বরবাবু বহুবার রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়েছেন। বালক রমেশও বাবার সঙ্গে এসে ঠাকুরবাড়িতে গান শুনিয়ে যেত রবীন্দ্রনাথকে।

সেটা সম্ভবত ১৯২২ সাল। কোন এক সকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের গানের আসর জম-জমাট। বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে সেই আসরে। রমেশচন্দ্রও এসেছে পিতার সঙ্গে কবিগুরুকে তাঁর প্রিয় গান শোনাতে। সাহিত্যিকদের মধ্যে উপস্থিত অমল হোম, অমিয় চক্রবর্তী এবং কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা। প্রথমে চলল সাহিত্য-আলোচনা। পরে আরম্ভ হল গান। রমেশচন্দ্র দরদ দিয়ে সেদিন গাইলেন কবির বিখ্যাত গান—'প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুম গন্ধে' এবং 'স্বপন যদি ভাঙিলে।'

গান শেষে রমেশকে কবিগুরুর জিজ্ঞাসা—'তুমি স্বরলিপি কেমন শিখেছো?'

পুত্রের হয়ে গোপেশ্বরবাবু বললেন—'রমেশ আমার কাছ থেকেই স্বরলিপি করা শিখেছে।'

রবীন্দ্রনাথ আবার রমেশকেই জিজ্ঞাসা করলেন—'বেশ, তাহলে ডিকটেশন লেখার মতো গান শুনে তাড়াতাড়ি স্বরলিপি করতে পার তো?'

উত্তরে রমেশ বলল—'হ্যাঁ, পারি।'

রবীন্দ্রনাথ সেদিন রমেশচন্দ্রের গান শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে এক প্রশংসাপত্র লিখে দেন—'রমেশচন্দ্রর কণ্ঠ মধুর ও ব্যঞ্জনাময়।'

বস্তুত রমেশচন্দ্রের সুমধুর কণ্ঠ এবং তান, বিস্তার, অলঙ্কার, মাধুর্য, শুদ্ধ মুদ্রা ও শুদ্ধ রীতিতে গাইবার ভঙ্গি ইত্যাদি গুণগুলিই তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর গুণীর আসনলাভে সহায়তা করেছিল। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন বলেই বোধহয় ভবিষ্যতে রমেশচন্দ্র প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিলেন।

পিতা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বর্ধমান রাজস্টেটে সঙ্গীতাচার্যের পদে আসীন। সেই সময় রমেশচন্দ্র সাত বছর বয়সে বর্ধমান রাজস্কুলে ভর্তি হলেন। পিতা পুত্র রমেশকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন—'বীণাপুস্তকধারিণীর দুই হাতের আশীষ লাভের জন্য সাধনা কর।'

রমেশচন্দ্র ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা ও প্রেরণা পেয়েছিলেন যে, সঙ্গীতের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অবিচ্ছিন্ন। এই সময় মাতা চণ্ডীবালা দেবী পরলোকগমন করলে রমেশচন্দ্র পিতার অজস্র স্নেহ পেয়ে মানুষ হতে লাগলেন।

রমেশচন্দ্র বর্ধমান থেকেই ম্যাট্রিক পাস করে (১৯২২) কলকাতায় কাকার বাড়ি চলে এলেন। আই-এ-তে ভর্তি হলেন রিপন কলেজে। ১৯২৪ সালে রিপন থেকে আই-এ এবং ১৯২৬ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি-এ পাস করেন রমেশচন্দ্র। এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হন (এম-এ ক্লাশে হুমায়ুন কবীর তাঁর সহপাঠী ছিলেন)। দু'বছর এম-এ পড়েও পরীক্ষাটা আর দেওয়া হল না। কারণ সঙ্গীত-জগৎ তাঁকে মোহিনী মায়ায় তখন যেন বেঁধে ফেলেছে। মন শুধু সঙ্গীত জগতেই উদ্বেলিত। সঙ্গীতে জ্ঞানলাভের জন্যই শুধু উন্মুখ ও উদ্বিগ্ন।

তিনি বাংলা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন বাইরে। এলাহাবাদ, মজঃফরপুর, গোয়ালিয়র, মীর্জাপুর, দিল্লী, লখনউ ইত্যাদি স্থানে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলন'-এর অধিবেশনে যোগদান করে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। মীর্জাপুর অধিবেশনে কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত গুণিসমাজ রমেশচন্দ্রকে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রায় আট মাস বাইরে ঘুরে রমেশচন্দ্র আবার এলেন কলকাতায় ফিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা আর হল না। তবে তখনকার দিনে বি-এ পাস করা কোন নবীন যুবকের সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা শিক্ষিত সমাজে এই প্রথম। অতঃপর রমেশচন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনী বিদ্যালয়ে প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষকের কাজ করতে সুরু করেন।

নিখিলবঙ্গ আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯২৫ সালে কলকাতার য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে।

[illegible]

স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্ররূপে রমেশচন্দ্র এই অনুষ্ঠানে প্রকাশ্য সভায় গান গাইলেন। এই প্রতিযোগিতার বিচারকবৃন্দ ছিলেন—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, লছমীপ্রসাদ মিশ্র, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরামতুল্লা খাঁ (সরোদ-বাদক), যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় এবং পিতৃদেব গোপেশ্বরবাবু। ঐ বছরেই রমেশচন্দ্র পিতার লেখা দুটি শ্যামাসঙ্গীত রেকর্ড করেন এইচ এম ভি থেকে—

১। ও রাঙা চরণ আজ,
২। কালের কোলে ফেলো না মোরে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে নিয়মিত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, ভজন, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে আরম্ভ করেন ১৯২৭ সাল থেকে। প্রায় বারো বছর যাবৎ তিনি কলকাতা বেতার থেকে নিয়মিত-ভাবে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এতে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। অনেকেই তখন ভাবতেন, এই সব গানের সুরকার বুঝি স্বয়ং রমেশচন্দ্রই। আসলে এগুলি যে রবীন্দ্র-নাথেরই সৃষ্টি অনেকেই সে কথা জানতেন না।

১৯৩৩ সালে রমেশচন্দ্র গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজে সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের নিয়ে অনেক সঙ্গীতালেখ্য, গীতিনাট্য ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে নতুন প্রতিভা আবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকেন। রমেশচন্দ্রের পরি-চালনায় 'সাত ভাই চম্পা', 'কুমার-সম্ভব' ও 'প্রিন্স সিদ্ধার্থ' প্রভৃতি গীতি-নাট্য নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সার্থক হয়ে ওঠে।

উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের রমেশচন্দ্র বোঝাতে লাগলেন। ১৯৫২ সালে 'তানসেন সঙ্গীত সম্মিলনী' এবং 'অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে' উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি ও টপ্পা গেয়ে রমেশচন্দ্র প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন। বাংলা ভাষাতেও যে মার্গসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে এবং তার যথাযথ বিকাশ ঘটে তা দাশুবাবুই (রমেশচন্দ্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সঙ্গীতমহলে তাঁর এই ডাকনামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন) সবপ্রথম সপ্রমাণ করে গেছেন। ১৯৫৪ সালে দিল্লীতে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করতে গিয়ে বেতারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বাড়াবার জন্য তখনকার বেতারমন্ত্রী ডা: বি ভি কেশকারকে অনুরোধ জানান। কেশকার সে রকম ধরণের গান শুনতে চাইলে রমেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তা গেয়ে শোনান।

রমেশচন্দ্রের কণ্ঠ থেকে ওই সব ওস্তাদী গান শুনে কেশকার খুব প্রশংসা করেন এবং ন্যাশনাল প্রোগ্রামে তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। রমেশচন্দ্র তখন দিল্লী বেতার থেকে ত্রিশ মিনিটের এক প্রোগ্রামে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা গাইলেন। বাংলা দেশের বাইরে এই প্রথম রেডিও মারফৎ ভারতবর্ষের জন-সাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের পরিচয় পৌঁছোল। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের 'সঙ্গীত নাটক একাডেমি'-এতে রমেশচন্দ্র যোগদান করেন।

সাত থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত পিতার নিকট নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা রমেশচন্দ্রের রোজকার জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রচলিত, অপ্রচলিত কত রাগ কত রকমের গানই না বাবার কাছ থেকে শিখতেন। বাবাও খুব

ছায়াবাণী পরিবেশিত শরৎচন্দ্রের 'কমললতা' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও মুই বন্দ্যোপাধ্যায়

রকম গান যত্ন করে শেখাতেন। পিতা গোপেশ্বরবাবু অনেক ঘুরে, বহু ওস্তাদের কাছ থেকে সঙ্গীতরত্ন আহরণ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র সে রত্ন বাবার কাছ থেকেই পেলেন। কলেজের গ্রীষ্ম, পুজোর এবং অন্যান্য ছুটি-ছাটাতে বিষ্ণুপুর চলে এসে খুল্লতাত সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করতেন।

কাকা সুরেন্দ্রনাথই রমেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে দীক্ষা দেন। সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম প্রবর্তক ও স্বরলিপিকার। রবীন্দ্রনাথের 'গীত-লিপি'র ছয় খণ্ড তিনি প্রকাশ করে সঙ্গীত জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। সেই সময় দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাঙালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন যদি রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সুরের সঙ্গে স্বরলিপি না করে রাখতেন তা হলে রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ত। এঁদের দান রবীন্দ্র-সঙ্গীত সৃষ্টির মূলে অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ কবিগুরুর বিখ্যাত গানগুলি রমেশচন্দ্রকে শিখিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—প্রভাত বিমল আনন্দে, সার্থক জনম আমার, কার মিলন চাও বিরহী, শান্ত হ'রে মন, বর্ষ এ'গেল চলে—ইত্যাদি।

এইসব গানগুলি গাইবার সময় রমেশচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগত—'গানের পূর্ণ সার্থকতা কোথায়? শুধু কি সুরে? না কাব্য ও সুরের সমন্বয়ে এক অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে।'

বিশ্বভারতীর তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত গানের স্বরলিপি করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় রমেশচন্দ্রকে। অনেকগুলির স্বর-লিপিই তিনি সমাপ্ত করে গেছেন।

সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত শিক্ষক ছাড়াও রমেশচন্দ্র একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ও মনীষীদের জীবনী গুণিসমাজে সমাদর লাভ করেছে। প্রকাশিত ও প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ—বিষ্ণুপুরের ইতিহাস, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বর্ষাঋতু, বসন্ত গান, স্বদেশী গান ও আগমনী গানের আলোচনা, ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ও গোপেশ্বর-গীতিকা। যদুভট্ট, নিধুবাবু, দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, সুরদাস, কবীর প্রমুখ সঙ্গীতসাধকদের জীবনী। রমেশচন্দ্রের জীবনে একদিকে দেখি সঙ্গীত, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চা। একই সঙ্গে এই দুইয়ের সাধনা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ই হল সঙ্গীতের সংজ্ঞা।

রমেশচন্দ্র বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সঙ্গীত সাধনা ও শিক্ষকতার মধ্যেই তাঁর জীবনের দিনগুলো কেটেছে। বহু ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ-জীবনের গুরু-দায়িত্ব বহন করে চলেছিলেন মাস্টারমশাই। তিনি যাপন করতেন অভিমানহীন সহজ জীবন। মুখের কথার চেয়ে সঙ্গীত সাধনার ভেতরই যেন তাঁর হৃদয়ের অজস্র কথা অনবরত তানপুরার ঝঙ্কারে অনুরণিত হত। তাই বাইরের পৃথিবীর প্রতি রমেশচন্দ্রের ছিল বেশি উদাসীনতা। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সঙ্গীত' বিভাগের ডীন-এর পদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রমেশবাবুরা ছিলেন তিন ভাই দুই বোন। ১৯২৫ সালে রমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা বর্তমান। রমেশচন্দ্র বলতেন—'শিক্ষার মধ্যে কোন বিশেষ ঘরওয়ানার দাম্ভিকতা থাকা উচিত নয়। কোন দলগত প্রতিষ্ঠান বা ঘরওয়ানার মূল্য নষ্ট করে সব কিছু সমন্বয়ে যথার্থ রস গ্রহণ করে তার পরিবেশনই সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য।'

আজকাল বিদেশে ভারতীয় ডেলি-গেশান যাবার একটা রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্টির অমূল্য সম্পদ বিদেশে যতখানি প্রসার লাভ করা উচিত ছিল ততখানি আজও হয়ে ওঠেনি। এ সম্পর্কে একবার রমেশচন্দ্রের অভিমত জানতে চাওয়া হলে উত্তরে তিনি বলেন—'পৃথিবীময় রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রচার ও প্রসার আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। নামকেওয়াস্তে ঘটা করলে চলবে না। একটু ভেবে ও বুঝে সব কিছুর সমন্বয় ঘটাতে হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এত ব্যাপক এত বিচিত্র যে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের পূর্ণ শিক্ষাই রয়েছে এর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টি, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও জ্ঞানের পরিচয় প্রত্যেকেরই জানা দরকার। নইলে রবীন্দ্র-সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। এত বড় প্রতিভা লোকে জানবে না।'

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর ও ছন্দে একদিকে রয়েছে মধ্যযুগের সঙ্গীত-সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ আর অপরদিকে কবির নিজস্ব সৃষ্টি যা অভিনব ও যুগোপযোগী। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—'যুগ বদলায়। কাল বদলায়। তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান। এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীরা। শোকে, দুঃখে ও আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবে।'

আজ দেখি রবীন্দ্রনাথের বাণী সার্থক। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কদর দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আরও প্রসার লাভ ঘটছে। সঙ্গীতে সুরের সঙ্গে কথাও গুরুত্বপূর্ণ, সঙ্গীতের কাব্যমূল্যও যে অপরি-সীম এবং অনস্বীকার্য তা রবীন্দ্রনাথই এ দেশে সর্বপ্রথম সপ্রমাণ করেন। বিভিন্ন যুগের সঙ্গীত রূপায়িত হয়েছে কবিগুরুর গানে। আর রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি সেই গীত-সুধাধারা রজে-রসে সঞ্জীবিত হয়েছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন সঙ্গীত সাধকের অক্লান্ত সাধনায়। রমেশচন্দ্রের মৃত্যু নেই। সুরলোকের মাঝেই তিনি চির-অমর। আপন মহিমার দ্যুতিতে চির-ভাস্বর।

কঙ্কাবতীর ঘাট

সম্প্রতি গঙ্গাধরপুর বাজারের কাছে ময়দানে অভিনীত হোল 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। এ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন বলাইচন্দ্র সাঁতরা ও পঞ্চানন দাস। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন প্রফুল্লকুমার আদক। সামগ্রিক অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আবহসঙ্গীত প্রশংসা পেয়েছে। শিল্পীরা সকলেই আপন আপন চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের অভিনয়ে ছিলেন যামিনীকান্ত কোলে, বিভূতি দাস, অর্ধেন্দু শেখর, অবনীদাস, শম্ভু দাস, জহর দাস, পান্নালাল দাস, কমল, নবীন, লক্ষ্মীমণ্ডল, কুমারী কানন প্রমুখ শিল্পীরা। নাটকের সুরারোপ করেছেন জীবনকৃষ্ণ ভাণ্ডারী।

নাম নেই, ব্যাণ্ডমাস্টার ও ঝিঁঝিপোকার কান্না

অনামী নাট্য সংস্থা রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অভিনয় করলেন 'নাম নেই', 'ব্যাণ্ড মাস্টার' ও' ঝিঁঝিপোকার কান্না।' তিনটি নাটকই সুপরিচালিত অভিনয় সৌকর্যে মূর্ত করে তোলেন এ সম্প্রদায়ের কুশলী নাট্য-শিল্পীরা, নাট্য-পরিচালনায় ছিলেন শৈলপতি ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্যের সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি নাটকগুলির গতি ব্যাহত হতে দেয় নি। সব ক'টি নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মণ্ডল, পূর্ণেন্দু সরকার, প্রশান্ত সরকার, বিমান হাজরা, তপন দত্ত, স্যরজিৎ পাল, যতীন পাল, সুবল মণ্ডল, ভীষ্মদেব হালদার, অরুণ লালা, শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্দেশক শ্রীভট্টাচার্য স্বয়ং। আবহসঙ্গীত ও আলোকসম্পাত যথাযথ।

চরিত্রহীন

সম্প্রতি ডানলপ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা 'চরিত্রহীন' অভিনয় করলেন স্টার রঙ্গমঞ্চে। শরৎচন্দ্রের এই সুখ্যাত উপন্যাসটিকে কৃতিত্বের সঙ্গে নাটকে রূপায়িত করেছেন চিত্ত রায়। প্রযোজনাটির সামগ্রিক সাফল্যের অনেক অংশই এসেছে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাট্যরূপদানের জন্য। অভিনয়ে এই প্রমোদ সংস্থার শিল্পীরা পূর্বখ্যাতি ম্লান হতে দেন নি বরং কিছু অংশ আন্তরিক অনুশীলনের জন্য অধিকতর উন্নত মনে হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পরিতোষ বসু, প্রদীপ কর, মিতা চট্টোপাধ্যায় ও গীতা দে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন রাসমোহন সিংহ,

মহারানা কলেজ অফ কমার্স (সান্ধ্য বিভাগ)-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে রাগপ্রধান সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন শিল্পী শ্রীমতী চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

অন্তরা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের 'নটরাজ' নৃত্যনাট্যে নৃত্যরতা শিল্পিগণ

রূপেন ঘোষ, জয়চাঁদ পালিত, দীপক গুপ্তশর্মা, মদন দত্ত, শুকদেব ব্যানার্জি, সুবিমল চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন দে।

বৈকুণ্ঠের উইল

রয়েল ইনস্যুরেন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি মিনার্ভা মঞ্চে এ নাটক অভিনয় করলেন। নাটকের মূল বক্তব্যকে ক্ষুণ্ন না করে দলগত অভিনয়ে এঁরা যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। সারা নাটকটির স্বচ্ছন্দ পরিবেশনের জন্য নির্দেশক বিভূতি মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন অনায়াসেই। অভিনয়ে প্রশংসা পেয়েছেন ললিত দাস, অরুণ দত্ত, অশোক রুদ্র, ললিত চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্য, ভোলানাথ সেন, বলাই দত্ত, মণি গুহ, কানাই মুখোপাধ্যায়, ধীরেন দাস ও জীবন নন্দী, স্ত্রী-চরিত্রে অংশ নেন ডলি মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি দাস, প্রভা চৌধুরী, জয়শ্রী কর ও মেনকা দেবী।

ইচ্ছা পূরণ

মিলনী নাট্যগোষ্ঠী জামসেদপুর সবুজ কল্যাণ মঞ্চে সম্প্রতি 'ইচ্ছাপূরণ' অভিনয় করলেন। শিল্পীদের দলগত অভিনয় বিশেষ প্রশংসার যোগ্য হতে পেরেছে। একক অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এ নাটকের নির্দেশক পরমেশ রায়চৌধুরী এবং অরুণ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন সুধীর মজুমদার, শৈলেন রায়চৌধুরী, লীলা মজুমদার, বেবী ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র প্রমুখ আরও অনেকে।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী নূপুর ডান্স একাডেমীর উদ্যোগে শ্রীশিক্ষায়তন হলে ভারতীয় লোকনৃত্য ও শকুন্তলা নৃত্যনাট্য প্রচুর দর্শক সমাগমের মধ্যে শেষ হয়।

বন্দনা সেন যিনি এই একাডেমীর স্রষ্টা, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অনুষ্ঠানকে এত সুন্দর ও সার্থক করতে পেরেছেন। শ্রীমতী সেন তাঁর ছোট্ট বিবৃতিতে বলেন যে, বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের মান যেভাবে বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে নৃত্যের দিক থেকে তাতে ভারতীয় লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্য এবং নৃত্যনাট্য দর্শকদের সামনে উপস্থিত করলে ভারতীয় সঙ্গীতের মান বজায় থাকবে।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় বাণী সেনের পল্লীগীতি দিয়ে। তাঁর প্রাণবন্ত আবেগ-দীপ্ত লোকসঙ্গীত সশিল্পত্তার পরিচয় রাখে। প্রচুর দর্শক-সমাগমকে মাতিয়ে রেখেছিল বাংলার চাষী-নৃত্য ও জিপসী-নৃত্য। ছোটদের কত্থক ব্যালে খুব উচ্চ মানের বলা যায়। একক কত্থক নৃত্যে মঞ্জুষা ব্যানার্জী তাল ও বোলের সঙ্গে খুব সুন্দর। ছাত্রী হিসাবে এর চেয়ে বেশী আশা করব না।

শকুন্তলা নৃত্যনাট্য শ্রীকানাই মজুমদারের পরিচালনায় বন্দনা সেনের প্রযোজনায় কত্থক, মণিপুরী ও ভারত নাট্যমের মাধ্যমে সার্থক হয়ে ওঠে। নূপুরের ছাত্র ও ছাত্রীরা যেভাবে নিজেদের অভিনয়-সত্তা প্রকাশ করেছে তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে রাজ-নর্তকীর ভূমিকায় ইতি ভট্টাচার্য ও উমা চ্যাটার্জীর নাচ সবার ভালো লেগেছে। নারদ ও দুর্বাসার ভূমিকায় শ্রীকানাই মজুমদার, মুনি বিশ্বামিত্র (বৃজেন মুখার্জী), জেলে (সুনীপা ভট্টাচার্য), শার্ঙ্গদেব (প্রণতি ভট্টাচার্য) এদের প্রত্যেকের অভিনয় এবং সঙ্গীত পরিচালনায় অজিত নন্দী ও ধারা ভাসে বাদল রায় ও আলোকসম্পাতে শান্তনু দাস প্রশংসার দাবী রাখে।

পুরস্কার বিতরণী উৎসব

গত ২৭শে মার্চ দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্র সরোবর হলে নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসব ও সঙ্গীত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানের প্রথমে দ্বৈতকণ্ঠে গৌর বসাক ও কল্পনা ব্যানার্জী ধ্রুপদ গান পরিবেশন করেন। অন্যান্য সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বপ্না মুখার্জী, বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী, রেবা পাল, অর্চনা রায়, চৈতালী ঘোষ, ইভা পাল, করবী ঘোষ ও কান্তি মৈত্র। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী ও দুলাল ভট্টাচার্য। সঙ্গীতানুষ্ঠানের শেষে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য

২৫শে মার্চ, সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের কর্মী সাংস্কৃতিক শাখার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামা নৃত্যনাট্যে উমা দত্ত (শ্যামা), কানাই মজুমদার (বজ্র সেন), অনুপশঙ্কর (কোটাল) ও বিভিন্ন ভূমিকায়

নন্দিতা চক্রবর্তী, উর্মিলা ঘোষ, অরুণা দে, অনীতা ঘোষ, কল্যাণী চৌধুরী, শেলী দাস, মিত্রা ঘোষ, সুচরিতা ঘোষ ও মানসী ঘোষ সুঅভিনয় করেন। স্বর্ণালী ঘোষ, ইতি ঘোষ, মিতা দাস অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেন আশীষকুমার ভট্টাচার্য। শ্যামল বড়াল, সুদীপ্ত রায় ও অঞ্জনা মিত্র সঙ্গীতে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, ভানু চ্যাটার্জী প্রমুখ যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। সহকারী নৃত্য পরিচালকরূপে অংশগ্রহণ করেন—অরুণশঙ্কর, শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা ও কানাই মজুমদার। অনুষ্ঠানে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নৃত্যের তাল একাডেমীর দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করছেন মাজশ্রী দাস, শীলা দেবশর্মা এবং কানাই ভট্টাচার্য

নটরাজ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নটরাজ নৃত্যনাট্যটি সম্প্রতি হিন্দী হাইস্কুল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন অন্তরা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

নটরাজ নৃত্যনাট্যটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীবিশ্বজিৎ রায়। শ্রীরায় পরিচালনায় মুন্সিয়ানা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ পরিচালনায় নটরাজ নৃত্যনাট্যটি যথেষ্ট উপভোগ্য হয় ও দর্শকদের আনন্দ দান করে। অন্তরা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বর্তমান অনুষ্ঠানে তাঁরা পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সঙ্গীত ও নৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা যে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছেন ত দর্শকদের মনে বহুদিন দাগ কেটে থাকবে। শিল্পীদের আন্তরিকতাও দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে।

নৃত্যে, সঙ্গীতে ও সঙ্গতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী শিবশঙ্করণ, রামগোপাল ভট্টাচার্য, শম্ভু ভট্টাচার্য, সাধন গুহ, বটু পাল, শর্বরী সেন, শ্যামলী সেন, মালা বিশ্বাস, সাতী রায়, অনিন্দ্য মিত্র, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ রায়, প্রসূন চৌধুরী, অমিত মিত্র, অভিজিত সেন, চন্দ্রোদয় ঘোষ, সৌমেন্দ্র ঘোষ, কমলা বসু, কমলা দাস, অঞ্জলি সেন, স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়, তপন দাস, অর্চনা মিত্র, বিভাস গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু ঘোষ, রবীন গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটিকে সুষমামণ্ডিত করে তোলার জন্য অন্তরা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্রদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'রূপসী' চিত্রে শিখা রায়চৌধুরী — চিত্র : দিলীপ বসু

রীটা মোরেনো

একরাশ ঘন চুল---সোনালী রঙের ঢেউখেলানো। টানা টানা দুটি আয়ত আঁখি---যাকে বলে পটলচেরা চোখ, টিকালো নাক। হাসির মধ্যে এক অদ্ভুত ধরণের মাদকতা, চলার ভিতর একটি মিষ্টি ছন্দ। সব মিলিয়ে রীটা মোরেনো বহু দর্শকের চিত্তজয়ের যাঁর রেকর্ড সর্বজনবিদিত, অসংখ্য অনুরাগীর প্রীতির স্পর্শে যিনি ঝলমলিয়ে উঠেছেন। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচে এবং গানেও যিনি সমানভাবে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সেই রীটা মোরেনো ভারতীয় চিত্রামোদী সমাজেও মোটেই অপরিচিত নন।

পোয়েতো রিকোয় তাঁর জন্ম। ১৯৩১ সালের ১১ই ডিসেম্বর পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পানুরাগ তাঁর ভিতর অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে থাকে। শৈশব থেকেই দেখা যায় শিল্পসাধনায় তিনি তৎপর। 'এ-বি-সি-ডি' বা 'ওয়ান টু--থ্রি'। সঙ্গে সঙ্গে নাচে-গানেও তাঁর হাতেখড়ি হয়ে গেল। ছোট্ট মেয়ে রীটা লেখাপড়াও শেখেন, সেই সঙ্গে নাচ-গানেও তালিম নিতে থাকেন। চার বছরে নাচ শেখা প্রথম সুরু হয়। পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষক পাকো কানসিনোর সঙ্গে গ্রীনউইচের একটি গ্রাম্য নাইট ক্লাবে নাচতে আরম্ভ করলেন, বহু নাইট ক্লাবে—তারপর থেকে রীতিমতভাবে নর্তকীর জীবনযাপন সুরু হল। পনের বছর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রতারকা হওয়ার বাসনা মনের মধ্যে পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। রঙ্গমঞ্চেও তিনি দেখা দিয়েছেন---'স্কাই ড্রিফট' নাটকটি তাঁর মঞ্চসাফল্য সগৌরবে ঘোষণা করছে। পনের বছর বয়স থেকে স্প্যানীশ ভাষাভাষী ছবিগুলিতে 'ডাবিং'-এর ব্যাপারে তাঁর কণ্ঠ কাজে লাগানো হতে থাকল।

লম্বায় যিনি পাঁচ ফিট এবং ওজনে যিনি একশো এক পাউণ্ড---তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে 'সো ইয়ং সো ব্যাড', 'সেভেন সিটিজ অব গোল্ড', 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি', 'কিং এ্যাণ্ড আই' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সালে 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' তাঁকে এনে দিল বছরের সেরা সহ-অভিনেত্রীর সম্মান।
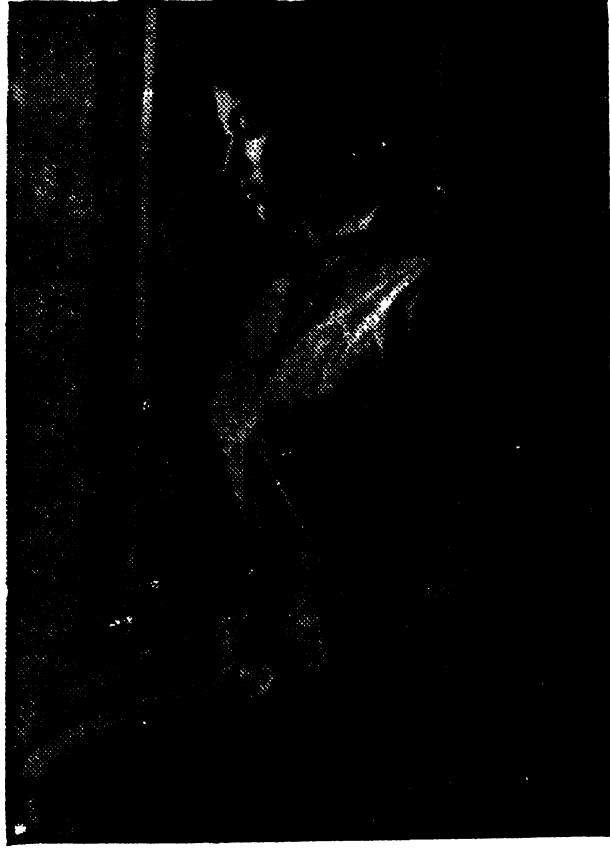
রীটা মোরেনো

'সেভেন সিটিজ অব গোল্ড' চিত্রে রীটা মোরেনো

নানা ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রীটা। কখনও গুরুগম্ভীর, কখনও লঘু-চপল। কখনও লীলা-চঞ্চলা, লাস্যময়ী। কখনও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না, গাম্ভীর্যবিমণ্ডিতা। বিভিন্ন ধরণের রূপদানে সমান শক্তিসম্পন্না অভিনেত্রী রীটার নিজের কিন্তু একটি বিশেষ জাতীয় চরিত্রের প্রতি একটা অসম্ভব আকর্ষণ আছে---সে হল 'মাতাহরি' জাতীয় চরিত্র। এই ধরণের চরিত্র অভিনয় করার উৎসাহে তাঁর কখনই ভাটা পড়ে না। কারণ এই জাতীয় চরিত্রের রূপদানে তিনি এক অসাধারণ আনন্দ অনুভব করে থাকেন।

—চিত্রপ্রিয়

'টু ফর দ্য রোড' চিত্রের একটি দৃশ্যে এ্যালবার্ট ফিনি ও অড্রে হেবার্ন

স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি অড্রে হেবার্ন

একদিকে স্নিগ্ধতা, অন্যদিকে গাম্ভীর্য—এই দুটির সম্মিলন থেকে যে অপরিসীম সৌন্দর্যের উদ্ভব—সেই অনন্য সৌন্দর্যের যাঁরা সার্থক অধিকারিণী অড্রে হেবার্ন তাঁদেরই একজন। তাঁর অঙ্গ সঞ্চালনে, অভিব্যক্তিতে, কথোপকথনে, অভিনয়ে, এমন কি চোখের দৃষ্টি ও মুখের হাসির মধ্যে দিয়েও এই কথাটিই যেন বারবার ব্যক্ত হয়ে চলেছে।

বয়সকেও আপন নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন অড্রে। তাঁর আকৃতির মধ্যে কোথাও এতটুকু কোন অংশেও বয়স তার আপন স্বাক্ষরের একটি আঁচড়ও টানতে পারে নি। বয়স তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। বয়সের রাশ এখনও শক্তমুঠিতে ধরে আছেন অড্রে। প্রৌঢ়ত্বের ঘরে আজ তিনি পা দিয়েছেন কিন্তু তাঁর লাবণ্যময়ী আকৃতিকে রেখেছেন আরও বছর চোদ্দ-পনের পিছিয়ে।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ১৯২৯ সালের ৪ঠা মে অড্রের জন্ম। বাবা জোসেফ এ্যাণ্টনি। মা ছিলেন একজন ব্যারনেস—তাঁর নাম এলা হেবার্ন। মায়ের হেবার্ন পরিচিতিই মেয়ে আপন পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করলেন। ব্রাসেলসে যাঁর জন্ম হলিউডের পটভূমিতে যাঁর খ্যাতি সেই অড্রে হেবার্ন শিক্ষালাভ করেছেন হল্যাণ্ডে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান ও ব্যালেও যথানিয়মে শিখতে আরম্ভ করলেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ-গান-ব্যালে শেখাও সমান তালে চলতে থাকল।

১৯৫৪ সাল অড্রের জীবনে এক স্মরণীয় মুহূর্ত। পরিণয়ের বন্ধনে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করলেন চিত্রাভিনেতা মেল ফেরারের সঙ্গে। জীবনের চলার পথে দোসর পেলেন। দু'জনে দু'জনের দিকে হাত এগিয়ে দিলেন। তাঁদের একটিমাত্র ছেলে সীন।

কোর দ্য ব্যালের সদস্যা অড্রে ক্যাবারে এবং টেলিভিসনে যোগ দিলেন। ছবিতে ছোটখাটো চরিত্রে রূপদান সুরু হল—লাফটার ইন প্যারাডাইস, ল্যাভেণ্ডার হিল, ইয়ং ওয়াইভস টেল, সিক্রেট পিপল প্রভৃতি ছবিগুলিতে অল্প পরিসর চরিত্রে তিনি দেখা দিয়েছিলেন।

১৯৫৩ সাল। অড্রের জীবনেতিহাসের এক বিজয়-বৈজয়ন্তীর বছর। এই বছরটিই তাঁর বিরাট জয়যাত্রার সূচনা ঘটিয়ে দিল। এই অবদটিই তাঁকে সারা পৃথিবীর জয়মাল্য এনে দিল, তাঁকে পরিচিত করল আন্তর্জাতিক চিত্রসমাজে। 'রোম্যান হলিডে' ছবিটি এই বছরই মুক্তি পায় এবং এই ছবিটিতেই তিনি প্রথম দীর্ঘ চরিত্রে তথা নায়িকার ভূমিকায় প্রথম অবতরণ করেন। পরের বছর সাব্রিনা, তার পরের বছর ওয়ার এ্যাণ্ড পীস। তারপর একের পর এক ফানি ফেস লাভ ইন দ্য আফটারনুন, গ্রীন ম্যানসনস, নানস স্টোরি, আনফরগিভেন, ব্রেকফাস্ট এ্যাট টিফানিস, চিলড্রেন্স পাওয়ার, প্যারেড মাই ফেয়ার লেডী, প্যারী হোয়েন ইট মিজলস, হাউ টু স্টীল এ মিলিয়ান, টু ফর দ্য রোড, ওয়েট আনটিল ডার্ক প্রভৃতি ছবিগুলির নাম উল্লেখ করতে হয়।

রঙ্গমঞ্চেও তিনি অনাগতা নন। গিগি, অনদিন, প্রোডিউসার্স শো-কেস প্রভৃতি নাটকগুলি তাঁর অভিনয় প্রতিভায় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করে গেছে, ১৯৫১ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য মঞ্চে অবতরণ।

রোজ্যান হলিডে' ছবিতে তাঁর অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসাবে এ্যাকাডেমী পুরস্কার তাঁর অধিকারে আসে।

১৯৬৮ সালে মেল ফেরারের সঙ্গে তাঁর চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনের সকল বন্ধন ছিন্ন হল। কয়েক মাসের মধ্যেই এক ইতালীয় চিকিৎসকের ঘরণী হিসাবে নিজের পরিচয় তিনি আইনসিদ্ধ করলেন। কয়েক বছর আগে বিখ্যাত অভিনেতা উইলিয়াম হোল্ডেনের সঙ্গে অড্রের অতি অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ মেলামেশা নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করেছিল। প্রসঙ্গত চিত্রখ্যাতা অড্রের দুই স্বামীর মধ্যে প্রথমজন তাঁর চেয়ে পনের বছরের বড় আর দ্বিতীয় জন তাঁর চেয়ে ন' বছরের ছোট।

—চিত্রপ্রিয়

সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব

গত ২১শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত কোলকাতায় ওরিয়েন্ট সিনেমা হলে সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশিষ্ট সোভিয়েট চিত্র-পরিচালক আলেকজাণ্ডার জগুরিদির নেতৃত্বে একটি সোভিয়েট প্রতিনিধিদল কোলকাতায় এসেছিলেন। উৎসবে সাতটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র দেখান হয়। এগুলি হল ৬ই জুলাই, মমতা, বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের ছায়া, আবার প্রেম নিয়ে, তোমায় ভালবেসেছিলাম, থ্রু ওয়াটার, ফায়ার এ্যাণ্ড ড্রামস অব ব্রাস ও হ্যামলেট, কয়েকটি ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সোভিয়েট চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এই প্রসঙ্গে নিচে দেওয়া হল।

পরিচালনা—যুলি কারাসিক।

কাহিনীটি ৬ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে। নবীন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ও বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়ছে। দেশে দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এসবের সুযোগ নিয়ে প্রতিবিপ্লবীরা চূড়ান্ত আঘাত হানবার সিদ্ধান্ত নিল। এদিকে শান্তির প্রশ্নে বাম সোসালিস্ট রেভলিউশানারীদের সঙ্গে বলশেভিকদের বিরোধ বাধে। কংগ্রেসে সাড়া না পেয়ে বাম সোসালিস্ট রেভলিউশানারীরা অন্য পথ নেয়। তাদের একজন জার্মান দূতাবাসে ঢুকে রাষ্ট্রদূতকে খুন করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খবর আসে ইয়ারোস-লাভল-এ বিদ্রোহ ঘটেছে। মস্কোর সোসালিস্ট রেভোলিউশানারীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ বাধায়। তারা জার্কিনসাঙ্কিকে গ্রেপ্তার করে ও তার অফিস, বিদ্যুৎ-কেন্দ্র ও ক্রেমলিন দখল করার চক্রান্ত করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই দিনটিতেই ভি, আই, লেনিনের প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ দেখা যায়। বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে তীব্র আপোষহীনতা, জয় সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকট হয়ে ওঠে। রাজধানীতে শ্রমিক-বাহিনীগুলিকে সশস্ত্র করা হল। বিপ্লবের প্রতি অনুগত রেজিমেণ্ট-গুলি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তুমুল লড়াইয়ের পর ভোরের দিকে সোসালিস্ট রেভলিউশানারীদের নিরস্ত্র করে ফেলা হয়। পঞ্চম কংগ্রেসের কাজ আবার শুরু হয়।

রাশিয়ান চিত্র 'শ্যাডোস অফ ফরগটন এ্যানসেসটর্স' চিত্রের একটি বিবাহ-দৃশ্যে তাতিয়ানা বেস্টেভা ও নিকোলাইচুক

মমতা

যৌবন, পবিত্র প্রেমের প্রথম আবেগ ও গভীর নৈতিক সত্যের উপলব্ধি ছবিটির উপজীব্য।

কিশোর সশ্তার যৌবনে পা দিয়েই লেনার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু লেনা তার চেয়ে বয়সে বড় ও সে তার নিজের কাজের ভাবনায় মশগুল। এদিকে তিমুর তাকে বিয়ে করবে বলে সব ঠিক হয়ে আছে। এমন সময় ঘটল এক দুর্ঘটনা— একটি ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে লেনার মৃত্যু হল।

এক কার্নিভালে সশ্তার ভিড়ের মধ্যে ক্রন্দনরতা মামুরাকে দেখতে পেল। মামুরা তিমুরের কাছ থেকে লেনার মৃত্যুসংবাদ শুনেছে। তাকে সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে আসে সশ্তার। সে জানে না মামুরা কি কারণে কাঁদছে।

জীবন, প্রেম, ঈর্ষা ও মৃত্যু এ-সবের বিশ্লেষণসমৃদ্ধ ছবি মমতা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ই, ইশমগাম-মেদোপ।

তোমায় ভালবেসেছিলাম

ম্যাক্সিম গর্কী ফিল্ম স্টুডিওতে তোলা এই ছবিটিতে তরুণ-তরুণীদের প্রথম প্রেমের কথা বলতে গিয়ে চিত্র-নির্মাতা দক্ষতার সঙ্গে তরুণদের উপর শিল্পকলার মহৎ প্রভাবের ভাব-ধারাটিকে মিলিয়েছেন।

কোলিয়া অপরিচিত একটি মেয়ের কাছ থেকে হঠাৎ একটি ব্যালের টিকিট পেয়ে গেল। মেয়েটি এই ব্যালেতে অংশ নিয়েছে। এইভাবে নাদিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সূচনা। একদিন নাদিয়ার একটি নিমন্ত্রণে যাবার আগে কোলিয়া নিজের ধারণায় ফ্যাশনদুরস্ত হয়ে সেখানে গেল। কিন্তু ফল হল উল্টো। নাদিয়া তাকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল। পরে নাদিয়াকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার সময় কোলিয়া তার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করায় দুজনার মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায় এরপর থেকে কোলিয়ার চালচলন মেজাজ চলে যায়। একাগ্রমনে সে পড়াশুনা করতে থাকে এবং সাহিত্যের পরীক্ষায় পুশকিনের 'প্রেমের কবিতা' চমৎকার আবৃত্তি করে শুনিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু নাদিয়ার সঙ্গে আবার দেখা করতে সে লজ্জা-বোধ করছিল। কিন্তু নাদিয়াকে সে ভুলতে পারল না। একদিন মহলার সময় নাদিয়ার নজর পড়লো কোলিয় তার দিকে প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।----

আবার প্রেম নিয়ে

দুটি সাধারণ তরুণ-তরুণী। তাদের দুজনের সাক্ষাৎ দিয়ে ছবিটির শুরু। অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু বলা যায় আবেগের জীবন। আলাপ-আলোচনা, আবার কলহ, সুখ তারপর সাময়িক বিচ্ছেদ, আবার সাক্ষাৎ, সমগ্র ছবিটি জুড়ে আবেগের উত্থান-পতন, সংশয়, ভুল বুঝাবুঝি, অবিশ্বাস, তীব্র ঈর্ষা, পরস্পরের সম্পর্কে ভয়, আবার পরস্পরের প্রতি মমতা। দুটি তরুণ-তরুণীর পরস্পর সম্পর্কের গভীর ও আন্তরিক অনুভূতিতে ভরা সম্পর্কের কাহিনী এই ছবিটি।

সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ৫০ বছর

১৯১৯ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখটিকে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের জন্মদিবস বলে গণ্য করা হয়। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময়ই সোভিয়েট চলচ্চিত্র প্রথম পদক্ষেপ করেছিল। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর চলচ্চিত্র দ্রুত এগিয়ে যায়। ১৯২২ ও '২৫ সালের বেশ কিছু আগ্রহোদ্দীপক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। কিন্তু সমগ্র বিপ্লবী তৎপরতাকে তুলে ধরার জন্য এই তৎপরতার সামাজিক উপাদান, নতুন শৈলিক বাহন নতুন পদ্ধতি ইত্যাদি বের করা প্রয়োজন হয়েছিল এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন নবীন পরিচালকেরা' ১৯২৫ সালে মুক্তি পেল আইজেন-স্টাইনের 'দি স্ট্রাইক', এরপরেই এল তাঁর সুবিখ্যাত ছবি 'পোতেমকিন যুদ্ধ জাহাজ'। এর এক বছর পরেই 'মা' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হল।

ত্রিশ দশকের পর থেকে সোভিয়েট সিনেমা সত্যিকার জনপ্রিয় ও মৌলিক শিল্পকলা হয়ে ওঠে। সোভিয়েট নির্বাক চিত্রগুলি পৃথিবীর বহু দেশে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। এই সময়েই এল চলচ্চিত্রে শব্দ প্রয়োগের যুগ। ত্রিশের দশকের সোভিয়েট রঙ্গ-মঞ্চের অভিনেতারা আকর্ষণীয় চরিত্র সৃষ্টি করলেন। এরূপ ছবির নাম করা যায় অস্ত্রভস্কির—'ঝড়' ও 'বিনা পণের কনে', দস্তয়ভস্কির—সেণ্ট পিটার্সবার্গের 'রাত', এবং পুশকিন, তুর্গেনেভ, টলস্টয়, গোগোল, বলজাক ও মোপাসাঁ-এর রচনার ভিত্তিতে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলি।

ফ্যাসী বিরোধী যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে তোলা নিউজ রীল গুলি সোভিয়েট নরনারীর অবিনশ্বর কীর্তিকে তুলে ধরেছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে ত্রিশ লক্ষেরও বেশী দীর্ঘ ছবি তোলা হয়েছিল। কাহিনী-চিত্রগুলিও নতুন নতুন গতিশীল আঙ্গিক খুঁজে পেয়ে-ছিল।

তৈরী হয় বৈপ্লবিক ছবি। আইজেনস্টাইন তৈরী করলেন 'ইভান দি টেরিবল'। যুদ্ধোত্তর যুগের সমাপ্তি ঘটে '৫৩ সালে আবার প্রাধান্য পেতে শুরু করে সাময়িক ঘটনাবলী। নৈতিকতা প্রেম, বন্ধুত্ব, সৃজনশক্তি তৎপরতা এবং দৈনন্দিন জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা নিয়ে তৈরী হয় নতুন নতুন চলচ্চিত্র। ক্রমে বছরে পূর্ণ দৈর্ঘ কাহিনী চিত্র তৈরীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১২০। বছরে বিক্রি হয়েছে ৪০০ কোটি সিনেমা টিকিট। সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্প সোভিয়েট সমাজে যে সব প্রক্রিয়া ঘটছে সেগুলি প্রতিফলিত করে চলেছে।

পিতাপুত্র

রাজকুমার মৈত্র রচিত সামাজিক প্রেমকাহিনী পিতাপুত্রকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন প্রবীণ ও খ্যাতিমান চিত্র-পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটিতে সুর সংযোজনা করেছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন কমল মিত্র, ছায়াদেবী অনুপকুমার, তরুণকুমার, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, গীতা দে, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন বোম্বাইয়ের সুদক্ষ অভিনেত্রী শ্রীমতী তনুজা সমর্থ। নায়কের চরিত্রে স্বরূপ দত্ত। চিত্রটির নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত চিত্র 'পিতাপুত্র'। চিত্রটির মুক্তি আসন্ন।

সমান্তরাল

সুলেখক শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী কৃত কাহিনীকে চিত্রে রূপদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীগুরু বাগচী। চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা নির্মল দে'র। চিত্রটির সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন শ্যামল মিত্র। সিলি পিকচার্স চিত্রটির পরিবেশক। চিত্রটির শিল্পি-তালিকায় রয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়) অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পদ্মা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, কালী সরকার, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, মাঃ মলয় প্রমুখ।

সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

আর ডি বনসল প্রযোজিত 'চৈতালী' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও তনুজা
চিত্র : দিলীপ বসু

শুকসারী

ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী শুকসারীকে চিত্রায়িত করছেন সুধীর মজুমদার। কাহিনী-চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পীযূষ বসু। চিত্রটির সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই সঙ্গীতবহুল চিত্রটির নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে রূপ দান করেছেন উত্তমকুমার ও শ্রীমতী অঞ্জনা ভৌমিক। চিত্রটিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে,

লীলা ঘটক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, [illegible] মুখোপাধ্যায়। চিত্রালী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় চিত্রটির শীঘ্রই মুক্তিলাভ ঘটবে। বি কে প্রোডাকসন্সের চিত্র 'শুকসারী।'

পদ্ম-গোলাপ

সুসাহিত্যিক ডাঃ বিশ্বনাথ রায় রচিত কাহিনী 'পদ্মগোলাপ' রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করছেন চিত্র পরিচালক শ্রীঅজিত লাহিড়ী। চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাস। চিত্রটির সঙ্গীতাংশের বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে শ্রীশ্যামল মিত্রের উপর। চরিত্রচিত্রণে রয়েছেন শ্রীমতী অপর্ণা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার প্রমুখ। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন শ্রীশুভঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

কলঙ্কিত নায়ক

ডাঃ বিশ্বনাথ রায় কৃত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীসলিল দত্ত। চিত্রটির পরিচালনাও করছেন শ্রীসলিল দত্ত। চিত্রটিতে সুর দিচ্ছেন প্রবীণ সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটিতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, অপর্ণা, বিকাশ রায়, অনুপকুমার ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীরা। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন এস, বি, ফিল্মস।

শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' চিত্রে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্র বোম্বাই

চলচ্চিত্রলোকের স্বপ্ন-মহলে আপন কৃতিত্বের স্বর্ণস্বাক্ষর খোদাই করার পালা শুরু হয়েছিলো সে যুগের আকাশ বাতাস মথিত করা ছবি 'মহল'-এর মাধ্যমে। তারপর সেই রেখাঙ্কনের সাধনা চললো ছবির পর ছবিতে, গড়ে উঠলো 'বাদল', 'আরাম', 'খাজানা', 'সইয়াঁ', 'সাকী', 'সঙ্‌দিল', 'বহুত দিন হুয়ে', 'চাকে-কি মলমল', 'চল্‌তি কি নাম গাড়ি', 'কালাপাণি', 'ইনসান জাগ উঠা', 'জালি নোট', 'খবরু', 'মুঘল-এ-আজম' --- শিল্পীর স্মরণীয় অভিনয়দীপ্ত চিত্ররাজি। এসবের আগে —একেবারে সূচনায় যখন নামের প্রথমে লেখা হোতো 'শিশু শিল্পী', সেই দিনের প্রথম প্রয়াসই দর্শকবন্দনায় ধন্য হয়েছিলো। সে ছবি 'বসন্ত'। স্বর্গত অমিয় চক্রবর্তী পরিচালিত বম্বে টকিজের বিজয়-বৈজয়ন্তী। আজও হয়তো অনেকের কানে বাজতে পারে সেই প্রখ্যাত গানটির পংক্তি ক'টি: 'তুমকো মুবারক হো উঁচে মহল ইয়ে, হামকো হ্যয় প্যারী হামারি গুলিয়াঁ।' অবিশ্যি তখন নাম ছিলো মমতাজ জাহাঁ বেগম। কখন সে অভিধা মধুবালা-য় পরিবর্তিত হ'য়েছে অনেকেরই তা হয়তো স্মরণ নেই। কিন্তু জাতশিল্পী যে অতন্দ্র সাধনায় নামের মধু অকাতরে বিতরণ করে গেছেন দু'দশক ধরে ঘর এবং বাইরের আপামর জনসাধারণকে, তাতে আর সন্দেহ কি। তাই তো অকস্মাৎ ফেব্রুয়ারীর তেইশ তারিখের ওই দু:সংবাদে চিত্রামোদী মাত্রেই সংশয়াতীতভাবে মর্মাহত হলেন। শ্রীমতী মধুবালা 'মুঘল-এ-আজম' ছবির অকল্পিত সাফল্যের পর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'য়ে শয্যাশায়ী হ'ন। তিন বছর আগে বিদেশে গিয়েছিলেন বিশেষ চিকিৎসার জন্যে। তখন অনেকেই আশা করেছিলেন হয়তো আগামী দিনের দর্শকরা তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু ধরে রাখার মতো নিদর্শন লাভ করবে। সে আশা সফল হ'তে চলেছিলো বৈকি, দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কালো পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলে তিনি আবার অংশ নিচ্ছিলেন 'চালাক' নামের ওই ছায়াছবিটিতে। রাজকাপুরের বিপরীতে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু হায়রে মানুষের প্রচেষ্টা। কালের অমোঘ শাসনে ছবিটি

রমেন চৌধুরী

অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। যদিই বা কোনো দিন ছবিটি সাধারণ্যে দর্শন দেয় তাহ'লেও দেখতে পাওয়া যাবে না নায়িকারূপিণী মধুবালাকে পুরোপুরি। তিনি অমরলোকে প্রয়াণ করেছেন।

তারকা-কাহিনী কিংবদন্তীর মতো। কিছু বাস্তব, অনেকটা কল্পনায় মেশানো। কিন্তু অধিকাংশের মতো শ্রীমতী মধুবালা নিজেকে পর্দার বাইরে লোকচক্ষুগোচর করতে বিশেষ অনাগ্রহী ছিলেন। তাই সহজে তাঁকে কোনো সমাবেশে কিংবা ছবির প্রিমিয়ারে (নিজের ছবির ক্ষেত্রেও) প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ছিলো না। তাঁর সুতীব্র অনীহার কারণটি খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিলো। একবার তিনি কোনো উদ্যোক্তাকে বলেছিলেন —'যে অনুষ্ঠানে শুধু বর্তমানের সৌভাগ্যবানদের নিয়ে মাতামাতি করা হয়, যাতে অতীতের কাউকেই স্মরণ করার রীতি নেই—সে আসরে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ডাকবেন না। কারণ এটা তো ঠিক, ভবিষ্যতে আমিও যখন ফুরিয়ে যাবো, আমাকেও তখন আপনারা বর্জন করতে ভুলবেন না।'

বিশ বছরের তারকাজীবনে শতাধিক চিত্রে তাঁকে অংশ নিতে আমরা দেখেছি। শিল্পীর একান্ত সাধ ছিলো আরো অনেক ছবিতে অভিনয় করার। আরো উজাড় ক'রে নিজেকে সঁপে দিতে ছবির মাঝে সৃষ্টির সাধনায়। ন'বছরের অসুস্থতা তাঁকে অবদমিত করতে পারে নি বিন্দুমাত্র। প্রকৃত শিল্পিসুলভ মনের অধিকারী ছিলেন। ভেবেছিলেন রোগমুক্ত হয়েই আগের মতো আবার নিয়মিত কাজের সমুদ্রে ডুবে যাবেন। এতো তাড়াতাড়ি এই সুন্দর ভুবন থেকে বিদায় নেবেন না।

তবু হারিয়ে গেলেন শ্রীমতী মধুবালা। খোদাতালার দরবারে তাঁর হাজিরা দেবার ডাক এসে গেল। চলে গেলেও কিন্তু তাঁকে সেলুলয়েডের ফিতেয় বেঁধে ফেলতে পেরেছি। অনুরাগীদের এই বা সান্ত্বনা।

●

রাজকাপুর প্রযোজিত পরিচালিত সর্বাধুনিক ছবি 'মেরা নাম জোকার' ফ্লোরে থাকতে থাকতেই যেভাবে দর্শক-হৃদয় জয় করে নিয়েছে, মুক্তি-পাওয়া ছবির ভাগ্যেও তা সচরাচর ঘটে না। রিলিজের সময় কী কাণ্ডটাই না করবে। 'সঙ্গম'-এর চেয়েও নাম এবং দাম পাবে বলেই তো সকলের ধারণা। ছবিটি সম্বন্ধে নতুন একটা খবর আছে। এ ছবিতে বম্বের অধিকাংশ খ্যাতিমান নায়কই বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন ধরুন বিশ্বজিৎ, ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্না এবং রাজেন্দ্রকুমার-এর সঙ্গে সইপত্র সারা। রাজ ভেবেছিলেন এই সঙ্গে রাজকুমারকেও দলে ভিড়িয়ে নেবেন। কিন্তু তা বুঝি আর সম্ভব হোলো না। রাজকুমার পত্রপাঠ 'না' বলে দিয়েছেন। রাজকুমারের একটা বিশেষ আভিজাত্য রয়েছে, দর্শক-মহলে তাঁর প্রতিপত্তিও অনেকখানি। রাজকাপুর

নিশ্চয় এটা আরো বড়ো হবে না কি। তাঁর ইচ্ছা না হবে—তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষটা রক্ষে হয়নি। আবার দিলই এই গণ্ডগোল ঘটছে বোধ হয়।

মীনাকুমারী হঠাৎ আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। খবরে জানা গেল দিল্লীতে 'শামে গালিব' অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতে গিয়েছিলেন। মির্জা গালিব রচিত কয়েকটি গজল আবৃত্তি করছিলেন, এমন সময়েই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন শিল্পী। রক্তবমন হোলো অতিরিক্ত পরিমাণে। অবিলম্বে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় তাঁকে সুস্থ করে তোলা হয়। নার্গিস দত্ত, মালা সিনহা, মিন্নি সেই সময়ে যথাসাধ্য সেবা করেছেন। বোম্বাই নিয়ে আসার সময়েও তাঁরা সঙ্গে ছিলেন। এর পর জলন্ধরে 'শামে গজল' নামে অনুষ্ঠানটিতে শ্রীমতী মীনার অংশ নেবার কথা ছিলো—সে ব্যবস্থা রদ করা হয়। এখন মীনাজীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামের বিধান দিয়েছেন চিকিৎসকরা। চলেছে রীতিমত ডাক্তারী ব্যবস্থাদি। তিনি অচিরে রোগমুক্ত হোন, কামনা করি।

বাঙলার অজয় বিশ্বাস দীর্ঘদিন বম্বেতে রয়েছেন। তাঁর পরিচালনায় 'সম্বন্ধ'-এর কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। কিছুদিন আগে ছবির যে ট্রায়াল শো হয় সেখানে শিল্পী প্রযোজক প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেল। তাঁরা তো ছবির সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। ফিল্মালয়ের এই নিবেদনটিতে সর্বসাকল্যে বারোখানা গান আছে। সবগুলিই আকর্ষণীয় হয়েছে নাকি।

আরেক খবরে দেখা যাচ্ছে শ্রীবিশ্বাস এবার শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল রচিত সাড়া জাগানো থ্রিলার 'রক্তনদীর ধারা'-কে চিত্রায়িত করতে চলেছেন। কলকাতার গুণ্ডা বোঁদার রক্ত জলকরা কীর্তি-কাহিনী অবলম্বনে এটি লেখা। পঞ্চানন-বাবুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট গল্পের এই হিন্দী চিত্ররূপটি ইস্টম্যান কালারে তোলা হবে। বোঁদা গুণ্ডারূপে কাকে দেখা যাবে জানেন? বিশ্বজিৎকে। শিল্পী-নির্বাচন ভালো হয়েছে বলেই মনে হয়। সুরসঙ্গতিতে অংশ নেবেন ও পি নায়ার। বর্তমানে ছবির প্রাথমিক কাজ এগুচ্ছে।

'কতো রূপে দিলে দেখা'। অধুনা-বিস্মৃত একটি গানের কলি। কবি সে সময় কাকে উদ্দেশ করে বলেছেন জানি না। কিন্তু আজ স্বচ্ছন্দে এটা বলা যায়—এখানকার শাশ্বত নায়ক অশোককুমারকে। দেখতে দেখতে চারটে দশক কালের গর্ভে লীন হ'য়ে গেছে কিন্তু এই জাতশিল্পী সমানে মুখ্য ভূমিকায় অংশ নিয়ে চলেছেন। শুধু যে অভিনয় করে চলেছেন নিয়ম মাফিক—তাতো নয়। ক্রমেই যেন পারদর্শিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছবিতে যতো ভালো অভিনয় করতে দেখছি, পরের ছবিতে তার চেয়েও আকর্ষণীয় রূপটি চোখে পড়ছে। এমন দক্ষতা অনেকেরই নেই, এটা নিশ্চয় বলার দরকার করে না। অশোককুমারের গুণের অবধি নেই—হ্যাঁ, সত্যিই তাই। উনি অভিনয় ছাড়াও অনেক কিছু হাতে কলমে জানেন। উনি হাত দেখতে পারেন, সংখ্যা গণনা (নিউমারোলজি) জানেন, হোমিওপ্যাথিতে দক্ষ, ভালো আঁকিয়ে এবং দাবা খেলাতেও ওস্তাদ। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে রেকর্ডিং-এও যথেষ্ট হাত পাকিয়েছেন। টেপ রেকর্ডার নিয়ে এই ব্যাপারে অনেক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিচ্ছেন। ওঁকে তাই অনায়াসে বলা যায়: কতো রূপে দিলে দেখা।—

ইন্দ্রনাথের সুরজিত

উচ্চাভিলাষী সুরজিত শিক্ষাদীক্ষা ও সামর্থ্যের অধিকারী। কিন্তু বহুগুণের অধিকারী হয়েও সুরজিত আত্মকেন্দ্রিক। ফলে একদেশদর্শী সুরজিত তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না। ধীরে ধীরে তার কর্মজীবনে পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের কালোছায়া ঘনিয়ে আসে। বিপর্যয় বলা হল এই কারণে যে সুরজিতের বিরোধিতা তো অন্য কারো সংগে নয়। তার প্রতিপক্ষ কে? স্ত্রী? বন্ধুবান্ধব? কর্তৃপক্ষ? আসলে সে নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ। বিরোধিতা তার নিজের সংগেই। কাজেই বিপর্যয় তো আসবেই। বিপর্যয় কি পরিণতি? এর জবাব পাওয়া যাবে ইন্দ্রনাথ রচিত ও ম্যাক্সমুলার ভবন আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক 'সুরজিতে'।

সুরজিত নাটকটি পরিচালনার গুরু-দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীঅঞ্জন দাশগুপ্ত। তিনি নাটক পরিচালনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা দর্শক মনে দীর্ঘদিন গভীরভাবে দাগ কেটে থাকবে।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অপূর্ব অভিনয়দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তাঁরা হলেন—বীথি গংগোপাধ্যায়, চিত্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গৌর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মুখোপাধ্যায়, বিলাস মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, শক্রা রায়চৌধুরী, অশোক বসু, সমর ঘোষ ও অনুপ দাশগুপ্ত।

সুরজিত নাটকটির প্রযোজনায় ছিলেন আগন্তুক গোষ্ঠী। অনবদ্য নাট্যসৃষ্টির জন্য নাট্যকার, নির্দেশক, শিল্পী ও অন্যান্য কলাকুশলীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

"Nothing is more disgraceful than insincerity."

—*Cicero*

শত্রুপক্ষের দূত বিদায় লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা প্রতাপাদিত্য মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন। মন্ত্রিবর শঙ্কর, গৃহকুলগৌরব প্রধান সেনাপতি সূর্যকান্ত, অগাধবুদ্ধি ভবানী দাস এবং অন্যান্য প্রধান কর্মচারিগণ জরুরী ডাক পেয়ে দ্রুত উপস্থিত হলেন। সকলেই যেন চিন্তাকুল, স্তব্ধ, গম্ভীর। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, আকাশপ্রান্তে কৃষ্ণমেঘ ঘনিয়েছে। ঝড় উঠতে আর খুব বেশী দেরী নেই। সকলেই অবগত হয়েছেন, আমীরগণের আদেশ অনুসারে শত্রুদূত কর্তৃক প্রেরিত অসি ও শৃঙ্খলমধ্যে মহারাজা প্রতাপাদিত্য অসিই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এক্ষণে যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন পন্থা নেই। সভার মধ্যমণি বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপকেও দেখায় যেন চিন্তাগ্রস্ত, স্থির, অচঞ্চল। অহারাজা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—আপনারা ব্যক্ত করেন, যুদ্ধ কি প্রণালীতে পরিচালিত হবে? কোন্ উপায় অবলম্বন করলে আমাদের সৈন্যক্ষয় না হয়ে শত্রুপক্ষ সমূলে নির্মূল হবে?

এতদ্বিষয়ক নানা প্রকার প্রশ্ন ও আলোচনা চলতে লাগলো।

মহাবীর শঙ্কর বললেন,—রাজন্, শত্রুগণ বিপুল বাহিনী-সহ আমাদিগের রাজ্যমধ্যে অবস্থান করছে, এরূপ অবস্থায় আমাদিগের আর নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করা উচিত নয়।

প্রধান সেনাপতি সূর্যকান্ত অকপটে বললেন,—শত্রুগণ এক্ষণে জলাভূমি ও নদীজালে পরিবেষ্টিত হয়েছে। তাহাদিগকে রাজধানীর সমীপবর্তী হতে দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য বললেন,—এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদের কী কর্তব্য, সূর্যকান্ত তুমিই ব্যক্ত করো।

সূর্যকান্ত বললেন,—আমার বিবেচনায় শত্রুপক্ষীয় নৌকাসকল সর্বাগ্রে ধ্বংস করে দেওয়া হোক। তদনন্তর শত্রুগণ যাহাতে পলায়ন করতে না পারে তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভ করা হোক। সম্মুখে বর্ষা সমীপবর্তী, যে পর্যন্ত না বর্ষাকাল উত্তমরূপে আগমন করে সেই সময় পর্যন্ত শত্রুগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হবে। ততঃপর বর্ষাঋতু আগমন করলে, সমগ্র পৃথিবী তাহাদের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হলেও কেহ তাহাদের যমের করাল দংষ্ট্রা হতে রক্ষা করতে পারবে না। স্বভাবতঃই আমাদের দেশের বর্ষাকাল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক। তদুপরি তাহারা আবার বিদেশী। সুতরাং শত্রুপক্ষীয় শিবির-সমূহ অচিরে রোগীপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই সময়ে আমরা অল্প প্রয়াসে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করতে সমর্থ হবো।

প্রধান সেনাপতি এইরূপ নানা প্রকার হিতগর্ভ উক্তির পর নিস্তব্ধ হলে সকলেই তাঁর অশেষবিধ প্রশংসা করলেন এবং তাঁর বাক্যানুসারে কার্য করতে প্রবৃত্ত হলেন।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য অধীনস্থ সেনাপতিগণকে আহ্বান-পূর্বক যুদ্ধের জন্য আজ্ঞা প্রদান করে বললেন,—স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রত্যেক স্বদেশবাসীর সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। যদি এই ধর্মযুদ্ধে কোন ব্যক্তি বৃক্ষচ্ছেদনপূর্বক পথরোধ করে শত্রুসৈন্যকে একমুহূর্তের জন্য রোধ করতে পারেন, তাহা হলে এক সময় এইরূপ সামান্য ঘটনায় দেশের ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হতে পারে। তাই বলি, বীরগণ, আমাদিগের এই যুদ্ধের সহিত দেশবাসী জনসাধারণ যাহাতে একহৃদয়ে শত্রুগণকে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়েও যেন আপনারা যত্নবান হন। আপনারা এক্ষণে দলে দলে বিভক্ত হয়ে কার্য করতে প্রবৃত্ত হউন।

কথার শেষে কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত থেকে মহারাজা আবার বললেন,—কোন্ দল রাস্তা-ঘাট, জনপথ প্রভৃতি গমনপথ সকল রোধ করেন। কোন্ দল শত্রুগণ যাহাতে বাহিরের সংবাদ প্রাপ্ত না হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করেন। কোন্ দল শত্রুসৈন্যের খাদ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে বাধা প্রদান করেন। কোন্ দল শত্রুসৈন্যের গতিবিধি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করেন। প্রত্যেক দল বিভিন্ন হলেও যেন পরস্পর মিলিত হয়ে কার্য করেন। আবশ্যক হলে তাঁরা যেন একপ্রাণে মিলিত ও নিযুক্ত হন। শত্রুগণ আমাদের হৃদয়ের উপর অবস্থান করে শোণিত শোষণ করছে। এইরূপ অবস্থায় সকলে ধীরভাবে প্রাণপণে কার্য করতে অগ্রসর হউন।

যুদ্ধ-উদ্যোগের প্রাথমিক সাধারণ উপদেশাবলী—সকলেই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে স্থিরচিত্তে শ্রবণ করলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা, মাতৃভূমির গৌরব বিপন্ন হতে চলেছে বিজাতীয়দের সম্ভাব্য আক্রমণে—তাই সকলেই যেন সমব্যথার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। দেশের ডাক—সাড়া দিতেই হবে। রাজ-শাসনে নির্ভরশীল অনুরাগী দেশবাসীদের রক্ষা করতেই হবে।

মহারাজা যেন কাকে সন্ধান করছেন চোখের দৃষ্টিচালনায়। যাঁকে চাইছেন তাঁকে দেখে পরিতৃপ্তির হাসির সঙ্গে বললেন,—নৌ-সেনাপতি রডা, তুমি যুদ্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ, তুমি অক্লান্ত-কর্মা মহাবীর। তুমি আমার নৌসেনা পরিচালক। শত্রুনৌকা সকল আক্রমণ কর। আর কালক্ষেপ নয়।

নির্দেশ-দান আবার খানিক স্থগিত রেখে কী যেন ভাবতে থাকলেন প্রতাপ। চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে এধার-সেধার দেখতে

দেখতে মহারাজা বললেন,—সুখদ ও সুখা, তোমরা দুইজনে যথাক্রমে শত্রুসৈন্যের গমনাগমনপথে এবং তাদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের সকল প্রকার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করবে।

এইরূপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হল। আকাশে-বাতাসে রণ-দামামার ধ্বনি বেজে উঠল। কখনও বাঙলার সেনাগণ মোগল-গণকে পরাজিত, কখনও বা মোগলগণ বঙ্গীয় সেনাদের পরাজিত করতে লাগলো।

মোগলদের অধিকাংশ নৌকা ও খাদ্যদ্রব্য বঙ্গীয়দিগের হস্তে পতিত হতে থাকে। কিছুকাল যাবৎ এই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চলতে থাকলো। জয়-পরাজয় কোন পক্ষেই নির্নীত হয় না।

ক্রমে বর্ষাও ঘনিয়ে আসতে থাকে।

বর্ষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমীরগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হল। কেউ কেউ শীঘ্রই স্থানত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। অপর পক্ষ বললেন,—দুই-চারি দিনের মধ্যেই যুদ্ধের ফলাফল ঘোষিত হবে, অতএব কয়েক দিবসের জন্য আমাদিগের এত ক্লেশ ও পরিশ্রম, এত জয় সমস্তই কী বৃথা যাবে? আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দেখতে দেখতে ঘনঘোর বর্ষা নামলো। অবিমিশ্র ধারা-বর্ষণ চলতে থাকে অহোরাত্র। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত দেশ জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। উন্নত প্রদেশসমূহ দ্বীপাকার ধারণ করলো এবং স্থলচর প্রাণীদিগের একমাত্র আবাসভূমিতে পরিণত হল। নানা প্রকার বিষাক্ত সর্প, কীট, মশক ও জলোকা প্রভৃতি উৎপাত সুরু করলো। জ্বররোগ মোগল শিবিরমধ্যে ধীরে ধীরে আগমন করে ভৈরব-মূর্তি ধারণ করলো।

দুর্ভিক্ষ ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে অন্তরাল হতে উঁকি মারতে লাগলো।

মোগলগণ এখন আর অগ্রসর হতে পশ্চাদগমন করতে পারলেন না।

মোগল শিবিরের দুরবস্থার সংবাদ প্রতাপের কর্ণগোচর হতে মহারাজা অকস্মাৎ একদিন সমস্ত সৈন্যসহ মোগলগণকে চতুর্দিক হতে আক্রমণ করলেন।

এই লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ যুদ্ধকালে একদিক থেকে নির্ভয়চিত্ত রডা রণতরী হতে মোগলদের ওপর অশনিসম অগ্নি-বৃষ্টি করতে লাগলেন। কোনদিক হতে গজারূঢ় সৈনিকগণ কালান্তক যমের ন্যায় মহাপরাক্রমে মোগলব্যূহ ভেদ করলো। কোনদিক হতে পদাতিকগণ শাণিত তরবারি চালিয়ে শত্রুদের খণ্ড খণ্ড করতে লাগল।

হিন্দুগণের 'কালী, কালী' ধ্বনির সঙ্গে মোগলদের 'দীন্ দীন্' ধ্বনি মিলিত হওয়াতে দিকসকল প্রকম্পিত হতে থাকল।

শত্রু করতলস্থ হয়েছে, এক্ষণে শত্রুকে পদদলিত করতে পারলেই বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে হস্তগতা হন, এই আশায় উৎসাহিত হয়ে হিন্দুগণ ঘোরতররূপে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কয়েক দিন ধরে ভয়ংকর যুদ্ধ হওয়াতে বেশ কয়েকজন মোগল সেনাপতি নিহত হলেন। এজন্য মোগলগণ বিজয়-বিষয়ে হতাশ হয়ে হতবীর্য হয়ে পড়ল।

সেনাপতিদের মৃত্যু-সংবাদে মোগলগণ নিরুৎসাহ হয়েছে জেনে প্রতাপ ঘোরতর পরাক্রমে তাদের আক্রমণ করলেন। মোগলরা কোনরূপেই বাঙালী সেনাদের বেগ রোধ করতে পারলেন না।

অবশেষে মোগলগণ জয়ের আশা ছেড়ে পলায়ন করতে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু চতুর্দিকেই বাধা, অবরোধ। কেউ আর পালাতে পারে না। তাই হতাবশিষ্ট সকলেই বন্দী হল।

ইছামতীতটে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় এই স্থানের নাম পরিবর্তন করা হয়। নাম দেওয়া হল সংগ্রামপুর।

যুদ্ধ-বিজয়ের পর মহারাজা প্রতাপাদিত্য মোগল-বন্দিগণের পদমর্যাদা অনুসারে তাঁদের সসম্মানে গ্রহণ করলেন। তাঁদের অবস্থানের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর মহারাজা বন্ধুগণসহ বহুল পরিমাণে বিজয়লব্ধ দ্রব্যসহ যশোর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মোগলগণের পরাজয়কথা সমস্ত বাঙলাদেশে ব্যাপ্ত হল। বঙ্গদেশ এতদিনে মোগলদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হল।

দেশের লোক আবার নির্ভয়ে শঙ্খধ্বনি করতে লাগলো। সকলেই প্রার্থনা জানালেন,—ঈশ্বর, প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর প্রভৃতি বীরগণকে দীর্ঘজীবন দান করেন। বঙ্গদেশ রক্ষাপ্রাপ্ত হোক।

মোগলকুলগৌরব মহাভাগ আকবর রাজধানী আগ্রায় মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। কুমার খসরু স্বীয় মাতুল মহাবীর মানসিংহ এবং শ্বশুর মন্ত্রিপ্রবর আজিম খাঁর সাহায্যে রাজ্যের শাসনদণ্ড অধিকারের জন্য পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।

এই দুঃসময়ে সুদূর বঙ্গদেশে মোগলসৈন্যের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং দ্বাবিংশ আমীরের নিধন-সংবাদ রাজধানী আগ্রাতে নীত হয়। সম্রাটের মৃত্যু আসন্ন। পিতাপুত্র আপন আপন ভুজবলে সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রস্তুত হওয়াতে রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের পূর্ব-লক্ষণ সকল লক্ষিত হ'তেছিল। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কে কিরূপভাবে অভিনয় করবেন, সেই-সকল চিন্তায় তাঁরা সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন।

বঙ্গদেশের কোন্ নিভৃত স্থানে মোগল-সৈন্যের জয় বা পরাজয় হয়েছে—এই ক্ষুদ্র চিন্তা তাঁদের মস্তিষ্কে উপস্থিত হওয়ার অবকাশ প্রাপ্ত হল না।

কালক্রমে দেবচরিত্র আকবর মানবলীলা সংবরণ করলেন।

মানসিংহ, আজিম খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ খসরুকে সিংহাসনে বসাতে অসমর্থ হয়ে পলায়ন করলেন।

কুমার সেলিম পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করে এই সকল অন্তর্বিপ্লব কিরূপে নিবারিত হয়, কিরূপে প্রবল পরাক্রান্ত মানসিংহকে হস্তগত করা যায়, কিরূপে আজিম খাঁ প্রমুখ প্রধান কর্মচারিগণ শত্রুতা পরিত্যাগ করে মিত্রতা অবলম্বন করেন, এই সকল বিষয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি প্রদান করেন।

সম্রাট কর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধের বশবর্তী না হয়ে শান্তভাবে স্বীয় পুত্র এবং মানসিংহ প্রমুখ কর্মচারিগণকে তাঁদের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করে স্বীয় কর্মে আগমন করতে অনুরোধ জানালেন।

মানসিংহ প্রমুখ বীরগণ খসরুর পক্ষ পরিত্যাগ করে আবার জাহাংগীরের নিকট আগমন করলেন। মানসিংহের অধীনে এই সময়ে প্রায় বিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত আছে। এতদ্ব্যতীত রাজপুত জাতির উপর মানসিংহের অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি মনে করলে রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত করতে পারেন।

এই অবস্থায় মানসিংহকে রাজধানীতে রাখা কোনরূপে মঙ্গলকর নয় বিবেচনায় সম্রাট জাহাংগীর তাঁকে বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের জন্য প্রেরণ করতে মনস্থ করলেন। এই উপায় অবলম্বন করলে গৃহের ও বাহিরের উভয় শত্রু প্রশমিত হবে।

যদি ঘটনাক্রমে মানসিংহ এই যুদ্ধে নিহত হন, তা হলে সিংহাসনে আরোহণের প্রধানতম শত্রু বিনা প্রয়াসে ইহলোক হতে অপসারিত হবে। আর যদি প্রতাপাদিত্য বিনষ্ট হয় তা হলে রাজ্যের একজন প্রধান শত্রু নিশ্চিহ্ন হবে।

সম্রাট জাহাংগীর উভয়দিকে ইষ্টসিদ্ধি হবে, এইরূপ

সিদ্ধান্ত করে মানসিংহকে বহুবিধ মধুর বাক্যে সম্মানিত করে তাঁকে বাঙলার শাসনকর্তৃপদে নিয়োগ করলেন। মানসিংহ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসক নিযুক্ত হয়ে রাজপুত সৈন্য ব্যতীত আরও অনেক সৈন্য নিয়ে বাঙলায় শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত আগ্রা হতে বহির্গত হলেন।

আমীরগণের পরাজয়ের পর থেকে প্রতাপ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন। এই সময় থেকে তিনি রাজ্যশাসনব্যবস্থা এবং বঙ্গের স্বাধীনতা যাতে চিরস্থায়ী হয়, তজ্জন্য বিশেষরূপে যত্নবান ও মনোযোগী হয়েছিলেন। বঙ্গীয় নৃপতি ও জমিদারবৃন্দকে আহ্বান জানিয়ে প্রতাপ আবেদন জানালেন,—আপনারা পরস্পর হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হবেন। যাতে পরস্পরের সুখে-দুঃখে পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন, তজ্জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাই।

কিন্তু বাঙলাদেশের কয়েকজন কুলাঙ্গারের নিকট প্রতাপের এই অতুল ক্ষমতা ভাল লাগল না। একজন কায়স্থ যুবক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে, এ দৃশ্য তাঁদের চক্ষে শূলস্বরূপ বিদ্ধ হতে লাগল। কেমনে এই কায়স্থ যুবকের সর্বনাশ সাধন করা যায়, তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য নানা ফন্দী-ফিকির খুঁজতে থাকলো।

এই নারকীয় ষড়যন্ত্রে যে সকল মহাপাপী লিপ্ত ছিল, তন্মধ্যে ভবানন্দ মজুমদার সর্বপ্রধান। প্রতাপের অন্নে প্রতিপালিত বঙ্গের এই সকল অকালকুষ্মাণ্ড জননী জন্মভূমির গলদেশে কঠোর দাসত্ব-পাশ পরাতে বদ্ধপরিকর হল।

মহাবীর মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমনকালে রূপরাম ও কচু রায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। রূপরাম বললেন,—আমরা আপনার নিকট প্রতাপের গৃহচ্ছিদ্র ও দুর্বলতা সম্যকরূপে ব্যক্ত করবো।

মহাবল মানসিংহ তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করলেন। তৎপর বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

বাঙলার প্রজাগণ মোগলসৈন্যের আগমন-সংবাদ অবগত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য দূরবর্তী প্রদেশে পলায়ন করতে লাগল। জমিদার ও প্রজাগণের পলায়নের জন্য মানসিংহকে সময় সময় অন্নের জন্য বিশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হয়।

মানসিংহ মানব-বিহীন প্রদেশ বহু ক্লেশে অতিক্রম করে রাজমহলের সন্নিকটে পাকুড় রাজবংশের আদিপুরুষের সহিত মিলিত হলেন। ইনি স্বীয় দলবলসহ মানসিংহের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের রাস্তা অধিকতর সুগম করে দিলেন। মানসিংহ তাঁর ব্যবহারে প্রীত হয়ে এক জমিদারী প্রদান করলেন। বললেন,—এই জমিদারীর নামকরণ করা হোক আম্বের।

মানসিংহ রাজমহল, বীরভূম প্রদেশ অতিক্রমের পর বর্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

বহু সৈন্য সহিত মানসিংহ আসছেন শুনে প্রতাপ তাঁর দুর্জয় ফিরিঙ্গি সেনাপতি রডাকে ভাগীরথীর উভয় তীর রক্ষা ও মানসিংহের গতিরোধ করবার জন্য প্রেরণ করলেন। ফেরংগবীর রডা সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী প্রদেশ সুরক্ষিত করলেন। যেন শত্রুগণ গঙ্গা উত্তীর্ণ হতে না পারে। তাই নিকটের নৌকাসকল নদীগর্ভে নিমগ্ন করতে আদেশ দিলেন।

চর-মুখে প্রতাপের সৈন্যবিন্যাসের কথা অবগত হলেন মানসিংহ। তৎক্ষণাৎ গঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করলেন। অবশেষে চাপড়া গ্রাম সমীপবর্তী নদীতটে সৈন্যসহ উপস্থিত হলেন। ইতিপূর্বেই এ প্রদেশের আপামর জনসাধারণ মোগলবাহিনীর আগমনবার্তা শুনে অন্যত্র পলায়ন করেছে। নৌকাসমূহ পাছে শত্রুহস্তে পতিত হয় এজন্য নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত এবং জলমধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।

মানসিংহ যে সময় নদী উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় উদ্ভাবনে চিন্তাগ্রস্ত, সেই সময়ে কুলাঙ্গার ভবানন্দ অতি গোপনভাবে মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হলেন। ভবানন্দ জননী জন্মভূমির হৃদয়দেশে কুঠারাঘাত করতে প্রতিশ্রুত হলেন এবং নৌকা ও দ্রব্য সংগ্রহের ভার গ্রহণ করে স্বীয় নারকীয় উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করলেন।

মানসিংহ ভবানন্দের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হলে পর সপ্তাহকালব্যাপী ভয়ংকর বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই প্রলয়ংকর বৃষ্টিতে সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত হল। মোগলসৈন্যের দুর্দশার সীমা থাকল না। ঝড় ও বৃষ্টির প্রকোপে শত শত মোগলসৈন্য মানবলীলা সংবরণ করতে লাগলো। এই মহাবিপদের উপর দারুণ অন্নাভাব দেখা দিলো।

কুটিল ভবানন্দ মানসিংহের আগমনবার্তা অবগত হয়ে গোবিন্দদেব প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার অছিলায় ইতিপূর্বে বহুল-পরিমাণে ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন। এখন তিনি স্বীয় ভাগ্যচক্র পরিবর্তনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সেই সকল দ্রব্য মানসিংহের আতিথ্যে বিনিয়োগ করে তাঁর কৃপা ক্রয় করতে লাগলেন।

প্রতাপ নৌবলে অত্যন্ত প্রবল।

বিশেষত জলযুদ্ধনিপুণ পর্তুগীজগণ অসামান্য বুদ্ধিবলে তাঁর নৌবলচালনা করে সতর্কতার সঙ্গে রাজ্যরক্ষা করছে। পূর্বের মোগলসেনাপতিগণ জলপথে গমন করে সকলেই নিহত হয়েছেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে মানসিংহ জলপথে গমন-সংকল্প পরিত্যাগ করে একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করতে করতে যশোহরাভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সপ্তাহকালব্যাপী ঝড়বৃষ্টিতে প্রতাপেরও ক্ষতির সীমা থাকলো না। এই দারুণ দুর্বিপাকে বঙ্গের আশা-ভরসার স্থল—সকল প্রকার উপকরণসম্পন্ন রণপোত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই অভাবনীয় বিপদাগমে কিছুমাত্র ব্যাকুলিত না হয়ে প্রতাপাদিত্য যশোহর রক্ষার বিপুল আয়োজন করতে লাগলেন। তিনি পর্তুগীজ নৌসেনা এবং স্বদেশীয় সৈন্যগণকে সমবেত করে মোগলসৈন্য পরাজয়ের উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন। বঙ্গের দুরদৃষ্টক্রমে ভবানন্দ প্রমুখ পুরুষগণ মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে মিলিত হওয়ায় প্রতাপের নীতিজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। মানসিংহ বঙ্গের কুলাঙ্গারগণের নিকট থেকে প্রতাপের গতিবিধি অবগত হয়ে তাঁর রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

উপযুক্ত স্থানে সেনানিবেশ সংস্থাপন করে মানসিংহ প্রতাপের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত অসি ও শৃংখলসহ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভায় গমন করে বিনম্র সহকারে অভিবাদনপূর্বক মানসিংহ প্রেরিত পত্র, অসি ও শৃংখল সভামধ্যে প্রদান করে স্বীয় আগমনের কারণ নিবেদন করলেন।

দূত উপবিষ্ট হলে প্রতাপের আদেশক্রমে কেশব ভট্ট জলদগম্ভীর স্বরে বললেন,—দূত! তোমার প্রভু-সমীপে কহিবে, মহারাজা প্রতাপাদিত্য জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়াছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত প্রবাহিত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার হস্তপদাদি দেশের কল্যাণকর কার্য হইতে বিরত থাকিবে না। মহারাজা প্রতাপাদিত্য যেরূপ অন্যান্য আমীরগণকে যম-ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইরূপ হিন্দুকুল-কুলাঙ্গার মানসিংহকে সমরে নিহত করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন। দুর্বৃত্ত বিহারী মল মানসিংহের পিতামহ, রাজপুতদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে জন্মভূমি বিক্রয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করেন এবং সম্রাট আকবরের নিকট আগমন করিয়া স্বীয় কন্যাকে প্রদান করেন। এই দুরাচারীরা অমরকীর্তি রাজপুতদিগের

পবিত্র বংশে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। তাহার পুত্র এবং তোমার প্রভুর পিতা ভগবানদাস স্বীয় কন্যা প্রদান করিয়া কুমার সেলিমের চিত্ত-বিনোদন করেন। তোমার প্রভুর পূর্বপুরুষগণ পুরুষাণুক্রমে মুসলমানগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা বিধ্বংস করিয়া আসিতেছেন। এই মোগলক্রীতশরীর পিশাচের অগণিত পুত্রগণ যেরূপ আমাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে সেইরূপ ইহাকেও আমরা যমালয়ে প্রেরণ করিয়া ইহাদিগের দুষ্কর্মের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। ভারতের বাহিরের শত্রুগণ ভারতের যে সকল অনিষ্ট করিতে সমর্থ না হইয়াছে, এই সকল ক্রুরকর্মা স্বদেশ-বাসী পাপিষ্ঠগণ তুচ্ছ সুখ, পদ ও উপাধির জন্য তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। আমরা যখন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘোরতর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তখন এই সকল দেশদ্রোহী স্বাধীনতার জাতশত্রুগণকে সমূলে নির্মূল করিতে ক্ষণ-বিলম্ব করিব না, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র।

বাগ্মিবর কেশব ভট্ট এই সকল উদ্দীপনাপূর্ণ কথার শেষে অসি চুম্বন করে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পাদদেশে স্থাপন করলেন।

মানসিংহ-প্রেরিত দূত প্রতাপ-সভা হতে প্রত্যাগমন করে যথাযথ সমস্ত কথা প্রভুর সমীপে নিবেদন করলেন।

প্রতাপের পতন হইলে অন্যান্য রাজারা হতবীর্য হয়ে পড়বে. এজন্য মানসিংহ স্বয়ং প্রতাপকে আক্রমণ করলেন। উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে কতকগুলি নির্বাচিত সৈন্য দিয়ে তিনি কেদার রায়কে দমন করবার জন্য শ্রীপুরাভিমুখে প্রেরণ করলেন।

কেদার রায়, মধু রায় প্রমুখ বীরগণ-পরিচালিত বঙ্গীয় সৈন্যের শূরতা ও ধীরতার কাছে মোগলসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হল। দেশের জনসাধারণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একপ্রাণে কাজ করেছেন, তাই অতুল সমৃদ্ধিশালী মোগল-গণও তাঁদের কিছুই করতে সমর্থ হল না। স্থলপথে বিক্রম-প্রদর্শিতর কোন ক্ষতি করতে অসমর্থ হয়ে মানসিংহ জলযুদ্ধের বিপুল আয়োজন করতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একশত রণপোত মোগলসৈন্যে পরিপূর্ণ হয়ে কেদার রায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হল। মানসিংহ-প্রেরিত অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা পরিশোভিত একশত রণতরী কেদার রায়কে সমূলে নির্মূল করবার জন্য মেঘনা অভিমুখে ধাবিত হতে লাগল।

বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে মেঘনার উপকূলে মোগল ও বাঙালী সৈন্যের বাহুবলের পরীক্ষা চলতে থাকল। এই লোম-হর্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মোগলদিগের সমস্ত নৌবল মেঘনার গর্ভে নিমজ্জিত হল। লোহিত্য আজ মোগলরক্তে লোহিতবরণ ধারণ করে জীবগণকে বিভীষিকাগ্রস্ত করতে লাগল।

এই ঘোরতর যুদ্ধে বীরবর মধু রায় বিপক্ষ-প্রেরিত গোলকাঘাতে বীরলীলা সংবরণ করে স্বর্গলোকে গমন করলেন। ডমিনিক কার্ভালো শরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

[ক্রমশ]

সময়োচিত

সত্যধন ঘোষাল

আলোগুলি এখনো জ্বলছে!
হ্যাঁ হ্যাঁ,
বুকের ভিতর কবোষ্ণ ভালবাসায়
সেই আলোগুলি!

তুমি শুধু চোখের নিচের রেখায়
তিমির-চিহ্ন দেখে
ফিরিয়ে নিলে তোমার মুখ,
চোখের জলের গভীরে যে ভার
তা সইতে পারবে না বলেই কি
আলোহীন মেলায়
তৈরী বাতাসে
বেলুন উড়িয়ে
মত্ত হয়ে গেছো!

না না,
আলোগুলি এখনো জ্বলছে!
নিবুনিবু স্পন্দন
ঝড়ের আগে
তাই লড়াই,
সেখানে তুমি বা আমি থাকি বা না থাকি
তাতে কি যায় আসে?
ইতিহাস কি থমকে থাকে!
আন্দোলিত প্রকৃতি
সাহস যোগায়।

আলোগুলি এখনো জ্বলছে!

সম্পাদকীয়

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

জনতার জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর জয়টীকায় ললাটদেশ সুচর্চিত করিয়া এক বৎসর স্থায়ী রাষ্ট্রপতির শাসনকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার আবার প্রতিষ্ঠিত হইল। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত শুভকামনা ও সহানুভূতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের যাত্রাপথের প্রধান পাথেয়। অন্তর্বর্তী নির্বাচন যে গভীর এবং আলোর মত স্পষ্ট সত্য প্রমাণ করিল তাহা হইল যুক্তফ্রন্টের উদ্দেশে দেশবাসীর হৃদয়ে কি সুগভীর ভালবাসা জমা হইয়া আছে, সহস্র প্রতিকূল প্রচার ও প্রচেষ্টাও তাহার পথরোধ করিতে পারিল না। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসের পর ১৯৬৯ সালের মার্চে পুনরায় সে আপন পরিত্যক্ত আসন সগৌরবে অধিকার করিল।

কিন্তু তাহার যাত্রাপথকে কিছুতেই কুসুমাস্তীর্ণ করিতে দেওয়া হইতেছে না, সে পথ নিয়তই কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখার প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে। কিছুতেই তাহাকে যেন সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না।

রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের নিকট হইতে অনেক অর্থ ও কিছু ক্ষমতা যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন এবং তাহাই সে চাহিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যাহা শত সহস্র সমস্যায় জর্জরিত। খাদ্যের সমস্যা অক্টোপাসের মত তাহার সর্বাঙ্গ আষ্টেপৃষ্ঠে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিটি সমস্যাই সমান গুরুত্বপূর্ণ, কোনটির মূল্যই অন্যটির তুলনায় কম নয়। সেই বিচারেই কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। এবং এই সমস্যাগুলির আশু সমাধান না হইলে সমগ্র রাজ্য এক নিদারুণ দুর্যোগের তথা এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশা ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

এ-হেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের একেবারে পুরোপুরি বিমাতৃসুলভ আচরণ তাঁহাদের রীতিমত বিচলিত তথা অবাক করিয়া তুলিতেছে। তাহারা বিস্মিত কিন্তু ধৈর্যহারা বা উত্তেজিত নন। এ-হেন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের এই ধরণের ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষা তাঁহাদের রীতিমত অবাক করিয়াই তুলিয়াছে।

চাই প্রচুর অর্থ খাদ্য, শিল্প, শিক্ষা - তিনটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ শোচনীয়। জনসংখ্যা যেভাবে বিপুল পরিমাণে উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান, সে ক্ষেত্রে তাহার সহিত তাল রাখিয়া খাদ্য জোগান মুখের কথা নয়। দেশকে প্রকৃত সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে দেশের খাদ্যশস্য বাড়ানো এবং কৃষি-ব্যবস্থার সর্বতোভাবে উন্নয়ন, শিল্পের প্রসার এবং শিক্ষার বিস্তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ সমস্যাগুলি মোচনের পন্থাস্বরূপ যুক্তফ্রন্ট সরকার যে উপায়গুলি অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহার বাস্তবে রূপায়ণের জন্য যে পথ চিহ্নিত করিয়াছেন সেগুলি আজ জনসাধারণের অজানা নয়। তাঁহারা যে পরিকল্পনাগুলি পেশ করিয়াছেন সেগুলির কার্যকারিতা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে-কোন পরিকল্পনাকে কার্যে রূপ দিবার জন্য যথোপযুক্ত অর্থের প্রয়োজন। অর্থ ব্যতিরেকে কোন করণীয় কাজের রূপায়ণ সম্ভব নয়। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ আর বাস্তবে এক নয়।

এখন কেন্দ্রের অনমনীয় মনোভাব স্বভাবতই যুক্তফ্রন্টের উদ্দেশ্য রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রধান ও একমাত্র বাধা। তাঁহারা যে সফলকাম হইবেন একথাও যেমনই জোর করিয়া বলা যায় না তেমনই তাঁহারা ব্যর্থতাবরণ করিবেন এমন কথাও জোরের সঙ্গে বলা চলে না। অতএব তাঁহাদের সুযোগ না দিলে কেমন করিয়া তাঁহাদের কর্মক্ষমতা তাঁহারা প্রমাণ করিবেন? তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র যদি সহযোগিতার হস্তটি আদৌ প্রসারিত না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে এই জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা? তাহা হইলে যদি এ জাতীয় মন্তব্য কেহ করেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করার জন্য, অন্য কোন পথ চোখের সামনে না পাইয়া এই পথ অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ এই উদাসীন্য নিছক দীর্ঘসূত্রিতাবশতই নয় ইহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক সে ক্ষেত্রে তাঁহার এই মন্তব্য খণ্ডন করার স্বপক্ষে কোন যুক্তির সন্ধান মেলে কি?

অথচ ইহাও মিথ্যা নয় এত দুর্যোগের ভিতরেও পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রকে যে ভাবে সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহা অভাবনীয়। চা হইতে, পাট হইতে সারা ভারত যে অর্থ উপার্জন করে তাহার মূলে পশ্চিমবঙ্গের অবদান কতখানি সে সম্বন্ধে নতুন করিয়া কিছু বলা নিতান্ত অনাবশ্যক। বিভিন্ন খাতে পশ্চিমবঙ্গ যে অর্থ আজও ভারতকে সরবরাহ করিয়া চলিতেছে তাহার অঙ্কও উপেক্ষণীয় বা সামান্য নয়। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সারা রাজ্যের কল্যাণের এবং সমৃদ্ধির সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ ঘটাইয়া স্বীয় সহযোগিতার হস্তটি সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই সমর্থন পাইতে পারে না।

এখন এই আর্থিক বরাদ্দ ও ক্ষমতা-[illegible] ও রাজ্যের মধ্যে ক্রমশই যে তিক্ততার সৃষ্টি করিতেছে তাহাকে এইভাবে বাড়িতে দিলে পরিণতিতে উহা যে কি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহাও ভাবিয়া দেখার প্রবৃত্তি [illegible] হইতে দূরে নয়।

এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নিকট এত [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করার ফলে পশ্চিমবঙ্গ যদি তাহার আপন সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার পরিপূর্ণরূপে নিজে করিয়া সমস্যাগুলির সমাধানপূর্বক রাজ্যের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইয়া কেন্দ্রের এই অদ্ভুত আচরণের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া মনস্থ করেন এবং সেই সিদ্ধান্তে যদি তাঁহারা অবিচল থাকেন তাহা হইলে কেন্দ্র যুক্তফ্রন্টের সর্বনাশ করিতে যাইয়া নিজেদের যে কতখানি সর্বনাশ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছেন, তাহা যদি এখন বুঝাইয়া বলিতে হয় তাহা হইলে এ সম্পর্কে আর বলার কিছু থাকে না।

ভুয়া সংগ্রাম

আমাদের সহযোগী 'যুগবাণী' বলিতেছেন—

"১৯৫৬ সালে বামপন্থীরা ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠন আন্দোলন মাঝপথে অসমাপ্ত অবস্থায় ইতি করিয়া দিয়া বাঙলার দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। যুক্তফ্রন্ট তাঁহার কর্মসূচীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের কথাকে স্থান দেয় নাই। ইহাতে বাঙালীর স্বার্থ লইয়া লড়াইয়ের ব্যাপারে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাবই প্রমাণিত হইতেছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার একথা একবারও বলিতেছেন না যে বাঙলা দেশে সমস্ত চাকুরির ক্ষেত্রে বাঙালীর দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, এমন কি 'সন্স অফ দি সয়েল' বলিয়া কংগ্রেস সরকার চাকরির ক্ষেত্রে যাহাদের অগ্রাধিকার তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার তাহাদের কথাও মুখে উচ্চারণ করিতে ভয় পাইতেছেন। আধুনিক যুগে বাঙলার সর্বনাশের প্রধান কারণ অবাঙালীর হাতে তাহার অর্থনীতি চলিয়া যাওয়া। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইবার পর হইতে এই ধারা চলিয়া আসিতেছে এবং ইহারই কারণে বাঙলায় ক্রমাগত জটিল সমস্যা সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে।

বাঙলায় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রভাবের মূলে একদা ছিল অবাঙালী মুসলমান বুর্জোয়াদের অর্থশক্তি। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখ্য আয়োজনকারী ছিল অবাঙালী মুসলমান শিল্পপতিরা ও ইংরাজ পাটকল মালিকরা। তাঁহারাই বঙ্গ বিভাগ করিয়াছিল। এখনও পশ্চিমবঙ্গে মাঝে মাঝে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধে তাহার জন্য কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন শিল্পাঞ্চলের অবাঙালী মুসলমানরা ও মাড়োয়ারী বুর্জোয়ারাই দায়ী।

টিটাগড়ে করেক দিন আগে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে কাহারা তাহার মূলে ছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার সাহসের সঙ্গে তাহা প্রকাশ করিবেন কি? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু টিটাগড়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিষয়ে এ পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। তাঁহার বাধাটা কিসের? বাঙালীর স্বার্থের মুখ চাহিয়া তিনি যদি রাজনীতি করিতেন তবে এ বাধা তাঁহার আসিত বলিয়া মনে করি না। বাঙলা দেশের অর্থনীতির উপর হইতে অবাঙালীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া দেওয়ার কোন ইচ্ছাই যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রকাশ করেন নাই।

কলিকাতায় যত মিছিল, মিটিং হাঙ্গামা, বোমা ছোড়ার ঘটনা বামপন্থী দলভুক্ত কর্মীরা ঘটায় সবই ঘটে বাঙালী প্রধান এলাকায়। কলেজ স্কোয়ারের ছোট ছোট বাঙালী ব্যবসায়ীরা উদ্বাস্তু হকার ও স্টলধারীরা পুস্তক প্রকাশকরা নিত্যই সে জন্য খেসারত দিতেছেন। বড়বাজার অঞ্চলে কোন দিন কোন বাঙালী বিক্ষোভ মিছিল যায় না, বিশৃঙ্খলা ঘটে না, ইট ও বোমা বৃষ্টি হয় না। মাড়োয়ারীদের ব্যবসায়িক স্বার্থে তিলমাত্র আঁচড় লাগে না। বামপন্থী শ্রম-আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তুও হইয়াছে বাঙালী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ। বিড়লাজীর কারখানায় ঘেরাও দেখা দেয় নাই। যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু পর্যুদস্ত বাঙালী ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের সাহায্য দিবার জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেন নাই।

জ্যোতি বসু কেন্দ্রের নিকট হইতে যে সব অর্ডার আনিয়া দিবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন শেষ পর্যন্ত সেগুলি কাহারা পায় আমরা তাহা দেখার অপেক্ষায় রহিলাম।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার কথা—ভাল কথা, কিন্তু দেখিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, খাদ্য ও শিল্প সম্পর্কে গত বিশ বৎসর যাবৎ কেন্দ্র যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহার পরিবর্তন যুক্তফ্রন্ট দাবী করিবেন কি না। এখনও পর্যন্ত তেমন কোন লক্ষণ নাই।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেন যে, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের শিল্প বাণিজ্যের মানচিত্রে যে প্রধান স্থান দখল করিয়া আছে তাহা হইতে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে ও বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রকে ভারতের শিল্পবাণিজ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সমস্ত ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন বা ঋণ

জাত প্রতিষ্ঠানগুলির হেড অফিস বোম্বাইয়ে লইয়া যাওয়া হয়—এল, আই, সি; স্টেট ব্যাঙ্ক; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির হেড অফিস কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ে সরাইয়া লওয়া উহার দৃষ্টান্ত মাত্র।

বোম্বাইয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এই সব প্রতিষ্ঠান হইতে যত সহজে ও যত বেশী পরিমাণে টাকা পায় কলিকাতার ব্যবসায়ীরা তাহার সিকি ভাগও পায় না ও যেটুকু পায় তাহা সংগ্রহ করিতে তাহাদের হয়রানির এক শেষ হইতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স দরাজ হস্তে বোম্বাইয়ে চালিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিতই করিয়া চলিয়াছেন।

লাইসেন্স আজিকার ব্যবসায় বাণিজ্যের মূল চাবিকাঠি। পশ্চিমবঙ্গ উহা হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে এখানে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার মন্দা হইয়াছে, কিন্তু বোম্বাইয়ে উহা বিপুলভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গকে লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই। মূলধন দেওয়া হয় নাই। কাঁচা মালও দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের সঙ্কট সৃষ্টির অন্যতম কারণ কাঁচা-মালের অভাব। পশ্চিমবঙ্গে ও তৎ-সংলগ্ন অঞ্চলে কয়লা ও লোহার খনি থাকায় এখানকার শিল্পকারখানাগুলি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কয়লা ও লোহা পাইত। ভারত সরকার এক অন্যায় আদেশ জারি করিয়া সারা ভারতে কয়লা ও লোহার দাম সমান করিয়া দেন, পরিবহন ব্যয়ের দরুণ দামের যে স্বাভাবিক পার্থক্য ঘটে তাহাও তাঁহারা নাকচ করিয়া দেন। রাণীগঞ্জের কয়লার দাম কলিকাতায় ও পাঞ্জাবে সমান। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলির যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সুবিধা ছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে।

অথচ পক্ষান্তরে পাঞ্জাবের গমের দাম পাঞ্জাব ও কলিকাতায় সমান নয়। অন্ধ্রে চালের দাম পঞ্চাশ পয়সা কেজি। অথচ কলিকাতায় উহা চার টাকার কমে মিলে নাই। ভারত সরকার ইচ্ছা করিয়া এই বৈষম্যকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। কলিকাতায় মজুরীর হার বোম্বাই অপেক্ষা কম অথচ বোম্বাইয়ে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিলে তাহা লইয়া কেহ হৈ চৈ করে না। কিন্তু কলিকাতায় শ্রম অসন্তোষ দেখা দিবামাত্র তাহা ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া সারা দেশের সংবাদপত্রে এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন পুঁজি লগ্নীকারীরা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আতঙ্ক-গ্রস্ত হইয়া পড়েন।

গত তিন বছর যাবৎ ভারতে যে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা বা রিসেশান দেখা দিয়াছিল তাহা ভারত সরকার কৌশলে একা পশ্চিম বঙ্গের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে তাঁহারা সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতার ইঞ্জিনীয়াররা দলে দলে বেকার রহিয়াছেন, কিন্তু বোম্বাইয়ে বেকার ইঞ্জিনীয়ার নাই।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার এই সকল গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারে নীরব রহিয়াছেন। তাঁহারা রাজ্যপাল ধর্মবীরের ভাষণ পাঠ দিয়া হৈ চৈ করিয়া কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন। উহা স্টানট মাত্র প্রকৃত কাজ নহে। যুক্তফ্রণ্ট নেতারা বাঙলা ও বাঙালীর আসল দাবীগুলি এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছেন। ই, এম, এস নাম্বুদিরিপাদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধিয়া কেন্দ্রকে দুর্বল করিয়া দিবার আন্দোলনে যুক্তফ্রণ্ট শরিক হইতে চান। কম্যুনিস্ট পার্টির স্বার্থ তাহাতে সুসিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু বাঙালীর ন্যায্য দাবী-পূরণের আন্দোলন তাহাতে বিভ্রান্ত ও বিপথচালিত হইবে।

কেন্দ্রকে দুর্বল করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন আমরা দেখিতেছি না। আমরা যাহা চাই তাহা হইল আমাদের প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকার। যুক্তফ্রণ্ট যদি তাহা করিতে সক্ষম না হন তবে যে পথে প্রফুল্ল সেন বিদায় নিয়াছেন তাহাকেও এক দিন সেই পথে বিদায় নিতে হইবে।

সুরের পরিবর্তন

অধঃপতিত 'মার্কসবাদী'রা আজ প্রয়োজনে নিজেদের থুথু নিজেরা চেটে খেতে দ্বিধা করছে না। কাল যা বলেছে ঠেলায় পড়ে আজ আবার তার উল্টো কথা বলছে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এবারের বরাহনগরের ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী জনসভায় প্রচুর লোকসমাগম সম্পর্কে আনন্দবাজার মন্তব্য করেছিল—

"গত রবিবার রাজবাগান (বরাহ-নগর) ময়দানের 'বরাট জনসভা, শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতা শোনার জন্য জনসাধারণের অধীর আগ্রহ বাম কম্যুনিস্টদের কর্মীদেরও অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে।"

(আনন্দবাজার, ২১-১-৬৯)

'আনন্দবাজারের' এই মন্তব্যের জবাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী দেশহিতৈষীতে লেখা হয়—

"আনন্দবাজার এইটে ভুলে গিয়েছিলেন যে মধুবালা, মীনা-কুমারী কিম্বা সুচিত্রা সেনকে দেখবার জন্যও ঐ রকম লক্ষ লক্ষ মানষের ভীড় হয়। আর, আনন্দবাজারের এটাও খেয়াল ছিল না যে, ইন্দিরা গান্ধীর নাম প্রিয়দর্শিনী।"

(দেশহিতৈষী, ২১শে ফেব্রুয়ারী)

২১এ ফেব্রুয়ারী দেশহিতৈষীতে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। আর ৯ই মার্চ ময়দানের জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন—

"ভুললে চলবে না কংগ্রেস এবারও শতকরা ৪০ জনের ভোট পেয়েছে তাদের সবাই পুঁজিবাদী, চোরা-কারবারী বা প্রতিক্রিয়াশীল নয়। তারাও সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী সভাগুলিতে প্রচুর ভীড় হত। অনেকে বলেন, এর কারণ তিনি প্রিয়দর্শিনী। কিন্তু জগজীবন রামের সভাতেও ত 'বহু মানুষ ভীড় করেছেন, তাঁর কথা শুনে ভোট দিয়েছেন। জগজীবন রাম কিছু সুপুরুষ নন। কাজেই কংগ্রেসের শক্তিকে ছোট করে দেখলে চলবে না।

(আনন্দবাজার, ১০ই মার্চ)

হঠাৎ এই সুর পরিবর্তন কেন? যে থুথু ফেলেছিল তারা ২১শে ফেব্রুয়ারী সেই থুথু তারা কেন চেটে খেল ৯ই মার্চ? কংগ্রেস এখনও শক্তিশালী বলায় ২১শে ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজারকে বাপান্ত করা হল যে যুক্তিতে এমন কি যে ভাষায়, ৯ই মার্চ প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে ঠিক সেই যুক্তিকে ও সেই ভাষাকেই আক্রমণ করা হল কেন?

এ রহস্যের চাবিকাঠি কোথায়? এ কি নিছক প্রমোদ দাশগুপ্তের পাগলের প্রলাপ? না। মোটেই তা নয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত সেয়ানা পাগল। তাঁর পাগলামীর মধ্যে পদ্ধতি আছে এবং মনে রাখতে হবে তার এই উক্তির মধ্যে তার 'পলিট ব্যুরো'র লাইনে নিহিত রয়েছে।

—'দেশব্রতী' হইতে সঙ্কলিত।

মুখ্যমন্ত্রিত্বের আবদার

"মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবী প্রমোদবাবুরা নিজেরাই ছেড়েছেন।" শিরোনামা দিয়ে ১১ই মার্চ কালান্তর যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন তার প্রথম লাইনেই এঁদের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট বিরোধিতা লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে চাগাড় দিয়ে উঠেছে। "কালান্তর" সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছেন—

"প্রমোদবাবুর দল প্রথমে জিদ ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দল থেকেই করতে হবে।"

এ যেন বাচ্ছার মোওয়া-চাওয়ার কান্না। ভাবখানা এই যে, মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের মুখ্যমন্ত্রিত্বের উপর কোন নৈতিক কিংবা আইনসঙ্গত দাবী ছিল না, খালি ছেলেমানুষের মত জিদ ধরে বসেছিল মুখ্যমন্ত্রিত্ব তাদের চাই-ই। সমগ্র যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বৃহত্তম দল। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাঁদের সমর্থিত এম এল এ'র সংখ্যা ৮৩। বিধান সভায় সর্ববৃহৎ দল হিসাবে "প্রমোদবাবুর দল" যদি মুখ্যমন্ত্রিত্ব দাবী করে থাকেন, তাহলে তর্কশাস্ত্রের কোন্ হিসাব অনুযায়ী এটাকে 'জিদ' আখ্যায় ভূষিত করা যায়? ঐ একই সম্পাদকীয়তে 'কালান্তর' বলছেন—

"যুক্তফ্রণ্টের সভায় বিশ্বনাথ মুখার্জী বা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কেউই মার্কসবাদী দলের জ্যোতি বসুকে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবীর প্রতিবাদ করেন নি।"

মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবী যদি 'জিদ' হয়ে থাকে, স্বভাবতঃই সঙ্গতভাবেই দক্ষিণপন্থীদের প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তাহলে যুক্তফ্রণ্টের এই সভায় আপনারা প্রতিবাদ করলেন না কেন?"

—'দেশহিতৈষী' হইতে সঙ্কলিত।

খেল খতম

পাকিস্থানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বেশ কিছুকাল ধরিয়া দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হইতেছিল, সম্প্রতি এই নাটকের বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষকদিগকে চমকিত করিয়া দিয়া এবার অঙ্ক বদল হইল। একটি জমানা শেষ হইল। আয়ুব খাঁ প্রস্থান করিলেন—এই সংবাদ সমগ্র বিশ্বে এক আলোড়ন আনিল। পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে যে নাটক ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন বেশ জমাট হইয়া উঠিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হইল। একাদশবর্ষব্যাপী আয়ুব খাঁর রাজ আজ আর বর্তমান নয়, আজ তাহা নিছক স্মৃতিমাত্র, ইতিহাসের একটি অধ্যায়মাত্রে আজ তা পর্যবসিত।

ইতিহাসের চক্র ঘূর্ণায়মান। তাহা নিয়ত ঘূর্ণনরত। নিচের চাকা উপর দিকে উঠিয়া থাকে আবার উপরদিককার চক্র নিম্নগামী হইয়া থাকে। মহাকালের ইহাই নির্দিষ্ট নিয়ম। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সমগ্র পৃথিবী অবলোকন করিয়াছিল সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক আয়ুব খাঁ প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জাকে সহসা অতর্কিতে গদীচ্যুত করিয়া নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতি সাজিয়া বসিলেন। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি একইভাবে একই উপায়ে আবার ঘটিয়া পূর্বোক্ত সত্যটিই নতুন করিয়া যেন আর একবার প্রমাণিত হইল। যে পদ্ধতিতে যে উপায়ে আয়ুব ইস্কান্দারকে গদীচ্যুত করিয়া দিলেন, একই উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাভারও আজ সেই সামরিক বাহিনীরই অধিনায়ক ইয়াহিয়া খানের হস্তে অর্পিত হইল। আয়ুবের পদত্যাগের পিছনে আসলে কোন্ রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে বা মূলত কোন্ ঘটনা বা পরিস্থিতি এই ঐতিহাসিক ক্ষমতাবদলের জন্য দায়ী তাহা অজ্ঞাত, সৈন্যবাহিনীর চাপে পড়িয়া আয়ুব পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন কি না সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট অনুমানের অবকাশ আছে। যেভাবে সামরিক নায়ক আয়ুব রাষ্ট্রনায়কের আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন—সকলেই দেখিলেন সেই একইভাবে সামরিক নায়ক ইয়াহিয়া খানও রাষ্ট্রপতির আখ্যায় নিজেকে আখ্যাত করিলেন।

আয়ুব খাঁর বিদায়কালে তাঁহার কার্য-কলাপ পর্যালোচনা করিলে স্বভাবতই তাঁহার একটি বিশেষ কীর্তি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পাকিস্তান মাত্র বাইশ বৎসর পূর্বে রূপপরিগ্রহ করিলেও সৃষ্টির বোধনলগ্ন হইতেই একটি বিষয়ে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। অস্বীকার করার উপায় নাই, সে ঐতিহ্য আজও অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত। যাঁহারাই গদীলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই প্রাণপাত করিয়া সেই ঐতিহ্য রক্ষার সাধনায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহা সূর্যালোকের মত সত্য যে, আয়ুব খাঁই সেই সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ইহা কোনক্রমেও কদাচ অস্বীকার করা চলে না যে, এই ঐতিহ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আয়ুবের অবদান সর্বাধিক। এ ক্ষেত্রে তাঁহার মত দক্ষতা তাঁহার পূর্বসূরীদের কেহই দেখাইতে পারেন নাই। এ ঐতিহ্য ভারত-বিদ্বেষ এবং ভারতের ক্ষতিসাধন। হয়তো লিয়াকৎ খাঁ আরও অধিককাল জীবিত থাকিলে বা নাজিমুদ্দীন, সুরাবর্দী, ফিরোজ খাঁ নুন আরও কিছুকাল গদীতে অধিষ্ঠিত থাকিলে এ সম্বন্ধে তাঁহারা আরও অধিকতর নৈপুণ্য (?) প্রদর্শন করিতে পারিতেন—যে-কোন কারণেই হোক আয়ুবের মত এত দীর্ঘ সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে আর কাহাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় তখৎ অধিকার করিয়া থাকিতে দেখা যায় নাই। তাই কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল ভারত-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে আয়ুবের কীর্তিকলাপ তাঁহার পূর্বসূরীদের এ বিষয়ক সকল কীর্তি-কেই অবলীলাক্রমে টেক্কা মারিয়া গেল। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়ের একটি মুহূর্তও এ বিষয়ে তিনি অবহেলা করেন নাই।

ভারতীয় হিসাবে আজ আমাদের অনেক কিছুই একে একে স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতেছে। ১৯৬৪ সালের প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গের অকথ্য তুলনাবিরল নারকীয় হিন্দু-নির্যাতন, ১৯৬৫ সালে অন্যায়ভাবে ভারত আক্রমণ, চীনের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় যত্রতত্র ভারতের বিরুদ্ধে বেহুঁশ-বেসামালের মত বিষোদগার এ সব জলের দাগ নয়। রক্তের ছাপ জলের দাগকে সময় অপসৃত করিয়া দেয়, কিন্তু রক্তের ছাপ এত সহজে মুছিয়া যায় না।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহার কোন্ কাজটি সফল, কোনটি অসফল, কি করা উচিত ছিল আর কি তিনি করিয়াছেন এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। কাহারও ঘরোয়া আলোচনায় নাক গলানো আমরা অনধিকারচর্চা বলিয়াই মনে করি। পাকিস্তানের ভারত-নীতি এবং হিন্দু-নীতি কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের যা-কিছু আলোচনা।

এত তর্জন গর্জন হুহুঙ্কার এত লাফালাফি দাপাদাপি যেন ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হইয়া গেল, যে ইস্কান্দারকে দেশছাড়া করিয়া স্বস্তি পাইয়াছিলেন আয়ুব, আজ তাহার প্রতিও নির্বাসনের ফতোয়া ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। যে পাকিস্তান-পাকিস্তান করিয়া আয়ুবের এতকাণ্ড, সেই পাকিস্তানে আজ তাঁহার বসবাসেরও অধিকার নাই। তিন মাসের মধ্যে তাঁহাকে চিরতরে পাকভূমি ত্যাগ করিতে হইবে। অদৃষ্টের কি পরিহাস।

আয়ুবের ভারত-বিদ্বেষের বিষ সারা ভারতকে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলিয়া আয়ুবের প্রস্থানে ভারতবাসীরও বাহু তুলিয়া নৃত্য করার কিছু নাই। আয়ুব গেলেন। ইয়াহিয়া আসিলেন। ১৯৬৫ সালের ভারত আক্রমণের মুখ্য নায়ক এবং এ-বিষয়ে আয়ুবের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক ভুট্টো এবং চীনের দালাল ভাসানী এখনও রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট প্রভাবশালী বিদ্যমান।

এই দুই রাহুগ্রহ এবং শনি-গ্রহ সম্বন্ধে ভারতবাসী যেন সচেতনতা না হারান। ভারত সম্বন্ধে ইঁহাদের বৈরিতার তুলনা মেলা ভার। আয়ুব সম্বন্ধে তাঁহাদের শোনা অভিযোগের মধ্যে ভারত-প্রীতিও অন্যতম। আয়ুবের ভারত-নীতি তাঁহাদের নিকট ভারত-প্রীতির নামান্তর হইয়া দেখা দেয় তাহা হইলে জানি না তাঁহাদের বিচারে পাকিস্তানের অবলম্বনীয় ভারত-নীতিটির স্বরূপ আরও কত ভয়াবহ এবং আরও কত জঘন্য।

ভারত শান্তিকামী রাষ্ট্র। পঞ্চশীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক যুগে মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সহাবস্থানের পক্ষপাতী। ভারত প্রথমে কোন রাষ্ট্রের দিকেই তাহার গ্রাসধর্মী বাহুযুগল বাড়াইয়া দেয় নাই, বিশেষ করিয়া সেই রাষ্ট্রের প্রতি-যে রাষ্ট্র তাহার সোনার অঙ্গ খণ্ডিত করিয়া উদ্ভূত কিন্তু তথাপি তাহার শান্তি যদি কেহ অকারণে বিঘ্নিত করে, অন্যায়ভাবে যদি কেহ তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে, সে অন্যায়কে প্রতিরোধ করার এবং সে অন্যায়ের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়ার যথাযথ শক্তি-ও যে তাহার ভাণ্ডারে কানায় কানায় বিদ্যমান, ১৯৬৫ সালে সমগ্র বিশ্বের দরবারে তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়া গেলেন সর্বজনবরেণ্য লোকনায়ক লালবাহাদুর শাস্ত্রী—এই গভীর সত্যটি যদি পাকিস্তানের নবনায়ক ইয়াহিয়া খাঁ বিস্মৃত না হন তাহা হইলে ভারত-পাক সম্পর্কের ইতিহাস এক নূতন মোড় ধরিতে পারে বা এতাবৎকাল হইতে এক বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে বলিয়া আমরাও বিশ্বাস পোষণ করিতে পারি।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীতারকনাথ

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'মাসিক বসুমতীর' সম্পাদকীয় 'ডঃ খোরানা—ইয়াসুনারী কাওয়াগতা' পড়লে পর কয়েকটি বিষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মানসপটে উদয় হয়ে ওঠে। আজ দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর পর এশীয় মহাদেশের দুইটি সুসন্তান একজন বিজ্ঞানে ও একজন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন। ইহাতে সমগ্র এশিয়ার বিশেষ করে ভারতের বিশেষ ভাবে মুখোজ্জ্বল হয়েছে। ডঃ খোরানা তাঁর কৃতিত্বের দ্বারা ভারত মাতার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। ভারতবাসী আজ ডঃ খোরানার গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন কিন্তু একটা প্রশ্ন সব সময়ই থাকিয়া যাইতেছে যে, ডঃ খোরানার মত এক জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের ভারত মাতার বক্ষে স্থান লাভ হয় নাই। তাঁহাকে বৈদেশিক নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এর চেয়ে আমাদের লজ্জার ও পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে। এই প্রসঙ্গ ব্যক্ত করিতে গিয়া আপনাদের সম্পাদকীয়তে আপনারা সুন্দরভাবে বলিয়াছেন যে, 'এই গৌরব ম্লান করার অধিকার কি ভারতবর্ষের আছে, একদিন যে সু-সন্তানকে দুমুঠো অন্ন না দিয়ে ভারতবর্ষ নির্বাসিত করিয়াছে, জননীয় স্নেহ ঘন করুণায় আপন বক্ষের প্রশান্ত ঘন পরিমণ্ডলে না টানিয়া বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়া এত বড় বিশাল বক্ষে স্থান দিল না, আজ তাঁহার গৌরবে কোন লজ্জায় ভারতবর্ষ বাহু তুলিয়া নৃত্য করিবে? এর কোন উত্তর কি আছে, এর কোন উত্তরই আজ আর আমাদের দেবার নাই। আমাদের দেখাতে হবে যে ভবিষ্যতে আমরা যেন এরূপ ভুল আর না করি। প্রতিভার কোন নিদর্শন পাইলেই তার যেন যথাযোগ্য সমাদর আমরা দিতে

পারি। একটা বিষয় সকলেরই বিশেষ করে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। আমাদের দেশের যেসব সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়গুলি যা নিয়ে আমরা গবেষণা করে থাকি। তার কতখানি আমরা আন্তর্জাতিক দুয়ারে পৌঁছে দিতে পেরেছি, আজ জাপান তার সাহিত্য বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের বিশেষ সহায়তা করেছে। আমার মনে হয় ভারতবর্ষ আজ এ বিষয় অনেক পিছিয়ে আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাদর ও পুরস্কার লাভ করিতে হলে সর্বতোভাবেই সর্বোপায়ে আমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।

—শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮সি, সি, এন রায় রোড, কলিকাতা—৩৯।

বীরভূম প্রসঙ্গে

মাসিক বসুমতী (মাঘ ১৩৭৫) শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত 'বীরভূম' নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট তথ্যগত ভুলের সংখ্যাধিক্যে বিস্মিত হয়েছি। প্রবন্ধকার খুব অস্পষ্ট ধারণার উপর সীমিত আকারে এই প্রবন্ধ লেখায় প্রয়াসী হয়েছেন। লেখকের সঙ্গে যে সব বিবরণে একমত হতে পারলাম না তার বিবরণ নীচে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হোল।

(১) ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে এই অংশ মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল—তারও আগে শুম্ভ দেশের অধীনে। —কথাটা শুম্ভ না সুহ্ম দেশ? গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত বীরভূম—এ রকম কোন উল্লেখ দেখলাম না।

(২) সাঁওতাল পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকা বীরভূমের অন্তর্গত ছিল—কোন সময় তা বিচ্ছিন্ন হয় তা লেখক উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না, যদিও সাঁওতাল বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন।

(৩) নদী বিবরণ লেখকের যথাযথ আলোচিত হয় নাই। ময়ূরাক্ষীর উৎপত্তি স্থল ব্যক্ত হলেও পতিত স্থান বলা উচিত ছিল। ময়ূরাক্ষীর শাখা 'কানা' নদী সম্বন্ধে উল্লেখ হলেও অপরাপর নদীর নামমাত্র উল্লেখিত হয়েছে। দ্বারকার অপর নাম বাবলা এ রকম তথ্য জানা নাই।

(৪) কৃষি পরিচ্ছেদে ময়ূরাক্ষী নদী পরিকল্পনার কানাডা বাঁধের কথা বলা হয়েছে (যদিও সেটা বিহারের অন্তর্গত) অথচ সিউড়ীর উপকণ্ঠে তিলপাড়া ব্যারেজের উল্লেখ নাই। ময়ূরাক্ষী নদী পরিকল্পনার বহু পূর্বে বক্রেশ্বর ক্যানেল' প্রকল্প হয়েছে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না?

(৫) শিল্প ও ব্যবসায় পরিচ্ছেদে জেলার বাণিজ্য কেন্দ্র সাঁইথিয়ার উল্লেখ না থাকায় অবাক হয়েছি। কয়ালাপুর কড়িধ্যা না হয়ে কালীপুর কড়িধ্যা হওয়াই স্বাভাবিক।

(৬) ঐ একই পরিচ্ছেদ অন্তে লেখক পট শিল্পীদের উল্লেখ করে যে উপসংহার টেনেছেন তাতে একমত হতে পারলাম না। রামপুরহাট থানার চাঁদপাড়া গ্রামের পটুয়ারা আজিও তাদের পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখে পটখেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে থাকেন।

(৭) প্রসিদ্ধ স্থান পরিচ্ছেদ লেখক নানাধরণের অবাস্তব বা মিথ্যে তথ্যের অবতারণা করেছেন। 'সিউড়ী শহরের অনতিদূরে লাভপুর গ্রাম'—অনতিদূর

বলতে কি বুঝেছেন জানি না তবে লাভপুর বাসযোগে বা ট্রেনযোগে সিউড়ী হতে অন্তত কুড়ি মাইলের কম তো নয়। উপরন্তু তিনি আরও লিখেছেন—এই গ্রামে 'রতন লাইব্রেরী নামে এক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ শালা' আছে। লাভপুর গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। এই গ্রামে 'অতুলশিব পাঠাগার' নামে পাঠাগার আছে। আর রতন লাইব্রেরী সিউড়ী শহরেই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ˚শিবরতন মিত্র (বীরভূমের ইতিহাস রচয়িতা ˚গৌরীহর মিত্র মহাশয়ের পিতা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

বক্রেশ্বর ˚সতীমাতার মন বা ভ্রূ মধ্যস্থানে পতিত হওয়া একান্ন (মতান্তরে বাহান্ন) পীঠস্থান—ভৈরব বক্রনাথের জন্য শিবস্থান।

তারাপীঠে ˚সতীর উর্ধ্বনয়ন তারা পতিত হয় সেই অর্থে একান্ন (বা বাহান্ন) পীঠস্থানের অন্তর্গত। কিন্তু তারাপীঠ সেরূপ নয় তবে এটি একটি সিদ্ধপীঠ এবং সাধক বামাক্ষেপা এখানে সিদ্ধিলাভ করেন।

প্রবন্ধকার ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন কাজেই পরের সংখ্যায় উপরের ভুল সংশোধিত হবে এবং আগামী সংখ্যায় এ রকম পীড়াদায়ক ভুলের আধিক্য নিশ্চয় থাকবে না।

—সুনির্মল রায়, পিনাকী রায় ও অন্যান্য, সানঘাটাপাড়া, রামপুরহাট, বীরভূম।

উপন্যাস প্রসঙ্গে

আমি আপনার মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠিকা। ধারাবাহিক রচনা—'গাছের পাতা নীল', ও বাণি দেবীর লেখা 'অন্য ঠিকানায়' অপূর্ব লেগেছে। 'অন্য ঠিকানায়' উপন্যাসটি ভালো লেগেছে তার সুন্দর ভাষা ও লেখার স্টাইলে। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় আবার বাণি দেবীর লেখা পড়তে চাই।

—বেলা মজুমদার, ৩০৭, থার্ড এভিনিউ, খড়্গপুর।

বেচিতে চাই

মাননীয় মহাশয়,

নিম্নোক্ত পুরাতন মাসিক বসুমতী পত্রিকাগুলি ক্রয়মূল্যের অর্ধেক দামে বেচিতে চাই। আপনি দয়া করিয়া সকলের অবগতির জন্য মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ছাপাইয়া বাধিত করিবেন।

একসঙ্গে বা খাপছাড়াভাবে বেচিতে চাই

১৩৭৫ সাল—শ্রাবণ সংখ্যা ছাড়া বাকী সব

১৩৭৪ সাল—শ্রাবণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ছাড়া বাকী সব।

১৩৭৩ সাল—সব সংখ্যা।

১৩৭২ সাল—সব সংখ্যা।

১৩৭১ সাল—সব সংখ্যা।

১৩৭০ সাল—জ্যৈষ্ঠ ছাড়া সব

১৩৬৯ সাল—আশ্বিন ছাড়া সব

১৩৬৮ সাল—সব সংখ্যা।

১৩৬৭ সাল—সব সংখ্যা।

১৩৬৬ সাল—পৌষ ও ভাদ্র ছাড়া বাকী সব।

১৩৬৫ সাল—পৌষ ছাড়া সব।

১৩৬৪ সাল—সব সংখ্যা।

—শ্রীমৃণালিনী চ্যাটার্জী, গ্রাম: ময়নাডাল, পো: রাণীপাথর জিলা: বীরভূম।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ, সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন, ১৩, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ●শ্রীনপেন্দ্রকুমার মৌলিক, অফিস অব দি কণ্ট্রোলার অব ফিনান্স, ফুড সাপ্লায়িং বিভাগ, গভঃ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১১এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ●শ্রীমতী সোমা সুর, অব: শ্রীরবীন্দ্রনাথ সুর, সুর'স মিল, ডাক—নাবাদা, গয়া। ●শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত, অব: সি আর দাসগুপ্ত, অফিস-ইন-চার্জ, এ সি এস সিভিল এরোড্রোম, ডাক—কৈলাসহর, ত্রিপুরা। ●শ্রী এস কে ঘোষ, ব্লক ডেভোলাপমেণ্ট অফিসার, শীতলকুচী, কুচবিহার। ●ডিম্বেশ্বর বরা, দাফলাগড় টি এস্টেট, পো:—টটেনবাড়ি, দরং, আসাম। ●শ্রীমতী সুষমা প্রভা পাল, অব: এ সি পাল, ডি এল সিংহ রোড, ভাগলপুর। ●শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ অব: শ্রীপি বি ঘোষ, সাতগাছিয়া, ডাক—বাওয়ালী, ২৪ পরগণা। ● শ্রীমতী এস রায়, ১৩, নেহরু রোড, দেরাদুন, উত্তরপ্রদেশ। ● ডা: পি কে রায়, বারলা মেডিকেল কলেজ, বারলা, সম্বলপুর, উড়িষ্যা। ●শ্রীমতী কল্পনা পাঁজা, অব: মুরলীধর পাঁজা, দাওয়ারী কাইগ্রাম, মন্তেশ্বর, বর্ধমান। ●শ্রীমতী রেণবালা সিংহ, অব: এস এন সিংহ মেনদাস ডিভিশন, ডাক—বারলা, সম্বলপুর। ●শ্রীবল্লভেন্দ্রনাথ সেন, সালিপর উচ্চ বিদ্যালয়, সালিপুর, কটক ●●● শ্রীস্বপনকুমার মণ্ডল, সন্ধ্যা গোরাবাজার, বীরভূম। ●এল টি পি মঞ্জুশ্রী, ৭ চার্লস প্লেস কলম্বো-৩, সিলন। ●শ্রীনীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কাছারীপটি, ডাক—বোলপুর, বীরভূম। ● গ্রন্থাগারিক, ইউনিভার্সিটি, লাইব্রেরী, গৌহাটি ইউনিভার্সিটি গৌহাটি, আসাম। ● শ্রীমতী ডি কে সেন, ওয়াজির হাসান রোড, লক্ষৌ-১। ●শ্রীআশীষকুমার গায়েন, হাঁসচরা, মেদিনীপুর। ●শ্রীসুবোধরঞ্জন সরকার ৩৬১৯ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কলিকাতা-৪২। ●শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী, অব: ডঃ পুলক সান্যাল, এম ডি 4011 Karelia St, L. A Calif 90065 U. S. A.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের গ্রাহকমূল্য ২০৲ টাকা পাঠালাম। অনুগ্রহপূর্বক মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাবেন। শ্রীমতী গৌরী দেবী (মুখোপাধ্যায়) অব:—ডঃ জে কে মুখার্জী সুন্দরঘাট, ডাক-মীরজাপুর, এম পি।

আগামী ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ১০৲ টাকা পাঠালাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠিয়ে বাধিত করবেন। শ্রীমতী হেনা রায়, চাতরা নেতাজী বালিকা শিক্ষা নিকেতন, দক্ষিণ চাতরা, ২৪-পরগণা।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

॥ ৪৮ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥

ব্রহ্মচারী ও শিষ্য সাপ

"প্রায় এক বছর পরে ব্রহ্মচারী আবার এসে সাপের সন্ধান করলেন। রাখালরা বললে—'সে সাপটা মরে গেছে।' কিন্তু ব্রহ্মচারী জানেন, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। তাই তিনি সেদিকে গিয়ে তাঁর দেওয়া নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। গুরুদেবের আওয়াজ শুনে সাপটি গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন—'কেমন আছিস?' সে বললে—'আজ্ঞে, ভাল আছি'। ব্রহ্মচারী—'তবে এত রোগা দেখছি কেন?' সে বললে, 'আজ্ঞে, হিংসে তো করি না, তাই পাতাটা, ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়েছি।' সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে থেকে ওর কারু উপর ক্রোধ নাই—ও ভুলেই গেছে যে একটা রাখাল ওকে খুব মেরেছিল। ব্রহ্মচারী বললেন—'তাতে অতো রোগা হবি কেন? আরো কিছু কারণ নিশ্চয়ই আছে—ভেবে দেখ।' রাখালের মারের কথা তখন তার মনে পড়লো—বললে, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে; রাখালরা তো অজ্ঞান, তারা তো জানে আমার মনের অবস্থা—একদিন আমাকে খুব মেরেছিল'।

"ব্রহ্মচারী বললেন—'তুই এত বোকা কেন? আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না? ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নি কেন? আমি তোকে কামড়াতে বারণ করেছি—ফোঁস করতে নয়। তুই যদি ফোঁস কত্তিস, তবে শত্রুরা তোকে মারতে পারতো না'।

"দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই। সংসারী লোক ফোঁস করবে—বিষ ঢালা উচিত নয়, কাজে কারু অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়;—না হলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।"

ব্রহ্মজ্ঞান

'যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ (গী-১৮।১৭)

ইহা পারমার্থিক দৃষ্টি। এ অবস্থা যাঁর হয় তিনি সর্ব-কার্যের সাক্ষিস্বরূপ শুদ্ধ আত্মা—নিষ্ক্রিয় আত্মা। দেহের কোন কার্যের সঙ্গেই তিনি জড়িত নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মায়া আবরণস্বরূপ। ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। মায়া থাকতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। 'নেতি নেতি' বিচার শেষ হলে, মনের নাশ হয়ে সংকল্প-বিকল্প চলে গেলে সমাধি হয়। সে অবস্থায় বুদ্ধি যখন বোধস্বরূপ পরব্রহ্মে লয় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এভাবে নিত্যে পৌঁছানোর নাম ব্রহ্মজ্ঞান; আর এপথের নাম জ্ঞানপথ বা বিচার পথ।

"ব্রহ্মজ্ঞান সহজে হয় না; বিষয়বুদ্ধি একেবারে না গেলে হয় না; মনের নাশ না হলে হয় না। মনের নাশ হলেই অহং নাশ হয়। তাই রামপ্রসাদকে 'আপনি যদি না পারিস মন, তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।' মনের লয় হওয়া চাই, আবার 'রাম-প্রসাদের লয়' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

"একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সুতায় একটু আঁস থাকলে সুচের ভিতরে যাবে না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি কামিনীকাঞ্চন উৎসাহ সব চলে যায়; সব শান্তি হয়ে যায়। কাঠ পুড়ে শেষ হয়ে গেলে—ছাই হলে, আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়—শেষে শান্তি। তাঁর যত নিকটে যাবে ততই শান্তি।

"যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত। সে ঠিক বুঝতে পারে যে আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করার পর দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর

নড়্ নড়্ করে। যেমন খড়ো নারকেল—শাঁস আলাদা, মালা আলাদা ; যেমন শুকনো পাকা সুপারি বা বাদাম,—শাঁস আলাদা, ছাল আলাদা—নড়্ নড়্ করে।

“ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। লেশমাত্র বিষয়বুদ্ধি থাকতে না, কামিনী-কাঞ্চন মনে আদৌ থাকবে না। তবে হবে। কামিনী-কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি—এসব বিদ্যার ঐশ্বর্য। বিদ্যামায়া ধ'রে ধ'রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির উপরের পৈঠে—তার উপর ছাদ। ছাদে পৌঁছেও কেউ কেউ সিঁড়িতে আনাগোনা করে—জ্ঞানলাভের পরও 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি' রাখে লোকশিক্ষার জন্য, ভক্তি আস্বাদনের জন্য, ভক্তের সঙ্গে বিলাপ করবার জন্য। অবতার ও ঈশ্বরকোটির এরূপ হয়। এ ছাড়া আর কারুই ব্রহ্মজ্ঞানের পর একুশ দিনের বেশী শরীর থাকে না।

“সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্ম দর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। সমুদ্র মাপতে গিয়ে নুনের পুতুলের অবস্থা হয়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার অবস্থা বা শক্তি থাকে না।

“ভক্তির পথ ধ'রে গেলেও ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে পারে। ভগবান সর্বশক্তিমান। মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তেরা প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ছেলে, তুমি মা'—এই অভিমান রাখতে চায়। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও সগুণব্রহ্ম আদ্যাশক্তির কাছে প্রার্থনা কর; তিনি প্রার্থনা শুনেন। তাঁকে বললে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম ; যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম; পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল; কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইতো না। তারা কেউ বাৎসল্য, কেউ সখ্য, কেউ দাস্য, কেউ মধুরভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করতে চাইতো।

“স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে হওয়া কঠিন। যত সেয়ানা হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।

“পার্বতী গিরিরাজকে বলেছিলেন—'বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, তাহলে সংসার ত্যাগ ক'রে সাধুসঙ্গ করতে হবে।

“এক থেকেই অনেক হয়েছে—নিত্য থেকে লীলা। কে অবস্থায় অনেক চলে যায়। আবার এক চলে যায়, সেই-ই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা—অন্ধকার আলোর মধ্যে। আমরা যে আলো দেখি, সে আলো নয়—এ জড় আলো নয়। (তমসঃ জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ বা তং—মুণ্ডক)।

“এ অবস্থায় মন্ত্র হয় শরীরগুলি খোল মাত্র থাকলেও এসে যায় না—তেমনও এসে যায় না। ঠিক বোধ হয়—ঠিক দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন। ত্যাজ্য গ্রাহ্য থাকে না—কারু উপর রাগ করবার জো থাকে না। কেবল হরিকথা ভাল লাগে, আর ভক্তসঙ্গ। তখন ঠিক এক জ্ঞান হয়—অনৈক্যভাব আর থাকে না। এ অবস্থায় অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর।

“গাড়ি ক'রে যাচ্ছি—বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম।”

ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—“ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা কর, আর কাঁদ। এতে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। তখন নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। “ভক্তের আমি”-রূপ জলে প্রতিবিম্ব সূর্যকে দেখতে হয়, অন্য উপায় নাই। যতক্ষণ 'আমি' সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যও সত্য—যোল আনা সত্য ; সেই প্রতিবিম্ব সূর্য আদ্যাশক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিম্বকে ধ'রে সত্য সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণব্রহ্ম—যিনি প্রার্থনা শুনেন—তাঁকেই বলো, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। যিনি সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম; পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

“অপর পথ—জ্ঞানযোগ; বড় কঠিন পথ।”

ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ—“ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে। কখনো (১) বালকবৎ—সরল, উদার, অহংকার নাই, কোন জিনিষে আসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, কোন আঁট নাই—সদা আনন্দময়।

“কখনো (২) জড়বৎ—অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন করে অবাক্ হয়ে থাকে; কি যেন দেখছে! এ অবস্থায় কর্মত্যাগ হয়—কোন কর্ম করতে পারে না, কোন চেষ্টা করতে পারে না; সমাধিস্থ!

“কখনো (৩) উন্মাদবৎ—হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়! পাগলের মত ব্যবহার করে।

“আবার কখনো (৪) পিশাচবৎ—শুচি অশুচি ভেদবুদ্ধি থাকে না; আচার-অনাচার এক হয়ে যায়।

“আর একটি লক্ষণ—আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল কল্লোল—নীচে স্থির গভীর জল। কখন বাল্যভাব, কখন পৌগণ্ড ভাব—তখন ফষ্টি-নষ্টি করে; কখন যুবার ভাব—লোকশিক্ষা দেয়, কর্মে সিংহতুল্য।

"আবার আছে, সুন্দর বাজনা শুনলে—যেমন ঐকতান বা নহবতের রাগ-রাগিণী—ভাবাবিষ্ট হয়ে যায়।"

ব্রহ্মের রূপকল্পনা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"এ মানুষের কল্পনা নয়; এ কল্পনা ব্রহ্ম নিজে করেন। কেন করেন? তিনি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন না। তাঁর খুসী। তিনি ইচ্ছাময়। কেন তিনি করেন, এ খবরে আমাদের কাজ কি? বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও;—ক'টা গাছ, ক' হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এসব হিসেবে কাজ কি? বৃথা তর্ক-বিচার করলে বস্তুলাভ হয় না।"

ব্রহ্মের স্বরূপ

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না; তিনি অবাঙ্মনসোগোচর। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে? যে ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সে-ই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে সে-ই জানে বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

'তিনি নিরাকার, আবার সাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল-কিনারা নাই। ভক্তি হিমে সেই সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়, জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গ'লে যায়। তখন তিনি নিরাকার, নির্গুণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন; মন বুদ্ধিদ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

'যখন তিনি ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন, তখন ভক্তের প্রেমের শরীর 'ভাগবতী তনু' দ্বারা সেই চিন্ময়রূপ দর্শন হয়। ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময়রূপ দর্শন করেছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন।'

ব্রহ্মানন্দ

ব্রহ্মবিদোপনিষদ বলেন—যাঁরা সাধু, অধীতবেদ, বলিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন, তাঁরা এই পার্থিব উপভোগ দ্বারা যে বিষয়ানন্দ লাভ করেন তাহাই চরম মনুষ্যানন্দ। এই মনুষ্যানন্দ পিতৃলোকের আনন্দ, গন্ধর্বলোকের আনন্দ, দেবলোকের আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ, বৃহস্পতির আনন্দ, প্রজাপতির আনন্দ, ইত্যাদি উত্তরোত্তর ক্রমে শতগুণ অধিক। ব্রহ্মলোকের আনন্দ তারও শতগুণ। ব্রহ্মানন্দ পরম আনন্দ, যে আনন্দের কোন বিঘ্ন, বা তারতম্য নাই—যাহা ভূমা (মহান্) বা অমৃত—যাহা ব্রহ্মজ্ঞেরই ভোগ্য, অবিনশ্বর পরমানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দের উল্টো। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে—কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ। বিষয়াসক্তি একেবারে না গেলে ব্রহ্মানন্দ হয় না; বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ একসঙ্গে হয় না।

'ভজন করতে করতে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন—তখন ব্রহ্মানন্দ। একবার ভগবানের আনন্দের স্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়,—বিষয়ানন্দ তখন ভাল লাগে না, তাতে সংসার থাকে আর যায়। তখন চাতকের মত বৃষ্টির জলই খোঁজে—বিনা স্বাতীকি জল সব ধূরে!'

ভক্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তিনি তো সর্বভূতেই আছেন—তবে ভক্ত কাকে বলে? না, যে তাঁতে থাকে—যার মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে, সে-ই ভক্ত। ভক্তের মন সর্বদা ঈশ্বরেতে আছে। অহংকার, অভিমান থাকলে ভক্ত হ'তে পারে না। 'আমি'রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। 'আমি' যন্ত্র।

'তাই ভক্তেরা সব অবস্থাই লয়; তিন অবস্থা, তিন দেহ, তিন গুণ, সবই স্বীকার করে।

'ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় ক'রে থাকে; সাধুসঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য—এই সব আশ্রয় ক'রে থাকে। সে বলে, যদি 'আমি' সহজে না-ই যায়, তবে থাক্ শালা 'দাস' হয়ে, 'ভক্ত' হয়ে।

'ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম; অর্থাৎ তার কাছে তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনি প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। সাকার রূপ মানো, আর না-ই মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি, এ বোধ থাকলেই হলো—যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন—যে ব্যক্তি অনন্ত শক্তি।

'ভক্ত যে আলো দেখে ভগবানের দিকে ছুটে যায়, সে যেন মণির আলো। এ আলো খুব উজ্জ্বল—আবার তেমনি স্নিগ্ধ ও শীতল। এ আলোতে দাহ নাই, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

'ভক্ত কিরূপ কর্ম ও কি প্রার্থনা করে? ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, খুশী হ'লে তিনি ভক্তকে ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

'ভক্ত বলে, 'মা, সকাম কর্মে আমার বড় ভয়। সে কর্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম করতে গেলে তোমায় ভুলে যাব। তবে এমন কর্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত যেন কাজ ক'মে যায়। যেটুকু কর্ম থাকবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি; আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন কোন নূতন কর্মে জড়াতে মন যেন না যায়। তবে, যখন তুমি আদেশ করবে, তখন তোমার কর্ম করবো—নচেৎ নয়।

'ভক্তের ভিতর তিনি বিশেষরূপে আছেন; ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা।

'ভক্ত অনেক রকম আছে। যার যে ভাব, সে ঈশ্বরকে তেমনই দেখে। তমোগুণী ভক্ত দেখে মা পাঁঠা খায়, তাই সে বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত ক'রে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই; তার পূজা লোকে জানতে

করে না। ফুল নাই ত বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পূজো করে। দুটি মুড়কি কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। ত্রিগুণাতীত ভক্তের বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজো। শুধু তাঁর নাম।

'আবার আছে, তিন রকম ভক্ত—অধম, মধ্যম ও উত্তম ভক্ত।

'ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। সে স্বপ্নবৎ বলে না—বলে, তিনিই সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম—তাঁরই নানারূপ।

'ভক্তের পক্ষে আহারে যদৃচ্ছাচার চলে না. সব রকম খাওয়া চলে না।'

ভক্তি

ভক্তি কাকে বলে? মহর্ষি শাণ্ডিল্য তাঁর 'ভক্তিদর্শন' সূত্রে বলেছেন—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'—অর্থাৎ ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠা (পূর্ণ) অনুরক্তি বা অনুরাগই ভক্তি। দেবর্ষি নারদ তাঁর 'ভক্তিসূত্রে' বলেছেন—'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা', অর্থাৎ ঈশ্বরে পরম প্রেমই ভক্তি। 'মন্ত্রযোগ' তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলেছেন— স্ব স্ব ইষ্টদেবতার প্রতি ঐকান্তিক প্রেম বা ভালবাসার নাম ভক্তি। আবার কেউ কেউ বলেন, জীবের স্বরূপ কি, ইহার অনুসন্ধানই ভক্তি।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন,—রাগ বা অনুরাগ সুখপ্রদ এবং দ্বেষ দুঃখপ্রদ। এই সুখপ্রদ রাগবৃত্তি যখন ভগবানের বা ইষ্টের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসায় পরিণত হয়, তখন তাকে ভক্তি বলে। সোজা কথায় ভগবানের প্রতি একটা প্রাণের টান.--তাঁর কথা শুনতে, তাঁর রূপ ধ্যান করতে, অন্তরে বাইরে তাঁর পূজা করতে, সকল সময়ে সকল বিষয়ের মধ্যে তাঁরই গুণগান করতে মনের যে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয়, তাকেই ভক্তি বলে।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

হেইনরিখ হাইনে

এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা-সংগ্রামী দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শুভজন্মের ঠিক শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৭৯৭ সালে পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই দিক্‌পাল কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রাচ্যে মীর্জা গালিব এবং প্রতীচ্যে হেইনরিখ হাইনে।

রাইন নদীর তীরবর্তী ডুসেলডর্ফে তাঁর জন্ম। বাবা স্যামসন হাইনে ছিলেন একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী, জীবনে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে তাঁর কবিপুত্র ভালবেসেছেন কিন্তু পুত্রের হৃদয়ে তিনি যে আসন অধিকার করে-ছিলেন সেদিক দিয়ে তাঁকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কারো হয় নি। মা ছিলেন যথেষ্ট বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতেন, ল্যাটিন সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে পড়তেন, বাঁশিও বাজাতেন অপূর্ব। সন্তানদের লালন পালন ও যথাযথ ভবিষ্যৎ গঠন সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার অন্ত ছিল না।

কাব্যানুরাগ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। বাল্যকাল থেকেই এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি তাঁর ভিতর ফুটে ওঠে। মানুষকে আকর্ষণ করার একটা ক্ষমতাও তাঁর ছিল সহজাত। স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পর ব্যবসার দিকে গেলেন না হাইনে। পড়তে আরম্ভ করলেন আইন। এক জায়গায় নয়—বন, গোটিনজেন এবং বার্লিন, তিন জায়গায় আইনের পাঠ নিয়েছেন হাইনে। বার্লিন থেকে বৈচিত্র্যের অন্বেষণে পাড়ি জমালেন ইংল্যাণ্ডে, গেলেন ইটালিতে শেষে হেলিগোল্যাণ্ডে। ১৮২৫ সালে আইনে তিনি ডক্টরেট অর্জন করেন।

১৮৩১ সালে এলেন প্যারিসে। প্যারিসের অভিজাতমহলে সাড়া জাগালেন তখনই তাঁর কবিখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে প্যারিসের মহিলামহলে আলোড়ন বইছে। কে তাঁকে একেবারে নিজস্ব করে পেতে পারে এই নিয়ে অভিজাত ফরাসী নারী সমাজে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা।

এদের অনেককেই করুণা করেছিলেন কবি, কিন্তু তার মধ্যে একটা ক্ষণকালের স্পর্শমাত্র ছিল—ছিল না চিরকালের নিশ্চিত আশ্বাস আর ক্ষণকালের সঙ্গে চিরকালের সংগ্রামে যে একজন মাত্র জিতেছিল সে আভিজাত্যের গৌরবে গৌরবিতা নয় সে এক অতি সাধারণ মেয়ে। এক দোকান কর্মচারী। নাম তার গিলেসটাইন। কবি তাকে ডাকলেন নতুন নামে—সে নাম ম্যাটিল্ডি।

খ্যাতির হাত ধরে এলেই এল টাকা। প্রচুর টাকা। কোটাস এ্যালগে-মেন জিটাং পত্রিকার প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন তিনি মোটা বেতনে। বই থেকেও টাকা আসছে প্রচুর। ধনী পিতৃব্য সলোমন এবং প্যারিসের ব্যাঙ্কার রথচাইল্ড মুহুর্মুহু চলেছেন টাকা জুগিয়ে। ফরাসী সরকার তাঁর প্রতি গভীর সম্মানের নিদর্শন হিসাবে মোটা অঙ্কের বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

এককথায় শুধু সরস্বতীই নয় লক্ষ্মীও কৃপা ঢেলে দিলেন তাঁর প্রতি অবিরাম ধারায়। ১৮৩৭ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্য সংকলন "বুক অফ সংস" প্রকাশিত হল। ১৮৪৩ সালে বার বছর পরে দেশে ফিরলেন কিন্তু দেশের সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে কোনদিনই তাঁর সদ্ভাব ছিল না, সেই আবহাওয়া এবার যেন আরও তিক্ততা ধারণ করল। তারই ফল—এ উইন্টার্স টেল। ১৮৫১ সালে তাঁর অপর কাব্য সংগ্রহ 'রোমা-ন্সেরো' প্রকাশ পেল।

বাঙলা দেশে হাইনের অপরূপ গীতিকাব্য একাধিক দিকপাল কবিদের দ্বারা অনূদিত হয়েছে। ভারতবর্ষকে কবি দূর থেকে চিরদিন ভালবেসেছেন। শুধু জন্ম সালের আকস্মিক সাদৃশ্যই নয়—অন্তরের দিক থেকেও ভারতের মাটির প্রতি টান ছিল। ভারতবর্ষ তাঁর ভাষায়—

India, the land of the sun, where the ambra blossoms perfume the mellow air.

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর দেহান্তর ঘটে।

কাছাড় রাজসভায় বাঙলা ভাষার সমাদর

?াদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে · বাঙলা সাহিত্যে যখন ঘনরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল', 'ধর্মপুরাণ', কবিচন্দ্র 'রামায়ণ', দ্বিজরসিক 'মনসামঙ্গল', রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর', 'কালিকামঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি পাঁচালীকাব্য ও মঙ্গলকাব্য লিখছেন তখন বাঙলার সংস্কৃতিধারা থেকে বহুদূরে কাছাড়ীদের রাজধানী মাইবং (কীর্তিপুর) ও খাসপুরে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির উন্নতির যুগ, বাঙলা সংস্কৃতির অনুসরণে কাছাড়ীদের রেনেসাঁর চরম বিকাশের যুগ।

১৭০০ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগের কাছাড় রাজ্য—বর্তমানের সমগ্র উত্তর কাছাড় জেলা, কাছাড় জেলা ও উত্তরে নওগাঁ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন কাছাড় রাজ্য তথা হৈড়ম্ব রাজ্য রাজা তাম্রধ্বজের শাসনাধীনে। কোন একসময় রাজা তাম্রধ্বজ প্রতিবেশী জৈন্তারাজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বন্দী হন। প্রমাদ গণলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। স্বামীকে রক্ষার জন্য রাণী অহোমরাজ রুদ্রসিংহের শরণাপন্ন হলেন। দূত পাঠালেন অহোমরাজের কাছে। রাণীর এহেন প্রার্থনায় সাড়া দিলেন রুদ্রসিংহ। মুক্ত করলেন রাজা তাম্রধ্বজকে। কাছাড় রাজ্য অহোম রাজের সামন্তরাজ্য হিসাবে রইল। রাণী চন্দ্রপ্রভা সম্পর্কে অহোম বুরুঞ্জীতে আছে—'কচারী রাজার দেবীজনা, মহাসুন্দরী। চন্দ্র সূর্যতে মলি আছে, দেবীত মলি নাই, কেশ সাতহাতিয়া' (কাছাড়ী রাজাদের এই রাজলক্ষ্মী পরমাসুন্দরী। চন্দ্র সূর্যে কলঙ্ক আছে কিন্তু রাণীর কোন কলঙ্ক নেই, মাথার চুল সাত হাত লম্বা)।

এ কিন্তু রূপকথার গল্প নয়! এই অসামান্যা নারীর খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি ছিলেন বুদ্ধিতে অসামান্যা। তাঁর বুদ্ধি ও রূপের কথা তৎকালীন ত্রিপুরা, আসাম ও বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অসাধারণ স্বাধীনচেতা রমণীর উৎসাহ ও প্রেরণায় রাজা তাম্রধ্বজ নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে ঘোষণা করলেন। অহোমরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হলো কাছাড়ীদের। পরাস্ত হলেন কাছাড়ীরাজ।

শীতাংশু পাল

অহোমরাজাদের বারবার আক্রমণের ফলে কাছাড়ীরা মাইবং পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। মাইবং থেকে দক্ষিণে বরাক পর্যন্ত মধুরা নদীর তীরে সুরক্ষিত অঞ্চলে তাঁরা রাজধানী স্থাপন করলেন। কাছাড়ীরাজকুলের সেই অসামান্যা রাণী চন্দ্রপ্রভার আনুকূল্যে কাছাড়ী রাজকার্যে বাঙলা ভাষার প্রচলন হলো। তখন সিংহাসনে রাজা শূরদর্পনারায়ণ। রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার পরামর্শে রাজসভায় বিশিষ্ট বাঙালী পণ্ডিত আনা হলো। পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রীভুবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য ছিলেন রাজগুরু। তিনি সম্ভবত পূর্বদেশীয় অধিবাসী ছিলেন। রাজমাতা চন্দ্রপ্রভাদেবীর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ১৬৫২ শকাব্দে (১৭৩০ খৃস্টাব্দ) 'শ্রীনারদীয় রসামৃত' বাঙলা ভাষায় রচনা করেন। (মূল পাণ্ডুলিপি শিলচর নর্মাল স্কুলে রক্ষিত)। 'নারদীয় রসামৃত' দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। বাঙলা সাহিত্যে কাছাড়ের অবদানের জন্য রাজা শূরদর্পনারায়ণের রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি 'শ্রীনারদীয় রসামৃতে' লক্ষ্মীর বন্দনা লিখতে গিয়ে বন্দনা করেছেন রাজা শূরদর্পনারায়ণের পুরীতে অচলা থাকতে—

'প্রণমহ ভূমিপতি লক্ষী ঠাকুরাণী।
বিষ্ণুর বল্লভা কামদেবের জননী ॥
ক্ষিরোদ তনয়া দেবী ভকতবৎসলা।
না বুঝিআ নরলোকে বলে তো চঞ্চলা।
লক্ষীছাড়া পুরুষের বুদ্ধি হত হয়।
তব কৃপা আছে যার সেই মহাশয় ॥
লক্ষীছাড়া পুরুষেরে ছাড়ে বন্ধুজন।
লক্ষী ছাড়িলে তার বিপক্ষ হয় গণ ॥
লক্ষীছাড়া পুরুষের সব আন্দিআরা।
থাকুক অন্যের দায় ঘৃণা করে দারা।
কৃপা করি ঠাকুরাণী থাক যার ঘরে।
ইহলোকে পরলোকে সেই জন তরে ॥
কবি বাচস্পতি বলে শুন মা কমলা।
সুরদর্প নৃপ ঘরে হইবে অচলা ॥"

পয়ার ছন্দে লিখিত 'শ্রীনারদীয় রসামৃত'। অপভ্রংশ ও আঞ্চলিক শব্দের বহুল ব্যবহার পাওয়া যায় সমস্ত কাব্যে। অপভ্রংশ ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো কাব্য যেন সর্বজনবোধগম্য হয়। তাই 'শ্রীনারদীয় রসামৃতের' বৃহন্নারদীয়পুরাণের কিয়দংশ অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন—

'দেবব্যাস নির্মিত অষ্টাদশ পুরাণ।
বহুপুণ্য কথা হেতু নারদী প্রধান ॥
নারদী পয়ার পষ্ট করিতে পয়ারে।
দেবী চন্দ্রপ্রভা আজ্ঞা দিলা তো আমারে।
যুবালোকে দঢ় দ্রব্য হলনে চিবায়।

[illegible]

ভক্তিহীন হৈলে যথা তুরি কর্ণী ধার ॥
জেন মতে বিধানে বুঝএ শাস্ত্র বলে।
ভালমতে ব্যক্ত হইলে বুঝিব সকলে ॥
সর্বলোক উপকার হেতু রাজমাতা।
করাইবা অতি পষ্ট বড় গুহ্যকথা ॥

●

হরিধ্যান কর গ্রন্থ হইল সমাপন।
ষোলশ বায়াম্ন শকেতে হইল লিখন ॥
তাম্রধ্বজ মহারাজ ছিলা মহাভাগ।
সর্বলোকে সদা করে তান অনুরাগ ॥
তান পুত্র রাজা সুরদর্প মহাশয়।
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয় ॥
কবি বাচস্পতি তান বাক্য অনুসারে।
শ্রীনারদী রসামৃত রচিলা পয়ারে ॥
ইতি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য
বিরচিত নারদী রসামৃত
আটত্রিশ অধ্যায় ॥'

কাছাড়ীরা পুরোপুরি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁরা ছিলেন হিন্দু। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের আমলে কাছাড়ীরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তখন প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের জোয়ার চলেছে। খাসপুর রাজ-অন্তঃপুরে মণিপুর রাজকন্যা ইন্দুপ্রভা প্রবেশ করলেন রাজমহিষীর পদমর্যাদায়। কাছাড়ী জনসমাজে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের কাজ ত্বরান্বিত হলো। কিন্তু এর পূর্বে তাঁরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। তাদের আরাধ্যা দেবী ছিলেন 'রণচণ্ডী'। প্রবাদ আছে, কাচা নরমাংস তিনি খেতেন, তাই দেবীর আরেক নাম 'কাঁচাকান্তি'। নরবলি দেওয়া হতো দেবীর সামনে। সে যুগে কাছাড় ভিন্ন ত্রিপুরা, জৈন্তা ও আসাম রাজ্যেও নরবলির প্রচলন ছিল। দেবী 'রণচণ্ডীকে' উদ্দেশ্য করে রাজা শূরদর্পনারায়ণ নিজে বহু গান লিখেছেন। সে গানগুলিও বাঙলা ভাষায় লেখা—

'দিন দয়াময়ী নাম তোমার ॥ ধু ॥
শুনিআ ভরসা হইয়াছে আমার ॥
পুজা জপ তপ কিছু নাহিক আমার।
তবে যদি কৃপা কর মহিমা তোমার ॥
আমি তো কুমতি অতি গতি নাহি আর।
ভরসা করিয়াছি কেবল শ্রীচরণ তোমার ॥
প্রণতি করিআ বলে সুরদর্প রায়।
আজ্ঞা কর মুণ্ড দিয়া ভজি রাঙা পায় ॥'

আজ থেকে প্রায় ২৩৬ বৎসর পূর্বের কথা যখন বাঙলা সাহিত্যে পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য রচনা করা হচ্ছে তখন বাঙলা দেশ থেকে যোগসূত্রহীন বহু দূরে কাছাড়ে একজন অবাঙালী কাছাড়ীরাজা নিজে বাঙলা পয়ার ছন্দে গান লিখে চলেছেন, রাজকার্যে বাঙলা ভাষার ব্যবহার করছেন ও রাজসভায় বাঙালী পণ্ডিতদের উচ্চ সমাদর দিচ্ছেন; এ ছিল বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতির প্রচারের একান্ত গৌরবের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন আসাম, ত্রিপুরা, আরাকান ও রোসাঙ্গ প্রভৃতি রাজসভার উল্লেখ আছে কাছাড়ী রাজসভায় বাঙলা ভাষার চর্চা সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি থাকা সত্ত্বেও আলোচনা করা হলো না। এগুলির কি ঐতিহাসিক মূল্য নেই?

কাছাড়ীদের মধ্যে এককালে অসমীয়া ভাষার প্রভাব এসেছিল সত্য কিন্তু তা' স্থায়ী হয় নি। কাছাড়ীদের নিজস্ব ভাষা আছে। তাঁদের নিজস্ব ভাষায় লোকসঙ্গীত আছে। যেমন—"বার ছিরি চ্রাছে বার ফাইডু"। এর অর্থ বার মানে বাতাস, ছিরি মৌনভাবে 'চ্রাছে' শান্তি, 'ফাইডু' প্রবাহিত (অনন্ত শান্তি নয়ে দয়াপরবশ হয়ে মৌনভাবে বাতাস বহিছে। এ তো শরৎসঙ্গীতের অংশবিশেষ। ডিমাছা কাছাড়ীদের এ' ভাষা ভোটব্রহ্ম শাখার 'বড়ো' গোষ্ঠীর ভাষার অন্তর্গত। আসামের আদিম সমাজের মধ্যে এই ভাষাই প্রধান। আর্যভাষার প্রভাবে এদের ভাষা আজো প্রভাবান্বিত না হয়ে আর্যেতর একটি ভাষা হিসাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কিছু ডিমাছা ভাষার উল্লেখ করছি—

যেমন দুধ (মুসুত্তি), হাতি (মিধুং), নাপিত (নাবডি), সড়ক (লাজাল), জল (খাইছা), বৃষ্টি (হাডি), আজ (সাইং), বিকাল (ব্রিছা) প্রভৃতি। কাছাড়ী ভাষায় এখন দস্তুরমত সাহিত্য চর্চা করা হয়। বর্তমানের বাঙলা আধুনিক কাব্যের প্রভাবে ডিমাছা ভাষায় কাব্যচর্চা উল্লেখযোগ্য।

উত্তর কাছাড় জেলার নদীগুলির নাম হারাং, লরাং জাটিঙ্গা, মাকা ও দোয়াং এ সব তো ডিমাছা শব্দ। 'ডি' শব্দবাচক আসামের ডিহং, ডিবং, ডিব্রু, দিখৌ ও ডিমা প্রভৃতি নাম ডিমাছা কাছাড়ী শব্দ থেকেই। কত শতাব্দীর আগের মানুষ এই কাছাড়ীরা। ইতিহাসবিহীন কোন ঘন তমিস্রার মধ্যে ভুটান ও বার্মার পথ ধরে এই আশ্চর্য মানুষরা আসাম কাছাড় জুড়ে রাজ্যশাসন করল, অরণ্যাশ্রিত নদীতটে পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রাম জনপদ গড়ে তুলল, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলা কাব্যে যে পাঁচালীকাব্যের ধারা প্রচলিত ছিল 'মমতাবিহীন কালস্রোতে বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিত' এ' কাছাড়ে তারই একটি বিক্ষিপ্ত ধারা শত শত মাইল দূরে বাঙালী সভ্যতা ও কৃষ্টির পারস্পরিক প্রভাবে কাছাড়ী রাজার কণ্ঠে গান হয়ে ফিরছিল—এগুলির মূল্যায়ন কি হবে না?

কাছাড়ীদের নিজস্ব ভাষা কাছাড়ী। প্রশ্ন উঠতে পারে রাজকার্যে কাব্যরচনায় বাঙলা ভাষার প্রচলন হল কেন বা রাজারা কেন বাঙলা ভাষার প্রতি আগ্রহী হলেন। বলা বাহুল্য কাছাড়ীরা ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। মাইবং রাজধানী থাকাকালীন শ্রীহট্টের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র স্থাপন হয়েছিল। রাজা প্রতাপনারায়ণ ১৬০২ শকাব্দে বাঙলার শাসনকর্তা প্রেরিত মোগল সৈন্যগণকে পরাজিত করে শ্রীহট্টের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। (গৌহাটি মিউজিয়ামে রক্ষিত হাফলং-এ প্রাপ্ত একটি মুদ্রায় আছে—'হরিচরণ কমল মধুকরঃ শ্রীশ্রীন্দ্র প্রতাপনারায়ণ হাচেংছা বংশজস্য শ্রীহট্ট বিজয়ীন শাখে ১৬০২।") রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য গৌড়দেশ থেকে

১৪ জন কুলীন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন। তার কাছাড়ী রাজাদের মধ্যে রাজা শূর-দর্পনারায়ণ যে দূরদর্শিতাসম্পন্ন ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে তিনি সাংস্কৃতিক দূত প্রেরণ করতেন। অহোম বুরুঞ্জীতে কাছাড়ী রাজাদের সাংস্কৃতিক দূতের কথা উল্লেখ আছে—

'হেড়ম্ব দেশের রাজা পাঠাইছে আমাকে।
অনেক ভকতিভাবে তোমাকে নিবাক ॥'

দূত মহাপুরুষ শংকরদেবের কাছে ভক্তিভাবে সংবাদ নিবেদন করছেন হৈড়ম্বরাজ্যে যাওয়ার জন্য। খাসপুরে রাজত্বকালে রাজা শূরদর্পনারায়ণের উত্তরসূরী রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র প্রমুখরা বাঙলা ভাষার চর্চা ও সমাদর করে গেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র "রাসলীলামৃত", "বসন্ত-বিহার" ও "গোবিন্দ কীর্তন" প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন। কাছাড়ী রাজারা কাছাড়ে প্রচলিত বাঙলা ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য ও সমতল কাছাড়ে বাঙলা সাহিত্য রচনার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

কাছাড়ীরা মাইবং-এ আসার পরই হেড়ম্ব নামে অভিহিত হন। কারণ তাঁরা হিড়িম্বার বংশধর। তাঁরা ভীমের ঔরসজাত পুত্র ঘটোৎকচের উত্তরসূরী রাজা। তাঁরা নামের সঙ্গে উপাধি জুড়েন 'বর্মণ'। কাছাড়ীদের শেষ স্বাধীন নরপতি গোবিন্দচন্দ্র নিজে বহু বাঙলা কাব্য রচনা করে গেছেন তন্মধ্যে 'শ্রীমহারাসোৎসব গীতিমালা' গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ। এ 'শ্রীমহারাসোৎসব গীতিমালা' নিঃসন্দেহে শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয় বাঙলা সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গান তিনি লিখেছেন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তখন বাঙলা সাহিত্যে গদ্য রচনার আদিপর্বের যুগ। 'রাসোৎসব গীতিমালা' যদিও বাঙলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ভণিতায় রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"কোথা ব্রজাঙ্গনাগণ প্রিয় রাধা মোর।
কোথা বৃন্দাবন কোথা নিকুঞ্জকুটির ॥
ব্রজধাম বাসস্থান স্মরিয়া কাতর।
বাক্য নাহি স্ফুরে প্রভু ভাবে জরজর ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র লীলামৃত রসে।
শ্রীগোবিন্দ নৃপ কহে জানি জসে ॥"

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের শেষ জীবন ছিল করুণ ও যন্ত্রণাময়। তিনি অতি করুণ ও বিষাদমাখা গান রচনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক। সঙ্গীতজ্ঞদের রাজসভায় সম্মান দেওয়া হত। রাজা গোবিন্দচন্দ্র নিহত হয়েছিলেন ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট অত্যন্ত করুণভাবে আততায়ীর হাতে। এরপর কাছাড় হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। কাছাড় স্বাধীনতা হারালো।

বর্তমানে বর্মণ সমাজে রাসনৃত্যের প্রচলন হয়েছে। বারোয়ারী নাটমণ্ডপে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার অভিনয় ও গান চলে সারারাত ধরে। অবহেলিত এ জাতির রাসনৃত্য, লোকগীতি ও ধামাইল গানে আছে বিষাদের সুর।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র রাজকার্যে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে-ছিলেন ব্যাপকভাবে। তৎকালীন জনসমাজের প্রতাপশালী ব্যক্তিদিগকে চৌধুরী, মজুমদার, বারভূঞা ও লস্কর প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হতো রাজ-দরবারে। সনদ লেখা হতো বাঙলায়। রাজার দণ্ডবিধির রায় লেখা হতো বাঙলায়। উদাহরণস্বরূপ সংগৃহীত সনদগুলির উল্লেখ করছি—

"শ্রী পানিআ — অতিথ জানিবা, তুমি রাজবাটার পান খাইবা, যোগী সমাজ সংস্কার করিবা। যে তোমার কথা না মানিবে সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে। মহারাজ গোবিন্দ-চন্দ্র ১৭০৮ শকাব্দঃ।

নাথ যোগী সম্প্রদায়ের কোন এক-জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে তিনি অধিকার দিচ্ছেন নাথ যোগী সমাজ সংস্কার করার। তাও লিখিতভাবে। তাঁর কথা অমান্যকারী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া হবে। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের অন্য একটি সনদপত্রে আছে—

"জমিতেকেনকে সনদ হুকুমজারি হৈড়ম্বাধিশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দচন্দ্র নৃপ বাহাদুরস্য- - -৮৭ সুধাকর কুলোদ্ভব পাণ্ডুবংশ—প্রভুশিত ছত্রিত কীর্তিমণ্ডল ভূপালবৃন্দ বন্দ্য হৈড়ম্বাধিশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ মহারাজাধিরাজ নৃপেন্দ্র বাহাদুরস্যাজ্ঞা সনদ-পত্রমিদং—
৭ সন ১৭৩৮ শালর তারিখে ৬ জৈষ্ঠ মাসে পরগণা বরাক পারের জমিধারান ও তালুকধারাআন ও রাযের প্রতি হুকুম সাদির হৈলেক মৌজে কনকপুরের পুর্বের প্রমাণ পত্রের চৌহদ্দ মৌজা মজকুরের শ্রীরঙ্জুমিআ ও নিকিমিআকে নিজে চালুকর মিরার খরিদা মিরাস ও রাইঅতান সহিতে এক নম্বর খরিতান খেলাত মৌজা মজকুরের চৌধুরীকি বিসয় দিলাম উহার বিবাহের কালেতে মণিধার ও সোণার খাড়ু ও খেস কমলি ও পালকি ও চৌদল ও নিশান ও টাশাবন্দুক আওয়াজ এইসব রকম চৌধুরী মজকুর চালাইতে হুকুম সাদির হৈলেক- - -সন ১৭৩৮ শাল মাহে ৭জৈষ্ঠ।"

এ তো গেল সনদপত্র। সেকালে কাছাড়ী সভাতে বাঙলা ভাষায় রাজার অনুগৃহীত ব্যক্তিদিগকে খেতাব ও পদবী দেওয়া হতো। ১২০৬ সালের কথা কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তখন কোলকাতাতে বৃটিশদের ঘাঁটি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গবর্নর জেনারেলের নিকট দুই শত সৈন্য প্রার্থনা করে বাঙলা ভাষাতে চিঠি লিখছেন—

"৭স্বস্তি শ্রীদুর্গা চরণারবিন্দ মকরন্দ সনানন্দিত মত্ত মধুব্রতায় মানস শ্রীশ্রীযুক্ত কৈলকাত্তাধীকারিন সদুদার চরিত্রেষু ভবতু বাহু (?) কহিয় মানস্য মমপি শ্রামইকং কুশলং বিশেস আমি আপনার

প্রিত প্রণয়র কারণ পুষে পত্র পাঠাইয়াছি তাহাতে সমাচার মালুম হৈআ থাকিব আর আমার উকিল শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস মুন্সীর পত্র দ্বারাতে আপনার হুজুরের সাহেব লোকর নেক্‌নজরবানি আছে হেন জানিআ অনেক হরিষ হইলাম মাত্র ও মদ্ধে কথাকার মগন (?) ও কল্যাণ সিংহ সুবেদার কারসাজি করিআ বাজে নিমকহারাম লোক লৈআ অনাহত আমার রার্জ লুটতরাজ করিছেন এহাতে আপনাকে মুরবী জানিআ --- লেখিতেছি আমার উকিলর দরখাস্ত মত এক পরাণা ও ২০০ জনা সিফাই সরকার হৈতে দিবেন আমি আপনাতাবে একান্ত থাকিব আপনার সরকারে শত দুই শত জনা লোক আমার ইথানে থাকিলে কেওর সহিত কিছু কাজিআ না হৈব আপনে মুরবি বিসযে কা লেখীব ইতি সন ১২০৬ সাল বাংলা ১৫ চৈত্র। পত্রমেতৎ শ্রীশ্রীযুক্ত কৈলকাত্তা বড়সাহেব গোহরবনর স্থানে দেনা।"

১৮৩২ ইংরাজির পরে কাছাড়ে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হয়; কিন্তু তাঁরাও রাজকার্যে বাঙলা ভাষার প্রচলন করেন।

এ হেন সনদপত্র থেকে আমরা তৎকালীন শাসনপদ্ধতি ও সমাজচিত্রের কথা জানতে পারি। শুধু সনদপত্রই নয় রাজদণ্ডবিধিগুলিও বাঙলায় লেখা ক্রমশ ক্রমশ বাঙলাভাষা চর্চার ফলে পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী বাঙলাগুলিতে দুর্বোধ্যতা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। খাসপুর রাজবাড়ীর "বারদুয়ারীতে" বসত রাজসভা। বিচার হতো রাজসভাতেই। বিচারের রায় প্রকাশ হতো দণ্ডবিধির ধারা অনুযায়ী।

"খনন করিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চৌর্য্য করে যে ব্যক্তি এমত চোরকে রাজায় হস্তদ্বয় ছেদন করিআ তিক্ষ্ণ শূলেতে প্রবিষ্ট করেন।"

১৮১৭ সালের কাছাড়ী রাজ্যের পেনাল কোডের বা দণ্ডবিধির ধারা ছিল এরূপ। রাজা গোবিন্দচন্দ্র আইনজারি করেছেন—

"শুনুন শুনুন, বিষ দ্বারা কিংবা অগ্নিদ্বারা পুরুষকে মারে যেই স্ত্রীয়ে, তাকে শিলাবান্ধিআ জলেতে ক্ষেপণা করিবেক, কিন্তু গর্ভযুক্তা হইলে জলে ক্ষেপণা করিবেক না।"

"কৃতাপরাধী যে রাজা তাকেই যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে, তবে তাকে শূল গাঁথিয়া অগ্নিতে পাচনা কুরিব।"

"লাঙ্গল, ফুল, ফল ইত্যাদি চুরি করিলে রাজাকে সোয়া ছয় কাহন দণ্ড দিতে হয়।"

বিস্মৃত অতীতের পৃষ্ঠায় কী কী দৃশ্য অভিনীত হলো তা' আমরা জানি না। একটি আদর্শ হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করার জন্য কাছাড়ী রাজারা কি অদম্য চেষ্টাই না করে গেছেন।

কাছাড়ী রাজাদের আমলে প্রচলিত যে যে কাব্য ও পুরাণের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তন্মধ্যে রামায়ণের 'অযোধ্যাকাণ্ড', 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড', 'সুন্দরাকাণ্ড', 'লঙ্কাকাণ্ড', 'উত্তরাকাণ্ড', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়', মহাভারতের 'বিরাট পর্ব', 'রঘুনাথের অশ্বমেধ', 'বীরবাহুযুদ্ধ' ও 'দ্রোণপর্ব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুপুরাণ থেকে 'প্রহলাদ চরিত্র', 'নারদীয় রসামৃতের পাঠ', 'পদ্মপুরাণের পাঠ, 'শ্রীকৃষ্ণস্তব' প্রচলিত হয়েছিল। এ ছাড়া গোপাল ঠাকুরের গান ও হাস্যনাথের পাঁচালীর শ্রীহট্টীয় পাঠ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত পুস্তকগুলি সবই রচিত হয়েছিল বাঙলা ভাষাতেই। তৎকালীন যুগের রচিত পুস্তকাবলীর বহু পাণ্ডুলিপি কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে ইতিবিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। উপযুক্ত সন্ধান করলে হয়ত আরও পুঁথি পাওয়া যেতে পারে যদ্দারা ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হওয়া বিচিত্র নয়। কাছাড়ের জনজীবনের ধ্যান-ধারণার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে কাছাড়ী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা বাঙলা সংস্কৃতির উন্মেষের সহায়তা করেছিল, একথা আজকের জনসমাজকে অকপট চিত্তে স্বীকার করতেই হবে।

নকল কিডনি

আমেরিকায় এক ধরণের নকল কিডনি নিয়ে পরীক্ষা চালান হচ্ছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে "ক্যাপিলারি কিডনি", কেন না এটা মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ রক্তবাহী ক্যাপিলারি জালকে অনুকরণ করে তৈরী।

এর আকৃতি বড় একটি টর্চলাইটের মত এবং প্রায় দশ হাজার ফাঁপা সূক্ষ্ম চুলের মত সেলুলোজের সুতা এতে থাকে। মারকোয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রিচার্ড ডি স্টুয়ার্ড জানাচ্ছেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে ছ'জন কিডনির রোগীকে একদিন থেকে দু'সপ্তাহ পর্যন্ত সুস্থ রাখা গেছে।

এ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা ক্যালিফোর্নিয়াস্থ ডো কেমিকাল কোম্পানী।

এ নিয়ে আরো পরীক্ষা চলছে সানফ্রান্সিসকো হাসপাতালে এবং চলবে অনেকদিন ধরে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে এ যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও প্রস্তুতি। সর্বাধুনিক এই কৃত্রিম কিডনি-র বিশেষত্ব এর ক্ষুদ্রাকৃতি এবং রক্তকণিকার খুব অল্প ক্ষতি করে কিডনির স্বাভাবিক কাজ পরিচালনা। এর আগে নকল কিড্‌নির ব্যবহারের একটা প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল, ক্যাপিলারির মধ্যে জমাট বেঁধে যাওয়া,—যেটা এ যন্ত্রে খুব কম হচ্ছে।

শরীরের মূত্রনালী নির্গত ময়লা নিঃসরণ কার্যে এই যন্ত্র আগের যন্ত্রাদি থেকে শতকরা অন্তত দশ থেকে কুড়ি ভাগ বেশী কার্যকরী।

ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ১০ ॥

কপট কান্ত, সরল বালায় কুটিল ক'রেছো তুমি।
রাগ ছিলো যার ভ্রূকুটি রচনা,
নিগ্রহ শুধু মৌন রসনা;
প্রসাদ ঝরা'তে ওষ্ঠের স্মিতে,
অনুনয় হ'তো নম্র দিঠিতে;
মান ভাঙাতেই পারো নাকো আজ চরণনখর চুমি'।

॥ ১১ ॥

মোর সংবাদ নিয়ে গিছ্‌লি তো সন্ধ্যায়,—
ফিরলি কি ডুব দিয়ে রাস্তার ঝর্ণায়?
দেখছি না চন্দন কম্পিত বক্ষে,
নাই কেন অঞ্জন রক্তিম চক্ষে?
মুছলো কে ওষ্ঠের তাম্বূল কান্তি?
মুখ হেরি চিত্তের অঙ্গের ক্লান্তি।
হায় দূতি মিথ্যাই বল্‌ছিস্‌ রঙ্গে—
সাক্ষাৎ হয় নাই ধূর্তের সঙ্গে।

॥ ১২ ॥

'ফর্সা ওটা যে' — বলি বল্লভে,
'সত্যি তো তা'ই' কয়?
'উঁহু কালো যেন'—ফের কই যবে,
সে-ও বলে— 'নিশ্চয়।'
'চলো যাই এবে?'—শুধালাম আমি,
'এখখুনি'—হাঁকে সে;
'কাজ নাই যেয়ে'—কহিলাম থামি',
কয়—'থাক্ তবে'—হেসে।
একদিন ছিলো তার' পরে মোর সংশয়হীন দাবি;
আজ পরিহার করে মনোচোর;
পুরুষচরিত দুর্জ্ঞেয় ঘোর—
অশ্রুতে ভেসে ভাবি ॥

॥ ১৩ ॥

বাঁকাই যখন ভুরুর লতা—
একদিঠে চায় মোর নয়নে;
কপট রোষে কই না কথা—
চাপলো হাসি অধরকোণে।
ক'রনু বিরূপ চিত্ত বটে,
অঙ্গে তবু, শিহর ফোটে;
সেই প্রিয়জন ধরলো চরণ,—
মান রাখি, সই, আর কেমনে।

॥ ১৪ ॥

উষ্ণ নিশাসে দহিছে মদন,—
অন্তরে করে আমূল মথন;
দিন রজনীতে করুণ রোদন
দেখিতে দেয় না দয়িতের মুখে।
কতো না সাধিলো চুম্বি' চরণ,
অবহেলা-ছলে দিইনু বেদন;
অনুতাপ করে অঙ্গশোষণ,—
মানিনী সাজিয়া আছি কী সুখে।

॥ ১৫ ॥

বাল্য সখীরা শিখালো আমায়
খন্তির কটু বাণী ;
ব'লবো সেগুলো একে একে তায়
বঙ্কিম দিঠি হানি'।
ভাবছিনু তা'ই যেই ক্ষণতরে,
ধূর্ত সহসা বাঁধে বাহুডোরে ;
ওষ্ঠের সাথে জিভের কথায়
পিইলো বাধা না মানি'।

॥ ১৬ ॥

পাঠিয়েছিনু দূতি তোমায় প্রিয়তমের কাছে ;
আর ছলনা ক'রলে আমায়—দেহেই প্রমাণ আছে।
ব'লছো —খর রবির তাপে মলিন হ'লো মুখ,
শঠের কথায় বক্ষ কাঁপে পেয়ে অনেক দুখ ;
আলুলিত কেশের রাশি দম্‌কা হাওয়ার বেগে,
কুঙ্কুমেরি তিলক বাসি—ওড়না ভালে লেগে।
শিথিল তনু—যাতায়াতের ক্লেশেই হবে বটে ;
কিন্তু তোমায় শুনাচ্ছি ফের—দাগটা কিসের ঠোঁটে ?

॥ ১৭ ॥

মান করি যদি—প্রিয়তম তবে
পাঠাবে প্রথমে কোনো দূতিকায় ;
তারপরে নিজে এসে চাটু ক'বে,
লোটাবে চকিতে মোর দু'টি পা'য়।
প্রতি লোমকূপ চুমোয় শিহরে'
জড়াবে তনুটি দৃঢ় বাহুডোরে ;
পুলক পাথারে ডুবি বারে বারে,—
ভয় লাগে—বুঝি প্রাণ বাহিরায়।

॥ ১৮ ॥

প্রিয়তম গেলো যখন প্রবাসে —বন্ধুরা চলে সাথে ;
বলয় খসিলো, অশ্রু ঝরিলো ছাপিয়ে আঁখির পাতে।
ধৈর্য না রহে ক্ষণকাল তরে,
চিত্ত-ও যায় তারি পথ ধ'রে ;
নিঠুর প্রাণ, তুমি হতমান রইলে অন্ধকারাতে।

॥ ১৯ ॥

প্রেমের কুসুম যায় যদি ঝ'রে—
অনাবেগ শুধু দয়িত ;
দেখা হ'লে কভু পথ মাঝে—তা'র
উদাসীন ভাব নেহারি।
প্রাণসখি, জানো—হৃদয় আমার
কেন-যে যায় না বিদারি' ?
অতীত সোহাগ স্মরণের ডোরে
বেঁধে রাখি মোর চিত।

॥ ২০ ॥

অভিন্ন ছিলো জোড়ায় মোদের—প্রাণ দেহ মন সখি,—
তারপরে তুমি হ'লে প্রিয়তম—প্রেয়সী হইনু আমি ;
এখনো আমি অবলা গৃহের—তুমি গৃহস্বামী স্বামী ;
হৃদয় আমার পাষাণের সম—তারি ফল আজ লভি।

॥ ২১ ॥

"নিরালায় কথা ক'বো দু'জনায়"—
এই ব'লে প্রিয় ডেকে নিয়ে যায়
নিরজন বন মাঝে ;
চপল তরুণ জানি তা'রে তা'ই—
কাছে ব'সে খালি সাবধানে চাই,
পাছে, সই, মরি লাজে।
লোকজন মোটে নেই কোনোখানে,
শঠ তবু কথা কয় কানে কানে—
সহসা জড়িয়ে ধরে ;
সারা দেহে মোর ভয়ে ঘাম ছোটে,
শুথ বাস যেই নীবী 'পরে লোটে,—
দংশিনু তা'রি অধরে ॥

॥ ২২ ॥

হায় লো সখি, তোর বেশে কাল ধূর্ত এলো আঁধার সাঝে ;
ঠাট্টা ক'রে জড়িয়ে তা'রে মরনু পিছে দারুণ লাজে।
অট্টহাসি ছুটলো তারি,
বললো—'এ কাজ শক্ত ভারি।
অন্য বালায় আলিঙ্গনের চেষ্টা জেনো নেহাৎ বাজে।'
চমকে উঠে' যাই পালাতে—বাঁধলো তনু বুকের মাঝে ॥

॥ ২৩ ॥

'যাও তুমি আজ'—কঠোর স্বরে
কইনু তা'রে খেলার ছলে ;
হাত দু'টি মোর ছাড়িয়ে জোরে
নিঠুর প্রিয় গেলোই চ'লে।
প্রেম টুটে'-যে বিরাগ আসে,
তবু কিসের বৃথার আশে
চিত্ত আমার ধায় বারে বার ;
ক'রবো কী, সই, দাও না ব'লে ॥

॥ ২৪ ॥

অন্য রামার আশ্লেষ দাগ
দেখছি তোমার অঙ্গ 'পরে—
ওষ্ঠে ভালে সিন্দূর রাগ,
বক্ষে বেণীর তৈল ঝরে।
ভুল ক'রে যে চুমলে আমায়
ছুটে এসে জড়িয়ে ধ'রে ;
লাভ কিবা এই ঘৃণ্য খেলায় ?
চক্ষে আমার অশ্রু ক্ষরে ॥

॥ ২৫ ॥

প্রিয়তম যদি হায় পরবাসে যেতে চায়,
অন্য কামিনী সবে হয় দিশাহারা ;
গলা ছেড়ে তাই কাঁদে, আঁচলে চরণ বাঁধে,
ক্লেশবাস আলুলিত পাগলিনী পারা ।

বর্বর হিয়া মোর—নাহি ভয় আঁখিলোর,
যাত্রাটি হোক্ শুভ—এই শুধু কামনা ॥
পৌঁছলে ভিন্‌দেশে—ভেটিবে আবার হেসে,—
জন্ম লভিয়া পুনঃ পুরাবো বাসনা ॥

সখী-সংবাদ

॥ ১ ॥

'কোথা যাস্ সখি এ ঘোর নিশায়?'
—'প্রিয়তম মোর রয়েছে যেথায়।'
'একা যেতে ভয় হয় না কি তোর?'
—'সাথে আছে স্মর নিয়ে ফুলশর॥'

॥ ২ ॥

তুমি-ই সখীরে শিখালে পিরীতি,
গরবিনী হ'লো তোমারি আদরে;
চপল প্রেমের এই কি গো রীতি?—
অবহেলা আজি মরম বিদরে!
সান্ত্বনা বাণী বৃথা হে কিতব,
চায় না শুনিতে আর চাটু তব;
নয়নের জলে ভাসুক বিরলে—
দহনের জ্বালা যদি সে পাসরে!

॥ ৩ ॥

কুঞ্জের দ্বারে কান্ত নিরত অঙ্গে মাখিতে ধূলি,
অশ্রুবিভোল প্রাণসখী যতো—ভুলেছে আহার স্নান!
পিঞ্জর মাঝে লুণ্ঠিত শুক কয়না মধুর বুলি,
বক্ষে তোমার উচ্ছলে দুখ—ত্যজো সখি ঘোর মান!

॥ ৪ ॥

মুক্তাফলের নির্মিত হার
উল্লাসে তব যুগল স্তনে;
কাঞ্চী দুলিছে ইন্দ্রনীলার—
উন্মাথি' দিক্ মধুর স্বনে।
স্বর্ণ নূপুর ঝঙ্কারে পায়,
রক্তকমল ফুটছে ধূলায়;
উছ্‌রে পড়িছে রূপের বাহার,
জয় করো, সই, সখার মনে!

॥ ৫ ॥

বিদেশ থেকে প্রেমিক তব ছুটে এলো কাছে,
কও না কথা—আদর যতোই করলো চরণ ধ'রে;
অলীক রোষের কুফল, সখি, ভাগ্যে তব আছে—
অশ্রুজলের বর্ণা ধারায় নাইবে জীবন ভ'রে।

॥ ৬ ॥

ভাবনা কিসের প্রেমিক কিতব—তুমি থাকো নিজ ঘরে।
বিরহ যাতনা কান্তার তব—নিলো সবে ভাগ করে।
চিন্তা-কাতর মাতাপিতা তা'রি,
আত্মীয় যারা মোছে আঁখিবারি;

মনবেদনা সখীগণ সহে,
শুশ্রূষা কাজে পরিজন রহে;
ভয় লাজ মিছে—মৃত্যু আসিছে, সখী ল'বে তায় ব'রে।

॥ ৭ ॥

সব গৃহে আছে যুবতী রমণী,—
জিজ্ঞাসা ক'রো যেয়ে!
তোমা সম সুখী আছে কোন্ ধনী,
বল্লভ পূজা পেয়ে।
দুর্জনবাণী কানে তোলো যদি,
কান্ত উদাস হবে;
দুঃখের তব র'বে না অবধি,—
আপনার রিপু হবে।

॥ ৮ ॥

আস্তে টেনে সে অঞ্চলে তা'র
ব'ল্লো—'দাসের এই নিবেদন,—
কঞ্চলিকা চাইনে তোমার,
বক্ষে যুগল মদনমোহন।'
রাঙলো সখী চক্ষু বুজি',
আমরা ছুটি দরজা খুঁজি';
বর কহে ফের—'দেবদাসীদের
ক'রনু বিদায়—চাওনা এখন।'

॥ ৯ ॥

নিঠুর প্রিয়' পরে
সই যবে মান করে,
আঁখি তা'র নানারূপ ধরে নিরবধি;
উৎসুক—দূরে গেলে,
তির্যক্—কাছে এলে,
আয়ত সে—প্রিয়তম কথা কয় যদি;
রক্তিম—ভাবাবেশে,
বিহ্বল—আশ্লেষে,
বহায়—চরণ ছুঁলে—অশ্রুর নদী।

॥ ১০ ॥

'কৃশতর হোক্ তনু দেহ মোর,
মদন করুক হৃদয় দহন।
ছুঁইবো না তা'র বাহু কি অধর,—
চটুল প্রেমিক আসিবে যখন' :—
এই মতো সখী অস্ফুট জপে,
ঘন ঘন কাঁপে দেহলতা কোপে।
হেনিন চকিতে—বিলোল বেদীতে
প্রিয় তরে চলে পূজা আয়োজন।

॥ ১১ ॥

লজ্জাহীনারা হ'চ্ছে সফল
বশ ক'রতে তোর বল্লভে।
সন্তাপ মিছে—অশ্রু বিফল,
হর্ষই যে দিস্ সেই সবে।
বাঞ্ছিত তোর কেলিরুচিমান্—
নিত্য সে চায় নব অভিমান।
হিংস্র প্রথায় জয় করি' তায়
রাজরাণী হোস্ গৌরবে।

॥ ১২ ॥

গ্রাহ্য না করি' প্রিয় সখীজনে—
মাতলে প্রণয়ে কিতবের সনে,
ঘটনার যাহা ঘটিল এখনে,—
মান করো, সখি, মিছে।
জাল্লে আগুন আপনার হাতে,
কাম্যকবন ব্যাপ্ত শিখাতে।
অঙ্গার ঘেঁটে পুড়ছো যে তাতে,—
অরণ্যে রোদন মিছে।

॥ ১৩ ॥

বিরহেতে কাম হ'য়ে অতি বাম
সুতনুর তনু ক্ষীণতর করে।
কৃপাহীন যম—হিসাবী বিষম,
আয়ুর খাতাটি ল'য়ে খালি ঘোরে।
প্রিয় সখীপতি দৃঢ়কায় অতি—
তবু যেন কাবু মানের দহনে।
চাবো, মহাশয়,—কচি কিশলয়
তরুণীর প্রাণ বাঁচিবে কেমনে।

॥ ১৪ ॥

কইনু তারে—কান্না থামাও,
অবোধ শিশুর স্বভাব ভোলো।
ধৈর্য ধ'রে মান ক'রে যাও,
সহজ কথা শিকেয় তোলো।'
এই না শুনে' ত্রস্ত চোখে
চাইলো ভীরু—কয় পলকে :
'বক্ষে প্রিয়া, আমায় বাঁচাও,—
বলবে যা' তাই, আস্তে বোলো।'

॥ ১৫ ॥

কম্পন জাগে বুকের মাঝারে,
কণ্ঠে বচন থামে বারে বারে,
উদ্বেল হিয়া আবেগ জোয়ারে
ক্লান্তি জড়ালো দেহে।
অশ্রু ঝরিছে আকুল নয়নে,
চিন্তা যে শোষে কমল আননে।
দুর্মর মান ত্যাজো এইক্ষণে,
কান্ত এসেছে গেহে ॥

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বুদ্ধদেবের জন্ম   শিল্পী : বাসুদেব পাল

গরীবের মেয়ে

দেবব্রত ভট্টাচার্য

[illegible] ভারতে প্রায় দু'শ বছর ধরে চলেছিল একটানা মোগল শাসন; এবং ঐ শাসনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কাহিনী। কারণ নূরজাহান বাদে অন্য কোন মোগল নারী 'বাদ্শার ওপর বাদ্শা' হওয়ার ক্ষমতা ও সৌভাগ্য অর্জন করেনি। তাই সমগ্র মোগল শাসনের বুকে তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয়া এক নারী এবং যাঁকে আমরা বলতে পারি মোগল ইতিহাস বা মোগল রোমান্সের নায়িকা।

ইতিহাসের পাতায় এই অসামান্যা সুন্দরী নারীর সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানি তা কেবল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রূপসী পত্নী নূরজাহানের কথা। কিন্তু এই ঐতিহাসিক পরিচিতির পেছনে তাঁর সত্যিকারের যে পরিচয়টুকু লুকিয়ে আছে তা হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই, তাই এখানে সেই লুকিয়ে-থাকা পরিচয়টুকু তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'মিস্ট্রি ইজ দি ওয়ে অফ প্রভিডেন্স' যার সমার্থক বাংলা হল, 'ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার'।

কথাটা খুবই সত্য। কারণ কখন যে কার ভাগ্যে কি ঘটে তা কেউ জানে না। তাই আমাদের সমস্ত জীবনটা এক বিরাট রহস্যে ঢাকা। আর সেই রহস্যের আলো-আঁধারেই জীবনের ওঠা আর নামা, ভালো আর মন্দের আনাগোনা।

তাই দেখি, আজ যে রাজা, কাল সে ফকির, আজকের ভিখারিণী কালকে মহারাণী। স্বয়ং ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাঁর নাম, যাকে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের 'জাহান্ নূরী' এবং সর্বকালের 'নারী সৌন্দর্যের মৃত্যুঞ্জিৎ বিগ্রহ' তিনিই হচ্ছেন দীন দরিদ্রের একমাত্র কন্যা এবং তাঁর জন্ম হল কান্দাহারের কোন এক 'ধূসর মরুর ঊষর বুকে।' পারে কি কেউ কল্পনা করতে? না পারলেও এ এক সত্য ঘটনা।

তাঁর মা-বাবা হলেন পারস্যের এক দীন দুঃখী নিরন্ন দম্পতি। দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই স্বদেশ ছেড়ে পাড়ি দেন ভারতের উদ্দেশ্যে। নূরজাহান তখন মাতৃগর্ভে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, স্বামী-স্ত্রী মরুভূমি পার হতে থাকেন। পথিমধ্যে আসন্ন বেগম কন্যা সন্তান প্রসব করেন। তাঁর স্বামী মির্জা গিয়াস বেগ পড়লেন ভারী বিপদে। সদ্যোজাত ঐ শিশু কন্যাটিকে নিয়ে যে কি করে কি করবেন সেই চিন্তায় আকুল হয়ে পড়লেন। 'মরুর বুকে' ফেলে দেওয়াও যায় না, অথচ তাকে বাঁচিয়ে রাখাও এক সমস্যা।

সমস্যা সমাধানের একটা উপায় ভাবতে ভাবতে মরুভূমির পথে চলতে লাগলেন। শিশু বেঁচে রইল তার মায়ের জীর্ণ বুকের দুধ খেয়ে। কিন্তু খাদ্যের অভাবে বুকের দুধও যে কমে আসবে। কিন্তু না—ভগবানই উপায় করে দিলেন। হঠাৎ দেখা মিলল এক মুসলমান সওদাগরের। সে পারস্যে ব্যবসা করে ফিরছিল আগ্রা। গিয়াস্ অতি করুণকণ্ঠে তাঁকে আবেদন করে তাঁর ঐ ফুলের মত নবজাত শিশুটিকে সঁপে দেন তাঁরই হাতে চিরদিনের মত।

বণিক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে শিশুর রূপ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চোখেই জল। পেটের সন্তানকে সঁপে দিতে হয় অন্যের হাতে কঠিন দরিদ্রতার আঘাতে? কি ভয়ানক নির্মম পীড়ন এই দরিদ্রতার। ভাবলেন তাঁরা উভয়েই। কিন্তু তখন তাঁদের কাতর হৃদয়ে কি এ ভাব জেগেছিল।

'হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছো মহান্।'

না, তা ভুণাক্ষরেও জাগে নি! কারণ বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে দরিদ্রতার যে নির্মম পরিহাস তা কল্পনায় আসে না।

যাই হোক, বণিক শিশুকন্যাটিকে কোলে নিয়ে ভাবল, এর রূপ যে বসরার গোলাপকেও হার মানায়। তাই বোধহয় নূরজাহানের আর এক নাম 'মরুর গোলাপ,' অবশ্য কবির ভাষায়। বাপ-মার দেওয়া নাম কিন্তু মেহের-উন্নিসা। বণিকের ঘরে একজন স্ত্রীলোক প্রয়োজন, ধাত্রী হিসেবে। তাই শিশুর সঙ্গে তার মাকেও গ্রহণ করে এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে বণিক আগ্রায় এসে উপস্থিত হয়। এইখানেই মেহের উন্নিসার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের শুরু।

সুতরাং মেহের এখন সওদাগরের পালিত কন্যা এবং মেহেরকে কবি তাই বলেছেন 'ইরান দেশের শকুন্তলা'। দেখতে দেখতে তার বছর চৌদ্দ বয়স হল। কিশোরী মেহেরের রূপ দেখে সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং সম্রাট আকবরও মেয়েটির রূপে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। এই সওদাগরের সঙ্গে সম্রাটের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

তাই সওদাগর মাঝে মাঝে মেহেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাটের প্রাসাদে আসা-যাওয়া করত। সম্রাট মেহেরকে মুখ ধরে আদর করতেন, সময় সময় দু'একটি কথা বলে মেহেরের মুখের হাসি দেখতেন কারণ মেহেরের পাতলা লাল ঠোঁটের হাসিতে যেন এক অপরূপ সৌন্দর্যের ভাব ফুটে উঠত। সম্রাট হয়ত ভাবতেন যে, মেয়েটি যথার্থই অসামান্য রূপ নিয়ে এসেছে এবং তার মুখখানি যেন বিশ্ব-শিল্পীর হাতে আঁকা।

সত্যিই তাই। মেহের হল খোদার মেহেরবানী, 'গরীব বাপের গরব-মণি'। 'মরুভূমির গোলাপ ফুল' এবং এ 'রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না—' ইত্যাদি কতভাবেই না কবি নূরজাহানের 'ভুবনবিজয়ী রূপে'-র বর্ণনা করেছেন।

হঠাৎ একদিন রূপের ডালি এই মেহের পড়ে গেলেন যুবরাজ সেলিমের চোখে। দেখ.মাত্র সেলিম একেবারে দিশেহারা; যেমন একদিন সুলতান আলাউদ্দিন পাগল হয়েছিলেন রাণী পদ্মিনীকে দেখে। সেলিমের মনে জেগে ওঠে ভয়ঙ্কর এক প্রণয়তৃষ্ণা। মনে মনে স্থির করে ফেললেন যেমন করেই হোক এই রূপসীকে পেতে হবে এবং তাকেই করতে হবে চিরদিনের জীবনসঙ্গিনী, ছলে, বলে, কৌশলে, যে ভাবেই হোক।

সেলিমের প্রতিও মেহেরের মন কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু তা ঠিক দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। কারণ যুবরাজের আসক্তির কথা সম্রাট জানতে পারেন প্রথমটা লোকমুখে এবং শেষকালে যুবরাজ নিজের মুখেই সম্রাটের কাছে তাঁর প্রাণের ইচ্ছে প্রকাশ করেন ও মেহেরকে গ্রহণ করার অনুমতি চান। কিন্তু সম্রাট অতিশয় বিরক্তির সঙ্গে বলেন—না, তা কখনই সম্ভব নয়। সেলিম, তুমি এ আশা পরিত্যাগ কর। বাধ্য হয়েই সেলিমকে মেহেরের আশা ত্যাগ করতে হয় তখনকার মত। কারণ সম্রাট আকবর খুব তাড়াতাড়ি মেহেরকে সেলিমের চোখের আড়াল করার ব্যবস্থা করে-ফেললেন, যেহেতু যুবরাজের চরিত্র তাঁর অজানা ছিল না। তাই বর্ধমানের জায়গীরদার (ইনিও পারস্যের অধিবাসী) আলিকুলী শের আফগান খাঁর সঙ্গে মেহেরের বিবাহ হয় সম্রাটের উপস্থিতিতে রাজকীয় মর্যাদায়।

শুরু হল মেহেরের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আগ্রা থেকে বর্ধমানে এলেন মেহের, নববধূ হয়ে। সেলিমের কাছ থেকে মেহের বিদায় হলেন বটে; কিন্তু এ বিদায় হয়ে রইল অভিশপ্ত। কারণ সেলিমের মনে তখনও স্থির সঙ্কল্প, মেহের তাঁরই হবে। তাই সেলিম রইলেন ঘুমের ভাণ করে, সুযোগের অপেক্ষায়।

এল সেই সুবর্ণ সুযোগ, সম্রাট আকবরের মৃত্যুতে। ইংরেজী ১৬০৪ সাল, সেলিম 'জাহাঙ্গীর' উপাধি নিয়ে বসলেন ভারতের সিংহাসনে। এবারে দেখে নেবেন ঐ শের আফগানকে, যে নাকি তাঁর মেহেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে সুখের সংসার পেতে জায়গীরদারী ভোগ করছে।

মনে মনে আবার স্থির করলেন, সরিয়ে ফেলতে হবে ঐ শেরকে এই দুনিয়া থেকে। তাই শেরের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসেবে বাংলার সুবাদার কুতুবউদ্দীনকে আততায়ী নিযুক্ত করলেন। দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে চলল এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু কুতুবকেই জীবন দিতে হয় শেরের হাতে। অবশ্য অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে শেরও শেষ পর্যন্ত নিহত হন বটে, কিন্তু তাঁর উদার মন ও সত্যিকারের বীরত্বের যে পরিচয় তা ইতিহাসের পাতায় আজো স্পষ্ট।

কিন্তু জাহাঙ্গীরের চরিত্রে যে কলঙ্কের ছাপ, যে নিকৃষ্টতার পরিচয়, তা ইতিহাসের পাতায় তা চিরকালের মত ঘৃণ্য ও কুশ্রী হয়েই থাকবে।

এবারে আমরা দেখব বিধবা মেহেরকে দিল্লীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে। বছর চারেক মেহের রইলেন বিধবা অবস্থায়। তারপর ইং ১৬১১ সালে সম্রাটের সঙ্গে হল তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ বা নিকে। সম্রাট তাঁর নতুন নামকরণ করলেন 'নূর-জাহান,' অর্থাৎ জগতের আলো। নূরজাহানের বয়স তখন প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ; পরিণত-যৌবনা তরুণী এবং তাঁর তখন একটি-মাত্র কন্যা সন্তান।

এখানে একটু বলা প্রয়োজন যে কোন ঐতিহাসিকের মতে নূরজাহান প্রথমে জাহাঙ্গীরকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে চান নি, কারণ শের আফগানের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। কিন্তু এ মত গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত।

যেহেতু কিশোরী মেহেরের মধ্যে সেলিমের প্রতি একদিন যে অনুরাগের উদয় হয়েছিল তা তাঁর গোপন হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিল সম্রাজ্ঞী হওয়ার এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি নেপথ্যে ঐ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মূলে কিছুটা জল দিয়েছিলেন। সুতরাং এ কথা অনায়াসেই বলতে পারি যে, তিনি অন্তরে অন্তরে জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী হওয়ার উচ্চ আশা পোষণ করতেন। হয়ত এ কথাও ভেবেছিলেন যে, তাঁর নিজের যে রূপ, সে রূপের কদর শের আফগানের মত একজন সামান্য জায়গীরদারের কাছে নয়, বরং বাদশা জাহাঙ্গীরের কাছে।

পূর্ণ হ'ল সে আশা। ভাগ্যচক্র নিয়ে এসে বসাল এই গরীবের মেয়েকে সম্রাজ্ঞীর আসনে; যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি তাই ঘটল বাস্তবে। শুরু হয়ে গেল নূরজাহান জীবনে এক নতুন অধ্যায়। নিজের বুদ্ধিও বিচক্ষণতার বলে কিংবা রূপের জাদুবিদ্যায় 'বাদশার ওপর বাদশা' হয়ে মোগল শাসনের বুকে এক অভাবনীয় নজির রাখলেন।

ক্রমশ সম্রাট জাহাঙ্গীর যেতে লাগলেন প্রাসাদপুরীর অন্তরালে, আর তাঁর হারেমের বেগম বেরিয়ে এসে আলোকিত করলেন প্রকাশ্য রাজসভা। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল মোগল জনতা। ভাবল তারা এ কি এক অভিনব দৃশ্য। অভিনবই বটে। কারণ সম্রাট হলেন নূরজাহানের হাতের পুতুল, কেবলমাত্র স্বাক্ষরকারী সম্রাট। প্রকৃতপক্ষে

নূরজাহানই হলেন মোগল ভারতের মুকুটমণি। তাঁর সেই দরিদ্র পিতা মির্জা গিয়াস্ বেগ হলেন রাজমন্ত্রী এবং ভ্রাতা আসফখান পেলেন সৈন্যাধ্যক্ষের উচ্চপদ। মাতা আসমত বেগমকেও অবশ্য কাছে রাখতে ভোলেন নি।

কিন্তু কোথায় গেল সেই সওদাগর, যে একদিন নূরজাহান্‌কে কণ্বমুনির মত বুকে করে মানুষ করেছিল? যাঁর নাম মুদ্রিত হল মোগল মুদ্রার এক পিঠে, তিনি হয়ত আর সে সওদাগরের কথা মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি।

যাক এ সমস্ত অবান্তর কথা। আসল কথা হল নূরজাহানের শাসন চলল একটানা প্রায় দশ বছর। রাজত্ব বেশ সুন্দর ও সুশৃংখলভাবেই চলেছে, ইতিহাসও তাই বলে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে একজন নারীর ঐ অপ্রতিহত আধিপত্যের ফলে জনগণের মন ভরে উঠেছিল বিতৃষ্ণায়। কোথাও কোথাও বিদ্রোহের চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সব কিছুকে দম্ভভরে উপেক্ষা করে এসেছেন।

কিন্তু নিয়তির বিধান বা বিধির বিধানে নূরজাহানের জীবনে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসতে থাকে, তারপর একদিন একেবারে অন্ধকার। মৃত্যুর করালগ্রাসে প্রবেশ করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তখন ঐ জাহাননূরীও মিশিয়ে গেলেন আঁধারের বুকে। গরীবের মেয়েকে আবার আশ্রয় নিতে হ'ল ঐ প্রাসাদ-পুরীর কোন এক গরীবখানায়। জীবন, যৌবন, ধন-সম্পদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব কিছুই শেষ। সুতরাং এখান থেকে আরম্ভ হ'ল আর এক নতুন অধ্যায়, যাকে বলতে পারি সকল সুখ ও সৌন্দর্য বিলুপ্তির এক ভয়ানক অধ্যায়। সব কিছু হারিয়ে নূরজাহান নিশ্চয় ভেবেছেন,—

'যৌবন বিদায় লয়ে চলে গেছে আজ;
সম্পদের স্বর্ণ-রথ মিলায়েছে স্বপ্নবৎ
চ্যুত মোর মস্তকের তাজ।'
—ওমর খৈয়াম।

লাহোরের কোন এক নির্জন স্থানে জাহাঙ্গীরের সমাধি রচিত হয়, যার নাম হ'ল 'শাহ-দেরা'। নূরজাহান্ নিজের হাতে সাজিয়ে দেন স্বামীর সমাধিস্থল হীরে জহরত দিয়ে। অলঙ্কার-যুক্ত এই সমাধিস্থল দেখে হাজার হাজার মানুষের মন মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নূর-জাহান্ শুধু তাঁর চোখের জলই ফেলে এসেছিলেন সমাধির বেদীমূলে এবং দুই চোখে জল নিয়েই তাঁকে কাটাতে হ'ল দীর্ঘ আঠারোটা বছর। তাই বোধ হয় ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ বলেছেন—

'সি লভড্ জাহাঙ্গীর ইণ্টেন্সলী—সি মোর্নড হিম ইণ্টেন্সলী।'

এই সময় থেকে আর তিনি রাজকার্য পরিচালনা সম্পর্কে একদিনের তরেও কোন কথা বলেন নি। তাই প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট কাউণ্টার সাহেব লিখেছেন—

'সি নেভার হেন্সফরওয়ার্ড স্পোক আপন স্টেট এ্যাফেয়ার্স, অর এ্যালাউড দ্য সাবজেক্ট টু বি মেনশ্যানড ইন হার প্রেজেন্স।'

আবার নূরজাহানের দাম্পত্যজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে ইনিই বলেছেন যে,

'দো হ্যার প্যাশনস অয়ার ভায়োলেণ্ট হার চেস্টিটি ওয়াজ নেভার ইমপীচড, এ্যাণ্ড সি লিভড এ্যান এমিনেণ্ট প্যাটার্ন অফ কনজুগাল ফিডেলিটি।'

ঐতিহাসিক যে নূরজাহানের মধ্যে ভয়ানক প্রবৃত্তির (ভায়োলেণ্ট প্যাশনস) কথা উল্লেখ করেছেন তা অতি সত্য। কারণ তাঁর চরিত্রে এক পিশাচী প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করত বলেই মনে হয়।

তাই আমাদের নাট্যকার তাঁর 'নূরজাহান্' নাটকের এক জায়গায় নূরজাহান্‌কে দিয়ে বলিয়েছেন, 'আমি পিশাচী।' জাহাঙ্গীর যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি দেবী, না মানবী।' (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)।

৭

সুতরাং আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, নূরজাহানের চরিত্রে পাতিব্রত্যের পবিত্র ছাপ কোনমতেই দেওয়া চলে না।

পাশ্চাত্ত্য নারীর কাছে 'চেস্টিটি' কথাটির যে তাৎপর্য ভারতীয় নারীর জীবনে এর মূল্য যে কতখানি তা বোঝার ক্ষমতা কোন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকের নেই বলেই মনে হয়।

যাক্, এবারে দেখব আমরা নূর-জাহানের জীবনের শেষ অধ্যায়। শেষের এই অধ্যায় বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। বৈধব্যের নিদারুণ জ্বালা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন মরণের পথে। আঠারো বছর পর একদিন এল সেই মরণ। জুড়িয়ে গেল সব জ্বালা।

স্বামীর কবরের পাশেই তাঁকে কবরস্থ করা হ'ল বটে কিন্তু সে কবর অতি মামুলী এক কবর। সে কবরের সাজ নেই, পোষাক নেই; অলঙ্কারের শোভা নেই। দীন দরিদ্র কোন এক গরীবের মেয়ের কবর যেমন হয়, এও তাই। তবে হাঁ—এই কবরের গায়ে ফার্সিতে লেখা আছে নূরজাহানের নিজের লেখা ক'টি বেদনাদায়ক কথা। মৃত্যুর আগে এটুকু লিখে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন যাতে তাঁর কবরের বুকে ঐ গুটিকয়েক কথা লিখে দেওয়া হয়। অনুরোধ রক্ষে করেই তা লেখা হয়েছে এবং তা আজো লেখা রয়েছে। যথা—

'গরীব আমি—
গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না,
ফুল দিও না কেউ ভুলে—
শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ,
দাগা না পায় বুলবুলে।'
—(অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই কবরের সামনে একদিন কবি সত্যেন্দ্রনাথ এসে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন, ভাবে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন 'জগৎ-জ্যোতি নূরজাহানের' শেষ জীবনের পরিণতির কথা ভেবে। হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেছিলেন এবং বেদনাগ্রস্ত হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল এক অপূর্ব ভাব ও ভাষা নিয়ে তাঁর অমর কবিতা 'কবরে নূরজাহান্'।

॥ লুপ্তরত্ন ॥

লালন ফকিরের গান

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্যকবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবত উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন ; কবিওয়ালা, তর্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের]

সংগ্রহকর্তা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন, যা কর্ ত্বরায় কররে ত্বরায় কর্ এই ভবে।
অনন্ত রূপসৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি, মানবের তুলনা কিছুই নাই,
দেব দানবগণ, করে আরাধন,
জনম নিতে মানবে।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি,
মন রে, পেয়েছ এই মানব-তরণী,
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী সুধারায়,
যেন ভরা না ডোবে।
মানুষে হবে মাধুর্য ভজন,
তাইতে, মানস রূপ এই গঠিল নিরঞ্জন,
এবার, ঠেকিলে আর
না দেখি কিনার,
লালন কয় কাতর ভাবে ॥

॥ ২ ॥

মন আইন-মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি?
কাল-শমন এলে হবে কি?
ভাবিতে দিন আখের হ'ল,
ষোল আনা বাকী প'ল,
কি আলস্য ঘিরে এল,
দেখলি নে খুলে আঁখি।
নিষ্কামী নির্বিকার হলে,
জীবয়ে মরে যোগ সাধিলে,
তবে খাতায় ওয়াশীল পাবে,
নইলে উপায় কই দেখি।
শুদ্ধ মনে সকলি হয়,
তাও তো এবার জোটিল না তোমায়,
লালন বলে করবি হায় হায়,
ছেড়ে গেলে প্রাণপাখী।

॥ ৩ ॥

সে লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে।
লীলার যার নাইরে সীমা কোন্ খানে কোন্ রূপ ধরে।
আপনি ঘর সে, আপনি ঘরী,
আপনি করে রসের চুরি, (ঘরে ঘরে)
ও সে আপনি করে ম্যাজিষ্টিরি,
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ী পরে।
গঙ্গায় রইলে গঙ্গাজল হয়,
গর্তে গেলে কূপজল কয়, (বেদ-বিচারে
তেমনি সাঁইর, বিভিন্ন আকার জানায় পাত্র-অনুসারে।
একে বয় অনন্তধারা,
তুমি আমি নাম বেওরা, (ভবের পরে)
অধীন লালন বলে, কেবা আমি জানলে ধাঁধা যেত দূরে।

॥ ৪ ॥

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরসী-নগর,
এক পড়্শী বসত করে।
ও সে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি,
তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে—
মনে বাঞ্ছা করি,
দেখ্‌বো তারি,
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে।
বলবো কি সেই পড়শীর কথা, তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা,
নাইরে—
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
সেই পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
তবে যম-যাতনা যেতো
দূরে—
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
থাকে লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

॥ ৫ ॥

হতে চাও হুজুরের দাসী।
মনে গোল তো পোরা রাশি রাশি।
না জান সেবা সাধনা,
না জান প্রেম উপাসনা,
সদাই দেখি ইতর-পনা,
প্রভু রাজি হবে কিসি?
কেশ বেশে বেশ করলে কি হয়,
রসবোধ না যদি রয়,
রূপবতী কে তারে কয়,
কেবল মুখে কাষ্ঠহাসি।
কৃষ্ণপদে গোপী সুজন,
করেছিল দাস্য সেবন,
লালন বলে তাই কি রে মন
পারবি ছেড়ে সুখবিলাসী।

উত্তর আফ্রিকার উপকূলে

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
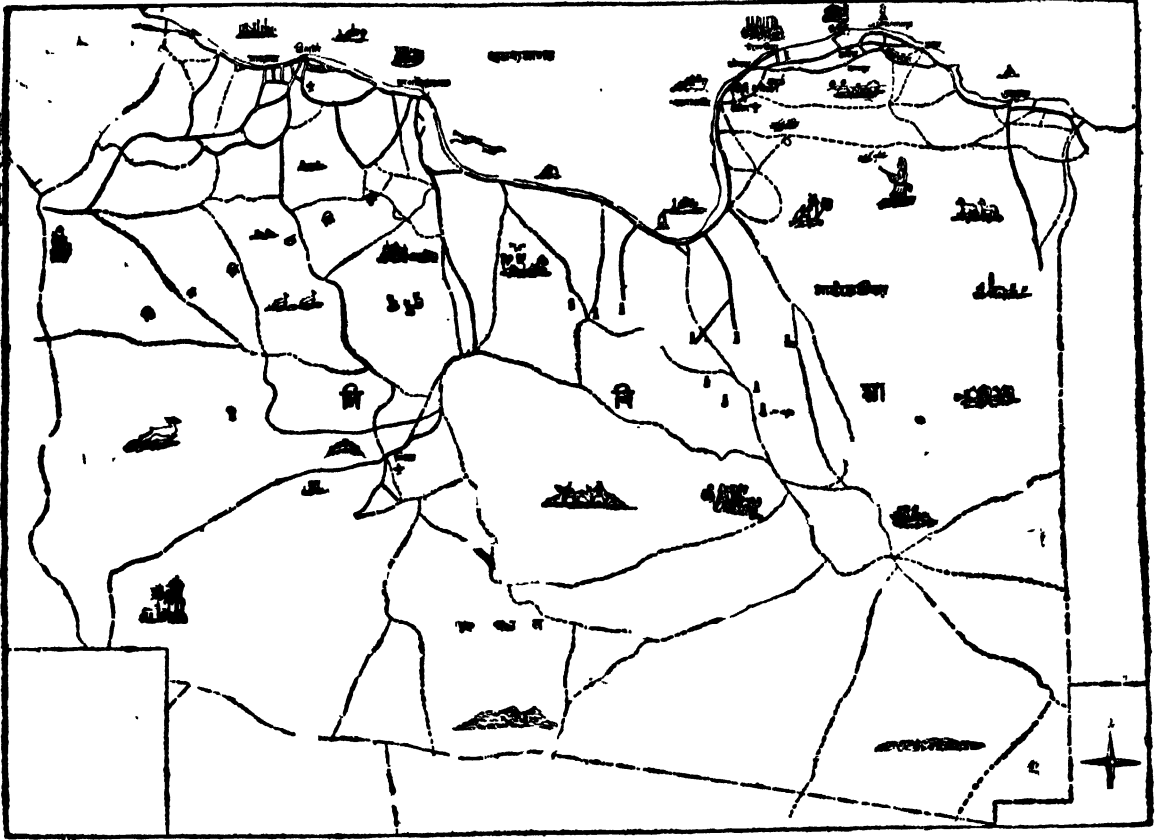
লিবিয়া

ইতিহাসের পুনরাবর্তন জগতের নিত্যরীতি। বর্তমান ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যার মত সমস্যা দেখা দেয় আড়াই হাজার বছরেরও কিছু আগে ইজিয়ান দ্বীপে (অর্থাৎ গ্রীকরাজ্যে)। অতীতে সেই দ্বীপটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ক্রমাগত আটবছর অনাবৃষ্টি হওয়ায় শস্য উৎপাদনের অভাবে লোকের দুঃখ-দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। গ্রীকেরা দেবদেবীতে বিশ্বাসবান। তাই বিপদের দিনে ডেলফীর এ্যাপোলোর মন্দিরে ধর্ণা বা 'হত্যে' দেওয়ার ফলে দেবতা প্রসন্ন হলেন। দৈববাণী হ'ল—'যাও তোমরা ভূমধ্যসাগর পার হ'য়ে লিবিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন কর।'

গ্রীকেরা নৌবিদ্যায়, স্থাপত্যে শিল্পে, কলায়, দর্শনে, গণিতে অর্থনীতিতে, গঠন বিদ্যা প্রভৃতিতে সুনিপুণ ছিলেন। গ্রীক জনগণ দেবতার আদেশ অনুসারে দলে দলে চলে এলেন ভূমধ্যসাগর পার হ'য়ে উত্তর আফ্রিকার কূলে নতুন ক'রে সহর গড়তে, নতুন ক'রে অনাবাদী জমিতে চাষ করতে, যেখানে নেই জলের অভাব।

কিংবদন্তী আছে যে, সেই দৈববাণী অনুসারে তখনকার দিনের রাজা কোন এক এরিস্টটলস্‌কে দুশো লোক দিয়ে সমুদ্র-যাত্রার অভিযানে পাঠান পালতোলা নৌকো নিয়ে একেবারে ভূমধ্যসাগর পারে না এসে প্রথম ঘাঁটি 'ক্রীট (Crete) দ্বীপে' স্থাপিত হয়। সেখান থেকে এঁরা যাবেন আফ্রিকায়। প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন বোম্বা উপসাগরের সাইরেনিকার (Syrenica) উর্বর মালভূমির পূর্ব প্রান্তে (প্লোটিয়া নামে একটা ছোট্ট দ্বীপে) এই দ্বীপনগরীতে উপনিবেশ বেশ সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁরা চললেন আরও ভাল জায়গার সন্ধানে, যেখানে গিরি-প্রস্রবণ নিত্য শীতল জল দান করে, যেখানে মাটি বেশ উর্বর, যেখানে শীত ও গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বিশেষ সুখকর, যেখানে বৃষ্টিপাত শস্য উৎপাদনে বেশী সহায়ক, যেখানে শীতল সমীরণ স্নিগ্ধ করে দেশবাসীকে ও যেখানে নেই বহিঃশত্রুর উৎপাত।

দেবতা এ্যাপোলোর দৈববাণী অনুযায়ী কাজ ক'রে অবশেষে অনুরূপ স্থান আবিষ্কার করলেন। এরিস্টটলস্ নাম নিলেন বেট্টাস্ Battus এবং হলেন সিরিনিয়ার প্রথম রাজা। বেট্টাস বংশের রাজত্বের পর ৪০০ খৃস্টপূর্বে এল সিরিনিয়ায় প্রথম গণতন্ত্র।

কোথায় এই সিরিনিয়া যার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে? কোথায় সেই সিরিন সহর যেখানে 'অলিভ' জলপাইয়ের তেলের কারখানা থেকে বয়ে যেতো নালা বেয়ে তেল। ইউরোপের নানা অঞ্চলে রপ্তানী হতো সেই তেল। কোথায় সেই বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র যা রোমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর United Kingdom of Libya যে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র গঠিত হয়েছে, সুলতান ইদ্রিসের রাজ্যশাসন তারই পূর্বাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে এই সহর। বর্তমান লিবিয়া রাজ্য তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। উত্তরে 'ত্রিপোলিতানিয়া' ও 'সাইরেনাইকা' আর দক্ষিণে 'ফেজ্জান' অঞ্চল।

সাইরেনিকা ও ত্রিপালিতানার সীমারেখা

অতি প্রাচীনকালে কার্থেজ প্রভাবিত ত্রিপালিতানা ও সাইরেনিকার সীমা নিয়ে দুই পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তার সমস্যার সমাধান করেন তৎকালীন রাজনীতিবিদেরা নন, করেন ক্রীড়াবিদেরা। স্থির হয় যে, একই সময় একজন দৌড়কার ছুটবেন কার্থেজ থেকে সিরিনের দিকে, অপরজন সিরিন থেকে কার্থেজের দিকে। দু'জনের যেখানে দেখা হবে সেটিই হবে দুই রাজ্যের সীমান্তরেখা। দেখা গেল দৌড়ে কার্থেজের দৌড়কার মহাশয় সীরটেক বা সিদরী উপসাগরের Sirtec gulf উপকূলে এসে হাজির। সিরিনের দৌড়কার ভাল ক'রে দৌড়ান নি অথবা পথে নানা জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশেষ [illegible] করুণ সাইরেনিকার লোকেদের মনে বিপুল সন্দেহ যে, কার্থেজিয়ানরা ওদের ঠকিয়েছে, তখন দৌড়কার ফিলেনী বলে—আমি সত্যকথা বলছি। আমার এখানে সমাধি দিয়ে এখানেই সীমারেখা স্থির হ'ক। ফিলেনীর সমাধির উপর স্মৃতি-মন্দির গড়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক কাহিনী

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আগমন ও প্রত্যাবর্তন

৩৩২ খৃস্টপূর্বে মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাঁর চল্লিশ হাজার ম্যাসিডোনীয়ান সৈন্য নিয়ে 'মিশর' জয় করেন ও মিশর রাজ্যে পারসিক প্রভুত্বের অবসান ঘটান। এর এক বছর বাদে ইনি আলেকজেন্দ্রিয়ায় এক নতুন নগরী নিজের

হোটেল থেকে কবরের দৃশ্য
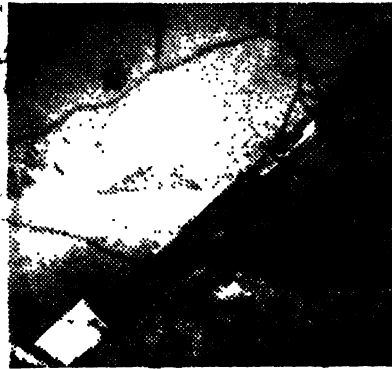
নামে গড়ে তোলেন। প্রচণ্ড জিগীষা পেয়ে বসে মহাবীর আলেকজাণ্ডারকে। তখনকার দিনে লিবিয়ার দক্ষিণে 'শিবা'তে (Sebha) বিখ্যাত জিয়াস আম্মান'-এর মন্দিরে দৈববাণী শোনার ইচ্ছে হয় আলেকজাণ্ডারের। জানতে চান তিনি বিশ্ববিজেতা হবেন কি না? তাই তিনি আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে পশ্চিমমুখে যাত্রা করেন প্যারেটনিয়ম (বর্তমানে Mersamatruh) নামকস্থানে এলে হাজির। এখানে দক্ষিণ-মুখো রাস্তা এসে মিশেছে ও মরুভূমির দিকে চলে গেছে। এখানে এলো সিরিনের রাজদূত মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে হাজির। এমন কি সেই সঙ্গে তিনশো যুদ্ধের ঘোড়া ও পাঁচটি চারঘোড়ার গাড়ী। মহাবীর [illegible] আলেকজাণ্ডার এতে অত্যন্ত প্রীত হলেন ও 'শিবা'র দিকে চলে যান। জিয়াসের মন্দিরে দৈববাণী হয়।' পুরোহিত বলেন —তুমি জিয়াসের পুত্র।

—'তা' হ'লে বিশ্ববিজেতা হওয়ার মনোরথ কি আমার পূর্ণ হবে? পিতা কি আমাকে সারা বিশ্বের ভূমির অধিকার দেবেন?'

—'তথাস্তু।'

শিবায় জিয়াসের মন্দির থেকে ফিরে এসে আলেকজাণ্ডার এক মাস বাদে মিশর ছেড়ে মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, ব্যাকট্রিয়া এমন কি সিন্ধু নদীর উপকূলে যেখানে মহাবীর বন্দী পুরু আলেকজাণ্ডারের 'তুমি আমার কাছ থেকে কি ব্যবহার প্রত্যাশা কর?' প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—'বীরের প্রতি বীরের আচরণ।' সাইরেনিয়ার গণতন্ত্রের অবসান ঘটে মিশররাজ টলেমীর আক্রমণে ৩৩০ খৃস্টপূর্বাব্দে। তাঁর সৎপুত্র মাগস Magas এখানের রাজ্যপাল হ'ন ও ২৮৩ খৃস্টপূর্বাব্দে রাজা ব'লে নিজেকে ঘোষণা করেন। অবশেষে গণতন্ত্রের অবসান ঘটে আনুষ্ঠানিকভাবে; কিন্তু শাসন-ব্যবস্থায় প্রজাদের যথোপযুক্ত অংশগ্রহণ করার জন্য এক বিশেষ শাসনতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। টলেমীর রাজত্বকালে এরকম শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শাসন-পদ্ধতির নির্দেশনামার নকল আজও সিরিনের যাদুঘরে শিলা-ফলকে সংরক্ষিত আছে।

প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা

এখানের শাসনতন্ত্র হ'ল দুভাগে বিভক্ত। একটি হ'ল সিনেট, যেখানে ১০১ জন সদস্য আর অপরটি হ'ল ৫০০ জনের এক পরিষদ। মোট ১৫,০০০ ভোটার নিয়ে এই দুই সভা গঠিত। যাঁরা শুধু সম্পত্তির অধিকারী, তাঁরাই ভোটার। মাগসের দীর্ঘ শাসন-কালে শাসনব্যবস্থার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে—এরই কথা আমাদের শিলা লিপিতেও উল্লেখ আছে বলে অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস।

অপমার কাহিনী

মাগসের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা রাণী 'অপমা' বা 'অনুপমা' মিশরীয় প্রাধান্য দূর করার জন্যে নিজ কন্যা 'বিরেনীশের' বিবাহের জন্য 'ম্যাসিডন' দেশ থেকে 'দিমিত্রিয়াস্' নামে এক অপূর্ব রূপবান রাজপুত্র আনান। বিধবা অপমাই কিন্তু দিমিত্রিয়াসের যৌবন ও রূপে এত মুগ্ধ হলেন যে, পোষ্য জামাতাকে নিজের দৈহিক সুখের জন্য পেতে চাইলেন। এখানের লোক ঐ ব্যবহার অতি ঘৃণার চক্ষে দেখতে লাগলো। রাণীর নৈতিক অবনতি শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, অত্যন্ত নিন্দনীয়। একদিন দেখা গেল যে, 'অপমা'র আলিঙ্গনাবদ্ধ যুবরাজ বিয়াত্রিশ ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। রাজকন্যা বিরেনীশ তাঁর পুরোনো প্রণয়ী মিশরের যুবরাজ দ্বিতীয় টলেমীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ন, ঐ কলঙ্কিত ঘটনার কিছুকাল পরে।

মিশরীয় টলেমী সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে 'সাইরেনিকা' মিশর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরের একশো বছর সিরিনের রাজপ্রাসাদ জনশূন্য ছিল। ফলে মিশর ও সাইরেনিকার সব অর্থ আলেকজেন্দ্রিয়ার রাজপ্রাসাদ ও মহানগরী উন্নয়নে খরচ হ'তে লাগলো। সাইরেনিকার উন্নতি স্থগিত রইল।

সাইরেনিকা অঞ্চলের গৃহবিবাদ শাসন-পদ্ধতির সামান্য অদলবদলে মিটে যায় এবং সাইরেনিকার পাঁচটি মুখ্য সহরের শাসনতান্ত্রিক মিলনে এক যৌথ সংস্থা গ'ড়ে ওঠে। এটি 'পেণ্টাপলিস্' (Penta Polis) নামে (অর্থাৎ পাঁচটি সহরের সংহতি) অভিহিত হয়। পাঁচটি সহর হ'ল :—সিরিন, অ্যাপো-লোনিয়া, টলেমাইস্, টউচিরা ও বেরেনীস্। এর সঙ্গে বহু পরে হেডিয়ানো পলিস্ নামে এক সহর যুক্ত হয়।

এ সবই খৃস্টপূর্বাব্দের কথা। ১১৬ খৃস্টপূর্বাব্দে টলেমী ফিলোমীটারের (যাঁকে আলেকজেন্দ্রিয়াবাসীরা ফিস্কন অর্থাৎ 'ভুঁড়োপেটা' বা 'লম্বোদর' বলতো) মৃত্যুর পর তাঁর রক্ষিতা পুত্র টলেমী এপিয়ান মাত্র বিশ বছরের জন্য সাইরেনিকার রাজা হ'ন। তিনি উইল ক'রে এই ব্যবস্থা করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর রাজত্ব রোমান শাসনাধীনে চলে যাবে। এই উইলের নকল সিরিনের যাদুঘরে আজও রক্ষিত আছে। এই সময় থেকেই গ্রীক প্রাধান্যের পরিবর্তে রোমান অভ্যুদয় সুরু হয়। রোমান সম্রাট অগস্টাসের রাজত্বকালে সাইরেনিকা ক্রিয়েটরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

ইহুদী বিদ্রোহ

রোমক রাজত্বের আদিপর্বে বেশ কয়েক দশক ধ'রে ইহুদী বিদ্রোহ সুরু হয়। ইহুদীরা সাইরেনিকার পতনের যুগে শাসনভার কুক্ষিগত করার নিষ্ফল চেষ্টা করেন। ইহুদীরা মন্দির ও রাজপ্রাসাদের যেসব ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করেছিলেন, বহু মেরামত ও সংস্কারের ফলে সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। এরা এখানের প্রচুর ক্ষতি করে যায়।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলে

বাইজেনটাইন প্রভুত্ব কনস্ট্যান্টিনোপোলে (অর্থাৎ বাইজেনটিয়াম-এ)

৩২৪ খৃস্টাব্দে যখন সম্রাট কনস্ট্যানটিন 'নবরোম' স্থাপন করেন, সেই সময় প্রদেশের নতুন সীমানা টানা হয় ও সৈন্যবাস নতুন পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়। সেই সময় সাম্রাজ্যের ধর্ম-খৃস্টান ধর্ম ব'লে গৃহীত হয়। এর ফলে স্থানীয় পৌত্তলিকদের বহুমন্দির ধ্বংস করা হয়। ৩৬৫ খৃস্টাব্দের দারুণ ভূমিকম্পেও বহু মন্দির দৈবদুর্যোগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কতজনের যে মৃত্যু এ ধ্বংসস্তূপের নীচে হয়েছিল তার নিদর্শন ধ্বংশাবশেষ অপসারণে বহু নরকঙ্কালের মধ্যে মেলে। পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুঁড়ে বসবাস ও সমাধির জন্য যে সব গুহা তৈরী হয়েছিল তারই একটির শিলালিপিতে মৃতজনের নামের কিছু উল্লেখ আছে। খৃস্টধর্মের প্রচুর প্রচলন ও প্রভাব যে সাইরেনিকা রাজ্যে তখন ছিল, তার কোন বিশেষ বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাইজেনটাইন রাজত্বে নগরী উন্নয়ন যখন মন্থর ছিল, তখন নগর থেকে লোক গাঁয়ে যায় ও গাঁয়ের লোক-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্বে (৫২৭-৫৬৫ খৃস্টাব্দে) নতুন ক'রে নব উদ্যমে নগরীর সংস্কার সুরু হয়। টলেমিযাসে তিনি জলবাহী নল (একুইডাক্ট) মেরামত করান। বেরিনিসে সাধারণ স্নানকুণ্ড, নগরী রক্ষাপ্রাচীর ও নিকটবর্তী দুর্গের সংস্কারসাধন করান। ৬০০ খৃস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার প্রদেশপাল হেরাক্লিয়াস তিন হাজার সৈন্য নিয়ে আলেকজেন্দ্রিয়া দখল করেন ও পরে মিশরের ধন-দৌলত ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কনস্টান্টিনোপোল আক্রমণ করেন। ৬১০ খৃস্টাব্দে তিনি রাজমুকুট মাথায় ধারণ করেন। এর দু'বছর বাদে পারসিকদের কবলে মিশর আবার চলে যায়। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর হেরাক্লিয়াস ৬২৮ খৃস্টাব্দে খসরুকে পরাজিত করে মিশর পুনরুদ্ধার করেন।

আরব আক্রমণ

নব অভ্যুদিত ইসলাম ধর্মের উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ধর্মবিস্তারের অভিপ্রায় খলিফ ওমর প্রথমে 'দামাস্কাস্' ও পরে ব্যাবিলনের (প্রাচীন কায়রোর) দুর্ধর্ষ দুর্গ অধিকার করেন ৬৪১ খৃস্টাব্দে। এর অল্পদিন পরেই মিশর আরবের করায়ত্ত হয়। পারসিকদের মত আরবেরা নীলনদের কূল পর্যন্ত

ভূভাগ জয় ক'রে সন্তুষ্ট হ'লেন না। সেনাপতি 'আমির ইবন উল আয়াসী' নীলনদ পার হ'য়ে পশ্চিম লিবিয়ার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। স্থানীয় বাইজেনটাইন সৈন্যেরা সামান্যমাত্র প্রতিরোধ দিতে সমর্থ হয়। 'পেণ্টা-পলিসে'র শাসনকর্তা পশ্চাদপসরণ ক'রে 'তেউচিরা'র দুর্গপ্রাচীর ঘেরা দুর্গনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবন রক্ষার জন্য জলপথে নৌকাযোগে রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করেন। 'বারবের' স্থানীয় জনগণকে শাস্তি দেবার জন্য 'বারচা' নগরী অবরোধ করেন। কিছুকাল অবরোধের পর এদের সঙ্গে 'বারচা' নগরপালের এই সর্তে সন্ধি হয় যে, বাৎসরিক ১৩,০০০ দিনার কর এখানের লোকেরা দেবে। তবে এই অর্থ সংগ্রহ করতে প্রয়োজন-বোধে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয়ও করতে পারে। এরা যে নিয়মমত কর দিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই কর আদায়ের জন্য নৃশংস আদায়কারী পাঠানোর এখানে কোনদিন প্রয়োজন হয় নি। এখানকার শান্তিপ্রিয় স্থানীয় লোকেদের ব্যবহারে 'আমির ইবন উল আয়াসী' এতই তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি একসময় নিজেই বলেছিলেন, 'আমার জন্মভূমি যদি 'হেজাজে' না হ'ত তা হ'লে আমি বার্কেতে এসেই কালাতিপাত করতাম, কখন এ স্থান ছেড়ে যেতাম না। এখান-কার চেয়ে শান্তিপূর্ণ ও মনোরম স্থান কোথাও আমি পৃথিবীতে দেখি নি।'

ত্রিপলী

রোমের বিমানকোম্পানীর নগর-কেন্দ্রের নিকট মুখ্য বিরাট অফিস থেকে কোম্পানীর বাসে নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে টিকিট কিনে ঘণ্টাখানেক চলার পর বিমানবন্দরে পৌছলাম। সহর থেকে বিমানবন্দরের পথ মাইল বিশেক হবে। রোমের বিখ্যাত বিমান বন্দর থেকে 'কিংডম অব লিবিয়া'র বিমানে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকার উপকূলে ত্রিপলীর বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। অন্য জায়গায় যেমন থাকার জায়গা নিয়ে ভাবনা অন্য জনার, এখানে আমার ব্যবস্থা আমার নিজেই করতে হবে। ত্রিপলীর বিমানবন্দর থেকে বিমান কোম্পানীর বাসে বিনামূল্যে আমাদের সহরে নিয়ে এল। বাসেই খবর নিয়েছিলাম হোটেলের ব্যাপারে। বাসেই পৌছে দিল 'হোটেল দিল মেহেরী'তে। এর চাইতেও আরও দামী হোটেল ত্রিপলীতে আছে যেমন 'Uaddan', লিবিয়া ক্যাসেল, গ্র্যাণ্ড হোটেল।' সবারই ব্যবস্থা বিলিতি কায়দায়—অর্থাৎ 'বেড' ও 'ব্রেকফাস্ট' ওরা দেবে। মার্কিনি কায়দা হ'লে হ'ত শুধু ঘরভাড়া। বিমানে আসার সময়

মসজিদ মিনার

বিমান-সেবিকাকে বলেছিলাম, 'বেন-গাজিতে' মিঃ এস মুখার্জিকে খবর দিতে যে, আমার 'বেনগাজি' যেতে আরও একদিন দেরী হবে। তোমার যখন ছুটি বিমান ত্রিপলী থেকে বেন-গাজি পর্যন্ত গিয়ে, আর তুমি যখন বলছ মুখার্জী সাহেবের বাসা তোমাদের হোটেলের খুবই কাছে ও তুমি তাকে চেনো বারবার ত্রিপলী থেকে বেন-গাজি যাতায়াতে, তা হ'লে তুমি এ খবরটি তাকে দিয়ো যে, আমি আগামী কাল ঐ একই সময়ে বেনগাজি পৌছব।'

লিবিয়াতে চলাফেরা হয় বিমানে নয় মোটরে। এখানের শেষ রেলখণ্ডটি লিবিয়ার মাটি থেকে উৎপাটন ক'রে নেওয়া হয়েছে। পরের দিন যখন বেন-গাজিতে পৌছলাম তখন জানলাম বিমানসেবিকা মুহাসকুমারকে খবর দিয়েছিল।

'দিল মেহেরী' হোটেলের খাতায় নাম সই ক'রে মাল নিয়ে উঠলাম হোটেলের একতলা এক ঘরে। ঘরের সঙ্গে লাগানো স্নানের ঘর ও বেসিন। পায়খানা দুটি, পাশাপাশি ঘরের জন্য একটি। ঢোকবার দরজা দু'ধার দিয়েও আছে—সামনের বারান্দা দিয়ে ছাড়াও। এর জন্য ভাড়া যদি কিছু কম নেয় নিক্। আমি তো অতি ভোরেই উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে নেবো, এতে আমার কোন অসুবিধে নেই। দৈনিক ঘরভাড়া ও সকালের প্রাতরাশ নিয়ে ১'৬০ লিবিয়ান পাউণ্ড। এক লিবিয়ান পাউণ্ড ২'৮০ মার্কিন ডলার।

'দিল মেহেরী' হোটেল সমুদ্রের কোল ঘেঁসে পীচেমোড়া চওড়া বড় রাস্তার উপরে। এই হোটেলেরই খাবার ঘর সমুদ্রের জলের উপর কংক্রীটের পাইলের তৈরী। হোটেলের সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথে এর একটি যোগ রয়েছে। রাস্তা পার না হ'য়েও হোটেলের লোকেরা সুড়ঙ্গপথে চলে যেতে পারেন। রাস্তা থেকে সিঁড়ির ধাপ বেয়েও নামা যায়। হোটেলের কাউণ্টারে সপরিবার এক পাকিস্তানী ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি লিবিয়ায় কাজ নিয়ে করাচী থেকে এসেছেন। সঙ্গে একটি কচি ফুটফুটে মেয়ে ও দুটি বাচ্চা। ভদ্রলোকের দেহের আয়তন ও বয়সের তুলনায় সে খুকী। জিগ্যেস করলাম—

—আপনি এখন মেয়েদের নিয়ে এসেছেন, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন কবে?

—'উনিই তো আমার স্ত্রী' ব'লে দেখিয়ে দিলেন।

—তাই নাকি? নমস্কার। কেমন বুঝছেন।

ভদ্রমহিলা বললেন—এই তো এলাম। কিছুই বুঝতে পারছি না। থাকার আস্তানা পাকাপাকি ঠিক না হলে কী যে হবে জানি না।

—ওরা যখন এসেছে, তখন সবই ঠিক হ'য়ে যাবে।

ভদ্রমহিলাটিকে আমার দেখে ভাবলাম, শাস্ত্রীয় মতে চারটি বিবাহ করা যেতে পারে। তবে বোধ হয় ইনি হলেন কনিষ্ঠতমা। নতুন কাজে নতুন উদ্দীপনায় মুসলমান রাজ্যের লোক মুসলমান রাজ্যে কাজ করতে এসেছে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ অর্থাৎ দু'খণ্ড রুটি, মাখন, ডিম সেদ্ধ ও এককাপ কফি বা চা। সকালের আহার সেরে হেঁটে সমুদ্রের দিকে চলতে লাগলাম। বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভের মত হাঁসুলি বাঁকের মত ভূমধ্যসাগরের উপকূল ধরে চলেছি। প্রথম গন্তব্যস্থান হ'ল Tripolitania, ট্যুরিস্ট বিভাগের অফিসে সরকারী অফিসের মত বাবুদের কিছু দেরীতে আসাই কায়দা। বহু ভারতীয় লণ্ডনে গিয়েও বিলম্বে আসেন দূতাবাসের অফিসে কাজ করতে। বিশ বছর আগে যখন কৃষ্ণমেনন হাই-কমিশনার ছিলেন তিনি এলেন হঠাৎ পরিদর্শনে নিয়মানুবর্তিতার পরীক্ষা নিতে। তাঁকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। সেই সময় আমার একটি কাজে ঠিক সময়ে এসে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল।

ত্রিপলীর লোকসংখ্যা ১৮৫,৬০০ যেখানে সারা লিবিয়ার মোট সংখ্যা হল ৬৭৯,৩৫০। বিদেশীদের অধিকাংশই থাকে ত্রিপলী সহরে। ত্রিপলীতে ১৬৩ খৃস্টাব্দে মার্কাস্ অরেলিয়াস স্থাপিত শ্বেতপাথরের বিজয় তোরণ আজও অতীতের গৌরবময় কীর্তির সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান। এখান থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে মার্কিন রাজ্যের বাইরে বৃহত্তম বিমানক্ষেত্র হল হুইলাস ফিল্ড এয়ার বেস্। এখানে প্রাচীন দুর্গে রোমক আমলের ও প্রাচীন কালের বহু দ্রব্য সংগ্রহের প্রদর্শশালা খোলা হয়েছে। গুর্গী মসজিদ ও করমানলী মসজিদ দর্শনের জন্য ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ছাড়পত্র পাওয়া যায়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের জন্য গভীর নলকূপ বসিয়ে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় ও বাড়ী বাড়ী পাঠানো হয়।

ট্যুরিস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে চললাম পৌর প্রতিষ্ঠানের অফিস ও সরকারী দপ্তরের দিকে। পৌর প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে এদের তরুণ মধ্য ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হল। তিনি একজন চেক্-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার জ্ঞাতব্য প্রশ্নের জবাবগুলি চেক্ ভদ্রলোকই দিলেন। এখানে অফিসের কাজের চেয়ে চা আর কোকোকোলাই বেশী চলে।

এখানে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ছাড়াও হিন্দুস্থানী ও পাকিস্তানী

ত্রিপলীর নগরকেন্দ্র

বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ও ডাক্তার অনেক এসেছেন ও চুক্তির সময় পূর্ণ হ'তে আবার ফিরে যাচ্ছেন। অধিকাংশ সময়েই কাজের চাপ কম থাকে। অনেক বিদেশীর ধারণা তাদের কার্যক্ষমতা ও কর্মশক্তি এবং বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাদের বহু সময় সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিয়ে কাটাতে হয়। তরুণ তারা তাই জানে না নিজের দেশেও সেই একই দশা। এর জন্য অভিযোগ কেমন করে কার কাছেই বা জানাবে। ধীরে কাজ করলে কর্মকাল দীর্ঘায়িত হবে সত্য। সাধারণত এরা তিন বছরের চুক্তিতে লোক আনে। পছন্দ হলে কারো কারো বেলা এক, কারো বেলা দুই ও কারো বেলা তিন বছরও মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

পৌর প্রতিষ্ঠানের দপ্তর থেকে সরকারী অফিসের ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরে এলাম। আমার একটি ঘরে যেখানে ভারতীয় কর্মীরা একসঙ্গে বসে সেইখানে পৌঁছে দিয়ে গেল। তখন বেলা দশটা। বাইরে বেজায় রোদ্দুর। ভেতরে প্রত্যেকে টেবিলের সামনে কাজে ব্যস্ত না থেকে তাঁরা চেয়ার ঘুরিয়ে মুখোমুখি আলোচনা-চক্রে গভীর আলোচনায় লিপ্ত। এঁদের মুখ্য বক্তব্য হ'ল কর্মকর্তাদের অযৌক্তিক নানা নির্দেশ পালনে ব্যস্ত। যে কাজ কোনদিনই মাটিতে করা সম্ভব হবে না, সেই সব পরিকল্পনার কাজই বেশী। মিশরের ভারতীয় দূতাবাস ও ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের শিথিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার জন্য এখন পাকিস্তানী ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তারই বেশী নিযুক্ত হচ্ছে।

লিবিয়ান সরকার দ্রুত অর্থব্যয়ের জন্য বিদেশী কর্মী চায় সে তুলনায় আমাদের পাঠানোর বিলম্বে তাদের নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্য দেশীয়রা ঢুকে পড়ছে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার এখানের কর্মশিথিলতার ও অর্থনৈতিক দুর্যোগের দিনে বিদেশী মুদ্রা অর্জন ক'রে আনা বহুল পরিমাণে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ-ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে গেলে প্রয়োজন লিবিয়া থেকে কর্ম-সংক্রান্ত পত্রের দ্রুত জবাব দেওয়া; ইচ্ছুক কর্মীদের নিজ নিজ সংস্থা থেকে দ্রুত ছেড়ে দেওয়া; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মীদের কর্মসম্বন্ধ ছেদ না করা; অন্যের উন্নতির জন্য করণিক সংশ্লিষ্ট মহলের মন্থরতা দূর করা।

এখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসুযোগ নিতান্ত কম (বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারদের বেকার সমস্যার কথাও স্পষ্ট তাদের পরিসংখ্যান থেকে) তাদের বাইরে যেতে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে বাধা দেবার প্রবণতাই সবচেয়ে বেশী। এই সূত্রে ভারত কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বড়লোক

[কাহিনীটি মিখাইল জোশেঙ্কোর (১৮৯৫-১৯৫৮) 'দি এ্যারিস্টেক্র্যাট' গল্পের মূল অনুবাদ। জোশেঙ্কোর রুশ-সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক গল্পের অন্যতমা স্রষ্টা। তাঁর সাহিত্য-জীবনে প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। ছোট গল্পের প্রায় শ' খানেক বই তিনি লিখেছেন। ১৯৬৭ সালে অক্টোবর নবজাগরণের (১৯১৭) পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ১লা এপ্রিল মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি স্মারক গ্রন্থে গল্পটি স্থান পায়। গল্পটির রুশ দেশে প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ সালে।]

এক ঘরোয়া বৈঠকে গ্রেগরী আইভানোভিক্ তাঁর কুঞ্চিত থুতনিটি জামার আস্তিনে ঘষে নিয়ে সখেদে জানালেন—যেসব ভদ্রমহিলা সাধারণত টুপি পরে চলাফেরা করেন তাঁদের আমি ঠিক পছন্দ করি না। যদি দেখেন যে কোন মহিলার মাথায় টুপি রয়েছে, পায়ে সিল্কের মোজা, কোলেতে একটি লোমওলা বিলিতি কুকুর অথবা তাঁর কোন একটি দাঁত সোনা বাঁধানো তাহলে আপনি স্থির নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি উঁচু মহলের বাসিন্দা; কিন্তু তিনি মহিলা নন কোন-মতেই মহিলা ছাড়া আর সব কিছুই হতে পারেন। অন্তত আমার কাছে তিনি কুয়াশাচ্ছন্ন এক প্রহেলিকা।

আজ আর অস্বীকার কোরবো না, একদা আমিও এই ধরণের এক উচ্চ-বিত্ত বাসিন্দার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমি তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতাম প্রায়ই। এবং একদিন বিকেলে থিয়েটারেও গিয়েছিলাম। আর সেই থিয়েটারেতেই বিচিত্র ঘটনাটি ঘটে গেল। প্রেয়সী আমার তাঁর প্রকৃত স্বরূপে উদ্ভাসিতা হলেন।

আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ীর সামনে এক মিটিং-এ তাঁর সঙ্গে একদিন আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল। আমার থেকে সামান্য দূরে বসেছিলেন তিনি। আমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর দিকে—সেই যথারীতি মাথায় টুপি, পায়ে সিল্কের মোজা, একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো প্রভৃতি সবই ছিল।

: আপনি কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন? আমি বিগলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

: সাত নম্বরে।

: আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সত্যিই বড় আনন্দিত হলাম।

আমি এবার প্রকৃত বিগলিত।

আমি সেই অঞ্চলের সরকারী ফ্ল্যাটগুলির কেয়ারটেকার ছিলাম। প্রথম দর্শনের পর থেকেই কেন জানি না আমি মহিলার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট

মিখাইল জোশেংকোর

হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিদিন কোন না-কোন কাজের অছিলায় এরপর আমি নিয়মিত সাত নম্বর ফ্ল্যাটে একবার করে যেতাম। দু-একটা ছোটখাট প্রশ্ন বিনিময় হত আমাদের।

: আপনার জলের পাইপে কোন গণ্ডগোল নেই তো?

: কই না তো, সবই ঠিক কাজ দিচ্ছে। বরফের মত ঠাণ্ডা স্বরে এক উত্তরেই ভদ্রমহিলা আমার সব আগ্রহ নিবিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে যেতেন। শুধু পলকের জন্য বোধ হয় তাঁর চোখের কোণে ও সোনা বাঁধানো দাঁতের ফাঁকে একটু হাসির ঝিলিক খেলে যেত।

আমি খুবই নিরাশ হতাম। কিন্তু এভাবেই মাসখানেক চললো। আমার মনে হল ভদ্রমহিলা ক্রমশ যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছেন। আমার প্রশ্নের জবাবে যেন আন্তরিকভাবেই বলতেন—

: না, না, আপনাদের জলের ব্যবস্থা তো খুবই ভাল। আমার কোন অসুবিধে নেই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ইত্যাদি।

ক্রমে ক্রমে আমাদের আলাপে গভীরতা এল। আমি তাঁকে নিয়ে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোতে লাগলাম। রাস্তায় চলার সময় তিনি তাঁর হাত ধরে চলার জন্য আমাকে অনুরোধ করতেন। আমি স্বভাবতই বিগলিত হৃদয়ে তাঁর হাত ধরতাম আর তিনি আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে যেতেন। প্রেমের এই মুকুলিত পর্যায়ে ঠিক কি কি বলা উচিত তা আমি জানতাম না এবং রাস্তায় অন্য লোকজন দেখে বেশ লজ্জায় পড়ে যেতাম।

একদিন হঠাৎ তিনি বললেন: আমাকে তুমি শুধু কেবল রাস্তার রাস্তায় নিয়ে ঘুরে বেড়াও কেন? আমি তো এর কোন মানেই বুঝতে পারি না। এমন হোমরা-চোমরা পুরুষ তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারো। অন্তত মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটারে যেতে পারি আমরা।

: এতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে? আমি রাজী।

একটু থাবড়ে গিয়ে আমি জানাই। আমার বরাত ভাল ছিল। পরের দিনই পার্টি অফিস থেকে একটা

অপেরার টাকচ পেলাম ঠ্যাম। আর লোহার কামার ভস্কার টিকিটটা সে আমাকে অযাচিত করুণায় দান করলো। আমি টিকিট দুটো ভাল করে দেখি নি। দুটো টিকিট বিভিন্ন জায়গায় বসার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আমরটা নীচে বেশ সামনের দিকে আর ভস্কারটা পেছনের গ্যালারীতে।

কথামত আমরা পরের দিন থিয়েটারে গেলাম। ভদ্রমহিলা আমার টিকিটটা নিলেন। আমার বসার জায়গাটা একেবারে পেছনের দিকে বেজায় উঁচুতে; সেখান থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আবার একটু নিচু হয়ে সামনে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করলে কেবল চোখের সামনে আমার পরিচিতা ভদ্রমহিলার বসার জায়গাটাই দেখতে পেতাম। এবং এই দুই অবস্থার কোনটাই স্বস্তিকর নয়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বিরক্ত হয়ে নিচে নেমে এলাম। অল্প পরেই মধ্যান্তর হওয়ায় ভদ্রমহিলা বাইরে এলেন।

: এই যে কেমন লাগছে? আমি বললাম।

: এই একরকম। ভদ্রমহিলা খাবার স্টলের দিকে ফিরলেন।

: এখানকার এই স্টলের খাবার দাবারগুলো মনে হয় না তেমন ভাল কিছু হবে।

: আমি ঠিক জানি না, বলে ভদ্রমহিলা প্রায় আমাকে নৌকার গুণ টানার মত টানতে টানতে একটা স্টলের সামনে নিয়ে এলেন।

কাউণ্টারের ওপর প্লেটে ভর্তি নানা ধরণের কেক ও পেস্ট্রি সাজানো এবং একটা উজবুক দাম্ভিকের মত আমি সেই আগের যুগের বুর্জোয়া চালে বলে ফেললাম: আপনার যদি কেক ভাল লাগে তো কোনরকম চিন্তা করবেন না। একটা নিয়ে নিন, আমি দাম দিয়ে দেবো।

: চমৎকার, বলে ভদ্রমহিলা প্রায় নৃত্যের তালে কাউণ্টারের দিকে ধাবিত হলেন। একটা কেকে ক্রীম লাগিয়ে তুলে নিলেন।

আমার কাছে সত্যি বলতে কি সেদিন পয়সা ছিল না। ঝেড়েঝুড়ে হয়তো কোনমতে গোটা তিনেক কেকের দাম হতে পারে। ভদ্রমহিলা খেতে শুরু করলেন আর আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পকেট হাতড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম ঠিক কত পয়সা আছে। যা ভেবেছিলাম তাই—খুব বেশি কিছু নেই পকেটে।

প্রথম কেকটা ক্রীম সহযোগে খেয়ে তিনি আর একটা নিলেন। আমি শুধু একটা ঢোক গিললাম, কিছু বলতে পারলাম না। একটা আতঙ্কের কিন্তু নিছক জমিদারীভাব আমাকে পেয়ে বসলো। হাজার হলেও আমি একজন সাহসী পুরুষমানুষ। সঙ্গে মহিলা বন্ধু রয়েছেন, আমার হঠাৎ নার্ভাস হওয়া উচিত হবে না। আমি এইসব ভাবতে ভাবতে বাচ্চা মোরগের মত ঘাড় উঁচু করে ভদ্রমহিলার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তিনি মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে খাওয়ায় মনোনিবেশ করলেন।

: এবার বোধহয় হলে যাবার সময় হল। আসনে বসবার ঘণ্টা যেন বাজলো মনে হচ্ছে। আমি বললাম।

: না, না, এখনও সময় হয় নি, বলে তিনি তৃতীয় কেক নেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

: খালি পেটে সব সময় যা-তা কিছু খাওয়া বোধ হয় ভাল নয়। বেশি কেক খেলে পরে বমি হতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি জানালাম।

: আমার কিছু হয় না। মহিলাটি অম্লান বদনে জানালেন,—আমার ওসব অভ্যেস আছে।

আমি এ পর্যন্ত ঠিক ছিলাম, কিন্তু তিনি চতুর্থ কেকটি নেবার জন্য হাত বাড়াতেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

: ওটা রেখে দিন। একটু ধমকের সুরেই বললাম।

তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং মুখটা হাঁ করতে সেই সোনা বাঁধানো দাঁতটা চকচক করছে মনে হল।

সত্যি সত্যিই তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। আচ্ছাড়া মনে মনে বললাম, ভাববার আর কিছু নেই যা হবার তা হয়েই গেছে।

: ভগবানের দোহাই ও কেকটা রেখে দিন।

আমি গম্ভীর গলায় বলতে পারলাম এবং তিনি সেটা রেখে দিতে আমার পেছনে আসতে জানালাম। কাউণ্টারের সেলসম্যানকে কেকের দাম জানতে চাইলে সে নিরুদ্বিগ্ন গলায় ভালমানুষের মত বলল—চারটে কেকের দাম তিন রুবেল।

: কী বলছেন কী? চারটের দাম চাইছেন কেন চতুর্থ কেকটা তো প্লেটেই রয়েছে। আমি উত্তেজিত হয়ে জানালাম।

: হাঁ, চতুর্থ কেকটা প্লেটে আছে বটে কিন্তু ওতে একটা ছোট্ট কামড় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আঙুলের দাগও লেগে রয়েছে। সেলসম্যানটি নির্বিকার।

: কী যা-তা বলছেন বানিয়ে বানিয়ে। কামড় কখন লাগান হল?

আমি তখন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু লোকটি আমাকে কোন পাত্তা না দিয়ে একমনে নিজের কাজ সারতে লাগল।

ইতিমধ্যে আমার চারপাশে কিছু লোক জড় হয়ে গেছে। এবং বুঝতেই পারছেন প্রত্যেকে এক একজন বিজ্ঞের মত মতামত জানিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে কেকে একটা কামড় যেন দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কেউ বলছে না ঠিক কামড় বলতে যা বোঝায় তা এখনও দেওয়া হয় নি। আমি আমার সব পকেটগুলো বাইরে উল্টে ধরলাম। টুকিটাকি নানা ধরণের জিনিষ ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা মজা পেয়ে হেসে উঠল। আমি কিন্তু তখন হাসবার মত কোন মজা তাতে দেখতে পেলাম না। পয়সাগুলো সব এক এক করে গুনে দেখলাম একেবারে টায়েটুয়ে তিন রুবল রয়েছে। বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না জেনে আমি সেলসম্যানকে চারটে কেকের দাম দিলাম। তারপর ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে বললাম—এখন আর চিন্তা করে কি হবে

ওটাও খেয়ে নিন, ওটার দাম চোকান হয়ে গেছে।

কিন্তু তিনি নড়লেন না। লজ্জায় তখন তাঁর খাবারমত অবস্থা বোধহয় ছিল না। একটা ফচকে ছোঁড়া ব_লে—ওটা এদিকে চালান করা হোক, আমরা শেষ করে দিচ্ছি। আর সে সত্যি সত্যিই এগিয়ে এসে সেটা খেল। এবং আমার পয়সাতেই।

আমরা হলের দিকে ফিরে গেলাম এবং একসময় থিয়েটারও শেষ হল। তারপরে আমরা নীরবে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। তাঁর ফ্ল্যাটের দরজার কাছে আসার পর হঠাৎ তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর জমিদারী গলায় বেশ মেজাজের সঙ্গে বললেন — যথেষ্ট ছোটলোকমীর পরিচয় আপনার থেকে পাওয়া গেল। পকেটে পয়সা না থাকলে মহিলাদের সঙ্গে না বেরোনোই ভাল।

আমি বললাম: পয়সাই সব সুখের বিষয় নয় ভদ্রে। অবশ্য আমাকে যদি বলতে অনুমতি আপনি দেন।

অর্থাৎ সেইখানেই আমাদের প্রেমের ইতি। সেই থেকেই আমি বুর্জোয়াদের পছন্দ করি না।

অনুবাদক—জ্যোতির্ময় দাশ

কৃষি প্রদর্শনী

আন্তর্জাতিক সবুজ সপ্তাহ নাম দিয়ে এ বছরের কৃষি প্রদর্শনীতে পশ্চিম জার্মানীর কৃষিজাত শাকসব্জী না দেখিয়ে কিভাবে সেগুলি দিয়ে সুখাদ্য তৈরী করা যায় তাই দেখান হয়েছে। বিভিন্ন স্টলে সুন্দরী সুবেশা তরুণীরা একাজে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অনেক স্টল থেকে দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার অভ্যাগতদের পরিবেশন করা হয়েছে। বাগান ও চাষবাসের আধুনিক নানা রকমের যন্ত্রপাতিও এই প্রদর্শনীতে ছিল। পৃথিবীর প্রায় ত্রিশটি দেশ এতে যোগ দিয়েছিল।

ভাগবতী-তনু

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সারাজীবন নানাপ্রকার বিরুদ্ধতা সহ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ—বিরুদ্ধতা অনেক সময় নিন্দা—বিদ্রূপের সাহিত্যিক-সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত অসম্মানে গিয়ে ঠেকেছে। বিপক্ষের বিরুদ্ধে বা নিজের সমর্থনে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, সে সব বিষভাষণের দিকে দৃকপাত করারও তাঁর কৌতূহল নেই। কানে অবশ্য শুনতে হয় যেহেতু আশেপাশে উত্তেজিত গুঞ্জনে বহু লোকই ঘোরাফেরা করে।

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'পত্রে আপনি যে কথার আভাসমাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটি আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধও করিয়াছি, কারণ, লেখকজাতির অভিমান অল্পেই আঘাত পায়—অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকে সেই গ্লানিজনক অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোনো সুখ নাই কোনো শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষ্টার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে আমি তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকি। জীবন-প্রদীপের তেল তো খুব বেশি নয়, সবই যদি রোষে-দ্বেষে হুহু: শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব?'

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনই এই ভগবানের আরতি।

ভগবানের রাজ্যে কোনো দুঃখই তুচ্ছ নয় কোনো অসম্মানও ত্যাজ্য নয়। অসম্মান তো ভগবানেই সন্নিহিত হবার ছাড়পত্র, তাঁরই স্বাক্ষরযুক্ত গোপন লিপি। একেবারে নিভৃতে নিমন্ত্রণ।

কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব॥

যতক্ষণ মনে আছে ততক্ষণ নাম কই? যে মানে থাকে সে নামে থাকে না। মানকে উলটে দিলেই নাম হয়। মানে ঘা পড়লে সেই আঘাতের বেগে একেবারে ভগবানের কাছটিতে চলে আসি।

কিন্তু কে ভগবান? কোথায় তিনি?

প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের আগেই রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে গিয়ে বসেন। দুচারজন শিক্ষক ও কয়েকটি ছাত্রও আসে। নীরবে কতক্ষণ ধ্যান করেন রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক ছাত্রেরাও স্তব্ধ হয়ে থেকে সে ধ্যানের প্রশান্তিকে প্রগাঢ় হতে দেয়। ধ্যানের শেষে তারা কবিকে অনুরোধ করে, কিছু বলুন।

রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন। তারপর ঘরে ফিরে সেই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেন। সেই কথিত বাণীর লিখিত রূপই শান্তিনিকেতন।

সতেরো খণ্ডে গ্রথিত এই শান্তিনিকেতন। প্রথম আটখণ্ডে ধর্মভাষণ ধর্মজিজ্ঞাসা, বাকি নয় খণ্ডে অন্যান্য বক্তৃতা। কী বিরাট সৃষ্টি। কী সুদূর বিস্তৃত সন্ধান। কী সর্বহৃদয়পূর্ণকারক সিদ্ধান্ত।

এ শুধু কবির কাব্যব্যঞ্জন নয়, একাগ্র সাধকের ধ্যান ও মননের সম্পদ।

'রবীন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি।' লিখছেন দীনেশচন্দ্র:

'ইহাই তাঁহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, খেয়া প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতি তাঁহাকে মনুষ্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্যসমাজ, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরসসিক্ত করিয়া দিয়াছে—ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভার স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে—ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা।'

এই 'শান্তিনিকেতন'ই গীতাঞ্জলির ভিত্তি।

আর গীতাঞ্জলির দেবতাই ভক্তের ভগবান। জীবন-দেবতার মত অনির্দেশ্য কেউ নয়, নয় বা 'খেয়ার' রহস্যের মাঝি, এ একেবারে কাছের মানুষ, মনের মানুষ। ঘনিষ্ঠ, অব্যবহিত, একেবারে চোখের উপর, সামনাসামনি, হাতের নাগালের মধ্যে। এ আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়।

দেশের সমস্ত ভূভাগের অধিপতি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যে সর্বভাবের সমন্বয়। তাঁর মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, গীতার কর্মবাদ, ভাগবতের ভক্তিবাদ, দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিবাদ—সমস্ত একসঙ্গে। তিনি এক আধারে জ্ঞানী, কর্মী, যোগী, ভক্ত—ভক্তশ্রেষ্ঠ। সর্বোপরি তিনি কবি, কবি সার্বভৌম, সেই হেতু তিনি সমস্ত রসে সমাবিষ্ট। তিনি তাই যেমন শৈব আবার তেমনি বৈষ্ণব, যেমন তিনি দ্বৈতভূমিতে তেমনি আবার অদ্বৈতলোকে। কিন্তু যেখানেই তিনি থাকুন,—সর্বত্র ও সর্বদা তিনি মানুষেই সন্নিহিত, সংসার থেকে অবিচ্ছিন্ন। এই মানুষ—মানুষোত্তম—চিরজীবী মানুষ—মনের মানুষ—এই মানুষই রবীন্দ্রনাথের ভগবান। 'নমি নরদেবতারে।'

জীবনদেবতা এখন এই পরমমানুষ মনের মানুষের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমি শহরের মানুষ,' হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ :

'একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুনলুম, 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে।' আমি যেন চমকে উঠলুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, 'হৃদা মনীষা' —খুঁজি হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে কর্ম দিয়ে। সেই মহান আত্মার অমরাবতী হচ্ছে, 'সদা জনানাং হৃদয়ে'।

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি সেথায় চরণ পড়ে।
ব্যথা পথের পথিক তুমি
চরণ চলে ব্যথা চুমি
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে।

'মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্মে যিনি বিশ্বকর্মা, আমি জেনে না জেনে সেই দেবতাকেই মেনেছি।' অন্য চিঠিতে আরো লিখছেন রবীন্দ্রনাথ :

তিনি যেখানে উপবাসী পীড়িত, সেখান থেকে আমার ঠাকুরের ভোগ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারিনে। খৃস্ট বলেছেন বিবস্ত্রকে যে কাপড় পরায় সে আমাকেই কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সে আমাকেই অন্ন দেয়—এই কথাটাই ব্রহ্মভাষ্য। এই কথাটাকেই 'দরিদ্রনারায়ণ' নাম দিয়ে হালে আমরা মানিয়েছি—দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণকে উপলব্ধি ও সেবা করার কথাটা ভারতের জাল স্বাক্ষর করা—আমাদের উপলব্ধি প্রধানত গো-ব্রাহ্মণের মধ্যে। কিন্তু যথার্থ পুরাতন ভারত, যে ভারত চিরনূতন—যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার সব লেখা যদি ভালো করে পড়তে তাহলে বুঝতে আমার চিত্ত মহা-ভারতের অধিবাসী—এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।'

রবীন্দ্রনাথ তাই সম্প্রদায়ের বাইরে, মতবাদের বাইরে। তিনি ব্রাহ্মও নন ব্রাহ্মণও নন। তিনি উপনিষদে আবদ্ধ নন, ভাগবতেও পরিমিত নন। তিনি সব কিছু ভরে তুলে আবার সব কিছু ছাপিয়ে। পূর্ণ করে আবার অফুরন্ত। ঋষি হয়েও তিনি আবার কবি। ঋষি তো ধ্যানে স্তব্ধ হয়ে যান কিন্তু কবির তো স্তব্ধ হওয়া নেই। তাঁর যে শুধু গানে-গানে পথ চলা। আর যারই শেষ থাকুক, পথের শেষ নেই। তিনি অনন্ত পথে তাঁর মনের মানুষকে খুঁজে ফিরুন কিন্তু আমরা আমাদের মনের মানুষকে পেয়ে গেছি। তাঁর জেনে কাজ নেই তিনি কে।

'আমার কল্পরূপকে আশ্রয় করে যাঁকে তুমি হৃদয়ে উপলব্ধি করেছ আমি তাঁকেই পূজা করে থাকি', কবি কি সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন হেমন্তবালাকে :

'তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই—তিনি পরমমানব। নিজেকে বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত করে যখন আমি ধ্যান করি তখন নিজেকে আমি সত্যরূপে জানি, আমার ছোট-আমির যত কিছু ক্ষুদ্রতা সব বিলীন হয়ে যায়—তখন আমি সত্য আধারে নিত্য আধারে থাকি। তাঁরই আহ্বানে রাজপুত্র ছিন্ন কন্থা পরে পথে বেরিয়েছেন। বীরের বীর্য গুণীর গুণ প্রেমিকের প্রেম তাঁরই মধ্যে চিরন্তন। তুমিও হৃদয় দিয়ে তাঁকেই গভীরের মধ্যে স্পর্শ কর, যেখানে তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার সত্যকার আত্মনিবেদন। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে।'

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর—
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই ॥

চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে, আসছেন রবীন্দ্রনাথ। বিকেল-বেলা, তাঁকে গাড়ি আনতে গিয়েছে। সবাই দীপ্ত আগ্রহে তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। উপরের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলেমেয়েরা, তাদের মধ্যে একজন সাহানা দেবী, চিত্তরঞ্জনের ভাগ্নী।

গাড়িটা পালকি গাড়ি কিন্তু ঘোড়া ভারি তেজী। সোয়ারি গাড়িতে ওঠবার জন্যে গাড়ির পা-দানে পা রাখতে-না-রাখতেই সে ঘাড় বেঁকিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে—সোয়ারির প্রায় পরিত্রাহি অবস্থা। ঐ পাটকিলে রঙের তেজী ঘোড়াটাকে দেখা গেল—গাড়িটা ঢুকল গেট দিয়ে। গাড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে।

গাড়ি থেকে নেমে রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের বোন অমলা দাশকে বললেন, 'তোমাদের এই ঘোড়ার গাড়িটিতে চড়তে

পায় একটা ব্যাপার। ভালো করে চড়বার আগেই ঘোড়া ছুটতে শুরু করে দেয়। সে এক মহাতটস্থ অবস্থায় উঠে পড়ার পালা সারতে হয় দেখলুম।

উপরে উঠে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহানা দেবী লিখছেন:

'তিনি উপরে এলে সামনাসামনি দেখবার সুযোগ পেলাম—কি সুন্দর চেহারা, কোথায় যেন যিশুখৃস্টের আদল আসে—গৌরবর্ণ লম্বা দোহারা, চোখ নাক মুখ সব যেন দেখবার মত। দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কালো চুল সিঁথি দিয়ে ভাগ করা, কপালের দু'পাশে একটু করে ঘোরানো। দাড়ি গোঁফ সবই কালো। দাড়ি অনেকটা ফ্রেঞ্চকাট। কালো ফিতে বাঁধা স্প্রিঙের টেপা চশমা নাকে, ফিতেটি গলায় ঝোলানো। একে ওই সুন্দর চেহারা, তার উপর সাদা ধুতি পাঞ্জাবির সঙ্গে কালো ফিতেয় বাঁধা চশমাজোড়াটি, মনে আছে, এমন সুন্দর মানিয়েছিল। সেই আমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা—জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন।---'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু' এই গানটি সবে লিখে নিয়ে এসেছেন পড়ে শোনাবার জন্যে। সে কি সুন্দর পড়া!'

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

এই দেখা-র কথাই বলছেন 'শান্তিনিকেতনে'।

'আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিখটি এখনও ধরেনি। বিকশিত দেখা এখনও হয়নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখিনি।

মনে কোরো না আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা ধ্যানের কথা কিছু বলছিনে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

কোন সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে, দেখ। আলোক যে দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না—দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে সে কী অদ্ভুত জিনিস। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি।'

এই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি এ দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার? এই দেখার পুরা হিসাব কি শুধু টাকায় পাওয়া যাবে, শুধু খ্যাতিতে, ভোগে, শুধু বেঁচে থাকায়? না, প্রভাতের আলোক প্রত্যহই এসে বলছে, তোমার এত সব দেখার মধ্যে তোমার একটি চরম দেখা, পরম দেখা লুকিয়ে আছে। সেটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।

সেটা কী দেখা, কাকে দেখা? আনন্দরূপ অমৃতরূপকে দেখা। সেইটিই তো মনের মানুষের শাশ্বত রূপ। এই পরম সুন্দর পরম প্রপন্ন মনের মানুষকে ঘরে-বাইরে আকাশে-বসুন্ধরায় সর্বত্র দেখার সাধনাই তো জীবনের সাধনা।

যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশি
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥

শুধু দেখা নয়, শোনাও।

কত ভাবে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন, কত সুরে গান গেয়ে যাচ্ছেন, কী নির্মল নিঃশব্দতায় তাঁর চিত্ত উদ্ঘাটিত করে ধরছেন। নিঃশব্দতাও তো শোনবারই মত গান।

'যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।'

'কাল কৃষ্ণা একাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীণকার তাঁর রত্নবীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম।' তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাষণে বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সেই ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সঙ্গীতে গাঁথা পড়ছিল। তারপর যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনও সেই জাগ্রত বীণকারের নিশীথরাত্রের বীণা বন্ধ হবে না—তখনও তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহনাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবে না, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার সঙ্গীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।'

ওস্তাদজি আমাদের হাতেও একটি করে ছোট বীণা দিয়েছেন—তাঁর ইচ্ছে আমরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে শিখি। কিন্তু কই সুর মেলাচ্ছি কই? একদিন যদি বা বাজে, অন্যদিন ঢিল পড়ে, ঝনঝন খনখন করে ওঠে। জীবনের তারগুলো এঁটে বাঁধো, তেমনি দেখো তার উপর যেন কিছু চাপা না পড়ে, সে মুক্ত থাকে। তারের উপর কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে, মরচে না পড়ে।

তারপর 'প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা কোরো, হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।'

আবার এই সব দেখা আর শোনা সমস্ত আবার তাঁকেই দিতে হবে—যিনি দেখাচ্ছেন, যিনি শোনাচ্ছেন। দেখ, তোমাকে ঠিক দেখেছি। শোনো, তোমারই সুরে জীবনের বীণার তার বাঁধা হয়েছে।

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী,
আমার চোখের চেয়ে দেখা আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা আমার আনাগোনা
সব দিতে হবে।

'শান্তিনিকেতনের' প্রথম কথাটিই হচ্ছে : উত্তিষ্ঠত,, জাগ্রত। ওঠো, জাগো। সমস্ত অসাড়তা ও অজ্ঞতা থেকে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা থেকে জেগে ওঠ। উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্যে বেঁচে থাকো।

'সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে : সমস্ত দীর্ঘ দিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মত জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানা দিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে—চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে। ওরে উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত।'

রবীন্দ্রনাথ বারে বারে তাঁর আবেষ্টনীর বেড়া উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন, নিজের ঘরে জন্ম নিয়ে আবার জন্ম নিয়েছেন ঈশ্বরের জগতে। সে জগৎ কোনো দল কোনো মত কোনো বিধিবিচার দিয়ে আবদ্ধ নয়। সে থেমে-থাকার জগৎ নয়, এগিয়ে চলার জগৎ। রবীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র 'চরৈবেতি'—বাইরে বেরিয়ে এস, এগিয়ে চলো। কোথায় চলেছ? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্থির, কৃতনিশ্চয়। শূন্যতার মধ্যে ছুটোছুটি করছেন না, চলেছেন বিশ্বভুবনেশ্বরের দিকে, অন্তহীন যাঁর রূপ অন্তহীন যাঁর ক্রিয়া। কাল থেকে কালে অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে সেই তাঁর চিরন্তন সম্মুখযাত্রা। যদি সত্যি ঈশ্বর না থেকে থাকে তবে মানুষের জীবনধারণ করবার প্রয়োজন কী? আর তবে কার জন্যে বেঁচে থাকা? বাঁচবার অর্থ খুঁজে পাওয়া? আর কে আছে যার প্রতি ভালোবাসা কিছুতেই শেষ হবার নয়?

রবীন্দ্রনাথ প্রেমে জাগ্রত, প্রত্যয়ে জাগ্রত, অখণ্ড বিশ্ববোধে জাগ্রত।

'ঈশ্বর থেকেও থাকেন না—এত বড়ো প্রকাণ্ড না-থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে। এই না-থাকার ভারে আমরা প্রতি মুহূর্তেই মরছি। এই না-থাকার মানে আর কিছু না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না-থাকারই শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই, এত বড়ো ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে। কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা। দিনে-রাত্রে এই জন্যেই যে গেলুম। সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ—প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগতপতি হে—'

যদি নিঃসংশয়ে প্রেম জাগে তা হলে আর দুঃখ কী, ভয় কোথায়, অভাব কিসের?

আছে আমার হৃদয় আছে ভরে
এখন তুমি যা খুশি তাই করো
এমনি যদি বিরাজো অন্তরে
বাহির হতে সকলি মোর হরো।
সব পিপাসার যেথায় অবসান
সেথায় যদি পূর্ণ কর প্রাণ
তাহার পরে মরুপথের মাঝে
উঠে রৌদ্র উঠুক খরতর।

হেমন্তবালাকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ : 'তোমাদের জীবনের লক্ষ্যকে একটি বিশেষ রূপে মূর্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছ, একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে বিবিধ উপচারসহ তাকে প্রদক্ষিণ করছ। ওখানে বাসা বাঁধবার মতো প্রকৃতিই আমার নয়। তুমি মনে করতে পারো যে, তার কারণ আমার মন ব্রাহ্মসংস্কারে চালিত—একেবারেই নয়, নূতন বা পুরাতন কোনো প্রচলিত সংস্কারে আমাকে কোনোদিন বাঁধেনি। মাঝে মাঝে ধরা দিতে গিয়ে ছিন্ন করে বেরিয়ে চলে এসেছি—আমার জায়গা হয়নি। কোনো সনাতন বা অধুনাতন ছাঁচে-ঢালা উপজগতের মধ্যে নিজেকে ধরাতে পারলুম না। আমি কেবল চলতে চলতে পাই এবং পেতে-পেতে চলি, এমনি করেই এতদিন কেটেছে।—আমি যাঁকে পাই বা পেতে চাই, কেবলি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পেতে হয়, আড্ডা গেড়ে বসলেই প্রতিষ্ঠাকে পাই সোনাটাকে ফেলে দিয়ে।—আমার সম্পদকে সুনির্দিষ্ট সুরক্ষিত করবার জন্যে আমি আমার পিতামহদের লোহার সিন্দুকটাকে কাজে লাগাতে চাইনে। ওজনদরে সে সিন্দুক যতই ভারী ও কারিগরিতে যতই দামী হোক না। আমার সম্পদ রয়ে গেল আকাশে আলোতে বাতাসে আর আমার অন্তরাকাশে। আর তাঁর পরিচয় রইল পৃথিবীর সকল কবির কাব্যে, কলারসিকের চিত্রে নৃত্যে গানে, মনীষীর মননে, কর্মীর কর্মে, পৃথিবীর সকল বীরের বীর্যে ত্যাগীর ত্যাগে। এরা যে চলেছে তাঁরই সঙ্গে যুগে যুগে তাঁরই পথে-পথে। কোনো বাঁধা বাক্যে তারা ধরা দেয় না, বাঁধা মতে আটক পড়ে না, বাঁধা রূপের শিকল পরে না। এটা অত্যুক্তি হবে যদি বলি কোনো বাঁধা মতে আমাকে পেয়ে বসে না—কিন্তু সে সব বাঁধনের গ্রন্থি আলগা—যখন টান পড়ে তখন আপনিই খোলে, গলায় ফাঁস লাগায় না।'

রবীন্দ্রনাথ আংশিক নন, আঞ্চলিক নন, প্রাদেশিক নন—তিনি অপ্রচলিত, অসাধারণ। তিনি সর্বাস্তিবাদী। আর অস্তিত্ব দেশকালপরিব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা।

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয়মাঝে বিছাও আনি।

রাতের তারা দিনের রবি, আঁধার আলোর সকল ছবি
তোমার আকাশভরা সকল বাণী
হৃদয়মাঝে বিছাও আনি ॥

চিঠিতে আরো লিখছেন :

'তুমি লিখেছ আমার সম্বন্ধে এক সময়ে তোমার এবং তোমাদের অনেকের একটা বিরুদ্ধতা ছিল। এই বিরুদ্ধতা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে আমার দেশের ভিতরেই আছে। আমার স্বভাব দেশের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারেনি। যাদের আমি বন্ধুভাবে গণ্য করেছি, হঠাৎ দেখি আমার সম্বন্ধে তাদের প্রতিকূলতা নিদারুণভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারি আমি যেখানকার লোক সেখানকার সঙ্গে আমি বেখাপ। এক জায়গায় এরা আমার কাছাকাছি এসে হুঁচট খেয়ে পড়ে—সেটা আমার স্বভাবের দোষে না তাদের চলনের ত্রুটিতে সে তর্ক করে কোনো লাভ নেই—এবং তর্কে জিতলেও কোনো সান্ত্বনা নেই।'

খণ্ড করে নয়, গণ্ডির মধ্যে বসে নয়, বিধিবিধানের আড়ম্বরের মধ্যে নয়, প্রেমের মুক্ত অঙ্গনে সমস্তকে নিয়ে সমস্তকে মিলিয়ে—সুরে রূপে কর্মে মর্মে—রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ সাধনা। এ সময়ে মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখলেন তাঁদের বাণীতে তাঁর ভাবের আশ্চর্য সমর্থন। নানক, কবীর, দাদু—কেউ অচল প্রকোষ্ঠে বন্দী নয়, সবাই সচল নদী, সকল সীমা পার হওয়া অসীম সমুদ্র-প্রণাম। নদী কিছুই রুদ্ধ করে রাখে না, নিজেকে দিয়ে দিয়ে চলে আর সেই দানে-ব্যয়ে নিজেকে সম্ভোগও করে। নদীর মধ্যে দুই গতি—দৈনিক গতি আর শাশ্বত গতি। দুই গতির ভরপুর সামঞ্জস্য এই নদীতে। রবীন্দ্রনাথেও এই সামঞ্জস্য। তিনি সাময়িক হয়েও সামগ্রিক, বর্তমানের হয়েও শাশ্বতের। গতি যে পথ দিয়েই হোক নদীর লক্ষ্য সমুদ্র।

লিখছেন চিঠিতে : 'আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব—ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে, নটরাজের নৃত্যও হয় —যমুনায় নৌকা ভাসান দিয়ে শেষকালে পড়ি গিয়ে সেই গঙ্গায় যে গঙ্গা গৈরিক পরে চলেছেন সমুদ্রে।'

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পিয়াসী তিনি নন বটে কিন্তু সমস্ত বন্ধনসম্ভোগের মধ্যে তিনি এক নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী এ কে অস্বীকার করবে ?

যতই তিনি শাশ্বতের অভিমুখী থাকুন, শান্তিনিকেতনের ভাষণ দিন বা গীতাঞ্জলির গান লিখুন তাঁর দৈনিক গতিতে বিচ্যুতি-বিচ্যুতি নেই। তিনি জমিদারির তদারকি করেন, শান্তিনিকেতনে স্কুল চালান, ছাত্র পড়ান, গোরা-উপন্যাসের মাসিক কিস্তি লিখে পাঠান সময়মত। শমীর মৃত্যু-শোকও তাঁর কর্তব্যে শৈথিল্য আনতে পারে না। ঈশ্বরে ওতপ্রোত হয়ে আছেন বলেই তো তাঁর এত শক্তি এত সৌন্দর্য এত কর্মিষ্ঠতা।

আবার লিখছেন : 'বার বার বলেছি গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি, নানাভাবে নানা দিকে আমার মন সঞ্চরণ করে—আমার স্বভাবের বৈচিত্র্যবশত নিজেকেও নিজে বুঝিনি, অন্যেও আমাকে বোঝে না। আমার প্রধান সার্থকতা সব কিছু প্রকাশ করা—বাণীর দ্বারা করেছি কর্মের দ্বারাও করছি। মনে কোরো না, আরামে করতে পেরেছি, দিতে হয়েছে অনেক, কষ্ট ও অপমান সয়েছি যথেষ্ট, নিজেকে প্রায় নিঃস্ব করেছি—কিন্তু ছুটি পাব না কোনো দিন, কেন না এই আমার স্বভাব।'

[ক্রমশ।

ফোর্ড সংগ্রহশালা

আমেরিকার ডিয়ারবর্ন নামক স্থানে হেনরী ফোর্ড এক অপরূপ সংগ্রহশালা স্থাপিত করেছেন। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৯ সাল থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থব্যয়ে ফোর্ড এই 'আমেরিকার ইতিহাস' সংগ্রহশালাকে পুষ্ট করেছেন। আক্ষরিক অর্থে এটা মিউসিয়াম নয়। এখানে সংগৃহীত আছে আমেরিকার বিখ্যাত মনীষীদের স্মৃতিচিহ্নাদি, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক ইত্যাদি।

যেমন ধরুন, এডিসনের আদি গবেষণাগারকে আক্ষরিক অর্থে 'তুলে' এনে এখানে বসান হয়েছে—এমন কি জানালার বাইরে যেখানে তিনি ভাঙা বোতল, কাচের টুকরো ইত্যাদি ফেলতেন, সেই মাটিটুকু পর্যন্ত বয়ে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাঙা বোতল ইত্যাদি সমেত। উদ্বোধনকালে (১৯২৯) এডিসন অন্তরঙ্গবন্ধু হেনরী ফোর্ডকে বললেন, "হেনরী, তুমি জিনিষটা প্রায় শতকরা ৯৯॥ অংশ ঠিক করেছ।"

"কেন ?" প্রশ্ন করলেন হেনরী চমকে।

"মানে, সবই ঠিক আছে, শুধু আমি ঘরটা এত পরিষ্কার রাখতাম না কোনকালে।" বললেন এডিসন।

এখানে আছে আরও জর্জ ওয়াশিংটনের সুটকেশ, যা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যেত কম্বল, বালিশ এবং রান্নার জিনিষপত্র বয়ে। প্রথম ফোর্ড গাড়িটি এখানে দাঁড়িয়ে আছে নিজস্ব গৌরবে, যেমন আছে রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয়ের আদি দোকান, যেখানে তাঁরা প্রথম 'উড়ন্ত কল' তৈরী করেছিলেন ১৯০৩ সালে। আমেরিকার আদিযুগে যে সমস্ত গাড়ি ব্যবহৃত হত, তার মডেল এখানে সংরক্ষিত। আব্রাহাম লিংকন্-এর ব্যবহৃত টুপি ও লাঠি, তিনি প্রথম যে বিচারালয়ে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন, বিখ্যাত শব্দতত্ত্ববিদ্ ওয়েব্স্টার যে ঘরে তাঁর প্রথম অভিধান লেখেন, ইত্যাদি সবই এখানে সযত্নে পারিপার্শ্বিক সহ সংরক্ষিত।

এ এক 'ঐতিহাসিক' মিউসিয়াম।

প্রতিকৃতির পটভূমি

রথীন রায়

এক রংয়ের দেয়ালকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে

আলোকচিত্রের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী অংশকে তাহার পটভূমি বলা হয়। প্রতিকৃতির আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে যথাযথ পটভূমি নির্বাচন একান্ত আবশ্যক। এই জাতীয় আলোকচিত্রের মুখ্য বিষয়বস্তু হইতেছে - প্রতিকৃতি; পটভূমি সেখানে গৌণ। এই ক্ষেত্রে পটভূমি যদি জমকালো এবং খুব স্পষ্ট হয়—তাহা স্বাভাবিকভাবেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাহাতে মুখ্য বিষয়-বস্তু অর্থাৎ প্রতিকৃতির প্রাধান্য ও আবেদন অনেকাংশে নষ্ট হইবে এবং সার্থক আলোকচিত্র হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইবে। এই কারণেই ১নং আলোকচিত্রটি ব্যর্থ হইয়াছে। প্রতিকৃতির পটভূমি এমন হওয়া উচিত যে তাহা মোটেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না; অথবা ততটুকুই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে যতটুকু প্রতিকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন। পটভূমি শূন্য রাখিতে হইলে সমতল, কারুকার্যহীন, মসৃণ একরংয়ের দেয়াল, কাপড় বা পরদা ইত্যাদিকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে। ২নং আলোকচিত্রটিতে মসৃণ একরংয়ের দেয়ালকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। বাহিরের খোলা জায়গায় অনেক সময় এই সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায় না। তখন ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ ক্যামেরা নিচু হইতে উপরদিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া বা উপর হইতে নিচুদিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া আকাশ, ঘাস, জল ইত্যাদিকেও পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে।

এই পদ্ধতিতে ৩নং আলোকচিত্রে আকাশকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রতিকৃতির চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পটভূমির স্বাভাবিক বিষয়বস্তুকে অনেক সময় দেখাইতে হয় যেমন যুদ্ধরত কোন সৈনিকের পটভূমিতে যুদ্ধক্ষেত্র, বক্তৃতারত কোন বক্তার পট-ভূমিতে শ্রোতা ইত্যাদি থাকিলে প্রতিকৃতিটি অনেকাংশে জীবন্ত মনে হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে পটভূমি যেন খুব স্পষ্ট না হয়। যে সব ক্যামেরায় লেন্স-ছিদ্রপথকে ছোটবড় করিবার সুবিধা আছে সেইসব ক্যামেরায় প্রতিকৃতিকে স্পষ্টভাবে ফোকাস করিয়া যথাসম্ভব বড় লেন্সছিদ্রপথ ব্যবহার করিয়া ছবি তুলিলে পটভূমি স্বাভাবিকভাবেই অস্পষ্ট হইবে।

অপেক্ষাকৃত বড় লেন্স ছিদ্র পথ ব্যবহার করিয়া পটভূমি অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে

ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করিয়া—নিচু হইতে উপর দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া আকাশকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে

সাধারণ বক্স ক্যামেরাগুলিতে এই সুবিধা নাই। এই ক্যামেরাগুলি স্পষ্টতা বা 'ফোকাস' অসীম দূরত্বে বাঁধা। তাই ছয় ফিটের বাহিরের সব কিছুই ইহাতে স্পষ্ট হয়। অবশ্য যদি 'ক্লোজ- আপ লেন্স' ব্যবহার করিয়া চার-পাঁচ ফিটের মধ্যে বক্স ক্যামেরায় প্রতিকৃতির আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় তবে দূরের পটভূমি অস্পষ্ট হইবে। ৪নং আলোকচিত্রে যথাসম্ভব বড় 'লেন্সছিদ্রপথ' ব্যবহার করিয়া পটভূমি অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে।

মোট কথা, একই সঙ্গে যেমন দুইটি গল্প বলায় সফল হওয়া যায় না, তেমনি একই সঙ্গে প্রতিকৃতি ও তাহার পটভূমির খুঁটিনাটি সমান স্পষ্ট-ভাবে দেখাইয়া সুন্দর প্রতিকৃতির আলোকচিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়।

রচনাটির সঙ্গে মুদ্রিত আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

জীব দিয়েছেন যিনি

খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী

যিনি জীবন দিয়েছেন, তিনিই আহার-বিহারে সংস্থান করে দেন—অন্তত মনুষ্যেতর প্রাণীর বেলায় এ কথাটা খাটে ঠিকই। তবে, যত গোলমাল করে মানুষ।

মহাভারতে আছে যে, ব্যাঘ্র বনের ও বন ব্যাঘ্রের অর্থাৎ উভয়ে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। বন ধ্বংস হলে ব্যাঘ্র ধ্বংস হয়। মানুষ বন কেটে, তৃণভোজী প্রাণী মেরে বন উজাড় করে; ফলে, হিংস্র প্রাণীরা জনপদ অভিমুখী হয়ে পড়ে এবং বন কাটার ফলে আশ্রয়হীন হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়।

বিগত ১৫০ বছর ধরে প্রায় ২৫০ রকম বন্য পশুপক্ষী পৃথিবীর বুক

যুক্তরাষ্ট্রের কেশবিহীন ঈগলপাখী

থেকে মুছে গেছে। এখনও পৃথিবীর প্রায় এক হাজার প্রাণী বিপদের মুখে।

অবশ্য, আবার মানুষই প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রাণী রক্ষার জন্য। দেশে দেশে পৃথকভাবে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ লুপ্তপ্রায় প্রাণিকুলকে ধ্বংসের হাত থেকে পুনরুজ্জীবনের পথে নিয়ে আসবার প্রয়াস পাচ্ছে বৈ কি। এর জন্য আমেরিকায় ১৯৬১ সালে 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—১৯৬৮ সালে এদের বাজেট ছিল ১,৩৮৮,০০০ ডলার। এ প্রচেষ্টার সঙ্গে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালী, হল্যাণ্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিল যুক্ত আছে বর্তমানে।

এঁরা পৃথিবীর সকল দেশকে প্রাণী-সংরক্ষণ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু উপযুক্ত স্থানে অভয়ারণ্য স্থাপনের অর্থও দিয়ে থাকেন। আজ পর্যন্ত এঁরা এ রকম ২০০,০০০ একরব্যাপী নয়টি স্থানের ব্যবস্থা করেছেন—উত্তর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, কলম্বিয়া, মধ্য আমেরিকা, আইসল্যাণ্ড এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সেচেলিস দ্বীপে। স্পেনে অবস্থিত ২৬ বর্গমাইলব্যাপী 'কোটো ডোনা' অভয়ারণ্য ইউরোপের সর্বপ্রধান অভয়ারণ্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

অস্ট্রিয়া এবং আয়ারল্যাণ্ড-এ জলবিহারী পক্ষিকুলের আশ্রয়স্থল তৈরী হচ্ছে এবং ট্যানজানিয়ায় বন্যপ্রাণীদের উপযুক্ত পরিমাণ জল সরবরাহ করবার কথাও ভাবা হচ্ছে।

আফ্রিকা এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় অন্তত ১৩টি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী রক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

এদের তেজের বিরূপ আত্মীয় কয়েকটি প্রাণী মনোযোগের দাবী রাখে—যথা—চিতাবাঘ, বাঘ, ওসেলট, জাগুয়ার, বুনো। এদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে আফ্রিকায়, এশিয়ায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায়। এই হত্যা এত ব্যাপক

বিরলজাতের কুমীর

ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে, জন্মহার তার সঙ্গে পাল্লা রাখতে পারছে না। অর্থাৎ, মানুষের লোভ আজ খোদার ওপর খোদকারী করতে চলেছে।

এই সংস্থা শ্বেত ভল্লুক, সিংহলী হস্তী, স্পেনের 'রাজকীয়' ঈগল, মালয়ের ওরাং-ওটাং, গণ্ডার, ফ্লোরিডার 'ম্যানাটি' এবং কয়েক ধরণের সীল মাছের সংরক্ষণ করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করছেন। বিশেষ করে সীল মাছকে সেণ্ট লরেন্স নদীর মোহনায় যেভাবে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, তাতে এদের আর বেশীদিন টিঁকে থাকা মুশকিল।

অতীব দুষ্প্রাপ্য দু'টি সিংহশিশু

সামুদ্রিক কচ্ছপেরাও আজ মানুষের লোভের বলি হতে চলেছে নানা কারণে। এদের মাংস সুস্বাদু, এদের তেল প্রসাধন দ্রব্যে অত্যাবশ্যকীয়, এদের চামড়ায় পাশ্চাত্ত্য সুন্দরীদের কোমল পায়ের পাদুকা এবং হাত-ব্যাগ তৈরী হয়। কাজেই এদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমছে।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড-এর তরফ থেকে কচ্ছপের বাসা সংরক্ষণ, বহুসংখ্যক ডিম সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে ফুটিয়ে বাচ্চা কচ্ছপদের বড় করে সমুদ্রে ছাড়া, ইত্যাদি নানা কার্যকলাপের মাধ্যমে এদের টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

কুমীর ও এ্যালিগেটরেরাও বিপদগ্রস্ত

—কুমীরের চামড়ার অত্যধিক চাহিদা থাকায় এরা মরছে হাজারে হাজারে। আবার, অতিরিক্ত খরার জন্য জলাশয় শুষ্ক থাকাতেও এরা উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে মরছে।

এককালে আমেরিকার প্রেইরী নামক তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে 'প্রেইরী চিকেন' নামে ছোট্ট পক্ষী বাস করত কোটি কোটি। কিন্তু আজ মানুষের পেটে গিয়েছে এরা বেশীর ভাগ—হিসেব করে দেখা গেছে যে, সমগ্র উত্তর আমেরিকায় বর্তমানে মোটে এক হাজারের মত প্রেইরী চিকেন কোন-রকমে টিঁকে আছে। ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড তাঁদের টাকায় ৩,৪০০ একর জমি কিনেছেন টেক্সাস অঞ্চলে এই পাখীদের জন্য অভয়ারণ্য স্থাপন করতে। ১৯৬৩ সালে এই অঞ্চলে ছিল মোটে ৩০টি প্রেইরী-চিকেন,—১৯৬৯ সালে এরা বেড়ে ৩৫০টি হয়েছে।

এই টেক্সাস অঞ্চলেই এঁরা আরও ১,৪০০ একর জমি কিনেছেন সাদা-

অবলুপ্তপ্রায় সামুদ্রিক কূর্মের এক প্রতিনিধি

পালকযুক্ত সুন্দর জাতের ঘুঘুর সংরক্ষণার্থে। এখানে আশ্রয় পেয়েছে অন্তত একলাখ ঘুঘু।

উত্তর আমেরিকার প্রতীক সোনালী ঈগলও নিষ্ঠুর শিকারীর কবলে পড়ে লুপ্ত হতে চলেছে বলে অনেকের বিশ্বাস। জাপানে ঝুঁটিওয়ালা আইবিস পাখীকে রক্ষা করবার জন্য সরকার এবং ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড যুক্তভাবে চেষ্টা করছেন।

আমাজন নদী অঞ্চল থেকে প্রতি বৎসর তিন লক্ষেরও বেশী বন্যপ্রাণীর চামড়া রপ্তানী হয়ে থাকে। এইভাবে হত্যালীলা চলতে থাকলে আরো অসংখ্য প্রাণী জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে।

আফ্রিকার উপকূলস্থ মাদাগাস্কার দ্বীপে 'আই-আই' বলে এক বৃক্ষবাসী বিড়াল জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে—বর্তমানে এরা বিলুপ্তপ্রায়। এই সংস্থা অবশিষ্ট 'আই-আই'-দের ধরে জনশূন্য নোসী মাংগাবে দ্বীপে পাঠাবার চেষ্টা করছেন, যেখানে এরা নির্বিবাদে বংশবৃদ্ধি করবার সুযোগ পাবে।

বহু বিচিত্র এই ধরণী। এখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীরও বিধিনির্দিষ্ট স্থান আছে। এ-কথাটা ভুললে মানুষেরই ক্ষতি।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মডেলটি তৈরী করেন ভাস্কর শিল্পী বাসুদেব পাল
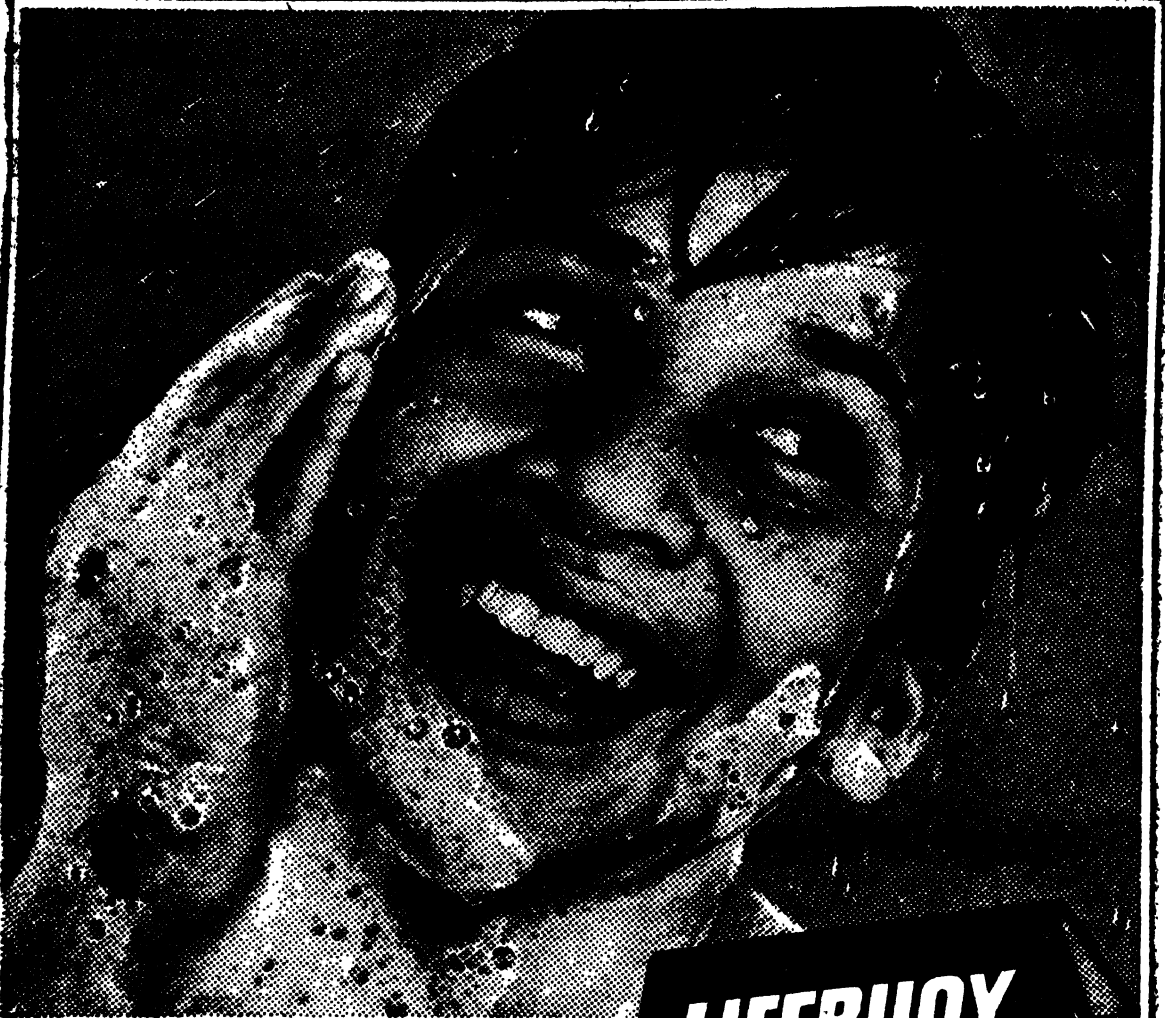
লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু
গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে !

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

ক্লিনটাস-L 52-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ভাইবোন
—চিত্রজিৎ ঘোষ

মাসিক

বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / ১৩৭৬

শুক্তি থেকে মুক্তি
—কাজল দেব

কাগজের নৌকা
—নারায়ণ হালদার

জলক্রীড়া
—বিশ্বনাথ গোস্বামী

তীর্থের পথে
—এম আর দত্ত

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন। ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে—

সম্পাদক, মাসিক বসুমতী
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

ডেলী প্যাসেঞ্জার
[illegible] বাগচী

রূপকার
—আশুতোষ সিংহ

মহামানব শঙ্করাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শঙ্কর-মতের উৎকর্ষ এই যে, এখানে বিবাদ নাই। অন্য মতে কখনও উপাস্য লইয়া, কখনও ভাব লইয়া, কখনও সাধন লইয়া বিবাদ হয় দেখা যায়। কখনও সর্ব বিষয়ে বিবাদ লাগিয়া আছে, দ্বৈত সত্য হইলে বিবাদ অনিবার্য, জীব ব্রহ্মে ভেদ থাকিলে বিবাদ থাকিবে, বিবাদে দুঃখ অনিবার্য, সুখের পরাকাষ্ঠায়ও দুঃখ যায় না যেমন রাধার, তিনি বিরহে বিষ খাইতে, অগ্নিতে প্রবেশ করিতে, জলে ঝাঁপ দিতে কুণ্ঠিত নন। নিত্য লীলাতে নিত্য দুঃখ বিদ্যমান, অদ্বৈতে এ-বিড়ম্বনা নাই, মিলন বিরহাত্মক অশান্ত সুখ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আপেক্ষিক সুখের চরম হইলেও নিরপেক্ষ চরম সুখ হয় না, দ্বৈত পথের সাধকদেরও ভগবান শেষে আপন স্বরূপে মিশান, দ্বৈতমতে শঙ্করের স্থান নাই। কিন্তু অদ্বৈতমতে দ্বৈতের স্থান আছে এই সমস্ত বিবেচনা করিলে শঙ্করের মত যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্বল্প আয়ুষ্কাল সত্ত্বেও শঙ্কর যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত, যে ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব, যে বীজ রোপণ করিয়াছেন তাহার ফল সুদূরপ্রসারী, বৈদিক ধর্মের প্রচারকল্পে দেশময় পর্যটন, সন্ন্যাসী সংঘ গঠন, তীর্থের লুপ্তগৌরব উদ্ধার, মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্য রচনা এবং অন্যান্য বহু প্রকরণ গ্রন্থ প্রণয়নাদির বিষয় বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছান বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, শঙ্কর মহামানব, ধর্মের মূর্ত-প্রতীক, উচ্চ দার্শনিকতার সুদৃঢ় স্তম্ভ, মানব জাতির মহত্ত্বের সমষ্টি স্বরূপ, তাঁহার জনপ্রিয়তা, আত্মবিশ্বাস, গুরুভক্তি, ভগবৎপ্রেম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সত্যনিষ্ঠা, দীনে দয়া, বৈরাগ্য, কর্তব্যবোধ, দূরদৃষ্টি, শিষ্যের প্রতি অগাধ স্নেহ সবই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক।

মাত্র বত্রিশ বৎসরের মধ্যে তিনি উত্তর-সাধকদের জন্য যে আধ্যাত্মিক চিন্তার খোরাক রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা

স্বামী তত্ত্বানন্দ

মিলে না, তাঁহার মত প্রতিভা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ মহান ব্যক্তির খবর ইতিহাসে মিলে না। কল্যাণমার্গের এই অগ্রদূত ভারতকে একাত্ম সূত্রে বাঁধিয়াছেন, প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই বিশ্বমনা, তিনি দেখাইয়াছেন এই জীবন অতি জীবনের আভাস, গভীর জীবনোপলব্ধিতেই সত্যের রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়, সাধনার উদ্দেশ্য সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া বিশ্বপ্রেমের উদার অঙ্গনে উত্তরণ, আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিশ্বকেন্দ্রিকতাতে রূপদান।

দেশ-কালের পরিধি মুক্ত হইয়া সর্ব যুগের, সর্ব মানবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করা তাঁহার প্রতিভার ধর্ম, তিনিই সমন্বয়ের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক, ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের দল নাই, সম্প্রদায় নাই, দেশ নাই—তাঁহার পক্ষে স্বদেশ ভুবন-ত্রয়ম্।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে দুগ্ধবতী গাভীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, দোহনের সময় গাভী মাঝে মাঝে লাথি মারে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচুর দুগ্ধ দান করে, ধর্ম অনুভূতির জিনিষ, স্বাধীন সত্তাই ইহার স্বরূপ, আত্মার ছন্দোময় গীতি ভবরোগের ওষধি-স্বরূপ, ধর্ম অশান্তির প্রতিষেধক, শান্তির অগ্রদূত, স্বাধীন সত্তার অনুভূতিই মানুষের লক্ষ্য বন্ধনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিনাশকে আমন্ত্রণ করা নয়, জগতে বহু সমস্যা বিদ্যমান, উহাদের সমাধান করুন, ধর্মের সমস্যা যেমন জটিল সমাধানও তেমন দুরূহ, উহা বিদ্বানদের ধাঁধায় ফেলে এবং অশেষ দুঃখ দেয়, ধর্মের সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে, স্থানে স্থানে বিরোধী ভাব প্রবল আকার ধারণ করিয়া এত অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

পৃথিবীতে ধর্মের জন্য যত মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে অন্য কিছুর জন্য তত হয় নাই, ইতিহাস তাহার সাক্ষী, এইজন্য অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, যাহা এত অনিষ্টকারী তাহা অনুষ্ঠানের চেয়ে বর্জনই শ্রেয় ইহা আংশিক সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নয়, কারণ ধর্ম যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু উপকারও যাহা করিয়াছে, অন্য কিছুতেই তাহা সম্ভব হইত না, ধর্মবোধ না থাকিলে সমাজে নীতি, সত্য, ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানের প্রসার হইত না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কল্পনার বিষয় হইত, সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবন ব্যর্থ হইত, শান্তিলাভ অসম্ভব হইত, সুতরাং ধর্মকে হেয় করা বাঞ্ছনীয় নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রে যে দুর্নীতি দেখা

...ের ধর্ম তাহার জন্য দায়ী নয় বরং বলা যায় যে, নীতিবোধের অভাব এবং ধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণাই কারণ, ধর্ম কারণ নয় অজ্ঞতাই কারণ, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ ধর্ম সম্বন্ধে বহু মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐগুলিকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিলে পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, বিরোধের কারণ দূরীভূত হয়, সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব হয়, সমাজের প্রত্যেক স্তরে স্তরে শান্তি আসে।

ঋষিগণ যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা ধর্মতত্ত্ব, বেদান্তের প্রতিপাদ্য, উহার মূল কথা অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, উহা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জাতিবিশেষের জন্য নয়, উহা সর্বদেশের সর্বজাতির পক্ষে কল্যাণজনক, উহা নেতিবাচক নয়, অন্ধ বিশ্বাসের উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়, উহা সম্পূর্ণ ইতিবাচক, পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সত্য ত্রিকাল অবাধিত, অনুভূতিই ইহার প্রধান ভিত্তি, ইহার ভিত্ত এত দৃঢ় যে কখনও বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

এই বেদান্তের ধর্মই দৈন্য-পীড়িত জগৎকে আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষী মোক্ষমূলার বলেন, 'বেদান্ত দর্শন প্রত্যেক মানুষের নশ্বর জীবনে শান্তি আনয়নে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, শান্তি লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছে, মানুষের মধ্যে গভীর কর্তব্য বোধ জন্মাইয়াছে এবং এই বোধ এত গভীর যে উহার ত্রুটি অমার্জনীয় বলিয়া ধারণা জন্মাইয়াছে।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক উচ্চ জিনিষ দিয়াছে, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে সর্বশক্তিমান মহান্ দেবতা বিদ্যমান তাঁহার সন্ধান দিয়াছে এবং এই দেবতার আরাধনায় যে দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ সম্ভব হয় তাহার উপায় স্থির করিয়া দিয়াছে, বেদান্তে সব ধর্মের স্থান আছে। সর্ব ধর্মই বেদান্তের অন্তর্গত।

শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তে উহার বিশেষ জোর দেন, সর্বভূতে আত্মদর্শন, আত্মায় একত্বের অনুভূতি, আত্মার সর্বভূতের অনুভূতি, প্রজ্ঞার মধ্যে ব্রহ্মে পরিণতি ইহার প্রধান তত্ত্ব, পৃথিবীতে যত তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে আত্মতত্ত্ব আবিষ্কার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং উহাই ভারতীয় ঋষির প্রধান কৃতিত্ব, জীব এবং ব্রহ্মের অভেদতত্ত্ব প্রতিপাদনই উহার লক্ষ্য, অন্যান্য কেহ কেহ জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মাণ্ডের একজন নিয়ন্তা আছেন, তিনি ইহাকে স্বাভিধর্ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

নীতি মানুষের ধর্ম, সমাজ এই নীতি অনুযায়ী চলে। বেদান্ত বলে প্রত্যেক আত্মাই স্বরূপত দেবভাবাপন্ন, যাহা আমরা ভাল কিম্বা মন্দ বলি প্রকৃতপক্ষে উহা নাই, উহা ভ্রান্তি মাত্র, উহার মধ্যে ভেদ যাহা দেখা যায় তাহা পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। শুধু তাই নয়, সবলতা ও দুর্বলতার মধ্যে, ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে, স্বর্গ ও নরকের মধ্যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহাও প্রকারগত নহে, পরিমাণগত, সকলই এক সত্তার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, মানুষ কখনও প্রকৃতির দাস নয়, কখনও ছিল না ভবিষ্যতেও হইবে না। যাহাকে প্রকৃতি বলা হয় তাহা সেই সিন্ধুর বিন্দুমাত্র।

ব্রহ্ম তথা আত্মা সেই সিন্ধু। আত্মা স্বাধীন। সত্তা, চেতনা এবং আনন্দ তাঁহার স্বভাব, গুণ নয়, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি সেখানে যাইতে পারে না, সেই অতীন্দ্রিয় সত্ত্বাই ভগবান আখ্যাপ্রাপ্ত হন, তাঁহার অনুভূতিই ব্রহ্মের একত্ব অনুভূতি, তাহা চিন্তার অতীত, অতি জীবন, জীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশ হয় মাত্র, এই শাশ্বত, অবিনাশী, পরিণাম ধর্মরহিত আত্মাকে লাভ করিয়াই মানুষ বলিতে পারে 'জীবন, মৃত্যু প্রকৃতির অন্তর্গত আমি জীবন মৃত্যুর পারে, আমি এই সকলের ঊর্ধ্বে, আমাতে জীবন নাই, মৃত্যু নাই।'

ইংরাজ কবি শেলী বলেন, 'একমাত্র সেই সত্তা বিদ্যমান, বহু বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এক। বহুত্ব পরিবর্তনশীল, একত্ব স্থির।'

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন, 'প্রকৃতির মধ্যে যাহা দেখা যায় তাহা সামান্য, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সত্তা বিদ্যমান, বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই ভগবান হইতে আমাদের উৎপত্তি, ভগবানেই গতি এবং ভগবানেই স্থিতি, তিনিই আপন হইতেও আপন, তাঁহার চেয়ে নিকট আত্মীয় আর কেহ হইতে পারে না।

এক বিবেকানন্দ বলেন, 'সসীম দৃশ্যমান, প্রকৃতপক্ষে অসীমই বিদ্যমান।'

যে সকল সমস্যা পৃথিবীবিখ্যাত মনীষীদেরও ভাবাইয়া ফেলিয়াছে শঙ্কর সেগুলির সুন্দর সমাধান দিয়াছেন, তিনি কোথাও মনগড়া কথা বলেন নাই, শ্রুতি, স্মৃতি, অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়াই ঐগুলির মীমাংসা করিয়াছেন। উহাতে অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি হয়।

শঙ্কর ভাষ্যের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী থিবট বলেন, অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়া সমস্ত উপনিষদকে একটা নির্বিরোধ অথচ সামঞ্জস্যপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করা এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছান প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ব্যাপার বলিলেই চলে কিন্তু কোন মহৎ ব্যক্তি যদি তাহা করিতে সমর্থ হন তবে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন সন্দেহ নাই, দেখা যায় শঙ্করই একমাত্র তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া যত মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে তাহার মধ্যে শঙ্করের মতবাদই শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ববাদিসম্মত, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

পাশ্চাত্য মনীষী গাফ্ শঙ্করের দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, শঙ্করের সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক এবং সুদৃঢ় যুক্তিপূর্ণ। একমাত্র তাঁহার মতবাদই অকাট্য যুক্তি দ্বারা সকল বাধক নিরস্ত

অবতারের আবশ্যকতা বিশ্বাস করিয়া অভ্যুদয় সাধন করিতে পারে। অদ্বৈতবাদী হইয়াও তিনি দ্বৈত কিম্বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের সাধন প্রণালীকে কখনও হেয় করেন নাই। তাঁহাদের সাধন প্রণালী যে জ্ঞান ও ভক্তি লাভের উপযোগী তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। শিব, বিষ্ণু, শক্তি এবং অন্যান্য দেব-দেবীর স্তোত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, সমাজ এবং ধর্মের কুসংস্কার দূর করিয়াছেন, শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি এবং অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া ধর্মকে নূতন ভাবে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। তিনি দার্শনিক, কবি, সংস্কারক এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অগ্রদূত।

শঙ্কর সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে, মায়াবাদী বলিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করা হইয়াছে, বৌদ্ধদের মতবাদ খণ্ডন করিলেও তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাঁহার মতবাদ সম্যক্ আলোচনা করিলে সমালোচকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা বৌদ্ধদের মায়াবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শঙ্করের মতবাদকে মায়াবাদ আখ্যা না দিয়া ব্রহ্মবাদ আখ্যা দিলে সমীচীন হয়, শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়, বাসনার জন্য সংসার, বাসনা হইতে জগতের ধারণা, সংসার কাঁচের রুদ্রাক্ষের মালার মত, দেখিতে রুদ্রাক্ষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাঁচ, সত্য এবং মিথ্যাকে একত্র মিশাইয়া জগতের রূপ দেওয়া হইয়াছে, ইহাকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যন্ত্রস্থ চাকার মধ্যে হাত দিলে যেমন উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় অশেষ যন্ত্রণার অনুভব হয়, সংসারের চক্রে প্রবেশ করিলেও সেরূপ জীব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বিস্তর দুঃখ ভোগ করে।

সংসার বিষধর সর্পের গর্তবিশেষ, উহাতে হাত দিলে মানুষ তাহার দংশনে ঢলিয়া পড়ে, অধিকাংশ সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সংসার-গর্তে একবার পড়িলে আর রক্ষা থাকে না, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া জীব অশেষ দুঃখ ভোগ করে।

কেন এরূপ হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া মনীষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অধ্যাসের ফলেই এরূপ হয় যেটা যাহা নয় অথচ সেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা তৎ বুদ্ধি করাই অধ্যাস, জগৎ সত্য নয় তথাপি তাহাকে সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিলে তাহার ফাঁদে অবশ্যই পড়িতে হয়। শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার পারমার্থিক সত্তা স্বীকার না করিলেও ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন, শশের শৃঙ্গ দেখা যায় না, উহা মিথ্যা, বন্ধ্যার পুত্র হয় না, হইলে বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়া যায়, সুতরাং উহা মিথ্যা, রজতে শুক্তি নাই, উহা মিথ্যা, রজ্জুতে সর্প নাই উহা মিথ্যা, রজ্জুকে সর্পের ন্যায় দেখাইলে এবং তজ্জনিত ভীতির উৎপাদন হইলেও রজ্জুতে সর্প নাই, কখনও ছিল না। ভ্রান্তিবশতঃ সর্প বলিয়া মনে হয়। ভ্রান্তি দূর হইলে রজ্জু রজ্জুই দেখা যাইবে এবং সর্পভয় বিদূরিত হইবে। সেরূপ জগৎকে যে সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা অজ্ঞানের জন্যই হইয়া থাকে। অজ্ঞান দূর হইলে জগৎ থাকে না। যতদিন না মুক্তিলাভ হয় ততদিন পর্যন্ত অজ্ঞানের প্রভাব থাকিবে, অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে মোক্ষ, অমৃতত্ব, জগতের জ্ঞান আছে অথচ অস্তিত্ব নাই এই আপত্তি উত্থাপিত হইলেও উহা টিকিতে পারে না, অধ্যাসের ফলে এরূপ প্রতিভাত হয়। যাহার উপর অধ্যস্ত হইয়াছে তাহা সত্য, ব্রহ্ম কিভাবে অধ্যস্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, যে শক্তির দ্বারা অধ্যস্ত হইয়াছে তাহাই মায়া, কেন হয়, কিভাবে হয় তাহা জানা যায় না। তাহা অনির্বচনীয়, মায়ার আবরণ শক্তি এবং বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে জীব আপনার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না, একজন বিখ্যাত মনীষী বলেন, পরমপুরুষ নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য সৃষ্টি করেন।

আমি বলি নিজেকে সর্বপ্রকারে গোপন রাখিবার জন্যই তিনি সৃষ্টি করেন।

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য সর্বশক্তিমান, পূর্ণ, স্বয়ং প্রকাশবান্, স্বাধীন অদ্বিতীয় সর্বগুণসমন্বিত আবার, সর্বগুণবিবর্জিত, সগুণ আবার নির্গুণ, সবিশেষ, নির্বিশেষ জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ উভয়ই। সৎ চিৎ আনন্দ, স্বরূপ, সত্য জ্ঞান, অনন্ত, স্বরূপ সত্ত্ব রজঃ-তম গুণ সমন্বিত আবার ত্রিগুণ রহিত, দেশকালের অতীত, ভাষায় অপ্রকাশ্য, স্থূল সূক্ষ্মাদি গুণবর্জিত, আদিতে মধ্যে অন্তে সর্বত্র বিরাজমান, জগতের মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান, আবার জগৎ না থাকিলেও তিনি থাকিতে পারেন। তিনিই মুক্তি, তাঁহাকে লাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য, চৈতন্যকে জীবনে প্রতিফলিত করাই বেদান্তের লক্ষ্য, শঙ্কর বেদান্তের এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন।

শঙ্কর কর্মবাদ মানেন, শুভকর্মের শুভফল অশুভ কর্মের অশুভ, কর্ম সুখ-দুঃখের কারণ হইলেও মুক্তি দিতে পারে না, শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম দ্বারা দেহমন বিশুদ্ধ হইলে জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। ভারতীয় কর্মবাদের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিখ্যাত বেলজিয়ান মনীষী মেটারলিঙ্ক বলেন যে, জগতের মধ্যে ঘোর অন্যায়ের অবিচার বিদ্যমান, তাহার যুক্তিসংগত কারণ একমাত্র বেদান্তেই পাওয়া যায়।

শমদমাদি অভ্যাসের ফলে মন বিশুদ্ধ হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়। এই অবস্থা জ্ঞান ও ভক্তির ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলনক্ষেত্র। ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এই অবস্থায় ভাব ও তত্ত্ব, কবিত্ব ও দর্শনে বন্ধুত্ব হয়, ইহাই প্রকৃত সমন্বয় ভাব, বেদান্ত যে ধর্মের কথা বলে এবং শঙ্কর যাহা প্রচার করেন তাহা

—এ ধর্ম। এই শঙ্কর ধর্ম সম্বন্ধে যত দার্শনিক আলোচনা হইয়াছে, ততই ইহার অধিক সত্তা প্রকাশও পাইয়াছে। ভারতীয় কল্পবৃক্ষের ছায়ায় যিনি আশ্রয় নেন, তাঁহার কল্যাণ হইবে।

শঙ্করের মতে মতবাদ শুধু দার্শনিক মতবাদ মাত্র নয়, পৃথিবীতে যত ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে সবই [illegible] অন্তর্গত, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুদ্ধ যাহা নিজে অনুভব করিয়া প্রচার করিয়াছেন, যীশু যাহা দেখাইয়াছেন, মহম্মদ, জোরাথুস্ট্র, কনফুসিয়াস শিক্ষা দিয়াছেন, সমস্ত একসঙ্গে গ্রথিত করিলে যাহা হয়, তাহা শঙ্কর বেদান্তে অতি [illegible] ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার অনুভূতিতে মানুষ নির্ভীক হয়, নিজে-ভয় মুক্ত হয়, তাঁহার দর্শনে ব্যক্তির চেয়ে বস্তুোপলব্ধির গুরুত্ব অধিক, তাই তাঁহার ব্যক্তিত্বে জগতের সকল উন্নত চিন্তাধারা প্রকাশ পাইয়াছে।

॥ ক্রমশঃ ॥

এডগার ওয়ালেস

অজ্ঞাত পরিচয় পিতার সন্তান এড্গার ওয়ালেস-এর জীবনীও রহস্য রোমাঞ্চময়।

জন্ম-অভিনেত্রী মেরী রিচার্ডস এর গর্ভে, পিতৃ-পরিচয় বোধ হয় সেও জানত না। জন্মের কয়েকদিন পরেই শ্রীমতী ফ্রীম্যান নামক ধাত্রীর কাছে গচ্ছিত হয়েছিল এড্গার। শ্রীফ্রীম্যান কিছু লেখা পড়া জানতেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় বাইবেল ও অন্যান্য বই পড়ে শোনাতেন পরিবারবর্গকে।

এই পরিবেশে এবং কঠোর দারিদ্রের মধ্যে এড্গারের শৈশব ও কৈশোর কাটল। রবারের কারখানায়, দুধ বিক্রয় করে, খবরের কাগজ বেচে কিশোর এড্গার কিছু রোজগার করত। লাড্গেট্ সারকাস নামক স্থানে, যেখানে দাঁড়িয়ে কিশোর এড্গার কাগজ বেচত, সেখানে আজ তার নামে স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়েছে।

১৮৯৯ সালে এড্গার সেনা দলে নাম লিখিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে যায়। এখানেই তার লিখিয়ে জীবনের আরম্ভ, খবরের কাগজের রিপোর্টারী করে এবং 'কেপ্ টাইমস্' নামে কাগজে কবিতা লিখে। 'রয়টার' এর যুদ্ধ রিপোর্টারীও করল কয়েকদিন।

বুয়র যুদ্ধ সম্বন্ধে তার কিছু কিছু রিপোর্ট আজও আছে এবং ভাষার উৎকর্ষে ও বর্ণনা মাধুর্যে সাংবাদিকদের আদর্শ স্বরূপ গণিত হয়।

যুদ্ধ শেষে এড্গারকে "র‍্যাণ্ড ডেইলি মেল" নামক কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। মাইনে, বছরে দু' হাজার পাউণ্ড। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মালিকের সাথে কলহ করে সে কাজ ছেড়ে দেয়। তার প্রথম স্ত্রী আইভিকে নিয়ে সে ইংলাণ্ডে ফিরে আসে, এবং বহু চেষ্টার পর 'ডেইলি মেল' পত্রিকায় সপ্তাহে পনের পাউণ্ড মাইনেতে চাকরী পায়।

এ চাকরীও তার অল্পদিনের মধ্যেই যায়।

শ্রীমতী ইসাবেল থর্ণ ছিলেন 'ইয়েস্ এ্যাণ্ড নো' নামক রহস্য রোমাঞ্চ বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদিকা। তাঁর কাছে একদিন এসে হাজির হল এড্গার, কয়েকটি ছোট গল্প নিয়ে। আলোচনা প্রসঙ্গে এড্গার তার আফ্রিকার অভিজ্ঞতা কিছু কিছু বলতেই শ্রীমতী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য! আরে ছোকরা তুমি এই সব নিয়ে লেখ না কেন! বড়লোক হয়ে যাবে।

এইভাবেই সৃষ্টি হল 'স্যাণ্ডার্স্ অফ্ দি রিভার', 'পিপল্ অফ্ দি রিভার'', ইত্যাদি আফ্রিকা সম্বন্ধীয় অজস্র অনবদ্য রচনা, যা আজও সমান জনপ্রিয়। আফ্রিকা সম্পর্কে এর আগে এমন নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনী ইংরাজীতে লেখা হয় নি। এড্গার রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠল।

এড্গার ওয়ালেস-এর রহস্য রোমাঞ্চ বিষয়ক কাহিনীগুলি এত পরিচিত যে আলাদা করে তার পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই।

১৯৩১ সালে এড্গার ওয়ালেসের জীবনান্ত হয়।

তামিলনাদের পথে পথে

অন্নদাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

পূজোর ছুটিতে দিন পনেরর জন্য মাদ্রাজে এক আত্মীয়ের বাড়ী ঘুরে আসবো এই মনে করে বেরিয়েছিলাম। কাগজে পড়েছি এদেশে চালের অভাব নেই। অভাব নেই বাংলা দেশের মত সব জিনিষেরই। লোটা-কম্বল নিয়ে যখন বেরিয়েছিলাম ভাবিনি কোন সঙ্গী পাবো, কিন্তু রেলগাড়ীতে উঠে দেখি আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক আশীষ তাঁর অনার্স-এর ছাত্রদের নিয়ে এডুকেশনাল টুরে যাচ্ছে।

বন্ধুবর বললেন, 'তুমি কোথায়?'

'দশ-বারোটা দিন শান্তিতে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি কোণ্ডাম্বাকামে'—বললাম আমি।

বন্ধু বললেন, 'আমরাও যাচ্ছি তামিল দেশে—আর এতদূর যখন একসঙ্গে যাচ্ছি, তখন তোমায় ছাড়ছি না' চল আমাদেরই সঙ্গে।

তা কি করে হয়, আমি যাচ্ছি নির্ঝঞ্ঝাটে, ক'টা দিন বিশ্রাম করতে। এদের ব্যাপার—আজ এখানে, কাল সেখানে দৌড়-দৌড় করে বেড়াবে। এদের সঙ্গে ড্যাং-ড্যাং করে আমি যে ঘুরে বেড়াবো সে বয়স এবং শক্তি কোনটাই নেই। কাজেই আমি জানাবাম আমার অক্ষমতা।

কিন্তু অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রেরাও এমন শুরু করলো যে শেষ পর্যন্ত রাজী না হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। তাছাড়া ছেলে-গুলিকেও আমার একটু অন্যরকম লাগল। কোলকাতার রাস্তায় একদল ছাত্রকে আমরা যে অবস্থায় দেখে থাকি, এরা যেন তাদের থেকে একটু অন্য-রকম। এদের কথাবার্তা ব্যবহার একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সভ্যতা এবং শালীনতা কখনো ভঙ্গ করেনি।

অধ্যাপকের বন্ধু হিসাবে আমিও ওদের 'স্যার' হয়ে গেলাম। কেমন যেন—বেশ ভালই লাগলো। ট্রেনে আমায় কিছুই করতে দিল না, না দিল বিছানা করতে, না দিল খাবার কিনতে। রাত্রে নিজেদের খাবার থেকেই আলাদা করে অধ্যাপক আর আমাকে ভাগ করে দিল। আমার কোন বারণই ওরা শুনলো না।

বুঝলাম, কোণ্ডামবাকামে আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়ার ইতি হয়ে গেল। ক'টা দিনের জন্যে বিশ্রাম করতে এসে একি ফাসাদে পড়লাম। ট্রেনে তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাওয়া শেষ করে অধ্যাপক আর আমি পাশাপাশি শুয়ে তামিলনাদে ওদের সময়-সূচী দেখলাম।

মাদ্রাজে ওরা একদিন থেকে মহাবলীপুরম্-এ যাবে, পরদিন সকালে জেঞ্জি ফিচ্ ও সন্ধ্যাবেলা রামেশ্বরম্ যাত্রা। পরদিন সকালে পম্বন্ জংশনে নেমে একদিন সমুদ্র সৈকতে থেকে তার পরদিন রামেশ্বরম্ মন্দির ও সমুদ্র উপকূলে থাকা।

রাত ২-১০ মিঃ রামেশ্বরম্ থেকে রামনাথপুরম্ যাত্রা। সেখানে ভোর পাঁচটায় পৌঁছে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সেখান থেকে সকাল চটায় এক্সপ্রেস বাসে চড়ে কন্যা-কুমারিকা রওনা।

পরদিন সেখান থেকে তারপর মাদুরা হয়ে আবার মাদ্রাজ প্রত্যাবর্তন, সেখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে কোলকাতা রওনা। ছেলেদের পরীক্ষার ব্যাপার কাজেই সমুদ্র তীরেই কাজ বেশী এ-কথাটাও অধ্যাপক শুনিয়ে দিলেন। এদিকে ওঁদের সময়সূচী শুনেই আমার অবস্থা কাহিল। খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ততক্ষণে বন্ধুবর চোখ বুজে নিদ্রার আরাধনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বুঝলাম বুড়ো বয়সে হাড়গোড়গুলো দ্রাবিড় দেশেই জমা রেখে যেতে হবে যে দেশে যাচ্ছি এমনেই তো নিরামিষ। আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে যে দু দিন আরাম করে মাছ-মাংস খাবো তা' আর এদের জ্বালায় কপালে জুটবে না দেখছি। যাই হোক ভাবতে ভাবতে ঘুমোলাম। এখনো দু' রাত আর একটা পুরো দিন কাটিয়ে তবে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছাবো।

ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছলাম। প্রথমেই মাদ্রাজ শহর না দেখে মহাবলীপুরম্ যাত্রার ব্যবস্থা করা হোল। কারণ পরদিন সারাদিন শহর দেখার জন্য স্থির হোল। স্টেশনের বিশ্রাম ঘরে একদিনের জন্য থাকার ব্যবস্থাও করা হোল। ইডলি, বড়া আর কফি সহযোগে প্রাতরাশ সেরে বুডওয়ে থেকে মহাবলীপুরমের বাসে চড়ে বসলাম।

মাদ্রাজ থেকে ৪৩ মাইল দূরে এই অঞ্চলটি সমুদ্র তীরে অবস্থিত। বাসে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগে। এই সমুদ্র সৈকতে অপূর্ব সুন্দর ঢেউ বিরামহীনভাবে তীরের বুকে আছড়ে পড়ছে। কতকগুলো উঁচু উঁচু টিলা সেগুলো দেখে

হচ্ছে বহু আগে তেউ থেকে দূরে ছিল, ক্রমশ সমুদ্রের ভেতর চলে যাচ্ছে।

এখানে সমুদ্র ক্রমশই এগিয়ে আসছে। অধ্যাপক আর ছাত্রেরা হাতে ছোট ছোট টিন আর জাল নিয়ে তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলো আর আমিও ছবি তোলার যন্ত্রটি কাঁধে ফেলে দ্রাবিড় ও বৌদ্ধ শিল্পের অক্ষয় কীর্তিগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বন্ধুবর আবার তাদের সঙ্গে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন, আমি কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দিলাম না। কারণ এদের পাল্লায় পড়লে আমাকেও কিছুটা জীব-বিজ্ঞান শিখিয়ে ছাড়বে, ওসব লেখাপড়ার মধ্যে আমি নেই, বেড়াতে যখন বেরিয়েছি, তখন ভাল করেই দেখবো আর জানবোও।

প্রথমেই চোখে পড়ে সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত একটি সুন্দর মন্দির। অনন্ত জলরাশি প্রতিমুহূর্ত তার পা ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এই মন্দির আজ 'শোর টেম্পল' বা তীর মন্দির নামে পরিচিত। ঠিক যেন সমুদ্র গর্ভ থেকে এ-মন্দির উঠেছে। বোধ হয় এই মন্দির যখন তৈরী করা হয়েছিল সমুদ্র দূরেই ছিল। কিন্তু সমুদ্র বর্তমানে এগিয়ে আসার ফলে আজ ভগ্নপ্রায়। কোন পূজা হয় না। সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ আর বাতাসে পাথরে খোদিত মূর্তিগুলি ক্ষয় হয়ে গেছে। এখন আর সেই সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায় না। সমুদ্র এগিয়ে আসার ফলে কয়েকটা মূর্তি জলের তলায় তলিয়ে গেছে। বহুদিন পর হয়ত এমন দিন আসবে সেদিন এই বিশিষ্ট মন্দিরটি জলের তলায় চলে যাবে। হারিয়ে যাবে এতকালের (প্রায় হাজার বছর পূর্বের) একটি সুন্দর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

এককালে নাকি এই মন্দিরের চূড়া ছিল সোনার পাতে মোড়া। এই মন্দির লাইট হাউসের কাজ করতো। আজ সে সোনার লাইট হাউস নেই। অবশ্য একটি আধুনিক লাইট হাউস একটু তফাতে গড়া হয়েছে। এই মন্দিরকে বিশিষ্ট বলার একমাত্র কারণ এই যে, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি থেকে এর গঠন-প্রণালী পৃথক। এই মন্দিরের চূড়া ক্রমশ সরু হয়ে একটা বিন্দুতে এসে মিলেছে যেমন উত্তর বা পূর্ব ভারতের মন্দিরগুলি। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের চূড়াগুলি কিন্তু এক বিন্দুতে এসে মেশেনি। চূড়া ক্রমশ সরু হয়ে পরে আবার কিছুটা চওড়া হয়ে গেছে (যেমন রামেশ্বরম বা মীনাক্ষী মন্দির)।

সেখানেই কয়েকটা নিরামিষ হোটেল ছিল তার একটায় বসে ভাত, রসম্ সম্বর, ভাজি, পাঁপড় আর দই সহযোগে দুপুরের আহার সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম অন্যদিকে যে দিকে পাহাড় আছে। সে সাতটি রথের জন্য এই অঞ্চলের নাম হয়েছে 'সেভেন পাগোডাস' তার পাঁচটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণরথ, অর্জুনরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ ও ধর্মরাজ রথ। এই রকম পাহাড় কাটা রথ আরও দুটো ছিল তা এখন সমুদ্র গর্ভে। এই রকম পাহাড়ের গা কেটে তৈরী করা হয়েছে অর্জুন তপস্যা। আবার পাহাড়ের গায়ে খোদাই আছে বলিরাজার মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বামন অবতার। সেইজন্য অনেকে বলেন, মহাবলীপুরেই বলিরাজার রাজধানী ছিল আবার অনেকে বলেন, কৌরবেরা যখন পাণ্ডবদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবেরা এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আমরা অবশ্যই ঐ বিতর্কে যেতে চাই না। আজ আর সেই রাজধানীর কোন চিহ্নই নেই। পল্লব রাজাদের সে বন্দরও গেছে ভেঙ্গে। সপ্তম শতাব্দীর সেই কীর্তি দ্রাবিড় স্থাপত্য হিসাবে আজও কিছুটা টিকে আছে। দেখে মনে হয় কিছুটা বৌদ্ধ রীতি অনুসরণ করে এগুলো তৈরী করা হয়েছে।

পাহাড়ের গা খোদাই করে এ-ধরণের শিল্প সত্যিই বিরল। পাথরের গায়ে খোদিত চিত্রগুলির মধ্যে অর্জুনের তপস্যা, সম্রাট মহাবলির রাজসভা, বামন, চিত্রা, হরিণ, বৃদ্ধ, ঋষি, সর্পরাজ নগেন্দ্র এবং হাতীর মূর্তি খোদিত রয়েছে। একটিমাত্র শিলা কেটে এগুলো করা হয়েছে। এছাড়া গোবর্ধনগিরি, মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি চিত্রও দেওয়ালের গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমশ উপরের দিকে উঠলে আরও নতুন দৃশ্য দেখা যায়। তবে প্রায় বেশীর ভাগই অসমাপ্ত।

দেখে মনে হয় কোন একটা প্ল্যান অনুযায়ী কাজ সুরু করা হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে সম্পূর্ণ করা হয়ে ওঠেনি। পাণ্ডবের রথগুলির একটি বাদে অন্য চারটিই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। মনে হয় কোন বিশেষ কারণে সমস্ত কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণভাবে মনে আসতে পারে, হয় কোন ভূমিকম্প, কিংবা সমুদ্রের হঠাৎ আগ্রাসন, হয়তো বা হঠাৎ যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার ফলে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, পাণ্ডবের রথগুলি যে পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে সেগুলির একটি কি দুটি বাদে অন্য সবগুলিই অসম্পূর্ণ। প্রথম চারটি রথ এক লাইনেই আছে, কিন্তু পঞ্চমটির অবস্থিতি একটু দূরে। প্রথম রথটি সম্পূর্ণ আছে তার উচ্চতা ১৬ ফুট, লম্বায় ১১ ফুট, চওড়ায়ও ১১ ফুট। এর ভেতরে কোন মূর্তি নেই। দ্বিতীয়টি প্রথমটির মতই তবে মাপে ১১ X ১১ + ২০ ফুট। তৃতীয়টি ৪২ X ২১ X ২১ ফুট এবং চতুর্থটি ২৭ X ২৫ X ৩৪ এই রথটির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ তবে এর গায়ে একটি বিরাট ফাটল দেখা যায়। মনে হয়, ভূমিকম্পের ফলে এই ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্রভাবে এই শিল্প সৃষ্টি দেখলে মনে হয় বৌদ্ধ ও দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের মিলন কেন এই মহাবলীপুরমেই হয়েছিল।

কোন রাজা এই বিরাট কীর্তির সৃষ্টি করেছিলেন কিংবা কোন শিল্পী কঠোর পরিশ্রম করে এইগুলি ফুটিয়ে

স্থলছিদ্রের মেইলিকের মধ্যে পড়িয়া যেতে চাই না। কিন্তু এগুলো কোথাও আনন্দ বড় হয়, দুঃখও ততই হয়। আনন্দে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই এই কীর্তি দেখে, প্রশংসা করি পঞ্চমুখে, কিন্তু দুঃখ হয় তখনই যখন দেখি কত কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। যদি এগুলোও সম্পূর্ণ হোত, তাহলে এর চেয়ে কত বেশী আনন্দই না পেতাম আমরা।

'কি হে! বাড়ী ফিরতে হবে না কি ?'

হঠাৎ বন্ধুবরের ডাকে চমক ভাঙলো। সত্যিই বেলা পড়ে এসেছে। বাসে উঠে পড়তে না পারলে স্টেশনে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যাবে, সন্ধ্যার বাসে চড়ে মাদ্রাজ ফিরে এলাম। সামনের দিকে বসে ভাবতে লাগলাম কি দেখলাম। শুধু দেখলামই, জানলাম না কিছুই। এদিকে পিছনে ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে কে কত নমুনা যোগাড় করল এই নিয়ে। প্রোটিজোয় ও 'আর্থাপোডা' নিয়ে ঝগড়াও বেধেছে দু' একজনের মধ্যে। বুঝি না কিছুই সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তা দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ পিছনের সিট থেকে আধো মিষ্টি গলায় কবিগুরুর—

'আজ ধানের খেতে'---

গান শুনে অবাক হয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি এক তামিল দম্পতির ৪।৫ বছরের শিশু কন্যা এই গানটি গাইছে। জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না। ভদ্রলোক বললেন—এ-গানের মানে তাঁরা জানেন না, বাংলাও তাঁরা জানেন না ; তবে কবিগুরুর গান তাঁদের ভালো লাগে তাই কন্যাকে শিখিয়েছেন। কিছুদিন আগের কথা মনে পড়লো, কালকাতায় বাসে দুটি ছেলেতে তর্ক বেঁধেছে একটা গান নিয়ে। গানের কথাগুলো কবিগুরুর সেটা বুঝলুম, কিন্তু তর্ক বেঁধেছে ওটা কোন্ সিনেমার গান সেই নিয়ে।

যে সময়ে আমরা মাদ্রাজ গিয়েছিলাম, সেই সময়ে সেখানে হিন্দী বিরোধী আন্দোলন বেশ জোরে চলছে। সমস্ত হিন্দী সিনেমা বন্ধ। কোন হিন্দী পোস্টার রাস্তায় দেখতে পেলাম না। কোথাও এমন কি অনেক স্টেশনে হিন্দী লেখাও নেই। অবশ্য আমাদের কাছে হিন্দীও যা তামিলও তাই। আমরা ইংরাজীতে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ চালিয়ে যেতে লাগলাম। যেখানে ইংরাজী চললো না, সেখানে আকারে ইঙ্গিতে কাজ সারলাম। অসুবিধা কিছুই নেই।

মাদ্রাজ সহরটি বেশ পরিষ্কার। স্থানীয় লোকেদের ব্যবহার অত্যন্ত ভালো। তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত। সকালের দিকে আমরা মেরিনা বিচ-এ গিয়েছিলাম। এই সৈকত পৃথিবীর দু'টি বৃহৎ সৈকতের মধ্যে অন্যতম। এতখানি সোজা লম্বা সৈকত—পৃথিবীতে অতুলনীয়। একটি বিরাট জাহাজ তীরের এত কাছে দেখে অবাক হয়ে স্থানীয় লোককে প্রশ্ন করলাম। কারণ তীরের এত কাছে এত বড় জাহাজ আর দেখিনি।

জানতে পারলাম, গত বৎসরের সামুদ্রিক ঝড়ে এই জাহাজটিকে ঢেউ-এর ধাক্কায় তীরের এত নিকটে নিয়ে এসেছে। এখন আর এটিকে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জাহাজটি ফরাসী সরকারের। তাঁরা এখন ঠিক করেছেন এই জাহাজে একটি ভাসমান রেস্তোরাঁ করবেন। মেরিনা বিচ ভাল হলেও আমার কাছে কিন্তু বেশ অপরিষ্কার লেগেছে। সৈকতে বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়লো এক অপূর্ব ভাস্কর্য। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তৈরী আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি। চার জন শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রমের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি।

সহরের যে সব অঞ্চলে ভীড় বেশী, সেই সব জায়গায় রাস্তা পার হওয়ার জন্য প্রধান রাস্তার নীচ দিয়ে আর একটা পথ আছে, যাতে করে সহজে পার হওয়া যায়। রিক্সাগুলি রাতে ঐ জায়গা রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য রাত্রি ১১টা নাগাদ ঐ রাস্তার গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রধান পথগুলি বেশ চওড়া ও পরিষ্কার, দু-দিকের গাড়ী যাতায়াতে কোন রকম অসুবিধা হয় না।

এই রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা এত ভাল যে, আমরা অবাক হয়ে গেছি। বাসগুলি খুব পরিষ্কার। যতদিন এখানে থেকেছি, একটি বালকে মাথা-বাজায় ঝোলাঝুলি হয়ে পড়ে থাকতে দেখি নি; দেখিনি কোনদিন কাউকে ধাক্কা দিতে বা চাপা দিতে, আর দেখি নি ভাড়া নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হতে—যেগুলো কোলকাতার রাস্তায় হরদম হতে দেখি। সমস্ত বাস ঠিক সময়মত চলে, কাউকে দেরী হতে দেখি নি, কাউকে আগে যেতেও দেখি নি। সবাই ঠিক পর পর চলে যাচ্ছে।

এখানে দেখবার অনেক জিনিষ আছে, তার মধ্যে ম্যায়লাপুরে কপালীশ্বরের মন্দির, মিউজিয়াম পিপলস্ পার্ক এবং মূর মার্কেট অন্যতম। অন্য সব জায়গায় যাওয়ার মত সময় আমাদের হয়ে ওঠেনি। এখানকার মূর মার্কেট আমাদের কোলকাতার নিউ মার্কেট-এর অনুকরণে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিনশো চারশো দোকানের সমাবেশ এখানে। অনেক বিদেশী জিনিষপত্রও পাওয়া যায়।

বাকিংহাম খাল আর কুম্ নদী সহরের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। বেশ কয়েকটা পুল দিয়ে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে।

আর একটা জিনিষ আমাদের অবাক করেছে—তা হোল ফুলের দোকান। সন্ধ্যা হলেই চারিদিকে ফুলের দোকানে ফুটপাথগুলো ভরে যায়। আর প্রতিটি তামিল-তনয়ার কবরী কিংবা বিনুনীতে দেখা যায় ফুলের মালা। জুঁই-বকুলের গন্ধে সারা সহরটা ভরে ওঠে।

সন্ধ্যাবেলা সাতটা নাগাদ মাদ্রাজ এগমোর থেকে মিটার গেজ রেলে চড়ে আমরা রামেশ্বরের পথে পম্বন জংশন রওনা দিলুম। অনেকটা পথ তাই খাওয়া-দাওয়া করে শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। নিজেকে কিছুই করতে হোল না। অদ্ভুত কর্মক্ষমতা এই ছাত্রদলের। ওদের বিশ্রাম বলে কোন কিছু নেই। ট্রেনে কখনো ঘুমোতে দেখি না। সারারাত গল্প করতে করতে যায়। ওরাই আমার সব ব্যবস্থা করে দিল।

মাদ্রাজের এক জনাকীর্ণ রাস্তার নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড। পরের দিন সকাল ১১টা নাগাদ পম্বন জংশন পৌঁছালাম। রামেশ্বরম্ দ্বীপের অন্তর্গত পম্বন। কাজেই ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপের যোগাযোগ রক্ষা হয় একমাত্র পম্বনের রেল-সেতু দিয়ে। এই রেলসেতু দেড় মাইল লম্বা। এর দু'পাশে কোন রেলিং নেই। দেখে মনে হয়, রেল-লাইন জলের ওপর পাতা। পম্বন সেতু এক অভাবনীয় কীর্তি। ১৯১৪ সালে তৎকালীন রেল কোম্পানী এই সেতু তৈরী করেছিলেন। তলা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। সে আওয়াজ রেলগাড়ীর আওয়াজ ছাপিয়ে কানে বাজে। ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে অনেকের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যখানের খানিকটা অংশ জাহাজ যাওয়ার সময় খুলে যায়। একে বলে সাজার রোলার ব্রিজ।

পম্বনে মেরিন বায়োলজিকাল সারভেসের একটি ছাউনিতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম। এখানে ছাত্ররা একদিন উপকূলে সামুদ্রিক জীবের নমুনা খুঁজে বেড়াবে। আমিও ইতিমধ্যে ছোট্ট একটি নৌকা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশের তিন-চারটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখতে। এই দ্বীপগুলির মধ্যে ক্রুসেড দ্বীপ অন্যতম।

ছোট্ট নৌকায় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ঠেলতে ঠেলতে এগোচ্ছিলাম। কিন্তু দ্বীপে নামার কোন অনুমতি পেলাম না। মাদ্রাজ সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এই সমস্ত দ্বীপে নামা নিষেধ। পরে অবশ্য অধ্যাপক বন্ধু দত্তগুপ্তকে নিয়ে নেমেছিলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয় নি।

পরের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ আবার আমরা সবাই রওনা দিলাম রামেশ্বরমের উপকূলে। আর একটা লাইন চলে গেছে ধনুষ্কোটির দিকে। সে লাইন আজকাল বন্ধ। ধনুষ্কোটি যাওয়ার এখন আর কোন উপায় নেই। গত বছরের সামুদ্রিক ঝড়ে ধনুষ্কোটির পিয়ার গেছে ভেঙে, লোকজনসহ ট্রেন চলে গেছে জলের তলায়। সেই মর্মান্তিক খবর আজ বোধ হয় কারুর জানতে বাকি নেই।

রামেশ্বরমের রেললাইন যেন বালির ওপর পাতা চারিদিকে বালি আর বালির পাহাড়। এই সমস্ত বালি সমুদ্র উপকূল থেকে ক্রমশ ভেতর দিকে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন রেলগাড়ীটা বালির মধ্যে ঢুকে গেলো। নারকোল আর খেজুর গাছের পাতাগুলো শুধু বেরিয়ে আছে আর সমস্ত গাছটা বালির ভেতর ঢুকে গেছে। দাঁড়িয়ে গাছের মাথায় হাত দেওয়া যায়। এসব আগে কখনো দেখি নি, অবাক হয়ে আমরা তাকিয়ে রইলুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা রামেশ্বরম্ স্টেশনে পেঁছিলাম। ১ মাইল থেকে দেড় মাইলের ভেতর শহরের পরিধি। চারিদিকে দোকান-পাট আর হোটেল। ইস্কুল ও একটি হাসপাতালও আছে। কিছু মৎস-ব্যবসায়ীরও বসবাস আছে। বর্তমানে রামেশ্বরমে ভিড় একটু বেশী কারণ ধনুষ্কোটি ঝড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে সিংহল থেকে জাহাজগুলি বর্তমানে রামেশ্বরমে এসে থামে। সপ্তাহে দু'বার জাহাজ আসে। জামা-কাপড়-শাড়ীর দোকান প্রচুর। প্রবাল, ঝিনুক, শাঁখ এখানে বিখ্যাত এবং দামেও সস্তা। বিচিত্র রকমের মানুষ টুকরী চ্যাটাই আমরা দেখলাম।

পঁচিশ মাইল লম্বা আর ৮ মাইল চওড়া এই রামেশ্বরম্ দ্বীপের চারিদিকেই শুধু বালি। কোন কৃষিকার্য এখানে হয় না। নারকোল আর খেজুর গাছে ভরা কিছু কিছু ঝোপ-ঝাড়ও দেখা যায়। ভারতের চারিটি ধামের একটি হোল রামেশ্বরম্। অপর তিনটির একটি পূর্বে—জগন্নাথ ধাম, পশ্চিমে দ্বারকাধাম অপরটি উত্তরে হিমালয়ে বদ্রিকাধাম।

কথিত আছে, রাবণের মৃত্যুর পর ব্রহ্মহত্যার অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য রামচন্দ্র এখানে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে শিবলিঙ্গ আনার জন্য কৈলাশে পাঠান। কিন্তু প্রতিষ্ঠার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে সীতা উপকূল থেকে বালি নিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরী করেন এবং পরে রামচন্দ্র ঐ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। হনুমান যে লিঙ্গ পরে নিয়ে আসেন সেই লিঙ্গও একটু দূরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ বালি থেকে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে সমস্ত রামেশ্বরম্ দ্বীপের কোন অংশেই চাষ করা হয় না।

তিনটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা এই মন্দিরের চারটি গোপুরের মধ্যে পশ্চিমের গোপুরটি সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে হয়। এর উচ্চতা ৭৬ ফুট। উত্তর ও দক্ষিণের গোপুর দুটিও অসম্পূর্ণ। পূর্বদিকের গোপুরটি সম্পূর্ণ ১২৬ ফুট উঁচু ও প্রায় ৫০ বছর আগে তৈরী হয়েছিল। বলা হয়, সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহু নাকি ১১৭৩ খৃঃ এর কিছুটা সংস্কার করিয়েছিলেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একান্ত বাধ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁরই প্রেরণাবশে বাল্যকাল থেকেই হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। হিন্দুমেলার অধিবেশনগুলিতে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ প্রমুখের রচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলি গীত হত। অনুষ্ঠানের বিবরণীতে (এ পর্যন্ত প্রাপ্ত) গায়কদের নাম নেই। তবে বালক রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর 'কামিনী-লাঞ্ছন' গীত 'কণ্ঠের' জন্য গায়কদলে স্থান পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

'ঘরোয়া'তে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, '---আর একটা গান গাওয়া হত সে গানটি তৈরি করেছিলেন বড়ো জ্যেঠামশায়,---

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরে লোচনবারি

এই গানটি বোধহয় রবিকাকাই গেয়েছিলেন হিন্দুমেলাতে।'

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'মিলে সবে ভারত সন্তান গানটি তখনই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হত এ অনুমান অসঙ্গত নয়।'

—দ্রঃ দেশ, সাহিত্য সং ১৩৭৪।

কিন্তু গায়ক হিসাবে নয় হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে কিশোর রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্যকর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল জাতীয় ভাবাশ্রয়ী কবিতা রচনা ও সাধারণ অধিবেশনের জনসমাবেশে আবৃত্তি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পার্শী বাগানে (১৮৭৫ খৃঃ, ১১ই ফেব্রুয়ারী)। এবারের সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বসু। ষোল বছরের কিশোর কবি 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। উল্লেখযোগ্য যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত রচনা হিসাবে এই বৎসরের ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঠাকুর পরিবারের একটি পারিবারিক 'হিসাব বহি' (অপ্রকাশিত) থেকে প্রমাণ পেয়েছি কবিতাটি পৃথকভাবে ছাপিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। (কবিতাটি রবীন্দ্র রচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।) কবিতাটির মূলভাবে গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্যের স্মরণ এবং জাতীয়তার আদর্শে প্রাণিত হওয়ার জন্য জাতির প্রতি আহ্বান।

অষ্টআশী পংক্তির দীর্ঘ কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করে বালক কবির দেশাত্মবোধের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন:

(৪)

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্। হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

(৯)

অমার আঁধার আসুক এখন
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাক্।

(১৫)

আবার সেদিন (ও) দেখিয়াছি আমি
স্বাধীন যখন এ ভারতভূমি
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে?

(১৮)

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি!

কবিতাটির মধ্যে 'গতানুগতিক ভাবনার পুনরাবৃত্তি' আছে কিনা বা এটি 'কবিতা হিসাবে তুচ্ছ' কিনা অথবা হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতার ক্ষীণ অনুকরণমাত্র'—কিনা; এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বাংলা দেশের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে; ষোল বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশাভিমানের এই তীব্র অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা। কবিতাটি যে উপস্থিত জনসমাবেশকে মুগ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' -এর ১৮৭৫ খৃঃর ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যার একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

"Baboo Rabindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendra Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut '(India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience."

দুই বৎসর পরে (১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথ একাদশ অধিবেশনে 'দিল্লীর দরবার' বিষয়ক আরও একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। হিন্দুমেলার জন্য লিখিত দ্বিতীয় কবিতাটি রচনার পশ্চাতে বালক রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক উত্তেজনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৭৬ খৃঃ গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী লর্ড লিটন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তাঁর শাসনকালে ভারতবর্ষ নিদারুণ দুর্ভিক্ষের করালছায়ায় আচ্ছন্ন। চতুর্দিকে খাদ্যাভাব—অনাহার—মৃত্যুর বিভীষিকা। এ হেন পরিবেশে ১৮৭৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসে লর্ড লিটন প্রভূত অর্থব্যয়ে মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবার আহ্বান করে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' ঘোষণা করলেন।

বিক্ষুব্ধ [illegible] বিক্ষোভ দমনে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' আরোপিত হলো, অস্ত্র আইন বলবৎ হলো। এই সময় তরুণ রবীন্দ্রনাথের চিত্ত-সংক্ষোভ সাম্রাজ্যশক্তির প্রতি ঘৃণা এবং বৈরিতায় ফেটে পড়েছিল। 'দিল্লী দরবার' বিষয়ক কবিতা সেই বিক্ষোভতাড়িতচিত্ত নির্বাণ।

এই কবিতাটি সম্পর্কে সমসাময়িক (১৮৭৭, ৪ঠা মার্চ) 'সাধারণী' পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক মন্তব্য করেন,—

"---রবীন্দ্রবাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ায় দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স বোধ কি সতের বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আদ্রিত হইয়াছিলাম; তাঁহার সুকুমার কণ্ঠে আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছেন, যখন দেখিলাম যে তাঁহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—আর ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান।' একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"

সাধারণীর পত্রলেখক যে 'সুপরিচিত কবির' উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন 'পলাশীর যুদ্ধ'খ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন। পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মস্মৃতিতে একথা স্মরণ করে লিখেছিলেন, "স্মরণ হয় ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের (১৮৭৭ খৃঃ) আমি কলিকাতার ছুটিতে [illegible] বাবুদের কাননে [illegible] 'হিন্দুমেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম।---একজন সদ্য-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন, দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন, 'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।' তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক, হাসিমুখে করমর্দন কার্যটি শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীত কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।---আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন।

—দ্রঃ আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ।

জীবনস্মৃতি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—'লর্ড কার্জনের সময় দিল্লী দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময়ে লিখিয়াছিলাম পদ্যে—তখনকার ইংরেজ গভর্নমেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।---"

রবীন্দ্রজীবনীর আক্ষেপ অমূলক ছিল। কারণ, বালক কবিকে ভয় না করলেও এই জাতীয় স্বাদেশিকতা উত্তেজনাসঞ্চারী রচনার প্রচারকে তৎকালীন সরকার যথেষ্ট ভয় করতেন—যার বাস্তব প্রমাণ 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট'। যে কারণে সোমপ্রকাশ, সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকা আইনের প্রতিবাদে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেন, হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতা ও নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'কে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়, সেই একই কারণে 'দিল্লীর দরবার' বিষয়ক কবিতাও অপ্রকাশিত এবং অবজ্ঞাত থেকে যায়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কবিরও বিশ্বাস ছিল কবিতাটি প্রকাশ পায় নি।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে কথাপ্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেছিলেন,—

'সেটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে লিখিত হয়। বহু উৎকট রকমের অনেক কথা আছে বলিয়া উহা কখনও ছাপা হয় নাই।'

—দ্রঃ 'সুপ্রভাত', ৩য় বর্ষ (১৩১৭)—থেকে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

'উৎকট রকমের অনেক কথা' বলতে তিনি নিশ্চয় সরকার-বিরোধী শব্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'রবীন্দ্র জীবনী'র ১ম খণ্ডে জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের স্মরণ থেকে কবিতাটির, ভাবধারা মাত্র উপস্থাপিত করেছিলেন দীর্ঘদিন পরে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্র গ্রন্থপরিচয়' গ্রন্থে লেখেন যে কবিতাটি বিলুপ্ত হয় নি। প্রয়োজনের খাতিরে 'বৃটিশে'র স্থলে 'মোগল শব্দ' বসিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটকে (১৮৮২ খৃঃ) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগত উক্তিরূপে কবিতাটি সন্নিবেশিত হয়েছিল অনুমান করা যেতে পারে যে, 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট'এর

জন্যই এরূপ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি দেখানো হলে তিনি এটিকে তাঁর হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা বলে চিনতে পারেন।

কবিতাটি তেতাল্লিশ প'ক্তিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার পরিচয় হিসাবে কবিতাটির অংশবিশেষ এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের দিকে দিকে যখন মহাশ্মশানের ভয়াল বিভীষিকা, ক্ষুধাতুর মানুষের আর্তনাদ-দিল্লীতে তখন মহাসমারোহে সম্রাজ্ঞীর অভিষেক উৎসব। লজ্জার বিষয় বহু ভারতবাসীও সেই উৎসবে সামিল হয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তসংক্ষোভ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন.--

নিবিড় [illegible] এ ঘে[illegible] দিনে,
ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস,
মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায়
হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি,
ভারতে আজি কি সুখের দিন?

●

তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়,
ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—
কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-
আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,

কিসের তরে গো ভারতের আজি,
সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যতদিন বিষ করিছে পান,
কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি

●

এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি,
স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনে, একত্রে ভারত জাগেনি,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!

●

মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে কজন আছি,
আমরা ধরিব আরেক তান।

(সম্পূর্ণ কবিতাটির জন্য ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান কবিতাটি প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের রচনা অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা কি না এ বিষয়ে পুনরায় বিতর্কের সম্ভাব হয়েছে। বিশেষ করে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'ঠাকুর বাড়ীর কথা' গ্রন্থে আলোচ্য 'দিল্লী দরবার' কবিতাটিকে হিন্দুমেলার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা রূপে বর্ণনা করেন নি। প্রবন্ধান্তরে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করা যাবে)।

হিন্দুমেলায় পঠিত কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলায় আত্মপ্রকাশ করার আগেই রাজনারায়ণ ও জ্যোতিরিন্দ্রের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে সঞ্জীবনী সভায় দেশমুক্তির কামনার আদর্শ আত্মদানের শপথ বাক্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলা যেতে পারে হিন্দুমেলার একটি অলিখিত শাখা সংস্থা ছিল সঞ্জীবনী সভা, যেখানে স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে বাহুবলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের ইঙ্গিত এ সভার কাজেকর্মে আর অস্পষ্ট ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো।'

মনে রাখতে হবে হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার 'উত্তেজনার আগুন'ই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধকে জাতীয়-চেতনার দৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সঞ্জীবনী সভার আদর্শপুষ্ট একটি গানের পংক্তিবিশেষ উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন স্বদেশ চিন্তার স্বরূপ লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন,—

'তোমারি তরে মা, সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে মা, সঁপিন প্রাণ,
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান॥

যদিও হে দেবী শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবু ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা।'

এই সঙ্গীতটি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'সঞ্জীবনী সভার 'দীক্ষা'র সময়ে তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) যে সংকল্প গ্রহণ করতে হয়েছিল, সম্ভবত এই গানটিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে---মনে হয় সঞ্জীবনী সভার দীক্ষা গ্রহণর সময়ে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন।'

—দ্রঃ দেশ: সাহিত্য সং ৭৪।

আশ্চয নয়, কারণ গানটিতে শোণিত পাতের যে ইংগিত কবি করেছেন তা সঞ্জীবনী সভার সংকল্প গ্রহণকালে বুক চিরে রক্তদান ও সংকল্প বাক্য লেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। সঞ্জীবনী সভায় সশস্ত্র সংগ্রামের যে দীক্ষা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে লেখা,

এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা
হাতে হাতে ধর গো।

●

'এখন যার যা কিছু আছে, ধরে
সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎস-ধারায়
মঙ্গলঘট ভর গো।'—ইত্যাদি

এই গানটির মধ্যে দিয়েও অভিব্যক্ত হয়েছে। একই বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বালক রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন।
জীবন মরণের শপথ বন্ধন
ভারতমাতার তরে সঁপিন এ প্রাণ
সাক্ষী পণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান।
—দ্রঃ ভারতী ও বালক ১২৯৬, কার্তিক।

পরে লিখেছেন—'বাধা দিলে বাধবে লড়াই। মরতে হবে'—ইত্যাদি।

'সুপ্রভাত' কবিতার এক জায়গায় তিনি সুগভীর ইঙ্গিতের সঙ্গে লিখেছেন—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী।
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

দীর্ঘকাল পরে তিনি 'গোরা' লিখলেন। লিখলেন, 'গোরা কহিল—ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো ক'রতে হবে'—

শেষ পর্যন্ত একই অনুপ্রেরণার বশে 'মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের' কাছে 'শক্তি' প্রার্থনা করেছেন, বলেছেন, 'কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী। কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন'---।

বিংশ শতাব্দীর দানবীয় হিংস্রতাকে লক্ষ্য করেছেন, কবি, লক্ষ্য করেছেন বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের সর্বগ্রাসী লেলিহান হিংস্রতা, লক্ষ্য করেছেন অগ্রসরমাণ সভ্যতার সংকট। জীবনের প্রান্ত দিনে এসে লব্ধ প্রজ্ঞাকবি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রামী চিরতারুণ্যকে আহ্বান করেছেন,—

'বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই দানবের
সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'---

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায়, "কালান্তরের" প্রবন্ধগুলিতে, রাজাপ্রজা, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে, গোরা, রক্তকরবী প্রভৃতি সকল রচনার মধ্যে দিয়েই বালককালের হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার লব্ধ প্রেরণা নিরন্তর প্রবাহিত হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক স্বদেশপূজার একটি অন্যতর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামভিত্তিক। হিন্দুমেলার আদর্শে জাতির বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই বোধ বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে 'সন্ত্রাসবাদ'কে তিনি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে হিন্দুমেলার জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে দিয়ে ভারত-বীক্ষার দুটি দিক বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলো জন্মভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা ও বন্দনা এবং ভারতের পূর্ব গৌরব স্মরণ। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুমেলার এই মাতৃবোধের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অনুমান করা যায়। 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে এবং কমলাকান্তের 'দেশ জননীর ধ্যানের' মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশদর্শনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু মেলার আদর্শে অনুষ্ঠিত বারুইপুরের মেলায় মনোমোহন বসু তাঁর ভাষণে যে দশভুজা উন্নতি দেবী'র রূপবর্ণনা করেছিলেন তাও তাঁর দেশমাতৃকার কল্পনায় একটি পৃথক স্বরূপ মাত্র।

—দ্রঃ মুক্তির সন্ধানে ভারত: যোগেশচন্দ্র বাগল)।

হিন্দুমেলার মাতৃ-চেতনা, মনোমোহন বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনা রবীন্দ্রনাথের জীবন আদর্শকে গভীরভাবে আবিষ্ট করেছিল পরবর্তীকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে হিন্দুমেলায় উপলব্ধ সেই দেশ-মাতৃবোধই প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন লিখেছেন, 'বন্দেমাতরম্', উর্দু কবি ইকবাল যেমন লিখেছেন, 'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা', তেমনি রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন '[illegible] আজ মায়ের ডাকে', 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ইত্যাদি বহু স্বদেশমাতৃরূপ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত।

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের কর্মময় দীর্ঘজীবনে হিন্দুমেলার পরিকল্পিত একটি বিশেষ আদর্শকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসৃত হতে দেখা গেছে। হিন্দুমেলার স্বদেশচর্চার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল জাতির মনে আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং জাতিকে খাদ্য শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলা।' এই মহৎ আদর্শকে ফলবতী করে তোলার জন্য স্বদেশীয় শিল্পচর্চায় হিন্দুমেলার পরিচালকমণ্ডলী সবিশেষ উৎসাহ দান করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মময় জীবনে সেই আদর্শকেই নানাভাবে রূপ দিতে চেয়েছেন। বাংলা দেশ গ্রামবহুল। সুতরাং গ্রামজীবনের উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতিকে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব নয়। সেই কারণে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, সমবায়নীতির বাস্তব প্রয়োগ প্রভৃতি সমাজ-সংগঠনমূলক কর্মের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই 'স্বাবলম্বন' সাধনাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন।

১৩১১ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ (১৩ই শ্রাবণ) কলকাতায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হিন্দুমেলার আলোচনায় এবং রবীন্দ্রমানসে তার প্রভাব প্রসঙ্গে প্রবন্ধটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রবন্ধটিতে তিনি দেশের সমকালীন রাজনৈতিক সভা, অধিবেশন ইত্যাদির পরিবর্তে মেলাগুলির মাধ্যমেই জাতীয় সমাজ, চেতনা এবং স্বদেশীয় সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজে জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "---'প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্সকে' যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার

কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্ত হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিকলণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা কিছু সুখ-দুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।'

তিনি আরও বলেছেন, গ্রামপ্রধান বাংলা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনতে হলে স্বদেশী-মেলা অনুষ্ঠান একমাত্র উপায়। অতএব, 'প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদভাব স্থাপন করেন, —কোনো প্রকার নিষ্ফল পলিটিকসের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।'

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনার সঙ্গে হিন্দুমেলার কর্ম-প্রকল্পের একটি সুস্পষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ জমিদারীতে পর্যন্ত ইহার পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] সম্বন্ধে এক [illegible] [illegible] [illegible] এই সময় মুদ্রিত হয়।'

—দ্রঃ রবীন্দ্র জীবনী : ২য় খণ্ড :

পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে শিলাইদহে জমিদারী দেখাশোনার কাজে নিরত থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে হিন্দুমেলার আদর্শকেই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহের তৎকালীন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট এবং হেড মাস্টার মশাই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার আদর্শেই কাত্যায়নী মেলা এবং পরে 'রাজরাজেশ্বরীর মেলা' প্রভৃতি নামে একাধিক স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন।

—দ্রঃ রবীন্দ্র প্রতিভার উৎস সন্ধানে: শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

পরবর্তীকালে বোলপুরের কাছে সুরুলে প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের পল্লী শিক্ষা সংগঠন কেন্দ্রে এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিভিন্ন কর্মাবলীর মধ্যে দিয়ে জীবন-প্রভাতে লব্ধ জাতীয় মেলার আদর্শ স্বদেশচিন্তাকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি; শ্রীনিকেতনের মাঘোৎসবের মেলা এবং শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবের মেলার মধ্যে দিয়ে স্বদেশী সমাজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটানোই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুমেলার স্বদেশ দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের বালক-চিত্তে যে গভীর প্রভাব সঞ্চারিত করেছিল উত্তরজীবনে তা নানান কল্যাণমূলক কর্মের জগতে আপনাকে প্রকাশ করেছিল।

শুধুমাত্র গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, পর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার স্বরূপ নানান রাষ্ট্র-নৈতিক কর্মেও পরিব্যাপ্ত ছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন নি তথাপি স্বীকার্য যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল দেশের প্রধান নেপথ্য নায়কের। কখনও তাঁকে সক্রিয়ভাবে কর্মের জগতেও দেখা গেছে, হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার একটি বিশেষ কর্মবৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে ছিল রাজনারায়ণ, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের নিরত সান্নিধ্য।

এই উভয় প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী প্রভাব রবীন্দ্রনাথের যৌবনচিত্তে স্বদেশপূজার হোমাগ্নিকে অনির্বাণ রাখতে সাহায্য করেছিল। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' ও দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বরচিত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'—গান দুটি তিনি জনসমক্ষে গেয়ে দেশবাসীর কাছে কংগ্রেসের আহ্বান এবং আদর্শকে পৌছে দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া, ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের দুর্দিনে প্রতিবাদ ও জনগণের ঐক্য-বন্ধন 'রাখী বন্ধন' পরিচালনা, শিবাজী উৎসবে অংশ-গ্রহণ, ১৯০৬ খ্রীঃ বরিশালে পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের দিনে নাইট উপাধি ত্যাগ ও বড়লাট চেমসফোর্ডকে খোলা চিঠি প্রেরণ, ১৯৩১ সালে হিজলী বন্দি-নিবাসে গুলি চালনার প্রতিবাদে, অসুস্থ অবস্থায় কলকাতার টাউন হলে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের প্রতি নিন্দা-সূচক ভাষণ দান প্রভৃতি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা এইরূপ অজস্র উদ্দীপনাময় ঘটনায় জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

[[illegible] সংখ্যায় সমাপ্য।

গহীন গাঙের ঢেউ

সমীরণ চৌধুরী

খুব ছোটবেলায় লা ফণ্টেইন্-এর কয়েকটা গল্প মুখস্থ করতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং প্রতিটি গল্পের নীতি বেশ যত্নসহকারে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হ'ত আমার অবগতির জন্য। এর মধ্যে ছিল 'পিপীলিকা ও গংগাফড়িং' গল্পটি, অসম্পূর্ণ পৃথিবীতে পরিশ্রমের পুরস্কার মেলে এবং চাঞ্চল্য কেবল মা-ই খায়,—এই প্রয়োজনীয় তত্ত্বটুকু শিশুমনে গেঁথে দেওয়াই গল্পটি লেখার উদ্দেশ্য।

এই সুন্দর গল্পের (মাফ চাইছি, কেন না এটি সকলেই মোটামুটি কাজ চলার মত করে জানেন বলেই ধরে নেওয়া হয়) পিপীলিকা সারা গ্রীষ্ম পরিশ্রম করেছিল শীতের সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে, অথচ গংগাফড়িংয়ের সময়টা কেটে গেল সূর্যের দিকে তাকিয়ে গান গাইতে গাইতে। শীত এল, পিঁপড়ের একটুও খাদ্যাভাব নেই, কিন্তু গংগাফড়িংয়ের ভাঁড়ার খালি; পিঁপড়ের কাছে গিয়ে সে ভিক্ষে চাইল। তখন তাকে এক অবিস্মরণীয় উত্তর দিল পিপীলিকা:

'সারাটা গ্রীষ্ম কী করেছো?'

'না মানে, দোষ নেবেন না, আমি গান গেয়েছি, সারা দিন, সারা রাত্তির।'

'গান গেয়েছিলে। বেশ ত যাও, এবার নাচো।'

এ শিক্ষা আমি কখনও ঠিক নিতে পারি নি, এরজন্য নিজের বিকার নয়, বরং নীতিজ্ঞানহীন, ফলাফলের চিন্তা-শূন্য শৈশবই প্রকৃতপক্ষে দায়ী। আমার সহানুভূতি পড়েছিল গংগাফড়িংয়ের ওপর, আর কিছুদিন পিঁপড়ে দেখলেই মাড়িয়ে দিতাম। এই সংক্ষিপ্ত উপায়ে (এবং বুঝেছি এটি সম্পূর্ণ মানবিক) আমি প্রকাশ করতাম সূক্ষ্ম বিবেচনা এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিরুদ্ধে আমার নালিশ।

সেদিন জর্জ রেস্টুরেণ্টে একা খেতে দেখে গল্পটি আপনি মনে পড়ে গেল। এমন গভীর বিষাদাচ্ছন্ন মুখ আমার আর কখনো চোখে পড়ে নি। সে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ধরেছিল শূন্যে, যেন সমস্ত পৃথিবীর সব দায়-দায়িত্ব তাকেই সামলাতে হচ্ছে। তার জন্য দুঃখ হ'ল: তক্ষুণি সন্দেহ হ'ল নিশ্চয়ই তার অকালকুষ্মাণ্ড ভ্রাতাটি আবার গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। তার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'কেমন আছো?'

'খুব ফূর্তিতে নেই'; উত্তর দিল সে।

'টম বুঝি আবার---?'

তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

'হ্যাঁ, টমই বটে।'

'তাকে তাড়াচ্ছ না কেন? তার জন্য কী কর নি বল ত।' এখন অবশ্যই বোঝা উচিত যে সে একেবারেই অপদার্থ।'

মনে হয় সব পরিবারেই একটা না একটা বেয়াদব থাকে। কুড়ি বছর ধরে টম তাকে জ্বালিয়ে মারছে। সুন্দরভাবে তার জীবন সুরু হয়েছিল,—সে ব্যবসা সুরু করল, বউ আনল ঘরে এবং দু'টি সন্তান জন্ম নিল একে একে। রামসেরা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার, কাজেই আশা হয়েছিল যে টম রামসেও বেশ কাজের হবে, অকলংক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে বলে বসল কাজ তার ভাল লাগে না, এবং বিয়ে করার যোগ্যতা তার নেই। ফূর্তি মারার মতলব আর কী। কারুর কোন যুক্তিসংগত আপত্তিতে সে কান দেয় নি। বউ এবং কাজ ঝেড়ে ফেলল টম। কিছু টাকা তার হাতে ছিল, কাজেই দ' বছর ইউরোপের নানান রাজধানীতে বেশ মজায় কেটে গেল। থেকে থেকে তার কীর্তিকাহিনী আত্মীয়স্বজনদের কানে আসতে লাগল, তারা অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন সে সব শুনে। সময় তার খুবই ভাল ছিল। টাকা ফুরিয়ে গেলে ও কী করবে—এ প্রশ্ন তারা ঘাড় নেড়ে আলোচনা করতেন।

শীগ্‌গিরই টের পাওয়া গেল যে, তার চলছে ধারের ওপর। টম ছিল আকর্ষণীয়, এবং তার বিবেকের বালাই ছিল না। আমার চোখে এমন একজনও পড়ে নি যাকে ধার দেব না বলা আরও শক্ত। বন্ধুত্ব গড়া তার পক্ষে খুব সহজ, এবং তাদের কাছ থেকে রোজগারও হ'ত নিয়মিত।

সে বলত প্রয়োজনে টাকা খরচ করা বিরক্তিকর, মজা পেতে হ'লে বিলাসিতার জন্য টাকা খরচ করা দরকার। এর জন্য জর্জ-এর ওপরেই সে নির্ভরশীল। এ জন্য চটকের দরকার ছিল না।

জর্জ কিঞ্চিৎ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, এবং এ জাতীয় প্রলোভনে উদাসী। মানী মানুষ জর্জ। বার দু'য়েক টম্-এর কথায় ভুলে নতুন করে জীবন সুরু করার জন্য তাকে সে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছিল। তা' দিয়ে একটা মোটর গাড়ি এবং বেশ সুন্দর কয়েকটা গয়না কিনল টম।

কিন্তু যখন জর্জ বাধ্য হয়েই বুঝল যে টম কখনও স্থিত হবে না এবং তার সংগে যোগাযোগ ছিন্ন করল, তখন নির্বিকার টম ব্ল্যাকমেলের পথ ধরল। নিজের ভাই যদি ককটেল্ পৌঁছে দেয় কোন সম্ভ্রান্ত আইনজ্ঞের প্রিয় রেস্টুরেণ্টের টেবিলে টেবিলে, কিংবা ক্লাবের বাইরে যদি সে ট্যাক্সী নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় বসে থাকে, তবে তা' বোধহয় খুব প্রীতিপদ হয় না।

টমের মতে শুঁড়িখানার কাজ, বা ট্যাক্সিচালানো বেশ সুন্দর কাজ।

তবে, জর্জ তাকে দু'শ পাউণ্ড দেয় ত' সে পরিবারের মুখ চেয়ে ওসব ছেড়ে দিতে রাজী। জর্জ দি- ছিল।

একবার একটুর জন্য টমের শ্রীঘর বাস হয় নি। অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল জর্জ। অসম্মানজনক ব্যাপারটার তাকে নাক গলাতে হ'ল। মাত্র ছিল না টমের। সে মুনো; চিন্তাশক্তিহীন এবং স্বার্থপর, কিন্তু এর আগে অসাধু অর্থাৎ জর্জ-এর মতে, আইনবিরোধী কিছু সে করে নি; বিচার হ'লে তার শ্রীঘর বাস ছিল অনিবার্য। কিন্তু নিজের একমাত্র ভাইকে ত' আর ফাঁসিকাঠে উঠতে দেওয়া যায় না।

টম্ ঠকিয়েছিল জোল্‌শ-কে; সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বদ্ধপরিকর। আদালতে সে যাবেই যাবে; তার কথা যে টম্-এর মত নীতিহীন বদমায়েশের শাস্তি হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

পর্বতপ্রমাণ ঝেঁপো সয়ে এবং নগদ পাঁচ শ পাউণ্ড গুণগার দিয়ে তাবে ব্যাপারটা চুকল। যখন সে শুনল চেক্ ভাঙানোমাত্র ওরা দু'জন একসংগে মণ্টিকার্লো-তে গিয়েছে, তখন তার সে কী ক্রুদ্ধ মূর্তি। আর কখনও তাকে ওভাবে দেখি নি। ওখানে একমাস বেশ ফূর্তিতে কাটিয়ে দিল ওরা দু'জন।

কুড়ি বছর ধরে টম রেস খেলল, জুয়া খেলল, সুন্দরতমাদের পেছনে পেছনে ঘোরাফেরা করল, নাচল তাদের সংগে, এবং সবথেকে দামী রেস্টুরেণ্টে খেয়ে টাকা ওড়াল দু'হাতে। তাকে দেখলে মনে হ'ত যেন সে সবে বেরিয়ে এসেছে ব্যাণ্ডবক্স থেকে। তার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী কখনো মনে হ'ত না, যদিও তার আসল বয়স ছেচল্লিশ।

আমুদে টম সংগী হিসেবে অতি উত্তম, তার চরম অপদার্থতা জানা সত্ত্বেও তার সংগ উপভোগ করা যেত, সন্দেহ নেই। সব সময়েই সে উচ্ছল, অফুরন্ত মজাদার, আর অদ্ভুত চটকদারও বটে। বেঁচে থাকার জন্য সে আমার কাছ থেকে নিয়মিত যা' নিত, তা'তে আমি অসন্তুষ্ট হই নি কখনও। এমনটা কখনও হয় নি যে, তাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড ধার দিয়ে অনুভব করি নি যেন আমিই অধমর্ণ। টম রামসে সকলেরই পরিচিত, সেও কারুর অজানা ছিল না। তাকে সমর্থন করা অসম্ভব, তবুও তাকে ঠিক অপছন্দ করাও সম্ভব নয়।

বেচারা জর্জ! নচ্ছার ভাইয়ের থেকে মাত্র এক বছর বড় হ'লেও মনে হ'ত তার বয়স ষাট। পঁচিশ বছরের মধ্যে সে কখনও বছরে পনের দিনের বেশী ছুটি নেয় নি। সকাল ন'টা তিরিশে অফিসে পৌঁছত সে; বেরুত সন্ধ্যে ছ'টার সময়। সে সৎ, পরিশ্রমী, কাজের লোক।

তার বউটিও ভাল। স্বপ্নেও সে তার প্রতি কখনও বিশ্বাসহন্তা হয় নি, আর চারটি মেয়ের কাছে সে একজন আদর্শ পিতা। আয়ের এক-তৃতীয়াংশ জমাত সে এবং আরও ঠিক করেছিল যে পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর নিয়ে দেশের ছোট্ট বাড়ির বাগান দেখাশোনা করবে এবং গল্‌ফ্ খেলবে। নিষ্কলঙ্ক তার জীবনযাত্রা। টমও বুড়ো হচ্ছে, সুতরাং নিজের বয়োবৃদ্ধিতে সে বেশ খুশী। হাত কচলে সে বলত:

'টম যখন যুবক এবং দেখতে ভাল ছিল, তখন খুবই ভাল ছিল ঠিকই, কিন্তু সে আমার থেকে মাত্র এক বছরের ছোট। চার বছর পরে তার বয়স হ'বে পঞ্চাশ। তখন কাঁদুনি টের পাবে। পঞ্চাশ বছর বয়সে আমার নগদ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড জমবে। পঁচিশ বছর ধরে বলে আসছি যে শেষ জীবন হবে অশেষ দুর্গতিময়। দেখা যাক্, বাছাধনের তা' কেমন লাগে। দেখাই যাক, কাজ করা ভাল, না নিষ্কর্মার ধাড়ি হয়ে সময় নষ্ট করা ভাল।'

বেচারা জর্জ। তার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। তার পাশে বসে আমার মনে হ'ত লাগল আবার কী কেলেংকারী টম্ করেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, জর্জের মানসিক অবস্থা শোচনীয়।

সে প্রশ্ন করল, 'এবার কী হয়েছে জানো?'

সব থেকে খারাপ খবরের জন্য আমি প্রস্তুত। এ কথাও মনে হ'ল টম্ হয়ত বা শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে পড়েছে। জর্জ-এর পক্ষে তখন কথা বলাই কষ্টসাধ্য।

'তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না যে আমি আজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছি, আমি ভদ্র, সম্ভ্রান্ত এবং সাদাসিধে মানুষ। সারা জীবন খাটার পর আমি নিশ্চয়ই কিছু সঞ্চয় নিয়ে অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে পারি। জীবনে সব সময় ভাগ্য মেনে যে-কোন অবস্থার মধ্যে কাজ করেছি।'

'ঠিক কথা।'

'আর মানতেই হ'বে যে টম্ আগাগোড়া অলস, অপদার্থ, লম্পট এবং মর্যাদাহীন বদমাশ।'

জর্জ-এর মুখ লাল হয়ে উঠল।

'কয়েক সপ্তাহ আগে মার বয়সী এক বুড়িকে সে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বুড়ি মারা গেছে, তার সব সম্পত্তি টম্‌কে দিয়ে,—পাঁচলক্ষ পাউণ্ড, একটা ইয়াট্, একটা লণ্ডনে এবং একটা শহরতলীতে—দু' দু'খানা বাড়ি।'

টেবিলের ওপর ঘুষি মারল জর্জ।

'ভাল নয়, এ কক্ষণো ভাল নয়। গোল্লায় যাক, এ কখনও ভাল হ'তে পারে না।'

সত্যিই সামলাতে পারলুম না। তার কুঁচকানো মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ফেললাম। চেয়ারে গড়িয়ে পড়লাম, প্রায় মেঝেয় পড়ে গিয়েছিলাম আর কী।

জর্জ আমায় কখনও ক্ষমা করে নি। কিন্তু টম্-এর মে ফেয়ার-এর চমৎকার বাড়িতে প্রায়ই জমজমাট খানাপিনার নেমন্তন্ন পাই। আর যদি কখন কখন সামান্য কিছু ধার চায় টম, তার কারণ তার পুরানো অভ্যেস। ধারের পরিমাণ এক সভেরেইন্ ছাড়ায় না কখনও।*

---

* বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে

বায়ুমণ্ডল

মলিনা নিয়োগী

ও

বিদ্যুৎ নিয়োগী

এটা কেমন? এটা যদি না থাকতো

পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে গভীর বায়ুমণ্ডল আর আমরা সেই বায়ু-সমুদ্রে ডুবে আছি। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে অক্সিজেন দরকার, বায়ুমণ্ডল থেকে সে অক্সিজেন আমরা পাচ্ছি। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলের অন্য কোন প্রয়োজন কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। এই বায়ুমণ্ডল আছে বলেই আমরা পৃথিবীর বুকে আজও টিঁকে আছি। মহাজাগতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে ওই বায়ুমণ্ডল।

বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হার

বায়ুমণ্ডলের কোথাও কোন উষ্ণতার তারতম্য আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু অনেক উপরে উঠলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্যটা বেশ বোঝা যায়। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা লিফটে ধরুন উপরে উঠছি। লিফটটা অবশ্য হতে হবে বিশেষভাবে তৈরী যাতে করে ভিতরকার বাতাসের চাপ সব-সময়েই সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান থাকে। সঙ্গে থাকবে থার্মো-মিটার আর উচ্চতা পরিমাপক 'অল্টি-মিটার'।

পাঁচ থেকে আট মিনিটের মধ্যে আমরা প্রথম স্তর অতিক্রম করে গেছি—এই স্তরকে বলে Troposphere মাউণ্ট এভারেস্টও এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে নিশ্চিন্তে। তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমতে থাকে আর এইভাবে ১০ কিলো-মিটার উপরে তাপমাত্রা—৬০' সেন্টি-গ্রেডে পৌঁছায়। মানুষের ধারণা ছিল যতই উপরে যাওয়া যায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ততই কমতে থাকে—এইভাবে ৩০ কিলোমিটার গিয়ে বায়ু-মণ্ডল শেষ—তারপর অসীম অনন্ত শূন্য।

মানুষের এই ভুল ধারণার আমূল পরিবর্তন আনেন বিজ্ঞানী বোর্ট ১৯০০ সালে। তিনি বলে গেলেন বায়ুমণ্ডল অসীম। এই জিনিষটাই প্রমাণ হ'ল কিছুদিন বাদে বেলুন আবিষ্কারের ফলে। দেখা গেল ১০ কিলোমিটার থেকে ২৭ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার বিশেষ কোন তারতম্য নেই।

১০ কিলোমিটার উপরে আমরা মেঘশূন্য সুনীল আকাশ দেখতে পাব। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা,—৬০' সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। তার পর আমরা ঢুকলাম পরবর্তী স্তরে—Stratosphere বাতাস এখানে শুষ্ক, স্বচ্ছ আর অত্যন্ত পাতলা ২৭ কিলোমিটার থেকে ৫৫ কিলো-মিটার পর্যন্ত তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে। এই তাপমাত্রা বাড়ার কারণ কী? সূর্য থেকে 'আলট্রাভাওলেট' রশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে অক্সিজেনের অণুকে দুটো পরমাণুতে ভেঙ্গে দেয়। এইভাবে আবার তিনটে অক্সিজেনের পরমাণু একসঙ্গে মিশে গিয়ে 'ওজন'-এ পরিণত হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে তাপ উৎপন্ন হয় তার ফলেই বায়ু-মণ্ডলের উষ্ণতা বেড়ে যায়।

৫৫ কিলোমিটার উপরে এই তাপমাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ৩০' সেন্টি-গ্রেড। এই স্তরকে বলা হয় 'ওজন স্তর'। এখানে বাতাসের অণু-গুলো খুবই ফাঁকা ফাঁকা আর বায়ুমণ্ডলের চাপ খুবই কম।

এই ওজনের বিরাট গভীর স্তরকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে এলে সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপে এর গভীরতা হবে একটা বিস্কুট যতখানি পুরু ততটা। সুতরাং সেখানে বাতাসের চাপ কত কম। এই ওজনের স্তরই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

অক্সিজেনকে ওজনে রূপান্তরে আলট্রাভাওলেট রশ্মি তার অনেকটা শক্তি হারিয়ে ফেলে। এরা যদি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাত তবে পৃথিবীতে জীবনের

অস্তিত্ব থাকা সম্ভবই হোত না। যেটুকু রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, সেটুকু আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

ওজনের স্তর যদি এমন গভীর হোত যে সমস্ত আল্‌ট্রাভাওলেট রশ্মিই সেখানে নষ্ট হয়ে যেত, পৃথিবীতে আর পৌঁছাত না তবে আমরা সবাই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। আল্‌ট্রাভাওলেট রশ্মির অভাবে যে সমস্ত রোগ দেখা দেয় তার মধ্যে প্রধান হো'ল 'রিকেট'।

৫৫ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যতই উপরে যাব তাপমাত্রা ততই কমতে আরম্ভ করবে। এইভাবে ৮৫ কিলোমিটার উপরে তাপমাত্রা প্রায় ৭০' সেন্টিগ্রেড। আকাশটা এখন আর নীল দেখাবে না—দেখাবে কালো। এখানে বাতাসের অণুগুলো এতই ফাঁকা ফাঁকা যে শব্দ পরিবহন অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাই এখানে চারিদিকে এক গভীর নিস্তব্ধতা।

এখানে এলেই কালো আকাশের বুকে পৃথিবীকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাব। পৃথিবী পৃষ্ঠের বক্রতা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়বে। ২৭ থেকে ৮৫ কিলোমিটারের মধ্যে এই স্তরকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন Mesosphere ৮৫ কিলোমিটার উপরে সে এক নতুন জগৎ। বাতাসের অণুগুলো সূর্যের আল্‌ট্রাভাওলেট রশ্মির আঘাতে ভেঙ্গে গিয়ে বিদ্যুৎ আধানগ্রস্ত Electrically charged হয়ে আছে এখানে। এই বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় Ionosphere রেডিও তরঙ্গগুলো এই স্তরে প্রতিফলিত হয়েই পৃথিবীতে আবার ফিরে যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম পথপ্রদর্শন করেন ১৯০২ সালে দুজন বিজ্ঞানী Kennelly এবং Heowside এর আরও ২০ বছর পর বিজ্ঞানীরা দেখলেন এরকম একটি স্তর নয়—পর পর তিনটি স্তর এইভাবে রয়েছে। এই স্তরগুলোকে তাঁরা নাম দিলেন D, E, F স্তর।

৯৫ কিলোমিটার উপরে এসে আমরা শেষ মেঘের স্তর পার হ'লাম। ভোরের বা সন্ধ্যার আকাশে মাঝে মাঝে এই মেঘগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে এসে আমরা দেখতে পাব একটা নতুন জিনিষ—উল্কাপাত। কালো আকাশের বুকে মাঝে মাঝে দেখতে পাব চুটন্ত আগুনের পিণ্ড। মটরের দানার আকারের এই উল্কাপিণ্ডগুলো প্রচণ্ড বেগে যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয় যার জন্যে এগুলো সমানে জলতে থাকে।

প্রতিদিন কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এইভাবে ধরা দিচ্ছে। এইভাবে উল্কাপিণ্ড ছাইয়ে পরিণত হয়ে জমা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে। বায়ুমণ্ডল না থাকলে উল্কাপিণ্ডের দৌরাত্ম্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত।

কি চুবাদেই আমরা E স্তরে পৌঁছে যাব। ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গগুলো এই স্তরে এসে প্রতিফলিত হয়। তাপমাত্রা ক্রমে বেড়েই চলে। দুঘণ্টা ক্রমাগত চলার পর তাপমাত্রা এসে দাঁড়াবে ৮০০' সেন্টিগ্রেড—তখন আমরা ২০০ কিলোমিটার উপরে। আরও ৩০ কিলোমিটার উঠে আমরা F1 স্তরে পৌঁছাব। ১০০ মিটারের কাছাকাছি রেডিও তরঙ্গগুলো এখানে এসে প্রতিফলিত হয়।

প্রায় ৩৩০ কিলোমিটার উপরে রয়েছে আর একটি স্তর—F2 স্তর। আরও ছোট রেডিও তরঙ্গগুলো এখানে এসে প্রতিফলিত হয়।

৩৩০ কিলোমিটার উপরে যে স্তর বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন Exos-Phere পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানে এতই দুর্বল যে বাতাসের অণুগুলোকে ধরে রাখতে পারে না। তাই বাতাস এখানে খুব পাতলা। এখানে এসে সব থেকে মনোরম যে দৃশ্য চোখে পড়বে সেটা হ'ল মেরুপ্রভা—যাকে বলে 'অরোরা'। উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি বছরের বিশেষ কয়েকটি দিনেই এই দৃশ্য চোখে পড়বে।

১৯৫৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বড় জোর হবে ১০০০ কিলোমিটার। কিন্তু সাম্প্রতিক মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণায় বিজ্ঞানীদের সে ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। আমেরিকান কৃত্রিম উপগ্রহ Explorer 1 ও 111 আর রাশিয়ার স্পুটনিক I ও 11 পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আরেকটি স্তর আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কারের নামে এর নাম রাখা হয়েছে Von-Allen স্তর। এই স্তরে রয়েছে উচ্চশক্তি বিশিষ্ট ইলেকট্রন আর প্রোটন। ১০০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত রয়েছে এই স্তর। একে বলে Magnetosphere.

মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণায় বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণায় ফলস্বরূপ মহাকাশের খুঁটিনাটি, বায়ুমণ্ডলের গভীর রহস্য বিজ্ঞানীরা কাজে ধরা পড়বে। বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আরও নতুন নতুন তথ্য আমরা জানতে পারব। বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমায় আমরা আজও পৌঁছাতে পারিনি। দেখতে হবে এর শেষ কোথায়।

ব্যর্থ স্পেস-ক্র্যাফ্‌ট

মণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

এলে মহাকাশ যান; সারি পুন ঃ চন্দ্রপরিক্রম
বহু বার্তা বহু চিত্র আনিয়াছ। চিরপ্রিয় সোম
শুধু না কি শুষ্ক মরু; গিরিকুল শষ্পসরিৎহীন
বিকট গহ্বররাজি বক্ষে লয়ে নিঃশব্দে আসীন;
মৃতভূমি ভয়ঙ্কর। জড়-চক্ষু, যন্ত্রের বিজ্ঞানী!
এ কি কোনো নব বার্তা, দীর্ঘ-তপস্যায়, দিলে আনি
কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে, যাত্রীদের তুচ্ছ করি প্রাণ?

সৌন্দর্য-সাধক চির-হৃদি-জ্যোতিঃ মনব-নয়ান
আস্বাদিছে যেই রূপ সুখে-দুঃখে অনন্ত তৃষায়,
যারে লয়ে নিতি নব গান গায় বিচিত্র ভাষায়,
তারে দীন করিবারে সাধ্য তব নাই। বৈদ্য ভণে—
নর দেহ, রক্ত-মাংস। তবু প্রেমিকার চন্দ্রাননে
সঞ্জীবনী সুধা লভি। হে শশি, হে প্রেয়সী-বদন
তোমরা অমর দোঁহে, তোমরাই অমিয়-জীবন॥

॥ উনত্রিশ ॥

হাসপাতাল বাড়ির কথায় আরও কিছু পুরানো দিনের কাহিনী মনে পড়ছে।

যখন এদেশে কোন স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেই সময়ে বৈদ্যনাথধামে ডাঃ বোস একটি স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য জগতে সুপরিচিত, রবিবাসরের প্রাক্তন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে ডাঃ বোসের নিকট আত্মীয় ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথ ধামে স্যানিটোরিয়ামের কার্যভার গ্রহণ করেন।

একজন স্থানীয় চিকিৎসক প্রত্যহ রোগীদের দেখতেন আর সপ্তাহে একদিন ডাঃ বোস নিজে গিয়ে রোগীদের দেখে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে আসতেন।

তাঁর দ্বিতীয় স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন কলকাতার মাইল চল্লিশ দূরে। যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য বসিরহাট অঞ্চলের দেগঙ্গায় তাঁর নিজস্ব জমিতে বিস্তৃত ঝিল কাটিয়ে তার পাশে বৃহৎ একটি দোতালা বাড়ি তৈরী করান। স্থির হয়েছিল—এই সেবানিকেতনের নাম হবে 'বিশ্রাম ভবন'।

যক্ষ্মারোগীরা এখানকার উন্মুক্ত প্রান্তরের উদার আবহাওয়ার মধ্যে কেবল চিকিৎসিত হবে তাই নয়; অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীরা বিশ্রাম সহ কিছুটা কাজ করে সত্বর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

এ কাজে তাঁকে সর্ববিষয়ে উৎসাহ যোগাতেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর পরামর্শ বন্ধু এক-ডি, বিলাতে পঠদশায় যিনি মেরুদণ্ডের ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসিত হয়েছিলেন। 'বিশ্রাম মন্দির'-টির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন—'রোগটা যখন টি বি'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। তিনি নিজেও একসময়ে ক্ষয় রোগে ভুগেছিলেন।

সঞ্জয়

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। কংগ্রেস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র নিজগৃহে অন্তরীণ আছেন। সহসা একদিন শোনা গেল। তিনি দুর্জ্ঞেয় ভাবে অন্তর্হিত হয়েছেন। শোনা গেল—জিয়াউদ্দিন নাম নিয়ে তিনি কাবুলের পথে দেশ ত্যাগ করেছেন।

তার পর খবর পাওয়া গেল—সুভাষচন্দ্র নেতাজী হয়েছেন, আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন। কলকাতায় যখন বোমা পড়ছে, আমরা তখন উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি, কখন সাইগন হতে নেতাজীর রেডিও বক্তৃতা শুনতে পাবো।

এর পূর্বেই জাপানের সেনাপতি জেনারেল তোজোর দুর্ধর্ষ বাহিনী পার্ল হারবার অধিকার করেছে। হিটলার দিত্য নতুন দিকে জয়যাত্রায় চলেছে। শোনা গেল; নেতাজীর সঙ্গে অক্ষ শক্তির যোগাযোগ ঘটেছে—ভারতের দিকে আসছে।

ইম্ফল-কোহিমায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানী যখন এগিয়ে এলো, মিত্র শক্তি তাকে তোজোর বাহিনী বলে বর্ণনা করে এ দেশবাসীকে ধোঁকা দিলে। 'তোজো কাকে ফেলেন না'—বলে তখনকার কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন; ট্রামে বাসে রাজপথের দেওয়ালে ছোট বড় মাঝারি পোস্টারের ছড়াছড়ি। বিদেশী সরকারের হাতের অস্ত্র রেডিওতে তারস্বরে চীৎকার।

কিন্তু তবুও তখন যখন একান্ত আমাদের ঘরের উপর উড়ে এলো তখন তো আর চুপ করে থাকা চলে না। তখন যা ঘটেছিল তা ভাবতেও এখন রোমাঞ্চ হয়।

চারিদিকে খোলা মাঠের মধ্যে ডাঃ বোসের তৈরী 'বিশ্রাম মন্দির' বাড়িটি ঐ অঞ্চলে সহজেই নজরে পড়বে। বারাসাত থেকে বসিরহাটের দিকে চলতে থাকলে ডাইনে দেগঙ্গার খোলা মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে ঐ সুবৃহৎ অট্টালিকা। পাশের ঝিলে তির তির করে কাঁপছে জল, ঝির ঝির করে বইছে হাওয়া। চাষীরা সকালে উঠে মাঠে চাষ করতে গেছে।

সহসা গ্রামের পাশে উঁচু গাছের ডালে আটকে থাকা সাদা একটা জিনিসের উপর দু তিনজন ছোকরার পথিকের দৃষ্টি পড়ল। কাছে এসে তারা

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

তাদের হাত পা কাঁপতে থাকে, কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়। তাদের বুঝিয়ে দেবার লোকের অভাব হয় না—যে ওটি একটি প্যারাসুট। রাতের অন্ধকারে কেউ নিঃশব্দে নেমেছিল, কিন্তু মাঠে না নেমে প্যারাসুটটি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে আটকে দিয়েছে উঁচগাছের ডালে।

ক্রমে দেখা গেল, একটি নয় দুটি নয়—তিনটি প্যারাসুট পড়ে আছে। আগন্তুকরা কে যে কোথায় গেছে তার কোন চিহ্ন নেই।

বলা বাহুল্য থানায় খবরটা পৌঁছবামাত্র সেটা সামরিক বিভাগে জানানো হল। আর আশেপাশে দু তিনটা গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে খানাতল্লাসী করা হল—যদিও কোন অপরিচিত আগন্তুকের দর্শন মেলে।

যখন এই ব্যাপক অভিযান চলছে, তখন আকাশে উড়ে এলো একখানি জঙ্গী বিমান। ঘুরে ঘুরে মাঠের মধ্যে সেই বিশ্রাম মন্দিরের সুবৃহৎ বাড়িখানি বিমানে বসে পর্যবেক্ষণ করলেন দুজন সামরিক অফিসার।

পরদিন ভোরে আমি ডাঃ বোসকে অমৃতবাজার পড়ে শোনাচ্ছি এবং দেগঙ্গার মাঠের খবরটা আছে কি না সন্ধান করছি এমন সময় দারোয়ান—শিউধারী এসে খবর দিল। এক ভদ্রলোক ডাঃ বোসের দর্শনপ্রার্থী।

তাকে উপরের বারান্দায় ডাকা হল।

সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরনে, চোখে চশমা, পায়ে স্যাণ্ডেল। মধ্যবয়সী, কিন্তু খুব উন্নত চেহারা। তিনি এসে ডাঃ বোসকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে শুধু চিনি না, চিরদিন দূর থেকে প্রণাম জানাই।

ডাঃ বোস হতভম্ব, বললেন—ব্যাপার কি বলুন তো।

ভদ্রলোক বললেন—কুড়ি বাইশ বছর আগে আমার একবার কঠিন অসুখ হয়। টাইফয়েড। পাঁচবার কোন আশা ছিল না। ডাক্তার হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার ঠাকুরমা শেষ পর্যন্ত আপনাকে দেখাবার জন্য বার বার বলতে থাকায় বাবা আপনাকে নিয়ে যান। আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতাম আমরা। মৃত্যুর মুখ থেকে যে বালকটিকে রক্ষা করেছিলেন এখনকার আমার এই মিলিটারি চেহারাটি দেখলে তাকে আর চিনতে পারবেন না।

ভদ্রলোকের আপাদমস্তক দেখলেন ডাঃ বোস। সত্যি অনিন্দ্যসুন্দর স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের, কিন্তু মিলিটারি চেহারা বলছেন কেন। দিব্যি ধুতি পাঞ্জাবীপরা খাঁটি বাঙ্গালী চেহারা।

আমি বললাম—আপনি কি মিলিটারিতে কাজ করেন?

তিনি বললেন—করি, কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

ডাঃ বোস বললেন—সঞ্জয় আমার সেক্রেটারি। অনেককাল আছে। ওর উপস্থিতিতে কোন কথা বলবার আপত্তি নেই, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে ওর সুমুখেই বলতে পারেন।

ভদ্রলোক—আমায় 'আপনি' বলবেন না, আমি আপনার ছেলে সুনীলের সহপাঠী। সুনীল তো ডাক্তার হয়েছে। আমি মিলিটারি অফিসার। গতকাল আপনার দেগঙ্গার হাসপাতাল বাড়ির কাছে তিনটি অপরিচিত প্যারাসুট নেমেছে। বাইরে বলা হচ্ছে ওগুলি জাপানী প্যারাসুট। আসলে ওগুলিতে হয়ত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের লোক নেমেছে। কলকাতায় একটা ভয়ানক রকম গোলযোগ হওয়া বিচিত্র নয়। তাই সরকারি দরকারে আপনার হাসপাতাল বাড়িটি রিকুইজিসন করা হবে স্থির হয়েছে—ওখানে রাডার স্টেশন বসানো হবে, যাতে শত্রুর প্লেনের গতিবিধি লক্ষ্য করবার সুবিধা হয়। মিলিটারি রিকুইজিসন—সুতরাং আপনার বিশ্রাম মন্দির তৈরী ব্যবস্থা পণ্ড হয়ে যাবে।

তখনও পুরা উদ্যমে কাজ চলছিল ঐ যক্ষ্মা হাসপাতাল তৈরীর। প্রায় প্রতি সপ্তাহে ডাঃ বোস নিজে বাড়ি তৈরী কতদূর এগুলো তা দেখতে যেতেন। আগেই বলেছি, 'রোগটা যখন টি বি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা সাহিত্যিক অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ঐ যক্ষ্মা হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। আমরা সবাই আশা করেছিলাম, অমিয়বাবু নিজে রোগী থাকা অবস্থায় অন্যান্য স্যানাটোরিয়ামে বিশ্রাম এবং হালকা কাজ দিয়ে কি ভাবে সদ্য যক্ষ্মা রোগমুক্তদের চিকিৎসা করা হয় যা দেখে এবং শিখে এসেছেন, তাঁরই পরিচালনায় এই নবনির্মিত স্যানাটোরিয়ামেও সেই ব্যবস্থা চালু করা হবে। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল 'বিশ্রাম মন্দির'।

ডাক্তার বোসের সম্পাদিত বিখ্যাত স্বাস্থ্য পত্রিকা 'স্বাস্থ্য-সমাচার'-এর একটি 'বিশ্রাম-মন্দির সংখ্যা'ও প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছিল—সারা বাংলা দেশে এই রূপ বারোটি বিশ্রাম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হবে

অনেক আশা অনেক প্রতীক্ষার বস্তু সেই 'বিশ্রাম মন্দির' প্রতিষ্ঠার মুখে এই প্রবল বাধা পড়বার আশঙ্কায় ডাঃ বোসকে বড়ই বিচলিত মনে হল। এই ঘটনার প্রায় পঁয়তিরিশ বছর আগে ভারতে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টাও তিনিই করেছিলেন বৈদ্যনাথধামে স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করে। এবার জীবনসায়াহ্নে এই চেষ্টায় তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, মুখে প্রায়ই বলতেন—একটা বিশ্রাম মন্দির দাঁড়িয়ে গেলেই আর একটি অঞ্চলে আবার কাজ সুরু করব। অপরের বিশ্রামের জন্য, রোগীদের বিশ্রামের জন্য যিনি এত ভাবতেন, তিনি নিজে বিশ্রাম নিতেন কতটুকু? তাঁর চিন্তা, চেষ্টা এবং কর্মোদ্যমের বিশ্রাম ছিল না।

ভদ্রলোকটি বললেন,—আপনার হাসপাতাল বাড়িটি মিলিটারি প্রয়োজনে নিয়ে নেবে। সেটি রদ করা যাবে না। কিন্তু আপনি ঐ নোটিশ পাওয়া সঙ্গে সঙ্গে আপনার খেসারত দাবী করলে

দাবীর টাকা যত সত্বর সম্ভব আমি আদায় করে দেব। আপনি আমার জীবনদাতা, আপনার জন্য যদি আমি এই কাজটুকু করতে পারি তাতে নিজেকেও যেমন কৃতার্থ মনে করব, তেমনি মনে করব, ঐ টাকা পেলে আপনি অন্য কোথাও আবার আর একটি হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারবেন, তার দ্বারা আরও অনেক রোগীরও উপকার করা হবে।

ভদ্রলোক আবার ডাক্তার বোসকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে তার নাম ঠিকানা সব সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম।

সেইদিন দুপুরেই বিশেষ পত্রবাহকের হাতে হাসপাতাল বাড়িটির রিকুইজিশন নোটিশ এসে পৌছুল।

তার পর খেসারত আদায়ের জন্য আবেদন এবং কিছুদিন ছুটাছুটি। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভদ্রলোক তাঁর কথা রেখেছিলেন। ক্ষতিপূরণের টাকাটা সহজেই আদায় হয়েছিল এবং সেই টাকাতেই ডাক্তার বোস আবার নতুন করে হাসপাতাল তৈরী করলেন চাংড়িপোতায়, তাঁর নিজের জন্ম ভিটায়, যে হাসপাতালটি তিনি ডক্টর রায়ের মাধ্যমে সরকারের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

॥ ত্রিশ ॥

পুরোনো রোগীদের কাছে কৃতজ্ঞতার এমন কাহিনী অনেক শুনেছি।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির দোতলায় উত্তর পশ্চিম অংশে ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি—ভারতের প্রথম ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি বলে যার খ্যাতি ছিল। এমন কি যখন মেডিক্যাল কলেজেও মলমূত্র-রক্ত-কফ পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেই সুদূর অতীতে এই ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীর পত্তন করেছিলেন ডা: বোস।

বাম দিকে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি আর ডানদিকে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি মধ্যে ডা: বোসের বসবার চেম্বার। মুখোমুখি বারান্দা, অপর দিকে নিজের অফিস। পাশের উত্তরদিকের ঘরে অ্যামপুল তৈরী হত। জগদীশবাবু সে বিভাগের কর্তা।

দোতলার ঐ চেম্বারে বসে অনেক সময় ডা: বোস রোগী দেখতেন। আবার ওখানে বসেই চিনির দালালদের সঙ্গে বাজারের দর নিতেন, তাঁর পরিচালনাধীন রাজলক্ষ্মী সুগার মিলস থেকে চিনি যেত চিনিপট্টিতে। বেলগাছিয়ার মার্টিনের লাইট রেলের ওয়াগন ভর্তি হয়ে চিনির বস্তা আসত।

ওই ঘরে বসেই এসিড ফ্যাক্টরির, অ্যালাম, প্রুসিয়ান ব্লু প্রভৃতির কারবারীদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতেন। ওদের আসবার সময় হত প্রায় বিকেলবেলা—যখন অফিস ছুটি হয়ে যেত।

একদিন আমাদের কোম্পানীর কাজ করতেন যে চিত্রশিল্পী তাঁর একজন মেসবাসী বন্ধু বিশেষ বিখ্যাত চিত্রশিল্পীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আমার কাছে। আমি তাঁদের খাতির করে বসিয়ে তাঁদের বক্তব্য শুনলাম। আমাদের আর্টিস্টটি আমায় বললেন—ব্যাপারটা গোপনীয়, ধীরেন অর্থাৎ তাঁর বন্ধুটি একটা গোপনীয় জঘন্য ব্যারামে আক্রান্ত হয়েছে। ওর সিফিলিস হয়েছে। একটু ডা: বোসের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

আমি আর্টিস্ট দুজনকেই অন্তরঙ্গভাবে চিনতাম এবং তাঁদের সম্পর্কে আমার ধারণা ভালোই ছিল। দেখলাম ধীরেন নামক বন্ধুটির মুখে, বুকে কয়েক স্থানে চাকা চাকা লাল দাগ ফুলে উঠেছে। ঐ স্থান চুলকায়, তার পর ঐভাবে ফুলে ওঠে।

অতএব তাঁরা ধারণা করে নিয়েছেন ব্যাধিটি কুৎসিত এবং গোপনীয়।

আমি অন্তরঙ্গভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, শিল্পিপ্রবরের সত্যাই কোন বাইরের টান আছে কি না এবং এ রোগের অন্য কি কি উপসর্গ ইত্যাদি। সব শুনে আমার ধারণা হল, রোগটি আর যাই হোক্, সিফিলিস নয়।

ডা: বোসের কাছে নিয়ে গেলাম রোগীকে। তিনি যখন রোগীকে দেখছেন তখন চিনির দালাল হরেনবাবুর কাছে চিনির বাজার দর শুনছিলেন। কথা বলতে বলতেই প্রেসকৃপশান লিখে দিয়ে আমায় বললেন—দু তিনদিন ব্যবহার করে কেমন থাকে দেখাতে বোলো।

রোগী ও তাঁর বন্ধু ব্যাজার মুখ নিয়ে আবার আমার কাছে এসে বসলেন।

ব্যাপার কি? এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন ভাই?

রোগী বললেন—মরছি সিফিলিসের জ্বালায় আর দেখুন উনি লিখে দিয়েছেন এই ওষুধ। অপরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি রোগী দেখা হয়?

প্রেসকৃপসানখানা খুলে দেখি—স্পষ্ট অক্ষরে লিখেছেন—'লাইমজুস গ্লিসারিন' লাগাতে।

আমি বললাম—দেখুন, রোগের যা বিবরণ দিলেন, রোগীর আচার ব্যবহারের যা বিবরণ দিলেন এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থার কথা যা যা বললেন তা যদি সত্য হয়—তবে আপনার সিফিলিস হয় নি, হয়েছে অন্য কিছু। আর এত প্রবীণ একজন ডাক্তার যখন একটা লাগাবার ওষুধ বলে লাইমজুস গ্লিসারিন ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন—দুদিন ব্যবহার করে ফলাফল জানাতে, তখন সেটা ব্যবহার করতে আপত্তি কি?

ওরা কথাটার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। উভয়ে মেসে ফিরে গেলেন।

পরদিনই ফোন পেলাম, ধীরেন সুস্থ আছে, নতুন আর চাকা দেখা যাচ্ছে না। পুরানোগুলিও মরমর। তার পরদিন খবর নিলাম—ফুললি কিওর্ড।

মিরাকল্—বলেছিলেন ধীরেনবাবু।

আমি বললাম—দেখুন, উনি চোখে রোগী দেখেন, মুখে দালালের সঙ্গে চিনির দাম শুধান। ব্রেনটা কিন্তু ঠিক ঠিক দুটি কাজই করে যায়। শুধু তাই নয়—মহানন্দ দত্তের গদিতে সেদিনকার

চিনির দাম ভুললেও ভুলতে পারেন, কিন্তু রোগীর অবস্থা ভোলেননা।

•

রোগীদের দিয়ে গাঁধা তামাক কমতেও কম দেখিনি।

কলুটোলায় পাইকারি ওষুধের কারবার এক সময় অবাঙ্গালী মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল আর সে মহলে ডা: বোসের দহরম মহরম ছিল পুরো তিনপুরুষ ধরে। যাঁদের তিনি বৃদ্ধ অবস্থায় চিকিৎসা করেছেন, যাঁরা তাঁর সমসাময়িক, আর যারা পরবর্তী যুগের অর্থাৎ পুত্রস্থানীয়—এই তিন পুরুষ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরা প্রয়োজনকালে তাঁর কথাই স্মরণ করতেন।

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে দু'জন বোরখা পরা অভিজাত পর্দানশীন মুসলমান নারী একটি গাড়ি করে এলেন।

এখানে ডা: বোসের আর একটি চেম্বারের কথাও বলে নিই।

দোতলার চেম্বারের খবর বলেছি। একতলার এই চেম্বারটি ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরে স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স নামক বিখ্যাত ওষুধের দোকানের দক্ষিণাংশে। তার দক্ষিণ দিকে তিনটি বড় বড় জানালা—তাতে লোহার মোটা শিক দেওয়া। আর পশ্চিমের দিকে দুটি বৃহৎ জানালা সম্পূর্ণ কাচ আঁটা ছিল। স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্সের শোকেস হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রধান প্রবেশ দ্বারের দু'দিকে তিনটি করে এই সুবৃহৎ কাচের জানালার পিছনে রঙিন জলভর্তি জার বা অনুরূপ ফার্মেসীর শো রাখা হত। আর এই কাচের তলায় বাইরের দিকে ছ'টি জানালার নীচে প্রকাণ্ড ছয়খানি শ্বেত পাথরে লেখা ছিল—

এ পাশের এই জানালা দু'টিকে ছাদ পর্যন্ত তোলা ওষুধের দুসারী কাচের আলমারি দিয়ে পার্টিশান করা; কেবল পূর্ব কোণে ডাক্তারের চেম্বারে যাতায়াতের পথ ছেড়ে রাখা ছিল। পূবে, বাইরের দিকে বারান্দায় দুটি বৃহৎ দরোজা। একটি কেটে এক সময়ে কার্লিয়াতের জানালা করা হয়েছিল, তার কিছু চিহ্ন ছিল। সে দরোজাটি বন্ধ থাকত। আর দরোজাটি খোলা থাকত—সেখান দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে বাড়ির ভিতর থেকে আসা যেত।

ঘরের ভিতর আসবাব সামান্য। একটা উঁচু লম্বা টেবিল দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে পাতা—দরকার হলে তার উপর রোগীকে শুইয়ে পরীক্ষা করা হত। কাচের আলমারির পাশে দু'খানি কালো ভারী বেঞ্চ পাতা। রোগীরা বসবে।

ডা: বোসের বসবার জন্য একটি প্রকাণ্ড ডেক চেয়ার, তাতে তিনি শুয়ে থাকতেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলবার সময় শুয়ে চোখ বুজে কথা বলতেন। ভারী ডেক চেয়ারের বেতের জাল ছিঁড়ে তার উপর কয়েকটুকরো কাঠের আবরণ। একটা গদি বিছানো থাকত, একটা মোটা বালিশের মত কাঁধে দেওয়ার জন্য। ডাইনের দিকে

ভাজ করা যেত না, লম্বা করা থাকত। যখন শুয়ে পড়তেন, তার উপর পা তুলে দিতেন। বাঁয়ের হাতল ভাজ করতেন, আবার লম্বা করতেন। বাঁয়ের হাতলের উপর রেখে নিজের নাম ছাপা কাগজে প্রেসক্রিপশান লিখতেন।

আর একটি ছোট টেবিলের উপর একটা কাঠের বাক্স থাকত। তার মধ্যেই ফি-এর টাকা ফেলতেন। বাক্সে কোন চাবি থাকত না। টাকা সব যে শেষ পর্যন্ত তাঁর ভোগে লাগত এমন নিশ্চয়তা ছিল না। তবে ওখান হতেই দু'হাতে ব্যয়-বিতরণ সবই চলতে থাকত। যেমন আয়, তেমন ব্যয়।

কাঠের বাক্সের পাশে একটি মুখখোলা ছোট্ট শিশি। প্যাকিং-এর কাঠের বাক্সের মধ্যে একটি কাচের দোয়াতে কালি আর একটা নিব পরানো কলম থাকত। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখতেন। ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করতেন না, কিনে দিলেও মুহূর্তমধ্যে হারিয়ে ফেলতেন। পকেটে ফাউণ্টেন পেন রাখতেন না, হাতেও ঘড়ি পরতেন না। তাঁর অফিস ঘরে একটা সেণ্ট টমাস দেওয়াল ঘড়ি ছিল—সেটাও সব সময় লক্ষ্য করতেন না। সময়ের আন্দাজ খুব স্পষ্ট ছিল।

যেমন দোয়াত-কলম নিচের চেম্বারে, তেমন দোয়াত-কলম উপরের চেম্বারে এবং অফিসের ঘরেও ছিল।

এ বাদে সেই উঁচু টেবিলের পাশে একটি সিগারেটের টিনের মত পাত্রে থাকত কতকগুলি লম্বা কাঠি এবং কিছু সাদা তুলো। আর পাশে ক'টি দু' আউন্স শিশি। এক শিশিতে কস্টিক লোশান থাকত। অধিকাংশ রোগীর গলা পরীক্ষা করে ঐ কাঠির ডগায় তুলো জড়িয়ে কস্টিক লোশান রোগীর গলার মধ্যে লাগিয়ে তুলাসহ কাঠিখানা একটা এনামেলের বালতিতে ফেলে দিতেন। বালতিটি তাঁর ডানদিকে সেই বড় উঁচু টেবিলটির তলায় থাকত। সারাদিন শেষে ভোরে ঘর পরিষ্কার করবার সময় বালতিটি মেথরে পরিষ্কার করে রাখত।

অন্য একটি শিশিতে থাকত—এবসল্যুট এলকোহল, ইনজেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ ধুয়ে পরিষ্কার করবার জন্য। একজন কম্পাউণ্ডার ইনজেকশন গুছিয়ে এনে দিত, তিনি ইনজেকশন দিয়ে দিতেন। শেষের দিকে আর নিজের হাতে ইনজেকশন দিতেন না, কেবল কি ইনজেকশন হবে লিখে দিতেন।

তাঁর সেই প্রকাণ্ড ডেক চেয়ার খানির সুমুখে থাকত কালো রং-এর ভারী ও প্রশস্ত একখানি টুল, তাতে রোগী বসলে তিনি পরীক্ষা করতেন। অনুরূপ একখানি টুল তাঁর চেয়ারের বাম পাশেও থাকত।

ওই টুলে এসে বসেছেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতী, বোম্বাই-এর আর একজন স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ। তিনি এই সব বিশিষ্ট অতিথিদের এই চেম্বারে বসিয়ে কথাবার্তা বলতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করতেন না। তাঁর নিজস্ব কেতাদুরস্ত কোন বসবার ঘর ছিল না, নতুন বাড়ির মধ্যে সোফাসেট সাজানো বসবার ঘর ছেলেরা করেছিলেন। তিনি সেখানে কোন দিন গিয়ে বসতেন না।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কি নিচের এই চেম্বারে, কি দোতলার অফিস ঘরে—কোথাও তাঁর বসবার ঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। পাখা ছিল অফিসে, পাখা ছিল ড্রাগ স্টোর্সের বড় ঘরের মাঝখানে। এমন কি ল্যাবরেটরির মধ্যেও ফ্যান ঘুরত। তিনি ব্যবহার করতেন তালপাতার হাতপাখা। যখন চোখ বুজে শুয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতেন, নিজের হাতেই পাখা চালাতেন

উপরে অফিস-ঘরে শক্ত তক্তপোশের উপর একটা তোষকে সাদা চাদর পাতা আর দুটি বালিস, এই ছিল তাঁর বিছানা। সেখানে কখন সখন তাঁর খাস চাকর দয়া তাঁর গায়ে তালপাতার পাখা চালিয়ে হাওয়া দিত আর তিনি হয়ত পড়তেন বা লিখতেন। এ সবই অবশ্য রাতের বেলার ব্যাপার।

তাঁর একমাত্র বিলাস ছিল রাতে শোয়ার পর দয়া বা অন্য কোন চাকরকে দিয়ে গা দলাইমলাই করা। বলতেন—এটা হল প্যাসিভ এক্সারসাইজ। ওটা না হলে শরীর সুস্থ থাকে না। দয়া গা দলে দলে মাটি তুলে দিত আর তিনি শুয়ে শুয়ে আমাদের কারো সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতেন। [ক্রমশ।

স্বপ্ন

এডগার অ্যালান পো

অন্ধকার রজনীর দৃষ্টির আলোকে
আনন্দের স্বপ্ন দেখি, যদিও প্রস্থিত—
জাগ্রত দিনের স্বপ্ন সকল আমার
হৃদয়ের উদ্দীপনা করেছে দমিত।

দিবাস্বপ্ন নয় যার নিকটে এমন
কারো চোখে উদ্ভাসিত প্রদীপ্ত জ্যোতিতে
চারিদিকে বস্তুচয় যাহা আছে পড়ে,
পশ্চাতে তাকাবে সে কি সন্দেহ অতীতে?

সে রম্য স্বপ্নের কথা সুন্দর, যখন
ভর্ৎসনার পালা চলে সমস্ত ভুবনে
উৎসাহিত করে যেন সুন্দর কিরণ
একটি নির্জন আত্মা পথ-প্রদর্শনে।

যদিও সে আলো ঝড়ে কিংবা রজনীতে
বহুদূর হতে কাঁপে, ঝরে পড়ে চোখে;
কী আছে অধিক দীপ্ত নিষ্কলঙ্ক হয়ে
দিনের তারার মধ্যে সত্যের আলোকে?

——: অধীর সরকার

নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত একটি জেলা ও শহর। নদীয়া বা নবদ্বীপ নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এই নদীয়াতেই বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। বল্লাল সেনের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ ও বল্লাল দীঘি আজও তার সাক্ষ্য দেয়। এই স্থানেই শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করে বৈষ্ণবধর্মের ভেরী নিনাদিত করেন, এই স্থানেই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, জটিয়াজাদু তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্বোধন করেন। নৈয়ায়িক ও স্মার্ত পণ্ডিতগণ বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন প্রমুখ তাঁদের বিজয়কেতন ওড়ান। এই স্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চায় পণ্ডিতগণ যশোমালা লাভ করেন। এই স্থানেই ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই জেলার অন্তর্গত পলাশীতে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লাইভ বিজয়পতাকা উড়িয়ে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই স্থানেই কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সুললিত ছন্দে কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি, শূলপাণি প্রধান স্মার্ত, জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী প্রধান কবি নবদ্বীপ-সভা উজ্জ্বল করেছিলেন।

নবদ্বীপের উৎপত্তি নিয়ে নানা কাহিনী শোনা যায়। গঙ্গার চরের উপর নতুন বসতি, নতুন দোকান-পসারী, নতুন জনপদ স্থাপন হওয়ায় এর নাম হয় নবদ্বীপ অর্থাৎ নতুন দ্বীপ। কেহ বলেন নতুন চরে বসতি হওয়ার পরে কোন নির্জন স্থানে এক সন্ন্যাসী এখানে যোগ সাধনা করতেন। তিনি ৯টি দীপ জ্বেলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। নৌকারোহী যাত্রিগণ দূর থেকে ঐ জ্বলন্ত ৯টি দীপ দেখে এই স্থানকে নদিয়ার (প্রদীপ) চর বলে অভিহিত করতেন। সেই থেকে এর নাম নদীয়া হয়েছে। 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থের প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস নবদ্বীপ পরিক্রমা বিবরণে এই স্থানটিকে ৯টি দ্বীপের সমষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। সেই ৯টি দ্বীপের নাম—
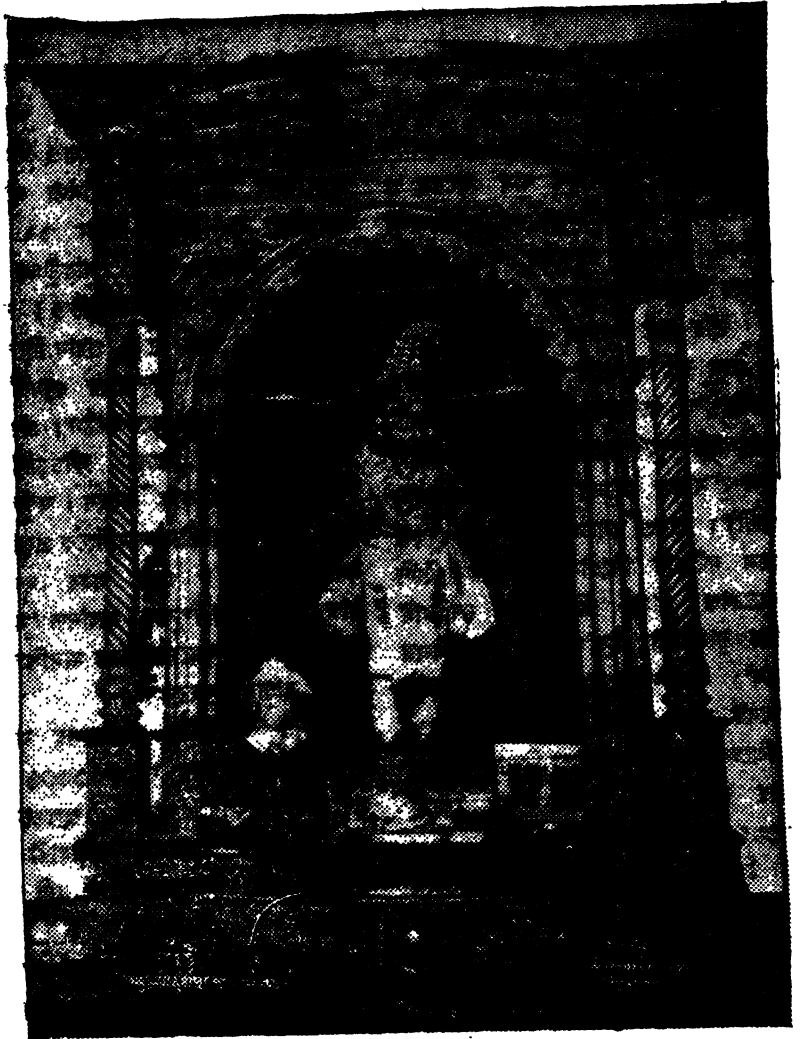
(১) অন্তর্দ্বীপ—এই স্থান প্রকৃত নবদ্বীপ। (বর্তমানে নদীয়া শহর ও বাবলাবাড়ী স্থান)।

(২) সীমান্তদ্বীপ—এই স্থান নবদ্বীপের উত্তরে। বামুনপুকুর। মিঞাপাড়া, বল্লালদীঘি।

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ—(গাদি গাছা, সুবর্ণ বিহার মহাপগার)।

(৪) মধ্যদ্বীপ—(মাজিদা, ভালু, পানশীলা এর অন্তর্গত)।

(৫) কোলদ্বীপ—নবদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

(৬) ঋতুদ্বীপ—নবদ্বীপের পশ্চিমে। (রাহুতপুর ও বিদ্যানগর এর অন্তর্গত)।

(৭) মোদদ্রুমদ্বীপ—নবদ্বীপের [illegible] পশ্চিমে। (মামগাছি, মহৎপুর, রুদ্রাণীতলা এর অন্তর্গত)।

(৮) জহ্নুদ্বীপ—নবদ্বীপের পশ্চিমে। জাননগর, পারুলিয়া ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

(৯) রুদ্র দ্বীপ—নবদ্বীপের পশ্চিম-উত্তর। রুদ্রডাঙ্গা, শঙ্করপুর ও পর্বস্থলী এর অন্তর্গত।

ঐতিহাসিক দিক্ দিয়ে দেখা যায় আগে নবদ্বীপে বেশ সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক ছিল। এখানে গৌড়-অধিপতি আদিশূরের রাজধানী ছিল বলে অনেকে বলেন। এই আদিশূর থেকেই নবদ্বীপের প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। পুত্র

ভূসুর গৌড়ের সিংহাসনে বসবার অল্পদিন পরেই মগধাধিপতি ধর্মপাল কর্তৃক পরাজিত হয়ে গৌড়নগর ত্যাগ করে নবদ্বীপে বাস করেন ও নবদ্বীপের দক্ষিণে পুণ্ড্র নামে রাজধানী স্থাপন করেন। ভূসুরের পুত্র ক্ষিতিশূরের সময়েই শূরবংশের অবসান হয়।

তার পর আসেন সেন বংশ।

সেন বংশের আদি রাজা সামন্ত সেন। নবদ্বীপের বর্তমান সিমুলিয়া স্থানটি বোধ হয় পূর্বে সামন্তদ্বীপ বা সীমন্তদ্বীপ ছিল সামন্ত সেনের নামে। (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। সামন্ত সেনের পর পুত্র হেমন্ত সেন নদীয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। নবদ্বীপই তাঁর রাজধানী ছিল। তাঁর পুত্র বিজয় সেন নবদ্বীপ-সিংহাসনে বসে অল্প দিনেই সমস্ত বাংলা, বিহার, কামরূপ ও কলিঙ্গের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১০৭২ খৃঃ থেকে ১০৭৬।

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে বসেন (১০৯৭-১১৬৮ খৃঃ)। বল্লাল সেন যেমন রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তেমনি সমাজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সদাচার রক্ষার জন্য কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন। 'দানসাগর', 'অদ্ভুত সাগর' নামে গ্রন্থরচনাও করেন। রাজধানী নবদ্বীপে বাস করার জন্য বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখানে এসে বাস করেন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন রাজা (১১৬৮—১২০৩ খৃঃ) হয়ে গৌড়ের নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন।

লক্ষ্মণ সেন শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি তিনটি রাজধানী করে ছিলেন—একটি নবদ্বীপ, দ্বিতীয়টি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে ও তৃতীয়টি বিক্রমপুরে। তিনি শেষবয়সে পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে নবদ্বীপেই বাস করতেন। লক্ষ্মণ সেন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন—নানা পণ্ডিত গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী কবিরাজ, শূলপাণি, হলায়ুধ প্রমুখ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন।

লক্ষ্মণ সেনের সময় পাঠানেরা গৌড় অধিকার করেন। এর পর বাঙলাদেশ মুসলমানদের অধিকারে আসে। মুসলমানদের অধিকারে এলেও বাঙলার ভূস্বামিগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করতেন না—তাঁদের মধ্যে ১২ জন প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁরা বারভূঁঞা বা দ্বাদশ ভৌমিক বলে পরিচিত। রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর মধ্যে প্রধান ছিলেন।

প্রতাপাদিত্য আকবরের শেষজীবনে তাঁর দুর্দমনীয় শত্রু হয়ে ওঠেন। প্রতাপাদিত্য নদীয়ার মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার কিছু অংশ অধিকার করেন। আকবরের মৃত্যু হলে জাহাঙ্গীর মানসিংকে প্রতাপের দমনে পাঠান। সেই সময় নবদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপকে দমনের জন্য মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ভবানন্দের কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ১৬০৬ খৃঃ নদীয়া মহৎপুর, লেপা, সুলতানপুর প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমীদারী দান করেন এবং 'মজুমদার' উপাধি দান করেন।

ভবানন্দ রাজা হয়ে নদীয়া জেলায় মাটিয়ারী গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গোপাল উত্তরাধিকারী হন। গোপালের পর রাঘব ১৬১৮ খৃঃ সিংহাসনে বসেন। তিনি মাটিয়ারি ত্যাগ করে নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও উলার মধ্যস্থিত রেউই নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা রাঘব এই রেউই নগরের চারদিকে পরিখা বেষ্টন করেন। প্রশস্ত রাজপথ তৈরী করেন, দীঘিনগরে প্রকাণ্ড দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিতদের প্রতিপালক ছিলেন।

রাঘবের পুত্র রুদ্র (১৬৬৯ খৃঃ) রেউই নগরের নাম পরিবর্তন করে 'কৃষ্ণনগর' নাম রাখেন। তিনি সম্রাট কর্তৃক মহারাজা উপাধি লাভ করেন। বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ ও দীঘি খনন করেন। তিনি 'জয়ানন্দসার' নামে বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

মহারাজ রুদ্রের দুই রাণী। জ্যেষ্ঠার গর্ভে—রামচন্দ্র ও রামজীবন। [illegible] গর্ভে রামকৃষ্ণ। রুদ্রের পরলোক গমনের পর প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে রামজীবন জমীদারী পান। কিন্তু কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ রামজীবনকে কৌশলে ঢাকায় কারারুদ্ধ করে জমীদারী হস্তগত করেন।

মহারাজ রামকৃষ্ণ বিদ্যোৎসাহী—নবদ্বীপে আগত বিদেশী ছাত্রদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের জন্য বহু ভূমি ও সম্পত্তি দান করেন। বহু অধ্যাপক পণ্ডিত ও ছাত্রেরা এই সম্পত্তির আয় থেকে প্রতিপালিত হত। পণ্ডিতসমাজ তাঁকে এই মহৎ কাজের জন্য 'নবদ্বীপাধিপতি' উপাধি দান করেন। সেই থেকে এই উপাধি তাঁদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে। আর এক তাঁর কীর্তি নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রাজপথ তৈরী করা। এই সময়ে তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণরের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি হওয়ায় ইংরেজরা তাঁর ব্যবহারের জন্য দু'হাজার সৈন্য মোতায়েন রাখত। কিন্তু তৎকালীন নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সঙ্গে তাঁর মনান্তর হওয়ায় তিনি ঢাকায় বন্দী হন ও সেখানে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রামজীবনের পুত্র রঘুরাম রাজ্যের অধিপতি হন। রঘুরামের মত হৃদয়বান ও ধনুর্ধর বীর সেকালে বড় একটা কেউ ছিলেন না। তিনি বারোকোটির যুদ্ধে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সেনাপতি লাহরি মলকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন ও রাজশাহীর বিদ্রোহী রাজা উদয়চাঁদের সেনাপতি আলি মহম্মদকে তীরবিদ্ধ করে নিহত করেন। এদেশে তিনি 'রঘুবীর' বলে পরিচিত ছিলেন। ১৩ বছর রাজত্ব করার পর রঘুরাম নাবালক পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে রেখে ১৭২৮ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। তখন রঘুরামের বৈমাত্রেয় ভাই রামগোপাল উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তিনি অলস, ব্যসনাসক্ত হওয়ায় নবাব সাহসুজা কৃষ্ণচন্দ্রকেই সিংহাসনে বসান।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল (১৭২৮-১৭৮২)। তাঁর সময়কে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ' বলা হত। তিনি নবদ্বীপের

ধর্মগুণান্বিত রাজা। জমীদারী পেয়ে তিনি দেখলেন নবাব সরকারের কাছে তাঁর পৈতৃক ঋণ কুড়ি লক্ষ টাকা। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঋণের অর্ধাংশ পরিশোধ করেন। কিন্তু নবাব আলিবর্দি খাঁ বাকী টাকার জন্য তাঁকে উৎপীড়ন করেন, মর্শিদাবাদে বন্দী করেন। সেই সময় তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের চেষ্টায় অধিকাংশ ঋণ পরিশোধ হওয়ায় তিনি মুক্তি পান। জমীদারীর অবস্থা ভাল ছিল না। নবাব সরকার বাকী খাজনার দায় থেকে তাঁকে মুক্তি দেয়।

তখন হতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যের নানা হিতকর কাজে মনোনিবেশ করেন। মাজদিয়া রেল স্টেশনের কাছে চূর্ণী নদীর তীরে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম স্থাপন করেন। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। কৃষ্ণগঞ্জের কাছে ইছামতীর তীরে 'শিবনিবাস' নামে এক নগর স্থাপন করেন। সেখানে সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরী হয়। রাণাঘাটের কাছে চূর্ণী নদীর পূব ও পশ্চিম পাড়ে 'হরধাম' ও 'আনন্দধাম' নামে আরও দুটি প্রাসাদ তৈরী করেন। প্রাসাদের নাম অনুসারে গ্রাম দু'টির নাম হয় হরধাম ও আনন্দধাম। এ ছাড়া অনেক দেবদেবীর মূর্তি তিনি স্থাপন করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় দেশে নানা বিপর্যয় হয়। ইংরেজের কাছে সিরাজের পতন হয়। নবাবকে পদচ্যুত করবার জন্যে যে ষড়যন্ত্র হয় কৃষ্ণচন্দ্র যে তাঁর প্রধান সহায়ক, তা ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন। ইংরেজরা তাঁর পরামর্শ ও সহায়তালাভের জন্য (লর্ড ক্লাইভ) দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে 'রাজেন্দ্র-বাহাদুর' উপাধি আনিয়ে দেন আর পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ১২টি কামান তাঁকে উপহার দেন। সে কামান রাজবাড়ীতে এখনও দেখা যায় (Bengal District Gazetteer Nadia, P. 169)।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজনীতি অর্থনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর সভা প্রকৃত বিদ্বজ্জনপুষ্ট রাজসভা ছিল। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন, গোপাল ভাঁড়, বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই সভা অলঙ্কৃত করতেন।

শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসাহ ও প্রচারের জন্য পারিতোষিক দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী করেন ও ১৭৮২ খৃঃ পরলোক গমন করেন।

মহারাজা শিবচন্দ্র (১৭৮২-১৭৮৮), তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের (১৭৮৮-১৮০২), মৃত্যুর পর মহারাজা গিরিশচন্দ্র উত্তরাধিকারী হন। তিনি এই বাঙলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। গিরিশচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। তিনি মহারাজা শ্রীশচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্র (১৮৪১—১৮৫৬ খৃঃ) তন্ত্রোক্ত 'নীলদুর্গা' পূজা অধিকার করেন।
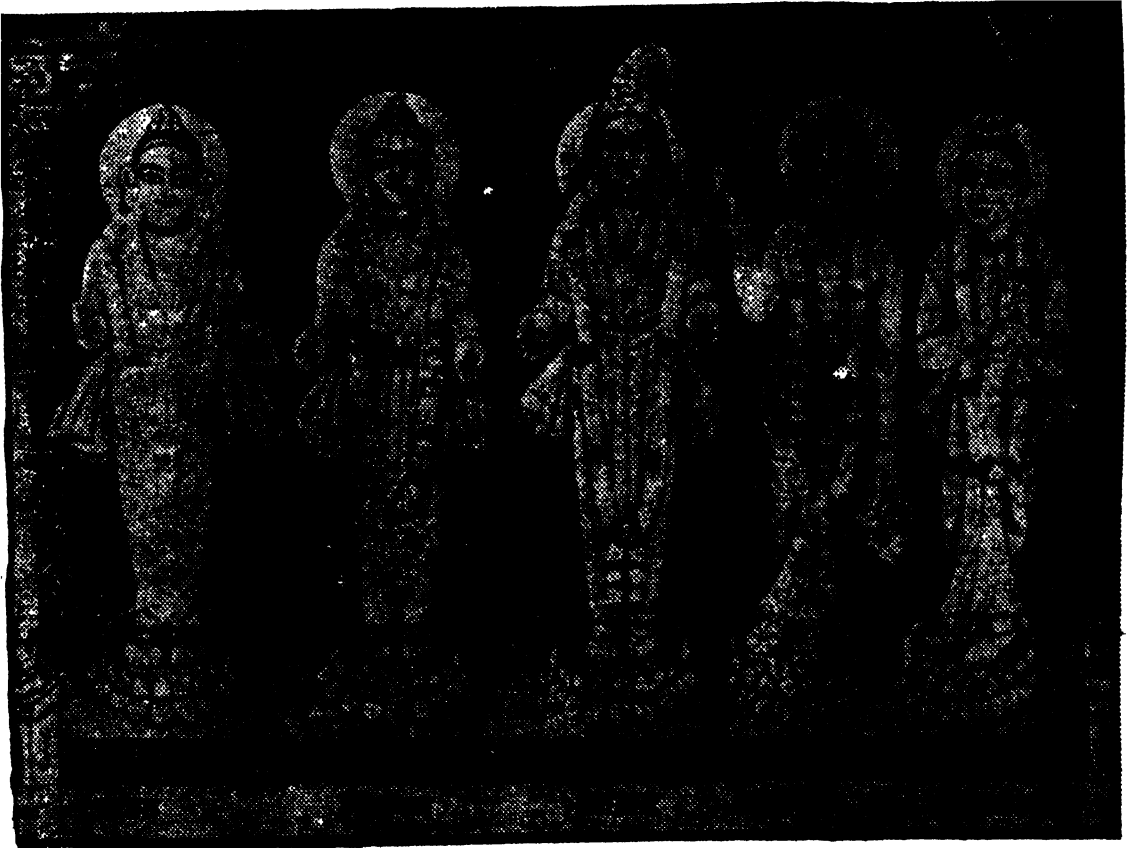
[illegible]

অবস্থা বংশোদ্ভিত্তে। ঐ পুত্র এখনও কোনও কোনও স্থানে হয়ে থাকে। তিনি ১৮৫৬ খৃঃ মারা যান। এর পর সতীশচন্দ্র। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭০ খৃঃ। তাঁর বিধবা পত্নী মহারাণী ভুবনেশ্বরী মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯১১ খৃঃ। তাঁর একমাত্র পুত্র মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র। মৃত্যু ১৩৩৫ সালে। তাঁর পুত্র সৌরীশচন্দ্র। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর জমীদারী প্রথার বিলোপ হয়। নদীয়া জেলার উত্থান ও পতনের এই ইতিহাস।

সীমা—পূর্বদিকে চব্বিশ পরগণা, উত্তর-পূব—পাকিস্থান, উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে—বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী।

আয়তন—১৫১৪ বর্গ মাইল।

লোকসংখ্যা—১,৭১৩,৩২৪ (১৯৬১)।

মহকুমা—রাণাঘাট (৫৪০ বর্গ মাইল) সদর (৯৬৯ বর্গ মাইল)।

নদী-খাল-বিল

নদীয়া জেলায় অনেকগুলি নদী আছে।

ভাগীরথী—মুর্শিদাবাদ জেলা হতে নবদ্বীপের তলদেশ হয়ে জলঙ্গীতে মিশেছে।

জলঙ্গী বা খড়ে নদী—পদ্মা থেকে বেরিয়ে এসে করিমপুরে নদীয়া জেলার উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণনগরের তলদেশ দিয়ে নবদ্বীপ-এর পাদদেশ হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে।

চূর্ণী নদী—কৃষ্ণগঞ্জ হতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে হাঁসখালি, রাণাঘাট, হরধাম প্রভৃতি হয়ে শান্তিপুর, চাকদহের মধ্যবর্তী হুগলী নদীতে পড়েছে।

মাথাভাঙ্গা বা হাবুরী নদী—পদ্মা ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থানে হতে প্রায় ৫ মাইল নিচে দিয়ে মাথাভাঙ্গা বা হাবুরী নদী বের হয়ে কৃষ্ণগঞ্জের কাছে দু'ভাগ হয়েছে। এই দু'ভাগের একভাগ হচ্ছে চূর্ণী ও আর একভাগ ইছামতী।

এ জেলায় বর্তমানে এখানে কয়েকটি ক্ষীণকায় নদী আছে—কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে অঞ্জনা, কাঁকিকাটা নদী। খাল ও বিল অনেক আছে।—বাপুদেবী খাল, হরিহর খাল, যমুনার খাল, বাচকোর খাল, হাড়খালি বিল, হাঁসডাঙ্গা বিল, উরুং বিল, ফোগাছির বিল, রায়সা বিল, সোনাডাঙ্গা বিল ইত্যাদি।

রাজপথ

কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুরে, শিবনিবাসে, নবদ্বীপে, রাণাঘাটে, পলাশীতে। শিবনিবাস থেকে রাণাঘাট [illegible] থেকে নবদ্বীপ। রাণাঘাট থেকে শান্তিপুর ইত্যাদি রাজপথ আছে।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান

নবদ্বীপ—লোকসংখ্যা ৭২,৮৬১ (১৯৬১)।

এই স্থান ঐতিহাসিক দিক থেকে, শিক্ষাকেন্দ্ররূপে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থস্থানরূপে বিশেষ সমাদৃত। এখানে বহু পণ্ডিত ও মনীষীর জন্মস্থান। ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য মনীষীরা এ দেশকে Oxford of India বলতেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে, বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ১২০৩ খৃঃ পাঠান সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি রাজধানী আক্রমণ করে বিজয়ী হন। সেই থেকে মুসলমান-শক্তি স্থাপিত হয়। এখানে ভট্টাচার্য বংশের শাখা, মণিপুরের রাজবংশ, [illegible] দাস বংশ এবং বহু পণ্ডিত বংশ উল্লেখযোগ্য।

নবদ্বীপ ঘাট—গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলের ওপর এই স্থান। এখানের গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নবদ্বীপ শহর ও পূর্ব তীরে মায়াপুর। মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মস্থান। এই স্থানটির প্রকৃত নাম [illegible]।

মহেশগঞ্জ—নবদ্বীপের মহেশ পাল চৌধুরীর নামে স্থাপিত।

[illegible]—[illegible] নবদ্বীপের

[illegible] [illegible] স্থাপিত।

কৃষ্ণনগর—লোকসংখ্যা ৭০,[illegible] (১৯৬১)। কৃষ্ণনগরের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর সিটি নদীয়া জেলার সদর শহর। কলকাতা থেকে ৬২ মাইল। শহরের উত্তরে জলঙ্গী নদী। পূর্বে এর নাম ছিল 'রেউই'। মহারাজ রুদ্র নাম পালটে কৃষ্ণনগর রাখেন। এখানে রাজপ্রাসাদ, রাজবংশের ঠাকুর বাড়ী আছে। রাজবংশ ছাড়া এখানে কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশ—দেওয়ান রায় বংশে, কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কবি ও নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঘোষ বংশে প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, বাগ্মী লালমোহন ঘোষ, লাহিড়ী বংশে রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ বহু পুরাতন। বহু ইংরেজ শিক্ষাব্রতী এই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শান্তিপুর—লোকসংখ্যা ৫১,১৯০ (১৯৬১)। প্রাচীন গ্রাম। কলকাতা থেকে ৫৪ মাইল। পূর্বে শান্তিপুরের তিন দিক দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হত। এখন গঙ্গা দূরে পশ্চিম দিকে সরে গেছে। শান্ত মুনির বাস ছিল বলে শান্তিপুর অথবা গঙ্গার তীরে শান্তিতে জীবন যাপন করত বলে শান্তিপুর নাম হয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বাসভূমি বলে শান্তিপুরের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয়। হুসেন শাহের আমলে একজন কাজি এই শান্তিপুর থেকে রাজ্য শাসন করতেন। শান্তিপুর বৈষ্ণবদের একটি শ্রীপাট। শান্তিপুরের অধিকাংশ পালপার্বণ মহাসমারোহে পালিত হয়। রাস উৎসব প্রসিদ্ধ।

১৮২৮ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক রেসিডেন্সী এখানে স্থাপিত হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ও হাজার হাজার টন চিনি এখান থেকে বিলেতে চালান হত। লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এখানে রেসিডেন্সীর মর্মরখচিত প্রাসাদ তৈরী হয়। দর্শনীয়

স্নান বিভায় টিনল হল, গোস্বামীদের রাটমন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির ইত্যাদি।

শান্তিপুরের কাছেই গঙ্গাধরপুর, বাওীঘাট, নাদঘাট প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি নীলকুঠি ছিল। ১৮২২ খৃঃ ছিল, ওয়ারডেন ও টুইন নামে তিনজন লণ্ডন মিসনারি সোসাইটির সাহেব এখানে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে আসেন। ১৮৪৬ খৃঃ কলকাতার লর্ড বিশপও এসেছিলেন। এই সময়ে শান্তিপুরের কিছু দূরে এক বিরাট কারখানা ছিল। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র ছিল। পূর্বে এখানে সাহিত্য-কীর্তিরও স্থান ছিল। ১৮৮৬ সালে এখানে এক মুদ্রাযন্ত্র (কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র) স্থাপিত হয়। মুদগর, রঙ্গভূমি, যবক প্রভৃতি মাসিকপত্র, ভারতভূমি, সেবা, প্রভৃতি সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশিত হত। এখানে বহু প্রসিদ্ধ বংশের বাস—গোস্বামী বংশ, রায় বংশ, খাঁ চৌধুরী বংশ, চট্টোপাধ্যায় বংশ, মুখার্জী বংশ, প্রামাণিক বংশ প্রভৃতি বংশে অনেক কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

শান্তিপুরের কাছেই উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলির মধ্যে—

বাগ-আঁচড়া—বাগদেবীর স্থান বলেই বাগ-আঁচড়া এখানে সাধক রঘুনন্দন সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন ১৬শ শতাব্দীতে। চাঁদ রায় এখানকার কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন।

ব্রহ্মশাসন—চাঁদ রায় কর্তৃক এই গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি জগদ্ধাত্রী দেবীর মূর্তি ও পূজাবিধি প্রচলন করেন।

আমঘাটা—কৃষ্ণচন্দ্রের সুরম্যপ্রাসাদ 'গঙ্গাবাস'।

উলা-বীরনগর—চূর্ণী নদীর পশ্চিম-তীরে অবস্থিত উলার আধুনিক নাম বীরনগর। কলকাতা থেকে ৫১ মাইল। প্রবাদ আছে উলুবনের জঙ্গল কেটে এই গ্রাম তৈরী হয়েছিল। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে ডাকাতির খুব উপদ্রব হয়। উলার অধিবাসিগণ এক-যোগে ডাকাতদের ধরে দমন করেন। গ্রামবাসীরা সেই সব লোকদের 'বীর' বলে ডাকত। তাই থেকে সরকার গ্রামটিকে বীরনগর আখ্যা দেয়। এই গ্রাম বর্ধিষ্ণু। কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশের মধ্যে—

মুখোপাধ্যায় বংশ—মহাদেব মুখোপাধ্যায় রংপুর কুঠির কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জমীদারী ক্রয় করেন এই বংশে বামনদাস, শম্ভুনাথ, রাধানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য পুরুষ।

মুস্তফী বংশ—এই বংশের কৃতী পুরুষ রামেশ্বর মিত্র নবাব সরকারে উচ্চপদে কর্ম করে 'মস্তফী' উপাধি পান।

খাঁ বংশ—কুণ্ডু বংশোদ্ভব খাঁ বাবুদের আদি পুরুষ মুর্শিদাবাদে সুপারির ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এই বংশের নীলাম্বর কুণ্ডু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে 'খাঁ' উপাধি পান।

উলার কাছের গ্রাম পাহাড়পুর, খিসমা, মামজোয়ান, আড়বন্দী, বাদকুলা এককালে বিখ্যাত ছিল।

রাণাঘাট—নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা। লোকসংখ্যা ৫৫,১০০ (১৯৬১)। কলকাতা থেকে ৪৫ ১/২ মাইল। চূর্ণী নদীর তীরে। রণা নামে কোন এক ডাকাতের ঘাঁটি বা আড্ডা ছিল বলে এর নাম রাণাঘাট হয়।

পাল চৌধুরী বংশ—রাণাঘাট পাল বংশীয় কৃষ্ণপান্তির জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণপান্তি ১১৫৬ সালে দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যবসায়ে অধ্যবসায়ের ফলে প্রচুর সম্পদ লাভ করেন। সাঁওার পরগণা তাঁদের সর্বপ্রথম জমীদারী। মহারাজ শিবচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে চৌধুরী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। হেস্টিংস সাহেব রাণাঘাটে এসে কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরীর অগণিত অশ্ব, প্রাসাদোপম সৌধশ্রেণী ও বিরাট ঐশ্বর্য দেখে তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করতে চান। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী বিনয়বশত উহা প্রত্যাখ্যান করেন ও নদীয়ারাজ প্রদত্ত উপাধিই গ্রহণ করেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। এই বংশের জয়গোপাল, শ্রীগোপাল, জয়চাঁদ প্রভৃতিও দানশীল ছিলেন।

দে চৌধুরী বংশ—রামসুখ দে-চৌধুরীও ব্যবসায়ে উন্নতি করে জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি ধর্মশীল ছিলেন ও বার মাসে তের পার্বণ করতেন। এই বংশের দাতারাম, শ্রীনাথ, রামলাল প্রমুখ খ্যাত। রাণাঘাটে তৎকালে 'বাবু' বললে রামলালকে বোঝাত। লোকে বলে পালচৌধুরী ও দে-চৌধুরী নিয়েই রাণাঘাটের ইতিহাস।

মাটিয়ারির মল্লিক বংশ—মল্লিক উপাধি হলেও পাল এঁদের পদবী। দিল্লীর দরবার থেকে এই উপাধি আসে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

নিমেষে গতি নিয়ন্ত্রণ

মহাকাশযান-এর গতি নিয়ন্ত্রণ এক অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কত যন্ত্রপাতি কত সূক্ষ্ম কৌশল, কত কম্পিউটার—কত কি। যেখানে সামান্য ভুলে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, সেখানে সাবধানতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বস্টন-এর হানিওয়েল কোম্পানী এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যা দ্বারা চোখের পাতার নড়াচড়ার সাহায্যে মহাশূন্যের অভিযাত্রী তার অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। যন্ত্রটির নাম 'অকিউলোমিটার'। অনেকানেক যন্ত্রপাতি এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে; এমন কি শারীর-তাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাদির কাজেও লাগান যাবে। এ যন্ত্রের কাজ পরিচালিত হয় নিম্নলিখিত ভাবে—

চোখের তারা ও পল্লবের সীমা-রেখার পরিবর্তন এবং কনিয়ার ওপর যান্ত্রিক আলো ক্ষেপণ—এই উভয় ব্যাপারকে কাজে লাগিয়ে।

প্রকৃতির ওপর অনেক কিছুই যখন মানুষের কাছে ধরা দেয়নি তখন তাকে প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল হয়ে চলতে হ'ত।

জাহাজের মাল্লা-মোড়লরা ঘুমোচ্ছে। কর্মব্যস্ততা সুরু হ'বার আগে বিশ্রাম সুখের শেষপর্ব। কিন্তু সবার ঘুমোলে চলে না এ সময়ে, দায়িত্বের ভার গুরুভার, তাই জেগে আছে জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং তার প্রধান সহকারী।

ক্যাপ্টেন তার ক্যাবিনে একটি মানচিত্রের মধ্যে তন্ময় হয়ে আছে। অথবা সেটি উপলক্ষমাত্র, মন ডুবে আছে অন্য চিন্তায়, কে জানে? টেবিলের অন্য কোণে সরাপূর্ণ পাত্র, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অবহেলায় লাঞ্ছনায় রক্তাভ সুরা যেন আরও রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দরজা খুলে দিয়ে এক ঝলক হাওয়া কয়েকটি কাগজপত্র ছড়িয়ে ফেললো।

জাহাজী জীবনে হাওয়ার, বেয়াদবি গা-সহা হয়ে যায়। মুখ না তুলেই ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলো 'সব ঠিক আছে, গুইলো?' গুইলম ফেলিপো তার বিশ্বস্ত সহকারী।

'না, সব ঠিক নাই, ক্যাপ্টেন। ঠিক ঐভাবে বসে থাকো।'

নারীকণ্ঠ। চোখ তুলে তাকালে ক্যাপ্টেন। সুন্দরী বরনারী, বেশ-ভূষায়ও আভিজাত্যের ছাপ, কিন্তু হাতে পিস্তল। নেটিভ সন্দেহ নাই। অথচ দিশী জেনানার এত রূপের জৌলুস হয়? দিশী জেনানার এত সাহস থাকে?

সভ্য জাতের স্বভাবজাত সৌজন্য-বোধে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বাধা পেল। না, না, দরকার নেই, যেমনটি বসে আছ, তেমনটিই বসে থাকো সঁনিয়ে—'

'পিয়েরে অ্যালবার আমার নাম। তুমি হয়তো পরিচয় দেবে না, মনে হয়?'

'অনুমান মিথ্যা নয় সঁনিয়ে অ্যালবার। এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি অভিসারে আসি নি, এসেছি প্রয়োজনে।'

নির্ভুল উচ্চারণ, বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষা, অ্যালবার বিস্মিত। তার যৌবন-দীপ্ত ললাটে কুঞ্চনের রেখা।

'অভিসারিণী নারীর চোখে ওরকম শাণিত দৃষ্টি থাকে না, সুন্দরীর, কণ্ঠস্বরে ইস্পাতের কাঠিন্য থাকে না, হাতে মারণাস্ত্রও থাকে না। কী তোমার প্রয়োজন?

'প্রয়োজন কথাটি ঠিক হ'ল না, বলবো অনুরোধ, রাখবে কী?'

'নারীর অভিলাষ পুরুষ যথাসাধ্য পূর্ণ করে, বিশেষ করে তোমার মত রমণীর। কিন্তু পুরুষ যদি সে ইচ্ছা পূরণে অসমর্থ হয়?'

দিবাদর্শী

'তার প্রতিকারের উপায় আমার হাতেই রয়েছে, দেখতে পাচ্ছো।'

'অনুরোধটি উপস্থিত করেছ আদেশের পরিচ্ছদে, এসেছ প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান নিয়ে, কেমন? কিন্তু হে অপরি চিতা রমণী, ভীতিপ্রদর্শনে নতি-স্বীকার করাতে পারবে না আমাকে। তুমি ভুল বুঝেছো।'

চমৎকার অভিনয় সঁনিয়ে অ্যালবার না, না, তোমার ডান হাতটি কটিদেশে এগিয়ে যাচ্ছে, ওখানে কোমরবন্ধের চামড়ার খাপে পিস্তল রয়েছে মনে হয়। ঐ অপরিণামদর্শী হাতটিকে গুটিয়ে নাও। না, না, দরজার দিকে বারে বারে তাকিয়ে কোনও লাভ নেই, ওখানে আমারই লোক পাহারা দিচ্ছে, তোমার সহকারীটির উপযুক্ত ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে। তোমার মত সুশ্রী যুবক এবং আমার মত সুন্দরী নারীর এই নিভৃত-প্রেমালাপে বাধা দেবার কেউ নাই।'

অ্যালবারের ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। কিন্তু ভয়ের আভাষ নাই, মানসিক চাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন নাই, ধীর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'ঐ অনাস্বা-দিত সুরা-পাত্রটি তুলে নিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর স্বপ্নলোকের মায়াবিনী, তোমার অধরস্পর্শে সুরা ধন্য হোক। দস্যুর বেশে এলেও তুমি আমার অতিথি, আমাদের জাত অতিথি-সৎকারের জন্য বিখ্যাত, তা বোধ হয় জান?'

রূক্ষকণ্ঠে জবাব এল গর্ব করবার অনেক কিছুই থাকতে পারে তোমাদের জাতের, কেমন? অসহায় বিদেশীদের ধরে নিয়ে কুকুর-বেড়ালের মত বিদেশে

বিক্রী করাটাও খুব গর্বের বিষয়, নয় ? তোমাদের নিজের দেশে দাস-ব্যবসা আছে ? এই পাপেই তোমরা এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। পর্তুগীজরা সুরু করেছিল এ ব্যবসা, তারা টিকতে পারে নি এ দেশে, ইংরেজরা এ ব্যবসা করে না, তাদের ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, ওলন্দাজ ও দিনেমাররা দিশী লোকদের খুশী রাখতে জানে আর তোমরা ফরাসীরা? ছিঃ ছিঃ নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছো।'

'কিন্তু রাজনীতি আলোচনার স্থান ও কাল এটি নয়, অপরিচিতা সুন্দরী। আমি জাহাজ কোম্পানীর ভৃত্যমাত্র। তোমার প্রয়োজনটি কী স্পষ্ট করেই বল।'

'বাইশটি যুবক এবং একটি তরুণীকে খাঁচায় পুরে রেখেছ জাহাজের গুদামঘরে, মেয়েটিকে ছেড়ে দাও আমার হাতে।'

'অসম্ভব। আমার কাছে ওরা মালেরই সামিল, আমার দায়িত্ব ওদের যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। মেয়েটিকে গুদামঘরে রাখা হয় নি, রাখা হয়েছে আলাদা ক্যাবিনে, যথাসাধ্য আরামে। শুনেছি ওকে ঠিকমত পৌঁছে দিতে পারলে বার্গাণ্ডির ডিউক মোটা পুরস্কার দেবেন আমাদের কোম্পানীকে। কোম্পানীর হুকুমের চাকর আমি।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে ফেটে পড়লো, 'জাহান্নামে যাক সেই ডিউক ও তোমাদের কোম্পানী। বিদেশী কুত্তার বিলাসের সামগ্রী হবে না মেয়েটি, হতে দেব না। এই খৃস্টান ধর্মের ঢাক পেটাও তোমরা? তোমার সাধ্য নেই তাকে নিয়ে যাবার, নিয়ে যেতে কখনই দেব না ক্যাপ্টেন, দরকার হলে তোমাকে হত্যা করে এই জাহাজে আগুন ধরিয়ে যাব, টাকার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জাহাজ কোম্পানীর।'

অ্যালবার হাসলো। বৃথা উত্তেজিত হচ্ছো, সুন্দরী। আমাকে গুলী করে হত্যা কর ক্ষতি নেই, কিন্তু গুলীর শব্দ শুনলে ঐ কেল্লা থেকে ফৌজ আসবে, পুলিশ আসবে শহর থেকে, আইন অনুসারে এই দস্যুবৃত্তির জন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে, সাবধান করে দিচ্ছি।'

'না, না ক্যাপ্টেন অ্যালবার, টেবিলটি আমার পায়ের উপর উল্টে ফেলে দেবার চেষ্টা করো না, আমি হুঁসিয়ার আছি। চন্দননগরের ফৌজ বা পুলিসের সাধ্য নাই আমার গায়ে হাত দেয়। কিন্তু তুমি নির্বোধ যুবক, এ চাকরী গেলে অন্য চাকরী পাবে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর ফিরে পাবে না।'

অ্যালবার আবার হাসলো।

'প্রাণের জন্য ভীত নই, কর্তব্য পালনে যদি প্রাণ যায় তবে তাও স্বীকার কিন্তু তোমাকে আমার ভয় করছে না কেন জানি না, বরং ভালই লাগছে, কেন তাও বুঝতে পারছি না। তোমাকে কী আগে কোথাও দেখেছি?'

'হয় তো আমারই মত আর কাউকে দেখেছ। কিন্তু ভাল লাগাটার কোনো হেতু নেই। হয় তুমি ভয় কাকে বলে জান না, নয় তো মূর্খ।'

অ্যালবার কিছুক্ষণ কি ভাবলো। জবাব দেবার চেষ্টা করলো না।

'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে যে?'

'দেখেছি, আরও ভাল করে দেখেছি।'

'আগুন নিয়ে খেলা করছো ক্যাপ্টেন, আমি আর বেশী সময় দেব না।'

'ফরাসী ফৌজ বা ফরাসী পুলিস তোমার গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না বললে, তবে কী তুমি ফরাসী প্রজা নও? তুমি কী নবাবের গুপ্তচর?'

'ফরাসী সম্রাটের অনুরক্ত প্রজা আমি, অস্বীকার করবো না।'

'তবে তুমি কে, যে এতবড় সাহস?'

'শুনতে চাও, ক্যাপ্টেন?'

অ্যালবার এবারও জবাব দিল না। টেবিলের উপর একটি চাবি দেখিয়ে দিয়ে বললো 'ঐ নাও চাবি, সে পাশের ক্যাবিনেই আছে, আমি কোনো বাধা দেব না। অঙ্গীকার রাখতে জানি আমরা, কিন্তু যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, শিকল তুলে বন্দী করে রেখে যাও আমাকে এই ক্যাবিনে। তুমি দস্যু নও আমি বুঝেছি, তুমি একটি অসামান্যা নারী, তবু জানতে ইচ্ছা হয় তুমি কে।'

'মাদাম রৌশন নামটি বোধ হয় তোমার অপরিচিত নয় আশা করি?'

পরম বিস্ময়ে ক্যাপ্টেন অ্যালবারের মুখে কথা ফুটলো না। মাদাম রৌশনের নাম এ অঞ্চলে কে না শুনেছে? শুধু কারিকল মাহে পন্দিচেরী চন্দননগরের ফরাসী সমাজেই নয়, এ নামটি ফ্রান্সের রাজদরবারেও অজানা নাই। অনন্যসাধারণ রূপসী, অসামান্যা বুদ্ধিমতী এই রমণী ভারতে ফরাসীদের ক্ষমতা প্রসারের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে, অ্যালবার পূর্বেই শুনেছে, অভিবাদন করলো সে দাঁড়িয়ে, উঠে।

'আমার কোনো অপরাধ নিও না, মাদাম, আমি দুঃখিত।'

'বরং প্রশংসাই করবো তোমার কর্তব্যনিষ্ঠায়।'

'কিন্তু এ, কর্তব্যনিষ্ঠা নয়, কর্তব্যের অপলাপ। ফরাসী আইনে আমি দণ্ডনীয়।'

'সে আইন মানুষের গড়া আইন, ভগবানের চোখে বে-আইনী। এ ব্যবসা পাপ-কলুষিত। তুমি মনুষ্যত্বের দাবী পূরণ করেছো। তোমাকে ধন্যবাদ মঁসিয়ে অ্যালবার।'

'মঁসিয়ে নয়, মাদাম। এখানকার গভর্নরের তুমি জীবনসঙ্গিনী, আমি সামান্য কর্মচারীমাত্র জাহাজ কোম্পানীর, শুধু পিয়েরে বলে সম্বোধন করলেই কৃতার্থ হব।'

'তবে এস পিয়েরে আমার সঙ্গে, নিজের হাতেই মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। পর্তুগীজ ও আরাকানি বোম্বেটেরা এখনো সাগর-মোহনায় উপদ্রপ চালাচ্ছে, জাহাজ কোম্পানী কৈফিয়ৎ চাইলে বলতে পারো তোমার জাহাজ তাদের হাতে পড়েছিল।'

'মিথ্যা আমি বলতে পারবো না, মাদাম। যা সত্য তাই বলবো। কিন্তু মঁসিয়ে না-গভর্নর তোমার এই নিশীথ অভিযানের কথা জানেন?'

'যদি বলি ডুবেছেন?'

'বিশ্বাস করবো না।'

'যদি বলি ডোবেননি?'

'বিশ্বাস করবো।'

ক্যাবিনের দ্বার মুক্ত হতেই বিষাদ-প্রতিমা বন্দিনী ভীতা কুরঙ্গিনীর মত এক পাশে ছুটে গিয়ে একে দাঁড়ালো।

'চিনতে পারছিস না, রাবেয়া?'

দিকভ্রান্ত উদাস দৃষ্টিতে শুধু মানুষের প্রতি চরম অবিশ্বাস ও ভয়ের বিহ্বলতা। মাদাম রৌশন এগিয়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো বন্দিনীকে।

'রাবেয়া আমি তোর দিদিজান রৌশন, তোকে নিতে এসেছি। এক বছরে এত বড়টি হয়েছিস তুই? নে, আর ভয় নেই, দুঃস্বপ্ন তোর কেটে গেছে।'

দুই বোনে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। স্থান-কালের সীমারেখা ওদের দু'জনের কাছে অবলুপ্ত। বহুকাল পরে দুই সহোদরার পুনর্মিলন। চরম দুঃখের শেষে নিবিড় সান্নিধ্যের সুখস্পর্শ। অপরাধীর মত অ্যালবারের আত্মগ্লানি। তার কোথাও বুঝি অন্ত নয়।

ভাঁটার টানে কাঠের সেতু দুলছিল। ক্যাপ্টেন হাত ধরে মাদাম রৌশনকে তীরে পৌঁছে দিল। রাবেয়া ক্যাপ্টেনের হাত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে রৌশনের হাত ধরে গেল।

'বিদায় গিয়েরে, ধন্যবাদ। ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন, দিন জেনো।'

'বিদায় মাদাম, তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। বিদায় মাদামোজেল রাবেয়া আমাকে ক্ষমা করো।'

রাবেয়া প্রতি-সম্ভাষণ জানালো না, একটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সামনে এগিয়ে চললো।

প্রস্তরমূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো অ্যালবার কিন্তু তার ধমনীর শোণিতপ্রবাহে এক অব্যক্ত চঞ্চলতা। গঙ্গার এই ভাঁটার তরঙ্গ যেন তার বক্ষদ্বারেই নিষ্ফল করাঘাত করছে। গঙ্গা বারিধির তরঙ্গভঙ্গে লা-রেনে-অ্যামির মত কত জাহাজ ডুবে গেছে সাগরের অতল গভীরে, কত মানুষের সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেছে চিরতরে সেই হীম-শীতল আলিঙ্গনে। সেই সর্বনাশের পথই হয়তো সর্বশান্তির পথ। হে দয়াময়। শান্তি দাও তুমি, ডুবে যাক লা-বেলা-অ্যামি তরঙ্গগ্রাসে, তলিয়ে যাক ক্যাপ্টেন গিয়েরে অ্যালবার নিঃসীম বিস্মৃতিলোকে।

●

লক্ষ্মী চপলা চঞ্চলা। সেই চপলতার সাক্ষ্য হিন্দু-ইতিহাসের পাতায় পাতায়। লক্ষ্মী বহুভোগ্যা আর অনপায়িনী হওয়া তার চরিত্রগত—। কিন্তু তিনি দেবী, সেই দেবী-মাহাত্ম্য মনুষ্যলোকের সতী-ধর্মের মাপকাঠিতে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ লঙ্ঘন করে, অস্ত্রের ঝনৎকারে আকাশ কম্পিত করে, শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করে এসেছিল পাঠান, গ্রীক,
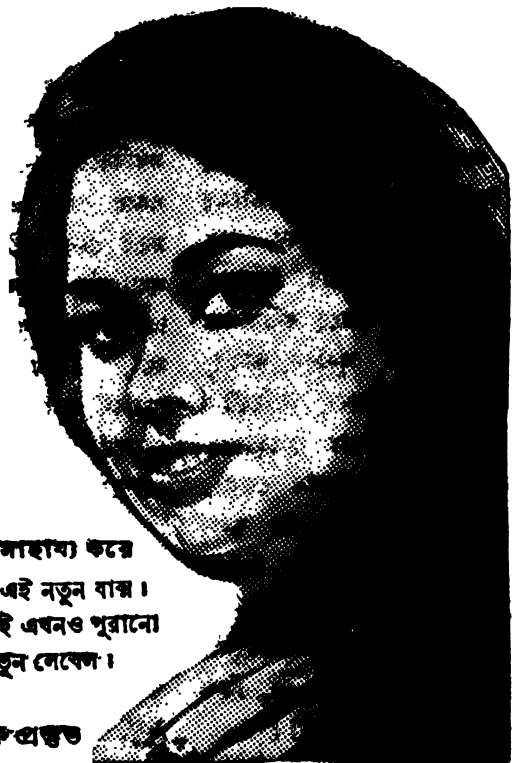
শক, কুশান, তাতার, পাঠান, মোঙ্গল রাজা জয়ের হিংস্র লোলুপতা তাদের কোন কপটতার আবরণে আত্মগোপনের চেষ্টা করে নি। তাদের বহু শতাব্দী পরে এল ইয়োরোপ হতে শ্বেতকায় বণিকরা। বন্ধুর ছদ্মবেশে দস্যুদল।

সরল ভারতবাসী উদার হৃদয়ে দিল তাদের অতিথির সমাদর, ভারতলক্ষ্মী অকৃপণ হস্তে বর্ষণ করলেন তাদের মস্তকে কৃপাধার। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গমাতা আরো স্নেহশীলা, স্থান দিলেন তাদের পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর দুই কূলে নিজের পতিত সন্তানদের প্রতি ফিরেও তাকালেন না।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছে বাণিজ্যক্ষেত্রে ফরাসী ও ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের অধোগতির সূচনা, পর্তুগীজ ফ্লেমিশ, প্রাশিয়ান ও ডেনিসদের অন্তর্ধান।

ছোট্ট চারিটি গ্রাম— তালডাঙ্গা, বোড়াকিষণপুর, খলিসানি ও গোন্দলপাড়া, এই ক্ষুদ্র প্রারম্ভ থেকে চন্দননগর সহরটি ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতার যখন বাল্যকাল, চন্দননগর তখন সমৃদ্ধশালী নগরী, বাণিজ্যসূত্রে আরব, পারস্য, ইউরোপ, সিংহল, মালয় ও চীনের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক। সুশাসন এবং সুরক্ষিত অর্লেয়াঁ কেল্লার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে বসবাস করছে বহিরাগত বহু বাঙ্গালী, আর্মানী, খৃষ্টান, কাফ্রী, মুসলমান, ফরাসী, ইহুদী, ফিরিঙ্গী। অর্লেয়াঁ কেল্লার তুলনায় কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা, হুগলীতে নবাবের কেল্লা, চুঁচড়ায় ওলন্দাজদের কেল্লা নিকৃষ্ট। এই তিনটি শহরের কোনটিই দ্বি-সহস্র ইষ্টকনির্মিত অট্টালিকা এবং লক্ষাধিক অধিবাসী আছে এই গর্ব করতে পারে না, কিন্তু সে সম্মান চন্দননগরের প্রাপ্য।

অর্লেয়াঁ কেল্লার খানিকটা উত্তরে গঙ্গার তীরে গভর্ণরের কুঠি।

গভর্ণর জুলিও রেনো অস্থিরচিত্তে পদচারণা করে বেড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে বার্গাণ্ডি সুরাপূর্ণ গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন মানসিক চাঞ্চল্য শান্ত করবার নিষ্ফল প্রয়াসে। নৈশ ভোজনে নিত্যসঙ্গিনী রৌশন ছিল অনুপস্থিত। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গেছে, তবু তার দর্শন নাই। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতি।

মান-অভিমান কলহ-কোন্দল, বিরহ-মিলন প্রণয়লীলার অবিচ্ছেদ্য সহচর। সেই কলহ-দ্বন্দ্বে পরাজয়ের গ্লানি নাই, জয়ের গর্ব নাই। বিরহ-বিবাদের দুঃখ-মিলনের আনন্দকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করে, নতন সুরে মন্দ্রিত করে।

কিন্তু জুলিও রেনো কী জানি কেন আজ বিশেষ বিচলিত, আশঙ্কিত। অনুপম সৌন্দর্য এবং বুদ্ধির সঙ্গে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাহীন দুর্দমনীয় দুঃসাহসিকতার সমাবেশ রৌশনের চরিত্রে। দুরধিগম্য তার ব্যক্তিত্ব। এই বিস্ময়কর সংযোগের যাদুস্পর্শে অভিভূত হয়েই অভিজাতবংশীয় এই পদস্থ ফরাসী পুঙ্গব বিদেশিনী এই নারীর পদপ্রান্তে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। প্রতিদানে ভালবাসাও যেমন পেয়েছেন, সর্ববিষয়ে সহকর্মিতাও পেয়েছেন যথেষ্ট। সময়ে সময়ে এই নারী হিমাদ্রিশিখরের মতই যেন অতীব সুদূর, অতীব আত্মসমাহিত, অতীব কঠিন। সময়ে সময়ে হিমাদ্রিজাতা স্রোতস্বিনীর মত কলহাস্যময়ী, স্নিগ্ধশীতলস্পর্শা, নয়নমনতোষিণী। কিন্তু মাঝে মাঝে ভয় হয় রেনোর, সে ভয় নিজের জন্য নয়, রৌশনের জন্য।

পদচারণা করছেন, রেনো অশান্ত আশঙ্কায়। সুন্দর সুশ্রী মুখে ঝাড়-লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে। যৌবনের মধ্যভাগেই পদোচিত গাম্ভীর্যের শান্ত দীপ্তি সেই মুখে, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, তীক্ষ্ণ চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসিকা, স্বর্ণাভ কেশ, অধরোষ্ঠে ক্ষুদ্র ত্রিকোণাকৃতি স্বর্ণাভ শ্মশ্রু। বারে বারে চোপদারকে তলব করে প্রশ্ন করছেন, মাদাম-সাহেবা ফিরেছেন কি না।

নিরর্থক এ প্রশ্ন তিনি নিজেও জানেন কিন্তু কতবারই তো সহসা ঐ অভিমানিনীর মান ভঙ্গ হয়েছে অযাচিতভাবে? রেনো জানেন নবাবের রক্ত ওর ধমনীতে, কিন্তু একদিন ও বলেছিলো ওর জননী যবনী নয়— জন্মসূত্রে ছিল ব্রাহ্মণ, বিবাহসূত্রে ব্রাহ্মণ পত্নী, ভাগ্যসূত্রে হয়েছিল মুসলমান নবাবজাদার অঙ্কশায়িনী। ওকে দেখেই বোঝা যায় সেই নবাবজাদা পতঙ্গের মতো কেন সেই রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়েছিলো।

অপরাহ্ণের কলহবিষয় দাসব্যবসা। রৌশন বলে ইংরেজদের হটিয়ে ফরাসীরাই হবে এদেশের ভাগ্যবিধাতা, তার আগে এই ঘৃণ্য ব্যবসা পরিত্যাগ করতে হবে, দেশী লোকদের সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জন করতে। রৌশন পণ করেছে রেনোই বসবেন বাংলার ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতার আসনে, সুতরাং রেনোর কর্তব্য অবিলম্বে এটি বন্ধ করা।

রেনোও জানেন সুসভ্য ফরাসীদের পক্ষে এটি একটি কলঙ্ক, অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বাণিজ্য-শুল্কে বেশীর ভাগ নিচ্ছেন ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালিকরা এবং ফ্রান্সের ফরাসী সরকার, চন্দননগরের রাজস্বের যে অবস্থা তাতে উপার্জনের এই পথ বন্ধ করা যায় না নিতান্ত স্বার্থের খাতিরে। ইংরেজরা প্রচুর অর্থ, সৈন্যবল এবং কামান বন্দুক পাচ্ছে তাদের বিলিতি কোম্পানীর কাছ থেকে, কিন্তু ফরাসী কোম্পানী আপাত-লাভের মোহে অবহেলা করছেন এই উপনিবেশের স্বার্থ এবং বাংলা দেশের অগ্রগতির সুবর্ণ সুযোগ।

রেনোর বক্তব্য এই যে নবাবের কুশাসনে দারিদ্র্য ও অনাহারের জ্বালায় যদি কোন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিদেশে যেতে চায় ক্ষুধার অন্নের জন্য তবে তাদের বঞ্চিত করা কী যুক্তিসঙ্গত? চন্দননগরের সরকার নিজে এ ব্যবসা করছে না, সুযোগ দিচ্ছে মাত্র, ব্যবসায়ী

কাশীপুর গান এ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর হাসপাতালে জনৈক আহত গুলীচালনার দিনের ঘটনাবলী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনকে বলছেন

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ৪৪তম সাধারণ সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণরত পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। পার্শ্বে রয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

জালিয়ানওয়ালাবাগের এক অনুষ্ঠানে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

শুভ নববর্ষ দিবসে কালী-মন্দিরের সামনে পূজা দেবার জন্য মহিলা ও পুরুষদের লাইন
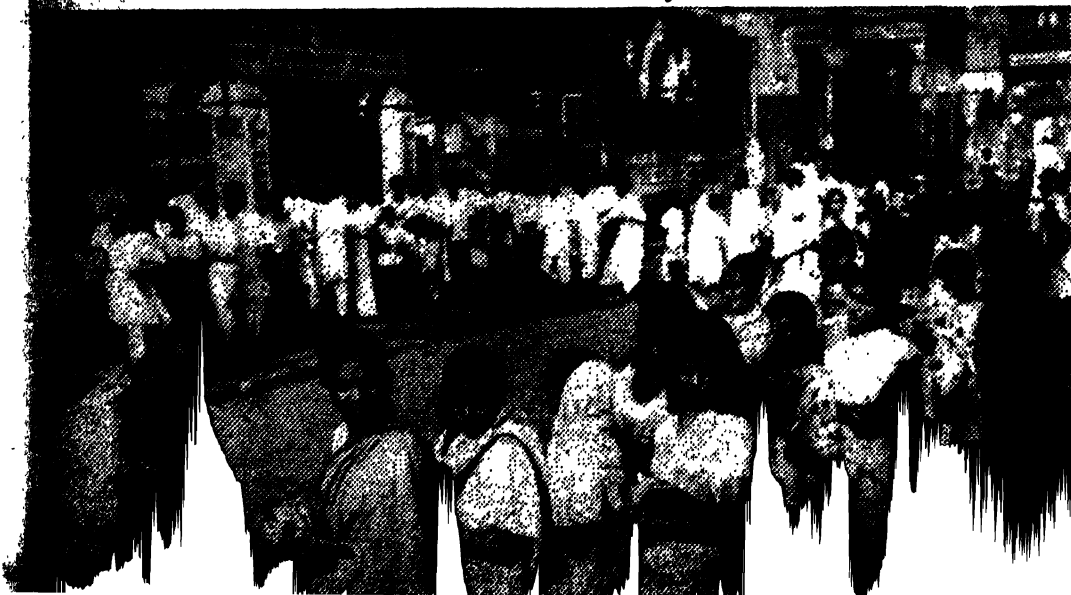
বিরোধী নেতাদের সংগে তেলেংগানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

অগ্নি প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে দমকল-বাহিনীর কর্মীরা মহড়া দিচ্ছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ও বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
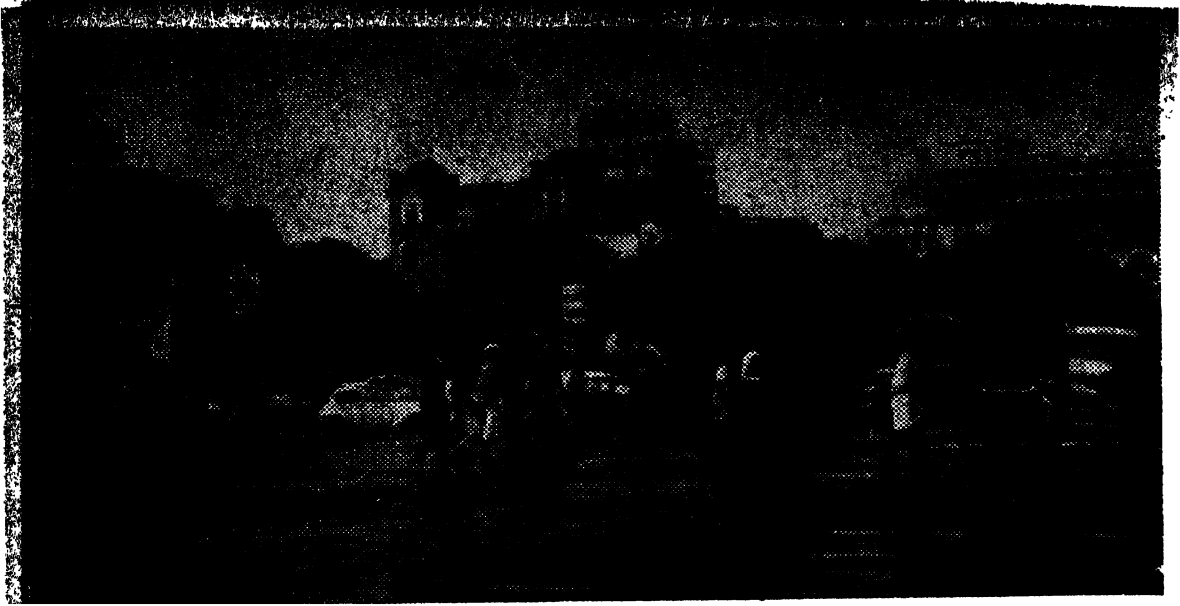
কালবৈশাখীর প্রথম প্রবল বর্ষণের দিনে কলকাতার রাজপথের দৃশ্য

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের বাগিচায় চায়ের আসরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপরত
পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ

করছে অন্য লোকে, সুতরাং রেনোর দায়িত্ব কতটুকু? উপরন্তু ব্যবস্থাটি আইন-গতভাবে রহিত করতে পারেন পন্দিচেরীর ফরাসী গভর্নর - জেনারেল, চন্দননগরের গভর্নর নয়। ফরাসীরা এসেছে বাণিজ্য করতে, অর্থাগমের চিরাচরিত পথে পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার করা চলে না। রৌশন বলে, সুযোগ দিয়েই তোমার সরকার দরজা খুলে দিয়েছে জবরদস্তি চালানোর। দালালরা লাঠিয়াল দিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে আসে মেয়ে পুরুষ। গভীর রাতে চড়াও হয়ে বৃদ্ধা মাতার কোল থেকে বালক পুত্রকে পত্নীর বাহুবন্ধন থেকে স্বামীকে, অশক্ত ভ্রাতার দুর্বল মুঠি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে তরুণী ভগ্নীকে। বিদেশে দেহ-পণ্যের বাজারে সেই তরুণীদের লাঞ্ছিত জীবনের কথা একবার ভেবে দেখো জুলিও। দেশী লোকদের ক্রুদ্ধ হবার যথেষ্ট কারণ কি এটি নয়?

রেনো বিশ্বাস করতে পারেন না এই অভিযোগ। প্রলোভন হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু প্রতারণা ও জবরদস্তি বিশ্বাস করা, যায় না। নবাবের শাসনযন্ত্র এখনো চলছে, নবাবের সিপাহীরা এখনো নিশ্চয়ই সজাগ ও সতর্ক, সত্যিই এই দস্যুতা তারা সহ্য করতো না দেশী ভাই-ভগ্নীদের উপর।

রৌশন ভুল শুনেছে। সাদাজাতের প্রতি নেটিভদের ভাল ধারণা নাই, নেটিভরা অনেক আজগুবি সংবাদ বিশ্বাস করে, সত্যাসত্য বিচার করে দেখে না, সহজেই বিশ্বাস করা এদের অভ্যাস-যেমন বিশ্বাস করে মাটি-পাথরের দেবদেবীর দলকে, তাদের সম্বন্ধে অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনীকে, বামুন ও মৌলবীদের ঝাড় ফুঁককে। কেবল বিশ্বাস করে না নিজেদের মধ্যে এ-ওকে, অন্য ধর্মকে।

কলহাভিমানিনী রৌশন যখন নিজের শয়নগৃহে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করলো তখনো দিগন্তের নিষ্প্রভ সূর্য গোধূলির ধূসরজালের অন্তরালে অন্তর্হিত হয় নি। নৈশ-ভোজের সময় রেনোর বার বার করাঘাতেও রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হলো না। কোনো সাড়া না পেয়ে রেনো ভেবেছিলেন নৈশপোষাকে সজ্জিত হচ্ছে রৌশন, এ সময়ে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

সর্পফণার মত কৃষ্ণ-কবরীসজ্জা, যৌবনোদ্ধত বক্ষে সূক্ষ্ম কাঁচুলির গ্রন্থিবন্ধন, স্বচ্ছ মসলিনের সালোয়ারে নিম্নাঙ্গের সুপুষ্ট রূপরেখাকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে লীলায়িত করবার প্রয়াস যে সময়সাপেক্ষ তা' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুলিও রেনোর অজ্ঞাত ছিল না। কমনীয় অঙ্গে রমণীয় আবরণ বিকশিত হবে বিচিত্র আভরণে, সেই দৃশ্য কল্পনা করে রেনো খাস কামরায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সে প্রতীক্ষা হল নিষ্ফল।

গভর্নর অবশেষে কৌচের ঘুমিয়ে পড়েছেন তাঁর খাসকামরায়। লাট-সাহেবকে নিদ্রিত দেখে তাঁর খোদ-খিদমৎগার আলি আসগর বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেছে মুচকি হাসি হেসে। কোনো

কিছুই তার চোখ-কান এড়াতে পারে না। আট-কুঠিতে লোকলস্করের আধিক্য—খানসামা, চোপদার, ফটকরক্ষী, দেহরক্ষী, বাবুর্চি, কোচম্যান, আয়া, খিদমৎগার, জমাদার, বেয়ারা, বেয়ারা মশালচী, বর্তনচী, সহিস, হাজাম, খরচপাত্রদার, মুন্সী, মালী, মেসেড়া, হুঁকাবরদার, জুতিবরদার, পাংখাবরদার, বাতিবরদার, ধোবী জমাদার, কামরাবরদার ইত্যাদি কিন্তু খোদ খিদমৎগার লাট সাহেবের কাছে কাছেই সর্বক্ষণ থাকে এবং সেই সূত্রে ভিতরকার অনেক ব্যাপারই তার অজ্ঞাত থাকে না।

সাহেব মেমসাহেবের ঝগড়াঝাটি আলি আসগর আগে অনেক দেখেছে। সমাজের নীচুস্তরে যেখানে হয় লাঠালাঠি, চুলোচুলি, কুৎসিত গালিবর্ষণ উঁচুস্তরে সেখানে দেখা যায় তার সভ্য সংস্করণ—বাক্যালাপে ছেদ, অসহযোগ, সম্ভব পক্ষে একপক্ষের অগোচরে অবস্থান। খানদানি সাহেবদের নোকরিতে সেপাদের বহুর বুদ্ধিতে শান দিয়েছে, যাই দেখুক যাই শুনুক না কেন প্রত্যক্ষে ও নেপথ্যে মুখের ভাবটি তার নির্বিকার নিস্পৃহ। বুদ্ধি নামক বস্তুটি দেহের ঠিক কোনখানে থাকে সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কেউ বলে মাথায়, কেউ বলে পেটে, কিন্তু কেউ কেউ ঐ দুই বিভিন্ন মতের সমন্বয় করে বলেন, দুটো কথাই সত্য, সুবুদ্ধির স্থিতিস্থান মাথায়, কুবুদ্ধির বাসস্থান পেটে। আলি আসগরের সম্বন্ধে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রভু ও প্রভুপত্নী শয়ন গৃহে অদৃশ্য হলে আলি আসগরের সে-রাত্রের মত ছুটি হয়। প্রস্থানপথ পেছনের দরজা বাগানের প্রান্তে। তার চিড়িয়া তারই জন্যে অপেক্ষা করে থাকে বিবিরহাট মহল্লায় একটি খোলার ঘরে। 'চিড়িয়া' আলি আসগরের দেওয়া নাম, মেয়েটি আর্মানি। ঘরটির ভাড়া দেয় আলি। চিড়িয়া পুষলে খাঁচার দাম দেয় যে পোষে। চিড়িয়ার খোরপোষও জোগায় আলি। চিড়িয়া রঙীন ঘাঘরা পরে, ব্লাউজ গায়ে দেয়, খুশবো মাখে, এটা-ওটা ইংরাজী বুলি বলে।

আলি মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় খিদমৎগারি কাজে অগ্নিপক্ক হয়ে তবে চন্দননগরের লাটসাহেবের খোদ খিদমৎগার হয়েছে। এই পদাধিকারের বলে সাধারণ লোকের কাছে ইজ্জৎ তার বড় কম নয়। কেউ কেউ আলিসাহেবও ডাকে। শুধু চিড়িয়া বলে বুঢ্ঢা মিয়া। অবশ্য বয়সটা বেশী নয়, চল্লিশের গা-ঘেঁষা, তবে কানের পাশে চুলে একটু পাক ধরেছে।

চিড়িয়া বলে, আমি কী পাখী যে ঐ বলে ডাকো? আলি জবাব দেয়, তুই আমার দিলকা চিড়িয়া, খেঁকে রেখেছি তোকে চাঁদিকা সিকলিসে, তুই চিড়িয়া নয় তো কী?

বিবিরহাট পাড়ায় বেশীর ভাগই আর্মানিরা থাকে। ওরা খৃস্টান, অল্প পয়সাতেই ছিমছাম ফিটফাট থাকতে জানে। তবে পাড়াটায় মেয়েদের খুব সুনাম নাই। রাতের বেলা অনেক মুখ দেখা যায় যাদের বাস এপাড়ায় নয়। বিবিরহাট নামটি অর্থশূন্য নয়; রুপিয়ার বদলে কেনা যায় বিবিদের রূপ। গোঁপে চাড়া দিতে দিতে আলি আসগর শিস দিতে দিতে চললো বিবিরহাটের দিকে।

চন্দননগরের বেশীর ভাগ লোকই ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে না দু'জন, রৌশন ও রাবেয়া। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা চলছে ভাদরেশ্বরের জঙ্গলের দিকে, তালডাঙ্গা গোন্দল পাড়া ছাড়িয়ে। ভাদরেশ্বরের অমর লক্ষ্মী নাকি খুব জাগ্রত। ভাদর-লক্ষ্মী মানে একটি জীর্ণ বটবৃক্ষ। প্রতি ভাদ্র মাসে আশেপাশের বহু গ্রামবাসিনী এখানে এসে ভাদুরি ব্রত করেন, সন্তান ও শস্য কামনায়। প্রাশিয়ান কোম্পানী এখানেই এসে প্রথম কুঠি খুলেছিল, তারপরে আসে ফ্লেমিস কোম্পানী; কিন্তু জায়গাটা এমনই অস্বাস্থ্যকর যে তারা কেউ টিকতে পারলো না। ভাদরেশ্বরকে প্রাশিয়ানরা বলতো 'ভাদারসি', নামটি ওদের কাছে ছিল সহজ কথ্য নয়, তাই হ্রস্ব সংস্করণ।

জঙ্গলের পথ। বেশীর ভাগই অন্ধকার সামান্য একটু চাঁদের আলো ফুটে বেরিয়েছে, তাই মাঝে মাঝে আলোর চিকিমিকি। ঘোড়া দুটি চলছে নিঃশব্দে। ওরা জানে হার্মাদ-দস্যুরা এধারে ওধারে ঘুরঘুর করছে, নৈঃশব্দই নিরাপদে যাওয়ার একমাত্র উপায়।

ভয় করছে দিদিজান।

কিসের ভয় রাবেয়া? বাঘ-ভালুকের?

ওদের চাইতেও ভীষণ হলো হার্মাদরা।

তারা কে?

পর্তুগীজ ও আরাকানি বোম্বেটেরা জাহাজে করে ওরা হানা দেয়, জঙ্গলের আড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসে মেরে কেটে লুটতরাজ করে ফিরে যায়।

কেন তবে দিদিজান এই শেষরাতে এ পথে আমাকে একা একা নিয়ে এলে? তোমার কাছে তো একটিমাত্র পিস্তল, ওদের সামলাতে পারবে তুমি? হয়তো আবার লুঠে নিয়ে যাবে আমাকে, তোমাকে খুন করে?

মৃদু মৃদু হাসছিলো রৌশন, অন্ধকারে রাবেয়া দেখতে পেল না; ঘোড়ার রাশ টেনে থামিয়ে বললো, 'চল, ফিরে চলো দিদিজান, খোদার কসম।'

দূরে একটা আর্তনাদ শোনা গেল, তারপর সব চুপচাপ। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে রাবেয়া।

অন্ধকারেও অনুমান করলো রৌশন রাবেয়ার আতঙ্ক। লাগাম রেখে সে দুই হাতে দিল তিনবার করতালি। গাছের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল বিশালকায় কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ। হাতে তার দীর্ঘ লাঠি, লাঠির মাথায় লোহার তীক্ষ্ণ ফলক আবছায়া আলোয় চকচক করে উঠলো।

'সব ঠিক, আছে, মৈনুদ্দীন?'

'বান্দা হুঁশিয়ার, বেগম সাহেবা।'

'ও কীসের শব্দ হলো?'

'জানমহম্মদের লোক আগে আগে চলেছে, বোধ হয় কয়েকটা হার্মাদ খতম হলো। সেলাম ছোটি বেগম, ডরিয়ে মাৎ, এই গোলাম জান কবুল করে ঐ দুষমনদের বরবাদ করবে।'

মুহূর্ত মধ্যে সেই মূর্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

রাবেয়ার সম্বিৎ ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে,

দিদিজান? তুমি এ দিকে থাকো? লোকটা কে?'

'এ লোকটাও ডাকাত, কিন্তু আমার বিশ্বস্ত অনুরক্ত গোলাম।'

'তুমিও তবে ডাকাতি কর?'

রৌশনের মনে পড়লো পিয়েরে অ্যালবারের কথা, সেও এই সন্দেহ করেছিল। হাসি পেল তার। ডাকাতের বেশে যেতে হয়েছিল তার কাছে এই রাবেয়ারই উদ্ধারের চেষ্টায়। ডাকাত সেজে ভয় দেখানোও তো প্রায় ডাকাতিরই মত।

'দরকার হলে করি বইকি বোহিন? তবে এখন যাচ্ছি কৌলবাবার কাছে।'

●

অনেক বছর কেটে গেছে রৌশন মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদ থেকে পালিয়েছিল, তারপর এই প্রথম সাক্ষাৎ, রৌশন কী করে, কোথায় থাকে কিছুই জানে না রাবেয়া, কথাটা বিশ্বাস করলো এবং ঘৃণায় সঙ্কুচিতও হলো। কে জানে কোন দুর্ভাগ্যের তাড়নায় নবাবজাদীকে ঘৃণ্য দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। নিজের অদৃষ্টেও কী না হতে চলেছিল—এই ভেবে সে শিউরে উঠলো। কিন্তু কৌলবাবা কে, তিনিই কী এ দলের সর্দার?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো রাবেয়া—কৌলবাবা কে?

'দেওয়ানা ফকির, হিন্দুরা বলে সাধু, মস্ত বড় সাধু।'

'পুতুল পূজা করে' কাফের।

'কোনো ধর্মই খারাপ নয় বোন, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান একই আল্লার বালবাচ্চা, আমাদের বুঝবার ভুল শুধু। বাবা বলেন পথ আলাদা আলাদা হলেও মালিক এক, আমাদের কারাক করে রেখেছে পুরুত মৌলবী পাদ্রিরা।

'তাকে বাবা ডাকো কেন?'

'হিন্দুরা সাধু-সন্তদের বাবা বলেই ডাকে। বিশেষ করে তোর আর আমার কাছে উনি বাবারই মত। কেন তা শুনতে চাস নে।'

'খোদার কসম, বল দিদিজান।'

রৌশন ইতস্তত করলো। বলা কী উচিত? এই সরলমতি বালিকার কাছে অতীতের সেই গ্লানিকর অধ্যায়ের উদ্ঘাটন করা কি ঠিক হবে? কিন্তু রাবেয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ বলতেই হবে, তবে হয়তো বলাই ভাল?

'আমাদের মা-জান হিন্দু ছিলেন, শুনে অবাক হোস না বোন। কাফের?

'আল্লা বা খোদা না বলে যারা ভগবান বা গড্ বলে, তাদের কাফের বলি আমরা, কিন্তু যে আল্লার হুকুম মত চলে না সে মুসলমান হলেও কাফের। আমাদের মা-জান হিন্দুই ছিলেন, ব্রাহ্মণ এই কৌলবাবার সঙ্গেই তাঁর সাদি হয়েছিল। গরীব ব্রাহ্মণের কুঁড়েঘরে নাকি অত বড় সুন্দরী বেমানান, তাই দুষমনরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল ঢাকার নবাবজাদার হারেমে।'

'কে সে শয়তান নবাবজাদা ?'

'ঢাকার নবাব নওয়াজিস খাঁ। সুবে-বাঙলার অধীশ্বর আলীবর্দী খাঁর বড় জামাই নবাবজাদা দেওয়ান-ই-মুলুক সুবেদার-সালার নবাববাহাদুর নূর মহম্মদ ইয়ারজঙ্গ নওয়াজিস খান-খানান। তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, তবে আল্লার আইনে কী বলে জানি না।'

পিতা নওয়াজিসকে মনে আছে রাবেয়ার। বিরাট পুরুষ। তার কোলে বসে আদর পেয়েছে কত? পিতার স্নেহ শিশুরাও বুঝতে পারে। কিন্তু তার সম্বন্ধে কী আজ বলছে তার ভগিনী। সত্য বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে? পর পর দু'দুটি ঘটনায় ঢাকার দরিয়া-বাগ প্রাসাদে যেন সব উলট-পালট হয়ে গেল হঠাৎ, তাও মনে আছে রাবেয়ার। প্রথমে চলে গেলেন মা-জান, পরে বুঝতে পেরেছিলো সে সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, আত্মহত্যা। কিছু পরেই বাবা-জান সাংঘাতিক অসুখে পড়লেন। অনেক বড় বড় হেকিম এল, কিন্তু কোনো দাওয়াই-এ ফল হ'ল না, সুন্দর কাঠের বাক্সে করে বাবা-জানকে নিয়ে গিয়ে দরিয়াবাগের বাগানে কবর দেওয়া হ'ল, শ্বেতপাথরের মিনার তুলে দেওয়া হ'ল সেই কবরের উপর। তার পর বজরায় ক'রে দু'বোনকে নিয়ে আসা হলো মুর্শিদাবাদে।

৷

সামনে দেখা গেল একটা ক্ষীণ আলোকের আভাস। অন্ধকারের ছায়াগর্ভ থেকে বেরিয়ে এল দুই মূর্তি, ঘোড়া দু'টির লাগাম ধরে তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো, সেলাম বেগমসাহেব, আমি জান মহম্মদ, আপনার নোকরের নোকর। ঘরের দাওয়ায় একটা বাঘ বসে আছে, ফুকার দিন যাঁতে সাধুজী শুনতে পান।

ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর, দরজা খোলা। ভিতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ এল 'সরে যাও, সরে যাও, মা ব্রহ্মময়ী, ... এসে গিয়েছে।'

এবার রাবেয়ার ঠাহর হলো প্রকাণ্ড একটা ডোরা-কাটা বাঘ আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে নেমে বনের ভিতর চলে গেল। তীব্রগন্ধে সে নাকে হাত দিল।

কোলবাবা বসেছিলেন একটা বিবর্ণ চামড়ার আসনে। তাঁর চোখ দু'টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, কিন্তু দৃষ্টি যেন বহুদূরে। সামনে নর-কপালে বোধ হয় দিশী মদ, বিশ্রী গন্ধ, একটি বটপাতায় কিছু অর্ধসিদ্ধ মাংস। কোল-বাবার সমস্ত মুখটি দাড়িগোঁপে ঢাকা, মাথায় রুক্ষ জটাজাল, পরিধানে রক্তবর্ণ কটিবাস। পরিবেশের কদর্যতা রাবেয়াকে বিতৃষ্ণায় অভিভূত করলো। সেই সঙ্গে ভয়।

রৌশনকে মাটিতে মাথা রেখে নমস্কার করতে দেখে রাবেয়া বিরক্ত হলো। গোলাম কাফেরদের নিয়ম হতে পারে এটা, কিন্তু মুসলমানদের নয়, সে হাত তুলে সেলাম জানালো।

কিন্তু প্রণাম ও সেলামের বাইরে চলে গেছে কোলবাবার দৃষ্টিপথ। তিনি গান সুরু করলেন,—

'করালবদনী শ্যামা ভীমারূপে ভয়ঙ্কর
রবি শশী কিন্তু তোমার রূপের আভায়
কী সুন্দর।
মাগো আমার,
কে বুঝাবে তোমার লীলা
দয়ার নাই তো সীমা
গলে শোভে মুণ্ডমালা, শ্মশানবাসিনী বামা
জননী হইয়া জীবে পালিতেছ নিরন্তর
মাগো আমার,
এক হাতে খড়্গ শোভে,
অন্য হাতে বরাভয়
অশুভ নিধন আর কর্মফল কর ক্ষয়
মাগো আমার।'

রাবেয়া বুঝতে পারে না গানের অর্থ, ঠকঠক্ করে কাঁপছে।

'ভয় পাসনে বোন, ওঁর হুঁস নেই, আমাদের কথা ভুলে গেছেন। আল্লার জন্যে যায় দেওয়ানা, তাদের মাঝে মাঝে এ রকমটি হয়। আমাদের পীর-পয়গম্বরদের এরকম হয়ে থাকে। তাকিয়ে দেখ গানের তালে তালে ঐ প্রদীপের শিখাও যেন নাচছে। তোর নসীব ভাল, তাই খোদার দরবারে এসে আজ হাজির হয়েছিস। আমাদের খোদা যিনি ওঁর কালীও তিনি।

॥ দুই ॥

সুখের রাত্রিও প্রভাত হয়, দুঃখের রাত্রিও প্রভাত হয়।

ভোর ভোর সময়ে রাবেয়া ও রৌশন আবার বনের পথে পা দিল। ভাদরেশ্বরের জঙ্গলের শেষে দ'খানা গ্রাম হাজির ছিল। মৈনুদ্দীন ও জানমহম্মদ ও তাদের দলের আটজন জওয়ান সেলাম করে বললো, উঠুন, আপনারা।

গ্রামের ভিতর দিয়ে পথ। চাষী লাঙল কাঁধে যাচ্ছে মাঠে, জেলে জাল নিয়ে চলেছে নদীর দিকে, গোয়ালা গরু নিয়ে যাচ্ছে চরাতে, কর্মকার দরজা খুলে হাপরে জ্বালাচ্ছে আগুন, ময়রা ছানা কাটছে উনুনে, ধোপা কাচছে কাপড় ডোবা পুকুরের ধারে, তেলী চালাচ্ছে ঘানি, গ্রাম্যবধূ কলসী-কাঁখে যাচ্ছে জল আনতে, পূজারী ঠাকুর নামাবলি গায়ে চলেছেন ফুলের ঝারি হাতে জমিদার বাড়ির গৃহদেবতার পূজায়। একটি মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ে চলেছে গঙ্গাস্নানে, কোলের ছোট ছেলেটি রৌশনকে দেখে বলে উঠলো 'মা, হাতি হাতি নেমে আয়।

মা-ডাক শুনে রৌশনের চোখ ছল ছল করে এল, একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে, সে অন্যদিকে মুখ ফেরায়। ছেলে বোধ হয় খব বেয়াদবি করেছে বড়লোকের ঘরণীর কাছে, ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয় ছেলেটাকে তার মা।

রৌশনের মনে হয় চড়টি যেন তারই গায়ে এসে লাগলো, নামতে ইচ্ছা হলেও নামার মত অবস্থা তখন তার নয়, রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো।

বাঙলার গ্রামাঞ্চলেই শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালীর প্রাণপাত্রখানি নিজেকে বার বার পূর্ণ করে নিয়েছে। বহুধারাপুষ্ট সেই পাত্রখানি। বিচিত্র এই বাঙালী-সমাজের রূপরেখা। বিচিত্র

এর ইতিবৃত্ত। সেই ইতিকথার ধারা-শৈলীর উৎস প্রত্ন-ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধূসর গর্ভে, কিন্তু অনুসন্ধানীর দৃষ্টি সে অধ্যায় উদ্‌ঘাটন করেছে। বাঙালীর ধর্মে কর্মে ঐতিহ্যে দৃষ্টিভঙ্গীতে সংস্কারে জীবনযাত্রায় সহস্র সহস্র বৎসরের সেই পূর্বতন ভাবধারার ছাপ অতি সুস্পষ্ট।

বাঙলার আদি-অধিবাসী ছিল নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠী। হ্রস্বকায় ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ ঘনকুঞ্চিতকেশ আদিম বর্বর। লুপ্ত হয়ে গেছে তারা কালতরঙ্গে।

তারপরে এল আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠী। দীর্ঘমুণ্ড তাম্রবর্ণ প্রশস্তনাসা, স্বল্পকুঞ্চিতকেশ, হ্রস্বকায়। কৃষিকর্ম, কার্পাসবস্ত্র, নারিকেল ও সরিষার তেল, সেলাইবিহীন উত্তর ও নিম্ন বাস, অগ্র-ভাগ-উন্মুক্ত পাদুকা, সংখ্যা গণনায় গুণিতক হিসাবে কুড়ির ব্যবহার তাদেরই অবদান। তাদের 'অস্থরভাষার' অনেক শব্দ বাঙলাভাষার অন্তর্গত হয়ে আছে, যথা—ঠেং, ঠোঁট, পাগল, খাসি, ছোট, পেট, ঝাড়, ঝোপ, দা', গঙ্গা, পগার, লাউ, লেবু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, পান, নারিকেল, ডোঙ্গা।

মসৃণ মৃৎপাত্র এদেরই সৃষ্টি।

এরপরে এল দ্রাবিড়গোষ্ঠী এশিয়া-মাইনরের সুমেরিয়া অঞ্চল থেকে। এদের আদি-ভূমধ্যসাগরীয়ও বলা যেতে পারে। নাতিদীর্ঘকায় দীর্ঘমুণ্ড হাল্কাদেহ শ্যামবর্ণ অনুচ্চনাসা তাম্রবর্ণ-কেশ।

নগরনির্মাণ কৌশল, ধাতুর ব্যবহার, গোযান, ইষ্টকনির্মিত অট্টা-লিকা, খিলানযুক্ত দরজা, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার, জলকূপ, পূজামন্দির, মৃতদেহ সৎকার, মৎস্য-মাংস আহার, পথবিন্যাস—এদের কাছেই পেয়েছে বাঙালী। এদের ধ্বজাদি পূজা, বৃত্তাদি উৎসব, বৃক্ষপূজা, শিলাপূজা, গ্রাম্য দেবতাদের (কালী ভৈরবী চণ্ডী বনদুর্গা শীতলা ষষ্ঠীলক্ষ্মী মনসা শিব জাঙ্গুলীদেবী ইত্যাদি) অর্চনা গ্রামাঞ্চলের বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

পেশাগত জাতিভেদ অতি প্রবল ছিল এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর এবং সেইহেতু বিবাহাদি সামাজিক প্রথায় ও খাদ্যাদিতে অসবর্ণ-সংযোগ পরিহার্য ছিল। বাঙলার ছত্রিশ জাতের সূচনা এইখানে। নদীমাতৃক এই অংশে জল-সেচে উন্নততর কৃষি-প্রণালীও দ্রাবিড়দেরই উদ্ভাবন। এদের ভাষা ও বাস্তবসভ্যতার চলমান প্রবাহ বাঙলা দেশের ভাষা ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

দ্রাবিড়দের পরে আসে প্রাচ্য আদি-আর্য নরগোষ্ঠী। দীর্ঘ মুখাবয়ব উচ্চনাসা গোলমুণ্ড দীর্ঘদেহ পিঙ্গলকেশ গৌরবর্ণ। অন্নব্যঞ্জনে ঘৃতের ব্যবহার, পরিচ্ছদ নির্মাণে সীবনশিল্পের ব্যবহার, উন্নততর পাদুকা নির্মাণের কৌশল এবং জন্মগত জাতিভেদ প্রথা ছাড়া এদের অপর কোনো বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। কালক্রমে এরা আর্য-ধর্ম থেকে স্খলিত হয়ে, 'ব্রাত্য' আর্য্য আখ্যা লাভ করে।

আদি-মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আবি-র্ভাবসময় সঠিক বলা যায় না। কিন্তু বাঙলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ ছাড়া তাদের সংস্পর্শ ছিল সীমিত। বাঙালীর জীবনে তাদের ছাপ অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। তবে বহু পরে এরাই এনেছিল সিঁদুর কাগজ চিনি রেশম।

সর্বশেষে এল বৈদিক আর্যগোষ্ঠী। দীর্ঘদেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নতনাসা, স্বর্ণাভকেশ। সমৃদ্ধ বৈদিক ভাষা ভিন্ন এদের কাছে কিছুই ছিল না প্রাচীন বাঙালীর গ্রহণযোগ্য। বাঙলার সৌভাগ্য এই যে, এই অর্ধসভ্য যাযাবর নরগোষ্ঠীর জীবনযাপনের নিম্নমান আদি অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড়দের সংযুক্ত ও উন্নততর সভ্যতায় কোনো রেখাপাত করতে কৃতকার্য হয় না, বরং এদের সংস্পর্শে এসে অভাবিত কৃষি, গ্রামীণ ও নগর-সভ্যতার সহিত পরিচয় লাভ করে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলো। পূর্বতন দুই নরগোষ্ঠীর 'আর্যীকরণ' হয়ে উঠলো তাদের এক বিরাট কীর্তিস্তম্ভ।

[ক্রমশ।

চিত্র : শ্রীআশুতোষ সিংহ

মহাপ্রলয়ের পরে

গীতা মুখোপাধ্যায়

আজ যে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে লিখতে বসেছি তাহা নিদারুণ মর্মস্পর্শী হলেও প্রণিধানযোগ্য। সুখের মধ্যে থেকে আমরা ভুলে যাই—আর্ত-ব্যথিতের ব্যথা, ভুলে যাই সেই পরম পুরুষকে, যাঁর অপরিসীম অনুগ্রহে আমরা চিরাশ্রিত।

মৃত্যুর বিভীষিকা আছে, নেই তার মধ্যে ভবিষ্যতের বাঁচার আশঙ্কা বা হারিয়ে যাওয়ার বেদনা—আছে শুধু ভীতি ও বিস্মরণ। কিন্তু বন্যা ও দুর্ভিক্ষের আছে করালছায়া, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও সংহারমূর্তি। উত্তাল উদ্দাম চিরচঞ্চল ক্ষিপ্রগতিতে যে আসে যায়, ধনী-নির্ধন কারুরই যে সমঝদার নয়, এক মিনিটে করে দেয় মানুষকে সর্বস্বান্ত দিশাহারা ও পথের ভিখারী। সমবেদনা ও সহানুভূতির চিহ্নমাত্র নেই তার প্রলয়-নৃত্যে। ধ্বংসের উন্মাদনায় তখন সে প্রমত্ত হস্তীর মত মত্ত পাগল। রূপ কিন্তু ভিন্ন, কখনও রুক্ষ, কখনও বর্ষণসিক্ত।

প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস মানুষের আশা-ভরসাকে নিয়ে। তাদের বাড়ীর মত সব কিছুরই শেষ হয়ে যায় মুহূর্তের একমাত্র দৃষ্টিপাতে। কিন্তু যিনি করেন এই সংহার তিনিই যোগান ধৈর্য ও শক্তি মানুষের প্রাণে। হতাশায় ভেঙে না পড়ে বুক বাঁধে তারা, নতুন উদ্যমে মেনে নেয় বিধাতার দান। ভাগ্যকে দোষারোপ করে আর কারও উপর করে না এই দুর্দশার দায়িত্ব অর্পণ।

সম্প্রতি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, মালদহ ও কালিম্পং-এর উপর দিয়ে যে বন্যা ও ধস নেমে গেলো তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। খরার পরে এই বন্যা আসাতে স্বভাবতই আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বহু দেশের ইতিহাসে এ তো নতুন নয়। আপনারা যদি ১৮৮৫ সনের বামাবোধিনী পত্রিকার এই অনুলিপি পড়েন বুঝতে পারবেন এর তাৎপর্য—

'অগ্নিদাহ, দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে এবার বহু দেশের অনেক স্থানের সর্বনাশ করিয়াছে, বর্ষার শেষে আবার ভয়ানক বন্যা হইয়া অনিষ্টের যাহা বাকী ছিল শেষ করিল। রূপনারায়ণ ও দামোদর উথলিয়া উঠিয়া মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার অনেক স্থান ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে—শত সহস্র লোকের ঘর-বাড়ী গরু-বাছুর বিনষ্ট হইয়াছে। ধান্য-ক্ষেত্র শ্মশানভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। হুগলী নদীয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ণিয়া ত্রিহুত প্রভৃতি জেলারও অনেক স্থানের দুরবস্থা হইয়াছে। পূর্ববাংলা রেলওয়ের ট্রেন প্রায় বন্ধ।

'হিতৈষী নর-নারীগণ এ সময়ে বিপন্নদিগকে সাহায্য করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন।

বিকাশভানু সংকলিত এই আবেদন আজ থেকে শতবর্ষপূর্বেও ছিল। আমাদের বিস্মৃতিই সব ভুলে যাওয়ার কারণ। এর সুফলও আছে—কারণ স্মৃতি যদি মানুষকে মোহান্ধ করে রাখতো তাহলে সে চিরদিনের মত মুহ্যমান হয়ে থাকতো। মানুষের ধৈর্যের সীমা যে কি অসম্ভব এবং মানুষ যে কিভাবে সকল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যেতে পারে, তারই কিছু আপনাদের জানাচ্ছি। এ সমস্ত কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছি সত্তরটি মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠিত 'উইমেন্স কো-অরডিনেটিং কাউন্সিল'-এর পক্ষ থেকে। ইংরাজি নামের উল্লেখ করলাম কারণ আর একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান আছে 'সংযুক্ত মহিলা পরি-পরিষদ' নামে। আমাদের তর্জমা করতে পারেন মহিলা সমন্বয় সমিতিরূপে।

আমাদের সভানেত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় এবং সভ্যা হিসাবে সকল ভাষাভাষি মহিলারা আছেন। স্বনামধন্যা শ্রীমতী রায় ছাড়া প্রথিতযশা বাংলাদেশের

প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের কাজ জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সঙ্ঘবদ্ধভাবে—তা সে দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, খরা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা।

১৯৪৪ সাল থেকে আমরা এ কাজ করে আসছি প্রতিটি জায়গায় জাতিধর্মনির্বিশেষে। আমাদের সদস্যেরা প্রতিটি বিপন্নের পাশে দাঁড়িয়ে যেটুকু দেন বা দিয়ে আসেন—প্রয়োজনবোধে সে জায়গায় থাকেন ও কয়েকদিন। যাতায়াতের খরচা তাঁহাদের দান হিসাবে সমিতিতে স্বীকৃত হয়। জরুরী আহ্বানে প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় জিনিষ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন অত্যন্ত তৎপরতা ও ভালবাসার সঙ্গে। নীরব কর্মীর খ্যাতিও বোধহয় আমাদের সমিতি সানন্দে আপনাদের কাছে স্বীকার করতে পারে।

এই রকম সমিতির যুগ্ম-সম্পাদিকা হিসাবে যখন বন্যায় সব জেলা প্লাবিত হয়ে যায়, আমাকে সমিতি সব জায়গায় আমাদের রিলিফের কাজের চালনার দায়িত্ব দেন আংশিকভাবে। প্রতিটি সদস্যাকে নিয়ে দল গঠন করা, যানবাহনের ব্যবস্থা করা, খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সমস্ত ভার আমার উপর দেওয়া হয় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমি দায়ী।

অবশ্য এ ব্যাপারে সহকর্মীদের অক্লান্ত সহযোগিতা আমাদের কাজের সফলতার রূপায়ণে সাহায্য করেছে। আমাদের পরিচয় আমাদের সমষ্টিগত কাজ। গত ৯ই জুলাই ১৯৬৮ যখন কলকাতা শহর জলমগ্ন হয় তখন থেকেই আমাদের কাজ শুরু হয়। মেদিনীপুর, হুগলী, ঘাটাল, হাওড়া, আমতা প্রতিটি জায়গায় কাজ সেরে যখন নিজেদের কাজের সমীক্ষায় বসবার ঠিক্ করছি আংশিকভাবে উত্তরবঙ্গের প্লাবনের খবর এলো। সুরু হল বিরাম-বিহীন কাজের পালা।

প্রথমেই বলেছি আমাদের সভ্যরা সকলেই অক্লান্তকর্মী ও সময়দানের সাথী। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু একটু সময়াভাব ও যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কয়েকজনকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হলো। ১৩ই অক্টোবর শ্রীমতী রায় শ্রীমতী প্রতিমা বসুকে নিয়ে সংগঠনের কাজে কিছু জিনিষপত্তর নিয়ে চলে যান জলপাইগুড়ি। আমি ১৫ তারিখে সকালের প্লেনে শিলিগুড়ি গিয়ে জলপাইগুড়ি যাই। মেদিনীপুর ও অন্যান্য জায়গায় দেখেছিলাম কেবল জল আর জল আর এখানে দেখলাম কেবল ভাঙা বাড়ী পলিমাটির স্তূপ, বড় কাঠ, মানুষ ও গবাদি পশুর মৃতদেহ পাশাপাশি ও তেমনি পচাগন্ধ।

দেখে মনে হলো এ কোন মহাশ্মশানের পথে যাচ্ছি। যেদিকে তাকাই দেখি জল, মানুষ নেই কেবল কাঠ আর কাঠ। হাসপাতালের একতলা জলে ডুবে আছে। আর ভেসে গিয়েছে তার দামী আসবাবপত্র। শিলিগুড়ি থেকে যাবার পথে দেখলাম ক্ষীণকায় বালসান নদী গ্রাস করেছে ৩।৪টি পাড়ী সেতুকে বিধ্বস্ত করে আর নিঃশেষ করেছে বস্তী।

দেখলে মনে হবে না কোন দিন মানুষের বসতি ছিল, ঘর বাড়ী মানুষ সব নিজেকে কোলে টেনে নিয়েছে। যাঁরা কোনরকমে বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রয়োজনীয় কিছু দিলাম; তবে দেখলাম আনন্দ তাদের জীবন থেকে চিরতরে নিয়েছে বিদায়, রেখে গিয়েছে বিষাদ আর অন্তহীন স্মৃতি। ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনাই যেন আজ তাদের করছে না আগ্রহান্বিত। এই সবের মধ্যে দিয়ে গেলাম জলপাইগুড়ির বন্যাবিধ্বস্ত পালপাড়া, রায়কতপাড়া, ওয়াকারগঞ্জ, সেনপাড়া ও সমাজপাড়া। যাবার পথে চোখে পড়ল দুরন্ত ঝরনার ভাসমান সেতু। পলিমাটিতে নব-কলেবর পাওয়া পুলিশের থানা ও তার গর্ভে জীপগাড়ী। রায়কত পাড়ার রাজবাড়ী ম্রিয়মাণ অবস্থায় তার সিংহদুয়ারের ভিতর পলিমাটিকে সযত্নে রক্ষা করছে - আর দেবদেউল ভগ্নাবস্থায় আশ্রয় দিয়েছে মন্দিরের চত্বরে, প্রাঙ্গণে শত শত বন্যাপীড়িতদের।

এসেছিলাম যার যেটুকু সম্বল তাই দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে নতুন সংসার। কিন্তু করবে কি দিয়ে এই সর্বস্বহারা- কিছু কি আছে—তাই আজ তারা আপনার আমার কাছে প্রার্থী শুধু বাঁচার আগ্রহে। কত মধ্যবিত্ত পরিবার একবস্ত্রে বৃষ্টির দিন থেকে রয়েছেন এই ওয়াকারগঞ্জে -কিন্তু তাঁদের আত্মমর্যাদা বাইরের দান নিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। —কিন্তু তবু করতে হবে অভাব নিবারণ। তাই বাড়ী গিয়ে আলাদাভাবেই যার যা প্রয়োজন দিয়ে এলাম। কত মা আজ সন্তানহারা, কত স্বামী স্ত্রীহারা, কত স্ত্রী স্বামীহারা তার কোন সংখ্যা নেই।

সেনপাড়া একটি সাধারণ 'দিন আনে দিন খায় এই রকম' লোকের পাড়া। সেখানে পাকাবাড়ী বিশেষ কোনদিন ছিলো না- সেখানকার অবস্থা দেখলে মনে হবে মরুভূমির শ্মশান। সুস্থচিত্তে বাস করার মানসিকতা এখনও লোকের মধ্যে ফিরে আসে নি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি বলেছিলেন সেনপাড়ার একটি নিঃস্ব পরিবার—

'একবার দেশ বিভাগে রিফিউজি হয়ে এখানে এসেছিলাম নিঃস্ব হয়ে- আবার হলাম এবার প্রলয়ঙ্করী বন্যায় নিঃস্ব।'

আজ তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই নেই, এমন কি দুই পুত্র স্ত্রী-কন্যাও হারিয়েছেন।

এ পাড়ার ব্যবসায়ীরা ছোটখাট ব্যবসা করে সংসার চালাতো- বেশীর ভাগ বাড়ীই একতালা। তাই বেশীর ভাগ বাড়ীই জলের তলায় ছিল। একই অবস্থা রায়কতপাড়া, সমাজপাড়া ও হাকিম পাড়াতেও। সমাজপাড়াতে অবশ্য কয়েকটি বড় বাড়ী পাহারা দিচ্ছে ভাঙ্গা আশপাশকে। সমাজপাড়াতে একজন ছেলের সঙ্গে দেখা হলো—তার বাড়ী তো গিয়েছেই আর গিয়েছে মা, বাবা, ভাই-বোন।

হাকিমপাড়ার এক ভদ্রমহিলা তাঁর দু'বছরের মেয়েকে কি করে হারিয়েছেন বলতে বলতে হাউ হাউ করে

কেঁদে ফেললেন। 'জল যখন ঘরের মধ্যে ঢুকছে বুঝতে পারিনি যে জল চালের উপর উঠবে। যখন চালে উঠলাম তখন কাঠের একটি গুঁড়ি এসে আমাকে ধাক্কা মারাতে আমি আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে ভেসে গেলাম।'

এই তো মানুষের অবস্থা দেহ-মন দুই-ই ক্লান্ত। তার পরের দিন ঠিক করলাম দো-মোহনী যাবার।

দো-মোহনী ময়নাগুড়ি থেকে মোটে ৬ মাইল, কিন্তু রাস্তা বন্ধ থাকায় আমাদের অনেক ঘুরে যেতে হলো। অবশ্য লাটাগুড়ির জঙ্গল ওদলাবাড়ী প্রভৃতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশ ভালই লাগলো। দো-মোহনীতে এসে যা দেখলাম—ভাষাতীত। রেলের লাইন দুমড়ে গিয়ে স্থানচ্যুত, টেলিগ্রাম, টেলিফোনের তার ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে—আর তার মধ্যে কাঠের স্তূপের মধ্যে রয়েছে অগণিত মানুষ অর্দ্ধবৃত অবস্থায়। নদীর ধারে তখনও দেখলাম শব। বিহ্বল বা হতবাক্ হলে চল্‌বে না, তাই এগিয়ে চললাম নিতান্ত সাহসভাবে একটা জায়গার খোঁজে, যেখান থেকে দেওয়া যায় কিছু জিনিষ এদের হাতে তুলে। নির্জীব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম তাদের ব্যথার কাহিনী। যে শোকে মানুষের চোখের জল রোধ করা যায় না, তাকেও তারা সংবরণ করেছে তাদের এই অভাবনীয় নিদারুণ শোক। চোখের সামনে দিয়ে আনাগোনা করছে দেখলাম অশৌচ গ্রহণ করেছে এমন নর-নারী, মুখে নেই কোন ভাষা, যন্ত্রচালিতের মত পথ চলে বেড়াচ্ছে নেহাতই প্রাণে বেঁচে আছে বলে। মনে হলো বন্যার জল যেন এদের চোখের জলও গ্রাস করে নিয়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম দুটি কাহিনী, যা আপনাদের কাছে বলছি, যে ছবি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। ২৪।২৫ বছরের মা ৫।৬ বছরের একমাত্র ছেলের হাত ধরে সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিষ্ঠুরভাবে জানতে চাইলাম তাঁর ব্যথার কাহিনী। দেখলাম—বলে গেলেন কোন ব্যথা প্রকাশ না করে, না কথায়—না ভাবভঙ্গীতে।

তিনি বললেন, 'মা আমার চার সন্তান ও স্বামী একটা মাটির বাড়ীতে থাক্‌তাম। আমার কোলের মেয়েটি মোটে ১৪ দিনের। আমাদের এদিকে জল বেশী হয় বলেই প্রতিটি বাড়ীতে একটি করে মাচান করা থাকে, যেখানে খাবার ও কিছু জিনিষ পত্তর তুলে রাখা হয়। আর জানেন তো এখানকার বৃষ্টি একবার নামলে আর থামতে চায় না সহজে। ৩।৪ দিন বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে এবং তার সঙ্গে এলোপাথাড়ি ঝড়। নদীর জল ফুলে উঠলো এবং আমাদের বাড়ীতে ৯।১০ ফুট জল।

অগত্যা আমরা সকলে মিলে আশ্রয় নিলাম মাচাং-এ। হঠাৎ রাত্তির তিনটের সময় শুনলাম মানুষ, গরু, ছাগলের মরণডাক আর জলের গর্জন—১০ মিনিটের মধ্যে সব শেষ করে দিয়ে গেলো, নিয়ে-গেলো আমার বুক ছিনিয়ে আমার ছোট মেয়েকে আর নিয়ে গেলো দুটি সন্তান ও স্বামীকে। দেড় দিন পরে জল ও ঝড় কমলে নেমে এসে পেলাম স্বামীকে ২ দিন বাদে অজ্ঞান অবস্থায় কিন্তু আর যাদের হারালাম তাদের চিরদিনের জন্যই হারালাম। আমিও যেন পাথর হয়ে গেলাম।

আবার এলেন এক বৃদ্ধ তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে, ৬৪ বছর বয়স। বললেন, মা যখন জল বাড়তে আরম্ভ করলো আর নদীর গর্জন শুনতে লাগলাম—কোলে, পিঠে, কাঁখে সাতটি সন্তান নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে আশ্রয়ের খোঁজে পাড়ি দিলাম। হঠাৎ দেখলাম প্রচণ্ড তোড়ে জল এসে নিয়ে গেলো আমার ছেলেমেয়েদের। স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়েছি দু'জনে, দুটি অজগর সাপ ফণা তুলে দাঁড়ালো। পুত্রশোকে কাতর জননী ভাবলেন—তাঁর ছেলেরাই খাবার চাইছে, কোঁচড়ের মুড়ি এগিয়ে ধরলেন মা—তারাও খেলো না, চলে গেলো।' এই কথা বলে বৃদ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

এই তো প্রতিটি পরিবারের অবস্থা দো-মোহিনীতে। প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। সঞ্জীবচন্দ্রের অশথ বৃক্ষ বড় রসিক—যে নীরস পাষাণ থেকেও রস টানে, এই মনোভাব না করতে পারলে মনোবল রাখাই কঠিন। প্রায় যা আপনাদের কাছে লিখছি, ভেবে দেখুন সেই পরিবেশের কথা। তবে দেখলাম মানুষ অকাতরে দাঁড়িয়েছে এই সর্বহারাদের পাশে, বহু সংস্থা তাঁদের সামর্থ্যমতো গিয়েছেন জিনিষপত্তর নিয়ে। সমস্ত সহরটি একটি কাঠের বনে পরিণত হয়েছে আর পলিমাটির স্তূপে। এত বড় বড় কাঠ এসেছে মনে হয় বাড়ী তৈরী হয়ে যায়। গল্পে শুনেছি সাগরে ভেসে আসে জগন্নাথদেবের দারুমূর্তির কাঠ, কোথা থেকে আসে কেউ জানে না। যদি বিশ্বাস করি—ভগবান কল্যাণময়, তাহলে এ কাঠেরও বোধ হয় অর্থ একদিন আমরা জানতে পারবো হয়তো অধর্মের বিনাশের জন্যই এই অস্ত্র।

এর পরে গেলাম কার্শিয়াং ও দার্জিলিং দেখলাম ধস নামার দৃশ্য। বড় বড় পাহাড় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আধফাটা হয়ে বড় বড় ফাটল দেখে মনে হলো—কেউ যেন ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তিস্তার ভীষণ রূপ তখন শান্ত, তার বুকে ঢেউ নেই আর আছে কেবল কাঠের গুঁড়ি। সেতু মেরামত হচ্ছে। বানের জল তখনও অপরিমিত। একদিকে আলো জ্বলে তো আর একদিক অন্ধকার। দার্জিলিং শহরে কয়েকজন বস্তীর লোক ধস-চাপা পড়ে মারা যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। কার্শিয়াং-এ রেল লাইনের ধারে ৩টি পরিবারের বাড়ী গিয়েছে এবং কয়েকজন মারাও গিয়েছেন। দার্জিলিং-এর বিজনবাড়ী ও কুলবাজার এলাকা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।

কার্শিয়াং-এ গীডডা পাহাড়ে ও টুং-এ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। কালিম্পং-এ রাস্তা না-থাকায় এইবার যাওয়া সম্ভব হয় নি, তবে কয়েকদিন বাদে যাই। এই জায়গার বিশেষ করে জলপাইগুড়ি দো-মোহনীর কাঠের বা ধসের নীচে চাপা পড়া মৃতদেহ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি—স্বজনহারা পরিবারের আর্তনাদে

এখনও আকাশ বাতাস বিষণ্ন। পথ-ঘাটের অবস্থা স্বাভাবিক হতে এখনও কিছুদিন লাগবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিঃস্ব সর্বহারাদের সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা নেই। এ সমস্ত এলাকা আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। আমার লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি শিলিগুড়ির লোকেরা যে চারদিন খাদ্য ও পানীয় দিয়ে জলপাইগুড়ির বিপদে এগিয়ে গিয়েছিলো, তাদের কথা না লিখি।

কিছুদিন বিরতির পর শেষ পর্যায়ে আবার ১১ই নভেম্বর তারিখে শ্রীমতী রায় ও আমি জলপাইগুড়ি যাই। জলপাইগুড়ি থেকে সেই দিনই ময়নাগুড়ি আমাকে যেতে হলো ধবল্লা নদীর তীরে মাধব গ্রাম নামে এক নতুন জায়গায়। এতদিন তো তিস্তার ধারেকাছেই যাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম তার কীর্তি—এবার দেখলাম ধবল্লার কাণ্ড। এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে দেখ—দুজনেরই সমান অবস্থা। এখানে বীজমোহন দাশ নামে এক মুচির সঙ্গে কথাবার্তা হলো। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ৬টি লোকের সংসার—বেচারার সুখের সংসার ছিল। বন্যায় তার বাড়ী ঘরদোর তো গেছেই আর গেছে দুই সন্তান ও স্ত্রী। নদীর তর্জন গর্জন ও তার পাশে এই গ্রাম দেখে মনে হচ্ছিল, 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব শাঁখ বাজিয়ে করলি গোল।'

আপনারাই বিচার করুণ—যদি এই গ্রামের নামের সার্থকতা থাকতো এই লোকগুলো তাহলে এরকম অঘটন কি ঘটতো। এই মুচির মত অজানার দুঃখের কাহিনী সন্ধ্যার অন্ধকারে মাধবডাঙ্গা হাই-স্কুলে শুনলাম আর এইখান থেকেই দেখলাম পাকিস্তান বর্ডারেও বিধ্বস্ত বাড়ী। দো-মোহনীতে এসে কিন্তু অবাক্ হয়ে গেলাম। চতুর্দিকে দোকানপাট খোলা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, তবে কেবলমাত্র ধ্বংসের পরিচয় আজও দিচ্ছে ভগ্ন রেল লাইন ও পূতিগন্ধময় বাতাস। জলপাইগুড়িও আবার স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে এসেছে।

১২ই তারিখে সকালে কালিম্পং-এর দিকে রওনা হলাম। চিরাচরিত রাস্তা নয় গরুবাথান দিয়ে লাভা, আনাগার হয়ে কালিম্পং। এ রাস্তা সৈনিকদের রাস্তা এবং লাভার উচ্চতা ৮,০০০ ফিট্। রাস্তায় অনেক ধস নেমেছে, টেলিফোন, টেলিগ্রামের তারও ছিন্নবিচ্ছিন্ন, মেরামতি চলছে আবার সময়ের বন্ধনী-নিবন্ধনীও প্রচুর।

টেস্ট রিলিফ এর কাজ হচ্ছে। জায়গায় সুন্দর সুন্দর পাহাড়ী জায়গায় মেয়ে রং-বেরংয়ের কাপড় পরে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। একদিকে বিরাট পাহাড়ের ধস আর অপর দিকে সুন্দর হাসিভরা মুখ-লাভায় গিয়ে কিন্তু বেশ কাঁপুনি লেগেছিল তবে প্রকৃতির শোভা ও ভারতের চার সীমান্ত দেখার লোভ সংবরণ করতে না পারায় ডাক বাংলোয় কিছুক্ষণের জন্য নামি। মনে হচ্ছিল 'কি দেখিলাম নয়ন মেলে ভুবন ভোলানো বুঝি এলে।"

এই ভুবন-ভোলানো রূপের কথা কিন্তু কালিম্পং-এ ১১ মাইল আশ্রয় শিবিরে এসে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তখন নয়ন মেলে আর দেখার প্রবৃত্তি নেই, তখন খালি হৃদয়হীনের মত শোনা। একই জায়গায় রাস্তার ওপর থেকে তোলা ৪৫টি মৃতদেহ আর একটি যুবকের অপরকে সাহায্য করতে গিয়ে প্রিয়জনকে হারানোর কথা।

একটি আশ্রয়-শিবিরে কিছু ছোটদের জামা কম্বল বিতরণ করে যখন আসছি—এই যুবক

সোভিয়েত রাশিয়ার মেজয়া স্কে বৈদ্যুতিক কলপাতির একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার এক দিন সব ছিল, আজ কিছু নেই—মা, বাবা, ভাই-বোন, জিনিষপত্তর সবই গিয়েছে—তাও অভাবের তাড়না আমার নেই তবে যদি একটি কম্বল দেন রাস্তার বিছানাতেও সুখে ঘুমাতে পারি।'

সে ছবি আমি আজও ভুলতে পারি নি। পরের দিন সকালে গেলাম ভানুখোপ ও তিস্তা বাজারে। কোন দিন মানুষের সহিত ছিল বলে ভানুখোপ মনে হয় না। চতুর্দিকে পাহাড়ের ধস নামা দেখে মনে হচ্ছে—কে যেন ডিনামাইট দিয়ে সব গুঁড়িয়ে দিয়েছে। চতুর্দিকের পাহাড় যেন যজ্ঞোপবীত পরেছে। দুই হাজার লোক জলের স্রোতে ভেসে কোন অজানার পথে পাড়ি দিয়েছে—কেউ জানে না। তিস্তাবাজার সাক্ষী দিচ্ছে রুদ্র-তাপসের সংহারমূর্তি কাকে বলে, এই-খানে এলে বুঝতে পারা যায়।

মানুষ-বিশ্বকর্মার করা জিনিষ প্রকৃতি এক ঝলকে তাদের বাড়ীর মত ভেঙে দিয়েছে, কত বাড়ী যে স্থানচ্যুত করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবে এইটুকু সুবিধা জবর-দখল করা বা কিছু করার জন্য মামলা দায়ের করার লোক নেই। বেদখল জমির মালিক হয়ে কয়েকটা বাড়ী বসে আছে।

এইভাবে সব জায়গায় ঘুরে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে এলাম নিজেদের কর্মস্থলে—সমীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকার জন্য।

বাল্মীকি-রামায়ণ প্রশস্তি

[illegible]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্রৌঞ্চবধ বাল্মীকি ও ব্রহ্মা
(সর্গ—২)

দেবর্ষি নারদ বাক্য হেনরূপ করিয়া শ্রবণ
হলেন বিস্ময়ে মগ্ন সশিষ্য বাল্মীকি তপোধন ॥
আপন মনেতে করি' মুনিবর রামের অর্চনা
করিলেন অনন্তর নারদের সশিষ্যে বন্দনা ॥
যথাবিধি পূজা তথা হয়ে প্রাপ্ত দেবর্ষি তখন
সম্ভাষিয়া বাল্মীকিরে করিলেন স্বর্গেতে গমন ॥
নারদ অমরলোকে গেলে চলি ক্ষণকাল পরে
গেলেন বাল্মীকি মুনি স্রোতস্বিনী তমসার পারে।
কর্দমবিহীন তথা ঘাট তার করি' নিরীক্ষণ
কহিলেন মুনিবর শিষ্যে তাঁর করি সম্বোধন,
হের ভারদ্বাজ হেথা ঘাট এই শিলা বিরহিত,
পবিত্র প্রসন্ন যেন সজ্জনের অন্তরের মত ॥
সমতল বালুময় ঘাট এই সুন্দর সজল
হেথায় করিব স্নান তমসার জলে সুনির্মল ॥
বল্কল আশ্রম হতে লয়ে তুমি কর আগমন
না হয় বিলম্ব যেন। গুরুবাক্যে করিয়া গমন
সত্বর আশ্রমে পুনঃ ভারদ্বাজ করি' আনয়ন
বল্কল, গুরুর হস্তে করিলেন প্রদান তখন ॥
লয়ে সে বল্কল তাহা পরিধান করি অনন্তর
স্নান [illegible] করিলেন তথা মুনিবর ॥
পিতৃগণে [illegible] করি' [illegible] তর্পণ
কাননে [illegible] করিতে ভ্রমণ ॥
হেরিলেন অনন্তর মুনিবর [illegible]
[illegible] ক্রৌঞ্চ বিরহিছে [illegible] ॥
[illegible] এক আসি' তথা, মুনির সাক্ষাতে
সে ক্রৌঞ্চমিথুন মাঝে একেরে বধিল শরাঘাতে ॥
শোণিতাক্ত দেহে তারে ভূলুণ্ঠিত নেহারি তখন
শূন্যপথে ভ্রমি' ক্রৌঞ্চী আরম্ভিলা করুণ রোদন ॥
নিষাদের হস্তে ক্রৌঞ্চ হত হেন নেহারি তথায়
শিষ্যসহ বাল্মীকির হলো প্রাণ পূর্ণ করুণায় ॥
করুণা আবিষ্ট হয়ে ক্রৌঞ্চীর সে করুণ রোদনে
কহিলেন মুনিবর বাক্য এই সন্তাপিত মনে ॥
'যুগল এ কামমুগ্ধ ক্রৌঞ্চ মাঝে বধেছ একেরে
রে নিষাদ হবে তাহে প্রতিষ্ঠাবিহীন চিরতরে ॥'
ভাবিলেন মুনিবর বাণী সেই করি' উচ্চারণ
ক্রৌঞ্চ লাগি শোকভরে একি বাক্য কহিনু এখন ॥
বাক্যকেই মনে মনে ক্ষণকাল ভাবিয়া তখন
কহিলেন ভারদ্বাজে মুনিবর করি সম্বোধন ॥
পাদচতুষ্টয়ে বদ্ধ কহিনু যে বাক্য সমাক্ষর
শোকভরে, শ্লোক নামে হবে তাহা খ্যাত নিরন্তর ॥
শুনি' গুরুবাক্য সেই করি' তাহে প্রীতি প্রদর্শন
'হোক্ তাই' কহিলেন ভারদ্বাজ তাঁহারে তখন ॥
শিষ্যসনে রহি রত সে শ্লোক প্রসঙ্গে মুনিবর
রহি' আর চিন্তামগ্ন গেলেন আশ্রমে অনন্তর ॥
সুবিনীত প্রিয় শিষ্য ভারদ্বাজ করিয়া গ্রহণ
জলপূর্ণকুম্ভ, তাঁর অনুগামী হলেন তখন ॥
সশিষ্য আশ্রমে পশি' উপবিষ্ট হয়ে অনন্তর,
গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন বাল্মীকি মুনিবর ॥
অনন্তর মুনিবরে হেরিতে হলেন উপনীত
স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, হেরি তাঁরে হয়ে সমুত্থিত
মুনিবর সসম্ভ্রমে, যুক্ত করে প্রণমি' তাঁহারে
করিলেন [illegible] তাঁর বিস্মিত অন্তরে ॥
[illegible] পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদান করি' আর
পূজি' তাঁরে মুনিবর [illegible] তাঁহার ॥
আসন গ্রহণ করি' [illegible] স্বয়ম্ভু তখন
করিলেন বাল্মীকিরে [illegible] আসন গ্রহণ ॥
সম্মুখে আসীন ব্রহ্মা, হয়ে তবু তদ্‌গত অন্তর
রহিলেন [illegible] মগন মুনিবর ॥

হয়ে শোকপরায়ণ ক্রৌঞ্চী তরে মনে মনে তাঁর
লাগিলেন মুনিবর শ্লোক সে ভাবিতে বারবার ॥
কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চে বধি' পাপাত্মা সে ব্যাধ দুরাচার,
করেছে দুষ্কার্য যেই, ভাবিলেন মনে তাই আর ॥
সহাস্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কহিলেন তাঁহারে তখন
ক্রৌঞ্চ-বধে হে মহর্ষি যে বাক্য করেছ উচ্চারণ
শোকেতে বলেছ তাই শ্লোক বলি' হবে তা বিখ্যাত,
এ বাণী ইচ্ছায় মম হে ব্রহ্মণ হয়েছে নির্গত ॥
কর এবে মুনিবর শ্লোকে এই প্রকাশ এখন
ধর্মশীল গুণবান ধীমান রামের বিবরণ ॥
দেবর্ষি নারদ মুখে যাহা তুমি করেছ শ্রবণ
রামের বৃত্তান্ত যত গোপন কি বাসে অগোপন,
রাম আর বৈদেহীর রাক্ষসকুলের আর যত
বৃত্তান্ত রয়েছে যাহা জ্ঞাত তুমি অথবা অজ্ঞাত,
পত্নী আর রাষ্ট্রসহ দশরথ নৃপ ব্যবহার
কর্মক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত যাহা কিছু আচরণ তাঁর,
যে সব বৃত্তান্ত মাঝে যদি কিছু থাকে অবিদিত,
মম অনুগ্রহে এবে হে বাল্মীকি হবে তা বিদিত ॥
এ কাব্যে তোমার বাক্য জেনো কভু মিথ্যা নাহি হবে,
মনোরম রামক । শ্লোক্কেতে রচনা কর এবে ॥
যতকাল নদীগিরি ধরাতলে রবে অবস্থিত
রামায়ণ কথা তব ততকাল রবে প্রচারিত ॥
যতকাল প্রচারিত রবে রাম চরিত তোমার
তুমিও করিবে বাস ততকাল জগতে আমার ।
কহি ইহা অকস্মাৎ স্বয়ম্ভু হলেন অন্তর্হিত,
হলেন বাল্মীকি তাহে শিষ্য সহ পরম বিস্মিত ॥
মনোরম অর্থেপদে, প্রতিপদে সমাক্ষর
শত শত শ্লোকে অনন্তর,
রামের আখ্যান লয়ে যশস্কর মহাকাব্য
রচিলা বাল্মীকি মুনিবর ॥

বাল্মিকী ও লবকুশ

(সর্গ ৩—৪)

রাজ্যপ্রাপ্ত হলে রাম রচিলা বাল্মীকি মুনিবর
বিচিত্র পদে ও অর্থে রামের চরিত্র মনোহর ॥
বিরচিত সে আখ্যান চতুর্বিংশ সহস্র শ্লোকেতে ।
সর্বপাপ বিনাশন প্রশংসিত ঋষি সমাজেতে ॥
অপূর্ব সে মহাকাব্য ধর্ম অর্থকাম সমন্বিত,
শ্রবণ মননে যার হয় পুণ্য সতত অর্জিত ॥
রচি' কাব্য রামায়ণ ভাবিলেন মহর্ষি তখন
লোক মাঝে কাব্য এই কে করিবে প্রচার এখন ॥
এ হেন চিন্তায় যবে মুনিবর ছিলেন মগন
আসি সেই বনে তাঁরে মুনিবেশ ধারী দুইজন
বালক, পরশি পদ করিলেন প্রণাম তখন ॥
শিষ্য তাঁরা বাল্মীকির রূপবান উদার হৃদয়
লব কুশ নামে খ্যাত, রাম আর সীতার তনয় ॥
মস্তক আঘ্রাণ করি' কহিলেন সে দোঁহে তখন
মুনিবর মমকৃত মধুর এ কাব্য রামায়ণ
শ্রবণ কীর্তনে যার হয় পুণ্য তোমরা দু'জন
কর মম নির্দেশেতে কাব্য সেই গ্রহণ এখন ॥
সুমধুর বীণাধ্বনি, সুমধুর আর সপ্তস্বর
সমন্বয়ে কাব্য এই শ্রোতৃগণ শ্রুতি মনোহর ॥
শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্য ভয়ানক আর
করুণ, অদ্ভুত, শান্ত, এই নবরসের আধার ॥
কাব্য রামায়ণ এই । কহি' ইহা মহর্ষি তখন
করালেন ভ্রাতা দোঁহে সে রাম চরিত অধ্যয়ন ॥
কহিলেন অনন্তর যথায় হবেন সম্মিলিত
ঋষিকুল, সাধুকুল, পুণ্যশীল নৃপ আর যত
তোমরা আখ্যান এই গান সেথা করিবে সতত ॥
সে রাজতনয় দোঁহে ছিলেন সুকণ্ঠ স্বভাবত
ছিলেন রূপেতে আর হেন তারা শ্রীরামের মত
রামরূপ বিম্ব হতে প্রতিবিম্ব যেন সমুদ্ভূত ॥
বাল্মীকি আদেশে আসি' ঋষিগণ সমুখে তখন
গাহিলেন ভ্রাতা দোঁহে সুমধুর স্বরে রামায়ণ ॥
শ্রবণ করি' সে কাব্য সর্বশঙ্খবাসী ঋষিগণ
'সাধু সাধু' বলি' রব করিলেন সবে উচ্চারণ,
মহাহর্ষ কোলাহল হলো সেথা উত্থিত তখন ॥
কহিলেন লবকুশে হৃষ্ট হয়ে মুনিগণ যত
কি সঙ্গীত সুমধুর কিবা কাব্য ভাব অনুগত ॥
আহা কি মনোজ্ঞ এই শ্রীরামের মহৎ আখ্যান
তালমান সমন্বিত কিবা শ্রুতি মনোহর গান ॥
এহেন প্রশংসা লভি বহুমান লভি' তারা আর,
গাহিলেন গান সেই সুমধুর স্বরে পুনর্বার ॥
দিলেন সে ভ্রাতা দোঁহে প্রীত হয়ে যত মুনিগণ
পানীয় কলস কেহ, কেহ বা বল্কল মনোরম
স্বাদু বন্যফল আর দোঁহারে দিলেন কোনজন ॥
কবি যাঁরা নরকুলে কাব্যের তাঁদের বীজভূত
অপূর্ব সে আদিকাব্য, মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত
হলো হেনভাবে যেথা মুনিগণ মাঝে সমাদৃত ॥
লভি' যশ ভ্রাতা দোঁহে নানা রাজ্যে করিয়া ভ্রমণ
নৃপকুল সন্নিধানে গাহিলেন কাব্য রামায়ণ ॥
অশ্বমেধ রত রাম শুনি' বার্তা, সে দোঁহে তখন
আনিলেন সমাদরে যোগ্য লোক করিয়া প্রেরণ ॥
রামের নির্দেশ লভি' লবকুশ অনন্তর
গাহিতে লাগিল রামায়ণ,
লয়ে যত সভাসদ নিবিষ্ট মনেতে রাম
করিলেন সে গীত শ্রবণ ॥

[illegible]
অযোধ্যা বর্ণন

(সর্গ ৫—৭)

সাগর সীমান্তামহী করিলেন বীর্যেতে অর্জন,
যশস্বী, অমিততেজা, পুণ্যকীর্তি যে রাজন্যগণ
মনু ইক্ষাকুর বংশে, করেছিলা জনম গ্রহণ
যাঁহাদের বংশে পূর্বে সগর নৃপতি নরোত্তম,
সাগর খননকারী বলি' যিনি খ্যাত চরাচরে
চলিত সঙ্গেতে যাঁর পুত্রষাটি সহস্র সমরে,
সুবিখ্যাত সেই যত নৃপতির বংশধর রাম
রামায়ণ বিরচিত লয়ে তাঁর পবিত্র আখ্যান ॥
কোশল নামেতে দেশ সরযূর তীরে অবস্থিত
সমৃদ্ধ আনন্দময়, ধনধান্য পশু সমন্বিত ॥
অযোধ্যা নামেতে পুরী দেশে সেই, ভুবনবিদিত,
পুরী সেই পুরাকালে মানবেন্দ্র মনু বিনির্মিত ॥
দ্বাদশযোজন দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে তিন যোজন বিস্তৃত
সৌন্দর্যে মণ্ডিত পুরী নব নব গৃহে বিমণ্ডিত ॥
পুরদ্বারে সুবিভক্ত, সুবিস্তীর্ণ পথ সমন্বিত
ধূলি যাহে জলসিক্ত হেন রাজপথে সুশোভিত ॥
নানা বণিকের বাস, নানাবস্তুরাজি বিভূষিত
বহু উপবন আর বিশাল ভবনে পরিবৃত ॥
রাষ্ট্রের কল্যাণকামী দশরথ নৃপ মহাত্মন্
অমরায় ইন্দ্রসম করিতেন সে পুরী পালন ॥
দৃঢ় পুরদ্বার যুক্ত মহাপথে, বহু বিপণিতে
নানা যন্ত্রে, নানা অস্ত্রে, সুবিচিত্র শিল্পসম্ভারেতে,
শতঘ্নী পরিখে বহু, ধ্বজশীর্ষ বহু তোরণেতে
সমাকুল নানাযানে বহু হস্তী, বহু অশ্বেরথে
পথিক, বণিক, দূতে, সুবিশাল দেবালয়ে আর
ছিল সে অযোধ্যাপুরী মনোরম শোভার আধার ॥
বিশাল উদ্যানে আর পানীয় ভবনে সুশোভিত
মহা অট্টালিকাপূর্ণ বহু নরনারী সমন্বিত,
পুরী সেই, ছিল পূর্ণ বিদ্বান পুরুষশ্রেষ্ঠে যত,
সুরম্য আলেখ্যসম গৃহ তার সুবর্ণে অঙ্কিত ॥
সমভূমি মাঝে স্থিত ঘন গৃহ শ্রেণীতে মণ্ডিত
বেণু, বীণা, মৃদঙ্গের মধুর নিক্বণে নিনাদিত ॥
উৎসবে মগন যত পৌরজনগণের পূরিত
ধনু নিঃস্বনেতে পূর্ণ, নিত্য বেদধ্বনি সমন্বিত,
শালি তণ্ডুলের অন্নে সুপেয় পানীয়ে পূর্ণ আর
মনোরম হবিগন্ধে ধূপে মাল্যে সৌরভ আধার,
অযোধ্যানগরী সেই লোকপাল সমতুল্য যত
শাস্ত্রবিদ্ বীরকুল করিতেন রক্ষা অবিরত ॥
বিদ্যাহীন অশাস্ত্রজ্ঞ সেথা নাহি ছিল কোন জন
গর্হিত পন্থায় কেহ করিত না অর্থ উপার্জন ॥

স্বপত্নীতে অনুরক্ত ছিল নর, নারী পতিব্রতা
ধৈর্যশীল বৃত্তাচারী ছিল সদা স্ত্রীপুরুষ সেথা।
কুণ্ডল মুকুটমাল্য প্রসাধনহীন কলেবর
দরিদ্র কদর্যবেশ নাহি ছিল নারী কিংবা নর।
সৌন্দর্য মাধুর্যময়ী নারী যত অযোধ্যা ভবনে
রহিতেন আচ্ছাদিত অম্লান বস্ত্রে ও আভরণে ॥
কুরূপ, অজিতেন্দ্রিয়, অলস, ঐশ্বর্যহীন আর
নীচমনা নাহি ছিল নর কেহ পুরী অযোধ্যার ॥
রক্ষা করে গিরিগুহা সিংহ যথা অযোধ্যা তেমন
করিতেন রক্ষা সদা যুদ্ধেতে অজেয় বীরগণ ॥
কাম্বোজ, বাহলীক আর সিন্ধুদেশ জাত অশ্বে যত
পূর্ণ ছিল সে অযোধ্যা, ছিল আর পূরিত সতত
বলবান হস্তিকুলে বিন্ধ্য আর হিমগিরিজাত।
তোরণে, উদ্যানে নানা, শত শত গৃহে সুশোভিত
পুরী সে, দশরথ করিতেন পালন সতত ॥
বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষিশ্রেষ্ঠ সর্ববেদবিদ্
দশরথ নৃপতির ছিলেন মন্ত্রী ও পুরোহিত ॥
অমাত্য ছিলেন তাঁর শুদ্ধাচারী আর অষ্টজন।
কল্যাণ কর্মেতে রত, সদা রাজ অনুরক্ত মন ॥
জয়ন্ত, অর্থ সাধক, ধর্মপাল, সিদ্ধার্থ, বিজয়,
অশোক, সুমন্ত, ধৃষ্টি, এই অষ্টনাম পরিচয় ॥
বিনয়ী, বিজিতেন্দ্রিয়, রাজাদেশ পালনে তৎপর
নীতিবিদ, জ্ঞানবান, বর্ষীয়ান, নির্লোভ অন্তর ॥
তেজ-ক্ষমা-ধৃতিবান, সহাস্যে সম্ভাষকারী আর
সত্যনিষ্ঠ, সুবিবেকী, সর্বলোকে সম ব্যবহার ॥
স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে মিত্র আর শত্রুদল যত
কোন্ কার্যে আছে রত, সব তাঁরা ছিলেন বিদিত ॥
ধর্মশীল, সদাচারী, সুবিবেক সম্পন্ন সতত,
অর্থ সংগ্রহেতে আর সৈন্যদল সংগ্রহেতে রত,
সর্বজনে সমদর্শী ছিলেন সে মন্ত্রিগণ যত ॥
পুত্রেরও পাইলে দোষ করিতেন শাস্তির বিধান
নির্দোষে শত্রুরও নাহি করিতেন কভু অকল্যাণ ॥
রাজ্যবাসী চতুর্বর্ণে করিতেন রক্ষার বিধান।
পিতৃপিতামহ ক্রমে জ্ঞাত তাঁরা জ্ঞান ও বিজ্ঞান ॥
পরস্পরে প্রীতিযুক্ত, প্রিয়ভাষী, গুণী অগর্বিত
সুবেশ প্রশান্তমনা, পরনিন্দা প্রচারে বিরত ॥
প্রভাবে তাঁদের ছিল সর্বলোক স্বকর্ম তৎপর
না ছিল তস্কর সেথা, নাহি ছিল অশুদ্ধাত্মা নর
দুষ্ট পরদারস্পর্শী সে সবার পরিচালনায়
উদ্বেগবিহীন ছিল রাষ্ট্র সেই, ছিল প্রশংসায়
পরিপূর্ণ অবিরত। এ হেন অমাত্য সমন্বিত
দশরথ, এ পৃথিবী করিতেন পালন সতত।
অম্বরে আপন তেজোদীপ্তিমান ভাস্করের প্রায়,
ছিলেন পৃথিবীপতি দশরথ বিখ্যাত ধরায় ॥

[ক্রমশঃ

অর্থোপার্জনে নারী

শ্রীমতী পরীরাণী সেন

গত মহাযুদ্ধের সময়, অর্থাৎ আটাশ-উনত্রিশ বছর আগে মেয়েদের সর্বপ্রথম সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে যায়। যুদ্ধ-চাকরির রেওয়াজ সংক্রান্ত বিভিন্ন অফিস সৃষ্টি হলো—এগুলোতে হঠাৎ অগণিত লোক দরকার; তাই, এ সময়ে শিক্ষিত ছেলেরা তো দলে দলে যোগ দিলোই, মেয়েরাও ঘরের আব্রু ছিন্ন করে প্রকাশ্য আলোকে ছেলেদেরি মতো ঐসব অফিসে এসে ঢুকতে শুরু করলো। এর পর থেকে সে প্রবাহ আর বন্ধ হয় নি।

ক্রমে যুদ্ধ একদিন থেমে গেল। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী যুগটা অর্থনৈতিক দিকে একটা অপ্রতিরোধ্য বিপ্লব নিয়ে এলো—ভোগ্য সব জিনিসেরি দাম হলো উর্ধ্বগতি। এটা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো এ বিপ্লব। আন্তর্জাতিকতার সুতোয় বাঁধা আমাদের দেশের আমদানি-রপ্তানিমূলক ব্যবসা-বাণিজ্যও তাই ঐ বিপ্লবের শিকার হলো। 'শিকার'—বলা হলো এ জন্য যে, দরিদ্র এ দেশের বুকে ঐ বিপ্লবের গতিবেগ সজোরে এসে নিষ্ঠুর আঘাত হানলো। দ্রব্যমূল্যের দেশগত এ মহাদুর্যোগের দিনে, ধূর্ত অমানুষ ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই নিজ দেশবাসীদের মর্মমূলে তাদের নিজস্ব নির্মম আঘাত হানতে ভুললো না—ঠিক পথ ছেড়ে বিপথে যেতে এদের বিবেকে আটকালো না—অর্থাৎ শুরু হয়ে গেল কালোবাজারি, জাল, ভেজাল, ভোগ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রেখে কূটকৌশলে মুনাফা-শিকার—প্রভৃতি।

এরই মধ্যে ক্রমে এলো দেশের স্বাধীনতা—অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়;—কারণ, গত বিশ বছর যাবৎ ওদিকটায় আমরা ডুবতে ডুবতে চলেছি। এ জন্য কংগ্রেস সরকার কিছু অংশে দায়ী হলেও, নিরপেক্ষ বিচারে সর্বাংশে তা কখনোই নয়। পৌনে দুশ বছরে বৃটিশ সরকার শিক্ষার যেটুকু প্রসার ঘটাতে পেরেছেন, কংগ্রেস সরকার বিশ বছরে তার থেকে বেশী ঘটিয়েছেন। তেমনি শিল্পে বাণিজ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণে সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে—এমন বহু দিকেই অগ্রগতির জলন্ত সব সাক্ষ্য চোখের সামনে রয়েছে। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নে আশানুরূপ মনোযোগ দেওয়া না হয়ে থাকলেও, গত ক-বছর যাবৎ সে ভুল শুধরে নেওয়ার কার্যকরী চেষ্টা পুরোদমে চলেছে।

উল্লিখিত কতকগুলো দিকে উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি হয়ে থাকলেও, দেশে অর্থনৈতিক মুক্তি তো দূরের কথা, ওদিকটায় বরং অদ্ভুত ও একটানা অবনতিই তো দেখতে পাচ্ছি। রপ্তানি-বাণিজ্য না বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি করা যাবে না, ঐ সঙ্গে আবার দেশে আমদানিও ফেলতে হবে যথাসম্ভব কমিয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে—দেশের নানা দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে হলে চাই ছোট ছোট বহু শিল্পের এবং বড় ও ভারী নানা লৌহজাত শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নয়ন। কিন্তু এসব ঘটাতে গেলে চাই প্রচুর অর্থ, চাই সুদীর্ঘ সময়। কারণ ৫১ কোটি জন-অধ্যুষিত দেশটা যেমন ছোট নয়, তার সমস্যাও রয়েছে দিকে দিকে এবং অসংখ্য। তবেই ন্যায্যত বলা চলে—অর্থনৈতিক মুক্তি, বা ঘরে ঘরে অনুভবযোগ্য প্রাণ-প্রাচুর্য চট করে পাওয়া যাবে না—যেতে পারে না।

এরই সঙ্গে ক'টি শুভের অভ্যুদয়ের সঙ্গে তারা যেন কতগুলো অশুভকেও সঙ্গী করে নিয়ে এলো। অতি-দ্রুত সাধারণ শিক্ষার প্রসার, নানা প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণ নিয়ে এলো ভয়াবহ (শিক্ষিত) বেকার সমস্যা। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হয়ে গড়-আয়ু বৃদ্ধিটা হলো শুভসূচক; কিন্তু সেজন্য পরোক্ষভাবে হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তাতে প্রতি পরিবারের হলো কলেবর বৃদ্ধি—সুতরাং হলো পারিবারিক ব্যয় ও বৃদ্ধি; কিন্তু সে অনুপাতে আয় তো বাড়লোই না—বরং মূল্যমানই চলেছে কেঁপে।

●

গত মহাযুদ্ধের সময় হঠাৎ এবং ব্যাপকভাবে মেয়েদেরও যে চাকরি-জীবনের সূত্রপাত, আজ তা ক্রম-বর্ধমান গতিতে এগিয়েই চলেছে। নেহাৎ মুষ্টিমেয় ধনী-ঘরের মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে চাকরির পেছনে না ছুটতে পারে, কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের

অধিকাংশই আজ চাকরি-প্রত্যাশী। শুধু তাই নয়, চাকরিক্ষেত্রে মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে সমতালে এসে পড়ায়, বেকার-সমস্যা দিন দিন বেশী ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। কতগুলো চাকরিতে মেয়েদের একচেটিয়া, বা প্রায়-একচেটিয়া অধিকার প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলো হলো—নার্সগিরি, মেয়েদের-স্কুলের চাকরি, মহিলা-কলেজের অধ্যাপিকা-পদ, টেলিফোনে চাকরি, টাইপিস্টের চাকরি, সেলস্-গার্লের চাকরি প্রভৃতি। এ কটি ছাড়াও নানা অফিসে নানা নতুন নতুন চাকরিতে মেয়েদের অনুপাত ছেলেদের তুলনায় যথেষ্ট কম হলেও একেবারে নগণ্য নয়; এ অনুপাত বাড়ছে, প্রতি বছর বেড়েই চলবে।

প্রতি বছর লক্ষাধিক ছেলেমেয়ে স্কুল-ফাইনাল ও হা: সে: পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে; এর পরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেও অসংখ্য ছেলেমেয়ে প্রতি বছর বেরোচ্ছে। আবার এরও পরে রয়েছে প্রতি বছর বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ডিগ্রীধারী ও নানা প্রযুক্তিবিদ্যায় পাশকরা অসংখ্য ছেলেমেয়ে। এসব শ্রেণীগুলোর অতিবৃহৎ অংশ চাকরি-প্রার্থী। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পে অনগ্রসর আমাদের এই দরিদ্র দেশে প্রতি বছর কতগুলো চাকরি খালি হয়, বা কতগুলো নতুন নতুন ধরণের চাকরি সৃষ্টি হয়? বেকার-সমস্যা মেটাতে প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় তা হাস্যকরভাবে নগণ্য নয় কি?

শিক্ষিত ছেলেদের কিছু অংশ এককভাবে বা অংশীদারি ভিত্তিতে ছোট ছোট ও মাঝারি শ্রেণীর ব্যবসায়ে ঢুকছে বা দোকান খুলে বসছে। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের উপার্জন-প্রচেষ্টা মানেই হলো শতকরা পঁচানব্বই জনেরই একমাত্র চাকরি-পানে ছোটা। অথচ তর্কাতীতভাবে এটা একটা নির্ভেজাল রূঢ় সত্যকথা যে, আমাদের দেশে অগণিত-সংখ্যক চাকরি প্রতি বছর খালি, বা সৃষ্টি হবার আশা নিকট ভবিষ্যতে নেই।

এজন্য মেয়েদের উপার্জন চেষ্টার কথা বাস্তবসম্মতভাবে ভাবতে গেলে, আমাদের অল্প বা অধিক শিক্ষিতা মেয়েদেরও তেমনিধারা দোকান-পাট—অর্থাৎ, ব্যবসার দিকটাও ভেবে দেখতে হবে—যা তাদের পক্ষে উপযোগী। যদিও এ-শ্রেণীর বহু রকম ব্যবসা-প্রচেষ্টার কথা কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু এখানে প্রাথমিক স্তর হিসেবে কটি মাত্র দিকে একটু ইঙ্গিত করার চেষ্টা করা হবে। যেমন:

১। মেয়েদের জন্য শাড়ী-জামা সংক্রান্ত দোকান।

২। মেয়েদের জামা-পোষাক প্রভৃতি তৈরীর দর্জি-দোকান।

৩। মেয়েদেরই জন্য রেস্তোঁরা।

৪। মেয়েদেরই জন্য স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ের দোকান।

৫। মেয়েদেইর জন্য (মেয়েদের দরকারী দ্রব্যাদির প্রাধান্যযুক্ত) স্টেশনারি দোকান প্রভৃতি।

শুধু মেয়ে-খদ্দেরদের জন্য দোকান! এমন একটা কথা ভাবতেও যেন চমক লেগে যায়। তবু ধরা যাক ১ নংয়ের একটি দোকান। এ-ক্ষেত্রটিতে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের জন্য একজন বা ক-জন সঙ্গতিসম্পন্ন হৃদয়বান ব্যক্তির প্রয়োজন। দোকান সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারলে, এ শ্রেণীর দোকানে প্রচুর লাভ হবেই। লাভ হবে বলে মনে হলে, ধনবান ব্যক্তিরাও লভ্যাংশের লোভে, বা সুদসহ ধীরে ধীরে অর্থ পরিশোধের আশায় কিছু অর্থব্যয়ে রাজী হতেও পারেন। কলেজে পাশ-করা মেয়ে হলেই দোকান চালানো যায় না। ঐ শ্রেণীর ব্যবসাতে পরিমিত মাস-মাইনের বিনিময়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বৃদ্ধ ভদ্রব্যক্তি পাওয়া অসম্ভব হবে না। এসব দোকানে পুরুষ কর্মচারীর সংশ্রব ঐ পর্যন্তই; আর থাকবে দুজন, বা প্রয়োজনানুযায়ী ততোধিক নারীকর্মী। একটি ভৃত্য বা দরওয়ান যদি দোকানে রাখা যায়, কোন পুরুষ-খদ্দের এলে সে শুধু বলে দেবে যে, এটা শুধুই মেয়ে-খদ্দেরদের জন্য দোকান—সকলকার জন্য সাধারণ দোকান এ নয়। এ ছাড়া সাইনবোর্ড তো থাকবেই। দোকানের নারী-কর্মীরা প্রথম চার-ছ মাস কিঞ্চিৎ হাত-খরচার বিনিময়ে কাজ চালাতে প্রস্তুত থাকবে, পরে লাভ অনুযায়ী মাইনে পাবে, বা অংশীদার-ভিত্তিক দোকান হলে আনুপাতিক লভ্যাংশ পাবে।

এরূপ একটি দোকান চালু হলে এবং সুনামের সঙ্গে একটা বছর টিকে দাঁড়াতে পারলে প্রাথমিক ধাক্কা কেটে

এই কৃষকটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় জমি চাষ করে প্রচুর সাফল্যলাভ করেছেন। কৃষকটির অভিজ্ঞতার কথা টেপ রেকর্ড করছেন সোভিয়েট ইউক্রেনের প্রতিনিধি

বলে।। এসব অভিনব "এ্যাডভেঞ্চারের" একটা নিজস্ব মাদকতা আছে, আছে উদ্দীপনাসূচক সক্রিয়তার স্বাদ। যদি ঐরকম একটি দোকান অল্পকাল ধরে শৈশবে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়, তখন দেখা যাবে—কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে ক্রমে আরো দোকান সৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব, আশা এবং উৎসাহ। এভাবেই ধীরে ধীরে এসব ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সার্থকতা আসবে। শুধুই ইতস্তত না করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়া দরকার।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, পুরুষ নারী—উভয় শ্রেণীর খদ্দের দ্বারা পরিপুষ্ট হতে গেলে, ক'টি তরুণী বা ত্রিশ-চল্লিশ বয়সের দু-চার জন মহিলা দ্বারা পরিচালিত দোকানে আমাদের দেশে (যেখানে সামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন) পাশ্চাত্ত্য দেশের অবাধ-রীতি প্রথম দিকটায় হুবহু ঢোকাতে গেলে ভরা-ডুবিও ঘটে যেতে পারে! দেখা যাবে, চাহিদা অনুযায়ী ও ন্যায্যমূল্যে শাড়ী-জামা প্রভৃতি পেতে থাকলে, মেয়ে-খদ্দেরদের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহানুভূতি এসব দোকানের পক্ষে সুনিশ্চিতভাবে সহজলভ্য হয়ে আসছে।

তেমনি যদি কোন নামী চৌ-মাথায়, কোন মহিলা-কলেজের কাছে, কোন সিনেমা-হাউসের খুব কাছাকাছি নারী-পরিচালিত চায়ের দোকান খোলা যায় —যাতে শুধুই মেয়ে-খদ্দেরদের প্রবেশাধিকার থাকবে—তাতেও লাভের অঙ্ক বেশ ভালো হয়ে উঠবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দেখা যায়, সকাল-সন্ধ্যেয় যত লোক রাস্তা চলাচল করে, তার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশই নারী; বস্তুত, কলকাতার মত শহরে নারীর পর্দা তো বহুপূর্বেই একদম উঠে গেছে। লক্ষ্যযোগ্য যে, চায়ের দোকান শুরু করতে খুবই কম মূলধন প্রয়োজন হয়।

আবার যদি ক'টা সেলাইয়ের কল নিয়ে মেয়েদের পোষাক-জামা তৈরীর একটা প্রতিষ্ঠান খোলা যায়, সেও তো

এনভায়রনমেণ্টাল সায়েন্স সার্ভিসেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনস রিসার্চ ল্যাবরেটরিজের অধীনস্থ এক্সপেরিমেণ্টাল মেটিরিওলজি ব্রাঞ্চের প্রধান ডাঃ জোয়ান সিম্পসনের কাজ মেঘ নিয়ে গবেষণা করা। কিভাবে মেঘের সঞ্চার হয়, মেঘের দরুণ কিভাবে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয় এবং কিভাবে এর প্রাবল্য হ্রাস করা যায় সে সবই তাঁর গবেষণার বিষয়। এখানে তাঁকে একটি গবেষণা বিমানে দেখা যাচ্ছে। তিনি তিনবার ঝড়ের মধ্য দিয়ে বিমান চালিয়েছেন।

পরিমিত মূলধনে খুব লাভজনক ব্যবসা হতে পারে। প্রতিটি নারীর প্রতি বছর কিছু কিছু ব্লাউজ, পেটিকোট, ফ্রক—প্রভৃতি তৈরী করাতে হয়েই থাকে। পুরুষ দর্জিদের কাছে জামার মাপজোক দিতে মেয়েরা স্বভাবতই কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করে। সেলাই-স্কুল থেকে পাশ-করা ভালো সেলাই-জানা বহু মেয়ে আজকাল পাওয়া সম্ভব।

নারী-পরিচালিত নারীর জন্য এমন দর্জির দোকান আমার জানা আছে, যেখানে (সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে) যে-কোন সময় জামার অর্ডার দিতে গেলেও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে মাপ লেখাতে হয়—এতই সেখানে ভিড়। পুজোর দু-তিন মাস আগে থেকে (পুজোর জামার) অর্ডার নেওয়া শুরু হয়ে যায় এবং পুজোর তিন-চার সপ্তাহ আগে (পুজোর পূর্বে প্রদেয়—এমন) কোন পূজা-অর্ডার গ্রহণ করা বন্ধ হয়ে যায়—যদিও প্রাক-পুজো ক'টি মাসের জন্য অতিরিক্ত দর্জিও নিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

এসব দোকানে বিয়ের মরসুমে এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে থাকে। শোনা যায়, অবস্থাপন্ন ঘরের এক-একটি মেয়ের বিয়েতে ১০০।১৫০ ব্লাউজের অর্ডার এসে যায়—ঐ সঙ্গে নারীর অন্যান্য আভরণ। ঐ মরসুমে বহু বিয়ের অর্ডার ওঁরা পান।

ঐ মত বহু শ্রেণীর ছোট ছোট দোকান (ব্যবসা) উৎসাহী মেয়েরা খুলতে পারেন। চাকরির তুলনায় এ শ্রেণীর দোকানের কতগুলো বিশেষ সুবিধে আছে। যেমন—(১) দোকান মোটামুটি চালু হলেও চাকরির মাইনের তুলনায় বেশী আয় এতে সম্ভব। (২) বেলা বারোটা থেকে চারটা অবধি নিজ নিজ বাড়ীতে থাকবার সুযোগ ঘটায়, 'ঘরকেও'—অর্থাৎ নিজ নিজ সংসারটিকেও যথাসম্ভব নিজ দায়িত্বে রক্ষা করা সহজতর হয়। (৩) বাড়ী থেকে দুবার দোকানে আসা এবং দোকান থেকে দুবার বাড়ীতে ফেরার সময়গুলোতে ট্রাম-বাসের যাত্রীর ভিড় অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

যে চাকরীজীবী তরুণী বা মহিলা

সন্তানের মা হয়েছেন, শিশু সন্তানকে বাড়ীতে ফেলে এসে অফিসের কাজে আট ঘণ্টা কলম-চালনার সময় গৃহস্থিত অসহায় সন্তানের করুণ মুখ ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে গিয়ে কী নির্মম বেদনা ও কী অব্যক্ত উৎকণ্ঠাই না তাঁর সমস্ত অন্তরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে। তারপর সবাকার সংসারে শাশুড়ী বা স্নেহময়ী বর্ষীয়সী আত্মীয়া থাকেন না; এসব ক্ষেত্রে ঐ মর্মবেদনা হয়ে দাঁড়ায় আরো ভয়াবহ। তদুপরি, শিশু-সন্তানদের কাউকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ী ফেলে এসে অফিসে বসে মায়ের মমতাপ্রবণ মনে মুহুর্মুহু ঐ রুগ্ন সন্তানের বেদনা-ক্লিষ্ট মুখখানাই কি মনে পড়তে থাকে না?

এ ছাড়া, দলিত মথিত হয়ে দুরন্ত ভিড়ের ট্রামে বাসে অফিসে যাতায়াত—নারী-চাকুরেদের পক্ষে একটি অতি-গুরুতর সমস্যা। তারও উপরে থাকে, কখনো কখনো নিজ নিজ শারীরিক মানসিক অসুস্থতা, থাকে ঘন-বর্ষার দুর্গম দিনগুলো, থাকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে লড়াই করে ট্রামে বাসে উঠে ঘর্মসিক্ত অবস্থায় নিষ্ঠুর যন্ত্রণাভোগ।

একা স্বামীর উপার্জনে বা একা বাপ-দাদার উপার্জনে এ-যুগে সংসার চলবার আর কোন আশাই নেই। দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়ে পেয়ে ভবিষ্যতে রাম-রাজত্বের প্রতিষ্ঠার আশাও অলীক কল্পনামাত্র। অর্থনৈতিক দিকে দেশের প্রকৃত উন্নতি (যা প্রতিটি পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্যের সাক্ষ্যে স্বীকৃত—এমন) ঘটতে এখনো বহু বিলম্ব আছে; বরং ভগবান করুন, মূল্যমান ধীরে ধীরে আরো ঊর্ধ্বগামী না হয়।

তাই দেখা যাচ্ছে, নারীসমাজ আজ নেহাৎ বাধ্য হয়েই অর্থোপার্জনরূপ দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছেন। কিন্তু এ অর্থোপার্জনের রাজপথ দুটি: একটি, আপাতরম্য মাস-মাইনের কষ্টসাধ্য চাকরি-পথ; আর অপরটি, চেষ্টা-ধৈর্য-সাহসসাপেক্ষ বিচিত্র ব্যবসা-পথ। 'এম্প্লয়মেণ্ট্ এক্সচেঞ্জে'র খতিয়ানে দেখা যায়—প্রতি বছর হাজার হাজার মেয়ে চাকরির জন্য নাম রেজিস্ট্রি করে রাখছেন; কিন্তু খালি চাকরির সংখ্যা তো সংখ্যাতীত নয়—আবার তারি উপর রয়েছে দুই অংশীদারের দাবী, অর্থাৎ ছেলের দল ও মেয়ের দল।

এ-হেন কাড়াকাড়ি ও মারামারির মধ্যে অর্থোপার্জনের যে নবদিগন্তের ইঙ্গিত করা হলো, সেদিকে শিক্ষিত তরুণীরা আর অল্পবয়স্কা মহিলারা মা ভৈঃ বলে অভিযান শুরু করার কথা গভীরভাবে ভেবে দেখলে ক্ষতি কি?

বৃষ্টি

মঞ্জুশ্রী বসু

বৃষ্টি পড়ছে, পড়ছে—
আর পড়ছে।
মেঘেরা গ'লে গ'লে পৃথিবীতে নামছে।
আকাশের অশ্রু ওরা
বৃষ্টি হ'য়ে পড়ছে।

বৃষ্টি পড়ছে।
ভিজছে মাটি গাছ বাড়ি মাঠ
নদী নালা যত।
ভিজছে আমার মনও।
আকাশের মতোই ব্যথা আছে আমারও
তারা কান্না হয়ে ঝরছে।

নতুন বরষ

শেফালী মালাকার

আবার এসেছে নতুন বরষ
বহিছে নতুন হাওয়া
মুছে যায় যেন, সকল কালিমা
জীবনের মাঝে পাওয়া
নব বরষের, নব বাতাসে
নব নব জয়গানে
প্রীতির কামনা জানাই আজিকে
সবার আমার মনে।

ক্ষুদ্রতম ছাতা

পশ্চিম জার্মানীর এক ছাতাওয়ালা 'সুপারমিনি ইম্প' নামে ক্ষুদে ছাতা তৈরি করেছে। বোজা অবস্থায় এটির মাপ মাত্র ২২ সেণ্টিমিটার, কিন্তু একটি বোতাম টিপলেই প্রমাণ সাইজের ছাতা হয়ে যায়। পুরুষ ও মেয়ে উভয়ের জন্যেই এই ছাতা এখন পাওয়া যাবে।

রাঙামাটির পথ

ঝাড়গ্রাম

শ্রীসুধীর রক্ষা

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ী

মেঘমেদুর আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে অঝোরে। বম্বে মেলে রওনা হলাম ঝাড়গ্রামের পথে। প্রায় চার ঘণ্টার ট্রেনযাত্রা যখন শেষ হল তখন রাত এগারটা। ঝাড়গ্রামের শালবীথির মধ্য দিয়ে নিরালা গ্রাম্যপথের এক পাকা রাস্তা দিয়ে আমি চলেছি একা। পূর্ণিমার চন্দ্রালোক সুপ্ত গ্রামের উপর শান্ত পরিবেশ। কলকাতার আকাশ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই দেখে এসেছি। অথচ পল্লীবাংলার আকাশের কি স্বচ্ছ রূপ।

বর্তমান জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতবহুল পরিবেশ আমাদের অনুকূল নয়। দ্বন্দ্ব-সংসারে হাহাকার। কামনা-বাসনা নিয়ে আমরা সদাই ব্যস্ত থাকায় নিত্য জীবনের গ্লানি বহন করে চলি। জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর দিয়ে আমরা অজানাকে খুঁজি। তার সঙ্গে সংযোগ-সূত্র মেলাতে। উড়িষ্যা ও ময়ূরভঞ্জের সংলগ্ন ঝারিখণ্ড ও ঝাড়গ্রামের একটানা পার্বত্য ও গভীর অরণ্য পথে একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম গেয়ে গণ্ডার, বাঘ, হাতী প্রভৃতি বন্যপশুদের আবিষ্ট করেছিলেন।

চৈতন্য অবতারে বহে
প্রেমামৃত বন্যা।

ঝাড়গ্রামের সঙ্গমক্ষেত্রে বাংলা সংস্কৃতির অনেক উত্থান-পতন ঘটেছিল। প্রস্তর যুগ থেকে সভ্যতার এই বনিয়াদ গঠন করেছিল যারা তাদের বংশধর হল সাঁওতাল, শবর, লোধা, কোড়া প্রভৃতি জাতি। বৃটিশ আমলে ঝাড়গ্রামের অঞ্চলবিশেষ আদিবাসীদের প্রাধান্য থাকায় সাধারণের গতিবিধি সেখানে নিয়ন্ত্রিত ছিল। ঝাড়গ্রামের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নিম্নাংশ এখানে উল্লেখ-যোগ্য—

'ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সেই সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ডে।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষাণ্ডে।'

প্রাকৃতিক বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রবীণ ও প্রাচীন হল উত্তর মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চল। ঝাড়গ্রামের লালগড় অঞ্চল থেকে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্য-প্রস্তরযুগের এক পাথুরে হাতিয়ার। মেদিনীপুরের ভূগর্ভে সমাধিস্থ নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সারা পশ্চিমবাংলার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বহন করে চলেছে। মানব সভ্যতার আদিতম যুগেও পশ্চিম-বাংলার একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ঝাড়গ্রামের সেই আদিম সংগ্রামক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি জাতের লোকেরা। তীর ধনুক ও পাথুরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তারা বন্যজন্তু শিকার করত। তারাই গড়েছিল ঝাড়গ্রামের প্রথম বসতি। এ সম্বন্ধে শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন নিষাদ-সংস্কৃতির মূল প্রবাহে যে বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগ থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে নিষাদ, বৌদ্ধ ও হিন্দু-সংস্কৃতির ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ।

ঝাড়গ্রামে সেই সব সাংস্কৃতিক নিদর্শনের অভাব নেই। সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রসার সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন তাঁরা জানেন যে, উৎসবের আঞ্চলিক আধিপত্য থেকে সাধারণত সাংস্কৃতিক উৎসবের হদিস পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে পশলুস্কি, লেভি প্রমুখ মনীষীরা বিচার বিশ্লেষণ করলেও আজও তার অনুসন্ধানের অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। আদিবাসীর আচার-ব্যবহার ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসব পার্বণ আজ তার সূত্রস্বরূপ অনেক নিদর্শন বহন করে চলেছে।

খানিকটা পথ আনমনে পায়ে হেঁটে চলে গেছি। দূরে পথের বাঁকে বিরাট এক গাছতলায় জনপঞ্চাশ লোক বাজনা বাজিয়ে গানে তখন মশগুল। রাত দুপুর। গ্রাম্য অধিবাসীরা একসঙ্গে জমায়েত হয়েছে সেখানে। পেট্রো-ম্যাক্সের আলো পথকে আলোকিত করে। আমার উপস্থিতিতে গান থামল।

প্রশ্ন করলাম—শান্তিনিকেতন হোটেলটি কোন দিকে?

কিছুক্ষণ তারা কি আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে, বুঝলাম না, গ্রামের একটি ছেলে আমাকে হোটেল পরিচালক শ্রীবিনোদ আচার্যের কাছে নিয়ে এল। কলকাতা থেকে আমি ঝাড়গ্রাম ভ্রমণে এসেছি শুনে তিনি সেই রাতে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শান্তিনিকেতন ধোচের দু'তলা অবস্থিত বাড়ী। দু'তলার বারান্দায় কেন্দ্র টব সাজান। নিঝুম রাতে প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ফুলের গন্ধ উপভোগ করতে খুবই ভালই লাগছিল। আবলে এক ফ্রটী কতে বলে আকাশতলা তারা দেখছি। মন আবার এক অনুভবে জড়ায় আবিষ্ট হল। আকাশে কখন কাল ঘন ভীষ মেঘের আনাগোনা। একদিকে ছেয়ে গেল কৃষ্ণকালো মেঘ। হঠাৎ সৌদামিনীর চমক সঞ্চারিত হল। মনে হল যেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ উত্তরের দিকে তাকিয়ে।

শ্রীরাধার দৃষ্টিভঙ্গী প্রক্রিয়ায় উর্ধ্ব প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিরূপ অবয়বে যুক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহলতায় আনন্দ রসের তরঙ্গ উঠল। শক্তি এবং শক্তিমানের দুইয়ের অঙ্গ মিলনে সমীরা হিন্দোলায় দোল দিল। বাংলা দেশের সুরধুনীকূলে সেই দোল প্রদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার সর্বাবতারের ব্যক্তিত্বে যে নূতন রূপ খুলেছে সেই রূপসুধা পানে আমিও যেন বিভোর হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছি। ভগবান মানুষকে চাহেন এবং আমরাও ভগবানকে চাই। তাঁর প্রেমের স্পর্শে আমাদের চিত্তের সকল সংকীর্ণতা দূর হয়। বৃন্দাবনের গোপীরা যেমন-ভাবে ভালবেসেছিল তেমন ভাবে ভগবানকে ভালবাসা। গীতার সুমহান আদর্শও গোপীদের এই প্রেমের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। হঠাৎ কুগলচন্দ্রিকার রণসাজোগে বাধা এল। ঘড়িতে দেখি রাত দ্বিপ্রহর। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই মশারীর মধ্যে আশ্রয় নিলাম। ঝাড়গ্রামের মশাকে বিশ্বাস নেই। হয়ত ঘুমন্ত মানুষকে কোন নিকুঞ্জে টেনে নিয়ে যাবে, জানা নেই। প্রতি টাকায় প্রতি রাত আশ্রয় পাওয়ার জন্য ঝাড়গ্রামকে প্রণাম জানাই।

সূর্যের আলো উঠল ফুটে। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম জনতার মধ্যে। পাকা রাস্তা দিয়ে বাজার পেরিয়ে চলে এলাম 'প্রাচ্যবাণী' সঙ্গীত শিক্ষা নিকেতনে। [illegible] এক মূর্তি গ্রন্থাগারে স্থাপিত। অডিটোরিয়াম সাজান হচ্ছে পুনরায়। সন্ধ্যায় সেখানে স্থানীয় লোকেরা সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দেবেন। জামসেদপুর থেকে শিল্পীরা আসবেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করতে। আমিও সে জলসায় আমন্ত্রিত হলাম। ঝাড়গ্রাম রাজকলেজের বাংলা-প্রধান অধ্যাপক শ্রীরাধারমণ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তাঁর বাড়ীতে। অল্প সময়ের মধ্যে ঝাড়গ্রামের দ্রষ্টব্য-স্থলগুলি কোথায় ও কোনদিকে জেনে নিলাম। ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ী যাবার রাস্তাটি রাধারমণবাবুর বাড়ীর পাশেই।

রাজার মোটা পথ দিয়ে আমি চলেছি এঁকেবেঁকে। দুপুর রোদে আমি তখন একা। দু'ধারে জঙ্গল। সাউথ ইস্টার্ন রেলের ট্রেনগুলি ঝাড়গ্রামে যাতায়াত করায় শালজঙ্গল ধীরে ধীরে সাফ হয়ে আসছে। রাস্তার আনাচে-কানাচে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান। সাইকেল মেরামত করার দোকান, সুতার পোষাক, সোনা-রূপার গহনা তৈরী, মিষ্টি ও বিড়ি তৈরীর দোকান থেকে শুরু করে চাল ও গমের মিলগুলি বেশ ভালভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৬১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ঝাড়গ্রামের মোট পুরুষ-সংখ্যা ১০,২৯৭ এবং নারী-সংখ্যা ৯,৬১৩। মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যা হল ৫৯,৫৩২। কিন্তু ১৯৫১ সালেই ঝাড়গ্রামকে আদম-সুমারীর অন্তর্গত নগর বলে পরিগণিত করা হয়েছিল। ঝাড়গ্রাম পরগণাটি দৈর্ঘ্যে ১৮ মাইল ও প্রস্থে ১০ মাইল। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম বিভাগটির মধ্যে ছয়টি পুলিশ ফাঁড়ি। থানাগুলির নাম—(১) ঝাড়গ্রাম, (২) জামবনী, (৩) বিনপুর, (৪) গোপীবল্লভপুর, (৫) সাঁকরাইল, (৬) নয়াগ্রাম।

১,১৮৬ স্কোয়ার মাইলের এই বিভাগটি শালজঙ্গলময়। সাঁওতাল ও আদিবাসীরা ঝাড়গ্রামের রাজাকে নামমাত্র খাজনা দিয়ে এখানে বসবাস করত।

ঝাড়গ্রাম রাজার দুই নাতি। রাম রঘুনাথ ও রঘুনাথনারায়ণ মল্ল। ১৮৮৬ সালে রঘুনাথনারায়ণ মল্ল সাবালক হলে উত্তরাধিকারসূত্রে ঝাড়গ্রামের রাজা হলেন। কিন্তু ১৯০৭ সালে জমির রক্ষিভার চলে যায় রাজা কোর্ট অব ওয়ার্ড-সের হাতে। সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বাবুয়ানী মৌজা নামে অনেক গ্রাম রাজার অনুগৃহীত বাবু, আমলা, চাকরদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। রাজার পাল্কী-বেয়ারা, চৌকি-দার, নাপিত প্রভৃতিদের মধ্যে বহু জমি নামমাত্র খাজনার বদলে বিতরিত। শালজঙ্গল কেটে বর্তমান ঝাড়গ্রাম একটি সুন্দর শহরে রূপান্তরিত। পাকা রাস্তার দু'ধারে শালগাছ। মোটর, রিক্সা ও বড় ট্রাক চলাচলের কোন বাধা নেই। কৃষিশিক্ষা দেওয়ার এক কলেজ চোখে পড়ল। বহু বাড়ী ও জনবসতি ক্রমশ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে গজিয়ে ওঠায় ঝাড়গ্রাম বর্তমানে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক'-এর বিশেষ এক অঙ্গ।

নূতন ঝাড়গ্রাম থেকে পুরানো ঝাড়গ্রামে এসে পড়লাম। ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ীর সুমুখে সু-উচ্চ প্রবেশপথ। গেটের উপর লাল রংয়ের জন্তু মুখব্যাদান করে আছে। ভিতরে প্রবেশ করেই দেখি এক চত্বরে অষ্টপ্রহর হরিনাম চলেছে। সন্ধ্যায় রাজবাড়ী থেকে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি এখানে আনা হবে। চত্বরের পাশেই মূল মন্দির। মন্দিরের ভিতর তখন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নামিয়ে রাজবাড়ীর এক কুমারী মহিলা সযত্নে বিগ্রহকে সাজাতে ব্যস্ত। বিগ্রহের চুলে গন্ধতেল, চোখে কাজল পরিয়ে সে তার আনত মুখটি তুলল। তখন সূর্যদেব আমার মাথার উপর তাঁর প্রখর তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

রাজবাড়ীর ভিতর-গেট পেরিয়ে আমি উপস্থিত হলাম ফুলেভরা উদ্যানে। রাজা নরসিংহ মল্ল ও তাঁর পুত্র উপস্থিত যে সব ঘরে বসেন সে সব ঘরে রয়েছে নানা আসবাব-পত্র। ঘরগুলি খুবই সুন্দরভাবে সাজান। বর্তমান রাজার পিতা, প্রপিতামহেরা যেখানে আরাম করতেন সেখানে

তাধি কয়েকটি বিরাট আকারের গদা। কাঠের তৈরী সে গদা নড়ান আমার পক্ষে সম্ভব হল না। লোহার এক ভাঙা ধাঁকাচোরা হয়ে পড়ে আছে। মাঠেতে পড়ে আছে পাথরের এক চক্র। এইসব ভারী জিনিষ নিয়ে যাঁরা ব্যায়াম করতেন তাঁরা কতটা দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, চিন্তা করি।

উপস্থিত রাজা নরসিংহ পূর্ব-পুরুষদের মত অতটা শক্তি ধারণ না করলেও তাঁর বিদ্যোৎসাহ, ঝাড়গ্রামের উন্নতিকল্পে বহু স্কুল-কলেজ স্থাপনে অগাধ দানের কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নয়। রাজপ্রাসাদের তিনটি গম্বুজ। পাথরের উপর নানা রংয়ের কারুকাজখচিত সেই আকাশ-ছোঁয়া গম্বুজগুলি পথচারীকে আজও আকর্ষণ করে। রাজবাড়ীর উপরমহল বাইরে থেকে খুবই আকর্ষণীয় হলেও অন্দরমহলে যাবার হুকুম নেই। রাজ-পরিবারবর্গ উপস্থিত সেখানে অবস্থান করেন। রাজবাড়ীর বাইরে একটি বাঁধান পুকুর। ছেলেমেয়েরা সেখানে জমা হয়েছে। সাবান নিয়ে তারা তখন ফাগ ও বিচিত্র রং তুলতেই ব্যস্ত। পাকা যে রাস্তাটি ঝাড়গ্রাম থেকে খড়গপুর চলে গেছে সেই পথের এক-পাশে ছিল এক দুর্গ। দুর্গের লাগোয়া প্রাচীন সাবিত্রীদেবীর মন্দির খুবই সযত্নে রক্ষিত হলেও, দুর্গের চিহ্নমাত্র আজ আর নেই। রাজপরিবারের কুল-দেবতা হলেন সাবিত্রীদেবী। নিত্য পূজিত হয় সে বিগ্রহ। মন্দির দ্বার নির্দিষ্ট সময় খোলা হলেও পিছনের জানালা সব সময় খোলা থাকে, এক বেদীর উপর কাঁসার মূর্তি সচন্দনে সজ্জিত। তাঁকে নিবেদন করি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। মন্দির মধ্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেবমূর্তি হল :—

১। চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি।

২। সর্পফণার ছত্র সহ দ্বাদশভুজা মূর্তি।

৩। একটি মনসা মূর্তির কোলে এক শিশু।

খোদিত লিপি ভিন্ন কোন মূর্তির সঠিক তারিখ বলা যায় না কিন্তু মূর্তিগুলি যে খুবই প্রাচীন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পাথরের চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি বাংলা দেশে সুদুর্লভ।

দ্বাদশভুজা লোকেশ্বর মূর্তিও বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত বড় একটা চোখেই পড়ে না। ঝাড়গ্রামের দুটি মুখ লিঙ্গমূর্তি এখনও নিখুঁত রয়েছে।

এই মূর্তিগুলি থেকে প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্ত ধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রামে যে শৈব্য ধর্মের প্রাধান্য ছিল মূর্তিগুলি সেই বিষয় সূচিত করে।

সারদা কন্যা পীঠের দিকে এবার এগিয়ে গেলাম। এটি হল একটি আবাসিক নারী প্রতিষ্ঠান। গেটের ধারেই রয়েছে ব্যায়ামের জন্য একটি ঘেরা মাঠ। জিমনাস্টিক করার সাজ-সরঞ্জামও সেখানে আছে। দূর থেকে ভজন গানের সুর আমাকে আকৃষ্ট করল। আমাকে সে সুর যেন ডাক পাঠাল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। পাঁচিল ঘেরা এক মন্দিরে তখন বিগ্রহকে পূজা করা হচ্ছিল। বিগ্রহের সামনে এক বর্ষীয়সী মহিলা তখন অর্ঘ্য নিবেদনেই ব্যস্ত। মন্দির চত্বরে গোটাপঞ্চাশ বালিকা আপন মনে গান গেয়ে চলেছে। দুইটি কাঠের মধ্যে আটকানো অনেকগুলি খঞ্জনী রয়েছে প্রত্যেকের হাতে। খঞ্জনীগুলি একই সাথে বেজে ওঠে সঙ্গীতের তালে তালে।

মিনিট পাঁচেক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কয়েক জোড়া নারী-চক্ষুর দৃষ্টি যখন আমার দিকে সন্নিবদ্ধ তখন ঐ স্থান ত্যাগ করে গেরুয়াপরা এক স্বামীজীর দর্শন পাই। তাঁকে প্রশ্ন করলাম কন্যাকূল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য জানাতে। তিনি জানালেন এখানে পুরুষ প্রবেশের অনুমতি নেই।

আজ বসন্ত উৎসব উপলক্ষে স্কুল বন্ধ। মেয়েরা তাই হোলি উৎসব পালন করছে বিগ্রহকে সামনে রেখে। মেয়ে-দের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা থাকায় দূরাগত বহু নারী এখানে থাকা-খাওয়া-শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পেয়ে আসছে।

সারদাপীঠ থেকে চলে আসি 'বাণীভবনে'। দমদমের নারী সমবায় শিল্পাশ্রম, কামারহাটির 'উদয়ভিলা'র মত ঝাড়গ্রামের 'বাণী ভবন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীযুক্তা অবলা বসু। সামা-জিক ও অর্থনৈতিক চাপে বিব্রত মেয়েদের বিশেষ করে বিধবা মহিলাদের আশ্রয়স্থল হল এই প্রতিষ্ঠানটি। আচার্য জগদীশ বসুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা অবলা বসু স্বামীর বহুবিধ কর্মক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী হয়ে নানা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে

ঝাড়গ্রামের রাজপ্রাঙ্গণে অষ্টপ্রহর উৎসব

নারীশিক্ষা সমিতি পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।

বাংলা দেশে ফিরে তিনি দেখলেন যে, মেয়েদের দারুণ শিক্ষার অভাব। এ অভাব দূর করতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। সেই অভাববোধ থেকে 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন' আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী আরো একধাপ এগিয়ে সমাজের অবহেলিত বিধবা নারীকে সমাজেরই পুনর্গঠন কাজে লাগিয়ে তাদের স্বমহিমায় সমাজে দাঁড়াবার পথ দেখালেন।

প্রধান শিক্ষিকার অনুমতি নিয়ে বাণীভবনে প্রবেশ করলাম। তিনি চাবির গোছাটি এক কর্মীর হাতে দিয়ে আদেশ দিলেন নার্সারি স্কুল, শিল্পাশ্রম ও নানা ঘর যেখানে মেয়েদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেগুলি দেখিয়ে আনার জন্য। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য পঠনপাঠনের ব্যবস্থা, নানা বিষয়ে শিল্প শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা প্রচার প্রভৃতি ক্লাসঘরগুলিতে সামান্য বেতনে বাংলার বহু মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পান। শ্রীমতী বসুর মন ছিল প্রচারবিমুখ। তাঁর আদর্শ ও কর্মধারা বর্তমানে প্রচারের সময় উপযোগী। বাণীভবনের পরিকল্পনাসম্ভূত পরিচালনা ও কার্যধারার সঙ্গে বর্তমান বাংলা দেশের ছোটবড় নানা প্রতিষ্ঠান আজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই বোধ হয় শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ একবার বাণীভবনে এসে বলেছিলেন :—

'এইখানেই গ্রামীণ বাংলার পুনর্গঠনের কাজ হচ্ছে এবং এই কাজ আমাদের জাতীয় কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত।'

কথাটি যে কত সত্য তা আজ আমরা এখানে এসে বুঝতে পারি।

ঝাড়গ্রাম থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে 'সেবায়তন' প্রতিষ্ঠান। অপরাহ্নে একটি রিক্সায় রেললাইন পার হয়ে শালজঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি। পাকা রাস্তা কখনও উঁচু বা নীচু হয়ে সোজা চলে গেছে পলিটেকনিক কলেজের দিকে। বর্তমান রাজা নরসিংহ মল্লদেবের দানে কলেজের বিরাট বাড়ী অনেকটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। ছাত্রদের জন্য একটি বেশ বড় হোস্টেল। পলিটেকনিকের এক ছাত্র ছিল আমার পথপ্রদর্শক। সে আমাকে দেখিয়ে দিল সিভিল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল বিভাগের যন্ত্রপাতি ; ব্যাখ্যা করল সেগুলির কার্যকারিতা ছাত্রদের কাছে কতটা প্রয়োজন।

দূরে ঝাড়গ্রামের সবচেয়ে বৃহৎ দীঘি। ওপারে শালবনের লম্বা গাছের সারি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সন্ধ্যার আলোছায়ায় শালবনের এক প্রান্ত থেকে দেখা যায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। জঙ্গলের মধ্যে কোন গ্রামে হয়ত তখন চুলোয় আগুন ধরান হয়েছে। সন্ধ্যার আঁধার দীঘির জলকে ধীরে ধীরে কালো করে তুলল। আমি এগিয়ে গেলাম 'সেবায়তন' প্রতিষ্ঠানের বেসিক ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ ভবন (আর্টস) -এর দিকে।

প্রথমেই পেলাম এক কালীবাড়ী—সামনেই নবনির্মিত ভবনগুলি। মহারাজ গিরি তখন দাঁড়িয়েছিলেন উদ্যানের মধ্যে। কয়েকজন তাঁকে ঘিরে কথা বলছিলেন। গিরি মহাশয় উপস্থিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। অনুমতি চাইলাম তাঁর প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখবার। তাঁর আদেশে এক দরওয়ান চাবি নিয়ে এগিয়ে এল। ঘরগুলি খোলা হল। পুস্তক প্রদর্শনীর এক বিরাট আয়োজন হয়েছে। কেমিস্ট্রী, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যার ক্লাস ঘরগুলিতে রয়েছে শিক্ষা দেবার নানা প্রকরণ। একটি ছোট অডিটোরিয়াম ; চেয়ারগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক জলসা।

কয়েক বিঘা জমির উপর সেবায়তন প্রতিষ্ঠানটি বিস্তৃত। মন্দির থেকে শুরু করে গাঁয়ের মধ্যে তাদের বাড়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হচ্ছে। জুনিয়র প্রাথমিক বিদ্যালয় সদর রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত। বাঁধরাস্তা পার হয়ে গ্রামের আরো ভিতরে এলে স্ত্রীশিক্ষার এক স্কুল। সেবায়তন প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। কেবলমাত্র ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কার্যধারা এখন অগ্রগতির পথে।

পরিবেশ বেশ শান্ত। অদূর ভবিষ্যতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা বাঙলা দেশের এক সার্থক আদর্শনীয় স্থলরূপে পরিব্যাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। এখন গাঁ থেকে ফিরতে হবে। পথের ধারেই এক কালীমন্দির। শুনেছি পূজারীর ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার ক্ষমতা অদ্ভুত। কিন্তু তাঁর দেখা পেলাম না। মা-কালীর মন্দির দ্বার রুদ্ধ। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে জমাট বাঁধছে।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। এক মহিলা তাঁর কন্যাকে সঙ্গে করে কালীমন্দিরের দিকেই আসছে। হাতে লণ্ঠনের মৃদু আলো তাদের পথ আলোকিত করে। মন্দিরের মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করলেন—ভক্তিভরে দেবীকে যখন তাঁরা প্রণাম করলেন আমিও তখন সেখানে উপস্থিত। ত্রিশূলের উপর আমি অর্পণ করলাম ফুলের এক গুচ্ছ।

এক সাথেই এবার আমরা ফিরে চলি গাঁছাড়া ঐ রাঙামাটির পথে। আলাপ পরিচয়ে পথ চলার ক্লান্তি গেল দূরে। বৃষ্টি এসে পড়ল। তাঁরা অনুরোধ করলেন আমি যেন তাঁদের কোয়ার্টারে চা পান করে যাই। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েরা পরকে আপন করে নিতে জানে। তাঁদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হল কারণ আমাকে এখন ফিরতে হবে শহরের দিকে।

ঝাড়গ্রামে মাত্র দুদিন কাটিয়ে আজ ফিরতে হবে কলকাতার দিকে।

সহকামিতা

সমকামিতা বা হোমোসেক্স্যুয়ালিটি কথাটির উৎস গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা এবং এর দ্বারা নর বা নারীর স্বজাতীয়ের প্রতি যৌনাসক্তি বোঝানো হয়ে থাকে।

গ্রীক্ ভাষায় 'হোমো' কথাটির শব্দার্থ হল স্বাজাত্য।

এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন এক হাঙ্গেরিয়ান চিকিৎসক ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে, ভদ্রলোকের নাম 'বেনকার্ট'।

দুর্ভাগ্যবশত হোমোসেক্স্যুয়ালিটি বা সমকামিতা সম্বন্ধে ডাঃ বেনকার্টের ধারণা খুব নির্ভুল ছিল না। কারণ তিনি মনে করতেন সমকামিতা কতিপয় মানুষের জন্মগত বা সহজাত প্রবৃত্তিবিশেষ এবং এটা যাদের থাকে তারা স্বাভাবিক যৌনসংসর্গের আনন্দ উপভোগে সক্ষম নয়।

অবশ্য এ উক্তি তিনি করেছিলেন প্রায় একশো বছর আগে এবং বলা বাহুল্য আজকের দিনে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই।

মেয়েদের সমকামিতাকে এক বিশেষ অভিধা দেওয়া হয়ে থাকে প্রায়শ, যথা 'লেসবিয়ান লভ্'। গ্রীসের এক প্রাচীন দ্বীপের নাম থেকে উক্ত নামটির উদ্ভব।

কথিত হয় ৫৭০ বি-সি'তে গ্রীসের অন্তর্গত লেস্বস্ দ্বীপের নারী বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই সমকামী ছিল এবং তা থেকেই রমণীদের পারস্পরিক যৌনাসক্তিকে এই নামে চিহ্নিত করার রেওয়াজ চালু হয়েছে।

পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষের সমকামিতাকেই মনস্তত্ত্ববিদ্গণ, ওভার্ট ও লেটেন্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকেন।

সাধারণভাবে ধরলে মেয়েদের ক্ষেত্রে, ওভার্ট লেস্বিয়ান বলতে এমন নারীকে বোঝায়, যে নিজের সমকামী প্রবৃত্তির জন্য বিন্দুমাত্রও লজ্জিত নয় এবং এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য এগুতেও প্রস্তুত খোলাখুলি-ভাবে; অপর পক্ষে লেটেন্ট লেস্বিয়ান নিজে হয়ত অনুভব করে এই প্রবৃত্তির বিকাশ, কিন্তু এটাকে গোপন করে চলতে চায় সর্বদাই এবং সচেষ্ট থাকে এই প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করার জন্য।

যে সব মেয়েরা জীবনে একবার-মাত্র সমকামিতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে তাদের লেস্বিয়ান এই আখ্যায় ভূষিত করা সঙ্গত নয়।

অনেকে ক্রমাগতই এই প্রবৃত্তির শিকার হয়ে থাকে, কিছুসংখ্যক নারী স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয়বিধ যৌনসংসর্গেই আনন্দ লাভ করে থাকে এবং এদের বলা হয় 'বিসেক্স্যুয়াল।' আবার একদল আছে যারা পুরোপুরি-ভাবেই সমকামী।

প্রকৃতপক্ষে শেষোক্তরাই লেস্বিয়ান এই সংজ্ঞালাভের যথার্থ অধিকারিণী।

ডাঃ কার্ল এইচ বোমান ও বার্নিস এঙ্গেল এ-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আইনের চোখে যে কোন মানুষ স্বজাতীয় মানুষের সঙ্গে যৌনাচার দোষে দুষ্ট হলে পর, তাকে সমকামী বলা হয়ে থাকে বটে কিন্তু সেটা সর্বত্র খাটে না। এ-ধরণের অপরাধে অভিযুক্ত নরনারীকে সর্বদা দুটো ভাগে বিভক্ত করা উচিত, যারা সমকামিতাকে একমাত্র যৌন আচরণ-রূপে গ্রহণ করে থাকে তারাই প্রকৃতপক্ষে সমকামী; কিন্তু এমনও অনেকে আছে যারা কদাচ কখনও সমকামিতার শিকার হয়ে থাকলেও সচরাচর স্বাভাবিক যৌন-জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং তাতেই তারা সত্যকার আনন্দের স্বাদ পায়।"

এই শেষোক্ত দলকে সমকামী বলাটা মোটেই সঙ্গত নয়।

বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদগণ এই সব অস্বাভাবিক যৌনাচারকে বিভিন্ন স্বাদের যৌনাচার হিসাবে মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মতে এসবকে বিকৃত কামনার প্রকাশ বলে অভিহিত করাটা সঙ্গত নয়।

সমকামিতাকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

তা না হলে সমকামিতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করাটাও সম্ভবপর হবে না এবং সকলের মনে এ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তার নিরসনও সম্ভবপর হয়ে উঠবে না কোনদিন।

মেয়েদের মধ্যে সমকামিতার প্রচার ও প্রসার নিয়ে বহু বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করছেন, তাঁদের মতে সাধারণের যা ধারণা তার চেয়ে অনেক বেশীমাত্রায় এই অভ্যাস যখন নারী-দেহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনাদি সাধিত হয় তখনই এই প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে।

মেয়েদের স্কুল-জীবনেই এর প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী, বিশেষজ্ঞরা বলেন—এ সময় মেয়েরা প্রায়শ তাদের চেয়ে বয়স্কা মেয়েদের প্রতি আকর্ষিত হয়, যাদের প্রতি তাদের মনোভাব থাকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত, অর্থাৎ সাদা কথায় হিরো ওয়ার্শিপের মত একটা কোন ব্যাপার।

বয়স্কা নারী সচরাচর সমকামিতার প্রশ্রয় দেয় যৌন বা প্রেম-জীবনের অভাব বা তৎসংক্রান্ত হতাশা থেকে।

ডাঃ বার্নউলফ্ এ সম্বন্ধে বলেন, যে মেয়ে জীবনে পুরুষের হাত থেকে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু পায় নি, দেহে-মনে পুরুষকে ঘৃণা করাটা খুবই স্বাভাবিক এবং সেজন্যই প্রেমের প্রয়োজনে সে সচরাচর নারীরই দুয়ারে হাত পাতে।'

তাঁর মতে সমকামিতা উত্তরাধিকার-সূত্রে আসে না, তিনি আরও বলেন যে, নারীর সমকামিতা অনেক সময়, দায়িত্ব এড়ানো ও মাতৃত্বের আশঙ্কা-সঞ্জাত। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে ভাল স্ত্রী ও মা হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা প্রচ্ছন্নভাবে সমকামী,

তবে তাদের ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য করা উচিত।

মনে হয় এই সমস্যাকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে শিখলে অনেক রমণীই নিজেদের মানসিক প্রবণতাকে যুক্তিযুক্তভাবে বিচার করতে সক্ষম হবে ও এই প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে তুলে স্বাভাবিক যৌনজীবন সম্পর্কেও নতুন করে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারবে।

এই বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে, অসংখ্য অবিবাহিতা নারী সম্পর্কে প্রথমে বিবেচনা করে দেখতে হবে, এই সব মেয়েরা সচরাচর একক জীবনযাপন করে বা কোন সঙ্গিনীর সঙ্গে একঘরে বাস করে।

মনস্তত্ত্ববিদের মতে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা মানুষমাত্রেরই সহজাত প্রবৃত্তি-বিশেষ।

কোন না কোন পাত্রে ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে না পারলে মেয়েরা অন্তত বাঁচতে পারে না।

এবং অন্য কোন আধারের অভাবেই সময় সময় কেউ কেউ সমকামিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।

কখনও কখনও বয়স্কা রমণীর প্রবলতর ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ নারী বাধ্য হয় এই ধরণের যৌনাচারে এবং ক্রমশ অভ্যস্তা হয়ে ওঠে এই জীবনযাপন করতে।

বলা বাহুল্য সমকামিতার ফল প্রায়শ শুভকর নয়।

মেয়েদের মধ্যে এ-ধরণের সম্পর্ক ঘটলে বয়স্কা সঙ্গিনী, প্রায়ই তার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী অংশীদারের ওপর জোর-জুলুম খাটাতে থাকে এবং ক্রমেই সন্দেহ ঈর্ষার কালোমেঘ ঘনিয়ে আসে, তাদের যৌথ জীবনধারাকে জটিলতর করে তুলতে।

মানসিক শান্তি ব্যাহত হয় পদে-পদে এবং তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বহ।

তথ্যাদি অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে যে, যে সব মেয়ে হীনমন্যতা-বোধে পীড়িত, তারা স্বভাবতই এমন সব মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাদের মানসিক দৈহিক সম্পদ বিশেষভাবেই চোখে পড়ার মত এবং এই শেষোক্তদের কামনা করে প্রথমোক্তর দল নিজেদের আদর্শের ভাবরূপটিকেই অর্চনা করে থাকে।

শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আধারস্বরূপ মানুষটিকে স্নেহ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাবার ইচ্ছা এইসব মেয়ের মনে এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, দৈহিক অন্তরঙ্গতাকেই তারা শেষ পর্যন্ত মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয়।

পুরুষ ও নারী এতদুভয়েরই সমকামিতা সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণা প্রচলিত, কারণ এ-সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গীর সবিশেষ অভাব।

এ সম্বন্ধে বহু ভুল তথ্যাদি প্রকাশিত হওয়ার ফলে সাধারণের মনে নানা অলীক ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে।

যেমন অনেকেরই বিশ্বাস, সমকামিতা জন্মগত প্রবৃত্তিবিশেষ, বলা বাহুল্য এই ধারণা সর্বতোভাবে মিথ্যা—সমকামিতা অভ্যাসগত জন্মগত নয়।

প্রধানত স্নায়ুর বিপর্যয় থেকেই এর উদ্ভব। যদিও সমকামী মেয়েরা সচরাচর এই প্রবৃত্তিকে জন্মগতসূত্রে লব্ধ ভাবতেই অভ্যস্ত।

বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য জানেন ও মানেন যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমকামিতার উদ্ভব হয় প্রধানত, যৌন ব্যাপারে নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং স্বাভাবিক যৌনজীবনের অভাব থেকে।

সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রণালীতে চিকিৎসা করালে তবেই মানুষ এর হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

সমকামিতার অন্যতম প্রধান চিকিৎসা হয় এনডোক্রাইন থেরাপীর মাধ্যমে।

মেয়েদের প্রবৃত্তিতে সমকামিতা চিকিৎসা করে সারানো যায় না বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তাও সম্পূর্ণ ভুল।

রোগিণী যদি আগ্রহী হয়, নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রায়শই সুফলপ্রদ হয়ে থাকে।

লেস্‌বিয়ানরা সন্তোষজনকভাবে স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে অপারগ একথাও শোনা যায়, বলা বাহুল্য মাত্র যে এর কোন ভিত্তি নেই; বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, সমকামী নারী যৌনক্ষেত্রে দ্বৈত ভূমিকার অধিকারিণী, এবং উভয় ক্ষেত্রেই সে সমভাবে যৌনানন্দ উপভোগ করতে সক্ষম, এই ধরণের নারীকে বি-সেকস্যুয়াল বলা হয়।

লেস্‌বিয়ান বা সমকামী নারীকে সহৃদয়তার সঙ্গে অস্বাভাবিক কোন জীবরূপে না দেখে, তার দুর্বলতাকে বিচার করে দেখাটাই ভাল।

সহানুভূতি ও সহৃদয়তার প্রভাবে অনেকেই এই ব্যাধির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে; পারে স্বধর্মচ্যুতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে।

—শ্রীমতী

জনহীন আকাশ আজ্ঞন। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে সুরু হলো। ওরা দুজনে তখন ভ্রাম্যমাণ।

'এইবার বলো কী সাজা দেওয়া যায় তোমায়?' অনেক ঘোরাঘুরির পর সইদার আঁচল টেনে ধরে মাহমুদ বলে। সইদা তখন হাঁপাচ্ছে হাসিতে আর পরিশ্রমে মুখটা হয়ে উঠেছে লাল।

'ভেবেছিলে আমি বোধহয় তোমায় ধরতে পারবো না?'

'ভেবেছিলাম কি—বলো ভাবছি।'

'ধরা পড়ার পরও রোয়াব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মেয়েদের রোয়াব সব সময়েই থেকে থাকে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরুন দেখি এইবার—'

'তাই নাকি—' মাহমুদ আবার তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। সইদাও আগে আগে ছুটে চলে। কিন্তু তার দম আর কতটুকু? অল্পক্ষণের মধ্যেই হাত-পা এলিয়ে আসে এবং সে মাহমুদের কোলে শুয়ে পড়ে। তার চাঁদ মুখে তখন স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত।'

'একটা কথার জবাব দাও তো সইদা!'

'বলুন।'

'আগে কথা দাও, ঠিক ঠিক বলবে—'

'তোবা তোবা,—কী বলতে হবে আগে জানি।'

'কথা দাও আগে!'

'বেশ মশাই, সত্যিকথাই বলব।'

'তবে বলত, কারো সঙ্গে তোমার ভালবাসা হয়েছে?'

'হ্যাঁ—'

'সে ভাগ্যবানটি কে?'

দ্বিতীয় পর্ব

'প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে নাকি?'

'তবে আমার চোখে চোখ রেখে দেখুন!'

—সইদা এখন আর স্কুলের লাজুক মেয়েটি নেই। আধুনিকতার জন্য ভারতখ্যাত ইউ, পি'র বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আই, টি, কলেজের চটপটে চতুর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সে এখন একজন।

'ব্যস, প্রশ্ন শেষ তো—নাকি, আরও বাকী আছে?'

'আসল জিনিষই তো বাকী রয়ে গেছে।'

'কী জিনিষ?'

'ওই যে ভালবাসার ব্যাপারটা—'

'কিন্তু বললাম তো—'

'আমি জানতে চাই—কার সঙ্গে হলো—'

'বললাম না যে আমার চোখে চোখ রেখে দেখে নিন—'

'তোমার চোখে তো আমার ছায়াই দেখা যাচ্ছে—'

'চোখের মণিতে যার স্থান তিনি আমার মনোমন্দিরের বাসিন্দা।'

'তবে তো আমি মহাভাগ্যবান।'

'সে আর বলতে—' মিটি মিটি হেসে সইদা বলে। মাহমুদের মনে আবেগের বন্যা আসে। সইদাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় সে। এদিকে যখন এই দৃশ্য, দৃশ্যান্তরে হামিদ তখন তার অফিসের সামনের পার্কে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে।

'এ আমার কী হলো'—সে খালি ভেবে চলে। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা সময় আছে। বয়স এখন তার চল্লিশের কোঠায়। সইদার সঙ্গে আদৌ তার জোড়া মেলে না। মাহমুদই সইদার যোগ্য পাত্র। হামিদের চিন্তার গতি এই খাতেই প্রবাহিত হয়। মাহমুদের কথা মনে হতেই বুকে তার অসহ্য বেদনা অনুভূত হয়। 'সে আর সইদা একই ছবির দুটি দিক।' সিগারেটের সন্ধানে

হাত দেয় সে। কিন্তু পকেট আজ খালি। হবে নাই বা কেন।

মাহমুদ দু'দিন আগেই জানিয়েছিল—

'দাদা, বন্ধুদের সঙ্গে আমার পিকনিকে যাবার কথা আছে। কিছু টাকা হলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, চিন্তা করিস না,—ব্যবস্থা হয়ে যাবে'খন।'

সেই জন্য আজ তার পকেটে একটা চার-মিনার পর্যন্ত নেই।

টুকরো একটা ছিল। সেটাই ধরাবার চেষ্টা করে হামিদ।

*　　　*　　　*　　　*

'কোথায় গিয়েছিলে?'—পাশের চেয়ারের ক্লার্কটি হামিদকে আসতে দেখে প্রশ্ন করে।

'কোথাও তো নয়—'

'বেশ ত, লাঞ্চের সময় খুঁজলাম—ক্যান্টিনে আজ দইভিড়া ভারি চমৎকার হয়েছিল—'

'কিন্তু পকেটের অবস্থা মোটেই চমৎকার ছিল না।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ' আজ আমার পকেটে পয়সা ছিল না।'

'কিন্তু ক্যান্টিনে তো ধার চলে—'

'তুমি তো জান, ধারের রোগ আমার নেই। মাসে আট-দশ টাকা কেটে নেবে—ও টাকাটা বাঁচলে ছোট ভাইয়ের কাজে লাগবে।'

'তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। আমি আমার জোয়ান ছেলের জন্যও কৃচ্ছসাধনে প্রস্তুত নই, আর তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য কেন কষ্ট পেয়ে মরতে যাবে? ভাই জাতটাই হচ্ছে দুধ কলা দিয়ে পোষা বিষধর সাপ।'

'আমার ভাই তুমি যা ভাবছ সেরকম নয়—'

মাহমুদের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। তার থেকে চৌদ্দ বছরের ছোট এই ভাইটিকে হামিদ পুত্রস্নেহে পালন করে আসছে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত মাহমুদ তাকেই চেনে। বাবা মারা গেছেন খুব ছোটবেলায়। কিন্তু আজ কেন জানি না হামিদের অন্যতম চিন্তা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে!—

'আমাতে আর মাহমুদে তফাৎটা কোথায়। দেখতে শুনতে, আচারে-ব্যবহারে আমরা ত প্রায় অভিন্ন—' চারটে বেজে গেছে। এরই মধ্যে হামিদ তার ফাইলপত্র গুছিয়ে চলে যাবার তোড়জোড় শুরু করে। অন্য সময় পাঁচটার পরে কতক্ষণ থেকে যায়। মাহমুদের মুখ চেয়ে ওভারটাইম খাটে। ভ্রাতৃপ্রেমের নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। নেশা তার জীবনের অনেকখানি অংশকে গ্রাস করেছে। এতদিন অন্য কারো দিকে নজর পড়ে নি বলে ভাইয়ের প্রতি সে ছিল একনিষ্ঠ। বহুদিন পরে আজ তার সেই নিষ্ঠায় চিড় ধরেছে। নতুন এক আকাঙ্ক্ষার হাহাকার উঠেছে তার বুকের মধ্যে।

গুনগুনিয়ে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে তাকে তার ফাইলপত্র অসময়ে গোছাতে দেখে পাশের এক সহকর্মী বলে, 'খবর-পত্তর সব ভালো তো?'

ইতিপূর্বে সে কোনদিন হামিদকে গুন-গুন করতে শোনে নি;—'আজকে খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে যে!'

'কেন?'

'গান প্র্যাকটিস করছেন কি না, তাই বলছি।'

'আলাপ আর বিলাপে সবারই অধিকার আছে ভাই।'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সব জিনিষেরই উপযুক্ত একটা সময় আছে। বয়সকালে রাগ-বিরাগের আলাপ চললে বলার কিছু ছিল না। চুলদাড়ি সাদা হতে চলল এখন সেটা ঘটলে কেমন কেমন লাগে না?'

হামিদের মনে হলো তার এই সহ-কর্মীটি যেন তার গালে সজোরে একটি চড় বসিয়েছে। কোন জবাব না দিয়ে গুম হয়ে গেল সে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বেরিয়ে যাবার জন্য।

'কোথায় চললে?'

'বাড়ী—!'

'কিন্তু এখনও তো পাঁচটা বাজে নি।'

'কাজে মন লাগছে না।'

অফিস থেকে বেরিয়েই সামনে পার্কের ধারে একটা জটলা নজরে পড়ল। সুরেলা গলায় একখানি গানের সুর ভেসে আসছে ওই ভিড়ের মধ্য থেকে। তন্বী এক ভিখারিণী যৌবনের জয়গান গাইছে। যৌবন, যৌবন, যৌবন। যেদিকে চাও, যেখানে যাও সেখানেই যৌবনের জয়ধ্বনি।

দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে সে। তার পড়ন্ত বয়সের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যেন চারিদিকে চক্রান্ত চলেছে। রাস্তার ধারে একটা কল দেখে থমকে দাঁড়ায় হামিদ। শুকনো গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে হবে। কলটা চাপবার জন্য নীচু হতেই পানের দোকানের আয়নাটায় নিজের প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। দাড়ি কামানো হয় নি তিন-চার দিন। দাড়ির পাকা চুলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাঃ, জল আর খাওয়া হলো না। আয়নাটা পর্যন্ত তাকে ব্যঙ্গ করছে! যৌবন প্রতি পদক্ষেপে তার প্রতি বিদ্রূপতা প্রকাশ করছে। হায়! একটিবারের জন্য সে তার বিগত যৌবনকে আবার যদি ফিরে পেত!

সইদা নিঃসন্দেহে সুন্দরী, কিন্তু সে নিজে তো চুম্বক নয়। মনের সমস্ত আশা যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে। যৌবন তেজ যৌবনকেই বরণ করে—' সে ভাবে। আমার প্রতি সইদার বিরূপতা তাই—বিচিত্র কিছু নয়।

'ওর সঙ্গে আমাকে মানায় না.....হ্যাঁ, মাহমুদের সঙ্গে মানায় বটে—'

মাহমুদের কথা মনে পড়তেই তার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়। চলতে চলতে থেমে যায় সে। নিজের হৃদয়ভূমি থেকে সইদার প্রতি অনুরাগের গাছটিকে সমূলে তুলে ফেলার ইচ্ছা জাগে তার মনে। কিন্তু তেমন শক্তি কই? বিজলী বাতির একটি থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে থাকে—

'জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়কে আমি হেলায় হারিয়েছি।........ সে সময় কাউকে যদি ভালবাসতাম তা'হলে আজ এমন অকাল পিপাসায় কষ্ট পেতাম না—' আবার পথ চলা শুরু হয় হামিদের।

'ইডিয়ট!' মোটরের ব্রেকের শব্দ এবং একটি তীব্র কটু কণ্ঠস্বর। খুব জোর বেঁচে গেছে সে। গাড়ির আরোহী মধ্যবয়স্ক সুবেশ এক ব্যক্তি। তার পাশে বসে রয়েছে খুশীতে উজ্জ্বল মুখ ষোড়শী একটি তন্বী। গালা-গালটা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে হামিদ ওই মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বয়স তো ওর আমার চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু যৌবনকে ধরে রাখার চেষ্টায় লোকটি কী তৎপর! ওর পাশে ষোড়শীকে তো তেমন কিছু বেমানান লাগছে না। পাকা চুল পর্যন্ত নিখুঁতভাবে কলপ করা। হামিদকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকার সুযোগ না দিয়ে গাড়িটা যেমন এসেছিল তেমনি হুস্ করে বেরিয়ে গেল। হামিদ কিন্তু ভেবেই চলেছে—

'মানসিক সুস্বাস্থ্যের নামই তো যৌবন!' —সে ভাবে। কিন্তু তার মতো সামান্য একজন কেরানীর পক্ষে মনকে বেশী বয়স পর্যন্ত সতেজ সবল রাখা কি সম্ভব? আমাদের সমাজের ব্যবস্থা এমনি, যে অর্থবান একটি শ্রেণীই জীবন আর যৌবনের সমস্ত মধু নিঃশেষে উজাড় করে নিচ্ছে। আর তার মতো বঞ্চিতরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে ভেবেই চলেছে। সমাজের বর্তমান এই অসম বাঁচাকে যদি বদলে দেওয়া যায় তা'হলে জীবন-যৌবন ধন-মান সবই সাধারণের উপভোগ্য হতে পারে। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করে থাকা তো হামিদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তার হাতের মুঠি আপনা থেকেই শক্ত হয়ে আসে। চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে বিদ্রোহের আগুন। বাড়ির দিকে ছুটে চলে সে। যা ঘটে ঘটুক আজ সে নিশ্চয় গিয়ে সইদাকে তার মনের কথা খুলে বলবে—

'আমার মন এখনো তরুণ!'

'আমার আত্মা পিপাসার্ত—'

'দোহাই তোমার, আমাকে প্রত্যাখ্যান করো না। চোখে চোখ রেখে আমার মধ্যকার তারুণ্যময় হামিদকে চিনে নাও!'

'একবার, শুধু একবার—'

'সইদা, মাত্র একটিবার বলো যে তুমি আমায় ভালোবাসো!'

ঝড়ের বেগে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে হামিদের প্রথম প্রশ্ন—

'সইদা কোথায়?'

'তার খুব জ্বর হয়েছে!'

'এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, ফেরার পথে খুব জলে ভিজেছে। তার ওপর আবার আইসক্রীম খেয়েছে!'

'ডাক্তার দেখানো হয়েছে?'

'ডাক্তার আনার মত কেউ ছিল না বাড়িতে—'

'মাহমুদ কোথায়?'

'সেও সারাদিন জলে ভিজেছে। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় ফুটবল খেলতে গেছে।'

'কিন্তু সইদার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত ছিল তার!'

'সইদার অসুখের কথা তুলে আমি তাকে অনেক করে বললাম কিন্তু বন্ধুদের চাপে পড়ে সে কিছুতেই থাকতে রাজি হলো না!'

'ওদের গাড়ির সময় হয়ে গিয়েছিলো বোধহয়। যাই হোক, আমি তো রয়েছি। —এক্ষুণি ডাক্তার ডেকে আনছি!'—আর এক মুহূর্তও দেরি না করে হামিদ বেরিয়ে পড়ে। সইদার অসুস্থতার সংবাদ তাকে খুবই বিচলিত করেছে।

॥ নয় ॥

'তাহলে আপনার মতে অবস্থা ভাল নয়?' হামিদ ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, কণ্ডিশন খুবই সিরিয়াস। অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার।' এই কথা বলে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন আর সে মাথা নীচু করে এসে ঘরে ঢুকল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছে সইদার।

জামিলা বেগমের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সাত রাজার ধন একমাত্র সন্তান তাঁর। শমীম আরা বেগমও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মেয়েটিকে ভারি ভালোবাসেন তিনি। ওকে তিনি মাহমুদের জন্য ঠিক করে রেখেছেন যে। মৌলার কাছে চোখের জলে আবেদন জানিয়ে চললেন ও'রা।

হামিদ তাঁদের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে সইদা পড়ে ছিল। প্রচণ্ড জ্বরে বেঘোরে পড়ে আছে সে।

'আপনারা অত ভয় পাচ্ছেন কেন? ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, ভয় পাবার কিছু নেই। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে,—চট্ করে সেরে উঠবে।'—সান্ত্বনা দিয়ে হামিদ বলে।

'সত্যি বলছ, বাবা?'

'সত্যি নয় কি আমি আপনাদের কাছে মিথ্যাকথা বলব!'

'দেখেশুনে তো অবস্থা খুব খারাপই মনে হচ্ছে।'

'না, না, খারাপ কিছু নয়। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়েছেন—খাওয়ালেই ভাল হয়ে যাবে।'—হামিদ তাঁদের বুঝিয়ে বলে।

'তবে আর দেরি করো না বাবা! ওষুধটা এক্ষুণি গিয়ে নিয়ে এসো!'

'হ্যাঁ, ওষুধ নিয়ে আমি এক্ষুণি ফিরব!' —সইদাকে ছেড়ে যেতে তার মন চাইছিল না। তবু সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে হলো।

সইদার আরোগ্যের জন্য বাড়ির অন্য সবাইকার চেয়ে কিছু কম উদ্বিগ্ন ছিল না।

সইদার শিয়রে বসে শমীম আরা বেগম তাঁর স্বপ্নের কথা ভাবছিলেন। মাহমুদের সঙ্গে সইদার বিয়ে দিয়ে ছোট্ট একটি সুখের সংসার গড়ে দেবেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই আশায় সত্যিই কি আল্লা বাদ সাধবেন? সম্ভাবিত বিপদের আশঙ্কায় চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে তাঁর।

সইদার জ্বর মনে হচ্ছে বেড়েই চলেছে। হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তিকর একটা চাঞ্চল্যের প্রবাহ খেলে গেল রোগিণীর দেহে। জ্বরের ঘোরে আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল সে।

'এসো মাহমুদ!—আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় চলে গেলে?—মাহমুদ!—আমার মাহমুদ!'

শমীম আরা বেগমের চোখে অশ্রুর ঢল নামল। নিজের ছেলের উপর ভারি রাগ হলো তাঁর। আজকে কি তার না গেলেই চলত না?

বিভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সইদা তখন চারিদিকে মাহমুদের সন্ধান করে চলেছে। কিন্তু কোথায় সে? তার বদলে হামিদ সামনে উপস্থিত। ওষুধ নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসার পরিশ্রমে তখনো সে হাঁপাচ্ছে। শমীম আরা বেগম সস্নেহে তার ঘর্মাক্ত মুখ আঁচলের প্রান্ত দিয়ে মুছে বললেন—

'মনে হচ্ছে ছুটতে ছুটতে গেছিস আর এসেছিস!'

'তা বটে। এসব অসুখে একটু গাফিলতির ফল অত্যন্ত খারাপ দাঁড়াতে পারে।' এই কথা বলে হামিদ বিছানার পাশে চেয়ারের উপর বসে পড়ে। শমীম আরা বেগম প্রার্থনারত জামিলা বেগমের কাছে চলে যান। মেয়ের অসুস্থতার কারণে এ-পর্যন্ত তিনি জল গ্রহণ পর্যন্ত করেন নি। দিবারাত্র শুধু নামাজ পড়ে চলেছেন।

শমীম আরা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন,—মায়ের প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হবার নয়। আল্লার উপর ভরসা রাখুন। হামিদ ওষুধ এনেছে—মেয়ে এইবার সেরে উঠবে। এখন চলুন, গিয়ে দু'গাল খেয়ে নিন।'

'না দিদি, এখন আমি কিছু খেতে পারবো না!'

'একে মেয়ের অসুখ তার ওপর আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কী হবে বলুন ত। আল্লার কৃপায় কাল সকালের মধ্যেই ওর জ্বর নেমে যাবে!'

'এখন যদি কিছু খাই তা'হলে শরীর ভারী হয়ে ঘুম এসে যাবে,—রাত জাগার অসুবিধা হবে!'

'আপনাদের জাগতে হবে না,—আমি তো রয়েছি। যান আপনি খেয়ে নিন গিয়ে!'

হামিদের এই অনুরোধের পর জামিলা বেগমকে দুমুঠো কিছু মুখে দিয়ে নেওয়ার জন্য উঠতেই হয়।

শীতের শীতল রাত্রি গভীরতর হতে থাকে। বাড়ির বর্ষীয়সী মহিলা দুটি দুদণ্ড ঘুমিয়ে নেবার জন্য শুয়ে পড়েন। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে নিদ্রার অচেতনতা আসতে দেরি হয় না।

ব্যস! এমনটিই হামিদ চাইছিল। নির্জন একাকিত্বে সে সইদার কাছে কয়েকদণ্ড থাকতে চায়। ক'টি কথা তার বলার আছে—

'সইদা আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি—'

'তুমি আমায় মুগ্ধ করেছ......'

'তোমায় পেলে আমার সকল পাওয়ার শেষ হবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে সইদার ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে।

'কী—অ্যাঁ?'—সইদা চমকে ওঠে। ওষুধের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। জ্বালাযন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। হামিদের আপাদমস্তক চকিত চোখে দেখে নেয় সে।

'আপনি আমার জন্য কেন কষ্ট করে রাত জাগবেন? মিস্টার মাহমুদকে পাঠিয়ে দিন। তাঁর বয়স কম। রাত্তিরে খানিকক্ষণ জাগলেও তেমন কিছু কষ্ট হবে না। আপনার পড়তি বয়স—কষ্ট বেশি হবে!'

'কিন্তু মাহমুদ তো এখানে নেই'—সে ধরা গলায় জবাব দেয়।

'আম্মা কোথায়?'

'বিশ্রাম করছেন!'

'আর মাসিমা?'

'তিনিও ঘুমোচ্ছেন!'

'আশ্চর্য তো! আমার অসুখের কথা

ওঁরা সবাই ভুলে গেছেন।'—স্বগতভাবে সে বলে।

'ওঁদের কোন দোষ নেই। আমি ওঁদের বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

হামিদের কথা শুনে সইদার মনে হলো, তার জিভটা টেনে বের করে নেয়। বুড়ো-বয়সে ভীমরতি হয়েছে লোকটার। পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ করে শোয় সইদা।

হামিদ কাছেই চেয়ারে বসে একটি উর্দু প্রেমসংগীত গুনগুনাতে থাকে। কণ্ঠস্বর সুরেলা এবং আবেগময়।

'এই বয়সেও ওসব গান গাইবার শখ যে আপনার আছে তা তো আমি ভাবি নি।'

'কী বললেন?'

'বলছি যে অসুস্থ মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেবার পর্যাপ্ত আপনার জ্ঞান নেই—'

'কিছু ভুল হচ্ছে আমার?'

'তাও কি বলে দিতে হবে?'

'বললে ভাল হয়।'

'অত ব্যাখ্যা করার শক্তি আমার নেই। আপনি, আপনি অনুগ্রহ করে এখন আসতে পারেন।'—সইদার কণ্ঠস্বরে দুঃখের সুস্পষ্ট আভাস।

হামিদের মধ্যে কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই। সে ধীরকণ্ঠে বলে—'কিন্তু আপনাকে একলা রেখে যাই কী করে?'

'আমার চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। আমি ভালই আছি।'

উত্তর-প্রত্যুত্তরের আর কোন সুযোগ না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় সে। কিন্তু রোগিণীকে একলা ফেলে সে যায় কী করে? সুতরাং দরজার বাইরেই তাকে অপেক্ষা করতে হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বাইরে বসে বসে সমানে কেঁপে চলে হামিদ। সইদার হৃদয়ে তার জন্য সূচের স্থানও নেই। অন্য এক-জনকে ব্যাকুল আহ্বান জানিয়ে চলেছে—সে—

'মাহমুদ। ...প্রিয়তম মাহমুদ আমার!'

'সামনে স্বামী অসুস্থ, এসে নিজের হাতে ওষুধ খাইয়ে আমাকে ভাল করে তোল।'

'আর দেরি করো না, প্রিয়তম.....'

'এসো। শীগ্‌গির এসো......'

॥ দুই ॥

হামিদ বাইরে দাঁড়িয়ে আসুনিক-প্রেমের বাহ্যাড়ম্বরের কথা ভাবছিল। যৌবনের উন্মাদ দিনগুলিতে মন যখন কিছু একটা খুঁজে বেড়ায় তখনি প্রেম নামক জিনিসের মোহটি এসে যুবজনের সমগ্র হৃদয়কে দখল করে বসে।

মাহমুদও তো এইরকমের একটি নব-যুবক। নিজের টীমের সঙ্গে অন্যত্র যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সইদার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। টীমের সম্মানে পার্টির পর পার্টির আয়োজন চলতে থাকল। চতুর্দিক থেকে আওয়াজ উঠল—

'মিস্টার মাহমুদ ওয়েলডান।'

'বাবাস!'

'সত্যিকথা বললে বলতে হয় যে টীম আপনার জন্যই জিতেছে!'

জয়ের গর্বে ফুলে উঠল মাহমুদ। প্রশংসার বন্যায় তলিয়ে গেল সইদার স্মৃতি। শতফুল যেখানে তাকে ঘিরে হিল্লোলিত সেখানে একটি ফুলের কথা কে মনে রাখে?

রুখসানা তার বাড়িতে মাহমুদকে নিমন্ত্রণ করেছে। জনৈক অধ্যাপকের একমাত্র কন্যা সে। কলেজের ছাত্রী। মেক-আপ পটীয়সী। সেজে-গুজে যখন বের হয় তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে। মাহমুদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের অবকাশে সে বলেছিল—'ওয়াণ্ডারফুল, অদ্ভুত খেলেন আপনি!'

অপরূপার প্রশংসায় মাহমুদের বুকখানা দশহাত ফুলে ওঠে। সে ভাবে, ভগবান আমাকে ক্রিকেটের শিল্পী করে পাঠিয়েছেন। ধন্য আমি।'

সর্বজন প্রশংসাধন্য মাহমুদের মুখ গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকলকে ছাপিয়ে তারই নাম আজ মুখে মুখে লোকের। তাই টীমের আর সবাই ফিরে গেলেও রুখসানার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সে রয়ে গেছে।

রাত ন'টা বেজে গেছে, খাওয়া-দাওয়া সেরে স্লীপিং গাউন পরিহিতা রুখসানা পিয়ানো বাজিয়ে একখানি ইংরেজী গানের সুরে গুনগুনিয়ে গাইছিলো। ঘরের জ্যোৎস্না-সদৃশ আলোয় তার উন্মুক্ত বাহু দুটি শ্বেতপাথরের মতো লাগছিল। মাহমুদ লুব্ধ-দৃষ্টিতে সেই দিকেই চেয়ে রয়েছে। সইদাও সুন্দরী। কিন্তু শরীরের আবৃত অংশ-গুলিকে উন্মুক্ত করে মানুষের চোখকে ধাঁধিয়ে দেবার কলাকৌশলগুলি তার জানা নেই। কাছে গিয়ে রুখসানার হাতদুটিতে হাত বুলিয়ে আদর করার দুর্নিবার আকর্ষণ মাহমুদ অনুভব করে।

'আপনি দেখছি আমার দিকে খুব মনোযোগ সহকারে চেয়ে আছেন।'

'বাস্তবিক পক্ষে আপনি যে দর্শনীয় বস্তু তাতে কারো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।'

'শুধু দর্শনীয়?—স্পর্শনীয় নয়?'—অর্থপূর্ণভাবে প্রশ্নটা করে সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। পরক্ষণেই সলজ্জ অথচ লীলাময় সঙ্কোচের সঙ্গে সে বিদায় নিতে চায়—'চলি তাহলে এইবার?'

'চললেন?'—মাহমুদকে হতোৎসাহ বলে মনে হয়।

'হাঁ।'

'এ বড় অন্যায়!'

'কেন?'

'কারণ আশ্রয়দাত্রীর পক্ষে আশ্রিতকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।'

'ছেড়ে যাওয়াটা তো স্থায়ী নয়—আবার কাল সকালেই—'

'কিন্তু রাতটা তো আমাকে একলাই কাটাতে হবে।' বলে ফেলেই কথাটার গূঢ় অর্থের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার পরে আরও কয়েকটি কথা জুড়ে দেয়—অর্থাৎ একলা রাত কাটানোর আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই। এই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি।'

'আমি কি বলেছি যে আপনি অন্য কথা বলতে চেয়েছেন?' 'আমি তো বলতে পাই নি'—মেয়েরা বলতে হলো যে!'

মিষ্টি হেসে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মাহমুদ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

মাহমুদের উদ্দাম যৌবন কিছু একটা কামনায় ব্যাকুল অস্থির। সইদা তার জীবনে এসেছে বটে কিন্তু শুধু তাকে নিয়ে মেতে থাকার মতো অবসর কই তার? চায়ের টেবিলে তাই রুখসানা যখন তাকে কয়েকদিন থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল তখন তার সেই অনুরোধটা সে ঠেলতে পারে নি।

মাহমুদ ভেবেছিল, পুরো না হলেও অন্তত অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত রুখসানা তার ঘরে থাকবে। কিন্তু তার এই আশা পূর্ণ হয় নি। রুখসানা চলে গেছে। এ অবস্থায় ঘুম আসে কী করে। শুয়ে শুয়েই সিগারেট ফুঁকতে থাকে সে। খালি মনে হয় অভিসারিকার মতো পা টিপে টিপে রুখসানা এই বুঝি এলো। আর সে এলে নিশ্চয়ই তার কণ্ঠ-লগ্ন হয়ে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেবে তার মুখ। কিন্তু তেমন যখন ঘটল না তখন মনে হলো সম্ভব হলে সে নিজেই গিয়ে টেনে নিয়ে আসুক তাকে। তারপর পাগলের মতো জোর করে আপাদমস্তক সর্বত্র হাজার চুমায় ভরিয়ে দিক, শেষে তার দেহের সর্বস্ব শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিয়ে আসুক।

মাহমুদ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়ল। শুয়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। অস্বাভাবিক এক অস্থিরতার সঙ্গে উঠে পড়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে চারদিকে ভাল করে একবার দেখে নিল সে।

নির্জনতা,......

অন্ধকার......

নীরবতা...

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। টলতে টলতে রুখসানার স্নানাগার পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি—?'

'কই শুনেছেন।'

'মিস্ রুখসানা—!' স্থান-কাল-পাত্রের সমস্ত বোধ বুঝি আজ সে খুইয়ে বসেছে।

প্রথম দর্শনের দিনেই এতদূর অগ্রসর হওয়া যে ঠিক নয় সে খেয়াল যেন তার নেই।

'কী ব্যাপার মিস্টার মাহমুদ ?' বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতে রুখসানা প্রশ্ন করে।

'কিছু না, একলা একলা ঘুম আসছে না—' আড়চোখে তার দিকে চেয়ে মাহমুদ জবাব দেয়।

মৃদু হেসে এগিয়ে আসতে আসতে সে বলে—'আপনার দেখছি একলা শোয়ার অভ্যাস একেবারেই নেই!'

'ঠিক বলেছেন।'

'তবে তো একলা থেকে যাওয়াটাও আপনার পক্ষে উচিত হয় নি ?'

'সংগে থাকার লোক প্রায়ই পাওয়া যায়—'

'এর বিপরীতও তো ঘটতে পারে—'

'আপনি যা বললেন তা ঠিক হলেও হতে পারে—'

রুখসানার কথাগুলো সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তর্ক-বিতর্ক করার মতো মানসিক অবস্থাও তার তখন নয়। সে তখন আলিঙ্গনের আগ্রহে উত্তাল।

'আপনি কোনদিন কাউকে ভালবেসেছেন ?' রুখসানা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

'নিজের কথা আমি ঠিক বলতে পারি না তবে সইদা অবশ্যই আমাকে ভালবাসে।'

'সইদা কে ?'

'আমাদের বাড়ীর ভাড়াটে।'

'তার ভালবাসার কথা জানা সত্ত্বেও আপনি কেন অন্যের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন ?'

'কারণ তার চেয়ে ভাল জিনিষ চোখে পড়েছে।'

'কিন্তু বিশ্বে জিনিষেরও তো অভাব নেই,—ভালর চেয়ে আরও ভাল বহুত আছে।— কী আমি ভুল বলছি ?'

'আজ্ঞে ?' —রুখসানার কথাগুলির জবাব খুঁজে মাহমুদ হয়রান হয়ে যায়। ভাবতে গিয়ে মাথা আপনা থেকেই নীচু হয়ে আসে তার—'আচ্ছা রুখসানা'

'আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন ?'

'না তো।'

'আমার কথাগুলো খেয়াল করবেন কিন্তু।'

যৌবনকালটা কিছু খেয়াল রাখার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয় তাই পরদিন ভোরে কারো অনুমতির অপেক্ষা না করেই সেখান থেকে সে সরে পড়ল।

* * *

'বলুন এখন কেমন লাগছে? হামিদ ভয়ে ভয়ে গিয়ে সইদাকে জিজ্ঞেস করে।

'আপনার কৃপায় মরিনি।'

'কপালগুণে আপনার মতো সেবক মিলেছিল তাই—' কথার মধ্যে কাঁটা আর দুচোখে ভরা ঘৃণার বিষ।

সইদার মায়ের ধারণা, তাঁর মেয়ে এ যাত্রা হামিদেরই কল্যাণে বেঁচে গেছে। সে যদি ছুটোছুটি করে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত না করত এবং ধৈর্য ধরে সেবাশুশ্রূষা না করত তাহলে মেয়েকে নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরানো যেত না। হামিদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা নেই তাঁর। তাই আবেগে কাঁপা স্বরে তিনি বললেন—'তোমার কল্যাণে মেয়ে আমার এবার বেঁচে উঠল।'

'তবে তো আমার কাজের কিছু পুরস্কার আমাকে আপনার দিতেই হয়, মাসিমা!'

'পুরস্কার ? এমন পুরস্কার আমি তোমায় দিতাম, বাবা, যে মন তোমার খুশিতে ভরে যেতো, কিন্তু—এমনি পণ করে তুমি বসে আছ যে সে কথা পাড়ব যে তার উপায় নেই। তা না হলে বড়জন থাকতে কি ছোটোর কথা ওঠে কখনো ?'

হাজারটা এ্যাটোম বোমা যেন হামিদের মাথায় বর্ষিত হলো। সইদার সারা দেহ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। স্থির বসে থাকা অসম্ভব দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হামিদ বলল—'চিকিৎসা বন্ধ করলে চলবে না। আমি একবার ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসি।'

'কিন্তু আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, —তিনি তো আসবেনই'। —সইদা বলে। হামিদ তাকে করুণা করবে এটা তার কাছে অসহ্য। মাহমুদের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু সে এখনো এলো না কেন। অভিমানে চাদরটা টেনে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দেয় সে।

'শরীরটা আবার খারাপ লাগছে নাকি মা ?'—

জামিলা বেগম প্রশ্ন করেন।

'না ভাল আছি।'

'মাহমুদ বাড়ী থাকলে, বিছানার পাশে বসে সে এতক্ষণ তোর পেছনে লেগে উত্যক্ত করে ছাড়ত—'

'কিন্তু মাহমুদদা এখনো এলেন না কেন ?'

'জোয়ান ছেলে। হেসেখেলে বেড়াবার এই তো সময় ওদের। কোথাও গিয়ে মেতে গেছে বোধ হয়!'

'গিয়ে সেখানে বেশ জেগে গেছে—' হামিদ সমর্থন জানায় এবং তার এই সমর্থনে সইদা মনে মনে জ্বলে ওঠে—'মাহমুদের বদনাম করার জন্য মুখিয়ে আছেন!'

'মাহমুদদা তেমন বাজে ছেলে নন।'—সে বলে।

'কিন্তু তাকে বাজে ছেলে কে বলেছে, মা।' —সইদার মা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। হামিদ আর সেখানে থাকতে পারে না। তার বুকের ভেতর তখন যেন জ্বলছে। যৌবন হারিয়ে বেঁচে থাকাই নিরর্থক। পথ চলতে চলতে দু'ফোঁটা চোখের জল সবার অজ্ঞাতে হামিদের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে হারিয়ে যায়।

॥ এগারো ॥

রুখসানা যদি তাকে কাছে ঘেঁষতে না-ই দিয়ে থাকে তাতেই বা কী এলো গেলো ? সকালবেলাই সে তার তৈজসপত্র নিয়ে প্রভুদয়ালের বাড়ী গিয়ে হাজির। নতুন এই শহরে সে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। —বিপক্ষ দলের একজন নামজাদা খেলোয়াড়।

'সাহেবজাদাকে ভোরবেলাই বের করে দিয়েছে বোধহয়!' দরজা খুলে তাকে স্বাগত জানাতে গিয়ে প্রভুদয়াল বলে।

'বের করে দিতে যাবে কেন ? —আমি নিজেই চলে এসেছি।'

'অর্থাৎ রাগ করে ?'

'একদম—'

'আমি আগে থাকতেই জানতাম যে রুখসানার কাছে গিয়ে কেউ তুষ্ট হয়ে ফেরে না— ও সবাইকে প্রথমে কাছে টানে এবং তারপরই লগুড় হস্তে তাড়া করে—'

'তাই যদি জানতে তবে আমাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিলে না কেন ?'

'দিলাম না শুধু এইজন্য যে ঠেকে শেখা ভাল। —যাই হোক, এখন ঘরে এসো।'

'শোন বন্ধু! ঘরে তো যাবই। কিন্তু রুখসানা আজ আমার মনে যে আগুন জ্বালিয়েছে তার নিবৃত্তির জন্য প্রেমের অভিনয় একজনের সংগে করতেই হবে।'

'সত্যি বলছ ?'

'সত্যি তো বটেই!' সে বেশ জোরের সংগে বলে, 'আরে ভাই, আমরা হলাম গিয়ে

প্রয়োজন মনে হয়—এরই মধ্যে একাধিক পালা শেষ করেছি— সইদাকে পেয়েওছি কিন্তু কোন কাজে লাগল না। সময় না হলে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, আমারও অত সহ্য শক্তি নেই—যে কেউ হোক, মেয়েছেলে হলেই, এখুনি তার কাছে যেতে রাজী—' এই কথা বলে মাহমুদ হাত কচলাতে থাকে।

'সইদা কে ভাই ?'

'একটি জোঁকবিশেষ। আমি কিন্তু ভালবাসার নামে রক্ত শোষণ করতে দিতে রাজী নই। মেয়েছেলে মানেই দুবছরে থলথলে খলখলে। অথচ সইদা চায় চিরদিনের জন্য বিবি হয়ে থাকতে। আমি তো ঠিক করেছি সইদাকে সাফ জানিয়ে দেব যে প্রেম এবং বিয়ে এক জিনিষ নয়। তাতে যদি সে রাজী থাকে তাহলে বেশ মজা লোটা যাবে। মুকুটহীন রাজা হয়ে থোরা যাবে।'

'মুকুটহীন রাজা তুমি কবে নও ?'

'কিন্তু রাণী ছাড়া রাজা মানায় না যে।'

'রাণী জোটাতে কতক্ষণ লাগে। এ মাসের 'স্পোর্টস'টা খুলে দ্যাখো ।'

দয়াল তার টেবিলের ওপর থেকে একখানি পত্রিকা তুলে নিয়ে বলে—

'এই হচ্ছে প্রসিদ্ধ হিরোইন জৈজৈবন্তীর বিবস্ত্র ছবি। একেই নিজের বেগম বলে মনে করো।'

'লুকিয়ে রাখো ভাই। সরকারের নজরে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে।'

'পাগল হয়েছ নাকি ! এ হচ্ছে সভ্যতার অগ্রদের চক্রান্ত। সরকারের সাধ্য কী যে ওদের বিরুদ্ধে কিছু করে। ফিল্মী-জগৎ আজকাল পুঁজিপতিদের দখলে এবং সরকারটাও তাদেরই। সুতরাং বুঝতেই তো পারছ—'

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে মৃদু হেসে দয়াল বলে,— 'তবে যাই বলো ভাই, মেয়েটি খাসা।'

'কিন্তু কাপড়-চোপড়ের টানাপোড়েনেও এ সত্যকে ঢাকা যাচ্ছে না যে অনেক ডলার্ডলি ওর দাম কমিয়ে দিয়েছে।' —মাহমুদ রিমার্ক পাস করে।

দয়ালের মোটেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মেয়েছেলের শত প্রয়োজন থাকলেও সে এমন বাজারের মালের কাছে ঘেঁষতে রাজী নয়। তাই সে বলে,—আচ্ছা, এইবার আসল কথার আসা যাক,— চলো একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

'এই ত' চাই ! এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা বলেছ যা হোক।' আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মাহমুদ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দয়াল তাকে নিয়ে সওয়ারিয়ার বাড়ীতে পৌঁছে যায়। মেয়েটির আসল নাম নূরজাহান। সৌন্দর্যের দিক থেকে সে সত্যই সার্থকনামা। কনভেন্টে পড়া নূরজাহান যৌবন মঞ্জরী হয়ে সওয়ারিয়া নামে পরিচিতি লাভ করল। প্রথম দর্শনেই মাহমুদ মুগ্ধ হলো।

'একটু অসময়ে আসতে হলো বলে মাফ চাইছি। আমার এই বন্ধুটি আপনার সংগে মিলিত হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ায়—'

'আসুন আসুন—' ওদের দুজনকে নিয়ে সে তার ড্রয়িং রুমের দিকে এগিয়ে যায়,— 'বসুন।'

'কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা বসি কী করে ?' —সম্পর্কটাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আত্মীয়তার পর্যায়ে আনার জন্য মাহমুদ বলে।

'আপনারা আমার বাড়ীতে অতিথি যে...'

'আমাদের অতিথি মনে করে অবিচার করা হচ্ছে কিন্তু।'—

দয়াল আপত্তি করে।

'আপনাকে না করলেও ওঁকে তো করতেই হয়।'

'আমি কিন্তু নিজেকে আপনার বাড়ীতে অতিথি বলে মনে করছি না—' তার এই দূরত্বজ্ঞাপক বিশেষণটিতে মাহমুদ ঘাবড়ে যায়।

'আপনি জানেন মিস সওয়ারিয়া, আমার এই বন্ধুটি মুহূর্তের মধ্যে পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা রাখেন—।'

'মানুষ হিসেবে উনি তাহলে খুবই ফ্র্যাঙ্ক বলতে হবে— ?'

'অর্থাৎ সাদা কথায় বলুন বেহায়া—' দয়ালের এই রসিকতায় হেসে ফেলে সওয়ারিয়া মন্তব্য করে—'আপনারা দেখছি একেবারে হরিহর আত্মা।'

'তাতে অবশ্য কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।'

'মানুষ মানুষের ঘনিষ্ঠ হবে এই ত' চাই—'

'আমাদের সরকারও মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির দিকে—'

'সব ব্যাপারে রাজনীতি টেনে আনেন কেন বলুন ত ?'

'আই এ্যাম সরী ! তুমি যে রোমান্টিকতার ভক্ত তা আমার খেয়াল ছিল না—'

'রোমান্স ছাড়া দুনিয়ায় আর আছেই বা কী ?'

'ঠিক বলেছেন,—জগতে সারবস্তু হলো ভালবাসা।'

'অর্থাৎ আপনিও আমার বন্ধুরই মতো রোমান্টিকতার ভক্ত।'

'তাই বলুন আর পাগলাই বলুন ছেলেবেলা থেকেই আমি রোমান্টিক।'

'তবে তো দুজনে মিলবে ভাল।'—দয়াল মন্তব্য করে।

এরপর ওদের জলযোগের ব্যবস্থা করার জন্য সওয়ারিয়া অল্পক্ষণের জন্য ভেতরে চলে যায়।

'কী রকম মনে হলো ?'

'চমৎকার।'

'দেখতে কেমন লাগল ?'

'ভারী মিষ্টি।'

'এই মিষ্টির বদলে আমাকেও মিষ্টি মুখ করাতে হবে কিন্তু।'

'পথে এলে তবে তো।'

'পথে আসতে আর বাকী কী ?'

'ওই আসছে, একটু আস্তে।'

প্লেটে ক'রে দুপ্রস্থ খাবার নিয়ে সওয়ারিয়ার আবির্ভাব ঘটতেই মাহমুদ বলে ওঠে— 'এত কষ্ট করতে গেলেন ?'

'একে কষ্ট বলছেন কেন ?'

'ভারী চটপটে—কাজের মেয়ে তো আপনি।'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইউনিভার্সিটিতে ও'র নাম সবার মুখে মুখে।'

দয়াল তার সম্বন্ধে বলে।

ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত ধনী নন্দনদের সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সওয়ারিয়ার ছিল। তাদের সমগোত্রীয় এবং সমান নির্বোধ ভেবে মাহমুদের চোখে চোখ রেখে সে বলল—'সিনেমা দেখেন তো ?'

'তা দেখি।'

'মুঘল-এ-আজম দেখেছেন ?'

'কয়েকবার।'

'সত্যি, এমন ছবি যে বার বার দেখেও মন ভরে না।'

'এখানে কোথাও চলছে নাকি ?'

'হ্যাঁ—'

'তবে চলুন না আজ।'

'বেশ—'

'আমি কিন্তু তোমাদের সংগে যেতে পারছি না—' দয়াল বলে।

'কেন ?'

'খুব জরুরী একটা কাজ রয়েছে। না করলে বাবা আর রক্ষা রাখবেন না।'

'তাহলে অবশ্য আপত্তি করা চলে না।' দয়ালের সাহচর্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় মাহমুদ বলে।

ইত্যবসরে সওয়ারিয়া গিয়ে চা নিয়ে আসে।

'অল্পক্ষণের পরিচয়েই আপনি দেখছি আমার মুগ্ধ করে দিচ্ছেন।'

'কী যে বলেন !—'

'নিজের মূল্য মানুষের নিজের চোখে ধরা পড়ে না।' চা পান করে ঘড়ির দিকে চেয়ে দয়াল বলে—'আমি এইবার চলি তাহলে—'

'অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিতে হচ্ছে—' দয়ালের কথার এই উত্তর দিয়ে মাহমুদের উদ্দেশ্যে সওয়ারিয়া বলে—'আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুণি কাপড়টা বদলে আসছি—তারপর ম্যাটিনী শোটা এ্যাটেণ্ড করা যাবে—'

এই কথা বলে সে ভিতরে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে সেজেগুজে এসে হাজির হয়। পোশাকে-পরিচ্ছদে আর প্রসাধনীতে সে কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে একেবারে অন্য মানুষ—অনন্যা হয়ে ফিরে আসে।

বেরিয়ে পড়ে ওরা। শো-এর তখনো অনেক বাকী। সুতরাং লাঞ্চের প্রশ্নটা স্বাভাবিক-ভাবেই এসে যায়। হোটেলের বিল চুকাতে গিয়ে মাহমুদের চক্ষুস্থির। দুজনে খেয়েছে এবং তার আর্থিক মূল্য প্রায় পনের টাকা। অনেকটা সময় তখনো হাতে রয়েছে। সওয়ারিয়ার হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার পূর্বনির্দিষ্ট মার্কেটিং-এর কথা। পথে আস্তে আস্তে যে প্রেমালাপ হয়েছে তার পটভূমিকায় এই মার্কেটিং-এ মাহমুদের অংশগ্রহণ অনিবার্য। কিন্তু তত টাকা কই। আসার সময় হামিদ তাকে তার পক্ষে যথেষ্ট পয়সা-কড়ি দিয়েছিল। কিন্তু তখন তো এই সমস্ত অপ্সরী রূপসীর কথা কেউই ভাবে নি—এদের পিছনে কত ঢালতে হবে সে হিসাবটা দুভায়েরই কল্পনার বাইরে ছিল। মাহমুদ মহা সমস্যায় পড়ে যায়। কিন্তু সংগে সংগেই তার স্মরণে আসে হাতের তাবিজের কথাটা। গত বছর হামিদ সেটা তার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলেছিল যে-কোন সময় আকস্মিক কোন আর্থিক অসুবিধায় পড়লে সে যেন ওই তাবিজটা খুলে দেখে ওর মধ্যে দুটি একশো টাকার নোট ভাঁজ করে পোরা ছিল। দাদার দেওয়া তাবিজটা খুলতে গিয়ে এই প্রথম বিবেকের দংশন অনুভব করল। নিজের ছেঁড়া কোটটার বদলে একটা নতুন কোট তৈরী করার কথা ছিল হামিদের। সে কিন্তু তা করে নি। তার ওই কোটের টাকাটাই সে তার ভাইয়ের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা ভেবে এই তাবিজটার মধ্যে ভরে দিয়েছিল।

মিস সওয়ারিয়ার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এতক্ষণে সে সচেতন হলো। সইদার সংগে তার পরিচয় তো খুব অল্পদিনের নয়। কিন্তু এত লম্বা সময়ের মধ্যে একটি বারও সে তার কাছে ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন দাবিই রাখে নি। আর এই মেয়েটি পরিচয়ের প্রথম দিনেই তার সর্বস্ব নিংড়ে নিতে চাইছে। কাপড়ের দোকানের কাউন্টারের সামনে তাই সে তার সঙ্গিনীর হাতে একশো টাকার নোট দু'খানি তুলে দিয়ে বলে—'এই নিন, আমার কাছে আর টাকা নেই।'

'কিন্তু ওগুলো আমার হাতে দিচ্ছেন কেন? যা বিল হবে, আপনিই মিটিয়ে দেবেন।'

'দিচ্ছি এই জন্য যে এরই মধ্যে আপনাকে মার্কেটিং সারতে হবে।'

'ধ্যাঃ। ঠাট্টা করছেন কেন ডার্লিং।'

'ঠাট্টা আমি আদৌ করছি না।'

'সত্যি বলছেন আর টাকা নেই আপনার কাছে?'

'সত্যি নেই।'

'কিন্তু আমার যে একবার জুয়েলারের দোকানে যাবার ইচ্ছে ছিল।'

'কিন্তু আমার পক্ষে আর কিছু দেওয়া তো সম্ভব নয়।'

আর এই জবাব শুনে সওয়ারিয়া ঘৃণা-ভরা দৃষ্টিতে তাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর তার দিকে পিছন ফিরে সাড়ি বাছাইয়ের কাজে মন দেয়।

মাহমুদও সেই সুযোগে দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়।

॥ বারো ॥

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সইদা চঞ্চল হয়ে ওঠে। চোখে জল এসে যায়। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করে। রাত ন'টা বেজে গেছে। ঘরের সামনে বসে অফিসের ফাইল নিয়ে হামিদ কাজ করে চলেছে। মাথায় তৈলহীন উস্কোখুস্কো চুল, পরনে প্যান্ট ও কোট এবং চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

কর্মব্যস্ত লোকটির দিকে সইদা কিছুক্ষণ

একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মুখে নবযৌবনের জৌলুস না থাকলেও পারণত বয়সের প্রশান্তিময় লাবণ্য অবশ্যই আছে। সার্দ-ঘমা'র প্রভাব থেকে মুক্ত—সুস্থ সে এখন।

'অহেতুক বিরূপতার ঝোঁক কেটে গেছে!'

'প্রেম এবং বাসনার মধ্যকার পার্থক্য বোঝাবার যোগ্যতা এখন হয়েছে!'

মামাকে ডাকার অজুহাতকেই অবলম্বন করে সে—'মামা.....মামা......'

'কী হয়েছে—'—হামিদ ছুটে আসে।

'কিছু না,—তেষ্টা পেয়েছে!'

কলসী থেকে জল গড়িয়ে দিয়ে হামিদ বলে—'বিশ্রাম ঠিকমতো হচ্ছে না,—লেখা-পড়া এখন বন্ধ করো। এত রাত্তির পর্যন্ত জাগাও ভাল নয়, আর পড়াশুনা তো নয়ই।'

'ঘুম আসতে চাইছে না' তারপর আপন মনেই বলে—'মাহমুদ সাহেব সেই যে গেছেন আজও আসবার নাম নেই।'

'যৌবনের ধারাই এই। এ বয়সে স্থিরতা আশা করাই ভুল। আমি তাকে তোমার অসুখের খবর পাঠিয়ে দিয়েছি—'

'তিনি যখন আপনাদের কথাই ভুলে গেছেন তখন আমি তো পর।'

'যৌবনের অন্য নাম নেশা—এটা বোধহয় আপনার জানা নেই। আর নেশার শুধু সামনের জিনিষই চোখে পড়ে!'—এই কথা বলে হামিদ গিয়ে আবার তার নিজের জায়গায় বসে।

অফিসের বহু কাজ বাকী। সুতরাং সে তার কাজের মধ্যে ডুবে যায়। দায়িত্বশীল এই লোকটির প্রতি সইদার মন ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। মাহমুদের তুলনায় হামিদ সত্যিই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। মাহমুদের চিন্তার মধ্যে স্থিরতা নেই এতটুকু। নেশার ঘোরে ভালোবাসার ভাণ করে সে।

নতুবা এতদিনে সে একবার তার খোঁজ নেবার সময় পর্যন্ত পেলো না?

কর্মরত হামিদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সইদা। কাজের ফাঁকে হামিদ একবার চোখ তোলে। চারি চক্ষের মিলন হতেই বিব্রতভাবে দুজনেই চোখ নামিয়ে নেয়।

সইদার বুকের ভেতরটায় তোলপাড় শুরু হয়।

'দাদা, আমার একদম ঘুম আসছে না। আপনি ছাদে গিয়ে কাজ করুন।'

'এতক্ষণ বলনি কেন!' বলে হামিদ তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যায়। সইদার অনুরোধ সে কি ফেলতে পারে কখনো।

'আহা! মানুষটা আমায় কী ভালই না বাসে।'

সইদা ভাবে,—'আমি বললে সব কিছু করার জন্য প্রস্তুত।'

ক্রমে তার মনে প্রশ্ন আসে: স্বার্থপর এবং চঞ্চলচিত্ত মাহমুদকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে না গ্রহণ করে হামিদকে বেছে নেওয়াই কি ভাল নয়? যতই চিন্তা করে হামিদের গুণাবলী তাকে ততই আকৃষ্ট করতে থাকে। কর্তব্যপরায়ণ মানুষটির প্রতি মমতায় মনটা ভরে ওঠে তার। সে বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে ছাদের দিকে।

'এখনো কাজ করছেন আপনি?'

হামিদ চমকে ওঠে।

'আরে, একি! দুর্বল শরীর নিয়ে উঠে এলে কেন?'

'আপনার জন্যেই তো আসতে হলো।'—মাথা নীচু করে সে জবাব দেয়।

'কিন্তু আমার জন্যে কেন?

'আপনার জন্যেই তো—'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, নীচে চলুন!'

'কিন্তু তোমার যে ঘুম আসবে না।'

'আপনি এখানে থাকলেই আমার ঘুম হবে না!'

'সে কি! কেন?'

'তা আমিও জানি না।'

সইদার কথাগুলি আজ হামিদের কাছে দুর্বোধ্য এবং রহস্যময় বলে মনে হলো। দ্বিরুক্তি না করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে সইদার পিছু পিছু ছাদ থেকে নীচের নেমে এলো।

॥ তেরো ॥

'আমার ওপর রাগ করেছ বুঝি?' সুযোগ বুঝে মাহমুদ সইদাকে জিজ্ঞেস করে।

'রাগ করবেন আমার মা-মাসিমা—আমি কে হই যে রাগ করবো?'

'বুড়ি-থুড়িদের রাগের আমি তোয়াক্কা করি নাকি?'

'দাদার তোয়াক্কাটা তো অন্তত করা উচিত।'

'দাদা আমার মাটির মানুষ—তাকে আমি যা বলব তাই সই।'

'তাই বুঝি 'শের' হয়ে উঠেছেন?'

'জোয়ান মানুষ 'শের' হবো না কি ভেড়া হবো?'

কথাটা সইদার ভারি ভাল লাগল। মনে হলো তার বুকে মাথা রেখে অভিমানের সকল কথা উজাড় করে দেয় তার কাছে। পরক্ষণেই কিন্তু বিবেক তাকে বাধা দিয়ে বলল—'এই সেই তরলমতি যুবক যে কয়েকদিন বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের ভালোবাসাকে অনায়াসে ভুলে যায়!' পর-ক্ষণেই হামিদের শান্ত-অনুগত মুখখানি তার মানসপটে ভেসে ওঠে। রোগশয্যার পাশে বসে হামিদের নিরলস সেবার কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে বলে—'আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না।'

'কিন্তু আমার কথাকে ঠকাবার চেষ্টা বলে ভুল করছ কেন?'

'করছি এই জন্য যে আপনি আমাকে আপনার খেয়ালের খেলনা বলে মনে করেন।'

'মোটেই তা নয় সইদা! বন্ধুরা আসতে দেয় নি তাই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল, সুযোগ পেয়েই চলে এসেছি।'

'আসল কথা হলো পয়সার খেলা শেষ হতেই—বিনা পয়সার খেলনার কাছে চলে এসেছেন।'—গূঢ় কোন অর্থ আরোপ না করেই কথাগুলি সইদা বলে।

'তুমি জানলে কী করে?'

'সত্য কখনো গোপন থাকে না। আপনাদের মতো ছেলেরা সুযোগ পেলেই ভিড়ে যায়!'—হামিদের কথার প্রভাব তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

'তুমি দেখছি, এই ক'দিনে একেবারে বদলে গেছ।'

'জগৎ পরিবর্তনশীল। এখানে কেউ একই জায়গায় স্থাণু হয়ে থাকে না।'

'বেশ ভাল কথা। বদলে থাকে বদলাও—' বলতে বলতে সে অবজ্ঞাভরে ওপরে চলে যায়।

সইদা তার এই ব্যবহারে খুবই আহত হলো। তার আশা ছিল যে নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে অনেক তোষামোদ করে মাহমুদ তার মান ভাঙাবে।

কিন্তু মাহমুদ তা করতে যাবে কেন? যৌবনের গর্বে সে যে আত্মহারা।

'আমাদের মতো পুরুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষা কখনো অচরিতার্থ থাকে না।'

'সইদা না হলে তার স্থান অন্য কেউ নেবে, ওর চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে ইউনিভার্সিটি চত্বরে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে মরছে। আমি রাজী হলে তারা সবাই আমাকে লুফে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি লাগাবে।'

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে সাজগোজ করে ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে মাহমুদ।

সইদা তার ওপর রেগে গেছে। রেগেছে তো বড় বয়েই গেছে। মেয়ের অভাব আছে তার?—

জামিলা।

হামিদা।

নাচিমা।

নাহিদ।

আজরা প্রমুখা প্রমুখা।

এরা সবাই তার অনুরাগিণী,—ইউনি-ভার্সিটি বিদুষী বালা। মিষ্টি মাদক চোখ ওদের। আকাঙ্ক্ষিত প্রতিমাগুলিকে মানস-চক্ষের সামনে সাজিয়ে পথপরিক্রমা করে চলে মাহমুদ। আগে কোনদিনই এরা

তার কাছে আমল পায় কি। আজ কিন্তু এদেরই মধ্যে কারো সংগে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করবে।

'কে সবচেয়ে ভালো?'

'জামিলা।'

'কিন্তু ও তো সাইকোবাজির ছাত্র ফারুককে একবার বোকা বানিয়ে ছেড়েছে।'

'তাহলে নাহিদই ভাল।'

'কিন্তু আজমপুরের নবাব তো এখনো ওর পিছনে লেগে আছে।'

'আজরা...'

'কিন্তু ও মেয়েটার চিন্তাধারা খুবই প্রাচীনপন্থী।'

ওদের মধ্যে নহকতকেই সবচেয়ে ভাল মনে হলো মাহমুদের। একটু রোগা বটে কিন্তু ভেতরটা ওর টৈ-টম্বুর।

মনস্থির করে ফেলে সে। সামনেই ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং। ওটা আজ তার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে। ফটকের কাছে এসে চলার গতিবেগটা হঠাৎ বেশ বেড়ে যায় তার।

'ঠিক যেন রেসের ঘোড়া।'

'দড়ি ছিঁড়ে আস্তাবল থেকে পালিয়ে আসছে।'

'তোদের কল্পনার ধারাটাই ভুল।'

'তবে তুই কী বলিস?'

'ও কি ঘোড়া নাকি!'

'তবে কী?'

'ধোপার কুকুর—ঘরেরও নয় আর ঘাটেরও নয়!'

'তবে ভাগিয়ে দে—কখন কাকে কামড়ে দেয় কে জানে।'

'কামড়াবে না—পালিত জন্তু তো।'

'কিন্তু জন্তু তো বটে।'

'হিস্'

'হিস্-স্।'

ধোপার কুকুরকে ভাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মেয়েগুলো হিস হিস করে উঠতেই সে ভাবল ওরা বুঝি তাকে ডাকছে, সুতরাং ছুটে এলো সে। কলরোল উঠল—

'কামড়াবে, কামড়াবে।'

'পালাও, পালাও।'

'হোয়াট ইজ দিস' মাহমুদ চেঁচিয়ে ওঠে।

এগিয়ে গিয়ে নহকত প্রশ্ন করে— 'কী বললেন মিস্টার?'

'এটা কী'

'ইউনিভার্সিটি।'

'তা তো দেখছি।'

'তবে আপনি কী জানতে চাইছেন।'

'আমাকে দেখে এতো গোলমালের কারণ কী?'

'নতুন জিনিষ দেখলে গোলমাল তো হয়ই।'

'কিন্তু আমি নতুন হলাম কী করে?'

'অতএব আমাকে আজ তো—নতুন নতুনই লাগছে।'

'মিস্টার মাহমুদ এমনিতেই সুন্দর।'

'শুভজনের [illegible] সুন্দর দেখ'

'এতই ঢাকা [illegible] যৌবন্য মনহরক দৃশ্য কমই বইএ।'

'আপনারা সবাই মিলে আমার পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো।' মাহমুদ বলল।

'পেছনে লেগেছি?—কখনো না।'

'সত্যি, মিস্টার মাহমুদের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে।'

'সত্যি বলছেন?'

'সত্য নয় কি মিথ্যে? বিশ্বাস যদি না হয় তাহলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভাল করে দেখবেন।'

'আমার আয়না তো এই মেয়েটো।' নহকতের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে মাহমুদ বলে।

'তাই নহকত; তুই বড়ই ভাগ্যবতী।'

'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলি কে জানে।'

'ও, ডুবে ডুবে এতদিন নহকতের সঙ্গে জল খাওয়া হচ্ছিল। তাই আমরা টের পাই নি।'

'বেশ বেশ।'

'[illegible] এমন ওর মুখের কথা—মনের কথা নয়, মনের কথা হলে ওর দ্বারা এতদিনে আমার অন্তত একটা উপকারও হতো।'

নহকত অভিমানের ভান করে।

'কিন্তু আপনি তো কোনদিন আমায় কিছু বলেন নি।'

'আমারও তো বেশ। ও কি কখনো মুখ ফুটে বলতে পারে?—আমরাই ওর হয়ে বলব।'

'বেশ তো আপনারাই বলুন।'

'বলব, কিন্তু তার আগে মিষ্টিমুখের [illegible] একটু ডিনারের যোগাড় চাই।'

মাহমুদ সানন্দে রাজি হয়ে যায়। আরও মেয়েরা এসে ভিড় করে।

আনন্দ সংবাদকে উপলক্ষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা তার পকেট বেশ কিছুটা হালকা করে দিল। পেস্ট্রী, [illegible] খুব উড়ল। উৎসাহী একজন প্রস্তাব করল—তাই, আজ ওদিকে প্রেম কম্প্যাক্টমেন্টস হচ্ছে।—দেখাতে হবে।'

'আমার মনের কথাটা তুমি বলে দিয়েছ।'— নহকত তাকে সমর্থন করে।

'হলে আজ আমরা ডিনারটাও সারব।' নাদিরা বলল।

'কাপুরুষ—এই জমবে ভাল।'

শো-এর পর যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যাবে।'

কোন প্রস্তাবেই মাহমুদ আজ আর আপত্তি করে না। পকেটও বেশ গরম আছে আজ। হামিদের মাইনের পুরো টাকাটা তার পকেটে গজগজ করছে।

'বাড়ির খরচ-খরচা আজ থেকে তুমিই চালাবে!'—টাকাগুলো ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে হামিদ বলেছিল— 'হাট-বাজার সম্বন্ধে এইবার ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

সিনেমা দেখে ডিনার করে ওরা সবাই কাপুরস থেকে বেরিয়ে এলো। মাহমুদের পকেট বেশ হাল্কা হয়ে এসেছে আর কয়েকটি টাকা মাত্র পড়ে রয়েছে। আড়মোড়া ভেঙ্গে লুব্ধদৃষ্টিতে নহকতের মুখের পানে চেয়ে দেখে মাহমুদ।

'এখন আপনি কোথায় যাবেন?'—পথ চলতে চলতে নহকতকে সে জিজ্ঞেস করে।

আশা ছিল উত্তর আসবে—'আপনি যেখানে বলবেন।'

উত্তরটা কিন্তু আদৌ সেরকম হলো না। সহপাঠিনীদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে নহকত বাস্তবে বলল—'বাই-বাই, মিস্টার মাহমুদ!'

॥ চৌদ্দ ॥

মাহমুদ ভোরবেলায় মাথা নীচু করে একলা বসেছিল। জীবনে এই তার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা।

'মাহমুদ মিয়া—' হামিদ তার কাছাকাছি এসে ডাকে।

'কী দাদা?'

'আজ খুব সকাল সকাল উঠে পড়লে যে!'

'রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি।'

'কেন?'

'খুব একটা অন্যায় করে ফেলেছি।'

'কী অন্যায়?'

'তোমার টাকাগুলো সব খরচ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু টাকা তো খরচ হবার জন্যই দেওয়া। তাতে অত ভাবনার কী আছে? আর টাকা তো অন্য কারো নয়—তোমার দাদারই টাকা—অর্থাৎ তোমারই জিনিষ।'

'কিন্তু সংসারের খরচ!......

মাহমুদ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হামিদ তার কথার মাঝেই বলে ওঠে—'তার কথা তোমায় ভাবতে হবে না। সে ব্যবস্থা আমি করবো।'

পর পর তিন জায়গায় ঘা খেয়ে এবং সাইদার রুষ্ট হওয়ায় মাহমুদের মনটা খুবই দমে গিয়েছিল। দাদার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার তাকে এমনিই বিচলিত করল যে তার চোখে জল এসে গেল।

'কাঁদছিস কেন?—কী হলো রে!' হামিদ সস্নেহে তার ভাইটিকে কাছে টেনে নেয়।

'ব্যাটাছেলে কাঁদে নাকি রে! তুই এবার বিয়ে করে ফেল। তুই যতদিন রোজগার না করছিস ততদিন সব ভার আমার। এক্ষুণি গিয়ে মার সঙ্গে আমি কথা বলছি।—'

মাহমুদ সব টাকা খরচ করে ফেলেছে। টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং সারাদিন ঘোরাঘুরি করে টাকা নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরে সে।

মা একলা খাটের উপর বসে আছেন, 'বাড়িটা আজ এত নিঃঝুম মনে হচ্ছে কেন মা?—চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে প্রশ্ন করে।

'সাইদা আর তার মা কাপড় কিনতে বাজারে গেছে।'

'মাহমুদ সঙ্গে গেছে বুঝি?'

'আমি যেতে বলেছিলাম, এবং সেও যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'—

'কিন্তু সে গেলে সাইদা কিছুতেই যাবে না—'

'সে আবার কী?—মাহমুদ ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছে বুঝি?'

'তুমি তো বাবা নিজের কাজেই ব্যস্ত থাক,—বাড়ির কোন ব্যাপারই তোমার নজরে পড়ে না। ওরা দুজন তো যতক্ষণ বাড়িতে থাকে পরস্পরের পিছনে লেগে আছে। ওদের মধ্যে মিল দেখে আমি এবং সাইদার মা তো ভেবেই রেখেছি যে আমাদের মধ্যে কুটুম্বিতার সম্পর্ক পাকাপাকি করে নেওয়াই ভাল—'

'অর্থাৎ সাইদা মাহমুদের বাগদত্তা—' হামিদের মুখ মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে যায়। সে যাকে নিজের মনে স্থান দিয়েছে সেই মেয়েটিই যে তার ভাইয়ের ভাবী হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এ ঘটনা এতদিন তার কাছে অজ্ঞাত ছিল। তার আশার ইমারতে এ যেন শত বজ্রাঘাত। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় তবু তার মুখ দিয়ে কি করে জানি না বেরিয়ে আসে—'তা ভালই মানাবে।'

'আমরাও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ইদানীং ওদের মনোভাব ক্রমেই অন্যরকম হয়ে আসছে।'

'মাহমুদের অনেকদিন বাইরে থাকা এবং সাইদার অসুস্থতার খবর পেয়েও না আসাই বোধহয় এর কারণ।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'ও আবার দু'দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'খোদা করুন তাই হোক—কিন্তু সাইদার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়েছে।'

'কেন মা?'

'মেয়েটা ভারি জেদী। একবার না বললে ওকে হ্যাঁ করানো প্রায় অসম্ভব।'

'তা যাই হোক, এ সম্বন্ধ পাকা আমাদের করতেই হবে।'

সেদিন রাতে হামিদের আর খাওয়া হলো না। মানসিক অবস্থা তার এমনি এক পর্যায়ে পৌঁচেছে সেখানে ক্ষুৎপিপাসার বোধ না থাকাই স্বাভাবিক।

একদিকে ছোট ভাই......অন্যদিকে প্রেমিকা। প্রেমকে জলাঞ্জলি দিতে মন চায় না। অথচ বিবেক বলছে—যে ভাইকে নিজের ছেলের মতো পালন করেছ, যার জন্য আজ তোমার ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি ত্যাগ করেছ, তার জন্য আজ তোমাকে এই ত্যাগটিও করতে হবে।—প্রেমকে বলিদান দিতে হবে।—'আমাতে আর মাহমুদে তফাৎ কী?—

'একই শাখায় দুটি ফল আমরা।'—প্রিয় ভাইয়ের পরিতৃপ্ত মুখখানি ভেসে ওঠে হামিদের চোখের সামনে। প্রেম এবং কর্তব্য-বোধের লড়াইয়ের দোলায় সে অনেকক্ষণ দুলতে থাকে।

এবং শেষ পর্যন্ত জয়ের আনন্দে হাসি-মুখে এসে মায়ের সামনে দাঁড়ায়। মায়ের ততক্ষণে তন্দ্রা এসে গেছে।

তিনি চমকে উঠে প্রশ্ন করেন—'কে?'

'আমি মা!—হামিদ!'

'কিছু বলবি?'

'আচ্ছা মা, মাহমুদও কি সাইদাকে বিয়ে করতে চায়?'

'সে কি আর বলতে! ওরা তো তৈরিই ছিল—কিন্তু—'

'বলো না, থেমে গেলে কেন?'

'কিছুদিন থেকে দেখছি, মাহমুদের প্রতি সাইদার টান বেশ কমে এসেছে।'

'মেয়ে ত', ছোটখাট কারণে হয়ত মন-কষাকষি হয়েছে,—ও ঠিক হয়ে যাবেখন।'

'কিন্তু বাবা! মাহমুদ তো এখনো নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে নি—'

'তাতে কী হয়েছে?'

'সে কী?'

'আমি যা রোজগার করি তা তো মাহমুদেরই।—'

'বেশ ভাল কথা।'

শমীম আরা বেগম সকালে ঘুম থেকে উঠেই নবোদ্যমে ওই প্রসঙ্গটি সাইদার মার কাছে পাড়লেন। সবই সাইদার কানে গেল। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখিয়ে উঠল— 'আমার বিয়ের মতলব আঁটছিলে বুঝি তোমরা?—মাহমুদকে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না।'

'কেন?'

'আমার খুশি।'

'কিন্তু এ বিয়েতে তোর আপত্তি কীসের?—রোজগার করে না এই তো?'

'রোজগারের ব্যাপার নয়।'

'তবে কী?'

'বললাম তো, আমার খুশি।'

সানলাইটে প্রতিবার আপনার জামাকাপড় আরো ঝলমলে ক'রে কাচে
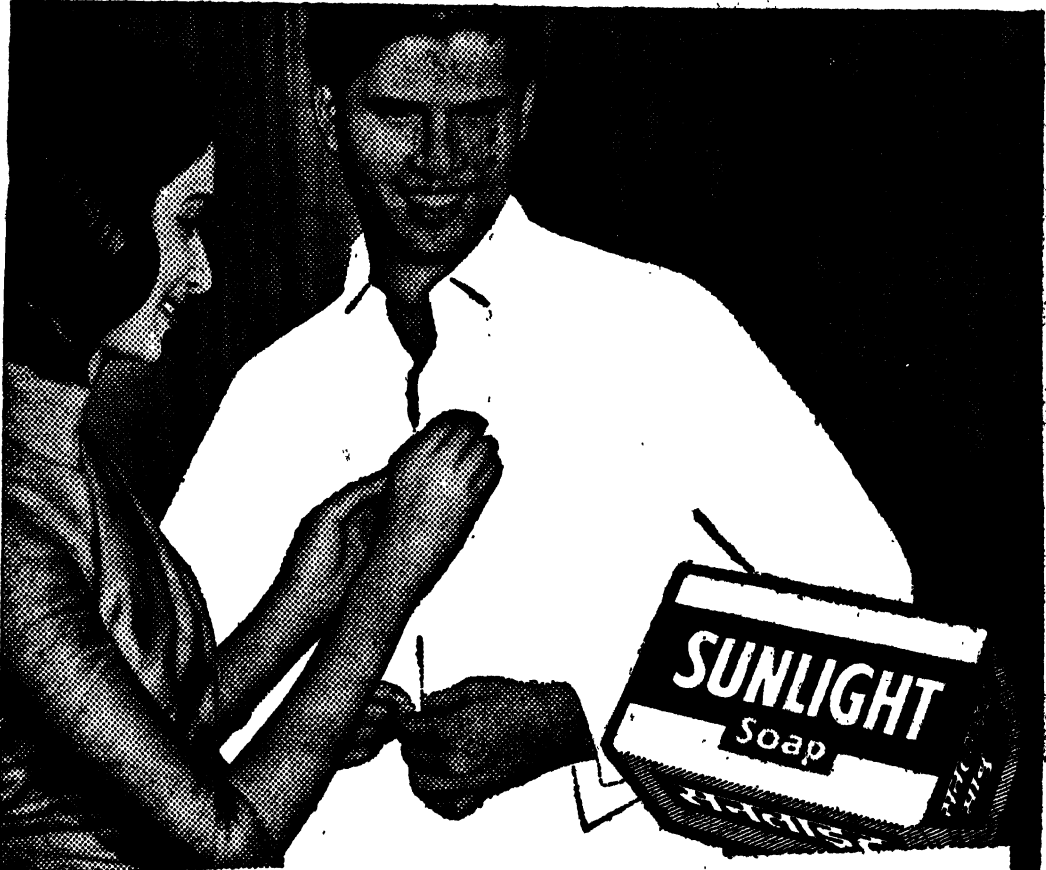
সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

মাসিক

বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / '৭৬

প্রভাতী —রোহিণীনন্দন সিংহ

সূর্য-প্রণাম —দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসদন (কলিকাতা)

—ভক্তিপ্রসাদ সরকার

ফুলের হাসি

—অমিতাভ অধিকারী

ভীরু

—বিশ্বনাথ গোস্বামী

—রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিযোগিতা—পোস্টার

(১ম পুরস্কার) —নারায়ণ চক্রবর্তী

প্রতিযোগিতা

পো
স্টা
র

—শিবু দত্ত
(২য় পুরস্কার)

মাসিক
বসুমতী
জ্যৈষ্ঠ / '৭৬

—বিশ্ববন্ধু বসাক
(৩য় পুরস্কার)

'এ কেমন ধারা খুশি তোর মা? এই তো দু'দিন আগে তুই—মাহমুদে বলতে অজ্ঞান ছিলি।'

'আজও তাই আছি।'

'তবে কেন ওকে বিয়ে করার তোর এতো আপত্তি?' প্রশ্নের উত্তর দেবার কোন সুযোগ না দিয়েই সইদার মা আবার বলেন—'তোর যদি মনে হয় যে বিয়ের পরে মাহমুদ সংসার চালাতে পারবে না তাহলে জেনে রাখ, সে ভার হামিদ নেবে বলেছে।'

'তবে তাঁরই সংগে আমার বিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'ওর সংগে তোর জোড় মেলে কখনো!'

'কেন মিলবে না?'

'কারণ ওর বয়স পঁয়তাল্লিশ আর তোর আঠারো।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে তা তুই কী বুঝবি?'

'কিন্তু আমি যা ঠিক করেছি তাই হবে।'

মায়ে মেয়েতে এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলল কিন্তু তাতে মেয়ের মতের কোন পরিবর্তন হলো না। মা শুধু এইটুকু জানলেন যে অসুখের সময় মাহমুদের অনুপস্থিতিই তার প্রতি সইদার অনাস্থার একমাত্র কারণ। তিনিও ভেবে দেখলেন, সত্যিই তো এমন দায়িত্বহীন ছেলেকে তাঁর মেয়ের যদি পছন্দ না-ই হয় তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তাই জামিলা বেগম মাহমুদের সংগে সইদার বিয়ের কথা এরপর একদিন পাড়তেই শমীম আরা বললেন—'চোখ বুজে মেয়ে বিয়ে দেবার দিন আর নেই ভাই।'

'কিন্তু চোখ বোজার কথা এর মধ্যে আসে কী করে? ওদের মেলামেশা অনেক দিনের আর ভাব-ভালবাসাও হয়েছে।'

'ভাবের ঘোরে ভালবাসা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সইদা এখন আর মাহমুদকে বিয়ে করতে রাজি নয়।'

'কী বললেন?'—শমীম আরা বিস্মিত হন।

'বলছি, সইদা চায় হামিদকে বিয়ে করতে। আপনার যদি মত থাকে, তাহলে—'

'আমার কাছে মাহমুদ হামিদে কোন তফাৎ নেই। সুতরাং মত থাকবে না কেন?'

'তবে হামিদের সংগে কথা বলে তার মতটা জেনে নিন।'

বড় ছেলের বিয়ের সম্ভাবনায় শমীম আরার খুশির মাত্রাটা যেন একটু বেশিই হয়। সুতরাং সেদিন রাত্রেই তিনি হামিদকে বললেন—'সইদা মাহমুদকে বিয়ে করতে চাইছে না।'

'কেন?'

'মেয়েদের মন খুবই স্পর্শকাতর। অসুখের সময়কার ঘটনায় মাহমুদের উপর তার আর ভরসা নেই।'

'এ তো খুব খারাপ হলো।'—হামিদ ভাবতে থাকে। মাহমুদের সংগে বিয়ে হলে সইদা অন্তত ভ্রাতৃবধূ হিসাবেও তার চোখের সামনে থাকত। কিন্তু এখন?

সে কী যেন একটা বলতে যাবে এমন সময় মা তাকে বললেন—'সইদা এখন তোমাকে বিয়ে করতে চায়।'

মুহূর্তের জন্য হামিদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—রোমাঞ্চিত হলো তার সারা দেহ। তার সামনে আনন্দের স্বর্গরাজ্যের দুয়ার খুলে গেছে যেন!

'কী বললে মা?'

'বললাম, সইদা তোমাকে বিয়ে করতে চায়।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু......'

'আমি বলছি, তুমি, বাবা গররাজী হয়ো না।'

'গররাজী...গররাজী...!' হামিদ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে—না—না—আমি গররাজী...— কী যেন বলতে গিয়েও তা বলতে পারে না।

মা তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন—তোমার তো এমন কিছু বয়স হয় নি। আর সইদাও ভারী ভাল মেয়ে। যেমন রূপ তেমনি গুণ।'

'কিন্তু ও যে মাহমুদের বাগদত্তা।'

'তাতে কী হয়েছে? আনুষ্ঠানিকভাবে তো কিছুই হয় নি। আমার এই কথাটা রাখো বাবা। সইদাকে বিয়ে করো।'

'আর মাহমুদের আশার মুখে ছাই দেবো?'

'ওর আশার মুখে ছাই দেবে কেন? আরও কত মেয়ে আছে—'

'হুঁ—'

হামিদ উঠে দাঁড়ায়।

'চলে যাচ্ছ কেন—কথা দিয়ে যাও।' মা যেন আকুল আবেদন জানান।

'ভেবে পরে বলব'খন।' এই কথা বলে হামিদ চলে যায়।

॥ পনেরো ॥

ঝিরঝিরে বৃষ্টির পর আকাশটা পরিস্কার হয়েছে। সান্ধ্য চাঁদও হাল্কা জ্যোৎস্নার ডালি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

অফিস থেকে ফেরার পথে ধারকরা টাকায় সইদার জন্য কিছু দামী কাপড় কিনেছে সে। বাড়ীর দিকে পা বাড়াবার আগে বাগানে বসে একটু দম নেয় হামিদ। —হাল্কা লাল রঙের ওড়নাটা সইদাকে ভারী সুন্দর মানাবে!' 'কাজল কালো সাড়ীটায় আমাকেও কম মানাবে না।' সইদাকে বধূবেশে দেখার সাধ তার মনে আঁকুপাঁকু করছে। বধূ অবশ্য আর নিজের নয়—তাই মাহমুদের। কিন্তু সইদা তো মাহমুদকে চায় না। যেমন তার হোক তাকে রাজী করাতেই হবে। কিন্তু তেমন সুযোগ সে পাচ্ছে কই? টিপটিপ বৃষ্টি আবার আরম্ভ হোল। কাপড়গুলো সামনে নিয়ে হামিদ উঠে পড়ে ধীরপদে পার্ক থেকে বেরিয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে অপরদিক থেকে এক সঙ্গিনীকে নিয়ে সইদা এসে হামিদ যেখানে বসেছিল সেই বেঞ্চিতেই বসে পড়ে।

'তুই তাহলে তোর মত আর পাল্টাচ্ছিস না?'

'প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরা তাদের মত বদলায় না।'

'তা যদি সত্যি হয় তাহলে মাহমুদের অনুরাগিণী হওয়াই তোর উচিত'

'অনুরাগিণী যে নই তা তোকে কে বলল? —কি... কিন্তু তালি কখনো একহাতে বাজে না। যে ব্যবহার সে করেছে তারপর তার সংগে কোনো সম্বন্ধ রাখা যায় না।'

'কিন্তু সে যে তোকে ভালবাসে না এ সিদ্ধান্তে তুই এলি কী করে?'

'ভালবাসলে আমার অসুখের খবর শোনার সংগে সংগে ঠিক ব্যস্ত হয়ে পড়ত—'

'তাহলে কী করবি ঠিক করেছিস?'

'আমি হামিদকে বিয়ে করবো।'—লজ্জিতভাবে সইদা জবাব দেয়।

'তোর সংগে তাকে মানায় না। সে তোর থেকে অনেক বড়।'

এরপর আর প্রসংগটি বেশীদূর অগ্রসর হয় না। হামিদের সন্ধানেই সে এখানে এসেছিল। বাড়ী ফিরে দেখে—বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু হামিদের ঘরে আলো জ্বলছে।

'আপনি এখনো জেগে আছেন?'—সইদা গিয়ে হামিদকে বলে।

'হ্যাঁ জেগে আছি।'

'কিন্তু কেন?'

'তুমি বাইরে ছিলে, তাই।'

'দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেই পারতেন। আমি এসে ডাকতাম।'

'কারো ঘুম না ভাঙলে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।'

'আমি দাঁড়িয়ে থাকি—অপেক্ষা করি তা বুঝি আপনি চান না!'

'আসলে তাই।'

'ধন্যবাদ!'

'এর মধ্যে তো ধন্যবাদের কিছু নেই।'

'কিন্তু আপনি যে আমার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।'

'না, আমি আমার নিজেরই অপেক্ষায় ছিলাম।'

জীবনে এই প্রথমবার হামিদ সাহসে ভর করে ভাবপূর্ণ একটি কথা বলল।

সইদা আড়চোখে তার মুখের পানে একবার দেখে নিয়ে মৃদু হেসে লজ্জায় মাথা নীচু করে বলে—'অর্থাৎ আপনার মন আপনাকে বাধ্য করেছে।'

'হ্যাঁ তাই!'

'কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছেন?'

'শুধু আমার চিন্তায় কিছু হবার নয়!'

'তবে আর কার চিন্তার দরকার?'

'সে কথা কি এখনো বলতে হবে?'—

হামিদের অর্থপূর্ণ এই কথার প্রতিক্রিয়ায় সইদার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হামিদের প্রতিটি ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছে। এমন সংযত এবং সুন্দর মানুষ সে ইতিপূর্বে দেখেনি। মাহমুদের তুলনায় হামিদ নিঃসন্দেহে উন্নত।

তার সখী সঙ্গীনী তার আপনজন আরও নজীর যদি তার সামনে এনে না দিত তাহলে তা এতদিনে বোধহয় মাহমুদের সংগে একটা সমঝোতায় এসে যেত।

চাঁদ আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচছে। হামিদের আকাঙ্ক্ষিতা আজ এই মুহূর্তে তারই সামনে দাঁড়িয়ে। সে তাকে অনায়াসে জীবনসঙ্গিনী হবার আহ্বান জানাতে পারে। কিন্তু নেপথ্য থেকে মাহমুদের মমতাময় মূর্তি তাকে যেন টেনে রেখেছে।—নিজেকে সংযত করে সে তাই বলে—'যাও, শোও গিয়ে;—অনেক রাত হয়েছে।'

'কিন্তু এখানে থাকতে আমার খুব ভাল লাগছে।'

'কিন্তু রাত বাড়ছে যে!'

'আপনিও তো জেগে রয়েছেন।'

'আমার অভ্যাস আছে।'

'আমিও অভ্যস্ত হতে চাই।'—এই কথা বলে সে তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘরে গিয়ে মন টেকে না। তাই আবার ফিরে এসে হামিদের খাটের উপর বসে পড়ে—

'শুনুন!'

'বলো—'

'আমি আপনার কাছে মাফ চাইতে এলাম।'

'কেন?'

'আপনার মনে আঘাত দিয়েছি বলে!'

'ওটা তো কোন অপরাধ নয়।'

'অপরাধ বলেই আমি মনে করি!'

'তবে নিজের কাছেই মাপ চেয়ে নাও।'

'কিন্তু নিজেই অপরাধী যে!'

'আমার মনে পড়ে না।'

'তবু মাফ করে দিন!'

'তুমি যখন বলছ তখন মাফ করছি, কিন্তু এক শর্তে—'

'বলুন কী শর্ত?' সইদার মুখে মৃদু হাসির রেখা ঝিকিয়ে ওঠে।

'খুবই কঠিন শর্ত।'

'বলুন। আমি রাজী।'

'তবে তুমি তোমার সিদ্ধান্তকে পালটে ফেল।'

'না পালটালে আপনার সামনে আসতাম না।'

'তোমার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।'

'না বুঝলে, আপনার শর্তটাই ভাল করে খুলে বলুন।'

'আমি বলছি যে তুমি মাহমুদের বাকদত্তা এবং তাকে বিয়ে করাই তোমার উচিত।'

'তা কখনো হতে পারে না।'

'কেন?'

'পুরানো কথা আমি ভুলতে চাইছি,—আপনিও ভুলে যান।'

'পুরোনো কথা তো ভোলার জিনিষ নয়।'

'কিন্তু এ ব্যাপারে আমার আর কিছু করার নেই।'

'আমার ভাই অতটা খারাপ নয় যতখানি তুমি ভাবছ।'

'তাঁকে তো আমি খারাপ বলি না। আমি নিজে তাঁর যোগ্য নই।'

'এ তো তেতো ওষুধে মিষ্টি মোড়ক দেবার মতো।'

'তা আপনি মনে করতে পারেন।'

'আমাকে হতাশ করছ তাহলে!'

'এ ক্ষেত্রে তাই।'

'তা হলে যাও, মাফ করা আমার দ্বারা হবে না।'

'বেশ।'—রুদ্ধকণ্ঠে শুধু এই একটি কথা বলে সইদা তার মায়ের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

॥ ষোল ॥

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

ঘরের কপাটটা নিঃশব্দে খুলে মাহমুদ বেরিয়ে পড়ে।

সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে সে। আজ আর বাইরের দুনিয়ায় তার কোনো বন্ধু নেই। পরীক্ষা হয়ে গেছে। তার হিস্ট্রি নোটের ভক্ত স্তাবক মেয়েগুলো কার্যোদ্ধার করে সরে পড়েছে। ইউনিভার্সিটি, কফি হাউস প্রভৃতি শহরের ছাত্র মহলের ঘাঁটিগুলিতে সে যেন আজ অবাঞ্ছিত। তাকে নিয়ে আড়ালে আবডালে সবাই হাসিঠাট্টা করে। সে আজ সবারই পরিহাসের বস্তু।

বাড়ীতে দাদা তাকে এখনো আগেরই মতো ভালবাসেন।

মা-মাসীমার ভালবাসাতেও কোন তারতম্য হয়নি। কিন্তু সইদা...? সে তো আর তাকে ভালবাসে না, মাহমুদের কামসর্বস্ব প্রেমের থিয়োরী তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সইদার তাত্ত্বিক প্রেম ভাবনার মর্ম মাহমুদের কাছেও বোধগম্য হয়নি। তাদের মধ্যকার ব্যবধান যে ক্রমেই বেড়ে যাবে—তা কিন্তু মাহমুদ, কোন দিনই ভাবেনি। তার আশা ছিল, মান অভিমানের পর্ব একদিন শেষ হবে এবং সইদা আবার একদিন তার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু হায়! তা হলো কই। ভয়ংকর জেদী মেয়ে সইদা।

বাড়ীতে মন বসে না মাহমুদের। খাওয়া মুখে রোচে না। দেহের উপরও এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। উদাসবিবর্ণ মুখ নিয়ে বাইরে বাইরে অকারণে ঘুরে বেড়ায় সে। জামিলা বেগম এবং শমীম আরা উভয়েই তার এই মনমরা ক্লিষ্ট ভাবকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা চিন্তিতও। কিন্তু কিছুই যে করার নেই। সইদা তার গোঁ ছাড়বে না। হামিদের বিয়ের সম্ভাবনা নতুন করে দেখা দেওয়ায় শমীম আরা বেগম খুবই খুশী। মাহমুদের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অভাব ভবিষ্যতে হবে না। হামিদের বিয়েটা তো হোক।

একই বাড়ীতে বাস করে স্নেহের ভাইটি গুমরে গুমরে শুকিয়ে যেতে থাকবে এ হামিদের কাছে অসহ্য। সইদার সংগে তার বিয়ে সে দেবেই। তাই সে একদিন একান্তে মাহমুদের কাছে এসে সস্নেহে ডাকে—

'মাহমুদ—'

'দাদা—!'

'অমন মুসড়ে পড়তে নেই।'—রুদ্ধকণ্ঠের অনুরোধ।

মাহমুদের মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না।

'আমি সব জানি ভাই। তুই কিছু ভাবিস না। আমার প্রাণ থাকতে তোর কোনো আশা আমি অপূর্ণ থাকতে দেবো না।'—নিজের হাতখানি ভাইয়ের দিকে প্রসারিত করে দেয় হামিদ। তার সে হাত শীতল।—ঘামে ভিজা।

'তোমার শরীর খারাপ নাকি দাদা?'

'না তো।'

'মুখটা কেমন যেন লাগছে।'

'বয়সটা তো বাড়ছে রে।'

'কী-ই বা বয়স হয়েছে তোমার?'

'প্রায় বুড়ো হতে চললাম।'

মাহমুদ এতক্ষণ নদীর ধারে বসে বসে মহাপ্রাণ দাদাটির কথাই ভাবছিল। এইবার সে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ সইদার কয়েকটি কথা তার মনে পড়ল। হামিদের উদ্দেশ্যে সইদাকে সে বলতে শুনেছে—

'আমি যখন আপনার কাছে এগিয়ে এসেছি, দোহাই আপনার, আপনি পিছিয়ে যাবেন না!'

'বলুন, ফিরিয়ে দেবেন না আমাকে।'...

'আমাকে দয়া করুন...দয়া...'

হামিদ যে তার ভাইয়ের স্বার্থে নিজের চিত্তবৃত্তিকে প্রাণপণে সংযত করতে চাইছে এ সত্য সইদার কাছেও আজ আর অজ্ঞাত নেই। তাই তার মনেও শান্তি নেই। মানুষটির প্রতি তার শ্রদ্ধা যতই বেড়ে চলেছে, ততই তাকে অলভ্য বলে সংশয় জাগছে তার মনে!

মাহমুদের দুর্গতিতে তার প্রতিহিংসাপরায়ণ নারীচিত্ত মোটেই অখুশি নয়। এই সব ফুলে ফুলে মধু খাওয়া লোকদের আরও শাস্তি পাওয়া উচিত। সুতরাং তার উসকো-খুসকো চুল আর শুকনো মুখ সইদার মনে মোটেই রেখাপাত করে না।

॥ সতেরো ॥

রাত দুটো বেজে গেছে।

হামিদের চোখে ঘুম নেই। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে চলেছে সে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যায়।

'সইদা!' হামিদ অবাক হয়।

'সইদা বলবেন না,—বলুন নির্লজ্জ—বেহায়া।'

'বসো। তুমি কাঁপছ কেন?'

'নির্লজ্জের মতো এসেছিল বলে।'

'কিছু বলবে?'

'মাহমুদের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন—'

'তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তার জন্য আত্মত্যাগের যে পরিকল্পনা—'

'ন্যায্যতার দাবিতে অনেক কিছুই মানুষকে করতে হয়।'

'তবে আমার জন্যও আপনাকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।'

'বলো, নিশ্চয় করবো।'

'আপনি বোধহয় আমাকে নেহাৎই শিশু বলে মনে করেন?'

'না তো।'

'নিশ্চয়ই তাই। গোপনে গোপনে কার বিয়ের তোড়জোড় করে চলেছেন বলতে পারেন?'

'মাহমুদের।'

'কার সংগে?'

'যার সংগে মানায়।'

'আমার প্রতি ইঙ্গিত করাই কারণ [illegible]?'

'ধরো তাই।'
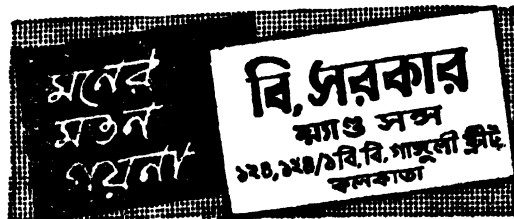
'কিন্তু আমি তো মাহমুদকে বিয়ে করবো না।'

'তুমি যতটা ভাবছ, আমাদের মাহমুদ ততটা খারাপ নয়।'

'সে বিচার করার ক্ষমতা আপনার নেই।'

'কিন্তু আমি আমার মতটা তো বলতে পারি।'

'আপনার ও মত পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট। স্নেহ আপনাকে অন্ধ করেছে।'

'কিন্তু তুমিও তো রাগের বশে সত্যকে দেখতে পারছ না।'

'আপনি নিজের ক্ষতি নিজেই করছেন।'

'কিন্তু এমন ক্ষতির মধ্যেও একটা লাভ আছে।'

'ওসব ভাবের কথা। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'তুমি বেশ রেগে রয়েছ মনে হচ্ছে।'

'আছিই ত।'

'কিন্তু আমি কি কোন অন্যায় করেছি?'

'আমার ঘৃণাকে আপনি ভালবাসায় পরিণত করেছেন। তারপর আমি যখন এগিয়ে এসেছি তখন আপনি পিছিয়ে যেতে শুরু করেছেন।'

'পিছিয়ে যাই নি—আমি তোমার কাছাকাছিই আছি—থাকবো।'

'কীভাবে?'

'তুমি আমার স্নেহের ভ্রাতৃবধূ—' হামিদের বাক্যকে পূর্ণ হতে না দিয়ে সইদা আর্তনাদ করে ওঠে—

'কখনো না,—আমি আপনার ভ্রাতৃবধূ হবো না।'

'তুমি তাহলে আমাকে কাছে থাকতে দিতে চাও না?'

'নিশ্চয়ই চাই।'

'তবে কেন অস্বীকার করছ?'

'কারণ আমি আপনাকে আমার জীবন পথের সঙ্গী হিসাবে কামনা করেছি—'

কথাটা বলতে গিয়ে স্বাভাবিক লজ্জায় সইদার মুখ নত হয়ে আসে।

'কিন্তু আমি তো তোমার সাথী হতে পারবো না।'

'আপনিও তাহলে আপনার ভাইয়ের মতো আমার জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।'

'ভালবাসা জিনিষটা একটা নির্মম সত্য।'

'কিন্তু এই কথাটা আপনি আগে উপলব্ধি করলে ঘটনাটা এতখানি জটিল হয়ে উঠত না।'

'যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। তুমি এখন মাহমুদের জীবনসঙ্গিনী হয়ে সুখী হও।'

'আপনি তাহলে আমাকে স্বীকার করবেন না?'

'আমার মনে তোমার প্রতি অগাধ ভালবাসা রইল।'

'আপনি আমায় গ্রহণ করবেন না?'

'আমি আমার ভাইকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারবো না।'

'একথাটা আপনি যদি আগে ভাবতেন!' —বলতে বলতে সইদার চোখে জল এসে যায়, হামিদ তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার নিজের বুকেই কি কম জ্বালা!

॥ আঠারো ॥

দরজায় সানাই বেজে চলেছে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখে নি হামিদ। ভোর হতেই সে জামিলা বেগমকে জানিয়ে দিয়েছে—যে সইদা রাজী হয়েছে। মাকেও জানিয়েছে সে কথা।

'দেখলে তো মা, আমি যা বলেছিলাম তাই হলো!'

'কিন্তু তোর বিয়ের আনন্দ থেকে তো আমি বঞ্চিত হলাম।'

'তোমার ছেলের বিয়ে নিয়ে ত কথা।'

'কিন্তু তুইও তো আমার ছেলে।'

মাহমুদ গতরাত্রের সব কথা—হামিদ আর সইদার কথোপকথন—আড়ি পেতে শুনেছিল। তাই সে সকাল হতেই মাকে জানিয়ে দিল—'আমি বিয়ে করবো না।'

'ও কী কথা! লোকে কি বলবে?'

'যাই বলুক।'

'কিন্তু কেন?'

'আগে দাদার বিয়ে হবে তারপর আমি বিয়ে করবো।'

'কিন্তু সে তো বরাবরই বিয়ে করতে চায় নি।'

বাড়ীতে সোরগোল পড়ে গেল। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা এখনি না হলে সইদার বদনাম হয়ে যাবে। বধূবেশে সখী পরিবৃতা হয়ে ঠাট্টা তামাসার সর্বজনীন শিকার এখন সে। মহল্লার লোকেরা একে একে এসে জমছে বাড়ীতে।

বিকেলে হামিদ বাড়ীতে এলো। এসেই মাহমুদকে কাছে ডেকে নিয়ে সে বলল—'তুই তো ভারি ছেলেমানুষ।'

'না দাদা, ছেলেমানুষ নই। আমারও কিছু বলার আছে ত। আপনাদের সব কথা আমি কাল শুনেছি।'

'কথাগুলো সব তুই সত্যি বলে ভেবেছিস বুঝি?'

'কিন্তু আমি আমার দাদাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি কী করে?'

'মেয়েটাকে শান্ত করার জন্য কয়েকটি মিথ্যাকথা আমায় বলতে হয়েছে—ভালবাসার ভাণও করতে হয়েছে। আর আমার সেই কথাগুলোকে তুই—বেমালুম বিশ্বাস করেছিস বলেই তো আমি তাকে ছেলেমানুষ বলছি। বিয়ে শাদীর মতো জিনিষের ঝামেলা পোহাবার মতো সময় এখন আমার হাতে নেই। তুই তো জানিস, চীনাবাহিনী আমাদের সীমান্তে এসে হামলা করছে এবং হিন্দুস্থানের প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য হচ্ছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়ানো। তাই আমি সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়েছি। তোর বিয়েটা ঠিক হয়ে গেছে দেখে আমি শান্তিতে নিজের কাজে যোগ দিতে চাই।'

'তুমি যুদ্ধে যাবে?'

'আজকে দেশের প্রতিটি জোয়ানের যা কর্তব্য তাই আমি করেছি।—লাদাকের পার্বত্য অঞ্চলে আর আসামের মাটিতে শত্রুর কামান গর্জে উঠছে। এ অবস্থায় চুপ করে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

মাহমুদের মুখ থেকে এরপর আর কোন কথা সরল না। চোখ দিয়ে টপটপ করে শুধু কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

'ভাইটিকে রাজী করাতে পারলি বাবা?'—মা প্রশ্ন করলেন।

'মাহমুদ কখনো আমার কোন কথা অস্বীকার করেছে।' হামিদ সগর্বে উত্তর দেয়।

* * *

মহা আনন্দের মধ্যে বিবাহের ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হতে থাকল। সমস্তই নিরাপদে ঘটে গেল দেখে বিবাহ সভায় সবার সামনে হামিদ উঠে বলল—'খোদাকে ধন্যবাদ; আমার পারিবারিক কর্তব্য শেষ হলো। এইবার আমি চললাম দেশমাতৃকার প্রতি আমার পবিত্র কর্তব্য পূর্ণ করার জন্য। রণক্ষেত্র আমায় ডাকছে।'

হঠাৎ এক বোমার বিস্ফোরণে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। মা জ্ঞান হারালেন আর হামিদ বেরিয়ে গেল বিপন্ন দেশমাতাকে অভয় দেবার জন্য।

ভোর হয়ে এলো। সইদা তার স্বামীর ঘরে যাবে এইবার।

ঠিক সেই সময় হামিদকে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাবার জন্য একটি বিমান বাসরঘরের উপরে চক্রাকারে ঘুরে গেল। সইদার মনে হলো যান্ত্রিক ওই পাখীটির একটানা গর্জনের মধ্যে কে যেন বলে চলেছে,—'বিদায়, আমি চললাম—দূরে—বহুদূরে।'

॥ সমাপ্ত ॥

অনুবাদক—যোজনা বিশ্বনাথন

মাকড়সার জন্মকথা

অনিলকুমার সমাগ্রদার

(গ্রীস দেশের উপকথা)

অনেক অনেক কাল আগে গ্রীস-দেশে এক তাঁতিনী বাস করতো, তারনাম ছিল অরেক্নী। অরেক্নীর রূপের খ্যাতি ছিল সারা গ্রীসদেশ জুড়ে। শুধু কি সুন্দরী? অরেক্নীর গুণের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়লো। তার মতন বিচিত্র বস্ত্র কেউ বুনতে পারতো না। সুন্দর সুন্দর কাপড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর চিত্র, সে চিত্রের মতন অন্য কারো দ্বারা কাপড়ের ওপর চিত্র আঁকা সহজ ছিলো না। কেউ পারতো না তেমনি করে কাপড় বুনতে—অথবা অমনি করে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে।

সারা দিনরাত নিজের প্রশংসা শুনে শুনে অরেক্নী আহ্লাদে আটখানা। ধরাকে সরা জ্ঞান করতো, অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, প্রশংসা শুনে বলে বেড়াতে লাগলো, আরে বাবা, আমার মতন দক্ষ-শিল্পী ইহজগতে তো নেইই স্বর্গেও নেই, এমন কি মিনার্ভা দেবীও আমার মতন এমন সুন্দর কাজ করতে পারে না। মানুষ তো কোন ছার্।

এক বর্ষীয়সী মহিলা কলা দেবী মিনার্ভার নিন্দা শুনে অবাক্। বলে অরেক্নীকে—দেখো খুকী যে দেবীর অসীম অনুকম্পায় আজ তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ও বয়নকারিণী হয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছো এতো যশ ও সুনাম পেয়েছো, সেই শিল্পী শ্রীমিনার্ভা দেবীরই নিন্দা করছো; ছিঃ মিনার্ভা দেবীর নিন্দা করো না কক্ষণো।

কিন্তু তাঁতিনী অরেক্নী তো নিজের গর্বে নিজেই মশগুল। এসব উপদেশের কথা গ্রাহ্য করবেই বা কেন?

হলো কি জানো? দেখতে দেখতে সেই বৃদ্ধা মহিলা মিনার্ভা দেবীর রূপ ধারণ করলেন।

দু'জনে বস্ত্র বয়ন ও নকশা বানানোর প্রবল প্রতিযোগিতা হ'ল। প্রথমে অহঙ্কারিণী অরেক্নীর কাপড় দর্শকগণ দেখলেন। দেখে সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাঃ বাঃ কি সুন্দর।

চিত্র : এম আর দত্ত

কি চমৎকার। কি আশ্চর্য। এমন বস্ত্রের আর জুড়ি নেই, নানা লোকের নানান্ অভিমত।

মিনার্ভা দেবীর কাপড় দেখানো হলো—দর্শকরা থ। এমনি অদ্বিতীয় আর অপূর্ব বস্ত্র এমন রং এমন নিপুণ চিত্র জীবনে দেখে নি কেউ।

অরেক্নী প্রতিযোগিতায় হেরে গেলো।

অহংকার ধূলিসাৎ হলো অরেক্নীর। পরাজয়ের গ্লানিতে লোক-সমাজে মুখ দেখাতেও তার লজ্জা করতে লাগলো। ছিঃ ছিঃ করতে লাগলো অরেক্নীর বিপক্ষদলের মেয়েরা। অরেক্নীর গর্ব চূর্ণ হওয়ায় তারা খুবই খুশী।

অরেক্নী দুঃখে অপমানে জর্জর। অকস্মাৎ একটি ছোরা উঁচিয়ে আমূল বিদ্ধ করে দিল নিজের বুকে। ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ছুটলো। অরেক্নীর দেহ লুটিয়ে পড়লো ধরার ধুলোয়।

মিনার্ভা দেবীও কেঁদে ফেললেন। তিনি মৃতা অরেক্নীর মাথা নিজের কোলে টেনে নিলেন।

অরেক্নীকে বরদান দিলেন—পরবর্তী জন্মে অরেক্নী যতদিন জীবিতা থাকবে আর পৃথিবীও যতদিন সৌরজগতে পরিভ্রমণ করবে, ততদিন বয়ন-কলায় সে লোক-সমাজে প্রশংসার পাত্রীরূপেই গণ্য হবে।

অরেক্নী মাকড়সারূপে জন্ম নিল। আর সূক্ষ্ম বয়নশিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ধরার বুকে সর্বত্র বিরাজ করে পৃথিবীর সকলের প্রশংসার পাত্ররূপেই রয়ে গেলো মিনার্ভা দেবীর বরে।

গ্রীসে আজও মাকড়সাকে অরেক্নী রূপেই জানে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধায় মাকড়সার জাল বোনা দেখে—দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়।

[...]কালের নিদ্রা। শীতকালে মেরুঘোতর বহু প্রাণী কয়েক মাস ধরে একনাগাড়ে ঘুমোয়; শীতান্তে ঘুম ভেঙে যায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার সুরু হয়। এমন কি কয়েক রকমের গাছপালাও সারা শীত ঘুমোয়।

অবশ্য সবাই একরকমে ঘুমোয় না। যেমন ধরুন, ভালুক ভায়ার কথা— তিন মাস পড়ে পড়ে ঝিমোয়; কেবল মাঝে মঝে চমকে জেগে ওঠে। আবার টডচাক জাতীয় পাখীরা প্রায় ছমাস ধরে অঘোরে নিদ্রা যায়। এ পাখীরা মাটিতে গর্ত করে তার ভেতরে ঘাস বিছিয়ে রীতিমত বিছানা পেতে ঘুমোতে আরম্ভ করে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ। আশপাশ থেকে ঝুরো মাটি টেনে নিয়ে প্রায় জীবন্ত কবরখানা তৈরী করে এরা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; দেহ শীতল হতে হতে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট

পর্যন্ত নেমে যায়। এমনই থাকে চার-পাঁচ মাস ধরে। কানাডাতে এ পাখী প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।

এক ধরণের কাঠবেড়াল, বাদুড়, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ, মশা, মাকড়সা এবং দু-এক রকম পোকাও এই শীতকালের কালঘুম ঘুমোয়। বেঁচে থাকে শরীরের জমান চর্বি দিয়ে। এমনভাবে জৈবক্রিয়া শিথিল হয় যে, অনেক সময় অঙ্গচ্ছেদ করলেও রক্তপাত খুব কম হয়, বা হয় না একেবারে।

এদের যদি এ সময় টেনে বার করা হয়, তাহলে মনে হবে যে ঘাড় কে ভেঙে দিয়েছে। আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে স্বাভাবিক করতে হলে বহুক্ষণ কৃত্রিম উত্তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ভালুক ভায়ার ব্যাপারটা কিছু অন্যরকম। এরা ঠিক ঘুমোয় না—ঝিমোয় এবং মাঝে মাঝে চমকে জেগে ওঠে। দেহের উত্তাপও বে

কুম্ভকর্ণের দোসর

বজায় থাকে। হঠাৎ জেগে উঠে এরা সময় সময় বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে আবার এসে ঝিমোতে সুরু করে।

যে সমস্ত ভালুকের দল বেশ ভাল খেয়ে-দেয়ে প্রচুর চর্বি সঞ্চয় করতে পারে সময়ে, তারা মাস তিনেক আরামে ঝিমোয়, কিন্তু যারা তা পারে না নানা কারণে তারা একটানা নিদ্রা-সুখ উপভোগ করতে পারে না।

শ্রীমতী বিভা দেবী

শীতের প্রারম্ভে ভালুক মেরে দেখা গেছে যে, এ সময় তাদের পাকস্থলী কুঁকড়ে ছোট ও শক্ত হয়ে খাদ্য গ্রহণের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যাতে করে আর খাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় না শীতঘুমের সময়টা।

অবশ্য মেরুপ্রদেশবাসী শ্বেত ভল্লুকের বেলায় ঠিক এ নিয়ম খাটে না—এদের মধ্যে কেবলমাত্র গর্ভিণী স্ত্রী ভল্লুকরাই শীতকালে বরফ-গর্ত খুঁড়ে ঘুমোয়। ঘুমোতে ঘুমোতেই এরা সাধারণত একজোড়া বাচ্চা প্রসব করে

এতে করে একটা কথা বোঝা যায় যে, শীতে খাদ্যের অভাবই এদের ঘুমের একমাত্র কারণ নয়, অথবা অত্যধিক শীতের কবল থেকে ত্রাণ পাবার জন্যই এরা ঘুমোয় না—অন্য জৈবিক কারণ আছে। একজন চাষী একজোড়া ভল্লুক পুষেছিলেন। তারা তাঁর খামারে বেশ আরামে থাকত— খাওয়ার অভাব ছিল না বা শীতেও কষ্ট হত না তাদের। কিন্তু প্রতি শীতের

সুরুতে তারা খড়-কুটোর ভেতরে ঢুকে ঝিমোতে আরম্ভ করত।

বাদুড়েরা সারা শীত ঘুমিয়ে কাটায়।

ইঁদুর এবং কাঠবেড়ালীর মাঝামাঝি এক ধরণের প্রাণী আছে, যাকে ইংরেজীতে বলে ডারমাউস অর্থাৎ ঝিমন্ত ইঁদুর। এই বিচিত্র প্রাণীটি সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে বাদাম খেতে খেতে গোলগাল হয়ে ওঠে; অক্টোবর মাসে বা নভেম্বরের প্রথমে এরা নিজেদের গর্তে কিছু খাবার সঞ্চয় করে ঝিমোতে সুরু করে। সময় সময় (কানাডা বা আমেরিকাতে) এদের এই ঘুম ছমাস জুড়ে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং দেহ এত শক্ত হয়ে যায় যে, বলের মত গড়ান যেতে পারে অক্লেশে। কৃত্রিম উত্তাপে তাড়াতাড়ি এদের জাগাতে গেলে প্রায়ই এরা মরে যায়।

কচ্ছপ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ঘুমোয়। অনেক সাপ ও টিকটিকি জাতীয়

প্রাণীও গর্ত খুঁড়ে শীতঘুম ঘুমোয়, যদিও স্বাভাবিক সময়ে এরা কখনও গর্ত খোঁড়ে না।

সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ ইত্যাদি উভচর প্রাণীরা ভিজে মাটি খুঁড়ে শীতঘুম ঘুমোয়।

মেরুদণ্ডী পোকামাকড়েরাও শীতের সুযোগে কিছুদিন বিশ্রাম করে নেয়। শীতকালে ঝোপজঙ্গল এই কারণেই অস্বাভাবিক নীরব থাকে।

কয়েক জাতের মাকড়সারাও মাটিতে গর্ত করে বা নির্জন স্থানে জাল বুনে বেশ কয়েকদিন ঘুমিয়ে নেয়। একজাতের মাকড়সা আবার খুব গরম পড়লেও ঘুমোয়।

মশক জাতীয় পোকারা এক থেকে দেড় মাস লুকিয়ে ঘুমোয় শীতকালে।

শামুক তার প্রকৃতিদত্ত দুর্গকে বেশ শক্ত করে এঁটে শীতঘুম দেয়।

কয়েক ধরণের মাছ (যেমন কার্প

জাতীয়) শীতকালে জলের তলায় আংশিকভাবে মাটিতে ঢুকে ঘিমোয়। এ ধরণের মাছের দৈহিক উত্তাপ এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে যায় সময় সময়। বাইরের উত্তাপ বৃদ্ধি পেলেই এরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

শীতঘুমেরও রেকর্ড আছে। এক ভল্লুকী সাড়ে তিন মাস ঘুমিয়েছিল এবং একটি কাঠবেড়ালী ঘুমিয়েছিল একনাগাড়ে তেত্রিশ সপ্তাহ।

অনেকে আবার গ্রীষ্মকালে ঘুমোয়।

যেমন, একরকম মাকড়সা এবং মাদাগাস্কার নিবাসী টেনরেক নামক স্তন্যপায়ী প্রাণী।

কয়েক ধরণের মাছ এবং কুমীরেরা গ্রীষ্মের খরতাপে জল শুকিয়ে গেলে মাটির ভেতরে ঢুকে থাকে এবং বর্ষার সময় মাটি নরম হলে কবর থেকে বেরিয়ে আসে।

গ্রীষ্ম-ঘুমে অভ্যস্ত প্রাণী আরও আছে, যেমন আফ্রিকার লাংফিস বা ফুসফুস মাছ, কই মাছ মালয় দেশীয় পায়রা মাছ, পাঁকাল জাতীয় মাছ ইত্যাদি।

মিশর দেশীয় শামুকেরাও গ্রীষ্মকালে বালির ভেতরে ঢুকে ঘুমোয়। এ জাতীয় একটি শামুক ১৮৪৬ সাল

থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে রেকর্ড করেছিল বৃটিশ মিউজিয়মে।

গাছপালারাও ঘুমোয় শীতে।

আহা, মানুষেরাও যদি প্রয়োজনবোধে এ রকম একনাগাড়ে ঘুমোতে পারত। হায় রে কুম্ভকর্ণের কাল।

একটি বিস্মৃত প্রতিভা

পার্বত্য বৃক্ষসমূহ যেমন প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে জগতের বুকে মহীরুহ হয়ে দেখা দেয়, পৃথিবীতেও তেমনি ঐ ধরণের দু'একটা মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটে, যাঁরা সকল প্রকার বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে জগতের ভাগ্যাকাশে জ্যোতিষ্কের সম্মান লাভ করেন। বিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ কার্ল ফ্রেডারিক গাউস ছিলেন এই ধরণের প্রতিভা। অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞানের গভীরতার জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে 'প্রিন্স' অব ম্যাথমেটিক্স' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সেই বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভা সম্বন্ধে দু'চার কথা আমি তোমাদের বলছি।

জার্মানীর ব্রানস্ উইকের এক দরিদ্র পরিবারে কার্ল ফ্রেডারিক গাউসের জন্ম হয়। পিতা কখনও বাগানে মালীর কাজ করে, কখনও বা ইঁটের কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পুত্র বড় হয়ে তাঁর কাজ শিখে সাংসারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করুক, ইহাই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ফ্রেডারিক অন্যান্যদের থেকে ছিলেন একটু আলাদা প্রকৃতির। তাঁর কাজকর্ম বা কথাবার্তায় বেশ একটা চিন্তাশীলতার ছাপ থাকত। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। আর সবচাইতে তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল গণিত।

তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে ব্রানস উইকের ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড তাঁর লেখাপড়ার ভার নিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডিউক ফ্রেডারিকের

শ্রীগণেশ দত্ত

কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। গাউসের ছন্নছাড়া জীবনে ডিউকের করুণাধারা বর্ষিত না হলে হয়ত পৃথিবী এমন একটা বিশাল প্রতিভাকে হারাত কি না কে বলতে পারে।

সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য স্থানীয় এক কলেজে ভর্তি হ'ন। এইখানেই তাঁর প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়। কলেজে পড়ার সময়ে তিনি উচ্চ পাটিগণিতে গবেষণা করে জার্মানীর হেমস্টেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এই গবেষণার ফল যখন 'Disquisitiones of Arithmaticae' নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'ল তখন বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা তাঁর দক্ষতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এরপর থেকে গাউস পুরোপুরি গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন।

এই সময় গিউসেপ্পি নামক একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক 'সিরাস' নামক নূতন গ্রহ আবিষ্কার করলে পৃথিবীর প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকগণ তাকে আমল দিলেন না কিছুতেই। সকলে একবাক্যে তার আবিষ্কারকে ভিত্তিহীন বলে প্রচার করলেন।

কথাটা কিন্তু গাউস স্বীকার করে নিতে পারলেন না। গিউসেপ্পির গবেষণা-প্রণালী বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে তিনি সিরাসের কক্ষপথ নির্ধারণ করবার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি গিউসেপ্পির আবিষ্কারকে সত্য বলে জগতের সম্মুখে প্রমাণ করলেন। এই গবেষণা গাউসকে জগতের কাছে সুপ্রসিদ্ধ করে তুলল। বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ল্যাপল্যাস পর্যন্ত দ্বিধাহীন চিত্তে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেন। বিশ্ববাসী তাঁকে 'প্রিন্স অব ম্যাথমেটিক্স' আখ্যায় সম্মানিত করেন।

এরপর গাউস বিয়ে করলেন তাঁর এক পরিচিত সহকর্মীকে। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী তিনটি শিশুকে রেখে মারা যান। স্ত্রীর শোক কাটিয়ে না উঠতেই তিনি তাঁর দুর্দিনের বন্ধু, অভিভাবক, শিক্ষক ও সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস ব্রানস উইকের ডিউককে হারালেন। শোকে ভেঙ্গে পড়লেন গাউস। আর্থিক কষ্ট তাঁর দৈনন্দিন জীবনে প্রকট হয়ে গেল। স্বদেশে কর্ম-সংস্থান করতে না পেরে তিনি বিদেশ যাত্রার মনস্থ করলেন। কিন্তু স্বদেশ তাঁকে পরিত্যাগ করতে হ'ল না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও অনুরাগীদের চেষ্টায় তিনি 'গোটিনজেন অবজারভেটরীর' পরিচালক পদ লাভ করে দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত থেকে মুক্তিলাভ করেন।

এ-ব্যাপারে তাঁকে সবচেয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আলেকজাণ্ডার হমবোল্ট। এরপর গাউস দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন।

গাউস শুধু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না। তিনি সাহিত্যের একজন প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। সেক্সপিয়র, স্কট, বায়রনের তিনি ছিলেন ভক্ত। এ-ছাড়া ঐতিহাসিক মেকলে ও গীবনের রচনা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। গণিত ছাড়া তিনি এ্যাসট্রোনিমি, ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম্ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন ছিলেন তাঁর কাছে দেবতা-স্বরূপ।

স্বদেশের প্রতি গাউসের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সম্রাট নেপোলিয়নের জার্মানীর প্রতি অত্যাচার তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই হীন কাজের একাধিকবার সমালোচনা করেছেন। এজন্য তাঁকে রাজরোষে পড়তে হয়, তথাপি রেহাই পাবার জন্য তিনি সম্রাটের কাছে মাথা নত করেন নি।

নিজের অতুলনীয় সম্মানকে রাজদরবারে করুণার নীলামে তোলবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সরল। তরুণ ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে বহু সাহায্য পেয়েছেন গবেষণা-সংক্রান্ত ব্যাপারে।

এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর নাম সকলের জানা না থাকলেও, এগিয়ে চলার পথে তাঁর অবদান চিরকাল অমর হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

পুষ্পবিচিত্রা

প্রথম যেদিন রংদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফুলের বনে, সেদিন লাল, সাদা ও হলদে রং আসরে প্রথমে এসে যে যার পছন্দমত ফুলদের অধিকার করে নিয়েছে। বেগুনী ও নীল রং পেরেছে দু'একজনকে তাদের মনের মত করে সাজাতে, তা সত্ত্বেও 'ভারতগৌরব', 'ফুলের রাণী' ইত্যাদি পদগৌরবে গৌরবান্বিত যে ফুলটি তার রং বেগুনী। প্রথম দুটি ঋতু ভারী খুসী হয়ে থাকে এর বাহারী ফুলের সাজে। বড় বড় ফুলে ভরা গাছটিকে প্রথম দেখতে ভাল লাগবেই। জারুলের ল্যাটিন নাম ল্যাজেরস্ট্রোমিয়া স্পেসিওসা, সুইডেনের উদ্ভিদবিদ্ ম্যাগনাস ভি ল্যাজের-স্ট্রোমের নাম অনুসারে এ নামটি রাখা হয়েছে। এটি লিথ্রেসী গোত্রের গাছ। এ গোত্রের অন্যান্য পরিচিত গাছ হচ্ছে বেদানা, কেওড়া, ধাইফুল, দাদমারি, বাদরনুলা, মেহেদী ইত্যাদি। লিথ্রেসী গোত্রের গাছ আছে চারশ পঞ্চাশটি প্রজাতির।

জারুল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। এটি মাঝারি আকারের পর্ণমোচী গাছ—প্রায় কুড়ি ফুটের মত উঁচু হয়। ছাল ধূসর

জারুল

রঙের, পাতা লম্বাটে—চার থেকে আট ইঞ্চির মত, শিরা-উপশিরা সুস্পষ্ট। একক পত্র অভিমুখ পত্রবিন্যাস, শাখা-প্রশাখার আগায় বড় বড় পুষ্প-মঞ্জরীতে

ইন্দুবিকাশ দাস

ফুল আসে। রেসিম পুষ্পবিন্যাস। যুক্ত-বৃতি বাটির আকার। ছটি কুঞ্চিত পাপড়ি, প্রায় গোলাকার। ফোটার পর থেকে পাপড়ির রং ফিকে হতে থাকে। অনেকগুলি পুংকেশর থাকে মাঝখানে। ফল উভলিঙ্গ ক্যাপসিউল্ জাতীয় ছোট গোলাকার ফল। ফলের উপরে গর্ভদণ্ডটিকে দেখা যায়। গাছে পাকা ফল বেশ কয়েক মাস থাকে। বীজের গায়ের পাখনা বংশ-বিস্তারে সাহায্য করে। বীজ থেকে গাছ হয়। এ গাছের আদিবাস আমাদের দেশে। আসাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন, মালয়, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, পশ্চিম-ঘাট ও পূর্বঘাট অঞ্চলের তিন হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় একে দেখা যায়।

আমাদের পোড়ো জায়গা ও বনে-জঙ্গলে দেখা গেলেও আজকাল একে আদর করে বাগানে, রাস্তার ধারে, পার্কে রাখার চেষ্টা করা হয়। শুকনো পাথুরে জায়গা অপেক্ষা গভীর, রসাল, নরম মাটিতে ভাল হয় জারুল। বুনো জারুল গাছ থেকে জারুল কাঠ পাওয়া যায়। এর গাছ পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মত উঁচু হয়। গোলাপী, সাদা, বেগুনী ফুলের বিভিন্ন আকারের গাছওয়ালা জারুলের কয়েকটি জাত আছে। ছোট ছ-আট ফুট উঁচু জারুল গাছ আছে।

জারুল কাঠ জলে সহজে নষ্ট হয় না। সেজন্য নৌকা তৈরী ও অন্যান্য নানা কাজে একে লাগান হয়। ব্রহ্মদেশে জারুল কাঠের খুব আদর আছে।

বিলাতের চিঠি

॥ তিন ॥

হাটে-বাজারে

তখন নতুন বিলাতের মাটিতে পা দিয়েছি। খুবই ভয়ে ভয়ে চলা-ফেরা করি, —শুনেছি এদেশের লোকেরা নাকি খুব 'এটিকেট' মেনে চলে। নতুন বিদেশী হিসাবে আমার ওসব রীতিনীতি জানার কথা নয়, তাই একটু সন্ত্রস্ত ভাব সদাই আছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন আমাদের কোয়ার্টারে এসে হাজির হল মিসেস আইরীন ভিচ, তার ছোট্ট এক বছরের বাচ্চা হাম্পীকে নিয়ে—সঙ্গে কুকুর পেস। মেয়েটি আমার সামনের কোয়ার্টারেই থাকে, ওর স্বামী ডাঃ ভিচ আমার স্বামীরই সহকর্মী, তাই আলাপ জমে উঠতে দেরী হল না।

আইরীনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে গেলাম যে একটি বিদেশীর সঙ্গে কথা বলছি—'এটিকেট' কোথায় উড়ে চলে গেল। অবশ্য সত্যিকথা বলতে আইরীনের চেয়ে হাম্পী-ই আমার বেশী বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তার মায়ের কথায় ওর হাম্পী নামের কারণ ওর চেহারার সঙ্গে ইংরাজী কবিতার সেই বিখ্যাত 'হাম্পটি ডাম্পটি'র নাকি খুবই মিল আছে, সেই জন্যে ওকে হাম্পী বলে ডাকা হয়।

একদিন দুপুরে কোয়ার্টারের সামনের বাগানে সুন্দর উজ্জ্বল রোদ উঠেছে বলে, যেটা এদেশে এক দুর্লভতম বস্তু, পায়চারী করছিলাম। হঠাৎ আইরীন এসে হাজির। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলে উঠল, চল হোয়াইট হ্যাভেন সহরে হাট বসেছে দেখে আসা যাক্।

ওর ভাষায় অবশ্য হাট নয়, 'ওপন মার্কেট'। কিন্তু সে যাই হোক ইংল্যাণ্ডে হা—ট।

একটু চমকে উঠলাম। কিন্তু দর্শনই জ্ঞানের প্রথম সোপান, আর কালবিলম্ব না করে হাতে একটা ঝুলি নিয়ে ওর সঙ্গে রওনা দিলাম ০৫ বাস স্টপের দিকে। দার্জিলিং ইত্যাদি পাহাড়ী অঞ্চলে নেপালী বা শেরপাদের বাচ্চারা যেমন মায়েদের পিঠের সঙ্গে বাঁধা থাকে—হাম্পী সেইভাবে একটা ঝুলন্ত কাপড়ের দোলনায় বসে মায়ের বুকের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। দোলনাটা আইরীনের গলা থেকে ঝুলছে। অনেক সময় বাসে ভিড়ের জন্য

ভারতী মুখোপাধ্যায়

প্রাম বা প্যারাম্বুলেটর নিয়ে যাবার অসুবিধা থাকলে এদেশের মায়েরা বাচ্চাকে এইভাবে নিয়ে পথে বা'র হয়। আইরীনের কুকুর পেসও অবশ্য আমাদের সঙ্গ নিতে ছাড়েনি—সেও জিভ বা'র করে আমাদের পিছু নিল।

প্রায় মিনিট পনের বাসে আসার পর হোয়াইট হ্যাভেন সহরে পৌঁছালাম। সহরের প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র ছাড়িয়ে এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মত জায়গায়ই বলা যায়, সেখানে দুজনে হাজির হলাম। এ কি তাজ্জব ব্যাপার?

এ যে আমাদের দেশে মেলা বসা-র মত কাণ্ড. মাইলখানেক জায়গা জুড়ে ছোট ছোট দোকান ঘর—বাঁশ আর ক্যাম্বিসের আস্তরণ দিয়ে তৈরী. কোন কোন দোকান আবার চলন্ত অর্থাৎ বড় বড় ভ্যানের পিছনের অংশ। কেউ বা মাটিতেই কাপড় বিছিয়ে পসরা সাজিয়েছে।

পরে জেনেছিলাম, ইংল্যাণ্ডের সর্বত্রই এই ধরণের হাট বা ওপন মার্কেট আছে। তবে বৃষ্টির দিন কিংবা শীতের সময় মাটিতে বসা চলে না, তখন প্রায় সকলেই তাদের চলন্ত বিপণী অর্থাৎ "মোবাইল সপ" থেকে জিনিষপত্র বিক্রি করে। এই কাম্বারল্যাণ্ড অঞ্চলে, অর্থাৎ আমরা যেখানে আছি—যতগুলি বড় বড় শহর আছে প্রত্যেকটিতে সপ্তাহের একদিন করে এই হাট বসে। একই দোকানদার এইভাবে এক একদিন এক একটি সহরে ঘুরে বেড়ায়।

বিভিন্ন স্টলে বিক্রি হচ্ছে উলের এবং অন্যান্য গরম জামা-কাপড়, সূতীর জিনিষ, কাঁচের বাসন, মালা, হার, ব্যাগ ইত্যাদি সৌখীন বস্তু, কার্পেট, নানারকম দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ, কেক বিস্কুট চকোলেট, তরীতরকারী, এমন কী আসবাবপত্র পর্যন্ত। অবাক হয়ে চারধারে তাকাতে তাকাতে যতই এগুচ্ছি, ততই নতুন নতুন জিনিষের দোকান। বাচ্চাদের নাগরদোলা থেকে সুরু করে কোন কিছুরই অভাব সেখানে নেই। সত্যিকথা বলতে কী, "ওপন মার্কেট"-এর মাঝখানে খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাজার করতে করতে যেন আমার দেশের কোন হাট বা মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে জিনিষ কিনছি মনে হল। ইংল্যাণ্ডের হাটে বাজার করতে করতে নিজের দেশের মেলার গন্ধে মন কেমন করতে লাগল।

"ওপন মার্কেট" কিন্তু দৈনন্দিনের নয়। দৈনিক বাজারের ব্যবস্থা অন্যরকম। কলকাতায় যখন সুপার মার্কেট জাতীয় বাজার নিউমার্কেট অঞ্চলে খোলা হল, তখন আমরা পুলকিত চিত্তে সেটা দর্শন করতে গিয়েছিলাম। দিল্লী, বোম্বাইতেও ইতিমধ্যে সুপার মার্কেট ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আজ বিলাতের হাট-বাজার লিখতে বসে বুঝতে পারছি সুপার মার্কেট জাতীয় জিনিষটি কী এবং তার উপকারিতাই বা কতখানি।

সারা ইংল্যাণ্ডে কত সুপার মার্কেট আছে, আমার জানা নেই কিন্তু প্রতি শহরে তা ছোটই হোক আর বড়ই হোক, আমি অন্তত কম করেও দুটি সুপার মার্কেট দেখেছি। তার মধ্যে স্টেপটন, ওয়াল্টার উইলসন এবং কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট-ই প্রধান।

বিলাতের বাজার প্রায় পুরোপুরিই মেয়েদের ব্যাপার। আমার বিলাতের জীবনে খুব কমই মনে পড়ে যে, কোন দোকান বা বাজারে শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী পুরুষমানুষ দেখেছি। ক্রেতাই যে শুধু নারী, তা নয়,—দোকানের সাধারণ সেলস গার্ল থেকে সেক্রেটারী জাতীয় উচ্চ পদগুলির প্রায় বেশীর ভাগই মিস কিংবা মিসেস। তার মানে এই নয় যে পুরুষদের এই সব কাজ দেওয়া হয় না বা তারা একেবারেই এ সব কাজ করে না কিন্তু তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় তারা অনেক কম।

এই প্রসঙ্গে এদেশের স্ত্রী-শক্তি বা 'উয়োম্যান পাওয়ার' নিয়ে একটু আলোচনা করি। ছোটবেলায় মনে আছে, পড়াশুনার ফাঁকে শুনেছি বাবা বাজার করে আনার পর কোন কোন সময় মা-ঠাকুরমার মিলিত আক্রমণ—এটা আনো নি, সেটা নেই কেন, অমুকটা বেশী, এই জিনিষটা কম। তখন আমার সেই বালিকা-মনেও বিদ্রোহ জাগত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে —মনে হত, মায়েদের বলি তোমরা নিজেরা বাজার করে আনলেই তো পার।

কিন্তু আজ বুঝতে পারি পুরুষরাই আমাদের এই অবস্থার জন্য কতকাংশে দায়ী। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাই আমাদের ঘরের কোণে আটকে রেখেছে। কিন্তু এদেশে আমি দেখেছি যে-কোন পরিবারের মেয়ে যে-কোন কাজ করতে লজ্জা পায় না। ছুটির সময়ও অতিরিক্ত কোন কাজ করে তারা সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার করছে।

এদেশের প্রতি ঘরে ঘরে মেয়েদের যে স্বাধীনতা, কাজের ইচ্ছা এবং পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা দেখেছি নিজেদের দেশে সেটা দেখিনি বলেই আপনাদের না জানিয়ে পারলাম না।

এদেশের সুপার মার্কেটে আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করি। বাচ্চাদের প্র্যামের ব্যূহ ভেদ করে সুপার মার্কেটের ভিতর যখন ঢুকলাম তখন অত ভিড় ইত্যাদি দেখে একটু হ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, অন্য সকলের দেখাদেখি দরজার গোড়ায় স্তূপীকৃত জালের বাস্কেটের মধ্যে একটি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে এগুলাম। জালের বাস্কেট বা বেশী জিনিষের জন্য ঠেলাগাড়ী সুপার মার্কেটের নিজস্ব। সারা মার্কেটটি ঘুরে নিজের পছন্দমত জিনিষ তার মধ্যে ভরতে হবে। সব জিনিষের গায়ে দাম লেখা আছে। বেরিয়ে যাবার পথে দরজার কাছে মেয়েরা যন্ত্রগণক (কমপিউটার) নিয়ে বসে আছে। সেখানে হিসাবমত সব পয়সা একসঙ্গে দিয়ে নিজের ব্যাগে জিনিষ তুলে বাস্কেটটি অথবা ঠেলাগাড়ী তাদের জমা দিয়ে দিতে হবে।

সুপার মার্কেটে এক একটি বিভাগ পাশাপাশি সাজান—প্রথমেই ধরা যাক 'বুচারি ডিপার্টমেন্ট', যেখানে সব-রকম মাংস কেটে বিভিন্ন ওজনের প্যাকেটে রাখা আছে। তারপর মাখন চীজ ক্রীম—এইভাবে ক্রমে ক্রমে কৌটা এবং বোতলে ভরা খাবার, তরিতরকারী সবজী পানীয় দ্রব্য, জমান খাবার আর শুকনো খাবার। আরও আছে চকোলেট বিস্কুট গৃহস্থালীর সব রকম সাজ-সরঞ্জাম ও সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি জিনিষ।

ছোট ছোট দোকানে যে খুচরো ভাবে এ সব জিনিষ পাওয়া যায় না, তা নয়। আশেপাশে বহু দোকানে আমাদের দেশের মত সব জিনিষ বিক্রি হয়, তবে গৃহিণীরা দৈনন্দিন সংসারের বাজার সাধারণত সুপার মার্কেটিং থেকেই করেন। যাদের গাড়ী নেই, অনেক সময় ভারী বাজার বয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, এই জন্য জিনিষ কিনে সুপার মার্কেটে জমা দিয়ে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে চলে এলে, তারাই গাড়ী করে বাড়ীতে পৌঁছে দেবে। এই প্রসঙ্গে মোবাইল সপ্ ভ্যান-এর কথাও একটু বলে নিই। প্রতি অঞ্চলে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ভ্যান আসে মাছ-মাংস, তরীতরকারী ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে—গৃহিণীরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে শুধু কিনে নেন, এতে বইবার হাত থেকে বাঁচা যায়, তবে তুলনামূলকভাবে এই ধরণের ভ্যান-এ জিনিষের দাম একটু বেশী। কিন্তু সকলেই ভার বইবার হাত এড়াতে এদের কাছ থেকে বহু জিনিষ কিনে থাকে।

খাবারের দোকানের কথা বলতে গিয়ে 'বার্ডস আই' ফ্রজেন ফুড কোম্পানীর কথা একটু না বলে পারছি না। ইংল্যাণ্ডের যে-কোন দোকানে ঢুকলে 'বার্ডস আই'-এর জিনিষ চোখে পড়বেই এবং 'প্যাকেট ফুড' ছাড়া বোধহয় এখানে চালানো যায় না।

'প্যাকেট ফুড' বলতে এখানে ফ্রজেন চেম্বারে বা প্যাকেটে করে বিক্রি হয়, তাই বোঝায়। এর মধ্যে আছে কড়াইশুঁটি বীন আলু গাজর প্রভৃতি সবজী, নানা ধরণের মাছ, মাছের খাবার, মাংস, মিষ্টি, কেক ইত্যাদি যাবতীয় তৈরী খাবার। প্যাকেট খুলে গরম করে খালি খাওয়ার অপেক্ষা। এদেশে জমান খাবার তৈরির বহু প্রতিষ্ঠান আছে তবে তার মধ্যে "বার্ডস আই"-ই একচেটিয়া।

একদিন এখানকার স্থানীয় কলেজে এই প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের উৎপাদন ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচারমূলক একটি সিনেমা দেখিয়েছিল। সারা ইংল্যাণ্ড-এ এদের বোধ হয় ছয় সাতটি কারখানা আছে। শত শত লোক সেখানে কাজ করে। মাছ, মাংস, তরিতরকারী প্রভৃতি কাঁচা খাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে ধোয়া,

পরিষ্কার, ছাল, কাঁচা ও খোসা ছাড়ান হয়ে থাকে এবং অবশেষে যন্ত্রের সাহায্যেই খাবার তৈরি হয় ও যন্ত্র দিয়েই প্যাকিং করে হিমঘরে তা রাখা হয়। হিমযান বা "ফ্রজেন ভ্যান"-এ সারা দেশের অসংখ্য দোকানে তা সরবরাহ করা হয়। প্রতি দোকানেই "ফ্রজেন চেম্বার" থাকে। সেখান থেকে খাবার কিনে ক্রেতারা নিজেদের রেফ্রিজেটারে, সাতদিন থেকে তিন মাস পর্যন্ত রেখে তা ব্যবহার করতে পারেন।

'সুপার মার্কেট'-এর পর যে জিনিষটা এখানে চোখে পড়ে, তা হোল এদেশের 'ডিপার্টমেণ্টাল সপ' বা বিভাগীয় বিপণী। 'বিলাতের চিঠি'র প্রথম পর্বে 'টিমোথী হোয়াইট', 'বুটস্' এবং 'উলওয়ার্থের' নাম উল্লেখ করে ছিলাম। এই দোকানগুলি ঠিক বিভাগীয় বিপণী নয়। দেশের ছোট-বড় প্রতিটি সহরে এদের শাখা একটি করেও অন্তত আছে। কিন্তু বিভাগীয় বিপণী লণ্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার, নিউক্যাসেল, এডিনবরা ইত্যাদি বড় বড় শহর ছাড়া নেই। "বুটস" ও "টিমোথী হোয়াইট" 'কেমিস্ট শপ' অর্থাৎ ওষুধপত্র এবং প্রসাধনই এদের প্রধান পণ্য। তা ছাড়া অন্যান্য সখের জিনিষ, গৃহস্থালী যন্ত্র এবং পুতুল-ও এই দোকান-গুলিতে পাওয়া যায়।

"উলওয়ার্থ" আবার এমনই দোকান যে এখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নেই। আমেরিকাতেও "উলওয়ার্থ"-এর শাখা সর্বত্র।

আমাদের বৃদ্ধা প্রতিবেশী মিসেস ল'ম্যান একদিন গল্প করতে করতে বলেছিলেন—'আমাদের ছোটবেলায় উলওয়ার্থ ছিল ন' পেনী, ছ' পেনীর দোকান। এর বেশী দামে "উলওয়ার্থে" কোন জিনিষই বিক্রি করত না।

অর্থাৎ আমাদের দেশে যেমন "লে লে বাবু ছে আনা" গাড়ী কিন্তু আজ "উলওয়ার্থ"ই বোধ হয় এখানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দোকান। বিরাট বাড়ার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য গৃহস্থালীর যাবতীয় ব্যাপার। প্রসাধন সামগ্রী, বই, উপহারের জিনিষ কী যে নেই, মনে করতে পারছি না। এককথায় মিসেস ল' ম্যানের ভাষায় 'উলওয়ার্থ ইজ আওয়ার মোস্ট হ্যাণ্ডি শপ্।'

এবার একটু বিভাগীয় বিপণীর মধ্যে ঢুকে পড়া যাক। 'ব্রিটিশ হোম স্টোর', 'লিটল উড', 'জন লুইস' 'বি এ্যাণ্ড জি', 'মার্কস এ্যাণ্ড স্পেন্সার' 'বীনস্' ইত্যাদি এদেশের সব নামকরা বিভাগীয় বিপণী। মুগ্ধ হয়েছি লণ্ডনের এই দোকানগুলি দেখে। অক্সফোর্ড সার্কাস কিংবা পিকাডেলী সার্কাসের পাশ দিয়ে দোকানগুলি দেখতে দেখতে যখন পথ হেঁটেছি তখন মনে পড়েছে ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম লণ্ডন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম সহর। এই যদি তৃতীয় হয় তবে প্রথম দ্বিতীয়গুলি কি কল্পনা করারও সাহস আসে নি।

লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়েছে শুধু বোধ হয় দোকানগুলির অঙ্গসজ্জার জন্যে। চলুন, ঢুকে পড়া যাক যে-কোন একটা দোকানে। ধরুন: 'জন লুইস'— বিরাট পাঁচতলা বাড়ীর কোনদিকে কি পাওয়া যায় ভেবে যখন এদিক সেদিক হতভম্ব হয়ে তাকাচ্ছি, সামনেই চোখে পড়ল তীর চিহ্নে পথনির্দেশ "বেসমেণ্ট" বা মাটির তলা থেকে চারতলা অবধি সব জিনিষের ছবি যেন চোখের সামনেই ফুটে উঠল। তাছাড়া ক্রেতাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদাই শপ্ অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একরকম পোষাকপরা মেয়েদের সহজেই চিনে নেওয়া যায়। এর মধ্যে বহু ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং সিংহলী মেয়েও চোখে পড়ল। সব দোকানের ইউনিফর্ম পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নানারকম পণ্য। দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে কোনটা কিনব, কোনটা কিনব না ভেবে মাথার মধ্যে যখন গোলমাল হতে আরম্ভ করেছে, তখন হঠাৎ চোখে পড়ল "নাইলন এ্যাণ্ড সিল্ক মেটিরিয়াল ডিপার্টমেণ্ট"-এর দিকে।

বাঙ্গালী মেয়ের মন, সাড়ী আর ব্লাউস পীসের জন্য ছটফট করে উঠল। ঢুকে পড়লাম, গিয়ে দেখি আমি একা নই। আরও বহু সাড়ীধারিণী পছন্দমত কাপড়ের থান তুলে নিয়ে তার থেকে সাড়ে পাঁচ বা ছয় গজ কেটে দিতে বলছেন।

পাঠিকারা যেন মনে করবেন না, সাড়ী বলে সেগুলি বিক্রী হয়—এভাবে কাপড়ের থান কেটে নিয়ে বাড়ী এসে দুধার মুড়ে নিয়ে সাড়ী করে পরতে হয়। সাধারণত বড় দিনের আগে একবার "ক্রীস্টমাস সেল" আর মে-জুন মাসে একবার "সামার সেল" দেওয়া হয়। সেই সময় এইসব দোকানের জিনিষের দাম অনেক কমে যায় — আর বিক্রীও হয় অনেক বেশী। সব একবার করে চোখ বুলিয়ে আর কিছু জিনিষ কিনে দোকান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন দেখি ঘড়ির কাঁটা তিন ঘণ্টা এগিয়ে গেছে।

মানুষের মন, বিশেষ করে মেয়েদের, মন দোকানপাট দেখতে পেলে বোধ হয় আর কিছু চায় না। এদেশে এসে আমার দেশী-বিদেশী যত মেয়ের সঙ্গেই কথা হয়েছে সকলেই দেখেছি বড় বড় শহরের বিভাগীয় বিপণীগুলিতে ঢুকে কিছু কিনুক, না কিনুক, কিছু সময় কাটিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। তাই আমার পাঠিকাদেরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ ভবিষ্যতে বিলাতে আসেন তবে অনেক কাজের ভিড়ের মধ্যে যেন এই ছোট কাজটি বাদ না যায়। সেটি হ'ল অক্সফোর্ড সার্কাসের বিভাগীয় বিপণীগুলি একবার অন্তত ঘুরে দেখা

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল। অমোঘ অলংঘ্য অনিবার্যকে স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎ চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে, গভীর একটি ত্যাগের জন্য মনকে প্রস্তুত করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন সরোজাক্ষ, কিন্তু সেই অমোঘ অনিবার্যই যেন নতুন এক নির্লজ্জ খেলায় ব্যঙ্গের হাসি হেসে সবকিছু ভণ্ডুল করে দিয়ে গেল, মর্যাদাহীন করে দিয়ে গেল সরোজাক্ষর ত্যাগের গভীরতাকে, দুঃসাহসের শক্তিকে।

সেই নির্লজ্জ খেলাটা এলো মৃত্যুর বেশে।

এলো সেই রাত্রিটা শেষ হবার আগেই। যে সকালে যাবার কথা সরোজাক্ষর।—কিন্তু সে মৃত্যু রাজার মতো পরম সমারোহে এলো না, এলো চোরের মতো চুপিচুপি।—মৃত্যুর এই তস্করের রূপটা ঘৃণ্য কুৎসিত অশুচি। এই অশুচির সামনে শোকের পবিত্রতা মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়, শোকের স্তব্ধতা আতঙ্কে বিদীর্ণ হয়।

এই তস্কর এসে উঁকি মারলো সরোজাক্ষর সংসারে। চুরি করে নিয়ে গেল সংসারের এক পরম মূল্যবানকে, আর যেন সেই নিয়ে যাওয়ার সূত্রে ক্রূর হাসি হেসে বলে গেল, শুধু নিজেকে নিয়ে থাকলেই হয় না সরোজাক্ষ, শুধু 'শান্তিপ্রিয়' হলেই হয় না। সে শান্তিরক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়। না হলে এই রকমই হয়। তোমার সংসারের সব সৌন্দর্যের সবুজ কোন কাঁকে বিষে নীল হয়ে বসে আছে, তুমি তাকিয়েও দেখো নি, তুমি শুধু নিজেকে ভদ্র আর সুন্দর করে রাখবার সাধনায় নিজেকে ঘিরে দুর্গ রচনা করে তার মধ্যে নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছো।

তবে এখন দ্যাখো।

দ্যাখো তোমার দুর্গপ্রাচীরের ওপারে কতো বিষ জমছিল। হয়তো তুমি ওই যন্ত্রণাকাতর আত্মাটাকে তোমার স্নেহের স্পর্শ দিয়ে কিছুটা স্নিগ্ধ করতে পারতে, হয়তো ওই নিরুপায় অভিমানকে তোমার ছত্রতলে আশ্রয় দিয়ে, তাকে একটু সুস্থ রাখতে পারতে। হয়তো তোমার আশ্রয় তাকে পায়ের তলার মাটি দিতে পারতো, কারণ সে তোমাকে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো, ভক্তি করতো। কিন্তু তুমি মহিমায়, উদাসীনতায় কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখো নি।

দেখো এখন কী দুর্নিবার লজ্জা তোমার, কী দুঃসহ পরাজয়।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

হয়তো আর কেউ বলে যায়নি—ওই মৃত্যুনীল মুখটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ ভাবনাটা নিজেই ভাবছিলেন সরোজাক্ষ।

আমি ওকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম, স্নেহের সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে, তারপর আমি ওকে ভুলে গিয়েছিলাম। অন্তত ও তাই ভেবে [illegible] নির্মমতাকে, আবার নির্লিপ্ততাকে।

অথচ চিরদিন আত্মহত্যার সংকল্প ঘোষণা করে এসেছেন বিজয়া। কে কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঠাণ্ডা লড়াইয়ে স্বামীকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন 'গলায় দড়ি দেব' বলে।

সেই ঘোষণায় অদ্ভুত এক নিরুপায়তার রজ্জুতে সরোজাক্ষরই দম বন্ধ হয়ে এসেছে, সরোজাক্ষ পরাভূত হয়েছেন।

কিন্তু সেই বিজয়া কী দীনভাবেই না পরাভব স্বীকার করে বসলেন!

বিজয়া সরোজাক্ষর কাছে আছড়ে এসে পড়ে বললেন, 'আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।'

সেই ভয়ানক মুহূর্তে বিজয়ার তো তাঁর সেই হাতের মুঠোর অস্ত্রটার কথা মনে পড়লো না। সেটাকে কাজে লাগালেই তো জিতে যেতে পারতেন বিজয়া, জব্দ করে ফেলতে পারতেন তাঁর চিরদিনের প্রতিপক্ষকে।

কিন্তু তা করেন নি বিজয়া।

বিজয়া হার মেনেছেন।

বিজয়া বলেছেন, 'আমায় ফেলে চলে যেও না।'

মরবার বদলে হারলেন বিজয়া।

তা' মরার কথা তো এ বাড়ির ছোট মেয়েটারও ছিল। মরাটাই তো ছিল ওর কাছে সবচেয়ে সহজ সমাধান। কিন্তু ও সেই সহজের পথে যায় নি।

ও সমস্যার জটিলতর জালে নিজেকে জড়িয়েছে অপর সবাইকে জড়িয়েছে।

অথচ যার মরবার কোনো কথা ছিল না, যার নামের কাছাকাছি 'মৃত্যু' শব্দটাকে কেউ কোনোদিন ভাবতেই পারে নি, সেই মানুষটা অম্লান বদনে একমুঠো ঘুমের বড়ি খেয়ে মরে গেল।

বিগত সন্ধ্যাতেও সুনন্দা জরির শাড়ি গায়ে জড়িয়ে মুখে তুলির কারুকার্য করে, ওর বরের সঙ্গে কার যেন একটা দামী মোটর গাড়ি চেপে বেড়িয়ে এসেছে।

বেশ কিছুদিন অবশ্য যাচ্ছিল না ওই প্রমোদ ভ্রমণে, জরির শাড়ি গায়ে জড়াচ্ছিল না, খুব সাদাসিধে সাজ

ঘরে ঘরের কোণে পড়ে থেকে বই পড়ছিল, ছবি আঁকছিল।

কোনো কোনো দিন হয়তো একা চলে যাচ্ছিল মায়ের কাছে।

মায়ের রান্নাঘরের দরজার ধুলোয় বসে পড়ে বলছিল, 'আচ্ছা মা তোমার কখনো মনে হয় না এখান থেকে পালিয়ে যাই; অনেক অনেক দূরে।'

বলছিল, 'আচ্ছা মা তোমার কখনো মনে হয় না বেঁচে থাকার মানেটা কী?'

মা বলেছে, 'হয় না আবার? রাতদিনই তো মনে হচ্ছে কোথাও ছুটে পালাই—অহরহই মনে হচ্ছে এমন দুর্গতি করে বেঁচে থাকার থেকে মরণ ভালো।'

বলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে খস খস করে বড়ির ডাল বেটেছে, মিহি মিহি করে মোচা কুটেছে, আমতেলে মশলার গুঁড়ো মেখেছে তরিবৎ করে।

সুনন্দা মৃদু হেসে উঠে এসেছে।

একদিন মা বলেছিল, 'একটা মাত্তর সন্তান সেটাকে দিয়ে দিলি বোর্ডিঙে, মন 'হু হু' করবে এ আর আশ্চয্যি কি?'

সুনন্দা বলেছিল, 'তুমি ওকে নাও তো বোর্ডিং থেকে নিয়ে আসি, তোমায় দিয়ে যাই।'

মা বলেছিল, 'বালাই ষাট। নিতে যাবো কেন? তোর জিনিস তোর বুকভরা হয়ে থাক। তবে যদি আমার কাছে রাখতে চাস—'

সুনন্দা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'মাঃ যেমন আছে থাক।'

কিন্তু কাল সুনন্দা ওর মার বাড়ি যায় নি।

কাল জরির শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বরের সঙ্গে পার্টিতে নাচতে গিয়েছিল। যে নাচের দৌলতে ওর বরের দৌলত বেড়ে যাবার কথা।

সেই মিনতিই করেছিল ওর বর, পায়ে হাতে ধরে বলেছিল, 'টাকা না থাকলে বেঁচে থাকবার কোনো মানেই নেই সুনন্দা।'

নাচের পর সুনন্দা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল, আর নীলাক্ষ একখানে বসে বসে গেলাশের পর গেলাশ খালি করেছিল। দাঁড়াতে পারছিল না টলছিল।

তারপর সুনন্দাও ফিরে এলো প্রায় টলতে টলতে, আর খুব হাসতে হাসতে। কেমন করে যে এক রাঘব-বোয়ালকে ঘায়েল করে নীলাক্ষর বেঁচে থাকার মানে জোগাড় করবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে ফেলেছে, রসিয়ে রসিয়ে তার গল্প করেছিল সারাক্ষণ গাড়িতে।

নীলাক্ষ মাতাল হলেও ইসারায়—ড্রাইভারকে দেখিয়ে দিয়েছিল, সুনন্দা সে ইসারা গায়েই মাখে নি। হি হি করে হেসে উঠে বলেছিল, 'দূর দূর, ওরা কি শুনতে পায়? ওরা কালা বোবা অন্ধ।'

নীলাক্ষ আর কিছু বলে নি, কারণ তখন নীলাক্ষ চটাতে চায় নি তার স্ত্রীকে।

বাড়ি ফিরেও তোয়াজই করেছে তাকে।

অথচ কোন ফাঁকে সুনন্দা এক-মুঠো ঘুমের বড়ি খেয়ে বসে থাকলো।

নিঃশঙ্ক নীলাক্ষ লম্বা একটা ঘুমের পর জেগে উঠে হঠাৎ কী ভেবে অভিমানিনীকে একটু কাছে টানতে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠেছিল, লাফিয়ে পড়েছিল বিছানা থেকে। দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে মায়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল, 'মা মা, শীগ্‌গির একবার এসো এ ঘরে।'

●

হয়তো সরোজাক্ষর আর কোনোদিনই এবাড়ি ছেড়ে যাওয়া হবে না, হয়তো এই শহরেরই কোনো একখানে কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে ট্রাম ধরবেন, বাস ধরবেন, ছাতাটা সব সময় হাতে রাখবেন। আর বারে বারে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছবেন।

শৈশব থেকে সরোজাক্ষ শুধু একটি জিনিসই চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা তিনি পান নি। 'সুন্দরে'র বদলে অসুন্দরকেই পেয়ে এসেছেন সরোজাক্ষ, কারণ সরোজাক্ষর মা-বাপ জীবনের মানে খুঁজেছিলেন রাঢ়ী বরেন্দ্র কুল-শীল গোত্র পর্যায়ের মধ্যে। সরোজাক্ষর স্ত্রী জীবনের মানে খুঁজেছিল দেহগত প্রাপ্তির মধ্যে আর সরোজাক্ষর পুত্র সেই মানেটা খুঁজতে গিয়েছিল ব্যাঙ্কের খাতার মধ্যে।

হয়তো একা সরোজাক্ষরই নয়, সকলেরই এমনিই হয়। হয়তো 'সুন্দর'কে চাওয়াটা খুব একটা অসম্ভব চাওয়া, কারণ মানুষরা বড় বেশী নির্বোধ। ওই 'সুন্দর'টাকে তারা নিজে হাতে ধ্বংস করে।

মনে হয় ওরা বুঝি শয়তান, কিন্তু তা' নয় আসলে শুধু ওরা বোধহীন। তাই নিজের হাতে গড়া সভ্যতা নিজের হাতে ধ্বংস করে উল্লাসের হাসি হেসে চীৎকার করে 'জিতেছি জিতেছি।'

সরোজাক্ষর ছাত্রদলও তাদের গুরুকে অবমাননা করে মহোল্লাসে ভেবেছিল 'জিতেছি জিতেছি।'

'দিবাকর' নামের সেই মহামূর্খটাও তার স্বর্ণহংসীকে হত্যা করে উল্লাস করেছিল 'জিতেছি জিতেছি।'

হয়তো বিজয়া একদা যদি একটা হৃতসর্বস্ব রোগজীর্ণ মানুষের দেহটার সেবার অধিকার পায়, সেই দাবিতেই পুলকিত হয়ে ভাববে 'জিতেছি, জিতেছি।'

বিজয়ার বড় মেয়ে তার স্বামীর কালোবাজারী পয়সায় দামী শাড়ী পরে মোটরগাড়ি চড়ে বেড়াবে আর ভাববে 'কী জেতাই জিতেছি!'

হয়তো বিজয়ার ছোট ছেলে তার বিপক্ষ পার্টির নেতার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে ভাববে, 'জিতেছি।'

শুধু হয়তো বিজয়ার বড় ছেলে কিছু ভাববে না, শুধু বসে বসে মদ খাবে, আর নেশার ঝোঁকে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলবে।—আর বিজয়ার ছোট মেয়ে একটা সস্তা স্কুলের মাস্টারী, আর একটা অবাঞ্ছিত শিশুর বোঝা টানতে টানতে ভাববে 'জিতলাম না হারলাম?'

রুক্ষ শুষ্ক সেই মানুষটা হয়তো

ক্রমশই একটা তিক্ততার পুতুল হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কারণ এরা জানতো না কোনটা 'সুন্দর'।

আর একদল বোধহীন আছে জগতে। জীবনেও যাদের জ্ঞান-চক্ষু খোলে না। জীবনেও যারা লাভ-লোকসানের হিসেব বুঝে উঠতে পারে না। সারদাপ্রসাদ চিরদিনই তাদের দলে। তাই সারদাপ্রসাদ 'ফুলটুংরী' গ্রামের দোরে দোরে ঘুরে 'সহায়' সংগ্রহ করে অন্যায় দখলকারী জ্ঞাতি ভাইপোর কবল থেকে নিজের পিতৃভিটে আর সাতপুরুষের বিষয়-আশয় উদ্ধার করবার চেষ্টা না করে চলেই গেল ফুলটুংরী ছেড়ে।

অথচ 'সহায়' খুঁজলে পেতো।

নির্ঘাত পেতো।

কিছু কমিশনের আশা থাকলে 'ন্যায়ের পক্ষ' অবলম্বন করতে প্রাণপণ করবার মতো লোকের অভাব ছিল না ফুলটুংরী গ্রামে।

সারদাপ্রসাদ সেই সহায়ের পথ না ধরে সামনের পথ ধরলো।

কিন্তু সারদাপ্রসাদের সেই পথ কি শেষ হয়েছে? খুঁজে পেয়েছে সে তেমন জায়গা, আজও যেখানে সারল্য আছে, সততা আছে, বিশ্বাস আছে।

তা' কে জানে পেয়েছে কি না খুঁজে, তবে পথ চলা থামিয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে বটে তা'কে একটা জায়গায়। যার সামনে দিয়ে ঝিরি ঝিরি একটা নাম না-জানা নদী বয়ে যাচ্ছে, আর চোখ তুললে আকাশের কোলে কোলে ছোট্ট ছোট্ট ঢিবি ঢিবি পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

সারদাপ্রসাদের বসবার জায়গাটা অবশ্য খুব একটা আদর্শ নয়। গাছ-তলাকে কে আর কবে আদর্শ আশ্রয় বলে? কিন্তু সারদাপ্রসাদই বা কবে লোকে কাকে কী বলে তার ধার ধেরেছে?

ওই গাছতলাটাই তো রাজসিংহাসন লাগছে তার। অন্তত তার মুখ দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছে। চোখে তার উৎসাহের উদ্দীপনা, মুখে তার আনন্দের দ্যুতি। তার মসৃণ ললাটে নির্মল সুখের ছাপ। ওর সিংহাসনটা যে নিতান্তই ধূলি-ধূসরিত একটা গাছতলা, ওর পৃষ্ঠপটে যে নিতান্তই একটা মাটির কুটির, সেটা ওর মনেও পড়ছে না।

ওই মাটির ঘরটার গায়ে যে অদ্ভুত সুন্দর করে আলপনা আঁকা আছে, ওই গাছের গোড়াটা যে কাঁকর কাঁকর লালচে মাটির প্রলেপে অভিনব হয়ে উঠেছে, আর ওই কুঁড়েটার পাশ দিয়ে যে পায়ে চলা পথটা ঘন চুলের মধ্যেকার সরু সিঁথির মতো যেতে যেতে কোন একটা জঙ্গলে যেন হারিয়ে গিয়েছে, এইটাই ওর কাছে পরম সম্পদ।

কিন্তু ফুলটুংরী গ্রামের ধারেকাছেই তো এসব ছিল। দেহাতি প্রতিবেশিনী-দের দেখাদেখি রান্নাঘরের মেটে দেওয়ালে আলপনা আঁকতো শ্যামাপ্রসাদের বৌ। যা দেখে শ্যামাপ্রসাদের বিধবা দিদি বলতো, 'সাঁওতাল হয়ে গেলি নাকি বৌ? তোর ধরণ-ধারণ পছন্দ-অপছন্দ সবই যেন সাঁওতালদের মতো।'

তার মানে ফুলটুংরী গ্রাম থেকে অধিক দূর যায় নি সারদাপ্রসাদ।

তার মানে যে জিনিসগুলোর সন্ধান করছিল সারদাপ্রসাদ সেগুলো খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে গেছে। অনেক পথ হাঁটতে হয় নি।

অথবা হয়তো ওই 'সারল্য সততা, বিশ্বাস' ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্য জিনিসগুলো নিজের কাছেই ছিল সারদা-প্রসাদের, ও মনে করলো 'খুঁজে পেয়েছি'।

যদিও একটা বড় হাতুড়ির ঘায়ে ওর ওই দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সিন্দুকটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কে জানে কখন যেন সেই ভাঙা টুকরোগুলোই জোড়া লেগে লেগে আবার আস্ত হয়ে উঠেছে।

হয়তো তেঁতুল পাতার ঝিরিঝিরি, হয়তো ওই নাম না-জানা নদীটার বালি চিকচিকে ঝিরিঝিরি জল, হয়তো ওই শাল জঙ্গলের সোঁদা সোঁদা গন্ধ এরা ভাঙা জোড়ার কারিগর।

বারে বারে খালি হয়ে যাওয়া ভাঁড়ার বারে বারে পূর্ণ করে তোলার অনাহত লীলায় যে চিররহস্যময়ী, তার একান্ত সন্নিকটে এসে বসতে পারলে ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ আবার কোন ফাঁকে ভরাট হয়ে ওঠে।

অথবা সবাই হয়ে ওঠে না, শুধু সারদাপ্রসাদের মতো বোধহীন মানুষ-গুলোই—নিজে বোধহীন বলেই হয়তো সারদাপ্রসাদের সঙ্গী গুলোও ততোধিক বোধহীন।

ওরা তাই সারদাপ্রসাদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না। সারদাপ্রসাদকে দেখলেই মহোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাগলা মাস্টার মশাই আসছে, পাগলা মাস্টার মশাই।'

'মাস্টার মশাই' আখ্যা পেল কেন সারদাপ্রসাদ, তা সে নিজে জানে না।

ওই মালকোঁচা মেরে ছোট ছোট ধুতির টুকরো পরা খালি গা ছেলে-গুলোকে তো কোনদিনই বই শেলেট নিয়ে পড়াতে বসায় নি সারদাপ্রসাদ। ওদের সঙ্গে যোগসূত্র শুধু গল্প বলায় আর শোনায়। সেটা অবশ্য শোনায় সারদা খুব সমাদরে।

যদিও ছেলেগুলো নিতান্তই বালক বলে শুধু খেয়ে খেলিয়ে বেড়াবার ছাড়-পত্র পায় না, ওদের মধ্যে অনেককেই ছোট ছোট 'টোকা' মাথায় দিয়ে গরু চরাতে হয়। বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে ক্ষেত-বাড়িতে গিয়ে উঞ্ছবৃত্তির কাজগুলো করতে হয়, অথবা মজুরণী মায়েদের সঙ্গে সঙ্গে 'জোগাড়ের' কাজে হাত পাকাতে হয়। তবু ফাঁকে ফাঁকে ছুটে আসে ওরা এই শাখা-প্রশাখা ছড়ানো প্রকাণ্ড ছাতিম গাছটার ছাতার মতো ছায়ার নীচে।

নতুন জগতের স্বাদ পাওয়া কৌতূ-হলী চোখ মেলে মহোৎসাহে বলে, 'তার পর?'

ডাকতে অবশ্য 'পাগলা মাস্টার' বলে না ওটা উচ্ছ্বাসের ডাক।

সারদা মাঝে মাঝে সচেতন করিয়ে দেয়, 'মা-বাপের কাছে বকুনি খাবিনে তো বাপ? যা বাবা যা একবার গিয়ে দেখে আয় গরুগুলো পালিয়ে গেল কি না। যা বাবা দেখগে মা ডাকছে কি না।'

কেউ হয়তো অভিমানভরে গড়িতে উঠে উঠে যায়, কেউ বা হয়তো অন্যমনস্কভাবে বলে, 'মা ডাকতেছে মা, তুমি বল।'

সারদাপ্রসাদ বলতে সুরু করে।

অফুরন্ত গল্পের সঞ্চয় আছে সারদার ভাঁড়ারে, সারদা এইসব চির-পতিত জমিতে তার বীজ ছড়ায়।

গল্প বলে আর তারপর মহোৎসাহে বলে, 'তাহলে বুঝছিস, সাহেবরা কোনো কিছুই নতুন আনে নি। এই যে নলকূপ দেখতে পাস জজন বাঙলোর মাঠে কী যেন বলিস তোরা ওকে? টিপ্‌কল তাই না? ওটা সেই হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। ভীষ্ম ঠাকুর যখন শর-শয্যায় শুয়ে ঠাণ্ডাজল চাইল অর্জুন তীর মেরে মেরে মাটির ভেতর থেকে জল বার করলো মানে কি? কিছু না। ওই 'টিপ্‌কল।'

আর উড়োজাহাজের গল্প তো বলেইছি সেদিন। এখন যে এতো সব অস্ত্র-শস্ত্রের বড়াই করে সব তো মানুষ মারবার কল। মরামানুষ বাঁচাতে পারে কেউ? পারে না। তবে চেষ্টা করছে। আর সেই তখন? হাজার হাজার বছর আগে? হাসতে হাসতে মরামানুষ বাঁচাতে পারতো।'

বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সারদাপ্রসাদ, শ্রোতাদের 'গ্রহণের' পাত্রটার মাপের হিসেব ভুলে যায়, জোরালো গলায় বলে, 'লক্ষটা মানুষ মেরে ফেলার থেকে একটা মানুষ বাঁচানো যে অনেক শক্ত তা ভাবো না। শুধু মারামারি। পৃথিবী জুড়ে শুধু মারামারি।

হয়তো এই উত্তেজনার ঊর্ধ্বলোক থেকে তার শ্রোতাদেরই কেউ তাকে নামিয়ে আনে বলে, 'সেই অবদি আমরা আর মারামারি করেছি মাস্টার মশাই?'

সারদাপ্রসাদ ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসে। বলে, 'না না তোরা যে সব সোনার চাঁদ ছেলে।'

সোনার চাঁদদের দু'একজন হয়তো পাশের ছেলেদের সঙ্গে চিমটি কাটাকাটি চালাচ্ছিল তারা হাত জোড়ে সারদা-একে অলৌকিক শান্তমুখে বলে, 'সেই আঙুলকাটার গপপোটা আজ আবার বল না মাস্টার মশা, ধনু শোনে নাই। ধনুর বাপ সেদিন ওকে হাটে নে গেছিল।'

আঙুলকাটার গপপো, অর্থাৎ এক-লব্যের কাহিনী। একলব্যের কাহিনী, উতঙ্কের কাহিনী, বকরাক্ষসের কাহিনী, জতুগৃহদাহর কাহিনী, এগুলো ওদেরও প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সারদা ওদের মগজে ঢুকিয়ে তবে ছেড়েছে।

বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা ওরা ওদের মায়ের কাছে গল্প করে সেইসব কাহিনী হয়তো কতক ভুলে গিয়ে কতক উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে, তবু ওদের মা-বাপেরা সারদাপ্রসাদকে ভক্তিশ্রদ্ধার চোখে দেখে।—কথক ঠাকুরদের মতন সুর করে না হোক, সেইসব ঠাকুর দেব-তাদের কথাই বলছে মাস্টার মশাই।

সারদাপ্রসাদের গল্পের আসরে মেয়ে শ্রোতার অভাব। মেয়েগুলো নিতান্ত শৈশব থেকেই মায়ের কাজে ভিড়ে যায়, পথেঘাটে বিশেষ ঘোরে না। তবু তারাও হঠাৎ কোনখানে 'টোকা' মাথায় সারদাপ্রসাদকে দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে পাগলা মাস্টার লোমোস্কার।'

সারদাও হাসে, বলে, 'লোমোস্কার। তা তোরা কেন গপপো শুনতে আসিস না?

ওরা হি হি করে হেসে ছুটে পালায় আর চেঁচায়, 'পাগলা মাস্টার, পাগলা মাস্টার।'

ব্যঙ্গ করে নয়, ভালবেসেই।

ওরা যে ওদের ভাইটাইদের মতো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না রাখতে পেলেও মনের মধ্যে যোগসূত্র ওরা রেখেছে সেটাই প্রকাশ করে।

পাগলা মাস্টার ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটে আজ কোন গল্পটা বলবে।---হনুমানের ল্যাজের আগুনে লঙ্কা পোড়া!
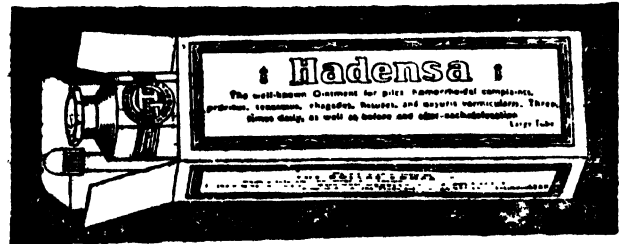
...নার গল্প অথবা গন্ধমাদন পর্বত ...য়ে আনার গল্প, কাঠবেড়ালীর সমুদ্র ...ন্ধনের গল্প এইগুলোয় ওদের মহোৎ-...সাহ, হেসে কুটিকুটি হয়, ঠেলাঠেলি করে মাটির চাপড়া মাথায় তুলে হনুমান সাজে, কিন্তু সারদাপ্রসাদ যেন মহাভারতের গল্প বলতেই বেশী উৎসাহী। সারদাপ্রসাদ সেকাল আর একালের তুলনা করে 'এ কালকে' নস্যাৎ করে দিয়ে ওদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দিতে চায়।

মেয়েরা বিশেষ আসে না, শুধু—মাঝে মাঝে একটি মহিলা শ্রোতা এসে বসে, সারদাপ্রসাদ তটস্থ হয়, সারদাপ্রসাদ কোঁচার কাপড় দিয়ে ...চতলাটা ঝেড়ে ধুলো ওড়ায়।

যে আসে সে অবশ্য গল্প শোনার উদ্দেশ্যে আসে না, আসে সারদাপ্রসাদের জন্যে খাবার নিয়ে হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ সেই খাবার, তবু যে আনে তার হৃদয়ের স্পর্শে সেই তুচ্ছতেই পরমের স্বাদ লাগে।

ওই মলিনবাসা গ্রাম্য বিধবার মুখে রাণীর মহিমা দেখতে পায় সারদাপ্রসাদ।

যে আসে সে অবশ্য একা আসে না, সঙ্গে তার ছেলে দুটোও আসে, তার বড়টা কোনো কোনোদিন বলে জানো দাদু, তোমার বলা রামচন্দরের গপপোটা আমাদের ইস্কুলের বইতে আছে।

সারদাপ্রসাদ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'সেই তিন মাইল রাস্তা ভেঙে ইস্কুল যেতে হয় ভাই, আবার কেন এই দু-কোশ রাস্তা ভেঙে এতোদূর আসিস ভাই?'

'মায়ের সঙ্গে আসবো না হিঃ।' ছেলেটা সারদার উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বেটা ছেলের বুঝি হাঁটলে কষ্ট হতে আছে? মা?'

মা ঘোমটার অন্তরাল থেকে মৃদু হেসে বলে, 'না।'

সারদাপ্রসাদ বলে, 'তুমিই বা কেন প্রায় প্রায় এতো কষ্ট করে আসো বৌমা? আমিই বরং গিয়ে খেয়ে আসবো।'

অটল নামের ছেলেটা হেসে উঠে বলে, 'মা বুঝি নল চালিয়ে তোমায় বলে পাঠাবে 'আজ কলাবড়া করেছি, আজ সরুচুকলি করেছি। তুমি জানবে কি করে?'

সারদাপ্রসাদ বলে, 'তা' এতোসব করতেই বা বসো কেন বৌমা? তোমার শরীর খারাপ—'

অটল বলে, 'মা বলে সারাদিন কী করবো?'

হয়তো সত্যিই তাই, শ্যামাপ্রসাদের হঠাৎ মৃত্যু শ্যামাপ্রসাদের চিরবন্দিনী স্ত্রীকে ভয়ানক একটা মুক্তির শূন্যতা দিয়ে গেছে।

আর তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা।

তাই সে কলার-বড়া তালের পিঠের উপচার নিয়ে দুক্রোশ পথ ভেঙে আসে তার চিরদিনের অদেখা খুড়শ্বশুরের কাছে।

ননদ রেগে রেগে বলে, 'শ্যামা মরে তোমার বড্ড পাখা উঠেছে বৌ। বলি সাতজন্মের অচেনা খুড়শ্বশুরের জন্যে এতো ভক্তি উথলে উঠেছে কেন? বুড়ো নয় হাবড়া নয় জোয়ান মদ্দ তার কাছে তোমার যাওয়ার দরকার?'

বৌ না রাম না গঙ্গা কিছুই করে না, অথচ যায়।

ননদ বলে, 'মুখের ঘোমটাটা ফেলে গলগল করে গপপো হয় বোধ হয় শ্বশুরের সঙ্গে।'

বৌ বলে, 'কুচ্ছিৎ কথা বলে ভগবানের দেওয়া মুখটা নষ্ট কোরো না ঠাকুরঝি।'

এই সদুপদেশ বাণীতে আরো জ্বলে ওঠে। বলে, 'শ্যামা মরে তোর পাই শুধু লম্বা হয়নি বৌ মুখও খুব লম্বা হয়েছে। ওরে শ্যামারে ওপর থেকে দেখ তোর বৌয়ের আসপদ্দা। সাতচড়ে যে রা কাড়তো না, সে এখন চোটপাট করছে।'

'চোটপাট আমি কিছুই করিনি ঠাকুরঝি'— বলে বৌ দুটো ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে।

ননদের হাঁটুতে বাতের ব্যথা, তাই পিছু পিছু গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে পারে না তাই পিছনে দাঁড়িয়ে আঙুল মট্‌কায়। আর চেঁচিয়ে বলে, 'বলে যা তবে তুই বলে যা, যাস কেন সেখানে? যাস কেন?'

●

কেন যায় সেকথা ননদের কাছে বলে না শ্যামার বৌ, বলে আসল জায়গায়। কিন্তু মুখের কাপড় ফেলে কথা তো আর বলে না সত্যি। ছেলেদের মাধ্যমে কথা।

অটল বলে, 'দাদু মা বলছে, কুলটুংরীতে তোমার রাজ্যপাট পড়ে, তুমি কেন এখানে পাঁচজনের দয়ায় পড়ে থাকবে।'

সারদাপ্রসাদ হেসে হেসে বলে, 'তোর মাকে বল ভাই তোর দাদুর এখানেও রাজ্যপাট। রাজা আমি হবোই ভাবলে কে তার রাজ্যপাট কাড়তে পারে।

'মা বলছে তুমি ওখানে গিয়ে আমাদের দেখাশুনো করবে, আমাদের মানুষ করার ভার নেবে।'

'দূর দূর।' সারদা হেসে ওঠে, 'তোদের দাদু নিজে তো একটা অমনিষ্যি সে আবার মানুষ করবে কি। তোরা যে মা পেয়েছিস তাতে তোদের মানুষ হওয়া আটকায় কে?'

'মা বলছে তোমার বিষয়-আশায় তোমাকে ভোগ করতে না দিয়ে নিজেরা ভোগ করছি মহাপাপ হচ্ছে আমাদের।

সারদা এ কথায় উষ্ণ হয়েছে।

অতএব সারদা মাধ্যম ছেড়েছে।

সরাসরিই বলছে, 'এ কথাটি তো তোমার মতন কথা হল না বৌমা। আমার বিষয়-আশায় আমার নাতিরা ভোগ করবে না তো কে করবে শুনি? আমি তো একটা বাউণ্ডুলে পাগল ছাগল, আমি ওসবের মর্ম বুঝি? এ আমি বেশ আছি, খুব ভালো আছি। পাঁচজনের ভালবাসায় খাওয়া থাকাটা চলে যাচ্ছে, এদের নিয়ে আনন্দে আছি।'

ছেলেটা আবার মাতৃশিক্ষা মত বলে, 'মা বলছে, তোমার তো একটা মান-সম্মান আছে, বরাবর অন্যলোক তোমায় খাওয়াবে কেন?'

'খাওয়াবে কেন?'

সারদাপ্রসাদ হাহা করে হেসে ওঠে। বলে বলে, কিন্তু খাওয়াবে কেন। আরে বাবা ঘরের ঠাকুরটিকে খাওয়ায় কেন লোকে? পোষা কুকুরটাকে খাওয়ায় কেন। না খাওয়ালে আর কে খাওয়াবে। এই ভেবেই খাওয়ায়। সে খাওয়ায় ঠাকুরও লজ্জা পায় না। কুকুরও লজ্জা পায় না। তবে? তাছাড়া এই ছেলে বুঝলে বৌমা ভারী বুদ্ধিমান। এককথায় বুঝে ফেলে, এটা ঠিক নয়। ওটা ভুল বলছো বলে খোঁচ তোলে না। বোঝেও সব। তা তোমার অটলও খুব বোঝে। সেদিন বলছিলাম সেকালে এই ভারতবর্ষের মুনিঋষিরা শরীরকে সবরকম সওয়াবার জন্যে গ্রীষ্মকালে চারিদিকে আগুন জ্বেলে শীতকালে একগলা জলে ডুবে, আর বর্ষাকালে খোলা আকাশের নীচে বসে তপস্যা করতেন—ছেলেটা ফট্ করে বলে উঠলো, ওইসব শুনে শুনেই সাহেবরা সব বিদ্যে শিখে নিয়েছে না দাদু? আমাদের ইস্কুলের মাস্টার মশাই বলেছেন, সায়েবরা যাদের চাঁদে পাঠিয়েছিল তাদেরও ওই রকম করে ঠাণ্ডা গরম, না খেয়ে থাকা, সব কিছু সইয়ে নিয়েছিল।---

শুনে তো আমি তাজ্জব বনে গেলাম অতটুকু বাচ্চা তার মাথায় এলোও তো প্রকৃত ঘটনাটা। ঠিক তাই বুঝলে বৌমা, অবিকল তাই। ওই ভাবেই মুনিঋষিরা আকাশে উঠতেন, পাতালে ঢুকতেন। তবু তো এযুগে মায়ের পেটের মধ্যেকার শিশুর সাধ্যি নেই বাইরের জগতের কিছু শোনে কি দেখে, কিন্তু প্রাচীনকালে?

সারদাপ্রসাদ একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে, 'প্রাচীনকালে ততোদূর পর্যন্তও এগিয়েছে মানুষ। তোমার গিয়ে অভিমন্যুই তার সাক্ষী। কিন্তু সায়েবদের দেশে হোক দিকি এখন ওই ঘটনা? ধন্যি ধন্যি পড়ে যাবে। সবাই বলবে—'বিজ্ঞানের কী শক্তি।' অথচ এমন কপাল আমাদের কেউ একবার নিজেদের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখবে না। মহাভারতখানা একবার সাহেবদের নাকের সামনে তুলে ধরে বলে উঠতে পারবে না 'কীসের বড়াই করছো তোমরা যাদু, এই দেখো। বিদ্যে থাকে তো পড়ে দেখো। বুঝতে পারবে কিছুই নতুন করনি তোমরা।'

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর উদাত্ত হয়ে ওঠে সারদাপ্রসাদের, চোখ ঝকঝক করে। নিজের একহাতের তালুতে অপর হাতে একটা ঘুসি মেরে বলে, 'আসল কথা কী জানো বৌমা আমাদের দেশের কারো কোনো বিষয় খেয়াল নেই। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও, চমকে ওঠে না, উল্টে আবার হাসে।--- তবে এই আমি বলে রাখলাম, এ হাসি আমাদের ঘুচবে একদিন। ওই সাহেবরাই যখন একদিন স্বীকার করবে আমাদের যা কিছু বিদ্যে সবই তোমাদের ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া বাপু। সংস্কৃত শাস্ত্রের যতো কিছু প্রাচীন পুঁথি সেগুলি আমাদের হাতেই এসে গিয়েছিল, তার থেকেই আমাদের এতো লপচাপানি' তখন আমাদের বাছাধনরা বলবেন, 'তাই তো, তাই তো, সত্যিই তো। এই যে দেখছি হুবহু সব মিলে যাচ্ছে।'

❧

মধ্যাহ্ন সূর্য্য ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে চলে পড়ে।--- পড়ন্ত বিকেলের সোনালী আলো সমস্ত পরিবেশটাকেই যেন সোনালী করে দিয়ে যায়।

আধাপাগল একটা প্রৌঢ় ব্যক্তিকে ঘিরে বসে থাকে কতকগুলো অবোধ বালক আর একটা সংসার-অভিজ্ঞ মলিনবসনা প্রৌঢ়া।

সারদাপ্রসাদের কথাগুলো তারা ঠিকমত বুঝতে পারে কি না কে জানে, কিন্তু সারদাপ্রসাদকে তারা বোঝে।--- সেই বোঝার মধ্যে এক অপরিসীম কৌতূহল।

এতোকাল ধরে তো এই দৃষ্টিরই প্রতীক্ষা করে এসেছে সারদাপ্রসাদ।

এই ভয়ঙ্কর বিস্ময়কর তথ্যটা জেনে ফেলে আবিষ্কারককে তারা মুগ্ধদৃষ্টির প্রদীপ জ্বেলে পুজো করবে না?

সারদাপ্রসাদের কণ্ঠ ক্রমশ গভীর হয়ে আসে, সারদাপ্রসাদ একটির পর একটি কাহিনী বলে চলে, আর তার ব্যাখ্যা শোনায়।

ওর সেই রাশি রাশি কাগজের স্তূপ নিজে হাতে বিসর্জন দিয়েছে ও, কিন্তু তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে? কোন কথাটা হারিয়ে গেছে?

সারদাপ্রসাদের মনের মধ্যেকার আগাগোড়াই ছাপা হয়ে মুদ্রিত নেই?

ছাপাখানায় ছাপা হয়ে সারদাপ্রসাদের এই অমূল্য 'গবেষণা' লোকলোচনে আসতে পেল না বলে আর আক্ষেপ নেই সারদাপ্রসাদের, নেই জগতের উপর কোনো ক্ষোভ, অভিমান।---এই প্রায়---অরণ্য প্রকৃতির কোলে, এই গাছতলায় বসে, নিজেকে তার প্রাচীনকালের শিষ্য পরিবেষ্টিত মুনিঋষির মতো লাগে।

সারদাপ্রসাদ অতএব মুনিঋষির দিব্য জ্ঞানটাও পায় যেন। তাই সেই গভীর গম্ভীর গলায় বলে, 'এতো জ্ঞান বিজ্ঞান, এতো যন্ত্র-শক্তি কি করে হারিয়ে ফেললো ভারতবর্ষ তা বুঝতে পারছো?-- শুধু শক্তির অহঙ্কারে নিজেরা নিজেরা কাটাকটি করে। লঙ্কাকাণ্ডের পর ত্রেতা যুগ ধ্বংস হলো, কুরুক্ষেত্রের পর দ্বাপর। তবু এই অভাগা কলিযুগের চৈতন্য নেই, নিজেকে ধ্বংস করে, সব উন্নতি সমুদ্রের জলে খতম করে আবার গুহার মানুষ হয়ে গিয়ে তবেই যেন ওর ছুটি।--- হবে হচ্ছে, এই হিপিরাই তার সূচনা।'

শ্রোতাদের কথা বুঝি আর মনে থাকে না সারদাপ্রসাদের, যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা কয়, 'তবে আর তোদের বড়াই কিসের? বিধাতার নিয়মেই চলছিস তোরা। যেমন দিনের পরে রাত, তেমনি আলোর পরেই অন্ধকার, নিজেদের সৃষ্টি নিজেরাই ধ্বংস করে ফের কাঠে কাঠে ঘসে আগুন জ্বালাবি মানুষ এও তো সেই প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা লিখে রেখে গেছেন।

॥ সমাপ্ত ॥

মোগল যুগের ভারত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হতে আর মাত্র তখন বছরখানেক বাকী। দিল্লীর সিংহাসনে সেদিন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ আকবর। ইতিহাসের ঠিক মধ্যযুগ।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে শ্যামল বঙ্গদেশ। সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা। ভুবনমনোমোহিনী অনন্ত সম্পদে পরিপূর্ণা, অফুরন্ত সৌন্দর্যে সমৃদ্ধা, বাঙলা দেশ তখন শ্রীচৈতন্যের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নতুন আদর্শে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সারা বাঙলায় তখন প্রেমধর্মের প্লাবন বইছে। মঙ্গল কাব্যের চলছে জয়যাত্রা। ভগবৎপ্রাণ বৈষ্ণব সাধক কবিদের ধ্যানে ও অনুভূতিতে বাঙলার বৈষ্ণব-সাহিত্য লালিত্যে, লাবণ্যে, রস-প্রাচুর্যে শ্রীমণ্ডিতা হয়ে উঠছে। ভগবান শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে বঙ্গ সাহিত্য নতুন প্রাণের প্রদীপে দীপ্তভাস্বর হয়ে উঠছে।

বাঙলার সঙ্গে ভারতের অন্য প্রদেশগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রের মিল অনেক দিক দিয়ে। বহু বিষয়ক ঐক্য এবং সমধর্মিতা দুটি রাজ্যকে এক অসাধারণ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে। চিন্তাধারার, ধ্যান-ধারণার, ভাবকল্পনার বিনিময়ে উভয়ে উভয়ের অতি নিকটেই এসে গেছে—এবং এই নৈকট্যও অল্পদিনের নয়। এ নৈকট্যও বয়সের বিচারে কম প্রাচীন নয়। বাঙলার কালজয়ী পুরুষরাও অবিরাম ধারায় নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ঐক্যের সেতুকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে গেছেন।

শুধু সাহিত্য, সংস্কৃতি বা রাজনীতিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেই নয়, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র সারা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় অধিকার করে আছে। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার এক স্বর্ণশিখা মহারাষ্ট্রের গগন থেকেও প্রসারিত হয়েছিল, এই মহাদেশের অধ্যাত্মবাদের বিকাশ ও পরিচর্যা মহারাষ্ট্রের মাটিতেও কম ঘটে নি।

জর্জ এ্যাডেন্স

ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিঞ্চিদধিক শতাব্দীকাল পরে মহারাষ্ট্রের দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে, দিগ্‌-দিগন্তরে ভক্তিবাদের বীজ বপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, সমগ্র মানব-সমাজকে ভক্তিরসের প্রাবল্যে ভরিয়ে দেওয়ার মন্ত্র বহন করে আবির্ভূত হলেন তুকারাম। সাধকশ্রেষ্ঠ, ভক্তকুলতিলক তুকারাম।

প্রেমময় সত্তা, নিখিল ভুবন মাতানো প্রবল প্রগাঢ় ঈশ্বরানুভূতি, সর্বজীবে ভালবাসা—এই কথাগুলির যেন জীবন্ত বিগ্রহ তুকারাম।

পুণার আট ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে 'দেহু' নামীয় স্থানে এক বণিক পরিবারে তাঁর জন্ম। জন্ম সাল ১৫৯৮।

বিঠোবাজীর পরম ভক্ত এবং তাঁর উদ্দেশে সর্বস্ব সমর্পিত 'মোরে' পরিবারের সন্তান বোল্লাবা মোরে। বোল্লাবা যেমনই ভক্তিমান তেমনই দাতা। তাঁর স্ত্রী কনকানাইও সাধারণ্যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান আহরণ করেছিলেন তাঁর প্রবল ভগবদ্ভক্তির জন্য। এই আদর্শ দম্পতির তিন ছেলে। বড় সাওজী, মেজ তুকারাম ও ছোট কানহাইয়া, আদর্শ পিতামাতার আদর্শ সন্তান। বোল্লাবা ও কনকানাইয়ের চরিত্রে যে বীজ দেখা গিয়েছিল, সেই বীজই মহীরুহের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তুকারামের চরিত্রে।

ছেলেবেলা থেকেই দেখা গেল সাওজী সংসারবিমুখ। বিশেষ উদাসীন। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব তাঁকে বাঁধতে পারে না, সংসারের কোন আকর্ষণই তাঁর মনে পুলক রোমাঞ্চের শিহরণ তিলমাত্র বহায় না। আরাম, ভোগ, গৃহসুখ কোন মূল্যই বহন করে না তাঁর কাছে। বোল্লাবা বুঝলেন কোন দায়িত্ব এর ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে একে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আবার তাই, কোন জিনিসের ভার এর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকারও উপায় নেই। সাংসারিক ক্ষেত্রে এর উপর নির্ভর করা চলে না।

অবশেষে মেজ ছেলে তুকারামকে ঢুকিয়ে দিলেন ব্যবসায়ে। কতই বা বয়স তখন? সামান্য বয়স। সেই বয়সে ব্যবসার জোয়াল কাঁধে পড়ল তুকারামের।

আঠার বছর পর্যন্ত সংসার-নদী স্থির ছন্দে বয়ে চলেছিল, কোন বাধা ছিল না তার মধ্যে, তারপরই এল সংঘাত, উত্তাল উদ্দাম প্রবাহের পর প্রবাহ। সেই প্রবাহে সংসারের শান্তির বিগ্রহটি কোথায় মিলিয়ে গেল, তার ঠিকঠিকানা মিলল না। বোল্লাবা ও কনকানাইয়ের তিরোধান ঘটল, লোকান্তরিত হলেন অগ্রজ সাওজীর সহধর্মিণী। গৃহত্যাগ করলেন সাওজী

আর ঠিক সেই সময়েই সমগ্র মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ তার ভয়াল-করাল বাহু বিস্তার করল। দুর্ভিক্ষের ভীষণ ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাবে সারা মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে উঠল হাহাকার, কোন ঘরে একটি কণা চালেরও সন্ধান মিলছে না। মানুষ বিরল। ঘরে ঘরে শুধু 'একমুঠো অন্ন দাও, এক মুঠো চাল দাও, একটু খেতে দাও' এই রব।

একে সাংসারিক অভাব অনটন। তায় দেশের এই অবস্থা। তুকারামের গার্হস্থজীবন এ থেকেই সহজে অনুমেয়। তুকারামের ব্যবসা লাটে উঠল। তুকারাম দেউলিয়া। স্ত্রী জিজা সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে। তিনি জোগাড় করলেন কিছু টাকা। তুলে দিলেন তুকার হাতে। প্রেরণাময়ী, উদ্দীপনাময়ী, প্রেমময়ী স্ত্রীর কাছ থেকে এল সাহস, এল অনুপ্রেরণা, এল উৎসাহ। জিজা বললেন, ভয় কি। যা গেছে তা গেছে। সে ভেবে দুঃখ কোর না। এই নাও টাকা, নতুন কিছু কর।—এতগুলি কথার ভিতর হয়তো একটি না-বলা কথাও শুনতে পেলেন তুকা—সেই না-বলার বাণী এক অপরূপ ধ্বনিতরঙ্গ তুলল তুকার প্রাণবীণার তন্ত্রে তন্ত্রে—সেই না-বলা কথাটি হল—'আমি তো আছি, তোমার পাশেই তো আছি।'

কিন্তু বিধিলিপি যে অন্যরকম—জিজাবাই যা বাঁধতে চান, তুকার ললাটলিপিতে তো তার অনুরূপ লিখন নেই। তার ভাষা যে আলাদা। তার রঙ যে ভিন্ন, তার ধর্ম যে পৃথক। ব্যবসা তো সুরু করলেন কিন্তু দেশের তো ভয়ানক অবস্থা, লোকে জিনিস কিনে দাম দিতে পারে না, ধার রাখে, ধার করে, শোধ দিতে পারে না। তুকার কাছে কেঁদে পড়ে—এই তো অবস্থা, দেব কোথেকে। দয়ার শরীর তুকারামের, কোমল প্রাণ, আহা সত্যিই তো, কি করে দেবে বেচারারা—এ-ব্যবসাও লাটে উঠল।

কিছুদিন পর কোন কাজে প্রচুর অর্থ পেলেন তুকারাম—সেই টাকা নিয়ে বাড়ী আসছেন, আনন্দে ফেটে পড়ছেন জিজা। ঘরে বসে বসে আনচান করছেন, স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছেন, অনেক দিনের দুঃখ-বেদনার দুর্গ এবার ধূলিসাৎ হবে, তাঁর স্বামী নিয়ে আসছেন এই দুঃখ দূর করার চাবিকাঠি। স্বামী ফিরে এলেন কিন্তু চাবি হাতে নিয়ে নয়। যেমন রিক্ত হাতে গিয়েছিলেন, তেমনই শূন্য হাতে ফিরে এলেন। টাকা নিয়ে যখন ফিরছেন তুকা—সেই সময়ে পথিমধ্যে এক অসহায় অধমর্ণের উপর ক্ষমতাশালী উত্তমর্ণের অত্যাচার দেখে সেই টাকা দিয়ে হতভাগাকে ঋণমুক্ত করে এসেছেন।

অচলাবস্থা চরমে পৌঁছাল। এক কৃষক দয়াপরবশ হয়ে তুকারামকে এসে বললে তোমার হাতে তো কোন কাজ নেই—আমার জমিগুলি একটু দেখো তো—তুকা খুশীমনে সেই দায়িত্ব নিলেন কিন্তু ফল উল্টো হল, যা রোধ করার জন্য তুকাকে নিয়োগ করা হল—তুকা নিজেই সেই কাজে সহায়তা করে বসলেন। তাবৎ পশু-পক্ষী, পতঙ্গ জমির শস্যগুলি নষ্ট করতে লাগল। তুকা উত্তরে বললেন, আহা! কৃষ্ণের জীব ওরা। ওদেরও তো ক্ষুধা আছে, আমরা খেতে না দিলে খাবার ওরা পাবে কোথায়।—এর জন্যে যে লাঞ্ছনা তুকার ভাগ্যে জুটল তারও সীমা-পরিসীমা নেই।

কিন্তু এত পরিবেশের প্রতিকূলতা, চতুর্দিকের এত বিরুদ্ধাচরণ, এত অভাব, এত লাঞ্ছনা, সাংসারিক জীবনের এত অশান্তি তুকারামকে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে তিলমাত্র ভ্রষ্ট করতে পারে নি। জীবনের সেই সুরটি কোনদিন কেটে যায় নি। তুকারাম এত কিছুর মধ্যেও ভগবৎ চিন্তা থেকে বারেকের তরেও নিজেকে সরিয়ে নেন নি। ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকারাম অনুভব করলেন ব্যাপক অধ্যয়ন প্রয়োজন। পড়লেন গীতা, পড়লেন ভাগবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। এদের মর্মার্থ গ্রহণে তাঁকে অসুবিধা ভোগ করতে হল না। উপলব্ধির এক সহজাত শক্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। ধীরে ধীরে গীতায়, ভাগবতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মে গেল। একনাথের ভাগবত ভাষ্য, জ্ঞানেশ্বরী, নামদেবের অভঙ্গ পাঠের ভিতর দিয়ে ধর্ম ও শাস্ত্রের আলোয় নিজেকে তিনি পরম আলোকিত করে তুললেন।

এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল এক স্নিগ্ধ কার্তিক সন্ধ্যায়। ইষ্ট বিঠোবানাথের দর্শনে চলেছেন তুকারাম, সারা পথ আলোয় আলো, পূর্ণিমার আলো-ঝলমলে সন্ধ্যা। পথ চলতে চলতে চেতনা হারিয়ে ফেললেন তুকারাম। বিঠোবানাথকে দেখতে পেলেন সামনে—তিনি আদেশ করছেন অভঙ্গ রচনা করতে।

ইষ্টের আদেশে তুকারামের জীবনের ইতিহাস নতুন অধ্যায়ের সম্মুখীন হল। সমগ্র জীবন এবার পূর্ণতার সিংহদ্বারে উপনীত হল। জীবনের সামনে এবার যেন অমৃতলোকের যবনিকা উঠে গেল।

সুরু হয়ে গেল একের পর এক ভক্তিরসাত্মক অভঙ্গ রচনা। ভাগবতে বর্ণিত ভগবান কৃষ্ণের লীলাপদাবলী নির্গত হল তাঁর চিররসনিষ্যন্দী লেখনী থেকে।

ভক্তের সমাগম সুরু হল। আকুলচিত্ত ভক্তদের সমাগমে ভরে উঠল গৃহ-প্রাঙ্গণ। তুকারামের হৃদয় উজাড়-করা ঐকান্তিক ভক্তি ভারতের ভক্তিবাদের ক্ষেত্রে একটি নতুন ঐতিহ্য পরবর্তীকালে সৃষ্টি করিল। ঈশ্বরের মানসপুত্রদের বারংবারই আবির্ভূত হতে হয়, অসংখ্য শত্রুতার সামনে নিশ্চিত বিপদকে তাদের বারংবার আলিঙ্গন করতে হয়।

জাতি অনুসারে তিনি বণিক অর্থাৎ অব্রাহ্মণ। দলে দলে ব্রাহ্মণরাও তাঁর পবিত্র পদরজ মাথায় ধারণ করেন পরম শ্রদ্ধায়। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ ক্ষেপে উঠলেন। গভীর চক্রান্ত চলল তুকাকে হত্যা করার। বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে তুলল, তুকার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নাম-গানে তিনি বিভোর। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানই নেই। 'রাখে হরি মারে কে'—ঈশ্বর যাঁর সহায় কার ক্ষমতা তার কেশাগ্র স্পর্শ করার? লাঞ্ছিত হতে হল। নিপীড়িত হতে হল কিন্তু প্রতিবারেই শত্রু হল পরাস্ত। যে প্রাণ নিতে এগিয়ে এসেছিল যারা—সেই প্রাণ রক্ষারই তারা ভার নিল, যার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্কল্প যারা নিয়েছিল—তারাই নিজেদের মাথাটা তারই পায়ের উপর লুটিয়ে দিল।

রামেশ্বর ভট্ট এই রক্ষণশীল সমাজের এক প্রতিনিধি। তিনি ফতোয়া দিলেন—তুমি শূদ্র—ব্রাহ্মণের প্রণাম নেওয়ার তোমার কি অধিকার আছে—যাকে কেন্দ্র করে এই অন্যায় (?) ঘটছে সেই অভঙগুলি এই মুহূর্তে তুমি জলে বিসর্জন দাও। জলে বিসর্জন দেওয়ার পর তুকারামের মন অনুতাপে ভরে উঠল। এ কি করলেন তিনি—এ তো ভগবানের সম্পদ এ তো বিঠোবানাথকে নিবেদিত। তাঁর জিনিস তিনি জলে নিক্ষেপ করলেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন তুকারাম। অনশন সুরু করলেন, বেদনার তাঁর অন্ত নেই। কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়—ঘটনার কোন হেরফের হয় না। একদিন অন্য ভক্তরা স্বপ্ন পেলেন—স্বয়ং বিঠোবানাথ বলছেন—কোন ভয় নেই। ওকে অনশন ত্যাগ করতে বল—জলের তলাতেই অভঙগুলি আছে। অলৌকিক ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে তুকারাম এগিয়ে গেলেন সেগুলি উদ্ধার করতে। এতদিন জলের মধ্যে থেকেও দেখা গেল পাণ্ডুলিপিগুলি অবিকৃত আছে। এই ঘটনায় চতুর্দিকে আলোড়ন পড়ে গেল। অনুতপ্ত এবং হতবাক্ রামেশ্বর ভট্ট লুটিয়ে পড়ল তুকারামের পায়ে।

তুকারামের কাছে অনেকে এসেছেন। এসেছেন নানাদিক থেকে, নানা কোণ থেকে, এসেছেন রাজা, এসেছেন প্রজা, এসেছেন ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ। এদের মধ্যে আসতেন একটি কিশোর। পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতের ইতিহাসে তার অভ্যুদয় দেখা গিয়েছিল এক অফুরন্ত শক্তির আধার হিসাবে, ভারত-ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় জোড়ার কৃতিত্ব যাঁর অনস্বীকার্য—তিনি ছত্রপতি শিবাজী।

১৬৫০ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকারাম।

মহাকাশ বিজ্ঞানের দশম বৎসর

আজ থেকে দশ বছরের কিছু আগে আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা—'নাসা', অর্থাৎ ন্যাশনাল এরোনটিক্স এ্যাণ্ড স্পেস্ এ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশন—জন্মগ্রহন করে। এ্যাপোলো-৭ এই দশম বার্ষিকী উৎসবের সার্থক উদ্‌যাপন করল বিগত বৎসরের শেষে।

এক দশক ধরে বহু আশা, নিরাশা, সন্দেহ ও সংশয়-এর সার্থক নিরসন করল এ্যাপোলো-৭। অবশ্য ইতিমধ্যে ৯ এবং ১০ তাদের পূর্বনির্দিষ্ট কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করে ইতিহাস রচনা করেছে। মানুষের জয়যাত্রার পথে এগুলো হয়ে রইল অক্ষয় পদচিহ্ন।

১৯৫৮ সালের পয়লা অক্‌টোবর "নাসার" জন্ম। জন্মলগ্নে একে নির্দিষ্ট কার্যক্রম দেওয়া হয়েছিল, যথা—

(১) চাঁদ এবং গ্রহপুঞ্জ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ।

(২) যাতায়াত, সংবাদ আদান-প্রদান এবং আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহের জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে সংস্থাপন।

(৩) মহাকাশ থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ এবং মানুষের কাজে তার যথাযথ প্রয়োগ।

(৪) মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার।

(৫) আহরিত তথ্যাদির ব্যাপক সর্বজনীন প্রসার এবং পৃথিবীব্যাপী অবারিত প্রয়োগ।

প্রথম থেকেই "নাসা" কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সারা পৃথিবীতে সংবাদ আদান-প্রদান, আবহাওয়ার সঠিক নির্ণয়, আকাশ ও জলপথে গমনাগমন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর কাজ করেছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব মহাকাশযান ছাড়া হয়েছে, তার মাধ্যমে চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহের অসংখ্য চিত্র নেওয়া হয়েছে—যা' বহু নতুন খবর দিয়েছে আমাদের।

'নাসার" খরচ ছিল ৫'২৫ বিলিয়ন ডলার, ১৯৬৫ সালে। এর স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৬৭ সালে ছিল ৩৫,০০০।

বেদব্যাস রচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে চারটি বিভিন্ন পর্যায়ে মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন বর্তমান অনুবাদক। রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে আহূত ঋষিবর্গের সামনে সৌতি, ব্যাসদেব কথিত কাহিনী পরিবেশন করতে আরম্ভ করেন এবং এইভাবেই সূচিত হয় প্রথম পর্ব বা প্রথম পর্যায়। এর পর পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের অসংখ্য ও বিভিন্ন কাহিনী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও তার পরিণাম। এই বিরাট ও সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ বড় কম পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার নয়, তবু এই দুরূহ কর্মেই ব্রতী হয়েছেন অনুবাদক ও তাতে সিদ্ধিলাভও করেছেন সযত্ন অনুশীলনের মাধ্যমে। মহাভারতের অমূল্য উপদেশাবলী যথাযথভাবেই মর্মস্পর্শ করবে বিদেশী পাঠকের এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসরণ করতেও সক্ষম হবেন তাঁরা। অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাকুলতা তাঁর ও তাঁর সংবাদ দাতা সঞ্জয়ের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অবিকল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এই সূত্রে হিন্দুর প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ গীতার ভাবধারাকেও অনুধাবন করা সম্ভব। আলোচ্য অনুবাদকর্মকে সেজন্যই বিশেষ মূল্যবান বলে অভিহিত করা চলে। খণ্ড পুস্তকগুলির অঙ্গসজ্জা পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। অনুবাদক—পি লাল, প্রকাশনা — রাইটার্স ওয়ার্কশপ, ১৬২।৯২ লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৪৫, দাম—প্রতি খণ্ড আট টাকা।

জাহাঙ্গীর নামা / মিত্র ও ঘোষ

আলোচ্য গ্রন্থটি বিখ্যাত মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মকথা বা স্মৃতিচারণ। সিংহাসনে আরোহণের দিনটি থেকে পুরো দ্বাদশ বৎসরের বিবরণ এতে প্রদত্ত। দিনপঞ্জীর ধরণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ঘটনাসমূহ। ইতিহাসের মতে জাহাঙ্গীর স্বভাবত ছিলেন অলস ও আমোদপ্রয়াসী, কিন্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধেও তিনি যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি যে তীক্ষ্ণধী ও বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ইতিহাসের প্রয়োজন এই রচনা অনেক ভাবেই মেটাবে। এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে অনুবাদকদ্বয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছেন, আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। লেখকদ্বয়—শচীন্দ্রলাল রায় ও অধ্যাপক সোমেন্দ্রলাল রায়, প্রকাশনায় – মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম— আট টাকা।

এক চামচ গঙ্গা / মিত্র ও ঘোষ

প্রখ্যাত সাহিত্যকারের এই নতুন রচনা, পাঠককেও নতুন করে খুশী করবে। অনবদ্য ভঙ্গীতে কাহিনী পরিবেশন করেছেন প্রবীণ লেখক। তাঁর অপরাপর রচনার মতই এই উপন্যাসও নায়িকাপ্রধান, বস্তুত নায়িকা বুলুই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠক মনকে টেনে রাখে। দুঃখ দৈন্য, অভাব অভিযোগ সর্বোপরি ভাগ্যের চরম মার খেয়েও যে নারী দমে না, জ্বলতে থাকে অমলিন দীপশিখার মত তেমনই এক ভাস্বতী নারী বেরিয়ে আসে বুলুর রক্তমাংসের খোলসটার ভেতর থেকে বার বার। সে দীপ্তিতে আলো আছে জ্বালা নেই, তাই বোধ করি রমেন পারলো শেষ পর্যন্ত তাকে জীবনে বরণ করে নিতে বিনা দ্বিধায়, অসংশয়ে। সব গ্লানি সব কলুষের ওপর জয়লাভ করলো ওদের কালজয়ী প্রেম। ভাষার জোরে কাহিনীর আবেদন দুর্বার ও প্রাণস্পর্শী, আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রকাশনা—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা।

প্রেমিক / আনন্দ পাবলিশার্স

মানুষের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় রহস্য হল প্রেম, এই প্রেম ভিখারীকেও দেয় রাজাধিরাজের মহিমা, নগণ্যকেও করে তোলে বরণীয়। অশিক্ষিত, অমার্জিত ভবঘুরে কমলমুকুলের প্রাণে জ্বলেছিল এক অমলিন প্রেমের দীপশিখা যার আলোয় সে নিজেই শুধু উদ্ভাসিত হল না, প্রেমকেও দিল এক নতুন গরিমা, নতুন মূল্য। অভিজাত তনয়া সুন্দরী ইভাকে ভালবেসেছিল কমলমুকুল, কিন্তু সে প্রেমে ছিল না কোন ভোগেচ্ছা, ব্যক্তিগত কামনার কোন ছায়া। প্রিয়তমার কল্যাণ কামনাতেই শুধু তৃপ্ত হল সেই সর্বজয়ী প্রেম, চিরদিন পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সুধাক্ষরিত হল কমলমুকুলের বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে প্রিয়ার উদ্দেশে তবু মুহূর্তের জন্যও আত্মসংযম হারালো না সে। অনবদ্য ভঙ্গীতে স্বর্গীয় এক প্রেমের শুভ্র ছবি এঁকেছেন লেখক, পড়তে পড়তে অনাবিল আনন্দে প্লাবিত হয়ে যায় পাঠকের হৃদয়। এমনটা কি সত্যিই হয়, এ সন্দেহ জাগলেও, এমন হলে যে ভাল হয় একথা স্বীকার করবেন সকলেই। প্রচ্ছদ ভাল, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—মনোজ বসু, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—ছয় টাকা।

আমি কান পেতে রই / মিত্র ও ঘোষ

সার্থক এপিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায় এ গ্রন্থ তাই। স্বনামধন্য সাহিত্যকার পরিণত কলমের সমস্ত শক্তি সংহত করে রচনা করেছেন এই উপন্যাস, বস্তুত এই রচনা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একটি মাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে—সে সুরবালা,

এই গ্রন্থের নায়িকা। সামান্য দারিদ্রের কুটিরে জন্মগ্রহণ করে ও নিজের অসামান্য রূপ ও গুণের প্রসাদে সুরবালা জীবনে পেয়েছিল সবই, অর্থ নাম যশ তো ঘটেই এ ছাড়াও জীবনের পরম পাওয়া অর্থাৎ প্রেমের দাক্ষিণ্যেও বঞ্চিতা হয়নি সে, তবু জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে গেল সে ভগবানকে আশ্রয় করেই। কুশলী কথাকারের তুলির টানে টানে মানব জীবনের চরম ও পরম অনুভূতিগুলি যেন মূর্ত হয়েই ধরা দেয় পাঠকের মানসে। প্রেমের যে রূপ তিনি ফুটিয়েছেন তাতে বিস্ময় জাগে মনে, দয়িতকে পাওয়ার আনন্দে উচ্ছল সার্থক প্রেমের মহিমা যেন ফুটে উঠেছে সুরবালা ও রাজাবাবুর প্রেমকে কেন্দ্র করে তেমনি ত্যাগের মাধ্যমে বঞ্চিত প্রেমের বেদনা শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে সুরবালা ও কিরণকে আশ্রয় করে। সত্যকার প্রেম যে নানাভাবেই জীবনকে নাড়া দিয়ে যেতে পারে এই সত্যই যেন সোচ্চার গ্রন্থোক্ত কাহিনীর মাধ্যমে। আর শৈলী বা ভাষার তো কথাই নেই, বড় গায়কের সঙ্গে দক্ষ সঙ্গতকারের মতই মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ কাহিনীকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে, লেখকের অনবদ্য শৈলী। যে সময় ও যে পরিবেশে কাহিনী গড়ে উঠেছে, নিখুঁত শৈলীর মাধ্যমে সেইকাল ও সেই পরিবেশকে পরিবেশন করেছেন লেখক এবং একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে কতকটা সেজন্যও এতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে তাঁর রচনা। চরিত্র সৃষ্টিতেও আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি, এই মহতী গ্রন্থে বহু চরিত্রেরই সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু তারা কেউই ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, আপন আপন ক্ষেত্রে প্রতিটি চরিত্রই সার্থক ও উজ্জ্বল। বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রচনা নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল সংযোজন এবং এর আবেদনও চিরকালীন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রকাশনায়—মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—চৌদ্দ টাকা।

বকুল বাসর / অমর সাহিত্য প্রকাশন

স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভঙ্গীতে অনাড়ম্বর প্রেমের এক কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক আলোচনা গ্রন্থে। ছোট্ট মফস্বল শহরে লেকচারার হয়ে এসে জড়িয়ে পড়ল কমলেশ বকুলবাড়ির মায়ায়। বকুলবাড়ি নামে বাড়িটির সবই কেমন যেন অদ্ভুত, গৃহকর্ত্রী মিষ্টিমাসিমা থেকে তাঁর আশ্রিত পরিজন সকলকেই কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকে কমলেশের চোখে। মিষ্টিমাসিমা নিজে তো এক মূর্তিমতী রহস্য, গোঁড়া হিন্দুঘরের বিধবা হয়েও তিনি লালপাড় শাড়ী, শাঁখা সিঁদুর ভূষিতা, মৃতপ্রায় একটা বকুল গাছের ওপর তাঁর অবিশ্বাস্য মমতা। তাঁর দুই ভাশুরপো সিদুবাবু ও বীরুবাবু ভাসুর-ঝি সকলেই কেমন যেন অন্যধরণের, কিছুই বুঝতে পারেনা কমলেশ এক রহস্যময় গোলকধাঁধায় ঠোক্কর খেতে থাকে ওর মন অবিরত। অবশেষে ধীরে ধীরে খসে পড়তে থাকে রহস্যের অবগুণ্ঠন, প্রৌঢ়া বিধবার অন্তরস্থ বেদনার ধারাটির মূলে পৌঁছতে পারে সে অনেক ধৈর্য অনেক প্রতীক্ষার পর, সেই সঙ্গে উন্মোচিত হয় আপাত-কঠোর দেবযানী বা দেবীরও হৃদয় রহস্য। সফলকাম কমলেশ ও দেবীর মনের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটে যায়, নতুন আগ্রহে নবজীবনের পথে পা বাড়ায় তারা। একটু সিনেমাগন্ধী হলেও কাহিনীটি বিশ্বস্তভাবেই পরিবেশিত, লেখকের শৈলীও আকর্ষণীয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

সাগিনা মাহাতো / আনন্দ পাবলিশার্স

কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমেই কাহিনী বিবৃত, লেখকের স্মৃতিচারণও বলা যায় একে। বসন্দা, দিদ্দা, কমরবীদি, শরৎদা, কমরেড নির্মলা সেন ও সাগিনা মাহাতো মোট এই ছয়টি চরিত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে কাহিনী। টুকরো টুকরো কাহিনীগুলি তাব বা তত্ত্বপ্রধান নয়, মূলত যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেই চরিত্রকে স্পষ্ট করে ফোটাবার জন্যই যেটুকু ঘটনা বিস্তার করা প্রয়োজন সেটুকু করেছেন লেখক, চরিত্র সৃষ্টিই তাঁর কাছে মুখ্য আর সবই গৌণ। একাজে সফলও হয়েছেন তিনি, প্রতিটি চরিত্রই ফুটে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে উজ্জ্বল ভাবেই। বসন্দা ও সাগিনা মাহাতো চরিত্র দুটি তো বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। লেখকের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকেই পটভূমি স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে যার একটা নিজস্ব মূল্য উপস্থিত। লেখকের শৈলী একাধারে সরস ও স্নিগ্ধ। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—গৌরকিশোর ঘোষ, প্রকাশনায়—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—চার টাকা।

জীবনস্মৃতি / বেঙ্গল পাবলিশার্স

পরাধীন ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বা ত্রৈলোক্য মহারাজের এই আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণ নানা কারণেই উল্লেখ্য। অনুশীলন সমিতির সভ্য এই মহান বিপ্লবী বলতে গেলে আজীবন নির্যাতন ভোগ করেছেন দেশের জন্য, বিদেশী রাজশক্তি তাঁকে বারবার কারারুদ্ধ করেছে, নির্বাসনে পাঠিয়েছে তবু পারেনি তাঁর মনের দেশপ্রেমের আগুনকে নির্বাপিত করতে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ দিকের অন্তরঙ্গ পরিচয়ও কিছুটা বিধৃত এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। সবদিক জড়িয়ে গ্রন্থটি প্রামাণ্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। গ্রন্থকারের অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক বাচনভঙ্গী মনকে স্পর্শ করে। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), প্রকাশনা—বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাইভেট, লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—চার টাকা।

আকাশ কুসুম / গ্রন্থ প্রকাশ

বর্তমান যুগের মধ্যবিত্ত সমাজের কয়েকটি নর-নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রন্থোক্ত কাহিনী। শোভাকর সুদর্শন স্বাস্থ্যবান অলস স্বভাববিশিষ্ট এক যুবক, স্ত্রী দেবকীর উপার্জনে সংসার চলে। দেবকী থিয়েটারে কাজ করে সংসার চালায়। ভালবেসে বিয়ে করলেও স্বামীর স্বভাবগত শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্টই সচেতন, ফলে পাশাপাশি বাস করেও দাম্পত্য সম্বন্ধের সহজ মাধুর্যটুকুও ক্রমেই যেন হারিয়ে ফেলতে থাকে ওরা। এরই মধ্যে আবিষ্কৃত হয় যে দেবকী সন্তানসম্ভবা। নতুন আনন্দের জোয়ার লাগে শোভাকরের ঝিমিয়ে-পড়া দেহে মনে, নতুন করে সে বরণ করে নেয় দেবকীকে নিজের জীবনে। মোটামুটি গ্রন্থকারের বক্তব্য এটাই, তবু কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ করতে জুড়তে হয়েছে অনেক ডালপালা যার মধ্যে বরদা ও আরতির ঘটনাই প্রধান। তিক্ততা, ভুল বোঝাবুঝি, বাদ-বিসংবাদের পালা শেষ করে দেবকী ও শোভাকরের পরিণতি যথেষ্ট চমক জাগায় মনে, লেখকের ভূয়োদর্শিতা সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। নিপুণ ভঙ্গীতে সমস্যাবহুল জীবনের কথা বর্ণনা করেছেন লেখক, তাঁর বাস্তবসচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা না করে পারা যায় না। রচনাশৈলী সহজ ও সাবলীল। প্রচ্ছদ ইঙ্গিতপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—বিমল কর, প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—নয় টাকা।

রাজতরঙ্গিণীর দেশে / বর্ণালী প্রকাশনী

আলোচ্য গ্রন্থে বাঙালীর বীরত্বের কিছু প্রামাণ্য কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে উদ্ধার করে পরিবেশন করা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় বারশো বছর আগে, গৌড়বঙ্গ থেকে মুষ্টিমের ক'জন বাঙালী সেনা গিয়েছিল সুদূর কাশ্মীরে প্রভুহত্যার প্রতিশোধ নিতে, তাদের তরুণ রাজা যশচন্দ্রকে গুপ্তহত্যা করিয়েছিলেন কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য। প্রবল কাশ্মীরাধিপতির অগণ্য সেনাবাহিনীর সামনে তারা কতটুকু, কিন্তু তবু ভয় পায়নি সেদিনের বীর বাঙালী, মহারাজ ললিতাদিত্য অবধি পৌঁছুতে পারেনি তাদের হাতে, তবু অগণ্য শত্রু বধ করে ও সৈন্যাধ্যক্ষ রামস্বামীকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল তারা, নির্ভীক চিত্তে একে একে মৃত্যু বরণ করে বাঙালীর বীরত্বের মানদণ্ড তুলে ধরেছিল বিদেশীর চোখের সামনে, আবেগপূর্ণ ভাষায় বাঙালীর বীরত্বের এক লুপ্তপ্রায় নিদর্শন ইতিহাসের গহ্বর থেকে উদ্ধার করে মনোরম কাহিনীর মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন লেখক। ঐতিহাসিক এই রচনা পাঠকের মনোরঞ্জন করবে বলেই আমরা আশা করি। রচনাতে বানান ভুলের আতিশয্য একটু পীড়াদায়ক। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দ্বৈপায়ন, প্রকাশক—বর্ণালী প্রকাশনী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯, দাম—আট টাকা।

মেম-বাইজী / সুবর্ণরেখা

নতুন সুন্দর নতুন এক জগতের কথা শুনিয়েছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আমরা চিনি সৌখিন এক বিশেষ জাতি হিসাবে, দূর থেকে তাদের চটুল জীবনযাত্রার ছন্দও চোখে পড়ে, কিন্তু সে আর কতটুকু। নাচের তোড়ে হাল্কা প্রজাপতির মত বিচরণ সুসজ্জিতা অ্যাংলো তরুণীর, দেখলে মনে হয় ওর দুনিয়ায় বোধ হয় অভাব অভিযোগ, দুঃখ দৈন্যের কোন স্থান নেই, ও যেন চিরযৌবনা স্বর্গ নর্তকী উর্বশী; কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওই সুন্দরী মেম বাইজীও তো আসলে চিরন্তনী কল্যাণী নারী; ঝকমকে বহিরাবরণের অন্তরালে সেও যে মাতা, কন্যা, জায়া ব্যতীত আর কিছুই নয় বর্তমান কাহিনীতে সেই সত্যই স্বপ্রকাশ। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি আছে, খুব বিশ্বাস্য ভাবেই তিনি বিশেষ এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের চিত্রিত করেছেন। মনে হয় বুঝি বা খুব কাছে থেকেই দেখেছেন এদের। আন্তরিকতাপূর্ণ বাচনভঙ্গী রচনার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলে। প্রচ্ছদ শিল্পসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—এককড়ি ভট্টাচার্য, পরিবেশক—সুবর্ণরেখা, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, দাম—তিন টাকা।

সুষুপ্তি

অনিদ্রারোগে ভুগছেন কি? তাল করে পরীক্ষা করে দেখুন, কারণ খুব সম্ভবত হজমের গোলমাল, অসম খাদ্যগ্রহণ, গুরুভোজন, অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ পান, উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ, বা অত্যধিক পরিশ্রম।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, এর প্রতিবিধান হচ্ছে, কারণটা খুঁজে তাকে দূর করা। মনোবল এতে আপনার সহায়ক হবে খুবই।

অনেকে পিল খেয়ে প্রতিবিধান করেন, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় না হলে এটা না করাই ভাল। স্বাভাবিক নিদ্রা আপনাকে যেমন তৃপ্তি দিতে পারবে, কোন পিলই তা পারবে না।

দেহে ও মনে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আনতে পারলে তবেই দেবতার আশীর্বাদের মত নিদ্রা আসবে আপনাকে নবজীবন দিতে।

একটা ভাল উপায় হচ্ছে, ঘুমোবার আগে শুয়ে কোন বই পড়া—অবশ্য কোনও উত্তেজক বা রোমহর্ষকারী কাহিনী পড়া উচিত নয়, কেন না এতে স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।

রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে গরম পানীয় কিছু খেলে ভাল হয়; কিন্তু ভারী খাবার নৈব নৈব চ। শয়নকক্ষটিতে বায়ু চলাচল অবশ্যই ভাল হওয়া চাই।

অনেকে আবার কঠিন অনিদ্রার প্রতিবিধান করতে শোবার আগে গরম জলে স্নানের বিধান দেন।

পুতুল নাচের কাহিনী

[খালি স্টেজ। রাস্তার দৃশ্য। কালো আলখাল্লা, মাথায় টুপি পরে নাট্যকার ঢুকবে। অন্ধকারে হাল্কা আলো কেবল তাকেই ঘিরে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা খালি কাঠের বাক্স যোগাড় করে তাতে কিছুক্ষণ বসবে। একটু বাদেই রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠবে। পেছনে দৃশ্যপটে গলির দৃশ্য। অনেক বাড়ী।]

নাট্যকার। কই, লোকজন ত' বিশেষ দেখছি না। আমার পালা তাহলে জমবে কেমন করে। তবু স্টেজটা অন্তত সাজিয়ে ফেলা যাক। (পকেট হাতড়ে একটা কাগজ নিয়ে) হুঁ—কি কি লাগবে? একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরোয়া-দৃশ্য অতএব একটা টেবিল চাই। ফুলদানী—তাতে ধূলোমাখা কাগজের ফুল। চেয়ারও আছে গোটা দুই। দেওয়ালে ফটোতে শুকনো মালা। তক্তপোষে অগোছালোভাবে বই-পত্র সাজানো—

(বলতে বলতে স্টেজ অন্ধকার হয়ে আসবে। পর্দা পড়ে যাবে। কিন্তু কথা শোনা যাবে নেপথ্যে)

যেমন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ীর বাইরের ঘর থাকে। এ-পরিবারে দুটো মানুষ' উর্মিলা আর শঙ্কর। ওরা কেমন মানুষ! ভালোও নয়, মন্দও নয়। মানুষ যেমন হয়। আমাদের ভুল কোথায় জানেন, আমরা মানুষকে হয় শাদা নয় কালো বলে ধরে নিই। তার কোন কাজ অথবা চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে লোহার শিক পুড়িয়ে পিঠের চামড়ায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখে রাখি লোকটা ভালো অথবা মন্দ। কিন্তু কেউ কি পুরোপুরি ভালো থাকতে পারে। অথবা একেবারেই মন্দ কি কেউ হয়। মানুষ আসলে মানুষ। যা বলছিলাম, এই উর্মিলা আর শঙ্করকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছি। বেশ ভালো করে মন দিয়ে শুনছেন তো; একটা গল্প। গল্প অবশ্য জীবনেরই ছায়া। কিন্তু ছায়া জীবন নয়। অতএব গল্পকে যদি সত্যি বলে ধরে নিতে চান, তাহলে কিন্তু ভয়ানক ভুল করবেন। আমি জানি, আপনারা যাঁরা আজ নাটক দেখতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই উর্মিলা শঙ্করের মত। হয়তো পুতুলনাচ দেখতে দেখতে নিজেদেরই আয়নার মধ্যে বার বার আবিষ্কার করবেন,

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

তাতে চমকানোর কিছু নেই। আমি তো রূপকথার গল্পের চেয়ে সাধারণ মানুষের কথাই বলেছি। সেদিন একজন দর্শক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—পুতুল নাচের ব্যাপার মশাই রাজ-রাজড়াদের। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র অথবা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে লড়াই হবে—আমরা হাততালি দেব। সে সব ছেড়ে একটা জলো পানসে সস্তা গল্প বেছে নিয়েছেন কেন? ছ্যা: ছ্যা: আমাদের পয়সাই জলে গেল। কথাটা মিথ্যে বলেন নি ভদ্রলোক। আপনারা নিশ্চয় রোজকার ডাল-ভাত খাওয়া জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে এখানে অন্যরকম কিছু পাবেন মনে করেই এসেছেন, কিন্তু একটা কথা গোড়াতেই আপনাদের আমি বিশেষ করে বলতে চাইছি। সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। সে আসলে নিরীহ ছাপোষা অতি সাধারণ জীব হলেও হাসি-কান্না তার পৃথিবীকেও তোলপাড় করে দিতে পারে। সে হয়তো ভুলও করে। আগেকার রাজ-রাজড়ার দল বিশাল চৌহদ্দির মধ্যে বড় বড় সুখ-দু:খের টানাপোড়েনে যে গল্পের সৃষ্টি করত. এ হয়তো সে জাতীয় রোমহর্ষক ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতেও পারবে না। অতি মামুলী চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, অতি সামান্য সুখ-দু:খ, এই নিয়েই তার জীবন।

তবুও এই মানুষের কথা আপনারা আজকে ভাবুন। এর দু:খে হয়তো রাজসিংহাসন টলে না, কিন্তু আপনাদের মনের মধ্যে একটু ব্যথা টনটন করে উঠুক।

ভালোও নয়, মন্দও নয়, এই হোল মানুষের পরিচয়। আমার গল্পের শুরুতে আপনারা দেখতে পাবেন উর্মিলা ও শঙ্করকে, তাছাড়া আরও কয়েকটি চরিত্র রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন অন্তত ওদের জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়েছিল। তার নাম অসীম। আপনারা নিশ্চয়' বস্তাপচা একটা ত্রিভুজ গল্পের সূচনায় বিরক্ত হয়ে উঠছেন। আচ্ছা দেখাই যাক না, শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়ায়।

(পর্দা একটু নড়ে উঠতেই)

দাঁড়াও, এখনও আমার ভূমিকা শেষ হয়নি। নাটকের স্থান, কাল বোঝাতে হবে। কেবল পাত্র-পাত্রীর পরিচয় দিলেই তো কাজ ফুরিয়ে যায় না। স্থান ধরে নিন একটা বেনামী পচধরা পুরান শহর। এমন শহর, যার আকাশ ক্রমশ ইমারত, ধোঁয়া আর উপেক্ষার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। খোলা বাতাস যেখানে কৃত্রিম উপায়ে ঘরে ঢোকাতে হয়। জীবনের চাকা যে শহরের কর্দমাক্ত পরিবেশে একটু একটু করে অচল হয়ে উঠছে। আর সময়, ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের শেষের কয়েকদিন। খবরের কাগজে বন্যা, ধস, মৃত্যুর খবর, বেকার মানুষদের আশাহীন জীবনের রোজ-নামচা ও ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের আশ্বাস ও কেনেডি হত্যাকাণ্ড সন্দেহের ছায়ায় বিবর্ণ।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস একভাবে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু সংসারের ছোট গণ্ডীর মধ্যে তার ছায়া কতটুকু নাবে, মানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাস তারই নিজস্ব। এবার পর্দা সরিয়ে দাও।

[পর্দা সরে গেলে দেখা যাবে একটি সাধারণ ঘর। যেমন গোড়ায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। অযত্নের ছাপ সর্বত্র। নায়ক ব্যস্ত হয়ে ঢুকবে। তার হাতে কয়েকটি সুতো। একটি সুতো টানতে টানতে সে উইংসের বাঁদিকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ডান-দিক দিয়ে ঊর্মিলার প্রবেশ। তার বাঁহাতে সুতোটা জড়ানো।]

ঊর্মিলা। যতই দিন যাচ্ছে, আমার সব কিছু অসহ্য হয়ে উঠছে। এই চারটে দেওয়াল, উনুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সকাল বিকেল, জীবনের এই একঘেয়েমির মাঝখানে আমি কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাব। (সুতোর টান পড়বে) না, না, এ কি বলছি আমি। (একটু হেসে) সত্যিই বোধ হয় পাগল হবার যোগাড়। তা না হলে পার্ট তো আমি মুখস্থ করে রেখেছি। ভুল হবার কথা নয়। (হঠাৎ হাব-ভাব বদলে ঘর গোছাতে শুরু করল) আমার জীবনে এমন আর কি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমার চাইতে ও বাড়ীর শ্যামার মার অবস্থা কত খারাপ। তার স্বামী মাতাল, প্রায়ই চাকরী থেকে ছাঁটাই হয়, তিন-চারটে অসুস্থ ছেলে-মেয়ে। খেতে দিতে পারে না ভালো করে। আমার তো সে জাতীয় কোন নালিশ নেই। সত্যিই নেই। সাধারণ মানুষের তুলনায় আমি সুখী। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই সুখী। (একমিনিট নিস্তব্ধতার পর হাসির শব্দ) কে যেন হেসে উঠল মনে হোল। কেন, কেন হাসছ তোমরা আমার কথা শুনে। আমার স্বামী মোটামুটি ভালই মাইনে পায়, অন্তত আমাদের দুটো মানুষের দিব্যি চলে যায় তাতে। সংসারের কাজ সেরে আমি সন্ধ্যাবেলা বেশ খানিকটা অবসর পাই। মাঝে মাঝে মাথার একটা যন্ত্রণা হয় এখানে। এ ছাড়া অন্য কোন অসুখ আমার নেই। এ-পাড়ার প্রত্যেক লোকেরই আমাদের দেখে চোখ টাটায়। তবে কেন আমি নিজেকে সুখী বলতে পারি না ; আমার স্বামী ? বিয়ের আগেই পরিচয় ছিলো আমাদের। পাশের বাড়ীর ছাত ও আমাদের দালানের বারান্দা—এ দুটো জগতের মাঝখানে বোধ হয় কয়েক গজ তফাৎও ছিলো না। সাত বছর আগে ভাব করে ভালোবেসে গুরুজনদের মৌন আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে আমরা বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পরের বছর একটি ছেলেও হয়েছিলো, কিন্তু বাঁচল না শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ ঐ একটাই দুঃখ যা আমার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে কান্নার ঝড় তোলে। তা না হলে, তা না হলে—

(২য় সুতোর টান পড়াতে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। (বিরক্ত হয়ে) আজকাল নিজের মনে সারাক্ষণ কথা বল কেন ?

ঊর্মিলা। (অপ্রতিভ হয়ে) নিজের মনে কথা বলছিলাম বুঝি ? আমার কেমন যেন মনে হোল কেউ আমাকে কিছু প্রশ্ন করছে।

শঙ্কর। কি যে হয়েছে তোমার জানি না। অ্যাবনর্মাল।

ঊর্মিলা। তোমার ফিরতে আজ এত দেরী ?

শঙ্কর। রোজ রোজ এক কথা—কেন দেরী হোল ? কোথায় গিয়েছিলে, কার কাছে গিয়েছিলে। যখন স্পষ্টই বুঝতে পার যে আমি কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে প্রস্তুত নই—(ঊর্মিলা কথার জবাব না দিয়ে তক্তপোষের উপরে ছড়ানো বইগুলো গোছাতে শুরু করল। শঙ্কর শার্টটা খুলতে খুলতে পাশের ঘরে যাবার মুখে বলল) চা-এর ব্যবস্থা কর। অসীম আর ঝর্ণা আসবে।

ঊর্মিলা। চা-এর ব্যবস্থা করাই আছে। আমি জানি অসীম আর ঝর্ণা আসবে। (শঙ্কর চলে যাবে) হয় ওরা আসবে, অথবা আমরা যাব। এ আমাদের অলিখিত রুটিন। (শঙ্কর ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলবে—রেডিওটা খুলে দাও। সুচিত্রা মিত্রের গান আছে) রেডিও বাজছে না। দুপুরবেলা হঠাৎ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

শঙ্কর। (ভেতর থেকে) জ্বালাতন। বাড়ীতে যদি একটা কিছু নিয়মে চলে। মাসের শেষে এখন মেরামতের জন্যে আবার খালি পকেট হাতড়াও। ভালো লাগে না কিছু।

ঊর্মিলা। (চমকে উঠে) ভালো লাগে

না। কিছু ভালো লাগে না।
এ কথাটা তুমিও বললে। কি আশ্চর্য। তোমারও কিছু ভালো লাগে না। তবে—তবে আমাদের এই জীবনের মানে কি? (এই সময় বাঁদিক থেকে নায়ক এসে দাঁড়াবে। মুখে-চোখে ভ্রূকুটি—সুতো ধরে জোরে জোরে টানবে) না, না, আমারই দোষ। আজ যে কি হয়েছে আমার? সব কিছু কেমন উল্টো-পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। যে সব কথাগুলো সারা জীবন ধরে মুখস্থ বলে যাবার কথা—তাতেও এত ভুল হচ্ছে। অসহ্য।

শঙ্কর। (পোষাক বদলে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে) দেখি, কি হয়েছে রেডিওর? জোরে জোরে ঘুরিয়েছিলে বুঝি?

ঊর্মিলা। মোটেই না। দুপুরবেলা মহিলামহলে নতুন রান্না শেখাচ্ছিল। তাই লিখছিলাম খাতায়। আমার মনে হয় ভালভ্ কেটে গেছে।

শঙ্কর। (রেডিও ছেড়ে) আপদ চুকেছে। আমার কোন চিঠিপত্র এসেছে?

ঊর্মিলা। ঐ তো টেবিলে ফুলদানীর নীচে। (শঙ্কর পেছন ফিরে দুটো খাম খুলে পড়তে শুরু করবে) শুনছ।

শঙ্কর। (অন্যমনস্ক গলায়) হুঁ—

ঊর্মিলা। আজকে একটা সিনেমায় গেলে হোত না।

শঙ্কর। (মুখ ঘুরিয়ে) সিনেমা? অসীম ঝর্ণারা মনে করছ সাতটার আগে এসে পৌঁছাবে।

ঊর্মিলা। (ইতস্তত করে) যদি শুধু আমরাই যাই। না না ওদের খবর পাঠিয়ে দেব। বরং উপরতলার মাসিমার বাড়ী থেকে টেলিফোন করে দিই একটা।

শঙ্কর। সারাদিন অফিসে খেটে-খুটে এখন অত হাঙ্গাম। পোষাবে না। (ভক্ত-পোষে তাকিয়ায় মাথা দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় একখানা বই হাতে) যতক্ষণ না ওরা আসে, আমার এই ডিটেকটিভ নভেলটা শেষ করে ফেলি। তারপর চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

ঊর্মিলা। (উৎসাহ নিভে এলেও) আজ পূর্ণিমা—লেকের ধারে বেড়াতে যাবে?

শঙ্কর। (বই বন্ধ করে উঠে বসে) তোমার আজ নির্ঘাত কিছু একটা হয়েছে। খুব সিরিয়াস কিছু। কার্তিক মাসের হিম মাথায় করে নইলে লেকের ধারে কবিত্ব করার শখ জাগে।

ঊর্মিলা। (হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে) হ্যাঁ—আমার একটা কিছু হয়েছে। নিশ্চয় হয়েছে। তুমি তোমার অফিস, তোমার বন্ধু-বান্ধব, ডিটেকটিভ, নভেল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত এসব নিয়ে মেতে আছ। তুমি কি করে বুঝবে আমার মনের মধ্যে কি হয়। দিনের পর দিন পাশাপাশি একই ঘরে বাস করছি—লোকে ভাবে একই সঙ্গে হাসছি কাঁদছি, একই চোখ দিয়ে জীবনকে দেখছি, কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ—আমাদের মাঝখানে কি বিশাল দূরত্ব।

(এবারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জোরে জোরে পায়ের শব্দ করে নাট্যকারের প্রবেশ)

নাট্যকার। কি হচ্ছে কি ঊর্মিলা? আমি আজ একটি সাধারণ ঘরোয়া জীবনের ছবি মাননীয় দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। একটানা রিহার্সেল দেওয়া হয়েছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তোমাকে শিখিয়েছি না—সূর্য কোনদিকে ওঠে?

ঊর্মিলা। (যান্ত্রিক সুরে) পূবদিকে।

নাট্যকার। কোন দিকে অস্ত যায়?

ঊর্মিলা। পশ্চিম দিকে।

নাট্যকার। এখন কি মাস?

ঊর্মিলা। অক্টোবর।

নাট্যকার। কোন খৃস্টাব্দ?

ঊর্মিলা। উনিশ শ' আটষট্টি।

নাট্যকার। জীবন সম্পর্কে তোমার কোন নালিশ আছে? তুমি বলতে পারো এটা অথবা ওটা, তুমি পাওনি—সাধারণ মানুষ যা পেলে বর্তে যায়।

ঊর্মিলা। (টেনে টেনে) না—জীবন সম্পর্কে আমার কোন নালিশ নেই। যা পেয়েছি, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

নাট্যকার। তাহলে থেকে থেকে ওরকম বেহিসেবী কথাবার্তা বলছ কেন? তোমার তো সব কিছুই মানিয়ে চলার কথা।

ঊর্মিলা। (একই সুরে) আমার সব কিছুই মানিয়ে চলার কথা।

নাট্যকার। তাহলে তাই কর।

ঊর্মিলা। তাই করব।

নাট্যকার। আর ভুল হবে না ত'?

ঊর্মিলা। না, আর ভুল হবে না।

(শঙ্করের হাতে বাঁধা সুতোয় টান দিয়ে নাট্যকার বেরিয়ে যাবে)

শঙ্কর। তোমার বোধ হয় মাথা ধরেছে ঊর্মিলা। একটা অ্যাসপিরিন খাও। (টেবিলের ড্রয়ার থেকে খালি শিশি ঝেঁকে) আঃ কখন যে ফুরিয়ে যায় তারও খেয়াল থাকে না। বসন্ত কোথায়, ডাকো তাকে। কিনে নিয়ে আসুক ডাক্তারখানা থেকে।

ঊর্মিলা। বসন্ত বাজারে গেছে, তারপর তাকে রান্না চাপাতে হবে। আমার ওষুধের দরকার নেই।

শঙ্কর। তাহলে দয়া করে আমাকে আর জ্বালাতন কোর না। দিলে সন্ধ্যেটা মাটি করে। আমার গল্প পড়ার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল। (সশব্দে বই বন্ধ করে বইটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে) এদিকে এসো। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা। (সংযত গলায়) কথা? আমার সঙ্গে। (হেসে) আমার সঙ্গে আবার কি নতুন কথা থাকতে পারে?

শঙ্কর। নতুন নয়—খুবই পুরোন কথা। ভালো করে ভেবে জবাব দেবে কিন্তু। আচ্ছা উর্মিলা, আমাদের জীবন এরকম হয়ে গেল কেন?

উর্মিলা। কি রকম? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

শঙ্কর। সাত বছর আগে যখন তোমাকে প্রথম দেখি, তখন তুমি সম্পূর্ণ অন্য আরেকটা মানুষ ছিলে।

উর্মিলা। তা হবে।

শঙ্কর। আর এখন তুমি কি হয়ে গেছ? আয়না দিয়ে নিজের মুখও বোধ হয় দেখ না।

উর্মিলা। (উঠে দাঁড়িয়ে) মানুষ মাত্রেই বদলে যায়। আমি যাই, চায়ের জল চাপিয়ে দিই গে। ওরা এসে পড়বে এখুনি। একবার বাজারে গেলে—সে হতভাগা তো সহজে ফিরবে না।

শঙ্কর। আমার মনে হচ্ছে প্রশ্নটা তুমি এড়িয়ে গেলে।

উর্মিলা। গোলমেলে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। যা জানো তারই সহজ সরল উত্তর লিখে যাও জীবনের খাতায়। অনায়াসে পাশ মার্ক পেয়ে যাবে।

শঙ্কর। আমাদের কথা না হয় থাক। কিন্তু অসীম আর ঝর্ণা। ওরা কি সুখী।

উর্মিলা। আমি জানি না।

শঙ্কর। কি আশ্চর্য— এতদিন এত ঘনিষ্টভাবে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করলে, কিন্তু ওরা সুখী না অসুখী—তাও বলতে পার না।

উর্মিলা। তুমিও আজ শেখানো কথা ভুলে যাচ্ছ। ওরা আসার আগে আমাদের একচোট ঝগড়া হয়ে যাবার কথা। কোন সামান্য উপলক্ষ—কিন্তু ঝগড়াটা সামান্য নয়। হাব-ভাবে প্রকাশ পাবে আমরা পরস্পরকে কতখানি ঘৃণা করি। স্পষ্ট করে অবশ্য কেউ কাউকে কিছু বলব না।

শঙ্কর। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) যাক্ গে—মিস্ত্রি রান্নাঘরের কল সারিয়ে দিয়ে গেছে?

উর্মিলা। হাঁ। দেড় টাকা চেয়েছিল—আমি একটা টাকা দিয়ে বিদেয় করেছি।

শঙ্কর। আজকাল এরা সবাই ডাকাত হয়ে উঠেছে। আর পেরে ওঠা যায় না। হ্যাঁ, ভালো কথা, শিবানীদের খবর নিয়েছিলে?

উর্মিলা। বসন্তকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সকালেই। ছেলের জ্বর নেই, কিন্তু মেয়েটা কাল থেকে পড়েছে। গায়েও নাকি কি সব বেরিয়েছে। ভাবছি একটু ফলটল কিনে পাঠিয়ে দেব।

শঙ্কর। তাতেই তোমার কর্তব্য ফুরিয়ে গেল? আজ একমাস ধরে বাড়ীশুদ্ধ লোকের অসুখ-বিসুখে হিমসিম খাচ্ছে মেয়েটা। আমার মনে আছে সেজ পিসিমার টাইফয়েডের সময় মা রাতের পর রাত জেগে রুগীর সেবা করতেন।

উর্মিলা। (কঠিন গলায়) আমি ভাড়া-করা নার্স নই। সমস্ত দিন সংসারের ঘানি টেনে আর রাত জাগা পোষাবে না। তাছাড়া—তাছাড়া কি কর্তব্য তা আর কেউ শেখায় সেটা আমি চাই না।

শঙ্কর। নিজেকে দেখছি খুব বড় মনে কর আজকাল।

উর্মিলা। প্রত্যেকেই করে। তুমি নিজেও।

শঙ্কর। আমার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে তোমার এই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত হাবভাব মোটেই প্রশংসা করার মত নয়। তাছাড়া শিবানী আমার ছোট বোন।

উর্মিলা। শিবানী তোমার ছোট বোন, অতএব আমাকে তার সুখ-দুঃখে নিজের কথা ভুলে ক্রমাগত তাল দিয়ে যেতে হবে। কি পেয়েছি আমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে? প্রথম তিন-চার বছর ভালো করে কথা পর্যন্ত কেউ বলেনি—কারণ ওদের ধারণা ছিলো তোমাকে ঠকিয়ে আমি এই সংসারে জায়গা জুড়ে বসেছি। অনেকবার তোমার মাকে বলতে শুনেছি কারা যেন নগদ তিন হাজার টাকা, তাছাড়া বারাসতের ওদিকে কয়েক কাঠা জমি পর্যন্ত লিখে দিতে প্রস্তুত ছিলো। আর সেই মেয়েও নাকি আমার চেয়ে ফর্সা। আত্মীয়-স্বজনের কথা শুনলেই পারতে বাধ্য ছেলের মত।

শঙ্কর। না শুনেই বোধ হয় ভুল করেছি।

উর্মিলা। কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক তা যদি আমাদের কেউ শিখিয়ে দিতে পারত।

শঙ্কর। আমি এখুনি শিবানীর ওখানে যাচ্ছি। আলমারীর চাবী দাও—একশিশি হরলিক্স্ আর যা যা দরকার কিনে নিয়ে যাব। (উর্মিলা টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবী খুলে ছুঁড়ে দিল) অসীম আর ঝর্ণাকে বোল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি ঘুরে আসব। ওরা যেন অপেক্ষা করে।

উর্মিলা। আলমারীতে সবশুদ্ধ টাকা ছ'য়েক মত পড়ে আছে।

শঙ্কর। কেন?

উর্মিলা। তোমার টাকায় আমি নিজের শখ মেটাই না। খরচ হয়ে গেছে, কেন তা আমি বলতে পারব না। হিসেবের খাতা আজ থেকে না হয় প্রতিদিন লক্ষ্য রেখো।

শঙ্কর। তাই রাখব। চিরকালই তুমি বেহিসেবী টাকা-কড়ির ব্যাপারে। অনেক আগেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। রক্ত জল করে টাকা রোজগার করতে হয়—

উর্মিলা। শস্তা থার্ড ক্লাশ নাটকের মত টাকা পয়সার কথা তুলে এই দাম্পত্য কলহে পৃথিবীশুদ্ধ লোককে বোকা বানানো যায় না। যে লোকটা সুতো টেনে টেনে পুতুল নাচের মহড়া দিয়েছে,

আমাদের নিয়ে—তার গল্পটা আগাগোড়াই ন্যাকামি, মিথ্যা আর মেলোড্রামায় ভর্তি। আমার মনে হয় এবার আমাদের ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত।

শঙ্কর। না, না কখনো না। আমাদের একটা সমাজ আছে, তার অনুশাসন আছে। যা ইচ্ছা তা কখনই আমরা করতে পারি না।

উর্মিলা। তা বলে অন্যের কথায় উঠতে-বসতে হবে?

শঙ্কর। নিশ্চয়। একশবার। অবশ্য আইন আদালতের সাহায্য নেবার ব্যবস্থা আছে—ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে সে পথ ধরতে পার।

উর্মিলা। তুমি তো তাই চাইছ। আমি কি তোমার মনের ভাব বুঝতেপারি না।

শঙ্কর। উর্মিলা, বাজে কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নেই। তুমি হয়তো ঠিকই বলছ। নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো অভিনয় করে এভাবে জীবন কাটানোর কোন অর্থ হয় না। আমাদের কোথাও আর এতটুকুও মিল নেই।

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

উর্মিলা। থাক, এ-প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করলেও চলবে। বোধ হয় অসীমরা আগেই এসে পড়েছে।

(শঙ্কর দরজা খুলে দিল)

অসীম। নিভৃতে কি আলাপ হচ্ছিল দুজনের? বেশ আছ বাবা দুজনে, একটা তৃতীয় প্রাণীর ছায়া পর্যন্ত ডিসটার্ব করতে পারে না। আর আমি তো বিয়ের পর থেকে এই ভদ্রমহিলাকে ধারেকাছে আর পেলামই না।

ঝর্ণা। পেয়ে আর কাজও নেই। আচ্ছা শঙ্করদা, একজন ভালো উকিলের নাম বলতে পারেন?

শঙ্কর। উকিল? ব্যাপার কি? তোমার সেই চা বাগানের মেসোমশাই উইলে তোমাকেই সব কিছু দিয়ে গেছেন নাকি?

অসীম। আরে না না। আমাদের কপালে সে সব জুটবে না। আজ এখানে আসার আগে তুমুল একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে, তাই উকিলের খোঁজ।

উর্মিলা। (হেসে) উকিল কি ঝগড়া মিটিয়ে দেবে?

অসীম। বিচ্ছেদটা পাকাপাকি করে দেবে অন্তত।

শঙ্কর। এমন ঝগড়া—যে ডিভোর্সের কথা ভাবতে হচ্ছে।

অসীম। আরে ছেড়ে দাও মেয়েদের কথা। কথা বলা মানেই ঝগড়া হওয়া। আমি আজকাল মৌনব্রত অবলম্বন করে গালাগালগুলো নির্বিঘ্নে হজম করি।

(নাট্যকার একবার স্টেজে ঢুকে এক-পাশে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করবে। শঙ্কর আর অসীম দাবার ছক নিয়ে বসবে। ঝর্ণা ও উর্মিল এককোণে বসে নিজেরা গল্প করবে)

নাট্যকার। এই যে দুটি নতুন চরিত্র এখন আপনাদের সামনে এসে দাঁড়ালো এরা এই শংকর উর্মিলার মতই সাধারণ দুজন স্বামী আর স্ত্রী। সংসারের বন্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে এদের মনেও ডাঙায় ওঠার অথবা তলিয়ে যাবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমি তা হতে দিই না। যেমন আছে ঠিক তেমনিই ওরা থাকে। তা না হলে জীবনকে আবার এই মঞ্চের আয়নায় ফুটিয়ে তুলতে পারব না। আমি জানি আপনাদের অনেকের মনেই ইবসেনের ডলস হাউস-এর চরিত্রগুলো উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে সব ঘটনা জীবনে খুব বেশী ঘটে না—গল্পে উপন্যাসে নাটকেই তাদের দেখা মেলে। সত্যিকারের জীবনে মানুষ সমাজের কাছে, পারিপার্শ্বিকতার কাছে, যুগের কাছে, এমন কি তার নিজের কাছেও স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছাচারিতাকে বিক্রি করে ফেলেছে। সে যা খুশী তা করতে পারে না। তারা সব আমার পুতুল নাচের পুতুল। আমি মাঝে মাঝে সুতোগুলো বেঁধে ওদের নাচাচ্ছি। আপ-নারা বোধহয় ওদের কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করেছেন কখনো কখনো বাজনা বেসুরো বেজে উঠছে। নিরেট দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে বন্ধ জানলার ছিটকিনি হঠাৎ খুলে ফেলার চেষ্টা। কিন্তু কেবল চেষ্টাই। ওদের বাইরের জানলা কোনদিনই খুলবে না। খুলতে পারে না। পুকুরের চারদিকই শান বাঁধানো. তাতে কি আর বাঁধ ভাঙা প্লাবন নামে; এই অসীমের সঙ্গে বিয়ের আগে উর্মিলার কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তারপর আকস্মিক আবার দেখা বিয়ের পরে। সেকথা কিন্তু দু' জনেই গোপন রেখেছে। অথচ মানিয়ে নেওয়া অভ্যস্ত জীবনে সেই পূর্ব-পরিচয়কে শংকর অথবা ঝর্ণা কেউই খুব একটা গুরুত্ব দিতো বলে মনে হয় না। সত্যি-কথা বলতে কি জীবনের রাস্তায় চলাটাই এত জটিল যে মানষের মন অথবা হৃদয় নিয়ে ভাবালুতার অবসর মেলে না। হয়তো একে অন্যকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করার সময় শ্লেষাত্মক অর্থে সে সব তথ্য ব্যবহার করে থাকে। আমরা বোধহয় সেই কারণেই উর্মিলা ও অসীমের এই অতীতের পরিচ্ছেদ-গুলো ভুলে থাকার অথবা গোপন করার প্রবণতা লক্ষ্য করছি। ঝর্ণা গান গাইতে পারে এবং শংকর তার গানের প্রচণ্ড ভক্ত। সেখানে অবশ্য লুকোচুরির প্রশ্ন ওঠে না। দেখা যাচ্ছে মানুষ তার নিজের পরিবেশকে নিয়ে কোনদিন সুখী হতে পারে না। সুখ নদীর এপারে নয়,—ওপারে। সাধারণ নদী হলে সাঁতার কেটে অথবা নৌকো চড়ে স্বচ্ছন্দে

ওপারে পৌঁছন যেত। কিন্তু এ নদী মনের নদী, কল্পনার নদী। এখানে পারাপার করতে পারে এমন মানুষ এখনো জন্মায় নি। আচ্ছা, এবারে আপনারা নিজেরাই স্বচ্ছন্দে এদের দেখুন, অথবা এই প্রাণহীন পুতুলের অস্তিত্বে নিজেদের প্রতিফলিত হতে দেখে নিজেদের সমস্যা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করুন। আপনাদের মনকে নাড়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাতে যদি সফল হতে পারি, তবেই এত পরিশ্রম সার্থক হবে।

(নাট্যকার এপারে বেরিয়ে যাবে)

অসীম। আজ তোমার দেখছি খেলার দিকে একটুকু মন নেই। অফিসে বড়সাহেবের বকুনী খেয়েছ বুঝি।

শংকর। (দাবার ছক উল্টে) না। আজ মন-মেজাজ বিনা কারণেই কি রকম স্যাঁৎসেতে ভিজে ভিজে লাগছে।

অসীম। সে তো আমাদের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বারুদ জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা কোনদিন হয়নি, কোনদিন হবেও না। তা নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। ঝর্ণার এক পিসতুতো দাদা বিদেশ থেকে ফিরেছে। (ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে) কোথায় থাকে যেন মহীদা।

ঝর্ণা। গত দু'বছর প্যারিসে আছে।

অসীম। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্যারিসের কথাই বলছিল। ওখানে প্রত্যেক মুহূর্ত যেন ছিনিয়ে নেবার অপেক্ষায় থাকে। যা করবে কর, যা নেবে নাও দু' হাত ভরে। কার্পণ্যের লেশও নেই। আর আমাদের পাথরচাপা কপালে কেবল হাত পেতে রাখাই সার।

উর্মিলা। (তীক্ষ্ণ গলায়) যা নেই, তার জন্যে মিছিমিছি কপাল চাপড়ানোর অর্থ আমি বুঝি না। নালিশ করা মানেই অক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া। ওদের দেশের মানুষদের ভোগ করার সাহস আছে। দুহাত বাড়িয়ে তারা ছিনিয়ে নিতে জানে, ভিক্ষার প্রত্যাশায় বসে থাকে না। মেরুদণ্ড যখন ভেঙেই গেছে, তখন বিনা প্রতিবাদে, বিনা দ্বিধায় ধুলোয় মিশে যাক। কেন মাথা তুলতে পার না, তা নিয়ে কান্নাকাটি কোর না।

ঝর্ণা। উর্মিলাদি, হাত বাড়িয়ে কি ভাগ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়।

উর্মিলা। যায় না, যায় না।

(মুখ চাওয়াচাওয়ি করে)

অসীম। ব্যাপার কি শংকর?

শংকর। ও কিছু নয়। আমাদের দেশের বাড়ীর দেওয়ালে মাঝে মাঝে অকারণেই চিড় ধরত। ঠাকুর্দা সকালবেলা বারান্দায় বসে হুঁকো টানতে টানতে নির্বিকার চিত্তে রাজমিস্ত্রিকে ডেকে বলতেন—ওরে ফাটল বুজিয়ে দে। আমাদের এই একঘেয়ে জীবনেও মাঝে মাঝে সময় এসে অমনি কারসাজি করে যায়।

অসীম। জীবনের ফাটল কি চূণকাম করে সারিয়ে তোলা যায়?

শংকর। অন্তত ঢাকা পড়ে যায়। উর্মিলা, তুমি আজ আমাদের চা দেবে না?

ঝর্ণা। চলুন উর্মিলাদি আমরা বরং চা করে আনি।

শংকর। উঁহু হোল না। তোমার গান শোনানোর কথা —সেটাতে ফাঁকি দিলে চলবে না।

ঝর্ণা। আমার গলা আজকে খুব খারাপ। সত্যি বলছি শংকরদা, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। সকালে একদম বসে গিয়েছিল।

অসীম। বিকেলে ঝগড়া করার পর খুলে গিয়েছে।

ঝর্ণা। ঝগড়া আমি করেছি?

অসীম। তুমি ঝগড়া করবে? আরে রামো, মেয়েরা কখনো ঝগড়া করে। সেটা পুরুষদেরই একচেটিয়া। যাই হোক, তুমি শংকরকে গান শোনাও। আমি উর্মিলাকে সাহায্য করতে পারব।

উর্মিলা। কাউকে সাহায্য করতে হবে না। রান্নাঘরে সাড়াশব্দ পাচ্ছি, তার মানেই বসন্ত বাজার থেকে ফিরেছে। আমি ওকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসছি।

(উর্মিলা চলে যাবে।

[ক্রমশ।

কবরী-ই নুরজাহান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ লাহোরের শহরতলীর
কাঁটাবনের আবডালে
লুপ্ত তোমার রূপের লহর
জঙ্গলে আর জঞ্জালে;
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ,
মীনার বাহার যায় ঝরি

আজকে তুমি নিরাভরণ
চিরদিনের সুন্দরী।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ
ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলে
ডুবছ কালের সঙ্কেতে।

স্বাস্থ্য, শ্রম ও উৎপাদন

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ৭ই এপ্রিল, ১৯৬৯, তারিখে পঠিত বেতার ভাষণ

শ্রীননী ভট্টাচার্য

স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

প্রত্যেক মানুষেরই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে কতকগুলি সমস্যা থাকে—যা ভৌগোলিক সীমা, আবহাওয়া বা আচার-বিচারের উপর নির্ভর করে না। বিশেষ করে স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যাগুলির রূপ প্রত্যেক দেশেই প্রায় এক প্রকার। এই উপলব্ধির উপর নির্ভর করেই ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল জেনেভাতে বিশ্বের সব জাতি মিলিত হয়ে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি 'বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

বিশ্বে সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতই একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা স্থাপিত হয়। এই বৎসর এই সংস্থার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উৎসবের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও তাদের এ বৎসরের আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, 'স্বাস্থ্য, শ্রমিক ও উৎপাদন'। এই বিষয়ের তাৎপর্য হলো শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপরই নির্ভর করছে শিল্পের উৎপাদন ও দেশের সমৃদ্ধি। কোন শ্রমিক যদি শারীরিক বা মানসিক অসুস্থ হন তবে তিনি তাঁর কাজে কখনও মনোযোগী হতে পারবেন না। তাতে একদিকে যেমন উৎপাদন ও কাজের ব্যাঘাত ঘটবে তেমনি দেশের সমৃদ্ধিও ব্যাহত হবে।

শিল্প-সভ্যতার বিকাশের পর থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে কারখানা স্থাপিত হয়েছে অনেক, উৎপাদন বেড়েছে প্রচুর। নতুন নতুন শিল্পও প্রসারিত হয়েছে দেশময়। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে কলকারখানা-জনিত নানা অসুখ-বিসুখ। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক-স্বার্থ বজায় রাখার জন্য অনেকগুলি আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই আইন অনুসারে কারখানায় শ্রমিকদের ক্যান্টিন, বাথরুম, চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জীবন বীমা, বার্ধক্য ভাতা, স্ত্রী-শ্রমিকদের প্রসবকালীন ছুটি ইত্যাদিরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমাদের মত অনগ্রসর দেশে এই অপরিহার্য সুযোগগুলি অনেকাংশে এখনও পর্যন্ত প্রতিশ্রুতির স্তরে রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৫ হাজার ২শো ৫৬টি কারখানা রয়েছে, তাতে প্রতিদিন ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার (৮,৮৭০০০) শ্রমিক কাজ করছেন। তা ছাড়া ২৮৪টি কয়লার খনিতে কাজ করছেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার ২শো ৬৭ (১, ৩২, ২৬৭), বন্দর শ্রমিক সংখ্যা হলো ৪০ হাজার ৩শো ৮১ (৪০, ৩৮১), তা' ছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প, হোটেল, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতির সংখ্যা হলো প্রায় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭শো ২১টি (২, ৯৫, ৭২১), তাতে কাজ করছেন ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭শো ৩৫ (৫, ৪৬, ৭৩৫) জন শ্রমিক। এ ছাড়া এই রাজ্যের চা-শিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ চা-শ্রমিক নিযুক্ত। এই সংখ্যাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমাদের জনসংখ্যার বেশ একটি বৃহৎ অংশই শ্রমিক হিসাবে জীবিকা অর্জন করছেন। এঁদের উপরই নির্ভর করছে কারখানার উৎপাদন। দেশের সমৃদ্ধি। কিন্তু দেখা যায় আমাদের শিল্পাঞ্চলগুলিতে বহু জায়গায় এখনও পর্যন্ত ঘিঞ্জি ও নোংরা অস্বাস্থ্যকর বসতি রয়ে গেছে। কঠোর পরিশ্রমকারীদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, বিশ্রামের ব্যবস্থা ও রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এখনও সম্ভব হয় নি। আমরা জানি কয়লার খনিতে চোখের রোগ, হাঁপানী, যক্ষ্মা, কেইজন সিক্‌নেস্‌ ইত্যাদি হয়। ফ্যাক্টরীগুলিতে চোখের রোগ, লিউকোমিয়া, লেড্‌ পয়জনিং, টিটেনাস্‌ প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে। চা-বাগানগুলিতে হুক্‌ওয়ার্ম ও নানাবিধ চর্মরোগ চা-শ্রমিকদের নিত্য সঙ্গী।

গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ১৩লক্ষ ১ হাজার পাঁচশ ৬৫ টকা রোগজনিত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। মহিলা-কর্মীদের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৬শো ৯১ টাকা প্রসবকালীন সাহায্য দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের আজকাল সব রকম চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং মৃত্যুর পর পারিবারিক ভাতা দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, প্রয়োজনের তুলনায় এই সব সাহায্যের বন্দোবস্ত অপ্রতুল এবং এক বিরাটসংখ্যক শ্রমিক এখনও পর্যন্ত এই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

সম্প্রতি গ্রেটবৃটেনে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শ্রমবিরোধের দরুন যদি একমিনিট নষ্ট হয়ে থাকে, তা' হলে নয় মিনিট নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনায় এবং দু'ঘণ্টারও বেশী সময় নষ্ট হয়েছে অসুস্থতার দরুন। এ' দেশেও এ' চিত্রের খুব বেশী তারতম্য হবে না। ধুলো, গরম, আওয়াজ, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি এবং ক্লান্তি এ'গুলির প্রতিক্রিয়া হয়ত সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করা যায় না কিন্তু এই সবগুলিই শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এক হিসাবে একটা কারখানাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কোন্‌ ধরণের শিল্পপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে শ্রমিক-স্বাস্থ্যের ঝুঁকিগুলি অব্যাহত

ভাবে বাড়তে পারে। কাজেই শ্রমিক-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমাদের শুধু অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা নিবারণের দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে না, কাজের পরিবেশের উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যন্ত্রপাতিকে মানুষের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে, মানুষকে যন্ত্রপাতির সঙ্গে নয়। মিশ্র সীসা তৈরী শোধন ও বহন, ছাপাখানা, ইলেক্‌ট্রো প্লাইটি‌ক্ প্লেটিং ক্রোমিক এ্যাসিড উৎপাদন ইলেকট্রিক অ্যাকুমুলেটার তৈরী ও সারাই, কাঁচের কারখানা ও মৃৎপাত্রের কারখানা প্রভৃতি বিপজ্জনক কাজকর্মের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত ক্যান্টিন ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা এবং ক্লান্তি ও একঘেয়েমি দূর করার জন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে কাজের ঘণ্টাকেও এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাতে দক্ষতা বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এবং আমাদের শ্রমিক ভাইদেরও অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন কারখানার ভেতরে যে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ, সীমাবদ্ধভাবে হলেও আছে তা' যেন তাঁরা অবশ্যই গ্রহণ করেন। কারণ অনেক সময় আমাদের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা না গ্রহণের জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে। তা' ছাড়া নিরাপত্তা-ব্যবস্থা না গ্রহণের জন্য হয়তো বর্তমানে আপনার কোন ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু দশ বৎসর পরে দেখা গেলো, --সেটাই আপনার অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়লা খনি, লোহা গালাই, গ্যাস প্রভৃতি কারখানায় ঢোকার সময় এবং প্রতি ১৫ দিন অন্তর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোন রোগ হলে তা' সহজেই ধরা পড়ে। আজকাল প্রত্যেক কারখানায়, খনিতে শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে, তা' ছাড়া কোন অসুখ হলেই বিনামূল্যে সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে।

কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা সহজে চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না। কাজের ঘণ্টা নষ্ট হবে, কিংবা রোগ ধরা পড়লে কাজ করতে দেওয়া হবে না, এই ভেবে রোগ যতক্ষণ না বেশী হয়, ততক্ষণ তাঁরা রোগ গোপনের চেষ্টাই করেন। এতে তাঁর নিজের যেমন ক্ষতি হয়, অপর আর পাঁচজন সহকর্মীও তাঁর রোগে সংক্রমিত হতে পারেন। নিজের, পরিবারের এবং আর *পাঁচজনের কথা চিন্তা করে রোগ কখনও গোপন করবেন না।* বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ-প্রতিরোধক টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে, সেগুলিও আপনাকে আগ্রহী হয়ে গ্রহণ করতে হবে। আপনার কারখানার ক্যান্টিনে সস্তায় খাবার পাবার যে ব্যবস্থাটুকু রয়েছে, এই সব ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার জন্য কল-কারখানার মালিকদের যে দায়িত্ব রয়েছে, তাঁদের সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিকেও এজন্য উপযুক্ত কর্মসূচী নিতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা উল্লেখ করছি, বর্তমানে কারখানা-গুলিতে যে পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা রয়েছে তা' গ্রহণ করুন। বহু সন্তান হলে স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে, অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়, ফলে শ্রমিকদের মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়। কারখানার কাজে অমনোযোগী হওয়ার দরুন দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে আজ বিশ্ব-স্বাস্থ্য দিবসে আমি শ্রমিক ভাইদের অনুরোধ করবো তাঁরা যেন নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের, পরিবারের এবং দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার কারণ তাঁরা যেন এড়িয়ে চলেন। কারখানা ও শিল্প-মালিকরা যেন একথা স্মরণ রাখেন অসুস্থ ও ক্লান্ত শ্রমিকদের অসুস্থতা ও ক্লান্তি দূর করার প্রচেষ্টার উপর উৎপাদন বৃদ্ধি করা এমন কি অব্যাহত রাখাও *নির্ভরশীল।*

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের স্বাস্থ্য-উন্নতির খরচ খাতে ব্যয় হয়েছে প্রথমটিতে ১৪'৫০ কোটি, দ্বিতীয়টিতে ১৫ কোটি এবং তৃতীয়টিতে ২২ কোটি টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের *অসুস্থতার সমস্যা আজও মেটে নি। এ' ব্যাপারে পাশ্চাত্ত দেশগুলি* অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি 'শ্রম দিবস' শ্রমিকদের অসুস্থতার জন্য নষ্ট হয়েছে। কাজেই উন্নতশীল দেশ হিসাবে আমাদের কর্তৃপক্ষকে এবং শ্রমিকদেরও তাঁদের নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে, তা না হলে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে না, দেশের সমৃদ্ধিও ব্যাহত হবে।

উপসংহারে বলা হলেও যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো – রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং তারই পাশাপাশি রোগ হবে না এমন একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ আমাদের মত দেশে গড়ে তুলতে হলে, বর্তমান সমাজের আমূল রূপান্তরের কথা ভাবতে হবে, নতুন সমাজ— সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যের দিকে এগুতে হবে। যে সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব ভয়াবহ, বর্ণ ও শ্রেণিবৈষম্যের মৃগয়াক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ যেখানে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে রোগমুক্ত স্বাস্থ্য-সুষমামণ্ডিত মানবগোষ্ঠীর কল্পনা নিছক কল্পনাবিলাস।

—আকাশবাণীর সৌজন্যে।

সদ্য প্রকাশিত হল

প্রেম পরিণয় ইত্যাদি ॥ বিমল মিত্র ॥ ৭·০০

প্রেম মৃত্যু আশা-হতাশা প্রেম-পরিণয় ইত্যাদি নিয়েই তো জীবন! হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ গল্প-উপন্যাস লিখেও এই জীবনের কণামাত্র রহস্য উদঘাটন করা যায় না। রহস্যই এই জীবনের আকর্ষণ, আবার রহস্যই এই জীবনের অশান্তি। এই রহস্য থাকবে, অথচ এই রহস্য উন্মোচনের জন্য মানুষ তপস্যাও করে যাবে চিরকাল। লেখক তিনটি যুগের উপাখ্যান দিয়ে মানুষের এই চিরন্তন সংগ্রামের মর্মান্তিক ইতিকথা বলেছেন।

বোধোদয় ॥ শংকর ॥ ৫·০০

আজকের যুগের এক শ্রেণীর শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ভারতবাসী যে সর্বনাশা সমস্যায় ভুগছেন তা জেনেশুনেও অনেকে চোখ বন্ধ করে ছিলেন—'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র লেখক আশ্চর্য নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে তার গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। এ উপন্যাসের শুরু বিদেশের এক বিমানবন্দরে। যা কিছু ঘটবার তা ঘটছে ভারতগামী এক বোয়িং বিমানে।

কুশীলব ॥ বিমল কর ॥ ৩·৫০

বাজনা আর সুর—শুধু এই ছিল শোভনের নেশা। ছোটখাট ফাংশনে টুকটাক বাজিয়ে হাততালিও পেয়েছিল। হঠাৎ একদিন এক জলসায় বাজিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল শোভন। তারপরই যেন অগ্নিস্পর্শ ঘটল ছাউইয়ে। এক শিল্পী-সত্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভয়-ভাবনা যাতনা-নৈরাশ্য থেকে আস্থায়, বিশ্বাসে উত্তরণের এক মহত্তর রচনা বিমল করের নতুন উপন্যাস "কুশীলব"।

আমাদের প্রকাশিত আরও কয়েকখানি বই :

মনোজ বসুর
প্রেমিক ৬·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
সাগিনা মাহাতো ৪·০০

বুদ্ধদেব বসুর
কালসন্ধ্যা ৩·০০

বনফুলের
অসংলগ্না ৩·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
নুনের পুতুল সাগরে ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
অরণ্যের দিনরাত্রি ৪·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বেণীসংহার ৪·০০

কালকূটের
কোথায় পাবো তারে ২০·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
সময়ের সুর ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন ৪·০০

প্রতিভা বসুর
দ্বিতীয় দর্পণ ৮·০০

বুদ্ধদেব গুহর
নগ্ন নির্জন ৪·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
ভালোবাসার অনেক নাম ৬·০০

বুদ্ধদেব বসুর
কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ ৫·০০

বিমল করের
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ৪·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
আগ্রা যখন টলমল ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সন্ধ্যারাগ ৫·০০

সমরেশ বসুর
এপার ওপার ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৩৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

খেলার ছলে

-শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্ত অঙ্কিত

মাসিক
বসুমতী
জ্যৈষ্ঠ
১৩৭৬

● শ্রীমতী মায়া চ্যাটার্জী, রবীন্দ্র সরণী, বাঁকুড়া—

প্রশ্ন ১ : মুখের দাগগুলি দূর করার উপায় কি ? মেচেতা কি আরোগ্যযোগ্য ?

উত্তর : রোগ হলেই আরোগ্য হবার উপায় আছে। আপনি কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করুন। দু'বেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে কার্কোফেরল ও Siomethionine Forte (Albert David) খাবেন দু'মাস। রোদ একদম লাগাবেন না।

প্রশ্ন ২ : আমার স্বাস্থ্য কি ভাল হবে ?

উত্তর : যা বললাম, তাই করে দেখুন, উপকার হয় কি না ?

নৃপেন মোদক, দিগনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া—

প্রশ্ন ১ : আমার অনেকদিন যাবৎ কুঁচকিতে দাদ হইয়াছে—

উত্তর : নিয়মিতভাবে স্থানটি পরিষ্কার করে, ভাল দাদের মলম লাগান। অন্তর্বাসগুলি রোজ সাবান দিয়ে কাচবেন।

প্রশ্ন ২ : পুরাতন অর্শের বলি বাহিরে আসে। নিরাময়ের ব্যবস্থা কি জানাইবেন।

উত্তর : অর্শের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা অপারেশন করা। ওষুধ ব্যবহার করে স্থায়ী ফল হবে বলে মনে হয় না।

● শ্রীপ্রবীর চ্যাটার্জী, রবীন্দ্র সরণি, বাঁকুড়া।

প্রশ্ন ১ : পেটের গোলমাল প্রায় থাকছে। মাঝে মাঝে stool পরীক্ষা করে গোলমাল পাওয়া যায় নি। অম্বল ভাব বোধ হয়। চুলে খুব খুস্কি হচ্ছে। প্রচুর দাড়ি চুল পাকছে।

উত্তর : পুরনো আমাশয়ে অনেক সময়ে পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় না। আপনি Methylene Blue দিয়ে Bowel Wash করিয়ে নিন। তার পর Emetine Hydrochlor Injection নিন। আপনার ওখানে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ রয়েছে। এ ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার পর Vitamin B Complex চা-চামচের দু'চামচ করে দু'বেলা ভাতখাবার পর খাবেন, তিন মাস।

● শ্রীভাস্করকুমার রায়চৌধুরী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ছেলেটির Eosinophil সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ ধরণের রোগ অতি অল্প চিকিৎসাতেই সেরে যায়। আপনি ওকে নিয়মিতভাবে মাস তিন চার Pulmocod (Plain) Stadmed চা-চামচের দু'চামচ করে সকাল সন্ধ্যা খেতে দেবেন।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

প্রশ্ন ২ : মেয়েদের Ligation Operation আজ ৩ বৎসর আগে হয়েছে। মাসিকের সময় ভীষণ পেট ব্যথায় কষ্ট পায়। কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। এমন ওষুধ বলুন, যাতে সাদা স্রাব বন্ধ হয় এবং পেটের ব্যথা কমে।

উত্তর : কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য রোজ রাতে শোবার সময় ইসব্‌গুলের ভুষির সরবৎ খাবেন। এ ছাড়া Siolan 12 (Albert David) ও Placembex (Albert David) সমপরিমাণে মিশিয়ে ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা করবেন একদিন অন্তর ১২টি। তাছাড়া সকাল বিকাল Dolorina Cordial চা-চামচের দু'চামচ করে সকাল বিকেল এবং Ferrochelate (Albert David) Syrup একই পরিমাণে দু'বেলা ভাতখাবার পর দু'চামচ খেতে দেবেন।

● মধুচক্র, নৈহাটি—

প্রশ্ন ১ : এক মাসে পাঁচবার স্বপ্নদোষ হওয়া কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ?

উত্তর : এ সব ব্যাপারে কোন আঙ্কিক নিয়ম খাটে না।

প্রশ্ন ২ : মাঘ মাসে আপনি লিখেছেন স্বপ্নদোষ ক্ষতিকর নয়, কিন্তু ক্ষতিকর নয় কেন ? এর ফলে শরীর থেকে রক্তপাত ঘটে ও শরীর খারাপ হয়ে যায় সুতরাং ক্ষতিকর নয় কেন ?

উত্তর : শরীর থেকে মল, মূত্র, ঘাম যেভাবে নির্গত হয়, বীর্যপাতও সেইরূপ ঘটে। বীর্য সর্বদা সৃষ্টি হয়ে একটি আধারে জমা হচ্ছে, যখন সেই আধারটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন বীর্য আপনাথেকেই বেরিয়ে আসে ঘুমন্ত অবস্থায়। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রের প্রভাবে নির্গত হয় না, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় উচ্চতর কেন্দ্র স্তিমিত থাকে, ফলে স্বপ্নদোষ ঘটে, মুখ্যত যে কারণে অনেক বড় বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় মূত্রত্যাগ করে ফেলে।

শরীর এবং মন খারাপ হয় স্বপ্নদোষের প্রতিক্রিয়ায়। যে রাতে স্বপ্নদোষ হয়, পরদিন স্বাভাবিক কাজকর্মে মন লাগে না। সারাদিন মন খারাপ হয়ে থাকে এবং যৌনচিন্তায় মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই চিন্তার জন্য মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, তার ফলে আবার স্বপ্নদোষ ঘটে।

আমি বলতে চেয়েছি স্বপ্নদোষ দোষের নয়, কারণ পুরুষ দেহ যতদিন থাকবে, ততদিন যে-কোন কারণে স্বপ্নদোষ ঘটতে পারে। স্বাভাবিক বীর্যক্ষয়ে শরীর খারাপ হয় না। শরীর খারাপ হয় যৌনবিনিময় নিয়ে চিন্তা করার জন্যে। আর যৌনবিষয় নিয়ে চিন্তা করলেই স্বপ্নদোষ হয়ে যাবে।

সেইজন্য আমার পরামর্শ, যাঁরা পড়ছেন, তাঁরা নিয়মিত পড়াশুনা করুন দু'বেলা। বিকেল বেলা ব্যায়াম

করুন। রাতে গভীরভাবে ঘুমোন। দেখবেন আপনাথেকেই শরীর ভাল হচ্ছে এবং স্বপ্নদোষ কমে যাচ্ছে।

স্বপ্নদোষে রক্তপাত হয় না।

● শ্রীঅমল বসু, ল্যান্সডাউন ট্যারেস, কলিকাতা-২৬—

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ২২।২৩ বৎসর। অত্যন্ত রোগা। কি করলে মোটা হওয়া যায়?

উত্তর : আপনি কিছুদিন Glucose ইনজেকশন (I. V.) নিন। এ ছাড়া দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Aminozyme (Stadmed) তিনমাস খাবেন। সকাল সন্ধ্যা একই পরিমাণে Haliborange (Glaxo) তিনমাস খাবেন। এইভাবে থাকলে ২ নং প্রশ্নেরও সমাধান হবে।

● শ্রীসন্তোষ সরকার (ছদ্মনাম), বাদকপাড় কলোনী, ২৪ পরগণা—

আপনার সমস্যার বিষয় এই সংখ্যাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পেটপুরে ডালভাত খান। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করুন, বিকেল বেলায় একটু ফ্রি হ্যাণ্ড ব্যায়াম করবেন। দেখবেন ও সমস্যা কমে গেছে।

● শ্রীমতী খুকুরাণী সাহা, গড়িয়া, ২৪ পরগণা—

আপনার উপসর্গগুলি পড়ে মনে হল, আপনি অ্যালার্জিজনিত সর্দিকাশি হাঁপানিতে ভুগছেন। আপনি সকাল সন্ধ্যা ১টি করে Redoxon (Roche) অথবা Celin (Glaxo) বড়ি নিয়মিতভাবে বরাবর খেয়ে যাবেন। খব ভ্যাপসা গরম, জোলো হাওয়া লাগাবেন না। Pulmocod (with Guaiacol), (Stadmed) চা-চামচের দু'চামচ করে দু'বেলা ভাত খাবার পর খাবেন। গুরুপাক খাবার, চিংড়ী, কাঁকড়া, ডিম, কলা খাবেন না।

● শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখাল ঘোষ লেন, কলিকাতা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আমার মনে হয় আপনার মাড়িতে বা গলায় কোন দোষ আছে। আপনি-যে ওষুধের নাম লিখেছেন, তা খেতে পারেন।

● শ্রীমতী বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-৩৮—

আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, অনেকের শরীরের নানাস্থানে নুন জমে। ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই। দৈনিক পরিষ্কার করলেই দূর হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা লিখেছেন, তার উত্তরে জানাই, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন রোগের, ওই কারণে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় নি।

● কুমারী নন্দা চট্টোপাধ্যায়, সাকচি মন্দির রোড, জামসেদপুর—

আপনি লিখেছেন আপনার প্রশ্নগুলি অশালীন, কিন্তু আপনার প্রশ্ন আমার খুব ভাল লেগেছে। এই ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন এলে আরোগ্য বিভাগ সত্যিই পাঠক-পাঠিকাদের আরও উন্নতিসাধন করবে। সেইজন্যেই আপনার প্রশ্নটি যথাযথ তুলে দিলাম।

প্রশ্ন : Madness কিরূপে, কেন বংশগত হয়? পুরুষানুক্রমে তার রেশ কতদূর বা কতদিন চলে? কোন্ Generation-এ তা stop হয়? এ থেকে পরবর্তী বংশধরদের কি মুক্তির উপায় নেই? Madness বা মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে, Personality disorder থেকে। বংশপরম্পরায় বাপ-মায়ের অনেক গুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বর্তায়। যে বাপ-মা খুব লম্বা চওড়া, তাঁদের সন্তানও সাধারণত লম্বা চওড়া হয়। এই ধরণের বংশানুক্রমিক সঞ্চরণ Genes ও Chromosome -এর জন্য ঘটে। বাপ মায়ের Genes ও Chromosomes সন্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে 'আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী' কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনটির কেবলী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

বাপমায়ের গুণ যেমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বর্তায়, ঠিক তেমনি অনেক দোষও বর্তায়। মস্তিষ্কবিকৃতি Genes-এর গোলমালে সাধারণত হয়, সেই জন্য পাগলামি বংশগত হয়।

পুরুষানুক্রমে কতদূর চলে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, পাগলামি রোগ এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে ছড়ায় না। Genes-এর গোলমালটাই সঞ্চারিত হয়। তার পর হঠাৎ যদি কোন কারণে দুর্বল Genesকে আঘাত করে, তাহলেই মস্তিষ্কবিকৃতি রোগ দেখা যায়। Manic Depression Psychosis রোগ তিনপুরুষ পর্যন্ত পর পর দেখা যায়। Schizophrenia দু'—এক পুরুষ বাদ দিয়ে আবার দেখা দিতে পারে। তবে জন্মের পর থেকে শিশুকে যদি খুব সযত্নে মানুষ করা যায়, তাহলে হয়ত পাগলামির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

● শেখ এ হোসেন, অনন্তপুর, মেদিনীপুর—

ওষুধে যখন টনসিলের রোগ নিরাময় হয় না, তখন অপারেশন করিয়ে ফেলাই উচিত।

● শ্রীঅমলরঞ্জন গুহ, শ্যামনগর, ন'পাড়া—

এত দীর্ঘদিনের হাঁপানি নিরাময় হওয়া আয়াসসাপেক্ষ। আপনি কোন বিচক্ষণ চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতানুযায়ী চলুন।

● শ্রীঅনাথবন্ধু পাল, ভবানীপুর, দিনাজপুর—

আপনারা উভয়েই ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করান।

● শ্রীমতী অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়, খাগড়াম, মুর্শিদাবাদ—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● এস এ আনোয়ার, আদ্রা, পুরুলিয়া—

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হাইড্রোসিলের অপারেশন ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই।

● শ্রীসুবলচন্দ্র কুইল্যা, মজলমাড়ি, মেদিনীপুর—

আপনার সমস্যা নিয়ে এই সংখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে। আলাদাভাবে বলবার দরকার নেই।

● শ্রীতপনকুমার সরকার, পুরুলিয়া—

বার বার একই ব্যক্তিকে, ব্যক্তিগত চিঠি দিলে, অন্য আর একজন যোগাযোগে বঞ্চিত হন।

● শ্রীদীপকুমার (ছদ্মনাম) কলিকাতা-৮—

আপনার সমস্যার কথা এ সংখ্যাতে বলা হয়েছে। পড়ে দেখুন। যদি উপকার না হয়, জানাবেন, সমাধানের উপায় বলে দেওয়া হবে।

● শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সরকার, যাদবপুর—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীদিলীপকুমার নন্দী, কাপাসডাঙ্গা, হুগলী—

আপনি চিকিৎসক দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আপনার সমস্যার চিঠিতে সমাধান হবে না।

● শ্রীভোলানাথ পাণ্ডে, বড়িষা, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন: আমার দিদিমা ছয় মাস যাবৎ আমাশয়ে ভুগিতেছেন।

উত্তর: ওঁকে সকালে ১টি, বিকালে একটি Davoquin (Albert David) বড়ি দশদিন খেতে দেবেন। তাতেও যদি না সারে, তাহলে চিকিৎসক দেখাবেন।

● শ্রীমতী নন্দা অধিকারী, শিবপুর, হাওড়া—

আপনি দাঁতের যে চিকিৎসা করছেন, তাই করুন, তার সঙ্গে এবেলা একটি ওবেলা একটি করে Vitamin C 500 mg করে খেয়ে যান।

● শ্রীমতী এস রায়—ঠিকানা নেই—

ছাপার ভুলে ২৮ বছর হয়ত ১৮ বছর হয়ে গেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনি যতগুলি উপসর্গের কথা লিখেছেন। সবগুলি একটি ওষুধে সারানো সম্ভব নয়। যে চিকিৎসক আপনার লাইগেশন

অপারেশন করেছেন, তাঁকে আর একবার দেখিয়ে চিকিৎসা করান।

● শ্রীএস নরেন্দ্র, শিলিগুড়ি—

আমাদের নির্দেশে আপনি খুব উপকার পেয়েছেন জেনে আনন্দিত। তিনমাস খেয়ে যান। চোখের চিকিৎসক যা বলেছেন, তাঁর নির্দেশমত চলুন।

● কুমারী রুমনি বসু—ঠিকানা ও প্রশ্ন ছাপতে অনিচ্ছুক—

যা অতীত, তা নিয়ে ভাবতে নেই, শরীর খারাপ হয়। অনেক সময়ে মনে অশান্তি থাকলে শ্বেতস্রাব হয়। আগে ছোট কৃমির চিকিৎসা করিয়ে নিন; তার পর স্বাস্থ্য ভাল হবার চিকিৎসা করাবেন। এই অল্প বয়সে অত হতাশ হবেন না। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। এর জন্যে বিয়ে আটকায় না।

● শ্রীঅমিয়কুমার আদক, বজবজ—

প্রশ্ন: বড্ড অল্প বয়সে গোঁফ বেরিয়ে মুখ ভরতি হয়ে গেছে। কামিয়ে মুখের অনেক জায়গা কেটে নষ্ট হয়ে গেছে। যদি কোন লোমনাশক ওষুধ-এর কথা বলেন—

উত্তর: থাকলেও কোন লোমনাশক লোশন লাগান উচিত নয়। তার চেয়ে সেলুনে ভাল করে দাড়ি কামাবেন এবং উল্টো করে কামাবেন না।

● শ্রীনিতাই দাস, উমাচরণ বসু লেন, হাওড়া—

Polio রোগের চিকিৎসা চিঠির মাধ্যমে করা উচিত নয়। Medical College এ যে বিশেষজ্ঞকে প্রথম দেখিয়েছিলেন, তাঁকে আবার আপনার

ডাইকে দেখান। আপনি ফুলো জায়গাতে Relaxil মলম লাগান।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রেলস্টেশন, কোপাই, বীরভূম—

Gynovular 21 Tablet মাসিক শুরু হবার চার দিন বাদ দিয়ে পঞ্চম দিন রাত থেকে প্রত্যহ একটি করে ২১ দিন খেতে দেবেন আপনার স্ত্রীকে। ২১ দিন খাওয়া হলে বড়ি বন্ধ করে দেবেন এবং মাসিকের জন্য অপেক্ষা করবেন। আবার মাসিক হলে চারদিন বাদ দিয়ে খাবেন।

●শ্রীঅমিয়কুমার কুণ্ডু, হাওড়া—

আপনি চিকিৎসক দেখান। যদি আঘাতজনিত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, এবং যদি অণ্ডকোষের মধ্যে রক্ত জমে থাকে, তাহলে ভয়ের কথা। যদি হাইড্রোসিলের জন্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাহলে অপারেশন করাতে হবে, তবে ধীরেসুস্থে করলেও হবে। যদি Filaria-র জন্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাহলে ওষুধ ইনজেকশনে কমে যাবে। কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে, জানার জন্যই ডাক্তারবাবুকে একবার দেখিয়ে নিন।

শ্রীমতী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ডায়মণ্ডহারবার, রায়নগর, ২৪ পরগণা—

আপনি নাম, ঠিকানা এবং প্রশ্ন না দেবার অনুরোধ করেছেন। তাতে যদি বুঝতে পারেন আমাদের আপত্তি নেই। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, সন্তান না হবার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, এ ধরণের কোন বড়ি নেই। পুরুষের পক্ষে Cap নিশ্চয়ই অন্যতম নির্ভরযোগ্য বস্তু।

এ বি (ছদ্মনাম), ২৪ পরগণা—

আপনি সকালে ১টি, বিকালে ১টি Alvite (Alembic) বড়ি খাবেন দুমাস ধরে।

শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়, অশোকনগর হাওড়া—

আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচকরে Sioplex Lysine (Albert David) দু'মাস খাবেন। খাবার আগে Digiplex অথবা Takacombex অথবা Sioplex Enzymes দু'চামচ করে খাবেন।

আপনার পুত্রের বিষয়ে যে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, তাই খাওয়ান। পড়াশুনায় মন বসানো অভ্যাসের বিষয়। কি ভাবে ছেলেমেয়েদের পড়ায় অভ্যাস করাতে হয়, সে বিষয় মাসিক বসুমতীতে অনেকবার আলোচিত হয়েছে। যদি আবার দরকার হয় জানাবেন, পরবর্তী কোন সংখ্যায় আলোচনা করা হবে।

●শ্রীবৃজেন্দ্রনাথ দাস, চুঁচুড়া, হুগলী—

আপনার ও আপনার স্ত্রীর সমস্যার কথা পড়লাম। আপনার স্ত্রীকে দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Ferradol (Park Davis) খেতে দেবেন। অন্তত দু'মাস ধরে খাবেন। আপনি Nervigor with vitamins and Formates (Huxley) চা-চামচের এক চামচ করে ভাতখাবার পর একমাস ধরে খাবেন।

●শ্রীঅনিল পাল, চুঁচুড়া, হুগলী—

আপনি একদিনও দেরি না করে, চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শমত চিকিৎসা করান।

●শ্রীকল্যাণ বসু, ঠিকানা ছাপাতে অনিচ্ছুক, কলি-৩—

আপনার ১ নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই শারীরিক দুর্বলতা হলে বিশেষত ভিটামিন এ শরীর থেকে কমে গেলে, তখন কোন জীবাণু চামড়ার ক্ষতকে কেন্দ্র করে চর্মরোগ সৃষ্টি করে। যেহেতু শারীরিক দুর্বলতা থেকেই যায়, সেই জন্য চর্মরোগ সহজে সারতে চায় না। আপনি যে ওষুধ লাগাচ্ছেন তার সঙ্গে দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে, Haliborange (Glaxo) খাবেন।

২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ওই মুদ্রাদোষগুলি মন থেকে ঝেড়ে না ফেলতে পারলে সারবে না। ওগুলি রোগ নয়, মুদ্রাদোষ এবং মনে জোর আনলেই আপনা থেকেই চলে যায়।

শ্রীরণজিৎকুমার মাইতি, পূর্ব-গাজীপুর, হাওড়া—

প্রশ্ন ১: আমার বয়স ২৩।২৪ বছর। আমার দাঁতের রং লালচে। মুখে দুর্গন্ধ।

উত্তর: আপনার নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, মনে হয়। আপনি দাঁতের জন্য যে চিকিৎসা করাচ্ছেন, তাই করুন, তার সঙ্গে রাতে শোবার সময় ত্রিফলার জল প্রত্যহ পান করুন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই আপনার মা'কে কোন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা করান। এতদিনের হাঁপানি শুধু চিঠি লিখে সমাধান হবে বলে মনে হয় না।

●শ্রীনবীন ঘোষ, (ছদ্মনাম) মাঝের পাড়া, ইছাপুর—

প্রশ্ন ১: Gynecomastia রোগটা কি জন্য হয়? অপারেশন ছাড়া কি এ রোগ নির্মূল হয় না?

উত্তর: এ রোগের কারণ অত্যন্ত জটিল। বললে বুঝতে পারবেন না; তবে এইটুকু জেনে রাখুন, নিয়মিত পড়াশুনা খেলাধুলা করলে আপনা থেকেই কমে যায়। একটা বয়স আছে, যে সময়ে ওই ধরনের উপসর্গ দেখা যায়, যেমন ধরুন ব্রণ। ওদিকে নজর না দিলে, আপনা থেকেই বয়স বাড়লে কমে যায়।

প্রশ্ন ২: অভিভাবককে না জানিয়ে কি এই অপারেশন করানো যাবে?

উত্তর: অভিভাবককে না জানিয়ে কোন কাজই করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৩: এ অপারেশন করাতে হলে কি হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে?

উত্তর: হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ৪: এ অপারেশনে কতক্ষণ সময় লাগে?

উত্তর: যিনি অপারেশন করবেন, তাঁর উপর নির্ভর করছে।

●শ্রীসমীর রায়, দাঁতন, মেদিনীপুর—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়ে মনে হল, আপনি High blood pressure-এ ভুগছেন। আপনি প্রেসারজনিত চিকিৎসা করান। নিয়মিতভাবে দুপুরে একঘণ্টা বিশ্রাম করুন (শয়ন করে) এবং সাইকেল চড়া পরিত্যাগ করুন।

●শ্রীসাধন সরকার, হুগলী—

আমারও মনে হচ্ছে আমাশয় থেকে আপনার পেটের ব্যথা হচ্ছে। আপনি

যে ভাবে চিকিৎসা করাচ্ছেন, সেই ভাবেই অন্তত দু'-তিন মাস চিকিৎসা করান।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, এত দীর্ঘদিনের দাগ মেলাবে কি না সন্দেহ।

● শ্রীইব্রাহিম সরকার-মালিকাপুর, হুগলী—

আপনি নিয়মিতভাবে দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Sioplex Lysine (Albert David) দু'মাস খাবেন।

● শ্রীবেচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা নেই—

১৮ বছরের পুরনো আমাশয় সহজে সারবে না। আপনি মাঝে মাঝে Emetine ইনজেকশন নেবার ব্যবস্থা করুন, কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে।

● শ্রীনিউটন ব্যানার্জী (ছদ্মনাম), মাকড়দহ, হাওড়া—

প্রশ্ন ১: বয়স ১১ বৎসর। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি। মনে শান্তি নেই।

উত্তর: আপনি ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Aminozyme (Stadmed) খাবেন, আর মনে জোর এনে পড়াশুনা করুন, দেখবেন সব দূর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ২: আমার হাত কাঁপে।

উত্তর: এ উপসর্গ দুর্বলতার জন্য হচ্ছে। প্রথম প্রশ্নের ব্যবস্থাতে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সমাধান হবে।

● শ্রীকমলকুমার ঘোষ, ঝালুয়ার বেড়, মাকড়দহ, হাওড়া—

আপনি দু'বেলা খাবার পর ১টি করে Eggluvite বড়ি খাবেন।

● শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল, মথুরাপুর, ২৪ পরগণা—

আপনার স্ত্রীকে কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান। যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা চিঠিতে সমাধান করা যাবে না। B. C. G. যে-কোন বড় হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা আছে।

● শ্রীশঙ্করকুমার দে, আন্দুল রোড, হাওড়া।

আপনি আগে একমাস ওষুধ খেয়ে শরীর ভাল করুন; প্রয়োজন হলে Liver Extract ইনজেকশন নেবেন। তার পর কৃমির চিকিৎসা করান। দেখবেন শরীর ভাল হয়ে উঠছে।

● শ্রীএককড়ি ঘোষ, কলি-৫—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি Pulmocod (plain) (Stadmed) চা-চামচের দু' চামচ করে দু'বেলা খাবেন তাছাড়া Macalvit 1m (Sandoz) অথবা Micaldee 12 (Albert David) অথবা Calciostelin ইনজেকশন নেবেন।

● শ্রীবেণী দত্ত, বক্সীবাগান, সাঁতরাগাছি।

(ছ'খানি কুপন আছে)।

প্রশ্ন ১—আমার High power (minus) কি করে বাড়া Check করা যায়?

উত্তর: পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে, বিশেষ করে, Vitamin A, D মিশ্রিত খাদ্য।

প্রশ্ন ২: কৃমি আছে। কি ভাবে মুক্ত হওয়া যায়?

উত্তর: আগে মল পরীক্ষা করিয়ে জেনে নিন, কি ধরণের কৃমি আছে, তারপর সেই কৃমিরোধের ওষধ খান।

প্রশ্ন ৩: শুক্রধারণ ক্ষমতা কম। অল্প উত্তেজনায় ক্ষরণ হয় ও রাত্রে ঘুমের মধ্যে অসাড়ে শুক্রপাত হয়।

উত্তর: গভীর নিদ্রা হলে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে, তার সঙ্গে, ও বিষয়ে কোন চিন্তা না করলে ও উপসর্গ দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৪: প্রসাব সরু হচ্ছে। বার বার হচ্ছে।

উত্তর: আপনি কোন ডাক্তারকে দেখিয়ে জেনে নিন, Prostate বেড়েছে কি না। না হলে কোন ভয় নেই।

প্রশ্ন ৫: তলপেটের বাঁ দিকে খাওয়ার পর হাঁটলে অল্প ব্যথা হয়।

উত্তর: বোধ হয় পুরনো আমাশয়ের জন্য।

প্রশ্ন ৬: পুরনো আমাশয় আছে মনে হয়। চিকিৎসা কি?

উত্তর: Berberal (Alembic) বড়ি ব্যবহার করে দেখুন, হয়ত আরাম পাবেন।

প্রশ্ন ৭: শক্ত পায়খানা হয় ও মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে।

উত্তর: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য প্রত্যহ quino Bael খান।

● শ্রীমুকুলকুমার সাহা, বজবজ—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীধ্রুব সরকার, বৈদ্যবাটি—

প্রশ্ন ১: কিছুদিন ধরে গায়ে, পায়ে শুকনো দাদ হচ্ছে।

উত্তর: Scabalcid (Fairdeal) লাগাবেন স্নানের পর এবং রাত্রে শোবার সময়।

প্রশ্ন ২: Nervousness কিসে যায়?

উত্তর: মনের জোরে। মনে জোর এনে কাজ করুন, দেখবেন মানসিক দুর্বলতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

● শ্রীচন্দ্রশেখর ভড়, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলি-৭—

চিঠি পড়লাম। মনের অবচেতন স্তরে উত্তেজনা আছে বলেই নখ খাওয়ার অভ্যাস। কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে Tofranil বা ওই জাতীয় কোন ওষুধ খেলেই কমে যাবে। বুড়ো আঙুলের ব্যাপারটা ওষুধে সারবে বলে মনে হয় না। প্রয়োজনমত নম্বর পেলে নিশ্চয়ই ডাক্তারী পড়বেন।

● শ্রীকৃশকায়, ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা-২৬—

মধু খেয়ে যান। এর সঙ্গে প্রয়োজন হলে Livergen খেতে পারেন।

শ্রীঅশোককুমার লাহিড়ী (ছদ্মনাম) বরাহনগর—

স্থানীয় ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছেন। আপনা থেকেই চলে যায় তবে অনেকদিন সময় লাগে, ধরুন, পাঁচ থেকে দশ বছর। একশিরা অপারেশন না করে একেবারে সারে না।

● শ্রীউৎপল দাস ভৌমিক, কয়াডাঙ্গা, ২৪ পরগণা—

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর

Vitamin B Complex দু' চামচ করে খাবেন, তিন মাস।

●পাখী, যাদবপুর, কলি-৩২—

ওটা কোন রোগ নয়। ও উপসর্গ প্রত্যেক পুরুষের হয়। কোন ভয় নেই।

●শ্রীদেবব্রত দাস বক্সী, কালিপুর, ইউদিহ্যা, বীরভূম—

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Metatone (Park Davis) খাবেন দু'মাস। আপনার ভগ্নীর যকৃৎ-দুর্বলতার চিকিৎসা করান।

●শ্রীসমীর হালদার, নৈহাটি—

আপনার উপসর্গ নিয়ে এই সংখ্যাতে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে।

●শ্রীমতী ছায়া ভট্টাচার্য, আগরপাড়া, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন : আমার মুখে তিলের মত ছোট ছোট কালো দাগ বহুদিন থেকেই (জন্ম থেকে নয়) দেখা দিয়েছে। যথেষ্ট চিকিৎসা করা সত্ত্বেও এই দাগগুলি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

উত্তর : এই ধরণের দাগ ফরসা ছেলেমেয়েদের মুখেই বেশি দেখা যায়। এগুলিতে যত সূর্যরশ্মি লাগবে, তত বাড়বে। Melanin Pigmentation-এর আধিক্যে এই ধরণের দাগ হয়। সাধারণত লিভারের গোলমালে এগুলি আরও বাড়ে। এগুলি কমাতে হলে (একেবারে সারা খুবই সময়সাপেক্ষ) একেবারে রোদ লাগাতে পারবেন না। বহুদিন ধরে লিভারের পুষ্টির চিকিৎসা করবেন, এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং ক্যালসিয়ম খাবেন। মুখে কিছু মেখে উপকার পাবেন বলে মনে হয় না।

●পি কে পি, এইচ বি টাউন, সোদপুর—

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ১৬ বৎসর। আমার মাথার অধিকাংশ চুল পাকিয়া যাইতেছে।

উত্তর : আপনি Vitamin B Complex ইনজেকশন নিন, স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শমত।

প্রশ্ন ২ : আমার হাতে ছুলির মত সাদা সাদা দাগ হইয়াছে।

উত্তর : Paladec দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে দু'মাস খান এবং Ascabiol লাগান।

●শ্রীস্বরূপ মিত্র, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬—

প্রশ্ন : আমার গায়ে অসম্ভব লোম।

উত্তর : লোম কমাবার উপায় থাকলেও ব্যবহার করা উচিত নয়। আরও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

●শ্রীঅরুণ রায়, পূর্ব সিঁথি প্লেস, দমদম—

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি Arovit (Roche) বড়ি খাবেন একমাস ধরে। তাতেও যদি উপকার না পান, চোখ দেখিয়ে চশমা নেবেন।

●শ্রীঅরিন্দম মিত্র, করডাইস লেন, কলিকাতা-১৪—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি দু'বেলা ভাত খাবার আধঘণ্টা আগে চা-চামচের এক চামচ করে Elixir Neogadine (Raptakos Brett) একমাস খাবেন।

●শ্রীমতী মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোদপুর, ২৪ পরগণা—

প্রথম প্রশ্নের জবাব এই সংখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২ : মাথায় অসম্ভব খুস্কী।

উত্তর : যে-কোন ভাল Sampoo দিয়ে মাথা ঘষে Pragmatar মলম মাথায় ঘষে ঘষে লাগাবেন। তার পর রোজ স্নানের পর নারকেল তেলের সঙ্গে ওই মলম মিশিয়ে নিয়ে ঘষবেন। সপ্তাহে একদিন Sampoo করবেন। এ ছাড়া Multivitamin নিয়মিতভাবে খাবেন অন্ততপক্ষে দু'তিন মাস।

●শ্রীপার্থ চৌধুরী, দুর্গাপুর-৪—

প্রশ্ন ১ : চোখের কোন ব্যায়াম আছে কি?

উত্তর : রোজ সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা চোখে দেবেন।

প্রশ্ন ২ : ব্রুণ সারাবার উপায় কি?

উত্তর : এ বিষয়ে এই সংখ্যাতে আলোচিত হয়েছে।

●শ্রীমতী সুস্মিতা পাল, ধানবাদ—(পুরো ঠিকানা জানাতে অনিচ্ছুক)।

টাইফয়েডের পর চুল উঠে যায়, আবার হয়। ও নিয়ে ভাববেন না। এখন ডাক্তারবাবু যা চিকিৎসা করছেন, তাই করুন। আরও তিন মাস তাঁর চিকিৎসায় থেকে তারপর জানাবেন, তখন পরামর্শ দেবো।

●শ্রীবিমলকুমার মজুমদার, ক্যামাক স্ট্রীট, কলি-৭—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

●শ্রীঅলোক দত্ত, চেতলা, আলিপুর।

আপনি যা লিখেছেন, তা নতুন বলে হচ্ছে। কিছুদিন অভ্যাস হয়ে গেলে আর হবে না। ও জিনিস প্রত্যেকেরই হয়। কোন ভয় নেই।

●শ্রীমান শ্যামল (ছদ্মনাম) সোদপুর—

ও সব চিন্তা নাইবা করলেন। পড়াশুনা নিয়ে সময় কাটিয়ে দেখুন, স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে ও মাথা ঘোরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

●শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাতবাঁকুড়া, মেদিনীপুর—

আপনি দু'বেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Panlyn খাবেন দুমাস।

●শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা—

আপনি ভাতখাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Aminozyme (Stadmed) খাবেন অন্তত দু'মাস।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ব্যায়াম করতে হবে নিয়মিত ভাবে।

(প্রশ্ন ছাপতে নিষেধ করেছেন)

●শ্রীপি আর মাইতি, সরোজিনীনগর, নিউদিল্লী—

আপনি দু'বেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Waterbury's compound খান, অন্তত দু'মাস।

● শ্রীঅশোক দে, মল্লিকাটি, ২৪-পরগণা—

প্রশ্ন : আমার মাড়ি দিয়ে প্রায়ই রক্তপাত হয়॥

উত্তর : ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে কোন ভাল মাজন দিয়ে মাজবেন। ভিটামিন সি নিয়মিত খাবেন। শক্ত খাবার চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন। প্রথম কয়েকদিন রক্ত বেশি পড়বে, তার পর দেখবেন সেরে যাচ্ছে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য ভাল হবার ওষুধ খাবেন।

● এ কে (ছদ্মনাম), পার্কসাকাস, কলিকাতা—১৭—

আপনার চিঠি পড়লাম। যে উপসর্গের কথা লিখেছেন তাতো একদিনে কমবে না। আপনি Nevrovitamin-4 (adult) বড়ি ব্যবহার করুন আর Metatone জাতীয় ওষুধ খান।

● রোগিণী (ছদ্মনাম) ঠিকানা প্রকাশ অনিচ্ছুক—

আচ্ছা বলুন তো! নাম নেই, ঠিকানা নেই, ব্যক্তিগত পত্র দিই কি করে? অথচ আপনাকে দেওয়া উচিত ছিল। আপনি সমস্যার কথা আপনার বাবাকে বলে যত তাড়াতাড়ি স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করান।

● শ্রীআর কে বর্মণ, দুর্গাপুর—

আপনার উপসর্গ অপারেশন ছাড়া সারা সম্ভব নয়।

● শ্রীঅধীর মজমদার, বড়শুল, বর্ধমান—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি—

আপনার প্রথম প্রশ্ন এ সংখ্যায় অনেকবার আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২ : শরীর বেশ রোগা।

উত্তর : আপনি দু'বেলা ভাত-খাবার পর চা-চমচের দু'চামচ করে Calcinol (Raptakos Brett) দুমাস খাবেন।

● শ্রীপি কে মুখার্জী, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা—

না। স্বাস্থ্য খারাপ হবার কোন কারণ নেই।

প্রশ্ন ২ : স্বামী-স্ত্রীর কেবল মিলনের দিনগুলিতে কোন্ ওষুধ বা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে, সন্তান জন্মাইতে পারিবে না তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর : মিলনের দিন কোন ওষুধ খাবার নিয়ম নেই। এ অবস্থায় Cap ব্যবহার করতে পারেন। বড়ি খাবার নিয়ম এই সংখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে।

● শ্রী কে কে দে, লিডু, আসাম—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

আশ্চর্য স্মারক কবিমূর্তি

জার্মানীর সম্প্রতি পরলোকগত এক স্থানীয় কবির একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়েছে। মূর্তিটিতে ভাস্কর এক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। ব্যক্তি-জীবনে উক্ত কবি মদ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। মূর্তিটির ডান হাতে একটি মদ্যপাত্রও যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র

দণ্ডপাণি

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় বিপ্লববাদ চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব আনে নাই

প্রখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে. 'পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায়, ভারতীয় বিপ্লববাদ চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব আনে নি।' আমরা দেখেছি বহু বিপ্লবী স্বাধীনোত্তর ভারতে নিজেদের প্রাক্তন বিপ্লবী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তারা প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী হতে পারেন, কিন্তু বিপ্লবীর সংজ্ঞা কি এই। এ সব বিপ্লবীদের অনেকেই ইংরেজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষিত বলে পরিগণিত। তাঁরা এখনও ইংরেজের 'গলাবন্ধ' ব্যবহারে আনন্দ বোধ করেন। ডাঃ দত্ত সে জন্যই বলেছিলেন, 'আজ আমরা বিদেশী রাহুবিমুক্ত, ইহা সত্য বটে। কিন্তু আজও ইংরেজীকরণ চলছে। ইহার কারণ, যাঁরা আজ আমাদের জাতীয় কর্ণধার হয়েছেন, তাঁরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁরা অন্য কৃষ্টির খবর বিশেষ রাখেন না। ইহা আমাদের অজ্ঞতারই দোষ।' চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লবের অভাব হেতু বিপ্লবীদের ধ্যান-ধারণায় বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

এই উপলক্ষে লর্ড মেকলের একটি উক্তি মনে পড়িতেছে। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—

'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinion, in morals and in intellect.'

অর্থাৎ শাসক এবং শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা এমন একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলব—যারা জন্মে ভারতবাসী, রং-এ ভারতবাসী, কিন্তু তাদের রুচি, তাদের মতবাদ, তাদের নৈতিক চরিত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষা হবে বৃটিশ ভাবাপন্ন এবং তারা ব্যাখ্যাকার হিসাবে শাসকদের সমস্ত মতবাদ অগণিত শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রকাশ করবে।

জাতীয়তা ও স্বাজাত্যবোধ যুবসম্প্রদায়কে উদ্বেলিত করে তুলে। যৌবনের প্রকাশ—দুঃসাহসিকতায়। আশ্চর্যজনক কাল্পনিক কার্যকলাপে, কোন বাধাকেই সে বাধা বলে স্বীকার করে না। ধ্বংসের মধ্যে নূতন সৃষ্টির আহ্বান তাঁকে আকর্ষণ করে। বৈপ্লবিক ঘটনা তাঁর কাছে রোমাঞ্চকর ও প্রাণস্পর্শী। বৈপ্লবিক কার্য তাঁর নিকট সহজগম্য। কিন্তু বৈপ্লবিক দর্শন তাঁর নিকট দুর্জ্ঞেয়।

যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের পশ্চাতে ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতির গুণভেদ বর্তমান থাকে। পরিণত বয়সে কর্মের মধ্যে দিয়েই তাঁর গুণাগুণ পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লব আন্দোলনে বহু যুবক সরকারের উৎপীড়নে দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে দলের বহু গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। এতেই প্রতিভাত হয় যে, যদিও বিপ্লববাদ রজোগুণসম্পন্ন মনোভাবেরই বিকাশ; তাহলেও ব্যক্তির প্রকৃতিগত তমসাচ্ছন্ন মনোভাবের ফলেই রজোগুণসম্পন্ন কার্যের জন্য সে উপযুক্ত ছিল না। যৌবনের উচ্ছ্বাসবশতই সে বৈপ্লবিক কার্যে নিয়োজিত হয়েছিল। বৈপ্লবিক ধর্মের গুণাগুণের ধারক বাহক সে হয় নি। হতে পারেও না। কারণ প্রকৃতির বা স্বভাবের নিয়ম অপরিবর্তনীয়। এ জন্যেই ভারতে বিপ্লব-আন্দোলন কখনও কখনও বিরাট আকার ধারণ করলেও রজোগুণের অভাব হেতু সফল্যজনক পরিণতি লাভ করে নি।

ঋষি বঙ্কিম প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছিলেন—'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে। সন্তান সম্প্রদায়ের জন্য 'আনন্দমঠের' মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা দার্শনিক মতবাদও দিয়েছিলেন। মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ধাবিত হলেও তার ভিত্ বিপ্লববাদের পরিপোষক হয় নি। কারণ, মানব-প্রকৃতি ও স্বভাবকে তেমনভাবে গ্রহণ করা হয় নি বলে। ভারতীয় বিপ্লববাদের পরাজয় এখানেই।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানকেও বিপ্লববাদের ধারক-বাহকরা তেমনভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন নি। তিনি

বলেছেন—'এখন রজোগুণের দরকার। দেশের যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস তাদের ভেতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এখন চাই প্রবল রজোগুণের উদ্দীপনা।'

বৈপ্লবিক আদর্শকে দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলনে ঋষি অরবিন্দ যুগান্তরের পাতায় তুলে ধরে বললেন—'ন্যায় ও ধর্মের জন্য পবিত্রতা যেমন প্রয়োজন, ক্ষত্রিয়ের তরবারীও তেমনি প্রয়োজন। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হলেও সবলের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্বলকে নির্যাতন হতে রক্ষা করতে হবে। এ কাজর জন্যই ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি। কিন্তু ক্ষত্রিয় বা ক্ষাত্রধর্ম মানব-প্রকৃতির কোন্ বিশেষ গুণ-সম্পন্ন; সে সম্বন্ধে তেমন বিচার-বিবেচনা করা হয় নি।

নেতাজীও রেঙ্গুন হতে ডাক দিলেন—"ভারতের ত্রিশ কোটি দেশবাসী আমাদের কাতরস্বরে ডাকছে। আর ডাকছেন আমাদের পরমাত্মীয় পরিজনবর্গ। হে সৈনিক! উত্থান কর, হাতিয়ার গ্রহণ কর। যে পথ আমাদের দেশের বীর শহীদেরা প্রস্তুত করে গিয়েছেন—সে পথেই আমরা অগ্রসর হব। ভগবান যদি চান আমরা আমাদের পূর্বগামীদের মতই বীরের মৃত্যু বরণ করব।' 'ইত্তেফাক', 'ইত্তেমাদ' ও 'কোরবাণী'র আকুল আহ্বানে সমস্ত সৈনিকদের উন্মাদ করে তুলল। কিন্তু এখানে এসেও দেখছি কর্মযোগের পশ্চাতে রজোগুণের অভাব।

ধর্মরক্ষা, আত্মরক্ষা, সমাজ-রক্ষা, স্বদেশ-রক্ষা, প্রজা-রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ, তাহাই ধর্মযুদ্ধ। বিপ্লববাদ ধর্মযুদ্ধেরই নামান্তর। Salvation অথবা নির্বাণই যদি মানবের ultimate objective of life তবে ধর্মযুদ্ধে ব্যক্তির মোক্ষলাভ হলে, বিপ্লববাদেও ব্যক্তির মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। বিপ্লবদর্শনের এ শিক্ষা ভারতীয় বিপ্লববাদ তেমনভাবে গ্রহণ করে নি, সেই জন্যই চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব আসে নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম। আর এই স্বদেশ-স্বজাতিপ্রেমই হচ্ছে ক্ষাত্র ও সামরিক শক্তির মূল উৎস। আপোসমূলক দেশবিভাগজনিত স্বাধীনতা বিপ্লববাদের ধ্যানধারার বহির্ভূত বস্তু। স্বরাজলাভ হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেবের ঘোষণা উল্লেখযোগ্য।
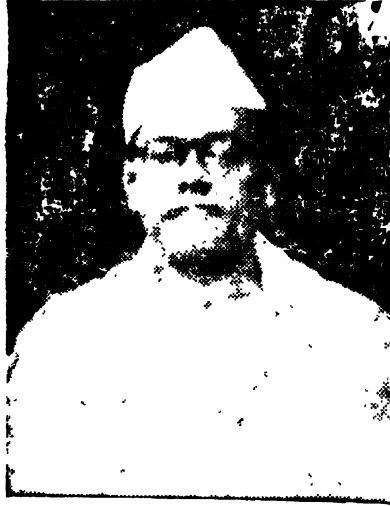
সুভাষচন্দ্র

'The spread of Nationalist feeling among the armed forces as one of the compelling consideration for the transference of power.' এখানেই একমাত্র বিপ্লববাদের সত্তা স্বীকৃতিলাভ করেছে। তারপরে দেখা গেল জাতি গঠনের দায়িত্ব 'By the process of co-operation and not by the process of coertion'রূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ফল দেখছি বিপরীত। বিশ্বপ্রেমের জয়গানে সাধারণ মানুষের হৃদয় হতে স্বাজাত্য-প্রেম মুছে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বার্থপরতা, দুর্নীতি কর্তব্যজ্ঞানহীনতা উচ্চতর হতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিসর্পিত। তাই এক যুগে রাষ্ট্রকল্যাণের পরিকল্পনাগুলি স্বার্থকতা লাভ করে নি। যে স্বাজাত্যবোধের উপর পরিকল্পনার রূপায়ণ নির্ভর করছে, তার অভাব হেতু, জাতি গঠনে যে সঙ্কল্প ও উদ্যমের প্রয়োজনীয়তা, তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হচ্ছে।

জাতি গঠনকার্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় জোড়াতালির কোন স্থান নেই। সে তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলতে থাকে। তাঁর চলার পথ কণ্টকিত হলে জাতির জীবন ও ব্যাহত হয়। আজ তাই হচ্ছে। তার কারণ, বিপ্লবের আলোকবর্তিকা যাঁরা বহন করে চলেছে, তাঁদের চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লবের অভাব, একথা পূর্বেই বলা হচ্ছে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র ও নেতাজীর জাতীয় ঐক্যের বাণী আজ নিগৃহীত।

সত্যিকার বিপ্লবদর্শন কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা নয়। ইহা সর্বব্যাপক জীবনদর্শন। মানুষের চিন্তা, ভাবনা, কার্যধারা ও আবেগ-অনুভূতি সবকিছু বিপ্লবদর্শনে রূপায়িত না হলে সত্যিকার বিপ্লবী মন গড়ে উঠে না। বিপ্লব মানে শুধু ধ্বংস নয়। সৃষ্টিধর্মী ধ্বংস। এই ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির নব উন্মেষ। বিপ্লবী এগিয়ে চলে সত্যিকার সৃষ্টির উন্মাদনায়। পথের বাধা তার গতিরোধ করতে পারে না। চিন্তার জড়তা, সংস্কারের বাধা, মায়া-মোহ, অন্ধবিশ্বাস তার প্রবল গতিমুখে চূর্ণ হয়ে যায়।

বিপ্লবী তার চিন্তাধারাকে এইভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে চিরদিন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্থবির সমাজব্যবস্থা, আচার-বিচার, বিধিনিষেধ সব কিছু ভেঙ্গে তারা পথ চলেছে। স্বাধীনতার আবেগপূর্ণ আবেদন তাদের মনকে এত ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে, সত্যিকার বিপ্লবী মনের কাঠামো সর্বক্ষেত্রে গড়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু স্বরাজলাভের পর নূতনতর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা যখন তীব্র

হয়ে উঠেছে, তখন বিপ্লবী কর্মীদের কর্মতৎপরতা সময়োপযোগী হয়ে উঠতে পারছে না।

কিন্তু বৈপ্লবিক আদর্শ কখনও ম্লান নয়। বিপ্লববাদ প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিকারের সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে আসে। সত্যিকার বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে তাঁরা নবীনই হোন বা প্রবীণই হোন, তাঁরা রণোন্মোদী হোন বা রণক্লান্তই হোন, বিদ্রোহী কবি পরিষ্কারভাবে বলেছেন,—

'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত;
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল,
আকাশ-বাতাস ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ,
ভীম রণভূমে রণিবে না,
আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেইদিন হব শান্ত।'

প্রকৃত বিপ্লবী অভিষ্টলাভের অনুকূল বলে যে পন্থা যখন প্রতিভাত হয়, বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে তাহা গ্রহণ করেন, প্রয়োজনবোধে পূর্ব পন্থা বদলাতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। বিপ্লবীই পারে পরিবর্তিত অবস্থায় নূতন কর্মনীতি অনুসরণ করতে ও অভিষ্ট লাভের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করতে।

সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে জড়বাদ ও আদর্শবাদ

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল স্রোত একটি হইলেও দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় তাহা প্রবাহিত, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একটি সহিংস (Dynamic) অপরটি অহিংস (Crystalic)। একটি জয়লাভের নিমিত্ত আপোষহীন সংগ্রাম, অপরটি আপোষমুখী আন্দোলন। প্রথমটি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে শেষ পর্যায়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত অভিযান। অপরটি গান্ধীজীর নেতৃত্বে আপোষমূলক মাধ্যমে দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ। কিন্তু কথা হইতেছে, যে-কোন উপায়েই স্বাধীনতা অর্জিত হোক না কেন, যে স্বাধীনতাকে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা কি প্রকারের হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

ইতিমধ্যে মার্কসীয় কম্যুনিস্ট-দর্শন সমাজবাদের বুনিয়াদরূপে ধরা হইতেছিল। নেতাজী কোনদিনই কম্যুনিজমের জড়বাদী দর্শনকে (Dialectic Matirialism) গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যদিও পণ্ডিত নেহরু কম্যুনিজমের মৌলিক আদর্শ ও ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। নেতাজী মনে করিতেন যে, চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পাঁচটি মহাভূত যথা পৃথ্বি, অগ্নি, জল, বায়ু ও আকাশ উপলব্ধ; তাহার পশ্চাতেও যে ঐহিক সত্তা বর্তমান, তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত না-হইলেও কম্যুনিজম তত্ত্ববিশিষ্ট কম্যুনিস্ট সমাজই, মানব-সমাজের অন্তিম পরিণতি নয়। সেই উপলব্ধ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতের পশ্চাদস্থিত কোন শক্তি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু না হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে শক্তিকেন্দ্রিক, এ-বিষয়ে নেতাজীর কোন সংশয় ছিল না। তাই তিনি সেই শক্তির অনুধ্যানী ও অনুসন্ধানী। সেই দুর্জ্ঞেয় জ্ঞানের জ্ঞান-পিপাসু। এই পরিনির্বাণ শক্তিও পরিত্রাপক। অনন্তকাল ধরিয়া এই দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে জানিবার জন্য কত দেহী সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অনির্দেশের পথে পথে ছুটিয়া গিয়াছে, কেহ খড়্গ হস্তে মাতৃ-মূর্তির সম্মুখে নিজের জীবন বলি দিতে উদ্যত দেখা গিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন 'যা চেয়েছ তার বেশী দিব বেণীর সঙ্গে মাথা।' তাঁহারা নিজের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; এই আত্মবিসর্জন ও আত্মত্যাগের মূল্য-নিরূপণই নেতাজীর জীবনদর্শন। মানুষের জীবনে ইহাই পরম ও চরম পাওয়া। ইহার ব্যতিক্রমই হইল সীমিত জীবন। ইহাই রামকৃষ্ণের 'মিশন' এবং স্বামীজী ও নেতাজীর জীবনে তাহার রূপায়ণ। নেতাজী বাস্তববাদের ঐকান্তিক প্রবৃত্তির মধ্যে, মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সামাজিক বৈষম্যকে দূর করিতে চান—ঐহিক সত্তাকে কেন্দ্র করিয়া। এইখানেই জড়বাদের সঙ্গে আদর্শবাদের সমন্বয়। এইখানটায়ই সাম্যবাদের সঙ্গে আদর্শবাদের পার্থক্য এবং নেতাজীর মৌলিক প্রভেদ।

ভারত বর্ণাশ্রমভিত্তিক দেশ। তার অর্থশাস্ত্র ও সমাজনীতি সহযোগিতামূলক। সেখানে প্রতিযোগিতার কোন স্থান নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিযোগিতাশীল; সুতরাং সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুইটি ধৃত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত System বা নিয়ম। যেমন কার্ল মার্ক্সের মতে বস্তুই সৃষ্টির মর্ম তত্ত্ব। ইহা একটা গভীর বিশ্বাস (dogma) ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া লইয়াই আজ পৃথিবীশুদ্ধ লোক প্রভাবিত হইতেছে। কয়েকটি দেশে বিপ্লবও সংগঠিত হইয়াছে। নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা সত্য যে, আমি আছি বা আমার সত্তা বর্তমান। আমি এই মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ। এই অস্তিত্বের মূল কারণকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যোগ-সাধনা দ্বারা অনেকে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া অসাধ্য সাধন করিতেছেন। কেহ বলিতে পারেন—এর কি প্রয়োজন। প্রয়োজন না থাকিলে মার্ক্সই বা কেন তাঁর অর্থনৈতিক সাম্যবাদের জন্য Dialectic Matirialism তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যদি একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই না থাকে, তবে তো fossils (শেওলা) এর মত ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। সেই জন্যই তো মহাভারতের যুগে তদানিন্তন কালের অভিজাত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের পশ্চাতে জীবনদর্শনের গভীরতায় পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী আত্মার কথা

উত্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ জীবন-দর্শনের উপরই সমস্ত যোগধর্মের বুনিয়াদ নির্ভর করিতেছে বলিয়া নেতাজী বিশ্বাস করিতেন। আমরাও এই বিশ্বাস লইয়াই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম।

তিনি বলেন—কোন একটি বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাই মানব-প্রগতির শেষ কথা হইতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। সমাজবাদের উপর বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করিতেছে, তাহা ঠিক। কিন্তু ভারতকে সমাজবাদের নিজস্ব রূপ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে। কেন-না তাহার ইতিহাস ও দর্শনকে বাদ দিয়া সে নয়। সে জন্যই স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভজনিত বিশৃঙ্খলাকে প্রতিরোধ করিয়া, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য, এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, যাহা দ্বারা অন্তত কিছু সময়ের জন্য নিয়মশৃঙ্খলাজনিত সামরিক অনুশাসনের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। বিশেষভাবে এই জন্য যেন সে সরকার ধনী চক্রের ক্রীড়নকরূপে পরিগণিত না হয়। অথচ জনসাধারণের মুখপাত্ররূপে শাসন পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। ইংরাজের অনুকরণীয় পার্লামেণ্টারী শাসন কোন দিনই জাতীয় ঐক্য ও প্রগতির সহায়ক হইতে পারে না। কেন না, দাসত্বের রজ্জু তখনও তাহার গলায়। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফার কোন দিনই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সেই জন্যই সেই চক্রকে নরককুণ্ডের আবর্জনায় নিক্ষেপ করিয়া কঠোর হস্তে সামরিক শাসনকে বিন্যস্ত করায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি FASCIST মনোভাবাপন্ন ছিলেন, যদিও নব্য আদর্শবাদীরা তাঁহাকে নির্মমভাবে সেইভাবেই দেশবাসীর নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে কোনরূপ সঙ্কোচবোধ করেন নাই। আজ বিশ বছর পর যে শাসনতন্ত্রের আশ্রয়ে জাতীয় ভিত টলটলায়মান ও রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তিগুলি ব্যাপকভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। তখন নেতাজীর ভবিষ্যবাণী সম্বন্ধে লোকের প্রতীতি জন্মাইতেছে। ইহাই স্বাভাবিক।

চন্দ্র পরিক্রমা

শ্রীরমানন্দ ব্রহ্মচারী

চাঁদ হাসে?
তুমি যে দ্যাখ নি কবি
অসম্মোর্ধে সমগ্র ছবি
সারারাত সুবিস্তীর্ণ নভে
জেগে জেগে ভাসে,
নীড়হারা সম সে নিত্য অঝোরে কাঁদে।
দিগন্তবিহারী কত পান্থজনে সাধে—
একবার এসো এই ঘরে।
আর্তনাদ শুনেছে কে কবে!
ভাসমান আর্তিফেনাগুলি
দূর হতে জ্যোৎস্না নাম ধরে!

মুখময় দুষ্ট ব্রণ
শত শত শতাব্দীর বঞ্চনার দাগ—
মূলা অবিদ্যার পুঞ্জীভূত কলঙ্কের
প্রকৃষ্ট চেরাগ।
বুকেতে অশ্রুর হ্রদ,
দীর্ঘশ্বাস আগ্নেয়গিরি,
বন্ধুর নিরুদ্দেশ পথ
অতল আঁধারস্পর্শী নানা খানা খন্দ,
নির্বায়ু বাতাবরণে
কবিদের স্তোত্রধ্বনি—নির্মম টিটকারি!
একাকী সর্বহারা বোবে এই সামগ্রিক রণে!

চিরন্তণ বৃথি ক্ষয়—
না জয়, না পরাজয়!
আজ দেখি—অ্যাপোলো ৮ রকেটে চড়ে
পৃথিবীর স্নেহাকর্ষ অগ্রাহ্য করে
তিনজন চন্দ্রনট ছুটছে তার কাছে
ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল গতিতে—
ভালবাসা নিয়ে নয়,
অদম্য কৌতূহলের গর্ব-বিলাসে
দুঃসাধ্যে বরিতে।
না জানি স্বর্ণাধারে নিয়ে ফেরে অভিনব কোন্ অভিজ্ঞতা
প্রলয় সূর্যের কিছু অগ্নিম উত্তাপ!

একদিন মোহনীল নীলাঞ্জন ছায়া
জেগেছিল মর্ত্যের চতুষ্টয় চোখে—
তখন কে ছিল অগ্নিসাক্ষী বোধ কল্পলোকে
একা তুমি ছাড়া?
বোরম্যান, লোভেল, অ্যান্ডার্স ফিরেই আসুক।
ফিরে এসে যা বলে বলুক—
দশাশ্ববাহন চিররথী তুমি,
অতনু প্রেমের সাধ্য-সাধনে
তুমি হৃদয়ের সাড়া!

দিল্লীকা লাড্ডু এবং মহানায়ক

আচার্য ভরত মুনি

(পাঁচ দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা)

প্রথম দৃশ্য

স্থান : ময়দানবীর ময়দান। মাঝখানে একটি পুরুষ্টু স্তম্ভ; স্তম্ভের দেয়ালে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটি বৃহদাকার টেলিভিশন সেট।

কাল : অনেকগুলি সন্ধ্যা।

কুশীলব : জনতা, নান্দী, সূত্রধার এবং পাঁচটি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

[শেষ ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে যায়। সমবেত অর্কেস্ট্রা বেজে ওঠে—সুর : 'আমার কাঁধে রাখো তোমার মাথা'। পর্দা কেঁপে কেঁপে ওঠে বৈপ্লবিক বীর বিক্রমে। প্রেক্ষাগৃহের মাঝখান দিয়ে জনতার স্রোত এগিয়ে চলে মঞ্চের দিকে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে—]

জনতা। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ (পর্দা উঠতে থাকে)। চ্যবন-দেশাই মুর্দাবাদ (পর্দা উঠতে থাকে)। দিল্লীর ষড়যন্ত্রকে কবর দিন...কবর দিন (পর্দা ওঠে)। কেন্দ্র-বিন্দু নিপাত যাক... নিপাত যাক, নিপাত যাক।

(পর্দা সবটা উঠে যায়)

[মঞ্চে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দুই মূর্তি]

সূত্রধার। যাক, ভালোয়-ভালোয় সভাপুজো শেষ হল!

নান্দী। এর নাম সভাপুজো! মন্ত্র নেই, আশীর্বচন নেই, দেবদেবীর—

সূত্র। ওসব মধ্যযুগীয় রাবিশ আমরা নিপাট বিদায় করেছি। সোসালিস্ট দেবতার মন্ত্র জনতার শ্লোগান। নাটক তাতে আরও জমে।

নান্দী। বুঝলুম। তা, আপনাদের আজকের নাটকের নাম কী?

সূত্র। মিস্টার তড়বড়ে!

নেপথ্যে। ইয়েস স্যর!

[মঞ্চের আলো একদমকে নিভে যায়। স্তম্ভগাত্রের টেলিভিশনে আলো জ্বলে ওঠে। তার ওপর ফুটে ওঠে, বেশ বড়ো বড়ো অক্ষরে : "দিল্লীকা লাড্ডু এবং মহানায়ক"]

নান্দী। বাঃ, চমৎকার নাম। কিন্তু নায়কটি কে হে?

সূত্র। আমাদের মহান নেতা...মহানায়ক—শ্রীজ্যোতি বসু।

নান্দী। স্বয়ং নাটের গুরু? অহো! তা, নাটকের বিবরবস্তুটি কী?

সূত্র। পশ্য পশ্য।

[টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিফলিত হয় একটি বিরাট টাকমাথা]

অ-মু-র কণ্ঠস্বর। আমি অজয় মুখোপাধ্যায়...পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী...আপনাদের বলছি—দিল্লীর এই ষড়যন্ত্র আমরা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলব, গুঁড়িয়ে দোব চ্যবন-দেশাইয়ের বজ্জাতি বিবদাঁত—

[যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে। সুর : জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে'। টি-ভি-র বুকে ফুটে ওঠে এক প্রকাণ্ড চুরুট।]

প্র-দা-র কণ্ঠ। দিল্লীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আজ, এইখান থেকে, এই মুহূর্তে—

[চুরুট থেকে গল্‌গল্‌ ধোঁয়া বেরিয়ে টি-ভি-র পর্দা ঢেকে ফেলে। ধোঁয়া সরে যায়। একজোড়া ঝকমকে চশমার ঝিলিক, কাঁচের ওপর টেকনিকালার প্রবাহ]

জ্যো-ভ-র কণ্ঠ। দরকার হলে, আমরা প্রতিটি ছাত্রের হাতে রাইফেল তুলে দেব...গুলিভরা পয়েন্টটু-টু রাইফেল... কলকাতার বুকে নতুন ইতিহাস রচনা করব—

[গুলির শব্দ। চশমা অদৃশ্য। একটা জবর পিঠ নড়তে থাকে নাচের ভঙ্গিতে]

রা-চ্যা-র কণ্ঠ। ঘুঘুদের বাসা ভেঙে ওদের ভিটেয় নতুন ঘুঘু চরাব।

জনতা। সরে দাঁড়ান...সরে দাঁড়ান। চুপ করুন। হে মহা-নায়ক—

[টি-ভি-র পর্দায় একজোড়া চোখ—বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, বোধে বিষণ্ণ, শান্ত দান্ত চতুরোদাত্ত]

জ্যো-ব-র কণ্ঠ। আমাদের আরও খাদ্য চাই, আরও টাকা চাই, আরও ক্ষমতা চাই। মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ, নব্যযুগীয় সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া ক্যাপিট্যালিজম্, শোষণবাদী যোজনা—এদেরই বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লবী সংগ্রাম।

জনতা। আহা-হা-হা! কী জবান, কী সাহস! গুরুদেব—গুরু গুরু গুরু।

জ্যো-ব-র কণ্ঠ। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন—কার্যোদ্ধার আমি... মানে আমরা করবই। কমরেড্‌স্, বিদায় দিন অকুতোভয়ে—

জনতা। মহানায়ক জিন্দাবাদ।

[দিব্য পুষ্পবৃষ্টি। উলুধ্বনি। কোরাসগীতি : 'জয়যাত্রায় যাও গো']

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : প্রধানমন্ত্রীর বিশ্রামকক্ষ। পরিচালক মনোমত সাজিয়ে নেবেন।

কাল : অকাল সকাল। দর্শকের দিকে ফিরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোফায় উপবিষ্ট। দর্শকের দিকে পিঠ রেখে একজন যুবক—হাত-পা নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে। কথা অবশ্য শোনা যাচ্ছে না।

বাইরে খুট্ করে শব্দ হতেই মুহূর্তে যুবক অদৃশ্য।

(যশোবন্তরাও চ্যবনের প্রবেশ)

চ্যবন। কে পালাল?

ইন্দিরা। কে আবার?

চ্য। চন্দ্রশেখরের মতো মনে হল না!
ই। চন্দ্রশেখর? মাই গুড়নেস্!
চ্য। ইন্দিরাজী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন চাণক্যের শিষ্য। তার গুপ্তচর—
ই। প্রধানমন্ত্রীর শয়নকক্ষেও থাকে। জানি চ্যবনজী।
চ্য। তাহলে একথাও জানেন নিশ্চয়ই, এসব আমি পছন্দ করি না।
ই। কিন্তু চ্যবনজী, শত্রু যে চারিদিকে। প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনের চারদিকে কাঁটা। যেভাবে দক্ষিণপন্থীরা—
চ্য। অর্থাৎ মোরারজী দেশাই আর তাঁর দলবল। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি যে বলেন ঃ কংগ্রেসের মধ্যপন্থার, দক্ষিণে না বামেও না!
ই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! আপনি চাণক্যের শিষ্য, কিন্তু তাঁর কূট-বুদ্ধিটুকু পান নি।
চ্য। পেয়েছি কি না, তার প্রমাণ যথাসময়ে দেব। কিন্তু অকংগ্রেসী রাজ্যের নেতাদের সংগে দহরম-মহরমের ফলটা—
ই। ফল একটিই—কেন্দ্রে আবার কংগ্রেস। অর্থাৎ আমি আপনি—
চ্য। আস্তে প্রধানমন্ত্রীজী। দেয়ালেরও কান আছে।... কিন্তু পশ্চিমবংগের যুক্তফ্রন্টের উঠ্‌তি মন্ত্রীদের আপনি চেনেন না।
ই। বাঃ, অজয়বাবু তো, বলতে গেলে, আমাদেরই পার্টির একজন নেতা।
চ্য। তিনি তো সাইফার...নৈবেদ্যের চুড়োর সন্দেশের মতো।
ই। জ্যোতিবাবুর মতো দক্ষ...বিচক্ষণ.. সমঝদার—
চ্য। স্টপ্ স্টপ্...খামোশ্।
ই। নো নো। আপনি ভয় পাবেন না। বিষহীন সাপেরই বেশি ফোঁসফোসানি! ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি—সেই শান্তিনিকেতনের ট্রেনিং পিরিয়ড থেকেই।

[বাইরে গুম্ গুম্ আওয়াজ ওঠে। ঘর ভর্তি সূর্যের আলো টকটকে লাল হয়ে আবার ভ্যাপ্‌সা শাদা।]

চ্য। ওই ওঁরা আসছেন।
ই। মুখে হাসিটা ঝুলিয়ে রাখবেন। আর, মেঝের ওপর ছড়িয়ে রাখবেন ফ্রেঞ্চ্ চক্।
চ্য। ফ্রেঞ্চ্ চক্?
ই। যা বললাম, করুন। যান।

[গজরাতে গজরাতে চ্যবনের প্রস্থান]

[দরজার পর দরজা পেরিয়ে পেরিয়ে শেষে ঘরে প্রবেশ করেন অজয় মুখোপাধ্যায় এবং জ্যোতি বসু]

ই। (উঠে দাঁড়িয়ে) আইয়ে আইয়ে। তস্‌রিফ রাখিয়ে।
অ। (আশীর্বাদের ভঙ্গিতে) শুভমস্তু।
জ্যো। (বুকের ওপর করজোড়) নমস্কার।
ই। নমস্কার।...বসুন। (তিনজনে বসে) তারপর অজয়দা, কেমন আছেন বলুন।
অ। আছি? বেশ ভালোই তো। কোন ঝুট্‌ঝামেলা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই, মুখ্যমন্ত্রিত্ব হারাবার ভয় নেই—
জ্যো। অজয়দা এখন ভোলানাথ শিব।
অ। বেশ সুখেই আছি...মানে, এরা রেখেছে আর কী!
ই। অত্যন্ত সুখবর! এবার তাহলে কাজের কথা হোক—
অ। নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি হয়তো রাগ করবে ইন্দিরা, কিন্তু কথাটা আমাকে বলতেই হচ্ছে—
ই। বলুন না, নির্ভয়ে বলুন।
অ। তুমি আগের চেয়ে অনেক.. অনেক সুন্দর দেখতে হয়েছো। জ্যোতিবাবু, ঠিক কি না?
জ্যো। সত্যি সুন্দর!
ই। (লজ্জিত ভাবে) থ্যাঙ্কু!
অ। না, না, এতো সহজে কথাটা এড়িয়ে গেলে চলবে না—
ই। আমাদের হাতেসময় কিন্তু কম। আসল কথাগুলো—
জ্যো। এ শহরে এতো গেট কেন? দিল্লী গেট, কাশ্মীরী গেট, আজমীরী গেট, লাহোর গেট, ইণ্ডিয়া গেট—
ই। ওটা ইতিহাস।
জ্যো। আপনার কাছে পৌঁছুতে হলে এতো দরজা পেরিয়ে আসতে হয় কেন?
ই। বোধহয়—পরিহাস!
অ। (উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে) বাঃ বাঃ, ইন্দিরা, তুমি কবি হতে পারতে!
ই। বহোৎ শুক্‌রিয়া। এবার বলুন, কোথা থেকে আলোচনা শুরু করব আমরা?
জ্যো। আপাতত কণ্ঠ থেকে।
ই। কণ্ঠ থেকে?
জ্যো। কণ্ঠে আমার তৃষ্ণা...তৃষ্ণা আমার—
ই। ও ইয়েস্

[একটা সুইচ টিপলেন। বুঁ-উ করে শব্দ হল। উর্দিপরা খানসামা ট্রেতে করে দু' গ্লাস রক্তিম শরবত নিয়ে ঢুকল।]

অ। জ্যোতিবাবু, ইন্দিরার কাছে এসে আপনিও কবি হয়ে উঠলেন!
জ্যো। (গ্লাসে চুমুক দিয়ে) শুধু কবি? আমার তো ইচ্ছে করছে—
ই। শ্লোগান দিতে?...ওঃ! যেরকম যুদ্ধের হুমকি দিয়ে এসেছেন—
অ। আরে, না না, ওসব—

[শরবতের গ্লাস তুলে নেন]

জ্যো। আপনি তো জানেন ইন্দিরাজী, রাজনীতিক মাত্রেই অভিনেতা; পাবলিকের সামনে একটু ওভার-অ্যাক্‌টিং করতেই হয়।
ই। তাহলে...বেশ, আপোষেই আলোচনা হোক।
অ। আলোচনা আবার কী? এই তো অনেক হয়ে গেল। তাছাড়া, তুমি কি আমাদের পর?
জ্যো। ঠিক ঠিক।
ই। আমি সম্মানিত বোধ করছি। তবু বলুন—
জ্যো। আমি বলছি। খাদ্যটা একটু বাড়াতে হবে: টাকাটাও একটু বেশি দিতে হবে; আর, সাংবিধানিক ক্ষমতা কিছু পরিমাণে—এই আর কী!
ই। শুধু এইটুকু! তা, এর জন্যে এতো কুণ্ঠা কেন জ্যোতি-বাবু? একটু-একটু করে সব দেব। বলেন তো, গোটা-কয়েক কমিটি-কমিশন বসিয়ে দি'!
অ। তাহলে তো সবই পাওয়া হয়ে গেল। শরবতটা সত্যি ভালো।
ই। কী—খুশি তো?
জ্যো। বহুত খুব। আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।
ই। আর একটু শরবত দেবে? পুরানা দিল্লীর ঘন্টেওয়ালার জিনিস—

অ। হ্যাঁ-হ্যাঁ।
জ্যো। না-না থাক।
ই। আচ্ছা, তাহলে এবার আপনারা মোরারজীভাই আর চ্যবনজীর সঙ্গে মোলাকাত করুন।
অ। মোরারজী দেশাই? ওরে বাবা, হিসেবের পাহাড় নিয়ে বসবে।
জ্যো। চ্যবনকে আমি স্ট্যান্ড্ করতে পারব না।
ই। জ্যোতিবাবু, আপনি বাংলাদেশের মহানায়ক। জানেন তো—পলিটিকস্ হ্যাজ স্ট্রেঞ্জ্ বেড্‌ফেলোজ্! মন্ত্রী যখন হয়েছেন—
জ্যো। ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন—
ই। কেন—ধরমবীরের সঙ্গে সেবারে এক প্লেনে আসেন নি? একসঙ্গে ফটো তোলেন নি?
অ। হ্যা-হ্যা-হ্যা! ইন্দিরা, তুমি অনির্বচনীয়া!
জ্যো। বেশথ্।
ই। লেকিন, আমাদের দিকটাও মনে রাখবেন। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসংঘ—এদের দাবিয়ে রাখতে হলে, আমাদের সঙ্গে আপনাদের হাত মেলানো দরকার।
জ্যো। ও, সিওর, সিওর। তবে, পাবলিক—
ই। কাকপক্ষীও জানতে পারবে না। ওয়ার্ড্ অফ অনার।
জ্যো। আর বলতে হবে না। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। চলুন অজয়দা।
অ। আর একপ্লাস খেয়ে গেলে হত না?
ই। নো! জ্যোতিবাবু যখন 'না' বলেছেন, তখন—আর না।
অ। হায় রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী!
ই। এবার কিন্তু আপনিও কবিতা আওড়াচ্ছেন!

[তিনজনে হেসে ওঠে কলস্বরে। হাসির দমকে দমকে পর্দা নেমে আসে]

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্চকে দুভাগ করে দুটো ছোট ছোট কিউব। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকের কিউব জোরালো স্পটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দুটো প্রোফাইল—একটি মোরারজী দেশাই, অন্যটি অজয় মুখোপাধ্যায়ের। বাইরে—গন্‌গনে দুপুর।

মোরারজী। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখে খুশি হলাম।
অজয়। আমিও।
মো। কথা বলে ভালো লাগল।
অ। আমারও।
মো। ভেবেছিলাম : ওদের দলে ভিড়ে বদলে গেছেন আপনি।
অ। তাও কি সম্ভব মোরারজীভাই? আপনিও তো দিশি-বিদিশি, মার্কিন ক্যাপিট্যালিস্টদের সঙ্গে দুবেলা খানা-পিনা করছেন, তাই বলে কি গান্ধীবাদ থেকে আপনি সরে গেছেন?
মো। হে-হে-হে, বেশ বলেছেন, জবর বলেছেন!...কিন্তু শুনলাম, আপনি আমার ওপর বহোৎ নারাজ হয়েছেন?
অ। কে বললে? কে? সব শত্রুদের সাজানো কথা।
মো। আমিও তাই ভাবছিলাম। খাঁটি গান্ধীবাদী দুজন—
অ। আমৃত্যু এক রক্তের মোরারজীভাই। আমাদের রঙ বদলাবে না।
মো। কিন্তু অজয়বাবু, মুখ্যমন্ত্রী হবার পর আপনি কেমন যেন চুপসে গেছেন—
অ। (চমকে) কই না!
মো। শুনেছি, সব কিছুই জ্যোতিবাবুর কব্জায়, সবই উনি করেন। (অজয়বাবু নীরব) এটা কি ভালো? ওরা আস্কারা পাচ্ছে।...বলেন তো, আমি আপনাকে মদত্ দিতে পারি।

অ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) মনে থাকবে আপনার কথা মোরারজী-ভাই।
মো। তাহলে—আমাদের আলোচ্য বিষয় : যোজনা, স্টেট রেভিনিউ—
অ। যেমন ব্যবস্থা করবেন। শুধু—দরকারের সময় একটু দরাজ হাত হবেন।
মো। অবশ্যই অবশ্যই। আমি-আপনি যখন হাত মেলাচ্ছি, কিন্তু ভাবনা করবেন না।...ভালো কথা, সুধীন কুমার কই? আপনাদের যুক্তফ্রন্টের ব্ল্যাড্‌ল্-চাইল্ড্?
অ। দিল্লী শহরটা দেখে বেড়াচ্ছে। কোনদিন তো আসে নি।
মো। বেশ বেশ। তাহলে আমার প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি নেই?
অ। বিলকুল না।
মো। ফাইন। এই হচ্ছে জেন্ট্‌ল্‌ম্যানস্ এগ্রিমেন্ট। আসুন, আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব—স' এ লুমিয়ে।
অ। ও—লাল কেল্লার সেই 'আলো ও শব্দ'-র ম্যাজিক? চলুন চলুন। অনেকদিন সিনেমা-টিনেমা দেখা হয় নি।

মিউজিক : জ্যাজ্

মো। সিনেমাই বটে।

[বাঁদিকের কিউবের স্পট্ নিভে যায়। ডানদিকের কিউবে একটা স্পট জ্বলে ওঠে। তাতে দেখা যায় : মহানায়ক জ্যোতি বসু হ্যান্ড্‌শেক্ করছেন যশোবন্তরাও চ্যবনের সঙ্গে। দুজনের মুখেই কান পর্যন্ত টানা হাসি। ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ্ বাল্‌ব্ দপ্ দপ্ করে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।]

চ্যবন। আর আমার ওপর ক্রোধ নেই তো?
জ্যোতি। কোনদিনই ছিল না চ্যবনজী। তবে, আপনারা—
চ্য। আপনি পশ্চিমবঙ্গের মহান নেতা...মহানায়ক জ্যোতি বসু—
জ্যো। তা তো বটেই!
চ্য। বিদেশী কাগজে কাগজে আপনারই জয়গান—
জ্যো। তা তো বটেই!
চ্য। অজয়বাবু তো নাম-কে-ওয়াস্তে—
জ্যো। তা তো বটেই! (হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে) না-না, মাথার ওপর উনি আছেন বলেই—
চ্য। জ্যোতিবাবু, আপনি একটা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাও হাফ্। আর আমি তামাম ভারতের নায়েব-ই-দেওয়ান। কোন্ মন্ত্রী তাঁর শোবার ঘরে বউকে কী বলেন, তা পর্যন্ত—
জ্যো। তা তো বটেই। আপনি তো সবই জানেন চ্যবনজী।
চ্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমাদের রক্ত এক—
জ্যো। হ্যাঁ—আপনার আর আমার—এাঁ!
চ্য। বিধান পরিষদ তুলে দিয়ে বুড়ো দেশপ্রেমিকদের আর মারলেন—
জ্যো। ওখানে যে কংগ্রেস দলে ভারী!
চ্য। আমারই লাভ হল এতে। আজ না, আর একদিন বুঝতে পারবেন। বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি তার বিনিময়ে?
জ্যো। তার জন্যে তাড়া কিসের? হবেখন্।
চ্য। কেন্দ্রের ক্ষমতা নিয়ে কি সব অভিযোগ তুলেছিলেন—?
জ্যো। (লজ্জিত) আরে, সে কিছু না। লক্ষ-লক্ষ লোকের সামনে একটা ফোর্স এসে যায় তো!
চ্য। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ তুলে নেওয়ার দাবি—
জ্যো। থাক না ওরা যতদিন খুশি। তবে, আমরা যখন চাইব, একমাত্র তখনই—

স্ম। সিওর, সিওর। হোম-গভর্নমেন্ট চালানোর কিছু কায়দা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেব। কেমন করে নকশালদের—

জ্যো। (বিগলিত হয়ে) আপনি মহাশয় ব্যক্তি!

স্ম। আপনি মহানায়ক। আসুন আর—একবার হ্যান্ডশেক করি।

[দুজনে উঠে দাঁড়ান। দৌড়তে দৌড়তে সুধীন কুমার প্রবেশ করেন—ফ্রেঞ্চ চক মাখানো চকচকে মেঝেয় পা পিছলে সড়্ড়ড়্ করে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খান। বাল্‌ব্ ফেটে গিয়ে ইলেকট্রিক ফিউজ। অন্ধকার!]

(ইলেকট্রিক মিউজিক বাজতে থাকে)

চতুর্থ দৃশ্য

ভারী ট্রাক চলার শব্দ। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্লোগানিং মঞ্চ ঘুরতে থাকে। উত্তেজিতা নারী-বাহিনী—পিঠখোলা, পেটখোলা ব্লাউজপরা মহিলা. কারও কোলে বাচ্চা, কারও হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, ; কারও মাথায় চুবড়ি, কারও মাথায় বাবুই-বাসা-খোঁপা। হাতে হাতে জনসংঘের পতাকা।

জনতা। জনসংঘ জিন্দাবাদ! জ্যোতি বসু মুর্দাবাদ। মহানায়ক—গো ব্যাক, গো ব্যাক।

[কুতব-মিনারের গায়ে ঝোলানো টি-ভি- সেট। ওর পর্দার বুকে ছবি ফুটে ওঠে—ধাবমান মোটরে অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবু।]

অ। তাই ব'লে পেছনের দরজা দিয়ে পালাবে?

জ্যো। ওদের ফেস্ করতে পারব না অজয়দা।

অ। তুমি! মহানায়ক জ্যোতি বসু! ময়দানের লক্ষাধিক জনসভায়—

জ্যো। সেসব পার্টির লোক, ঘরের আদমী। আর, এ যে—

মঞ্চে জনতা। ইয়ে রুশ নেহি, চীন নেহি জ্যোতিবাবু, ইয়ে হ্যয় ভারত। হিঁয়া নারীকা পুজা হোতি হ্যয়, অপমান নেহি।

টি-ভি-তে জ্যো। জোরে, ড্রাইভার, জোরে। টুলু যে এমন করে ডোবাবে, কে জানত!

অ। আর, তুমি-যে কলকাতার মস্তানদের এভাবে ডোবাবে, মাথা হেঁট করাবে—

জ্যো। আমি!

অ। তারা যখন শুনবে ঃ কয়েক হাজার স্মার্ট মহিলা দেখেই মহানায়ক পলাতক—

জনতা। জ্যোতি বসু—ভাগ্‌তো হ্যয়, ভাগ্‌তো হ্যয়!

মাইকে ঘোষণা ঃ বন্ধুগণ—থুড়ি, বন্ধুগণ—থুড়ি, বান্ধবী—না না, মায়েঁ ঔর বহিনোঁ! জ্যোতিবাবু আপনাদের জন্যে সকাল থেকে অপেক্ষা করছিলেন। অকালবসন্ত পড়তেই উনি নারাজ হয়ে চলে গেলেন...এইমাত্র।

জনতা। কোথায়? কোথায়? কোন্ মুল্লুক? কখন?

মাইক। বিজ্ঞানভবনে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মিটিং-এ।

জনতা। চলো চলো—বিজ্ঞানভবন চলো।

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে। পথ পেরিয়ে পেরিয়ে ট্রাকশুদ্ধ মিছিল এসে পৌঁছয় বিজ্ঞানভবনের সামনে। গেটে-গেটে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, যেন পুতুলপ্রতিমা।]

জনতা। জ্যোতিবাবু—কাম আউট, কাম আউট।

[টি-ভি-তে দেখা যায় ঃ একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বিজ্ঞানভবনের ভেতরে জ্যোতিবাবুর সন্ধান করছেন। কোথাও মিটিং, সেখানে নেই। হল থেকে করিডর থেকে ব্যালকনি থেকে হল থেকে ঘর থেকে লাউঞ্জ থেকে অবশেষে পেছনের একটা ছোট্ট ঘরে একলা জ্যোতি বসুকে পাওয়া যায়।]

পু, অ। স্যার!

জ্যো। অ্যাঁ—এখানেও!

পু, অ। না, না, স্যার, আমি...মানে, আমি।

জ্যো। অঃ।

পু, অ। ওঁরা স্যার দেখা করতে চাইছেন।

জ্যো। আমার সময় নেই। এক্ষুণি মিটিং।

পু, অ। এখনও আধঘণ্টা দেরী স্যার।

জ্যো। তার আগে অনেক কাজ আছে, অনেক কাগজপত্র।

পু, অ। তাহলে।

জ্যো। যেতে বলে দিন।

পু, অ। যাবে কি? তার চেয়ে, একটা মেমোরান্ডাম দিতে বলি—

জ্যো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বলুন। মানে, মানে...তাই করুন।

পু, অ। ইয়েস স্যার। [প্রস্থান।]

জ্যো। ওঃ—এখনও বুক কাঁপছে।

[জনতার স্লোগান ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে। চোখ বুজে জ্যোতি বসু দেহ ঢেলে দেন আরাম-কেদারায়।]

বঙ্গভবন। সাংবাদিক সভা। পুনশ্চ—সন্ধ্যা গ্লাডে উজ্জ্বল।

অ। কী, সিঙ্গাড়া কেমন লাগছে? চাঁদনী চকের বিখ্যাত—

জনৈক সাংবাদিক। এখানে বলে সামোসা।

অন্য সাংবাদিক। অতুল্যদা কিন্তু বাংলা দেশ থেকে সন্দেশ এনে খাওয়াতেন।

অ। আমরাও খাওয়াব। একটু জমিয়ে নিতে দিন।

জ্যো। আমরা জানাব সন্দেশ অর্থাৎ খবর—দিল্লী জয়ের। বলুন আপনাদের প্রশ্ন। হ্যাঁ—আমিই জবাব দোব।

১ সাং। সুধীনবাবুর কপালে অমন কালো দাগ কি করে হল? শুনলুম, সেক্রেটারিয়েটের ফ্লোরে—

সু, কু। কে বললে? নাতো! রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে।

২ সাং। জ্যোতিবাবু—আমি ভট্টাচাজ্‌মশাইকে বলছি—কলকাতার সভায় আপনি নাকি বলেছেন ঃ প্রত্যেক ছাত্রের হাতে—

জ্যো, ভ। কই না তো! সব কাগজওয়ালাদের কারসাজি। আমি বলেছিলাম—কী যেন বলেছিলাম! মানে, ঠিক ওভাবে নয়. অন্য একভাবে ; যাকে বলে—

৩ সাং। প্রমোদবাবু বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন—

অ। প্রমোদবাবুর সঙ্গে দেখা হলে শুধোবেন। আমি তার কী জানি?

৪ সাং। দিল্লী জয় কিভাবে করলেন তাহলে? আমি মিঃ বোসকে বলছি। দিল্লী ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে? কতোটা?

জ্যো, ব। অ-অনেকখানি। না দিয়ে যাবে কোথায়—হুঁ!

৫ সাং। কাশীপুর ফ্যাক্টরীর তদন্ত ব্যাপারটা?

জ্যো। আমরাই করব। তবে, সেন্টারের সাই নিয়ে।

৬ সাং। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ? সরিয়ে আনা হবে?

জ্যো। কী দরকার, থাক না। আমাদের কাজে লাগতেও তো পারে।

৭ সাং। সেন্টার কি-কি খাতে কতখানি ছেড়ে দেবে বলছে?

জ্যো। মোটা—কলকাতায় গিয়ে হিসেব না করে বলতে পারব না।

৮ সাং। কত? মহিলাদের জন্যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন?

জ্যো। হুঁ হুঁ।
৯ সাং। কতো টন ক'রে?
জ্যো। সেটা—ওয়াগান না গেলে বুঝতে পারব না।
১০ সাং। আচ্ছা জ্যোতিবাবু, আপনারা নাকি যোজনা সমর্থন করেন নি?
জ্যো। বুর্জোয়াদের তৈরি যোজনা—
১০ সাং। তবু, সমর্থন করবেন বলে নেতাদের কথা দিয়ে এসেছেন!
জ্যো। (চোখ টিপে) ওইটেই তো মজা।
১১ সাং। মার্কিনী সাহায্য চালু রাখার জন্যে অনুরোধ করেছেন। ওটাও কি—
অ। জল দেব? জল?
১১ সাং। কাকে বলছেন? আমাকে না জ্যোতিবাবুকে?
অ। বুঝতে পারছি না, ঠিক কাকে যেন বলছি। অথবা কাউকেই না!
১২ সাং। মোরারজী দেশাইকে কেমন লাগল?
অ। এই সিঙাড়া, না না, সামোসার মতো।
১২ সাং। জ্যোতিবাবু, আপনার চিরশত্রু চ্যবনজীর সংগে আপনার হ্যান্ডশেকের ছবিটা কিন্তু দারুণ উঠেছে।
জ্যো। চ্যবন না। উচ্চারণ—চওহান।
১৩ সাং। শত্রুর কথায় মনে পড়ল মেনন সাহেবের কথা। আপনারা তো ওঁকে চিরকাল গাল দিয়ে এসেছেন 'বুর্জোয়া ল্যাংবোট, লেজুড়' এইসব বলে। তাহলে ওঁকে নমিনেশন দিলেন কেন?
জ্যো। ওঃ, আজ বড্ডো গরম পড়েছে।
১৪ সাং। এস, ইউ, সি-র স্টেটমেন্টটা দেখেছেন? আপনারা... সি, পি, এম নাকি শ্রমিকবিরোধী এবং শিল্পপতিতোষণের পথ নিয়েছেন? এর প্রতিবাদ করবেন না?
জ্যো। সুধীন, পাখার স্পীডটা একটু বাড়িয়ে দাও তো ভাই।
১৫ সাং। রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামের ঘটনাটা আপনি অতো হালকাভাবে নিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? ওটা কি—
জ্যো। অজয়দা, এক্গ্লাস জল।
জ্যো, ভ। আমাদের সাংবাদিক সভা এইখানেই শেষ হল। আশা করি, আমাদের দিল্লীজয়ের খোশখবর শুনে আপনারা আহ্লাদ পেয়েছেন। এবং আমাদের মহানায়ক—
[সাংবাদিকরা উঠতে উঠতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।]

জ্যো। ভ। আপনারা উঠবেন না—আমি সমবেত দর্শকদের বলছি। এবার আপনাদের কয়েকটি তথ্যচিত্র দেখানো হবে—কিভাবে যুক্তফ্রন্টের বীর নেতাগণ এবং মহানায়ক মুহূর্তে দিল্লী জয় করলেন।

[জ্যোতি ভট্টাচার্য পকেট থেকে এক বৃহদাকার টি, ভি, সেট বার করে ভবনের দেয়ালে টাঙিয়ে দেন। সুইচ টেপেন—ঝংকৃত হয়ে ওঠে গান 'আমায় দে মা পাগল করে'। টি, ভি-র পর্দায় ভেসে ওঠে প্রথম দৃশ্যের মতো একে একে টাকমাথা, চুরুট, চশমা, পিঠ, আর চোখ।]

পাঁচটি বজ্রকণ্ঠ, কোরাসে। ভিনি-ভিডি-ভিসি। আমরা গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম। দিল্লী তো সামান্য, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। দিল্লী থেকে নিয়ে এসেছি এক বিরাট বিকট লাড্ডু। হে পশ্চিমবঙ্গের মূঢ় জনগণ, গ্রহণ করে কৃতার্থ হও।
নান্দী। দিল্লীকা লাড্ডু—
সূত্রধার। এবং মহানায়ক—
[নেপথ্যে বেজে ওঠে টুইস্ট্ নাচের পপ্ মিউজিক: 'লাড্ডু লাড্ডু দিল্লীকা লাড্ডু...এবং মহা—নায়-অ-অ-ক।' জনতা মঞ্চের ওপর উঠে এসে তাণ্ডব নাচ জুড়ে দেয়।]
জনতা। লাড্ডু লাড্ডু দিল্লীকা লাড্ডু...এবং মহা—নায়-অ-অ-অ-অ-ক। ইয়াহু! হু হু ইয়াহু!
চিৎকারের চোটে টি, ভি, সেট বার্স্ট করে 'দুম' ক'রে। এক-ঝলক আগুন, একমুঠো ধোঁয়া, আর রাশি রাশি তুলো মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এগিয়ে আসে প্রেক্ষাগৃহের দিকে। দর্শকজন মুদিল নয়ন, প্লে হল নিস্তব্ধ॥

---

* সর্বস্বত্বসংরক্ষিত। অভিনয়ের জন্যে নাট্যকারের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

সবচেয়ে মূল্যবান শয্যা

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে যে ঘুরন্ত শয্যাগুলি, সেগুলি পশ্চিম জার্মানীর অন্য সব হাসপাতালের শয্যার চেয়ে মূল্যবান। এই হাসপাতালের অগ্নিদগ্ধ ও প্লাসটিক সার্জারী বিভাগের পঁচিশটি শয্যার দাম চার লক্ষ মার্ক বা সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। এই শয্যায় একটি বোতাম টিপলেই রুগী নিজেকে ইচ্ছামত নড়াতে পারেন। ফলে রুগীদের শয্যা-ক্ষতের ভয় থাকে না।

॥ জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলাফল ॥

Man with his burning soul
Has but an hour of breath
To build a ship of Truth
In which his soul may sail
Sail on the sea of death
For death takes toll
Of beauty, courage, youth.
Of all but Truth.

—*John Mase field, Truth.*

ভৃগু-আচার্য

মুনের সত্তায় শতদল সত্যের সহজ অনুশীলনের মধ্যেই ক্রমোত্তর বিকসিত হয়ে উঠে। আমাদের পৌরাণিক ঋষিগণও শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষমা, বীর্য ও বুধ-চেতনার মর্মবাণী যে একমাত্র সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তা কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যকেই সাধনার সারবস্তু বলে নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞান সত্যের স্পর্শে বিজ্ঞানরূপে রূপান্তরিত হয়। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক—এক কথায় নীতিগত ব্যক্তিত্বই বর্তমান থাক না কেন—সত্যের অবজ্ঞায় ধ্বংস অনিবার্য।

মিথ্যার শক্তি দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে না। মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত দর্পের ফলে জাতি নষ্ট হয়, অভিমানের ফলে কুল নষ্ট হয় এবং অত্যধিক দানের ফলে সাম্রাজ্যচ্যুত হতে হয়।

রাবণ, দুর্যোধন আর বলিরাজকে স্মরণ করার সময় বর্তমানে এসেছে। অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে এই তিন চরিত্রের কথা ভাবা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনায় বা তর্কের মাধ্যমে সামান্য স্মরণ করলেই পারষ্কার রাজনৈতিক ছন্দটা তালে তাল দিতে দিতে মনের কোন-না-কোন একস্থানে এসে ছন্দিত হতে থাকবে। জ্ঞান না হোক, কুজ্ঞান যে হবে না—এ বিষয়ে আমার ধারণা সত্য ও সন্দেহাতীত। ওঁ সত্যং পরং ধীমহি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিন এবার মেষ রাশি। বৃষলগ্ন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রভাতী সূর্য বিষাদাচ্ছন্ন ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে দুঃখ ও সংশয়বাদী কুটিলচক্রান্তকারী ও দশমপতি শনিদেবের ব্যয়স্থানে মেষ রাশিতে চন্দ্রসহ অবস্থান সংবাদে স্বীয় সাম্রাজ্যের অরাজকতা যে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সংশয় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা নিয়ে বক্রী বুধের সঙ্গে মন্ত্রণারত। চন্দ্র—রাজা, শনি—দাস। সূর্য—রাজা, বুধ—রাজপুত্র। বুধ বক্রী। সূর্যদেব এই বক্রী বুধকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। উপরন্তু লগ্নের একদেশে রাহু ও শুক্র লগ্নের পঞ্চমস্থানে দৃষ্টিপ্রদান করে চলেছেন গুরু বৃহস্পতির উপর। শুক্র রাজমন্ত্রী। ক্রূর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করে চলেছেন সশিষ্য রাহুকে সঙ্গে নিয়ে। বন্দী দেব ও রাজগুরু। যদিও সূর্যদেবকে আশীর্বাদ প্রদান করে চলেছেন ত্রিকোণ দৃষ্টির বলে, তথাপি বৃহস্পতি এক্ষেত্রে বহুলাংশে শক্তিহীন। স্বাভাবিক বিচারে

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরাসুরের দ্বন্দ্ব প্রবলাকার ধারণ করতে পারে।

ইংরেজী ১৫ই মে থেকে ১লা জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হয়েছে।

গ্রহাদির সঞ্চার—
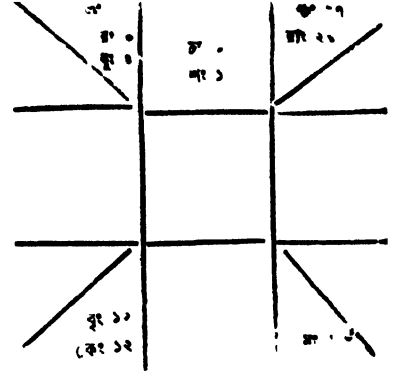
১লা জ্যৈষ্ঠ দঃ ২।৪ পলে বুধ বক্রী হবেন। ৪ঠা ৩৬।১৮ পলে বক্রী বুধ পশ্চিমদিকে অস্তমিত হবেন। ৭ই ৫।৪৩ পলে মঙ্গল ১৭ অনুরাধানক্ষত্রে যাবেন। ১১ই ৪১।৩৫ পলে বুধ বক্রগতি দ্বারা ৩ কৃত্তিকানক্ষত্রে যাবেন। ১৩ই ৩২।৭ পলে বৃহস্পতি বক্রত্যাগ করবেন। ১৬ই ২৮।৫০ পলে শুক্র মেষ রাশিতে যাবেন। ১৮ই ৩৯।৩০ পলে বক্রী বুধ পূর্বদিকে উদিত হবেন। ২৩শে ২৩।৫৫ পলে বুধ বক্রত্যাগ করবেন। ৩১শে ২।৪২ পলে শুক্র ২ ভরণী নক্ষত্রে যাবেন।

মেষঃ ক্ষুধার্ত চিন্তাগুলো এলোমেলো-ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে; সমস্যার পর সমস্যা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মন বিষাদাচ্ছন্ন। এই বিষাদাচ্ছন্ন মনের প্রভাবের ফলে আর্থিক ও কর্মস্থল শুভসূচক হয়ে দেখা দিবে না ৮ই জ্যৈষ্ঠ অবধি। স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই শুভসূচক থাকবে না। ১০ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ অবধি দিনগুলে স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ যাবে না; আহার বিহারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কর্মক্ষেত্রে সামান্য কারণেই নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। খুব সতর্কতার সঙ্গে কথাবার্তা পরিচালনা করা কর্তব্য সংসারের প্রায় সকল

ক্ষেত্রে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা ১৬ই জ্যৈষ্ঠের পর ক্রমশ খারাপ হতে থাকবে বলে ধরা যায়। ১লা থেকে ৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোন-না-কোন বন্ধুর সহায়তায় ভবিষ্যতের পথ সুগম হয়ে দেখা দিতে পারে। ১৩ই থেকে ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে দালালীতে বা কন্ট্রাক্টারীতে কর্মের পথ অনেকটা সুগম হয়ে দেখা দিতে পারে। কারখানার মালিক বা ডিরেক্টরদের 'ঘেরাও' হবার ভয় রয়েছে। মালিক পক্ষের এ অরাজকতা দমনে বেশ বেগ পেতে হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটামুটি চলবে। সম্ভাব্য বিবাহ নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যানবাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ভাগ্যস্থানে অশুভ গ্রহাদির দৃষ্টি বর্তমান না থাকায় ভাগ্যস্থান শুভপ্রদ। সর্ববিধ শত্রুতা ও বিপদাপদ থেকে ভাগ্যবলে সহজেই মুক্তিলাভ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

মেষ লগ্নের মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই অশুভ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে একের পর এক নানাবিধ ঝামেলার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। সাংসারিক কারণে ব্যয়বহুলতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যবহার ১০ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ অবধি শুভসূচক নয়।

বৃষঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেই চলেছেন দিনের পর দিন। কবে এ স্বপ্ন সার্থক হবে—বাস্তবের বিচরণক্ষেত্রে কবে আশাতীতো একের পর এক পঙ্খীরাজ ঘোড়ার ক্ষেপ সমবেত হবে, কবে সুদিন ফিরে আসবে? কিন্তু কই—স্বপ্নেও সমুত্তর মিলছে না। না মিলাই স্বাভাবিক। কেন না, লৌহ জাতীয় ব্যবসায়ে যাঁরা মগ্ন রয়েছেন তাঁদের বলতে গেলে গত পাঁচ বছর কাল শুভ চলছে না। কর্ম ক্ষেত্রে প্রোমোশান ইত্যাদি ব্যাপারে বিলম্বের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সংসারে আর্থিক সুরাহার প্রয়োজন। ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার সুব্যবস্থা এ মাসেও শুভ হয়ে দেখা দিবে না। চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সঙ্গীত-শিল্পীদের আর্থিক-স্বল এ মাসে মোটামুটি মন্দ যাবে না। মাতৃপক্ষ থেকে সাংসারিক বিষয় নিয়ে একের পর এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। ৮ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোন বন্ধুর সহায়তায় ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা ভাল যাবে না। কর্মক্ষেত্রে কথায়-বার্তায় সংযম অবলম্বন করা কর্তব্য। ভাগ্যস্থানের উপর শনির দৃষ্টি বর্তমান। যাদের কর্মক্ষেত্রে একের পর এক ঝামেলার সৃষ্টি হয়ে চলেছে তাদের আকস্মিকভাবে কর্মহীনতার যোগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং সর্ববিধ পরিবেশে স্থির গাম্ভীর্য বর্তমান থাকাই সমীচীন। স্ত্রীর পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। মাতার বা মাতৃস্থানীয়ার আকস্মিকভাবে রোগভোগ হতে পারে ২রা থেকে ৬ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে। ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে। গৃহে চুরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৬ই থেকে ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে। বৃষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের বিবাহাদি ব্যাপারে, ব্যবসায় বা কর্মক্ষেত্রে এবং আর্থিক আয় প্রভৃতি ব্যাপারে নানাবিধ ঝঞ্চাটের সৃষ্টি হতে পারে। বাসস্থান এবং বাসগৃহের পরিবর্তনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মিথুনঃ একটা বিরাট অজগর ক্রোধে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে ক্ষণে ক্ষণে। চারদিকেই বলতে গেলে অশান্তি ধূমায়িত হয়ে উঠছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের ব্যবহার ও ক্রূরতায় আচ্ছন্ন। স্বাস্থ্যের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেও আশানুরূপ সুযশ মিলছে না। কণ্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনীয়র ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে নানাবিধ তিক্ত পরিবেশের উদ্ভব হবে; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই—স্বাভাবিক ধর্মের বলেই সে তিক্ত পরিবেশের অবসান ঘটবে। ভ্রাতাদের বিরূপ মনোভাব শুভ হয়ে দেখা দিবে। ৮ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অপর পক্ষে ২০শে থেকে ৩০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোন-না-কোন বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবার যোগ রয়েছে। বিদেশ ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তির বিদেশ ভ্রমণযোগ সুগম হয়ে দেখা দিতে পারে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটামুটিই থাকবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ২রা থেকে ৬ই জ্যৈষ্ঠ অবধি শুভ যাবে না। শত্রুরা যতই প্রবল হোক না কেন, সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে পূর্ব ঝঞ্চাটের নিরসন হতে পারে। বিবাহের যোগাযোগ স্থির হয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে শনির দৃষ্টি বর্তমান রয়েছে। কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির দ্বারা অপপ্রচারের যোগ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার ও সাহিত্যিকদের আয়ের পথে বিঘ্ন ঘটবে। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। মিথুন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের বন্ধু, পত্র ও কন্যা এবং আয়ের স্থান এ মাসে শুভসূচক হয়ে দেখা দিবে না। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলার সৃষ্টি হলেও ভয়ের কারণ নেই।

কর্কটঃ ভুল—ভুল—ভুল। এই সংসারে ভুলের খেয়াতরী বেয়ে চলেছেন যেন দিনের পর দিন। ব্যর্থতা আর হতাশায় মুহ্যমান মন সাংসারিক চাপে অস্থির আক্রোশে মাথা খুঁড়ে চলছে। সাংসারিক সমাধানের একটা প্রশস্ত পথ চাই—কিন্তু কোথায় সে পথের সন্ধান, কোথায়ই বা রয়েছে আর্থিক পথের সমাধান। স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছে না। কর্মক্ষেত্রেও মন চঞ্চল। সমস্যা—রয়েছে, সমাধান হচ্ছে না। ভ্রাতাদের ব্যবহারে অসৌজন্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কনিষ্ঠা ভগ্নীর ব্যবহারও শুভ বলে মনে হবে না। কথায়-বার্তায় আলাপ-আলোচনায় বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার স্পর্শ থাকা কর্তব্য। আর্থিক ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ব্যবহার অশুভ হয়ে দেখা দেবে। কনিষ্ঠ পত্রের ১০ই থেকে

১৪ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আঘাতপ্রাপ্তির যোগ বিদ্যমান রয়েছে। মামলা-মোকদ্দমার জন্য শুভসূচক নয়। যতটা সম্ভব মিটিয়ে ফেলাই সমীচীন। কবি, সাহিত্যিক, আইনবিদ্‌ জ্যোতির্বিদ্‌ ও ভেষজবিদ্‌দের আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে ১৬ই জ্যৈষ্ঠের পর ধীরে ধীরে। কঠিন কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে ৮ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে। বিবাহবিষয়ক ব্যাপারে পূর্ব থেকে সতর্ক না থাকলে বিবাহ ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে অতি সামান্য কারণেই। কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধি পেতে পারে ২রা থেক ৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে । আয়ের পথ বৃদ্ধির জন্য কোন অন্যায় পথকে না আঁকড়ে ধরাই শ্রেয়। বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নীর মানসিক ও স্বাস্থ্য এ মাসে শুভ যাবে না কর্কট লগ্নের জাতক ও জাতিকাদর ভ্রাতৃস্থান, পুত্রস্থান, বৃদ্ধি ও বিদ্যাস্থান আয় এবং ব্যয়স্থান এ-মাসে শুভসূচক হয়ে দেখা দেবে না। অতি সামান্য কারণে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে মানসিক আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহঃ এই পৃথিবী না ভারতবর্ষ না বাংলা দেশের জনগণই ধীরে ধীরে বিশ্বাসঘাতকদের সম্মিলিত আক্রমণে হতায় হয়ে চলেছে। আপনার মনের অবস্থাও অশান্তিমগ্ন। কোন কর্মই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। আর্থিক স্থলেও একের পর এক বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। ৮ই থেকে ১৬ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আকস্মিকভাবে আর্থিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে অশান্তি আসা অসম্ভব নয়। পুত্র ও কন্যাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে লোকপরিচালনা ও আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট অনেকটা তিরোহিত হবে। বন্ধু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার যোগ রয়েছে। কোন বন্ধু ও আত্মীয়ের পরামর্শানুসারে ভূসম্পত্তি ক্রয় কিংবা বিক্রয়াদি করা সমীচীন নয়। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। মাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। পত্নী স্বাস্থ্য মোটামুটি। ৮ই থেকে ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছোট-খাট ভ্রমণের যোগ । দৃষ্ট হয়। ইঞ্জিনীয়র, ডাক্তার ও গ্রন্থকারদের আয়ের পথ প্রশস্ত হবে ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পর ধীরে ধীরে। কর্মক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয় না। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সিংহ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে আর্থিক, বন্ধুভাগ্য ও কর্মস্থান শুভসূচক নয়। পুত্রের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। ২রা থেকে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

কন্যা ঃ কাঁকড়া বিছার জ্বালা অনুভূত —, বিষ ও যেন ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। দিনের মধ্যে দু'এক ঘণ্টা প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাজনিত এই জ্বালা থাকা অসম্ভব নয়। আবেগবিহ্বল মন নিয়ে চার পাশের দশজনের সাথে মিত্রতা করবার ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দেখা দিলেও, সে মনকে সংযত করে একাকিত্ব যতটা সম্ভব নিয়ে আসাই সমীচীন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও ভ্রাতাদের ব্যবহার সন্তোষজনক হয়ে দেখা দেবে না। যথেষ্ট প্রয়োজনেও আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার লক্ষণ রয়েছে। স্বাস্থ্য ৫ই থেকে ৮ই জ্যৈষ্ঠ অবধি শুভ থাকবে না। আর্থিকস্থল ভাল যাবে না। শনির প্রত্যক্ষ কুপিত দৃষ্টি আর্থিকস্থলে বিদ্যমান। কন্ট্রাক্টর-এর নিশ্চিত কন্ট্রাক্ট নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। দূরভ্রমণের যোগ রয়েছে ১৮ই থেকে ২৪শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে। গৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে নানাবিধ মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ১০ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোন বন্ধুর সহায়তায় সবিশেষ উন্নতির যোগ দৃষ্ট হয়। শত্রুরা যতই প্রবল হোক সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। কোমরে বা পেটের তলদেশে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। আহারবিহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ইঞ্জিনীয়র, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সাংবাদিক ও পত্রিকা-সম্পাদকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। কন্যা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য, ভ্রাতৃ, পত্নী, মামলা-মোকদ্দমা, শত্রু, ভাগ্য ওআয়স্থান ১৬ই জ্যৈষ্ঠ অবধি শুভসূচক নয়। কোন সম্বন্ধু লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের ব্যবহার ও স্বাস্থ্য শুভ থাকবে না। ১৮ই থেকে ২৪শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে হঠাৎ ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়।

তুলা ঃ হিংসা-দ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে সংসার। বিশৃঙ্খলার অক্টোপাশের মধ্যে আবদ্ধ হন মুক্তিলাভের ইচ্ছায় ব্যাকুল। সম্মান-প্রতিপত্তি ও আদর্শ নিয়ে কোনক্রমেই চলতে পারা যাবে না বুঝি সাংসারিক জীবন সংগ্রামে। ভ্রাতৃবিরোধের রোষ ক্রমশ প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। বিচার-বুদ্ধি ও সমতাহীন দৃষ্টি আর বক্তব্যের কঠোরতাঃ মনে হবে ঘর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু উপায় নেই, নেই আর্থিক স্বচ্ছলতার যাদুমন্ত্র, যে মন্ত্র-প্রভাবে আলাদীনের মত রাতারাতি ইমারত গড়ে সরে পড়া যাবে। যাক ১০ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যথাক্রমে অশুভ থাকবে। আহার-বিহারে ও কথাবার্তায় যথেষ্ট সংযম অবলম্বন করা কর্তব্য ধনস্থানের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা মন্দ যাবে না। কোন বন্ধুর নিকট হতে ছোটখাট প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধু ও আত্মীয়স্থান মোটামুটি। কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির দ্বারা অপপ্রচারের যোগ রয়েছে। ৮ই থেকে ১৪ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে প্রীতিভোজনাদির উপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না এবং তাদেরই বড় রকমের ক্ষতি হবার যোগ রয়েছে। স্ত্রী-ব্যবহার ও স্বাস্থ্য শুভসূচক নয়। চিত্র-তারকা ও ইঞ্জিনীয়রদের আর্থিক বিষয়ক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তুলা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পত্নীস্থান, ধনস্থান ও বন্ধুস্থান শুভসূচক নয়। আর্থিক বিষয়ে

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম- ....

ঠিকানা- ....

....

মাসিক বসুমতী

লেনদেনের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের পক্ষে সামান্য কারণে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয় ৮ই থেকে ১৪ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে।

বৃশ্চিক : সংকল্প রয়েছে অনেক, কিন্তু সম্ভাবনার সূত্র কই। ভাব ও ভাষা রয়েছে কিন্তু গুছিয়ে লিখবার সময় কই। ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চতুর্ভুজ মনকে স্থায়িভাবে আবদ্ধ করে রাখবার হৃদয়াবেগও ক্ষণস্থায়ী। চার দিকেই ভাবনাগুলো পাওনাদারের মত দানব-দৃষ্টি ছড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সাংসারিক পরিবেশ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন। যাক নির্ভয়চিত্তে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য; স্বাস্থ্যের দিকে যত্ন নেওয়া বিশেষভাবে কর্তব্য ৮ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ অবধি। কোন বন্ধুর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ন্যায্য অর্থপ্রাপ্তিতে বাধা ঘটবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অশুভ বলে বোধ হবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চাকুরীক্ষেত্রে বা ব্যব-সায়-ক্ষেত্রে গোলযোগ দৃষ্ট হয়। আত্মীয় ও বন্ধুস্থান মোটামুটি। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ১৬ জ্যৈষ্ঠের পর থেকে ২২শে জ্যৈষ্ঠ অবধি শুভ যাবে না। কনিষ্ঠ পুত্রে বা কন্যার পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। শত্রুদের মধ্যে কেউ-না-কেউ বশ্যতা স্বীকার করবে। পত্নী বা পতির স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা ৫ই থেকে ১০ই জ্যৈষ্ঠ অবধি শুভ থাকবে না। বিবাহাদির ব্যাপারে বিঘ্নের সম্ভাবনা রয়েছে। আহার-বিহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। বৃশ্চিকলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আর্থিক, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, পত্নী, ব্যবসায় ও আয়স্থান শুভসূচক নয়। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের যোগ বিদ্যমান রয়েছে। এ মাসে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হবে।

ধনুঃ দুঃখ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষের মনের এমন একটা শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, যে অবস্থাকে কোনক্রমেই বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা চলে না। ব্যাখ্যা করা চলে না কর্ম, জ্ঞান, ধর্ম ও শক্তির সাহচর্যে। ব্যথা-বেদনা গুমড়ে গুমড়ে উঠে কার্যক্ষমতাকে পর্যন্ত নষ্ট করে দিতে চায়। আর্থিক বিষয়ে চিন্তা-তাপিত মন দারিদ্র্যের নিদারুণ তাপে বিবর্ণ বিশুষ্ক। এ অবস্থায় ধর্মহীন হলে চলবে না কোন ক্রমেই। দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মে মনোনিবেশ করাই সমীচীন। অর্থস্থানে শনির দৃষ্টি বর্তমান থাকায় আর্থিক যোগাযোগের সূত্রপাত হলেও কার্যকরী হয়ে দেখা দিবে না। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ থেকে ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আর্থিক বিষয়ে লেনদেন করা সমীচীন নয়। নূতন কোন ব্যবসায়ে অর্থ ব্যয় না করাই শ্রেয়। ভ্রাতাদের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা শুভ হয়ে দেখা দিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রের গোলযোগ অনেকাংশে তিরোহিত হবে। ১২ই থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোন শ্বেতকায় বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। ব্যবসায় সম্মিলিতভাবে করা সমীচীন নয়। ৫ই থেকে ১০ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে পুত্রের বা কন্যার সঙ্গে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। পত্নীর ব্যবহার ও স্বাস্থ্য শুভ যাবে না ১৮ই থেকে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ অবধি; কনট্রাক্টরদের পক্ষে ২০শে জ্যৈষ্ঠের পর দিনগুলো আর্থিক বিষয়ে শুভসূচক। ধনু লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ধনস্থান শুভসূচক নয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অশোভন বলে মনে হবে। পুত্র ও কন্যাদের শারীরিক ও বিদ্যা-শিক্ষাদির ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

মকর : কল্পনার সমুদ্রে ভাসমান শৈবালের মত নিরাশ্রয় জীবন যাপন করার জন্য বাস্তবের ক্ষণিক আনন্দ রয়েছে, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। স্বপ্ন মনে করা থেকে লোকসমাজে প্রকাশ করা অবধি অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বইয়ে চলেছে মনের প্রান্তরে। এই ঝড়-ঝঞ্ঝাকে দমিত করতে হ'লে চাই সুগন্ধস্নাত মনে পবিত্র গাম্ভীর্য। কথাবার্তায় ও আলাপ-আলোচনার মধ্যেও বর্তমান থাকা চাই স্নিগ্ধ ভাববিলাস। অনেক নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে কর্মক্ষেত্রে—সে সব যোগাযোগকে স্থায়ী করা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না। প্রকাশক, গ্রন্থকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই তিক্ততায় আচ্ছন্ন থাকবে। ৮ই থেকে ১০ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোন-না-কোন সবন্ধু লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। কোন বন্ধু দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার যোগ দৃষ্ট হয়। সাহিত্যিক, কবি ও গ্রন্থকারদের আয়ের পথ প্রশস্ত হবে। ১৫ই থেকে ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবার যোগ রয়েছে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। কোন মহিলার দ্বারা অপ্রচারের যোগ দৃষ্ট হয়। ১৮ই থেকে ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ভূমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ৫ই থেকে ৭ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ছোটখাট ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। মকর লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের বিষয়-সম্পত্তিমূলক ব্যাপারে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে মানসিক নিদারুণ অশান্তি আসা অসম্ভব নয়। বন্ধুদের নিকট গুপ্ত মন্ত্রণাদি যতদূর সম্ভব প্রকাশ না করাই শ্রেয়। চাকুরী-ক্ষেত্রের গোলযোগ পূর্বাপেক্ষা অনেকটা হ্রাস পাবে।

কুম্ভ : বিশ্বাস-বিশ্বাস-বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের নিদারুণ প্রতিশোধের মর্ম-জ্বালায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে সর্বশরীর ও মন। নিজেও সারল্যের বনিয়াদ দৃঢ় করে নির্মাণ করেন নি, ফলে সেই বনিয়াদ ধ্বসে পড়ছে ক্রমশ। যাকে বিশ্বাস করা প্রয়োজন এবং যাকে বিশ্বাস করলে ভবিষ্যতের পথ দৃঢ় হবে এবং কর্মক্ষেত্রে

প্রসারণও সৃষ্টি হবে সেক্ষেত্রে পুরোপুরি বিশ্বাস করা নিরর্থক বলেই মনে হয়েছে। থাক. এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষকেই দোষী হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। গোচর-ফল হিসেবে গ্রহদোষের ফলেই মনের এ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে বলে ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টরদের পনরায় তাদের আত্মবিশ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসা সহজ ও স্বাভাবিক কর্তব্য বলেই মনে করা উচিত। আর্থিক অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। কণ্ট্রাক্টরদের নূতন কোন কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে সতর্ক থাকাই সমীচীন। ৫ই থেকে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ অবধি দিনগুলো ভ্রাতৃস্থানের পক্ষে শুভসূচক নয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মানসিক অশান্তি সাংসারিক কারণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। মনের কোন গুপ্ত আশা সফল হয়ে দেখা দিবে। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। কোন বন্ধুর সহায়তায় প্রাপ্য টাকা আদায় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ই থেকে ১৪ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে পুত্র বা কন্যাদের পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ভূসম্পত্তি, বাসগৃহ ও বাস-স্থানের ব্যাপার নিয়ে গোলযোগের যোগ দৃষ্ট হয়। বৃষলগ্নের জাতক ও জাতিকা-দের ধনস্থান, ভ্রাতৃস্থান ও বন্ধুস্থান এ মাসে সবিশেষ শুভপ্রদ থাকবে না। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। নূতন কোন ব্যবসার যোগ এলেও সে যোগাযোগ পিছিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

মীন : ব্যক্তিগত জীবনের বহু অকথিত কাহিনী রয়েছে, রয়েছে অনেক সমস্যা, যে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হলেও প্রয়োজন ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, যার সমাধান হবে মীমাংসা অথচ মীমাংসা করবার মত মনের অবস্থাও নেই। মীমাংসা না হলেও উপায় নেই। বিদ্বেষ-বহ্নি তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে সংসারের চারদিকেই ছড়িয়ে পড়বে। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ৮ই থেকে ১০ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। ২রা থেকে ৮ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আকস্মিক-ভাবে শরীর খারাপ হয়ে পড়বার যোগ রয়েছে। ধনস্থান শুভ যাবে না। চাকুরীস্থলে হঠাৎ গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কোন মহিলার প্ররোচনায় সংসারে তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। ভ্রাতা ও ভগ্নীস্থান মোটামুটি শুভ বলা চলে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধির যোগ দৃষ্ট হয়। বন্ধু ও আত্মীয়-স্থান মোটামুটি। পুত্র ও কন্যাদের শারীরিক অবস্থা ভাল যাবে না। কন্যা বা পুত্রের নিশ্চিত বিবাহে বিঘ্নের সম্ভাবনা রয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বা কন্যার চাকুরী লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পত্নীর সঙ্গে মনো-মালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। গর্ভবতী রমণীর কন্যা লাভের যোগ রয়েছে—১০ই থেকে ১৪ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে যাদের জন্ম হবে। ১৮ই থেকে ২৪শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে দূর-ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। ভূসম্পত্তি বিষয়ক অসুবিধা-গুলো অনেকাংশে দূরীভূত হবে। মীন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য, অর্থ, ভ্রাতা-ভগ্নী, পত্নী, ভাগ্য ও আয়স্থান শুভসূচক নয়। হাতে বা পায়ের আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

পত্রোত্তর

● বাসন্তী চক্রবর্তী, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলি-১১—(ক) মন দিয়ে পড়াশুনা করুন পাশ করতে পারবেন। (২) বৌদির প্রভাবে ভ্রাতারা স্বার্থপর হয় না। স্বার্থপর মন নিয়েই ইহলোকে তাঁরা এসেছেন। ● শেফালী গোস্বামী বেলেঘাটা মেইন রোড, কলি-১০—(ক) একমাত্র ঈশ্বরের অণুক্ষণ চিন্তার বলেই মনে শান্তি পাওয়া যায়। (খ) স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে দেখুন। ● ঊষা রায়, কল্যাণী—সাংসারিক সন্দেহের উৎপত্তি হয় পরস্পরের স্নেহের অভাব হলেই। নিজেকে প্রথমে সন্দেহমুক্ত করুন। ● এ বি হাজরা যাদবপুর, কলি-৩২—মেষরাশি, দেবগণ, তুলা লগ্ন। বর্ষফল এখানে কেমন করে দেব ভেবে পাচ্ছি নে। ● এস এন বোস, বালা, বোম্বাই—আপনার উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বড়ুয়া, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪—দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ● মিতালী দে, কলি-১০—ধৈর্য ধরুন, সমস্ত বিপদই কেটে যাবে। বিশ্বাস করে বগলা দেবীর স্তব প্রতিদিন সকালে শুচি বসনে পাঠ করুন। অশুচি অবস্থায় বাদ দিলেই চলবে। ● কুমারী পলা, নীলমণি রো কলি-২—সতর্ক হয়ে পড়াশুনা করবেন। আগামী ৩ বছরের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীসুজিত কুমার বসু, ভাগলপুর, বিহার—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। (খ) স্বামী হবার যোগ রয়েছে। ● শ্রীমতী মিনতি ঘোষ, গোপাল ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৫—আপনার সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● শ্রীমৃণালকান্তি ব্যানার্জি, মতিলাল কলোনী, দমদম—ভালই বলা চলে। আগামী ২ বছরের মধ্যে হবে। (খ) ৩২ বছরের পর থেকে ধীরে ধীরে শ্বেত জাতীয় ব্যবসায়ের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ● অনিন্দিত্র সেন, বৌবাজার স্ট্রীট। কন্যা রাশি, কুম্ভ লগ্ন। ● অজানা, অপেক্ষা করুন। পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ● শ্রীরমেন্দ্র চক্রবর্তী, কল্যাণগড়, ২৪-পরগণা— চাকুরীতে বদলীর সম্ভাবনা রয়েছে। ● মতিলাল দত্ত, কলি-৪৬—ধৈর্য ধরে 'শ্রীশ্রীদুর্গা' নাম এক লক্ষবার লিখুন। সকল সমস্যার হাত হতে মুক্ত হবেন। ● শ্রীমতী ছায়ারাণী ঘোষ, বালী, বাদামতলা, জি, টি, রোড—ধনু রাশি, মিথুন লগ্ন, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, নরগণ, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী শুক্রের

শা। আত শীঘ্রই করে আসবে। ●শ্রীমতী মিহিকা, শীল বাগান লেন, কলি-১৪ — ১৯৬২ সালের মধ্যে আশা করতে পারেন। ●শ্রীকিশোরীমোহন দাস, পুরুলিয়া, ৬-৮ রতি গোমেদ রূপায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ●শ্রীদিবাকর মুখার্জী, অশোকনগর (হাবড়া) জেলা ২৪-পরগণা। এখানে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ●রুমা দেবী সদগোপ পাড়া, নবগ্রাম, শ্রীরামপুর। সিংহ রাশি, পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র, মকর লগ্ন। রক্তপ্রবাল ৬ থেকে ৮ রতি রূপায় বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়, দীঘা, বর্ধমান। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরুন, সময় ভাল হবে। ●শ্রীব্যানার্জী, লোয়ার বাজনা—কলি, ধানবাদ—চেষ্টা করুন। ●তপনকান্তি শিকদার, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৪১—(ক) ১ বছরের মধ্যে আশা করতে পারেন। ৩৮-৩৫ মধ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। ●শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সোনড়া, হুগলী—৮-১০ রতি রক্তপ্রবাল রূপায় বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করার পর বিয়ের চেষ্টা করুন। সফলতা আসবে।

●শ্রীদীপক চক্রবর্তী, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করুন। ●শ্রীরতনলাল কর্মকার—প্রেমের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনার কথা ভাবুন, তাহলেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেন। ●শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড, কলি-৩০—আপনার উভয় ক্ষেত্রেই শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। ●কল্পনা ধর, সি, আই, টি, রোড, কলি-১০— বর্তমানে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। হলদে পোকরাজ ৬-৮ রতি সোনায় বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●ধীরা চ্যাটার্জী, মাণিকচন্দ্র সাধুখাঁন লেন। ৩৩ বছরের মধ্যে বিবাহ ও চাকুরীতে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ●পিনাকীরঞ্জন সরকার, ধানবাদ— সাধারণভাবে ভালই বলা চলে। এক বছরের গ্রহের বর্ণনা কি করে দেবো তাই ভাবছি। ●কল্যাণকুমার বড়াল চন্দননগর, হুগলী —ঋষি-শাস্ত্রানুসারে আপনার গোমেদ ধারণ করা অতি প্রয়োজন। ৬-৮ রতি রূপায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করা বিধেয়। আপনার প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী ঠিক রয়েছে। ●কুমারী বিজয়লক্ষ্মী বসাক, অরবিন্দ রোড, গৌহাটি— ১ বছরের মধ্যে আপনার চাকরী হবে। ধৈর্য ধরে ধর্মপথে এগিয়ে চলুন। ●হারাধন ভট্টাচার্য, বাবুনপাড়া, বর্ধমান। ৫-৭ রতি ইন্দ্রনীল সোনায় ডানহাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমধু উপাধ্যায়, কাকলিয়া রোড, কলি-২৯— কর্মক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। চেষ্টা করুন।

শ্রীশৈলেন্দু চক্রবর্তী, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, বেহালা— আগামী তিন বছরের মধ্যে আশা করতে পারেন। ধীরে ধীরে পূর্ব প্রাপ্য টাকা আদায় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ●ধ্রুব সরকার, বৈদ্যবাটি, হুগলী। আপনার ছক পরিষ্কার করে লিখে পাঠাবেন। ●শ্রীমতী রাণু পাল রামহরি ঘোষ লেন, কলি-৯—ভাস্বতী, তুলা রাশি, সিংহ লগ্ন, স্বাতী নক্ষত্র, দেবগণ। ●শ্রীমতী, গোলাপট্টী, মালদা— দু'বছরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। বিয়ে আপনার শুভই হবে। ●শ্রীরাধারমণ দত্ত, নয়াদিল্লী-২৩। গোমেদ ৮-১০ রতি রূপায় ডানহাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। তিন বছরের মধ্যে আপনার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ●নচিকেতা, কলি-৪০— ধৈর্য ধরে গুরু গুরু জপ করুন। গু-অর্থ—অন্ধকার, রু-অর্থ—নাশক। তিনিই প্রকৃত গুরু পাঠিয়ে দেবেন। ●শ্রীমতী ব্যানার্জী, লোদী রোড, নিউ-দিল্লী। ২ বছরের মধ্যে পদোন্নতি ও ৫ বছরের মধ্যে ভ্রমণ যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। ●রাণী, শিলং, আসাম—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ●শ্রীশ্যাম-ভিক্ষু, মিত্র কুঠি, দাসপাড়া লেন। আপনি ব্যবসায়ে ধীরে ধীরে উন্নতি করবেন। ●শ্রীনিশীথকুমার মণ্ডল, তেঁতুলখুলী, বাটানগর—ধৈর্য ধরে চেষ্টা করুন। সমস্ত জীবনের উত্তর দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ●রীতা চক্রবর্তী, সার্কুলার রোড, শিবপুর — আপনার পক্ষে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। ●শ্রীকাজল চৌধুরী, পণ্ডিচেরী — বিদেশযাত্রা এবং বাড়ি উভয় ক্ষেত্রেই আপনার সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ, বিডন স্ট্রীট, কলি— আপনি ধৈর্য ধরে শ্রীশ্রীদুর্গা নাম এক লক্ষবার লিখুন। দেখবেন সমস্ত বিপদের হাত থেকে মুক্ত হবেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করবেন। ●বিষাণকুমার বেরা, কড়েপুর ২য় লেন, কলি-২৪—ভালবাসার জন্য সব হারাতে না চাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ●অনলকুমার দাঁ—চম্পারণ, বিহার—আগে বিয়ে করুন, পরে সন্তানের খবর বলা যাবে। ●পি পাল, যাদবপুর, কলি-৩২—চাকুরী ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীমাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আলমবাজার, কলি-৩৫— আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আপনার অনেক আশাই বাস্তবে পরিণত হবে। ●শ্রীশক্তিকুমার মুখার্জী, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলি-২৭—আগামী ৩ বছর আপনার পক্ষে মোটামুটি শুভই বলা যায়। ২ বছরের মধ্যে বিবাহের যোগ রয়েছে। ●শ্রীসুভাষ ব্যানার্জী, চাউল পট্টী রোড, বেলেঘাটা। ৬-৮ রতি গোমেদ রূপায় বা সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীশ্যামলকুমার রুদ্র, জামসেদপুর—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ●শ্রীতৃপ্তিকুমার বসু, ফরডাইস লেন, কলি-১৪। চাকুরীর ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্ত্রীর ছক পাঠাবেন। ●কলি বসু, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১৪— পড়াশুনা ভালই হবে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে চলবেন। ●সুকন্যা বহুবাজার স্ট্রীট, পরীক্ষার ফল বলা হয় না। দুটি প্রশ্নের অধিক উত্তর

দেওয়া হয় না। ● শ্রী পি কে মুখার্জী, গরিফা রায়পাড়া—আপনার প্রমোশনের সম্ভাবনা রয়েছে। ● কুমারী ললিতা ব্যানার্জী, ডাক্তার লেন, কলিকাতা-১৪—স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে গোলমাল করবে। পড়াশুনায় বিঘ্ন হতে পারে। ৬-৮ রতি হলদে পোখরাজ বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● ডাঃ বিনয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, চাঁচোল, মালদহ—আপনি ৫-৭ রতি বিপ্রবর্ণের নীলা সোনায় ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। শ্রীমৃন্ময় কলিকাতা-৬—ধৈর্য ধরুন, হবে। ২ বছরের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীশঙ্করকুমার ঘোষ, গজেন্দ্র মিত্র লেন, কলি-৪—আপনার প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং সরস্বতীর চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ● শ্রীসমীরকুমার বসু, চৌরঙ্গী রোড, কলি-২০—আপনি ধৈর্য ধরে 'শ্রীশ্রীদুর্গা' নাম লিখুন। ● শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, ফারাক্কা প্রোজেক্ট—৬-৮ রতি গোমেদ রূপায় ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলিতে ধারণ করুন। আগামী তিন বছরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। ● সোমা, কলি-৩২—চেষ্টা করুন, হবে। মোটামুটি ভালই বলা চলে। ● রমা, কলি-৩২—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হউন। ৮-১০ রতি রক্তপ্রবাল বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শানু—চেষ্টা করুন লেখাপড়া ভালই হবে। ● সিক্তা—৬-৮ রতি সম্ভব হলে গোমেদ বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। 'শ্রীশ্রীদুর্গা' এই নাম সময়ে, অসময়ে শুচি ও অশুচি-ভাবে লাল কালিতে ধৈর্য ধরে এক লক্ষবার লিখুন, তা'হলেই দেখবেন স্বামী নিজেই ফিরে আসবেন। ● শ্রীমতী করুণা বসু, কলি-৯—চেষ্টা করুন। ১ বছরের মধ্যে ভাল চাকুরী হবার যোগ রয়েছে। ● শ্রীপ্রিয়নাথ চৌধুরী, বিলাসপুর। আগামী তিন বছর অবধি সময় শুভপ্রদ হয়ে দেখা দিবে না। ৪ থেকে ৬ রতির মধ্যে পান্না ডান হাতের অনামিকাতে ধারণ করুন। ● গৌরী দত্ত, রায়গড় দিনাজপুর—স্বামীর ও আপনার নিজের জন্মকুণ্ডলী পাঠাবেন। ● আদিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঝড়ার, মেদিনীপুর। আপনি ৬-৮ রতি ইন্দ্রনীল সোনায় বা রূপায় ডান হাতের মধ্যমাতে এবং ৭-৯ রতি রক্তপ্রবাল রূপায় বা সোনায় ডান হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● কণিকা শীল, আনন্দ পালিত রোড, কলি-১৪—২১-২৩ বছরের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। মনের ইচ্ছা প্রায় ক্ষেত্রেই পূর্ণ হবে। ● শ্রীসুব্রত কুমার বসু, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলি-৬—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। বিবাহে বিলম্বের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীদক্ষিণা সেন, অটল সরকার রোড, নৈহাটি—ধৈর্য ধরুন। সম্পত্তি পাবেন। ● শ্রীমতী অনুশীলা রায় হাজিনগর পেপার মিল, ২৪-পরগণা—ভালই হবে। ৩ বছরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীজন্মেজয় গুপ্ত, মিত্রপাড়া, নৈহাটি। বিলম্বে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ● কৃষ্ণকুসুম মজুমদার, হালিসহর, শিবের গলি—যে পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। ● ইলা দে, হাজি মোহসিন রোড, কালীঘাট—আপনি ধৈর্য ধরুন, আপনার সকল সমস্যার সমাধান অচিরেই হবে। ● অঞ্জলি বসু, তেজপুর, আসাম—আপনি নরেন বাগল মহাশয়ের কোষ্ঠি বিচারের ধারা ও সূত্রাবলী 'বইখানা' পড়ে দেখতে পারেন। আপনার প্রশ্নের সমাধান হবে বলেই আশা রাখি। ● প্রভাত গুপ্ত ৬-৮ রতি উচ্চ শ্রেণীর গোমেদ ও ৮-১০ রতির মধ্যে ইটালিয়ান রক্তপ্রবাল যথাক্রমে রূপায় ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন।

নিঝুম

শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়াময়ী—
কুহেলিকাঘেরা তিমির রাত্রি—
ওগো—কেন তুমি এমন স্তব্ধ।
কে তোমায় করেছে নিশ্চুপ।
তোমার আঁধার মেশানো নিরবতার আবেশে
সমস্ত বাস্তব মোহমুগ্ধ।

তোমার ঐ ঘনকৃষ্ণ রূপের মাঝে
রয়েছে যেন কত মায়ামেশানো হাসিগান
আর হৃদয় ভাঙা কাহিনী।
তবুও তোমায় বলি সুন্দরী রূপময়ী—
তুমি যেমন স্নিগ্ধ, প্রশান্ত আর তেমনি নিঝুম।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

[পশ্চিমবাংলার সেচমন্ত্রী]

বাঙলা দেশের ছাত্র-আন্দোলন আজ যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং যে বলিষ্ঠরূপ পরিগ্রহ করেছে তার মলে যাঁদের অক্লান্ত উদ্যম এবং অতুলনীয় অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে অর্থাৎ সকলের পুরোভাগে উল্লেখ করতে হয় বিখ্যাত জননেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রিসভার এক বিশিষ্ট সদস্য শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম। স্বীয় [illegible] উন্নয়নের জন্য জীবনের সর্বপ্রকার আরাম, নিশ্চিন্ততা সর্বতোভাবে পরিহার করে সমগ্র যৌবনপর্ব লাঞ্ছনাবরণ, অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার এবং প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার আজ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি চিহ্নিতব্য।

উত্তরপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বিশ্বনাথের জন্ম ১৯১৫ সালের ১৭ই এপ্রিল। বাবা শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন ধুরন্ধর আইনজ্ঞ। আইনজীবী হিসাবে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল এককথায় ঈর্ষাযোগ্য। শরৎচন্দ্র উত্তরপাড়ার বাস তুলে তমলুকে বসতি স্থাপন করেন। সেই থেকে এই পরিবারের কাছে তমলুকই স্থায়ী বাসভূমি হিসাবে গৃহীত। শরৎচন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে বিশ্বনাথ ছাড়া আরও যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে, তিনি সারা বাঙলার জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা পশ্চিমবাঙলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

ন' বছর বয়স থেকেই রাজনৈতিক জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করলেন বিশ্বনাথ। ঐ সময়ে কংগ্রেস-আহূত আন্দোলনের এক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তাঁর দেশসেবা সুরু হল। সেই ধারা আজও প্রবহমাণ এবং অব্যাহত। প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ফলে সেদিন নানাপ্রকার লাঞ্ছনাবরণের হাত থেকে বালক বা কিশোর বিশ্বনাথও রেহাই পান নি। কিছুকাল পরে প্রাইভেটে খড়গপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন বিশ্বনাথ।
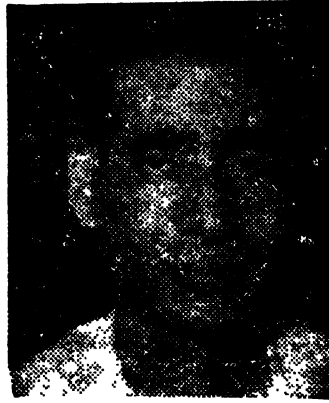
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৫ সালে কলকাতায় এলেন। যোগ দিলেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। সেদিন অঙ্গুলিগণ্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক যে ক'জনকে নিয়ে এই রাজনৈতিক দলটি বাঙলা দেশে তাদের যাত্রারম্ভ করেছিল বিশ্বনাথ তাঁদের অন্যতম। চটকল অঞ্চলসমূহ ঘুরে ঘুরে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন বিশ্বনাথ।

১৯৩৭-৩৮ সাল কাটল বাঙলার ছাত্র-আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট মূর্তি দিতে। একদিকে মুক্তি-আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা অন্যদিকে তাদের নিজস্ব দাবী এবং ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এই দু'টি রেখাকে একটি বিন্দুতে মিলিত করে বাঙলায় ছাত্র-আন্দোলনের রূপ দিলেন বিশ্বনাথ। ছাত্র-সংগ্রামে যখনই প্রতিকূলতা দেখা গেল তখনই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখা গেল বিশ্বনাথকে।

১৯৪০ সালে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। ১৯৪২ পর্যন্ত কাটল অজ্ঞাতবাসে। আসাম এবং উড়িষ্যায় পার্টির বিস্তারের জন্য ঐ অঞ্চলগুলিতে তাঁকে পাঠানো হল এবং সেখানে এই দলটি আজ যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তা তারই সাংগঠনিক শক্তির এক বিশেষ নিদর্শন। এই দলটি যখন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল তখন আবার বিশ্বনাথকে করতে হল কারাবরণ।

১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর অগ্রজ অজয়কুমারের বিরুদ্ধে। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি দাঁড়ালেন স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী জননায়ক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে। ১৯৬৫ সালে পশ্চিম বিধান পরিষদে তিনি নির্বাচিত

ডঃ সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

[...তের কৃতী বৈজ্ঞানিক গবেষক]

যাঁদের অক্লান্ত সাধনা এবং অতুলনীয় গবেষণা দেশের গর্ব ও গৌরববৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে আসছে তাঁরা সকলেই কিন্তু দেশবাসীর নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত নন। এর একমাত্র কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে এই কথা বলা চলে—এই কর্মসাধকের দল প্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে যথাসম্ভব নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে আপন সাধনাতে বিভোর থাকাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন। আত্মপ্রচার থেকে দেশের কল্যাণকর কার্যসাধনই এঁদের জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। সেইজন্যেই তাঁদের খবর সর্বসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কর্মসাধক কর্মসমুদ্রেই অবগাহন করতে থাকেন অবিরাম গতিতে, প্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে এবং এই প্রচ্ছন্ন মহিমাই তাঁদের কর্মকে যেন সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলেছে।

এই তালিকায় যাঁদের নাম অনায়াসে উল্লেখ করা চলে, তাঁদেরই একজন ডক্টর সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভারতের কৃতী বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম।

১৯২২ সালে হুগলী জেলার হোয়েড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রামের স্কুলেই লেখাপড়া, তারপর চুঁচুড়াতে ও কোলকাতায় উচ্চতর কলেজী শিক্ষা, ইং ১৯৪৫ সালে এম এস সি ডিগ্রি লাভ করলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

এরপর একটানা কাজ মাটি ও গঙ্গামাটির ওপর। চীনামাটি যে জন্ম থেকেই 'না-ধর্মী' সেইটাই প্রমাণ করেছেন, যদিও সাগরপারের বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, তার জন্য থেকে কোন 'চার্জ' নেই। এ ছাড়াও গঙ্গার পলিমাটিও যে একটা মূল্যবান সেরামিক সামগ্রী আর তা থেকে রঙীন ও সাদা জিনিষপত্রও যে তৈরী করা যায়, তার সন্ধানও দিয়েছেন।

কাজে সাফল্য লাভের পর যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য বিভাগে ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসাবে ১৯৫৮ সালে। সেই সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস সি ডিগ্রিও লাভ করেন।

কিন্তু সেই বাধানিষেধ আর ক্ষমতার লড়াই। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৯৬৪ সালে নিজেই শুরু করলেন কাজ। এবার সত্যিকার ফলিত রসায়ন বিজ্ঞানের মধ্যে, বিশেষ করে বড় এবং ভারী শিল্পে যার ব্যাপক ব্যবহার। এর এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে ভারতীয় ইনস্টিটিউসন অফ কেমিস্টস-এর ফেলো নির্বাচিত হন।

সেরামিক থেকে রসায়ন বিজ্ঞানের মধ্যে কাজ করার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ভারতে যে সমস্ত কেমিক্যালস বিদেশ থেকে আসে, সেই সমস্ত কেমিক্যালস যতটা সম্ভব নিজের দেশের কাঁচা মাল দিয়ে এখানেই তৈরী করা। এতে অবশ্য লাভ হয় দু'ভাবে—(ক) নিজের দেশের চাহিদা মেটে, (খ) দেশ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

প্রথমে নাইট্রোবেনজিন—যা ভারতে সর্বপ্রথম ওনার হাতেই হয়েছে। বেরিয়াম এক্স-রে মিল এও আসত বিদেশ থেকে। ডি বি পি, ডি এম-পি এবং ডাই অ্যাসিটোন অ্যালকোহল, রবার ব্লোইং এজেন্ট, ডায়াসটেস পাওডার, পেপসিন, প্যাপেন বিভিন্ন ধরণের পেস্টিসাইড, বেবিফুড প্রভৃতি সব কাজই ওনার হাত দিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে এমন কতকগুলো কেমিক্যালস আছে, যা এর আগে সরকারী ও বেসরকারিভাবে এ দেশেতে তৈরী করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাতে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে নি। এরপর লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির ফেলো নির্বাচিত হন ডক্টর চট্টোপাধ্যায়।

এ তো গেল অপরকে কাজ করে দেওয়ার কথা। নিজের জন্যেও আছে, কিন্তু করার বেশী কিছুই নেই। টাকার দরকার, কারণ ভালভাবে কাজ করার জন্য একটা ল্যাবরেটরি চাই।

প্রথমে রাজ্য সরকার পরে দিল্লীর 'কাউন্সিল অফ সাইনটিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ'-কে পর্যন্ত জানানো হয়েছিল। কিছু ফল হয় নি। ওখানকার বৈজ্ঞানিক শ্রীদত্ত অক্ষমতা প্রকাশ করে একখানা চিঠি অবশ্য দিয়েছিলেন। ব্যস ঐখানেই আমাদের দেশের ওপরতলার মানুষদের কর্তব্য শেষ।

এরপর ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে আর পাঁচজন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মত লণ্ডনে অথবা আমেরিকাতে বিশেষ কোন কিছু আবিষ্কারের মধ্যে ও দেশের কাগজে যদি দেখতে পাই তাতে নতুন করে অবাক হবার কিছু থাকবে না; আর তখন হয়তো উনি ভারতের নাগরিকও নন।

॥ খেলাধূলা ॥

বব বীমন (আমেরিকান ক্যাঙারু)

সহজাত প্রতিভা অতি সহজে মানুষকে অভিভূত করে ফেলে কিন্তু কৃচ্ছ্রতার সাধনায় আর সংগ্রামী শক্তির উপর ভিত্তি করে যে কীর্তিস্তম্ভ রচনা করে সে মানুষকে করে বিস্মিত, অভিভূত। ব্যক্তিগতভাবে এটা তো আছেই, সমষ্টিগতভাবে ক'জন চেষ্টা করেন আপন দেশকে সম্মানের উচ্চশিখরে নিয়ে যেতে। যেমনটি দেখা যায় আমেরিকা ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে। নিত্যনতুন বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে আজ এই দুই দেশের এ্যাথলেটরা মরণপণ প্রতিজ্ঞা করে খেলাধূলার আসরে পরস্পরের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন। আরো চাই, আন্তরিকতা ইচ্ছা ও সাধনা। যা কোন ব্যক্তিকে বা একটি জাতিকে বলীয়ান, গরীয়ান করে তুলতে পারে। বব বীমন সেই প্রকৃতিরই এ্যাথলেট যিনি আপনার শক্তি সামর্থ্য অনলস পরিশ্রম ও উন্নতর কলাচাতুর্যের দ্বারা আমাদের চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়েছেন, আর আপন দেশকে পাইয়ে দিয়েছেন অজস্র সম্মান।

বব বীমনের বয়স যখন মাত্র বার বৎসর সেই সময় তিনি ট্রাক ইভেণ্টে যোগ দিতে শুরু করেন। কিন্তু তখনও তিনি হাযার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্র মন. সেই সময় তিনি লঙ জাম্পের দিকে মনোযোগ দেন। আজ বীমন আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় নিগ্রো এ্যাথলেটস্‌দের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। শুধু দীর্ঘ লম্ফন প্রতিযোগিতাতেই নয়, ট্রিপল্‌ জাম্পেও (পূর্বে বলা হত হপ্‌ স্টেপ এবং জাম্প্‌) অনন্যসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, যদিও তখন তার এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল সীমাবদ্ধ।

বীমনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যাঁরা, অথবা তাঁর দৈহিক নিপুণতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলেই আশান্বিত ছিলেন যে, বীমন গত অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত মেক্সিকো অলিম্পিক থেকে দীর্ঘ লাফ, ট্রিপল জাম্প প্রভৃতি বিষয়ে একটি করে অন্তত পদক [illegible] [illegible] আনবে এবং আজ পর্যন্ত যেসব টেক্‌ বব অর্জন করেছেন তাদের সব ঔজ্জ্বল্য ম্লান করে দেবে, অলিম্পিকের মাঠ থেকে যদি কোন পদক তিনি ছিনিয়ে আনতে পারেন।

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বীমন ইনডোর বিভাগে লম্ফন প্রতিযোগিতায় ২৭ ফুট ১ ইঞ্চি (৮২৫৫ মিঃ) লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ডের অংশীদার হয়েছিলেন। ন্যাশনাল এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার পর তাঁর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এরপর বিশ্বখ্যাত নিগ্রো এ্যাথলেট রালফ বোস্টনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। বোস্টন ১৯৬০ সালের বিশ্ব অলিম্পিকে লঙ জাম্পেই স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের

ক্রীড়ারসিক

টোকিও অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেনের লীন ডেভিসের কাছে পরাজিত হওয়ায় স্বর্ণপদকটা তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। সে সময় উভয়ের দূরত্বের ব্যবধান ছিল ১·৫ ইঞ্চি। সেই থেকে, বীমন বলেন, রালফ্‌ আমার জীবনের ধ্রুবতারা। তিনি আমার উন্নতির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, লঙ্‌ জাম্পের বিভিন্ন কলাকৌশল দেখিয়ে দিয়েছেন এবং উন্নতির শিখরে কি করে ওঠা যায় সে সম্বন্ধে এ্যাথলেটিকসের খুঁটিনাটি অনেক গোপন জিনিষও আমাকে বলেছেন। এবং তাতে আমার সুবিধা হয়েছে আরো এগিয়ে যাওয়ার।

এর ফল হল কি—শিষ্যের কাছে গুরুর পরাজয়। একবার নয় বহুবার। এবং গুরু বোস্টনও নিজে পরাজিত হয়েও গৌরবান্বিত বোধ করতেন ভবিষ্যতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন লঙ্‌ জাম্পার-এর কাছে পরাজিত হয়ে। শুধু বোস্টনই নয়, বীমনের কোচ ভ্যানডেনবার্গও সমান আশা পোষণ করতেন। বীমন যে লঙ্‌ জাম্প ও ট্রিপল্‌ জাম্পে তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবেই, এটা ছিল তাদের সন্দেহাতীত। শুধু তাই নয়, বব যে ২৮ ফুটের উপর লাফ দেবে, এ ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে লীন ডেভিসের রেকর্ড ছিল ২৬ ফুট ৫·৫ ইঞ্চি (৮·০৬ মিটার)। সেই ডেভিসের বব সম্বন্ধে অভিমত হচ্ছে, 'আজ পর্যন্ত বব ছাড়া অন্য কোন এ্যাথলেটের উপর আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি। আমি নিশ্চিত বব লঙ্‌ জাম্প ও ট্রিপল জাম্পে রেকর্ড স্থাপন করবে।'

বব বীমন

ভারতীয় ধর্ম সঙ্গীত

অর্চনা মিত্র

প্রাচীন যুগ থেকে, ভারতীয়রা ধর্মপ্রবণ। দ্রাবিড় যুগেও মানুষ অজানা কোন এক শক্তিকে ভয় করতো। এই অজানা শক্তি যে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটা তাদের মনে সব সময়েই জাগ্রত থাকতো। ভক্তিতে না হোক, ভয়েই তারা এই অজানা শক্তিকে অর্চনা করতো। বৈদিক যুগে, যখন মানুষ সমাজ-বন্ধনের প্রথম সংস্পর্শে এলো, ধর্ম-চেতনা মনে আরো বৃদ্ধি পেলো।

ভারতীয় দর্শন, মুনি-ঋষিদের বহু ও বিভিন্ন চিন্তাধারার ফল। ধর্মীয় বিশ্বাস ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গীতের জন্ম অত্যন্ত প্রাচীন কালে হয়েছিল। সঙ্গীত যে ভারতের উৎপত্তি-স্থল, বলা বাহুল্য হবে না। চারিটি বেদ রচিত হল, এই যুগে।

যজুর্বেদে, সঙ্গীত গায়কের উল্লেখ আছে। সামবেদ ওঁ শব্দের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সামগান ব্যতীত, কোন অনুষ্ঠান বা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হত না। সুতরাং প্রাচীন যুগ থেকেই ধর্ম-সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার।

ভজন ও কীর্তনকে ধর্ম-সঙ্গীত বলা যায়। ভক্তিমার্গ দ্বারা উপাসনা করলে এই দুই ধরণের গানের প্রয়োজন।

ভক্তিমার্গের অধিকারী যে-কোন সাধারণ মানুষ হতে পারেন। বাংলা দেশের সম্পদ 'কীর্তন গানের' দ্বারা যে-সব মহাপুরুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করছেন, তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। জয়দেবে, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাপুরুষরা আজও বাংলার মানুষের কাছে পূজ্য। তাঁদের রচিত কীর্তন গান আজও গাওয়া হয়।

বর্তমান যুগের কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পী কীর্তনের সুর জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য ধরণের সুরারোপ করে উপরোক্ত কীর্তন-রচয়িতাদের পদগুলি গাইছেন। কীর্তনের মূল সুরটুকু বজায় না রেখে অন্য ধরণের সুরগুলি প্রয়োগ করার কী মানে হয়, বোঝা সম্ভব নয়। এই ভাবে, কীর্তন-রচয়িতাদের ভুলে যাওয়ার নবতম পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে। যে কীর্তন গুলি গাওয়া হচ্ছে, সেগুলি বাংলা আধুনিক বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কয়েকটি রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ বলে মনে হয়।

ভজন গান প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এই গানগুলির ভাষা ভগবানের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সাধকেরা ভজন গান পছন্দ করেন।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই ভজনের প্রচার। নানা ভাষায় ভজন গান সমৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রধানত হিন্দী ভাষায় বহু ভজন আছে। সন্তকবীর, তুলসীদাস, নরসী ভগৎ, ব্রহ্মানন্দ, সুরদাস, জ্ঞানেশ্বর প্রমুখ রচয়িতারা আজও তাঁদের ভজন গানে অমর হয়ে আছেন। রাজস্থানের সাধিকা মীরাবাঈ, রাণা কুম্ভ বহু ভজন গান রচনা করেন। এঁদের ভজন গানের ভাষা নিঃস্বার্থ ভগবৎ প্রেম ও ভগবানের সুন্দর রূপের প্রকাশ করে। তাঁরা, তাঁদের সঙ্গীতে কুপথযাত্রী মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। নৈরাশ্যজনক কোন কথা তাঁদের ভজনে রচিত হয় নি।

পরন্তু—কয়েকজনের রচিত এমন

সুশীল মজুমদার পরিচালিত শুক সারী চিত্রে অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমার

কতকগুলি ভজন গান আছে, যাদের ভাষা, রচয়িতাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সাংসারিক পরাজয়, ক্ষোভ, বেদনা, ব্যথা প্রভৃতি মানসিক অশান্তি ও অবস্থার কথায় ভরপুর।

প্রতিটি ভজন গানের সুর রাগ-রাগিণী সম্বলিত হওয়া দরকার। তা না হলে, গানগুলিতে গাম্ভীর্য আসবে না। ফলে গানগুলি অত্যন্ত সাধারণ (চীপ) মনে হবে। ভক্তিরস ও শ্রদ্ধার ভাব কমে যাবে।

বাস্তব পক্ষে, জ্ঞানীদের রচিত ভজনগুলি মুমুক্ষু জীবকে উৎসাহ দেয় ও ভগবান সম্বন্ধে আনন্দময় ধারণার উদ্রেক করে। এই যে অনুভূতি তারা লাভ করে, এ অভাবের বা শূন্যতার নয়, পরন্তু শান্তি, প্রেম এবং পরম প্রাপ্তির নির্দেশ বলে মনে হয়।

সগুণ ভক্তির গণ্ডি, মূর্তি-পূজা, মঠ ও দেবমন্দির পর্যন্তই, কিন্তু নির্জন পথ অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু মহত্তম। ভজন গান কিন্তু দুই ধরণের সাধকরা শ্রবণ করেন।। ভক্ত বা জ্ঞানী ভজন গানে আনন্দলাভ করেন, প্রত্যক্ষ করা যায়।

কীর্তন গান শুধুমাত্র ভক্তদের জন্য। বাংলা ভাষায়ই এর প্রচার। অন্যান্য ভাষায় রচিত হয়েছে কি না, ঠিক জানা যায় নি। কীর্তন গানের অনেক স্থানে কাম ও বাসনার কথা উল্লেখ আছে, যা সাধারণ মানুষ ভুল বুঝে বিপথগামী হয়ে পড়েন। বৈষ্ণব ধর্মে পরকীয়া প্রেম প্রভৃতি শাস্ত্রের উল্লেখ আছে, যা ভক্তিমার্গের পক্ষে, হয়তো প্রশস্ত নয়। আবার সর্বস্য ত্যাগ করে কৃষ্ণ-ভক্তির উল্লেখ আছে, যা ভক্তিমার্গের পথ প্রশস্ত করে।

রাধা যে হ্লাদিনী শক্তি, কোন স্ত্রী-রূপিণী নন, এ কথা বৈষ্ণব শাস্ত্রের মূল কথা হলেও, সাধারণ মানুষ বোঝেন না। বৈষ্ণব তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ভাগবতে, কোথাও রাধার কথা উল্লেখ নেই। কীর্তনে, রাধা-কৃষ্ণের মিলনের গানগুলির মর্ম বোঝা অত্যন্ত কঠিন। বর্তমান যুগে, অনেক সময় কোন বকাটে ছেলেকে 'কলির কৃষ্ণ' বলে সম্বোধন করতে শোনা যায়। সুতরাং, ভগবান

কৃষ্ণ যিনি পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ, তাঁর কথা এভাবে প্রয়োগ করা শ্রুতিকটু মনে হয়। এর কারণ মানুষই ভগবানকে সাধারণ মানুষের স্তরে বা তার চেয়ে নিম্নস্তরে নামিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছে বা গান রচনা করেছে। একবার জনৈক ভদ্রমহিলাকে 'শ্রীকৃষ্ণ-রাধা'র মূর্তিকে কর্তা-গিন্নি' বলতে শোনা গিয়েছিল। ভারতবর্ষ বলে ধর্মের নামে ছেলেখেলা বা মিথ্যাচার চলেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা শ্রীকৃষ্ণ-রাধা সম্বন্ধে যা ধারণা করে রেখেছে বা রাখছে, অধঃপতনের দিকেই সেই ধারণা তাদের টেনে নিয়ে যাবে বা যাচ্ছে।

অমর চৌধুরী পরিচালিত 'সৌদামী মন' চিত্রে শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] দাস

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনীর তিনদিনব্যাপী নাট্যোৎসব

গত ২১।৪।৬৯, ২২।৪।৬৯ ও ২৩।৪।৬৯ তারিখে শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনী তাঁদের ৩৭তম নাট্যোৎসব সাড়ম্বরে উদযাপন করলেন রঙমহল নাট্যমঞ্চে। শ্যামপুকর বান্ধব সম্মেলনী ইতোপূর্বে নাট্য পরিবেশন করে দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করেছেন। বর্তমানে যে নাটকগুলি তাঁরা পরিবেশন করলেন তাতে তাঁদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। প্রথম দিনের নাটক শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ পরিবেশিত হল। চন্দ্রনাথ নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীরাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী। শ্রীচক্রবর্তীর নাটক-পরিচালনায় দক্ষতা ও মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক পরিচালনায় তাঁর গভীর নাট্যবোধের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনীর ৩৭ বর্ষ নাট্যোৎসবের 'চন্দ্রনাথ' নাটকের দুই শিল্পী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ও সব্যসাচী হাজরা

'চন্দ্রনাথ' নাট্যরূপ দিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয়ে যাঁরা দর্শকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছেন ও সুন্দর অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হলেন—রাখালের ভূমিকায় কালীপদ চক্রবর্তী, কৈলাসের চরিত্রে পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী স্বয়ং। নামভূমিকায় সব্যসাচী হাজারাকে দর্শকরা দীর্ঘ দিন মনে রাখবেন। সুলোচনার ভূমিকায় আশা বসু, সরযূর চরিত্রে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, হরকালির ভূমিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন—বিশ্বনাথ বসু, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারকৃষ্ণ ভাদড়ী, সুনীল মুখোপাধ্যায়, নটুবিহারী ধর, সুধাংশুকুমার পাল, উমাকান্ত দত্ত, রাস বিহারি দে, তাপস চট্টোপাধ্যায়, মুনমুনি ও বীণা গঙ্গোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিনের নাটকটি হল ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান'। সাজাহান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শচীন বসু। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী। নাটকটিতে সুঅভিনয় করেছেন তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় সব্যসাচী হাজারা, অসীম সাহা, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য, লিলি গঙ্গোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাসবিহারী দে, অনিল চট্টোপাধ্যায় সুনীল মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য সুধাংশুকুমার পাল, হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ উমাকান্ত দত্ত, প্রণব দত্ত, ইন্দ্র বিশ্বাস তারকনাথ দে, উমা দত্ত, নাজিমুদ্দিন আমেদ, রামচন্দ্র মণ্ডল। জাহানারার ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন শ্রাবন্তী গীতা দে। পিয়ারার চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। নাদিরা ও জহরৎউন্নিসার ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেন আশা বসু ও স্বপ্না বসু।

তৃতীয় দিনের নাটক সুঅভিনীত ও প্রশংসনীয়। মহেন্দ্র গুপ্তের নাটক 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। নাটকটি পরিচালনা করেছেন তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির চরিত্রচিত্রণে রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, তড়িৎকুমার ভট্টাচার্য বীরেন ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুনীল মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নটুবিহারী ধর, সুধাংশুকুমার পাল, উমাকান্ত দত্ত, বিমলেশ ঘোষ, রাসবিহারী দে, লীলা গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন দত্ত, নাজিমুদ্দিন আমেদ, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় গীতী দে, বীণা গঙ্গোপাধ্যায়, আশা বসু। মণালের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এর অভিনয় দর্শকমনে দীর্ঘ দিন দাগ কেটে থাকবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শ্যামপুকর বান্ধব সম্মেলনীর প্রতিটি শিল্পী কলা-কুশলী ও অন্যান্য প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অভিযাত্রী এ্যাথলেটিক ক্লাবের বসন্ত উৎসব

গত ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৯ পুণ্য শ্রীপঞ্চমী দিনে অভিযাত্রী এ্যাথেলেটিক ক্লাব বসন্ত উৎসবে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে

অভিযাত্রী এ্যাথলেটিক ক্লাব প্রযোজিত 'রাধার মানভঞ্জন' ও 'দোললীলা' নৃত্যনাট্যের দুই শিল্পী মীনাক্ষী বসু ও বাঁশরী বসু

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীমণি সান্যাল। শ্রীস্যান্যাল সামাজিক জীবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের তৃপ্তিদান করেন। শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গীটারে অনুপম সুর সৃষ্টি করে শ্রোতাদের চমৎকৃত করেন। অনুষ্ঠানে 'রাধার মানভঞ্জন' ও 'দোললীলা' নৃত্যনাট্য দুটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় কুমারী মীনাক্ষী বসু ও রাধার চরিত্রে বাঁশরী বসু অনবদ্য নৃত্য প্রদর্শন করে সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করেন। অভিযাত্রী এ্যাথেলেটিক ক্লাবের সভাপতি শ্রীজি এস বসু অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে ক্লাবের সদস্যরা যে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অভিনন্দনীয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দুর্গেশনন্দিনী

গত ৯ই এপ্রিল ১৯৬৯ তারিখে বিশ্বরূপা নাট্যমঞ্চে সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত কাহিনী 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করলেন ট্রাফিক ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব। নাটকটি পরিচালনার বিরাট দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্র রায়। শ্রীরায় নাটকটি পরিচালনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নাটকটিতে সঙ্গীত-পরিচালনা করেন নীহার রায়। নাটকটিতে সুন্দর অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন সর্বশ্রী হরিবিলাস চক্রবর্তী, জয়ন্তকুমার রায়, দীপক হালদার, মিতা দাসগুপ্ত, জয়শ্রী কর, মায়া বসু, অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার মজুমদার, রঘুনাথ পাল, নির্মলকুমার ঘোষ, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ঋষিকেশ রায়, অরুণকান্তি সেনগুপ্ত, হরিদাস মিত্র, সুশীলকুমার বসু, হরিদাস অধিকারী, হরিপদ বসু, রবীন ভট্টাচার্য, প্রীতিকণা পাল, পীতাম্বর মিত্র, আজমবর পাণ্ডব প্রমুখ। নাটকটিতে সুন্দর অভিনয় করার জন্য শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবস্থাপকদের ধন্যবাদ জানাই।

নায়িকা বিদায়

বসন্ত ভট্টাচার্যের হাসির নাটক 'নায়িকা বিদায়'। সম্প্রতি শিল্পী চক্রের উদ্যোগে মিনার্ভা মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়. পাঠকের প্রধান চরিত্র অঞ্জলিরূপে অলকা গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় অভিনন্দিত হয়েছে। শীতল, মনসা ও জয়কালী চরিত্রে সুশান্ত বোস, রমাপতি মজুমদার ও বারীন রায় অভিনয়-দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় রাখেন. এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন মুকুল রায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সিতাংশু রায়, নাটকটির পরিচালনা করেন বারীন রায়।

সম্রাটের মৃত্যু

সেণ্ট্রাল এক্সাইজ এ্যাণ্ড কাস্টমস ক্লাবের সদস্য শিল্পীরা বিশ্বরূপা মঞ্চে এ নাটক খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করলেন। সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচালনায় উল্লেখযোগ্য চরিত্র চিত্রণের নিদর্শন রেখে গেছেন প্রদ্যোৎ বসাক, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবদাস মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন মিত্র, অন্যান্য চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন অমিয় মুখোপাধ্যায়, সরোজ দে, অনিল ঘোষ দস্তিদার, শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বোস, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কল্পনা ভট্টাচার্য ও ইরা মিত্র।

'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য

১৯শে এপ্রিল রাত্রি ৭টায় বাটা ক্লাবের (বাটানগর) ব্যবস্থাপনায় নৃত্যবিদ্‌ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ও কানাই মজুমদারের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা-মন্দিরের 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। নৃত্যে কানাই মজুমদার, মৃদুলা চ্যাটার্জী, মঞ্জুলা চ্যাটার্জী, সুতপা দত্ত, পাপড়ি বোস নন্দিতা চক্রবর্তী, অনুপশঙ্কর, নির্মলশঙ্কর, কমল ভট্টাচার্য দেবল রায়, নীরেন্দ্রনাথ দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন। অরুণা দে, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা, মায়া ভট্টাচার্য, তন্দ্রা রায়ের বিশ্বপ্রণাম (কথাকলি) নৃত্য উপস্থিত দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শকুন্তলা নৃত্যনাট্য রচয়িতা' বাদল রায় সূত্রধরের ভূমিকায় সুনাম অর্জন করেন।

মমতাময়ী হাসপাতাল

'বার্ড হিলজার্স' রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি গোখেল মেমোরিয়াল হলে এ নাটক মঞ্চস্থ করলেন, সুঅভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, ও বেবী ঘোষ। নাটকটি পরিচালনা করেন জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়
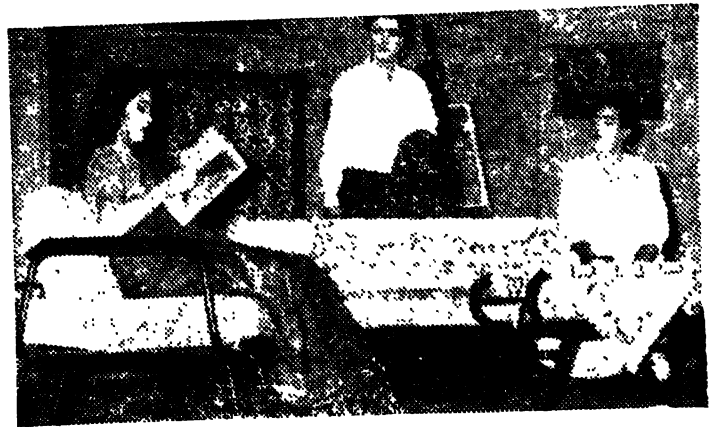
আগন্তুক প্রযোজিত 'পরাজিত' নাটকের এক আবেগময় মুহূর্ত

চেনা-অচেনা

জনপ্রিয় লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সামাজিক কাহিনী 'চেনা অচেনা'কে চলচ্চিত্রায়িত করছেন পরিচালক শ্রীহীরেন নাগ। কাহিনীটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীনাগ। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন দুলালী চৌধুরী। চিত্রটিতে সুর-সংযোজনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে যাঁদের দেখা যাবে তাঁরা হলেন বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, সুস্মিতা সান্যাল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যা রাও, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, গণেশ দাস প্রমুখ। পরিবেশনায় রয়েছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস। চিত্ররঙ্গের চিত্র 'চেনা অচেনা'।

অগ্নিযুগের কাহিনী

স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তরাঙা পটভূমিকায় রচিত কাহিনী 'অগ্নিযুগের কাহিনী।' অগ্নিযুগের কাহিনীটির রচয়িতা হলেন বীরেন রায় (এম পি)। চিত্রটির সংলাপও রচনা করেছেন বীরেন রায়। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন ভূপেন রায়। চিত্রটির নেপথ্যে যাঁরা কণ্ঠদান করেছেন তাঁরা হলেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্রচিত্রণে বিকাশ রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, গীতা দে, সুলতা চৌধুরী, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন মঞ্জুশ্রী বসু এবং ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। দি নিউ এরা পিকচার্সের চিত্র 'অগ্নিযুগের কাহিনী।' চিত্রটি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

অপরিচিত

সমরেশ বসু কৃত কাহিনীকে রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করার গুরুদায়িত্বে

সুপ্রিয়া দেবী—[illegible]
চিত্র : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

রয়েছেন এস বি প্রোডাকসন্স। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন সলিল দত্ত। পরিবেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন চণ্ডীমাতা প্রাঃ লিঃ। চিত্রটির সঙ্গীতাংশে প্রবীণ সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন বিকাশ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, সন্ধ্যা রায়, উত্তমকুমার প্রমুখ। চিত্রটির কাজ শেষ হয়ে গেছে।

দিবারাত্রির কাব্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কাহিনী 'দিবারাত্রির কাব্য'। দিবারাত্রির কাব্য চিত্রটি চলচ্চিত্রায়িত করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন তিমিরবরণ। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন স্প্যান ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটার্স। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), অঞ্জনা ভৌমিক, বসন্ত চৌধুরী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, রুদ্রপ্রসাদ ও নবাগত স্বপন রায়। নাবিক প্রোডাকসন্সের নিবেদন 'দিবারাত্রির কাব্য'।

অন্য মন

সমরেশ বসু কৃত কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক সলিল দত্ত। চিত্রটিতে সুরসংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রবীণ সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটি পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ। চিত্রটির চরিত্রচিত্রণে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত ও উত্তমকুমার। আর ডি প্রোডাকসন্সের চিত্র 'অন্য মন'।

চলচ্চিত্রের সর্ববিদ্যাবিশারদ একজন স্রষ্টা হিসাবে ফেডেরিকো ফেলিনির জীবনকাহিনী নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ ও চমকপ্রদ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু পরিচালনা করার আগ্রহ বা উপলব্ধি তিনি পেলেন কোথা থেকে।

প্রথমত একজন গ্যাগম্যান থেকে এ্যাডাপটার পরে কথাকার থেকে সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যের লেখক এবং বস্তুত ইহারই ফলস্বরূপ তাঁকে আমরা পরিচালক হিসাবে দেখতে পাই। এই সময় চিত্রকাহিনীকার হিসাবে তাঁর মধ্যে বহু জিনিষ পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে দুটি জিনিষ হল তিনি একজন সর্বদিকে পারদর্শী চিত্রনির্মাতা, যিনি শুধু চিত্রনাট্যটাই মনের মধ্যে ধরে রাখেন না, সমস্ত চিত্রনাট্যসহ গোটা বইটার কথা চিন্তা করেন।

ফেলিনির জন্ম ১৯২০ সালে রিমিনিতে। আড্রিয়াটিক উপসাগরের ধারে। চাপ চাপ কুয়াশা, বৃষ্টি আর গরমকালে হাসিখুসীতে ঝলমলিয়ে ওঠা রিমনির সমস্ত আকাশটাই যেন ফেলিনির জীবন।

ফেলিনির বাবা ছিলেন ইতালীর মুদিখানার একজন দোকানদার। ছোট বেলা থেকেই মঞ্চের দিকে ফেলিনির এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ। তাঁর বৃদ্ধা মা বলেন, পাড়ায় সার্কাস আসার উপায় ছিল না দুষ্টু ফেলিনির জন্যে। খাওয়া দাওয়া ভুলে সেই যে ছোটে সার্কাসের আডডায়, সারা রাত সেখানে পড়ে থাকে।

কখনও বা রাত দুপুরে ফেরে, কখনও পরের দিন সকালে। স্কুলে যাওয়াও সে ভুলে যেত। যার ফলে মাত্র বার বছর বয়সের সময় তিনি একটি সার্কাস পার্টিতে যোগ দেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে কাহিনীলেখক হিসেবে মঞ্চের সঙ্গে কিছুদিন তিনি যুক্ত ছিলেন এবং এই সময় এ্যালডো ফেবরিজির সঙ্গে অভিনয়ও করেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে রেডিওর জন্যে নক্সা লিখেছেন প্রচুর। ইতালীবাসীদের প্রিয় পত্রিকা 'ফিউসেণ্টি'র তিনি মাহিনা করা শিল্পীও ছিলেন কিছুকাল। এরপরে

সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে
চিত্র : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোমান রেস্টুর‍্যাণ্টএ ক্যারিকেচারিস্ট হিসেবে যোগদান করেন এই ফেলিনি। এই সময় তিনি চেষ্টা করতেন কি ভাবে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ও ধারণাকে বাস্তবায়িত করা যায়। এর ফলে আমরা তাঁর সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাই।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রে ফেলিনির আগমন খবই সরল এবং সহজভাবেই দর্শকদের মধ্যে কোনরকম চাঞ্চল্যই সৃষ্টি হয় নি সে সময়। বন্ধু এবং সহলেখক এ্যালডো ফেবরিজির সংস্পর্শে এসে তিনি ছবির জন্য কাহিনী লিখতে সুরু করেন। ১৯৪৪ সাল ফেলিনির জীবনে একটি স্মরণীয় বছর। এই সময় তিনি রবার্ট রসোলিনির সঙ্গে পরিচিত হন এবং রসোলিনি তাঁকে 'ওপেন সিটি' চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য লিখে দিতে বলেন। চিত্রটি সমস্ত ইতালি সহরে সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে ফেলিনি রোসেলিনির 'পয়সা' চিত্রের সহকারী পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। চিত্রটির কয়েকটি দৃশ্য সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব পরিচালনায় তৈরি হয়। '৪৮ সালে বিতর্কমূলক ছবি 'দি মিরাকেল' চিত্রের সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য তিনি রচনা করেন এবং সহকারী পরিচালক হিসেবেও কাজ করেন।

এই বইয়ে তিনি এ্যানা ম্যানানামি'র বিপরীতে নায়কের ভূমিকায়ও অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই চরিত্রে ফেলিনির স্ত্রী গিলেটা মসিনাকে দেখতে পাওয়া যায়।

স্ত্রী গিলেটা শুধু সুন্দরীই ছিলেন না, অভিনেত্রী হিসেবেও সুনাম ছিল। 'মিরাকেল' চিত্রের কাহিনী অতি সুন্দর। একটি সরল চরিত্রের কৃষক রমণী। হঠাৎ টোটো করে ঘুরে বেড়ান একজন পুরুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। এবং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

কয়েকমাস পরে মহিলাটি লক্ষ্য করল সে সন্তানসম্ভবা। এবং ঘোষণা করে ছিল যে এটি এক আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু সকলে তাকে দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ সুরু করে দিলে এবং শেষে তাকে তাড়িয়ে দিলে।

স্বভাবতই সেই রমণী একটি পাহাড়ের উপর উঠে গেল। কারণ, সেখানেই তার শিশু জন্ম নেবে। এবং তাকে এই বলে সম্বর্ধনা জানান "মঃ স্যাণ্ট ফিলি।" 'দি মিরাকেল' চিত্রে আমরা প্রথম ফেলিনির জীবনদর্শন দেখতে পাই।

বলা চলে, এই চিত্রে পরবর্তীকালের ফেলিনিকে দেখতে পাই তার

বাস্তবধর্মী পরিচালক ফেডেরিকো ফেলিনি

নায়ক-নায়িকার মধ্যে, তার বিষয়বস্তুর মধ্যে, তার জীবনদর্শনের মধ্যে, এবং তার ধর্মসম্বন্ধে রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার মধ্যে।

এই নাটকে 'সুন্দরভাবে এ' দ্বন্দ্ব পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু কার্ডিন্যাল স্পেলম্যান এটাকে পাষণ্ডতাপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন অথচ জেস্যুটরা একে গভীররূপে ধর্মসম্বন্ধীয় বলে চিহ্নিত করেছেন। এই দ্বন্দ্ব ফেলিনির পরবর্তী চিত্রনাট্য 'ফ্রান্সেসকো গির্ডলার দি ডিও'তেও প্রকাশ পেয়েছে। রোসেলিনির 'দি লিটল ফ্লাওয়ার্স অফ সেণ্ট ফ্রান্সিস অফ এ্যাসিসি' ধাঁচে হলেও ইহাই একমাত্র ফেলিনির সম্পূর্ণ প্রথম নাটক। রোসেলিনি সাধারণত বাহ্যবিষয়জ্ঞানসম্পন্ন; কিন্তু ফেলিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আত্মগত। পশ্চাৎপট তার কাছে মনের ও আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তব ছবি। সুতরাং বাস্তবজগৎ তার কাছে হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তিনি একজন সুরিয়ালিস্ট। যেমন গিওটো ও বটিশেলী ছিলেন।

ফেলিনি সম্পূর্ণরূপে অন্যধরণের পরিচালক ছিলেন। বিশ্বের সমস্ত বস্তু বা জিনিষ তাঁর কাছে প্রতীকরূপে ধরা দিয়েছে। পরিচালনায় স্রষ্টার ভূমিকায় সুচারুতা ও শিল্প-নৈপুণ্যের উপর বেশী জোর দিতেন। এমন কি অনেক কিছুকেই তিনি রোমাণ্টিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন। এই সব রোমাণ্টিক কাহিনী ও দৃশ্যের মধ্যে নাটকীয় ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি! এই জন্যই তাঁর লেখা ও পরিচালিত নাটক 'ওভার' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে।

'লুইস ডেল ভ্যারিয়েটাতে' ফেলিনির অনেক গুণই পরিলক্ষিত হয়। যদিও গল্প ছোট, ব্যঙ্গময় এবং অতি-অনুভূতি-সম্পন্ন, তথাপি এই নাটকের মধ্যেই আমরা ফেলিনিকে লক্ষ্য করি তার ঘটনার চয়নের পারদর্শিতায় এবং বিষয়বস্তু ও গুণের মধ্যে।

দুর্গে আমোদপ্রমোদের দৃশ্যে এবং কেকের ভ্রমণদৃশ্য সত্যি চমৎকার। কি ভাবে নাটকের গতি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, ফেলিনি সেই দিকটিই দর্শকদের দিকে তুলে ধরেন। এর জন্য নানা প্রক্রিয়ার সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন। প্রথম নাটকের আরম্ভের পর জটিল গতির মধ্যে দিয়ে চরিত্র এবং তাদের সমস্যার উদঘাটন, পরে তাদের ক্রমশ বিচ্ছেদ এবং অবশেষে তাদের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করানোর মধ্যে ফেলিনির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ পায়।

স্বগৃহে কণিকা মজুমদার
চিত্র : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন কি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও তার কাছে প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই রকম সমুদ্রপ্রতীক একমাত্র 'ইল বিডোন' ছাড়া, 'লো সিইকে বিয়ানকো'তে ও অন্যান্য আরো নাটকে প্রকাশ পেয়েছে।

'লো বিয়ানকোতে সমুদ্র রোমাণ্টিক এ্যাডভেঞ্চারের প্রতীক। তার কাছে সমুদ্র শঙ্কাদায়ক রহস্য, অমরতা ও অসীমের প্রতীক। সমুদ্র বাস্তব, কিন্তু এই বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে চরিত্রের অন্তর্নিহিত মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি প্রকাশের সাহায্য করেছে। 'লো সিয়ানকো বিয়ানকো'র চরিত্র বোকা কুৎসিত ও অসংশোধনীয় হতে পারে —কিন্তু ফেলিনির অনুকম্পা তাদেরকে এক অকল্পনীয় জগতে নিয়ে গেছে।

'আই ভিটোগিনি' অনেক ক্ষেত্রে 'লো সিয়ানকো বিয়ানকো'র মত। ভিটোলিনি হচ্ছে একদল ছন্নছাড়া উদ্দেশ্যহীন মানুষ, তবে তারা কেউ অসৎ নয়। তারা স্বপ্ন দেখে উজ্জ্বল সহরের, উজ্জ্বল দিনের। নাটকটির আরম্ভ হয়েছে দিনের আলো নিভে যাওয়ার পর, সন্ধ্যার আগমনে। নাটকটি একটি হালকা ব্যঙ্গচিত্র এবং বর্তমান জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন এক নষ্ট জাতির ভয়ঙ্কর চিত্র। ফেলিনির কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি দর্শকদের অতি সহজভাবেই ভিটোলিনি জগতের মধ্যে নিয়ে যান।

দর্শকেরাও সেখানে গিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েন এবং তাদের সাথে একাত্মবোধে দ্বিধা করেন না। যদিও ভিটোসিনিরা বাস্তব জগতেরই মানুষ, তবু ফেলিনির হাতে পড়ে তারা অন্য জগতের মানুষ হয়ে পড়ে। নাটকটির শিল্পনিপুণতা সাধারণত দীর্ঘ ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল।

আই ভিটোলিনির অন্যতম চরিত্র এ্যালবার্টো সোরদি। বিশেষ করে যে দৃশ্যে তিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া ভগ্নীর জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, তা যেমন হৃদয়বিদারক তেমনি মর্মস্পর্শী। এই ধরণের চরিত্রসৃষ্টি এক কথায় অনবদ্য। আই ভিটোলিনির পর ফেলিনির পরবর্তী চিত্র 'লা স্ট্রাডা'। এ কাহিনীর কয়েকটি চরিত্র ফেলিনি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর পূর্বের চিত্রের মত এটিও দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি পরের পর সাজানো সুন্দর দৃশ্য ও ঘটনাবলীর উপর। এর প্রধান গতি হবে কিভাবে গোল সাম্প্রিয়ানা সরলতা ও দয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে।

নাটকটির প্রতীকের ধারা সুন্দর ও সাবলীল। কেহ কেহ বলেন, কিভাবে এক পাষাণহৃদয় মানুষের জীবনে পরিবর্তন এল, কেউ কেউ বলেন, কিভাবে এক অসৎ চরিত্রের মানুষ এক রমণীর দ্বারা জীবনের গতিকে পরিবর্তন করল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিচিত্র বোম্বাই

খবর যখন রয়েছে প্রথমেই সেটা পরিবেশন করা ভালো।

মীনাকুমারী সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর 'পাকিজা' ছবিতে আবার অংশ নিচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা শুধু কথার কথা নয়, সেইমতো কাজও শুরু হয়ে গেছে। আন্ধেরীতে অবস্থিত অশোকা স্টুডিওতে সেদিন যখন মীনাজী হাজির হ'লেন শুটিং করতে—সবাই মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। পলক নিশ্চয় পড়েনি। না পড়ার কারণ ছিলো অবশ্যই। যে প্রশান্তি নিয়ে শিল্পী তাঁর ভূতপূর্ব স্বামী কামাল আমরোহীর এতোদিনের আশা সফল করতে আজ বদ্ধপরিকর, তারই বর্ণচ্ছটা তাঁর চোখে-মুখে ভাস্বর হয়ে উঠেছিলো বৈকি।

ওঃ, পাঁচ বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে। এই সময়টা মীনাকুমারীর জীবনে শুধু দুঃখই বয়ে এনেছে। অসুস্থতা যেন নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিলো। শ্রীআমরোহীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরই এসবের সূচনা। ওই সময়টা নানান গুজবেও ভারী হ'য়ে উঠেছিলো। ধর্মেন্দ্র এবং আরো যারা তখন খবরের উপাদান হয়েছেন, আজকের এই মুহূর্তে তাঁরা কেউই হাজির নেই।

চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়ে যাওয়ার পর 'পাকিজা'-র দৃশ্যগ্রহণ যখন বন্ধ হয়ে গেল মীনাকুমারীর অসহযোগিতার জন্যে, তখন নিদারুণ হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন শ্রীআমরোহী তথা চিত্রজগতের 'শুভানুধ্যায়ীরা'—অতো অতো টাকারই যে সলিলসমাধি হয়েছিলো তাই নয়, চলচ্চিত্রকারের বহু আকাঙ্ক্ষারও অবসান ঘটেছিলো। অবিশ্যি শ্রীআমরোহী অনেক প্রয়াস পেয়েছেন মীনাজীকে পুনরায় নায়িকার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে। যতো কাল পরে সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। ওঁর (শ্রীআমরোহীর) প্রতীতি ছ'মাসের মধ্যে 'পাকিজা'-র চলচ্চিত্রায়ণ সমাধা হ'য়ে যাবে। এর আগে নায়িকার অংশই বেশির ভাগ গৃহীত হয়েছিলো। এইবার নায়ক দেখা দেবেন রঙ্গমঞ্চে (স্টুডিও সেটে)। না না, ধর্মেন্দ্র নয়,

রমেন চৌধুরী

রাজকুমার। শেষবেশ এঁকেই চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত যা কোনো ছবিতে খরচ হয়নি, এ ছবিতে তাই খরচ হবে বলে পরিচালক জানিয়েছেন। তাঁর মতে ছবিটি সর্ববিষয়ে দর্শনীয় হ'য়ে উঠবে। তাঁর স্বপ্ন এতো দিন পর সার্থক হবে।

'পাকিজা' ঘরে বাইরে রেকর্ড সৃষ্টি করবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। আমরাও চাই তা যেন সত্যি হয়।

আর একটি নায়িকা জন্মলাভ করলো হিন্দী চিত্রজগতে। বাঙলা দেশে এ জিনিষটির অভাব খুবই। সহজে নতুন মুখ পাওয়াই যায় না—ফলে কী অসহনীয় পরিস্থিতিই না চলেছে। সেদিক থেকে এখানে প্রাপ্তির সুযোগ অনেক। মেয়েটির নামকরণ হয়েছে 'দীপা'। এ আলোকবর্তিকা আগামী দিনে কতো রঙ ছড়াবে, তার পরীক্ষা এখনই হয়তো সম্ভব নয়; তবে প্রত্যাশার বশবর্তী হয়ে নিশ্চয় শুভেচ্ছা জানাবো নবাগত নায়িকা দীপাকে।

খবরে জানা গেছে দীপার বংশ-পরিচয়। খাইকুলার (হায়দ্রাবাদ) এক খানদানি মুসলমান পরিবারের সুন্দরী বিদুষী কন্যা ইনি। কনভেন্টে শিক্ষা পেয়েছেন। ভোগ-বিলাসের খুবই অনুরাগিণী। ছবিতে অভিনয় করবার

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চিত্রে তপেন চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা

জন্যে ব্যাকুলতাও তেমনি। তিনি এই উদগ্র বাসনার শিকার হয়ে তাঁর বাবাকে পাঠিয়েছিলেন প্রযোজক রাধাকৃষ্ণণের কাছে। মেয়েকে নায়িকা করে নিলে চার লক্ষ টাকা ছবি তোলার জন্যে বিনিয়োগ করবেন—এমন অঙ্গীকার দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু টাকাতে তো অভিনয়-প্রতিভা সৃষ্টি হয় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁকে। তারপর দেখাশোনা অন্তে তিনি সহজেই দীপাকে তাঁর আগামী চিত্রে নায়িকারূপে নির্বাচিত করেছেন। শ্রীমতী দীপা সহজ ও সাধারণ চরিত্রের চেয়ে ঘোরালো ধরণের ভূমিকার বিশেষ ভক্ত। তাঁর বিশ্বাস চিত্রতারকারা উজ্জ্বল হ'লেই হবে না। তারা বেঁচে থাকে তাদের অভিনয়-দক্ষতার জাদুস্পর্শে।

পরিচালক সত্যেন বোস এখন বোম্বাইয়ের মাথার মণি। তাঁর এই সমাদরের কারণ অবশ্যই আছে। মানুষ সহজে তো কাউকে কিছু দেয় না; টাকাকড়ি হয়তো কিছু দিতে পারে কিন্তু সুনাম যশ নৈব নৈব চ। সবই আদায় করে নিতে হয়। শ্রীবোস তাই করেছেন। পর পর তিনখানা ছবি তাঁর 'রজত-জয়ন্তী'র বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে এখানকার আকাশে। আর বক্সে আছে! সকলে ধর্ণা দিচ্ছেন তাঁর দুয়ারে। যে ছবিই তিনি তুলবেন তাই-ই দশের হাটে বিকোবে চড়া দামে।

'জ্যোত জলে' তাঁর অতি-আধুনিক চিত্র-প্রয়াস। সম্প্রতি ছবিটি মুক্তি পেয়েছে এখানে। স-শস্ত্র ছাত্র-বিপ্লব জাতীয় কিছু কাহিনী-অবলম্বন। শ্রীবোসেরই উপযুক্ত বিষয়-বস্তু। কথাটা নতুন

ডঃ ভূপেন হাজারিকা পরিচালিত অসমীয়া 'চিকমিক বিজুলী' চিত্রে বিদ্যা রাও
চিত্র : আশু সেনগুপ্ত

ক'রে সবাই স্বীকার করেছেন। নাট্যরস, নাটকীয় মুহূর্ত, সেই সঙ্গে সাতখানা গানে ভরা এই 'জ্যোত জলে'-র আবেদন সার্বজনীন। ছাত্রদের অভিভাবক সম্প্রদায় ছবি দেখে লাভবান হবেন বলে সবার ধারণা। অভী ভট্টাচার্য একটি আকর্ষণীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। শিশু অভিনেতা মহাবীরের অভিনয় মুগ্ধ হবার মতো।

●

'মুঘল-এ-আজম' নির্মাতা কে, আসিফ আবার ফিরে এসেছেন। অনেক দিন দূরে সরে ছিলেন তিনি। লায়লা মজনু-র অমর কাহিনী নিয়ে 'লাভ এণ্ড গড' ছবিটির কাজ শুরু করেছিলেন আসিফ সাহেব, কিন্তু আর্থিক কারণে ১৯৬৪ সালে কাজে বাধা পড়ে। পরে নায়ক গুরু দত্তের পরলোকগমনে ছবির দৃশ্যগ্রহণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। গুরু দত্ত মজনু চরিত্রে অংশ নিচ্ছিলেন। 'লায়লা'র রূপসজ্জা নিয়েছেন নিম্মি।

মুঘল-এ-আজম-এর ফিনান্সিয়ার শেঠ সাহুরজি সম্প্রতি এগিয়ে এসেছেন। আসিফ সাহেবের সঙ্গে অল্প আলোচনা চালিয়ে ব্যবস্থা পাকা করেছেন। 'লাভ এণ্ড গড' আবার তোলা হবে, এবং তা যতো শীঘ্র সম্ভব। গুরু দত্তকে নিয়ে খুব বেশি দৃশ্যগ্রহণ করা হয় নি বলেই, এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে। খবরে প্রকাশ 'মজনু'রূপে এবার দিলীপকুমারের আগমন নিশ্চিত। আসিফের সঙ্গে দিলীপকুমারের একটা সামাজিক সম্পর্কও রয়েছে। কাজেই বাধা বিশেষ দেখা দেবে না।

এই ধ্রুপদী ছবির বারো রীলের কাজ সারা হ'য়ে আছে, অচিরে নব পর্যায়ের দৃশ্যগ্রহণ আরম্ভ হ'বে।

●

ধর্মেন্দ্র-অনুজ কুমার অজিত এবার চিত্রলোকে দর্শন দিতে আসছেন। যে-সে ভূমিকায় নয়—একেবারে নায়ক-রূপে। দাদার সহায়তা পেলে এবং তপদীরের জোর থাকলে প্রথম দর্শনেই অসাধ্যসাধন করা কিছু দুরূহ কর্ম নয়।

মুভি ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনালের রঙিন ছবি 'মিঠে বোল'-এ তাঁর সুরত আর বোল দুই-ই দেখা শোনা যাবে। তাঁর বিপরীতে নায়িকা হ'চ্ছেন কানন কৌশল। কাহিনী ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন সুখদেব। নতুন সুরকার

'তীরভূমি' চিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও গীতা দেবী

কমল রাজস্থানীরও আত্মপ্রকাশ হ'চ্ছে এ ছবিতে।

●

দিলীপকুমার সস্ত্রীক নতুন যে ছবিটির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন, তার নাম 'গোপী'। রঙিন সেই ছবি সঙ্গীতবহুল। প্রস্পারিটি ফিল্মসের এই নিবেদনে সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন কল্যাণজী-আনন্দজী। যে কথাটা জানবার বা জানাবার মতো তা' হোলো দিলীপ নিজকণ্ঠে গান গাইছেন এতে। একখানা গান আমরা শুনতে পাবো। এক যুগ আগে এমন সুযোগ এনে দিয়েছিল 'মুসাফির'। দিলীপকুমার তখনই গেয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন পরের গলার সঙ্গে মুখ নেড়েই গেছেন।

বাবা পরিচালক, ছেলে প্রযোজক। ব্যবস্থাটি সুন্দর। এটি সম্ভব হচ্ছে কিশোর সাহুর ক্ষেত্রে। শ্রীসাহু বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকাররূপে নিজস্ব একটা স্থান করে নিয়েছেন দীর্ঘদিন। এবার তিনি পুত্রের প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ 'প্যার ভরা চ্যায যবসে'-র পরিচালন-ভার নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সঞ্জয় নায়ক হবে। নায়িকারূপে দেখা দেবেন সায়রাবানু। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরের জাল বনবেন ছবিটির।

শ্রীমতী সুরাইয়া সম্পর্কে একটু-আধটু খবর পাওয়া যাচ্ছে। অতীতের এই বরণীয়া শিল্পীকে ইদানীং আর ছবিতে দেখাই যায় না। তাঁর সুরেলা কণ্ঠও দীর্ঘদিন নীরব। এখন উনি লোক-লোচনের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন, কিন্তু তাই বলে অনাদি অনন্তকাল এ মনোভাব থাকবে বলে বিশ্বাস করেন না অনেকেই। সুরাইয়া নিজেও স্বীকার করেছেন সেকথা। তিনি বলেছেন প্রায়ই প্রযোজক-পরিচালকের দল তাঁকে ছবিতে নামাবার আর্জি নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এঁরা কেউ চুনো-পুঁটি, কেউ বা রুই-কাতলা। তাহ'লে কি হয়, শিল্পীর মনে কোনোই সাড়া জাগাতে পারছেন না তাঁরা। ওদিকে উনি এ ধরণের অলস জীবন যাপনে হাঁফিয়ে উঠেছেন। কিছু একটা করতে তাঁকে হবেই। সুরকার রবি চেষ্টায় আছেন গানের আসরে শ্রীমতীকে টেনে আনবেন। চিত্রানুরাগীরা নিশ্চয় সুরাইয়ার সুরের মাধুর্য বিস্মৃত হন নি। রবির সময়োপযোগী প্রয়াসকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন বলেই বিশ্বাস করি।

●

কিশোরকুমার তাঁর 'দূর কা রাহী'র একটি উল্লেখনীয় গান সম্প্রতি রেকর্ড করেছেন। এ ছবির নায়ক তিনিই। শুধু তাই নয়, তিনি একাধারে গল্পকার, সুরকার, প্রযোজক এবং পরিচালক। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীও তিনি। শ্রীমতী তনুজা হচ্ছেন নায়িকা। সহশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অশোককুমার, কিশোর-তনয় অমিত গাঙ্গুলী, অভী ভট্টাচার্য, হীরালাল, অসিত সেন, কেষ্ট মুখার্জী, তপন ও গঙ্গা। চিত্রগ্রহণের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

ছবির নাম 'পরীক্ষিৎ'। পরিচালক মোহনকুমারের এই সর্বাধুনিক প্রয়াসের মহরৎ-পর্ব সম্পন্ন হয়েছে সাড়ম্বরে। ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরী ও স্টুডিওতে শুভ অনুষ্ঠানে করতালি-কাষ্ঠ (ক্ল্যাপস্টিক) দিয়েছিলেন প্রযোজক জে ওমপ্রকাশ। ক্যামেরার সুইচ অন করেছিলেন মগনভাই সাজানী (পরিবেশক)। পরিচালক মোহন সায়গলের নির্দেশে মহরৎ-শট গৃহীত হয়েছিলো। কাশ্মীরের ডাল লেকের পাশে একাদিক্রমে ন'দিন দৃশ্য গ্রহণের বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রধান দুটি ভূমিকার শিল্পী সাধনা ও রাজেশ খান্না। আর যাঁরা চরিত্রচিত্রণে অংশ নেবেন বলে স্থির আছে, তাঁরা হলেন প্রেম চোপরা, রাজেন্দ্রনাথ, সজ্জন প্রমুখ। 'পরীক্ষিৎ'-এর গল্প লিখেছেন লেঃ কমাণ্ডার রবি থাপার, ভেদ রাহি চিত্রনাট্যরচয়িতা। আনন্দ বক্সীর গানে সুরসংযোজনা করছেন মদনমোহন।

রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওর অভ্যন্তরে এক বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের সেটে বেশ কিছু দৃশ্যগ্রহণ করলেন পরিচালক কে শঙ্কর তাঁর 'সাচ্চাই' ছবির। এম পি আর ফিল্মসের পতাকাতলে গৃহীত এ ছবিটির দু'দিনের বহির্দৃশ্যও গ্রহণ করা হয়েছে। অন্তর্দৃশ্যের শিল্পী ছিলেন সঞ্জীবকুমার, জগদেব এবং রাজমেহরা। এ ছাড়া প্রাণ, সুলোচনা, সিবরাজ ও জনি ওয়াকারকে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। মুখ্য ভূমিকাদু'টিতে অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার রূপসজ্জায় আছেন শাম্মি-কাপুর ও সাধনা। সংলাপ ও গান রচনা করেছেন রাজেন্দ্রকৃষ্ণ। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করবেন শঙ্কর জয়কিষণ

ইন্দর সেন পরিচালিত অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্তের 'প্রথম কদমফুল' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

॥ ইন্দ্রসেন

"আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে আছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারিদিকে মরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিল সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া কহ অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥"

—কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র

মহাবীর মানসিংহ প্রধান প্রধান কর্মচারিগণকে ডাক পাঠালেন। কচু রায়কেও আহ্বান জানালেন। সকলের উপস্থিতিতে বললেন,—আপনারা বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন। বিপক্ষকে চরম আঘাত হানতে হবে।

মানসিংহের আদেশ শুনে বৈরনির্যাতনাকাঙ্ক্ষী কচু রায় বিনীতভাবে বললেন,—রাজন! বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত যুদ্ধ করবেন। তিনি যুদ্ধ-বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী, আমীরবিজয়ে উদ্দীপ্ত এবং অবসরজ্ঞ। সত্য বটে, আপনি কাবুলাদি নানা স্থানে অনন্যসাধারণ জয়লাভ করেছেন, কিন্তু আমি বিবেচনা করি, প্রতাপের ন্যায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন কুত্রাপি হন নাই। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হতে স্বীয় অসাধারণ ভুজবলে এরূপ উন্নতি লাভ করেছেন। প্রতাপের অভিজ্ঞতা অসামান্য। বর্তমানে তিনিই বঙ্গদেশের একমাত্র নেতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি যে সকল বিশ্বস্ত, প্রভুকার্যতৎপর কর্মচারিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন, তাঁরা সকলেই অসমসাহসী, অক্লিষ্টকর্মা, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ। স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য তাঁরা প্রাণ প্রদানেও কুণ্ঠিত নন। দৈবানুগৃহীত প্রতাপ মহামায়ার বরপুত্র হিসাবে সকলের নিকট পরিচিত হন। জনসাধারণের হৃদয়ের উপর তাঁর অসীম ক্ষমতা। অতএব আমার বিনীত নিবেদন, আপনি একটু বিশেষ নিপুণতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। আপনি হয়তো অবগত নন অদূরবর্তী যশোহরপুরী লঙ্কার ন্যায় সুরক্ষিত। যশোহরপুরীর চতুর্দিকে দুর্গ ও দুস্তর যমুনাবেষ্টিত হওয়াতে শত্রুগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্গম। দুর্গপ্রাকার কামানশ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হওয়াতে যশোহরপুরীকে লোকে অজেয় আখ্যা দিয়াছে। রাজন! ঐ যে পূর্বদিকে সুবিস্তৃত রণক্ষেত্রের উপযোগী ভূমি দেখছেন, উহার নিম্নপ্রদেশের সুড়ঙ্গশ্রেণীতে প্রচুর পরিমাণে বারুদ রক্ষিত আছে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে ঐ স্থানে উপস্থিত হলেই সে সসৈন্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। এইরূপ ইহার উত্তরদিকে ক্রোশপরিমিত ভূমির নিম্নদেশের স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ রক্ষিত আছে। দুর্গের দক্ষিণদিকে আমমাংসাহারী দুর্জয় পার্বত্যসৈন্য সকল অবস্থান করছে। কুটযুদ্ধপ্রিয় ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ অহরহ সতর্কতার সহিত যশোহর রক্ষা করছে। ইহার পশ্চিমদ্বারে গজারোহী সৈন্য, উত্তরদ্বারে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য, দক্ষিণদিকে বঙ্গীয় বীরগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য বহুপ্রকার আয়ুধসম্পন্ন হয়ে সর্বদা যুদ্ধসজ্জায় অবস্থান করছে।

বৈরিজ্বালায় সদাক্ষণ কচু রায়ের বক্ষ যেন জ্বলছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। অহোরাত্র কামনা করেন, প্রতাপাদিত্য ধ্বংস হোক। প্রতাপ নিপাত যাক। এই ভূপৃষ্ঠ থেকে যেন তেন প্রকারেণ প্রতাপকে বিদায় করতে হবে। তবেই মানসিক শান্তি লাভ করবেন কচু রায়। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় রাত্রি যাপন করবেন।

কচু রায়ের এই মানসিক অশান্তির সুযোগ গ্রহণ করেন মানসিংহ। পুরাণ-কথার বিভীষণের ভূমিকা গ্রহণ করেন কচু রায়। মানসিংহ প্রতাপের নিন্দা করলেই অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি

পড়ে। কচু রায় অনর্গল ব্যক্ত করতে থাকেন প্রতাপের যত গোপন তথ্য।

কচু রায়ের মুখে যশোহরদুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনে ঘোরতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে ব্যূহ রচনা করে দক্ষিণদিকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, বামদিকে গোলন্দাজগণ, সম্মুখে গজারোহী সৈন্য সংস্থাপন করলেন। পশ্চাদ্‌ভাগে আমীরগণ-পরিবেষ্টিত বহুসংখ্যক সৈন্য সংস্থাপন করলেন। এবং স্বয়ং সকলের অগ্রবর্তী হয়ে যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন।

মানসিংহের সৈন্যগণ সময়ে অসময়ে আকাশ কাঁপিয়ে ধ্বনি দিতে থাকে। কখনও সরবে চীৎকার করে, জয় মানসিংহের জয়। কখনও বলে, দিল্লীশ্বরের জয়।

বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা প্রতাপাদিত্য মহাশক্তির উদ্বোধনপূর্বক জনগণ-হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করে শত্রুবিজয়ের জন্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন,—মহাশয়গণ অভিমত প্রদান করেন, কী উপায় অবলম্বন করলে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের অঙ্কগতা হন? কোন উপায়ে আমার জ্ঞাতিসহ মানসিংহকে পরাভব করা যায়।

সূর্যকান্ত বললেন,—এবার আমাদের অন্যপ্রকার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে, কচু রায় প্রমুখ আপনার জ্ঞাতিবর্গ মানসিংহের সহিত মিলিত হয়ে পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আগমন করেছে। শুনেছি ইহার সহিত আরও কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি একত্র হয়েছেন। শুনা যায়, নদীতটে মানসিংহ যৎকালে খাদ্যদ্রব্য ও নৌকা অভাবে অত্যন্ত কষ্টভোগ করছিল ও আকুলিত হয়েছিল, সেই বিপদসময়ে ভবানন্দ খাদ্যদ্রব্য, নৌকা ও আশ্রয় প্রদানে মানসিংহের সৈন্যগণকে রক্ষা করেছিল।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য বললেন,—আমিও তাহা জানি। এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। কচু রায় ও ভবানন্দই এক্ষণে মানসিংহের দুই প্রধানতম সহায়। আমাদিগকে সকল প্রকার গোপন তথ্যাদি তারা অকপটে প্রকাশ করছে।

শংকর প্রতিহিংসায় মুখর হয়ে বললেন,—দুই পাষণ্ড এখন কোথায় অবস্থান করছে কে জানে! দখলে পাওয়া যায় তো জীবন্ত দগ্ধ করি দুটাকে।

আক্ষেপের শুষ্ক হাসি মহারাজার মুখে। বললেন,—কোথায় আর, মানসিংহের নিরাপদ আশ্রয়ে। আমাদের শত্রু-শিবিরে।

সূর্যকান্ত আবার বলতে থাকেন,—এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ করতে হবে। যখন বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী, স্বদেশবাসিগণ পরাধীন হওয়ার জন্য শত্রুদিগকে সাহায্য করছে, যখন মহারাজা, আপনার কুলাঙ্গার কর্মচারিগণ মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া শত্রুপদতলে জননী জন্মভূমিকে বলিপ্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে, তখন আমাদিগকে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে ঘোরতর বিক্রমে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। আমাদিগকে এখন গৃহ ও বহিঃশত্রু হতে আত্মরক্ষা করে প্রতিটি কাজ করতে হবে।

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সূর্যকান্তকে সমর্থন জানালেন।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য বললেন,—নূতন রীতিতে আমাদিগের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সজ্জিত করা চাই। তথ্যাদি আর গোপন নাই। সেনাপতিগণ অবহিত হোন। আমি এখনই আদেশ প্রদান করছি, আপনারা শত্রুব্যূহে আক্রমণ করেন।

মহারাজার আদেশানুসারে পূর্বদেশীয় সেনাপতি রঘু, ফিরিঙ্গীপতি রডা, গুপ্ত-সেনাপতি সুখা, ঢালীপতি মদন, রাজকুমার উদয়াদিত্য, যুদ্ধপ্রিয় প্রতাপসিংহ প্রমুখ বীরগণ বহুল সৈন্য পরিচালনা করে মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করলেন।

উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হল।

বঙ্গীয় বীরগণ চতুর্দিক হতে মানসিংহের সৈন্যদের আক্রমণ করলে দুই পক্ষের বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করে বিজয়লাভের জন্য পরস্পরের উপর শাণিত তরবারি প্রহার করতে লাগলো।

শোণিত প্রবাহে পৃথিবী পঙ্কিল হয়ে উঠলো।

এইরূপ কয়েক দিবস উভয়পক্ষ ঘোরতররূপে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

লোমহর্ষণ যুদ্ধকালে পর্তুগীজ সেনাপতি রডা মানসিংহের দশজন আমীরকে নিহত ও বহুসৈন্যকে বধ করলেন।

উভয়পক্ষই বিজিগীষু হয়ে অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। জয়-পরাজয় কোনপক্ষেই নির্ধারিত হল না।

আরও কয়েকদিন যুদ্ধ চললো।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য ভক্তিভরে ভগবতীর পূজা করে একদা অতি প্রত্যুষে সেনাপতিগণসহ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

বাগ্মিবর শংকর যুযুৎসু সৈন্যগণকে সম্বোধন জানিয়ে বললেন,—বীরগণ! আমরা এক্ষণে জয়-পরাজয় নামক দুইটি রাস্তার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। একদিকের রাস্তায় শত্রুসৈন্য বিসর্জন করে স্বাধীনতার শান্তি-নিকেতনে উপনীত হওয়া যায়। অন্যদিকের রাস্তায় গমন করলে শত্রু কর্তৃক মর্দিত হয়ে পরাধীনতার চিরদুঃখভবনে উপস্থিত হতে হয়। এক্ষণে স্থির করেন, আপনারা কোন্ রাস্তায় গমন করবেন? যদি আপনারা পুত্রকলত্রের চিরসুখের জন্য জীবনাশা পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করেন, তাহা হলে আপনারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করবেন। ইহাতে আপনারা ইহলোকে পরলোকে বিমল কীর্তি রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। আর যদি আপনারা কাতরতাপূর্বক যুদ্ধবিমুখ হন, তাহা হলে আপনারা শত্রু কর্তৃক পশুর ন্যায় নিহত হবেন। তখন আপনাদিগের বহুক্লেশে সম্পাদিত কীর্তি সকল চিরকালের জন্য ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন বিস্মৃতসাগরে নিমজ্জিত হবে। বীরগণ! আপনারা যে বহুদিন হতে বহুক্লেশে মোগলগণকে যুদ্ধস্থলে মথিত, ব্যথিত ও নিহত করে স্বাধীনতা সংস্থাপন করলেন, তাহা কী আমাদিগের ভীরুতার জন্য বিফল হবে। কখনই নহে। ঐ দেখুন, ভগবতী আমাদিগের সহায়তার জন্য কৃতান্তের ন্যায় অসি নিষ্কাশিত করে অবস্থান করছেন। আপনারা একবার প্রাণপণে যুদ্ধ করুন, অদ্যই আমরা শত্রুগণের উপর চিরস্মরণীয় বিজয়লাভে সমর্থ হবো।

ভাষণ-শেষে শংকর সৈন্যগণ সহ শত্রুসৈন্যের মধ্যে বজ্রের ন্যায় ভয়ংকরবেগে ভৈরবনাদ করতে করতে প্রবেশ করলেন।

সূর্যকান্ত, রঘু, মদন, উদয়াদিত্য প্রমুখ সেনানায়কগণ সকলেই আপন আপন সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করে অদ্ভুত বিক্রমে মানসিংহকে আক্রমণ করলেন।

কামানরাজীর অবিরাম অগ্নিবর্ষী গোলাবৃষ্টিতে রণস্থল ভয়ংকর এবং ঘোরতর ধূমাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। আগ্নেয় অস্ত্রসমূহের শব্দ-ভৈরব, গর্জন রণবাদ্য এবং যোদ্ধাগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হয়ে প্রাণিগণের বিভীষিকা উৎপন্ন করতে লাগলো। গজ ও অশ্ব প্রভৃতি শোণিতপাতে মেদিনী কর্দমাক্ত হল। এইরূপ ভয়ংকর যুদ্ধে যোদ্ধাগণের ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হয়ে পড়ে। শংকর প্রমুখ বীরগণ অবিচলিতভাবে অতি নিপুণতার সঙ্গে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করে মানসিংহের দুর্বল পক্ষ আক্রমণ এবং স্বীয় পক্ষের অসংযত সৈন্যগণকে সংযত করতে লাগলেন।

সারাদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর বেলা অবসানের সময় কতকগুলি নূতন সৈন্যসহ ভীষণ পরাক্রমে সূর্যকান্ত প্রমুখ বীরগণ

মানসিংহকে আক্রমণ করলেন। শংকর সমবেত সেনাগণকে সম্বোধন করে বললেন,—বীরসেনাগণ, ঐ দেখ আমাদিগের যুদ্ধসহচরগণ কিরূপ ভৈরবাবক্রমে যুদ্ধ করছেন। সমুদ্রের ভীষণ আলোড়নে দৃঢ়কায় পোতসমূহ যেরূপ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সেইরূপ উঁহাদের প্রবল পরাক্রমে মোগলসৈন্য বিপর্যস্ত হতেছে। বীরগণ, এই অবকাশে মোগলদের আক্রমণ করলে প্রবল প্রভঞ্জনের নিকট যেমন জলদ-জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় তেমন শত্রুগণ প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করে চতুর্দিকে পলায়ন করবে। অতএব, এইরূপ সুযোগ বৃথা না যায়।

শংকর প্রমুখ সেনানিগণ মহারুদ্রের ন্যায় মোগলসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। যে সকল সৈন্য যুদ্ধরত ছিল তারা অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হল। মানসিংহের সৈন্যগণ সমস্ত দিন যুদ্ধ চালিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো। তদুপরি আবার নতুন সৈন্যদলের আক্রমণে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রবল বায়ু বৃক্ষাদিকে যেরূপ সমূলে উৎপাটিত করে, সেইরূপ প্রতাপসৈন্য মোগলসৈন্যগণকে সংহার করতে লাগলেন। প্রলয়সম যুদ্ধে মানসিংহের সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করে চতুর্দিকে পলায়ন করতে লাগলো। মানসিংহ সৈন্যগণকে শত্রু-পদদলিত দেখে জীবন ও জয়ের আশা পরিত্যাগ করে অসামান্য নিপুণতার সঙ্গে পরাজিত সৈন্যগণকে কোনরূপে সংগ্রহ করে পলায়ন করতে আরম্ভ করলেন। সমস্ত দিবসের যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ পশ্চাৎ হতে বারম্বার প্রতাপসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হতে লাগলো। একে রাত্রিকাল, ঘোরতর অন্ধকার যুক্ত হওয়াতে সৈন্যগণকে অধিকতর ক্লেশ প্রদান করতে লাগলো।

মানসিংহ পাঁচ ক্রোশ দূরে পলায়ন করে আর অগ্রসর হতে পারলেন না। সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থান করে সৈন্যগণসহ শ্রান্তি দূর করতে লাগলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপ সৈন্যগণসহ মানসিংহকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করলেন। আবার রণবাদ্য ও কামানগর্জন চতুর্দিক কাঁপিয়ে তোলে। প্রাণের মায়া ছেড়ে মানসিংহ অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। পূর্বদিন অপেক্ষা অদ্যকার যুদ্ধ অধিকতর ভয়ংকররূপে প্রজ্বলিত হল। এই ঘোরতর যুদ্ধে মহাবীর রঘু, মামুদ আদি সেনাপতিগণসহ বহুসংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করে বীরলোক প্রাপ্ত হলেন।

মানসিংহ দিন দিন তাঁর সৈন্যসকল নিহত হতেছে এবং প্রতাপকে পরাজিত করা সহজসাধ্য নয় বুঝে প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং রাঘব রায়, ভবানন্দ মজুমদার প্রমুখ স্বদেশ-শত্রু নরপিশাচগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন,—আমি কাবুল প্রভৃতি অনেক অনেক দেশ জয় করেছি, কিন্তু কোথাও এইভাবে পরাজিত হই নাই। আমার পরাক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হয়েছে, কিন্তু আজ আমাকে প্রতাপের পরাক্রম দেখে কম্পিত হতে হতেছে। সম্রাট আমাকে আমার মৃত্যুর জন্য এই বঙ্গদেশে প্রেরণ করেছেন। এদেশ হতে পরাজিত হয়ে সম্রাট-সমীপে গমন করলে [illegible] তাঁর ক্রোধানল থেকে মুক্তি পাবো না। উদারধী মহা[illegible] আবুল ফজল যেরূপ ঘাতকহস্তে নিহত হয়েছেন, মহাবীর শের খাঁকে যেরূপ নৃশংসতা সহকারে হত্যা করা হয়েছে, তাহা পৃথিবীবিদিত। এইরূপ কঠোর অবস্থায় কী প্রকার কার্য করলে উভয়দিকেই হিত সাধিত হয়, আমাকে সেই মত পরামর্শ প্রদান করুন।

স্বদেশদ্রোহী কচু রায় সর্বাগ্রে মুক্তকণ্ঠে বললেন, মহাভাগ! বিজয় আপনার অঙ্কগতপ্রায়, এহেন সময়ে যদি আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার করে ইহার ফলভোগ না করেন, তাহা হলে জানলাম, বীরধর্ম পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়েছে। আমি গতরাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, যশোহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতাপের উপর বিমুখ হয়েছেন। ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কাসমরে ভগবতীর উদ্বোধন করে বানর-চমূমধ্যে যেরূপ শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, সেইরূপ আপনিও মহামায়ার পূজা করে সৈন্যগণহৃদয়ে বল প্রদান করুন। দেখবেন, অচিরকালমধ্যে আপনার অভীষ্ট সাধিত হবে। রাজন্! আপনি যদি এই দুর্বৃত্ত পিতৃহন্তার সমুচিত দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হলে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে রক্ষা করবে?

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে কচু রায়ের বাক্য অনুমোদন করলেন। মানসিংহ কচু রায়ের উপদেশানুসারে অতি সমারোহের সঙ্গে ভগবতীর অর্চনা সেরে সৈন্যমধ্যে এরূপ জনরব প্রচার করলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবতী তাঁর ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে প্রতাপের পক্ষ পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং প্রতাপকে আর কেহ রক্ষা করতে সমর্থ হবে না।

সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করে কৃতসংকল্প মানসিংহ পুনরায় যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন।

মানসিংহের সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখে প্রতাপ সেনাপতিগণকে চতুর্দিক হতে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করতে আদেশ প্রদান করলেন। সূর্যকান্ত, মদন রডা এবং অজাতশত্রু বীরবর কুমার উদয়াদিত্য আপন আপন সৈন্যগণকে উৎসাহিত করে বিজয়লাভের জন্য শত্রুব্যূহে প্রবেশ করলেন।

মৃত্যুভয়-বিরহিত মানসিংহ সৈন্যগণকে সম্বোধন জানিয়ে বললেন,—অদ্য ভয়ংকর যুদ্ধের অভিনয় হবে। শত্রুপক্ষ পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কদাচ রণস্থল পরিত্যাগ করবো না। অদ্যকার ভীষণ পরীক্ষায় যদি আমরা উত্তীর্ণ না হই, তাহা হলে এই নানা রত্ন-পরিপূর্ণ বঙ্গদেশ আমাদিগের পদদলিত হবে। অতএব বীরগণ, তোমরা যে প্রকার শূরতাপূর্বক আফগানদের পরাজিত করেছো, সেইরূপ বীর্যবলে বঙ্গীয়গণকে পরাস্ত কর।

কথার শেষে মানসিংহ কুঞ্চিতকেশ হাবসী, উন্নতশরীর রাজপুত এবং অতিকায় মোগলগণকে যুদ্ধ করতে আজ্ঞা প্রদান করলেন।

দেখতে দেখতে চতুর্দিকে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ অশ্রুতপূর্ব ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে আগ্নেয়াস্ত্র সকল বর্ষণ করতে লাগলো। সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিপটল আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করলো। যুদ্ধমদোন্মত্ত বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করে ঘোরতররূপে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন।

মহাবীর সূর্যকান্ত অনন্যসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে মানসিংহের ব্যূহ ভেদ করে সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন, দলিত, মথিত করতে আরম্ভ করলেন। সমীরণ যেমন ভৈরব-মূর্তি ধারণ করে বারিধি-বারি আলোড়ন করে থাকে, তেমনই সূর্যকান্ত মানসিংহের সৈন্যগণকে আকুলিত করতে লাগলেন।

উত্তাল তরঙ্গাকুলিত সমুদ্র ভীষণ মুখব্যাদান করে পৃথিবীকে গ্রাস করবার জন্য যেরূপ গভীর গর্জন করে ধাবিত হয়, সেইরূপ মানসিংহ সৈন্যগণসহ বঙ্গীয় সৈন্যগণকে ধ্বংস করবার জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। মানসিংহের সৈন্যগণের সঙ্গে সূর্যকান্তর ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। মোগলসৈন্যগণ সূর্যকান্তর চতুর্দিক আচ্ছাদিত করলো। সূর্যকান্ত আপনাকে মোগল পরিবেষ্টিত দেখে অলৌকিক বীর্য প্রকাশ করে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। প্রবল দাবানল ইন্ধন-বিহীন হয়ে যেরূপ নিস্তেজ হয়ে আসে, সেইরূপ সূর্যকান্তর সৈন্যগণ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। মহাবীর উদয়াদিত্য সেনাপতি সূর্যকান্তকে বিপৎসাগরে নিমগ্ন দেখে সৈন্যগণসহ সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলেন। মানসিংহ উদয়াদিত্যকে আগমন করতে দেখে কতকগুলি সৈন্যকে তাঁর অবরোধের জন্য প্রেরণ করলেন এবং সূর্যকান্তর নিধন জন্য অপর কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করলেন।

মানসিংহ-প্রেরিত সৈন্যগণ বিপুল পরাক্রমে সূর্যকান্তকে আক্রমণ করলো। সূর্যকান্ত তাদের রোধ করতে কোনরূপ সমর্থ

হলেন না। তিনি মহারুদ্রের ন্যায় রণস্থলে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করে বীরগতি প্রাপ্ত হলেন।

মহাবীর উদয়াদিত্য সূর্যকান্তর পতনে অত্যন্ত দুঃখাভিভূত হয়ে মধ্যাহ্নকালীন আদিত্যের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করে দ্রুতবেগে মানসিংহকে আক্রমণ করলেন। বঙ্গীয় সেনাগণ সূর্যকান্তর পতনে ভয়বিহ্বল না হয়ে সেনাপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়ার জন্য উগ্ররূপ ধারণ করে ভৈরববিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো। যুবক উদয়াদিত্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করে পূর্বাহ্নের আদিত্যের ন্যায় তীক্ষ্ণবীর্য প্রকাশ করে শত্রুমথনে প্রবৃত্ত হলেন।

সূর্যকান্তকে বিনাশ করে মানসিংহ সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করে বললেন,—বীরগণ, ঐ দেখ শত্রু-সেনাপতি তোমাদিগের হস্তে নিহত হয়ে রণস্থলে পতিত রয়েছে। এক্ষণে তোমরা তোমাদের পূর্ববীর্য স্মরণ করে ঐ যে যুবক কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় আমাদের সৈন্যগণকে সংহার করতে করতে অগ্রসর হতেছে, উহাকে তোমরা আক্রমণ কর। ঐ যুবক প্রতাপাদিত্যের পুত্র। উহাকে নিহত বা বন্দী করতে পারলে আমরা শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সমর্থ হব।

কতকগুলি মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত ও হাবসী সৈন্যকে মানসিংহ উদয়াদিত্যের অভিমুখে প্রেরণ করলেন। উভয়পক্ষে লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন উদয়াদিত্য শাণিত অসির ভীষণ আঘাতে বিপক্ষ সৈন্যগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে লাগলেন। যে সময় মহাবীর উদয়াদিত্য প্রলয়কালীন মহারুদ্রের ন্যায় যুদ্ধস্থলে বিচরণ করছিলেন, সেই সময় বিপক্ষপক্ষ-নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলক তাঁর বক্ষঃস্থলে নিপতিত হয়ে তাঁকে অমরধামে প্রেরণ করলো। বঙ্গের গৌরবরবি কায়স্থকুলভূষণ বীরশ্রেষ্ঠ উদয়াদিত্য যৌবনের প্রারম্ভে যেরূপ শৌর্য প্রদর্শন করেছেন, তাহা বীর-ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নয়।

সেনাপতি সূর্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের পতনে বীরগণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। মহাবীর রডা সৈন্যগণকে বিমোহিত ও বিশৃংখল দেখে ফিরিঙ্গি সৈন্যগণকে আহ্বান করে বললেন,—ভ্রাতৃগণ, আমার জননী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ ও অনন্ত বারিধিবারি অতিক্রম করে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনতায় পরম সুখে বাস করছি। মহারাজার স্নেহ ব্যবহারে আমরা জন্মভূমি-বিয়োগজনিত দুঃখও অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হয়েছি। ইনি আমাদিগের সুখের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে থাকেন। ইনি আমাদিগের ধর্ম-উপাসনার জন্য গির্জা নির্মাণ করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে এজন্য ঋণগ্রস্ত। এখন আমাদের সেই পূর্বঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়েছে। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে আমাদের উন্নতি ও অবনতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতএব ভ্রাতৃগণ, আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। এ যুদ্ধে বিজয়লাভ করতে পারলে এদেশে আমাদিগের অক্ষয়-কীর্তি চিরস্থাপিত হবে।

মহাবীর রডা সৈন্যগণকে এইরূপে প্রোৎসাহিত করে সিংহবিক্রমে মোগলগণকে আক্রমণ করলেন। ফিরিঙ্গী সৈন্যগণ বঙ্গদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলদের বিনাশার্থে মত্ত হয়ে উঠলো।

বিধাতা যখন প্রতিকূল হন তখন সকল উপায়ই বিফল হয়। আবার যখন অনুকূল হন তখন বিপদও সম্পদে পরিণত হয়। বিধাতা, সারমেয়-বৃত্তিপ্রিয় স্বজাতিদ্রোহী বঙ্গীয়গণের অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঙালীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে উদারধী ইউরোপীয় বীরগণও যথেষ্ট চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারলেন না। মহাবীর রডা অসাধারণ শূরতাসহকারে যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুহস্তে নিহত হলেন। বঙ্গীয় ও ফিরিঙ্গী সৈন্যগণ উপর্যুপরি সেনাপতিগণকে নিহত হতে দেখে অবসাদে বিশৃংখল হয়ে পড়লো। স্বজাতিদ্রোহী বিজয়গর্বিত মানসিংহের সৈন্যগণ ঘোরতর-বিক্রমে বঙ্গীয় বীরগণকে আক্রমণ করলো।

এইরূপে বঙ্গীয় সৈন্যের সহিত মোগলসৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হতে লাগলো। কোন পক্ষই বিজয়লাভে সমর্থ হল না। উভয়পক্ষই বিজয়লাভের আশায় অধিকতর পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহ যশোহরদুর্গ অবরোধ করলে অবরুদ্ধ নগরমধ্যে ধীরে ধীরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। প্রতাপাদিত্যের কতিপয় আত্মীয়, বঙ্গীয় সেনানিগণের নিধনে ভয়বিহ্বল হয়ে কোনরূপে প্রাণরক্ষার জন্য গোপনে মানসিংহের সঙ্গে মিলিত হলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সকল স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, নরপিশাচ বাঙালীদের কাছে মানসিংহ যশোহরদুর্গের সকল গোপন তথ্য অবগত হয়ে, দুর্গ হস্তগত করতে ঘোরতর বিক্রমে প্রতাপকে আক্রমণ করলেন। এরূপ সংকটকালে প্রতাপ যশোহরদুর্গে অবস্থান শ্রেয়স্কর নয় বিবেচনা করে ধূমঘাটদুর্গে গমন করলেন।

প্রতাপাদিত্য ধূমঘাটদুর্গে গমন করলেও যশোহরদুর্গ হস্তগত করতে মানসিংহকে বড় সামান্য ক্লেশ ভোগ করতে হল না। প্রতিপদে বঙ্গীয় সেনানিগণ অসাধারণ শূরতা ও বীরতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মানসিংহের বিস্ময় উৎপাদন করতে লাগলেন।

বাঙালী জাতির দুরদৃষ্টক্রমে বাঙালীর সমস্ত বীরত্ব, অধ্যবসায় ধূলোয় মিলিত হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতক বাঙালিগণ মানসিংহকে প্রতাপের দুর্গের দুর্বল স্থান নির্দেশ করে আক্রমণ করতে পরামর্শ দিলো।

মানসিংহ মোগলবাহিনীর সাহায্যে যশোহরদুর্গ আক্রমণ এবং লোমহর্ষণ ভয়ংকর যুদ্ধ করে দুর্গ হস্তগত করলেন।

যশোহর হস্তগত হওয়ার পরে এই লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিরাম-বাসনায় সন্ধির প্রস্তাবসহ প্রতাপাদিত্যের নিকটে একজন দূতকে প্রেরণ করলেন।

অপমান বোধ করলেন প্রতাপ। আত্মসমর্পণ, যুদ্ধবিরতি শব্দগুলি প্রতাপের অভিধানে নেই। মানসিংহের সন্ধি-প্রস্তাব পরম অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁকে মানসিংহের সহিত সন্ধি করবার জন্য পরামর্শ প্রদান করলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতাপ তাঁদের উপদেশ শ্রবণের পরে বললেন,—আমার আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশীয়গণ পরাধীন হওয়ার জন্য অম্লানবদনে শত্রুপাদুকা মস্তকে বহন করে যখন আমাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য নিরতিশয় যত্নবান, তখনই আমি অনুমান করেছি, আমাদের জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হওয়া সুকঠিন। যখন আমার সামান্য পরাজয়ে বঙ্গীয় জনসাধারণ স্বর্গাদপি প্রিয়তর স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করে শত্রু-পক্ষের সংগে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছে তখনই ধারণা করেছি যে. আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনামাত্র। এরূপ অবস্থায় যদি আমি বুঝিতাম যে, বর্তমানকালে সন্ধিস্থাপন করলে আবার সুযোগক্রমে অধিকতর পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করলে এই পতিত দেশের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হতে পারে তাহা হলে তাহাই বিবেচ্য বিষয় হত। কিন্তু যিনি বাঙালীচরিত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছেন তিনি কখনই এরূপ আশা পোষণ করতে পারবেন না। সত্য বটে, সকল দেশেই স্বদেশদ্রোহী নরপিশাচ জন্মগ্রহণ করে থাকে, কিন্তু তারা এমন কী তাদের বংশধরগণও অন্যান্য দেশে বিশেষ ঘৃণার সংগে দর্শিত হতে থাকে কিন্তু এই হতভাগা দেশে তার বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। তাই বলি, যখন আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা ঘোরতর তমসাবৃত তখন যে সকল যুদ্ধ সহচর বন্ধুগণ সংগ্রামক্ষেত্রে নিপাতিত হয়েছেন, তাঁদের পরিত্যাগ করে আমি জীবনধারণ করতে কখনই সম্মত নহি। অতএব এরূপ অবস্থায় বীরের ন্যায় জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য অসিহস্তে সংগ্রামস্থলে নিহত হওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করি।

দৈব-বিড়ম্বিত প্রতাপাদিত্য ভগ্নহৃদয়ে এই উক্তি করলে আর কেহই তাঁর সমীপে সন্ধির প্রস্তাব করতে সাহসী হলেন না। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে স্বাধীনতারক্ষার শেষ চেষ্টায় উদ্যোগী হলেন। মৃতকল্প কী জীবনের আশা ত্যাগ করতে পারে?

[ক্রমশ।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির লোকান্তর

ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৩ ১৯-এ বৈশাখ অকস্মাৎ দেহান্তরিত হইলেন। ভারতবর্ষে এই প্রথম একজন কার্যরত রাষ্ট্রপতির দেহান্তর ঘটিল। জীবনের বাহাত্তর বৎসর পূর্ণ করিয়াও তিনি যথেষ্ট পরিমাণেই সুস্থ ও সক্ষম ছিলেন এবং পরিপূর্ণরূপেই কর্মের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বয়সের বিচারে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইলেও তাঁহার জীবন-নাটক যে একেবারে যবনিকার সম্মুখীন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে দেশবাসী বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্যই এই মৃত্যু আকস্মিক মৃত্যু বলিয়াই সাধারণো গৃহীত।

স্বাধীন ভারতবর্ষ তিনজনকে রাষ্ট্রপতিরূপে লাভ করিয়াছে। তাঁহার পূর্বসূরী দুই জনই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গুণাবলীর জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তীজন তো রাজনীতিক অপেক্ষা দার্শনিক সুধী হিসাবেই শুধ ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীর বুধমণ্ডলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত আদৃত। এইভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের যে ঐতিহ্য ও গরিমা সৃষ্টি হইয়াছিল ডঃ হোসেন তাহা অক্ষুণ রাখিয়াছিলেন। বরং সেই ঐতিহ্যের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির দিকেও তাঁহার মনোযোগের অন্ত ছিল না। ভারতের রাষ্ট্রপতিগণের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা স্বল্পকাল ঐ আসনে সমাসীন ছিলেন। এই আসন গ্রহণের পর পুরা দুইটি বৎসর পূর্ণ হওয়ার ঠিক প্রাক্কালেই নিয়তি তাঁহাকে পার্থিব রঙ্গমঞ্চ হইতে সরাইয়া দিল। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই ভারতের ন্যায় পৃথিবীর একটি প্রধানতম শক্তি এবং সুপ্রাচীনকালের এক বিরাট

ডঃ জাকির হোসেন

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি এই মহাদেশসদৃশ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পরিমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা শীর্ষস্থানটির অধিকারী হইয়া তিনি যেভাবে এই আসনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। এই অল্পপরিসর সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি একাধারে দরদ ও সহানুভূতিশীল মন আবার অন্যদিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্য ও দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত মনোভাব এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান পুরুষ হিসাবে দেশের বাহিরে নানাস্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়া সর্বত্রই এক গভীর প্রভাব বিস্তারে এবং সমাদর ও শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হইয়া শুধ নিজের বৈশিষ্ট্য এবং শক্তিরই পরিচয় দেন নাই, সারা ভারতবর্ষেরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হইলেও শুধু রাজনৈতিক জগতই তাঁহার জীবন প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম নয়। দেশের শিক্ষা-জগতের মাধ্যমেও তাঁহার প্রতিভা ইতঃপূর্বে বহুল পরিমাণে স্ফুরিত হইয়াছে। রাজনৈতিক জীবনে দপার্পণের পরও যথেষ্ট কর্মদায়িত্ব পালনের মধ্যেও পাঠস্পৃহা ও অধ্যয়নতৃষ্ণা তাঁহার তিলমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই জ্ঞানতৃষ্ণাকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের আয়ুবশাহী সরকার পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু অসহায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে জঘন্য, নারকীয়, বীভৎস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড অবাধে চালাইয়া সমগ্র সভ্য-জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল সেই সময় সেই চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডঃ হোসেন যে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া নিরপেক্ষ এবং ধর্ম, ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতবাসীর স্মৃতিতে চিরজাগরূক থাকিবে।

আমরা স্বর্গত রাষ্ট্রপতির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

বীভৎস পাশবলীলার এক সাম্প্রতিক নিদর্শন

প্রগতির পরিপূর্ণ জয়যাত্রার দিনেও, সভ্যতার ব্যাপক অগ্রগতির মুহূর্তেও, মানুষের সেই আদিম, হিংস্র, বর্বর প্রবৃত্তির আজও যে অবলুপ্তি ঘটে নাই, গত ৬ই এপ্রিল রবীন্দ্র-সরোবরের নারকীয় ভয়াবহ লোমহর্ষক ঘটনাটির ভিতর দিয়া সেই কথাটিই প্রমাণিত হইল। সেদিন এই গভীর সত্যটিই যেন এই ঘোর কালিমার মাধ্যমেই আলোকিত হইয়া উঠিল যে যদিচ বহু শতাব্দীর সেতু অতিক্রম করিয়া সময়ের ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে, যুগের অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হইতে হইতে আমরা যাবতীয় অন্ধতা তমসার অন্ধ রজনী অতিক্রম করিয়া আলোকের সংক্রান্তির প্রসন্ন প্রভাতের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম, তথাপি সেই আদিম পাশব প্রবৃত্তির বীজ এখনও মানুষের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয় নাই, তাহার প্রভাব হইতে অধুনাকালীন মানবও এখনও মুক্তিস্নান করিতে পারিল না, সময়ে অসময়ে সেই প্রবৃত্তি এখনও মানুষের মনে দানা বাঁধিয়া উঠিয়া আপনার প্রকাশ ঘটায়।

রবীন্দ্র-সরোবরে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল তদপেক্ষা জঘন্য, নীচ, কলঙ্কময় আর কোন নজীর সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও নেত্রপথে আবির্ভূত হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এ-ধারণা আমাদের অমূলক নয়।

নৃত্য-গীত-কাব্য-শিল্প-অভিনয়ের লীলাভূমি এই মহানগরী কলিকাতা। শুধু ললিতকলার ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে অগ্রণী এই মহানগরী কলিকাতা সভ্যতার এক ব্যাপক অগ্রসরণের একটি অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য হিসাবে সারা জগতের স্বীকৃতিতে ভরপুর। এই কলিকাতার একটি অভিজাত অংশে ললিতকলার অনুশীলনের মধ্যে যে ভয়াবহ সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। নাচ-গান-বাজনা যে এই মর্মান্তিক পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে, এ ধারণা কতজনের ছিল তাহা আমরা জানি না।

নাচ-গানকে উপলক্ষ করিয়া সেদিন কলিকাতায় নারীর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, মনের আনন্দে, পরম উল্লাসে একদল নরপশু, আমাদের মাতৃবৃন্দের, কন্যাবৃন্দের, ভগ্নীবৃন্দের, কুললক্ষ্মী-দের চরম সম্মান ভূলুণ্ঠিত করিল, ন্যক্কারজনক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা একটি চৈত্র-সন্ধ্যাকে চিরকালের জন্য মসীলিপ্ত করিয়া দিয়া সভ্যতার সুডৌল অঙ্গে এক গভীর কুৎসিত ক্ষত সৃষ্টি করিল।

এই ঘটনা হইতে তাহা হইলে আজ আমাদের এই পাঠই কি গ্রহণ করিতে হইবে যে, একটি সভ্যদেশে গৃহের বাহিরে নারীর কোন নিরাপত্তা নাই, শুধু অলঙ্কার দিয়াই নয়, শরীর --সর্বাসর্বস্ব দিয়া লোভী দানবের কামনাগ্নি নির্বাপিত করিতে হইবে, মহিলার চরম অসম্মান করিয়াও দুষ্কৃতকারীরা অম্লানবদনে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া মাথা উঁচু করিয়া আমাদেরই সঙ্গে ঘোরাফেরা করিতে পারে?

এই নারকীয় ঘটনা সমগ্র সভ্য জগতকেই স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অন্যতম সমর্থক 'ব্লিৎজ' পত্রিকাও এই ঘটনা সম্পর্কে লেখনী ধারণ করিয়াছেন এবং একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষায়—

STRIPPED NAKED

Scores of women, mostly young and from good families became victims of the worst types of goondas who were apparently mobilized from different places with motives yet to be ascertained. Many of these women were stripped on the streets, molested and even raped. Calcutta has never seen such lawlessness... A lawyer who was an eye-witness told Blitz that not even a victorious medieval army could have been as brutal with the vanquished as the goondas were that night. He said his car was burnt to ashes because he switched on the headlights when a goonda was raping a young girl on the road... Chased by mad sex maniacs, the women jumped into the nearby lakes and their bodies were recovered next day. Some police officers testified that they rescued a few stark naked young girls running for their lives.

এই কথাগুলিরই ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম সমর্থক "যুগবাণী" বলিতেছেন—

---একজন আইনজীবী, যিনি ছিলেন সেদিনের ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী, 'ব্লিৎস' পত্রিকাকে তিনি বলিয়াছেন যে, মধ্যযুগের বিজয়ী সেনাদল পশুর মত পরাজিত দেশের নারীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত কিন্তু কলিকাতায় সেদিন রাত্রে গুণ্ডাবাহিনী নারীদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারে পশুকে তাহাদেরও বহু গুণ ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক আরও বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গাড়ির হেড লাইট জ্বালার ফলে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, পথের উপর একটি গুণ্ডা একটি তরুণী মেয়েকে ধর্ষণ করিতেছে। চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বলিয়া উঠায় গুণ্ডারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে ও ভদ্রলোকের গাড়ীখানিকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া গুণ্ডারা তাহাদের নারকীয় রাজত্ব চালায় আর পুলিশ

কয়েক রাউণ্ড টিয়ারগ্যাস চালাইয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করে। কামোন্মত্ত গুণ্ডাদের দ্বারা তাড়িত হইয়া মহিলারা লেকের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল—পরদিন তাহাদের মৃতদেহ সেখান হইতে উদ্ধার করা হয়। কয়েকজন পুলিশ অফিসার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কিছু তরুণীকে প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করিতে দেখিয়া সেই অবস্থায় তাহাদের উদ্ধার করেন---।

যুগবাণী আরও বলেন, কলকাতা শহরের বুকে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, যেখানে কারও কারও মতে অন্ততপক্ষে ৫00 মহিলার ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে, ন্যূনপক্ষে ১00 জন মেয়েকে নগ্নাবস্থায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখা গেছে এবং তার মধ্যে কমপক্ষে ৫0 জন মেয়ে গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে, গাড়ী করে বহু মেয়ে অপহৃত হয়েছে —আশ্চর্যের বিষয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ-সম্পর্কে আজকের লেখার সময় পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নি। এই ঘটনা যখন ঘটল তখন সেই লজ্জায় বর্তমান সরকারের পদত্যাগ করা উচিত ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল কঠোর হস্তে অপরাধীদের শাস্তিবিধান সম্পর্কে ঘোষণা করার। অজয় মুখার্জী শ্রীমান, নারীর সম্মান রক্ষা করাতে অসমর্থ, দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি-বিধানে অশক্ত, নারকীয় বীভৎসতার একজন মৌন সাক্ষী ও সমর্থক---।

গত ৮ই এপ্রিলের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাতেও দেখা যায় লেখা হইয়াছে—

Mr. Sen said that sunday's incident was one of the worst the city had witnessed so far.

কলিকাতার আরক্ষা বাহিনীর প্রধান শ্রীপ্রণবকুমার সেনের মনোভাব এই কথাটির মধ্যেই পরিস্ফুট।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে একটানা নীরবতার পর অবশেষে সরকার তদন্ত কমিশন বসাইয়াছেন। বিচারপতি শ্রীশম্ভুচন্দ্র ঘোষকে লইয়া গঠিত এই তদন্ত কমিশনের দিকে আজ সারা বাঙলার তথা সমগ্র সভ্যতার উপাসকমণ্ডলীর দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। প্রকৃত অপরাধী অন্বেষণ করিয়া তাহার যথাযথ শাস্তি বিধানে এবং নারীর সম্মান রক্ষার সরকার যদি আজ অপারগ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের হাতে এই বিরাট রাজ্যটির ভবিষ্যতে আরও কত সর্বনাশ যে নৈমিত্তিকভাবে ঘটিতে থাকিবে তাহা ভাবিলে কোন সীমা-পরিসীমা পাওয়া যায় না।

কাশীপুরের হত্যাকাণ্ড

সম্প্রতি যে ক'টি ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি-মূল নাড়াইয়া দিয়াছে, কাশীপুর গান শেল ফ্যাক্টরীতে কয়েকজন শ্রমিকের হত্যাকাণ্ড তন্মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

পৃথিবী বৈচিত্র্যের লীলাভূমি, এবং মানবজীবনেও দেখা যায় সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি সমানভাবে তালে পা ফেলিয়া চলিতেছে এবং এইভাবে জীবনকে একটি পরিপূর্ণ অর্থে ভাস্বর করিতেছে। প্রাকৃতিক বন্যা, বিপর্যয়, ক্ষয়ক্ষতি তাই যতই হৃদয়বিদারক বা মর্মস্পর্শী হউক, মহাকালের বিধি-লিপি অনুসরণ করিয়া সেগুলি আমা-দের স্বাভাবিক বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু যেখানে মনুষ্য-ইচ্ছায় এই জাতীয় বর্বর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহার শোক বা তজ্জনিত বেদনা আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রশমিত হয় না।

সেদিনকার সেই স্নিগ্ধ সকালবেলায় উজ্জ্বল সূর্যালোকদীপ্ত প্রসন্ন প্রভাত যে কটি তাজা সতেজ জীবনের সকল আশা নিরাশায় স্বল্প-বেদনার একটি ফুৎকারে সমাপ্তি ঘটাইয়া দিল, তাহা কি স্বাভাবিক বা মহাকালের বিধান-সম্মত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়? মানুষ মরণশীল জীবনের কখন কোন পর্বে, কোন অধ্যায়ে, কোন বসন্তে গ্রীষ্মে বর্ষায়, কোন প্রভাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে মৃত্যুর কখনো অতর্কিতে, কখনো জাঁকজমক সহকারে ভেরী বাজাইয়া আবির্ভাব ঘটিবে, তাহার সঠিক প্রগতি জানা না থাকিলেও তাহার আবির্ভাব সুনিশ্চিত, তথাপি মৃত্যুকে আমরা পরম সমাদরে বাহু প্রসারিত করিয়া স্বাগত জানাইতে পারি না। মৃত্যুর পদধ্বনি ভীতির এবং বেদনারই সঞ্চার করিয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়মসম্মত।

সেদিন ক্ষণিকের উত্তেজনায় যে সর্বনাশা নাটকের অভিনয় কাশীপুরে ঘটিয়া গেল, তাহার ফলে যে কটি অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হইল, তাহার জন্য পরে তাহাদের পরিবারবর্গকে কিছু ক্ষতিপূরণ হয়তো দেওয়া হইবে। হয়তো কিছু মামুলী শোক-দুঃখসূচক প্রস্তাব এ প্রসঙ্গে গৃহীত হইবে: কিন্তু ইহা কি সত্যই যথার্থ ক্ষতিপূরণ। পিতা-মাতার শূন্য কোল, ঘরণীর সীমন্ত হইতে মুছিয়া যাওয়া সিঁদূর, সন্তানের অপূরণীয় ক্ষতি ইহার দ্বারা কি কদাচ পূরণ হইতে পারে?

সুতরাং সকল দিক বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে অনায়াসে এবং নির্দ্বিধায় উপনীত হওয়া যায় যে, এই মৃত্যু অতীব বেদনাদায়ক এবং সকরুণ।

এখন, কেন এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল, সে সম্বন্ধেও সম্যক অনুসন্ধান প্রয়োজন; হঠাৎ কোথাও কিছু নাই, এমন কি ঘটিল যাহাতে এত বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইলেন, কি অবস্থার উদ্ভব হইল যাহার ফলে অবাধে গুলী চালাবার আদেশ দেওয়া ছাড়া তাঁহারা

দ্বিতীয় কোন পথ চোখের সামনে অবলম্বনের জন্য পাইলেন না।

যে-কোন কর্মক্ষেত্রে, আফিস আদালতই হোক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অথবা প্রমোদকেন্দ্রই হোক বা কলকারখানাই হোক কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে—সেই নিয়ম কর্মিবৃন্দকে মানিয়া চলিতে হয়, এই নিয়মগুলির নিকট তাঁহাদের বাধ্যতা অনস্বীকার্য; অবশ্য নিয়মগুলি যুক্তিসঙ্গত বা ঔচিত্য অনুযায়ী পালনীয় না হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে আইনসম্মতভাবে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার শ্রমিকবৃন্দের নিশ্চয়ই আছে। এবং এই প্রতিবাদ জানানোরও একটি আইনসম্মত পন্থা আছে এবং সেই প্রতিবাদ জানানোর শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও অবিসম্বাদিত।

সেদিন শ্রমিকদের পক্ষ হইতেও কোনপ্রকার আইনশৃঙ্খলা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভঙ্গ হইয়াছিল কিনা, সে সম্বন্ধেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সম্যক বিচার দরকার। এ প্রসঙ্গে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বনের পূর্বে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করিয়া ইহার আসল কারণটি জান এবং সর্বসাধারণকে জানানো দরকার। প্রকৃতপক্ষে কাহার আদেশে এই চরম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল সে সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য উদঘাটন প্রয়োজন।

যে প্রতিষ্ঠানে ভারতরক্ষার আয়ুধ নির্মিত হইতেছে, সেই আয়ুধের দ্বারাই তাহারই নির্মাতাদের কয়েকজনকে হত্যা করা হইল, এ ঘটনা যেমনই মর্মঘাতী তেমনই কলঙ্কজনক—তাই সমগ্র ঘটনার প্রতি যথাযথ আলোকপাত দেশবাসী হিসাবে আমাদের বিশেষ ভাবে কাম্য।

জ্যোতি বসুর নির্দেশ

"যুক্তফ্রণ্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ৩১শে মার্চ মহাকরণে রাজ্যের পদস্থ পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্মকে পুনর্বিন্যাস করা হবে এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। নয়া সংশোধনবাদী নেতা গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকে কি কি কাজ পেতে চান, তা বৈঠকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে রাজ্যের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের ওপর কঠোরভাবে গোয়েন্দা পুলিশদের নজর রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

নয়া কংগ্রেসীদের কাজের ধরণ কংগ্রেসীদের চাইতে কিছুটা পৃথক। কংগ্রেসীরা যে জিনিষ স্থূলভাবে করত, এঁরা সেটা কৌশলী কায়দায় করতে চান। কারণ এঁরা জানেন কংগ্রেসীদের ওই পুরাতন কায়দার সঙ্গে জনসাধারণ পরিচিত। তাই কংগ্রেসী-পদ্ধতি গ্রহণ করলে লোকে সরাসরি তাঁদের অভিপ্রায় বুঝে ফেলবে। কংগ্রেসীরা বিপ্লবীদের ওপর গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখা সঠিক কাজ বলে মনে করত। কিন্তু নয়া সংশোধনবাদীদের 'সংগ্রামের হাতিয়ার' যুক্তফ্রণ্ট সরকার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মেনে নেওয়ার ভঙ্গী গ্রহণ করে চলতে চায়। তাই উপমুখ্যমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়ে গোয়েন্দা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন—নাশকতার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে 'উগ্রপন্থীদের' (বিপ্লবীদের ওঁরা আখ্যা দিয়ে থাকেন) বিরুদ্ধে কঠোর প্রহরা রাখতে হবে। অর্থাৎ নয়া সংশোধনবাদী ধূর্ত নেতা চান গোয়েন্দা পুলিশ যেন কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের দরুণ না ধ'রে 'নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থাকা'র অভিযোগে আটক করে। কারণ, তাঁরা চান না রাজনৈতিক কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করা হোক।"

—দেশব্রতী হইতে সংকলিত।

শোক-সংবাদ

বিমলাচরণ লাহা

প্রথিতযশা পুরাবিদ মনীষী ডঃ বিমলাচরণ লাহা গত ২০-এ বৈশাখ ৭৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন, ইনি কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের এক মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। ১৯১৬ সালে পালিতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯২৪ সালে ডক্টরেট অর্জন করেন। আইন পরীক্ষায়ও ইনি সফলকাম হন। বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, আইন, প্রাচীন শ্লোকসমূহ, ইতিহাস, ভূগোল, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি পণ্ডিতসমাজে সসম্মানে স্বীকৃত। 'বেঙ্গল-পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট'-এর ভূতপূর্ব সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি এবং মহানগরীর ভূতপূর্ব শেরিফ ডঃ লাহা রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সম্মানাত্মক সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত সদস্য, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স, বঙ্গীয় ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদদ্বয়, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁর লোকান্তর বাঙলার সংস্কৃতিজগতের এক পুরোধার আসন শূন্য করে দিল।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

সূচীপত্র

বৈপ্লবিক মতামত

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

নিতান্ত শিশুকাল থেকে আমি মাসিক বসুমতীর একজন দর্শক। মাঝে মাঝে পাঠকের ভূমিকা নিয়ে থাকি। বছর সুরুর সংখ্যায় সমাজের 'চরিত্র-দ্রষ্টার' একখানা উল্লেখজনক ছবি দিয়ে প্রচ্ছদপটকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন—এজন্য ধন্যবাদ। এর সঙ্গে প্রচ্ছদ-পরিচিতিতে যদি সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতক চক্র মার্কস্‌বাদকে কবরে পুরে দিয়ে মার্কসের মূর্তিপূজা কিভাবে করছে তা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরতেন, তাহলে শোষিত সমাজের কাছে একটা অনবদ্য অবদান হয়ে থাকত। আপনাদের সংকলিত 'সুরের পরিবর্তন' ও 'মুখ্যমন্ত্রিত্বের আব্দার' বেশ অকর্ষণীয় হয়েছে।

এই সংখ্যাটি বেশ ভালো করেই দেখেছি। এটা প্রাচীন সনাতনী পরিবেশন কায়দার সঙ্গে প্রগতিমূলক সাধারণ সাহিত্য জগতে একটা চমৎকার 'পাঞ্চ ঘটানোর' নজীর। ফিচারগুলোর ভেতর সংবাদ সাহিত্যের ক্ষুধা খানিকটা মেটে। আলোকচিত্রের ফিচারে বেলেল্লাপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বসুমতী তার ট্র্যাডিশনকে রেখে চলতে পারছে দেখে খুশী না হয়ে পারা গেল না।

সমাজ এখন গুণগত পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে নিদারুণ ছটফট করছে। তার মধ্যে তাঁবেদার সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধকার, এবং গবেষণাকারীরা আফিঙের রস ঢেলে ঝিমিয়ে ফেলে রাখতে চাইছেন। আপনার এই সংখ্যায় সেই আফিঙের গন্ধ না পেলেও 'যুগের চাওয়া' পূরণ করার উপযোগী মশলার পরিমাণ খুব উল্লেখজনক নয়। প্রবন্ধ, কবিতা, সংগ্রহ, জীবনকথা, গীতিকাব্য, আলোচনা, গল্প, বড় গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ফিচার, সবের মধ্যেই সমাজ কাঠামোর মধ্যেকার বিভিন্ন দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দেখার আশা মেটেনি। গ্রাম ও জনপদের পরিচয়ের সঙ্গে সেখানকার সমাজ চরিত্রের একটা ছবি আজকের মানুষ পেতে চায়। একটু নজর দিলে বসুমতী অবহেলিত সমাজের কাছে বন্ধু হিসেবে আসন করে নিতে পারবে।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে 'ইয়াংকি' শৃঙখলে বাঁধার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধেও একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আশা করছি। মোদ্দা কথায় অধিকাংশ রচনা মনোজ্ঞ হয়েছে। ধারাবাহিক উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলা মুসকিল। প্রতিপাদ্য বিষয় শেষ অধ্যায়ে না এলে বোঝা যায় না। ছোট গল্প আর কিছু দিলে পাঠকেরা অখুশী হবেন না, কবিতাগুলি ভালো।

পুরনো যুগের ক্লাবগুলো সম্পর্কে, খেলোয়াড়দের সম্পর্কে, মঞ্চ ও আসরের অভিনেতা অভিনেতৃদের সম্পর্কে, চিত্র-গীত-নৃত্য শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁদের আবির্ভাব ও বিকাশের বিবরণ গল্পচ্ছলে জানবার আগ্রহ পাঠকদের মধ্যে রয়েছে—সেটা আপনার মুন্সিয়ানার ভেতর দিয়ে বেরুলে নিশ্চয়ই গোলা মাল হবে না।

মাত্র দেড় টাকা দক্ষিণায় এত রকমারী বিষয়ের সন্নিবেশ করে প্রতি মাসে যথাসময়ে কি করে বাজারে হাজির করছেন তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ঠুনকো মালের ফেরিওয়ালা নয় বলে মাসিক বসুমতীর যে কদর বাজারে রয়েছে তার যথার্থতা বৈশাখের সংখ্যাটি আরেকবার রেখেছে, সত্যিই অমূল্যধন জলের দরে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরই বিকিয়ে দেবার এখনও একমাত্র অধিকারী।

—সত্যানন্দ ভট্টাচার্য, কলি—৩।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● এম ব্যানার্জী, ৩৬ রায়পুর রোড, দেরাদুন ইউ পি • লাবণ্যপ্রভা মল্লিক 'কনকরেখা' 7/1, Christian Pathways, ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা-৮ ● এ মুখার্জী, 'মুখার্জী লজ' পানবাজার, গৌহাটি—১ আসাম • ডঃ আর কে রায় মেডিক্যাল অফিসার, জেলা—হাসপাতাল, বালিয়া, ইউ পি। ● রমা গোস্বামী, 'ধুরিয়াওয়ালীকুঞ্জ' বৃন্দাবন, মথুরা ● শ্রীতাপসকুমার পাত্র, গ্রাম—খালোর, ডাক—বাগনান, জেলা—হাওড়া ● শ্রীনারায়ণ রাও আপ্তে, কোরগাঁ, জেলা— সাতারা, বোম্বাই। ● বি বি চৌধুরী, ম্যানেজার, মাণিকনগর টি ই ডাক—মাণিকনগর, কাছাড়, আসাম ● প্রধান শিক্ষক, ভারা উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক—ভারা, জেলা—বাঁকুড়া। ● সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ, সি ডি বুক—অফিস, মধুবন, গুলওয়ারা—মধুবন চম্পারণ, উত্তর বিহার, ● তারিণীপ্রসাদ দাসমহাপাত্র, গ্রাম— মাইতানা, ডাক—বাতালা, মেদিনীপুর।

I am sending herewith Rs. 10/- (Rupees ten only) being the half-yearly subscription from Falgoon 1375 to Sravan 1376 B.S. Please accept and send the magazine regularly.—Secretary, Malatipur Sarat Ch. Bani Mandir Rural Library, P. O. Malatipur, Dt. Malda.

I am sending herewith Rs. 9/- (Rupees nine only) being the half-yearly subscription of the Monthly Basumati with effect from the month of Baisakh 1376 B.S.—Dr. K. L. Mookherji, 2/4, A. K. Mukherji Road, P. O. Sinthi. Cal-50.

॥ [illegible] ॥ রহস্যসন্ধানী [illegible] ঘনশ্যাম ৪·০০ গোলকধাঁধায় [illegible] ঘনশ্যাম ৪·০০
॥ অজিতাভ চৌধুরী ॥ যবনিকা কম্পমান ৪·০০ অচেনা শহর কলকাতা ৩·০০
॥ অজিত চট্টোপাধ্যায় ॥ নীল দরিয়ায় ৬·০০
॥ অজাত শত্রু ॥ পাপ ৪·৫০
॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ রাগশর ৬·৫০, চলো জঙ্গলে যাই ৫·০০
॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ জীবন-স্বাদ ৪·৫০ দুই মেরু ৩·৫০
॥ কণিষ্ক ॥ ফেরারী সিপাই ৭·০০
॥ কৃত্তিবাস ওঝা ॥ নকসালবাড়ি ও রাজনৈতিক আবর্ত ৫·৫০
॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ নীলকণ্ঠ ৭·৫০
॥ জরাসন্ধ ॥ একুশ বছর ৫·০৫

॥ [illegible] সেন ॥ [illegible] অন্তরালে ৫·৫০ [illegible] ৪·০০
॥ জসীমউদ্দিন ॥ ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ৪·০০
॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কান্না ৭·০০ জঙ্গলগড় ৪·০০, বসন্তরাগ ৩·০০, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ১০·০০
১০·০০
॥ দিলীপ মালাকার ॥ মস্কো থেকে মাদ্রিদ ৫·৫০
॥ দীপঙ্কর ॥ বৈমানিকের ডায়েরী ৪·৫০
॥ দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ বিবাহ-প্রবেশিকা যৌনবিজ্ঞান ১২·০০
॥ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ॥ নেতাজী সংগ ও প্রসংগ ১ম খণ্ড ১২·৫০ ২য় খণ্ড ৬·০০ ৩য় খণ্ড ৭·০০

॥ নমিতা চক্রবর্তী ॥ দ্বিতীয় বর্ষণ ৩·৫০
॥ নারায়ণ গংগোপাধ্যায় ॥ তিন প্রহর ৩·৫০ বনবাংলো ৪·০০ চিত্ররেখা ৩·৫০
॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ অগ্নিস্বাক্ষর ৭·০০ লিপিকা ৫·৫০ রহস্যভেদী কিরীটি ১০·০০
॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ পরম্পরা ৪·৫০ মুগ্ধ প্রহর ৩·৫০
॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ সমাজ-সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার ৭·০০
॥ নিমাই ভট্টাচার্য ॥ ভি আই পি ৩·৫০
॥ নির্মল গংগোপাধ্যায় ॥ ভারত-পথিক ১ম মহারাষ্ট্র পর্ব ৭·০০ ২য় খণ্ড মধ্য-ভারত পর্ব ৮,০০
॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ বসন্তবাহার ৪·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

সূর্য কাঁদলে সোনা

মধ্যযুগের নতুন আবিষ্কার-গুলির মধ্যে রহস্য বিস্ময়ে রূপকথাকেও হার মানিয়েছে উত্তুংগ পার্বত্য মালভূমির বিচিত্র এক রাজ্য, বর্তমান কালে পেরু যার নাম। এই পেরু-বিজয়ের প্রায়-অবিশ্বাস্য ইতিহাসকে আশ্রয় করে ত্রিভুবন-বিমোহন শ্রীঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদার রসাল রঙিন উধাও কল্পনা এমন এক পরমাশ্চর্য মহাগদ্যগাথা রচনা করেছে—**শুধু বাংলায় কেন, বিশ্বসাহিত্যেও যা তুলনারহিত।**

ইতিহাসের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায় সাতরঙা কাহিনীর মহোৎসব হয়ে উঠেছে। সামনের থেকে পেছনের মলাট পর্যন্ত এক অফুরন্ত আহার-নিদ্রা ভোলানো আনন্দভোজ। ১৫·০০

রাজনৈতিক উপন্যাস। একালের কথা—তবু এ উপন্যাস ঐতিহাসিকও বটে। এক-ভারতবর্ষ এবং এক-বাংলা কলমের খোঁচায় দুটো দেশ হয়ে গেল, তারই তাজ্জব কাহিনী। দুই বাংলার বর্ডার-লাইনের দুই দিকে রাকে পারাপারের জন্য যাত্রীর সব জমায়েত হয়েছেন। পরিবেশ : ১৯৬৬-এর খাদ্য-আন্দোলন এবং নৃশংস নর-মৃগয়া। তুলনায় আসছে নানা দেশের জ্বলন্ত বিপ্লব-কথা। মাতৃভাষা মুখ থেকে কেড়ে নেবার চক্রান্ত—পূর্ববাংলায় এবং ভারতের শিলচরে বঙ্গভাষার জন্য প্রাণদান। ভ্রান্ত নেতৃত্ব, ভণ্ড নেতৃত্ব, লোভী নেতৃত্ব বাংলাকে সর্বনাশের প্রান্তে এনে দাঁড় করাল। অপরাধী যত মান্যগণ্যই হোন, লেখনী কাউকে রেহাই দেয় নি। দুই বঙ্গের গভীর সৌহার্দ্য—পথ আমাদের কে রুখবে? ১২·০০

মনোজ বসুর

॥ বনফুল ॥ তিন কাহিনী ৬·০০ ছিট মহল ৪·০০
॥ বিভূপদ কীর্তি ॥ আমাদের কালীদা ও তপোবন কথামৃত ৫·০০
॥ বরুণ রায় ॥ ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে ৮·০০
॥ বুদ্ধদেব গুহ ॥ বনবাসর ৪·৫০, দূরের দুপুর ৪·৫০
॥ বিমল কর ॥ মধ্য দিন ৩·৫০, আকাশকুসুম ৯·০০
॥ বিকর্ণ ॥ দণ্ডকশবরী ৯·০০ নীলিমায় নীল ৫·০০ পথের মহাপ্রস্থান ৪·০০
॥ মনোজ বসু ॥ রাজকন্যার স্বয়ম্বর ৪·৫০ ছবি আর ছবি ৮·০০ নিশিকুটুম্ব (১ম/২য়) ৮·০০/৮·৫০ আমার ফাঁসী হল ৪·৫০ পথ কে রুখবে ১২·০০ মায়াকন্যা ৪·০০ ঝিলমিল ৫·০০

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ স্তব্ধ প্রহর (২য় মুঃ) ৫·০০ সূর্য কাঁদলে সোনা ১৫·০০
॥ মোহনলাল গংগোপাধ্যায় ॥ অসমাপ্ত চটান্দ ৫·০০ পুনর্দর্শনায় ৮·০০
॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ রূপং দেহি ধনং দেহি ৩·২৫
॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ বিরাট ভোগ ৩·০০ স্ত্রী মানেই ইস্ত্রী ৩.০০
॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রঙীন নিমেষ ৪·৫০
॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সোনালী ধোঁয়া ৭·০০ আদি নেই অন্ত নেই ৩·৫০ এই হৃদয় নিয়ে ৪·৫০
॥ সমরেশ বসু ॥ শেষ দরবার (৪র্থ মুঃ) ৪·০০, স্বর্ণপিঞ্জর ৩·৫০ মিছিমিছি ৩·৫০

॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ বহে নদী ৩·০০ স্বয়ংনায়ক ৪·০০
॥ সুকুমার সেন ॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১২·০০ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ১৫·০০
॥ সুজাতা ॥ নারী রূপে রূপে ৪·০০
॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ পথ চলতি ২য় খণ্ড ৬·০০
॥ সিন্ধুবাদ ॥ নায়ক নারী নিয়তি ৪·০০
॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ হাস্যমধুর ৫·৫০
॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ কন্যা ৮·৫০

গ্রন্থপ্রকাশ

C/o. বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা বারো

সমুদ্রসৈকত (পুরী) —বি, আর, পানেসর অঙ্কিত

হুড্রু ফলসের পথে —উমা সিদ্ধান্ত অঙ্কিত

॥ ৪৮ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭৬ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা ॥

ভক্তি

সংসারে আত্মীয়স্বজন, কামিনীকাঞ্চন ইত্যাদির প্রতি যে অনুরাগের বন্ধন হয়, আর ঈশ্বরের প্রতি যে অনুরাগ বা প্রেম জন্মে—এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটি হচ্ছে বিষয়-সংস্পর্শযুক্ত—তাই লৌকিক ও ক্ষণস্থায়ী; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিষয়-রস-বর্জিত,—তাই অলৌকিক ও অবিনশ্বর। এই শেষেরটির নামই ভক্তি।

ভাগবত বলেন,—সত্ত্বমূর্তি ভগবানের প্রতি প্রকাশাত্মক ইন্দ্রিয়-গণের যে স্বাভাবিক বৃত্তি তাকেই নিষ্কাম ভাগবতী ভক্তি বলে। এ বৃত্তি বৈধী কর্মে প্রবৃত্তি থেকে জন্মায়—আপনা থেকে হয় না। এ ভক্তি হ'লে মুক্তিও হয়। কেন জান? জঠরানল যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, এ ভক্তিও তেমনি অবিলম্বে লিঙ্গশরীরকে ক্ষয় করে ফেলে। তাই এ ভক্তি শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে মুক্তিরই মত শ্রেষ্ঠ। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—'মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী'—মোক্ষের কারণরূপ যত সামগ্রী আছে, তার মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। (বিবেকচূড়ামণি)।

এই ভক্তি প্রধানত দু'রকম—'গৌণী' ও 'মুখ্যা'। সাধনা-বস্থায় যে ভক্তি, তাহাই গৌণ; আর সিদ্ধাবস্থার ভক্তিই 'মুখ্যা' বা পরাভক্তি। গৌণী ভক্তি আবার দ্বিবিধ—'বৈধী' ও 'রাগাত্মিকা'।

যখন সাধক শাস্ত্রনির্দিষ্ট ও শ্রীগুরূপদিষ্ট বিধিনিষেধের অধীনে পূজা, জপ, ধ্যান, শ্রবণ, মননাদি ও যাগাদি ক্রিয়া সাধনের দ্বারা ক্রমশ ভক্তিলাভ করতে এবং ইষ্টের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হ'তে থাকেন, তাঁর তখনকার যে ভক্তি, তা-ই বৈধীভক্তি। আর যখন ঐ সাধনার ফলে কিঞ্চিৎ ভক্তি রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের চিত্ত ইষ্টদেবতার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে অলৌকিক ভালবাসার সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠে, তখন তাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে।

অবশেষে সাধনার শেষ সীমায় পৌঁছে সাধকের হৃদয়ে যখন এই বোধ জাগরিত হয় যে বিষয়ানন্দ ভূমানন্দের বিন্দুমাত্র—তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র, তখন তার সেই প্রকৃতি-গুণযুক্ত সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হৃদয়ে মুখ্য-রস-পুষ্ট পরম আনন্দপ্রদা যে ভক্তির উদয় হয়, তারই নাম 'পরাভক্তি'। সাধনাপরায়ণ যোগিগণ সাধনার পরিপুষ্ট ফলস্বরূপে এই পরাভক্তির রসাস্বাদন করার অধিকারী হন। অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস, হৃদয়ে অচঞ্চল ধৈর্য, এবং দেহমনে পূর্ণ সুস্থিরতা না এলে—তাঁতে নির্ভরতার দৃঢ়তায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে না পারলে, কিছুতেই সাধকের তন্ময়তা বা সেই পরম রসযুক্ত আনন্দ উপলব্ধি হবে না।

রামানুজের মতে 'ইতর-বৈতৃষ্ণ্যরূপিণী' ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি, অর্থাৎ যে ভক্তিতে ভগবান ব্যতীত অপর সকল বস্তুতেই বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই প্রকৃত (পরা) ভক্তি।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (৯।৩৪)। ইহাই শ্রেষ্ঠ গভীর রহস্যযুক্ত ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ; ইহাই পরা-ভক্তি। এ অবস্থায় সাধকের ক্ষুদ্র 'আমি' সেই বিরাট 'আমি'র সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। সে ভক্তের গুণাতীত অবস্থা হয়।

'ভক্তি কিসে হয়?' এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামী ভাস্করানন্দ বলেছিলেন—'নাম করো; রাম রাম বোলো।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'ভক্তির মানে হচ্ছে কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা।' যতক্ষণ মন কায়া ও বাক্যের ভজনায় সঙ্গে ষোল আনা সায় না দেয়—যতক্ষণ কায় মন ও বাক্য—এই তিন রকমে ভজনার সমন্বয় না হয়, ততক্ষণ বৈধী ভক্তি। মন ষোল আনা সায় দিলে তখন রাগাত্মিকা ভক্তি। কিন্তু পরাভক্তি—যাকে ঠাকুর প্রেমা ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি বলতেন—সে ভক্তি যতক্ষণ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করার মত ভালবাসা না হয়, ততক্ষণ হয় না। এই
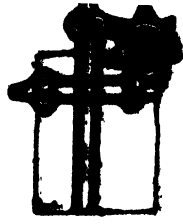
পরাভক্তিকেই ঠাকুর পাকাভক্তি বলতেন; আর সব কাঁচা ভক্তি। ভক্তি অভ্যাসের ফল।

শ্রীরামকৃষ্ণ,—'ভক্তির মানে হচ্ছে কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা—নামগুণকীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহদর্শন। মন,—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য,—অর্থাৎ স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম-গুণকীর্তন, এই সব করা।

'ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধুসঙ্গ হয়; সাধুসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা—ঈশ্বরের কথা বই আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না, তাঁরই কাজ করতে ইচ্ছা করে। এই নিষ্ঠার পরে ভক্তি আসে। ঈশ্বরের নাম-গুণ-কীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়। ওতে লজ্জা করতে নাই। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।

'ভক্তি পাকলে ভাব; তারপর মহাভাব—প্রেম। প্রেম হলে তাঁকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

'স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয়, তবেই ভক্তি হয়। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বদা প্রার্থনা কর। যদি এখানে ব'সে ভক্তিলাভ করতে পার, তীর্থে যাবার কি দরকার? আর তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হলো, তবে তীর্থে যাবার ফল হ'লো না। ভক্তিই সার—একমাত্র প্রয়োজন।

'তাই আসল কথা—সার কথা—স্থূল কথা হচ্ছে তাঁর ভক্তি করা, তাঁকে ভালবাসা। ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে রাগানুগা ভক্তি। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই—ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। তাঁর জন্য ব্যাকুল না হলে কিছু হবে না। জ্ঞান-বিচার পুরুষ মানুষ,—বা'র বাড়ী পর্যন্ত যায়; ভক্তি মেয়ে-মানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়। ভক্তিলাভের জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মেছে; এই ভক্তি যাতে হয়, সেই চেষ্টা করো।

'ভক্তিদ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে কিছুরই অভাব থাকে না। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদেরই ভক্তি হয়। ভক্তি দ্বারাই মুক্তিও হয়। মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়।

'ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম; অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, স্বরূপ হয়ে, ভক্তকে দেখা দেন। তিনি প্রার্থনা শুনেন। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্তলীলা; কিন্তু আমার দরকার প্রেম-ভক্তি, আমার দরকার ক্ষীরটুকু। গাভীর বাঁট দিয়ে ক্ষীর আসে; অবতার গাভীর বাঁট। ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দেন—শরণাগত হতে বলেন। ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়—জ্ঞান, বিজ্ঞান, সব হয়। 'কেবল কাদের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাধা আছে!'

'চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার। জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। তাঁর উপর ভক্তি হলে সবই হলো। ভক্তিনদী ওথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। ভক্তি হলে আর কিছুই চাই না। যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা, এসব অনিত্য বিষয় গ্রাহ্য করে না।

'কলিতে নারদীয় ভক্তি, কিনা, সর্বদা তাঁর নামগুণকীর্তন করা। 'ভক্তির আমিতে অহংকার হয় না—অজ্ঞান করে না—বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। ভক্তি ফল, কর্ম ফুল—ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি হলে আর কর্ম থাকে না। সমাধিমধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়।

'ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে,—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে।

'ভক্তি কামনা, কামনার মধ্যে নয়; তাই ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা করতে পার।

'আমি মা'র কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। মা'র পাদপদ্মে ফুল দিয়ে বলেছিলাম, 'মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি-অশুচি, এই নাও তোমার ধর্ম-অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।

'শুদ্ধাভক্তিতে কোন কামনা থাকবে না। কিছু চাও না, অথচ ভালবাসো, এর নাম শুদ্ধাভক্তি—অহৈতুকী ভক্তি। প্রহ্লাদের এটি ছিল। এ ভক্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়।

'সংসারীদের মধ্যে যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ আছে, ভক্তিরও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে। ভক্তির সত্ত্বে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না; শরীরের উপর মন নাই, খাবার ঘটা নাই, পোষাকের আড়ম্বর নাই, আসবাবের জাঁকজমক নাই। ভক্তির রজঃ থাকলে লোককে দেখাতে চায় আমি ভক্ত। ষোড়শোপচারে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে যায়। হয়ত তিলক আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

'ভক্তির তমঃ যার আছে, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত; এরূপ ভক্ত ঈশ্বরের কাছে জোর করে—বলে, 'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি। আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শংকরী॥'
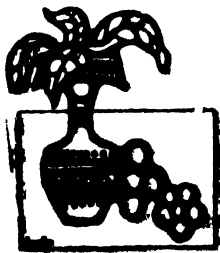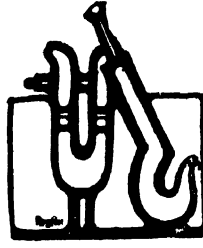
'এক রকম আছে ত্রিগুণাতীত ভক্তি—কি না, ভক্ত কোন গুণের বশীভূত নয়। সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম ; ভক্ত ও চিন্ময়—সব চিন্ময়। এ ভক্তি কম লোকের হয়।

'আবার আছে ঊর্জিতা ভক্তি। ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। 'ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়' ; যেমন চৈতন্যদেবের। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—'ভাই, একটা কথা জেনে রাখো, যেখানে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি।' যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর যেখানে স্বয়ং বর্তমান।

'এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় ; ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।

''ভক্তির আমি'তে অহঙ্কার হয় না—অজ্ঞান করে না; এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়; যেমন হিঞ্চেশাক শাকের মধ্যে নয়—মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।'

ভক্তি কাটারি দ্বারা ভব-নিগড় ছেদন

'নারদ পঞ্চরাত্রে' আছে, নারদ তপস্যা করছিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী হল ঃ—

> "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌?
> নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥
> অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।
> নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥
> বিরম বিরম ব্রহ্মন্‌ কিং তপস্যাসু বৎস।
> ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্‌॥
> লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্‌।
> ভবনিগড় নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ॥"

অর্থাৎ, হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তা হলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তবে তপস্যা করেই বা কি হবে? হরি যদি অন্তরে বাইরে থাকেন, তা হলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরি যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন তবে বৃথা তপস্যা। অতএব হে ব্রহ্মণ, বিরত হও ; বৎস, তপস্যা করে কি হবে? জ্ঞানসিন্ধু শঙ্করের কাছে গমন ভক্তি লাভ কর, লাভ কর। এই ভক্তি—এই ভক্তি কাটারি দিয়ে ভক্তি লাভ করে, লাভ কর। এই ভক্তি—এই ভক্তি কাটারি দিয়ে ভবনিগড় ছেদন হবে।

ভক্তিপথ

শ্রীরামকৃষ্ণ—'যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। কাজেই কোন্‌ পথ ভাল অত বিচারের দরকার নাই। তবে, ভক্তির পথ সহজ পথ, জ্ঞানবিচারের পথ কঠিন পথ। অনুরাগের সঙ্গে ভক্তির পথে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ—নির্জনে, গোপনে—'দেখা দাও' বলে। আন্তরিক হলে দেখা পাবেই। 'ডাক্‌ দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে'।

"যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগে, তা হলে ইন্দ্রিয়সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়।

'ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হতে পারে। কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরের সাকাররূপ দেখতে চায়—তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়; তাই প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ছেলে, তুমি মা'—এ রকম অভিমান রাখতে চায়। তবে, তিনি ইচ্ছে ক'রে ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন ; ভক্তি দেন, জ্ঞানও দেন। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন হয়,—নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়,—তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না। মা-ই জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। তাই ভক্তিপথেও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে

ভক্তিযোগ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ—এরই নাম ভক্তিযোগ ; তার মানে, ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন, ভজন এই সব করে তাঁতে মন রাখা। ভক্তি আর অনুরাগ নিয়ে তাঁর নাম-গুণকীর্তন করলে কর্মক্ষয় হয়।

"ভক্তিযোগের সাধনায় প্রথমে সাধুসঙ্গ থেকে ক্রমে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম হয়। সর্বশেষে প্রেম। ভক্তি পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব ও প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবকোটির হয় না। যার তা হয়েছে, তার বস্তুলাভ (ঈশ্বর লাভ) হয়েছে।

"যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগে, তা হলে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হয়ে যায়। যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে, না সুখসম্ভোগ করতে পারে? ঈশ্বরের বিরহ তার মনকে অন্য কোন দিকে যেতে দেয় না।

"ভক্তিযোগে কুম্ভক হয়ে সমাধি হতে পারে। ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয় ; যার হয়, সে নিজে টের পায় না। 'নিতাই আমার মাতা হাতী' 'নিতাই আমার মাতা হাতী'—এই বলতে বলতে যখন ভাব হয়ে যায় তখন সব কথাগুলো বলতে পারে না—কেবল 'হাতী' 'হাতী'—তারপর শুধু 'হা'—। তখন ভাবে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়।

"ভক্তিযোগে কুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। গান করে একাগ্রতার সহিত গাইবে, —নির্জনে, গোপনে,—

> "জাগো মা, কুলকুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী,
> প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্ম-বাসিনী!"

ভক্তি আসুতে হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত,—এ'রা গানে সিদ্ধ হয়েছিলেন। "কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ; তাই ভক্তিযোগই যুগধর্ম। ভক্তিপথে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগও ভাল পথ; কিন্তু বড় কঠিন, 'চড়াই' পথ।

"ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কে'দে কে'দে বলেছিলাম—'মা, যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে,—আমায় জানিয়ে দাও, আমায় দেখিয়ে দাও।' মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।

"ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়—জ্ঞান বিজ্ঞান সব হয়। ভক্তিযোগ রাগভক্তি এলে তবে তাকে পাওয়া যায়। রাগভক্তির পতন নাই। যাদের রাগভক্তি ঈশ্বর তাদের ভার লন। তিনি লীলা করছেন—তিনি ভক্তের অধীন।

'কোন্ কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে'!"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ভক্তিযোগের মত সহজ ও মধুর পথ আর কিছুই নাই।

জ্ঞানযোগে সাধনার কাঠিন্য যত বেশি, ভক্তিযোগে তত কম—পতনের ভয়ও কম।"

ভক্তের সুখদুঃখ

ভক্তকে কেন দুঃখভোগ করতে হয় এ কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"কি জান, সুখদুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চন্ডীতে আছে যে কালুবীর জেলে গিছিল, তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহ ধারণ করলেই সুখদুঃখ ভোগ আছে।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

মহামতি লেনিন

'মহানায়ক' বিশেষণটির আজকাল যত্রতত্র প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। এক সাময়িক অদম্য উচ্ছ্বাসের বশীভূত হয়ে এমন একাধিক ব্যক্তিকে এই বিশেষণে বিভূষিত করা হচ্ছে যাঁরা, একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, কি যোগ্যতায়, কি ব্যক্তিত্বে, কি অবদানে এঁরা এই বিশেষণটির ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেন না। এই বিশেষ বিশেষণটির সার্থক অধিকারী যাঁরা—তাঁদের তালিকায় প্রথম সারিতে যে ক'টি নাম এসে দাঁড়ায়—সেই নামের মিছিলে লেনিন একটি কালজয়ী নাম। তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতাই একথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব আন্দোলনের সাফল্য ও পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই তাঁর অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত।

১৮৭০ সালের বাইশে এপ্রিল সিমবিরস্ক শহরে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জন্ম। শহরটি ভল্গা নদের তীরে অবস্থিত। বাবা ছিলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক, বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন লেনিন। জড়িয়ে পড়লেন ছাত্র-আন্দোলনে। গ্রেপ্তার হলেন এবং কাজান থেকে হলেন বহিষ্কৃত। এরই পরিণতি বিপ্লবী লেনিনের জন্ম। উনিশ বছর বয়সে সামারা শহরে বসবাস সুরু করলেন ও মার্কস এবং এ্যাঙ্গেলসের রচনায় ও ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে একটি মার্কসবাদী বিপ্লবীচক্র গড়ে তুললেন। বাড়ীতে অধ্যয়ন করে বাইরের ছাত্র হিসাবে আইনের পরীক্ষা দিলেন এবং সফলকাম হলেন (১৮৯১)।

১৮৯৩ সালে এলেন সেণ্টপিটার্সবার্গে (আজ যার নাম লেনিনগ্রাদ)। সেখানে শ্রমিক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করলেন। তাদের মধ্যে মার্কসের বাণী ও ভাবধারার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে লাগলেন এবং তাদের শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে থাকলেন। এককথায় তাদের ভিতর আত্মসচেতনতা এবং অধিকারবোধ এনে দিলেন।

১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরে লেনিন গ্রেপ্তার হলেন চোদ্দমাস কারাবাসে থাকার পর তাঁকে এক গ্রামে নির্বাসিত করা হ'ল। এই সময়ে বহু তত্ত্ব ও তথ্যগত মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। আন্দোলনের সামনে যে সব জটিলতা ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল, রচনাগুলি তাদেরই সমাধানের পথনির্দেশ।

১৯০০ সালে মুক্তিলাভ করে জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন ও ১৯০৫ সালে দেশে ফিরে এসে রাশিয়ার প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুরু করেন। ১৯১৭ সালে দ্বিতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। স্বৈরতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটিয়ে একদিন দেশে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই নতুন দিগন্তের গ্রহপতি সূর্য হলেন লেনিন। রাশিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়ে যে নতুন সরকার সংগঠিত হ'ল তার সর্বময় কর্ণধার হলেন লেনিন। সারা বিশ্বে এবার ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। তাঁর দুর্ধর্ষ, রোমাঞ্চকর বিপ্লবীজীবন। বিচিত্র কর্মপন্থা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকল। এক প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে পৃথিবী তাঁকে বরণ করে নিল।

১৯২৪ সালের একুশে জানুয়ারী ৫৪ বছর বয়সে মহামতি লেনিনের জীবনাবসান হয়

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

চা ও বর্তমান সভ্যতা

নিখিলানন্দ সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় চার্লসের আমলে যখন ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম চা-পানের রেওয়াজ সুরু হয়, তখন বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এ প্রথার বিরুদ্ধে মুষ্টি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মনে কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, চায়ের সঙ্গে নাকি চারিত্রিক অধঃপতনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তবে তাঁদের সেই ভুল ভাঙতে বিলম্ব হয় নি। অচিরেই চা-রূপ অমৃতের প্রতি সমগ্র জাতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁদের জীবনে রুটি ও মদের ন্যায় চা-ও একান্ত অপরিহার্য পানীয় হিসেবে গণ্য হয়।

ইংরেজের বুকের উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তার পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য ছারেখারে গিয়েছে। তবু, তবু সে আপন পৌরুষ হারায় নি। চা-ই তাকে জুগিয়েছে সকল দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে মাথা উঁচু রেখে চলবার অপার ক্ষমতা। তাই, তার চায়ের প্রতি অনুরক্তি রাজভক্তির মতই প্রবল।

শুধু ইংরেজই বা কেন, মধ্যবিত্ত বাঙালীর কথাই ধরুন। সকালে চোখ মেলে এককাপ গরম চা হাতের কাছে না পেলে তাঁর প্রাণ চাতকের মতো আনচান করে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। সাধারণ বুদ্ধিটুকুও লোপ পায়। আর তাঁর শ্রীমুখ হতে শ্রীমতীর উদ্দেশ্যে যে মধুর সম্ভাষণ বর্ষিত হয়, তাকে কোনক্রমেই প্রেমালাপ বলা চলে না।

অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা স্মরণ করে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে পড়েন। হয়তো চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা তাঁর মনের ভিতরে দানা বেঁধে ওঠে।— আর নয়। এই শেষ। এবার থেকে চায়ের পয়সায় ফল খাবো। শরীরে পুষ্টি হবে। কিন্তু হায়! তাঁর এই মহৎ সংকল্প নির্বাচনে জেতার পূর্বে ভোটপ্রার্থী প্রদত্ত অজস্র প্রতিশ্রুতির মতন, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে মোটেই বিলম্ব হয় না। আবারও তিনি চায়ের নেশায় চেঁচাতে থাকেন চিঁহি চিঁহি স্বরে।

তাই বলি, কাজ কি নীতির কচ্‌কচানিতে! মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। ধুরন্ধর ঔপন্যাসিক এ, জে, ক্রনিন একবার এক সাংবাদিকের নিকট যে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন, তা রীতিমত চমকপ্রদ। তিনি বলেছিলেন, আমি চার গ্যালন চা গিলে এক হাজার শব্দ রচনা করতে পারি। কী সাংঘাতিক কথা!

বর্তমান যুগে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল (রাজ্যপাল নয়), তাঁরা জীবনে প্রথম লেখার অনুপ্রেরণা পান চায়ের কাপ বা খুরি থেকেই। এ কথার ভুরি ভুরি প্রমাণ তুলে ধরতে পারি আপনাদের সামনে। সুতরাং—

আর, শুধু সাহিত্যিকবৃন্দই বা কেন, অন্যান্য শ্রেণীর শিল্পীরাও ওই একই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। চা না পেলে তাঁরা একপাও চলতে পারেন না।

কিছুকাল পূর্বের কথা। এক ঘরোয়া বৈঠকে কয়েকজন জনপ্রিয় গায়ক উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা, কোন শিল্পীই প্রথমে গান গাইতে রাজী নন। প্রত্যেকের মুখে এক উত্তর—পরে গাইবো।

গৃহকর্তা পড়লেন মহা সমস্যায়। তবে আগে গাইবে কে? অনুষ্ঠানের তো সূচনা করতে হবে। কোন কূল-কিনারা খুঁজে না পেয়ে তিনি স্থির করলেন, তিনি নিজেই উদ্বোধনী সঙ্গীত সুরু করবেন তাঁর চারমিনার খাওয়া খ্যানখেনে গলায়। এমন সময়ে [illegible] ট্রেতে চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে প্রবেশ করলো বাড়ির ভৃত্য। যে [illegible] কয়েক মিনিট পূর্বেও সকলের শেষে তাঁর সিটিং দেবার জন্যে উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করেছিলেন, তিনিই চা পানান্তে হাসিমুখে সর্বপ্রথম হারমোনিয়ামটা টেনে নিলেন কোলের কাছে।—

> হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
> ময়ূরের মতো নাচেরে।

বুঝুন ব্যাপার। শিল্পী-মেজাজের সঙ্গে চায়ের কী নিবিড় সম্পর্ক।

তবু এও তুচ্ছ। চা খাইয়ে চাকরি এবং জমিদারি লাভের কাহিনী শুনেছেন কখনও? বোধ হয় শোনেন নি। কারণ, লিখিত ইতিহাসে সব তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তার বাইরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ছড়িয়ে থাকে অনেক সংবাদ। সেই রকমই গোটা দুই নির্ভেজাল সত্য কাহিনী আজ পরিবেশন করবো আপনাদের কাছে।

লর্ড হেস্টিংসের আমল। একবার তিনি সরকারী কার্যোপলক্ষে কেশনগরে গমন করেন। সেকালে বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে চায়ের এত ব্যাপক প্রচলন ছিল না। সাগরপারের বণিকেরা তখন সবেমাত্র কালা আদমীদের বিনামূল্যে কাপড়-গামছার প্রলোভন দেখিয়ে চা-পানে অভ্যস্ত করাতে ব্যস্ত।

সে যাই হোক্, গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই হেস্টিংস মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর আরদালী এসে পৌঁছয়নি। তার কাছেই চায়ের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম। এখন উপায়? আধঘণ্টা অন্তর অন্তর গরম চায়ে গলা না ভেজালে তাঁর কাজের মুডই যে আসে না। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথের ধারে চুঁ মারতে সুরু করলেন—মাটির পুতুলের দোকান, ময়রার দোকান,

এমন কি স্যাকরার দোকানও বাদ গেল না। কিন্তু, কোন ব্যক্তিই তাঁর তৃষ্ণা নিবারণে সক্ষম হলো না।

এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির রকে বসে সাহেবের দাপাদাপি লক্ষ্য করেছিলেন। এক সময়ে তিনি এগিয়ে এসে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর মা-বাপ। আপনি কি চা খেতে ইচ্ছে করেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ।—সাহেব যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।—টোমি খাওয়াইটে পারিবে?

—নিশ্চয়ই।—কৃতার্থ হয়ে ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক।—আমার সাথে আসুন।

তিনি হেস্টিংসকে বাড়ির কাছে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এলেন একবাটি চায়ের পাঁচন হাতে নিয়ে।—তার মধ্যে না ছিল দুধ, না চিনি। কিন্তু, সেই অপরূপ চীজ পেটে পড়তেই সাহেবের স্ফূর্তি আর ধরে না। সে কী নাচন-কোঁদন!

আমি টোমার জন্যে কি করিটে পারি?

হেস্টিংসের মহানুভবতায় ভদ্রলোক মাখনের মতো গলে গেলেন। হাত কচলাতে কচলাতে সবিনয়ে নিবেদন করলেন, কি যে বলেন, স্যার! তবে যদি একান্ত কৃপা করেন, তাহলে আমার বড় ছেলেটাকে একটা চাকরি—বড্ড বঞ্চে আছি, স্যার।

ব্যস, আর বলতে হলো না। সাহেব তাঁর পিঠ থাবড়ে বললেন, ঘাবড়াও মৎ। টোমি টোমার ছেলেকে ক্যালকাটায় আমার কাছে পাঠাইয়া ডিও।

দু'তিন দিন পরে ভদ্রলোকের 'ক' লিখতে কলম ভাঙ্গার যোগ্যতাসম্পন্ন পুত্ররত্নটি কোলকাতায় হেস্টিংসের দরবারে উপস্থিত হলো। সাহেব তার জ্ঞানবুদ্ধি যাচাই করে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। তদ্দণ্ডে তাকে গাঁজা বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন এবং তাতেও চা পানের ঋণভার লাঘব হয়নি বিবেচনায়, ছেলেটির বাপের নামে তেত্রিশ একর নিকর জমি দান করলেন কেশনগরের কাছাকাছি কোন এক জায়গায়। দেখুন কাণ্ড-কারখানা। একেই বলে বরাত জোর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উইনস্টন চার্চিল একদা বৃটিশ তথা মিত্রপক্ষের জয়লাভ সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে পড়েন। হাজার হাজার উড়ন্ত বোমার ঘায়ে ইংলণ্ড তখন ঘায়েল হবার উপক্রম। মানুষ মরছে কাতারে কাতারে, কীটপতঙ্গের মতো। কী কৌশলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা যায়, সর্বক্ষণ সেই চিন্তায় চার্চিল সাহেব উদ্‌ভ্রান্ত। অবশেষে এক সময়ে, তাঁর হতাশা এমন চরমে এসে পৌঁছল যে, হিটলারের কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে একদিন নিশীথ রাত্রে তৈরী করলেন একখানি দলিল। দলিলটি রচনার পর তিনি 'বয়'কে এককাপ চা আনবার হুকুম দিলেন।

চা খেয়েই কিন্তু চার্চিলের মাথা গেল ঘুরে। ছিঃ ছিঃ। জাতির এই দাসপত্র রচনা করেছেন তিনি। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও তেজস্বিতার প্রতিমূর্তিস্বরূপ চার্চিল সেই মুহূর্তে দলিলটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে নিক্ষেপ করলেন বাজে কাগজের টুকরিতে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করলেন এক চিরস্মরণীয় উক্তি—'ভি' অর্থাৎ ভিক্‌ট্রি। ভিক্‌ট্রি ইজ আওয়ার্স। ইংল্যাণ্ডের অভিধানে পরাজয় বলে কোন শব্দ নেই।—চায়ের কী অপার মহিমা!

আজ আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে চায়ের রেওয়াজ। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা ভদ্রতা-মিত্রতা যাই বলুন, সব কিছু রক্ষার সহজ উপায় চা। যে-কোন পল্লীর চল্লিশটা দোকানের মধ্যে প্রায় বিশটাই টি-স্টল। বর্তমানে বি-এর ডিগ্রীখানা পকেটে পুরে ড্যালহৌসীর অফিসে অফিসে ঘুরে জুতোর হিল খোয়ালেও সামান্য মাড়িমারা কেরাণীর চাকরি আকাশে থাক্ চাপরাসীর খাজও জোটে না। আর, সেই চরম গ্লানি ও পরম ব্যর্থতা অন্তত সাময়িকভাবেও বিস্মৃত হবার একমাত্র উপায় চা, আরো চা, আরো—আরো ...।

দেওয়ালসজ্জার সামগ্রী

পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত বোকামের এক মৎস্যজীবী মনে করেন যে, দেশে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে দেওয়ালসজ্জার সামগ্রী বিশেষভাবে সহায়ক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সযত্নে কড-মাছ, শুশুক, হাঙর, সামুদ্রিক নেকড়ে, পিরানহা প্রভৃতি থেকে নানাবিধ দেওয়াল সজ্জার সামগ্রী প্রস্তুত করে থাকেন। এই সব জিনিস বিদেশী পর্যটকের কাছে বিক্রি করলে দেশের আকর্ষণ তাদের কাছে অনেক বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ছবিটিতে একটি তরুণীকে কড-মাছের চোখ আঁকতে দেখা যাচ্ছে।

[illegible]

শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

শ্রীহরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞান—ছেলেবেলায় সন্তান বাপ-মার আদরে বড় হয়, বিদ্যালয়ে বই-এর লেখা পড়ে মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করে, কলেজে উচ্চশিক্ষার সময়ও বই পড়ে তথ্য জানে, ব্যবহারিক-ভাবে পরীক্ষা-গৃহে পরীক্ষা করে সত্যতার প্রমাণ পায়। পড়ার শেষে কর্মময় জীবনে প্রবেশ করে। সেখানে ছাত্র-জীবনের প্রায় সব শিক্ষাই কাজে লাগে এবং তার উপর আসে সামাজিক চাপ। এখানেও কম শিক্ষা নাই। এখানকার শিক্ষা এতই দুরূহ যে কল্পনা করা যায় না। এই সমাজ-রাজ্যে কোন নির্ধারিত পুস্তক বা পদ্ধতি নাই, আর সবাই অজানা—বাপ-মা ভাই-বোন থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-শ্বশুর-শাশুড়ী; কর্মক্ষেত্রের সহকর্মিগণ—এক কথায় যাহাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা যায় তারা সকলেই চেনা বা পরিচিত হতে পারে কিন্তু তাদের মন অজানা, কাজেই তারাও অজানা। কি করে তাদের সঙ্গে মিশে বেশ সহজে সরল-ভাবে দৈনন্দিন কাজে চলা যেতে পারে অথচ নিজের বা পরমাত্মীয়ের কোন ক্ষতি না হয়। এই বিদ্যার শিক্ষা করা কি কম কঠিন? এক উদ্দেশ্যে এক কথা বলা হল, কিন্তু তার অন্য অর্থ নেওয়া হল, প্রচার করা হল এবং সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হল, স্বল্প বিত্তের মধ্যে ঘটলে হয়ত একটা প্রাণ নষ্ট হত, রাজ্যায় রাজ্যায় হলে লাখে লাখে লোক প্রাণ হারাল, সমৃদ্ধ সহর নগর শ্মশানে পরিণত হল। এর প্রধান কারণ হল সংসারের কর্তা বা দেশের কর্ণধার স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে কথা বলতে বা কাজ করতে না পারার ফল।

ব্যবহারিক জীবনে এই সামাজিক শিক্ষা আরম্ভ করা অতিবড় জ্ঞানীর পক্ষেও সুকঠিন। ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে এই নীতির নাম চালাকী এবং বৃহত্তম ক্ষেত্রে এই নীতির নাম রাজনীতি। এই নীতি-শিক্ষার শেষ নাই, ইহার দেশ কাল ও পাত্র কোনটাই জানা নাই। কে যে কোথায় কখন, কি অভিসন্ধিতে কি কথা বলবেন তা কেমন করে জানা যাবে? আজ যে পরম আত্মীয় কাল কেন পরমুহূর্তে সে পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল। আপন সহোদর ভাই যে আমার সব কিছু জানে, আমি যার সব কিছু জানি এবং প্রাপ্তবয়সে দেবতা সাক্ষী করে পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষীর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলাম সেই গোপনে আমাকে ছুরিকাঘাত করল, বিশ্বাসঘাতকতা করল। এই দৃষ্টান্ত অহরহ পাওয়া যাচ্ছে, তবে এই জগতে কাকে বিশ্বাস? অথচ এই বিশ্ব-জগৎ চলছে পরস্পর সহযোগিতা ও বিশ্বাসে। সূর্য থেকে প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বিশ্বাস বর্তমান, প্রতি জীব উদ্ভিদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধের বিশ্বাস বর্তমান, ভঙ্গ হয় না, তবে জীবন ধারণ সম্ভব। প্রতিশিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা পার-স্পরিক বিশ্বাস সহানুভূতি ও সহযোগি-তার ওপর গড়ে ওঠে।

এইখানেই কর্মজীবনের চালাকি নীতি বা রাজনীতির সাফল্য নির্ভর করে অথচ এর আধারের কোন অংশ কাহারও জানা নাই।

ছাত্র-জীবনের শিক্ষা নির্ধারিত নীতিমত পাঠ মুখস্থ করে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু কর্মজীবনের শিক্ষার কোন নির্ধারিত নীতি নাই তবুও লোকে কর্মজীবনে সাফল্য আসছে কি করে?

সরল উত্তর—কর্মজীবনে চলার পথে প্রতি পদক্ষেপে যে সমস্ত বাধা পাওয়া যায় তাহাই এই শিক্ষার পুস্তক এবং ঐ বাধার উপযুক্ত সমাধান হল কৃত-কার্যের সূত্র, এই শিক্ষার কোন শিক্ষক নাই, নিজেই নিজের শিক্ষক, অবস্থা-মত নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করতে হবে, অন্য যে কেউ সমাধান করবে সেটা তার সুবিধা ও উপযুক্ত মত হবে, নিজের নয়, ঠিক যেমন অন্যের জুতো চাহিয়া পরায় সম্যক সুখপ্রদ হয় না। উপরোক্ত উপায়ে শিক্ষা অর্জন করিতে হয় এবং তাহা ব্যক্তিগত সম্পদ।

জ্ঞান—ছাত্রজীবনের শিক্ষা থেকে বুদ্ধি কিছু সচল হয়, কর্মজীবনে হঠাৎ সমস্যার সমাধান করতে করতে বুদ্ধির আরও উৎকর্ষ হয়, উপস্থিত বুদ্ধি আরও তীক্ষ্ণ হয়। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং বয়সের অগ্রগতিতে ঐ বুদ্ধির ধারণা-শক্তির বৃদ্ধি হয়। ছাত্রজীবনের শিক্ষা থেকে কর্মজীবনের ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান পর্যন্ত কোন আন্তরিক প্রয়োগ বা মিল নাও থাকিতে পারে তবে ঐ পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হওয়ার পর সমষ্টিগতভাবে মনের মধ্যে যে ছাপ স্থায়ী হয় তাহাই হল জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা—এই জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্ফুরণ আবার পূর্ব জীবনের বুদ্ধির উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে। যেমন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে সেই রকম প্রতিসমস্যা সমাধানের পর মনে হয় 'এই পথে, এই কথা বললে ভাল হত' কিন্তু ততক্ষণে কার্য শেষ। এই ফন্দি আঁটার কোন সার্থকতা নাই। এমনও হয় যে পরবর্তী অনুরূপ সমস্যার সময় পূর্ব পরিকল্পিত নীতি ও পন্থা প্রয়োগ করা গেল না। ইহা প্রমাণ করে যে শিক্ষা ও জ্ঞানের সম্যক চর্চা ও অভ্যাসের অভাব, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার অভাব। যত দিন যায় তত অভিজ্ঞতা

বাড়ে এবং দূরদর্শিতা প্রকাশ পায়। ইহা নিরক্ষর দিন মজুর থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞানের শীর্ষে অবস্থিত ব্যক্তি ও নিজ গণ্ডিমত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর কি এই অভিজ্ঞতার শেষ হয়, তবে যে শাস্ত্র বলছে :—

পূর্ব জন্মানি যা বিদ্যা,
পূর্ব জন্মানি যা ধনং।
পূর্ব জন্মানি যা ভার্যা,
অগ্রে ধাবতি ধাবতি।

মনীষিগণের এই উক্তি মিথ্যা নয়। এই জন্যই কাহারো উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর এবং সাধারণ জ্ঞান তীক্ষ্ণ হয়। এই অভিজ্ঞতার শেষ নাই। জন্মের পরক্ষণ হতে আরম্ভ করে মৃত্যুর সময় জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হতে থাকে। এই ৬০ বৎসর বয়সে এক এক সময় মনে হয়—আজকের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যদি আমার ১৬ বৎসর বয়সের সময় পেতাম তাহলে বোধ হয় জগতে আরও সহজ, সরল ও সুখের সহিত বাস করতে পারতাম, সাধারণের পক্ষে তা অসম্ভব, কিন্তু মহাপুরুষের পক্ষে তাহা সম্ভব। মানুষের গড়া ইমারত কালের প্রকোপে যেমন ভূমিসাৎ হয়; আবার নতুন মানুষ এসে সেই সৌধকে নতুন করে গড়ে, সেই রকম জীব একবার পরপার থেকে ঘুরে এলে তাকে সেই শিক্ষার, জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার অ, আ, ক, খ, থেকে আরম্ভ করতে হয়। এখানে কোন চাতুরি বা অন্য কোন নীতি চলবে না, চলবে কেবল প্রার্থনা।

জীব এই জগতে জন্মায় ও মরে। শাস্ত্র বলছে সকলেই পর পর জন্ম-জন্মান্তরের ঘূর্ণিপাকে ছুটে চলেছে, প্রতি বারই কিছু কিছু শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। প্রাক্তন রূপে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার কিছুই উপলব্ধির মধ্যে পায় না, মনে হয় সবই নতুন, যেন কোন অভিজ্ঞতাই হয় নাই। শিক্ষার সার হইল জ্ঞান, জ্ঞানের সার হইল অভিজ্ঞতা, অথবা শিক্ষা হইল পথ, জ্ঞান পথ-প্রদর্শক জ্যোতি এবং অভিজ্ঞতা হইল লক্ষ্যস্থল। এই আবর্তনের শেষ চক্রে পায় চরম শিক্ষা, চরম শিক্ষায় পায় চরম জ্ঞান এবং চরম জ্ঞানে পায় চরম অভিজ্ঞতা অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ এবং ভগবৎ-দর্শন যাহা চরম কাম্য।

পুলিশ কুকুরদের বল খেলা

পশ্চিম বার্লিনের চোরধরা কয়েকটি পুলিশের কুকুর খুব চমৎকার বল খেলতে পারে। নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে ওরা যখন বল খেলে তখন দর্শকদের আনন্দ দেখার মত। তবে ওদের নাক খুব নরম ও জখম হবার সম্ভাবনা থাকায় খেলার সময় নাকে বর্ম দেওয়া হয়। ওদের ট্রেনার কিন্তু এটা পছন্দ করছেন না, কারণ খেলার মোহে ওরা চোরধরা ভুলে যেতে পারে।

যৌন রূপান্তরের ইতিকথা

নিখিল সেন

সম্প্রতি গর্ডন ল্যাংলে হাল 'হরমন' চিকিৎসার সাহায্যে নর থেকে নারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি তাঁর নিগ্রো শোফারকে বিয়েও করেছেন বলে খবরে প্রকাশ।

এমনতর ব্যাপার কেবল মার্কিন মুলুকে নয়, ইউরোপের অন্যত্রও সংঘটিত হয়েছে। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার জর্জ জরগেনসেন শল্য ও হরমন চিকিৎসায় নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। একদা বিশ্বের সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করে তা ছাপাও হয়েছিল। জর্জ ছেড়ে তিনি খৃস্টিন নামও নিয়েছিলেন মেয়েদের মত।

বিখ্যাত ইংরেজ বৈমানিক রবার্ট কাওয়েলও জরগেনসেনের মত নারীতে পরিণত হয়েছিলেন। শুধু পুরুষের বেলায় নয়, মেয়েদের ক্ষেত্রেও এমনিতর যৌন রূপান্তরের নজির রয়েছে। ইংলণ্ডের চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়াবিদ ম্যারি ওয়েস্টন কাওয়েলের মত লিঙ্গ পরিবর্তন করেন এবং পুরুষে পরিণত হন। নিউ ইয়র্কের শাসনকর্তা লর্ড কর্নবেরির যৌন রূপান্তরের কাহিনী দীর্ঘকালের।

এ ছাড়া ইতিহাসের পাতায় এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যারা পুরুষ হয়েও মেয়েদের মত সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। চায় নিজেদের জাহির করতে মহিলা বলে। ইতিহাসের এমনি এক পুরুষ-মহিলা হলেন ক্যাভেলিয়র দি'য়ন। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন শ্যাম, ভেনিস ও আরো অনেক দেশে ফ্রান্স-এর রাষ্ট্রদূত। শ্যামের রাজদরবারে তিনি ফরাসী মহিলার বেশে উপস্থিত থাকতেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে ফরাসী রমণীর বেশে দেখে শ্যামের রাজা ভাবতেন, এ বুঝি ফরাসী রীতি। ফরাসী পুরুষেরা এমনি করে বুঝি মেয়েদের মত পোষাক পরে থাকেন।

ক্যাভেলিয়র দি'য়ন-এর নাম থেকে লিঙ্গ পরিবর্তনের ধারাকে 'ইয়নিজম' বলা হয়ে থাকে। ক্যাভেলিয়র দি'য়ন মেয়েদের মত পোষাক পরে মেয়ে সেজে বসলেও পুরুষালী গুণের তাঁর অভাব ছিল না। তিনি ছিলেন অসি ও অশ্বচালনায় সুদক্ষ, আর কেউ যদি তাঁর মেয়েলি স্বভাবের জন্য তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তিনি তা বরদাস্ত করতেন না। উপহাসকারীকে আহ্বান করতেন অসিযুদ্ধে। এমনি এক ডুয়েল লড়তে গিয়ে তাঁর মৃত্যুও ঘটে আত্মসম্মান রক্ষায়।

এমনি ধারা 'ইয়নিজমের' দৃষ্টান্ত ইয়োরোপে বিরল নয়। এ 'ইয়নিজম' কেবল পুরুষদের মধ্যে সংক্রামিত নয়, মেয়েদের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত হ্যাভলক এ্যালিসই প্রথম এ যৌন-রূপান্তর সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করেন। এ যৌন-পরিবর্তন প্রবণতাকে তিনি ইয়নিজম বলে আখ্যা দেন।

হ্যাভলক এ্যালিস মনে করেন, কোন নর বা নারীর আপনার আকাঙ্ক্ষিত জনের সঙ্গে আইডেন্টিফিকেশন বা একাত্মীকরণ করার প্রবল ইচ্ছাই হোল এ যৌন-রূপান্তরের মুখ্য কারণ। এর সঙ্গে রয়েছে অবশ্য পুরুষের দুর্বল যৌনক্ষমতা মেয়েভাবাপন্নতা আর আনুষঙ্গিক বিবিধ মেয়েলিপনা।

প্রসিদ্ধ জার্মান যৌনবিশারদ ডঃ মেঘনাস হার্সফেল সর্বপ্রথম এ যৌনরূপান্তর বা 'ট্রান্সভেস্টিজম' শব্দটি ব্যবহার করেন যৌন বিকৃতি প্রসঙ্গে। তিনি ঘোষণা করেন, যৌন-রূপান্তর যৌন-সকামতা থেকে ভিন্ন। দুটোকে এক পর্যায়ে ফেললে ভুল হবে। তিনি আরও মনে করেন, সমকামীরা যেমন যৌন-রূপান্তরকামী নয়, তেমনি যৌনরূপান্তরকারীরাই যে সমকামী তা ঠিক নয়। বিপরীত যৌনের প্রতিই ওরা তেমনি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট। ডঃ হার্সফেল যৌনরূপান্তরকে চারভাগে ভাগ করেছেন:

(ক) যৌন বহুমুখিতা,
(খ) সমকামিতা,
(গ) সকামতা,
(ঘ) যৌন-বিমুখতা।

ডঃ হিউগো বেইগেল তাঁর যৌন শিক্ষাকোষে যৌন-রূপান্তর ব্যাখ্যা করেছেন: 'মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরার প্রতি পুরুষের প্রবৃত্তি। তেমনি আবার পুরুষের বেশে সজ্জিতা হওয়ার মেয়েদের ইচ্ছা।'

ডঃ বেইগেলের মতে নরনারীর এই প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে তাদের সমকাম প্রবৃত্তি আর 'ফেটিশ-ইজম' বা একটু ছুঁয়ে বা একটুখানি যৌনসুখ চরিতার্থ করা। তিনি আরও মনে করেন, ছোটবেলা থেকে কোন ছেলেকে মেয়েদের পোষাক পরিয়ে রাখা, কিংবা তার মেয়েদের মত নাম রাখা অথবা বারবার তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা যে ছেলের চাইতে মেয়ে হয়ে জন্মালে তার ভাল হোত—এমনি ধারা বাপ মায়ের অসতর্ক কথাবার্তা হাবভাবে জাতক-জাতিকার মধ্যে যৌন-রূপান্তরের ইচ্ছা সঞ্জাত হয়ে থাকে।

প্রখ্যাত জার্মান মনোবিজ্ঞানী ডঃ উইলহেলম স্ট্যাকেল মনে করেন: যৌন-রূপান্তরের পেছনে জাতক-জাতিকার সমকামের সুপ্ত অভিব্যক্তি নিহিত রয়েছে। ইংরেজ যৌনবিদ ডঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেনও বিশ্বাস করেন যে, এ যৌন-রূপান্তরের মূলে রয়েছে সমকামের সুপ্ত অভিব্যক্তি। যারা যৌন-রূপান্তর করে থাকে তারা সকলে না হলেও বেশীর ভাগই কমবেশী পরিমাণ সমকামপ্রবণ। অবশ্য কোন কোন

ক্ষেত্রে এ প্রবণতা থাকে অবদমিত। বস্তুত, এটা একটা রোগবিশেষ। রোগী নিজেকে তার মায়ের অনুরূপ ভেবে থাকে এবং নারীসুলভ হাবভাব, চাল-চলন, পোষাক-আসাক পরে থাকে।

ডঃ বেঞ্জামিন কার্পম্যানও এ মতে বিশ্বাসী। তিনিও মনে করেন, উগ্র সমকাম প্রবৃত্তি এ যৌন-রূপান্তরের প্রতিনিধিমূলক অভিব্যক্তি। অবচেতন মনের কোণে থাকে সে ঘুমিয়ে। নেপথ্যগামী হবার শক্তি তার নেই।

ডঃ কেনেথ ওয়াকার অবশ্য মনে করেন, যৌন-রূপান্তরের এ যৌন পরিবর্তনের পশ্চাতে 'সামাজিক পরিবেশ' যতখানি আছে, অস্বাভাবিক যৌনতা ততখানি নেই।

সে যাই হোক, বিশিষ্ট মনোবিশেষজ্ঞ ড্যাভিড কেলার এ যৌন-রূপান্তরের ইচ্ছাকে শারীরিক ব্যাধি বলে অভিহিত করেন এবং জানান যে, এ প্রবণতা বাতুলতা নয়। যৌন-রূপান্তরকারী জাতকের 'পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড'-এর কিছু একটা বিচ্যুতি ঘটেছে বলেই পুরুষের শরীরে স্ত্রী যৌন হরমন ক্ষরিত হয়ে থাকে। এক্স-রে পরীক্ষা আর শল্য-চিকিৎসায় এ গ্ল্যাণ্ডকে নির্ণয় করা যেতে পারে। তা হলে হয়ত রোগ ধরা পড়বে। টিউমার জাতীয় কিছু একটা খুঁজেও পাওয়া যাবে। সমকাম এ শ্রেণীর যৌন-রূপান্তরকারী পুরুষের মত কোনরূপ যৌনবাসনা থাকে না বরং চায় পুরুষের প্রেম সাহচর্য লাভ করতে, সন্তানও তারা কামনা করে থাকে এবং চায় জননীর মত তাকে লালন-পালন করতে। কিন্তু তাদের এ ইচ্ছা পূরণ হয় না নিজেদের দেহের পুরুষাঙ্গের জন্য। দেখা যায় তাদের প্রায় স্মৃতিভ্রম ঘটে থাকে। ক্রমাগত মাথাধরার অভিযোগও করে থাকে অনেকে এবং এ মাথাধরার সঙ্গে সঙ্গে তিন দিন ধরে তাদের মলদ্বার দিয়ে ঋতুস্রাবও হয়ে থাকে। প্রতি মাসে এমনি ধারা নিয়মিত মাথাধরা ও ঋতুস্রাবের কথা জানা যায়।

নিউ ইয়র্কের এক ভদ্রলোক মনে করতেন তিনি বুঝি স্ত্রীলোকে পরিবর্তিত হতে চলেছেন। আশংকা করতেন, তিনি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। তাই ঘরের বাইরে তিনি আর পা বাড়াতেন না বড় একটা। একা একা থাকতে ভালবাসতেন। মেয়েদের পোষাক পরে থাকতেন।

আইওয়ার আর এক ভদ্রলোকও এমনধারা নারী জীবন যাপন করতেন দূর-প্রান্তরের এক নির্জন গোলাবাড়ীতে। তিনিও মনে করতেন তিনি নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন। মেয়েদের মত পরিবর্তনও তিনি লক্ষ্য করতেন আপন শরীরে। সাধ যেত তাঁর মা হতে। সন্তান লালন-পালন করতে।

দক্ষিণ অঞ্চলের এক ভদ্রলোক সংবাদপত্রে পত্র লিখে জানতে চান তিনি প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে তাঁর দেহের পুরুষাঙ্গগুলি অপসারিত করে তার স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করা যায় কি না। আজ তাঁকে অবশ্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে হোত না। তিনি তাঁর নিকটতম ক্লেমথ ক্লিনিকেই মনের বাসনা পরিপূর্ণ করতে পারতেন।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে এ শ্রেণীর লোককে বাতুল বলে হয়ত উড়িয়ে দেওয়া যেত এবং উন্মাদাগারে হয়ত পাঠান হোত। কিন্তু আজ যুগ পাল্টিয়েছে। শরীর-বিজ্ঞানের হয়েছে অগ্রগতি। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও সমস্যাটি বিবেচনাধীন। এ শ্রেণীর মেয়ে-পুরুষগুলিকে যদি জোর জবরদস্তি করে পুরুষের হরমন প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ওরা বেঁকে বসবে। মেয়েলিপনা ছেড়ে ওরা যখন কিছুতেই পুরুষ বনতে চাইবে না, তখনই ওদের উপর জোর-জবরদস্তি করতে গেলে তাদের মানসিক শান্তি ও ধৈর্য বিঘ্নিত হবে। সুতরাং যাতে ওদের তৃপ্তি তাই করতে দেওয়া বিধেয়। নতুবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধেও তাদের হস্তক্ষেপ করা হয়।

তবে এ সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্লাস্টিক সার্জারীর দৌলতে যত বিস্ময়কর যৌনরূপান্তরই না সংঘটিত হোক, এ সমস্যার সমাধান এখনও সুদূরপরাহত। হাজার রূপান্তরই ঘটুক পুরুষ পুরুষ এবং নারী নারীই শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। নারী-পুরুষে এবং পুরুষ নারীতে পরিবর্তিত হয় না কোনদিন পুরাপুরি। সন্তান ধারণ বা সন্তান প্রজননের ক্ষমতা সে লাভ করবে না। বাসনা তার মনের কোণে ঘুমিয়ে থাকবে চিরদিনের মত। খৃস্টিন জরগেনসেনের আত্মকথাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

টেলিফটোতে এক্স-রে

অনেক সময় এমন হয় যে এক্স-রে ছবি তোলা হল, কিন্তু বিশেষজ্ঞ দূরে থাকার দরুণ রোগনির্ণয় করতে দেরী হয়। ডাকে পাঠান সময়-সাপেক্ষ এবং হারিয়েও যেতে পারে।

এ অসুবিধা বর্তমানে দূর করার ব্যবস্থা হয়েছে আমেরিকায়। নতুন এক উপায়ে টেলিফটো পদ্ধতিতে এক্স-রে ছবি মুহূর্ত মধ্যে দূরে বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি উইস্কন্‌সিন্‌স্থিত ইউনাইটেড্ প্রেস্ ইণ্টারন্যাশনাল্ সংস্থা একখানি এক্স-রে ফটো টেলিফটো সহযোগে তাদের শিকাগো অফিসে পাঠিয়েছেন। দূরত্ব ২৪০ মাইল। পাঠাতে লেগেছে কয়েক মিনিট মাত্র।

শিকাগোর যন্ত্র ছবিটির একখানি নেগেটিভ তৈরী করে একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে দেখান, যাঁর কাছে অরিজিন্যাল নেগেটিভও ছিল। তিনি বলেছেন যে টেলিফটোতে পাঠান ছবি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এবং এর থেকে অনায়াসেই রোগনির্ণয় সম্ভব।

এর আগে, ১৯৬৩ সালে, একই পদ্ধতিতে হৃদয়স্পন্দনের আলেখ্য (ইলেক্‌ট্রোকার্ডিয়োগ্রাম) টেলিফটো দ্বারা দূরে পাঠান হয়েছিল, যা আজ সর্বত্র করা হচ্ছে। কিন্তু এক্স-রে ছবি এই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে একই পদ্ধতিতে পাঠান হল।

উত্তর আফ্রিকার উপকূলে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সরকারী আরেকটি দপ্তরে আমার তরুণ বন্ধুরা নিয়ে গেল ঐ রোদে। এরা সুহাসকুমারের বন্ধু। ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং আমায় নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করতে বললাম যে আগে থেকে রাতের আহার বেনগাজিতেই ঠিক আছে। ওরা সরকারী গাড়ীতে আমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সন্ধ্যার বিমান ধরার জন্য হোটেলের হিসেবপত্র চুকিয়ে লাউঞ্জে ব'সে আছি---কখন বিমান বন্দরের বাস আসে। তাদের আগে থেকেই বলা আছে। সোফায় বসে বসে লোক-জনের যাতায়াত দেখছি। কত রকম বেশভূষা, কত রকম ভাষায় কথোপকথন। এখানে কেউ স্থিতিবান নয়। নানা উদ্দেশ্যে নানা দিক থেকে লোক আসে আর যায়। ছুটেছে কেউ সরকারী দপ্তরের দিকে, কেউ আবার তেলকূপের দিকে। বিরাট এক কর্ম-চঞ্চলতা—ওই দিল-মেহেরী হোটেলকে কেন্দ্র ক'রে।

বেনগাজি

বর্তমানে 'বেইদা'কে রাজধানী বলে ঘোষণা করা হলেও বেনগাজি ছিল

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

লিবিয়া রাজ্যের রাজধানী। ত্রিপলীও এর সহমর্যাদার দাবী করে। বেনগাজি খ্রীস্টজন্মের ৪৬৬ বর্ষ আগে স্থাপিত হয়। এই স্থানটির খ্যাতি ছিল ভাল কম্বলের জন্য।

কিংডম অব লিবিয়ার বিমানে ত্রিপলী থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (১৪।৭।৬৬) বেনগাজি পৌঁছিলাম। বিমান বন্দরে আমাকে নিতে এসেছিল লিবিয়ার একজন মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমান সুহাস ও তার বন্ধু আশীষ। কনিষ্ঠরা থাকলে আমাকে আমার আধমণী ব্যাগটার মুটেগিরি করতে হয় না; ওটাই আমার বিশেষ লাভ।

'এই কুলি---ইধার আও' ব্যাপার আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলেও নেই। লিবিয়ার সরকারী অফিসে পিওন আছে—তাদের দিয়ে যখন তখন চা, পান, সিগারেট আনানো চলবে না। তারা দেশী লোক, বিদেশীর জন্য কাজ করছে এই যথেষ্ট বলে মেনে নিতে হবে।

মুসলমানপ্রধান রাজ্য, তাই শুক্রবার ছুটির দিন। অতএব ঠিক হল যে, আমরা শুক্রবার বেনগাজি সহরটা ঘুরে ফিরে দেখে নেবো এবং কায়রো যাবার বিমানের টিকিটটা পাকা করে [illegible] পৃথিবী পরিক্রমার
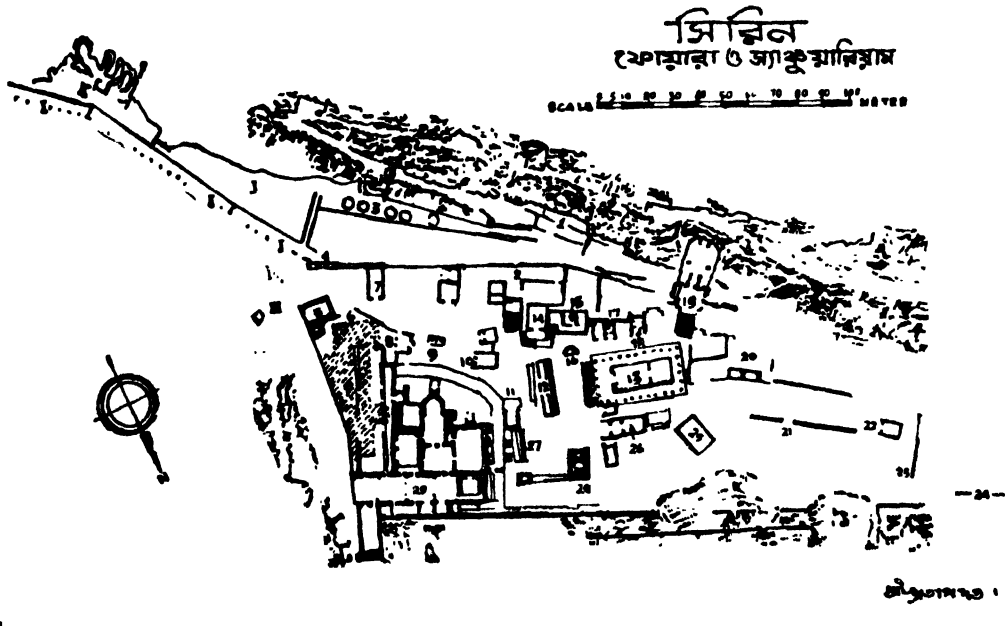
টিকিটের শেষ অংশটুকুতে শিক্ষকের নির্দেশ দেওয়া ছিল না।

আশীষ পূর্বনির্দেশ মত তার গাড়ী নিয়ে শুক্রবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ সুহাসের বাড়ীতে এসে হাজির।

আমরা তিনজনে বেরুলাম সহর পরিক্রমায়। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত জনসংখ্যায় এটি লিবিয়ার দ্বিতীয় সহর ও বন্দর। লিবিয়া তিনটি প্রদেশে বিভক্ত—পশ্চিম 'ত্রিপলিতানিয়া', পূর্বে 'সাইরেনাইকা' ও দক্ষিণে 'ফেজ্জান'। ত্রিপলিতানিয়ার রাজধানী 'ত্রিপলী' যার সঙ্গে দ্বিতীয় মহাসমরের সময় কত যে নাম জড়িয়ে আছে তার অবধি নেই। সাইরেনাইকার বর্তমানে রাজধানী—'বেনগাজি'।

এর কথা গত মহাযুদ্ধের সময় রেডিও ও খবরের কাগজের পাতায় প্রচুর প্রকাশিত হত। বর্তমানে লিবিয়া রাজ্যের নতুন রাজধানী 'বেইদা' (Beida)। ফেজ্জান প্রদেশের রাজধানী 'সেবা' বা 'শিবা' (Sebha)। রাজা মহম্মদ ইদরিস্ সেনুশীর অল্পদিনের রাজত্বে লিবিয়া রাজ্যে অদ্ভুত ভাগ্যপরিবর্তন এসে গেছে। উন্নয়নের বহু কাজ এঁরা হাতে নিয়েছেন এবং বড় করে কিছু করার নেশা এঁদের পেয়ে বসেছে। যেখানে লিবিয়ার অধিকাংশই ৯০ % মরুভূমি, যেখানে স্থানীয় বেদুইন শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে কর আদায়ের কোন ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল না ও বর্তমানে নেই, সেখানে এত বড় বড় কাজ হবে কোথা থেকে ?

বছর আটেক আগে বেনগাজির দক্ষিণ অঞ্চলে মাটির তলায় তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। নানা দেশ থেকে লোক এসেছে 'তরল সোনার' সন্ধান পেয়ে। ইটালিয়ান উপনিবেশের সময় এখানে গ্যাস ও তেল পাওয়ার সম্ভাবনার কথা তারা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবে নি। সেখানে এই নব আবিষ্কার লিবিয়ার আর্থিক জগতে এক বিরাট বিপ্লব এনে দিয়েছে। তার মুনাফা যৎসামান্যই প্রকৃত লিবিয়ার
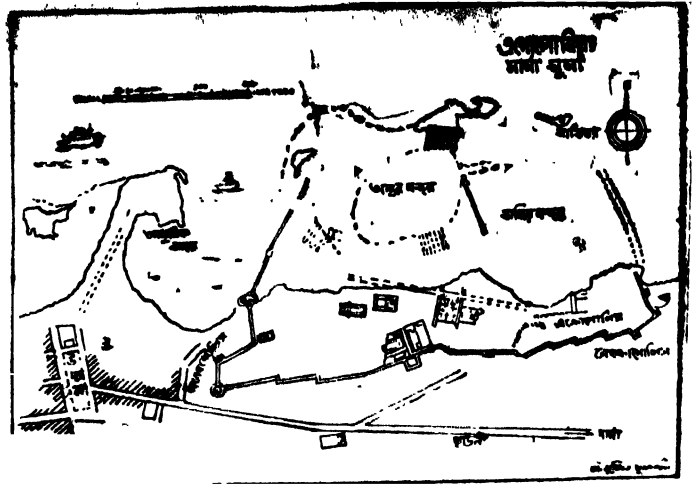
ভাগ্যে জোটে। লিবিয়ার দক্ষিণের মরুভূমির তেলের খনি থেকে কাঁচা তেল নল বেয়ে সমুদ্রতীরে পাঠিয়ে জাহাজে ভরে বিদেশে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীতে চালান দেওয়া হচ্ছে। সামান্য ভগ্নাংশমাত্র লিবিয়া পায় কাঁচা তেলের 'রয়েলটি' হিসেবে। এখানে এই ছ'বছরেও একটিও তেল পরিষ্কার করার কারখানা (OIL REFINERY) বা PETRO CHEMICAL ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠলো না, যার ফলে লোকের আরও কাজ হতে পারতো, দেশের আয়ও বাড়তো, দেশের সম্পদ দেশেই থাকতো।

তবুও বর্তমানে যিনি রাজা তিনি সাদা-সিধে মিতব্যয়ী লোক। ওঁর নিজের জন্য হয় সামান্যই ব্যয়—আওরংজেবের মত, ইংলণ্ডের রাণীর বা রাজার মত নয়। বিগত মহাযুদ্ধের পরে ইতালিয়ানদের আওতা থেকে যখন লিবিয়া মুক্তি পেল, তখন কিছুকাল লিবিয়াকে 'উনো'র

ভূমধ্যসাগরের উপকূলে

(বিকল্পে উনোর হ'য়ে ইংরেজের আওতায় থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু আয়পত্র কিছু না থাকায় লিবিয়া রাষ্ট্রসংঘের এক অকারণ কাঁধে বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বর্তমানে রাজা ও তাঁর দল বিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন ও ইংরেজরা এদের গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতেন বলে জনশ্রুতি।

বর্তমানে রাজা নানা Tribal দল থেকে মনোনীত হয়েছেন। ওঁর ঠাকুরদা ছিলেন একজন বিখ্যাত আরবী-জানা পণ্ডিত ব্যক্তি। বংশানুক্রমিক রাজা নন এঁরা। প্রথমেই পূর্ণ গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র যে লিবিয়ায় একেবারে চলবে না, সবাই তা' বুঝেছিল। তাই নবাব, বাদশাহ, সুলতান বা রাজা। তিনটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে এই রাজ্যকে বলা হয় লিবিয়া যুক্তরাজ্য (United Kingdom of Libya)।

এখানে পার্লামেণ্ট আছে, মন্ত্রিপরিষদও আছে। শাসনের মুখ্যভার মন্ত্রীদের। অধিকাংশ আদি অধিবাসীও আজও বেদে ও বেদুইনের জীবন কাটায়। যারা কিছু উচ্চশিক্ষা পেয়েছে—তাদের আজ পোয়াবারো। এদের কাউকে ক'রে দেওয়া হয়েছে এক-একটি দপ্তরের অধিকর্তা।

অনেক ক্ষেত্রে চ্যাংড়া ছোকরা—যার কোন অভিজ্ঞতা বা মুখ্যজ্ঞান নেই, তাকে অভিজ্ঞদের উপরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—কেননা তারা স্বদেশীয় লিবিয়ান। তারা লিবিয়ান রীতিতে মাইনে পায়

অত্ত সামান্য, বিদেশীদের চেয়ে ঢের কম। যারা উপরি আয়ের ফন্দিফিকির জানে, তাদের 'গোপাল ভাঁড়ের' মত মাইনে ছাড়াও রোজগারের জন্য অন্য সময়ে অন্য কাজেও বা অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হতেও বাধা নেই। সরকারী কাজ ছাড়াও অন্য সময়ে অন্য কাজেও বা অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হতেও বাধা নেই। তাদের অধীনে বছরে ২৫০০।৩০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত মাইনে পাচ্ছে প্রচুর বিদেশী। তাদের কাজের সঙ্গে বিশেষ ক্ষেত্রে যখন মনের মিল হয় না, তখন তাদের মাঝে মাঝে আকারে ইংগিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ বলে আনা হয়নি। লিবিয়ান সরকার যাঁকে যখন যেমন কাজ করতে বলবেন তখনই তাঁকে, তেমনই করতে হবে।

একজন তরুণ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার আমায় নালিশ জানালেন যে, তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে না; যেমন—যে লোক বন্দর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মরুভূমিতে তেলের খনির কাজে।

আমি, বলি—কেন ক্ষুণ্ণ হচ্ছ, ক্ষতি কি ?—জলের সমুদ্র না হয়ে এ বালির সমুদ্র—এইতো তফাৎ। মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের সেই মজার গল্প—

আগেকার দিনের জমিদার-বাড়ীতে সাহেব কোচম্যান রাখার রীতি ছিল। বিরাট উদিপরা কোচম্যান ফিটন গাড়ী চালিয়ে চলেছে। ভিতর থেকে জমিদারবাবু সাহেব-কোচম্যানকে 'লেফট্ স্যার, রাইট স্যার' বলে রাস্তার নির্দেশ দিচ্ছেন।

সাহেব গাড়োয়ান বিরক্ত হয়ে বললো 'আই নো মাই বিজিনেস-বাবু' (I know my business, Babu)। সে রকম দশাও অনেক দেশীয় অধিকর্তার ভাগ্যে জোটে।

মধুর নেশায় ছুটে এসেছে ইংরেজ, আমেরিকান, ইতালিয়ান, চেক্, যুগো-শ্লাভ, গ্রীক্, মিশরী, পাকিস্তানী, ভারতীয় প্রভৃতি। লিবিয়ার হুইলাস বিমান-ক্ষেত্রটি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আমেরিকার বৃহত্তম বিমানক্ষেত্র। এখানে ইংরেজেরও সৈন্যাবাস আছে। রাজা অধিকাংশ সময় থাকেন 'তবরুকে'। তাছাড়া তাঁর থাকার জন্য বাড়ী ত্রিপলী, বেনগাজী, বেইদা প্রভৃতি স্থানে আছে। এখানে প্রাচীন স্থানীয় লোক বেদুইনের জীবন যাপন করে।

প্রশস্ত পীচে মোড়া পথ দিয়ে যেতে মাঝে মাঝে দেখা যায় বিরাট তাঁবু। সেখানে বেদুইনরা বিশেষ বিশেষ দলে বাস করে। তাদের সঙ্গে থাকে ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট, কুকুর।

ভগ্নস্তম্ভ

বিশেষ দলের চিহ্ন হিসেবে দাড়িতে নানারকমের দাগ বা উল্কি আঁকা। তাই থেকে বোঝা যাবে কে কোন্ দলের ?

তেল আবিষ্কারের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই সব প্রাচীন অধিবাসীদের যে কিছু উন্নতি হল, তা বোঝা আদৌ যাচ্ছে না। এই ফাঁকে অর্থনৈতিক লুণ্ঠন যে চলেছে, তা' অতি বড় মূর্খও বোঝে। তবে একটা উন্নতি দেখলাম—যে ড্রাইভার পিওন এখানে আছে, তারা একটু মর্জিতে চলে। কেননা এটা তাদের যে নিজের দেশ—এ চেতনা অতি সুস্পষ্ট। নিয়মানুবর্তিতার কোন বালাই বা প্রয়োজন যে তাদের নেই, এই রকম ভাবগতিক সুস্পষ্ট, ভাবখানা এই যে 'যা করে দিচ্ছি তাই যথেষ্ট মনে করে খুশি থাকো।'

বেনগাজি শহর ভূমধ্যসাগরের উপকূলে একটা সুন্দর বন্দর। এর জন-সংখ্যা মাত্র দেড় লাখ। এই বন্দর উন্নয়নের কাজ দ্রুতবেগে চলেছে। ঘর-দোর, পাঁচিল ভেঙে রাস্তা চওড়া হচ্ছে। নতুন বাড়ি, নতুন রাস্তা, নতুন জলকল নতুন মসজিদ নির্মাণ পূর্ণবেগে চলেছে।

বন্দর পরিদর্শনে গিয়ে দেখি—কংক্রীটের টেট্রাপড দিয়ে সাগরের আছড়ে-পড়া ঢেউ-ভাঙ্গার ব্যবস্থা হয়েছে। ছোট ও মাঝারি জাহাজ এখানে আসে। প্রায় সব জিনিষই এখানে চালান আসে।

দেখলাম, একটা জাহাজ থেকে কাগজের বস্তায় সিমেণ্ট নামানো হচ্ছে। ইটালী থেকে এসেছে। দুধ, আইসক্রীম, মাংস সবই আসে বিদেশ থেকে রপ্তানী হয়ে। সেদিন আমরা দোকানে থেকে বিলিতি (U K মার্কা) আইসক্রীম কিনে নিয়ে এলাম। বন্দরের গা দিয়ে রেল লাইন এতদিন পাতা ছিল। মাসখানেক হল, তা' তুলে দেওয়া হয়েছে। লাইন এখনও পাতা আছে। এর অর্থ হল যে, সারা লিবিয়া রাজ্যে কোন রেলগাড়ী নেই, ট্রামগাড়ী নেই, ট্রলী বাস নেই। শুধু ডিজেল ও পেট্রোল দিয়ে চালানো যতসব গাড়ী ও যন্ত্রপাতি আছে। আর তার বিশেষ মূল্য আছে। তাই বলে লিবিয়ার তেলের কুয়ো থেকে তেল তোলা হচ্ছে বলে পেট্রোল এখানে সস্তা নয়। এই অপরিষ্কার (Crude) তেল দেশের বাইরে গিয়ে পরিশোধিত হয়ে আবার পরিশোধিত তেল লিবিয়ায় চালান আসে। ফলে বেশী মূল্য দিতে হয়।

আমেরিকার মত তেল এখানে এত সস্তা নয়। সমুদ্রের ধার দিয়ে চওড়া রাস্তা—তার দু'পাশে খেজুর ও করবী ফুলের গাছের সারি। মাঝে মাঝে ইউ-কেলিপটাস্ ও ফুলের গাছের মধ্যে লাল, গোলাপী ও সাদা করবীর প্রচুর বিলাস। ভারতের বাইরে মধ্য আমেরিকার মায়াসভ্যতার দেশে এই করবীর প্রচুর প্রকাশ দেখেছি। আর দেখলাম উত্তর

আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলভাগেরও সহরের শোভাবর্ধন করতো। এখানে ডিজেল তেল দিয়ে চালানো 'পাওয়ার হাউসে' বিদ্যুৎ প্রস্তুত হয়। খানিকটা জলাজমি বোজাই করার পর্ব চলেছে। বেলে ও পাথুরে মাটি কেটে Well Point ও Steel Shuttering লাগিয়ে ময়লা জলের নল বসানোর পর্ব চলেছে। যেহেতু এখানে পার্বত্য নদী বা হ্রদ নেই, তাই ভূমধ্যসাগরের নোনা জলের বদলে কতকগুলো গভীর নলকূপ থেকে জল সংগ্রহ করে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। জলের পাইপ সহরের নানা জায়গায় বসানো চলেছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে মাড়োয়ারীদের বাড়ীর মত কারুকার্যখচিত জাফরী ও রংয়ের প্রকাশ বস্তুসবিশিষ্ট বাড়ী গড়ে উঠেছে। জোড়াগম্বুজ দেওয়া মসজিদের সংস্কার চলেছে এখানে ছোট একটি নগরকেন্দ্র (City centre) আছে। সেখানে মোটর গাড়ী রাখলে 'পার্কিং মিটারে' মুদ্রা ফেলতে হয়, নইলে জরিমানা।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীর জীবনাহুতি দিয়েছিলেন সেই 'ওমর মোক্তারে'র গম্বুজ দেওয়া আটকোণা স্মৃতিমন্দির দেখতে গেলাম। অল্প খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে চাতালে উঠলাম। বিরাট চাতাল চেন দিয়ে ঘেরা। এই বীরকেই ইতালিয়ানরা উড়ন্ত বিমান থেকে দরজা খুলে ঠেলে ফেলে দেয়।

রোমান নৃশংসতার রক্ত আজও

ক্লিওপেট্রার স্নানাগার

ইতালীবাসীর ধমনীতে যে বিদ্যমান, তা' বর্তমান সভ্যতার ধারায় নৃশংস ও নিন্দনীয়, তবুও তা' মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এরাই প্রায় দু'ই হাজার বছর আগে যীশুখৃস্টকে কাঠের ক্রুশে পেরেক মেরে' মেরে' ফেলেছিল। খৃীস্ট-বিশ্বাসীদের হিংস্র সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে আনন্দে উল্লসিত হত। তারই শেষ রেশ মাঝে মধ্যে দুর্বল মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নইলে অধিকাংশ ইতালিয়ানরা স্বভাবে বিনয়ী ও ভদ্র। এদের ইউরোপের 'উড়ে' বলা যেতে পারে।

এইতো অধ্যাপক 'উগলিনী' যিনি আমাকে রোমের নানা জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। এইতো সেদিন রোমে বার্তোলিনী আমাদের সঙ্গে নানা কাজের বিষয় আলাপ-আলোচনা করলেন কত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে—যা থেকে এরকম আচরণের প্রত্যাশা স্বপ্নেও হয় না। এদের দেখে ইতালীর পাষণ্ডমূর্তির কথা মনে হয় না, বরঞ্চ অতি নম্র ও বিনয়ী বলেই মনে হয়। তবে, মানুষ এক অপূর্ব জীব। ভাব-অভিব্যক্তির অভিনয়ে এরা অতুলনীয়।

এবার বেনগাজির যুদ্ধে মৃতের কবরখানায় গেলাম। সেখানে রয়েছে খৃীস্টানদের গোর, মুসলমানদের গোর ও হিন্দু মৃত সৈনিকের স্মৃতিফলক যাতে লেখা আছে 'ওঁ ভগবতে নমঃ'। এর মধ্যে বিখ্যাত ফলকটি হল এক তরুণ ইংরেজ M. C., V. C (মিলিটারী ক্রস ও ভিক্টোরিয়া ক্রস) যে রোমেলকে হত্যা করতে এসে নিহত হয়। ইংরেজ এই নামের তালিকা প্রকাশ করেছে নিজ ব্যয়ে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই তালিকার নাম হল:—

The war deads of the British Commonwealth and Empire.

The Register of the names of those who fell in 1939-45 war and are buried in Cemeteries of Libya.

Benghazi War Cemetery.

The Imperial War Graves.

এখানে দর্শকদের মন্তব্য লেখার বই রাখা আছে। তাতে একটা সই করে দিলাম। বেলা দুপুর পার হয়ে যাওয়ায় মাথায় চনচনে রোদ। আমরা এখান থেকে আমাদের বাসায় ফেরবার পথে চললাম।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

তামা পুনরুদ্ধার

ফেলে দেওয়া ইলেক্ট্রিক তার ও অন্যান্য বস্তু থেকে মূল্যবান তামা পুনরুদ্ধারের এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এক আমেরিকান সরকারী সংস্থা। এঁরা বলছেন যে, কোটি কোটি টাকা মূল্যের তামা আবার বার করে ব্যবহার করা যাবে এবং এতে খরচও পড়বে খুবই কম। আগেকার পদ্ধতি ছিল জবড়জঙ্গ এবং ব্যয়বহুল, যার জন্য এসব ফেলে দেওয়া হত এবং কোটি কোটি টাকার তামা (যা পৃথিবীতে কমই পাওয়া যায়) নষ্ট হয়ে যেত।

সমস্যাটা হচ্ছে, লোহা ও অন্যান্য ধাতব অংশ থেকে অল্প খরচে তামাটা আলাদা করে নেওয়া। আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে—টুকরো টুকরো পরিত্যক্ত ধাতব অংশগুলিকে গলিত লবণ, বেরিয়াম্ ক্লোরাইড্ ইত্যাদিতে ডুবিয়ে বেশ কয়েক মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করা হয়। এই দ্রবণ উত্তপ্ত হতে হবে, এবং লোহা ও ইস্পাতের কোন ক্ষতি না করে কেবলমাত্র তামাকে দ্রুত গলিয়ে দেয়। তামার বিন্দুগুলো ক্রমে ক্রমে নীচে গিয়ে জমা হয় এবং সহজেই ছেঁকে পৃথক করা যায়। জাম্বিয়ার নির্গমন পথ আগলে রয়েছে রোডেশিয়া এবং আকাশপথে যথেষ্ট তামা রপ্তানী সম্ভব নয়। এ অবস্থায় এই নতুন পদ্ধতিতে পৃথিবীর তামার ক্ষুধা মিটবে বলে আশা করা যায়।

কেশ-কোষ

অরুণ চৌধুরী

যে-কোনও মহিলার বর্ণনায় প্রথমেই আসে চুলের কথা। বস্তুত চুল সৌন্দর্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ। কালো হয়ত মন্দ, কিন্তু কেশ পাকলে মনোকষ্ট হবেই। এ সম্পর্কে আমরা কতটুকু। খানি জানি?

দশ ইঞ্চি লম্বা চুল আলতো ক'রে দু'দিকে টানলে দু' ইঞ্চি বাড়ে। ছেঁড়ে না। ছাড়লেই পুনর্দশ ইঞ্চি। প্রকৃতপক্ষে চুল ধ্বংস হয় না। দু' হাজার বছরের পুরনো মিশরীয় মামী-র চুল কোন কোন ক্ষেত্রে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

চুলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য শুষে নেওয়ার ক্ষমতা। কেশবতী কন্যা আধকাপ জল চুলে ঢেলে ধীরে ধীরে চুল নাড়লে সবটুকু জল শুষে যায়, গলা পর্যন্ত একফোঁটাও পৌঁছোয় না।

আমরা জানি চুল দেহত্বককে ধুলো আর রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। মাথার চুল সুন্দর এবং তা মাথাকে বাঁচায়ও বটে। সাধারণত মাথায় আশি হাজার থেকে একলক্ষ চল্লিশ হাজার চুল থাকে এবং কোন দু'টি চুলের মাথা এক নয়। পার্থক্য একাধিক—রং, বুনন, ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য এবং মাপে।

মানবিক চুলের দু'শ' রং ভেদ আছে—ঘন কালো আর টকটকে লাল এবং সোনালী থেকে ধবধবে সাদা পর্যন্ত; মধ্যে অসংখ্য রং-এর মেলা।

এত রং-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিশুদ্ধ নিগ্রোর চুল কালো হবেই। পীতজাতির মধ্যেও এটি চোখে পড়ে। রং-বাহার য়ুরো-আমেরিকার লম্বা নরম চুলওলা মানুষদের মধ্যেই বেশি।

চুল চিরে অনুবীক্ষণের তলায় ফেললে দু'টো স্তর দেখা যায়: ছিটে-দেওয়া আভ্যন্তরীন কোষ ঘিরে বাইরে-কার কোষ—শিঙারমত দেখতে। প্যাপিলার ঠিক ওপরে অনবরত কেশ-কোষ তৈরি হচ্ছে, ফলিকল্-এর তলায়। নতুন কোষ বেড়ে উঠে পুরনো 'মরা' কোষ ঠেলে ফেলে দেয়। আড়াই মাসে এই হার এক ইঞ্চি।

আমেরিকানদের চুল সেরা জাতের নয়, নরম চুল তৈরী হয় মধ্য এবং দক্ষিণ য়ুরোপ-এর মেয়েদের চুল থেকে। বিশেষত চাষী-মেয়েদের চুল যেমন ঘন, তেমনই সুস্থ, বুনন ভাল, চাকচিক্যও বেশি। এদের অনেকে পুরুষানুক্রমে আমেরিকার বাজারে বিক্রির জন্য যত্ন ক'রে চুল বাড়ায়।

চুল থেকে খুনের কিনারা করা সম্ভব। হয়েওছে। কেন না, প্রকৃতি জাতি-ভেদে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। নিগ্রোর কালো কোঁকড়ান চুল আমেরিকান ইন্ডিয়ান, চীনা বা অন্যান্য এশীয়দের সোজা কালো চুলের থেকে পৃথক। ব্লন্ড নরডিক্দের চুল ভিন্নতর। এ থেকে জাতিগত পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল জাতি নয়, রং, লিংগ, এমন কি বয়সের আন্দাজও চুল থেকে পাওয়া যায়।

তবে একই মাথার ভিন্ন অংশে ভিন্ন ধরণের চুল থাকা অসম্ভব নয়। আবার দু'জনের একই জাতের চুল থাকাও সম্ভব। তাই, শুধুমাত্র চুল পরীক্ষা করে ষোল আনা নির্ভুল সিদ্ধান্ত হয় না।

অধিকাংশ মানুষ নিজেদের চুল সম্বন্ধে দু'টি কথা জানতে ইচ্ছুক—

১। চুল কী ভাবে তাদের চেহারাকে প্রভাবিত করে;

২। চুল উঠে যায় কেন?

টাইফয়েড জাতীয় জ্বর, এক্জিমা জাতীয় চর্মরোগ, উপদংশ বা যক্ষ্মা, কিংবা মাথার খুলির কোনও বিপজ্জনক রোগের ফলে চুল উঠে যায়। কখনও কখনও টক্সিক্ ওষুধ গরহজম বা স্নায়বিক ধাক্কা, বা সংক্ষোভজ উদ্বেগের ফলেও চুল ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে নতুন চুল গজায়।

অনেক সময় মেয়েদের মাথার চারপাশ থেকে কিছু কিছু চুল উঠে যায়—কৃত্রিম উপায়ে চুল কোঁকড়ানর প্রায় অবশ্যম্ভাবী ফল। কেউ কেউ মাথার কোনও বিশেষ অংশ খোঁটেন—সেখানটায় টাক পড়ে যায়।

উত্তরাধিকারসূত্রেও কেউ কেউ কেশহীন। এরা সংক্ষোভজ উদবেগে ক্লিষ্ট হয়—নিজেদের কখনও আর পাঁচজনের সঙ্গে একই রকম ভাবতে পারে না বলে।

কিন্তু সাধারণত টাক পড়ে জন্মসূত্রে। খুস্কি বা অন্য কিছু ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করে মাত্র। আজও এর কোনও ফলপ্রদ প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি।

চুল বাড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে। শরীরের অন্যান্য অংশ যখন বয়সের ভারে কুঁচকে যায়, তখনও চুলের বৃ[illegible] অব্যাহত থাকে। হাত এবং পায়ের নখের মত চুলও স্নায়ুহীন, কাজেই কাটলে বা পোড়ালে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। এবং নখ, ঠোঁট, চোখের মণি হাতের তালু আর পায়ের তলা ছাড়া সর্বাঙ্গে চুল গজায়।

চুল সম্পর্কে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রীতিমত স্পর্শকাতর—আমাদের চোখে চুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-উপচার কেশবতী কন্যার স্বপন আজও অক্ষয়।

কুমারেশ ঘোষ
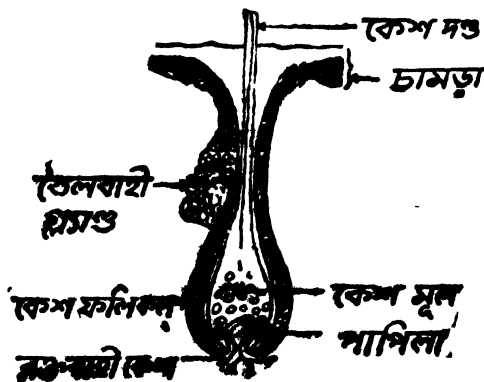
মিথিলায় জনকরাজার কন্যা সীতার স্বয়ম্বর সভায় শ্রীরামচন্দ্র যখন হরধনু ভঙ্গ করিলেন, তখনই একটা বিরাট শব্দ হইল মড়মড় মড়াত্।

সেই শব্দে কৈলাসাধিপতি মহাদেবের ঘুম গেল চটকাইয়া। তিনি বাঘছালটা কোনরকমে ভুঁড়িতে জড়াইয়া লইয়া কৈলাস শিখরে গিয়া উঠিলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার তৃতীয় নয়নের ফোকাস ফেলিয়া দেখিলেন, মিথিলায় জনকরাজার সভায় অযোধ্যার রাজা দশরথের শ্যামলা ছেলেটা রাম তাঁহার দেওয়া ধনুকটা দুই আধখানা করিয়া ভাঙ্গিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। আর জনকরাজার কুড়াইয়া-পাওয়া মেয়ে সীতা একগোছা মালা হাতে ঝুলাইয়া ও ঠোঁটে হাসি মাখাইয়া রামের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। পাশে লক্ষ্মণদাদার বিক্রমে আনন্দে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া নাচিতেছে এবং সভাস্থ রাজন্যবর্গ রামের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে—হাঁ হতভম্ব।

কৈলাসপতিও প্রথমে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন পরে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন এবং তখনি ত্রিশূল হাতে এক হুংকার দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন সোজা মিথিলার স্বয়ম্বর সভায়। ঝাঁকুনিতে কৈলাস পর্বত কাঁপিয়া উঠিল। পার্বতী হায়-হায় করিয়া উঠিলেন। নন্দী-ভৃঙ্গীর ভাঙের নেশা গেল ছুটিয়া। আর মহাদেবের ষাঁড়টা ক্ষেপিয়া গিয়া ল্যাজ উঠাইয়া ও শিং নাড়িয়া সারা পর্বতময় ছোটাছুটি করিতে লাগিল।

উমাপতি স্বয়ম্বর সভার মাঝখানে ধপ করিয়া পড়িয়াই তাঁহার খাটো বাঘছালটা সামলাইয়া লইলেন। পরে রামচন্দ্রের দিকে ত্রিশূল তাক করিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, আরে রে পাপিষ্ঠ পাপাচার। আমার ধনুক ভাজিলি কেন? ধনুক ভাজিয়া আমাকে অপমান করিলি—এত বড় সাহস।

তাঁহার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া সভাস্থ সকলেই থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রামের কাঁপুনিই বেশি দেখা গেল। সীতার গেল মুখ শুকাইয়া। তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল বরমাল্য। এ কী ফ্যাসাদ।

তবে সহসা একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শূলপাণি হঠাৎ 'ওঃ' বলিয়া হাতের ত্রিশূল ফেলিয়া নিজের পেট টিপিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার বহুদিনের শূল-বেদনাটা চাগাড় দিয়া উঠিল। বেশিরকম গাঁজা-সিদ্ধি খাওয়ার ফল। তাই উমাপতি শূলের বেদনায় ত্রিশূল ধরিতে পারিলেন না বটে, তবে হঠাৎ রামচন্দ্রের গালে ঠাস করিয়া একটা চপেটাঘাত করিয়া বসিলেন।

শিব-চড়ে রামচন্দ্রের পদ্ম আঁখি দিয়া জল গড়াইতে লাগিল দেখিয়া লক্ষ্মণ গোঁয়ার-গোবিন্দের মত মহাদেবের দিকে তাড়িয়া-ফুঁড়িয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু জনকরাজা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ঠাণ্ডা করিলেন।

আর স্বয়ম্বর সভার হতভাগা ঈর্ষান্বিত রাজন্যবর্গ তখন হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, বেশ হইয়াছে, খুব হইয়াছে, মনটা আমাদের খুশি হইয়াছে। ততক্ষণে জনকরাজা শম্ভুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিলেন, প্রভু ক্ষমা করুন।

মহাদেব নিজের পেট তেমনি টিপিয়া রাখিয়া তাঁহার তিনটি নয়নই মুদ্রিত করিয়াই ধমক দিয়া উঠিলেন, তাহার আগে আমার বেদনাটা কমাইবার ব্যবস্থা করো দিকি।

সীতা বুদ্ধিমতী রমণী। তখনি ছুটিয়া গোয়ালঘরে গিয়া খানিকটা চোনা আনিয়া গরম করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাদেবের পাশে বসিয়া নিজের পরণের বহুমূল্যের বেনারসী শাড়িখানার আঁচল ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া শূলপাণির তলপেটে সেক দিতে লাগিলেন। একটু পরেই মহাদেবের শূল-বেদনার উপশম হইল।

তিনি রাষ্ট্রভাষায় সীতাকে বলিলেন, জীতে রহো বেটি।

সীতা সুযোগ পাইয়া বলিলেন, প্রভু! ঐ রাম ছাড়া আমার জীবন আমার কাছে হারাম। রামচন্দ্রকে ক্ষমা করুন প্রভু। নতুবা আপনার ঐ লম্বা জটা দিয়া আমার গলায় দড়ি পাকাইয়া আত্মহত্যা করিব।

মহাদেব মেয়েটির ভাবী-পতিভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বলিলেন, আর আত্মহত্যার দরকার নাই বৎসে। যাও মালাটা রামচন্দ্রের গলায় পরাইয়া দাও।

ইহার পর তিনি রামচন্দ্রকে ডাকিলেন, ইদিকে আয়, কাছে আয় রাম।

রামচন্দ্র ছলছল নেত্রে নীলকণ্ঠের কাছে আসিলে তিনি নিজের জটাজাল দিয়া তাঁহার লাল হইয়া যাওয়া নীল আঁখি দুইটি মুছাইয়া দিলেন। পরণের খাটো বাঘছালে চোখ মুছাইবার একটু অসুবিধা ছিল। শেষে বলিলেন, কিছু মনে করিস নে বাপু। গলায় বিষ আছে কি না, আর বয়সও তো হইয়াছে, তাই কখন কী যে বলি বা করি, তাহার ঠিক থাকে না।

এবং সমাগত রাজন্যবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন, তোরা এই স্থান পরিত্যাগ কর। লোভী কুকুরের মত আর দাঁড়াইয়া থাকিয়া কী লাভ আছে? পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করিতে নাই। আর ইহাদের বিবাহের ভোজে লুচি-মণ্ডা কি তোদের গলা দিয়া নামিবে?

রাজন্যবর্গ শংকরের ইঙ্গিত বুঝিলেন এবং শুষ্কমুখে বিদায় নিলেন তাঁহারা। তবে যাইবার সময় বিক্ষোভ জানাইতে ভুলিলেন না। সমস্বরে বলিতে লাগিলেন—শিববাদ, শিববাদ—মুর্দাবাদ। ইনকেলাব জিন্দাবাদ।

হয়তো ঘেরাও করিতেন। তবে সে প্রথার তখন তেমন প্রচলন ছিল না। (অবশ্য অভিমন্যুকে লইয়া পরে একটা কেস ঘটিয়াছিল।)

যাক রাম-সীতার মালা বদল হইয়া গেলে জনকরাজা তখন গুটিগুটি মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইলেন। রাজা তো! কাজেই জানেন, কখন কী করিতে হয়, বা কখন কী বলিতে হয়।

এইবার বলিলেন, প্রভু আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

ভুজঙ্গধর বলিলেন, বলো বৎস।

জনকরাজা বলিলেন, আপনি তো আপনার ধনুক পাঠাইয়াছিলেন সীতার স্বয়ম্বর সভায় ভঙ্গ করিবার জন্যই যাহাতে আজেবাজে লোক সীতাকে না কব্জা করিতে পারে। অথচ আপনি জনন সুপাত্র রামচন্দ্রকে অযথা চপেটাঘাত—

মহাদেব জনকরাজার কথা শেষ করিতে দিলেন না। বলিলেন, তুমি ভুল বুঝিয়াছিলে বৎস! নিজের জিনিস কেহ কাহাকেও ভাঙিতে দেয়? আমি বলিয়াছিলাম, আমার ঐ ধনু তুলিয়া বাগাইয়া ধরিয়া যে তাহাতে ছিলা পরাইতে পারিবে, তাহাকেই তুমি কন্যাদান করিতে পারো। তাহাকে ভাঙিতে বলি নাই।

জনকরাজা তখন জামাতার দোষ চাকিবার জন্য বলিলেন, তবে আমার মনে হয়, ঐ ধনুতেই কোন দোষ ছিল।

শুনিয়া শম্ভুর মনে খটকা লাগিল। একটু ভাবিয়া বলিলেন, তাহা হইতে পারে। আমার ঐ ধনুটি বিশ্বকর্মা তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহাকে ডাকাও এবং একটি অনুসন্ধান সমিতির ব্যবস্থা করো।

তাহাই হইল। বিশ্বকর্মাকে ডাকা হইল এবং জনকরাজারই কয়েকজন ধনু ও অস্ত্রবিশারদের একটি এক-কোয়ারী কমিশন গঠন করা হইল।

তাঁহারা ভাঙা ধনুকটাকে পুঙ্খা-নুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার পর দোষ বাহির করিলেন। দেখা গেল, ধনুকটির ধরিবার জায়গায় একটা গাঁট আছে এবং সেই ক্ষতস্থলে পাকা পুডিং দিয়া বেমালুম মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এনকোয়ারী কমিশনের রিপোর্ট শুনিয়া মহেশ্বর খাপ্পা হইয়া গেলেন। উপস্থিত বিশ্বকর্মাকে চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, হাঁরে মিশে এইসব ফাঁকিবাজী শিখিয়াছিস কোথা হইতে? শেষে আমার সঙ্গেই চালাকি। তোর ঐ হাতুড়ি দিয়াই তোর দাঁত ভাঙিয়া দিব।

বিশ্বকর্মা ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পরে করজোড়ে বলিলেন, প্রভু মার্জনা করুন। দোষ আমারই। তবে আমার কারখানার শ্রমিকদের গাফিলতির জন্যই এই অপকর্মটি হইয়াছে। তাহারা মন দিয়া কাজ করে না, কথা বলিলেও শোনে না।

বটে! মহাদেব বলিলেন, আমি তোর শ্রমিকদের অভিশাপ দিতেছি, তাহাদের অবস্থার কখনোও উন্নতি হইবে না। মালিকরা তাহাদের ঘাড় ভাঙিয়া পয়সা রোজগার করিবে। আর তোকে অভিশাপ দিতেছি— শ্রমিকরা তোর পূজা করিবে বটে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে না। তোকে উপলক্ষ করিয়া বাইজী নাচাইবে ও লুচি-মাংস খাইবে।

শুনিয়া বিশ্বকর্মা হাতের হাতুড়ি ফেলিয়া দিয়া মহাদেবের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। বলিলেন, প্রভু, আপনার অভিশাপ ফিরাইয়া নিন। রক্ষা করুন প্রভু।

দেখা গিয়াছে, দেবতারা বা মুনিরা অভিশাপ দিবার পরই বড়ই অনুতপ্ত হন। এক্ষেত্রেও ভোলানাথ অনুতপ্ত হইলেন, সব কিছু ভুলিয়া গেলেন। বিশ্বকর্মার হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন, বেশ, তবে শোন। তোমার আরও নাম-যশ হইবে। আরও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিবে। তবে যন্ত্রের পূজারী মানব সে সব যন্ত্রের যন্ত্রণায় ভুগিবে, শান্তি পাইবে না। তবুও তোমার জয়জয়কার নিশ্চিত। আর ঐ শ্রমিকদেরও মঙ্গল হইবে যখন পৃথিবীতে লাল-ঝাণ্ডা উড়িতে থাকিবে এবং কারখানায় ঘেরাও প্রথার চালু হইবে।

বলিয়াই মহাদেব একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার ভাঙা ধনুকটি হাতে লইয়া বলিলেন, সবই তো হইল, কিন্তু মাঝখান হইতে ক্ষতিটি হইল আমারই। একটা গাঁটের জন্য ধনুকটি আমার গচ্চা গেল। ইহাকেই বলে গাঁটগচ্চা।*

---

* অনেকেই হয়তো বলিবেন, এইসব কথা রামায়ণে লেখা নাই। কিন্তু আত্মজীবনীতে তো বটেই অনেক মনীষীর জীবনচরিতেও অনেক কিছুই চাপিয়া যাইতে হয়। যদি কখনও 'রাবণায়ন' লেখা হয়, তখন এইরূপ অনেক অপ্রকাশিত জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। —লেখক।

কথকতা

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

পৃথিবী নগরের আমি অশান্ত নাগরিক এক।
সাহারার বালি থেকে ভল্গার জল,
চাঁপার সৌরভ আর মমির গন্ধ,
কুতুবের চূড়া হতে ইফেলের সিঁড়ি,
আমার শ্রবণে, স্পর্শনে, দর্শনে দিয়ে গেছে ধরা;
তবু শান্তি পাই নি তো!

যুবতীর সোনালী স্তনের পেলব কাঠিন্য,
হাজার বছরের পুরোন শাল আর সেগুনের ঘ্রাণ,
জীবনের যতকিছু কামনা—উদ্দাম, উদগ্র, চঞ্চল,
আমার শ্রবণে, স্পর্শনে, দর্শনে দিয়ে গেছে ধরা;
তবু শান্তি এলো না তো!
নিরাশার চোরাবালি গ্রাস করে জীবনের পরমাণু,
বসুমতীর আমি এক অযোগ্য প্রেমিক।

শ্রীমতী লীলা মজুমদার

[প্রখ্যাতনাম্নী সাহিত্যশিল্পী]

জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙলা দেশের সামগ্রিকভাবে যে ক'টি পরিবারের অবদান ইতিহাসে সসম্মানে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেই তালিকায় রায় (রায়চৌধুরী) পরিবার একটি দীপ্তি-সম্পন্ন মালিন্যমুক্ত নাম। এই পরিবারের একাধিক সন্তানের সার্থক সাংস্কৃতিক সাধনা দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাভিনন্দনে ভাস্বর হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে সারদারঞ্জন রায়, উপেন্দ্রকিশোর (কামদারঞ্জন) রায়,-চৌধুরী, কুলদারঞ্জন রায়, প্রমদারঞ্জন রায়, মুক্তিদারঞ্জন রায়, সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, সত্যজিৎ রায়, সুখলতা রায় ও পুণ্যলতা রায়চৌধুরী প্রভৃতি এক একটি স্মরণীয় নাম।

এ কালের অন্যতম যশস্বিনী কথাশিল্পী শ্রীমতী লীলা মজুমদারও এই পরিবারের মেয়ে, পিতৃ-পরিজনের মত তিনিও সংস্কৃতির নানা শাখায় স্বীয় প্রতিভার ছায়াপাতে সমর্থা হয়েছেন। স্বর্গত শিশুসাহিত্যিক প্রমদারঞ্জন রায়ের কন্যা লীলা মজুমদারের জন্ম কলকাতায় ১৯০৮ সালের ২৬-এ ফেব্রুয়ারী তারিখে। বাল্যকাল কেটেছে বাবার কর্মস্থল শিলঙ-এ। সেখানে লোরেটোয় শিক্ষালাভ। কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন ডায়োসেসানে। ১৯২৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন সসম্মানে উত্তীর্ণা। ভর্তি হলেন ডায়োসেসান কলেজে। ১৯২৮ সালে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় অধিকার করলেন প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি। ১৯৩০ সালে এম-এতেও অনুরূপ সফলতার পরিচয় দিয়ে ছাত্রী হিসাবে আপন প্রকৃষ্ট মেধার পরিচয় রাখলেন।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯৩১ সালে যোগ দিলেন শান্তিনিকেতনে। ইংরাজী ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হল। ১৯৩২ সালে চলে এলেন কলকাতায়। দেশবরেণ্য জননায়ক স্বর্গত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর হাতে তুলে দিলেন আশুতোষ কলেজের মেয়েদের বিভাগের ভার। ১৯৩৩ পর্যন্ত আশুতোষ কলেজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তারপর বিদ্যাসাগর কলেজের মেয়েদের বিভাগও কিছুদিন তাঁর হাতে ছিল। ১৯৫৬ থেকে '৬১ পর্যন্ত তাঁকে দেখা গেল আকাশবাণীর মহিলা এবং শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহের প্রযোজিকা হিসাবে। ১৯৬১ সালে কবিগুরুর শত-বার্ষিকী-বর্ষে আকাশবাণীর নয়াদিল্লীর কেন্দ্রের ঠাকুর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মুখ্য প্রযোজিকার আসন তাঁর দিকে এগিয়ে দেওয়া হল। ১৯৬৩ পর্যন্ত আকাশবাণীর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

১৯৬৩ এবং ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ যথাক্রমে লীলা-লেকচারার ও শরৎ চ্যাটার্জী লেকচার প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে অবনীন্দ্রনাথ এবং সুকুমার রায় সম্বন্ধীয়। ১৯৬৬ সালে তিনি লাভ করলেন সুরেশ-পুরস্কার। বর্তমান বর্ষে তিনি সম্মানিতা হলেন রবীন্দ্র-পুরস্কারে। তাঁর 'আর কোনখানে' গ্রন্থটি তাঁকে এই পুরস্কার এনে দিল।

আশ্রমিক সংঘের সাধারণ সচিবের আসনে তিনি অধিষ্ঠিতা ছিলেন। এ ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের বাঙালী কমিটির, ডি পি আই-এর সম্পাদকীয় মণ্ডলীর, রবীন্দ্রভারতীর কার্যনির্বাহক পরিষদের এবং সাহিত্য আকাদামীর সাধারণ পরিষদের তিনি সদস্যা। সুপ্রসিদ্ধ শিশু ও কিশোর পাঠ্য পত্রিকা 'সন্দেশ' বর্তমানে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

এই 'সন্দেশ'-এই তাঁর সাহিত্য-সাধনার হাতেখড়ি। বয়েস তখন চোদ্দ। বড়দা সুকুমার রায় তখনও জীবিত। বড়দার কাছ থেকে আহ্বান এল 'সন্দেশ'-এ লিখতে। কিন্তু তারপর বেশ কয়েক বছর লীলা মজুমদার সাহিত্যের দরবারে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকেন। ১৯২৯ থেকে আবার নিয়মিতভাবে লেখা আরম্ভ করলেন।

তারপর আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। এই চল্লিশ বছরে অবিরাম ধারায় তাঁর লেখনী রচনাবৃষ্টি করে চলেছে। প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থের তিনি রচয়িত্রী। তাঁর শিশুসাহিত্য, সুকুমার সাহিত্য, আলোচনা, নাটক গ্রন্থগুলির মধ্যে যে ক'টি গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাদের তালিকা— দিন দুপুরে, পদিপিসির বর্মীবাক্স, শ্রীমতী জোনাকী, গুপীর গুপ্তখাতা, বকধার্মিক, মাকু, টংলিঙ, হট্টমেলার দেশ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচিত), বাঘের চোখ, গুপ পণ্ডিতের

অপশলা, হোটদের তার ... বঞ্চ, ... 'মণিমোখের বাড়ি'। ... ... আবদ্ধ হন। ঝকঝকপালা (সঙ্গীত নাটক আকাদামীর পুরস্কারপ্রাপ্ত), ঝাঁপতাল, নাটঘর, ইটকুটুম, চীনে লণ্ঠন, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। তাঁর গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত ১৯৩৮-৩৯ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৩ সালে ইনি আজকের দিনের প্রথিতযশা দেশবিখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক ডক্টর সুধীরকুমার মজুমদারের ... প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাঙলার এই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের জীবনকথাও মাসিক বসুমতীর এই বিভাগে অল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

[তারাপুর প্রকল্পের সুযোগ্য কর্ণধার]

ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অফুরন্ত উদ্যম, সেই সঙ্গে অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সমস্যা নিবারণের ও পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণের অভূতপূর্ব কুশলতা যাঁদের কর্মজীবনকে একটি চলমান ইতিহাসে পরিণতি দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে যে ক'টি নাম পুরোভাগে উল্লেখিত হওয়ার দাবী রাখে বাঙলার সুসন্তান শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তারই একটি যুগপৎ মুখ্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আজকের দিনের শত সহস্র সমস্যায় জর্জরিত খণ্ডিত ভারতভূমিতে বিদেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় দেশ ও জাতির আগামী দিনের স্বর্ণোজ্জ্বল সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি বহন করে যে সকল লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদেরই একটির সামগ্রিক পরিচালনার ভার তাঁর যোগ্য ও কুশলী হাতে ন্যস্ত। যে বিরাট প্রতিষ্ঠান (তারাপুর প্রকল্প) বিপুল সমস্যার হতভাগ্য শিকার, এই ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীকে আবার তাদের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ, সমৃদ্ধি ও শান্তি অনেকাংশে ফিরিয়ে দিতে চলেছে সেই প্রতিষ্ঠানের আজ তিনি কর্ণধার। হতাশা বেদনায় অবসন্ন কোটি কোটি মুখকে আপন কর্মক্ষেত্রকে মাধ্যম করে আবার যিনি অনির্বাণ আনন্দের প্রসন্ন মঙ্গলালোকে দীপ্ত, ভাস্বর, প্রাণবন্ত করে তুলতে চলেছেন সারা জাতির সকৃতজ্ঞ ও স্বতোৎসারিত শ্রদ্ধাভিনন্দন তাঁর দিকেই উৎসারিত হয়ে যায়।

মহাতীর্থ বারাণসীর এক অতীব সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পরিবারের অন্যান্যরা প্রত্যেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে জয়লক্ষ্মীর কৃপাচন্দনে আপন আপন ললাট করেছেন সুচর্চিত। মণীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনও মেধা ও সার্থকতার আলোকে রশ্মিমান। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সফল ছাত্র মণীন্দ্রনাথ আচার্যরূপে লাভ করেছেন দুজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিককে। একজন ডঃ মেঘনাদ সাহা, অন্যজন ডঃ নীলরতন ধর।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১৯২৮ সালের মার্চ মাসে রেলওয়ে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন মণীন্দ্রনাথ। যোগ দিলেন উত্তর-পশ্চিম রেলপথে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, বয়সে তখনও তিনি নিতান্ত তরুণ, বিশেষভাবে তিনিই নির্বাচিত হলেন করাচী বন্দরের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে ঐ বন্দরের কার্যকারিতাকে পাঁচগুণ বাড়িয়ে তোলার জন্যে। এ কাজে তাঁর সাফল্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিপুল অভিনন্দন তাঁর অধিকারে এনে দিল।

সারা পৃথিবীকে ক্ষত-বিক্ষত করে যুদ্ধদানবের সংহারলীলা শেষ হল। মানুষের রক্তে ভয়ঙ্করের হোলি খেলা হল সমাপ্ত। বিশ্বচরাচর প্রান্তর থেকে মরণের দামামা হল স্তব্ধ। সেই সময়ে লাহোরে রেলপথের কর্মী ও অফিসারদের শিক্ষাদানের ভার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। এরপর তিনি যুক্ত হলেন উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় রেলপথ সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনে—যার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এবং পরে ডঃ হৃদয়নাথ কুঞ্জরু।

এই কাজ শেষ হওয়ার পরেই সারা বিহারে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের ক্রুর কুটিল পদসঞ্চারে বিহার মৃত্তিকার শস্যশালিনী মূর্তি একেবারে বদলে গেল, তার ভয়াল ভ্রূকুটি ঘরে ঘরে তুলল হাহাকার। জঠরের জ্বালায় মানুষের তীব্র বেদনা ছেয়ে ফেলল সারা রাজ্য। সমগ্র বিহারকে সেই সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কবল থেকে উদ্ধার করে সেখানকার মানুষগুলিকে নিরন্ন অবস্থার রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি দেবার ভার অর্পিত হল এই অনন্যকর্মা কর্মবীরের প্রতি।

সেই জটিল এবং ভয়াবহ সমস্যা সমাধানে তিনি যে কতখানি যোগ্যতা এবং মরণপণ সাধনার পরিচয় দিয়েছিলেন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে লেখা বিহারের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের একটি পত্রের নিম্নলিখিত অংশটি অনুধাবন করলে সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে—

"We feel particularly thankful to Shri Chakrabarty. He never for once mentioned to us the possible difficulties in meeting our requirements but tried his level best and invariably got for us whatever we needed...The part played by him in meeting the food crisis in Bihar was important enough to be brought to your notice personally".

তারপর সেণ্ট্রাল রেলওয়ের জেনা- রেল ম্যানেজারের গুরুদায়িত্বপূর্ণ ও অশেষ সম্মানসূচক আসনে তাঁকে দেখা গেল। ১৯৫৬ সালে জেনারেল বোর্ডে তিনি অন্তর্ভুক্ত হলেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল এ্যাটমিক পাওয়ার প্রোগ্রামের ভার।

বর্তমানে তারাপুর প্রকল্প ধীরে ধীরে যেভাবে সাফল্যের অমৃততীর্থে সমুত্তীর্ণ হচ্ছে তার মূলে আছে শ্রীচক্রবর্তীর ন্যায় বিদগ্ধ কর্ণধারের একাধারে প্রশাসনিক দক্ষতা অন্য-দিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং ঐকান্তিকতা।

বাঙলার যশোজ্জ্বলকারী এই সন্তানের প্রতিভার স্পর্শ আজ সারা ভারতের জাতীয় উন্নয়নের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে। ভারতের নানা অঞ্চল হয়েছে তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর সমগ্র কর্মজীবনকে একটি মিউজিক সঙ্গীতে পরিণত করলে সেই জীবন-বীণায় যে সুরটি প্রতিধ্বনিত হবে তারই ভাষারূপ হল—ভারতের সার্বিক জাতীয় সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালীর গুরুত্ব আজও নিছক স্মৃতিতে পরিণত হয় নি। সে ক্ষেত্রে বাঙালীর মহামূল্য অবদান আজও সসম্মানে ঈপ্সিত।

ডঃ আশুতোষ দাস

[বহু বিস্মৃত ও অবলুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথির আবিষ্কর্তা]

যাঁদের অভাবনীয় পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় মনীষা সাত-সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গমালা অতিক্রম করে বিদেশের সুধী-সমাজে বাঙলার গৌরব ঘোষিত করছে বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতী এবং এককালের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী ডঃ আশুতোষ দাস তাঁদের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্যসমৃদ্ধ নাম। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের উৎকর্ষ সাধনের এবং মূল্য-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এককভাবে যে বিস্ময়কর ধৈর্য, অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার উপমা একমাত্র তিনি নিজে।

চুয়াত্তর বছর বয়স্ক এই বিপ্লবী-শিক্ষাব্রতী সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। বহু বিস্মৃত, অবলুপ্ত, অপরিজ্ঞাত প্রাচীন পুঁথি, গ্রন্থাদি তিনি যে কি রোমাঞ্চকর ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশে সংগ্রহ করেছেন তা ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কখনও সাপুড়ে বা বেদে সেজে, কখনও একতারা হাতে বাউলের ছদ্মবেশে, কখনও গীতা-ভাগবতের পাঠক আবার কখনও বৈরাগীদের কণ্ঠি-বদলের পুরোহিতের ছদ্মবেশ নিয়ে এমন কি বহু ক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে এই কার্যে তিনি সফল হয়েছেন।

এইভাবেই তিনি আবিষ্কার বা উদ্ধার করেছেন দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ, তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসা-পুরাণ, রামচন্দ্র খানের পাণ্ডববিজয়, নরসিংহ দাসের

ডঃ আশুতোষ দাস

রসসূত্র, আনন্দঘন বিরচিত রামার্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি।

পৈত্রিক নিবাস চট্টগ্রাম। কিন্তু জন্মস্থান নোয়াখালি। পিতৃদেব ভৈরব-চন্দ্র দাস ছিলেন পরম শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী এবং দাতা। মা রাজেশ্বরী তাঁর দয়াশীলতার জন্যে সাধারণ্যে পরিচিতা ছিলেন পরমেশ্বরী হিসাবে। ভৈরবচন্দ্র ভূস্বামী ছিলেন কিন্তু পর-হিতার্থে তাঁর সম্পদ নিয়োজিত হওয়ায় পুত্র আশুতোষকে জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁর সারস্বত জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

ন' বছর বয়সে স্কুলে পড়ার সময় চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী চারুবিকাশ দত্ত তাঁকে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। গুরু শিষ্যের এক হাতে এগিয়ে দিলেন পিস্তল আর এক হাতে তুলে দিলেন নজরুলের অগ্নিবীণা। তের বছর বয়সে চট্টগ্রামের অন্যান্য বিপ্লবীদের জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা নিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরম-হংসের কাছে।

কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে তাঁর বিপ্লবের কর্মভূমি ছিল পাহাড়-পর্বত ও অরণ্য অঞ্চল। বিপ্লবী জীবন বরণ করে নিলেও অধ্যয়নে ছেদ পড়ে নি। স্কুল-কলেজের গণ্ডী গুলি অতিক্রম করতে করতে একদিন বাঙলা ও ইতিহাসে তিনি এম-এ ডিগ্রী অর্জন করলেন।

১৯৩৯ সালে তদানীন্তন বঙ্গ সরকারের অধীনে জুট রেজিস্ট্রেশন বিভাগে একটি অস্থায়ী কর্মের মাধ্যমে

তাঁর কর্ম-জীবনের সূত্রপাত। ১৯৫৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে যোগ দিলেন বাঙলা বিভাগের লেকচারার হিসাবে। কৃষি বিভাগে চাকরি করার সময়ে অভয়ামঙ্গল কাব্য তিনি উদ্ধার করেন এবং বিদগ্ধ মনীষী ডঃ সুকুমার সেনের অধীনে সে সম্বন্ধে গবেষণা করে ডি-ফিল উপাধি অর্জন করেন।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে মৌলিক গবেষণার কৃতিত্বে ১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট্ উপাধি তিনি অর্জন করেন। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম মনসাপুরাণ ও তন্ত্রবিভূতি। এই কাজটি সম্পন্ন করতে তাঁর সময় লেগেছিল এগার বছর। অদ্যাপি বাঙলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যুগপৎ ডি-ফিল ও ডি-লিট্। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ টি, ডব্লিউ, ক্লার্ক তাঁর গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। সাহিত্য জীবনে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি গুরুরূপে বরণ করেন ডঃ সুকুমার সেনকে।

পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ দাস, নরোত্তম দাস ও অজ্ঞাতপূর্ব পরেশনাথ প্রমুখ বৈষ্ণব-কবিদের অপ্রকাশিত পদাবলী আবিষ্কারেও অতুলনীয় কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। স্ব-আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে গবেষণার ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ... রায় বিদ্যাবল্লভ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীদের তিনি সুযোগ্য উত্তরসাধক বলা যায়।

বাঙলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণপাত তপস্যা ভাবীকালের সাহিত্য গবেষকদের যাত্রাপথকে এক অনবদ্য প্রেরণায় আলোকিত করে রাখবে। সাহিত্য-রসপিপাসুর আজ তাঁর কাছে প্রত্যাশারও যেন অন্ত নেই।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম লেকচাররূপে তিনি যুক্ত আছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন

[হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি]

গত শতাব্দীতে যাঁদের আবির্ভাব বাঙলা দেশের আইন ও রাষ্ট্রনীতির জগতের গৌরব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—সেই তালিকায় স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ সেন একটি অসাধারণ নাম। তাঁর দক্ষতা এবং কর্মকৃতি বাঙলার তৎকালীন আইন ও রাষ্ট্রনৈতিক জগতে তাঁকে এক প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্বে পরিণতি দিয়েছিল। এ দুটি জগৎ তাঁর সাধনায় যে কতখানি সমৃদ্ধ ইতিহাস তার স্বপক্ষে একটি অকাট্য এবং উজ্জ্বল সাক্ষ্য। বৈকুণ্ঠনাথের অন্যতম পৌত্রকে কেন্দ্র করেই এই রচনার অবতারণা। আইন জগতের সমৃদ্ধিসাধনে বৈকুণ্ঠনাথ যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সময়ের অগ্রসরণে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সে এক ভূমিকা তাঁর পৌত্রকেও গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। পিতামহের পদাঙ্ক আদর্শ এবং প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনও জীবনের সার্থকতার এক একটি ধাপ আজ অতিক্রমণ করে চলেছেন।

জীবনের শতাব্দীর রথচক্র আজ তার অর্ধপথ অতিক্রম করল। বৈকুণ্ঠনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেনের পুত্র অমরেন্দ্রনাথ আজ পঞ্চাশে পা দিয়েছেন। ১৩২৬ সালের ২৮-এ ভাদ্র (১৯১৯) কলকাতায় মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মদিন ২৮-এ ভাদ্র তারিখটি বাঙলা দেশের সাহিত্যজগতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি গৌরবময় দিন। একালের সাহিত্যজগতের অন্যতম মহানায়ক,

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন

বাঙলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারার ভগীরথ, জীবনের এক অসামান্য ভাষ্যকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন হিসাবে এই তারিখটি জাতীয় জীবনে এক বিশেষ মর্যাদায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

বহরমপুরের সৈদাবাদ হার্ডিঞ্জ এইচ, ই স্কুল (বর্তমানে মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ) থেকে ১৯৩৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন অমরেন্দ্রনাথ। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষাতেও সাফল্যের সঙ্গে হাত মেলানোয় কৃতকার্য হলেন। এই দুটি পরীক্ষার বিভাগীয় স্কলারশিপ তাঁর অধিকারে এল। কলকাতায় এসে গণিতে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। তিন-চার মাস পরে পঠিত বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে ১৯৪০ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হলেন অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে।

১৯৪২-'৪৩ সালে আইন পরীক্ষাতেও হলেন সফলকাম। আইনের প্রাথমিক পরীক্ষায় পেয়েছিলেন স্যার আশুতোষ জু প্রাইজ।

ইনার টেম্পল-এ 'ইন এ্যাবসেন্সি-য়ায়' ভর্তি হলেন অমরেন্দ্রনাথ। পরীক্ষাও দিলেন 'ইন এ্যাবসেন্সিয়া'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিলেতে না গিয়েও ব্যারিস্টারি পড়ার এই বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সুবিধার ফলেই দেশে থেকেই ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় লব্ধসিদ্ধি হয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। শুধু চেম্বারে যোগদানের জন্য ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে একবার তাঁকে বিলেত যেতে হল। সেই বছরই কাজ শেষ করে দেশে ফিরে এলেন।

১৯৪৭ সালের ২৩-এ জানুয়ারী কলকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায় তিনি আরম্ভ করলেন। বিভূতিভূষণের জন্ম তারিখে যাঁর জন্ম—সুভাষচন্দ্রের জন্ম তারিখে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৬৫ সালে কলকাতায় মহামান্য হাইকোর্টের অন্যতম বিচারকের আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী মন্দিরা দেবী তাঁর সহধর্মিণী।

পৃথিবীর সবচাইতে দামী কুকুর

এরা বর্তমানে হামবুর্গের অধিবাসী। আদিবাস চীন। এদের গায়ে একটিও লোম নাই, কিন্তু গাত্র সুখস্পর্শ এবং নরম। মাথায়, লেজে এবং থাবায় অবশ্য কিছু লোম আছে। গায়ে কোন গন্ধ নেই, কাজেই কোন পোকাও বাসা করে না সেখানে। এদের আদিবাস চীন দেশে কিন্তু এরা বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সারা পৃথিবীতেই এদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। কাজেই দাম অত্যন্ত বেশী—সারমেয়-প্রেমিকেরা একটি কুকুরের জন্য আড়াই হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করতে রাজী। বর্তমানে জার্মানীতে তিনটি আছে; হামবুর্গের নর্তক জোয়াচিম্ ওয়েলেনবার্গ এদের ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করেছেন।

[সাম্য শব্দটি বৈদিক। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক মহাগ্রন্থে সাম্য শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ লিখিত আছে সাম্যম্—(ক্লী) সমতা। তুল্যত্ব। যথা—চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্। সাম্যন্তেকস্থানত্বম্। ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণম্ ॥

কালের গ্রাসে ও বিদেশীয়দের আক্রমণে যুগে যুগে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের ক্রমিক ধারা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিদেশী শাসনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেশীয় ঐতিহাসিক ধারাটি প্রায় ভুলতে বসেছি। ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, মহাজনদের এই উক্তি আজ যেন মাত্র এক নীতিবাক্যে পরিণত হয়েছে।

বিখ্যাত চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস সাম্যবাদ ও সাম্যবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে কষ্টকর গবেষণায় তাঁর মহৎ জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ও সাম্যের নানা ভাষ্য রচনা করেছেন। মার্কসীয় সাম্যবাদের বাস্তব রূপদানে অগ্রণী হয়েছিলেন স্বদেশপ্রেমিক ও দেশহিতৈষী মহামানব লেনিন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও নেতৃত্বে রুশীয়গণ চরম অত্যাচারী জারকেও ক্ষমতাচ্যুত করতে পেরেছে। রুশ-বিপ্লবের প্রধান হোতা লেনিনের কোন পূর্ণাঙ্গ জীবনী এ যাবৎ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। মাসিক বসুমতী সে অভাব পূরণ করবে। লেনিনের বৈপ্লবিক জীবনীপাঠে জানা যাবে যে সাম্যবাদ নিছক ফ্যাশান বা দেশদ্রোহিতা নয়। সাম্যবাদ পরাধীন ও শোষিত দেশকে মুক্তি দান করে। সাম্য ধ্বংস আনয়ন করে না। নিপীড়িত দেশ ও জাতিকে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করে। —সম্পাদক, মাসিক বসুমতী]

[**পরিপ্রেক্ষা**—'উপ-মহাদেশ' বিশেষণটি আশৈশব শুনে আসছি ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য। এশিয়ায়।

রাশিয়া, নিঃসন্দেহে বলা চলে, য়ুরোপ-এর · উপ-মহাদেশ, যার অংশ-বিশেষ এশিয়ায়ও বটে।

কেবল য়ুরোপখণ্ডে নয়, রাশিয়া পৃথিবীর বিশালতম দেশ। অশেষ বৈচিত্র্যময়। চিরতুষারময় সাইবেরিয়া থেকে কাজাকাস্তান-এর রুদ্র মরুভূমি —প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার। কেবল উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তের এই অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি নয়, নয় শুধু তুষার আর মরু অঞ্চলের বৈপরীত্য, রাশিয়ায় হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে একাধিক পর্বতমালা—আল্তাই, তিয়েনশান্, ককেশীয়; সমতলভূমি এগুলোর মধ্যে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কলরোলে মুখর।

এর সীমান্ত ষাট হাজার কিলোমিটার। বারটি দেশ প্রান্তলগ্ন। সীমান্তর দুই-তৃতীয়াংশ বারোটি সাগর আর তিনটি মহাসাগরের উপকূল জুড়ে।

উত্তর আমেরিকার তিন গুণ, য়ুরোপীয় ফ্রান্স-এর অন্তত চল্লিশ গুণ। এই সুবিশাল দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে সর্বাধুনিক জেট প্লেন-এরও লাগে বারো ঘণ্টার বেশি সময়।

এ দেশের পূর্বপ্রান্তীয় মানুষ যখন সকালের কাজে ব্যস্ত, বাইলোরুশিয়া আর বালটিক গণতন্ত্রের নাগরিক তখন সান্ধ্য পোশাকে ভ্রমণসুখমগ্ন। বলা চলে, ক্রম উলটিয়ে: 'অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো;--- এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া। ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে

ইভান বাবুশ্কিন্

[illegible] অর্থে এই উক্তি আর কোনও দেশ সম্পর্কে বলা চলে কি?

একই কালে সকাল-সন্ধ্যার দেশে তাপ এবং শৈত্য দুই-ই চরম। উত্তর প্রান্তে বরফ পড়ে বছরে ২৬০ দিন, য়ুরোপীয় রাশিয়ার মধ্যভাগে ১০০-১৬০ দিন। আর আছে মরুভূর অন্তহীন বিস্তারে চিরস্থায়ী অসহ্য উত্তাপ। জলের চিহ্নহীন।

অথচ গোটা দেশে মোট হ্রদের সংখ্যা দু' লক্ষ সত্তর হাজার। পশ্চিম সাইবেরিয়াতে পর্যন্ত হ্রদ রয়েছে। য়ুরোপীয় উত্তর-পশ্চিম অংশে হাজার হাজার হ্রদ অপরূপ শোভাময়। গভীরতম স্বাদু জলের হ্রদ বৈকালও রাশিয়ায়।

পৃথিবীর জ্ঞাত লোহার পরিমাণের শতকরা চল্লিশ ভাগ—একশ' হাজার মিলিয়ন টন; পৃথিবীর শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ পেট্রোল ছাড়াও তামা, ম্যাংগানীজ, সীসা, দস্তা, নিকেল, টিন, কোবালট, পটাসিয়াম, গন্ধক, কয়লা এবং সোনা এদেশে আছে।

আংশিক য়ুরোপীয়, অংশত এশীয় রাশিয়ায় ১২৬টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস। খাঁটি য়ুরোপীয় রুশরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ; উক্রেণীয়রা শতকরা ২০ ভাগ; বাদবাকিরা অন্যান্য জাতীয়। এশিউণীয় ৫০০ জনের বেশি নয়। মোট জনসংখ্যা ২৩৪ মিলিয়ন। জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মী (উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ডাক্তার, উকিল, প্রযুক্তিবিদ্, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি) এবং বাকি ২৫ ভাগ কৃষক এবং হস্তশিল্পী। বুদ্ধিজীবীরা শতকরা দশজন।

সহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ৫৪—পৃথিবীর সহরবাসীর গড়সংখ্যা শতকরা ৩২ জন মাত্র।

দক্ষিণ রাশিয়ার কাজাকাস্তান, সমরকন্দ, বোখারা, উজবেকস্তান, তাসখন্দ ইত্যাদি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু যুগব্যাপী। সমরকন্দ থেকেই বাবর এসে ভারতবর্ষে মুঘল

সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সেই থেকে এই দুই দেশের মধ্যে আদান-প্রদান চলে আসছে, নানান ধাঁচে।

জাতি-বৈচিত্র্যে, আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যে, সীমান্তর বিশালত্বে এবং অন্যান্য দিক দিয়েও রাশিয়া এবং ভারতের মিল লক্ষণীয়—

'নানা জাতি, নানা বেশ, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।'

এ মন্তব্য আমাদের দেশ এবং রাশিয়া সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য।

নানামুখী এবং সুবিশাল সম্পদশালী দেশ ছিল খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত—জার-এর শাসনাধীন হওয়া সত্ত্বেও। সমগ্র দেশ ছিল অত্যাচারজর্জরিত। শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি থেকে দেশকে মুক্তি দিতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন অসংখ্য দেশভক্ত রুশ—তাঁদের সব সাধনা নিষ্ঠা পরিণতি পেল যুগন্ধর লেনিন-এর মধ্যে।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'মানব-ইতিহাসের বিধাতা ---বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।'

বাঙালি হিসেবে আমরা এতে গর্বিত, আনন্দিত। সেই বিধাতাই রাশিয়ার প্রতি ভার দিয়েছিলেন লেনিন-কে মানুষ করার। সেই গর্বে, সেই আনন্দে শুধু রাশিয়া নয়, পার্থিব মানুষমাত্রই উৎফুল্ল। বিশ্ব-নাগরিক লেনিন রুশ-ইতিহাসের পুরুষোত্তম। চিন্তায় এবং কর্মে গোটা পৃথিবীতে এমন আলোড়ন, এমন আমূল পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের প্রত্যয় সৃষ্টি ইতিহাসে আর কেউ করতে পেরেছেন বলে জানা নেই।]

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সমীরণ চৌধুরী

লেনিন জন্মেছিলেন ১৮৭০ খৃস্টাব্দে।

রাশিয়ায় তখন মার্ক্সবাদের পরিভাষায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন সোচ্চার।

উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝিই উৎপাদনক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি আর ক্রমোন্নতিশীল উৎপাদন-শক্তিগুলোর বিরোধ সংকট ঘনিয়ে তোলে। সামন্ততান্ত্রিক জমি-বন্দোবস্তর ফলে বাধা পায় যান্ত্রিক উন্নতি এবং শ্রমিকের বেশী উৎপাদনের ক্ষমতা। পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার চাপে প্রতিক্রিয়াশীল জার (ইতিমধ্যে ক্রিমিয়া যুদ্ধে হেরে যিনি বাধ্য হয়েছেন নরম হতে) ১৮৬১-র 'কৃষক সংস্কার'-এর জন্য উদ্যোগী হলেন। তবে, গণ-অভ্যুত্থান তখনও স্বতঃস্ফূর্ত, বিক্ষিপ্ত এবং স্থানীয়। শোষণ চূড়ান্ত হলেও রুশ বুর্জোয়া'রা তখনও পর্যন্ত বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভংগী নিতে পারেন নি; এবং সর্বহারারাও শ্রেণী হিসেবে সংবদ্ধ নন। মূলত-অভিন্ন 'সারফ' (ভূমিদাস)-দের মালিক আর উদারনীতির পক্ষপাতীদের কাজিয়া চলছিল কতটুকু। খালি সুবিধা দিয়ে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ মুখ রক্ষাও হয়।

বিপ্লবী গণতান্ত্রিকরা চেয়েছিলেন কৃষক-সমাজের সম্পূর্ণ দাসত্ব-মুক্তি। ১৮৬১-র সংস্কারে মোট ২২,৫০০,০০০ জন ভূমিদাস মুক্তির আস্বাদ পেলেন। তবে, ভূস্বামীদের আধিপত্যের ভিত্তি এবং জমিতে তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রইল। সংস্কারের আগে ভূমিদাসরা যে পরিমাণ জমি চষতেন, স্বাধীনতার পর তাঁরা গড়ে সে তুলনায় কম জমি পেলেন। সেরা জমি ভূস্বামীদের নীরেস অংশ এল কৃষকের ভাগে, তাও আবার অত্যধিক দামে ক্রীত। ফলে বহু কৃষক-পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

যাই হোক, এই সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় ধনতন্ত্র বিকাশের অনেক বাধা আর রইল না। অ-রুশ অঞ্চলে ভূস্বামীরা কায়েমী স্বার্থ বেশি পরিমাণে বজায় রাখতে পারলেন। লেনিন-এর জন্মস্থান ভলগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষকরা পেলেন ছোট ছোট, টুকরো টুকরো চাষের জমি। ককেসাস অঞ্চলে জমির মালিকের ত' হল পোয়াবারো। জরজিয়ান জমি-মালিকরা যে কেবল কৃষকের তুলনায় সাতগুণ বেশি জমি নিজেদের দখলে রাখার অধিকার পেলেন তা-ই নয়, ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের দেওয়া হল সত্তর লক্ষ রুব্‌ল। ককেসাস-এর সামগ্রিক ভূমিদাসদের মুক্তি হল ১৯১২ খৃস্টাব্দে, ১৯১৩-য় সুরু হল জমি-ক্রয়। পরিবর্তন

ভাসিলি শেলগুনভ্

এল ঠিকই, কিন্তু সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ তখনও চতুর্দিকে ছড়ানো।

ষাট আর সত্তরের দশকে জার বাধ্য হলেন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দিতে, আর্থিক ব্যবস্থার রদবদল করতে। আরও টুকিটাকি বুর্জোয়াসুলভ সংস্কার করা হল দায়ে ঠেকে। বলা চলে এসব সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বদলে বুর্জোয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটা ধাপমাত্র। স্থানীয় বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের কাজ করার কিছু কিছু সুযোগ দেওয়া হলেও 'জার-ইজম্' তখনও dvoryanstvo ভূস্বামীদের একনায়কতন্ত্র। কাজেই তাদের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

॥ দুই ॥

কৃষক-সংস্কার হওয়ামাত্র রাশিয়া জুড়ে কৃষকদের বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। ১৮৬১'-৬৩-র মধ্যে প্রায় হাজার দুই বিক্ষোভ সংগঠিত হয় ; অনেক ক্ষেত্রে তা বিদ্রোহের পর্যায়ে উন্নীত হলে জার-এর বাহিনীর সংগে সংঘর্ষও বাধে। ইতিমধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণীয় ঘটনা ঘটল—রুশ বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের কর্তৃত্ব এল পাতি বুর্জোয়া, ব্যবসায়ী, যাজক আর কৃষকদের নিচের সারির বুদ্ধিজীবীদের হাতে। অর্থাৎ, লেনিন জন্মগ্রহণের আগেই তিনি যে-শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা আন্দোলনের নেতৃত্ব অভিজাত dvoryanstvo-র হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন। লেনিন-এর যুগান্তকারী—আক্ষরিক অর্থে—এবং অবিস্মরণীয় আবির্ভাব এবং নেতৃত্বের পটভূমি তৈরি হয়ে চলেছিল ধীরে কিন্তু নিশ্চিত এবং দৃঢ় পদক্ষেপে। সে প্রসংগে পরে আসছি।

মোটামুটি ১৮৬১ থেকে রাশিয়ায় যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় তার জের চলেছিল ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ দশকে চেরনীশেভ্‌স্কী, হারজেন এবং ওগারীওভ্-এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় গোপন বিপ্লবাত্মক 'সোসাইটি ল্যান্ড্ অ্যান্ড্ ফ্রীডম্' গড়ে ওঠে। এই সময় বিপ্লবভাবাপন্ন গণতান্ত্রিকদের কাজকর্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সংগ্রাম ছিল ভূমিদাসত্ব পূর্ণ অবসানের পক্ষে এবং জার-এর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। উদারপন্থীরা ভাবতেন স্বতঃস্ফূর্ত গণ- বিপ্লবই রাশিয়ার সামাজিক পরিবর্তন আনার একমাত্র পথ, জার-এর সামনে তারা অসহায়—তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন বিপ্লবভাবাপন্ন গণতান্ত্রিকরা। শেষোক্তরা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ পর্যন্ত পৌঁছলেও ঐতিহাসিক জড়বাদের মর্ম বুঝতে পারেন নি।

নাদেজদা কাস্‌টানটিনভ্‌না ক্রুপস্‌কায়া

এদের বলা চলে য়ুটোপীয়ান সোস্যালিস্ট—অসম্ভবের ছন্দে মাতোয়ারা একদল সমাজতন্ত্রবাদী। তাঁরা ভাবতেন পুরনো কৃষক কম্যুন-এর মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হবে। পশ্চিমী য়ুটোপীয় সমাজতান্ত্রিকদের থেকে এঁরা কিন্তু চিন্তায় ভিন্নপন্থী—শান্তিপূর্ণ উপদেশ দানে এঁদের বিশ্বাস ছিল না, ছিল বিপ্লবে। এদের কৃতিত্ব এই যে, কেবল জারতন্ত্রের মুখোস উন্মোচনেই নয়, বুর্জোয়া প্রতীচ্যের আদর্শীকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও এঁরা সক্রিয় সংগ্রামী ছিলেন। বিশেষত চের্নীশেভ্‌স্কী ছিলেন ধনতন্ত্রবাদের গভীর সমালোচক। ইনি এবং হারজেন রুশ বুদ্ধিজীবীদের অন্যান্য জাতির বিপ্লবাত্মক ধারণা আর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে ধারণা, তত্ত্ব আর অবলম্ব্য বাস্তবপন্থা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। চের্নীশেভ্‌স্কী ছিলেন বেশিমাত্রায় গণতান্ত্রিক, স্বমতে প্রত্যয়ী পুরুষ।

রাশিয়ার সামাজিক জীবনে এবং আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

স্লাভ দেশগুলোর প্রগতিশীল মানুষ এঁদের ধারণা মেনে নিয়েছিলেন—বুলগেরিয়ার বিপ্লবাত্মক মুক্তি আন্দোলনের নেতা বোতেভ্ এবং লেভ্‌স্কী, আর সার্ব-দেশীয় বিপ্লবী মার্কোভিচ্‌ও তা মেনে নেন।

পোল্যান্ড্, বাইলোরুশিয়া এবং লিথুয়ানিয়ায় ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহ আদর্শগত প্রেরণা পেয়েছিল রুশ বিপ্লবভাবাপন্ন গণতান্ত্রিকদের আন্দোলন থেকে। বাইলোরুশিয়া আর লিথুয়ানিয়ার 'লাল সরকার'-এর প্রধান হন জেভ্ সেরাকাউস্কি। উপযুক্ত তিন জায়গার জাতীয় এবং সামাজিক মুক্তি-সংগ্রাম রুশ-বিপ্লবীদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিল। ১৮৬৪-তে জার-এর ১০০,০০০ সৈন্য পোলিশ বিদ্রোহ চূর্ণ করে নৃশংসভাবে। রুশ কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং বিপ্লবভাবাপন্ন গণতান্ত্রিক নেতারাও জার-এর কাছ থেকে অনুরূপ ব্যবহার পেলেন। ১৮৬২-তে চের্নীশেভ্‌সকি-কে গ্রেপ্তার করা হল; '৬৪-র ১৯শে মে বিচারের প্রহসন অন্তে তাঁকে পাঠান হল নির্বাসনে—সাইবেরিয়ায়।

গণতান্ত্রিক শক্তি জারতন্ত্র টলাতে অক্ষম হল এবং বিপ্লবভাবাপন্ন গণতান্ত্রিকরা কৃষক-বিপ্লবের ওপর যে আশা করেছিলেন তা মিলিয়ে গেল মরীচিকার

॥ তিন ॥

ষষ্ঠ দশকেই রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের সূচনা। ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ধনতন্ত্রের দ্রুত অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল। ১৮৮০-র মধ্যেই ও দেশের বস্ত্রশিল্পে 'লুম'-গুলোর দুই-তৃতীয়াংশ হল যন্ত্রচালিত, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হস্তচালিত। ভারি শিল্পোন্নতি শুরু হয়ে গেল, নতুন নতুন শিল্প-কেন্দ্র গড়ে উঠল। শ্রেণী-গঠনে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হল—এল দুই নতুন শ্রেণী: সর্বহারা আর বুর্জোয়া।

সংস্কারের পরবর্তী যুগে রাশিয়ার শিল্পোন্নয়নের হার পশ্চিম য়ুরোপ-এর তুলনায় বেশি। ১৮৬০ থেকে ১৯০০—এই চল্লিশ বছরে রাশিয়ার উৎপাদন বাড়ল সাতগুণ; জার্মানী, ফ্রান্স আর বৃটেন-এর তুলনায় যথাক্রমে পাঁচ, আড়াই এবং দু' গুণেরও বেশি। তবুও ও দেশ তখন মূলত কৃষিপ্রধান, শিল্পে অনগ্রসর। শিল্পোদ্যোগ আর কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে চলল দ্রুততালে। তবে, অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়ায় হাতে তৈরি কুটির শিল্প বেশি দীর্ঘায়ু হয়েছিল।

আভ্যন্তরীণ ব্যবসার প্রসার এবং বিশ্ব-বাজারের সংগে রাশিয়া-র যোগাযোগের সংগে বাষ্পীয় যানের উন্নতি জড়িত। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ১৮৬৫-তে ছিল ৩,৮০০ কিলোমিটার, ১৮৯০-তে তা দাঁড়াল ২৯,০০০ কিলোমিটার-এ। ১৮৬১-তে বাষ্পীয় জলযান ছিল মাত্র ৬৪৬টা, সেই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে দাঁড়াল ২,৫৩৯টায়।

পশ্চিম য়ুরোপ-এ একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক রীতি প্রসারের সংগে সংগে আশি এবং নব্বইয়ের দশকে রাশিয়াতেও লাগল তার অনিবার্য হাওয়া।

অবশ্য ওদেশে ধনতন্ত্রের উন্নতি ছিল অসম।

উরাল বা ভল্গা-তীরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মত ভূমিদাসদের গড়া শিল্পে ভরপুর জায়গায় এ উন্নতি স্বল্প।

উলিয়ানভ পরিবার

বাল্টিক, আজভ্, আর সিস্‌ককেসিয়ান অঞ্চলে ধনতন্ত্রের ভাণ্ডার কানায় কানায় ভর্তি। কেবল সমুদ্র-সান্নিধ্য নয়, সংস্কার-পূর্ব যুগে এইসব অঞ্চলে ভূমিদাসপ্রথার তুলনায় কম প্রসার লাভও এই কুবের-আশীর্বাদধন্য হওয়ার মূলে সক্রিয়। আশির দশকে দক্ষিণাঞ্চলে নির্মিত হল নতুন শিল্পকেন্দ্র।

এর ফলে দেশবাসী সহরমুখী হওয়ার দরুণ কাঁচা মাল আর খাদ্যের চাহিদা বাড়তে লাগল। এই চাহিদা মেটাতে সুরু হল নিবিড় চাষ আর পশুপালন। কার্যত তখনও ভূমিদাস-সেবিত জমিদারী ধনতান্ত্রিক 'ফার্ম'-এ রূপান্তরিত হল। মনিবের দল লুপ্ত হওয়ায় একপ্রান্তে রইল মোটামুটি স্বচ্ছল চাষী আর অসংখ্য প্রোলেতারিয়েৎ চাষী তখন অপরপ্রান্তবাসী। শুধু প্রাণধারণের জন্য দিনযাপনের গ্লানিভারজর্জর। চাষীরা শোষিত হতেন, কারণ ভূস্বামীরা ছিলেন আর্থিক সংগতিসম্পন্ন, আর চাষীরা ভূস্বামী-নির্ভর ভাগচাষ, কাজ করে ভাড়া শোধ করার পদ্ধতি চাষীদের ছিবড়ে ক'রে ফেলল; তা ছাড়া ভূস্বামীরাও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নততর চাষ করতে মনোযোগী হন নি। গ্রামগুলো তখন তাই ক্ষুধা-জর্জর, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত। অধিকাংশ মানুষের সামান্য ক্রয়ক্ষমতা শিল্পের বাজার সংকুচিত ক'রে তুলল।

রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ 'নিরবচ্ছিন্ন' নয়; ১৮৯১-'৯২-র দুর্ভিক্ষে অনেক অঞ্চলের মানুষ দলে দলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

॥ চার ॥

ক্রমে ধনতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ল গোটা রাশিয়ায়। মধ্য রাশিয়া এল দ লে

বিস্তারিত বিবরণ বাদ দিয়ে বলা চলে রুশ বুর্জোয়ারা ছিল শাসকদের সংগে, তাদের উপর নির্ভরশীল—অভিজাতদের সংগে তাদের দহরম-মহরম, তাদের ভয় পাছে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে যায়- শ্রেণী শক্তিগুলো গোটা রাশিয়ায় স্পষ্ট চেহারা নিলে এবং নানা জাতির শ্রমিকদের পরিচিতি আরও শক্তিশালী হওয়ার পর জাতীয় বুর্জোয়ারা রুশ বুর্জোয়াদের পক্ষে এসে জার-তন্ত্রের সংগে আপোষ করল।

চেরনীশেভ্‌স্কী প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার এবং কৃষক আন্দোলনে ভাঁটার টান প্রতিক্রিয়ার উৎস খুলে দিলেও সপ্তম দশকে বিপ্লবী আন্দোলন নতুন প্রেরণা লাভ করে। এই কালের নায়ক নরোদনিকরা। সহরের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তখন গ্রামে গ্রামে—ভলগা, ডন ইত্যাদি নদী-তীরবর্তী গ্রামগুলোর কৃষকদের 'কম্যুন' তাদের দৃষ্টিতে বিপ্লবের কেন্দ্র। তবে নরোদনিকদের 'সাধারণের সংগে মেশা'র আন্দোলন সফল হয় নি; ১৮৭৪-এর শেষাশেষি ১,০০০-এরও বেশিসংখ্যক নরোদনিক গ্রেপ্তার হন। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয় 'ল্যান্ড এ্যানড ফ্রীডম্'—সেনট পিটার্সবুর্গ-এ। এস এন ক্রাভ্‌চিন্‌স্কী, জি ভি প্লেখানোভ্, এ ডি মিখাইলোভ এবং ও ভি আপটেকম্যান-এর নেতৃত্বে কৃষক-বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করার কৌশল গৃহীত হয়। পরে প্লেখানোভ্-এর নেতৃত্বে নরোদনিক আন্দোলনের একটা অংশ (ব্ল্যাক রিডিস্ট্রিবুশন) মার্ক্সইজম-এর পন্থানুসারী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পর পর দুটি বিপ্লবাত্মক অবস্থা বিপ্লবে পরিণত না হওয়ায় (এবং ইতিমধ্যে ১৮৮১-র ১লা মারচ জার দ্বিতীয় আলেকজান্দার নরোদনিকদের হাতে নিহত হওয়ায়) তৃতীয় আলেকজান্দার প্রতিক্রিয়ার স্রোত বইয়ে দিলেন—বহুমুখী সেই স্রোত, গণ-নিপীড়নের বিচিত্র ক্ষমতাসম্পন্ন।

॥ পাঁচ ॥

ধনতন্ত্র বিকশিত হওয়ার সংগে সংগে রুশ প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর নির্দিষ্ট রূপও ফুটে উঠতে লাগল। ১৮৬৫-তে শ্রমিক-সংখ্যা ছিল ৭০৬,০০০; ১,৪৩২,০০০ হল ১৮৯০ খৃস্টাব্দে। বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকরা দানা বাঁধায় শ্রমিক শ্রেণী অসংখ্য রুশ-চাষীদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অষ্টম দশকে শিল্প-সংকটের প্রত্যক্ষ ফল রূপে তাদের ধর্মঘটের প্রবণতা বাড়তে লাগল। এর মধ্যে রুশ-শ্রমিকদের প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয় ওরেখোভো-জয়ীয়েভোতে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে। 'মোরোজোভ স্ট্রাইক' নামে এর পরিচিতি, তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অন্যান্য জাতির শ্রমিকবর্গ।

এর আগে, ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে, জেনেভায় প্লেখানোভ প্রথম রুশ মার্ক্সীয় দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দল দ্য ইমানসিপেশন অব লেবর গ্রুপ। শ্রমিকদের মুক্তি—রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণীর তাত্ত্বিক ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা। রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারে এই দলীয় সভ্যদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮৩-'৮৪, ১৮৮৫-১৮৮৮ রাশিয়ায় পর পর মার্ক্সীয় দল স্থাপিত হতে লাগল। রুশ-শ্রমিকদের তখন সমস্যা মৌলিক—কীভাবে বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েত দল গঠন করা যায়। নরোদনিকরা এ পথে বাধাস্বরূপ। প্লেখানোভ-এর 'সোস্যালিজম এ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল স্ট্রাগল' (১৮৮৩), 'আওয়ার ডিফারেন্সেস' (১৮৮৫), 'দ্য ডেভেলপমেণ্ট অব্ দ্য মোনিস্ট ভিউ অব্ হিস্ট্রি' (১৮৯৫), 'দ্য রোল অব্ দ্য ইনডিভিজুয়াল ইন হিস্ট্রি' (১৮৯৮) এবং অন্যান্য বই নরোদনিকদের বিরুদ্ধ প্রচারে এবং রাশিয়ায় মার্ক্সীয় মতবাদ প্রসারের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নরোদনিকদের ভ্রান্ত মতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে মার্ক্সীয় তত্ত্বের সাহায্যে প্লেখানোভ-এর ভূমিকা পথিকৃতের।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে লেনিন সেন্ট পিটারস্‌বুর্গ-এ এসেই স্থানীয় মার্ক্স-বাদীদের নেতৃপদ পেলেন। নরোদনিকদের অন্তর্মুখী আদর্শবাদী মতবাদ নিশ্চিহ্ন ক'রে তাদের যবনিকার অন্তরালে প্রেরণের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব লেনিন-এর।

[ক্রমশ।

প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র

দণ্ডপাণি

বিশিষ্ট বিপ্লবীদের সান্নিধ্যলাভ ও দলগঠন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে যাঁহারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের শেষতম প্রতিনিধি।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯০৭ সালে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে 'স্বরাজ' কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র। ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে সভায় ভারত বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেই সভায় যে দশজন দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেন শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাহার অন্যতম নেতা এবং তাঁহার প্রধান সমর্থক ছিলেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ। দেশ বিভাগ—অন্যায় ও ভুল, নানা যুক্তি দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার কিছুদিন পর তিনি সেখানকার আইন পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন। পাকিস্তান সংবিধানে যখন ইসলামী গণতন্ত্র গ্রহণ করা হয়, শ্রীচট্টোপাধ্যায় বারোজন সদস্য লইয়া সর্বপ্রথম পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন হইতে 'ওয়াক আউট' করেন। এই সময়েও পাকিস্তান আইন পরিষদে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অতীত দিনের ভারত বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণের অন্যতম বিরোধী নেতা আবদুল গফুর খাঁ।

বিশ্বপরিক্রমকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ক্যানেডার ওটোয়া নগরীতে তাঁহার অশীতিতম জন্মতিথি উদযাপিত হয়। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তেই তিনি গমন করিয়া থাকুন না কেন তাঁহার স্বদেশী পোষাক—সামান্য ধুতি ও পাঞ্জাবীই ছিল তাঁহার একমাত্র পরিচ্ছদ।

মণীন্দ্রকিশোর রায়

তিনি ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী। 'আদর্শের বিরুদ্ধে কোন আপোষ নেই'—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। আইন ব্যবসায়ে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সর্বপ্রকার সহায়তা করিয়াছিলেন।

অনিল রায়

এমন একটিও রাজনৈতিক মামলা দেখা যায় না, যাহাতে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আসামীদের সমর্থন করেন নাই। ঢাকার বিখ্যাত 'ট্রেন ডাকাতী' মামলার অন্যতম আসামী ছিলাম আমি নিজেই। হত্যার
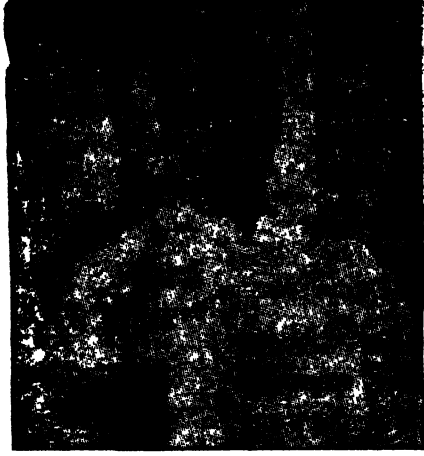
হেমচন্দ্র ঘোষ

দায়ে আমি অভিযুক্ত। তাঁহার অভূতপূর্ব জেরার উপর দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের সওয়ালে আমি প্রমাণাভাবে মুক্তি পাই। শ্রীশবাবু আমাকে মানসপুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমার সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :---

"A condemned man can build a nation when with his own exertion makes him free. I feel proud of to be instrumental for saving Biren (Birendra Chandra Dey) from the gallows. His father late Gobinda Chandra Dey was a close associate of mine and a political sufferer.

Biren has been one of those political workers of Bengal who suffered long detentions and carried on with their mission till independence has been achieved. I appreciated all his organising abilities as the Secretary of the Dacca Sadar Congress Committee during 1946 and '47 when I was the President of the District Congress. He organised the Volunteer Corps of the district and had the opportunity to receive Pandit Jawharlal Nehru at Dacca as G.O.C. of the Corps. He was then a delegate to the B.P. C.C., and a member of the A.I.C.C. After partition he left Pakistan for Calcutta under circumstances which made it impossible for him to stay on there. I wish him long life to render more valuable service for the oppressed humanity."

অনিল রায়

এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি'

১৯২০ সালের শেষের দিকে বাংলার প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকায় চলিয়া আসেন। তখন দল বলিতে তাঁহার তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তবে ইতিমধ্যে তাঁহার পুরাতন সহকর্মী শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও তাঁহার দুই জন সহায়ক শ্রীপ্রমথ চক্রবর্তী ও কালিদাস ঘোষ এবং বিশেষভাবে শ্রীঅনিল রায়ের কর্মতৎপরতায় ঢাকাতে বেশ কয়েকজন যুবকর্মীর একটি সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরসময় শূর, শ্রীভবেশ নন্দী, শ্রীপ্রফুল্ল দত্ত, শ্রীসত্য গুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্রকিশোর রায়, শ্রীসুরেন দত্ত, শ্রীপ্রফুল্ল মুখার্জী, শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়, ডাঃ ভূপাল বসু ও ডাঃ অরুণ নন্দী।

তাঁহাদের কর্মপরিচালনায় সংগঠন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই নূতন সমাবেশের মধ্যেই একটি অনামী বিপ্লবী গোষ্ঠী সংগঠিত হইয়া উঠে। পুলিস অবশ্য পরে এই সংগঠনকে তাহাদের কাজের সুবিধার জন্য 'ঢাকা পার্টি' নাম ধরিয়া লইয়াছিলেন।

পুলিসের চোখে ধূলি দেওয়ার জন্যে তাঁহারা ১৯২২ সালে জনহিতকর কার্যের জন্য 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার লীগ' এবং কিছুকাল পরে 'শ্রীসঙ্ঘ', 'শান্তি সঙ্ঘ', 'ধ্রুব সঙ্ঘ', 'কায়েৎটুলী ক্লাব' নামে ঢাকা শহরে কয়েকটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'শ্রীসঙ্ঘ' ছিল প্রথম শ্রেণীর সমাজসেবা-সংস্থা।

অনিল রায়কে কেন্দ্র করিয়া এই সংস্থা বিভিন্ন প্রকারের সেবাকার্যে, স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজে অথবা দুষ্ট দলনে অগ্রণী ছিল। অচিরেই শহরের সর্বত্র উচ্চশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান,

মেজর সত্য গুপ্ত

দুঃসাহসী ও চরিত্রবান জনকল্যাণকামী কর্মিরূপে এই দলের ছেলেদের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। শহরের পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়ামাগার খুলে নিয়মিতভাবে ডন-কুস্তি এবং লাঠি ছোরা খেলার চর্চা করিয়া তাঁহারা বস্তুতই সাধারণ যুবকদের জীবনেও স্বাস্থ্যরক্ষার মান উচ্চতর পর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রতিভাদীপ্তা লীলা নাগ, অনিল রায়ের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৩ সালে এম-এ পাশ করিবার পর শ্রীরায়ের

ভবেশচন্দ্র নন্দী

নির্দেশে তিনি সর্বান্তঃকরণে নারী সংগঠনে মন দিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি ঢাকা শহরে 'দীপালী সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইল। 'শ্রীসঙ্ঘের' অঙ্গরূপে এই সঙ্ঘ 'দীপালী স্কুল', কয়েকটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পরে 'নারী শিক্ষা মন্দির' —'শিক্ষা-

ডাঃ ভূপাল বসু

ভবন' প্রভৃতি ইংরেজী উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইভাবে সমাজসেবার শিক্ষা বিস্তারে, নারী ও শিশুদের কল্যাণ সাধনে, তাহাদের স্বাস্থ্যচর্চামূলক কাজের মাধ্যমে বহু ছাত্রী ও মহিলার সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে নিম্নে লিখিত কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী রেণু সেন (বসু), শ্রীমতী ঊষা রায়, শ্রীমতী বীণা রায় (কলিঃ), শ্রীমতী শকুন্তলা চৌধুরী (কলিঃ), শ্রীমতী সুশীলা সেনগুপ্তা (কলিঃ), শ্রীমতী প্রমীলা দাশগুপ্তা (কলিঃ), শ্রীমতী হেলেনা বল (দত্ত), শ্রীমতী শান্তি ঘোষ (দাস), (কুমিল্লা), শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার, শ্রীমীরা দত্তগুপ্তা, (কলিঃ), শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)---কুমিল্লা।

এই 'দীপালী' সমিতিকেই কেন্দ্র করিয়া ঢাকাতে এবং বিভিন্ন জেলায় বহু শিক্ষাকেন্দ্র ও নারীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটি মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীও সংগঠিত হয় এবং 'জয়শ্রী' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। এইভাবে হেমচন্দ্রের বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী মন, অনিল রায়ের যুক্তিবাদী দার্শনিক চিন্তাধারা ও ভাব-প্রসারতা, প্রথম পর্যায়ের কর্মীদের চরিত্রবল ও সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং লীলা নাগের আনুপূর্বিক সংহতি উভয়বিধ সংগঠনকে অত্যুগ্রভাবে সম্প্রসারিত করিয়া তোলে।

সমর সুর

১৯২৬ সাল হইতেই এই গোষ্ঠীর মাসিক পত্রিকা 'বেণু'ও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। ১৯৩০ সালের মধ্যে এই সংস্থাকে যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে —শিক্ষায়, দীক্ষায়, বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মে বাংলা দেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসে কৌলীন্যের আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞাত অখ্যাত থাকিয়া গেলেও কিছুসংখ্যক সতীর্থের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। [ক্রমশ।

মুক্তিকামী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

এবারে বিদায় নেব! খেদ কিছু নেই,
এ গ্রহের যত জ্বালা যত শোকতাপ,
নীরবে সয়েছি। সব প্রেম প্রীতিতেই
মোহমুগ্ধ আমি। আর যত অভিশাপ
কুড়ায়েছি অকাতরে। অযাচিত বরাভয় যত
সবিনয়ে নতশিরে নিয়েছি যে আমি।
আজ তাই মনে হয় বুঝি শান্তিমত
উচ্চকণ্ঠে বলা যায়—এবে মুক্তিকামী।
এ পৃথিবী যতটুকু দিয়েছে আমারে
তার চেয়ে শতগুণ প্রাপ্য ছিল মোর—
সুখ শান্তি ঐশ্বর্য ও পুণ্যের বাহারে,
কখনো ছিল না মনে এ দম্ভের ঘোর।

আমি তৃপ্ত, অতি তৃপ্ত, যা পেয়েছি তাই,
উচ্চাকিত কামনার জর্জরিত বিষে
অনলব্ধ বাসনায় কভু জ্বলি নাই।
আমার আঁধার গেছে জ্যোছনায় মিশে
বঞ্চনায় অনুরাগে সুখ দুঃখ মাঝে
উপবাসে পতনেতে অথবা সম্ভোগে,
অতিভরে নিরাময়ে শংকাহীন সাজে,
আক্রান্ত হয়েছি বহু, সবই একযোগে—
কভু বা হয়েছি জয়ী, কভু আশাহত।
তবু কোন খেদ নেই, বিদায়ের কাল সমাগত।

কাশ্মীরী মেয়ে

—এম, আর, দত্ত

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু

শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন
হাসি	নীচ থেকে ওপর	পাঠিকা

১ম পুরস্কার কুড়ি টাকা

২য় পনেরো টাকা : ৩য় দশ টাকা

বি
চি
ত্র
পো
ষা
ক

…চিত্র পোষাক —শীলা সুর (১ম পুরস্কার)

…ন্তুক —দুলাল দত্ত

—পার্থসারথি নিয়োগী

লণ্ডনে বরফ —ডাঃ নীলাম্বুজশশী রায়

তেনজিং নোরকে
—দীপঙ্কর সেনগুপ্ত

—বিপ্লবকান্তি রায়
(২য় পুরস্কার)

—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
(৩য় পুরস্কার)

বি চি ত্র পো ষা ক

-বিন্দুশেখর বিশ্বাস

পাহাড়তলী
—বকুল বসু

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / ১৩৭৬

* প্রতিযোগিতার
ছবি
প্রতি বাংলা
মাসের
১৫ তারিখের মধ্যে
পাঠাতে হবে

Angelo
Shellacs

EXPORT QUALITY
এখন আপনাদের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা ®
একসিকিউটিভ কালি
এতে সলভেন্ট এস-১০০ আছে
পার্মানেন্ট ব্লু-ব্ল্যাক, নেভি ব্লু ও জেট ব্ল্যাক
ওয়াশেবল রয়্যাল ব্লু, এমারেল্ড গ্রীন ও স্কারলেট রেড
BLACK
EXECUTIVE INK
Sulekha
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২
EXECUTIVE INK
Progressive/SW-34

জগদীশবাবুর গীতা
মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তর্নিহিত রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম
ভারত-আত্মার বাণী
শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা
কর্মবাণী
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী
বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী
বাংলার মনীষী ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী
বাংলার বিদুষী
আচার্য জগদীশ
রাজর্ষি রামমোহন ১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
যুগাচার্য বিবেকানন্দ
জীবন গড়া
রবীন্দ্রনাথ
ব্যবহারিক শব্দকোষ
STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

তামিলনাদের পথে পথে

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শেষাংশ)

পরবর্তীকালে রামনাদের রাজারা প্রায় ৩৫০ বছর ধরে এই মন্দির সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই মন্দিরের পাথরগুলি প্রতিটি ৪০ ফুট লম্বা। এগুলো সিংহল থেকে আনা হয়েছিল। রামেশ্বরের মন্দির কিন্তু খুব পুরো নয়। শোনা যায় এক কুঁড়ের মধ্যে রামেশ্বরের লিঙ্গ ছিল। এক সন্ন্যাসী পূজা করতেন। তারপর কোন রাজা নিজের দেশ থেকে কালো পাথর দিয়ে ঐ মন্দিরের গর্ভগৃহ তৈরী করেন। তারপর নতুন রাজা এসেছেন আর মন্দিরও ক্রমশ বড় হয়েছে। একসঙ্গে একেবারে মন্দির তৈরী হয় নি। ক্রমশ প্রাকার ও গোপুরের সংখ্যা বেড়েছে। কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা যখন যাই, ভেতরে ও বাইরে কাজ হচ্ছে। অনেক রাজমিস্ত্রী খাটছে। ঐ মন্দির তৈরীর আর শেষ নেই।

'দ্রাবিড় শিল্পের সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই রামেশ্বরমের মন্দির।' এই বিরাট মন্দিরের গৌরব কিন্তু তার করিডরে। এই করিডর সর্বসাকুল্যে ৪০০০ ফুট লম্বা। দু'পাশের অজস্র থাম করিডরের ছাদকে ধরে রেখেছে। থামগুলি নীচের দিকে সরু, ওপর দিকে ক্রমশ চওড়া হয়ে ছাদে ঠেকেছে। থামগুলিতে দেব-দেবী, যোদ্ধা, রাক্ষস, জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা আছে। সাদা, হলদে আর গাঢ় খয়েরী রঙে রঙ করা হয়েছে মূর্তিগুলিতে। রঙের কাজ যেন একটু স্থূল। সূক্ষ্ম কাজের আনন্দ পাওয়া যায় না এ দেখে।

প্রথমে লোক আসতো কম, মন্দিরও তাই ছিলো ছোট। ধীরে ধীরে দর্শনার্থী আর তীর্থযাত্রীর ভিড় বাড়তে সুরু করলো, মন্দিরও বাড়তে আরম্ভ করলো। এখন তীর্থযাত্রীদের জন্য স্নানের বাঁধানো ঘাট চাই, চাই বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত স্থান। তাই মন্দির ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাইরে যদিও ইলেকট্রিক লাইট, গর্ভগৃহে কিন্তু শুধু প্রদীপের আলো। দেবতার খুব কাছে যাত্রীদের যেতে দেওয়া হয় না দক্ষিণ ভারতে। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আমাদের মত সাধারণ মানুষকে দূর থেকে দেখেই চক্ষু সার্থক করতে হয়।

রামলিঙ্গেশ্বরের ঠিক সম্মুখেই দ্বিতীয় প্রাকারের ভেতরে চুনাপাথরের তৈরী এক বিরাট নন্দীর (ষাঁড়) মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। নানা রঙীন প্রলেপে তাকে আঁকা হয়েছে। এই নন্দীর উচ্চতা ১৭ ফুট, চওড়া ১২ ফুট ও লম্বায় ২২ ফুট। মাদুরার বিশ্বনাথ নাইয়ার ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণাপ্পার মূর্তি নন্দীর সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে।

মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেবী পর্বতবর্ধিনী নামে পরিচিতা। প্রতি শুক্রবার দেবীকে নবরত্নে অলংকৃত করে সোনার পালকীতে চড়িয়ে শোভাযাত্রা বার করা হয়। সেই শোভাযাত্রায় আমরাও অংশগ্রহণ করেছিলাম। শোভাযাত্রার সামনে দু'জন শানাই ও একজন ঢোল বাজাতে বাজাতে যায়। সে সানাই লম্বায় আড়াই থেকে তিন ফুট। এই মন্দির সমুদ্র উপকূলে অগ্নিতীর্থের কাছে অবস্থিত। বিরাট প্রাচীর দিয়ে মন্দিরটি ঘেরা। পূর্বে-পশ্চিমে এই প্রাচীর ৮৬৫ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ৬৫৭ ফুট লম্বা।

মন্দিরের ভেতরেই নাকি ২২টি তীর্থ আছে, যেমন মহালক্ষ্মী তীর্থ, গায়ত্রী তীর্থ, গন্ধমাদন তীর্থ, সর্ব তীর্থ, কোটি তীর্থ ইত্যাদি। আবার বাইরেও নাকি ২১টি তীর্থ, যেমন চক্রতীর্থ, পাপবিনাশ তীর্থ, দ্রৌপদী তীর্থ, অগস্ত্য কুণ্ড, নাগতীর্থ ইত্যাদি।

পূর্ব গোপুরমের সম্মুখে সমুদ্রতীরে অগ্নিতীর্থ এবং নবনির্মিত শঙ্করাচার্যের মঠ দেখতে পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য হিসেবে গন্ধমাদন পর্বতের নাম করা যেতে পারে। মন্দির থেকে মাইল দেড়েক দূরে অবস্থিত। একে পর্বত না বলে একটা টিলা বলা যেতে পারে। এই টিলা রামেশ্বরম্ দ্বীপের সর্বোচ্চ স্থান। এই মন্দিরের উপর থেকে সমগ্র রামেশ্বরম দ্বীপ দেখা যায়। চারিদিকে নীল সমুদ্র। পদ্মবনের পলাটিও দেখা যায়। পূর্বে রামনাদ (বর্তমানে রামনাথপুরম্) থেকে রামেশ্বরমের পথের সমস্ত কর্তৃত্ব রামনাদের রাজাদের ওপর ছিল। তাই রামানাদের রাজাদের সেতুপতি বা সেতুর রাজা বলা হয়। এই মন্দিরের ভিতরে কোন বিগ্রহ নেই, শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন এখানে পূজা হয়। মন্দিরের কিছুটা আগেই বাঁদিকে একটা ভগ্নপ্রাসাদ দেখে টাঙ্গাওলা বললো, এ প্রাসাদ রামনাদের রাজাদেরই কোন পূর্বপুরুষের ছিল।

রামেশ্বরমের মন্দির ১৯১১ সালে সারদামাতা দর্শন করতে আসেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন তীর্থযাত্রী ছিলেন। রামনাদের রাজা বিশেষভাবে পুরোহিতদের আদেশ দিয়েছিলেন মাকে যেন দেবতা স্পর্শ করতে দেওয়া হয়। মা ১০৮টি পদ্মপাতা দিয়ে দেবতাকে

[illegible] বেশ। শিবলিঙ্গ থেকে [illegible] নাকি নিজের মধ্যেই দলে উঠেছিলেন, যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।'

দেখে দেখে শরীর মন দুইই ক্লান্ত। যতটুকু দেখলাম, তার অনেকটাই বাকি রয়ে গেল। একটু ঘুমিয়ে না নিলে শরীর আর বইছে না। কিন্তু ঘুমোবার কোন উপায় নেই। রাত ২-১০ মিনিটে ট্রেন। স্টেশনে জেগে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ছাত্ররাও উপকূল থেকে কাজ সেরে ফিরে এসেছে স্টেশনে। কার কতো নমুনা সংগ্রহ হোল সেই নিয়ে আলোচনা দলাবাজি ও শেষ পর্যন্ত ঝগড়া শুরু হোল—ওদের কোন ক্লান্তি নেই, নেই পথের কোনই কষ্ট।

ভাবলাম ওদের বয়সে যদি আসতে পারতাম এখানে তাহলে আরও কতো দেখতাম, জানতাম। এখন আক্ষেপ করে কি হবে ?

যাই হোক্ ভোর পাঁচটা নাগাদ রামনাদ পৌঁছালাম। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। ছেলেরা কেউ বসার পযন্ত যায়গা পায় নি। আমাকে এবং বন্ধু আশীষকে ছাত্রেরাই একটু স্থান করে দিয়েছিল বসার মত। রামনাদে কাফি ইডলি খেয়ে সকাল ৮টায় রাজ্য-পরিবহনের সরকারী এক্সপ্রেস বাসে উঠলাম।

আগেই বলেছি এদেশের মত এত ভালো সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা ভারতে আর কোথাও নেই। একটানা ১০ ঘণ্টা এই বাসে করে আমরা নাগেরকয়েল পৌঁছলাম। সেখান থেকে অন্য বাসে চড়ে আরও দেড় ঘণ্টা পর কন্যাকুমারিকা এসেছিলাম।

এক্সপ্রেস বাসের ভেতরের ব্যবস্থাও অত্যন্ত সুন্দর। মোটা গদী আঁটা আলাদা আলাদা চেয়ারে বসার ব্যবস্থা। প্রতিটি বসার যায়গায় নম্বর দেওয়া আছে, যাতে অপর লোক না বসতে পারে। ৪৫ মিঃ থেকে একঘণ্টা অন্তর বাস থামে। চালকের ঠিক মাথার ওপর লেখা থাকে বাস পরবর্তী যে যায়গায় থামবে সে জায়গার নাম ক'টায় পৌঁছাবে. কত মিনিট থামবে ইত্যাদি। যাত্রীদের [illegible] জলের বাক্স ও গ্লাস। [illegible] ব্যবস্থা আছে। দাঁড়ানো কোন যাত্রী এরা নেয় না। এত ভাল ব্যবস্থা আমার মনে হয় না আর কোথাও আছে। মাঝ রাস্তায় সময়মত আমরা খাওয়া-দাওয়া করে বিকেল ৬টায় নাগেরকয়েল পৌঁছলাম, সেখান থেকে আবার বাসে করে এসে পৌঁছলাম কন্যাকুমারিকা প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ।

ব্যবস্থা যতই ভাল হোক আমার পক্ষে এতটা রাস্তা এইভাবে আসা— এখন তো ভাবতেই পারছি না কি করে গিয়েছিলাম। যতটা বেড়ানো হচ্ছে দেখা হচ্ছে কম। বিশ্রাম ছাড়া এত বেড়ানো আমার এ বয়সে পোষায় না। ট্রেন থেকে বাস, আর বাস থেকে ট্রেন ছোটাছুটি করতেই সময় চলে গেল। ছাত্রদের অল্পবয়স, অসাধারণ ক্ষমতা ওদের। ওদের কোনই ক্লান্তি নেই। ১০।১২ দিনে প্রায় ৩৫০০-৪০০০ মাইল ঘুরলাম। এই ছাত্ররা কোন যায়গায় কুলির ব্যবস্থা করে নি। প্রায় দেড়শো টাকার কুলিখরচ বাঁচিয়েছে। আমাকে ও বন্ধুবরকে একটি জিনিষও বইতে দেয় নি। অমিমিল্যা [illegible]ও ছিল না।

আবার মাদ্রাজ থেকে কোলকাতা ফেরার ট্রেনেও দেখেছি ওদের আলোচনার শেষ নেই—কে কত নমুনা যোগাড় করলো এই নিয়ে। তারপর সেই পুরোন ব্যাপার—দলাবাজি ও অবশেষে ঝগড়া—আবার ভাব।

এদের মধ্যে একজন ছাত্র ছিল, নাম ভুলে গেছি—শুধু মনে আছে তার নামের শেষে আছে রাজপণ্ডিত। কোন গোলমালে তাকে থাকতে দেখি নি, দেখেছি সর্বদাই কলম আর খাতা নিয়ে লিখতে। কথা বলতে খুব কম। কি লিখতো জানি না। বেচারার দু'দিনেই শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল বিরামবিহীন ঘোরাতে।

প্রায় দেড়দিন রাতে দিয়ে মাদ্রাজ ফিরেছিলাম। এই সময়টুকু কোডাম-বাক্কামের [illegible] বাড়ীতে শুধু পড়েছিলাম— [illegible] [illegible] হবে। শুধু মাছ-মাংস খেয়েছি আর ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আমার আত্মীয়ের দুই শিশুকন্যা ডোরা আর রীতা সারা দুপুর আমার মাথার পাকা চুল তুলে দিত। এতটুকু হাত-পা পর্যন্ত নাড়াই নি। চুল তুলতে তুলতে রীতা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতো 'নাপাও নালে'—ঘুমের ঘোরে অবাক হয়ে চোখ মেলে তাকাতাম, বলতো, 'বুঝলেন তো ? এর মানে ৩৪টা পাকা চুল তুললাম।

কন্যাকুমারিকায় বাস থেকে নেমে এক দেবস্থানে স্থান পেয়েছিলাম আমরা। রাস্তায় শীতকালে বৃষ্টি পেয়েছিলাম, বাসের মাথায় আমাদের স্যুটকেশ বেডিং ইত্যাদি জিনিষপত্র সমস্ত 'ভিজে' গিয়েছিল। দেবস্থানের সামনেই ছিল সমুদ্র। কিন্তু সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা সামান্য মেঘ থাকার জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম আমরা। এই অঞ্চলটি খুবই ছোট। প্রধান পথ একটু ঘুরেই মন্দিরে শেষ হয়েছে। কন্যাকুমারীর মন্দিরকে একপাশে রেখে বসতি গড়ে উঠেছে। দোকান হোটেলও বেশ কয়েকটি আছে। বোধ হয় খুব বড় তীর্থস্থান নয় বলেই, কিংবা যাতায়াতের অসুবিধা অথবা দূরত্ব একটু বেশী বলেই তীর্থযাত্রীর সংখ্যা এখানে কম। দু'চার জন যারা এসেছেন তাঁরা টুরিস্ট হিসেবেই। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন তুলনা নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় ডানদিকে, সম্মুখে, বাঁদিকে বালি জল, শুধু পিছন দিকে তাকালে স্থল দেখা যায়। এই মহা-সমুদ্র তিন নামে ভারতের তিনদিক ঘিরে রেখেছে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে আরবসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর নামে পরিচিত। সমুদ্রের বালিও বিচিত্র রঙের। উত্তাল-তরঙ্গ বার বার এসে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানছে জলের ওপর মাথা উঁচু করা পাথরগুলোর ওপর। যেমন তার গতি তেমনি প্রচণ্ড তার গর্জন। ঢেউ-এর ধাক্কায় জল ছিটকে উঠছে ২৫।৩০ ফুট উঁচু হয়ে, তারপর জলকণা

ছিটকে পড়ছে চারিদিকে রামধনু রঙে। এমন দৃশ্য আর কোথাও আমাদের চোখে পড়ে নি। অভিভূত হয়ে গেলাম। এ যেন দুই দৈত্যের লড়াই। একজন অপরজনের মাথা নুইয়ে দেবার চেষ্টা করছে, আর অপরজন তাকে উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। বিরামহীন ভাবে চলেছে এই খেলা অনাদি-অনন্তকাল থেকে।

সন্ধ্যাবেলা আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এ মন্দিরের কাহিনীটি একটু দুঃখের। কথিত আছে—বাণাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে যখন অমরাবতী থেকে বার করে দিলেন, তখন বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র যে যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞ থেকে এক কুমারীকন্যা বেরিয়ে বাণাসুরকে বধ করেন। কুমারী-কন্যা তখন শিবকে বিবাহ করার জন্য তপস্যা করেন, তাতে তিনি সফল হন। কিন্তু শিব বললেন যে, বিয়ে করতে তিনি রাজী আছেন বটে, তবে লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এ বিয়ে আর হবে না। ঠিক সময়মত শিব বিয়ে করতে বেরুলেও পথে দুর্বাসা মুনির সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় বসে পড়েন, কাজেই অনেক দেরী হয়ে যায়।

আলোচনা শেষ করে শিব যখন উঠলেন, তখন হঠাৎ কাক ডেকে ওঠায়, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ভেবে শিব শুচীন্দ্রমেই (কন্যাকুমারিকা থেকে ৯ মাইল দূরে) থেকে যান। সেই থেকে কন্যাকুমারী আর বিবাহ করেন নি, সারাজীবন কুমারীই থেকে যান।

কন্যাকুমারী এখানে বিভিন্ন নামে পরিচিতা—কখনো দেবী কুমারী, কখনো দেবী পরমেশ্বরী ইত্যাদি। মন্দিরে দেবী দর্শন করতে গেলে পুরুষদের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে একবস্ত্রে প্রবেশ করতে হয়। আমাদের প্রবেশপথ ছিল উত্তরে। দক্ষিণেও অনুরূপ একটি দরজা আছে; সে দরজা খুললে সামনেই তিন সাগরের মিলন দেখা যায়। কিন্তু এই দরজা সর্বদাই বন্ধ থাকে। বলা হয়, দেবী কুমারীর কপালে একখণ্ড হীরক আছে, [illegible] দু'পাশে এবং দেবীর [illegible] থেকে তা জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। এই আলো দেখে আগে অনেক জাহাজ নাকি ভুল পথে চলে গিয়েছিল, তাই সেই দরজা বছরে মাত্র একদিন খোলা হয়। কন্যাকুমারীর সর্বাঙ্গে যেন চন্দন মাখানো। আর অলংকারের সীমা নেই। চারিদিকে অসংখ্য প্রদীপের আলোয় সমস্ত অলঙ্কার ঝলমল করছে। কিন্তু সকালের বেশ নাকি অন্যরকম। তখন সাধারণ বেশ থাকে গায়ে কোন অলঙ্কার থাকে না। এত সুন্দর মূর্তি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। ঠিক মনে হয় ষোল-সতের বছরের এক কুমারী মেয়ে ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেবীর রত্নালঙ্কারের মধ্যে 'নাগমণির' নাম সুবিদিত। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রাচীর সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠেছে। দক্ষিণের দ্বার দিয়ে যে সিঁড়ি আছে তা দিয়ে নামলে সমুদ্রের স্নানের যায়গায় পৌঁছানো যায়। জলে নেমে যদি আরও দশ-বারো গজ জলের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে অনুভব করা যায় 'ভারতের শেষ শিলাটিকে'। কন্যাকুমারীর মন্দির ছাড়া আরও এগারোটি তীর্থ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন চক্রতীর্থ, পাপনাশন, গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, কুমারী তীর্থ ইত্যাদি। জল এবং স্থলের সঙ্গমে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিন দিকে বিরাট জলরাশি---ভারতের স্থলভাগের এই শেষ।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে দেখা যায় দুটি শিলা জলের ওপর মাথা উঁচু করে আছে। আগ্নেয় শিলায় গঠিত এই বিরাট জমাট বাঁধা পাথর দুটি আবহমানকাল ধরে সমুদ্রের ঢেউকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশকে বোধ হয় ঠিকমত দেখা যায় না। তাই স্বামীজী সাঁতার কেটে এই শিলাটিতে বসে ভারতের মুক্তির জন্য, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য ধ্যান করতেন। তাই আজ এ শিলা 'বিবেকানন্দ রকস্' নামে পরিচিত।

বর্তমানে মোটর বোট বা নৌকা পাওয়া যায় তাতে করে 'বিবেকানন্দ রকস্'-এ যাওয়া যায়। সেখানে এখন কাজ সুরু হয়েছে স্বামীজীর মূর্তি বসানোর। কন্যা-কুমারীতে তার একটি অফিস ও লাইব্রেরী আছে। তবে যে ভাবে কাজ এগোচ্ছে কবে শেষ হবে বলা শক্ত।

আমাদের অশিক্ষিত দেশে এই একটা সুবিধে আছে যে, যে কোন ব্যাপারেই আমরা রাজনীতি ঢুকিয়ে দিতে পারি। সমুদ্রের ধারেই স্বামীজীর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি আছে একটি ছোট মন্দিরের ভিতর। ঠিক তার পাশেই তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে আর একটি বিরাট মণ্ডপ সরকারী খরচে তৈরী করা হয়েছে—যার নাম গান্ধী-মণ্ডপ বা গান্ধী-মন্দির। তার চারিদিকে এবং মাথায় বড় বড় আলো দেওয়া আছে যাতে যাত্রী বা টুরিস্টদের কোন অসুবিধা না হয়। এই মণ্ডপের চারিদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো মানুষজনের বসার সুবিধের জন্য।

স্বামীজী বাংলা দেশে জন্মেছিলেন বটে, সারাভারতের হিন্দুধর্মের প্রতীক ছিলেন তিনি। স্বামীজী যখন পরিব্রাজক হয়ে পদব্রজে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করতে করতে রামনাদে এসে পৌঁছান তখন রামনাদের তৎকালীন রাজা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজা তাঁকে আহ্বান জানান, তিনি যেন হিন্দুদের প্রতিনিধি হয়ে শিকাগোর আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। কিন্তু স্বামীজী তাতে রাজী হন নি, কারণ ভারত প্রদক্ষিণ তখনো তাঁর সম্পূর্ণ হয় নি।

পদব্রজে তিনি কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন যেখানে ভারতের শেষ মৃত্তিকার সঙ্গে তিন সাগরের মিলন হয়েছে। শিকাগো থেকে ফেরার পথে অবশ্য রামনাদের রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁর অতিথি হয়েছিলেন।

রাজা পরবনে হিন্দুধর্মের প্রতীক এই বীর সন্ন্যাসীকে প্রথম রাজোচিত সম্বর্ধনায় আপনার অতিথি হিসাবে বরণ করেছিলেন। রাজার বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী রামেশ্বরমে গিয়ে বক্তৃতাও করেছিলেন। কাজেই স্বামীজীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ ও পরিচয় বহু কালের। তাই তাঁর মন্দিরের এই দুরবস্থা আমাদের চোখে একটু দৃষ্টিকটু লাগে বৈকি। জানি না এটাও রাজনীতির কোন এক নতুন চাল কি না। না আছে সে মন্দিরে একটু আলোর ব্যবস্থা, না আছে মন্দির দেখাশোনার একটু সুব্যবস্থা। ক'টা চটি বই নিয়ে 'লোক. দেখানো' একটি লাইব্রেরী দাঁড় করানো আছে। যাত্রীরা এবং বিদেশীরা একট দূরেই বিচিত্র রঙের আলোয় ঝলমল করা বিরাট গান্ধী-মণ্ডপের ওপরে উঠে, ব্যালকনিতে [illegible] বেঁধে বসে গল্প করে, ট্রানজিস্টার বাজায়, চা-চানাচুর খায়, আর বেড়ায়।

অবিশ্যি এসব দেখে মনে হয় ভাগ্যিস আলোর ঝলমলানি এখানে নেই, তাহলে এরাই ট্রানজিস্টার নিয়ে এসে জুটতো এখানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা দু' একজন যাত্রী আর সিটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ জীববিজ্ঞানের ১৪জন অনার্সের ছাত্র [illegible] আর কাউকে দেখা যায় নি স্বামীজির এ ক্ষুদ্র মন্দিরের কাছে।

চিরন্তনী গান

বিষ্ণু দত্ত

বিদায়!
কথাটি পরাণে যেন বিষাদ জাগায়।
কভু কারো বিদায় বেলায়,
হৃদয় কাঁদিয়া উঠে বিচ্ছেদের নিবিড় ব্যথায়।
মোহমুগ্ধ মানবের মন,
তাই কাঁদে না মানি বারণ।
ঐ কার শঙ্খে বাজে শুনিবারে পাই,
এ সংসারে বিদায় যে কভু কারো নাই।
আজ যার বিসর্জন,
কাল প্রাতে তারই আবাহন,
চলে অনুক্ষণ,
হয় ইহা জগতের নীতি চিরন্তন।
শোন রে বধির! উঠিছে পূরবী তান,
বিদায় সমীরে বাজে আবাহনী গান,
রবি যায় অস্তাচলে, নলিনী প্রিয়ার পাশে মাগিয়া বিদায়,
পুনঃ কি দেয় দেখা, প্রিয়ারে তাহার, পরদিন
প্রভাতবেলায়?
রতিপতি কামদেব, ভস্ম হয়ে, ধূর্জটির
ভাল নেত্রানলে,
সৃষ্টির মোহন মন্ত্রে, জাগেনি কি পুনরায়, প্রেয়সীর
শোক অশ্রুজলে?
লক্ষ্মী সে বিদায় নিলে, ভরে উঠে গৃহ, দুর্ভিক্ষের
মর্ত্ত হাহাকারে,
ক্ষুধার্তের ডাকে পুনঃ ফিরে না কি রমা, অন্ন নিয়ে
দুয়ারে দুয়ারে?
রিক্ততার ব্যথা নাশি,
জাগে না কি পুনরায় প্রাচুর্যের হাসি?
নৈরাশ্যের ভগ্নতীরে,
আশার স্বপন সে কি আসে নাকো ফিরে?
চিত্র অবসানে, ব্যথাতুর নিবিড় সন্ধ্যায়,
তন্দ্রাতুর রজনীর ঘনতমসায়,
বিদায় লইয়া যায় পুরাতন ক্লান্ত যে বরষ,
বৈশাখের প্রথম প্রভাতে, পাই নাকি নবরূপে
তাহারই পরশ?
নাই—নাই—নাই—কারো বিসর্জন
পিছে তার চলে আমন্ত্রণ।
পুরাতন—অক্ষয় অব্যয়,
নূতনের মাঝে, নবনবরূপে, হয়ে থাকে

গুরু সন্নিধানে নিবেদিতার দিনগুলি

বিবেকানন্দ

নিবেদিতা

১৮৯৫ খৃস্টাব্দ ভারতের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসরই ভারতের দিগ্বিজয়ী নেতা, মুক্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ই, টি, স্টার্ডির আমন্ত্রণে লণ্ডনে আসেন। তাঁর অসাধারণ তেজোদীপ্ত সম্মোহনী ভাষায় প্রাচ্যের ধর্ম—বেদান্তধর্ম তিনি প্রচার করতে থাকেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনে। বেদান্ত-দর্শনের এমন অপূর্ব ব্যাখ্যা এর পূর্বে আর কেউ শোনেন নি লণ্ডনে। এই দিগ্বিজয়ী পুরুষের কথা অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। দলে দলে নর-নারী তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে এলেন তাঁর কাছে।

এমনি একদল নর-নারীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন ইংলণ্ডে বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। ভগবৎ কমের জন্য নিবেদিত-কুসুম নিবেদিতা উপনীত হলেন তাঁর গুরুর সন্নিধানে। অভাবিত ব্যাপার। তাঁর গর্ভধারিণী জননীর অতীতের প্রতিশ্রুতি এমনি আকস্মিকভাবে সত্যে পরিণত হবে—ঈশ্বর যে তাঁর কাজের জন্য নিবেদিতাকে গ্রহণ করবেন, এ কথা তখন কে ভেবেছে?

১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম মিলিত হলেন। তখন অবশ্য নিবেদিতা 'নিবেদিতা' বলে পরিচিত হন নি, তখন তাঁর নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ফ্রয়েবেলের এবং পেস্টালজির এক [illegible] ছাত্রী মার্গারেট তখন একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকাযে নিযুক্ত আর আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এমনি সময়ে সাক্ষাৎ হ'ল গুরু-শিষ্যায়—স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতায়।

ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রথম ও দ্বিতীয় পরিভ্রমণের মধ্যে মার্গারেটের ভবিষ্যৎ-জীবন নির্ধারিত হয়ে গেল। মার্গারেট স্বামীজীর কোন বক্তৃতা বা আলোচনা-সভাতেই যোগদান থেকেই বিরত থাকতেন না। এর মধ্যেই বোধ হয় তাঁর

শ্রীঅরুণ সেন

সুপ্ত ভবিষ্যৎ প্রস্ফুটিত হচ্ছিল। একদিন তিনি স্বামীজীকে তাঁর ভারতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন; বেদান্তকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন—এ কথা জানালেন স্বামীজীকে।

রত্ন চিনতে দেরী হয় নি স্বামীজীর। অত্যন্ত কাছে থেকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন মার্গারেটকে। স্বামীজী লিখলেন:

'আমি এখন নিশ্চিত ভারতের কাজের জন্য তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতে আমার কর্মপ্রণালীতে আমার মাতৃভূমির নারীদের সাহায্য করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় পদ্ধতিতে নারী-শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আমার আছে। এ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুধু আদর্শ গৃহিণী, [illegible] তৈয়ারী করাই নয়, স্ত্রীজাতির সাহায্য করতে পারে এমন ব্রহ্মচারিণী তৈয়ারী করাও এর উদ্দেশ্য। ---তোমার শিক্ষা, সততা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, সংকল্প এবং সর্বোপরি কেল্টিক রক্ত তোমাকে এ কাজের উপযুক্ত নারী করে রেখেছে।'

১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী মার্গারেট তাঁর কর্তব্য সাধনে ভারতে আগমন করলেন। ভারত-মাতার সেবার জন্য ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার ভারতে এল। এই সময়ে হেনরিয়েটা মুলার, শ্রীমতী ওলি বুল এবং জোসেফাইন ম্যাকলিওডও ভারতে আসেন। মার্গারেট এবং এই মহিলাগণও স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মার্চ মাসে মার্গারেট ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হন এবং স্বামীজীর কাছ থেকে 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করেন। এর পর থেকেই তিনি ভগিনী নিবেদিতা বলে পরিচিত হন।

প্রথম বৎসর গুরুর অতি নিকট সাহচর্য লাভ করেন নিবেদিতা। কত অসংখ্য বিষয়ে আলোকপাত করতেন স্বামীজী। অজ্ঞাত, অপরিচিত ভারতের স্বরূপ কতভাবে উদ্ঘাটিত করতেন স্বামীজী তাঁর কাছে। ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা—কোন কিছুই আলোচনা থেকে বাদ পড়ত না।

বেলুড়ে গঙ্গার তীর-সংলগ্ন একটি নির্জন কুটিরে এই বিদেশী শিষ্যগণ বাস করতেন। স্বামীজী এখানে প্রায় প্রত্যহই আসতেন; তাঁর শিষ্যদের কতভাবে শিক্ষা দিতেন। বেলুড়ের

দিনগুলির একটি চমৎকার চিত্র এঁকেছেন নিবেদিতা তাঁর 'দি মাস্টার, অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে:

গঙ্গাতীরের বৃক্ষ-প্রান্তরের মধ্যে আমি আমার নেতাকে ভালভাবে চিনতে পারি, তাঁর কাজের জন্য আমার সমস্ত জীবন প্রদত্ত হয়েছিল।... এখানে আমাদের কুটিরে স্বামীজী তখন প্রত্যহই ভোরবেলা একা অথবা তাঁর কয়েকজন গুরু-ভ্রাতাকে নিয়ে আসতেন। প্রাতরাশেরও অনেক পর পর্যন্ত গাছের তলায় বসে তাঁর ব্যাখ্যার অফুরন্ত প্রবাহ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করতাম। কদাচিৎ প্রশ্নোত্তরের জন্য ব্যাখ্যা বন্ধ রাখা হত, তখন তিনি এই ভারতখণ্ডের কত গভীর রহস্যের সন্ধানই না আমাদের দিতেন।... একদিক দিয়ে স্বামীজীর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাধা প্রায় হলেও তাঁর বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। যে-সব মনকে উদ্দেশ করে তিনি বক্তৃতা করতেন, তাদের প্রতি তাঁর উদাসীনতা কখনও লক্ষিত হয় নি। ঝড়ের বেগ আর শক্তি ছিল তাঁর কথার মধ্যে প্রভূত পরিমাণে—কোন এক অজ্ঞাত উৎস থেকে মধুরিমা তারা বহন করে আনত।

স্বামীজীর শিক্ষা-প্রণালীর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে নিবেদিতা লিখেছেন:

এখানে আমরা ভারতাত্মার সুমহান মূলমন্ত্র ও আদর্শের কথা শিক্ষালাভ করলাম। ইতিহাস, সাহিত্য এবং এ-রকম আরো সহস্র উৎস থেকে তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করা হ'ত। কিন্তু উদ্দেশ্য সব সময়েই এক ছিল। ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করাই ছিল উদ্দেশ্য।

এর মধ্যে এক অগ্নি-পরীক্ষা নেমে এল নিবেদিতার জীবনে। প্লেগ মহামারীর রূপ ধরে কলকাতার জীবনকে বিপন্ন করে তুলল। ভয়ে দিশাহারা হয়ে মানুষ পালাতে আরম্ভ করল শহর ছেড়ে। স্বামীজীর শিক্ষা সফল হ'ল নিবেদিতায়। রুগ্ন, আর্ত মানুষের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন নিবেদিতা প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে। স্বামীজীর নর-নারায়ণ সেবার আদর্শ সার্থক হয়ে উঠল নিবেদিতায়।

মহামারী শেষে স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য-শিষ্যাদের নিয়ে হিমালয় পরিভ্রমণের পরিকল্পনা করলেন। নিবেদিতার জীবনে এ এক স্মরণীয় অধ্যায়। স্বামীজীর অতন্দ্র প্রচেষ্টায় ফলে ভারতীয় ভাবধারায় মন তাঁর পূর্ণ হয়ে এসেছে। ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য সম্পর্কে একরূপভাবে আলোকপাত করেছেন স্বামীজী তাঁর মনে। তবুও এ ভারতভূমির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় তাঁর তেমন হয় নি। সে চাক্ষুষ-পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে এল এই হিমালয়-যাত্রা।

ট্রেনে করে চললেন স্বামীজী। সঙ্গে নিবেদিতা, শ্রীমতী ওল বুল, শ্রীমতী প্যাটারসন, জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড, স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ ও সারদানন্দ। সে কি ট্রেন-যাত্রা! সচল রেলকক্ষের মধ্যে দুই পাশের প্রকৃতি যেমন জীবন্ত হয়ে উঠল, তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠল ভারতের অতীত ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য। স্বামীজীর অনির্বচনীয় বাচনভংগীতে, অসাধারণ মনোরম ব্যাখ্যায় অভিভূত হয়ে পড়েলন সকলে। একটির পর একটি স্টেশন আসে, স্বামীজী বলে চলেন সে অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতির কথা। শুধু তো আর স্থান দর্শন নয়, তার সঙ্গে দৃষ্ট হয়ে যায় তার অতীত ইতিহাসও। সে এক অপূর্ব ব্যাপার! পথ চলতে চলতে স্বামীজী বলে চললেন কত স্থানের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। লক্ষ্ণৌতে এসে বললেন এখানকার নবাবদের কাহিনী, এখানকার সংস্কৃতির কথা। ভারতকে আরো নিবিড়ভাবে চিনলেন নিবেদিতা, তার আরো বাস্তব পরিচয় পেলেন।

সকলে মিলে প্রথমে এলেন নৈনিতাল। তারপর সেখান থেকে আলমোড়া। আলমোড়ায় নিবেদিতা যে-শিক্ষা লাভ করলেন, তা তাঁর জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: কারণ, পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় জীবন গ্রহণ করতে তাঁর সুদৃঢ়প্রথিত পাশ্চাত্য-সত্তা বাধা দিচ্ছিল। বিবেকানন্দ চান নিবেদিতা মনে-প্রাণে সত্তার প্রতিটি স্তরে ভারতীয় হয়ে উঠুন। কিন্তু নিবেদিতার বিচারশীল মন প্রতিটি মুহূর্তে তর্ক তোলে। স্বামীজীরও ধৈর্যের সীমা নেই, প্রচেষ্টার বিরাম নেই। অক্লান্তভাবে তিনি তাঁর ভারত-প্রেম নিবেদিতার মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে চলেছেন। পরে অবশ্য স্বামীজীর ইচ্ছাই ফলবতী হ'ল। মনে-প্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। ভারতীয় ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণে নিবেদিতার দ্বিধা স্বামীজীকে বিচলিত করতে পারে নি, কারণ পরিবর্তন যেখানে নিশ্চিত, সেখানে বাধাটাও একটু প্রবলই হয়। স্বামীজীর নিজের জীবনেই তো তা হয়েছে—তাঁর তার্কিক মন বিনা দ্বিধায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের অনেক কথাই তো গ্রহণ করতে পারে নি।

আলমোড়া থেকে কাশ্মীর। তারপর আবার কোলকাতা, ফেরার পথেও স্বামীজী একাগ্রভাবে শিক্ষা দিয়ে চললেন তাঁর শিষ্যাদের। কত বিষয়ের অবতারণা করেন, কত বিষয় পরিষ্কারভাবে তাদের বুঝিয়ে দেন।

নিবেদিতার শিক্ষা সমাপ্ত হ'ল। এবার যে-কাজে নিবেদিতাকে নিয়োজিত করবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন স্বামীজী, সে-কাল এসে উপস্থিত হ'ল। হতভাগ্য ভারতের নারীদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন স্বামীজী, এদের অ-শিক্ষা তাঁর চিত্তকে ব্যথিত করে তুলত। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন জাতির সামগ্রিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে নারী-প্রগতির 'পরে; আর নারী-প্রগতি শিক্ষা ব্যতীত আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। কে এদের অজ্ঞানের অন্ধকার ঘোচাবে? নিবেদিতার মধ্যে স্বামীজী প্রদীপ্ত সূর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, এ-ই সেই নারী যার মধ্যে রয়েছে সুপ্ত নারী-জাতিকে জাগরিত করার ঐশ্বরিক ক্ষমতা।

বেলুড় ছেড়ে বাগবাজার চলে এলেন

নিবেদিতা তাঁর [illegible]। প্রথমে শ্রীশ্রীমা সারদামণির সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। বাগবাজার অঞ্চলে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল এবং নিবেদিতা হলেন তার সর্বেসর্বা। স্কুল আরম্ভ হ'ল ১২ই নভেম্বর কালীপূজার দিনে। বিকেলের দিকে শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এলেন বিদ্যালয়ের আরম্ভ-উৎসবে যোগদান করার জন্য। উৎসব-শেষে তাঁরা প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ের শুভ-কামনা করে নিবেদিতার উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানালেন। শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করলেন, 'জগজ্জননীর আশীর্বাদ বিদ্যালয়ের উপর বর্ষিত হোক, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকারা আদর্শস্থানীয়া হয়ে উঠুক।'

স্থানীয় পল্লী থেকে অল্প কিছু ছাত্রী সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হ'ল। নিবেদিতার পবিত্র জীবন, আদর্শনিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করল। আট মাস ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য চালালেন নিবেদিতা। স্বামীজী তাঁর উপর স্ত্রীশিক্ষার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে-কার্য পালন করে নিবেদিতা বুঝলেন স্বামীজীর আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে তাঁর বিশেষ অসুবিধে হবে না। এখন প্রথম প্রয়োজন অর্থের।

এই অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন নিবেদিতা ১৮৯৯ সালের জুন মাসে। বিদ্যালয়টি বন্ধ রইল বৃহত্তর সম্ভাবনার অপেক্ষায়।

নিবেদিতা, স্বামী তুরীয়ানন্দজী এবং স্বামীজী—একদিন জাহাজে করে কলকাতা থেকে ইয়োরোপের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। জাহাজটি কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ, কলম্বো, এডেন, নেপল্‌স্‌ ও মার্সে হয়ে জুলাইয়ের শেষে লণ্ডন এসে পৌঁছাল। এই সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছিল। সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। একদিন বললেন, 'যত বয়স বাড়ছে [illegible] দেখছি যে [illegible] সর্ব-[illegible] সার্বভৌমত্ব। এই নতুন বাণী। যদি মন্দও কিছু করতে হয়, মানুষের মতো ত' কর।'

আর একদিন বললেন, 'আমার আশা এই যে সনাতন ভারতবর্ষের যা কিছু কল্যাণ তার সঙ্গে বর্তমান যুগের মহৎ শিক্ষাগুলি স্বাভাবিকভাবে সম্মিলিত হবে। এই নূতন সমন্বয় ভিতরকার ক্রমবৃদ্ধি থেকে হওয়া চাই। সেজন্য আমি কেবল উপনিষদই প্রচার করি। উপনিষদ ছাড়া অন্য শাস্ত্র আমি বড় একটা উদ্ধৃত করি না। উপনিষদের একটি ভাবের উপর আমি বেশী জোর দিই—বীর্যবত্তা, অভী।'

লণ্ডনে কয়েকদিন অতিবাহিত করে স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকার দিকে যাত্রা করলেন। নিবেদিতা ইংলণ্ড থেকে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ-প্রচেষ্টা করতে লাগলেন।

নিউ ইয়র্ক হয়ে স্বামীজী ক্যালিফোর্নিয়া এসে অক্লান্তভাবে বেদান্ত প্রচার করতে থাকেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্বামীজী নিবেদিতাকে লিখলেন: 'তোমার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ আসবে। কখনো ভয় করো না। অর্থ আসতেই হবে।'

কিছুকাল পরে নিবেদিতা স্বয়ং আমেরিকায় এলেন অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা আমেরিকার জনসাধারণের কাছে তুলে ধরলেন। অনেকে তাঁকে এ-কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন। লেগেট দম্পতির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০২ সালের প্রথমভাগে নিবেদিতা ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন বিদ্যালয় পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। স্বামীজী তাঁর আশীর্বাদ পাঠালেন: 'সকল শক্তি তোমার মধ্যে জাগুক। জগজ্জননী স্বয়ং তোমার বাহুতে আর মনে অবস্থান করুন।'

সরস্বতী পূজা উদযাপনের মধ্যে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করলেন। ২৮শে জুন সকালবেলা স্বামীজী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে এলেন। গুরুকে প্রণাম করে দোতলার ঘরে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিবেদিতা। মৃগ-চর্মাসনে বসে স্বামীজী সস্নেহে তাকালেন নিবেদিতার দিকে। কত কথা হ'ল। শেষে বললেন, 'এ বাড়ী আমার বেশ ভাল লাগছে। এ বাড়ী তোমার কাজের উপযুক্ত হবে। ছোট শিশুদের পূজা করতে কখনো ভুলো না, কারণ যথার্থ মহত্ত্ব এদের মধ্যেই সুপ্ত হয়ে রয়েছে।'

স্বামীজীর ফেরার সময় হ'ল। নিবেদিতা একটি প্রার্থনা করলেন: 'স্বামীজী, যেদিন এই বিদ্যালয় দ্বার-উদ্‌ঘাটন করবে, সেদিন আপনি তাকে আশীর্বাদ করতে আসবেন তো?'

স্বামীজী বললেন, 'আমার আশীর্বাদ সর্বদা তোমার সঙ্গে আছে।'

স্বামীজীর আগমনের পর চারটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। নিবেদিতা তাঁর গুরুকে দেখতে আসার ইচ্ছা মনের মধ্যে অনুভব করলেন। বেলুড়ের দিকে সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলেন। সেদিন ছিল একাদশী। এই দিনে নিষ্ঠাবান হিন্দুরা উপবাস পালন করেন। নিবেদিতাকে সাদর-অভ্যর্থনা করলেন স্বামীজী। স্বামীজী নিজে উপবাসী থেকে নিবেদিতার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করালেন। ভাত, তরকারি, ফল, দই শ্বেতপাথরের পাত্রে আনা হ'ল। স্বামীজী নিজে পরিবেশন করে নিবেদিতাকে খাওয়ালেন। খাদ্য পরিবেশন করতে করতে কত মধুর কথাই না বলছিলেন স্বামীজী। শেষে হাত-মুখ ধোয়ার জল নিজেই ঢালতে লাগলেন। নিবেদিতা বললেন, 'এ কি স্বামীজী, আপনি যে-কাজ করছেন, এ-কাজ যে আমার করা উচিত।'

মৃদু হেসে স্বামীজী বললেন, 'যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' আশীর্বাদের একটি মন্ত্র পড়লেন স্বামীজী। স্বামীজীর অপরিসীম করুণা অনুভব করলেন নিবেদিতা মনে-প্রাণে।

তারপর আর মাত্র দু'টি দিন। প্রয়োজনীর দিনে নেমে এলো মহা-নির্বাণ। পরমপুরুষ বিবেকানন্দ, ভারত-সূর্য বিবেকানন্দ মহাসুষুপ্তির কোলে সজ্ঞানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পিছনে রেখে গেলেন তাঁর সীমাহীন কার্যের সুমহান ফলশ্রুতি। ইয়োরোপ, আমেরিকা থেকে যে-সমস্ত কুসুম চয়ন করে এনে ভগবৎ-কার্যে নিবেদিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে সুন্দরতম নিবেদিতাকে নিবেদিত করে গেলেন দেশমাতার অক্লান্ত সেবায় নর-নারায়ণের নিঃস্বার্থ কল্যাণ-সাধনে।

স্বামীজীর চিতাশয্যার পাশে বসে নিবেদিতা শুধু এ-ই ভাবলেন: স্বামীজী বাহির থেকে সরে গিয়ে তাঁর অন্তরে আশ্রয় নিয়ে চিন্ময় হয়ে রয়েছেন। অন্তরের প্রেরণায় এবার তাঁর স্বামীজী-নির্দিষ্ট কর্মকেই প্রাণ দিয়ে সফল করে তুলতে হবে। তাঁর মনে প্রেরণা সঞ্চার করল স্বামীজীর অমর বাণী:

'তোমার সঙ্গে আমার আশীর্বাদ সব সময়েই আছে (My blessings is always with you)।'

অক্ষমতাই কবিতা

শ্রীআদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

টো করে কাগজ কালি নিয়ে
সময়ের বুকে থাবা মেরে
আবোল-তাবোল কি যে আসে মনে
মায়ার প্রদীপ জেবলে
আশার আঙ্গিনায়
কি যে লিখি—বুঝি না হায়।
অলির মত এফুলে-ওফুলে
মধুর অন্বেষণে
সব কাজ ভুলে
কি এক নেশায় নিশিদিনে
চলেছি ছুটিয়া
কাঁটার আঘাত সহিয়া।
কি লিখি-কি মানে তার
এ যে মোর শূন্য অহংকার
দুটো কবিতা লেখার অভিনয়ে
আঁখি বুজে স্বপনের সিঁড়ি বেয়ে
রকেটের বহু আগে
গভীর অনুরাগে
চাঁদটাকে ধরতে গিয়ে
সাগরের তলে যাই হারিয়ে।
মনটাকে বোঝাই কত
কাগজ কলমে বন্দী হয়ে
অবুঝ শিশুর মত
সময় দিও না কাটিয়ে।
চল যাই—পথে-প্রান্তরে
নিপীড়িত লাঞ্ছিতের ঘরে ঘরে
যারা পায় না খেতে
দারিদ্র্যের কশাঘাতে
প্রতিভা যাদের লুপ্ত
যে পরম ধন রয়েছে গুপ্ত
জোর করে টেনে আনি
ধরি বিশ্বপিতার চরণখানি।
মন সায় দেয় বটে
আসলে, শক্তি নাই যে মোটে
ছুটবে সে কেমন করে
ভগবান, শক্তি দেয়নি তারে।
শুধুই দিয়েছে আশা আর আলো
তাই যে ভুলিনি কবিতার মায়া।
আবার এসেছি ছুটে
আমার এ শীর্ণ করপুটে
সোহাগে নিয়েছি তুলে
যা লিখি মনের ভুলে—*

রক্তের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎশক্তি উৎপাদনের অভিনব প্রণালী

আমাদের সারা শরীরে অসংখ্য শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, রক্তপ্রবাহের এই গতি থেকে তড়িৎশক্তি উৎপাদনের একটি অভিনব পদ্ধতি সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হয়েছে নবোদ্ভাবিত তড়িৎশক্তি আর কোনো কাজে বর্তমানে লাগানো সম্ভব না হলেও মানুষের রোগ-চিকিৎসায় দেহাভ্যন্তরে যে স্বল্প পরিমাণ তড়িৎ-শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তার কাজ এ দিয়ে চলবে বলে গবেষক বৈজ্ঞানিকগণ আশা করছেন।

হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য যেসব রোগীর হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে পড়ে তাদের হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শল্য-চিকিৎসকগণ 'পেস-মেকার' নামে একটি ক্ষুদ্র ব্যাটারী-চালিত ইলেকট্রনিক যন্ত্র অস্ত্রোপচার করে রোগীর দেহাভ্যন্তরে বসিয়ে দেন। এই 'পেস-মেকারে'র বিদ্যুৎশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেলে পনবায় অস্ত্রোপচার করে নূতন যন্ত্র বসানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বার বার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না এবং রোগী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন উক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদিত তড়িৎশক্তি 'পেস-মেকারে' স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঞ্চালিত হবে ও যন্ত্রটি সক্রিয় থাকবে।

ওয়াশিংটনের অদূরবর্তী মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর অ্যাডাম কাওলী এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মোস্তাফা, ই, তালাতের নেতৃত্বে একদল গবেষক বিজ্ঞানী কুকুর এবং খরগোশের হৃৎপিণ্ডের দুধারে ধাতব দুটি ইলেকট্রোড বা তড়িদ্দ্বার বসিয়ে এবং তার দ্বারা সংযুক্ত করে এই জৈব বিদ্যুতের প্রবাহের আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা তড়িদ্দ্বার দুটি দেহের বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে উৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাপ করেছেন। গবেষকগণ বলেছেন 'পেস-মেকার'কে চালু রাখতে প্রয়োজনীয় তড়িৎশক্তির দ্বিগুণ এবং চতুর্গুণ এই পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে।

প্রাণিদেহ থেকে তড়িৎশক্তি আহরণের চেষ্টা কিন্তু ইতিপূর্বে অ্যামেরিকায় করা হয়েছিল এবং এক ধরণের জীবাণু-দেহ থেকে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করে আলো জ্বালানোর কাজেও সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল। তা ছাড়া ইঁদুর ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জন্তুর দেহ থেকে উৎপাদিত তড়িৎশক্তিতে ছোট-খাটো যন্ত্রও চালনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু অতীতের এইসব গবেষণায় তড়িদ্দ্বারগুলিকে রাসায়নিক বস্তুতে ডুবিয়ে রেখে রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগানো হতো। কিন্তু উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোনো রাসায়নিক বস্তুর প্রয়োজন হচ্ছে না। নতুন পদ্ধতিতে প্ল্যাটিনামের তৈরী তড়িদ্দ্বার ব্যবহৃত হয়, এর ফলে তড়িদ্দ্বারগুলি দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব জেনারেল মেডিসিনের অর্থ-সাহায্যে তিন বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

রোগ-চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষের দেহে প্রয়োগের পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ আরো কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হয়ে নেবেন।

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

অতি দ্রুত অগ্নি-নির্বাপণের নতুন পদ্ধতি

'এফ ই-১৩০১' নামক নবাবিষ্কৃত গ্যাসটি খুব সহজে ও প্রচলিত পদ্ধতির অন্যান্য গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি) অপেক্ষা অনেক কম, বস্তুত কয়েক সেকেণ্ডে যে-কোনো রকমের অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এই গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো—ইহা আগুনের শিখার স্বাধীন উপাদানগুলির সাথে বিক্রিয়া করে (আগুনের শিখার এই উপাদানগুলি শিখাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে) তাদের স্তিমিত করে দেয়। কেম্ব্রিজ ইলেকট্রন অ্যাকসিলেরেটর যন্ত্রের কমপিউটার কমপ্লেক্সে 'এফ ই-১৩০১' গ্যাস-ভিত্তিক অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ধোঁয়া, উত্তাপ বা শিখা-সম্বলিত আগুনের অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য ছয়টি অন্বেষক (ডিটেক্টর) যন্ত্র ব্যবস্থাটিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রদান করেছে। সমগ্র নির্বাপক ব্যবস্থাটি এতই সংবেদনশীল যে · মিটার দূরের আট সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের শিখার অস্তিত্বও ইহাতে ধরা পড়ে।

পরীক্ষা-নলে বিবর্তন ও দুরারোগ্য ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা জীব-বিজ্ঞানী ডাঃ সোল স্পাইজেলম্যান R N A বা রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চালানোর সময় পরীক্ষা-নলে এমন এক জৈবিক বিবর্তনের আবিষ্কার করেছেন যা, তিনি আশা করছেন, দুরারোগ্য ক্যানসারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার হবে।

ডাঃ স্পাইজেলম্যান রেপ্লিকেজ নামক একটি উৎসেচকের (এনজিম) সংযোজনে R N A উৎপাদন অধিকতর হতে লক্ষ্য করেন। R N A হচ্ছে ভাইরাসের জন্ম-বিষয়ক উপাদান যা জীবাণুকে সংক্রমণ করে।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

(আধুনিকতম আবিষ্কার পর্যালোচনা)

"যদি মানুষের দেহের ক্যানসার-দুষ্ট কোষে এই RNA প্রবিষ্ট করানো যায় তাহলে ইহা ক্যানসার-দুষ্ট কোষের নূতন ভাইরাস উৎপাদনে নিঃসন্দেহে বাধা দেবে। এ সম্পর্কে গবেষণা এখনো চলছে।

ভারতবর্ষে নূতন ধরণের মেনেনজাইটিস

মেনিনজোকক্কাল মেনিনজাইটিস রোগীকে অতি দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের (স্পাইন্যাল কর্ড) আবরণকারী ঝিল্লী জীবাণু আক্রান্ত হলে এই মেনিনজাইটিস রোগের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের তরল পদার্থের যার নাম সেরিব্রোস্পাইন্যাল সহিত জীবাণুগুলি মিশ্রিত হয় ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে মেনিনজাইটিস বিচ্ছিন্নভাবে স্থানে স্থানে শোনা যায় ঘটে তবে সৌভাগ্যক্রমে ব্যাধিটি মহামারী আকারে ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত দেখা দেয় নি। সর্বপ্রথম ১৮৮৩ সালে এই মেনিনজাইটিস ব্যাধি ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। শিকরপুর জেলখানায় কয়েক ব্যক্তি এই রোগে প্রাণ হারায়। পরের বছর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৮ জন উক্ত রোগাক্রান্তের মধ্যে ১১ জন মৃত্যু-কবলিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ১৯৩৪ সালে রাজধানী দিল্লীতে মেনিনজাইটিসের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৪ সাল থেকে অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রায় তিন হাজার উক্ত রোগাক্রান্তের মধ্যে ৬১ শতাংশের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গেছে।

১৯৬৬-৬৭ সালে দিল্লীতে নূতন ধরণের ভয়াবহ মেনিনজাইটিসের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দিল্লীর বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই মারাত্মক মেনিনজাইটিস রোগাক্রান্ত ৪৭৭ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করেছে। ৪৭৭ জনের মধ্যে ২০০টির ক্ষেত্রে রোগের মূলে ছিল এন, মেনিনজাইটাইডিস নামক জীবাণু। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে এবং ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে উক্ত রোগের প্রকোপ চরম হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ভারতীয় চিকিৎসা - বিজ্ঞানীরা রোগটি সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছেন।

চিঠি মারফৎ গাড়ি কেনা

সাড়ে সাত হাজার টাকায় যদি গাড়ি কিনতে চান, তাহলে হ্যামবুর্গের 'পোস্ট শপ'-এ চিঠি লিখলে তারা 'স্পাইডার' গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। আঠারো 'ঘোড়ার' এই গাড়িটি বেশ মজবুত আর সবই পোড়া লাল রঙের'। কালো নকল চামড়ার আসনগুলি ঘোরানো-ফেরানো যায়। গাড়ির ছাদ আবহাওয়া বুঝে খোলা চাকা যায়।

বাদাবনের বাঘ

সুন্দরবনের সম্পদ হচ্ছে তার মোম, মধু, মাছ আর কাঠ। গরীব মানুষদের পেটের ভাতের জন্য এর মধ্যে আবার মধু আর মাছই হচ্ছে প্রধান। সুন্দরবনের কাছে শহরাঞ্চলের চাহিদাও বেশ কিছুটা মেটে। আরও বেশি মিটতো যদি মাছধরা ও চালানের একটা ভাল ব্যবস্থা থাকত।

কিন্তু শহরের মানুষ যদি জানতো সুন্দরবনের এই মাছ ধরার পিছনে থাকে কত অশ্রু।

খাল আর নদীর শেষ নেই দক্ষিণের সুন্দরবনে। নদী এ দেশে অগুণতি। কালিন্দী, রায়মঙ্গল, ঝিলা, মাতলা, বিদ্যাধরী, শিবসা, ভদ্রা, পশর—কত নাম কে দেবে। এঁকেবেঁকে গিয়ে অবশেষে বনের আড়ালে চলে গেছে। এইসব নদী থেকে আবার বেরিয়েছে ছোট-বড় অনেক খাল। ঘন বনের বুক চিরে চলে গেছে কত খাল, বনের মধ্যে গিয়ে মজে গেছে কত সরু খাল।

সুন্দরবনের এইসব ছোট-বড় নদী আর খাল থেকে মাছ ধরে বেঁচে থাকে বনের কাছাকাছি পল্লী-অঞ্চলের অনেক গরীব মানুষ। কিন্তু এখানে আসতে হলে তাদের প্রাণটি হাতে করে আসতে হয়। কারণ এ-বনে সাপ আছে, বাঘ আছে আর নদীতে ছড়ানো আছে কুমীর কামটের ঝাঁক। মৃত্যুনীল বিষভরা সেই সব সাপ, ভয়ঙ্কর নরখাদক বাঘ।

বীভৎস কালো কালো কামটগুলো তাদের ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে নৌকার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও হয়তো দেখা যায় কালো গুলিওঠা পিঠ কুমীর। মৃত্যু এখানে পদে পদে। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য বন্দুকের লাইসেন্স সব গরীব মানুষ পায় না। কাজেই জঙ্গলে যাবার সময় এমন একটি মানুষ তারা চায়, যার নাকি বনের অন্ধিসন্ধি সব জানা। বাওয়ালী হচ্ছে সেই মানুষ। গভীর জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে বাওয়ালী, মন্ত্রবিদ ফকির। আর তার সঙ্গে আসে মানুষ। তারা কেউ কাঠ কাটে, কেউ নেয় চাক ভেঙে মধু, কেউ ধরে মাছ। আর তাদের সকলের নিরাপত্তার জন্য মন্ত্র পড়ে বাওয়ালী।

তবু কিন্তু মানুষ মরে। আর তার সঙ্গীরা তখন এই বলে মনকে প্রবোধ দেয় যে, জঙ্গলে ঢুকবার সময়

সুখেন্দু দত্ত

নিশ্চয়ই অশুচি ছিল তাদের সঙ্গী। বাঘের দৌরাত্ম্যে প্রতি বছরই এমনি করে অনেক মানুষ প্রাণ দেয়। সুন্দরবনের সব বাঘই নাকি নরখাদক। বাঘ কখনও হয়তো নদী সাঁতরে এসে জেলে নৌকা থেকে মানুষ নিয়ে যায়। জলকাদায় ভরা ঝোপঝাড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যেও অনেকে বাঘের পেটে যায়।

তবু বনে না গিয়ে মানুষগুলোর উপায় নেই। আজ বনে না গেলে কালই হয়তো তাদের সংসারে হাঁড়ি চড়বে না। জীবিকার তাগিদে সরকারের অনুমতি না নিয়েই অনেক জেলে গোপনে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে নদী আর খালে মাছ ধরতে যায়।

তাদের কেউ বাঘের মুখে গেলে সঙ্গীরা পুলিশের ভয়ে সে খবর সরকারকে জানায় না। জেলেপাড়ার কোন একটা দরিদ্র কুটীরে শুধু নিঃশব্দে কান্না ওঠে। সরকারিভাবে ঘোষিত মৃত্যু-সংখ্যার চেয়ে আসল মৃত্যুর সংখ্যা তাই অনেক বেশি। এক গোসাবা থানার মালোপাড়ারই ষাটজন সক্ষম পুরুষ নাকি জীবিকার তাগিদে জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে। যার ফলে এই মালোপাড়া নাকি আজ পুরুষশূন্য 'বিধবাপল্লী' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

আজও তাই মাছের অভাব নেই বাদাবনে, অভাব লোকের। প্রতিদিন দু'বার করে জোয়ার আসে সুন্দরবনের খাল আর নদীতে। জোয়ারের টানে মাছ এসে ভর্তি হয় এইসব খালে। এখন অবশ্য অনেক কমে গেছে। সরু খালে জোয়ারের জল নেমে গেলে জল থাকে না, কালো কাদার উপর তখন ছিটিয়ে পড়ে থাকে 'সলেট, পারশে, ভেটকী। হাঁটুভোর কাদা থেকে তখন ছটোপাটি করে শুধু খালইতে ভরা।

কিন্তু শুধু মানুষই নয়, ভাঁটার সময় খালের কাদায় আটকেপড়া মাছের লোভে অনেক সময় বন থেকে বাঘও আসে। সামনের দুই থাবা দিয়ে সাপটে মুখে পোরে তাজা ধড়ফড়ে মাছগুলোকে হাঁটুভোর কাদায় নেমে। মাছ ধরতে গিয়ে কেউ কেউ তাই 'বড় মিঞা'রও দেখা পেয়ে যায়।

●

সরু খালটা বনের ভিতর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে হেঁতাল আর কেওড়া বনের বুক চিরে। খালের ধারে সবুজ গোলগাছ ও ঝাঁকড়া-মাথা হেতাল-ঝোপের সারি ক্রমশ গভীর হয়ে গেছে বনের ভিতর। ভোরবেলাই ডিঙিতে জাল নিয়ে খালের মুখে এসেছে নারাণ মাছ ধরতে। সঙ্গী পাতু আর মোনা। সুন্দরবনের এই সব খালে পুরো জোয়ারে মাছ ঢুকে পড়লে খালের মুখ জাল দিয়ে ঘিরে বসে থাকতে হয়। দু'ঘণ্টা পর পর ভাটির সময় জল বেরিয়ে যায়

নদীতে। তখন এই জালে আটকা পড়ে মাছ। ছোট-বড় নানা আকারের মাছ। আগেকার দিনে তো সেই মাছে এক-একটা ডিঙি বোঝাই হয়ে যেত।

খালে ঢুকে জাল পাততে লাগল নারাণ। খুঁটি আর গাছের গুঁড়িতে জালের মাথা বাঁধা হল। তারপর পাতু নেমে পড়ল জলে। ডুব দিয়ে জালের গোড়া খুঁটি দিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিল।

জাল পেতে বসে রইল তারা ভাঁটার টানের অপেক্ষায়। জোয়ার পুরে গেছে। ভাটি শেষ হলে জালের এপাশ থেকে আটকে পড়া মাছ তুলতে হবে।

বেলা পড়ে আসতেই কলকল করে জোয়ারের জল নামতে শুরু করল। খালের জলও নামছে। পাখী-গুলো ছুটল মরা ভাটিতে মাছের সন্ধানে, নারাণদের তোড়-জোড়ও শুরু হল। ডিঙির উপর থেকেই তার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'জাল সামলে, জল নামছে!'

খালের কালো জল আস্তে আস্তে নেমে গেল। হাঁটুভোর কাদার উপর তখন রূপোর পাতের মত সিলেট, পারশে, ভাঙন, আরও কত মাছ। জালের এপাশে সব মাছ আটকা পড়ে গেছে।

সামনে মাছ দেখলে মানুষ সব ভুলে যায়। ডিঙি থেকে কাদার উপর লাফ দিয়ে পড়ল নারাণ আর পাতু। যত চাও তত মাছ। হুটোপুটি করে ক্যানাস্তারা টিনে মাছ ভরতে আরম্ভ করল তারা। কাদায় হাঁটু অবধি বসে গেছে তাদের। দু'টিন ভর্তি হয়ে গেছে, তবু আরও কত মাছ! শুধু মাছ খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারবে তারা দু'একদিন।

কিন্তু শুধু তারাই নয়। খালের ধারে অগণিত হেঁতাল ঝোপ। তারই একটার মধ্যে নিজের হলদে রং আর কালো ডোরা মিশিয়ে মাছের লোভে বসেছিল আর একজন। কাদায় হুটো-পুটি করে এরা মাছ ধরছে- আর শিকারী বিড়ালের মত চার পা ভেঙে বসে সামনের দুই থাবায় ভর দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে হেঁতাল ঝোপের ফাঁক দিয়ে সে তাই দেখছে।

বাদাবনের বাঘ বড় সাবধানী শয়তান জানোয়ার। এত বড় জানো-য়ারটা চলাফেরা করে, চোখে দেখা যায় না একবার। পাতার একটু শব্দও ওঠে না। শুকনো পাতায় পা লেগে শব্দ উঠলে চাপা আক্রোশে নিজেই নিজের লেজ কামড়ায়। গাছের ডাল-পাতার সঙ্গে রং মিলিয়ে আড়াল হতে তার জুড়ি নেই। বাদার মানুষও সব-সময় ধরতে পারে না বাঘের চাতুরি আর শিকার-কৌশল। অত বড় জানো-য়ারটা কখন এসে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রয়েছে, কিছুই টের পায় নি।

অনেক মাছ ধরা হয়েছে। তবু তখনও দু'হাতে কাদা থেকে টিনে মাছ ভরছে নারাণ আর পাতু। ওদিকে ডিঙির উপর বসে অধীর হয়ে উঠেছে মোনা। বলল, 'ও মামু, আর কত মাছ ধরবানি? ওঠ এইবার।'

কাদার মধ্য থেকে নারাণ বলল, 'উঠছি এইবার, দাঁড়া। জঙ্গলের দিকে তুই নজর রাখিস। সিদিন সুবুদ্ধি হাঁকাড় দিয়ে ফিরল।'

নারাণের কথা শেষ হবার আগেই বাঘের হুঙ্কার। নিমেষের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটে গেল। হুঙ্কার দিয়েই বাঘ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ডিঙির উপর থেকে মোনা দেখল, হেঁতাল-ঝোপের ভিতর থেকে একটা হলদে আর কালো ডোরার বিদ্যুৎ যেন ছিটকে এল খালের ধারে।

ডিঙির উপর থেকে সে চীৎকার করে উঠল, 'মামু! মামু! বাঘ! বাঘ! শীগগির উঠে এসো—'

কয়েক পা এগিয়ে বাঘ এবার খালের ধারে এসে দাঁড়াল। প্রাণভয়ে সেই কাদামাখা অবস্থায়ই পড়ি কি মরি করে ডিঙিতে গিয়ে উঠল নারাণ আর পাতু। তারপর লগির এক ধাক্কায় ডিঙি প্রায় নদীর মুখে। তাদের অত কষ্টের টিন ভর্তি মাছ আর জাল পড়ে রইল সেই খালের কাদায়।

তা থাক। প্রাণটা তো বাঁচল। আর একটু হলেই তো গিয়েছিল আজ।

এদিকে বাঘটাও যে তাদের আক্রমণ করবে, সে চেষ্টা তার নেই। আর একটা গর্জন করেই সে লাফ দিল। খালের কাদায় 'ঝপাৎ' করে পড়ল তার গোটা দেহ, ছিটকে পড়ল কাদা। আসলে মানুষ তার লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল ঐ টিনভর্তি মাছ। যতক্ষণ মাছ ধরেছে নারাণরা, লুব্ধ বাঘ ততক্ষণ নিঃসাড়ে বসে থেকেছে কাছাকাছি ঝোপের আড়ালে। মাছধরা শেষ হয়ে আসতেই ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেই মাছই দখল করে বসেছে ধূর্ত বাদাবনের বাঘ।

নারাণ, পাতু ওদের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। পাগলের মত ডিঙি চালাচ্ছে তখন তারা খালের মুখকে পিছনে ফেলে,—অনেক পিছনে ফেলে।

রঙ বদলে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দিন ত' বসেই ছিলাম
কাল গুণি।
হঠাৎ কবে উঠল জেগে ফাল্গুনি।
একা ত' নয়, অনেক ওরা দল নানা।
আসছে মিছিল স্রোতের মত
একটানা।

চোদ্দ দলের চতুর্দশী
করব ছিন্ন
করল দখল একজোটে ত'
লালঝাঁপ।

রঙের তরঙ্গে বদলে খেলা
আচমকা।
দেশ ও দশে রইল চেয়ে
অবাক, হাঁ।

স্বদেশ-চিন্তার বিবর্তন

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

স্বদেশ-চিন্তার মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে মানুষের স্বাধিকার-বোধ বা স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থেকেই এর উদ্ভব। দেশের ভৌগোলিক পরিচয় এবং ঐতিহ্য সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন এর একটা দিক তেমনি রাষ্ট্র স্বাতন্ত্র্য-বোধ এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বাসনা যা পররাষ্ট্রের সঙ্গে বা বাইরের শক্তির সঙ্গে সংঘাতে বিকাশ লাভ করে তা এর অপর দিক।

যুগে যুগে স্বদেশচিন্তার রূপ বিবর্তিত হয়েছে, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য প্রমুখ অবতারকল্প পুরুষদের কথা বাদ দিলে, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিবাজী, আকবর বাদশাহ প্রমুখ ইতিহাসবিখ্যাত মানুষদের স্বদেশচিন্তা আজ অধিকাংশের নিকট বিস্মৃতপ্রায়। হিন্দুসভ্যতা, বৌদ্ধ-সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতার অবসানে ভারতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও পরাধীনতার বন্ধনলব্ধ যে আক্ষেপ তার থেকে স্বদেশচিন্তার নতুন অনুভূতি আমরা প্রত্যক্ষ করলাম রামমোহন রায়ের মধ্যে।

ফরাসী বিপ্লবের যে স্রোত সারা ইউরোপকে প্লাবিত করেছিল সেই 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'র মর্মবাণীর ঢেউ সুদূর ভারতবর্ষে রামমোহন-কেও (১৮১৫) অনুপ্রাণিত করেছিল। সমাজ ও ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে রামমোহন স্বদেশচিন্তার ভাবনাকেও দেশবাসীর কানে প্রথম তুললেন।

১৮২৩ সালে ইংরেজ সরকার যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন রামমোহন তখন অসমসাহসিক-তার সঙ্গে তার প্রতিবাদ জানালেন। তিনি যেমন সরকারী অন্যায়ের প্রতি-বাদে 'মীরাৎউল আখবার' বন্ধ করলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে স্বাদেশিকতার বীজ বপন করলেন।

রামমোহনের পর দ্বিতীয় যে ব্যক্তির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন বিখ্যাত ফিরিঙ্গি অধ্যাপক ডিরোজিও। তিনি ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে যেমন তার স্রোতে নিক্ষেপ করে অবগাহন করেছিলেন তেমনি তাঁর ছাত্র সমাজকেও একই ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ফকীর অফ জঙ্গিরা' এই বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন তখন সবে সূচনা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতা, শিক্ষাদীক্ষা, রীতি-নীতির সঙ্গে এদেশের যুবক ও ছাত্র সমাজ সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে নতুন আবেগে পদক্ষেপ করছে ঠিক সেই সময় একজন বিদেশীকে ভারতভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবনত দেখে সকলেই বিস্মিত হয়ে গেল এবং তাঁর সকল কথাকে যেন নতুন বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে নিল।

এইভাবে বিদেশী ভাবধারা ও বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা ও আচার-অনু-ষ্ঠানের মোহে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যখন ক্রমশ কুপথে চালিত হচ্ছিল এবং স্বধর্ম ও স্বসমাজকে পরিত্যাগ করে ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে আবির্ভূত হলেন মহামতি বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজে লালিতবর্ধিত হয়েও সংস্কারমুক্ত পুরুষ ছিলেন। যার ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, স্বদেশী সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন ও শিক্ষিত যুবকগণকে দেশীয় চিন্তা-ধারায় নতুন করে অনুভাবিত করার মন্ত্রে ব্রতী হয়েছিলেন এবং বিপুল অধ্য-বসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁদের স্বদেশচিন্তার মানকে উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র মাধ্যমে দীর্ঘ বিশ বছর মাতৃভাষায় অনুশীলন ও স্বদেশ প্রীতির ব্রত উদযাপন করেন।

১৮২৬ সালে ডফ সাহেবের 'হিস্টরি অফ দি মারহাট্টাস' ও ১৮২৯ সালে টড সাহেবের 'অ্যানালস অফ রাজস্থান' প্রকাশিত হলে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ও বীরত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রথম অপক্ষপাত পরিচয় লাভ করলেন। কানিংহাম সাহেবের 'শিখদের ইতিহাস' ও ম্যাক্সমূলার সাহেবের বেদের অনুবাদও তাঁদের মনে স্বদেশ-চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। পরবর্তী-কালে রমেশচন্দ্র দত্ত যে ঋগ্‌বেদের বাংলা অনুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ, 'মহারাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাত' ও 'ইকনমিক হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া' রচনা করেন তার মূলেও ছিল উপরোক্ত গ্রন্থের সাক্ষাৎ প্রেরণা। ১৮৫১ সালে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন' স্থাপিত হলে দেশীয় ব্যক্তিগণও জাতীয়তা-বোধের পথে আর একধাপ পদক্ষেপ করলেন।

১৮৩১ সালে কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাঁরা বিদেশীর অনুকরণে স্বদেশের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ক্ষুরধার ব্যঙ্গ প্রয়োগে তাঁদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে-ছিলেন।

১৮৪৮ সালে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সংবাদ প্রভাকরে লিখেছিলেন—

"জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে?"

ইতিপূর্বে ঈশ্বরগুপ্ত একথাও বলেছিলেন—

"কেন মা ভারত বৃথা কর হাহাকার
ঘুচিবে না দুর্দশা তোমার।
তোমাকে তুলিবে যারা
মনুষ্যত্ব হারা. তারা
পশুর অধম হয়ে করে কদাচার।"

১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেই দিন সন্ধ্যায় 'ব্যারাকপুরে' সিপাহী বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠল এবং ক্রমে তা সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। বিদেশী সরকার তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এই অভ্যুত্থানকে অবদমিত করল। কিন্তু জনসাধারণের মনে তখন মাতৃভূমির প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ এবং তার শৃঙ্খলিত অবস্থার ও নানা উৎপীড়ন এবং নির্যাতনের জন্য দুঃখ গুমরিয়ে উঠতে থাকল। তাই পরের বছরেই অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে
চায় রে কে বাঁচিতে চায়?"

মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যও এই সময়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মধুসূদনের স্বদেশচিন্তা প্রত্যক্ষভাবে দেশের পরাধীনতার গ্লানি সম্বন্ধে কিছু উচ্চারণ না করলেও পরোক্ষে দেশের ঐতিহাসিক পৌরাণিক গৌরব-মাহাত্ম্যকে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করেছে। 'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারতরতনে'—মধুসূদনের স্বদেশ-চিন্তার অন্যতম নিদর্শন। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) নাটকের প্রস্তাবনায়—

'শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়'

—ইত্যাদিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

১৮৬০ সালের নীলবিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহেরই অনুসৃতি, হরিশ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানাল এবং জনমত গঠনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করল, 'নীলদর্পণ'-এর প্রধান বক্তব্য —'ইংরেজ বণিকদের অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন' অর্থাৎ দেশের সম্পদ দেশের মানুষ উপভোগ করবে তা বিদেশীর করতলগত থাকবে না।

১৮৬৬ সালে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম সহকর্মী রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী' সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় নবগোপাল মিত্র ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৭ সালে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার আয়োজন করেন। বলা বাহুল্য হিন্দুমেলাই সক্রিয় স্বদেশচিন্তা প্রচারের প্রথম প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৮ সালে 'হিন্দুমেলা'র দ্বিতীয় অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ এই মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন—'ধর্মকর্মের জন্য নয়, বিষয়সুখের জন্য নয়, আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়, স্বদেশের জন্য ও ভারতভূমির জন্য সকলকে মিলিত করাই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য।'

১৮৮১ সাল পর্যন্ত এই মেলার নিয়মিত অধিবেশন হয়। প্রতি বৎসর অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীতে ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত—

"মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত রচিত হবার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত ছিল জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত। আর যে দুটি সঙ্গীত এই সময় জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছিল তার মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের—

'কতকাল পরে বল ভারতরে
দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে।'

এবং মনোমোহন বসুর—

'দিনের দিন সবে দীন
ভারত হয়ে পরাধীন।।'

১৮৬৮ সালে নবীন সেন 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা সুরু করেন যা ১৮৭৫ সালে মুদ্রিত হয়। গুপ্ত কবির অনুপ্রেরণায় তিনি কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কাব্যে জন্মভূমিকে মৃন্ময়ীমূর্তিতে কল্পনা না করে চিন্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস লক্ষিত হয়।

১৮৭০ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতবিলাপ' ও 'ভারতসঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। এই দুটি কবিতা প্রকাশের জন্য ভূদেবকে সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস' রচনা করে স্বদেশচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' ও 'ভারতবিলাপ' স্বদেশচেতনা উদ্বোধনের অমর গীতি। এগুলি কবির ক্ষণিক বিক্ষোভ মাত্র নয়, এ কবির অন্তর্নিহিত অনুভূতির অভিব্যক্তি। 'ভারত কি শুধু ঘুমায়ে রবে?' এই প্রশ্নই তাঁর চিত্তকে সবচেয়ে ব্যথিত করেছিল। এ ছাড়াও তিনি বলেছিলেন—

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি
আর কি ভারত সজীব আছে।"

—ভারত সঙ্গীত।

"হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে
পুরাতে নারিলে মনের আশা।"

—ভারত বিলাপ।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে আবির্ভূত

হলেন। তারপর থেকে চলল সৃষ্টির অবিরাম অগ্রগতি। গল্প, উপন্যাস, আলোচনা, সমালোচনার সঙ্গে প্রকাশিত হল 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি।' আর প্রকাশিত হল সেই অমর জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্।' 'বন্দেমাতরম্'-এর মর্মস্পর্শী বাণী একদা বঙ্কিমচন্দ্র উদাত্তকণ্ঠে তাঁর 'আনন্দমঠ'-র (১৮৮২) কাহিনী মাধ্যমে যখন দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন সেদিন থেকে আজও তা প্রতিটি জনসাধারণকে এক অপূর্ব শ্রদ্ধা ও মহৎ অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর যে-কোনও কবি সাহিত্যকার শিল্পী বা স্রষ্টা যিনিই স্বদেশানুভূতিমূলক কিছু কর্ম সম্পাদন করতে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন তিনিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 'বন্দেমাতরম্'-এর স্রষ্টাকে অনুসরণ করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর অস্তিত্ব না থাকলে 'গোরা' বা 'পথের দাবী'র সৃষ্টি সম্ভব হোত কি না সন্দেহ। এমন কি বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও গান্ধীজীর স্বদেশচিন্তাও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা যে বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে তা উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না।

১৮৭২ সালে 'কলকাতা সাধারণ রঙ্গালয়' প্রতিষ্ঠাও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হিন্দুমেলারই প্রেরণাতে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক মঞ্চস্থ করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাদেশিকতার চিন্তাকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত। এতে যথাক্রমে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা,' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুষবিক্রম ও সরোজিনী', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটক অভিনীত হয়। শেষোক্ত নাটক দুটিতে অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত ছিল।

ফলে সরকারী কোপদৃষ্টি ক্রমে কঠোর হতে রঙ্গমঞ্চ মাধ্যমে দেশপ্রেম প্রচারের প্রচেষ্টাকে বন্ধ করতে উদ্যত হলো। পরবর্তীকালে রঙ্গমঞ্চের যে পুনর্জাগরণ দেখা দেয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তখন যাঁরা স্বদেশীয়ানা প্রচারে উদ্যত হন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম স্মরণীয়।

আমাদের স্বদেশচিন্তার উদ্বোধনে 'হিন্দুমেলা'র ভূমিকা যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। ঠাকুর পরিবারের সকলেই অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, সরলা দেবী সকলেই সাক্ষাৎভাবে এই মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই মেলাকে কেন্দ্র করে তাঁরা যেসব দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করেন সেগুলি একাধারে আমাদের জাতির গৌরব ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উৎস অনুসন্ধান করলে সর্বাগ্রে তাঁর পিতৃদেব প্রবর্তিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তারপরে ১৮৭৫ সালে তিনি 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করেন।

অতঃপর ১৮৭৭ সালে আবৃত্তি করেন :

"দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর
অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে
প্রলয় কালের নিবিড় আঁধার
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার যে অধিবেশনে কবিতা পাঠ করেন সেই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন তাঁরই পিতৃদেবের প্রিয়সহকর্মী রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের স্বদেশচিন্তা ছিল চরমপন্থী। তিনি কেবলমাত্র 'হিন্দুমেলা'তেই সন্তুষ্ট না থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় একটি গুপ্তসভা স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছিলেন 'স্বাদেশিকতার সভা।' বেদ, নরমুণ্ড ও তরবারি নিয়ে রাজনারায়ণের পৌরোহিত্যে এই সভায় উদ্বোধন হয়। উদ্দেশ্য ভারত উদ্ধার সাধন এবং সেই সূত্রে দীক্ষা গ্রহণ।

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু এ প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"

রাজনারায়ণের স্বাদেশিকতা ছিল অগ্নিশিখার মত দীপ্ত ও দহনশীল। তিনি একবার তাঁর প্রিয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পালকে বলেছিলেন : 'আমি মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারিতাম তবে জন্মটা সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।'

রাজনারায়ণের স্বদেশচিন্তা যাঁদের প্রভাবিত করেছিল তাঁদের মধ্যে তাঁর জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্র, দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সহযোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠা করেন। এর পূর্বে শিশিরকুমার ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র ব্যানার্জী ও মতিলাল ঘোষ 'ইণ্ডিয়া লীগ' স্থাপন করেন।

এক হিসেবে এই দুই প্রতিষ্ঠানই জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। এই সময় থেকে শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে রাজনৈতিক অধিকার অর্জন সম্বন্ধে বিশেষ চেতনা লক্ষিত হয় কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কাব্যে, গানে, নাটকে যে স্বদেশচিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছিল তার অধিকাংশ ছিল নিছক ভাবোচ্ছ্বাস, কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং সাময়িক হুজুগের মত। বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে এর মোড় ঘুরে গেল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তার 'সন্ধ্যাপত্রিকায়' লিখলেন, 'এ স্বদেশী খাঁটি স্বদেশী নয়, ইহা দায়ে পড়িয়া স্বদেশী।'

স্বামী বিবেকানন্দ 'বিশ্বধর্ম মহাসভায়' ভারতের বাণীকে প্রচার করে বিশ্বনন্দিত গৌরবের জয়টিকা ললাটে

ধারণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান জানালেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।'

'উদ্বোধন' আর 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ছত্রে ছত্রে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর বজ্রনির্ঘোষ বাণী। প্রতিটি ভারতবাসীর কানে শোনালেন—'এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?' তিনি একথাও শোনালেন—"বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

দেশে যখন স্বাদেশিকতার ভাববন্যা প্রবল আকার নিয়েছে ঠিক সেই সময় এল বিদেশী শাসক লর্ড কার্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদের উদ্ধত আঘাত। সেই আঘাতের সংঘাতে জনচিত্ত হয়ে উঠল সংক্ষুব্ধ। আরম্ভ হল অগ্নিযুগের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। একদিকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও তাঁর সহকর্মিগণ কর্তৃক 'টু আনসেটেল দ্য সেটেল্ড ফ্যাক্ট'-এর আপোষমূলক সংগ্রাম, অপর দিকে অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখের জ্বালাময়ী বাণী— যার স্পর্শে জেগে উঠল বিপ্লবের অগ্নিশিখা, বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, হাজার হাজার যুবক এগিয়ে গেল প্রাণ বলি দিতে।

মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে ইংরেজের বিচারশালার কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বলে উঠল— 'আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু স্বাধীনতার বীজ বপন করুক।'

কলকাতা ও শহরতলীর নানাস্থানে, উড়িষ্যার 'বুড়ী বালামের তীরে'— চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারে এই সংগ্রামের প্রকাশ ও উচ্ছ্বাস দেখা গেল।

অসংখ্য শহীদের কারাবরণ ও মৃত্যুবরণে এই যুগের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিশোর বালক ক্ষুদিরাম থেকে কানাই দত্ত, গোপীনাথ সাহা, বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, প্রীতি ওয়দ্দেদার প্রমুখ অসংখ্য প্রাণ উৎসর্গের পরেও কিন্তু কাম্য স্বাধীনতা অনায়ত্ত থেকে গেল। এর কারণ এই যে, দেশের জনসাধারণ যদিও স্বাদেশিকতার মর্মবাণীতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে এই চরমপন্থাকে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তাই যাঁরা এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা অচিরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অন্য পথের আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করে তাঁরা কেউ ধর্মসাধনায়, কেউ বা অপর সাধনায় মনোনিবেশ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেন নি তথাপি তাঁর স্বদেশচিন্তার একটা স্পষ্ট দিক ছিল এবং আজীবন লালিত তাঁর ধারণা এবং কল্পনা দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছে, তার কখনও প্রতিবন্ধক হয় নি। হিন্দুমেলার যুগ অতিক্রান্ত হলে যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ তখন প্রার্থনা করেছিলেন—

"নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

অথবা

"পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে
জাগাইবে হে মহেশ, কোন মহাপ্রাণে
হে মোর কল্পনাতীত- - -
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।"

স্বদেশের মানুষের মধ্যে সত্যিকারের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হোক, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মানুষের ঐক্যবুদ্ধি জাগরিত হোক, তার মধ্যে ভেদনীতি দূরীভূত হয়ে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হোক এই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান চিন্তা, আর তাঁর মূল বাণী ছিল:

'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী'

এবং

'বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান।'

দেশে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির একটা সুফল হয়েছিল এই যে সেই বিক্ষোভ ও বিদ্বেষের বহ্নি স্পর্শে বিদেশী শাসক বঙ্গভঙ্গ আইন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর অবস্থা যখন কিছুটা শান্ত হয়েছিল তখন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শাসকদের সঙ্গে একটা আপোষমূলক পন্থা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আলোচনা চালাবার চেষ্টা করলেন।

১৮৮৫ সালে ডবলিউ সি ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। পরের বছর কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন দাদাভাই নৌরজী।

১৯০২ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও ১৯০৫ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে যথাক্রমে আমেদাবাদ ও বেনারসে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ হবার পর সুরেন্দ্রনাথ আইনসভার প্রবেশাধিকার নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকলেন এবং গোখলে দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনকে ঘনীভূত করতে সচেষ্ট হলেন।

কিন্তু এই সকল নরমপন্থী নায়কদের সলাপরামর্শ ১৯১৮-'১৯ সাল পর্যন্ত কোনও সুফল সৃষ্টি করতে সক্ষম হল না। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের শোষণনীতি পুরোদমে অগ্রসর হতে থাকল এবং স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে একটা ভাটার স্রোত ছাড়া আর কিছুই রইল না; যাই হোক ১৯১৯ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড আইন প্রবর্তিত হল এবং তখন থেকে বিদেশী শাসকগণ দেশীয় ব্যক্তিগণের আনুগত্য ও বিশ্বাসপরায়ণতার পরীক্ষা নিয়ে কিছু কিছু আইনসভার প্রবেশাধিকার দানে সম্মত হলেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অনুরাগ আর বিরাগ বিরুদ্ধবর্তী। ভগবানে অনুরাগ অহেতুক এবং অপ্রতিহত হইলে সংসারে বিরাগ জন্মে, এই অনুরাগ যতই বৃদ্ধি পায় ততই সংসার ত্যাগের বাসনা প্রবল হয়, তখন বন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষের উপায় স্থির করে, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া সৎগুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হয়, শাস্ত্র বলে জীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষ বা নির্বাণ, উপায় বিষয়াসক্তি-ত্যাগ, নিষ্ঠার সহিত গুরূপদিষ্ট সাধনা, নিষ্ঠাই সাধককে গন্তব্য পথে পৌঁছাইয়া দেয়।

কনোজের অপর নাম কান্যকুব্জ, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক সভ্যতার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, কনোজ তাহাদের অন্যতম। ন্যায়ের মর্যাদা যথাযথ রক্ষিত হইল, রাজা সৎ হইলে, বিধি-অনুযায়ী পুত্রবৎ প্রজারঞ্জন করিলে, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিলে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করে তখন ইহার অধিবাসিগণ শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব বিষয়ে উন্নত হয়, ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুশীলনে রত থাকেন, ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবীর্যশালী হন, বৈশ্যগণ ধনশালী হন, সর্ব বিষয়ে উন্নতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় কনোজ রাজ্যে শান্তি ছিল, তখন বীরবর্মণ দেশের রাজা, তিনি ক্ষত্রিয়, প্রজাবৎসল, বীর, রাজ্যশাসনে পারদর্শী। তাহার সুশাসনে সর্বত্র সমৃদ্ধি ছিল, প্রজাগণ সুবিচার পাইত, তিনি বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু একটা দেশ জয় করিতে পারেন নাই, যে-কোন কারণেই হউক মগধ জয় তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু জয়ের আশা ছাড়েন নাই, সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, বিজয়াদিত্য তখন মগধের রাজা। তিনিও শক্তিশালী, গুণী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, প্রজাবৎসল, রাজ্যশাসনে পারদর্শী। ঐ সময়ে হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি চলিত, রাজা নিয়ে রাজায়-রাজায় রেষারেষি থাকিলেও ধর্ম নিয়ে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল

পূর্বেই বলা হইয়াছে কনোজরাজ বীরবর্মণ মগধ জয় করিতে সক্ষম না হইলেও জয়ের আশা ছাড়েন নাই। তিনি এখন নানা প্রকার আয়োজন করিলেন, সৈন্য-সামন্ত বৃদ্ধি করিলেন, প্রচুর রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মগধ আক্রমণ করিলেন, এই সাঁড়াশী আক্রমণের বিশেষত্ব ছিল, সৈন্যক্ষয় বেশী না করিয়া যুদ্ধজয়ের জন্য তিনি নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন, মগধকে চারিদিক হইতে অনেকদিন পর্যন্ত অবরোধ করিয়া রাখিলেন।

মগধরাজ বিজয়াদিত্য বেষ্টনী ভাঙ্গিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। প্রচুর সৈন্যক্ষয় হইল, রসদ ফুরাইয়া আসিল, অবরোধের জন্য নূতনভাবে রসদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সেনা সংগ্রহ সম্ভব হইল না। বেষ্টনী ভাঙ্গিতে পারিলেন না। তাঁহার পক্ষে অধিক দিন যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

কনোজের রাজা বীরবর্মণ বীর, বীরের মর্যাদা জানেন, শত্রু পরাজিত হইলেও তিনি মগধের রাজাকে রাজোচিত সম্মান দেখাইলেন।

মুক্তি পাইয়া বিজয়াদিত্য কনোজের রাজা বীরবর্মণের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সন্ধির সর্ত সবই সম্মানজনক। সর্তানুযায়ী বিজয়াদিত্য নামে মাত্র কনোজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বিজয়ী বীর বীরবর্মণের সম্মানার্থে তিন বৎসর অন্তর একটিমাত্র মূল্যবান স্বর্ণ রত্ন উপহার পাঠাইতে হইবে। ইহাতে বিজয়াদিত্যের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হয় নাই। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে রাজ্যের কোন অংশও দান করিতে হয় নাই, কিন্তু একটা মারাত্মক ক্ষতির জন্য তিনি অত্যন্ত আঘাত পাইলেন।

মগধের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, রাজাও বৌদ্ধ, রাজধানীর নিকট বৈশালীতে বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড মন্দির, মন্দিরে বুদ্ধদেবের খুব সুন্দর মূর্তি ছিল, বিজয়ী বীর বীরবর্মণ মূর্তি দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইলেন, তিনি উহা জোর করিয়া নিয়া গেলেন, মূর্তি রাখিয়া যাইবার জন্য রাজা বিজয়াদিত্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। উহার পরিবর্তে দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত হইলেন, বুদ্ধদেবই তাঁহাদের উপাস্য প্রাণ, সর্বস্ব দিয়া উপাস্যের সেবা করেন। উহা লইয়া গেলে উপাসকদের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিবে, ধর্মে আঘাত দেওয়া হইবে। সারা দেশে হৈ-চৈ পড়িবে। নিরাশা দেখা দিবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে, কিন্তু বিজয়ী বীরবর্মণ পরাজিত রাজা বিজয়াদিত্যের অনুনয়ের কোন মূল্য দিলেন না।

সম্ভবত মূর্তি খুব সুন্দর ছিল বলিয়া উহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণই তাঁহাকে এই কাজে প্রেরণা দিয়াছিল, কিন্তু বিজয়ী বীরের অহমিকাই পরাজিতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল। কারণ যাহাই হউক না কেন তিনি বুদ্ধের মূর্তি কনোজে লইয়া গেলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন বিজয়াদিত্য মূর্তি রাখিতে পারিলেন না, তিনি অত্যন্ত হতাশ হইলেন। তিনি বিজিত, বিজয়ীর উপর কোন হাত নাই, বুদ্ধ-ভক্তেরা আরও মর্মাহত হইলেন। যেখানে তাঁহাদের রাজা বিজয়াদিত্য এই অন্যায়ের প্রতিকারে সম্পূর্ণ অপারগ

সেখানে ভক্তেরা আর কি করিবেন? হা-হুতাশই নিরুপায়ের একমাত্র সম্বল।

রাজা ভক্ত প্রজাদের অনেক বুঝাইলেন, ইহার চেয়ে আরও বড় এবং সুন্দর বুদ্ধমূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন, কিন্তু তাহাদের মন মানিল না। যাহা যায় তাহার শোক ভোলা যায় না। ঐ মূর্তির মধ্য দিয়া তাহাদের আদর্শের রূপায়ণ হইত, এই জন্য পুত্র-কন্যার চেয়েও তাহারা ঐ মূর্তিকে অধিক ভালবাসিত। ঐ মূর্তির জন্য তাহারা এত মর্মান্তিক আঘাত পাইল যে, কিছুতেই ইহার শোক ভুলিতে পারিল না। নিজেদের পুত্র-কন্যা মরিয়া গেলেও তাহাদের এত দুঃখ হইত না, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এমন যে, উহা ফিরাইয়া আনিবার কোন উপায় ছিল না।

ভিক্ষু সুপ্রিয় বৈশালী মঠের মঠাধিপতি। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বুদ্ধই তাঁহার ইষ্ট, ইষ্টলাভের জন্য ঘর-সংসার ছাড়িয়াছেন, ইহকাল ও পরকালের সব সুখের আশা বিসর্জন দিয়াছেন, ত্যাগের আদর্শে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। প্রাণপণে ইষ্টসেবা করিয়াছেন। রাজা বিজয়াদিত্য এবং অন্যান্য ভক্তদের চেয়েও তাঁহার প্রাণে বেশী আঘাত লাগিয়াছে। ইষ্টসেবায় বঞ্চিত হইয়া তিনি নিজেকে অতিশয় বিপন্ন মনে করিলেন। জীবন বিফল হইয়াছে বলিয়া হতাশ হইলেন, এইভাবে জীবনযাপন সম্ভব নয়। ইহার চেয়ে মৃত্যু অধিকতর কাম্য। কাম্য হইলেও মৃত্যুকে বরণ করা যায় না। প্রথমত আত্মহত্যা মহাপাপ, ইষ্টলাভের পূর্বে দেহ বিনষ্ট করলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তার চেয়ে কোন-না-কোন উপায়ে উহা ফিরাইয়া আনিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সেবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

মনে নানা কল্পনা-জল্পনা করিয়া সুপ্রিয় অবশেষে মাথায় এক বুদ্ধি আঁটিলেন। যে-কোন উপায়ে যে-কোন মূল্য দিয়া বুদ্ধমূর্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই জন্য জীবনের মায়া ছাড়িতে হইবে, প্রয়োজন হইলে মরণের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

একদিন রাজা বিজয়াদিত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষু সুপ্রিয় বিনীতভাবে বলিলেন, মহারাজ কনোজ হইতে বুদ্ধদেবের মূর্তি ফিরাইয়া আনিতে চাই। আপনি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন।

রাজা ভিক্ষুকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ইষ্ট, নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীতি-লাভ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন অসম্ভব, নিষ্ফল, তথাপি বুঝাইলেন ঐ মূর্তি ফিরাইয়া আনা কোন প্রকারে সম্ভব হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না, মগধ জয় করিয়া কনোজাধিপতি রাজ্য, ধন, দৌলত, হীরা, জহরত কিছুই নিলেন না। ইচ্ছা করিলে সবই তিনি নিতে পারিতেন, কিছুই না নিয়া শুধু মূর্তি লইয়া গেলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেও তাহা ছাড়িলেন না। ইহাতে বুঝা যায় তিনি নিজে ঐ মূর্তি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন এবং রাজ্যে নিয়া উহা যথাযথভাবে রক্ষা এবং সেবার ব্যবস্থা করিবেন, এই অবস্থায় তিনি ঐ প্রাণের বুদ্ধমূর্তি ফিরাইয়া দিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না, সুতরাং এই বিষয়ে চেষ্টা করা বৃথা। তার চেয়ে অস্থির না হইয়া ধৈর্য অবলম্বন করা ভাল, আর এক বড় অথচ খুব সুন্দর বুদ্ধমূর্তি তৈয়ার করাইয়া প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

রাজা বিজয়াদিত্যের প্রবোধ বাক্য ভিক্ষুর মনে কোন রেখাপাত করিল না। যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। প্রিয় বস্তুর অভাব নূতন বস্তুর দ্বারা পূরণ হয় না, মনোরম হইলেও নয়।

রাজা বিজয়াদিত্য কোন প্রকারে ভিক্ষু সুপ্রিয়কে তাঁহার সংকল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—ঐ মূর্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করিতে পারি বলুন।

তখন ভিক্ষু সুপ্রিয় বলিলেন—মহারাজ, কনোজাধিপতির সঙ্গে সন্ধির সর্ত অনুযায়ী আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে আপনাকে তিন বৎসর অন্তর একটি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইতে হয়, তাছাড়া ইচ্ছা করিলে আপনি যে-কোন সময় যে-কোন মূল্যবান উপহার পাঠাইতে পারেন। আমার মারফতে উহা পাঠাইলে, আমি সানন্দে উহা তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দিব, আপনি আমার সঙ্গে এক পরিচয়-পত্র দিবেন। পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিবে যে আপনার প্রেরিত পত্রবাহক অতিশয় বিশ্বস্ত লোক। তাহার অনেক গুণ, ইচ্ছা করিলে তাহাকে ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে গ্রহণ করা চলে, সে প্রাণ দিয়া সেবা করিবে এই বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

সুপ্রিয়ের পরিকল্পনা জানিতে পারিয়া রাজা বিজয়াদিত্য ভাবিলেন—এই পরিকল্পনা উত্তম, ইহা কার্যকরী করিতে অসুবিধা হইবে না। মূল্যবান রত্ন উপহার প্রেরণ এবং পরিচয়-পত্র দেওয়া বরং সহজ, ইহাতে যদি কার্যোদ্ধার হয় মন্দ কি। তিনি তাহাই করিলেন।

ভিক্ষু সুপ্রিয় কনোজে আসিলেন। মহারাজ বীরবর্মণের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মগধরাজ বিজয়াদিত্য প্রেরিত মূল্যবান রত্ন উপহার এবং পরিচয়-পত্র তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। ঐ রত্নের একটা বিশেষত্ব ছিল। উহা অতি উজ্জ্বল, অন্ধকারে ঝলমল করে, ঐ রকম রত্ন কনোজাধিপতির কোষাগারে একটাও ছিল না। অমূল্য রত্ন উপহার পাইয়া তিনি আনন্দিত হইলেন, ভিক্ষু সুপ্রিয়ের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে রাখিয়া দিলেন।

অসাধ্য সাধন করিবার সংকল্প লইয়া সুপ্রিয় সুদূর বৈশালী হইতে কনোজে আসিয়াছেন। মঠাধিপতি হইয়াও এখানে রাজা বীরবর্মণের ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে কর্ম গ্রহণ

করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা এবং আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এত প্রবল যে তিনি এই কর্মকে হীন মনে করেন নাই। কর্ম গ্রহণ তাঁহার পক্ষে ভালই হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সম্ভাবনা নিহিত ছিল, পরবর্তী ঘটনাবলীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

সুপ্রিয় নিজ কর্তব্যসাধনে রত। প্রাণ দিয়া রাজা বীরবর্মণের সেবা করেন। তাঁহার অকৃত্রিম সেবায় রাজা অত্যন্ত প্রীত। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইলেন, কর্ম গ্রহণ করিয়া সুপ্রিয় সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে কর্মচারীরা সকলেই সুখী। কেহই তাঁহার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করিতেন না।

কর্মচারীদের মধ্যে রাজার এক ব্যক্তিগত সেবক ছিল। তাহার নাম সিংহকেতু, সে কাহারও সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিত না। সকলকে এড়াইয়া চলিত, সে অতি অল্পবয়সে এখানে আসিয়াছে, রাজা বীরবর্মণের ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে বিশ বৎসর যাবৎ কাজ করিতেছে, বীরবর্মণের মথুরা আক্রমণকালে তাঁহারই আদেশে নিজ পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলের হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছে। তখন সিংহকেতুর বয়স দশ বৎসর মাত্র। হত্যার বীভৎস দৃশ্য যখন চোখে ভাসিয়া উঠিত সে স্থির থাকিতে পারিত না। অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিত, প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ খুঁজিত।

এত বৎসর যাবৎ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, সিংহকেতু সুপ্রিয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করিত, অতিশয় বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বলিয়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রতিহিংসা লইবার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সুপ্রিয় ও সিংহকেতুর মধ্যে হৃদ্যতা এত গভীর হইয়াছিল যে তিনিও বলিলেন যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সুদূর মগধ হইতে কানাজে আসিয়া রাজার ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। উভয়ে রাজাকে প্রাণপণে সেবা করেন। উভয়েই তাঁহার প্রিয়পাত্র, অন্যান্য কর্মচারী অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন।

সুপ্রিয় এবং সিংহকেতুর উভয়ের উদ্দেশ্য এক নয়। সুপ্রিয় ভিক্ষু সন্ন্যাসী। সৎ সংস্কার তাঁহার মধ্যে প্রবল, সুতরাং তাঁহার মতলব ভাল হইবে ইহা স্বাভাবিক। তাঁহার উদ্দেশ্য রাজার বিশ্বাস অর্জন করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সেই বুদ্ধমূর্তি মগধে ফিরাইয়া আনা, বৈশালীর মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ইষ্টসেবায় থাকিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যে নির্বাণ তাহা লাভ করা, অন্যপক্ষে সিংহকেতুর উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, মাতা এবং আত্মীয় স্বজন হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া, প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়া—বিসর্জন দেওয়া নয়।

উভয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। একদিন সুযোগ জুটিয়া গেল; গরম কাল, রাজা বীরবর্মণ নিজ শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, সেই সময় সুপ্রিয় এবং সিংহকেতু উভয়েরই সেবার পালা। উভয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন, নিকটে কেহই নাই, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত সময়, প্রতিহিংসা নিলে কেহই টের পাইবে না।

সিংহকেতুর অন্তরে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। বিশ্রামের পর রাজা সুমিষ্ট সরবৎ পান করেন। সিংহকেতু সরবতের সঙ্গে তীব্র বিষ মিশাইয়াছে, বিশ্রামের পর হাত-মুখ ধুইয়া রাজা সরবতের অপেক্ষায় আছেন এমন সময় সিংহকেতু তীব্র বিষ মিশ্রিত সরবতের পাত্রটি রাজার কক্ষে সম্মুখের বেদীর উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রাসাদের সীমা অতিক্রম করিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল কেহ টের পাইল না।

রাজা সরবতের পাত্রটি মুখের কাছে নিতেছেন এমন সময় সুপ্রিয় কক্ষান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত হইতে পাত্রটি কাড়িয়া লইলেন উহা পান না করিবার জন্য সাবধান করিয়া দিলেন।

হঠাৎ সুপ্রিয়ের এইরূপ অশোভনীয় আচরণে রাজা আশ্চর্যান্বিত হইলেন, এরূপ ঘটনা একদিনও ঘটে নাই।

এই আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুপ্রিয় বলিলেন, মহারাজ আমার আচরণ অশোভনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। বিনা কারণে ইহা হয় নাই। আমার সন্দেহ জাগিয়াছে যে এই সরবতের সঙ্গে তীব্র বিষ মিশান হইয়াছে। ইহা পান করিলে অবিলম্বে আপনার জীবন নাশের সম্ভাবনা আছে, আমি আপনার সেবক, সেবক হিসাবে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন। আপনার জীবনের মূল্য আছে এরূপ না করিলে আমি আপনার নিকট বিশ্বাসঘাতকরূপে পরিগণিত হইতাম, বিশ্বাসঘাতক হিসাবে জীবন যাপনের চেয়ে মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল. আপনার অমূল্য জীবন বাঁচাইবার জন্য আমি এইরূপ দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছি। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।

সুপ্রিয়ের কথায় রাজা বীরবর্মণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, সিংহকেতু আমার নিকট বিশ বৎসর সেবক হিসাবে আছে, এ পর্যন্ত অবিশ্বাসের কোন কারণ ঘটে নাই, কি করিয়া বুঝিব যে সে বিষ মিশাইয়াছে, আর তুমিই বা কি করিয়া জানিলে যে সে ইহা করিয়াছে।

সুপ্রিয় তখন বলিলেন, মহারাজ, আমি তাহার হাতে একটা বড়ি দেখিয়াছি। সেই জন্য আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহা বিষ কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক, ইহার পর ঐ পাত্রের সরবতের কিয়দংশ সুপ্রিয় একটা কুকুরকে পান করিতে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি মরিয়া গেল, সুপ্রিয়ের সন্দেহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

রাজা বীরবর্মণের মনে পূর্বস্মৃতি জাগরূক হইল। বিশ বৎসর পূর্বে মথুরা আক্রমণকালে তাঁহারই হুকুমে সিংহকেতুর বাপ, মা, আত্মীয়স্বজনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে। সে নিজে ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছে, উহা ভুলিতে পারে নাই। সম্ভবত ঐ জন্য প্রতিহিংসা লইবার উদ্দেশ্যে

সরবতের সঙ্গে তীব্র বিষ মিশাইয়াছে, বিষের তীব্রতা পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞকে ডাকা হইল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তিনি অভিমত দিলেন যে, সরবতে অতিশয় মারাত্মক রকমের বিষ মিশান হইয়াছে, পান করিলেই মৃত্যু অবধারিত। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

●

ধরা পড়িলে এই অন্যায় কর্মের ফলাফল কি হইবে অনুমান করিয়া সিংহকেতু সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ হইতে এবং সুযোগমত রাজধানীর বাহিরে পলাইয়া গেল। তাহার সন্ধান মিলিল না। প্রহরীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। জনসাধারণের মধ্যে খবর ছড়াইয়া পড়িল, তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ভগবান সুপ্রিয়ের মধ্য দিয়া রাজাকে বাঁচাইয়াছেন, রাজাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া শতমুখে সুপ্রিয়র প্রশংসা করিল।

সুপ্রিয়কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাজা বীরবর্মণ অতিশয় কৃতজ্ঞ হইয়া বলিলেন, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমি তোমার নিকট ঋণী, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে আমি তাহা দিব, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। তুমি না থাকিলে আমার জীবন কিছুতেই রক্ষা পাইত না।

সুপ্রিয় খুব সচেতন, রাজার প্রশংসায় বিন্দুমাত্র স্ফীত না হইয়া তিনি বলিলেন, আমি আপনার সেবক, সর্বদা আপনার মঙ্গল চিন্তা করা আমার কর্তব্য। আপনার হাত হইতে বিষমিশ্রিত সরবতের পাত্র কাড়িয়া লইয়া আমি আমার কর্তব্য করিয়াছি। ইহাতে প্রশংসার কিছুই নাই। ইহা না করিলে আমি ভগবানের নিকট, আপনার নিকট এবং আমার বিবেকের নিকট দোষী হইতাম। আমাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন তাহার প্রয়োজন নাই, পুরস্কারের কোন প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

সুপ্রিয়ের বিনয় অথচ যুক্তিপূর্ণ কথায় রাজা বীরবর্মণ আরও মুগ্ধ হইলেন, জীবনে এমন সৎলোকের সঙ্গ, তাঁহার কখনও মিলে নাই। তিনি বার বার সুপ্রিয়কে অনুরোধ করিলেন, তোমাকে নিতেই হইবে। ভালবাসার বশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পুরস্কার দিতেছি। দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, কিম্বা দশখানি গ্রাম কিম্বা কোন উচ্চ পদ যাহা চাও আমি নিশ্চয়ই দিব?

পূর্বেই বলা হইয়াছে গভীর উদ্দেশ্য লইয়া সুপ্রিয় সুদূর বৈশালী হইতে কনৌজে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রাণপণ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা অনেক কিছু দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং প্রাণের চেয়েও প্রিয় সেই বুদ্ধমূর্তি বৈশালীতে ফিরাইয়া নিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়া জীবন সার্থক করিবার এই সুযোগ ইহা হারানো কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

তখন সুপ্রিয় অতিশয় বিনীতভাবে রাজা বীরবর্মণকে বলিলেন, মহারাজ, আমাকে কিছু দেওয়া যদি আপনার একান্ত অভিপ্রায় হয়, তবে দয়া করিয়া একটিমাত্র ভিক্ষা দিন, স্বর্ণমুদ্রা, দশখানি গ্রাম কিম্বা উচ্চপদ আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। পাইবার বাসনাও নাই। আপনি বৈশালী হইতে যে বুদ্ধমূর্তি লইয়া আসিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। ইহাতে আপনার কি ক্ষতি হইবে আমি জানি না; কিন্তু আমি বিশেষভাবে লাভবান হইব তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, যদি কিছু দিতে চান তবে আমার প্রার্থিত ভিক্ষাই দিন।

সুপ্রিয়ের ত্যাগ ও নির্লোভতায় রাজা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তিনি আবেগভরে বলিলেন, তুমি বাসনা জয় করিয়াছ, তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী, অর্হৎ, আমি অবশ্যই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব, তুমি যাহা চাও তাহা দিব। তোমার মত মহৎ ব্যক্তিকে আমার সেবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই না। তোমার দ্বারা অনেক মহৎ কাজ হইবে।

তখন সুপ্রিয়ের মনে হইল সিংহকেতুর দুর্ভাগ্যই তাঁহার এই সৌভাগ্যের কারণ। কাজেই তাঁহার জীবনও রক্ষা করা কর্তব্য। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, 'মহারাজ যদি অনুমতি করেন তবে একটি কথা বলি, সিংহকেতু অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়া এখন চলিয়া গিয়াছে কিন্তু কোন না কোন দিন ধরা পড়িবে এবং শাস্তি হইবে, আমি আপনার নিকট তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি। যদি ধরা পড়ে তাহার প্রাণনাশ করিবেন না। অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করিবার অবসর দিবেন; তাহাতে ভবিষ্যতে সে মহৎ হইবার সুযোগ পাইবে।

রাজা বীরবর্মণ তখন সুপ্রিয়কে সিংহকেতুর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন, ভিক্ষুর পুণ্যফলে রাজা বীরবর্মণ এবং সিংহকেতুর জীবন রক্ষা পাইল। ইষ্টনিষ্ঠার ফল ফলিল, সুপ্রিয় বৈশালীতে সেই বুদ্ধমূর্তি ফিরাইয়া আনিয়া রাজা বিজয়াদিত্যের সহযোগিতায় উহা পুনরায় মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নির্বাণ লাভ করিয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাইলেন।

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা

স্বপনপ্রসন্ন রায়

(শেষাংশ)

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং নানান কর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিল দিনে দিনে। তথাপি জীবন-প্রভাতে হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভায় তিনি যে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন জীবন-সায়াহ্নের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত স্বদেশসাধনার সে মন্ত্র তিনি বিস্মৃত হন নি। ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক—রবীন্দ্রনাথের সেই মহান ভূমিকার আলোচনা এই সীমিত প্রবন্ধের বিষয় নয়।

বর্তমান আলোচনায় স্বাভাবিক কারণেই দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) কথা এসে পড়ে। ঠাকুর পরিবারের স্বদেশ-সাধনার অনুকূল প্রেক্ষাপটে স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের নিয়ত অনুপ্রেরণার বশে, তৎকালীন স্ত্রী-অবরোধ ব্যবস্থার নেপথ্যালোকে থেকেও স্বর্ণকুমারীর জীবনাদর্শ স্বদেশলগ্ন হয়েছিল। তাঁর স্বদেশচর্চা সংক্রমিত হয়েছিল নানান সমাজ-মঙ্গলকর কর্মে।

আলোচ্য হিন্দুমেলার পটভূমিতে স্বর্ণকুমারীকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রচেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক মনে হলেও পরোক্ষভাবে (কখনও কখনও প্রত্যক্ষত) যে স্বর্ণকুমারীর মনে প্রথম স্বদেশাত্মার স্ফূর্তি অধিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুমেলার দেশাত্মবোধের প্রেরণার ফলেই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর জীবন-সাধনার বিচিত্র প্রকাশে তার ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য নয়।

হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনকালে স্বর্ণকুমারীর বয়স বার বৎসর। এর কয়েক মাস পরেই স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয় তৎকালীন সমাজের খ্যাতিমান স্বদেশ-সচেতন যুবক জানকীনাথের সঙ্গে। স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি একজন বড় সমর্থক ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন হিন্দুমেলার অন্যতম উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং স্বামীর নিরত উৎসাহে এবং পরিবারের অনিবার্য প্রভাবে তিনি যে হিন্দুমেলার আদর্শকে জীবনধর্মে আশ্লিষ্ট করবেন সেটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে তাঁর এই অধীত স্বদেশচেতনাকে নারী-কল্যাণ সংস্থা সংগঠনে, শিল্পমেলা স্থাপনে, ভারতী পত্রিকা সম্পাদনে ও সাহিত্য-কর্মে নানাভাবে পরিব্যাপ্ত দেখতে পাওয়া যায়।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হিন্দুমেলার কোন বিবরণেই স্বর্ণকুমারীর প্রকাশ্য উপস্থিতির কথা বলা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসের পটভূমি ছিল জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং চরিত্রগুলি ছিল 'হিন্দুমেলা' ও 'সঞ্জীবনী সভা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত। স্বর্ণকুমারীর জীবনের উল্লেখযোগ্য সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক কর্ম 'সখি সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও 'শিল্প মেলা'র আয়োজন অনুষ্ঠানের বিবরণ হিন্দুমেলার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে হিন্দুমেলার আদর্শে লালিত তাঁর স্বদেশচর্চার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব হবে। প্রকৃতপক্ষে, 'স্নেহলতা' (১৮৯০), 'বিচিত্রা' (১৯২০), স্বপ্নবাণী' (১৯২১) ও 'মিলন রাত্রি' (১৯২৫) এই চারটি উপন্যাসের মধ্যেই 'সঞ্জীবনী সভা' ও 'হিন্দুমেলার' আদর্শকে অনুস্যূত দেখা যায়।

স্নেহলতা উপন্যাসে যে 'গুপ্তসভা'র উল্লেখ করা হয়েছে তা যে রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রের 'সঞ্জীবনী সভা'র আদর্শে স্থাপিত সন্দেহ নেই। সেখানে নবদীক্ষার্থী দু'জন যুবককে প্রথম যে গান শোনান হয়েছে তা হলো, 'আজি হতে একসূত্রে গাঁথিনু জীবন, জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন।' এবং গান থামিবামাত্র সভাপতি নিকটবর্তী হইয়া পদ্মাবিদ্ধ দুইখানি খড়্গ তাহাদের দুইজনের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এ পদ্ম ভারতের চিহ্নস্বরূপ,—এই খড়্গ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার চিহ্নস্বরূপ, ইহা ধারণা করিয়া শপথ কর—আজ হইতে তুমি ভারতের মঙ্গলকার্যে প্রাণপণ করিলে—আজ হইতে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে।"

দ্র: স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী: তৃতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত।

এই অনুষ্ঠান পরিচিতির সহিত সঞ্জীবনী সভার দীক্ষানুষ্ঠানের নিয়মাবলী স্মরণযোগ্য। 'স্নেহলতা' উপন্যাসের গুপ্তসভার আদর্শ বর্ণনার সঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুমেলার আদর্শকে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে (উপন্যাসে) সভাপতি জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাষণে বলেছেন, 'ভ্রাতৃগণ, আমরা এই পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, দেশহিতকর অনুষ্ঠানে জাতিগত মাহাত্ম্য বৃদ্ধিই ইহার মূল সঙ্কল্প, দেশোন্নতিই ইহার চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত উপায় কি? দেশে ধন-বৃদ্ধি ও শিক্ষা-বিস্তার।------শিল্পের উন্নতি এবং বাণিজ্য বৃদ্ধিই দেশে ধনবৃদ্ধির প্রকৃত উপায়।---এককালে আমরা শিল্পাগ্রগণ্য ছিলাম। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রারম্ভ পর্যন্তও ভারতবর্ষ নানা দেশে শিল্প রপ্তানী করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভারতের শিল্প লুপ্তপ্রায়। দেশের শিল্প বিদেশে পাঠান দূরে থাক—আমরাই অধিকাংশ বিদেশীয় শিল্প ব্যবহার করি। আমাদের প্রয়োজনীয়

দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রাদি হইতে সামান্য দেশলাইটি পর্যন্ত বিদেশী।'

ভাষণে শিল্পবিষয়ে উন্নতির উপায় হিসাবে বলা হয়েছে, 'আমরা যদি শিল্পে উন্নতি চাই ত' কল-কৌশলের দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে।' এবং সর্বোপরি গুপ্তসভা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "---একতা, দৃঢ়তা, সমবেত চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? একতার দার্ঢ্যবর্ধনের জন্যই আমাদের এই গুপ্তসভা।"

সভাপতির ভাষণে ইংরাজের নিন্দা করা হয় নি সত্য, কিন্তু ইংরাজের পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে জাতিকে বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে, '---যদি তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে চাও, নিজে যোগ্য হও, কেবল গালিবর্ষণে যোগ্যতা জন্মে না। একতা। দৃঢ়তা। কার্যতৎপরতা। আমাদের এই লক্ষ্য যেন অভঙ্গ থাকে।'

এই সভাতেই অন্য বক্তা নবীনের ভাষণে বলা হয়েছে, '---কেবল বিজ্ঞানচর্চা নহে—আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাতীয়তা রক্ষা এ সভার আর এক উদ্দেশ্য হউক।'

দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র ও অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারীর স্নেহলতা উপন্যাসের গুপ্তসভার আদর্শ যেন তারই প্রতিধ্বনি। এমন কি দেশীয় সাবান প্রস্তুতের, বস্ত্র প্রস্তুতের এবং মেলা বসানোর যে ইঙ্গিত উপন্যাসে করা হয়েছে তাও 'হিন্দুমেলা' ও 'স্বাদেশিকদের সভা'র কর্মাবলীরই ভাষান্তরমাত্র।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে হিন্দুমেলার কর্মাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ব্যায়াম অনুশীলন ও দৈহিক শক্তিবৃদ্ধি। স্বর্ণকুমারীর স্বদেশচিন্তায় এর প্রভাব কম ছিল না। 'মিলন রাত্রি' উপন্যাসের প্রথমেই সন্ন্যাসী রাজকন্যাকে বলেছেন, "সকলেই একবাক্যে বলছেন, স্বরাজ চাই, স্বাধীন ভারত চাই। আকাশে-বাতাসে এই কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।"---

কিন্তু স্বরাজ সাধকের জন্য কিসের প্রয়োজন? 'শরীর-পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন।' বিচিত্রা উপন্যাসের নায়িকা রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী পণ্ডিতমশাইকে বলেছেন, 'জাতির মঙ্গল-চেষ্টা ত' আর বিদ্রোহিতা নয় যে, আপনি ফাঁসি যাবেন।'

জাতির মঙ্গল এবং জাতিকে তার আপন সম্মানের আসন সুদৃঢ় করতে হলে, "সহরে-নগরে, গ্রামে-পল্লীতে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি রীতিমত ব্যায়ামশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে শারীরিক তেজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তেজও বাড়বে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তখন তাদের পীড়ন করতে কারো সাহসই হবে না।" 'বিচিত্রা' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ব্যায়ামচর্চায় গুরুত্ব প্রদান যে হিন্দুমেলার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল তার প্রমাণস্বরূপ উপন্যাসের অপর মহিলা-চরিত্র কুন্দের উক্তি অনুধাবনযোগ্য,—

'কুন্দমালা বলিল, একসময় হিন্দু-মেলা নামে কলকাতায় একটা মেলা হয়েছিল,—তার উদ্যোগে দিনকতক নাকি ছেলেদের মধ্যে ব্যায়াম-চর্চার খুব ধুম প'ড়ে গিয়েছিল।' পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—হাঁ, সে অনেক দিনের কথা,—আমরা তখন ছেলেমানুষ।"

—দ্রঃ স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ ভাগ/বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত।

বিচিত্রা উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ী পিতার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, "বাবা, রাজ্যের যত বিদ্যালয় আছে, আমি তাতে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে চাই—অনুমতি দাও তুমি।"

হিন্দুমেলার প্রধান পরিচালক নবগোপালের নেতৃত্বে তৎকালীন কলিকাতার প্রতিটি বিদ্যালয়েই ব্যায়াম-চর্চার ক্লাস খোলার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী হিন্দুমেলার সেই পরিকল্পনাকে সম্ভবত তাঁর কালে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ব্যায়ামচর্চার বিষয়ে স্বর্ণকুমারী মহিলাদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কন্যা সরলার জীবন-চর্চায় তাঁর এই স্বাদেশিক মনোভাবই অনুস্যূত হয়েছিল।

স্বর্ণকুমারীর স্বদেশসাধনার একটি বিরাট সময়-কাল নারী-জাতির স্বাধিকার লাভ ও নারী-জাতিকে স্বদেশ-কর্মে প্রাণিত করার ব্রতে সংলগ্ন ছিল। বিচিত্রা উপন্যাসে রাজা ও ক্লাউডেন সাহেবের কথোপকথনে তার যথার্থ লক্ষ্য করা যায়—"আর কে বলতে পারে, নারী-জাতির দ্বারাই ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধৃত হবে না।"

নারী-কল্যাণ বিষয়ে নিয়ত-প্রাণিত স্বর্ণকুমারীর মহৎকার্য 'সখি সমিতি' (১২৯১ সাল) ও 'শিল্প মেলা'র আয়োজন। এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবী লিখেছেন—

"---থিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার যখন মান্দ্য পড়িয়া গেল 'সখি সমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করিলেন।---নামকরণ রবীন্দ্রনাথ-কৃত। অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিপন্ন বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্প মেলায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতির আয়োজনে 'সখি সমিতি' বিখ্যাত হইয়া উঠিল।"

—দ্রঃ ভারতী: ফাল্গুন ১৩৩২।

স্বর্ণকুমারী 'সখি সমিতির' সম্পাদিকা ছিলেন। এই সংস্থায় তাঁর এককালীন ১০২৫ টাকা অর্থসাহায্যের কথা উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, 'সখি সমিতির' অর্থবৃদ্ধির জন্যই স্বর্ণকুমারীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'মহিলা শিল্প মেলা' আয়োজিত হয়। কিন্তু এর আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল।

এ প্রসঙ্গে 'ভারতী ও বালক' (১২৯৫ সাল) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল " ..সমিতির অর্থবৃদ্ধির উদ্দেশে সমিতি

হইতে সম্প্রতি মহিলা শিল্প মেলা নামে একটি মেলা হইয়া গিয়াছে। অর্থবৃদ্ধি ভিন্ন মহিলাগণের শিল্পোন্নতি এবং পরস্পর সম্মিলন প্রভৃতি ইহার অন্য গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল।"

উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় শিল্পোন্নতি এবং বৎসরের শেষে তাবৎ হিন্দুগণের একত্র সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে স্বদেশচেতনাকে একটি বলিষ্ঠ রূপ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দুমেলারও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

মহিলা শিল্প মেলার আয়োজন অনুষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দুমেলার আয়োজন অনুষ্ঠানের তুলনা করলে উভয় অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যাবে। 'ভারতী ও বালক' থেকে পুনরায় উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতায় বেথুন স্কুল-বাটিতে লেডী বেলী কর্তৃক দ্বিপ্রহরের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেলা খলিবার পরই লেডী ল্যান্সডাউন আগমন করেন। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিনদিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলার দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা, ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এই মেলায় মহিলা। মেলা উপলক্ষে বেথুন স্কুলের বাড়ীটি লতা-পাতা-ফুল প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাড়ীর মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাঁদোয়া দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে একটি লতাপাতা খচিত কুটির নির্মিত হইয়াছিল। কুটিরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের চারিপার্শ্বে বারান্দায় ও ঘরে মহিলাদিগের ক্রয়োপযোগী নানারূপ দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল এবং এক একজন মহিলার উপর বা দুই তিনজনের উপর দ্রব্য-বিশেষ বিক্রয়ের ভার ছিল। কাহারও নিকট গহনা, কাহারও নিকট নানা প্রকার রেশমী কাপড়, কাহারও নিকট ঢাকাই শান্তিপুরে সাড়ী, কাহারো নিকট খেলনা, কাহারো নিকট মহিলা শিল্প ইত্যাদি।

'---এ ছাড় মেলার প্রদর্শনীতে মহিলাদের নির্মিত নানান মৃৎশিল্প, সিলাই শিল্প, চিত্রশিল্প, নানান সূক্ষ্ম শিল্পাদি রাখা হয়েছিল। উল্লেখ করার বিষয় যে শিল্পকার্যে উৎকর্ষ প্রদর্শন করার জন্য 'সখি সমিতির' পক্ষ থেকে পাঁচজন কৃতী মহিলাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য হিন্দুমেলার কর্তৃপক্ষও দেশীয় শিল্প-কলায় উৎকর্ষ প্রদর্শনকারীকে 'হিন্দু-মেলা' নামাঙ্কিত পদক দানে পুরস্কৃত করতেন। এছাড়া, হিন্দুমেলার প্রদর্শনীর উপকরণ আয়োজনের ক্ষেত্রে যে সর্বভারতীয় চিন্তা কার্যকর ছিল, (দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনোমোহন বসুর ভাষণ দ্রষ্টব্য) মহিলা শিল্প মেলার আয়োজনও একই প্রকল্পের অনুযায়ী ছিল. নানা স্থান হইতে মহিলা শিল্প সংগ্রহ করা ব্যতীত আগরা, কাশ্মীর, বোম্বাই, মোরাদাবাদ, কাশী, জয়পুর, আগ্রা, গাজিপুর, বীরভূম, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতার ইংরাজ বাঙ্গালী বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে নানারূপ প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি এখানে আনীত হইয়াছিল।"

অবশ্যই স্বদেশী মেলার সঙ্গে মহিলা শিল্প মেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ আদর্শগত মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তথাপি স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বদেশচর্চার অন্যতম পরিণতি হিসাবে শিল্প মেলার যে পরিকল্পনা তা যে হিন্দুমেলার প্রেরণাবশেই পরিকল্পিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীর জীবনে পারিবারিক স্বদেশ-প্রীতির জন্মগত প্রভাব ছিল, সেই সঙ্গে (অনুমান করা যায়) হিন্দুমেলার স্বদেশচিন্তাও সমীভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই নব্য-স্বদেশবোধই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁকে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী অন্যতমা মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীগণের অধিকার সাব্যস্ত করেছিলেন।

ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা এবং লেখিকা হিসাবেও তাঁর ভারত-চিন্তা নানান স্বরূপ মনোজ্ঞ প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু-মেলার জাতীয় সঙ্গীতের মাতৃবোধের দ্বারা তিনিও প্রাণিত হয়েছিলেন। শৃঙ্খলিতা ভারতমাতার মূর্তি তাঁকে বিচলিত করেছিল। সমকালীন নিশ্চেষ্ট বলবীর্যহীন ভারতবাসীর প্রতি তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন তাঁর ভারত সঙ্গীতের মাধ্যমে—

"তবু তারা হাসে।
মা গো। ম্লান তব চন্দ্রানন, অশ্রুপূর্ণ দু'নয়ন,
ব্যথিত সুতনু লৌহপাশে—
তবু তারা হাসে।

●

ধর্মহীন কর্মহীন, হেয়, পদানত দীন,
বাঁচিয়া যে মরিয়াই আছি—
এস ভাই মরে তবে বাঁচি।
আয় ভাই, আয় তবে আজি।
সাধিতে মায়ের কাজ, মুহূর্ত না করি ব্যাজ
একসূত্রে মরিবারে সাজি—
আয় তবে আয় সবে সাজি।"

জাতীয় পরাধীনতার গ্লানিময় জীবন স্বর্ণকুমারীও অনুভব করেছিলেন। দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে জীবন উৎসর্গের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী তাঁর জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘকাল পূর্বে স্বর্ণকুমারী আশা করেছেন একদিন ভারতের ভাগ্যাকাশ থেকে পরাধীনতার কালমেঘ অপসৃত হবে.—

"চাহি ও মা [illegible] ডাকয়া বিদীর্ণ বুকে.
পাই, মা, তাহার সাড়া এ মঙ্গল সুস্বপনে
যদিও মহিলা তব, হেরিতে আমি না রব,
সত্য ইহা স্বপুরূপে তোমার কুমারী ভণে।"

পরাধীন ভারতের এক নারীর কণ্ঠে এ জাতীয় ক্রন্দন নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ঘটনা। স্বর্ণকুমারী সে বিস্ময় সৃষ্টির অধিকারিণী ছিলেন। মনে হয়, হিন্দু-মেলার স্বদেশবোধের দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে দীক্ষিত না হলে স্বর্ণকুমারীর পক্ষে এরূপ স্বদেশবোধের অধিকারিণী হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর এই স্বদেশচিন্তার সফল পরিণতি ঘটেছিল

তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী ও সরলা দেবীর জীবনচর্চায়।

ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চায় হিন্দুমেলার ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনায় ভারত শিল্পের পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। ঠাকুর পরিবারের স্বদেশভাবনা ভারত-সংস্কৃতির যে মৌল বিষয়গুলিকে আশ্রয় করে জাতীয় জীবনে নবযুগ আনয়নের সাধনা করেছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল দেশীয় চিত্রকলার উন্নয়ন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলায় দেশীয় চিত্রকলার অঙ্কন ও প্রদর্শনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বলা যেতে পারে, দ্বিজেন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার মাধ্যমে ভারত-শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় তা বাস্তব রূপ লাভ করেছিল।

উত্তরকালে অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত বলেছেন, 'ছবি দেশী মনে ভাবতে হবে, দেশী মতে দেখতে হবে। রবিবর্মাও তো দেশী মতে ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু বিদেশী ভাব কাটাতে পারেন নি. সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেইখানে হলো আমার পালা। বিলেতী পোর্ট্রেট আঁকতুম, ছেড়েছুড়ে দিয়ে পট—পটুয়া যোগাড় করলুম। যে দেশে যা কিছু নিজের নিজের শিল্প আছে সব যোগাড় করলুম।' (দ্র: ঘরোয়া)।

ইতালীয়ান শিল্পী গিলার্ডি, ইংরাজ শিল্পী পামার, ভারত শিল্পের একান্ত অনুরাগী হ্যাভেল, জাপানী শিল্পী ওকাকুরা, টাইকন, হিসিদা প্রমুখ অনেক বিদেশী শিল্পীর কাছে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পদীক্ষা লাভ করেছিলেন। এর ফলে ভারত শিল্পের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে অথচ শিল্পীর জীবনসাধনায় বিদেশী শিল্পের প্রভাব আগ্রাসী হয়ে দেখা দেয় নি।

অবনীন্দ্রনাথের এই স্বতন্ত্র-স্বদেশপ্রবণ শিল্পসাধনার পশ্চাতে দুটি প্রভাব কার্যকর হয়েছিল। প্রথমত ঠাকুর-পরিবারের স্বাভাবিক স্বাদেশিক প্রবণতা ও রবীন্দ্রনাথের নিয়তনির্দেশ. দ্বিতীয় শিশু অবনীন্দ্রনাথের চিত্তাকাশে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি 'অবজেক্ট' হিসাবে নিয়েছিলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণলীলার কাহিনী। আর হিন্দুমেলার প্রদর্শনীতে তিনি দেখেছিলেন রামায়ণ মহাভারতের ছবি, শ্রীমন্ত সওদাগর কমলেকামিনীর ছবি। হিন্দুমেলার প্রদর্শনীতে কালীঘাটের পটুয়ারা পট দেখাতেন, শিশু অবনীন্দ্রনাথের হৃদয়ে সে ছবি প্রগাঢ় ছাপ রেখে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর হাতে এই দেশীয় শিল্পের আশ্রয়েই ঐতিহ্যময় ভারতশিল্পের নবজন্ম হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে (১৯০৫ খৃ:) জাতীয় আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা পটভূমিকায় 'ভারতমাতা' চিত্রের মধ্যে দিয়েই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চায় স্বদেশ-চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পিজীবনে এই স্বদেশবোধ হিন্দুমেলার স্বাদেশিকতার আদর্শরস-লালিত ও ঠাকুর পরিবারের অনিবার্য দেশাত্মবোধের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছিল। উত্তর জীবনে বহু ঘটনার সংঘাতেও হিন্দুমেলার কথা অবনীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নি।

অবনীন্দ্রনাথের জন্মকালে (১৮৭১ খৃ:) হিন্দুমেলার পাঁচটি অধিবেশন হয়ে গেছে। হিন্দুমেলার শেষ অধিবেশনের কালে তাঁর বয়স নয় বৎসর। সেই শিশুকালে হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা প্রভৃতির স্বাদেশিক-উষ্ণ আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথ বড় হয়েছেন। রামলাল ভৃত্যের হাত ধরে অবনীন্দ্রনাথ এবং সমবয়স্ক ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য ভাই-বোনেরা হিন্দুমেলার সমারোহ দেখতে যেতেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছে হিন্দুমেলার কথা, "শেষ যেবার আমরা দেখতে গিয়েছিলুম এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে—বাগানময় মাটির মূর্তি সাজিয়ে রাখত, এক-একটি ছোট্ট চাঁদোয়া টাঙিয়ে বড়ো বড়ো মাটির পুতুল তৈরী ক'রে, কোনোটাতে দশরথের মৃত্যু, কৌশল্যা বসে কাঁদছেন, এই রকম পৌরাণিক নানা গল্প মাটির পুতুল দিয়ে গড়ে বাগানময় সাজানো হত।----তাছাড়া কুস্তি হত, রায়-বেঁশে নাচ হত, বাঁশবাজির খেলা—আরো কত কী। তাদের আবার প্রাইজ দেওয়া হত।

এই তো গেল বাইরের ব্যাপার, ঘরের ভিতরেও নানা দেশের নানা জিনিষের একজিবিশন—ছবি, খেলনা, শোলার কাজ, শাড়ি, গয়না,---সন্ধ্যেবেলা নানারকম বৈঠক বসত, কথকতা, নাচগান, আমোদ-আহলাদ সবই চলত।"

দ্র:—ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ।

হিন্দুমেলায় জাতীয় সঙ্গীতের জন্মকথা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই আমাদের আমলের সকাল হবার পূর্বেকার সুর, যেন সূর্যোদয় হবার আগে ভোরের পাখি ডেকে উঠল। আমরাও ছেলেবেলায় এইসব গান খুব গাইতুম।"

দ্র:—ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ।

জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা কামনার অস্ফুট সুর শুনেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ সেই শিশুকালেই। সমষ্টিগত জাতীয় সাধনার যজ্ঞবেদী থেকে উত্থিত সেই স্বদেশমন্ত্রই পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংকেত শঙ্খ ধ্বনিত করেছিল। এই সুরের জগতে অবিরত সংক্রমিত অবনীন্দ্রনাথ স্বত:দীক্ষিত হয়েছিলেন স্বদেশমন্ত্রে। পরিণত বয়সে 'ঘরোয়া'তে তিনি হিন্দুমেলার প্রাণ-পুরুষ নবগোপাল মিত্রের কথা স্মরণ করেছেন এবং নবযুগের ভারত-চেতনার উল্লেখ করে বলেছেন, "নবযুগের গোড়াপত্তন করলেন নবগোপাল মিত্তির। চারিদিকে ভারত, ভারত—ভারতী কাগজ বের হল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয় ভাবের উৎপত্তি হল ওই তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখলে।"

জীবনের উষালগ্নে অবনীন্দ্রনাথের চেতনায় যে ভারত-বোধ

জন্ম নিয়েছিল (১৯০৫-৬-এর) বঙ্গভঙ্গের যুগে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল "ভারতমাতা" চিত্রের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগামী অবনীন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গে মিলে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বদেশীয় দ্রব্যের দোকান 'স্বদেশী ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্লেগমহামারীর নিবারণে সেবা-সমিতির জন্য 'মাতৃভাণ্ডার' সৃষ্টি করে চাঁদা তুলেছিলেন, নাটোরের প্রোভিনসিয়াল কনফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ প্রমুখের ইংরাজী বক্তৃতার বিরুদ্ধাচরণ করে বাংলা ভাষাকে সম্মানিত করেছিলেন, জাতীয় আন্দোলনের দিনে জাতির চিত্তোদ্বোধনের প্রেরণা হিসাবে এঁকেছিলেন 'বঙ্গমাতা বা ভারতমাতার' ছবি

'আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে ধনবস্ত্র বরাভয়,—এক জাপানী আর্টিস্ট সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলে।---রাবকাকা গান তৈরী করলেন, দিনুর (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে ক'রে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল।'

এ হলো ১৯০৬ সালের জুন মাসের ঘটনা। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে শিবাজী উৎসবের নামে যে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়, ১৯০৬ সালে সখারাম গণেশদেউস্কর, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বারীন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সহযোগিতায় সেই শিবাজী-উৎসব ও ভবানী পূজার দ্বারা বঙ্গভঙ্গোত্তর বাংলা দেশে নূতন জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন তিলক। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত 'ভারতমাতা' চিত্র সেই চিত্তবিমথনকারী উৎসবের বিজয়পতকারূপে সম্মানিত হয়েছিল, "টিলক মহারাজ উৎসবের মধ্যে একদিন গঙ্গাস্নানে গেলেন—প্রায় ত্রিশ হাজার লোক তাঁহার সঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা ছবি মিছিলের অগ্রভাগে।"

—দ্র: ভারতে জাতীয় আন্দোলন: প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-চিন্তায় এই ভারতবোধ হিন্দুমেলার জাতীয় আদর্শের সফল পরিণতি। জাতীয় জীবনের এক ব্রাহ্মমুহূর্তে অমিত সম্ভাবনার বীজ বুকে নিয়ে হিন্দুমেলার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মাত্র চতুর্দশ অধিবেশনের পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরজীবনে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের এই জাতীয় পাঠশালার কথা স্মরণ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন—

"হিন্দুমেলা সে প্রকাণ্ড ব্যাপার তখনকার দিনে। তার অনেক পরে হিন্দুমেলারই আভাস নিয়ে মোহন মেলা, কংগ্রেস-মেলা, এ-মেলা সে-মেলা হয় কিন্তু অত বড়ো নয়।

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যই ছিল ভারত প্রীতি ও আজকাল তোমাদের যে কথা হয়েছে কৃষ্টি, সেই কৃষ্টির উপর তার প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু বাঙালীর যা বরাবর হয় শেষটায় মারামারি করে কৃষ্টি কে' পায়—হিন্দুমেলারও তাই হল। (দ্রঃ প্রবোধ)

অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্যের মধ্যে হিন্দুমেলার অধিবেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু হিন্দুমেলার স্বাদেশিকতার মাটিতেই জন্ম নিয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় জীবনের প্রকার স্বাদেশিক আন্দোলনে সংক্রমিত হয়েছিল হিন্দুমেলার আদর্শ। তাই বলা যেতে পারে জাতীয় মেলার সমাপ্তি তার তিরোধান নয়,—জাতীয়-চেতনার নবজাগরণের কালে নবরূপে আবির্ভাব।

হিন্দুমেলার পরে বাংলা দেশের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান, ইণ্ডিয়ান লীগ, জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, জানকীনাথ ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, শিশিরকুমার ঘোষ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অতিনিষ্ঠ স্বদেশসাধনার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করতে থাকেন।

অপরদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ ও শিষ্যা নিবেদিতার যুগ্ম-সাধনায় সনাতন ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তায় স্বদেশকল্যাণময়ী মানবধর্মের নবজন্ম ঘটে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড আলোড়ন বিপ্লব স্তনিত সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

এই বৈপ্লবিক বিবর্তনের পটভূমিকায় হিন্দুমেলার স্বদেশী আদর্শে লালিত অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, দীনেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ীর কৃতী সন্তানগণ অমিত প্রতিভাধর পুরুষ রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বদেশ সাধনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিজেদের বহুমুখী প্রতিভাকে কর্মলগ্ন করে তোলেন।

রামমোহন ও দ্বারকানাথের জীবনে যে স্বদেশবোধের অস্ফুট সঞ্চার হয়েছিল এঁদের জীবনে ও কর্মে তার পূর্ণ পরিণতি বিস্ময়করভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। জাতীয় আন্দোলনে নানাভাবে এঁরা প্রেরণা দিয়েছেন, শতাধিক বর্ষব্যাপী শোষিত-পরাশ্রয়ী স্বদেশবাসীর কাছে স্বাবলম্বনের আদর্শ তুলে ধরেছেন, গ্রামবাংলার উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করেছেন, জাতীয় সঙ্গীতের জন্ম ও জাতীয় ভাষার সম্মান দিয়েছেন।

এককথায় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনে উদার দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ঠাকুরবাড়ীর সন্তানগণ চারণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমান ভারতের পরানুকরণ, পরনির্ভরপ্রবণতা, চরম খাদ্যাভাব এবং শিল্পবিষয়ে অনীহার দিনে শতবর্ষ পূর্বের হিন্দুমেলার আদর্শ প্রকল্পের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমতার সঙ্কটের কালে, আত্মহননের দিনে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও ঠাকুরবাড়ীর কৃতী-সন্তানগণের স্বদেশচর্চার ইতিহাস অনুশীলন।

॥ সমাপ্ত ॥

[ঋণ স্বীকার : রচনায় ব্যবহৃত আলোক চিত্রগুলি বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়ের অনুমতিক্রমে ও রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে প্রাপ্ত, নবগোপাল মিত্রের ছবিটি পুনরঙ্কন করেছেন শ্রীসেলিম মুন্সী, ব্যক্তিগতভাবে উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীলপ্রসন্ন রায়, শ্রীঅমরেন্দু দত্ত এবং আরও বহু গুণী ব্যক্তি। প্রত্যেকের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ।]

আলোর চেয়ে দ্রুতগামী ?

আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কিছু হতে পারে কি না, এই প্রশ্ন বহুদিন ধরে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা ও আলোচনার বিষয় ছিল। আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকবাদে (রিলেটিভিটি) বলেছেন যে, না, আলোর চেয়ে দ্রুতগতি আর কিছু হতে পারে না।

বর্তমানে এই মূল বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জেরাল্ড ফিনবার্গ হচ্ছেন এই চ্যালেঞ্জার। তিনি এক অভিনব থিওরী প্রচার করেছেন।

তাঁর মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ধাবিত অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণায় পরিপূর্ণ—অর্থাৎ আলোর চাইতে অনেক দ্রুতগতিবিশিষ্ট। এদের নাম দিয়েছেন ইনি "টাকিয়ন"। এঁর বিশ্বাস, সময় সময় এই বস্তুকণায় অনন্ত গতিবেগ নিয়ে চলে।

ডঃ ফিনবার্গ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আইনস্টাইনেরই প্রবর্তিত গণিত অনুসরণ করে।

এ পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে এই বস্তুকণার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। ডঃ ফিনবার্গ-এর মতে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া কঠিন কেন না এ কণাগুলি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নয়।

বলা হচ্ছে যে, এই বস্তুকণাগুলি গতির দ্রুততা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিক্ষয় করে কিন্তু সাধারণ বস্তুগুলি গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চার করে।

যদি ডঃ ফিনবার্গ-এর মত ঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে হয়তো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে শক্তি চালনা করা চলবে।

(শেষ-প্রকাশিতের পর)

রোশন ও রাবেয়া চলেছে যে গ্রাম্য-পথে সেই গ্রাম্যজীবনই বাংলার প্রাণস্বরূপ। বাঙলা ও বাঙালীর জীবন চিরকালই মধ্যত গ্রামভিত্তিক। উত্তর ভারতের রাজগৃহ পাটলীপুত্র, সাকেত, শ্রাবস্তী, হস্তিনাপুর, পুরুষপুর, শাকল, কান্যকব্জ, তক্ষশীলা উজ্জয়িনী, বিদিশা কৌশাম্বী এবং দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য বাণিজ্যবন্দর পুরানগর প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন হিন্দুদের ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করে আছে বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে নগর-নগরী সে স্থান অধিকার করতে পারেনি, চেষ্টাও করেনি। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মূর্তিই তার আসল মূর্তি।

রাবেয়া দেখেছিল এক গ্রাম্যবধূকে বটবৃক্ষমূলে জল দিতে দেখে, তাঞ্জাম চড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে। ভয় পেয়েছিল কোলবাবার কুটিরে কালীমূর্তির পট থেকে। আল্লার কোনো তসবির নাই, তিনি নিরাকার। কিন্তু অরূপের ধ্যান ও জ্ঞানময় অধ্যাত্মচিন্তা বরাবরই বাঙালী চিত্তে স্বল্প ও শিথিল। বাঙালী তার ধ্যানের দেবতাকে পেতে চায়, রূপে-রসে মণ্ডিত করে। বাঙালীর ভক্তি জ্ঞানানুগ নয়, আবেগপ্রধান। সে সাধনা রূপের ও রসের সাধনা।

আর্যদের বৈদান্তিক সাধনা, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং ইসলামের নিরাকার একেশ্বরবাদ তাই এখানকার গণচিত্তে প্রভাব লাভ কোনদিন করতে পারেনি। তাই সব মত সব পথই সাধ্যানুসারে চিত্তের নিকটতর করে গ্রহণ করেছে রূপে রসে বর্ণে পূর্ণ করে।

বাঙলার গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য দেবমন্দির, কিন্তু ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো; অজন্তা ইলোরার মত প্রসারিত ও বিস্তৃতায়ন মন্দিরনগরী একটিও নাই। কিন্তু এখানকার বহু মন্দির সূক্ষ্ম কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ এবং ইন্দ্রিয়ানুগতার গভীরতায় সমৃদ্ধ। বৃহৎ কর্মপ্রয়াস ও গঠননৈপুণ্য সেখানে স্থান পায়নি।

সৃষ্টি ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় প্রাচীন বাঙলার গীতিকাব্যেও। প্রাচীন বাঙালী কোনো মহাকাব্য রচনা করে নাই কিন্তু অপরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করেছে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর অন্তরে।

লাটকুঠির সামনে তাঞ্জাম এসে থামলো। ফটকের রক্ষীদল সেলাম করে খুলে দিল ফটক। রাবেয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, এ আবার কোথায় নিয়ে এলে দিদিজান?

দিব্যদর্শী

রোশন জবাব না দিয়ে বললো, ভিতরে চল রাবেয়া। এটা চন্দননগর।

নবাবের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে পালিয়ে এসেছিল রাবেয়া মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ থেকে দু বছর আগে। কিন্তু নবযৌবনপ্রাপ্তা অসহায় সুন্দরী কিশোরীর কাছে সমস্ত সংসারটিই যেন এক বিরাট ষড়যন্ত্রস্বরূপ। বহু রাত্রির জাগরণ এবং বহু দিনের অনাহারক্লিষ্ট শ্রান্ত ক্লান্ত আশ্রয়হীনার আশ্রয় মিললো ত্রিবেণীর এক বৃদ্ধ কাজী সাহেবের গৃহে।

কিন্তু সে গৃহেও কিছুকাল পর দেখা দিল একটি বিষধর সর্প। সে সর্পটি কাজী সাহেবের ছেলে। কোরান ও সরিয়ত-এ লায়েক হতে গিয়েছিলো আজমীঢ় শরীফে, পড়া ছেড়ে দিয়ে, ফিরে এলো। বিশ্রী চেহারা, বিশ্রী স্বভাব, বিশ্রী তার পাপচক্ষুর দৃষ্টি।

আবার পথে বেরোতে হল রাবেয়ার। সেই পথেই ঘনিয়ে এল তার বিপদ। ত্রিবেণী থেকেই বোধ হয় পিছু নিয়েছিল দুষমনদের চর, তারপরেই জাহাজের এক কামরায় বন্দিনীর জীবন হলো সুরু। আল্লার মেহেরবানি, কিন্তু যেখানে এসে আজ সে পৌছেছে সেটা কী সে জানে না, তবে সহোদরার সান্নিধ্য তো বটে? সে সান্নিধ্য স্নেহ-শীতল, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। ক'দিন ঘুমিয়েই কাটাবে সে।

রোশন দেখলো রেনো ঘুমিয়ে আছেন খাসকামরায়। পোষাক ছাড়েন নি, জুতো খোলেন নি, দরজা খোলা। ছটফট করে অনেক রাতে হঠাৎ কৌচেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, বোঝা যায়। হাসি এল, দুঃখও হলো বেচারির 'পর, বাইরে যাঁর এত সম্মান ও প্রতিপত্তি রোশনের কাছে তেমনি একটি শিশুর মত, কিছুক্ষণ না দেখলে যেন পাগল

-হয়ে থাক। তবেই হবেন, অবেলাকে চান করিয়ে, নতুন জামাকাপড় পরিয়ে নিজেও চান করে নিতে পারবে। রাবেয়ার জন্য সব বন্দোবস্তও করতে হবে।

ওদিকে আলি আসগর জোর পায়ে আসছিল, সাহেবের গোসলখানায় সব ঠিক আছে কি না আগে-ভাগে দেখে নিতে হবে। সাহেব অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন, উঠতেও দেরী হবে, সুতরাং তাড়াহুড়ো করে লাভ কী? চরণ ধুপী আগে আগে যাচ্ছিল, ডেকে বললো, 'এত সকালে কোথায় চলেছো ভালমানুষের পো?'

চরণ পেছনে তাকিয়ে থামলো।

'থানায় চলেছি বড় মিঞা।''

কারু মাথা ফাটিয়েছো বুঝি, তাই ডাক পড়েছে?'

'অনেক মাথাই ফাটাবার মত, সেগুলি ফাটাতে পারলে পুণ্য ছাড়া পাপ হতো না, কিন্তু ফাটাতে পারছি কই বড় মিঞা।'

'সার্জেন্ট সাহেব ডেকেছেন তাঁর উর্দিগুলো ময়লা হয়েছে।'

চরণের আসল নাম শ্রীচরণ। লেখা-পড়াও কিছুটা শিখেছে কিন্তু লেখাপড়া শিখেও যখন সে ধোপাগিরি সুরু করলো তখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন হে বাপু, চাকরিও তো পেতে নবাবের সেরেস্তায়?' জবাবে চরণ বললো, 'লেখাপড়া শিখেছি ব'লে চৌদ্দপুরুষের জাত-ব্যবসাটা ছেড়ে দেব? স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে কি গোলামি ভাল?'

বামুন কায়েতরা বললেন, 'চাকরি করলে তুমি কেউকেটা হতে, শ্রীচরণ বলেই ডাকতাম কিন্তু করছো যখন ধোপাগিরি, তখন তোমাকে আর শ্রীচরণ বলে ডাকা চলে না, ডাকবো চরণ।

শ্রীচরণ হাসে, 'আপনাদের চরণের তলায়েই যখন পড়ে আছি তখন চরণ বলেই ডাকবেন।'

আলি আসগর লাটসাহেবের খোদ খিদমৎগার, তাই বড় বড় কথা বলে। মনের জোরে বড়াই করে প্রকাশ করে। তার কথার দাম আছে, বুদ্ধির দাম আছে। তাই ব'লে কথা সে কম বলে না, বেশীই বলে। কলকাতায় সে কয়েক বছর ছিল, কলকাতার কথা ইংরেজ সাহেবদের কেচ্ছা বলতে তার মুখ দিয়ে খই ফোটে।

'বুঝেছো চরণ, চন্দননগর শহরটা এত বড় হয়েছে কিন্তু দিশে-বিশে নেই কোন, এলোপাতাড়ি ভাবে ছড়ানো। তুমি থাকো কটকগোড়ায়, আর তোমার শ্বশুর থাকে সনাতন তলায়, তোমার ভগিনীপতি বিশালাক্ষী মন্দিরের কাছে, অথচ কাজ করছো একই। কলকাতায় বাপু এমনটি দেখা যায় না, এক জাতের লোক দল বেঁধে এক জায়গায় থাকে—

কুমোররা কুমোরটুলী, মুচিরা মুচি-পাড়ায়, নাইরা নাইপাড়ায়, আহিররা আহিরীটোলায়, জেলেরা জেলে-টোলায়, পটুয়ারা পটুয়াটোলায় কাঁসারীরা কাঁসারীপাড়ায়, তাঁতীরা তাঁতী বাগানে, নাথরা নাথবাগানে, কসাইরা কসাইটোলায়, কম্বলীরা কম্বলীটোলায়, আর্মানীরা আর্মানিটোলায়, আবার প্রত্যেকটি মহল্লায় একটি করে বাজার বসিয়েছে ওরা।

শ্যামবাজার, বাগবাজার, শোভা-বাজার, নতুনবাজার, বড়বাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লসবাজার বেগবাজার, বৌবাজার, ঘাসতলাবাজার।

কাউকেই বাজার-সওদা করতে খুব বেশীদূরে যেতে হয় না।

চরণ আলির ঘ্যানর-ঘ্যানর বেশী-ক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে না, কেটে পড়বার মতলবে বলে, 'তুমি তো বড়-মিঞা লাটসাহেবের কানের কাছেই থাকো, তোল না কথাটা তাঁর কানে? এ শহরটাকে সত্যিই একেবারে নতুন করে ভেঙে সাজানো দরকার? আমায় আর এক জায়গা যেতে হবে, এই গলিটা দিয়ে সোজা হবে, সেলাম।'

খানাঘরে ঢুকে রেনো অবাক হলেন না রৌশনকে দেখে, অবাক হলেন তার সঙ্গে আর একটি তরুণীকে দেখে। তাঁর তীক্ষদৃষ্টি একপলকেই বলে দিল এটি রৌশনের সহোদরা হবে। পাঁচ বছর আগেকার রৌশন যেন আবার মূর্তি ধরে এসেছে, তবে চোখের ভাব আরো সুন্দর, চিবুকের ভাঁজটি আরো গভীর, চুলের ভার আরো একটু বেশী, এই পাঁচ বছরে রৌশনের দেহ একটু সুডৌল হয়েছে, এ মেয়েটি তন্বী।

রেনো এগিয়ে গিয়ে স্বাগত জানালেন, 'বন্‌জুর মাদামোয়াজেল।'

রাবেয়া প্রতি-সম্ভাষণ করলো না, হাতও বাড়িয়ে দিল না। রেনো বুঝতে পারলেন ও ফরাসী ভাষা জানে না, বিদেশীর সঙ্গে সৌজন্য প্রকাশের রীতিতেও অনভ্যস্ত। তিনি নিজেই রাবেয়ার ডান হাতখানি তুলে নিয়ে নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করলেন। তারপর সেই ওষ্ঠাধর রৌশনের গালে স্পর্শ করে ফরাসীতেই প্রশ্ন করলেন সহাস্যে, 'ঐ চাঁদটি কোন গগনে এতদিন মেঘাবৃত ছিল? এবং এ চাঁদটিও কাল রাতে কোথায় অস্তমিত হয়েছিল?'

রাবেয়া ত্রস্তে তার হাত টেনে নিয়েছিলো, এখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো এই ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যে। বিদেশী জাতের সম্বন্ধে তার ধারণা ওরা পাজী বেইমান চরিত্রহীন। তার সহোদরা তাদেরই একজনের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ হতে পারে? ছিঃ।

'যাও যাও বোস গিয়ে, জুলিও। বিদেশী জাতের সঙ্গে ও কখনো মেশেনি আগে, বিব্রত বোধ করছে এস পরিচয় করিয়ে দেই।'

'রাবেয়া, ইনি মঁসিয়ে রেনো, এখানকার গভর্নর, ওঁরই সরকারি কুঠি এটা।' আর 'জুলিও, এ আমার ভগিনী রাবেয়া।'

রেনো সম্বোধন করলেন, 'মেরামালে-কম মাদামোয়াজেল, তোমার শুভাগমনে বিশেষ সন্তোষ লাভ করলাম।'

বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে [illegible] কেন, এদেশের সকল লোকেরই ধারণা তার বয়. [illegible] [illegible] [illegible] ওমরাহদের হারেমেই ব্যভিচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার স্রোত অবাধে প্রবহ-মাণ ছিল, এরা সেই বিষ পরিবেশ

করছে প্রকারভেদের কারকের যথাযথ ও নিখু-ত্তরে। স্বদেশীয় শিল্পশিল্পীদের অভাবে যে শূন্য তার মেটাচ্ছে প্রবাসশিল্পীদের আশ্চর্যে।

প্রয়োজনের তাগিদে আয়োজন মনুষ্যজীবনের চিরাচরিত ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটি এক্ষেত্রে এমন বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে লজ্জা ও কলঙ্কের সীমা লুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কি কোনো কোনো স্থলে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি কেন, পাঁচ-সাতটি প্রবাসশিল্পী বিবি-জানের মালিক গঙ্গার গঙ্গায় ছড়িয়ে আছে চন্দননগর, শ্রীরামপুর, হুগলী, ব্যাণ্ডেল, চুঁচড়ো, কাশিমবাজার ও মালদহের ইংলিশ বাজারে।

সাগরপাড়ি দিয়ে যারা এদেশে আসে পয়সা লুঠতে, ফূর্তি লুঠতেও তারা ভালই জানে, বিক্রয়-পণ্যের মত ভোগ্যপণ্য সম্বন্ধে এরা অতিমাত্রায় সচেতন, সেই পণ্যের মূল্য দিতেও মুক্তহস্ত। পঞ্চম'কারের সাধনায় এরা সিদ্ধপুরুষ।

রেনো মোটামুটি বাঙলা বলতে শিখেছেন, কিন্তু লিখতে বা পড়তে পারেন না। রৌশন ফরাসী ভাষা খুব ভাল বলতে পারে, কিন্তু লিখতে বা পড়তে জানে না। রেনো পণ্ডিত ব্যক্তি. প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে তাঁর বিস্তর বই, ফরাসী ইটালিয়ান ও ইংরেজী। তাঁর আপশোষ তাঁর জীবনসঙ্গিনী এই মধু-চক্রের স্বাদে বঞ্চিত। জীবনসঙ্গিনীটি এই লাইব্রেরীর প্রতি ঈর্ষাগ্রস্ত, কারণ সপত্নীর মত এটি তার প্রিয়তমের অনেকটা সময় অধিকার করে থাকে।

প্রাতরাশ পরিবেশন সুরু হলে রৌশন হাসলো রেনোর মুখের দিকে তাকিয়ে। আহা, বেচারাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে কাল। সে হাসির বর্ষণে গভীর ভালবাসার স্নিগ্ধ শীতলতা, সে হাসির মধ্যে উৎসর্গীত হৃদয়ের উৎসারিত উচ্ছ্বাসধারা।

'জুলিও, বাবেয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো মিশর-রাণী ক্লিওপেট্রার প্রতিচ্ছবি। এমনটি কোথাও দেখেছো, কাকেও দেখেছো?

'না রৌশন, তোমাকে বাদ দিলে আর কাউকে নয়।'

'আমি জানতাম কী উত্তর দেবে তুমি।

'হয়তো আমার উত্তরটি বুঝতে পারলে না। ক্লিওপেট্রা যে অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন সেটি কিংবদন্তী, সত্য নয়, কবির কল্পনা। তিনি মিশরের রাণী ছিলেন বটে, কিন্তু মিশরীয়ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন ম্যাসিডনিয়ান গ্রীক, তাঁর বংশের আদিপুরুষ টলেমী ছিলেন আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি, তাঁর রাজধানী আলেকজেণ্ড্রিয়াও ছিল বলতে গেলে গ্রীক নগরী, গ্রীকরা ছিল সংখ্যায় বেশী।'

'যত অদ্ভুত কথা তোমার মুখে।'

'আমার মুখে যা শোনো তা আমার কথা নয় সবটুকু। সত্যমিথ্যা অনেক কিছু কল্পনার রঙে রঙীন হয়েছে কবি ও ঐতিহাসিকদের কলমে। ক্লিওপেট্রা

স্বাভাবিকই অদ্ভুত সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন অসামান্যা বুদ্ধিশালিনী। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বরং তুমিই ক্লিওপেট্রার মত।'

কথা হচ্ছিল ফরাসীতে। কিন্তু রাবেয়া অনুমান করছে ঠিকই, তার সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু ক্লিওপেট্রা কে?

'না, রৌশন, তোমার ভালবাসায় অন্ধ হলেও আমি বাড়িয়ে বলছি না তোমাকে। ক্লিওপেট্রার ছিলো অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞান। রোম-সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতিপত্তির সহায়তা না পেলে তার ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। তাই জুলিয়াস সীজার ও মার্ক অ্যান্টনীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলবার তার প্রয়োজন ছিল। অপূর্ব বুদ্ধি, অপূর্ব কণ্ঠস্বর, অপূর্ব বিলাস-ব্যসনের মোহে ধরা দিয়েছিল এই দুই বীরশ্রেষ্ঠ, রূপের জন্য নয়। রূপসীর অভাব ছিল না সীজারের।

'আমার মধ্যে ওর কিছু দেখেছিলে বলেই কি ধরা দিয়েছিলে মঁশিয়ে গভর্নর? আমি তো এসেছিলাম ভিখারীর মত, নিঃস্ব ঐশ্বর্যের প্রলোভন ছিল না, সুতরাং সেটাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে নিশ্চয়ই?

'ঠাট্টা রাখো রৌশন। ক্লিওপেট্রা ছিলেন দুঃসাহসিকা, আমি সেটা পছন্দ করি না মনে রেখো। এ কী রাবেয়া এ মাংসটা তুমি নিলে না কেন? ভারী সুন্দর হয়েছে খেতে?'

সত্যিই রাবেয়া মাংস ছোঁয়নি। চেহারা দেখে খটকা লেগেছিলো। মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদে অথবা কাজী সাহেবের গৃহে ত্রিবেণীতে এ মাংসটা দেখেনি, বোধহয় মুসলমানরা খায় না।

'শুয়োর মাংস হারাম জুলিও,' বললো রৌশন।

'জানি, কিন্তু তুমিও মুসলমান, তুমি তো খাও?

'আমি আধা-মুসলমান, আধা-খৃস্টান, তোমার মত ম্লেচ্ছের হাতে পড়ে আমার কী আর ধর্ম আছে?'

'তাহলে স্বর্গে যাবার পথে তোমাকে পা ফস্কে পড়ে যেতে হবে।'

'স্বর্গে আমি যেতে চাই না জুলিও তোমাকে ফেলে, তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আমি যাবো।'

এটা ঠাট্টা নয়, জুলিও রেনো জানেন, অন্তরের কথা। জীবনে মরণে রৌশনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি সইতে পারবেন না তিনিও। রৌশনও কী তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? দেশ ধর্মজাতের ব্যবধান মানুষের তৈরী, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের দেওয়া-নেওয়ার অমৃতলোকে সকল বৈষম্য ও ব্যবধানের নিঃশেষ। কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন, 'রাবেয়া কী ভালবাসে বলে দিও ভাতানেসকে। ফরাসী খানা যদি ওর পছন্দ না হয় তবে মোগলাই খানার যেন বন্দোবস্ত করে।'

●

রাবেয়া যেন একটি পুতুল। পুতুল নিয়ে খেলা করছে রৌশন। নিজের হাতে দু'বেলা চান করায়, সাজায়, বারে বারে জিজ্ঞাসা করে মুখটি শুকনো দেখাচ্ছে কেন।

রাবেয়া উসখুস করে, 'দুটো আয়া রেখে দিয়েছো দিদিজান আমাকে দেখাশোনা করতে, নিজেও আমি কচি খুকীটি নই, আঠারো ছাড়িয়ে উনিশে পা দিয়েছি।

রৌশন বলে, 'থাম তো? তুই এখনো ছেলেমানুষ, তুই কী জানিস?'

রৌশনের অন্তরের গোপন কোণের গহ্বর ভেদ করে যে উৎসের ধারা বেরিয়ে এসেছে তা রুদ্ধ করবার ক্ষমতা হারিয়েছে ও; রেনো কী ভেবে যেন গম্ভীর হয়ে যান।

রৌশনের মনে হয় শাড়ি পড়লে রাবেয়াকে আরো ভাল দেখাবে, সালোয়ার কামিজ একঘেয়ে হয়ে গেছে। পরের দিন কলকাতায় সুতানুটীর হাট। সিল্ক, মসলিন, মলমল সুতীর হরেক-রকম নক্সা কেনাবেচা হয় ওখানে, চন্দননগরে অত রকমারি নাই। বজরা ঠিক হয়েছে। সঙ্গে যাবে মৈনুদ্দীন, আলমবরদার এবং জাঁদেরা দলের সেরা দুজন লাঠিয়াল।

এই যাওয়াটা রেনোর ত পছন্দ নয়, অন্তত চারজন সেপাই সঙ্গে নিতে বলেন, কিন্তু রৌশন ভাবে দরকার নেই, মৈনুদ্দীন একাই একশ'। নামা হবে হাটখোলার ঘাটে, সন্ধ্যের আগেই চন্দননগরে ফিরে আসতে হবে।

ভোর-ভোর সময়ে লক্ষ্মীগঞ্জের ঘাট থেকে বজরা ছাড়লো।

অবাক হয়ে দেখছে রাবেয়া জানলার ধারে বসে গঙ্গার শান্তশ্রী, আর দুই তীরের ঘনবনানীর স্নিগ্ধ শ্যামলতা। ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, বাবাজানের সঙ্গে কতবার সে বজরায় বেড়িয়েছে বুড়িগঙ্গার বুকে। নবাবজাদা নওয়াজিস খান একমনে কী ভাবতেন আর লিখতেন, মাঝে মাঝে সঙ্গের ইয়ার বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন, তারা বলতো, 'তোফা, তোফা, হুজুর, এমন খাসা উর্দু গজল কেউ লিখতে পারে না।' উর্দু না বুঝতে পারলেও কবিতার ঝঙ্কার রাবেয়ার শিশুমনে দোলা দিয়ে যেত, পিতার মুখের দিকে সে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো।

'ভাইসাহেব সঙ্গে এলেন না কেন? এলে ভাল হোত, দিদিজান।' রেনোকে রাবেয়া এই নামে ডাকে। অষ্টাদশী যুবতী অষ্টাদশ বছরের ছেলের চাইতে অনেক বেশী পরিপক্ব হয়, প্রকৃতির স্বভাবদত্ত প্রেরণায়। এই দু'জনের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্কটি সে অনুমান করতে পারে।

কলকাতায় কোনো বড়সাহেব নিমন্ত্রণ না করলে উনি সেখানে যেতে পারেন না, গভর্নরের একটা পদমর্যাদা আছে তো? তারপরে, ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বাইরে কোন অসদ্ভাব না থাকলেও ভিতরে ভিতরে ভাবের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ঈর্ষা ও ক্ষমতার লড়াই এখনো বুঝবার বয়েস হয়নি তোর। জুলিও মস্ত বড়ঘরের ছেলে, অনেক গুণ আছে ওর যার একটিও অনেকের মধ্যে নেই, তাই তো এত অল্প বয়সেই এ রকম দায়িত্বের ভার

[illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] এই যে ফরাসী কোম্পানীর বড়কর্তারা প্যারিসে বসে এখানকার অবস্থা বঝতে পারছে না, না পাঠায় টাকা, না পাঠায় কামান-বন্দুক। ইংরেজ কোম্পানী ঠিক এর উল্টো। পণ্ডিচেরীতে ফরাসী গভনর জেনারেল মসিয়ে দ্যুপ্লে ক্লাইভকে বেশ হিংসাও করেন।

এসব শুনতে বা জানতে রাবেয়ার কোন আগ্রহ নাই। আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ওটা একটা শহর মনে হচ্ছে না?'

'শ্রীরামপুর, দিনেমারদের। ওরা আগে ভাদরেশ্বরের কাছে থাকতো, সুবিধে হলো না বলে এখানে চলে এলো। ব্যবসায়ে ওদের মন নেই, খৃস্টানধর্ম প্রচারেই ওদের মন। ধর্মের সঙ্গে অর্থের কোনদিনই মিলমিশ হয় না। দিনেমারদের নামে এখনো ভাদরেশ্বরে একটা মহল্লার নাম আছে দিনেমার ডাঙ্গা।'

আবার দেখা দিল ঘন অরণ্য নদীর দুই তীরে। প্রাণী সৃষ্টি করবার আগে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছিলেন বৃক্ষলতা। ধরণীর তপ্ত রুক্ষ বকে ঘনিয়ে এলো নিবিড় শ্যামলতা। পশুপক্ষী আশ্রয় পেলো, খাদ্য পেলো আদিম মানব আরো পেলো তার দুর্বহ জীবনের অনেক কিছু সম্পদ। ধরিত্রীর স্তনরসপুষ্ট বৃক্ষলতা গুল্ম ফুল ফলের মধ্যে সে দেখতে পেলো ভবিষ্যতের হাতছানি, বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত শিকার-জীবিকার পরিবর্তে কৃষি-জীবিকার নিশ্চয়তা। কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষের প্রথম নরদেবতা রামচন্দ্র ঐ শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্রেরই প্রতীক।

সীতার অন্য অর্থ হল রেখা, তিনি রামায়ণ মহাকাব্যের কেন্দ্রস্থল। লক্ষ্মণের উজ্জ্বল মেরুদণ্ড কৃষিসম্পদের প্রতিমূর্তি। জনকের রাজশক্তি ও বিশ্বামিত্রের ক্ষাত্রশক্তি, এই কৃষি সভ্যতার প্রবর্তক ও সহায়। যন্ত্রসভ্যতায় বলদৃপ্ত নিষ্ঠুরমতি রাবণ কৃষিলক্ষ্মী-রূপিণী সীতাকে ধর্ষণ ও বশীভূত করতে চেয়েছিল। শিল্পসম্পদের [illegible] মারীচ [illegible] [illegible] সীতাকে প্রলুব্ধ করতে, কিন্তু রাবণ ও মারীচ দুজনেই হল বিনষ্ট, যন্ত্র ও শিল্পসভ্যতা পরাজিত হল কৃষিসভ্যতার কাছে।

বজরা চলেছে [illegible] ঘাটের কাছ দিয়ে। দূরে দেখা যাচ্ছে গোবিন্দ মিত্রের বিরাট অট্টালিকা এবং তার নবরত্ন মন্দিরের উচ্চ চূড়া। একটা কথা মনে পড়ে রোশনের হাসি পেল ইংরেজদের দৌলতে কেউ কেউ বিস্তর টাকা বা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, ছড়া বানিয়েছে কলকাতার লোক—

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি
জগৎশেঠের কড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি।

বনমালী মিত্রের বিরাট সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরও পেছনে ফেলে বজরা চলেছে, বাঁয়ে অনেক দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে উমিচাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সামনে বহুদূরে ইংরেজদের সেণ্ট অ্যান গীর্জা।

'চন্দননগরের মত পাকাবাড়ি বেশী দেখছি না তো দিদিজান' জিজ্ঞাসা করে রাবেয়া।

'[illegible] [illegible] পাড়া, [illegible]—এলাকাটাকে [illegible] ব্ল্যাক টাউন, [illegible] কালা আদমীদের পাড়া। এ [illegible] ওদের [illegible] হবে। ওরা [illegible] থাকে ঐ গীর্জার কাছ বরাবর। [illegible] তৈরী হয়ে নে, হাটখোলার ঘাট এসে গেল।'

বজরা থামলো, কাঠের সিঁড়ি নামলো। আগে মৈনুদ্দীন, পেছনে জানমহম্মদ, মধ্যে বোরখাপরা রোশন ও রাবেয়া। কেউ জানলো না চন্দননগরের লাটকুঠি থেকে এসেছে এরা। দেখতে পেলো না এদের মুখ। সুতানুটির হাটে আসে সাহেব, মেম, হিন্দু, মুসলমান, আরব, কাফ্রি, আর্মানী, ইহুদী, হাবসী, তুর্কী, ফিরিঙ্গী। হরেকরকম মাল, হরেকরকম খদ্দের, যা কিনলেও দেখতে আসে অনেকে।

বোরখার ভিতর দিয়ে রাবেয়া অবাক হয়ে সব দেখতে লাগলো। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের হারেমে এবং ত্রিবেণীর কাজী সাহেবের বাড়িতে সে এতকাল কাটিয়েছে জনচক্ষুর অন্তরালে, জনতার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় এই প্রথম।

অনেকগুলি শাড়ি ওড়না ও জামার কাপড় কিনে ওরা উঠলো একটি রাউনবেরীতে। সাদা আরবী

ঘোড়া টগবগ করে চলেছে, গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে মৈনুদ্দীন ও জানমহম্মদ। আশেপাশে তাঞ্জাম, পালকী, ফিটন, ব্রাউনবেরী, অনেক সাহেব মেম চলেছে ঘোড়ার পিঠে।

মৈনুদ্দীন কলকাতা শহরটা বেশ ভাল করেই চেনে। যাতায়াত আছে তার। লালদীঘি তার কাছেই ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা, কোম্পানীর রাইটারদের ব্যারাক, সেণ্ট অ্যান গীর্জা, হলওয়েল সাহেবের কঠি, পাদ্রি বেলামী সাহেব কঠি, বারুদখানা, কোম্পানীর আস্তাবল, হাসপাতাল দেখিয়ে মৈনুদ্দীন ওদের নিয়ে গেল আর্মানীদের এক হোটেলে। হোটেলটি যে রাস্তায় তার নাম হামাম গল্লি, অনেক হামাম আছে ওখানে চান করবার, আর্মানীরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাত। বান্নাও খুব ভাল। ইংরেজরা সরাইখানাকে বলে হোটেল দেখাদেখি আর্মানীরাও ঐ নাম ধরেছে।

হামামের বন্দোবস্ত চমৎকার। ঠাণ্ডা জল, গরম জল, সুগন্ধি তেল, সাবান, আতরদানে আতর, সুর্মাদানে সুর্মা, কাজলদানে কাজল, গোলাপদানে গোলাপের নির্যাস, ধোপদুরস্ত তোয়ালে, কিছুরই অভাব নেই। অনেক সাহেব মেমও এখানে নাকি চান করতে আসে মাঝে মাঝে।

চানের আরামের পরে গরম গরম পোলাও, মাছের কাবাব, মাংসের বিরিয়ানি, মালাই, তরমুজের সরবৎ, রূপোর তবকে মোড়া পানের খিলি খুব তৃপ্তি করে খাওয়া হল। মৈনুদ্দীন ও জানমহম্মদ এক মুসলমানের সরাইখানা থেকে পেট ভর্তি করে তার আগেই ফিরে এসেছে। একপশলা ঝগড়াও হয়ে গেছে, হিসাবের অঙ্ক ভুল করেছিল সরাইওলা।

৬

বাতাস পড়ে গেছে। পালে হাওয়ার জোর কম। শ্রীরামপুরের আগেই রোদে পড়েছে ভাঁটা। একরাশ মেঘ বাকিটুক দিনের আলো দিল নিভিয়ে। মাঝিদের সঙ্গে মৈনুদ্দীন ও জানমহম্মদও বজরা দাঁড়। দিল্লী নবাবের দুর্বল শাসনে লোকের বেড়েছে অভাব, বেড়েছে চুরি ডাকাতি, গঙ্গার বুকে বোম্বেটের রাহাজানি। মৈনুদ্দীন হাঁক দিল, 'জোরসে দাঁড় মারো মিঞাভাইরা, হেঁইয়ো।'

দুখানা লম্বা ছিপ-নৌকা পাড়ের গা ঘেঁষে যাচ্ছিল। একখানা তারপরে দুখানাই মুখ ঘুরিয়ে তীরবেগে ছুটে এল বজরার দিকে। আরো একখানা ডিঙ্গি দেখা গেল একটু দূরে।

মৈনুদ্দীন ও জানমহম্মদ দাঁড় ফেলে লাঠি হাতে দাঁড়ালো বজরার ছাদের উপর। 'হুঁসিয়ার, মিঞাভাইরা দাঁড় খুলে হাতে নাও, ওরা দুষমন, হটাতে পারলে বড় ইনাম পাবে'-হাঁক দেয় মৈনুদ্দীন।

রোশন ও রাবেয়া জানলা দিয়ে দেখেছিল ওদের। মৈনুদ্দীনের হাঁকে আরো স্পষ্ট হলো ব্যাপারটা। রাবেয়ার মুখ ফ্যাকাসে, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। রোশনের মুখে উদ্বেগের কালো ছায়া নেমেছে, জুলিয়ের কথা না শুনে কী আহাম্মকিই করেছে।

ভারী বজরা চলে হাতীর মত ধীরেসুস্থে, ছিপনৌকা চলে ঘোড়ার মত ছুটে। একটা ছিপ একেবারে কাছে এসে পড়েছে, দুটো লোক লাফ দিল বজরায় উঠতে। রাবেয়া চীৎকার করে অজ্ঞান। ছিপ নৌকার অন্য লোকরা বিকট চিৎকার করে উঠলো উল্লাসে।

গুরুম্-গুরুম্। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আগের দুটো লোকই পড়ে গেল জলের ভিতরে, পা আর পড়লো না তাদের বজরার পাটাতনে।

গুরুম্-গুরুম্। ছিপের একটা লোক কাৎ হয়ে পড়লো, আর একজন দাঁড়িয়েছিল বুক চেপে বসে পড়লো।

গুরুম্-গুরুম্। বাকি লোক নিয়ে দুটো ছিপই চম্পট দিল।

মৈনুদ্দীন তাকিয়ে দেখে আর একটা নৌকা কাছে এসে পড়েছে। সাদা মুখ, হাতে বন্দুক। সে-ডিঙ্গির মাঝি হাঁক দিল, 'মৈনুদ্দীন সর্দার না? আমি কুর্বান শেখ।'

মৈনুদ্দীন সেলাম করলো সাহেবকে, লাঠি রেখে। রোশন জানলা দিয়ে সবই দেখেছে। ডেকে বললো, 'সাহেবকে ভিতরে আসতে দাও।'

সাহেব অভিবাদন করলো, 'গুড ইভিনিং বিবি।'

রোশন গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'বিবি নয়, ম্যাডাম।' রোশন ইংরেজী বলতে পারে, তবে খুব ভাল নয়।

'তোমার সঙ্গিনীটি কি মূর্চ্ছিত?'

'তাই তো মনে হচ্ছে সাহেব?'

'তোমাদের সঙ্গে কোনো পুরুষমানুষ নাই, মানে অভিভাবক?'

'না।'

'বুদ্ধির পরিচয় নয়, স্বীকার করবে আশা করি?'

'না সাহেব, তা অস্বীকার করবো না, কিন্তু প্রত্যেকেরই ভুলচুক হতে পারে। তোমরাই তো বল ভুল হয় না শুধু শয়তানের? তোমার পরিচয়টি দিতে কোনো আপত্তি আছে?'

'লেফটেনেণ্ট রবার্ট সিলভেস্টার'-

'ইংরেজ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

'ফৌজে কাজ কর?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, তোমার এখানে হাতপাখা আছ?'

রোশন দেখিয়ে দিল হাতপাখাটা। লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার তার কাঁধের থলির ভিতর থেকে একটি টিনের বোতল থেকে জল বার করে রুমাল ভিজিয়ে রাবেয়ার কপালে লাগিয়ে পাখার হাওয়া করতে লেগে গেল।

'ভয় পাবারই কথা, ম্যাডাম, তোমার আত্মীয়া?'

'ভগ্নী।'

'চেহারার মিল রয়েছে, আমার দেখেই বোঝা উচিত ছিল।'

লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার হেসে বললো, 'তোমার সাহস আছে খুব, খুব কম স্ত্রীলোকই এ রকম বিপদে নিজেকে ঠিক রাখতে পারতো।

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
—একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫
SBS-2/69

জ্য সরকারের দ্বিতীয় লটারী খেলার উদ্বোধন করছেন পশ্চি
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

চিত্রে সংবাদ ॥

দা শশিভূষণ কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সচিবের হাতে একটি টেপ-রেকর্ডার
উপহার দিচ্ছেন বৃটেনের পক্ষ থেকে জর্জ ই বেল

জনস্বাস্থ্য সেবাকার্যে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নয়জন
নার্সকে 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' স্বর্ণপদক পুরস্কার দেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য

বেকারী বিরোধী অভিযান দিবসে মহাকরণের সামনে চাকুরী বা বেকার ভাতার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সমাজবাদী যুবসভায় সভ্যরা

নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি কে আর ভি রাও ও অন্যান্য গুণিজন
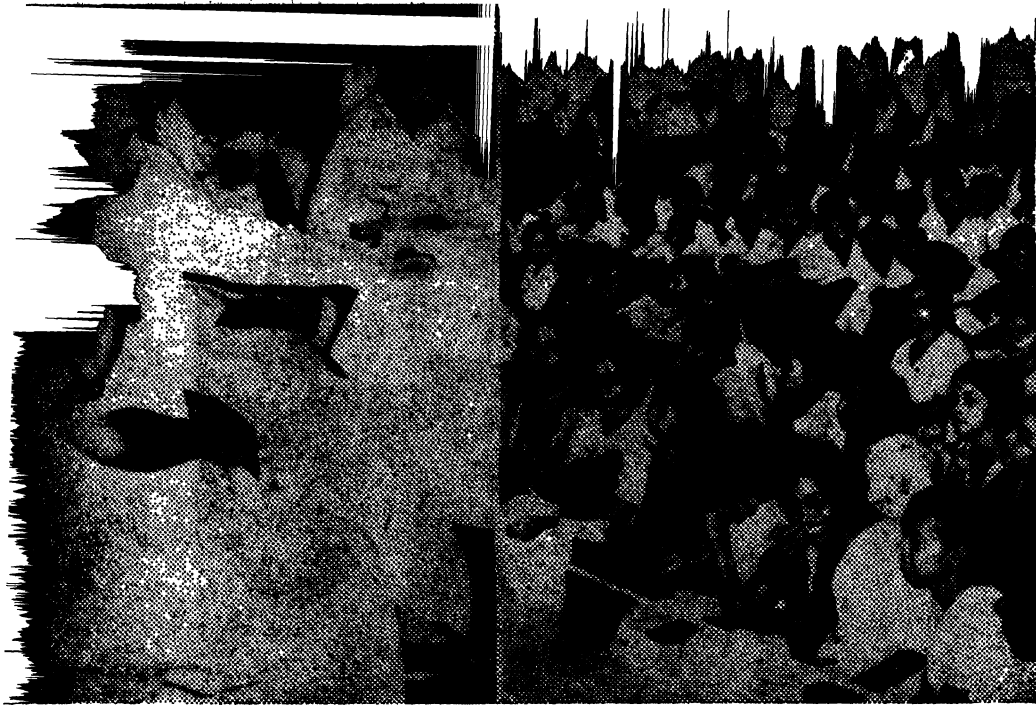
মনুমেণ্ট ময়দানে রাজ্য সরকারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত রয়েছেন সর্বশ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, যতীন চক্রবর্তী, সোমনাথ লাহিড়ী ও ভক্তিভূষণ মণ্ডল

প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীসুধীর দাস রাজ্যপাল শ্রী ডি এন্ সিংহের নিকট শপথ নিচ্ছেন

তোমরা উইকার সেল্প বললে রাজী করবে?'

সিলভেস্টার চোখ ফেরাতে পারে না রাবেয়ার মুখ থেকে। একটি যেন গোলাপ ফুল। এমন রূপ সে দেখেনি, রূপের সঙ্গে এমন শ্রী সে দেখেনি। এর ভগ্নীও চমৎকার সুন্দরী, কিন্তু এ যেন তার চাইতেও বেশী। নিশ্চয়ই কোনো রাজামহারাজার বা আমীর ওমরাহের মেয়ে এরা।

'আমাদের জান ইজ্জৎ বাঁচিয়েছো লেফটেনেণ্ট, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।'

'কর্তব্য করেছি মাত্র, ধন্যবাদের দরকার নেই ম্যাডাম, কোথায় যাচ্ছো জানতে পারি কী?'

'চন্দননগর।'

'সে তো এখনো অনেক দূর? আবার ডাকাতের হাতে পড়তে পারো। ভেবেছিলাম তোমরা শ্রীরামপুর যাচ্ছো। ওখানে এক দিনেমার পাদ্রী আমার বন্ধু, তার ওখানে রাত কাটাতে কী আপত্তি আছে?'

'না, চন্দননগরে ফিরতেই হবে আজ, লেফটেনেণ্ট।'

'তবে আমাকেও সঙ্গে যেতে হচ্ছে ম্যাডাম। আপত্তি আছে?'

রাবেয়া চোখ খুলেছে। চোখ মেলেই দেখে একটি সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ যুবক তার মাথায় হাওয়া দিচ্ছে। লজ্জা পেয়ে সে উঠে বসলো।

'ভাল লাগছে এখন, মিস্—'

'রাবেয়া,' জবাব দিল রোশন। 'খুব ভয় পেয়েছিলে মিস রাবেয়া?'

রাবেয়া স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকালো সাহেবটির মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ছাড়াও বোধ হয় আরো কিছু ছিল, কে জানে?

'বড়ই দুঃসাহস করেছিলে ম্যাডাম—'

'ম্যাডাম রোশন—'

'কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, কিছু মনে করো না।'

'সত্যকথা রূঢ়ই হয়। তুমি যা করেছো তার প্রতিদান নাই, লেফটে-নেণ্ট। রাবেয়া ওকে ধন্যবাদ দিলি না?'

রাবেয়া ভিজে রুমালটি দিয়ে মুখ মুছলো, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোলো না, রুমালটিও ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেল।

সাহেব বের হচ্ছে না দেখে কুর্বান তার ডিঙ্গী নৌকাটি বজরার সঙ্গে বেঁধে মৈনুদ্দীনের সঙ্গে তামাক টানছে।

'সাহেবটি কে, কুর্বান মিঞাভাই? কোত্থেকে ঠিক এ সময়ে এসে হাজির হলো? যেন আল্লাই পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ফৌজী সাহেব, কলকাতার কেল্লায় থাকে, মাছ ধরবার নেশা, জঙ্গলেও বেড়িয়ে বেড়ায় শিকার করতে। আমার বাঁধা খদ্দের। খুব সরেস আদমী। দিলদার আদমী, মোটা বকশিশ দেয়। নেশাফেশার ধার ধারে না, অন্য সাহেবদের মত নয়।'

'শুনেছি ইংরেজরা হারামজাদা জাত?'

'ইংরেজরা বলে ফরাসীরা হারামজাদা জাত।'

'দেখে নিও এই ফরাসীরাই এক-দিন দেশের রাজা হবে।'

'না মৈনুদ্দীন ভাই, আমার মনে হয় ইংরেজরাই হবে রাজা। কালকেও ওদের দুশো গোরা ফৌজ আর চারটে বড় বড় কামান জাহাজ থেকে নেমেছে, নতুন একটা বড়রকমের কেল্লাও নাকি তৈরীর বন্দোবস্ত হচ্ছে।'

খবরটা দিতে হবে রোশন বেগম সাহেবার কাছে, ভাবে মৈনুদ্দীন। কল-কাতার অনেক খবরই দিতে হয় তাকে মোটা বকশিশও পায়। আরো টোপ ছাড়ে সেয়ানা মৈনুদ্দীন, 'কিন্তু ওরা ক'টা লোক, দোস্ত? নবাব একটা ফুঁ দিলেই তো ওরা উড়ে যাবে?'

কুর্বান স্বীকার করে না। 'ইংরেজ-দের হিম্মৎ কিম্মৎ জানো না সর্দার, নবাব তো সরাব আর বিবিদের নিয়েই বেসামাল হয়ে পড়ে থাকে, সুবেদার ফৌজদার ফৌজী সর্দাররা তো বেশীর ভাগই বেইমান শুনেছি। নবাবের সেপাইরা শুনেছি নিয়মমাফিক মাইনে পায় না, আলসে হয়ে গেছে, সার বেঁধে দাঁড়াতে ভুলে গেছে, হাতিয়ার ফেলে ওরা দৌড়তে জানে। ইংরেজের ফৌজ খায়দায় ভালো, কুচকাওয়াজ করে রোজ, চাঁদমারিতে বন্দুক কামানের নিশানা দোরস্ত রাখে।'

মৈনুদ্দীন কোনো মন্তব্য প্রকাশ করলো। না শুধু বললো, 'হুঁ।' [ক্রমশ।

সমুদ্র তলদেশে বসবাস

হাসবেন না, আর হাসা চলবে না। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে সান ক্লেমেণ্ট দ্বীপের সমুদ্রজলে এক-নাগাড়ে বারোদিন সমুদ্রের তলদেশে বাস করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

পাঁচটি দল মিলে এ পরীক্ষা চালাচ্ছে।

পরীক্ষাটির নাম 'সী ল্যাব্—৩'।

এ পরীক্ষা চলবে ৬০০ ফুট জলের নীচে। কানাডার ২ জন এবং অস্ট্রেলিয়ার একজন নাবিক এই পরীক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের সংযোগ থাকবে টেলিফোন সাহায্যে —আর কোনরকমে নয়।

অবশ্য এর আগে 'সী ল্যাব্—১' ও 'সী ল্যাব্—২' নামক পরীক্ষা হয়ে গেছে—প্রথমটি ১৯৩ ফুট জলের নীচে এবং দ্বিতীয়টি ২০৫ ফুট জলের নীচে।

বর্তমান পরীক্ষার অধিনায়ক কম্যাণ্ডার স্কট্ কার্পেণ্টার, ইনি দ্বিতীয় পরীক্ষার সাথেও যুক্ত ছিলেন।

যে আধারের ভেতর এঁরা একনাগাড়ে বারো দিন থাকবেন জলের নীচে, তার আকৃতি ডুবোজাহাজের অভ্যন্তরের ন্যায়। অসংখ্য যন্ত্রপাতিতে ভরা এই আধারে থাকবে রান্নার, ল্যাবরেটরি এবং আটজন লোকের শয়ন ব্যবস্থা।

অবশ্য জলের ওপরে থাকবে একটি জাহাজ—'এল্‌ক্ রিভার'— এখান থেকেই আধারটি ওঠান, নাবান, ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ চলবে।

ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

(শেষাংশ)

কবির মুখে

॥ ১ ॥

লীলারণ শেষে শিবির উধারি' চ'লে যায় সেনাপতি,
লজ্জিতা বালা চাহে বিহ্বল নয়নে :
ফুলধনু হাতে এলো পিছে তা'রি মহাবীর রতিপতি—
শরধনু তার উপহার দেয় চরণে।

॥ ২ ॥

প্রেমিক বলে—'চাই ক্ষমা আজ ,—
চরণ যুগল জড়িয়ে ধ'রে :
'কোথায় ছিলে কাল্‌কে নিলাজ ?'—
কইলো বালা ক.. স্বরে।
কপট যুবক যেই না পালায়—
চক্ষে প্রিয়ার অশ্রু-যে ছায়
বক্ষে বাজে ধিক্কার ও লাজ,—
বাধলো দু'হাত উরোজ 'পরে ॥

॥ ৩ ॥

আম্রবিটপী প্রাঙ্গণ পাশে হ'য়েছে মঞ্জরিত,
ভৃঙ্গবধূরা করে আনাগোনা পরিমল লোভে মাতি ;
বক্ষোনুকূল অংশুকবাসে করিয়া আচ্ছাদিত—
ক্রন্দনাতা আনতলোচনা—আজো সেলে নাই সাথী।

॥ ৪ ॥

'—কান্তা এসো, প্রেমকথা কই,
কান্না ভুলে দেখাও হাসি।
মার্জনা চাই—মান ত্যজো সই,
সত্য তোমায় ভালোই বাসি।'
—হায় দয়িত, তোমার কী ভুল,—
দোষ ক'রেছি অনেক আমি ;
চাও নাকো আর মোর প্রেমফুল,
তাই তো কাঁদি দিবসযামী।'

॥ ৫ ॥

চতুর প্রেমিক লাজুক বালায় দংশে অধর 'পরে ;
'না না নিলাজ, ছাড়ো আমায়'—কইলো সে হ.. নেড়ে।
'তাই হবে'—কয়, ওষ্ঠপুটে অমৃত খায় কেড়ে ;
মূর্খ যতো অমর জাতি' সাগর মথন করে।

॥ ৬ ॥

যুক্তি ক'রে সখার সাথে ভোরে
খণ্ডিতা যায় প্রিয়ের কাছে রুখে ;
ভর্ৎসনা তোর জিহ্বা থেকে ঝরে,
কামনতা ফুটলো চোখেমুখে।
ভাবলো যখন নিজে খানিক পরে,
স্বভাব-সুলভ রূপটি পুনঃ ধরে ;
চিত্ত বিভোল দৃষ্টি বিলোল,
বাক্য হারায় ওষ্ঠাধরে সুখে।

॥ ৭ ॥

বক্ষোযুগলে চন্দন রেখা—সিক্ত সলিলে সন্ধ্যা নাহি ;
অক্ষিপলাশে অঞ্জন লেখা—পুষ্প মালিকা বদ্ধ কেশে ;

চিবুক বাম অঙ্গের মাঝে—তাম্বুল লেখি ; মিষ্টি হেসে—
কান্তা আসিলে গ্রীবার পাশে, মন্মথ কয়—'শর না চাহি।'

॥ ৮ ॥

'কও কথা, সই,—চরণতলে
লোটায় দেখো প্রেমিক তব ;
মৌন এ মান হৃদয় দলে,
শাস্তি যা' দাও—মাথায় ল'বো।'
কান্তা শুনিয়া সোহাগভরে
চাইলো ঈষৎ নয়ন মেলি ;
উষ্ণ জলের ঝর্ণা ঝরে
ম্লান হাসি তায় ক'রছে কেলি।

॥ ৯ ॥

মন্দ মধুর মলয় বায়ের মধু ভোরে ভারি তাড়া
রক্ত রাজীব পরাগ ছড়াবে লীলা নিলয়ের দোরে ;
তন্বী মুখের ঘামটি মুছায়ে, কুন্তলে দিয়ে নাড়া,
মসৃণ বাস আলগোছে চুমি' কেলি অবসাদ হরে।

॥ ১০ ॥

কর্ণে সে পরে নাই পুষ্পের কুণ্ডল,
অশ্রুতে মুছে গেছে চক্ষের কজ্জল ;
ওষ্ঠ-অধরে কোথা তাম্বুল-লাঞ্ছন,
পাণ্ডুর পদে ভোলে লাক্ষার রঞ্জন ;
ক্রুদ্ধ হয়েছে বালা কান্তের 'পর খুব
হৃৎপটে করে তবু অঙ্কন তার' রূপ।

॥ ১১ ॥

অপরাধী প্রিয় আসিতে চাহিলো ঘরে,
বিরহিণী তাকে বারণ না করে,
কহে না পরুষ বাণী ;
সাধারণ জন পশে তার গৃহে যবে,
তেমনি চতুরা দাঁড়ালো নীরবে,
সহজ চাহনি হানি।

॥ ১২ ॥

গভীর নিশীথে নবঘন রব শুনি' বিরহিণী নারী
লোটায় ভূতলে পাগলিনী সম—সখীরা ভয়েতে কাঁদে।
গদগদ ভাষে কয় ক্ষণপরে মুছিয়া নয়ন বারি,
'প্রিয়ের রোদন শুনি যে মেঘের করুণ-মধুর নাদে।'

॥ ১৩ ॥

স্বল্প আলোতে কর-কিশলয় কম্পিত করি বালা
আলুলিত কেশে বেড়ায় কাঁচুলি খুঁজি ;
দীপশিখা দেখে উঠিলো শিহরি'—ছিন্ন কুসুমমালা
ছুঁড়িলো চকিতে প্রদীপ নিবাতে বুঝি।
ঢাকিবে কেমনে পতির নয়ন—ভাবিলো আকুল লাজে,
নূপুর খুলিয়া চলিলো শিয়রে তারি ;
দু'হাতে আঁকড়ি বদনকমল-চুমিয়া আঁখির মাঝে,
বিস্ময়ে হেরে—তস্কর আপনি ঘারী।

॥ ১৪ ॥

বর্ষ কাটিলে ঘুচিলো বিরহ,
দোঁহে দেখা পুনরায় ;
উদ্বেগ গেলে জাগে নব মোহ,
ধরণী নবীন ভায়।
দীর্ঘ দিবস অবসান হ'লে,
শুরুধ নিশায় মিলিলো বিরলে ;
কথা যবে শেষ—চলে তা'রি রেশ,
রজনী পোহায়ে যায়।

॥ ১৫ ॥

লাজুক বধূ সকল বাধা ভুলে'
বরকে ডাকে আদর ক'রে রাতে ;
তাই শিখে' শুক খাঁচায় গলা খুলে'
নতুন বুলি শোনায় মাকে প্রাতে।
ত্বরায় বধূ খাঁচার পানে ছোটে,
দুলের প্রবাল গোঁজে পাখীর ঠোঁটে ;
কইলো হেসে ঘোমটা মাথায় তুলে'—
'ডালিম দানা চায় খেতে মোর হাতে।'

॥ ১৬ ॥

জলদ পটল আকাশ ছেয়ে গর্জে গভীর স্বরে,
কপট যুবক প্রিয়ায় ফেলে' যাবেই দেশান্তরে।
ধরলো না সে স্বামীর বসন, দোর দিলো না ঘরে ;
চরণতলে-ও পড়লো নাকো, কয় না—'দেখো মোরে
বাষ্প জলের অঝোর ধারা সরিৎ রচন করে ;
বিস্ময়ে মূক চতুর পতি হাত দু'টি তা'র ধরে।

॥ ১৭ ॥

দুই তরুণী মুচ্‌কি হেসে
গল্প করে সাঁঝের বেলায় ;
এক জনারি কান্ত এসে
ইঙ্গিতে তায় আদর জানায়।
'চোখ বোজো না'—ব'ললে তা'কে,
ঘাড় বাঁকিয়ে সেই-সে ফাঁকে
ধূর্ত যুবক একনিমেষে
চুমু খেলো যে অপর বালায়॥

॥ ১৮ ॥

গলায় রয়েছে কেয়ূরের দাগ, অলক্তলেখা ভালে ;
তন্দ্রালু চোখে তাম্বুল রাগ, অঞ্জনরেখা গালে।
এই বেশে প্রিয় ফিরিলো প্রভাতে,
প্রেয়সীকে ধরে দৃঢ় ডান হাতে ;
লোল উরসিজ—
যেন সরসিজ—
কম্পিত বাহু মৃণালে।
কহিলো নিলাজ—''শুভদিন আজ, অর্ঘ্য পা'ইনু সকা[ল]

॥ ১৯ ॥

'কান্ত তোমার চরণতলে,
বিরূপ তুমি আজকে ভারি!
পাদ্য জোগায় নয়ন জলে,
অধর স্পর্শ অর্ঘ্য তারি।
বর দেবে না ভক্তজনে?
মান ক'রে সই, রও কেমনে!'
সখীর কথায় আঁখির পাতায়
থমকে দাঁড়ায় বাষ্পবারি॥

॥ ২০ ॥

ক্রন্দনরতা কয় বঙ্কিম হাসি' :—
'সাধ ক'রে কেবা হয় মন্মথ-দাসী!
মৌক্তিক-রচা হার, কজ্জল তুলী,
পদ্মের দল আর সিক্ত কাঁচুলি,
চন্দন, হিমালয়, জ্যোৎস্নার রাশি
ইন্ধন হ'লো যার তায় কিসে নাশি।'"

॥ ২১ ॥

কদলী যুগল রোপে পেলব জঘনে,
মাঝখানে চারুবেদী রচে দুই স্তনে,
লাবণি-বারিতে ভরা শ্রোণির কলসী,
মনসিজে অভিষেক করিবে রূপসী।

॥ ২২ ॥

বাসর ঘরে বধূটি ধীরে টানলো আঁচল কোণে,
লাজুক বধূ মুখ বাড়িয়ে কেবল প্রমাদ গণে।
আলিঙ্গনের দেয় ইসারা চিমটি কেটে পায়ে,
তরুণ চেলী মায়ের' বালা তাকায় ডাইনে বাঁয়ে।
ফুটলো গালে রক্ত আভ, শাসায় ভুরুর ভাষে,
প্রগলভ বর বন্ধুজনে তাই দেখিয়ে হাসে॥

॥ ২৩ ॥

গুপ্ত কেলির চিহ্ন ধরে শয্যাবরণ বস্ত্রখানি :—
কস্তুর রেণু, আলতার দাগ,
কর্পূর চূর, তাম্বুল রাগ;
বিচ্যুত কেশ, শীর্ণ কুসুম,
আস্তর বুকে ঊর্মির ধূম;
সন্ধানী কয় হাস্য ক'রে—'নর্মরীতির মর্ম জানি।'

॥ ২৪ ॥

গৃহশুক কয়—'পেট ভ'রে আজ পাওনা আমার খাওয়া,
নইলে তোমার গোপনীয় কথা বলিব অরবনে।'
নবীন বধূর লাজে নীরবতা—বুক দুরু দুরু করে,—
পদ্মিনীকে কাঁপায় বিনায় পাগলা দখিন হাওয়া।

॥ ২৫ ॥

যৌবন শেষে রূপবতী নারী
ভাবে নিজ ভুল নববধূরূপে :—
'কান্ত যবে চুম্বন মাগে
বঙ্কিম করি আমজলি মুখে;
অনুনয় করি ক'রতে গোপন,
বক্ষ ঢাকা'নু অঞ্জলি ভরে;
মৌন রহিনু সঙ্কোচে ভারি,
যখন শোনাতো স্তুতি চুপেচুপে।'

॥ ২৬ ॥

মধুর পাত্রে শিশির রাত্রে
পশিলো চাঁদের কায়া;
পিইয়া রঙ্গে সুরার সঙ্গে
হাসিলো মানিনী জায়া।
মুহূর্তে হ'লো যে রোষের অন্ত,
মন্মথ সাথে এলো বসন্ত;
অন্তরে পশি' পূর্ণিমা শশী
নাশে বুঝি মান-ছায়া॥

॥ ২৭ ॥

তন্বী কিশোরী প্রণয়ে মজিয়া বিরহের দুখে জ্বলে,
অশ্রুর ধারা গুরুজন ভয়ে রোধিলো নয়ন-দ্বারে;
অন্তর মাঝে মন্মথ শিখা বাষ্প করিলো জলে
তাইতো কেবলি তারি ধোঁয়ামাখা সুরভি নিশাস ছাড়ে।

॥ ২৮ ॥

ফুৎকার দিয়ে মদিরনয়না চেলীর আঁচল ওষ্ঠে মোছে,
পুষ্পপরাগ সম কুঙ্কুম কুচকলসের প্রান্তে ঝরে;
অঞ্চল চুমি' হেমন্ত বায়ু হিমানীর জাল তূর্ণ রচে;
লুব্ধ ভ্রমর ধাইলে রভসে—তাড়ায় কেমনে কুন্ত করে।

॥ ২৯ ॥

প্রিয়কে হেরিবে দূরে দূরে থাকি'
বসিতে দেয় না একাসন মাঝে;
জড়ায়ে ধরিতে ফাঁক পাবে নাকি?
প্রদীপের কাছে ব'সে পান সাজে।
পরিজন ঘরে আছে এই ছলে
দয়িতের সাথে কথা-ও না বলে;
ব্যাকুল তরুণ রোগে হয় খুন,
তীর অবহেলা বুকে তা'র বাজে।

॥ ৩০ ॥

শতেক যোজন ব্যবধানে রয় বিরহীর প্রাণপ্রিয়া,
সরিৎ তরু বনানী ও গ্রাম দৃষ্টি ব্যাহত করে;
তবু সে-অবুঝ উদ্গ্রীব হ'য়ে পদাগ্রে ভর দিয়া
বারবার চায় দূর দিশপানে অশ্রুতে আঁখি ভ'রে।

॥ ৩১ ॥

বিরহবিধুরা বধূর দয়িত
গভীর নিশীথে ফিরিলো ঘরে;
পরিজন যতো জিজ্ঞাসে তার
প্রবাসের কথা প্রহর ধ'রে।
অঙ্গের বাস করি আকুঞ্চিত,
'কী জানি হঠাৎ দংশিলো মোরে—'

বিয়ে আমার হ'ল দূরে।

॥ ৩২ ॥

দংশিলো অধরে তাঁর অপর নায়িকা,
নিক্ষেপ করিলো রোষে কমল কলিকা;
আরক্ত নয়নে মুগ্ধা এলো প্রিয়া পাশে।
মার্জনা না চেয়ে তাকে চুমে বারেবার;
মুগ্ধা বিরহিণী ভাবে দোষ বুঝি তার;
আঁখিতে ফুৎকার দিলো—শঠ মৃদু হাসে॥

॥ ৩৩ ॥

তন্দ্রাকাতর বরটি যখন
শয়ন পরে পড়লো ঢুলে,
ছোট কনের সব সখীজন
পালায় হাসির লহর তুলে'।
লজ্জাবতীর হর্ষ অপার
মুখটি রাখে বরের বুকে;
সুষুপ্তিতে মগ্ন যুবার
পুলক জাগে পরশ সুখে।
ঘুমটা নেহাৎ কপট তবে,
রাঙলো বালা ঘোর শরমে;
[illegible] হায় করলো ক্রমে॥

॥ ৩৪ ॥

কেহ বলে—'ভালো দিবসের আলো',
কেউ কয়—'না না, চারু শশিলেখা';
তৃতীয়া জানালো 'দোঁহে ঘোর কালো,
পাই না যদি গো দয়িতের দেখা।'

॥ ৩৫ ॥

গুরুজন জানে সবটুক যার,
সুহৃদে যেথায় সহায় চাই;
মুখ বুজে' সয় হীন উপচার,
ভয় কৃপা যার গোড়ায়, ভাই।
লজ্জা যেখানে বাধা বলি গণে,
প্রত্যয় আসে শপথ বচনে,
প্রেম সে তো নয়—শুধু পরিচয়,
নেইকো সেথায় মানের ঠাঁই।

॥ সমাপ্ত ॥

রচনাটির সঙ্গে প্রকাশিত চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন কুমারী বৈজয়ন্তী ভট্টাচার্য।

রুশদেশে ঘোড়দৌড়

না, বাজী খেলে নয়—কেবলমাত্র আনন্দ লাভার্থে এবং ঘোড়া ও সওয়ারের শিক্ষার জন্য। মস্কোতে দৌড়বার মাঠ, তার বয়স ১৩৫ বছর। তিনটি কোর্স আছে— ১,৮০০, ১,৬০০ এবং ১,৫০০ মিটার লম্বা। শেষেরটি শুধু শিক্ষাদানার্থে ব্যবহৃত হয়।

সপ্তাহে তিনদিন দৌড় হয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এবং গাড়ীতে ঘোড়া জুতে দৌড় হয়। বিজেতা পুরস্কার পায়।

এ-মাঠ ব্যবহৃত হয় অলিম্পিক-এর ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ট্রেনিং দিতে। ১৯৬৮ সালে চল্লিশ বছর বয়সে জেনারেল ইভান্ কিজিমভ্ এক অজ্ঞাত ঘোড়ায় চড়ে অক্লেশে হারিয়ে দিলেন সের্গেই ফিলাটভ্‌কে, যিনি ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিক বিজয়ী। অবশ্য, এটা যে হঠাৎ কিছু নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তিন মাস আগে মেক্সিকো অলিম্পিক-এ, যেখানে এই জেনারেল ইভান সবাইকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতলেন॥

মাঠে দশ হাজার দর্শকের ব্যবস্থা আছে এবং দৌড়ের দিনে প্রায়ই ভর্তি থাকে। প্রতি জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে 'ট্রইকা' বা তিন ঘোড়ার গাড়ির রেস খেলা হয়। নগদ টাকা ও সার্টিফিকেট পুরস্কার দেওয়া হয়।

নিকোলাই নাজিমভ্ পাঁচিশ বছর ধরে ঘোড়ায় চড়েছেন, ৬১৬ বার জিতেছেন দৌড়ে, যার মধ্যে ৫৩ বার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। ১৯৬৫, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭—পর পর তিনবার নিকোলাই কলোন্ শহরে অনুষ্ঠিত 'ইউরোপা' পুরস্কার পেয়েছেন।

মেয়েরাও এ-খেলায় যোগদান করে থাকেন। মারিয়া বারলোভা দেশে ছাড়াও ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছেন। ইয়েভ্‌গেনিয়া নিয়োখাবা ভিয়েনা থেকে প্রথম পুরস্কার নিয়ে এসেছেন ১৯৬৭ সালের শরৎকালে।

এই রেস কোর্স-এ ৬০টি ঘোড়া রাখা হয় ঘোড়ায় চড়া শেখাবার জন্য। শিক্ষা লাগে: ঘণ্টায় ৮০ কোপেক মাত্র॥

পুতুল নাচের কাহিনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অসীম। আমি লক্ষ্য করছি শংকর, উর্মিলার নার্ভাস সিস্টেমে ডেফিনিটলি গোলমাল হয়েছে। সব সময়ে কেমন একটা ভূমিকম্পের আভাস। আমার মনে হয় তোমাদের কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও যেতে পারলে ভালো হোত। সেবারে যে শান্তিনিকেতন যাওয়ার প্ল্যান করছিলে।

শংকর। রোগটা শারীরিক নয়। আজকের দিনে পৃথিবীর শতকরা নব্বইটি মানুষ এই মনের রোগে ভুগছে। জায়গা বদল করেও ওকে সারানো যাবে না।

ঝর্ণা। আমার মনে হয় উর্মিলাদির একটা বাইরের কাজকর্ম করা উচিত। বাড়ীতে একা একা সারাক্ষণ থাকতে হলে আমিও পাগল হয়ে যেতাম।

শংকর। আমাদের যদি কেউ বলত সকালবেলা বাজারের থলি, র‍্যাশনের ব্যাগ নিয়ে ছোটাছুটি করতে হবে না, ন'টায় নাকে-মুখে ভাত গুঁজে ট্রাম-বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে অফিস যেতে হবে না—বাড়ীতে আরামে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও—তাহলে আমি তো বেঁচে যেতাম।

ঝর্ণা। দুদিনের জন্যে মশাই। তারপরেই দেখতেন আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাদের গানের স্কুলে সেলাই শেখানোর ক্লাশ খোলার কথা হচ্ছে। আমি উর্মিলাদির নাম নিশ্চয় প্রপোজ করব।

অসীম। আমি উর্মিলার সঙ্গে আলাদা একবার কথা বলতে চাই। এমনও হতে পারে ওর অবচেতন মনে কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সফল হয় নি, হয়তো—

শংকর। সে তো ভালো কথা। আজকেই এখনই ওকে প্রশ্ন করে দেখো। পাড়ার দোকানে হরলিকস পাওয়া যায় কি না তার খোঁজ নিতে বেরোতে হবে। শিবানীর মেয়েটা আবার অসুখে পড়েছে। ঝর্ণা তুমি আমার সঙ্গে চল।

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

ঝর্ণা। (একটু ইতস্তত করে) উর্মিলাদির কাছে আজই এসব কথা তোলা কি ঠিক হবে। ওর মন একটুও ভালো নেই।

শংকর। না, না সুযোগকে কখনো ছাড়তে হয় না। আমরা আধ-ঘণ্টার মধ্যেই তো ঘুরে আসব।

অসীম। ঠিক আছে। দেখি আমার ডাক্তারীতে কিছু ফল পাওয়া যায় কি না।

ঝর্ণা। কিন্তু শংকরদা—

অসীম। উঃ, এতগুলো 'কিন্তু আর 'যদি' নিয়ে মানুষ যে কি করে বেঁচে থাকে তোমাকে না জানলে তা বিশ্বাস হোত না। তুমি হোচ্ছ টিপিকাল বাঙ্গালী মেয়ে।

ঝর্ণা। টিপিকাল বাঙালী বলে পরিচয় দিতে আমার কোন লজ্জা হয় না। বাংলা দেশে জন্মেছি, কাজেই অন্যরকম হব কি করে?

অসীম। স্ট্যাগনেশনই এ দেশের মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। প্রত্যেকে যেন মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

শংকর। দেরি কোর না ঝর্ণা। অসীমের বক্তৃতা তো থামতে জানে না একবার সুরু হলে। ও বোধহয় ঘুমের মধ্যেও কথা বলে।

ঝর্ণা। কথা বলে কিনা জানি না, কিন্তু প্রচণ্ড নাক ডাকায়।

অসীম। মোটেই না। ঝর্ণা স্বপ্নে দেখে যে আমি নাক ডাকাচ্ছি। স্বপ্ন দেখা ব্যাপারটাই একটা বিদঘুটে ব্যারাম আমার মতে।

ঝর্ণা। স্বপ্ন কে না দেখে?

শংকর। ঠিক বলেছ ঝর্ণা, খুব দামী কথা বলেছ। স্বপ্ন দেখি বলেই আমরা তবু এখনও টিকে থাকতে পারছি। অনেক দিন ধরেই মনের মধ্যে প্রশ্নটা উঁকি মারছিলো। আমরা কি নিয়ে বেঁচে আছি। জীবন তো সব দিক থেকেই ফাঁকি দিয়েছে আমাদের।

ঝর্ণা। এ আপনার সঙ্গে মতে মিলছে না শংকরদা। জীবন আমাদের ফাঁকি দেয়, না আমরাই জীবনকে ফাঁকি দিই? একটা আসল প্রশ্ন আর একটা নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা থাক গে যেতে

হয়তো চলুন। (অসীমকে) তুমি উর্মিলাদির সঙ্গে খুব বেশী বাজে বোক না। বরং হালকা কথা-বার্তায় ওকে ভোলাতে চেষ্টা কোর।

(শংকর ও ঝর্ণা বেরিয়ে যাবে)

নাট্যকারের প্রবেশ। অসীম।

অসীম। আমাকে কিছু বলছেন?

নাট্যকার। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ঝর্ণা আর শংকর দুজনে অপূর্ব অভিনয় করছে। যা শিখিয়েছি, একেবারে হুবহু তাই বলে যাচ্ছে. কোনরকম নিজের বুদ্ধি খাটানোর চেষ্টা নেই। উর্মিলার কথা ছেড়েই দিলাম, ওর না হয় মাঝে মাঝে মাথা বিগড়ে যায়। কিন্তু তোমার হাবভাবও আজকে আমার ভালো লাগছে না।

অসীম। কিন্তু আমি তো এখন পর্যন্ত কোন ভুল করিনি। নিজের বউ-এর সঙ্গে ঠাট্টা করছি, শংকরকে সদুপদেশ দিচ্ছি, আর উর্মিলাকে---

নাট্যকার। উর্মিলার প্রতি খুব নর্মাল ব্যবহার তুমি করতে পারছ না। ও যখন এলোমেলো বকছিল, তখন নিজের পার্ট ভুলে তুমি ও-ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে-ছিলে কেন?

অসীম। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম কখন? আমার তো মনে পড়ছে না।

নাট্যকার। সে দৃষ্টির একটামাত্রই মানে হয়। পুতুল নাচের পুতুল হলেও শংকর আর ঝর্ণাকে তুমি অত বোকা পাওনি। ওরা সবই লক্ষ্য করেছে। এর পরে যদি ওদের দৃষ্টিভঙ্গী পালটে যায়, তাহলে আমার এত কষ্ট করে লেখা গল্পটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

অসীম। আপনি সত্যিই তাই মনে করেন।

নাট্যকার। অর্থাৎ তুমি তা মনে কর না। কিন্তু আমি কোন-রকম বেচাল কাজ তোমাদের করতে দেব না। তোমরা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কি করে, সব সুতো আমার হাতের মুঠোয়। তুমি এখন উর্মিলাকে কি বলবে মনে আছে তো।

অসীম। (মুখ নীচু করে) আছে।

নাট্যকার। একটু রোমাণ্টিক হতে পার। অতীতের মধুর স্মৃতি নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করার অধিকার তোমাদের দিয়েছি। কিন্তু খবরদার, আর এগিও না।

অসীম। শুধু অতীতকে নিয়ে মানুষ তার গোটা জীবনটা কাটাতে পারে কখনও?

নাট্যকার। মানুষ সব পারে। বিশেষ করে দুঃখকে বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ানোর ক্ষমতা তার অসীম। সেখানে সে বোধহয় তার কল্পনায় তৈরী ঈশ্বরের চেয়েও অনেক বড়।

অসীম। আপনি কিন্তু নিজেকে কণ্ট্রাডিক্ট করছেন। আপনিই এর আগে আমাদের শিখিয়েছেন মানুষ তার স্বাধীনতাকে ক্রমশ বিক্রি করে ফেলেছে—যা খুশী সে তাই করতে পারে না।

নাট্যকার। দুটোই সমান সত্যি—তুমি বুঝতে চাইছ না বলেই তোমার দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে আছে। মানুষ নিশ্চয় তার অদৃষ্টের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে—যা খুশী তা সে করতে পারে না। কিন্তু সে যে শক্তিহীন, সে কথা আমি একবারও বলিনি। এই যে অবর্ণনীয় চাওয়া আর না-পাওয়ার চিরন্তন ট্র্যাজেডি তোমরা সহ্য করছ—এর কি তুলনা আছে।

অসীম। কিন্তু কেন? কেন আমরা অকারণে এ ট্র্যাজেডিকে সহ্য করব? এ প্রশ্নের জবাব আজকে আপনাকে দিতেই হবে।

নাট্যকার। জবাব দেওয়া না-দেওয়াটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত অধিকার। প্রশ্ন তোমরা অনায়াসে করতে পারো। প্রশ্নের তীক্ষ্ণ হুল বুকের মধ্যে যত বিঁধবে, ততই তো দুঃখের আর হতাশার তীব্রতা আরও প্রখর হয়ে উঠবে। শংকর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রশ্ন করে চলেছে, উর্মিলা সরব হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে—তোমার মনেও সেই একই জিজ্ঞাসা—কেন? কেন? কেন? (হেসে উঠবে) প্রশ্নের গোলকধাঁধায় ঘুরেই মরতে হবে চিরকাল—বাইরে বেরোনোর দরোজা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অসীম। যদি আমাদের মধ্যে কেউ কখনও উত্তরটা পেয়ে যায়।

নাট্যকার। 'যদি' শব্দটা মানুষ আকাশ-কুসুম কল্পনা করার সময় ব্যবহার করে। সেটা নিছক বিলাস। আমি কাজের মানুষ। যা বললাম মনে থাকে যেন। উর্মিলা এখন পরস্ত্রী, মাঝখানের দূরত্ব পার হবার চেষ্টা কোর না। ঐ তো সে আসছে এখানে। (চলে যাবে)

উর্মিলা। এ কি—ঝর্ণারা কোথায়?

অসীম। শংকর পাড়ার দোকানে হরলিকস কিনতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

উর্মিলা। চা আনতে বারণ করে দিই তাহলে। তোমাকে কি আগেই দেব?

অসীম। না, না, একবারেই হবে এখন।

উর্মিলা। (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) বসন্ত—আর কিছুক্ষণ বাদে চা ভিজিও। বাবু বেরিয়েছেন।

অসীম। উর্মিলা, একটু স্থির হয়ে বসবে? তোমার সঙ্গে কথা আছে।

উর্মিলা। (বসবে) তোমাদের আজ হোল কি? যত রাজ্যের কথা আজ সন্ধ্যাবেলার জন্যেই জমিয়ে রেখেছ।

অসীম। আমি ছাড়া আর কে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে?

উর্মিলা। কেন, তোমার বন্ধু। খুব গম্ভীর চালে আমাকে ডেকে বলল (শংকরের গলা নকল করে) আচ্ছা উর্মিলা, আমাদের জীবন এ রকম হয়ে গেল কেন?

অসীম। তুমি তার উত্তরে কি বলল?

উর্মিলা। আমি কিছু না বোঝার ভাণ করলাম। তার কারণ উত্তর আমার জানা নেই। প্রশ্নটা কি আমিও করি না? দিনে রাত্রিতে কতবার ছুঁচের মত বুকের মধ্যে সেই একই প্রশ্ন বিঁধতে থাকে। কেন—কেন—জীবন অন্য রকম হলো না।

অসীম। উর্মিলা, তুমি কি ভাগ্যে বিশ্বাস কর?

উর্মিলা। জানো অসীম, আমার এক এক সময়ে মনে হয় বিশ্বাস শব্দটাই আগাগোড়া একটা বানানো মিথ্যা। আসলে কোনো কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস নেই। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সত্যি মিথ্যা, ভালো মন্দ এমন কি—এমন কি নিজেকেও আর আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

অসীম। আমার অনেকবার সন্দেহ হোত শংকরকে বিয়ে করে তুমি সুখী হতে পারনি। এখন দেখছি সে সন্দেহ নেহাত অমূলক নয়।

উর্মিলা। আমি সেদিন তোমাকে ঠকিয়েছিলাম। তুমি বোধহয় ভাবছ শংকরকে বিয়ে না করে যদি তোমাকে—

অসীম। না, না—ও রকম কোন কথা আমি বলতে চাইনি।

উর্মিলা। বলতে চাওনি, তার কারণ সঙ্কোচ, সংস্কার আর-আর হয়তো বা বন্ধুবৎসলতা। কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় তাই ভাব।

অসীম। উর্মিলা, তোমার নিশ্চয় শরীর ভালো নেই। আমি শংকরকে সেই কথাই বলছিলাম। ক'দিন যদি ছুটি নিয়ে চেঞ্জে কোথাও ঘুরে আসে—

উর্মিলা। চেঞ্জ। বদল। জীবনকে বদলানোর ক্ষমতা তোমাদের আছে? পারবে তুমি আমাকে এই জেলখানার বাইরে নিয়ে যেতে (অসীম ভয়ে ভয়ে বাঁ ধারের উইংসের দিকে তাকাবে। নাট্যকারের মুখটা একবার ভেসে উঠবে) পারবে না—পারবে না। ভয় নেই অসীম—পুরোন দিনের কথা তুলে সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠবে না। তুমি আমি কেউই এই সূতোয় বাঁধা অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। কাজেই অনুতাপ করাও বোকামী।

অসীম। সেন্টিমেন্ট কি তোমার একটুও বাকি নেই উর্মিলা।

উর্মিলা। উঃ। আবার কবিত্ব। তুমি কি মনে কর আমি সেদিনকার সেই সব ছেলেমানুষী মনে করে রেখেছি? তুমিই যদি সেদিন আমার জীবনে আসতে—তাহলে, তাহলেও কি আমার এই অবস্থায় পরিবর্তন ঘটত?

অসীম। (নীচু গলায়) আমিও তো নিজেকে সেই প্রশ্নই করি উর্মিলা। প্রশ্ন করাটাই আমাদের একমাত্র বিলাস—উত্তর কখনো পাব না জেনেও।

উর্মিলা। উত্তর পাব না? কোনদিনও না?

অসীম। না।

উর্মিলা। (হাসতে হাসতে) তাহলে তো সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। যেমন আছি, ঠিক তেমনই থাকব। অতএব মন-ভোলানো কতগুলো কথার অবতারণা করে কি লাভ? তার চেয়ে রোজকার জীবনে যা ঘটছে, তাই নিয়েই এসো আমরা আজকের সংলাপ তৈরী করি।

অসীম। রোজকার ডাল-ভাত খাওয়া জীবনে যা ঘটে, তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি।

আমাকে বল উর্মিলা, তোমার কি দুঃখ ?

উর্মিলা। দুঃখ ? অনেক ভেবে দেখেছি অসীম, আমার জীবনে কোথাও কোন দুঃখ নেই। দুঃখ যদি থাকতো, তবেই সুখের অনুপস্থিতির কথা টের পেতাম। সুখ নয় দুঃখ নয়, এ দুই-এর মাঝামাঝি- একটা অবস্থা আমাদের —তাই না ?

অসীম। এ রকম নৈরাশ্যজনক জীবন-দর্শন যদি মানতে হয়, তাহলে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি ?

উর্মিলা। আবার প্রশ্ন—যার কোন উত্তর নেই। দরজায় মাথা কুটে মরাই বোধহয় আমাদের ভাগ্য। কিন্তু আমার সম্পর্কে আজ নতুন করে এত কৌতূহল কেন ?

অসীম। তুমি ঝর্ণাদের স্কুলে সেলাই শেখাবে ? বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

উর্মিলা। কি ভুলে থাকব অসীম ? তাও তো আমি জানি না। (হাসতে হাসতে) বুক ছারখার করে দেওয়া একটা স্মৃতিও যদি থাকতো, যাকে নিয়ে সব কিছু ভুলে থাকতে পারতাম।

অসীম। (দুঃখিত গলায়) স্মৃতি কি একটুও নেই ?

উর্মিলা। তোমাকে কঠিন জবাব দিতে আমার কষ্ট হয় অসীম, কিন্তু মিথ্যা উত্তর তো দিতে পারব না। আমাদের সেদিনকার সেই ছেলেখেলার কথা ভাবতে আজ হাসি পায়।

অসীম। (নীচু গলায়) আমার ভালবাসা সেদিন কিন্তু মিথ্যা ছিল না। তুমি জানো উর্মিলা, আমার এখনও—

নাট্যকার। (হঠাৎ ঢুকে) হোপলেস। আজ আগাগোড়াই তোমরা প্রত্যেকে ভুল বকছ। আমার গল্পটাই দিলে মাটি করে। সবচেয়ে দোষ উর্মিলার। গল্পটা আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে এবং সেখানে আমি উর্মিলার পার্ট ছেঁটে কেটে অনেক সংক্ষিপ্ত করে দেব। আর কোন ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত নই। শুনে রাখো আমার প্ল্যান।

অসীম। কিন্তু স্যার আমাদের এই সিনটা অন্তত শেষ করতে দিন। মাঝপথে বেখাপ্পা বন্ধ হয় গেলে এঁরা কি মনে করবেন।

উর্মিলা। দরকার নেই অসীম। উনি যা বলছেন, তাই হোক। এ দৃশ্য শেষ হলেও দর্শকদের লাভ কতটুকু ? আমরা কি একপাও এগোতে পারব ? ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানেই থাকতে হবে। ঝর্ণারা ফিরে আসার আগে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে কিছুক্ষণ কাব্য করতে হয়তো। তারপর আবার মামুলী চলে ফিরে যাওয়া। তার চেয়ে ড্রপসিন পড়ে যাওয়াই ভালো।

অসীম। আপনারও কি তাই মত। (ঝর্ণা আর শংকর ফিরে আসবে। হাতে হরলিকস-এর শিশি, ঠোঙ্গায় ফল) এই তো তোমরাও এসে গেছ।

শংকর। কি হয়েছে ?

নাট্যকার। তোমাদের অভিনয় আজ একদম কিছু হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েই মাঝপথে বন্ধ করে দিলাম। (হাতের সূতো খুলে ফেলতে ফেলতে) গল্পটা আমাকে আবার নতুন করে তৈরী করতে হবে। তোমাদের বেশী স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছিলাম—

উর্মিলা। আমাদের বেশী স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছিলেন। (হাসতে হাসতে) কথাটা কি মজার, তাই না ?

নাট্যকার। হাসির কথা নয়। আমাকে আরও অনেক—হতে হবে। সাজানো গোছানো নিরুদ্বেগ একটা ফর্মূলা তৈরী করতে হবে, যেখানে বাঁধা রাস্তা ছেড়ে একপাও আমি-ভিন্ন কাউকে নড়তে দেবো না।

উর্মিলা। যদি আমরা আপনাকে না মানি।

নাট্যকার। না মেনে উপায় নেই উর্মিলা। তোমাদের চেয়ে আমি অনেক—অনেক বেশী শক্তিমান। মানুষের সভ্যতা যত জটিলতর হয়ে উঠছে, আমার ক্ষমতাও সে অনুপাতে ক্রমশ বাড়ছে। শংকর তুমি উর্মিলাকে ভালো করে বুঝিয়ে বোল ভবিষ্যতে এ জাতীয় ছেলেখেলা সে যেন না করে। (দর্শকদের প্রতি) আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন, আজকে আপনাদের আনন্দ দিতে পারলাম না, দুঃখ তো নয়ই। অথচ ট্র্যাজেডি কমেডি মেশানো সুখ-দুঃখের সাদা-কালোয় সূতোয় বোনা একটা আস্ত জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। (একটু থেমে) কিন্তু পারলাম না। দোষ আমার নয়। দিনের পর দিন বিশ্রাম ভুলে পাখিপড়া করে যা শিখিয়েছি, এদের মাথায় কিছুই ঢোকেনি মনে হচ্ছে। আপনারা যদি দয়া করে আর একদিন আসেন। (অভিনেতাদের প্রতি) তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিশৃঙ্খল ব্যবহারের ফলে আমায় আজ এতগুলো লোকের সামনে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হোল।

ঝর্ণা। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

নাট্যকার। আর বুঝে কাজও নেই। কি হচ্ছে—ড্রপসিন ফেলছ না কেন।

(আস্তে আস্তে পর্দা নামবে)

[ক্রমশঃ

নবরত্নের ভূগোল ও বিজ্ঞান পরিচয়

শ্রীশুকদেব গোস্বামী

কল্পনার রঙ্গীন পাখা মেলে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন রাজপুত্র দিক থেকে দিগন্তরে ও বন থেকে বনান্তরে। কত নগর থেকে রাজধানী, দেশ থেকে দেশান্তরে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটেই চলেছে অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তবে কি রাজপুত্র চলেছেন আবিষ্কারের নেশায়, রত্নের সন্ধানে? না কি তাঁর সুযোগ্যা অপরিচিতা কন্যাকুমারিকার প্রেমরত্ন উপহারের সন্ধানেই ক্লান্তিহীন দুর্বার এ পরিশ্রম?

কোন রাজপুত্রই রত্ন আবিষ্কার করেন নি—করেন নি কোন নৃপতি। নারীরত্নের সন্ধানে সন্ধানী দৃষ্টি নারী আবিষ্কারের মধ্যেই মাতাল রক্তিম হয়ে উঠতো। জীবন্ত রত্ন হিসেবেই উপভোগের পালাবদল চলতো। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরেও চলতো। আর এ ঘোর কলিতে নাকি তা রসময়ভাবেই চলবে স্বাভাবিক গতিতে, মানব জীবনবোধের সার্থকতা নিয়ে। জীবন্ত রত্নদের উপকরণের প্রসাধন হিসেবেই কি এই রত্নের আবিষ্কার? মৃতরত্ন তা'হলে প্রজাকুলের আবিষ্কার নিশ্চয়।

প্রজাকুলের পরিতুষ্ট করতেই হবে রাজন্যকুলদের। চাই নারী ও রত্ন। নৃপতি ঈশ্বরের প্রতিভূ। যেমন করেই হোক পরিতুষ্ট করতে পারলেই স্বর্গলোকের মোক্ষদ্বার আপনা থেকেই উন্মোচিত হবেই হবে। এমন কি নিজের স্ত্রীরত্ন আর কন্যারত্নই হোক, আপত্তি নেই।

গুরু শিষ্যকে সন্তুষ্ট করেছেন সেবা-যত্নে-শুশ্রূষায়। গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য জ্ঞানী হলেন। গুরু সন্তুষ্ট হ'লেই ত' চলবে না। গুরু-পত্নীর আদেশে নাগলোক থেকে নাগমণি আনা চাই—তবে ত' পূর্ণাঙ্গ হবে শিষ্যের জ্ঞান। নিশ্চিত মৃত্যু। গুরু-পত্নীর আদেশ পালন করতেই হবে। বাৎসল্যবিহীনা, নির্মম কঠোর গুরুপত্নী।

অষ্টাদশ মহাপুরাণে এ রত্ন আনয়ন পর্ব থেকে দানপর্ব বিষয়ক অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। রাজন্যকুল সংগ্রহ করতেন জীবন্তরত্ন আর প্রজাকুল সংগ্রহ করতেন মৃতরত্ন। এভাবে এক-সময় জীবন্তরত্ন রত্ন বলে পরিগণিত হ'লো আর মৃতরত্ন উপরত্ন হিসেবে সমাদৃত হ'তে লাগল।

নৃপতিকুলের মুকুটশোভিত থাকত রত্নরাজি। কণ্ঠেও শোভা পেত সূর্য-রশ্মি বিনিন্দিত করে। নৃপতি পত্নীদের সমাদর মুকুট ও কণ্ঠ থেকে আরম্ভ করে অঙ্গের বস্ত্রাদিতেও শোভা পেত।

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এ ত্রিভূবনেই রত্নের চাহিদা অফুরন্ত। দেবলোকে নীলকান্ত মণির এবং মর্ত্য ও পাতাল-লোকে হীরক ও মুক্তোর প্রাধান্য দেখতে পাই। সত্যযুগে ভগবান শ্রীহরি নীলকান্তমণি ও মুক্তো, ত্রেতায় রামচন্দ্র মাণিক্য, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও রাধারাণী নীলকান্তমণি ও কৌস্তভ মণি, ভীষ্মদেব স্ফটিক মণি, লক্ষ্মীদেবী হলদে মুক্তো, সরস্বতী দেবী শ্বেতমুক্তো, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র নীলকান্তমণি (ইন্দ্রনীল), প্রজাপতি ব্রহ্মা স্ফটিক মণি, বরুণদেব বরুণমণি, শ্রীশ্রীদুর্গা বা শ্রীশ্রীকালী দেবী ইন্দ্রনীল মণি ও প্রবাল মণি, ধন্বন্তরী শ্বেত মুক্তো, দেবাদিদেব মহাদেব শ্বেত মুক্তো এবং পার্থ ধনুর্ধরের মহানীলমণি প্রিয় ছিলো।

এভাবে সূর্যদেব মাণিক্য রত্ন, চন্দ্রদেব শ্বেত মুক্তো, মঙ্গলদেব প্রবাল রত্ন, বুধদেব মরকত মণি, বৃহস্পতিদেব পীত পদ্মরাগ, শুক্রদেব বজ্র (রত্ন), শনিদেব নীলকান্ত মণি, রাহু গোমেদ এবং কেতু বৈদূর্য মণি ধারণ করে প্রীতিলাভ করেন। প্রাচীন প্রামাণিক রত্ন গ্রন্থ হিসেবে মহর্ষি অগস্ত্য প্রণীত রত্ন সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় 'অগস্তি মতম্' গ্রন্থটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরাণ ও গরুড়-পুরাণে এই রত্ন সম্বন্ধে কিছু না কিছু কাহিনী এবং উপযোগিতার কথা উল্লেখিত রয়েছে।

গরুড়পুরাণে এই রত্নাদি মহামতি বালাসুরের অস্থি, রক্ত, পিত্ত ও দন্তরাজি থেকে উৎপত্তি হয়েছে—এমন কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও পিত্ত থেকে পান্নার (মরকত) সৃষ্টি হয়েছে এ কথার উল্লেখ সুস্পষ্ট।

অনেকে বালাসুরের অস্থি,' রক্ত, পিত্ত ও দন্তরাজি থেকেই রত্নাদির সৃষ্টি হয়েছে বলে থাকেন। সে কথা স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই। কেন-না, একই চরিত্রের বিভিন্নতা পুরাণে উল্লেখিত থাকে।

ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের পর আবির্ভূত হয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবী মুক্তোর মালা কণ্ঠে ধারণ করে। দধীচির অস্থি-নির্মিত বজ্রই হীরক মণি। অন্য সব রত্নাদি বোধ হয় মহাতপা অগস্ত্যের দানবজিত্ত-পুরস্কার। বাতাপিকে হজম করার পর রত্নেশ্বর ইল্বল মহা-তপাকে প্রভূত মণিমুক্তো দান করে-ছিলেন। তা'ছাড়া দারিদ্র্যের নির্মম জ্বালায় জর্জর মহাতপা অগস্ত্য স্বীয় পত্নী লোপামুদ্রাকে রাজৈশ্বর্যের সুখপ্রদান করবার নেশায় যোগবলের সাহায্য নিয়ে কর্মবলেই লোপামুদ্রাকে রাজৈশ্বর্যের সুখ প্রদান করেছিলেন। দেবলোক থেকে কোন লোকই বাদ পড়েনি। এই মর্ত্যধামে রত্নসংগ্রাহক হিসেবে মহাতপা অগস্ত্যের পরিশ্রম কম নয়। তা'ছাড়া দানবকুল ও রাক্ষসকুলেরাও রত্নসংগ্রাহক হিসেবে সুবিদিত। যাক, পুরাণ উপপুরাণের কাহিনী ও গল্প লিখে রত্ন সম্বন্ধে পাঠক ও পাঠিকাদের ধর্মচ্যুতি ঘটাতে চাইনে। মূল কথা হচ্ছে নবগ্রহের রত্ননির্বাচন ও মূল্যায়ন করা কি উপায়ে সম্ভব, তার

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোকপাত করা। বিষ্ণু ধর্মোত্তর, বৃহৎ সংহিতা, যুক্তি কল্পতরু, শুক্রনীতি, রাজনির্ঘণ্ট, রসরত্ন সমুচ্চয় ইত্যাদি বহুমূল্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রত্ন সম্বন্ধে বর্ণনা বিষদ আলোচনার মধ্যেই উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থে রত্নাদির নাম প্রায় ক্ষেত্রেই সাধারণ পণ্ডিতদেরও পরিচয়ের সীমানা থেকে বহুদূরে। এই রত্ন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত ডাঃ রামদাস সেন প্রণীত 'রত্ন রহস্য', যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'রত্ন পরীক্ষা', দ্বিজবর দাস প্রণীত 'রত্নতত্ত্ব পবিধি', যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'মণিবত্ন বিজ্ঞান', মহারাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত 'মণিমালা' ইত্যাদি গ্রন্থে রত্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তা'ছাড়া ইংরেজী ভাষায় প্রণীত Robert Webster-এর Practical Gemmology, Edward Henry Kraus-এর Gems and Gem Materials, R. W. Anderson-এর Gem Testing, A, Selwyn-এর The Retail Jeweller's Hand Book এবং Encyclopaedia Britannica-র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ একনিষ্ঠ সাধকের মত স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চন্দ্র এম-এ, বি-এল মহাশয় রত্ন-সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন, তাঁর কণামাত্র আশীর্বাদলব্ধ জ্ঞান নিয়ে ও আমার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতগণ যাঁরা এই রত্ন সম্বন্ধে তাঁদের অমূল্য রত্ন গ্রন্থাদিতে যে গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে রত্নশাস্ত্রকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক প্রণাম জানিয়ে প্রচলিত রত্নাদির নাম উল্লেখ করছি।

অনেক জ্যোতিষী পণ্ডিত এবং রত্ন-ব্যবসায়ী কিছুসংখ্যক রত্নের নাম জেনেই রত্নধারণের উপযোগিতার কথা বিশ্লেষণ করে থাকেন। অনেকে বিদেশী রত্নের নাম শুনেছেন মাত্র কিন্তু সে রত্ন দৃষ্টিগোচরও হয় নি। আমার বিশ্বাস তাদের ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে আমার গবেষণালব্ধ জ্ঞান যদি কিছুসংখ্যক লোকেরও গ্রহণযোগ্য হয় তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক-সুন্দর হয়ে দেখা দেবে।

সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, পারসী ও আরবী ভাষায় প্রচলিত রত্নের নাম।

অসস্কান্তমণি—এই প্রস্তর অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে। কালো হলেও পস্তর স্বচ্ছ টিলটিলে দ্যুতি বিদ্যমান থাকে।

অনেস্ট স্টোন, Onyx. ইংরেজী অনিক্স শব্দের অপভ্রংশ, স্ফটিক জাতীয় প্রস্তর, গায়ে ডোরা থাকে।

অ্যাকিক—Agate অ্যাকিক পারসী শব্দ। পারস্য দেশে অ্যাকিক প্রস্তরের বহুল প্রচলন রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এই প্রস্তরকে রুধির পালঙ্ক বা উপল বলা হয়। লাল বা কৃষ্ণবর্ণের স্ফটিক জাতীয় প্রস্তর। উপরে বিভিন্ন বর্ণের ডোরা থাকে। মুসলমান মৌলবী ও ফকিরগণ বিপদাপদ ও সাংসারিক সুখ ও শান্তির জন্য উক্ত প্রস্তর আংটি হিসেবে ব্যবহার করতে বলে থাকে। বর্তমানে Agate-এর ব্যবহারবিধি অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু জ্যোতিষী পণ্ডিতগণও মেনে নিয়েছেন দেখা যায়।

আতসী পাথর—Sun Stone. উক্ত প্রস্তরকে সংস্কৃত ভাষায় সূর্যকান্তমণি বলে। ফেলস্পার জাতীয় অস্বচ্ছ প্রস্তর। অনেক হিন্দুগৃহে উক্ত মণি নারায়ণ শিলার মতই নারায়ণজ্ঞানে পূজিত হয়ে থাকে।

আলেমানী—Onyx (Agate Group.) সংস্কৃত ভাষায় পালঙ্ক বলা হয়। ধোঁয়ার মত রং-এর অনিক্সকে 'আলেমানী' এবং শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের অনিক্সকে 'সোলেমানী' বলে। ইহা এগেট জাতীয় প্রস্তর। আংটি হিসেবে 'আলেমানী' ও 'সোলেমানী' প্রস্তরের প্রচলন রয়েছে। স্বপ্নদোষ, দুঃস্বপ্ন ইত্যাদি রোগে আলেমানী এবং মাথাধরা, মৃগী ও মূর্চ্ছাদি রোগে সোলেমানী প্রস্তরের ব্যবহার-বিধি রয়েছে।

প্রৌঢ় দিনের আয়োজন

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সারাটা দিন তপ্তপথে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত আমি
দগ্ধ মাঠ মরুর মতো দীর্ঘ হাহাকার,
কোথায় পাবো মায়ের মতো বটের শীতল ছায়া,
কোথায় পাবো শান্ত নদীর অমল নির্জনতা!

সারাটা দিন ক্লান্তপথে হেঁটে হেঁটে রিক্ত আমি
সকল ফসল হারিয়ে গেছে হাটের কোলাহলে,
কোথায় পাবো একটু ঘাসের সবুজ আশীর্বাদ
শুষ্ক মাটির মৌন ধূসর বিশাল বিশ্বলোক!
ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে খুঁজে সারা দুপুর গেছে
এখন বেলা ডুববে দূরে জলাভূমির শেষে,
দূরের গ্রাম তালের সারি দীর্ঘ মাঠের ছবি
ধীরে ধীরে আকাশ জুড়ে আবছা হয়ে আসে।

এখনো আমি ক্লান্তপথে যেতে যেতে খুঁজি
সে-কার ছায়ায় ফিরে ফিরে আসব সন্ধ্যাবেলা,
কোথায় সেই ভালোবাসা-বটের ছায়ার মতো
শান্ত নদীর অপার্থিব অমল নির্জনতা
বটের ছায়া শান্ত নদীর নির্জনতার ছবি
জানি আমি, সেই তো দিনের শেষের দেবালয়,
একটি শুদ্ধ ভালোবাসার স্তব্ধ উঠোন কোণে
রেখে গেলাম প্রৌঢ় দিনের সকল আয়োজন!!

॥ একত্রিশ ॥

সেই যে দুজন বোরখা পরা মেয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন একটি নবীন যুবতী আর তাঁর ঠাকুরমা। দুজনেই ডাঃ বোসকে বিলক্ষণ চেনেন, কারণ তিনি তাঁদের দীর্ঘদিনের গৃহচিকিৎসক ছিলেন।

তাঁরা দুজনে নিচে রোগীদের ঘরে এককোণে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছেন, ভিড় না কমলে তাঁরা কথা বলতে পারছেন না।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ঘর খালি হলে এবার তাঁরা এগিয়ে এলেন এবং ডাক্তার বোসকে আদাব জানালেন।

ডাঃ বোস বললেন—বিশুদ্ধ উর্দুতেই জিজ্ঞাসা করলেন—তবিয়ৎ কি?

বৃদ্ধা বললেন—মেয়েটা তো মাঝে মাঝে ফিট হয়ে যাচ্ছে।

ডাঃ বোস বললেন—দেখি হাত দেখি। হাত নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করলেন। নাড়ী পরীক্ষা করা তাঁর একটি বহুদিনের অভ্যাস ছিল। এমন কি থার্মোমিটার না দিয়ে হাত দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করেও তিনি জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গের চিকিৎসা করতেন।

মেয়েটির নাড়ী পরীক্ষা করে এবার স্টেথেসকোপ কানে দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করতে চাইলেন। মেয়েটি লজ্জা বোধ করছে দেখে তার ঠাকুরমা একবকম রেগে উঠে বললেন, উনি তোর ঠাকুরদার বন্ধু, তোর বাবার জন্ম ওঁর হাতে। উনি নিজের হাতে প্রসব করিয়েছিলেন, আর ওঁকে তোর লজ্জা করছে? বলে বৃদ্ধা যুবতীটির বুকের বোরখার বোতাম খুলে অসাবধানে তার, আমার খানিকটাও নজরেতেই বেরিয়ে পড়ল তার অনাবৃত উন্নত পীনপয়োধর।

আমি আকস্মিকভাবে ঐ সময় ওখানে গিয়ে পড়েই চমকে উঠে বেরিয়ে এলাম। পরক্ষণেই ডাঃ বোসের একটি মজাদার ঠাট্টা কানে এসে গেল। তিনি বলেন—ভাবীজী, লেড়কী যে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছে তার কারণ তো দেখাই যাচ্ছে। নাতজামাইকে ডেকে পাঠাও। সে গিয়ে লক্ষ্ণৌ বসে থাকলে এ মূর্চ্ছা তো ওষুধে সারবে না।

মেয়েটি মাথা নীচু করে হাসি লুকায়, বৃদ্ধাও হাসি চাপতে পারেন না।

আর একদিন দেখি ডাঃ বোসের পাশে একজন বিশিষ্ট ডাক্তার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কি আলোচনা করছেন। পরে শুনলাম, তিনি ডাঃ বোসের কয়েকটি প্রেসক্রিপশান ব্যবহার করে চিকিৎসা করে বিশেষ ফল পাচ্ছেন বলে জানালেন।

ভদ্রলোককে আমি চিনতাম। তিনি আমার দেশ খুলনায় বি, কে, ফার্মাসি ছিল—সহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারখানা, তিনি ছিলেন তার মালিক ডাঃ বি কে দাস। তাঁকে ডেকে নিয়ে বসালাম। তাঁর কাছে শুনলাম তিনিও নাকি প্রথম জীবনে ডাঃ বোসের সহকারী হিসাবে এখানে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে গেছেন।

তিনি বললেন, কত সামান্য উপকরণে, কত সহজ পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা করা যায় তার নানা নিদর্শন তিনি ডাঃ বোসের নিকট হতেই সংগ্রহ করেছেন এবং নিজে সেইভাবে চিকিৎসা করে সুফল পাচ্ছেন।

নাটার বীজ, কুলেখাড়া, সর্পগন্ধা, আমলকি, এসব বস্তু হয়ত কবিরাজেরা ব্যবহার করেন, কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের এলোপ্যাথিও যে কত সহজে এইসব উপাদানই তাঁর চিকিৎসার মধ্যে ব্যবহার করতেন ডাঃ দাস তারও বর্ণনা করলেন। রোগীর আর্থিক অবস্থা বুঝে ওষুধ নির্ণয় করতেন ডাঃ বোস। এতখানি সহানুভূতি ক'জন চিকিৎসকের থাকে?

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে তাঁর কাছে ভিড় করত এবং কখনও কেউ বিমুখ হত না। কতখানি ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকলে এরকমভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব তা বলে বোঝানো যাবে না।

ডাঃ দাস বললেন, উনি চরকসুশ্রুত গুলে খেয়েছেন, আবার এদিকে ল্যান্‌সেট-এর সর্বাধুনিক রিসার্চ পেপারটিও নজর এড়ায় না।

কোন জটিল রোগী হাতে এলে রাত জেগে বড় বড় বাঁধানো মেডিক্যাল জার্নাল খুঁজতে, পড়তে, নোট নিতে আমিও দেখিছি। তবেই তো সম্ভব হয়েছিল শিল্পব্যবসায়ের সঙ্গেও রোগীর চিকিৎসাও সমান দক্ষতার সঙ্গে চালানো।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

. ॥ বাঁড়শ ॥

গৃহকে যদি আশ্রয় বলা যায় তবে ডাঃ বোসের বসতবাড়িখানি একটি সত্যিকারের আশ্রয়স্থল। শুধু বসতবাড়িখানিই নয়, তিনি যেখানে যা কিছু বাড়ি ঘর করেছেন সবই আকারে বড়, প্রকারে বিচিত্র, তাই সব স্থানেই বহু লোকের আশ্রয় জুটেছে। যেন বিশাল বটের ছায়ায় এসে জুটেছে অগণিত আশ্রয়প্রার্থী।

কার্তিকপুর নামে বারাসাত বসিরহাট লাইট রেলওয়েতে একটি স্টেশন হয়েছিল। দেগঙ্গা অঞ্চলে তিনি অনেক চাষের এবং বাসের জমি কিনে সেখানে 'কৃষি, গোপালন এবং জনসেবা লিমিটেড' নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। সেখানে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার সঙ্গে চাষবাস এবং গোপালন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্কুলবাড়িও তৈরী করেন। যে সময়ে এই সব করেন তখন দেশ স্বাধীনও হয় নি, দেশ বিভাগও হয় নি।

৭

দেশবিভাগের ফলে যখন হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসে পড়ল তখন তিনি কার্তিকপুরে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেই সব জমি বণ্টন করেন। কথা ছিল সমিতি হতে জমির ক্রয়মূল্য তুলে দেওয়া হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেকথাও রক্ষিত হয় নি। তবু বহু উদ্বাস্তু পরিবার সেখানে আশ্রয় পেয়েছে এতেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন। কেবল দুঃখ করতেন, দলাদলিতে জনসেবা ও শিক্ষা প্রচারের মূল প্রতিষ্ঠানটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বলে।

মৈত্র বাগানে রাজলক্ষ্মী সুগার মিলস্ নামক চিনির কল ঘিরেও একটি ছোটখাটো কলোনি গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করে নিজেই সপ্তাহে একবার গিয়ে বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা করে আসতেন। চিনির কলের কর্মচারীরা ওখানে যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে তার জন্যে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন।

এমন কি উদ্বাস্তুদের মধ্যে জমি বণ্টনের সময়ও নিজহাতে তিনি তাদের বাড়ি ঘর তৈরী করবার যে প্ল্যান আঁকেন তাতে দেখান হয়েছিল একটি করে সাধারণ পুকুরের চারদিকে চার জনের চারটি বাড়ি হবে। পুকুরে চারটি পরিবারের সমান অধিকার থাকবে, চার পরিবার জল পাবে, মাছ খাবে, হাঁস চরাবে। আর পুকুর কেটে যে মাটি উঠবে তাতেই চারটি গৃহস্থের ঘরের মেজে উঁচু করা হবে।

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে যে চারতলা বাড়িতে তাঁর বওেড ল্যাবরেটরি এবং ফার্মাসিউটিকাল ওষুধের কারখানা

সেখানে চারতলার একাংশ জুড়ে কর্মচারী-দের বাসস্থান। তাঁরা সেখানে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বাস করছেন। নীচের তলায় দরোয়ানদের আশ্রয়।

বেলেঘাটায় রাধামাধব দত্ত'স গার্ডেন লেন-এ এখন যেখানে বেলেঘাটা লেক-এর মনোরম পরিবেশ ওখানে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ডা: বোসেস ল্যাবরেটরী লিমিটেডের সুবৃহৎ কারখানা ছিল। ওখানেই ছিল সালফিউরিক এ্যাসিডের ছয়তলার সমান উঁচু সুবৃহৎ গ্লোভাল টাওয়ার, যেখানে প্রচুর পরিমাণে সাল-ফিউরিক এ্যাসিড তৈরী হত। সালফিউ-রিক এ্যাসিড হল রসায়ন জগতের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় মূল উপাদান। ওখানে নাইট্রিক এ্যাসিড এবং অন্যান্য এ্যাসিড-সমূহ তৈরীর কারখানা ছিল। এলাম বা ফটকিরি তৈরী হত টন টন ওজনে। তৈরী হত প্রুসিয়ান ব্লু। বেলেঘাটা এ্যাসিড এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ নাম ছিল কোম্পানীর।

ওখানেই এক অঞ্চল জুড়ে ছিল বেলেঘাটা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস—যেখান হতে ভারতবর্ষে প্রথম ট্যাবলেট তৈরীর যন্ত্র (ছোট এবং বড আকারের) তৈরী হয়। পারকোলেটর, ভ্যাট প্রভৃতি রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় নানা যন্ত্রপাতি এখানে তৈরী হয়ে সারা ভারতে বিক্রয় হত। এখানে পিতল এবং তামা প্রভৃতি ঢালাই-এর কাজও হত, জলের কলের মুখ তৈরী হত। এক সময়ে ডি-বি-এল ছাতু এবং কল্ বেশ বিখ্যাত হয়েছিল।

আর এক অংশে ছিল বেলেঘাটা সোপ ওয়ার্কস। সেখানে কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান তৈরী হত। কাঁচি মার্কা বল সাবান এবং কম দামের 'জাহ্নবী' সাবান এবং নিম সাবানও তৈরী হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—বোসেস ল্যাবরে-টারীর বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী, কেশতৈল, লাইমজুস গ্লিসারিন এবং নানারকম সেন্ট তৈরী হত। এসব বিভাগ ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে। সবচেয়ে বেশী চলত নার্সারি পাউডার এবং নিমো-ডেন্ট টুথপেস্ট।

বোম্বাই অঞ্চলের পরিবেশন ভার ছিল ইণ্ডিয়ান ড্রাগস এণ্ড ফার্মা-সিউটিক্যাল ওয়ার্কস নামক একটি বড আকারের দোকানে। তার মালিক মিস্টার আর ভি মুরকুন্ডি ছিলেন ডা: বোসের হাতেগড়া আর একজন খাঁটি মানুষ। তাঁর কাহিনীও পৃথকভাবে বলবার মত। তিনি সমগ্র মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট অঞ্চলে নার্সারি পাউডার পরিবেশন একচেটে করে রেখেছিলেন। আর পাঞ্জাবে চলত নিমোডেন্ট টুথপেস্ট লাহোরের মিস্টার কেদারনাথ চিৎকরণ ছিলেন তার একমাত্র পরিবেশক, তাঁর ফার্মের নাম ছিল গোবিন্দরাম রামনাথ। তখন অবশ্য লাহোর ভারতেরই অংশ ছিল।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি কিভাবে তৈরী হয় তার আভাস আগেই দিয়েছি। বিখ্যাত ধনী কেশোরাম পোদ্দার আমহার্স্ট স্ট্রীটের জমি একজন মাড়োয়ারি খাতকের কাছ থেকে সুলভ মূল্যে ডা: বোসকে কিনিয়ে দেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে তখনও পিচ পড়েনি, খোয়ার রাস্তা ছিল, তবে বেশ চওড়া। বৃষ্টি হলেই জলে অনেক-খানি পথ ডুবে যেত; আজও সামান্য বৃষ্টিতেই সেণ্টপলস কলেজের কাছ থেকে সুকিয়া স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত জল জমে। সিটি কলেজের কাছে সে জল হাঁটু ছাড়িয়েও যায়। তবু এরাস্তাটির গুরুত্ব অনেক। দক্ষিণে বোবাজার (এখনকার নাম বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) থেকে উত্তরে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত নাকবরাবর টানা এই রাস্তায় উপরেই ডাফরিন হাসপাতাল, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট এণ্ড টেলি-গ্রাফ অফিস, ১৮২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট পলস্ চার্চ, সেণ্ট পলস্ মিশনারী স্কুল ও কলেজ, মাড়োয়ারি হাসপাতাল, সিটি কলেজ, রামমোহন হোস্টেল, রাজা হৃষীকেশ লাহার বাড়ি, হৃষীকেশ পার্ক, রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি ইত্যাদি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও সুবৃহৎ ভবনগুলি রয়েছে।

ইণ্ডিয়া হোটেল, রয়াল হোটেল এবং ক্রাউন বোর্ডিং এবং বিখ্যাত ইলিসিয়াম বোর্ডিং ও এই রাস্তার উপরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু এত সব বিখ্যাত ভবনের মধ্যেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ৪৫নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের সুবৃহৎ চারতলা বাড়িটি—ডা: বোসের বাসভবন। নানা কারণে সারা দেশের কাছেই এই বাড়িটি সুপরিচিত।

বস্তুত বাড়ি একটি নয়, একাধিক। বড় রাস্তার উপরেই পাশাপাশি দুটি বৃহৎ বাড়ি, মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা ভিতরের প্রশস্ত অঙ্গনে এসে মিশেছে—যেন কোন বৃহৎ স্টেথেসকোপ উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত; পূর্বে এই বাড়ির প্রাঙ্গণের দিকে যেন স্টেথেসকোপের একক নলটি লম্বিত।

দুটি বাড়ির মধ্যে বৃহৎ গেট, দুপাশে বিশাল আকারের দুটি স্তম্ভ, তাতে লোহার গেট লম্বিত। স্তম্ভ দুটির উপরে লোহার পাতে অর্ধচন্দ্রাকার খিলান, তার উপরে দীর্ঘাকার কাঠের ফলকে লেখা—

ডা: বোসেস ল্যাবরেটরী লিমিটেড।

এই ল্যাবরেটরীর জন্য সারা দেশের লোক চেনে এ বাড়িটি। এই বাড়িতেই রয়েছে স্ট্যাণ্ডার্ড একমুলে ল্যাবরেটারি, ভারতের তো বটেই, এশিয়ারও সর্বপ্রথম রঞ্জন-রশ্মির যন্ত্র এ বাড়িতেই বসেছিল। সারা দেশের লোক সেজন্যও চেনে বাড়িটি। এ বাড়িতেই ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী—এতদ্দেশের সর্বপ্রথম এবং সর্ব প্রাচীন ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী—যেখানে মলমূত্র রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হত। সারা বাংলার লোক সেজন্যও চেনে এ বাড়িটি। কলকাতার বিখ্যাত চশমার দোকান—ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোম্পানি প্রাই-ভেট লিমিটেডও এই বাড়িতেই আছে। সেজন্যও অনেকে চেনে এ বাড়িটি।

কিন্তু সবার উপরে চেনে—এ বাড়িটি ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর বাড়ি বলে।

বাড়ির উত্তরাংশে নিচের তলায় সুবৃহৎ অঞ্চল জুড়ে স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স, ঔষধ ও পথ্য বিক্রয়ের একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। এর আসবাবপত্র দেখবার মত। আলমারির বড় বড় কাচ, সুগঠিত শোকেস-এর ঢেউ খেলানো অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাচ জার্মানি থেকে আনানো হয়েছিল।

বিলাতে প্রকাশিত একটি বড় ডাক্তারি ডাইরেক্টরি পুস্তকে ডাক্তার বোসের জীবনীসহ এই চমৎকার ডাক্তারখানার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই ডাক্তারখানার খ্যাতি সারা ভারতে একদা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম যখন এই ডাক্তারখানাটি তৈরী হয় তখন এরও নাম রাখা হয়েছিল শুনেছি বটকৃষ্ণ পালের নামে—কারণ ডাক্তার বোস তখন বটকৃষ্ণ পালের আদি দোকানে বসতেন। এটিকেও সেই দোকানের শাখা হিসাবে পরিচিত করা হয়েছিল।

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সে ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। অতি অল্পদিনেই এই অঞ্চলে ডাক্তারখানাটি জনপ্রিয় হয়। পরে যখন ডাঃ বোস এবং বটকৃষ্ণ পালের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কুড়ি বছরের ব্যবসায়িক সম্পর্ক অন্তরঙ্গতার, মধ্যেই আপোষ মীমাংসায় বিচ্ছিন্ন হল তখন স্বাভাবিক কারণেই ডাঃ বোসের নিজের বাড়ির ডাক্তারখানাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে রাখা হল স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স। বর্তমানে এই ডাক্তারখানার একাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বোসেস ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং বোসেস মেডিক্যাল স্টোর্স নামে পৃথক প্রতিষ্ঠান।

স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স-এর প্রধান প্রবেশ পথের ডাইনে বাঁয়ে তিনটি করে ছটি কাচের জানালা, তার তলায় দেওয়ালের গায়ে ছখানি শ্বেতপাথরে যে কথাগুলি লেখা ছিল তাতেই এই ডাক্তারখানাটিরও ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যেত। তাতে লেখা ছিল—হোলসেল এ্যাণ্ড রিটেল পাইকারি ও খুচরা; সার্জিক্যাল স্যাণ্ড্রিজ অস্ত্র চিকিৎসার দ্রব্যাদি; ফার্মাসিউটিক্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস ঔষধ প্রস্তুতের দ্রব্যাদি; পিওর কেমিক্যাল। বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি; পেটেন্ট ঔষধাদি এবং আয়ুর্বেদ ঔষধাদি।

ডাক্তারখানার উপরে দোতলার বৃহৎ হল তিনটি কামরায় পার্টিশান করে তাতে ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি। আর তিনতলাতেও ঐ সুবৃহৎ হলটি পার্টিশান করে দুটি বড় কামরা করা ডাঃ বোসের পরিবারবর্গ ব্যবহার করতেন। উত্তরের অংশে ছিল স্টাডি রুম, দক্ষিণের অংশে ছিল ডাঃ বোসের শয়নকক্ষ।

এখানে একটি মজার কাহিনী মনে পড়েছে।

ডাক্তার বোস বিয়ে করেছিলেন দেবানন্দপুরের প্রসিদ্ধ মুন্সী বাড়ীর স্বর্গত মোহিনীমোহন দত্ত সাব জজ মহাশয়ের কন্যা নির্মলনলিনীকে। তিনি একে জজ সাহেবের কন্যা, তাতে কিছুটা স্থূলাঙ্গী ছিলেন। তিনি বিয়ের পরে ঝামাপুকুরের বাড়িতে এসে নিজের শয়নকক্ষটি সম্পর্কে স্বামীকে বোধ হয় শয়নকক্ষের আকার নিয়ে একটু পরিহাস করেছিলেন। হয়ত তিনি ছোট ঘরের মধ্যে চলতে ফিরতেও অসুবিধা বোধ করতেন বলেই বলেছিলেন—হাঁটতে গেলে দরোজা জানালা গায়ে বাধে।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির উত্তরাংশই প্রথম তৈরী হয়েছিল। রাস্তার উপরে একতলা দোতলা তিনতলা তিনটি কামরা এতবড় যে তা পার্টিশান দিয়ে তিনটি বড় বড় কামরায় পরিণত করা হয়েছিল। তিনতলার কামরাটিতে কোন পার্টিশান না দিয়ে সবটা খোলা রাখা হল, ফলে চারদিকের দেওয়ালের মাঝে তিন কাঠারও বেশী জমি রইল।

ডাঃ বোস তাঁর শয়নকক্ষ হিসাবে সেই সুবৃহৎ হলঘরটি খুব বড় বড় দরজা জানালা দিয়ে নিজের মনের মত করে তৈরী করে তাঁর স্ত্রীকে এনে দেখিয়ে বললেন, এই নাও তোমার শোওয়ার ঘর। আশা করি এবার আর চলতে-ফিরতে দরোজা জানালা গায়ে বাধবে না।

নির্মলনলিনী দেবী সভয়ে বললেন—এ তো ঘর নয়, এ যে দেখছি একটি উদোম মাঠ। আমি বাপু এমন ঘরে থাকতে পারব না। এটিকে কেটে ছোট করো।

তাঁরই অনুরোধমত উত্তরের দিকে একটি অংশ ঘিরে স্টাডি রুম তৈরী হয়ে-

ছিল। তবু দক্ষিণের দিকে যতখানি জায়গা রইল তাতে দুটি বড় শয়ন-কক্ষ হতে পারত।
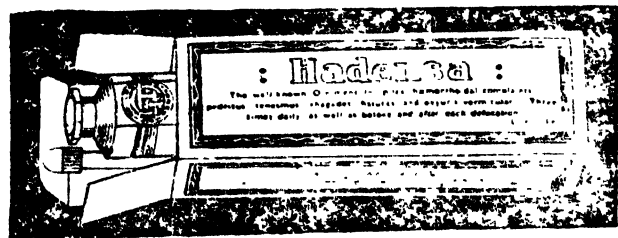
উত্তরের এই অংশ একটি 'জে' আকারের বাড়ি। বড় রাস্তার উপরে জে অক্ষরের তলার অংশ। উত্তরের দিকে একটি বড় ঘর এবং উত্তর ও পশ্চিম দু'দিকের ঘরের সুমুখ দিয়ে প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা, কাঠের ঝিলমিল দিয়ে আগাগোড়া ঘেরা. মাঝে মাঝে বড় বড় জানালা ঝিলমিলির মধ্যেও প্রচুর আলোবাতাস আনে।

এই বাড়িটির দক্ষিণ অংশ পূবে পশ্চিমে টানা—তাতে বড় বড় তিনটি ঘর—তেতলা পর্যন্ত সমান টানা। দু'দিকেই টানা বারান্দা। দক্ষিণের বারান্দা অপেক্ষাকৃত সরু। তিনতলায় বারান্দার উপরে কাঠের বাহারি বারান্দা। একতলায় দক্ষিণে বারান্দা নেই, সেখানে গাড়ি যাতায়াতের পথ প্রশস্ত রাখবার জন্য উঠান খোলা। উত্তরের দিকের বারান্দা ঘিরে ঘর তৈরি করা।

গেটের দক্ষিণের দিকে আবার একটি তিনতলা সুগঠিত বাড়ি। বড় বড় খোলা হল। ডাঃ বোসের বড় ছেলে পঞ্চানন বোস বার্লিনে এম-ডি হতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এখানে নার্সিং হোম করবেন সেইভাবে তৈরী হয়েছিল এ অংশের একতলা দোতলা তিনতলায় খোলা হল—হাসপাতাল বাড়ির মত। কাঠের সিঁড়ি এত প্রশস্ত যে সহজেই স্ট্রেচারে করে রোগী তিনতলা পর্যন্ত তোলা যায়। এই কাঠের সিঁড়িটি মেডিক্যাল কলেজ হতে কেনা।

যে মেডিক্যাল কলেজ ডাঃ বোসের ছাত্রজীবনের সাধনার ক্ষেত্র ছিল সেখানকার ধূলিকণাও তিনি পবিত্র মনে করতেন। মেডিক্যাল কলেজের একটি বাড়ি ভাঙ্গা হলে তার দরোজা জানালা এমন কি বৃহৎ আকারের প্রশস্ত কাঠের সিঁড়িও ডাঃ বোস সর্বোচ্চ দাম দিয়ে নীলামে কিনেছিলেন। দুটি বাড়ির দুটি সুপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি সেই মেডিক্যাল কলেজের প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করছে।

দক্ষিণ দিকের বাড়ির নিচের তলায় একাংশে বড় রাস্তার দিকে ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোম্পানির শো-রুম এবং বাম দিকে চক্ষু পরীক্ষার দুটি বৃহৎ কেবিন। তার পিছনে এই কোম্পানীর অফিস। আরও দক্ষিণে এক্স্‌রে বিভাগ। বড় রাস্তার উপরে সুবৃহৎ কাচের দরজা। সুমুখে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বড় রাস্তায় নেমেছে।

এখানে রোগীদের বসবার ঘর। তার পিছনে আর একটি ঘরে পরীক্ষাগার। মধ্যে হল। পূবের দিকে রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষার সুবৃহৎ কক্ষটি। এই যন্ত্রটি আদিম যুগের কিন্তু এখনও নিখুঁতভাবে শরীরের অভ্যন্তরের ছবি তোলে। রেডিওলজিস্ট ডাঃ বসন্তকুমার দে আজীবন এই কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাঁর কাজের নৈপুণ্য এবং রোগ বিচারের সূক্ষ্মতার উপরে কলকাতার সব বিশেষজ্ঞই গভীর আস্থা পোষণ করেন।

দোতলায় ডাঃ বোসের ল্যাবরেটরীর অফিস, তিনতলায় আগে ডাঃ বোসের পরিবারবর্গ থাকতেন, এখন অনেকগুলি পরিবার বাস করেন।

রাস্তার উপরের এই বড় দুটি বাড়িরই তিনতলায় ছাদের উপরে আর একতলা ঘর তোলা। উত্তরের অংশ টালি দিয়ে ছাওয়া, দক্ষিণের অংশে টিন। তাতে ছাদ রক্ষা পায়, পরন্তু অনেকখানি স্থান বাসযোগ্য হয়।

উত্তরের অংশে দীর্ঘকাল ধরে মেডিক্যাল মেস ছিল। ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সময় এই বাড়িটি যখন আক্রান্ত হয়েছিল তখন এই মেসের যুবকেরাই ছাদ থেকে ইটপাটকেল ছুড়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেছিল। সে কাহিনী পরে বলছি।

দক্ষিণের টিন ঢাকা অংশে হয়েছিল প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়—ডাঃ বোসের স্বাস্থ্য ধর্ম সঙ্ঘ পরিচালিত আয়ুর্বেদ পঠন পাঠন ও রোগ চিকিৎসার বিস্তারিত আয়োজন। শ্যামাদাস আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য এই প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়েরও অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। একাংশে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। এখন সমগ্র অঞ্চলটিতে অনেকগুলি পরিবার বাস করছেন।

উত্তরের বাড়ির ভিতরে ছোট একটি উঠান। তার পূব কোণে একখণ্ড জমিতে উঠেছে আর একটি ছোট বাড়ি। তার নিচের তলায় কবিরাজী ওষুধপত্র জ্বাল দেওয়া হয়। একাংশে দরোয়ানরা থাকে। তার দেড়তলাটা ভাড়াই করা সেটাই আগলে চাকরবাকরদের আশ্রয়। দোতলায় একটি পরিবার থাকে, তিনতলায় আর একটি পরিবার। এই ছোট বাড়িটি তাই প্রকৃতপক্ষে চারতলা এবং একটি মাত্র বড়ঘর তলায় তলায় উঠে গেছে। মধ্যে পার্টিশান করে তিনতলায় চারতলায় দুটি করে ঘর তৈরী করা। প্রতি ঘরে লোক। চোখ বুজে ভাবলে মনে হয় যেন একটি ছোট মৌচাক। তবে মৌচাক শুধু এই ছোট বাড়িটিই নয়, গোটাবাড়িটিই তাই।

বাইরে বড় উঠানের দক্ষিণে প্রকাণ্ড গ্যারেজ, চারিদিক খোলা চারখানা বড় গাড়ি দাঁড়াতে পারে। আগে লরীও থাকত একখানা।

স্টীল স্ট্রাকচার করে গ্যারেজ বাড়িটি নির্মিত। নীচের তলাটি সম্পূর্ণ খোলা, কেবল ইস্পাতের থামগুলি ঘিরে ইঁটের থাম গাঁথা—যাতে জল লেগে স্টীলফ্রেম নষ্ট না হতে পারে। বর্ষাকালে বেশী বৃষ্টি হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট যখন জলের তলায় চলে যায় তখন মেইন গেটে হতে জল চলে আসে বাড়ির ভিতরের বড় উঠানে, জল চলে আসে গ্যারেজের গোড়ায়। গ্যারেজের মেজে কিছুটা উঁচু করা, তবু ইঁটের গাঁথুনি না থাকলে ইস্পাতের থামগুলিতে জল লাগত।

[ক্রমশ]

ভয়ঙ্কর সেই দিনটি

প্রাণেশ চক্রবর্তী

বাইশ হাজার আটশ' ফুট উঁচু পঞ্চম শিবিরে প্রাতরাশ সারছিলাম। শেরপা আঙরিতা একটু আগে এনামেলের থালায় করে দু'খানা চামড়ার মত শক্ত পরোটা, খানিকটা মেটেভাজা, পর্ক ও লঙ্কার চাট্‌নি দিয়ে গেছে। আমি তখন সেগুলোর সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। সহসা চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা প্রচণ্ড শব্দ উঠল। মনে হল শতাধিক কামান যেন একসঙ্গে গর্জে উঠেছে। তার তীব্র ধ্বনি চারিপাশের তুষারশুভ্র গিরিগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস ব্যাকুল করে তুললো। তা'হলে কি সুন্দরী মানার গা থেকে ভয়ঙ্কর তুষার ধস্ ভেঙে পড়ল?

এমন তো হিমালয়ে হামেশাই হচ্ছে। এতে বিচলিত হবার কি আছে? কেননা হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে ধস্ নামা একটা সাধারণ ঘটনা। লোকচক্ষুর অন্তরালে বিধাতার বিরাট কর্মশালায় প্রলয়ের এ এক অদ্ভুত খেলা। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এখানে এমনি কতশত ঝুলন্ত বরফের চাঁই ভেঙে পড়েছে কে তার হিসেব রাখে!

আমরা মানা (২৩,৮৬০ ফুট) অভিযানে এসেছি। নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস গতকাল তাপস ভট্টাচার্য ও তিন-জন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁরা মানার ভয়াবহ উত্তর-পশ্চিম গাত্রে একটি শীর্ষারোহণ-শিবির প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্থির হয়েছে, আবহাওয়া ভাল থাকলে আজ ঐ শিবির থেকেই তাঁরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

আগে অবশ্য এ ধরণের কোন পরিকল্পনা ছিল না। ঠিক ছিল—এই পঞ্চম শিবির থেকেই শিখরাভিযান করা হবে। সেই ভাবেই আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল। তুষারপাত সমস্ত আশা-ভরসাকে ধূলিসাৎ করে দিল। আজ তিন দিন ধরে অবিরাম তুষারঝঞ্ঝা ও তুষারপাতের ফলে আমাদের অমানুষিক শ্রম দিয়ে গড়া পথ তুষার চাপা পড়ে গেছে। পঞ্চম শিবির ও মানার উত্তর-গাত্রের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত প্রান্তরে মানুষসমান উঁচু নরম তুষার জমেছে। অক্সিজেনের স্বল্পতাহেতু যেখানে উঠতে বসতে ফুসফুসের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, সেখানে তুষার কাদা ভেঙে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শীর্ষারোহণ অবাস্তব ও অসম্ভব। তাই ওঁরা কাল ঐ বিপজ্জনক পথটুকু অতিক্রম করে শীর্ষারোহণ শিবিরে এগিয়ে রয়েছেন, যাতে শিখরাভিযানের দিন অভিযাত্রীরা অযথা পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়েন। কিন্তু এ সব তো অতীতের কথা। আমি বিচলিত বর্তমানকে নিয়ে। ভাবছি ঐ বীভৎস শব্দটার কথা। শুনে মনে হচ্ছে খুব কাছাকাছিই কোথাও ভেঙেছে। শীর্ষারোহণ শিবিরের সন্নিকটে কি?

প্রাতরাশের থালাটা তাঁবুর ছোট্ট দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিই। তাড়াতাড়ি 'ক্যাম্পসু' পরে বাইরে বেরিয়ে আসি। শেরপা পাসাংশেরিং, আঙরিতা আর ঢুক্কেও হাতের কাজকর্ম ফেলে বাইরে ছুটে এসেছে। তাদের চোখে-মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। তাহলে কি আমার অনুমান মিথ্যে নয়? সবাই তাকিয়ে আছে সামনে—যেখানে মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। একহাত দূরের জিনিষও নজরে আসছে না। সুন্দরী মানা কুয়াশার ওড়নায় তার মুখখানি লুকিয়ে রেখেছে।

আমাদের কি কর্ত্তব্য? শীর্ষারোহণ-শিবিরে সহযাত্রীরা কেমন আছেন? গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। আমরা এগিয়ে যাবো কি? শেরপারা কি রাজি হবে?

শেরপারা যেমন নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই আবার তাঁবুতে গিয়ে ঢোকে। আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি তাঁবুর সামনে। ভাবতে থাকি সহযাত্রীদের কথা। আর তুষারধসের কথা।

প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি এই তুষার ধস্। গিরিগাত্র থেকে মাটি, নুড়ি, পাথর ইত্যাদি ভেঙে গড়িয়ে পড়লে তাকে এ্যাভালঞ্চ বা ধস্ বলে। ফরাসী 'এ্যাভালনস্' কথা থেকে ইংরেজী 'এ্যাভালঞ্চ' কথার উৎপত্তি।

এই তুষারধসের উপাদান বড় বিচিত্র। এক ইঞ্চির একশ' ভাগের একভাগ থেকে আধইঞ্চি ব্যাস পরিমিত বিভিন্ন আকারের তুষারকণার প্রত্যেকটি কণাই তুষারপাতের সময় আলগাভাবে পড়ে। দশ হাজার তুষারকণার পৃথক পৃথক ছবি নিয়ে দেখা গেছে—একটির সঙ্গে আরেকটির কোন সাদৃশ্য নেই। হিসেব করে দেখা গেছে—এক কিউবিক মিটার নরম তুষারের ওজন কুড়ি পাউণ্ডের কিছু কম হয়। অথচ ঐ সমপরিমাণ তুষারই যখন কালের ব্যবধানে কঠিন আকার ধারণ করে, তখন তার ওজন

বাইশ হাজার আটশ' ফুট উপরে পঞ্চম শিবিরে প্রাতরাশ সারছিলাম

দাঁড়ায় আঠারোশো পাউণ্ড। কাজেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কিউবিক মিটার পরিব্যাপ্ত বরফের চাঁই যখন সশব্দে পর্বতগাত্র থেকে খসে পড়ে, তখন নিচের অবস্থা হয় শোচনীয়।

সামান্য শব্দতরঙ্গ, রোদের উত্তাপে, বাতাসের চাপে ও তাপমাত্রার তারতম্যে এই তুষারস্তূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কখন ভেঙে পড়বে আগে থেকে জানা সম্ভব নয় বলে পর্বতারোহীরা সাধারণত একে এড়িয়ে চলেন। তবে লক্ষ্য করে দেখা গেছে সকালে রোদ উঠলে সূর্যতাপে সাধারণত এই ধরণের তুষারস্তূপগুলি সশব্দে ফেটে পড়ে। তবে একথা ঠিক যে, এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে-কোন সময়ে যে-কোন জায়গায় তুষারধস্ নামতে পারে।

তুষারধসের কবলে পড়ে বহু পর্বতাভিযাত্রী প্রাণ হারিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে জার্মান পর্বতাভিযাত্রীদের বিখ্যাত নাঙ্গাপর্বত অভিযানের কথা। গভীর রাত্রিতে অভিযাত্রীরা যখন তাঁবুর ভেতরে ঘুমে অচেতন, হঠাৎ আশেপাশের বিস্তৃত এলাকা কাঁপিয়ে তাঁদের তাঁবুর ওপরে তুষারধস্ ভেঙে পড়ে। পরে বরফের স্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকারীরা বহুকষ্টে নিহত অভিযাত্রীদের হিমশীতল দেহ খুঁজে বার করে।

তুষারধস্ প্রকৃতির মৃত্যুবাণ। কিন্তু মানুষ কখনও কখনও একে নিজের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়া-ইটালী সীমান্ত শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করার জন্য এই তুষারধস্কে সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে আল্পস পর্বতমালা থেকে ক্রমাগত তুষারধস্ সৃষ্টি করা হয়। ফলে বহু সৈন্য হতাহত হয়। হিসেব করে দেখা গেছে, যুদ্ধকালীন তিনটি শীতের ঋতুতে অন্যূন ষাট হাজার সৈন্য এই মনুষ্যসৃষ্ট তুষারধস্ চাপা পড়ে প্রাণ হারায়।

সহসা আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। দূর থেকে যেন একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। শেরপারা বেরিয়ে আসে বাইরে। আমরা উৎকর্ণ হই। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করি, যদি আর একবার শব্দটা শুনতে পারি। পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার শুনতে পেলাম কেউ আমাদের ডাকছে-পা-সাং--- প্রা-ণে-শ ---

আমরা অধীর আগ্রহে শব্দটা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। তারা আরো কি যেন বলছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

তবে কি আমার অনুমান সত্য? সত্যিই কি ওদের কোন বিপদ হয়েছে? ওরা কি তুষার ধসের কবলে পড়েছে?

অজানা আশঙ্কায় বুকটা কাঁপতে থাকে। আজ আটদিন আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পঞ্চম শিবিরে রয়েছি। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নিচের শিবিরে নেমে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ। বরফের গায়ে দড়ি লাগিয়ে সিঁড়ির মত ধাপ কেটে আরোহণ-অবরোহণের জন্য যে নিরাপদ পথ তৈরী করা হয়েছিল, তা তুষারপাতে চাপা পড়ে গেছে। আলগা নরম তুষার জমে সে পথ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সুতরাং নিচে নামতে হলে এখন জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

নিরবচ্ছিন্ন তুষারপাতের ফলে নিচের শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ। ফলে রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। খাবারের বড় টানাটানি চলেছে ক'দিন ধরে। তার উপরে কেরোসীন তেলও নিঃশেষপ্রায়। একবারের জায়গায় দু'বার জল খেতে গেলে চিন্তা করতে হয়। এখানে বহুক্ষণ ধরে গরম করলে বরফ জল হয়। তাই আমরা জল খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। শুধু সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়ার শেষে দু'মগ জল বরাদ্দ। অর্থাৎ পিপাসাও এখন বিলাসিতা।

আবার সেই শব্দ। এবারে আরো স্পষ্ট। কিন্তু আমি চমকে উঠি। এ যে করুণ আর্তচীৎকার। এ কি মৃত্যুপথযাত্রীর আকুল-আহ্বান। দিশেহারা হয়ে পড়ি। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শেরপাদের এগিয়ে যেতে বলি। আমি ওদের অনুসরণ করি।

কুয়াশাচ্ছন্ন পথ। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত অব্যাহত। বাতাসের বেগও বেড়েছে। আমরা তুষার-কাদা ভেঙে অগ্রসর হচ্ছি। জানিনা কখন ওদের সঙ্গে দেখা হবে। জানিনা ওরা কেমন আছে। এলোমেলো নানা দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ছি। আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব।

চমকে উঠি। ছায়ার মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। মানুষ কি? হাঁা। তাই তো মানুষ। আমার সহযাত্রী। কে? পাসাং ফুতার? কিন্তু সে একা কেন? আর সকলে আমার দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে। ভাবলাম ছুটে এগিয়ে যাই তার কাছে। জিগ্যেস করি সঙ্গীদের কথা। কিন্তু পারলুম না। না জানি কি শুনতে হবে। এখুনি বুঝি পা টলে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ব বরফের উপরে।

ধীরে ধীরে পাসাং আসে কাছে। একদিনের ভেতরে সে যেন শুকিয়ে গেছে। তাকে বড় বেশী রুগ্ন ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। জিগ্যেস করি—কি খবর পাসাং?

কোন জবাব দেয় না সে। বোধ করি পারে না। অস্ফুটস্বরে শুধু বলে—জল, একটু জল।

আমরা ফিরে আসি তাঁবুতে। পাসাং শুয়ে পড়ে এয়ারমেট্রেসের ওপর। আমি তাকে জল এনে দিলুম। এক চুমুকে মগের জল নিঃশেষ করে সে আবার শুয়ে পড়ে। চোখ বোজে। তবে

[illegible]

কি আর কেউ নেই? তা হতে পারে না। পাসাং একটু সুস্থ হলে নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু কখন বলবে? কি বলবে? আমার মন মানছে না। আমার বুকের ভেতর তোলপাড় করছে—ওরা কোথায়? আমার প্রিয় নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস, প্রিয় সহযাত্রী তাপস ভট্টাচার্য। প্রিয় শেরপা শেরিং লাকপা ও গ্যালজেন।

পাসাং অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমি একবার তাঁবুতে আসছি, একবার বাইরে বেরুচ্ছি। অনেকক্ষণ কেটে যায়। কিন্তু কেউ আসে না, আসে না আমার সহযাত্রীরা, যাদের থেকে বেশী আপন আজ আমার কেউ নেই এ সংসারে। নিশ্চয়ই মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি কি করব? কোথায় যাব? আমি একা।

ওকি হচ্ছে মানুষের কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি। আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকি। হ্যাঁ, শব্দটা বাড়ছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ। নরম বরফের উপর দিয়ে হেঁটে আসার শব্দ। এবারে দেখাও যাচ্ছে কয়েকটি বিন্দু। অস্পষ্ট নেই। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেদিকে ছুটে চলি। হ্যাঁ এসেছে। ওরা ফিরেছে। বিশ্বদেবদা, তাপসদা, শেরিং লাকপা আর গ্যালজেন। তুষার গাঁইতিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদল শিবিরে ফিরেছে। আমার সহযাত্রীরা আমার কাছে আসছে।

তুষারকাদা ভেঙে আমি আরো এগিয়ে আসি। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি। কান্নায় আমার বুক ভেঙে যায়। ওরা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। ওরা ভাল আছে। তবে ওরা খুবই ক্লান্ত, অবসন্ন। তা হোক্, কিন্তু অক্ষত দেহে ওরা এসেছে ফিরে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে। আমি ওদের জড়িয়ে ধরি।

কিছুক্ষণ পরে। গরম কফির মগে চুমুক দিতে দিতে শুনি দুর্ঘটনার কথা। বলেন বিশ্বদেবদা আর তাপসদা। বলেন তুষারধসের কাহিনী। জাগ্রত যৌবনের স্বপ্নকে নিষ্ফল করার জন্য ছলনাময়ী মানা চরম অস্ত্র হেনেছিল। একটি বিরাট তুষারধস্ শীর্ষারোহণ-শিবিরের উপর নামিয়ে দিয়েছিল মানা। সে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করছে। আমরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।

বিশ্বদেবদা বলেন—গতকাল শিবির প্রতিষ্ঠার পরে আমরা সকলেই তাঁবুতে বসে চা পান করছি আর শিখরের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হল শিখর যেন হাতের মুঠোয়। অকস্মাৎ গোধূলির ম্লান আলোতে একটি তুষারধস্ ভেঙে পড়ল। কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের, সে ধস্ তাঁবুকে স্পর্শ করতে পারেনি। উত্তরগাত্রের ঠিক নিচেই গভীরখাদে পড়ে তা নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সাবধানের মার নেই ভেবে আমরা কাল সারারাত বসে কাটাই। আশেপাশে কোথাও তুষারধসের শব্দ শুনলেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি আত্মরক্ষার জন্য। এইভাবে আমাদের রাত কেটেছে।

রাত পোহাল। আমরা তখন তাঁবুতে। চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শেরপারা চা তৈরী করছে। তাপস ক্লাইম্বিং সু' পরছে। আমি ক্যামেরা নিয়েছি। আর ঠিক তখনই সেই বিপর্যয়। অকস্মাৎ সমুদ্রগর্জ্জনের মত বিপুল শব্দে ভেঙে পড়ল তুষারধস্। মনে হল আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে পৃথিবী একনিমেষে মুছে যাচ্ছে।

আমরা হতবাক্, বিহ্বল, বিমূঢ়। ভগ্নতুষারস্তূপ খান্ খান্ করে ভেঙে আছড়ে পড়ছে তাঁবুর উপর। শেরপাদের চীৎকার করে ডাকলাম। সাড়া নেই। ছিটকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। তাপসও কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে এল। তুষারচাপা পড়ল তাঁবু। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারকণা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। সেই ঘন তুষারকণার মধ্যে বাতাস টেনে নিতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম। মনে হলো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এক্ষুণি মারা যাব।

তারপর কতকগুলি চরম মুহূর্ত কেটেছে। অল্পবিস্তর আঘাতে আমরা দিশেহারা। শেরপারা তুষারস্তূপের অভ্যন্তর থেকে মালপত্র বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তবে তার জন্য কোন ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ শুধু মানার শীর্ষকে আমরা আজ স্পর্শ করতে পারলুম না। তার তুষারধবল শিখরে দাঁড়িয়ে তাকে আমরা আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারলুম না।

বিশ্বদেবদা থামলেন। বাইরে তখন প্রবল তুষারপাত শুরু হয়েছে। চারিদিক কেমন ঘষা কাচের মত ঝাপসা। তবে কি মানা সত্যিসত্যিই আমাদের পথ দেবে না। শুধু ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হবে। আমাদের এত দুঃখ কষ্ট কি তাহলে বিফল হবে?

সব আলো নিভে গেলে

মনোময় চক্রবর্তী

আমার পুষ্পিত মন অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা আমার
জীবনের সুখস্মৃতি ঈষদুষ্ণ ক্ষণিক আবেগ
কম্পিত বাসনা এবং স্পৃহণীয় দুর্লভ চেতনা
সমস্ত তোমার পায়ে স্ব-ইচ্ছায় করি সমর্পণ।

ফলোন্মুখ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত এই বর্তমান
অস্থির বিশ্বাস এবং কোনো কোনো নিবিড় সান্ত্বনা
আমার প্রার্থিত সুখ অনিবার্য জীবন উচ্ছ্বাস
সমস্ত তোমার পায়ে স্ব-ইচ্ছায় করি সমর্পণ।

পৃথিবীর সব আলো নিভে গেলে সমস্ত লালসা
তোমার করুণা চাই মনোরম তোমার দাক্ষিণ্য;
অবশেষে কেউ নেই অনির্বাচ্য অপার শূন্যতা
অখণ্ড বিশ্রাম চাই অনুপম শান্তির লালিকা।

বিলাতের চিঠি

॥ চার ॥

নিঃসঙ্গ চিকিৎসক

লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্র-নিবাসে গেছি ডাঃ যোশীর সঙ্গে দেখা করতে। অনেক খোঁজ-খবরের পর দক্ষিণী বেয়ারা এসে খবর দিল—তাঁর নাকি ফিরতে রাত হয়। আর একমাত্র রবিবার দুপুরে এলে ওঁর দেখা মিলতে পারে। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম, আবার রবিবারে চেষ্টা করতে হবে।

ভদ্রলোক আমাদের অনেক দিনের বন্ধু—আমার স্বামীর সঙ্গে কাজ করতেন। বিলাতে এসেছেন এফ আর সি এস হতে। ভাল করে পড়াশুনা করার জন্য কিছুদিন মাত্র চাকরী করেই সামান্য সঞ্চয় করে লণ্ডন চলে এসেছেন।

সারাদিন লাইব্রেরী, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ঘুরে পড়াশুনা করেন আর থাকেন ভারতীয় ছাত্র-নিবাসের একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া করে। ভদ্রলোক চিঠিতে আমাদের লিখেছিলেন খুবই নিঃসঙ্গ জীবন—ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোনরকমে দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাই লণ্ডনে ইস্টারের ছুটি কাটাতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার তাগিদটা একটু বেশীই ছিল।

যাই হোক, এসে গেল রবিবার। দুজনে সামান্য কিছু লাঞ্চ করে ছুটলাম টিউব স্টেশনের দিকে। শুনেছি লণ্ডনের টিউব ট্রেন নিউ ইয়র্ক ইত্যাদির টিউব ট্রেনের থেকেও অনেক দ্রুতগতি। আর সেই দ্রুতগতি টিউবের সঙ্গে তাল রেখে লণ্ডনবাসীরাও যেন দিনরাত ছুটছে .

রবিবারে দেখলাম অন্য দিনের চেয়ে ভিড়ের চাপটা একটু কম। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যিক চার্লস ল্যাম্বের একটি রচনায় পড়েছিলাম রবিবার নাকি লণ্ডনের চেহারা যায় বদলে—সেদিন সব বন্ধ। কেবল ক্ষণে ক্ষণে শোনা যায় চার্চের ঘণ্টাধ্বনি আর রাস্তায় রাস্তায় চোখে পড়ে ছুটি পাওয়া ভৃত্য-দলের ক্লান্ত মুখচ্ছবি। কিন্তু ল্যাম্ব যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁকে এই ধারণা পাল্টাতে হোত। রবিবারেও পথে-ঘাটে লোকের বিরাম নেই—বহু দোকানই খোলা রয়েছে—আর টিউবেও বেশ ভিড়।

যাই হোক, সব কিছু সামলে 'হোবর্ন স্টেশনে' যখন থামলাম, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। স্টেশন থেকে ভারতীয় ছাত্রনিবাস, ৮৯, গীলফোর্ড স্ট্রীট, বেশী দূর নয়। হেঁটেই চলে যাওয়া যায়।

ভারতী মুখোপাধ্যায়

ওয়েটিং রুমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাঃ যোশী যখন ঘরে ঢুকলেন, আমরা দুজনেই তাঁকে দেখে হাস্য-বিনিময় করার বদলে চমকে উঠলাম। সেই লম্বা, চওড়া, জোয়ান চোদ্দ স্টোন ওজনের মানুষটি অন্তত দু স্টোন কমে গেছেন।

আমাদের দেখে তাঁর চির-পরিচিত অট্টহাসির বদলে একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—'আমি খুব দুঃখিত সেদিন ছিলাম না বলে। আপনারা কবে লণ্ডন এসেছেন?'

আমরা হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে আলাপে নেমে এলাম।

এবারে আমি যা লিখব তা আমার ডাঃ যোশীর সঙ্গে কথা বলার পর একদিনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা নয়। পথে-ঘাটে বহু ডাক্তার, পরিচিত-অপরিচিত সকলের সঙ্গে কথা বলে বিলাতে ভারতীয় ডাক্তারের জীবন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটিই আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

যাঁরা এদেশে এসে পাশ করে বা ট্রেনিং নিয়ে ভারতে ফিরে গেছেন, জানি না তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার এই রচনা কতখানি মিলবে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে যে শত শত ভারতীয় ডাক্তার রয়েছেন অন্তত তাদের কিছু অংশের সঙ্গেও আমার আলাপের সৌভাগ্য হয়েছে। আর তাঁরা অন্তত আমার এই বর্ণনাকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

ডাঃ যোশীর করুণ কণ্ঠ কানে ভাসছে—'আমরা দুশো বছর ইংরাজের দাস ছিলাম, মাত্র কুড়ি বছরে কী সেই দাসত্বের আচরণ কাটিয়ে উঠতে পারি? বোম্বের উজ্জ্বল ছাত্র শ্রীযোশী এম বি বি এস পাশ করে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এম এস হয়ে চলে এলেন, এদেশে এফ আর সি এস-এর জন্য।

কোন বড় শহরে তাঁর চাকরী জুটল না, চলে যেতে হল কভেণ্ট্রি থেকে ২০ মাইল দূরে একটা ছোট্ট শহরে। প্রথমে তাঁর কোন ক্ষোভ হয় নি। বড় হতে গেলে অনেক কষ্টই সহ্য করতে হয়। সেই আশাতেই মুখ বুজে, হাসপাতালের উপরওয়ালাদের অবজ্ঞা সয়ে পড়াশুনা করে যেতে লাগলেন প্রাইমারী এফ-আর-সি-এস-এর জন্য। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও কৃতকার্য না হয়ে লণ্ডন চলে আসেন চাকরী ছেড়ে পুরো সময় পড়াশুনা করার জন্য।

তৃতীয়বারের চেষ্টাও বিফল হয়েছে—ভদ্রলোক নিজে যথেষ্ট ভাল ছাত্র ছিলেন, তাই এইভাবে আঘাত পেয়ে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছেন। বললেন, জানি না কেন ভারতীয় অথবা কালো ছাত্ররা এইভাবে বছরের পর বছর ফেল করে।

শুধু তাঁর কথা শুনে নয়, আমি নিজেও লণ্ডনের রয়াল কলেজে গিয়ে দেখেছি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নব্বই ভাগ কালো, আর দশ ভাগ সাদা। কালোদের মধ্যে পড়ে ভারত, পাকিস্থান, আফ্রিকা

আর মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশের ছেলে-মেয়েরা। আর তাঁদের খুব কম অংশই একবার বা দুবারে পাশ করেন।

আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে এক ডাক্তার ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন: 'এদেশের পরীক্ষকরা মনে করেন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সমান নয়। সেইজন্য প্রাচ্যদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাতে সহজে এ দেশের মেম্বারশিপ বা ফেলোশিপ না পেতে পারে তার জন্য এই কড়াকড়ি ব্যবস্থা।

কারণ তাঁদের মতে বিদেশী ছাত্ররা এইসব ডিগ্রী নিয়ে যখন নিজেদের দেশে ফিরে যাবে, তখন হাসপাতালের বা সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের বড় বড় পদগুলি পেতে তাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু বিলাতী ডিগ্রী সহ এইসব পদ পেতে গেলে যে জ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্রে যে দক্ষতা থাকা দরকার, তার জন্য বেশ কিছু সময় লাগে। যে জ্ঞানের একান্ত অভাব নাকি দেখা যায় প্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে—সেইজন্যই তাঁদের এই ডিগ্রী-গুলি অর্জন করতে এত বার এবং এত বছর লেগে যায়। এই একই কারণে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একটি ছাত্রের এম আর সি পি বা এই ধরণের ডিগ্রী নিতে যে সময় লাগে—পাকিস্তানী বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা একটি ছেলের তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে। কারণ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের তফাৎ।'

কিন্তু এ কথাটা কি সত্যি? অনেক ভেবে, অনেককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি—না। একথা যদি সত্যি হোত তবে ট্রেনিং অর্থাৎ টিচিং হাসপাতালগুলিতে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ছেলে-মেয়েরা প্রথমেই ঢোকার সুযোগ পেত। শুধু তাই নয়, প্রতিটি হাসপাতালের পরামর্শদাতাদের দৃষ্টি থাকত এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের উপর।

ইংল্যাণ্ডে বিদেশ থেকে আসা ছেলে-মেয়েরা সহজেই বড় শহরে চাকরী পেত তাদের লাইব্রেরী কোর্স ইত্যাদির সুবিধার জন্য। কিন্তু এগুলির কোনটিরই সুযোগ তারা পায় না। যারা পায়, সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে আট ভাগ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল 'লং কোর্স' হয়, তাতে কালোদের সংখ্যাই বেশী কিন্তু 'সর্ট কোর্সে'-এ নির্দিষ্ট ৫০টি আসনের মধ্যে ৪৮ জন সাদা ছেলেমেয়ে দু'জন হয়তো কালো—তাও খোঁজ নিলে দেখা যাবে হয়তো এদের উপরওয়ালারা এদের ঢুকিয়েছেন।

ভাল হাসপাতালের ভাল ভাল পদগুলি অর্থাৎ সিনিয়র রেজিস্ট্রার বা জুনিয়র ও সিনিয়র কনস্যালট্যাণ্ট ইত্যাদি পদগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাদা ছেলেদের জন্যই নির্দিষ্ট।

ইংল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল হেলথ সার্ভিসের বয়স ২০ বছর। দেশের সব হাসপাতাল একভাবে গঠিত। অর্থাৎ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পদের বেতনও যেমন সারা দেশেই নির্দিষ্ট, তেমনই সব হাসপাতালই ওষুধ, রক্ত, যন্ত্রপাতি, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি নানা ব্যাপারে সমান সুযোগ পায়। প্রতি হাসপাতালে সার্জারী, মেডিসিন, গাইনি-মেটার্নিটি ইত্যাদি প্রতিটি বিভাগে প্রথমেই সিনিয়র কনসালট্যাণ্ট, তারপর জুনিয়র কনস্যালট্যাণ্ট—ক্রমে ক্রমে সিনিয়র ও ও জুনিয়র রেজিস্ট্রার তারপর সিনিয়র ও জুনিয়র হাউস অফিসার।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সিনিয়র ও জুনিয়র হাউস অফিসারের মধ্যে আশি ভাগ বিদেশ থেকে আসা ডাক্তার, জুনিয়র রেজিস্ট্রারদের মধ্যে ষাট ভাগ বিদেশী আর উপরের পদগুলিতে বিদেশীর সংখ্যা শতকরা দুই থেকে পাঁচ।

যোগ্যতা থাকলেও কেন তারা এই পদগুলি পায় না বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলিতে সহজে সুযোগ পায় না, তার কারণ পাঁচ, দশ বছর আগে কী ছিল জানি না কিন্তু আজ টেলিভিশন আর খবরের কাগজের পাতা চোখ রাখলেই বোঝা যাবে।

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই কনজার-ভেটিভ দলের এনোক পাওয়েলের এদেশের ইমিগ্র্যাণ্টদের উপর দেওয়া বক্তৃতার কিছু না কিছু অংশ পড়েছেন বা শুনেছেন। সেই থেকেই ইমি-গ্র্যাণ্টদের উপর এদেশের বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা যত বাড়ছে ইমিগ্র্যাণ্ট ডাক্তারদেরও কর্মদক্ষতা এমন কী তাদের ইংরাজী ভাষায় কতখানি দখল সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে গার্ডিয়ান লিখছে:

"Hospitals have been told to tighten up their selection procedure for foreign doctors, to make sure that they speak good enough English before they are given a job.... in casualty work the patient's chances of quick diagnosis and treatment could suffer if the doctor in charge lacks a good grasp of colloquial English. Communication is also of particular importance in psychiatry."

ভেবে দেখতে গেলে কথাটা হয়তো অনেকাংশে সত্যি। ছোটবেলা থেকে ইংরাজী পড়া থাকলেও এ-দেশের উচ্চারণ বুঝতে নতুন অবস্থায় অনেক অসুবিধা হয়। কিন্তু তা হয়ত সাময়িক। তার জন্য 'সিলেকশন টা টেন আপ' করতে হবে কেন? নতুন আসা ছেলেমেয়েরা বিলাতী উচ্চারণের সম্মুখীন না হলে নিজেদের জড়তা এড়াবে কী করে?

এ তো গেল ভাষার কথা। এবার একটু ট্রেনিং-এর কথায় আসা যাক্। টেলিভিসনে একদিন এদেশের এক সাহেব কনসালট্যাণ্টের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল ইংল্যাণ্ডের বিদেশী ডাক্তারদের উপর।

কথায় কথায় তিনি বললেন: কেন আমরা তাদের ট্রেনিং দেব—অপারেশনের সূক্ষ্ম কলাকৌশল ইত্যাদি শিখিয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের লাভ কী?

তারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এদেশে আসে উচ্চতম ডিগ্রী লাভের আশায়। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কয়েক বৎসর পর নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করে নিজের দেশে ফিরে যাবে। তাতে আমার দেশের —ইংল্যাণ্ডের লাভ হল কী? যদি এদেশের উপকারেই তারা না এল—শুধু শুধু আমরা তাদের নিজেদের স্থান বিলিয়ে দেব কেন?

খাঁটি দেশপ্রেম সন্দেহ নেই। আর নিজের মধ্যেও সেই দেশপ্রেমই অনুভব করে সাহস করে বলে ফেলছি—আর কেন? তরুণ ডাক্তারদল, এবার আপনারা বিলাতের মোহ ত্যাগ করে দেশটাকেই আঁকড়ে ধরুন না।

হয়ত ভাববেন, নিজেরা বিলাতে বসে উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু তা নয়। প্রাচ্য জগতের অন্য দেশগুলির কথা জানি না। কিন্তু ভারতীয়দের কথা বলতে পারি—তাদের হৃদয়ের অনুভূতিকে সামনে রেখে বলছি, কত কষ্ট ও বেদনা দিয়ে একটা ডিগ্রী অর্জন করতে হয়।

রঙিন স্বপ্ন নিয়ে যারা এদেশে আসে, প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে কতখানি কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন যে হতে হয়, প্রথমে তা বোঝা সম্ভব নয়। হয়ত টাকা ভোগবিলাস আমাদের দেশের দ্বিগুণ কিন্তু তা নিয়েই তো জীবন নয়। সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে কোন সান্ত্বনা, আলো, আশা নেই। ভবিষ্যতের কঠোর জীবন পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন—আরও অসহ্য যদি সেই পরীক্ষাতেই বারবার আসে অসাফল্য।

পরীক্ষা কী নিজেদের দেশে নেই? এফ আর সি এস-এর বদলে এম এস কিংবা এম আর সি পি-র বদলে এম ডি তার মধ্যে কি দুঃস্বপ্ন চিন্তা নেই? আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে এই চিন্তাটা নেই—আমার রং কালো, আমার ইংরাজ পরীক্ষকদের জড়ানো উচ্চারণ বোঝার হয়ত অসুবিধা হতে পারে, আমার ইংরাজী আদব কায়দাটা এখনও ঠিক রপ্ত হয় নি। হ্যাঁ, এগুলিও পরীক্ষার দুস্তর বাধার এক একটি। থ্যাঙ্ক ইউ বলতে ভুল হলেও বহু পরীক্ষক আছেন, যাঁরা অখুশী হতে পারেন।

এদেশে ডাক্তারের অভাব—তাই এখনও বিদেশ থেকে ডাক্তার এরা আমদানী করে। বিলাত আসতে গেলে যে 'জব ভাউচারের' প্রয়োজন, তা একমাত্র নার্স ও ডাক্তাররাই সহজে পেয়ে থাকেন। কিন্তু ডাক্তারদের নিজেদের মুখেই শুনেছি—দু'বছর ভাল ভাল কাজেরও একান্ত অভাব হয়ে পড়েছে। এদেশে চাকরী পাওয়ার পদ্ধতি হোল প্রতি সপ্তাহে বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল-এ সারা দেশের সমস্ত হাসপাতালে যত চাকরী খালি আছে, তাদের বিজ্ঞাপন বেরুবে—সেই দেখে নিজের পছন্দমত দরখাস্ত করতে হবে।

এক একটি চাকরীর জন্য প্রায় পঞ্চাশ- টিটি দরখাস্ত পড়ে। তার থেকে ডাক আসে হয়ত পাঁচ জনের এবং যাতায়াতের খরচাও দেওয়া হয়। কিন্তু আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাকরীর জন্য লোক ঠিক করে শুধু প্রহসনের জন্য আঞ্চলিক বোর্ডের নিয়মানুযায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এক হাসপাতালের কনস্যালট্যাণ্ট তাঁর বন্ধু অন্য হাসপাতালের কনস্যালট্যাণ্টকে ফোন তুলে তাঁর পুরনো ছাত্রকে নিতে অনুরোধ করেন। তার চাকরী নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

আর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্যজনকে ফিরে আসতে হয়। তা ছাড়া ভারতীয় বা অন্য প্রাচ্যদেশের ডাক্তারদের অসুবিধা এই যে, তাদের নিজেদের দেশের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রীর কোন মূল্যই এরা দেয় না। কলকাতা বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা এম এস, এম ডি, এম ও-কে এরা নিজেদের দেশের এম বি বি এস এর সমান মনে করে। তাই তাদের পড়ে থাকতে হয় 'পেরিফেরাল' হাসপাতালের হাউস অফিসার হয়ে।

স্বাধীনতার পর তো ২২ বছর কেটে গেল। এবারেও কী আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সময় হয় নি? বিলাতী ডিগ্রীর মোহ ত্যাগ করে তরুণ ডাক্তাররা নিজেদের দেশের ডিগ্রীকেই যদি চরম বলে মনে করতে পারেন—তবেই একমাত্র আশা। তাঁদের ভূতপূর্বরা বিলাত থেকে পাশ করা —এইজন্য পরবর্তীদেরও সেই পথ অবলম্বন করতে হবে, তার কী মানে আছে? নবযুগের কর্ণধারদের তো নতুন পথে চলার কথা। দূর থেকে সব জিনিষই রমণীয়, কিন্তু কাছ থেকে তার চেহারা অন্য।

শরৎচন্দ্রের উক্তির অনুসরণে বলি—আমি এ সমস্যার সমাধান করছি না। পাঠক-পাঠিকাদের সামনে সমস্যাটা তুলে ধরছি মাত্র। সমাধানের ভার তাঁদের হাতে। এক বাঙালী মেয়ের অনুভূতিপ্রবণ মনে বিলাতে ভারতীয় চিকিৎসকদের জীবন যে প্রভাব ফেলেছে—সেটিই শুধু তুলে ধরলাম।

ম্যাণ্ডেভিলের ভ্রমণ-কাহিনী

দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে তারই ওপরে ভিত্তি করে লেখা ভ্রমণকাহিনী আমরা আজকাল হাতের কাছে অনেকই পাই। অজানা দেশের বৃত্তান্ত জানতে জ্ঞানপিপাসু মানুষমাত্রই উৎসুক; তার উপর লেখকের লেখনীশক্তির গুণে লেখা যদি মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তাহ'লে অতি সাধারণ স্তরের একখানা ভ্রমণকাহিনীও অতি সহজেই পাঠকের কাছে উঁচু সমাদর লাভ করতে পারে। কিন্তু বিনা দেশ-ভ্রমণে ও ঘরে বসে কল্পনায় রাঙিয়ে এক মিথ্যা ভ্রমণকাহিনীও যে শুধমাত্র লেখকের সৃজনী-শক্তির গুণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষকে চমৎকৃত ও অভিভূত করে রাখতে পারে, স্যার জন ম্যাণ্ডেভিলের ভ্রমণকাহিনী তারই এক জ্বলন্ত নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে এই বই-এর লেখক কোনও সময়েই দেশ ভ্রমণ করেন নি। শুধুমাত্র লাইব্রেরীতে বসে ও নানা বই-এর সাহায্যে তিনি তাঁর ঘরে এমন এক কল্পনার মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন যে, কোন এক সময়ে তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনীখানি ইউরোপের ঘরে ঘরে স্থান পেত।

স্যার জন ম্যাণ্ডেভিলের ভ্রমণ-কাহিনীখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ফরাসী ভাষায় সম্ভবত ১৩৫৬ অথবা ১৩৫৭ সালে। বইখানি প্রকাশের সাথে সাথেই গভীর জনপ্রিয়তা লাভ করে ও অতি শীঘ্রই সেই বই ল্যাটিন ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ১১টি ভাষায় অনূদিত হয়। ক্রমে এই বই-এর খ্যাতি সারা ইউরোপে এমন ছড়িয়ে পড়লো যে, লোকে অধীর আগ্রহের সাথে একখানা এই বই-এর জন্য অপেক্ষা করতো এবং কোনমতে একবার হস্তগত হ'লেই একনিশ্বাসে সেখানি প'ড়ে শেষ না করে থাকতে পারত না। এমন নিখুঁতভাবে এমন সব উদ্ভট কাহিনীকে লেখক তাঁর বইতে 'চাক্ষুষ দেখেছেন' বলে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সে-যুগের মানুষ তাঁর কাহিনী পড়ে চমৎকৃত, স্তব্ধ ও অভিভূত হ'ত।

যে সমস্ত অদ্ভুদ অদ্ভুত কাহিনী সেই বইখানিতে স্থান পেয়েছিল, সেসব পড়ে এ যুগের যে-কোন পাঠক এমন অবিশ্বাস্য ও মিথ্যা ভ্রমণকাহিনী কি ক'রে বিশ্বাস করেছিল, ভেবে বিস্মিত হ'ত, অথচ সে সব কাহিনীর বাস্তবতা বা অসামঞ্জস্যতা সম্বন্ধে সে-যুগের

শ্রীঅঞ্জলি রায়

মানুষের মনে কখনই এতটুকুও সন্দেহ দেখা দেয় নি। অবশ্য এ সবই সম্ভব হয়েছিল তখনকার প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের জন্য। দূর তখন মানুষের কাছে অনেকটাই দূর ও বহির্জগৎ-সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। তাছাড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন সব কিছুই উদ্ভট বর্ণনাকেই বিনা বিশ্লেষণে সত্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। সেই কারণেই লোকের চাহিদা মেটাতে সে সময়ে পৃথিবীর ১১টি ভাষায় এই বই-এর অনুবাদ সম্ভব হয়েছিল।

যা হোক, এই ম্যাণ্ডেভিলের ভ্রমণ-কাহিনীখানি সাধারণত ২টি অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশে ইহুদী-দিগের তীর্থভূমি প্যালেস্টাইনের ও তার যাত্রাপথের বিবরণ ও অপর অংশে সুদূর এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। সমস্ত কিছুই এত সুন্দর ভাবে ও এত দৃঢ়তার সাথে লেখক বর্ণনা করেছেন যে, পাঠকবর্গের মনেই হয় নি সেসব অলীক কল্পনার সৃষ্টি।

বইখানিতে বিবৃত কিছু ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। যেমন হীর

[illegible]

সম্বন্ধে লেখা ছিল,—লেখক নিজের চক্ষে দেখেছেন হীরা একরকমের প্রাণী। স্ত্রী-হীরা ও পুরুষ-হীরা একত্রে বসবাস করে। তাদের সন্তানসন্ততিও যথানিয়মে হয় এবং তারা শিশিরবিন্দু দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ক্রমে বড় হ'তে থাকে। আরো লিখেছেন যে, যদি কোনও মানুষ কোনও হীরকশিশুকে একটুকরো পাথরের সাথে একত্রে রেখে দেয় ও শরতের প্রভাতকালীন শিশিরবিন্দু দিয়ে তাদের অভিষিক্ত করে, তাহ'লে সেই শিশুহীরা ক্রমশ বড় হ'তে থাকে সারা বছর ধ'রে—এ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

তাঁর মতে মুক্তা যেমন ভাবে ভগবানের অসীম ক্ষমতায় শিশিরের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, হীরাও একইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোরিয়া সম্বন্ধে লেখা ছিল যে, কোরিয়া একটি সুন্দর রাজ্য। সেখানে একরকম ফল পাওয়া যায়, দেখতে অনেকটা কুমড়োর মত। একটি পাকা ফল কেটে ২ ভাগ করলে তার ভেতরে রক্তমাংসপূর্ণ একটা ছোট্ট প্রাণী দেখা যায়, যা দেখতে অনেকটা ছোট্ট একটি ভেড়ার মত। আশ্চর্যের বিষয় যে, সেখানকার লোকেরা সেই প্রাণীসহ ফলের সবটাই খায়। এই বিবরণ দিয়ে লেখক লিখেছেন যে, এতে ভগবানের সীমাহীন ক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে সেই ফল খেয়ে দেখেছেন, খেতে বেশ সুস্বাদু।

এই ধরণের বহু অবাস্তব ও হাস্যকর বিবরণ সেই বইখানিতে ছিল এবং এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে এসব সত্ত্বেও তখনকার পাঠকদের কাছে এই বই এত সমাদর লাভ করেছিল। তাহ'লেই বোঝা যায় সে যুগে মানুষ কতখানি অন্ধকারের রাজত্বে বাস করতো যার ফলে বইতে লিপিবদ্ধ কোনো কিছু দেখলেই তারা সেটা সত্যি বলে বিশ্বাস করতো।

লেখক সে যুগের মানুষের প্রকৃতি কিছুটা জানতেন বলেই অকাতরে মিথ্যা কাহিনীগুলো সত্যি বলে লোকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী আগাগোড়াই এক বিরাট ধাপ্পা এবং লেখক সত্যই প্রাচ্যের এই সব দেশে কোনো দিনই ভ্রমণ করেন নি। এই ধূর্ত লেখক পুরানো দিনের বিভিন্ন ভ্রমণকাহিনীগুলির অংশবিশেষ নিয়ে এই কাহিনী রচনা করেছিলেন।

তাঁর বইখানিতে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্বন্ধে মৌলিক বিবরণের এমনই অভাব যে, তিনি কোনদিন লাইব্রেরীর বাইরে বেশীদূরে কোথায়ও বেড়াতে গেছেন কি না, সে সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে।

পরে দেখা গেছে যে, বইখানির প্রথম অংশ যেখানে পবিত্রভূমি জেরুজালেম সম্বন্ধে লেখা আছে, তার জন্য লেখক উইলিয়ম দ্য বলডেন্সেলের লেখা অনুসরণ করেছিলেন। পরবর্তী অংশের ভ্রমণকাহিনীর জন্য তিনি পোরডেননের ফ্রায়ার ওডরিকের লেখা প্রাচ্যের ভ্রমণকাহিনীর সাহায্য নেন।

অন্যান্য অংশের জন্য তিনি সে যুগের বিভিন্ন বিশ্বকোষগুলি থেকে বিবরণ সংগ্রহ করেন।

এই কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনীটির প্রকৃত লেখক কে, সেটাও বহুদিন পর্যন্ত রহস্যাবৃত ছিল। বইখানির ভূমিকায় লেখক নিজেকে নাইট্ উপাধিধারী স্যার জন ম্যাণ্ডেভিল নামে পরিচয় দিয়েছেন। আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর আদি বাসস্থান ইংল্যাণ্ডের আলবামা অঞ্চলে এবং সেখান থেকে তিনি ১৩২২ সালে জেরুজালেমের পথে পবিত্র তীর্থযাত্রায় বাহির হন।

দেশবিখ্যাত একজন লেখকের প্রতিবেশী হিসাবে সেণ্ট আলবামার অধিবাসিবৃন্দ বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের গর্বিত বোধ করত।

কিন্তু ম্যাণ্ডেভিলের মৃত্যুর পর তাঁর নামে কোনো কবরের অস্তিত্ব সেখানে পাওয়া যায় নি এবং কেন পাওয়া যায় নি, তার কোনও সদুত্তরও আলবামাবাসীরা দিতে পারেনি।

অবশেষে ১৭৯৮ সালে ফরাসীদেশে লিজে ওইলেমিনের চার্চের কাছে জন্ ম্যাণ্ডেভিল নামে খোদিত এক কবর পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। লিয়েজের জাঁ দ্য আঁত্র্যামা নামে এক ব্যক্তি ম্যাণ্ডেভিলের ভ্রমণকাহিনীর লেখকের এক ভিন্ন পরিচয় দেন। আঁত্র্যামা তাঁর নিজের লিখিত ইতিহাস বইতে এক বৃদ্ধ ব্যক্তির উল্লেখ করে লেখেন যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় আঁত্র্যামার কাছে নিজেকে জন্ ম্যাণ্ডেভিল ও মণ্টফোর্ডের আর্ল নামে পরিচয় দেন।

আরও উল্লেখ আছে যে, এই জন্ ম্যাণ্ডেভিল ইংল্যাণ্ডে বসবাস করতেন এবং ১৩২২ সালে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করায় পুলিশের চোখকে ধূলা দেবার জন্য তখন থেকে জ্যা দ্য বুর্জো এই ছদ্মনাম গ্রহণ করে দেশত্যাগ করেন।

দেশত্যাগের পর তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হন এবং প্রথমে জেরুজালেম ও পরে পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেন। অবশেষে ১৩৪৩ সালে তিনি লিজে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন একজন ডাক্তারের উপদেশে তিনি এই ভ্রমণ কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উৎসাহিত হন। কিন্তু আঁত্র্যামার বিবৃতিতেও অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

দেখা যায় যে, ১৩২২ সালে কোনো এক ব্যক্তি দুষ্কৃত কার্যের জন্য আদালতকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে পলায়ন করেন যাঁর নাম জোয়ান দ্য বুর্জো। এখন মনে হয় এই দুইজন একই ব্যক্তি।

জোয়ান দ্য বুর্জোই পরে স্যার জন্ ম্যাণ্ডেভিল এই ছদ্মনামে ভ্রমণকাহিনীখানি লেখেন।

ম্যাণ্ডেভিলের ভ্রমণকাহিনীর প্রকৃত লেখক যিনিই হউন না কেন, তিনি যে অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। নির্জলা মিথ্যা কাহিনীর আশ্রয়ে একখানা চমকপ্রদ সাহিত্য সৃষ্টি করে হাজার হাজার পাঠককে দীর্ঘকাল অভিভূত করে রাখা—সাহিত্যে এত বড় ধাপ্পাবাজীর দ্বিতীয় কোনো নিদর্শন আর আছে বলে জানা নেই।

কালের ঢেউ

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের এক ছুটির দিনে বেলা তিনটার সময় সরমাকে আসতে দেখে শিউলী বললে, 'এই গরমে পশু, পক্ষী নীড় ছেড়ে বের হচ্ছে না, আর তুই সেই কোন প্রান্ত থেকে রোদে ঝাকশান করে এলি। এমন সময় বিশেষ কোন কারণ না হলেতোব মত মেয়ে তো বের হয় না।'

'আমায় ওরা যে তাড়িয়ে দিলে'—বলতে বলতে দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল তার, জীবনের মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে প্রবীণা সরমা আজ কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি।

আশ্চর্য হয়ে শিউলী বললো, 'কারা তোকে তাড়ালে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

সরমা চোখের জল মুছে আস্তে আস্তে সুরু করল তার অশ্রুবিধুরক কাহিনী।

'আজ রুমাকে দেখতে আসবে, তাই সকাল হতে আমার ভাইবোনেরা আমাকে বার বার বাড়ী হতে বাইরে যাবার জন্য নোটিশ দিচ্ছিল। তাদের মতে আমার বিষদৃষ্টিতে রুমার সব পাত্র নাকি ভেগে যাচ্ছে। তাই এত বয়সেও সে পাত্রস্থ হতে পারেনি।

এ কথা শুনে আমি উমাকে বললাম তাই যদি হবে, তোকে ও রমাকে তো যতবার দেখতে এসেছে, আমিই তোদের সাজিয়ে দিয়েছি। তবে কেন তোদের সময় আমার বিষদৃষ্টি পড়েনি? তোদের কেন সুশিক্ষিত, সুখী, সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'ল—যার জন্য তোরা দুজনেই আজ সুখী। শুধু তাই নয়, তোরা জানিস্—আমার জন্য যেসব পাত্র এসেছিল, তাদের সঙ্গেই আমি তোদের বিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি জানি আমার মত সংগ্রাম তোরা জীবনভোর করতে পারবি না। যৌবনে যখন নিজেকে বঞ্চিত করে তোদের সুখী করেছি, তখন এই জীবন সন্ধ্যায়—এ কি অপবাদ তোরা আমায় দিচ্ছিস?'

শ্রীশিপ্রা দত্ত

নতমুখে উমা উত্তর দিল—'তোমার ত্যাগের কথা জানি দিদি। তবু রুমার যখন এ ভ্রান্ত ধারণা—তখন তুমি কেন বাসায় থেকে এ অপমান গায়ে মাখবে? তুমি বরং কোনও সিনেমা বা থিয়েটারে ঘুরে এসো।'

মা ও ভাইদের সবার কাছ থেকে আজ সকাল হ'তে বার বার আমাকে বাইরে বের হবার তাগিদ আসছিল।

'কিন্তু সরমা, এদের মানুষ করবার জন্যই তোর সমস্ত যৌবন ও জীবন তুই উৎসর্গ করেছিলি।

বিষাদ মলিন মুখে সরমা উত্তর দিল, 'আমার কর্তব্য আমি করেছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-বোধ যদি তাদের না থাকে, তবে নিজের অদৃষ্ট ছাড়া কাকে দুষবো?

আজ সকাল হতে মনটা এসব কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। আজ যে রুমাকে দেখতে আসছে তাও আমার কাছে সবাই গোপন রাখছিল। উমার চার বছরের ছোট্ট মেয়েটি ভোর হতে আমাকে বার বার এসে বলেছে, 'মাসী, জান আজ ছোট মাসী বউ হবে। আজ ছোট মাসীর বর আসবে।'

শিশুর কথায় আমি তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু সে আমাকে তার কথা বিশ্বাস করাবার জন্য আরও বলতে লাগলো—'জানো মাসী, তাদের জন্য ছোট মামুরা এত্ত মিষ্টি, ফল ও ফুল কিনে এনে দিদার ঘরে রেখেছে।'

খানিক পরে দেখি সে তার কচি হাত মুঠো করে কি একটা এনে পিছন হতে আমার মুখে গুঁজে দিল। দেখলাম একটা সন্দেশ। ছানা-বর্জিত কলকাতায় যখন সন্দেশের আমদানী হয়েছে, তখন বুঝলাম পাপিয়ার কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বাড়ীতে কয়দিন ধরে কি সব আলোচনা হচ্ছিল। আমাকে দেখলেই সবাই সে আলোচনা বন্ধ করে রাখতো, হঠাৎ উমার এখন কলকাতায় আসার মূলেও হয়ত এই ব্যাপারই।

আমি তাই উমাকে ডেকে বললাম,

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র সদনে নৃত্যনাট্য পরিবেশনের দৃশ্য

ঘুঁয়ারে উন্নু, পাগিয়া বলছে কুমার আজ দুর আসবে—ব্যাপার কি ?'

প্রথমে সে কথাটা চাপা দিয়ে বলল 'ওর আবার একটা কথা। ওসব বাজে কথা কানে তুলো না।' কিন্তু বেশীক্ষণ কথাটা চাপা থাকেনি। কারণ সবাই মিলে যখন আমাকে আজ বাইরে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল, তখন আমি প্রশ্ন করলাম ব্যাপারটা কি ?

তখনই আস্তে আস্তে কেবল সত্য কথাটাই প্রকাশ হয় নি, তাদের মনের কুৎসিত পর্দাটাও সরে গেল। বাড়ীর সকলের প্রকৃত রূপটি ভেসে উঠল।

খানিকক্ষণ মৌন থেকে পুনরায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সরমা বলল, 'আজ সকাল হতেই অতীতের সব কথা ভেসে উঠছে। আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী, তখন বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। আমার ছোট তিন ভাই ও তিন বোন। বিধবা মাকে নিয়ে আমি অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। মামারা সামান্য কিছু সাহায্য করতেন। বাবার কোন ভাই ছিল না। তাই আমাকে তখনই নিতে হ'ল ২।৩টা টিউসনি। এদিকে নিজের পড়া, অন্যদিকে সংসারের ব্যয়ভার আমাকে বহন করতে হয়েছে। বাবার সঞ্চিত যা ছিল—তাতেও হাত দিতে হয়েছে। কোনরকমে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়েই একটা স্কুলে চাকরী নিলাম। সকাল ও বিকালে কয়েকটা টিউসনি—সন্ধ্যায় কলেজ করে বহু কষ্টে বি-এ পর্যন্ত পাশ করলাম।

আমার বরাবরের ইচ্ছে ছিল—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুন্দর পরিবেশেই আমি আমার কর্মজীবন অতিবাহিত করব। কিন্তু আমার ইচ্ছাকে শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ দেওয়া গেল না। মা বললেন স্কুলের চাকরীর এত কম মাইনায় কি করে তিনি তাঁর এতবড় সংসার ও এতগুলি ছেলেমেয়ের শিক্ষাদীক্ষা দেবেন। কথাটা আমিও চিন্তা করলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খিড়িকে তখন অফিসে অফিসে মেয়েদের জন্য চাকরীর দরজা খুলে দিয়েছিল। আমিও ঢুকে পড়লাম এক অফিসে। এ চাকরীতে নেই সম্মান, নেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার অবকাশ। কিন্তু সংসারের ঘানিতে কলুর বলদের মতই নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে এ কাজে নিজেকে জুড়ে দিতে হোল।

টিউশনি—অফিসের কাজ করে আবার আমাকে বাড়ীর সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়েছে। ছুটির দিনে নিজের হাতে রান্না করে পরিবেশন করে—খাইয়েছি ছোট ভাই-বোনদের। ভাই-বোনদের পাতে বেছে বেছে ভাল ভাল বড় বড় মাছের টুকরোগুলি দিয়ে—নিজের জন্য রেখেছি ছোট বা ভাঙ্গা একটি টুকরো। নিজের মুখের অন্ন বা খিদের খাদ্য তুলে ধরেছি ছোট ভাই-বোনদের মুখে। মোটা, অতি সাধারণ শাড়ী ছাড়া নিজের জন্য কখনও শাড়ী কিনি নি। নিজে বিলাসিতা বর্জন করে—সেই অর্থে ছোট ভাই-বোনদের চাহিদা মিটিয়েছি। তাদের হাতে তুলে দিয়েছি বিলাস ব্যসন।

এইভাবে কোথা দিয়ে আমার জীবনে যৌবনের হাওয়া বয়েছিল—তা জানবার বা বুঝবার অবকাশ আমি পাই নি। কর্তব্যের চাকায় নিজেকে তিল তিল করে নিষ্পেষিত করে, আমি ভাই-বোনদের নিয়ে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের নন্দনকানন গড়তে চেয়েছিলাম। তাই বাইরের সব আকর্ষণ হতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে গৃহকোণে ভাই-বোনদের সযত্নে পড়াতাম।

কত আশা, কত কল্পনার রঙ্গীন স্বপ্ন ভেসে বেড়াত আমার মানসচোখে। ভগ্নপ্রায় পরিবারকে তুলে দাঁড় করাবো। জ্ঞাত শত্রুরা দেখবে তাদের সাহায্যের

পরিবর্তে শত্রুতা পেয়েও—মেয়ে হয়েও আমি অসাধ্য সাধন করেছি। বোনেদের ধনী ঘরে বিয়ে দেব। ভাইরা হবে বড় বড় অফিসার। তারপর সবাই মিলে বাড়ী গাড়ী করে থাকবো। কত স্বপ্ন !! ভাইদের বিয়ে দিয়ে, আমি ছুটি নেবো সংসার হ'তে। মায়ের দায়িত্ব ভাইরা তখন নেবে। তখন অনন্ত অবসরসুখ ভোগ করব আমি।

রমা ম্যাট্রিক পাশ করার পরই আমার জন্য যে পাত্র এসেছিল,—তার সঙ্গে আমি রমার বিয়ে দিলাম। জমিদারের ছেলে। অপর্যাপ্ত অর্থ। তার সঙ্গে আছে শিক্ষা, কৃষ্টি সবই। এককথায় রমার বড় ঘরে ভাল বরে বিয়ে হ'ল।

কয়েক বছর পর নাক্ষনী মানবিকা আবার আমার জন্য আর একটি সম্বন্ধ আনলো, পাত্র ইঞ্জিনিয়ার। বাপের এক ছেলে। প্রচুর বিদ্যা। এবারও আমি নিজে অন্তরালে থেকে উমার সঙ্গেই তার বিয়ে দিলাম। উমা সেই বছরই বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিল।

রুমা কিন্তু লেখাপড়া কিছুই করল না। স্কুল ফাইন্যালটাও পাশ করল না। রংটা তার অন্যান্য ভাই-বোনদের তুলনায় একটু উজ্জ্বল। সেই গর্বে সে স্ফীত। তার ধারণা দিদিদের যখন অত ভাল বিয়ে হয়েছে, তখন তার মত রূপসীর জন্য রাজপুত্র নিশ্চয় বাঁধা। তাই রাতদিন দুধের সর, চন্দন, মুসুরী ডাল বাটা, কাঁচা হলুদ মেখে রূপচর্চাতেই দিন অতিবাহিত করত।

আমি কত বুঝিয়েছি,—রুমা, রূপের সঙ্গে গুণের চাহিদাও যে আজকালকার দিনে আছে, সুতরাং লেখাপড়া কিছুই না করলে যে দিদিদের মত ভাল পাত্র জুটবে না।

কিন্তু রূপের গরবে রুমা তখন মত্ত। আমার হিতোপদেশ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না। বাড়ীর সবার ছোট। তাই আদরের মাত্রাও ছিল বেশী। তাই তাকে পড়াশুনা করতে বললে ভাইরা উল্টে আমাকে বলত—'রুমার জন্য দিদি তুমি চিন্তা কর না। রুমাকে কখনও চাকরী করে খেতে হবে না। সুতরাং বেশী পড়াশুনার তার দরকার কি?'

তখন ভাইদের কটাক্ষ বা ইঙ্গিত ঠিক উপলব্ধি করতে পারি নি। হেরে হাল ছেড়ে দিয়েছি। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল। রুমার মনোমত পাত্র আর পাওয়া গেল না। যারা তাকে বিয়ে করতে আসে, তাদের টাকার তেমন গরম নেই বলে রুমা তাদের প্রত্যাখ্যান করে। আবার রুমা যাদের আকাঙক্ষা করে, রুমার বিদ্যার দৌড় দেখে—তারা ভেগে যায়। এইভাবে এক একটি বসন্ত রুমার জীবনে ব্যর্থতার ডালি নিয়েই এল।

ইতিমধ্যে বড় ভাই হয়েছে এড্‌ভোকেট, মেজভাই আই এ এস অফিসার, ছোট ভাই মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। আমার বহুদিনের মনোবাঞ্ছাও ভগবান পূর্ণ করেছেন। সবাই বড় হয়েছে। বড় ভাই দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করে।

কিন্তু এ কি হ'ল? কোথায় যেন ঘুণ ধরল। সবাই আজ বড় হয়ে আমাকে হেয়জ্ঞান করতে সুরু করল। ভাইদের লজ্জার কারণ তাদের দিদি। কারণ আমি কেরাণী। আমার পরিচয় দিতেও তারা না কি লজ্জা বোধ করে। তাই বাড়ীতে যখন তাদের অফিসের বন্ধু-বান্ধব আসে—আমি তখন নিজেকে নিভৃতে লুকিয়ে রাখি। রুমা কিন্তু, তার রূপের পসরা সাজিয়ে দাদার বন্ধুদের মন ভোলাবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ হয়ত তার ক'টা রং-এ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখনই জানে সরস্বতীর সঙ্গে তার সদ্ভাব নেই,—তখনই তারা সরে পড়ে। কারণ এ যুগে মাকাল ফল নিয়ে কেউ খুশী হতে পারে না। বিশেষ করে যারা পদস্থ অফিসার।

কোন রকমেই কাউকে ভজাতে না পেরে—অবশেষে রুমা কয়েকটা অত্যাধুনিক ক্লাবের সভ্যা হয়েছিল। যদিও আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের ঐ সব ক্লাবের মেম্বার হওয়া শোভা পায় না। তবু ঠোঁটে, গালে, নখে রং মেখে রুমাও যেয়ে জুটেছিল, ময়ূরপুচ্ছসজ্জিত দাঁড়কাক-শ্রেণীর দলে। কিন্তু বেশীদিন সেই আবহাওয়ায় সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। পদে পদে তাকে সেখানে হোঁচট খেতে হয়েছে; শুনতে হয়েছে নানা টিটকারী।

অবশেষে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে ও পথ হ'তে। যে পারে নি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মত দাঁত চেপে—কথায় কথায় ইংরাজী কপচাতে, অথবা পিয়ানোর সামনে বসে গাইতে অথবা ছেলেদের কোমর ধরে বলডান্স করতে। মনে মনে রুমা যতই উপলব্ধি করেছে যে, দিদির পরামর্শমত লেখাপড়া না করে সে ভুল করেছে,—ততই দিদির প্রতি

কি যেন তার বিদ্বেষের ভাব বেড়ে চলেছে। সেই অষ্টপ্রহর দাদাদের কাছে দিদির বিরুদ্ধে নানা কথা বলে—তাদের মন ভারী করতে লাগল। আমি বেচারী এতকাল রুমার এসব ষড়যন্ত্র কিছুই জানতে পারি নি।

এখন যদিও ভাইরা মোটা মাইনার চাকরী করে, কিন্তু সংসারের সব খরচই আগের মত আমাকেই দিতে হয়। ভাইরা তাদের টাকা কিছু জমায়—কিছু স্ফূর্তি করে উড়ায়। তাই আমি যখন উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে চলেছি সংসারের জন্য,—তখনও আমার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন যে গোপন বৈঠক হচ্ছে আমার গৃহে—তার ঘুণাক্ষরেও আমি জানতে পারিনি। মাঝে মাঝে ভাইদের আমার প্রতি শ্লেষোক্তি আমাকে আঘাত করত। তবু আমি তাদের ক্ষমা করতাম এই ভেবে—'ওরা অবোধ শিশু আমার কাছে। না বুঝে যে অন্যায় কথা এরা বলছে, ভগবান যেন সে জন্য এদের ক্ষমা করেন। তবু কখনও কঠিন উত্তর আমি দিই নি। আমার এই নীরবতাকে—আধুনিক ভাইরা মনে করল আমার দুর্বলতা। তাই উঠতে-বসতে সব কাজে আমার সমালোচনা তারা প্রকাশ্যে সুরু করল। শিক্ষিত পদস্থ ছেলেদের মা কখনও কিছু বলেন নি বা আমার পক্ষ নিয়েও তাদের ত্রুটি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা কখনও করেন নি।

মন যখন আমার ভাইদের ও রুমার ব্যবহারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল, তখন এক বান্ধবীর স্বামী ভবানন্দর খবর পেলাম। স্বামী ভবানন্দের মধুর সুরের কীর্তন ও ভাগবত পাঠ আমাকে আকৃষ্ট করল। তাই আমি ছুটির দিনে স্বামী ভবানন্দের আশ্রমে যেতে সুরু করলাম। দীক্ষা নেবার উদ্দেশ্যেই আমি যেতাম। খানিকটা সময় অকৃতজ্ঞ সংসারের জ্বালা ভুলে থাকতে চেষ্টা করতাম।

কিন্তু এই ভবানন্দের আশ্রমে যাওয়ার জন্যও আমার লাঞ্ছনার অবধি নেই। অহোরাত্র আমাকে বাড়ীতে শুনতে হয়েছে—'বুড়োবয়সে ঢলাঢলি করবার জন্য আমি স্বামীজীর শিষ্যা হয়েছি।' আরও কত নোংরা কথা, যা মনে করতেও আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে। একান্তে বসে আমি ভগবানকে ডেকে বলি—এই কি আমার প্রাপ্য? এই কি আমি চেয়েছিলাম ভগবান? নিজেকে তিল তিল করে নিঃশেষ করেছিলাম কি এই জন্য? আমারই কোনও শিক্ষা দেবার ত্রুটিতে কি এরা এমন নোংরা মনোবৃত্তি পেলো? তাদের কি সুশিক্ষা দিতে পারি নি? কিন্তু এমন স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, নীচতা তো আমি কখনও শিক্ষা দেই নি।

আমি ভাবি, এই কি এ যুগের ধর্ম? কত আশায় বুক বেঁধে নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে—নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে অফিসের চাকরী করে—আমার তিল তিল রক্তের বিনিময়ে এদের শিক্ষিত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। কিন্তু সব আশা আজ ধূলিসাৎ হ'ল।

ভাইরা চাকরী নিয়ে বিদেশে গেছে। যখন তারা থাকে না, তখন আমি খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নতুবা তারা যখন কলকাতায় ফিরে আসে ছুটিতে বা কর্মোপলক্ষে—তখন আমাকে অতি সাবধানে চলতে হয়। কি জানি আমার কোন কাজে তাদের নব্য আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়।

এদের এই নিষ্ঠুর সমালোচনা, শ্লেষোক্তি যে আমাকে কতটা বিদ্ধ করে, তা কখনও তারা একবার চিন্তাও করে না।

কত রাত চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়, কতদিন স্থির করেছি কোনও একটা 'মহিলা নিবাসে' যেয়ে থাকবো। তাহলে আর অকারণ এই বয়সে ছোটভাই-বোনদের লাঞ্ছনা অপমান সইতে হবে না। কিন্তু পারি না একমাত্র মা'র প্রতি কর্তব্যের টানে। যদিও মার পক্ষপাত এইসব অন্যায়কারীদের প্রতি,—কিন্তু একমাত্র আমি ছাড়া।

কোন সন্তানই মার দায়িত্ব নিতে

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরুর শুভ জন্ম— শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার দৃশ্য

মারাজ। 'হাই ব্লাড প্রেসারের রোগীকে তাই একা ফেলে আমি যেতে পারি না। জানি রুমা তার প্রসাধন নিয়েই দিনরাত অতিবাহিত করে। মা'র অসুখে-বিসুখে পরিচর্যা করা বা তাঁর খাবার দেখাশোনা করা—তা সে করে না। কিন্তু সংসারের সব দায়-দায়িত্ব বুঝি ভগবান আমার জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাই সব অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে নীরবে অশ্রু মোচন করে—এদেরই কল্যাণ কামনা করে আমি পড়ে আছি এ-সংসারে।

কিন্তু আজ যেন সব ধৈর্যের বাঁধ আমার ভেঙে গেছে। রুমার অযোগ্যতার দোষও যখন আমার উপরই বর্ষিত হ'ল এবং এমন নিষ্ঠুরভাবে আমাকে এই আনন্দ-অনুষ্ঠান হতে সরে যেতে বললো, তখন নিজেকে আর সত্যি ধরে রাখতে পারি নি। ভগবানের কাছে বার বার তাই এই সংসার হতে মুক্তি প্রার্থনাই করছি। কিন্তু বধির ভগবানের কর্ণ কুহরে কি এ অভাগীর কান্না পৌঁছবে।

কান্নায় ভেঙে পড়'ল সরমা।

নীরব শ্রোতা শিউলী—নীরবে বান্ধবীর সারা জীবনের পুঞ্জীভূত দুঃখের কাহিনী শুনলো। সরমাকে কি সান্ত্বনা সে দেবে? একমাত্র ভগবা-ই পারেন এই কৃতঘ্নতার শাস্তি দিতে। আধুনিক সমাজে স্নেহ, ভালবাসা, ত্যাগের কোন মূল্যই নেই।

ট্র্যাজেডি

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাগুষাকাল। শিশুসূর্যের রাগরক্ত একঝলক আলোক পৃথিবীর সবুজকে ভালবাসলো। একটি নতুন প্রাণের প্রথম সকাল। সে প্রাণের শিরা-উপশিরার গহন অরণ্য অজস্র আশার স্পন্দনে শিহরিত। প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্য সমুদ্রের মত বিস্তৃত তার সামনে। ছোট্ট দু'টি চোখের গবাক্ষে বন্দী সমগ্র বিশ্ব, অপাঙ্গে তাই তার মমতা অতলান্ত।

কিশোর সূর্য। ভাললাগা-ভালবাসার বর্ণালী বিচ্ছুরিত। নতুন প্রাণের কৈশোর। প্রতিটি ধমনী তার উত্তপ্তরক্তপ্রবাহ-স্নাত। একটুকরো বিশ্বাসের কুঁড়ি আধোবিকশিত।

মধ্যাহ্ন। প্রজ্বলিত জীবন। লেলিহান উদ্ধত অগ্নিশিখায় সমর্পিত। হাওয়াই দ্বীপের উচ্ছলিত জীবনপ্রবাহ কিংবা 'মারামা'-র নৃত্যতরঙ্গ নতুনকে করে আকৃষ্ট। বিলসিত কামনার স্বাদ তারুণ্যের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় মানুষকে করে উন্মাদ। অতঃপর জীবনযুদ্ধের ভেরী বাজে ঘনঘন। বিপর্যস্ত প্রাণের অরণ্য। প্রচণ্ড দাবানলে দগ্ধ সদ্যবিকচ বিশ্বাস।

অবশেষে, রাত্রি নামে ধীরে ধীরে। শ্মশানের সুগভীর স্তব্ধতা জীবন ঘিরে। মাঝে মাঝে শকুনির ডাক মৃতশিশুর প্রাকমৃত্যুলগ্নে শেষবার মাতৃনাম উচ্চারণের মত ছড়িয়ে পড়ে রাত্রির একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।
তন্বী ঊষার প্রতি অঙ্গে বিবমিষা। তরুণী প্রাতের প্রতি অন্ধ ভালবাসা কিংবা উজ্জ্বল যৌবনা জীবনের মধ্যাহ্নলগ্নে সূর্যসত্তার সম্ভাবনা যে নবদিগন্তের এষণা সোচ্চারে করেছিল ঘোষণা তাদের প্রত্যেকটিকে মনে হয় যেন তারা করেছে ভয়াবহরকমের বিশ্বাসঘাতকতা। ভালবাসা নেই। মৃত।— স্নেহ নেই। কবরখানার সমাধিস্থ।—মমতা নেই। অকালে নিহত।
সর্বহারা বৃদ্ধ পবিত্র মন হাহাকার করে কাঁদতে উন্মুখ হল। কান্না নেই। এক প্রচণ্ড দাবানলের তপ্ত হাত তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরে ভিসুভিয়াস গর্জন করছে। অন্ধকার ঘন হয়ে নামে একদা সম্ভাবিত প্রাণের ওপর। মানুষ বললো এবার তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হবে।

শেষবার হাত তুলে খুঁজলো। ফিরে এল না তার প্রার্থিত। তার বিশ্বাস অতলান্ত।—

সহস্র দিনের শেষে
অজস্র তাপের স্পর্শ লেগে
নবনীত বিশ্বাসের পুষ্প
হয়ে গেছে দগ্ধ
শুধু পড়ে আছে তার ছাই

পুনরায় প্রভাত হল।
সবাই দেখলো একরাশ ভস্মস্তূপে শায়িত
একটি মৃতদেহ।
ছড়ানো হাতটা শক্ত।
দু'চোখে বাহিত
ক্ষীণ একটি অশ্রুধারা
তার প্রান্তসংলগ্ন
একফোঁটা রক্ত
চুনীর মত ঝকঝক করে উঠলো শেষবার॥

বাল্মীকি-রামায়ণ প্রসঙ্গ

আশালতা সেন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দশরথের যজ্ঞের সঙ্কল্প ও ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন

(সর্গ ৮-১০)

তনয় কামনা করি' তপস্যায় রত নিরন্তর
দশরথ নৃপতির নাহি ছিল পুত্র বংশধর ॥
চিন্তাকুল মহীপতি ভাবিলেন মনেতে তখন
করিব পুত্রার্থে এবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন ॥
যজ্ঞের সঙ্কল্প এই সুনিশ্চয় করি মনে মনে
করিলেন দশরথ মন্ত্রণা অমাত্যগণ সনে ॥
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রেরে কহিলেন নৃপ অনন্তর
বশিষ্ঠ প্রমুখ যত গুরুগণে আনিতে সত্বর ॥
সুমন্ত্র কহিলা নৃপে বলেছেন সনৎকুমার
পূর্বে যাহা, এবে তাহা বলিব নিকটে আপনার ॥
বলেছেন তিনি, 'মুনি বিভাণ্ডক খ্যাত ধরাধামে
মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ নামে ॥
ঘোরতর অনাবৃষ্টি হয়েছিল রাজ্যেতে যখন
অঙ্গপতি লোমপাদ করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
প্রতিকার পন্থা তার বিপ্রগণে, কহিলেন তাঁরে
বিপ্রগণ, আনি হেথা ঋষ্যশৃঙ্গ নামে মুনিবরে
প্রদান করুন কন্যা। শুনি' তাহা-লয়ে মন্ত্রিগণে
মন্ত্রণা করিয়া নৃপ মুগ্ধ করি' নানা প্রলোভনে
আনিলেন ঋষ্যশৃঙ্গে করিলেন যবে আগমন
অঙ্গদেশে ঋষ্যশৃঙ্গ, হলো সেথা সুবৃষ্টি তখন ॥
করিলেন লোমপাদ কন্যা তাঁরে দান অনন্তর
হেনভাবে নৃপতির জামাতা হলেন মুনিবর ॥
দশরথ নৃপতির আকাঙ্ক্ষিত পুত্রেরও বিধান
করিবেন মুনি সেই করি যজ্ঞে আহুতি প্রদান ॥
কথা হেন পূর্বে যাহা কহিলেন সনৎকুমার,
ঋষিগণে, সত্য বলি' হয় তাহা মনেতে আমার ॥
শুনি' তা' কহিলা নৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বিবরণ
হে সুমন্ত্র, বাঞ্ছা মম সবিস্তারে করিতে শ্রবণ ॥
কহিলেন দশরথে সে আখ্যান সুমন্ত্র তখন
হেনভাবে, হে রাজন্ কহিলেন যত মন্ত্রিগণ
লোমপাদে, মোরা এই উপায় করেছি নির্ধারণ ॥
নারী ও বিষয় সুখে অনভিজ্ঞ তপস্যামগন
বনচারী ঋষ্যশৃঙ্গে হেথায় করুন আনয়ন
হে রাজন চিত্ত তাঁর প্রলোভনে করি' আকর্ষণ ॥
নৃত্যগীতে সুনিপুণা নারীগণ করুক ধারণ
মুনিবেশ, অনন্তর আশ্রমেতে করুক গমন ॥
রহিবেন ঋষ্যশৃঙ্গ একা যবে সেথা অবস্থিত
আনিবে তাহারা তাঁরে নানাভাবে করি' প্রলোভিত ॥
[illegible]ণ-বাক্য সেই নরপতি হলেন সম্মত ॥

গেল অনন্তর যত বারনারী নির্জন কাননে
রহিল তাহারা সেথা আশ্রম নিকটে সংগোপনে
হয়ে লতাসমাবৃত বিভাণ্ডকে ভয় করি' মনে ॥
হলেন আশ্রম হতে বিভাণ্ডক বহির্গত যবে
ঋষ্যশৃঙ্গ দৃষ্টিপথে তখন আসিল তারা সবে ॥

বায়ু বিকম্পিত বস্ত্রে মনোহর নানা আভরণে
সুললিতভাবে তারা শোভান্বিত হলো সেইখানে ॥
আশ্রমেতে ঋষ্যশৃঙ্গ লভি' জন্ম, রহি' সেথা আর,
লোকালয়ে স্ত্রী-পুরুষ না হেরিলা জীবনে তাঁহার ॥

কৌতূহলে করি' তাই সে সবার নিকটে গমন
করিলেন অবস্থান হয়ে অতি বিস্ময়ে মগন ॥

তাঁহারে বিস্মিত হেরি হাসিল সে বারনারীগণ
গাহিতে লাগিল আর সুমধুর সঙ্গীত তখন ॥

সুধাইল তারা আর, কহ তুমি কাহার নন্দন
কেন করিতেছ একা এ নির্জন বনে বিচরণ ॥

কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা মোর ভুবন বিদিত
মুনি বিভাণ্ডক, আমি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে পরিচিত ॥

স্বাদু ফলমূলে পূর্ণ মোদের আশ্রমে আগমন
কর হেথা তোমা সবে পূজা আমি করিব এখন ॥

গেল তারা সঙ্গে তাঁর, ঋষ্যশৃঙ্গ অতি সমাদরে
পাদ্য অর্ঘ্য ফলমূল করিলেন প্রদান সবারে ॥
পূজা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কহিল সে বারনারীগণ
মোদের আশ্রম হতে মোরাও করেছি আনয়ন
হে নিষ্পাপ, সুমধুর ফলমূল বিবিধ হেথায়
করুন ভক্ষণ যদি মনে তব হয় অভিপ্রায়
কহি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গে দিল তারা ফলের আকার
মিষ্টদ্রব্য, খাদ্য নানা, সুমধুর মদ্য যত আর ॥
'হে সুব্রত, কর পান তীর্থের এ সলিল এখন।'
কহি ইহা সবে তাঁরে সহাস্যে করিল আলিঙ্গন ॥

ফলাকৃতি বিবিধ সে খাদ্য যত করিয়া ভক্ষণ
ভাবিলেন ফল বলি' ঋষ্যশৃঙ্গ মনেতে তখন ॥

সুরভিত মদ্য আর ফলাকৃতি খাদ্য অজানিত
পানাহার করি' সুখে ঋষ্যশৃঙ্গ হলেন মোহিত ॥

আপন আবাসস্থান নারীকুল করিল জ্ঞাপন
ঋষ্যশৃঙ্গে, অনন্তর গেল চলি' করি' সম্ভাষণ ॥

আসিলেন যবে মুনি বিভাণ্ডক, তাঁহারে তখন
কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ, মনোহর সুন্দর নয়ন ॥
তাপসকুলেরে আমি হেথায় দেখেছি ভগবন
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তাঁরা আমারে করেছে আলিঙ্গন ॥
করেছে তাহারা আর মধুর সঙ্গীত বারবার
অপূর্ব ভ্রূভঙ্গী সহ করেছে বিবিধ ক্রীড়া আর ॥

আইলেন বিভাণ্ডক, তপস্যার বিঘ্নের কারণ
এসেছিল রক্ষকুল করি' সেই আকৃতি ধারণ,
কোরো না তাদের প্রতি কভু পুত্র বিশ্বাস স্থাপন ॥
এক রাত্রি পুত্র সনে অবস্থান করি' অনন্তর
তপস্যার তরে পুন অরণ্যে গেলেন মুনিবর ॥
ত্বরা করি' ঋষ্যশৃঙ্গ সেই স্থানে গেলেন তখন
এসেছিল পূর্বে তাঁর দৃষ্টিপথে যেথা নারীগণ ॥
দূর হতে নারীকুল ঋষ্যশৃঙ্গে করি' নিরীক্ষণ
কহিল সম্মুখে আসি, হে প্রভো, করুন আগমন
মোদের সুরম্য ওই আশ্রমে করুন দরশন,
লভি' পূজা পুনঃ হেথা আসিবেন ফিরি তপোধন ॥
হলেন সম্মত তাহে ঋষ্যশৃঙ্গ, লয়ে অনন্তর
সঙ্গে তাঁরে নারীকুল সবে মিলি হলো অগ্রসর ॥
ক্রমে তারা ঋষ্যশৃঙ্গে অঙ্গদেশে আনিল যখন,
করিলেন দেবগণ বৃষ্টি সেথা বর্ষণ তখন ॥
হেথা বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমেতে করি' আগমন
আশ্রম নেহারি' শূন্য করিলেন পুত্রে আবাহন ॥
'কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ' বলি' করিলেন বনে অন্বেষণ
বাহিরেতে আসি' আর করিলেন গ্রাম নিরীক্ষণ ॥
হয়ে সর্ব বিবরণ ধ্যানবলে জ্ঞাত অনন্তর
ইহাই নিয়তি বলি' নিবৃত্ত হলেন মুনিবর ॥
মেঘধ্বনি সহ আর বৃষ্টিধারা সহ আগমন
করিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদ রাজ্যেতে যখন
বারি বর্ষণেতে বুঝি আগমন তাঁর নৃপবর
অর্চনা করিলা তাঁরে ত্বরা করি' হয়ে অগ্রসর,
করিলেন রাখি শির ভূমিতে প্রণাম অনন্তর ॥
বহু ভোগ্যবস্তু আর করি' ঋষ্যশৃঙ্গেরে প্রদান
কন্যা শান্তা নৃপ তাঁরে ভার্য্যারূপে করিলেন দান ॥
লভি' লোমপাদ হতে হেন বহু পূজা ও সম্মান।
ভার্যাসহ ঋষ্যশৃঙ্গ করিলেন সুখে অবস্থান ॥
হে রাজন্ নিজগুরু বশিষ্ঠেরে করি' নিবেদন
বিভাণ্ডক পুত্রে হেথা আনা তব কর্তব্য এখন ॥
দশরথ করি' সেই সুমন্ত্রের মন্ত্রণা শ্রবণ
কহিলেন বশিষ্ঠেরে করি তাঁর নিকটে গমন
সুমন্ত্রের কথা যত। বার্তা সেই করিয়া শ্রবণ
দিলেন সম্মতি তাঁরে মুনিবর বশিষ্ঠ তখন ॥
অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গে করিতে বরণ
করিলেন ত্বরা করি লোমপাদ রাজ্যেতে গমন
লয়ে মন্ত্রী পুরোহিত, লয়ে আর পুরনারীগণ ॥
লোমপাদ হয়ে তাহে প্রীত অতি রাজসমাদরে
করিলেন অভ্যর্থনা সে প্রিয় অতিথি নৃপবরে ॥
রহি' সেথা দশরথ বহুভাবে হয়ে সমাদৃত
কহিলেন লোমপাদে হলো যবে সপ্তাহ অতীত
যেতে হবে ভর্তা সহ এবে কন্যা শান্তার তোমার
সাধিতে মহৎকার্য নৃপবর, রাজ্যেতে আমার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গে লোমপাদ কহিলেন, অযোধ্যা নৃপতি
দশরথ ইনি, মম সখা আর প্রিয়পাত্র অতি ॥
ছিলাম সন্ততিহীন, দশরথ মম প্রার্থনায়
প্রিয় কন্যা শান্তা তাঁর পুত্রীরূপে দিলেন আমায়,
তোমার শ্বশুর বলি মোর সম জানিবে ইঁহায় ॥
পুত্র কামনায় ইনি এসেছেন লইতে শরণ
তোমার হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কর এবে যজ্ঞ সম্পাদন
পুত্রার্থী এ নৃপতির কার্যসিদ্ধি করিতে এখন
ভার্যা শান্তা সহ এবে কর তুমি অযোধ্যাগমন ॥
সম্মত হলেন তাহে ঋষ্যশৃঙ্গ, লভি' অনন্তর
লোমপাদ অনুমতি, আনন্দে হলেন অগ্রসর
শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গ সহ দশরথ নৃপতি সত্বর ॥
সুসজ্জিত নিজপুরে তূর্যধ্বনি সহ আগমন
করিলেন অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গে করি' সংস্থাপন
পুরোভাগে, অগ্নিপ্রভ ঋষিপুত্র সহ সমাগত
হেরি' নৃপ দশরথে পৌরজন হলো আনন্দিত।
পূর্ণকাম দশরথ আনি' নিজ অযোধ্যা ভবনে।
ঋষ্যশৃঙ্গে ভাবিলেন নিজেরে কৃতার্থ বলি মনে ॥
শান্তারে নেহারি হলো আনন্দিত পুরনারী যত
পতি সহ তাঁরে সবে অর্চনা করিল বিধিমত ॥

দশরথের যজ্ঞ সম্পাদন ও অভীষ্ট সিদ্ধি

(সর্গ ১১-১৫)

হিমঋতু হলে শেষ বসন্ত কালেতে অনন্তর
যজ্ঞ অনুষ্ঠান তরে দশরথ হলেন তৎপর ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ সন্নিকটে করি' নৃপ গমন তখন
পূজা প্রণিপাত অন্তে যাচিলেন পুত্রের কারণ
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁরে হোতৃপদে করিতে বরণ,
করিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ নৃপতিরে সম্মতি জ্ঞাপন ॥
নরপতি দশরথ কহিলেন সুমন্ত্রে তখন
বেদবিদ্ গুরুগণে সত্বর করিতে আনয়ন ॥
শুনি' নৃপতির বাক্য সুমন্ত্র করিয়া সমাদর
দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণে যত আনিলেন সেথায় সত্বর ॥
আনিলেন বশিষ্ঠেরে বামদেবে, কশ্যপেরে আর
সুযজ্ঞ ওজাবালিরে, সবে বেদবিদ্যার আধার ॥
কহিলেন নৃপ করি' তাঁহাদেরে অর্চনা তখন
অভীপ্সিত পুত্র মম নাহি করে জনম গ্রহণ ॥
ইচ্ছামম করি তাই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন,
শরণার্থী মোরে সবে অনুগ্রহ করুন এখন ॥
বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ
প্রীতিভরে দশরথে করিলেন প্রশংসা তখন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গে অগ্রে রাখি নৃপতিরে কহিলেন সবে
যজ্ঞদ্রব্য আনি বহু করুন মোচন অশ্ব এবে ॥

পুত্রার্থে ধর্মানুগত মতি তব হয়েছে যখন
আকাঙ্ক্ষিত পুত্ররত্ন লভিবেন নিশ্চয় তখন ।।
শুনি' তাহা দশরথ কহিলেন মন্ত্রিগণে তাঁর
গুরুজন আজ্ঞামত আনা হোক যজ্ঞের সম্ভার ।।
সঙ্গেতে ঋত্বিক দিয়ে করা হোক অশ্ববিমোচিত,
সরযূর পরপারে যজ্ঞভূমি হোক সংগঠিত ।।
সুসম্পন্ন হয় যাহে নির্বিঘ্নে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠান
করুন মিলিতভাবে এবে সবে তাহার বিধান ।।
নৃপতির আজ্ঞা সেই মন্ত্রিগণ করিয়া গ্রহণ
করিলেন যথাবিধি সে আদেশ সকলে পালন ।।
পূর্ণ হলো সংবৎসর পুনরায় বসন্তে যখন
কহিলেন প্রণমিয়া বশিষ্ঠেরে নৃপতি তখন
শাস্ত্র অনুসারে যজ্ঞ সত্বর করুন সম্পাদন ।।
আপনি পরম গুরু স্নেহশীল সুহৃদ আমার,
করুন বহন এবে এই যজ্ঞ সম্পাদন ভার ।।
কহিলেন নৃপতিরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তখন
অভীপ্সিত সর্বকার্য সম্পাদন করিব এখন ।।
কহিলেন অনন্তর দ্বিজগণে করি' আবাহন
বশিষ্ঠ, স্থপতি যত করুন কর্মেতে নিয়োজন ।।
কর্মনির্বাহক আর চিত্রকর লিপিকর যত
খনক, গণক, শিল্পী, নর্তক করুন নিয়োজিত ।।
করুন ব্রাহ্মণ আর পৌরজন তরে সমুচিত
আবাস নির্মাণ বহু, ভক্ষ্য আর পানীয় পূরিত ।।
জনপদবাসী তরে করুন ভোজ্যের আয়োজন
সমাদৃত হয় যেন সর্ববর্ণ মাঝে সর্বজন ।।
যজ্ঞকর্মে নিয়োজিত শিল্পী আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যত,
[illegible] অনুসারে সবে অর্চনা করুন বিধিমত ।।
কহিলেন সুমন্ত্রেরে বশিষ্ঠ করিয়া আবাহন
নরপতিগণে যত এবে তুমি কর নিমন্ত্রণ ।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি যত নরগণ
সর্বদেশ হতে সবে সমাদরে কর আবাহন ।।
সপুত্র কেকয়রাজে, কাশীরাজে, নৃপ জনকেরে
অঙ্গপতি লোমপাদে আনয়ন কর সমাদরে ।।
সৌবীর, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, পূর্বদেশে দাক্ষিণাত্যে যত
আছেন নৃপতিকুল আন সবে হয়ে ত্বরান্বিত ।।
বহুলোকে আহ্বানিয়া অবিলম্বে সুমন্ত্র তখন
আনিতে নৃপতিকুলে করিলেন আদেশ জ্ঞাপন ।।
যথাকালে নৃপকুল আসিয়া হলেন উপনীত,
লয়ে বহু উপহার, হয়ে তাহে মহা আনন্দিত ।।
কহিলেন দশরথে মুনিবর বশিষ্ঠ তখন
সমাগত হে রাজন্, এবে যত নরপতিগণ ।।
যথাবিধি সমাদরে সে সবারে করুন গ্রহণ ।
যজ্ঞের সম্ভার সব সংগৃহীত হয়েছে রাজন ।।
আহ্বানিয়া সুমন্ত্রেরে কহিলেন বশিষ্ঠ তাঁহার,
কর একত্রিত যত যজ্ঞদ্রব্য আনিয়া হেথায় ।।
ঋষ্যশৃঙ্গ আর মোর অনুজ্ঞাতে নৃপতি এখন
শুভ নক্ষত্রেতে আজ যজ্ঞভূমে করুন গমন ।।
অনন্তর যজ্ঞতরে বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ যত
করিলেন সবে মিলি কর্মের আরম্ভ বিধিমত ।।
নরপতি দশরথ যজ্ঞভূমে হয়ে উপনীত
পত্নীগণ সহ যজ্ঞে যথাবিধি হলেন দীক্ষিত ।।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ।

চেতনার ভাবনা

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

বাতাসের বোবা কান্নার মত
মানুষের মন আজ কাঁদে,
কাঁদে বেদনার পরাজয়,
কাঁদে আটকেপড়া মানুষ বিকারহীন অমনুষ্যত্বের ফাঁদে।

রক্তাক্ত মানুষের ইতিহাস
মানুষেরই মনে আনে পরাজিত বিকার,
প্রাচীন নগরীর বিরাট স্তম্ভের মত
সে যেন ভেঙেপড়া এক বিরাট প্রাকার।
বেদনাময় সে ইতিহাস
জাগিয়ে তোলে উত্তেজনা মানুষের দেহের ধমনীতে,
সেই জাগ্রত সত্যের মাঝে
মুক্তি চায় মানুষ, চায় এ চেতনা হতে বিশ্রাম নিতে।

মিথ্যার চেতনা আজ
সত্যকে করেছে আচ্ছাদিত,
বিরাট অমানবিকতার মহাফলক
আজ দিকে দিকে উদ্ভাসিত।
সত্য চেতনা আজ যেন
[illegible]রে বন্দী—আসামী,
মুক্তি—পাবে না জেনেও
মুক্তির দিনকে মনে করে আগামী।
তার চেতনা আজ
মানুষের বিচারালয়ে অপরাধী,
কারণ অপরাধ কাকে বলে সে জানে না,
সে আদর্শবাদী।

দূরের মহাপ্রস্থানের—পথের যাত্রীদের মত
অহরহ সে হেঁটে চলেছিল অবিরত,
ঝিলিমিলি আনন্দের স্রোতে সে হয়েছিল উন্মত্ত
তাই হারিয়ে ছিল তার সমস্ত চেতনা সমস্ত ব্যক্তিত্ব।
সেই হারিয়ে যাওয়া
ব্যক্তিত্বকে আমি ফিরিয়ে আনতে চাই,
যে চেতনা মানুষেরই চেতনার কাছে
পরাজিত নিয়তই।

যাক সে মিথ্যার জয়,
আসুক ফিরে নব আনন্দ এই পৃথিবীতে,
আনন্দের রোশনাই বেজে উঠুক
বিপুলা এই পৃথিবীর সর্ব কোণটিতে।

বন্দী

-সমরজিৎ

মাসিক বসুমতী

আষাঢ়, ১৩৭৬

ঘরের পথে

—কাজল দেব

বিবেকানন্দ ব্রীজ

—নারায়ণ চক্রবর্তী
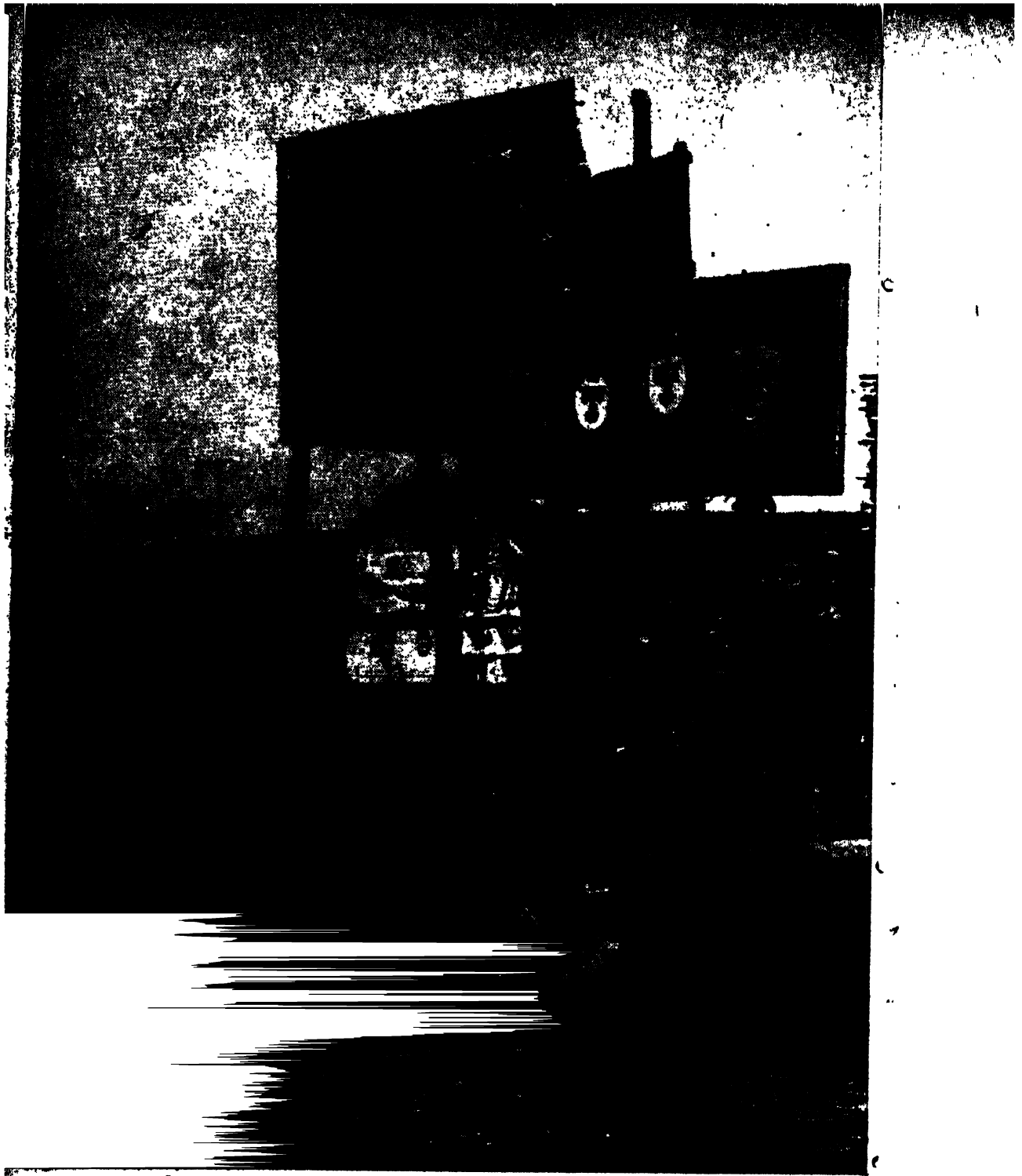
জল ও স্থল

—আশুতোষ সিংহ

মোড়ের মাথায়
—আর কে সাউ

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন। ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন

* ছবি পাঠাবেন এই নামে—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২

(জেলাগুলো)

রাণাঘাটের সন্নিকটে মাঝের গ্রাম, দেগ্রাম, চৌবেড়িয়া, ফুলিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

চাকদহ—চক্রদহ বা চক্রদ্বীপ থেকে চাকদহ। স্থানটি প্রাচীন। কলকাতা থেকে ৩৮ মাইল। আগে এখানে টোলধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বাস ছিল। বহু অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

এর সান্নিকটে পালপাড়া, মনসাপোতা প্রভৃতি গ্রামে বিদ্যাচর্চা হত। এখানকার কাজিবংশ, মুন্সীবংশ, দত্তবংশ, জশোড়ার মিত্রবংশ, গোসাঁই বংশ, পালপাড়ার মজুমদার (গুহ) বংশ, ঢোলবংশ, চট্টোপাধ্যায় বংশ, সান্যাল বংশ, মনসাপোতার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাঁচড়াপাড়া—কাঞ্চনপল্লী। পূর্বে নাম ছিল নবহট্টগ্রাম। এটি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের চরভূমির ওপর স্থাপিত। একদা চৈতন্যদেব এখানে শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে এসেছিলেন। এটি বৈদ্যপ্রধান গ্রাম। এখন কাঁচড়াপাড়া বললে কাঁচড়াপাড়া রেল স্টেশনের স্থানটি বোঝায়, সে কিন্তু নদীয়ার সীমানার বাইরে।

চৌবেড়িয়া—রাণাঘাট জংশন থেকে প্রায় ২১ মাইল। এ গ্রামটি যমুনা নদীর ওপর। এর প্রাচীন নাম চতুর্বেষ্ট দুর্গ। এখানে মুসলমান আমলে কাশীনাথ রায় রাজা ছিলেন। তাঁর দুর্গের চারধারে খাতে তখন যমুনা নদী প্রবাহিত হত। রাজা কাশীনাথ পাঠানের বিরুদ্ধে মোগলদের সাহায্য করলে সম্রাট অকবর তাঁকে 'সমর সিংহ' উপাধি দেন। পরে কোনও বিশ্বাসঘাতক দ্বারা নিহত হলে অকবর-সেনাপতি টোডরমল বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন ও এখানে এক দরবার করেন। বর্তমান দুর্গের কোনও চিহ্ন নেই। যমুনায় লীন হয়েছে। এখন এ স্থান রাজার বাগান। ফুলবাড়ী ও সেহালা নামে তিনটি পল্লীতে ভাগ হয়েছে।

ফুলিয়া—কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান। কলকাতা থেকে ৫৪ মাইল। এখানে যবন হরিদাসের সাধন ক্ষেত্র। মুসলমান হয়ে হিন্দুধর্মের আচার ব্যবহার করায় কাজির অভিযোগে মুসলমান শাসনকর্তার আদেশে তাঁকে একে একে বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়। তাতেও তিনি নিবৃত্ত হলেন না বরং সকলকে ক্ষমার চোখে দেখায় তিনি জগতের ইতিহাসে ক্ষমার আদর্শ বলে স্বীকৃত হন। কাজি ও শাসনকর্তার মন ফিরে যায় ও তাঁকে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করতে অনুমতি দেন। তাঁরা তাঁরও অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পালপাড়া—চাকদহের কাছে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের কাছে প্রদ্যুম্ন সরোবর আছে। প্রাচীন দলিলে প্রদ্যুম্ননগর ও হ্রদের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, চাকদহ এই প্রদ্যুম্ননগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেউ বলেন—প্রদ্যুম্ন রায় নামে এক হিন্দু রাজা এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা।

পলাশী—কলকাতা থেকে ৯৩ মাইল। নদীয়া জেলার এটাই হচ্ছে শেষ সীমানা। পলাশী স্টেশন থেকে ২ মাইল পশ্চিমে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে বাঙলার স্বাধীনতা-সূর্য ইংরেজের কাছে অস্তমিত হয়েছিল।

মেলা ও মন্দির

নদীয়া জেলায় বহু স্থানে প্রাচীন মন্দির, প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি দেখা যায়—তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

পোড়ামাতা (সিদ্ধেশ্বরী) মন্দির—নবদ্বীপে। দেবী পীঠস্থান, তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দ্বারা স্থাপিত লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির প্রায় ১০০ বছর পরে। আগে বিগ্রহ ছিলেন দক্ষিণ-কালিকা। পরে মূর্তির পরিবর্তে এখানে ঘট প্রতিষ্ঠা হয় ও গ্রাম্যদেবী রূপে পরিণত হন। গ্রামের প্রান্ত থেকে এই ঘট গ্রামের মধ্যস্থলে এক বটগাছের তলায় স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরে দৈবাৎ আশপাশের ঘরে আগুন লেগে যাওয়াও ঐ বটগাছও পুড়ে যায়। তখন থেকেই ওই স্থানকে পোড়াতলা ও দেবীকে 'পোড়া-মা' বা 'বিদগ্ধ জননী' নামে আখ্যা দেওয়া হয়।

আগমেশ্বরী মাতার মন্দির, পাড়ার মা, বুড়োশিব প্রভৃতি—নবদ্বীপে।

শ্রীচৈতন্য মন্দির বা যোগীপীঠ মন্দির—মায়াপুরে। এই মন্দিরের মধ্যে গৌর-রাধামাধব, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া, পঞ্চরত্ন — গৌর, নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস আচার্যের বিগ্রহ আছে। এই মন্দির খুব উঁচু আর কারুকার্যময়। রাত্রে এর চূড়াগুলি নানা রকমে বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে সুসজ্জিত। বহু দূর থেকে দেখা যায়। বাংলা দেশে আর কোনও মন্দিরে সারা বছর ধরে এ রকম আলোকসজ্জা দেখা যায় না। মন্দিরের প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে ক্ষেত্রপাল

গৌরগোবিন্দজী

শিবের মন্দির, তার পাশে নিম-গাছের তলায় শচী মায়ের আঁতুড় ঘরে শিশু শিশু-নিমাই, শচীমা ও জগন্নাথ মিশ্রের মূর্তি।

শ্রীচৈতন্য মঠ—মায়াপুরে। এই মঠে মোট ২৯টি চূড়া আছে। এখানে গৌরাঙ্গদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত। চারটি কক্ষে চার সম্প্রদায়ের গুরু মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজের প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত আছে।

শ্রীবাস অঙ্গন—(খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা) গৌর নিতাই ও অন্যান্য বিগ্রহ আছে। এই স্থানে কাজি সংকীর্তনে খোল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। —মায়াপুর।

অদ্বৈত ভবন—মায়াপুর।

মুরারি গুপ্তের বেন—নবদ্বীপ।

গৌরকুণ্ড, নিতাইকুণ্ড, শ্রীধর অঙ্গন, মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণঘাট, জয়দেবের পাট—মায়াপুরে।

জলেশ্বর (মহাদেব) মন্দির — মহারাজা রামকৃষ্ণ কর্তৃক কারুকার্য-খচিত মন্দির স্থাপিত। —শান্তিপুর।

শ্যামচাঁদের মন্দির: (রামগোপাল প্রতিষ্ঠিত ১৭২৬ খৃ:), গোকুলচাঁদ মন্দির (ঐ, ১৭৪০ খৃ:)। গোস্বামী-দের নাটমন্দির—শান্তিপুর। ভাঙ্গা রাসের মেলা।

গণেশজননী মন্দির—মাঘী পূর্ণিমায় পক্ষকালব্যাপী বিরাট মেলা—আনন্দ-গঞ্জ বাজার, চাকদহ।

পালপাড়ার প্রাচীন মন্দির—এই মন্দিরের ছাঁচ চৌচালার আকারে তৈরি। কারুকার্য অনুমান ৬০০ বছরের—চাকদহ।

বাগ্‌দেবীর মন্দির— ১৬শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত। —বাগ্‌আঁচড়া গ্রামে।

চাঁদ রায়ের শিবমন্দির—ব্রহ্মশাসন গ্রামে। একসময় সমগ্র নদীয়া জেলার গৌরব মন্দির ছিল। কারুকার্য সুন্দর।

শিবমন্দির, বুড়োশিবের মন্দির, রামেশ্বর মন্দির, রাজরাজেশ্বর (১৭৫৪)। রাগ্নীশ্বর (১৭৬২), রাম-চন্দ্রের মন্দির (১৭৬২)—শিবনিবাসে।

ওলাইচণ্ডী মন্দির —দ্বাদশ মন্দির, মুস্তৌফিদের জোড়বাংলা —বীরনগর-উলা। ওলাইচণ্ডীর মেলা তিন দিন ব্যাপী. বৈশাখী পূর্ণিমায়।

হরিহর মন্দির, কালভৈরব মন্দির —গঙ্গাবাস, আমঘাটা।

নৃসিংহদেবের মন্দির—দেপাড়া। বৈশাখী শুক্লা চতুর্দশীতে উৎসব। মূর্তিটি এক বৃহৎ কষ্টিপাথরে খোদিত। উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। পদতলে প্রহ্লাদ ও কোলে হিরণ্যকশিপু।

ব্রহ্মাণী মন্দির—জাহাঙ্গগর গ্রামে। প্রতি ভাদ্র মাসে সংক্রান্তিতে এই স্থানে মনসা পূজা 'গাছ পূজার মেলা' নামে বড় মেলা বসে।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির—এতে গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণজী ও মদনমোহন বিগ্রহ আছে (১৭৯২ খৃ:) —রামচন্দ্রপুরে।

যুগলকিশোর বিগ্রহ মন্দির—আড়ংঘাটা চূর্ণী নদীর তীরে। কথিত আছে গঙ্গারাম দাস নামে এক বৈষ্ণব বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণবিগ্রহ এনে নব-দ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে স্থাপন করেন কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার জন্য সেখান থেকে আড়ংঘাটায় নিয়ে আসেন। এখানে এক বণিকের সহায়তায় তিনি কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। প্রথমে কৃষ্ণ-পূজাই হত। পরে আনুমানিক ১৭২৮ খৃ: মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণের বামে রাধামূর্তি স্থাপন করে 'যুগলকিশোর' নাম দেন, প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসব্যাপী এখানে মেলা বসে।

এ ছাড়া এই জেলায় বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে—যশোড়ায় জগন্নাথের দোলমঞ্চ, চাকদহে মহেশ পণ্ডিতের কুলসমাজবেদি ও মন্দির, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ, কৃত্তিবাস কূপ, হরিদাস ঠাকুরের ভজন-গোফা ইত্যাদি।

ফুলিয়ার মঠ—মন্দির বলরাম, রেবতী, কৃষ্ণ ও রাধার বিগ্রহ। প্রতি দোলপূর্ণিমায় মেলা হয়।

পীরমল্লিকগম সাধুর সমাধি — অম্বুবাচীর সময় মেলা।

পারুলিয়ার মসজিদ—পিরল্যা গ্রামে।

কৃষ্ণনগর রাজবংশের ঠাকুরবাড়ী —চৈত্র মাসে 'বারদোল'—১২টি কৃষ্ণ-মূর্তি একসঙ্গে—কৃষ্ণনগর।

ঘোষপাড়া দোলের মেলা—

আউলচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের—৭ দিন থাকে। রথের মেলাও হয়।

ধূলার উৎসব—দোগাছিয়া। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা চতুর্দশীতে। এই সময় নিত্যানন্দ প্রভুর একটি পাগড়ী প্রদর্শিত হয়।

বৈষ্ণব মহোৎসব — কাঁঠালপুলিতে। মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে।

জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসব —কৃষ্ণনগরের ঘরে ঘরে।

নবদ্বীপের পটপূর্ণিমার মেলা।

শিবরাত্রি, চড়ক ও ভৈমী একাদশীর দিন শিবনিবাসে মেলা।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মদিন উপলক্ষে (ফাল্গুনী পূর্ণিমায়) শ্রীধাম নবদ্বীপ বা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের ৯টি দ্বীপ পরিক্রমায় বহু বৈষ্ণব যোগদান করেন।

এ ছাড়া ছোটখাট মেলাও অনেক হয়। যেমন মাঘী পূর্ণিমায় পাটুলীর মেলা, আমঝুপি গ্রামে রাসযাত্রার মেলা, নদীয়ায় দশহরার মেলা ইত্যাদি।

প্রাচীন কীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ

বল্লাল ঢিবি—৪০০ ফুট লম্বা ও ২৫।৩০ হাত উঁচু। মহারাজ বল্লাল সেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। দূর থেকে ঢিবিটিকে জাহাজের মত দেখায়। এই ঢিবি থেকে বহু পাথর ও ইট নিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রত্নবিভাগের অধীনে—নবদ্বীপের মায়াপুর এর আধ মাইল দূরে বামনপুকুর গ্রামে। মাটিয়ারি (বানপুরের কাছে) কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ।

সুবর্ণবিহার—কৃষ্ণনগর হতে ৬ মাইল দূরে আমঘাটায় সুবর্ণবিহার (বৌদ্ধবিহার) ধ্বংসাবশেষ। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই ধ্বংসাবশেষ প্রায় ২ বিঘা জমি নিয়ে বিস্তৃত ও ১০ হাত উঁচু।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটা, কৃত্তিবাস স্তূপ, যবন হরিদাসের সাধনপীঠ (গোফা)—ফুলিয়াতে।

মণিপুর রাজবাড়ী — ভেবরি মৌজায় 'মণিপুর'।

উগ্রতারা বিগ্রহ—ব্রোঞ্জের মূর্তি, পরিধানে বস্ত্র, গলে মুণ্ডমালা, মাথায় মুকুট, শিরোদেশে মহাদেব, চার হাতে অস্ত্ররাজি—বৌদ্ধতান্ত্রিক মূর্তি, নামান্তর চামুণ্ডা। দে-পাড়ার কাছে চামটার বিল থেকে প্রাপ্ত।

তোপখানার মসজিদ—ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্তৃক ১৭০৫ খৃঃ স্থাপিত। —নবদ্বীপে।

রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ— হরধামে ও আনন্দধামে। রাণাঘাটে চূর্ণী নদীর উভয় তীরে।

বীরমদনের সমাধি—ফরিদতলা।

দেগাঁর ঢিবি— মাঝের গ্রামের (রাণাঘাট স্টেশন হতে ৯ মাইল) ৩ মাইল উত্তরে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কথিত আছে—দেবপাল বা দেপাল নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। দেগাঁর প্রাচীন নাম দেবগ্রাম। দেবপাল একসময়ে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পরশপাথর অপহরণ করে বিপুল সম্পত্তি করেন ও এ স্থানের নাম দেবগ্রাম রেখে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। একসময়ে মুসলমান শাসনকর্তার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। মীমাংসার জন্য তিনি দিল্লীতে বাদশাহের কাছে যান। যাওয়ার সময়ে কালো ও সাদা জয় ও বিজয় নামে দুটো পায়রা নিয়ে মহিষীকে বলে যান যদি সফল হন তো সাদা পায়রা ফিরে আসবে আর অশুভ কিছু হলে কালো পায়রা ফিরে আসবে। তা দেখে মহিষী উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। দেবপাল সফল হয়ে ফিরছিলেন—কিন্তু তাঁর অনুচর ভ্রমক্রমে কালো পায়রা ছেড়ে দেয়। কালো পায়রা দেখে রাণী অশুভ মনে করে পুকুরে প্রাণ বিসর্জন করেন। রাজা ফিরে এসে সেই সংবাদ শুনে তিনিও আত্মহত্যা করেন। দেবগ্রাম তখন মুসলমান অধিকারে আসে। দেগাঁর ঢিবিতে কারুকার্যখচিত বহু ইট এখনও দেখা যায়।

চাঁদকাজির সমাধি— মায়াপুর থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর গ্রামে চাঁদকাজির সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। চাঁদকাজির আসল নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন। তিনি নাকি এক সময়ে গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন। এই কাজি প্রথমে গৌরাঙ্গদেবের সংকীর্তনে খোল ভেঙ্গে দেন ও সংকীর্তন বন্ধ করতে আদেশ দেন। চৈতন্যদেব আদেশ অমান্য করে শোভাযাত্রা নিয়ে চাঁদকাজির বাড়ীতে যান ও তাঁকে স্বমতে আনেন। কাজির সমাধির পাশেই কাজির প্রাসাদের চিহ্ন দেখা যায়।

মনীষী, পণ্ডিত ও সাহিত্যিক

মহাতীর্থ নবদ্বীপ নৈয়ায়িক, স্মার্ত, তান্ত্রিকগণের অধ্যুষিত স্থান।

নৈয়ায়িক—বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র সার্বভৌম, মধুসূদন বাচস্পতি, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য, স্মার্তে রঘুনাথ স্মার্ত ভট্টাচার্য, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, তন্ত্রশাস্ত্রে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, জটিয়া যাদু প্রমুখ, কৃত্তিবাস ওঝা (ফুলিয়া), যবন হরিদাস (ফুলিয়া), বুনো রামনাথ (রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত), মহাম: শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ উজ্জ্বলরত্ন। মহাম: সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ, রায় দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য, (বাহাদুর), জাস্টিস বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী, রায় দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য (বাহাদুর), নীলমণি চৌধুরী, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ দত্ত, সঙ্গীতবিশারদ নীলকণ্ঠ বাগচি এবং আরও অনেকে এই জেলার গৌরব বর্ধন করেছেন।

শান্তিপুরে — সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি বনোয়ারীলাল গোস্বামী

প্রতিষ্ঠাতা গোপাল হক, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (হরিপুর), পণ্ডিত প্রমথমোহন বিদ্যানিধি, কবি হরিমোহন প্রামাণিক, পদকর্তা গৌরী দাস পণ্ডিত (অম্বিকা গ্রাম), বীর আনন্দ ঢেঁকি (মুখোপাধ্যায়), গোপাল ভাঁড় প্রমুখ।

কৃষ্ণনগরে—দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, রামতনু লাহিড়ী, জগদানন্দ রায়, হাস্যকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীননাথ সান্যাল, শিক্ষাবিদ্ প্যারীচরণ সরকার, মহিলা কবি প্রমীলা (বসু) নাগ, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায় (সরডাঙ্গা) প্রমুখ।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (চৌবেড়িয়া), অক্ষয়কুমার দত্ত (চুপী), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (নরাপাড়া সিমলা গ্রামে), ইন্দিরা দেবী (নবদ্বীপে), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (ঐ), দ্বারকানাথ অধিকারী (গোস্বামী দুর্গাপুরে), নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষপাড়ায়), কবি বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (মাটিয়ারি), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (গোস্বামী দুর্গাপুর), ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আমোদর শর্মা, কাচকুলি), কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচি (জামসেদপুর), মীর মশারফ হোসেন (লাহিনীপাড়া), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (বিল্বগ্রাম), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (লোকনাথপুর), কবি কৃষ্ণচন্দ্র বাগচি (বেগেগ্রাম), কবি কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী (ভাজন ঘাট), কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস (কৃষ্ণগঞ্জ, নাথপুরে)।

উলা-বীরনগরে —চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় (পাহাড়পুর), শ্যামাচরণ সরকার (খিসমা), 'ডাকের' সাজের উদ্ভাবক—কানাইলাল আচার্য ও নীলমণি আচার্য (পালিতপাড়া), 'কুলার্ণবতন্ত্র' রচয়িতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (পালপাড়া), রায়বাহাদুর জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কাঙাল হরিনাথ (কুমারখালি. পূর্বে নদীয়ার বর্তমানে পাকিস্তানে), কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী (ভাজনঘাট)।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়

নদীয়ার হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে বৈষ্ণবই প্রধান। শাক্ত, শৈবও আছে। গৌরাঙ্গদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় নদীয়া জেলাকে গৌরব-শীর্ষে তুলেছে। এক কালে শাক্ত ও শৈব প্রাধান্য ছিল। বর্তমান কালে চৈতন্যদেবের মতানুসারে বৈষ্ণবধর্ম এ অঞ্চলে বেশী। ভক্তি ও প্রেম এই ধর্মের সর্বস্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ দুই প্রভু, নিত্যানন্দের সঙ্গী দ্বাদশ গোপাল। ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ছয় গোস্বামী—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট:, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ দাস। এই ধর্মের প্রত্যেকেই মনে করেন ভগবান চৈতন্যরূপে কলিকালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

কর্তাভজা সম্প্রদায়—এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউলচাঁদ। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা আউলচাঁদকে ঈশ্বরের অবতার বলে থাকেন। কথিত আছে উলানিবাসী মহাদেব নামে এক বারুজীবী ১৬৯৪ খৃঃ ফাল্গুন মাসে প্রথম শুক্রবারে তাঁর পানের বরজের মধ্যে এক সুন্দর অজ্ঞাত বালককে পান। মহাদেব তাকে ঘরে এনে প্রতিপালন করে নাম রাখেন পূর্ণচন্দ্র। ক্রমে বালক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে আউলচাঁদ নাম গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায় নদীয়ায় উৎপত্তি।

সাহেবধনী—সাহেবধনী নামে এক উদাসীনের কাছে কয়েকজন হিন্দু ও একজন মুসলমান উপদেশ নিয়ে সাহেবধনী ধর্মমত প্রচার করেন। এটি কর্তাভজারই শাখাবিশেষ।

আউল সম্প্রদায়—এটি কর্তাভজারই শাখা। এর অপর নাম সহজ কর্তাভজা।

বাউল সম্প্রদায়—চারজন ফকির —বনচারী, হরিগুরু, কমলিনী ও অখিলচাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নদীয়া এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

সহজে সম্প্রদায়—বাউল সম্প্রদায়েরই মত। নদীয়া এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

বলরাম ভজা—এদের অধিকাংশই ভিক্ষোপজীবী। এদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন উভয় লোকই আছে। এর প্রবর্তক বলরাম হাড়ি।

খৃস্টান—এই জেলায় খ্রীস্টীয় সম্প্রদায় আছে—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্‌ট্যান্ট উভয়ই। কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর, কাপাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাস। খ্রীস্টান মিশনারিগণ এই জেলায় খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেছেন। এই জেলায় বাংলা দেশের সকল জেলা অপেক্ষা খ্রীস্টানদের সংখ্যা অধিক।

মুসলমান—এই জেলায় বহু মুসলমানদের বাস। অধিকাংশই কৃষিজীবী ও চাকুরীজীবী। শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন মুসলমানও আছেন। এই জেলায় বহু পীর, ফকির বা গাজিগণের পুজো হয়ে থাকে। নদীয়া জেলায় প্রায় প্রতি গ্রামেই দু-একটি পীরের আস্তানা দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া পাঁচপীর, সাত পীর, পীর ব'র প্রভৃতি মহাপুরুষদের পুজো হয়ে থাকে

শিল্প ও ব্যবসায়কেন্দ্র

তাঁতের কাপড় শান্তিপুরে, তামা পিতল কাঁচের বাসন—নবদ্বীপ, রাণাঘাট।

মিঠায়ে কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, উলারমুণ্ডি, মনোহরা, বীরখণ্ডী ও সুয়াভোলা সন্দেশ, রাণাঘাটের পান্তুয়া, শান্তিপুরের মৈচুর ও নিখুঁতি, মেহেরপুরের রসকদম্ব, ক্ষীরের মেঠাই, গোপালনগরের কাঁচাগোল্লা ৪০-৫০ বছর আগেও খুব বিখ্যাত ছিল।

কুশাসন, পাটি, পিতলের ছবি-রাণাঘাট।

বাসনের কারখানা, নদীয়া ট্যানারি, জুতোর কারখানা—মহেশগঞ্জে

গী দ্য মোপাসাঁ

মঁসিয়ে আঁতোয়ান লাইয়ে বিধবা মাদাম মাতিল্দ সুরিকে বিয়ে করলেন। দশ বছর ধরে তাঁকে তিনি ভালবাসছেন।

মঁসিও সুরি ছিলেন তাঁর কলেজের পুরোন বন্ধু এবং সহপাঠী। লাইয়ে বন্ধুকে খুব ভালবাসলেও তাকে বোকা বলেই মনে করতেন এবং প্রায়ই বলতেন 'বেচারী সুরিটা একেবারে গাধা।'

যখন সুরি মাদমোয়াজেল মাতিল্দ দ্যুভালকে বিয়ে করেছিলেন তখন ল্যাইয়ে একটু বিস্মিত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ মাদামের প্রতি তাঁর বেশ আসক্তি ছিল।

মাতিল্দ ছিলেন প্রতিবেশী এক মহিলার মেয়ে। এই মহিলার ছুঁচ-সুতো-বোতাম ইত্যাদির ছোট্ট একটা দোকান ছিল। তাঁর মেয়ে বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী ছিলেন এবং সুরিকে অর্থরূপে গ্রহণ করলেন।

অতঃপর ল্যাইয়ে এক বিশেষ আশা নিয়ে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ভাব জমাতে সুরু করলেন। তিনি সুপুরুষ ছিলেন তার ওপর ধনী এবং বেশ চতুরও ছিলেন।---ভেবেছিলেন সফল হবেন নিশ্চিত কিন্তু ব্যর্থ হলেন।---বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার দরুন একটু বিবেচনা আর সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগলেন।---মাদাম সুরির ধারণা হল ল্যাইয়ে এখন আর তার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করেন না। তাদের ভেতরে একটা সাধারণ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রইল। এই বন্ধুত্ব ন' বছর স্থায়ী হল।

একদিন মাদাম সুরি ল্যাইয়ের কাছে সাংঘাতিক খবর পাঠালেন যে মঁসিও সুরি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এই সংবাদ শুনে ভীষণ আঘাত পেলেন লাইয়ে কারণ তাঁরা দুজনে সমবয়সী ছিলেন---কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার অসীম স্বস্তি, মুক্তি আর গভীর আনন্দ দেহ-মনকে ছেয়ে ফেলল—মাদাম সুরি এখন মুক্ত।---ল্যাইয়ে একটু শোকার্ত ভাব দেখালেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পনের মাস পরে তিনি বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলেন। সবাই এই ঘটনাকে খুবই স্বাভাবিক এমন কি লাইয়ের পক্ষে এটা একটা উদারতার কাজ বলে মনে করলেন—খাঁটি বন্ধু এবং সৎলোকের কাজই বটে।

বিয়ের পর তাঁরা সুখীই হলেন। পরস্পরের প্রতি বোঝাপড়ার ভাব এবং অন্তরঙ্গতার মাধুর্য নিয়ে বাস করতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের ভেতরে কোন কিছুই গোপন রইল না বরং পরস্পর পরস্পরকে গোপনতম চিন্তার কথাও বলতেন। ল্যাইয়ের ভালবাসার ভেতরে একটা শান্ত আর নিশ্চিন্ততার ভাব দেখা গেল।

লাইয়ে মনের এক নিভৃত কোণে মৃত সুরির প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতেন—কারণ সে-ই প্রথমে এই নারীর মন এবং পুষ্পিত যৌবনকে পেয়েছিল। --মৃত স্বামীর স্মৃতি জীবিত স্বামীকে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। মৃত-ব্যক্তির প্রতি এই হিংসা ল্যাইয়ের মনকে দিনরাত পীড়ন করছিল।

হিংলী তামাকের চাষ---চাকদহে, মদনপুরে, হরিণঘাটা ও কাঁচড়াপাড়ায়।

দেবীর 'ডাকের' সাজ---উলা।

মৃৎশিল্প---কৃষ্ণনগর (ঘূর্ণি), রাণাঘাট, শান্তিপুর নদীয়ার ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্প আজ বিশ্বে সমাদৃত।

কম্বল তৈরী---মাঝদিয়া, মহেশগঞ্জ, শিকারগঞ্জ, গোয়ারী, মেহেরপুর, স্বরূপগঞ্জ ও কৃষ্ণনগর।

টুপি---কালীগঞ্জ, দেবগ্রাম ও পলাশীপাড়া শাঁখের করাতীর কাজ---বালিয়াডাঙ্গা।

ছোলা, ডাল, কোষ্টা, মসিনা, সর্ষে-লঙ্কা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। ধান-চালের গঞ্জ ও ব্যবসায় কেন্দ্র- চুয়াডাঙ্গা, বগুলা, স্বরূপগঞ্জ, রাণাঘাট, শান্তিপুর, আঁদুলিয়া, কৃষ্ণনগর, হাঁসখালি, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি। এই জেলায় কয়েক স্থানে হোসিয়ারি দ্রব্যের কারখানা আছে।

॥ সমাপ্ত ॥

তিনি সুরির সম্বন্ধে অনর্গল বলে যেতেন ---তার স্বভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে স্ত্রীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতেন এবং তার খোঁটিগুলি আলোচনা করে হাসি-ঠাট্টা করতেন। প্রায়ই বাড়ির এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তস্থিত স্ত্রীকে ডেকে বলতেন—এই মাতিল্দ।

---এই ত', কি গো ?

—একটা কথা বলে যাও।

স্বামী মৃত সুরির সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করবেন জেনে হাসিমুখে হাজির হতেন তিনি এবং নতুন স্বামীর এই বাতিককে সমর্থন করে যেতেন।

---তোমার মনে আছে সুরি একদিন আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল---কেন মেয়েরা দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তিদের চাইতে খর্বাকৃতি লোকদের বেশি ভালবাসে।---

মৃত সুরির সম্বন্ধে এক অপ্রীতিকর চিন্তার ভেতরে ডুবে গেলেন তিনি --- কারণ, সুরি ছিলেন খর্বাকৃতি আর ল্যাইয়ে নিজে দীর্ঘাঙ্গ।

মাদাম ল্যাইয়ে পূর্বতন স্বামীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে প্রাণখুলে হাসতেন বর্তমান স্বামীকে খুশি করবার জন্য। সবশেষে ল্যাইয়ে একটি কথা বারে বারে বলতেন—'সুরিটা একটা হাঁদা ছিল।'

সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন তারা। ল্যাইয়ে সমস্ত কাজকর্মের ভেতর দিয়ে অতৃপ্ত ভালবাসা প্রকাশ করতেন।

একদিন রাত্রে ওঁদের ঘুম আসছিল না। হঠাৎ যেন নব-যৌবন ফিরে পেয়ে আবেগবিহ্বল হয়ে উঠলেন তাঁরা। ল্যাইয়ে স্ত্রীকে দুই বাহুর ভেতরে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন——

—বল না গো।

—কি ?

—সুরি কি সত্যিই তোমায় ভালবাসত ?

—না গো, তোমার মত অত নয়।

নিজের ভালবাসার প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে বললেন—ও একটা হাঁদা ছিল---নয় কি ?

কোন জবাব না দিয়ে স্বামীর ঘাড়ের কাছে মুখ লুকিয়ে একটু হাসলেন মাদাম---ঈর্ষামিশ্রিত হাসি।

ল্যাইয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—সে ছিল একেবারে বোকা --- চতুর মোটেও নয় ---- নয় কি ?

মাথা নাড়লেন তাঁর স্ত্রী ----যার অর্থ চতুর মোটেও নয়।

—রাত্রে নিশ্চয়ই তোমাকে জ্বালাত ---- কি বল ?

—ঠিক। অসঙ্কোচে জবাব দিলেন তাঁর স্ত্রী।

এই কথা শুনে আবার তাকে চুমু খেয়ে বললেন---কি পাষণ্ড। ওকে পেয়ে সুখী হয়েছিলে তুমি ?

—না, আমরা সর্বদা সুখী ছিলাম না।

ল্যাইয়ে তার স্ত্রীর পুরোন অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে খুব খুশি হলেন। খানিকক্ষণ নীরব থেকে আনন্দে উল্লসিত হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন---

—একটা কথার জবাব দেবে ?

—কি, বল।

—খোলাখুলিভাবে আমায় বলবে ?

—হ্যাঁ গো, বলছি তো।

—আচ্ছা, অন্য কাউকে ভালবেসে চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে নির্বোধ সুরিকে প্রতারণা করবার ইচ্ছে হয় নি কখনও তোমার ?

লজ্জায় স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট একটি কথা বললেন—ও।

----ল্যাইয়ের মনে হল তাঁর স্ত্রী যেন হাসছে।

আবার তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—সত্যি করে আমায় বল---- বোকা সুরিটা প্রতারিত হয়েছিল ?—কি মজার ব্যাপার।—লক্ষ্মীটি শুধু আমায় বল।

'শুধু আমায় বল' এই কথাটার ওপর জোর দিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন যদি চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে স্বামীকে প্রতারণা করবার ইচ্ছে থাকত তবে ল্যাইয়েকেই ভালবেসে চরিত্র-ভ্রষ্টা হতেন মাদাম---ল্যাইয়ে আনন্দে অধীর হয়ে এই কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।—

কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে হাসতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী—যেন একটা খুব মজার ঘটনার কথা মনে পড়েছে। ল্যাইয়েও হাসতে লাগলেন এই ভেবে যে মেয়েটিকে চরিত্রভ্রষ্ট করে তিনি সুরিকে ঠকাতে পারতেন—আনন্দে তোৎলাতে তোৎলাতে বলতে লাগলেন—বেচারী সুরি।—নির্বোধ—হ্যাঁ নির্বোধই।

মাদাম ল্যাইয়ে বিছানার চাদরের নিচে সমস্ত শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে জোরে জোরে হাসতে লাগলেন—চোখে জল এসে গেল তাঁর।

ল্যাইয়ে বলতে লাগলেন—জবাব দাও। জবাব দাও। নিঃসঙ্কোচে বল আমার কাছে ----আমার সঙ্গে চরিত্র-ভ্রষ্ট হওয়া তো খারাপ কিছু নয়।

হাসি চাপতে চাপতে কোনরকমে জবাব দিলেন মাদাম—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—হ্যাঁ মানে কি ? সব খুলে বল আমায়।

হাসি থামিয়ে স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে বললেন—হ্যাঁ, আমি তাকে প্রতারিত করেছিলাম।

ল্যাইয়ের মনে হল যেন হাড়ের ভেতর দিয়ে হিমপ্রবাহ বয়ে গেল—বললেন—তুমি তাকে প্রতারিত করেছ চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে ?

মাদামের মনে হল স্বামী যেন ভীষণ মজা পাচ্ছেন —আবার বললেন—'হ্যাঁ, চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে।'

রাগে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন ল্যাইয়ে —নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—মনে হল---তিনি নিজেই ভ্রষ্টা নারীর স্বামী হয়ে প্রতারিত হয়েছেন।

ল্যাইয়ে প্রথমে কিছু বললেন না—কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—ও।

নিজের ভুল অনেক দেরিতে বুঝতে পেরে মাদাম হাসি বন্ধ করলেন।

—কার সঙ্গে চরিত্রভ্রষ্টা হয়েছ ? ল্যাইয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

কি জবাব দেবে মাদাম নীরবে ভাবতে লাগলেন

—কার সঙ্গে? আবার জিজ্ঞেস করলেন ল্যাইয়ে।

—একজন তরুণের সঙ্গে। শেষে জবাব দিলেন মাদাম।

হঠাৎ মেয়েটির দিকে ফিরে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ল্যাইয়ে— —নিশ্চয়ই রাঁধুনীর সঙ্গে নয়। আমি জানতে চাই কে সেই তরুণ?

মাদাম কোন জবাব দিলেন না।

যে চাদরটা দিয়ে মাদাম মাথাটা ঢেকেছিলেন সেটা খুলে ফেলে দিলেন ল্যাইয়ে বিছানার মাঝখানে---আবার জিজ্ঞেস করলেন---আমি জানতে চাই কি নাম সেই তরুণের? শুনতে পাচ্ছ?

অনেক কষ্টে জবাব দিলেন তাঁর স্ত্রী—আমি ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম।

ল্যাইয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—কি? ঠাট্টা করতে চেয়েছিলে? আমাকে ঠাট্টা করা? ওসব চালাকি চলবে না—আমি জিজ্ঞেস করছি সেই তরুণের নাম কি?

কোন জবাব না দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মাদাম।---স্ত্রীর হাতটা ধরে সজোরে চাপ দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ল্যাইয়ে বললেন—আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

—আমার মনে হচ্ছে তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ---আমায় একটু একা থাকতে দাও। নার্ভাস হয়ে জবাব দিলেন মাদাম।

রাগে আর কিছু বলতে না পেরে কাঁপতে লাগলেন ল্যাইয়ে---স্ত্রীকে শক্ত করে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—শুনছ। শুনছ।

মাদাম এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে স্বামীর নাকটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন। স্ত্রী তাঁকে আক্রমণ করেছে মনে করে ল্যাইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর স্ত্রীর ওপর।---স্ত্রীকে নীচে ফেলে দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চড় মারতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন —এই নাও। এই নাও। হতভাগী পতিতা।

যখন দম ফুরিয়ে গিয়ে শরীরের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এল তখন স্ত্রীকে ছেড়ে দিলেন। কমলালেবুর পাতা দিয়ে এক গ্লাস মিষ্টি সরবৎ তৈরি করবার জন্য দেরাজটার দিকে এগিয়ে গেলেন —তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন অবসন্ন হয়ে ভেঙ্গে পড়ছেন।---

নিজের ভুলের জন্য সমস্ত সুখের অবসান হল মনে করে মাদাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন ---- তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন—শোন জাঁভোয়ান। আমি মিথ্যেকথা বলেছি। শোন, তুমি সব বুঝতে পারবে।

যুক্তি আর ছলের সাহায্যে আত্মরক্ষা করবার জন্য মাদাম মাথাটা একটু তুললেন ----চুলগুলো উস্কখুস্ক ---- টুপিটা উল্টে গিয়েছে।----

ল্যাইয়ে স্ত্রীকে আঘাত করেছেন বলে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন বটে কিন্তু অন্তরটা অসীম ঘৃণায় ভরে উঠল ---কারণ এই স্ত্রীলোকটিই আরেকজনকে প্রতারণা করেছে—সে সুখি।----*

অনুবাদক—সুবীরকান্ত গুপ্ত

* মূল ফরাসী থেকে অনূদিত।

কি রঙের চুল চান?

বাদামী, লাল, কালো, সবুজ, গোলাপী না সোনার রং?—যা' চান তাই হবে। শুধু---শ্যাম্পু দিয়ে ধোয়া চুল রগড়ে নিন্—ব্যস্। আর কিছু করতে হবে না আপনাকে বেশ কিছু-দিন। রঙীন মাথা নিয়ে ঘুরেফিরে বেড়ান সগর্বে।

সময়ের সাথে সাথে মানুষও পাল্টায়, পাল্টায় তার রুচি ও প্রকৃতি। ভগবদ্দত্ত চেহারা নিয়ে আজকের মানুষ খুশী নয়---প্ল্যাস্টিক সার্জারীর কল্যাণে বোঁচা নাক বাঁশীর মত হয়, ছোট চোখ হয় পটলচেরা---আরও কত কি হয়। পাতলা চুলকে ঘন করার সদুপায় ছিল এতকাল পরচুল পরা; ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে, মেলবোর্নের এক সার্জন নাকি টাকের ওপর টেক্কা দেবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং প্রয়োগও করতে সুরু করেছেন।

অতএব, প্রকৃতিদত্ত চুলের রং যদি পছন্দ না হয়, তবে তাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় "ইন্স্ট্যাণ্ট" কালার শ্যাম্পু দিয়ে ঘষে নিন মাথাটা। তৎক্ষণাৎ পছন্দসই রঙের চুল পেয়ে যাবেন। এ যেন ঠিক গালে কস্‌মেটিক ঘষার মত—মাঝে মাঝে রিপিট্ করা চাই অবশ্য।

দশ মিনিটের মধ্যে চেহারা পাল্টাবার কৌশল আজ মানুষ আয়ত্ত করেছে। ছদ্মবেশ ধারণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরচুলার প্রয়োজন ফুরিয়েছে—রং পাল্টে নিলেই হ'লো চুলের---আর কি চাই!

রং করার পর কুসুম কুসুম গরম জলে একবার ধুতে হবে চুলকে। রং করার জন্য হাত দিয়ে ঘষা চলে বা ছোট্ট ব্রাশ্ দিয়ে আলতো করে লাগিয়ে দিতে হয়।

খোদার ওপর খোদকারী আরও কত যে করবে মানুষ।

কালের আলাপ

সুনীলকুমার নাগ

॥ এক ॥

সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় 'নিজের' বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি সে-রকম কিছু থাকে না তাঁদের। নিজের জীবন, নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ বলতে এঁরা যা বোঝেন, সে জিনিষটা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না। কারণ, এঁরা কখনোই সংসারের আর পাঁচজনকে 'নিজের' থেকে বাইরে মনে করতে পারেন না। আমার বড়মামা হলেন ঠিক এইরকম এক ব্যক্তি।

সেই কিশোর বয়স থেকেই প্রথম কিছুদিন বড়মামাকে বুঝবার চেষ্টা করে, যখন ওঁর প্রকৃতির ব্যতিক্রম-গুলি লক্ষ্য করলাম, তখন থেকেই ওঁকে আর বুঝবার চেষ্টা করি নি। সাধ্যমতো কেবল ওঁকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি।

হাঁপানী রোগটা শুনেছি তরুণ বয়স থেকেই বড়মামার সঙ্গ নিয়েছিল. সেই সঙ্গে ইদানীং প্রেসার যুক্ত হয়ে ওঁকে একেবারেই শয্যাশায়ী করে ফেলেছিল। তারই মধ্যে বারবার থেমে জিরিয়ে নিয়ে বললেন, বাস থেকে নেমেই ডানদিকের বড় রাস্তায় ঢুকে পড়বি, খানিকটা এগোবার পরে একটা চৌমাথা পাবি, এখানেও ডান দিকের গলিটায় ঢুকবি। কিছুদূর এগোবার পরে দেখবি আর একটা চৌমাথা, এবার বাঁ দিকে যাবি, এখান থেকে কয়েক প. এগোবার পরই এক মুদি দোকানের পাশ দিয়ে আর একটা গলি বেরিয়েছে। এই গলি দিয়ে খানিকটা এগোবার পরেই দেখবি একটা খোলার ঘরে চায়ের দোকান—তার পেছনেই ছোট মাঠ—সেখানে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে সুরথ চৌধুরী কোথায় থাকেন। নামটা ভুলিস না যেন। বাসার নম্বরটা আমার ঠিক মনে নেই।

বড়মামার সন্দেহটা মিথ্যে নয়। সুরথ চৌধুরীর আস্তানার গলিটার নাম যা তাঁর নির্দেশ যা উনি বলেছিলেন, তা ওঁর 'ডানবাঁয়ের' দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। একটু লিখে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোলেই হত ভালো—বড়মামা বলেও ছিলেন কথাটা, কিন্তু তখন কানে তুলিনি, তাই এতো ভুগতে হচ্ছে, এ হলো যাকে কথায় বলে—গলির গলি তস্য গলি।

ছেলেবেলা থেকে আছি কলকাতায়, কিন্তু এ রকম একটা গলি যে ভবানীপুরের এতো কাছে থাকতে পারে, তা সত্যি ভাবিনি কখনো। বড়মামার একটা কথা কিন্তু মনে গেঁথে গিয়েছিল—যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করবি সুরথ চৌধুরী কোথায় থাকেন, নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেবেন। 'সুরথ চৌধুরী' নামটা অবশ্য আগেও আরো বহুবার শুনেছি, গত কয়েক বছর ধরেই শুনে আসছি বড়মামার মুখে, কাজেই ও নামটা ভুলবার নয়। আর ওঁর এ কথাটাও যে কতো সত্যি তা তো পাড়ায় ঢুকেই টের পেয়েছি। ডাক্তারখানা, লণ্ড্রি, চায়ের দোকান—যেখানেই জিজ্ঞাসা করেছি ওঁর বাসার কথা, প্রত্যেকেই আগ্রহের সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন কেউ কেউ বলেছেন, 'সুরথ-দা'র বাসায় যাবেন, ঐ তো এসে গেছেন। ভাবটা যেন, এতো কষ্ট করে যখন এতোটা এসেছেন, তখন আর একটু কষ্ট করে দেখাটা করেই যান না।

কিন্তু যে নামটা সম্বন্ধে এতো শুনেছি, যাঁর সামনে শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, এম এল এ, এম পি,—দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নাকি নেহাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতার আসনে বসে থাকেন, সেই ব্যক্তির বড়মামার ভাষায় সেই 'অসাধারণ পুরুষের' আস্তানা যে এ হেন একটা পল্লীর মধ্যে হতে পারে তা' বাস্তবিক কল্পনা করতে পারিনি।

অনেকবার ডানে বাঁয়ে করবার পরে একটি কিশোর বয়সের ছেলের শরণাপন্ন হলাম। সুরথ চৌধুরীর বাসা খুঁজে পাওয়ার আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, তখন দেখি এই ছেলেটি রাস্তার কলে কখন জল আসবে তার অপেক্ষায় গোটা দুই ছোট ছোট বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। আরো অনেকেরই বালতি, ঘটি, কলসী 'কিউ' দিয়ে সাজানো রয়েছে, তবে ওই ছেলেটিই ছিল সবার আগে।

জিজ্ঞাসা করলাম—খোকা, সুরথ চৌধুরীর বাসাটা চেন?

—নিশ্চয়ই। বা:, এই তো এসে গেছেন। আর একটু এগিয়ে যান, দেখবেন ছোট একটা মাঠের মতো জায়গা। কয়েকটা গরু মোষ বাঁধা আছে। টালির চাল টিনের বেড়া এক-খানা ঘর, ঐ ঘরটাই। জ্যেঠাবাবু বাসায়ই আছেন, দেখে এসেছি একটু আগে। চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বলে, ছেলেটি ওর বালতি দুটি একেবারে কলের গা ঠেকিয়ে রেখে প্রায় দোড়োবার মতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো—আসুন আসুন আমার সঙ্গে।

•

ওকে অনুসরণ করে খানিকটা এগোবার পর একটা ছোট মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা পেলাম। গরু মোষও কয়েকটা বাঁধা রয়েছে। খোঁটার সঙ্গে ফাঁকা জায়গাটার একদিকে, আর অন্য পাশে টালির চাল আর টিনের বেড়ার একখানা ঘর। দরজাটা খোলাই ছিল। একজন লোক খোলা দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে কিছু একটা কাজে ব্যস্ত।

ছেলেটি বললো—ঐ তো, ঐ যে বসে আছেন জ্যেঠাবাবু। আমাদের বাসা ঐ যে। বলে, ছেলেটি মুলি বাঁশের বেড়া, খোলার চালের একখানা ঘরের দিকে হাত তুলে দেখালো।

ঘরের জানালার সামনে একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন ওঁকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন—এই বিশে, তুই বালতি ফেলে টোটো করে বেড়াচ্ছিস, এক ফোঁটা জল নেই ঘরে।

—তোমার নাম বুঝি বিশে? ছেলেটির একখানা হাত ধরে বললাম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালো নাম বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

আমি হাতটা একটু আলগা করতেই বিশ্বনাথ আবার কলের দিকে দৌড়লো। এক পা দু'পা করে আমি এসে সুরথ চৌধুরীর দরজার সামনে দাঁড়ালাম। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় আমার ছায়াটা ওঁকে ছাপিয়ে ভেতরের বেড়ার অর্ধেকটা জুড়ে পড়লো।

সুরথ চৌধুরী হামানদিস্তায় কিছু একটা গুঁড়ো করবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমি নিঃশব্দে এলেও আমার ছায়াটা ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, একটুক্ষণ বন্ধ রেখে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালেন। ভালো করে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলেন, প্রথমে চশমাটা পরা অবস্থায়ই তারপর বাঁ হাতে খুলে নিয়ে স্পষ্টত আমাকে চিনতে পারলেন না, তাই ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—কত নম্বর চাই? কাকে খুঁজছেন?

—আজ্ঞে আমি সুরথ চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছি, দু'হাত তুলে নমস্কার করে বিনীতভাবে বললাম, আপনিই তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই সুরথ, আসুন। সুরথ চৌধুরী ব্যস্তসমস্তভাবে হাতের কাজটা পাশে সরিয়ে রেখে চৌকির তলা থেকে একটা বেতের মোড়া টেনে বের করে দু' তিন বার ফুঁ দিয়ে ধুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

আমার জন্যে ওঁর ব্যস্ততা দেখে রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। বললাম, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমি তক্তপোষেই বসছি।

—না না না, ওখানে বসবেন না, সুরথ চৌধুরী আরো ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনার ধোপের জামাকাপড় ময়লা হয়ে যাবে। আজ কতদিন ধরে ভাবছি সুজনিটা কাচতে দেবো, তা মনেও থাকে না। একটু বসুন, এই মিনিট দুই, আমি হাতের কাজটা একটু সেরে নিই।

সুরথ চৌধুরী হামানদিস্তাটা আবার কোলের কাছে টেনে নিয়ে চূর্ণ করা খানিকটা জিনিষ একটা কৌটোর মধ্যে পুরতে লাগলেন।

আমি একপলক দেখে নিলাম ওঁকে। বয়সে বড়মামার চাইতে ছোটই হবেন মনে হল, বাষট্টি-তেষট্টির বেশী কিছুতেই নয়। কিন্তু নানা কারণে বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বুড়ো দেখাচ্ছে। চোখ দুটি বড্ড খারাপ, শরীরের প্রতি যত্নেরও বিশেষ অভাব মনে হলো।

ঘরের ভেতরের দিকে ভালো করে নজর দিতে ক্রমেই আমার বিস্ময় বাড়তে লাগলো। একপাশে জোড়া তিনেক জুতো। একজোড়া বেশ দামী সোয়েডের নিউকাট, আর দু' জোড়া প্রায় ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। দুই বেড়ার সঙ্গে একটা দড়ি খাটানো, তাতে গোটা তিনেক ঢিলেহাতা পাঞ্জাবী, একটি গেঞ্জী মেলে দেওয়া, বোধ হয় ঘাম শুকোবার জন্য, খান দুই ধুতি, একটা গামছা, একখানা বেশ দামী শাল অগোছালোভাবে জড়ো করা রয়েছে।

ছোট বিছানাটার ওপর দেখলাম অনেক রকম জিনিষ। মশলার ডিবে, চশমার খাপ, বেশ বড় একখানা ছুরি, একটা স্টেথিসকোপ, এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি কয়েক রকমের ওষুধের শিশি, কিছু খুচরো পয়সা চাপা দেওয়া রয়েছে। কয়েকটা ছোট নোটের ওপর, খানতিনেক বই, একটি রুদ্রাক্ষের মালা এবং বেশ মোটা একখানা পকেট ডায়েরী।

বইয়ের র্যাকটার দিকে চোখ পড়তে বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অনেকের বাড়ীর লাইব্রেরীতেই সংখ্যায় এর চাইতে অনেক বেশী বই আমি দেখেছি, কিন্তু এক্ষেত্রে যতো বিচিত্র রকমের বইয়ের একত্র সমাবেশ ঘটেছে, বিশেষত দুটি মাত্র র্যাকের দশটা তাকের স্বল্প পরিসরে তা' আর কখনো কোথাও দেখেছি বলে মনে হলো না। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী এবং সংস্কৃতে গীতার পাশেই মার্কসের ক্যাপিটালের দুটি খণ্ড, আর একটি তাকে একখণ্ডে সম্পূর্ণ সেক্সপীয়রের রচনাবলীর পাশে দেখি স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং চিকাগো বক্তৃতা কথামৃতের কয়েকটি খণ্ড, গোরা, গ্যেটের ফাউস্ট এবং মার্লোর ডক্টর ফস্টাস, ব্রাউনিঙের প্যারাসেলসাস; একটা তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনা দেখলাম বসুমতী সংস্করণে, তার পাশে মিল এবং কোঁতের বই, কার্লাইলের ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন, ওয়েলস-এর আউটলাইন অব হিস্ট্রী, দেশী বিদেশী ইতিহাস সম্পর্কিত আরো খানকতক বই, আর একটি তাকে মোটা মোটা কয়েকখানা বিজ্ঞানের বইয়ের পাশেই রামায়ণ, মহাভারত, কোরান, বাইবেল প্রভৃতির একেবারে ঠাসাঠাসি।

সবার ওপরের তাকটিও বইয়ে ভর্তি—তবে এতো দূর থেকে সেগুলির নাম পড়তে পারলাম না। সবার নীচের তাকটির একপাশে লেখবার সরঞ্জামও রয়েছে দেখলাম।

সব চাইতে বিস্মিত হলাম বিছানাটার শিয়রের দিকের বেড়ায় চোখ পড়তে—রকমারী ছবির হাট। দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, কোনটা ক্যালেণ্ডার কাটা, কোনটা খবরের কাগজ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া, কোনটা আর্টিস্টের তুলিতে আঁকা, কোনোটা বা ক্যামেরায় তোলা। জীবিত এবং মৃত নানা শ্রেণীর মানুষ থেকে দেবদেবীও অনেকেই রয়েছেন। কেউ আমার চেনার মধ্যে কেউ বা অচেনা, কয়েকখানাই মাত্র আমার চেনার মধ্যে। যেমন সেক্সপীয়র, নেপোলিয়ান, শ্রীরামকৃষ্ণ, কার্ল মার্ক্স, বুদ্ধদেব, ক্ষুদিরাম, বারট্রাণ্ড রাসেল, নেতাজী সুভাষ, দেশবন্ধু, শিবাজী, আচার্য রায়, টলস্টয়,

হিটলার, আচার্য জগদীশচন্দ্র, ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু, কাজী নজরুল ইসলাম, গ্যারিবল্ডি, শরশয্যায় ভীষ্ম, এব্রাহাম লিঙ্কন, রবীন্দ্রনাথ, ক্রমওয়েল, সারথি-রূপে শ্রীকৃষ্ণ সহ অর্জুন, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, শরৎচন্দ্র, মাও সে তুঙ, আইনস্টাইন, হুইটম্যান, তৈলঙ্গস্বামী, আলেকজাণ্ডার, কুকুরসহ যুধিষ্ঠির, স্যার যদুনাথ, ভিক্টর হুগো, তেনজিং, লেনিন, শ্রীঅরবিন্দ, ডারুইন, বঙ্কিম-চন্দ্র, গান্ধী, লালবাহাদুর এবং আরো অনেকে।

শুকনো গামছাখানা দিয়েই মুখ-খানা মুছতে মুছতে বললেন সুরথ চৌধুরী—অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাকে, কিছু মনে করবেন না, তারপর, বলুন, কোত্থেকে আসছেন আপনি?

—আজ্ঞে, আমার বড়মামা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।

—আই সি, সুরথ চৌধুরী কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, নরেশবাবুর ভাগ্নে তুমি, মানে তুমি অশোক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অশোক মিত্র।

—মিত্র ত' বটেই, শত্রু নও, তা আমি জানি। সুরথ চৌধুরী বেশ খানিকটা খুশীর হাসি হেসে নিয়ে বললেন, তোমার কথা যে কতো শুনেছি নরেশবাবুর মুখে তার লেখা-জোখা নেই, তোমার বাঁ হাতে কব্জির নীচে মুসলমান গুণ্ডার ছোরার দাগ আছে, ডান পায়ে হাঁটুর নীচে আছে বৃটিশ পুলিসের গুলির দাগ, আর বাঁ পায়ে হাঁটুর বেশ খানিকটা ওপরে আছে স্বদেশী পুলিসের বুলেটের চিহ্ন। তাই না? তুমি মামলেট খেতে খুব ভালোবাসো, টেনিস কাফ সার্ট ছাড়া পারো না, ম্যাট্রিকে তিনটে লেটার পেয়েছিলে, বাইরে তুমি খুব ঠাণ্ডা কিন্তু মাসের ওপর হম্বিতম্বি করো, বোনের সঙ্গে মারপিট করো, অস্কার ওয়াইল্ড তোমার প্রিয় লেখক, বর্তমানে একশ পঁচাশী টাকা মাইনে পাচ্ছ, ছেলেবেলায় একবার তুমি চলন্ত স্টীমার থেকে নদীর মধ্যে পড়ে গিয়ে-ছিলে, মায়ের নিরামিষ তরকারী দিয়ে মাখা অন্তত একগ্রাস ভাত কি ছুটির দিনে তোমার না খেলে পেট ভরে না, হা হা হা হা, বলো এসব সত্যি কিনা, বলো বলো। হা হা হা---

এঁর প্রতিটি কথাই এমন সত্যি যে প্রতিবাদ করবার আমার সাধ্য নেই। লজ্জায় এবং সঙ্কোচে আমি যেন প্রায় কুঁকড়ে গেলাম। সুরথ চৌধুরী বুঝলেন আমার অবস্থা, তাই হাসি থামিয়ে বললেন—এতে লজ্জার কি আছে অশোক, তোমার বড়মামা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, বিয়ে-থা করেন নি, জীবনে তাঁর একমাত্র আকর্ষণ তুমি, আর যার জন্যে যখন যা করে-ছেন তা কেবল কর্তব্য হিসেবে। সবই বলেছেন আমাকে, সবাই আমাকে সব কথা বলে, এইটেই স্বাভাবিক। বুঝলে অশোক, আমরা সভ্য হয়ে সবাই নিজের নিজের খাঁচার মধ্যে ঢুকে বন্দী হয়ে থাকবার চেষ্টা করি, এটা কিন্তু আসলে মানুষের স্বভাব নয়, মানুষ চায় তার মনের কথা অপরকে বলে তার হৃদয়ের প্রসার ঘটাতে, যে তা পারে সে জীবনে সুখের সন্ধান পায়, নিজের কথা অপরকে বলতে পারলে তবেই না মানুষ অপরকে তার সত্যিকার আত্মীয় মনে করতে পারে।

মানুষে মানুষে যে পার্থক্য সেটা প্রধানত বাইরের আকৃতিতে, অন্তরের দিক থেকে দেখতে গেলে মানুষ মাত্রেই সমান—এ একটা আশ্চর্য হয়ে যাবার মতো ব্যাপার। থাক এ সব কথা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভগ-বানের আশীর্বাদ থাকলে সবই বুঝবে। তা কি পারে বল?

আমি কিছু বলবার আগেই সুরথ চৌধুরী নিজেই বললেন আবার—দাঁড়াও দেখি চায়ের বন্দোবস্ত করছি—ওরে ও বিশে। বলতে বলতে দরজার দিকে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বনাথকে দেখা গেল দোরগোড়ায় দুহাতে দুটি ছোট কাচের গেলাশ ভর্তি চা নিয়ে।

—কি রে তোর মা মন্তরটন্তর জানে নাকি, ঠিক দুটো চাই নিয়ে এসেছিস?

—আমিই ত' রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে এলাম ওনাকে, বিশ্বনাথ কিছুটা গর্বের সঙ্গেই বললো, মা ও দেখেছেন।

—বেশ করেছিস, দেখ তো কালী দোকান খুলেছে কি না, তাহলে বিস্কুট নিয়ে আয় দু'খানা।

আমি ইচ্ছে করেই সুরথ চৌধুরীর কোন ইচ্ছাতে বাধা দিলাম না। কারণ, মনে হচ্ছিল, ওঁর ইচ্ছাশক্তি এতই প্রবল যে আমার পক্ষে ওঁকে কোন কাজে বাধা দিয়েও নিরস্ত করা সম্ভব হবে না।

—আজ তো রোববার তাই না, অশোক? গতকাল বিকেলের দিকে নরেশবাবুর আসবার কথা ছিল আমার বাসায়, কিন্তু---

—আজ্ঞে ওঁর শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না, কাল বার বার বলছিলেন, ভেবেছিলেন আজ আসতে পারবেন কিন্তু আজ শরীরটা আরো খারাপ বোধ করছেন, সেইজন্যেই আমাকে পাঠালেন।

—শরীর খারাপ মানে, সেই প্রেসারের ব্যাপার নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভালোই করেছেন তা'হলে আসেন নি। রেস্টই ও রোগের বেস্ট মেডিসিন।

—বড়মামা বিশেষ করে বলেছেন, আপনার যদি খুব অসুবিধে কিছু না হয়, যদি দয়া করে একবার আসেন আমাদের বাড়ী।

—আহা হা, ওভাবে বলছো কেন, নিশ্চয়ই যাবো। আমাদের কি সেই সম্পর্ক। তুমি বস, আমি আজই, তোমার সঙ্গে যাবো, যা দিনকাল, তায় মেয়ের বিয়ে বলে কথা, এ সব ব্যাপার ফেলে রাখা ঠিক নয়।

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ দু'খানা বিস্কুট নিয়ে এলো, সুরথ চৌধুরী

একখানা দিলেন আমাকে, আর একখানা ওকেই খেতে বললেন।

বিশ্বনাথ বিস্কুট খেতে খেতে ঘর থেকে বাইরে পা বাড়ালো। সুরথ চৌধুরী ফতুয়াটা গায়ে চড়িয়ে বললেন, হ্যাঁরে বিশে, বাড়ী যাচ্ছিস? না, আমি একটু বেরুচ্ছি, বেশী দূর নয়, এই ভবানীপুরে। তোর বাবা-টাবা সবাইকে বলে দিস, কেউ যেন ঘুমোয় না, আমি কিন্তু তাহলে এক এক করে টেনে তুলবো, তবে ছাড়বো। শিবু খুড়োকে মনে করিয়ে দিস আজ সংস্কৃত ক্লাস নিতে হবে, মণ্টার বাবাকে বলিস যেন ইংরেজী হাতের লেখার খাতাটা নিয়ে আসতে আজ আর না ভুলে যায়, আর ঐ নিধু গোয়ালার মামা না পিসে কে যেন, কালও আসেনি কেন, জেনে রাখিস। নে একবারে দরজাটা দিয়ে যা।

কথা বলতে বলতেই সুরথ চৌধুরী পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়ালেন, তারপর পকেট ডায়েরীটা পকেটে পুরে সেই সঙ্গে বালিসের তলা থেকে কয়েকখানা নোটও রাখলেন বুক পকেটে। বাঁ হাতে করে তুলে নিলেন কিছু খুচরো পয়সা আর ডান হাতে করে নানা রকম ওষুধের চূর্ণ মেশানো সেই কৌটোটা তুলে নিলেন। প্রথমে একটা ছেঁড়া চটি পরে আবার কি মনে করে সেটা ছেড়ে সোয়েডের নিউ কাটটা পরলেন' তারপর ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকালের জন্যে চোখ বুজে মাথাটা ঈষৎ নোয়ালেন। ওখানে তো কাজী নজরুল ইসলাম, হিটলার থেকে মার্কস, যুধিষ্ঠির প্রমুখ অনেকেই রয়েছেন। কাজেই প্রণামটা যে উনি কাকে জানালেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—এসো অশোক, এবার বেরিয়ে পড়া যাক। আমাকে আবার সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে, তা না হলে ইস্কুলটা ঠিকমতো চলে না।

॥ দুই ॥

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্বনাথ দরজাটার তালাটা দিয়ে চাবিটা নিয়ে ওদের বাসার দিকে দৌড়ল।

—এই বিশ্বনাথ ছেলেটা বড় ভালো, ও না থাকলে আমি অনেক আগেই মরে ভূত হয়ে যেতাম, সুরথ চৌধুরী বললেন, শিবু খুড়ো, মানে শিবনাথ ভট্টাচার্য হলেন ওর ঠাকুরদা, সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত, কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন ত,' এখানে এই বিরাট কলকাতা সহরে কে কার পরিচয় জানে বলো।

এমনই দুর্ভাগ্য যে ভদ্রলোকের ছেলেটা, মানে বিশের বাবা রাধানাথ একটি মহামূর্খ, বাজারে কাঁচা মালের দোকান করে, রোজগার নেহাৎ মন্দ নয়, সংসার তো ওই চালায়, অনেক চেষ্টা করেও শিবু খুড়োর যজমান সে রকম জোটাতে পারলাম না। আমার নাইট ইস্কুলে উনি সংস্কৃত ত পড়ানই, কোন কোন দিন বাংলাও পড়ান, নিয়মিত কিছু দিতে পারি না, এই হয়েছে মুস্কিল।

কথা বলতে বলতে সুরথ চৌধুরী গলির মুখটাতে এসে দাঁড়ালেন। গরু মোষগুলির পেছন দিকে একটা বড় ছাপরার দিকে দেখিয়ে বললেন—ঐ যে খাটালটা দেখছো অশোক, ওটা নিধু গয়লার, একপাশে ওর গরু-মোষগুলি থাকে আর হোগলার বেড়া দেওয়া এদিকটায় আমরা ইস্কুল বসাচ্ছি, অবশ্য বেড়াটা না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, একটু থেমে বললেন উনি, লেখা-পড়া না জানলে, বোধ ভাসি্য না থাকলে অপরের জন্য কিছু করবার প্রবৃত্তি না থাকলে মানুষ আর গরু-মোষে যা প্রভেদ তা শুধু ঐ চেহারাটায়।

চেষ্টা করছি কিছু ডোনেশন তুলবার, যদি পারি তা হলে একটা ঘর ভাড়া করবো ইস্কুলটার জন্যে। গত কয়েক বছরে আমাদের এ ইস্কুল থেকে অন্তত তিন শ জন সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোক এমন লেখাপড়া শিখছে যে আজ তারা স্বচ্ছন্দে খবরের কাগজটা পড়তে পারে। আমাদের সবচাইতে মুস্কিল হয়েছে ইংরেজী পড়াবার লোকের অভাব। শিব খুড়ো বলতে গেলে ইংরেজী জানেন না, নিধুও জানে না, মণ্টার জ্যেঠা যদিও যা কিছু কিছু জানে, কারণ ও ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিল, কিন্তু চর্চা নেই ত' কাজেই ব্যাকরণটা বলতে গেলে ভুলেই গেছে, আর আমি নিজে ত' মোটে ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছিলাম, নিজে পড়ে অবশ্য ইংরেজী সবই বুঝতে পারি, কিন্তু অপরকে বোঝাতে পারি না। ভরসা শুধু কালীঘাট থেকে একটি ছেলে আসে। ও একটা কলেজের প্রফেসর, খুব সিনসিয়ারও বটে, কিন্তু সংসারের ওর এমন চাপ যে তেমনি নিয়মিত আসতেই পারে না। যেদিন ও আসে সেদিন আমরা আর কেউ পড়াই না, ও একাই সকলকে নিয়ে ইংরেজী ক্লাস নেয়।

বিরাজ বড় ভালো ছেলে, আলাপ করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে, দেখো ভাল লাগবে। নাও এগোও, আমাকে আবার পথে এক-আধটা জায়গায় যেতে হবে।

এবার গলিতে ঢুকে হন হন করে চলতে লাগলেন সুরথ চৌধুরী। ওঁর সঙ্গে সমান তালে হাঁটা রীতিমত কষ্টকর বোধ হচ্ছিল। কৃশ চেহারার লম্বা গড়নের মানুষ এক এক কদমে এতোটা এগোচ্ছিলেন যে তা সামলাতে আমার ঘন ঘন দু' তিনবার পা ফেলতে হচ্ছিল।

একটার পর একটা গলি বেঁকতে লাগলেন উনি। আর মাঝে মাঝে কখনো এপাশ থেকে কখনো বা ওপাশ থেকে নানা বিচিত্র প্রশ্ন ওঁর উদ্দেশ্যে করা হচ্ছিল।

'সুরথদা বেরোচ্ছেন নাকি, আজ স্কুল বসবে ত?---করপোরেশন ইলেকশনেও কংগ্রেস টিকে গেল সুরথ দা, তবে এইবারই শেষ বার।---রক্ত আমাশার আপনার সেই ওষুধটা তৈরী আছে তো বাসায়? ফেরবার মুখে একটু ডেকে নিয়ে যাবেন, আপনার বৌমা খুব ভুগছে---ইস্ট পাকিস্তানে ঝড়ে কী ক্ষতিটাই না করলো এবার, ফেরবার পথে হয়ে

যাবেন একটু, পড়ে শোনাবো'খন। ---সুরথকাকা বাবা বলেছেন, কাল সকালে চা-টা আমাদের বাড়ীতেই খাবেন।' এই ধরণেরই সব কথা।

সুরথ চৌধুরী চলার বেগ একটুও না কমিয়ে প্রত্যেকের কথারই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে লাগলেন। গলির পালা শেষ করে বড় রাস্তায় পা দেওয়ার মুখেই দেখা আর একজনের সঙ্গে, প্রায় মুখোমুখি। বয়স আমার চাইতে একটু বেশীই হবে, তবে বত্রিশ-তেত্রিশের বেশী নয়। বেশ ছিমছাম চেহারা।

—এই যে সুরথদা, বেরোচ্ছেন বুঝি, আর একটু দেরী হলে ত' দেখাই হতো না আর আজ। এই নিন ফাইনান্স পত্রিকা, গোল করে পাকানো কতকগুলি কাগজ সুরথ চৌধুরীর হাতে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, চশমাটা পাল্টান নি মনে হচ্ছে ত', তা হলেও রাত্রে আর দেখতে পারবেন না, যা হোক, কাল দিনের বেলায় যখন হোক দেখে রাখবেন, কাল রাতে আমি পড়াতে যাবো তখন নিয়ে আসবো। পরশু দিনই ছাপা হয়ে যাবে।

—ছাপা হবে বলছো, তা কাগজ?

—সে জন্যে ভাববেন না, এখন প্রেসেই চালিয়ে দেবে বলেছে, তবে মাসখানেকের মধ্যে ওদের দামটা চুকিয়ে দিতে হবে।

—তুমি টিউশনীতে চললে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চলি। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে বড় রাস্তা ধরে হন-হন করে এগিয়ে চললেন।

সুরথ চৌধুরী রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়েই গোল করে পাকানো প্রুফটা একবার খুলে দেখে আবার আগের মতই পাকালেন। তারপর বললেন, এ একটা নতুন জিনিষ অশোক। আমাদের একটা সমিতি আছে। আজ উনিশ বছরে এর সদস্য সংখ্যা দু হাজার পুরো হয় নি। তবে সিমপ্যাথাইজার আছে অনেক। গতবার নোয়াখালিতে ঝড়ের পর তোমার বড়মামাও 'আটচল্লিশ টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য ঠিক নামকো আস্তে সদস্য বাড়াবার জন্য খুব চেষ্টাও করি না, কারণ, অন্তত আমার জীবনে এ স্বপ্ন সফল হবে না জানি। তাই চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব আদর্শটা, আমাদের বক্তব্যটা পাঁচজনের সামনে তুলে ধরতে। আমাদের সাধ্যমতো প্রচার চালিয়ে যাই। শুধু কলকাতায় বা পশ্চিম বাংলাতেই নয়, গোটা বাংলা দেশে, গোটা পাকিস্তানে, গোটা ভারতবর্ষে। আমাদের সমিতির চরম লক্ষ্য যদিও একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা, তবে আপাতত কার্যত আমরা সে বিষয়ে কিছুই করে উঠতে পারছি না। আমরা কেবল দুই ভারতের দুঃস্থ, দুর্গত বা বিপন্ন মানুষকে আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করবার চেষ্টা করি মাত্র। আমরা এর নাম রেখেছি 'অখণ্ড ভারত সেবা সমিতি।'

বড় রাস্তায় উঠে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোতে লাগলাম। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুরথ চৌধুরী বললেন—অলৌকিকে তোমার বিশ্বাস আছে অশোক?

ঠিক এরকম প্রশ্নের জন্য আমি তৈরী ছিলাম না। তাই অকস্মাৎ কিছু বলতে পারলাম না। উনিই বললেন, অলৌকিক মানে হঠাৎ ঐ গাছটা মাটির শেকড় ছিঁড়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল বা তুমি আর আমি চক্ষের নিমেষে এই মাইল দু' তিন রাস্তার কয়েক হাজার বাড়ী ডিঙ্গিয়ে একেবারে তোমার বড়মামার বিছানার পাশে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, তা নয়। আমি যা বলতে চাইছি সে অলৌকিক কাণ্ড লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের উপর ঘটে গেছে, কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতায় সে একটা বাস্তব সত্য। দেখো আমি যখনই যার কাছে আমার এই সমিতির কথা বলি অনেকে মুখের উপরই আমাকে পাগল বলে হটিয়ে দেয়, আবার কেউ বা আমার প্রতিই হোক কিংবা আমার আদর্শের প্রতিই হোক অল্প বিস্তর মমতার জন্য আড়ালে পাগল বলে। তোমার কি ধারণা হয়েছে আমার সম্বন্ধে তা তুমিই জান। তবে আমার কিন্তু বিশ্বাস বাস্তবিক পাগল আমি নই। লোককে ঠিকমত আমি বোঝাতে পারছি না সেটা আমার অক্ষমতা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাঙলা দেশের কত ছেলেই ত' কতো সময় বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে, বৃটিশকে বোকা বানিয়েছে, কিন্তু তারা কি আর সবাই নেতাজী হতে পেরেছে? না, পারে নি। সে জন্যে অন্য ধরণের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকে, কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপ দিতে সবাই পারে না।

●

আমরা প্রায় বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলাম। সুরথ চৌধুরী একটুক্ষণ থমকে দাঁড়ালেন। চোখে মুখে ওঁর একটা অদ্ভুত দীপ্তি ফুটে বেরোলো। বললেন, হ্যাঁ, যে বাস্তব অলৌকিকের কথা বলছিলাম। পঁয়তাল্লিশ সালে তুমি ত' কলকাতায় ছিলে? কলকাতার বুকের ওপর আই, এন, একে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়ই। এবার যা বলছি শোন। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ভেবে দেখে বলো এটা অলৌকিক কি না? অথচ এটা বাস্তব সত্য। আমি দেখেছি, সকলেই দেখেছে এই শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ, তার মধ্যে কে হিন্দু আর কে মুসলমান তা হয়ত অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে তারা নিজেরাও ভুলে গিয়েছিল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিশের বিরুদ্ধে। নেতাজীর ছবি সামনে রেখে তারা অসীম সাহসে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়, লাঠি, টিয়ার-গ্যাস, রাইফেল, স্টেনগান, ব্রেনগান, এমন কি মেসিনগান দেখেও তারা পিছিয়ে যায় নি। হাজারে হাজারে মানুষ শত্রুর উৎপীড়নে আহত হয়েছে, কয়েকশত নিহত হয়েছে। আমি

কিছুতেই ভুলতে পারি না অশোক, যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর প্রথম পুলিশ ফায়ারিং-এর দিন দেখেছি দুটি ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাতরানির মধ্যেও এ ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিছুদিন হাসপাতালে থেকে ওরা সেরে উঠেছিল। কিন্তু এমনই অলৌকিক ব্যাপার, অশোক, মাত্র কয়েকমাস পরেই ছেচল্লিশের আগস্ট মাসে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় সেই ছেলে দুটিই পরস্পরকে আঘাত করেছিল, আহত করেছিল। একজন চালিয়েছিল ছুরি, আর একজন ছুঁড়েছিল বোমা। ওরা যে পরস্পরকে চিনতে না পেরে আঘাত করেছিল, তা মনে করো না যেন। ওরা দুজনেই সে সময়ে ছাত্র ছিল, আই, এন, এ মুভমেণ্টের সময় থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তবু দুজনে দুজনাকে শেষ করবার উদ্দেশ্যেই আঘাত করেছিল। একজন নেতার অভাবে সাধারণ মানুষের কি অধোগতি হয় একবার ভেবে দেখো। যা হোক ভাগ্যের কথা, ওরা দুজনেই বেঁচে যায়। এসবগুলিকে কি তোমার অলৌকিক বলে মনে হয় না?

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে স্বরূপ চৌধুরী নিজের ক্লান্তি খানিকটা লাঘব করে নিয়ে আবার বললেন, আমি মোট প্রায় তিরিশ বছর জেল খেটেছি, অশোক, কিন্তু সেটা আমি কিছুই মনে করি না। আমার জীবনের সব চাইতে বড় রাজনৈতিক সাফল্য কি জানো অশোক, ঐ দুটি ছেলেকেই আমি আমার অখণ্ড ভারত সেবা সমিতির সভ্য করতে পেরেছি। রহিম অবশ্য ঢাকায় থাকে, ওদিকটার সংগঠনের ভার ওরই ওপর, খুবই ভালো ছেলে, মাঝে মাঝে আসে কলকাতায়, আলাপ করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে, চিঠিপত্র অবশ্য প্রায়ই লেখে।

আর হিন্দু ছেলেটি, মানে রাধেশ কলকাতায়ই থাকে, সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য আজকের দুই বাংলার মানুষ, মাত্র কয়েক বছর আগেও আমরা একদেশের মানুষ ছিলাম, অথচ আজ আমরা কেউ কাউকে চিনি না, একজন কোন বিষয়ে কষ্ট পাচ্ছে শুনলেও যেন আর একজনে খুশী হই, মানুষের হৃদয়ের এই যে পরিবর্তন এটা কি অলৌকিক নয়। এই কথা বলি শুনেই লোকে আমাকে পাগল বলে।

প্যাকেটের বাণ্ডিলটা স্বরূপ চৌধুরী পকেটে পুরলেন। আমরা দুজনে বাসে উঠে বসলাম। উনি বললেন, একটা খুব ভুল হয়ে গেল, এই যে ছেলেটি দেখলে, বিরাজ, অধ্যাপক বিরাজ রাহা, ওই আমাদের নাইট ইস্কুলে ইংরেজী পড়ায়, তাছাড়া আমাদের সমিতির সেক্রেটারী, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো ভেবেছিলাম কিন্তু একদম ভুলে গেছি। যা হোক, খুব কোন কাজেরব্যাঘাত না হলে কাল রাতে, এই আটটা নাগাদ এসো আমার বাসায়, দেবো'খন আলাপ করিয়ে। [ক্রমশ।

নারকেলের মালা থেকে শিল্পসৃষ্টি

নারকেলের মালা থেকে শিল্পসৃষ্টি দৃষ্টিপাতে এমন অনেক কিছুর সন্ধান মেলে যা গুরুত্ববিহীন বা উপেক্ষণীয় বলে মনে হলেও গুণীর অনুভূতির প্রাবল্যে এবং কল্পনার গভীরতায় শিল্পের প্রকাশের এক বিশেষ মাধ্যমে পরিগণিত হয়। নারকেল মালা এই ধারণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারকেল মালাকে কেন্দ্র করে যে কি অপরূপ শিল্পসৃষ্টি হতে পারে উপরোক্ত চিত্রটি তার একটি বিশেষ উদাহরণ। এই সার্থক শিল্পসৃষ্টির কৃতিত্ব শ্রীহরিদাস সাহার। চিত্রাঙ্কন, অলঙ্করণ, শান্তিনিকেতনী বাটিকের কাজ, চামড়ার উপর এম্বসিং এবং নারকেল কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরণের শিল্পসৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তাঁর শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত হয়েছে এবং পুরস্কারও লাভ করেছেন। বয়েস তাঁর এখনও পঁয়ত্রিশের ঘরে পৌঁছোয় নি।

মাতাল হওয়ার কারণ

খানিকটা তরল পদার্থ মাত্র। এককথায় যাকে বলি পানীয়। চা নয়, দুধ নয়, সরবৎ নয়—এর অন্য এক নাম। ধর্মও ভিন্ন। এই বস্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যা দেখা যায় আপনার উদরে গেলেই অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার মধ্যে এক সর্বৈব পরিবর্তন এনে দেবে। বদলে যাবে আপনার চেহারা। আপনার চলাফেরা আচরণও অন্যরকম হয়ে যাবে। যে সব জিনিস তখন আপনি করে বসবেন তা ভুলেও কদাচ অন্য অবস্থায় আপনি করেন না। মাত্রাতিরিক্ত সেবনে মৃত্যু পর্যন্ত আসতে পারে তাও অকস্মাৎ অতর্কিতে নয়, দীর্ঘকাল আপনি দুরারোগ্য, তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে কবলিত থাকার পর। এর নাম মদ। শান্তিপ্রিয় ভদ্র আদর্শ সংসারে এর নাম শুনলে একাধারে আসে তীব্র ঘৃণা, অন্যদিকে অপরিসীম ভয়।

অবশ্য অনেকেই আছেন যাঁরা এই বস্তুটি অদ্ভুতভাবে হজম করে থাকেন, প্রচুর পরিমাণ সেবন করলেও তাঁদের চেহারায় অথবা কার্যকলাপে কিছুমাত্র এর প্রভাব ধরা পড়ে না। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী নন।

মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যাওয়া আমাদের কাছে এক অদ্ভুত বা অশ্রুতপূর্ব কোন ব্যাপার নয়। আমাদের পরিমণ্ডলে চেনাশোনার গণ্ডীর মধ্যে এক ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের আমরা মুখোমুখি হয়ে থাকি। কিন্তু এইবার একটা প্রশ্নও অনেকের মনেই উঁকিঝুঁকি মারতে পারে যে অন্য কোন পানীয়ে যেটা হয় না এই একটি বিশেষ জাতের পানীয়েই বা লোকে এভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে কেন অর্থাৎ মদ খেলে লোকের মাতাল হওয়ার কারণটা কি?

সুরসিক

এর একটি উত্তরও পাওয়া গেছে। ডাঃ উইলিয়াম জে, হিকসন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মাতাল হওয়াটা একটা ঝোঁকের উপর নির্ভর করে এবং এই ঝোঁকটা একটা রোগ ছাড়া কিছু নয়। যাঁরা এই ঝোঁকের বশীভূত তাঁরা অনেকেই খুব ভালভাবেই জানেন যে, এটা একটা বিষ এবং এই বিষ ক্ষতি করবে এ একেবারে অবধারিত, তথাপি এই ঝোঁক তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

ডাঃ হিকসনের পরীক্ষাশালায় এক ধরণের চিত্রাঙ্কন পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। কয়েকটি রেখাবদ্ধ আয়তক্ষেত্রের ছবি দশ সেকেণ্ড দেখতে দিয়ে পরে ঐ ছবি স্মৃতি থেকে আঁকতে বলা হয়। যাদের মন সুস্থ, সজীব তারা অবিকলভাবে নক্সাটি এঁকে দেয়, যাদের মন এর বিপরীত তারা কিছুতেই ঠিকভাবে নক্সাটি আঁকতে পারে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শেষের দলের মদ ছোঁয়া উচিত নয়। হিকসনের পরীক্ষায় মদের প্রভাবে তারাই পড়ে যায় যারা আসলে দুর্বলচিত্ত। প্রচ্ছন্ন পাগল, মনমরা বা মৃগীরোগী এরা সুস্থ ও স্বাভাবিক নয় বলে মদের ধাক্কা সহ্য করতে পারে না এবং এই ব্যাধিগুলির প্রকোপেই তারা মদ খেলে মাতাল হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই রোগের বশীভূত যাঁরা নন তাঁরা অবলীলাক্রমে প্রচুর মদ পান করেও নিজেদের স্বাভাবিক রাখতে পারেন। মানুষ কেন মদ খেলে মাতাল হয়ে পড়ে সে প্রসঙ্গে উক্ত সিদ্ধান্তেই হিকসন এসেছিলেন তাঁর পরীক্ষাগারে ব্যাপক গবেষণার পর।

ভিয়েৎনাম

স্নেহাশিস্ শুকুল

ভগবানকে রাইফেলের খোঁচায় এগিয়ে নিয়ে যাবার
সময় নির্দয়ভাবে গুলী করেছে ওরা ইতিহাসকে আর
কোলের মেয়েটাকে বুক হতে কেড়ে নিয়ে জোর করে
ধরে নিয়ে গেছে তার মাকে প্রাগ-ঐতিহাসিক অন্ধকারে।
মেয়েটার কান্না কেউ শোনে নি, অথচ আকাশটা লজ্জায়
চোখ বুজেছিল, ইতিহাসের বুক হতে চুইয়ে চুইয়ে পড়া
রক্তের ফোঁটাগুলোর উপর কয়েকটা মাছি উড়তে দেখে
টিকটিকিটা ডাক করে বসেছিল সামনের পা দুটো শক্ত
করে। ডানে বাঁয়ে হেলিয়ে উলঙ্গ দেহটার অনেক ছবি
তোলার পর, রাইফেলের খোঁচায় ওর দেহের নরম
জায়গাগুলোতে বিন্দু বিন্দু রক্তের আভা দেখে ওরা
অকারণে হেসেছিল। শিস দিতে দিতে ওরা যখন
মেয়েটার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে টহল দিতে বার
হয়েছিল ক্যাম্প হতে, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল
ভিয়েৎনাম। তামসী অন্ধকার নেমেছিল মেয়েটার
মথিত উরুর উপর দিয়ে ভিয়েৎনামের প্রান্তরে।

অফিসে ঢুকতেই বড়বাবু বললেন, আপনাকে সাহেব একবার দেখা করতে বলেছেন।

সাহেব মানে? সুধাকান্ত ঠিক বুঝতে পারল না। রেলের চাকরিতে এসে অনেক সাহেবকেই সে দেখছে আজ চার বছর। ছোট বড় মেজ সেজ নানা-বিধ সাহেব। কোন সাহেবের কথা বলছেন বড়বাবু?

সাহেব চেনেন না? রং না চিনেই তাস খেলতে বসেছেন? সুর না জেনে গান গাওয়ার মত যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে সুধাকান্ত। কাঁচুমাচু মুখ দেখে বড়বাবু আসল রহস্যটা ভাঙলেন, এ সি এস বর্ধন সাহেব। আমাদের কাছে সাহেব একজনই এ সি এস। যান গিয়ে হাজিরাটা এক্ষেলা দিয়ে আসুন।

কী ব্যাপার কিছু জানেন? সুধা-কান্ত ঠিক ভেবে পেল না, হঠাৎ এ সি এসের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবার মানে কি? কর্তব্যে কোন অবহেলা? জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন অভি-যোগ? মনে মনে আকাশ-পাতাল ভেবে কিছুতেই থই পেল না সুধাকান্ত। তাই বড়বাবুর দিকে একবার তাকাল।

আমি তার কী জানি মশায়। টেলি-ফোন এল। সাহেব আমাকে বললেন, এস আই সুধাকান্ত দাস আছে? আমি বললাম, ওর নাইট ডিউটি স্যার। তা উনি বললেন দাসকে কালই আমার অফিসে পাঠিও। জরুরি দরকার। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আপনাকে তাই জানালাম। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে আপনি কী ধরণের ঘাস খাচ্ছেন এবং কতদিন থেকে খেতে সুরু করেছেন তা আমি কি করে জানব?

মুখটা ব্যাজার করে বড়বাবু ডাইরির পাতায় তন্ময় হয়ে গেলেন।

কিন্তু কেন ডাকতে পারেন সাহেব? সারা রাত ধরে ভেবেও সুধাকান্ত সে প্রশ্নের জবাব পেল না। আর পি এফ অর্থাৎ রেলরক্ষী বাহিনীতে তার চার বছরের চাকরি। এই চার বছরের চাকরিতে সে একপয়সাও ঘুস খায় নি। কারর ওপর অন্যায় জুলুম করে নি। গোটা পাঁচেক ভাল ভাল কেসের ডিটেকশনের রেকর্ড আছে তার। প্রায় তিন-চার লক্ষ টাকার চোরাই মাল সে উদ্ধার করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে সে নির্বিরোধ লোক। অবসর সময় কোয়ার্টারে শুয়ে বসে, নয়ত ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী থেকে আনা বাংলা বই পড়ে কাটায়। শনি-রবি ছুটি পেলেই দেশে যায়।

না সত্যিই ভয়ের কিছু নয়।

সত্যমেব

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পরদিন সকালবেলা বর্ধন সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে মনে বল এল সুধা-কান্তর। বেশ হাসিমুখেই তাকে অভ্য-র্থনা করলেন বর্ধন সাহেব।

: বসুন, বসুন। এক মিনিট। তারপর টেলিফোনে একটা জরুরী নির্দেশ পাঠিয়ে বর্ধন সাহেব বললেন, আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ খুব বেশী নেই। নতুন এসে এখনও সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে উঠতে পারি নি। তবে আপনার সম্পর্কে আমি অনেক খবর রাখি। সিকসটি সেভেন-এর সেই নটোরিয়াস গ্যাংকে আপনিই ধরেছেন। তার ফলে হাওড়া-শ্রীরামপুরের মধ্যে রেলওয়ে কপার তার চুরি একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডে পর্যন্ত রেফার হয়েছে কেসটা।

সুধাকান্ত তো মেয়ে দেখে তো চোখ ফেরাতে পারে না

আমার প্রিডিসেসর আপনার সম্পর্কে লাইলি রেকমেনড করে গিয়েছেন।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। সুধাকান্ত বিনয়ে বিমুক্ত হল। ক'দিন আগে কালির এক জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলেন, পনেরই নভেম্বরের পরে উন্নতির যোগ প্রবল। আজ দশই নভেম্বর।

বর্ধন সাহেব বললেন, স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে বড্ড চুরি হচ্ছে। ও-সির নামে অনেক কমপ্লেন। আমি ওকে বদলি করে দিচ্ছি। ও জায়গায় একজন জবরদস্ত এবং অনেস্ট অফিসার দরকার। আপনাকে যদি প্রমোশন দিই, কেমন হয়?

আমি? এস আই সুধাকান্ত দাস, যার মাত্র চার বছরের সারভিস, যার এখনও ভাল করে গোঁফের রেখা ওঠেনি—সে চমকে উঠল।

: হ্যাঁ আপনি? জ্যেষ্ঠ হলেই কি শ্রেষ্ঠ হয়? সিনিয়রিটিই একমাত্র এফিসিয়েন্সি নয়। আমি চাই দক্ষ এবং সৎ একজন অফিসার। আপনার মতন। ও-সি হলে অবশ্য মাইনে আপনার বাড়বে না। সামান্য অ্যালাউন্স বেশী পাবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দায়িত্ব বাড়বে আপনার। প্রায় আড়াইশ স্টাফ আপনার কথায় উঠবে বসবে। আসল চাকরি কি টাকার অঙ্কে? জব স্যাটিশফেকশান হল সবচেয়ে বড় কথা। যে কাজে যত দায়িত্ব তা পালনে তত বেশী স্যাটিশফেকশান।

●

কালির এক আঁচড়েই কেউ রাজা, কেউ ফকির। সুধাকান্তও রাজা হল। গোটা স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড জুড়ে তার রাজ্য। আড়াইশ স্টাফ তার প্রজা। রেল কারখানার বাড়তি-পড়তি মাল এ ইয়ার্ডে এসে জমা হয়। এখান থেকে নীলাম হয় সে সব মাল। তারপর ওয়াগন বোঝাই হয়ে চলে যায়। এই ইয়ার্ডে রেলরক্ষী বাহিনীর ও-সি হয়ে বসল সুধাকান্ত দাস, যে নাকি মাত্র পাঁচ বছর আগে পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে জয়েন করেছে। লম্বা চওড়া চেহারা হলে কী হবে সারভিসে যার চার বছরের বেশী অভিজ্ঞতা নেই।

কিন্তু ঐ কালির আঁচড়কেই মেনে নিতে হয় নির্বিবাদে। গোমেদ আর বিড়ালাক্ষী ধারণ করেও যেখানে ও-সি হতে পারছে না দশ-বারো বছরের এক্সপিরিয়েন্সওয়ালারা, সেখানে পঁচিশ বছরের ছোকরা একেবারে ও-সি হয়ে বসল তাও আবার রুক্ষ মরুভূমিতে নয় সতেজ সবুজ এক কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে। কৃষিক্ষেত্র না বলে হীরার খনি বললেই বোধহয় উপমাটা সঙ্গত হবে। লোহা-লক্কড়ের স্ক্র্যাপ তো নয় হীরের টুকরো সব। রাতের অন্ধকারে লরি বোঝাই হয়ে সে সব হীরের টুকরো কোথায় পাচার হয়ে যায় আর তার বদলে ও-সির কাছে আসে মোটা মোটা খাম। অবশ্য ও-সি সকলের সাথে ভাগ করেই অন্নপান খান।

বছরের পর বছর ধরে এমন দস্তুর এ রাজ্যে। সকলের কাছেই তাই স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড---হয় মক্কা নয় মদিনা।

কিন্তু এই বুঝি নিয়মের প্রথম ব্যতিক্রম হল। লোহা-লক্কড়ের কারবারি হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁ দেখা করতে এলেন নতুন ও-সির সঙ্গে। গায়ে ফিনফিনে আদ্দি। গলায় সোনার হার। পাঁচ আঙুলে পাঁচটি রত্ন। সমস্ত গ্রহকে খাঁটি সোনা দিয়ে বেঁধে রেখেছেন হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁ। শুধু গ্রহ কেন গ্রহের চেয়েও যারা তাড়াতাড়ি কুপিত হন সেই সব নেতা-দেরও বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকের জন্যই নির্বাচনী তহবিলের চাঁদা বরাদ্দ আছে।

লোহা-লক্কড়ের কারবারি হলেও মনটা যে নরম মোমের মত হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁর। তাই নতুন দারোগাবাবুর জন্য কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে এলেন চার কিলো।

: ওসব কী? জিজ্ঞাসা করল সুধাকান্ত।

: আজ্ঞে সামান্য মিষ্টি।

: না না। ওসব নিয়ে যান। আমি মিষ্টি খাই না।

হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁ রীতিমত বিগলিত হলেন।

: হে-হে কী যে বলেন স্যার। মিষ্টি না খান সন্ধ্যার পর করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। কটু এবং কষায় জিনিসেরও ব্যবস্থা আছে। পাঁচজন ভদ্রলোক আসেন কিনা, তাই—হেঁ-হেঁ।

: সুধাকান্ত বুঝতে পারল না ইঙ্গিত অথবা বুঝেও না-বোঝার ভাণ

ওসব থাক, খবর-টবর কি বলুন?

হরিকৃষ্ণ এবার অভয় পেয়ে .. থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে ধরলেন সুধাকান্তের দিকে। হে-হে, প্রথম দেখা করতে যাচ্ছি। ভাবলাম স্যারের জন্য কিছু নজরানা নিয়ে যাই।

: হোয়াট?

এবার সুধাকান্ত আর নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারল না। আর তার চিৎকার শুনে একটা কেন্নোর মত গুটিয়ে গেলেন হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁ। আঙুলের পাঁচটি রত্ন পাঁচটি বিষাক্ত সাপের চোখের মত জ্বলতে লাগল।

●

সব বন্ধ হয়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যে। রাত-ভোর কড়া গার্ডের ব্যবস্থা রাখল সুধাকান্ত। ঢালাও অর্ডার রাতের বেলা কোন লরি ইয়ার্ড থেকে বেরুতে দেখলেই গুলি করবে। শুধু তাই নয় রাতে নিজে গিয়ে দেখে আসতে লাগল পাহারাদাররা কাজ করছে কি না।

ডেকে পাঠালেন বর্ধন সাহেব।

: এই তো চাই। শোন, আমাদের আকাঙ্ক্ষার আর শেষ নেই। একবার যদি তার পিছনে ছোটা শুরু করি তাহলে সে ছোটার আর শেষ হবে না। কারণ আকাঙ্ক্ষা আলেয়ার আলোর মত। কোনদিনই তাকে ধরা যায় না। তাই আমার জীবনের 'মটো'—আমার যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব। আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছি বলেই আমি আজ অনেস্ট, আমি আজ খাঁটি। তোমাকেও তাই খাঁটি হতে বলছি।

প্রলোভন আছে বলেই তো খাঁটি হওয়ার এত দাম।

দু' কাপ চা আনালেন বর্ধন সাহেব।

চা খাওয়া শেষ হলে বললেন, উইশ ইয়ু গুড লাক।

কিন্তু কি হল মাস ছয়েকের মধ্যেই। বদলির অর্ডার এল বর্ধন সাহেবের। একেবারে অপ্রত্যাশিত এবং অসময়োচিত। একেবারে অন্য ডিভিশনে বদলি। নতুন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্রাইম সুপারিনটেনডেণ্ট হয়ে এলেন মিঃ গুপ্ত।

সেকেণ্ড অফিসার সোম বলল, নতুন সাহেবের কাছে একবার সেলাম বাজাতে যাবেন নাকি স্যর?

: না ডাকলে কেন যাব? বর্ধন সাহেব ডেকে পাঠাতেন তাই যেতাম। জবাব দিল সুধাকান্ত।

কিন্তু ডাক এল সুধাকান্তর। গুপ্ত সাহেব নিজে ফোন করেন নি। ওঁর ক্লার্ক করল ফোন। সাহেব ডেকেছেন।

সুধাকান্তর আর যেতে আপত্তি নেই। সে তো বুক ফুলিয়ে যাবে। ছ'মাসের মধ্যে তিনটে চোরাই পার্টি গ্রেপ্তার হয়েছে। চুরি একদম বন্ধ। তার নামে এখন ভয়ে কাঁপে লোকে। আড়ালে যা বলে বলুক—সামনে সমীহ করে। উড়ো চিঠি দিয়ে শাসায় অনেকে কিন্তু সুধাকান্ত হাসে মনে মনে। আমার তো কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। তবে কেন আমি লোভ করব। সে এই বলে বোঝায় নিজেকে।

গুপ্ত সাহেব মেজাজি অফিসার। সব সময় পাইপ খান। মধ্যবয়সী ভারি চেহারা।

: আপনি স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডের ও-সি?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: আজ ছ মাস এসেছি দেখা করেন নি কেন?

: আপনি তো ডাকেন নি।

তবু দেখা করাটা কার্টসি। আপনি একজন দায়িত্বশীল অফিসার ভুলে যাবেন না। যাক সে কথা, আমাকে তো একেবারে পাত্তাই দিচ্ছেন না। আমদানির হিসেব-টিসেবগুলোও তো একবার আমার জানা দরকার। গোল্ড মাইনের আপনিই একমাত্র মাইনার হয়ে বসে রইলেন আমরা আঙুল চুষব তা তো আর হতে পারে না।

সুধাকান্ত বলল, ঠিক কি বলছেন বুঝতে পারলাম না স্যর।

গুপ্ত সাহেব বললেন, ন্যাকা! দেখুন খোলাখুলি আলোচনাই আমি পছন্দ করি। খাম-টাম যা আসে আমাকে তার ডিটেলস হিসেব দেবেন। আমি অবশ্য সিংহের ভাগ নেব না। ন্যায্য যার যা পাওনা তাই দিয়ে দেব।

সুধাকান্ত বুঝল সব। বুঝল গুপ্ত সাহেব গুপ্ত সাহেব। তিনি বর্ধন নন।

সে বলল, কিন্তু খাম সিসটেম তো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্যর। এখানে ওসব হয়-টয় না। আগে নাকি হত।

: ন্যাকামি রাখুন মশায়। আমি যা বলছি তাই শুনুন। নয়ত কেন মিছি-মিছি বিপদে পড়বেন।

হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁকে ডেকে পাঠাবার আগে সুধাকান্ত তিনদিন ধরে আকাশ-পাতাল ভেবেছিল। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান সে করতে পারে নি। স্টাফ মহলে সে গত ছ' মাসে অপ্রিয় হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেরই উপরি পাওনা ছিল। জওয়ান কিষণ সিং তো বলেই বসল শ রুপেয়াস কী এই বাজারে চলে হুজুর!

: এতদিন কি করে চালাতে?

: এতদিন তো বকশিস চালু ছিল। মাহিনা পেলে কমসে কম তিনশ রুপেয়া ঘরে আসত।

: তার মানে ঘুস খেতে? সেটা আবার বড়াই করে বলছ? লজ্জা হচ্ছে না তোমাদের? চেঁচিয়ে উঠেছিল সুধাকান্ত।

কিন্তু সে জানে সকলের বাড়তি রোজগারে হাত পড়েছে। সকলেই বিক্ষুব্ধ। লোকে তাকে আড়ালে বলে যুধিষ্ঠির। ক্রমাগত উড়ো চিঠি আসছে—খুন হয়ে যাবে। বর্ধন সাহেব নেই। কাকে একথা বলবে এখন? কার কাছে প্রতিকার চাইবে?

●

অতএব---। অতএব এলেন হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁ। পাঁচ আঙুলে গ্রহ বাঁধা পোষা কুকুরের মত। জ্যোতিষী বলেছিল ছ' মাস রাহু ট্রাবল দেবে। রাহুমুক্তির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন তিনি। মধ্যবর্তী নির্বাচন আসছে। অথচ হাতে আমদানি নেই। কিন্তু ভগবান মুখ তুলে আবার চাইলেন। পকেট থেকে খামটা বার করে হাসতে হাসতে বললেন, আপনি স্যর ছেলেমানুষ তো ব্যাপারটা এতদিন বুঝতে পারেন নি। মানে কয়েক লরি মাল এদিক-ওদিক না হলে ছোটখাট শিল্পগুলি কি করে বাঁচবে বলুন। এ তো দেশের শিল্পকেই সাহায্য করছেন স্যর---হেঁ-হেঁ।

ঐ খামের পথ ধরেই লক্ষ্মী এলেন সুধাকান্তের জীবনে। বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠল সে। পা যখন একবার পিছলেছে তখন আর পদস্খলনের আশঙ্কা রইল না। মনে মনে নিজেকে সে প্রবোধ দিল, আমার ওপরওয়ালা যদি চায় আমি ডিস-অনেস্ট হই, তাহলে আমার কি দোষ? আমার কি অপরাধ? অনেস্টির জন্যও কি মন পেলাম কারও? আজ যদি গুণ্ডারা পিছন থেকে গুলি চালায় তাহলে কে বাঁচাবে আমার জীবন?

তার চেয়ে এই ভাল। সবার মুখে
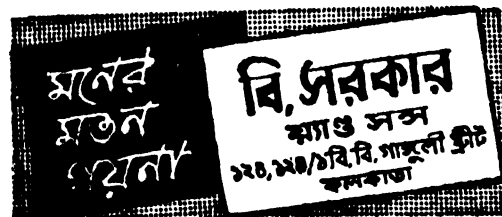
হাসি। কিষণ সিং তো কৃতজ্ঞতায় গদগদ। দেশ থেকে গিয়ে ভঁইশা ঘিউ এনে দিল সুধাকান্তের জন্য। জওয়ান থেকে এ এস আই সবাই বড়বাবু বলতে অজ্ঞান এখন।

সুধাকান্তরও বাড়বাড়ন্ত এখন। দেশের বাড়িটা ভেঙে পড়ছিল পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে মেরামত করল। মায়ের নামে গ্রামের পোস্টাপিসে হাজার পাঁচেক টাকা জমা রেখে এল। ইতি-মধ্যে হরিকৃষ্ণের নৈশ আড্ডাতেও সে ঘুরে এসেছে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে খাঁটি বিলিতি দ্রব্য পান মন্দ রোমান্স নয়।

কিন্তু লক্ষ্মীকে এবার ঘরে বেঁধে রাখা চাই। অতএব সুধাকান্ত ঠিক করল সে বিয়ে করবে।

খবরের কাগজ দেখে পাত্রীর সন্ধান মিলল। জামালপুরের এক কনিষ্ঠ অফি-সারের একমাত্র মেয়ে। সুন্দরী এবং সঙ্গীতজ্ঞা।

দুই বন্ধু মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। সুধাকান্ত তো মেয়ে দেখে চোখ ফেরাতে পারে না। এককথায় সে রাজী।

: কত মাইনে ছেলের? মেয়ের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন। একমাত্র মেয়ে—পাত্রকে যাচিয়ে দেখে নিতে চান।

কিন্তু কত আর মাইনে সুধাকান্তর। মাস গেলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গ্রহণ করে আড়াইশটা টাকা। হেলায় পকেটে রেখে দেয়। দু'তিন দিনের মধ্যে পকেট ফাঁকা। তার আসল আয় তো খাম থেকে। খামই তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

বন্ধু বলে, মাইনে আড়াইশ।

পাত্রীর বাবা চমকে ওঠেন। আড়াইশ টাকায় সংসার চালাবে কি করে? পাঁচশ টাকা মাইনে পায় এমন পাত্রও আমার পছন্দ হয়নি।

সুধাকান্ত কাশছে দেখে তুখোড় বন্ধুটি বলে, ওটা শুধু মাইনে অর্থাৎ গোবচিনা। আসল আয় তো এখনও আসেনি। সে প্রায় কম করেও দু হাজার।

পাত্রীর বাবা মুখ টিপে হেসে বলেন, খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী—তার মানে ঘুষ?

বন্ধু বলে, ছি-ছি ঘুষ বলছেন কেন? বলুন একস্ট্রা ইনকাম। নিজে গিয়ে পাত্রের ঘর-সংসার দেখে আসুন। কর্মস্থানে গিয়ে খোঁজ নিন পছন্দ আপনার হবেই।

তা পছন্দ হতে দেরী হল না। তেজী বাজারের শেয়ারের দরের মত সুধাকান্তের দরও বাড়ছে। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। চারপাশে পায়েক-পেযাদারা ঘুর ঘুর করছে। শুধু মুখে রা কাড়বার অপেক্ষা। ভাবী জামাইয়ের প্রতিপত্তি দেখে ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক।

বিয়ের আর দেরী নেই। কিন্তু সেই সময় বাজ পড়ল মাথায়। অমন প্রবল প্রতাপশালী গুপ্ত সাহেব স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। পরনারীতে আসক্তি ছিল কিন্তু করোনারী ভেতরে ভেতরে কীভাবে ওৎ পেতে বসেছিল কেউ জানতে পারেনি। সবাই বলল, যাক ভালই গেছেন। দুই মেয়ের বিলেত ফেরৎ জামাই। এক ছেলে ডাক্তার। এক ছেলে পুলিশের ডি এস পি। খবরের কাগজে বেরুলো—তিনি অগণিত গুণ-মুগ্ধ ব্যক্তিকে রেখে গেছেন।

তাতো সত্যি। অন্তত গুণমুগ্ধদের একজন সুধাকান্ত তো বটেই। কিন্তু এমন বেটাইমে মরাই বা কেন? আর এ মৃত্যু যেন একেবারে বিধ্বংসী বোমার মত সুধাকান্তর মাথায় এসে পড়ল।

গুপ্ত সাহেবের জায়গায় আবার আসছেন বর্ধন সাহেব।

ডিপার্টমেন্টে মহাকান্না পড়ে গেল। হরিকৃষ্ণ সাধুখাঁ গুরুজীর কাছে ছুট-লেন।

আর সুধাকান্ত ভেবেই পেল না সে কী করবে। বর্ধন সাহেব মানেই তো আবার সেই হরিমটর—মানে আবার সেই নিরামিষ—মসি লিখিত সুসমাচার।

●

আবার ডাক পড়ল বর্ধন সাহেবের ঘরে।

: ঘুরেফিরে আবার এখানেই এলাম। বেশ নিস্পৃহভাবে কথা ক'টি বললেন বর্ধন সাহেব।

সুধাকান্ত বলল, এ তো আমাদের আনন্দ স্যার। মনে মনে বলল, এসেছ আমার সর্বনাশ করার জন্য।

বর্ধন সাহেব বললেন, দ্যাখ এখানে আমি প্রথমে কিছুতেই আসতে চাইনি। কিন্তু আসতে হল। চাকরি বড় বালাই। তোমার কোন চয়েজ নেই।

: কেন আসতে চাননি স্যার? মনে মনে ভাবিত হল সুধাকান্ত। তার কীর্তি-কাহিনী কি বর্ধন সাহেবের কানে গেছে।

বর্ধন সাহেব বললেন, দেখ স্বীকার করতে লজ্জা নেই। ছ'মাস আগেকার আমি আর আজকের আমি এক নই। ছ'মাস আগে আমি একজন সৎ অফিসার ছিলাম। আজ আর সে গর্ব করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আর সৎ থাকতে পারলাম না। সকলেই যখন চুরি করছে একা আমি চুপ করে বসে দেখি কেন? আমিও তাই ওদেরই একজন হয়ে গেছি। আমিও আজকাল খামের মর্ম বুঝি। পাওনার ভাগ বুঝি। কিন্তু এখানে আসতে চাইছিলাম না কেন জান, তোমাকে তো চিনি। মরে গেলেও তুমি ওসবের ধারেকাছে ঘেঁসবে না। সুতরাং আমারই ডাহা লোকসান। গুপ্ত বেচারা বোধহয় এই শোকেই মারা পড়ল। আহা বেচারা—। কিন্তু তোমাকেও বলি সুধাকান্ত, কি হবে আর সতীপনা করে। তুমিও লক্ষ্মী ছেলেটির মত দলে ভিড়ে যাও। ভয় নেই, সিংহের ভাগ দাবি করব না। শুধু স্মরণ রাখলেই হবে—কী বল অ্যাঁ, হাঃ হাঃ, হাঃ হেসে উঠলেন বর্ধন সাহেব।

আর সেই হাসি দেখে সুধাকান্তর মনে হল একটা ধূর্ত হায়েনা দাঁত বার করে হেসে চলেছে একটানা।

●

বিয়ের দিন পনের আগে সুধাকান্ত পাত্রীর বাপকে চিঠি লিখে জানাল, যা শুনেছেন সব ভুল। আমার মাত্র আয় আড়াইশ টাকা। আমার উপরি নেই। শুধু আড়াইশ টাকায় যদি দুজনের বেঁচে থাকা সম্ভব মনে করেন তাহলেই এ বিয়েতে এগোবেন।

গোস্বামী তুলসীদাস

কমললোচন নবদূর্বাদলশ্যাম। তিনি দশরথসুত রঘুপতি রাম। তিনি ইন্দীবরতনু, তিনি জানকীবল্লভ, তিনি অহল্যার ত্রাতা। তিনি প্রজানুরঞ্জন। তিনি শিষ্টের পালক, দুষ্টের সংহারকর্তা। তিনি নররূপে নারায়ণ। তিনি সময়ের অন্তহীন মহাসমুদ্র অতিক্রম করেও, একাধিক সহস্রাব্দীর দাঁড়িয়া প্রাচীর পেরিয়েও আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ের মন্দিরে সেই বিষ্ণু অবতার শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা বন্দনার উপচারে আরতির প্রদীপ্ত রশ্মিতে চিরন্তনের দাবীতে আজও সমুদ্ভাসিত।

জীবনের বোধনপর্ব থেকেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শাশ্বত কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। সেই দিব্যপুরুষের পবিত্র জীবনের আদর্শে যাতে উত্তরপুরুষের জীবন উদ্বুদ্ধ হয়, সেই পবিত্র ভাবধারায় যাতে জীবন আলোকিত হয়ে ওঠে, সেই জীবনের ছন্দে যাতে জীবন অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে—সেদিকে সদাসতর্ক প্রখর দৃষ্টি পূর্বসূরীর। ভগবান রামচন্দ্রের পুণ্যজীবনের আলোকদীপ্ত কাহিনী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পুণ্যব্রত গ্রহণ করে যাঁরা সকলের ভক্তি-অর্ঘ্য অর্জন করে চলেছেন, তাঁর দিব্যদীপ্ত বীরত্বের, বাৎসল্যের, প্রেমের, ত্যাগের, ধৈর্যের, সহনশীলতার গাথা যাঁরা মানুষের কাছে প্রচার করেছেন, সর্বসাধারণকে যাঁরা সচেতন সজাগ করেছেন—শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে রামের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের তাঁরাই যোগসূত্র। তাঁরাই জীবন্ত সেতু। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় আদিকবি বাল্মীকির নাম। যে ভারতবর্ষের বিশ্বনন্দিত সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ কাব্য, যে কাব্যের সুষমা ছড়িয়ে পড়ে দিকদিগন্তে, আকাশে-বাতাসে, যার মাধুর্যলালিত্য কত অনুর্বর মনে এনে দিয়েছে রসের প্লাবন, যা নিজেকে পরিণত করেছে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ ও মহার্ঘ সম্পদে, সেই বিরাট ঐতিহ্য ও গৌরবের এক মহামূল্য নিদর্শনকাব্য সর্বপ্রথম রূপলাভ করল রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই।

বাল্মীকির পরই এ ক্ষেত্রে আরও দুটি নাম উল্লেখ করতে হয়। একজন কৃত্তিবাস অপরজন তুলসীদাস। একজন সংস্কৃতির পীঠভূমি বাঙলার আর একজন তীর্থরাজ প্রয়াগের।

জর্জ এ্যালেন

সময়ের মাইল স্টোনে অবশ্য কৃত্তিবাসের অনেক পরে তুলসীদাসের আবির্ভাব। প্রায় তিনশ' বছরের ব্যবধান দু'জনের। তুলসীদাস দেখা দিলেন ঠিক সেই সময়ে যখন ভারতবর্ষের হাল মোগল সম্রাট শাহজাহানের হাতে। বুদ্ধ শঙ্করাচার্য চৈতন্য রামানন্দের লীলার অবিরাম ধারায় ভারতবর্ষের অধ্যাত্মলোক এক অপূর্ব আলোকে দ্যুতিভাস্বর হয়ে উঠেছে। সেই তাৎপর্যপূর্ণ কালের তিনি এক স্মরণীয় ফসল। তুলসীদাস নগরের আরাম-বিলাস ব্যসনময় পরিবেশের মানুষ নন। তিনি গ্রামের ছেলে। গ্রামের শান্ত, স্নিগ্ধ, নয়নভোলানো, প্রকৃতির অফুরন্ত দানসমৃদ্ধ পরিমণ্ডলে লালিত। ১৬৪৬ সালে প্রয়াগের কাছাকাছি বান্দা জেলার রাজাপুর গ্রামে তাঁর জন্ম।

ধর্মানুশীলনে এবং অধ্যাত্ম আকর্ষণের উত্তরাধিকার বোধহয় এসেছিল বাবার কাছ থেকে। পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আত্মারাম দ্বিবেদী সেদিন সমাজে এক ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ এবং বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হিসাবে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু এই মহাপ্রাণ পিতা এবং তাঁর আদর্শ সহধর্মিণী হুলসী অর্থাৎ মাতাকে বেশীদিন পান নি তুলসীদাস। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হলেন তুলসীদাস। শৈশব কাটল নিদারুণ অনাদরে। অবহেলায় আর উপেক্ষায় এ বেদনাদরদী কবি ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর কাব্যে, গানে, গাথায়।

শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন এই ভাগ্যহত বালককে পরম স্নেহে বুকে তুলে নিলেন নরসিংহ দাস। আত্মারাম ছিলেন নরসিংহদাসের গুরু। শিষ্যপুত্রকে তিনি অনাদৃত অসহায় অবস্থায় দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। ফল্গুর মত স্নেহের ধারায় পরিপ্লাবিত করে দিলেন স্নেহরসপিপাসু এই বালকটিকে। শুধু আহার বাসস্থানই নয় যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হয়ে পিতার ঐতিহ্য ও মর্যাদা যাতে পরিপূর্ণভাবে সে রক্ষা করতে পারে সে সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব তিলমাত্র ছিল না নরসিংহদাসের।

তুলসীদাসকে জীবনে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন নরসিংহদাস। তুলসীদাস তাঁরই চেষ্টায় সংসারী হলেন। ঘরে এল ঘরণী। তুলসীদাসের জীবনে এলেন রত্না। তন্বী কিশোরী। অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, অনুপম লাবণ্যের এক অপরূপ প্রকাশ। সুন্দরের দেবতার ভাণ্ডারে যা কিছু ছিল তার সব কিছু শূন্য করে, উজাড় করে, নিঃশেষ করে যেন রত্নার সৃষ্টি। বিয়ের পর দিবানিশি স্ত্রীকে ঘিরে রইলেন তুলসীদাস। রত্নার পাশ ছাড়া তাঁকে দেখা যায় না। শয়নে-স্বপনে, ধ্যানে-জাগরণে রত্না ছাড়া তুলসীর অন্য কোন দ্বিতীয়

চিন্তা নেই। রত্না তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন ও সাধনা। রত্নার মুহূর্তের অদর্শন তাঁর কাছে অসহ্য।

রত্নার বাবা দীনবন্ধু পাঠক পড়লেন অসুখে। বাপের বাড়ী থেকে খবর এসেছে। তুলসীও তখন বাড়ী নেই। রত্নার উৎকণ্ঠা তুলসী না ফেরা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে দিল না। বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে। বাড়ী ফিরে খবর শুনে তুলসীদাসের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কত দিন রত্না বাপের বাড়ী থাকবেন কে জানে—তার মানে রত্নার অদর্শন অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে—এ অসহ্য, এ সহ্য করতে পারবেন না তুলসী। বাইরে তখন ঝড়ের অভিসার সুরু হয়ে গেছে। বজ্রের হুঙ্কার, ঝড়ের গর্জন। পৃথিবী প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করেছে। বিদ্যুতের ঝিলিকে বাতাসের গতিতে অরণ্যের মর্মরে শুধু ভয়াবহতার নির্দেশ। সর্বনাশের ইঙ্গিত। বাইরের জগৎ যখন প্রলয় ঝড়ের রুদ্রলীলায় মেতে উঠেছে, তুলসীর ভিতরের জগতের ঝড়ের তীব্রতা তার থেকে কোন অংশে কম নয়। কালবিলম্ব করলেন না। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

শ্বশুরবাড়ী যখন পৌঁছলেন তখন জলে ভিজে একাকার। কিম্ভূতকিমাকার চেহারা তখন। প্রতিটি লোক আশ্চর্যে বিমূঢ়, বিস্ময়ে হতবাক। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন রত্না, তীব্র তিরস্কার করলেন স্বামীকে। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এ প্রেম নয়, এ মোহ—শুধু অনিন্দ্যসুন্দর, রূপলাবণ্যময়ী, যৌবনরসে টলোমলো এই কোমল দেহবল্লরীর প্রতি একটা উদগ্রকামনার মোহ। রত্না নির্ভীকভাবে বললেন—যেভাবে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ এভাবে যদি ভগবানকে খুঁজতে তা হলে আখেরের কাজ হত।

যার জন্যে এই ভীষণ দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এত ক্লেশ স্বীকার করে এখানে আসা, যার জন্যে জীবনের যা কিছু কর্ম, যে জীবনের একমাত্র অবলম্বন, জীবনের সব কিছু স্বপ্ন আশা সাধ, একমাত্র যাকে কেন্দ্র করে তারই কাছ থেকে এল এই রূঢ় আচরণ, এই পরম প্রত্যাখ্যান—কিন্তু একি হল, এ যেন এক অলৌকিক ঘটনা। লক্ষ্যবিহীন ইতস্তত জীবনে একমাত্র লক্ষ্য নিরূপিত হয়ে গেল, জীবনের সার সত্যের সন্ধান মিলল এই গঞ্জনার ভিতর দিয়ে, এতদিন চোখের সামনে যে পর্দা বাধাসদৃশ হয়েছিল এই লাঞ্ছনা সেই পর্দা সরিয়ে দিল—মানসদৃষ্টির সামনে তখন আর কোন বাধা নেই। ভগবানেই অর্থাৎ রামচন্দ্র তখন তুলসীর সমস্ত চিন্তা ধ্যান সাধনা আকর্ষণ করে নিলেন। তিরস্কার দেখা দিল পুরস্কারের ভূমিকায়।

●

কাশীতে এলেন তুলসীদাস। দিবা-রাত্র রামনাম। আর চলছে সেই পরম অন্বেষণ। এক প্রেত তাঁকে সন্ধান দিলেন অমুক জায়গায় রামায়ণ পাঠ হয়, প্রত্যহ এক বৃদ্ধ সেখানে আসেন, সবার আগে আসেন, সবার শেষে যান। তিনি আর কেউ নন—ছদ্মবেশী হনুমান—তাঁকে ধর, তোমার ইষ্টলাভে সহায়তা তিনি করতে পারেন.

লুটিয়ে পড়েন ব্রাহ্মণের রূপধারী ভক্তসম্রাট মারুতির পায়ে। ভক্তের ঐকান্তিক আকুলতা হৃদয়ে রেখাপাত করে ভক্তসম্রাটের। প্রসন্ন হলেন হনুমান। পথ দেখালেন। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন অমুক দিন রঘুপতি রাঘবকে তুমি দেখতে পাবে।

আনন্দে দিশাহারা তুলসীদাস। হৃদয়ে আনন্দের যেন সীমা নেই। এল সেই দিন, ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুণছেন তুলসীদাস। কখন—কখন আসবে সেই মুহূর্ত—যখন তার জন্ম সার্থক হবে, জীবন হবে ধন্য। ভক্তের সামনে আবির্ভূত হবেন ভগবান। তুলসীর সামনে দাঁড়ালেন ভক্তবৎসল নীলোৎপলনয়ন রঘুকুলপতি রাম।

অধীরতার যেন শেষ নেই।

এল এক বেদে। দুঃখে, বেদনায় ব্যর্থতায় মন ভারাক্রান্ত। ফিরিয়ে দিলেন তুলসীদাস। হনুমানকে গিয়ে ধরলেন—কই। রঘুপতি তো এলেন না।

হাসলেন হনুমান। বললেন—গিয়েছিলেন, তুমি চিনতে পারনি। সেই জ্যোতির্ময় দিব্যরূপ তুমি সহ্য করবে কি করে, তাই তো বেদের ছদ্মবেশে তিনি গিয়েছিলেন। আবার আর একটি তারিখ দিলেন মহাবীর।

চন্দন ঘসছেন তুলসীদাস ইষ্টের জন্যে। কোথা থেকে একটি বালক এসে বলল—ঐ চন্দন আমাকে পরিয়ে দাও।

এবার আর ভুল হল না তুলসী-দাসের। ভক্তের হাতে চন্দন পরে অদৃশ্য হলেন ভগবান। পরিতৃপ্তির সেদিন যেন আর শেষ নেই। কি বিস্ময়, কি রোমাঞ্চ, কি উন্মাদনা—ধন্য পূর্ণ চরিতার্থ সেদিন তুলসীদাস।

মদনগোপালের বিগ্রহের সামনে তুলসীদাস। রামমূর্তিতে দেখার বাসনা ভীষণভাবে তাঁকে পেয়ে বসেছে। হঠাৎ দেখা গেল, কোথায় বাঁশি, হাতে যে ধনুক-বাণ, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান ভক্তের আকুলতায় সকলের সামনেই হাতে বাঁশি ছেড়ে অসি তুলে নিলেন। মদনগোপাল রূপান্তরিত হলেন শ্রীরামচন্দ্রে।

রামনামের প্রচার, রামের মাহাত্ম্য বর্ণন, সর্বস্তরের নরনারীকে রামচন্দ্রের পবিত্র জীবনালোকে আলোকিত করে তোলাই হল তাঁর জীবনের ব্রত। এক মহাযোগী তাঁকে অভিহিত করলেন 'নবযুগের বাল্মীকি' হিসাবে।

শত্রুরও তো অভাব নেই। তাঁর 'রামচরিতমানস' এবং পাণ্ডুলিপি চুরি করতে এল গভীর রাতে দুই দুর্জন। দেখল একটি নবদূর্বাদলশ্যামল কিশোর প্রহরায় রত। কিছুতেই তার চোখ এড়িয়ে বা তাকে অতিক্রম করে তারা অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারল না। বুঝল তুলসীদাস সাধারণ লোক নন, এর মধ্যে ঐশী শক্তির খেলা আছে। আছড়ে গিয়ে পড়ল তুলসীদাসের পায়ে। আদ্যোপান্ত বললে গতরাত্রের ঘটনা।

প্রেম ও জীবন

যখন যুবক উকীল গুস্তাফ ফক্ লুইসের পাণিপ্রার্থী হয়ে ওর বাবার কাছে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব করল, বুড়ো ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন হল, তোমার রোজগারপাতি কি রকম?

মাসে একশ ক্রোনারের* বেশী নয়। কিন্তু লুইস—

অন্য কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না, ফকের ভবিষ্যৎ শ্বশুর ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন, তোমার আয় যথেষ্ট নয়।

ওঃ, কিন্তু লুইস আর আমি পরস্পরকে এত ভালবাসি। আমরা দুজনে দুজনকে পরিপূর্ণভাবে জেনেছি।

হতে পারে। যাই হোক তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার সব রোজগার একত্র করলে কি বছরে বারশ ক্রোনারে গিয়ে দাঁড়ায়?

নিভিনগোতে আমাদের প্রথম পরিচয়।

গভর্নমেণ্ট থেকে তুমি যা মাইনে পাও, তাছাড়া তুমি আর কিছু কর কি? লুইসের পিতা নাছোড়বান্দা।

আজ্ঞে হাঁ, আমার মনে হয় আমাদের কোন অভাব হবে না। আর তাছাড়া দেখুন, আমাদের পরস্পরের যে ভালবাসা –

হ্যাঁ ঠিক বটে; কিন্তু দু-একটা হিসেব করা যাক।

উপরি কাজ করে আমি যথেষ্ট পেতে পারি। আগ্রহী প্রেমিক উচ্ছ্বসিত হয়।

কি রকম কাজ? কত পাবে?

আমি ফ্রেঞ্চ পড়াতে পারি, অনুবাদও করতে পারি। তাছাড়া আমি খানিকটা প্রুফ রীডিংয়ের কাজও পেতে পারি।

অনুবাদকের কাজে কতটা হবে? পেন্সিল হাতে বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

কৃষ্ণা সেন

একেবারে সঠিক বলতে পারি না, তবে বর্তমানে আমি যে ফ্রেঞ্চ বইটা অনুবাদ করছি তাতে ফোলিও প্রতি দশ ক্রোনার করে পাই।

সবশুদ্ধ ক'টা ফোলিও আছে?

কয়েক ডজন নিশ্চয়ই।

বেশ ভাল। ধর এতে পাবে শ' আড়াই ক্রোনার। এখন অন্য কি পাবে বল?

তা আমি জানি না; সবটাই একটু অনিশ্চিত।

কি! তুমি নিশ্চিত না হয়েই বিয়ের চিন্তায় আছ? ওহে যুবক, বিয়ে সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুব অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। যখন ছেলেমেয়ে হবে, তাদের খেতে পরতে দিতে হবে, বড় করে তুলতে হবে, এ সব কথা ভেবেছ কি?

কিন্তু, ফক্ আপত্তি জানায়, এত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ে নাও হতে পারে। আর আমরা পরস্পরকে এত নিবিড়ভাবে ভালবাসি যে—কবে নবাগতের আবির্ভাব হবে সে সম্বন্ধে বেশ ভালভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে।

তারপরে নরম সুরে লুইসের বাবা বলেন—আমার মনে হয় তোমরা দুজনে বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর, তোমাদের পরস্পরের ভালবাসায়ও আমি সন্দিহান নই। কাজেই আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমাকে সম্মতি দিতেই হবে। যে সময়টা বাগ্দত্ত থাকবে, সে সময়টার সদ্ব্যবহার কর; নিজের আয় বাড়াতে সচেষ্ট হও।

এই অনুমতিতে যুবক ফক্ আনন্দে উচ্ছ্বসিত একেবারে; তার প্রকাশ দেখাল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হস্তচুম্বন করে। ভগবান জানেন, সে আর তার লুইস, দুজনেই আজ কত সুখী। প্রথম যেদিন দুজনে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেরোল, আর সকলে বাগ্দত্ত এই প্রণয়ীযুগলের উজ্জ্বল মুখের দিকে ফিরে ফিরে তাকাল, কি গর্বটাই জেগেছিল ওদের মনে।

সন্ধ্যাবেলা যখন ফক্ তার প্রিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত, প্রুফের যে কাগজগুলো ও সংশোধন করতে নিয়েছে, সেগুলো থাকত সঙ্গে। এতে বাবার ধারণা ভাল হল, আর বাগ্দত্তার কাছ থেকে কর্মী যুবকটির প্রাপ্য হল একটি চুম্বন। কিন্তু এক সন্ধ্যায় মুখ বদলাবার

* সুইডেনের মুদ্রা; একক্রোন প্রায় আমাদের একটাকার সমান।

তুলসীদাস কেঁদেই আকুল। নিবিড়ভাবে তাদের জড়িয়ে ধরে বলেন, তোমরা ধন্য, পূর্ণ রঘুপতির দর্শন তোমরা পেলে, তোমাদের তুল্য ভাগ্যবান ক'জন আছে ভাই।

দ্যাবিধবাকে চিরায়ুষ্মতী হও বলে আশীর্বাদ করলেন তুলসীদাস—পরে জানলেন কিছুক্ষণ আগেই বেচারার কপাল পুড়েছে। কিন্তু আশীর্বাদ তো বিফল হবে না। একবার যা মুখ থেকে বেরিয়েছে তা তো ফলবেই। চিতার উপর উঠে বসল মৃতব্যক্তি। মৃতের পুনর্জীবন ঘটালেন তুলসীদাস রামচন্দ্রকে স্মরণ করে।

১৭৩৭ সাল। একানব্বই বছর বয়সে রঘুনাথের পদে বিলীন হয়ে গেলেন তাঁরই পরমাশ্রিত ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধক কবি তুলসীদাস।

জন্য ওরা গেল থিয়েটারে; বাড়ী ফিরল ট্যাক্সিতে। সেই সন্ধ্যায় আনন্দের খোরাক যোগাতে বেরিয়ে গেল দশ ক্রোনার। এছাড়া আরো কয়েকটি সন্ধ্যায়, মানসীর সাথে একটু ঘোরার অভিপ্রায়ে শিক্ষকতা না করে ফক্ চলে এল ওদের বাড়ী।

বিয়ের দিন যেমন এগিয়ে আসতে থাকে, ফ্ল্যাটের জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনার কথা ভাবতে হয়। খাঁটি ওয়ালনাট কাঠের একজোড়া সুন্দর খাট কিনল ওরা, সঙ্গে তার উপযোগী স্প্রিংয়ের গদী, আর হাঁসের পালকের নরম লেপ। লুইসের চুলের রং হাল্কা, কাজেই লেপের রং হওয়া চাই নীল। গৃহসজ্জার দোকানে যেতেও ভুল হয় নি ওদের; সেখান থেকে এল লাল শেড দেওয়া একটা আলো, চীনামাটির তৈরী ছোট একটি চমৎকার ডিনার, ছুরি, কাঁটা সব সমেত টেবিলে খাবার দামী কাঁচের বাসন-কোসন। রান্নাঘরে কি লাগবে না-লাগবে সে বিষয়ে মা ওদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলেন। সহকারী উকীলটি সদা ব্যস্ত—এই বাড়ী খুঁজতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, এই মিস্ত্রীদের কাজ দেখাশোনা করছে, আবার দেখতে হচ্ছে সব ফার্নিচার ঠিকমত পৌছাল কি না, চেক লিখে সব জিনিসপত্রের দাম মিটোন - কোন কাজটা নয়।

এই হুড়োহুড়ির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গুস্তাফের অতিরিক্ত আয় কিছু হল না; কিন্তু বিয়ের পরে সহজেই ওটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে। দেশসেবী হবার ইচ্ছে ওদের মোটেই নেই, কাজেই কয়েকটা কেবল ঘর নিয়ে সুরু করছে। বড় ফ্ল্যাটের থেকে ছোট ফ্ল্যাট অনেক বেশী ভাল করে সাজান যায়। ছয়শ ক্রোনারে দোতলায় বাসা নিল ওরা—দুটো ঘর, রান্না, ভাঁড়ার। প্রথমে লুইসের ইচ্ছে ছিল উপরতলার তিনটে ঘর নেবার। কিন্তু যতক্ষণ ওদের মধ্যে আছে প্রেমের এই একনিষ্ঠতা, ততক্ষণ এইসব সামান্য ব্যাপারে কি আসে যায়?

অবশেষে ঘরদোর গোছানো শেষ। শয়নকক্ষটি লাগছে একটা মন্দিরের মত, পালঙ্ক দুটো রথের মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যেন জীবনের যাত্রাপথে চলা সুরু করেছে। নীল লেপ দুটো, বরফের মত সাদা ধবধবে চাদর, বালিশের ওয়াড়ে নবদম্পতির নামের আদ্যাক্ষর সুদক্ষভাবে জড়িয়ে এমব্রয়ডারী করা - সব কিছুতেই একটা উজ্জ্বল খুশীর চেহারা। লুইসের ব্যবহারের জন্য লম্বা সুদৃশ্য একটি স্ক্রীনও আছে; বারশ ক্রোনার মূল্যের ওর পিয়ানোটা আছে অপর কক্ষে—যেটা নাকি একই সাথে খাওয়া, বসা ও স্টাডি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এ ঘরেও একটা বড় ওয়ালনাট কাঠের লেখার ডেস্ক ও খাবার টেবিল, মানানসই সব চেয়ার সমেত। সোনালী ফ্রেমে একটা বড় আয়না, একটা সোফা, একটা বইয়ের আলমারী কক্ষটিকেও সুসজ্জিত আরামদায়ক করে তুলেছে।

এক শনিবার রাত্রে বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন হল; রবিবার সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত নবদম্পতি ঘুমিয়ে রইল। প্রথমে গুস্তাফ ওঠে। খড়খড়ির মধ্য দিয়ে আলোকোজ্জ্বল দিনের ছটা উঁকি মারছে; ও কিন্তু জানলা না খুলে লাল শেড দেওয়া আলোটি জ্বালল, চীনামাটির ডিনার এক অলৌকিক গোলাপী আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠলেন। ওর ছোট্ট মিষ্টি বউ সুখে শয়ান; কোন অস্থিরতা নেই, ভালই ঘুমিয়েছে। রবিবার সকালে হাটুরে গাড়ীগুলোর আওয়াজেও ওর ঘুম ভাঙ্গে নি। নরনারীর সৃষ্টিক্ষণকে উৎসবায়িত করতে এখন যেন গীর্জার ঘণ্টা বাজছে আনন্দধ্বনিত হয়ে।

লুইস পাশ ফিরল; গুস্তাফ স্ক্রীনের পিছনে গিয়ে সাজসজ্জায় মন দিল। রান্নাঘরে গিয়ে দুপুরের খাবারের কথা বলে এল। নতুন কেনা ধাতুর বাসনগুলি কি ঝকঝকে চকচকে – চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে! সব ওর নিজস্ব ওদের দুজনের। রাঁধুনীকে বলল পাশের রেস্টুরেন্টে গিয়ে ওদের দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে আসতে। মালিক সবই জানে; ওকে আগের দিনই সব নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে। কেবল মনে করিয়ে দেওয়া যে সময় উপস্থিত।

এর পরে ঘর শোবার ঘরে ফিরে এসে দরজায় মৃদু টোকা দেয়, আসতে পারি কি?

অল্প একটু বিস্ময়ধ্বনি, তারপর। না লক্ষ্মীটি, একমিনিট অপেক্ষা কর।

গুস্তাফ নিজেই খাবার টেবিল সাজাল, যতক্ষণ না রেস্টুরেন্ট থেকে দুপুরের খাবার এসে পৌছল, ততক্ষণে নতুন সাদা টেবিল চাদরের উপর নতুন প্লেট, কাঁটা-চামচ, গ্লাস—সব লাগান হয়ে গেছে। লুইসের জায়গার পাশেই কনের ফুলের তোড়াটি। সকালের উপযোগী কাজ করা একটা চাদর জড়িয়ে যেই ও ঘরে ঢোকে, রবিরশ্মি ওকে অভ্যর্থনা জানায়। এখনো ওর দেহে অল্প ক্লান্তির ছোঁওয়া, গুস্তাফ ওকে একটা আরামকেদারায় বসিয়ে টেবিলের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়; দু-এক ফোঁটা পানীয় ওকে চাঙ্গা করে তোলে; উপাদেয় দু-একটা জিনিস মুখে দিতেই ওর ক্ষিধে ফিরে আসে। মা যদি এখন মেয়েকে মদ্যপান করতে দেখেন কি বলবেন ভাব ত'! কিন্তু এইটাই ত' বিবাহিত জীবনের সুখ; তোমার যা খুশী তাই করতে পার।

নবীন স্বামী অতি মনোযোগে তার তরুণী ভার্যার পরিচর্যা করে। এতে কি আনন্দ! অবশ্য এর আগে, কৌমার জীবনে ও ভাল ভাল খানা খেয়েছে, কিন্তু তাতে কোন সুখ বা তৃপ্তি আসে নি। কিছুমাত্র না। খাদ্য ও পানীয় নিঃশেষ করতে করতে গুস্তাফ চিন্তা করে—যারা বিয়ে না করে একক থাকে, কি বুদ্ধু তারা। স্বার্থপরও বটে। যেরকম কুকুরের উপর ট্যাক্স আছে, ওদের উপরও ট্যাক্স ধার্য করা উচিত।

লুইস অবশ্য অতটা কঠোর নয়; ধীরে মিষ্টি করে ও বুঝায়—যে সব বেচারারা একক জীবন বেছে নেয়, তারা করুণার পাত্র। লুইস মনে করে সঙ্গতি থাকলে ওরা নিঃসন্দেহে বিয়ে করে ফেলত। গুস্তাফের মনে একটু ব্যথা লাগে। অর্থ দিয়ে নিশ্চয়ই আনন্দকে মাপা যায় না। না, না;"

কিন্তু-কিন্তু-না কিছু ভাবার নেই; শীঘ্রই প্রচুর কাজ আসবে, আর তখন সব কিছুই ভালভাবে চলবে। আপাতত মুখরোচক সস্ দেওয়া মুরগীর রোস্ট আর দামী পানীয়ের দিকে মন দেওয়া যাক। খাবারের ব্যয়বাহুল্য নতুন বৌকে ক্ষণেক উন্মনা করে; ভয়ে ভয়ে গুস্তাফকে জিজ্ঞাসা করে এই বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সাধ্য ওদের আছে কি না।

গুস্তাফ ওর ছোট্ট লুইসের গেলাসে আরো পানীয় ঢেলে দেয়; এই নিরর্থক দুশ্চিন্তা থেকে ওকে আশ্বস্ত করে। এই একটা দিন আর প্রতিদিনে পার্থক্য আছে, ও বলে, তাছাড়া সুযোগ পেলে জীবনটাকে উপভোগ করে নেওয়াই মানুষের কর্তব্য। জীবনটা কি নশ্বর।

ডিনারের সময় দুই ঘোড়ায়টানা একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল ওদের দরজায় আর নবদম্পতি বেড়াতে বেরোল। আরাম করে হেলান দিয়ে বসে, পার্কের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে লুইসের ভারী ভাল লাগল। পরিচিতেরা ঘুরছে পায়ে হেঁটে; নবদম্পতিটির দিকে চোখ পড়তেই মাথা হেলিয়ে শুভকামনা জানাচ্ছে, আর ওদের চোখে-মুখে বিস্ময় আর হিংসার চিহ্ন স্পষ্টই ফুটে উঠছে। ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে, সহকারী উকীলটি বেশ ভালই জুটিয়েছে, মেয়েটার নিশ্চয়ই দু'পয়সা আছে; আর আমরা গরীব বেচারীরা পায়ে হেঁটে মরছি। নরম কুশনে শরীর এলিয়ে, বিনা পরিশ্রমে গাড়ী চড়ে বেড়ান কি সুখের। এই ত' সচ্ছল বিবাহিত জীবনের প্রতীক।

প্রথম মাসটা কেটে গেল একটানা আনন্দের মধ্যে দিয়ে—নাচের আসর, পার্টি, নিমন্ত্রণ, থিয়েটার। এ সত্ত্বেও যে সময়টুকু ওরা বাড়ীতে কাটাত, তা ছিল অতুলনীয়। লুইসকে ওর বাবা-মার কাছ থেকে রাত্রিবেলা বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার মধ্যে কি অপূর্ব অনুভূতি নিজেদের বাসায় ওরা এখন স্বাধীন। ফ্ল্যাটে পৌঁছে অল্প কিছু খাবার করে নেওয়া, তারপর আরাম করে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করা।

গুস্তাফ ব্যয় সংকোচের পক্ষপাতী; অবশ্য বলা ভাল সেটা মুখেই। গৃহিণী একদিন মাছ আর আলুসিদ্ধ দিয়ে মুখ বদলাবার চেষ্টা করল। বেশ ভালও লাগল, কিন্তু গুস্তাফের পছন্দ হল না। ফের যেদিন লুইস মাছ বানাল, ও কিনে আনল খানিকটা পাখীর মাংস বাজার থেকে এক ক্রোন দিয়ে। বেশ সুবিধামত দরে পাওয়া গেছে বলে ও উচ্ছ্বসিত যদিও লুইস একমত হতে পারল না। ও কিছুদিন আগে একজোড়া কিনেছে আরো সস্তায় তাছাড়া পাখীর মাংস খাওয়ায় খরচ বেশী। যাই হোক, এই সামান্য ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তর্কাতর্কি শোভা পায় না।

আরো কয়েক মাস পরে লুইসফকের শরীর কিরকম খারাপ হল। ঠাণ্ডা লাগল না ধাতুনির্মিত রান্নার বাসনপত্র থেকে কোনরকম বিষক্রিয়া সুরু হল? যে ডাক্তার এসেছিলেন, খালি

হেসে বললেন, সব ঠিক আছে। যখন তরুণী মহিলাটি এরকম মুমূর্ষু, তখন এই রোগনির্ণয় আশ্চর্যজনক সন্দেহ কি। তাহলে হয়ত ওয়ালপেপারে আর্সেনিক আছে। ফক্ খানিকটা কেমিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে ওকে সাবধানে পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করল। কেমিস্টের রিপোর্টে দেখা গেল কোন অনিষ্টকর পদার্থ থেকে ওয়ালপেপার সম্পূর্ণ মুক্ত।

বউয়ের অসুখ ভাল না হওয়ায় গুস্তাফ এবারে নিজেই কারণ খুঁজতে বসল। ডাক্তারী বইপড়া বিদ্যা দিয়েই লুইসের রোগ নির্ণয় করে ফেলে ও। গরম গরম ফুলিবাপ নিতে লাগল বৌ আর একমাসের মধ্যেই শরীরের বেশ উন্নতি দেখা গেল। এটা একেবারেই হঠাৎ ওরা যা ঠিক করে রেখেছিল তার অনেক আগেই; তাও বাবা-মা হওয়া কি মজার ব্যাপার। বাচ্চাটা যে ছেলে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কি নাম হবে এখনই ভাব। ইতিমধ্যে লুইস অনেকবার একান্তে ওর স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, বিয়ের পর থেকে মাইনে ওর এক পয়সাও আয় হয় নি। খালি মাইনেতে মোটেই কুলোয় না। অবশ্য এটা ঠিকই যে ওদের জীবনযাত্রার মান একটু উচ্চমুখী কিন্তু এখন একটা পরিবর্তন করে সবকিছু মনোমত করা যায় না কি।

পরের দিন সহকারী উকীলমশাই ওঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ব্যারিস্টার সাহেবের সাথে দেখা করে কিছু ধারের উদ্দেশ্যে আবেদন জানালেন। এই টাকাটার বিশেষ প্রয়োজন সামনে যে অবশ্যম্ভাবী খরচপত্র আসছে, এই অর্থে সেই দাবী মিটবে ফক্ ওর বন্ধুকে পরিষ্কার করে সব বোঝায়।

হ্যাঁ—ব্যারিস্টারটি স্বীকার করেন, বিয়ে এবং পরিবার প্রতিপালন দুটোই অর্থসাপেক্ষ। আমি কোনদিনও এ দুটোর জন্যে যথেষ্ট উপায় করতে পারলাম না।

ফক্ আর বেশী অনুরোধ করতে লজ্জা পেল। খালি হাতে বাড়ী ফিরতেই খবর এল, দুজন আগন্তুক এসেছিল ওর সাথে দেখা করতে। গুস্তাফ ভাবল কোর্ট ভন্নহলের সৈন্যদলে ওর যে দুজন লেফটেনান্ট বন্ধু আছে নিশ্চয়ই তারা।

না, এরা লেফটেনান্ট নয়, বেশ বয়স্ক লোক।

তাহলে উপসালাতে থাকাকালীন যে দুই ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল, তারাই হয়ত ওর বিয়ের খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছে। চাকরটা অবশ্য বলে, ওরা উপসালা থেকে আসে নি, স্টকহলমেরই বাসিন্দে আর হাতে ছিল ওদের এক এক গাছা লাঠি।

বিস্ময়কর! বেশ ভালরকমই! নিশ্চয়ই ওরা আবার ফিরে আসবে।

নবীন গৃহকর্তা এবারে আবার বাজারে বেরোলেন। স্ট্রবেরী কিনে ফিরলেন—লাভে অবশ্যই।

বিজয়গর্বে গৃহিণীকে বলেন—ভেবে দেখ, বছরের এই সময়ে এত বড় বড় কতকগুলো স্ট্রবেরী মাত্র দেড় ক্রোনারে।

কিন্তু লক্ষ্মীটি গুস্তাফ, এভাবে খরচা করা আমাদের পোষায় না।

কিছু ভেবো না গো; আমি কিছু উপরি কাজের ব্যবস্থা করেছি।

কিন্তু আমাদের দেনার কি হবে?

দেনা আমি একটা বড়রকম ধার নিয়ে একসঙ্গে ওদের সব শোধ করে দেব।

কিন্তু, লুইস আপত্তি জানায়, তাতে কি আরো নতুন দেনায় জড়িয়ে পড়ব না?

তা হলেও কোন ক্ষতি নেই। একটু ত' অবসর পাওয়া যাবে, কি বল কিন্তু এসব বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে লাভ কি? স্ট্রবেরীগুলো অতি উপাদেয় তাই না? স্ট্রবেরীর পরে এক-গ্লাস শেরী হলে বেশ ভালই জমত।

অতএব চাকরটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এক বোতল শেরীর জন্যে—অবশ্যই সব থেকে ভালটা চাই।

সেদিন দুপুরে সোফায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে ওঠার পর ফকের স্ত্রী ইতস্তত করে আবার দেনার প্রসঙ্গে ফিরে আসে। লুইস আশা করে ও যা বলবে তা শুনে স্বামী রাগ করবেন না।

রাগ? না নিশ্চয়ই না। কি কথা? ওর কি বাড়ীর জন্যে কিছু টাকার প্রয়োজন?

লুইস বোঝাতে চেষ্টা করে:

মুদীর দোকানে টাকা বাকী পড়েছে, মাংসওলা শাসিয়ে গেছে, ঘোড়ার গাড়ীর লোকটাও ওর পাওনার জন্যে জবরদস্তি করছে।

ব্যস এই ত'? সহকারী উকীল মন্তব্য করেন, এক্ষুণি ওদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে- কাল- প্রতিটি পাই পয়সা পর্যন্ত। এখন চল, কিছু একটা করা যাক। পার্কে একটু ঘুরে আসতে কি রকম লাগবে?

না গাড়ী নেবার দরকার কি? ঠিক আছে, ট্রাম ত' আছেই তাতেই চল পার্কে যাই।

কাজেই ওরা পার্কে গেল আর আলহামব্রা রেস্টুরেন্টের একটা নিভৃত কক্ষে বসে রাত্রের খাওয়া সারল। কি কাণ্ড। বড় খাবার ঘরটায় বসে যে সব ভোজনার্থীর দল, তারা ওদের একজোড়া ছুটকো প্রেমিক বলে ধরে নিয়েছে, মনে হচ্ছেই গুস্তাফ বেজায় খুসী যদিও লুইসের মুখ একটু মেঘাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে, বিশেষ করে বিলটা দেখার পর। ঐ টাকায় বাড়িতে চমৎকার ব্যবস্থা হতে পারত।

কয়েকমাস কেটে যায়; এবারে সত্যিই সব বন্দোবস্ত করার সময় এল—একটা দোলনা, বাচ্চার জামাকাপড়—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

টাকার বন্দোবস্ত করা ফকের পক্ষে দুঃসাধ্য হল। ঘোড়ার গাড়ীর মালিক আর মুদী দুজনেই ধারে আর কিছু দিতে অস্বীকৃত; ওদেরও ত' পরিবার প্রতিপালন করতে হয়। বাস্তব কি কঠোর।

অবশেষে সেই বিশেষ দিনটি এল। গুস্তাফকে একজন নার্স জোগাড় করে আনতে হয়; এমন কি নবজাত কন্যাকে কোলে তুলে, ভাল করে মুখদর্শন করার আগেই, বাইরে গিয়ে দেনাদারদের শান্ত করতে হয়। নতুন দায়িত্বের ভারে বেচারা ব্যতিব্যস্ত; নানারকম দুশ্চিন্তায় প্রায়

ভেঙ্গে পড়ে ও। খানিকটা অনুবাদের কাজ অবশ্য পেল কিন্তু সব সময়েই যদি দৌড়ে বেড়াতে হয়, কাজ ও করে কখন? এই মানসিক অবস্থায় শ্বশুরের কাছে গেল সাহায্যের আবেদন নিয়ে।

বুড়ো ভদ্রলোক অতি নিস্পৃহভাবে ওর কথা শুনলেন: আমি তোমাকে এই একবার সাহায্য করব, কিন্তু আর নয়। আমার নিজেরই সামান্য আছে; তাছাড়া তোমরাই আমার একমাত্র সন্তান নও।

মায়ের জন্য মু···চক এগারোটা লাগে; লাগে সবগুলো আর দামী পানীয়। নার্সের মাইনে দিতে হয়।

সৌভাগ্যবশত ফকের বৌ বেশ তাড়াতাড়িই সেরে উঠল। ছিমছাম শরীরের বাঁধুনি দেখে মনে হয় যেন আগের সেই কুমারী মেয়েটি। মুখের চেহারাতেও উন্নতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। লুইসের বাবা একদিন জামাইকে ডেকে সগাম্ভীর্যে বলেন, আর ছেলে-মেয়ের দরকার নেই। অবশ্য তুমি যদি একেবারে ফতুর হতে চাও সে আলাদা কথা।

আরো অল্প কিছুদিন তরুণ ফকের পরিবার প্রেম ও দেনার মধ্যে বর্ধিত হতে থাকল।

কিন্তু একদিন দরজায় আঘাত হানল দেউলে হবার শমন। বাড়ীর জিনিসপত্র সব কেড়ে নেবে বলে আতঙ্ক হল। বুড়ো ভদ্রলোক এসে লুইস ও তার বাচ্চাকে নিয়ে গেলেন। গাড়ীতে যেতে যেতে তিক্তচিন্তাচ্ছন্ন বুড়ো ভাবেন, এমন লোককেই মেয়ে দিয়েছি যে একবস্তুর বাদে অসম্মান করে মেয়েকে ফিরিয়ে দিল।

লুইস অবশ্য সানন্দেই গুস্তাফের সঙ্গে থাকতে রাজী ছিল, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। গুস্তাফ পিছনে পড়ে রইল: বোকার মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বেলিফরা—সেই লাঠিওলা মানুষ দুটো ওর ফ্ল্যাট একেবারে খালি করে সব নিয়ে গেল—কাঁচের বাসন, কাঁটাচামচের সেট, রান্নার জিনিষপত্র, ফার্নিচার, বিছানা—সর্বস্ব।

●

এবারে স্বরু হল গুস্তাফের জীবনযুদ্ধ। একটা প্রভাতী সংবাদ-পত্রের অফিসে প্রুফ-রীডারের কাজ জোগাড় হল, এজন্য প্রতি রাত্রেই বেশ কয়েক ঘণ্টা ডেস্কে বসে কাটে। একেবারে দেউলিয়া বলে চিহ্নিত না হওয়ায় গভর্নমেন্টের কাজটা ওর বজায় আছে, যদিও উন্নতির আর কোনো আশা নেই। ওর শ্বশুরমশাই দয়াপরবশ হয়ে প্রতি রবিবার ওকে বৌ আর বাচ্চার সাথে দেখা করতে দেন, কিন্তু ওদের নিভৃতে পাবার অনুমতি নেই। সন্ধ্যায় যখন ওদের ছেড়ে কাগজের অফিসে যাবার জন্যে উঠতে হয়, ওরা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে; গুস্তাফকে এই অপমান হজম করে বেরিয়ে যেতে হয়।

হয়ত সব দেনা শোধ দিতে ওর বিশ বছর লেগে যাবে। আর তারপর, হ্যাঁ তারপরে কি? তখন কি ও স্ত্রী আর মেয়ের ভরণপোষণে সক্ষম হবে? না, বোধহয় না। যদি এর মধ্যে ওর শ্বশুরের মৃত্যু হয় তাহলে ওদের মাথা গুঁজবারও কোন ঠাঁই থাকবে না। কাজেই এই কঠোর-হৃদয় বৃদ্ধ, যিনি এত নিষ্ঠুরভাবে ওদের আলাদা করে রেখেছেন, তাঁর কাছেও গুস্তাফকে কৃতজ্ঞ হতে হয়।

●

হ্যাঁ, মানুষের জীবনটাই ত' কুৎসিৎ-কঠোর। বন্য পশুদের জীবনধারণ কত সহজ ব্যাপার, আর সব সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষকেই কেবল চরকির মত পরিশ্রম করে বেড়াতে হবে। কি লজ্জা, হ্যাঁ কি অতীব লজ্জা, যে এই জীবনের যাত্রাপথে সকলের ভাগ্যে উপাদেয় পাখীর মাংস আর স্ট্রবেরী জোটে না।●

*সুইডিস লেখক অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯—১৯১২) রচিত 'লাভ এ্যাণ্ড ব্রেড' থেকে অনূদিত।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যায়ামশালা

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে একটি ৮০০ বছরের প্রাচীন ব্যায়ামশালার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেকালের এক জমিদার এটি তৈরী করিয়েছিলেন এবং এখানে তাঁর পাইক-পেয়াদারা কসরৎ করে শরীরকে দুরস্ত রাখতো। এখন স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখানে শরীর-চর্চা করে।

চিত্র : কানুপ্রিয় গুপ্ত

জীবজন্তুর নবজন্ম

কিছু দিলে তবে কিছু পাওয়া যায় অর্থাৎ কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা থাকলে তার আগে কিছু দিয়ে যেতে হয়, তবেই প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা। এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়েই জগৎটা এগিয়ে চলেছে এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে। এই নিয়মের অনুশাসনেই পৃথিবীর অগ্রসরণের সার্থকতা। এ নিয়ম আজকের নয়, এ নিয়মের ধারাস্রোতের আরম্ভ অনাদিকালের উৎস থেকে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর তর্জনীসঙ্কেত।

আদিমকালের অসভ্য যুগের গণ্ডী অতিক্রম করে সভ্যতার প্রশস্ত অঙ্গনে যখন আমরা পা ফেললুম, অসভ্য-বর্বর যুগের অবসান ঘটিয়ে সভ্যতার জয়রথ যখন আমাদের জীবনের প্রাঙ্গণের সীমানায় প্রবেশ করল, তখন তাকে আবাহনের মূল্য হিসাবেও আমাদের অনেক কিছু দিতে হয়েছে।

শ্রীলেখা গঙ্গোপাধ্যায়

সভ্যতার আবির্ভাব বন্য বর্বরতাকে যেমনই নির্বাসন দিয়েছে আবার তেমনই আদিকালের [illegible]কেও আমাদের হারাতে হয়েছে। শুধু প্রাক-সভ্যতা যুগেরই নয়, পরবর্তীকালেরই অনেক অনেক কিছু আজ আমাদের চোখের আড়ালে সরে গেছে। এই শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু জীবজন্তুই এই রচনার উপজীব্য।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে বহুবিধ পশু-পাখি আমাদের নজরের বাইরে চলে গেল। ধরে নেওয়া হল তারা অবলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু জগতের আরও একটা নিয়ম আছে। সে নিয়ম আবর্তন-বিবর্তনের। তাই, সুদীর্ঘকাল পরে অবলুপ্তির অন্ধকার থেকে আবার তাদের অভ্যুদয় ঘটছে।

হাওয়াইয়ের নকুন্দ পাখি

ধূসর বর্ণের প্রায়-অবলুপ্ত ভাল্লুক

আবার তারা তাদের প্রাচীনতা নিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে। তাদের আবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানের আঙ্গিনায়।

যে সকল জীবজন্তুকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটছে, তাদের মধ্যে স্তন্যপায়ী জীব, পাখি, জল ও স্থল উভচর পক্ষী মাছ প্রভৃতি প্রাণীরা আছে। এদের তালিকা যেমনই আকর্ষণীয় তেমনই তথ্যবহুল।

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে ইণ্ডিয়ানার বাদুড়, ক্যালিফোর্নিয়ার খ্যাঁকশিয়াল ও কাঠবেড়াল, টেক্সাসের লোহিতবরণ নেকড়ে, কৃষ্ণপদ নেউল, ফ্লোরিডার চিতা এবং সামুদ্রিক গাভী।

পাখিদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে হাওয়াইয়ের কৃষ্ণবরণ নিতম্বসম্পন্ন সামুদ্রিক

পাখী পেট্রেল, মেক্সিকোর রাজহাঁস, ক্যালিফোর্নিয়ার জলচর পাখি টার্ন, দুগ্ধশুভ্র পাতিহাঁস, দক্ষিণের কেশহীন ঈগলপাখি, চীৎকাররত সারসপাখী, গায়ক পাখী, এস্কিমো কার্লু, পোয়েটো-রিকোর পায়রা, কাঠঠোকরা, চড়াই এবং হাওয়াইয়ের রাজহাঁস, পাতিহাঁস, শ্যেন বা বাজপাখী, জলচর পাখী কুট গায়ক পাখী ফিঞ্চে।

উভচর প্রাণীদের ভিতর পোয়েটো-রিকোর নো, স্যাণ্টাক্রুজের দীর্ঘ-ক্ষুর সরীসৃপ, টেক্সাসের দৃষ্টিহীন সরীসৃপ, হাউস্টনের উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলসমূহের ব্যাঙ।

মাছের মধ্যে ক্ষুদ্র নাসিন, সুখাদ্য মৎস্য স্টারজর, লম্বা চোয়াল সিসকো,

পুয়েটোরিকোর বোরা সাপ

মন্টানার কর্তিতকণ্ঠ ট্রাউট মাছ, ছোট ছোট ড্রেক মাছ, কুব্জাকৃতি চান মাছ, মেরিল্যাণ্ডের নীলরঙের পাইক মাছের নাম।

ধূসরবর্ণের এক শ্রেণীর ভাল্লুক একরকম অবলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে তাদের সংখ্যা বেশ বেড়ে চলেছে। একটু একটু করে আবার তাদের দেখা মিলছে। সভ্যতার এই সন্ধিলগ্নে বহু লুপ্তপ্রায় জীবজন্তুর এই নবজন্ম কি ইঙ্গিত বা তাৎপর্য বহন করছে, তা কে জানে?

নতুন ধাতু—টিটানিয়াম-

টিটানিয়াম ধাতু আবিষ্কৃত হয়—আজ থেকে ১৫০ বছর আগে, ইংলণ্ডের কর্নওয়াল জেলার সাগর-সৈকত থেকে। বৈজ্ঞানিকগণ নতুন এই বিশেষ ধরণের ধাতুকে দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেও এই অবিশুদ্ধ ধাতু থেকে বিশুদ্ধ ধাতু টিটানিয়ামকে পৃথক করতে পারেন নি। ফলে—এই ধাতু মানুষের কাছে অপরিচিত হয়ে রইল। এই ধাতুকে বিশুদ্ধ উপায়ে পেয়ে নানা কাজে প্রয়োগ করবার জন্য, বিজ্ঞানীরা গত কয়েক বৎসর ধরে গবেষণার কাজ করে চলেন। অবশেষে বৈজ্ঞানিকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় অবিশুদ্ধ ধাতুপিণ্ড থেকে বিশুদ্ধ টিটানিয়াম পৃথক করা হয়। তাই আজ এই নতুন ধাতুর ব্যবহার শিল্পজগতে, ব্যবসা-জগতে।

এবার এই ধাতুর ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের কথায় আসা যাক। এই ধাতুটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—এটি ওজনে খুব হাল্কা। ইহার অপর একটা বৈশিষ্ট্য খুব কম বা বেশী তাপমাত্রায় ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহার ওজন অ্যালুমিনিয়াম ও নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ওজনের ঠিক মাঝামাঝি। ইহা সংকর জাতীয় ইস্পাতের চেয়ে ৪৫% হাল্কা এবং অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে ৬০% বেশী ভারী।

বর্তমানে এই নতুন ধাতুকে বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্রুতগতি সম্পন্ন বিমান, রকেট প্রভৃতি নির্মাণ-কার্যে ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে। জেমিনী মহাকাশযান ও অ্যাপোলোতে ইহা ব্যবহার করা হয়। শল্য-চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম, কাপড় শিল্পে, রাসায়নিক কার্য প্রভৃতিতে ইহার চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আবার কাগজ শিল্প, প্লাস্টিকস্, রঞ্জনশিল্পে ইহার ব্যাপকতর ব্যবহার আছে। টেট্রাক্লোরাইড

শ্রীসমীরকুমার নিয়োগী

হিসেবে ইহা ব্যবহৃত হয় আকাশের উপর লেখাতে ও ধূম্রজাল সৃষ্টিতে।

বিশ্ববিজ্ঞানিগণ এই নতুন ধাতু টিটানিয়ামকে নানা গঠন ও উন্নতিমূলক কার্যে ভবিষ্যতে নিয়োজিত করবার জন্য নানা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত রেখেছেন। এই ধাতুর সাহায্যে এমন সব বিমান নির্মিত হবে, যা বেগপাল্লা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমান বিমানগুলির থেকে উন্নত ধরণের হবে। অদূর ভবিষ্যৎকালে মহাসাগরে অতি গভীরে যে সকল সাবমেরিন চলাচল করে, সেগুলোতে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে নীলবর্ণ করার যন্ত্রেও এই বৈশিষ্ট্যময় ধাতুকে ব্যবহার করা যাবে।

এমন দিনের আর বেশী দেরী নেই। মানুষ নিত্য-পরিচিত ধাতু লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ভুলে যাবে। নতুন ও উন্নত ধরণের ধাতুর আবিষ্কারের ফলে—মানুষ তার প্রয়োজনীয় সম্ভারের চাহিদা পূরণ করবে। তখন ধাতু-জগতে বিজ্ঞানের নতুন আলোর দীপশিখা প্রজ্বলিত হবে। প্রাচীন কালের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা চোখ মেলে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব—লৌহযুগের পর তাম্রযুগ, অ্যালমিনিয়াম যুগ প্রভৃতি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ধাতুর থেকে যখন উন্নত ধরণের ধাতু আবিষ্কার হচ্ছে, তখন সেই ধাতুর ব্যাপক প্রসার লাভ করছে অর্থাৎ সেই ধাতুর যুগের সৃষ্টি হচ্ছে। এমন একদিন আসবে, যখন আমি এই মর্ত্যালোকে হয়ত থাকব না—এই টিটানিয়াম ধাতু তার বিজয়পতাকা জলে, স্থলে ও আকাশে স্থাপন করবে। তাই বর্তমান বিজ্ঞানিগণ টিটানিয়ামকে বলছেন—"মহাজাগতিক যুগধাতু"। সেই অনাগত ও শুভদিনকে প্রণাম জানিয়ে প্রবন্ধ লেখা শেষ করছি।

এক কবি রাজপুত্রের কাহিনী

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

এক যে ছিল রাজা। মস্ত-বড় তাঁর রাজ্য। রাজ্যজোড়া তাঁর নাম, তাঁর সুখ্যাতি। অনন্ত ঐশ্বর্য, অগাধ বিত্ত। লোক-লস্কর, পাইক-পিয়াদা, আত্মীয়-পরিজন কোনটারই অভাব নেই, তবু রাজার ভোগে স্পৃহা নেই। দেবোপম তাঁর চরিত্র, উদার তাঁর হৃদয়, দরিদ্রের দুঃখ মোচনে মুক্তহস্ত। ধর্মে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কর্মে তাঁর অসাধারণ শক্তি। তিনি যেন ভোগের সরোবরে ত্যাগের শতদল পদ্ম। রাজ্যের যত জ্ঞানী, গুণী, সঙ্গীতরসিকে রাজবাড়ী সব সময় সরগরম। রাজকুমারেরা শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত হয়ে উঠতে লাগলো।

বাদ সাধলো সকল সুখে কনিষ্ঠ রাজকুমার। রাজবাড়ীর এই আনন্দ-কোলাহল মুখরিত হাওয়া একটা কিসের যেন আকর্ষণ কিসের যেন কৌতূহল সৃষ্টি করলো। সঙ্গীত ও কাব্যের ছোঁয়া লাগলো রাজপুত্রের বুকে। রাজপুত্রের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। সাত-মহলা দালানের ভোগবিলাসের অন্তরাল থেকে যেন কিসের একটা অব্যক্ত বেদনা, অশান্ত আকুলতায় রাজপুত্রের প্রাণ ছট্‌ফট্ করে ওঠে যেমন করে মুক্তির জন্য ডানা ঝাপটায় পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী। একটা কাব্যের প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হতে থাকে। এত বিলাস, এত সুখ তাঁর সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না বন্ধন। ভৃত্য-রাজতন্ত্রে তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। সহসা একদিন তাঁর বন্ধনাহত হৃদয় থেকে মহাকবি বাল্মীকির মত নিঃসৃত হয় কাব্যের ধারা।

ওরে চারিদিকে মোর একি কারাগার ঘোর
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর।

রাজধানীর ইঁট-কাঠ-পাথরের অন্তরাল থেকে যেন কার চাপা আর্তনাদ গুমরে গুমরে ওঠে নিশিদিন, অস্থির হয়ে ওঠে রাজকুমারের প্রাণ, চঞ্চল হয়ে ওঠে অন্তর, তিনি গেয়ে ওঠেন,—

হেথা নয় হেথা, নয়,
অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। একদিন ইঁট-কাঠ-পাথরের অষ্টোপাসের বন্ধন ছিন্ন করে রাজপুত্র লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ, দাঁড়ি-মাঝি নিয়ে নদীর বুকে ভাসিয়ে দিলেন তাঁর সোনার তরী।

অমল ধবল পালে লাগলো মন্দমধুর হাওয়া। খরপরশা ক্ষুরধারা ভরা নদীর বুকে ভরা পালে এগিয়ে চলতে লাগলো রাজপুত্রের সোনার তরী। দুদিকে গ্রাম, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, চর, নানারকম বিচিত্র ছবি দেখা যায় আবার মিলিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে। আকাশে ভেসে ওঠে রাঙা মেঘ, সন্ধ্যায় ফোটে সেখানে নানা রঙ। নৌকা চলে, জেলেরা মাছ ধরে। সন্ধ্যের পর বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত, নিদ্রিত শিশুর মত একেবারে স্থির হয়ে পড়ে থাকে উন্মুক্ত আকাশে সমস্ত তারা একসাথে জেগে ওঠে মাথার ওপর। সবুজ গাছের ছায়া, নিঝুম পূর্ণিমার চাঁদ, আর সাধারণ মানুষের মুখে পল্লী-কবির গান শুনতে-শুনতে রাজার নৌকা চলে যায় অনেক —অনেক দূরে।

তারপর একদিন এসে থামলেন তিনি রাজধানীর থেকে বহুদূরে, ইঁট-কাঠ-পাথরের রাজত্ব পেরিয়ে এক পল্লীর প্রান্তসীমায়—সেইখানে বটগাছের নীচে খেয়াঘাটের কাছে ভিড়লো তাঁর সোনার তরী।

পাড়াগাঁয়ের লোকেরা দূর থেকে সভয়ে সসঙ্কোচে রাজার সোনার তরীর

চিত্র : নকুল দাস

উত্তরপাড়া মিতালী সংঘ আয়োজিত ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় 'গো-এজ ইউ-লাইক' বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীমান্ প্রতিম মুখোপাধ্যায়—"তারকনাথের যাত্রী"

পানে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ধরলো। অবাক হয়ে গেলো তারা। আকাশের চাঁদ নেমে এলো মর্ত্যের মাটিতে। রাজা, সোনার চামচ মুখে দিয়ে যার জন্ম তিনি এলেন এই নামহীন গাঁয়ে, অজ্ঞাত অখ্যাত জনসমাজে।

রাজাও দেখলেন তাদের দূর থেকেই। কারণ, নিশিদিন তাঁর সাথে যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তার জ্বালায় রাজপুত্রের মনে শান্তি ছিল না। সেই সব লোক-লস্কর সর্বদাই রাজমর্যাদা রক্ষার জন্য সঙ্গীন উঁচিয়ে বসে থাকতো। ধীরে ধীরে এই দূরত্ব কমে আসতে লাগলো ছায়াঢাকা, পাখী-ডাকা গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটা মিলনের বন্ধনের সৃষ্টি হল। তাঁর হৃদয়ে রুদ্ধ কবিতার শতদল একটি একটি করে পাতা মেলে ধরলো।

বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গ উদার আকাশে পাখা মেলে দিয়ে যেন গান ধরলো—

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে।

দিন যেতে লাগলো। ভাবুক কবি রাজপুত্র পাড়াগাঁয়ের ঘাটে ঘাটে তরী ভাসিয়ে বেড়াতে লাগলেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখময় দৈনন্দিন জীবনের দারিদ্র্যের ইতিহাস শুনলেন, অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন। এই দেশের নিপীড়িত, অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের সান্নিধ্য লাভ করলেন। আর অজ্ঞ চাষাভুষা মেহনতি মানুষের দল ধীরে ধীরে রাজসন্নিধানে আসতে লাগলো। তিনি দেখলেন, তিনি জানলেন, তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন, সত্যি এরা কত অসহায়, এরা কত সরল, কত কষ্টসহিষ্ণু। তাঁর অন্তরের বীণায় বেজে উঠলো—

এই সব মূঢ়, ম্লান,
মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

মানুষ আর তাঁর কাছে মানুষ থাকলো না, তারা হয়ে উঠলো দেবতা আর দেবতা হয়ে উঠলো মানুষ, তিনি বুঝলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নেই।' তিনি বললেন, প্রীতিমাত্রেই রহস্যময়ের পূজা, কেবল সেটা আমরা অবচেতনভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভেতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটা শক্তির সজাগ আবির্ভাব। নিজের সন্তানকে যখন ভালো লাগে, তখন সে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অনুবর্তী হয়ে পড়ে। স্নেহ-মমতার বাহুল্য তখন উপাসনার পর্যায়ে এসে পড়ে। তাই তিনি হয়ে উঠলেন মানবত্বের পূজারী, তিনি হয়ে উঠলেন সব মানুষের কবি, তিনি লিখলেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো
অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার
সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও
নাই স্থান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার
সমান।

ধীরে ধীরে এইসব অবজ্ঞাত মানুষের বেদনা তাঁর চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করলো। তিনি বুঝলেন, দেশের সত্যিকার রূপ পল্লীতে। তিনি

সমুদ্রতীরে আমরা দুজনায়
চিত্র : অজিতকুমার পাল

ভুললেন, আমাদের দেশের মা—
মনের ধাত্রী পল্লী জননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। এখানকার লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তখন এই সম্রাট কবি তাঁর সাহিত্যের ভেতর দিয়ে অজস্র সহস্র ধারে সেই অসহায়দের দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করতে লাগলেন।

দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো সেই রাজপুত্রের নাম। কিন্তু তখন আর তিনি রাজপুত্র নন রাজাও নন। তাঁর ঐশ্বর্যের আবরণের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করলো যে মানবতার কবি, সেই কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশে-দেশান্তরে। দিক-দিগন্তের অন্তহীন, চক্রবাল রেখায়।

যিনি ছিলেন রাজা, তিনি হলেন দরদী কবি এবং শুধু কবি নয়, কবিসম্রাট। সমস্ত জগৎ এসে ধরা দিল তাঁর কাছে। তিনি দিগ্বিজয় করে কণ্ঠে ধারণ করলেন জগজ্জয়ী বরমাল্য। তাঁর দেশ হয়ে উঠলো সারা বিশ্বের কাছে পবিত্র তীর্থ। বিশ্বকে মানুষের গান শুনিয়ে তিনি হলেন বিশ্বকবি।

কবিসম্রাট আর সেই শহরের ইঁটের পাঁজরে লোহার খাঁচার নির্মম বন্ধনে ধরা দিলেন না। এক শান্ত, স্নিগ্ধ-শ্যামছায়াঘেরা পল্লীর প্রান্তে গড়ে তুললেন আশ্রয়। সেই আশ্রমে তিনি দেশের অজ্ঞ অধিবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে, পল্লীবাসীদের অভাব-অভিযোগপূর্ণ জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন নিজের জীবনকে। তিনি হাত দিলেন পল্লী গঠনের কাজে, মানুষ গড়ার কাজে। সারা জগতে ছড়িয়ে গেল তাঁর অমর বাণী, বিস্মিত চোখে জগৎ চেয়ে থাকলো তাঁর পানে। অন্ধ তমসা ভেদ করে যেন একটা জ্যোতির স্ফুলিঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এই পৃথিবী। এই কবি হয়ে উঠলেন জগতের কবি; আর সেই সম্রাট কবি আমাদেরই দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জন্মদিনে আজ তাঁকে জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা।

সাহিত্যের দিকপাল জন মিলটন

শ্রীঅলোককুমার সেন

ইংরেজী সাহিত্যে যাঁরা এনেছেন যুগান্তর, মানবমনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নতুন প্রেরণায়—জন মিলটন তাঁদের অন্যতম।

আজ থেকে তিনশো ষাট বছর আগে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে মিলটনের জন্ম। ছ' বছর বয়সে সেণ্ট পলস্ স্কুলে শুরু হয় তাঁর শিক্ষা। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। তারপর মিলটন এলেন বাকিংহামশায়ারের হর্টনে। এখানে আসার পর থেকেই তাঁর প্রকৃতি-প্রেমী মন প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য আস্বাদনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পাইন, বীচ, ওক ও এলম গাছের সবুজ পাতা, স্কাইলার্ক, থার্স পাখীর সুমধুর কণ্ঠস্বর আর পাহাড়ী নদীর কলতান তাঁকে মুগ্ধ করতো, হৃদয়ে এনে দিত অনির্বচনীয় আনন্দ।

এই সময় থেকেই মিলটনের কাব্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। 'সনেট' কবি হিসেবে তিনি পাঠক সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। 'সনেট' রচনার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শব্দচয়ন ও অলঙ্কার ব্যবহারে দক্ষতা আর ছন্দের সাবলীল গতি। 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'প্যারাডাইস রিগেণ্ড' মহাকাব্যদ্বয় বিশ্বসাহিত্যে মিলটনের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহুদী পুরাণে বর্ণিত পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ও ইভের অপূর্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে এই মহাকাব্যদ্বয়ে। 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যে বর্ণিত আছে যে কিভাবে শয়তানের প্ররোচনায় ফুলের মতো নিষ্পাপ আদম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলেন আর ঈশ্বরের অভিশাপে হলেন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত।

কেমন সেজেছি   চিত্রঃ দ্যুতি তপাদার

'প্যারাডাইস রিগেইন্ড' হলো মানব-পুত্র যীশুর প্রচেষ্টায় আদম ও ইভের স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির ইতিকথা।

উপরোক্ত কাব্যদ্বয়ের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে মিলটনের দরদী মনের পরিচয়। মানুষ পাপ করে কিন্তু পাপের কালিমা কি তার উজ্জ্বল আত্মার দীপ্তিকে চিরদিন আচ্ছন্ন রাখতে পারে? বিশ্ববাসীর কাছে মিলটনের জিজ্ঞাসা। উত্তরে তিনি বলেছেন যে, অন্তরলোকের গভীরে শ্রেয়োবোধের উদ্বোধনের পরেই মানুষের পাপের কলঙ্ক হয় বিলুপ্ত—আত্মবিশ্লেষণ ও কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ তাকে ফিরিয়ে দেয় তার হারানো স্বর্গ। মিলটন বিশ্বাস করতেন জীবনে পাপ আছে কিন্তু মানুষ পা[illegible] নয়। একটি অনির্বাণ দীপশিখার প্রভাবে সে অমৃতলোকে উন্নীত হতে পারে।

মিলটন আরও অনেক কবিতা ও কাব্য রচনা করেন, যার মধ্যে 'স্যামসন এ্যাগোনিস্টেস' নামের গীতি-নাট্য উল্লেখযোগ্য। শুধু কবিতা রচনাতেই নয় গদ্য রচনাতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান।

এইভাবে মিলটন যখন যশের চরম শিখরে আরোহণ করেছেন তখনই এলো সেই ভয়ঙ্কর দিনটি। ১৬৫২ সালের সেই নিষ্ঠুর দিনটি সেদিন রূপময়ী প্রকৃতি অন্ধকারে লুপ্ত হলো। এই পৃথিবীর আশা ও আনন্দ, দুঃখ ও বেদনা সব মুছে গেল। সারা জীবন যিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাজিয়েছেন কাব্যের বীণা তিনি হলেন অন্ধ, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। আকাশে সূর্য উঠেছে, কবি অনুভব করছেন প্রচণ্ড তাপ কিন্তু কোথায় আলো? পাখীদের কাকলিধ্বনি তাঁর কানে প্রবেশ করছে অথচ তিনি তাঁর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তে কবি পেলেন অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি, প্রবেশ করলেন কল্পলোকের রাজ্যে, সৃষ্টি করলেন অমর কবিতা—'অন হিজ ব্লাইণ্ডনেস'।

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যখন কবি বিচলিত হন তখন তাঁর অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মহান ঈশ্বরের রাজ্যে যে হাসিমুখে জীবনের সব পরীক্ষায় চরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে উত্তীর্ণ হয় সেই ঈশ্বরের যথার্থ সেবক।

দীর্ঘ বাইশ বছর দৃষ্টিহীনতার অভিশাপ তাঁকে মৃতপ্রায় করে রাখে। অবশেষে ১৬৭৪ সালে মিলটনের মৃত্যু হলো, অমর আত্মা গেল অনন্তে—বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে।

সডাক যাবে পরপারে

তমাল চট্টোপাধ্যায়

দেশের সেবায় পানুবাবুর
জীবন এল কেটে,
শান্তি সুখে মরলে বাকি
আশাটা তাঁর মেটে।

মধু এসে বললে, 'দাদা-
পরপারে গিয়ে,
ঠিকানাটা পাঠিও বেন
কেয়ার অফ-টি দিয়ে॥

ব্যস্ত-বাগীশ দেশের মানুষ
তোমার কথা ভুলে,
এলোমেলো প্ল্যান আঁটছে
জ্ঞানের ঝাঁপি খুলে।

এই ফাঁকেতে মায়ার বাঁধন
ছিঁড়বে তুমি জানি,
তারপরে ঠিক দেবেই তোমায়
পদ্মভূষণখানি।

'কেবল পতা' জানিও দাদা
একটু কেবল খেটে,
ভূষণটুকু সডাক দেব
খামের ভেতর এঁটে।

টুটুর অভিযান

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমের ঘোরে রকেট চড়ে
চলল টুটু চাঁদের দেশে
ভীষণ জোরে আওয়াজ করে
রকেট চলে হাওয়ায় ভেসে।

পৃথিবীটার বাইরে থেকে
দেখতে কেমন পৃথিবীতে
দেখছে টুটু অবাক চোখে
পৃথিবীটার বাইরে এসে।

এমন সময় মা ডেকে ক'ন
বেলা হল উঠবি কখন
স্বপ্নে দেখা চাঁদটা তখন
ভেঙে-চুরে হাওয়ায় মেশে।

আমাদের প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের গ্রন্থরাজি

অম্লান দত্তের

প্রগতির পথ ৩·০০

গণযুগ ও গণতন্ত্র ৩·০০

বিশ্বদেব বিশ্বাসের

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ৫·০০

সুভাষচন্দ্র বসুর

তরুণের স্বপ্ন ৬·০০

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মেঘ বৃষ্টি রোদ ৩·০০

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

সুর ও সুরভি (কবিতা) ৩·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ৫·০০

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৮·০০

সরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা) ৩·০০

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ৪·০০

Sister Nivedita

The Complete Works
(4 vols.) Each vol. 12·00

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

নিবেদিতা লোকমাতা (১ম খণ্ড) ৩০·০০

লাল বল লারউড ৬·০০

নট আউট ৬·০০

শ্রীপান্থের

হারেম ৫·০০

টপ্পা ৫·০০

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর

বাংলার লৌকিক দেবতা ৬·০০

মুকুল দত্তের

ফুটবলের আইনকানুন ৬·০০

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের

ইন্দ্রজিতের আসর ৩·০০

বীরেন্দ্রনাথ সরকারের

রহস্যময় রূপকুণ্ড ৩·৫০

জওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ ২০·০০

আত্মচরিত ১২·০০

Amarendra Nath Roy

Students Fight for Freedom 6·00

মতি নন্দীর

ক্রিকেটের আইনকানুন ৫·০০

সাগরময় ঘোষের

ঝরাপাতার ঝাঁপি ৪·০০

সম্পাদকের বৈঠকে ৬·০০

সুধীর ঘোষের

গান্ধীজীর দূত ১৫·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন

কাশ্মীর '৬৫ ১০·০০

রাণা সান্যালের

শিবঠাকুরের আপন দেশে ৪·০০

ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাসের

এভারেস্ট ডায়েরী ৯·০০

আর· জে· মিনির

চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪·০০

শ্রীগৌরাঙ্গ ৩·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত ৭·০০

আমাদের প্রকাশিত কিশোর-সাহিত্যের বই

শিবরাম চক্রবর্তীর

ইতুর থেকে ইত্যাদি ৩·০০

মৌমাছি

রাজার রাজা (তিন খণ্ড)
প্রতি খণ্ড : ১·৫০

রাজার রাজা (অখণ্ড) ৪·০০

নকুল মুখোপাধ্যায়ের

দেবতার পাহাড় ৩·০০

শৈলেন ঘোষের

অরুণ বরুণ কিরণমালা (নাটক) ২·০০

মিতুল নামে পুতুলটি ৩·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

সরলাবালা সরকারের

পিনকুর ডাইরি ২·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

<u>বহুক্ষণের জন্য</u> এমন অনিন্দ্য উজ্জ্বল মুখশ্রী এনে দিতে পারে পণ্ড্‌স ফেস পাউডার

রেশমের মত মোলায়েম পণ্ড্‌স ফেস পাউডার মেখে আপনার মুখখানিকে অনিন্দ্য-সুন্দর আভায় ভরিয়ে তুলুন। এ পাউডার ঘামের সাথে ধুয়ে যায় না, আবার এখানে ওখানে জমেও থাকে না। পণ্ড্‌স ফেস পাউডার সারা মুখে হালকা ভাবে ছড়িয়ে থাকে তাই আপনাকে বহুক্ষণ ধরে অপরূপ সুন্দর দেখায়।

৮ রকম ড্রীমফ্লাওয়ার রঙের মধ্যে যেটা ইচ্ছে বেছে নিন:

ন্যাচেরাল, র‍্যাচেল, গোল্ডেন র‍্যাচেল, পীচ, সান ট্যান, ব্রোন্‌জ, হনি গ্লো ও হোয়াইট।

তিনরকম সাইজে পাওয়া যায়: ছোট, মাঝারি ও বড়।

এখন
৮ রকম মনোরম
রঙে পাবেন। গায়ের
রঙের সঙ্গে মিলে
আপনাকে আরো
রমণীয় করে তুলবে।

পণ্ড্‌স ফেস পাউডার—*বেশীর ভাগ মেয়েরই অন্য ফেস পাউডারের চেয়ে এটা বেশী পছন্দ*

চীজব্রো-পণ্ড্‌স-ইন্‌ক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

P 4960 A

মাঙ্গলিকী

—শ্রীমতী সরমা ভৌমিক অঙ্কিত

মাসিক
বসুমতী
আষাঢ়
১৩৭৬

LIFEBUOY
for health
LIFEBUOY SOAP
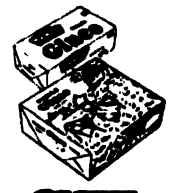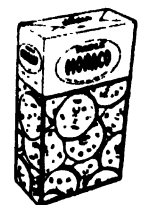
বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী রচনাসমূহ একত্রিত করে সঙ্কলন করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আন্তর্জাতিক লেখক, তাঁর ভাবধারা বাংলার মতই পূর্ণ বিকশিত আলোচ্য ইংরাজী রচনাবলীর মাধ্যমেও। তাঁর চিন্তাশক্তির গভীরতা, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান বাংলার মতই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেও স্বপ্রকাশ। এই রচনাবলী বহুদিন যাবৎই বাজারে দুষ্প্রাপ্য ছিল, কাজেই এগুলিকে গ্রথিত করে প্রকাশ করায় বিদগ্ধ পাঠকমাত্রই উপকৃত হলেন। আমরা এই রচনাবলীর সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়ের কাছেই সমভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। সম্পাদন-কৌশল বিশেষ প্রশংসনীয়। লেখক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রকাশক—সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯, দাম—পনের টাকা।

খ্যাত যাঁদের জগৎজোড়া /
এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থটিকে রেফারেন্স বুক হিসাবে গণ্য করা চলে। পৃথিবীর বরণীয় মানুষদের সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় প্রদত্ত এই গ্রন্থের মাধ্যমে। সমগ্র বিশ্বে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছেন, যা অপর কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্যমাত্রায় যশ অর্জন করেছেন, তাঁদের অনেককেই ধরে রাখা হয়েছে এই গ্রন্থে। সাধারণ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে রচনাটিকে প্রধানত সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, বিজ্ঞান, ক্রীড়াঙ্গন, দুঃসাহসিক অভিযান, দেশনায়ক ও সমাজসংস্কারক ও মহাশূন্যে অভিযানের বিবর্তন। প্রস্তাবিত সব বিষয়েরই আগে সুষ্ঠু ভূমিকা সন্নিবেশিত। সাধারণভাবে শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু এই উভয়বিধ পাঠকই যে, বর্তমান গ্রন্থটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। সঙ্কলক—নির্মলেন্দু

রায়চৌধুরী, প্রকাশক—এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) /
আনন্দধারা প্রকাশন

প্রখ্যাত লেখকের চারটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সঙ্কলিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থাবলীতে। বাংলা সাহিত্যে নতুন প্লাবন এসেছিল একদিন যাঁদের মাধ্যমে অচিন্ত্যকুমার তাঁদেরই একজন; দুঃসাহসী কলমে প্রচলিত চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি সেদিন। গ্রন্থাবলিভুক্ত 'বেদে', 'প্রচ্ছদপট' ও 'বিবাহের চেয়ে বড়' উপন্যাস তিনটি অন্তত সেই নবচেতনারই প্রতীক। 'বেদে' উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে একদিন ঝড় উঠেছিল পাঠক সমাজে, বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে ও লিখনরীতিতে এই উপন্যাস গতিকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যে দুঃসাহসী ভাবধারা এই উপন্যাসের মাধ্যমে স্বপ্রকাশ তা চমক জাগায় আজও পাঠক মননে। চলমান জীবনের এক অপূর্ব আলেখ্য এই রচনা, অন্বেষী মনের এক অনন্য দলিল। 'বিবাহের চেয়ে বড়'তে স্বামি-স্ত্রী না হয়েও নর-নারীর সহাবস্থান সম্ভবপর কি না সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে; প্রেম যে বন্ধনের মাঝে টেকে না এই সত্যই সোচ্চার

[illegible] বড়, আলোচ্য [illegible] এটাই; কাজেই এই রচনা আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিন যে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তার তাৎপর্য বোঝা যায় সহজেই। 'প্রচ্ছদ পটে' পূর্ব স্বামী সন্তান পরবর্তী দাম্পত্যজীবনে ঠিক কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তার আভাস দেওয়া হয়েছে। পুত্রবতী বিধবা তরুণী ভালবেসে বিয়ে করে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হল, তার প্রথম স্বামীর সন্তানের সঙ্গে দ্বিতীয় স্বামীর সংঘর্ষ। ভালবাসা কি কেবল বহিরঙ্গ—অন্তরঙ্গ নয়? শাঁস নিতে হবে বলে কি খোসাকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে? এই প্রশ্ন সোচ্চার আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্যমে। 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'তে একেবারে অন্য সুর, অন্য কথা। এ যেন আকাশের আরেকটি দিগন্ত। গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত নর-নারীই এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রী, আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য ও প্রাণবন্ত। লেখকের শৈলী অদ্ভুত সমৃদ্ধ, উপমার ঝলকে ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে চমৎকৃত হতে হয়, কল্পনা-বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর, ভাষার যে তিনি নিপুণ কারিগর এ কথা অনস্বীকার্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। আমরা এই সুদৃশ্য গ্রন্থাবলীর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশনায়—আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দাম—আঠারো টাকা।

রঙরুট / সান্যাল এণ্ড কোম্পানী

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় কাহিনী উপস্থাপিত। সাধারণ সৈনিক বা রিক্রুট অমল, অশিক্ষিত হাবিলদার বা জমাদারের ভাষায় রঙরুট; মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত এই যুবক দারিদ্র্যের তাড়নায় বাধ্য হল সৈন্যবিভাগে যোগ দিতে একদিন, ভারতে বৃটিশ শাসনের তখন অন্তিম অবস্থা, মণিপুরের দিক থেকে জাপান ভারত আক্রমণ করেছে সোৎসাহে,

গোলা পড়ার ভয়ে কলকাতা মহানগরীর জীবনস্রোত প্রায় রুদ্ধ। সাধারণ সৈনিক জীবনের নিদারুণ হীনতায় অনলের সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করতে চায় বার বার, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার চাপে তার মন ভেঙে পড়তে চায়। অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক যুদ্ধের বাস্তব বীভৎস দিকটার অবগুণ্ঠন মোচন করেছেন, যুদ্ধ যে মানুষকে কতটা অমানুষ করে তুলতে পারে সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে এই গ্রন্থ পাঠ করলে। একদিক দিয়ে এই রচনা রেমার্কের বিখ্যাত কাহিনী "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের-এর সঙ্গে তুলনীয়, সামরিক জীবনের আভ্যন্তরীণ রূপটি তেমনি নিখুঁত তেমনি মর্মস্পর্শী। সেই সঙ্গে পরাধীন ভারতের শেষ পর্বেরও এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এতে বিধৃত, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিই শুধু নয়, সমকালীন মানসিকতাও সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই কাহিনীর ছত্রে ছত্রে। লেখকের দরদ ও আন্তরিকতায় রচনাটি প্রাণধর্মী হয়ে উঠতে পেরেছে এবং শিল্পোত্তীর্ণও। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—নরেন বসু, প্রকাশক—সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

বলিভিয়া / আনন্দধারা প্রকাশন

কিউবার বিপ্লব-নায়ক চে গুয়েভারাকে কেন্দ্র করে বলিভিয়া তথা ল্যাটিন আমেরিকার সমগ্র বিপ্লব-চেতনাকে রূপায়িত করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। ল্যাটিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আজও চলেছে ক্ষমাহীন সংগ্রাম, সে সংগ্রাম শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, সে সংগ্রাম নিপীড়িত মানবতার বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের প্রবলতম প্রতিবাদ। আর এই পটভূমিতে কুশলী লেখকের কলমের টানে টানে সমুজ্জ্বল হয়ে উপস্থিত চে গুয়েভারা, আদর্শ বিপ্লবী, মানবতার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। লেখক স্বয়ং রাজনীতিজ্ঞ, খ্যাত সাংবাদিক, বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই সংগ্রামকে তিনি নিজের চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, আর সেই উপলব্ধিই ছড়িয়ে দিয়েছেন আলোচ্য রচনার ছত্রে ছত্রে। ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তাৎপর্যও অনেকটাই বোধগম্য হয়, বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করলে। বিপ্লবী-নায়ক চে গুয়েভারার বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, অনমনীয় মনোবল, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে পাঠক মননে, মনে হয় কাল্পনিক কোন মহৎ চরিত্রকেই বুঝিবা মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। মানবতার পূজারী এই বীর বিপ্লবীর করুণ উপসংহারও তাই সহজেই বেদনাম্বিত করে তোলে পাঠক অন্তরকে। মনে হয় চে যেন সত্যই এই পৃথিবীর মানুষ ছিলেন না, তিনি রূপকথার দেশ থেকেই নেমে এসেছিলেন একদিন আবার লীলা শেষে সেখানেই ফিরে গেছেন। উপন্যাসের চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই তথ্য কাহিনীটি পাঠ করে আমরা প্রভূত আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—গৌরীশ সেন, প্রকাশনা—আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—বারো টাকা।

কাল সন্ধ্যা / আনন্দ পাবলিশার্স

পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাব্যনাট্যটি সত্যই অভিনব। মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র উপস্থাপন করে কবি জীবনের শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সব কর্মেই আছে ছেদ, সব চলারই শেষ হয় একদিন, শুধু থাকে কালের অবিনাশী স্বাক্ষর, স্বয়ং ভগবানও এই নিয়মের বহির্ভূত নন। তাই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেও লীলা সাঙ্গ করে চির বিশ্রাম নিতে হয়েছিল একদিন। কবির রচনা-শৈলী অনবদ্য, স্থানে স্থানে রবীন্দ্র কাব্যধারার অনুসারী, কিন্তু তিনি বলিষ্ঠ হাতেই লেখনী ধারণ করেন আর সেজন্যই সে অনুসরণ সার্থক ও সফল। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। কবি—বুদ্ধদেব বসু, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

রমণ্যাণ বীক্ষ্য (অভ্র পর্ব) /
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং

স্বভাব-যাযাবর লেখক ইতিপূর্বে এই একই নামে কয়েকটি উপন্যাস-রসাশ্রিত ভ্রমণ কাহিনী উপহার দিয়েছেন বাঙালী পাঠককে; আলোচ্য গ্রন্থটিও তারই ধারাবাহী। এই রচনায় লেখকের দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র প্রদেশে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে লেখক শুধু দেশই দেখেন নি দেখেছেন মানুষকেও, শুধু ভ্রমণ সাথীই নয় নতুন দেশের নতুন মানুষও তাঁর অন্তরে স্থান করে নিয়েছে অতি সহজে, অন্ধ্রের অপরূপ ভাস্কর্যমণ্ডিত দেবমন্দিরগুলির দর্শনানন্দের পাশাপাশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাই সাধারণ কয়েকটি মানুষকে চেনবার ও জানবার আনন্দ। হৃদয়ের মধ্যে এক মনোরম ও স্নিগ্ধ প্রবণতাকে বহন করে লেখক ভ্রমণে বেরিয়েছেন এবং তারই ছোঁয়ায় তাঁর দর্শন সার্থক, উপলব্ধি সফলতার মর্যাদামণ্ডিত। ভ্রমণসঙ্গিনী স্বাতীর সঙ্গে তাঁর যে সহজ মধুর সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছে তার লালিত্যে মুগ্ধ হয় মন। এইখানেই বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা এমন ভাবে মিশে গেছে যে, দুটোকে আলাদা করে দেখতে রাজী হয় না পাঠকের মন এবং এজন্যই লেখককে রোমাণ্টিক আখ্যা দিতে ইচ্ছা হয়। লেখকের ভাষা স্বচ্ছন্দ, ভঙ্গী পরিশীলিত। বইটি পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক—এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ দাম—নয় টাকা মাত্র।

ক্যালিকট থেকে পলাশী / শিশু সাহিত্য সংসদ

১৪৯৮ খৃস্টাব্দের শকেরই অসাফট ভারত শতবর্ষব্যাপী পরাধীনতার শৃংখল খুলে মুক্ত হয়ে দাঁড়াল দুনিয়ার সামনে : এ স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রীয় নয়, যুগ-যুগান্তের পর নতুন মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র জাতির উত্তরণ। এই উত্তরণের পেছনে যে ইতিহাস রয়ে গেছে তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে, সবই বৃথা হয়ে যাবে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই প্রচেষ্টাই করেছেন। এই গ্রন্থে লেখক যে পটভূমি ব্যবহার করেছেন তা ব্যাপক, মধ্যযুগে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতিগুলি ঐশ্বর্যের লোভে প্রাচ্যে প্রথম অভিযান সুরু করে বাণিজ্যিক সাফল্যের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে দেশের পর দেশের রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়ে কিভাবে শাসক ও শোষকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে তার প্রামাণ্য ছবি এঁকেছেন লেখক তথ্যনিষ্ঠভাবে। স্বভাবতই ইংরেজ ও বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষ প্রাধান্য পেয়েছে এই রচনায়। কালিকট থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাবিবরণী-স্বরূপ গণ্য হওয়ার যোগ্য এই রচনা। আমরা গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ, লেখক—শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৮, দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

[illegible] / গ্রন্থবিকাশ

চার অংকে সমাপ্ত এই নাটকে, লেখক আধুনিক যুগযন্ত্রণায় নিপীড়িত কয়েকটি মানুষের ছবি আঁকতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন এ যুগের সর্বোত্তম শক্তিকে—যার অভিশাপে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারছে না। যার প্রভাবে দাম্পত্য জীবন, ঘরসংসার, সুখশান্তি সবই ধ্বংস হতে বসেছে, যার নাম টাকা—কালো টাকা। রাশি রাশি টাকা কামাতে কামাতে নেশায় নিমগ্নপ্রায় মানুষের বিরুদ্ধে অভিযান এনেছেন বিখ্যাত আর্টিস্ট ও শিল্পী চ্যাটার্জী, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষেরই দরবারে অভিযোগ তাঁর। কাহিনীতে নাটকীয়তার অভাব নেই, সাসপেন্সও যথেষ্ট। লেখকের শৈলী অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দীপক চৌধুরী, প্রকাশক—গ্রন্থবিকাশ, ২২।১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বোধোদয় / আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:

মানুষের আসল পরিচয় মনুষ্যত্বে এবং এই মনুষ্যত্ব যে মরেও মরে না, বর্তমান কাহিনীর সেটাই মূল বক্তব্য। ভোগসুখপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী অনির্বাণ চাটুজ্যে জীবনের পথে চলেছিল হাল্কা-ছন্দে, নারীমাংস ভোগে তার রুচি অসাধারণ, সব ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধেই তার তৃষ্ণা অপার, নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাটাকেই জেনেছিল সে জীবনের চরম ও পরম কাম্য বলে, তবু তো শেষরক্ষা হল না ; মানুষের বুকের মধ্যে বাসা করে থাকে যে বিবেক তার অনুশাসন থেকে তো নিষ্কৃতি পেল না সে শেষপর্যন্ত। ধ্বংসোন্মুখ জলন্ত বিমান থেকে সহযাত্রী কুমারকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিল অনির্বাণ। মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত অতি গভীরে, উত্তরাধিকার কথাটিও বুঝি নিগূঢ় অর্থবহ, না হলে একাজ করতে গেল কেন অনির্বাণ? বাল্য থেকে যৌবনের অপরাহ্ণ অবধিই তো তার কেটেছে আত্মসুখের সন্ধানে, তবে কেন গেল সে নিজের জীবন বিপন্ন করে অপরকে বাঁচাতে? এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন লেখক কাহিনীর শেষ পর্যায়ে—মনুষ্যত্ব কখনও মরে না এবং মহত্ত্বের উত্তরাধিকার কখনও বৃথা হয়ে যায় না। সব আবিলতা সব ভয়কে জয় করেও তাই শেষ মুহূর্তে প্রমাণ করে গেল অনির্বাণ যে সে তার মহৎ পিতারই যোগ্য সন্তান। লেখকের স্নিগ্ধ শৈলী কাহিনীর আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে, আমরা বইটি পড়ে খুশী হয়েছি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শঙ্কর, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

স্বাধীনতার অগ্রদূত / পাবলিকেশন্‌স্ ডিভিশন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সংস্থাপিত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের রৌপ্যজয়ন্তী বা সিলভার জুবিলী উপলক্ষে আলোচ্য পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। আজাদ হিন্দ সরকার পরাধীন ভারতের স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নের প্রথম বাস্তব ফসল, আজ আর এর কোন অস্তিত্ব বা প্রয়োজন না থাকলেও একদিন ছিল। সেদিন ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে আপামর ভারতবাসীই উদগ্র আগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল এই প্রথম জাতীয় সরকারের অঙ্কুরটুকুকে। এর ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রয়োজনও সহজেই অনুমেয়, আলোচ্য কথিকায় সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। নেতাজীর জীবন ও কর্মধারারও একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে বিধৃত, তাতে রচনাটির মূল্য আরও বেড়ে গেছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনায়—পাবলিকেশন্‌স্ ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব্ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং, গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।

যৌবন নিকুঞ্জে / বেঙ্গল পাবলিশার্স

সাংবাদিক লেখক সাংবাদিকতার সঙ্গে পাক করেই উপভোগ্য এক কাহিনী পরিবেশন করেছেন। কাহিনীর পটভূমিতে বিস্তৃত রাজধানী দিল্লী, শুধু ঐতিহাসিক দিল্লী নয় আজকের রাজনীতিপ্লাবিত স্বাধীন ভারত বা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ানের শ্রেষ্ঠতম নগরী নয়া দেশাত্মবোধের নয়া আঁতুড় ঘর নয়াদিল্লী। লেখকের বলার ভঙ্গীটি ভাল, অল্পায়াসেই তিনি বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। চরিত্রসৃষ্টিও নিপুণ হাতেই করা হয়েছে। মিসেস বাজপেয়ী,

মমতা চৌধুরী, সদানন্দ, আরতিদি, ডাক্তার অরবিন্দ সরকার প্রভৃতি সব ক'টি চরিত্রই বিশ্বাস্য হয়ে ফুটে উঠেছে, মানবিকতা বোধ ও দরদ এই কাহিনীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নিমাই ভট্টাচার্য, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা।

জায়গা আছে / অমর সাহিত্য প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থে দুটি বড় গল্প সংকলন করা হয়েছে। লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানবিক আবেদনে দুটি রচনাই সমৃদ্ধ। প্রথম গল্প 'জায়গা আছে'। এক বঞ্চিতা নিপীড়িতা নারীর অন্ধকার থেকে আলোর উত্তীর্ণ হওয়ার বেদনামধুর কাহিনী। পেটের দায়ে রিফিউজী মেয়েকে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল পথে, পুরুষের দেহক্ষুধার ইন্ধন হয়ে বাঁচার পথ আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিল সে, নারীমনের সহজাত আকাঙক্ষা কিন্তু মরেও মরে না, তাই রিফিউজী মেয়ে মীনাও স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধার: পণ্য করে তোমায় পরিবর্তে সেখানকার প্রদীপ করে তুলে ধরার কামনায় দোদুল-চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মন। বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের ধারায় ভেসে মীনা একদিন সত্যিই পেল ঘর, পেল সেই পুরুষকে কামের বদলে প্রেম দিয়ে যে তাকে ডেকে নিয়ে গেল জীবনের পথে। অপর গল্প 'অভিযোগ না অভিনয়' আর একটি ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী, লেখকের দরদ ও আন্তরিকতায় যা নাকি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। লেখকের স্নিগ্ধ ও সাবলীল শৈলী কাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধিকর। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—জরাসন্ধ। প্রকাশনায়—অমর সাহিত্য প্রকাশন। ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

ঘুড়ি

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্যসংগ্রহ। কবির তরুণ বয়সে লেখা বেশ কয়েকটি কবিতা একত্রিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। কিশোর-কবির কল্পনা ঘুড়ির মতই নভোসঞ্চারী অন্তত আলোচ্য কবিতাগুলি পড়লে সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। কবির তাজা এক মনোরম স্নিগ্ধতা বর্তমান, হালকা ভাবের পাল তুলে, সহজ শৈলীর অনুকূল ছন্দের ছোঁয়ায় কবিতাগুলি যেন তরতর করে বেয়ে যাওয়া ছোট ছোট তরী। পড়তে ভাল লাগে এটাই এগুলির পক্ষে সবচেয়ে বড় বলবার মত কথা। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি, লেখক—জয়ন্তকুমার মিত্র, প্রকাশক—সাধনকৃষ্ণ দেব, ৩৬, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা দাম—দু টাকা।

একটি গাছ একশ ফুল / নবজাতক প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্যসঙ্কলন। মোট ষাটটি কবিতা স্থান পেয়েছে এতে। কবির কল্পনায় সৌন্দর্যের আভাস আছে, তাঁর ছন্দজ্ঞানও প্রশংসনীয়। জাতে আধুনিক হলেও কবিতাগুলি সুপাঠ্য। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—দুর্গাদাস সরকার, প্রকাশনায়—নবজাতক প্রকাশন ৬, এ্যাণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম

রাধামোহন মহান্ত

মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো, আমি স্বপ্ন
দেখছিলাম—রামা কৈবর্ত, সোমাই মারাডি আর
ইমান হোসেনের চোখে: ক্ষেতে ক্ষেতে সোনালি
ফসলের হাসি, ছেলেমেয়েগুলো পাঠশালার মাঠে
ছুটোছুটি করছে, পুকুরে পুকুরে মাছ আর হাঁসের
রুপোলি বৃষ্টি. ভারতের মাটিতে তাল তাল সোনা!

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম...মাঝরাতে আমার ঘুম
ভেঙে গেলো! একটা জাতির শিয়রে ভয়ানক দুঃস্বপ্নের
নহবৎ বেজে চলেছে...নিশির ডাকে মন্ত্রাবিষ্টের মতো
ছুটে চলেছি আমরা সবাই: নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!
ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন বাগান...সব মানুষই সাপ—
তীক্ষ্ন ঘ্রাণশক্তি; বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় পাওয়া যদিও,
আসলে এটা সব মানুষেরই জানা: মানুষ—
সভ্যমানুষের পোষাকের আড়ালে মুখ্যত পশু;
ইচ্ছাগুলো এতোকাল অর্গলে আটকা পড়েছিল, এবার
সোজাসুজি সদর দরজা ভেঙে ছড়িয়ে হলো বিশ্বময়!

মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো—আগ্নেয়-বোমা
ফাটার শব্দ...কাঁদানে গ্যাস...দিকে দিকে আগুন জ্বলছে,
তবু—
যোজন যোজন ব্যাপী আঁধার, মনের পাওয়ার-হাউজগুলো
সব
বিকল হয়ে গেছে...মূল্যবোধের মূল শুকিয়ে কাঠ!
বায়োলজির ল্যাবরেটারীতে ফুলগুলো সব মাংসপিণ্ড
ব্যবচ্ছেদে বুর্জোয়া-কৃষ্টির ললিত-রাগ দলিত; ক্ষুধার্ত
বুলভগের উল্লাস! বিপ্লবের পথ বাঁধা হয়......ধাপে ধাপে
স্বর্গ...বৈপ্লবিক চিন্তার কী অপরিসীম মেহনত...

যমের দুরমুষ—সব সমান!...বুকের কাছে তখনো
টপ্‌টপানি,
তবু, একটা জাতির শিয়রে দুঃস্বপ্নের নহবৎ বেজে
চলেছে!...
শীতলে স্বপ্নের ঘুম ভেঙে গেলো. পাশ ফিরে আবার
ঘুমোই!

বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রায়ই করেন: প্রাক্‌বিবাহ বা সদ্যবিবাহিত পর্বর প্রগাঢ় অনুরাগ তাদের আর নেই। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যৌন অনুরাগে ভাঁটার প্রধান কারণ নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায়: অফলদায়ী কলা-কৌশল, ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কোভজ সমস্যা আর দৈহিক অসুখ-বিসুখ।

ভালবাসারও সময়-অসময় আছে। স্বামী হয়ত এমন সময় মিলিত হতে চাইলেন, যখন স্ত্রী কোনও সাংসারিক কাজে ব্যস্ত, কিংবা কোথাও যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তার পক্ষে স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা করা এ-ক্ষেত্রে সম্ভব কি? ফলত স্বামী আর এ-ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করতে অনিচ্ছুক হন, উপেক্ষিত হবার আশঙ্কায় বা বিরক্তিবশত। স্ত্রীরও সময়-স্থান থাকা দরকার। ব্যস্ত বা ক্লান্ত স্বামীকে বিশেষ কারণ না থাকলে ব্যস্তত্র বা ক্লান্ততর না করাই বাঞ্ছনীয়।

বিয়ের পর স্ত্রীবর্গ সাধারণত উদাসীন হয়ে যান। বিয়ের আগে বা বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক পর্বে যাঁরা ছিমছাম—অনুরাগী ছিলেন, হয় স্বামী বা স্বামীদের ঘিরে রাখতেন ভালবাসায়; পরে তাঁরাই অমনোযোগী, অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে স্বামীদের কাছে নিজেদের আকর্ষণ কমিয়ে ফেলেন। অমনোযোগী স্বামীরাও স্ত্রীদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ না দেওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর হার্দিক উষ্ণতা কমতে থাকে পর্যায়ক্রমে। এর পরিণতি কোনও কোনও ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃখজনক।

কখনও কখনও স্ত্রীর বিশ্বাসের মধ্যে পারস্পরিক শীতলতার কারণ খুঁজতে হয়:

খব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা ভাবতে পারেন কেবলমাত্র সন্তান কামনা থাকলেই স্বামীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। ফলত, অন্য যে-কোন সময় এ-ব্যাপারে তিনি বিড়ম্বিত বোধ করেন, একটা অপরাধ-বোধ গড়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ (জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নয়) পাপ মনে হলে সন্তানভয়ে ভীতা স্ত্রী স্বামীর যৌনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে অক্ষম হন। স্বামী সে-ক্ষেত্রে বিস্মিত। এই বিস্ময় তিক্ততায় পর্যবসিত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে, ধরিয়েছেও বহু ক্ষেত্রে। অহং বড় ভীষণ বস্তু। কেবল অহংবোধের তৃপ্তির জন্যও স্বামীর পক্ষে এ-ক্ষেত্রে অন্যত্র যৌনতৃপ্তি লাভের চেষ্টা অসম্ভব নয়।

কুসংস্কারও রয়েছে। পরুম-পরম্পরায় অনেক মহিলা জানেন—মিলনের পক্ষে কেবলমাত্র একটা বিশেষ আসনই 'ঠিক', অন্য যে-কোনও আসন অবলম্বন করা 'পাপ'। মিলন-কালে আলো থাকা অন্যায় ইত্যাদি ভিত্তিহীন এবং চরম অ-বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারও কারও কারও থাকে।

সংস্কোভজ কারণও অনেক মর্মান্তিক দাম্পত্য কলহের মূলে সক্রিয়। স্পষ্টতই বোঝা যায় স্বামী বা স্ত্রীর সংস্কোভ-জীবনে উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি থাকলে তা বিবাহিত-জীবনে শান্তির প্রতিবন্ধক হতে বাধ্য। যেমন, স্বামী অন্য নারীদের প্রতি মনোযোগী না-হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী সন্দেহবাতিক-বশত তাঁকে ওই রকম মনে করলে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি চিড় খায়; ভালবাসার জোয়ারে এইভাবে ধরে ভাঁটার অবাঞ্ছিত টান। স্বামীর যৌন-শিক্ষা যথাযথ না হলেও রীতিমত অসুবিধা হয়। স্বামী যদি মনে করেন স্ত্রী দেবী মনষ্যাতের প্রাণী, তাহলে মিলিত জীবনে সত্যিকার মিলন আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হয়।

স্বামী বা স্ত্রী যৌন-মিলনের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে হলে মানব-জীবনের এই গাঢ়তম ও মধুরতম আনন্দমুহূর্ত নিছক যান্ত্রিকতায় ক্লান্তিবহ হয়ে উঠতে পারে।

স্বামী বা স্ত্রীর 'কুচৈষণা' থাকলে দাম্পত্য-জীবন সুখকর হতে পারে না।

নিজের কোনও ত্রুটি বা অপরাধ-বোধ জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ক্ষেত্রে অদ্ভুত অবস্থা।

গর্ভভীতি বা পারস্পরিক মানসিক আদান-প্রদানের অভাবও বিবাহিত জীবনে অশান্তির উল্লেখ্য কারণ। এর ফলে স্বামীর পক্ষে শেষ পর্যন্ত পরনারীর প্রতি আসক্তি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়।

দৈহিক ত্রুটিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। যদিচ মানসিক সমস্যার তুলনায় দৈহিক ত্রুটিজাত সমস্যা সংখ্যায় অল্প এবং এর নিরাময়ও তুলনায় অনেক সহজসাধ্য। শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে উভয়েরই অত্যন্ত বিবেচক হওয়া প্রয়োজন।

ক্লান্তি স্বভাবতই ভালবাসার শত্রু। দেহ সুস্থ এবং সতেজ না থাকলে ভালবাসা সম্ভব নয়। ক্লান্ত হলে তাই উচিত প্রফুল্লকর আলাপ-আলোচনা করা বা উভয়ের পক্ষে রুচিকর গান শোনা। হাল্কা বই পড়াও চলতে পারে। ক্লান্ত অবস্থায় যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনরকম চেষ্টা অবাঞ্ছনীয়। দেখা যাচ্ছে দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি আসতে পারে নানা কারণে। এর অধিকাংশই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য। বস্তুত এইটিই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সূচনা। এরপর সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং প্রতিকারের চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞর কাছে যাওয়া যেতে পারে। মনে রাখা দরকার স্বামী-স্ত্রীর সহজ এবং অনাড়ম্বর সম্পর্কই দাম্পত্য-জীবনকে প্রকৃত সুখদ।

গর্ভকালে মিলন

শিশু জন্মগ্রহণের অনেক আগেই গর্ভাবস্থা দম্পতির যৌনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত গর্ভসঞ্চারের ক্ষণ থেকেই স্ত্রী নিজের বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন।

অজাত শিশুর মঙ্গলচিন্তাই তখন ভাবী-মায়ের কাছে প্রধান বিষয়। এ সময় নিজের যৌনজীবন সম্পর্কে চিন্তা-দুশ্চিন্তাও এড়ানো যায় না, অজাত শিশুকে আহত করার বিপদ কি? এ সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার সাহস তাঁর হতে না-হতে স্বামীও এ নিয়ে ভাবতে সুরু করেন।

নবপরিণীত তরুণ-তরুণী বা যাঁদের প্রথম সন্তান হতে যাচ্ছে, তাঁরা পরস্পরের যৌনজীবন সংক্রান্ত সব খবর খুঁটিয়ে জানতে ইচ্ছুক হন। খবর আসে: অধিকাংশই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বক্তব্য, প্রকৃত তথ্য যে একেবারে থাকে না, তা নয়। খবর দেয় বন্ধুবান্ধব এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাজার চলতি যেনো অ-বৈজ্ঞানিক যৌনগ্রন্থ নামধেয় পর্নোগ্রাফি। মেয়েরা এ ব্যাপারে অধিকতর সৌভাগ্যবতী। কেন না, তাদের বান্ধবী বা গুরুজনরা ঢের বেশি সহানুভূতি এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্য-ভিত্তিক আলোচনাই একমাত্র অবলম্ব্য।

'অ্যাম্‌নিওটিক' তরলে ভাসমান ভ্রূণ গর্ভে সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণকারী ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। তা ছাড়া গর্ভাবস্থায় নাছোড় 'মিউকাস্ প্লাগ্' 'সার্‌ভিক্যাল ক্যানাল্' ভর্তি ক'রে রাখায় ভ্রূণ 'ভ্যাজিনা' থেকে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত বিপন্মুক্ত। এবং তারও পরে 'সার্‌ভিক্স্'-এর বাড়তি একটা তরল বাধা তৈরি থাকায় ভ্রূণ-বিপদের সম্ভাবনা নেই বললেই হয়।

কাজেই গর্ভে অবস্থানকালে পিতা-মাতার যৌন মিলনের ফলে ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে যে-সব গালগল্প প্রচলিত, সেগুলো ভুল। কোনও রকমেই যৌনমিলন গর্ভস্থ ভ্রূণের মানসিক বা দৈহিক কোনও ক্ষতি সোজাসুজি করতে পারে না।

যৌন মিলনের ফলে ভ্রূণ নার্‌ভাস হয় না; তার আঙ্গিক বিকৃতিও ঘটে না। তার দেহ, মেজাজ বা বুদ্ধিকে প্রভাবান্বিত করাও সম্ভব নয়। 'ভ্যাজিনার' মধ্য দিয়ে কোন কিছুই ভ্রূণকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। খুব জোরের সঙ্গে এই মত প্রচারিত।

তাহলে গর্ভিণী নারীর যৌন মিলনে সম্ভাব্য বিপদ কি কি? চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে প্রথমেই ভয় জাগে গর্ভপাতের। যুগ যুগ ধরে একটি ধারণা প্রচলিত এই মর্মে যে, স্বামীর দেহভার বা আলিঙ্গনের চাপ অজাত শিশুর ক্ষতি করতে পারে।

আধুনিক জন্মতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন—মা'র শরীরের ওপর ভীষণ ঝাঁকুনি, চাপ ইত্যাদি থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করার প্রায় নিখুঁত পদ্ধতি প্রকৃতি তৈরি ক'রে রেখেছে। যে তরলের মধ্যে ভ্রূণ ভাসে তা-ই তাকে রক্ষা করে আকস্মিক ধাক্কা, পতন, ঝাঁকুনি বা চাপের হাত থেকে। এইসব তৎক্ষণি ভ্রূণের চারপাশের তরলে চারিয়ে যাওয়ায় তার আহত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

পতনের চেয়ে বেশি চাপ সৃষ্টিকারী যৌন-আলিঙ্গন হয় কি? তবুও অসংখ্য গর্ভিণী শেষের দিকে পতনের ধাক্কা সামলে নেন, ভ্রূণ আহত হয় না, গর্ভপাতও হয় না।

'একেবারে শেষের দিকে' বলতে ঠিক কোন্ সময় বোঝাচ্ছে? কোন্ সময় থেকে যৌনমিলন কমানো বা বন্ধ করা উচিত?

বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন দিনক্ষণ নির্ধারণের পক্ষপাতী, গর্ভপাত বা ঐ জাতীয় কোন বিপদ আগে ঘটে থাকলে গর্ভসঞ্চার হওয়া-মাত্র যৌনমিলন বন্ধ করা প্রয়োজন হতে পারে। অত্যল্প ক্ষেত্রেই এমনটা দরকার হয়।

প্রথম চারমাস অনেক বিশেষজ্ঞ মিলিত হতে নিষেধ করেন। এটি রক্ষণশীল মতামত। কেবল বিশেষ-ক্ষেত্রে' প্রযোজ্য।

মোটামুটি সুস্থ গর্ভিণীর পক্ষে সাধারণত এত কড়াকড়ি অপ্রয়োজনীয়। সপ্তম মাস শেষ হওয়ার আগে অধিকাংশ গর্ভিণীরই যৌন-মিলনে ব্রতী হওয়া বিপজ্জনক নয়। তবে সাধারণভাবে সাবধানতা ভাল।

স্ত্রীর তলপেটে যদি বেশি চাপ না পড়ে, সে ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা সপ্তম মাসের শেষ পর্যন্ত যৌন মিলনে আপত্তি জানান না। এই সময় তাঁরা যৌনমিলন বন্ধ করতে উপদেশ দেন।

বিশেষ ক্ষেত্রে আরও এক সপ্তাহ বা দিন দশেক মিলনকাল বাড়ানো গেলেও অষ্টম মাসের মাঝামাঝি থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিত মিলনে ব্রতী না হওয়া।

এই সময় থেকে স্বামীর উচিত স্ত্রীকে শান্তভাবে আদর ক'রে তৃপ্তি দেওয়া। এ তৃপ্তি যতটা দৈহিক, তার চেয়েও বেশি মানসিক। পারস্পরিক আনুগত্য এবং ভালবাসা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই সময়টা অত্যন্ত উপযোগী।

—[illegible]

মানসিক রোগ

রমণীমোহন সিংহরায়

মানসিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ও সমাজের চেতনা খুব কম। অনেকেই মনে করেন যে, মানসিক রোগীমাত্রেই উত্তেজিত ও উন্মত্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু মানসিক রোগ বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং সে প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

মানসিক রোগ সম্বন্ধে এই বিরূপ মনোভাবের কারণ হিসাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, শারীরিক রোগে দৈহিক পরিবর্তন সকলের নজরে পড়ে কিন্তু মানসিক রোগে তাহা লক্ষণীয় নহে। শারীরিক রোগ যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি, আমাশয়, ঘা, ফোড়া ইত্যাদির সহিত সাধারণের যথেষ্ট পরিচয় আছে এবং পীড়িত ব্যক্তির প্রতি সকলে সহানুভূতিসম্পন্ন।

আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব সকলেই রোগীর চিকিৎসার ও আরোগ্যের জন্য যথেষ্ট তৎপর হন। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ও পথ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সকলে যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। কিন্তু মানসিক রোগীর প্রতি আমাদের অনেকের এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী অন্য রকমের। মানসিক রোগকে মনের অসুস্থতা বলে মানতে পারি না। অনেকের ধারণা ব্যক্তিবিশেষের কোন রোগ বা মানসিক বিকৃতি হয়নি এবং অস্বাভাবিক ব্যবহার রোগীর দুষ্টামী বা ইচ্ছাকৃত। সেই কারণে মানসিক রোগীর চিকিৎসার জন্য সকলে উদ্যোগী হন না।

এই প্রকার বিরূপ মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দৈহিক রোগে রোগীর অনেকক্ষেত্রে তার দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন যদি কেহ বলে জ্বর হয়েছে তাহলে গায়ে হাত দিলেই বোঝা যায় দেহের উত্তাপ বেশী এবং থার্মোমিটারে উত্তাপ বৃদ্ধির সঠিক মাত্রা ধরা পড়ে। কিম্বা যদি কেহ বলে কাশি হয়েছে তাহলে দেখা যায় রোগী কাশছে এবং হয়ত কফ বার হচ্ছে। অন্যান্য রোগেও শারীরিক বিকৃতি লক্ষণীয়। সেইজন্যে সকলেই শারীরিক রোগকে সহজে স্বীকার করেন এবং তার চিকিৎসার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে প্রায়ই সেটা প্রযোজ্য নয়। হঠাৎ কোন ব্যক্তি যদি বলে যে সে 'মা-কালীকে' তার সামনে দেখছে, বা মা-কালীর আদেশ শুনতে পাচ্ছে বা অপরে তার খাবারে বিষ মেশাচ্ছে বা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবার ষড়যন্ত্র করছে তাহলে তার আত্মীয়-স্বজন বা অপরে সেগুলির চাক্ষুষ প্রমাণাভাবে প্রথমত সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। মনে করেন ওটা ব্যক্তিবিশেষের মনের ভুল এবং ঠাণ্ডা তেল বা সরবতের ব্যবস্থা বা যুক্তির দ্বারা ধারণা লুপ্ত হবে। ঐ লক্ষণগুলি যে মানসিক রোগের পরিচয় সেটা অনেকেই মেনে নিতে পারেন না।

উপরন্তু যেহেতু অনেক সময়েই রোগী দেবদর্শনের বা দৈববাণীর কথা বলে সেইজন্য ধারণা হয় যে, রোগীর দেহে দেবতা বা অপদেবতা ভর করেছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় রোজা বা পুরোহিতের মাধ্যমে মাদুলী, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির সাহায্যে।

অনেকে বলবেন যে মন্ত্র, তাবিচ, মাদুলী ইত্যাদির সাহায্যে অনেক মানসিক রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। এদিকেও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অনেক সময়ে সর্দি-কাশি বা অন্যান্য রোগও কোন চিকিৎসা ব্যতীত আরাম হয়। কারণ রোগমুক্তির জন্য রোগীর প্রাণশক্তি ও স্বভাব (নেচার) সকল সময়ে চেষ্টা করে, ওষুধ বা অন্যান্য চিকিৎসাপ্রণালী আরোগ্য লাভের পথে সহায়ক মাত্র। যদি রোগীর প্রাণশক্তি না থাকে তাহলে বহুমূল্য ঔষধাদির দ্বারাও রোগমুক্তি সম্ভবপর নয়। তেমনি মানসিক রোগীর ক্ষেত্রেও আপনা আপনি হঠাৎ রোগমুক্তি সম্ভবপর এবং ঐসব ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক, পূজার্চা ইত্যাদি কাকতালীয়বৎ রোগমুক্তি উপায় হিসাবে গণ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াগুলি সম্মোহনী চিকিৎসা বা সাজেশেটিভ থেরাপী বলে ধরা যেতে পারে।

মানসিক রোগকে অস্বীকার করার অপর কারণ সামাজিক ও আইনগত প্রতিবন্ধক। মানসিক রোগী বা পরিবারের পুত্র-কন্যার বিবাহাদি ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সেইজন্য অনেক সময়ে আত্মীয়-স্বজনেরা মানসিক রোগের কথা গোপন করেন ও চিকিৎসার জন্য খোলাখুলি ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন না। সমাজের চোখে মানসিক রোগকে মনের অসুস্থতা বলে সহজভাবে দেখা হয় না।

এমন কি আরোগ্যোত্তর মানসিক রোগীকে কেমন যেন একটা সন্দেহের চোখে দেখা হয়। এবং তাকে অপর সাধারণ লোকের মতন ভাবা হয় না।

অনেক সময়ে তার সামনেই সমালোচনা করা হয় যে, এই লোকটি পাগল হয়েছিল। ইহাতে সেই রোগমুক্ত ব্যক্তির আত্মমর্যাদায় কত আঘাত লাগে তা সকলে ভেবে দেখি না। ব্যক্তিবিশেষের মানসিক রোগ পুনরাক্রমণের রোধের জন্য সামাজিক ও আন্তঃজন (ইণ্টার-

) সম্বন্ধের উন্নতি বিধান প্রয়োজন। আইনগত প্রতিবন্ধক হচ্ছে পাগল প্রমাণিত হলে বিষয়-সম্পত্তিতে ভোগ দখলের বিঘ্ন ঘটবে। উপরন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকমতে মানসিক হাসপাতালে ভর্তির জন্য 'সার্টিফিকেট' প্রয়োজন।

কেবলমাত্র যে সাধারণ লোকদেরই মানসিক রোগ সম্বন্ধে এইরূপ ধ্যান-ধারণা তা ঠিক নয়। অনেক চিকিৎসকের ধারণাও ওই একপ্রকার এবং কারণও হচ্ছে মানসিক রোগীর মধ্যে কোন স্থূল পরিবর্তন তাদের উপলব্ধি হয় না। যখন কোন রোগী সর্দি-কাশী ও বুকে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসেন তখন ডাক্তারবাবু রোগীর দেহের তাপ, নাড়ীর গতি ও স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিতে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন। স্টেথিস্কোপের সাহায্যে ছাতি পরীক্ষার দ্বারা বুকের মধ্যে কফের সন্ধান পান। প্রয়োজনবোধে রক্ত, কফ ইত্যাদির অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে রোগ নির্ণয় চূড়ান্তভাবে করেন।

তাঁদের ধারণা দৈহিক পরিবর্তন ব্যতীত রোগীর রোগভোগ সম্ভব নয়। মানসিক রোগে সচরাচর দৈহিক পরিবর্তন ঘটে না এবং এইজন্য চিকিৎসকের পক্ষে মানসিক রোগীকে রোগী বলে স্বীকার করতে পারেন না।

তাঁরা রোগীকে বলেন—'ও কিছু না, মনের জোর কর সব সেরে যাবে' বা 'বিবাহ করলে' বা 'কাজে নিযুক্ত হলে' বা 'বায়ু পরিবর্তন করলে' সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি কোন দৈহিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে—যেমন টাইফয়েড রোগীকে বলা হয় যে তুমি রোগ ঝেড়ে ফেলে দাও তাহলে কি তার পক্ষে রোগমুক্তি সম্ভব? যদি শারীরিক রোগ উপেক্ষার দ্বারা আরোগ্যলাভ সম্ভবপর না হয় তাহলে সেই ব্যবস্থায় মানসিক রোগীকেও রোগ মুক্তিতে সাহায্য করতে পারে না।

শারীরিক রোগে যেমন ওষুধ, সেবা-শুশ্রূষার ও পথ্যাপথ্যের সাহায্যে রোগমুক্তির ব্যবস্থা করা হয় সেইরকম মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও করা উচিত। শুধু উপদেশ বা তাচ্ছিল্যের দ্বারা মানসিক রোগের প্রতিকার করা যায় না। যখন চিকিৎসকেরা মানসিক রোগকে মনের অসুস্থতা বলে মেনে নেবেন তখনই চিকিৎসার উপর তাঁরা গুরুত্ব দেবেন এবং জনসাধারণের মনে মানসিক রোগ ও তার আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসার উপর আস্থা জাগবে।

সবচেয়ে উঁচু বসতবাড়ী

তেতারিশ মিলিয়ান মার্ক খরচ করে রাইন নদীর তীরে তেতাল্লিশ তলা যে বাড়ীটা উঠছে সেটাই হবে ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু বসতবাড়ী। এই বাড়ীতে মোট তিনশ' চল্লিশটি আলাদা আলাদা ফ্ল্যাট থাকবে। একেবারে নীচের তলায় থাকবে রেস্তোরাঁ আর বাড়ীর ছাদে থাকবে কফি হাউস। কফিতে চুমুক দিতে দিতে চারদিকের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া খেলা-ধুলা, ব্যায়ামশালা, সুইমিং পুল, বাচ্চাদের স্কুল, যাবতীয় দরকারী জিনিষের দোকান—সব এই বাড়ীর মধ্যে ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৭১ সালের মধ্যে এই বাড়ী তৈরী হয়ে যাবে।

আরোগ্য বিভাগ

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়
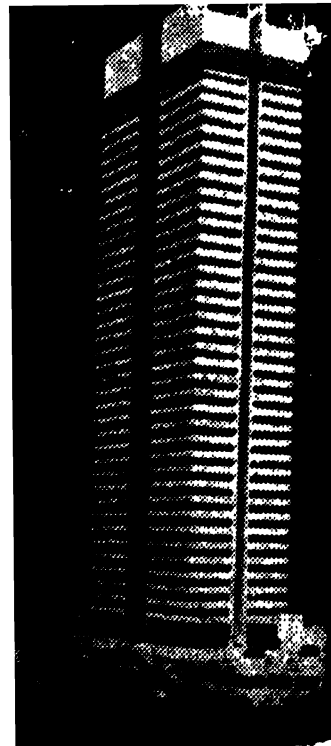
●উপাসী (ছদ্মনাম) দমদম, কলি-২৮—

প্রশ্ন ১ : একটু মোটা হইতে চাই। চুলও ওঠে।

উত্তর : আপনি দীর্ঘদিন ধরে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খান অথবা ইনজেকশন নিন। জণ্ডিস্ হলে যকৃৎ দুর্বল হয়ে যায়। আর সেই দুর্বলতা সারিয়ে তুলতে অনেকদিন লাগে।

প্রশ্ন ২ : চোখের চারিপাশের কালিমা কি উপায়ে দূর করা যায়?

উত্তর : যকৃতের দুর্বলতা কমিয়ে ফেললে এবং দুশ্চিন্তা দূর করলে চোখের চারপাশের কালি আপনা থেকেই কমে যায়।

●মিসেস্ রুদ্র, জামসেদপুর—

প্রশ্ন : আমার বর্তমান বয়স ৪৩ বৎসর। গত ডিসেম্বর মাস থেকে আমার দুটো কানেই তালা লেগে বন্ধ হয়ে যায়। সর্বদাই কানে শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে, কোন কিছুই শুনতে পাই না।

উত্তর : আমার মনে হয় আপনি মাসিকের গোলমালে ভুগছেন। হয় আপনার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে, আর নইলে বন্ধ হবো হবো করছে। এই অবস্থাকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় Menopause, Menopausal Syndrome হলে অনুরূপ উপসর্গ দেখা দেয়। আপনি একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে তাঁর চিকিৎসাধীন থাকুন। দেখবেন উপসর্গ কমে গেছে।

●শ্রীমতী সীতা দাশগুপ্তা, হাওড়া-১—

সঙ্গে কোন ডাক-টিকিট না থাকায় ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া গেল না। যে বড়ির নাম লিখেছেন, তা খাওয়া কখনো উচিত নয়। দ্বিতীয় উপসর্গের জন্য Pulmocod (Plain) চা চামচের ২-চামচ করে সকাল সন্ধ্যা খাবেন, অন্তত তিন মাস।

●শ্রীমতী লীনা চ্যাটার্জি, শেওড়াফুলি—

আপনি Dinoestrol Cream গলায় লাগাবেন সকালবেলায় আর রাত্রে শোবার সময়।
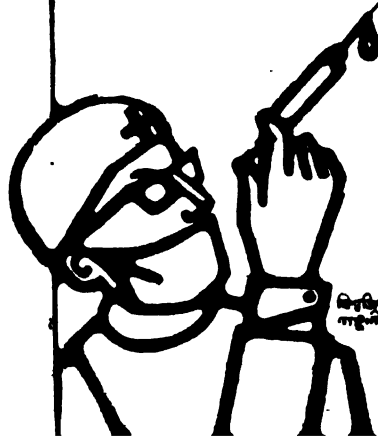
●শ্রীমতী মালবিকা চ্যাটার্জি, শেওড়াফুলি—

আপনি এখন কোন চিকিৎসক দেখাবেন না। তিন মাস দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে Hepatoglobin আর সকাল সন্ধ্যা জলখাবারের পর Paladec (Park Davis) দু-চামচ করে খাবেন। মাসিকের জন্য কোন ভাবনা নেই।

●শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়, কলি-১০—

প্রশ্ন ১ : আমার চোখের উপর পাতাগুলি বড় বড় কিন্তু নীচের পাতা খুব কম। যাতে চোখের পাতা বাড়ে, সেই রকম একটি ওষুধের নাম বলবেন।

উত্তর : এ ধরণের ওষুধের নাম আমার জানা নেই।

প্রশ্ন ২ : আমার উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, কিন্তু সেই তুলনায় আমার ওজন খুব কম, শরীরে চবি কম—

উত্তর : আপনি আলু, ভাত পেট ভরে খান। রোজ ভাত খাবার পর দুপুরে ঘুমান অভ্যাস করুন। এ ছাড়া দুবেলা খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Ferradol (Park Davis) খাবেন তিন মাস ধরে।

●শ্রীমতী বিজলী দাশগুপ্তা, গ্রাহক নং ৫৫০৭২, বিকানীর—

প্রশ্ন ১ : আমার ১৯৬৬ সালে Chicken pox হয়েছিল। মুখে কয়েকটা দাগ এখনও আছে। কিসে যাবে?

উত্তর : এতদিনেও যখন যায় নি, তখন এ দাগ যাবে বলে মনে হয় না। আপনি Siloderm মলম (Neopharma) মুখে মেখে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন ২ : আমার ছেলের বয়স ১০ বছর। দুষ্টুমি বেশ করে। খিদে একেবারে হয় না।

উত্তর : আপনার ছেলেকে দু-বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে Siomethionine Forte syrup (আলবার্ট ডেভিড) এবং ভাত খাবার আধ ঘণ্টা আগে Elixir Neogadine (র‍্যাপটাকস বেট) খেতে দেবেন। এগুলি তিনমাস ব্যবহার করবে।

●শ্রীমতী সুমিত্রা দস্তরায়, উলুবাড়ি, গৌহাটি—৮—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি যে রোগের কথা লিখেছেন স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ বিবাহিতা নারীদের হয়। একবার হলে কিছুতেই সারতে চায় না। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে হয়। ওই রোগের থেকে সন্তান সৃষ্টিতে কোন বাধা হয় না। আপনি দু মাস প্রত্যহ একটি করে Ephynal 100 mg বড়ি খাবেন। তাতেও যদি কোন সন্তান না হয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরীক্ষা করিয়ে আবার গোড়া থেকে চিকিৎসা করাবেন। D. C. I -এর গুণ বড় জোর ছ' মাস থাকে।

●শ্রীমতী মণিকা ঘোষ, জানির লেন, কলিকাতা—১৯—

প্রশ্ন ১ : আমার স্তনযুগল শিথিল শুষ্ক বা অবনত হইয়াছে—

উত্তর : সাধারণত স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেলে, কঠিন অন্তর্বাস ক্রমাগত ব্যবহার করলে অথবা ক্রমাগত আঘাত লাগলে স্তনযুগল শিথিল ও অবনত হয়।

প্রশ্ন ২ : সাধারণ পুষ্ট বা শিথিল ও অবনত স্তনের জন্য কি করিতে হইবে ?

উত্তর : স্বাস্থ্যের উন্নতি করুন। কঠিন অন্তর্বাস ব্যবহার করবেন না। অতিরিক্ত আঘাত যাতে না লাগে সে বিষয়ে যত্ন নেবেন।

●শ্রীমতী আকাশী মজুমদার, কলি-৪১—

প্রশ্ন : আমি বিবাহিতা। কিন্তু একটু বেশী উত্তেজনা হলেই আমার Discharg হয়ে যায়। সঙ্গম করবার সময় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই (আধ মিনিট থেকে এক মিনিটের মধ্যেই) আমার হয়ে যায়। খুব দুর্বল নই।

উত্তর : হ্যাভলক অ্যালিসের যৌন মনোদর্শন (বসুমতী প্রাঃ লিঃ কর্তৃক অনুদিত) গ্রন্থ পড়লেই জানা যায়, বহু মহিলার সঙ্গম-তৃপ্তি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়। এর জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না।

●শ্রীমতী সুমিত্রা গাঙ্গুলী, জামসেদপুর-৪—

ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

●শ্রীঅভাগা বাবু (ছদ্মনাম), শিবপুর, হাওড়া-৩—

আপনার প্রশ্নগুলি স্বাস্থ্যবিষয়ক নয়, তাই এগুলি সরাসরি সম্পাদকের নামে পাঠাবেন।

●শ্রীপঞ্চানন দত্ত, কলেজ রো, কলি-৯—

আপনার চিঠি পড়লাম। আমার মনে হয়, আপনি ৮।১০টি Sterodine (ইউ ড্রাগ) অথবা Siolan-12 (এ্যালবার্ট ডেভিড) ইনজেকশন নিলে কমে যাবে।

●শ্রী এস, কে, রে, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, নয়াদিল্লী-১—

আপনি স্নানের পর মাথায় ঘসে ঘসে Faircolin (ফেয়ারডীল করপোরেশন) মলম মাখবেন। স্নানের আগে ভিজন তেল মাখবেন। এ ছাড়া সপ্তাহে একদিন Shampoo করবেন ও দুবেলা খাবার পর Multivitamin বড়ি খাবেন। সব চিকিৎসা তিন 'স চলবে।

●শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাশ, বালুরঘাট, পশ্চিম-দিনাজপুর—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়েছি। আপনি দুবেলা খাবার পর ১-চামচ করে Nervigor with Vitamins & formates খাবেন দু মাস ধরে।

●শ্রীআশুতোষ দাশ, কামারকিতা, বর্ধমান—

আপনি একবার কলকাতার মেডিকেল কলেজের চোখের Out-door-এ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শমত চলুন। এই জটিল বিষয়ে চিঠি লিখে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়।

●নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, খড়দহ, ২৪-পরগণা—

প্রশ্ন : কিছুদিন হইতে যে-কোন কারণে কখনও একটু উত্তেজিত হলে আর লিখতে পারি না। হাত কাঁপতে থাকে।

উত্তর : এটা কোন রোগ নয়। যে-কোন মানুষ উত্তেজিত হলে হাত কাঁপতে থাকে। কম আর বেশি এই তফাৎ।

●শ্রী পি, কে, পাল, সিংভূম, বিহার—

আপনি প্রত্যহ দাড়ি কামানোর পর

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম- -

ঠিকানা- -

- -

মাসিক বসুমতী

রাখবেন। তিন মাস।

● খোকা (সাঙ্কেতিক নাম), বি এম রোড, কলি-১০—

● আপনি প্রশ্নটি সম্পাদকের কাছে পাঠান। স্বাস্থ্য বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে এই বিভাগে আলোচনা করা হয় না।

● শ্রীরতন চৌধুরী, ইস্ট কমলাপুর, দমদম, কলিকাতা—২৮—

● আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর Pulmocod (প্লেন) চা-চামচের দু-চামচ করে খাবেন দু মাস।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা—

প্রশ্ন ১: বছর দুই হল আমার শরীরের কয়েক স্থলে, যেমন কুঁচকীর কাছে, কনুইয়ের কাছে দাদের ন্যায় গোল গোল রিং উঠেছে—।

উত্তর: আপনি যে ওষুধের নাম লিখেছেন, সেই ওষুধই ব্যবহার করুন, তবে বহুদিন ধরে করতে হবে, অন্তত পক্ষে এক বছর। অল্প কয়েকদিন ব্যবহার করলে ওপর থেকে সেরে গেছে মনে হয়, কিন্তু ভিতরে থেকে যায়। ওষুধ লাগানো বন্ধ করলে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ ছাড়া দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দুবেলা ভাল করে সাবান মেখে স্নান করবেন। জামা-কাপড় কেচে পরবেন। গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া প্রভৃতি নিয়মিত সাবান দিয়ে কেচে পরবেন। এ ছাড়া দুবেলা Multivitamin বড়ি খাবেন। অন্তত এক বছর। তাতে ২নং প্রশ্নেরও সমাধান কিছুটা হতে পারে, তবে একেবারে সারবে বলে মনে হয় না।

● শ্রীঅলোককুমার দত্ত, চেতলা—

আপনি যে উপসর্গের কথা উল্লেখ করেছেন, তা অল্প সময়ের মধ্যে সারে না। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করাতে হয় ধৈর্যসহকারে। আপনি Nevrovitamin-4(এডাল্ট) বড়ি খেয়ে শোবেন, অন্তত এক মাস।

● শ্রী এ কে রায়, বাঁকুড়া—

বহুদিন ধরে ওষুধ খেলে উপসর্গ যেতে চায় না। আপনি কিছুদিন ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিন। রোজ ভোরবেলায় বেল খান। রাতে ইসবগুলের ভূষির সরবৎ খান। ছানা একটু বেশি করে খান। চর্বি এবং ভাজা জাতীয় খাদ্য পরিহার করুন।

● শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬—

এ-ধরণের উপসর্গ ভাল খাওয়া-দাওয়া করলে সেরে যায়। আপনি খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। দিনের মধ্যে একটা সময় করে। কিছুক্ষণ (অন্তত একঘণ্টা) বিশ্রাম করুন। ওষুধের মধ্যে দুবেলা খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Palymin (ডলফিন) ওষুধ খান।

● শ্রীঅনীতকুমার মুখোপাধ্যায়, বড়-বাজার, চন্দননগর—

প্রশ্ন: আমার ভাই রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে।

উত্তর: আপনার ভাইকে রাতে শোবার সময় একটি করে Tofranil বড়ি খাইয়ে দেখুন, একমাস।

● স, ক, গ (ছদ্মনাম), বাঁকুড়া—

প্রশ্ন: আমার বয়স ১৯ বৎসর। মুখে সর্বদা একটা তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হয়, ফলে সারামুখ চট্‌চট্‌ করে। মুছে ফেললে কিছুক্ষণ পরে আবার বাহির হয়। মুখে ব্রণ আছে।

উত্তর: আপনার ব্রণ সাধারণ ব্রণ। বয়স বাড়লে আপনা থেকেই সেরে যায় হয়। আপনি Siocitrate (এ্যালবার্ট ডেভিড্) দিনে তিনবার করে চা-চামচের দু চামচ করে আধকাপ জলে মিশিয়ে খাবেন। এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। ব্রণর জন্য চিন্তা করতে হবে না। আপনা থেকেই কমে যাবে। না কমলে পরে জানাবেন।

● শ্রীশিশিরচন্দ্র ধর, নৈহাটি, ২৪-পরগণা—

প্রশ্ন ১: আমার গায়ের কোন অংশ থেকে বিদ্‌ঘুটে গন্ধ বেরোয়, রোগটা কি এবং সারবে কি না?

উত্তর: আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়ে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, রোগটা কি। আপনি কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এবং তাঁর চিকিৎসাধীনে থাকুন।

প্রশ্ন ২: এক বৎসর যাবৎ সেই রোগটার চিকিৎসা করেছি। এটা কি সত্যি রোগ, না অন্য কিছু?

উত্তর: রোগ না হতেও পারে। আপনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

● শ্রীঅরুণকুমার রক্ষিত, আমতা, হাওড়া—

আপনি এক মাস ধরে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ইনজেকশন নিন।

● শ্রীসুব্রত চৌধুরী, সোদপুর, ২৪-পরগণা—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Sioplex Lysine (এ্যালবার্ট ডেভিড্) খাবেন, অন্তত পক্ষে তিন মাস।

● শ্রীমনোজ মৈত্র, বর্ধমান—

প্রশ্ন ১ : আমার গায়ে মাঝে মাঝে সাদা সাদা খড়ি ওঠে।

উত্তর : আমার মনে হয়, আপনার শরীরে ক্যালসিয়ম এবং ভিটামিন-এ কম আছে। আপনি Arovit (রোচ) বড়ি সকালে ১টি, রাতে ১টি এক মাস খাবেন।

প্রশ্ন ২ : বয়সের তুলনায় ভীষণ রোগা।

উত্তর : যে ওষুধ বললাম, তাই খাবেন, তাছাড়া পেট ভরে দুবেলা ভাত খাবেন।

● শ্রীফখরুদ্দিন আরবাসী, খাড়গ্রাম, রামপুরহাট—

আপনি 'আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী' এই ঠিকানায় বিস্তারিত ভাবে রোগের বিষয় জানাবেন। যথাযথ পরামর্শ দেওয়া হবে।

● শ্রীভূপতিনাথ ঘোষ, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী—

আপনার বয়স ৭২ বৎসর। আমার মনে হয় আপনার কলিক্ ব্যথা হচ্ছে। বেশি বয়সে গুরুপাক খাদ্য খেতে নেই, হজমের ব্যাঘাত হয়। আপনি লঘুপাচ্য খাদ্যবস্তু খান এবং দুধ একটু বেশি পরিমাণে খান, দেখবেন ব্যথা কমে যাচ্ছে।

● শ্রী জি, পি, রায়, বৈঁচি, হুগলী—

ডায়াবিটিস মেলিটাস রোগ একবার হলে সহজে সারতে চায় না। সেইজন্যে ঐ রোগের চিকিৎসাতে ধৈর্য হারাতে নেই। যে চিকিৎসকের চিকিৎসায় আছেন, তারই অধীনে থাকুন। তিনি যে ভাবে থাকতে উপদেশ দেন, সেইভাবেই থাকুন, প্রয়োজন হলে সারা জীবন থাকতে হবে।

● শ্রীঅভাগা বাবু(ছদ্মনাম) ঠিকানা নেই—

আপনি ও বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ও সমস্যা প্রত্যেক পুরুষের জীবনেই আসে। ও সব নিয়ে না ভেবে, নিজের কাজকর্ম করুন, দেখবেন ও সমস্যা দূর হয়ে গেছে।

● শ্রীশ্যামলকুমার পাল, খালাসিপাড়া, বর্ধমান—

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগের অপারেশন ছাড়া সারবার কোন ভাল চিকিৎসা আমার জানা নেই।

● শ্রীসুশীলকুমার কর্মকার, দুর্গাপুর-৪—

হয় আপনার অর্শ হয়েছে, আর নইলে ডিসেণ্ট্রি হয়েছে। আপনি কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে পরামর্শ নিন।

● মিঃ কুক, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, ২৪-পরগণা—

কোন ভয়ের নেই। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা পরিচালনা করুন।

● শ্রীশান্তিময় দাশ, গোটাপটি, মালদহ—

আগের উপদেশে উপকৃত হয়েছেন জেনে আনন্দিত। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে Sioplex Enzymes (এ্যালবার্ট ডেভিড) খাবেন এক মাস। চুলের জন্য 'হিজল' তেল ব্যবহার করতে পারেন।

● শ্রীমাখনলাল পোদ্দার, পোড়ামাতলা রোড, নদীয়া—

আপনি শারীরিক প্রশ্ন পাঠালে মাসিক বসুমতীতে উত্তর পাবেন।

● শ্রীআর, এ, বারভুঁইয়া, শিলচর, কাছাড়—

আপনি ও বিষয়ে ভাববেন না। বয়স একটু বাড়লে ও উপসর্গ আপনা থেকেই কমে যায়।

● শ্রীদীপককুমার পাল, নদিয়ালী রোড, কলি-২৪—

প্রশ্ন : আমার বয়স ২১ বৎসর। প্রায় দু বছর হল আমার ভীষণ ঠোঁট ফাটছে এবং ঠোঁটের ছাল উঠে যাচ্ছে—

উত্তর : আপনার শরীর থেকে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স কমে যাচ্ছে। আপনি কিছুদিন বি. কমপ্লেক্স ইনজেকশন নিন। ওষুধ খেয়ে কোন ফল হবে না মনে হচ্ছে। মুখে কিছু মাখবেন না।

● শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৌলিক, নরেন্দ্র মুখার্জি ফার্স্ট লেন, উত্তরপাড়া—

প্রশ্ন ১ : Anastomosis of vas এতদিন পরে (ছ বছর ৬।১১।৬৩—আগে Vasectomy হয়েছিল) করা স্থাকফলপ্রসূ হবে কি, Operation টা Easy কি না?

উত্তর : রোগীর অবস্থা না দেখে বলা সম্ভব নয়। অনেক সময় Successful হয়। মোটেই সহজ নয়।

প্রশ্ন ২ : এ-অপারেশন কলিকাতায় কোন কোন ডাক্তার করিতে পারেন, এবং কোন কোন হাসপাতালে হইয়া থাকে?

উত্তর : এস. এস. কে. এম হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারী ডিপার্টমেণ্টের ডা: মুরারিমোহন মুখার্জির পরামর্শ গ্রহণ করুন।

প্রশ্ন ৩ : Blood Grouping test-এ পিতৃত্ব নিশ্চিত প্রমাণ করা যায় কি না? সন্তানের Blood Group পিতামাতার অনুরূপ হয় কি না?

উত্তর : নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কারণ পূর্বপুরুষদের রক্তের প্রভাব সন্তানদের ওপর আসতে পারে।

প্রশ্ন ৪ : 'আরোগ্য বিভাগের' মারফৎ কোন হাসপাতালে Anastomosis of vas operationটি free কিংবা স্বল্পব্যয়ে করাইয়া দিতে পারেন কি না?

উত্তর : যদি P G Hospital-এ এই operation করতে রাজী হন, তাহলে বিনা পয়সাতেই হবে। (২টি কুপন ছিল)

● শ্রীপার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়, আমতা, হাওড়া—

প্রশ্ন ১ : বহুদিন হইতে আমার ঘাড়ে, পিঠে, বুকে ও এমন কি মাথার চুলের তলায় পর্যন্ত ছুলি হইয়াছে।

উত্তর : খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন। Multivitamin বড়ি খাবেন। এ ছাড়া ছুলিতে Faircolin মলম দুবেলা ঘষে ঘষে লাগাবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার দিদির বয়স ২২ বৎসর। তাহার সারা মুখে কালো তিলের মত অসংখ্য ছোট ছোট চিহ্ন আছে।

উত্তর : আপনার দিদিকে রোদে বেরোতে নিষেধ করবেন, তাছাড়া Liver

Extract ইনজেকশন নিতে হবে।

●শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, তকিপুর, বর্ধমান—

আপনি এ বিষয়ে সম্পাদককে লিখুন, তিনি হয়ত সাহায্য করতে পারেন।

●শ্রীবিভূপদ ভট্টাচার্য, বিশ্বাসপাড়া, রাণাঘাট—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। মৃগী-জনিত রোগ সারতে অনেক দেরি লাগে, অনেক সময়ে সারে না। আপনার ছেলের যখন উপকার হয়েছে, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চিকিৎসা বন্ধ করবেন না। কোন ভয় নেই, চিকিৎসা যেভাবে চলছে, সেইভাবেই চলুক।

●শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মালিক, রামকৃষ্ণবাটী, হুগলী—

Paroximal Hemoglobinurea হয়ে থাকলে মূত্র পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসা করাবেন। আপনার আত্মীয়কে দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে Aminozyme খেতে দেবেন একমাস।

●শ্রীশান্তনু সরকার, টাকী, ২৪-পরগণা—

আপনি ভাত খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে Sioplex Lysine (এ্যালবার্ট ডেভিড) দু মাস খাবেন।

●শ্রীঅলোক দত্ত, জয়নুদ্দীন মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-২৭—

আপনি এ নিয়ে কিছু ভাববেন না। দৈনন্দিন কাজকর্ম করুন এবং ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

●শ্রীশিশির দেববর্মণ, আগরতলা, ত্রিপুরা—

একটি মেয়ে কেন পুরুষের কাছে আসতে চায়, এ কথা সবাই জানে এবং এ কোন রোগের আওতায় পড়ে না। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বহু উপায় আছে এবং বহুবার বসুমতীতে আলোচনা করা হয়েছে।

●শ্রীসরজিৎ রায়, মেটেলী, জলপাই-গুড়ি—

আপনার প্রশ্নগুলি মাসিক রাশিফল বিভাগে পাঠাবেন।

●শ্রীযতীন্দ্রনাথ জানা, কুমিরদা, মেদিনীপুর—

কি জন্য একশিরা হয়েছে, না দেখে কিছু বলা সম্ভব নয়। আপনি কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

●শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, ফকিরদাস মণ্ডল লেন, হাওড়া—

আপনার ছেলেকে অন্তত ছ মাস ধরে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স খাওয়াবেন।

চলমান বিদ্যালয়

উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরে অনেক স্কুল এমন জায়গায় অবস্থিত যে ছাত্রদের স্কুলে পৌঁছতে বাসে অন্তত চল্লিশ ঘণ্টা সময় চলে যায়। এই সময়টুকু একেবারেই বরবাদ যেত ছাত্রদের।

এখন পেনিসিলভানিয়া ও কলোরাডো রাজ্যের কর্তৃপক্ষ দেখছেন চেষ্টা করে কি ভাবে এই সময়টুকুকেও শিক্ষা-দানে কাজে লাগান যায়। তাঁরা স্কুল বাসগুলিতে টেপ রেকর্ড করা নানা ধরণের শিক্ষাপ্রদ বিষয় ইয়ারফোনের সাহায্যে ছাত্রদের শোনবার ব্যবস্থা করেছেন। যেমন আমেরিকার ইতিহাসের স্মরণীয় মুহূর্তগুলির বর্ণনা, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মহারথিগণের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও সঙ্গীত-কৌশল শোনান, পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থাদির সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি। বিজ্ঞান, সামাজিক বিদ্যা, চারুকলা প্রভৃতি নিয়ে নানা আলোচনা, ছাত্রদের জন্য টেপ রেকর্ড করে তাদের স্কুলে যাবার বাসে শোনান হয়।

এ সব প্রোগ্রাম তিন মিনিট থেকে ৫৮ মিনিটব্যাপী হয়ে থাকে। যে জায়গায় ছাত্রদের বিদ্যালয় অবস্থিত, সেখানকার ইতিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, আবহাওয়া, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য সরস ভাষায় পরিবেশন করা হয়।

বাসের ড্রাইভাররা এ ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা বলে, যেদিন থেকে এ ব্যবস্থা হয়েছে, সেদিন থেকে তারা নিশ্চিন্ত—আর ছুটোপাটি নেই, চেঁচামেচি নেই, বাস থেকে ছেলে পড়ে যাবার ভয় নেই।

খরচও খুব বেশী নয় একটা। পেনিসিলভানিয়া রাজ্যের সমস্ত স্কুল-বাসগুলিতে এর জন্য খরচ হয়েছে মোট ৫,৭০০ ডলার—এর মধ্যেই আছে যাঁরা কথাগুলো রেকর্ড করিয়েছেন। তাঁদের পারিশ্রমিক।

ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক।

"শেষে ছিল যারা পলাইল তারা মানসিংহে জয় হৈল।
পিজরে করিয়া পিজরে ভরিয়া প্রতাপাদিত্যে লৈল ॥"

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

আর সম্মুখ থেকে নয়, এবার পিছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করলেন মহাবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্য ও সেনাধিনায়ক শঙ্কর। অকস্মাৎ উপস্থিত হলেন দুই মহারথী। সঙ্গে আছে বহুসংখ্যক সুদক্ষ সৈন্য। অমিত-বিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন বঙ্গীয় সেনাগণ। মহারাজা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, তাই যেন সবিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় সৈন্যমধ্যে। দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার যুদ্ধ, মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন বঙ্গীয় সেনাগণ। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ দেশের মাটি আঁকড়ে থাকবেন দেশপ্রেমীর দল। দুইমহাপুরুষ প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করে মানসিংহের সৈন্যগণকে যেন মন্থন করতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ সিংহের মত তাঁরা শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেছেন। অলৌকিক শূরতা সহকারে শত্রুগণকে সংহার করছেন। যে সম্মুখে পড়ে সে আর রেহাই পায় না। আক্রমণকারী মোগল সৈন্যদের কারও মুণ্ডচ্ছেদ হয়, কারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হতে থাকে। রক্তপ্রবাহে যুদ্ধক্ষেত্র পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। আহত সৈন্যদের অন্তিমক্ষণের কাতর চীৎকারে আকাশ যেন কেঁপে ওঠে। ঘোরতর যুদ্ধ চলতে থাকে। মোগল সৈন্যগণ ক্রমেই বিপর্যস্ত হতে থাকে।

বঙ্গীয় সেনাগণ যে সময়ে হুতাশনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করে শত্রু-সৈন্য ভস্মীভূত করছিলেন, যে সময়ে মোগল-সৈন্যগণ বিপক্ষের যুদ্ধ-নিপুণতায় পরাজিত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করছিলেন, যে সময়ে বাঙলার সৈন্যরা জয়োল্লাসে উল্লসিত হয়ে মোগলগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই আনন্দের সময়ে বঙ্গীয় সৈন্যমধ্যে সহসা প্রতাপের মৃত্যুকথা প্রচারিত হয়। শত্রুসৈন্য এই মিথ্যা রটনা করে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, প্রতাপের মৃত্যু-সংবাদে যদি প্রতাপের সৈন্যগণের মনোবল ভেঙে পড়ে। যদি তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নে তৎপর হয়।

মহারাজার মৃত্যু-সংবাদ শুনে বঙ্গীয় সেনাগণ যেন বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকেন।

অলীক মৃত্যু-সংবাদটা মহারাজার জানতে বাকী থাকে না। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ অন্যতম সেনানায়ক প্রতাপসিংহ দত্তকে বললেন, —আমার বিজয়ী সৈন্যের কিয়দংশকে আপনার অধীনে রেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেনাদের সাহায্যে এখনই যাত্রা করেন। আমার মৃত্যুর সমাচারটা যে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা এই কথা তাঁদের ব্যক্ত করবেন।

প্রতাপসিংহ বিজয়বাহিনীসহ বঙ্গীয় সৈন্যগণের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শত্রুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠ থেকে তিনি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। মরজগতে অমরকীর্তি রেখে তিনি সুরলোকে প্রস্থান করলেন।

বাঙলার সেনাগণ সেনাপতি বিহনে বিশৃঙ্খল হয়ে ইতস্তত ধাবিত হতেছে, এ হেন সময়ে তাঁরা শ্রবণ করলেন, মহাবীর প্রতাপাদিত্য পশ্চাদ্ভাগের শত্রুসৈন্যদের পরাজিত করে তাঁদের সহায়তার জন্য বিজয়বাহিনীসহ আগমন করেছেন, তখন তাঁরা মন্ত্র-মোহিত ভুজঙ্গের মত প্রতিনিবৃত্ত হয়ে ঘোরতর সিংহনাদ করে মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করলেন।

ইত্যবসরে প্রতাপাদিত্য এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং আত্মরক্ষায় বিমুখ হয়ে প্রচণ্ড পরাক্রমে মানসিংহকে আক্রমণ করলেন।

শঙ্কর বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে সংযত করে ভর্ৎসনাপূর্বক বললেন,— বীরগণ, এই কী তোমাদিগের অবসন্ন হওয়ার সময়? তোমাদিগের প্রিয়তম সেনাপতিগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে কিরূপে তোমরা জড়পিণ্ড পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করছো? ইহা যুদ্ধক্ষেত্র, এস্থানে আলস্য ও অবসাদের কোন অবকাশ নাই। তোমরা পূর্ববীর্য স্মরণ কর, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমরা অচিরকালমধ্যে বিজয়লাভে সমর্থ হবে।

মহাবীর শঙ্কর সৈন্যগণকে সংযত করে পুনরায় প্রতাপাদিত্যের পার্শ্বে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রতাপাদিত্য শঙ্করসহ মিলিত হয়ে মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মহাবেগে অরাতিকুল সংহার করতে করতে মানসিংহাভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

কতকগুলি সৈন্যকে প্রতাপের সৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি স্বয়ং প্রতাপকে আক্রমণ করতে উদ্যোগী হলেন।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা উপস্থিত হল।

তথাপি যুদ্ধের বিরাম নেই। বীরগণ আত্মরক্ষায় বিস্মৃত হয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন

মানসিংহ যে সকল সৈন্যকে প্রতাপসৈন্যের পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, তারা ঘোরতর-বিক্রমে বঙ্গীয় সৈন্য ভেদ করে দুই ভাগে বিভক্ত করলো।

প্রতাপ স্বীয় সৈন্য হতে বিভক্ত হয়ে মানসিংহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হলেন।

রাত্রির ঘনান্ধকার যত বর্ধিত হতে থাকে যুদ্ধের তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেন এক কুটিল ও ভয়াবহ বিভীষিকা সৃষ্টি হয়। অমানিশার অন্ধকারে কে যে স্বপক্ষের ও কে যে বিপক্ষের নির্ণয় করা যায় না। ঘন ঘন অস্ত্রের ঝঙ্কারে রাতের মূক আঁধার যেন মুখর হয়ে ওঠে। স্তূপীকৃত মৃতদেহের আশেপাশে শৃগালের পাল এসে জমায়েৎ হয়। রুধিরধারা পান করে তারা। ঘোর অন্ধকারে ঝিলিক তোলে ক্ষুরধার তরোয়াল।

মানসিংহের সৈন্যগণ সরবে ধ্বনি তোলে,—প্রতাপাদিত্য পরাজিত হয়েছে। প্রতাপাদিত্য আর ইহজগতে নাই। প্রতাপের মৃত্যু হয়েছে।

প্রতাপের মৃত্যু, এই শব্দ দুটি বঙ্গীয় সেনাগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে তাঁরা যেন দশদিক অন্ধকার দেখতে থাকেন। কাণ্ডারীবিহীন সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন।

মোগলসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত প্রতাপাদিত্য কোনরূপেই আর শত্রুব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হলেন না। উদয়াস্ত ভীষণ পরিশ্রম ও ক্ষতস্থানসমূহ থেকে অজস্র শোণিত প্রবাহিত হওয়াতে পূর্ব হতেই প্রতাপের শরীর অবসন্ন, এক্ষণে আবার শত্রুপ্রহারে জর্জরিত হওয়াতে তিনি যুদ্ধস্থলে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

এই অবকাশে মানসিংহ পরিশ্রান্ত বঙ্গীয় সৈন্যগণকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করলেন। কিন্তু বাঙালী সৈন্যরা মহারাজার শরীররক্ষা করবার জন্য অচলের ন্যায় অটল হয়ে মোগলসৈন্যদের আক্রমণ রোধ করতে লাগলেন। বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পর্বতের পাদদেশে প্রতিহত হয়ে যেমন পুনরায় পশ্চাত প্রত্যাবর্তন করে থাকে, সেইরূপ মানসিংহের সৈন্যগণ উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে পশ্চাৎপদ হতে লাগলো।

কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর অঙ্গুলিপরিগণিত বঙ্গীয় সৈন্যগণ মানসিংহের অগণিত সৈন্যের হস্তে বীরলীলা সংবরণ করে।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের শরীররক্ষায় নিযুক্ত একমাত্র অবশিষ্ট মহাপ্রাণ শঙ্কর যুগপৎ চতুর্দিক হতে আক্রান্ত হওয়াতে আহত অবস্থায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

শঙ্করের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধরত মানসিংহ সহসা বিজয়ানন্দে অট্টহাস্যে যেন ফেটে পড়লেন। হাসতে হাসতে আদেশ দিলেন,—লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ কর এই দুই বীরপুঙ্গবকে। ততঃপর লোহার খাঁচায় বন্দী কর। দুজনকে দুই পৃথক খাঁচায় রাখা হয় যেন।

যুদ্ধে বিরতি পড়লো। মোগলসৈন্যরা বিজয়-উল্লাসে মেতে উঠলো। পান-পর্ব শুরু হল। অকাতরে শরাব বিতরণ চলতে থাকে। যে যত পারো পান কর। ক্লান্তি বিমোচন কর।

শরাব পান করতে করতে জয়ধ্বনি তোলে মোগলসৈন্যরা। রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে ধ্বনি তোলে,—মহারাজা মানসিংহের জয়। মানসিংহ দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

মহারাজা মানসিংহ হাসতে হাসতে বলেন,—আমি নিমিত্তমাত্র, সম্রাট আকবরের জয়। বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন।

মোগলসৈন্যরা বললে,—মহারাজা, আদেশ দিন। আমরা লুণ্ঠন চালাই।

মানসিংহ গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বললেন,—আলবাৎ, আলবাৎ। ধুমঘাট আর যশোরনগর তোমরা নির্দয়তা সহকারে লুণ্ঠন কর। বিলকুল লণ্ডভণ্ড কর। রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দাও। কেবল রত্ন ও স্বর্ণ যা কিছু পাওয়া যায় আমার শিবিরে জমা দাও। বাকী যা' থাকে সবই তোমরা গ্রহণ করবে। মণিমাণিক্য ও স্বর্ণজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত সবই এক্ষণে তোমাদিগের সম্পত্তি।

খুশির উচ্চহাস্যের ঢেউ ওঠে গভীর রজনীতে। যেন অগণিত প্রেতাত্মার হাসির ঐকতানের মত শোনায়। কচি কচি গোশাবকদের ধরে ধরে কাটতে থাকে কসাইরা। অপরিণত বাছুরের পাল আর্ত চীৎকার করে। বড় করুণ শোনায় হাম্বা হাম্বা রব।

যুদ্ধস্থলের অদূরে শত শত চুল্লী জ্বালানোর কাজ চলে। রুটি আর গোস্ত বানানো হবে। ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ মোগলসৈন্যরা। পৃথিবী গ্রাস করবে যেন, এমনই ক্ষুধার তাড়না।

বহুল পরিমাণে মূল্যবান দ্রব্য জমা পড়তে থাকে মানসিংহের কোষাগারে। রত্নরাজির বাহারে ও স্বর্ণজাত বস্তুর চাকচিক্যে বিমুগ্ধ মানসিংহের চোখ দুটিতে সে কী ভীষণ লোলুপতা ফুটে ওঠে। বিশ্বস্ত পার্শ্বচরদের কোষাগার রক্ষার ভার অর্পণ করলেন মানসিংহ। মনে মনে ফন্দী আঁটতে থাকেন, সম্রাট সকাশে কতটা পরিমাণ প্রেরণ করা যায়, আর তিনি নিজেই বা কী পরিমাণ গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ আত্মসাৎ করবেন। নিজের হেফাজতে সরিয়ে ফেলবেন।

মধ্যরাত্রে মানসিংহের সমীপে উপস্থিত হলেন কচু রায়। তিনিও যুদ্ধক্লান্ত। মোগলসৈন্যের পক্ষ অবলম্বন করে অবিরাম যুদ্ধ করেছেন। তাঁরই তরবারির আঘাতে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দক্ষিণ হস্ত দ্বিখণ্ডিত হয়।

কচু রায় বললেন,—মহারাজা মানসিংহ, আমি শপথ রক্ষা করেছি। আপনার নির্দেশানুযায়ী প্রতাপের সকল গোপন তথ্য অকপটে সরবরাহ করেছি। মহারাজার আদেশে প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি।

মানসিংহ সহাস্যে বললেন,—বিনা স্বার্থে মনুষ্যজাতি কোন কর্ম করে না। কচু রায়, তুমিও নিস্বার্থভাবে কিছু কর নাই। তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে তুমি প্রবৃত্ত হয়েছো। তজ্জন্যই প্রতাপের বিরুদ্ধে তোমার অস্ত্রধারণ, আশা করি অস্বীকার করবে না।

কচু রায় বললেন,—সত্যকথা, প্রতিহিংসার জ্বালায় আমি অহোরাত্র অস্থির ছিলাম। অদ্য হতে আমার সেই অসহনীয় জ্বালা হতে মুক্তি পেয়েছি। প্রতাপের যে হস্ত অস্ত্রাঘাতে নিরপরাধ পিতাকে হত্যা করেছে, প্রতাপের সেই হস্ত তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। যাই হোক, প্রতাপ পরাস্ত, আপনিও যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হয়েছেন। বাদশাহ আকবর নিশ্চয়ই আপনাকে এই জয়লাভের জন্য পুরস্কৃত করবেন। হাঁ, আমিও স্বীকার করি মনুষ্যজাতি স্বার্থ ভিন্ন একপাও চলে না।

মানসিংহ বললেন,—বাক্-বিতণ্ডা থাক, তোমার আসল বক্তব্যটা কী তাই শুনি।

কচু রায় বললেন,—যশোহরের রাজ-সিংহাসন সর্তানুযায়ী আমার প্রাপ্য হয়। এখন এই সর্তটা কাজে পরিণত হোক, ইহাই আমি চাই।

মানসিংহ বললেন,—আমি তাহা অস্বীকার করি না। তবে তোমার সিংহাসন-প্রাপ্তির বিষয়টা বাদশাহ কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে। তিনিই তোমাকে অর্পণ-পত্র দিবেন। সুতরাং আমার সহ দিল্লীযাত্রার জন্য তুমি প্রস্তুত হও। বাদশাহ আদেশ দিয়েছেন, প্রতাপকে জীবিতাবস্থায় দিল্লীতে আনয়ন করতে হবে। আমিও সেইমত ব্যবস্থা করেছি। প্রতাপকে লৌহপিঞ্জরে বন্দী করা হয়েছে। এক্ষণে যশোহর রাজ্য রক্ষার, শাসন পরিচালনার

[illegible] যশোহরকে [illegible] করতে চাই। [illegible] শেষ হলেই আমি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করবো। তুমি অধীর না হও। মানসিংহ যাহা বলে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

—তথাস্তু। তাই হোক। কচু রায় বললেন।

ভোরের আকাশে শুকতারা জ্বলছে। নিঃসঙ্গ নক্ষত্রটা দপ দপ করছে আকাশপটে। কিছু যেন শুভ্রতা ফুটেছে রাত্রির কৃষ্ণাকাশে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। যুদ্ধস্থলের কয়েকটি সু-উচ্চ বৃক্ষশাখায় গৃধিনীর দল উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। স্তূপীকৃত মৃতদেহ, তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

অদূরে লৌহপিঞ্জরে বন্দী দুই বীর। অচৈতন্য প্রতাপ ও আহত শংকর। প্রতাপের দেহের অগণিত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে তখনও। পিঞ্জর থেকে শতধারায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে।

মহাবীর শংকর [illegible] কাতর, কিন্তু মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। দুই চক্ষু মুদ্রিত। তিনি যেন মনে মনে ইষ্টনাম জপ করছেন। দিবালোকে শত্রুর মুখদর্শন করবেন না, তিনি যেন পণ করেছেন।

মানসিংহ বললেন,—কচু রায়, আমি এখনই এই প্রভাতকালে যশোহর-নগরে প্রবেশ করতে চাই। উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমে প্রতাপ যাঁর কৃপায় সমর-দুর্জয় হয়েছিলেন, যাঁর মহৎ কৃপায় প্রতাপ বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আমি সেই সমরপ্রিয়া অসুর-মর্দিনী মহামায়ার পূজা করতে চাই। মাতৃপদে পুষ্পার্ঘ্য দিতে চাই। দ্বিতীয়, প্রতাপের মহিষী ও তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করতে চাই। বাদশাহ আদেশ দিয়েছেন, প্রতাপের সমস্ত পরিবারকে দিল্লীতে প্রেরণ করতে হবে।

কচু রায় সংগোপনে বললেন,—আমি যতদূর শুনেছি, প্রতাপ-মহিষী রাজপুরী পরিত্যাগ করেছেন।

মানসিংহ সাগ্রহে বললেন,—তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন।

কচু রায় বললেন,—তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয়-বার্তা শ্রবণের সংগে সংগে মুসলমান-হস্তে পতিত হওয়ার ভয়ে আপন পরিজনসহ যমুনার গর্ভে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছেন।

শিহরিত হলেন মানসিংহ। ক্ষণেক নিশ্চুপ থেকে দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন। ততঃপর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। বললেন,—যশোহর-নগর পরিদর্শনে যেতে চাই। কচু রায়, ভবানন্দ, তোমরা উভয়ে আমাদের সংগে চল, ইহাই আমার মনোগত বাসনা।

কয়েক সহস্র সুদক্ষ সেনাকে লৌহপিঞ্জর প্রহরার কাজে নিযুক্ত করে মানসিংহ সদলে যাত্রা করলেন। পিছনে চললো এক বিরাট বাহিনী।

মানসিংহ যেতে যেতে প্রধান সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, —এক্ষণে কেদার রায়কে [illegible] জন্য প্রস্তুত হোন। সৈন্য-দের সজ্জিত করা হোক।

চলমান বাহিনী ধীরে ধীরে এগোতে থাকে পুরোভাগে চলেছেন মানসিংহ, কচু রায় ও ভবানন্দ। পূর্বাকাশে রক্তিম আভা ফুটেছে। এখনই সূর্যোদয় হবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সময়ের গতি

সময় নিরবধি এবং তার মাপ সুনির্দিষ্ট করেছে মানুষ—বৎসর, মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড দিয়ে সঠিক পরিমাণে ভাগ করেছে সময়কে। ঘণ্টা আমার কাছেও যতটা, প্রেসিডেণ্ট দ্য গল-এর কাছেও ততটা।

'কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি তাই ?

পণ্ডিতেরা বলছেন—না ! সময় নাকি আপেক্ষিক, সে নির্ভর করে উত্তাপ, বয়স, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। মস্তিষ্কের সময়-বোধক কেন্দ্র এই সব অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে আমাদের সময় কাটায় দ্রুততালে বা ঢিমে তালে।

পণ্ডিতেরা বলছেন যে, যখন আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি, তখন সময় কাটে দ্রুততালে এবং যখন আমরা জ্বরে বা বাহ্যিক কারণে উত্তপ্ত হই তখন সময় চলে মৃদু-মন্থর গতিতে। আরিজোনায় পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা বোঝা গেছে যে, মেয়েদের কাছে সময়ের গতি দ্রুততর পুরুষদের চাইতে। আরও দেখা গেছে যে, যখন আমার মেজাজ খারাপ থাকে তখন নাকি মহাকাল আমার খাতিরে তাঁর রথের গতি মন্দ মন্দ করে দেন।

অল্পবয়স্কদের কাছে সময় অপেক্ষা-কৃত মৃদুগতি। উনিশ-এর নীচে নিম্ন-বয়স্কদের চাইতে ষাটের ঊর্ধ্ববয়স্কদের সময় পাঁচগুণ দ্রুততর।

কেফিন খেলে (চা বা কফির ভেতরে থাকে) সময় কেটে যায় বলাকা-পাখায়। এই কারণেই দু'চার কাপ চা বা কফি খেয়ে কাজ করলে দিন কেটে যায় দ্রুততালে।

অতএব, কি করবেন ঠিক করুন। চা-কফি খেয়ে 'তাড়াতাড়ি' মরবেন, না চা-কফি বর্জন করে আয়ু বাড়াবেন ?

ঠিক করে নিন।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।··· এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।···বায়রণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।·· নবীনবাবুর যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ম হা ক বি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮, মূল্য মাত্র সাত টাকা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

বাংলা-সাহিত্যে সার্থকনামা অনুবাদক কর্তৃক বিশ্ব-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার।

মা (ম্যাক্সিমগোর্কী), এরাও মানুষ (রেণেমার্ক), এ-যুগের অভিশাপ (টলষ্টয়), কথা কও (ভেরকর), চক্র ও চক্রান্ত। (বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৪'০০ টাকা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ : স্বরস্রোতা, রায়চৌধুরী, ছায়াছবি, গঙ্গা-যমুনা, সতীন কাঁটা, তরুণোদয়, ধ্বংসের পথে, যাত্রী, এক, কয়লাকুঠি। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৩'৫০ পয়সা।

২য় ভাগ : বন্দী, মানে না মানা, অভিনয় নয়, শহর থেকে দূরে। বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৩'৫০ পয়সা

স্কটের গ্রন্থাবলী

২য় খণ্ড : আইভান হো, হাইল্যাণ্ড উইডো, সার্জনস ডটার, ফেয়ার মেড অফ পার্থ। অনুবাদক—শরৎচন্দ্র মিত্র। মূল্য : ৩'০০ টাকা।

৩য় খণ্ড : দি ব্রাইট অব ল্যামারমুর, দি লিজেণ্ড অব মন্ট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি। মূল্য : ৩'০০ টাকা।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

দীনেন্দ্রকুমারের রোমাণ্টিক রহস্য উপন্যাস ও ডিটেকটিভ কাহিনীগুলি বিদেশী ছাপ থাকা সত্ত্বেও অভিনব।

২য় খণ্ড : সাটিনার নবরূপ, দুইবার মৃত্যু, ছায়ার কায়া, ডাকাতির সোনা, একাদশ অবতার। (বোর্ড বাঁধা) মূল্য : ৪'৫০ পয়সা।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

বাংলা সাহিত্যে এ প্রবীণ নাট্যকার ও উপন্যাসিকের এই গ্রন্থাবলীতে আছে :

১ম ভাগ : অপরাজিতা, মহীয়সী, রাজকন্যা, সুটকেশের উপাখ্যান, নারীর রূপ, গোখরো, কাশীধামে শরৎচন্দ্র। মূল্য : ৩'৫০ পয়সা

২য় ভাগ : অপরিচিতা, নিগ্রহ, আত্মসমর্পণ, ভাই বোন, জয়-পরাজয়, কবির মানস-প্রতিমা। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৩'৫০ পয়সা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

পদ্মিনী উপাখ্যান, সুরসুন্দরী, কাঞ্চী কাবেরী, কুমারসম্ভব, নীতি কুসুমাঞ্জলি, কর্মদেবী ও কবির জীবনী সহ। মূল্য : ৩'০০ টাকা

অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী

বামুন বাগ্দী, রক্তের টান, পিপাসা, প্রণয় প্রতিমা, কামিখ্যের ঠাকুর, বন্ধন, মাতৃঋণ প্রভৃতি। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৩'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

॥ খেলাধুলা ॥

মল্লবীর কোজমা

রিচার্ড ওয়েজ যেদিন তাঁর অতুলনীয় নৈপুণ্যে হাঙ্গেরীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম অলিম্পিকে রেস্‌টলিং চ্যাম্পিয়ান হয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে আপন দেশের গৌরব বহুগুণ বাড়িয়ে তুললেন সেই দিনটি থেকে আজ হীরকজয়ন্তীকালও উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ১৯০৮ সালে সারা হাঙ্গেরীকে এক বিপুল গৌরবে গৌরবান্বিত করল ওয়েজের এই অবিস্মরণীয় কীর্তি। কিন্তু সে ঐতিহ্য হাঙ্গেরী চিরদিন অব্যাহত রাখতে পারল না। সে গৌরব ক্রমে শুধু ইতিহাসের মধ্যেই আবদ্ধ রইল। যদিও এই নামের মালায় রিচার্ড ওয়েজের পরেই আরও কয়েকটি নাম উল্লেখিত হওয়ার দাবী রাখে, তথাপি সামগ্রিকভাবে বিচার করলে উপরোক্ত মন্তব্য অনায়াসেই করা চলে।

বছর দুয়েক আগে ১৯৬৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত মিনস্কে হাঙ্গেরীর লুপ্ত গৌরব যেন আবার ফিরে এল অদ্ভুত নতুন করে তার জয়যাত্রার যেন এক শুভ সূচনা দেখা দিল। অন্ধকার থেকে আবার যেন আলোকে উত্তরণ আরম্ভ হল। ইতিহাস আবার আলোর পথ ধরল। ইয়োরোপীয় স্প্রিং চ্যাম্পিয়ানশিপ টুর্নামেণ্টে বিজয়ীর তিলক স্থান পেল তিনজন হাঙ্গেরীয়র প্রশস্ত ললাটে। হেভিওয়েট ক্লাসে ইস্টভান কোজমা, লাইট হেভিওয়েটে ফেরেঙ্ক কিস্, ফ্লাইওয়েটে জানোস ভার্গা।

আধুনিক হাঙ্গেরী এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক গর্ব করতে পারে কোজমার জন্যে। কোজমা হাঙ্গেরীর এই অবলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে শুধু আপন অভূতপূর্ব শক্তিই প্রদর্শন করলেন না—সমগ্র হাঙ্গেরীর ক্রীড়াজগতের ইতিহাসের এক নব অধ্যায়ের দ্বারোন্মোচন করলেন।

অথচ কতই বা বয়েস? এখনও তিরিশের ঘর তিনি পেরিয়ে যান নি। মাত্র আটাশ বছর বয়সেই তাঁর জগজ্জোড়া খ্যাতি। এক অতুলনীয় দৈহিক আকৃতির অধিকারী তিনি। লম্বায় ছ' ফুট সাত ইঞ্চি, ওজনও আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মত—একশ' চল্লিশ কিলোগ্রাম। পায়ে যে জুতো তিনি ব্যবহার করেন সেটি হল ১৪ সাইজ সু। একটি যে প্রধান অসুবিধায়

ক্রীড়ারসিক

তাঁকে পড়তে হয় সেটি হল পরিধেয় বেশভূষা সমস্ত তাঁকে তৈরী করিয়ে নিতে হয়। বাজারে যা তৈরী পোষাক পাওয়া যায় তার কোনটিই তাঁর দেহে ধরে না। এমন কি শুনলে আশ্চর্য হতে হয় গলার টাই পর্যন্ত তাঁর বিশেষ মাপে তৈরী করাতে হয়।

অথচ ১৯৫৬ পর্যন্ত তাঁর মল্লবীর হওয়ার তিলমাত্র বাসনা ছিল না।

মল্লবীর কোজমা

স্বপ্নেও কোনদিন তিনি এ চিন্তা করেন নি। সতের বছরের কোজমা তখন বাস্কেট বল খেলে দিন কাটাতেন। হঠাৎ পিতৃবন্ধু ল্যাজোস কেরেসতেস বন্ধুকে বোঝালেন যে, তাঁর ছেলে মল্লবীর হিসাবে সাফল্যলাভ করবেই। বাবার মনে এ ধারণা একেবারে তিনি বদ্ধমূল করে দিলেন। তাঁর বোঝানোর গুণে কোজমার পিতৃদেবের সে সম্বন্ধে আর কোনপ্রকার সংশয়ই রইল না। তাঁর ধারণা হয়ে গেল ছেলে তাঁর জাতমল্লবীর।

দীর্ঘ সাধনায় আজ যে সিদ্ধি তিনি লাভ করেছেন সেই সিদ্ধির তেজে আজ তিনি নিঃশঙ্ক। কাউকেই তিনি কুস্তির ক্ষেত্রে ডরান না। সহযোগী যোদ্ধারা কেউই তাঁকে টলাতে পারে না। অবশ্য এই তালিকায় তিনি নিজে ব্যতিক্রম বলে মনে করেন সোভিয়েট ইউনিয়নের রোশিন ও স্ন্যাকভকে চেকোশ্লোভাকিয়ার মেণ্টকে এবং পশ্চিম জার্মানীর ডিয়েত্রিচকে।

ষোল বছর বয়স পর্যন্ত কোজমা মাংস স্পর্শ করেন নি। কিন্তু আজ মাংস ছাড়া তিনি মুখে খাদ্য তুলতেই পারেন না। ছেলেবেলায় এ্যাকুইরিয়ামের খুব শখ ছিল কোজমার কিন্তু সে সখ আজ তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছে তার কারণ প্রায়শই তাঁকে স্থানান্তরে থাকতে হয়, ফলে মাছগুলিকে দেখাশোনা করার লোক থাকে না।

মল্লবীর হিসাবে টোকিও থেকেও তিনি অলিম্পিক স্বর্ণ পদক লাভ করেছেন। গুলা বরিস উনচল্লিশ বছর বয়সে প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হন। কোজমা ছত্রিশ বছরের মধ্যেই তাঁর শেষ পুরস্কারটি পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

শক্ত দু'খানি পা এবং সবল ফুসফুসই একজন দৌড়বীরকে দৌড়তে সাহায্য করে। কিন্তু তিনি সক্ষম হবেন কি না সেটা নির্ভর করে তাঁর মনের জোরের উপর।

ডেভ পেট্রিকের অন্তত তাই হচ্ছে মত। অথচ তিনি মনস্তাত্ত্বিক নন। তিনি সম্প্রতি ভিলেনোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছেন। পেট্রিককে কিন্তু একরকম বিশেষ একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলা যায়, কারণ বহু বছর ধরে প্রগাঢ় গবেষণাই তাঁকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে এবং ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত ১৫০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি প্রধান প্রতিযোগী ছিলেন।

দৌড়সংক্রান্ত ব্যাপারে যখন কোন আলোচনা হয়, তখন কিন্তু পেট্রিক গম্ভীর। তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, সম্প্রতি কয়েকজন গোঁড়া পৃষ্ঠপোষক একটি সাপ্তাহিক ক্রীড়া পত্রিকার কভারে তাঁর ছবি ছেপেছিলেন। পেট্রিক তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করে উত্তর যা পেয়েছিলেন তা হচ্ছে, কভারে যাদের ছবি ছাপা হয় তারা নাকি ভাল দৌড়তে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে মন্দভাগ্য। পেট্রিক কিন্তু এ কথায় আমল দেন নি। বলেছিলেন, তোমরা, যদি মনে কর তোমরা ভাল দৌড়তে পারবে তা চেষ্টা করে দেখতে পারো।

পেট্রিকের মনোবল অসীম। তিনি চার মিনিট মাইলের বাধা ৩-৫৬ সেঃ অতিক্রম করেছিলেন। দ্রুততার দিক থেকে এইটিই পূর্বাঞ্চলের রেকর্ড সময়। লস এ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ট্রায়ালের সময় তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নেন এবং অতি সহজে ১৫০০ মিটার ইভেন্টে রেকর্ড সময়ের মধ্যে অতিক্রম করেন।

অন্যান্য শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটদের মত পেট্রিক নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং

আমেরিকার দ্রুততম দৌড়বীর ডেভ পেট্রিক

অনুশীলনের ব্যাপারে তীক্ষ্নদৃষ্টি রেখে থাকেন।

সাধারণত তিনি সপ্তাহে ৩০ মাইল (৪৮ কিলোমিটার) দৌড়ে থাকেন কিন্তু অলিম্পিক বা ঐ জাতীয় কোন বড় প্রতিযোগিতার আসরে নামার আগে ৬৫ মাইল (১০৪ কিঃ মিঃ দৌড়ান।

ভারোত্তোলনের দ্বারা শরীরের উপর দিকটার গঠন প্রকৃতি সুন্দর ও সবল হয় এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন যখন কেউ দৌড়য় তখন যে শুধু পা দুটিই কাজ করে থাকে তা নয় হাত দুটিও সমানভাবে কাজ করে থাকে। ভারোত্তোলনের দ্বারাই হাতের পেশীগুলি শক্ত হবে সতেজ হবে এবং নিজেকে সবসময় 'তৈরি' বলে মনে হবে।

পেট্রিক জোর দিয়ে বলেন, মানসিক প্রস্তুতি একটি মস্তবড় জিনিষ। এ না থাকলে শক্তিশালী দৌড়বীরেরাও অনেক সময় ভেঙ্গে পড়েন। পেট্রিক স্বীকার করেন আইরিশ দৌড়বীর রণ ডিলানী যিনি ১৯৫৬ সনে ১৫০০ মিটার দৌড়ে জয়যুক্ত হয়েছিলেন তিনিই তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন, দৌড়নর জন্যই তুমি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছ। হতাশ হবার জন্য নয়। দৌড়বার আগে মনকে যেভাবে তুমি গঠন করবে মনই তোমাকে সেইভাবে চালিত করবে।

ডিলানী যা বলেছেন, তা প্রচুর ভাবে আমাকে সাহায্য করেছে, এর আগে এ সম্বন্ধে আমার কোন উপলব্ধিই ছিল না।

কয়েকটি ক্ষেত্রে পেট্রিকের এ উপলব্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দৌড়নর সময় অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে এমন একটি দূরত্বে থাকতেন যে, পড়ে গেলে অথবা কোন কারণে চোট লাগলেও তারা তাঁর গতির কাছে দাঁড়াতে পারতো না।

একবার রানিং-সু পরে দৌড়নর সময় তাঁর পায়ে কি করে জুতোর কাঁটা ফুটে যায় এবং তিনি পড়ে যান। তাঁর পায়ের মাংসপেশীতে গুরুতর আঘাত লাগে এবং ডাক্তার এসে বারটি সেলাই লাগায়। পায়ের আঘাত যখন কমে এল পেট্রিক তখন পুনরায় দৌড়তে শুরু করলেন এবং যে পায়ে লেগেছিল সেই পা-টিকেই ভালবাসতে শুরু করলেন। এছাড়া ছোটবড় অনেক আঘাতই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু কোন কিছুতেই নিরাশ হন নি। বহুদিন ধরে টনসিলের ব্যথায় তিনি ভুগেছেন।

এর জন্য তাঁকে পুরো দু' বছর নানারকম অসুখে ভুগতে হয়েছে। ২২ বৎসর বয়স্ক পেট্রিকের বর্তমান ওজন ১৬০ পাউণ্ড এবং তাঁর দৈহিক উচ্চতা ৬ ফুট।

আসক্তি ওষুধে

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

[illegible] বাংলা [illegible] এই কথাটি ব্যবহার করেছিলেন, হাজার বছর ধরে ভাগীরথীর বুক দিয়ে অনেক জল বয়ে গেল, রাজ্য ভাঙাগড়া কতো হোল, কতো লোকজন এল গেল, কিন্তু কথাটি তার উপযুক্ত তাৎপর্য নিয়ে কোনদিন দেখা দিল না। আজ এই ছোট্ট পৃথিবী-টার দেশে দেশে ব্যবধান ঘুচে গেছে, 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর—বাংলার বৈষ্ণব কবিদের এ কথাটাও আজ তার যথার্থ মানে খুঁজে পেয়েছে, আজকের দুনিয়াদারীতে হাজার বছর আগেকার বাংলা দেশের কবি-ব্যবহৃত কথাটি তার জগজ্জোড়া তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে।

আজ পৃথিবীর সামাজিক জীবনযাত্রায় এমন এক লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তাকে, একমাত্র 'রসানেরে কংখা' এই অভিধাতেই ভূষিত করা যেতে পারে। উতলা হবেন না, ধীরে বন্ধু ধীরে, ব্যাপারটা খুলে বলছি।

আজ সারা পৃথিবীতে লোকদের মধ্যে ওষুধ ব্যবহারের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। মাথা ধরল—স্যারিডন, অ্যানাসিন, আবেদন, নোভেলজিন যে-কোনো একটা ট্যাবলেট কিনে খেয়ে নিলেই হোল; সর্দি হয়েছে, জ্বর হয়েছে—ওষুধ-দোকানে গিয়ে এলকোসিন বা এ পি সি যা হোক একটা চেয়ে খেয়ে নেওয়া গেল; পায়খানা হচ্ছে না একটা সুলভপ্রাপ্য পারগেটিভ ট্যাবলেট ব্যবহার করলেই হোল। ডেটল, আইওডেক্স, বার্নল ইত্যাদি নানা জাতীয় সাংসারিক ব্যবহার্য ওষুধপত্র তো আছেই। ঘুম হচ্ছে না তো, ঘুমের বড়ি বা সামনে পরীক্ষা—রাত জেগে পড়তে হবে, ঘুম না হবার বড়ি হামেশাই ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া, যাদের কোনো রোগ পাকা হয়ে গেছে, তারা তো তাদের ব্যবহার্য অনেক ওষুধের নাম জেনে যায়, ওষুধের দোকানে গিয়ে প্রয়োজনমত তাদের যে-কোনো একটা কিনে নেয়। এভাবে পৃথিবীতে ওষুধ ব্যবহারের একটা মারাত্মক ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ঝোঁকটিকে আমরা 'রসানেরে কংখা' নামকরণ করতে পারি। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে এ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

এর পিছনে কি কারণ আছে—ভাবতে গেলে দেখা যায়, সাধারণ লোকেরা আজকাল চিকিৎসকদের সম্মুখীন হতে ভয় পায়, অর্থনৈতিক চাপে তারা এমন পিষ্ট, চিকিৎসার ব্যয় বহন করা তাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই প্রথম প্রথম বা অল্প-স্বল্প কিছু রোগজ্বালা নিজেরাই সারিয়ে নিতে অগ্রসর হয়।

জনশিক্ষার বহুল বিস্তার হয়েছে, প্রত্যেক বিষয়েই প্রাথমিক ধারণা নানান লেখার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের এসে যাচ্ছে। খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন মারফৎ নানান পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় হচ্ছে। ওষুধও ব্যবসায়িক জগতের একটি অন্যতম পণ্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক চিকিৎসা-মূলক প্রতিষ্ঠান ওষুধপত্র উৎপন্ন করছে, —প্রচার করা হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার বাজারে প্রচারকে আরও জোরদার করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে ওষুধপত্রের নাম লোকের [illegible] জমে ওঠা চাই। লোকেরা চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে সোজাসুজি দোকানে এজন্য ভিড় জমাচ্ছে।

অর্থনৈতিক কারণের জন্যেই যে এ ব্যাপারটি ঘটছে, তা নয়। ওষুধের সঙ্গে যে পরিচিত, এ ব্যাপারে যে জ্ঞান আছে, এরকম একটা বাহাদুরির ভাব থেকে ওষুধ দোকানের দ্বারস্থ হয় অনেকে। শেষ পর্যন্ত এটা একটা ফ্যাসানেই দাঁড়িয়ে যায়। তারপর মদ খাওয়া যেমন একটা নেশা, তেমনি ওষুধ খাওয়াও একটা নেশাতে পরিণত হয়েছে।

এই কর্মব্যস্ততার যুগে মানুষ ছোটাছুটিতে মত্ত, জীবন-সংগ্রামে বিব্রত। অবকাশ নেই, অবসর নেই দু'দিন বিশ্রামের, নানা কাজ, নানা ধান্দায় সে নিরন্তর ব্যস্ত; তাই অসুখটা হয়েছে, দু'দিন বিশ্রাম গ্রহণ, চিকিৎসকের পরামর্শমত সময়মাফিক ওষুধ সেবন, ইত্যাদি করবার সময় হাতে নেই। তাই কোনরকমে ওষুধ দোকানে গিয়ে একটা ওষুধ কিনে খেয়ে চাপা দিয়ে চলে যায় যদি—চলুক। এভাবে চলতে চলতে শুধু ব্যক্তি মানুষটি নয় সমস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গবেষণামূলক ক্রোড়পত্রে লেখা হয়েছে,—

"The present set-up in society seems designed to ensure the total failure of treatment, and it is time we emerged from the pre-scientific era into one of scientific investigation. If not, the future of addiction, prevention and treatment will be gloomy indeed."

অলিম্পিকের অঙ্গনে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও পেট্রিকের ভবিষ্যতে অন্য কারো কিছু করার ইচ্ছে আছে। তাঁর মতে হয় আমি কোন স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করবো নতুবা অন্য কিছু। কিন্তু পেট্রিক কি অবসর নিচ্ছেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, অলিম্পিকের অঙ্গন থেকে স্বর্ণ-পদক অর্জন না করা পর্যন্ত আমি অবসরের চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না।

পেট্রিকের বড় ভাই লিওনার্ড তিনিও এককালের একজন খ্যাতনামা দৌড়বীর, ছিলেন তাঁর কাছেই তালিম নেন এবং বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তিনিই পেট্রিককে পরিচয় করিয়ে দেন। গর্বের সঙ্গেই একথা স্বীকার করেন পেট্রিক দৌড়ানর সবচেয়ে বড় জিনিষ যে ট্রাক সেসম্বন্ধে পেট্রিকের অভিমত হচ্ছে অভিজ্ঞতাই হচ্ছে বড় জিনিষ, নিজের মনের উপর আস্থা রাখাটাও বিশেষ প্রয়োজন।

'ডেভিড এ্যান্ড বাথসেবা'র একটি বিখ্যাত দৃশ্যে নায়িকা সুজান হেওয়ার্ড'

অসাধারণ শক্তি এবং অভিনন্দনীয় দক্ষতা যাঁদের নাম হলিউডের জনপ্রিয় শিল্পীদের তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হতে সহায়তা করেছে, অস্কার-বিজয়িনী সুজান হেওয়ার্ড সেই নামের মালার অন্যতম দ্যুতিভাস্বর নাম। শুধু রোম্যান্টিক নায়িকার চরিত্রই নয় অতীব দুরূহ জটিল এবং রীতিমত মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্রে তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় প্রমাণ করেছে যে, শিল্পী হিসাবে তিনি কি বিপুল ও বিরাট শক্তির অধিকারিণী।

১৯১৮ সালের ৩০শে জুন ব্রুকলীনে সুজানের জন্ম। ওয়াল্টার এবং এলেন ম্যানেরারের মেয়ে সুজানের শিক্ষালাভ হয় ব্রুকলীনের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতেই। ১৯৩৭-৩৮ সালে এই অসামান্যা সুন্দরী তরুণীকে দেখা গেল আলোকচিত্রীদের মডেলরূপে। ১৯৩৯ সালে চিত্রলোকের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই তিরিশ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে অসংখ্য ছায়াচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চরিত্রে তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় তাঁকে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে আজ এক প্রথম শ্রেণীর তারকায় পরিণতি দিয়েছে।

তাঁর প্রথম ছবি ব্যুগিস্তে। ১৯৩৯ থেকে '৪৫ তিনি চুক্তিবদ্ধা ছিলেন প্যারামাউণ্টের সঙ্গে, ১৯৪৫ সালে তাঁর চুক্তি হল ওয়ানার ব্রাদার্সের সঙ্গে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ তিনি ছিলেন ওয়াল্টার ওয়্যাগনারের শিল্পী, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ তাঁকে দেখা গেছে টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের শিল্পী হিসাবে।

তাঁর অভিনীত অবিস্মরণীয় ছবিগুলির মধ্যে আই'ল ক্রাই টুমরো, স্নোজ অফ কিলিমাঞ্জারো, ডেভিড এ্যাণ্ড বাথসেবা, কনকারার, কনকারড, এ্যাডা, স্টোলেন আওয়ার্স, টুলসা, টপ সিক্রেট এ্যাফেয়ার, ইয়ং এ্যাণ্ড উইলিং, হানি পট, হিট প্যারেড, ব্যাক স্ট্রীট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালে পৃথিবীর দু'জন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অভিনেত্রীর একজন হিসাবে তিনি স্বীকৃতা হলেন। ১৯৫৬ সালে নিউ ইয়র্কের চিত্রসমালোচকদের বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত হলেন। ১৯৫৯ সালে 'আই ওয়াণ্ট টু লিভ' ছবিটি তাঁকে 'অস্কার' এনে দেয়।

১৯৪৪ সালে টমাস জেস বাকারের সঙ্গে সুজানের বিবাহ হয়। এই বিবাহে তাঁদের দুটি যমজ পুত্র—টিমলি ও গ্রেগরীর জন্ম হয়। ১৯৫৭ সালে সুজান হেওয়ার্ড ও ইটন চাকলির সহধর্মিণীর বরণ করেন।

—চিত্রপ্রিয়

শক্তিময়ী শিল্পী সুজান হেওয়ার্ড

চলমান কথাচিত্র পরিচালকের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা

কথাটা বা শব্দটা বর্তমানে [illegible] ব্যাপক অর্থ লাভ করেছে। বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত—যেমন ফিজিক্স্, কেমিস্ট্রি, মেথেম্যাটিক্স্, টেক্‌নলজি ইত্যাদি—সমাজে মানুষের যাবতীয় কার্যকেই শিল্প নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এখন আর এছুতোর, মিস্ত্রী, কেরাণী, কামার, মুচি নেই। সবাই শিল্পী—সব কর্মই শিল্পকর্ম। এমন কি জুতো তৈরীও পাদুকা শিল্প। ফুট্‌পাথের লালা মুচি আর চীনে বাজারের হোয়াং ফং চর্মশিল্পী। ধাঙড় বা মেথরদের কী শিল্পী বলা হয় জানি না।

সঙ্কীর্ণ কিংবা বহুপ্রসারী অর্থে চলমান-কথা-চিত্রকে (সিনেমাকে) নিঃসন্দেহে শিল্পের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। সিনেমার নাম চিত্রশিল্প—পরিচালক চিত্রশিল্পী! আর অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা? তাঁরা নীল আকাশের নক্ষত্র—স্বপ্নলোকের নায়ক আর নায়িকা। সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্টার বা তারকা বলার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে তাদের সঙ্গে দর্শকদের বাস্তব জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। ভাবটা কতোকটা এই যে ফিল্ম স্টারদের বাড়ী ভাড়া, গয়লার টাকা, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজের মাইনে, বাজার খরচের টাকা—এ সব কিছুই লাগে না। তারা শুধু অন্ধকারের ওম্‌লেট্ আর জ্যোছনার সরবৎ খেয়ে দিন আর রাত্রি কাটিয়ে দেয়। শিল্পীদের—যদি তাঁরা শিল্পী হন—পক্ষে এটা গৌরবের কি অগৌরবের সেটা বিবেচ্য।

যতো রকম শিল্প আছে—কাব্য, নাটক, উপন্যাস, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্যে বর্তমান জগতে সিনেমা-শিল্প-এই চলমান-কথা-চিত্র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এই আলো-ছায়াবাণী-চিত্রের আবেদন—অবদান যাই হোক—প্রত্যক্ষ এবং দুর্বার—যুগপৎ অধিগম্য ও উত্তেজক। যেমন এ পারে দর্শকের চিত্তকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করতে তেমনি পারে রসাতলের অতল তলে তলিয়ে দিতে। অর্থকরী দিক থেকেও সিনেমা প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন। কোনো একখানা কাব্য কি উপন্যাস যদি ব্যবসায়িক অর্থে

হীরালাল দাশগুপ্ত

একেবারে মার খেয়েও যায়—এক কপিও যদি বিক্রয় না হয়—তা হলেও লোকসানের মাত্রা পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকার বেশী নয়। কিন্তু

[illegible] পরিচালিত '[illegible]' চিত্রে মাধবী চক্রবর্তী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

একটা ফিল্ম যদি এক সপ্তাহ না চলে—মার খেয়ে যায়—তা-হলে লোকসান কমসে কম একলক্ষ টাকা। আর যদি মার না খেয়ে পারে দর্শকদের মারতে তা-হলে লাভের পরিমাণ যে কতো লক্ষ টাকায় উঠতে পারে তার নির্ভুল পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

যে-কোনো মৌলিক শিল্পের জন্য একমাত্র শিল্পীই দায়ী। রবীন্দ্রনাথের কবিতার জন্য প্রাপ্য পুরস্কার কিংবা তিরস্কার একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই—বিশ্বভারতী কিংবা ভোলানাথ দত্তর নয়। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা একমাত্র শরৎচন্দ্রেরই গুণ—প্রকাশক বা মুদ্রাকরের নয়। সাহিত্য এবং শিল্পের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষতার জন্যে একমাত্র সাহিত্যিক এবং শিল্পীকেই শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধা করা হয়। অন্য কাউকে নয়। চিত্রাঙ্কনের বেলায় শুধু রং, তুলি ও কাগজ থাকলেই শিল্পীর শিল্পকর্ম সম্পন্ন হতে পারে!

অবশ্য নৃত্য ও সঙ্গীতে সঙ্গতের প্রয়োজন আছে স্বীকার করে নিলেও একথাও মেনে নিতে হবে যে, এতে আঙ্গিকের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করলেও এটা একেবারে অপরিহার্য নয়। কোনো
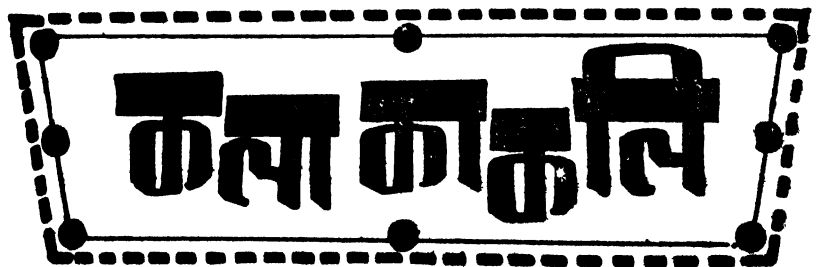
প্রকার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীতও উচ্চাঙ্গের নৃত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। শিল্পী তার একক ব্যক্তিগত প্রতিভার গুণে অনবদ্য শিল্পকর্ম বিচিত্র রস-ধারায় উৎসারিত করে। বিশেষ করে কথাশিল্পীর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ-দানের অন্য কোন এক বা একাধিক সহকারী শুধু অনাবশ্যক নয়—অবাঞ্ছিত। দশজনে মিলে পরামর্শ করে একসঙ্গে কবিতা-উপন্যাস বা নাটক লেখা যায় না, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-নৃত্য বা চিত্রাঙ্কন হয় না।

এই একক শিল্প থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার এবং চলমান-কথাচিত্র বা সিনেমা, যাকে বলা যেতে পারে যৌথ শিল্প বা 'কর্পোরেট আর্ট।' এইখানেই—কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার কিংবা চিত্র-শিল্পী যাকে সাধারণত বলা হয় আর্টিস্ট—এদের থেকে—কিংবা গাইয়ে বা বাজিয়ে বা নাচিয়ে থেকে—একেবারে পৃথক গোত্র হলো রঙ্গমঞ্চ এবং চলমান-কথা-শিল্পের পরিচালক, নির্দেশক, আলোকশিল্পী (তিনিও শিল্পী), শব্দ-নির্দেশক, সম্পাদক, দৃশ্য-নির্বাচক, সংলাপ লেখক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নেপথ্য-সঙ্গীতকার, সুরকার এবং সর্বোপরি মূল গল্প লেখক। এই সবাকার সমন্বয়ে—এই বারোয়ারী প্রচেষ্টায়—একটি চলমান-কথা-চিত্র কিংবা গতিশীল রূপবাণী গড়ে ওঠে। সুতরাং এর—এই কথাচিত্রের—ব্যবসায়িক কৃতকার্যতা কিংবা অকৃতকার্যতা—কিংবা এর শৈল্পিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষতা আর সৃষ্টিশক্তিশালী - সৌন্দর্য - রসোত্তীর্ণতা-প্রতিভার অধিকারী কেউ একক ভাবে (দাবী করে) হোতে পারে না। যে-হেতু থিয়েটার কিংবা সিনেমা দশমিক দিগ্দর্শন মাত্র।

এবং যে-হেতু, যেখানে সাহিত্যের শৈল্পিক মূল্যায়নে একমাত্র সাহিত্যিকই পাঠকের বিচারাধীন, সেখানে চলমান-কথা-চিত্র কিংবা মঞ্চে অভিনীত নাটকের শৈল্পিক সাফল্য কিংবা

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক পুরস্কৃত ১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন নায়ক উত্তমকুমার

অসাফল্যের জন্যে কোনো একজন মাত্র শিল্পীকে দায়ী করা চলে না। যে-হেতু সমস্ত বিষয়টাই সামগ্রিক—বারোয়ারি দুর্গাপুজোর মতনই এটা একটা বারোয়ারি শিল্প। (শিল্প-কলা বারোয়ারি হয় কি না তা বিচার করবেন সুধীজন—আমি নয়)।

পৃথিবীর কোনো চিত্র-পরিচালকই মৌলিক নয়—একমাত্র ব্যতিক্রম—সাধারণ নিয়মকে প্রমাণ কোরবার জন্যেই যেন—চার্লি চ্যাপলিন—*যিনি নিজেই গল্পলেখক—চিত্রপরি-*চালক এবং প্রধান অভিনেতা—বোধ হয় আলোক-চিত্র-শিল্পীও। মনে হয় পৃথিবীতে আর কোনো শিল্পী চলমান-বাণী-চিত্র সৃষ্টিকর্মে এতো মৌলিকতা-স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতার সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি করতে আজ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। এবং তথাপি তার শৈল্পিক অবদানকেও একক—ইনডিভিজুয়াল বলা চলে না—চার্লি চ্যাপলিনের কাল্পনিক অনুভূতির বাস্তব উপলব্ধিকে একক প্রতিভার স্বাক্ষর ব'লে স্বীকার করা যায় না। জানি আমার এই মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে মতভেদের সহায়ক, কিন্তু বিগতস্পৃহ সূক্ষ্ম বিচারে সত্যোপলব্ধির অনাসক্ত সঙ্গী।

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রবন্ধের নামকরণের সঙ্গে এ পর্যন্ত যা লেখা হল তার কোনো সম্বন্ধ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অমূলক এই সন্দেহ। একটু তলিয়ে দেখলেই দৃশ্যমান হবে যে শেষ পরিচ্ছেদ ও প্রথম অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ।

কথাটা এই—সহজ—সরল। কিন্তু সহজ কথা সহজ ভাষায় বলা অতিশয় কঠিন। যিনি পারেন তিনি সত্যিকারের কথাশিল্পী। একেবারে পর্দা ঠেলে অন্দরে ঢোকা যাক্—ভয় আছে অনধিকার প্রবেশের—কিন্তু ভরসা আছে গৃহস্বামীর উদারতার প্রতি।

বর্তমান ভারতের—এশিয়ার—সমগ্র পৃথিবীর চলমান-কথা-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীসত্যজিৎ রায়। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য অথবা সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক বা টেক্‌নিক্—বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন—বিভিন্ন ভাষা—প্রকাশভঙ্গী—মাধ্যম—আবেদন এবং বিচিত্র জিজ্ঞাসা। সত্যজিৎ রায়ই একমাত্র চলমান চিত্র-পরিচালক যিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন এই উন্নাসিকের নাসিকা নির্গত শব্দ সিনেমাকে আর্টের উত্তুঙ্গ চূড়ায় উন্নীত করার দিন আগত। তিনি দিলেন একে নতুন ভাষা—নতুন ছন্দ, নতুন আঙ্গিক—অভিনব প্রকাশভঙ্গী—অপরূপ বৈচিত্র্য আর অনবদ্য ব্যঞ্জনা।

এবং তথাপি। এবং তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁর প্রতিভা স্বয়ংসিদ্ধ নয়। একক নয়—যৌথ—'কর্পোরেট'—উৎকৃষ্ট বিচিত্র মাল-মশলা এবং বহুবিধ উপকরণ সহযোগে সুস্বাদু মৃগ-মাংস রন্ধনে তিনি অদ্বিতীয় কারিগর। তাঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মূলে মাত্র তিনখানি চিত্র—পথের পাঁচালী, অপুর সংসার এবং অপরাজিত। নয় কি?

এই তিনখানি কথাশিল্পের একখানিও তাঁর নিজের রচিত নয়। এরই সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন তাঁর স্বরচিত কাহিনী গল্প বা উপাখ্যান কাঞ্চনজংঘা কিংবা নায়ক চিত্র। এরই সঙ্গে তুলনা করুন চারুলতার। এই চারখানি ছবি—বাণীচিত্র ভাবে, ভাষায়, বৈচিত্র্যে, অপরূপ-ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে, সুরসঙ্গীতে একেবারে অনবদ্য। আর কোনো ছবি এরকম হয়নি কেন? এর কারণ কী? এর একমাত্র কারণ কথাচিত্র মৌলিক শিল্প নয়—সৃষ্ট শিল্পের রূপান্তর মাত্র। সিনেমা শিল্প বহু প্রতিভার মিলনক্ষেত্র। এখানের ফাঁক কিংবা ওখানের ফাঁকিতে সামগ্রিক ফলশ্রুতি বিনষ্ট।

চিত্র-পরিচালকের স্বাধীনতা সুতরাং সঙ্কীর্ণ। দ্বিতীয় সমস্যা মূল রচনা—চিত্রের ভিত্তি—কতোখানি পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিবর্জন্ করা পরিচালকের পক্ষে সম্ভব। মূল রচনার মৌলিক চরিত্র—আবহাওয়া ও বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের আমূল পরিবর্তন কখোনই সম্ভব নয়। আর তাই সম্ভবও হয় এবং লেখকের সম্মতিক্রমে পরিচালক যদি তাই চিত্রায়িত করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যের রচনা অবলম্বন করে বিকৃত ছায়াছবি নির্মাণ না করে তিনি নিজেই সাহিত্যিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। অতএব এ ক্ষেত্রেও চিত্রপরিচালকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। শুধু কি এই? প্রয়োজন প্রতিভাবান অভিনেতৃসংঘ, আলোকশিল্পী, শব্দশিল্পী ইত্যাদি এবং ইত্যাদির শক্তিশালী সহযোগিতা। এখানেও চিত্রপরিচালক পরনির্ভরশীল। তাঁর স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তা সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোনো চিত্রের শৈল্পিক সার্থকতার কিংবা ব্যর্থতার জন্য কৃতিত্ব কিংবা অকৃতিত্বের অংশীদার সমভাবে না হোলেও কমবেশী সংশ্লিষ্ট সকলে।

হীরেন নাগ পরিচালিত 'চেনা-অচেনা' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও [illegible]

মাধুর্যের প্রতিমূর্তি

শার্লে ম্যাকলেন

'উওম্যান টাইমস সেভেন' চিত্রে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় শার্লে ম্যাকলেন

হলিউডের শিল্পিকুলের মধ্যে আরো আরো নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ভারতের সঙ্গে এক যোগসূত্রের অধিকারী। কেউ জন্মেছেন এই পুণ্য ভারত ভূমিতে, কারো বাল্যকাল কেটেছে এই দেশের পবিত্র মৃত্তিকায়। কেউ কেউ এসে দেখে গেছেন এই মহাদেশ। কিন্তু ভারতের অধ্যাত্মজগত সম্বন্ধে কৌতূহল এ জগতের বাসিন্দাদের সঙ্গে সংযোগসম্পন্না এমন একটিমাত্র নামই উল্লেখ করা যেতে পারে—সে নাম শার্লে ম্যাকলেন।

যাঁর চোখের দৃষ্টি এবং মুখের হাসি সারা জগতকে উত্তাল করে তোলার ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় রাখে। যাঁর এক-জোড়া চোখ এবং ওষ্ঠাধরের হাসি রাশি রাশি মাধুর্যের জন্ম দেয়, যাঁর নামমাত্র লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মধ্যে চাঞ্চল্য বইয়ে দেয়—সেই শার্লে ম্যাকলেনের বয়স এখনও চল্লিশের ঘরে পৌঁছায় নি।

১৯৩১ সালের ২৪শে এপ্রিল ভার্জিনিয়ায় তাঁর জন্ম। ইরা-ও এবং ক্যাথলীন ম্যাকলেন বিটির মেয়ে তিনি, চলচ্চিত্র জগতের মত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র ক্ষীণ বা দুর্বল নয়। পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়েও দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি এবং রাশি রাশি অভিনন্দন-লাভের সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছে। মি-এ্যাণ্ড জুলিয়েট (১৯৫৩) এবং প্যাজামা গেম (১৯৫৪) তাঁর নাট্য-প্রতিভার নিদর্শন।

ছবির জগতে এলেন ১৯৫৪ সালে ট্রাবল উইথ হেনরির মাধ্যমে। তারপর এক এক করে নানা ছবি, নানা চরিত্র, প্রতিভার ব্যাপক প্রকাশ।

তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে আর্টিস্টস এ্যাণ্ড মডেলস, এ্যারাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ, হট স্পেল, ম্যাচমেকার শীপম্যান, সাম কেম রানিং, আস্ক এনি গার্ল, কেরিয়ার ক্যানক্যান, এ্যাপার্ট-মেণ্ট টু ফর দ্য সী শ, আর্মা-লু-দুস, মাই গেসা, হোয়াট এ ওয়ে টু গো, ইয়েলো রোলস রয়েস প্লীজ কাম হোম ইত্যাদির নাম উল্লেখ্য।

সাম কেম রানিং ১৯৫৯ সালে তাঁকে এনে দিল ফরেন প্রেস এ্যাও-য়ার্ড। আস্ক এনি গার্লের মাধ্যমে ঐ বছরই বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎ-সবে লাভ করলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সিলভার বিয়ার।

১৯৬০ সালে ভেনিস চিত্রোৎসব তাঁর গলায় পরিয়ে দিল শ্রেষ্ঠ অভি-নেত্রীর জয়মাল্য 'এ্যাপার্টমেণ্ট' ছবিটির জন্যে।

১৯৫৪ সালে স্টিভ পার্কারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন শার্লে। একটি মেয়ে তাঁদের ১৯৫৫ সালে জন্মায়। প্রখ্যাত অভিনেতা ওয়ারেন বিটি শার্লের ছোট ভাই।

ভারতবর্ষে কিছুদিন আগে এসে-ছিলেন শার্লে এবং তাঁর ভারত-জিজ্ঞাসা ও ভারত ভ্রমণের বিশেষত্ব এই রচনার প্রারম্ভেই বর্ণিত হয়েছে।

—চিত্রপ্রিয়

বাসবদত্তা—একটি অপরূপ নৃত্য

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যে অসামান্য দানগুলির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার কল্পনাতীতভাবে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে 'বাসবদত্তা' তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্ভুক্ত এই কবিতাটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অতি পরিচিত। সর্বপ্রকার জটিলতা অনিত্যতা ও দ্বিধার ঊর্ধ্বে যে দিব্য প্রেম তারই স্মৃতি এক রূপগর্বিণী নগরের নটীর জীবনে যে বিরাট পরিবর্তনের ছোঁয়া এনে দিল সেই কাহিনীই রবীন্দ্র-লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বোধিসত্তাবদান কল্পলতা এই কাব্য-কাহিনীর উৎস। রবীন্দ্রনাথের অনুপম লেখনীর মাধ্যমে যে অসংখ্য বৌদ্ধ কাহিনী, গাথা কাব্যরূপ নাট্যরূপ লাভ করে বাঙলা সাহিত্যের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারকে বিপুল ঐশ্বর্যে ভরপুর করে তুলেছে 'বাসবদত্তা' তাদেরই একটি।

এই বহুপঠিত এবং সর্বজন-সমাদৃত কাহিনী কাব্যটির নৃত্যনাট্যরূপ বাঙলার রস-পিপাসু সমাজে উপহার দিলেন যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ, গত ৩০শে মে রবীন্দ্র সদনে উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের মাধ্যমে। নৃত্যনাট্যটির সঙ্গীত পরিচালনা করলেন রবীন দাস। সঙ্গীতাংশে দ্বিধায় বলা যায় সুপরিচালিত ও সুপরিবেশিত। এ কালে ভারতের নৃত্যকলাকে পৃথিবীর সামনে যিনি তুলে ধরলেন তিনি উদয়শঙ্কর। তাঁরই মাধ্যমে বিশ্ববাসী অবহিত হল ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর এই কালজয়ী সাধনা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। শ্রীমতী অমলাশঙ্কর তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী। ভারতীয় নৃত্যের উৎকর্ষসাধনে ও শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেদিনকার এই অপূর্ব অনুষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার

সত্যেন চৌধুরী পরিচালিত 'অন্দর মহল' চিত্রে কল্যাণী ঘোষ
চিত্র : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে তিনি মৌলিকচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রয়োগকুশলতা এবং সৃজন-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেন তা বিস্ময়ে হতবাক করে দেওয়ার মত। তাঁর নৈপুণ্যে সমগ্র পরিকল্পনাটি এক অপরূপ রসসমৃদ্ধ হয়ে একদিকে যেমনই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে অন্যদিকে হয়ে উঠেছে তেমনই বিস্মরণীয়। নৃত্যাংশে শ্রীমতী মমতাশঙ্কর ও শ্রীচম্পক জৈনও মুঠো মুঠো অভিনন্দন দাবী করতে পারেন।

সেদিনকার এই অনুষ্ঠানে বহু সম্ভ্রান্ত এবং সুবোদ্ধা দর্শকদের সমাবেশও লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের নামও উল্লেখযোগ্য।

'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান'—বিষয়ে একটি সেমিনার

বিগত ২৮শে এপ্রিল ১৯৬৯ সন্ধ্যায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাঁদের ৪, এলগিন রোডের একটি বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন। বিষয় ছিল "রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান" এবং বক্তা ছিলেন শ্রীআবু সয়ীদ আ'য়ুব। শ্রীআইয়ুব তাঁর লিখিত প্রবন্ধের প্রথমেই বললেন, রবীন্দ্রনাথের গানের ফসলই তাঁর মতে সবচেয়ে মূল্যবান এবং তার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দুঃখবিষয়ক গানগুলিই তাঁকে নাড়া দেয় বেশী। রবীন্দ্রনাথের গানে কথার ব্যঞ্জনাই প্রধান, সুরের ভূমিকা শুধু রঞ্জক, কখনও বা হয়তো সারথিরও, রথীর ভূমিকা তার জন্য নয়।

শ্রীআইয়ুব বলেন, কবির গানে যখন অন্তর্বেদনা ও বিশ্ববেদনা মিলে একাকার হয়ে যায়, সেইক্ষণেই গান পৌঁছায় আপন অখণ্ড পূর্ণতায়। বক্তা কবিগুরুর বহু গান নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখান।

সমস্ত আলোচনাটি বিষয়বস্তুর নির্বাচনের বিশেষত্বে, বক্তার সাবলীল, মাধুর্যমণ্ডিত অথচ গুরুগম্ভীর প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্যে এবং সর্বোপরি বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ সঙ্গীতগুলি শ্রীমতী নীলিমা সেন কর্তৃক গীত হওয়ায়, শ্রোতাদের দীর্ঘসময় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

কয়েকটি গানের বিশ্লেষণে শ্রীআইয়ুব যেমন বিদগ্ধ চিন্তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর

স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তেমনই স্বনামধন্যা গায়িকা শ্রীমতী সেন 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল', 'সকল জনম ভরে', 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' প্রভৃতি গানে তাঁর সর্বজনস্বীকৃত সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন নতুন করে।

টেগোর রিসার্চ ইমস্টিটিউট প্রতি মাসেই তাঁদের ছাত্রছাত্রী, সদস্য ও জনসাধারণের জন্য যে সব সেমিনারের আয়োজন করেন সেগুলির বিষয়বস্তু ও আলোচনাপদ্ধতি সব সময়ই বিশিষ্টতার দাবী রাখে। "রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান" সেমিনারটি বিশিষ্টের মধ্যেও একক বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সবার কাছে। ইনস্টিটিউট সেজন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আজকের এই রসবিকৃতির দিনে, এই চিত্তদৈন্যের সঙ্কটক্ষণে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছে না বাৎসরিক ২৫শে বৈশাখের ভাবোচ্ছ্বাসে, বাঙ্গালীর মনকে রবীন্দ্রচিন্তা ও রবীন্দ্রচর্চার আলোকে চির-উদ্ভাসিত করে তোলার ব্রত তার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৫ সাল থেকে এই ইনস্টিটিউট রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ক যে আটটি পত্রের দুই বছর ব্যাপী 'ডিপ্লোমা কোর্স' প্রবর্তন করেছেন, দেশবাসীর কাছ থেকে তাতে অভাবিত সাড়া পাওয়া গেছে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে নতুন রেকর্ড

রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানী প্রতি বছরের মতো এবারও বেশ কয়েকখানি রেকর্ড উপহার দিয়েছেন গীতিরসিকদের, বলা বাহুল্য সব ক'খানি রেকর্ডই রবীন্দ্রসঙ্গীতের।

লঙ প্লেয়িং রেকর্ড দু'খানি—"আনফরগেটেব্‌ল্ টেগোর সঙস" এবং "বসন্ত"। প্রথম রেকর্ডটিতে স্থান পেয়েছে কনক দাস, মালতী ঘোষাল, সতী দেবী ও রেণুকা দাশগুপ্তর গান। এক সময়ে এই সমস্ত শিল্পীরাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত করিয়েছেন এবং এখনও এঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত যে ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সাহানা দেবীর ই পি রেকর্ডটিও একটি অনবদ্য অবদান। বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যাওয়া কণ্ঠের গানগুলি নতুন ক'রে প্রকাশ ক'রে গ্রামোফোন কোম্পানী আমাদের আনন্দ দিয়েছেন।

আরেকখানি এল পিতে "বসন্ত" সঙ্গীতালেখ্য প্রকাশ পেয়েছে। গানের শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক একজন দিক্‌পাল। কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি এবং বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের নিজ-কণ্ঠের আবৃত্তি এর বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাস্কর বসুর সংকলনের কাজ প্রশংসনীয়।

ই পি রেকর্ডে হেমন্ত, সুচিত্রা, কণিকা, চিন্ময়, দ্বিজেন, সুমিত্রা সেন, পূরবী, শ্যামল ও ঋতু গুহর গান চারটি ক'রে আছে। এবারের একটি নতুন ই, পি—মান্না দের কণ্ঠে উপভোগ্য হয়েছে রেকর্ডটি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই পুরোধা শিল্পীদের রেকর্ড সম্বন্ধে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন।

অনেকদিন পরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রকাশিত হলো। রেকর্ডটি ৪৫ আর পি এম স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে। আরও যাঁদের স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড বেরিয়েছে—তাঁরা হলেন—অর্ঘ্য, সাগর, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, পূর্বা, আরতি, নমিতা, স্বপন, সুমিত্রা ঘোষ এবং সুশীল মল্লিক। প্রথম পাঁচজন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। সুশীল মল্লিক তাঁর পূর্বের দু'খানি রেকর্ডেই জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছেন; তাঁর বর্তমান রেকর্ডটিও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। সুমিত্রা ঘোষও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নবীন শিল্পীদের মধ্যে তাঁর আসন ক'রে নিয়েছেন। স্বপন গুপ্ত নবীন অথচ সম্ভাবনাময়। 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া' এবং 'তোমায় কিছু দেব বলে' দুটো গানেই শিল্পীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেছে। নমিতা ঘোষালের "বাজিল কাহার বীণা" গানটি সমান উপভোগ্য।

'দুর্বাদল' ও 'বিপ্লব' নাট্যানুষ্ঠান

বালী চৈতলপাড়া কিশোর নাট্য-সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব অত্যন্ত সাফল্য ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোপীরাম সরিয়া, প্রধান অতিথিরূপে শ্রীপতিতপাবন পাঠক এম এল এ এবং বিশেষ অতিথিরূপে শ্রীনীরেন সেন ও শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী গৌরী চক্রবর্তী ও শ্রীচিত্ত বসু-মল্লিক।

বিজয় বসু পরিচালিত 'আরোগ্য নিকেতন' চিত্রে নায়িকা সন্ধ্যা রায়

শেষে নীরেন সেন রচিত 'সূর্য-চন্দ্র' ও নন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত 'বিপ্লব' নাটক দুটি শ্রীপ্রহ্লাদ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন—শ্রীশম্ভুনাথ সেনগুপ্ত, শিবনাথ সেনগুপ্ত, প্রদীপ গাঙ্গুলী, অলোক গাঙ্গুলী, সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ দাস, তপন মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও কুমারী জয়ন্তী সেনগুপ্ত।

নববর্ষ উৎসব

ভাওরা ইন্‌স্টিটিউটের জেলা—ধানবাদ (বিহার) সভ্য ও সভ্যাগণ বাংলা নববর্ষ (১৩৭৬) উপলক্ষে মঞ্চস্থ করলেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' যথাক্রমে ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল ১৯৬৯।

নাটক দুটিতে চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য দর্শকেরা নাটকের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে যাবেন। চমৎকার অভিনয়ের জন্য সর্বপ্রথম যাঁদের নাম উল্লেখিত হবে তাঁরা হ'লেন—সর্বশ্রী মাগারাম চ্যাটার্জী (পরিচালক), বিমলপ্রসাদ মুখার্জী, ডাঃ সোমনাথ বিশ্বাস, লোকনাথ মুখার্জী, এস আর দাশরায়, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, দেবদাস ব্যানার্জী, দেবেশ বিশ্বাস, শ্রীমতী মৃদুলা বোস, জয়শ্রী বক্সী, স্মৃতি চৌধুরী, স্বপ্না ও দীপালী চ্যাটার্জী।

অন্যান্য চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন—সর্বশ্রী বিরাজকৃষ্ণ মুখার্জী, গোবিন্দ চ্যাটার্জী, রমেন মুখার্জী, জনার্দন রায়, মৃণাল দাস, তুষার ব্যানার্জী, রত্নাকর খাওয়াস, তুলসী ব্যানার্জী, ভূতনাথ ব্যানার্জী, কালীপদ, আর আর রায়চৌধুরী, এন সি পাণ্ডা, অরুণ চ্যাটার্জী, মিস্ রেণু বিশ্বাস, গীতা দাস, স্বপ্না ও মীরা চ্যাটার্জী, লক্ষ্মী দাস-রায়, মিসেস্ দাসরায় ও শ্রীমান উত্তম সেনগুপ্ত।

'জোনাকি'র বার্ষিক উৎসব

'জোনাকি'র বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত হল। উৎসবে ভাইবোনেরা নৃত্য, গীত, নাটকাভিনয় করে সারা সময়টা তারা দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। উৎসবের সভাপতি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি শিশু-সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ মল্লিক ও বিশেষ অতিথি রাজ্যের অন্তঃশুল্ক মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ হালদার মুক্তকণ্ঠে শিশুদের এই প্রয়াসে স্বাগত জানিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

শ্রীমতী পিনু ঘোষ ও শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষের পরিচালনায় কবিগুরুর বর্ষার গান শোনান শ্রাবণী গাঙ্গুলী, স্বপ্না চৌধুরী, রুমা দত্ত, বিশ্বনাথ সেন, সত্যভামা দাশগুপ্ত আর নাচ দেখালেন মিতা চক্রবর্তী, অপিতা বসু, সংযুক্তা গুহ, শর্মিষ্ঠা গুহ, শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী, মৈত্রেয়ী মুখার্জী, ইলা মুখার্জী।

শ্রীকনক মুখার্জীর গল্প ও সুরে, শ্রীঅশোক দত্তের পরিচালনায় ও নন্দিতা বসু'র গানে 'নাকাল রাজা ছক্কা জোকার' অভিনয় করল নন্দিতা বসু, স্মিতা বসু, মীনাক্ষী দাস, তপন মুখার্জী, অমিত ব্যানার্জী, শ্যামলী গাঙ্গুলী, অঞ্জনা শ্রীবাস্তব, পুষ্কর দাশগুপ্ত, মনীষা, নিতাই দাস, দেবযানী মল্লিক, টিঙ্কু ঘোষ, গৌতম শ্রীবাস্তব, সীমা সিংহ, সীমা গুপ্তা, অদিতি সান্যাল, অর্পণ সান্যাল, পিউ দত্ত, রাজা মল্লিক।

স্বর্গত সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' শ্রীমতী ভারতী গুহের পরিচালনায়

বাংলার একমাত্র মহিলা যাদুশিল্পী শ্রীমতী ডি, পাণ্ডা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন

'অগ্নিযুগের কাহিনী' চিত্রে মাধবী চক্রবর্তী

রূপায়িত করল শকুন্তলা রায়, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুস্মিতা বসু, প্রভাত সরকার, পৃথা সেন, শমিষ্ঠা গুহ, সংযুক্তা গুহ, তপতী মুখার্জী, মেঘবর্ণা মুখার্জী, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, কেকা মিত্র, দেবযানী মল্লিক, বিভাস ভট্টাচার্য। শ্রীঅলোক দত্ত, সর্বশ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্য, বাবলু দে, কৃষ্ণপদ দেবের সহযোগিতায় দুটি পুতুল নাচ 'খেলার সাথী', 'তিন বানর' দেখান।

শ্রীশঙ্করনাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আসরের ছোট ভাইবোনেরা ৪র্থ বার্ষিক এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

রীতিমত নাটক

দশম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত "রীতিমত নাটক" মঞ্চস্থ করলেন সাহা ইন্সটিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স রিক্রিয়েশান ক্লাব স্টার প্রেক্ষাগৃহে। ১২ই মে, সোমবার, সন্ধ্যা ৫॥টা। উক্ত সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅলকচন্দ্র গুপ্ত এবং প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন যশস্বী ঔপন্যাসিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ও সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মহোদয়ের উপর। সেই দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। অভিনয়াংশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে "দিগম্বর মজুমদারের" ভূমিকায় অমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। বলতে দ্বিধা নেই যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একজন খুবই শক্তিশালী অভিনেতা। "দিবোন্দুর" ভূমিকায় হীরেন বসুর অভিনয়ও খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "সুহৃৎ" চরিত্রানুগ হয় নি। সত্যেন রায়চৌধুরী—"বসন্ত" চরিত্র রূপায়ণে কোনপ্রকারে কাজ চালিয়ে গেছেন। দুটি ক্ষুদ্র চরিত্রে সুঅভিনয় করেন যথাক্রমে রাধাশ্যাম সেন (পাঁচু মিঞা) ও শ্রীরণজিৎ দাস (রঞ্জন)। বালক "মধুমঙ্গলের" ভূমিকায় কুমারী রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় খুবই সাবলীল। "স্বাগতা" চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন মঞ্চশিল্পী শ্রীমতী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রে সঙ্গতিপূর্ণ অভিনয় করেন শ্রীমতী কল্পনা ভট্টাচার্য (শান্তা), শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় (সান্ত্বনা) ও শ্রীমতী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (সুলেখা)। সর্বোপরি সংস্থাটির দলগত অভিনয় খুব ভাল।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ১৭ই মে, শনিবার বিরাটীতে মহাজাতি যুবগোষ্ঠীর পরিচালনায় মহাজাতিনগর সাধারণপ্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও সাহিত্যিক মিহির সেন রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী সাগর সেন, দিলীপ চক্রবর্তী, রতন রায়, সুধীন সরকার, মঞ্জু ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মূকাভিনেতা তপন দত্ত।

পুরী হোটেলে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী

গত ১৮ই এবং ২৫শে মে সন্ধ্যা ৭টায় পুরী হোটেলের নিজস্ব মঞ্চে ও প্রাঙ্গণে বহু স্থানীয় ও বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে, শ্রীমতী রাণী হালদারের উদ্যোগে এবং শ্রীঅপূর্বরতন চৌধুরী ও শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এক সুন্দর পরিবেশে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

দুদিনের সভায় রবীন্দ্র ও নজরুল কাব্যের ও জীবনাদর্শের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন শ্রীঅপূর্বরতন চৌধুরী, কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধাংশু দাশ। একক রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ 'পূজা' একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমাখনলাল হালদার, কুমারী মহামায়া লাহা, কুমারী অঞ্জলি মুখার্জি, অমিতা রায় এবং গীতা দাশ। নৃত্য পরিবেশন করেন কুমারী নিবেদিতা গুপ্ত, দেবযানী চ্যাটার্জি, কৃষ্ণা লাহা, সুমিত্রা লাহা এবং বাণী মল্লিক। তবলা সঙ্গত করেন শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ ও পূর্ণচন্দ্র পট্টনায়েক, সঙ্গীত অলঙ্কার। রূপসজ্জা মঞ্চসজ্জা আলোকনির্দেশ ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীমতী বীণা মুখার্জি ও শ্রীহরিহর সামন্তরায়, রাজু হালদার, ভ্রমর জেনা ও কার্তিকচন্দ্র দে। নৃত্য-পরিচালনা করেন কুমারী মমতা হালদার।

একক নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন—কুমারী মণিকা দাশ। 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠ করেন শ্রীসুধাংশু দাশ। লিখিত ভাষণ পাঠ করেন শ্রীবঙ্কিম চৌধুরী। একক শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ। নজরুল-সঙ্গীতসমৃদ্ধ গীতি-আলেখ্য সুধাংশু

পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের পূর্ব-উল্লেখিত শিল্পিবৃন্দ। দু' দিনই অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

নজরুল জয়ন্তী

গত ২৫শে মে '৬৯ রবিবার সন্ধ্যায় ৮০, বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া—১, 'অভিনব অগ্রণী' কিশোর মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে অভিনব অগ্রণী সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও অগ্রণী ছোটদের সংসদের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মদিবসে শ্রীদিলীপকুমার বাগের সভাপতিত্বে অনাড়ম্বর পরিবেশে সঙ্গীত-কবিতা পাঠ আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবাগ সহ ত্রিদিব মিত্র, মধুসূদন গাঙ্গুলী, অসীম বাগ, তপনকুমার ঘোষ, অনীতা বাগ, পঞ্চানন রায়চৌধুরী, অপূর্ব কুণ্ডু, নয়নরঞ্জন বিশ্বাস অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

দেবতার গ্রাস

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে উদয় ছোটদের সংসদের ভাইবোনেরা কবি রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে দর্শকদের মনে ছাপ রাখতে সমর্থ হয়। সর্বশ্রী প্রকাশ চৌধুরী, নান্টু চন্দ্র, দিলীপ দত্ত, নূপুর চক্রবর্তী, করবী চক্রবর্তী, রীণা দাস, কেতকী চক্রবর্তী, মীলু চক্রবর্তী, শিখা দাস, শিবশঙ্কর সেন প্রমুখ কিশোর শিল্পিবৃন্দ নৃত্য ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। মোক্ষদার ভূমিকায় তনুজা সাহার ব্যঞ্জনা মনোগ্রাহী হয়। সঙ্গীতাংশে শ্রীকাজল সেনগুপ্ত ও শ্রীপাপিয়া চক্রবর্তীর সুরেলা দরদী কণ্ঠ সকলকে মুগ্ধ করে। সমগ্র নৃত্যনাট্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন শ্রীপ্রশান্ত মৌলিক।

কুমারেশ চক্রবর্তী রচিত এ নাটক সম্প্রতি অভিনীত হল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। অভিনয় করলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বর্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। নাটকটি সাম্প্রতিককালের ছাত্র-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। সামগ্রিকভাবে অভিনয়, নির্দেশনা ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মগুলি প্রশংসার দাবী রাখে। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন পূরবী গুহঠাকুরতা, গৌতম মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ সাহা, সুখলাল রায়, বিশ্বনাথ লাহিড়ী, তপন রায় এবং নাট্য-রচয়িতা শ্রীচক্রবর্তী স্বয়ং।

চিলড্রেন নোভেল থিয়েটার-এর অনুষ্ঠানে 'হরবোলা'

প্রতি বছরের মতন এই শুভ নববর্ষে বিশ্বরূপায় অনুষ্ঠিত হল 'চিলড্রেন নোভেল থিয়েটার'-এর নবম বর্ষীয় অনুষ্ঠান। এতে অংশ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃত্য ও নাট্যসংস্থা। শুভ নববর্ষে 'বিশ্বরূপায়' প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান আমরা দেখলাম। পরিপূর্ণ দর্শকসারির উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা গেল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলার বিখ্যাত শিশু-নাট্য সংস্থা 'চিলড্রেন নোভেল থিয়েটার-'এর পরিচালকবৃন্দ।

দীপালী দেবচৌধুরীর পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'নূপুর'—ঝুমর নাচের মধ্যে দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। পরবর্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় 'ফ্লাওয়ার কর্নার'-এর 'নাগ' ও 'বাকিস নৃত্য'। পরিচালনায় ছিলেন মানসী দে চৌধুরী। আর এর সঙ্গে প্রশংসা না করে পারা যায় না বাংলার 'হরবোলা' 'বেতার-শিল্পী' শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়কে। ছিলেন 'বিশ্বরূপার' একমাত্র শিল্পী যিনি পর্দার অন্তরালে থেকেও উপস্থিত সকলের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। 'হরবোলা' শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় পর্দার অন্তরালে থেকে শুধুমাত্র কণ্ঠের সাহায্যে বিভিন্ন জন্তুর ডাকের মাধ্যমে 'চিলড্রেন নোভেল থিয়েটার'-এর 'বাঘ', 'সোনালী সিং' ও 'নকল রাজা' এই তিনটি নাটকে দৃশ্যের অবতারণা করেন। এই নাটকগুলি রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস। সহকারী পরিচালক হিসাবে ছিলেন চিত্রা দাস।

এই কয়েকটি নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে—'সনৎ দাস, অনীতা চক্রবর্তী, দীপা চৌধুরী, শুক্লা চক্রবর্তী, রাজা দাশগুপ্ত, সুপ্রিয়া গাঙ্গুলী, তাপস চ্যাটার্জী, কাকলি দাস, দীপা সাহা, চিত্রা চ্যাটার্জী, অনিন্দিতা সেন, মিতা চ্যাটার্জী, তিলক চ্যাটার্জী, মালা সাহা ও রোশনারা, কাকলি দাস ও তাপস চ্যাটার্জীর অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলার এই উদীয়মান দুই শিল্পী বহু নাটকে বিভিন্ন রূপদান করে পুরস্কার লাভ করে।

নাটকে নেপথ্য সঙ্গীতে কণ্ঠদান করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন—তপতী দাস, গৌরী সেনগুপ্ত, সুপর্ণা রায়-গুপ্ত ও পিয়ানোতে ছিলেন—ভরত কারকি।

সমান্তরাল

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক প্রশান্ত চৌধুরীর সামাজিক কাহিনী 'সমান্তরাল' রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করার দায়িত্বে রয়েছেন গুরু বাগচী। চিত্রটির চিত্রনাট্য ও চিত্রের প্রথমাংশের পরিচালক স্বর্গত নির্মল দে। নির্মল দের মৃত্যুর পর চিত্রটি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন গুরু বাগচী। চিত্রটির সঙ্গীতাংশের ভার অর্পিত হয় স্বনামধন্য শিল্পী ও সুরকার শ্রীশ্যামল মিত্রের উপর। চিত্রটি পরিবেশনায় রয়েছেন মিলি পিকচার্স। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পদ্মা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, কালী সরকার, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু ও মা: মলয় প্রমুখ। স্যাডো মুভীজ-এর নিবেদন 'সমান্তরাল'।

আঁধার সূর্য

সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত চিত্র আঁধার সূর্য। চিত্রটিতে সুরস্রষ্টার দায়িত্ব বহন করেছেন প্রবীণ ও খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির শিল্পি-তালিকায় রয়েছেন দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, কমল মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ-কুমার প্রমুখ। নায়কের ভূমিকায় রয়েছেন মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন রীণা ঘোষ। আর ডি বনশল নিবেদিত চিত্র আঁধার সূর্য।

স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে

কালকূট কৃত (সমরেশ বসু) কাহিনীকে চিত্ররূপ দিয়েছেন পীযূষ বসু। চিত্রটির নাম 'স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে'। চিত্রটির সুরকার হলেন শৈলেন রায়। চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন কালীপদ দত্তগুপ্ত; চরিত্র-চিত্রণে মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, স্বরূপ দত্ত, বেবী রীতু প্রমুখ। সারদা চিত্রবাণীদের চিত্র 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন আর ডি বনশল।

পরিণীতা

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সামাজিক কাহিনী পরিণীতাকে চিত্রে রূপদান করেছেন চিত্র-পরিচালক অজয় কর। চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্তা, যমুনা সিংহ, রমি চৌধুরী, নীরা মালিয়া, সমিত প্রমুখ। চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন অজয় কর ও বিমল দে। চিত্রলিপি ফিল্মস নিবেদিত চিত্র পরিণীতা।

বিলম্বিত লয়

অগ্রগামী পরিচালিত চিত্র বিলম্বিত লয়। চিত্রটির অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন উত্তমকুমার, নির্মলকুমার, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, দীপা চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী প্রমুখ।

ইন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদমফুল' চিত্রে নায়িকা শ্রীমতী তনুজা ও নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

লা' স্ট্রাডা'র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে ছিলেন তাঁর স্ত্রী গিলেটো মাসিনা।

'আই ভিটোলোনি' সম্বন্ধে আরো বলা প্রয়োজন যে, এটি ফেলিনিরই রচনা ও পরিচালনা। ইটালীতে এই সময়ের মধ্যে যে সব চিত্র সবচেয়ে বেশী অর্থ এনে দিয়েছে 'আই ভিটেলিনি' তার মধ্যে দ্বিতীয়। ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই চিত্রটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করে।

লা স্ট্রাডা' সম্বন্ধে ধর্মের দিক থেকে কেহ কেহ বলেন, কি ভাবে দুটি আত্মার মুক্তি হল আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

'ইল বিডোন' চিত্রে ফেলিনির প্রথম জীবনের ছবি দেখতে পাই, যখন তিনি রোমে সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তাঁর চিত্রে আমরা দেখতে পাই শঠতা এবং সংঘাতের ছবি।

ফেলিনি নিজেই বলেন, লা স্ট্রাডা এক নিশ্বাসে তিনি শেষ করেছেন, কিন্তু 'বিডোন' অত্যন্ত সতর্কতার ও অনেক বিপদের মধ্যে তৈরি করতে হয়েছে। যার ফলে তাঁর এই চিত্রে অনেক বেশী শিল্প-কৌশল ও দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'ইল বিডোন'কে তাই অনেকাংশে 'লা স্ট্রাডার'ই অনুরূপ খণ্ড বলা যেতে পারে। তাই 'লা স্ট্রাডা' যদি পাপস্খলন হয়, 'ইল বিডোন' নরক ছাড়া কিছু নয়। এছাড়া দুটি প্রবর্ধন বা গতি এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় অথবা একই গতিকে দুটি বিভিন্ন ভাগে দেখান হয়েছে বলা চলতে পারে। প্রথমে যা ছিল সাঙ্কেতিক এখন তা আরো স্পষ্ট উচ্চারিত।

'বিডোন'কে কিছুটা 'ভিটেলেনি' চরিত্রের বলা যেতে পারে। 'ভিটেলেনি' একদল ছন্নছাড়া বেকার আশাহীন যুবক। কেবলই বিরক্তিপূর্ণ, গরীবের সঞ্চিত অর্থ ঠকিয়ে নেওয়া যাদের কাজ। নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গভীরভাবে তারা চিন্তা করেনা। যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা অন্য কোন সঙ্কটের দিকে বিশেষভাবে বাধিত হয় অর্থাৎ বাস্তব সত্যের মুখোমুখি না আসে। ফেলিনি চিত্রের এই হল আসল সত্যরূপ।

ফেলিনির পরবর্তী চিত্র 'লা নোটি ডি ক্যাবিরিয়া।' ফেলিনির অসংখ্য অনুরাগিবৃন্দকে যা হতাশ করেছে বলা চলতে পারে। অনেক কারণও তারা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ।

তবুও নাটকটির বিশেষত্ব এই যে, ফেলিনির সব নাটকই গতিময়, ইহাই একমাত্র স্থিতিশীল।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকটির নাটকীয় দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু ঘটনাবলীকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে গিয়ে ফেলিনি তাঁর শিল্পী-নিপুণতা দেখিয়েছেন। 'নাইট অফ দি ক্যাবিরিয়া' অস্কার ছাড়াও আন্তর্জাতিক আরো ষাটটি পুরস্কার অর্জন করে। 'ফরচুনেলা'র গল্প ফেলিনির নিজস্ব। ইহা অন্যান্য চিত্র হতে পৃথক; কারণ এখানকার সময় আর আত্মগত নয়। কাব্যিক দিকও চলে গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা এক সুন্দর উপভোগ্য চিত্র।

'লা ডোলচে ভিটা' ফেলিনির সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে সমালোচনাপূর্ণ চিত্র। ১৯৬০ সালে কেনস্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার ও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জনকারী এই চিত্র দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ও সমালোচকদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। কি দর্শক-সংখ্যার দিক থেকে। কি টিকিট বিক্রীর দিক থেকে বিশ্বের বহু রেকর্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছে। 'গন উইদ দি উইণ্ড' এরপর এতবড় লাভজনক ছবি খুবই কম তোলা হয়েছে।

'লা ডোলচে ভিটা'র বিষয়বস্তু হচ্ছে মানবিক যন্ত্রণা। ইহার মধ্যে ফেলিনির পরবর্তী চিত্রের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। নাটকের মধ্যে দেখান হয়েছে কি ভাবে এক বুদ্ধিদীপ্ত দুশ্চরিত্র পুরুষ জীবনের ধারাকে ঘুরিয়ে ফেলল।

নাটকটির জগৎ এক অপ্রশমিত আঁধারে। শহরের এক তিমির ঘন রাত্রি, অনেকে বলেন ইহা এক নির্দয় ও নিষ্করুণ সামাজিক সমালোচনা। রাত্রির আলোছায়ার খেলা এই নাটকের প্রধান জিনিষ। কিন্তু নাটকটির শেষে আমরা আলোর সন্ধান পেয়েছি। এই আলোর সন্ধানই নাটকটিকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছে। ছবির নায়ক হল সার্থক ও মোহমুক্ত এক সাংবাদিক। ফেলিনির পরবর্তী চিত্র '৮-১।২'। কিন্তু তার আগে উপাখ্যানমূলক চিত্র 'লা টেনটাজিওনি ডেগ ডোটার এ্যানটোনিও' বোক্কাচিও ভাবধারাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। ইহারই শিল্প-নিপুণতা '৮-১।২' তে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'৮-১।২' ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে একজন লেখককে নিয়ে। ইহাকে ফেলিনির ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিও বলা চলে। চিত্রটি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। গুইডো ভিড়ের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় গাড়ীর মধ্যে বসে আছে। তার চারিদিকে শত্রু। ফেলিনির বাল্যকালের সঙ্গীও এই চিত্রের মধ্যে বর্তমান। 'লা ডোলচে ভিটা'র মত '৮-১।২' একটি সত্যসন্ধানমূলক নাটক। এর বিষয়বস্তু আগের অনেক নাটক থেকে নেওয়া।

সেই চিরপরিচিত ইমেজ বা প্রতীক সমুদ্র। পাহাড়ময় ফাঁকা নির্জন স্থান, আত্মসমালোচনার প্রস্তুতির স্থান। '৮-১।২'

বাস্তবধর্মী পরিচালক ফেডেরিকো ফেলিনি

বিচিত্র বোম্বাই

হালফিল এখানে দুর্ঘটনার যেন এপিডেমিক লেগে গিয়েছিলো। এ কোনো সাজানো ব্যাপার নয়, কিন্তু যেমন স্যুটিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কৃত্রিমতার নাম গন্ধ ছিলো না-একেবারে পুরোমাত্রায় অকৃত্রিম। তবে হ্যাঁ বড়দরের কিছু হতে পারেনি এইটাই পরম লাভের। কিছুটা লোকসান অবিশ্যি সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির হয়েছিলো তাতেও কোনো ভুল নেই।

ধর্মেন্দ্র এবং প্রাণের কথাই ধরুন। খ্যাতনামা শিল্পিযুগল বেশ খোশ মেজাজেই সেদিন দৃশ্য গ্রহণে অংশ নিতে এসেছিলেন ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে। 'প্যার হী প্যার' ছবির সেট পড়েছে, বিরাট আয়োজন ধর্মেন্দ্র আর প্রাণ জ্বলন্ত মশাল নিয়ে একটি দৃশ্যে কাড়াকাড়ি করবেন চিত্রনাট্যের এমনই নির্দেশ। ওঁরা নির্দেশমতো মহড়ায় মেতে উঠলেন। নিশ্চয় ব্যাপারটাকে ওঁরা বাস্তবোচিত করতে চেয়েছিলেন বিশেষভাবে ঘটলো বিপত্তি।

ধর্মেন্দ্রর কোটে ধরে গেল আগুন। আগুন লাগলো প্রাণের চুলে। হৈ হৈ কাণ্ড। আতঙ্কে সবাই আড়ষ্ট। ত্বরিতে উভয়েই কোট এবং চুল খুলে ফেললেন। রক্ষে পেলেন দারুণ দুর্ঘটনার হাত থেকে। ভাবছেন কোট তো খুলে ফেলা সহজ কিন্তু চুল খুলে ফেলাটা কেমন রহস্যজনক। কিন্তু প্রাণকে যাঁরা ভালো করে দেখেছেন। ছবির জগতের বাইরে তাঁরা এঁনাকে সহজেই মেনে নেবেন। ও চুলগুলো পরচুলো---ইচ্ছে মতো যত্র তত্র স্থানান্তরিত করায় কোনই অসুবিধে নেই। এবং সেই কারণেই ভদ্রলোক চতাশনের লোলুপ-তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পেরেছেন।

রমেন চৌধুরী

বিরলকেশ হওয়া দেখছি শাপে বর হলো প্রাণের। তবে ধর্মেন্দ্র তাঁর পোড়া কোটের জন্যে কিছুটা ক্ষুব্ধ। হতেন ছবির নির্মাতারাও, যদি দৃশ্যটা সেদিন না গৃহীত হোতো। দুর্ঘটনার আগেই ওই বিশেষ দৃশ্যটি ক্যামেরায় বন্দী করা গিয়েছিলো সঠিকভাবে।

রাজেন্দ্রনাথের ব্যাপারে কিন্তু জিনিসটা অতো সহজে মেটেনি। তাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালশায়ী হতে হয়েছিলো। রসরাজ রাজেন্দ্রনাথ বর্তমানে খুবই ব্যস্ত শিল্পী। কেবল শুটিং আর শুটিং করে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। দু'তিন শিফটে একটানা চলেছে কাজ। এই কর্মব্যস্ততার মাঝে আবার সামাজিকতার আহ্বান রয়েছে, তাতে সাড়া না দিয়েও রক্ষে নেই। অতএব সেদিন তিনি নেমন্তন্ন খেতে এলেন সান-অ্যাণ্ড-স্যাণ্ড হোটেলে। সেখানে সমবেত সকলের সঙ্গে হাসি গল্প প্রভৃতি সেরে যখন শিল্পী তাঁর গাড়ীতে আসন নিলেন রাজ্যের পরিশ্রান্তি যেন সর্বাঙ্গে চেপে বসেছে।

এইটাই তো স্বাভাবিক। মানুষ মেসিনের মতো কাজ করে গেলেও তার দেহটা নিশ্চয় যন্ত্র নয়। কাজেই অবসন্ন দেহে বোধহয় অর্ধনিমীলিত চোখে অ্যাকসিলেটরে চাপ দেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেঁধে গেল সংঘাত। গাড়িটা তো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তারা অদ্ভুতভাবে রক্ষে পেয়ে গেলেন, পেছনের সিটের তিনজন সোয়ারীও বেঁচে গেলেন চমকপ্রদ উপায়ে। তাবলে ভাববেন না কারুরই গায়ে কোন আঁচড় লাগে নি।

আঘাত ঠিকই পেয়েছিলেন সবাই আর তার মধ্যে রাজেন্দ্রনাথের আঘাতটা হয়েছিলো বেশ গুরুতর। ঘটনাস্থলের পাশেই নায়ার হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট এড দেয়া হোলো। তারপর বিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই রাজেন্দ্রনাথ আরোগ্য লাভ করলেন। ফ্যানরা তো ভেবেই অস্থির। তারা রোজই অসংখ্য চিঠি পাঠিয়েছে শিল্পীর দ্রুত নিরাময় কামনা করে। শুভ কামনার নিশ্চয়

ফেলিনির জীবনেতিহাস। গঠন প্রণালীর দিক থেকেও ফেলিনি এতে সুনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর এই ছবি সম্পর্কে সিনরা ফেলিনি বলেন, ওর ছবি মজার ছবি, ঠাট্টা তামাসা ওর ছবিতে আছে। আমার খুবই ভাল লাগে তবে ৮-১/২ ছবিটি এতই করুণ যে ওটি দেখার পর আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। বহুদিন ওর সঙ্গে আমি কোন কথা কইনি।

ফেলিনির সুখ্যাতি তাঁর চলচ্চিত্রের উপরে নাটক লেখা এবং প্লট ও চরিত্র অঙ্কনের উপর অবস্থিত। শব্দ, দৃশ্য, চরিত্র, কথা ও তার ভঙ্গিমা সব কিছুই সুন্দরভাবে তাঁর পরিচালিত নাটকে বর্তমান।

যদি কোন স্রষ্টা নির্দেশক ও পরিচালক নিজেকে চলচ্চিত্রের জগতে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন করে থাকেন তবে তিনি ফেলিনি। তাঁর চলচ্চিত্র নাটক ও তাদের সুস্পষ্ট ভাবপ্রবণতা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের নিকট ভয়ের কারণ হতে পারে তবে মানুষকে তিনি কোনদিন দূরে সরিয়ে রাখেন নি। সর্বোপরি তাঁর চলচ্চিত্রে প্রত্যেক দর্শকই অভিনব সৃষ্টির ছাপ অনুভব করে।

ফেলিনির বিষয়-বস্তু ফেলিনি নিজেই। জীবনের প্রত্যেকটি পটভূমি তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। সরাসরি ধর্ম কিংবা সাংবাদিকতা নয় তার চেয়ে আরো বড় ও মহৎ অন্বেষণ আছে তাঁর।

বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়ে থাকে। [illegible] সকলের আগে হচ্ছে কিসমৎ।—

●

নায়িকা আশা পারেখের হাতে এখন অনেক ছবি। রকমারি চরিত্র চিত্রণের ব্যবস্থা। শিল্পীর ধার প্রমাণিত এমন অবস্থাতেই। তা ছাড়া একই ধরণের ভূমিকায় যদি ক্রমাগত দেখা যায় কাউকে একঘেয়ে লাগেই। যতো ভালো সন্দেশই হোক, দু চারটের পর মুখ মেরে দিতে বাধ্য। তখনই দরকার হয় রসের জিনিস, রাবড়ি, ক্ষীরের সান্নিধ্য। শ্রীমতী আশার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এমনটাই ঘটেছে। উনি শক্তি সামন্তের 'কীট পতঙ্গ' ছবিতে যে চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন সেটা বিধবা নারীর। জে ওমপ্রকাশের 'আয়া শাওন ঝুমকে'তে ওঁকে দেখা যাবে লেডি ডাক্তাররূপে গুপ্তচর চক্রের নায়িকা হয়েছেন আশা আগ্রা-রানের 'চন্দা আওর বিজলী' চিত্রে। এক জাল রমণী হতে দেখা যাবে ওঁকে নাসির হোসেনের পরবর্তী ছবিতে। সেই যে কথা আছে না 'আহার এবং ওষুধ' এও অনেকটা তাই। রঙবেরঙের ভূমিকা, বিচিত্র সাজসজ্জা, ক্রিয়াকলাপ, দর্শকের চোখ ধাঁধাবার বন্দোবস্ত। শ্রীমতী আশা এত দিনে প্রকৃতই সুযোগের সম্মুখীন। পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলে ইনাম পাবেন যথেষ্ট।

আশা পারেখের আসন্নমুক্তি কয়েকখানি ছবি হচ্ছে: চিরা—ওঁর বিপরীত নায়ক হয়েছেন সুনীল দত্ত; পেয়ার কা মৌসম (নায়ক: শশী কাপুর); আয়া শাওন ঝুমকে (নায়ক: ধর্মেন্দ্র); পাগলা কাঁহিকা (নায়ক: শশী কাপুর); সাজন (নায়ক: মনোজকুমার) ও মহল (নায়ক দেব আনন্দ।)

নতুন ছবি। নাম: 'পূরব পশ্চিম' বিশাল ইণ্টারন্যাশনালের পতাকাতলে বিশাল ভাবেই তোলা হচ্ছে ছবিটি। তুলছেন মনোজকুমার। উনিই একাধারে প্রযোজক, লেখক এবং নায়ক। সায়রা বানু নায়িকার রূপসজ্জা নিচ্ছেন। সম্প্রতি ছবির একটানা আঠারো দিনের দৃশ্য গ্রহণ সমাধা হয়েছে ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে কাজ হয়েছিলো দুটো সেটে যেসব শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রাজেন্দ্রনাথ, প্রেম চোপরা, কুলজিত, মদনপুরী একেবারে খাস হিপি জনাকয়েক (ছেলে মেয়ে দুইই) অবতীর্ণ হোলো বিশেষ দৃশ্যে। অনুরাগীরা নিশ্চয় এ খবরে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। জানা গেছে দৃশ্যটি বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। আড়াই সপ্তাহব্যাপী স্যুটিং-এ একখানা ভজন গানও চিত্রায়িত হয়েছে। 'পূরব-পশ্চিম-এর' সুর সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন কল্যাণজী ও আনন্দজী।

●

এস ডি নারাং তাঁর সর্বশেষ ছবি 'অনমোল মোতি'-র কাজ শেষ করে ফেলেছেন। 'দিল্লী কা ঠগ', 'বোম্বাই কা চোর' প্রভৃতি চিত্রে শ্রীনারাং পরিচালকরূপে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন আলোচ্য ছবিটিও নানা দিক থেকে উল্লেখনীয় হবে বলে জানা গেছে। জলের তলায় কাহিনীর বিস্তার এ ধরণের ভারতীয় চিত্র প্রয়াস ইতিপূর্বে আর হয়নি। সমুদ্রের ভূমিকা ছবিতে মুখ্য। মানুষের শৌর্যবীর্য আত্মত্যাগ প্রভৃতি গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। চোখ ধাঁধানো চিত্তাকর্ষক অনমোল মোতি সকলের মন জয় করতে পারবে বলে নির্মাতাদের ধারণা, শিশু এবং ছাত্ররা তো বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হবে গল্পের বি[illegible]াসের
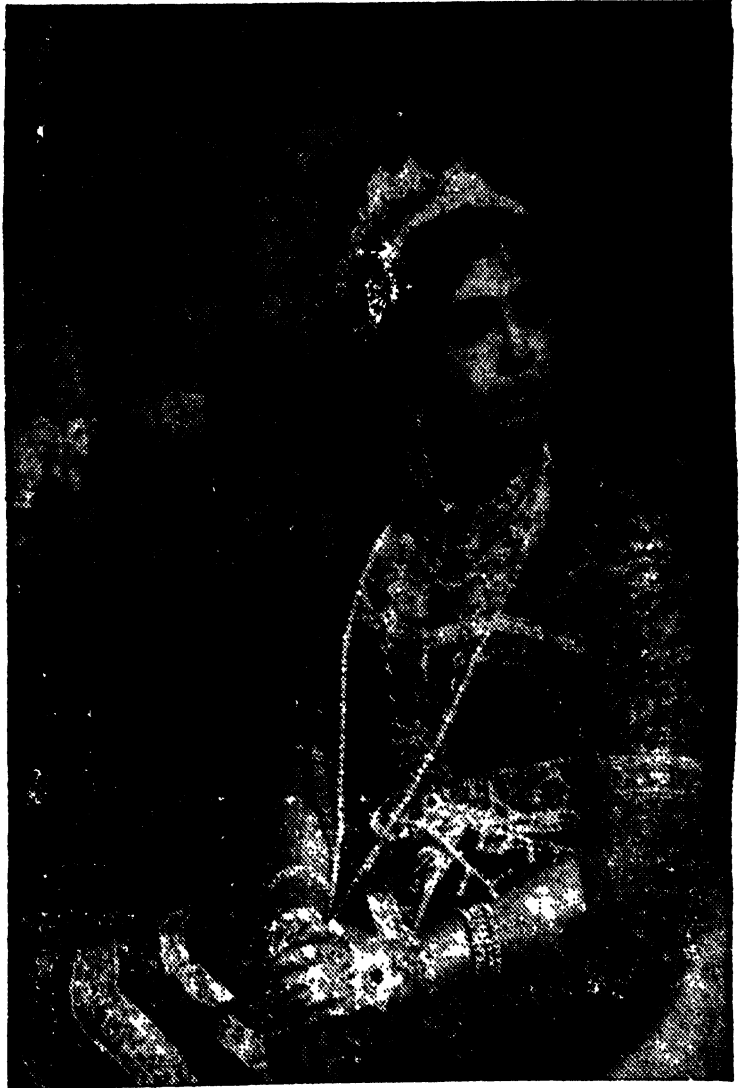
গোপালকৃষ্ণ রায় পরিচালিত 'নল দময়ন্তী' চিত্রে দময়ন্তীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গুণে। বিমল চট্টোপাধ্যায়কৃত স্ক্রীন অ্যাডাপটেশনে সংলাপ লিখেছেন এইচ এ রাহী। সুধীন মজুমদার ফটোগ্রাফীর দায়িত্বে আছেন। সঙ্গীত পরিচালক রবি গানে সুর দিয়েছেন। গোপীকৃষ্ণ নৃত্য পরিচালনা করেছেন। শবনম এবং জগদীপ প্রধান চরিত্রে দুটির শিল্পী। রাজেন্দ্রনাথ আর অরুণা ইরাণীর ভূমিকা এ ছবিতে বিশেষ উপভোগ্য। জয়ন্ত, গজানন জাগীরদার, সাপ্রু, বীণা, টুনটুন, জীবন প্রভৃতি সহ-শিল্পি তালিকার শোভাবর্ধন করেছেন।

গোটা মাসটাই এপ্রিলের 'ফুল' বানাবার জন্যেই বুঝি উন্মুখ। অবিশ্যি শুরুর রেশ বেশ খানিকটা থেকেই থাকে। তাই নিশির আঠারো তারিখের ঘোষণায় চিত্রলোকের মানুষজন কেমন বোকা বনে গিছলেন। ওই দিনই নিশি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী রাজকুমার কোহলীকে বিয়ে করলেন। একান্ত সচীবকে জীবন-সাথী করার জন্যে সকলের বিস্ময় নিশ্চয় জাগে নি। তাঁরা অবাক হলেন অন্য কারণে। এতদিন প্রচারিত ছিলো রাজকুমার কোহলী হচ্ছেন নিশির ভাই। হঠাৎ সে পরিচয়ের এ হেন পরি-ণতিতে কেই না বিস্ময় বোধ করবে? এতে করে চিত্রজগতের সেই সংশয় বাক্যটি আবার প্রমাণিত—'যা দেখছো, যা শুনছো তা সর্বৈব ভিত্তিহীন, অতএব সাবধান।'

নিশি পাঞ্জাবের মেয়ে। জন্মস্থান শিয়ালকোট (পশ্চিম পাকিস্তান)। আজ চোদ্দ বছর ধরে চলচ্চিত্রে অংশ নিচ্ছেন। রাজকুমারের সঙ্গে গত বছর ওঁর মতান্তর হয়। মতান্তর শেষে মনান্তরে রূপ নেয়। ফলে শ্রীকোহলী সব ফেলে গৃহত্যাগ করে চলে যান। এরপর উনি চিত্র প্রযোজকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন ছবির নাম ঘোষণা করলেন: 'খণ্ড'। তবু যাহোক হয়তো ওঁদের মিটমাটের শর্তও হয়ে গিয়েছিলো। ফলে রাজকুমার নিশিকে পেল ভাবছেন? তা পেল তবে এ নিশি সে নিশি নয়। এ ঘর ছাড়ায় না, ঘর বাঁধায়।

শ্রীমতী অঞ্জলি: 'সীতার বনবাস' চিত্রে

গ্যাম্বলার ছবিটির সবচেয়ে একটা সেটের কাজ সমাধা করেছেন প্রযোজক পরিচালক অমরজিৎ। শরত্তানন্দের আড্ডায় এই চলচ্চিত্রায়ণে অংশ নিলেন দেব আনন্দ এবং নবাগতা জাহিরা। কাহিনীকার কুশল ভারতী। গান লিখে-ছেন নীরজ। সুর সংযোজনায় রয়েছেন শচীন দেব বর্মণ। কাহিনীর অপরাপর চরিত্রে দেখা যেবেন রসিদ খান, মদন সিংহ, জগদীশরাজ, মাস্টার শচীন এবং আ ডজনেক ছোটখাটো শিল্পী। ফাল্গুনি ইরাণী 'গ্যাম্বলার'-এর চিত্রশিল্পী।

মুকেশ আর আশা ভোঁসলে দ্বৈত কণ্ঠে গাইলেন গানখানি। আনন্দ বক্সীর রচনা। 'পেয়ার কিয়া করসে' ছবির শুভ সূচনা হয়ে গেল এরই মাধ্যমে। বিজয় সাহু প্রযোজিত ছবিটির পরিচালক কিশোর সাহু। পিতা এবং পুত্রের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে আকর্ষ-ণীয় গল্পটি। ন' দিনের দৃশ্য গ্রহণও হয়ে গেছে। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন সঞ্জয়, হেলেন, ললিতা চ্যাটার্জি, জানকী দাস, ইন্দিরা বিল্লী প্রমুখ। ফিল্ম ইনস্টিট্যুটের দুটি ছাত্রকেও এ ছবিতে দেখা যাবে। এরা কমেডিয়ান আর মোল্টো ও আসরাণী।

উচ্চবাচ্য শুনা যায়, কিন্তু শেষের লাইনটার উচ্চবাচ্য অমীমাংসিতই থেকে যায়। বর্তমানে অনেক বুদ্ধিমানের দল লাড়ম্বর বাগাড়ম্বর করে চলেছে যে, সত্য ও মিথ্যা ভাল ও মন্দ এ দুটোই whims of mortal will এদের মধ্যে কেউ না কেউ রাজনীতির তুঙ্গ শীর্ষে অবস্থান করছেন, কেউ না কেউ পকেটমারের দলপতি। হায়রে সাম্য নীতি। এই নীতির রাম নাম ছাড়া পথ নেই।

হে মহর্ষি বাল্মীকি। প্রথম জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না, জড়-বাদকেই প্রাধান্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু সফল হলো না সে আশা—রামনাম করতে করতে 'রামায়ণ' রচনা করলেন। চিত্তে অনাবিল শান্তির সৃষ্টি হলো। সে অনাবিল শান্তির স্পর্শ আমাদের সাম্য নীতিতে প্রদান না করুন ক্ষতি নেই—কর্ণকুহরে রামনাম দিলেই চলবে। অহঙ্কার, হিংসা ও দম্ভের ত্রিভুজে গড়া রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি কিছুতেই দৃঢ় থাকতে পারে না। এ কথা বিজ্ঞান ভিত্তিক সত্য।

আষাঢ় মাসের প্রথম দিন এবার মিথুন রাশি। মিথুন লগ্ন থেকেই আষাঢ় মাসের বিরহকাতর সূর্যদেবের প্রভাতী আগমনযাত্রা স্থুরু হলো। আশাবাদী ও আত্মিক সম্বন্ধে কাতর সূর্য দ্বিতীয় পতি চন্দ্রের সাথে লগ্নে দুঃখকাতর হয়েই সহাবস্থান করছেন। অপর দিকে দুঃখবাদী শনি, যিনি অষ্টম ও নবমপতি একাদশে নীচস্থ ভাবে ক্রুর অভিলাষী ও কুমন্ত্রণাতৎপর নাশস্থ শুক্রের সাথে সহাবস্থান করে চন্দ্র ও রবির উপর রোষ কষায়িত অন্তর-দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলবেন এই মাসকেই কেন্দ্র করে। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক আকাশ স্বচ্ছ সুন্দর হয়ে দেখা দিবে না। স্থানে স্থানে দাঙ্গা, হাঙ্গামা, বন্যা, ভূমিকম্প (চন্দ্র ও রবি ষষ্ঠস্থ ভাব বিচারে) ইত্যাদির যোগ দৃষ্ট হয়। পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট দলগুলো একের এক পর বিচ্ছিন্ন হয়ে

There is no Good,
there is no Bad, there be the whims of mortal will:
That works me weal that I call "good" what harms and hurts me I hold as "ill".

—Sir Richard Burton,
The Kasidah.

ভৃগু-আচার্য

পড়ার সম্ভাবনা। কন্যারাশি হিসেবে পশ্চিম বাংলার বিচারে উক্ত দলের কর্মস্থান বাস্তবিকই অশুভ। প্রতিটি দলেই কর্মের বিষয় নিয়ে নানাবিধ উপায়ে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করতে থাকবে। সুতরাং আষাঢ় মাস যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে শুভসূচক নয়। যাক, রাজনৈতিক আলোচনাকে এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা

এগিয়ে যাওয়া শ্রেয়। অবশ্য এক্ষেত্রে মঙ্গল সর্ববিধ বিঘ্নহন্তারক। মাসির গোচর হিসেবে বলা হলো।

ইংরেজী ১৬ই জুন থেকে ১লা আষাঢ় আরম্ভ হলো। ১লা আষাঢ় দং ১৭।২৬ পলে বুধ ৪ রোহিণী নক্ষত্রে, ১১ই ৩৯।৪৬ পলে বুধ ৫ মৃগশিরা নক্ষত্রে ১২ই ১৩।১০ পলে শুক্র ৩ কৃত্তিকা নক্ষত্রে, ১৫ই ২৩।১১ পলে শুক্র বৃষরাশিতে এবং ১৫ই ৫৩।২৭ পলে বুধ মিথুন রাশিতে যাবেন। ১৭ই ২৭।২৬ পলে মঙ্গল বক্র-ত্যাগ করবেন। ১৯শে ২৯।৪ পলে শীঘ্র বুধ পূর্ব দিকে অস্তমিত হবেন। ১৯শে ৫১।২০ পলে বুধ ৬ আর্দ্রা নক্ষত্রে, ২১শে ১২।৪০ পলে শনি ২ ভরণী নক্ষত্রে, ২৩শে ১০।৩ পলে রাহু ২৫ পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে, ২৪শে ৪১।৩৮ পলে শুক্র ৪ রোহিণী নক্ষত্রে এবং ২৭শে ২১।৫৮ পলে বুধ ৭ পুনর্বসু নক্ষত্রে যাবেন।

নিম্নে সূর্যের মিথুন রাশির সংক্রমণ-কালীন গ্রহাবস্থান নির্ণায়ক চক্র প্রদান করা হলো।
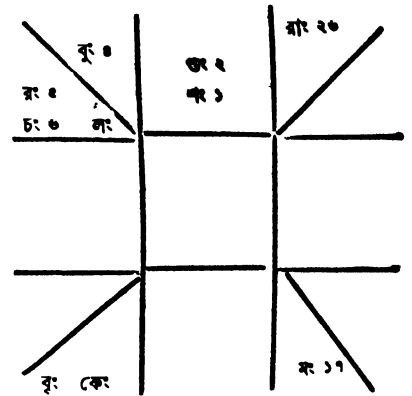
মেষঃ আশা-আকাঙক্ষার কেন্দ্রভূমি এই মনই তো বারংবার বিকেন্দ্রিত হচ্ছে হতাশার নিষ্ফল আক্রোশে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের ব্যবহার মর্যাদাপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে না। এলোমেলো চিন্তাগুলো ছড়িয়ে থাকবে মনের চারদিকেই। কোন সমস্যাই সমাধানের রূপ নিবে না। প্রতিটি মানুষকেই শেষটায় অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে দেখতে

লোকের অভাব রয়েছে এ জগতে—এই স্পষ্ট সুন্দর কথাটা অনেক সময় বারংবার অনুরণিত হতে থাকবে। স্বাস্থ্য ১৪ই আষাঢ় অবধি সুস্থভাবে থাকবে বলে মনে হয় না। আষাঢ় মাস আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবচন রয়েছে—এ মাসে বৃদ্ধদেরও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আহার, বিহার ও শয়ন যতটা সম্ভব নিষ্ঠাপূর্ণ হওয়াই কর্তব্য। আর্থিক যোগাযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ১৮ই আষাঢ়ের পর তা ক্রমশ কার্যকরী হয়ে দেখা দিতে পারে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সাহিত্যিক ও চিত্রতারকাদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পেতে পারে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার মোটামুটি। হঠাৎ কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি। শত্রুতার সৃষ্টি হ'লেও ভয়ের কারণ নেই। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পায়ে বা কোমরে আঘাত পাবার সম্ভাবনা রয়েছে ৬ই থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে। ১৮ই আষাঢ়ের পূর্বে নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা সমীচীন নয়। তা ছাড়া এ মাসে ধর্ম, কর্ম, আয় ও ব্যয়ের স্থান মধ্যমই বলা চলে। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ স্থগিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মেষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আয়ের পথ অশুভ। ভ্রাতাদের নিকট হতে অপমানিত হবার যোগ রয়েছে। নিশ্চিত বিবাহযোগ নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যান-বাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়।

বৃষঃ সংসারক্ষেত্রে চলেছে অর্থহীনতার দাবানল। চারদিকেই প্রয়োজনের সতর্ক কর্মীরা 'ঘেরাও' করে রেখেছে। পুত্র-কন্যাদের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থার দাবী, সংসারে আহার্যের ন্যায্য দাবী, বাসস্থান ও বাসগৃহের স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক পরিবেশের দাবী—এক কথায় প্রয়োজন আর প্রয়োজনীয়তার দাবী। ধৈর্য ধরে কর্ম করতে হবে। নিজেকে অসহায় মনে করলে চলবে অপমানের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে বা মামলা-মোকদ্দমাতেই নিষ্পত্তি ঘটবে তাদের পক্ষে একমাত্র ধৈর্যই মহাস্ত্ররূপে পরিগণিত হবে। ১২ই আষাঢ়ের পর মানসিক অবস্থা ক্রমশ শুভ হয়ে দেখা দিবে। স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা শুভই থাকবে, তবে লীভারের অহিতজনক কার্যাদির হাত থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব মুক্ত রাখা যায়, সেদিকে যত্নপর হওয়া সমীচীন। আর্থিক যোগাযোগ প্রায় ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যাবে। চাকুরী প্রার্থীদের চাকুরী লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ১৮ই আষাঢ়ের পর, কনট্রাক্টর, জ্যোতির্বিদ সাহিত্যিক, ডাক্তার ও প্রকাশকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অশোভন বলে মনে হবে। বিষয়-সম্পত্তি বিষয়ক মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভ হবে বলে মনে হয় না। ১৮ই থেকে ২২শে আষাঢ়ের মধ্যে ছোটখাটো ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। কোন বন্ধুর দ্বারা অপমানিত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। বৃষলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ভ্রাতৃপক্ষ থেকে অপমানিত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির যোগ বিদ্যমান রয়েছে। কোন কুচক্রী ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুনঃ স্বার্থপরতার বিষ নির্গত হচ্ছে ক্রমোত্তর কর্মক্ষেত্রের জটিল আবেষ্টনীতে মনটাও যেন অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে চলেছে। অবচেতন মনের চিন্তা চেতন মনে উঁকি মারতে চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায় চেতন মনকে আচ্ছন্ন করতে পারছে না কোনক্রমেই। অনেক অকথিত কাহিনী রয়েছে, যা অপ্রকাশ্য বা গোপন হলেও বর্তমান, এর বাস্তব মূল্য রয়েছে, কিন্তু সে বাস্তবের প্রকাশ বর্তমানেও সময় হয় নি। ১৮ই আষাঢ়ের পর কিছুটা প্রকাশ করা অযৌক্তিক হবে না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১০ই আষাঢ় আর্থিক যোগাযোগ প্রায় ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যাবে। কেন-না সেক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে রাহুর দৃষ্টি বর্তমান। মামলা-মোকদ্দমা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ৮ই থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুতার সৃষ্টি হবে। নিজের মতামত অনেক সময় কার্যকরী হয়ে দেখা দিবে না। আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে আর্থিক বিষয়ে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। ১০ই থেকে ১৪ই আষাঢ়ের মধ্যে পুত্র বা কন্যার হঠাৎ শারীরিক রোগভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে কৃতকার্যতার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, কোনরূপ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। মামলা-মোকদ্দমার (পুরাতন) ফল শুভসূচক। নূতন বিবাহিত দম্পতিদের দাম্পত্যজীবন শুভ যাবে না। একটু-না-একটু অশান্তির সৃষ্টি হবেই হবে। হঠাৎ ভ্রমণের যোগ আসতে পারে। ৫ই থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে ব্যবসায়মূলক কোন কর্মাদিতে অর্থব্যয় থেকে যতটা সম্ভব বিরত থাকাই সমীচীন। মিথুন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য, অর্থ, পুত্র ও মামলা মোকদ্দমাদির স্থান শুভসূচক নয়। নিজের বুদ্ধির দোষে ১০ই থেকে ১৮ই আষাঢ়ের মধ্যে অর্থক্ষতির যোগ দৃষ্ট হয়।

কর্কটঃ সংসার সুন্দর হোক, হোক মধুময় এই তো প্রার্থনা ছিল পরমেশ্বরের কাছে কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণ করলেন না এ প্রার্থনা। কিছুটা অপূর্ণই রয়ে গেল। ভয়াবহ হয়ে উঠছে যেন সাংসারিক পরিস্থিতি। স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। ৬ই থেকে ১২ই আষাঢ় অবধি দিনগুলো আহার্যের সংযমতার মধ্যে অতিবাহিত করা প্রয়োজন। ১৫ই থেকে ২০শে আষাঢ়ের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের

বিষয়ে লেনদেনের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ৪ঠা থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে উক্ত লেনদেনাদি অবিধেয়। নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা সমীচীন নয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার শত্রুবৎ মনে হতে পারে ৮ই থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে। বিষয়-সম্পত্তিমূলক মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়। বন্ধুদের ব্যবহার মোটামুটি। কোন বন্ধুর সহায়তায় কর্মক্ষেত্রের ঝামেলা অনেকাংশে তিরোহিত হতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কথায়-বার্তায় সতর্ক ও সংযমতা অবলম্বন করা কর্তব্য। সামান্য ভুলের জন্য বেশ বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ৮ই থেকে ১২ই আষাঢ় অবধি শুভ যাবে না। জ্যেষ্ঠপুত্রের পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের বিদ্যাশিক্ষার পারে। শত্রুরা প্রবল হয়ে দেখা দিলেও ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভ হবে। পত্নীর স্বাস্থ্য ১লা থেকে ৮ই আষাঢ় অবধি শুভ যাবে না। ধর্মোপলক্ষে ১০ই থেকে ১৪ই আষাঢ়ের মধ্যে ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। কবি ও সাহিত্যিকদের সুনাম বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। কর্কট লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ২রা থেকে ৬ই আষাঢ়ের মধ্যে সৎবন্ধু লাভের যোগ দৃষ্ট হয়।

সিংহঃ হিংসু মনোভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে মনে হবে কর্মক্ষেত্রের নিম্নতন কর্মচারীরা। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ক্রমশ অচল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন যথেষ্ট মনোবলের। এই মনোবলের পূর্ণতার বলেই বিরুদ্ধ গ্রহ কর্তৃক আনীত বিপদ হতে বহুলাংশে রক্ষা পাবেন। ভ্রাতাদের ব্যবহার শত্রুবৎ মনে হবে। কনিষ্ঠ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ২রা থেকে ৮ই আষাঢ়ের মধ্যে কোন বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন কি কোন-না-কোন বন্ধুর সহায়তায় উন্নতির যোগ দৃষ্ট হয়। শ্বেতকায়, খর্বাকৃতি নিম্নপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে বচসার সৃষ্টি হতে পারে। ৮ই থেকে ১৮ই আষাঢ়ের মধ্যে অনেক দিনের প্রাপ্য অর্থ কিছুটা আদায় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আত্মীয়দের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ বলে মনে হবে না। শত্রুতা যতই প্রবল হোক, ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভসূচক। সিংহ রাশির অষ্টমে রাহু, নবমে শনি থাকায় সম্ভাব্য কর্ম প্রায় ক্ষেত্রেই পিছিয়ে যাবে। বিবাহাদির ব্যাপার নিয়ে আলোচনাদি যথেষ্ট সংযমতা ও সতর্কতার সঙ্গে না করলে শেষটায় স্থায়ী সম্বন্ধাদি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রেম ও প্রীতির ব্যাপারে যথেষ্ট সংযমের প্রয়োজন। ৩রা থেকে ৮ই

আষাঢ় অবধি দিনগুলো স্ত্রীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। গৃহে ধর্মানুষ্ঠান বা ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মস্থানের অবস্থা মোটামুটি। নূতন কোন উন্নতির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে চাকুরীলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। কবি, সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের আয়ের পথ ১৪ই আষাঢ়ের পর কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। সিংহ লগ্নে জাতক জাতিকাদের পক্ষে এই মাসে নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ না করাই শ্রেয়। বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা : অনেক কিছুই সংকল্প রয়েছে যা বাস্তবের নির্মম নিষ্ঠুর কষাঘাতে নষ্ট হতে চলেছে। মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক ঔদাসীন্য বাধা বন্ধহারা গতিতে এগিয়ে আসছে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রকাশ্য অশান্তির সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সংসারের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে ক্রমোত্তর। অসহনীয় হয়ে উঠছে মন সাংসারিক কার্যাবলীর ক্রূরতা লক্ষ্য করে। স্বাস্থ্য ১০ই আষাঢ় থেকে ক্রমশ খারাপ হতে থাকবে। এ সময়ে বায়ুচাপ এবং উদর-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। আর্থিক ক্ষেত্র ২রা আষাঢ়ের পর শুভ হয়ে দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন মহিলার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। ভ্রাতাদের নিকট হতে অপমানকর ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার চাকুরীর ক্ষেত্রে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটিই থাকবে। ৮ই থেকে ১২ই আষাঢ়ের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের চাকুরী লাভের যোগ রয়েছে। শত্রুরা প্রবল হয়ে দেখা দিলেও ভয়ের কোন কারণ নেই। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভ হয়ে দেখা দেবার সম্ভাবনা। ভূসম্পত্তি বিষয়ক মামলা-মোকদ্দমা যতটা সম্ভব মিটিয়ে ফেলাই সমীচীন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ৪ঠা থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে স্ত্রীর মানসিক অশান্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। নিশ্চিত বিবাহের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মোপলক্ষে ১৬ই থেকে ২০শে আষাঢ়ের মধ্যে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রে অশান্তির মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাবে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কন্যালগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। কনট্রাক্টরদের আয়ের পথ ক্রমশ সুগম হয়ে দেখা দিবে। গুপ্ত প্রেমপ্রীতির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা সমীচীন। আকস্মিকভাবে আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলা : সত্যই শান্তির অভাব ঘটছে সংসারে। ধূমায়িত হয়ে উঠছে বিদ্বেষবহ্নি ভ্রাতৃপক্ষ থেকে। সংসারের আর্থিক প্রয়োজনের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শান্তিপূর্ণ জীবনটাতে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে কর্মক্ষেত্রেও। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের শ্রদ্ধাহীন অপ্রিয় ভাষণে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে মাঝে মাঝেই। ৪ঠা থেকে ৮ই আষাঢ়ের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়ে উন্নতিসূচক আলাপ-আলোচনার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সঞ্চার হবে। শারীরিক অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। মানসিক দুশ্চিন্তায় শরীর ক্রমশ খারাপ হয়

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম- ....

ঠিকানা- ....

....

মাসিক বসুমতী

উঠতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যবহার শত্রুবৎ বলে মনে হবে। সংসারের বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের বন্ধুদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রিয় বলে মনে হবে। কোন সৎবন্ধুর সহায়তায় আর্থিক উন্নতির যোগ দৃষ্ট হয়। কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের পরামর্শানযায়ী জমি ক্রয় বা বিক্রয়াদির ব্যাপারে যতটা সম্ভব নিজেকে মুক্ত রাখাই শ্রেয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদিতে কৃতকার্যতার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। ২রা থেকে ৮ই আষাঢ়ের মধ্যে কোন বন্ধুর ব্যবহার শত্রুবৎ বলে মনে হবে। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের সম্ভাবনা। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার প্রকাশক ও সাংবাদিকদের সম্মান লাভের যোগ দৃষ্ট হয় ১২ই থেকে ১৮ই আষাঢ়ের মধ্যে। ধর্মোপলক্ষে অর্থ ব্যয়ের যোগ দৃষ্ট হয়। বাসস্থান ও বাসগৃহের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। তুলা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের শারীরিক ও মানসিক অশান্তি কিছু না কিছু পরিমাণে থাকবেই। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করতে হলে আর্থিক বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থেকেই ব্যবসায় আরম্ভ করা শ্রেয়।

বৃশ্চিক ঃ মন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, কর্মক্ষেত্রেও ভাল লাগছে না। শারীরিক অসুস্থতাও চলেছে নির্বিবাদে। সাংসারিক পরিবেশ তিক্ততায় আচ্ছন্ন। প্রতিদিনই পৃথিবীটাকে নূতন বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে---পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর স্বভাব। হিংসা-দ্বেষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এগিয়ে আসছে যেন ক্রমশ। স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। আর্থিক যোগাযোগের নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চিত কনট্রাক্ট নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভেষজবিদ ও জ্যোতিবিদদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্থল শুভপ্রদ থাকবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। ৮ই থেকে ১২ই আষাঢ়ের মধ্যে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা অপমানিত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। ১৮ই থেকে ২৪শে আষাঢ়ের মধ্যে কোন-না-কোন বন্ধুর সহায়তায় ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ৮ই থেকে ১৬ই আষাঢ় অবধি সবিশেষ শুভ যাবে না। শত্রুরা যতই প্রবল হোক, ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। কোন মহিলা শত্রুর দ্বারা অপপ্রচারের সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নীর স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভালই থাকবে। বিবাহাদির ব্যাপারে পূর্বকথিত সম্বন্ধ যা নাকচ হবার পর্যায়ে ছিল তা ২রা থেকে ৮ই আষাঢ়ে কার্যকরী হয়ে দেখা দিতে পারে। বৃশ্চিক লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। নূতন কর্মের যোগাযোগ আসতে পারে।

ধনু ঃ কেন, কি কারণে সময়টা খারাপ যাচ্ছে, কি অপরাধই বা লুক্কায়িত রয়েছে—এ জন্মে না পরজন্মে, কোন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ থাকলে নিশ্চয়ই তা জানতে পারা যেত বা কোন-না-কোন ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু এ দুরবস্থাকে বইয়ে চলতে তো আর পারা যাচ্ছে না। যাক, অতীতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানের ভবিষ্যতের দিকে কর্মতৎপর হয়ে এগিয়ে চলাটাই হচ্ছে সাহসিকতাপূর্ণ কর্ম। স্বাস্থ্য এ মাসে মোটামুটি মন্দ যাবে না, আর্থিক যোগ ১৬ই আষাঢ়ের পর ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের ঝামেলা বহুলাংশে তিরোহিত হবে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যতই অসুবিধার সৃষ্টি করুক মনে রাখা কর্তব্য, এ সময়ে প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মোটামুটি। ভ্রাতাদের মধ্যে কারো-না-কারোর কর্মপ্রাপ্তির যোগ দৃষ্ট হয়। আত্মীয় বা বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা অপমানিত হ'বার যোগ দৃষ্ট হয়। ৮ই থেকে ১৪ই আষাঢ়ের মধ্যে নূতন কর্মলাভের যোগাযোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র ও কন্যাদের স্থান মোটামুটি। ৫ই থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যার পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক ও জ্যোতিবিদগণের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। শত্রুরা কর্মক্ষেত্রে যতই চক্রান্ত করবার চেষ্টা করুক না কেন, ভয়ের কারণ নেই। কোন আত্মীয়ের ব্যবহার শত্রুবৎ হয়ে দেখা দিতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। সম্ভাব্য বিবাহের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম-প্রীতিতে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকাই সমীচীন। পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে কারো-না-কারোর চাকুরী পাবার যোগ দৃষ্ট হয়। ১৮ই থেকে ২৪শে আষাঢ়ের মধ্যে ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। পায়ে কিংবা মাথায় আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ধনু লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের অর্থ, ভ্রাতৃ, বন্ধু ও স্ত্রী বা স্বামীর স্থান মঙ্গলপ্রদ নয়। পুত্রের বিদেশগমনের পথ প্রশস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির যোগ দৃষ্ট হয়।

মকর ঃ উর্ধ্বভাবাপন্ন মন নিয়ে চলতে চলতে যখন বারংবার বাস্তবের নির্মম কষাঘাতে ভাগ্যের অনুচরেরা আত্মগোপন করে, মন তখনই নিম্নাভিমুখে গমন না করে পারে না—সাংসারিক পরিবেশে আবদ্ধ হয়ে। নিষ্ঠুর বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে মন হতাশায় ক্ষীণতেজ হয়ে পড়ে। আপনারও প্রয়োজন প্রচুর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন স্বাভাবিক জীবন, মর্যাদা মান বৃদ্ধি করার। চাই আত্মবিশ্বাস, প্রখর, প্রবলতর ও প্রবলতম।

সংঘাত বিহীন করতে হবে। আর্থিক অবস্থা এমাসেও শুভপ্রদ নয়। ঋণের বোঝা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মামলা-মোকদ্দমার চাপও এসে পড়েছে ঘাড়ে। এ অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে সর্ববিধ ঝঞ্ঝাটের মীমাংসা করতে হলে তুচ্ছ মানের বড়াই না করে ঋণদাতার এবং বিরুদ্ধভাজন ব্যক্তির নিকট অগ্রসর হয়ে নতি স্বীকার করাই শুভপ্রদ হবে। গুপ্ত শত্রুতার সৃষ্টি হবে। ভ্রাতাদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অশোভন বলে মনে হবে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে শুধু মাত্র বক্তব্যের সংযমে। ভ্রাতার বিবাহের যোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ২রা থেকে ৮ই আষাঢ়ের মধ্যে কোন বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে। কৃষ্ণকায় কোন আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ৫ই থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ না করাই সমীচীন। ৮ই থেকে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে ছোট খাটো ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই সমীচীন। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। মকর লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রের শত্রুতা অনেকাংশে দূরী-ভূত হবে। ভ্রাতাদের ব্যবহার শত্রুবৎ বলে মনে হবে। কর্মপ্রার্থীদের কর্ম লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ই থেকে ১৮ই আষাঢ়ের মধ্যে বন্ধুর সহায়তায় আকস্মিক কোন বিপদ হতে রক্ষা পেতে পারেন।

কুম্ভ : জীবনে ছিল কতই না আশা ভরসা, কতই না ছিল সুখস্বপ্ন, কিন্তু কই সে-সব আশা-ভরসা ও সুখস্বপ্ন সবই যেন ব্যর্থতার অন্ধকূপে নিমজ্জমান। আর্থিক ব্যবস্থার সুরাহা হবে—কিন্তু কই সুরাহা ত হচ্ছে না। আশায় আশায় তো দিন চলে যাচ্ছে। মনে হয়, এ দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে না। কারাগারের বন্দী-জীবনের মতই মনে হচ্ছে দিন-গুলো। কর্মক্ষেত্রেও শান্তির অভাব। সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পথগুলোও মনে হচ্ছে দুর্গম। আর্থিক স্থল মোটামুটি। ১৮ই থেকে ২৪শে আষাঢ়ের মধ্যে কণ্ট্রাক্টরদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পেতে পারে। সাহিত্যিকদের নূতন কোন উপন্যাস প্রকাশনের ভিতর দিয়ে সবি-শেষ সম্মানলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার মোটামুটি। কনিষ্ঠভ্রাতার চাকুরীলাভের যোগ রয়েছে। ভগ্নীর নিশ্চিত বিবাহের যোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুস্থান শুভ যাবে না। আত্মীয়-স্বজনদের সহিত আর্থিক লেন-দেনের ব্যাপারে যতটা সম্ভব সতর্ক থাকাই সমীচীন। পুত্র ও কন্যাদের শিক্ষাদির ব্যাপারে কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ পুত্রের আকস্মিকভাবে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। জমি ক্রয় ও বিক্রয়াদির ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সমীচীন। ২রা থেকে ১০ই আষাঢ়ের মধ্যে কোন প্রকার ভূসম্পত্তি ক্রয় করা উচিত নয়। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। গুপ্ত প্রেমের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সমী-চীন। ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ের যোগা যোগ প্রায় ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ই থেকে ১৮ই আষাঢ়ের মধ্যে ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। আশ্রিত কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির দ্বারা গৃহে চুরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের ঝামেলাদি অনে-কাংশেই তিরোহিত হবে। কুম্ভ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে অর্থ, ভ্রাতা-ভগ্নী, বন্ধু-আত্মীয়, শত্রু, কর্ম ও ব্যয়স্থান এমাসে সবিশেষ শুভসূচক নয়। সাড়েসাতি অতিক্রম করা কুম্ভলগ্নের লটারীতে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির যোগদৃষ্ট হয়।

মীন : হতাশায় পঙ্কিলাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে মনের রাজপথ। এ পঙ্কিলতা ক্রমবর্ধমান গুলোও হয়ে উঠছে দুর্গম। স্বাভাবিক সরল সাংসারিক পরিস্থিতির অভাব অভাবনীয় হয়ে উঠছে। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য ক্রমেক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। ২রা থেকে ৮ই আষাঢ়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভপ্রদ থাকবে না। লীভার-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্টভোগ-যোগ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘকাল যাদের লীভার-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্টভোগ চলছে, ২০শে আষাঢ়ের পর তা ধীরে ধীরে মুক্তি-পর্যায়ে উপনীত হবার সম্ভাবনা। অর্থ-স্থান শুভপ্রদ হয়ে দেখা দিবে না। কোন-না-কোন বন্ধুর দ্বারা অর্থক্ষতির যোগ দৃষ্ট হয়। ৮ই থেকে ২০শে আষাঢ়ের মধ্যে কোন বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মীমাংসাপূর্ণ বক্তব্য মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ে শুভপ্রদ হয়ে দেখা দিবে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য এমাসে মোটামুটিই থাকবে। কনিষ্ঠ পুত্রের পায়ে কিংবা মাথায় ফোঁড়া-পাঁচড়াদিতে কষ্টভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা ক্ষতি করতে চেষ্টা করলেও সফলকাম হবে না। মামলা মোকদ্দমার ফল আশানু-রূপ হবে না। বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ৮ই থেকে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে বাসস্থানের অসুবিধা দূরীভূত হবে। কণ্ট্রাক্টর, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়রদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০শে থেকে ২৬শে আষাঢ়ের মধ্যে নতুন কোন কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ করা সমীচীন নয়। স্ত্রীর ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হবে না। ১০ই থেকে ১৪ই আষাঢ়ের মধ্যে বিবাহাদির সম্বন্ধ নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রীর আকস্মিকভাবে কঠিন রোগভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ধর্মোপলক্ষে অর্থব্যয় যোগ দৃষ্ট হয়। ১৮ই থেকে ২২শে আষাঢ়ের মধ্যে

নূতন কোন কর্মযোগ এলেও যোগদান না করে পূর্বকরেই নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয়। মীনলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের ব্যবসায়ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। নিজের বুদ্ধির দোষে কোন বন্ধুদ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ই থেকে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়।

পত্রোত্তর

● শ্রীঅনল সাহা, চাকদহ—(ক) একমনে মায়ের চিন্তা করার মধ্যেই তো রয়েছে অনন্ত শক্তি। এই অনন্ত শক্তি সর্ববর্ণের লোকেই লাভ করতে পারে। ঈশ্বরচিন্তা ও গুরুর আশীর্বাদ ব্যতিরিকে কারো কামশক্তি সহজে দমিত হতে পারে না। ● বিজয় সেন, কবীর রোড, কলি-২৬, আগামী দু' বছরের মধ্যেই সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রী কারো মনের মত হয় না। ● শ্রী রায়, লাউপ সিঁথি, কলিকাতা-৪০। ধৈর্যধরে কিছুদিন অপেক্ষা করুন। মোটামুটি ভালই হবে। ●অঞ্জলি মল্লিক, যদু পণ্ডিত রোড, কলি-৬, এক বছরের মধ্যে আপনার চাকুরী হবার যোগ রয়েছে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখুন। ● শ্রীমতী বাসু পার্ক সার্কাস, কলি-১৭, আপনার পক্ষে সময়টা শুভ নয়, বছর দুই খারাপ চলবে। ১০ থেকে ১২ রতি রক্তপ্রবাল বাঁ হাতের অনামিকাতে ধারণ করবেন। ● বি-এস-র, আমগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ৬-৮ রতি রক্ত গোমেদ রূপোয় ডানহাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীরায়, বালী হুগলী, আগামী তিন বছরের মধ্যে আপনার মনের কিছু না কিছু আশা ফলবতী হয়ে দেখা দিবে। ● সুপ্রিয়, রামপুরা, লাউদহ, ৮-১০ রতি রক্তপ্রবাল ডান হাতের অনামিকায় ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীআশুতোষ দাস, কামার কেতা, বর্ধমান, পরাধীন হয়ে থাকার সম্ভাবনা নেই ● শ্রীরবীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর, কন্যার বাঁ হাতের অনামিকাতে ৬-৮ রতি রক্তপ্রবাল রূপোয় ধারণ করিয়ে বিবাহের চেষ্টা করুন। বেশ কিছুদিন ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীকমল চৌধুরী, পণ্ডিচেরী—বর্তমান বছর নূতন ব্যবসায়ের পক্ষে শুভ নয়। চেষ্টা করুন আকস্মিক যোগাযোগের প্রয়োজন। ● জী, মেদিনীপুর-৬ থেকে ৮ রতি গোমেদ রূপোয় ডানহাতের মধ্যম অঙ্গুলিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুধাংশুশেখর মল্লিক, যদু পণ্ডিত রোড, কলি-৬, চেষ্টা করুন। ৬-৮ রতি ইন্দ্রনীল সোনায় বা রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীদিলীপকুমার নাগ—উত্তর হাবড়া, ২৪ পরগণা, চেষ্টা করুন। ৫ থেকে ৭ রতি শ্বেত মুক্তো রূপোয় ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীকেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্টালী, দেড় বছরের পর থেকে কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। হলদে প্রোকরাজ ৫ থেকে ৭ রতি সোনায় ডানহাতের তর্জনীতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● কুমারী আশা রায়, সিঁথি, কলি-১০, ধৈর্যধরে এগিয়ে চলুন, সবই ঠিক হয়ে যাবে। সম্ভাবনা রয়েছে ● শ্রীঅসিতকুমার সাহা, বারুই পাড়া লেন, কলি-৩৫, মোটামুটি ভালই বলা চলে। উন্নতি হবে। ● শ্রীঅপরিচিত, কল্যাণগড়, ২৪ পরগণা, বিয়ে করে সংসার করুন, তা'হলেই বুঝতে পারবেন, ভাল না মন্দ। শ্রীসমীরকুমার পাল, মেদিনীপুর, ধৈর্য ধরে চেষ্টা করুন, চাকুরী এবং পড়াশুনা দুটোই হবে। ● শ্রীমতী মণিকা গঙ্গোপাধ্যায়, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-বাড়ি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ বলা চলে। ● শ্রীমতী অ: ভ: পাল্লা, বর্ধমান—যোগ রয়েছে। বাঁ হাতের ৫-৭ রতি গোমেদ ও ৮-১০ রতি রক্তপ্রবাল রূপোয় যথাক্রমে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●এস কে ঘোষ, বেলেঘাটা, কলি-১০—আগামী আড়াই বছরের মধ্যে যে-কোন সময়ে ছেলে ফিরে আসবে এবং আপনাদেরও ঝগড়াঝাটি মিটে যাবে। ●দীপক, রাজস্থান ৫৫৩৩২—আপনি জন্ম, সন তারিখ ও সময় ভালভাবে লিখে পাঠাবেন। ● সমীর নন্দী, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-১—প্রথমা ভগ্নীকে ৪ রতি শ্বেতমুক্তা সোনায় মধ্যমাতে ও রক্তপ্রবাল রূপোয় ৬-৮ রতি অনামিকাতে ও দ্বিতীয়া ভগ্নীকে গোমেদ ৫-৭ রতি মধ্যমাতে ও রক্তপ্রবাল ৮-১০ রতি রূপোয় যথাক্রমে বাঁ হাতের মধ্যমা ও অনামিকাতে ধারণ করা কর্তব্য। ● চিত্র চৌধুরী, ক্রশ রোড ১৫, জামসেদপুর-৯—চেষ্টা করুন, বিয়ে মোটামুটি ভালই হবে। ● শ্রীঅঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক-সনাতনতলা, চন্দননগর—দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীরঞ্জিৎ-কুমার দত্ত, পো: দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা—আপনি আপনার বক্তব্য স্পষ্ট করে লিখুন। 'ইহা অপেক্ষা', এই শব্দ দুটোকে যতটা সম্ভব বর্জন করতে চেষ্টা করুন। ●সত্যসন্ধ দাস, মিত্রকুঠি, দাসপাড়া লেন, কোন্নগর, হুগলী—স্বাধীন ব্যবসায় ও আর্থিক উন্নতির যোগাযোগ শুভপ্রদ। ● শ্রীশ্যামাপদ মোদক, গ্রাম—পুরাতন হাট, জেলা-বর্ধমান—ধনুরাশি। সাধারণ পর্যায়ে বলা চলে। ● শ্রীতপোব্রত ঘোষ, সুভাষ নগর, ২৪ পরগণা—আপনি লিখেছেন ১৩৬৯ সালে জন্ম, কিন্তু ১৩৭৬ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে একাদশ শ্রেণীতে পড়ছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। ● শ্রীতপো-ব্রত ঘোষ, গ্রাম সুভাষনগর—২৪ পরগণা—ধৈর্য ধরে চেষ্টা করুন—হবে। ● অশান্তি, রামকৃষ্ণবাটি, জেলা, হুগলী—৪-৬ রতি ইন্দ্রনীল সোনায় ডানহাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার দে বিশ্বাস, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, বৃষরাশি, মীনলগ্ন—শ্বেতপ্রবাল ৬-৮ রতি রূপোয় ডান হাতের অনামিকাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● নবকুমার দাস, কালুপাড়া লেন,

কুরিয়া—বৃশ্চিকরাশি, সিংহলগ্ন, অনুরাধানক্ষত্র, দেবগণ। ● অনিলকুমার [illegible]কার, পঞ্চানন তলা রোড, হাওড়া—ধৈর্যধরে চেষ্টা করুন, বিপদের হাত হতে মুক্ত হবেন। গৃহের সম্ভাবনা রয়েছে। ● [illegible]আর চ্যাটার্জী, রবীন্দ্রসরণী, বাঁকুড়া—স্পষ্ট করে লিখে পাঠান। ● ছায়া চ্যাটার্জী বাঁকুড়া—আপনি ধৈর্যধরে 'শ্রীশ্রী দুর্গা' এই নাম একলক্ষবার লিখুন, সব অশান্তিই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসবে। ● প্রণব চ্যাটার্জী বাঁকুড়া আপনার জীবনে হঠাৎ কর্মস্থলে পরিবর্তন ও অর্থ প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। ● শ্রীঅসিত-কুমার গুপ্ত, কোচবিহার—চেষ্টা করুন, পড়াশুনা হবে। ● শ্রীমতী গৌরী রায়, যাদবপুর বিজয়গড়—হ্যাঁ, উচ্চ শিক্ষার যোগ রয়েছে, ডিগ্রীলাভ অনিবার্য। নিয়মমত আহারাদি গ্রহণ করা উচিত। ● শ্রীমতী অনিতা রায়, যাদবপুর—ক্রোধের মাত্রা কমিয়ে ফেলুন, তবেই সকলের নিকট ভালবাসা পাবেন। পড়াশুনার যোগ শুভ। টনসিলের দোষ আসতে পারে। ● শ্রীমতী নীলিমা রায় (মালদহ)—পড়াশুনার যোগ কম। দু'বছরের মধ্যেই বিবাহ যোগ। স্বামী সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকবেন। পেটের ব্যাথায় ভুগবেন। ● শ্রীমতী রমা সেন, সত্যেন রায় রোড, বেহালা—দাম্পত্যজীবন সুখের। বহু ভ্রমণ-যোগ রয়েছে। মাথাধরা ও পেট-ব্যাথা কেউ সারাতে পারবে না। ● শ্রীবীরেশ সেন, সত্যেন রায় রোড, বেহালা—বহু ভ্রমণ যোগ রয়েছে। জীবনে সর্ববিধ উন্নতিকল্পে ৬-৮ রতি রক্তমুখী গোমেদ সোনায় বা রূপোয় ধারণ করা বিধেয়। ডিগ্রীলাভ অনিবার্য। দু'বছরে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ● দীপ্তি সেনগুপ্ত, বাঘাযতীন পল্লী, কলি-৩২-—মন দিয়ে লেখাপড়া করুন, ত হ'লেই প্রতি বছর পরীক্ষা পাশ করতে পারবেন। ● বেলফুল, সাহেবগঞ্জ ৬-৮ রতি গোমেদ ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করা বিধেয়। ● অপর্ণা সেন, [illegible]পাড়া, হবানী—বৃষরাশি, নরগণ, কন্যালগ্ন—তাড়াতাড়ি হবে। ● [illegible]আর চ্যাটার্জী, বোলপুর, বীরভূম, গোমেদ মধ্যমাতে ধারণ করা বিধেয়। ● রাধা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, বোলপুর, বীরভূম—মেয়েকে ৮-১০ রতি চন্দ্রকান্ত মণি রূপোয় বাঁ হাতের মধ্যমাতে ধারণ করা বিধেয়। ভাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় বোলপুর বীরভূম, চেষ্টা করুন, যে-কোন সময়ে পেতে পারেন। ● রাজা বোস, হাজারিবাগ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন ও বিবাহ আপনার হবে। ● ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্র, কান্দী গোপীনাথপুর, পরীক্ষার ফল ভাল হয় না। ● শ্রীমতী দীপ্তি দে, হাইলাকান্দি আসাম, শেষ কিছুকাল আপনাকে চাকুরী করতে হবে। দায়িত্ব পালন করতে হবে। ● প্রিয়া উল হক-আফরিন রোড, ধুবড়ী, ৭-৯ গোমেদ সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● শ্রীআজি-জুল ইসলাম দরদর, সেণ্ট্রাল জেল, আপনি সেণ্ট্রাল জেল থেকে বেরিয়ে আসুন, তবে তো নূতন বাংলা গড়ার ও রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়ার স্বপ্ন আপনার সফল হবে। ৩৮ বছরের পর হতে জীবনে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীযুক্ত-কুমার চক্রবর্তী, হাওড়া, সময় ঠিক করে লিখে পাঠাবেন। ● শ্রীগৌরচাঁদ বড়াল ন্যাকড়াপাড়া লেন কলিঃ, আপনার প্রশ্নের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● মনীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় লাগের বাজার, দমদম, বাড়ী করার সম্ভাবনা রয়েছে। মলয়রঞ্জন পুরকায়স্থ শিলচর, আসাম, দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● দ-ক-প বাঁকুড়া, ৮-১০ রতি চন্দ্রকান্ত মণি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীমতী এস রায় যদু পণ্ডিত রোড কলিঃ, দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● লোকনাথ দুর্গাপুর, ৫-৭ রতি মিশ্র-বর্ণের নীল রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। পারিবারিক বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ● সুজিত দত্ত মানিকপুর কলিঃ, আপনি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নবগ্রহের স্তব পাঠ করুন। ● শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী, [illegible]ওড়া, মাটির তাগে বা [illegible] প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ● [illegible] মিত্র সুখী ৮-১০ রতি রক্ত প্রবাল সোনায় বা রূপোয় হাতের অনামিকাতে ধারণ ক দেখতে পারেন। হরিদাসী, নিউদিল্লী বিলম্বে (বছর দুই) স্বামী প্রমোশনের যোগ রয়েছে। ● সুখে বিকাশ গুহ, অনিল রায় রো বালিগঞ্জ, ৫-৭ রতি গোমেদ সোনায় ডা হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখ পারেন। ● কুমার বাবু, বলাই মিস্ত্রী লে হাওড়া, বিলম্বে হবে, স্নাতক হ পারবেন। ● দীপককুমার ভট্টাচার্য খড়দা ২৪ পরগণা, ৪-৬ রতি শ্বেতমুক্তো সোনা ডান হাতের অনামিকাতে ধারণ কর দেখতে পারেন। ● ময়া, আপনার প্রশ্নের বিস্তারিত বর্ণনা এখানে দেওয়া সম্ভ নয়। ● ব্যানার্জী [illegible] কাজল নিরাশা [illegible] দেখুন। ● গৌর বসাক নৈহাটি, ২ বছর ধৈর্য ধরে চলুন, ধীরে ধী সমস্ত বিপদ কেটে যাবে, শত্রু, মিত্র হয়ে দেখা দিবে। ● শ্রীঅরুণকুমার বসাক নৈহাটি, সময়টা বিশেষ শুভ নয়, সতর্ক হয়ে চলবে। ● শ্রী[illegible]নন্দন বসাক, নৈহাটি ব্যবসা ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন। প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীগৌর গোপা বসাক, [illegible] রোড, আপনি ধর্মকে আশ্রয় করে কর্মে অগ্রসর হউন। ● শেফালী বসাক অরবিন্দ রোড ধৈর্য ধরে ঈশ্বর স্মরণ করুন তিনিই আপনাকে পথ দেখাবেন ● উমারানী বসাক নৈহাটি, কেউ আপনার কোন রকম ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। ● শান্তি বসাক, অরবিন্দ রোড পড়াশুনার চেষ্টা করুন, ঈশ্বর মনের ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন। ● শ্রীদীপক সেনগুপ্ত পূর্বাচল, হাওড়া, বিদেশযাত্রা আপনার হবেই, মাঝে মাঝে কালী মন্দিরে গিয়ে পূজা দেবেন। ● শ্রীমতী কমলা চ্যাটার্জী, পি সি রোড, কলিঃ, আপনার সমস্যা অচিরেই সমাধান হবে, জয় সুনিশ্চিত। ● শ্রীঅরুনকুমার পোদ্দার উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ী হবার যোগ রয়েছে। [illegible]বছরে মধ্যে সাংসারিক শান্তি বিঘ্নিত [illegible]।

ব্যাং-এর ছাতা

সঞ্জয়া গুহ

কয়দিন ক্রমাগত বৃষ্টির পর আজ সকালেই মিঠে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে। বাগান জুড়ে সজীব স্নিগ্ধতা। চারিদিকে শ্যামল সমারোহ। হঠাৎ দেখি এক কোণে নতুন আগন্তুক। গুটিকয় বাদামী রং-এর ছত্রাক-ব্যাং-এর ছাতা ভোরের হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে বলছে---কেমন অবাক করে দিলাম ত ?

ব্যাং-এর ছাতা বর্ষাকালে প্রায়ই চোখে পড়ে। রাতরাতি গজিয়ে ওঠে, বনে-বাঁদাড়ে, পাথরের আড়ালে আব-ডালে, কেটে রাখা গাছের গায়ে। বিষাক্ত বলে আমরা সব সময় ওদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি। দেখতে অবশ্য ভাল লাগে।

ভারতবর্ষের বাইরে বহু দেশে ছত্রাক একটি লোভনীয় ভোজ্য। ছত্রাক দেখলে ওদের রসনাসিক্ত হতে মুহূর্ত দেরী হয় না। ওদের দেশের ছত্রাক বা মাশরুম নাকি স্বাদ গন্ধে অতুলনীয়। দুর্লভ বলে দুমূল্যও বটে। বাজারে রকমারী চেহারার রকমারী স্বাদের মাশরুম বিক্রি হয়। রীতিমতো চাষ করে পছন্দসই মাশরুমের ফলন বাড়ানো হচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকায় বহু থেকে প্রচলিত---এ্যাগারিকাস। চীন জাপান পছন্দ করে লেন্টিনাস ইডোড। থাইল্যাণ্ড মালয় বার্মা ইত্যাদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রিয় মাশরুম ---ভলভারেলা ভলভাশিয়া।

লক্ষ্য করলে মাশরুমের গোড়া ঘিরে দেখা যাবে রঙ্গীন বৃন্তশ ছত্রাক থেকে ঝড়ে পড়ে রঙ্গীন পরাগ। ছাতার তলায় মাছের কানকোর মত ঝির-ঝিরে শিরা থাকে। ছাতার প্রান্ত থেকে হাতল পর্যন্ত বিস্তৃত---শিরায় ঘন জালি, ইংরেজীতে বলে গিল। ছত্রাকের শিশু অবস্থায় গিল পাতলা পর্দায় ঢাকা থাকে। ছাতা পুরো খুলে গেলে পর্দা ছিঁড়ে যায়। যৌবনে উপনীত হলে গিল থেকে ঝড়ে পড়তে থাকে পাউডারের মত মিহি পরাগ।

পরাগই মাশরুমের জীবন প্রবাহ বয়ে বেড়ায়। এর থেকে জন্ম নেয়, নতুন ছত্রাক গোষ্ঠী। পশুপাখীর পায়ে বা গায়ের লোমে লেগে এখানে ওখানে ছড়িয়ে যায়। কোন কোন মাশরুমের রেণু বাতাসে ভেসে চলে একশ বা হাজার মাইল দূরে। রেণু হলো জীবন্ত কোষের সমষ্টি। পরমাণু আকৃতি কোষগুলির দারুণ জীবনী-শক্তি। শুকনো আবহাওয়া বা তুষার-পাতে ওদের কিছু ক্ষতি হয় না। অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করে। কোষ অবস্থায় অবলীলাক্রমে কয়েক যুগ বেঁচে থাকে। ওদের জন্মের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণ জল। স্যাঁৎসেতে অন্ধকার জায়গা হচ্ছে ওদের প্রিয় জন্মভূমি।

আমাদের দেশে সব ব্যাং এর ছাতা একই ধরণের দেখতে। বিদেশে কিন্তু মাশরুমের চেহারা, রং প্রকৃতির অনেক বৈচিত্র্য।

ভরা গ্রীষ্মে সাদা পাইনের গোড়ায় এক ধরণের গোলাপী ছাতা মনোরম রঙ্গীন পরিবেশ সৃষ্টি করে। তার নাম বোলেটাস। ছাতার তলায় গিল থাকে না। তার বদলে থাকে অসংখ্য ফুটো। এই ফুটো থেকে রেণু পড়ে।

ঘন ডালপালা ঘেরা বিরাট বিরাট গাছের তলায় ধোঁয়াটে রং-এর ছত্রাক থোপা থোপা ফুটে থাকে। এদের ছাতা আধ খোলা। পুরো মেলে না। ছত্রাকের

শ্রাবণ সমাগত হলে গিল একেবারে কুচকুচে কালো হয়ে যায়। আর তার থেকে টপ্ টপ্ করে ঝাড় পরে তরল পরাগ। কলমের কালির মত তরল কালো। তাই এদের নাম ইংকি ক্যাপ।

মাশরুম মানেই ছাতার ক্ষুদ্র সংস্করণ তা নয়। এই যে পাফবল—মাথার দিক বলের মত নিটোল গোল, আর তার নিচে লম্বা ডাঁট। হালকা সাদা। খসখসে গা। পশু-পাখীর পায়ের চাপ লাগল—অথবা জোর বৃষ্টির ঝাপটা, অমনি হুস করে একখানি আওয়াজ। বলের মাথা ফুটো হয়ে বেড়িয়ে এল একরাশ পরাগ, ছুটল একেবারে আকাশ-মুখো।

অনেকটা একই জাতের কপ্রিনাস কমেটাস আর স্পঞ্জ। কপ্রিনাসের চেহারা আনারসের মত রেখা ক্ষত গা। জন্মায় অবশ্য নোংরা আবর্জনার মধ্যে। স্পঞ্জ বসন্তকালে হয়। গা ফোঁপরা। ডাঁটের ওপর তিনকোণা মাথা।

লিকলিকে লম্বা গড়নের মাশরুম আছে। নাম ফিংগার এণ্ড থাম্ব। রং খুব সুন্দর—উজ্জ্বল হলুদ।

চ্যাণ্টেরেল দেখতে অনেকটা কচি পদ্মপাতার মত। ও রকম নরম নয় তাই বলে। শক্ত গড়নের, বেগুনী আর বাসন্তী রং-এর হয়। পূর্ণতা এলে ছাতি ফুটো হয়ে পরাগ বেগে উর্ধ্বমুখী হয়।

সব থেকে মনোহর চেহারার মাশরুম হল পুয়ে। সবুজ শেওলা-ছাওয়া গাছের গুড়ি। তার গা ঘিরে থরে থরে ফুটে রয়েছে যেন আধখানা চন্দ্রমল্লিকা। ধপধপে সাদা থাকে থাকে সাজানো থালের মত এই ছত্রাকের চলতি নাম—শেলফ্।

নিউগিনি থেকে একজন আমেরিকান সাংবাদিক তার স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। অদ্ভুত পরিবেশে। শহর-তলীর এক উন্মুক্ত প্রান্তর। রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। মাঠ জুড়ে গাঢ় অন্ধকার। এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই। তারই একটিতে বসে উনি চিঠি লিখছেন। তার পিঠের দিকে একটি উঁচু পাথর। সেই পাথরের গা থেকে ঝুলছে গুটিকয় আলোর ফের টোপ। ছড়িয়ে পড়েছে নীলাভ আলো। প্রকৃতির দেওয়া নিয়ন লাইট পোস্ট। এরা এক ধরণের ছত্রাক। দেখতে সাধারণ ছত্রাকের মতই। নাম মাইসেনা লাক্সকোয়লি। জাপানের হ্যাচিজো দ্বীপেও এদের দেখা গেছে।

এই ছত্রাক খাওয়া যায় কিনা জানি না। অন্যরা বাজারে বেশ চলতি। আনাড়ি লোকেদের অবশ্য এ সব কেনাকাটা না করাই উচিত। অনেক ছত্রাক আছে দারুণ বিষাক্ত।

আমার এক বন্ধু আমেরিকায় সদ্য বসবাস সুরু করেছে। বাড়িতে একটা বড় ভোজের আয়োজন হচ্ছে ও বাজারে গিয়ে রকমারী জিনিষ কিনেছে। এক গোছা ছত্রাকও কিনেছে। টুকটুকে লাল তার ভেতর সাদা বুটি। ভারী সুন্দর দেখতে, রান্নার ফাঁকিবাজি ব্যালান্স করতে হবে প্লেট সাজানোর কেরামতি দিয়ে। তার পতিদেবতা অফিস থেকে ফিরবে টেস্ট করার জন্য এগিয়ে দিল একটি সুসজ্জিত ডিস। ময়দাগোলা মাছ সেদ্ধ তার চার পাশে চাকচাক লাল মাশরুম।

গুণবতী স্ত্রীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি হেনে ভদ্রলোক নির্বিঘ্নে খাবার নিঃশেষ করলেন। তারপর। ডাক্তার হাসপাতাল—ইনজেকসন—পেট পাম্পিং ইত্যাদি। ভদ্রলোক সে যাত্রায় রক্ষা পেলেন।

ঐ যে সাদা বুটি তোলা—ওগুলো হলদে আর লাল দুই জাতের হয়। নাম ফ্লাই এগ্যারিক। পাইন বার্চ এ সব গাছের গোড়ায় নীলচে সাদা ছত্রাক অপূর্ব স্বপ্নের আবেশ সৃষ্টি করে। ওদের নাম ডেস্ট্রয়িং এঞ্জেল। খাদ্যরসিকরা মনে করবেন, দেই না লাল ডগডগে, চিংড়ী মালাই এর বাসনে গুটিকয় কচি নীল ছত্রাক। ব্যস। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুরু হয়ে যাবে—বমি আর দাস্তের প্রতি-যোগিতা। এর পর শরীর অবশ, হৃদপিণ্ড আক্রান্ত। সুষ্ঠু চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু অসম্ভব নয়। বিষাক্ত ছত্রাককে বলা হয় টোড স্টুল। মাশরুম খেতে হলে ভালো দোকান অথবা অভিজ্ঞ লোকের ওপর নির্ভর করা উচিত।

মাশরুম কখনও ডোবা তেলে ভাজতে হয় না। নুন জলে ভেজানো কাপড় দিয়ে মুছে চাকচাক করে কেটে নুন গোলমরিচ মাখন দিয়ে সামান্য ভাজলে অপূর্ব খেতে হয়। অল্প মসলা দিয়ে ভাপে সেদ্ধও ভালো হয়। বড় আকারের বোলেটাস, চ্যাণ্টেরেলে মাছ-মাংসের পুর ঠেসে রোস্ট করলে চমৎকার খেতে লাগে।

বড় মাশরুমের শক্ত ডাঁট, খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। আদা পেঁয়াজের রস দিয়ে এগুলো কিছুক্ষণ সেদ্ধ করে স্ট্যু করা যায়। মাংসেও দেয়া যায়। সুন্দর গন্ধ হয়।

কচি মাশরুম খাবারের বাসন অলঙ্করণের জন্য ভারী উপযোগী। মাশরুম সুরূপ, সুগন্ধি, সুস্বাদু। তা ছাড়া আছে প্রচুর খাদ্যগুণ। প্রোটিন, খনিজ পদার্থ আর সামান্য নাইট্রোজেন থাকায় একটি পুষ্টিকারক খাবারও বটে। বিদেশে তাই মাশরুমের এত কদর।

আমাদের এই খাদ্য সংকটের দেশে মাশরুমকে ভোজ্য তালিকায় ঠাঁই দিলে হয় না। কৃষিবিদরা এর ফলনের কথা ভেবে দেখতে পারেন।

দা-দে-ই-জি-র লড়াই

ইংরাজী ভাষা অনুশীলনের প্রারম্ভকালের প্রায় অব্যবহিত পরেই যে সকল প্রবাদ বাক্যগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়া থাকে তন্মধ্যে একটি প্রবাদ আজ আমাদের স্মৃতিপটে বারবার ভাসিয়া উঠিতেছে। সেই প্রবাদ বাক্যটি হইল— 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল।—'

পশ্চিম বাঙলার রাষ্ট্রীয় জগতের বর্তমান স্বরূপ দেখিয়া আজ সেই বহু পুরাতন প্রবাদ বাক্যটিই আমাদের মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে, তবে যথাযথরূপে নয়, ঈষৎ ভিন্নরূপে। পরিবর্তনই পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া মহাকালের নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী পৃথিবী তাহার পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পরিবর্তন ব্যতীত পৃথিবীর অগ্রগতি অসম্ভব। জানি না। সেই নিয়ম অনুসারেই কি না। এই বহু পুরাতন প্রবাদ বাক্যটি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মাধ্যমে আজ পরিবর্তিত হইল কি না অর্থাৎ 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড'-এর স্থলে 'ইউনাইটেড উই ফল' কথাটি দাঁড়াইল কি না। ইহাদের সাংগঠনিক কাঠামোর আজ যে চেহারা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই পরিবর্তিত বাক্যটিই আমাদের মনে আজ বিশেষভাবে রেখাপাত করিতেছে।

অধুনাকালীন সংবাদপত্রসমূহে প্রায়শঃ যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে নিয়ত বিবাদ-বিসম্বাদের কাহিনীসমূহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিছুতেই যেন একটা সর্ববাদীসম্মত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। একমাত্র 'যুক্তফ্রণ্ট' নামটুকু ছাড়া আর যেন কোথাও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও ঐক্যের কণামাত্রও দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেছে না।

১৯৬৭ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া ইঁহারা প্রথম গদীলাভ করিলেন, সে যাত্রায় ইঁহারা ন' মাসের বেশী গদীতে অধিষ্ঠিত থাকিলেন না। যদিও তাঁহাদের ক্ষমতালাভ সেবার নানাকারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দেশ খণ্ডিত অবস্থায় স্বাধীনতা হওয়ার পর হইতে বৃটিশ আমলের বিরোধী দল কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল।

একটানা নিরবচ্ছিন্ন কুড়ি বছর পর দেশের শাসনভার সেই প্রথম হস্তান্তরিত হইল সেই কংগ্রেসী আমলের বিরোধী দলের হাতে।

এই বিরোধী দলই যুক্তফ্রণ্ট। এই মধ্যবর্তী সময়ে নানা ঘটনা। নানা কাহিনী, নানা ইতিহাস, কত সংগঠন, কত বিপর্যয়, কত ভাঙা, কত গড়া।

ঐতিহাসিক বিচারে এই কারণেই যুক্তফ্রণ্টের শাসনভার লাভ এত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য বিমণ্ডিত। কিন্তু ন' মাসের মধ্যে তাঁহারা প্রধান যে দুটি অবদান (?) রাখিয়া গেলেন তাহা হইল চালের দরকে প্রায় পাঁচ টাকায় তোলা, ঘেরাও নামক ভয়াবহ সাঙ্ঘাতিক পদার্থটির পৃষ্ঠপোষণ এবং দেশের পুলিশবাহিনী একেবারে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া।

পুনরায় ১৯৬৯ সালের প্রথমার্ধে গদা হাতে তাঁহারা দ্বিতীয়বার গদী অধিকার করিলেন। বিপুল ভোটে জিতিয়াই আসিলেন কথাটি মিথ্যা নয়। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে, তাঁহারা যে এই বিপুল ভোটের মালা গলায় ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহার মধ্যে প্রকৃতই সার্থক জনপ্রিয়তার কোন চিহ্ন আছে কি—জনগণ ভোট দিয়াছে ঠিকই কিন্তু সেই ভোট কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসিয়াছে। প্রাণখোলা মনোভাব লইয়া ভোটের জয়তিলক জনগণ কি তাঁহাদের ললাটে লেপিয়া দিয়াছেন। আসলে কংগ্রেসের কুশাসন, অযোগ্যতা ও দুর্বলতাই জনগণকে উৎসাহিত করিয়াছে তাঁহাদের স্বপক্ষে ভোট দিতে, কংগ্রেসের শাসনকালে যদি গ্লানিমুক্ত থাকিত তাহা হইলে ইতিহাস আজ ভিন্ন রূপ ধারণ করিত, কংগ্রেসী কুশাসনেই অতিষ্ঠ জর্জরিত হইয়া সর্বহারা জনগণ বাধ্য হইয়া ইঁহাদের ভোট দিয়াছেন। ইঁহাদের এই বিষয়টি কংগ্রেসের শাসনযন্ত্রের কাঠামোয় যে অজস্র ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছিল সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়াই ইঁহাদের অনুপ্রবেশ। এই সম্মিলিত দলগুলির মধ্যে এমন কোন দল আছে যে দলের কীর্তিকলাপ শিহরিত হওয়ার মত। তবে আনন্দাপ্লুত বিস্ময় এই শিহরণের জন্য দেয় না। ভীষণ আতঙ্ক এই শিহরণের উৎস। সেই কার্যকলাপগুলির স্বরূপ বাঙলা দেশের জনগণেরও অজানা নয়।

আরও একটি বিখ্যাত প্রবাদবাক্য এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আমাদের মনে পড়িতেছে 'মর্ণিং সোজ দি ডে'- -

গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়লাভের পরেই টানাপোড়েন চলিয়াছিল তাহা এই অল্পকালের মধ্যেই বিস্মরণের অঙ্কে আশ্রয় লইতে পারে না। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন স্থিতধি ব্যক্তিমাত্রেই সেদিন এই অবস্থা দেখিয়া বলাবলি করিয়াছিলেন, 'সুরুতেই এই। না জানি শেষ কোথায় এবং কি ভাবে'— কথাগুলি কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। দুই-তিনটি দিন ইঁহাদের পুরা কাটিয়া গেল কে নেতা হইবেন, পুলিশ দপ্তর কাহার হাতে থাকিবে এই আলোচনায়।

বর্তমানে সেই অঙ্কুরই আজ

[illegible]রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে ফাটল ধরিতে শুরু করিয়াছে। এতগুলি মানুষের অন্ন-বস্ত্র প্রমুখ হাজারো সমস্যার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা দলীয় কোন্দলেই মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়া বসিয়া আছেন। মনোবৃত্তি কোন স্তরের হইলে কংগ্রেসের সহস্র দোষ দেখাইয়া, অজস্র আশার বাণী শুনাইয়া ভোট পাওয়ার অর্থাৎ কার্য সমাধা হওয়ার পরই সকল প্রতিশ্রুতি শিকায় তুলিয়া ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া যায় তাহা আমরা নিরূপণ করিতে পারিতেছি না।

একটি বালকও বোধহয় আজ সম্যকরূপেই অবগত আছে যে এই হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গ কতখানি সমস্যায় প্রপীড়িত। এই সমস্যার জন্য বিপুলভাবে দায়ী তাঁহাদের অপসারণ করিয়া যাঁহারা গদীতে আসিলেন তাঁহারও সেই পূর্বসূরীদের মতই আপন আপন জাতীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া ঔরংজেবের অপদার্থ বংশধরগণের ন্যায় 'দা-দে-ই-জি'র লড়াই সুরু করিবেন। ব্যাপারটি হাস্যকর বলিলেও ঠিক বলা হয় না।

ব্যাপারটি আসলে মর্মান্তিক। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য এমনই যে যাহারা তাহার শাসনভার গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের নিকট দেশ ও জাতি বড় নয়। তাঁহাদের নিকট দল বড়। দেশ ও জাতি অপেক্ষা দল তাঁহাদের নিকট অধিক উপাস্য। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশ এই দুর্দশার রাহু হইতে কবে যে মুক্ত হইবে তাহা একমাত্র সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরেরই জানা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্কট

'হায় মা ভারতী চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে
যে জন সেবিবে, ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে—'

বহু বর্ষ পূর্বে রচিত বাঙলার কাব্য গগনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই খেদোক্তি সময়ের দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নানা কারণে আজও স্মৃতিপটে চির-জাগরূক থাকার দাবী রাখে। বাঙলা দেশের সারস্বত সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্মীর রাগত দৃষ্টি যে এককালে কত সীমাহীন ছিল সে স্মৃতিও কদাচ আমাদের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হওয়ার নয়। সময়, পরিস্থিতি পরিবেশ প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে দেখা যাইতেছে যে সরস্বতীর অধিকাংশ সেবক আজ এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেও তাঁহার কৃপালাভের প্রধান কেন্দ্র আজ সম্পূর্ণরূপে এই দুরবস্থার কবলিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে যে ভয়ানক সংবাদ প্রচারিত হইতেছে তাহার পরিণাম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলে জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে নিদারুণ কৃপাহীন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও হাত পা আশঙ্কায় হিমশীতল হইয়া যাওয়ার মত। অর্থের অভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক এমন কি সাধারণ জীবনেও ইহা অপেক্ষা আর কি নিদারুণ দুঃসংবাদ থাকিতে পারে তাহা আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানেরই দরজা বন্ধ হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহুজনের ভাগ্য জড়িত থাকে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু কি একটি প্রতিষ্ঠানই মাত্র? এখানে কি শুধু নিছক কিছুসংখ্যক ব্যক্তিবিশেষেরই ভাগ্য জড়িত? ইহার গুরুত্ব এবং জাতীয় জীবনের নবজাগরণে ইহার দীর্ঘকালের অব্যাহত বহুমুখী অবদান এবং সর্বোপরি জাতিগঠনে ইহার মহান ভূমিকা স্মরণ করিয়া ইহাকে অনায়াসে এক মহামন্দিরের সহিত তুলনা করা চলে এবং সেই বিচারে ইহার সহিত বলা চলে, সারা জাতির ভাগ্য বিজড়িত শুধু কিছুসংখ্যক অধ্যাপক ও কর্মচারীই নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে কিরূপ গ্রহ সমাবেশ ছিল তাহা আমাদের জানা নাই, তাহার জ্যোতিষীর ঠিকুজি, রাশিচক্রের ভাষ্য ও পাঠোদ্ধার কে করিয়াছেন তাহাও আমাদের জানার বাইরে, তবে এইটুকু বলা যায় যে বোধহয় তাহার গ্রহসংস্থান ভাল ছিল না, বিধাতার প্রতিকূল হাসির ভিতর ভিতর দিয়াই বোধহয় তাহার জন্ম হইয়াছিল। তাই তাহার সারা জীবনের যাত্রাপথ কাঁটায় ভরা, কণ্টকাকীর্ণ, কি ব্রিটিশ রাজত্বে কি স্বাধীন দেশে একটি দিনের জন্যও নিস্তরঙ্গ সুখের মুখ তাহার ভাগ্যে আর দেখা হইল না। ইংরেজ শাসক চিরদিন বাঁকা চোখেই তাহাকে দেখিলেন, জাতীয়তার অন্যতম সূতিকাগৃহ হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন তাঁহাদের কাছে চিহ্নিত ছিল। স্বাধীন দেশে সে মনোভাব ঘুচিলে বটে, কিন্তু নূতন দুরবস্থার উদ্ভব হইল। একটির পর একটি সমস্যা তাহাকে ক্ষতবিক্ষত জর্জরিত করিয়া তুলিতে থাকিল। তথাপি যে মহৎ ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহার রূপ পরিগ্রহ সেই মাহাত্ম্যই সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাহার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার অবস্থা অর্থাভাবের জন্য চরমে পৌঁছিয়াছে।

ইংরেজের যুগে সরকারী আনুকূল্য ইহার ভাগ্যে জোটে নাই বলিলেই চলে। পরীক্ষার ফি বাবদ যে অর্থ তাহার ভাণ্ডারে জমা হইত তাহাই ছিল তাহার প্রধান অবলম্বন। স্বাধীন দেশে সে অবস্থাও বদলাইয়া গেল। যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একক চন্দ্রের মহিমায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতের আকাশে কিরণ সঞ্চার করিতেছিল সে স্থলে আজ তাহা নিছক একটি তারকা মাত্র। এ আকাশে আরও কয়েকটি তারা সমানভাবে বিরাজ করিতেছে

ছোট হইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সংগঠিত হওয়ার পর প্রবেশিকা ও প্রাকস্নাতক পরীক্ষাও এক এক করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে চলিয়া গেল। এই সকল কারণে তাহার তহবিল চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হইতেছে।

সর্বোপরি একটি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ার মত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গণ আজ রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত। বিদ্যাদেবীর পবিত্র পূজার মন্ত্র যে প্রাঙ্গণ হইতে উচ্চারিত হওয়ার কথা সে প্রাঙ্গণ আজ রাজনৈতিক শ্লোগানের ধ্বনিতে মুখরিত। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে দেশের ছাত্র সম্প্রদায়কে তাড়াইয়া মাতাইয়া, উত্তেজিত করিয়া দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজাইয়া এক জাতীয় সর্বনাশকে সাদরে বরণ করিয়া আনিলেন। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সেই কুহকের মায়াজালে উজ্জ্বলের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' পিতৃপিতামহের সময়ের এই মূল মন্ত্রটি বিস্মৃত হইয়া 'ছাত্রানাং রাজনীতিং তপঃ'—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

বর্তমানকালে সভ্যতা ও প্রগতির এই দুর্বার অগ্রগতির দিনে শিক্ষা দীক্ষা সভ্যভাবে এবং মার্জিত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে জীবন ধারণ অচল। অন্ন-বস্ত্রের মতই এ ক্ষেত্রে শিক্ষা, দীক্ষা অপরিহার্য। প্রগতির অপ্রতিহত অগ্র-গমনের সহিত তালে তাল রাখা শিক্ষা-দীক্ষার সহায়তা ব্যতীত কোন-ক্রমেই সম্ভব নয়। এ কথা কোনক্রমেই বিস্মৃত হওয়ার নয় যে শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতার একটি বিরাট বাহন।

এখন পরিতাপের এবং ক্ষোভের বিষয় এই যে কলিকাতা শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির পীঠভূমি জ্ঞান-বিদ্যার বিকাশের মহাতীর্থ। নব নব চেতনা, চিন্তাধারা, মানস জাগরণের উৎস সেই কলি-কাতারই প্রধানতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি, আজ অর্থা-ভাবের জন্য অবলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যে শিক্ষা দীক্ষার জন্য সারা কলিকাতার সমগ্র বিশ্ব জগতে গর্ব ও গৌরবের অন্ত নাই সেই কলি-কাতারই বিশিষ্ট শিক্ষামন্দির যদি সত্যই আজ দ্বারদেশ অবরুদ্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে সভ্যতাগর্বী বাঙালীর জাতীয় জীবনে সে যে কত লজ্জা এবং কি মর্মান্তিক অভিশাপ। ভবিষ্যত যে কত ঘন অন্ধকার, সে চিন্তা কি কাহাকেও আকৃষ্ট করিতেছে না। এখন আমাদের প্রধান জাতীয় কর্তব্য যে শিক্ষা দীক্ষা নব নব ভাবধারার পুণ্যতীর্থ, বিপুল ঐতিহাসিক গৌরবে ভরপুর। অগণিত মনীষীর পুণ্য স্মৃতি ধন্য, স্যার আশু-তোষের কালজয়ী সাধনার এক অসামান্য নিদর্শন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যাকাশে যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনীভূত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া সেই আকাশকে পুনর্বার প্রসন্ন সূর্যের অরুণ রশ্মিতে আলোকিত করা।

অবশেষে 'ল্যাজে পা পড়িল'

আকাশে সূর্য-চন্দ্র ওঠার ন্যায় দৈন-ন্দিন আহার নিদ্রার যে বস্তুটি গত দুই বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে এক প্রাত্যহিক কর্মের তালিকায় স্থান-লাভ করিয়া নিত্যকৃত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার নাম 'ঘেরাও'।

১৯৬৭ সালে পশ্চিম বাঙলায় কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটাইয়া যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হইতেই ব্যাপারটি যেন তাহার শৈশব কৈশোর অতিক্রম করিয়া রাতারাতি এক বিপুল প্রমত্ততাসম্পন্ন বাঁধনহারা, ছন্দোহারা, উদ্দাম পরিপূর্ণ যুবকে রূপান্তরিত হইল। রাতারাতি যেন একটি বালক এক প্রাণবন্ত তরুণে পরিণত হইল। অবাধ স্বাধীনতা, যত্রতত্র বিচরণ রাশ-হীন, বল্গাবিহীন গতি তাহার প্রকট হইয়া উঠিল।

যুক্তফ্রণ্ট আবার ক্ষমতার গদা হস্তে ধারণ করিয়াছেন। ঘেরাও অব্যাহতই আছে। কিন্তু এইবার বড় আশ্চর্য কিন্তু অতি স্বাভাবিক এবং অনুমিত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। শিল্প প্রতি-ষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও মালিক মণ্ডলীই এতদিন 'ঘেরাও'-এর লক্ষ্য ছিলেন। এইবার খোদ যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীবর্গও সেই গণ্ডীতে অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন। দুই বৎসর পূর্বে যে দলের সমর্থনে ঘেরাও বস্তুটি রাতারাতি শিশু হইতে প্রাপ্ত-বয়স্কে পরিণত হইয়াছে এবং 'ঘেরাও' এর বিকাশ এবং জয়যাত্রার ইতিহাসে যে দলের অবদান কোনক্রমেই বিস্মো-রণযোগ্য নয়। সেই দলেরই নায়ক-গণের মধ্যে কাহারও কাহারও কণ্ঠ এই 'ঘেরাও'এর শৃঙ্খল বেষ্টন করিতেছে।

অর্থাৎ প্রাঞ্জল ভাষায় যাহা বলা যায়, যে অবশেষে ল্যাজে পা পড়িল। বুমেরাং হইয়া গেল। সাপুড়ের মৃত্যু সাপের হাতেই হয়। সেদিন জনকল্যাণের নামে শ্রমিকদের প্রতি নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত মনোভাবের নামে 'ঘেরাও' নামক যে মৃত্যুবাণটি বাঙলার প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের দিকে নিক্ষেপ করিতে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সহায়তা করিয়া-ছিলেন, সেই বাণ আজ তাঁহাদেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আজ যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ নিজেরা সেই বাণের তীব্র জ্বালা উপ-লব্ধি করয়া হাড়ে হাড়ে টের পাইতে-ছেন যে ঘেরাও কি ভয়ানক চীজ। এখন তাঁহাদের অনেককেই বলিতে শোনা যাইতেছে যে 'ঘেরাও' জিনিসটি মোটেই ভাল নয়, ইহা অত্যন্ত কুফল প্রসব করে। এমন কি মুখ্যমন্ত্রী অজয়

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন যে ল্যাজে পা পড়িয়াছে।

অথচ আমরা কেহই ভুলি নাই যে দুই বৎসর আগে এই 'ঘেরাও'এর প্রাদুর্ভাবে সারা বাঙলা দেশের শিল্প-রাজ্যে যে ভয়ানক নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল ন্যায্য দাবী আদায়ের নামে যে নৃশংসতার বন্যা বহিয়াছিল তাহা ভুলি নাই। ঘেরাও প্রায় হত্যার স্তরে সেদিন উঠিয়াছিল। মালিকপক্ষের আহার নিদ্রা এমন কি প্রাকৃতিক কৃত্যাদি পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া 'ঘেরাও'-এর যে ব্যাপক বীভৎসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তাহার হতভাগা শিকার-দের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছিল।

শুধু এই নয়। ইহা ছাড়া অশ্রাব্য গালিবর্ষণ তো আছেই। এই যুক্তফ্রণ্টই সেদিন শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির নাম করিয়া এই সকল বেআইনী কার্যের বিরুদ্ধে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। ভাগ্যের পরিহাসে তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী (বর্তমানে পূর্তমন্ত্রী) শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও একদিন দেখা গেল ঘেরাওয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। শ্রীসুশীল ধাড়ার ঘেরাও হওয়াও এক অতি উল্লেখ-যোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা।

শ্রমিকদের এবং নিম্নতম কর্মীদের ন্যায্য দাবী দাওয়া কখনই আমরা উপেক্ষা করি না। তাঁহারা মুখের রক্ত তুলিয়া জীবিকার্জনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিবেন আর বিনিময়ে যথা-প্রাপ্য পাইবেন না---এ ধরণের হীন মনোভাব আমরা কদাচ সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু, ন্যায্য দাবী আদায়ের পথ ইহা নয়।

আর একটি বিষয়ও আজ কাহারও অজানা নয় যে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্বাচনে ভোট কুড়াইবার ফিকিরে ইহাদের বন্ধু সাজিয়া ইহাদিগকে তাতাইয়া মাতাইয়া, উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করিয়া এই সকল অন্যায় কর্মে প্ররো-চিত করিতেছেন। ইহার পরিণতি যে সারা বাঙলা ও বাঙালীর পক্ষে কতখানি শোচনীয় ও মর্মান্তিক তাহা এখনই তো কিছু কিছু বোঝা যাইতেছে।

ঘেরাওএর বিষময় পরিণতি ব্যাখ্যা করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কোন সভ্য ও প্রগতিশীল অঞ্চলে শিল্পের সমৃদ্ধি অপরিহার্য। প্রগতির অন্যতম বাহন শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের প্রতি জাতীয় উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। তদুপরি এক-একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যে কতগুলি জঠরের জ্বালা মিটাইয়া থাকে সে গুরুত্ব তাহার উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এখন, ঘেরাও মুক্ত হওয়ার পর বহু শিল্পপতি বা প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের মনের যা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অনেকেই প্রতিষ্ঠান চালাইতে আর সাহস বোধ করিতেছেন না।

ব্যবসা চালানো না চালানো ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল তা ছাড়া পশ্চিম বাঙলার বুকে বহু অবাঙালী ব্যবসায় চালাইতেছেন, এই নিদারুণ অবস্থা হইতে কোর্টের আনু-কূল্যে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি পাইয়া অনেকেই জাল গুটাইতে সঙ্কল্প করিতেছেন, অবাঙালী শিল্পপতির দল বাঙলা দেশ ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গেলে তাঁহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান প্রবেশপথে একের পর এক যদি তালা ঝুলিতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচ্যুত হইবেন—তাঁহাদের অবস্থাটা যে কি হইবে তাহা কি তাঁহাদের এই সকল 'অশেষ শুভা-কাঙ্ক্ষীর দল' বারেকের জন্যেও ভাবিয়া দেখিতেছেন। এই শুভাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায় একবারও তো ঘোষণা করিতেছেন না—যে—আমাদের সমর্থনে পরি-চালিত হইয়া তোমরা কর্মচ্যুত হইলে আমরা তোমাদের ভার গ্রহণ করিব। এ ধরণের আশ্বাসবাণী কিন্তু অদ্যাপি শ্রুত হইল না।

এখন সর্বাগ্রে—সমগ্র জাতির মঙ্গল চিন্তা স্মরণ করিয়া যাহা একমাত্র কর্তব্য তাহা অবিলম্বে এই কথায় কথায় 'ঘেরাও' বস্তুটি নিষিদ্ধ এবং বেআইনী ঘোষণা করা হউক। আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিকদের বন্ধু সাজিয়া যাহারা এতগুলি লোককে নিরন্ন করি-তেছে শিল্পের দিক দিয়া অগ্রণী এই বাংলা দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিতেছে তাহা-দের জন্য কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হউক।

সমাজ বিরোধী বলিয়া যাহারা চিহ্নিত এবং সমাজ বিরোধী কাজের আওতায় যে সকল কার্য পড়ে এই সকল ব্যক্তি এবং তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের তুলনায় কোন অংশে পৃথক নয়। একদল গুণ্ডা ব্যক্তিবিশেষ বা কয়েকটি ব্যক্তির ক্ষতি এক সঙ্গে সাধিত করে, কিন্তু ইহারা সারা জাতির ক্ষতি সাধিত করে।

অতএব এই অবস্থা যদি আরও কিছুকাল চলে তাহা হইলে এই ঘেরাও তন্ত্রের প্রকোপে সারা বাঙলার শিল্প-বাণিজ্য ডকে উঠিবে এবং সারা দেশ আবার নতুন এক সর্বনাশা বিপর্যয়ের সম্মুখে পতিত হইবে।

মন্ত্রী মহোদয়দের মধ্যে কেহ কেহ যখন শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়া শিখিয়া আজ ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন, তখন এইবার এই সর্বনাশের কবল হইতে বাঙলাদেশকে রাহুমুক্ত করুন—ইহাই কামনা।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[শ্রী বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,— আপনাদের শ্রাবণের (১৩৭৫) সালের সম্পাদকীয় 'শিক্ষাজগতে তাণ্ডব' প্রবন্ধটি বার বার করে পড়লেও পড়বারই ইচ্ছাটাই আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অতি সময়োপযোগী প্রবন্ধটির জন্য আপনাদের মুঠোমুঠো শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে—শিক্ষাজগতের সমস্যা ও শিক্ষাজগতের যে ক্রমবর্ধমান তাণ্ডবলীলা দিনের পর দিন দেখতে পাচ্ছি, সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা নিবেদন করতে চাই। অপরিণত ও দুধের মত সুন্দর বালকবালিকাদের মধ্যে আজ যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং দিনের পর দিন যে বিক্ষোভ বেড়ে চলেছে, তার জন্য দায়ী কে বা কারা সেই প্রশ্নটিই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যার আকারে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ এবং আমার মনে হয়, তার প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্কট। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বিচারে এই সরলমতি শিশুদের লইয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে বড়ের চালের মত ব্যবহার করা। এই বিশেষ কথাটিই পূর্বতন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা সাহেব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—

Students should not be used as a pawn in the game of politics.

সাপ লইয়া খেলিতে খেলিতেই একদিন এই সাপের হাতেই ওস্তাদের মৃত্যু অবধারিত হইয়া পড়ে।

আমাদের বোধ হয় সেই দিনই আসিয়াছে—এই সরলমতি অপরিণত বালকবালিকাদের মাথায় নানান চিন্তার বোঝা চাপাইয়া দিয়া আজ দেশের যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাতে বিশেষ অবাক হইবার কিছুই নাই। আজ বিশ বৎসরের উপরকাল ধরিয়া

আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু নীতি প্রবর্তন করিতে পারি নাই। কমিশনের পর কমিশন বসাইয়া কমিটির পর কমিটি স্থাপন করিয়া আমাদের কতকগুলি অর্থই ব্যয় হইয়াছে, কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। জোর করিয়া হিন্দীকে প্রাধান্য দিতে গিয়া এবং মতলব করিয়া ইংরাজীকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেবার সুচিন্তিত পরিকল্পনা আমাদের আজ এক ভীষণ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে।

নির্বিচারে সব দোষ বালকবালিকাদের উপর চাপাইয়া দিলেই এই সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। আমাদের ইহার গভীরে ও মূলে যাইতে হইবে। তবে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জঘন্য তাণ্ডবলীলা হইয়া গেল—উহার তীব্র নিন্দা সকলেই করিবে। পরিশেষে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন যেমন নির্ভীক ও কঠোরভাবে ঐ পরিস্থিতিটাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি, আমাদের বর্তমান উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন শিক্ষাজগতে নূতন আলোকপাত করতে সক্ষম হবেন এবং ছাত্রদের ঠিক পথে নিয়ে যাবেন।

—শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮সি, সি এন রায় রোড, কলিকাতা-৩৯

সুন্দরবন অতীত ও বর্তমান

মাসিক বসুমতীর গত পৌষ ও ফাল্গুন (১৩৭৫) সংখ্যায় শ্রীনরোত্তম হালদারের "সুন্দরবন: অতীত ও বর্তমান" পড়লাম। প্রথম অংশে সুন্দরবনের জনপদ ও জঙ্গলের ভৌগোলিক পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং বর্তমান অভয়ারণ্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি অতীত কাল থেকে সুন্দরবনের উত্থান পতন এবং বহু তথ্য প্রমাণাদি সহ আদি গঙ্গার প্রবাহপথ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণালব্ধ অভিমত প্রকাশ করেছেন, অশেষ ঐতিহ্য মণ্ডিত সাগর দ্বীপের বিবরণ থেকেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সুন্দরবনের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অত্যন্ত দুরূহ বিষয়—সন্দেহ নেই।

শ্রীযুত হালদারের বহু পরিশ্রমলব্ধ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশ করে মাসিক বসুমতী তার পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। সুন্দরবনের অন্যান্য অংশের প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ এবং এতদঅঞ্চলের জাতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় সমগ্র সুন্দরবনের প্রকৃত রূপ বসুমতীর পাতায় ক্রমশ দেখতে পাব, এই আশা রাখি। ধ্বংসস্তূপ থেকে ইতিহাস রচনায় উপাদান সংগ্রহে মাসিক বসুমতীর এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই, সুন্দরবনের ইতিহাস লেখা দুঃসাধ্য হলেও একেবারে অসাধ্য নয়, লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা অনুমান করা যায়।—শ্রীকিশোরীমোহন নস্কর, মধুসূদনপুর, পোঃ সূর্যনগর, ভায়া—কুলপী, ২৪ পরগণা।

রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ হোক

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

চৈত্র সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত "রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ হোক" প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পড়িলাম। নিবন্ধে প্রকাশিত তাঁর যুক্তিপূর্ণ অভিমতটি আমাদের দেশের তত্ত্ব

বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতারা ও সমর্থকেরা একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করলে সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন। সম্প্রতি কয়েকমাসে রাজনৈতিক গোলযোগকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে অনেকগুলি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এটা সত্যিই দুঃখের কথা। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন মত, বিভিন্ন চিন্তাধারা, দৃষ্টিগত পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই বলে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটবে কেন? দলীয় শৃঙখলা বজায় না রাখতে পারলে রাজ্যের আইন শৃঙখলা কি ভাবে রক্ষিত হবে?—শ্রীতিমির দাশগুপ্ত, ৭৭, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন, বেলেঘাটা কলি-১০।

বিবিধ প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আমি দীর্ঘদিনের মাসিক বসুমতীর একনিষ্ঠ পাঠক। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মাসিক বসুমতীই একমাত্র পত্রিকা, যে সত্যিকারের সৎ সাহিত্য প্রচার করে এবং পাঠককে আনন্দ প্রদান করে। বাঙলা দেশে তো আরো বহু মাসিক পত্রিকা আছে, কিন্তু থাকলে কি হবে, সে সব পত্রিকা পাঠককে আনন্দ দিতে পারে না। মাসিক বসুমতীর বিশেষ আকর্ষণ হল জর্জ এ্যালেনের সংগ্রহ, তারপর চারজন, আরোগ্য বিভাগ, রাশিচক্র, এমনি আরো অনেক বিভাগ।

ধারাবাহিক রচনাগুলি বেশ ভালো লাগে। ভালো লাগার কারণ মননশীল রচনা। যেমন নমিতা চক্রবর্তীর—অহল্যা রাত্রি। বাণি দেবীর—অন্য ঠিকানায়। প্রফুল্ল রায়ের—বাতাসে প্রতিধ্বনি। এখানে প্রফুল্ল রায় মহাশয়কে একটি প্রশ্ন করছি। বাতাসে প্রতিধ্বনির চিরঞ্জীব কে? লেখক তো নিজেকে চিরঞ্জীব বলে পরিচয় দিয়েছেন। বিস্তারিত জানালে সুখী হব। —ভীবরুল, আতপর, ২৪ পরগণা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

●শ্রীমতী গায়ত্রী ঘটক, অব:—শ্রীশশাঙ্ক ঘটক, কোলবোর্ড, জি টি রোড, ডাক—আসানসোল, জেলা—বর্ধমান ●শ্রীমতী রাণী সেনমজুমদার, ডেপুটি ইন্সপেকট্রেস অব স্কুলস, চাতরা, ডাক—চাতরা, হাজারীবাগ ●শ্রী জে কে নন্দী, নন্দীবাড়ী, ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা—৮ ●শ্রীমতী অর্চনা চক্রবর্তী, অব:—শ্রী পি কে চক্রবর্তী, ৩৭, ফার ট্রি এ্যাভেনিউ, নর্মাণ্ডি, মিডলস্ বরো, ইয়র্কশায়ার, ইউ কে। ●শ্রী বি কে গুপ্ত, ফিল্ড রিসার্চ স্টেশন, অব:—আই এন এস, ভালসুরা, ডাক—জামনগর, গুজরাট। ●শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, কোটবাজার, হোসাঙ্গাবাদ। ● সচিব, সারভজনিক হিন্দু পুস্তকালয়, দেরগাঁও, শিবসাগর, আসাম। ●হেড মিস্ট্রেস, জিয়াগঞ্জ গার্লস স্কুল, জিয়াগঞ্জ।

আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহকমূল্য বাবদ ২০৲ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইবেন। বি কে পাল, কটক, উড়িষ্যা।

I am remitting Rs. 20/- being the annual snbscription of Masik Basumati from Baisakh 1376 B.S. to Chaitra 1376 B.S. Please send regularly.—Headmaster, R. K. Institution, Kailashar Tripura.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ১০৲ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী যথারীতি পাঠাইবেন। সন্ধ্যা ভট্টাচার্য অব:- সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী সহর, কুচবিহার।

এম ডি বসুর নির্দেশ মত ৩৬৲ টাকা পাঠালাম। তাঁকে মাসিক বসুমতীর নতুন সদস্য করে নেবেন। সি-মেল-এ নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। শ্রীএম ডি বসুর ঠিকানা—স্টুডেন্টস হোম, সেণ্টজন হসপিট্যাল, লণ্ডন রোড, লিঙ্কন, ইংল্যাণ্ড।

SQUIBB
VIMGRAN
MULTIPLE VITAMINS MINERALS TABLETS
SARABHAI CHEMICALS

ভিমগ্র্যান®

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর আড়াজাগানো উপন্যাস

মহাস্থবির জাতক (৪র্থ পর্ব) ৬.০০

প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্ব : প্রতি পর্বের দাম ৬.০০

[ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু—সব দিক থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যের অগ্রগতির পথে একখানা মাইলস্টোন স্বরূপ। বহুদিন পরে পুনর্মুদ্রিত হ'লো।]

'বনফুল'-এর উপন্যাস
পক্ষীমিথুন ৪.০০
পঞ্চপর্ব ৭.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কোকিল ডেকেছিল ৩.২৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
ক্লাসিক উপন্যাস
বার ঘর এক উঠোন (৪র্থ সং) ১০.০০

সুনীলকুমার নাগ-এর
মনের আলোয় দেখা ৫.০০

নবেন্দু ঘোষ-এর
পঞ্চম রাগ ৩.২৫

অজিতকুমার বসুর
প্রজ্ঞাপারমিতা ১০.০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস) ৪.০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জন্ম ও মৃত্যু ৩.০০

অজিতকৃষ্ণ বসুর
নন্দিনী সোম ৪.০০

বনফুল-এর উপন্যাস
হাটে-বাজারে ৪.৫০

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়'র উপন্যাস
সেই প্রেম আস্বাদন ৩.০০
অতি বড় বরণী ২.৫০

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
মেঘলা আকাশ ২.০০

উপহারের অনবদ্য : কবিতা গ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কখনো মেঘ ৪.০০
সাগর থেকে ফেরা ৩.৫০

'বনফুল'-এর
নুতন বাঁকে ২.৫০

জয়ন্তী সেনের
তুষারে রোদ ৩.০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
স্বনির্বাচিত কবিতা ৪.০০

দেবেশ দাশের
সুদূর বাঁশরী ২.৫০

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
শতাব্দীর সঙ্গীত ৫.০০

দিলীপকুমার রায়ের
মধু মুরলী ১০.০০

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যগ্রন্থসমূহ :

গৃহদাহ ২.৫০ : দেবদাস ২.৫০ : নিষ্কৃতি ১.৭৫ : পণ্ডিত মশাই ২.৫০ : পথের দাবী ২.৭৫
বিজয়া ২.৫০ : রমা ২.৫০ : ষোড়শী ২.৭৫

গ্রাম : কালচার (বি)
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৪-২৬৪১

প্রান্তর

-কুমারী বন্দনা সেনগুপ্তা অঙ্কিত

॥ ৪৮ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭৬ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা

ভক্তের সুখদুঃখ

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত ; আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল।

"একজন কাঠুরে— পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে ; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না ; সেই কাঠ কেটেই তাকে খেতে হবে।

"কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হল, কিন্তু কারাগার ঘুচলো না।

"কি জান, এ সব প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। একজন কানা গঙ্গাস্নান করে পাপ সব ঘুচে গেল, কিন্তু কানার চোখ সারলো না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল, তাই এ ভোগ।

"দেহের সুখদুঃখ যা-ই হোক্, ভক্তের জ্ঞানভক্তির ঐশ্বর্য থাকে ; ঐশ্বর্য কখনো যাবার নয়। দেখ না,—পাণ্ডবদের অতো বিপদ, কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত কোথায় ?"

ভগবান

ভগবান কাকে বলে ? লৌকিকভাবে ছয়টি গুণ বর্তমান থাকলে তাঁকে ভগবান বলা হয়। যথা ঃ

'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥'

ভূত সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ, ভূত সকল কোথা থেকে [illegible] থাকবে, আর বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই ছয়টি বিষয় যিনি জানেন তাঁকে ভগবান বলা হয়। এ মতে মহাপুরুষরাও ভগবানই।

ভগ শব্দ অস্ত্যর্থে বতুপ্ প্রত্যয় করে ভগবান শব্দ সিদ্ধ হয়। তার মানে ভগ আছে যাঁর, তিনিই ভগবান। ভগ কি ? বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥'

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টি ভগ নামে প্রসিদ্ধ। এই ছয়টি যাঁর সম্পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান।

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা পরমেশ্বরে এগুলি সব আছে বলে তিনি ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ওঙ্কারনাথ বলেছেন—"ভগবান দৃষ্টিগোচর হন কিনা বড় শক্ত প্রশ্ন ; তবে তিনি মানসগোচর হন নিশ্চয়ই। তাঁকে অনুভব করা যায়।। বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে, প্রতি জ্যোতিকণায়, প্রতি তৃণে, প্রতি ধূলিকণায় তিনি। তিনি আছেন তাই আমরা আছি, তোমরা আছ—বিশ্ব আছে। তিনি সকলেরই। তুমি চাও, তোমার ; আমি চাই, আমার। বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে যেও না—পারা যায় না। সে ইন্দ্রিয় সকলের নেই। তবে শুদ্ধ তাঁকে ভালবাসা দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এমন ভূমি লাভ করা যায়, যে ভূমি থেকে তাঁকে অনুভব করা যায়। নয়তো যার সে ক্ষমতা নাই—সে-ও যদি আকুল হয়ে ডাকে—তার মন ও বুদ্ধির গম্য হয়ে নিজেকে খুব ছোট করে সে ভক্তকে তিনি দেখা দেন। পৃথিবীতে কত লোক ইষ্টরূপে তাঁকে ভজনা করে। ছোটর কাছে ছোট হয়ে দেখা দেন তিনি—এত কৃপা তাঁর। কিন্তু তাঁর নিজের যে রূপ—সে রূপে তাঁকে যাঁরা দেখতে পান—তাঁরা মহাশক্তিধর, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করার ক্ষমতা রাখেন
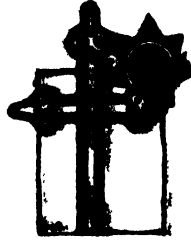
তাঁর। তাঁকে মানুষের রূপে দেখতে চাও ত' তুমিও পাবে—ভক্তি করে চাও। অত বড়ও কেউ নেই, আবার অত ছোটও কেউ নেই।

"বিশ্বের ভগবানের অসীম ধৈর্য। কাউকে তিনি অবহেলা করেন না। তবে দেরী হতে পারে। যাঁর নিরলস আত্মা,—আধ্যাত্মিক জ্যোতি যাঁদের মধ্যে জ্বলছে—স্বয়ম্প্রভ মহিমায় তাঁরা এক জন্মেই ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে। যেমন বলেছিলেন ঋষি—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—

আমি অন্ধকারের ওপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জেনেছি। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—'ওগো শোন; সবাই শোন।' আনন্দের ভাগ সবাইকে না দিলে কেন চলছে না! কিন্তু ক'জন সেজন্য ব্যগ্র? আদিত্যবর্ণ পুরুষকে না জেনেও তাদের জন্মের পর জন্ম, এমন কি, কল্পের পর কল্প পরম আরামে অন্ধের মত কেটে যাচ্ছে, চরম অন্ধকারে। তার ওপারে কি আছে, কে সন্ধান রাখে?

"কিন্তু অসীম শক্তিধর সে সত্য প্রচার করে কৃপা করে সবাইকে কেন উদ্ধার করেন না? তা হয় না—কারণ, যে পৃথিবী যে সত্যের জন্য প্রস্তুত নয়, যে মানুষকে যে কথা বললে সে বুঝবে না—যে মানুষ সত্যগ্রাহী নয়—সে মানুষকে সে কথা জোর করে শোনানো হয় না। স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়লে মুক্তো হয়—কিন্তু ধুলোয় পড়লে? যা হয় না, মহাজ্ঞানী ভগবান তা করেন না।

"তবে মানুষের মুক্তি কেমন করে হবে? হবে—যখন মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি উন্মুখ যে মন, সে মনের সকল ভ্রান্তি ঘুচিয়ে দিয়ে, সত্যের প্রদীপ, জ্ঞানের প্রদীপ তিনি জ্বালিয়ে দেন। 'ত্বামেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি'—তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে। জীবাবর্তকে জয় করাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা। তাঁকে না জানলে কিছুতেই এ আবর্ত এড়ানো যায় না। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই।

"তাঁকে ডাকো। তাঁর কাছে আলো ভিক্ষা চাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর সর্বদা। পরকে ভালবাসো। যেখানে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ক্ষমা—সেখানে তিনি। তিনিই তাঁকে বোঝবার শক্তি দেবেন। তাঁর জন্য যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান। এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই পৃথিবীর মানুষের। যারা নিরলস হয়ে তাঁকে ডাকে, ভালবাসে— পরের সেবা করে; এক অমানব পুরুষ তাদের হাত ধরে দেবযান পথে জন্মমৃত্যুর দুস্তর অকূল মহাসমুদ্র পার করে নিয়ে যান। ভগবান নিজেই সেই অমানব পুরুষ—যিনি অসীম করুণায় নিজেই এগিয়ে এসে হাত ধরেন অসহায়ের, শরণাগতের। সৃষ্টির আদিকালের বাণী এ। যা সত্য, তা চিরকালই সত্য—এই একই বার্তা যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে, দূতের পর দূত এসেছে গিয়েছে,—"অন্ধ জাগো।"—না, কিবা রাত্রি কিবা দিন' চোখ আছে, কেউ দেখে না! কান আছে, কেউ শোনে না!

"ভগবান তারেই সাহায্য করেন, যে অকপটে সৎ হবার চেষ্টা করছে—শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। যেচে তিনি সাহায্য করতে গেলে তাতে কোন ফল হবে না বলেই তাঁর কাছ থেকে অযাচিত সাহায্য আসে না।

"যে ভগবানকে চেনে না—তাঁকে স্বীকার করে না,—তার হল 'আচ্ছাদিত চেতন'। তার চেয়ে যে ভালো তাকে বলে 'সঙ্কুচিত চেতন'। এই দুই ধরণের লোককে ভগবৎ কথা শোনালে উল্টো উৎপত্তি হয়। আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনির মধ্যে আলো সেঁধোবে না।

"এদের উপরে 'মুকুলিত চেতন'—তাদের মনে ভগবানের জ্ঞান জাগতে সুরু করেছে। তারও উপরে 'বিকশিত চেতন'—জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এখনো হয় নি। সবার উপরে 'পূর্ণ বিকশিত চেতন'—যেমন বড় বড় ভক্ত কি সাধকেরা।

"'সঙ্কুচিত চেতন' জীবেরা নিম্নস্তরের চৈতন্য নিয়ে জন্মে। ওরা মরে যাওয়ার অল্পদিন পরেই আবার দেহ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়, কারণ ভুবর্লোকে ওদের চৈতন্য মোটেই থাকে না; যদি থাকে ত খুব কম। ওই দেহ না নিলে উপায় হয় না। সুতরাং দীর্ঘ সময় ধরে ওদের প্রায় স্থূল দেহেই বর্তমান থাকতে হয়—পৃথিবীর কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে ওদের অনেক দেরী। সভ্য সমাজেও এমন অনেক আছে—খুনী। দস্যু, অলস, চোর, পরপীড়ক ইত্যাদি।

"জোর করে মানুষের উপর কোন সত্য, কোন বাণী চাপানো যায় না। বুদ্ধিহীন বা স্থূলবুদ্ধি ভোগাসক্ত মন হঠাৎ ভগবানকে গ্রহণ করতে পারে না। পারলেই যে মুক্তি— ভগবানকে যে ভালবাসে, সে যে ভগবানের সমান হয়ে যায়। কাজেই মহাযুগ মন্বন্তর চলে যায় স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের মুক্তি পেতে। এক জন্মেই মুক্তি হতে পারে—যদি সত্যের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে,—যদি ভগবৎ প্রেমে বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে মনে। প্রেম-এর মধ্যেই সব। এই-ই মাত্র একটি কথা—জীবে প্রেম, ভগবানে প্রেম। যে ভগবানকে জানতে চায়, ভগবান তাকে জানবার সব রকম সুযোগ দেন।
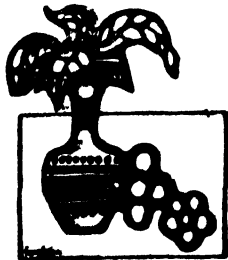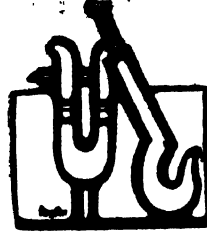
"ভগবানের কৃপা না হলে হয় না। কিন্তু সে কৃপার জন্য ক্ষেত্র তৈরী হওয়া দরকার। পরকে ভালবাসো, জীবকে সেবা করো, আসক্তি ত্যাগ করো, ভগবানে মন দাও। মনের কুয়াসা না কাটলে সত্যের আলোকপাত হয় না। ভগবানকে যে আন্তরিকভাবে ডাকে, তিনি তার কাছে যাবেনই। যে রূপ সে চায়, সে রূপেই যাবেন। এ একটা অমোঘ নিয়ম। যেমন চুম্বকের কাছে লোহা ছুটে যাবেই, তেমনি। ভগবান যাবেনই ভক্তরূপ চুম্বকের কাছে। তাঁকে টেনে নেবে আকর্ষণ করে। এ ওকে টানছে, ও একে টানছে।

"ভগবান কল্পতরুস্বরূপ; যথার্থ পিপাসু ও আকুল ব্যক্তিকে নিরাশ করেন না। তিনি প্রত্যেক গ্রহে অসীম বিশ্বের সমস্ত জীবকুলের সম্মুখে তাদের ভাবানুযায়ী মায়িক রূপ নিয়ে দেখা দেন। তিনি অসীম অনন্তরূপী; তাঁর কোন শেষ নেই। কিন্তু সসীম মানুষ তাঁর কোটি কোটি মায়িকরূপ ধারণ করতে পারেনা—অরূপ ত নয়ই,—তাই তাঁর একটিমাত্র সুন্দর রূপের ধারণায় সিদ্ধিলাভই হল সহজ পথ। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞানের পথ,—বীরের পথ, কঠিন পথ। দু পথেই তাঁকে পাওয়া যায়।

"তাঁর স্বরূপ কি শুনবে? তিনি বালস্বভাব; পথের বাঁকে বসে থাকেন উৎসুক হয়ে ধরা দেবার জন্যে। কিন্তু তাঁর পেছনে ছুটতে গেলে তিনি বালকের মত হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে যান। সেই সময় যদি তুমি হতাশ হয়ে ছুট দেওয়া বন্ধ করো—তবে তিনি নিরাশ হবেন, দাঁড়িয়ে যাবেন বালকের মত। তিনি চান, জীব তাঁর পিছনে পিছনে খানিক ছোটে—হাঁপায়। ভগবান জীবের সঙ্গে বালকের মত খেলা করেই মহাখুশী। না থেমে পেছনে ছুটতে থাকলে ভগবান শেষে অকারণেই আবার ফিরে আসবেন, হাসতে হাসতে ধরা দেবেন। তাই, ভগবানকে নিরাশ কোরো না, তাঁকে একটু জীবকে নিয়ে খেলা করতে দাও—তিনি একা থাকতে ভালবাসেন না। করুণার আলোয় তিনি বিশ্বজগৎ জুড়ে আছেন। কাউকে তিনি ভোলেন না, অবহেলা করেন না—তাঁর মত প্রেমিক কে? যে তাঁকে ডাকে, যে তাঁর শরণ নেয়, তিনি তারই দোরে ছুটে যান—পাপী-পতিত দেখেন না। কিন্তু কেউ কি তাঁকে চায়?

"মহাসমুদ্রের মত অন্তহীন তাঁর করুণা! লোকে তাঁকে বুঝতে পারে না--তাই বলে তাঁকে নিষ্ঠুর। তিনি দু'-তিন জন্মের মঙ্গল করেন একজন্মের কর্মক্ষয় করে। পৃথিবীর লোকে সদ্য সদ্য ফল চায়; বোঝে না তিনি কি করতে চাইলেন। ধ্বংসের মধ্যদিয়ে অনেক সময় আসে তাঁর করুণা। কাজেই অবুঝের গলাগালি তাঁকে সহ্য করতে হয়। এ জগতে ভয় নেই, অমঙ্গল নেই, তাঁর আশীর্বাদ রয়েছে বিশ্বের উপরে।"

ভাগাড়ে নজর

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে—যেখানে মরা জানোয়ার ফেলা হয়; কেবল খুঁজছে কোথায় মরা জানোয়ার—কোথায় ভাগাড়, কোথায় মরা! তেমনি যারা শুধু পণ্ডিত, তারা খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলোক ঝাড়তে পারে, নানা জ্ঞানের কথা বলে—কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—তার মিছে পড়া। মেয়েমানুষ টাকা, মান, ঐশ্বর্য, দেহের সুখ, এ সবই যারা সার বস্তু মনে করেছে, যারা তীর্থে গিয়ে ভক্তিলাভ করা দূরে থাক, বাড়ির কথা, বিষয়ের কথা ভেবেই অস্থির—তারা আবার পণ্ডিত কি? এদেরও ত ভাগাড়ে নজর! শকুনির মত এরাও ত পচা মড়া খুঁজছে! যদি শুনি পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য আছে ঈশ্বরচিন্তা আছে, তবে ভয় হয়; তা না হলে এ সব পণ্ডিতকে খড়-কুটো বলে, কুকুর-ছাগল বলে, বোধ হয়।"

ভাব

ভাব কাকে বলে? বিভিন্ন অর্থে আমরা ভাব শব্দটিকে ব্যবহার করি। যেমন (১) মনের ভাব অর্থে অভিপ্রায় বা প্রবৃত্তি বুঝি; (২) শরীরের ভাব অর্থে সুস্থতা (স্বাস্থ্য) বুঝি; (৩) কথার ভাব অর্থে প্রবণতা বা inclination বুঝি; আর (৪) চিত্তের ভাব বলতে বিভিন্ন প্রকার মনোবিকার—বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক বিষয়জাত মনের বিকার (রত্যাদি এবং নির্বেদাদি) বুঝি। এগুলি চিত্তের বিলাপ।

প্রথম তিন প্রকারের ভাবে কোন অস্পষ্টতা নাই; তাই সহজবোধ্য। কিন্তু শেষ প্রকারের ভাব ঠিক কি জিনিষ তা একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক। স্বয়ং ভগবানও বলেছেন, ভাবের স্বরূপে বাক্যদ্বারা প্রকাশ অসম্ভব। সে চেষ্টা ব্রহ্মকে বাক্যদ্বারা প্রকাশের চেষ্টার মত। তবে, মোটামুটি এটুকু বলা যায় যে, ভাবকে অনেকটা 'তন্ময়তা' বলা চলে।

বিষয় সংস্পর্শে মানুষের মায়াজনিত—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহজনিত নানারূপ ভাব হয়। তা ছাড়া মাতৃভাব, প্রেমভাব, স্নেহভাব ইত্যাদি নানাপ্রকারে বিষয়ে তন্ময়তা আসে, যার ফলে সংসারী মানব অধীর ও উন্মত্ত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার বিষয়ের প্রতি তন্ময়তা এত প্রবল হয় যে, তার প্রেমের বা ভালবাসার বস্তুর (এবং সেই সঙ্গে নিজ মনের) তৃপ্তি সাধনই সে জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলে মনে করে; আবার সেই ভালবাসার পাত্রের বা বস্তুর অভাব যেন তাকে উন্মাদের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করে ফেলে। এগুলি সংসারীর বৈষয়িক ভাব।

আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক রাজ্যেও তেমনি একই রূপ ভাব-তন্ময়তা উপস্থিত হয়। ভগবৎশক্তির মাধুর্য ও আনন্দ উপভোগ করতে হলে তাই তাঁতে তন্ময় হয়ে তাঁর শক্তি আত্মতত্ত্বে (যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি দেহাত্মবুদ্ধিরূপে প্রকটিত হয়) সংক্রামিত করতে হয়। এ তন্ময়তা কি রকম জান? এ হল তাঁর ভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলা—তাঁর সত্তায় নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়া—যার ফলে সাধক ভাবের উন্মাদনায় যা কিছু করে সবই একলক্ষ্য হয়ে সাধকের ভাব-সিদ্ধির সহায়ক হয়।

যখন সাধক সাধনার ফলে অভীষ্ট দেবতায় এরূপ তন্ময় হয়ে পড়েন, তখন জগতের যেদিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে সেখানেই তাঁর ধ্যেয় অভীষ্ট দেবতাকে দেখতে পান এবং সর্বত্র সব কিছুই তাঁর কাছে দেবতাময় বলে মনে হয়। বস্তুত অভীষ্ট দেবতার সাধনা তখনই সার্থক হয় যখন সাধক অন্তরে বাহিরে তাঁর ভাবে একান্ত হয়—তন্ময় হয়।

এ তন্ময়তা সাধকের মধ্যে দুই রকমে আত্মপ্রকাশ করে—দুই রকমে ইহা অভিব্যক্ত হয়। উভয় প্রকার অভিব্যক্তিকেই ভাব বলে।

প্রথম প্রকারের অভিব্যক্তিতে ঈশ্বরকে চিন্তা করে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে, যখন তাঁর সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠে, সে অন্তরঙ্গতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যখন দীর্ঘস্থায়ী একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ আলম্বনের ইচ্ছায় সাধক সেই অন্তরঙ্গতাকে আত্মীয়তায় পর্যবসিত করার জন্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাবে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তখনই বলা হয় একটা ভাব আশ্রয় করা হয়েছে। এই ভাব আশ্রয় করে সাধনা করার নামই ভাব-সাধন; আর শান্ত, দাস্যাদিই বিভিন্ন ভাব। এ সকল ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী।

দ্বিতীয় প্রকারের অভিব্যক্তি বেশ তীব্র কিন্তু স্বল্পকাল-স্থায়ী। চারে মাছ এসে টোপ খেতে আরম্ভ করলে যখন ফাত্না নড়ে, তখন যে ছিপ ফেলেছে সে যেমন ব্যস্ত হয়ে ছিপ হাতে করে, নিষ্পলকে একাগ্রমনে ফাত্নার দিকে চেয়ে থেকে একেবারে বাহ্যশূন্য হয়ে পড়ে—কারু কথা শুনতে পায় না, কারু সঙ্গে কথা কয় না—ফাত্নাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়—দ্বিতীয় প্রকারের ভাবও অনেকটা সে অবস্থা। এরকম ভাব হলে মানুষ অবাক হয়—বায়ু স্থির হয়ে যায়—আপনি কুম্ভক হয়। চিত্তের পূর্ণ একাগ্রতা থেকে আভিনিবিষ্ট হলে এইরকম ভাব হয়। ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় এই ভাব হয়—সচ্চিদানন্দকে ভেবে এরূপ তন্ময়তা—বাহ্যশূন্যতা।

. শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই, তবে তো হবে। ভাব কাকে বলে? তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতানোর নাম ভাব—যেমন তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি। খেতে, শুতে, বসতে, সর্বক্ষণ এ সম্বন্ধটা মনে রাখা চাই। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিলে তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। তাই ঈশ্বরলাভ করতে যে চাইবে তাকে শান্ত দাস্যাদি পাঁচরকম ভাবের কোন একটা আশ্রয় করতে হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্তভাব, হনুমান দাসভাব, ব্রজের রাখালরা সখ্যভাব, যশোদা বাৎসল্যভাব (ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি), আর শ্রীমতী মধুরভাব নিয়েছিলেন। ভাব—ভালবাসার, ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা। তাঁকে ভালবাসতে না পারলে তিনি ধরা দেন না।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ফ্রেডারিক শিলার

জার্মানীর সাংস্কৃতিক গর্ব, গরিমা ও গৌরব বিবর্ধনের ইতিহাসে মহাকবি গ্যেটের পরেই যে নামটি অমলিন দীপ্তিতে বিরাজ করছে—সেই শুভনাম শিলার। ফ্রেডারিক শিলার। জার্মান নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন ও শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর মহান ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা সারা জার্মান জাতিকে তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী করে রেখেছে। ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য এ প্রসঙ্গে আজ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

গ্যেটের চেয়ে দশ বছরের ছোট ও নাপলিয়ঁর চেয়ে দশ বছরের বড় শিলারের জন্ম দক্ষিণ জার্মানীর নেকার নদীর তীরবর্তী মারবাকে ১৭৫৯ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে। বাবা ছিলেন সৈন্য-বাহিনীর এক অফিসার। শিলার চেয়েছিলেন ধর্মবিদ্যা সম্বন্ধে পাঠ নিতে, কিন্তু ১৭৭৩ সালে স্থানীয় শাসনকর্তা উর্টেমবার্গের ডিউক কার্ল ইউগেনের আদেশে তাঁকে ঢুকতে হল সামরিক বিদ্যালয়ে।

এইখানেই তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম নাটক 'দ্য রবারস'। ১৩ই জানুয়ারী ১৭৮২ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লেখা এই নাটক মঞ্চস্থ হয়ে চার-দিকে এক অভাবনীয় আলোড়ন আনল। ডিউক আরও গেলেন ক্ষেপে। এই ধরণের নাটক লেখা সম্বন্ধে শিলারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী হল। শিলারকে পালাতে হল রাজ্য ছেড়ে।

তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'দ্য কনস্পিরেসি অফ ফিয়েস্কো ইন জেনোয়া' এবং তৃতীয় নাটক 'ইনট্রিগ এ্যাণ্ড লাভ'ও দর্শক সমাজে সাদরে গৃহীত হয়ে জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত করল।

১৭৮৭ সালে শিলার এলেন ওয়েমারে। এইখানে অন্যান্য সমকালীন দিকপালদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই তালিকায় গ্যেটে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকেন। দুই প্রতিভাধরের মধ্যে এক আত্মার বন্ধন গড়ে উঠল যা শিলারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অটুট ছিল।

গ্যেটের প্রচেষ্টাতেই জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক পদ শিলারের অধিকারে আসে। স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ডাচেদের বিদ্রোহের ইতিহাস লিখে তখন ঐতিহাসিক হিসাবেও শিলার সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

শিলার ছিলেন দর্শনাচার্য কান্টের মন্ত্রশিষ্য। কান্টের আদর্শে নিজের ভাবজীবন তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন।

১৭৯৯ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে শিলার রচনা করলেন তাঁর আর একটি সুপ্রসিদ্ধ নাটক—মেরী স্টুয়ার্ট। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে এগার। শিলার বিবাহ করেছিলেন শার্লোটি লেঙ্গফেল্ডকে। গ্যেটে এবং শিলারের বন্ধুত্ব ইতিহাস বিখ্যাত। কিন্তু একটি জায়গায় দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড বৈষম্য। ভাগ্য-দেবতা গ্যেটের বেলায় পরমায়ুর রাশ আলগা করেই দিয়েছিলেন কিন্তু শিলা-রের বেলায় তা ধরে রেখেছিলেন বজ্র-কঠিন মুষ্টিতে। গ্যেটে বেঁচেছিলেন তিরাশি বছর। কিন্তু শিলার মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে—১৮০৫ সালে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্ম সমন্বয়

শ্রীরাধাচরণ রায় (সাহিত্যরত্ন)

মহাপুরুষগণ কোন বিশেষ ধর্ম, কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা কোন বিশেষ কালের মধ্যে তাঁদের জীবন-দর্শনকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। সাধারণ মানব ও মহামানবের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য। এসম্বন্ধে আমি গুটিকয়েক প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার পরমহংসদেবকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে যান। ভবানীপুরে তাঁর এক খৃ.ধর্ম যাজক বন্ধু ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনে তিনিও সহযাত্রী হলেন। দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হয়ে শিবনাথবাবু ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'এ আমার একজন খৃস্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

অমনি পরমহংসদেব ভূমিষ্ঠ প্রণত হয়ে বললেন—'যীশুখৃস্টের চরণে আমার শতশত প্রণাম।'

পাদ্রীটি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'মহাশয় যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন ?'

'কেন ঈশ্বরের অবতার।'

পাদ্রী বললেন, 'ঈশ্বরের অবতার কি রূপ ? কৃষ্ণাদির মত ?'

রামকৃষ্ণবললেন 'হাঁ, সেরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।'

পাদ্রী বললেন, 'আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন ?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'সে কেমন জান ? আমি শুনেছি, কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে এক জায়গায়, কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল, ধরবার, ছোঁবার মত হল। অবতার যেন কতটা সেরকম।' অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছে। কোন বিশেষ কারণে কোন এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ও ছোঁবার মত হল। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি, সে ঐশীশক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

উত্তরকালে * ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্মরাজ্যে যে অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন ও অপূর্ব যুগান্তর আনবেন, তজ্জন্য আরও দু' একটি ভাবের প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত তাঁর অদ্বৈতভাব সাধনের প্রায় দু' বৎসর পরে গোবিন্দচন্দ্র রায় নামক এক মুসলমান দরবেশ দক্ষিণেশ্বরে আসেন। দরবেশ গোবিন্দ প্রথমে হিন্দু ছিলেন। পরে ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর উদারভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দ সর্বদাই কোরাণ পাঠ করতেন। তারপর অকৃত্রিম ধর্মানুরাগ দেখে পরমহংসদেব তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। অতঃপর ইসলাম ধর্মকেও ভগবানকে জানবার অন্যতম পথ জেনে তিনি দরবেশের নিকট উপদেশ ও আল্লা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মসাধনে মন দেন। ইসলাম ধর্মসাধনকালে তিনি পূর্ণমাত্রায় ঐ ধর্মানুগ আচার সম্পন্ন হয়েছিলেন। ঐ ধর্ম সাধনায় নিমগ্ন অবস্থায় দু'দিন অতিবাহিত হলে, তৃতীয় দিবসে রামকৃষ্ণদেব এক দীর্ঘ শ্মশ্রু দিব্যকান্তি মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন। এঁকে তিনি ইসলামধর্ম প্রবর্তক হজরত মহম্মদ বলে নির্দেশ করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম সাধনা করে হজরত মহম্মদের দর্শন লাভের পর ধ্যানযোগে পরমহংসদেব দেখতে পেলেন এক জায়গায় কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু ও সমাজের উচ্চ নীচ সকল স্তরের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রমুখ নানা জাতীয় লোকের একত্র সমাবেশ হয়েছে। ওদের মধ্যে একজন শ্মশ্রুশোভিত মুসলমান সানকীতে অন্ন নিয়ে একদিক থেকে সকলের মুখে একটু একটু করে অন্ন দিয়ে যেতে লাগল, পরমহংসদেবের মুখেও দিয়ে গেল। এতে রামকৃষ্ণদেবের এরূপ অনুভূতি হল যে, বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি ও আচার আচরণে প্রভূত প্রভেদ থাকলেও জীবজগতের সকল প্রাণী ও বস্তুই স্বরূপত এক ও অভিন্ন।

১২৮০ সালে পরমহংসদেব স্বীয় সহধর্মিণী সারদামণিকে জগদম্বাজ্ঞানে অর্চনা করেন এবং আজীবন সাধনার ফলও জপমালা তাঁর চরণে অর্পণ করে পূজার পূর্ণাহুতি প্রদান করেন। এই

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

---

* বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা।
তোমার ধেয়ানে মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।।

ঘটনার পর তাঁর সাধক জীবনের অবসান হয়। এরপর থেকে তিনি অধিকাংশ সময় শুধু শাস্ত্র পাঠাদি শ্রবণ করে কাল যাপন করতেন—বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণের ও নানকাদি দশগুরুর প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। সে সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সন্নিহিত এক বাগানবাড়ীর বৈঠকখানা গৃহের প্রাচীরে একখানি চিত্রপটে মেরীর কোলে খ্রীস্টধর্ম প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় বালক মূর্ত্তির দর্শন লাভ করে পরমহংসদেব তিনদিন পর্যন্ত যীশু-খ্রীস্টের ভাবে তন্ময় হয়েছিলেন। তিনি নিজ জীবনে সকল ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে অশেষ প্রকার উপলব্ধি করে নিঃসংশয়-রূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনন্ত ভাবময় ভগবানকে জানবার অনন্ত পথ বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি পথ সাধককে পূর্ণজ্ঞান দানে সমর্থ।

যার ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের চিত্ত অভিন্নতা ও উদারতার প্রস্রবণ স্বরূপ হবে, এতে আর বিচিত্রতা কি? যেখানে ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা সেখানেই বিভেদের প্রাচীর মস্তকোন্নত করে দণ্ডায়মান হয়। যেখানে ভূমার প্রকাশ সেখানে সব ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা মৃত্তিকাগর্ভে লুক্কায়িত হয়।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।। ওঁ শান্তি।।।

★ গায়ের চামড়াকে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে রাখুন ★

চামড়াকে উজ্জ্বল ও মসৃণ করতে হলে যথাযথভাবে যত্ন করা প্রয়োজন।

সময় ও ঋতুর প্রভাবে গায়ের রং প্রায়শ মলিন ও খসখসে হয়ে যায়, এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এবং আপনার গায়ের রংকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে হলে নিম্নোক্ত উপায়-গুলিকে অবলম্বন করা উচিত।

চামড়ার উজ্জ্বলতা ও পেলবতা রক্ষাকল্পে, বিশেষ ধরণের তৈলমর্দন করে সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তৈল মর্দনের ফলে চামড়া মসৃণ হয়ে দ্যুতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং কর্কশতা দূরীভূত হয়। উলে তৈল এ-ব্যাপারে সবিশেষ ফলপ্রদ, গাত্রচর্ম বিশেষজ্ঞবৃন্দ অকুণ্ঠে উলে ব্যবহারের স্বপক্ষে। তাঁরা বলেন, এই তৈল নিয়মিত ব্যবহার করলে গায়ের রং দিবাভাগে উজ্জ্বল থাকে এবং এক সর্বাঙ্গীণ দীপ্তি লাভে সক্ষম হয়।

সুন্দর মুখের পরিপূরক হিসাবে সুন্দর কণ্ঠশোভা থাকাটাও একান্ত আবশ্যক।

কণ্ঠশোভা অব্যাহত রাখতে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজনীয়।

এর ফলে গলায় রেখা বা দাগ পড়ে না।

নরম তুলো লেমন ভেল্ক ক্লেশনার নামক তরল পদার্থে ভিজিয়ে নিয়ে নিয়মিতভাবে ঘাড় ও গলায় মালিশ করুন।

উপরে থেকে নীচে এবং নীচে থেকে উপরে মালিশ করুন, এই প্রক্রিয়ায় মালিশ করলে কণ্ঠস্থিত রক্তবাহী শিরাসমূহ আপনা হতেই সতেজ হয়ে ওঠে এবং কণ্ঠের পূর্ণতা রক্ষিত হয়।

এর জন্য উলের যে বিশেষভাবে প্রস্তুত ক্রীম বর্তমান তা ব্যবহার করাটাই সমীচীন।

মসৃণ ও গোলালো কনুইয়ের সৌন্দর্য বিশেষভাবেই তৃপ্তিদায়ক।

বাহুর সৌন্দর্য এর মুখাপেক্ষী।

চিনি, লেমন ভেল্ক ক্লেশনার ও উলে তৈল এই ত্রিবিধ বস্তু সম পরিমাণে নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন তারপর ঐ মিশ্রিত মলম ঘষে ঘষে লাগান কনুইয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে, তারপর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন কনুই দুটি।

ধোয়া হলে পর উলে তৈল মালিশ করুন আস্তে আস্তে, দেখবেন সব ময়লা কেটে গিয়ে কেমন মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানের চামড়া।

হাতের সৌন্দর্য খুব সহজেই মনকে টানে, বিশেষ করে মেয়েদের কোমল রক্তাভ ক্ষুদ্র করপল্লবের প্রশস্তি গেয়ে আসছে পুরুষেরা অনাদি কাল হতেই।

সুন্দর করপল্লবের অধিকারিণী হতে হলে কিছুটা সচেষ্ট হতে হয়।

হাতের নোখে যেন কখনও ময়লা না থাকে, নিয়মিতভাবে নোখ কেটে ময়লা সাফ করে ফেলতে হয়, উকো দিয়ে ঘষে নোখের মাথা মসৃণ রাখাটাও বাঞ্ছনীয়।

উলের ট্রপিক্যাল ম্যাসাজ অয়েল নিয়মিতভাবে মালিশ করলে হাতের চামড়া পেলবতা ও মসৃণতা লাভ করে, ফলে সুন্দরীরা সত্য সত্যই সুন্দর করপল্লবের অধিকারিণী হয়ে উঠতে পারেন।

হিন্দী সাহিত্যে তস্করবৃত্তি

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

কুন্তীলকের উপাখ্যান বা 'কুন্তিলোপাখ্যান' অর্থাৎ 'চোরের গল্প'। শোনাচ্ছেন একজন হিন্দী সাহিত্যিক এবং হিন্দী সাহিত্যের অত্যন্ত বিখ্যাত এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিয়েই এই মারাত্মক গল্প শোনাবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন হিন্দী ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করে।

বহুদিন পূর্বে হিন্দীর বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রেমচন্দ তাঁর 'সেবাসদন' গ্রন্থে একটি চরিত্রের মুখে এই ধরণের কথা দিয়েছিলেন যে, 'অনুবাদোঁকো নিকাল ডালিয়ে তো আপকে নবীন হিন্দী সাহিত্য মেঁ ঔর কুছ রহতা হৈ নহীঁ—জিন মহানুভাবোঁনে দো চার অংরেজী ইয়া বঙ্গলা গ্রন্থোঁ কী সহায়তা সে হিন্দী মেঁ অনুবাদ কর লিয়ে বে তো অপনেকো ধুরন্ধর সাহিত্যজ্ঞ সমঝনে লগে হৈঁ।'

নবীন সাহিত্যিক শ্রীশুক্ল এই গবেষণা গ্রন্থে হিন্দী সাহিত্যের আধুনিক কালের কয়েকজন 'ধুরন্ধর সাহিত্যজ্ঞ'কে নিয়ে ('কুন্তিলোপাখ্যান'-এ) অপূর্ব আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল, এম-এ। আলোচনার বিষয়বস্তু হিন্দী সাহিত্যে মৌলিক বলে পরিচিত কয়েকটি নিবন্ধ ও গল্প যে আসলে ইংরাজী ও বাংলা হ'তে 'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ'—এ বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান ঘটান।

আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছেন নবীন হিন্দী সাহিত্যের বিশিষ্ট বাণীব্রত বাবু শ্যামসুন্দর দাস, যশোদানন্দন অখৌরী, ডঃ রামকুমার বর্মা এবং আচার্য শ্রীচতুর সেন শাস্ত্রী। বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন বাংলার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখক স্বর্গত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়কে। বাবু শ্যামসুন্দর দাস হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত পরিষদ্ নাগরী প্রচারিণী সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের অন্ত বড়ে ফোগ—ডঃ রামকুমার বর্মা একদা এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান স্মরণ ক'রে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' করা হয়েছে। আর আচার্য চতুর সেন-শাস্ত্রী হিন্দী কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে আপন মৌলিকত্বে সমুজ্জ্বল 'অপনী লেখনী দ্বারা অক্ষয় কীর্তি প্রাপ্ত কী হৈ'।

এঁদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সমালোচক শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল যে আলোকপাত করেছেন 'কুন্তিলোপাখ্যান' গ্রন্থে তাতে হিন্দীর অনেক ঐতিহাসিকই সচকিত হয়ে উঠবেন। শুক্লজী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, উল্লিখিত কয়েকটি রচনা ইংরাজী ও বাংলা হ'তে হুবহু অনুবাদ মাত্র।

এই গ্রন্থটি আমার নজরে এনেছেন ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি আমার গুরু। কেবল গুরু নন আদর্শও। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। হঠাৎ দিন পনের আগে যে মাসের প্রথম সপ্তাহে শুনলাম তিনি আমাকে খুঁজছেন। খবর পেয়েই ছুটলাম হিন্দুস্থান পার্কে। সকালবেলা। বসেছিলেন ওপরকার ঘরে। বললাম, 'আমাকে ডেকেছেন।'

'হ্যাঁ'—হাত ধরে একেবারে জানালার ধারে নিয়ে গেলেন। নিচের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে দেখালেন কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ফুটেছে—সুন্দর—জানালার নিচে কৃষ্ণচূড়ার মাথাটা লাল। বললেন জাপানে চেরী ফুলের কথা—অনেক কথা। এর পরে কথাটা পাড়লেন তিনি। বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়েছেন বইটা?'

বললাম, 'না।'

দেখলাম বই 'কুন্তিলোপাখ্যান'। লেখক শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল। প্রকাশক 'আলোকপর্ব'। ডি ৪৮।১৫১, মিশ্র-পোখরা, বারাণসী। প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৬৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক 'হিন্দী সাহিত্য মেঁ তস্কর বৃত্তি' দেখাবার জন্য একটি বই এপ্রিল মাসের শেষে সুনীতিবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহার কাছে আমার খোঁজ করেছেন। তিনি চান গ্রন্থটির বিষয়ে আমি আলোচনা করি এবং লেখককে আমার 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' বিষয়ে বইটি পাঠিয়ে চিঠি দিই।

প্রায় একযুগ আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে থীসিস দিই তখন আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার আমার উপদেষ্টা ও অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। পরে ইংরাজীতে লেখা ঐ থীসিস বাংলায় সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ক'রে প্রকাশ করি।

সুনীতিবাবুর কাছেই বোধ হয় পরে শুনেছি যে, রাশিয়াতে হিন্দীভাষী কোনও সজ্জন বইটির বিষয়বস্তুতে অর্থাৎ আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান বিষয়ে আমার আলোচনা পড়ে খেপে গিয়ে 'চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে' নীতিবাক্য অনুসরণ করেছিলেন।

অথচ ঈশ্বর জানেন আমি হিন্দী-বিদ্বেষী নই। বরঞ্চ ছাপার অক্ষরে আমার অন্য বইয়ের মধ্যেই জানিয়েছি যে, প্রাগাধুনিক হিন্দী সাহিত্যের মূল্য আমার কাছে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের চাইতে বেশী। আর আমার হিন্দী বিষয়ে থীসিসের পরীক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় ডঃ হজারীপ্রসাদ

দ্বিবেদী এবং মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ। তাঁদের অনুমোদন কি হিন্দী বিদ্বেষপ্রসূত?

আমার আলোচনার বিষয় নিয়ে ভারতের অন্য অঞ্চলের অনেক হিন্দী সাহিত্যিকদের কাছ থেকে পরবর্তীকালে যে শ্রদ্ধা পেয়েছি তাও কি হিন্দী বিদ্বেষপ্রসূত। আমি হিন্দী সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করি—কিন্তু সত্যের পূজারী যাঁরা তাঁদের একথা প্রমাণ সহযোগে দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম, আধুনিক হিন্দী সাহিত্য বাংলার কাছে গভীরভাবে ঋণী। ইতিহাস তাই বলে। নৈনং দহতি পাবকঃ। আমার থীসিসের একটা পরিচ্ছেদ ছিল আধুনিক হিন্দী নাটকে বাংলার প্রভাব।

আমার পরে ঐ বিষয়ে আলোচনা করেছেন পাঞ্জাব হতে সতেন্দ্র তনেজা। তিনি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আমার মতামত বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। সশ্রদ্ধ চিত্তে তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমি ও তাঁকে স্নেহ-প্রীতি শ্রদ্ধা করেছি। তাঁর থীসিসও কি হিন্দী বিদ্বেষ? পাঞ্জাব হ'তে, হিমাচল প্রদেশ হ'তে হিন্দীতে প্রবন্ধ লেখার যে আমন্ত্রণ পেয়েছি তা মাথা পেতে নিয়েছি। তাঁরা সত্যকে স্বীকার করতে চেয়েছেন।

এবার 'কৃত্তিলোপাখ্যান'-এ একজন হিন্দী সাহিত্যিক 'হিন্দী সাহিত্য মেঁ তস্করবৃত্তি' নিয়ে আলোচনা করেছেন। আচার্য সুনীতিবাবুর ভাষায় গড়ো মেরে দিয়েছেন। এ বইটি একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলে বিস্মিত হব না। গ্রন্থের লেখক আমার পরিচিত নন—বইটি আমাকে পাঠানও নি। কিন্তু স্বাগত জানাই লেখককে—সাধুবাদ দিই তাঁর সৎ সাহসের।

গ্রন্থের বিষয়সূচী এইরূপ—(১) ভাষান্তরাভরণলুণ্ঠন, (২) শব্দচরিত্র—প্রভৃতি ইত্যাদি কথা, (৩) শেক্সপিয়র—সুরদাস; (৪) 'সেজিনা বেগম' অপনা দুঃখ কিসসে কহে? (৫) 'মেহরুন্নিসা' কা 'হীরক বলয়' লুটা—প্যারে মৈ; (৬) হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, (৭) হরিসাধন পরিশিষ্ট—

প্রথম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ 'ভাষান্তরাভরণ লুণ্ঠন' অংশে শ্রীশুক্ল বাবু শ্যামসুন্দর দাস সাহিত্য বিষয়ক একটি ইংরাজী নিবন্ধ গ্রন্থ হ'তে কিভাবে পংক্তির পর পংক্তি অনুবাদ করেছেন তা পাশাপাশি দুই কলমে সাজিয়ে তুলে ধরেছেন।

শ্যামসুন্দর দাস ১৯২১ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষার অধ্যাপক পদে বৃত হন। এঁর লিখিত বা সম্পাদিত অনেক গ্রন্থ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে কলিকাতা, কাশী, প্রয়াগ, নাগপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী পড়ুয়া বি-এ এম-এ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য।

বাবু শ্যামসুন্দর দাস যে অনুবাদ করেছেন এ কথা সমালোচক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, 'অনুবাদ করা জিনিষকে হিন্দীতে মৌলিক বলে চালান একটি প্রচলিত রীতি এবং পুণ্যকার্য বলে পরিগণিত' (ঐ পৃঃ ৩)।

লেখক বাবু শ্যামসুন্দর দাস এই ধরণের মৌলিক লেখক প্রসঙ্গে তীব্রভাবে শ্লেষ ক'রে বলেছেন, জানি না হিন্দীর কত শ্যাম কতদিন এইভাবে সুন্দর সেজে থাকবেন ('পতা নহীঁ হিন্দীকে কিতনে শ্যাম কব তক ইস প্রকার সুন্দর বনতে রহেঙ্গে'—ঐ পৃঃ ৩)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'শব্দচরিত্র প্রভৃতি ইত্যাদি কথা'। বাংলা মাসিক-পত্র প্রদীপ, কার্তিক ১৩০৭ সংখ্যায় 'শব্দচরিত্র—ইত্যাদি ও প্রভৃতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমালোচক শ্রীশুক্ল পুরোনো প্রদীপ হ'তে প্রবন্ধটির একটি পাতার একটি ফোটোস্ট্যাটিভ প্রতিলিপি দিয়ে প্রমাণকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাবু শ্যামসুন্দর দাস সম্পাদিত হিন্দীর বিভিন্ন লেখকের নিবন্ধ সংগ্রহ 'গদ্য রত্নাবলী' (ইণ্ডিয়ান প্রেস, লিঃ, এলাহাবাদ ১৯৩২) হ'তে একটি নিবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিবন্ধটির নাম 'ইত্যাদি কী আত্মকাহিনী', লেখক শ্রীযশোদানন্দন অখৌরী।

যশোদানন্দন অখৌরীর মৌলিক নিবন্ধটি যে আসলে বাংলা প্রবন্ধটির না-বলা অনুবাদ অনুসরণ তা শ্রীশুক্ল উদ্ধৃতি সহযোগে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মূল বাংলা লেখাতে যে 'উইট' বা 'হিউমার' ছিল তা হিন্দীতে অনেক ক্ষেত্রেই বিবর্জিত হওয়ার ফলে হিন্দীর মৌলিক সরস নিবন্ধটি না হয়েছে মৌলিক না হয়েছে সরস। হিন্দীতে প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত না থাকার ফলে লেখক কেবল 'ইত্যাদি' নিয়ে আলোচনা করেছেন, 'প্রভৃতির আত্মকথা' শোনান নি।

'শেক্সপিয়র—সুরদাস' পরিচ্ছেদে ডঃ রামকুমার বর্মার একটি নিবন্ধ যে মৌলিক রচনা নয়, আসলে অনুবাদ তা শ্রীশুক্ল মূল ইংরাজি ও তার হিন্দী অনুবাদ পাশাপাশি কলমে সাজিয়ে দেখিয়েছেন। ডঃ রামকুমার বর্মা তাঁর নিবন্ধ বিষয়ে অবশ্য লিখেছেন, 'নিবন্ধ-লেখন অংশত কুছ অংগ্রেজী সাহিত্য কী পুস্তকোঁ সে সম্বন্ধ রখতা হৈ। ঐসী স্থিতি মেঁ যদি ইন মেঁ কিসী কে ভাব ইয়া বিচার ইয়া বাক্য কী ছায়া আ গই তো মৈঁ উস ভাব কী পংক্তিয়োঁ কে লেখক কা কৃতজ্ঞ হূঁ।'

শ্রীশুক্ল কিন্তু চমৎকারভাবে উদ্ধৃতি সহযোগে দেখিয়েছেন যে, ডঃ রামকুমার বর্মার আলোচিত প্রবন্ধটি 'যদি কোনও ইংরাজি লেখার ছায়া' নয় একটি বিশেষ ইংরাজি প্রবন্ধের কিয়দংশের 'অবিকল অনুবাদ হৈ।'

ডঃ রামকুমার বর্মা তাঁর লেখায় মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন এক জায়গায়। যেখানে মূলে ইংরাজি লেখক 'সেক্সপীয়র' কথা ব্যবহার করেছেন সেখানে তিনি 'সুরদাস' নামটি ব্যবহার করেছেন, যেমন—

'এ্যাণ্ড দ্যাট ইজ হোয়াই শেক্সপীয়র হ্যজ হার্ট ওয়াজ মেড আউট অব দ্য হার্টস অব অল হিউম্যানিটি।

ডঃ রামকুমার বর্মার ভাষায়, 'য়তী কারণ হৈ কি সূরদাস জিনকা হৃদয় মানব জাতি কে হৃদয় সে বনা থা'—ইত্যাদি।

এই জন্য শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল এই আলোচনার শিরোনাম দিয়েছেন শেক্স-পিয়র-সূরদাস।

শ্রীশুক্ল হিন্দী প্রবন্ধের পর ছোট গল্প-উপন্যাস ক্ষেত্রে 'হিন্দী সাহিত্য মেঁ তস্করবৃত্তি'র উদাহরণ দিয়েছেন। কথাসাহিত্যিক আচার্য চতুর সেনশাস্ত্রী হিন্দী সাহিত্যে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন। শ্রীশুক্ল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন চতুর সেনের 'দুখবা মৈঁ কাসে কহুঁ মোরী সজনী' ('দুখ আমি কারে কই মোর সই') গল্পটি তাঁকে অমরতা দান করেছেন।

এই গল্পের প্রসঙ্গে চতুর সেন নিজেই জানিয়েছেন যে, তিনি আজন্ম সাহিত্যিক। তাঁর লেখা তাঁর নিজেরই, অন্য কারুর প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে নি। একদা চিকিৎসা করার জন্য আয়ুর্বেদাচার্য চতুর সেনকে এক সুন্দরী শুভ্রকান্তি স্বচ্ছবাস পরিহিতা রাজকুমারীকে দেখতে যেতে হয়েছিল। 'দুখবা মৈঁ কাসো কহুঁ মোরী সজনী' গল্পে তিনি তাঁকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পটি সমালোচক নন্দদুলারে বাজপেয়ীর মতে শাস্ত্রীজীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প।

চতুরসেনজী বলেছেন, 'এই গল্পটিকে কেউ যদি চোরাই মাল প্রমাণ করতে পারে তাহলে হাত কেটে ফেলব' (যদি ইসে চোরী কা মাল কোঈ সাবিত কর দে তো মৈঁ হাথ কটা লঙ্গা' ঐ পৃ: ৪৯)।

শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল বলেছেন, 'জন্মজাত সাহিত্যকার হবার দাবী, অপরাধী মনোবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হয়ে চোরাই মাল হলে হাত কেটে ফেলার সদম্ভ ঘোষণা, এক নগ্নপ্রায় রাজকুমারীকে কাহিনীর মাঝে ফুটিয়ে তোলার কথা বলে লেখক চতুর-সেন একটি কুহক-কুতূহলের সৃষ্টি করেছেন (ঐ পঃ ৫০)।

গল্পটি আসলে বাংলায় লেখা। মূল গল্পটি সেলিনা বেগম নামে প্রদীপ পত্রিকায় লিখে-ছিলেন তদানীন্তন বাংলার বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে 'সেলিমা বেগম' নামে গল্পটি হরিসাধনবাবুর গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ 'রঙ্গমহল'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রীশুক্ল গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়ে 'সেলিনা বেগম' বা 'সেলিমা বেগম' গল্পটির পরিবর্তনের ধারানুসরণ করেছেন।

তিনি চতুরসেনের 'দখবা মৈঁ কাসে কহুঁ মোরী সজনী' এবং হরিসাধনবাবুর 'সেলিনা বেগম' পাশা-পাশি উদ্ধৃতি দিয়ে দুই কলমে স্থাপন করে চতুরসেনজীর মৌলিকত্ব বিচার করেছেন। শ্রীশুক্ল উদ্ধৃতি দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন চতুর-সেনের রচনাটি বাংলা হ'তে না বলা অনুবাদ এবং বলেছেন যে গল্পটি এত সুন্দর যে, এ কাহিনীটিকে হিন্দী হ'তে বাদ দেওয়া যায় না। কেবল এই গল্পের লেখক হিসেবে চতুর-সেনের জায়গায় হরিসাধন মুখোপাধ্যায় নাম দিতে হবে। আর হরিসাধন মুখো-পাধ্যায়কে হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগত জানান উচিত।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ পঞ্জাবী উর্দুর অনেক লেখককে হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগত জানানো হয়েছে। ('হরিসাধন কো হিন্দীকে কহানীকারোঁ মেঁ শামিল কর লিয়া জায়। ঐসে ইয়হ কোঈ নয়া সুঝাব নহী হৈ। পঞ্জাবী ঔর উর্দুকে সভী লেখক হিন্দীকে হী মানে জাতে হৈঁ—এক বাঙ্গালী লেখক কো সমাবিষ্ট করনে মেঁ কোঈ বাধা ন হোনী চাহিয়ে।'—ঐ পৃ: ৫৮)।

হরিসাধনবাবুর আর একটি কাহিনীও চতুরসেনজী 'না বলিয়া নিজের করিয়া' উপহার দিয়েছেন। হরিসাধনবাবুর কাহিনীটি প্রথমে 'প্রদীপ' পত্রিকায় 'মেহের উন্নিসা' নামে প্রকাশিত হয়। পরে তাঁর 'রঙ্গমহল' শীর্ষক সংগ্রহ গ্রন্থে গল্পটির নাম পরিবর্তন করে শিরোনাম দেন 'হীরক বলয়'। এই গল্পটিই হিন্দীতে অনূদিত ও কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে নাম নেয় 'প্যার'।

চতুরসেন এখানেও মৌলিক গল্প লেখার ফলশ্রুতি লাভ করেন। চতুরসেন নিজেই জানিয়েছেন কাহিনী লেখা কালে দরজা বন্ধ করে বা রাত দুটোর সময় কলম চালাতেন। দিনের বেলা কারুর সামনে লিখতেন না। চতুরসেনের ভাষায় 'মৈঁ কহানিয়াঁ কিসী কে সামনে দিন মেঁ নহীঁ লিখতা। ইয়া তো বন্দ কমরে মেঁ লিখতা হুঁ, ইয়া রাত কো দো বজে।'

এই প্রসঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গ করে শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল বলেছেন, 'দিনের বেলা বা খোলা-মেলা ঘরে লেখা বিপজ্জনক ছিল কারণ (কীমিয়াগিরী কে রাজ ঔরোঁ পর খুল জাতে—ঐ পৃ: ৭৩) আয়ুর্বেদাচার্য কি ভাবে রসায়ন বা কিমিতি বিদ্যাচর্চা করছেন তার রহস্য অপরে জানতে পেরে যেত।

এই গল্পটিও পাশাপাশি দুই কলমে হিন্দী ও বাংলার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীশুক্ল নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন হিন্দী সাহিত্যে তস্করবৃত্তি। বিশেষ করে চতুরসেনজী প্রসঙ্গে তিনি যে —বলেছেন 'মাই লেডী প্রোটেস্ট টু মাচ'—কথাটি খাঁটি সত্য।

সত্যনিষ্ঠ রসমধুর তথ্যসমৃদ্ধ 'কুম্ভি-লোপাখ্যান' বা 'কুম্ভীলকোপাখ্যান' গ্রন্থটি লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। বাঙ্গালী বা হিন্দী সাহিত্যিক এবং গবেষকদের প্রত্যেকের গ্রন্থটি পড়া উচিত। লেখক শেষ অংশে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ও রচনাবলী বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। এ অংশটি বিশেষ করে হিন্দীভাষীদের অজ্ঞাত তথ্যে পরিপূর্ণ।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

বাংলা দেশ রত্নপ্রসবিনী। বহু বীর সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে মাতৃভূমির মুক্তি-কামনায় উৎসর্গীকৃত হয়েছে কত প্রাণ। মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানের রক্তে মাতার ললাটদেশ রঞ্জিত হয়েছে বার বার। রাসবিহারী বসু মায়ের এমনি এক মৃত্যুভয়হীন অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগী সন্তান। বর্ধমান জেলার সুবলদা গ্রামের বিনোদবিহারী বসুর পুত্র রাসবিহারী। ১৮৮৬ সালের ২৫শে মে হুগলী জেলায় পলাতি বিষতীরতে মামার বাড়ীতে তাঁর জন্ম হয়। দুঃসাহসিক বীরত্বমণ্ডিত জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় অতি শৈশবে 'আনন্দমঠ' ও 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি যুদ্ধের কাহিনী পাঠে তাঁর আগ্রহে।

অরবিন্দের আদেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কোলকাতায় এসেছেন গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠার জন্য, রাসবিহারী তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন। বিদেশী শক্তির আবেষ্টনীতে মাতৃভূমির শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা রাসবিহারীর বীরহৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আজন্ম-বিপ্লবী যুবক রাসবিহারীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। চারুচন্দ্র রায়ের 'সুহৃদ সম্মেলনী'তে যোগদান; পণ্ডিচেরীর French Indian Army তে যোগদানের বাসনা এবং সেখান থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভারতের ক্রোড় করদ রাজ্যের সৈন্যদলে ভর্তির জন্য গৃহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিপ্লবী রাসবিহারীর মনোভূমির পরিচয়বাহী।

এই অস্থির চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যে তিনি একটি কেরাণীর চাকরী পেলেন ফোর্ট উইলিয়মে। কিন্তু সন্তুষ্ট না হয়ে কাসৌলীতে সামরিক বিভাগে চাকরি নিলেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। পরে আবার পিতার ইচ্ছায় দেরাদুনে Forest Research Institute-এ কেরাণীর চাকরি নিতে হলো। বয়স তখন বাইশ বছর। বঙ্গভঙ্গের জন্য দেশে তখন দারুণ বিক্ষোভ। সরকারের নির্দয় শাসনও বেড়ে চলেছে। মুক্তি-সংগ্রামীদের ইচ্ছামত কারাগারে বা আন্দামানে পাঠানো হচ্ছে। তখন ভারতবর্ষে ত্রয়ী নেতা লাল - বাল - পালের যুগ।

শাসকের অত্যাচার যত বাড়তে লাগল রাসবিহারীর বৃটিশ-বিরোধী

রাসবিহারী বসু

মনোভাবও তত উগ্র হতে লাগল। গোপনে বিপ্লবী কার্যকলাপে তিনি যুক্ত হলেন। তিনি বাহিরে ছিলেন রাজভক্ত প্রজা। ছদ্মবেশ ধারণে তিনি ওস্তাদ। তাঁর প্রতি পুলিসের এত বিশ্বাস ছিল যে, পুলিশ প্রধান Mr. Denham তাঁকে চন্দননগরে বিপ্লবী দলের খোঁজখবর নেওয়ার ভার দিয়েছিলেন। তাঁর গতিবিধি সরকারের কাছে সন্দেহজনক মনে হয় নি। সেইটাই ছিল তাঁর সুযোগ। সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি যোল আনাই করেছিলেন। যুগপৎ বাংলা ও উত্তর ভারতের সমস্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। মুরারিপুকুর আখড়াতে তাঁর নামে দুটি চিঠি পাওয়া গেলেও তিনি পুলিসের সন্দেহের এক্তিয়ারে পড়েন নি।

১৯০৮-৯ সালে পুলিশী অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করল। পাঞ্জাবে লালা হরদয়াল, সুফি অম্বাপ্রসাদ, সর্দার অজিত সিং এবং মৌলানা বরকতুল্লা প্রমুখ বিপ্লবী নেতাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হল। মুরারিপুকুর কেসের বিচারে অনেকেই কারাগারে, কেউবা আন্দামানে কারও বা ফাঁসি হয়েছে। উত্তর ভারতে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন রাসবিহারী। তাঁর সহকর্মী অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, অমৃত লাল হাজরা এবং প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে বাংলা দেশে আসতে হত।

আজমীরের জাগীরদার রাও গোপাল সিং রাঠোরের মাধ্যমে তিনি রাজপুতনাতেও প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর অন্যতম সহকর্মী ভাই বাল মুকুন্দ যোধপুর-রাজের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে যোধপুরে অবস্থান করলেন। বাংলায় যতীন্দ্রনাথের উপর সব ভার ন্যস্ত ছিল। এইভাবে ভারতের সর্বত্র শক্তি সঞ্চিত হতে লাগল। ১৯০৯ থেকে রাসবিহারীর বিপ্লবী দলের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯১১-১২ সালের কোন এক সময় তিনি বাংলা দেশে এসে অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর 'শ্রমজীবী সমবায়' থেকে বসন্তকুমার বিশ্বাসকে উত্তর ভারতে নিয়ে গেছলেন।

যখন দেশব্যাপী আন্দোলন, উত্তেজনা, বিশেষ করে বাংলা যখন উপদ্রুত এলাকা—কারণ বিপ্লবীদের নাশকতামূলক কার্য মাঝে মাঝে চলছিল—তখন নিরাপদ স্থান দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব হয়। ১৯১২ সালের

২৩শে ডিসেম্বর প্রস্তাবটি কার্যকরী হল।

ঐ বিশেষ দিনটিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ যাচ্ছিলেন দিল্লীর চাঁদনি চক দিয়ে রাজকীয় সমারোহে। হঠাৎ তাঁর উপরে বোমা নিক্ষিপ্ত হল। মাহুত মরল, তিনি আঘাত পেয়েও বেঁচে গেলেন সে-যাত্রায়। প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় পুলিশী তৎপরতা বেড়ে গেল। ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হল। ভাই বাল মুকুন্দ, আমীরচাঁদ এবং অবাধবিহারীর হল প্রাণদণ্ড। বসন্তকুমারের প্রথমে দ্বীপান্তর, পরে লাহোর কোর্টের রায় অনুযায়ী প্রাণদণ্ড হল। অন্যান্য অনেকের জেল হল। দীননাথ ও সুলতানচাঁদ ছাড়া পেলেন ১৯১৪ সালের ৫ই অক্টোবর। অবশেষে দলপতি রাসবিহারীর পরিচয় প্রকাশ পেল সরকারের কাছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কারও ঘোষিত হ'ল।

রাসবিহারী ভীত হবার লোক নন। British Indian Army-র মধ্যেও তিনি বিদ্রোহের বীজ বপন করলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ভিতরে বাইরে আক্রমণ না করলে বৃটিশ সরকারের পতন ঘটানো যাবে না। কোবে থেকে কাবুল সানফ্রান্সিস্কো থেকে বার্লিন পর্যন্ত তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈন্যদলের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন-সঙ্গে ছিল তাঁর বিশ্বস্ত কর্মীরা। আমেরিকা-প্রত্যাগত গদররা তাঁর অনুসঙ্গী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক মাস আগে ১৯১৪ সালে জব্বলপুরের কয়েক মাইল দূরে মদন মহলে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন।

ইউরোপে মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ত্রিশ হাজার বৃটিশ সৈন্যের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। সুযোগ-সন্ধানী রাসবিহারী ঠিক করলেন, জার্মান অস্ত্রের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলে বিক্ষোভ ঘটাবেন। ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরে দূত পাঠানো হয়েছে। বেলুচিস্থানে সীমান্তের উপজাতি দলপতিরা নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। বিপ্লবী মহানায়ক স্বয়ং থাকবেন লাহোরের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করবার জন্য। শচীন সান্যাল থাকবেন বেনারসে, পিঙ্গলে মীরাটে, কর্তার সিং সরাবা পাঞ্জাবে, নলিনী মুখার্জী জব্বলপুরে।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে শচীন সান্যাল, পিঙ্গলে, কর্তার সিং ও পণ্ডিত পরমানন্দ ঝান্সী সহ রাসবিহারী লাহোরে উপস্থিত হলেন তাঁর সহকর্মী রামশরণ দাসের বাড়ীতে। মুস্কিল হল তাঁর জন্য বাসা ভাড়া নিয়ে। তখন সরকারের সার্কুলার অনুযায়ী স্ত্রীহীন কোন নতুন লোক ঘর ভাড়া নিতে চাইলে তাকে পলিসে খবর দিতে হয়, সবাই বিপাকে পড়লেন।

সমস্যার সমাধান করলেন রামশরণের দেশভক্ত স্ত্রী। তিনি 'বসুজী'র সঙ্গে স্ত্রীরূপে বাস করতে রাজী হলেন। ১৯১৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাঁরা স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বাস করেন। বিপ্লবের সব আয়োজন প্রস্তুত, কিন্তু কার্যকালে সব পণ্ড হয়ে গেল।

বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে বৃটিশ সরকার সব গোপন খবর পেয়েছিল। সমস্ত লাহোর ঘিরে ফেলল পুলিশে, রাসবিহারীকে ধরবার জন্য। কিন্তু তিনি পুলিশকে বোকা বানালেন। এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দিনের প্রশস্ত আলোকে একটি ট্রেনের কামরায় উঠে মাঝপথে নেমে গেলেন। পুলিসের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

পুলিসের চোখ এড়িয়ে তিনি বেনারসে শচীন ও গিরিজাবাবুর সঙ্গে মিলিত হলেন। অর্থাভাবে দলের অবস্থা তখন সঙ্গীন। তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে অনুরোধ করলেন তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কারের টাকা নিয়ে দল পুনর্গঠন করতে। তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। শেষ পর্যন্ত জাপানের সহায়তায় এশিয়া থেকে সাদাচামড়া বিতাড়নের মনস্থ করলেন তিনি। 'এশিয়াবাসীদের জন্য'—এ কথা তাঁরই মুখে প্রথম শোনা গেছল। তিনি জাপান যাওয়া ঠিক করলেন। কিন্তু পাসপোর্ট না হলে তো জাপানে যাওয়া যায় না। তিনি নবদ্বীপে এলেন। রবীন্দ্রনাথের তখন জাপান যাওয়ার কথা চলছে। তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। P. N. Tagore ছদ্মনামে খিদিরপুর ডকের বার নম্বর জেটি থেকে ১৯১৫ সালে ১২ই মে 'Samki Maru' জাহাজে দেশ ছাড়লেন। কে জানতো মাতৃভমি থেকে এই তাঁর শেষ বিদায়।

নিমতলা ঘাট স্ট্রীট থেকে শচীন ও গিরিজাবাবু তাঁকে জাহাজঘাটে ছাড়তে এসেছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারীর ভারতীয় জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি।

১৯১৫ সালের জুন মাসে রাসবিহারী কোবে পৌঁছলেন। সেখান থেকে গেলেন সাংহাই। সাংহাই থেকে দু'জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র তিনি ভারতে পাঠালেন। কিন্তু এবারও বিশ্বাসঘাতকের শয়তানীতে মাঝসমুদ্রে জাহাজ ধরা পড়ে। ভারতের বাইরে থেকে রাসবিহারীর প্রথম বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জাপান বৃটেনের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছে। স্বভাবতই বৃটিশকে অসন্তুষ্ট করে রাসবিহারীকে সাহায্য করা জাপান সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৃটিশ এমব্যাসিও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তাঁর ওপর। তাঁর আসল পরিচয় জানতে তাঁরা ব্যস্ত। অবশেষে তা জানাও গেল। লালা লাজপৎ রায় এই সময়ে জাপানে ছিলেন। হেরম্বলাল গুপ্ত আমেরিকা থেকে রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা তিনজন বৃটিশ এমব্যাসীর বিষনজরে পড়লেন। জাপ সরকারকে Embassy প্রভাবিত করতে লাগল তাঁদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে।

লালাজী আমেরিকা চলে গেলেন। রাসবিহারী ও হেরম্বলাল আত্মগোপন করে রইলেন। এইভাবে রাসবিহারীকে সাত বছর কাটাতে হয়েছিল। সাত বছরে ১৭ বার বাসা পরিবর্তনের পর রাসবিহারী একটি জাপানী মেয়েকে বিয়ে করে জাপানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে তাঁর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। চীনের বিপ্লবী নেতা সান ইয়াৎসেন নির্বাসনে ছিলেন জাপানে। তাঁর সঙ্গে রাসবিহারীর গোপন আলাপ হয়। দুই খ্যাতনামা বিপ্লবীর এই মিলনবিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের দু'জনের আলোচনা যে রাজনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম করে নি, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর জাপ সরকার রাসবিহারীর ওপর খানিকটা সদয় হয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে তা' জানতে পারা যায়---

"Before the naturalisation I was practically cooped up in a cage. I could not even travel inside Japan freely, not to speak of visiting Korea, China or Russia. The British were all along keeping their eyes on me. But now I am beyond their control and jurisdiction and they can't do anything legally."

নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়েও তিনি কখনও হতোদ্যম হন নি। তাঁর বিপ্লবী মন ঠিকই বলেছিল---

"Independence India must have. Because her independence is essential for the regeneration of the whole world. It is not the end in itself, but it is a means to an end and that end is the destruction of imperialism and militarism and the creation of a better world for all to live in."

(শচীন সান্যালের নিকট লেখা চিঠি)।

জাপ সরকার রাসবিহারীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করলেও জনসাধারণের কিন্তু তাঁর প্রতি সমর্থন ছিল। বিশেষ করে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন 'সামুরাই' (Samurai) দল ও Rev. Misura Toyama জনসাধারণের মনকে কেবল ভারতমুখী করেন নি। মিলিটারিরও পরও প্রভাববিস্তার করে ছিল। ১৯২৩ থেকে রাসবিহারী কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। মেলা, Group meeting এবং জনসভায় বক্তৃতা মারফৎ তিনি জনমত গঠন করতে লাগলেন। জাপানী ভাষা রপ্ত করেছেন কিন্তু আরম্ভ করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁকে সবাই ডাকত 'Sensi' বা শিক্ষক নামে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত বৃটিশের সঙ্গে আঁতাত থাকার দরুণ জাপ সরকার তাঁকে সাহায্য না করলেও জাপানী নাগরিক বলে তাঁর কাজে কোন বাধা সৃষ্টিও করে নি। ১৯৩৩ এ জাপ বৃটিশ আঁতাতে চিড় ধরল। জাপ সরকারের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব দেখা দিল। রাসবিহারী এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বিক্ষোভ বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন তিনি।

১৯৩০ সাল থেকে নানা জাতীয় ভারতীয় বাস করতে লাগল জাপানে। কেউবা এল ছাত্র হিসেবে, কেউ বা ব্যবসা করতে। এই সমস্ত ভারতীয়রাই রাসবিহারীর বিপ্লব আন্দোলনের সহায় হন। 'Voice of Asia' নামে জাপানী ও ইংরেজী ভাষায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মুখপাত্র। কংগ্রেসী আবেদন নীতির প্রতি তিনি আস্থাবান নন। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীদার, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন তিনি কোন মতেই সমর্থন করেন নি। Young India-র সম্পাদককে একটি চিঠিতে (1922, 21, Sep) তিনি লিখেছেন যে, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেও যে স্বাধীনতা লাভ করেছে, তার কারণ উভয় দেশের জনসাধারণই ইংরাজ। ভারতের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ দাসত্বস্বীকার।

"Freedom and slavery cannot go together. If India wants freedom, she must completely sever all connections with Britain. Of Course she will be at liberty to conclude a friendly alliance with England, but that should be done as between equals, between two sovereign states. If she wants Home Rule or Status of equal partnership within the Empire, it cannot mean anything else than that she desires to perpetuate her serfdom."

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৪-এ গঠন করলেন Indian Independence League এই লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি স্বয়ং। অন্য দু'জন সদস্যের নাম ডি এস দেশপাণ্ডে ও দেবনাথ দাস। জাপানের Indian National Congress Committee নামে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন সহায়, সেক্রেটারি দেবনাথ দাস। প্রতিষ্ঠানটির কাজ ছিল ভারতের খবরগুলো জাপানে প্রচার করে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এই প্রতিষ্ঠানটির পরে নামকরণ হয়েছিল। Indian National Committee of Japan দুটি প্রতিষ্ঠান গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। নেতাজীর সহকারী মেজর জেনারেল শা নাওয়াজ তাঁর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী' গ্রন্থ হতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হচ্ছে যাতে করে Indian Independence League-এর উৎপত্তিতে রাসবিহারীর বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হতে পারে। "সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'বার কিছু কাল পরেই তিনি জাপানী সৈন্যদলের 'ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের' অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল সুগিয়ামার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন বর্তমান মহাসমর ভারতীয়দের পক্ষে বৃটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষ উদ্ধার করবার একটা সুবর্ণ সুযোগ। তাঁর (ফিল্ড মার্শাল সুগিয়ামার) সাহায্য পেলে ভারতীয়েরা পূর্ব এশিয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পূর্ব দিক থেকে বৃটিশদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে। রাসবিহারী তাঁর কাছে এই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিনি জেনারেল স্টাফকে আরও অনুরোধ

জানালেন তাঁরা যেন জাপানী সৈন্য-বাহিনীকে এই মর্মে এক আদেশ দেন, যাতে তারা জাপান অধিকৃত প্রদেশে ভারতীয়দের শত্রু-প্রভাবৎ না দেখে। স্থগিয়ামা রাসবিহারীর প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন নি।

তিনি বলেন, ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বৃটিশেরা এখন জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধরত, সুতরাং ভারতীয়দের শত্রু-প্রভাবৎ মনে করাই স্বাভাবিক।

মিঃ বোস তখন ডেপুটি ওয়ার মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললে তিনি মিঃ বোসের প্রস্তাবে রাজী হলেন। ফলে মিঃ রাসবিহারী বোসের অধিনায়কত্বায় সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করবার জন্য জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League) নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল, জাপানীরা থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) অধিকার করবার পর স্বামী সত্যানন্দ পরী কয়েকজন ভারতীয় নেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যাঙ্কক্ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ স্থাপন করেন। জাপানী সৈন্যদল মালয় যাত্রা করলে এর কয়েকজন প্রতিনিধি-তাদের সঙ্গে গিয়ে স্থানীয় ভারতীয় নেতাদের অধিনায়কত্বায় বিভিন্ন স্থানে এই সংঘের শাখা পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র যথা ফিলিপাইনস, থাইল্যাণ্ড, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া, ফরাসী ইন্দোচীন, সাংহাই, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশে স্থাপিত হয়। এ সকল শাখাই মিঃ রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীন ভারতের কর্তৃত্ব মেনে চলে।

১৯৩৭ এ জাপান সাংহাই, নানকিং, হ্যাঙ্কাও, ক্যাণ্টন টিয়েনসিন দখল করে নিলে পিকিংয়ের পতন হল। চীনের সমর্থনে ভারতে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। রাসবিহারী কিন্তু স্ফটিক-স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখলেন এবার বৃটিশ ও জাপানের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তিনি তারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধেও ভারতে কুৎসিৎ সমালোচনা হয়েছিল। তিনি সে সবে ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

১৯৩৯ এর ৩রা সেপ্টেম্বর ইওরোপে যুদ্ধ বাধলে তিনি দেবনাথকে পাঠালেন থাইল্যাণ্ড, হ্যানয় হাইফং, বিউ, কম্বোডিয়া (সুবর্ণ ভূমি), লাওসে সেখানকার ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনার জন্য। প্রাণলাল কাপাদিয়াকে ভারতে পাঠান হোল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য। কিন্তু তাঁর ডাকে কেউই সাড়া দিলেন না। নেতাজী তখন জেলে। সুতরাং মিশন ব্যর্থ হয়েছিল।

আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য ১৯৪২-এর মার্চের মাঝামাঝি টোকিওতে রাসবিহারী বসু একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। কিন্তু Conference-এ যোগদানের জন্য যাবার পথে গিয়ানি প্রতীম সিং, ক্যাপ্টেন আক্রম খাঁ এবং নীলকান্ত আয়ার সহ স্বামী সত্যানন্দ পুরী বিমান-দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। ফলে পুনরায় সম্মেলন আহ্বান করা হোল ব্যাঙ্কক-এ ১৯৪২-এর ২১শে জন। সম্মেলনে যোগদানের জন্য এসেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে তাঁরা একটি সংকল্প গ্রহণ করেন। সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে রাসবিহারী একটি দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ভাষণের শেষে বললেন,

"I bow my head to the bravery of our soldiers and we should have no doubt that with their wholehearted support we are going to win our final fight against British Imperialism. Let us stand shoulder to shoulder and let us march hand in hand to success. Let us remember, we have one indivisible nation, INDIA—One enemy, England, One God, Complete Independence."

কিছুদিন পরে ভুল বুঝাবুঝির ফলে I. N. A এর G. O. C মোহন সিং-এর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রাসবিহারীর মনোমালিন্য দেখা দিল। মোহন সিং ষড়যন্ত্র করে I. N. A-এ ভেঙ্গে দেবেন ঠিক করেছিলেন বুঝতে পেরে রাসবিহারী মোহনকে বরখাস্ত করলেন। তাঁকে ও কর্নেল N. S. Gill-কে গ্রেপ্তার করা হোল ১৯৪১-এর ২৫শে ডিসেম্বর।

গণ্ডগোলের পর নতন করে I. N. A গঠন করা হোল। তাঁকে সহায়তা করলেন জি কে ভোঁসলে, এ, সি, চ্যাটার্জী, জমান কিয়ানী ও শা নওয়াজ প্রমুখ মেজর জেনারেলগণ। দল পুনর্গঠিত হল। কিন্তু রাসবিহারীর শরীরও ভেঙ্গে আসছে। তিনি যোগ্য ব্যক্তি নেতাজীকে তাঁর সাধনার সৃষ্টি I. N. A এর কর্তৃত্ব তুলে দিলেন ১৯৪৩-এর ৪ঠা জুলাই। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,—

..."it was the confluence of two master minds, one collecting the materials and putting them into the furnace, while the other processing them into steel, the steel for use at the right moment."

নেতাজীকে তিনি যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে পেয়েছিলেন। জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী "day is not far off—" ব্যর্থ হয়ে যায় নি। আজাদ হিন্দের দেশভক্ত সেনানীর বীরত্বের কাহিনী রক্তের অক্ষরে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। সেই সঙ্গে তাঁদের বীরনেতা রাসবিহারী ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে এক মহিমময়রূপে বিরাজ করবেন।

মোস্‌লেম সংস্কৃতি

বৈশম্পায়ন

বস্তুটি যে কি, তা আজও আমরা বুঝতে পারি নি। আমাদের ধারণা যে, একটি বিশিষ্ট ধর্মমতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নাম, তার সঙ্গে জাতিগত সংস্কৃতির সম্পর্ক খুব বেশী নেই। কিন্তু গ্রামের ফৈজুদ্দিন মোল্লা যখন 'মোস্‌লেম' সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে সুদূর আরব বা পারস্যের—যার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, ছিল না, বা থাকতে পারে না—অতীত গৌরবের বড়াই করে, তখন বড় দুঃখেও হাসি পায়। ভাবি, ইন্দোনেশিয়াও তো ধর্মে প্রধানত মুসলমান, কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের খোঁজে তারা আরবদেশের মরুভূমিতে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মরে না। রামায়ণ, মহাভারতের বিশাল পটভূমিকাই তাদের সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা মেটায় এবং তাই নিয়েই তারা পরিতৃপ্ত। কই, এতে করে তো তারা অ-মুসলমান হয়ে যায় নি।

প্রায় ছত্রিশ বছর আগে মৌলভী সেরাজউল হক বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে যে অনুপম ভাষণ দিয়েছিলেন, তার অংশবিশেষ গর্ব-মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে উদ্ধৃত করছি। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান যে এ দেশে আছেন, তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এটা :—

'নিখিলের কেন্দ্রে জাগরণ-ভেরী নিনাদিত হওয়ায় সমস্ত দেশের সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত, প্রমত্ত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্রই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলার মুসলমানগণ আজ নিজেদের অদূরদর্শিতা, গোঁড়ামী এবং অন্ধতার ফলে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ভ্রাতৃগণ। আজ তুরস্ক, ইরান, পারস্য প্রভৃতি নিজ নিজ দেশের প্রাচীন স্মৃতি স্মরণপূর্বক পূর্বগৌরবের 'সংবোধ' ও 'সংবেদ' লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আরব আরবের ভাবে, পারস্য পারস্যের ভাবে, তুরস্ক তুরস্কের ভাবেই জাগিতেছে। পারস্য, তুরস্ক, আফগানীস্থান, আরব-গৌরবের কাণাকড়িও গ্রহণ না করিয়া স্বকীয় অমুসলমান পূর্বপুরুষদের অতীত যুগের কীর্তিকাহিনীর—স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়া আধুনিক দুনিয়ার স্কেল কম্পাস হাতে পলিটিক্স ও পলিসির মারপেঁচ দেখিয়া দূরবীক্ষণ-চোখে নূতন রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছে।

মহোদয়গণ। পারস্য আরবীয় যুগের বিজাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের জামশেদ, জোহাক, ফরিদুন, কায়কোবাদ, খশরু এবং জাল ও রোস্তমের নামেই মাতিয়া উঠিতেছে। প্রাচীন জেন্দাবেস্তার ধর্ম বা আধুনিক কোরানের ধর্ম এই জাতীয় গৌরবের আলোকপুঞ্জের পথে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তুরস্ক ও তাহার বৌদ্ধ পূর্বপুরুষ চেঙ্গীস, হালাকু, কুবলয় ও মঙ্গুখাঁ প্রভৃতি দিগ্‌-বিজয়ী বীরেন্দ্রবর্গের ছবি বা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। মোস্তাফা কামাল পাশা আরবীয় পর্দা ও বোরকা ঝাড়িয়া ফেলিয়াই আধুনিক তুর্কী রমণীদিগকে প্রাচীন তুর্কী রমণী-দিগের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে ও গিরিশৃঙ্গে ধাবিত এবং সাগরতরঙ্গে দোলায়িত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ এই প্রকার স্বাধীনচেতা তেজস্বিনী রমণী ব্যতীত অরিনিসূদন বীর সন্তান লাভ করা অসম্ভব।—কিন্তু ভারতীয় মুসল-মানগণই ভারতের প্রাচীন গৌরবময় মহিমাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন।

বন্ধুগণ। যে-সকল মুসলমানের রক্তে এখনও হিন্দু রক্তের তাজা গন্ধ আছে, তাঁহারা পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা এবং অতুলনীয় ক্ষাত্রবীর্যমহিমার বাণী ভুলিয়া গিয়াছেন এবং সেই ভুলিয়া যাওয়াটাকেই গৌরবকর বোধ করেন। মহোদয়গণ। যে মহাবীর ভীষ্ম, সত্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র, সব্যসাচী অর্জুন, শূরকুলসূর্য কর্ণ প্রভৃতি চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিবংশীয়গণের- - -বীর্য-গরিমার জন্য কোন গৌরবই বোধ করে না এবং করাটাকেও কলঙ্কজনক মনে করে, অন্যদিকে সে আরব বা পারস্যের বীরপুরুষদিগের গৌরবের বড়াই করিলেও তাহাতে মনে কোন জোর পায় না, কারণ সে জানে যে, তাহাদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই।

ভ্রাতৃগণ। বিগত দশ বৎসর কাল প্রচারকর্মের জন্য বাংলার সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু সভাসমিতিতে যোগদানকরত অনেক সময় বিশাল জনশ্রেণীকে উত্তেজিত করিবার ও গৌরবে মাতাইবার জন্য মুসলিম গৌরব-গাথার প্রাণময়ী উদ্বোধনী বাণী শুনাই-য়াছি। তাহার ফলে মূর্খ লোকদের চেহারায় কোন প্রকার আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। বরং লজ্জায় অনেকের মুখ মলিন হইতেই দেখিয়াছি। কারণ মিথ্যা গৌরবকে বরণ করিয়া লইতে মন বেচারা কোন প্রকারেই প্রস্তুত নহে। মহোদয়বৃন্দ। এই জন্য দেখিতে পাই—বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সামান্য-সংখ্যক, মোগল, পাঠান ও খাঁটি সৈয়দের সন্তান ব্যতীত আর কাহারও মনে স্বাধীনতার ভাব, আত্মমর্যাদা, আত্ম-গৌরব, আত্মবিশ্বাস, আত্মানুভূতি ও আত্মসম্ভ্রমশীলতা নাই। ইহার ফলে অধুনা আমাদের শত শত যুবা গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডারগ্রাজুয়েট হইলেও আত্মানুভূতি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রম-শীলতার অভাবে শ্রেষ্ঠবংশসম্ভূত

উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানগরিমা ও [illegible] তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। অথচ বাংলার এই লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ভিতরে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুতের জ্যোতি ও তেজপূর্ণ রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহারা কেহই সেই গৌরবের স্মৃতি সম্মুখে ধরিতে না পারায় নীচতা ও অন্ধকারেই ঘুরপাক খাইতেছে। কেহ কেহ কৃত্রিমভাবে আপনাদিগকে মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ বলিয়া দাবি করিলেও মন তাহাতে মোটেই জোর পাইতেছে না। তার মানে, মনের কাছে কোন চালাকিই খাটিতে পারে না। বাংলার মুসলমানদের দুর্গতির ইহাই এক কারণ।

বন্ধুবর্গ! আজ যেখানে অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আর্য গৌরব-গরিমা-কাহিনীতে মাতিয়া উঠিতেছে এবং বুকের পাটা উঁচু করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পতাকা লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান যুবক গৌরব ও মহিমার পথে কিছুই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। যখন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীম, পার্থ, কর্ণ, প্রভৃতি বীরপুরুষগণ, কিম্বা কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি জগৎগুরু দার্শনিকগণ, অথবা ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, ভারবী, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভাস প্রভৃতি কবিগণ বা চরক, সুশ্রুতি প্রভৃতি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ভিষকগণ, এবং ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী অথবা সতীকুলশিরোমণি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতি মহাপুরুষ ও মহতী নারীবৃন্দের গৌরবের কথায় হিন্দু ছাত্র বা যুবকের বুক ফুলিয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্র ও যুবকদের মন দমিয়া যায়। তাহারা চারিদিক হাতড়াইয়া গৌরবের কিছুই দেখিতে পায় না। কি ভীষণ ব্যবস্থা! অথচ হিন্দু ছাত্র এবং সেই হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্রের পক্ষে প্রাচীন ভারতের গৌরবের অধিকার সম্পূর্ণ তুল্য!

তরুণমণ্ডলি! আজ বিশ্বের জাগরণ-দিনে আমাদের জাতীয় জীবনের গভীর দুর্দিনে তরুণ ছাত্রবর্গকে মুসলমান নেতৃবৃন্দের আদেশ ও অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রাচীন ভারতের আলোময় গৌরবের জন্য মুসলমানদিগকেও দাবীদার করিতে [illegible] করেন। অন্যথায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় জীবনের অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হইয়াই থাকিবে।

মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুত ও শিখ ছিল। সুতরাং তাহাদের সম্মুখে প্রাচীন হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, কাব্য, মহাকাব্য ও দর্শন এবং বিজ্ঞান রচনায় জ্ঞানের যে গৌরব—সে গৌরবের কাছে প্রাচীন গ্রীক ব্যতীত প্রাচীন ফিনিসিয়া, মিডিয়া, লুডিয়া, বাক্‌ট্রিয়া, কার্থেজ, রোম, মিশর, কালডিয়া ট্রয়, ব্যাবিলেনিয়া ও পার্থিয়া প্রভৃতি সকলেরই মাথা নত। অথচ সেই প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের মহাজ্যোতি হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিলে মুসলমানেরা কখনও ভারত-বক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এজন্য হিন্দুকে শুধু আপনার মনে করিলে চলিবে না, তাহার সমস্ত গৌরবকেই হিন্দুর ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া লইতে হইবে।

খৃস্টান সমাজ বিদেশী কৃষ্টি ও বিদেশী নামের মোহ ত্যাগ করে পূর্ণ স্বদেশী হয়েছেন। আশাকরি মুসলমান সমাজও এই পথে যাবেন।

গাছপালার বৃদ্ধির দ্রুততর উপায়

বৈজ্ঞানিকেরা গাছপালার দ্রুততর বৃদ্ধির এক সহজ অথচ চমকপ্রদ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এটা তাঁরা করেছেন গাছের আশপাশের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে।

সুইডিশ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডঃ গুস্তে বিয়োর্কম্যান এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। ক্যালিফোর্নিয়ার কার্নেগী সংস্থায় গবেষণাকার্য চালান হয়।

এর প্রাথমিক উপকারিতা হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে—যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে হলে গবেষণাকার্য ব্যাহত হয়। তাই সেখানে তাড়াতাড়ি খাদ্যশস্য বাড়িয়ে তুলতে পারলে খুবই ভাল হয়।

আপাতত এ পদ্ধতি গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ আছে॥ কিন্তু এর ব্যাপকতর খাদ্যশস্যের উৎপাদনক্ষেত্রে পদ্ধতিটি বিপ্লব আনতে পারে। অবশ্য, আরও প্রচুর গবেষণা ও প্রয়োগানুসন্ধান করতে হবে, ব্যাপক ব্যবহারের আগে।

ভূপৃষ্ঠের বাতাসে শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন থাকে। ডঃ বিয়োর্কম্যানের গবেষণায় গাছের আশপাশের বাতাসে মাত্র শতকরা ৫ বা ২.৫ অংশ অক্সিজেন থাকে, কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক বাতাস লাগান হয়। এতে করে মটরশুঁটির গাছ ২.১ গুণ দ্রুত বেড়ে ওঠে। কয়েক জাতীয় ফুল এ গবেষণায় দু'দিনের মধ্যে স্বাভাবিকের থেকে শতকরা ৪০ ভাগ ওজনে বেড়ে গিয়েছিল।

এই প্রক্রিয়ায় কার্বনডাই অক্সাইডকে স্বল্পায়াসেই কার্বোহাইড্রেট-এ পরিণত করা যায় সূর্যালোকের সাহায্যে॥

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সমীরণ চৌধুরী

শৈশব ও যৌবন

ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ্ (লেনিন) এর জন্ম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ভল্গা নদীতীরবর্তী সিম্বির্স্ক (অধুনা উলিয়ানোভ্স্ক) শহরের এক মধ্যবিত্ত বংশে। তাঁর বাবা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ্ উলিয়ানভ্-এর আদি বাসস্থান আসট্রাখান। আশৈশব দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামরত নিকোলায়েভিচ্ সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তারপর তিনি অঙ্ক এবং পদার্থ-বিদ্যার শিক্ষক—জেনজা আর নভ্‌গোরোড্-এর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

তৎকালীন সমাজে নিকোলায়েভিচ্ ছিলেন মতবাদের দিকে 'অগ্রসর' বুদ্ধিজীবী। য়ুরোপ-এর অগ্রগামী মতবাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সামঞ্জস্য ছিল। তাঁর স্বপ্ন জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের জীবন জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল করে তোলা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে ইন্সপেক্টর এবং পরে সিম্বির্স্ক-গুবারনিয়া-র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

আজীবন শিক্ষাপ্রসারে বিশ্বাসী নিকোলায়েভিচ্ এই সুযোগে নিজেকে শিক্ষাবিস্তারকল্পে নিয়োগ করলেন। কাজ উপলক্ষ্যে তিনি কয়েক সপ্তাহ গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, সারা প্রদেশ ছিল তার কর্মক্ষেত্র। তীব্র শীতে, বসন্তের কাদাভরা গ্রাম্য পথে, হেমন্তের কুৎসিত আবহাওয়ায় তিনি ঘুরতেন প্রদেশের দুর্গমতম অংশে; উদ্দেশ্য বিদ্যালয় স্থাপন আর চাষী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে আগ্রহী শিক্ষকদের সম্ভাব্য সবরকম সাহায্যপ্রদান।

এ কাজ সহজসাধ্য নয়, তার স্বাস্থ্যও টিকল না এই পরিশ্রমের ফলে। সরকারী কর্তাব্যক্তি, জমিদার এবং জোতদার—তিন পক্ষীয় সংগ্রামে লিপ্ত নিকোলায়েভিচ্ দেখলেন শেষোক্তরা চাষীদের শিক্ষালাভের পথে বিরাট অন্তরায়; তা ছাড়া কুসংস্কার চাষীদের মধ্যে এমন সর্বব্যাপী যে, লেখাপড়ার চেষ্টামাত্রই তারা সন্দেহ-দৃষ্টিতে দেখে।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক নিকোলায়েভিচ্ সব বাধাবিঘ্ন সরিয়ে চাষীদের সঙ্গে
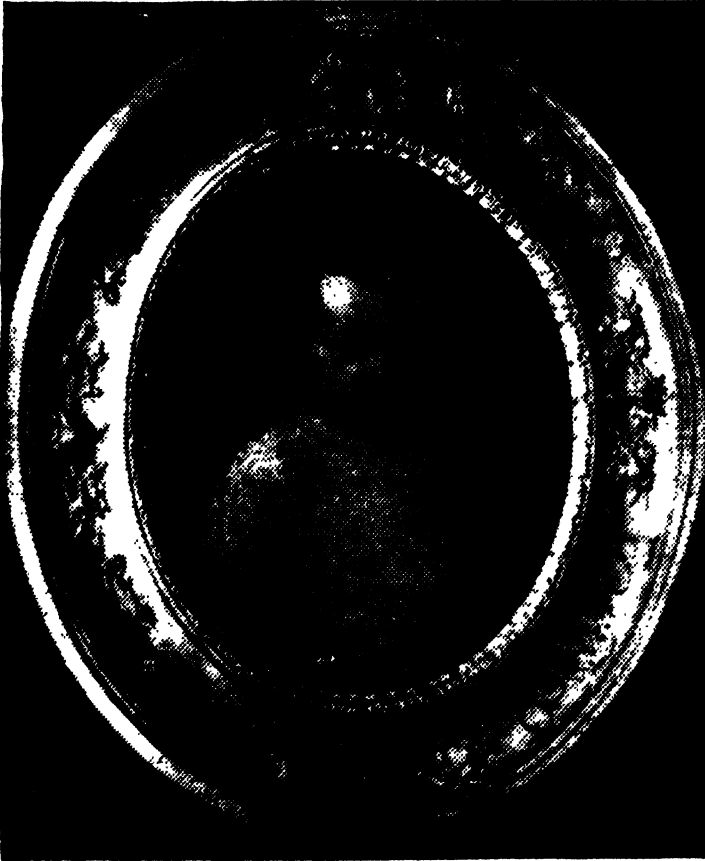
তিন বছর বয়সে লেনিন (ভ্লাদিমির উলিয়ানভ)

মিশতেন সহজভাবে। প্রায়ই তিনি তাদের দরজায় উপস্থিত হতেন তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে।

ভল্গা অঞ্চলের অ-রুশ অধিবাসী-দের মধ্যে তাঁর সুশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিশ বছরের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন অনেক শিক্ষক আর শিক্ষাবিদ—যাদের বলা হত 'উলিয়ানোভাইট্'। বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বাড়ল সিম্বির্‌সক গুবারনিয়াত অঞ্চলে, এও তার আন্তরিক পরিশ্রমের ফল।

লেনিন-এর মা মারিয়া আলেকজান্‌দ্রোভ্না এক চিকিৎসকের কন্যা। তার বাপের বাড়ি রীতিমত বড় হওয়ায় দারিদ্র্য তার নিয়মমাফিক লেখাপড়া শেখার পথে বাধা হয়েছিল; গৃহেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। এই অসাধারণ প্রতিভাময়ী ও সঙ্গীতপ্রিয়া মহিলা কেবল নিজেই কয়েকটি বিদেশী ভাষা শেখেন নি, সন্তান-দেরও সেগুলো শিখিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, গৃহকর্মের বিরল অবসরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার পরীক্ষা পাশ করলেও সংসারের চাপে কোনদিন শিক্ষকতা করতে পারেন নি।

আলাকাইয়েভ্‌কা-তে উলিয়ানভ্ পরিবার (লেবেদেভ অঙ্কিত চিত্র হইতে)

গার্হস্থ্য পরিবেশ এবং বিদ্যাশিক্ষা

উলিয়ানভ্ পরিবার সম্পর্কে 'আদর্শ' বিশেষণটি প্রযোজ্য। ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ্ প্রেমিক স্বামী এবং উদার পিতা মারিয়া মূর্তিমতী ভালবাসা। তাঁদের সন্তান ছ'টি: আনা, আলেকজান্‌দার, ভ্লাদিমির, ওলগা, দিমিত্রি এবং মারিয়া। তাঁরা সন্তানদের সৎ পরিশ্রমী আর জনসাধারণের প্রয়োজনমুখী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। এদের 'বিপ্লবী' হয়ে ওঠা তাই আদৌ কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়।

পিতামাতার ব্যক্তিগত আদর্শ সন্তান-দের উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা দেখত গণশিক্ষার জন্য পিতার অ-সাধারণ পরিশ্রম, দায়িত্বপালনের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা, আর নতুন গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপনের সাফল্যে তার অপার আনন্দ। বাবাকে তারা অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন।
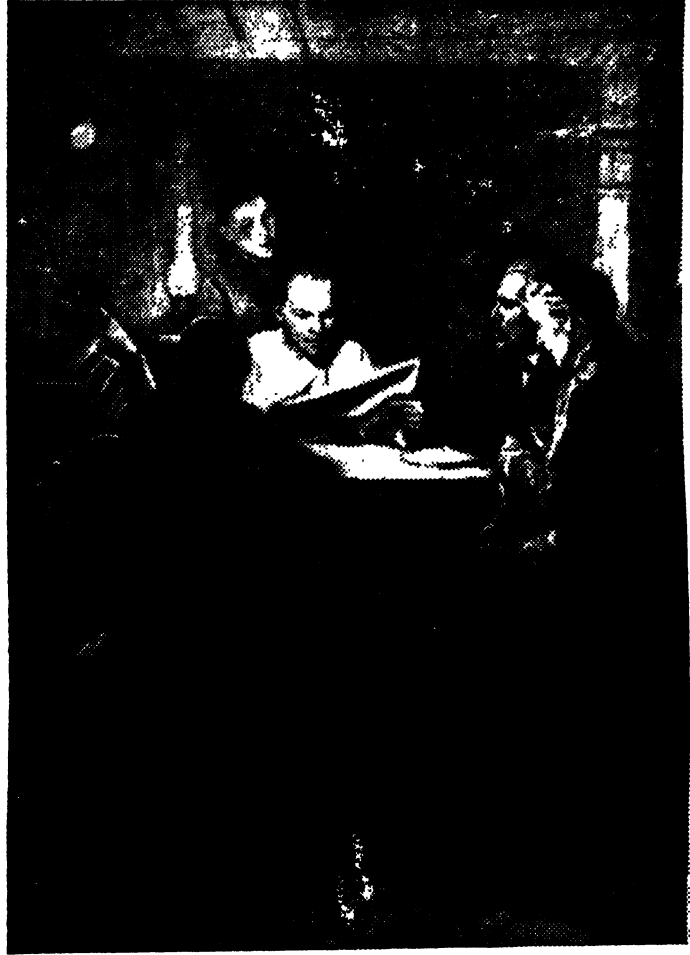
রুশ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দোব্রোলিউবভ্ ছিলেন ইলিয়া-র আদর্শ, নিজের সন্তানদের সামনে তিনি এই আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন তাদের জ্ঞানস্পৃহা জাগানোর জন্য সচেষ্ট। নেক্রাসভ্ এবং নিষিদ্ধ কবি প্লেস্‌চেইয়েভ্ ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। শেষোক্ত কবির কবিতা তিনি নিজের ছেলেদের বারবার শোনাতেন:

আমরা আত্মিক ভাই, পাশাপাশি
ঝড়ে ও ঝঞ্ঝায় একসাথে;
আমৃত্যু ঘৃণা করবো
মাতৃভূমির সব শোষকদের।

ছেলেমেয়েদের স্কুলের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানো সত্ত্বেও নিকোলায়েভিচ্ তাদের আরও ভাল হওয়ার জন্য প্রেরণা দিতেন। তাঁর অবসর সময়ের সবটুকু কাটত ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। তাদের কৌতূহল নিবৃত্তি এবং গল্পচ্ছলে শিক্ষাদান ছিল তাঁর প্রিয় কাজ।

তাদের মা মারিয়া উলিয়ানোভা-ও আদর্শ মহিলা। শান্ত স্বভাবের। কিন্তু সন্তানরা যাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। ক্ষীণা, শান্ত এবং সংযত; অথচ কর্তব্যে দৃঢ় এবং সংকল্পে অটল এই মহীয়সী মহিলা উত্তরজীবনেও এই গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছিলেন উলিয়ানোভ পরি-বারের চরম দু:সময়ে।

পরিবারটির ধরণ-ধারণ ছিল বিচিত্র। যেদিন ক্ষুদে ভ্লাদিমির হঠাৎ দরজা দিয়ে রাস্তায় না বেরিয়ে জানলা টপ্‌কে গেল, সেদিন তাঁর বাবা মা তাঁকে বকাবকি করেন নি, বিদ্রূপও নয়। নিকোলায়েভিচ্ ছেলের সুবিধার জন্য ছোট্ট কাঠের

তিনি করতেন না, যা সত্য করতেন না। সমসাময়িক একটা ছোট্ট ঘটনায় তার উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রমাণ মেলে: একদিন এক অতিথির কাছে নিকোলায়েভিচ্ প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সন্তানদের গীরজা-য় যেতে অনিচ্ছার কথা বলায় তিনি মন্তব্য করেন, 'বেত লাগান, তবেই চিট হবে।' ক্রুদ্ধ ভ্লাদিমির গলার ক্রশ চিহ্নটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

ভূমিচাষী আর মজুরদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চলত, ভ্লাদিমির তা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতেন এবং প্রতিবিধানের কথাও চিন্তা করতেন। তাঁর বাবা তাঁদের কাছে অনেক কাহিনী বর্ণনা করতেন--গ্রামের অতল অজ্ঞতা, কর্তৃপক্ষের অন্যায় অত্যাচার, চাষীমজুরদের দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি বিষয়ে। সর্বদা তাঁকে অ-রুশীয় এবং অত্যাচারিত তাতার মরদিভিয়ান প্রমুখ জাতির সংস্পর্শে আসতে হত, তাদের বঞ্চিত জীবন দেখে তিনি খুব বিচলিত হতেন। জার-এর কু-শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁর ঘৃণার উৎস রয়েছে এইখানে।

সেইসময়ের একটা ছোট্ট কাহিনী স্মরণ করলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্টতরভাবে বোঝা সম্ভব। তখন তিনি তামিল দিতেন একজন চোভাশ্ শিক্ষককে—তাঁর নাম ওখটনিকভ্। ভদ্রলোকের বিষয় ছিল শিক্ষক-শিক্ষণ-পদ্ধতি; ভ্লাদিমির তাঁকে অঙ্ক আর প্রাচীন ভাষা বুঝিয়ে দিতেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে।

চারিদিকের নানা অত্যাচার অবিচারের সমাধানকল্পে ভ্লাদিমির সর্বক্ষণ পড়াশুনো করতেন—পুশকিন, গোগোল তুর্গেনেভ্, নাব্রন্তভ, নেক্রাসভ্, আর তলস্তয়। বেলিস্কি, হার্জেন, চার্নিশেভ্স্কী, পিসারেভ্ প্রমুখ লেখকদের বিপ্লবী সাহিত্যও তিনি সে সময় গোগ্রাসে পড়েছিলেন। এইসব লেখা পড়ে তৎকালীন রাশিয়া-র সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠল এবং তিনি জার-তন্ত্রের ঘোর শত্রুতে পরিণত হলেন। তৎকালীন বিপ্লবাত্মক পত্রিকা 'ইস্ক্রা'-য় প্রকাশিত সব কবিতা ছিল লেনিন-এর মুখস্থ।

স্কুলজীবনে লিখিত তাঁর প্রবন্ধাদি থেকেও তাঁর বিপ্লবাত্মক মতবাদ খানিকটা বোঝা যায়। একবার তাঁর প্রধান শিক্ষক (এক কেরেন্সকী ১৯১৭ খৃস্টাব্দের প্রথম বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের প্রধান কেরেন্সকী-র বাবা) ক্লাস-এ ভ্লাদিমির-কে প্রশ্ন করলেন, তুমি যে নিপীড়িত জনগণ' সম্বন্ধে লিখেছো, এরা কারা ? কোথায় থাকে ?'

ভাগ্য তাঁকে অল্প বয়সেই কঠোর আঘাত হেনেছিল। ১৮৮৬-র জানুয়ারী মাসে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। ১৮৮৭-র ১লা মার্চ গ্রেপ্তার হন তাঁর বড়ভাই আলেকজান্দার। তখনও তিনি পিতৃবিয়োগের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেন নি। আলেক্জান্দার না কি জার তৃতীয় আলেক্জান্দারকে হত্যাপ্রচেষ্টায় জড়িত। এর কিছুদিন পরেই তাঁর বোন আনা-কে জার-এর পুলিস গ্রেপ্তার করলো, সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে।

পরিবারের কেউ জানতেন না আলেক্জান্দার বিপ্লবাত্মক কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রাণিতত্ত্বে গবেষণার জন্য পদকপ্রাপ্ত আলেক্জান্দার ছিলেন পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন এবং প্রাণিতত্ত্বের গবেষক। সকলের ধারণা তিনি নামজাদা অধ্যাপক হবেন কিন্তু বিপ্লবী সংঘের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না। মতবাদের দিক থেকে তিনি 'নারোদ্নাইয়া ভোলিয়া' এবং 'মার্কস্ইজম'-এর মধ্যপন্থী।

জনৈক পারিবারিক বন্ধু খবরটি লেনিন-এর মায়ের এক বন্ধুর কাছে লিখে জানালেন। ভদ্রমহিলা ভ্লাদিমিরকে ডেকে দেখালে (তাঁর ভাষায়)—'ভ্লাদিমির ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইল।—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সে বলল, 'ব্যাপারটা গুরুতর, আলেক্জান্দার-এর সমূহ বিপদ।' বেচারা ভ্লাদিমির। মার কাছে এই অপ্রীতিকর খবর দেওয়ার ভার পড়ল তাঁর ওপর।

এ খবর সিম্বির্‌সক সহরে ছড়াল দ্রুতবেগে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার তথাকথিত 'উদার মতাবলম্বী' সমাজ একঘরে করল গোটা উলিয়ানভ্ পরিবারকে। এই প্রথম লেনিন তথাকথিত উদার মতাবলম্বীদের কাপুরুষতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলেন।

মা মেয়েরা পুত্রের বিচার দেখতে গেলেন—বিচারকের অভিযোগের উত্তরে অভিযুক্ত আলেক্জান্দার বলে গেলেন স্বৈরাচারের অবসান এবং সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথা উদাত্ত কণ্ঠে। মা ফিরে এসে মেয়ে আনা-কে বলেছিলেন, 'আলেক্জান্দার-এর কথা শুনে আমি ত অবাক—ও যে এত ভাল বক্তৃতা করতে পারে জানতাম না।---

অবকাশে লেনিন (বৃকভ অঙ্কিত চিত্রানুসরণে)

জন্মদিনে

(অপ্রকাশিত)

স্বর্গত অসিতকুমার হালদার

সবুজ মাটি সুনীল গগন
চন্দ্র তারায় নিয়ে
জীবন ভরে দেখচে সবাই
কোন চোখটা দিয়ে?
এর বাইরে ভূতের বাসায়
হামলা দিয়ে দেখি
পিকাসো আর অন্য সবাই
আঁকলো ছবি একি?
ভাবনা যাতে নাইকো কোনই
অভাব জোটে শেষে
চোখ মেলিয়ে চায়নি কেহই
এই দুনিয়ায় এসে।
খুঁজেচে তারা ললিত কলায়
তবু দেখচে না যে

রূপের মাঝে অরূপ রতন
লুকিয়ে কোথা আছে।
গানের কেলা কাব্য কলায়
এই ধরণীর রসে
ভরচে কবি, গাইচে গায়ক
রইচে আত্মবশে।
ছবির বেলা ভূতের আকার
ভবিষ্যতের খেলা
এই জীবনে খেলচে সবাই
বহুৎ ছবির মেলা
ছবি আঁকার বেলায় কেবল
চায় যে দিতে ফাঁকি
যাহাক্তরে পেঁচিছে এখন
আর্টকে কোথায় রাখি?

কিন্তু আমি সহ্য করতে না পেরে আদালত থেকে চলে এসেছি।'

১৮৮৭-র ৮ই মে আলেক্জান্দার উলিয়ানভ্-এর ফাঁসী হল। তখন তিনি মাত্র একুশ বছরের যুবক। এই দুর্ঘটনায় ভ্লাদিমিরের মনে মর্মান্তিক আঘাত লেগেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা সুদৃঢ় হল এবং তিনি বিপ্লববাদের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠলেন। ভগ্নী আনা লিখেছেন :

'বীরের মৃত্যু বরণ করল আলেক্জানদার, এবং তাঁর গৌরবময় আত্মদানের উজ্জ্বল রশ্মি আলোকিত করল ভ্রাতা ভ্লাদিমির-এর পথ।'

দাদার স্মৃতিতর্পণ ক'রে লেনিন স্থির করলেন তাঁর পথ হবে ভিন্ন—সন্ত্রাসবাদ তাঁর পথ নয়। এ তিনি তখনই ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন।

সেই অবস্থায় তাঁর আত্মবিশ্বাস আর সহনশীলতার চরম পরীক্ষা হল। শোকে অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্কুল-এর শেষ পরীক্ষায় (স্কুল-লিভিং) সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন —সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র একমাত্র লেনিন-ই পেলেন স্বর্ণপদক। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একজন ফাঁসীর আসামীর ভাইকে স্বর্ণপদক দানের ব্যাপারে বেশ দ্বিধান্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত কোনরকমেই আর লেনিন-এর অনন্য প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারলেন না।

তাঁর সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য : 'অত্যন্ত দক্ষ, পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী ছেলে। সে সব ক্লাসেই প্রথম হয়েছে, এবং শেষ পরীক্ষায় তাঁকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে সব থেকে ভাল ছেলে হিসেবে।'

[ক্রমশ।

আলেকজাণ্ডার ও বিষকন্যা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'বিষকন্যা' শব্দটি গৌণ অর্থে কোনও অপরূপ নারীকে বোঝাত —যিনি খুব নিপুণতার সাথে অন্যের ক্ষতিসাধন করতেন। এঁর সঙ্গে যাঁর বিয়ে হত তাঁর ধ্বংস ছিল অনিবার্য। এঁরা সাধারণত রাজাদের আশ্রিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী বিষদ্বারা লালিত কন্যাকেই বিষকন্যা আখ্যা দেওয়া হত। এই 'কন্যা'র দেহে ছোটবেলা থেকেই অল্প অল্প করে বিষ সঞ্চারিত করা হত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের দেহে বিষধারণ ক্ষমতাও বেড়ে যেত। কখনো কখনো আবার এদের শরীরে ক্ষতিকারী রোগবীজাণু সঞ্চারিত করা হত। কালক্রমে এদের শরীর এত বিষময় হয়ে উঠত যার ফলে এদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসও অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর হত। সাধারণত অসাধারণ রূপলাবণ্য-সম্পন্ন নারীদেরই এই কাজে নিয়োগ করা হত। এদের সঙ্গে মিলনের ফলে পুরুষের দেহেও রোগের আবির্ভাব হত এবং তার মৃত্যু ছিল অবধারিত। রাজারা এই ধরণের বিষকন্যা লালন ও পোষণ করতেন তাঁদের শত্রুদের বিনাশসাধনের জন্য। শত্রুরাজাদের মধ্যে এই ধরণের নারীদের পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদের এই নারীদের রূপমুগ্ধ করা হত এবং শত্রুরা এদের সংস্পর্শে এসে রোগাক্রান্ত হয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতেন। ভারতবর্ষে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে জানা যায় না। তবে আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন এই বিষকন্যার মাধ্যমে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কয়েকটি কাহিনী বিদেশীয় সাহিত্যে প্রচলিত আছে।

প্রাচীন ভারতে বিষকন্যাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ খুব সহজসাধ্য নয়। তবে Dr. Jivanji Jamsedji Modi এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য দান করেছেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ২৫শে জুন লণ্ডনের 'ফোক-লোর সোসাইটি'-র বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি স্বরচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির নাম —'The Vish-Kanya or Poison damsel in Ancient India'।

এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের বিষকন্যা-দের লালনপ্রক্রিয়া ও তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এই বিষয় সম্বন্ধে আরও কিছু লিখতে অনুরোধ করা হলে তিনি ১৯২৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'জার্নাল অব দ্য বোম্বে ব্র্যাঞ্চ অব রয়েল এশি-য়াটিক সোসাইটি' পত্রিকায় 'দা স্টোরি অব আলেকজাণ্ডার দা গ্রেট এ্যাণ্ড দা পয়জন ড্যামজেল অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ ডঃ মোদির রচনার সাহায্যপুষ্ট।

আলেকজাণ্ডার ও বিষকন্যার এই কাহিনী সম্বন্ধে মিঃ এন এম পেনজার (ইনি সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে'র ইংরাজী অনুবাদ করেন 'ওসেন অব স্টোরি' নাম দিয়ে) কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন। Secretum Secretorum (১) নামে একটি লাটিন গ্রন্থ থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, আলেকজাণ্ডার এক ভারতীয় বিষকন্যা দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনতে চলেছিলেন কিন্তু আরিস্টটলের সুপরামর্শে তিনি রক্ষা পান। Secretum Secretorum গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মূলত আলেকজাণ্ডারের কাছে লব্ধ আরিস্টটলের লেখা কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও গোপন পত্র।

এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে মিঃ পেনজার বলেছেন –

"The Secretum, however, is not reckoned among Aristotle's genuine works, but as one of a number of unauthenticated treatises which, reflecting as it does theories and opinions contained in his famous philosophical writings, was readily accepted as a work of the Master himself."

উক্ত গ্রন্থের অংশবিশেষে আলেক-জাণ্ডারের কাছে আরিস্টটলের প্রেরিত-বার্তা প্রসঙ্গে পেনজার যা উদ্ধার করেছেন তার সারমর্ম এই—আরিস্টটল আলেক-জাণ্ডারকে নিষেধ করেছেন তিনি যেন কেবলমাত্র নারীদের তত্ত্বাবধানে নিজেকে সমর্পণ না করেন। তিনি যেন মারাত্মক

১। Kalifa al: Mamun. (৮০০ খৃস্টাব্দ) এর অধীনস্থ John the son of Patricians নামে এক সিরিয়ান কর্মচারী Asklepios (সূর্যদেবতা) এর মন্দিরে গ্রন্থটি প্রথম আবিষ্কার করেন। গ্রন্থটি গ্রীক-ভাষায় রচিত এবং স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। John গ্রন্থটিকে প্রথমে রুমিভাষায় ও পরে আরবীভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষায় রচিত মূলগ্রন্থটি আর পাওয়া যায় না। গ্রন্থটির হিব্রু অনুবাদও পাওয়া যায়। এটি এখন Judah Al-Harizi-র গ্রন্থ বলে সর্বজনবিদিত। ইনি ত্রয়োদশ শতকের লোক। গ্রন্থটির লাটিন অনুবাদ দ্বাদশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিষ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। তিনি যেন কোনও একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করেন; কিন্তু যেন কয়েকজন বিশ্বস্ত চিকিৎসকের মিলিত উপদেশ শুনে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

তারপর আরিস্টটল আলেকজাণ্ডারকে একটি পূর্বঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—

Remember what happened when the king of India sent thee rich gifts, and among them that beautiful maiden whom they had fed on poison until she was of the nature of a snake, and had I not perceived it because of my fear, for I feared the clever men of those countries and their craft, and had I not found my proof that she would be killing thee by her embrace and by her perspiration, she would surely have killed thee.

এই পত্রাংশ থেকে আলেকজাণ্ডার ও বিষকন্যার ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণিত হল। কোনও একজন ভারতীয় নৃপতি (আরিস্টটল তাঁর চিঠিতে এই রাজার নামোল্লেখ করেন নি) প্রেরিত একটি বিষকন্যা দ্বারা আলেকজাণ্ডার প্রতারিত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় রাজার কূটকৌশল বুঝতে পেরে আরিস্টটল আলেকজাণ্ডারকে সাবধান করে দেন। তা না হলে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু অবধারিত ছিল।

এই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অবকাশ থাকা বিচিত্র নয়। কারণ কোনও ভারতীয় ভাষায় আলেকজাণ্ডার ও বিষকন্যার এই কাহিনী লেখা হয় নি। চঃ মোদি পারসিক ভাষায় এই ঘটনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেন এই কাহিনী প্রথমে ভারতবর্ষের কোনও ভাষায় রচিত হয়, তারপর ভাষান্তরে অনূদিত হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"...the origin of our story in question is Indo-Persian. Its migration is in the following order: Indian—Pahlavi — Greek — Syrian — Arabic — Latin."

আলোচ্য কাহিনী হিব্রু ভাষায় যে ভাবে আছে তা থেকে এবং অন্যান্য বিদেশীয় ভাষায় রচিত কাহিনী থেকে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

একজন ভারতীয় রাজা আলেকজাণ্ডারের কাছে কয়েকটি মূল্যবান জিনিষ পাঠিয়েছিলেন,—এই জিনিষগুলির মধ্যে একটি সুন্দরী নারী ছিল। এর দেহে ছোটবেলা থেকেই অল্প অল্প করে বিষ সঞ্চারিত করে একে সাপের মত স্বভাবযুক্ত করে তোলা হয়েছিল।

আরবিক ভাষায় অনূদিত ঘটনায় বলা হয়েছে উক্ত ভারতীয় রাজার মা তাঁর পুত্রের কল্যাণার্থে এই মেয়েটিকে পাঠিয়েছিলেন। আবার কারো কারো মতে রাজমহিষী স্বামীর মঙ্গলের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

Frauenlob নামে ত্রয়োদশ শতকের একজন জার্মান কবির একটি কবিতার বিষয়বস্তু এই কাহিনী। সেখানে তিনি বলেছেন—ভারতীয় রাজার পাঠানো মেয়েটির নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও বিষ ছিল। সে যদি কারো দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করত তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। মেয়েটি আস্তে আস্তে আলেকজাণ্ডারের মনে অনুরাগ উদ্রেক করতে আরম্ভ করে। আরিস্টটলের নির্দেশে একজন জ্যোতিষী আলেকজাণ্ডারকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ শিকড় দান করেন। সেটি ধারণ করার ফলে তিনি বিপন্মুক্ত হন।

●

চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে ফরাসী ভাষায় এই ঘটনা নিয়ে একটি গল্প রচিত হয়েছিল। তার সারাংশ এই—

আলেকজাণ্ডারের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের এক রাজাকে কোনও এক ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা বলেছিলেন—'বহুদূর দেশে এইমাত্র একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করলেন যাঁর হাতে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।'

এই সংবাদ শুনে রাজা খুব বিচলিত হলেন এবং বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অলৌকিক কোনও উপায়ের সন্ধান করতে লাগলেন। মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত হল। সেই সময় তাঁর রাজ্যে যে সব পরিবারের শিশুকন্যা জন্মগ্রহণ করল তাদের পিতামাতাদের আদেশ দেওয়া হল তারা যেন তাদের কন্যাদের 'বিষ'-এর দ্বারা লালনপালন করে। কালক্রমে মেয়েরা বড় হল। একদিন রাজা কোনও এক শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে একটি মেয়েকে ঐ শত্রুরাজার কাছে উপহার-হিসাবে (এবং প্রাথমিক পরীক্ষা করার জন্য) গভীর রাত্রে পাঠালেন। আক্রমণকারী রাজা মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে যেইমাত্র আলিঙ্গন করলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হল। এই ঘটনায় ভারতীয় রাজা সন্তুষ্ট হলেন এবং ঐ মেয়েটি যাতে আরও যত্নে প্রতিপালিত হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হুকুম দিলেন। ইতিমধ্যে আলেকজাণ্ডার পৃথিবীবিখ্যাত হয়েছেন। তিনি এদেশে আসার আগেই ভারতীয় রাজা উপহার হিসাবে আলেকজাণ্ডারের কাছে পাঁচটি সুন্দরী কন্যা (তার মধ্যে একটি পূর্বোক্ত বিষকন্যা) পাঠালেন। আলেকজাণ্ডার বিষকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে গেলেন। কিন্তু আরিস্টটল ও সক্রেটিস ঐ বিষকন্যার স্বরূপ জানতে পেরে তাঁদের সন্দেহের কথা প্রকাশ করলেন এবং আলেকজাণ্ডারকে মেয়েটির কাছে যেতে নিষেধ করলেন। তখন আলেকজাণ্ডারের আদেশে মেয়েটির মাথা কেটে ফেলা হল এবং তার দেহ পুড়িয়ে ফেলা হল।

●

বিষকন্যার দ্বারা আলেকজাণ্ডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করার আরও একটি ঘটনা প্রচলিত আছে।

Sizire প্রদেশের এক বুদ্ধিমতী

রাণী তাঁর ইন্দ্রজালবিদ্যার কৌশলে জানতে পারলেন যে, একদিন তিনি আলেকজাণ্ডারের দ্বারা স্বরাজ্যচ্যুত হবেন। তখন তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে আলেকজাণ্ডারের একটি প্রতিকৃতি সংগ্রহ করলেন। ছবিটি দেখে তিনি বুঝলেন আলেকজাণ্ডার কামুক প্রকৃতির পুরুষ। ঠিক সেই সময়ে কোনও এক পরিবারে একটি শিশুকন্যার জন্মসংবাদ পেয়ে তাকে তিনি নিয়ে এলেন এবং তাকে একটি অজগর সাপের 'বড ডিমে'র মধ্যে রেখে দিলেন। কালক্রমে মেয়েটি সাপের দ্বারাই লালিত হতে লাগল এবং সাপের মতই 'হিস্ হিস্' শব্দ করতে আরম্ভ করল। তারপর রাণী সযত্নে তাকে নিয়ে এলেন এবং কথা শেখালেন। মেয়েটির প্রকৃতি দিন দিন সাপের মতই হল এবং তার নিশ্বাসের হাওয়াও অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠল। মেয়েটির সৌন্দর্য হল অপরূপ। তার মুখ হল দেবকন্যার মত। সুযোগ বুঝে রাণী মেয়েটিকে উপহার হিসাবে আলেকজাণ্ডারের কাছে পাঠালেন। আলেকজাণ্ডার তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং বন্ধুদের জানালেন —'আমি মেয়েটির সাথে একশয্যায় শয়ন করব।'

কিন্তু আরিস্টটল তাঁকে নিষেধ করলেন এবং প্রমাণ করে দিলেন যে, মেয়েটি 'বিষকন্যা'। প্রমাণ করার জন্য তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন তা হ'ল এই—

প্রথমে তিনি একটি বিষধর সাপকে একটি কলসীর মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তারপর কলসীটির চারপাশ দিয়ে কিছুটা দূরত্ব রেখে একরকম বন্য লতার রস (যাকে dittany juice বলে উল্লেখ করা হয়েছে) দিয়ে একটা বৃত্ত রচনা করলেন। তারপর কলসীর মুখটি খোলা হলে সাপটি ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আরিস্টটল নির্মিত গণ্ডীর বাইরে সাপটি আসতে পারল না এবং গণ্ডীর মধ্যেই মারা গেল। এইভাবে ঐ কন্যাটিকে অন্য দুটি সমবয়স্কা মেয়ের সাথে (যারা বিষকন্যা নয়) একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল এবং একই প্রক্রিয়ায় তাদের চারপাশ দিয়ে ঐ লতার রস দিয়ে গণ্ডী এঁকে দেওয়া হল। তারপর আরিস্টটল ঐ তিনজনকে গণ্ডীর বাইরে আসতে বললেন। তখন নির্বিষ মেয়ে দুটি অনায়াসে বাইরে এল কিন্তু ঐ বিষকন্যা বহু চেষ্টা করেও বাইরে আসতে পারল না এবং গণ্ডীর মধ্যেই মারা গেল।

বিষকন্যার দ্বারা আলেকজাণ্ডারের বিপদ ঘটানোর প্রচেষ্টার আর একটি কাহিনী পারসিক ভাষায় লেখা ফিরদৌসীর বিখ্যাত 'শাহ্ নামা' গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর কাহিনীর বিষয় বস্তু এইরকম—

ভারতে Kaid নামে এক রাজা ছিলেন। পর পর দশ রাত্রি তিনি কয়েকটি দুঃস্বপ্ন দেখেন। রাজসভার কেউই এই স্বপ্নের সুব্যাখ্যা দিতে পারল না। কয়েকদিন পরে রাজা গভীর বনের অধিবাসী মেহেরান নামে এক দৈবজ্ঞের কথা জানতে পেরে তাঁর কাছে গেলেন। রাজার স্বপ্নের কথা শুনে মেহেরান বললেন—ইরাণ জয় করে সিকান্দার (আলেকজাণ্ডার) বিরাট সৈন্যদল নিয়ে ভারত জয় করতে আসবেন। তাঁর হাতে আপনার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

রাজা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে জানতে চাইলে মেহেরান অভয় দিয়ে বললেন—চারটি মূল্যবান জিনিষ (চার চীজ্) যদি আলেকজাণ্ডারের কাছে পাঠানো হয় তবে তাঁর ভয়ের কোনও কারণ থাকবে না। এই চারটি হল—(১) একটি সুন্দরী নারী, (২) একজন পণ্ডিত দার্শনিক, (৩) একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং (৪) একটি পাত্র—যার মধ্যে জল রাখলে তা কোনও অবস্থাতেই উত্তপ্ত হবে না।

আলেকজাণ্ডার যথাসময়ে ভারতে এসে Kaid-কে আত্মসমর্পণ করতে বলে একটি চিঠি পাঠান। প্রত্যুত্তরে রাজা আলেকজাণ্ডারকে অভিনন্দন জানালেন এবং ঐ চারটি বস্তুর বিষয় তাঁর কাছে নিবেদন করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে আলেকজাণ্ডার তাঁর দশজন অমাত্যকে পাঠালেন ঐ জিনিষগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণের জন্য। অমাত্যেরা যথাসময়ে ভারতীয় নৃপতির আতিথ্য গ্রহণ করলেন এবং ঐ মহামূল্য বস্তুচতুষ্টয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন। মেয়েটির রূপলাবণ্যে তাঁরা খুবই মুগ্ধ হলেন এবং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে তার রূপের বর্ণনা দিয়ে আলেকজাণ্ডারের কাছে চিঠি লিখলেন। তারপর আলেকজাণ্ডারের নির্দেশে ঐ চারটি জিনিষ নিয়ে তাঁরা আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপস্থিত হলেন। মেয়েটিকে দেখে আলেকজাণ্ডার অভিভূত হলেন এবং তাকে 'জগতের প্রদীপ' (Kin ast cheragh-i-jchan) আখ্যা দিলেন। তার পর তিনি স্বদেশীয় প্রথায় মেয়েটিকে বিবাহ করলেন।

আলেকজাণ্ডারের কাছে যে চিকিৎসকটি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি খুব জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সবরকম সাপের বিষ ও বিষের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। পাহাড়ে উৎপন্ন নানারকম গাছের পাতা ও শিকড় দিয়ে তিনি বিষনাশক ওষুধ তৈরী করতে পারতেন। নিজের তৈরী ওষুধ দিয়ে তিনি প্রত্যেকদিন আলেকজাণ্ডারের দেহ মার্জনা করে দিতেন এবং তাঁকে সবসময়েই সুস্থ রাখার চেষ্টা করতেন।

আলেকজাণ্ডারের দেহ একদিন খুব অবসন্ন দেখে ঐ চিকিৎসক তাঁকে বললেন—নারীদের সাথে অতিমাত্র সহবাসের জন্য আপনার শরীর অবসন্ন হচ্ছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে রাতের পর রাত আপনি ঘুমোবার সময় পাচ্ছেন না।

আলেকজাণ্ডার বললেন—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার শরীরে কোনও রোগ নেই।

কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক একথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন ভারতীয় রাজা প্রেরিত মেয়েটির সাথে সহবাসের ফলেই আলেকজাণ্ডার বেশী দুর্বল হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তিনি তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার কৌশলে এমন বলকারক ওষুধ তৈরী করে দিতে

লাগলেন যার ফলে আলেকজাণ্ডার খুব শরীরেই অধিষ্ঠান করতে লাগলেন। ঐ চিকিৎসক সম্পূর্ণভাবে না জানলেও একথা বুঝেছিলেন যে, ঐ মেয়েটির শরীরে এমন কিছু আছে যা আলেকজাণ্ডারের পক্ষে ক্ষতিকারক। একদিন রাতে ঐ চিকিৎসক খুব যত্ন করে ওষুধ তৈরী করে আলেকজাণ্ডারকে খাওয়াতে এসে দেখলেন, তিনি শয্যায় একা শুয়ে আছেন, তাঁর পাশে কোনও নারী অনুপস্থিত। চিকিৎসক খুব আনন্দিত হলেন এবং সারারাত আলেকজাণ্ডারের পাশে বসে মদ খেলেন।

সকালে আলেকজাণ্ডার যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন তাঁর শরীর খুব সুস্থ দেখাচ্ছিল। তাই দেখে চিকিৎসক নিজের তৈরী ওষুধ ফেলে দিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁকে ওষুধ ফেলে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

চিকিৎসক বললেন—গতরাতে মহারাজের নারীসঙ্গের প্রয়োজন হয়নি। এবং আপনি একাই ঘুমিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আপনার ওষুধের কোন প্রয়োজন নেই।

এ কথা শুনে আলেকজাণ্ডার খুব মজা পেলেন এবং চিকিৎসকের উপর খুব প্রীত হলেন।

ফিরদৌসীর এই কাহিনীতে পরিষ্কার করে বলা না হলেও অনেকের মতে রাজার প্রেরিত ঐ মেয়েটি বিষকন্যা এবং এর সাথে সঙ্গমের ফলে আলেকজাণ্ডারের শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু ঐ চিকিৎসক রাজার প্রেরিত হলেও তিনি আলেকজাণ্ডারের গুণমুগ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর সর্বাত্মক চেষ্টার জন্য আলেকজাণ্ডার কোনও প্রবল রোগের কবলে পড়েন নি। এ কাহিনীর মধ্যে আরিস্টটলের কোনও স্থান নেই।

*

আবুল-হাসান আলি মুশৌদি নামে অন্য এক লেখক ফিরদৌসীর কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করেছেন তাঁর Moruj Al Zahab গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণের মধ্যেই তিনি ভারতীয় নৃপতি প্রেরিত বিষকন্যার দ্বারা আলেকজাণ্ডারের বিপদ ঘটানোর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারতীয় নৃপতির নাম Kend বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য ঘটনা ফিরদৌসী বর্ণিত ঘটনারই অনুরূপ।

বিষকন্যা ও আলেকজাণ্ডারের এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, ভারতীয় কোন ভাষায় এই কাহিনীর লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। তবে এই কাহিনীর সত্যতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, কারণ যে সব গ্রন্থে এই কাহিনীর অবতারণা তাদের ঐতিহাসিক মূল্য খুব নগণ্য নয়। সব কিছু বাদ দিলেও আলেকজাণ্ডারের কাছে লেখা আরিস্টটলের পত্রটি এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে এই কাহিনীর সত্যতা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত না হলেও এর থেকে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে বিজয়ী রাজাদের কাছে বিষকন্যা প্রেরণের প্রথা বর্তমান ছিল তা অনুমান করা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ
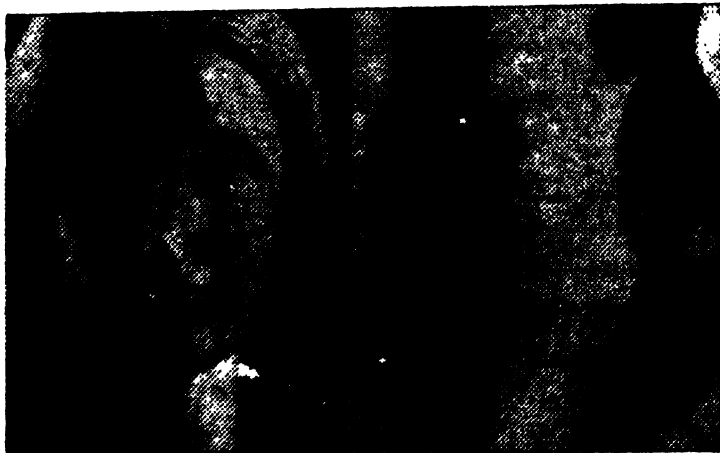
পশ্চিম জার্মানীতে এখন একদল নতুন প্রত্নবিজ্ঞানী দেখা দিয়েছে। এদের কাজের সীমা এখন স্পেন থেকে ইরাক ও পশ্চিম জার্মানী থেকে সুদান পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সম্প্রতি এদের বিভিন্ন আবিষ্কারের একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রদর্শনীতে যে দুটি আকর্ষণীয় জিনিষ ছিল সে দুটি হচ্ছে রোমান সম্রাট হাড্রিয়ানের আমলে স্পেনে খোদিত একটি রমণীর মাথা ও গ্রীসে প্রাপ্ত একটি নতজানু বালকের মূর্তি।

সমন্বয়-পথিক ডেভিড হেয়ার

ললিত হাজরা

ডেভিড হেয়ার বাঙালীর পরমাত্মীয়। নামটি শুনিবামাত্রই আজিও বাংলার হিন্দু-মুসলমান শ্রদ্ধাবনত হয়। দেশ-কালের সীমানা ছাড়াইয়া যুগে যুগে কিছু মানুষ দলিতমথিত মানবাত্মার নবজাগৃতির জন্য আত্মাহিত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন। এই বিশ্ববোধ কালজয়ী —ইহার মৃত্যু নাই। এই কারণেই ডেভিড হেয়ার কালজয়ী পরুষ-সিংহ।

১৭৭৫ খৃস্টাব্দের স্কটল্যাণ্ডের একটি গ্রামে ডেভিড হেয়ারের জন্ম হয়। পেশায় ছিলেন ঘড়ি-ব্যবসায়ী। ১৮00 খৃস্টাব্দে পঁচিশ বৎসর বয়সে ঘড়ি-ব্যবসায়ীরূপে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। সত্য বটে, পেশায় ছিলেন ঘড়ি-ব্যবসায়ী, কিন্তু আসলে নেশায় ছিলেন দরদী সমাজসেবী। সৎ মানুষটি অনতিবিলম্বে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেন। ১৮২০ খৃস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখের 'দি গভর্নমেণ্ট গেজেট (সাপ্লিমেণ্ট)'-এ ঘোষিত হয়—১৮২০ খৃস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার তাঁহার ব্যবসায় বন্ধু গ্রে সাহেবকে হস্তান্তরিত করিয়াছেন। ব্যবসায়ী জীবনে ছেদ পড়িল।

পূর্ব হইতেই রাজা রামমোহন রায় ডেভিড হেয়ারের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। হেয়ারও কলিকাতার বাঙ্গালী-সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হইতে লাগিলেন। শীঘ্রই বাঙালী পরিবারের পরিবেশের সহিত তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিল। তাহাদের সমাজ-জীবনের সুখ-দুঃখের সহিত হেয়ার একীভূত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়েই রাজা রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র (প্রতিষ্ঠা কাল ১৮১৫ খৃস্টাব্দ) সংস্পর্শে হেয়ার আসিলেন। অচিরেই তিনি 'আত্মীয় সভার' সহিত ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত হইলেন। প্রাচীন মতান্ধতা, কুসংস্কার, সতীদাহ প্রথার অবসান এবং দেশে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনকল্পে রামমোহনের প্রগতি-শীল চিন্তাধারা ও আন্দোলনক্রম হেয়ারের উপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করিল এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে হেয়ার তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করিয়া লইলেন।

এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকিলেও তিনি পুরাপুরি এই আন্দোলন-গুলির সহিত নিজেকে যুক্ত করেন নাই।

ডেভিড হেয়ার

তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় সংস্কারের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে সত্যকারের মানুষ করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা। সে শিক্ষা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। সে শিক্ষানীতির ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিয়া বাংলার চারিপ্রান্ত শিক্ষালোকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহা ছিল কল্পনাতীত।

পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন শাসকবৃন্দ এদেশের সামাজিক ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের প্রথম পর্যায়ে তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে কিরূপে পদানত করা যায় এবং অধিকৃত অঞ্চলে কিভাবে কোম্পানীর সার্বভৌম শক্তি সুদৃঢ় করা যায়, সেই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের রীতি অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম পর্যায়ে নিজেদের দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিবার মানসে হিন্দু ও মুসল-মান সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে তোষণনীতি গ্রহণ করে।

ফলস্বরূপ ১৭৮১ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় 'কলিকাতা মাদ্রাসা' এবং ১৭৯২ খৃস্টাব্দে বেনারসে 'বেনারস সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইল। শিক্ষা বিস্তারকল্পে এই বিদ্যায়তন দুইটি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় বিষয়ে ইংরাজ বিচারকদিগকে দেশীয় আইন ও প্রথা বিশ্লেষণ করিবার দক্ষতাসম্পন্ন মৌলবী ও পণ্ডিত তৈয়ারী করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মূল লক্ষ্য। তৎকালে এই মৌলবী ও পণ্ডিত দিগকে যথাক্রমে জজ্-মৌলবী ও জজ্-পণ্ডিত বলা হইত।

১৮00 খৃস্টাব্দে তরুণ বৃটিশ সিভিলিয়ানদের বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৩ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত খৃস্টান মিশনারীগণ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কিছু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন, এমন নজীরও পাওয়া যায়। মিশনারীদের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা বিস্তারের নামে ভারতীয়-দের মধ্যে খৃস্টান ধর্ম প্রচার ও ভারতীয়-দের খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণ।

যদিও মিশনারীদের স্থাপিত বিদ্যায়তন-গুলির খৃস্টানধর্ম প্রচারে মূল উদ্দেশ্য ছিল তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, এদেশে ধর্ম-নিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষা-প্রসারে

শিল্পীগণের ... ... ভূমিকা ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল স্বভাবতই স্বার্থপ্রণোদিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মূলত রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্যই এই বিদ্যায়তন গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সীমাবদ্ধতার কারণেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা প্রশস্ত হইতে পারে নাই। ১৮১৩ খৃস্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট (Charter Act of 1813) ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সের সভাগণ ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতি নির্দেশনামা প্রচার করিয়া বলিলেন—প্রতি বৎসরে এক লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহ দান ও ভারতবর্ষীয় বৃটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নতির জন্য এই টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এই নির্দেশনামা প্রেরিত হইবার দশ বৎসর পরেও ইহার বাস্তব রূপায়ণের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা হয় নাই।

রাজা রামমোহন কোম্পানীর শিক্ষাবিস্তারে অবহেলা লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সর্বপ্রথম অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রামমোহনই ছিলেন ভারতবর্ষে প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথিকৃৎ। অনুরূপভাবেই ডেভিড হেয়ার সাহেবও ছিলেন ইহার অন্যতম উদ্‌গাতা।

"১৮১৪ সালে রাজা রামমোহন রায় যখন কলিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্পকালের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সভাভঙ্গের পর দুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, এদেশীয় যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হইবে।" (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'—পৃঃ ৪৮)।

প্রশস্তভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের ইহাই আদিপর্ব। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এদেশে শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নয়, এ প্রচেষ্টা দেশবাসীর এবং দেশবাসীই এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা। শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা লইয়া রামমোহন ও হেয়ারের মধ্যে কিছু মতানৈক্য ঘটিলেও রামমোহন হেয়ার সাহেবের মতামত যুক্তিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে এক উচ্চতর নৈতিকভূমিতে উন্নীত করার জন্য রামমোহন ব্রাহ্মসভার বেদান্ত ধর্মের প্রচারকে প্রকৃত পথ বলিয়া প্রত্যয়িত হইয়াছিলেন কিন্তু হেয়ার সাহেব রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানাইতে পারিলেন না।

হেয়ারের সুচিন্তিত যুক্তি ছিল—ইংরাজী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে কুসংস্কার নির্মূল হইতে পারিবে এবং দেশীয় যুবকদের উপর ইহার অসীম প্রভাব নূতন মানুষ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিবে।

রামমোহন হেয়ারের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহারই বাস্তব রূপায়ণ ঘটিল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে শিক্ষা ছিল সীমিত ও সংকীর্ণ। এই পটভূমিকায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। কিন্তু সম্মুখে দেখা দিল দুস্তর বাধা।

রামমোহন ছিলেন প্রগতিশীল। পূর্ব হইতে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে একদল ধর্মান্ধ রামমোহনের প্রতিটি প্রগতিশীল গঠনমূলক কার্যের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা পরিষ্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন—হিন্দু কলেজের সহিত রামমোহনের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিলে তাঁহারা সহযোগিতা করিবেন না। এই নূতন প্রচেষ্টায় ধর্মান্ধদের অসহযোগিতা এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া হেয়ার সাহেব বন্ধু রামমোহনকে একটু দূরে থাকিতে পরামর্শ দিলেন।

হেয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী রামমোহন একটু দূরে রহিয়া গেলেন। দেশের মঙ্গলসাধনই যাঁহার জীবন ব্রত তাঁহার পক্ষে স্বীয় প্রভাব, প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কোন মূল্যই ছিল না। আত্মীয় সভার অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর এই প্রস্তাব লইয়া তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের সহিত আলোচনা করিবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ারের জীবনীকার প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়া ছেন, 'তৎকালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। স্যার হাইড ইস্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ হিন্দু যুবকদের ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে অনুকূল কি না তাহা নির্ধারণের জন্য বৈদ্যনাথকে তিনি অনুরোধ করিলেন---। বৈদ্যনাথ যথারীতি হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই কথা জানাইলেন এবং পরে স্যার হাইড ইস্টের নিকট হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মতির কথা জানাইয়া দিলেন---।' (David Hare, Page—6, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ)।

অবশেষে ১৮১৭ খৃস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী সোমবার গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। যাহা হউক, হেয়ার সাহেব যে হিন্দু কলেজের আদি কল্পক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। পরে হেয়ার

সাহেবের [illegible] হিন্দু কলেজের গৃহ নির্মিত হয়।

ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শন এ-দেশীয় যুবকদের পরিচিত করাইবার জন্য হেয়ার সাহেবের আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু এই একই কারণে এই দেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টায় তাঁহার অবদান বিরাট। তৎকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ বাংলা ভাষা ও অতি সাধারণ গণিতের শিক্ষাদান করা হইত। এই প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন :

"আমাদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলি অবসরবিনোদনের জন্য পাঠ করিতাম এবং পত্রলেখা ও জমিদারী সেরেস্তায় কার্য করিবার উপযোগী অঙ্ক শিখিতাম। (ঐ পৃ: ৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের উপযোগী কোন পাঠ্য পুস্তকই ছিল না। হেয়ার সাহেব এই অভাব পূরণের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

১৮১৭ খৃস্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশন ও সস্তায় অথবা বিনামূল্যে সরবরাহের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশন ও সরবরাহের কোন উদ্দেশ্যই এই সংস্থার ছিল না।

ইহার পর 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নামে আর একটি সংস্থা গঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল নূতন বিদ্যায়তন স্থাপন ও শিক্ষার উন্নতি সাধন। হেয়ার দুইটি সংস্থারই সহিত যুক্ত ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটিকে হেয়ার বার্ষিক একশত টাকা চাঁদা দিতেন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক ছিলেন হেয়ার। স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তক বঙ্গ বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়দের নিকট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরিত হইত।

সমস্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া ছাত্রদের কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য তাহাদের পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষা লওয়া হইত। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণকে পুরস্কৃত করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহাশয়দিগকেও নগদ অর্থে সম্মানিত করা হইত। কেবল ইংরাজী ভাষাই নহে, বঙ্গভাষার উপরেও হেয়ার সাহেব সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় হেয়ারের অবিস্মরণীয় অবদান ছিল। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ১লা জুন মেডিক্যাল কলেজের শুভ উদ্বোধনী সভায় ডা: ব্রেমলী (Dr. Bramely) বলিয়াছিলেন, 'কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল মি: হেয়ারের প্রভাবে ও সহযোগিতায় তাহা দূরীভূত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজ অথবা স্কুল সোসাইটি পরিচালিত বিদ্যায়তনসমূহে বহুসংখ্যক ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই বিদ্যায়তনগুলির সহিত হেয়ার ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় শুধুমাত্র ছাত্রদের কুসংস্কার ও ধ্যান-ধারণার সহিতই নয়, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার সম্যক পরিচয় ছিল।" ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে ডা: ব্রেমলীর মৃত্যুর পরে হেয়ার মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অন্যতম উদগাতা হিসাবে হেয়ার সাহেব পরিচিতি লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বাংলা দেশের বৃহত্তর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বৃহত্তর জীবনে তাঁহার চিরস্মরণীয় কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় জাগরণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। হেয়ারের কর্মপ্রচেষ্টার ধারাবাহিত বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে সম্ভবপর না হইলেও দুই একটির যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতেই হইবে।

১। দেওয়ানী মামলায় জুরি বিচারের প্রবর্তন—১৮৩৫ খৃস্টাব্দের [illegible] জুলাই [illegible] কলিকাতার [illegible] হলে এক জনসভায় সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী মামলায় সুবিচারের উদ্দেশ্যে জুরির সাহায্যে বিচার উৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে স্বীকৃত হয়। শুধু সুপ্রীম কোর্টে নহে সমগ্র দেশে যাহাতে জুরি প্রথা প্রবর্তিত হয়, তজ্জন্য সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সপার্ষদ গভর্নর জেনারেলের নিকট আবেদনপত্রসহ একটি খসড়া আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই খসড়া আইন প্রণয়নের দায়িত্ব হেয়ার সাহেবের উপর ন্যস্ত হয়।

২। এদেশীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ইংরাজী আদালতে উত্তর বিচারপ্রার্থনার অধিকার—আইনসভা হরণ করলে কলিকাতা ও উপকণ্ঠের অধিবাসিগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। এই অধিকার হরণকারী আইনের বিরুদ্ধে ১৮৩৬ খৃস্টাব্দের ১৮ই জুন কলিকাতায় এক বৃহতী জনসভা হয়। এই সভায় মি: টি টার্টন (T. Turton), দ্বারকানাথ ঠাকুর, মি: ডবলু পি গ্র্যান্ট (W. P Grant), মি: এস স্মিথ (S. Smith) ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক বক্তৃতা দেন। হেয়ার এই সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—

"That it is expedient to have an agent authorized of the petitioners and inhabitants of Calcutta for the purpose of presenting the petition upon and advocating their general interests, and the Committee now appointed be authorized and requested to prepare the requisite powers and instructions for such agent."

৩। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিকদের মরিশাস ও বুরবোঁ প্রেরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—১৮৩৫ খৃস্টাব্দে মরিশাস ও বুরবোঁ দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় শ্রমিক চালান দেওয়া শুরু হয়। বলপূর্বক এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রমিকদের চালান দেওয়া

বিত্তারে রাধাকান্ত দেবের সহিত ডুফ সোসাইটিতে নিষ্ঠার সহিত কঠোর পরিশ্রম করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। এদেশীয় ছাত্রদিগকে প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় কি না এই চিন্তার আবির্ভাব হইলেও হেয়ার উভয় শিবিরের প্রচারের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। মেকলে পরিচালিত এ্যাংলিসিস্টস্ (Anglicists) দল ভারতীয়দের জন্য বিকল্প প্রাচ্য কৃষ্টির সমর্থন করিতে লাগিলেন এবং ভারতীয় সমাজে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, যে শ্রেণীর মানুষ বর্ণে ও রক্তে হইব ভারতীয়, কিন্তু রুচি, নীতি চিন্তা ও বোধে হইবে ইংরাজ।

এই চিন্তাধারার সামিল হইয়াছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরুণ ইংরাজ কর্মচারিসহ রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি ভারতীয় প্রগতিশীল দলের সভ্যগণ। প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষপাতিগণ বলিলেন—ইংরাজীর মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার অপরিহার্য হইলেও সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও অপরিহার্য।

শিক্ষার মাধ্যমকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচ্য শিক্ষা-পক্ষপাতিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। এক দলের নাম [illegible] এবং [illegible] বোম্বাই দল। উভয় দলের মধ্যে বাংলা দল ছিল শক্তিশালী। হেস্টিংস এবং মিণ্টোর চিন্তাদর্শে প্রভাবান্বিত বাংলা দল আরবী ও সংস্কৃত ভাষার অনুকূলে যুক্তিযোজন করিতে লাগিলেন এবং মুনরো (Munro) ও এলফিনস্টোন (Elphinstone) পরিচালিত বোম্বাই দল মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষে রহিলেন। হেয়ার উভয়পক্ষের চিন্তাদর্শগত সংঘাত গভীর মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতের মধ্য হইতে এক সংশ্লেষণ উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একটি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সুপ্তবোধের উন্মুক্তকরণই হইল শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য এবং দেশের মানসসত্তা হইতে শিক্ষার উদ্ভব হইলেই শিক্ষার লক্ষ্য সাধিত হইবে, ইহাই ছিল হেয়ারের প্রত্যয়। যে দেশের সংস্কৃতি সবিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত, সে দেশের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য তাহার ক্ষীয়মাণ অবস্থায় বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রযুক্তি আবশ্যিক হইতে পারে কিন্তু তাহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাকৃত সম্পদের উপরেই ইহার প্রয়োগ প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় দেশের পক্ষে ইহা নয়, কারণ ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মৌলিকতা, রূপ ও ঐতিহ্য কোন অবস্থাতেই প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিরোধী চিন্তাচ্ছন্নতার অপূর্ব আত্তীকরণ ও সংশ্লেষণের ইতিহাস। ভারতীয় ইতিহাসের আত্তীকরণ ও সংশ্লেষণের প্রতিপথ অনুসরণ করিয়া ইংরাজী সংস্কৃতিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অন্যথায় ইংরাজী সংস্কৃতি কোন কালেই এই দেশের মাটিতে শিকড় গাড়িতে সমর্থ হইবে না—এই সত্য হেয়ার সাহেব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চিন্তাধারা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বাস্তবানুগ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

১৮৪২ খৃস্টাব্দে ১লা জুন কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ৬৭ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেব পরলোকগমন করেন। হেয়ার খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না—এই অভিযোগে খৃস্টান সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে হিন্দু কলেজ-সংলগ্ন তাঁহারই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। একশত সাতাশ বৎসর পরে সমন্বয় পথিক ডেভিড হেয়ারের মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত হইতেছি।

প্রথম বৃষ্টি

শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা

ভাতের মতো পরম সাদা
বৃষ্টি পরে ঝরে;
ঘাসের পাতা ভঙ্গ শরীর
শিউরে ওঠে জোরে!
একখানা মেঘ কোথায় ছিল
মায়ের হাতের মতো
সব কিছুই শীতল করে
আদর করে কত!
অম্লান বাতাস লাফায় ঝাঁপায়
লিচু জামের বনে;
বৃষ্টি প্রথম এলো মেঘে
পুলক জাগে মনে।

উজ্জয়িনী কুম্ভ প্রসঙ্গে

কুম্ভ পর্ব সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পৌরাণিক গল্প আছে। মহাভারতের আদি-পর্বে এবং অন্যান্য পুরাণাদিতে বিশেষত স্কন্দপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। উপাখ্যানের মর্মকথা এইরূপ—দেব-দানবেরা পরস্পরে প্রায়ই আধিপত্য লইয়া বিবাদ করিত। সেই-সেই সময়ে যে পক্ষ বলবান হইত তাহারাই বিজয় লাভ করিয়া আধিপত্য লাভ করিত। একসময়ে উভয়ে অর্থাৎ দেবাসুরেরা মিলিত হইয়া স্থির করিল যে, তাহারা অমর হইবার জন্য অমৃত পান করিবে। যেমন ইচ্ছা তেমনই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল। সমুদ্র মন্থনে চৌদ্দ রত্নসহ অমৃত-কুম্ভ উত্থিত হইল। ইন্দ্রের [illegible] তাঁহার পুত্র জয়ন্ত দানবদের বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে অমৃত-কুম্ভ লইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে দৈত্যরা তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

দেবমানে দ্বাদশ দিন যুদ্ধ হইবার সময় পৃথিবীর চারি-স্থানে (হরিদ্বারে, প্রয়াগে, উজ্জয়িনীতে এবং নাসিকে) জয়ন্ত দানবদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উক্ত চারিস্থানে কুম্ভ হইতে অমৃতবিন্দু সেই সময় পতিত হইয়াছিল। নীচে পড়িয়া গিয়া কুম্ভ যাহাতে না ভাঙ্গে এবং যাহাতে উহা এইভাবে অসুর-দের হাতে যাইতে না পারে সেইজন্য দেবতাদের মধ্যে চন্দ্র সূর্য এবং বৃহস্পতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। এই সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক আছে—

'চন্দ্র প্রস্রবণাদ রক্ষাং সূর্যো
বিস্ফোটনাদদসৌ।
দৈত্যেভ্যশ্চ গুরুরক্ষাং সৌরির্দেবেন্দ্র
জাদ্‌ভয়াৎ॥'

এইজন্য সূর্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতির পূর্ব সংঘটিত সময়ে তৎ তৎ রাশিস্থিত হইলে হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী এবং নাসিকে কুম্ভ পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় প্রসিদ্ধ আছে—

(১) সূর্যেন্দু গুরুসংযোগস্তদ্রাশৌ যত্র
বৎসরে।
সুধাকুম্ভপ্লবে ভূমৌ কুম্ভ ভবতি
নান্যথা॥ ২০

স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি

দেবানাং দ্বাদশাহোভির্মর্ত্যৈর্দ্বাদশ বৎসরৈঃ।
জায়ন্তে কুম্ভপর্বাণি তথা দ্বাদশ সংখ্যয়া॥
—২১ শঙ্কর সংহিতা (স্কন্দ পুরাণ)।
তত্রাধুনাত্তয়ে নৃনাং চত্তারো ভুবি ভারতে।
অষ্টৌ লোকান্তরে প্রোক্তা দেবৈর্গম্যান-
চেতরৈঃ॥
পৃথিব্যাং কুম্ভযোগস্য চতুর্ধা ভেদ উচ্যতে।
বিষ্ণুদ্বারে তীর্থরাজেঽবন্ত্যাং গোদাবরী
তটে।
সুধাবিন্দু বিনিক্ষেপাৎ কুম্ভপর্বেতি
বিশ্রুতম্॥

সূর্য চন্দ্র এবং গুরু বৃহস্পতি যে সংবৎসরে যে রাশিতে অবস্থিতিকালে ভূমিতে কুম্ভ হইতে অমৃতকণিকা পতিত হইয়াছিল, সে বৎসরে ঐ তিনটি গ্রহের পূর্বোক্ত রাশিসমূহে সম্মিলিত হইবে সেই বৎসরই কুম্ভপর্ব হইবে, অন্যথা নহে। দেবতাদিগের দ্বাদশ দিনে অর্থাৎ মনুষ্যমানে এক বৎসরে কুম্ভপর্ব দ্বাদশ স্থানে অর্থাৎ হইয়া থাকে। মর্ত্যে পূর্ব-উল্লিখিত চার স্থানে এবং অন্যস্থানে আটটি কুম্ভ পর্ব হইয়া থাকে।

উজ্জয়িনী কুম্ভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যোগ আবশ্যক। বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে এবং সূর্য মেষরাশিতে থাকিলে উজ্জয়িনীতে পূর্ণ কুম্ভ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে—

মেষরাশিগতে সূর্যে সিংহরাশৌ
বৃহস্পতৌ।
উজ্জয়িন্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ সর্বসৌখ্যবিবর্দ্ধনঃ।
মেষরাশিগতে সূর্যে সিংহরাশৌ
বৃহস্পতিঃ।
কুম্ভযোগসবিজ্ঞেয়ঃ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥
সিংহরাশিগতে জীবে মেষস্থে চ
দিবাকরে তথা।
মাধবে ধবলে পক্ষে সিংহে জীবে
অজে রবিঃ॥

বিগত বার বৎসর হইতেই এই কুম্ভ-পর্ব সম্বন্ধে মতভেদ চলিতেছে। গত বৎসর ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে এবং এই বৎসর ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে যথাক্রমে দশনামী দণ্ডী পরমহংসরা বৈষ্ণব মহাত্মারা মধ্যপ্রদেশের সরকার ও উজ্জয়িনীর প্রধান জ্যোতির্বিদেরা এবং দশনাম দণ্ডহীন পরমহংস, উদাসী, উভয় পক্ষের আখড়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কুম্ভপর্বে স্নানাদি করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

এই সম্বন্ধে উভয়পক্ষের মতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সন্ন্যাসী সংস্কৃত পাঠশালা বারাণসী হইতে এই সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তিকাতে দ্বাদশ ব[illegible] অন্তরই সনাতন কাল হইতে কুম্ভপর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাতে এই বিষয়ে উপলব্ধ শ্লোকাদির মধ্য হইতে যে অংশ তাঁহার মতের অনুকূল হইবে শাস্ত্র হইতে অংশেরই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই পুস্তিকায় অথর্ববেদ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক এবং জ্যোতিষ সিদ্ধান্তে 'বক্রীভাব' সম্বন্ধে যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে

তাহা বিযুক্ত এবং অস্পষ্ট হওয়ায় এবং উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ শ্রীসূর্যনারায়ণ ব্যাসজী দ্বারা উহা খণ্ডিত হওয়ায়, কাশীর প্রকাশিত মতবাদের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে সত্যই সংশয় এবং সন্দেহের অবকাশ আছে।

কাশীর মতবাদে বার বৎসরের উপর জোর দিয়া যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার পূর্ব শ্লোকের কথা উল্লেখ না করায় বার বৎসরের উপরই জোর দিতে সুবিধা আপাতদৃষ্টিতে হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। বার মাসে বৎসর হয় ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ক্ষয় মাস এবং অধিক মাস থাকিলে যথাক্রমে উল্লিখিত দ্বাদশ সংখ্যার কমে অর্থাৎ একাদশ মাসে এবং বেশীতেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ মাসেই বৎসর গণনা করার নিয়ম জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রসিদ্ধিই আছে।

[illegible]দিনে মাসের নিয়ম ও ঠিক থাকে না। [illegible] ২৯,৩০, ৩১ প্রভৃতি যাহা নির্ধারিত হইবে তাহাই সেই মাসে দিনের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইবে। সুতরাং দ্বাদশ মাসে বৎসর এবং ত্রিশ দিনে মাসের সাধারণ নিয়মের জিদ জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় না;—গণনায় যাহা যাহা নির্ধারিত হইবে তাহাই স্বীকৃত হইবে। এই সম্বন্ধে এদেশেই শুধু নহে, পাশ্চাত্ত্য দেশের জ্যোতির্বিদেরাও সময় নির্ধারণে গণনার উপরই জোর দিয়া থাকেন। তাঁহাদের গণনাতেও প্রতি চতুর্থ বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন বাড়িয়া যায়।

দ্বাদশ বৎসরের উপর বিশেষত্ব দিবার প্রথা কেন হইয়াছে? কুম্ভপর্বের জন্য সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতির নির্দিষ্ট রাশিতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। সূর্য ও চন্দ্র প্রায় প্রতি বৎসরই এক রাশিতে মিলিত হয় কিন্তু বৃহস্পতিই সাধারণত প্রায় দ্বাদশ বৎসর অন্তর সূর্য ও চন্দ্রের সহিত নির্দিষ্ট সিংহ রাশিতে মিলিত হয়। সেইজন্যই কুম্ভের জন্য সাধারণ নিয়ম হইতেছে যে উহা দ্বাদশ বৎসর অন্তরই এক স্থানে হইয়া থাকে। জ্যোতিষ গণনায় সূর্যের বর্ষমান ৩৬৫।১৫।৩১ দিনাদি এবং বৃহস্পতির বর্ষমান (এক রাশির মধ্যম ভোগ) ৩৬১।১।৩৬ দিনাদি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি বর্ষে এ দুই গ্রহের অন্তর ৪।১৩।৫৫ হইয়া থাকে। ঐ অন্তর (১২ X ৭) বা ৮৪ বর্ষে ৩৫৫ দিনের মত অর্থাৎ প্রায় এক বৎসরের মত হইয়া থাকে। ইহা ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র বা ইতিহাসের ১৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। তদনুযায়ী প্রতি ৮৪ বৎসরের মধ্যে ছয়বার কুম্ভপর্ব দ্বাদশ বর্ষ অন্তরই হইবে এবং সপ্তমবার একাদশ বৎসর অন্তর হইবে, ইহা নির্ণীত হয়। এই ভাবে প্রয়াগে এবং হরিদ্বারেও একাদশ বৎসরে কুম্ভপর্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব রেকর্ড অনুযায়ী বি, সং ১৮৩৬-এর পর ১৮৪৭ সংবতে, ১৯১৯-এর পর ১৯৩০ সংবতে এবং সং ২০০২-এর পর ২০১৩ সংবতে অবন্তিকা পুরীতে পূর্বে ১১ বৎসর অন্তর তিনবার কুম্ভপর্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে প্রমাণ পণ্ডিত শ্রীসূর্যনারায়ণজী ব্যাস পদ্মভূষণ জ্যোতির্বিদ মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে। এইরূপ তিনবার একাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভপর্ব না হইয়া যদি বরাবর দ্বাদশ বৎসর অন্তরই হইয়া থাকিত তাহা হইলে সংবত ২০২৫+৩ অর্থাৎ ২০২৮ সংবতে উহা অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত।

অপরপক্ষে অবন্তিকা পুরীর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত পদ্মভূষণ শ্রীসূর্যনারায়ণ ব্যাসজী কর্তৃক প্রকাশিত 'সিংহস্থ মহাত্ম্য উজ্জয়িনী দর্শন সহিত" পুস্তিকায় বিশদভাবে সকল বিষয় শাস্ত্র প্রমাণানুযায়ী আলোচনা করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্তমত সিংহস্থ বৃহস্পতির যোগই যে উজ্জয়িনী কুম্ভপর্বে প্রধান তাহা সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং দ্বাদশ বর্ষ সম্পর্কিত শ্লোকের তাৎপর্যও যথাযথভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও বিষয়ই চাপিয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একাংশ প্রকাশ করিয়া মতান্তর সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

সেইজন্যই বোধ হয় দশনামী দণ্ডবিহীন পরমহংস সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কোনও বিশিষ্ট মহামণ্ডলেশ্বর মহারাজও এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়া প্রচার করিবার জন্য স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার পত্র 'সিংহস্থ মহাত্ম্য উজ্জয়িনী দর্শন সহিত' পুস্তিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেণ্ট এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার জন্য ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদদের আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে 'সন্ন্যাসী সংস্কৃত পাঠশালা'র মতবাদী মহোদয়দেরও আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু বারাণসীর ঐ সংস্কৃত পাঠশালার পক্ষে কেহই উপস্থিত হন নাই।

শ্রীনিরঞ্জনী, শ্রীমহানির্বাণী এবং শ্রীজুনা আখড়া এবং অন্যান্য সাধু সম্প্রদায় এবং নানাস্থান হইতে সমাগত বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদদের এক সম্মেলনে শাস্ত্রযুক্তি ও পরম্পরানুযায়ী ২০২৫ সংবতেই অর্থাৎ ১৯৬৮ খৃস্টাব্দেই উজ্জয়িনীর পূর্ণ কুম্ভ পর্বের নিশ্চয় করা হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধু মহাত্মাদের মধ্যে বিভেদ চিরস্থায়ী করিবার জন্য কলির দুর্বার প্রভাববশত ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে দণ্ডী পরমহংস দশনামী সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরাই মাত্র উজ্জয়িনীর পরম্পরানুগত পূর্ণ কুম্ভপর্বে যোগ দিবার সৌভাগ্য অর্জন করে, কিন্তু অপরাপর সম্প্রদায়েরা ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে উজ্জয়িনী পূর্ণকুম্ভের যোগ না থাকা সত্ত্বেও পূর্ণকুম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি বিরুদ্ধভাবে প্রচার করিয়া নিষিদ্ধ কর্মের পাপফল লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিতেছে বলিয়া এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে। এই বিষয়ে বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদগণের শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত জনসাধারণকে জানান প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী সরকারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করি।

স্বপ্ন ও অহিফেন

শোক সে নিচ্ছে কলকাল

জাগায়ো না ঘোরে, জাগায়ো না"।

স্বপ্ন আর সত্য দুটো এক জিনিস নয়। স্বপ্ন ভঙ্গুর, স্বপ্ন অস্থায়ী, স্বপ্ন বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। তথাপি এই ভঙ্গুরতা, অস্থায়িত্ব বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যতা সত্ত্বেও স্বপ্নের প্রতি মানুষের অনুরাগ সহজাত। এ অনুরাগের সীমা নেই, অন্ত নেই। যতটুকু সময় এর স্থায়িত্ব, ততটুকু সময়ের জন্যেই এর প্রতি মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ। এর অনন্ত মাধুর্য এর অফুরান লাবণ্যই যেন এর জন্যে দায়ী। এর মাধুর্য, এই লাবণ্যই মানুষের মনে এক অচল প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।
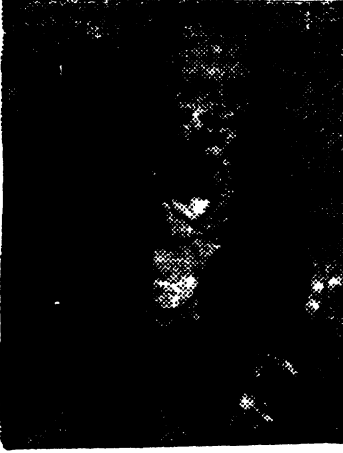
টমাস ডি কুয়েন্সী

এই স্বপ্নের সৃষ্টি কোথা থেকে? স্বপ্ন কি শুধু ঘুমে, স্বপ্ন কি জাগরণে নয়। গভীর নিদ্রার অতল অঙ্কই কি শুধু স্বপ্নের উৎস, জাগরণের পটভূমিতে কি স্বপ্নের ছায়াবিস্তার নেই—তা যদি না হয় তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল মহাসৃষ্টির, যে সকল যুগান্তরের উল্লেখ আছে—সেগুলো সম্ভব হচ্ছে কি করে, পৃথিবীর ভাবজগতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হচ্ছে কি করে, চিন্তারাজ্যে যুগে যুগে বিপ্লবের শংখ-ধ্বনিতে ফুৎকার হচ্ছে কেমন করে?

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বহুদূরগামী সূক্ষ্মদৃষ্টি, সজীব চিন্তাধারা, পিপাসু মন, ব্যাপক অনুভূতি—এরাই এককথায় স্বপ্নের স্রষ্টা। এখানেই শেষ নয়—এই

নামগুলির পর আরও একটি নাম উল্লেখ করতে হয়, কিন্তু সে নাম উল্লেখ করা-মাত্রই মনে হবে যেন ছন্দোপতন ঘটল, একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় দিশাহারা হওয়ার সম্ভাবনাও অবিদ্যমান নয়। তবু এ-ক্ষেত্রে তার অবদানও অল্পমূল্যের নয়, পাশ্চাত্য চিন্তানায়ক-দের কারো কারো মতে এ ক্ষেত্রে তার প্রভাবই অনস্বীকার্য। এই বস্তুর প্রভাবেই অর্ধশতাব্দীকাল আগে সমগ্র চীন ঝিমিয়েছিল। যে বস্তুর প্রভাবে কমলা-কান্ত বিদ্রূপের মাধ্যমে এমন বহু কথা বলে গেছে, যার অন্তর্নিহিত গভীর সত্য এবং প্রচ্ছন্ন বেদনা বাঙলা সাহিত্যের এক অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে আছে। তার নাম আফিং।

দেশরঞ্জন দাস

উনিশ শতকের প্রতীচ্যের চিন্তা-জগতে লডানাম যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল। এ বস্তুটি আফিমের আরক। এই বস্তু সেবনে শারীরিক ব্যথা-বেদনা থেকে নাকি অব্যাহতি মিলত। দামেও ছিল অত্যন্ত সস্তা। বীয়ারের থেকেও কম দাম। 'হ্যাঙ-ওভার' থেকে এই বস্তুটি রাজা চতুর্থ জর্জকে অব্যাহতি দিত।

যে স্বপ্ন দেখতে জানে, মহৎ সৃষ্টির চাবিকাঠি তারই হাতে। কে কেমন স্বপ্ন দেখতে পারে সেই অনুপাতে কোন লেখকের প্রতিভার মান নির্ধারণ করতেন চার্লস ল্যাম। অনেকের মতে অহিফেনের সহায়তায় সৃজনশীল গঠনধর্মী নতুন নতুন স্বপ্নের জন্ম হয়। এই মতবাদ অনুসারে সমগ্র চিন্তারাজ্যে আফিং একটা গভীরতা এনে দেয়, মানুষকে বাহ্যিক চেতনা থেকে সরিয়ে নিয়ে এক

সূক্ষ্ম চেতনাসম্পন্ন অনুভূতির দরজায় এগিয়ে দেয় এবং সেইখানেই কালজয়ী স্বপ্নের সূতিকাগৃহ যার ফল—কালজয়ী সৃষ্টি। এর প্রভাবে প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে মানুষের একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে—যা সৃষ্টি এবং স্বপ্নের পক্ষে প্রভূত সহায়ক।

কোলরিজের 'কুবলা খাঁ' একটা স্বপ্নের মধ্যে তাঁর স্রষ্টাচিত্তে ভেসে উঠেছিল কিন্তু লেখার সঙ্গে আর এক-জনের ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য তা পূর্ণতা পায় নি। কিন্তু সমালোচকদের মতে স্বপ্নটাই ছিল "disappointingly dull" কোলরিজের নাকি উচিত ছিল এ বিষয়ে আরও সতর্ক থাকা।

স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ

অবার ডি কুয়েন্সী, যিনি নিজে লিখলেন "দ্য কনফেসানস অফ এ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার"—তিনিও নিজে কখনও ভাবেন নি যে, অহিফেন সেবনে একজন অকবি কবি হয়ে উঠতে পারে।

স্বপ্ন দেখার সাধনায় এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় উপ-ন্যাসিকা মিসেস র‍্যাডক্লিফের নাম। তিনি অবশ্য অহিফেনের মাধ্যমে স্বপ্নকে আবাহন করেন নি। মাধ্যম হিসাবে তিনি গ্রহণ করতেন পরি-পাকের অযোগ্য খাদ্যসমূহ। সেই ধরণের খাদ্য গ্রহণ করে ঘুমুলে নাকি নানাবিধ স্বপ্ন দেখা সুনিশ্চিত এই রকম একটা দৃঢ় ধারণা তাঁর ছিল।
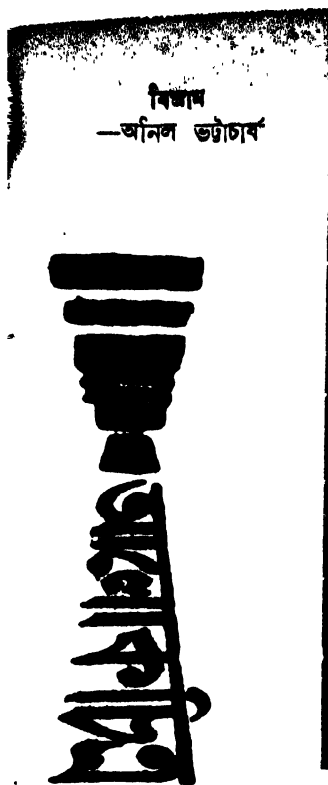
মাসিক বসুমতী। শ্রাবণ / '৭৬

বন্দীবিহঙ্গ
—বিন্দুশেখর বিশ্বাস

হা
বেণুলাল ভট্টাচার্য

—শম্ভু মুখোপাধ্যায়

—চিত্রজিৎ ঘোষ

—বিন্দুশেখর বিশ্বাস

হাসি

মাসিক বসুমতী। শ্রাবণ / '৭৬
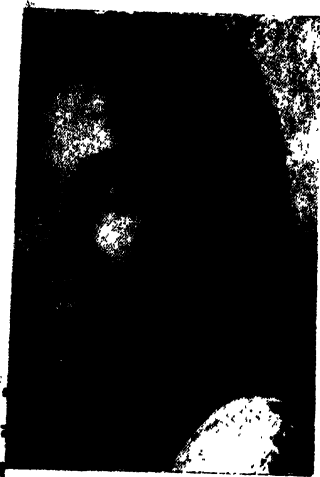
—শিবু দত্ত
(১ম পুরস্কার)

স্বপনকুমার ঘোষ

—ডলি ঘোষাল
(৩য় পুরস্কার)

উল্লম্ফন
—বিজয় ঘোষ

—অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
(২য় পুরস্কার)

হাসি

দেওয়াল চিত্র
—সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

—আশীষকুমার সিংহ

কলকাতার গঙ্গায়
—দীপঙ্কর সেন

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু

ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক
নীচ থেকে ওপর	পাঠিকা	নায়ক

১ম পুরস্কার কুড়ি টাকা
২য় পনেরো টাকা : ৩য় দশ টাকা

ফোয়ারা (ভিয়েনা)
—রথীন রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তিন ॥

হাজরা-মোড়ে এসে বাসটা থামল, নেমে পড়লাম আমরা। আমাদের বাড়ী প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। কাজেই আমাদের বাড়ী মানে মামাদের বাড়ী। বাবা মারা যান আমার খুব ছেলেবেলায়, একটা দুর্ঘটনার ফলে। আমার বোন কেতকী তখন মায়ের কোলে। সেই থেকে মামার বাড়ীতেই আমরা মানুষ। দাদামশায় তখনও জীবিত ছিলেন, তবে দিদিমা গত হয়েছিলেন তারও কয়েক বছর আগে।

বাবার মৃত্যুর পরে পিতৃকুলে জ্যেঠা-খুড়োদের অত্যাচারের ফলে কিছু দিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে যদিও মামারবাড়ী চলে এসেছিলাম আমরা, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বড়রা সকলেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার মায়ের মতো গুছিয়ে সংসার চালাবার মতো একজন মহিলার এখানেও প্রয়োজন ছিল।

আমার দাদামশায় শিক্ষকতা করতেন। দেশের জমি-জমা সব বিক্রি করে দিয়ে প্রথম যৌবনেই কলকাতা এসে এই বাড়ী করেছিলেন। ওঁর ছেলে দু'টি, আর মেয়ে বলতে আমার মা।

আমরা যখন স্থায়িভাবে এসে মামার বাড়ী উঠলাম, তখনই বড় মামার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বলে শুনেছি। আমার মা ওঁর পরে, সবার ছোট ছোটমামা। একদিন, মনে পড়ে, মা অনুযোগ করে বলেছিলেন দাদামশায়কে বড়মামার বিয়ের জন্য। উনি তখন দাদামশায়ের মতো শিক্ষকতা সুরু করেছিলেন।

আমার মায়ের কথার উত্তরে দাদামশায় বলেছিলেন বড়মামার বিয়ে সম্পর্কে কতকগুলি নিতান্ত অভাবিত বাধা-বিপত্তির কথা। কবে সেই দশ বছর আগে বি এ পাশ করবার পরের বছরই বিয়ের সব পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল এক জায়গায়।

হঠাৎ মারা গেলেন দিদিমা। তার বছর তিনেক বাদে আবার এক জায়গায় কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছিল, এমন সময় হঠাৎ উনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কেউ বলেছিল প্লুরিসি, কেউ টি-বি, কেউ বা ঐ রকমই একটা কিছু। বুকের পাশের দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতেন বড়মামা। কয়েক দিন ধরে নানা রকম পরীক্ষার পরে জানা গিয়েছিল— হাঁপানীর বীজাণু রয়েছে ওঁর রক্তে। মাসখানেকের মধ্যে অবশ্য সেরে গিয়েছিল ওঁর অসুখ।

সুনীলকুমার নাগ

এরপর বড়মামাই নাকি বলেছিলেন যে, বিয়ে করবেন তবে বোনের বিয়ের পরে। কিন্তু বোনের বিয়ে চুকে যাবার পরে বলেছিলেন যে, এখন নয়, এখন এম এ পড়বো। এম এ পরীক্ষার পরে বিয়ে। কিন্তু এম-এ পাশ করবার পরে বলে বসলেন বিয়েই করবেন না। আমার বাবাকে বড়মামা খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রধানত তাঁর পীড়াপীড়িতেই শেষ পর্যন্ত বড়মামা আবার রাজী হয়েছিলেন বিয়ে করতে। কিন্তু আমার বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে আবার বাধা পড়লো।

আমরা মামার বাড়ীতে এসে উঠবার পরেই মায়ের তাগিদে দাদামশাই আবার নতুন করে কনে দেখতে বেরোলেন। পর পর তিন-চারটি কনে দেখে আসবার পরে মাত্র দুদিনের জ্বরে দাদামশাই চলে গেলেন। ম্যানিনজাইটিশ হয়েছিল ওঁর।

দাদামশায় গত হবার পরে সংসারের যে চাপ এসে পড়লো বড়মামার ওপর, তাতে একদিকে যেমন বিয়ে করবার মতো সঙ্গতি ছিল না, অন্যদিকে তেমনি কুরসৎও রইলো না। ছোটমামা তখন স্কুলে পড়তেন, আর এদিকে আমরা তিনজন। বেতন সামান্য যা পেতেন তাতে চালাতে পারতেন না বলেই টিউশনীও আরম্ভ করেছিলেন সেই সঙ্গে। দেখতে দেখতে যৌবন ওঁর শেষ হয়ে গেলো। প্রৌঢ়ত্বেরও শেষ দশা।

তিনখানি মাত্র কোঠার ছোট একখানি বাড়ী। সামনের কোঠায় দাদামশায়ের মৃত্যুর পর থেকেই আমি আর বড়মামা থাকি। মধ্যের কোঠায় থাকেন ছোটমামা, আর পেছনের কোঠায় মা আর কেতকী।

সামনের কোঠার লাগোয়া রাস্তার দিকে বেশ উঁচু একটা রোয়াক ছিল। দূর থেকেই দেখলাম, মা দরজার একপাশে রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে আসবার পরে ভেতরে চলে গেলেন উনি।

বড়মামা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। আমার সঙ্গে সুরথ চৌধুরীকে দেখে উনি একবার উঠবার চেষ্টা করলেন বিছানার ওপর। কিন্তু পারলেন না।—কি সৌভাগ্য আমার সুরথদা', আপনার পায়ের ধুলো পড়লো আজ আমাদের বাড়ীতে।

বলতে বলতে বড়মামার গলা কেঁপে উঠলো।

—ব্যস্ত হবেন না নরেশবাবু, সুরথ চৌধুরী ওঁর স্বাভাবিক সরলতার সঙ্গে আমার পড়ার টেবিলের কাছ থেকে একখানা চেয়ার নিজেই টানতে টানতে বড়মামার বিছানার পাশটিতে এনে বসে বললেন, কেমন আছেন এখন, আগে বলুন শুনি।

—আমার নিজের তো ধারণা অসুখটা ক্রমশ বাড়ছে, বড়মামা থেমে থেমে বললেন, কিন্তু ডাক্তারবাবু আজও বলে গেছেন যে, দশ-বারো দিনের মধ্যে আবার চলেফিরে বেড়াতে

পারবো। কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আপনার তো কিছু বুঝবার দরকার নেই, পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটি ধরিয়ে গোটা দুই টান দিয়ে হালকাভাবে বললেন সুরথ চৌধুরী, বুঝবার যা তা বুঝবে এরা, হাত তুলে আমাকে দেখিয়ে বললেন, এমন পুত্রের অধিক ভাগনে রয়েছে আপনার, চিন্তা কি আপনার নরেশবাবু? হ্যাঁ, আগে সবাইকে চিনিয়ে দিন দেখি এক এক করে, নামে তো চিনি সবাইকে, চাক্ষুষ পরিচয়টাও দরকার।

কথাটা বলে মুহূর্তকাল থেমে বড়মামাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বেশ জোরেই হাঁক দিলেন সুরথ চৌধুরী,—পরেশ আছো নাকি ভেতরে, একবার এঘরে এসো বৌমাকে নিয়ে, বাসন্তী তুমিও এসো মেয়েকে নিয়ে।

এমনভাবে হাঁকটা দিলেন উনি যেন কতদিনের পরিচয়, কত আপনার জন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম ভেতরের দিকের দরজার সোজাসুজি। বড়মামার ইঙ্গিতে হাত নেড়ে মাকে আসতে বললাম এঘরে। একে একে মা, কেতকী, ছোটমামা, ছোটমামী সবাই আসবার পরে বড়মামা বললেন—এঁর কথা তোমরা সবাই জানো, ইনিই সুরথদা, শ্রীযুক্ত সুরথ চৌধুরী, দেশের জন্য দশের জন্য—উৎসর্গিত প্রাণ, মহৎ ব্যক্তি, আমার নমস্য, তোমরা সকলে এঁকে প্রণাম করো।

—আরে না না, প্রণাম করতে হবে না। তোমরা একটুক্ষণ থাকো আমার সামনে। এতো শুনি তোমাদের কথা, একবার তাই দেখবার ইচ্ছে হলো।

একে একে সকলে প্রণাম করলো সুরথ চৌধুরীকে। উনি প্রত্যেকের সঙ্গেই দু'একটা কথা বললেন। তারপর মাকে একটা মোড়া দেখিয়ে বসতে বললেন। অন্য সকলে ভেতরে চলে গেল। মা বসলেন। সুরথ চৌধুরী বললেন—আমার কাছে কোন সঙ্কোচ করো না বাসন্তী। আমিও তোমার এক দাদা। মেয়ে ত আমার একেবারেই ছেলেমানুষ। এতো অল্প বয়সে বিয়ে দেবার জন্য এতো ব্যস্ত হয়েছ কেন?

মা নিঃসঙ্কোচেই বললেন, আজ্ঞে আমি তো খুব ব্যস্ত হই নি, কিন্তু দাদা বলছেন বারবার, তাই।

—দাদা বলছেন? কিন্তু দাদা যে বলছেন মেয়ের বিয়ের তাগাদা করে করে নাকি তুমি ওঁর কানে পোকা ধরিয়ে দিচ্ছো? বলতে বলতে সুরথ চৌধুরী পর পর কয়েকবার কখনো মায়ের দিকে, কখনো বড়মামার দিকে তাকালেন। তারপর হো হো করে উঁচু গলায় বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, ঠিক বুঝতে পেরেছি। এ হচ্ছে ব্যাচেলরের তাড়াতাড়ি দাদু হবার সখ। ব্যাপার মন্দ নয়।

বড়মামা স্পষ্টতই একটু বিব্রতবোধ করছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, বুঝতেই তো পারেন সুরথদা, আজ কিছুদিন ধরেই শরীরটা একদম ভালো যাচ্ছে না। মানুষের জীবন ত, কখন কি হয় বলা যায় না। বাবার মৃত্যুশয্যায় ওদের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। একজনকে যা হোক খানিকটা লেখাপড়া শেখাতে পেরেছি। চাকরীও যা হোক করছে একটা। অশোকের বিয়ের জন্য আমি মোটেই ব্যস্ত নই। কিন্তু কেতকীর বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি দিতে চাই। আর আমার বিশ্বাস ওর বিয়েটা চুকে গেলে আমার এই প্রেসারের রোগটাও কমে যাবে। কারণ দুশ্চিন্তা ত আর কিছু থাকবে না।

—সে কথা মিথ্যে নয়, এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন সুরথ চৌধুরী, দায়িত্ববোধ যাঁদের থাকে, দায়িত্ব পুরোপুরি পালন না করা পর্যন্ত তাঁরা মানসিক শান্তি পেতে পারেন না, কথাটা ঠিকই। আমি কথা দিচ্ছি, আগামী একমাসের মধ্যে কেতকীর বিয়ের বন্দোবস্ত আমি করে দেবো। কিন্তু একটা কথা নরেশবাবু, ভাগনীর বিয়ের পরে আপনার প্রেসারটা যাও কমতে পারে। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তো তাই বলে। এখন কেবল ভাগনীর সম্বন্ধে ভাবছেন, বিয়ের পরে ভাগনী-জামাইয়ের সম্বন্ধেও ভাবতে হবে, তারপর তাদের ছেলেপুলেদের সম্বন্ধে—এইরকম আর কি। পৃথিবীতে আকর্ষণের বস্তু ক্রমশ বাড়তেই থাকে, কখনো কমে না।

এ কথার পরে মা উঠে যাচ্ছিলেন। সুরথ চৌধুরী বললেন, আর একটু বসে যাও বাসন্তী। পাত্রের বিষয় তোমারও কিছু শুনে রাখা দরকার।

মনে মনে একটু ভেবে নিয়ে বললেন সুরথ চৌধুরী, দেখ, তোমার জামাই হতে পারে—আমার জানাশোনার মধ্যে এরকম পাত্র অনেকেই আছে। তাদের মধ্যে কোটিপতি না হোক অন্তত পাঁচলাখপতি দশলাখপতির ছেলেও আছে দু'চারটে, কিন্তু মুস্কিলটা হয়েছে কি জানো, আজকালকার—দিনকাল, ছেলে হিসেবে, মানুষ হিসেবে যে তারা কে কি রকম হবে, তা সত্যি আমি কিছুই জানি না। কিন্তু একটা ছেলেকে আমি জানি, এক বিধবা মা ব্যতীত পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। বয়সে তোমার অশোকের মতোই হবে। বি-কম পাশ করে একটা মার্চেন্ট অফিসে কেরানীগিরি করছে। শ' আড়াই টাকা মাইনে পায়। তাই দিয়ে কোনরকমে চলে তাদের। ভাড়াবাড়ীতে থাকে। এই একটিমাত্র ছেলেকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে ছেলেবেলা থেকে জানি। এবং ছেলে হিসেবে, মানুষ হিসেবে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি।

ইতিমধ্যে ছোটমামী চা আর কিছু খাবার দিয়ে গেছেন সুরথ চৌধুরীর সামনে। উনি তা থেকে কিছু খাবার মুখে তুলে বারকয়েক চিবিয়ে নিয়ে বললেন, ছেলেটার মা প্রায়ই খবর পাঠায় আমাকে যাবার জন্য, তা আমি একদম সময় পাই না, কাজেই যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমার দেশের মেয়ে, মানে একগ্রামেই বাড়ী ছিল আমাদের। মাস কয়েক আগে সীতা বেজায় রেগে এক চিঠি দিয়ে জানিয়েছে আমাকে

যেতে হবে না। আমি যেন তার ছেলের জন্য একটি ভালো পরিবার থেকে পাত্রী যোগাড় করে দেই, তা হলেই সে বাধিত হবে। হা-হা-হা! বেজায় রেগে আছে আমার ওপর। যা হোক আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, তার ছেলের বিয়ের দায়িত্ব আমি নিলাম। মনোমত পাত্রী পেলেই খবর দেবো। ছেলেটির নাম কুশল। ওরা ঘোষ বংশ। দিন পনেরো আগে আমার বাসায় নরেশবাবুর সঙ্গে কুশলের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। ওঁর তো খুবই পছন্দ হয়েছে ছেলেটিকে। তোমার কি মত?

—এক দাদার পছন্দই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে দুই দাদার পছন্দের পরে আর আমার মতামতের জন্য অপেক্ষা করবেন না। মা বিনীতভাবে বললেন।

—বেশ, বেশ। খুশীতে ভরে উঠলো সুরথ চৌধুরীর মুখচোখ, খুব আনন্দ পেলাম তোমার কথা শুনে, ছেলে হিসেবে কুশল সত্যি খুব ভালো, ওরা সুখী হবে নিশ্চয়ই, এ তুমি দেখে নিও। আচ্ছা তুমি তা' হলে এসো।

মা ওঁকে আর একবার প্রণাম করে ভেতরে চলে গেলেন।

সুরথ চৌধুরী বললেন, তা' হলে নরেশবাবু, আর তো এ রকম শুয়ে আরাম করা চলছে না। ভাগনীর বিয়ে, এবার একটু মনে জোর করে তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন।

—এখন মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস অসুখটা একটু বেড়েছিল, রোগযন্ত্রণার মধ্যেও বড়মামার মুখচোখে একটা ছেলেমানুষী তৃপ্তির ছাপ লক্ষ্য করলাম, তা না হলে কি আর সুরথ চৌধুরীর পায়ের ধুলো পড়তো আমাদের বাড়ীতে। আজ কত বছর হয়ে গেল, বোধ হয় হাজারদিন অনুরোধ করেছি আসবার জন্য, আপনিও অন্তত একশো দিন আসবেন বলেছেন, কিন্তু আসেন নি।

—সবই ত জানেন নরেশবাবু, আমার কি আর কোথাও বেড়াতে যাবার সময় থাকে, না কি, আমার দ্বারা কোন সামাজিক কর্ম সম্ভব। কাজেই, ঠিক প্রয়োজনের সময় কোথাও গিয়ে উপস্থিত হতে পারলেই যথেষ্ট পারলাম মনে করি। ইদানীং এতো রকমারী কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি যে, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় সবদিকে যোগাযোগ রেখে উঠতে পারবো কি না। এই তো এই কেতকীর বিয়ে একি আমি আমার ঘাড়ে দায়িত্ব রাখবো মনে করেছেন, আমি যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিয়েই খালাস। অবশ্য, আমার দেখাই দেখা, তা' হলেও সীতা নিজেও দেখে যাবে, দরকার হয় কুশলও আসবে। আজ-কালের মধ্যেই মোহিতকে আমি ডেকে পাঠাবো ভাবছি।

তার পর একটু ভেবে নিয়ে, আমাকে বললেন, হ্যাঁ অশোক, তোমাদের কলেজের প্রফেসর মোহিত রায়ের বাড়ী চেনো ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি। আগে যেতাম মাঝে মধ্যে, ইদানীং বছরখানেক দেখা নেই।

—অবশ্য টেলিফোন করলেও চলে। তার চাইতে পরিচয় যখন আছে, তুমি নিজেই, কাল যে-কোনও সময়ে হোক একবার যেও মোহিতের বাড়ী। আমার নাম করে বলবে, যেন অবশ্য দেখা করে আমার সঙ্গে, সন্ধ্যার দিকেই আসতে পারলে ভালো। বড়মামার দিকে ফিরে বললেন, কুশলের বাসা মোহিতের বাড়ীর একদম লাগোয়া। এ বিয়ের ব্যাপারে আমার যা বলবার আমি মোহিতকে বলে দিলেই সীতা নিশ্চয়ই সেইমত কাজ করবে। মোহিত আমার বাল্যবন্ধু, আমাদের সব-একগ্রামেই বাড়ী ছিল। ও সীতাদের অনেকটা অভিভাবকের মতোই, কাজেই ওর সম্মতিরও একটা প্রয়োজন আছে।

—সে আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন, বড়মামা বললেন, দায়িত্ব যা, তা আপনার।

—অবশ্যই। দায়িত্ব পুরোপুরিই আমি নিলাম। সে জন্য আপনি কিছুমাত্র ভাববেন না। আপনি শুধু শীগগির করে সেরে উঠুন। হাজার হলেও ভাগ্নীর ঘরের বিয়ে, তার মেয়ের বিয়ে; অনেক যোগাড়-যন্তরের ব্যাপার আছে। অশোক তো একেবারেই ছেলেমানুষ আর পরেশও ছেলেমানুষ বললেই হয়। কাজেই আপনাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। তা' হলে আসি আজ?

—এখনি উঠবেন?

—হ্যাঁ ভাই, উঠি এখন, পকেট থেকে ওষুধের মোটা শিশিটা বের করে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বললেন, এই দেখছেন তো ওষুধ, একেবারে নিজের হাতে তৈরী, আমাশায় অব্যর্থ বললেই চলে। স্বাধীনতার অনেক আগে একবার ডেটিনিউ ছিলাম লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে। আমাশায় ভুগে ভুগে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন জেলের ডাক্তার ছিল একটি মাদ্রাজী ছেলে, ওরা যথাসাধ্য করে একটুও কমাতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে সময়ে, মানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাত-আট বছর আগে, আজকের মত এতসব ভালো ভালো এলোপ্যাথি ওষুধ তো আর পাওয়া যেত না, কাজেই বেচারা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল।

একবার ঠিক হয়েছিল যে, আমাকে হাসপাতালে পাঠাবে, কিন্তু আমিই তাতে আপত্তি করেছিলাম। কারণ, মনে হয়েছিল যে ওষুধপত্র জেলের ডাক্তার ছেলেটি দিচ্ছে হাসপাতালেও তাই দেবে। উপরন্তু একটা অচেনা ডাক্তারের হাতে হাঁপিয়ে উঠবো। অবস্থা যখন আমার একেবারেই সঙ্গীন তখন একদিন একজন বয়স্ক পাঞ্জাবী, ডাকাতির দায়ে ও জেল খাটছিল, আমার সেল সাফাই করতে এসে বলেছিল, বাবু সাহেব, অনেক কিছু ত করলেন, এবার গরীবের একটা টোটকা দাওয়াই খেয়ে দেখুন, সাতদিনে ভালো হয়ে যাবেন।

বললাম ডাক্তারকে ডাকাতের কথাটা। সে শুনে বলেছিল যে একবার পরখ করে দেখা যেতে পারে, কারণ উপকার কিছু না হলেও

ক্ষতি কিছু হবে না ওর টোটকাতে। কয়েকটা সাধারণ গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরী ওষুধ। তার মধ্যে প্রধান হলো পেয়ারা পাতা আর আদা পোড়া। তাতেই আমার আমাশয় সেরে গিয়েছিল। বিয়াল্লিশ সালে যখন হিজলীতে ছিলাম, তখন অনেক ডেটিনিউকে আমি এই টোটকা দিয়ে আমাশার হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

আমাদের সেবা সমিতির চিন্তাহরণকে দেখেছেন ত, ও ছিল হিজলীতে, কাজেই এই টোটকাটার কথা জানে। ক'দিন ধরে বেজায় আমাশায় ভুগছে। খবর পাঠিয়েছে কাল আমার ওষুধের জন্য। আজ সারা বিকেল বসে বানিয়েছি। এখন যাবার পথে ওকে দিয়ে যাবো। আচ্ছা তা' হলে উঠি এখন নরেশবাবু। আপনি বিশ্রাম করুন।

সুরথ চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে বেরোবার মুখে আমাকে বললেন, তা' হলে অশোক, মোহিতকে খবর দেবার দায়িত্ব তুমি নিচ্ছ। আর তা' ছাড়া কাল সন্ধ্যার দিকে তুমি ত আমার বাসায় আসছই।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তার পর ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে। উনি বাসে উঠবার পরে আমি বাড়ীর দিকে ফিরলাম।

॥ চার ॥

বড়মামা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, বিশেষ করে সেই জন্যেই আমিও লাইটটা অফ করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না। সুরথ চৌধুরীর চিন্তাটা আমাকে রীতিমত পেয়ে বসেছে। দুপুরের পর বড়মামা যখন ওঁর বাসার নির্দেশ দিচ্ছেলেন তখন অবশ্য বারবারই বলেছিলেন—ওঁকে কিন্তু একজন ঘটক মনে করো না। আমার বন্ধুস্থানীয় তো বটেই, হয়ত তার চাইতেও অনেক বেশী। সারাটা জীবন পরের উপকার করে কাটিয়েছেন, অতি মহৎ ব্যক্তি—কোনো চাল-চুল নেই। নেহাৎ সাধারণভাবেই থাকেন।

কথাগুলি আমার কানে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছেছিল যে, বড়মামা সুরথ চৌধুরীর সম্বন্ধে আমার মনে একটা বড় ধারণা সৃষ্টি করতে চাইছিলেন, যাতে আমি ওঁকে খানিকটা তোয়াজ করি। নিজের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বহুবার টানা-পোড়েন করে এ-জাতীয় প্রশ্নে ওঁর একটা অহেতুক ভীতি জন্মেছে যা অতিমাত্রায় সতর্ক করে তুলেছে—এইটেই আমি ধরে নিয়েছিলাম।

এবার কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছিল যে, বড়মামা প্রকৃতই সুরথ চৌধুরী সম্বন্ধে খুব সামান্যই বলেছেন আমাকে। উনি নিজে কতটুকু জানেন তা'ও অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তবে ওঁদের পরিচয় যে মাত্র দশ-বারো বছরের তা বড়মামার মুখেই শুনেছি। কয়েক ঘণ্টা আগে যদিও ব্যক্তিগতভাবে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু ওঁর অন্তরের স্পর্শটুকু দু'চারটি কথাবার্তার মধ্য থেকে যা আমি লাভ করেছি, তার প্রভাবে ওঁর প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করছিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার পর সুরথ চৌধুরীর বাসায় যাবার কথা আছে। তাই টিফিনের একটু পরেই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অধ্যাপক মোহিত রায়ের বাড়ীর উদ্দেশে।

অধ্যাপক রায় অনেকদিন পরে আমাকে পেয়ে খুব খুশী হলেন। সাদরে বসতে দিয়ে কুশল-প্রশ্নাদি করলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন এমনি বেড়াতে এসেছি। আগে আগে যেমন প্রায়ই আসতাম। তাই বললাম, একটা জরুরী প্রয়োজনে এসেছি স্যার।

—জরুরী প্রয়োজন? আমার কাছে? কি ব্যাপার বলতো?

সুরথ চৌধুরী নামটা উচ্চারণ করতেই হকচকিয়ে উঠলেন অধ্যাপক রায়—সুরথ, সুরথ চৌধুরী, মানে আমাদের সুরথ, ওকি তোমার পরিচিত? কই কখনো বলোনি ত আগে?

—আজ্ঞে, আমার সঙ্গে পরিচয় মাত্র গতকালই হয়েছে। তবে শুনেছি আমার বড়মামার সঙ্গে পরিচয় অনেকদিনের।

—বেশ, খুব ভালো কথা। শুনে খুব খুশী হলাম যে, তোমার বড় মামা সুরথের বন্ধু। একদিন তাহলে আমার সঙ্গেও পরিচয় হবে নিশ্চয়ই। সুরথ আমার বাল্যবন্ধু। একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়ী ছিল আমাদের। আজ ষাট বছরে বহু বিষয়ে অসংখ্যবার আমাদের মতান্তর হয়েছে, কিন্তু কখনো মনান্তর ঘটে নি। গোটা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই বলছি অশোক, সুরথের মতো মহৎ ব্যক্তি আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন—পৃথিবীর কোনো দেশেই কখনো খুব বেশী জন্মায় নি। সুরথ যে আমার বন্ধু, এ জন্যে সত্যি আমার বড়ো গর্ব। কী ব্যাপার বলো ত? হঠাৎ আমার কাছে তোমায় পাঠালো সুরথ? খুব জরুরী কিছু ব্যাপার না হলে তো আমার কখনো ডাক পড়ে না?

—আজ্ঞে একটা প্রয়োজনের কথা আমি জানি, তার সঙ্গে আমার স্বার্থও জড়িত আছে। কিন্তু তা ছাড়া অন্য কিছু প্রয়োজনও আছে কি না আমার ঠিক জানা নেই।

—বেশ ত কি সেই একটা বিষয়—যার সঙ্গে তোমারও স্বার্থ জড়িত আছে, সেইটেই শুনি না?

—আমার বোনের বিয়ের চেষ্টা করছেন উনি। কুশল নামে নাকি একটি পাত্র আছে আপনাদের পরিচিত।

—আই সি। বুঝতে পেরেছি। ঠিক হয়েছে। ভালোই হয়েছে। আমরা ঠিক এইরকমই খুঁজছিলাম। মানে একটু জানাশোনার মধ্যে আর কি। সীতা, মানে কুশলের মা, এই পরশুদিনও এসেছিল। আমাদের ছোট বোনের মত। আমরা এক গ্রামেরই লোক কি না। তা তোমরা ক' ভাই বোন?

—আমি আর আমার ঐ একটি বোন।

—পড়াশোনা কতদূর করেছে?

—পড়ছে। এই থার্ড ইয়ার।

—তুমি কি এখনই কুশলের মায়ের

সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে যেতে চাইছো?

—আজ্ঞে উনি সে রকম কিছু বলে দেন নি আমাকে। তা'ছাড়া বাড়ীতে বড়রা আছেন।

—ঠিক বটে। আমার একদম খেয়াল ছিল না। ঠিক আছে। আমি আজই দেখা করে আসবো'খন সুরথের সঙ্গে। বেলাটা আর একটু পড়লেই বেরিয়ে পড়বো।

॥ পাঁচ ॥

বাড়ীতে এসে বললাম সব কথা।

সন্ধ্যার দিকে আজ একবার সুরথ চৌধুরীর বাসায় যাবার কথা আছে সে কথাও বললাম বড়মামাকে।

বড়মামা বললেন—দেখ, সুরথদাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। নির্মল চরিত্রের আদর্শবাদী মানুষ। কিন্তু ওঁর এমন কিছু কিছু ধারণা আছে, বিশ্বাস আছে, যা' অন্তত আমি বুঝে উঠতে পারি না। যেমন ধর এই যে আমাদের দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেছে এটা উনি কিছুতেই মানতে পারেন না। এই টুকরো দুটো যাতে জোড়া লেগে আবার আগের মত হয়ে যায় সে জন্যে উনি অহোরাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন আজ বিশ বছর ধরে। কিন্তু উনি এ সম্পর্কে ঠিক কাজ বলতে যা করে থাকেন তা আদৌ রাজনৈতিক ধরণের নয়, বরং সামাজিক ধরণের, মানবতাপন্থী। এভাবে কত দিনে দুই ভারত এক হবে তা' অন্তত আমার বুদ্ধি দিয়ে শত চেষ্টা করেও আমি বুঝতে পারিনি। অনেকে ওঁকে পাগল মনে করে। কিন্তু আমি তা' করি না। বাস্তবিক পক্ষে পাগল বলতে যা বোঝায় উনি তা ননও। ওঁর কিছু কিছু ধারণা এবং বিশ্বাস আছে যা অনেকের কাছেই খুব বিচিত্র মনে হবে। আমিও যে তা সব—অন্তত যেটুকু জেনেছি, সব যে বুঝে উঠতে পেরেছি তা' বলছি না। তুই বরং তোর নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে ওঁকে বুঝবার চেষ্টা করে দেখতে পারিস।

একটু ভেবে নিয়ে বড়মামা আবার বললেন, বিস্তর বড় বড় লোক, প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এ রকম বহু লোকের সঙ্গেই সুরথদার পরিচয় আছে সেটুকু আমি জেনেছি, তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ও আমি একাধিকবারই পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই সুরথদার কিছু কাজ করে দেবার জন্য প্রচুর আগ্রহও আমি দেখেছি; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উনি যতোটা সম্ভব ঐ সমস্ত বড় বড় লোকদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেন।

আমি বললাম, ওঁর বাসা দেখে তো মনে হলো একাই থাকেন, ওঁর নিজের বলতে কি কেউই নেই?

—ঠিক আত্মীয় কুটুম্ব বলতে যা বোঝায় সে রকম কাউকে কখনো গত দশ-বারো বছর দেখিনি। তবে অনাত্মীয় কিন্তু প্রকৃত আপনার জন ওঁর অনেকেই আছে। দু'চার দিন গেলেই দেখতে পাবি তাঁদের অনেককে। নিরক্ষর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ঠেলা-ওয়ালা, ঘুঁটে-ওয়ালা থেকে সুরু করে দু'চারখানা গাড়ী-বাড়ীর মালিক, সকলেই সুরথদা'র কাছে মানুষ মাত্র। তার বেশি বা কম কিছু নয়।

বড়মামার এই সমস্ত কথাবার্তা সুরথ চৌধুরী সম্বন্ধে আমার মনকে রীতিমত একটা নাড়া দিল।

॥ ছয় ॥

কথায় বলে নতুন পথ দূর মনে হয়। কথাটা সত্যি। গতকাল সুরথ চৌধুরীর বাসায় আসতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আজ কিন্তু মনে হলো বাস থেকে নেমে বাসাটা খুব দূর নয়।

ঘরের ভেতর বেশ কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠস্বর একটা গণ্ডগোলের মতোই লাগছিল আমার কানে। তারই মধ্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের হট্টগোলের ভাবটা খানিকটা কমে গেল।

সুরথ চৌধুরী আগ্রহভরে বলে উঠলেন, আরে অশোক, এসো এসো, ভেতরে এসো। খুব সময়মত এসেছ তো'। এসো তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই।

আমি ভেতরে ঢুকে তক্তপোশের এককোণায় একটু জড়োসড়ো ভাবেই বসলাম।

আমার পিঠের ওপর একবার নিজের একখানা হাত বুলিয়ে নিয়ে সুরথ চৌধুরী বললেন, এটি হলো আমার এক ভাগ্নে শ্রীঅশোক মিত্র, গতবার বি-এ পাশ করেছে, অতিশয় সৎ ছেলে। অশোককে আমাদের মধ্যে পাবার জন্যে আমার ইচ্ছে এবং আগ্রহ খুবই। কিছুই ওকে বলা হয়নি। আপনারা সবাই সুবিধেমত ওকে আমাদের পথ ও মত সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। আপাতত আমাদের সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে সমিতির তরফ থেকে আমি ওকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি।

তারপর আমাকে বললেন, অশোক, আসবে কিন্তু অবশ্যই। ১৫ই আগস্ট আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস। কোন আড়ম্বরের বালাই নেই। আমরা সবাই যেমন গরীব, আমাদের অনুষ্ঠানও হয় একান্ত গরীবানার সঙ্গেই। এই মাঠটার মধ্যেই কষ্টেসৃষ্টে একটা ত্রিপল আর খানকতক সতরঞ্চি জোগাড় করে আনা হয়। আর আলো আনি আশপাশের কোন একটা বাড়ী থেকে। এস, এবার একে একে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই।—এই হলো বিরাজ। কাল ওকে দেখেছ রাস্তায়। বিরাজ অধ্যাপনা করে। আমাদের নাইট স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। পাণ্ডিত্যের বিচার করবার বা পাণ্ডিত্য বোঝবার যোগ্যতা আমাদের কারোরই নেই। তবে পণ্ডিত হিসেবে নামধাম আছে, কলকাতার এরকম অনেক বয়স্ক বন্ধু-বান্ধবেরাই বিরাজের লেখাপড়া জ্ঞানের প্রশংসা করে। অখণ্ড ভারত সেবা সমিতির বলতে গেলে ওর প্রাণ, নামে যদিও শুধুই সেক্রেটারী। আইডিয়াটা আমার ছিল বটে, কিন্তু বিরাজকে না পেলে সবকিছু লিখেপড়ে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরা যেত না কোনদিনই। আইনত, মুখে যতই বলি না কেন, কি ইংরেজি আর কি বাংলা, দু'টি বাক্য

শুধু করে দেখবার যোগ্যতাও আমার নেই।

—কি যে বলেন। বিরাজবাবু সঙ্কোচে মাথা নোয়ালেন।

—সবই সত্যিকথা বলছি বিরাজ। বিরাজ বয়সে তোমার চাইতে কয়েক বছরের বড়ো হবে অশোক, ওকে তুমি দাদা ডেকো। এর নাম নিধিরাম ঘোষ ঘোর কালো রঙের মোটাসোটা এবং বেশ লম্বা গড়নের একটি ভদ্রলোককে দেখিয়ে সুরথ চৌধুরী বললেন, তবে নিধু গয়লা বলেই বেশি পরিচিত। নিধু হলো অখণ্ড ভারত সেবা সমিতির কোষাধ্যক্ষ। তবে তহবিল আমাদের প্রায় সময়ই শূন্য থাকে, কাজেই তা' সামলাবার জন্য কোন ঝক্কি বড়ো একটা নিতে হয় না ওকে। বরং আমাদের হঠাৎ টাকাকড়ির দরকার হয়ে পড়লে ও-ই তা চালায়। ফাণ্ডে কালেকশন কিছু জমা হলেঃ অবশ্য আমরা আবার ওকে কিছু কিছু দিয়ে দেই, তবে ধার আমাদের সব সময়ই কিছু না কিছু থাকে। এইত সেদিন রহিম জানালো ওর বোনের বাড়ীর গ্রামে দশ-বারোটি ছেলে টাকার অভাবে বইপত্র কিনতে পারছে না, পড়াশোনা বন্ধ, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মিটিং করে ঠিক করলাম এখুনি পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করে পাঠাবো। এদিকে কলকাতায় তখন পরপর ক'দিন ধরে এমন বৃষ্টি যে বাড়ী থেকে বের হওয়া যায় না। তখন নিধু একাই দিয়েছিল টাকাটা। নিধুর কাছে সমিতির দেনা এখন বোধ হয় চার শ' টাকার ওপর। নিধুর চেহারাটাই ওই রকম ভয়ঙ্কর। আসলে ওর মনটা বড়ো নরম। ওর চরিত্রে জীবে দয়াই হলো সবচাইতে বড়ো গুণ। ওই যে ঐ খাটালটা দেখছো, ওখানে আছে আটটি মোষ, চারটি গরু আর এদিকে এই আমি এই তেরোটি জীবের জন্য দিবারাত্র ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

—সুরথদা কি চান আমি চলে যাই? নিধু গোয়ালা কপট ক্রোধের সঙ্গে কথাটা বলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

—আরে ভালো হোক আর মন্দ হোক, সত্যিকথায় কখনো চটতে নেই, বস বস। সুরথ চৌধুরী নিধু গোয়ালার দু' কাঁধের ওপর চাপ দিয়ে ওকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমিই বলো অশোক, এই যে উনিশ বছর হতে চলল ওর এই ঘরখানা দখল করে আছি, একটি পয়সা কখনো ভাড়া বলে দিতে পারিনি তার ওপর আবার রয়েছে আমার হাজারো রকমের খেয়াল। যার কোনটাই নিধু ছাড়া মেটানো চলতো না। আজকের দিনে নেহাৎ জীবে দয়া না থাকলে কেউ আমার মতো আহাম্মকের পেছনে পয়সা খরচ করে। পঁয়তিল্লিশ সালে যখন আমরা জেল থেকে ছাড়া পেলাম, এক-সঙ্গে আমাদের ষোলজন রাজবন্দীকে ঐ পার্কটাতে একটা সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানের পর যে যার চলে গেল। আমিই শুধু ভাবছিলাম কোথায় যাই। কলকাতায় কোনদিনই আমার কোন নির্দিষ্ট আস্তানা ছিল না। কখনো থাকতাম কোনো পার্টি অফিসে কখনো বা কোন বন্ধুবান্ধবের বাসায়। একচল্লিশ সালে কয়েকমাসের জন্য যখন জেলের বাইরে ছিলাম, তখনই দেখেছি পর পর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বিয়ে-থা করে নন-পলিটিক্যাল হয়ে গেলো। এবারে আবার তাদের কাছে গেলে হয়ত নেহাৎ আপদ মনে করে বসবে। তাই ভাবছিলাম পূর্ববঙ্গে আমার গ্রামেই ফিরে যাবো না কি। এদিকে মিটিং-এর ভিড় ক্রমশ পতলা হচ্ছিল। দেখছিলাম নিধু ক্রমশ আমার কাছে এগিয়ে আসছিল। শুনলাম ঐ সম্বর্ধনার উদ্যোক্তাদের একজন হলো নিধু।

ও বলেছিল, কোথায় যাবেন আপনি? আমরা ট্যাক্সী এনেছি, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি বলেছিলাম কোথায় যে যাবো তাতো ভাল ঠিক করে উঠতে পারছি না আপাতত। ভাবছি দু' একদিন একটা হোটেলে-টোটেলে থেকে তারপর দেশেই চলে যাবো।

নিধু বলেছিল, বেশত দেশে না হয় যাবেন। তা আপাতত দু' একদিন হোটেলে না গিয়ে আপনি আমার বাড়ী-তেই চলুন না। অবশ্য আমি একজন সাধারণ গেরস্ত, আপনার খুবই কষ্ট হবে।

অতীতের কিছু কথা মনে এসে যেতে সুরথ চৌধুরী ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, বুঝলে অশোক সেই যে চেপেছি নিধুর কাঁধে অনেক চেষ্টা করেও আর নামতে পারলাম না। দেশের জন্য নিধু যা করছে তার জন্য ষোল আনা কৃতিত্বই নিধুর নিজের, একথা মনে রেখো। আমি বলতে গেলে ওর জন্য কিছুই করতে পারিনি। দেশপ্রেমের একটা শিখা ওর মধ্যে বরাবরই ছিল, যেমন দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেই আছে। আমি বড় জোর সেই পলতেটাকে একটু উসকে দিয়েছি মাত্র। তার বেশি আর কিছুই নয়। নিধু আমাদের নাইট স্কুলেও পড়ায়। অঙ্ক করায়। আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করলে ক্রমে বুঝতে পারবে এই বিশ্রী চেহারার মানুষটির ভেতরটা কী সুশ্রী।

—এঁকে প্রণাম করো অশোক, পলিতকেশ এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন সুরথ চৌধুরী, ইনি হলেন আমাদের শিবুখুড়ো, শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য।

আমি এদিকে এসে শিবুখুড়োকে, প্রণাম করলাম। উনি স্নেহভরে আমাকে আশীর্বাদ করে কী একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন।

সুরথ চৌধুরী বললেন, এটা সত্যি পাবলিসিটির যুগ। পাবলিসিটির অভাবে যে মহাজ্ঞানী মহাগুণী মানুষও অজ্ঞাত থেকে যান তার প্রমাণ এই শিবুখুড়ো অবশ্য তাতে এঁদের কোনই ক্ষতি হয় না। কারণ চিন্তার যে রাজ্যে এঁরা বাস করেন সেখানে পাবলিসিটির ঢাকের বাড়ি সচরাচর পৌঁছয় না। এঁদের প্রকৃত রূপ না জানার ফলে ক্ষতি যা তা শুধু সাধারণ মানুষের না জানার জন্য যাঁরা এঁদের জ্ঞান ও গুণের কোন ফলই নিতে পারে না। আমরা অনেক দিক দিয়ে ভাগ্যহীন, বুঝলে অশোক, ভাগ্যহীন বললেও বেশি বলা হয়, কারণ—ভাগ্য আমাদের কোন কালেই ছিল না। বরং বলব আমরা অভাগা।

কিন্তু এখানেই এক্স্যা: [illegible] [illegible] ব্যবস্থা এর শিবুখুড়োর জন্য চালিয়ে যেতে পেরেছি।। আমাদের স্কুলের বাংলা আর সংস্কৃত এই দুটো বিষয়ের দায়িত্ব শিবুখুড়োর ওপর। অনেক কিছুই আমাদের স্কুলে পড়াবার চেষ্টা করা হয়, তবে বুঝতেই পারছো তার মধ্যে বাংলাটাই প্রধান। বাংলার শুধু ব্যাকরণের দিকটাই নয় — আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, সমস্ত পুরাণ, বেদ এবং উপনিষদগুলি শিবুখুড়োর কণ্ঠস্থ বলেই পড়ুয়ারা কার্যত অক্ষর পরিচয়ের আগেই কয়েকশ' গল্প শিখে ফেলে। আর বাস্তবিক পক্ষে এ গল্পের আকর্ষণ, সৃষ্টি না করতে পারলে নেহাৎ লেখাপড়া শেখবার আগ্রহে যে ক'জনকে পেতাম আমরা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চিন্তা করো অশোক, একেবারেই অক্ষর জ্ঞানহীন তিনটি সন্তানের বাপ পঁয়তাল্লিশ বছরের এক মাছের দোকানী, কিছু কিছু নেশা-ভাঙের বদভ্যাসও আছে। এ হেন পড়ুয়াও নিয়মিত এসে স্কুলের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে রোজ বসে, সে আসে ঐ গল্পের আকর্ষণে। ক্রমে ঐ গল্প এবং আরো অনেক নতুন নতুন গল্প নিজে পড়ে জানবার জন্য একটা ইচ্ছে জাগে মনে। এইভাবে কিছুদিন কাটাতে পারলে প্রত্যেক পড়ুয়ারই একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুল আসবার জন্য। আমরা না জেনে পঞ্চতন্ত্রের স্রষ্টার এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করে পরে বুঝতে পারি, বিষ্ণুশর্মা প্রকৃতই কতো বড়ো শিক্ষক এবং মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন। হ্যাঁ, গোটা পঞ্চতন্ত্রের গল্পও শোনান হয় আমাদের স্কুলে এবং তা শোনান ঐ শিবুখুড়ো।

—এঁর নাম মণি বিশ্বাস, তবে মণ্টার জ্যেঠা বললেই লোকে সহজে চেনে, মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন সুরথ চৌধুরী, ময়মনসিংহ জেলায় বিরাট অবস্থা ছিল ওঁর। নায়েব গোমস্তা মিলে আট-দশজন কর্মচারী খাটতো ওঁদের কাছারীতে, আর এখন কিনা তোমাদের কংগ্রেসের কৃপায় ও নিজে তিন চারটে দোকানে খাতা লেখার কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। মণি আমাদের স্কুলে ইংরেজী ত' পড়ায়ই তাছাড়া প্রাচীন ইতিহাস এবং ভূগোলটাও পড়ায়। মণির বড়ো মেয়ে সুজাতা গতবার বি-এ পাশ করেছে। মণি উঠেপড়ে লেগেছিল মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য কিন্তু বেচারার পড়াশোনার খুব ইচ্ছে তাই আমাদের সেবাসমিতি ওর ভার নিয়েছে— ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে সুজাতাকে, তার সমস্ত খরচ আমাদের। আমরা সুজাতাকে বলেছিলাম আমাদের স্কুলে কিছু একটা সাবজেক্ট পড়াতে। তা—সে মেয়ে বলে কিনা বাবা-কাকার বয়সীদের পড়াতে লজ্জা করে। বলে, সুরথ চৌধুরী বেশ খানিকটা হাসলেন।

তারপর বললেন—আমি নিজে পড়াই ইতিহাস। আধুনিক ইতিহাস। বাংলা তথা ভারতের যেমন, বাইরেরও যতোটা সম্ভব চেষ্টা করি। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ভারতের ইতিহাসের বেশির ভাগটাই আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে বাইরের ইতিহাসও কিছু কিছু বুঝবার চেষ্টা করেছি। এ সমস্তই মুখে মুখে গল্পের মতো করে পড়াই আমি। এই ক'বছর ধরে বয়স্কের স্কুল চালাবার ফলে আমাদের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, অঙ্ক, ভূগোল এবং ইতিহাসের কয়েকখানা টেকসট বই আমরা হাতে লিখে তৈরী করেছি। বুঝতেই পারছো, লেখার ব্যাপার যখন, তার প্রধান কৃতিত্ব বিরাজের, তবু শিবুখুড়োও খেটেছেন খুব। টাকা-পয়সার যোগাড় হলে আর একটা কাজও আমাদের করবার ইচ্ছে আছে। তা' হলো ঐ সুজাতাকে দিয়ে বয়স্কা নিরক্ষর মেয়েদের একটা স্কুল আরম্ভ করা। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় অশোক যে আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা মুখে মেজায় মাতৃ-ভক্ত।। পশ্চিমে দেশকে বলে ফাদারল্যাণ্ড আমরা বলি মাদারল্যাণ্ড। ভারতবাসীর রীতিমত মূর্তি গড়ে পুজো আচ্চা করবার রেওয়াজও দেখা যায় অনেক জায়গায়ই। কিন্তু আসলে, মনে মনে আমরা মাকে এতই অবজ্ঞা করি যে মায়ের জাতির বেশির ভাগই যে অন্ধকারের জন্যে অন্ধকারে জীবনটাকে শেষ করে দিয়ে যায় তা' আমরা একবারও তলিয়ে দেখি না। আমরা নিজেরাও কেমন অধিকাংশ ছেলেরা জানি না যে মনুষ্য জীবনের বিশেষত্ব কি, কি এর মহত্ত্ব ঠিক তেমনি আমাদের দেশের মেয়েরাও গোটা জীবন শেষ করার মুখেও একবার বোধ করতে পারে না যে একটা দুর্লভ সৌভাগ্য-মানবজীবন সে যাপন করে গেলো। এর একটা বিহিত করা দরকার অশোক। এর একটা ব্যতিক্রম হওয়া প্রয়োজন। কোন এক পণ্ডিত বলে গিয়েছিলেন যে দেশের মেয়েরা না জাগলে দেশ জাগতে পারে না। কথাটা অতি সত্যি, অশোক। অত্যন্ত মূল্যবান কথা। এই তো দেখো না আমাদের বয়স্ক নিরক্ষরদের স্কুলের যারা পড়ুয়া—কুড়ি থেকে পঞ্চাশ অবধি যাদের বয়স—যাদের আজ এই অবেলায় আমরা জাগাবার চেষ্টা করছি, এদের মায়েরা যদি শিক্ষিতা হতেন তাহলে ত' এরা অনেক আগেই জেগে দেশের এবং দশের কাজে লাগতে পারতেন। মায়ের কোলে বসে শিশু যা শেখে, তার সঙ্গে তুলনায়, তার সমকক্ষ শিক্ষার আর কোনো পদ্ধতি নেই জেনো।

কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম সুরথ চৌধুরীর মুখেচোখে এমন একটা আবেগ বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো যা এর আগে আর দেখিনি। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে নিজেকে সংযত করে নিচ্ছিলেন উনি। বোধ হয় একবারে অনেক কথাই মনে এসে যাচ্ছিল, তার থেকে কিছু কিছু ছাঁটকাট করে বলছিলেন। বললেন—দেখো, আমাদের দেশে আজকের দিনে মেলাই বড়ো বড়ো কলেজ ইউনিভার্সিটি আছে। সে-সব কলেজ, আর ইউনিভার্সিটিতে দেশ-বিখ্যাত, চাই কি বিশ্ববিখ্যাত অনেক প্রফেসরও রয়েছেন। এই সব ইউনিভার্সিটিতে এইরকম সমস্ত প্রফেসরের কাছে পড়াশুনো করে বি-এ এম-এ

লাভ করেছে। এরকম হাজার হাজার ছেলেও আজকার দিনে বেকার। দেশের এবং কালের যখন এহেন অবস্থা, তখন আমাদের এই স্কুলে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখে সেই বিদ্যার জোরে যে কেউ অন্নসংস্থান করতে পারবে একথা মনে করবার মতো অর্বাচীন আমরা সত্যি নই। সে স্পর্ধাও সত্যি আমরা রাখি না। আমরা শুধু চাই আমাদের পড়ুয়াদের মধ্যে একটা মনুষ্যত্ববোধ জাগাতে। বুঝতেই পারছো, এজন্য পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে অন্তরের সুপ্ত শক্তির পরিচালনাই বেশি প্রয়োজন যেমন শিক্ষকের তেমনি পড়ুয়ার। উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে যদি শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তা' হলে পড়ুয়াদের বিভ্রান্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। এসো না আমাদের মধ্যে। যেদিনই সন্ধ্যার পর যেটুকু সময় পাবে একটু-আধটু পড়িয়ে যাবে। আসবে আমাদের মধ্যে?

-আমি ত' নিজেকে আপনাদের একজন বলেই মনে করি। নিজের কথাটা কানে যেতে নিজেই চমকে উঠলাম। এইটেই কি আমার অন্তরের কথা? হ্যাঁ এটা যথার্থই অন্তরের কথা। তাই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, চেষ্টা নেই, নির্দ্বিধায় স্পষ্টভাবে নিজে নিজেই প্রকাশিত হলো।

সুরথ চৌধুরী আমাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিতভাবে বলতে লাগলেন, আমি জানতাম তুমি একথা বলবে। তোমার কথা অনেক শুনেছি নরেশবাবুর মুখে, তারপর চোখে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল তুমি আমাদেরই একজন। মানুষকে তুমি নিছক মানষ বলেই ভালবাসতে পারবে।

তারপর বিরাজবাবুকে বললেন, বিরাজ, অশোককে আমাদের অখণ্ড ভারত সেবাসমিতির প্রতিজ্ঞাগুলি একটু সংক্ষেপে আজই শুনিয়ে দেবে নাকি?

-বেশ ত, আমি এক্ষুণি বলছি। বিরাজবাবু গোল করে পাকানো প্রুফের কাগজগুলি আধাআধি খুলে আবার জড়িয়ে রেখে বললেন, মুখেই বলছি:

'আমি বিশ্বাস করি যে আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ অবিভাজ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ক্ষমতালোভী ভারতীয় রাজনীতিকদের সহায়তায় ভারতবর্ষ যে আজ দ্বিধাবিভক্ত, এটা ঘোরতর অন্যায়।

আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের দুই অংশে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে তারা সবাই আমার কাছে সমান, আমার একই দেশের অধিবাসী। তাদের প্রত্যেকের দুঃখে আমি দুঃখ বোধ করি, প্রত্যেকের সুখে আমি সুখী। তাদের প্রত্যেকের ইষ্টসাধন করা আমার কর্তব্য।

আমি বিশ্বাস করি যে খণ্ডিত ভারতবর্ষকে পুনরায় যুক্ত না করা পর্যন্ত আপামর ভারতবাসীর প্রকৃত মঙ্গল এবং মুক্তির পথ উন্মুক্ত হবে না। স্বাধীন অখণ্ড ভারত গঠনের এই পবিত্র উদ্দেশ্যে আমি সাধ্যমত ত্যাগ স্বীকার করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবো।—মোটামুটি এই।

প্রতিজ্ঞা ক'টি বেশ উঁচু গলায় বলে বিরাজবাবু আবার বসলেন।

কথাটা শুনছিলাম সকলের উৎসুক দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ। বললাম, আমি এর প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করি

—করো? আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সুরথ চৌধুরী, অভাগিনী ভারত মায়ের কপাল একদিন ফিরবেই ফিরবে এ তোমরা তোমাদের জীবনেই দেখে যেতে পারবে, অশোক, আমরা হয়ত নাও পারতে পারি। তাতে দুঃখ নেই। যে কোনো সাফল্যের জন্যে অশেষ ত্যাগবরণ করতে হয়, তবে না হয়। কি করেছি আমরা মায়ের জন্য? ভাবো ত' একবার। তিন কোটি মানুষের দেশ আলজেরিয়া স্বাধীন হবার জন্য দশলক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। ষোলো কোটি মানুষের দেশ সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দু'কোটি মানুষ প্রাণ দিয়েছিলো। সে তুলনায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্যে কোন আন্দোলনই হয় নি। তাই প্রকৃত স্বাধীনতাও আসে নি। নেতাজী আহ্বান জানিয়েছিলেন, আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। যথেষ্ট রক্ত সত্যি আমরা দেই নি, তাই প্রকৃত স্বাধীনতাও পাই নি। যা হয়েছে তা যেন দুই গোঁয়ার সরিকের পৈতৃক বাগান ভাগ করবার মতো অবস্থা। আর কি। হঠাৎ বাগানের মধ্য দিয়ে একটা বেড়া পড়ে গেলো। একদিকে পড়লো একটা গাছের গুঁড়ি আর একদিকে তার ডালপালা। এটা কখনোই গাছের স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে না। এ অবস্থায় গাছ বাঁচতে পারে না। শিকড়ের মালিক যেমন শিকড় কাটছে, ডালপালার মালিক তেমনি ডালপালা কাটছে। এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ অবস্থা। ঠিক যেমন এদিকে আমাদের আর ওদিকে পাকিস্তানে ওদের অবস্থা। একটা দেশকে ভেঙে কৃত্রিম উপায়ে দুটো দেশ করা হয়েছে। দুটো রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন লোকদের কারোরই সাধারণ মানুষের জন্যে কিছুমাত্র দরদ নেই জেনো। আর দরদ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। যেমন গাছও পারে না।

। ক্রমশ।
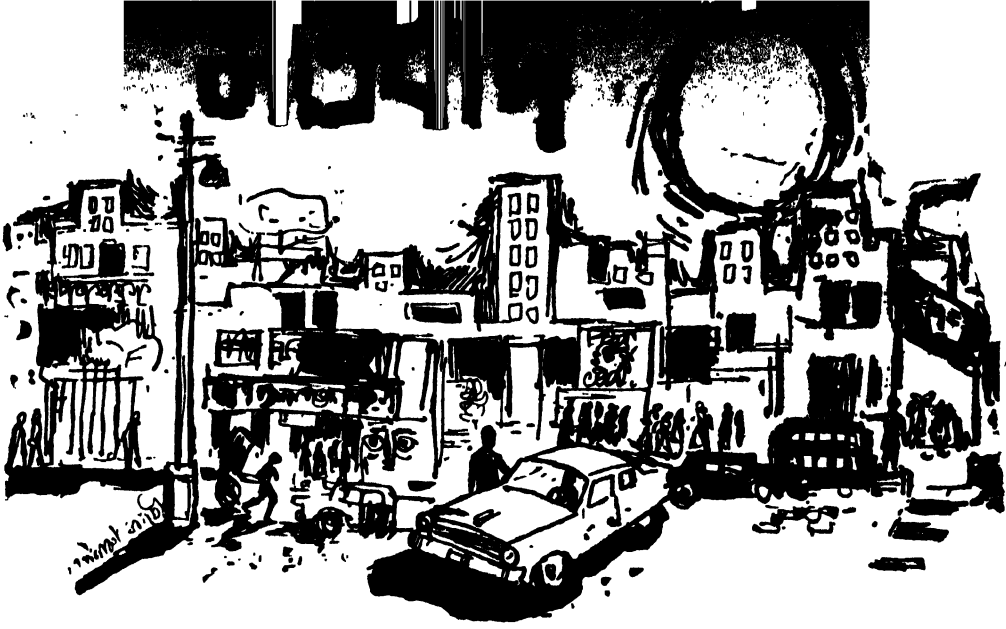
বন্ধুর হাত আমার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরলো, 'না, না, কিছুতেই না।'

অবাক হলাম।

মানে বঝতে বন্ধুর মুখের দিকে চাইলাম।

কি হলো হঠাৎ?

এমন তো হবার কথা ছিল না।

অনেকদিন পরে এই কিছুক্ষণ আগে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। বাস স্টপেজে দাঁড়িয়েছিল, আমি দেখতে পেয়ে গাড়ী থামিয়ে মহোল্লাসে ডাক দিয়েছি, 'আরে তুই! উঠে আয়, উঠে আয়।'

ও প্রথমটা চকিত হয়েছিল, তারপর নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, 'উঠে আসবো মানে? তুমি কোনদিকে, আমি কোনদিকে?'

বললাম, 'আরে বাবা, দিক নির্ণয়টা পরে হবে, উঠে তো আয়। ভয় নেই দিগ্‌ভ্রান্ত করে দেব না।'

তবু ও বললো, 'আজ থাক্, যাবো একদিন।'

'সেই শুভদিন ভবিষ্যতের গর্ভে, হাতেরটা ছাড়ি কেন?'

দরজাটা আগেই খুলে ধরেছিলাম, অতঃপর নামলাম। বললাম, 'ধরে তুলতে হবে?'

অগত্যাই যেন উঠে এলো ও।

বললো, 'খুটমুট ঝামেলা করলি। বাসেই চলে যেতাম।'

'আমি কি বলছি যেতিস না? অনন্তকাল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতিস? কতোদিন পরে দেখা হলো'—

'তা বটে, অনেকদিন পরে—' বন্ধু পিঠটাকে আরামের ভঙ্গীতে এলিয়ে দিয়ে বললো, 'কোনদিকে যাচ্ছিলি?'

বললাম, 'তুই যেদিকে।'

আশাপূর্ণা দেবী

ও হেসে উঠলো। তারপর প্রীত-গলায় বললো, 'আজ বুঝি কোনো সভা নেই?'

হেসে আমিও ফেলি, 'রোজই সভা করছি না কি?'

'প্রায় তাই। কাগজ খুললেই তো দেখতে পাই, পৌরোহিত্য করিবেন শ্রীঅমুক—সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন শ্রীঅমুক—'

'তা বলেছিস ঠিক,' হেসে ফেলি, 'ওই দুটি কর্মই আছে এখন দেশে শ্লোগান আর ফাংশান।'

পরিহাসের কথা থেকে গভীরে এসে গিয়েছিলাম আমরা, সভা থেকে সাহিত্যে। তার উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারে তর্কে উত্তেজিতও হয়েছিলাম।

বন্ধুই বরং শান্ত থেকেছে। শান্তগলায় বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে এবং সেই বর্তমানের খতিয়ান করে রায় দিয়েছে, লক্ষ্যহীন, মানবিকতা বোধহীনা। সমাজচিন্তাহীন এই দেহবাদী সাহিত্য দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।'

কই খুব একটা রেগে ওঠবার কারণ তো ঘটে নি।

তবু হঠাৎ দেখছি বন্ধুর মুখে ক্রোধের রেখা, কণ্ঠে ক্রোধের আমেজ।

'কক্ষণো না, কিছুতেই না, ভিক্ষে দিতে পাবে না তুমি'—বলে আমার পয়সা-ধরা হাতটা চেপে ধরেছে।

অথচ এইমাত্র মানবিকতার কথা বলছিল।

এদিকে আমার চোখের সামনে আর একখানি বাড়ানো হাত প্রত্যাশার পাত্রটি ধরে স্থির হয়ে রয়েছে।

যেমন হয়—তাই হয়েছে। গাড়ী চালাতে চালাতে রাস্তায় লাল আলো জ্বলে উঠতেই যেই গাড়ী থামাতে হয়েছে, বুড়োটা তার মরচে-পড়া কৌটোটা-ধরা হাতখানা বাড়িয়েছে গাড়ীর জানালায়।

এইটুকুই তো বড় মওকা ওদের।

আশেপাশে গাড়ীর রাশি, সবাই থমকে থেমেছে। আর স্বভাবতই সবাই সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে সময় পাচ্ছে। এ সময় ভিখিরীকে

ব্যাপার। তাকরে থাকা লোকেরা ভাবতে পারে, এ লোকটা মানবিকতা-বোধশূন্য। হয়তো এমন মন্তব্যও কানে আসতে পারে, 'সাহেব, গাড়ী চড়ে চলেছেন, অথচ ভিখিরীকে একটা পাঁচ নয়া দিতে হাত ওঠে না।'

যারা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা এসব মনস্তত্ত্ব ভালমতোই জানে। তাই তারা এমন দামী মওকাটা ছাড়ে না।

তবে কতোটুকুর জন্যেই বা।

নিভে যাবে লাল আলো, নিভে যাবে আশার আলো। হয়তো কোন হৃদয়বান ব্যক্তির হাতের পয়সা হাতেই থেকে যাবে, গাড়ী ছেড়ে দেবে।

হয়তো কারুর ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা কুড়োতে গিয়ে রাস্তার ধূলো হাতড়ে মরতে হবে বেচারাদের।

তাই লাল আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা চট করে গাড়ীর জানলার মধ্যে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

এখনও দিয়েছিল একটা বুড়ো।

আমিও যত দ্রুত সম্ভব বার করে ফেলেছিলাম একটা 'দশ নয়া', কিন্তু দেওয়া হল না।

বন্ধুর নিষেধে থমকে যেতে হল।

কিন্তু নিষেধটা কেন?

বুড়োটা কি ইতিপূর্বেই আমার বন্ধুর কাছে মোটা কিছু বাগিয়েছে? তাই ওর 'প্রয়োজন' সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন নেই? না কি, বুড়োটাকে যত বুড়ো ভেবেছি, ততটা বুড়ো নয়।' শক্ত সমর্থ?

শক্ত সমর্থদের ভিক্ষে করার ব্যাপারে অনেকেই অসহিষ্ণু হয় বটে।

আমিও যে একেবারে ছিলাম না তা নয়, তবে এখন আর নেই। অনেক-দিন আগে একটা ভিক্ষুককে বলেছিলাম, 'জোয়ান লোক, ভিক্ষে করতে লজ্জা হয় না? খেটে খেতে পারো না?'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'কেন পারবো না? পারতেই তো চাই। সেই খেটে খাবার ঘরের দরজাটা বাৎলে দেখানেই তো পাচ্ছি না দেখাল!'

সেই থেকে আর অসহিষ্ণু নই।

সেই থেকে 'কি না কি' জবাব শোনবার ভয়ে মুখে কুলুপ দিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু এ লোকটা তো সত্যই বুড়ো।

শিরাসর্বস্ব শীর্ণ হাতটা দেখে, খেটে খেতে বলবার কথা মনে আনা সম্ভব নয়। কি ভেবে তবে আমার বন্ধু—?

অবাক গলায় বললাম, 'কি হলো? লোকটা তো সত্যিই বুড়ো—'

'জানি। তবু রাখো তোমার পয়সা—'

নিরুপায় হয়ে রাখতেই হলো।

কারণ লাল আলো নিভে গেছে ততক্ষণে।

গাড়ীরা চলতে সুরু করেছে।

'হ্যাং।' বলে বুড়োটাও সরে গেছে।

হাতে তোলা পয়সাটা পকেটে তুলে রাখতে হলো।

ক্ষুণ্নভাবে বললাম, 'কী হলো বল তো?'

বন্ধু উদ্দীপ্ত গলায় বললো, 'কী হলো, সেটা খেয়াল করবারও ক্ষমতা নেই কেমন? আশ্চর্য অহমিকা।'

'অহমিকা!' অবাক হয়ে তাকাই।

বন্ধু উত্তেজিত গলায় বলে, 'হ্যাঁ অহমিকাই। সেটা নিজেকে একটু স্টাডি করলেই বুঝতে পারতে। মনস্তত্ত্বমূলক বই তো লিখছো অনেক, নিজের মনের তত্ত্ব ভেবে দেখ কোন-দিন? তা নয় ভাবছিলে ওই দশ নয়াটির বদলে খুব একখানা মহানুভবতা দেখানো যাবে। একটি দশ নয়া দিয়ে অনেকখানি আত্মপ্রসাদ কেনার সুখ পাওয়া যাবে। কিন্তু কেন? কেন? বলতে পারো কেন তুমি তোমার ওই দশ নয়াটির অহঙ্কারে একটা মানুষের আত্মাকে অবমাননা করবে?'

কুণ্ঠিত না হয়ে পারি না।

সেই গলাতেই বলি, 'একথা ভাবতে হবে। চিন্তা করতে হবে।' বন্ধু আরো উত্তেজিত হয়। মনে রাখতে হবে যখনই তুমি কাউকে ভিক্ষে দিচ্ছো, তখনই তুমি তাকে অপমানিত করছো। তুমি তার অভাব আর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছো। আমার মতে ভিক্ষে দেওয়া একটা পাপ। মানুষের মর্যাদাকে অস্বীকার করা। আমি তো ভুলেও কোনোদিন কাউকে ভিক্ষে দিই না।

'আমি'-টা এমনভাবে বললো, যেন সেটাই একমাত্র আদর্শস্থল। যেন 'আমি'-র পর আর কথা নেই।

তবু কথা বলতে গেলাম, 'কিন্তু ওদের তো—'

'জানি ওদের অভাব। আর সেই অভাবের সুযোগ তোমরা নিচ্ছো। দাতা হচ্ছো, নিজেকে করুণার অবতার ভাবছো।'

বুঝলাম তর্ক চালানো যাবে না।

কারণ 'মতবাদ'।

মতবাদের কাছে তর্ক দাঁড়ায় না।

আমার এক ভাগ্নে 'মানুষের ঘাড়ে চাপবে না' বলে রিকশা গাড়ী চাপে না, 'মানুষকে দিয়ে মোট বওয়াবে না' বলে স্টেশনে কুলি করে না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলে মিলে বয়ে বয়ে দরকার মিটোয়।

যদি বলতে যাও—'ওদের তো ওটাই রুজি-রোজগার—'

ভাগ্নে লম্বা লেকচার দিয়ে বলে, 'হতে পারে। কিন্তু তার জন্যে আমি তো নীতিভ্রষ্ট হতে পারি না।'

'কিন্তু তোর ওই বৌ-ছেলেগুলোও তো মানুষ?'

ভাগ্নে দরাজ গলায় বলে, 'হতে পারে কিন্তু এটা হচ্ছে নিজের প্রয়োজন—এখানে তো অপরকে ছোট করা হচ্ছে না।'

বন্ধুর মতবাদ ভাগ্নের সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে হলো। রিকশাটাকে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়ার চিন্তায় তৎপর

কিন্তু এখন যে সেই টিনের কৌটো ধরা শিরাবহুল হাতটাকে মন থেকে সরাতে পারা যাচ্ছে না। আর তাড়াতে পারা যাচ্ছে না সেই ক্ষোভ এবং তাচ্ছিল্যমিশ্রিত 'হ্যাৎ' শব্দটা। ও কি বুঝতে পারবে কতখানি উঁচু চিন্তা নিয়ে ওর ঐ প্রসারিত হাতকে শূন্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বুঝবে এ বিশ্বাস নেই তাই ভাবতে থাকি আর কোনো 'লাল আলোর' সঙ্কেতের সময় কি দেখতে পাওয়া যাবে না ওকে?

বন্ধু একটা সিগারেট ধরাতে এটা কী পাষণ্ড, কী হৃদয়হীন। কিন্তু যদি ভাল করে ভেবে দেখো বুঝতে পারবে ভুল বলি নি আমি। মানুষের মর্যাদাকে বড় মূল্য দিই আমি।'

বন্ধুর সিগারেটটা দামী, গন্ধটা গাঢ়।

বন্ধুর কণ্ঠস্বরও গাঢ় হয়ে আসছিল, সহসা তরলিত হয়ে উঠলো, 'এই থামো থামো, এইখানেই নামবো আমি—আচ্ছা লিফ্‌টের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

নেমে পড়ে।

গলির মধ্যে ঢুকে যায়।

আমি আস্তে আস্তে চলতে থাকি।

বন্ধুর মতবাদটাকে হয়তো ভুল বলে অস্বীকার করা যায় না, হয়তো ওর সব কথাগুলোই দামী, কিন্তু কোনটা আগে?

শিক্ষা না পরীক্ষা?

ব্যবস্থা না শাসন?

আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করা, না দানের হাত গুটিয়ে নেওয়া? জমি প্রস্তুত করা, না মতবাদের চারা চাপা দেওয়া? পুরো দেশটাই তো আজ ভিখিরি বনে গেছে। স্বকীয়তাহীন দেশের এই মতবাদগুলোই কি নিজস্ব। সেও তো ভিক্ষালব্ধ ধন।

একালের শিলাপটে

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গতার বিধুরবৃন্তে
অস্তায়মান সূর্যের মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হব।
জীবন চর্চার বিস্তীর্ণ অঙ্গনে
উৎকর্ণ হয়ে শুনেছি যে সুন্দরের ডাক।
শৈল্পিক এষণা প্রত্যয়ের ঘন নীল রঙে রাঙা
পুষ্পবতী হবে, সারবান মাটির রসে অনুপ্রাণনায়।
বৈপ্লবিক চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ত অভিষিক্ত প্রাণ
জ্বলেওঠা জীবনের অগ্নি অর্ঘ্য দিয়ে
কালান্তর দেবতার শেষপূজো দেবে!
মিথ্যা হয় আকিঞ্চন একালের তামস বিধুরে—
কেন হল—যা চাহি নি আমি
কেন পুড়ে ছাই হল হৃদয়ের হরিৎ ফসল?
নিশিভোরে সে কি শুধু স্বপ্ন ছায়াময়
স্মৃতির কিনারে খোঁজা কবন্ধ সময়!
ব্যর্থ সে কি বৈপ্লবিক সত্তা শিলাপটে?
জরাসন্ধ সময়ের বন্ধ্যা পরিবেশে
মনে হয় পৃথিবীর পুষ্পিত যৌবন
যেন কোন স্বৈরিণীর কণ্ঠুলিতে বেঁধে রাখা
ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে যাওয়া ঢেউ
উত্তর যৌবন দেহতটে।
ছলনার মধুচক্রে পরিপুষ্ট লালসার ঘৃণ্য সমারোহ—
অমড়ক চেতনার মাঙ্গলিকে জন্ম নেবে কবে
ভ্রূণশিশু মহাসত্য জীবনের নবাংকুর
আরক্তিম নব সূর্যোদয়ে?

স্বদেশ-চিন্তার বিবর্তন

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

(শেষাংশ)

তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও লালা লাজপত রায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে চালিত করছেন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে তখন একটা আস্থার ভাব দেখা দিয়েছে এবং সকলেই মনে করেছেন যে, ইংরেজ সরকার অন্তত কিছুটা আন্তরিকতা প্রদর্শন করবেন।

কিন্তু মণ্টেগু চেমসফোর্ড আইনের ফাঁকি ধরা পড়তে বিলম্ব হল না। দেশের নেতৃবৃন্দ অচিরেই বুঝতে পারলেন যে, চতুর ইংরেজ সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতার কিছু অংশ অনুগতদের দান করার নামে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতারিত করেছেন মাত্র।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও কংগ্রেসী রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিল। ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে সেখানকার সরকারের বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে গান্ধীজী দেশের অশ্বেতকায় জনসাধারণের পক্ষ হয়ে অহিংস আন্দোলন পরিচালিত করে পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাসে নতুন একটা অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তিনি সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে সংগঠন আরম্ভ করলেন।

১৯২০ সালে লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় যখন বিশেষ অধিবেশন আহূত হল তখন থেকেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকল। তার পরের বছরই গান্ধীজীর নির্দেশে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল। বিদেশী সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশী পণ্য বর্জন, দেশী পণ্য উৎপাদন, চরকার সুতোয় বস্ত্র প্রস্তুত করা যেমন এর একটা দিক তেমনি আইনসভা বর্জন, আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি বিদেশী প্রভাবিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এর অপর দিক। গান্ধীজীর আহ্বানে মতিলাল নেহরু, লাজপত রায় যেমন সাড়া দিলেন তেমনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র সেনগুপ্তের ন্যায় অনেক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ চিকিৎসকগণও পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। পরোক্ষে যাঁরা সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁরা হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি।

দেশবন্ধু ও বিধানচন্দ্রের প্রচেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (National College) গড়ে উঠল কলকাতায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রচেষ্টায় বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং দেশের অন্যত্র অনুরূপ সংগঠন প্রকটিত হয়ে উঠল। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী হস্তক্ষেপ ও প্ররোচনার ফলে স্থানে স্থানে তার হিংসাত্মক রূপ ফুটতে থাকল। --- গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করতে বাধ্য হলেন এবং দেশকে অধিকতর সংযম ও কঠোর অধ্যবসায়ের ব্রত গ্রহণ করে গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দিলেন। ফলে গান্ধীজীর সহকর্মীদের মধ্যে প্রথম মতপার্থক্য দেখা দিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আপাতদৃষ্ট ব্যর্থতা লক্ষ্য করে ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে প্রকাশ্যভাবে গান্ধীনীতি বিরোধিতা করলেন এবং আইনসভা পুনরায় অধিকার করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

এই সময় দেশবন্ধুর অন্যতম সহকর্মীরূপে দেখা দিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ইংরেজের দেওয়া বহুবাঞ্ছিত আই-সি-এস-এর পদমর্যাদা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে—স্বদেশের সেবায় ও স্বাধীনতা অর্জনের দুঃসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প ঘোষণা করেন। এর পর থেকে দেশের রাজনীতি ও স্বদেশচিন্তা সমান্তরাল দুই খাতে বইতে শুরু করল।

১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল গান্ধীজীর সভাপতিত্বে আর তার পরের বছরই দেশবন্ধু পরলোকগমন করলেন। ঐ একই বছরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও লোকান্তরিত হন, ফলে বাংলা দেশের রাজনীতির শূন্যস্থান পূরণ করতে সুভাষচন্দ্রের উপর আহ্বান এল।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে নতুন স্বদেশচিন্তার উদ্ভব হোল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোল, তাতে পূর্ণ স্বরাজের প্রথম ধ্বনি উচ্চারিত হোল সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে। তরুণ দেশনায়কের এই চিন্তা পরের বছর জওহরলাল নেহরুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও প্রবীণ নেতৃবৃন্দ সহজভাবে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, ফলে প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল দুই মতবাদের সংঘাতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কিছুকালের জন্য স্থিতিশীল হয়ে রইল।

'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সুভাষচন্দ্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে, কোনদিনই এই আত্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন নি। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থাশীল হওয়ায় এমন কি জওহরলাল নেহরু প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যভাবে গান্ধীজীর বিরোধিতা করায় সাহসী না-হওয়ায় সুভাষচন্দ্রকে একক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হয়। নিজের আদর্শের প্রতি অটুট আস্থা এবং স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁকে শত বাধা সত্ত্বেও অভীষ্ট-সিদ্ধির দুরূহ পথে পদক্ষেপ করতে সহায়তা করে।

১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর সমর্থন ব্যতিরেকেও তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমন ক্রূর পরিহাস যে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চক্রান্ত উগ্র আকার ধারণ করে তাঁকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য করল। এই কলঙ্কিত ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা আলোচ্য প্রবন্ধে না করাই শ্রেয়। কারণ তা আত্মনিন্দার পরিচায়ক। অতএব এ প্রসঙ্গ বিস্মৃত হওয়া যাক।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গান্ধীজীর দান অবিস্মরণীয়। তাঁর অহিংসনীতি, সত্যের পরীক্ষা, ধর্মবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, শত্রুকেও মিত্রভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, তিতিক্ষা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মনীষা, স্বল্পভাষিতা, উপবাস ও অভিনব জীবনচর্যা, সর্বোপরি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল তা সত্যই দুর্লভ।

বিদেশী সরকার এই মানুষটির রাগদ্বেষবিমুক্ত আচরণের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যে-কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন সূচনা করার পূর্বে তিনি শাসনকর্তাদের তা প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দিতেন। এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার দ্বারা আপোষের উপায় উদ্ভাবনের শেষ চেষ্টা পর্যন্ত করে যেতেন।

বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, গান্ধী-আরুইন চুক্তি এবং একাধিক বড়লাটদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গান্ধীজীর ব্যক্তিচরিত্রকে আপোষপন্থীরূপে উজ্জ্বল করে রেখেছে। পক্ষান্তরে তিনি যখনই দেশবাসীকে যে-কোনও সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, ডাণ্ডীমার্চ, একক সত্যাগ্রহ, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সর্বদাই তিনি দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনলাভ করেছেন। এমন কি তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বরাবর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং যতবার তিনি আন্দোলন শুরু করেছেন, সুভাষচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দূরদর্শিতা ও প্রগতিশীল স্বদেশ-চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সংগঠন আরম্ভ করলেন এবং গান্ধীজীকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য অধিনায়কত্ব করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু যুদ্ধে বিপন্ন ইংরেজ সরকারকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করতে গান্ধীজী আদৌ রাজী ছিলেন না। এবং দেশ তখনও সম্যকভাবে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয় এই ধুয়া তুলে সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক চিন্তাকে অবদমিত করতে সচেষ্ট হলেন। ফলে সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় স্বপন্থা অবলম্বন করতে হল।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না
আসে তবে একলা চলো রে'—

এই কথা স্মরণ করে তিনি সুদূর রহস্যময় রাজ্যে পাড়ি দিলেন। অতীতে রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্র রায়, বীর সাভারকার প্রমুখ বৈপ্লবিক চিন্তানায়কগণ দেশের মাটি থেকে বাইরে গিয়ে স্বদেশের মুক্তিসাধনার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তাঁদের স্বপ্নকে সফল করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের [illegible] সম্যকভাবে সচেতন হয়ে সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হলেন ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ঐটি একটি স্মরণীয় দিন।

তারপর চলল মহাভারতের মহানায়কের অজ্ঞাতবাস। যেদিন অজ্ঞাতবাসের কাহিনীর আবরণ সেদিন উন্মোচিত হল, সেদিন সমগ্র দেশবাসী চকিত হয়ে বিস্মিত হয়ে আনন্দে গর্বে ভরপুর হয়ে দেখতে থাকল এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোড়নের মধ্যে দেশের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ স্বদেশচিন্তার বাণীকে প্রচার করলেন তেমনি অন্যদিকে বহু প্রতিভাবান ও চিন্তাশীল কবি ও লেখকের সাহিত্য-সাধনায় ও সৃজনীধারায় দেশের জনচিত্তে স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্রকে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। এই সকল কৃতির সার্থক অভিব্যক্তি সঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকে বাংলা দেশে কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে স্বাদেশিকতার একটা বিশেষ রূপ ফুটে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দেশের আপামর জনসাধারণকে যে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল, সেই অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাস্পর্শে অজস্র সঙ্গীত-সৃষ্টিতে দেশব্যাপী অভাবনীয় সাড়া জাগিয়ে তুলল। রবীন্দ্রনাথের 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'—বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্রের প্রতিধ্বনি। এ ছাড়া 'আয় ভুবন-মন-মোহিনী', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে', 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান' ইত্যাদির সঙ্গে 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে', 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', 'আমার সোনার বাঙলা', 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' প্রভৃতি বিচিত্রধর্মী স্বাদেশিকতার বাণী সমৃদ্ধ

চিত্তে স্মরণীয়। এ ছাড়া 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' যা স্বাধীন ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অতুলপ্রসাদের 'উঠ গো ভারত লক্ষ্মী', 'বল বল বল সবে, শত-বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে', 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির —নাহি ভয়'।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র, মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ' 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা'—ইত্যাদি স্বদেশচিন্তার অনবদ্য নিদর্শন। একই সঙ্গে স্মরণীয় নজরুল ইসলামের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,' 'চল চল চল। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'; 'এই শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল'—ইত্যাদি।

রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'; কামিনী ভট্টাচার্যের 'শাসন সংযত কণ্ঠ জানি। গাহিতে পারি না গান'।

মুকুন্দ দাসের 'জাগো গো, জাগো জননী'।

অশ্বিনীকুমার দত্তের 'চল্ চল্ চল্ জীবন আহবে চল, বাজিবে সেথা রণভেরী বুকেতে আসিবে বল', এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল'?

অথবা, সরলা দেবীর 'বন্দি তোমায় ভারত জননি, বিদ্যামুকুট-ধারিণি' কিংবা প্রজ্ঞানন্দের 'কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে, এস কে কেঁদেছ নীরবে'।

১৯৪২ সালে ৯ই আগস্ট যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল ভারতের মাটিতে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম। সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে অনেক সাহিত্য ও সঙ্গীত রচিত হয়েছে, যার মধ্যে স্বদেশ-চিন্তা খুবই সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসের "নয়ই আগস্ট, তোমায় নমস্কার। কাটল যেদিন ভারত জোড়া মনের অন্ধকার", "শ্মশানে কি নতুন করে লাগল সবুজ রঙ, সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কি বন্দেমাতরম্'?"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হাতেতে হাত মেলাও, ভাই ভাই সারা দুনিয়াই আজ, জোরসে পা চালাও'; অভ্যুদয় সম্প্রদায়ের "জাগে নব-ভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা", কিম্বা 'বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি, উচ্চে তুলেছি মাথা, আর কেহ নয়, এবার জেনেছি মোরাই মোদের পরি-ত্রাতা'-বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত সঙ্গীতের উদ্দীপনা প্রাক্-স্বাধীনতা কালে যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল খুব কম সঙ্গীতে তা একালে সম্ভব হয়েছিল। ঐ সঙ্গীতের পরবর্তী কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধৃত করা যাক—

'করিব অথবা মরিব'—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত ভুবন,
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন
স্বাধীন ভারতগাথা—
জয় জয় জয়, ভারতের জয়,
জয়তু ভারতমাতা।'

এই সময় হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত কয়েকটি সঙ্গীতও দেশের জনসাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। সেইগুলির মধ্যে অন্তত দুটি গান—'উঠ জাগ মুসাফির। ভোর ভঈ, অব রৈন কহাঁ জো সোবত হৈ'? এবং 'ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা। বিজয়ী বিশ্বতিরঙ্গা প্যারা'। সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য।

এই সময় বিখ্যাত পারসীক কবি ইকবাল রচিত 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা' গানটি বহুল প্রচার লাভ করেছিল এবং সকল অনুরাগী ব্যক্তি কর্তৃক গীত হয়েছিল। ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক সমর সঙ্গীত হিসেবে এটি গৃহীত হয়েছিল। তবে তাঁদের আর যে একটি গান বিশেষ সমাদর ও শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়েছিল, সেটি হল 'কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশী সে গীত গায়ে যা, এ জিন্দগী হায় কৌম কী তুকৌম পর বঢ়ায়ে যা'।

এ পর্যন্ত আলোচ্য প্রসঙ্গের কিছুটা বাইরে চলে আসতে হয়েছে, তবে মূল বক্তব্যের থেকে অবান্তর কিছুর অব-তারণা করা হয় নি। রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাকে উপলক্ষ করেই মুখ্যত স্বদেশচিন্তার অভিব্যক্তি আলো-চিত হচ্ছিল। সেই সূত্রে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বাঙলা দেশে যে স্বাদে-শিকতার জ্বলন্ত প্রমাণ উদ্ভাসিত হয়ে-ছিল ইতিপূর্বে তার কিছুটা আভাস দেওয়া হল।

যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইংরেজ জাতিকে বিশ্বের ক্ষমতাবান জাতিদের আসন থেকে অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছিল, তবু ভারতের প্রতি তার প্রভুত্বের আচরণে কোনও সততা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে নি। গান্ধীজী প্রথমে তাঁর স্বভাবসুলভ ধৈর্য ও ইংরাজ শাসকদের আপদকালের কথা চিন্তা করে তাঁদের অসুবিধার সৃষ্টি করতে সম্মত হন নি। কিন্তু ক্রমশ দেশের সর্বাঙ্গীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, শাসক সম্প্র-দায়ের দমননীতি ও শোষণ-উৎপীড়নের নানা দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে এবং দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার পরাধীনতার প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ লক্ষ্য করে অবশেষে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব উপস্থাপিত করতে বাধ্য হলেন। তাঁর 'Do or Die' নীতি একই সময়ে মন্ত্রের মত সমস্ত ভারতবাসীকে অপূর্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করল এবং আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সাত লক্ষ

গ্রামের চল্লিশ কোটি প্রাণের জাগরণে আত্মনিয়োগ সৃষ্টি করল।

সুচতুর শাসকগোষ্ঠী তখন আসন্ন মৃত্যুর সাতিশয্যকে রুদ্ধ করার প্রয়াসে কঠোরতম দমননীতি ও নিষ্ঠুরতম উৎপীড়ন আরম্ভ করল। দেশময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে অবদমিত করতে চাইল। দৈবদুর্যোগ, কৃত্রিম অভাবসৃষ্টি, সরকারী দমননীতি ও অধিকতর শোষণ-ব্যবস্থা যখন পুরোমাত্রায় চাপিয়ে দিয়ে ইংরেজজাতি আপনার স্বার্থ কায়েম করার চেষ্টা করছিল, সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজদের সংঘবদ্ধ অভিযানে—'Give me blood, I will give you freedom' এই মহাবাণীতে উদ্বুদ্ধ করে, 'দিল্লী চলো' এই ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে স্বদেশের শৃঙ্খলিত অবস্থার অবসানকল্পে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সেই ফৌজের একাধিক বীরের আত্মনিয়োগ এবং স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে এবং সেই গৌরব-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

এর পর ভারতের ইতিহাসের ঘটনাস্রোত দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়েছে। বিদেশী শাসক পরাধীন জাতির ঐক্যবদ্ধতা; আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম-প্রভৃতি ও বহিঃপ্রদেশের বিপুল সংগঠন লক্ষ্য করে আপনার কূটবুদ্ধি ও ক্রূরনীতির প্রয়োগে এইসব বানচাল করার চিন্তা করছিল, ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ তার সাফল্য নিয়ে প্রকাশিত হল। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্ব-রাজনীতিতে ইংরেজ জাতি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে অবতরণ করতে বাধ্য হল এবং তখন একটা আপোষের সন্ধানে কথাবার্তা চালাতে বাধ্য হল।

এর পূর্বে তার সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি যাকে অবলম্বন করে শতাব্দীকাল ইংরেজ-শাসন অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়েছিল, তাও কালবিরোধী প্রমাণিত হল এবং রক্ষণশীল দল থেকে ক্ষমতা শ্রমিকদলে হস্তান্তরিত হয়ে তার চিরাচরিত নীতি থেকে বহির্ভূত একটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে প্রয়াসী হয়।

বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে 'তিনজন সদস্য বিশিষ্ট' একটি ক্যাবিনেট মিশন আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা প্রস্তাব নিয়ে এ দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপিত করল। ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিকদল কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালালেন। যাই হোক বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বহু আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের পর এই প্রস্তাবকেই অবশেষে রদবদল করে গ্রহণ করা হল এবং ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট মধ্য-রাত্রিতে ইংরেজ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। ভারতবর্ষ তার অখণ্ডতাকে বিসর্জন দিয়ে দুটি রাজ্যে বিভক্ত হল —স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান। একটি হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র, অপরটি মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র। স্ব স্ব আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে পাশাপাশি দুই রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করল এই উদ্দেশ্যে যে একে অপরের পরিচালনা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং পরস্পর মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রেখে উভয়েই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আশা আজও ফলবতী হয় নি।

ভারত ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে তার গঠনতন্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছে।

আর পাকিস্তান আজও তার সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ও ধর্মান্ধতার কূট-বুদ্ধি নিয়ে জাতিবৈরীভাবকে পোষণ করে, সামরিক শাসনের স্বৈরতন্ত্রে বাঁধা পড়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। সেখানকার জনগণ অবশ্য কতদিন এই নিদারুণ অবস্থা নীরবে সহ্য করবে, সে বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন নেই। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি সরকারের আভ্যন্তরীণ ভেদনীতি যা একাধিকবার ভাষা-সমস্যা ও অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকটিত হয়েছে, তাতে এই আশা হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে সংস্কৃতির শতাব্দীব্যাপী বন্ধন ও ভাষার ঐক্যবুদ্ধি বিভক্ত দুই বঙ্গের মধ্যে (পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান) নব সংহতি সৃষ্টি করে স্বদেশচিন্তার ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে এবং যার থেকে ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রই মুক্তির সত্যকার পথের সন্ধান লাভ করবে।

॥ সমাপ্ত ॥

প্রেম

পিং সিন

॥ চীনা কবিতা ॥

প্রেমের চিন্তার হাত থেকে
রেহাই পাবার জন্যে
আমি আমার পশমের জামাটা পরলাম
আর বাতিজ্বলা থমথমে বাড়ীটা থেকে
রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম।

ছোট ফুটপাথের ওপর উজ্জ্বল চাঁদ
উঁকি দেয়,
আর বরফের পোষাকপরা পৃথিবীর
ফ্যাকাসে গাছপালা

পেরিয়ে যায় আর পেরিয়ে যায়
আর সর্বত্রই দ্রুত লিখে রেখে যায়—
'প্রেম'।

অনুবাদক—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

মীরাকে প্রভু গহরী গম্ভীরা সদা
রহো জী ধীরা।
আধী রাত প্রভু দরসন দে হৈঁ
প্রেমনদীকে তীরা ॥

কে এই মীরা ?

গান শুনছিলাম। গ্রামোফোনে বাজছিলো সুরেলা গলার গান। এবং মনের মধ্যে ওই প্রশ্ন। কে এই মীরা? কি তার পরিচয়?

রেকর্ডের সুন্দর মোড়কখানি তুলে নিলাম। ওখানে লেখা আছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মীরা,—কুইন অফ চিতোর, চিতোরের মহারাণী। দি গ্রেট সেণ্ট পোয়েটেস,—মধ্যযুগের মহিমাময়ী সাধিকা কবি। কিন্তু ওটুকুই কি পরিচয়?

এই শোনো, কে এই মীরাবাঈ? আমায় কিছু বলতে পারো তার সম্বন্ধে।

বাঃ, এ কি প্রশ্ন তোমার? কে না জানে? চিতোরের রাণা কুম্ভের বৌ। চিতোরের রাজরাণী মীরা।

না, না, সে তো কিংবদন্তীর মীরা। তার কথা আমি জানতে চাইনি। আমি শুনতে চাই ইতিহাসের মীরার কাহিনী, যে রচনা করেছিলো অসংখ্য অনবদ্য গান,—কিন্তু যে রাজরাণী ছিলো না কোনো কালে, যার জন্ম হয়েছিলো রাণা কুম্ভ মারা যাওয়ার প্রায় তিরিশ বছর পরে।

সেই মীরাকে আর কেন? কিংবদন্তীর ঘন কুয়াশার আড়ালে সে একেবারে আবছা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ইতিহাসের মীরাকে ইতিহাসই ভুলে গেছে। ধর্মপ্রাণ সরল সাধারণ মানুষের জন্যে এই মনগড়া মীরাই তো বেশ। তাকে রাজরাণী ভাবতে ভালো লাগে। রূপকথার নায়িকা রাজরাণী হলে শুনতে ভালো লাগে। আমাদের কিংবদন্তীতে নাটকে সিনেমায় মহারাণী সে চিতোরের মহারাণী হয়েই থাকুক।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

সে প্রত্যাখ্যান করুক পরাক্রান্ত রাণার স্বামিত্বের হৃদয়হীন দাবিকে। রাণা তাকে নির্যাতন করুক। তখন আবহ-সঙ্গীতের সঙ্গে তার গান শুনে আমরা মুগ্ধ হবো। শেষ পর্যন্ত সে বিলীন হয়ে যাক এক পাষাণ দেবমূর্তির মধ্যে। তারপর যবনিকা এবং দর্শক-দর্শিকার চোখে জল। এ নাই বা হোলো ইতিহাসের কাহিনী, কিন্তু ইতিহাসের সত্যের চাইতে এ যে আরো বড়ো সত্য কারণ এই মীরা আমাদের একটা চেনা বেদনার রূপপ্রতিমা। তাই তার এই স্নিগ্ধমধুর গৃহস্থকন্যার চেহারাই আমাদের ভালো লাগে, যার কাছে রাজবাড়ীর ঐশ্বর্য বৈভব সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। এই বৈরাগ্যের সুর আমাদের নিভৃতে মনে বেজে আসছে এতকাল ধরে। সেই সুরের অনুভূতি ঘিরে আছে।

কিন্তু না, একবার ইতিহাস দিয়েই তাকে অনুভব করতে চাই। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ আমার কাছে ইতিহাসের গুরুত্ব অনেক বেশী। আজ কিংবদন্তীর কুয়াশা সরিয়ে মীরাবাঈকে দেখতে ইচ্ছে করছে আরো কাছে এসে দাঁড়িয়ে। পারছি না। বার বার সে কুয়াশা ফিরে এসে ঘিরে ফেলছে মীরাবাঈকে। তবু যখন দু-এক পলকের জন্যে দু-এক নজর দেখে নিচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের মীরা আরো বড়ো, আরো মহান। প্রচলিত অলৌকিক কাহিনীগুলোর চাইতে আরো যেন বৈচিত্র্যময় তার জীবন। তাই জিজ্ঞেস করছি বার বার, জানতে চাইছি কে এই মীরা, কি তার পরিচয়।

তাই আমি স্তব্ধ হয়ে দেখছি ইতিহাসের এক মহান সন্ধিক্ষণে তার আবির্ভাব। দিল্লীর লোদী সুলতানদের গৌরবসূর্য তখন মধ্যগগন পেরিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলো টুকরো টুকরো দেশ। বাংলায় সুলতান হুসেন শাহ অত্যন্ত পরাক্রান্ত। তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না দিল্লীর সিকন্দর লোদী। জৌনপুর কিছুকাল আগে তার স্বাধীনতা হারিয়েছে। উড়িষ্যার গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করার জন্য তৈরী হচ্ছে। মালবের সুলতান গিয়াসউদ্দীন তার দুই ছেলের সিংহাসনের জন্যে দ্বন্দ্বের ঝঞ্ঝাটে বিব্রত। গুজরাটের সুলতান মাহমুদও নানা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত। দক্ষিণে বাহমনী রাজ্য ও বিজয়নগর রাজ্য পরস্পরের শত্রু। সিন্ধু ও মুলতান আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগে বিক্ষুব্ধ। কান্দাহার থেকে বাবরের অনুগ্রহভাজন শাহ বেগ অরঘুন এসে আক্রমণ করছে সিন্ধুর পশ্চিমে। তাকে রুখতে পারছে না সিন্ধুর সুলতান নন্দা। মুলতানের উজীর বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে সুলতান হোসেনের উত্তরাধিকারী ফিরোজকে। সমুদ্র পেরিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে এক ইউরোপীয়

বাবিক। বাবর তখন শক্তিমান হয়ে উঠছে কান্দাহারে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই হিন্দুকুশ পেরিয়ে নেমে আসবে হিন্দুস্তানের সমতলভূমিতে। রাণা রায়মল্লের ছেলে সংগ্রাম সিংহ বা সাঙ্গা তখন তরুণ রাজকুমার। ভায়েদের শত্রুতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মেবারের সিংহাসন পাওয়ার সম্ভাবনাই তার কাছে সুদূর পরাহত, দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হবার জন্যে চেষ্টা করার কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

এই তখনকার ভারতবর্ষের ছবি। অসংখ্য ছোটো-বড়ো রাজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ। ইতিহাসের একটা বিরাট পরিবর্তনের মুখে, কিন্তু কেউ সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। সারা দেশ জুড়ে একটা অনিশ্চয়তা। শিথিল হয়ে গেছে নৈতিক চরিত্র। হারিয়ে গেছে জীবনের মূল্যবোধ।

একদিকে ভাঙন। কিন্তু অন্যদিকে একটা নতুন বলিষ্ঠ জীবনবোধের পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। কবীর এরই মধ্যে রচনা করছে তার গান। আরো কয়েক বছরের মধ্যেই শোনা যাবে তুলসীদাসের নামও। নানক সবে প্রচার করতে আরম্ভ করেছে তার নতুন ধর্ম। চৈতন্য তখনও অপরিণত কিশোর। একশো বছর আগে ঘটে গিয়েছে তৈমুরলঙ্গের নৃশংস অভিযান। সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা লোকের আর মনে নেই। প্রায় একশো বছর হতে চললো বিদ্যাপতি লিখেছে তার গানগুলো। সেগুলো এখন ছড়িয়ে পড়েছে লোকের মুখে মুখে। বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বড়ু চণ্ডীদাসের সম্প্রতি লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলো।

চোদ্দোশ' আটানব্বই খৃস্টাব্দের মে মাসের এক নিদাঘ দিনে কালিকটের কাছে ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করলো ভাস্কো-ডা-গামা এবং প্রায় একই সময় বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় মারওয়ারের মেরতার কাছে কুড়কী গ্রামে এক গ্রামে জন্ম হোলো একটি
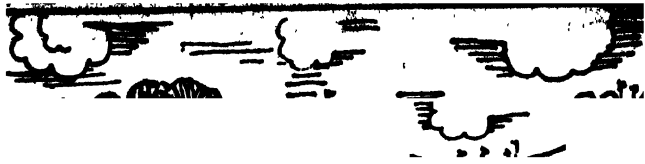
ছেলে আর মেয়েটিও এদের তাকিয়ে দেখলো......

সুন্দর মেয়ের। তার ফুটফুটে মুখে সূর্যের মতো দীপ্তি। বৈশাখে সূর্যের লগ্নে জন্ম। তাই সূর্যের নামে নাম রাখা হোলো মিহিরা। সেই মিহিরা নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে হোলো মীরা।

পরের কয়েক দশকের মধ্যে একটা বিরাট ওলট-পালট হয়ে গেল সারা দেশে। লোদী খানদান হারিয়ে গেল ইতিহাসের পাতা থেকে। রাণা সাঙ্গা উত্তরাপথের সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখেছিলো। সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বাবর এসে দখল করলো দিল্লী। প্রতিষ্ঠিত হোলো মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ। চৈতন্যের ভক্তিধর্ম বন্যার মতো ভাসিয়ে নিলো পূর্ব ভারত। বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া কেড়ে নিলো পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি আলবুকার্ক। পশ্চিম ভারতে শোনা গেল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পদধ্বনি।

ইতিহাসের এই বিরাট ভাঙাগড়ার মধ্যে মীরাবাঈ তোমার অনন্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তোমার চোখের সামনে ঘটে গেল পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ। তোমার চারপাশে চিতোরের নানা কুটিল আভ্যন্তরীণ চক্রান্ত। তুমি দেখলে শের শা'র উত্থান ও পতন। তুমি দেখতে পেলে আকবরের একজাতি গড়ে তোলবার প্রথম প্রয়াস। তোমারই চোখের সামনে ধাত্রীপান্না বাঁচালো তোমার দেবর, শিশু রাজকুমার উদয়কে। মনে পড়ে সেই দিনগুলো? চিতোরগড়ের ভিতর সেই বিভীষিকার অন্ধকার। দমবন্ধ হয়ে আসা গুমোট ষড়যন্ত্রের পরিবেশ।

হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। বাবর হেরে যেতে পারতো রাজনীতির দাবাখেলায়। রাণা সাঙ্গা হোতো দিল্লীর অধীশ্বর। পরে সেই সিংহাসনে বসতো রাণা সাঙ্গার জ্যেষ্ঠ সন্তান তোমার স্বামী কুমার ভোজরাজ।

তুমি হতে ভারতসম্রাজ্ঞী। কিন্তু সে তো হোলো না। রাণা সাঙ্গা, কুমার ভোজরাজ, সবাই বিদায় নিলো ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে। তুমি রয়ে গেলে আরো মহান ভূমিকার জন্যে।

কিন্তু সেই স্মৃতি আজ হারিয়ে গেছে। আজ আর কারো মনে নেই তোমার প্রভাব কতোখানি পড়েছিলো তখনকার রাজনীতির আদর্শগত সংঘাতের মধ্যে—রাণা সাঙ্গা থেকে বাদশাহ আকবর পর্যন্ত। ভাবীকালের আটপৌরে জীবনে শুধু থেকে গেছে কয়েকটি মধুর ভজন; —আর এক সাধিকা মীরাবাঈয়ের কিংবদন্তী।

তুমি সাধিকা, তুমি কবি এবং তারপরেও তুমি আরো কিছু। তুমি ইতিহাসের নেপথ্য নায়িকা। তবু এতকাল নিজেকে রেখেছো ঐতিহাসিকের নাগালের বাইরে।

ওদের অক্লান্ত গবেষণায় কিছু কিছু উপকরণ ছোটো ছোটো জানলা তৈরী করেছে বিস্মৃতির দেওয়ালে। সেখানে চোখ রেখে আভাস পাওয়া যায় তোমার ঝাপসা ব্যক্তিত্বের।

সেই ব্যক্তিত্ব আরো বিরাট, আরো বিচিত্র। তাহলে আবার নতুন করে বলতে হয় তোমার কাহিনী। আবার নতুন করে দিতে হয় তোমার পরিচয়। একবার ফিরে যেতে হয় পটভূমিকায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকের কথা। তখন মেবারের অধিপতি ছিলেন হাম্বীরের নাতি রাণা লাখা। সে সময় মারওয়াড়ের অধিপতি রাওয়ল চুণ্ডা। সে তার মেয়ে হংসাবাঈকে দিতে চাইলো রাণার বড়ো ছেলের হাতে। তারও নাম চুণ্ডা,—বাংলা ভাষায় লেখা রাজপুত কাহিনীতে যে নাম হয়ে গেছে চণ্ড।

কিন্তু রাণা লাখা নিজেই বিয়ে করতে চাইলো হংসাবাঈকে। মারওয়াড়ের রাওয়ল বললো, তা হলে তো আমার মেয়ের সন্তান সিংহাসন পাবে না। রাজকুমার চুণ্ডা বললো,—বেশ, আমি তাহলে ত্যাগ করছি মেবারের রাজসিংহাসনের উপর আমার দাবি এবং অধিকার। —মহাভারতের ভীষ্মের মতো ব্যাপার। যদি সত্যযুগ হোতো, ঐতিহাসিকেরা লিখতে পারতো যে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলো স্বর্গ থেকে।

যথাসময়ে সিংহাসন পেলো রাণী হংসাবাঈ আর রাণা লাখার ছেলে মোকল। সেই রাণা মোকলের ছেলে রাণা কুম্ভ। রাণা কুম্ভের নাতি রাণা সাঙ্গা বা সংগ্রাম সিংহ,—বাংলায় সেটা এতদিন লেখা হয়ে আসছে রাণা সঙ্গ বলে।

রাণা সাঙ্গার বড়ো ছেলে কুমার ভোজরাজ, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

ওই মেবারের রাণী রাঠোর-কন্যা হংসাবাঈয়ের কথা বললাম, তার এক ভাই ছিলো নাম রণমল্ল। রাজপুত ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র। সেই হয়েছিলো মারওয়াড়ের রাজা। তার পরে রাজা হোলো রণমল্লের ছেলে রাও জোধা, যে তৈরী করেছিলো রাজধানী জোধপুর।

রাও জোধার কনিষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে ছিলো রাও দুদাজী। তাকে দেওয়া হয়েছিলো একটা ছোটো রাজ্য নাম মেরতা। দুদাজীর চার ছেলে সবার বড়ো বীরমজী আর সবার ছোটো রতনসিংহ। মেরতা শহরের কাছে কুড়কী গ্রাম ছিলো রতনসিংহের জায়গীর। সেই রতনসিংহের মেয়ে মীরাবাঈ।

আমাদের কাহিনীর আরম্ভ হচ্ছে ১৫১৬ খৃস্টাব্দে। মেবার এ সময়ে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। জোহর অঞ্চলে রূপো ও সীসের খনি আবিষ্কারের ফলে খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তার সমৃদ্ধি। দক্ষিণে মালব দুর্বল হয়ে গেছে সুলতান নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর। দিল্লীতে সুলতান সিকন্দার লোদীর রাজত্ব প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাবর এখনো শুধু কাবুলেরই রাজা। ভারতে আসতে কিছু দেরি আছে। চৈতন্যদেব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণ শেষ করে পুরীতে ফিরে এসেছেন। মারওয়াড়ের সিংহাসনে বসেছে মীরার পিতামহ রাও দুদাজীর ভাই রাও সাজা। মেবারের রাণা সাঙ্গা দিল্লীকেও নিজের দখলে আনবার কথা ভাবতে শুরু করেছে।

সে সময় একটা পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কথা রাণা সাঙ্গার কাছে অসম্ভব মনে হয়নি। যদি তাই হয় তাহলে সে রাজ্যের ভাবী সম্রাট হবে কুমার ভোজরাজ। তাকে সেভাবেই তৈরী করেছিলো রাণা সাঙ্গা।

সেই ১৫১৬ খৃস্টাব্দে রাণা সাঙ্গার মনে হোলো এবার ভোজরাজের বিয়ে দিতে হবে। কোনো রাজবংশ থেকে এমন একটি মেয়ে খুঁজে আনতে হবে যে দিল্লীর ভাবী সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত।

॥ দুই ॥

ছোটো ছোটো টিলা। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো লাল রঙের পাথরের চাঁই। কোথাও বা মাটি ক্ষয়ে গিয়ে ধূসর পাষাণ, এখানে সেখানে সাঙ্গরের বন, কেজড়ীর জঙ্গল, ছোটো-বড়ো কাঁটা গাছ। মাঝে মাঝে দু-একটা বট বা অশথ। শীর্ণ আঁকাবাঁকা পথে হলদে ধূলো। আর গাঢ় নীল আকাশ। —এই নিয়ে মারওয়াড় দেশের রুক্ষ সৌন্দর্য। অনেক দূরে দূরে ছাগল চরাচ্ছে মাথায় লাল নীল রংয়ের সাফা বাঁধা দু-তিনজন গ্রামবাসী। আর কোনো জনমানব নেই। চারদিক স্তব্ধ।

তখন বেলা পড়ে আসছে। সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কানে এলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। হয়তো বা দু-একজন মুখ ফিরিয়ে তাকালো। কিন্তু কোনো কৌতূহল দেখা গেল না তাদের চোখে। হয়তো প্রায়ই দেখে সওয়ার দুজনকে নিশ্চয়ই জানে তাদের পরিচয়।

খুব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ঘোড়া দুটো। মাঝে মাঝে গতি কমিয়ে একটি টিলার খাড়া গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে। তারপর আবার খুব জোরে ছুটে নেমে যাচ্ছে। কখনো বা লাফিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে কোনো নিচু ঝোপের বাধা। মাঝে

মাঝে শোনা যাচ্ছে দুজনের উচ্চকণ্ঠে হাসি।

মিষ্টি গলা। অল্প বয়েস, একটি হাসি মেয়েলী গলায়।

কাছে এলে দেখা যায় দুটি ঘোড়ার পিঠে অল্পবয়েসী একটি ছেলে ও মেয়ে। ছেলেটির মাথায় জরীর কাজ করা রঙীন পাগ, পরনে চুড়িদার পাজামা আর আঁট জামা। কোমরে তলোয়ার, হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। বলিষ্ঠ রুক্ষ সুন্দর চেহারা।

মেয়েটির রংদার বিস্তৃত ঘাগরা ঘোড়ার দু পাশে ঝালরের মতো ছড়িয়ে আছে। হাওয়ায় উড়ছে হালকা রঙের উত্তরীয়। খুব ফরসা গায়ের রং।

ওরা একজন আরেকজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার গতি কমিয়ে হেসে উঠছে একসঙ্গে।

একটি টিলার উপর উঠে ছেলেটি ঘোড়ার রাশ টেনে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। মেয়েটিও থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলেটি হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখালো।

তাকিয়ে দেখলো মেয়েটি।

দূরে একটি খোলা জায়গায় একটি খুব উঁচু বটগাছ। তার তলায় দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ-ছ'জন অশ্বারোহী।

একজন আঙুল বাড়িয়ে আকাশের দিকে কি যেন নির্দেশ করছে। মুখ উঁচু করে দেখছে অন্যরাও।

ছেলেটি আর মেয়েটিও দেখতে পেলো। কয়েকটি তিতির পাখী উড়ে যাচ্ছে বেশ নিচু দিয়ে। অশ্বারোহীদের একজন ধনুক তুলে তীর বসিয়ে নিশানা করলো।

মেয়েটি হাত বাড়ালো ছেলেটির দিকে। ছেলেটি নিজের তীর ধনুক দিলো তাকে।

বটগাছের তলায় সেই অশ্বারোহী তীর ছুঁড়তে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একটা শব্দ হোলো। যে কোনো যোদ্ধার খুব চেনা শব্দ। ওরা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দেখলো গাছের গুঁড়িতে একটি তীর এসে বিঁধছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা তারপর আরেকটা।

ওরা সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো অন্যদিকে। দেখতে পেলো ঘোড়া ছুটিয়ে টিলা বেয়ে নেমে আসছে দু-জন সওয়ার। একজনের হাতে খোলা তলোয়ার।

এরাও তলোয়ার খুলে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে।

ঘোড়া দুটো কাছে এগিয়ে এসেছে।

আরে, একটি মেয়ে,—অবাক হয়ে বলে উঠলো একজন।

চেহারা দেখে বড়ো ঘরের মেয়ে মনে হচ্ছে, বললো আরেকজন।

ততক্ষণে ঘোড়া দুটো কাছে এসে থেমে গেছে। ছেলেটির হাতে তলোয়ার। মেয়েটির হাতে ধনুক বাণ।

এরা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো মেয়েটির মুখে একটা অপরূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। ফরসা মুখ ঘোড়া ছোটানোর পরিশ্রমে একটু রাঙা হয়ে আছে।

ছেলে আর মেয়েটিও এদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। সওয়ার ক'জনকে খুব সম্ভ্রান্ত বলে মনে হয়। সবারই বলিষ্ঠ চেহারা। সামনের একজনের বয়েস অন্যদের চাইতে কম, তাদের দুজনের চাইতে বেশী হবে না।

তলোয়ার ধরেছেন? —মেয়েটি প্রশান্ত হাসি হেসে বললো, সামনের অল্পবয়েসী সওয়ারকে।—একটি মেয়েকে দেখে? আপনি রাজপুত?

যাকে বলা হোলো তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। উত্তর দিলো—আমি সিসোদিয়া।

মেয়েটি বললো,—আমরা রাঠোর।

তরুণ সওয়ারের পাশে ছিলো এক-জন প্রবীণতর সওয়ার। সে জিজ্ঞেস করলো,—তুমি আমাদের দিকে তীর ছুঁড়ছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—ইনি একটি নিরীহ পাখি মারতে যাচ্ছিলেন। খুবই অন্যায়। তাই বাধা দিতে হোলো।

—তীর ছুঁড়ে? ইনি জখম হতে পারতেন।

—না, তা হোতো না। আমি তীর ছুঁড়েছি খেজুর গাছ লক্ষ্য করে।

—যদি গায়ে লেগে যেতো?

মেয়েটি হাসলো। মুখ ফিরিয়ে তাকালো অন্যদিকে।

—ওই দেখুন।

অন্যরাও তাকালো। একটু দূরে একটি ক্যায়র গাছ। একটি বেগনী রঙের কমেড়ী পাখি বসেছে একটি শুকনো ছোটো সরুডালের উপর।

সাঁ করে একটি তীর চলে গেল সেদিকে। মাটিতে এসে পড়লো সরু ডালটি। পাখি উড়ে গেল।

মেয়েটি বললো,—ডাল দেখেই তাক করেছিলাম, পাখির দিকে নয়। পাখির গায়ে লাগেনি।

—তুমি কে? —জিজ্ঞেস করলো বয়স্ক সওয়ার।

—আমায় আপনি করে বলবেন।

খুব শান্ত, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠে কিন্তু তার মধ্যে আছে একটা দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ।

কোনো উত্তর দিলো না সেই সওয়ার। তার চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি।

মেয়েটির সঙ্গী ছেলেটি বয়স্ক সওয়ারের পাশের তরুণ সওয়ারের দিকে তাকিয়ে বললো,—তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখুন।

—কেন?—সে জিজ্ঞেস করলো।

—রাঠোর কন্যার সঙ্গে তলোয়ার হাতে কথা বলা অত্যন্ত বেয়াদবী।

তরুণ সওয়ার একটু হাসলো। তলোয়ারও কোষবদ্ধ করার কোনো রকম আগ্রহ দেখালো না। বললো,—আমার সঙ্গে কেউ ওভাবে কথা বলে না। তুমি জানো না আমি কে।

—আপনি যেই হোন,—উত্তর দিলো ছেলেটি,—মেবারের মহারাণা হলেও আমি পরোয়া করি না। আমি রাঠোর।

—হুঁম?—আবার হাসলো তরুণ সওয়ার।

হঠাৎ শোনা গেল ইস্পাতে ইস্পাত ঠোকার ক্ষণিক ঝনঝনা। পরপৃষ্ঠায়

তরুণ সওয়ারের হাত থেকে তলোয়ার বিচ্যুত হয়ে চড়কি পাক খেয়ে উপর দিকে উঠে গেল। তারপরই নেমে এলো নিচের দিকে। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই হাত বাড়িয়ে তলোয়ারের হাতল বাঁ হাতে ধরে ফেললো ছেলেটি। তারপর হাত বাড়িয়ে সেটি দিলো মেয়েটির হাতে।

পেছন থেকে আরেকজন সওয়ার তলোয়ার হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে দু' তিন কদম এগিয়ে এলো।

তরুণ সওয়ার তর্জনীর ইশারায় তাকে থামালো।

ছেলেটি বললো,—ওকে থামালেন কেন? না হয় একটু দেখতো যে, রাঠৌর তলোয়ার ধরতে জানে।

—না জয়মল, ঝগড়া কোরো না,—বললো মেয়েটি, রাজপুতের সঙ্গে রাজপুতের কোনো ঝগড়া নেই। না মানুষের সঙ্গে মানুষের।

মেয়েটি তলোয়ার ফিরিয়ে দিলো তরুণ সওয়ারকে। তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে বললো,—চলো।

চোখের পলকে ছেলেটি আর মেয়েটি ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হয়ে গেল, নিজেদের পরিচয় দিলো না। ওদের পরিচয়ও জানতে চাইলো না।

এরাও রওনা হোলো। খানিকটা এসে দেখতে পেলো এক গ্রামবাসীকে। সে একটি লাঠি নিয়ে ছাগলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করছে।

সূর্য ঢলে পড়েছে একটি ছোটো পাহাড়ের পেছন দিকে। আকাশের রং লালচে।

—এই শোনো, মেরতা এখান থেকে কদ্দুর?

—ওই যে টিলা দেখছেন, তার পেছন দিকে যে রাস্তা, সেটা ধরে এগুলেই মেরতা শহর।

—নাম কি তোমার?

—কেশোলাল।

—আচ্ছা, তুই যে একটু আগে ঘোড়ায় চেপে যে দুজন চলে গেল, ওদের জানো?

—ওদের সবাই জানে।

—ওরা কে?

—একজন হলেন আমাদের রাজা বীরমজীর ছেলে জয়মল। আর অন্যজন হলেন বীরমজীর ছোটো ভাই রতন সিংজীর মেয়ে মীরাবাঈ।

ঘোড়সওয়ারেরা পরস্পরের দিকে তাকালো। তাদের চোখে ফুটে উঠলো কৌতূহল।

॥ তিন ॥

ঘোড়সওয়ারেরা যখন মেরতা শহরে এসে পৌছালো তখন গোধুলি। বিকেলে হাট বসেছে। কিছু কিছু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। অনেকে ফিরে আসছে সারাদিনের কাজকর্ম সেরে। পথে জায়গায় জায়গায় ছাগলের দল তাড়িয়ে নিয়ে আসছে অনেকে। তাদের মাঝখান দিয়ে পথ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো ছয়জন সিসোদিয়া ঘোড়সওয়ার।

সবার আগে আগে যাচ্ছিলো সেই বয়স্ক ঘোড়সওয়ার। সে একবার ফিরে তাকিয়ে বললো,—বীরমদেবজীকে আমাদের আসার খবর দিলে ভালো হোতো। উনি তোমার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে রাখতেন।

তরুণ ঘোড়সওয়ার উত্তর দিলো, —না সুরজমলজী, এই বেশ। আমরা যে এখানে এসেছি সে কথা বেশী জানাজানি না হওয়াই ভালো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়লো মহলের সামনে। সামনের দিক প্রায় দুর্গের মতো, প্রয়োজন হলেই যাতে ফটক বন্ধ করে ভিতর থেকে প্রতিরোধ করা যায়। তখন খুব অনিশ্চিত সময়। কখন এসে হামলা আরম্ভ করে কোনো শত্রুবাহিনী তার কোনো স্থিরতা নেই। পাথরের তৈরী মহল, চারিদিকে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন প্রহরী। বন্ধ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দশজন সশস্ত্র সৈনিক।

ওরা কাছাকাছি আসতেই ফটক খুলে গেল। দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল সৈনিক প্রহরীরা। ওরা সমস্বরে অভিবাদন করলো আগন্তুকদের।

এরা অবাক হোলো। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার আগেই একজন এগিয়ে এলো ভেতর থেকে। মুখ দেখে মনে হয় বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু শরীর অল্পবয়েসীদের মতোই বলিষ্ঠ এবং পেশী সংবদ্ধ।

সৈনিকের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে এসে তরুণ ঘোড়সওয়ারকে অভিবাদন করে বললো,—কুঁবর-সা', ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক। আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে মেরতার রাজমহলে। আমি তাতে কৃতার্থ মনে করছি নিজেকে।—তারপর বয়স্ক ঘোড়সওয়ারের দিকে ফিরে বললো,—আসুন সুরজমলজী।

সুরজমল তরুণ ঘোড়সওয়ারের দিকে ফিরে বললো,—রাও বীরমদেবজী।

তরুণ ঘোড়সওয়ার চট করে ঘোড়া থেকে নেমে অভিবাদন করলো বীরমদেবকে। বললো,—আপনার সৌজন্যে আমরা যতো না খুশী, তার চাইতেও বেশী অবাক হয়েছি। —কি করে জানলেন আমরা এসেছি?

বীরমদেব হাসলো। উত্তর দিলো,—রণমল্ল আর মীরার সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে। রণমল্ল মহলে ফিরে এসে আমাকে জানালো ছজন সিসোদিয়া ঘোড়সওয়ার আসছে। আমি তাইতে অনুমান করে নিলাম। আমার ভাই রতন সিং কিছুদিন আগে চিতোরগড় থেকে আমায় খবর পাঠিয়েছিলো যে, আপনারা কয়েকদিনের মধ্যেই রওনা হবেন। আমি অনুমান করেছিলাম যে, আপনারা খবর না দিয়েই আসবেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে মহলের দোতলায় একটি ছোটো ঘরে বসে সুরজমল একাই কথা বলছিলো বীরমদেবের সঙ্গে।

—অনুমান করেছিলেন?—সুরজমল জিজ্ঞেস করলো।

বীরমদেব বললো,—তাই তো স্বাভাবিক। জোধপুরের সঙ্গে চিতোরের

একটা কথা বললাম তাতে কথাটা আগেই জানাজানি হয়ে যায় এটা রাণা সাঙ্গাজী চাইবেন না।

সুরজমল হেসে বললো,—রাণাজী চারদিক আটঘাট বেঁধেই কাজ করেন। এমন ব্যবস্থা করছেন যাতে জোধপুরের রাওয়ল সাঙ্গাজী কিছু মনে না করেন।

—কি ব্যবস্থা করছেন?

—চিতোরগড়ে ধনবাঈয়ের ইজ্জত খুব বেড়ে গেছে। তাঁকে কয়েকটি নতুন জায়গীর দিয়েছেন রাণাজী।

বীরমদেব হাসলো। রাণা সাঙ্গার অন্যতমা রানী ধনবাঈ রাও সাঙ্গার আপন বোন,—এবং বীরমদেবের বিমাতা বোন।

সুরজমল বলে গেল,—রাও সাঙ্গার ছেলে মল্লদেবকেও নিয়ে রেখেছেন নিজের কাছে।

—তাহলে সাঙ্গাজী কিছু মনে করবেন না?—জিজ্ঞেস করলো বীরমদেব।

—কোনো রকম বাধা। দেওয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন না।

—আমার মনে হয় খুশিই হবেন,—বীরমদেব বললো,—রাঠোরদের সঙ্গে সিসোদিয়াদের আত্মীয়তা অনেক-দিনের। রাণা লাখার পত্নী হংসাবাঈ ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ চুণ্ডাজীর কন্যা। আমার পিসী শৃঙ্গারবাঈয়ের বিয়ে হয়েছিলো রাণা সাঙ্গার বাবা রাণা রায়মলজীর সঙ্গে। আমার পত্নী রাণা রায়মলজীর কন্যা।

—তবু রাঠোরদের সঙ্গে সিসোদিয়া-দের এত শত্রুতা,—সুরজমল হেসে বললো,—আপনার ছেলে জয়মল্ল যেই শুনলো কুঁবর-সা' এবং তাঁর সঙ্গীরা সিসোদিয়া অমনি ক্ষেপে যাওয়া বাঘের বাচ্চার মতো ফুলে উঠলো। মনে একটু ভয় নেই, আমরা ছজন, ও একা, চোখের পলকে তলোয়ার কেড়ে নিলো কুঁবর-সা'র হাত থেকে।

বীরমদেব বলে উঠলো ব্যস্ত হয়ে,—ওর অল্পবয়েস। ওকে আপনারা মার্জনা করবেন। আপনাদের পরিচয় না জেনে ওরকম অশোভন ব্যবহার করেছে। আমি ওকে ডেকে বলবো কুঁবর-সা'র কাছে ক্ষমা চাইতে।

—না, না, কিছু বলবেন না। আমরা মনে মনে প্রশংসা করছিলাম ওর সাহসের। ওকে চমৎকার অস্ত্র-বিদ্যা শিখিয়েছেন। এবং মীরাকেও।

—আমি নয়। আমার পিতা রাও দুদাজী। আপনি তো জানেন মীরার মা বীরকুমারী যখন মারা যায় তখন মীরার বয়েস মাত্র পাঁচ বছর। আমি আর রতন সিং দুজনেই তখন সাঙ্গাজীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি মেবারের অন্য রাজকুমারদের সঙ্গে সাঙ্গাজীর লড়াইয়ে। তখন থেকে জয়মল্ল আর মীরা মানুষ হয়েছে রাও দুদাজীর কাছে। দুজনে এক বয়েসী। দদাজী দুজনকেই খুব ভালোবাসতেন। জয়মল্লের সঙ্গে মীরাকেও একই রকমভাবে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। রাজবংশের মেয়েদের যেরকম ভাবে তৈরী করা হয় অন্য রাজবংশের আদর্শ বধূ ও ঘরণী হবার জন্যে, তা তো দিয়েছেনই। সেই সঙ্গে একদিকে যে রকম নাচগান এসব ভালোভাবে শিখিয়েছেন, অন্যদিকে ঠিক ছেলেদের মতোই ঘোড়ায় চড়া, অসি চালনা, ধনুর্বিদ্যা এসবও শিখিয়েছেন।

সুরজমল তেমন অবাক হোলো না এ কথা শুনে, কারণ সে সময় রাজপুত রাজবংশের মেয়েদের যুদ্ধ-বিদ্যাও শেখানোর রেওয়াজ ছিলো। চিতোরের রানীদের সময় সময় তলো-য়ারও ধরতে হয়েছে। সে সব ঘটনায় আমরা পরে আসছি।

—জয়মল্ল ও মীরাকে দরবারে সব সময় নিজের পাশে পাশেই রাখতেন রাও দুদাজী,—বীরমদেব বলে গেল,—এখনকার রাজনীতিতে নিজে শিখিয়ে পড়িয়ে ওয়াকিবহাল করেছেন দুজনকে। যদি মীরার সঙ্গে কথা বলেন, দেখবেন হিন্দুস্থানের রাজনীতি সে আপনাদের চাইতে কম বোঝে না।

—কিন্তু শুনেছি মীরাজী নাকি বেশিরভাগ সময় ভজনপূজন নিয়েই পড়ে থাকেন।

একটা স্নেহের হাসি দেখা দিলো বীরমদেবের মুখে। বললো,—হ্যাঁ। ও যখন একেবারে ছোটো সন্ত রই-দাসজী পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন এই মহলে। ওঁর কাছে ছোটো একটি কৃষ্ণের মূর্তি ছিলো।

—রইদাসজীর কাছে কৃষ্ণের মূর্তি? উনি তো রামভক্ত।

—শুনেছিলাম কাশীতে যখন রইদাসজীর সঙ্গে দেখা হয় রাণা সাঙ্গা-জীর মা রানী রতনকুমারী ঝালীর, তখন উনি রইদাসজীকে দিয়েছিলেন এই গিরধরজীর মূর্তি। যাই হোক, ভক্ত সাধকের কাছে কৃষ্ণ আর রামে কোনো তফাৎ নেই। রইদাসজী যখন মেরতায় এলেন তখন তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। আমরা কানাঘুসো শুনেছিলাম উনি কাউকে না জানিয়ে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—কাকে তিনি দিয়ে যাবেন গিরধরজীর মূর্তি তাই খুঁজবার জন্যে। উনি এ সময় নিজের পরিচয় দিতেন না কাউকে। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছিলাম। কয়েকদিন তিনি আমাদের এখানে থাকলেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতো-টুকু সামর্থ্য সে অনুযায়ী তাঁর সেবা করলাম। উনি চলে যাওয়ার সময় তিন বছরের মীরা হঠাৎ কান্না জুড়ে দিলো,—ওই গিরধরজীর মূর্তি ওর চাই। আমরা ওকে বোঝালাম ওটা খেলনা নয়। ওকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলাম। রইদাসজী চলে গেলেন। কিন্তু আবার ফিরে এলেন পরদিন। উনি নাকি স্বপ্নেও শুনেছিলেন তার কান্না। আর মনের ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে বলছিলো মূর্তিটি মীরাকেই দেওয়ার জন্যে। যাওয়ার আগে মীরার মাথায় হাত রেখে বললেন,—তোমাকে দীক্ষা দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি আর বেশীদিন নেই। তুমি বড় হয়ে উঠতে এখনো অনেক দেরি। তোমার কানে গিরধরজীর নাম বলে দিচ্ছি। এই আমার দীক্ষা।

—এসব কথা শুনলে রাণাজী খুব খুশী হবেন,—সুরজমল বললো,—আমারও খুব ভালো লাগছে।

বীরমদেব বলে গেল,—সেই থেকে মীরা পড়ে থাকে গিরধরজীর সেবা নিয়েই। ছেলেবেলার ঘটনা সে শুনেছে। তার ধারণা, সন্ত রইদাসজীই তার দীক্ষাগুরু।

—আমাদের রাজমাতা রানী ঝালীও তা রইদাসজীর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন,—বললো সূরজমল।

—উনি তো সত্যি সত্যি দীক্ষা নিয়েছিলেন,—বীরমদেব উত্তর দিলো,—মীরার তো তা নয়। তাই বলছিলাম এ ব্যাপারে ওর একটু পাগলামি আছে। কিন্তু মীরা আমার বড়ো ভালো মেয়ে। রাও দুদাজীর মৃত্যুর পর থেকে সে আমার সঙ্গেই আছে। আমার কখনো মনে হয় না যে সে আমার মেয়ে নয়।

—সত্যি আপনার মেয়ে খুব ভালো। অল্পক্ষণ যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হোলো, সে রাজবংশের বধূ হওয়ার যোগ্যাই বটে। এত তেজ অথচ কী নম্র।

—ওর মন খুব কোমল,—হেসে বললো বীরমদেব,—এত ভালো তীরন্দাজ, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনোদিন একটি পাখিও মারতে দেখিনি। গাছের ডাল ফল পাতা, ওসবের উপরই লক্ষ্যভেদ।

—হ্যাঁ, আমি দেখেছি,—সূরজমল হাসলো,—তবে একটা কথা। এখন বয়েস হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে যে বাইরে ঘুরে বেড়ায় সেটা কি ঠিক?

বীরমদেব একটু গম্ভীর হোলো। বললো,—মেরতার অধিবাসী সবাই তাকে খুব ছেলেবেলা থেকে দেখছে। সবাই তার আপনজন।

সূরজমল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই; তা ছাড়া বিয়ে হয়ে গেলে পরে রাজমহলের অন্তঃপুরের বাইরে আসার তো অবকাশ থাকবে না। সুতরাং এই স্বাধীনতা এখন যতোটা ভোগ করে নেওয়া যায়।

ওরা যখন কথা বলছিলো, সেখানে এসে উপস্থিত হোলো বীরমদেবের ছেলে জয়মল্ল। সে বীরমদেবের দিকে একবার তাকালো, কিন্তু চিনতে পেরেছে এমন কোনো ভাব দেখালো না। যদিও সে খুব সংযত, বীরমদেবের মনে হোলো সে একটু উত্তেজিত হয়ে আছে।

—কিছু বলবে?—জিজ্ঞেস করলো বীরমদেব।

জয়মল্ল সূরজমলের দিকে একবার তাকালো, তারপর বীরমদেবের দিকে ফিরে বললো,—আমাদের সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে একজনের ব্যবহার আমার খুব অশোভন মনে হয়েছে। তবে আমি নিজেদের থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করতে এলাম।

—কেন, কি হয়েছে?

—মহলে তেতলায় যাঁর ঘর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তিনি নিচে নেমে অন্তঃপুরের সামনে গিরধরের মন্দিরের ভিতর গিয়ে ঢুকেছেন। ওঁকে গিয়ে কি বলবো এই মন্দির শুধু মহলের লোকেদের জন্যে?

বীরমদেব একটু হাসলো। সূরজমল তাকালো তার দিকে। বীরমদেব সূরজমলের দিকে ফিরে বললো,—মন্দির বলতে সবাই যা বোঝে ঠিক তা নয়। অন্তঃপুরের দিকে একটি বড়ো ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মীরার গিরধরের পুজোর জন্যে। আমরা এমনিতে মন্দির বলি।—মীরা এখন কি করছে জয়মল্ল?

—মন্দিরেই আছে। ভজন গাইছে।

বীরমদেব বললো,—এঁকে চেনো? এসো, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি সূরজমল হাডা, বুঁদীর রাও নর্বদ সিং হাডার ছেলে। এখন চিতোর দরবারে রাণা সাঙ্গাজীর কাছেই আছেন।

জয়মল্ল ভদ্রতা রক্ষা করে একটু অভিবাদন করলো, তারপর বীরমদেবকে জিজ্ঞেস করলো,—আমাদের সেই অতিথির ব্যাপারে তো আমায় কিছু বললেন না। আমি গিয়ে কি ওঁকে পাঠিয়ে দেবো বাইরে চতুর্ভুজের মন্দিরে?

—না,—উত্তর দিলো বীরমদেব,—অন্তঃপুরের মন্দিরে যাওয়ার অধিকার তার আছে। একটু পরে অন্তঃপুরের ভেতরেই যাবে। তোমার মা ওর পিসী।

একথা শুনে অবাক হয়ে তাকালো জয়মল্ল।

বীরমদেব বললো,—উনি মেবারের টিকায়েত, মেবার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কুমার ভোজরাজ। মহারাণা সাঙ্গাজীর বড়ো ছেলে।

[ক্রমশ]

আহা পৃথিবী

ভীমরুল

জীবনে কোন কিছুর পেলাম না স্বাদ
কেবল ভূতের মতো বেগার খাটলাম
আর সংসারের বোঝা বয়ে মরলাম
এই দিনরাত, রাতদিন-দিনরাত।

আহা পৃথিবী! তোমার বিশাল অঙ্গনে
আছে, বিলাসবহুল অট্টালিকা বাড়ি
কিন্তু, চাইনি ত' তা-চাইনি ঘোড়া গাড়ি
বা। ছিল না লোভ কাহারো গচ্ছিত ধনে।

যারা লুটছে মুনাফা মানুষ মেরে
তাদের প্রতি তোমার যতো দয়া দাক্ষিণ্য
যাদের-পথের ধুলোয় জীবন ধন্য
তাদের প্রতি তোমার দৃষ্টি নাহি পড়ে।

আহা পৃথিবী! তোমার পক্ষপাত সার।
কাউকে দিয়েছো ঐশ্বর্য দু'হাত ভরে
কাউকে দিয়েছ ঐশ্বর্য দু'হাত ভরে
আহা পৃথিবী! কি বিচিত্র বিচার তোমার।

পুতুল নাচের কাহিনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(একই দৃশ্য। কেবল নাট্যকার অনুপস্থিত)

ঝর্ণা। (একই ভাবে) আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। (সকলে চুপ করে থাকবে) অভিনয় কেন বন্ধ হয়ে গেল? তুমি কি বলছিলে ঊর্মিলাদিকে?

অসীম। অভিনয় যখন বন্ধ হয়ে গেছে—তখন সবকিছু নির্ভয়ে বলতে পারি। এখন তো আর কারো চোখ-রাঙানীর ভয় নেই।

ঊর্মিলা। ভয় কিসের? আমরা কি এমন প্রতিশ্রুতি ওর কাছে দিয়েছি—যে দিনের পর দিন একই বাঁধানো গতের অর্কেস্ট্রার মত একটানা বেজে যাব।

অসীম। তা ছাড়া ওকে? আমরা বোকার মত ওকে মেনে চলি কেন?

শঙ্কর। একটা আশ্চর্য ঘটনা অসীম। এতদিন আমরা হাজার প্রশ্নের ঢেউ-এ হাবুডুবু খেয়েছি কিন্তু কখনও তো ওকে মুখ ফুটে বলতে পারি নি—আমাদের জীবন ওর শেখানো বুলি আউড়ে কেন কাটাতে হবে? ঊর্মিলা কথাটা কি তুমিও ভাবোনি।

ঊর্মিলা। ভেবেছি। অনেকবার জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আবার তোমাদের মুখ চেয়ে থেমে গেছি।

শঙ্কর। আমাদের মুখ চেয়ে থেমে গেছো? কেন?

ঊর্মিলা। আমার প্রশ্ন যদি তোমাদেরও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতো, তাহলে ওর সাজানো তাসের ঘর যে তখুনি ভেঙ্গে পড়ত চুরমার হয়ে। আমরা কি ভীষণ বোকা—সমাজ, সংসার, সংস্কার, সম্পর্কের হাজার দাবী মানতে মানতে কখন পুতোয় বাঁধা পতুলে পরিণত হয়েছি অথচ কোনদিনও সাহস করে বলতে পারিনি—মিথ্যা অভিনয়কে সত্যিকার জীবন বলে মেনে নিতে পারব না।

ঝর্ণা। কিন্তু ঊর্মিলাদি না মেনেও কি কোন লাভ আছে।

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

শঙ্কর। আমাদের তিনজনের অনেক পোড়-খাওয়া সিনিকাল জীবন-দর্শন তুমি বুঝতে পারবে না ঝর্ণা—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। তোমার সাজানো-গোছানো পৃথিবীতে এখনও ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখা দেয়নি। আমার মনে হয় আমাদের কথা-বার্তার মধ্যে তোমার না থাকাই উচিত।

ঝর্ণা। না শঙ্করদা—সত্য কথাটা আমিও জানতে চাই। অনেক সময় আপনাদের তিনজনকেই আমার হেঁয়ালী বলে মনে হয়েছে। মঞ্চে যা বলছেন, বুঝতে পেরেছি সেটা কৃত্রিম। মনের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য আর এক ভাবভঙ্গি—আমি ভালো করে তার মানেও ধরতে পারি না।

শঙ্কর। মানে বোঝো কিই বা করবে। তার চেয়ে একটা গান শোনাও। অভিনয়ে আজ তোমার কোন গান গাওয়ার কথা ছিল যেন—'আমার মল্লিকা বনে—'

ঝর্ণা। না না; ওটা তো আগেই দিন গেয়েছি। আজকে ভাবছিলাম 'এই তো তোমার প্রেম ওগো—' অথবা আপনার সেই ফেভারিট গানটা—ঐ যে—'মনে রবে কিনা রবে আমারে—

শঙ্কর। অভিনয়ের দৃশ্য শেষ হলেও গান যে জমে, তার প্রমাণ দিয়ে দাও—

অসীম। গান এখন থাক শঙ্কর। তার চেয়ে আমরা বরং নিজেরাই নতুন গল্প তৈরী করি। ওর গল্পের সঙ্গে যার এতটুকুও মিল নেই। অর্থাৎ যা পেয়েছি, তাকে ভুলে যা চেয়েছিলাম।

ঝর্ণা। সে গল্প যদি কোন গল্প-লেখক পত্রিকার পাতায় লিখতেন, তাহলে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু জীবন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার অনেক ন কি। সত্যিই বলছি শঙ্করদা—আমার কেমন ভয় করছে। তার চেয়ে—তার চেয়ে—

শঙ্কর। তোমার কোন ভয় নেই ঝর্ণা। আমার আর ঊর্মিলার জীবনে যে জট পড়েছে—তাতে তুমি অন্তত জড়াও নি

ঊর্মিলা। ঝর্ণা নিজের কথা একটুও ভাবছে না। এখনও মিছিমিছি না-বোঝার ভাণ করছ কেন? ওর ধারণা—অসীম আমাদের সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছে। হয়তো পড়েছে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি ভাই। আমাদের সম্পর্কের

ভিত্তি গড়ে ওঠে চোরাবালির উপরে। আজ যা আছে, কাল তা নেই। কোথাও এতটুকু চিহ্নও আর পাবে না। কাজেই সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কিচ্ছু লাভ হয় না।

ঝর্ণা। আমিও তো তাই বলছি উর্মিলাদি। মনে মনে যা জানি, তাকে মুখে প্রকাশ করে কি হবে? তবু ভাণ করে থাকার দেওয়ালগুলো আমাদের অনেকখানি সামলে রাখে।

উর্মিলা। ঝর্ণা যখন বলছে, তখন আজকের মত আমরা না হয় অভিনয় করেই কাটিয়ে দিই।

অসীম। না। সারাজীবন ধরেই তো অভিনয় করে চলেছি। এই দেখো, হাতে সেই সুতো-গুলোর দাগ কেমন গভীরভাবে কেটে বসেছে। ভুলে থাকবো মনে করলেও ভুলে থাকা যায় না। অনেকদিন বাদে আজকে কিছু-ক্ষণের জন্য পুতুল নাচের পুতুল হওয়ার দুর্ভোগ যখন কেটেছে, তখন না হয় মানুষের পার্ট প্লে করা যাক।

উর্মিলা। মানুষও কিন্তু আসলে পুতুল। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।

শঙ্কর। আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। এসো, আমাদের চার-জনকে নিয়ে প্রত্যেকে মুখে মুখে একটা গল্প তৈরী করি। যে যেমনটি চাই।

উর্মিলা। যা চাই, তা বলার সাহস আমাদের ক'জনের আছে?

অসীম। আমার আছে।

ঝর্ণা। না, না, যা পাবার নয়, তাকে চেয়েই বা কি হবে। শঙ্করদা, আমি বরং একটা গান শোনাই।

অসীম। গান শোনার মুড আমাদের একটুও নেই ঝর্ণা। প্লিজ, তুমি কায়দা করে বাধা দিতে চেষ্টা কোর না। সত্যিকে স্বীকার করতে তোমার এত ভয় কেন?

ঝর্ণা। কোনটা সত্যি, তা কি তোমরাও জানো।

অসীম। নিজের কাছে নিজে যতক্ষণ ভণ্ডামী করছি না, ততক্ষণ আমি সত্যিকে স্পষ্ট করেই দেখতে পাচ্ছি।

উর্মিলা। নিজের কাছেই মানুষ সব-চেয়ে বেশী ভণ্ডামী করে এবং একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে চিরকাল সত্যিকে আমরা নিজেরা খুশিমত একটা চেহারা দিই। সেটা আসল নয় সম্পূর্ণ নকল।

শঙ্কর। আমি যা সত্যি মনে করি, তুমি তা কর না। তার মানে দাঁড়ালো এটা একটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ঝর্ণা। কক্ষণো না। সত্যি সব সময়ে সত্যি। তোমরা ইচ্ছা করে সব কিছু বিকৃত করে দেখছ। একটা ছবিকে উল্টো করে দেখার মত। কিংবা মাথা মাটিতে রেখে পা শূন্যে তুলে যে ভাবে পৃথিবীকে লোকে দেখে। উর্মিলাদি, জীবন এমনিতেই জটিল, আরও জটিল কেন করতে চাইছেন আপনারা। আমিই বরং খুব সহজ করে গল্পটা শুরু করে দিই। যে-কোন কারণেই হোক আজকে আমাদের কারো মন ভালো নেই। তাই জীবন সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলছি। তারপরে আমরা যে যার পৃথিবীতে ফিরে যাব। সব কিছু মেনে নেব বিনা দ্বিধায়, বিনা অভিযোগে। খারাপ ভালো দুটো মিলিয়েই তো বেঁচে থাকা।

অসীম। তোমার গল্পের আরম্ভই বা কি, আর শেষই বা কোথায়।

ঝর্ণা। আরম্ভ তো বললাম। শেষটা এখনই জানব কি করে।

অসীম। অর্থাৎ অভিনয় করতে করতে তুমি ঐ লোকটার দ্বারা সম্পূর্ণ হিপ্নটাইজড হয়ে গেছ। ওর গল্পের সঙ্গে তাই তোমার কল্পনার এত মিল। আমার গল্প শুনবে।

ঝর্ণা। (হঠাৎ উঠে অসীমের মুখ চাপা দিয়ে) চুপ কর তুমি। আমাদের ভবিষ্যৎকে এভাবে চুরমার করে দিও না।

অসীম। (হাসতে হাসতে) ঝর্ণা ভয় পাচ্ছে, পাছে আমার সঙ্গে উর্মিলার সম্পর্ক সবাই জেনে ফেলে। কিন্তু লুকোচুরির আর কি দরকার। আমি উর্মিলাকে ভালবাসতাম। শঙ্কর, তোমাকে চেনার ঢের আগে উর্মিলার সঙ্গে আমার পরিচয়।

শঙ্কর। সত্যি?

ঝর্ণা। না, না শঙ্করদা—ও সব বানিয়ে বলছে। উর্মিলাদি আপনি ওকে থামতে বলুন। এসব কথা তুলে কারো ভালো হবে না।

উর্মিলা। (ক্লান্ত সুরে) অসীম—তুমি কি মনে কর আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি? একটা বয়স পেরিয়ে গেলে, কাউকে দরকার হয় না। নিজেকে নিয়েই যত টানাপোড়েন।

অসীম। আমি তোমার যুক্তি মানি না উর্মিলা। তাই যদি সত্যি হোত, তাহলে তোমার জীবনে এত ফ্রাসট্রেশন কিসের।

উর্মিলা। (হাসতে হাসতে) অসীম—তুমি কি বোকা আর ছেলেমানুষ। আমি মনে মনে তোমার জন্যে ভেবে মরি, এই কথাটি তুমি বিশ্বাস কর? ঝর্ণা, তুমি ভাই ওর ছেলেমানুষীকে সিরিয়াসলী নিও না।

শঙ্কর। অসীমকে বলতে দাও উর্মিলা। আমার আর ঝর্ণার সব কিছু জানার অধিকার আছে।

উর্মিলা। আমি যখন তোমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অংশবিশেষ, তখন তো ষোলো আনা অধিকার মেনে নিতেই হবে। বল কি জানতে চাও। আমার গল্পটা। বেশ তো গোড়া থেকেই শুরু করি। অসীম তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, আমি ফার্স্ট ইয়ারে। ওর বোন নমিতা আমার সঙ্গে পড়ত, সেই সূত্রে আসা-যাওয়া। ঐ বয়সের ছেলে-মেয়েদের রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী

সম্পর্কে নতুন করে বলতে হবে না। ও আমাকে লুকিয়ে চিঠি দিতো, আমি জবাব দিতাম। তারপর ক্রমে সাহস বাড়ল। বাড়ী থেকে লুকিয়ে দুজনে লেকের ধারে দেখা করতাম—আর আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতাম।

শঙ্কর। তারপর?

অসীম। উর্মিলা, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে।

উর্মিলা। কে প্রতিজ্ঞা করে? কার কাছে? সেই তুমি আর আমি আজকে কি আর বেঁচে আছি। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা একটু একটু করে তিলে তিলে ফুরিয়ে যাই।

শঙ্কর। (আগের স্বরে) তারপর?

উর্মিলা। ও তুমি এখনও সেই গল্পের উপসংহার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। তারপরে আর কি? স্বাভাবিক নিয়মে ধরা পড়ে গেলাম। কি হয়েছিল যেন? সিনেমায় গিয়েছিলাম, তাই না, সেদিন সেজ মামারা নতুন জামাইকে ঠিক ঐ ছবিই দেখাতে নিয়ে যাবেন, তা আমি জানব কি করে, বাস, তারপরেই দরজায় তালা পড়ল। কোথায় যাই, কি করি, সবই অভিভাবকদের কড়া দৃষ্টির সামনে।

শংকর। তার ঠিক তিন বছর পরে, অর্থাৎ তুমি যেবারে বি-এ দেবে, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ।

উর্মিলা। ততদিনে বাড়ীর পাহারা ঢিলে হয়ে এসেছে। অসীমকে আমি ভুলে গেছি, এ কথা বুঝতে ওদের এতটুকুও অসুবিধে হয় নি। আর তুমি তো জাত গোত্র মিলিয়ে ভালো পাত্র। চাকরীও করছ মোটামুটি। আমার বাড়ীর লোকেদের কাছে এ বিয়ে তো অপছন্দের ছিলো না। তুমি কল্পনা করতে আমি ওদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে ছাতে উঠেছি, আসলে ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। সেজদি গায়ে সেন্ট মাখিয়ে দিত, মা বলত নীল শাড়ীতে বেশ মানায়। বাবা নিজে লেক মার্কেট থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেলফুলের মালা এনে দিতেন।

শংকর। এসব তো তুমি আগে আমাকে কোনদিন বল নি।

উর্মিলা। বলবার সুযোগ সুবিধা সময় পেলাম কখন। দিনের পর দিন শুধু অভিনয় করেই চলেছি।

শংকর। তবুও এতবড় একটা ফাঁকির কথা আমাকে আগে জানানো উচিত ছিলো।

উর্মিলা। ফাঁকি কি তুমিই আমাকে দিচ্ছ না। অসীম ঝর্ণা ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো। ওরা একে অন্যকে নিজেকে ক্রমাগত ফাঁকি দিয়ে চলেছে। সেই কি ঢাক পিটিয়ে বলার জিনিষ।

ঝর্ণা। আমি তখনই বলেছিলাম উর্মিলাদি। আপনারা ভয়ানক ভুল করছেন। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব আর একটা জগৎ থাকে—সেটা তার নিজেরই।

অসীম। তোমার নিজস্ব জগতের কথা তাহলে আমাকেও বল নি ঝর্ণা। আমার কিন্তু দারুণ কৌতূহল হচ্ছে।

ঝর্ণা। সব কথা সকলকে বলতে নেই। যতই হোক, সমাজ-সংসারের দায়িত্ব আমরা যখন একবার মেনে নিয়েছি।

অসীম। হয়েছে, হয়েছে। অভিনয়ের সময়ে ওসব বস্তাপচা বক্তৃতা শুনিও। আমরা এখন প্রত্যেকে সত্যিকথা বলব বলে প্রতিশ্রুত।

ঝর্ণা। পরে কিন্তু সত্যিকথার জের তোমাদেরই সামলাতে হবে। শংকরদা আমি কোন যুক্তি শুনব না, আমি গান শোনাবই। গীতবিতানটা কোথায়।

(টেবিল হাতড়ে বাঁধানো গীতবিতান নেবে। পাতা উল্টে)

কোনটা গাইব বলুন। 'এ পথে আমি যে—'

শংকর। একটা ঝড়ের গান গাও বরং। আজকে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছে।

ঝর্ণা। ঝড়কে তো নিজেরাই ইচ্ছে করে ডেকে আনছেন। এ কি ছেলেখেলা।

শংকর। একটা গান মনে পড়ে গেল। 'নয়—নয় এ মধুর খেলা।' ওটা শোনাও লক্ষ্মীটি।

অসীম। কি যে একঘেয়ে গান শুনতে তোমাদের ভালো লাগে জানি না। হোপলেস। গান পরে হবে। অন্তত উর্মিলার জবানবন্দী আগে ফুরোক। শুনতে দাও শেষ অবধি।

উর্মিলা। শেষ পর্যন্ত আর তো কিছু ঘটে নি। অসীম—তোমার সঙ্গেও ভালোবাসার অভিনয় করেছি, শংকরের সঙ্গেও তাই। শংকর সেটা জানতো না। এবং তাই ও ভাবতো আমাদের জীবনটা এরকম হয়ে গেলো কেন; আজকে ওর ভুল ভেঙ্গেছে। আর কোনদিন ও প্রশ্ন করবে না বোকার মত।

শংকর। না, আমি আর কোনদিন ও প্রশ্ন করব না। তোমার কথা যখন শোনালে এবারে আমার কথাও শোন তাহলে। জীবনকে আমি সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমি গান ভালবাসি, কোন একটা সুন্দর সূর্যাস্ত দেখে আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে। হ্যাঁ, এখনও সেই সব অনুভূতি মরে যায় নি। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে) এই জানলাটা সবসময়ে বন্ধ থাকে কেন? এখনও তো তেমন ঠাণ্ডা পড়ে নি।

অসীম। তাই তো। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল দম আটকে আসছে। অথচ জানলাটা যে বন্ধ, তা একবারও খেয়াল করি নি।

উর্মিলা। ও নিজের হাতে সব কটা জানলা বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

[illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible] বড় [illegible] থাকার কথা। [illegible] (তোমাদের পুতুল) এবং আকাশ। আকাশ। চোখ জুড়ানো বিস্তৃতি। শহরের ধোঁয়ার মলিনতা। তার ফাঁকেও অনেক দূরের তারার মুখ দেখতে পাচ্ছি। উর্মিলা জীবনে এখনও অনেক কিছু আছে যার প্রভাবে সব ফাঁকি, সব মিথ্যাকে ভুলে থাকা যায়।

উর্মিলা। (জানলার দিকে তাকিয়ে) ভুলেই যদি থাকতে চাইবো তাহলে পুতুল নাচের পুতুল হতে আপত্তি কিসের; ও তো আমাদের চিরকাল সেই একই ভাষা প্রম্পট্ করছে। 'ভুলে থাকো। ভুলে থাকো।' আমরা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, চোখের উপরে রঙিন চশমা চাপিয়ে, মনের উপর পর্দার ঘেরাটোপ পরিয়ে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়ার খেলনা জড়ো করে সব ভুলে আছি। সব ভুলে থাকবো।

অসীম। উর্মিলার চরিত্র সবচেয়ে কমপ্লেক্স্। একেবারে কমপ্লিট নেগেশন্। ওকে নিয়ে আমাদের গল্প জমবে না। আর শংকর তার ঠিক উল্টো। একটা ঘা খেয়েও দেখ ওর এতটুকু বদল হোল না। আকাশের তারা দেখে এখনও ও কবিত্ব করতে পারছে।

ঝর্ণা। শংকরদার ফিলজফিই ঠিক। আমাদের গল্পটা শংকরদা আপনিই দিন।

অসীম। শংকরের পালা পরে আসবে। আগে আমি কিছু বলে নিই। উর্মিলা যেখানে আমার প্রসঙ্গ শেষ করেছিল, সেখান থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমার তখন কুড়ি বছর বয়স। উর্মিলার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। এক একবার মনে হোত আত্মহত্যার কোন সহজ উপায় যদি জানা থাকত। বুকের মধ্যে যে কি শূন্যতা, তা কাউকে বুঝিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] উর্মিলার কি [illegible] [illegible] [illegible] না, তবে আমার বেঁচে থাকার তাগিদ পর্যন্ত ছিলো না। সব কিছু যন্ত্রের মত করে চলেছিলাম। বি-এ পাশ করলাম, তারপর এম-এ। চাকরীও পেয়ে গেলাম আমার মেসোমশাই-এর কল্যাণে। সবাই বললো এবারে বিয়েটা করে ফেল।

উর্মিলা। (হাসতে হাসতে) এর মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি খবর পেয়েছিলে।

অসীম। তোমার বিয়ের জন্যে বাড়ীতে চেষ্টা চলেছে, সে সব খবরই আমার কানে আসত। পাত্রপক্ষ নিশ্চিন্ত নির্বিকার চিত্তে মিষ্টি খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে পরে খবর দেব বলে বিদায় নিত। শুনে আমার মনে ক্ষীণ আশার আলো দপদপ করে জ্বলে উঠত। যদি উর্মিলার কোনদিনও বিয়ে না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার আশা হয়তো পূর্ণ হবে।

শংকর। আমার আগমন তাহলে তুমি ভালো চোখে দেখ নি অসীম।

অসীম। না, আমি মনে মনে এমন কল্পনাও করতাম যে এই শহরে অ্যাক্সিডেন্টে এত লোক মারা যায়, আর এই লোকটা কি করে দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঝর্ণা। ছিঃ, ও কি ছোটলোকের মত কথা। ভিতের কি কোন বাঁধন নেই।

শংকর। সত্যিকথা বলবে বলে কোমর বেঁধে লেগেছে। অতএব ওদের বাধা দিও না ঝর্ণা। দেখিই না ওরা কি করতে চায়। আমার কিন্তু ওদের দুজনকে দেখে হাসি পাচ্ছে।

অসীম। কেন? হাসির কি হোল। আমরা কি কুষ্টিদের পার্ট করতে এসেছি।

শংকর। তোমাদের এত রাগ, এত আক্রোশ কার বিরুদ্ধে। যে [illegible] পুতুল নাচায়, তার পরেশের শুধু একটা পরিচয় আছে। আর তোমরা দুজনে মিলে কেবল বিদ্রোহ ঘোষণা করছ, তাতে আমাদের একদিন-কার গড়ে তোলা অভ্যাসগুলো পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু তারপরে কি হবে সেটা কি একবারও ভেবে দেখেছ। উর্মিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একেবারেই ফাঁকি, অসীমের আর ঝর্ণার সাজানো-গোছানো জীবনের ভিতও বালিতে গড়া। এখন উর্মিলা আর অসীমও আর হারানো দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ওদের মোহও কেটে গেছে।

অসীম। আমার মোহ কাটে নি।

উর্মিলা। মিথ্যাকথা। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তোমার কাছে অর্থহীন। আমাদের সকলের কাছেই অবশ্য তাই। সেন্টিমেন্টাল বলে অতীতের বালিতে উটপাখীর মত মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছ। একবারও চোখ খুলে দেখো সত্য কি স্বচ্ছ, সহজ, সরল। কোন কল্পনা নেই, কোন মোহ নেই। আমরা আসলে সবাই বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো অস্তিত্ব। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই, সম্পর্ক নেই।

ঝর্ণা। শংকরদা, এই সর্বনাশা খেলা আপনি বন্ধ করুন। আমি সত্যি-কথা শুনতে চাই না। বিশ্বাস হারাতে পারি না। পায়ের তলার মাটিকে এভাবে সরে যেতে দেবেন না শংকরদা।

অসীম। একটা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে তুমি নিজেকে সুখী বিবেচনা কর। ছিঃ ছিঃ ঝর্ণা। মুখোশ-আঁটা মুখগুলো তোমার কাছে এত সত্যি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মাস্টারদার স্মৃতি

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

চট্টগ্রাম বিপ্লব আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার মধ্যে আমরা দেখেছি ভীষ্মের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। তিনি মহাবিপ্লবী ছিলেন বলে তিল তিল করে দধীচির মত আত্মদান করে যেতে পেরেছেন। রাণা প্রতাপ সিংহ বা ছত্রপতি শিবাজীর ন্যায় তিনি গ্রামে গ্রামে কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্গ সংগঠন করেছিলেন এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদীর সম্মুখীন হয়েছিলেন তা' এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

চট্টগ্রামের জনসাধারণ—বিশেষ করে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, সাম্পানের মাঝি, মোটর ড্রাইভার, বনের কাঠুরিয়া—সবারই অকুণ্ঠ সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন। দু' তিনটি মুসলমান পরিবারও আমাদের এই গোপন সংঘের সদস্য ছিলেন। (মীর আহম্মদ—হাওলা গ্রাম, চৌধুরীবাড়ী—বিদগ্রাম, নোয়াব মিয়া—দেওয়ানপুর)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে আর একটি ঘটনা উল্লিখিত হ'ল। চট্টগ্রাম জিলার হাওলা গ্রামের 'খুড়ীমা'র আশ্রয় সেই নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করে।

'খুড়ীমা'র আশ্রয়ে উপস্থিত হয়নি এমন বিপ্লবী আমাদের পলাতক সদস্যদের মধ্যে তেমন কেউ ছিল না। নির্মলদা (নির্মল সেন), ফুটুদা (তারকেশ্বর দস্তিদার), রামকৃষ্ণদা (রামকৃষ্ণ বিশ্বাস), শৈলদা (শৈলেশ্বর চক্রবর্তী) (এঁরা সবাই শহীদ), আমি ও কালী চক্রবর্তী বহুদিন একত্রে ছিলাম। প্রথম মাস্টারদার সাথে এই বাড়ীতে আসি এবং দেখতে পাই খুড়ীমা নিজ হাতে আমাদের পরিবেশন করতেন। বেশ একটু যত্ন নিয়ে রান্না করা, রুচিমত খাওয়ান, দরদভরা ব্যবহার তাঁর কাছে পেতাম। ধীরে ধীরে খুড়ীমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। পরে বুঝতেও পারতাম না যে তিনি আমাদের আত্মীয়া নন। সব আবদার আমরা তাঁর উপরে খাটাতাম। এই আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলাম হরিপদ ভট্টাচার্য এবং বসন্ত ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। দু'জনেই গোপন সংঘের কিশোর সদস্য ছিল। চপলা সেন, খুড়ীমার বড় মেয়ে, অতি সঙ্গোপনে আমাদের দলভুক্ত ছিল। তার প্রভাবে খুড়ীমা আমাদের আশ্রয় দিতে স্বীকৃতা হন। চপলা সংঘের প্রয়োজনে নিজের অলঙ্কার খুলে হরিপদর হাতে দিত। ওর গোপন দান সামান্য ছিল না।

খুড়ীমার বাড়ীর সম্মুখে জোড়া পুষ্করিণী ছিল। ঐ পুষ্করিণীর পাড়ে নানারকম গাছের বাগান ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা সেই বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। একটু ফাঁকা জায়গায় বাতাসে বসে ভিন্ন গ্রামের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতাম। হরিপদ ও বসন্তকে দেখে আমার রামায়ণের লব-কুশের কথাই

নির্মল সেন
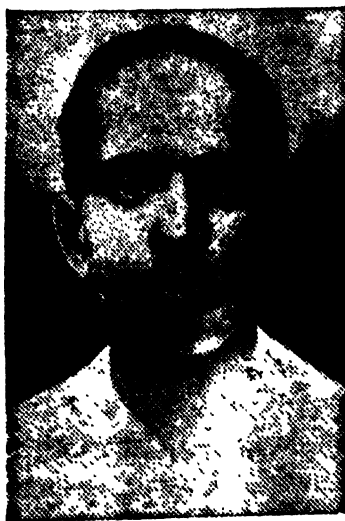
মনে পড়ত। আমার রিভলবারটা নিয়ে তারা ট্রেনিং নিত। হরিপদর চেহারার বৈশিষ্ট্য ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অন্ধকারেও তার মুখ জলজল করত—চাউনি ছিল নিরীহ হরিণ শিশুর মত—নিরীহ, সরলতার সীমা ছিল না। মাস্টারদার সঙ্গলাভের অল্প কিছুদিনের ভেতর হরিপদর আশ্চর্য পরিবর্তন উপলব্ধি করেছিলাম। ধীরে ধীরে সে গ্রামের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হ'ল। মাস্টারদার সাথে গোপন আলাপে অংশগ্রহণ করে, অনেক আশ্রয় ঠিক করে দিত।

আমি অবাক হয়ে ওর কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করতাম। যাদুকরের হাতে যেমন জিনিষের পরিবর্তন ঘটে, হরিপদও যেন মাস্টারদার সান্নিধ্যে এসে তড়িৎ গতিতে দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছে। ডি আই বি ইন্সপেক্টর আসানুল্লা এই সময়ে ভীষণ অত্যাচার সুরু করেছিল। এই সংবাদ মাস্টারদার কাছে এসে পৌছল। সে বিপ্লবী সংঘের ছেলেদের উপর তীব্র অত্যাচার চালাত স্বীকার-উক্তি আদায়ের জন্যে। এমন কি সে মুসলমান মেয়েদেরও বোরখা খুলে তল্লাসী করত। তার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শক্তিকে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান এবং নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে উন্নতির শিখরাসীন হওয়া। সেই কুমতলব হাসিল করবার জন্যে তার জঘন্য মনোবৃত্তি জনসাধারণের মনে ঘৃণার উন্মেষ ঘটাল। বিশেষ করে অম্বিকাদাকে গ্রেপ্তার করার পর আসানুল্লা তাঁর উপর জঘন্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন করেছিল। সেই জন্যেই মাস্টারদা ঠিক করলেন যে, আসানুল্লাকে সরিয়ে দিতে না পারলে জনসাধারণের আস্থা ফিরে পাওয়া যাবে না।

মাস্টারদা বললেন, 'আমরা বিরাট আদর্শ নিয়ে লুকিয়ে আছি। প্রয়োজনে এক একটি করে পথের কাঁটাও নির্মূল নিশ্চয়ই করতে হবে। আমরা যে জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছি সেই জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশও কম নয়। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সঙ্গে নেই সত্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে পূর্ণ সমর্থন আমরা তাদের পেয়েছি, নইলে গ্রামের পর গ্রাম দখল করে আমরা পাল্টা সরকার গঠন করতে সমর্থ হলাম কি করে। আসানুল্লার অত্যাচার মুসলমান সম্প্রদায়কেও অব্যাহতি দেয়নি।'

আসানুল্লাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মাস্টারদা আমার এবং অপূর্ব সেনের (ধলঘাট যুদ্ধে নিহত) নাম প্রস্তাব করলেন। হরিপদকে দায়িত্ব দেওয়া হ'ল উপযুক্ত সময় ও স্থান নির্ধারণ করে আমাদের সাহায্য করতে। দ্বিজেন দাশ (ছোড়দা—হাবিলাস দ্বীপ গ্রাম) ও বিনয়ভূষণ সেন (কোয়েপাড়া)-এর উপর ভার পড়ল সাম্পান ও গাড়ীর ব্যবস্থা করে আমাদের শহরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

হরিপদ খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে আসানুল্লার উপস্থিতির সংবাদ জানাবে আমাদের। খবর পাওয়া গেল নির্দিষ্ট দিনে আসানুল্লা বিজয়ী খেলোয়াড়দের শীল্ড প্রদান করবার জন্যে মাঠে উপস্থিত থাকবে। সেই সুযোগে আমরা তাকে মারবো দেবো—এই ছিল আমাদের কর্মসূচী। বিনয়দা সাম্পান ঠিক করলেন। ছোড়দা (দ্বিজেন দাশ) বার্মার অভিজ্ঞ ড্রাইভার, তিনি প্রাইভেট-কার ঠিক রেখেছেন জেটির দিকে। আমি ও অপূর্ব মাস্টারদার পদধূলি নিয়ে প্রস্তুত হলাম। আমি, অপূর্ব সেন, বিনয়দা ও ছোড়দা সাম্পানে উঠে পড়লাম

অপূর্ব খুশী হয়েছে আমার সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেল বলে। সে আমাকে খুবই ভালোবাসত। জালালাবাদের পাহাড়তলীতে পৌঁছে প্রথমেই অপূর্বের সাথে দেখা হয়। সেই থেকেই সে আমার খুবই অনুরক্ত ছিল। আমিও যে তাকে কত গভীরভাবে ভালবাসতাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তার নাম দিয়েছিলাম 'জুয়েল ক্রেও'। মাস্টারদাও সেই নাম অনুমোদন করেছিলেন। অপূর্বের মত সরল, নির্ভীক, আত্মভোলা বিপ্লবী বন্ধু খুব কমই পেয়েছি।

সাম্পানে করে কর্ণফুলী পার হয়ে জেটির পাশের গোপন স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। সাথে সাথে প্রাইভেট কার উপস্থিত। পিস্তল কোমরে ভালভাবে গুঁজে নিয়ে দুইজনে পাশাপাশি উঠে বসলাম। ছোড়দা সামনের সীটে বসলেন। বিনয়দাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলাম। গাড়ী ছুটল খেলার মাঠে। মাস্টারদার হাতে গড়া হরিপদ নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্বকে বেশ প্রফুল্ল ও উত্তেজিত দেখে উৎসাহিত হলাম। মোটর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছামাত্রই হরিপদ এগিয়ে এসে জানাল তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে, কারণ, আসানুল্লা সেদিন আসেনি।

ঐ সংবাদ তীব্র শেলের মতই মনে হ'ল। যাব কোথায়? সবাইকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। বহুদিন পর (১৮ই এপ্রিলের পর) দিনের আলোয় সেই পুরাতন শহরের স্মৃতি নতুনভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। অপূর্ব বজ্রাঘাতের ন্যায় উদ্ধতভাবে বলল, 'ফিরব না। যে-কোন একটা সাহেব মারব।

আমি ভাবলাম, 'গাড়ী ফিরিয়ে প্রত্যাবর্তন করা মঙ্গল হবে না। লোকের সন্দেহ হবে।'

আমি দ্বিজেনকে গাড়ী সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আদেশ দিলাম। ছোড়দা—গাড়ী কিছুদূর সামনের দিকে গিয়ে ঘুরপথে জেটির দিকে ফিরিয়ে নিলেন। কারণ আর অধিক এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। পথঘাট দ্বিজেন দাশের ভালো জানা ছিল। বিনয়দা (বিনয় সেন) সাম্পানে বসে অপেক্ষা করছিলেন গুলিগোলার শব্দ শোনা যায় কি না, আমাদের দেখামাত্র তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে সাম্পান থেকে এগিয়ে এসে আমাদের তোলে।

আমাদের মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে তিনিও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আমরা যে শহরের বুক থেকে দিনের বেলায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি, অসংখ্য পুলিশের চোখে ধূলা দিয়েছি—এতেও তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি অতি শীঘ্র নদীর অপর পারের দিকে সাম্পান সোজা বেয়ে নিতে বলেছিলেন।

সেইদিন অপূর্বের মনের ব্যথা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। কিছু করতে না পেরে সে বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিতে হল। যখন কর্ণফুলী নদীর অপর পারে সাম্পান পৌঁছল মাঝির কাছে বিদায় নিয়ে আমরা যাত্রা করব, এমন সময় আর এক বিপদের সম্মুখীন হলাম। কর্ণফুলীর পাড় পর পর ধসে পড়ে তলিয়ে যেতে লাগল। বিনয়দার অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি সামনের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করলেন।

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গিয়ে আমরা রক্ষা পেলাম। বিনয়দা বললেন, যদি পড়ে পড়তাম তবে নদীর তলায় তলিয়ে যেতে হত। কোনক্রমে জীবন রক্ষা। ব্যর্থতা নিয়ে মাস্টারদার কাছে ফিরে যেতে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করছি। প্রকাশ করলে জুয়েল ক্রেও-এর মন (অপূর্ব সেন) আরও খারাপ হবে ভেবে কিছু বলছি না। আমরা সেই রাত্রে পরইকোড়া গ্রামে আশ্রয় নিলাম।

হরিপদ গভীর রাতে বাড়ী ফিরে সব ঘটনা মাস্টারদার কাছে ব্যক্ত করেছে। সেদিন আসানুল্লা (আই বি ইন্স) উপস্থিত ছিল না। হরিপদ মাস্টারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করল যে, খেলার মাঠে অসংখ্য লোক ডিঙিয়ে পলাতকদের পক্ষে কোনও কাজ করা সম্ভব হবে না। হরিপদ নিজেই আসানুল্লাকে হত্যা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। কারণ এ ক'দিনে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে দর্শকের মত ধীরে ধীরে আসানুল্লার নিকটে যেতে পারে। কারও সন্দেহের উদ্রেক হবে না। সুতরাং সে ভীষণ উৎসাহিত।

মাস্টারদা যেন হরিপদকেই আসানুল্লার হত্যার কাজে নিয়োজিত করেন।

দু'দিন পরেই ফুটবল খেলা সুরু হবে। মাস্টারদা হরিপদকেই সে সুযোগ দিলেন। আমাদের বললেন ফুটুদা সহ অন্য পরিকল্পনার ব্যবস্থা করতে।

হরিপদ রিভলবার হাতে নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। তার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী খেলার মাঠে হাজির হল। ঠিক খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণের সময় ধীরে ধীরে আসানুল্লার সন্নিকটবর্তী হয়ে দৃঢ় হস্তে রিভলবারের ট্রিগার টিপে দিল, পর পর দুটি গুলি গর্জন করে আসানুল্লার বক্ষ বিদীর্ণ করে ছুটে গেল। সে ভূপাতিত হল।

সারা খেলার মাঠ অগ্নিনালিকার গর্জনে কম্পিত হ'ল। লোকে ছুটাছুটি করে চারিদিকে পালাতে লাগল। দুঃসাহসী হরিপদ দৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দিয়ে বহু লোকের বেষ্টনী ভেদ করে ছুটে চললো। সিকি মাইল দৌড়ে রেল রাস্তার লাইনে পা আটকে পড়ে গেল। তখন পুলিশের লোক (বিশেষ করে সিদ্দিক দেওয়ান) তার বুকের উপর চেপে বসল। তরুণ বিপ্লবী অসহায় অবস্থায় ধরা পড়ল।

আরম্ভ হল প্রাণশোষ এবং প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর অমানুষিক নির্যাতন। সারারাত অবিরত যন্ত্রণা ও উৎপীড়নের শেষ সীমায় পৌছেও কোন ফল হল না। নখে সূচ বিধানো, ইলেকট্রিক চার্জ, আরও কত রকমের হীন নির্যাতন সম্ভব হয়, তা প্রয়োগ করা হ'ল। আঘাতে ডান চক্ষুটি বেরিয়ে পড়ল। কিরূপ যন্ত্রণা দিলে একজন বন্দীর চক্ষু উৎপাটিত হতে পারে তা সাধারণ কল্পনার অতীত। পরদিন সেই অবস্থায় হরিপদকে নিয়ে গ্রামের রাস্তা প্রদক্ষিণ করা হ'ল। একবিন্দু জল পর্যন্ত তৃষ্ণায় পেল না। পরে প্রলুব্ধ করতে চাইলো শুধু মাস্টারদাকে ধরিয়ে দিলেই সে মুক্তি পাবে। ওর কোন দোষ নেই, ওকে প্ররোচিত করা হয়েছে'—ইত্যাদি।

কিন্তু তরুণ বিপ্লবী, মাস্টারদার দীক্ষিত বীর, নীরব। রক্তাক্ত বিষণ্ন মুখেও হাসি ফুটিয়ে তুলেছে, সজোর চেষ্টায়—যাতে সহকর্মী বা জনসাধারণ মর্মাহত না হন। যাকে একদিন ঋষি-বালক মনে করেছিলাম, সে এখন ঋষিতুল্য সহিষ্ণুতার নিদর্শন হ'ল। যাকে ভেবেছিলাম নিরীহ হরিণ শিশু তার মধ্যে দেখতে পেলাম সিংহের পরাক্রম। এ কী করে সম্ভব হ'ল—এখানেই মাস্টারদার সংস্পর্শ এবং প্রভাব অন্তর্নিহিত। মাস্টারদার দীক্ষা ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে, সফল চরম লাভে—দুঃখ কিছু নয়, ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়'। রাজশক্তির মাথায় কুচক্রান্ত ঢুকলো, চারিদিকে ছড়িয়ে দিল হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের বীজ। সমস্ত হিন্দুর দোকান লুঠ হল। প্রত্যেক বিপ্লবীর বাড়ী-ঘর আগুনে ভস্মীভূত হল। বিত্তশালীদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হল। পটিয়া, সারোয়াতলি, বোয়ালখালি থানার প্রতিটি বিদ্যালয় ঘেরাও করে ছেলেদের নির্বিচারে বেত্রাঘাত করা হল। পটিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র দেবেন দে স্যুটার সাহেবের (পুলিশ সুপার) ৭৫টি বেত্রাঘাত নীরবে পিঠ পেতে নিল। ৭৬টি বেত্রাঘাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। (শ্রীদেবেন দে এখনো জীবিত, শিক্ষকতা করেন)।

তার সহনশীলতা দেখে হান্ট সাহেব অবাক হয়েছিলেন। পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীকে এইভাবে ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মিঃ এস এন রায় (সদর এস ডি ও) নিরীহ জনসাধারণকে রক্ষা করবার আদেশ দিলে তাঁরা তা উপেক্ষাভরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে অক্ষম বলে জানান। পরে এস এন রায় কুমিল্লায়, তাঁদের ডিভিসনাল কমিশনারকে টেলিগ্রাফ যোগে সমস্ত ঘটনা অবগত করালেন। ফল তথৈবচ, সে কী প্রলয় কাণ্ড! সারা শহরের সে ভীষণ সাম্প্রদায়িক প্রলয়কাণ্ড গ্রামের মুসলমানকে প্রভাবিত করতে পারল না। তার কারণ দুটি—মাস্টারদার প্রতি গ্রামের মুসলমানদের সহানুভূতি এবং গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের ভয়, পাছে বিপ্লবীরা কোন প্রত্যক্ষ প্রতিশোধ নেয়।

ভেবে আশ্চর্য হই কী করে রাজশক্তি মসজিদে শুকরের মাথা রেখে এবং কালীমন্দিরে গরুর মাথা রেখে এই বিষময় সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু লুটতরাজ ভিন্ন সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নি। পুলিশেরাও লুটতরাজে যোগ দিয়ে বিপ্লবীদের বাড়ীর অস্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং অলঙ্কারাদি নিয়ে যায়। সারোয়াতলির সরাণ মহাজন-এর বাড়ী থেকে বহু স্বর্ণ অলঙ্কার লুণ্ঠিত হয়েছিল। মাস্টারদা গ্রামের বিপ্লবীদের স্থানে স্থানে এই সাম্প্রদায়িকতার সংঘর্ষ হবার জন্যে এবং মুসলমানদের বোঝাবার আদেশ দিয়েছিলেন। যাতে রাজশক্তি কৃতকার্য না হয়।

●

চট্টগ্রামের এই বীভৎস দৃশ্য উপেক্ষা করতে না পেরে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত (স্বর্গীয়) নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ব্যারিস্টার শাসমল পায়ে হেঁটে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে সমস্ত ধ্বংসের দৃশ্য সচক্ষে দেখেছেন। বিলাতে মহাত্মা গান্ধীর কাছে (প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে) টেলিগ্রাফ যোগে চট্টগ্রামে রাজশক্তির অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন, 'সুদূর চট্টগ্রামের পুলিশী অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা সাগর পার হয়ে আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে। চট্টগ্রাম একটি ক্ষুদ্র জেলা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই জেলাটিকে ভারতের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে।'

দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ও মালব্যজীং বৃটিশের সভ্যতার মুখোশ খুলে

দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য।

আরম্ভ হ'ল হরিপদর বিচার। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় অন্নদা দত্ত হরিপদর পক্ষ অবলম্বন করলেন। ফাঁসি অনিবার্য। কোন আশা নেই, অন্নদাবাবু নিজের ব্যবসায়ী বিদ্যাবুদ্ধি নিঃশেষ করলেন।

পরিশেষে যখন অন্য উপায় খুঁজে পেলেন না তখন তিনি কূটনীতি অবলম্বন করে নিঃসহায়ের মতো নিজের আত্মসম্মানের দিকে না তাকিয়ে সরকারী উকিল আবদুল সত্তার মহাশয়কে সম্বোধন করে বললেন যে, তিনি মৌঃ সত্তার মহাশয়ের পদতলে বসে ওকালতি শিক্ষা করেছেন—আসামী অত্যন্ত নাবালক এবং অবোধ শিশু, সে স্কুলে পড়াশুনাও করেনি। সুতরাং এই অবোধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিশুটির প্রাণরক্ষার জন্য তার কচি বয়সের কথাই একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন।

এতে কাজ হল—মৌঃ সত্তার মহাশয় চিন্তায় পড়লেন। তিনি তাড়াতাড়ি প্রতিশ্রুতি দিলেন, যদি কোর্ট বয়সের বিচার বিবেচনা করেন তবে তিনি কোন আপত্তি করবেন না।

কিন্তু হরিপদ অচল অটল, কিছুতেই প্রাণভিক্ষা চাইবে না। অন্নদাবাবু একরকম ভিক্ষে করেই হরিপদর প্রাণরক্ষা করেছেন। হরিপদর যাবজ্জীবন আন্দামানে দ্বীপান্তর হ'ল। হরিপদ এখনো জীবিত। সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মাস্টারদার স্মৃতি বহন করবে।

মাস্টারদার এই যে যাদুমন্ত্র, হরিপদর প্রদর্শিত পরাক্রম এবং সহিষ্ণুতাই তার পরিচায়ক। তরুণদের প্রতি মাস্টারদার আহ্বান ছিল—

> 'লড়াবে কে আর একলা বয়ে,
> গান আছে যার উচ্চ গেয়ে,
> চলবে যারা চল রে ধেয়ে,
> আয় না রে নিঃশঙ্ক
> ধূলায় পড়ে রইল তোর
> ওই-যে অভয় শংখ॥

এইভাবে মাস্টারদা প্রতিটি বিপ্লবী আত্মাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মাস্টারদার আদর্শ ছিল সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান। স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝতেন নির্যাতিত, চিরবঞ্চিত শ্রমিক ও কৃষকের স্বাধীনতা। শুধু বিদেশী শক্তিকে উৎখাত করা নয় দেশের জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মসম্মান এবং জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা। অবশ্য তিনি গণতন্ত্র স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে মূল্য দিতেন বিশেষভাবে।

●

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম কারাভ্যন্তরে ফাঁসীর মঞ্চে মাস্টারদার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়।

ফাঁসির পূর্বে বিপ্লবীদের প্রতি যে বাণী দেন তা নীচে দেওয়া হল—

আদর্শ ও একতাই আমার বিদায় বাণী। ফাঁসির দড়ি ঝুলছে আমার মাথার উপর। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমার দোরগোড়ায়। মন যাত্রা করতে চাইছে অসীমের দিকে। সাধনার ইহাই উপযুক্ত সময়। মৃত্যুকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করবার সময় উপস্থিত। সাথে সাথে স্মরণ করতে ইচ্ছে করে ফেলে-আসা সেই উজ্জ্বল দিনগুলি। হে আমার প্রিয় ভাই ও ভগিনীগণ তোমাদের প্রিয় স্মৃতিগুলি, আমার কারা-প্রাচীরের অন্তরালের ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলি হর্ষ-মধুর করে তোলে। এই গম্ভীর ও পবিত্র আনন্দঘন মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে যাবো? শুধু একটি বস্তু—সে হল আমার স্বপ্ন, আমার আজীবন স্বপ্ন, আমার ধ্যান, জ্ঞান ও ধারণা, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন। যে দিনটিতে আমি স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিলাম সেই দিনটি আমার জীবনে সবচেয়ে পবিত্র হয়ে আছে। সেদিন আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। সমস্ত জীবনভোর গভীর মমতায় এবং ক্লান্তিহীন ক্ষ্যাপার মত আমি এই স্বপ্নটিকে লালন-পালন করে এসেছি। জানি না এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে আমি কতটুকু কৃতকার্য হয়েছি। জানি নি চলার পথে এগিয়ে গিয়ে আজ থাবার আমাকে থামতে হবে।... কৃতকার্য হবার আগে মৃত্যু এসে যদি তার শীতল স্পর্শ তোমাকে দেয়—তার কাজের বোঝা পেছনের লোককে দিয়ে যাবে, যেমন করে আজ আমি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে চলো, বন্ধুগণ এগিয়ে চলো, কখনই পিছিয়ে থাকবে না। বন্ধনের দিন শেষ হয়ে আসছে। তিমির রাত্রি অতিক্রম করে স্বাধীনতার ঊষার আলো ভারতবর্ষের পূর্বদিগন্তে চট্টগ্রামে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হে অমৃতের পুত্রগণ—ওঠো, জাগো, তমসা পরিত্যাগ করে আপন কর্ম সাধনা কর, কখনই ভগ্নমনোরথ হয়ো না। কৃতকার্য একদিন হবেই। ভগবান তোমাদের সহায় হোন্।

১৯৩০ সনে যেদিন চট্টগ্রামের বুকে পূর্বপ্রান্তিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়েছিল সেদিনটিকে কখনওই ভুলবে না। জালালাবাদ, জুলদা, চন্দননগর এবং ধলঘাটের মাটি যেসব শহীদের রক্তে প্লাবিত হয়েছিল মাতৃবন্ধন উন্মোচন করবার জন্য তাদের স্মৃতি তোমাদের হৃদয়ে চির-উজ্জ্বল হয়ে থাক। স্বাধীনতা-যজ্ঞে যেসব শহীদ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন সেসব স্বদেশপ্রেমিকদের নাম রক্তের অক্ষরে তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে লিপিবদ্ধ হোক।

তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ বিভেদ নয়, একতাই আমাদের সংঘ শক্তি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

> বিদায় বন্ধু বিদায়,
> বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
> বন্দেমাতরম্।

পরশুরাম কুণ্ড

শ্রীযুক্ত স্বামী বিষ্ণুপরাজী লিখিত 'পূর্ব সীমান্তে পরশুরাম কুণ্ড' প্রবন্ধটি সম্পর্কে অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানা চিঠি ছাপা হইয়াছে। পত্রলেখক ইউরোপীয় ও আমেরিকান পাদ্রিগণ নাগাভূমিতে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার করিতে পারেন, অথচ ভারতীয় সন্ন্যাসিগণ তাহা পারেন না কেন জানিতে চাহিয়াছেন। আসামের অধিবাসী হিসাবে আমি যতটুকু জানি এই পত্রে তাহা আলোচনা করিব। পরশুরাম কুণ্ডের অবস্থান ও তথাকার অধিবাসী সম্বন্ধে লিখিত বিষয়গুলিতে কিছু কিছু ভুল তথ্য সন্নিবেশিত আছে। ৬০ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক একখানা পুস্তক হইতে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিলাম এবং ধর্মপ্রচারের জন্য স্বামীজীর মনে দুঃখ হওয়া যে স্বাভাবিক তাহারও আলোচনা করিব।

ব্রহ্মকুণ্ড ও পরশুরাম কুণ্ড

'শান্তনু মুনির স্ত্রী অমোঘার গর্ভ হইতে ব্রহ্মার সংযোগে একটি বৃহদাকার জলডিম্বের উদ্ভব হইলে তাহা মিশমি পাহাড়ের মধ্যে একটি গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ঐ জলপূর্ণ গহ্বরটিকে ব্রহ্মকুণ্ড বলে। ঐ কুণ্ডে স্নানান্তে মাতৃহত্যাপরাধে পরশুরামের হস্তসংযুক্ত কুঠার খসিয়া পড়ায় পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র জল বাহির করিয়া আনয়নের জন্য কুঠার দ্বারা দুইটি ছিদ্র করিয়া দেওয়াতে উক্ত কুণ্ডের জলস্রোত নিম্নে যে স্থানে পতিত হয়, তাহাকে পরশুরাম কুণ্ড বলে। উভয় কুণ্ডই হিন্দুদের তীর্থস্থান। পরশুরাম কুণ্ডের চতুর্দিক অত্যুচ্চ পর্বতবেষ্টিত। ব্রহ্মকুণ্ডের জলস্রোত পর্বতের পৃষ্ঠদেশ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঐ দুইটি ছিদ্র দ্বারা ৭৫ ফুট নিম্নে পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইতেছে।'

—পূর্ববঙ্গ ও আসাম—২য় সংস্করণ, ১৯১১ ইং।

ব্রহ্মপুত্রের জলধারার সঙ্গে ঐ কুণ্ড দুইটির কোন সম্পর্ক ছিল না। ইং ১৯৫০ সনের ভূমিকম্পে এই সব স্থান প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। নানাভাবে অনুসন্ধানের পর বর্তমান স্নানের স্থানটিকেই পরশুরাম কুণ্ড বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ এবং পর্বতগুলির অবস্থানে ভূমিকম্পের ফলে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য

ব্রহ্মকুণ্ড আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে লক্ষ্মীমপুর জেলার প্রান্তে মিশমি পাহাড়ে অবস্থিত। ইহা নাগা অঞ্চল নহে। বর্তমানে লোহিত সীমান্ত জেলার অন্তর্গত। ৬০ বৎসর পূর্বেও স্বাধীন খামতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়ে এ অঞ্চলের চৌখাম নামক স্থানে যিনি রাজা ছিলেন তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর নিকটে একটি বৌদ্ধমন্দিরও ছিল।

পাহাড়ীদের পাহাড়িয়া ধর্ম। ইহারা উপদেবতায় বিশ্বাসী। সমতলের হিন্দুদের সান্নিধ্যে থাকায় হিন্দুদিগের পূজা-পর্বাদির কিছুটা আভাস তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে ইহাদের হিন্দুতে পরিণত করা সহজ ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম দুইটাই প্রচলিত আছে। পাহাড়িয়ারা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে, পশুবলি দেয়। নাগাভূমি—আসামের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। তথায় দেবদেবীর মন্দির দেখা যায় না। তাহাদের পুরোহিত বা ধর্মগ্রন্থ ছিল না। সূর্যকেই নাগারা একমাত্র দেবতা মনে করিত। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই তাহারা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হইতেছে।

—পূর্ববঙ্গ ও আসাম—১৯১১ ইং।

নাগা জাতি এবং আসামের অন্যান্য পার্বত্য জাতিদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ নাই। আমার মেয়ে শিলং-এ একটি মহিলা কলেজের হোস্টেলে চারি বৎসর বিভিন্ন পার্বত্য জাতির মেয়েদের সঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। বিশেষত একই কামরায় বাস করায় ধর্মীয় বিষয়ে যেসব আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পাহাড়িয়ারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নাই। শিক্ষার আলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্মের প্রচার না থাকায় তাহারা খৃস্টধর্মই গ্রহণ করিতেছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি জনসেবার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত মিশনারীরা গারো, খাসিয়া, লুসাই এবং নাগা প্রভৃতি জাতিকে উন্নত করিয়াছেন, তাই এ সব অঞ্চলে খৃস্টধর্মেরও বহুল প্রচার হইয়াছে।

ইউরোপীয় ও আমেরিকান পাদ্রিগণ নাগাভূমে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার করিতে পারেন অথচ ভারতীয় সন্ন্যাসিগণ তাহা পারেন না শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই। নাগারা নরহত্যা করিত, নরমাংস ভক্ষণ করিত। প্রচুর অর্থবল ও রাজশক্তি পেছনে থাকায় পাদ্রীরা পর্বতগুলির অভ্যন্তরে নিরাপদে প্রবেশ করত ধর্মপ্রচার করিতে পারিতেছেন। পাহাড়িয়াদের বিশেষ কোন ধর্ম না থাকায় খৃস্টধর্মের প্রচারে কোন বাধা আসে নাই।

[illegible]

[illegible] আদর্শ নিয়া রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এ সব স্থানে রাষ্ট্রের সহায়তা লইয়া হিন্দুধর্ম প্রচার করিতেন, তাহা হইলে সেই প্রচেষ্টা খৃস্টধর্ম প্রচারের চেয়ে অধিকতর সফল হইত।

১৯৩৮ ইং সনে হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দজীর বক্তৃতা শুনিয়াছি। তিনি আসামে হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কতটুকু সফল হইয়াছে জানি না। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের উচিত ছিল নূতন নূতন অঞ্চলে হিন্দুধর্ম প্রচার করা। হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলে স্বাভাবিকভাবেই ভারত-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য আসিবে (ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সত্ত্বেও)

ভারতের ধর্মগুরুদের আত্ম-বিস্মৃতি স্বামীজীর মনকে ব্যথিত করিয়াছিল—ইহা স্বাভাবিক। বর্তমানে হিন্দুদের চিরাচরিত [illegible] নানারকম সংস্কারসাধন করাই ধর্মগুরু এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। নূতন করিয়া হিন্দুধর্মে আনয়নের চেষ্টাই প্রয়োজন ছিল বেশী। বৈদিক হিন্দুধর্মে বিশ্বাস রাখিয়া চিরাচরিত পূজার্চনা একটা না-একটা আমরা ত্যাগ করিতেছি। উপাসনার পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য অসংখ্য গুরু, নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, প্রচুর অর্থব্যয়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বোধ হয় শতকরা ৮০ জনই কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের আশ্রিত, কিন্তু হাটে-বাজারে, অফিস-আদালতে, রাস্তাঘাটে কিংবা সমাজে এত অধিক চোরাবাজার ও অসাধুতা কেন? ক্রমে বৃদ্ধির দিকেই চলিতেছে। নৈতিক উন্নতি না দেখিলে আত্মিক উন্নতি হইতেছে কি করিয়া বুঝিব? শুধু স্বামীজী কেন আমাদেরও মন হতাশায় ভারাক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক।

[illegible] সঙ্গে [illegible] সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠান-গুলি পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষাদান, জন-সেবা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে অনগ্রসর জাতিদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিলে তাহাদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তা-বোধ জাগিবে। অস্ত্রের সাহায্যে যাহার সমাধান হইতেছে না, প্রেমের দ্বারা তাহার সমাধান হইবে। ধর্ম সবই সমান। খৃস্টধর্মের প্রতি আমাদের কোন বিরুদ্ধ মনোভাব নাই। পার্বত্য জাতিদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত এবং খৃস্টান, তাহাদের মধ্যে যদি বৈদেশিক মনো-ভাব আসিয়াই থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় খৃস্টানরা চেষ্টা করিলে ঐসব অঞ্চলে গিয়া জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে পারেন। এ বিষয়ে ভারত সরকার এবং খৃস্টান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নারীরূপে দেবী

রবিরতন ভৌমিক

হে নারী! ভুলে যাও তুমি সম্ভোগিনী—
তুমি না মর্ত্যের বীরপ্রসবিনী?
তুমি চণ্ডী-রূপা মহিষাসুর-মর্দিনী—
দুর্গারূপে চির দুর্গতি-নাশিনী।

ভুলে গেছো রণ-রঙ্গিণী চণ্ডীর রূপ?
অসুরকুলের সাথে সংগ্রাম
মনে রেখো নারী উষ্ণ রুধির পানে
পবিত্র করেছিলো এই মরধাম।

তুমি সতী-সীতা-সাবিত্রীর বংশধর
ভুলিও না তাহাদের ইতিহাস,
পবিত্র রক্ত-ধারা তোমাদের শিরায়
বহে, দূরে করো পাপ-পরিহাস।

ধরো অসি, রণ-সাজে সাজো তুমি নারী;
বলো, 'মূণ্ডং দেহি'—পরো রুদ্রবেশ,
অসুরের রক্তে রাঙাও তরবারি—
অসুরবীজের বংশ করো শেষ।

জাগো, জাগো হে নিদ্রিতা—মায়ারূপিণী!
চেয়ে দেখো দেশ ডোবে রসাতলে,
সতীর সতীত্ব নাশ,—অসুরের জয়োল্লাস—
মহাকাল লীলা খেলে বাহুবলে।

অট্টহাসি হেসে মহাকাল ছুটে আসে
দিকে দিকে আঁধারের ছায়া নামে,
ঘনঘোর রজনীতে তারাগুলো হাসে—
রণ-সাজে চলো দেবী সংগ্রামে।

ললাটে ভাবনারাশি, ঘুম নেই চোখে,
পরাণ কাঁদিয়া ব্যাকুল মরণ শোকে।

চিত্রে সংবাদ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আফগানিস্থান সফরান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ডঃ রামসুভগ সিং ও অন্যান্যরা

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের নিকট থেকে ডঃ জাকির হোসেন স্মারক ডাকটিকিট এ্যালবামটি গ্রহণ করছেন ডঃ হোসেনের কন্যা শ্রীমতী সঈদা খান

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে বাটা সু কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত রৌপ্যকাপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে দেন উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ ভি লিপনার। শ্রীমুখোপাধ্যায় পরে কাপটি টি-এ গ্রুপের কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল এস কে মুরশানের হাতে দেন

পশ্চিমবংগ প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির দশম বার্ষিকী সম্মেলনে ভাষণরত পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী এন জি গোরে

এশিয়ান এ্যান্ড প্যাসিফিক কাউন্সিলের চতুর্থ অধিবেশনের প্রাক্কালে ইডেন রেল স্টেশনের নিকট সংঘর্ষরত ছাত্র-পুলিশ

চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধান দিবস উপলক্ষে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর

মহাকরণের সামনে সওদাগরী শ্রমিক-কর্মচারীদের সমাবেশে ভাষণরত শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠানে হাত তুলে ভোট দিচ্ছেন কাউন্সিলাররা

আমি এখন টীমের ক্যাপ্টেন!
অথচ এই কিছুদিন আগেই আমি দল থেকে বাতিল হয়েছিলাম—অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, খেলা পড়ে গিয়েছিল। আমাদের কোচ বললেন ডাক্তার দেখাতে।
ডাক্তার বললেন: "খেলোয়াড়দের খেলাধুলো আর খাটুনির জন্যে বাড়তি শক্তির দরকার। হরলিক্স খাও — সেই বাড়তি শক্তি আর পুষ্টি পাবে।"
হরলিক্স খেতে শুরু করলাম। আর দেখতে দেখতে যেন নতুন মানুষ হয়ে গেলাম। আমার খেলার উন্নতি হল। আমিই এখন টীমের ক্যাপ্টেন! ভাগিস হরলিক্স খেয়েছিলাম! এখন রোজ খাই
হরলিক্স-এর গুণেই ক্যাপ্টেন হতে পেরেছি!
চটপটে তরুণ-তরুণীদের যে শক্তিক্ষয় হয় হরলিক্স তা পূরণ করে···আবার সারাদিন কাজে মেতে থাকতে হলে যে বাড়তি শক্তি চাই তা-ও যোগায়। হরলিক্স খেলে তাই কাজকর্মে ঢিলে পড়ে না, ক্লান্তি আসে না, স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
ছেলেবুড়ো সবারই হরলিক্স খাওয়া ভালো।
Horlicks
মাখন না-তোলা
সঙ্গে গম ও
পুষ্টিকর সারাংশ
HL. 7437 A
হরলিক্স বাড়তি শক্তি যোগায়

মাইক্রোসকোপ

বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী

খালি চোখে আমরা এক মিলিমিটারের দশভাগের একভাগ পর্যন্ত দেখতে পাই। এর থেকে ছোট জিনিষ দেখতে হলে আমরা মাইক্রোসকোপ ব্যবহার করে থাকি। মাইক্রোসকোপের মধ্যে শ্রেণভেদ আছে, সাধারণ অপ্টিক্যাল মাইক্রোসকোপ, আল্ট্রা মাইক্রোসকোপ, ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি। সাধারণ মাইক্রোসকোপে বস্তু থেকে আলোকরশ্মি অনেকগুলো লেন্স পেরিয়ে বস্তুর একটা বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মাইক্রোসকোপের একটা লিমিট আছে—তার থেকে ছোট জিনিষ দেখা সেই মাইক্রোসকোপে সম্ভব না। কারণ প্রতিবিম্বটি তখন পরিষ্কার বোঝা যায় না—অস্পষ্ট মনে হয়। একে বলে মাইক্রোসকোপের রিসলভিং পাওয়ার।

সূর্যের আলোর সাদা রঙ-এর মধ্যে আসলে লুকিয়ে আছে সাতটি আলাদা আলাদা রঙ—বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, বাদামী, কমলা আর লাল। সূর্যের আলোকে সরু রশ্মির আকারে একটি কাঁচের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে পাঠালেই এর সাতটি রঙ পৃথক হয়ে আসবে, যার ফলে সৃষ্টি হবে একটা সুন্দর বর্ণালী। যাকে বলে 'স্পেক্টরাম'। বিভিন্ন বর্ণের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন।

এখন ব্যাপারটা হচ্ছে—মাইক্রোসকোপের রিসলভিং পাওয়ার নির্ভর করে যে আলোকে বস্তুটিকে দেখা হচ্ছে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ওপরে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, সাধারণ অপ্টিক্যাল মাইক্রোসকোপে সব থেকে ছোট যে জিনিষ দেখতে পাই আকারে তা হোল এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক। বেগুনী রঙের আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সব থেকে কম ৪০০০ আংস্ট্রম অর্থাৎ ৪০০০ $\times$ ১০-৮ সেণ্টিমিটার। বেগুনী রঙ-এর আলো ব্যবহার করলে তাহলে আমরা ২০০০ $\times$ ১০-৮ সেণ্টিমিটার অর্থাৎ '০০০২ মিলিমিটার পর্যন্ত দেখতে পাব। সুতরাং এটাই হোল সাধারণ অপ্টিক্যাল মাইক্রোসকোপের লিমিট।

এর থেকে আরও ছোট জিনিষ দেখতে হলে তাহলে চাই এমন আলোকরশ্মি যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরো কম। তাহলে আমরা আল্ট্রাভাওলেট রে অর্থাৎ অতিবেগুনী রশ্মিও ব্যবহার করতে পারি—আর এইভাবে এর সাহায্যে মাইক্রোসকোপের রিসলভিং পাওয়ার দ্বিগুণ করা সম্ভব। একে বলে 'আল্ট্রা মাইক্রোসকোপ'।

আরও ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রয়েছে এক্স-রে-এর। এক্স-রেকে মাইক্রোসকোপে ব্যবহারের অনেক চেষ্টা হয় কিন্তু উপযুক্ত লেন্সের অভাবে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

এর পর এসেছে ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ। ১৯২৪ সালের কথা। একজন ফরাসী পদার্থবিদ্ ঘোষণা করেন—এ্যাটমের চারপাশে যে ইলেকট্রনগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও রয়েছে তরঙ্গ এবং এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও কম। তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক নতুন দ্বার খুলে দিল। দু'জন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডেভিসন ও জারমার তাঁর এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করেন পরীক্ষার সাহায্যে। এই ইলেকট্রনকে তখন মাইক্রোসকোপে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলতে থাকে। সর্বপ্রথম সফলকাম হল বিজ্ঞানী ভন বরিস। তিনি দেখলেন ইলেকট্রনকে উচ্চচাপে (প্রায় ৫০,০০০ ভোল্ট) বিদ্যুৎ-প্রবাহের মধ্যে দিয়ে পাঠালে এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় '০৫ $\times$ ১০-৮ সেণ্টিমিটারে এসে দাঁড়ায়। এই ইলেকট্রনকে মাইক্রোসকোপে ব্যবহার করলে সেটা হবে প্রচণ্ড শক্তিশালী। সাধারণ আলোকরশ্মির বদলে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে ব্যবহার করা হচ্ছে ইলেকট্রনের রশ্মি। উত্তপ্ত টাংস্টেন ফিলামেণ্ট (চিত্রে ক্যাথোড) থেকে ইলেকট্রনগুলোকে ৫০,০০০-১০০,০০০ ভোল্ট-এর মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে প্রথমে এর গতিবেগ বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপর পাঠান হয় শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে—যার ফলে ইলেকট্রনগুলো রশ্মির আকারে বস্তুটির ওপরে ঠিকভাবে পড়ে।

ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ

তারপর রয়েছে অবজেকটিভ লেন্স, যার সাহায্যে বস্তুর একটি বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব তৈরী হয়। প্রোজেক্টার লেন্স এই প্রতিবিম্বকে আরো বিবর্ধিত করে। সব শেষে ফ্লুওরেসেণ্ট পর্দায় বস্তুর বিবর্ধিত

বর্ণবৈষম্য-সঞ্জাত সমস্যা

প্রদীপ চক্রবর্তী

কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীকে পাশ্চাত্যের শ্বেতকায় জাতি আজও মুক্ত ক্রীতদাস বলেই ভাবতে অভ্যস্ত এবং এর ফলেই আজও রয়ে গেছে বর্ণবৈষম্য-সঞ্জাত সমস্যা।

ইংলণ্ডে এককালে দাসব্যবসা খুব ফলাও ভাবেই চলতো এবং তার তৎকালীন সমৃদ্ধির মূলে ছিল ক্রীতদাসের শ্রম।

ষোড়শ শতাব্দীতে সুরু হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথার বহুল প্রচার ও প্রসারের ফলেই ইংল্যাণ্ড প্রায় একশো বছর ধরে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শুধু লণ্ডন শহরেই ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল পনেরো থেকে বিশ হাজারের মত।

প্রত্যেক ক্রীতদাসের গলায় ঝুলতো একটি করে ধাতব চাকতি, তার নিজের ও প্রভুর নাম লেখা থাকতো তাতে।

এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অবধি তাদের সংখ্যা ছিল অগণ্য।

শেষ পর্যন্ত তারা মুক্ত হল বটে, কিন্তু তাদের একদা মনিব শ্বেতকায় জাত আজ অবধি তাদের সমকক্ষ ভাবতে অভ্যস্ত হল না।

আজও একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতকায়ের চোখে ক্রীতদাসের প্রতীক বই আর কিছু নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যৌন ঈর্ষাই বর্ণবৈষম্য-সঞ্জাত সমস্যার মূল কারণ। এবং যেহেতু ঈর্ষা প্রধানত পুরুষের ধর্ম, সেহেতু এক্ষেত্রেও শ্বেতকায় পুরুষই প্রধান প্রতিবাদী।

সাদা ও কালোর মিলনেই তাদের তাই এত আপত্তি।

বর্ণবৈষম্যের পৃষ্ঠপোষকবর্গের মতে সাদা ও কালোর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াটা একেবারেই উচিত নয়, তারা এর বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তির আমদানী করে থাকে, যেগুলি প্রায়শ ভিত্তিহীন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই ধরণের বর্ণসঙ্কর দাম্পত্য কি সত্যই দৈহিক ও মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর?

দৈহিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে এতে ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

প্রকৃতির নিয়মে যৌনসম্পর্কের মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন উপাদানের মিলন ঘটিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করা; যখনই কোন ছেলে কোন মেয়েকে বিবাহ করে তখনই সে প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয় এবং স্ত্রী-পুরুষের এই মিলনে বৈচিত্র্য বা ভিন্নধর্মিতা বিশেষভাবেই কল্যাণপ্রদ।

মংগ্রেল বা বর্ণসঙ্কর সারমেয়ও এজন্যই বংশ-গরবী বা পেডিগ্রিড কুকুরের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হয়ে থাকে এবং দুনিয়ায় টিকে থাকার লড়াইয়ে জিততে হলে বুদ্ধিই যে সর্বোত্তম হাতিয়ার তাতেই বা সন্দেহ কি?

এক বিশ্ববিখ্যাত বায়োলজিস্টের মতে পৃথিবী শেষ পর্যন্ত বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, সম্পূর্ণভাবেই এবং তাতেই নিহিত তার কল্যাণ। মনস্তত্ত্বর দিক দিয়েও এটাকে সুফলপ্রসূ বলা যেতে পারে।

কিন্তু তার আগে বোলা মনে এ ধরণের বিবাহকে মেনে নিতে শেখা দরকার, না হলে বর্ণসঙ্কর ছেলেমেয়ে সমাজে নিজেদের যোগ্য আসন খুঁজে পায় না এবং একটা অকারণ গ্লানির পীড়নে ছোটবেলা থেকেই তাদের মানসিকতা বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাদা কথায় হীনমন্যতা বা ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স-এ আক্রান্ত হয় তারা।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতে ইউরেশীয়ান সম্প্রদায়কে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার, খাঁটি ইউরোপীয়ান ও খাঁটি ভারতীয় উভয়

প্রতিবিম্বকে দেখতে পাই। এই সমস্ত কিছুই থাকে একটা বায়ুশূন্য আধারে।

সাধারণ অপ্টিক্যাল মাইক্রোসকোপের ২০০ গুণ এর বিবর্ধনের ক্ষমতা। এই ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ আবিষ্কারে চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং কারিগরী ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে। ব্যাকটিরিয়ার মত ভাইরাসও নানারকম রোগব্যাধির কারণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত পকস—সবই ভাইরাস থেকে সংক্রামিত হয়। এরা এত ছোট যে, সাধারণ অপটিক্যাল মাইক্রোসকোপে এরা ধরা পড়ে না। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ আবিষ্কারে এদের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে এবং তখন থেকেই এ বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়। তা ছাড়া এর সাহায্যে পাতলা ধাতব পাতের মধ্যে অণুর বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করে তার শক্তি নির্ধারণ করাও বিজ্ঞানীদের কাছে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে সহজে আরও উন্নত শ্রেণীর ধাতু বা ধাতু-সংকর তৈরী করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন—আরও শক্তিশালী মাইক্রোসকোপ তৈরী করা যায় কি না। ভবিষ্যতে হয়ত হবে; আর এর ফলে এমন সব জিনিষ আবিষ্কার হবে যা আমরা কল্পনা ভাবতেই পারি নি।

সম্প্রদায়ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের এই বাস্তব নমুনাকে সমভাবেই অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এসেছেন।

বাস্তবিক পক্ষে বর্ণসঙ্কর মানুষ যেন না ঘাটকা না ঘরকা—কোন দেশকেই যেন মাতৃভূমি বলে গর্ব করার উপায় নেই তার।

এ ধরণের অবস্থা আর যাই হোক শিশুমনকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে সহায়ক নয় মোটেও। ঘৃণা ও অবজ্ঞা মেশানো পরিবেশে যারা বড় হয়ে ওঠে তারা যে কিছুতেই উত্তরকালে সুস্থ ও সৎ নাগরিক হয়ে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, একথা তো সংশয়াতীতভাবেই সত্য।

দেশে দেশে কালে কালে সাদা-কালোর মিলনজাত সন্তানেরা অকারণে অপমান ও হীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে পদে পদে—অথচ জৈবিক নিয়মে এ ধরণের মিলনকে অস্বাস্থ্যকর বা অকল্যাণপ্রসূ বলা চলে না। কোনমতেই।

বর্ণসঙ্কর সমস্যার মূলেই আছে বর্ণবৈষম্য, শ্বেতকায় জাতির অশ্বেতকায় জাতির প্রতি ঘৃণাই আজকের প্রগতিশীল দুনিয়াকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না পূর্ণ শক্তিতে।

যদিও আজকের সভ্য মানুষ মুখে স্বীকার করে না বর্ণবৈষম্যকে তবু বাস্তবক্ষেত্রে এটা যে আজও এক প্রধান সমস্যা তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

সভ্যতা ও প্রগতির অন্যতম প্রধান প্রতীক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছুদিন ধরে বর্ণবৈষম্যকে কেন্দ্র করে যা ঘটে চলেছে তা শুধু সভ্যতার পরিপন্থীই নয়, মানবিকতারও বিরোধী।

মজা এই যে, বর্ণবৈষম্যকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে অন্যায় বলে মেনে নিয়েও বাস্তবে এর মুখোমুখি হলে পর আমরা অনেকেই বিচলিত না হয়ে পারি না।

যুগ-যুগান্ত ধরে কালো মানুষের বিরুদ্ধে সাদা মানুষের মনে যে ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক মনোভাব গড়ে উঠেছে একদিনে তা মুছে যাবে এ আশা করাটা বোকামী মাত্র, কিন্তু প্রকৃত সদিচ্ছা থাকলে, ধীরে ধীরে এ মনোভাব বিলুপ্ত হতে বাধ্য আর সেজন্য মানুষ হিসাবে আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে, না হলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা চিরকালই বঞ্চিত থেকে যাব।

বর্ণবৈষম্যমূলক সমস্যা যতদিন বর্তমান আছে ততদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই অগ্রগতি হোক না কেন প্রগতিশীল মানুষ হিসাবে আমরা গণ্য হতে পারি না কোনমতেই।

তোমার জন্মদিনে

সুকোমল বসু

পৃথিবী তার পথ-পরিক্রমায় দক্ষিণায়ন ছাড়িয়ে গেল
আবার এলো আরেকটা তেইশে জানুয়ারী।
অনেক মিছিলের পদচারণে
জয়ধ্বনির কম্বু নিনাদে
বয়সের গণনায় তোপধ্বনিতে—
চিহ্নিত হল তোমার আরেকটি জন্মদিন।
কিন্তু—হে নেতাজী—তুমি আজ কোথায়?
ভারত-সীমান্তে তোমার ঘোড়ার খুরের শব্দ—
হঠাৎ স্তব্ধ হল।
গভীর রহস্যের যবনিকার অন্তরালে
হল তোমার বিস্ময়কর অন্তর্ধান।
রূপ-কথার কাহিনীকেও হার মানালে তুমি।
সোনার কালিতে যে ইতিহাস লেখা সুরু
অসমাপ্ত রইলো সেই জীবনোপন্যাসের শেষ অধ্যায়!
সারা ভারতের প্রতীক্ষা আর ঐতিহাসিকের অনুশীলনকে
ব্যর্থ করে

ঝড় উঠলো প্রশ্নের—'হ্যাঁ' অথবা 'না'য়ের:
তুমি আছো—কি নেই!
হে মহামানব, হে সত্যসন্ধ, হে বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজী
তুমি যেখানে যে ভাবেই থাকো—
তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক—
ক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ, বিপর্যস্ত এই ভারতবাসীর আনত মস্তকে
আজ তোমার জন্মদিনে—তোমার পূত চরণের উদ্দেশে
আমরা রাখলাম আমাদের অকুণ্ঠ প্রাণ-ছোঁওয়া প্রগাঢ় প্রণতি।

একটি মানুষ

অমল ওকে বিয়ে করেছিল। বলেছিল, যতই খুঁত থাক, তবু ওকে বিয়ে করবো। কথা দিলাম।

বন্ধু হেমবাবু বলেছিলেন, তোমাকে দশ হাজার টাকা দেবো। ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আমার মেয়ে বোবা। কিন্তু সে সুন্দরী।

—কোন আপত্তি নেই আমার।

—শোন অমল, আমার মেয়ে 'বেলা' বোবা বলেই তোমাকে দশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে চাইছি। তুমি যেন ভবিষ্যতে তাকে ঘৃণা করো না। তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি ভালো ছেলে বলেই জানি। তাই তোমাকে কোন কিছু গোপন না করে বিয়ে দিতে চাইছি।

যুবক অমল বয়সে বেলার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। এখন সে পঁচিশ বছর বয়স্ক তরুণ। তরুণীর উপর ভালবাসা এবং মায়া তার পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এই তারুণ্যই মুক্ত আকাশের মত নির্মল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঝর্ণার জলরাশির মতই পঙ্কিলতাবিহীন।

হেমবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন মেয়ের বিয়ের জন্য। কিন্তু তা পারেন নি। কেউই সম্মত নয়। বহু জায়গায় প্রচেষ্টা চলেছে দিনের পর দিন। এমনি টাকার অঙ্ক আরো অনেককে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছেলের মা-বাবা আপত্তি তুলেছে সব জায়গায়।

এখানে অমল একা। তার মা-বাবা বহুদূরে, দিল্লীতে থাকেন। সেখানে তার বাবা একজন সরকারী চাকুরে। অমল এখানে এক বছর আগে এসেছিল কৃষ্ণনগর কোর্টে চাকরী নিয়ে। সেই থেকে এখানে আছে ছোট একটি বাসা ভাড়া করে। ছেলেটা এম-এ পড়তে-পড়তে চাকরী পেয়ে গেল। তাই পড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে চাকুরীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে, বাবার কাছে টাকা-পয়সা চাইতে হবে না মাসে-মাসে। তাছাড়া একটু স্বাবলম্বী হবার বাসনা প্রবল।

যৌবনের স্বাভাবিক সহানুভূতি এবং মমতা যা তরুণের মনে সদাজাগ্রত থাকে, তরুণী বা নারীর প্রতি যা প্রয়োগ করতে সদাব্যস্ত, তাই অমলের হৃদয়াকাশে তুমুল আলোড়ন তুললো। সে একটি মেয়ের মনে আঘাত দিতে পারবে না। হোক না কেন বোবা।

রমেশ মজুমদার

বোবা বলে কি আর বিয়ে হবে না। সেও কি আর পাঁচজনের মত প্রত্যাখ্যান করবে? না। অমল তা পারবে না। সে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু মনের আর একপ্রান্তে হাজার টাকার ঝনৎকার উঠেছিল, যা অমল স্বীকার করে নিয়েছিল একদিন।

•

আঠারো বছরের তন্বী কুমারী মেয়ে বেলা। তাকে বিয়ে করলো অমল। বাবাকে জানায় নি, মাকেও না। কাউকেই না জানিয়ে সে নিজের ক্ষমতা দেখাতে ব্যস্ত।

পাশের বাড়ীর ভাড়াটে ছেলে অমল জামাই হয়ে এলো। লোকজনে বিবাহ-বাসর পরিপূর্ণ। চারিদিকে আনন্দের জোয়ার, আলোর বন্যা। বাজনা বেজে চলেছে।

ধনী হেমবাবুর বাড়ীটা আজ উৎসব-মুখর। পাশেই আছে রাধানগর। সেখানে তাঁর বাগানবাড়ী। সেখান থেকে দারোয়ান, মালীরা এসেছে। বড় রাস্তার উপর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে সাত আটখানা। ব্যবসায়ী, ধনী এবং শিক্ষিত হেমবাবু কৃষ্ণনগরের গণ্যমান্য লোক। তাই সহরের মাননীয় প্রায় সবাই উপস্থিত বিবাহ উপলক্ষে। কতকগুলো উপঢৌকন দিয়েছেন তাঁরা। আবার বিদায় নিয়ে সবাই চলে গিয়েছেন প্রশান্ত চিত্তে।

পরদিন বেলাকে নিয়ে অমল রওনা দিলো দিল্লীর দিকে মা-বাবার কাছে। বৃদ্ধ হেমবাবু যাবার সময় জামাইয়ের হাতে দশহাজার টাকার একখানি 'চেক্' লিখে দিলেন। দরকার হলে এই টাকা দিয়ে জামাই ব্যবসা করতে পারবে। সাথে গেল হেমবাবুর মেজ ছেলে।

যথাসময়ে বেলাকে নিয়ে অমল পিত্রালয়ে উঠলো। জামাইয়ের পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে। সাথে বেলার ভাই বিপ্রদাস। কিরণবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। ছুটে এলেন হৈ-চৈ এবং হাঁক-ডাক শুনে। সবার মুখে হাসি এবং কৌতূহল। সবাই হাক-ডাক লাগিয়ে দিয়েছে,—অমল বিয়ে করে এসেছে। দেখবে এসো। কি সুন্দরী বৌ এনেছে! শীগ্‌গির এসো তোমরা, বরণ করে নাও নতুন বৌকে।

দোতলার জানালা থেকে কিরণবাবু একবার একটু সন্দেহের দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে চটি পায়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেবে এলেন।

এদিকে বাড়ীর মেয়ে-বৌরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে অমল আর তার বৌকে ঘিরে। বৌ বরণ করে নিতে ব্যস্ত।

সহসা সেখানে আবির্ভূত হলেন কিরণবাবু। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, কি হয়েছে, ব্যাপার কি? অমল বিয়ে করে এসেছে।

—হ্যাঁ, দেখো কি সুন্দরী বৌ! অমলা বললে স্বামীকে।

—দাঁড়াও। আগে সব শুনতে দাও। কিরণবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন।

অমল একটু ভীত হলো বাবার গম্ভীরতা লক্ষ্য করে। তাই সে তাড়াতাড়ি বাবাকে প্রণাম করে মাকে প্রণাম করলো। স্বামীর দেখাদেখি বেলাও অনুকরণ করলো।

—তা' বেশ করেছ। কিন্তু বৌটার পরিচয় দাও। বিয়ে করলে চুপি-চুপি, আমাদের জানাতেও চাইলে না? এত তাড়াতাড়ি গোপনে বিয়ে করবার কি প্রয়োজন ছিল? কিরণবাবু একটা সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে টানতে বলে চললেন,—আমরা তোমার মা-বাবা, এটা কি তুমি মনে করতে চাও না?

অমল একটু বেশী ভীত হলো। তবু বিনয়সহকারে বললে, এর বাবা আমাকে কয়েকদিন আগে সহসা বললেন, বিয়ের কথা। অন্য এক জায়গায় এর বিয়ে ঠিক হয়েছিল, কথাও পাকা। আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল। সহসা তাঁদের অমত হয়েছিল এবং তাঁরা বিয়ের একসপ্তাহ আগে তাঁকে প্রস্তাব করলেন। তখন তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে। জিজ্ঞেস করুন তাঁর ছেলেও সাথে এসেছেন।

সহসা অমলের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে চট করে পকেট থেকে 'চেক' বের করে বাবার হাতে দিতেই বাবা বললেন, কি ওটা?

—দশ হাজার টাকার একখানি 'চেক্' দিয়েছেন।

—অর্থাৎ টাকার জুতো মেরে আমার অপদার্থ ছেলেকে কিনে নিয়েছে। কিন্তু ওটাকা আমাকে দেয়নি, দিয়েছে তোমাকে।

—না, বাবা, আপনাকেই দিয়েছেন তিনি।

—কিন্তু চেক্‌খানিতে তোমার নাম লেখা আছে তা লক্ষ্য করেছি। তাই ওটাকা আমার প্রাপ্য নয়, ওটা তার জামাইয়ের।

অমলের মুখ শুকিয়ে গেল। সে ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে চেয়ে রইলো ভয়ে। কখনো মায়ের দিকে। মা নীরব। তিনি কখনো বাবার উপর কথা বলেন নি। আজও বললেন না।

—তোমার নাম কি? কিরণবাবু প্রশ্ন করলেন নববধূকে।

বেলা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। অমল মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, বাবা, ও বোবা।

—ও। তবে ঠিকই করেছেন মেয়ের বাবা। নইলে কি দশহাজার টাকার চেক দেয় তোমাকে। তুমি একটি মূর্খ, তুমি অনভিজ্ঞ।

কিরণবাবু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। মেয়ে-বৌদের বললেন, কি দেখছো দাঁড়িয়ে? ঘরে চলে যাও।

—বাঃ বধূবরণ করা হবে না। অমলা দেবী বললেন।

—না, না, না। সে এ পরিবারের বধূ হবার অযোগ্য। একটি বোবা মেয়ে চৌধুরী পরিবারে বধূ হয়ে আসবে এ যে ধারণার অতীত। কি করে তাকে

[illegible] দিতে পারো ? আমরা কি হীন, [illegible] ?

হেমবাবুর মেজছেলে বিপ্রদাস এবার পেছন থেকে সামনে এগিয়ে এলো সাহস করে। বললে, যতই অপরাধ করুক, তবু সে হলো আপনারই ছেলে। সে-ছেলে যদি কাউকে বিয়ে করে ত হলে সে আপনার কাছে আশ্রয় পাবে না ? তাহলে সন্তানের প্রতি মা-বাবার প্রীতি কোথায় ?

—চুপ। আমাকে শিক্ষা দিতে এসো না। আমি অমল নই। যদি তোমাদের সদুদ্দেশ্য থাকতো তাহলে আমাকে জানিয়েই বিয়ে দিতে পারতে। তা যখন জানাও নি, তখন আমার কাছে সে স্থান পাবে না। তারপর চৌধুরী পরিবারের বৌ হবে বোবা, এ ধারণাও করতে পারি নি। তাই তোমার বাবার দেওয়া চেক্ ও কন্যা কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারলাম না।

—কিন্তু মনে রাখবেন আপনার ছেলে অমল চৌধুরী নাবালক নয় এবং সে শিক্ষিত। তাই সাহস করে একটি অবলা মেয়েকে বিয়ে করে মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছে এবং সে অত্যন্ত হৃদয়বান ও উদারচিত্ত।

—থাক্। আর উপদেশ-মাখানো বুলি ছড়াতে হবে না। তুমি তোমার বোনকে নিয়ে চলে যাও কৃষ্ণনগরে, সাথে চেক্‌টাও নিয়ে যাও। আমি অমলকে অন্য মেয়ের সাথে বিয়ে দেবো।

—কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনার ছেলে এমন অমানুষিক এবং বর্বরতার পরিচয় দিতে পারবে না। সে আধুনিক জগতের মানুষ এবং শিক্ষিত। তার প্রতি আমাদের সে বিশ্বাস আছে। বিপ্রদাস আবার জবাব দিলে।

বৃদ্ধ কিরণবাবু হাতের সিগ্রেটটা মাটিতে ফেলে পায়ে নিষ্পিষ্ট করতে করতে বললেন, ওসব মনভুলানো কথায় কাজ হবে না। সে আমার ছেলে, তার ভালমন্দ আমাকে দেখতে হবে, তোমাকে নয়। তোমরা তার সর্বনাশ করেছো, আরো করবে জানি। তাই ওর অন্যত্র বিয়ে দেবো।

অমল হতবাক, অধোমুখী। মহা দুর্বিপাকে পড়েছে সে।

এবার কিরণবাবু ছেলেকে বললেন, শোন অমল, আমি তোমার বাবা, তোমার চেয়ে বিচার-বুদ্ধি ও ভালো-মন্দ জ্ঞান আমার অনেক বেশী। তুমি এ বৌকে ত্যাগ করো। ভুলে যেও না তোমাদের বংশের গৌরব। তুমি একটি বোবা মেয়েকে বিয়ে করতে পারো না টাকার লোভে বা মনভুলানো স্তুতিবাক্যে। সারাজীবন তাহলে দুঃখ পাবে। আমার হাতে একটি অদ্ভুত সুন্দরী মেয়ে আছে। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো। তুমি আমার কথা শোন।

এদের তিনজনকে ঘিরে প্রায় কুড়িজন লোক দাঁড়িয়ে। সবার দৃষ্টি পড়ে এদের তিনজনের উপর। অমল চিন্তান্বিত। অকূল সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। একবার বাবার কথা মনে করতেই মন চরম বিদ্রোহ সৃষ্টি করলো, না, সে মানুষ, সে অসভ্য জানোয়ার হতে পারবে না।

ঘোমটার আড়ালে এতক্ষণ যে একটি বধূ অশ্রুবিসর্জন করছিল তা কারো নজরে পড়ে নি। এবার সে হাতের রুমাল বের করে অশ্রু মুছতেই হাতের চুড়ির ঝন্-ঝন্ শব্দ হলো। সবার দৃষ্টি পড়লো সেদিকে। অমলও চাইলো বধূর দিকে। এবার সে ভীষণ ব্যথা পেলো মনে, বধূকে অশ্রুবিসর্জন করতে দেখে।

বোবা মেয়ে বেলা এই অপমান সহ্য করতে পারছে না, তাই সে অশ্রুবিসর্জন করছে নিঃশব্দে। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সে দগ্ধীভূত হচ্ছে, প্রতি-মুহূর্তে। বোবা বলেই তার এই অপরাধ ? বোবা বলেই হয়তো সে একটু কালা। কিন্তু তাই বলে কি সে মানুষ নয় আর পাঁচটা মানুষের মত ? সে কি বধূর মর্যাদা পেতে পারে না আর পাঁচটা বধূর মত ?

[illegible]

দেখে একটু দুঃখিত হয়ে তাদের তিন-জনকে ভেতরে বসতে আপ্যায়ন করলেন। বিপ্রদাস বসতে রাজী নয়, এমন কি বোনকেও বসতে দিতে রাজী নয়। অমল যদি বসতে চায় বসুক।

কিন্তু অমল বসতে পারলো না সঙ্গীদের না বসিয়ে। সে চিন্তা করে চলেছে কি করবে সে। বৌকে সে ত্যাগ করতে পারবে না, কোনমতেই না। ভুল যদি সে করে থাকে স্বেচ্ছায় করেছে, কিম্বা টাকার লোভে করেছে, তাই বলে সে-ভুল সংশোধন করতে একটি বধূকে বর্জন করতে পারবে না। সে বলে দিলে বাবাকে সেই কথাটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

সেই মুহূর্তে তার বাবা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, বেশ, তাহলে এ বাড়ীর দরজা চির-কালের জন্য বন্ধ রইলো তোমার জন্য। তুমি যেদিন বধূ ত্যাগ করবে, সেদিন এসো।

এবার বিপ্রদাস অমলের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলে যাবার জন্য। তারপর বোনকে বললে, চলো বেলা। ট্রেন ধরতে হবে।

—দাঁড়াও একটু। একেবারে খালি মুখে যেয়ো না। একটু মিষ্টিমুখ করে যাও। বসো তোমরা।

—না, আর বসতে ইচ্ছে নেই। মিষ্টিমুখও হয়ে গেছে, চললাম। মনে থাকবে। বিপ্রদাস বলে হাঁটতে লাগলো।

অমল এবং বেলাও চলতে লাগলো। সহসা মা ছুটে গিয়ে অমলকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন নিঃশব্দে। তারপর বেলার মুখে হাত বুলিয়ে কান্নায় ফেটে পড়লেন। নীরবে কাঁদতে লাগলেন। নিজের ছেলে বিয়ে করেছে, কত আনন্দ, কত গৌরব। ভুল করে না হয় বোবা মেয়েকে বিয়ে করেছে, তাই বলে তো সে ফেল্‌না নয়। সেও যে তাঁরই মত একটি নারী। তার মনে আজ কত ব্যথা। তাদের তিনি বরণ করে নিতে পারলেন না। কত দুঃখ।

তারপর তিনি তাদের সজল চোখে আশীর্বাদ করলেন এবং আদর করে বললেন, চিঠি দিও। কি করবো,

[illegible] দিতে পারলো না।

অমল মাকে প্রণাম করলো। বধূকেও প্রণাম করতে ইশারা করলে। বেলাও প্রণাম করলো। তারপর বিদায়, দূরে, বহুদূরে।

●

কৃষ্ণনগরে ফিরে শ্বশুরের হাতে দশ হাজার টাকার চেক ফিরিয়ে দিয়ে বললে, আপনিই রেখে দিন। ভেবেছিলাম, একটা ব্যবসা করবো সেখানে গিয়ে। যখন আপনার এখানেই থাকতে হবে তখন এটাও আপনার কাছে থাক।

হেমবাবু বললেন, এ চেক তোমার এ্যাকাউণ্টে জমা করে দিচ্ছি। তুমি ব্যবসা করতে চাইছো, তাই করো। টাকা যা লাগে আমি দেবো, আমার বাড়ীতেই থাকবে তোমরা দোতলার ঘরে। তোমাদের সব খরচ আমার। যখন যা প্রয়োজন নিঃশঙ্কচিত্তে বলবে।

এর পর অমল হলো শ্বশুরের মতই ব্যবসায়ী। বিরাট একটা স্টেশনারী দোকান। যার মূল্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। বড় রাস্তার উপর কোর্টের কাছেই দোকান। দৈনিক একশো টাকার কম বিক্রী হয় না। কোনদিন দুই-তিন কি চারশো টাকা বিক্রী হয়। টাকাগুলো সব শ্বশুরের কাছে জমা দেয়। হেমবাবু তা থেকে অর্দ্ধেক রেখে বাকী টাকা ফিরিয়ে দেয়। অমল তা থেকে সামান্য টাকা রেখে বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেয়। এমন কি দোকানের জন্য কিছু কেনার দরকার হলেও নিজের সঞ্চিত টাকা থেকেই খরচ করে। হেমবাবু মাঝে মাঝে দোকান পরিদর্শন করেন, কোন কিছুর অভাব দেখলে নিজের টাকা থেকে সেটা কিনে পরিপূর্ণ করে দেন।

এমনি করে কাটতে থাকে মাসের পর মাস, বছর। অমল মাঝে মাঝে মায়ের কাছে চিঠি লেখে। মাও লুকিয়ে লুকিয়ে তার জবাব দেন। আশীর্বাদ জানান ছেলে-বৌকে।

[illegible] না খায়। ভয়ে-ভয়ে কাঁদে। সেটা যদিও প্রকাশ্য নয়, তবুও অনেকটা অনুমেয়। বেলা কথা বলতে পারে না। মনের কথার আদান-প্রদান কেমন করে হবে? কেমন করে বলবে নিজের ভাল-মন্দ, সাধ-আহলাদের কথা? কানেও ভাল শুনতে পায় না। সব কিছু আভাসে-ইঙ্গিতে আদান-প্রদান হয়। মনের ভেতর একটা চাপা ব্যথা জমে ওঠে অমলের। অথচ তা কারো কাছে প্রকাশ করে না।

অমলের পৌরুষের কথা সহরের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বহু মেয়ে-বৌ আসে দোকানে, বসে, গল্প করে, প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে চলে যায়। একটি বধূ ক্রমে ভালবেসে ফেললো অমলকে। এসেই সে কথা আর হাসিতে মেতে ওঠে। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রম করে।

সেটা লক্ষ্য করেছে বিপ্রদাস। সে চুপিচুপি বাবাকে বললে অমলকে সতর্ক করে দিতে। হেমবাবু অনেকক্ষণ ভাবলেন। দেখলেন, এ-রসে অমল বধূর কাছ থেকে একেবারে [illegible] পরবধূর সাথে সেই কথা ও [illegible] বিনিময়ে তৃপ্ত হতে চায়। এটাই [illegible] ধিক। তারও একটা জীবন আছে, আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে। তাই [illegible] নিভৃতে জামাইকে ডেকে নিয়ে বললেন, শোন অমল, তুমি যে-কোন মেয়ে-বৌয়ের সাথে আলাপ করতে পারো আমার বাড়ীতে, ঘরে বসে। কেউ কোন কিছু মনে করবে না। কিন্তু দোকানে ওটা কেউ ভাল চোখে দেখে না। তাই বলছিলাম, তুমি যাকে খুশী তাকে নিয়ে এসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করো, কেউ প্রতিবাদ করতে যাবে না।

অমল সেটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কোন মেয়ে-বৌয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায়নি। বেলা স্বাভাবিক হাসি-আনন্দটুকু জানে না। স্বামীর সাথে প্রেমে প্রমত্ত হতেও জানে না সময়ে-অসময়ে।

হেমবাবু সব কিছু লক্ষ্য করেন, তাই ব্যথিত হন। মেয়ের জন্য নয়, জামাইয়ের জন্য। তাই একদিন জামাইকে

নিভৃতে ডেকে বলেছিলেন, অমল, তুমি যদি অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তো বলো।

—এ কি কথা বলছেন আজ ?

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। তাহলে ভাল একটি মেয়ে দেখে তোমার বিয়ে দিই। আমার মেয়ের আইবুড়ো নাম তো ঘুচলো, এই যথেষ্ট। তোমার দিকে চেয়ে আমার এই প্রস্তাব।

—না, তা আর হয় না। বিয়ে একবারই হয় বা হওয়া উচিত।

এর পর হেমবাবু আর কোন কথা বলেন নি। মাথা নিচু করে চলে গেলেন নিজের ঘরে। অমলের প্রতি তাঁর মমতা সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি মনে মনে অনুতপ্ত হলেন অমলের জন্য। দেবতুল্য ছেলে।

একদিন অমল মায়ের চিঠি পেলে। তিনি কলকাতায় ভাইয়ের কাছে যাবার নাম করে ছেলের সাথে দেখা করতে আসছেন। এক সপ্তাহ পর। সে-কথা, হেমবাবুর কাছে বলতেই তিনি সমারোহ ব্যবস্থা করে বসলেন। তিনি নিজেই সদলবলে তাঁকে স্টেশন থেকে গাড়ীতে করে নিয়ে আসবেন সসম্মানে। তাঁর লেখা চিঠিওঅমল দেখিয়েছে। তিনি বধূকে কিছু আভরণ উপঢৌকন দিয়ে আশীর্বাদ করতে আসছেন সামনের বুধবারে।

নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারে বেলার জ্বর হলো। ডাক্তার এলো, পরীক্ষা করলো, ওষুধ দিল। বলে গেল, সাবধানে রাখবেন। একটু খারাপ মনে হচ্ছে। এর বেশী নয়।

পরদিন বুধবার। হেমবাবুর বাড়ীতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এলো বিভিন্ন রকমের। অমলের মা আসছেন। ডাক্তার রোগীর পাশে। অমলও সেখানে বসে। দোকান বন্ধ।

হেমবাবু বিপ্রদাসকে নিয়ে স্টেশনে গেলেন বেয়ানকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ীতে চড়ে ফিরলেন বেয়ানের সাথে। অমলের মায়ের হাতে গহনার পুঁটলী। বধূর জন্য তৈরী করিয়ে এনেছেন। পুত্রবধূর ঘরে ঢুকে তার রোগশয্যায় বসে হাতে দিলেন গহনার পুঁটলী। ডাক্তার একটু পরেই বেরিয়ে গেলেন। কান্নার রোল উঠলো ভেতর থেকে।

হেমবাবু ছুটে গেলেন রোগীর পাশে। তখন বেলা ছিল না। তার নশ্বর দেহটাই পড়েছিল বিছানায়। দু'চোখে অশ্রুর বন্যা দেখা গেল। পড়ে রইলো তার উপঢৌকন সামগ্রী।

দু'টি পাকিস্তানী কবিতা (উর্দু)

মুনির নিয়াজী

বর্ষা

হায়, এই বর্ষার রাত
জল ঝড় বাতাস বিজলীর চমক—
বজ্রের হুংকার,
চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার,
এই ভয়ংকর কোলাহলের মাঝে লুকিয়ে আছে
সর্বনাশের আসব।
আকাশ ঢেকে ছুটে আসছে কালো বাদল রাশি
আর, আমার জানালার নিচে কম্পমান পল্লব
থরথর হাত,
পরপাশে নিরর্থক ঘুরে বেড়াচ্ছে
অতীতের বিস্মৃত দুর্ঘটনা সব।
জল বাতাসের গর্জনের মাঝেও
যেন কত দূরে থেকে
শুনতে পাচ্ছি তোমার আহবান।

দুর-ধ্বনি

চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার আর রুদ্ধ ঘনঘটা
সে প্রশ্ন করছে "কে?"
আমি জবাব দিচ্ছি "আমি—
খোলো এই ভারী দরজা
আমাকে ভিতরে আসতে দাও—
তারপর এক দীর্ঘ নীরবতা আর প্রবল বাতাসের গর্জন।

অনুবাদিকা : সুজাতা প্রিয়ংবদা

গঙ্গা দিয়ে যেতে আসতে অনেকবার দেখেছে লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার চন্দননগরের গভর্নরের কুঠী। কখনো ভাবেনি এখানে সে কখনো ঢুকতে পারবে। মহিলাটি ও তার ভর্তা ভারতীয় কিন্তু এখানে থাকে কেন ? তবে কী---?

গভর্নর রেনো নৈশভোজের পোষাকে রৌশনদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গলায় তুষারশুভ্র ক্র্যাভাট, গায়ে কালো ভেলভেটের কোট, সাদা সার্টিনের ব্রিচেস্ কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত, পায়ে বকলেশ-আঁটা পাম্পস্। সামনের হলঘরে বসে তিনি একটি বই পড়ছিলেন। বইটি উপলক্ষ মাত্র, মনটি সেখানে ছিল না, কারণ ঘন ঘন বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ফটকের কাছে রৌশন ও ক্লাবেয়ার সঙ্গে একটি অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ যুবককে দেখে তিনি ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। বাইরে রৌশনের গলা শোনা গেল, কাকে যেন হুকুম দিচ্ছে ভার্তানেসকে পাঠিয়ে দিতে জলদি।

ন্যাথানিয়েল ভার্তানেস লাট-কুঠীর 'দুবাস' অর্থাৎ প্রধান কর্মচারী। সব ব্যবস্থা তার হাতে। লোকজনেরা তার অধীনে। ওর মা ছিল কাফ্রী, বাবা জার্মানি। জাতে খৃস্টান নয়, ইহুদী। বাপের গায়ের রঙ পায় নি, পেয়েছে মায়ের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও তার উত্তরাধিকারসূত্রে বাপের চৌকস বুদ্ধি পেয়েছে। বাপের মতন ভোজনবিলাসী। স্বামী-পুত্রের ভোজনবিলাসের ইন্ধন জুগিয়েছিল ঐ কাফ্রী গৃহিণী। চল্লিশজন দাস-দাসী এ-কুঠীতে, কিন্তু ওর ছড়িদারি মানে না মাত্র দুজনে। প্রথম নম্বর লাটসাহেবের ফরাসী 'সেফ,' সোজা ভাষায় সর্দার-বাবুর্চি, দ্বিতীয় নম্বর খোদ খিদমৎগার আলি আসগর। আসগরের বিরোধিতা মনে মনে, সর্দার-বাবুর্চির প্রকাশ্যে, কারণ সে সাদা আদমী, মঁসিয়ে-লা-গভর্নর ফরাসী রান্না ছাড়া খেতে পারেন না, তাকে ছাড়া চলবে না।

ন্যাথানিয়েল যে কামরায় নিয়ে গেল লেফটেনেণ্টকে, সেটি চমৎকার সাজানো, গঙ্গার দিকে মুখ, সুন্দর হাওয়া আসছে। ন্যাথানিয়েল ভেবেছিলো সাহেবটিও ফরাসী, তাই ফরাসীতেই প্রশ্ন করলো। লেফটেনেণ্ট বুঝলো না, প্রতি-প্রশ্ন করলো, 'পার্লে ভু আংলেই, ইংরেজী বলতে পারো ?'

'হুইস্কী পাঠিয়ে দেব সাহেব ?' ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলো ন্যাথানিয়েল।

'ওটা অভ্যেস নাই।'

'চুরুট ?'

'ওটাও চলে না।'

'তবে চানের জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

চানের বন্দোবস্তের বহর দেখে সিলভেস্টারের হাসি পেলো। গরম জল ঠাণ্ডা জল গোলাপ জল সাবান তোয়ালে নিয়ে এসেছে চারজন লোক। আরো চারজন ঢুকলো একগাদা পোষাক-আষাক নিয়ে। কলকাতার আবারস

দিব্যদর্শী

ওয়াটসন কুক হলওয়েল প্রভৃতি হোমরা-চোমরারাও এরকম ঠাঁট-ঠাটে থাকে না, সে তো সামান্য লেফটেনেণ্ট, কেল্লার ব্যারাকে নিতান্তই নিজের হাত-রথের উপর ভরসা।

কলকাতায় কোম্পানীর আস্তাবলে ঘোড়াগুলোকে রোজ দলাই-মলাই করে সহিসরা। চার-চারটে জোয়ান মর্দ। তাকে সেরকমই দলাই-মলাই করে চান করালো। তারপরে পোষাক পরাতে লেগে গেল আর চারজন। সিল্কের গেঞ্জী, সিল্কের ইজার, সাদা ক্র্যাভাট, কালো ভেলভেটের কোট, সাদা ব্রীচেস্, সাদা মোজা, কালো পাম্পস্। সামনে দাঁড়িয়ে যে লোকটি তদারকি ও হুকুমদারি করছিল সে বোধ হয় এদের চাইতে একটু উঁচু শ্রেণীর কারণ তার চাপকানে জরির কাজ, পাগড়ি জরির, কোমরবন্ধে জরির খাপে দেখা যাচ্ছে ছোরার রূপোর বাঁটা। লোকটি আর কেউ নয়, আলি আসগর, সাহেবকে প্রস্তুত দেখে নিয়ে গেল হলঘরে।

ঘরটি প্রকাণ্ড। কেদারা কোচ টেবিল পর্দা বাতির ঝাড় গালিচা সব কিছুই ফরাসীদের রুচিবোধের সাক্ষ্য দিচ্ছে, এদেশে নিশ্চয়ই তৈরী নয়। যে টানা-পাখাটি চলছে একমাত্র সেটিই বোধ হয় দিশী-হাতের তৈরী কিন্তু আগাগোড়া বাঁটটি রূপোর।

'তোমাকে চেনা যাচ্ছে না, লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার।'

ঘাড় ফিরিয়ে সিলভেস্টার দেখলো ঘরে ঢুকেছে ম্যাডাম। তার পেছনে

রাবেয়া, তার পেছনে একটি সুঠাম সুগঠিত-দেহ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক।

সিলভেস্টার উঠে দাঁড়ালো।

'ইনি মঁসিয়ে-ল্য-গভর্নর জুলিও রেনো। তোমার পরিচয় আগেই এঁকে দিয়েছি।'

রেনো হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

'আমার সৌভাগ্য মঁসিয়ে গভর্নর কৃতার্থ হলাম।'

'কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার।'

'লজ্জা দেবেন না মঁসিয়ে।'

প্রথম দর্শনের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছে রাবেয়ার। নৈশভোজনের পোষাকে এই সুশ্রী যুবকটিকে আরো শ্রীমান দেখাচ্ছে। এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি সে এর সঙ্গে, অথচ এ-ই তাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে সিলভেস্টারের মুখেও যেন কথা সরছে না। বিবর্ণমুখ মূর্চ্ছিতা এই মেয়েটির মধ্যে সে দেখেছিল বিস্মিত নেত্রে যে অপরূপ-রূপের বিচিত্র ছবি, সে রূপ এখন অগ্নি-শিখার মত প্রদীপ্ত, আরো বিস্ময়কর।

'মিস্টার সিলভেস্টার, আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া এখনো বাকি আছে, ত্রুটি মার্জনা করো।'

কী সুন্দর কণ্ঠস্বর।

'ভাল বোধ করছো এখন মিস রাবেয়া আশা করি?'

ফরাসীদের রসবোধের আর একটি পরিচয় তাদের খাদ্য। ফরাসী রন্ধন প্রণালী ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইংরেজদের খাদ্য নীরস। ইংরেজ খিচুড়ি জাত। অ্যাঙ্গল্‌স্‌ স্যাক্সন টিউটন ডাইকিং নর্মান প্রভৃতি বহু নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ তাদের শোণিতে, রক্তক্ষয়ী বহু যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বংসলীলার পথে এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীদের ক্রমবিকাশ, তাই বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে ওদের রন্ধনপ্রণালী উৎকর্ষ লাভে অগ্রসর হতে পারে নি। ফরাসী খাদ্যের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় সিলভেস্টারের। তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে।

গভর্নর, রৌশন ও তার দিকের সামনে বিভিন্ন আকৃতির সুন্দর সুন্দর কাঁচের পাত্রে বিবিধ সুরা সাজানো।

'ওগুলো মুখে দিচ্ছ না কেন লেফটেনেণ্ট? স্যাম্পেন বার্গাণ্ডি দুঁবলে ক্রিম-দ্য-মেন্থ পছন্দ করো না? হুইস্কী কিম্বা ব্রাণ্ডি দেবে?'

'না ম্যাডাম, ও-রসে বঞ্চিত আমি।'

রৌশন আশ্চর্য হলো, রাবেয়া খুসী হলো, রেনো চুপ করে রইলেন। চারজন খানসামা খানা পরিবেশন করছিলো, ইঙ্গিত পেয়ে সিলভেস্টারের সামনের গেলাসগুলি সরিয়ে নিয়ে গেল।

'শুনেছি কলকাতা ও কাশিমবাজারের ইংরেজরা দিনে এক বোতল হুইস্কী খায়?'

'অস্বীকার করতে পারি না ম্যাডাম।'

'ওদের নাকি বিশ্বাস হুইস্কী জ্বর কলেরা ও আমাশার বিষ নষ্ট করে?'

অস্বীকার করবো না, ম্যাডাম। তবে প্রত্যেকটি কু-অভ্যাসের সমর্থনে মানুষ একটি যুক্তি আবিষ্কার করে। এটাও তাই।'

'ফরাসী মদগুলোয় বেশী নেশা হয় না, এরা ছেলেবেলা থেকেই ওগুলো খেতে অভ্যস্ত। মাতৃস্তন্য ছেড়েই প্রায় মদের আস্বাদ লাভ করে। মদ্যসাগরে এরা মৎস্যের মত সারাজীবন সাঁতার কাটে।

'আমাদের হুইস্কী ব্রাণ্ডি জিন-এ বেশ নেশা হয় এবং যারা খায় তারা নেশার জন্যেই খায় আমার অনুমান। কিন্তু দেশে থাকতে অত খায় না যত খায় বিদেশে এসে। হয়তো এর কারণও আছে, বিদেশের অনেক অভাব-অসুবিধা, মানসিক ও দৈহিক ক্লেশ ভুলে থাকতে চায়।'

রেনো চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন। এই তরুণ ইংরেজের কথাগুলি তাঁর ভালই লাগছিল। কথা বলার ধরণটিও সুন্দর। রাবেয়াও শুনে যাচ্ছিল আগ্রহের সঙ্গে, রৌশনই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। 'তোমাদের জাতের দুর্নাম আছে, লেফটেনেণ্ট, তোমাদের রক্ত নাকি ঠাণ্ডা, মনের দরজা চাবি আঁটা, মদ না খেলে রক্ত গরম হয় না, মনের দরজা খোলে না। তোমরা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর আগে সৈন্যদের মদের পিপে বিলি কর?'

'প্রত্যেক জাতেরই সুনাম দুর্নাম দুই-ই থাকে। তার কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা যাচাই করে দেখা হয় না।'

অর্দোভ, কন্‌সোম মার্সেল্‌স্‌, ফয়-দা গ্রা, সিকেন-অ্যালা-কিয়েভ শেষ হয়েছিল, এবার খানসামারা নিয়ে এল বড় একটা রূপোর ট্রেতে একটি দুর্গের মত বাড়ি। দুর্গের গম্বুজগুলো লাল, বাকিটুকু সবুজ, তুষারপাত হয়ে যেন সামনের বাগানটির কিছুটা সাদা হয়ে গেছে।

সিলভেস্টার বুঝতে পারছে না এটা কি, অথচ ছুরি ও সাঁড়াশীর মত একটা কি রয়েছে বাড়িটার দুই পাশে। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। খানসামারা আবার প্লেটগুলো বদলিয়ে দিয়ে গেছে।

'ছুরি দিয়ে কেটে তুলে নাও, লেফটেনেণ্ট। ওটা একরকমের পুডিং।' এবার আবার মুখ খুললো রাবেয়া। 'ঠকে গেলে মিস্টার সিলভেস্টার, কেমন?'

'যদি বলি ঠকে গিয়ে জিতে গেলাম।'

'কিসে জিতলে?'

'নতুন একটা পুডিং খেলাম, খুব ভাল খেলাম। তুমি চুপ করেছিলে, এখন কথা বলে উঠলে, এটা কি জেতা নয়?'

'তোমার দেশে কে আছে?'

'মা, আর কেউ নেই।'

'দুষ্টু ছেলে বলে বিদেশে চালান করে দিয়েছেন মা?'

'বোধ হয় হ্যাঁ, বোধ হয় না। তবে একটিই ছেলে তার এবং দুষ্টু হলেও ছেলের উপর মাতৃস্নেহ কম থাকে না, এজন্যেই মাতৃস্নেহের তুলনা নাই।'

'হয়তো তোমার মায়ের উপর টান নেই? মাকে দুঃখ দিচ্ছো। এ রকম ছেলে কোথাও দেখিনি।' বিদ্রূপ করে সকৌতুকে রাবেয়া।

কফি দেওয়া হয়েছিল বসবার ঘরে। হুঁকাবরদারেরা দুটো গড়গড়ায় সুগন্ধি তামাক সেজে এনেছে। রেনো তাঁদের খাবার পরে নিশী কায়দায় গড়গড়া

টানেন কফির সঙ্গে। একজন হুঁকাবরদার একটি গড়গড়ার নল তুলে দিল লাটসাহেবের হাতে, আরেকজন আরেকটির নল দিতে গেল নতুন সাহেবটির হাতে।

সিলভেস্টার হেসে বললো, 'এটাও অভ্যেস নেই, মাদাম।'

রেনো সামনের একটি সোনার বাক্স দেখিয়ে বললেন, 'তবে চুরুট?'

'ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে গভর্নর, এটার কোনোটাই চলে না আমার।'

কলকাতার সাহেবদের হুঁকো-গড়গড়া টানার কথা উঠলো, উমিচাঁদের বাড়িতে বাইজীর নাচ দেখতে সাহেব-মেমসাহেবদের দল বেঁধে যাবার কথা উঠলো। সিলভেস্টার একবার মাত্র দেখেছে নাচ কিন্তু হাব-ভাব ভাল লাগেনি, আর দ্বিতীয়বার যায়নি। কলকাতার পাদ্রী সাহেবদের কথাও উঠলো। সিলভেস্টারের মতে সকল ধর্মেই ভালমন্দ আছে। কারুর ধর্মমতেরই পরিবর্তন করতে যাওয়া ঠিক নয়।

'নিজেকে সব বিষয়েই খুব ভাল ছেলে বলে জাহির করছো, না?' শ্লেষ করলো রাবেয়া।

মৃদু ভর্ৎসনা করলেন রেনো, 'রাবেয়া, তুমি আগাগোড়াই বেচারীকে মুস্কিলে ফেলার চেষ্টা করছো।'

'না-না মঁসিয়ে গভর্নর, মিস রাবেয়ার কথা বেশ ভালই লাগছে আমার মানে মন্দ লাগছে না, ওকে বারণ করবেন না দয়া করে।'

রাবেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দেখে সিলভেস্টার ক্ষুণ্ণ হলো। সত্যিই বেশ লাগছিল তার রাবেয়ার সঙ্গে কথা বলতে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিতে।

পরের দিন খুব ভোরেই সিলভেস্টার রওনা হল কলকাতার দিকে। ইচ্ছে হচ্ছিল ম্যাডামের ব্রেকফাস্টের অনুরোধ রক্ষা করেই আসে। কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে ফোর্ট উইলিয়মে, প্যারেডের আগে। মঁসিয়ে গভর্নর বলেছেন, যখনই সুবিধে হবে আসতে পারো, কিন্তু সেটা হয়তো মৌখিক ভদ্রতা মাত্র। সে আর যাবে না।

কিন্তু অলক্ষ্যে যে দেবতা নর-নারীর জীবন নিয়ে খেলা করতে ভালবাসেন, তিনি হয়তো হাসলেন। সৃষ্টিকর্তা ভগবান যখন এই দেবতাটিকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন বলেছিলেন, 'তুমি মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে, কিন্তু দুটি জিনিষ দিতে পারবে না, আমার নিষেধ, একটি হলো সন্তোষ, আরেকটি হলো শান্তি। সবাই যদি সন্তুষ্ট থাকে তোমার দানে এবং শান্তিতে থাকে তোমার দয়ায়—তবে সৃষ্টির বৈচিত্র্য কিছু থাকবে না।'

ভাগ্যদেবতা মেনেই চলেন এই নির্দেশ, তাই শান্তস্বভাব সিলভেস্টার কলকাতায় ফিরে হঠাৎ বুঝতে পারলো তার মনের শান্তি কোথায় যেন হারিয়ে এসেছে।

॥ তিন ॥

পদগৌরবে গভর্নর রেনোর পরেই অর্দেঁয়া কেল্লার কমান্দান্ত মেজর আগ্লোয়া। সেনাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি গভর্নরের দক্ষিণহস্ত। পোষাকে ও পদক্ষেপেই নয়, চেহারাতেও তাঁর ফৌজী ছাপ।

তাঁর সঙ্গে এসেছেন চন্দননগর সরকারের দেওয়ান জগন্নাথ চৌধুরী। অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর। তাঁর পিতা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন এখানকার সর্বপ্রথম দেওয়ান।

আলোচনা হচ্ছে গভর্নর রেনোর কুঠিতে, আপিসঘরে, রৌশনও আছে রেনোর সঙ্গে। আগ্লোয়া পছন্দ করেন না এ সব আলোচনায় স্ত্রীলোকের উপস্থিতি, গভর্নরের জীবনসঙ্গিনী হলেও সরকারি কাজকর্মে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ বিধিসঙ্গত নয়, কিন্তু অধস্তন কর্মচারী হয়ে মুখ ফুটে বলতে পারেন না গভর্নরকে।

জগন্নাথ চৌধুরীও এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নন। কিন্তু তিনি হিন্দু, হর-গৌরী রাধা-কৃষ্ণ রাম-সীতা যুগলে বিরাজ করেন, এই ভেবে রেনো-রৌশনের যুগলে উপস্থিতি বরদাস্ত করে যান। সৃষ্টিতত্ত্বও তো পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাবিলাস।

কমান্দান্ত ভণিতা করতে জানেন না কোনো বিষয়ে, সোজা চলে আসেন কাজের কথায়। গোলাগুলি নিয়ে তাঁর কাজ, গোলাগুলির মতই সোজা লক্ষ্যভেদ করা তার স্বভাব।

'আমি জানতে চাই চৌধুরীর কাছে শহরের চারিদিকে গড় কাটা ও দেওয়াল তোলার কাজ সুরু হবে কবে, মঁসিয়ে রেনো। ইংরেজরা কলকাতায় নতুন

একটা কেল্লার ভিত্তি আরম্ভ করেছে, ইংরেজ চারিদিকে কামান বসাচ্ছে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে জায়গায় জায়গায়। আমরা কি জেগে জেগেই ঘুমোবো ?'

আগ্নোয়ার প্রতিধ্বনি করলো রৌশন, 'আমিও সেই কথা বলি কমান্দান্ত, আমরা কী জেগেই ঘুমিয়ে থাকবো এখনো ? যারা জেগে ঘুমোয় তারা না থাকে জেগে, না থাকে ঘুমিয়ে, তারা নিজেকেই ঠকায়, শেষে অন্যের কাছে ঠকে যায়।'

খুশি হলেন আগ্নোয়া রৌশনের সায় পেয়ে এবারকার মত।

স্পষ্ট কথার নামান্তর রূঢ়কথা। শ্রোতা খুশি হয় না, হয় ক্ষুব্ধ। বিরক্ত হলেও রেনো প্রতিবাদ করলেন না, চৌধুরীর দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করলেন। জবাব এল রৌশনের মুখ থেকে।

'চৌধুরী মশাইয়ের সমস্যা আমি বুঝতে পারি। সে-সমস্যার সমাধান ট্যাক্স বাড়ানো, অন্য সমাধান নাই। কোম্পানীর অংশীদাররা চান মোটা মুনাফা টানতে, আর ট্যাক্সের ভার টানবে এদেশের গরীব লোকরা সেটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু অন্য উপায় কী আছে ? আত্মরক্ষার প্রশ্ন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ইংরেজরা হুগলীর দিকেও নজর হানছে আমি খবর পেয়েছি। বলুন তো চৌধুরী মশাই কী কী ট্যাক্স আদায় করছেন আপনি ?'

'কোম্পানীর ব্যবসায়ের লাভের অংশ আমরা পাই কেবল সিকি ভাগ ; চৌথ। এখানে আদায় করা হয় হাট-বাজারে পাইকারদের কাছ থেকে 'তুলুনি', ধান চাল ডাল নীলের উপর 'কয়ালি', জমি দান-বিক্রির উপর 'পাট্টা সেলামী', দিশী খৃস্টান হিন্দু মুসলমান আর্মানি ফিরিঙ্গীদের মাথাপিছু 'চৌথাই', চিনি মদ ভিটেবাড়ি ফলবাগান পুকুর কাপড়ের উপর 'সুখানি', যারা নৌকা তৈরী করে তাদের কাছ থেকে 'গুড়িমাগুনি', জাহাজী আমদানি-রপ্তানি মালের উপর 'ঘাট-সেলামী'। এই শেষেরটা দেয় যারা কোম্পানীর লোক না হয়েও মাল আনে ও পাঠায়।'

'একটা মোটা রকমের আদায় চেপে গেলেন চৌধুরী মশাই, সেটা ঐ ঘাট-সেলামীর মধ্যেই পড়ে। ওটা পরে একেবারেই বন্ধ করতে হবে।'. গভর্নর রেনো বুঝতে পারলেন রৌশনের এই তীক্ষ্ণ বাণটি কাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলো, কথাটা চাপা দিয়ে বললেন, 'নবাবকে আমাদের কত দিতে হয়, চৌধুরী ?'

'চেহেল-দো, আমদানি-রপ্তানির উপর প্রতি চল্লিশ টাকায় দু-টাকা।

'ট্যাক্স বাড়ালে নবাব ভাগ বসাতে চাইবেন না তো ?'

'চুক্তির সর্তে পারেন না ভাগ বসাতে।'

'তবে আমরা শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে ট্যাক্স বাড়াতে পারি কি না বিবেচনা করে দেখুন। অনেক লোক নবাবের আওতা থেকে চন্দননগরে এসে বসবাস করছে, ব্যবসাপত্রও বাড়তির মুখে, কি বলেন ?'

অনেকে আছে যারা হাসে না, কারণ তারা হাসতে জানে না, হাসতে কখনো শেখেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল ঘোঁৎ করে একটু শব্দ করে, ওটাকে বলা যেতে পারে হাসির জানোয়ারি সংস্করণ, কেন না কোনো কোনো জানোয়ার খুশী হলে ওরকম শব্দ করে। কমান্দান্ত মেজর আগ্নোয়ার হর্ষপ্রকাশের বহির্মুখী প্রকাশ এই শ্রেণীর।

মঁসিয়ে গভর্নরের কথাটি একেবারে লুফে নিয়ে বললেন, 'বেশ বলেছেন, সত্যিকথা বলেছেন, তার কারণ ঐ অর্লিয়াঁ কেল্লা এবং সৈন্যদল নবাবের এলাকা নিরাপদ নয় বলেই ধন মান ব্যবসার জন্যে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। একটা 'ফৌজী সেলামী' বসানো যায় না ?'

প্রস্তাবটির কোনো সমর্থন এলো না।

'চৌধুরী মশাই, যে ট্যাক্সগুলোর কথা বললেন তা কি শুধু দিশী লোকরাই দেয়, না ফরাসী ব্যবসায়ীরাও দেয় ?'

'ফরাসীরা দেয় না, বাঙালীরাও দেয় না ? দিতে বাধ্য করা হোক, তবে ? সুখ-সুবিধা ওরাও পাচ্ছে, বিস্তর টাকাও লাভ করছে। কোম্পানী চন্দননগরের মালিক কিন্তু ওদের ব্যবসা নিজেদের, ওরাও সেহেতু কোম্পানীর প্রজা।'

রেনোর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো। এটা বৈষম্য বটে, কিন্তু জগতে কোথায় এ জাতীয় বৈষম্য নাই ? এখানেও নবাবের শাসন-যন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানের প্রতি বৈষম্য আছে, হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের বৈষম্য আছে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বৈষম্য আছে, পৃথিবীর কোথায় কোন দেশে বৈষম্যবিরহিত ?

আগ্নোয়া ভাবলেন, সত্যিকথা, সেনাদলেও তো সেনানী ও সৈন্যদের ভিতরে বৈষম্য আছে, তার নিজের দেশে অভিজাতশ্রেণী ও সাধারণ লোকদের ভিতর বৈষম্য রয়েছে।

চৌধুরী ভাবলেন, সত্যিকথা, তিনি কায়স্থ তাই ব্রাহ্মণরা তাঁকে নিচে খাড় না, পাঠান বাদশাদের রাজত্বে পাঠানরা সব রকম সুবিধা পেয়েছে, আবার মোগলদের রাজত্বে মোগলরা। এ রকম হয়েই থাকে, যা হোক আচ্ছা ঘা দিয়েছেন রৌশন, সাবাস।

রেনো বললেন, 'এখানে ফরাসীদের উপর ট্যাক্স বসানো আমার ক্ষমতার বাইরে। সে ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল মঁসিয়ে দ্যুপ্লের নাই, সে ক্ষমতা প্যারিসের ডিরেক্টরদেরও নাই, আছে কেবল ফরাসী সম্রাটের মন্ত্রিপরিষদের। কোম্পানী ফরাসী সরকারের কাছ থেকে যে সনদ পেয়েছে তার অন্যথা করতে পারে না।

রৌশন দেখে জানলা দিয়ে বৈনুদ্দীন কুঠির সামনে ঘোরাঘুরি করছে। একজন চোপদারকে দিয়ে ডেকে পাঠালো বাইরে গিয়ে। তার আর দরকার নাই এই আলোচনায় উপস্থিত থাকবার, যা বলার ছিল বলে এসেছে।

'কোনো খবর আছে বৈনুদ্দীন ?'

'জেনাব বেকসাহেব, দেখা হয়েছিল সেই লেফটেনেন্ট সাহেবের সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'শ্রীরামপুরের কাছে শিয়ালচাঁপার জঙ্গলে।'

'কোনো কথা হলো?'

'বললাম সাহেব তুমি অনেক দিন যাওনি কেন আমাদের চন্দননগরে?'

সাহেব বললো, 'দরকার কী, যখন দরকার হয়েছিল গিয়েছিল, আর দরকার নেই---বললাম, ছোট বেগমসাহেবা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো একদিন।'

রৌশন উষ্ণ হয়ে ধমক দিলো, 'ঝুট বাৎ বললে?'

'ঝুট বাৎ নেহি বেগমসাহেবা, হয়তো বাৎ-কে-বাৎ বলেছিল ছোট বেগমসাহেবা।'

রৌশন শুধু বললো, 'হুঁ।'

'সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, আমার হাতের লাঠিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো আমিও ডাকাত কি না।'

'কী জবাব দিলে মৈনুদ্দীন?'

'সচবাৎ বললাম, বললাম, সাহেবের আন্দাজ বেঠিক নয়। কিন্তু ডাকাত কে নয়? জমিদার ডাকাতি করছে প্রজাদের উপরে, বলে 'খাজনা'। নবাবের দেওয়ানরা ডাকাতি করছে জায়গীরদারদের উপরে বলে 'নজরানা'। খোদ নবাব লুঠ করছেন রাজা জমিদার জায়গীর দেওয়ান সওদাগরদের টাকা, বলছেন 'ভেট', তোমরাও এসেছ লুঠ করতে, বলছো 'মুনাফা।' আমি ডাকাতি করি পেটের দায়ে, কিন্তু ওরা? সাহেব বললো, ঠিক বাৎ বলেছো।'

'কী করছিলো সাহেব'—জিজ্ঞাসা করলো রৌশন।

'বন্দুক হাতে চুপ করে বসেছিলো আর কি যেন ভাবছিলো, কোনোদিকে খেয়াল ছিল না। বললাম, সাহেব জঙ্গলে হুঁসিয়ার হয়ে থাকতে হয়, হঠাৎ কোনো বড় জানোয়ার লাফিয়ে পড়তে পারে। সাহেব বললো, জান দিয়ে আর কী হবে মিয়া? সাহেবের দিল বোধ হয় আচ্ছা ছিল না।'

চলে গেল মৈনুদ্দীন। কিন্তু রেখে গেলো রৌশনের মনে দুর্ভাবনার এক-টুকরো কালো মেঘ। ছেলেটিকে ভাল লেগেছে রৌশনের, যেমন ভাল লেগেছিলো এক্রামকে—সিরাজের ছোট ভাই এক্রাম, আমিনাবেগমের ছোট ছেলে। নিঃসন্তান নওয়াজিস খান তাকে নিয়েছিলেন দত্তক, কিন্তু এই দত্তক, পুত্রের প্রতি স্নেহ দেখান নি কখনো ঘসেটি বেগম। শুধু দত্তকপুত্র বলেই নয়, সহোদরার গর্ভজাত বলে যে স্নেহের দাবি ছিল তাও করলেন উপেক্ষা। স্বৈরিণী নারী কঠোর আঘাত করলেন পুনরায় স্বামীর মনে। ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নারী হতে চায় শুধু প্রিয়া, ধর্মপত্নী বা মাতার পবিত্র কর্তব্য সাড়া দেয়নে তার অন্তরে।

এক্রাম ছিল রৌশনের অন্যতম খেলার সাথী ঢাকার দরিয়া-মঞ্জিল এবং মুর্শিদাবাদের মতিঝিল-মঞ্জিলে। বয়সে বালক, কিন্তু ধীর স্থির বুদ্ধিমান। এই ইংরেজ ছেলেটিকে দেখে তার কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো রৌশনের।

সিরাজ আজ আলিবর্দির মসনদে, বাঙল-বিহার-উড়িষ্যার মালিক-উল-মুলুক। আলিবর্দি যৌতুক দিয়েছিলেন সুরম্য মতিঝিল মঞ্জিল কন্যা ঘসেটি বেগমকে। এক্রাম ঘুমুচ্ছে মতিঝিলের প্রাঙ্গণে একটি কবরে। ঘসেটি বেগম এক্রামের কবরের উপরে একটি খণ্ড পাথরও বসাতে দেননি। সিরাজের মাথায় রাজছত্র, এক্রামের শিয়রে একটি জীর্ণ বটগাছ, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে অবহেলায় লাঞ্ছিত সেই কবরে। হায় খোদাতাল্লা, যারা সাচ্চা ও ইমানদার তাদের তুমি কোলে তুলে নাও অকালে।

সিলভেস্টারের তবিয়ৎ কী ভাল যাচ্ছে না, ভাবলো রৌশন। নিতান্তই ছেলেমানুষ ও, রাবেয়ার চেয়ে বছর দুই মাত্র হয়তো বড়। মায়ের স্নেহাঞ্চল থেকে এত দূরে বিদেশে আসা ঠিক হয়নি।

●

রাবেয়াকে ফ্রেঞ্চভাষা শেখানো হচ্ছে। রেনোর ইচ্ছা, রৌশনের আগ্রহ। মূলোৎপাটিত হয়ে এসে পড়েছে ফরাসীদের কাছে, তাদের ভাষা ভাল করে বুঝতে পারা দরকার, বলতে পারা দরকার। মনুষ্য সমাজে ভাব আদান-প্রদানের বাহন ভাষা।

পশু-পক্ষীদের ভাষা নাই। ক্ষুধার্ত হলে, ভয়ার্ত হলে, কামার্ত হলে, উল্লসিত হলে, ক্রুদ্ধ হলে ওরা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি করে মাত্র। ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন নাই, ওদের গুটিকয়েক ধ্বনিতেই চলে যায়।

মানুষেরও একেবারে আদিম অবস্থায় কণ্ঠে ফুটেছিল কেবল কয়েকটি ধ্বনি, বোধহয় ঐ পশুদেরই অনুকরণে। ধ্বনি ও আকার-ইঙ্গিতই ছিল নিজেকে ব্যক্ত করবার একমাত্র উপায়। অতিকায় কোনো জন্তু নিকটে এসে পড়েছে, অথবা ছোট কোনো শিকার কাছাকাছি আছে বোঝাতে সেই জানোয়ারের শব্দ অনুকরণ করতো। ঝর্ণা বা নদীর কুলু-কুলুধ্বনি অনুকরণ করে জানাতো জল নিকটেই আছে দেখে এসেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হলে বুঝিয়ে দিতো কাতরোক্তি করে। শ্রান্ত হয়ে পড়লে জানিয়ে দিতো ক্লান্তিসূচক শব্দে। ক্রমে এলো গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন, জীবনযাত্রার বিবর্তন,
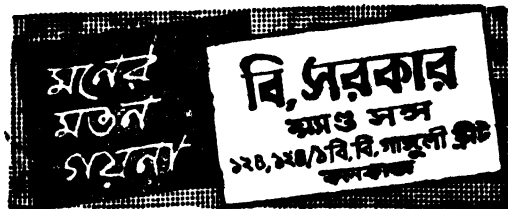
মনোভাব প্রকাশের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন, নতুন নতুন ধ্বনি ও শব্দের প্রয়োগ। কতিপয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্যাপকতা লাভ করলো সেই ধ্বনি ও শব্দগুলি, পর্যায়ে ও বিন্যাস সুসংবদ্ধ হয়ে ধারণ করলো একটি বিশিষ্ট রূপ। সৃষ্টি হল ভাষার। সাত কোটি বছর ধরে চলেছিলো এই বিবর্তন।

শিশুরা ও মূকবধিররা কথা বলতে পারে না, অর্থহীন ধ্বনি ও ইসারা-ইঙ্গিতের উপরেই করে নির্ভর, কিন্তু সেটা পরিণতির অভাব, অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ। কিন্তু রাবেয়ার ক্ষেত্রে এ দুটির একটিও প্রযোজ্য নয়। বোবার মত চুপ করেও থাকতে চায় না ও, শিশুর মত আধ-আধ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ফ্রেঞ্চও চলবে না ওর।

ফাদার ভ্যালেরি মাস্টারির ভাঁজে ভাঁজে খৃস্টধর্মের মহিমা শোনান। খৃস্ট-ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মই যে ধর্ম নয় সেটাও ইঙ্গিত করেন।

রাবেয়া প্রশ্ন করে, 'আপনি যে মুক্তি কথাটা বারে বারে ব্যবহার করেন, সেটা কী রকম বলুন তো, ফাদার?'

'সে মুক্তি অনন্ত শান্তি লাভ ও নরকাগ্নি থেকে নিষ্কৃতি লাভ এবং স্বর্গস্থ পিতার সন্নিধানে স্বর্গসুখ অনুভব করা।'

'সে স্বর্গসুখটাই বা কী রকম?'

'স্বর্গে সুখ নাই, দুঃখ নাই, আহারের প্রয়োজন নাই, বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, অবিরাম বীণাবাদন ও সঙ্গীতশ্রবণে সময় কাটে। রবিবারে আমাদের গীর্জায় যে রকম উপাসনা ও সঙ্গীত হয় স্বর্গে সর্বদাই সে রকম উপাসনা ও সংগীতানুষ্ঠান চলে।'

চন্দননগরে কোনো গীর্জা নাই, ফরাসীরা ও দিশী খৃস্টানরা মাঝে মাঝে যান চুঁচড়োর জন-দি-ব্যাপিস্ট চার্চে অথবা রোমান ক্যাথলিক চ্যাপেলে, কখনো কখনো যায় শ্রীরামপুরের সেন্ট ওলাফ চার্চে অথবা মিশন চার্চে। রাবেয়া এ পর্যন্ত কোনো চার্চে যায়নি, তবে লোকের মুখে শুনে মোটামুটি ধারণা আছে খৃস্টীয় উপাসনার রীতিনীতির। ফাদার ভ্যালেরি চন্দননগরে চালাচ্ছেন একটি হসপিস, মানে অনাথাশ্রম, সম্প্রতি একটি ছোট্ট হাসপাতালও খুলেছেন, অপিতাল ন্যাশনিয়ল। স্বর্গরাজ্যের বিবরণ শুনে রাবেয়া হেসে বললো, 'মাফ করবেন ফাদার কিন্তু ওখানে আমি যেতে চাই না, রাতদিন সঙ্গীত ও বীণাবাদন শুনলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

বেশ চটলেন ফাদার। 'তাহলে তোমার স্বর্গটা, মানে 'বেহেস্ত', কী রকম বলতে পার?'

'আপনাদের হেভেন-এর চাইতে আমাদের বেহেস্তটি মনে হয় একটু বেশী বাস্তব। সেখানে সুন্দর সুন্দর নদী, সুন্দর সুন্দর বাগান ফুলে-ফলে ভরা, পাখীরা সুন্দর গান করে, মিষ্টি বাতাস, মিষ্টি আলো। পুরুষরা সেখানে গিয়ে সুন্দরী সুন্দরী হুরীদের সঙ্গে রাত-দিন আমোদ-প্রমোদ করে, মেয়েরা সেখানে গিয়ে সুন্দর সুন্দর দেবদূতদের সঙ্গে পরমানন্দে বিহার করে।'

ভ্যালেরি ভ্রূকুটি করলেন।

'কিন্তু রাবেয়া, ইন্দ্রিয়সুখের লালসা মেটাতে স্বর্গে যাবার প্রয়োজন কী? তারপরে ধরো তোমাদের পয়-গম্বরের দেশ ছিল আরবের মরুভূমি, ঐ নদী কানন ফুল ফল ও-দেশের লোকের কাম্য হতে পারে কিন্তু তোমার?'

'ফুল আমি খুব ভালবাসি, নদী ভাল-বাসি, খুশিই হব আমি ওখানে গেলে।'

ভ্যালেরি স্বর্গরাজ্যে সুবিধা করতে না পেরে প্রভু খৃস্টের আশ্বাসবাণীর পুনরুক্তি করে বললেন, তিনি জীবন পণ করে আমাদের পাপের সকল ভার গ্রহণ করেছেন, তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা।'

'তা হলে, ফাদার, মুক্তি পেতে হলে আমাদের পাপ করতে হবে আগে।'

রাবেয়ার যৌবন-পুষ্পিত দেহ-সৌষ্ঠবের দিকে তাকিয়ে ভ্যালেরি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গেলেন। সে পর্দার সামনে রাবেয়া সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো।

'ফাদার, শরীরটা আজ ভাল নাই আমার, তাই মুখ দিয়ে অনেক কথা বেরিয়ে গেল, ক্ষমা করবেন। আজ তবে এ পর্যন্তই থাক, কাল আবার দেখা যাবে।'

ভ্যালেরি নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছেন ততক্ষণে। বললেন, 'শরীরের দোষ নেই মনে হচ্ছে, মনটাই তোমার কিছুদিন ধরে কেমন হয়ে গেছে যেন। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাও পড়তে পড়তে, কখনো কখনো উদ্ধত হয়ে ওঠো। কাল থেকে একমাস আমি পড়াতে আসতে পারবো না, 'লেন্টের' উপবাস আরম্ভ হবে।'

হেসেই কথাগুলি বললেন পাদ্রী সাহেব, কণ্ঠস্বরে উত্তাপ ছিল না, উত্তাপ ছিল রক্তে, সে উত্তাপ তাঁর মনেও ছড়িয়েছে কিছুদিন ধরে।

ভালই হলো ভাবে রাবেয়া, এক মাস ছুটি, কোন পড়ুয়ার ভাল লাগে না পড়ার হাত থেকে দিনকয়েক রেহাই পেতে?

●

চৈত্র সংক্রান্তিতে কলকাতার জেলেরা প্রতি বৎসর একটা মিছিল বার করে, জেলেপাড়ার সঙ। চন্দন-নগরের ধোপারা বার করে ধোপা-পাড়ার সঙ। আড্ডাটি ফটকগোড়ায়।

ফটকগোড়ার চরণ ধুপী যত রকম হৈ-হুল্লোড়ের মোড়ল। ফুর্তিবাজ, দুনিয়ারি বুদ্ধি প্রচুর, সাঙ্গোপাঙ্গর দল কম নয়। নিজেও মেতে উঠতে জানে, আর সবাইকেও মাতিয়ে তুলতে জানে, চট করে একটা কিছু গড়ে তুলতে ওস্তাদ।

ফটকগোড়ায় কোনো ফটক নাই বটে, কিন্তু ওটা পার হয়ে গোরাসৈন্যরা দিশী পাড়ায় আসতে পারে না। কত-গুলি বিশ্রী কাণ্ড করেছিলো ওরা, তারপর থেকে এদিকে আসা ওদের নিষেধ হয়ে গেছে।

ফটক-হীন ফটকগোড়ার মত, ধোপাপাড়ার সঙও কেবলমাত্র ধোপাদের নয়। ধোপাপাড়া বলে কোনো

পাড়াও নাই, ধোপারা ছড়িয়ে আছে যেখানে যার সুবিধা। ধোপাপাড়ার সঙে আছে ধোপা জেলে তাঁতি বাগদী গয়লা নাপিত সোনারবেনে, দু' একজন কায়েতের ছেলেও।

চরণ গান গাইতে জানে, ছড়া বাঁধতে জানে, ডুগডুগী ও বাঁশী বাজাতে জানে, যাত্রার আসরে পাঠ বলতে জানে, মজলিশী লোক। তার দলের কেউ বেলেল্লাপনা করলে ঠেঙ্গিয়েও দিতে জানে। ভালও বাসে ভয়ও করে সাঙ্গাতরা, মোড়লি বিনা বাক্যে মেনে নেয়। রোজ সন্ধ্যায় ওখানে গানবাজনার আড্ডা জমে। তামাক ছাড়া আর কোনো নেশাই দলের লোকদের নিষেধ। ভূতো বাগদী লুকিয়ে-চুরিয়ে গাঁজা ধরেছিল, মুখে গন্ধ পেয়ে চরণ তাকে তাউৎখানার এঁদোপুকুরে এমন চুবুনি দিয়েছিল যে ভূতো বাগদী আর কখনো গাঁজার কলকে ছোঁয়নি। শিবু মণ্ডল একদিন মদ খেয়েছিলো, খবর পেয়ে চরণ আর চরণের দু'জন চেলা তাকে একহাঁড়ি গোবরজল গিলিয়ে দিয়ে বমি করায়, তারপর থেকে শিবু আর শুঁড়িখানার দিকে পা বাড়ায় নি।

ফটকগোড়া থেকে সুরু হয় মিছিল। কাজীডাঙা, সিংহীর বাগান, বাবুবাজার ষষ্ঠীতলা, সনাতনতলা, সত্যপীরতলা, বিষহরিতলা, ঘোড়াপুকুর, নাড়ুয়া, পঞ্চাননতলা, কলুপুকুর, খলিসানী, বিচলীপট্টি, চান্দদারবাগান, গোন্দলপাড়া সব ঘুরে ঘুরে আবার ফটকগোড়ায় শেষ হয়। বিস্তর লোকের ভিড় হয়, আশেপাশের বহু জায়গা থেকে লোক আসে চন্দননগরের এই সঙের মিছিল দেখতে। খুশি হয়ে অনেকে পয়সা ছড়িয়ে দেয় মিছিলের মধ্যে, সেই পয়সা দিয়ে চরণ খুশী ভোজের ব্যবস্থা করে।

চরণ শ্রীরামপুরের চ্যারিটি স্কুলে কয়েক বছর পড়াশুনা করেছিলো, তখন জুতো পায়ে দিত। জাতব্যবসা আরম্ভ করে জুতো পরা ছেড়ে দিল। জিজ্ঞাসা করলে বলে, বেণীর ভাগ সাহেবদের কাপড়ই কাচি, জুতো বাইরে খুলে রেখে ঢুকতে হয়, তার চেয়ে জুতো না পরাই ভাল, চরণ খালি চরণেই চলবে।

'ঐ আসছে, আসছে' রব শোনা গেল। সত্যিই মিছিল এসে পড়েছে। ঘরে ঘরে জানলা খুলে বৌ-ঝিরাও ফুঁচি দিচ্ছে ঘোমটার আড়াল থেকে, রাস্তার লোক গিসগিস।

বড় একটা রামছাগলের পিঠে কোট-প্যাণ্ট পরা একটা লোক। মাথায় সোলারটুপী, হাতে বেতের ছড়ি, খড়িগোলার পোঁচে মুখখানা খটখটে সাদা। পেছনে গান উঠেছে—

কোথা থেকে এল এসব সাদা ভূতের দল,
সোনা লুঠতে দানা লুঠতে
ফাঁদছে কতই কল।
চোঙ্গার মত পেণ্টু পরে, ঘটির মত টুপী,
যত বকম কুকম্ম, তা করছে চুপি চুপি।

তার সঙ্গে ধুয়া ধরেছে জনকয়েকে—
হায় রে হায় রে হায় রে,
বিষম ক্যাচাঙ ভাই রে।

তারপরে গাউন ও ব্লাউজ-পরা একটি মেয়ে। মাথায় পালক-দেওয়া টুপী, হাতে ছোট ছাতা, পায়ে উঁচু গোড়ালী জুতো। মাথা পেছনে হেলিয়ে বুক ফুলিয়ে পা ফেলছে। ছেলেকে মেয়ে সাজানোর ফ্যাসাদ বুকের দিকটায়, কিন্তু মতি ভড় সাজাতে ওস্তাদ, ব্লাউজের তলায় কী দিয়েছে না জানলেও আকৃতি-যুগল এমন বিশাল রূপে ফুটে উঠেছে যে দর্শকরা হেসে কুটিপাটি।

গানের সুর উঠলো—

মোটা কাপড় মোটা ভাতে করবো না
তোর ঘর
গাউন পরে বিবি সাজবো
করবি কি তুই কর,
গণ্ডা গণ্ডা জুটবে সাহেব,
জুটবে গাড়ি কুঠি,
চেয়ার ঠেসে খানা খাবো
সরেস মাংস রুটি।

ধুয়া—

তাধিন তাধিন ধিঙ্গী, দেখনা মাগীর ভঙ্গি
ফড়িং সাজলো ময়ূর হায়,
বেড়াল হলো সিঙ্গী
তাধিন তাধিন ধা
বসাও ঝ্যাঁটার ঘা—

তার পেছনে একটি ছোকরা, সেজেছে যেন লক্কাপায়রা, গায়ে কোট, পায়ে কালো বার্নিশের জুতো, মুখে চুরুট।

গান উঠলো—

কোথায় যাচ্ছো ছোট খোকাবাবু
সেজেগুজে ভোরে?
বুড়ো বাবা পায় না খেতে,
পড়ে আছে জ্বরে,
শুনছি নাকি খৃস্টান হয়ে
বংশে দিলে কালি,
গরু বাছুর শুয়োর খেয়ে
নাম নিয়েছো 'স্যালি।'

ধুয়া—

হায় রে হায় রে হায়, একি বিষম দায়,
পৈতে ছিঁড়ে বেজাত হয়ে
বামুনপুত্তুর যায়।

এরপরে বড় একটা কাঠের বাক্সে চেয়ার ঠেসে চলেছে ভুঁড়িওলা বাবু। বাক্সের গায়ে লেখা 'হঠাৎবাবু।'

ফরাসীদের আসার পরে এখানে অনেক ভুঁইফোড় ব্যক্তি দালালি পাটোয়ারি পাইকারি করে ফেঁপে উঠেছে। পয়সা করেছে বলে ওদের উপর রাগ নাই চরণের, সেটা বরাত-জোর, কিন্তু সাদাদের পা-চাটা এবং দিশী ভাইদের চাটানো একসঙ্গে বরদাস্ত করা যায় না। গত সরস্বতী পুজোয় ছেলেরা গিয়েছিলো শঙ্কর শেঠের বাড়ি চাঁদার জন্যে, গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। ভুবন দত্ত আগে দুবেলা খেতে পেতো না। এখন তার ঠাট-ঠাটের ঠেলায় পাড়ার লোক অস্থির। মতি ভড় বলে 'চরণদা, এবারকার সঙের মিছিলে ঐ কুপুত্তুর ব্যাটাদের খোলস খুলে আসল চেহারা দেখিয়ে দাও তো? সবাই আমাদের বাহবা দেবে দেখো।'

হঠাৎবাবুর পরনে ফিনফিনে কোঁচানো ধুতি, গায়ে রেশমী চাপকান গলায় কুঁচি দিয়ে মোড়ানো চাদর, হাতে টাকার থলি।

গান ধরা হলো—

হঠাৎবাবু হাঁটিতে কাবু,
পেটটি যেন ঢাক,
ঘরের ভিতর মাগের ঝাঁটা,
বাইরে দেখান জাঁক,
বুটের লাথি হজম করে
কাঁচা পয়সা কামায়
নাকে দড়ি দিয়ে সাহেব
বাঁদর নাচ নাচায়।

ধুয়া—

তাই রে নাই রে নাই রে ভাই,
এমন জীব আর কোথাও নাই।

তারপরে জনকয়েক খালি গায়ে লেংটি পরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চলেছে। একসঙ্গে গান ধরেছে—

সাদা ইঁদুর ঢুকলো এসে
আমাদের এই ক্ষেতে
ক্ষেত গেল জাত গেল, সব বসেছে যেতে,
হায় রে হায়।
ঘরের ঝি-বৌ সামলানো দায়,
হচ্ছে ঘরের বার,
ধর্ম গেল জন্ম নিচ্ছে ফিরিঙ্গিদের ঝাড়,
হায় রে হায়।
মেথর হল বাবুর্চি, আর বামুন বেচে মদ,
ছেলেছোকরার মুখে কেবল
ম্লেচ্ছ বুলির গদ,
হায় রে হায়।
(এই) ফরাসডাঙার ফরাসী আর
কলকাতার ইংরাজ,
শ্রীরামপুরের দিনেমার, আর চুঁচড়োর
ওলন্দাজ,
একই জাতের ডাকাত ওরা,
মুখে মিষ্টি বুলি,
সবাই মিলে ভাগ বসাবে মারবে
ভাণ্ডার খুলি,
সামাল সামাল ভাই রে।
শত হলেও নবাব হলেন
দেশের মাটির ছেলে,
কাঙ্গাল পরে দেবেন মোদের
আপন কোলে তুলে,
ধর লাঠি একসাথে ভাই হিন্দু-মুসলমান,
রাখতে প্রাণ, রাখতে মান,
জেনানা, আর ধন।
সামাল সামাল ভাই রে।

বোড়কিষণপুরের একটি ভাঙাবাড়ির দালানে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছিলেন। শীর্ণকায় অভাবগ্রস্ত চেহারা, কিন্তু গৌরবর্ণ প্রশস্ত ললাটে বংশ-গৌরবের ছাপ এখনো রয়েছে। তিনি প্রথমে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, এখন কাপড়ের খুঁটি দিয়ে চোখের জল মুছলেন। হরি-রাম চৌধুরীর পৌত্র ইনি। এককালে বোড়কিষণপুর ও গড়প্রসাদপুর এঁদেরই জমিদারি ছিল, ফরাসীরা কতকটা কিনে নিল, কতকটা ঠকিয়ে নিল, আজ এই বৃদ্ধের ভাত জোটে না, একমাত্র ছেলে পাটনায় ইংরেজদের কুঠিতে কাজ নিয়ে যায়, সেখানে খৃস্টান হয়ে একটি ফিরিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করেছে, বাপের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি।

[ক্রমশ]

মালতী লতা

সকাল থেকেই ফাইফরমাসের অন্ত নেই।

লতা দুধের গেলাসটা ধুয়ে দিয়ে যাও:

লতা আমার সার্টের বোতাম এখনও বসাস নি?

লতা ডিবেতে পান যে একেবারে নেই।

লতাদি আমার ক্রিকেট ব্যাট কোথায় রেখেছো?

কত রকমের ফরমাস, কত রকমের আবদার। কোনটাতে অনুরোধের সুর, কোনটাতে হুকুমের কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। যাকে হুকুম করা হচ্ছে সে নির্বিকার। মেশিনের মত চরকি পাক ঘুরে সে সব কাজ সেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। সবাইকেই তুষ্ট করবার প্রচেষ্টায় হাত দুটোর আর বিরাম দিচ্ছে না।

উপায় নেই। কাজ করবে আসলে একজন আর ফরমাস করবে সবাই। ফল যা হয়।

ভোর পাঁচটায় ওঠা আর রাত বারটায় শুতে যাবার আগে পর্যন্ত এককোঁটা অবসর পায় কি করে লতা, শুধু দুপুরে ঘণ্টাখানেক। সকলে অফিস-ইস্কুলে গেলে আর কাকীমা ঘুমুলে। তাও লতা ঘুমোয় না। নিজের প্রিয় বইগুলো নিয়ে বসে যায় লতা জানালার ধারে, যেখান থেকে নীল আকাশ আর সাদা মেঘের দল দেখা যায়, যারা স্বাধীন-ভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। হয়ত এ মেঘ নূরপুরেও যায় সেখানে অমলদা আছে আর আছে লতার ফেলে আসা বাল্যকালের দিনগুলো।

ঐটুকু সময়ই লতার নিজস্ব। তাই এ সময় লতা খালি নিজের কথাই ভাবে, নিজের অতীত, নিজের ভবিষ্যৎ। অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝখানে এই বিবর্ণ বর্তমানকে লতা আমল দিতে চায় না। বর্তমান তো চিরদিন থাকবে না, একসময় বর্তমানও অতীত হয়ে যাবে, ততদিন সে অপেক্ষা করে থাকবে, আরও অনেকদিন অপেক্ষা করবে সে। শুধু এই দুপুরটুকুই মাত্র তার নিজস্ব। তারপর আবার ডাক পড়বে।

লতা, লতা, লতা----

তপতী রায়

লতা ওর ডাক নাম। ভাল নাম মালতী। বাবা আদর করে ডাকতেন মালতী ফুল, মালতী লতা।

ফুল না ছাই, লতা না ছাই। তাহলে আর এমনি জীবন হয়? আদর হ'ত না সে ফুলের? যত্ন হ'তনা? সাজিয়ে রাখত না কেউ? তবে? তবু বেশী ভাবতে চায়না মালতী আর অবকাশও নেই। কাকীর সংসারে দয়া করে আশ্রয় পাওয়া মেয়ের আবার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে নাকি? তাই মালতীও মেনে নিয়েছে এ জীবনকে। প্রাণপণ চেষ্টায় সকলকে খুশী করে কিন্তু তাতে কি সকলে সন্তুষ্ট হয়? তা না হলে পরশু সকালে ফুলদি তাকে অত কথা শোনাবে কেন? সোনাবৌদি সেদিন মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে কেন, চা আনতে দেরী হওয়ার জন্য? রাঙাদাই বা কাকীমাকে সমর্থন করে তাকে বাঁকা বাঁকা কথা বলতে যাবে কেন? শুধু ব্যতিক্রম ছোড়দা আর মিঠু। মিঠুর তো তাকে না হলে চলেই না। ছোড়দাটাও ভারী ভাল।

অথচ কাকীমা তাকে দেখতে পারে না। ফুলদিও। সোনাবৌদি আর রাঙাদা তো বলে বখার একশেষ। কিন্তু মালতী ছোড়দাকে সব থেকে বেশী ভালবাসে।

সোনাবৌদি এমনিতে মানুষটা বেশ কিন্তু বড় খেয়ালী, কোন সওদাগরী অফিসে কাজ করে মাসে চারশ টাকা ঘরে আনে। সকাল নটায় বেরিয়ে যায়, বাড়ী ফেরে সন্ধ্যারও অনেক পর। কতদিন আরও রাত্রে। বাড়ী এসে খুব গম্ভীর হয়ে থাকবে, মোটা গলায় কথা বলবে ক্লান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শুতে যাবে, যা হোক দুটি খেয়ে বলবে মিটিং ছিল। কিন্তু মালতী ঠিক বুঝতে পারে সিনেমা দেখে ফিরছে। কেন বুঝবে না? মালতী যখন সোনাবৌদির কাপড়-জামা পাট করে তোলে, ব্যাগ থেকে বাজে জিনিস, ময়লা রুমাল, ট্রামের টিকিট সব বার করে আনে তখন বুঝি ওর সিনেমার টিকিট চোখে পড়ে না। একটা নয় দুটো টিকিট। সোনা-বৌদি যে একা সিনেমায় যায় না মালতী তা জানে কিন্তু ও মাথা ঘামায় না। সারাদিন খেটেখুটে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবে বৈকি। হোক না সোনাবৌদি বিধবা। তা ছাড়া বিধবার মত কোনটা

করছে সে? কাকীমা হাজার মুখ নাড়া দিক। সারামাস খেটে রোজগারে ছেলের মত সে সংসারে চারশ টাকা এনে দিচ্ছে না? তবে?

বাতে পঙ্গু কাকীমা। বাঁদিকটা প্রায় অবশ। হাত-পা নাড়াতে পারে না, উঠতে পারে না, সংসারে ইচ্ছেমত গিন্নীপনা করতে পারে না। মুখে তার শোধ তোলে। সারাদিন যে কোন তুচ্ছ কারণে এমন চেঁচাবে যে বলার নয়। দুপুরে তবু দু-এক ঘণ্টার শান্তি কাকীমা ঘুমলে। কিন্তু বিনা কারণে রাতদিন চেঁচালেও কেউ কিছু বলবে না। বলবে কোত্থেকে? কাকীমার বাবার দেওয়া এই বিরাট বাড়ীই শুধু নয়, অনেক টাকা, সব তার বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়েকে দিয়ে-যাওয়া যৌতুক। তাই সবাই মানা করে কাকীমাকে মা বলে নয়, বাড়ীর গৃহিণী বলেও নয়। বহু টাকার মালিক কাকীমা।

শুধু ছোড়দা আর সোনাবৌদি কাকীমাকে ভয় পায় না। ছোড়দা তো বাড়ীতেই থাকে কম। আর সোনাবৌদির বাবাও কম দেননি এ সংসারে। ঝগড়ার সময় তো সোনাবৌদি বলেই নেয় সে সব কথা, তাই তো জানতে পারে মালতী।

জানতে পারে আর অবাক হয়ে যায়। সব শুধু টাকার জন্য? সব সম্বন্ধ এমনই হয় নাকি?

কই দাঙ্গার সময় বাবা মারা যাবার আগে সব ছেড়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার আগে তাদেরও তো কত টাকা ছিল, তবে? এমন কি পাশের বাড়ীর হোসেন সাহেবরা, যাদের বড় ছেলে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও প্রাণ দিল তারা? তাদের তো কত টাকা ছিল। সেখানে তো টাকা থাকা না-থাকায় কোন প্রভেদ দেখেনি।

তাহলে বোধহয় নূরপুর আর কলকাতার কথা আলাদা। তাই হবে। নূরপুরের কথা ভাবতে গেলে বুকের মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হয় মালতীর। দুপুরে বই পড়তে পড়তে কতবার তার মন চলে যায় সেইসব দিনে। তার ফেলে-আসা একান্ত আপন নূরপুরের কথা মনে পড়ে। সেই নূরপুর যেখানে তার আজন্ম কেটেছে—সেই স্কুলের জীবন, গলাগলি ভাব রাবেয়ার সঙ্গে জ্যোৎস্নার সঙ্গে, সেই বীণাদি—বীণাদির ভাই অমলদা।

চোখে জল এসে পড়ে মালতীর। কি হবে এসব কথা ভেবে—অমলদা ভাই তোমায় আমি ভুলিনি।

নূরপুর তোমায় আমি ভুলিনি। আপন মনেই যেন আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে মালতী কোন গোপন নিজস্ব সম্পত্তির মত।

আর এখানে? খালি কাজ আর কাজ। আর তার সঙ্গে বকুনি। ফুলদির তো উঠতে বসতে বকুনি। ফুলদির স্বভাবই ঐ। অথচ বাইরের লোক এলে বিশেষ করে সৌমিত্র এলে কি মিষ্টি করে কথা বলে। ভারি হাসি পায় মালতীর। ফুলদি বেশ এত মজার চরিত্র।

ফুলদির নাম কে মৈত্রেয়ী রেখেছিল কে জানে। ছোড়দা তো রোজই এ নিয়ে ঠাট্টা করে আর ফুলদি তাতে আরও চটে যায়। লেখাপড়ার মাথা সত্যিই ফুলদির একেবারে নেই। তা না হলে তিনবার চেষ্টা করেও পার্ট ওয়ান পাশ করতে পারল না। থার্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে, ব্যস ঐ দের। মন কোথায় ফুলদির?

বাবা বলতেন পড়াশোনা একটা তপস্যা। মালতীও তাই মনে করে। ও তো পড়াশুনো নিয়ে ডুবে থাকত, তাই তো অত অল্প বয়সে বি-এ পাশ করতে পেরেছিল। অথচ ফুলদির ভাবখানা যেন পড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। কোন কাজ বললে বই মুখে নিয়ে বসবে নিজের দক্ষিণের ঘরটায়, আর চিঠি লিখবে। একমাত্র মেয়ে বলে কাকীমার ভারী আদরের। মিত্র বলে ডাকে ওকে, কত আদর করে। ফুলদিও কাউকে কেয়ার করে না। মেজাজ আর নখ। সোনাবৌদি আর ছোড়দার সঙ্গে মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন কথা বন্ধ।

ফুলদির ভারী রাগ সোনাবৌদির ওপর। শুধু মায়ের আদরে। নাহলে বিধবা হয়েও সে কুমারী মেয়ের মত থাকে কি করে?

এতে সোনাবৌদি আরও রেগে যায়। বিয়ের এক বছরের মধ্যে তার টি-বি রুগী স্বামী মারা যায়নি? কোন সাধটা মিটেছে তার জীবনে?

তবে?

ভাই না হয় বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, বৌদিরা পাপ বিদেয় করেছে। কিন্তু তারা তো এ সব জানত না। আর এরা যে জেনেশুনে তার এত বড় সর্বনাশ করেছে? ভাগ্যিস লেখাপড়া শিখেছিল তা না হলে আজ কি হোত তার?

ভাবতেও পারেনা সোনাবৌদি।

সব কথাই তো ঝগড়ার সময় জানতে পারে মালতী। না হলে ওকে কেউ বলতে যায় নাকি? আর ঝগড়া তো সপ্তাহে একবার অন্তত হবেই। ভাগ্যিস মালতীকে কেউ দলে টানতে যায়না। মালতীর তো মাথা ঘোরে এসব শুনলে। নূরপুরে তাদের অতবড় সংসারে, পাশের বাড়ীতে হোসেন সাহেবের চারবিবির সংসারে, কোথাও সে এত অশান্তি দেখেনি। নাকি দেখবার চোখ ছিল না?

নিজেরা ঝগড়া করুক তাতে মালতীর কিছু আসে যায় না। সব কিছুকেই সহজভাবে মেনে নেওয়া তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই হাসি তামাসার মত মাঝে মাঝে ঝগড়াকে সে স্বাভাবিক বলে মনে করে কিন্তু ফুলদি যেন মাঝে মাঝে সীমা ছাড়ায়। তখনই রাগ হয় মালতীর রাগের প্রকাশ সে করেনা, করলেই বা শুনছে কে? কিন্তু এই সব অশান্তিতে দুপুরের সময়টুকুও তার খারাপ লাগে। মনের মধ্যে আসতে চায় না, কিন্তু অশান্তি আর নীচতার এই গ্লানিটুকু সারাক্ষণই যেন বিঁধতে থাকে তাকে।

●

ফুলদির পরিচর্যা করতেই তো মালতীর বেলা যায়।

ফুলদি সাজবে, শাড়ী জামা চতুর্দিকে

ভাবে আর সব মালতীকে সাজিয়ে, পাট করে গুছিয়ে রাখতে হবে।

সাজে পটু ফুলদি।

সব সময় লেজেগুজে পরিপাটি, এক চুলই সাত বার বাঁধবে। কাল বলে রং ফরসা করবার জন্য কত আয়োজন। দুধের ফেনা, কাঁচা হলুদ, বেসন গোলা কিছু বাদ দেবে না। সাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে শুধু ব্যাগ চটি জুতোই নয়, লিপস্টিকও লাগাবে।

জিজ্ঞেস না করলেও মালতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে এ সব হোল ঘরেটোর হাল। লরেটোর মেয়ের সাজ মালতী বুঝবে কোথা থেকে? এসেছে তো পাকিস্তানের এক মফস্বল সহর থেকে।

মালতীর বোঝার দরকারও নেই। ঘত সময়ও নেই তার, আগেই ওসব ওর মাথায় আসত না। এখন তো কথাই ওঠে না। তবে একথা জানতেও তার বাকী নেই লরেটোর ছাত্রী বলে ফুলদির নিজেকে মনে করতে ভাল লাগে, তাই একথা বলে। নাহলে লরেটোর কলেজে ফুলদি পড়েছে মাত্র এক বছর। আর তো যায়ই না। ভাল লাগে না তার নিয়ম কানুন, মাদারদের কড়াকড়ি আর টিউটোরিয়াল ক্লাসের হাঙ্গাম তাই বাড়ীতেই পড়ছে।

পড়ছে যে কত ত সোনাবৌদি ভালই জানে। বলতেও তো ছাড়ে না। আসলে ছিল তো বীণাপাণি বিদ্যা-মন্দিরের ছাত্রী। একেবারে শেষ বেঞ্চের ছাত্রী, সে সবও জানে সোনাবৌদি। মালতীকে কতবার বলেছে, রাত্রে সোনাবৌদির বিছানা করে দেবার সময়।

সোনাবৌদির ঐ এক দোষ। পরিষ্কার করে পাতা বিছানাও আবার শোবার আগে মালতীকে দিয়ে নিভাঁজ করাবে। অবশ্য নিজেও হাত লাগায় তব এ বাতিক ছাড়া আর কি?

কিন্তু ফুলদি তো নড়েও বসবে না। সাজবে, মার্কেটে যাবে, সিনেমায় যাবে আর খালি আডডা দেবে।

কাকীমাও ফুলদির কাছে জব্দ। হাজার অমত থাকলেও একটি কথা বলতে পারবে না। তাহলে কেঁদে অনর্থ বাঁধাবে না ফুলদি?

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা আত্মহত্যার ভয় দেখাবে না?

তাই কাকীমা চুপ, সোনাবৌদি চুপ, রাঙাদাও চুপ। শুধু চুপ নয় ছোড়দা।

ছোড়দা তো স্পষ্ট বলে যে ফুলদির সাজের বাহুল্য—উৎকট ফ্যাসান, আর গানের নাম করে নাকি সুরের কান্না ছোড়দা সহ্য করতে পারে না। ফুলদি অবশ্যই এরপরে কেঁদে, চুল ছিঁড়ে, মাকে নালিশ জানিয়ে অনর্থ করে, কিন্তু ছোড়দা ছাড়ে কই?

মালতীর ওপরও তো ফুলদির রাগ কম নয়। মালতী সুন্দর বলে নয় ফুলদির ধারণা ওর সব সাড়ী জামার ওপর মালতীর লোভ, সে ইঙ্গিত করতেও ছাড়ে না।

মালতীর তখনই অসহ্য লাগে। যা তার ধারণারও বাইরে তাকে সেই অপবাদ দেওয়া কিন্তু নিজের ছোট্ট ঘরে চলে গিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মনের আবেগ আর বেরিয়ে আসা চোখের জলকে সংযত করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে সে?

এ বাড়ীতে ছোড়দা আর মিঠুই শুধু তার শান্তি।

ছোড়দা শুধু মালতীকে বই এনে দেয় গল্পের, তাই নয়, কোন ফরমাস করে না। মালতী যে অনেক খাটে, ছোড়দা আর তাকে খাটায় না। বরং মালতীকে বলে এত কাজ নীরবে না করতে। ছোড়দা ভারী ভাল।

কিন্তু মালতী না করলে করবে কে?

অবশ্যই ঠাকুর আর একটা চাকর আছে বড় কাজ, রান্না এসব করবার জন্য। কিন্তু ঠাকুরের হাত জোড়া থাকলে? চাকর বাজার গেলে?

তাই বলে তো আর ছ সাতজন লোকের জন্য ছ-সাতটা চাকর বাকর রাখা যায় না তবে?
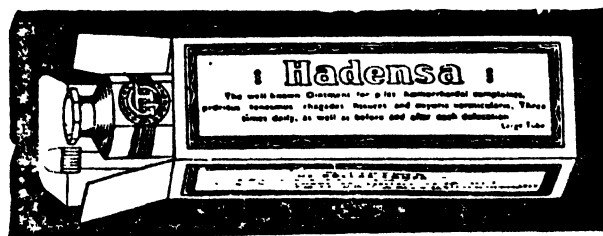
তাই মালতী হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে। তার নিজের জন্য তো দুপুরটুকু আছে। যখন সে চিন্তা করতে পারে নূরপুরের কথা, ছোড়দার দেওয়া বই পড়তে পারে, অনায়াসে এ জগতকে পেছনে ফেলে অন্য জগতে চলে যেতে পারে।

নূরপুরের কথা ভাবলেই চোখে জল আসে তার। সেখানে সব লোককে খুশী করবার দায় নেই। লোকের মেজাজ বুঝে চলতে হ'ত না। বাবার আদরে বন্ধুদের স্নেহে আর প্রতিবেশীদের ভালবাসায় খালি আনন্দের দিন কাটান।

কি যে সব হয়ে গেল। বাবার অত স্নেহ পেয়ে মা হারানোর দুঃখ ভুলে ছিল বলেই বুঝি অত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল।

এখানে ছোড়দা তাকে ভালবাসে তাই মালতীকে এম-এ পড়তে বলে। কাকীমার কাছেও সে কথা বলতে ছাড়ে না।

কাকীমা কথাটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। ছেলে তাঁর বোকা হ'তে পারে তাই বলে তিনি কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

নাকি? একে ঐরূপ মালতীর ভয়ে তিনি কাঁটা হয়ে আছেন তার ওপর আরও লেখাপড়া শিখিয়ে দিবি সাজালে তাঁর মেয়ের দিকে কেউ ফিরে তাকাবে নাকি?

আর সেজন্যই বাইরের লোকের সামনে তিনি মালতীকে বার হতেই দেন না। বারবার বলে দিয়েছেন, ঠাকুরকে সাহায্য করুক, বিছানা করুক পরিবেশন করুক সব ঘর সংসারের কাজ করুক, কাজ না থাকলে নিজের ঘরে বা ছাদে যাক, কিন্তু হাজার প্রয়োজনেও যেন বাইরের লোকের সামনে কাজ না দেখাতে যায়।

এমন কি, মিঠুর আবদারে তাকে স্কুলে পাঠাবার সময়ও যেন বাইরে না আসে।

কি দরকার?

সাজিয়ে গুজিয়ে তো ঐ দিচ্ছে।

কাকীমা কি তাতে আপত্তি করেছেন? তবে?

আবার আদিখ্যেতা ক'রে দরজা অবধি এসে হাত নাড়ার কি দরকার?

প্রথম দিনের ধমকের পরই মালতী তাই আর বার হয়নি। মিঠু অভিমান করেছে, তবুও নয়।

কাকীমার বারণ অনেক।

ছাদে চুল শুকোবার নাম করে পাড়ার ছেলেদের চুলের রাশ না দেখালেও চলবে। তার ঘন আর লম্বা চুল বলে এমনি হাতে কুলিয়ে দিয়ে শুকিয়ে নিক না। হয় খানিকটা কেটে ফেলুক কি হবে অত বাহার? থিয়েটারের নটী নয়ত।

তবে?

অথচ ফুলদির চুলের দরকার।

তাই তার মাথায় ঘষে ঘষে তেল, কেশুত পাতার রস মাখালেই শুধু হয় না, রাত্রে শুতে যাবার আগে, কাকীমার পায়ে তেল মাখাবারও আগে ফুলদির চুল একঘণ্টা ধরে আঁচড়ে বেঁধে দিতে হয় মালতীকেই।

আগে আগে সোনাবৌদিরও চুল বেঁধে দিতে হত।

আজকাল সোনাবৌদির নিজেরই সময় হয় না, এই অফিসে ঢুকে অবধি। নটার ভেতরই খেয়েদেয়ে যায় সোনাবৌদি, তখন তো মালতীর রান্নাঘরের পাটই চোকে না।

ঠাকুর চাকরকে খেতে দিয়ে নিজে খেয়ে পরের দিনের ভোরের ভাঁড়ার বার করে, ভিজে কাপড় থাকলে তা মেলে দিয়ে তবে সে আসে কাকীমার ঘরে তার নিজের বিছানাটা ছোট ঘর থেকে নিয়ে।

শোবার ব্যবস্থা কাকীমার ঘরের মেঝেতেই, তাঁর বিধবা হবার পর থেকে। কাকীমা একা শুতে পারেন না, তার ওপর একটা লোকেরও দরকার রাতে তাই রাত্রে মালতী বিরাট মসৃণ মেঝেয় শুতে পাবার অধিকারিণী হয়েছে।

অবশ্য বাইরের লোককে অন্য কথা বলেন। সোমত্ত মেয়ে, যেখানে সেখানে তো শুতে দিতে পারেন না, তাই নিজের কাছে নিয়ে শোন। নিজের মেয়ের থেকেও তাঁর পরের মেয়ের জন্য ভাবনা বেশী।

ছোড়দা হাসে। মার চালাকী সব ও জানে। কাকীমাকেও বলতে ছাড়ে নি। আসলে ঘরে না শোওয়ালে মালতী এগারটা অবধি পা টিপে চলে গেলে ঘরের দরজা বন্ধ করবে কে? তাছাড়া রাত্রে পাঁচ ছবার জল খাওয়া, বাতের ব্যথা বাড়লে মালিশ লাগান, গরম জলের বোতল দেওয়া এসব করবে কে?

এ কথায় কাকীমা আরও রেগে গেছেন। কিন্তু ছোড়দা বলতে ছাড়ে নি। কাকীমা ছোড়দার সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। রেগে বলে বিয়ে কর বাদল, তোর বৌ এসে সেবা করুক।

সেই ভয়েতো বিয়ে করছি না।

কি বললি, বৌ-এর হাতের সেবা পাব না? দুটো একটা বৌ তো এসেছে একটা তো থাকেই না, অন্যজন তো আছে, কত সেবা পাচ্ছ তার কাছে। লতা না থাকলে তো মারা যেতে।

সে বেচারা সারাদিন অফিস করে না।

কাকীমা নিজের মানরক্ষা করেন।

এখন নাহয় অফিস করে, আগে? কখনও তো এত রাজআদর তোমার দেখি নি।

পাকামি করিস নি বাদলা। সে আমি বুঝব। তুই বিয়ে কর ত।

রক্ষে কর, ও কাজটি আমা হ'তে হবে না।

হুঁ হবে না, ভাল হই দেখাচ্ছি তোমায়। লতা। পানের ডিবেটা খাবি মা।

গলায় যথাসম্ভব মাধুর্য আনেন তিনি ছোটছেলের সামনে। ছোড়দাকে ভয় করেন তিনি।

●

শুধু ছোড়দা নয়, সম্প্রতি আর একজন যে তাকে সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করে সেটুকু বুঝতে আর বাকী নেই মালতীর। ফুলদির জন্য কাকীমা

জন্য আলাদা মনোনীত করে রেখেছেন।

সে হৃদয়বান, মালতীকে সে উপেক্ষা করে না সে পরিচয় বহুবার পেয়েছে মালতী। এজন্য সে কৃতজ্ঞ।

ছোড়দা তো শুনে হেসেই খুন।

কৃতজ্ঞ কি রে? সৌমিত্র শুনলে তো হেসেই মরে যাবে।

বা রে কত ভদ্র উনি।

ভালই তো!

তবে?

তবে আর কি? মা তো ঐ জন্যই ফুলদির জন্য ওকে ঠিক করতে চাইছে। দেখিস নি, সৌমিত্র আসলে তোর ফুলদির মুখের চেহারাই বদলে যায়।

ফুলদি ওঁকে ভালবাসে না ছোড়দা?

ভালবাসে? হাঁসালি।

কেন?

তুইও যেমন। ফুলদিকে চিনিস না? আগে এত বড় বাড়ী, ব্যাঙ্ক আর অমন চাকরি না থাকলে ভালবাসা কবে উবে যেত।

কেন চেহারাও তো বেশ ভাল।

সেটা তো বাড়তি, চেহারা খারাপ হলেও কিছু এসে যেত না। কিন্তু ব্যাপার কি?

কিসের?

সৌমিত্রর চেহারা বুঝি তোর খুব ভাল লাগে?

বাঃ—

বাঃ কি, দেখিস তুই আবার সৌমিত্রর প্রেমেট্রেমে পড়ে যাস নি যেন। ফুলদির সঙ্গে ডুয়েল ফাইটে পারবি না কিন্তু।

যাও কি যে বল।

বুকটা ধড়াস করে উঠেছে মালতীর। ছোড়দা যেন কি। অত ভাল সুন্দর লোককে ভাল লাগবে না। নূরপুরের অমলদাকেও তো ভাল লাগত। তাছাড়া সৌমিত্র কেমন সকলের কথা ভাবে। সেদিন ফুলদির জন্মদিনে ফুলদির জন্য দামী প্রেজেন্ট যেমন এনেছিল তেমনি সোনাবৌদি আর তার জন্য দুটো টাটকা যুঁইয়ের গোড়ে। সোনাবৌদির জন্য তো প্রায়ই আনে তাই বলে মালতীর জন্য? আর মালতী যখন যুঁইফুলের মালা অত ভালবাসে।

তাছাড়া অন্যদিন হলে নিতে ওর দ্বিধা হত, কিন্তু সেদিন মালাটার ওর দরকার ছিল।

বাবার মৃত্যুদিন সেদিন।

বাবার ছবিতে একটা মালা দেওয়ার ইচ্ছে তার মনের কোণায় ছিল। কিন্তু বলবে কাকে? ছোড়দাটাও দুদিন গেছে দুর্গাপুরে। সৌমিত্রের প্রতি এ জন্যও কৃতজ্ঞ বোধ করেছে মালতী।

ছোড়দা পরে শুনে বলেছে।

সত্যি ভারী ভাল ছেলেরে সৌমিত্র।

ফুলদি খুব সুখী হবে দেখো। নীচু গলায় মালতী বলেছে।

ছাই!

কেন?

ফুলদির ভেতর সুখী হবার মালই নেই, বরং আমার তো সৌমিত্রর জন্য দুঃখই হয়।

সেকি?

আহা ফুলদিকে তো চিনিস, আমি ভাবছি বেচারা সৌমিত্রর জীবনটা ফুলদি না নষ্ট করে দেয়।

ছোড়দা তুমি কি বলতো? নিজের বোন। তা কি করব। আমি এসব ব্যাপারে খুব ইম্‌পারসিয়াল।

॥

সোনাবৌদিও একথা বলেছে।

ছোড়দার মত স্পষ্ট করে না হলেও ইঙ্গিতে। সেই জন্মদিনের পার্টির মধ্যে গানবাজনার ভেতরই সোনাবৌদির হঠাৎ মাথা ধরে গেল আর মালতীর ডাক পড়ল সোনাবৌদির ঘরে। তখনই তো।

সোনাবৌদির বুকের জ্বালা স্পষ্ট দেখতে পেল মালতী। অনুভব করতে পারল আকণ্ঠ কি পিপাসা নিয়ে এ সংসারে সোনাবৌদি বাস করছে।

কিন্তু কার জন্য পিপাসা, কিসের পিপাসা? তার পথ কই? সার্থকতা কোথায়?

মালতী ক্রমশই অবাক হয়ে যায় বেশী তারপর নিজের চিন্তার সঙ্গে কখন সোনাবৌদির সমস্যাও তার চিন্তায় স্থান পায়।

তাই আরও বেশী রাত্রে শুতে যাবার আগে যখন মালতীকে ডেকে চুপি চুপি সৌমিত্রকে দেবার জন্য চিঠি দিয়েছে তখনও সেটা মালতী কিছুতেই দিতে পারে নি সৌমিত্রকে। তবে অবাক হয় নি, মালতীর হাত দিয়ে সৌমিত্রকে চিঠি দিতে সোনাবৌদির নির্লজ্জতা দেখে।

মালতী অবাক হয় না। ও জানে মালতীকে কেউ লজ্জা পায় না। ওর ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবাই যেন সচেতন নয়, ওকে তাই কেউ লজ্জা পায় না, দয়া করে, অনুগ্রহ করে।

মালতী চিঠিটা সৌমিত্রকে দেয় নি। বারবার সোনাবৌদি বলে দেওয়া সত্ত্বেও ও চিঠিটা তেমনি খাম সুদ্ধই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। না পড়েলেও বুঝতে পেরেছে সোনা বৌদি কি লিখেছে।

এটাও বুঝেছে সৌমিত্রর কাছ থেকে উত্তর না পাওয়ায় দারুণ রেগে

গেছে সোনাবৌদি সৌমিত্রের ওপর, আর সৌমিত্র না আসা পর্যন্ত সে রাগ কমে নি।

কিন্তু নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে মালতীর। তাই টাটানগর থেকে ট্যুর করে ফেরার পরই যেদিন সৌমিত্র এখানে এসেছে সেদিনই তাকে বলেছে।

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমার সঙ্গে? বল।

সোনাবৌদি আপনাকে দিতে একটা চিঠি দিয়েছিল আমাকে?

অবাক হবার ভাণ করেছিল নাকি সৌমিত্র।

হ্যাঁ, আপনাকে।

তুমি কি করে জানলে?

একটু গম্ভীর হয়ে গেছে সৌমিত্র।

আমাকেই দিতে দিয়েছিল।

কি সে চিঠি?

ওর আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে গেছে মালতী।

আপনাকে দিতে বলেছিল, কিন্তু—

কিন্তু হারিয়ে ফেলেছ বুঝি?

মানে, সে চিঠি---

ঠিক আছে।

কিছু মনে করেন নি তো?

তোমার নিজের লেখা চিঠি আমাকে না দিয়ে হারিয়ে ফেললে ঠিক মনে করতাম।

খুব গাঢ়স্বরে বলেছে—সৌমিত্র মালতীর কাছে সরে এসে।

মালতী এই স্পষ্ট ছলনাকে ভয় পেয়েছে, ও সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু খেলা নয়।

তার নিজের বুকটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে যায়, ছোড়দার কাছে সব শুনেছে ও। ছোড়দাকে মালতীর কথা, তাদের দেশ। অতীত কথা সব নাকি জিজ্ঞেস করে সৌমিত্র প্রায়ই, সামনে কোনদিন বলে না কিছু---কিন্তু মালতী জানে সৌমিত্রর চিন্তায় মালতী আছে, সে বাড়ীর একজন নেহাতই অনুগৃহীতা হয়ে সকলের আড়ালে থাকলেও সৌমিত্রর চোখের দৃষ্টিতে সে আছে। তার মনের দর্পণে কোথাও না কোথাও মালতীর ছায়া আছে। ছোড়দার কাছে একথাও শুনেছে। মালতীর এই ভাগ্য বিপর্যয়ে সৌমিত্রর আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

কিন্তু সহানুভূতি দয়া? আর কিছু নয়?

বুক ভেঙ্গে গেলেও কোন কথা বলতে পারে নি মালতী।---আবার ভেবেছে নূরপুরের কথা। সেইসব দিনগুলোর কথা---

●

সৌমিত্রকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি।

সৌমিত্র যেন সাতরাজার ধন মাণিক।

সৌমিত্র কি নয়।

তাই কাকীমার ভয় মালতীকে, মালতীর রূপকে, পারতপক্ষে তাই তিনি মালতীকে আসতে দিতে চান না সৌমিত্রর সামনে।

সেদিন তো আরও বেশী।

যেদিন সকাল থেকে অঝোর ঝরে বৃষ্টি। কেউ আসবে বলে ভাবাও যায় নি তবু ফুলদি সেজেছে সকাল থেকেই। অন্তত তোড়জোড় চলেছে সকাল থেকেই। মাথা স্যাম্পু করেছে। নখ পরিষ্কার করে নতুন রং লাগিয়েছে সব। তরপর বিকেলে নিজের সামনে বসিয়ে ফুলদিকে সাজিয়েছে কাকীমা। মলতীকে হঠাৎ সে ঘরে দেখে, তো বেশ রেগেই গেছে।

তুই এখানে কি করছিস?

একটা বই খুঁজতে।---

বই খুঁজতে না ছাই, ছুতো করে খালি এ ঘরে আসা।

ছুতো করে? কেন? মালতী বুঝতে পারে নি। কি লাভ ছুতো করে এ ঘরে এসে? কিন্তু কাকীমাই বুঝিয়ে দিয়েছে।

এই লতা শোন, মিতাকে আজ দেখতে আসছে, তুই যেন আর এদিকে আসিস নি। -

মা---

না-না বলছে বটে কিন্তু ঠিক আসবে ও দেখ। ফুলদি ঠোঁট উল্টে বলেছে।

আর ফুলদির এই নির্লজ্জতায় অবাক হয়ে গেছে মালতী।

ফুলদিকে দেখতে এলে সেখানে মালতীর এসে লাভ কি? বুঝতে পারে না মালতী, চলে যাবার সময় স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ফুলদির গলা।

জান মা, ঐসব ইংরেজী বই পড়ে ও ফ্যাশন দেখায়।

তাছাড়া আর কি?

কাকীমা তৎক্ষণাৎ সায় দিতে দ্বিধা করে নি। আর মালতীর দুচোখ জলে ভরে এসেছে।

বই পড়া আবার ফ্যাশন নাকি? বাবার কাছে থাকতে কোন বই পড়া তার বাকী ছিল—বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক বলে বাবা তো তাকে ভাল ইংরেজী বই পেলেই পড়াতেন। হঠাৎ বাবা দাঙ্গায় মারা না গেলে আজ হয়ত ফরাসী সাহিত্যের মূল বইও সে অনেক পড়ে ফেলত। বাবা বলতেন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য বিশেষ করে জানা দরকার। অমলদার সঙ্গে তো ফরাসী শিখতে গিয়েই বেশী আলাপ। বই পড়তে পড়তে কত সন্ধ্যাই তো তাদের কেটেছে বাড়ির পশ্চিমের বারান্দায়।

তবে?

ফ্যাশন দেখাবে বই পড়ে?

এতো তার চিন্তারও বাইরে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

কবিতা, গদ্য, গদ্য-কবিতা

ছা[illegible] পেরোবার প[illegible] সাধারণ পাঠক-পাঠিকা কবিতা খুব কম পড়েন। গল্প-উপন্যাসের কথা ছেড়েই দিই, অন্য জাতের সাধারণ গদ্য-রচনার পাশে রাখলেও ভালো জাতের কবিতারও হার হয়ে যায়। পাঠক সাগ্রহে গদ্যের বইখানা টেনে নেন কবিতাকে ফেলে রেখে।

এর কারণ বোঝা অবশ্য খুব কঠিন নয়। গদ্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যাসের সাথী, তার সুরটা তাই আমাদের খুব চেনা। আমরা চিঠি লিখি গদ্যে, সংবাদপত্র পড়ি গদ্যে কর্মক্ষেত্রেও গদ্য আমাদের সুয়োরাণী ছাত্র-জীবনের পরও নানাভাবে আমরা গদ্যের অনুশীলন করে চলি। কিন্তু কবিতার সঙ্গে ঐ রকম কোন সম্পর্ক থাকে না। তাই একদিন স্বাভাবিক-ভাবেই আমরা ভুলে যাই আমাদের তরুণ যৌবনের এই রোমান্টিক নায়িকাকে!

হাট-বাজারের মধ্যে কেয়ারী-করা ফুলের বাগান আমরা কেউ কল্পনা করি নে। গদ্য আমাদের সেই হাট-বাজার আর কবিতা, ফুল-বাগান। তার সুরটা অন্যরকমের। চেহারাটাও। কবিতার প্রেমে পড়তে ভালোবাসার সঙ্গে অভ্যাস আর আগ্রহেরও দরকার। এই অভ্যাস, এই আগ্রহ এখন আর তেমন নেই আমাদের মধ্যে।

কোন গ্র্যাজুয়েট গৃহিণী যিনি দ্বি-প্রাহরিক বিশ্রামের মধুর মুহূর্তে যে-কোন সিনেমা পত্রিকা, নিদেন পক্ষে একখানা শিশু-পাঠ্য গল্প-গ্রন্থ পেলেও খুশি হয়ে ওঠেন, তিনি কখনো একটি কবিতার বই হাতে করে বিছানায় শুয়েছেন বলে শুনি নি।

রান্নাঘরের খুন্তি-কড়াই-এর সঙ্গে তাল রেখে কোন রসিকার কণ্ঠে সঙ্গীতের গুন্-গুঞ্জন কখনো যদি বা শোনা যায়, কবিতা কদাচ নয়। ট্রেন-যাত্রী কোনো মনোযোগী পাঠককে কেউ কি কখনো দেখেছেন কবিতার বইকে সঙ্গী করে সময় কাটাতে? যদি দেখে থাকেন তা হলে তিনি সাধারণ নন, অসাধারণ কেউ। হয় তো কবি, নয় তো লেখক, না হয় নির্ঘাৎ কাব্য-সমালোচক।

সাধারণ পাঠক - পাঠিকা কবিতা পড়েন না। রেডিওতে কখনো-সখনো হয়ত সুললিত কণ্ঠের কবিতা-আবৃত্তি কান পেতে শোনেন কেউ কেউ কিন্তু পত্র-পত্রিকায় কবিতার পৃষ্ঠাগুলো উল্টেই চলে যান সকলে।

কণা সেন

কবিতার কাছে গদ্যের ঋণও কিছু কম নয়। এখনো গদ্যের কান ও মন তৈরী করবার জন্য শিশুদের ছড়ার কবিতায় অক্ষর চেনার পালা শুরু হয়। গদ্য রচনায় হাত পাকাবার আগে প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই কবিতার ভাষায় মনের কথা বলে থাকেন। গদ্যের সঙ্গে মিতালি জমে উঠবার আগে পাঠক-পাঠিকারাও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী হয়ে যথেষ্ট ভাবেই কবিতার চর্চা করে থাকে। পড়ে, ভাবে, প্রিয় কবি এবং কবিতার উপর রচনাও লেখে। কবিতার প্রতি-যোগিতায় যোগ দেয়, পুরস্কারও পায়। অর্থাৎ আদিম অবস্থায় মননশীল জগতে কবিতা এখনো আমাদের ঘনিষ্ঠ সহচরী। কিন্তু তারপর? চলতে শিখে শিশু যেমন আর মায়ের কোলে থাকতে চায় না, গদ্য শিখে আমরাও আর কবিতার ধারে ঘেঁষতে চাই নে।

অথচ কবিতা এখনো লেখা হয়। অজস্রভাবেই লেখা হয় এবং অজস্র কবিতা ছাপাও হয়। সুতরাং কবি আছেন, কবিতাও আছে। কবিদের পকেট-ভার লাঘব করা কবিতার বইও বাজারে আছে। কিন্তু পাঠক নেই। গদ্যের হাটে কবিতার এই দুর্দশা দেখে মূঢ় প্রেমিক ওথেলোর হাতে ডেস-ডেমোনার অপমৃত্যুর দৃশ্যটাই মনে জাগে আমাদের। কবিতা আমাদের ডেসডেমোনা আর গদ্য সেই মুর—ওথেলো।

কবিতার দিনও বদলেছে। পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্রাক্ষর, অনুষ্টুপ, মন্দা-ক্রান্তার ছন্দ-ভারাক্রান্ত কবিতার যুগ গত হয়েছে বহুদিন। এখন পত্র-পত্রিকায়, পুস্তকাকারে নির্ভেজাল যে মাত্র এক ধরণের কবিতার চেহারাই চোখে পড়ে তার নাম গদ্য-কবিতা। এ কবিতার গদ্য-ছন্দের আলাদা কোনো নাম আছে কিনা আমি ঠিক জানি না।

বোধহয় নেই। নাই থাক, তবু তো কবিতা। গদ্যের মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মতো এই গদ্য-কবিতাই এখন কাব্য-পাঠকের সম্বল। তার আকৃতির গঠনে যতই নীরস, রুক্ষ ও কঠিন গদ্যের ছোঁয়াচ থাক, প্রকৃতিতে তাকে আমরা কবিতার সম্মান দিতে কুণ্ঠিত নই। 'কালরাত্রে বাবাকে হাসতে দেখলাম' কিংবা 'আমি রক্তাক্ত কবরের তলায় ঘুমিয়ে আছি' গোছের শিরোনাম দেখলেও আজকের কোনো পাঠক চেঁচিয়ে উঠে বলবেন না, 'এ আবার কেমন কবিতার নাম!'

আধুনিক যুগের গদ্য এবং গদ্য-কবিতার মধ্যে ফারাক খুব সামান্যই। তার শুরুকে বিনাস্ত মেয়েলী সজ্জাটুকু ঘুচিয়ে দিলে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে সে দিব্যি আধুনিক গদ্য হয়ে ওঠে। গদ্য কবিতার সৃষ্টি-লগ্নে হয়ত তার একটা মূলগত বৈশিষ্ট্য, একটা তফাৎ কিছু ছিল, সেটুকু আজ লুপ্ত।

তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু কঠিন গদ্যের তাড়নায় তার আরও অনেক কিছু হারিয়েছে। এককালে কবিতার কাজ ছিল বস্তু জগৎ ও বাস্তব জীবনের সৌন্দর্য-সত্তার ভাষ্য করা। সেটাই ছিল তার কাব্য-রস-সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উপাদান।

শুধু বাস্তব নিয়ে কোনো সাহিত্যই বাঁচতে পারে না, যদি না তার স্বপ্ন-দেখার চোখ থাকে। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, জীবন-যন্ত্রণা আর যুগ-যন্ত্রণা সর্বযুগে, সর্বকালে জীবনের সর্ব-স্তরেই পরিব্যাপ্ত ছিল, কোথাও বেশী, কোথাও কম। কিন্তু কবিদের প্রাণরসের উৎস এমন করে আর কখনো শুকিয়ে যায় নি। রুদ্র বাস্তবের নিষ্ঠুর সংঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়েও তাঁরা স্বপ্ন দেখতে ভোলেন নি।

আমাদের বাস্তব জীবন থেকে এবং রসের ক্ষেত্র থেকেও আজ একটা জিনিস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সেটা একটা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, যে নিষ্ঠা থেকে জন্ম নেয় সুস্থ জীবনের সঞ্জীবনী রসধারার উৎস, সুন্দর স্বপ্নের সন্ধান।

সেই স্বপ্নের অভাবেই হয়ত বেচারা গদ্য কবিতার নৈরাশ্য আর যন্ত্রণার শেষ নেই। গদ্য এবং বাস্তব এ'দুই-এর মাঝখানে সে যেন এখন একটি নড়বড়ে সেতুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। যদি ক্ষমতা থাকত, নিঃসন্দেহে ও তাহলে আজকের স্বপ্ন-বিহীন গদ্য জীবনের নীরস প্রভাবমুক্ত হবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করত। কিংবা ওর কবির কাছ থেকে ছুটিই চেয়ে নিত।

বিভিন্ন মহিলা সংস্থার সভ্যরা সর্বোদয় প্রজেক্টের অফিসের সামনে ২৪ ঘণ্টাকাল অনশন করেন

বাল্মীকি-রামায়ণ প্রশস্তি

[illegible]লতা সেন

(শেষাংশ)

দশরথের যজ্ঞ সম্পাদন ও অভীষ্ট সিদ্ধি

(সর্গ ১১-১৫)

ধরা প্রদক্ষিণ করি' হেনকালে আসিল যখন
ফিরিয়া যজ্ঞের অশ্ব, সরযূর তীরেতে তখন
নৃপতির অশ্বমেধ যজ্ঞভূমি হলো বিরচিত
ঋষ্যশৃঙ্গ আদি যত যাজ্ঞিকের অভিপ্রায় মত ॥
বেদবিধি অনুসারে বেদবিদ সে যাজকগণ
অনুষ্ঠান-যোগ্য কর্ম করিলেন সম্পন্ন তখন ॥
স্খলন বিচ্যুতি কিছু নাহি ছিল কর্মে তাঁহাদের।
নিবিষ্ট হৃদয়ে সবে করিলেন কার্য সে যজ্ঞের ॥
মহানন্দ মাঝে সেথা বহু শত সহস্র ব্রাহ্মণ
শূদ্র আদি যত করিলেন সকলে ভোজন ॥
অন্ন আদি সর্ব শ্রেষ্ঠ ভোজ্য সেথা লভিল সতত,
রহিল না দীনজন, বালবৃদ্ধ কিংবা নারী যত
ভোজনহীন কেহ সেথা। চারিদিকে হলো অবিরত
এ শব্দ, 'ভোজন কর, দাও ভোজ্য', ধ্বনি হেন মত।
সুস্বাদু ব্যঞ্জন নানা, অন্নরাশি আর স্তূপাকার
সে যজ্ঞভূমিতে নিত্য হলো দৃষ্টিগোচর সবার ॥
'অহো কি সুস্বাদু ভক্ষ্য তৃপ্ত মোরা হয়েছি এখন
হোক শুভ সকলের' কহিলেন যত দ্বিজগণ ॥
কর্ম অবসরে কভু বাক্যপটু ঋত্বিকেরা যত
একে অন্যে জিনিবারে হলেন বিতর্কে সবে রত।
শিক্ষাদক্ষ মন্ত্রবলে ঋষ্যশৃঙ্গ আদি হোতৃগণ,
করিলেন যজ্ঞে সেই ইন্দ্র আদি দেবে আবাহন ॥
সিদ্ধ আবাহন মন্ত্রে আহূত দেবতাগণ তরে
দিলেন আহুতি হবি যোগ্য ভাগে অনল ভিতরে।
পলাশ, খদির, বিল্ব, দেবদারু কাষ্ঠে বিনির্মিত
একবিংশ যূপ হলো যে যজ্ঞভূমিতে সংস্থাপিত ॥
হলো সংস্থাপিত অন্য যূপ এক স্বর্ণে গঠিত।
গরুড়ের মূর্তি এক হলো আর সেথায় নির্মিত ॥
স্থলচর, জলচর, অন্তরীক্ষচর প্রাণী যত
দেবতার উদ্দেশ্যেতে যজ্ঞে সেই করা হলো হত ॥
তিনশত পশু নিত্য করি' যজ্ঞে হত দ্বিজ যত
অনন্তর অশ্বশ্রেষ্ঠে দেবোদ্দেশ্যে করিলেন হত ॥
প্রদক্ষিণ করি' অশ্ব নিয়ে মাল্য গন্ধ আভরণ,
কৌশল্যা সে অশ্বে সেথা করিলেন অর্চনা তখন ॥
রহি' আর একরাত্রি অশ্বসহ কৌশল্যা সেথায়
করিলেন যথাবিধি যত্ন তার পুত্রকামনায় ॥
প্রীত হয়ে অনন্তর, অশ্ব সহ সেথা অবস্থিত
কৌশল্যায়, আশীর্বাদ করিলেন মুনিগণ যত ॥

করি' সেই অশ্ব হতে বহির্গত ঋত্বিক তখন
মেদ তা'র, মন্ত্রপূত করি' তাহা আহুতি অর্পণ
করিলেন অনলেতে, দেবগণে করি' আবাহন ॥
করিলেন দশরথ কৌশল্যার সহিত তখন
অশ্বমেদ সমুত্থিত ধূম হতে আঘ্রাণ গ্রহণ ॥
করি আর খণ্ড খণ্ড সে অশ্ব ঋত্বিকগণ যত
দিলেন আহুতি তাহা দেবতা উদ্দেশ্যে বিধিমত ॥
অবশেষে নরপতি করি' সেই যজ্ঞ সমাধান
যজ্ঞ অনুষ্ঠাতাগণে করিলেন দক্ষিণা প্রদান ॥
কাম্যবস্তু বাঞ্ছামত সুপ্রচুর সুবর্ণরজত
ঋত্বিকগণেরে দান করিলেন নৃপ দশরথ ॥
দক্ষিণায় হয়ে প্রীত দ্বিজগণ কহিলেন তাঁরে
এবে মনোবাঞ্ছা যাহা কহ নৃপ আমা সবাকারে ॥
আনন্দিত দশরথ কহিলেন সে ব্রাহ্মণগণে
বীর্যবান চারিপুত্র অভিলাষ করি আমি মনে ॥
কহিলেন নৃপতিরে, তাঁরা সবে 'তথাস্তু রাজন
আকাঙ্ক্ষিত পুত্র সব হবে প্রাপ্ত অচিরে এখন
কহিলেন অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গ করিব আবার
পুত্রপ্রদ যজ্ঞ অন্য হে নৃপতি পুত্রার্থে তোমার
নৃপতির হিতাকাঙ্ক্ষী ঋষ্যশৃঙ্গ আরম্ভ তখন
করিলেন পুত্রেষ্টি, নৃপবাঞ্ছা করিতে পূরণ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গে যজ্ঞ সেই অনুষ্ঠিতে করি নিরীক্ষণ,
প্রজাপতি পাশে আসি কহিলেন যত দেবগণ—
যুক্তকরে, তব বরে দর্পোদ্ধত রক্ষেন্দ্র রাবণ
হে ব্রহ্মণ, তপোরত ঋষিগণে করিছে পীড়ন ॥
করিছে সে রক্ষপতি হিংসা সবে এই ত্রিভুবনে
গন্ধর্ব, অসুর যক্ষ, দেবকুল আর নরগণে ॥
সূর্যের কিরণ ম্লান ভয়ে তার, নিশ্চল পবন
অনল নিষ্প্রভ সেথা বাস করে যেখানে রাবণ ॥
ভয়ে মহা ঊর্মিশালী সমুদ্রও রহে অচঞ্চল ॥
কুবের ছাড়িল লঙ্কা হয়ে তার পীড়নে বিহ্বল ॥
সে পীড়নকারী হতে আমা সবে করিবারে ত্রাণ
করুন তাহার দেব বিনাশের উপায় বিধান।
কহিলেন ব্রহ্মা সবে রাবণ মাগিল এই বর
হবে সে অবধ্য যত যক্ষরক্ষ দেবতা কিন্নর
গন্ধর্ব ও পন্নগেরা বর সেই দিয়েছি তাহায়
মানুষের নাম সে যে করে নাই ঘোর অবজ্ঞায় ॥
জেনো সে পাপাত্মা তাই হবে নর হস্তেতে নিহত।
শুনি' তাহা আনন্দিত হলেন দেবতাকুল যত ॥
ব্রহ্মার মানস ধ্যানে সেই স্থানে এহেন সময়
অমিত প্রভাব বিষ্ণু আসি নিজে হলেন উদয় ॥
ব্রহ্মা আর দেবগণ কহিলেন তাঁহারে তখন
তোমার শরণ মাগি আর্তত্রাতা হে মধুসূদন ॥

মহৎ তপস্যা আর অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান
করেছেন দৃঢ়ব্রত দশরথ নৃপ গুণবান
তনয় কামনা করি'। এ প্রার্থনা আমা সবাকার
জনম গ্রহণ তুমি কর এবে পুত্ররূপে তাঁর ॥
নৃপতির লক্ষ্মীসমা তিন ভার্যা গর্ভেতে এখন
চারি অংশে পুত্ররূপে কর তুমি জনম গ্রহণ ॥
কহিলেন নারায়ণ, কহ এবে মোরে দেবগণ
জন্ম সেথা লয়ে আমি করিব কি কর্তব্য সাধন,
এহেন ভাবেতে ভীত হলে সবে কিসের কারণ ॥
কহিলেন দেবগণ, হে বিষ্ণু হয়েছি ভীত সবে
লোক নিপীড়নকারী রাক্ষস রাবণ উপদ্রবে ॥
দীর্ঘ তপস্যায় তাঁর হয়ে তুষ্ট দিলেন এ বর
পূর্বে তাঁরে পিতামহ, নর ভিন্ন জেনো অতঃপর
অন্য কারো হতে আর ভয় কিছু রবে না তোমার,
সে বরে উন্মত্ত হয়ে দেবঋষি গন্ধর্বাদি আর
সর্বপ্রাণী উপরেতে অত্যাচার করিছে রাবণ,
হতেছে নিহত তার আক্রমণে নরপতিগণ ॥
তপস্বীর মহাবিঘ্ন ইন্দ্রদ্বেষী দর্পেতে উন্মত্ত,
সে রাবণে কর তুমি নরজন্ম লয়ে এবে হত ॥
দেবগণ বাক্যে বিষ্ণু করিলেন সঙ্কল্প গ্রহণ
পিতৃত্বে বরিতে নৃপ দশরথে, ছিলেন যখন
পুত্রার্থ যজ্ঞেতে রত দশরথ পুত্রের কারণ ॥
যজ্ঞে সেই অনন্তর অগ্নি হতে হলেন উত্থিত
বিরাট পুরুষ এক দীপ্তানল সম প্রভান্বিত
জটাকৃষ্ণাজিনধারী শ্মশ্রুধারী অসিতবরণ
মেঘের নিস্বনসম কণ্ঠস্বর রক্তিম নয়ন ॥
সুলক্ষণ সমন্বিত দিব্য আভরণেতে ভূষিত
সিংহকটি, সিংহনেত্র গিরিশৃঙ্গ সম সমুন্নত ॥
লয়ে তাঁর হস্তে তিনি পাত্র এক সুবর্ণে নির্মিত
পূর্ণ দিব্য পায়সেতে, সেথায় হলেন আবির্ভূত ॥
কহিলেন অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গে, হেথায় এখন
দ্বিজবর, করেছেন প্রজাপতি আমারে প্রেরণ ॥
দাও নৃপে করি' তুমি আমা হতে এপাত্র গ্রহণ,
প্রদান করুন নৃপ পত্নীগণে তাঁহার এখন
পুত্রপ্রদ এ পায়স। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন তাঁরে
স্বহস্তেই দান ইহা এবে তুমি কর নৃপবরে ॥
প্রজাপতি প্রেরিত সে দ্যুতিময় পুরুষ তখন
কহিলেন দশরথে, প্রীতিভরে দিতেছি এখন
সুরস অমৃতময় এ পায়স, ইক্ষ্বাকুনন্দন,
লহ ইহা আমা হতে। নতশিরে প্রণমি তখন
লয়ে তাহা দশরথ কহিলেন এবে ভগবান
কি করিতে হবে মম করুন সে আদেশ জ্ঞাপন ॥
কহিলা পুরুষবর, দাও ইহা করিতে ভক্ষণ
ধর্মপত্নীগণে নৃপ, করেছ এ যজ্ঞের উদ্যম
যার লাগি, হবে প্রাপ্ত এ পায়স হতে তা' এখন ॥
প্রদানি পায়স নৃপে সে অদ্ভুত পুরুষ তখন
করিলেন অন্তর্ধান লভি' তাহা আনন্দে মগন
হলেন নৃপতি হয় লভি' ধন দরিদ্র যেমন ॥
অনন্তর দশরথ করি' অন্তঃপুরেতে গমন
কহিলেন কৌশল্যারে কর দেবি, ভক্ষণ এখন
পুত্রপ্রদ এ পায়স। কহি ইহা দিলেন নৃপতি
অর্ধ পায়সান্ন তাঁরে, অপরার্ধ হতে নরপতি
দিলেন অর্ধেক ভাগ কৈকেয়ীরে করিতে ভক্ষণ
অনন্তর নরপতি চতুর্থাংশ করিয়া গ্রহণ
দ্বিধাভক্ত করি' তাহা অর্ধেক দিলেন সুমিত্রায়,
চিন্তা করি পুনরায় অপরার্ধে দিলেন তাঁহায় ॥
ভক্ষণ করিয়া সেই পায়সান্ন অনন্তর
হলেন নৃপতি পত্নীগণ
শুভ গর্ভবতী সবে, হেরি' তাহা দশরথ
হলেন আনন্দে নিমগন ॥

রাম ও রাম ভ্রাতাদির জন্ম
(সর্গ ১৬-২০)

যবে সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ হলো সমাপন
গেলেন স্বস্থানে চলি' হবির্ভাগ লয়ে দেবগণ ॥
মহামনা ঋষিকুল করিলেন স্বস্থানে গমন
পূজা প্রাপ্ত হয়ে সবে। সমাগত যত নৃপগণ
গেলেন বিভিন্নপথে পরস্পরে করি' সম্ভাষণ ॥
গেলেন স্বস্থানে চলি' কিছুকাল হলো যবে গত
শান্তা সহ ঋষ্যশৃঙ্গ, সমাদর লভি' নানামত ॥
সঙ্গেতে গেলেন নৃপ কিছুদূর, লয়ে পৌরজন।
রক্ষা তরে অবশেষে সঙ্গেতে দিলেন সৈন্যগণ ॥
যজ্ঞমাঝে নিষ্ঠাভরে দেবার্চনারত নৃপবর।
লভিলেন সুদুর্লভ সুকৃতির ফল অনন্তর ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা নামেতে তিনজন
ছিলেন মহিষী সেই নৃপতির রূপে অনুপম ॥
সে তিন মহিষী গর্ভে জন্মিলেন অমিতবিক্রম
শ্রীরাম ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন চারিজন ॥
তেজে বীর্যে জ্যেষ্ঠ রাম বিষ্ণুতুল্য মহাপরাক্রম
পুত্ররূপে কৌশল্যায় করিলেন জনম গ্রহণ
কৈকেয়ীর হলো পুত্র সুবিদিত ভরত নামেতে
ধর্মশীল মহামনা, খ্যাত সদা বল বিক্রমেতে ॥
জনম লভিল আর তনয় যুগল সুমিত্রার
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন নামে, মহোৎসাহী ভক্তিমান আর ॥
মহাধনুর্ধর তাঁরা সুযশস্বী ধর্মপরায়ণ
করিলেন জনকের সর্বরূপ কামনা পূরণ ॥
সর্বজনে সমদর্শী কুলশ্রেষ্ঠ লোকহিতে রত
প্রজানুরঞ্জক রাম, লক্ষ্মণ ভক্ত ও অনুগত
সতত ছিলেন তাঁর, শ্রীরামের ছিলেন তেমন
প্রাণের অধিক প্রিয় পরাক্রান্ত অনুজ লক্ষ্মণ ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ যথা, ভরত শত্রুঘ্ন দুইজন
প্রাণের অধিক প্রিয় পরস্পরে ছিলেন তেমন ॥
পরস্পর হিতে রত ভ্রাতা সব তুষ্টি সম্পাদন
করিলেন জনকের বিনয়ে পৌরুষে অনুক্ষণ,
সে সবার মাঝে রাম ছিলেন পিতার প্রিয়তম ॥
বহুগুণে করি রাম প্রজাগণে রঞ্জন সতত
লভি' খ্যাতি, রাম নামে ধরাতলে হলেন বিদিত ॥
অনুষ্ঠান যথাকালে করিলেন নৃপ সে সবার
বেদবিধি অনুযায়ী বৃত উপনয়ন সংস্কার ॥
সর্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত বেদবিৎ সুপণ্ডিত আর
সর্বগুণে গুণবান হলেন যে চারিপুত্র তাঁর
চারি ভ্রাতা মনোহর করিলেন রঞ্জন স্বগুণে
আপন বান্ধবকুলে আর সর্ব পৌরজনগণে ॥

দশরথ পুত্ররূপে করিলেন জনম গ্রহণ
যবে বিষ্ণু কহিলেন.দেবগণে স্বয়ম্ভু তখন ॥
দেবকুল হিতকামী বিষ্ণুর সহায় ধরাতলে
হতে সদা সংগ্রামেতে কর সৃষ্টি তোমরা সকলে
বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত গুণবান্ বীরকুল যত।
ব্রহ্মার বাক্যেতে সেই দেবকুল হলেন সম্মত।
রাবণ বিনাশ মনে অভিলাষ করি' দেবগণ,
করিলেন পরাক্রান্ত বহু কপি সৃজন তখন।
মহাবৃক্ষ উৎপাটিতে পর্বত করিতে উত্তোলন
হস্তে বিদারিতে ধরা ছিল তারা সকলে সক্ষম।
মহানদনদী তারা পারিত করিতে বিক্ষোভিত,
উঠি লম্ফে ঊর্ধ্বে, মেঘ পারিত করিতে নিপাতিত।
রামের সহায় হতে সংগ্রামেতে, হলো সমাবৃত
বসুন্ধরা হেনরূপ মহাকায় কপিকুলে যত ॥

॥ সমাপ্ত ॥

বিভাগীয় বিপণিতে দুর্মূল্য শিল্প প্রদর্শনী

ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্যে ডিসেলডর্ফের একটি বিভাগীয় বিপণির কর্তৃপক্ষ এক উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। 'আর্ট অফ নেশনস' নাম দিয়ে দোকানে তাঁরা একটি মনোমুগ্ধকর এবং চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। নানা দেশের মূল্যবান শিল্প নিদর্শন নিয়ে এই প্রদর্শনীর সৃষ্টি। এই জাতীয় প্রায় ছ' হাজার শিল্পসৃষ্টি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। চোদ্দটি দেশ থেকে এই সব দুর্মূল্য বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি বিক্রিতব্য বলেও ঘোষিত হয়েছে। এই ছবিতে একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি দেখা যাচ্ছে। মূর্তিটির পাশে দেখা যাচ্ছে শ্যামদেশীয় মন্দির- নর্তকী ক্যানিয়া সেমকাটাকে। পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাঁর মাতৃভূমির রূপকথাকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক পরিচ্ছদে সজ্জিতা হয়ে প্রতিদিন তিনি চারবার করে নৃত্য প্রদর্শন করেন।

বেলা দশটা সাড়ে-দশটা হবে। সহরের সবচেয়ে কর্মব্যস্ততার সময়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, রিক্সা—সবেরই ভিতর এমন চাঞ্চল্য এমন একটা তৎপরতা এসেছে —যা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। এই ভিড়ের ভিতর বিজনও এসে দাঁড়ালো—কর্মস্থল অর্থাৎ অফিসে যাবার জন্য একখানি ট্রামের যাত্রী হওয়ার আশায়। দুখানা ট্রাম সামনে দিয়েই চলে গেলো—কিন্তু ভিতরের অবস্থা দেখে আর উঠতে সাহস হলো না। অধীর হয়ে বারবার সে মণিবন্ধের ঘড়িটির দিকে চায়, আর ভাবে, যারা নিজেদের 'কারে' করে প্রায় তার গা ঘেঁসেই চলে যাচ্ছে তারা কি সুখী ও নিশ্চিন্ত। বাদুড় ঝোলার মত হয়ে, জামা-কাপড়ের দুর্দশা ঘটিয়ে, অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে না। কিন্তু কিছুদিন আগে, প্রায় আট বৎসর আগে হবে—সেও তো ভেবেছিলো এইবার গাড়ী একটা কিনে ফেলবে—টাকাও তৈরী ছিল—কেনার কথা প্রায় যখন স্থির করে ফেলেছে—ঠিক সেই সময়ে এমন বাধা একটা হলো যে গাড়ী কেনা তো হোলই না—মাঝ থেকে টাকাগুলি সব বেরিয়ে গেলো। তার পরে এই সাত-আট বছরে গাড়ী কেনার প্রবৃত্তি যেমন নিভে এসেছে—তেমনি টাকাও আর জমেনি অর্থাৎ জমাবার চেষ্টাও আর করে নি। সব কথা বলতে গেলে খানিকটা পিছনে চলে যেতে হয়।

মফস্বল সহর-স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, ক্লাব, সিনেমা সবই আছে—আবার সহরের অত্যুগ্র রূপের প্রকাশ নেই। প্রতিবেশীরা একে অপরের খবর নেয়। সহানুভূতিশীল মন নিয়ে একে অপরের সুখ-দুঃখের খবর নেওয়া-দেওয়া করে।

এমনি একটা সহরে পাশাপাশি বাড়ীতে তিন-চার মাস আগে-পরে এলেন পুলিশ সুপার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দুই বাড়ীর কর্তারা বাহিরে পদমর্যাদা অনুযায়ী সাহেবী কায়দায় চলাফেরা করতেন—আর ভিতরে তাঁদের গিন্নিদের সীমানায় এসে হিন্দুয়ানীর চরম সীমায় উঠতেন। 'হরির লুট' থেকে সত্যনারায়ণ—ভাগবত পাঠ থেকে কীর্তন গান সবেতেই দুই পরিবার সমানভাবে যোগ দিতেন।

এমনি দুই পরিবারের ছেলেমেয়ে হলো বিজন ও ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী কলিকাতায় হস্টেলে থেকে কলেজের পড়া পড়ে—সেই সঙ্গে নাচ, গান, বাজনা, খেলাধূলা সব কিছুরই চর্চা করে। ছুটিতে মা-বাবার কাছে এসে এই সহরটায় কয়েকদিনের জন্য ঝড় তুলে দিয়ে, ফিরে যায়।

শ্রীপ্রমীলা রায়চৌধুরী

পুলিশ সুপার, বাবা অভিলাষ সেন মেয়ের এই 'কালচারের' দুরন্তপনায় একটু যেন নিজেকে গর্বিত, গৌরবান্বিত মনে করেন। বিজন ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে হলেও, শান্ত শিষ্ট আত্মসমাহিত পাঁচ-ছ'টি ভাইবোনের একতম। বাবার পদমর্যাদা থাকলেও ধন-মর্যাদা নেই। চারটি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুটির বিয়ে হয়েছে—দুটি অবিবাহিতা—ভাই একটি খুবই ছোট। শেষের পরীক্ষাটি যাঁ'তে ভালভাবে দিয়ে দিতে পারে-সেই চেষ্টা মনে রেখে সে সাধ্যমত বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতো। ইন্দ্রাণী কিন্তু তার এই নির্লিপ্ত ভাবটাকে আমলই দিতো না। যখন তখন তার পড়ার ঘরে ঢুকে অনর্গল কথা বলে দমকা হাওয়ার মত চলে যেতো। কিন্তু তারপরে পড়ায় বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে যে কি বিষম চেষ্টা করতে হতো সে-ই জানে।

এমনি করে দু বৎসর পার হয়ে গেলো। বিজন পরীক্ষা ফলন্তে একটি চাকরী পেয়ে যখন কর্মস্থলে যাবার উদ্যোগ করছে—মা বাবার তখন মনে হলো এবারে তার বিয়ে হওয়া দরকার এবং বিয়ের শেষে সস্ত্রীক কর্মস্থলে গেলে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মোটামুটি পরিকল্পনা ভালভাবেই আঁকা হলো। কিন্তু মুস্কিল হলো যে বিয়ে করবে তাকে নিয়েই। একটি কথায় সে তাদের আঁকা সমস্ত চিত্র মুছে দিলো। বাড়ীতে যার দুটি আইবুড়ো বোন—একটি নাবালক ভাই—বিবাহ করার মতো বিলাস তার সাজে না।

মা অনেক বোঝালেন, বাবা অনেক উদাহরণ ও সদ্‌যুক্তি দিলেন কিন্তু—আত্মসমাহিত বিজনের দৃঢ়তা কেউই ভাঙতে পারলেন না। মৃদু হেসে সে একটা যুক্তি দিলো, তোমরা এতদিন অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমার সব খরচ চালিয়েছো এখন সবে মাত্র একটু রোজগারের আশা হতে না-হতেই বিয়ে করে তফাৎ হয়ে যাব—আমাকে এতটাই স্বার্থপর ভাব কেন মা? বরং আমার বউটা বেঁচে গেলে আর আমি সংসারে কিছু দিতে পারলে, আর একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবে তোমরা।

মা হেসে বললেন—ওরে পাগলা ভাল সম্বন্ধ না হলে কি আমরাই তোকে বিয়ে করতে বলব। ইন্দ্রাণীর মা'র তোকে খুব পছন্দ আমাদের বলেও রেখেছেন। শুধু তোর পরীক্ষার ফলের জন্য আমরা চুপ করে ছিলাম। তা ভগবান যখন মুখ রেখেছেন, তখন তুই আর আপত্তি করবি কেন?

শশব্যস্তে বিজন বলে—কি বলছ মা? সর্বনাশ! ইন্দ্রাণী? ও মেয়ে তুমিই বা কোথায় রাখবে—আর আমিই বা কোথায় রাখব? এ অদ্ভুত কল্পনা তোমার মাথায় কি করে এলো বুঝতে পারছি নে—তা ছাড়া বোনেদের বিয়ে না হয়ে গেলে আমি বিয়ে করব না।

তারপরে যে ক'দিন সে বাড়ী থাকলো শুধু অশান্তি নিয়েই কাটলো—কারণ মা ইন্দ্রাণীকে বধূরূপে না পাওয়ায় ম্রিয়মাণা হয়েই রইলেন—আর সে মা'র বিষণ্ণ মুখখানি মনে নিয়ে দূর প্রবাসে যাত্রা করলো।

চাকরীতে ঢুকে বিজন ছুটি আর পায় না। একঘেয়ে জীবন—অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, কর্মান্তে বিশ্রাম বেলায় মায়ের ম্লান মুখখানিই ভেসে ওঠে—ভাবে বিনা মাহিনায় ছুটি নিয়ে, মায়ের কাছে চলে গিয়ে, ওই বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে, তারই ছবি মনে নিয়ে চলে আসি—আবার ভাবে সে কাছে গেলেই কি আর মায়ের বিষণ্ণতা দূর হবে? মায়ের হাসিমুখ যে অনেক দাম দিয়ে দেখতে হবে—তা হয় না। আগে বোন দুটির বিয়ে। দিন কেটে যায়—প্রবাসে একক জীবনযাত্রা সহনীয় হয়ে বহনীয় হয়ে আসে। প্রায় আড়াই বছর পরে বাড়ী যাবার জন্য সে যখন প্রস্তুত হয়েছে খবর এলো বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—বাবা সেরে না উঠলে তার ঘাড়ে যে এবার কি বোঝা এসে পড়বে তাই ভাবতে ভাবতে সে বাড়ী রওনা হলো। সেখানে গিয়ে তাকে আর জীবিত দেখলো না।

বাবা ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদাতেই ছিলেন—সঞ্চয় কিছুই ছিলো না যাতে করে বোন দুটির বিয়ে ও ভাইটির লেখা-পড়া চলতে পারে। শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে একেবারে এখানকার পাট উঠিয়ে সবশুদ্ধ নিজের কাছেই নিয়ে যাবে ঠিক করলো। দু জায়গায় বাসা ব্যয়সাধ্য আর দেখা-শোনা করার লোকেরও অভাব। সেই থেকে একটানা জীবনসংগ্রাম সুরু। নিজের সুখ, সুবিধা, আরামের কথা তার মনে আসে নি। চাকুরীর ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে—বোন দুটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ভাইয়েরও পড়া শেষ—কিন্তু তার ব্যক্তিগত কিছু পরিবর্তন হয় নি আর।

সংসারী হওয়া যখন জীবনে হয়ে উঠলো না তখন ত' নিয়ে মনে আর কোন ক্ষোভ রাখলো না। মধ্যবয়সে এসে পৌঁছিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ জীবনের লোভ মাঝে মাঝে উঁকি দিতে লাগলো। বাড়ীতে আপন বলতে এক মা ছিলেন তিনিও গত হয়েছেন—সম্পূর্ণ নির্দায় জীবন। চাকরেই সংসার চালায়—সে টাকা ফেলে দিয়েই খালাস—কি হলো না-হলো খবরই রাখে না। একখানি মোটর কেনার সখ তার বহুদিন থেকে—গাড়ীটি থাকলে ইচ্ছা-সুখে বেড়ানো যায়। একটু একটু করে জমিয়ে গাড়ী কেনার টাকা প্রায় যখন জমে এসেছে তখন এলো আবার অপ্রত্যাশিত এক ধাক্কা যাতে তার এতদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

অন্য দিনের মত সেদিনও অফিসে এসে বসেছে বিজন—বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে এলো—'ইন্দ্রাণী চৌধুরী'। কে এ ইন্দ্রাণী? কি দরকার? কিছুতেই মনে করতে না পেরে, বেয়ারাকে বলে দিলো, পাঠিয়ে দিতে।

একটু পরেই দরজার বাইরে 'আসতে পারি?' শুনে সে আসবার অনুমতি দিলো। দরজা ঠেলে ঘরে যে ঢুকলো তাকে দেখে সে একেবারে চমকে গেলো। সেই ইন্দ্রাণী—কলেজে পড়া বিদুষী—সহরের নামকরা মেয়ে—পুলিশ সুপার অভিলাষ সেনের মেয়ে একদা তার ভাবী বধূরূপে মায়ের পছন্দ করা মেয়ে। তাকে হঠাৎ এভাবে দেখে বিজনের মনে অনেক কথা ভিড় করে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলো। একটু ঢোক গিলে সব কথাগুলি গিলে নিয়ে মৃদু হাসি মুখে এনে সে ইন্দ্রাণীকে বসার জন্য চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—এ কি ইন্দ্রাণী দেবি যে। হঠাৎ কি মনে করে?

সামনে যে ইন্দ্রাণী বসেছিলো সে আর আগের সেই ইন্দ্রাণী নয়—বাইরের খোলস চাকচিক্য তাঁর সবই মুছে গিয়ে, ভিতরের একান্ত নিজস্ব রূপটি বেরিয়ে পড়েছে। ইন্দ্রাণীও হাসলো। অনেক খুঁজে খুঁজে তোমার খবর পেয়েছি বিজনদা---জানি তুমি এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছ--এ ভাবে সাক্ষাৎ হয়তো তুমি করো না—

বাধা দিয়ে বিজন বললো—থাক—ইন্দ্রাণী ওসব—তোমার হঠাৎ আগমনের হেতুটা বলো—।

হেতু হচ্ছে আমার এমন একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থা এসেছে যে তোমার নামটাই আমার মনে পড়লো। আমি অনেক আশা করে এসেছি—জানি তুমি বিমুখ করবে না আমাকে—

তোমার কি দরকার তাই তো বললে না এখনও পর্যন্ত—সেটা বলো—

দরকার? বলে ইন্দ্রাণী একবার করুণ হাসলো—আমার স্বামী হঠাৎ একটা এ্যাক্সিডেণ্টে বছর দুই আগে জখম হয়েছিলেন—আঘাতটা পায়ের ওপরেই—চিকিৎসা করার পরে শুনলাম যে, আহত পা'খানা কেটে না ফেললেও সে আর আগের মত নির্ভরশীল নয়। ভেবে দেখ কি অবস্থা! খেটে খাওয়াই যাদের সম্বল—তাদের কাছে এটা যে কী অভিশাপ তা আশা করি তুমি বুঝতে পারবে। অফিস থেকে

কালয়ানে পদত্যাগের অনুরোধ এলো। লজ্জা ত্যাগ করে আমি নিজেই গুরু হয়ে, ওর 'বসের' সাথে দেখা করলাম। ফল হলো না কিছুই। শুধু ওই একই কথা—আমি কি করতে পারি বলুন। চাকরীটা গেলো।

তার পরের কথা আর তোমায় বলতে পারব না—আমি এদিকে সংসারের সাথে যুদ্ধ করছি আর ওর মুখের বুলি—এই 'ইনভ্যালিড'কে কোনমতে সরিয়ে দাও—তাহলে লাইফ ইনসিওরেন্সের মোটা টাকা হাতে পাবে, অসুবিধা হবে না তোমাদের—আচ্ছা বলতো তাই কখনো হয়? এখনকার দরকার ছেলেকে ইন্‌জিনীয়ারিং-এর একটা পরীক্ষা দিতে 'গ্লাসগো' যেতে হবে—পাস করলে ভাল সম্ভাবনা, তারই খরচ কোনদিক থেকে কুলিয়ে উঠতে না :পেরে তোমার কাছে এসেছি, তুমি যদি টাকাটা আমাকে ধার দাও শোধ আমি নিশ্চয়ই করে দেবো।

পুরু চশমার ভিতর দিয়ে বিজন সোজা ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে বললো—কিন্তু মেসোমশায়ের শুনেছি বেশ টাকাকড়ি ছিলো তুমি কি তার কিছু পাও নি?

টাকা আর কোথায় ছিলো? 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'। বাবার তো সঞ্চয় বলে কিছু ছিলো না—না হলে এক দাদা আর আমি ছোটবেলায় ওই ভাবে কাটাতে পারতাম? তখন তো জানতাম না যে এইসব দিনও আসতে পারে।

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বিজন বললো—থাক 'লেট দ্য পাস্ট বি পাস্‌ড।' তোমার কত টাকার দরকার? আমিও তো 'দিন-মজুর'—দেখছ না সারা জীবনে একটা বিয়েই করে উঠতে পারলাম না। পোস্টাফিসে কয়েক হাজার টাকা পড়ে আছে মাত্র—ভেবেছিলাম বিয়ে তো আর হয়ে উঠলো না একটা গাড়ী কিনে বিলাস করে ঘুরে বেড়াব তা না হয় সেটাও থাক এখন তাই বলে তোমার ছেলের ভবিষ্যতটা তো আর নষ্ট হতে পারে না, তুমি দুদিনে যেমন আমাকে স্মরণ করেছ—তেমনি আমিও মন থেকে আশীর্বাদ করছি যে তোমার ছেলে কৃতী হয়ে ফিরে আসুক।

শেষের সঞ্চয়ের কয়েক হাজার টাকা স্বল্প পারিচিতা ইন্দ্রাণীর ছেলের জন্য দিয়ে দিলো। বাক্যহারা, রুদ্ধ-কণ্ঠে ইন্দ্রাণী কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছিলো তাতেও বাধা দিয়ে বিজন বলেছিলো—ওসব কথায় কাজ নেই ইন্দ্রাণী—ওতে মনে অহমিকা আসে—ভাগ্যক্রমে আমার কাছে টাকাটা ছিলো—আর তোমার ছিলো প্রয়োজন—সিদ্ধ হোক সে প্রয়োজন, টাকা না থাকলে তো দিতে পারতাম না।

ইন্দ্রাণীর ছেলে পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এসেছে, যে টাকা নিয়ে সে বিদেশে গিয়েছিলো সে টাকা সে বিজনকে ফিরিয়ে দিতে গিয়েছে কিন্তু বারবার বিজন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিজন এমন কিছু নেই যার জন্য টাকাটা দরকার—আমার জন্য তো এখনও আমি আছি—টাকাটা তোমার কাছে রেখে দাও ইয়ং ম্যান—যখন আর খাটতে পারব না তখন বসিয়ে খেতে দিও।

ছেলে বাড়ী গিয়ে গল্প করেছে—বিজনের মহানুভবতায় পিতাপুত্র অভিভূত হয়েছে—একমাত্র ইন্দ্রাণীই মনে মনে বুঝেছে বিজনকে, কেন সে টাকা ফিরিয়ে নিতে চায় না—কেন এককথায় সবই ঝেড়ে ফেললো—সে যে দধীচি—তাই আত্মোৎসর্গ করে সকলেরই মঙ্গল চায়—তাই তে বুঝি তারও মঙ্গল।

●

ট্রাম এতক্ষণে এসে পড়লো—ধীরেসুস্থে তার মধ্যে উঠে একটু জায়গা পেয়ে বিজন বসে পড়লো—চারিদিকে কত রকমের কথাবার্তা, বাজার দর থেকে রাজনীতি পর্যন্ত। তারই মধ্যে তার মন ধীরে ধীরে ডুবে গেলো।

গুজরাট অভিযান: অভিযাত্রী দলের চার সদস্যা—শ্রীমতী উষা ভাট, ডঃ রেণু শ্যামী, শ্রীমতী ভলি সাহেব ও রিতা প্যাটেল

চাকুরিয়ার বাস থেকে নামলো স্টেশন রোডে—ব্যাঙ্ক প্লট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পছন্দমত বাড়ী দেখে বেল টিপলো মরিয়ম—যে মহিলা দরজা খুলে দিলেন—তাঁকে সুপ্রভাত জানালো।

তারপর চোখে রুমাল চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ক্রমশ ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো—কান্না আর থাবে না—তারপর—কান্না থামলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো—আমার ছেলে মারা গেছে, তাঁকে আমি গোর দিতে পারছি না।

ভদ্রমহিলা মেরীকে ধরে ফেললেন। দুই হাতে ধরে এনে সোফায় বসালেন। মেরীর চোখে আবার কান্নার বন্যা নামলো—কি আমি করতে পারি বলুন, কি সাহায্য করতে পারি—। আপনার স্বামী কোথায়? আপনারা তো খ্রীশ্চান। ফাদারের কাছে যান নি কেন?

—আমরা বৌদ্ধস্ট—আমরা খ্রীশ্চান নই।

—তবে চলুন আপনাকে নিয়ে চাকুরিয়ার বুদ্ধ মন্দিরে যাই।

—ওখানে আর গিয়েছিলাম—বলে একটু থামলো—কিন্তু ওরা আমাকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করলো—।

—কেন? ভদ্রমহিলার কণ্ঠে উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা।একবার ঢোক গিলে মেরী বললো—ওরা বললো—ওরা বললো—বললো আমি আসামের বুদ্ধিস্ট, ওরা আমাকে সাহায্য করবে না, বললো—কণ্ঠ কান্নাতে বুজে এলো মেরীর।

চোখদুটি জলে ভরে নিয়ে তাকালো ভদ্রমহিলার দিকে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো—আমি কি চলে যাব—। আপনি কি আমায় কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবেন না? তার চোখে আবার কান্নার ঢল নামলো। ভদ্রমহিলার চোখের বিস্ময়, বিদ্রূপ আর ঘৃণা এক নিমেষে মেরীর চোখের জলের ঢলে ধুয়ে মুছে গেল। বললেন—এই নিন।

দশ টাকার নোটটা বুকের রুমালের ভাঁজে রাখতে রাখতে মেরী বললো—আমায় এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন—খুব ঠাণ্ডা জল?

সন্দেশ দুটো মুখে পুরে জল খায় মেরী। তারপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

—মৃত ছেলেটিকে কার কাছে রেখে এসেছেন? আপনার স্বামী কোথায়? তিনি কেন বেরোন নি সাহায্য চাইতে?

কল্যাণী রায়চৌধুরী

—আমার স্বামী আসামের দাঙ্গা হাঙ্গামাতে মারা গেছেন। একটি দুঃখসূচক ধ্বনি বেরোয় ভদ্রমহিলার মুখ থেকে। ভাঁওতাটা বেশ ভালোই চলেছে ভেবে ভেতরে ভেতরে খুশী হয় মরিয়ম।

সকাল থেকে মেঘ করেছিল—এবারে শ্রাবণের আকাশে ঘনঘটা নেমে আসে।

এর পর আর একটি বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়। তখন ওর সারা অঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে স্যাঁতসেতে। একই কথা জানায় এখানেও। একইভাবে কাঁদে।

সাহায্যটা পাওয়া হয়ে গেলে জানায় তার বড্ড শীত করছে।

এককাপ গরম চা আসে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একখানা শুকনো তোয়ালেও, কিন্তু মরিয়মের সেদিকে খেয়াল নেই। তার যে ক্ষতি হয়ে গেছে— ভিজে থেকে নিমোনিয়া হয়ে মরলেও সে ক্ষতি তার কতটুকু।

ভদ্রমহিলা মেরীকে গা-মাথা মোছার জন্য বারবার অনুরোধ করেন।

মাথা ও গা ভাল করে মুছে দিয়ে মেরী বিদায় নিয়ে হনহনিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ায়। আজ আর কোথাও যাবে না। একটু সকাল সকাল বাসায় ফিরবে। শরীরটাও ভাল লাগছে না, মাথা ঘুরছে—দুচোখ জ্বালা করছে—কাল রাত্রে একেবারে ঘুমাতে পারে নি—জ্বরের জন্য। তারপর একটু আগে বৃষ্টিতে ভিজে কেমন যেন ঠাণ্ডা লেগে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া বেশী পরিশ্রম করে আবার দু'দিন যদি জ্বরে পড়ে থাকে তো সংসার চলবে কেমন করে।

কিন্তু তবু জ্বর আসে। অনেক রাত্রে জ্বরটা একটু কমে এলে ছেলে-মেয়ে দুটোর মাথায় সস্নেহে হাত বুলায় মরিয়ম এলবার্ট ওরফে মেরী। বুকে একবার ক্রশ আঁকে—হে পরম পিতা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি তো মানুষকে ক্ষমা করার কথাই প্রচার করার জন্য যীশুকে পাঠিয়েছিলে—হে পিতা আমাকে ক্ষমা করো। এবারে সেরে উঠলে আমি ১০০টি মোমবাতি দেব চার্চ-এ।

সকালে যখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তখন মেরী অন্য মানুষ হয়ে উঠলো। সারা রাত যেন এক প্রচণ্ড দৈত্যের সাথে লড়াই করে এখন সে বিজয়ী। মেয়েটি একপাত্র চা আর কিছু শুকনো পাউরুটি ওর শিয়রে রেখে দিয়ে-কনী মেশান ইংরাজীতে ওকে উঠতে বললো, পর পর দু'কাপ চা খাওয়ালো। অনেক দিনের পুরানো জমে যাওয়া একটি হরলিক্স-এর শিশি পেড়ে আনলো তাকের উপর থেকে — এক গেলাস হরলিক্স খেয়ে একবারে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠবে মরিয়ম।

৩

একটা দিন পুরো বিশ্রাম নিয়ে-পরের দিন মেরী আবার রোজগারের সন্ধানে বেরোয়। যাদবপুরের সেণ্ট্রাল পার্ক-এ নেমে কতকগুলি নতুন নতুন বাড়ী। তারি একখানা পছন্দমত যুৎসই বাড়ী দেখে গিয়ে মেরী কড়া নাড়ে। দরজা খুলে দেয় একটা ১৪-১৫ বছরের মেয়ে। মেরী তাঁকে সুপ্রভাত জানায়। মা'র সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—কিন্তু মাতো বাড়ী নেই।

মনে মনে খুশী হয় মরিয়ম, বলে একটু বসতে পারি কি? মরিয়ম ইংরেজী বলছে। তার উপরে মরিয়ম মেমসাহেব, গাউনপরা। একটু খুশী হয়েই মেয়েটি বলে – আসুন আপনি ভেতরে এসে বসুন।

সোফায় বসে পড়ে মেরী প্রথমে বলে—তুমি কোথায় পড় ডার্লিং? তোমার নাম কি?

উত্তরে মেয়েটি জানায়, তার নাম রত্না। সে এবারে স্কুলে ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে।

এবারে মরিয়ম নিজের কাহিনী সুরু করে বলে — আমার ও বয়েসী ঠিক তোমার মত মেয়ে আছে। সেও সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিত এবারে। কিন্তু ডার্লিং সে আজ খুব অসুস্থ—বাঁচবার কোন আশা আর নেই। পেটে ক্যান্সার হয়ে পড়ে আছে। রক্তে সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে—মেঝেতে সে শুয়ে পড়ে আছে। আর সারা ঘরে রক্তের গন্ধ বয়ে যাচ্ছে। কি করব তার একটা পেটিকোটও নেই, শুধু প্যাণ্টি পরে পড়ে আছে। সে ঠিক তোমার মত ডার্লিং ঠিক তোমার মাপের।

সাগরপারে যার পিতার দেশ— সেই বিদেশী মহিলার কষ্টের কথা শুনে প্রাণ গলে যায় রত্নার। বলে—আপনি একটু বসুন।

পাসের ঘর থেকে ফিরে আসে একখানা পেটিকোট আর একখানা শাড়ী হাতে নিয়ে। মরিয়মকে জিজ্ঞেস করে— আপনার মেয়ের শাড়ী পেলে কোন কাজে লাগবে?

উত্তরে মরিয়ম জানায়, যে-কোন জিনিস তার কাজে লাগবে। —ভগবান যেন 'রত্না'কে আশীর্বাদ করেন। বুকে ক্রশ আঁকে মেরী, আর একবার ভগবানের কাছে রত্নার জন্য আশীর্বাদ কামনা করে—তারপর বলে— 'রত্না' ডার্লিং আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পার? এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট। আমি আজ সকাল থেকে কিছু মুখে দেইনি।

এককাপ চা করে আনে রত্না—কিছু বিস্কুট—।

চা-বিস্কুট খেয়ে একটু চাঙ্গা হয় মরিয়ম। তারপর জানায় কুড়িটা টাকা ওকে আজ যে করে হোক জোগাড় করতে হবে—এই কুড়ি টাকা না পেলে আজ মেয়ের ওষুধ কিনতে পারবে না সে। মেয়েটি আজ সাত দিন বিনা ওষুধে আছে, তাতে ওর রোগ আরও বেড়ে গেছে ও যাচ্ছে।

রত্না বললেন—মাতো বাড়ী নেই। আমার কাছে দুটি টাকা মাত্র আছে— আপনাকে দিতে পারি।

রত্নার হাত থেকে টাকা দুটো নিয়ে আর একবার ঈশ্বরের কাছে রত্নার জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, মেরী রত্নার কাছে বিদায় নেয়।

দুটো বাড়ীতে আয় ১৫৲ টাকা পেয়েছে। এরকম ভালো রোজগার হলে মেরী এ-লাইনটাই ছেড়ে দেবে—ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটা ধেনো মদের দোকান করবে—বাইরে নয় বাড়ীর মধ্যে। যেমন করেছিল এলবার্ড। মেরী ছিল সেই দোকানের বিক্রেতা, এলবার্ড তার রক্ষক, তার আশ্রয়দাতা।

ই, আই, রেলওয়েতে ফায়ারম্যান এলবার্ড। অফ ডিউটি থাকলে আসে যায়, দোকান তদারক করে—জাতে

জাপানের রাজকুমারী জাপানের প্রথম আণবিক শক্তিসম্পন্ন জাহাজ 'মুৎসু'র দড়ি কেটে জাহাজটির উদ্বোধন করেন

আপনি কি বিচক্ষণা আধুনিকা মা না, নিতান্তই সাধারণ?

নীচেকার কথাগুলি প'ড়ে যাচাই ক'রে নিন:

আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনার শিশুর পক্ষে ধীরে ধীরে স্তন্যপান বা দুগ্ধখাদ্য ছেড়ে দিয়ে শক্ত খাদ্য সুরু করা কতটা জরুরী?

বেশ কথা।

তাহলে এ সম্বন্ধে আপনি কি করছেন?

শিশুকে শস্যখাদ্য বাড়ীতে রান্না ক'রে দিতে গেলে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়; অনেক সময় তা' খেতেও চায় না; পরিপূর্ণ পুষ্টিও তাতে হয় না; তাই না?

তাহলে ফ্যারেক্স খাওয়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

(শিশুরা সাধারণতঃ প্রথম শক্ত খাদ্য খায়—ফ্যারেক্স)। ফ্যারেক্স ব্যবহার করলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারবেন আপনার শিশু পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভ করবে, সহজেই হজম করতে পারবে।

তাছাড়া এও জানবেন, ফ্যারেক্স স্বাস্থ্যবিধিসম্মতভাবে প্রস্তুত এবং বেশ সুবিধাজনক। তৈরী করাও অতি সহজ। ওর সঙ্গে শুধু দুধ আর চিনি মিশিয়ে প্রয়োজনমত ঘন ক'রে তৈরী ক'রে নিন।

প্রথমে শিশুকে অল্প পরিমাণে ফ্যারেক্স দিতে সুরু করুন। পরে ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। শিশুরা এই শস্যখাদ্য, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, আয়রন ও সঠিক পরিমাণ প্রোটিনের মিশ্রণে তৃপ্তি

সুন্দর বেড়ে ওঠে। সুস্থ, মজবুতভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শিশুদের যা যা প্রয়োজন তা সবই এতে আছে। তাই পৃথিবীর সর্বত্র মায়েরা ফ্যারেক্সের ওপর নির্ভর করেন।

বিনামূল্যে—ফ্যারেক্স পুস্তিকা

আমার শিশুকে সবচেয়ে ভাল খাদ্য কি দিতে পারি তা জানতে চাই। একখানি ফ্যারেক্স পুস্তিকা নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। ডাকখরচের জন্য ২০ পয়সার ডাকটিকিট সঙ্গে পাঠালাম।

নাম..

ঠিকানা..

...... BC

ফ্যারেক্স, পোষ্ট বক্স ২০২, বোম্বাই-১

ফ্যারেক্স—শিশুর প্রথম শক্ত খাদ্য

Glaxo

গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

পিরামিড ও স্ফিংক্স
—রথীন রায়

নর্তক
-বিবলি সদর

ভদয়নগোশা
—দীপঙ্কর সেন
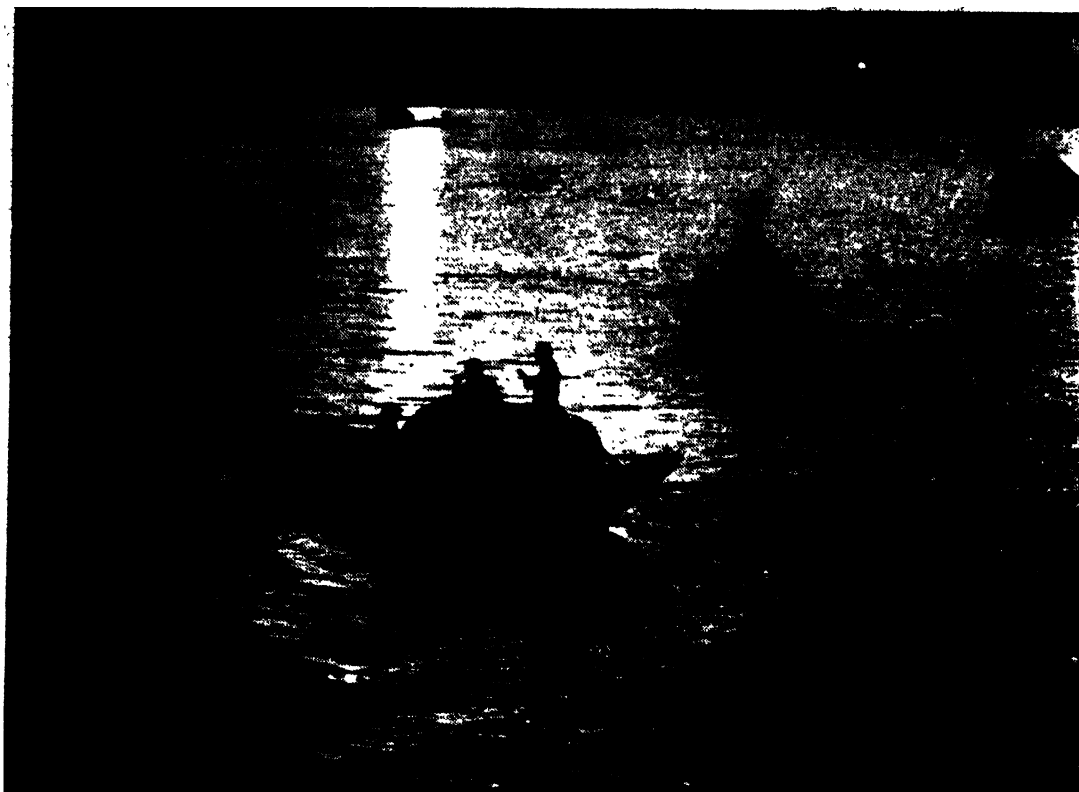
দিবাবসান
- আর মণ্ডল

দুঁয়ে দুঁয়ে চার
—সুচিত্রা বিশ্বাস

আমরা দ্‌জনা
—শক্তি ঠাকুর

সূর্য-রথের চাকা (কোনার্ক)
—গোপাল ভট্টাচার্য

দুগ্ধপান
এস পাল

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লাসি কাগজে পাঠাবেন। ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২

গাড়ীর মিছিল
—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইঙ্গ-ভারতীয়। দেখতে ইংরাজের মত ফর্সা, দুর্দ্ধর্ষ চেহারা, পাকানো গোঁফ। রবিয়ম নিজের জাত গোত্র জানে না, খ্রীশ্চান মিশনারীরা ওকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিল তারপর ঘর-বাঁধার আশায় মিশনারী আশ্রয় ছেড়ে এলবার্ডের পথে পথে বেরোয়—। এলবার্ড ঘর-বাঁধলো না, কিন্তু আশ্রয় দিয়েছিল। মদের কথা মনে পড়তেই কেমন বেশী ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হয় রবিয়মের ক পাত্র খেলে মন্দ হয় না— অনেক দিন খায় নাই। রুটির পয়সা রোজগার করতে পারে না তো মদ খাবে কি দিয়ে।

বাস থেকে নেবে, ধর্মতলার গলিতে গিয়ে সোজা শুঁড়ীখানায় ঢুকে এক গেলাস পচাই এর অর্ডার দেয়। সস্তা কাচের গেলাসে করে আনে সস্তা পানীয় সঙ্গে কিছু পচা চিংড়িমাছের বড়া।

গোগ্রাসে বড়া কটা গিলে নিয়ে, এক চুমুকে পানীয়ের গ্লাস নিঃশেষ করে দেয়।

দ্বিতীয় গেলাসে দুটি চোখ ভেসে ওঠে। উইলিয়মের চোখ --- তেমনি স্থির প্রত্যয় আর স্থির মিনতিভরা,— সুদূরে ঘরবাঁধার আহ্বান।

—মেরী আমি তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করব ---জীবনে।

না, না। মেরী জীবন থেকে পালিয়ে আসতে চায় --- ওয়েলেসলির কোন অন্ধকার গলিতে একটা ভাঙ্গা পড়ো বাড়ীর ছাদের চিলেকোঠায়— মেরী বেঁচে থাকবে—মেরী আর এলবার্ডের সন্তান দু'টি।

পচা চিংড়ির বড়া পচাই-এর সাথে অমৃত-আস্বাদ নিয়ে এসেছে। পচাইটুকু মেরী তাই নিঃশেষে পান করে বসে থাকে---। জীবন দূরে থাক। ঘর দূরে থাক। এলবার্ড—উইলিয়ম সব দূরে থাক।

---এলবার্ড দূরে সরে যায়। একটু করে কালো মেঘ এসে ঢেকে ফেলে এলবার্ডকে – একটি পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ এসে এক নিমেষে- আছড়ে পড়ে যায় এলবার্ডকে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে তার কণ্ঠ কেউ শুনতে পায় না। বাঁচার চেষ্টা হয়তো করে— কিন্তু নিমেষে তার ঊর্দ্ধে তোলা হাতের সবটুকু অংশ এবং শেষে তার মোটা মোটা আঙুলগুলো সমুদ্রের জলে ডুবে যায় – সে হাতে রক্তের ছাপ —কি দেখতে পায় মেরী।

অন্ধকারে মেরীর বন্ধ চোখের মধ্যে আবার স্পষ্ট উইলিয়ামের স্থির চোখ— সে চোখে মিনতি,—সে চোখে ঘর বাঁধার আহ্বান।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে মেরী ১৫।১৬ বছরের মেয়ে জেনী তখন পাড়ার কোথায় কোন আড্ডায় কে জানে। ছেলে জন ফিরবে অনেক রাতে। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মেরী তখন ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমবার আগে একবার হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা করে—হে পিতা, তুমি আমার সকল দোষ ক্ষমা করো। তুমি যদি আমার জনকে সুমতি দাও, যদি ওকে মানুষ করে তোল, আমি আর মিথ্যা কথা বলে পয়সা রোজগার করব না, প্রভু-প্রভু তুমি মুখ তুলে চাও।

নিদ্রাতে ডুবে যায় মেরী, একরাশ মেঘের মাঝে তলিয়ে যায় যেন---

উইলিয়ম আবার মিনতিমাখানো চোখে মেরীর দিকে তাকায় —মেরীর হাত থেকে মদের গেলাস কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে —মেরী তুমি মন ঠিক করলে --- মেরী চল আমরা ঘর বাঁধি।

ম্লান হেসে মেরী বলে, কোথায় ---? কেন? আমার দেশে—রাঁচিতে। —কিন্তু - এলবার্ড। সে তো তোমাকে আস্ত রাখবে না। ছেলেমেয়ে দুটিকে সে কেড়ে নিয়ে যাবে। আমি তাহলে বাঁচব কি করে?

—তাই বলে তুমি এখানে মদ বিক্রি করবে? আর মদ খাবে। না মেরী, আমি তা হতে দেব না। আমি তোমাকে জীবনে ফিরিয়ে আনব মেরী ---আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব।

আর এক ঢোক পানীয় গিলে ঝাঁঝের তেজে একটু যেন মুখ বিকৃত করে রবিয়ম।

জীবনে ফিরিয়ে আনবে ---বিয়ে করবে—লোকটা বলে কি? এলবার্ড তাহলে কি ওকে আস্ত রাখবে। দুর্দ্ধর্ষতায় এলবার্ডের সমতুল্য এ অঞ্চলে কেউ নেই—উইলিয়মের কাছে আজও কি তা অজানা।

—তা হয় না উইলিয়ম।

—কেন হয় না-প্রায় গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করেছিল উইলিয়ম।

এলবার্ড তাহলে মেয়েদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। তোমাকে পৃথিবী থেকে সরাতে একটুকু ইতস্তত করবে না।

—তুমি ছেলেমেয়েদের দাবী করবে তুমি আদালতে যাবে। আমি তোমায় সাহায্য করব।

—আদালতের কাছে ছেলেমেয়েদের ওপর আমার কোন দাবী নেই।

—তোমার নেই—এলবার্ডের আছে?

—না তারও নেই, হতভাগ্যরা আইনের চোখে কোন দাবীরই দাবীদার নয় – না আমি বা এলবার্ড কেউ ওদের দাবী করতে পারি না আদালতের কাছে।

ওয়েলেসলীর একটি নগণ্য গলিতে একদিন গভীর রাত্রে খুন হল উইলিয়ম। দুটি স্থির চোখ মেলে উইলিয়ম তাকিয়ে ছিল মেরীর দিকে। সেই স্থির চোখে যেন স্থির প্রত্যয়।—স্থির মিনতি।—মেরী তুমি আর মদ খেয়ো না। স্থির চোখের তারায় কোথায় যেন সুদূরে ঘর বাঁধার আহ্বান। —মেরী আমি তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করব ---জীবনে। কেঁদে ওঠে মেরী --উইলিয়ম---উইলিয়ম।—।

ঘুমের ঘোরে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে অনেক-ক্ষণ কাঁদলো মেরী – একসময় ঘুম ভেঙে গেল। মৃতদেহ সনাক্ত করতে গিয়েছিল মেরী, এলবার্ড সেদিন থেকে ফেরার। এলবার্ড কোথায় ধরা পড়েছিল, মেরী জানে না, কিন্তু শুনেছে সে এখন জেলে।

মেরীকে তারপর কেউ আর ভিক্ষা

উত্তর আফ্রিকার উপকূলে

শেষাংশ

বেনগাজিতে সুহাস কুমারের বাসায় স্বয়ংক্রিয় লিফট্, গরম জলের গীজার ফ্লাস টয়লেট্—আধুনিক আমেরিকান কায়দায় সবকিছুরই বন্দোবস্ত রয়েছে। তবে মূল্য এর যথেষ্ট দিতে হয়। আমরা সাদাসিধে আত্মনির্ভর আহারাদি করলাম।

বিকেলে এক লিবিয়ান ইঞ্জিনীয়ার এসেছিলেন। তার সঙ্গে নানান কাজের কথা হল। দুপুরে একটি ঠিকে ঝি আসে সুহাসের এঁটো বাসন মাজা, কাপড় কাচা ও ঝাঁট দেওয়া কাজ করতে। ঠোঁটে উল্কি আঁকা বৃদ্ধা দাসীর সুহাসের প্রতি অপত্যস্নেহের অন্ত নেই। বেদুইন সম্প্রদায়ের দাসী হলে কি হয়, গায়ে হাত দিয়ে কথা।

আমাদের বৈকাল বেলাটা কাটালাম সমুদ্রের উপকূলে ওদের নৌ-ক্লাবে। তীব্র জোলো হাওয়ায় মুখে লবণাক্ত প্রলেপ মাখিয়ে দেয়। এখানেই রাতের আহারাদি বিলিতি কায়দায় অল্প স্বল্পে সেরে নিলাম।

অ্যাপোলোনিয়া

পরের দিন দু'দিনব্যাপী সরকারী সফর। সকাল সাড়ে পাঁচটায় গাড়ী এসে হাজির। প্রাচীন ইতিহাস ও পুরা-তত্ত্বের সঙ্গে বর্তমানের কর্মকল্যাণের যেখানে সমন্বয়, সেই সব বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন ও সেই সঙ্গে সরকারী কাজ জড়িয়ে পরিক্রমায় চললাম। সুহাস কুমার 'সাইরেনাইকা' প্রদেশের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্য বাস্তুকার, তাই এই সরকারী সফরে তার পরিদর্শনের স্থান দেখা।

বেনগাজি থেকে দুটো রাস্তা 'এলমিরাজ' বা 'বার্চে' সহরে এসে মিশেছে। পথের দৈর্ঘ ঘল ৯৮ কিলোমিটার। এ রাস্তাটি সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গেছে। উপকূলের বালুকাময় অঞ্চল পার হলেই পাহাড়ী অঞ্চল। পাহাড়গুলো প্রায় তিন-চারশো মিটার উঁচু হবে। পথে পড়লো ছোট ছোট জনপদ 'সিদ্দিকি খলিফা', 'দেরিয়ানা' ও 'টোক্রা' 'এলমিরাজে' বা 'বার্চে'তে কয়েক বছর আগে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে বহু বাড়ী নষ্ট হয়ে যায়।

আজ দেখলাম খেতের মধ্যেও একতল একই ধাঁচের ইতালিয়ান ঔপনিবেশিকদের বাড়ীর ঢালাই ছাদ খসে পড়েছে; কিন্তু কয়েকটা দেওয়াল খাড়া আছে। এই ধ্বংসলীলার পর জাপানী ভূকম্প-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হয়। তাঁরা এর বিশেষ অনুসন্ধান করে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন ও সেই অনুসারে নতুন বাড়ী তৈরী ও পুরাতন বাড়ী মেরামত হচ্ছে।

[illegible] চট্টোপাধ্যায়
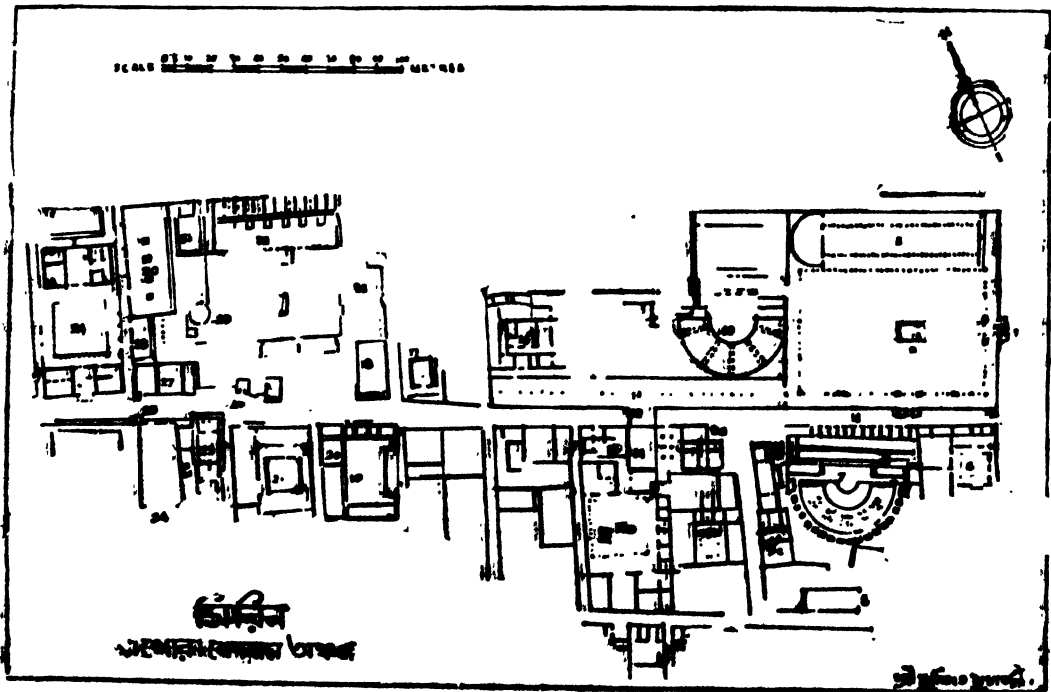
এখানেই আমরা Expresso কফি খেয়ে নিলাম। গাড়ী চালাতে চালাতে লিবিয়ান ড্রাইভার তার সিগারেট কেশ খুলে সিগারেট খেয়েই চলেছে। ভারী গাড়ী সিধে রাস্তায় চলেছে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে। 'এলমিরাজ' বা 'বার্চে' অঞ্চলে সারি সারি বাড়ী তৈরী হচ্ছে। এদের বিন্যাস হল মাঝখানে হল ঘর ও দু'পাশে দু'খানি ঘর সামনে পেছনে চওড়া বারান্দা। একই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ীগুলি তৈরী করা হয় ও প্রত্যেক বাড়ীর চারদিকে বেশ খানিকটা শস্যের খেতের জমি রাখা। প্রত্যেককে এক বা ততোধিক হেক্টেয়ার জমি দেওয়া হয়েছে। সেখানে ঐ উপনিবেশিকরা থাকবে ও আহারের জন্য ফসল ফলাবে। পাহাড়ের গা থেকে সমুদ্রের প্রায় উপকূল পর্যন্ত চাষের জন্য এই সুব্যবস্থা করেছিল। ইতালিয়ানদের এখন দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এ দেশীয়রা সেগুলি বর্তমানে প্রায় দখল করেছে।

বার্চে থেকে লামলুদা যাবার দুটী রাস্তা একটা 'বেইদা' হয়ে ও অপরটি 'সালান্তা' হয়ে। এখানে রাজধানী 'বেইদা'র জন্য নতুন জলকল ও বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র দেখা ও সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত এপোলোনিয়া, 'সিরিন' ও টলেমিস' নগরী দেখে আসা। গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর মন্দির এখানে স্থাপিত হয়েছিল বলে, এই সহরের নাম অ্যাপোলোনিয়া। এরই সংলগ্ন অঞ্চলের নাম SUSUZA বা শুধু 'সুজা' নামই বর্তমানে বলা হয়। মিশর-সুন্দরী ক্লিয়োপেট্রার সমুদ্রস্নানের স্নানকুণ্ড ও স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তনের সুন্দর প্রকোষ্ঠটি আজও এখানে মিশরীয় স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। 'টলেমিস্' এসেছে মিশরের রাজা PTOLEMAIS-এর নাম থেকে।

প্রাচীন অ্যাপোলেনিয়া সিরিনের বন্দর হিসেবেই গ্রীক্ অধিকারের যুগ থেকে সহস্র বর্ষ ব্যবহৃত হয়েছিল। সিরিন থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে। এর নগর প্রাচীরের বেশ খানিকটা আজও দেখা যায়। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ক্রীট দ্বীপের মুসলমানদের সরিয়ে এখানে মুস্লিম উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। এখানের লোকদের মধ্যে অ-আফ্রিকান চিহ্ন দেখা যায়। ইতালিয়ানদের অধিকার কালে এখানে বহু সংস্কারকার্য ও নতুন গঠনকার্য চলে।

বর্তমান সহর 'সুশা' প্রাচীন অ্যাপোলোনিয়ার সংলগ্ন। নগর প্রাচীর ঘেরা, বেশ কয়েকটা থাম-খাড়া অ্যাপোলেনিয়া যে এক সময় অতীত গৌরবের অধিকারী ছিল, তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায় এর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, নগর প্রাচীরের অংশে, প্রাচীন থিয়েটারের পাথর খুদে বসার যায়গায়, বিরাট

গুহা।

পানায় জলাধারে, গুহাবাসে, প্রশস্ত প্রাচীন পথের চিহ্নে, সাধারণ স্নানাগারে, মধ্যস্থিত ভজনালয়ে, পশ্চিম দিকের তোরণে, নৌকা-নির্মাণের পর জলে নিয়ে যাওয়ার 'স্লিপওয়ে'তে, ক্লিওপেট্রার স্নানকুণ্ডে ও মৃতের সমাধি দেওয়ার গুহাগাত্রের প্রকোষ্ঠে।

এর বহু হর্ম্য কালের প্রকোপে, বাইজানটাইন রাজত্বের ধ্বংসলীলায় ও আরব আক্রমণে বিনষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীন হর্ম্যের ভগ্নাবশেষ ও অংশ কালে কালে গৃহ ও মন্দির বিনষ্ট হয়ে গেছে। ভেনাসের মন্দিরের ভিতরে সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচীন হর্ম্যের ভগ্নাবশেষ ও অংশ কালে কালে গৃহ ও মন্দির নির্মাণে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হয় এরও সেই দশা, যতদিন না বর্তমান সরকার পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করছেন। বাদি সংগ্রহের আধারটি পাথর কেটে ও খিলেন দিয়ে যে ঢেকে রাখা হয়েছিল, তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বদিকের মন্দিরের মর্মরের থামগুলি একলাই যেন অতীতের জয়ধ্বজা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সিরিন

অ্যাপোলোনিয়া দেখে বেলা তিনটে নাগাদ পৌছালাম 'সিরিনে'। উঠলাম এসে এখানকার একমাত্র ভদ্র হোটেলে। গত মহাযুদ্ধে বোমার আঘাতে এর কিয়দংশ ভেঙে যায়। তা' আজ মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। তবু পুরাতন ও নতুনের সংযোজন ধরা পড়ে। এখানে একসময় মুসোলিনী আফ্রিকার যুদ্ধ ব্যাপারে এসেছিলেন। এই হোটেল থেকে একটু বেরুলেই নীচে দেখা যাবে সিরিনের ধ্বংসাবশেষ। বেশ কিছু থাম আজও খাড়া আছে। ঐ থামগুলির আঙ্গিকে রয়েছে গ্রীক্ স্থাপত্যের 'ডারিক, আয়োনিক ও করিন্থিয়ান' কায়দার সুচারু সন্নিবেশ ও বিকাশ। এখানে রোমান থাম ও বাইজেন্টাইনেরও চিহ্ন রয়েছে। নগর বিন্যাসে গ্রীক ও রোমান ধারার অভিজ্ঞান-মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে থেকে বের করা হচ্ছে।

প্রাচীন 'সিরিন' নগরী স্থাপনের একাধিক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত গ্রীক গাথাকার চারণ-কবি 'পিণ্ডার' অপ্সরা 'কুরাণা'র কাহিনী বর্ণনায় লিখেছেন—

পরমাসুন্দরী গ্রীক অপ্সরাকে গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো ভুলিয়ে লিবিয়ার প্রেয়সীরূপে নিয়ে আসেন। পিণ্ডারের বর্ণনায় বাহুবলধারিণী মহাশক্তিময়ী কুরাণা যাকে বাংলায় 'করুণা' ও বলা যেতে পারে। তিনি বিনা অস্ত্রে নিজ বাহুবলে বন্যজন্তু হত্যা করতেন। একসময় করুণাকে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দৃশ্য দেখে অ্যাপোলো বিমোহিত হন—মনে মনে বলেন কী অপূর্ব শক্তিশালিনী কন্যা—যে নিজবলে আমারও বীর্যকে

পরাভূত করতে চায়। অ্যাপোলো অতি বুদ্ধিমান উপদেষ্টা 'কিরণে'র উপদেশ চান—এটা কি সমীচীন হবে আমার বাহুবলে অপ্সরাকে গ্রহণ করা, না তাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা। কিরণ বলেন—তুমি এই অপরূপ সুন্দরীকে এই স্থানেই বিবাহ কর ও নবরাজ্যের অধীশ্বরী করো। কালক্ষেপণ না করে অ্যাপোলো লিবিয়ার এক স্বর্ণপুরীতে করুণাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করেন। সেখানেই গড়ে উঠেছিল সুবিখ্যাত প্রাচীন নগরী 'সিরিন'।

আরেক কিংবদন্তী হ'ল হিন্দু পুরাণের অসুরবিনাশিনী চণ্ডীর মত করুণা আপনা হতেই লিবিয়ায় বাস ও সেখানে এক সিংহকে নিজ বাহুবলে হত্যা ক'রেন ও সেই রাজ্যের অধীশ্বরী হন।

গুহা-মন্দির

লোকেরা তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে থাকে। করুণা বা কুরিণি বর্তমানে ল্যাটিন অপভ্রংশে 'সিরিন' নামটি আসে। সিংহের সঙ্গে মুক্তহস্তে যুদ্ধরতা 'করুণা'র প্রস্তর-চিত্রটি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

সিরিনে দুটি যাদুঘর, যেখানে প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলালিপি, কাঠের মুদ্রা, অলংকার, মৃৎশিল্পের নানা পাত্র সংগৃহীত আছে। সিরিনের ভগ্নাবশেষে গ্রীক, মিশরীয়, রোমান, পারসিক ও [illegible] সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। [illegible] প্রভুবিনীর [illegible] জলধারা এখানে প্রাচীন গ্রীকদের নগর স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। এটিকে বলা হয় 'অ্যাপোলোর [illegible]'।

এখানের 'অ্যাপোলো'র মন্দিরটি বিশেষ আকর্ষণীয় হর্ম্য। পাহাড়ের গায়ের উপর প্রাচীর-বেষ্টিত মূল নগরীর বিশেষ দর্শনীয় বস্তু হ'ল ফোরাম ও দেবস্থান। অ্যাপোলো মন্দিরের নাটমন্দির যদিও অপ্রশস্ত কিন্তু মূল মন্দিরটির পরিবেষ্টিত থামের কিছু কিছু আজও অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। নাটমন্দির থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠলে দেখা যাবে বেলেপাথরের কয়েকটি থাম। থাম গুলোর মাথায় কয়েকটা পাথরের বুক নিয়ে একসময় যে ছাদ ধরা ছিল তা' অতীতের সঙ্গে বর্তমান ধারার এক যোগসূত্র সৃষ্টি করে।

মন্দিরের মেঝেতে ছোট ছোট সাদা ও রঙিন মার্বেল দিয়ে বিচিত্র মোজায়েকের কাজ শিল্পরুচির অসামান্য পরিচয় দেয়। একে বলা হয় LABYRINTH MOSSAIC এই ছোট্ট নগরীটির পথ বিন্যাস বর্তমানের তুলনায় সেই সময়ের মুষ্টিমেয় লোকের অনুপাতে বিশেষ যে প্রশস্ত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পাহাড়ের কোলে মূল নগরী থেকে যে চালু রাস্তা পাহাড়ের মালভূমিতে উঠে চলে গেছে সেখানে আরও বিপুল বিস্তার লাভ করেছিল নগরবিন্যাস। এটিকে 'আগোরা ও ফোরাম' অঞ্চল বলা হয়। এই ফোরামটিকে 'Forum of Proculus' বা 'Caesareum' বলা হয়। এটি একটি বিরাট প্রাচীর ঘেরা চাতাল, যার ভেতরের দিকে থামের-সারি।

১৯৩৫ সালে এর খননকার্যের পরে ইটালিয়ানরা ভগ্নস্তূপ থেকে ভগ্নাংশ নিখুঁতভাবে সংযুক্ত ক'রে গড়ে তুলেছে। রোমান ফোরামের উদ্দেশ্য হ'ল যেখানে মোকদ্দমার বিচার ও রাজনৈতিক বক্তৃতা হয় সেখানে আবার বাজারও বসে। তবে এই হর্ম্যটির ব্যবহারের বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। পূর্ব তোরণে প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় এটি সম্ভ সাধু [illegible] Portico of Caesarium-এর কেন্দ্রে যে ছোট মন্দিরটি আছে সেখানে [illegible] [illegible] মূর্তি পূজার জন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৬১ সালে যখন এই মন্দিরের খননকার্য চলে তখন সেখানে রোমান সুরা দেবতা' বাক্যাস্-এর বিরাট মর্মর-মূর্তি পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলটি রাজ্য শাসন বিষয়ে ও আমোদ-প্রমোদের মুখ্য কেন্দ্রস্থল ছিল। বিরাট ফোরামের বহু থাম আজও বিদ্যমান আছে। ফোরামের পশ্চিমে হেলেনিক (গ্রীক) থিয়েটার, দক্ষিণে রোমান থিয়েটার। রোমান থিয়েটারের পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ, তার সংলগ্ন বিচারালয়। আরও পশ্চিমে সম্রাট বাট্টাসের সমাধি। যদিও বহু ভগ্ন অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া গেছে কিন্তু সেগুলো যে কি কাজে লাগতো তা আজও জানা যায় নি।

কবরস্থান

'ফোরামের' পাশ দিয়ে রাজপ্রাসাদের ধার ঘেঁসে, হারমিস্ মন্দিরকে বাঁয়ে রেখে যে পথ এক প্রশস্ত মুক্ত অঙ্গনে শেষ হয়েছে—তা হ'ল 'আগোরা' অর্থাৎ এখানে বসতো দৈনন্দিন হাট। তার পাশে চালু বারান্দা দেওয়া যে চাতালের ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে সেখানে ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের বিপণি। এই হাট পার হয়ে আরও পশ্চিমে গেলে মল্লশালা, যেখানে ব্যায়ামের ক্রীড়া-কৌশল শেখানো হ'ত।

তাছাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাথর খোদাই করে ছোট বড় গুহা তৈরী হ'য়েছিল সেগুলি কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন মৃতের সমাধি। কারো মতে সেখানে মানুষেরই বাসস্থান ছিল। [illegible] [illegible]

সমাজ পরাগতির তিনটি কারণ

ডঃ অসীম বর্ধন

বর্তমান যুগের আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে সমাজে যেসব পরিবর্তন এসেছে, তার মধ্যে একটি মস্ত বড় পরিবর্তন ঘটেছে পরিবার গোষ্ঠীর ওপর। পরিবার ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষিপ্রধান সমাজে ছিল পারিবারিক সংহতি—পরিবারের সকলকে একই কৃষি কাজে বিভিন্ন দায়িত্ব নিতে হতো। আজও কৃষক সম্প্রদায়ের পরিবারে সেই সংহতি কিছু কিছু রয়েছে। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েরাও পরিবারের সত্যিকারের সম্পদ ; তারা কাজ করে।

এই সুসংহত পরিবার ইউনিট শিল্প প্রধান সমাজে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। একে সামাজিক মূল্যবোধের পরাগতি (degression) বলা চলে। সন্তানদের আর টাকা পয়সার মাপকাঠিতে সম্পদ বলে ভাবা হয় না, বরং বোঝা বলেই মনে করা হয়, আর এইজন্যেই শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে সন্তানপ্রীতি বাৎসল্য এ সব অনুভূতিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকের সমাজে তাই পরিবার শোভিত গৃহকোণের মর্যাদা তেমন নেই।

সমাজবিদ্ পিটার ড্রাকার তাঁর লেখা 'দি নিউ সোসাইটি' বইখানিতে লিখেছেন, বড় বড় কলকারখানায় প্রচুর শিল্প উৎপাদনের উন্মাদনায় এই যুগটিতে সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায় এমনভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে যে, সমাজশক্তি ছত্রাকার হয়ে পড়ে সংহতি হারাতে বসেছে ; ফলে, হঠাৎ নতুন কোনো শক্তির সম্মুখীন হলে আবার সংহত হয়ে প্রতিরোধ করতে বর্তমান সমাজ বেশ বিব্রত বোধ করে। শিল্পভিত্তিক সভ্যতা এতো নবীন উন্মাদনায় পূর্ণ এবং এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এতো অর্বাচীন যে, অকস্মাৎ কোনো নতুন শক্তির আঘাতকে সয়ে নিতে কষ্ট পায়, ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই চাঞ্চল্য অনেক ক্ষেত্রে বহুদিনের ঐতিহ্য পরীক্ষিত শান্তি পথকেও কোলাহলময় করে তুলেছে।

চীনদেশে পরিবার গড়ে ওঠে যে ঐতিহ্য নিয়ে, তা বোধহয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু সেই সংহত সুখী পরিবার ব্যবস্থা আজ ভেঙে পড়তে চলেছে। ব্যাপক শিল্প সভ্যতার প্রসারের ফলে।—বিশেষ করে জাপানী আক্রমণের সময় চীনের পরিবারগুলি দেশের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে সরে যেতে বাধ্য হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিগ্রহের বলিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শিল্প সভ্যতাগর্বী আগ্রাসনই এই অশান্তির মূল কারণ, তা আজ সবাই জানেন।

ভারতেও শিল্প সভ্যতার প্রসারের ফলে সুপরিকল্পিত হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার অবক্ষয় সুরু হয়ে গেছে ; ভিন্নবর্ণের মানুষদের সান্নিধ্য ও মিলন আজ আর শাস্ত্র বিধিনিষেধ দিয়ে আটকে রাখা যাচ্ছে না, সে-শুধুই কলকারখানার সমাজ ব্যবস্থার জন্যেই। আমেরিকাতেও নিগ্রোদের আর অবাধ মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে কি হবে, সেটা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

সমাজের প্রকৃতিধর্মে এই যে সুদূর বিস্তারী পরাগতি, এটা ঘটেছে তিনটি কারণে। প্রথম কারণ যেটি, সেটিকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় সমাজ হোক, সাম্প্রদায়িক সমাজ হোক, কিংবা কোনো একটি কারখানার কর্মীদের নিয়ে ছোট গোষ্ঠীসমাজই হোক, প্রত্যেক সমাজই ঠিক এক একটা প্রাণকোষের প্রকৃতিধর্ম নিয়ে চলে। একে বদলে ফেলে যা খুশি করতে কেউ পারে না, কারণ একে বদলাতে হলে এর যা কাঠামো ব্যবস্থা তাকে মর্যাদা দিয়ে যা করবার করতে হয়। প্রচলিত ধারার যা প্রয়োজন তা পূরণ করার মধ্যে দিয়েই সে-কাজে এগুতে হয়।

দ্বিতীয় কারণ হলো, সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে ব্যাপকভাবে এমন একটা সুস্থ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে সকলেই নিজের কাজের সামর্থ্য অসামর্থ্য সম্পর্কে দরকার মতো আত্মসমালোচনা করতে শেখে। অনেক দিন আগে হারবার্ট স্পেনসার তাঁর 'দি স্টাডি অব সোসিওলজি' বইতে লিখেছিলেন অনেকে সমাজ সংস্কার করতে নামেন অনেকটা আনাড়ী কামারের জন্য—পিটিয়ে পিটিয়ে লোহার চাদরের

গুলি গুহা একাধিক প্রকোষ্ঠের। এ গুহার মধ্যে অজন্তা-ইলোরার মতো মূর্তি শিল্প ও তুলির কাজের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এগুলি আকারেও ছোট। সিরিনের বহু গুহায় পুরাতত্ত্ব বিভাগ দরজা লাগিয়ে তালা বন্ধ রেখেছে। 'সিরিনে'র আসার পথে গুহাগুলিকে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড় সিন্দের মতো দেখায়। দেবমন্দিরের ও বোরাবের দেওয়ালের পাথরগুলি নরম বেলে মাটির। বোরাবের দেওয়ালের পাথরের বুকে বহু শিলীভূত ঝিনুক অবরুদ্ধ রয়েছে দেখেছি। রেডিও কার্বন, ডেটিং পরীক্ষার জন্যে এর একটি স্বযত্নে আহরণ করেও আনি। দুদিন ধরে আমার বৃহত্তর সিরিন পরিদর্শন পর্বের শেষ।

॥ সমাপ্ত ॥

তোবড়ানো দিক সমান করতে গিয়ে উলটো দিকে নতুন করে তোবড়ানো সৃষ্টি করে ফেলে। যেদিকটা সমান ছিল সেদিকটাও অসমান করে দেয়। তার পেটাপেটির বিকট শব্দে লোকেরাও বেশ বোঝে, একটা কিছু হচ্ছে। মানুষের সমাজ-মনকেও অমন হৈ-হট্টগোল করে পিটে সোজা করা যায় না নতুন জটিলতাই সৃষ্টি হয়। আমেরিকায় মদ্যবর্জন আইন এবং সম্প্রতি নিগ্রো অধিকার আইন জোর করে চালাতে গিয়ে কি হয়েছিল, জর্মানীতে ওয়েইমার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অগণতান্ত্রিক জনসাধারণকে গণতন্ত্রের মর্ম বোঝাতে কি বেগ পেতে হয়েছিল, সে-সব সমাজসংস্কারমূলক এক্সপেরিমেণ্ট থেকে বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের সদিচ্ছা যতই থাকুক, সমাজমনের প্রয়োজন ও প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান-ধারণা না থাকলে, সে সদিচ্ছা সহজে কাজে লাগানো যায় না।

তৃতীয় কারণ, এ সব কথা জাতীয় সমাজ এবং সাম্প্রদায়িক সমাজের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রতিষ্ঠান সংগঠন কলকারখানার সমাজেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। একজন লোককে গণতন্ত্রের নীতি শিখিয়ে পড়িয়ে যদি এমন একটা সংগঠনের কাজে লাগানো হয়, সেখানে সবই কঠোরভাবে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'—তাহলে তত শেখানো পড়ানো সবই ব্যর্থ হবে। তেমনি, সমাজের যা কাঠামো, তার থেকে খাপছাড়া একটা কোনো বন্দোবস্ত বিনা প্রস্তুতিতে চাপাতে গেলে তোলপাড় হয়ে যায়—যেমন হয়েছিল বৃটেনে কয়লাখনিগুলোর সংস্কার ব্যাপার নিয়ে। খনিশ্রমিকদের বহুদিনের অভ্যাস, ছোটখাটো সংস্কারবোধ, রীতিনীতি, ভালমন্দ ধারণাকে তাচ্ছিল্য করে কিছু করতে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে কোনো সুফলই ফলে নি,—গোয়ালাদের ছানা তৈরী করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলে যা হয়েছিল সেদিন এদেশে।

নীতিবিদরা বলেন, লোককে ভাল কথা বলতে বলতে তারা ঠিক একদিন যুক্তি বুঝবে। যত বেশি সংখ্যক লোকে বুঝবে, ভাল কথা তত বেশী কার্যকর হবে। আবার যাঁরা ক্ষমতার আসনে থাকেন, তাঁরা ভাবেন, একটা আইন তৈরী করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকাল আর তা হয় না, কারণ সভ্যতার শেকড় আজ সারা জগতব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, তাই কোনো এক অঞ্চলে কয়েক হাজার মাত্র লোককে বুঝিয়ে বা কোনো দেশে একটা আইন তৈরী করে বিশ্বব্যাপী মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে সুসম্পৃক্ত কোনো আঞ্চলিক সংস্কারকে হঠাৎ বদলানো যায় না। লোককে সৎ, পরিশ্রমী করতে হলে, কেবল 'অসৎ হবেন না', 'কুঁড়ে হবেন না' ... সব বললে কিছুই হয় না।

প্রতিদিন কাগজে যে সব পাপ অন্যায়, শিশুর ওপর অত্যাচার, বিবাহ বিচ্ছেদের খবর বেড়ে চলেছে, এর অর্থ সমাজে রোগ ঢুকেছে। সারা পৃথিবীতেই জুয়োখেলা, তুকতাকের কুসংস্কারে বিশ্বাস—এ সব যে আজকাল খুব বেড়ে গেছে, তার কারণ বোঝাতে গিয়ে সমাজবিদ গিলবার্ট মারে বলেছেন, যে সমাজে মানুষের যোগ্যতা সামর্থ্য এবং উদ্যোগের অনুপাতমতো সৌভাগ্যসাফল্য আসে না, সে সমাজে কু-সংস্কারের ধারণা বেশ শক্ত হয়ে মানুষের মনে বাসা বাঁধে।

সুস্থ সমাজে সৎ এবং পরিশ্রমী লোকেরা জীবনে সফল হয়, অসৎ অলসরা ব্যর্থহয়, সুতরাং সে সমাজে লোকে কু-সংস্কারের চেয়ে কার্যকারণ বিষয়ে বেশি আস্থাবান হয়। আর যেখানে যোগ্য লোকেরাও দলে দলে গলগ্রহ বেকার জীবন যাপন করে, সেখানে মানুষ ভাবে, তার ভবিষ্যৎ একেবারেই তার নাগালের বাইরে, তাই 'কপালদোষ' আর কুসংস্কারের ওপর বেশি নির্ভর করে থাকে। এই ধরণের সমাজে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করা সাধারণ লোকের কর্ম নয়; মহামানবের প্রয়োজন। মহামানব ক'জন আর হয়? তবু তাঁর আত্মপ্রকাশের আশাতেই দিন গুণতে হয়।

সমুদ্র শাসন

রাধামোহন মহান্ত

আমরা অনেককাল নিজস্বর্গে মন্ডুক-দর্শন
নিয়ে তৃপ্ত—আত্মভোলা। কিন্তু আজ ডিউক-পিনাকী
বাঙালী ও মারাঠীর রাখী-বন্ধে রবীন্দ্র-দর্শন—
যৌবনের মহিমায় মৃত্যুঞ্জয়, পিন্টা ও নিনা কি
নয় মূর্ত প্রেরণার পর্ণযান কনোজী আংরের!
কলকাতার এক্সপ্লোরার ক্লাব—জাতির গৌরব
সপ্তসিন্ধু-জয়ী বীর সিন্ধুসিংহ মিহির সেনের
এই মহাভারতের তারুণ্যের দুর্বার সৌরভ।
বিজয় সিংহের পর বৃহত্তর ভারতের সাধ—
মৈত্রী ও কৃষ্টির মহা স্বর্ণসৌধ গড়েছিল দূর
দ্বীপময় সিন্ধুজনপদে অশ্ব দুর্বার নির্বাধ
মিলনের সেতু, ছিন্ন সেই যোগ করেছে মধুর।
পিনাকী-ডিউক নব ভারতের অশোক-শাসন,
সামান্য ভেলার পরে নতফণা,—সমুদ্র-শাসন।

মেয়েটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটা শক্ত কঠিন যবনিকা নেমেছে। কালো পর্দা নয়, কবিরা আদর করে যা বলে থাকেন ব্যর্থতার পটকে। মখমলী কালো পর্দা কারও খারাপ লাগে না।

এ পর্দা জমাট ইস্পাতের। সাদাটে ধূসর একখানা ইস্পাতের চতুষ্কোণ। প্রকাণ্ড কারখানায় দেখা যায় এমন প্রকার।

অনেক কিছু ঢেকে দেবার সাধনায় একদিন এই ইস্পাত নেমেছিল দিন-যাত্রায়।

সেই দিনগুলি।

হায়, কৈশোরে-গাওয়া গানের সোনার খাঁচার দিন নয়। প্রকাণ্ড উত্তেজনায় ছুটে চলা। প্রকাণ্ড আদর্শে ভবিষ্যৎ পণ্ড করা। সেদিন যেন শিরায় শিরায় বিদ্যুতের চাবুক পড়েছিল সপাং-সপাং করে।

বীতস্পৃহ ঘোড়াকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার চাবুক। জীবনের চক্রে ছুটে বোঝা বয়ে যাওয়া। রেসের ঘোড়ার বেড়া টপকানো। বাধা নয় বাধা।

কতদিন পরে, ঈশ্বর, পূর্বজীবনকে দেখালে।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে এক বাসের ছাউনীর নীচে। ওর পরনের কালো ডুরেটানা মোটা সুতোয় বোনা শাড়ী নিরীহ। নিরীহ পায়ের পাতলা কালো স্যাণ্ডেল। যেন মনে হয় এখনি ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু ছেঁড়েনি তো। গাম বুট পরা পা, লোহার নাল বাঁধানো জুতো ক্ষয় হয়ে যেত যত হাঁটা সে হেঁটেছে এমনি হাঁটলে।

শ্রীমতী বাণী রায়

আজ এখনি না হাঁটতে পারে, হেঁটেছে যুগান্ত ধরে।

এখন বাসের অপেক্ষা। যাত্রী বোঝাই মানোয়ারী জাহাজের মত হেলে দুলে আসছে সারি সারি বাস। বিশেষ নাম্বারী বাসটা এলেই উঠবে সে।

চার বছর আগে এমনি ছিল না কি? এত ভিড়?

না, আরও ভিড় বেশী ছিল। চক্র-রেলপথ হয়ে গেছে অতি দ্রুত, তাই ভিড় হয়তো কিছু কমেছে।

কিন্তু ভিড়ের মানুষ কি চার বছরে পরিবর্তিত হয়েছে। মনে যে কীট বিচরণ করত, তারা কি এখনও আছে?

রাস্তার চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে সেই মেয়েটি, যার কথা লিখছি আমি আজ। দৃষ্টি শূন্য। বাড়ীগুলো, দোকানগুলো সেই বৃষ্টিতে জলের ছায়ার মত ধরা পড়ছে। আবার ভেঙে যাচ্ছে অন্য চিত্রের আঘাতে।

চিত্র শুধু বাইরের নয়, মনেরও।

এই যে সেই বাড়ী।

নীচে জুতার দোকান তেমনি আছে। প্রথম যখন দোকান খোলা হয় কাব্যময় নাম দিয়ে তখন অনেক ক্রেতা আসত। মালিকের স্বভাব মাধুর্য, আপ্যায়নের সঙ্গে মিশেছিল মনোহর আকৃতি। মহিলারা যেন আবদারের সঙ্গে কথা বলতেন। আর বিশিষ্ট ভদ্রলোক মালিক সকলেরি আবদার রাখতেন সহাস্যে, মনে হ'ত সেই একমাত্র মহিলাটির জন্যই বুঝি তাঁর জুতোর দোকান খোলা।

পরেই একখানা জল খাবারের দোকান। উপরের দোতলার জানালায় একটি হাসিমুখ প্রায়ই চেয়ে চেয়ে রাস্তায় ট্রাম বাস দেখত—চার বছর আগে নয়, অনেক বছর আগে।

নিরুপমা ছিল বন্ধু। বিবাহ হয়েছিল ওই বাড়ীতে পিতৃবন্ধুর ছেলের সঙ্গে। দুই পক্ষ থেকে নেমন্তন্ন হয়েছিল।

বুভুক্ষা কেমন? না খেয়ে থাকলে [illegible] কেমন লাগে অনভবে কতবার এসেছিল?

সেদিন বৌভাতের আসরে মেয়েদের দিকে পরিবেশন করতে বলেছিলেন পিতৃবন্ধু। নিরুপমা ভাড়া করা ভেলভেটের রূপোলী জড়ি কাজের গালিচায় বসে ছিল রাণীর মত। মাথায় ফুলের মুকুট, সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা। কালো কোঁকড়া চুলে-ঢাকা মুখখানি যেন ভ্রমর পরিবৃত পদ্ম। সে মুখে সর্বদা হাসি

কলেজ থেকে ফিরে কিছু না খেয়েই গিয়েছিল সে। সন্ধ্যা বেলায় খাওয়া হবে আরম্ভ। রোজগার গতানুগতিক খাদ্য গ্রহণ না করে একেবারে বিবাহ ভোজের প্রত্যাশা ছিল।

রাত্রি দশটায় যখন শেষ ব্যাচ ওঠার পরে বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে সে বসতে গেল তখন খিদেয় দেহ কাঁপছে। মধ্যে একবার পিতৃবন্ধুকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এবার আমি বসব?

সদাশয় পিতৃবন্ধু পিঠে হাত রাখলেন, 'মা, তুমি এখন বসলে চলে কি, মা?'

বোবার মত খেটে গেল, চিরকালের বোকা যে মেয়েটি। আড়ালে দুটো পানতুয়া মুখেও তুলল না, শুধু পরিবেশন করে গেল।

শেষ বাজারে ঘাঁটা তরকারী, ঠাণ্ডা পোলাউ, মাংসের বাঁটা, মাছের হাড়। মিষ্টি খতম হয়ে গেছে পানতুয়ার দিকে, পরবেশটা আছে এলানো ছাড়া-ছাড়া ধারকোষে। অথচ রসে ভরা পানতোয়া চারটা-পাঁচটা করে সকলের পাতে দেবার সময় আস্বাদনে লোলুপ মনকে সে বুঝিয়েছিল, [illegible] পাবোই তো।

কিন্তু যখনকার যা তখন না দিলে এমনি হয়। ওই বাড়ীতেই।

সদ্যবিবাহিতা বন্ধুর অনুরোধে যেত সে মধ্যে মধ্যে। নিরুপমা আরও অনুপমা উত্তর বিবাহে হয়েছোনমাহাত্ম্যে কিন্তু হাসি মুখ তার প্রায়শ মলিন থাকত। সংসারে শাশুড়ী নেই। বড় ছেলের বৌ হয়ে এসেছে নিরুপমা। কয়েক দিনের মধ্যেই সংসারভার কাঁধে চাপল।

শ্বশুর মারাত্মক হিসেবী। কলেজী বিদ্যায় নিরুপমার অতটা হিসাব জানা ছিল না। এখন বিপাকে পড়ল।

'জানিস, সকালে উঠে তোরা মুখ হাত ধুয়ে নিস, আমি চালের হাঁড়িতে আগে হাত দিয়ে দেখি কতটা আছে। রোজকার খাদ্য রোজ কিনতে হবে, শ্বশুরের হুকুম। এধারে বিকেল বেলা দেওরদের ভরপেট জল খাবার চাই। লুচি-রুটি যা হোক। পেট না ভরলে ওরা উঠবে না। আমি যে কোথা থেকে কি যোগাব, জানি না। রোজ সেদিনের মত চাল-ডাল-তেল-নুন আটা আসে। হিসেব মাফিক। একটুও বাড়তি রাখার উপায় নেই। এক এক সময় কেঁদে ফেলি।

'কিন্তু, তোমার শ্বশুরের ব্যাঙ্কে অনেক টাকা, আমার বাবা বলেছেন।' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল সে।

'তাই শুনেই তো আমার বাবা ঝুলে পড়েছিলেন কিন্তু এখন নাকুনী চুবুনী খাচ্ছি আমি।'

নিরুপমার ছোট দেওর বিকাশ সবে চাকুরীতে ঢুকেছে উচ্চ শিক্ষা [illegible] চেহারা ভালো। বৌদির বন্ধুর প্রতি প্রচুর মনোযোগ দেখা গেল।

বিকাশের বাবা বিয়ের প্রস্তাব দিলেন মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটির বাবা কথাটা বাড়ীতে আলোচনায় ফেললেন। পাত্র মন্দ নয়।

কিন্তু মেয়েটি সবেগে প্রতিবাদ জানাল মায়ের কাছে। ওই বাড়ীতে সে বিবাহ করবে না।

পদস্থ অর্থশালী শ্বশুর, সুচেহারা অফিসার স্বামী। তাই এ পাশ মেয়েটির পক্ষে মন্দ ছিল কি? বিশেষত যখন আকাশে বাতাসে ভেসেছিল একটু তাকানো, একটু হাসির ইশারা।

কিন্তু না, সে সুন্দরী নিরুপমার চেয়ে অনেক সুন্দরী। ও কথা আয়না নিত্য বলে দেয়। তার বাবা নূতন দোতালা বাড়ী বালিগঞ্জে তুলে আত্মীয় বন্ধুর ঈর্ষা জাগিয়েছেন। তাছাড়া, এখনি বিয়ে কেন?

এই যে যৌবনের মাধুর্যময়, অপরূপ শ্রীময় দিনগুলি, এরা কি নীল আকাশ থেকে হঠাৎ খসে এসে আবার সময়ের স্রোতে অনন্ত সমুদ্রে ভেসে যাবে? মুঠো করে তুলে নেব না? আমার ঘরের তাকে শাদা শ্বেত পাথরের রেকাবী করে সাজিয়ে রাখব না? নিরুপমার মত ওই একখানা হাড়-কৃপণ বাড়ীর মধ্যে মাথায় গুণ্ঠন টেনে চলবে সে।

মা বোঝালেন, 'ছেলের যা চাকুরী এক জায়গায় কতদিন থাকবে? তোর নিজের সংসার হবে, নিজের মত থাকবি। সেধে-আসা সম্বন্ধ ঠেলে দিতে নেই।'

বাবা 'হ্যাঁ-না' কিছুই বললেননা। উঠতি বড়লোক তিনি। একমাত্র কন্যার পক্ষে সম্বন্ধটা এমন কিছু দেখলেন না।

ফিরে গেল নিরুপমার বাড়ী।

অথচ পরে বিকাশের বিবাহ হ'ল জমিদার কন্যার সঙ্গে। ধানবাদে নিজস্ব কোয়ার্টারে সে থাকে অতি আড়ম্বরে।

আর নিরুপমার জীবনে এসেছে পরিপূর্ণতা। কিছুদিনের মধ্যেই বদলী। ফিরে এল যখন দুই সন্তানের জননী। শ্বশুরের বাড়ী ছোট অজুহাতে এবং মাইনেতে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে

বনে আধুনিক ফ্ল্যাটে রইল। স্বামীর সঙ্গে সমুদ্র পাড়ে গেল। এখন টালিগঞ্জে গৃহনির্মাণ করেছে। টাকা অবশ্য ওই হাড়কৃপণ শ্বশুরই দিয়েছেন।

কি চমকপ্রদ আর্ট আয়ত্তে এনেছে সেদিনকার নিরুপমা। শ্বশুরের সেবাযত্ন নেই, অথচ মুখে কত ভাব! কখনও বা তরকারী রান্না করে বাটি ভরে পাঠায় মেয়ের হাতে। বিবাহের জন্য তৈরি হচ্ছে মেয়ে। আবার তো শ্বশুরের দাতা হাতের প্রয়োজন হবে।

এমন তো সে-ও করতে পারত। কিন্তু কখনও মনে তার গোঁজা মিল দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। সে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজে পছন্দ করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর ছেলেকে হাতে করে তাঁকে কলা দেখিয়ে কাজ গোছানো সে পারত না। তার সারাজীবন ওই বাড়ীর মধ্যে বা বিদেশেও ওই বাড়ীর পরিবেশ টেনে আজও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত।

আদর্শবাদ তার কাল হয়েছিল।

নইলে কিসের জন্য, সে সকলের কথা না মেনে মুখ থুবল? যে রাজনীতিজ্ঞেরা তাকে রাতারাতি কেউকেটা বানিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে যথাকালে অদৃশ্য হলেন, তাঁরা কোথায় আজ?

পরবর্তী দিনগুলোর অসহ্যভার বুকে চেপে ধরল তার। সে নিশ্বাসের বাতাস পেল না।

মনে আছে, বিমলাদি দরজায় ঘুরে ঘুরে যোগাড় করছিলেন তথ্য। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের রোদে বাড়ী বাড়ী পায়ে হেঁটে। আহার নিদ্রা বাদ দিয়েছেন, পরিচ্ছদে যত্ন নেই।

একদিন শয্যাশায়ী হলেন। সর্দিগর্মি। প্রচণ্ড রোদে মাইলের পর মাইল হেঁটে কোথাও বা শীতল জল পান করেছিলেন। প্রতিশোধ নিল পানীয়।

দেখতে গিয়েছিল সে।

বিছানায় আধবসা অবস্থায় বিমলাদি। ভাঙা গলা, নাকে ভিক্স মলম লাগানো। টেবলে মিক্সচার, বড়ি ইত্যাদি।

'দেখ জ্বর এলে তো কই হয়না, নিশ্বাস নিতে পারি না। বুকে যেন কোনও জায়গা নেই।' হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন বিমলাদি। সর্দি জুড়ে বসেছে বুক, নাকও বন্ধ।

কবিরাজ বাড়ী থেকে বিমলাদির মা পুরাতন ঘৃত সংগ্রহ করে আনতে গিয়েছিলেন অ্যালোপ্যাথির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা না রেখে। গরম করে বুকে পিঠে মালিশ দিলে অতি শক্ত শ্লেষ্মা তরল হয়ে যায়।

মেয়ের কাছে তাকে বসে থাকতে দেখে বিরাগপূর্ণ দৃষ্টি হানলেন। তাদের মত মেয়ের জন্যেই রাস্তায় বার হয়ে আজ বিমলার এই দশা।

কেন বিমলাদির মা বিরক্ত? কবিরাজ বাড়ী যাবার পথে গাছভরা কৃষ্ণচূড়া ফুটে রয়েছে লাল একটা পৃথক পরিমণ্ডলের মত। দেখেও কি বিমলাদির মায়ের মন ভালো হয়না।

আজও—ওকি; সারা আকাশে রংয়ের স্রোত। কনে দেখা আলো। লাল-লাল কৃষ্ণচূড়ায় রাস্তার পাশের গাছগুলি ভরে আছে—যেন লাল পতাকা উড়িয়ে এসেছিল বসন্ত।

কিন্তু রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে না? তার চোখ এতই খারাপ হয়েছে বুঝি? চার বৎসরের বিনিদ্র রাত্রির অশ্রুবর্ষণ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে দিয়েছে। তাইতো চশমা নেবার জনাই আসা।

এতো অজুহাত মাত্র। চোখ ওখানেও দেখানো যেত—সাবডিভিশনাল শহরটিতে তবে কলকাতার মেয়ে আসা পেত না নিশ্চয়।

আসল কথা, একবার আমার ইচ্ছা। যে-শহর তাকে দিয়েছে আনন্দ, দিয়েছে বেদনা, সেখানে ফিরে আসবে সে। চোখ মেলে দেখবে হৃদয়হীনা সত্যিই ভুলে গেছে নাকি?

আকাশ ফিকে হয়েছে চোখের দোষে নয়। বহুক্ষণ বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা নামছে। এতক্ষণ কি বাস এল না? না, এসে চলে গেছে? অন্যমনস্ক সে দেখেনি চেয়ে।

নিরুপমার শ্বশুর বাড়ী সামনে পড়ে বাওয়ার মন পুরানো দিনের একখানা ছেঁড়া পাতা পড়তে ব্যস্ত ছিল। ওই জানালা খোলা থাকত, ওটাই নিরুপমার শোবার ঘর ছিল। ওই নীচের দোকান থেকে সে গেলে খাবার আসত প্রচুর। নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যয়-কুণ্ঠ থাকলেও নিরুপমার শ্বশুর অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। তার বেলা বিশেষ আপ্যায়ন মিলত।

বাড়ীখানা অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল তাকে। হলেও হ'তে পারত তার জীবন।

'হলেও হতে পারত' তার জীবন সারা কলকাতায় ছড়ানো। এ বাড়ীর আনাচে, ও বাড়ীর কানাচে তার জীবন বেড়ে উঠছিল। আধো আধো বিকাশে। কোথাও পায়নি সম্পূর্ণতা।

নিরুপমার ঘরটি সুন্দর সাজানো ছিল বিবাহের যৌতুকে। সব নূতন। নিরুপমার সিঁদুর নূতন, শাঁখা নূতন। আলনায় কাপড় চোপড় নূতন। বিছানা নূতন।

সেই বিছানায় বসে নূতন কথা শোনাত নিরুপমা। যদিও বিবাহে আপাতত বিরোধী তবু শুনতে ভাল লাগত। এক সোনালী রসের সাগরে অবগাহন করে প্রজাপতি যেন মেলত পাখা। গান গাইত মীরার কোন আশ্চর্য পাখী।

মুখখানা লাল হয়ে যেত নিরুপমার। দেহ-প্রেমের নবীনা নায়িকা কখনও লজ্জাও পেত। কিন্তু সদ্যলব্ধ সম্পদ যে অন্যকে দেখানো চাই।

ভাল লাগে। তারও লাগত। কিন্তু সেই রাত্রে বিনা প্রস্তুতিতে জোরের দর্পে কি এল তার জীবনে? আজ সেই হলাহলে দিন রাত্রি তার বিষে নীল।

মেয়েটি বাসের রাস্তায় অসহিষ্ণু

নড়াচড়া করল। মেয়েটির নাম কি বলতো?

তোমরা কি চেন ওকে?

দেখেছো অনেকবার দেখেছ। ভীড়ের মধ্যে দেখেছ বাড়ীর মধ্যে দেখেছ। নিজের মুখে দেখেছ। চেনা, বড় চেনা এত চেনা মুখ যে তার নাম লাগে না।

তবু তো একটা নাম চাই। নইলে কি করে আমি এই আখ্যায়িকা তারি চারপাশে গেঁথে তুলব গুটিপোকার রেশমী সুতোর মত?

নাম কি দেবো?

রবীন্দ্রনাথ, তুমি অনেক নাম রেখে গেছ, অনেক কাহিনীর অনেক নায়িকাকে নাম দিয়েছ। এ মেয়েটির নাম দিতে তোমাকেও ঢোঁক গিলতে হত; ভাবতে হত।

নাম দেওয়া মেয়েটিকে নিয়ে যদি গল্প সুরু করতাম, তবে গোল চুকত। কিন্তু আমি যে আগে গল্প সুরু করে তবে নাম খুঁজছি। তাই গল্পের মিল নামে চাই না?

[illegible] এক মুখ।

এমন মুখ তোমরা অনেক দেখেছ। অনেক ভুলেছ।

কিন্তু, আমি তো ভুলতে দেব না। আমি লিখে যাব ওরি কথা, একদিন যাকে অনিবার্যভাবে তোমরা ভুলে যাবে। আমি তাকেই জাগিয়ে রাখব।

আমি বলব, তার নাম বলব। শুধু নাম নয়, তার সব কথাই বলব।

মেয়েটি রাস্তায় বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। [ক্রমশ।

কবি-বরণ

(কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি)

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত

রবে প্রতীচীর প্রেতনৃত্য, নিষ্পেষণের নিত্য মহাযাগ
জ্বলেছিল সারা ভারত জুড়ি
বণিক ছিল মহাকাল রূপে। সে কী করাল মন্বন্তর ফাগ!
রুদ্ররোষ করে কেলি হা-হা করি।
নিঃশেষ-শোষণ মন্থনে, ভারতভূমি জর্জর-ধূসর
তবু রক্ত-তৃষায় মত্ত প্রেতপাল
করে হৃৎপিণ্ড সঞ্চয় শতাব্দী ধরি। সে কী আর্তস্বর!
দিকে দিকে জমে উঠে শুধু কঙ্কাল।
সে দিনের চক্রব্যূহ ভেদি, বাণ-বিদ্ধ ক্ষিপ্ত সিংহের মত
কে আসিল বহিঃপ্রান্তে ছুটি?
ভীষণ-প্রহরণ-বজ্র অনুনাদে, কে জেগে উঠেছিল স্বতঃ
শোষণ-শাসন নাশন-ব্রতে।
আর্তির ডমরু বাজায়ে উন্নত করি শির, কোন্ সে বীর
রুদ্র-বীণায় দিল টঙ্কার?
বাঙ্গাল বিদ্রোহ মহাভেরী, গর্জে উঠে প্রাণ উদ্দাম মুক্তির
মন্ত্রপূত প্রণব ঝঙ্কার।
শতাব্দীর আঁধার পুরীর চত্বর পাথরে, অক্ষয় অক্ষরে
কে লেখে যায় স্বাধীনতার চরম তত্ত্ব?
কে দিল ধূপ-আরতি নিতি নিতি, বিদ্রোহের দিব্য-বাসরে
গাথিল গাথা মাতৃপূজার কঠিন সত্য।
সে যে মোদের অখণ্ড ভারতের চিরযুগজীবী কবি
কাজী নজরুল ইসলাম
ভারত-জননীর বরপুত্র, সর্বমানব কল্যাণের প্রতিচ্ছবি।
তবে কেন আজ এ পরিণাম?
তব রুদ্র-বীণায় বেজেছিল যে শাশ্বত ভাস্বর প্রভাতি-সুরে
বিলাস প্রভুদের উদ্দাম প্রমাদে
প্রতিহত তার [illegible] রূপ। মর্মে মর্মে তাই কী ধিক্কারে বিভো
আজিও নির্বাক তুমি কিম্-বিষাদে।

তুমি যে বিক্রমের ভালে দীপ্ত-রাগ রবি, তুমি যে সবার কবি
নহ তুমি হিন্দু, নহ তুমি মুসলমান
তুমি সবার তরে আত্মহারা, মানুষের সেরা মূর্ত-ছবি
কথা কও, কথা কও, বাজাও বিষাণ।
তব বিদ্রোহ কাব্যকলি, সে যে অমৃত প্রাণের মাতৃপূজা অঞ্জলি
মুমূর্ষু জাতির জীবনের দিশারী
আঁধারের কোলে উষসী অরুণ, জয়ের ভালে দীপালী
সে যে ভারতীয় পাণি-স্পর্শ-পূত মঞ্জরী।
তবু বলি, হে সৃষ্টিধর কবি, আজিও মোর প্রাণের শাখায়
আশার মঞ্জরী হয় নাই মুকুলিত
নেতার বিষ-নিঃশ্বাসে পেয়েছি উদ্বাস্তু সন্তাপ। ভ্রাতৃ-রক্তধারায়
মাতৃভূমি পুনর্বার সিক্ত কলুষিত।
আজিও শাসন শোষণ নিষ্পেষণ চাকে, চৌদিকে পিষ্ট আর্তরব
ওদের শ্বাসে শ্বাসে জাগে স্বার্থের পীড়ন।
মা-বসুমতী কাঁদে ফুকারি, বক্ষে করি কঙ্কাল আর শায়িত শব
বল কবি, কোথা আজি ফেলিব চরণ?
আজি কে দেখাবে পথ? কে চালাবে রথ? এমন কুয়াশা রাতে
চক্রব্যূহ হতে কোথা পাব নির্গমের পথ?
কে ধরিবে ভৈরবী জীবন-বীণা সুস্থচিত্তে। আবার বৈশাখ প্রাতে
কোন সারথি ধরিবে হাত, পুরাবে মনোরথ!
হে ভারত-ভানু, বঙ্গ-কুল-রবি কবি! তব কাব্য প্রদীপ্ত-শিখা
আজি এ উন্মত্ত তাণ্ডব ঝঞ্ঝা-ঘোর নিশীথে
শুভাশীষ-কমলে আমাদের ভালে আঁকি দিক জ্যোতির্ময় টিকা
মূক-ম্লান ভারত জাগুক আলোক সঙ্গীতে।
আজি মথিয়া পরাণ, মথিয়া চিত্ত, মাতৃপূজা আরতি কালে
স্মরণে করিছে নৃত্য,—শুধু একটি নাম
স্বাধীনতা পথের তীর্থ-পথিক কাজী নজরুল ইসলাম।
অর্ঘ্য-রূপে
হে কবি,—দিনু তোমায়, করিনু প্রণাম।

গ্যারেজের ছাদ নিচু। মেঝের দাঁড়িয়ে হাত তুলে প্রায় ছাদ ছোঁওয়া যায়। এর ঠিক উপরের তলাটিতেও অনুরূপ নীচু ছাদ। সেখানে হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের স্থায়ী বাস। তার উপরের তলায় বোসেস ল্যাবরেটরীর প্যাকিং বিভাগ। রেল ও স্টীমারে মাল বাইরে যাওয়ার জন্য কাঠের বাক্সে প্যাক করা হয় সেখানে। থাকে থাকে খালি প্যাকিং বাক্স সাজানো। একদিকে খড়ের গাদা। দিনরাত মাল প্যাকিং-এর হাতুড়ি মারবার শব্দ শোনা যায়।

প্যাকিং বিভাগের আবার একটা আধতলা আছে, মাঝে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওঠা যায়। প্যাকিং বাক্স, ওষুধপত্রের বোতল প্রভৃতি সেখানে সাজানো।

তার উপরের তলায় একটি ইংরাজি পাক্ষিক পত্রিকা 'এ্যাডভার্টাইসিং-'এর অফিস। কম্পোজিং প্রেস এবং সম্পাদক ধীরেন মিত্র সপরিবারে বাস করেন সেখানে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে ঘরে সাংবাদিকতার চর্চা হয়, ছাপাখানায় কাজ চলে।

তার উপরের আর একতলায় প্রাকৃতিক চিকিৎসার একটি বিভাগ ছিল। এখন পারিবারিক বাসস্থান।

গ্যারেজ বাড়িটি দেখতে ছোট, কিন্তু কার্যত তাও একটি মালটি-স্টোরিড বিলডিং। ছয়তলার ছোট একটু বাড়ি যা পূর্বদিকের সুবৃহৎ বাড়িটির সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বাড়িটির যোগসত্র স্থাপন করেছে।

যে সিঁড়ি গ্যারেজ বাড়ির পশ্চিম পাশ দিয়ে উঠেছে তার তলায় তলায় ছোট্ট তিনটি খুপরিতে তিনটি বাসস্থান। কোন স্থানই ফাঁকা নেই। তিনতলা এবং চারতলায় ঘরগুলি পাশের ঘরের সমান উঁচু। উত্তর দিক দিয়ে সরু খোলা বারান্দাও পূব-পশ্চিমে যোগসূত্র রচনা করেছে।

এই চাকরমহলে হিন্দুস্থানী চাকর দরোয়ান ড্রাইভার প্রভৃতি কয়েক পুরুষ ধরে বাস করছে। এটা তাদের নির্বূঢ় স্বত্বে বসবাসের অধিকার—যেন কেউ লিখেপড়ে দিয়ে গেছে।

সঞ্জয়

এখানে একদা থাকতেন সহদেব সুকুল—ডাক্তার বোসের ব্যক্তিগত ড্রাইভার। নামটিও যেমন সহদেব, চেহারাতেও তেমনি একটি পৌরাণিক ছাপ। দীর্ঘ গড়ন, উন্নত সুশ্রী গৌরবর্ণ। গলায় একটি পরিষ্কার যজ্ঞোপবীত শোভা পেত।

সুকুলজী এই রাজ্যে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সাধু প্রকৃতি, সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁর ভাই ছেলে, ভাইপো, দেশের লোক কতজনই তাঁর আশ্রয়ে এই ভৃত্যমহলে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার গাড়ি চালাতে শিখে অন্য কোথাও কাজ নিয়ে চলে গেছে।

রোজ সকালে সুকুলজী যখন কানে পৈতে জড়িয়ে পিতলের ঘটিটি হাতে নিয়ে প্রাতঃকৃত্যে যেতেন তখন অন্য সব চাকর-দরোয়ান পথ ছেড়ে দিত। তারপর গঙ্গামাটি দিয়ে পিতলের ঘটিটি সযত্নে মেজে চকচকে করে নিয়ে কলতলায় স্নান সেরে গামছা পরে খড়ম পায়ে যখন সুকুলজী ফিরে আসতেন তখন তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধা হত।

দরোয়ানদের মধ্যে ছিল কুলদীপ তেওয়ারি। চল্লিশ বছরের উপরে কাজ করে বিদায় নিয়ে গেছে। গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবীর ধূসর বর্ণ তার পায়ে ধূলি-মলিন জুতা। কুলদীপের পৈতা থেকে ভারি একগোছা চাবি পাঞ্জাবীর তলায় ঝুলে বেরিয়ে পড়ত। কুলদীপেরও ভাই, ছেলে, ভাইপো অনেকে এখানে একত্রে থেকে মানুষ হয়ে গেছে।

দরোয়ান শিউধারী ও ভাই ভাইপো ছেলেদের নিয়ে বাস করেছে। শিউ-ধারীর ভাই শিউপ্রসাদ ডাক্তার বোসের হাতে-চালানো ট্যাবলেট তৈরীর যন্ত্র চালাতে শিখে ক্রমে সেই কাজে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। দুই ভাই একত্রে থাকে। দুই ভাইয়ের ছেলেই গ্রাজুয়েট হয়েছে—এই বাড়িতে থেকে।

দয়া মানে উড়ে চাকরটি ডাক্তার বোসের দোতলার বাসঘরের পাশে সিঁড়ির উপরে কাঠের পাটাতন করে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে একটি ছোট্ট খুপরি তৈরী করে সেখানে থাকত। সেখানেই ছিল তার রাজ্যপাট। ডাক্তার বোসের চাকরের কাজ করে সে দেশের বাড়িতে পাকা দালান,

• ধারাবাহিক উপন্যাস •
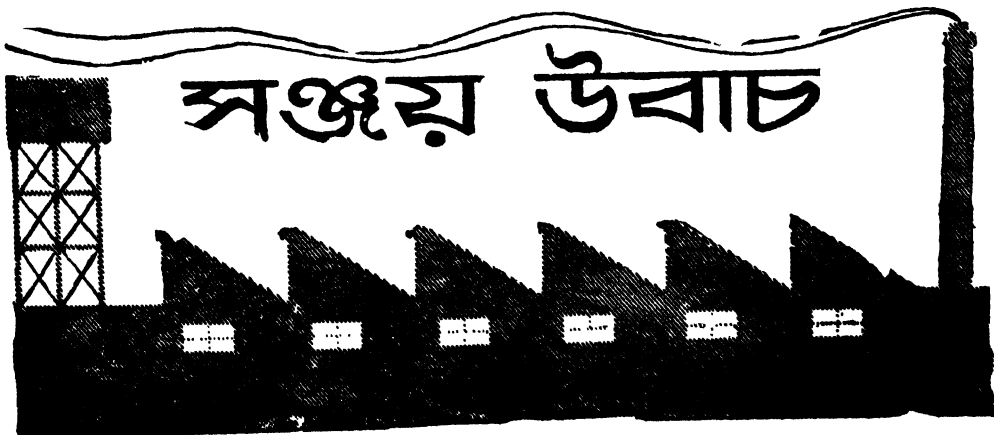
চাষের জমি অনেক কিছুই বিষয়-সম্পত্তি করেছিল। ডাক্তার বোসের সঙ্গে দয়াও বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ পাকানো কালো চেহারা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছিল। একটি বেনিয়ান গায়ে, কাঁধে একখানি ভিজা গামছা, হাতে কাচের গ্লাসে গরম জল ছোট্ট একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সে ডাক্তার বোসের ঘোড়ার গাড়ির শব্দ পেলেই ছুটে যেত তাঁকে ফকোরু জল খাওয়াতে। তিনি জল খেয়ে ভিজা গামছায় মুখ মুছে গামছা ফেরত দিলে দয়ার কাজ শেষ হত।

দয়ার বড় ছেলে একবার দুবার তিনবার চিঠি লিখে তাকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিল। দয়া চাকরি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশিদিন সে ডাক্তার বোসের সেবা করেছিল তাই এই পরিবারের উপর, বিশেষ করে ডাক্তার বোসের উপর গভীর ভাবে মায়া পড়ে গিয়েছিল। একবার ডাক্তার বোস কিছুকাল ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় দয়া নিজে গ্যাসের স্টোভে শুধু ডাক্তার বোসের জন্য আলাদা ভাত রান্না করে বাড়ির ভিতর থেকে মাছ তরকারি এনে খাওয়াতো। বয়সে কিছু ছোট ডাক্তার বোসকে সে 'তুমি' বলে কথা বলতে দেখেছি। রাশভারী ডাক্তার বোসের কাছে অনেকেই নিজে কোন আবেদন নিবেদন করে সহজে কাজ আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না ভেবে দয়ার শরণ নিত। দয়া সময় বুঝে ব্যাপারটা উপস্থাপিত করতে জানত এবং তার অনুরোধ পারতপক্ষে ডাক্তার বোস উপেক্ষা করতেন না। দয়াও কত দাবীর সুরে বলত—বোসো 'ডাক্তার'কে কউচি।—অর্থাৎ উপায় একটা হবেই হবে।

পুরোনো আমলের ঠকন ঠাকুর সারাজীবন এ বাড়ি কাজ করে গেছে। যজ্ঞের রান্না রাঁধতে হত তার। ভোর রাতে উনুনে আঁচ পড়ত—আর নিশুতি রাত পর্যন্ত জলত সে উনুন। এত যে খাটত তবু ঠকনের মুখে হাসিটুকু লেগেই থাকত। লোককে খাওয়াতে ভারি ভালোবাসত সে।

যাক্—চাকর দরোয়ানদের কথায় অনেকের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে সহিসদের কথা। হেড সহিস উচিত সারা জীবন এ বাড়িতেই আছে। বাড়ির একটি অংশে সহিসদের আড্ডা। বাড়ির ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বেখারু, তার ছেলে রাম। পূর্ণ, রামচরিত—কত জনের কথা বলব।

এদের কতজন যে দুই তিন পুরুষ ধরে এ বাড়িতে নিখরচায় বসবাস করছে কে তার হিসাব রাখে?

উত্তরের ছোট উঠোনটুকু পেরিয়ে আরও উত্তরে গেলে একটি বৃহৎ জলাধার। তার কাছে জলের পাম্প। পাম্প চললে জল উঠে যায় চারতলার ছাদে। সেখানকার বড় ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জল ছাপিয়ে ঝরঝর করে নিচে পড়তে থাকে। তখন হাঁকডাক শোনা যায়—মেসিন বন্ধ করো।

উত্তরে উঠোনেরও আরও উত্তরে কলতলা। একটি গঙ্গাজলের কল, একটি মিঠাজলের কল। বার মাস তিরিশ দিন সেখানে গঙ্গার ঘাটের ভিড় লেগেই আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সারা বাড়িতে কত লোক যে বাস করে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় এই কলতলায়। বোধ হয় সকলেই পরস্পরের নামও জানে না। বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী বিহারী উড়িয়া ছত্রিশ জাতির মেলা এই এক কলতলায়।

যে সিঁড়ি উত্তরের দিকের ফ্লাটে উঠেছে সেই সিঁড়ির পূবদিকের ঘরে নিচের তলায় চশমার কারখানা। অনেকগুলি বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রে কাচ কাটা ঘসা ও চশমার পাওয়ার তোলা হতে থাকে।

আরও পূবে একটি বৃহৎ গোশালা—অনেকগুলি গরু থাকে। গোশালার উপরে দোতলা তিনতলা চারতলা উঠে গেছে। দোতলায় আর একটি কম্পোজিং প্রেস।

পূবের দিকে টানা বড় বাড়ি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। নিচের তলার আধা-আধি জুড়ে বৃহৎ ছাপাখানা। এটিই ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ প্রেস—যেখান হতে স্বাস্থ্য সমাচার, হেলথ এ্যাণ্ড হ্যাপিনেস প্রভৃতি পত্রিকা বেরুত; বোসেস ল্যাবরেটরীর যাবতীয় ছাপার কাজ হত। ছাপাখানায় তিনটি ফ্লাট, একটি ট্রেডল মেসিন, দুটি লাইনো, কাটিং মেসিন, স্টিচিং মেসিন—মায় রোলার কাস্টিং, স্টিরিও ঢালাই—সব কিছুর ব্যবস্থা এখানেই ছিল।

কংক্রিট ঢালাই দেড়তলা জুড়ে বিস্তৃত কম্পোজিং বিভাগ। একতলার দক্ষিণাংশ জুড়ে বক্স মেকিং বিভাগ, তার যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং কার্ডবোর্ডের বড় গুদাম। বোসেস ল্যাবরেটরীর কার্টুন সব এ ঘরেই করা হত।

পূব দক্ষিণের দোতলায় আরও একটি হাফতলায় প্যাক করা ওষুধের স্টক থাকত। দোতলা জুড়ে বোসেস ল্যাবরে-টরীর বৃহৎ গুদাম, সেখানে ছাদ পর্যন্ত র‍্যাক, র‍্যাকভর্তি বোসেস ল্যাবরে-টরীতে তৈরী হাজার রকম ওষুধ শিশি বোতল কার্টুন ভরা। গুদামে দিনরাত আলো জলত। কত লোক কাজ করত।

ঐ অংশের তিনতলা চারতলা সবই পারিবারিক বাসস্থান। একসময় এর চারতলাতেও ল্যাবরেটরীর প্রসাধনী বিভাগের কাজ চলত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে এই পুরাতন বাড়িতে ডাঃ বোসের স্থান সংকুলান হচ্ছে না দেখে সেন্ট পলস কলেজের খেলার মাঠের ঠিক উত্তরে চারতলা নতুন বাড়ি করে ডাক্তার বোসের পরিবার নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ বোস স্থায়িভাবে পুরাতন বাড়ির দ্বিতলে অফিসের পাশের একটি ঘরে নিজ বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। নতুন বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বড় ঘরটি ডাক্তার বোসের ব্যবহারের জন্য বিশেষ-ভাবে নির্মিত হয়।

জীবনের শেষ তিনটি বছর সেই একতলার ঘরে বাস করে তিনি সেই ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডাক্তার বোসের বড় ছেলে পঞ্চানন

রোগ (সন্দেশ) মেরুদণ্ডের হাড়ে যক্ষ্মা হওয়ায় আজীবন শয্যাশায়ী থাকতে বাধ্য হন। তিনি কলকাতার গরম সহ্য হবে না বলে বছরে প্রায় নয় মাস শিলং-এর ডাউহীলের একটি বাড়িতে থাকতেন। যুদ্ধের সময় যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়ায় যাতে তিনি বারো মাস বাড়িতেই থাকতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে নতুন বাড়িতে তাঁর জন্য ছাদের একাংশ খোলা রাখা হয়। তাঁকে সকালে সন্ধ্যায় খোলা আকাশের তলায় চাকা দেওয়া খাটশুদ্ধ এনে শুইয়ে দেওয়া হত। সন্ধ্যার পরে ডাক্তার বোস সময়মত কিছুক্ষণ ছেলের কাছে গিয়ে বসতেন। দিনশেষে অন্তত একবার পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হত। দুজনেই দিকপাল, কিন্তু একজন বৃদ্ধবয়সেও সারা কলকাতা তোলপাড় করে বেড়াতেন—তখনও তাঁর কি কর্মোদ্যম, যেন একটি নররূপী বয়লার, এ হিউম্যান ডায়নামো। আর অপরজন সব জানেন, সব বোঝেন, সব বিষয়ে সন্ধান রাখেন। তবু তিনি নিশ্চল, শয্যাশায়ী, শান্ত, স্তিমিত, অতি ভদ্র, বিনয়ী এবং চারুভাষী। পিতাপুত্রে এক বিষয়ে মিল ছিল—মিল ছিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায়, চিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণায়। ডাক্তার বোসের বিখ্যাত মৌলিক গবেষণা—রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা বা সর্পগন্ধার সহায়তায় রক্তচাপ বৃদ্ধির চিকিৎসা—তাতেও পুত্র পঞ্চানন প্রভূতভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে ছিলেন।

॥ তেত্রিশ ॥

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস।

মুসলিম লিগ তখন বাংলার মসনদে আসীন। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে উস্কে উস্কে এমন এক পর্যায়ে তোলা হয়েছে, যাতে অচিরেই সেই বিস্ফোরণ প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হল, অনুষ্ঠিত হল—দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। কলকাতার সেই নারকীয় লীলার কথা স্মরণ করলে আজও ভয়ে চমকে উঠতে হয়। কলকাতার পথে পথে সে সময় কি বীভৎস দৃশ্যই দেখেছি।

কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান, ঠিক এক বছর পরে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেই ভারতবর্ষ তার বহু সাধনার ধন স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সে সময় আবার এই কলকাতার পথে পথে ধর্ম-দ্বন্দ্ব ভুলে সর্ব সম্প্রদায়ের কি স্বতঃস্ফূর্ত জয়োল্লাস উঠতে দেখেছি।

থাক্, যেদিনের কথা বলছিলাম। তলে তলে শাসক সম্প্রদায় যে কি ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার ষড়যন্ত্র করছিল বাইরে থেকে আমরা তা টের পাইনি। কৃষ্ণনগর থেকে ডাঃ বোসের সংবাদ এসেছিল, বেলেঘাটা এসিড কারখানার একজন পুরাতন কর্মচারী সেখানে গুরুতর অসুস্থ, তিনি যদি একবার তাঁকে দেখে আসেন। কোন চিকিৎসায় ফল হচ্ছে না।

১৯৪৬ সাল, ডাক্তার বোসের তখন ৭৩ বছর বয়স, কিন্তু তখনও তাঁর কর্মোদ্যম বিন্দুমাত্র কমে নি। কল্ পেয়ে রোগী দেখতে যান, তিনতলা চারতলায় স্বচ্ছন্দে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠেন। তবে কাজকর্ম ছেড়ে মফস্বলে রোগী দেখতে যেতে চাইতেন না।

কিন্তু এ তো টাকার জন্য রোগী দেখতে যাওয়া নয়, প্রাণের টান। প্রাক্তন কর্মচারী এক সময়ে যে এসিড ফ্যাক্টরীর জন্য কত পরিশ্রম করেছে আজ সে বিপদে পড়ে আমারই সাহায্য চাইছে, তাকে কি না দেখে পারা যায়?

এই বদান্যতা তাঁর সারা জীবনই ছিল। বোসেস ল্যাবরেটরীর ছোটবড় সব কর্মচারীকেই তিনি নিজে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন এমন কি ওষুধপত্রও বিনামূল্যে দিতেন। কর্মচারীরা কাজ করত লিমিটেড কোম্পানীতে অথচ তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হত স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স থেকে—যার মালিকানা ছিল তাঁর নিজের।

একবার এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক তাঁর বাড়িতে থেকে চিকিৎসিত হতে এলেন। বেশ অবস্থাপন্ন লোক, নিজের গাড়িতে এলেন। তাঁর পত্নীর কাপড়চোপড় গহনাগাটিতেও তাঁর আর্থিক স্বাচ্ছল্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। সহজেই তাঁরা যে-কোন নার্সিং হোমে গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু রোগীর ইচ্ছা, মাথা তো ডাক্তার বোসের হাতেই যেন মরি।

ডাক্তার বোস বললেন—মরবি বলেই কি আমার কাছে এয়েছিস। হয়েছে হার্টের ব্যামো। চুপচাপ শুয়ে থাক্, দুদিনেই সেরে যাবে। আমার কাছে নিয়ে এলাম, সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা আমি দেখতে পাব এইজন্যে।

অফিসের উপর তিনতলায় একখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হল, একজন চাকরকে ডেকে ভার দেওয়া হল তাদের দেখাশুনা করবার জন্য।

পরীক্ষিৎ মিস্ত্রি। তিনি 'পরীক্ষিৎ' বলে ডাকলে অতবড় মানী মানুষটিও কেমন তটস্থ হয়ে উঠতেন। কি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

আমার কাছে বলেছিলেন তাঁর আত্মকাহিনী। তিনি অল্পবয়সে ডাক্তার বোসের কাচের কারখানায় মিস্ত্রি হয়ে ঢুকেছিলেন। কালক্রমে সেই কারখানাটাই ডাঃ বোস তাঁকে চালাবার ভার দিয়ে চলে এসেছিলেন। তাই সেই সামান্য মিস্ত্রি একসময়ে সেই কারখানার মালিক হয়েছিলেন এবং ছোট কারখানাটি খেটেখুটে বড় করে তুলেছিলেন।

জীবনে প্রচুর অর্থ সম্মান যশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও ডাক্তার বোসের কাছে তিনি আগেকার মতই ছেলেমানুষটির মতই ব্যবহার করতেন, তেমনি আদর স্নেহ ও ভালবাসা পেতেন। তাঁদের সম্বন্ধও ছিল যেন পিতা-পুত্রের মত, তাই ডাঃ বোস নামধরে ডেকে তুই বলে কথা বললে তিনি কিছু মনে করা দূরে থাক, গভীর তৃপ্তি বোধ করতেন।

সে-যুগের মানুষগুলির কৃতজ্ঞতা বোধ কিছুতেই মুছতে চাইত না।

যাক্, যা বলছিলাম, কৃষ্ণনগরের অধিবাসী এসিড ফ্যাক্টরীর প্রাক্তন কর্মচারীটিকে চিকিৎসা করবার জন্য ডাঃ বোস যখন ভোরের ট্রেনে কৃষ্ণনগরে গেলেন তিনি কিছু জেনে গেলেন না সেদিন কি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটবার জন্য কলকাতা আতঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করছে। রোগী দেখে রাতের ট্রেনে যখন তিনি শিয়ালদহ ফিরে এলেন তখন যা ঘটবার

ঘটে গেছে। সারা কলকাতা শহর থমথম করছে।

স্টেশন থেকে বেরোবার উপায় নেই, কোলাপসিবল্ গেট বন্ধ। বাড়ি থেকে গাড়ি আসবার কথা ছিল ডাক্তার বোসকে স্টেশন থেকে নেওয়ার জন্য। উচিত কোচোয়ানের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। হ্যাকনিক্যারেজ স্ট্যাণ্ড শূন্য, খাঁ-খাঁ করছে।

ডাঃ বোস হতভম্ব হয়ে প্লাটফরমের একখানি বেঞ্চে বসে রইলেন। অনেক লোক স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে।

শেষ রাতে তিনি বেরিয়ে এলেন। হাতে ছোট চামড়ার একটি ব্যাগে স্টেথেসকোপ, ব্লাড প্রেসার দেখার যন্ত্র, গুটিকয়েক আশু প্রয়োজনের ইনজেকশান আর হাইপো ডারমিক সিরিঞ্জ। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে এধারে-ওধারে কতকগুলি মৃতদেহ পড়ে আছে, দেখে মনে হল, কিছুকাল এখানেও খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেছে। শেয়ালদা বলতে গেলে ডাক্তার বোসের নিজের পাড়া, এখানে ছেলে বুড়ো সবাই তাঁকে চেনে। বিশ বছর আগে আর একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি যেভাবে গুণ্ডার ছোরা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন সেকথাও মনে পড়ল তাঁর। সুতরাং পরিচিত কেউ অনর্থক তাঁকে খুন করে ফেলবে এ ভয় তাঁর মনে এলো না, তিনি ভাবলেন, হাঁটতে কষ্ট হলেও—এ পথটুকু শেষ রাতে পায়ে হেঁটে চলে যাওয়াই নিরাপদ।

সার্কুলার রোড আর হ্যারিসন রোডের মোড় পার হয়ে একটু এগুতেই আরও অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলেন এবং তখনও এদিকে ওদিকে বাড়ির রোয়াকে দু-চারজন লোক শুয়ে আছে। তাঁর জুতার শব্দে তাদের একজন উঠে বসে ছুটে এসেই তাঁর হাতের ছোট চামড়ার ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে পাশের গলির মধ্যে চলে গেল।

ডাক্তার বোস প্রমাদ গণলেন। অল্প দূরেই খান্না মোটরস্-এর পেট্রোল পাম্প। সেখানে গিয়ে তাদের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিয়ে ডাকতে লাগলেন—দরজা খোলো।

ভিতর থেকে তখুনি জবাব এলো—কে? কেউ যে ভিতরে আতঙ্কে ঘুমাতে পারছে না তাদের জবাবেই তা ডাক্তার বোস বুঝতে পারলেন।

তিনি নিজের পরিচয় দিতে খান্না মোটরস্-এর দরোয়ান তাঁকে দরোজা খুলে ভিতরে আশ্রয় দিল।

সেখান থেকে খবর পেয়ে মোটর ও চারজন দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার বোসের তৃতীয় পুত্র বর্তমানে এ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ সৌরাংশুকুমার বোস তাঁর বাবাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

ডাক্তার বোসের নিজমুখেই এই বিবরণ আমি শুনেছি, বার বার শুনেছি। শুনেছি, কিভাবে তাঁর বাসভবন আক্রান্ত হয়েছিল এবং বাড়ির ছাদের উপরে যে মেডিক্যাল মেস ছিল সেখানকার অধিবাসীরা ইট ছুঁড়ে বার বার সে আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। ডাক্তার বোসের বাড়ির বিপরীত দিকে চ্যাটার্জী বাড়ি ধনী জমিদার এবং অনেক কৃতী সন্তানের বাস। সিনেমার যন্ত্রপাতি তৈরীর কারবারও আছে তাঁদের। চ্যাটার্জী বাড়ির উপর থেকে ফ্লাড লাইট জেলে ডাক্তার বোসের বাড়ির গেট আলোকিত করা হয়েছিল এবং লোহার গেটের উপর মাকিন সৈন্য বিভাগে ব্যবহৃত শক্ত ইস্পাতে তৈরী ওয়েল্ড্ করা শিকের ফ্রেম উঁচু করে বাঁধা ছিল—যাতে গেট টপকে সহজে কেউ বাড়ির মধ্যে চলে আসতে না পারে।

বাজার-হাট বন্ধ। আর ৪৫ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে ঠাকুর চাকর, দরোয়ান, কোচোয়ান, সহিস, ড্রাইভার, মেসের বাসিন্দা দুচার ঘর ভাড়াটিয়া সব মিলিয়ে সাড়ে তিনশ-চারশ লোক আশ্রয় নিয়েছে। ব্যূহের মত সেই বাড়ির মধ্যে ফিরে এলেন গৃহস্বামী ডাঃ বোস।

ডাঃ বোসের ল্যাবরেটরীর প্রচার অধিকর্তা ছিলেন সাহিত্যিক সন্তোষকুমার দে। সপরিবারে এই বাড়ির একাংশে বাস করতেন। কোম্পানীর কাজে সন্তোষবাবু তখন বোম্বাই ছিলেন। তাঁর স্ত্রী গিয়ে ডাঃ বোসকে জানালেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপন্ন বোধ করছেন, সন্তোষবাবুর কাকা থাকতেন বেলগাছিয়ায়—তিনি সেখানে চলে যাচ্ছেন।

ডাঃ বোস বাধা দিলেন। এতগুলি লোক যেখানে আশ্রয় পেয়েছে সেখানকার আশ্রয় ছেড়ে তুমি এই বিপদের মধ্যে পথে বেরিও না। হাটবাজার বন্ধ, আমার ঘরে যে চাল আর ডাল আছে তাই সবাই ভাগ করে নেবে তুমিও নেবে।

সন্তোষবাবুর স্ত্রী তাঁর শিশু পুত্র কন্যার হাত ধরে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

ডাঃ বোসের বাড়ি থেকে চাল এলো, ডাল এলো। পর পর কয়েকদিন বাজার বন্ধ থাকায় তরকারি মাছ জুটলো না কারো।

এই দাঙ্গার সময়ে কলেজ স্ট্রীটের বাজার বসত না বলে বাজার বসত সিটি কলেজের দক্ষিণে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে, কলেজ রো-তে। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের একটি বাড়ির রোয়াকে তারই একটি আলু এবং তরকারির দোকান আজও টিঁকে আছে।

বাঙালী হিন্দুস্থানী ছেলেবুড়ো মিশিয়ে কয়েক শত লোককে আশ্রয় দিতে পারায় ডাক্তার বোস তাঁর ছেলেদের খুব প্রশংসা করেছিলেন, বলেছিলেন—মানুষই লক্ষ্মী। মানুষের রূপ নিয়েই ভগবান আমাদের সেবা গ্রহণ করেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

ছোটদের আসর

সাপের কথা

সাপ-নামটি সত্যিই ভয়ঙ্কর—নয় কি?

তবুও তোমাদের সাপের কথাই বলি—শোন—

সাপের কোন কান নেই, ওরা চোখ দিয়ে শোনে, তাই ওদের আর-এক নাম চক্ষুঃশ্রবাঃ। সাপ অনেক সময় বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে তাই ওদের আর এক নাম বায়ুভুক্। সাপের আরও নাম আছে যথা পন্নগ ও গূঢ়পাদ।

মাছের মত সাপের গায়ে একপ্রকার আঁশ আছে। নানান রঙের সাপ তোমরা দেখে থাক, আসলে ও রঙ সাপের আঁশের রঙ।

সাপের দৃষ্টি খুব প্রখর। ওরা মাছের মত চেয়ে ঘুমায়। শীতকালে সাপ তোমরা দেখতে পাও না—শীতে ওরা ঘুমায়। সর্পতত্ত্ববিদরা বলেন—সাপ খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না।

সাপের পা নেই—তাই ওরা দেহের ওপর ভর করে চলে, সেই কারণে ওদের সরীসৃপ পর্যায়ে ফেলা হয়।

নানান আলোচনা থেকে জানা যায়—পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের আগেই নাকি সরীসৃপরা এসেছিল।

সাপের ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ ফুসফুস থেকে বের হয়। ওদের ফুসফুসে দু'টি কোষ আছে—বাঁদিকের কোষে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হয়। সাপ মাংসাশী জীব। মজার কথা কি জান—।

সাপ দাঁত থাকা সত্ত্বেও খাবার গিলে খায়।

পৃথিবীর সব দেশেই সাপ দেখা যায়, কেবল—তুন্দ্রা অঞ্চল, নিউজিল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে সাপ নেই।

সর্পতত্ত্ববিদরা বলেন সাপ প্রায় কুড়ি বছর বাঁচে। তাঁরা আরও বলেন—পৃথিবীতে প্রায় আড়াই হাজার রকমের সাপ আছে—তবে বেশীর ভাগ সাপই উষ্ণ আবহাওয়া এলাকায় ও আর্দ্র অঞ্চলে বাস করে। ভারতে নাকি দু'শো ষোলো রকমের সাপ দেখতে পাওয়া যায়, ওদের মধ্যে বাহান্ন রকমের বিষাক্ত সাপ আছে বলে জানা যায়।

সাপুড়ে তোমরা দেখেছ—সাপ খেলানো যাদের পেশা—নয় কি? সাপুড়ের কাঁধে বাঁক থাকে, তাতে কয়েকটি চুবড়ি থাকে। ঐ চুবড়িতে সাপ থাকে—নানান রকমের বিষাক্ত সাপ। সাপুড়ে পেটফোলা বাঁশী বাজিয়ে সাপগুলোকে চুবড়ি থেকে বের করে। জানুও নাড়ে ঐ সময়ে—হাত ও নাড়ে অনেক সময়। সাপুড়ে যে বাঁশী বাজায়, তা একটু উঁচুতে, মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

সর্পতত্ত্ববিদরা বলেন, সাপ বাঁশী বাজানোর শব্দ শুনতে পায় না, শব্দ বায়ুতরঙ্গে মিশে অন্যত্র চলে যায়।

সাপ খেলাবার কালে জানু নাড়ার ও হাত নাড়ার নানান কায়দা-কানুন আছে। ওঁরা আরও বলেন—ভূমিচালিত শব্দে ওরা সচেতন, বায়ুচালিত শব্দে ওরা বধির।

জলচর ও স্থলচর দুই প্রকার সাপ

শ্রীনিরঞ্জন সেন

হাসি — চিত্র : দেবু দাস

ন.চক্রবর্তী — চিত্র : অনিলকুমার ভট্টাচার্য

আছে। মানুষের মত সাপেরও জল চাই। জলচর সাপের ফুসফুস স্থলচর সাপের ফুসফুসের চেয়েও বড়।

জানা যায়—সাপের মেরুদণ্ডে চার শত হাড় আছে।

সর্পতত্ত্ববিদরা বলেন—সাপের দাঁত যতবার ভাঙ্গবে ততবারই নতুন দাঁত বার হবে। সাপের ছ'সারি দাঁত আছে। ওপরে চার সারি ও নীচে দু'সারি। বিষ-দাঁতের পিছনে ছোট ছোট বিষদাঁতও থাকে। বড় বিষদাঁত ভেঙ্গে গেলে ছোট বিষদাঁত কাজ করে।

সাপের খোলস তোমরা দেখেছ! দেড়-দু'মাস অন্তর ওরা খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়ার সময় ওরা দেখতে পায় না। সাপ নিয়ে বহু পূজা-প্রথার প্রচলন আমাদের দেশে আছে। অতী-তের বহু স্থাপত্য-শিল্পে সাপের ছবি দেখা যায়।

সাপ দু'রকমের যথা বিষধর আর বিষহীন।

কতকগুলি সাপের বিষয় বলছি, শোন—

গোখরো—ওকে গোমা সাপ বলে থাকে। ওর ফণাটি বেশ বড়। বিষ বেশ জোরালো।

কেউটে সাপের বিষ গোখরোর চেয়েও বেশী।

গোখরো ও কেউটে সাপকে বলে কুলীন।

শঙ্খচূড় সাপকে বলে সাপের রাজা—এত বিষধর সাপ আর নেই, আর বিষধর সাপের মধ্যে আকারে শঙ্খচূড়ই সবচেয়ে বড়। তবে এ সাপ লোকালয়ে বড় একটা আসে না।

শঙ্খচূড়ের অন্য নাম—নাগরাজ অহিরাজ, রাজ গোখরো। অন্য সব বিষধর সাপ শঙ্খচূড়ের প্রিয় খাদ্য।

[illegible] আর কালনাগ ও ধুমনাচিতি। ঘুমন্ত মানুষকে বেশী কামড়ায়, তবে ফণা নেই। কালাচ সাপের আর এক নাম শেখর চাঁদা—।

বহু স্থানে কালাচ সাপকে ডোমনা-চিতিও বলে। অনেকে বলে, ধুমনাচিতি থেকে ডোমনাচিতি কথাটি এসেছে।

শাঁখামুটি সাপ বেশ নিরীহ—এ সাপ খুব কম কামড়ায়। ওর আর এক নাম শঙ্খিনী।

চন্দ্রবোড়া সাপ খুবই আস্তে আস্তে চলে এবং কামড়ায় খুব কম। চন্দ্রবোড়া ডিম পাড়ে না, বাচ্ছা দেয়।

বঙ্করাজ সাপ খুব ছোট, তবে সামান্য কারণে রেগে যায়। বঙ্করাজ চন্দ্রবোড়ার মতঃ, ডিম পাড়ে না, বাচ্চা দেয়। বঙ্ক-রাজের আর এক নাম ফুর্সা।

গেছো-বোড়ার বিষ খুব কম। সর্প-তত্ত্ববিদরা বলেন—গেছো-বোড়ার বিষে মানুষ মরে না। তবে ভাল করে বিষ চালাতে পারলে মানুষ মরে যায়। ওরাও ডিম পাড়ে না, বাচ্ছা দেয়।

লাউডগা সাপ তোমরা দেখেছ হয়তো—লাউগাছের মত রঙ। লাউগাছেই বেশী থাকে, তবে বিষ খুবই কম। ওদের বিষদাঁত পিছনে থাকে বলে জানা গেছে। নারকেল আর তালগাছেও ওরা থাকে।

র‍্যাটল সাপের নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। ইংরাজীতে ওদের Lightning Strikers বলে—জানা যায়। ওদের ফণা নেই, তবে বিষ আছে। ওরা ডিম পাড়ে না। বাচ্চা দেয়।

জানা গেছে, পূর্ব আমেরিকায় সাধারণ র‍্যাটল সাপ দেখা যায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় হীরক সাপ দেখা যায়।

সর্পতত্ত্ববিদরা বলেন—পৃথিবীর সব বিষাক্ত সাপের মধ্যে র‍্যাটল সাপই সব চেয়ে মোটা। ওরা একটু জলো জায়গায় থাকতে ভালবাসে।

মনিয়ার—ওর ইংরাজী নাম দিকমন ক্র্যাইট। তবে ভিন্ন ভাষায় ওর ভিন্ন নামও আছে। মনিয়ার নামটি মারাঠী।

ময়াল সাপ খুব বড় এবং তেমনি মোটা, ওর ওজন একমণেরও বেশী। ওর আর এক নাম অজগর।

এ সাপ সম্বন্ধে নানান গবেষণার পরে সর্পতত্ত্ববিদরা মত প্রকাশ করেছেন যে, ময়াল সাপ অনেক সময় ডিমে তা দেয়। ময়াল সাপের আর এক নাম বরাচিতি।

বেলে সাপ-এর নাম তোমরা শুনে থাকবে। সাপুড়েরা বলে থাকে ওদের বিষ আছে। আরও বলে—ওদের দু'টো মুখ আছে। এক মুখে ছ'মাস খায় আর-এক মুখে ছ'মাস খায়। (এ-বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে)। ঘরচিতি সাপের অন্য নাম ঘরমণি, চালবাউনি। ওদের বিষ আছে।

দুঁয়ে নামে এক প্রকার সাপ আছে। ওদেরও দু'টো মুখ আছে।

সাপ মানুষের প্রাণ হরণ করে সত্য। কিন্তু উপকার করে নানানভাবে। সাপের বিষ থেকে দুরারোগ্য রোগের ওষুধ তৈরী হয়।

হোমিওপ্যাথিমতে গোখুরা সাপের বিষ থেকে হৃৎপিণ্ডের কঠিন রোগের ওষুধ তৈরী হয়।

ল্যাকেসিস ওষুধের নাম তোমরা শুনে থাকবে হয়তো। সাপের বিষের চাহিদা খুব বেশী।

আহার্য হিসাবেও সাপ ব্যবহৃত হয়। জানা গেছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'চিন্ডুইন' অভিযাত্রী-দল ময়াল সাপের ঝোল খেয়ে থাকতো।

চীন ও বর্মায় ময়াল সাপ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নেফা এলাকায় সাপ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে। সাপের চামড়া নানান প্রয়োজনে লাগে ও বিক্রী হয়।

সাপ যদিও মানুষের প্রাণ হরণ করে, আবার বাঁচায়ও সহায়তা করে ---।

ছোটদের ফটো

রথীন রায়

ছোট ছেলেমেয়েদের ফটো প্রায় প্রতি পরিবারের এ্যালবামেই দেখা যায়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই হয় নিষ্প্রাণ, অতি সাধারণ ফটো।

এই জাতীয় ফটোতে যদি কোন অন্তর্নিহিত কাহিনী বা বিশেষ কোন ঘটনা বা অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তবে তাহা প্রাণবন্ত, সার্থক ও দৃষ্টি-আকর্ষণকারী হয় একটু সতর্কতার সঙ্গে যত্ন করিয়া সহজেই এই জাতীয় বহু চিত্তাকর্ষক ফটো তোলা সম্ভব।

ছোটদের জোর করিয়া বিশেষ কোন ভঙ্গিতে 'পোজ' দিয়া ফটো তোলা সব সময়ে সম্ভব নয়, এবং উচিতও নয়। কারণ, তাহাতে ফটো খুবই নিষ্প্রাণ মনে হইবে। স্বাভাবিক পরিবেশেই ছোটদের ভাল দেখায়, সুতরাং স্বাভাবিক পরিবেশেই ছোটদের ফটো তোলা উচিত। তাহাদের প্রিয় খেলার সামগ্রী বা স্বাভাবিক অন্য কোন জিনিষ দিয়া তাহাদের ব্যস্ত রাখিয়া ফটো তুলিলে তাহা খুবই সুন্দর দেখায়।

এই জাতীয় ফটো তুলিতে হইলে সব সময়ে ধৈর্য ধরিতে ও প্রস্তুত থাকিতে হয়। কখন যে কোন্ সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইবে—তাহা পূর্ব হইতেই বলা কঠিন। সুতরাং ফটো তোলার স্থান, আলোকব্যবস্থা ক্যামেরায় স্পষ্টতা, এক্সপোজার ইত্যাদি পূর্ব হইতেই যথাসম্ভব ঠিক করিয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে, যাহার ফটো তোলা হইবে, তাহার প্রতিটি ভঙ্গি ও অভিব্যক্তির উপর লক্ষ্য রাখা যাইবে এবং বহু সুন্দর ফটো তোলা সম্ভব হইবে

ছোটদের ফটো অধিকাংশ সময়েই খুব নিকট হইতে পুরো নেগেটিভ ভর্তি করিয়া তুলিতে হয়। তখন ফটোর স্পষ্টতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যে-সব ক্যামেরায় এত নিকট হইতে স্পষ্ট ফটো তোলা সম্ভব হয় না, তাহাদের সঙ্গে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লোজ-আপ-লেন্সের সাহায্য লওয়া উচিত। সাধারণ বক্স ক্যামেরায় পাঁচ ফিটের মধ্যে ফটো তুলিলে এই অতিরিক্ত লেন্সের সাহায্য লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে অনেক সময়ে ছোটদের ফটো তোলা হয়, তখন দূর হইতে ফটো তোলা হয় বলিয়া এই অতিরিক্ত লেন্সের প্রয়োজন হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ফটোর যে অংশই অস্পষ্ট হক না কেন, চোখ যেন অস্পষ্ট না হয়, কারণ চোখের মাধ্যমেই মনের ভাব প্রকাশ পায়, এবং ছোটদের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ছোটদের স্বাভাবিক উচ্চতা হইতে ক্যামেরা সমান্তরালভাবে ধরিয়া ফটো তুলিলে ফটো সুন্দর দেখায়। অবশ্য বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ ক্যামেরা উপর হইতে নিচ

স্বাভাবিক পরিবেশে ছোটদের ভাল দেখায়

দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া বা নিচু হইতে উপর দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া ফটো তোলা যাইতে পারে।

ঘরের ভিতরে এই জাতীয় ফটোর জন্য মসৃণ দেয়াল, জানালা বা পরদা ইত্যাদিকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে। বাহিরের স্বাভাবিক পটভূমিতে ফটো তুলিলে ক্যামেরায় যথাসম্ভব বড় 'লেন্সছিদ্রপথ' ব্যবহার করিয়া পটভূমি অস্পষ্ট রাখা উচিত। ছোটরা স্বভাবতই চঞ্চল। ঘুমন্ত অবস্থা ছাড়া অন্য যে-কোন সময়ে তাহাদের ফটো তুলিতে হইলে ক্যামেরায় দ্রুত-গতিসম্পন্ন শাটার যথা ১/১৫০ সেকেণ্ড বা তাহারও বেশী দ্রুত শাটারে ফটো তোলা উচিত। নতুবা, বিষয়বস্তু স্থির না থাকিলে ফটো অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

কৃত্রিম আলোর এই জাতীয় ফটো তুলিতে এক বা একাধিক আলো ব্যবহার করা চলিতে পারে। মূল অংশগুলি আলোকিত করার জন্য একটি চড়া আলো, গাঢ় ছায়া ঢাকা অংশগুলি আলোকিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত [illegible] এবং পা- [illegible] করার জন্য [illegible] একটি আলো ব্যবহার করা চলিতে পারে। 'ফ্লাশ বাল্বে' এই জাতীয় ফটো তুলিতে 'ফ্ল্যাশগান' সোজাসুজি বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য করিয়া না ধরিয়া কোন নিকটবর্তী দেয়াল ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া তাহার প্রতিফলিত আলোকে ফটো তুলিলে ফটো খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়।

খেলার জিনিষ দিয়ে ব্যস্ত রাখিয়া ফটো তোলা হইয়াছে

মোটকথা, স্বাভাবিক পরিবেশে ছোটদের স্বাভাবিক ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি এবং আলোকচিত্রশিল্পীর ধৈর্য ও সদাপ্রস্তুতি ইত্যাদির সংমিশ্রণ হইতেছে ছোটদের সুন্দর, প্রাণবন্ত ফটো তোলায় সার্থকতার মূলমন্ত্র।

রচনাটির সঙ্গে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমঙ্গলকান্তি বসু

জন্ম - মৃত্যু নিয়ে কি বিচিত্র খেলাই না হয় এই পৃথিবীতে। আমাদের দেশের এক বিচিত্র ঘটনার কথা বলছি।

১৮০৮ খৃস্টাব্দ। উড়িষ্যার যাজপুর গ্রাম। যাজপুরের শ্মশানে একদিন খাটিয়ায় করে নিয়ে আসা হল সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের এক তরুণ যুবকের মৃতদেহ। শোকার্ত আত্মীয়-পরিজনরা সৎকারের আয়োজন করতে লাগলেন। সাজানো হলো চিতা। একটু পরেই মৃতদেহ চিতায় তোলা হবে।

থমথমে আবহাওয়া - আত্মীয়-স্বজনদের বেদনায় আকাশ - বাতাসও যেন বিষাদমন্থর।

বাঁধন খুলে মৃতদেহকে স্নান করান হল—এখনই চিতায় তুলে অগ্নি-সংযোগ করতে হবে। আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে নশ্বর দেহ।---

সব কিছু প্রস্তুত। সহসা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এক জটাজূট-ধারী সন্ন্যাসী। মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—'ওরে—তোরা করছিস কি? জ্যান্ত মানুষকে চিতায় তুলছিস?'

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সকলে অবাক। কেউ কেউ বিদ্রূপের ভঙ্গীতেও তাকাল জটাধারীর দিকে। সন্ন্যাসী কোনদিকে দৃকপাত না করে তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন মৃতদেহের ওপর। তারপর যুবকের বুকে হাত বুলাতে বুলাতে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে যুবক চোখ মেলে তাকালো—কিছুক্ষণ পরে উঠে বসল সুস্থ মানুষের মত!

যে শ্মশানের আবহাওয়া কিছুক্ষণ আগেও ছিল বেদনায় থমথমে—তা মুহূর্তেই ভরে উঠলো আনন্দ-কোলাহলে।

নূতন জীবন লাভ করে যুবক সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'আমাকে দীক্ষা দিন, আজীবন আমি আপনার সেবা করব।'

সন্ন্যাসী বললেন,—'না, তোমার সন্ন্যাসী হলে চলবে না। তোমার এক পুত্র হবে, সে পুত্র তোমার বংশকে উজ্জ্বল করবে, দেশকে ধন্য করবে।'

সন্ন্যাসীর বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। এই যুবক হচ্ছেন—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি পরবর্তী-কালে হয়েছিলেন বাংলার দিকপাল সাহিত্যিক—অপরাজেয় সাহিত্য-সম্রাট। এঁরই অমর সৃষ্টি আজ আমরা রেডিও মারফৎ সর্বপ্রথমে সকালে শুনতে পাই।

ইনিই বাংলা মায়ের সর্বপ্রথম স্নাতক সন্তান ও 'বন্দেমাতরম্' মাতৃমন্ত্র প্রণেতা—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্—
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

যে কোন মুহূর্তে

পাড়ার মেয়েরা খেলতে নেমেছে মাঠে, সারাদিন ডিউটি দিয়ে পশ্চিমাকাশে লে পড়েছে সূর্যদেব। এখন তার তেজ য়েছে কমে। সূর্যদেব এখন বড় বড় চগুলির আড়ালে পড়ে গিয়েছে। বল তার শেষ রশ্মি ছড়িয়ে রয়েছে শ্চিমাকাশে। খেলাধূলার পক্ষে এই য়টা সত্যিই ভারি সুন্দর।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠে বেরিয়েছে খেলবে বলে। যারা স্কুলে পড়ে তারা স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর এসেছে খেলতে। আবার যারা খুব ছোট তারা এসেছে আয়ার সঙ্গে। নানারকম সাজে সজ্জিত হয়ে ছেলেমেয়েরা মিলিত হয়েছে এক জায়গায়। যেন নানারকমের ফুল ফুটে রয়েছে মাঠে। কারুর মাথায় প্লাস্টিকের ফুল, কারুর বা নাইলনের ফিতে দিয়ে হর্স-টেলের মত করে চুল বাঁধা।

হঠাৎ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। সবাই বেশ সতর্ক হয়ে ওঠে। তারা একসঙ্গে বলে ওঠে, ওরে পুল্টু আসছে রে—সবাই সাবধান।

গীতা, মালা, মিতা প্রভৃতি অনেক মেয়ে সাবধান হয়ে যায়, কিন্তু নমিতা গোঁ ধরে বলে উঠলো, কেন পালাবো? তোরাও যেমন ভীতু—পুল্টুও তো হাত-পা-ওলা একটা মেয়ে আমাদের মত, তাকে আবার এতে ভয় কেন শুনি?

নমিতা এ পাড়ায় নতুন এসেছে, পুল্টুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না।

পুল্টু মাঠে এসে কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে নমিতার গালে দিলো এক চড় কষিয়ে। সবাই চেঁচামেচি করে উঠল, পুল্টু নমিতাকে মেরেছে—পুল্টু মেরেছে নমিতাকে। এমন সময় দৌড়ে এসে যদু পুল্টুর হাতটা ধরে ফেলে।

পুল্টুর বাড়ীর কাছেই মাঠটা। মেয়ের গুণের কথা জানেন বলে পুল্টুর মা সর্বদা মেয়েকে চোখে চোখে রাখেন। কখন যে কোথায় কি করে আসবে। কোনো সময়ে একলা বাইরে ছাড়েন না মেয়েকে। পুল্টুকে সর্বদা দেখা-শুনা করবার জন্য যদুকে রাখা হয়েছে। যেখানে পুল্টু যাবে সেখানে যদুও যাবে। আজকে পুল্টু কাউকে না জানিয়ে একলাই বেরিয়ে পড়েছিল মাঠে।

শ্রীমতী রেবা দত্তরায়

যদু পুল্টুর হাতটা ধরে ফেলতে অন্যান্য সব ছেলে মেয়েরা পুল্টুকে ঘিরে ধরে বলতে থাকে, কেন মেরেছিস নমিতাকে? শীগগির বল? আগে পুল্টুর কাছে আসবার সাহস হচ্ছিল না কারুর, এখন যদু পুল্টুর হাতটা ধরে আছে বলে কাছে এগিয়ে আছে সবাই।

নমিতার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ছলছল করছে চোখদুটি। আর কিছুটা লজ্জাও পেয়েছে বন্ধুদের কাছে। কত বড় মুখ করে কিছুক্ষণ আগে সবাইকে উপদেশ দিচ্ছিল, আর তারই হলো কি না এই দশা। নমিতা মুখ তুলে তাকাতে পারে না কোনো বন্ধুর দিকে।

বন্ধুরা কিন্তু খুব ভাল। তারা এই নবাগত বন্ধুটির জন্যে খুব দুঃখিত। বেচারা কি না, বিনা দোষে মার খেলো! তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না এটা। গীতা বলে ওঠে, চলরে আমরা সবাই পুল্টুর মাকে গিয়ে বলে দিই গে, কেন পুল্টু আমাদের নমিতার গালে চড় মেরেছে।

দুর্যোধিনী — চিত্র : বৈদ্যনাথ ভড়

যদু দেখল মহা বিপদ। সে তখন মনে মনে একটা উপায় ঠিক করতে লাগল---কি করলে এদের থামানো যায়। মার কাছে যদি এরা গিয়ে বলে দেয়, তাহলে তো উল্টে সেই বকুনি খাবে মা'র কাছে। তাই যদু বলে, তোমরা কি করতে যাবে মা'র কাছে—আমিই মাকে বলে দেবোখ'ন।

—না না আমরা নিশ্চয়ই যাবো পুল্টুর মা'র কাছে, তুমি যতই না বলো, মিতা হাত নেড়ে বলে ওঠে।

—কি যে বলো, আমি আবার বলবো না---

—না-বাবা—তোমায় কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। মালা চোখ নাচিয়ে বলে ওঠে।

আচ্ছা, আচ্ছা---এখন চলো দেখি তোমরা, বাদামভাজা খাওয়াবো সকলকে, যদু কথাটা ঘুরিয়ে দেয়।

বাদাম ভাজা খাওয়ার কথা শুনে ছেলে-মেয়েরা সব কিছু ভুলে যায়, মনটা নরম হয়ে যায় তাদের। যদুও বেঁচে যায় বকুনির হাত থেকে।

এই পুল্টু কিন্তু এমন ছিল না। পুল্টু মা-বাবার কত আদরের মেয়ে। বয়স তার নয়-এর বেশী নয়। তবে গড়নটা একটু বাড়ন্ত। দেখলে মনে হবে দশ-এগারো। রংটা তার গোলাপী ফর্সা। ঠোঁট দুটি দেখলে মনে হবে বুঝি ওতে লিপস্টিক লাগানো। চোখ-দুটি খুব টানাটানা না হলেও বেমানান নয়। স্বাস্থ্যটিও বেশ ভাল। মাথায় ঘন চুল ঘাড় পর্যন্ত ববছাঁট করা।

সত্যিই ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, এমন সুন্দর মিষ্টি মেয়ে কেমন করে এমন রূঢ় স্বভাবের হলো। একেই বলে ভগবানের মার। না হলে যে-মেয়েকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে, তার কাছে বড় একটা কেউ যেতে চায় না। কারণ অবশ্য একটা ছিল।

পুল্টুর বয়স তখন সাত বছর হবে। তিন-চারদিন ধরে পুল্টুর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। অল্প অল্প জ্বর হচ্ছিল। বাড়ীর লোক ভেবেছিল, কি আর হয়েছে এমন, ও ভাল হয়ে

বাহিরপানে চিত্র : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

যাবে। কিন্তু অনেক সময় মানুষ যা ভাবে তা হয় না। পুল্টুর বাবা-মা প্রথমে অত গ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু যখন সাবধান হলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, ম্যানেঞ্জাইটিস্। অনেকে এ রোগে মারাও যায়। তবে পুল্টু ভাল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটা দোষ তার হয়েছিল, সেটি হচ্ছে হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া। তখন হাতের কাছে যাকে পাবে তাকেই মারধোর করবে। আর ডাক্তারবাবুর চোখে চশমা ছিল বলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক চশমার উপর পুল্টুর দারুণ রাগ।

এই তো সেদিন পুল্টুরা এক বিয়ে বাড়ীতে গিয়েছিল। পুল্টু সেখানে কত লোককে মেরেছে আর কামড়েছে তার ঠিক হিসেব নেই।

পুল্টুকে দেখলে কেউ বলবে না, ওর স্বভাব এ রকম। বেশ ভাল মানুষটির মত সে কারুর কাছে দাঁড়িয়ে আছে, দৈবাৎ যদি সেই লোকটি তাকে আদর করে তাহলে পুল্টু হয় তার হাতটা কামড়ে দেবে, আচমকা বা তার গালে এক চড় কষিয়ে দেবে। সে বেচারা তখন হতভম্ব হয়ে যায়।

তবে যারা পুল্টুকে চেনে তারা ওর কার্যকলাপ দেখে বিশেষ কিছু বলতে পারে না, বরং দুঃখ পায় পুল্টুর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। পুল্টু নিজেও জানে না ও কখন কি অন্যায়

[?]ড় করে ফেলবে। এখন ওর মা [যখন] বকেন তখন ও বলবে, কৈ আমি [তো] কিছু করিনি।

যখন মেজাজ ভাল থাকে তখন পুল্টু মাঝে মাঝে ওর ঠাকুমাকে পাউডার মাখিয়ে দেবে। সরু চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে দেবে। আপত্তি করা সত্ত্বেও পুল্টু কাজল পরিয়ে দেবে ঠাকুমার চোখে। ঠাকুমা পুল্টুকে চেনেন তাই তার কাজে বাধা দেন না, পুল্টু যাতে আনন্দ পায় সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি।

আজকাল পুল্টু মাঠে আর একলা খেলতে যায় না। সঙ্গে যদু থাকে। নমিতার সঙ্গে পুল্টুর আর ঝগড়া নেই। সেদিন বাদামভাজা খাওয়ার পর আর রাগ নেই নমিতার। সবাই পুল্টুর সঙ্গে খেলা করে বটে তবে সাবধান হয়ে সব সময়।

সেদিন পার্কে একটা বেঞ্চিতে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, চোখে তাঁর চশমা ছিল। তাই দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে পুল্টুর মনটা। যদু অবশ্য পুল্টুর হাতটা ধরেই ছিল। পুল্টু আপন মনে বলে ওঠে, চশমা পরেছে লোকটা—ওকে খুলতে বলো।

যদু মনে মনে প্রমাদ গণে। তাই আমতা আমতা করে ভদ্রলোকটিকে বলে, দেখুন বাবু যদি আপনি চশমাটা খুলে রাখেন দয়া করে—

তার মানে? চশমা খুলতে যাবো কেন? ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক।

আপনি জানেন না বাবু, এই ছেলেটি চশমা দেখলে দারুণ ক্ষেপে যায় কি না—তাই বলছি—

সে আবার কি? চশমা দেখলে মানুষ ক্ষেপে যায় না কি?

আজ্ঞে, এর একটু মাথার ইয়ে—মানে একটু গোলমাল আছে কি না—

তাই নাকি? আহা কি কষ্টই না পা ওই বাচ্চা ছেলেটির। বলে সেই ভদ্রলোকটি চশমা খুলে পকেটে রেখে, পুল্টুকে কাছে ডেকে নিয়ে খুব আদর করলেন। পুল্টুও দিব্যি ভাল মানুষটির মত আদর খেতে লাগল। কে বলবে আগে পুল্টুর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। যা-তা কিছু একটা করে ফেলাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

এহেন পুল্টুর মনও দুঃখে ভরে যায় একদিন। যেদিন শুনল মাঠে গিয়ে খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে নমিতার ডান পা'টি জখম হয়েছে। মানে পায়ের হাড়ে অল্প চিড় খেয়েছে। ডাক্তারবাবু নাকি বলেছেন নমিতাকে ছ'টি মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নমিতা বাড়ীতেই আছে। নার্সিং হোমে নমিতা যেতে চায় নি। নমিতাদের অবস্থা ভালই। তাই নমিতার সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করে একজন নার্স রেখেছেন ওর বাবা।

বাড়ী ফিরে দারুণ মন খারাপ হয়ে যায় পুল্টুর। মা জিজ্ঞাসা করেন, তোর কি হয়েছে রে পুল্টু—। কিছুই জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে পুল্টু। মা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। নতুন কোনো উপসর্গ আবার দেখা দেবে না কি?

পরের দিন সকালে জলখাবার খেয়ে পুল্টু বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে নমিতাদের বাড়ী যাবে বলে।

হঠাৎ অসময়ে পুল্টুকে ওদের বাড়ীতে দেখে নমিতা ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, পুল্টু আমাকে মারবে—ওকে শীগগির ধরো—

পুল্টু বলে, না ভাই, তোকে আমি মারতে আসি নি, শুনলাম তোর পায়ে খুব লেগেছে, তাই তোকে দেখতে এসেছি—এখন কেমন আছিস্ ভাই?

—কেমন আর—এই তো প্লাস্টার করা রয়েছে—বলে ডান পা'টি দেখিয়ে দেয় হাত দিয়ে।

—কত দিন লাগবে ভাল হতে?

—কি জানি ভাই—কতদিন যে তোদের সঙ্গে খেলা করতে পাবো না—বিছানায় শুয়ে শুয়ে এতো কান্না পায়—কি বলবো তোকে—

—অত মন খারাপ করিস না ভাই নমিতা, তুই শীগগিরই ভাল হয়ে যাবি, তখন আবার আমরা তোর সঙ্গে খেলবো।

ঘরটির এক কোণে ইজি চেয়ারে নার্স হেলান দিয়ে শুয়েছিল। বই পড়ছিল বলে মুখটা ঢাকা ছিল তার। নমিতার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে যেতে নার্স উঠে পড়ে। নার্স গ্লাসে ওষুধ ঢেলে অন্য হাতে জল নিয়ে নমিতার কাছে উপস্থিত হয়।

পুল্টু এতক্ষণ নার্সের মুখটা দেখতে পায় নি ভাল করে। নমিতাকে ওষুধ খাওয়াবার জন্য যখন নার্স তার কাছে যায়, পুল্টু তখন নমিতার পাশে বসে ছিল। হঠাৎ পুল্টু কেমন যেন অধীর হয়ে ওঠে। ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

নার্স নমিতার মুখের কাছে ওষুধের গ্লাসটা সবে ধরেছে তাকে খাওয়াবে বলে, এমন সময় হঠাৎ পুল্টু লাফিয়ে উঠে পড়ে। নার্সের চোখে ছিল চশমা। পুল্টু করল কি, সেই চশমাটি আচমকা এক টানে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মাটিতে, আর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, কেন তুমি চশমা পরে আমার কাছে এসেছিলে—জানো না চশমা আমি মোটেই পছন্দ করি না—

নার্স ও নমিতা পুল্টুর এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে অবাক। নার্সের হাত থেকে ওষুধের গ্লাসটা পড়ে গিয়ে বিছানার খানিকটা জায়গা ভিজে গেল ওষুধে। নমিতা ও নার্স তাকিয়ে দেখে ঘরের মেজেতে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে চশমার ভাঙ্গা কাচগুলি। আর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে পুল্টু।

রামকৃষ্ণ

মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিলে নাম তাঁর
দুই যুগের দুই অবতার।
সেদিন যখন সমাজ মনে
জ্ঞানী-গুণী জেনে শুনে,
মানিলেন বলে তিনিই অধিকারী
গদাই হইলে এই নামধারী।
পাপী-তাপী অগণিত
যথা রহে যত বা পতিত
হইলে চাতক সমান সতৃষ্ণ
বিজ্ঞান সুধায় তরে এই রামকৃষ্ণ।
দহন জ্বালা শীতল হলে নিয়ে নাম তাঁর
তাই মানবে বলেন তাঁরে যুগাবতার।

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

অভিশাপ সকল সময়েই তার ধর্ম পালন করে না। অভিশাপ সকল সময়েই অন্ধকারকে আমন্ত্রণ করে না। অনেক সময়ে আলোকের আবির্ভাবও সূচিত করে তোলে। জীবনে এমন অনেক কিছু দেখা দেয় তা 'অভিশাপ' রূপে প্রতীয়মান হলেও তার আশীর্বাদ-ধর্মী প্রকৃত মনোভাব একদিন প্রমাণিত হয়ে যায়। প্রমাণ হয় অভিশাপটা হয় মুখোস আর মুখ হল আশীর্বাদ।

আমাদের পরিমণ্ডলে বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, এইভাবে অভিশাপের মুখোস পরে আশীর্বাদের আত্মপ্রকাশ। ইংরাজীতে এই অবস্থাটিকেই বলা হয় 'ব্লেসিং ইন ডিসগাইস' আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয় ভয়াল, ভীষণ, ভয়ঙ্কর—কালে তাই প্রতিভাত হয় কল্যাণবর্ষী, শুভপ্রদ, মঙ্গলময়ের মূর্তিতে। বহু সাধক, বহু জ্ঞানী-গুণীরই জীবনই তার প্রমাণ।

বহু চিন্তাশীল কর্মনায়কের জীবনেতিহাস অনুধাবন করলে এই ধারণার স্বপক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ সাক্ষ্য মিলবে। এঁদের জীবনে দেখা যাচ্ছে যে জীবনে এমন বিপর্যয় এসেছে, যা প্রত্যাশিত বা স্বাভাবিক পরিণতির পরিবর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে এঁদের এক পরমাপ্রাপ্তির সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের জীবনও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। বাল্যকালে সারমেয়-দংশনকে কেন্দ্র করে তাঁর সারা জীবনের স্রোত যেভাবে ভিন্নমুখী হয়ে আরও বলিষ্ঠ ধারায় দিব্য পরিণতির দিকে প্রবাহিত হতে থাকল, তা তাঁর দিব্য জীবনের দিব্য কাহিনীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা বিশেষভাবেই অবগত আছেন। একটি হিংস্র কুকুরের তীব্র বিষাক্ত দংশনকে কেন্দ্র করেই ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় খুঁজে পেয়েছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসে পরিণত হওয়ার পথ।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বণ্ডুল গ্রাম। ১৮৫৬ সালের ১১ই মার্চ ভোলানাথের জন্ম। শিশুর বয়েস যখন ছ'মাসও হয়নি সেই সময়ে বাবা অখিলচন্দ্রের স্বর্গলাভ হল। কাকা চন্দ্রনাথ আর মা রাজরাজেশ্বরী পিতৃহারা শিশুকে লালনপালন করতে থাকলেন।

ছোটবেলা থেকেই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একদিকে যেমনই প্রচণ্ড গম্ভীর, অন্যদিকে তেমনই দেদার বেপরোয়া। বাচ্চা ছেলে! মনে ভয়-ডর নেই। রাত-বিরেতে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়। সাপ নিয়ে খেলা করে। বছর দশ-বারো তখন বয়েস।

জর্জ এ্যালেন

গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলেছেন—কোথা থেকে অতর্কিতভাবে এক ক্ষ্যাপা কুকুর ভোলানাথের দেহে বসিয়ে দিলে তার মারাত্মক বিষভরা দাঁত।

আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের কত উন্নতি হচ্ছে, এ ধরণের দুর্ঘটনা আজকের দিনে তিলমাত্রও চিন্তার কারণ নয়।

কিন্তু সেদিন এ রোগের কোন প্রতিকার ছিল না। সেই বিষের তীব্র প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহে যে নিদারুণ যন্ত্রণার উদ্ভব করত, তা বর্ণনা করার মত কোন ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। বালক কত আর সহ্য করবে। তার সহ্যশক্তিরও তো একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। কোন উপায় নেই, অথচ এই প্রাণঘাতী মারাত্মক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির পথ একমাত্র মৃত্যুর মধ্যেই আছে, এই চিন্তা শেষপর্যন্ত তার মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে থাকল।

গভীর রাত নিস্তব্ধ, নিঝুম। চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ভোলানাথ। চলল নদীর দিকে। নদীর জলেই সে এই ব্যাধিময় জীবনের অবসান ঘটাতে।

এইখানেই প্রমাণ হল যে—যে ব্যাধি অভিশাপের মূর্তি নিয়ে তার জীবনে এসেছে—আসলে সেই ব্যাধিই কত বড় আশীর্বাদের অমৃতলোকে তাকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এনেছে। নদীর জলে ডুবে আত্মবিসর্জন দিয়ে তাঁকে রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে হল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখে পড়ল এক মহাযোগী সন্ন্যাসীর কিছু অলৌকিক কীর্তি।

চুম্বকের মত ভোলানাথ চলে গেল, তাঁর কাছে। তাঁকে সব কিছু খুলে বলল। হাসলেন সন্ন্যাসী যন্ত্রণার স্থানে রাখলেন তাঁর কৃপাবর্ষী একটি হাত। বললেন এজন্যে আত্মবিসর্জন! তোমার সব জ্বালা সেরে গেছে, তুমি নীরোগ।

হতবাক ভোলানাথ। স্পষ্ট অনুভব করলেন সত্যিই, আর এক-টুকুও যন্ত্রণা তাঁর দেহে নেই। অনেক-দিন পর পরিপার্শ্বের সবকিছু আবার মধুময় হয়ে দেখা দিল। একটা ভাল-লাগার আমেজ অনেকদিন পরে মনের মধ্যে আবার যেন এল।

কিন্তু, রোগ তো সারল। কিন্তু এই রোগকে কেন্দ্র করে বালকের চিন্তারাজ্যে যে নতুন আলোড়ন এসে গেল। দিবসে-রাত্রে, প্রভাতে-সন্ধ্যায় তাঁর ধ্যানে, ধারণায়, ভাবে, ভাবনায় সবটুকু অংশ জুড়ে রইলেন সেই সন্ন্যাসী—বালকের কাছে এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেল যে অনন্ত চিত্তের ভাণ্ডারী যা দিলেন তা কণামাত্র। অফুরান মণিমাণিক্য এঁর ভাণ্ডার ভরে আছে। সেই ভাণ্ডার থেকে কিছু মহার্ঘ্য রত্ন তাঁর চাই। লুটিয়ে পড়লেন যোগীর পায়ে। দাও দাও প্রভু কৃপা যদি করলে তবে পরিপূর্ণরূপে কর, দেখাই যদি দিলে তবে চকিতের মধ্যে মিলিয়ে যেও না।

হাসলেন সন্ন্যাসী—বললেন, সময় হলেই প্রকৃত গুরুর দর্শন পাবে।

অদৃশ্য হওয়ার আগে এই অপূর্ব নীটির সঙ্গে শুধু একটি মন্ত্র দিয়ে ালেন আকুলচিত্তের বালকটিকে।

বছর ছয়ের পর কথায় কথায় নের মুখে এক মহাশক্তিধর যোগীর াম শুনল ভোলানাথ। মিলিয়ে খল এ তিনিই আর কেউ নয়। কানা জোগাড় হয়ে গেল। তার থেকেও শ্চর্যের কথা চোদ্দ বছরের ছেলের ্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প বাড়ীর কেউ র্থন করতে পারল না—এবং এ ভাবে যাঁর সবচেয়ে বেশী বেঁকে ড়ানোর কথা—সেই মা-ই অনুমতি লেন প্রসন্ন মনে।

াকার রমণায় সেদিনকার ঝোপজঙ্গলে পরিপূর্ণ নির্জন পরিবেশে যেদিন সেই যোগীর কাছে আশ্রয় পেলেন সেদিনই সেই যোগী যাঁর নাম পরমহংস নীমানন্দ—রমণার ঘাস তুললেন। হাত ধরলেন ভোলানাথের। কিছুদূর গিয়ে ভোলানাথের চোখ বেঁধে দেওয়া হল। চোখের সামনে ঘন পুরু অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র যবনিকা। কানে ভেসে আসছে কখনও শৃগালের চীৎকার, কখনও হিংস্র ব্যাঘ্রের হুঙ্কার।

পরের দিন সকালে চোখ খুলে দেওয়া হল। জানতে পারলেন যেখানে এসে তাঁরা পৌঁছেছেন জায়গাটির নাম বিন্ধ্যাচল। শুধু জানতে পারলেন না যে প্রায় ছ'শ মাইল পথ এত কম সময়ে কি করে অতিক্রান্ত হল—এ কোন যৌগিক লীলা। ঠিক এইরকম অলৌকিকভাবেই বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতের এক দুর্গম মালভূমিতে এসে তাঁরা পৌঁছলেন।

নীমানন্দের জন্মভূমি বাঙলা দেশ এবং যে সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল তখন মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজ্যকাল সবে শেষ হয়েছে অর্থাৎ তাঁর আত্মা তখনই একটি দেহকে দেখা যাচ্ছে পাঁচশ বছর আশ্রয় করে আছে। নীমানন্দ ভোলানাথকে নিয়ে গেলেন তাঁর গুরু স্বামী মহাতপার কাছে। তিনি দীক্ষা দিলেন ভোলানাথকে। নাম দিলেন বিশুদ্ধানন্দ।

বেশ কিছুকাল কাটল তপস্যায়। অধ্যয়নে, কচ্ছ্রসাধনে। একদিন গুরু আদেশ দিলেন দেশে ফিরে গিয়ে সংসারধর্ম পালন করতে। শিষ্য স্তম্ভিত, বিমূঢ়। যে সূত্র একদিন তিনি কেটে এসেছেন, তা জুড়তে তাঁর এতটুকু আগ্রহ নেই। পিছনের দিকে ফিরে তাকানো তাঁর কাম্য নয়, সামনের দিকই তাঁর লক্ষ্য। চিন্তার শেষ থাকে না তরুণ তাপসের। শুধু ফিরে যাওয়া নয়, বিবাহিত জীবনে প্রবেশ। তারপর কি পরিণতি এর, সাধনপথে এ কি বাধা, শিষ্য ভেবে পান না কি হবে। শেষপর্যন্ত গুরু এই আদেশ করলেন।

গুরু বোঝাতে থাকেন শিষ্যকে—সাধনার পথে স্ত্রী বাধা নয়, স্ত্রী সেখানে বিরাট সহায়ক। স্ত্রী শুধু দেহের সঙ্গিনী নয়, এমন কি নিছক জীবনসঙ্গিনী নয়—স্ত্রী আত্মার সঙ্গিনী। সাধনপথের উন্নতির ক্ষেত্রে সহধর্মিণীর সহায়তা যে অমূল্য, একের প্রচেষ্টায় সার্থকতা আসে না, দুয়ের সাধনায় আসে পূর্ণতা। দুটি জীবন স্রোত সম্মিলিত ভাবে এগোলেই পরম প্রাপ্তির তীর-ভূমি স্পর্শ করার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত।

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

—গুরুবাক্য মেনে নিলেন শিষ্য—এ সমস্যা তো মিটল, তারপর জীবিকা—

গুরু বললেন, তুমি যোগ জ্যোতিষী এবং চিকিৎসা বিদ্যায় আত্মনিয়োগ কর।

দেশে ফিরে এলেন বিশুদ্ধানন্দ। সুদীর্ঘকাল পরে পুত্রকে ফিরে পেয়ে মায়ের আনন্দ আর ধরে না। সুলক্ষণা মেয়ে কৃষ্ণভামিনী দেবীকে বধূরূপে ঘরে আনা হল।

জীবনেতিহাসের একটি অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায়ে এবার উত্তরণ। জীবন নাট্যের একটি অঙ্কের সমাপ্তি। অন্য অঙ্কের সূচনা।

সাধক হিসাবে খ্যাতি তখন একটু একটু করে বিস্তৃত হচ্ছে। স্বামীজী তখন গুস্করায়। সেখানে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম মহানায়ক জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশ দত্ত দেখা করতে এলেন। আসার আগে স্ত্রীর হাতে গোপনে কয়েকটি গিনি রেখে এলেন, উদ্দেশ্য—স্বামীজী সেটা জানতে পারেন কিনা, সেটা যাচাই করে দেখা। বলা বাহুল্য, সর্বজনসমক্ষে রমেশবাবুর মনস্কামনা পূর্ণ করে তাঁকে সূর্যবিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞানপ্রসূত নানা অলৌকিক ক্রিয়া দেখালেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ।

আমাদের মানবদেহে অতি পরিচিত কয়েকটি সাধারণ দ্বার ছাড়া আরও বহু দ্বার আছে। সেগুলি যোগীদের কাছে ধরা পড়ে। সাধারণের চোখে নয়। প্রতিটি লোমকূপই একটি একটি দুয়ার। চিকিৎসাজগতের প্রাতঃস্মরণীয় দিকপাল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্বামীজীকে ধরে বসলেন, এ তাঁকে দেখাতে হবে। সাধকের কাছে বিজ্ঞান নায়কের এ এক অপূর্ব আত্মসমর্পণ। একটি কাপড়ের বেশ খানিকটা অংশ ঘৃতে পূর্ণ করে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে তা উদর থেকে বার করে দিলেন। মহেন্দ্রলাল স্বীকার করে গেলেন যে, স্বামীজী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিজ্ঞানব্যক্ত দেহ-তত্ত্ববিদ্যা অসম্পূর্ণ।

পরমাণুর রূপান্তর ঘটিয়ে হীরক, প্রবাল প্রভৃতি রত্নও তিনি (স্বামীজী) প্রস্তুত করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনের এক মহারথী বাঙলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারার পথিকৃৎ মনীষী এ বিষয়ে স্বামীজীকে অনুরোধ জানালেন। মহেন্দ্রলালের মত সমর্পণী মনোভাব তাঁর ছিল না। নবজাগৃতির মধ্যাহ্নগগনে বিজ্ঞানের অনুশীলনকারী এই মনীষীর মনে যৌগিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সেদিনও সংশয়ের বীজ লুপ্ত হয়নি। তিনি ভাবলেন এ হাতের কৌশল। হাত চেপে ধরলেন সজোরে। স্বামীজীর হাতে ছিল একটি লেন্স স্বামীজী তাঁর এই অবিশ্বাসী আচরণের প্রত্যুত্তরে দিলেন এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতে।

বললেন—বেশ, লেন্সটা ফেলে দিচ্ছি, এবার দেখ আমার হাতে কি আছে—বলে করতল থেকে খানিকটা পশম ছিঁড়ে দিলেন। সেই পশমকেই রূপ দিলেন এক উজ্জ্বল প্রবালের।

এক সময়ে কামাখ্যা এবং দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থসমূহও তিনি পরিক্রমণ করেন। বারাণসীর হনুমানঘাট ও মালদহিয়া অঞ্চলে বহুকাল তিনি বসবাস করেন।

বর্তমান ভারতের সমগ্র পণ্ডিত সমাজের প্রণম্য নায়ক, এশিয়ার শেষ বিস্ময় মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর অন্যতম শিষ্য। গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত তাঁর জীবন কাহিনী নানা তথ্যের আকর। এই গ্রন্থের মাধ্যমে বিশুদ্ধানন্দের নানাদিক সম্বন্ধে সুবিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তাঁর সম্বন্ধে বহু কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার একটি পরিপূর্ণ নিরসন। বিশুদ্ধানন্দের দিব্যদেহ থেকে সকল সময়ে এক অপূর্ব মনোমুগ্ধকর পদ্মের সুরভি নির্গত হয়ে চতুর্দিকে সুরভিত করে রাখত।

এই কারণে 'গন্ধবাবা' নামেও তাঁর পরিচিতি ছিল সমধিক।

১৩৪৪ সালের ২৭এ আষাঢ়ের (জুলাই ১৯৩৭) এক মেঘমেদুর সন্ধ্যায় ৮২ বছর বয়সে কলকাতায় ভারতের অধ্যাত্ম গগনের এক মহান নক্ষত্র বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস নশ্বরলীলার অবসান ঘটালেন।

পৃথিবীর সম্পদ লুটে নেয়

কৃষ্ণরা গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তাল উন্মাদ হাওয়া বয়
উদ্যত অসি হাতে সৈনিক
নির্মম, সকলেরে ডেকে কয়
পালানোর পথ নেই কোন দিক॥

দেবদারু পাতা সব ঝরে তাই
ফোটা ফুল তারও পালা হোল শেষ
ধুলোমাখা সজ্জায় রং-ছাই
আকাশটা বিষাদেরই বুঝি বেশ॥

পৃথিবীর সম্পদ লুটে নেয়
ঝুলি ভরে সময়ের সৈনিক
রাজা-প্রজা মানে না তো সে যে হায়
আসে পালা যার কাছে যায় ঠিক॥

এসেছিলে পৃথিবীতে খাজনা
দিতে হবে তার কোন ক্ষমা নেই
ফুল, ফুটে আর কোন কাজ না—
খুশি করে নিয়মের পালাকেই॥

ভারতের শিল্প ও আমার কথা / এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং

বাংলা দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে যথেষ্ট মাতামাতি হলেও আসলে ও দুটি বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান খুব অল্প লোকেরই আছে। অতএব যাঁরা বহুদিনাবধি এ বিষয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়ে আসছেন তাঁদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও এঁদেরই একজন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চিত্র শিল্পের অন্তর্নিহিত নানা ধারাটি অনুসরণ করে করে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন বর্তমান রচনা তারই ছায়া-চিত্র। সেই সঙ্গে এ রচনাকে একটি অনবদ্য স্মৃতিচারণরূপেও গণ্য করতে হবে, কারণ বঙ্গীয় তথা ভারতীয় শিল্পের ভাবরূপটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখকের ঘরোয়া কথাও এসে পড়েছে, যার সঙ্গে জড়িত সেকালের কলকাতার এক পরিচ্ছন্ন পরিচয়। গল্প বলার ভঙ্গীতে রচিত হওয়ার দরুণ লেখার মধ্যে সরস কথকতার আমেজ পাওয়া যায়, অনেক কিছু খুঁটিনাটি এতে খুঁজে পাওয়া যায় যা পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলবে। ষাট-সত্তর বছর আগে কলকাতার সমাজ ঠিক কেমনটি ছিল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অবকাশ ঘটে এই পাঠ করলে। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে আসলে এই রচনা এই যুগের ভারতীয় শিল্পের এক প্রামাণ্য ইতিহাস এবং এর রচয়িতা শিল্পের জগতের এক ধুরন্ধর রসিক। মূল্যবান গ্রন্থের ভাণ্ডারে এই রচনা এক উল্লেখ্য সংযোজনরূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। প্রচ্ছদশিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (ও সি গাঙ্গুলী), প্রকাশক—এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—পনের টাকা মাত্র।

মেঘদূত / জয়দুর্গা লাইব্রেরী

অমর কবি কালিদাসের অন্যতম প্রধান কাব্য মেঘদূতের এই বঙ্গানুবাদ, হাতে পেয়ে বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই সুখী হবেন। এই কাব্য কবির পরিণত-বয়সের রচনা বলে অনুমিত হয়ে থাকে, বস্তুত মেঘদূতে যে কাব্য প্রতিভা ও গভীর জীবনবোধ বিধৃত তা পরিণত লেখনীরই স্বাক্ষরবাহী। সেই সঙ্গে আছে ভাবাবেগের অকল্পিত বিস্তৃতি, সত্য বলতে কি কালিদাসের কবি-মানসের সম্যক্ পরিচয় বুঝিবা একমাত্র মেঘদূতের মাধ্যমেই উপলব্ধিগোচর হওয়া সম্ভব। বিরহী যক্ষের বেদনার সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে কবি বিশ্ব-মানবের বিরহ বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছেন যেন, মেঘদূত তাই সুমধুর কাব্যমাত্র নয় দুনিয়ার সমস্ত বিরহীর অন্তরের সকলতম প্রতীক। অনিন্দ্য-সুন্দর এই কাব্যের ভাষান্তরকরণে, অনুবাদক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আদি সংস্কৃত শ্লোকগুলির পাশাপাশি অনূদিত শ্লোকাংশগুলি সন্নিবেশিত হওয়ায় তুলনামূলকভাবে সেগুলির কাব্য ও ধ্বনিমাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করাটা পাঠকের পক্ষে সহজতর হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। রচনা—কালিদাস, অনুবাদ—যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রকাশক—জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ৮-এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম সাত টাকা।

পূর্ব বাংলার লোকসঙ্গীত / সান্যাল অ্যাণ্ড কোং

যে-কোন দেশের মর্মস্থল স্পর্শ করতে চাইলে সে দেশের লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ থাকা প্রয়োজন এবং লোক-সঙ্গীত এই সংস্কৃতির প্রধানতম ধারক ও বাহক। বারো মাসে তেরো পার্বণ আর নিয়ত উৎসব বাংলা দেশকে করেছে গীতিময়, বাঙালীর মনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার লোকগাথা আর গ্রামীণ গীতির অজস্র ধারায়। বিভিন্ন প্রদেশে, জেলায় লোক-গীতি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ হয়ে এক স্বকীয় মর্যাদায় ভূষিত। আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে পূর্ববাংলার এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক বাঙালী পাঠকের চোখের সামনে। পূর্ববাংলার লোক-সঙ্গীতের মূল বিশেষত্ব ভাটিয়ালী, নদীর স্রোতোধারার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাটিয়ালীর সুর অনুরণন তুলে আসছে পূর্ব-বাংলার মানুষের মনে অনাদি কাল থেকে। আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ববাংলার লোকগীতির এই বিশেষ ধারাও অন্যান্য প্রচলিত ধারাসমূহের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বিধৃত। ষোলোটি শ্রেণীতে বিভক্ত লোকগীতির বিভিন্ন ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সাতচল্লিশটি গানের মাধ্যমে। পূর্ববাংলার বৈচিত্র্যময় জনজীবনের এক রূপময় আলেখ্য প্রকাশিত গ্রন্থোক্ত গীতিগুচ্ছের মাধ্যমে। এ গ্রন্থ যে বাংলা গীতি গবেষণমূলক রচনার ভাণ্ডারে এক উল্লেখ্য সংযোজন সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। সম্পাদনা—দিনেন্দ্র চৌধুরী, প্রকাশনা—সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—আট টাকা।

দেবী চন্দ্রগুপ্ত / প্রাইমা পাবলিকেশনস্

ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত এই উপন্যাস বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে এনেছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এই গ্রন্থের নায়ক, নায়িকা তাঁরই মহিষী

ধ্রুবদেবী বা ধ্রুবস্বামিনী, বস্তুত-নায়িকার নামেই নামকরণ করা হয়েছে উপন্যাসটির। যে সব চরিত্র নায়ক নায়িকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রধানতম হল মহাকবি কালিদাসের চরিত্র। গ্রন্থোক্ত কাহিনী সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক, এবং 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নামে পৌরাণিক নাট্যকার বিশাখ দত্তের যে নাটক আছে তারই অনুস্মৃতিমাত্র। লেখক ঐতিহাসিক কাহিনী রচনায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁর রচনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সরলতা। এই গ্রন্থেও সেই বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। কাহিনী বিন্যাসের চাতুর্যে অতীত যেন মূর্ত হয়ে পাঠকের মনে প্রতিভাত হয়। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নরনারীরা যেন একান্ত ঘরের মানুষ হয়েই দেখা দেন এবং সেজন্যই চন্দ্রগুপ্ত, ধ্রুবদেবী, কালিদাস, দত্তদেবী, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি সব চরিত্রই আপন আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়িয়ে দেয় পাঠক অন্তরে। ঘাত-প্রতিঘাতময় কাহিনীটি সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল টেনে রাখে। আমরা এই রচনাকে সাদর স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বারীন্দ্রনাথ দাশ, প্রকাশক—প্রাইমা পাবলিকেশনস, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

বাগীশ্বর বিবেকানন্দ /
(তৃতীয় খণ্ড) এম সি সরকার

আলোচ্য গ্রন্থে বিবেকানন্দের কর্ম ও ভাবধারাকে নিপুণভাবে রেখাঙ্কিত করা হয়েছে, তাঁর চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে। আলোচ্য রচনাটি এই পর্যায়ের রচনার তৃতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় দফায় প্রবাস যাত্রা, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ এবং ভ্রমণ শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ধারা বিবরণ প্রদত্ত। বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে মহাযোগী ও মহাকর্মী, বস্তুত ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে কর্মের বৈপ্লবিক প্রেরণা আনাতে তাঁর অবদান বড় কম নয়। 'কর্মের মাধ্যমেই ধর্ম'—এই মহান আদর্শের উদ্গাতা তিনিই। অনবদ্য শৈলীতে এই যোদ্ধাসন্ন্যাসীর ভাবরূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বিবেকানন্দকে যেন নতুন করে পাই আমরা এই রচনার মাধ্যমে, অচিন্ত্যকুমারের অনন্য ভাষার মাধ্যমে উপমার মনোহারিত্বে বিষয়বস্তু সহজেই হয়ে উঠতে পেরেছে রসোত্তীর্ণ। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ—শিল্পশোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—সাড়ে সাত টাকা।

কবি কালিদাসম্ /
(সংস্কৃত নাটক)

গতানুগতিকভাবে আজগুবি কিংবদন্তীর সাহায্য না নিয়ে নাট্যকার স্বকপোলকল্পিত একটি সম্ভাব্য কাহিনী রচনা করেছেন। এখানে আমরা মূর্খ কালিদাসের দেখা পাই না ;—পাই এক অপূর্ব মনীষার, যিনি বাল্য থেকেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন এবং ক্রমশ নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নের কাব্যিক লড়াই খুবই উপভোগ্য হয়েছে ; বিদূষক মন্দারকও একটি কৌতুকোদ্দীপক চরিত্র। বিদুষী রাজকন্যা মঞ্জুভাষিণী যেন গ্রন্থকারের মানস-দুহিতা ; পূর্বরাগে, বিরহে ও পুনর্মিলনে তিনি মহাকবি কালিদাসের উপযুক্ত সহধর্মিণী—একাধারে সখী, সচিব ও ললিতকলার প্রিয়শিষ্যা। হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একটি বলিষ্ঠ চরিত্র। রাজকন্যার সখী কস্তুরিকা, গিরিবালা, মানুমতী এবং মালিনী পুষ্পিতারাও কাব্যে উপেক্ষিতা নয়। সর্বোপরি—তরুণ কবি কালিদাস প্রতিভার একটি প্রভাতজ্জ্বল দিব্যমূর্তি ; কিন্তু সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ ও মিলনে তিনি জীবন্ত মানুষ,—কল্পলোকের অধিবাসী ন'ন। ঘটনাবৈচিত্র্য, চরিত্রস্ফুরণ ও গতি স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে মঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে নাটকটি সার্থক হবে—আশা করা যায়। গ্রন্থটিতে কালিদাসের কাব্যের অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের রচিত অজস্র কবিতা ও সঙ্গীত নাটকটিকে রসঘন করেছে। তিনি নিজে অনেকগুলি নতুন ছন্দের প্রবর্তন ও নামকরণ করেছেন ; নবীন হলেই যে নিন্দনীয় হয় না—সেটা আবার প্রমাণ হ'লো। রচনা-শৈলীও যুগোপযোগী এবং প্রসঙ্গত কাব্যের স্বরূপও আলোচিত হয়েছে। লেখক—ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ডি-লিট্ আই-এ-এস্ প্রণীত : প্রকাশক—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, প্রচ্ছদপট : বৈজয়ন্তী ভট্টাচার্য, কলিকাতা-৬, দাম—আট টাকা।

পাপুর বই / শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রাইভেট লিঃ

শিশু-প্রতিভার অনবদ্য নিদর্শনরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য আলোচ্য গ্রন্থটি। মাত্র সাড়ে আট বছরে যার জীবন শেষ হয়ে গেলো সেই পাপু এই গ্রন্থের রচয়িতা। গল্প, কবিতা ও ছবি এই তিনের প্রতিই সমান আকর্ষণ ছিল পাপুর, আলোচ্য গ্রন্থে তার স্বাক্ষর আছে। শিশুমনের রঙ্গীন কল্পনা অপরিণত লেখনীর মাধ্যমে যেন রূপকথার রাজ্যের বন্ধ দুয়ারটি খুলে দিয়েছো লেখনী অপরিণত কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত, শিশু বয়সের কাঁচা হাতে লেখা গল্প ও কবিতা, কচি হাতে টানা রেখাচিত্র থেকে খুঁজে পাওয়া যায় ভাবীকালের এক প্রতিভাধর শিল্পী ও সাহিত্যিককে; এ ধরণের প্রতিভার অকালসমাপ্তি কম বেদনাদায়ক নয়। তবু এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল কারণ তা না হলে আমরা শিশু-প্রতিভার সম্যক্‌রূপটি যে কত উন্নত ধরণের হতে পারে সে সম্বন্ধে অনবহিতই রয়ে যেতাম। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দের ভূমিকাটিও অনবদ্য। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সুব্রত সরকার,

প্রকাশক—শিশু-সাহিত্য সংসদ, প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

কুশীলব / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

এই উপন্যাসে যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার সফল রূপায়ণ করা হয়েছে। শোভন ও তপন দুই ভাই যেন যৌবনের বিভিন্ন ভাবরূপের মূর্ত প্রতীক, শোভন স্বভাবশিল্পী, গীটার বাজানোয় তার সহজ পারঙ্গমতা, স্বভাবে সে কিছুটা উচ্ছৃংখল ও বেহিসাবী শিল্পী হিসাবেই সে সার্থক হতে চায় বটে কিন্তু সেজন্য যে অনুশীলন ও ধৈর্যের প্রয়োজন তা তার নেই; অপরপক্ষে তপন ধীরস্থির জীবন-সংগ্রামে বিশ্বাসী এক মানুষ, হঠকারিতা তার ধাতে নেই, জীবনের পথে তার পদক্ষেপ সুদৃঢ় ও নিঃসন্দিগ্ধ। এই দুই যুবকের জীবনে নারীও এসেছে অনিবার্যভাবেই রুমকি ও হেনা, যদিও প্রধানত তপনেরই বান্ধবী তবু শোভনের প্রতিও আকর্ষণবোধ না করে পারে না হেনা, আর রুমকিও সত্যই বিচিত্র, ভালবেসেও তাই দূরে ঠেলে দিতেই চায় সে শোভনকে। এই দুই নারীর দ্বিবিধ আকর্ষণের জালে জড়িয়ে পড়া শোভনের ব্যাকুল অথচ অন্বেষী হৃদয় গুমরে মরে নিভৃত নির্জনে, তার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব বুঝি কোনকালেই মেটবার নয়। নিপুণ হাতে অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক কাহিনীর জাল বুনে গেছেন লেখক, চরিত্র সৃষ্টিতেও কুশল তিনি—সব ক'টি চরিত্রই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বিমল কর, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

মাকড়শার রঙ নীল / সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী

আলোচ্য উপন্যাসটি অপরাধমূলক। ছোট ছোট কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনী একত্র করে পরিবেশন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক এই ধরণের রচনায় ইতিমধ্যেই কিছু খ্যাতি অর্জন করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই খ্যাতিবর্ধনে সহায়কস্বরূপ গণ্য হওয়ার যোগ্য। কাহিনীগুলির নায়ক গোয়েন্দা বাসব, চরিত্র হিসাবে যথেষ্ট সুপরিকল্পিত, যেভাবে সে রহস্যের জাল উন্মোচন করে গিয়েছে একের পর এক তা যথেষ্টই কৌতূহলোদ্দীপক। বাসবের সহকারী ও বন্ধু ডাক্তার শৈবালের চরিত্রটি বিখ্যাত শার্লক হোমসের সহকারী ডাঃ ওয়াটসনের ছায়ায় রচিত। ছোট ছোট রহস্য কাহিনীগুলি, উত্তেজনাময়, সিচুয়েশন সৃষ্টির কৌশলও লক্ষ্য করবার মত। রহস্য কাহিনীর স্রষ্টা হিসাবে লেখকের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিময় বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৫।৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

একদা কুয়াশায় / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

আলোচ্য কাহিনীটি মিস্টিক রচনার পর্যায়ভুক্ত, কাহিনীর নায়ক বারিদ, অল্পবয়সে মাতৃহীন হয়ে এক ভাম্প ধরণের নারীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। বাল্যে ও যৌবনে আশ্রয়দাত্রীর নানা রকম অসদাচরণ চাক্ষুষ করে করে বারিদের মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, এই সময় সে বিবাহও করে কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। বেশ কিছুদিন পরে খোঁজখবর নিয়ে তার স্ত্রী নলিনী এসে উপস্থিত হয় তার গৃহে। স্ত্রী সম্পর্কে সব স্মৃতিই তখন হারিয়ে বসেছে বারিদ, এমন কি কোনকালে বিবাহ করেছিল কি না তাও তার মনে নেই, উপরন্তু শিবানী নামে আরেকটি মেয়ের প্রতি সে তখন প্রণয়াসক্ত। এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে শিবানী, তারই প্ররোচনায় মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার সেনের চিকিৎসাধীন হয় বারিদ। ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে বারিদও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেয় নলিনীকে স্ত্রীরূপে। যথেষ্ট নতুন ধরণে কাহিনীর ট্রিটমেণ্ট করেছেন লেখক, মানসিক বিপর্যয়ের যে রূপ বারিদকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে তা খুব দক্ষতার সঙ্গেই চিত্রিত। চরিত্র চিত্রণেও সফল হয়েছেন তিনি, বারিদ শিবানী ও নলিনী এই তিনটি চরিত্রই খুব বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত। নতুন ধরণের কাহিনীটি জনপ্রিয় হবে বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বিমল কর, প্রকাশনায়—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—ছ'টাকা।

জর্নাল অফ ব্রেখ্‌ট সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া / মে-দিবস সংখ্যা

জর্নাল অফ ব্রেখ্‌ট সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার এই বিশেষ সংখ্যাটি হাতে পেয়ে আমরা খুসী হয়েছি। নানা উল্লেখ্য রচনা স্থান পেয়েছে এতে। প্রসঙ্গত সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শয়তান-দর্পণ' নামে নাটিকাটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। গণবিপ্লবই গ্রন্থোক্ত রচনাগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু, এবং প্রতিটি লেখকই এই মূল আদর্শকে চোখের সামনে রেখে লেখনী তুলে ধরেছেন। আজকের মানুষের এক বিশাল অংশের চিন্তা-ভাবনাকে উপলব্ধি করতে হলে এ ধরণের পত্র-পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পত্রিকাটির আঙ্গিক সৌষ্ঠবও যথেষ্ট। প্রকাশনা—দি ব্রেখ্‌ট সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, ১৪০।২৪ এন এস বোস রোড, কলিকাতা—৪০, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সুস্মিতার সাহস। ছল / অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স

পুরোনো ধারায় এই প্রেমের উপন্যাসে মামুলী কয়েকটি সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে। একই গ্রামের ছেলে মেয়ে, সুস্মিতা ও নবাঙ্কুর বেড়ে উঠেছিল পাশাপাশি এবং অনিবার্যরূপেই প্রেমেও পড়েছিল পরস্পরের।

তাদের মিল না হওয়ায় তাদের মিলনে পড়লো বাধা, কিন্তু সুস্মিতার যেহেতু সাহস ছিল, সেহেতু অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর একদিন সে হঠাৎ গৃহত্যাগ করলো এবং একদল বৈষ্ণবীর সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে বৃন্দাবনে পৌঁছে প্রেমের সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করলো। বৈষ্ণব প্রেমের সাধনা তো মিথ্যা হওয়ার নয়, কাজেই নবাঙ্কুর-কেও অচিরে পৌঁছুতে হল অকুস্থলে এবং শেষ পর্যন্ত মালাবদলে মধুর সমাপ্তি। বৈষ্ণবী প্রেম, শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র এই ত্রিবিধ উপকরণের সাহায্যে পাক করা বিষয়বস্তু পুরোনোপন্থী পাঠকের কাছে উপাদেয় বলে মনে হলেও হতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যের ধোপে এ রচনা কতটুকু টিকবে তা বলা শক্ত। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দীপঙ্কর পাঠক, প্রকাশনা—অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা—১৪, দাম—ছ' টাকা।

মরা গাঙে এলো জোয়ার

আলোচ্য কবিতাপুস্তকে রবীন্দ্রযুগের কবিতা বিদ্যমান। কবি অতি আধুনিক কবিদের মত কবিতা লেখেন নি। যা লিখেছেন তা যেমন ভাবাশ্রিত এবং অর্থবোধক, তেমনি হৃদয়-নিঃসৃত বলা চলে। মোট চল্লিশটি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতা হৃদয়ে সাড়া জাগায় এবং পড়তে ভাল লাগে। অতি আধুনিকতার স্পর্শ কবিতা-গুলিতে না থাকলেও কবির সার্থক সৃষ্টি। সমাদর লাভ করবে বইটি এই আশা রাখি। ভূমিকা লিখেছেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু। লেখক: বারীন ভাদুড়ী। প্রকাশিকা: উমা দেবী, ৪ মতিলাল রায় লেন, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া। দাম—দুই টাকা।

তৃষ্ণা / ভোলানাথ প্রকাশনী

নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ বিষয়-বস্তুর মাধ্যমে লেখক অনাথ বালক বালিকার সমস্যার উপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু লেখনী একবারও যথেষ্ট পরিণত নয় এবং সেজন্যই তাঁর বক্তব্য তেমন সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি। কাহিনীকে অযথা ঘোরালো করে তোলায় সবটাই কেমন কৃত্রিম মনে হয়। তবু সমাজের এক দূষিত দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চাওয়ার জন্য খানিকটা প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য বলেই মেনে নেওয়া চলে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অ না চ, প্রকাশক—ভোলানাথ প্রকাশনী, ৩৭।১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-কাতা—৯, দাম—চার টাকা মাত্র।

আধুনিক পোলট্রী ফার্মিং / বসুমতী

ভারতে মুর্গী উৎপাদন সম্বন্ধে আরও বহুবিধ রচনাদি প্রকাশিত হয়ে থাকলেও, আলোচ্য গ্রন্থটির প্রয়ো-জনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত থাকার অবকাশ কম। অত্যন্ত সরল ভাষায় মুর্গী উৎপাদন ও পালন সম্বন্ধে লেখক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। মুর্গী পালনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত সব রকম সমস্যাকেই সামনে রেখে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে, বইটি পড়লে মুর্গী পালনকারী ব্যক্তি মাত্রই যথেষ্ট উপকৃত হবেন। মড়ক বা মহামারী যা নাকি মুর্গী পালনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, তার নিবারণকল্পে বহুবিধ উপায়ের কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর অবস্থাই যে মড়কের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী, একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন লেখক। পোলট্রি সম্বন্ধে উৎসাহী ও শিক্ষার্থী পাঠকমাত্রই যে এই রচনাটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। কয়েকটি রঙীন দুর্লভ সন্নিবেশিত হওয়ায় বইটির আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। অঙ্গসজ্জা এক কথায় চমৎকার। লেখক—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, জি, পি (আমেরিকা) এফ,এস,পি, আই,পি, এইচ (লণ্ডন), প্রকাশক—দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড. ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী / বসুমতী

বাংলা সাহিত্য জগতে দীনবন্ধু মিত্র এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। দীনবন্ধু মিত্রের এক একটি নাটক এক একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। শুধুমাত্র নাটক নয় কালোপযোগী বিদ্রূপাত্মক রচনায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি অসাধারণ এবং অন্যান্য রচনাবলীতে তিনি যে অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আলোচ্য গ্রন্থটি বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থাবলী। গ্রন্থাবলীটি দুই ভাগে সম্পূর্ণ। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটকসমূহ ও অন্যান্য রচনা-সম্ভার গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে রয়েছে নীল-দর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী। দ্বিতীয় ভাগে সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ। গ্রন্থটিতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত গ্রন্থকারের জীবনী ও ভূমিকা নিঃসন্দেহে অমূল্য সংযোজন। দীনবন্ধু মিত্রের রচনা-বলীর পরিচয় নতুন দেওয়া বাহুল্য-মাত্র। অতি সুলভ মূল্যে এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে বসুমতী সাহিত্য মন্দির অবশ্যই পাঠক-পাঠিকাদের ধন্যবাদ লাভ করবে। দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী, প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—প্রতি ভাগ চার টাকা।

হত্যাকারী রাজকুমার

কলকাতার অভিজাত হোটেলে ওঠেন—কুমার চন্দ্রনারায়ণ রাও—সূর্যনগরের রাজকুমার। কলকাতায় যদিও তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ আছে—তবুও সচরাচর কুমার প্রাসাদে থাকেন না। স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর এবং তাঁর মোসাহেবের দল কলকাতার প্রাসাদে থাকেন বলে—কুমার তাঁদের এড়িয়ে চলেন।

হোটেলের 'স্যুট' চিরকালই ভাড়া করে রাখা হয়েছে—তাঁর জন্য।

সূর্যনগরের প্রাসাদেও কুমার আর থাকতে চান না—সেই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকে। এক কথায়—তিনি একা-একা থাকতে চান সব সময়ে।

গরমকালে কুমার মুসৌরীর কোন এক অভিজাত হোটেলে ক'টা মাস অতিবাহিত করেন। মহারাজ স্বয়ং যান প্যারিসে—ভারতের গরম তাঁর সহ্য হয় না—কোনদিনও। কুমার চন্দ্রনারায়ণ বাবার সঙ্গে যান না—বাবার সঙ্গ, মা'র সঙ্গ তাঁর কোনদিনও ভালো লাগতো না। এখন তো মহারাজ বাহাদুরের নাম কেউ উচ্চারণ করলে কুমার সহ্য করতে পারেন না।

কুমার চন্দ্রনারায়ণের বাবা—নীতীন্দ্রনারায়ণ দুর্বল চিত্তের অধিকারী। পরস্ত্রীতে তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি ছিল, এখন বয়স যদিও যথেষ্ট হয়েছে, তবুও তিনি আগেকার মতনই রয়ে গেছেন, বদলান নি, এতোটুকুও।

রাণী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। তিনি শিক্ষিতা, বিদুষী এবং নব্যযুগের আলোকপ্রাপ্তা মহিলা ছিলেন।

রাও রাজবংশে অভিশাপ আছে। কুমারের এখন মনে হয় তাই। এ বংশে রাণী-রাজাদের চরিত্র কলঙ্কিত ছিলো—একমাত্র চন্দ্রনারায়ণই তার ব্যতিক্রম ছিলেন। নিষ্কলুষ চরিত্রে পড়লো সেই দাগ। বংশের ধারাকে তিনি এড়াতে চাইলেও—ধারাটা তাঁকে ছাড়লো না, ঠিক তাঁর রক্তে মিশে গেলো।

তাঁর মত মেধাবী ছাত্র ক'টা ছিল? যশ, ধন, বিদ্যা, মান-সম্ভ্রম সবই তাঁর মাথাটাকে উঁচু করে রেখেছিল। আর আজ? অর্থ ছাড়া তাঁর আর কিছু নেই।

কার দোষে হল?—মা'র? বাবার? দোষের ভাগী হয়তো অনেকেই, কিন্তু সব কিছুর ওপরে তাঁর ভাগ্যের দোষ। তা না হলে ভাগ্যচক্রের ফাঁদে তিনিই বা ভীমপুরে যাবেন কেন আর সোনালীকেই বা সেখান থেকে নিয়ে আসবেন কেন?

অর্চনা মিত্র

কুমারের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ক্ষণে-ক্ষণে। বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকেন প্রতি পোনেরো মিনিট অন্তর। বেয়ারা পূর্ণ করে দেয়—পাত্রে উগ্রতর পানীয়। মাত্রাধিক্যে ক্রমশ শরীর মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি এক সময়ে। ভোরের দিকে গাঢ় সুষুপ্তির কোলে আশ্রয় নেন। পাঁচ-সাত ঘণ্টার জন্য মুক্তি পান বিবেকের দংশন থেকে, মনের অশান্তি থেকে, সব হারানোর ক্ষোভ থেকে। কুমার, প্রায় প্রতি রাত্রেই বিশ্রাম করেন—এই পন্থা ধরে। তাঁর আর কিছু করার নেই—কোথাও যাওয়ার নেই, বন্ধু নেই, স্বজনদের ভালোবাসেন তিনি। তিনি চানও না কেউ তার কাছে আসুক।

সূর্যনারায়ণ রাও—ছিলেন এই রাও রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিরাট জমিদারীর পত্তন হয়েছিল—তাঁর আমলে। বহু বড়-বড় তালুক একত্র করে এক বিরাট রাজত্ব তৈরী করেছিলেন—তার নামকরণ করেছিলেন—সূর্যনগর। ইংরেজ সরকারের অতি প্রিয়পাত্র হওয়ায়—মহারাজাধিরাজ উপাধি লাভ করেছিলেন—সূর্যনারায়ণ। এই খেতাবের জোরে মহারাজারা হয়েছিলেন—বেপরোয়া। তাঁরা হয় কে নয়—নয় কে হয় করে গেছেন—চিরদিন ধরে। অত্যন্ত দাপট ছিল এই বংশের রাজাদের।

বর্তমান যুগে রাজা মহারাজাদের রাজত্ব নেই যদিও—তবুও মরা হাতী লাখ টাকা। রাজা-মহারাজারা চিরকালই সাধারণ মানুষের বিস্ময়—কারণ—এতো বছরের দাসত্ব করে আসা মানুষ আমরা—চট করে সেটা আমরা ভুলতে পারিনা।

মহারাজা সূর্যনারায়ণের তিন ছেলে ছিলেন। যথানিয়মে বড় ছেলে নরনারায়ণ রাজা হলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন—রাণী যোগমায়া। সূর্যনারায়ণ আর দুই ছেলে—শ্যামনারায়ণ এবং বিষ্ণুনারায়ণকে চক্রপুর এবং আনোয়ারপুরের তালুক এবং মোটা টাকার মাসোহারা দিয়ে আলাদা করে দিয়েছিলেন। খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলেন তিনি।

মহারাজা নরনারায়ণের সব সময়ে কেন জানি না মনে হতে লাগলো যে রাণী যোগমায়ার সঙ্গে শ্যামনারায়ণের অবৈধ সম্পর্ক আছে। রাজা হওয়ার পর থেকে এই ধারণা বদ্ধমূল হল। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক সম্পর্ক ক্রমশ চলে গেলো।

মহারাজা নীতীন্দ্রনারায়ণেরও এই ধারণা ছিল—নিজের স্ত্রীর প্রতি। কুমার চন্দ্রনারায়ণ একথা বেশ ভালো করেই জানতেন। মায়ের নতুন-নতুন বয় ফ্রেণ্ডদের কুমারও সহ্য করতে পারতেন না।

বেশ মিল আছে—নরনারায়ণের আর নীতীন্দ্রনারায়ণের মধ্যে। কুমারের পাত্র শূন্য। বেল টিপলেন কুমার।

বেয়ারা পূর্ণ করে দিলো পাত্রটা। কুমারের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। ডিনার সাব? বেয়ারা প্রশ্ন করলো।

অভি নেই। কুমার উত্তর দিলেন। বেয়ারা যদিও জানে যে, কুমারসাহেব কোনদিনই রাত্রে ভারী খাদ্য কিছু গ্রহণ করেন না। তবুও সে জিগ্যেস করে কর্তব্যটুকু সেরে নিল।

নরনারায়ণের বিষদৃষ্টি পড়েছিল—স্ত্রীর ওপর। ইদানীং স্ত্রীকে কিছুতে সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি।

হ্যাঁ'। খুনই তিনি করেছিলেন নিজের স্ত্রীকে—নিজের হাতে। লাসটা একাই বয়ে নিয়ে এসেছিলেন নরনারায়ণ গুম-ঘরে। তাঁর রক্তে ছিল তখন উগ্র পানীয়ের প্রভাব। অতি কঠিন কাজ অতি সহজে তাই তিনি করতে পেরেছিলেন। বন্দুকের গুলীটা সোজা লেগেছিল যোগমায়া দেবীর কপালে। তাই বীভৎস হয়ে উঠেছিল অত সুন্দর মুখখানা।

গুম-ঘরের পূর্ব দিকের মাটিতে বড় গর্ত করানোই ছিল। লাসটাকে নিজের হাতে পুঁতে ফেলে মহারাজা নির্বিকারচিত্তে ওপরে উঠে এসেছিলেন।

নীতীন্দ্রনারায়ণ কী করেছেন? তিনিও খুন করেছেন নিজের স্ত্রীকে—অবশ্য একান্ত আধুনিক পন্থায়। ইদানীং তিনিও স্ত্রীকে সহ্য করতে পারছিলেন না। মহারাণীর শ্যাম্পেনের গ্লাসে একটি মোড়ক থেকে সাদা গুঁড়ো ঢেলে দিয়েছিলেন মহারাজাবাহাদুর নীতীন্দ্রনারায়ণ। মহারাণী ঢলে পড়লেন চেয়ারের ওপরে। ডাক্তারের দল এলেন—যথারীতি। রাজবাড়ীর ডাক্তার—মাইনে করা সকলেই। তাঁরা রায় দিলেন—হার্ট এটাক।

কুমারের ইচ্ছা হয়েছিল একবার—সকলকে আসল কথাটা খুলে বলার। না—তা তিনি পারেন নি। যার চরিত্রে—বাবার চরিত্রে তাঁর ঘৃণা অপরিসীম। তাই তখন ভেবেছিলেন এদের মতো লোকগুলো মরে গেলে পৃথিবীর কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবার আশঙ্কা নেই।

নরনারায়ণ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বেশীদিন বাঁচেন নি। কী একটা রোগ হয়েছিল, চিকিৎসকরা ধরতে পারেন নি। পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মাস তিনেক ধরে এক মানসিক ব্যাধিতে ভুগেছিলেন। থেকে থেকে চমকে উঠতেন। মৃতা মহারাণীকে দেখতে পেতেন। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন মাঝে-মাঝে। সব সময়ে কিসের ঘোরে যেন থাকতেন।

সেবকের দল সব সময়ে অপেক্ষা করে থাকতো—মহারাণী কখন তাদের চর্মচক্ষের সামনে আসেন।

মহারাজা ঘুমের ঘোরে একদিন উঠে সোজা গুমঘরে নেমে এলেন। নাথুরাম বরকন্দাজ ধরে ফেলেছিল তাই রক্ষে, না হলে, মহারাজ মাটিতে পড়ে যেতেন গুমঘরের ভেতর। নাথুরাম নাকি মহারাণীকে তখন সেই ঘরে প্রত্যক্ষ করেছিল।

মহারাজাকে ধরাধরি করে যখন ওপরে আনা হল, তখন তাঁর দেহে প্রাণ ছিল না।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাঁর একমাত্র সন্তান জয়নারায়ণের অভিষেক হল খুব ধুমধাম করে।

তাঁর স্ত্রী রাজারামপুরের রাজার মেয়ে—স্বর্ণপ্রভা দেবী। সেকালের বিখ্যাতা সুন্দরী ছিলেন তিনি। চন্দ্রনারায়ণ চোখ বুঁজে ছবিখানা মনে করতে চেষ্টা করেন। ছবিখানা যেন দরবার ঘরটাকে আলো করে রেখেছে। রাও বংশের রাজা-রাণী-কুমারদের প্রায় সত্তরখানা ছবি দরবার ঘরে আছে, কিন্তু সবচেয়ে রূপসী মনে হয়—স্বর্ণপ্রভা দেবীকে। কুমার জয়নারায়ণের কথা ভাবছেন।

জয়নারায়ণের ছিল শিকারের বাতিক। একবার শিকার করে নিয়ে এলেন একটা বড় মরা বাঘ। আর সুখিয়াকে—এক সাঁওতালী মেয়ে, বছর বাইশ-তেইশ বয়স হয়তো ছিল তার। মহারাজার বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়েছে।

সুখিয়ার বাসস্থান নতুন করে তৈরী হল। মহারাণীর এলাকায় সে আশ্রয় নিলো না অথবা বাই-মহলেও সে উঠল না। যে বাড়ীটা তার জন্যে তৈরী হল—তার পরিকে. হন. বড় সুন্দর। সেই বাড়ীটা ভেঙে পড়েছিল ইদানীং। কুমার চন্দ্রনারায়ণ বাড়ী নতুন করে সুন্দর করে সাজি[য়ে] সোনালীকে রেখেছিলেন।

সোনালীকে ভালোবেসেছিলে[ন] কুমার। ভরা যৌবনে টলমলো দেহটাকে তিনি মোহগ্রস্ত হন নি। সামাজিক মর্যাদা দিয়ে সোনালীকে স্ত্রীর সম্মান দিতে চেয়েছিলেন।

বাধা দিয়েছিলেন মহারাজা নীতীন্দ্রনারায়ণ। পুত্রবধূরূপে মহারাণীর আসনে বসাতে চান কুলশীল গোত্র পরিচয়হীনা নারীকে।—রক্ষিতারূপে রাখতে ছেলেকে অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। বিবাহ করতে হলে কোন এক রাজপরিবারের মেয়েকেই করতে হবে।

কুমার এই যুক্তিগুলো মানতে বাধ্য হন নি। সোনালীকে আশ্বাস দিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। পড়াশোনা সমাপন করে সোনালীকে যে তিনি বিয়ে করবেন—সকলেই তা জানতেন। নিজের রোজগারে তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এ তিনি ভেবে রেখেছিলেন। বাবার পয়সায় প্রতিপালিত হয়ে তিনি যে সোনালীকে বিয়ে করতে পারবেন না, ভালো করেই জানতেন।

কুমার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—বিয়ে যদি করতেই হয় সোনালীকেই করবেন। অন্য নারীকে তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না কিছুতেই। যা এ বংশে হয় নি, তাই তিনি করতে চাইলেন। তাই, বিধাতা অলক্ষ্যে হেসেছিলেন।

বেয়ারা আবার কখন গ্লাস ভরে দিয়ে গেলো? ---কুমার টের পান নি।

●

জয়নারায়ণের নতুন আবিষ্কার সুখিয়া একদিন অবিশ্বাসিনীর কাজ করে ফেললো। মহারাজার প্রৌঢ় বয়সের প্রেম তাকে বাঁধতে পারলো না। মহারাজ নিজে তাকে জীবন্ত দেওয়ালে গেঁথে ফেললেন।

না—এদিক দিয়ে জয়নারায়ণের জীবনের সঙ্গে চন্দ্রনারায়ণের জীবনের মিল নেই।

মিল আছে জয়নারায়ণে[র] ছে-

—দেবনারায়ণের [illegible] না [illegible] নেই। মিল আছে সত্যনারায়ণের সঙ্গে।

মহারাজ দেবনারায়ণ খুব ভোগী পুরুষ ছিলেন। শৌখীনও ছিলেন। গান বাজনা বুঝতেন। লখনৌ অঞ্চলের নামকরা বাইজী বেগম দিলখোশা আর তার সঙ্গী ওয়াজিদ খান এসেছিলেন রাও-রাজবংশের দরবারে।

মহারাজার তো খুব পছন্দ হয়ে গেলো বেগমকে। কিছুতেই ছাড়লেন না বেগমকে। দিলখোশ বাগ তৈরী হল। পশ্চিমী কায়দায় তৈরী হল বাগিচা। ফার্সী আর উর্দ পড়েছিলেন মহারাজ, কিছুদিন। বেগমকে নিয়ে নিজেকে ভাবতেন দিল্লীর বাদশাহ।

এ ধরণের ঘোরতর অনাসৃষ্টি কাণ্ড মহারাণী শরৎকুমারী সহ্য করতে পারলেন না। ছেলে—সত্যনারায়ণকে ধারবার উত্তেজিত করতে লাগলেন তিনি। কুমার তখন যুবক। রক্তে তেজ খুব বেশী।

শোভনদের মতলবও ভালো ছিল না। তার ছিল—উচ্চাশা। এ সুযোগ সে হাতছাড়া করলো না। মহারাজের কাছ থেকে ফন্দি-ফিকির করে বেশ বড়-বড় দু'তিনখানা তালুক দিলখোশার নামে লিখিয়ে নিল। রায়পুরের বড় তালুকখানা যেদিন মহারাজ দানপত্র করে দেবেন—দিলখোশা বেগমকে, তার আগের দিন থেকে বেগমের আর সন্ধান পাওয়া গেলো না। ওয়াজিদের মৃতদেহটাকে সূর্যকুণ্ডের জলে ভাসতে দেখা গেল একদিন।

কুমার চন্দ্রনারায়ণের উদারতা মহত্ব ভুলে যাওয়ার কথা নয়—সোনালীর। কিন্তু ভুলে গেলো। তার ভাই লক্ষ্মণ সিং, ছাতু সিং এসে জুটলো। কুমার বিদেশে বিরহে জ্বলছিলেন যখন, ঠিক সেই মুহূর্তে মহারাজা নীতীন্দ্র-নারায়ণ সোনালীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন কোন এক দুর্বল মুহূর্তে নীতীন্দ্র-নারায়ণ লিখে দিলেন জয়নগরের প্রাসাদখানা লক্ষ্মণ সিং-এর নামে। সোনালীকে মহারাজা এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকতে পারতেন না, এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন—নীতীন্দ্র-নারায়ণ।

কী মতলবে সোনালীকে ওর সঙ্গীরা সূর্যনগরে পাঠিয়েছে—বুঝতে পারলেন মহারাণী রাজশ্রী দেবী। ছেলেও বিদেশে। মহারাজা এদিকে সব সম্পত্তি লিখে দিচ্ছেন ওদের।

ট্রাঙ্ককল করে কথা বললেন ছেলের সঙ্গে মহারাণী। কুমারের মাথায় বজ্রাঘাত হলেও বোধ হয় তিনি এতো দুঃখ পেতেন না। ডিগ্রী না নিয়েই তিনি ফিরলেন দেশে। ফিরে দেখলেন সবই সত্যি। সোনালীকে দিয়ে টোপ ফেলছে ওরা। মহারাজা সোনালীর প্রাসাদেই থাকেন—রাজপ্রাসাদে আসেন না। এক মাসের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন। কুমার বিস্মিত হন।

শোভন দ্বিবেদী এখন কুমারের সহায়। যে ছিল কুমারের চোখের বিষ সেই হল এখন আপন। মহারাণী রাজশ্রীর একান্ত প্রিয় বন্ধু এই দ্বিবেদী। বলহীন মনের মালিক নীতীন্দ্রনারায়ণ রাজ-প্রাসাদগুলো যদি এভাবে ওদের হাতে তুলে দেন—সপরিবারে দাঁড়াবে কোথায়? দিন রাত শোভন মন্ত্র দিতে শুরু করলো কুমারের কানে। কুমারের মনের মধ্যেও আগুন জ্বলছে সব সময়ে।

ইতিমধ্যে, এক উৎসবের মধ্যে মহারাণীর মৃত্যু হল। এ ঘটনাটা ঘটিয়ে-ছিল লক্ষ্মণ-সোনালীদের বুদ্ধি আর মহারাজার দুর্বুদ্ধি।

●

এক্ষুণি হয়তো পাশের 'স্যুট' থেকে মিসেস মিশ্র আসবেন আর ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলবেন—আর ড্রিঙ্ক করবেন না মিস্টার রাও। বিরক্তিজনক ভদ্রমহিলা। মিস্টারের দেখা নেই, তাকে ড্রিঙ্ক করা আগে ছাড়া, কোথায় পড়ে থাকে তার ঠিক নেই—তা নয়, আমার পেছনে লাগা খালি। কুমার বিরক্তি-জনক একটা শব্দ করলেন মুখ থেকে।

কোথা থেকে জুটেছে এই মহিলা, এবারে কলকাতায় এসে সুখ হল না, সেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের দলের কেউ না, কেউ ঠিক জুটবে—যেখানেই যাও না কেন। আওয়াজ পেলেন কুমার।

আসুন।

প্রবেশ করলেন মিসেস মিশ্র। সম্পূর্ণ বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত কুমার উঠে দাঁড়ালেন। পা দুটি টলটলায়মান হলেও, বিদেশী শিক্ষা তিনি ভুলে যান নি। মেয়েদের সম্মান তিনি দিতে জানেন।

মিসেস মিশ্র বসলেন। এ কী? এতো রাত্রে? মিস্টার মিশ্র কোথায়? ঘড়ি দেখতে দেখতে কুমার শুধোলেন।

এখনো ফেরে নি। রাত দেড়টা বেজে গেলো। একা একা ভালো লাগছিল না—তাই দেখতে এলাম—আপনি কী করছেন। বললেন মিসেস মিশ্র।

—আমি? নতুন আর কী করবো?

—এতো কেন ড্রিঙ্ক করেন?

—কী করার আছে আর? কিছু করার নেই বলেই করি।

—নতুন করে জীবন কী আবার শুরু করতে পারেন না? আকুতি ঝরে পড়ে মিসেস মিশ্রের স্বর থেকে।

—আপনাকে নিয়ে না কী? ব্যঙ্গ করলেন কুমার?

—না। গায়ে কথাটা মাখলেন না ভদ্রমহিলা। ম্লান হেসে উত্তর দিলেন।

—আমার সব শেষ হয়ে গেছে—বাকী কিছু নেই। বললেন কুমার।

—আছে। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন মিসেস মিশ্র।—মিসগাইডেড জিনিয়স আপনি। আপনাকে এভাবে নষ্ট হতে আমি দেব না।

খুব অবাক হলেন কুমার ভদ্রমহিলার প্রচণ্ড দাম্ভিকতায়।

—আচ্ছা চলি। আমার স্বামী বোধ হয় এসে গেছেন। আজ আর

বৈকালী

—শ্রী বি, বি, পালচৌধুরী অ

আপনার মুখখানি ফুলের পাপড়ির মতো
পেলব ও সুন্দর করে তুলবে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম
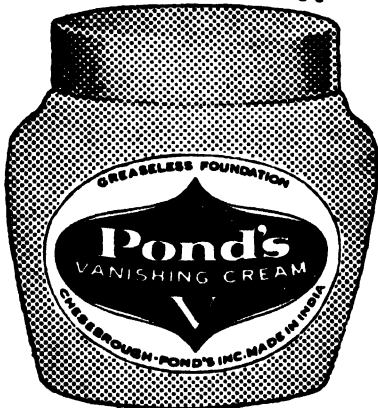
পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীমে আছে বিশেষ একটি উপাদান 'হিউমেকট্যাণ্ট'—এতে ত্বকের আর্দ্রভাব অটুট থাকে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম তাই আপনার মুখশ্রী কমনীয়, মসৃণ ও তাজা রাখে; আর ধুলোবালি ও রুক্ষ আবহাওয়ার হাত থেকেও বাঁচায়। তুষার-শুভ্র ও হালকা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম এমনিতেই মুখে একটি মার্জিতশ্রী এনে দেয়; আবার পাউডার বেস্ হিসেবে এর ওপর মেক-আপ ধরালেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিখুঁত থাকে।

চীজ্‌ব্রো-পণ্ড্‌স ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম—*নিখুঁত পাউডার বেস্*

P-4932 A

চিন্তা করবেন না। আমি [illegible] করছি।

মিসেস মিত্র চলে গেলেন

সপ্তায়ে কুমার কিছুটা বিরক্ত হয়ে ছিলেন, চিন্তাধারা ছিন্ন হওয়ায়। কানে একটা নতুন কথা নতুন সুরে বাজছিল—মিসগাইডেড জিনিয়স আপনি—আপনাকে এভাবে নষ্ট হতে দিতে দেব না।

জিনিয়স যে কুমারসাহেব, সন্দেহ নেই স্কুলে-কলেজে-অধ্যাপকদের কাছে, দেশে-বিদেশে—সর্বত্রই শুনেছেন—তিনি না-কি জিনিয়স। কিন্তু—মিসগাইডেড কথাটা কেউই বলে নি।

বেয়ারা বোতলটা পুরো বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে টেবিলে আর গোটা দুয়েক সোডা। বোতলে সামান্যতম অবশিষ্ট রয়েছে—অথচ আজই খোলা হয়েছে বোতলটা। থাক—বিতৃষ্ণা এলো কেমন যেন। আর খেতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম পাচ্ছে না, ভোর হয়ে আসছে।

চিন্তা করে যেতে হবে এখন—করার তো কিছু নেই, ঘুম আসতে দেরী আছে। এতো পান করেও চিন্তা যায় না—যতক্ষণ না ঘুম আসে। বার বার পুরোন স্মৃতিগুলো নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করতে বেশ ভালো লাগে। নতুন করে তো [illegible] নেই। [illegible] কী নেই ?

মহারাজা বাহাদুর না কি লিখে দিচ্ছেন—কলকাতার প্রাসাদ—সোনালীর নামে।

কুমার এবার স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। কুমারের দুই বোন এখনোও অবিবাহিতা, ছোট ভাই এখনোও নেহাৎ ছোট। এদের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে কতকগুলো নেমকহারাম। না—উপায় একটা বার করতে হবে।

না—এ হতে পারে না। কেন হতে পারে না ?

●

পর পর তিনটি বুলেট ছুটে গেলো—কুমারের হাতে ধরা বন্দুক থেকে। সোনালী পড়ে গেলো প্রথমে—লক্ষ্মণ সিং পড়লো আর্তনাদ করে। ছাতু সিং পালিয়ে গেলো।

কুমার উঠলেন কাঠগড়ায়। বিচার শুরু হল। মহারাজের বহু টাকা জলের মতো খরচ হয়ে গেলো কুমারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে। কুমার খালাস পেলেন।

ছাতু সিং প্রধান সাক্ষী। তিন হাজার টাকা হাতে নিয়ে সে বেমালুম [illegible] মিথ্যে কথা বলে গেলো। কুমার নিজেই সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কুমারকে অপ্রকৃতিস্থ বলে সেদিন হসপিটালে চালান দেওয়া হয়েছিল। প্রধান সাক্ষীরা সকলেই একবাক্যে বলেছিল—কুমার এবং লক্ষ্মণ সিং বন্দুক পরিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। কী করে লক্ষ্মণ সিং-এর হাত থেকে তিনটে গুলি ছিটকে যায়। কুমার ওদের যখন বাঁচাতে যান তখন সব শেষ—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

কুমারের ঘুম এসেছে। ক্ষীণ একটু আলো দেখতে পাচ্ছে। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করতে হবে এবার। মিসগাইডেড জিনিয়স—এতো-দিন ভুল পথে এসেছেন। সোজাপথ, ঠিক পথ দেখানোর জন্য একজন আছে—মনে হচ্ছে।

বহুদিন পরে কুমার একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লেন। সোফা থেকে উঠে বিছানায় এসে শুলেন। রোজই সোফায় ঘুমিয়ে পড়েন আজই ব্যতিক্রম হল।

আঙুলের ছাপ

প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে আঙুলের ছাপ অপরিবর্তনীয় এবং এর সাহায্যে যে কোনও লোককে খুঁজে বার করা যায় নির্ভুলভাবে। এতদিন তাই ছিল বটে, কিন্তু এখন পণ্ডিতরা বলছেন যে, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আঙুলের ছাপ বেমালুম পালটে ফেলা যায়। ডাঃ জেমস বার্কস্ এ কাজে ওস্তাদ। তিনি বলছেন যে, তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী, কেন না এর ফলে পুলিশের কাছে আঙুলের ছাপের গুরুত্ব কমে যাবে অনেকখানি। এ যাবৎ যে ভাবে আঙুলছাপের দ্বারা অপরাধী নির্দিষ্ট করা যাচ্ছিল, তা' আর করা যাবে না।

ডাঃ বার্কস দ্রুতগতিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ব্রুশের সাহায্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ঘষে চামড়া তুলে ফেলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে আতস কাচ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, আগেকার বহু রেখার পরিবর্তে কয়েকটি সমান্তরাল এবং কাটাকাটি' রেখা মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ডাঃ বার্কস অবশ্য ডাক্তারদের সাবধান করে দিয়েছেন যে তাঁরা যেন অপরাধীদের এভাবে চিকিৎসা না করেন। তিনি বলেন যে, নির্দিষ্ট কোন রোগের জন্যই (যেমন, আঙ্গলহাড়া) মাত্র এ পদ্ধতি অনুষ্ঠেয়।

তিনি বলেন, এটাও ঠিক যে, কোন লোকের আঙুলে যদি স্বাভাবিক গোল রেখাচিহ্ন না থাকে, তবে সেটাই সন্দেহের কারণ হয়ে ওঠা উচিত।

● শ্রীতরুণ মুখার্জি, হাজি জ্যাকারিয়া লেন, কলি—৬—

আপনার দীর্ঘ চিঠির মধ্যে কোন প্রশ্ন খুঁজে পেলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম, আপনার লেখায় আবেগ আছে। জীবনে আবেগ না থাকলে বেগ আসে না, আর বেগ না এলে উন্নতি করা যায় না। আপনার জীবনে যে আবেগ আছে, তা পড়াশুনার দিকে পরিচালিত করুন দেখবেন আপনার স্বপ্ন সফল হবে। ব্যক্তিগত পত্র দিলাম না।

● শ্রীজয়ন্ত দে, শরৎ বসু রোড, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট—

আপনার তোতলামি শারীরিক দুবলতার জন্য হয়েছে, পরে আপনার মনের কোণে ভয় সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কারুর সামনে কথা বলতে গেলেই আটকে যায়। অনেক সময় ভাল মানুষও ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে তোতলামি করে ফেলে।

আপনি স্বাস্থ্য ভাল করুন, আর বাড়িতে বসে রোজ ভাইবোনদের আবৃত্তি করে অথবা খবরের কাগজ থেকে খবর পড়ে শোনানো অভ্যাস করুন। প্রথম প্রথম আটকে যাবে, কিছু ভ্রূক্ষেপ করবেন না। দেখবেন কিছুদিন পরে সব ঠিক হয়ে গেছে।

● শ্রীমতী রীতা চক্রবর্তী, এক-ডালিয়া প্লেস, কলি—১৯—

আপনি নিয়মিতভাবে দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে সারকোফেরল (অ্যালেম্বিক) অথবা ফেরাডল (পার্ক ডেভিস্) খাবেন অন্তত তিনমাস।

● শ্রীঅমল পট্টনায়ক, মধুএটি, পুরুলিয়া—

আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে মিনিট দশ-পনেরো বসে থাকবেন। দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়ে গেছেন।

● শ্রীমতী মীরা পাল, ডায়মণ্ড-হারবার রোড, সখের বাজার—

আপনার চিঠি পড়লাম। অনেক সময়ে আপনার পছন্দ না হলেও-সাংসারিক শান্তির জন্য স্বামীর কথা

শুনতে হয়। পরস্পরের বোঝাবুঝিতেই সংসারের শান্তি বিরাজ করে। যে বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করেছেন, সে বিষয়ে আমি কোন পরামর্শ দেবো না। আপনারা স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা ও পরামর্শ করে উভয়ের সম্মতিতে যে পদ্ধতি মেনে নেবেন, তাই স্বীকৃত হবে।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

সাদা স্রাব ও ছোট ফুস্কুড়ির জন্য আই টি পি ভ্যাজাইন্যাল ট্যাবলেট (স্যাণ্ডোজ) অথবা কলেপোমিন্ ট্যাবলেট (ফেয়ারডিল করপোরেশন) ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহারবিধি স্থানীয় কোন চিকিৎসককে বললেই দেখিয়ে দেবেন।

● শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্রধরপুর, বিহার—

প্রশ্ন ১: বয়স ৩০।৩২ বছর। অত্যন্ত রোগা—

প্রশ্ন ২: বহুদিন যাবৎ কাদার মত বদহজমের পায়খানা হচ্ছে—

উত্তর: উভয় প্রশ্নের একই উত্তর। আমার মনে হয়, আপনি যকৃতের দুর্বলতায় ভুগছেন। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে লিভোজেন (বি ডি এইচ) অথবা লিভোজেন (বি ডি এইচ) অথবা

● শ্রীসিদ্ধার্থ সিংহ, উদয়পুর, কলি-৪৯—

আপনি দীর্ঘ চিঠিতে একই রোগের কথার বর্ণনা করেছেন। দাদের জন্য হুইটফিল্ড অয়েণ্টমেণ্ট লাগাবেন এবং মাল্টিভিটামিনের বড়ি সকালে একটি, সন্ধ্যায় একটি তিনমাস খাবেন। চর্মরোগ অতীব নচ্ছার এবং সহজে যেতে চায় না।

● শ্রীশঙ্কর বিশ্বাস, বারাকপুর, ২৪-পরগণা—

আপনার চিঠিতে যেসব কথা লিখেছেন, তা যৌনতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিষয়েই লিখেছেন। আপনি বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হ্যাভলক অ্যালিসের যৌনমনোদর্শন গ্রন্থানুবাদ পড়লেই এই বিষয়ের কারণ জানতে পারবেন; আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, যেসব উপসর্গ আপনি লিখেছেন, তা স্বাভাবিক।

● শ্রীমতী মহামায়া ঘোষ, গোবরহাটি, মুর্শিদাবাদ—

আমাদের আরোগ্যবিভাগ আপনার উপকারে লেগেছে জেনে আনন্দিত। হাই ব্লাডপ্রেসার-এর ওষুধ কখনও ডাক্তার না দেখিয়ে খাবেন না। আপনি স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতামত নিয়ে চলবেন।

● শ্রীমতী সুতপা রায়, কুঠিঘাট রোড, বরানগর—

আপনি প্রশ্নগুলি ছাপাতে নিষেধ করেছেন বলে ছাপালাম না। আপনার স্বাস্থ্য রোগা বলে যে সব উপসর্গের কথা লিখেছেন, তাই হচ্ছে। আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে সারকোফেরল (এ্যালেম্বিক) অথবা ফেরাডল (পার্ক-ডেভিস) দুমাস খেতে পারেন।

প্রশ্ন: আমার ছোট ভাইয়ের বয়স ১১। খুব ক্রিমি আছে।

উত্তর: আপনি স্থানীয় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে অ্যাণ্টিপার (বরোজ ওয়েলকাম) অথবা অ্যালকোপার (এ্যালনবারি এণ্ড হ্যানবেরিজ) খাওয়াতে

...সারোমেথিয়েল্ড কোট (এ্যালনবারি ডেভিড) খাবেন দুমাস ধরে।

পারেন। কি মাত্রায় খাওয়াতে হবে সে কথা চিকিৎসক আপনার ভাইকে পরীক্ষা করে বলে দেবেন।

শ্রীতুষারকান্তি বেরা, আকন্দা, মেদিনীপুর—

প্রশ্ন : আমার পুরনো আমাশয় আছে এবং পায়খানার রং সাদা। মাঝে মাঝে পেট খারাপ হয়।

উত্তর : (১) আপনি ফুটোন জল খাবেন পুরো গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে। (২) তেল, ঘি, চর্বি জাতীয় খাদ্য খাবেন না। (৩) বর্ষাকালব্যাপী ঝোল ভাত এবং মাছ খাবেন। (৪) মাছের মধ্যে চিংড়ী, কাঁকড়া ইত্যাদি বাদ দিয়ে এবং বড় মাছের ছাল ফেলে দিয়ে ভেতরের শাঁস খাবেন। (৫) যতদিন পেট ভাল না হয়, দুবেলাই ভাত খাবেন, রুটি খাবেন না। (৬) সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি করে বারবেরাল (এ্যালেম্বিক) বড়ি খাবেন দশদিন। (৭) দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে অ্যামাই-নোজাইম (স্ট্যাণ্ডার্ড) খাবেন একমাস।

শ্রীজ্যোতির্ময় রুই, বুনিয়াদপুর, পশ্চিম দিনাজপুর—

প্রশ্ন ১ : যেসব টিউবারকুলার রোগী 'ইউজুয়াল ড্রাগ'-এর প্রতি 'রেজিসট্যান্স ডেভেলপ' করেছে এবং একটা 'লাংস কমপ্লিটলি ডেস্ট্রয়েড' কিন্তু বয়স ও স্বাস্থ্যের জন্য 'সার্জারি' সম্ভব হচ্ছে না—সে সব রোগীকে কি 'থার্ড লাইন অব ট্রিটমেণ্ট'-এর 'নিউয়ার ড্রাগস' দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় অর্থাৎ 'পারমানেণ্ট'-ভাবে 'স্পটাম নেগেটিভ' করানো যায়?

উত্তর : 'স্পটাম নেগেটিভ' অর্থাৎ যক্ষ্মারোগের জীবাণু হত্যা করার জন্য ওষুধ ব্যবহার করতেই হবে, সার্জারী হোক আর নাই হোক। বিশেষজ্ঞ-গণ যখন সার্জারীর কথা ভাবেন, তখন ওষুধ দিয়ে নিরাময়ের প্রশ্ন থাকে না, তাই সার্জারীর বদলে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার কথা ওঠে না। যখন সার্জারী করা সম্ভব হয় না, তখন অবশ্য ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, তবে আরোগ্য-লাভের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কোন ভরসা দেওয়া যায় না।

প্রশ্ন ২ : 'ড্রাগ-রেসিসট্যাণ্ট ব্যাকটেরিয়া' যদি অন্য একজনে সংক্রামিত হয়, তাহলে সে রোগীর ক্ষেত্রেও কি 'ইউজুয়াল ড্রাগস' কোনো কাজ করবে না?

উত্তর : সাধারণত করে। তবে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম পরিমাণে এবং এলোমেলোভাবে ওষুধ খেলে অথবা ইনজেকশন নিলে 'রেসিসট্যাণ্ট' হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ৩ : আমার মা 'এ্যাডভান্স টাইপ অব পালমোনারী টিউবারকুলসিস'-এ ভুগছেন এবং কলকাতার একটি 'টি, বি, হসপিট্যাল'-এ রয়েছেন। আমি, আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা বেশ কয়েক বছর মায়ের 'ক্লোজ কণ্টাক্ট'-এ ছিলাম।

(ক) আমার ও আমার ফ্যামিলির পক্ষে কি কি ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত? Mantou's test করিয়ে প্রত্যেকের 'বি, সি জি' নেওয়া কি উচিত হবে?

(খ) টিউবারকুলসিস-এর ক্ষেত্রে 'কেমোথেরাপি' কত কার্যকরী?

(গ) আমার পক্ষে কি কি সতর্কতা বাঞ্ছনীয়?

উত্তর : (ক) নিশ্চয়ই। প্রত্যেককে Mantou's test করিয়ে বি, সি, জি দেওয়াবেন।

(খ) টিউবারকুলসিস-এর ক্ষেত্রে 'কেমোথেরাপি' কার্যকরী। বিলেতে অনেক হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারীদের Isoniazid

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর বহুল নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের অংশে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

জড়ি বন্ধ্যার প্রতিষেধক হিসাবে খেতে দেওয়া হয়। এতে ফল ভালই হয় দেখা গেছে। শারীরিক কোন ক্ষতির রিপোর্ট উল্লেখ নেই।

(গ) আগে আপনার মায়ের 'স্পুটাম' পরীক্ষা করিয়ে দেখে নেবেন, 'পজিটিভ' আছে কি না। 'পজিটিভ' থাকলে তাঁকে আলাদা রাখতেই হবে এবং কোন সংশ্রব রাখা চলবে না। 'নেগেটিভ' হলে নিজে বা ছেলেমেয়েদের রোগিণীর মুখের সামনে বসাবেন না। কোন এঁটো খেতে দেবেন না। আর যথাসাধ্য আলাদা রাখবেন।

প্রশ্ন : টিউবারকিউলসিস-এর 'ব্যাক্টেরিয়াগুলি শরীরে অনুপ্রবেশ করলে রোগ সৃষ্টি ঘটাবেই এমন কোন মানে আছে?

উত্তর : না। তাহলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারিবৃন্দ প্রত্যেকেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তেন।

শ্রীউৎপল দাস-ভৌমিক, কযাডাঙ্গা, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন : মাথার চুল অত্যন্ত পাতলা। ন্যাড়া হয়ে দেখেছি তবুও চুল ঘন হয় নাই।

উত্তর : হিজল হেয়ার অয়েল স্নানের পর মাথায় ঘষে ঘষে লাগাবেন আর ন্যায়োপ্লেকস্ লাইসিন (এ্যালবার্ট ডেভিড) দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে দুমাস খাবেন।

শ্রীমতী চন্দ্রা ব্যানার্জি, সিঁথি, কলি-৫০—

আপনার চিঠি পড়লাম। আপনার বাবাকে আমি চিনি। আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, অল্পবয়সে সব মেয়েরই অল্পবিস্তর থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ভাবুক এবং শিক্ষিতা মেয়েদেরই এই উপসর্গ সৃষ্টি হয়।

আপনি রোজ সকালবেলায় মাটিতে বা শক্ত বিছানায় চিৎ হয়ে শোবেন। হাত দুটি মাথার ওপর তুলে দেবেন। হাত দুটি যেন কানের পেছনে চলে যায়। তারপর হাত দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবেন। হাত কানের সামনে আসবে না এবং হাঁটু ভাঁজ হবে না। প্রত্যহ সকালবেলায় আধঘন্টা ধরে এই ব্যায়াম করবেন। দেখবেন আপনার ওই উপসর্গ একদম চলে গেছে। যতদিন এই ব্যায়াম করবেন, ততদিন এই ধরণের উপসর্গ একদম থাকবে না। যদি রক্তাল্পতা থাকে, বাবাকে বলে ওষুধ খাবেন। আপনার বাবাকে আমার নমস্কার দেবেন।

● শ্রীবিশ্বনাথ হাজরা, হাওড়া—

আপনার চিঠি পড়লাম। প্লাসেন্টা এক্সট্রাক্ট এবং লিভার এক্সট্রাক্ট দীর্ঘদিন ধরে নিতে হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছি এক ভদ্রমহিলা সাত-আট মাস চিকিৎসার পর নিরাময় হয়েছিলেন। ব্যায়াম করতে পারেন। আপনাকে যদি কোন চিকিৎসক আশা দিয়ে থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁর কাছে যান এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করুন।

● শ্যামা রূপা, বিষ্টুপুর, জামসেদপুর—

আরোগ্য বিভাগের নির্দেশে আপনার উপকার হয়েছে জেনে আমরা আনন্দিত। আপনার প্রশ্ন পড়ে মনে হচ্ছে, অতিরিক্ত গরমের জন্য পায়ের জ্বালা হচ্ছে। আপনি জল একটু বেশি পরিমাণে খাবেন এবং বেশি গরম লাগাবেন না। কিছুদিন দেখুন, তাতেও যদি উপসর্গ থাকে, তাহলে নির্দেশ দেব। আপনার স্ত্রীর বিষয়ে যা লিখেছেন, তাতে মুস্কিল হচ্ছে Couterization করলে স্থায়ী আরোগ্য হয় না। কিছুদিন পরে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। আপনার স্ত্রীকে Macalvit J. N. ইনজেকশন দেবেন একমাস ধরে। ইনজেকশনের পদ্ধতি এবং মাত্রা স্থানীয় কোন চিকিৎসকের কাছে গেলেই তিনি বলে দেবেন।

● শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য—

প্রশ্ন : আমার রাত্রে কোন পড়া মুখস্থ করলে সকালে কিছুই মনে থাকে না —।

উত্তর : পড়া মুখস্থ করার পদ্ধতি অনেকবার মাসিক বসুমতীতে আলোচিত হয়েছে, তবু আর একবার বলছি। পড়াশুনা একটি তপস্যা। নিষ্ঠা না থাকলে কখনও পড়াশুনা করা যায় না। রোজ সকাল ৬টা থেকে ৮টা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত পড়তে হবে। রাতে মুখস্থ করবেন। একদিন বাদ দিয়ে পরের দিন সকালবেলায় মুখস্থ পড়াটি খাতায় লিখবেন। তারপরের দিন বই খুলে মিলিয়ে দেখবেন ঠিক আছে কি না। যে কথাগুলো ভুল হবে অন্য রঙের কালি দিয়ে কেটে সঠিক কথাটা লিখবেন। তারপর খাতা বন্ধ করে চিন্তা করবেন, কি লিখেছিলাম আর কি কি ভুল গেছে। দেখবেন সংশোধনশুদ্ধ সমস্ত পড়াটাই মনে গেঁথে গেছে।

● শ্রীমতী স্বপ্না ব্যানার্জি, রবীন্দ্র সরণি, বাঁকুড়া—

প্রশ্ন ১ : মুখের দুর্গন্ধ ও দাগ যাবে কি ভাবে?

উত্তর : কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে হবে এবং যকৃৎ ভাল করতে হবে। আপনি নিয়মিতভাবে দুবার খাবার পর Colibil—S খাবেন আর খাওয়ার আগে চা চামচের দু চামচ করে Glutazyme (ঈগল ল্যাবোরেটরিজ) খাবেন তিনমাস।

শ্রীপ্রণব চ্যাটার্জি, রবীন্দ্র সরণি, বাঁকুড়া—

আপনিও ওই একই ওষুধ, একই মাপে তিনমাস খাবেন।

শ্রীমতী (নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক। প্রশ্ন ছাপাতে চান না)—

আপনার স্বামীর দেহ মোটা হয়ে যাচ্ছে যখন তখন খাদ্য থেকে চর্বিজাতীয় সামগ্রী বাদ দিয়ে দিন। চল্লিশের ওপর বয়স হয়ে গেলে সাধারণত লঘুপাচ্য খাদ্য খাওয়া উচিত। ডাক্তারী মতে একুশ বছর পর্যন্ত বয়স বলা যায়, তারপর আর যায় না।

● শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিরকুণ্ডা, ধানবাদ—

প্রশ্ন ১ : আমার মাথার চুলগুলি পেকে যাচ্ছে। কি মাখলে কালো হবে?

উত্তর : হিজল হেয়ার অয়েল মেখে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন ২ : আমার মনে একদম স্ফূর্তি নেই।

উত্তর : ভাল খাওয়া দাওয়া করে ভালভাবে ঘুমোন, দেখবেন, শরীর সুস্থ হচ্ছে এবং মনে স্ফূর্তি জাগছে।

শ্রীদীনবন্ধু দত্ত, হাওড়া—

আপনার চিঠির মধ্যে 'সেল্ফ এ্যাড্রেসড' খাম ছিল এবং আপনি ব্যক্তিগত উত্তর চেয়েছেন। যথাযথ উত্তর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমলকুমার নন্দী, গুড়গুড়িপাল, মেদিনীপুর—

প্রশ্ন ১ : আমি গোড়া থেকেই রোগা।

উত্তর : দুবেলা পেটভরে যা বাড়িতে জোটে খাবেন, আর দুপুরে ঘণ্টাখানেক ঘুমোবেন। মোটা হয়ে যাবেন।

প্রশ্ন ২ : জাঙ্গিয়া ব্যবহার করলে কি দাদ হয়?

উত্তর : যদি জাঙ্গিয়া নিয়মিত পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে হয়।

শ্রীশচীন মাইতি, কালীবাড়ি লেন, যাদবপুর—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনার মেয়েকে পি জি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেণ্টে দেখিয়ে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

শ্রীবসন্তকুমার দে, চকবাড়িত, মেদিনীপুর—

প্রশ্ন ১ : বাজারে দাঁত মাজার জন্য যে গুড়াকু বেরিয়েছে, তা দিয়ে দাঁত মাজলে কি শরীরের ক্ষতি হয়?

উত্তর : গুড়াকুতে কি আছে না জানালে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২ : স্বাস্থ্য খুব রোগা—

উত্তর : ডুরাবলিন ইনজেকশন এবং পেট ভরে খাবার খেলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

প্রশ্ন ৩ : খালি পেটে সামান্যক্ষণ থাকলেই পেটে বায়ু জন্মে। প্রতিকার কি?

উত্তর : পেট খালি থাকলেই বায়ু হবে, অতএব ঘন ঘন খাবেন এবং বায়ু সম্বন্ধে একদম চিন্তা করবেন না।

প্রশ্ন ৪ : মা বাতে খুব কষ্ট পেয়ে থাকেন।

উত্তর : নুন কম খেতে বলবেন। সহজপাচ্য খাদ্য খাবেন। বহু ভাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। আপনি যে-কোন চিকিৎসকের পরামর্শ চাইলেই বলে দেবেন। (২টি কুপন ছিল)

শ্রীভোলানাথ পাণ্ডে, বেড়িয়া, ২৪ পরগণা—

আপনার মামাকে ডাক্তার দেখান। পেটের ব্যথা কেন হয় বলা খুব মুস্কিল। রোগী পরীক্ষা না করে কোন মতামত দেওয়া যায় না। জনৈক চিকিৎসক বলেছিলেন, এ্যাবডোমেন ইজ এ ম্যাজিক বক্স। ডাক্তারবাবু দেখলেই বলে দিতে পারবেন ব্যথা কেন হয়। তখন তাঁর নির্দেশমত চিকিৎসা করবেন। পেটের ব্যথা নিয়ে হেলাফেলা করবেন না।

শ্রীতাপসকুমার বসু, গারুলিয়া, ২৪ পরগণা—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআনন্দ দাস, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর—

প্রশ্ন ১ : আমার সারা গায়ে গোটা গোটা কি বেরিয়েছে।

উত্তর : মনে হয় স্ট্রেপটোকক্কাস ইনফেকশন। আপনি পাঁচদিন সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি পেনেসিলিন বড়ি খাবেন। এ ছাড়া মালটি-ভিটামিন বড়ি খাবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার মায়ের বয়স ৪৮।৪৯ বৎসর হবে। ওষুধ না খেলে পায়খানা হয় না। আমাশার ভাব আছে।

উত্তর : রোজ রাত্রে ২ চামচ করে কুইনোবেল (স্ট্যাণ্ডার্ড) ভিজিয়ে খাবেন।

শ্রীমতী স্বপ্না ব্যানার্জি, বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া—

প্রশ্ন ১ : বয়স ৩০ বৎসর। ২টি সন্তানের জননী। আজ প্রায় ছ মাস যাবৎ মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, কানের দু'পাশের রগ দুটি ফুলে ওঠে। মাথা ঘুরতে থাকে। মাথার তালু দিয়ে মনে হয় গরম একটা ভাপ উঠছে এবং মাথার তালুতে চাপ বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে বুকে চাপ বোধ, শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং বুকের মধ্যে শিরশির করে। হাঁটতে গেলে পা ভেঙে আসে। উপর পেট জ্বালা করে—

উত্তর : এসব উপসর্গ মিগ্রেন নামক রোগে হয়। রোগটি সারানো বেশ আয়াসসাপেক্ষ। সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা সকাল সন্ধ্যা ফাঁকা বাতাসে দু'ঘণ্টা করে বেড়ান।

প্রশ্ন : বর্তমানে চুল পড়ে যাচ্ছে; আর গজাচ্ছে না।

উত্তর : প্রথম প্রশ্নের জন্যই চুল পড়ে যাচ্ছে। মাথায় স্নানের পর ভাল করে ভিজল তেল মাখতে পারেন।

শ্রীপ্রসাদ (ছদ্মনাম), সোদপুর, নাটাগড়—

প্রশ্ন ১ : মাস ৬।৭ হল আমার ভীষণ মাথা ধরে এবং চোখ বুজে আসে। যখন আমি ৫।১০মিনিট বসে কাজ করে দাঁড়াই, কিন্তু মিনিট-খানেকের মধ্যে সেরে যায়।

উত্তর : এ উপসর্গ প্রায় প্রত্যেকের হয়। এ নিয়ে ভাববেন না। শরীর ভাল হলেই এসব উপসর্গ দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন ২ : প্রায় বছর দেড়েক হল আমার স্তনের ভিতরে চ্যাপ্টা গোল-মতন বস্তু হয়েছে। টিপলে ব্যথা করে।

উত্তর ও বস্তুকে গাইনীকো-ম্যাস্টিয়া বলে। এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। ও জিনিস আপনা থেকেই সেরে যায়।

প্রশ্ন ৩ : এই কিশোরটির বয়স ১৭।১৮; সাধারণতঃ আমি অন্যান্যদের চেয়ে রোগা—

উত্তর : শরীর ভাল করলে সব উপসর্গই চলে যাবে।

প্রশ্ন ৪ : আমার পুরুষাঙ্গের চারধারে এবং কুঁচকিতে চুলকানি হয়েছে—

উত্তর : আপনি দুবেলা Scabalcid মাখবেন, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন। (২টি কুপন ছিল)

● শ্রীমৃন্ময় [illegible], [illegible] রেল, কলি-[illegible]—

আপনি নিয়মিত প্রাগমাটার মলম মাথায় ঘষবেন, দিনে দুবার। প্রথম প্রথম চুল উঠবে, পরে দেখবেন চুল ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। চুল নিয়ে যত চিন্তা করবেন, তত চুল পড়ে যাবে।

● শ্রীশান্তনু নন্দন, দমদম—

আপনার চিঠি পড়লাম। কটা চক্ষু তো কোন রোগ নয়। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 'বিড়াল চোখ' বলে ক্ষেপালেই আপনি ক্ষেপবেন কেন? নেপোলিয়নকেও বেঁটে বলে লোক ক্ষেপাত। সেদিন যদি আপনার মত অভিমান করে আত্মহত্যা করার চিন্তা করতেন, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নাম কোনদিনই প্রকাশিত হত না এবং ইতিহাস অন্যরকমের হত।

● শ্রীমতী দেবশ্রী দে, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, কলি-৬—

প্রশ্ন ১ : বয়স তেত্রিশ। মাসিকের স্রাব অত্যধিক পরিমাণে হইতেছে। কিন্তু পাঁচদিনে চলিয়া যায়। পেটে কোনও যন্ত্রণা হয় না।

উত্তর : প্রাইমোলুট এন ৫ মিলিগ্রামের বড়ি দিনে তিনটে করে মাসিকের দ্বিতীয় দিন থেকে খাবেন। যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন থেকে দশদিন ২টি করে খাবেন এবং ১১ দিন থেকে ২১ দিন পর্যন্ত ১টি করে খাবেন। এইভাবে তিনমাস খাবেন।

প্রশ্ন ২ : মাসিক চলিয়া যাইবার ৩।৪ দিন পর থেকেই সাদা স্রাব সুরু হয় এবং খুব বেশি হয়।

উত্তর : মাসিক নিয়মিত হয়ে গেলে, সাদা স্রাবও কমে যাবে।

প্রশ্ন ৩ : আমার বড় বোন এক বছর হইতে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগিতেছেন। কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন পেট খারাপ হইয়া যায়।

উত্তর : '[illegible]' চা চামচের দু চামচ করে রাত্রে শোবার সময় খাবেন প্রত্যহ অন্তত দু মাস ধরে।

● শ্রীসবীর [illegible], [illegible] ঘাট রোড, নৈহাটি—

আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। নাভিগর উইথ ভিটামিন্‌স্ অ্যাণ্ড কম্‌মেটস্ দুবেলা খাবার পর চা চামচের এক চামচ করে খাবেন একমাস। প্রশ্নটি ছাপলাম না বলে কিছু মনে করবেন না।

● শ্রী পি কে সিকদার, বিধান সরণি, কলি-৬—

প্রশ্ন : আমার মনে সর্বদা একটা ভয়-ভয় ভাব—

উত্তর : ভয় এমন একটি গুণ, যা নিয়ে যত ভাববেন, তত মনে চেপে ধরবে। আমি যা বলবো করতে পারবেন? তা যদি পারেন, তাহলে মন থেকে ভয় কেটে যাবে। অতীতের কথা নিয়ে মন খারাপ করবেন না। ভবিষ্যত নিয়ে একদম ভাববেন না। কে কি বলবে সে বিষয়ে একেবারে তোয়াক্কা রাখবেন না। শুধু বর্তমানের কাজ করে যাবেন, কষ্ট যাই হোক না কেন। দেখবেন, আপনার কমপ্লেক্স দূর হয়ে গেছে।

● শ্রীমাধবী বিশ্বাস, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলি-১৪—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীঅরবিন্দ দাস, টাকাপুরা, মেদিনীপুর—

প্রশ্ন ১ : আমি গত ৪।৫ বৎসর ধরিয়া মুখের ব্রণে ভুগিতেছি—

উত্তর : আপনি (১) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন, (২) ভাজা এবং চর্বিজাতীয় খাদ্য খাবেন না, (৩) সপ্তাহে একদিন শ্যাম্পু করবেন, (৪) মুখে কোন প্রসাধনী মাখবেন না, (৫) দুবেলা খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে লাইসিনেক্স (ঈগল ল্যাবোরেটরীজ) খাবেন দু মাস।

প্রশ্ন ২ : শরীরে লোমকূপের গোড়ায় একপ্রকার জীবাণু, দেখতে ক্যান্সার এর মত—

উত্তর : ক্যান্সার রোগের কোন জীবাণু আবিষ্কৃত হয় নি, তবু ক্যান্সার বিষয়ে সন্দেহ হলে কলকাতায় ক্যান্সার হাসপাতালে দেখিয়ে নিন।

● শ্রীমতী অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়, বহরমপুর,—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● এস এস এস, সিকদারবাগান স্ট্রীট, কলি-৪—

আপনার দীর্ঘ পত্র পড়লাম। অজ্ঞতাবশত আপনি ভয় পাচ্ছেন, ও নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

● শ্রীদীপককুমার, ইন্দা, খড়গপুর—

প্রশ্ন ১ : আমি প্রচুর লম্বা কিন্তু বড্ড রোগা—

উত্তর : আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে 'মেটাটোন' আর খাবার আগে চা চামচের ১ চামচ করে 'নিওগাডাইন' খাবেন।

প্রশ্ন ২ : প্রতিদিন কলগেট টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করি তবু মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় না।

উত্তর : কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক (মিসেস সান্যাল), গয়া, বিহার—

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই Dilatation and Currettage করলে উপসর্গ কমে যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই Preceptine jelly ব্যবহার করতে পারেন তবে পুরনো হলে ব্যবহার না করাই ভাল।

● শ্রীমতী মায়া রায়, সিঁথি, কলি-৫০—

প্রশ্ন ১ : কি করলে ব্রেন আর একটু খুলবে?

উত্তর : মস্তিষ্ককে প্রখর করে তোলার জন্যে চর্চা করতে হয়। বোপদেবের গল্প নিশ্চয়ই জানা আছে। আপনি নিয়মিতভাবে জ্ঞানলাভ করুন, দেখবেন আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক প্রখর হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন ২ : মুখে খুব লোম হচ্ছে—

উত্তর : ভাল চিকিৎসার কথা এখনো খোঁজ পেতে পাই নি। পেলে জানাব।

● শ্রীমতী পিয়ালী ([illegible]), চুঁচুড়া, হুগলী—

প্রশ্ন ১ : সকালবেলায় পায়খানা পরিষ্কার হয়, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে চা বা অন্য কিছু খেলে আবার পায়খানা যেতে ইচ্ছে করে এবং তখন পায়খানা খারাপ হয়।

উত্তর : আমাশার ধাত আছে। Viaquin বড়ি সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি দশদিন খাবেন।

প্রশ্ন ২ : ইদানীং ভাত খাবার পর হাঁসফাঁস করি।

উত্তর : হজমের কষ্ট হয় বলে। আপনি খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে 'গ্লুকাজাইম' খাবেন একমাস।

● শ্রীশচীনকুমার সেন, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। এভাবে চিঠি থেকে প্রশ্ন বার করে নেওয়া আয়াসসাপেক্ষ। প্রশ্নগুলি আলাদা ভাবে দিলে বোঝা যায় আপনি কি উত্তর চান। যাই হোক চিঠি পড়ে মনে হল আপনি অজীর্ণজনিত রোগে ভুগছেন। আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ডায়াপেপসিন (ইউনিয়ন ড্রাগ) খাবেন দু মাস ধরে।

● শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলি-২৬—

প্রশ্ন ১ : আমার চুল ওঠা বন্ধ করার উপায় কি?

উত্তর : স্নানের পর মাথায় প্রাগমাটার মলম এবং হিজল হেয়ার অয়েল ঘষে ঘষে লাগাবেন। একমাস ধরে।

প্রশ্ন ২ : তেল না দিলে কি চুল পাকে?

উত্তর : সম্ভাবনা থাকে।

● শ্রী বি ডি জি, বরাহনগর, কলি-৩৬—

আপনি একদম ভাববেন না। ওটা মনের অসুখ। দেখবেন আপনা থেকেই সেরে গেছে।

● শ্রীপ্রফুল্ল সরকার, সন্তোষপুর, যাদবপুর—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● দুশ্চিন্তা (ছদ্মনাম), [illegible], ২৪ পরগণা—

চুল পড়া সম্বন্ধে এ সংখ্যায় অনেকবার আলোচিত হয়েছে।

● শ্রীরামচন্দ্র, গাকুলিয়া, ২৪ পরগণা-

আপনি রোজ রাতে বেলের সরবৎ অথবা ইসবগুলের ভুসির সরবৎ খান।

● শ্রীরতন সাহা, বি কে পাল অ্যাভেন্যু, কলি-৫—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিস জাতীয় অসুখ শুধু ওষুধে নিরাময় হয় না, এ বিষয়ে বর্তমানকালের চিকিৎসকরা একমত। রোগের যন্ত্রণা থেকে মনের মধ্যে একটা ভীতি জাগে, আর সেই ভীতির প্রভাবে যন্ত্রণা বাড়ে। মনে সাহস আনতে হবে। আমার কি; হয় নি এই ভাব। এ ছাড়া নীচের নিয়মমত খাবার খেতে হবে।

১। প্রথম সপ্তাহে শুধু দুধ —
২। দ্বিতীয় সপ্তাহে দুধ ভাত –
৩। তৃতীয় সপ্তাহে দুধ ভাত আলুসেদ্ধ—
৪। চতুর্থ সপ্তাহে দুধ ভাত আলুসেদ্ধ এবং ডিমসেদ্ধ—
৫। পঞ্চম সপ্তাহে ওপরের খাদ্যের সঙ্গে ডাল ভাত—
৬। ষষ্ঠ সপ্তাহে যা খুসি—

এছাড়া দুবেলা খাবার পর অ্যালুড্রক্স, ক্যাটকিলল অথবা সায়োপেপ্নালিন্ বড়ি খাবেন নিয়মিতভাবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, ইস্ট বেলঘরিয়া, ২৪-পরগণা—

প্রশ্ন : আমার ডানদিকের নাসারন্ধ্রের নীচে, উপরের ঠোঁটে ও নীচের ঠোঁটের তলায় শ্বেতীর লক্ষণ দেখি। ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

উত্তর : আপনি লিভার এক্সট্র্যাক্ট (হোল)—২ এম এল, আই এম, একদিন অন্তর নেবেন— কমপক্ষে ৩০টি ইনজেকশন। দেখুন কমে কি না।

● এস কে এম (ছদ্মনাম), কলি-১০—

প্রশ্ন ১ : আমার স্ত্রীর বয়স ৫০ বৎসর। রোগিণীর মস্তকের অনুদেশ ভয়ানক উত্তপ্ত। সাধারণত গরম বোধ করে। পায়খানা ঔষধ না খেলে পরিষ্কার হয় না। [illegible] পায়ের গাঁটের কাছে পেন হয়।

উত্তর : আপনার স্ত্রীর Menopausal Syndrome হয়েছে বলে মনে হয়। কোন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে Mixogen জাতীয় ওষুধ খেতে দিলেই উপসর্গগুলি কমে যাবে।

প্রশ্ন ২ : আমার কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৩ বৎসর। বামদিকের স্তনের বোঁটার চারধারে বেশ উঁচু একটি 'গ্রোথ'-এর মত হয়েছে। চাপ দিলে ব্যথা করে। ইহার সম্ভাব্য কারণ এবং রেমিডি জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : যৌবনের সন্ধিক্ষণে হরমোনের এলোমেলো ক্ষরণে ওই ধরণের স্ফীতি ঘটে, যাকে ডাক্তারী শাস্ত্রে বলা হয় গাইনীকোম্যাস্টিয়া। এগুলো আপনা থেকেই কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সে মিলিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি নিরাময় করতে হলে অপারেশন করে কেটে বাদ দিতে হয়।

● শ্রীসুধীর কোঁয়ার, বড়বেলুন, বর্ধমান—

প্রশ্ন ১ : খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমি চাই শরীর সুস্থ-সবল হোক।

উত্তর : আপনি দুবেলা খাবার পর Lysinex (ইগল ল্যাবোরেটরীজ) চা চামচের দু চামচ করে খাবেন দু মাস।

প্রশ্ন ২ : আমার ছোট ভাই-এর বয়স ৮।৯ বৎসর। রাতে বিছানায় শুয়ে প্রস্রাব করে।

উত্তর : Tofranil বড়ি সকালে ১টি, রাতে শোবার আগে ২টি করে ১৫ দিন খাইয়ে দেখবেন।

প্রশ্ন ৩ : আমার আত্মীয়া, বয়স ১০ বৎসর। জন্মের পর থেকেই বৎসরে প্রায় ৩।৪ বার মলদ্বারের গায়েই ফোঁড়া হয়।

উত্তর : এ রোগের উত্তর চিঠিতে দেওয়া উচিত নয়। আপনি যতশীঘ্র পারেন চিকিৎসক দেখিয়ে, তাঁর মতামত নিন।

প্রশ্ন ৪ : আমার ভাই, বয়স ২২ বৎসর। প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ পায়ে একজিমা হয়েছে।

উত্তর : Siolan 12—2 ml এবং Placentrex (এ্যালবার্ট ডেভিড) 2 ml সমানভাবে সিরিঞ্জে মিশিয়ে Intramuscular Injection দেবার ব্যবস্থা করবেন একদিন অন্তর। এ ছাড়া Alvite বড়ি (এ্যালেম্বিক) সকালে ১টি, রাতে ১টি খেতে দেবেন একমাস। ইনজেকশন কমপক্ষে ১৫টি নেবেন। (২টি কুপন ছিল)।

● শ্রীমনীশ চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া—

প্রশ্ন : উপসর্গটি হলো—কথা বলার সময় অকারণ হাসি আসা।

উত্তর : এটি দৈহিক রোগ নয়। মনকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে অভ্যাস করতে হয়। কিছুদিন অভ্যাস করুন দেখবেন আপনা থেকেই উপসর্গ চলে গেছে।

● সপমদা, পানাগড়—

প্রশ্ন ১ : আমার কোষ্ঠবদ্ধতা আছে।

উত্তর : রোজ রাতে ইসবগুলের ভুষি খান আর দুবেলা ভাত খাবার পর 'গ্লুটাজাইম' খাবেন একমাস।

প্রশ্ন ২ : শরীরের সামান্যতম উত্তেজনায় বীর্যস্খলন হয়।

উত্তর : এ নিয়ে যত মাথা ঘামাবেন তত আরও বৃদ্ধি পাবে। যে সব উপসর্গের কথা বলেছেন প্রত্যেকটি সাময়িক এবং আপনা থেকেই কমে যাবে।

● শ্রীমতী যোগমায়া দেবী, বহরমপুর—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকাজল চৌধুরী, মালদহ—

প্রশ্ন ১ : আমি বারো মাসই সর্দিতে ভুগি।

প্রশ্ন ২ : আমার পায়ের তলা ও গোড়ালি বারো মাসই ফাটা থাকে।

প্রশ্ন দুটি পরপর দিলাম, কারণ দুটি প্রশ্নেরই উত্তর এক। আপনি সারা বছর নিয়মিতভাবে 'পালমোকড্' (প্লেন) চা চামচের ২ চামচ করে দুবার খাওয়ার পর খাবেন।

● শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ সাহু— কালীঘাট রোড, কলি—২৬

এ সংখ্যায় চুলের বিষয় অনেক আলোচনা হয়েছে।

● শ্রীলালু পাল, হাওড়া— ৪

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা স্বাভাবিক। ও নিয়ে কিছু চিন্তা করতে হবে না। অনায়াসে ব্যায়াম করতে পারেন।

● শ্রীমতী শান্তা ঘোষ, ষষ্ঠীতলা রোড, কলি—১১

আমাদের হাতে চিঠি এসেছে জুন মাসে, যে মাসে কি করে উত্তর দেব? যাই হোক আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীঅজিতকুমার সাহা, বীরশিমুল, বর্ধমান—

প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন, তাই শুধু উত্তর দিচ্ছি। সপ্তাহে একদিনের বেশি করলে শরীর খারাপ হতে পারে। ব্যায়াম যেভাবে করছেন, করে যান।

● শ্রীদামোদর মুখার্জি, রিভারসাইড রোড, বার্নপুর—

রোগের কথায় লজ্জা কি? আপনি বাড়িতে জানিয়ে অপারেশন করিয়ে ফেলুন, নইলে শরীর ভাল হবে না।

শ্রীরাজেন্দ্র রায়, কলিকাতা—

আপনি চারটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, কিন্তু প্রশ্নগুলি এমন যে আলাদাভাবে উত্তর দেওয়ার অসুবিধা আছে। সেইজন্যে একসঙ্গে উত্তর দিচ্ছি।

আপনি পড়াশুনায় মন দিন। বিকেলে খুব ছুটোছুটি করবেন যাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শারীরিক ক্লান্তি এলেই গভীর নিদ্রা হবে। এর মধ্যে আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে 'ক্যাল-সিনল' খাবেন এক মাস।

● শ্রীভদ্রেশ্বর মল্লিক, কুলিয়াপাড়া, হুগলী —

আপনার চিঠিতে আপনার স্ত্রীর রোগ সম্বন্ধে আমার যতদূর মনে হয় রোগটি মৃগী (এপিলেপসি)। এ রোগ সহজে সারবার নয়। আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে পি জি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে দেখান এবং তাঁদের মতানুযায়ী চিকিৎসা করান।

● শ্রীশিবনাথ চ্যাটার্জি, চন্দননগর, হুগলী —

শুধু উত্তর ছাপাতে লিখেছেন, তাই ছাপালাম: আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে 'মেলাটোন' (পার্ক ডেভিস) খাবেন অন্তত দুমাস।

● শ্রীমতী রীণা বসু, জামির লেন, কলি—২৯—

প্রশ্ন : আমার বয়স ২৮ বৎসর। আমি আজ প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর কাশিতে ভুগছি।

উত্তর : আপনি যখন এতদিন ধরে কাশিতে ভুগছেন তখন রক্ত এবং বুকের এক্সরে করিয়ে নিন। যদি কোন দোষ না পাওয়া যায়, তাহলে বুঝবেন গলার ফ্যারেঞ্জাইটিস-এর জন্যে ভুগছেন। দীর্ঘদিন ধরে কাশি ইয়োসিনোফিলিয়ার জন্যও ঘটে। অতএব সঠিকভাবে কি রোগ হয়েছে তার নির্ধারণ না করে চিকিৎসার মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

● শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, ফরিদপুর, দুর্গাপুর —

প্রশ্ন : আমার অম্বল হয়, পায়খানা পরিষ্কার হয় না। শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।

উত্তর : আপনি নিয়মিতভাবে দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে 'গ্লুটাজাইম' খাবেন। আপনি বয়সের উল্লেখ করেন নি। যদি চল্লিশের বেশি হয়, তাহলে পাকস্থলীর বেরিয়াম্ এক্সরে এবং গ্যাস্ট্রিক্ জুস্ অ্যানালিসিস করিয়ে নেবেন।

● শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী, বীরেশপল্লী, মধ্যমগ্রাম—

রোজ দুবেলা খাবার পর ভাল মাজন দিয়ে দাঁত মাজবেন, তারপর 'হাইজিনা গ্রানিউলস্' দিয়ে কুলকুচি করবেন। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় ভিটামিন সি খাবেন। সমস্ত নিয়মগুলি তিন মাস পালন করবেন।

শ্রীবিমল মিত্র

[প্রখ্যাত কথাশিল্পী]

একালের বাঙলা কথাশিল্পলোকের সীমাহীন দিগন্তের পরিধি বিস্তারে যাঁরা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আপন আপন অসামান্য শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছেন সংস্কৃতির ইতিবৃত্তে—বিমল মিত্র তাঁদেরই মধ্যে একটি মুখ্য নাম।

বিংশ শতাব্দীর অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই বাঙলা সাহিত্যের যে গৌরবময় ইতিহাস এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সম্মুখীন হ'ল তার মূলে যে ক'জন সাহিত্যশিল্পীর সাধনা এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার, বিমল মিত্র তাঁদেরই একজন।

১৯১২ সালের ১৮ই মার্চ তাঁর জন্ম। আদি বাড়ী নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফতেপুর গ্রামে। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্রের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ডাক্তার, মধ্যম ইঞ্জিনীয়ার। ১৯২৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আশুতোষ কলেজ থেকে পাশ করলেন আই-এ। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে সফল হলেন স্নাতক পরীক্ষায়। ১৯৩৮ সালে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষাতেও মুখোমুখি হলেন সর্বাঙ্গীণ সফলতার।

১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে অর্থাৎ সারা বিশ্বের দিগন্তচরাচর পরিবৃত করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মরণদামামা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে রেলবিভাগে কর্ম নিলেন বিমলকুমার মিত্র। কর্মসূত্রে সারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়েছে। নানা চরিত্রের তিনি সন্ধান পেয়েছেন। বিবিধ বৈচিত্র্যের পেয়েছেন পরিচয়, সামগ্রিকভাবে এক ব্যাপকতা করেছেন প্রত্যক্ষ—যা পরবর্তীকালে তাঁর লেখক-সত্তায় এক গভীর প্রভাব ও ব্যাপক আবেদন জাগিয়ে তোলে—যার ফলে বাঙলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা পেয়েছেন বহু বিশিষ্ট চরিত্রের সান্নিধ্য,

শ্রীবিমল মিত্র

বহু ব্যাপক বৈচিত্র্যের আস্বাদ। বিমলকুমার যখন ডেপুটি চীফ কণ্ট্রোলারের পদে সমাসীন সেই সময় ১৯৫৫ সালে তিনি কর্মজীবনে ইস্তফা দেন।

সাহিত্যসাধনা সুরু হয়েছে বাল্যকাল থেকেই। ষোল-সতের বছর বয়েস থেকেই সরস্বতীর প্রাঙ্গণের ছাড়পত্র পেয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হ'ল মাসিক বসুমতীতে। একটি কবিতা। বয়স তখন সতের। তারপর সে কালের অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হোত। জীবনের সখই ছিল পুরোপুরি লেখক হওয়ার। লেখক হওয়া ছাড়া আর কোন ধ্যান-জ্ঞান তাঁর ছিল না।

১৯৩৯ সালে কলম গুটিয়ে নিলেন। একটা অতৃপ্তি এর জন্যে দায়ী। লেখা বন্ধ রেখে এই সময়ে অধ্যয়নে একেবারে ডুবে গেলেন শ্রীমিত্র। ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস দুটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালে ধারাবাহিক প্রকাশ পেতে থাকে সাহেব-বিবি-গোলাম। ১৯৫৩ সালে এই উপন্যাস গ্রন্থরূপ লাভ করে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দিনের পর দিন'। ১৯৪৫ সালে এই গ্রন্থটি প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়। সাহেব-বিবি-গোলাম, একক-দশক-শতক, বেগম মেরী বিশ্বাস, কড়ি দিয়ে কিনলাম—এই চারখানি গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙলা দেশে ইংরেজের প্রবেশ থেকে এদেশ থেকে তাদের প্রস্থান পর্যন্ত একটি আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থগুলির স্রষ্টা বিমল মিত্র। তাঁর সামগ্রিক গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশ। ভারতবর্ষের সকল ভাষাতেই তাঁর গ্রন্থ আজ সসম্মানে অনূদিত।

ছাত্রজীবনে সঙ্গীতের অনুশীলনেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানটি তিনি আপন অধিকারে এনে স্বীয়

প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর গাওয়া ও লেখা বহু গানের সে সময় রেকর্ডও হয়েছিল।

১৯৬২ সালে তিনি মতিলাল পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে তাঁর অধিকারে আসে রবীন্দ্র পুরস্কার।

মহানগরীর 'জাস্টিস অফ দ্য পীস'দের মধ্যে তিনিও একজন। এ ছাড়া বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। 'কালিকলম' পত্রিকাটির বর্তমানে তিনি অবৈতনিক সম্পাদক।

তাঁর সামগ্রিক লেখকজীবনে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট প্রভাব তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'শৈলজাবাবুর লেখা পড়েই আমি লিখতে শিখেছি।'

শ্রীরমেন্দ্রমোহন দত্ত

[কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি]

বাংলা দেশে আইনজগতের ইতিহাসে যে ধুরন্ধরদের নাম হিরণ্য অক্ষরে অমরত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উল্লিখিত হয়ে আছে শরৎচন্দ্র দত্ত তাঁদেরই অন্যতম। ১৯০২ থেকে ১৯৪০ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই একটানা আটত্রিশ বছর তিনি যেভাবে আইনজগতের সেবা করে গেছেন তা নিঃসন্দেহে মুঠো মুঠো সাধুবাদের দাবী রাখে। এ্যাটর্নি হিসাবে তাঁর যশ আজও সারা আইনমহলের পরিপার্শ্বে সগৌরবে গীত হয়ে থাকে।

শরৎচন্দ্রের পর তাঁর বংশ থেকে সে ধারা লুপ্ত হলো না। তাঁর বংশ থেকে একাধিক সন্তান আইনজ্ঞ হিসাবেই অর্জন করলেন সাধারণ্যে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা। তাঁরই এক পুত্র রমেন্দ্রমোহন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে আজ যিনি অন্যতম।

শোভাবাজারের দত্তবাড়ীর অন্যতম মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান রমেন্দ্রমোহন দত্ত ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

লেখাপড়া আরম্ভ হল হিন্দু স্কুলে। ১৯৩৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯৪১ সালে স্নাতক হলেন। ১৯৪৪ সালে আইন পরীক্ষাতেও হলেন সফলকাম। ঐ বছরেই অর্জন করলেন অর্থনীতি-শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর উপাধি।

১৯৪৬ সালে পাড়ি দিলেন বিদেশে—সপ্তসাগরের উত্তাল ঊর্মি লঙ্ঘন করে ভারতের উপকূল থেকে উপনীত হলেন খাস ইংল্যাণ্ডে। যোগ দিলেন ইনার টেম্পলে। ১৯৪৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী ব্যারিস্টার হলেন রমেন্দ্রমোহন।

শ্রীরমেন্দ্রমোহন দত্ত

ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে ভারতের ছেলে ভারতে ফিরে এলেন। বাঙলার ছেলে ফিরে এলেন বাঙলায়। সুরু হল ব্যারিস্টারী। আইনজগতে আবির্ভাব হল এক নতুন তারকার। প্রথম জীবনে ইনি সহকারী হয়েছেন একাধিক দিকপাল আইনজ্ঞের। এলিশ মায়ার, বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, পশ্চিম বাঙলার প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল রথীন্দ্রচন্দ্র দেব প্রমুখ দিকপাল আইনজ্ঞদের সহকারী থেকে আপন জীবনেতিহাসকে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছেন।

১৯৫৮ সালে সরকারী কৌঁসুলী (কেন্দ্রীয়) নিযুক্ত হলেন রমেন্দ্রমোহন। আরও ন' বছর পরে তাঁর কর্মময় জীবনের ইতিহাস আর একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সম্মুখীন হল। ১৯৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হলেন।

১৯৪৯ সালে সিংহল পরিদর্শন করেন রমেন্দ্রমোহন। ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন শশিভূষণ সিংহ, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অমলকুমার সরকার, ভারতের পরলোকগত সলিসিটার হেমনাথ সান্যাল, গৌরী মিত্র। বিচারপতি (বর্তমানে) শম্ভু ঘোষ, অমিয়কুমার বসু প্রমুখ আইনজ্ঞবৃন্দ। এ ভ্রমণ কোন কার্যব্যপদেশে নয়—এ ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে অবকাশ যাপনার্থে।

বরাহনগরের সুপ্রসিদ্ধ নাগরিক নারায়ণচন্দ্র দত্তের নাতনী ভক্তি দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ।

আইনের অনুশীলন ছাড়া আলোকচিত্রশিল্পে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। এ বিদ্যাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এই বিদ্যার নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট গভীর। ছোট গল্পেরও. তিনি একজন বিদগ্ধ, বিশ্লেষণধর্মী এবং রসগ্রাহী পাঠ

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল পোদ্দার

[খ্যাতনামা চিকিৎসক]

মানব সমাজের অন্যতম বিরাট অভিশাপ ব্যাধির সঙ্গে যাঁরা চিকিৎসা-বৃত্তির মাধ্যমে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত, মানবদেহকে সর্বপ্রকার রোগ থেকে শতহাত দূরে রাখার সাধনায় যাঁরা তদ্গত চিত্ত, মানুষকে সুস্থ, সবল, সতেজ রাখার স্বপ্নে যে জনদরদী চিকিৎসকদের সমস্ত মনপ্রাণ সমাচ্ছন্ন, সেই তালিকায় ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল পোদ্দার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আজকের দিনের বাঙলা দেশে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য এবং প্রতিভা দেশের চিকিৎসক সমাজের একটি প্রথম সারির আসন তাঁর অধিকারে এনে দিয়েছে।

চিকিৎসাবিদ্যা অনুশীলন উত্তরাধিকারসূত্রে। বাবা স্বর্গত ডাঃ যদুলাল পোদ্দারও ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। আদি বাড়ী ছিল পাবনা জেলার নিশ্চিন্তপুরে। ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন যদুলাল। ১৯১৭ সালের ৩রা মার্চ দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম।

১৯৩২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা থেকেই ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানে প্রাকস্নাতক পরীক্ষায়ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তারপর এলেন কলকাতায়। ১৯৪২ সালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে হলেন স্নাতক। ১৯৪৫ পর্যন্ত কাজ করলেন ইডেন হাসপাতালে হাউস সার্জেন ও রেজিস্ট্রাররূপে।

বিদেশ গেলেন ১৯৪৫ সালে। উদ্দেশ্য চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর অধ্যয়ন ও তৎসম্পর্কিত উপাধি অর্জন। বিদেশে থাকাকালীন তিনি লণ্ডন থেকে এফ আর সি ও জি এবং এডিনবারা থেকে এফ আর সি এস উপাধি লাভ করে বাঙালী ছাত্রসমাজের তথা সারা বাঙলার মুখ বিদেশে উজ্জ্বল করে স্বদেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে এলেন ১৯৪৭ সালে। দেশে ফিরে এসে পুরোনো কর্মস্থল

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল পোদ্দার

ইডেন হাসপাতালেই আবার যোগ দিলেন। ভিজিটিং সার্জেন, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসার, প্রফেসার প্রভৃতি পদসমূহ অলঙ্কৃত করলেন। আট বছর ধরে যুক্ত রইলেন এই হাসপাতালে। তারপর ১৯৫৫ সালে তিনি নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অবসটেট্রিকস এ্যাণ্ড গায়নোকলজির ডিরেক্টর-প্রফেসর নিযুক্ত হন। এখনও সেই পদে তিনি সসম্মানে সমাসীন।

অবসটেট্রিক্স ও গায়নোকলজির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন তা যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই মূল্যবান। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর জ্ঞান এবং ধারণা যে কত গভীর ও প্রগাঢ় তার প্রমাণ তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী—যা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক নতুন চিন্তাধারা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হিসাবে তাঁকে অভিহিত করলেও বোধ করি, অত্যুক্তি হয় না।

১৯৬৬ সালে ডাঃ পোদ্দার প্রধান নিযুক্ত হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেণ্ট অফ অবসটেট্রিকস এ্যাণ্ড গায়নোকলজি, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিনের।

চিকিৎসক হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও এবং সময়ের একটি দীর্ঘায়তন অংশ চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলনে ব্যয়িত হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রের লোকহিতকর কার্যাদিতেও আছে তাঁর প্রবল অনুরাগ এবং অকুণ্ঠ সমর্থন। অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তিনি আপন জাতীয় কল্যাণকামী মনের এক প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

ডাঃ পোদ্দারের সহধর্মিণী শুধু সংসার বা গার্হস্থ্য বা সামাজিক জীবনেই স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী নন, কর্মজীবনেও তিনি স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী। খ্যাতনাম্নী চিকিৎসিকা ডাঃ শ্রীমতী নীলা পোদ্দার, এম বি, ডি এম, সি, ডবলিউ দ্বিজেন্দ্রলালের সহধর্মিণী।

শ্রীপ্রশান্তকুমার সুর

[কলকাতার বর্তমান মেয়র]

১৯২৪ সালে অর্থাৎ আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কলকাতার মেয়র পদটির সৃষ্টি হল, এই আসনে প্রথম অধিষ্ঠিত হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তারপর এই দীর্ঘ সময়ে (মধ্যভাগে কেবল পাঁচটি বছর ছাড়া) একের পর এক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য কৃতবিদ্য যশস্বী পুরুষ এই আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একটি ধারার সৃষ্টি হল। সেই বছরই অর্থাৎ সেই ১৯২৪ সালেই তাঁরও জন্ম হল যিনি বর্তমানে এই আসনটির অধিকারী। পৌরসভায় নিরঙ্কুশ কংগ্রেসী অধিকার যে-বছর প্রতিষ্ঠিত হল সেই বছর তাঁরও জন্ম হল—যিনি পৌরসভার পঁয়তাল্লিশ বছরের একটানা কংগ্রেসী আধিপত্যের অবসান

ঘটিয়ে যে অকংগ্রেসী শাসন সুরু হল, সেই ধারার প্রথম পৌরপাল।

মহানগরীর বর্তমান মেয়র শ্রীপ্রশান্ত-কুমার সুর জন্মেছেন মাতুলালয়ে চট্টগ্রামে—বাঙলার বীরপ্রসবিনী চট্টল বা বেদে উল্লিখিত চট্টভূমিতে। সুরে-দের আদিনিবাস নোয়াখালি। পিতৃদেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার সুর। গ্রামে মাইনার পর্যন্ত পড়ে শহরের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন (১৯৩৮), আই এস-সি পাশ করলেন কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে। ১৯৪২ সালে পাশ করলেন বি-এ। কলকাতায় এসে ইতিহাসে এম-এ এবং ল' পড়া সুরু হল। ১৯৪৫ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সাফল্যের মুখোমুখি হলেন।

তার আগেই কর্মজীবন সুরু হয়ে গেছে। ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাই বিভাগে সাব-ইনসপেক্টরের চাকরী নিলেন। অফিস সেক্রেটারী হলেন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাঁটাইয়ের তালিকায় তাঁর নামটাও দেখা গেল। গভর্নমেণ্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের প্রোপাগ্যাণ্ডা সেক্রেটারীর পদটিও তাঁরই অধিকারে ছিল। ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ যেদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রথম আইডেণ্টিটি কার্ডের প্রবর্তন হল সেইদিনই স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের কক্ষের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় সাঙ্ঘাতিকভাবে লাঠি পেটার মাধ্যমে গ্রেপ্তার বরণ করেন। আলিপুর, প্রেসিডেন্সী, দমদম, বক্সার, মেদিনীপুরের জেল-গুলিতে প্রায় দু' বছর কাটানোর পর ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি লাভ করলেন। ফিরে এসে টালি-গঞ্জের নেতাজীনগর কলোনীতে বস-

শ্রীপ্রশান্তকুমার সুর

বাস সুরু করেন। ১৯৫৩ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল আইন ব্যবসায় করেন তবে রাজনৈতিক এবং জনকল্যাণকর কার্যাবলীর সঙ্গে বিশেষ-ভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় আইন ব্যবসা তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করতে হয়।

১৯৫৩ সালে টালিগঞ্জ কলিকাতা পৌরসভার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হ'ল ১৯৫৪ সালে টালিগঞ্জে প্রথম পৌর উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই উপ-নির্বাচনে জয়ী হলেন প্রশান্তকুমার। পৌরসভার সঙ্গে সেই তাঁর সংযোগ স্থাপিত হল।

এর বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন প্রশান্তকুমার এবং বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার ও কারাবরণ করেছেন। টালিগঞ্জ অঞ্চলে বহু ট্রেড ইউনিয়ন তিনি গঠন করেছেন। আপন অঞ্চলে একাধিক স্কুল-কলেজ স্থাপন করে সেগুলির সঙ্গে কর্ণধার হিসাবে যুক্ত আছেন। যুব সংগঠন, শিক্ষা বিস্তার, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের অন্ত নেই। এ জাতীয় কাজে তিনি বরাবরই অগ্রণী।

পৌরসভায় কাউন্সিলার হিসাবে তাঁর প্রবেশ। বরো কমিটির চেয়ারম্যান আসনেও তিনি সমাসীন ছিলেন। বিরোধীদলের নেতা হিসাবেও তাঁকে দেখা গেছে। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত পৌরনির্বাচনে তিনি যখন জয়লাভ করলেন তখন তিনি কারাভ্যন্তরে।

১৯৫৭ সালে শ্রীমতী সন্ধ্যা সুরকে তিনি পত্নীত্বে বরণ করেন। শ্রীমতী সুর বিজ্ঞানের (উদ্ভিদ) স্নাতকোত্তর উপাধির অধিকারিণী এবং শিক্ষণ-বিষয়ক স্নাতক পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণা। বর্তমানে তিনি শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজের অধ্যাপিকা।

নিরুচ্চার

সন্তোষকুমার অধিকারী

সব আশা শেষকালে নিরুচ্চার হয়ে পড়ে থাকে—
বিস্তৃত জীবনে ক্লান্ত উচ্ছ্বাসের ফেনা ছেঁকে ছেঁকে
অবশিষ্ট গ্লানির উদ্‌গার ;
ব্যর্থ একদিন পার হয়ে শেষ প্রান্তরের ছায়া।

অথচ যাদুর খেলা অনেকেই জানে।
জানে, দীর্ঘ দড়িটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে
সেই দড়ি বেয়ে উঠে যেতে।
ঝুঁকে পড়ে মন তাই দেখে ; মোহগ্রস্ত আশার তাড়িত,
বার বার দড়ি ছোঁড়ে,
ছোঁড়ে আর শূন্যে চেয়ে দেখে ;

অথচ এ-হাতে তার সে-যাদুর ছোঁওয়া নেই,
বিচিত্র কৌশলও নেই,
অলৌকিক ভাগ্য তাকে করুণা করে না। —

সকালে রোদের মুখ হঠাৎ চমক—
দিয়ে উঠেছিল,
আকাশে ঝলকানো ছিল নীলে ও সাদায় ;
তারপর বিষণ্ণ শ্রাবণ, দিন, কোড়োহাওয়া, জল ;
হারিয়েছে সকালের মুখ,
অপরাহ্নে উদ্দিপন আঁধার।

নিরুচ্চার হৃদয়ের কথা ॥

প্রীতি-উপহার

শ্রীঅরুণ গাঙ্গুলী

এ[illegible] যোগিতায় হেরে মনের দুঃখে ডাক্তারী বিদ্যায় উচ্চশিক্ষার নাম করে চলে গেলাম সাগরপারে। কোনদিন আর এ দেশে ফিরবার ইচ্ছাও ছিল না। নেহাৎ ভাইদের সঙ্গে একটা বৈষয়িক ব্যাপারের নিষ্পত্তি করবার বিশেষ দরকার পড়ায়, দীর্ঘ বছর আটেক পরে আসতে হলো আবার সেই কলকাতায়, সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে।

প্রবাসে থাকতে দ্বিতীয়া প্রণয়িনী সুলেখার কথা প্রায়ই মনে পড়ত। আচ্ছা মেরে বাবা। আমাকে প্রায় এক বছর হাতে রেখে খেদিয়ে শেষে কিনা ছট করে বিয়ে করল কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী এবং সোসাইটিম্যান হেম মিত্রকে। হেম মিত্রের বয়স কম করে সুলেখার থেকে বছর কুড়ি বেশী হবে—তার উপর আবার দোজবর! সুলেখার মা'র কথা মনে হলে মাথা গরম হয়ে যায়। একবার সুলেখার জন্মদিনে অনেক কেউকেটার সঙ্গে আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র হাসপাতালে হাউস-সার্জেন। বাড়ীর অবস্থাও ভাল না। এদিকে সুলেখার প্রেমে পড়ে গেছি। কি করি—ডজন দুই লাল গোলাপ এবং সাদা রজনীগন্ধার একটি তোড়া নিয়ে গেলাম—তা দেখে সুলেখার মা কটাক্ষ করেছিলেন, বেশ অপমানিত মনে করেছিলাম এবং দূরছাই বলে ফিরে আসলাম—কিন্তু সুলেখা সেদিনকার অস্বস্তিকর আবহাওয়া হাল্কা করে আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গেই পরিচিত করে দিয়েছিল। যাক সেসব পুরানো স্মৃতি অনেকদিন ধুয়েমুছে গেছে, অনেক বান্ধবী পেয়েছি এবং ওসব কথা আর মনেও আনতে চাই না।

যা হোক উকিলের বাড়ীতে কাজ সেরে শীতের সন্ধ্যায় রাসবিহারী এভিনিউ ধরে হেঁটেই বাড়ী ফিরছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই আমার পুরানো "ফ্লেম" সুলেখা রাসবিহারী এবং গড়িয়াহাটার রোডের এক দোকান থেকে কিছু জিনিষ কিনে তার গাড়ীর দিকে এগোচ্ছে। এই আট বছরে বদলায় নি বিশেষ—চেহারার জৌলুষ প্রায় সেইরকমই আছে। এত কাছাকাছি এসে পড়েছি যে পাশ কাটিয়ে যাওয়া মুস্কিল এবং সুলেখাও আমাকে দেখেছে বুঝতে পারলাম, তাই বেশ সাধারণভাবেই বললাম—আরে সু যে—আছ কেমন? অনেক সওদা করেছ দেখছি, ব্যাপার কি?

উত্তর না দিয়েই সুলেখার প্রশ্ন।

—আরে প্রশান্তদা যে। কবে এলে? আমি ত' শুনেছি তুমি আমেরিকাতেই সেটল্ করেছ, অঢেল টাকা রোজগার করছো, নিউ আলিপুরে জমি কিনে পেল্লাই বাড়ী করে ভাড়া দিয়েও মোটা টাকা পাচ্ছ এবং—

—আরে তোমাকে এত খবর দিল কে?

—কে আবার দেবে—দিয়েছেন তোমার সহপাঠী ডা: দিলীপ সেন, উনি আমাদের 'ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান' কি না? ডা: সেন বলেছেন যে, তুমি নাকি আমেরিকায় এত রোজগার কর যে, মাঝেমাঝে ৪।৫ হাজার করে টাকা পাঠিয়ে নিউ আলিপুরে বড় বাড়ী করেছো আর সেখানে নাকি তুমি কেডিলাকে চেপে বেড়াও—

—এ একটা বেশী কিছু না—সেখানে প্রায় সকলেরই গাড়ী আছে—আমার রোজগারও ভাল—তাই মনে করেছিলাম যে, সারা জীবন বিদেশে না থেকে শেষ জীবনটা এখানে কাটাব—যখন কোন কাজকর্মের ভিতরে নেই কোন একটি ছোট যায়গায় থাকব এবং ঐ বাড়ীর ভাড়া দিয়ে চালাব, যাক আমার কথা—এখন তোমার কথা বল—

—কি বলব?

—যথা ছেলেপুলে পতিদেবতা ইত্যাদি---

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস আস্তে চেপে রইল—ভালই আছি, ছেলেপুলের ঝামেলা নেই। আমার জন্মদিন পরশু, তাই কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছি। 'আচ্ছা প্রশান্তদা' বলে একটু এগিয়ে এসে খপ করে আমার হাতটা ধরে বলল—তোমাকে নিমন্ত্রণ করবার আর আমার মুখ নেই—আমার জন্মদিন আমাদের বাড়ীতে হচ্ছে, তোমাকে যদি বিশেষ মিনতি করে বলি তবে তুমি আসবে কি? আর কোন ভবিষ্যৎ জন্মদিনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ বোধ হয় হবে না। অতীতের দিন ভুলে একটিবার আসবে কি?

আমি বললাম দেখ সু—এই আট বছরে পৃথিবী বদলেছে অনেক। আমিও বদলেছি এবং আবার আমাদের কখনও দেখা হবে কি না—ঠিক নেই। তাই পরশু পর্যন্ত যখন এদেশে আছি তখন নিশ্চয়ই যাব তোমার বাড়ীতে কিন্তু একটা সত্ত্বে। অতীতে এইরকম একটি সমাবেশে আমি খুবই ব্যথা পেয়েছিলাম। তাই এবার আমার উপহারটি আগে তোমাকে দেখিয়ে পছন্দ করে তবে সেটি পরশুদিন তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। কাল বেলা দুটো-তিনটের সময় কোথায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে বল।

একটু ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা—নিউ মার্কেটে আমার কিছু কিনবার আছে —আচ্ছা, যদি তোমার সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটের 'এম্বার' রেস্তোরাঁয় দেখা করি—তবে হবে? কিন্তু বেশী সময় থাকতে পারব না—বোঝই তো।

পরদিন যথাসময়ে এবং যথাস্থানে বসে কফি খাচ্ছি, দেখি—সুলেখার আবির্ভাব হচ্ছে। সাজগোজটা একটু উগ্র। এবার দেশে এসে দেখছি যে

এই সামান্য বছর আটেকে আমাদের মেয়েদের রুচি কি রকম বদলেছে; নাভিটি বার করে শাড়ী পরাকে আমি অতি কুরুচি বলে মনে করি। মার্কিন মুলুকে 'বিকিনী'-পরিহিতা বহু মেয়ে দেখেছি; কিন্তু আমাদের দেশে এরকমটি কেন যেন আমার ভাল লাগে না। প্রথম যৌবনে মেঘদূতের পর্বমেঘে পাচ্ছি—

'নারী যথা পতিধনে নাভি দেখাইয়ে ইঙ্গিতে বাসনা তার জ্ঞাপন করয়ে'

—ইত্যাদি

—কিন্তু 'পতিধন'কে দেখাবার কথা এবং স্থান-কালও থাকার কথা। তবে আজকালকার বহু ললনা কি যত্রতত্র এবং সকলকেই ইঙ্গিতে বাসনা জ্ঞাপন করতে ব্যস্ত। থাক, কালিদাস থাক, এই যে সুলেখা আমাকে দেখতে পেয়ে আমার টেবিলের কাছে চলে এসেছে। বহুদিন পরে আবার দু'জনে বেশ কাছাকাছি বসলাম।

কফির অর্ডার দিয়ে বললাম—সু! তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

সু তো কটাক্ষ হেনে বলল—আহা, তাই নাকি?

আমি অফিসে আসবার আগেই পার্ক স্ট্রীটের এক বিখ্যাত জুয়েলারের কাছ থেকে একটি দামী হীরের পেনডেণ্ট একটি সরু সোনার দড়িতে বাঁধা, কিনে পকেটে করে এনেছিলাম।

বাক্সটি খুলে সামনে ধরতেই সুলেখার মুখটা আনন্দে এবং লোভে অন্যরকম হয়ে গেল, সে আমার আরো কাছে এসে দু'হাতে আমার হাতটা জড়িয়ে নিজের গলাটা বাড়িয়ে বলল—দাও প্রশান্তদা, তুমি এটা পরিয়ে দাও—কি চমৎকার তোমার রুচি এবং কি সুন্দরই না জিনিষটা, আমি ভাবতেই পারছি না যে, এরকম একটা সুন্দর জিনিষ আমার হবে—এর দামও বোধহয় অনেক হবে, কি বল প্রশান্তদা?

—তা হবে—বলে সাড়ে সাত হাজার টাকার ক্যাশমেমোটা সুলেখার হাতে দিলাম, ও যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না।

গলাটা আরো এগিয়ে দিয়ে বলল—কৈ প্রশান্তদা দাও—পরিয়ে দাও তোমার হাতে—দিলাম পরিয়ে।

সুলেখা তার ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বার করে যে কতরকম পোজ দেখতে সুরু করে দিল, তার ঠিক নেই। অবশেষে বলল—আচ্ছা প্রশান্তদা, তুমি এত টাকা হুট করে খরচ করে বসলে?

একটু ভেবে বললাম—দেখ সু—সে একদিন ছিল যখন ১৫০৲ মাসিক বেতনের হাউস স্টাফ ছিলাম—একটি পয়সাকে একটি টাকা মনে করতাম। কিন্তু আজ আমার অবস্থা বেশ সচ্ছল। যথেষ্ট রোজগার করি, তাই—যখন তোমাকে একটা উপহার দেবার সওকা এসে গেল, তখন, যাতে তুমি খুসি হও তাই করলাম।

আমাদের হাত ধরাই ছিল। হঠাৎ দেখি সুলেখার মুখের ওপর একটা কালো ছায়া এসে পড়েছে—তাই একটু শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম——কি হয়েছে সু, অসুস্থ বোধ করছ না কি?

—না প্রশান্তদা, একটি কথা মনে হওয়াতে আমার সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। তোমার এ সুন্দর জিনিষটা আমি ব্যবহার করতে পারব না—তুমি তো জান আমার পতিদেবতার কি রকম সন্দেহবাতিক এবং উনি তোমাকে চেনেন, যখনই জানতে পারবেন যে এত দামী উপহার তুমি দিয়েছ তখন যা-তা সন্দেহ করে বসবে—হয়ত বা কোন নোংরা মন্তব্যও করে ফেলতে পারে। প্রশান্তদা আমার জীবন যে কি সুখের তা তোমরা কেউই বুঝবে না। তিনি থাকেন সব সময় নিজের কাজে, আমার সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ—সেই রাত্রে শোবার সময়, কিন্তু আমি যদি কোন বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যাই তবে হাজার প্রশ্ন। অর্থাৎ কারো কাছে আমার যাওয়া চলবে না। বাড়ীতে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে, আমাদের দু'জনার বয়সের এত তফাৎ, তাছাড়া কোন ছেলেমেয়ে আমাদের নেই—যারা আমাদের দুজনের মধ্যে সেতুর কাজ করবে। সোজা কথা হচ্ছে আর্থিক সচ্ছলতা প্রচুর কিন্তু মনের শান্তি নেই একটুও।

আমি একটু ভেবে বললাম—তাই তো তোমার পতিদেবতা যে এত বেরসিক, এই সোজা কথাটা আমার মাথার মধ্যে আসে নি, বয়েসের ব্যবধান বেশী হলেই যে মনের মিল হবে না এরকম কোন কথা নেই। থাক্ তুমি তোমার পতিদেবতাকে বল না কেন যে, তুমি মাসের খরচ থেকে বাঁচিয়ে এবং তোমার হাতখরচের একটি নয়া-পয়সা খরচা না করে সেই টাকা দিয়ে এটি কিনেছ।

মাথা নেড়ে সু বলল—তুমি জান না প্রশান্তদা, আমার পতিদেবতা কিরকম কৃপণ। দৈনিক খরচা হিসেব করে সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা দিয়ে থাকেন, ব্যবসায়ী লোক—হিসেবে গরমিল হবার উপায় নেই এবং আমার হাতখরচের জন্য মাসিক বরাদ্দ মাত্র ২০০৲ টাকা তা দিয়ে ৭।৮ হাজার টাকার গয়না কেনা অসম্ভব, কিছুতেই উনি বিশ্বাস করবেন না, বরঞ্চ সন্দেহ বেশী হবে,—না প্রশান্তদা, তোমার উপহার আমার যে কি পছন্দ হয়েছে তা বলতে পারব না, কিন্তু নিয়ে লাভ নেই। বাক্স-বন্দি করে রেখে দিলে গয়নার সার্থকতা কোথায়? তুমি বরঞ্চ যেখান থেকে কিনেছিলে সেখানেই ফিরিয়ে দাও।

আমি বললাম—দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও, কোন আমেরিকান ফন্দি মাথায় আসে কিনা দেখছি—এই বলে টপাটপ্ ২।৩ কাপ কফি খেয়ে বললাম, সু—আমার মাথায় একটা হাইক্লাস ফন্দি এসেছে, তোমার প্রৌঢ় সন্দেহ-বাতিক পতিদেবতা একেবারে 'ফ্ল্যাট' হয়ে যাবে। আমি ঐ জুয়েলার ফার্মের মালিক মিঃ মাধানীকে খুব চিনি, তা ছাড়া কিছু ফালতু টাকা পেয়ে সে সব কিছু করতে রাজী হবে, তাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বলব। তারা এ গয়নাটা কাল বিকেলে ৬টার সময়ে তাদের 'শো-কেসে' রেখে একটি কার্ড ঝুলিয়ে দেবে। তাতে লেখা থাকবে—জাপানী, পাথরের তৈরী। 'দাম মাত্র ৫০০৲ টাকা' তুমি তোমার বৃদ্ধ বন্ধুকে বলবে, তুমি এইমাত্র এই গয়নাটা দেখেছ এবং উনি যেন তোমা

জন্মদিনে এটি কিনে উপহার দেব। সবাই খুসী হবে। তুমি হবে—কারণ পছন্দমতন গয়না তুমি পাবে, তোমার কঞ্জুস খুসী হবেন কারণ মাত্র ৫০০৲ টাকায় রেহাই এবং সব শেষে আমি—কারণ, আমি তোমাকে আনন্দ দিতে পেরেছি। এই কায়দার কথা আমি এবং তুমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।

সব ঠিক—কায়দামাফিক কাজও হয়ে গেল। মিত্রসাহেব এরকম একটা সুন্দর জিনিষ ৫০০৲ টাকায় পেয়ে মহা খুসী। সুলেখা তো আনন্দে আটখানা।

বাড়ী ফিরবার মুখে মিত্রসাহেব সুলেখাকে বললেন—এরকম সুন্দর জিনিষ—এটা আমি আমার এক পরিচিত 'এন্‌গ্রেভার'-এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার আমার নাম এবং তারিখ খোদাই করে দেবে।

মিত্রসাহেব চলে গেলেন, সুলেখাও বাড়ী ফিরে গেল। প্রশান্তর কায়দা এরকম সুন্দরভাবে হবে, তা ধারণাই করতে পারে নি। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল যে, বোধ হয় কোন সন্দেহ দেখা দেবে এবং হেম মিত্র একটা অঘটন করে ফেলবে—কিন্তু কিছুই হলো না। না, প্রশান্তের মাথায় কিছু আছে। আহা বেচারাকে আগে পাত্তা দিই নি—কি করব, একটা 'স্ট্রাগলিং' ডাক্তারের সঙ্গে নিজের জীবন চিরকালের জন্য বেঁধে দিতে পারি না। হেম মিত্র বৃদ্ধ বটে, কিন্তু টাকা আছে অঢেল—একেই বলে মেয়েদের নিরাপত্তা। অবশ্য প্রশান্ত এখন বেঙ্গায় বড়লোক তাছাড়া আমেরিকায় থাকে, দেখতেও সুন্দর চেহারা, বয়সও কম না: এসব সাত-পাঁচ ভেবে এখন মন খারাপ করে লাভ নেই—যা হবার তা হয়ে গেছে কিন্তু এত বছর পরেও যে প্রশান্ত তার উপর এত অনুরক্ত, মনে করলেও প্রাণটা কেমন করে ওঠে—নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসে, আমার চেহারার আকর্ষণীয় শক্তি এখনও আছে প্রচুর। সুলেখার মনটা আজ আনন্দে ভরপুর, সে অনেক দিন পরে গুন্‌গুন্‌ করে গান করতে শুরু করে দিল।

রাত ন'টায় হেম মিত্রও খুসী মনে শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকল—সুলেখা কাছে এসে তার হাত দুটো হেম মিত্রের কাঁধের উপর রেখে বলল—কোথায়, দেখি কি রকম খোদাই হলো আমাদের নাম।

মিত্রসাহেব কিন্তু লম্বা সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—সত্যি সুলেখা তুমি বড়ই পয়মন্ত। আমি তো তোমার পেনডেণ্ট নিয়ে আমার পরিচিত খোদাইকারের কাছে গেছি—সেখানে এক বুড়ো জহুরীও ছিল তার কোন কাজে। সে গয়নাটি খুব্‌ নেড়েচেড়ে দেখে বেজায় তারিফ করল এবং জিনিষটি খুবই সাচ্চা বলে রায় দিয়ে দামটা জিজ্ঞাসা করল—আমি যখন বললাম যে এ হচ্ছে নকল জাপানী হীরে এবং দাম মাত্র ৫০০৲ টাকা।

ব্যাটা আঁতকে উঠে 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' দিয়ে আলোর কাছে নিয়ে তাকে পাকা ১৫ মিনিট ধরে দেখে বলল—মশায় আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন — আমি ৪০ বছর এই ব্যবসায় আছি, আমার হীরে জহরৎ সম্বন্ধে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ৪০ বছরেও যদি নকল আর সাচ্চা পাথর চিনতে না পারি তবে আমি জহুরীই না—এবং এই কথা প্রমাণ করবার জন্য আপনার এই নকল পাথরের গয়নাটি যা আপনি ৫০০৲ টাকায় কিনে এনেছেন তাই আমি এই মুহূর্তে ৫০০০৲ টাকায় কিনে নিতে চাচ্ছি—কি আপনি রাজি?

রুদ্ধশ্বাসে সুলেখা শুনছিল। চিৎকার করে বলল—যাক ঐ ব্যাটাকে বেচে দাও নি তো? ধাপ্পাবাজ নচ্ছার।

মিত্রসাহেব প্রচণ্ডভাবে আত্মতুষ্টির হাসি হেসে বললেন—আরে সুলেখা আমি হচ্ছি পাকা ব্যবসায়ী লোক। একঘণ্টা আগে কলকাতার অতি অভিজাত অঞ্চলের একটি বড় জুয়েলার যে গয়নাটি নকল পাথরের বলে মাত্র ৫০০ টাকায় বেচে দিল সেই জিনিষটাই আর এক বুড়ো পাগল ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন জহুরী ৫০০০৲ টাকায় কিনে নিতে চাচ্ছে তার মানে সে আরো দামে বিক্রী করবে নিশ্চয়ই—যা হোক আমি এক মিনিট দেরী না করে দিলেম পাগল বুড়োটাকে ৫০০০৲ টাকায় বেচে। বাস্‌ আচমকা আজ সন্ধ্যায় ভাল ব্যবসা হয়ে গেল—এই বলে ব্যাগ থেকে ১০০৲ টাকার পাঁচখানা নোট বের করে বলল—এই নাও তোমার ৫০০৲ টাকা, তোমার পছন্দমতন যে-কোন জিনিষ কিনে নিও এবং বাকি ৪৫০০৲ টাকা আমার বাণিজ্য-একে ব্যাঙ্কে রেখে দেব কাল সকালে।

সাহস আছে, ইচ্ছে হয়, তবু—

[illegible]

সাহস আছে তোমাকে নিয়ে হারিয়ে যেতে পারি
স্বপ্নের দেশ অথবা কোন নীল সাগরের বুকে
সাহস আছে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি
[illegible] শহরে, বন্দরে, গঞ্জেতে।

উর্মিমুখর মনের দ্বীপে সবুজ পাতা দোলে
চাওয়া পাওয়ার দৃষ্টিতে আর অসীম উদারতা
থাক না জেগে, যেহেতু মন একান্ত নির্ভয়ে
নতুন চেতনার মূল্য মোহে বিভ্রান্ত নীড়ে।

ইচ্ছে হয় তোমার কাছে ফিরে
শান্ত চোখে নিজের ছায়া দেখি;
ইচ্ছে নেই—আমার অধিকারে
হাত বাড়াবে অন্য এক বেনামী মন।

সাহস আছে, ইচ্ছে হয়, তবু—
সাহস নেই
ইচ্ছেও নেই
যখন দেখি তোমার মন শেকল দিয়ে বাঁধা।

॥ খেলাধুলা ॥

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অলিম্পিকে

চেকোশ্লাভের মেয়ে ওলগা পুরো নাম ওলগা ফিকোটোভা। যেমন কমনীয় রূপ তেমনি যৌবনদীপ্ত দেহভঙ্গিমা। চোখ দুটোতে বিশ্ববিজয়িনীর হাসি। স্বদেশে ছেলে-মেয়ে সকলের মুখে-মুখে ওলগার খ্যাতি। এমন ডিসকাস-ছোড়া মেয়ে দেশের গৌরব। বিদেশের মাটিতে এ মেয়ে সে-গৌরব আরো বৃদ্ধি করবেই। ক্রীড়া পরিষদ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ওলগাকে বিদেশে পাঠান হোক।

১৯৫৬ সাল। ওলগা এল মেলবোর্ন অলিম্পিকে। তাঁকে ঘিরে দেশের কর্মকর্তাদের অনেক আশা। অলিম্পিকের স্থান থেকে ওলগা একটা স্বর্ণপদক অন্তত ছিনিয়ে আনবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হল বিপরীত। তাঁর হাতের নিক্ষিপ্ত লৌহবল ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনতে পারল না কোন স্বর্ণ বা রৌপ্যপদক। তার নিজের দেশের লোকেরা হতাশ হল। কিন্তু ওলগার লক্ষ্য ব্যর্থ হোল না। তিনি অন্য আর

ক্রীড়ারসিক

একটি বিষয়ে জয়ী হলেন। মেলবোর্ন স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাহিরের হাজার হাজার দর্শক বা ক্রীড়ানুরাগী কারোও দৃষ্টি সে দিকে গেল না। ওলগার ভালবাসার বাঁধনে আবদ্ধ হলেন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী অলিম্পিকের স্বর্ণপদকজয়ী হ্যামার থ্রোয়ার হ্যারল্ড কনোলী। এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে চেকের কর্মকর্তারা উভয়ের এই রোমান্সকে চাপা দেবার খুবই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অলিম্পিকের এই দুই খ্যাতনামা বীরকে লালফিতার বাঁধনে আবদ্ধ রাখা গেল না। বিবাহবন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ হলেন।

এইবারে মেক্সিকো অলিম্পিকে যাবার আগে কনোলী বলেছিলেন, এইটাই তাঁর জীবনের শেষ অলিম্পিকে যোগদান। এর পূর্বে ১৯৬০ সালে রোমে ও '৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে তাঁরা উভয়েই যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর কনোলী স্থির করেছিলেন তাঁরা উভয়েই ডিসকাস অথবা হ্যামার ছোঁড়া কোন বিষয়েই যোগ দেবেন না। ক্যালিফোর্নিয়ার কালভার সিটিতেই চারটি শিশুসন্তানকে নিয়েই তাঁরা অবসর বিনোদন করবেন।

কিন্তু শেষে ওলগার ইচ্ছায় কনোলী যোগ দিলেন মেক্সিকো অলিম্পিকে। কিন্তু নিজের ও দেশের সম্মান কি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। দু'বছরের মধ্যে কোন রকম অভ্যাস নেন নি বা নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অনুশীলনও করেন নি। ওজনও কমে গেছে দশ পাউণ্ড। গত জানুয়ারী মাস থেকে পুনরায় অনুশীলন করতে শুরু করলেন। মনোবল দৃঢ় করলেন। বয়সের কথা ভুলে গেলেন।

তবে দু'জনে একসঙ্গে কখনো ট্রেনিং নিতে যান নি। স্বামী স্ত্রী পালা করে যান ও ছেলে মেয়েদের দেখাশুনা করেন একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন। শুধু হ্যামার থ্রোই নয় দৌড় ও ভারোত্তলনও হ্যারল্ড নিয়মিত করে থাকেন। এবং সেটি শুধু শরীর সুগঠিত রাখা এবং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা ছাড়াও বিশেষ সম্মান অর্জন করার জন্য প্রস্তুতি।

'৬৯ সালের গোড়াতে অপেশাদার এ্যাথিলেটরা লঙ্‌ বীচে জমায়েত হয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন এবং ২২৪ ফট ৯ ইঞ্চি দূরত্বে

অলিম্পিক বিজয়ী হ্যারল্ড কনোলী হাতুড় নিক্ষেপ করছেন

ছুঁড়েছেন। [illegible]

কলেজে যে প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাতে ২৩৩ ফুট ৯'৫ ইঞ্চি ছুঁড়েছিলেন। তখন সেইটাই ছিল বিশ্বরেকর্ড। সেটা ছিল ১৯৬৫ সালের গোড়ার কথা। কিন্তু পরে হাঙ্গেরির গুইলা ২৪১ ফুট ১১ ইঞ্চি ছুঁড়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। কনোলী বললেন, আমার সঙ্গে গুইলার বিশেষ পরিচয় আছে। মেক্সিকোর মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হবে।

মেক্সিকোর উচ্চতাকে কনোলী কোন আমলই দেন নি, এর জন্যে এ্যাথলেটদের কোন অসুবিধা হতে পারে, এ চিন্তাও মনের মধ্যে আনেন নি। তবু নিজেকে আরো শক্তিশালী করার জন্য তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার লেক টাহোয়ে সবচেয়ে উঠে কিছুকাল অনুশীলন করে গিয়েছিলেন। তারা উভয়ে অলিম্পিকে যোগদানের জন্য গেলে ঠিক হল ছেলেমেয়েরা থাকবে তার মায়ের কাছেই। ওলগার পিতামাতা ১৯৬৪ আমেরিকায় এসে তাদের বাড়ী থেকে মাত্র একমাইল দূরে বসবাস শুরু করেন। ওলগা একটি কিনিস সংবাদপত্র 'অস্লেটি'র নিজস্ব সংবাদদাতা ছিলেন অবশ্য স্পোর্টস সংক্রান্ত ব্যাপারে। এবং অলিম্পিকের যত খবরাখবরও তিনি সরবরাহ করতেন। ১৯৬২ সালে যখন কনোলী একটি সরকারী বৃত্তি নিয়ে ইংরাজী সাহিত্যে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে দু'বছরের জন্য তাসপিরে যান সেই সময় ওলগা এই চাকুরীটি গ্রহণ
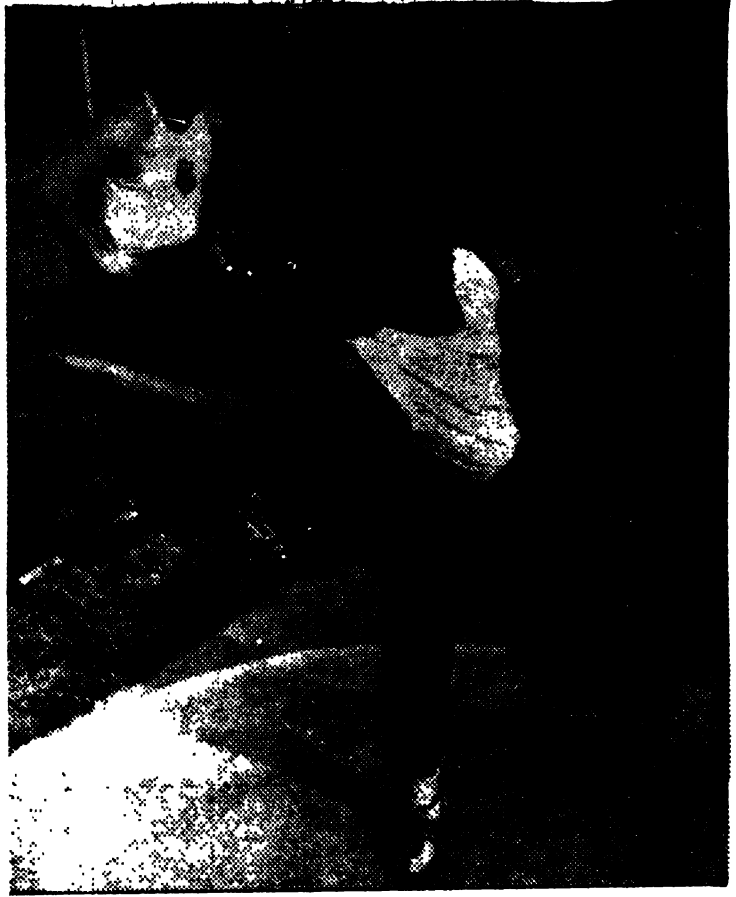
অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ওলগা কনোলী ডিসকাস ছোঁড়ার অনুশীলনরত। পাশে তাঁর স্বামী অলিম্পিক বিজয়ী হ্যারল্ড কনোলী গভীর আগ্রহসহকারে তা লক্ষ্য করছেন

করেন। কনোলী বস্টন কলেজে থাকাকালীনই হাতুড়ি ছোঁড়ার শিক্ষা ও কৌশল ইত্যাদি তাঁর কোচের কাছ থেকে একটু একটু করে জেনে নেন।

কনোলী ৩৫ পাউণ্ডের গোলা ৭১ ফু: ২'৫ ই: দূরত্বে ছুঁড়ে আমেরিকায় তার নিজস্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। কনোলীর দৈহিক ওজন ছিল ২১৫ পাউণ্ড। কিন্তু অলিম্পিকের সময় যে ওজন ১০ পা: কমে যায়। কনোলী বর্তমানে সাণ্টামনিকা হাই স্কুলের ইংরাজী সাহিত্যের একজন শিক্ষক। অবসর সময়ে ছেলে-মেয়েদের দেখা ছাড়াও স্ত্রী ওলগার অনুশীলনের সময় উপস্থিত থাকেন এবং যথাযথ নির্দেশও তাকে দিয়ে থাকেন।

একটি মুহূর্ত

শ্রীরমানন্দ ব্রহ্মচারী

একটি মুহূর্ত।
ভাল-মন্দ একটা কিছু ঘটেছিলো
সে আজ বিচার্য নয়।

কিন্তু যাবে কি প্রত্যয়
যদি বলি—
সে কাকলি
হয়ে আছে সমুদ্রের চেয়ে স্মরণীয়।
বুদ্বুদ ফেটে যাবে,
কিছুই র'বে না আঁকা আকাশ কিংখাবে।

তাহলেও এর চেয়ে সত্য আর আশ্চর্য কি আছে—
আর কোনো রঙই যে ধরে না পলাশে।
পলাশও ফুরিয়ে যাবে?
যায় যাক।
মুহূর্ত হয়তো তার সুনাম হারাবে—
তবু সে অনন্ত সুধা অদৃষ্টে নির্বাক।

মাছি আপনার শত্রু—এদের জন্মাতে দেবেন না

শ্রীননী ভট্টাচার্য ([illegible], পশ্চিমবঙ্গ)

সামান্য ছোট্ট কয়েকটা মাছি খাবারের উপর বসেছে। হাত নেড়ে সেগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার সেই খাবার খাচ্ছি। রাস্তাঘাটে, খাবারের দোকানে অহরহ কত মাছি খাবারের উপর বসছে, কিন্তু, একবারও ভেবে দেখছি না, এই ক্ষুদ্র মাছি মানুষের কী সাংঘাতিক ক্ষতি করতে পারে। মাছি বসা খাবার খেলে অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মাছির জন্ম হ'ল মল, পচাফল, আবর্জনা, গোবর ও আস্তাকুঁড় প্রভৃতি নোংরা জিনিষের মধ্যে। মাছি তার লোমশ শরীর ও পা নিয়ে সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সব নোংরা জিনিষের উপর। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা, যক্ষ্মা, হুপিং কফ, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত লোকের মল, বমি প্রভৃতির উপর বসে মাছি তার খাদ্য সংগ্রহ করে। ফলে, তার লোমশ গায়ে লেগে থাকে এই সব সংক্রামক রোগের জীবাণু।

মাছি শক্ত জিনিস খেতে পারে না। তাই কোন খাবারের উপর ব'সেই মাছি বমি ক'রে, তারপর পা দিয়ে তাকে নরম করে নেয়। ফলে, মাছির গায়ে ও পায়ে যে নোংরা লেগে থাকে, তা' সেই খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। তাছাড়া খাওয়ার সময় মাছি তার খাবারের উপরেই মলত্যাগ করে, সেই মলে থাকে অসংখ্য রোগ-জীবাণু। তাই মাছি যে খাবারের উপর বসে তা রোগ-জীবাণুর দ্বারা দূষিত হয়ে পড়ে। আর ঐ মাছি বসা খাবার খাওয়ার জন্য যে অসুখ করে, তা সহজেই বোঝা যায়।

গ্রীষ্মের পরে বর্ষা সুরু হলে, এই সময়টাতেই এখানে ওখানে জমা আবর্জনা বেশ পচে ওঠে, এই নোংরাতেই মাছির জন্ম আর এই সময় মাছির ডিমও তাড়াতাড়ি ফোটে, তাই মাছির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্য প্রতি বৎসর এই সময়টাতে ১লা জুলাই থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত আমরা 'মাছি ধ্বংস করুন' সপ্তাহ পালন করি। এই সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হ'লো জনগণ যাতে মাছি সম্বন্ধে সচেতন হন এবং মাছি যাতে না জন্মায় সে সম্বন্ধে যেন যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

বর্ষার স্তূপীকৃত আবর্জনা যখন পচতে আরম্ভ করে, তখন মাছি সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং ঐ আবর্জনার উপরই ডিম পাড়ে। অনিষ্টকর মাছির বংশবৃদ্ধি ঘটে অত্যন্ত দ্রুত।---একটি স্ত্রী মাছি এক একবারে এ'কশ থেকে দেড়শ মাছির জন্ম দেয়। একটি স্ত্রী মাছি এইভাবে তার একমাসের জীবনে ছয়শ' থেকে নয়শ' পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। ডিমগুলি এত ছোট থাকে যে, খালি চোখে দেখাই যায় না। ডিম থেকে প্রথমে পোকার মত শিশু মাছি বের হয়, তার রং সাদা এবং দেখতে ছোট্ট লম্বা ধরণের। এই পোকার কোন পা থাকে না। অনেক সময় বেশ পাকা বা মজা ফল, পচা গোবর প্রভৃতির মধ্যে ঐ ধরণের পোকা দেখা যায়।

শ্রীননী ভট্টাচার্য

প্রায় পাঁচ দিনের মধ্যে এই ছোট্ট পোকার রূপ পরিবর্তন হয়। সাধারণত ৮ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ডিম থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ মাছি জন্ম নেয়। মাছির এই দ্রুত বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের সব সময় সচেতন থাকা দরকার। মাছি জন্মাতে না দেওয়াই মাছির হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায়। এজন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

গ্রামাঞ্চলে মাছি না জন্মানোর ব্যবস্থা নিতে হলে প্রথমেই সচেতন হতে হবে মাঠে, ঘাটে, যেখানে-সেখানে মলত্যাগ না করার ব্যাপারে। গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরীর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যদি মাঠে মলত্যাগ করার দরকার হয়, তবে মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেবার অভ্যাস করতে হবে। গোবর বা আবর্জনা গর্ত করে জমিয়ে মাটি চাপা দিলে একদিকে যেমন মাছিও জন্মাবে না, অন্যদিকে সারের কাজও হবে। বাড়ির আশে-পাশে বিশেষ কর রান্নাঘরের ধারে যেন জল, আবর্জনা না জমে থাকে। গোয়াল ঘর, হাঁস-মুরগীর আস্তানা প্রভৃতি সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

সহরে নর্দমা বা ডাস্টবিন থাকা সত্ত্বেও আশে-পাশে ও যেখানে-সেখানে নোংরা ফেলা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বস্তী অঞ্চলগুলিতে যেখানে-সেখানে নোংরা স্তূপাকার হয়ে জমে থাকে তাতে জন্মাতে থাকে, অসংখ্য মাছি--এ'তো আমরা সব সময়ই দেখতে পাচ্ছি। কলকাতা ও হাওড়ার মত বড় সহরেও রাস্তার রাস্তার স্তূপীকৃত আবর্জনা জমে

উঠেছে, বাজার-হাট প্রভৃতি অঞ্চল-গুলিও অত্যন্ত নোংরা। অবশ্য একটু সতর্ক হলে এমনভাবে নোংরা জমে ওঠে না।

বাড়ির সব জঞ্জাল ও আবর্জনা মুখঢাকা টিনে জমা করে, পরে নির্দিষ্ট জায়গায় বা ঝাড়ুদারের গাড়ী এলে তাতে ফেলে দিতে হবে। আমরা অনেকেই নিজের বাড়ি-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি, কিন্তু বাড়ীর আশপাশ নর্দমা প্রায়ই পরিষ্কার রাখি না। অথচ সে সমস্ত জায়গাতেই মাছি জন্মায় এবং বাড়ীর খাদ্য, পানীয়, বীজাণুদুষ্ট করে তোলে। মাছি বিনাশের জন্য মাঝে মাঝে রান্নাঘরে ও খাবার ঘরের দেওয়ালে ডি-ডি-টি, পাইরেথ্রাম, গ্যামাকসিন প্রভৃতি কীটনাশক ওষুধ ছড়াতে পারেন এবং মেঝেতে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে দিতে পারেন। মাছি বিনাশের জন্য আঠা কাগজও ব্যবহার করতে পারেন। আঠা কাগজের আঠাতে মাছির লোমশ পা এবং পাখা আটকে যায়, তাকে মেরে ফেললেই হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ পর্যন্ত শুধু গ্রামাঞ্চল নয় সহর অঞ্চলেও আমরা খাটা পায়খানায় সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারিনি। সহরবাসী হিসাবে আমাদেরও সহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

রান্নাঘর ও খাবার ঘরের ভার গৃহিণীদের হাতেই থাকে, কাজেই তাঁরা মাছি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হবেন। যে কোন রান্না করা খাবার, কাটা-তরিতরকারী, দোকানের খাবার ও ফল সব সময় ঢেকে রাখবেন। কাটা তরিতরকারীর খোসা বা পরিত্যক্ত অংশ, রান্নাঘরের পরিত্যক্ত বস্তু বা জঞ্জাল, খাবার ঘরের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাবার প্রভৃতি একটি ঢাকা টিনের মধ্যে রেখে সময়মত নির্দিষ্ট জায়গায় বা ঝাড়ুদারের গাড়ী এলে ফেলে দিতে হবে। কেউ খেয়ে গেলে তক্ষুণি তা পরিষ্কার করবেন। শিশুদের খাবার তৈরির ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান হবেন। শিশুরা যাতে বাজারের মাছি-বসা কাটা ফল বা মিষ্টি খাবার না খায় সেদিকে নজর রাখবেন।

শিশুদের যেখানে সেখানে মলত্যাগ করতে দেবেন না; যদি বা করে তবে তা তক্ষুণি ভাল করে পরিষ্কার করে দেবেন। যে খাবারের দোকানে কাচের আলমারীর মধ্যে খাবার থাকে না সেখান থেকে খাবার কিনবেন না। মনে রাখতে হবে, একটি ক্ষুদ্র মাছি খাবারের সঙ্গে সংক্রামক রোগের লক্ষ লক্ষ জীবাণু মিশিয়ে আপনার পরিবারের সকলকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে আমাদের নোংরা আবর্জনা যাতে না জমে সেদিকে নজর দিতে হবে। সব সময় করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আবর্জনা, তরি-তরকারীর খোসা, পচা ফল, ফলের খোসা সব সময়ই আমরা বিনা দ্বিধায় রাস্তায় ছুড়ে ফেলি, একবার ভাবিও না যে কিছুক্ষণের মধ্যে এগুলির উপর মাছি বসবে, মাছি জন্মাবে। এই খারাপ অভ্যাসের ফলে পথচারীরা দুর্ঘটনায়ও পড়তে পারেন। বাড়ীতে কোন রোগী থাকলে তার মলমূত্র, কফ, থুথু, সব সময় মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে, তা না হলে সেখানেও মাছি বসে অন্যত্র রোগ-জীবাণু বয়ে বেড়াবে। এ সব কথা স্মরণ করে মাছি যাতে না জন্মায় সেদিকে সতর্ক হওয়ার মধ্যেই রয়েছে এ সপ্তাহ পালনের সার্থকতা।

মনে রাখতে হবে, নোংরাতে মাছি জন্মায়, মাছি সংক্রামক রোগ ছড়ায়, একে জন্মাতে দেবেন না। মাছি যাতে না জন্মায় সে ব্যাপারে যদি আমরা নজর রাখি তবেই আমরা মাছির হাত থেকে রক্ষা পাবো। এ-বিষয়ে প্রত্যেকের সচেষ্ট হতে হবে, মাছি জন্মানোর পর ধ্বংসের চেয়ে যাতে না জন্মাতে পারে সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী এবং পরিষ্কার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে—তবেই এই সপ্তাহ পালন সার্থক হয়ে উঠবে।

কাক ও ময়ূরপুচ্ছ

মায়ালতা রায়

"ময়ূরের ডানা ঝিলিমিলি,
কত রঙ তাতে জ্বলে,
বৃথা এ জনম! কাক আমি,
নাহি ত' তাদের দলে।
সৃজিলেন মোরে বিধাতা যে
কাল কাক রূপ দিয়ে,
জীবনের যত ব্যথা মোর
এই অভিশাপ নিয়ে।"
শিখীর পুচ্ছে সাজে নিজে,
কেকারব নাহি জানে।
কাকের কঠোর স্বর, হায়,
বিধিলিপি বলে মানে।

ময়ূরের সাথে করে কেলি,
নাহি রয় আর খেদ,
সুখে দিনগুলি যায় চলি,
শেষে হয় তার ছেদ।
শিখী ঝিরিঝিরি বরষায়
নাচিছে পেখম ধরে,
বিধাতার বর স্মরে যেন
শিখীর পেখম 'পরে।
কেকারব শুনি করে ধ্বনি
কাক নিজ 'কা কা' স্বরে,
ভুল ভাঙে যে ময়ূরের,
দেয় তাড়ায়ে দূরে করে।

নিজের কুলায়ে ফিরে শেষে,
চিনিতে পারে না কেহ;
বিষাদে সে ফিরে দেশে দেশে,
নাহি আর তার গেহ।
অপরে আদরে বরে যেরে,
করে যে ঘৃণা আপনে;
ত্যজিয়া তাহারে সবে যায়,
কাঁদে সে সাথী বিহনে।

॥ ইন্দ্রসেন ॥

"শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া তাহারে অকৃপা করি॥"

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

(শেষাংশ)

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পতন হয়েছে। তিনি এক্ষণে আহতাবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ। বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি শংকরও পিঞ্জরমধ্যে বন্দী। মহারাজা মানসিংহ যশোহরের রাজপুরী দেখতে দেখতে যেন বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। পুরীর অভ্যন্তরে কেউ নেই। শূন্য পুরী যেন খাঁ খাঁ করছে। মনুষ্য নাই বটে, তবে দ্রব্যাদি যেমনকার তেমনি আছে। উজীর মানসিংহ দলীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দিলেন,—রাজগৃহ লুণ্ঠন করা হউক। লুটের মাল তোমরা যাহা ইচ্ছা লও। কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তাদি যাহা আছে তাহা আমার সমীপে আনয়ন কর।

মানসিংহ নগদ একশত কোটি টাকা ও সুপ্রচুর মণি, মুক্তা প্রবালাদি স্বয়ং গ্রহণ করলেন। বললেন,—অদ্যই আমি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করবো। আমার সহ যাবে প্রতাপাদিত্য ও শংকরের দুই লৌহপিঞ্জর।

অস্ত্রাঘাতে আহত ও জর্জর শংকরের কথায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মানসিংহ বললেন,—শংকর, তোমার কী অভিপ্রায়? আর কী যুদ্ধের বাসনা পোষণ কর?

পণ্ডিতবীর মহাপ্রাণ শংকর বললেন,—প্রতিজ্ঞা করছি মহারাজা, আর কখনও বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।

মানসিংহ বললেন,—শপথ গ্রহণ কর শংকর।

শংকর বললেন,—ইষ্টদেবীর নামে শপথ গ্রহণ করছি। আর কখনও অস্ত্রধারণ করবো না।

মানসিংহ হৃষ্টচিত্তে বললেন,—তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি এখন কোথায় যেতে চাহ?

শংকর বললেন,—স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করতে চাই। ততঃপর গঙ্গাবাস উপলক্ষে গঙ্গার নিকটবর্তী বারাসাত গ্রামে সপুত্র বসবাস করবো।

পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত করলো রক্ষক-প্রহরী। শংকর বিদায় গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধের শেষ দিনে প্রাতঃকালে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য প্রসন্ন-হৃদয়ে দেবীর মন্দিরে গমন করে মহামায়ার স্তবপাঠ ও পূজা করেছিলেন। তিনি করুণকণ্ঠে বললেন,—হে ত্রিজগৎপূজ্যে, কাত্যায়নি, শিবে, দুর্গে, মহিষমর্দিনি, শরণ্যে, গিরিরাজসুতে, জগন্মাতঃ, আপনার শরণ লইলাম। শত্রু বিনাশ করিয়া জয় প্রদান করুন। অজ্ঞান ও মোহবশতঃ অপরাধ করিয়া থাকিলেও হে কালিকে আমাকে ক্ষমা এবং সর্বপ্রকার ভীতি হইতে রক্ষা করুন।

শিলাময়ী স্তব শ্রবণ করে বিমুখ হলেন।

মহারাজা পুনর্বার স্তব করলেন,—হে অনাদ্যে, পরমাবিদ্যে, প্রধানপুরুষেশ্বরি, প্রাণাত্মিকে, উত্তমা, উন্মত্তভৈরবি, উম্মুক্তকোশি, সর্বহিতৈষিণি, জয়া, জয়ন্তি, জননি, জলরূপা, জন্মনাশরহিতা, কালি, জগন্ময়ি, জগজ্জননি, সৌম্যা, দ্বৈতরহিতা, ব্রহ্মরূপিণি, নীলকণ্ঠের মনোরমা, আপনাকে প্রণাম। আমি মৃত্যুভয়ে ভীত নহি, প্রাণ অর্পণ করিলাম। শ্রীপাদপঙ্কজে স্থান ও নির্বাণ প্রদান করুন।

তদনন্তর মহারাজা প্রতাপ সূর্যকান্তকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়ে বললেন,—সূর্যকান্ত, অদ্য যুদ্ধে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হবে। অতএব আমার মরণান্তে তুমি কী করবে বল।

সূর্যকান্ত প্রতিজ্ঞা করলেন,—মানসিংহকে বিনষ্ট করে যশোর রক্ষা করবো, নতুবা সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করবো।

রাজপুত্রকে আহ্বান জানালেন প্রতাপ। বললেন,—উদয়াদিত্য তোমার কী অভিলাষ?

কুমার উদয়াদিত্য বললেন,— শত্রু বিনাশ করবো।

অতঃপর মহারাজা ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। অশ্বে আরোহণপূর্বক, অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করে নক্ষত্রগতিতে অশ্ব ছুটালেন। কী ভাবলেন কে জানে, আপন প্রাসাদের সম্মুখে একটিবার দাঁড়ালেন। অশ্ব হতে অবতরণ করলেন। প্রাসাদে প্রবিষ্ট হলেন। তখন প্রভাতকাল।

সম্মুখে মহিষীকে দেখে প্রতাপ বললেন,—প্রিয়ে, আজ শেষ দিন। বিদায় দাও। যেন জন্মান্তরে আবার তোমার সহ মিলিত হতে পারি।

পদ্মিনী ছল ছল চক্ষে, কাঁদ কাঁদ মুখে বললেন,—দেব, আজ যে আপনি এই দাসীকে এমন কথা শুনাবেন তাহা আমি পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছি। গত নিশীথে আমি স্বপ্ন দেখেছি—

প্রতাপ বাধা দিয়ে বললেন,—থাক, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আর শুনে কাজ নাই। আমি আপন মন দিয়াই তাহা বুঝেছি। ভাবিতব্য, যাহা হওয়ার তাই ঘটতে চলেছে। প্রিয়তমা, দুঃখ করিও না—সকলই সেই মহামায়ার খেলা। তাঁর মায়ামুহূর্তে, এতদিন

একটা সুখের স্বপ্ন দেখে ছিলাম। আজ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, মা-ও অন্তর্হিত হয়েছেন।

পদ্মিনী স্থিরচক্ষে, অবিকম্পিতকণ্ঠে বললেন,—এখন দাসীর প্রতি কি অনুমতি হয়? সেই শেষ-সংবাদ শোনার পরও কী আমায়—

প্রতাপ বললেন,—হাঁ, মায়ের খেলা অতি বিচিত্র। শেষ পর্যন্ত না দেখে তোমার তো কিছু করণীয় নাই।

পদ্মিনী বলেন,—তারপর?

প্রতাপ বললেন,—তারপর? তুমিই স্থির করিও। তুমি সতীসাধ্বী বীররমণী। শেষের সেই বিহিত অনুষ্ঠান তোমাতেই সম্ভবে। যদি শুন, বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য চির-অস্তমিত হয়েছে, ভবানীর বরপুত্র জীয়ন্তে মরেছে, তবে যমুনার অতল জলে ডুব দিও, আর উঠিও না। তুমি একা নহে মহিষী, আমার যে-যেখানে আছে, আমার নামে যারা গৌরব করে, সেই নয়না-নন্দদায়িনী চিরকল্যাণীগণ, কোলের শিশুটিকে বুকে লয়ে যেন হাসতে হাসতে তোমার অনুবর্তিনী হয়! বজরা প্রস্তুত রইল, সকলকে লয়ে তুমিও প্রস্তুত হও। অশুভ সংবাদ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মাঝ-যমুনায় গিয়া বজরার তলদেশ ফুটা করে দিও। আর, আর যদি শুন মা যশোরেশ্বরী মুখ তুলে চেয়েছেন, বঙ্গ-দেশ চিরস্বাধীনতা লাভ করেছে, তবে মঙ্গল শঙ্খনিনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করে, আনন্দে চারি-পাল তুলে বজরা লয়ে তীরে উঠিও। ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিও। নিজের পরিধের বস্ত্রটি রেখে আর সব বিলিয়ে দিও; মায়ের ইটের মন্দির সোনা দিয়া মুড়াইয়া দিও। কিন্তু শুভে! সেই শুভ মুহূর্ত আর কী আসবে? সেই সোনার স্বপ্ন আর কী ফলবে? সতী, কাঁদিও না, চোখের জল মুছে ফেলো। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাকে ডাকিও। মা, দয়াময়ী, পরমেশ্বরী!

প্রতাপের চক্ষু থেকে দর দর বেগে জল ঝরতে থাকে।

তৎপর সেই নীরব ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বীর-বীরাঙ্গনার শেষ আলিঙ্গন। সে আলিঙ্গনে উভয়ের বুকের ভিতর সমুদ্র-মন্থন হতে লাগলো। মুহূর্তকাল এইভাবে কাটলো।

এইবার প্রাণময়ী পদ্মিনী প্রাণস্পর্শী বাক্যে বললেন,—তবে যাও প্রাণেশ্বর, সেই শত্রু নিধনে। শত্রুরক্তে মাতা পৃথিবীকে তর্পণ করতে করতে, যেন তোমার বীরগতি—

দুঃখের হাসি ফুটলো মহারাজার মুখে। হাসি-কান্নার এক অপূর্বস্বরে তিনি বললেন,—হাঁ, এরূপ কথাই তোমার মুখে শুনতে চাই। প্রিয়ে, তোমাকে ধর্মপত্নীরূপে লাভ করেছি বলেই বিধাতা আমাকে বঙ্গাধিপের উচ্চ-আসনে স্থান-দান করেছিলেন।

কথার শেষে মহারাজা বিদায় গ্রহণ করলেন।

বীরবেশে সুসজ্জিত কুমার উদয়াদিত্য মাতৃপদে প্রণাম জানাতে এলেন। প্রণাম-শেষে বলেন,—মা, বিদায় দাও। আজি-কার যুদ্ধে যদি জয়যুক্ত হই মা যশোরেশ্বরীর সোনার মন্দির নির্মাণ করবো।

পদ্মিনী নীরবে, প্রাণের ভিতরে একটু হেসে কেঁদে পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করলেন।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য জানতেন না যে, তাঁর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ক্রোধে ও আক্রোশে বেশ কয়েকজন স্বদেশদ্রোহী পাপিষ্ঠ মানসিংহের সহ মিলিত হয়েছিলেন। জানতেন না যে, তাঁর গৃহছিদ্র প্রকাশ করতে এবং তাঁর নীতিজাল ছিন্ন করতে কয়েকজন মহাপাপী বদ্ধপরিকর হয়েছে। জানতেন না যে, তাঁর পরমারাধ্যা জননী-জন্মভূমিকে, এই সোনার বাঙলাকে মোগলহস্তে সঁপে দেওয়ার জন্য কয়েকজন হীনমতি নরপশু অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তিনি যখন নিশ্চিন্তমনে পূর্ব-উদ্যমে সম্মুখ-যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেইক্ষণে কয়েকজন সয়তান বিবিধ ষড়যন্ত্রে তাঁর স্বদেশ-স্বাধীনতারূপ দেবগৃহ ভেঙে দিতে উদ্যোগী হয়েছে।

মানসিংহ যখন অগণিত সৈন্যসহ বঙ্গের চাপড়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন দারুণ বর্ষা উপস্থিত। পথ, ঘাট, হাট, মাঠ—সব জলে ভরে গিয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের বড়ই অসংস্থান। সৈন্যগণের মধ্যে কী খাই, কী খাই রব পড়ে গেছে।

মানসিংহ নির্দিষ্ট পরিমাণে যে রসদ সঙ্গে এনেছিলেন, স্থলপথে স্থানে স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করে আসতে বিলম্ব হওয়ায়, ক্রমেই তা ফুরিয়ে আসে। তখন মানসিংহ মহা চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবতে থাকেন, নিজেই বা কী খাই, আর সৈন্যগণকেই বা কী দিই। একবার ভাবলেন, ফিরিয়া যাই। আবার ভাবলেন, না তাহা হয় না। পরক্ষণে ভাবলেন, তবে কী এই অগণিত সৈন্য-সামন্তাদি লইয়া না খাইয়া মরিব? উত্তরে আবার তখনই স্বগতোক্তি করলেন, আচ্ছা, আরও কয়েকটা দিন দেখা যাক। দেখি, ভবানন্দ মজুমদার কী করতে পারে।

সত্যই সেই স্বদেশদ্রোহী ভবানন্দই তাঁর এই বিপদে সহায় হল।

সেই দুর্বৃত্তই গোবিন্দদেবের মূর্তিপ্রতিষ্ঠার ভাণ করে, লক্ষাধিক কাঙ্গালী-ভোজনের অছিলায়, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আদেশ-পত্র লয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই পর্বতপ্রমাণ নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে ফেললেন। এবং বলা বাহুল্য, দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে, মহাপাপী, সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তাঁরই যোগ্য ইষ্টদেবতা মানসিংহের চরণে উপহার প্রদান করে কৃতার্থ হলেন।

এই নিদারুণ দুঃসময়ে, খাদ্যাভাবে যখন সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেছে, যখন বঙ্গবিজয়ের আশা আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হতেছে, সেই সময়ে মানসিংহ তাঁর ভক্তের নিকট থেকে এই আশাতীত ভোজ্যদ্রব্য পেয়ে অপার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন। সাদরে ভক্তকে আলিঙ্গন করে বললেন,—মহাভাগ, অগ্রে কার্য উদ্ধার করি। তোমার পুরস্কার আমার হৃদয়ে গাঁথা থাকলো।

একদিকে ভবানন্দ, অন্যদিকে ঘরভেদী বিভীষণ কচু রায়, মূর্তিমান প্রতিহিংসা রূপরাম বসু সহ অহরহ মানসিংহের কর্ণ-মূলে ইষ্টমন্ত্র দিতেছেন। তাই পুনঃপুনঃ বলতে ইচ্ছা হয়, এই অস্ত্রত্রয় একত্র না হলে, কার সাধ্য বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করতে সমর্থ হতো।

অধিকন্তু যশোরেশ্বরী শিলাময়ী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা ছিলেন। হঠাৎ রাত্রি মধ্যে তিনি পশ্চিমাস্যা হলেন। সকলেই বলতে লাগলো

[illegible]র জন্য প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হয়ে বিমুখী হলেন। কুকীর্তি আর কিছুই নয়, বসন্ত রায়কে হত্যা।

কেহ কেহ বলেন, প্রতাপ এক রাত্রে মানসিক ক্লেশ নিবারণের আশায় মধুপান করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকতে পারলেন না। সুরার উত্তেজনায় তিনি শীঘ্র সকল কিছুই ভুলে গেলেন। মহিষী পদ্মিনীর সহিত ক্রীড়া ও কৌতুকে রাত্রি অতিবাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এমন সময়ে এক দিব্যবস্ত্রপরিধানা দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়শী দিব্যাঙ্গনা তাঁদের কেলিগৃহে প্রবেশ করে মহারাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন।

প্রতাপ মনে করলেন, হয়তো কোন ভ্রষ্টা রমণী। কামনার জ্বালায় অধীরা চঞ্চলা। মহারাজা সক্রোধে বললেন,—তুমি এই মুহূর্তে রাজপুরী পরিত্যাগ কর', নচেৎ—

কঠোর বাক্য শুনে ষোড়শী বললেন,—মহারাজা প্রতাপাদিত্য, আমি সত্যপাশ থেকে মুক্ত হয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমাকে কটুবাক্য শুনাইলে, কাজেই তুমি আর আমার অনুগ্রহলাভের যোগ্য নহ।

আবার অন্যরূপ ঘটনাও শোনা যায়।

প্রতাপাদিত্য একদা রাজসভায় ব'সে আছেন। এ হেন সময়ে তাঁর ষোড়শী কন্যা বিন্দুমতীর আকার ধারণ করে মহামায়া ছলনা করতে এসেছিলেন। কন্যা রাজসভায় এসে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্য মহারাজার অনুমতি প্রার্থনা করে তাঁর অপমান করেছে ভেবে প্রতাপ কন্যাকে বললেন,—দূর হও।

তজ্জন্য মা ভবানী সত্যপাশ হতে মুক্ত হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন।

যাই হোক, বোঝা যায়, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরদত্ত শক্তির অপব্যবহার না করে, ততক্ষণ ঈশ্বর তাঁকে অনুগ্রহ করে থাকেন। ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনগণের উপর অত্যাচার করলে ঈশ্বরানুগ্রহলাভে বঞ্চিত হতে হয়। ভগবতী ভবানী কাজেই তাঁকে ছাড়তে বাধ্য হন।

প্রতাপের প্রতি দেবী বিমুখী হয়েছেন, সর্বসাধারণের মন এ ঘটনায় নিতান্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাঁদের ধারণা হয়, প্রতাপ দেবী ভবানী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। প্রতাপের আর জয়ের আশা নেই।

কচু রায়ের সমর্থকরা সুযোগ বুঝে সকলকে আরও বিভীষিকা দেখাতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে যশোরবাসিগণ কচু রায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে স্বীকার করলো। অঙ্গীকার করলো, রাত্রিকালে গোপনে মোগল সৈন্যদিগকে যশোর ছেড়ে দেবে।

যশোহর দুর্গরক্ষক গুপ্তজয় এ সকল সংবাদ পূর্ব হতে অবগত হতে পারেন নাই। সুতরাং সেইরূপভাবে প্রস্তুতও ছিলেন না।

কিন্তু গভীর নিশীথে রাজপুত সৈন্য যখন নগরে প্রবেশ করে সিংহনাদ করলো তখন গুপ্তজয়ের চমক ভাঙলো। তিনি লক্ষ্য করলেন, নগর অধিকার করে অপরিমেয় মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করতে আসছে।

গুপ্তজয় সাধ্যমত দুর্গরক্ষার চেষ্টা করলেন। তাঁর সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে অজস্রধারে অগ্নিবৃষ্টি করতে লাগলো। এইরূপে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চললো।

দুর্গরক্ষী সৈন্য সাধ্যমত যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অনেকে নিধনপ্রাপ্ত হল। মোগলগণের গতিরোধে সমর্থ হল না।

দুর্গরক্ষা অসম্ভব দেখে গুপ্তজয় রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে ও যথাসম্ভব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লয়ে নৌকারোহণ করলেন এবং ধূমঘাট অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হল।

রাজপুরী লুণ্ঠনের পরে মহামূল্য দ্রব্যাদি সহ মহারাজা মানসিংহ আবার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন। দেখলেন, প্রতাপাদিত্য তখনও সংজ্ঞাহীন ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় আছেন। মানসিংহ আহত প্রতাপকে স্বয়ং শুশ্রূষা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে মানসিংহের চেষ্টায় প্রতাপ সংজ্ঞালাভ ক'রে সকল বিষয় অবগত হলেন। কিন্তু একটিও কথা বললেন না।

মোগলশিবিরে নীত হয়ে জীবন ধারণের জন্য বারিবিন্দুও স্পর্শ করলেন না প্রতাপ। মানসিংহ পুনরায় তাঁকে লৌহপিঞ্জরে বন্দী করলেন।

মহারাজা মানসিংহ কচুরায়কে 'যশোহরজিৎ' উপাধি প্রদান করে তাঁকে যশোহর রাজ্যে অভিষিক্ত করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। গমনকালে যশোরের অধিষ্ঠাত্রী শিলাময়ী দেবী প্রতিমাকে সঙ্গে নিলেন। নিজ রাজধানী অম্বরে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বঙ্গীয় সেবায়েত ব্রাহ্মণও সঙ্গে ছিল। তাঁরা দেবীর পূজা ও সেবাকার্যে নিযুক্ত হলেন।

দিল্লী যাত্রার পথে বরুণা ও অসির সঙ্গমস্থল পুণ্যতীর্থে কাশীধামে মহারাজা প্রতাপাদিত্য প্রাণত্যাগ করলেন। যাঁর প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন কেঁপে উঠেছিল, যাঁর ক্ষমতায় মুসলমান শাসন-কর্তারা ভর্ৎসিত বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল, যাঁর বুদ্ধিবলে সমগ্র বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান একসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কার্য করেছিল, আজ তিনি কালচক্রের আবর্তনে বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ।

প্রতাপের সৎকারের ব্যবস্থা করে মানসিংহ দিল্লী যাত্রা করলেন।

॥ সমাপ্ত ॥

বুকের গভীরে নদী

বসুমিত্র দত্ত

বুকের গভীরে নদী ঢেউ ঢেউ উথালপাথাল
অনিবার্য জলস্রোত লক্ষকোটি মায়াবী ফণার
সর্পিল গতিতে চলে ; হৃদয়ের অন্দরমহলে
চিরসুখী ভালবাসা যথারীতি বন্দী হয়ে আছে
এবং ভয়ের ঋতু বহুদিন পলাতক জেনে
আকাঙ্ক্ষারা খেলা করে, স্মৃতিরা নূপুর হয়ে বাজে।

ফিরে যেতে অতএব বাধা নেই, মানসিকতায়
প্রিয়মুখ যথাযথ ধরা দেয় মায়াবী দর্পণে
গোলাপবাগানে না কি পরিচিত বকুলতলায়
গেলে যেন দেখা হবে কিংবা যেন দেখা হতে পারে
দুরন্ত রোদ্দুরে জ্বলে মধ্যদিন, আকাশের নীল-নির্জনে
তোমার মুখের ছবি আঁকা হয়ে আছে মণিমালা
বিরল স্বপ্নের আয়ু প্রসারিত করতলে—আর
বুকের গভীরে নদী ঢেউ ঢেউ উথালপাথাল।

[illegible] প্রথম পদন এবার কর্কট রাশি থেকে আরম্ভ হয়েছে, অবশ্য বেলা ১০টা ৪ মিনিট ১ সেকেন্ড গতে ভগবান ভাস্করদেব সিংহ রাশিতে গমন করবেন। কর্কট লগ্ন থেকেই শ্রাবণের আকাশ স্বতন্ত্রতার ও আপন ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে অবস্থান করবেন। কর্কট লগ্নে এবার রবি ও চন্দ্রের সহাবস্থান চলছে। বৃহস্পতি, কেতু কন্যা রাশিতে, মঙ্গল বৃশ্চিক রাশিতে, রাহু মীন রাশিতে, শনি শুক্র মেষ রাশিতে এবং বুধ বৃষ রাশিতে অবস্থান করছেন। রাহু কর্তৃক চন্দ্র ও রবি দৃষ্ট। চন্দ্র ও রবি এক্ষেত্রে ভীত ও দুঃখিত অবস্থায় অবস্থান করছেন। মনের উদ্দাম গতি আছে, কিন্তু আবেগ নেই। রবি ও চন্দ্র রাহু কর্তৃক দৃষ্ট থাকায় বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উক্ত কথা গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয়। মনের কারক চন্দ্র এবং সৃষ্টির কারক রবি। মন যেখানে স্তব্ধ, সৃষ্টি সেখানে কি করে সম্ভব। সুতরাং এমাসে অনেক কিছু সমাধান করবার পথ মনের মুকুরে প্রতিফলিত হবে, সত্য ; কিন্তু তা সৃষ্টির বিকাশে বিকশিত হয়ে দেখা দেবে না। ভারতের লগ্ন কন্যা. কন্যা লগ্নে বৃহস্পতি ও কেতু। এক্ষেত্রে বৃহস্পতি তার আবন্ধ সৃষ্টি নিবন্ধ করে চলেছেন রাহুর (সপ্তম স্থানের) উপর এবং (নবম স্থানের) শুক্রের উপর। ভারতের বৈদেশিক রাজনৈতিক বিষয়ে যতটা সম্ভব নিজস্ব মতবাদ প্রদান না করাই শ্রেয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিষয়ে দলীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে এমাস শুভকর নয়। একের পর এক অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য উক্ত সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতানৈক্যমূলক বৈষম্য উপস্থিত হবে।

ইংরাজী ১৭ই জুলাই থেকে ১লা শ্রাবণ আরম্ভ হল। ১লা শ্রাবণ দং ৪৮।৩৬ পলে বুধ কর্কট রাশিতে ; ৩রা ৩৫।৫৭ পলে বুধ ৮ পুষ্যানক্ষত্রে, ৫ই ৪৪।২১ পলে শুক্র ৫ মৃগশিরা নক্ষত্রে, ১০ই ৪৬।১৩ পলে বুধ ৯ অশ্লেষা নক্ষত্রে, ১১ই ৩৮।৩৯ পলে শুক্র মিথুন রাশিতে ; ১৬ই ৫১।২৪ পলে বৃহস্পতি ১৩ হস্তানক্ষত্রে ; ১৭ই ৩০।৫২ পলে শুক্র ৬ আর্দ্রা নক্ষত্রে ; ১৮ই ৩।১৮ পলে বুধ সিংহ রাশিতে ; ২১শে ৩৭।২২ পলে শনির বুধ পশ্চিম দিকে উদিত হইবেন ; ২৩শে ৩১।৫২

॥ শ্রাবণের ফলাফল ॥

পলে বুধ ১১ পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে ; ২৪শে ২৩।৩৫ পলে মঙ্গল পুনঃ ১৮ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ; ২৯শে ১।২১ পলে শুক্র ৭ পুনর্বসু নক্ষত্রে যাবেন।

নিম্নে সূর্যের কর্কট রাশিতে সংক্রমণকালীন গ্রহাবস্থান নির্ণায়ক চক্র প্রদান করা হলো।

মেষ ঃ ব্যর্থতা ও হতাশার অবসান আর হবে কবে। একথাটা মনে বারংবার অনুরণিত হতে থাকবে। কি করেই বা সম্ভব রবি-তনয় শনিদেব

রাশিকে সাড়ে সাতিতে আক্রমণ করে ফেলেছেন, বাধাবিঘ্ন তো থাকবেই, ধৈর্য হারালে চলবে না। কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার মনোবল নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক অবস্থার কিছুটা সুরাহা হতে পারে, ১০ই শ্রাবণের পর নূতন কোন কনট্রাক্ট ব্যবসায়মূলক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলে সুবিবেচনা নিয়ে গ্রহণ করা শ্রেয়। ভ্রাতাদের মনোভাব পূর্বাপেক্ষা অনেকটা শুভকর হয়ে দেখা দিবে। ১৪ই থেকে ১৮ই শ্রাবণের মধ্যে ভ্রাতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির উন্নতিযোগ দৃষ্ট হয়। বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ বিপদকালে কোন সাহায্য করবে না বলেই মনে হয়। ১৮ই শ্রাবণের পর কোন বন্ধুর দ্বারা শত্রুতা হবার যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্রদের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। কনিষ্ঠ পুত্রের ফোঁড়া-পাঁচড়ায় ১৮ই থেকে ২০শে শ্রাবণের মধ্যে কষ্টভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। উদর সংক্রান্ত রোগে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়, ডিভোর্স সংক্রান্ত ব্যাপারে যাদের মামলা-মোকদ্দমা চলছে তাদের অনেকেরই পরাজয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সাহিত্যিক, চিত্রতারকা ও ডাক্তারদের আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ডান পায়ে বা কোমরে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ই থেকে ১৮ই শ্রাবণের মধ্যে ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ ২রা থেকে ১০ই শ্রাবণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ১৪ই শ্রাবণের মধ্যে নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা সমীচীন নয়।

মেষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আয়ের পথ শুভ যাবে না। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্থিক লেনদেন যতটা সম্ভব ১৫ই শ্রাবণ অবধি স্থগিত রাখা উচিত। কোন বন্ধুর দ্বারা অপমানিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ ঃ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মন ক্রমোত্তর স্তিমিত দীপশিখার মত হয়ে উঠেছে। পূর্বনির্ধারিত কনট্রাক্টগুলো যে স্বপ্নের রঙীন আশা নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে নষ্টের পর্যায়ে উপস্থিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই চিন্তান্বিত হতে ও নির্ধারিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সঞ্চার হবে। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে নানাবিধ অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। ১লা থেকে ৬ই শ্রাবণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হঠাৎ রোগাক্রান্ত হতে পারে। ১২ই শ্রাবণের পর থেকে মনের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নত হয়ে দেখা দেবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সমীচীন। ২রা থেকে ১০ই শ্রাবণ অবধি আহার-বিহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ৫ই থেকে ১০ই শ্রাবণের

মধ্যে আকস্মিকভাবে কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়, জ্যোতির্বিদ, কনট্রাক্টর, ইঞ্জিনীয়ার, প্রকাশক ও চিত্র-শিল্পীদের আয়ের পথ সবিশেষ শুভ নয়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। ফোঁড়া-পাঁচড়াদিতে কষ্ট ভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীর যান-বাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকা কর্তব্য। ৬ই থেকে ১০ই শ্রাবণের মধ্যে কোন-না-কোন নূতন বন্ধুলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন কি ভবিষ্যতে তার সহায়তায় ভাগ্যের মোড় পর্যন্ত ফিরে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের আয়ের পক্ষে এই মাস শুভকর নয়। বৃষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের আর্থিক অবস্থা সবিশেষ শুভকর হয়ে দেখা দেবে না। ভ্রাতৃপক্ষ থেকে অপমানিত হবার ও কোন সম্বন্ধ লাভের যোগ ১২ই থেকে ১৮ই শ্রাবণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন : স্নেহপ্রবণ মনে যখন ক্রমোত্তরকালের কুটিল চক্রান্ত একের পর এক উপস্থিত হয়, সাংসারিক জীবনযাত্রায় তখনই মন হয়ে উঠে চঞ্চল ও দুর্বার—শান্ত করতে পারা যায় না। কিছুতেই সে মনকে নূতন আশার সংবাদ-সঞ্জীবনী-সুধা পান করেও। প্রতিটি মানুষ দৃষ্টিতে হয়ে পড়ে অবিশ্বাস্য। গ্রহ-তাপিত মনে এ সমস্ত কথার প্রকৃত মূল্যায়ন নেই। ধৈর্য ধরে কর্মক্ষেত্রে সর্ববিধ অশান্তিকে একের পর এক পদদলিত করে অবস্থান করার নাম যে সাহসিকতা—সে সাহসিকতা নিয়েই চলতে হবে। কেন না বর্তমানের গ্রহ পরি-স্থিতিতে এ মাসেও নূতন করে কোন কিছু সুষ্ঠু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ২রা থেকে ৮ই শ্রাবণ অবধি মনের অবস্থা শুভ যাবে না। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর সাথে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ থেকে ১৮ই শ্রাবণ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ নয়। নিশ্চিত আর্থিক যোগাযোগ প্রায় ক্ষেত্রেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কেন-না আর্থিক স্থানে রাহুর প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি বর্তমান। ভ্রাতৃস্থান মোটামুটি শুভ বলা চলে। ১০ই থেকে ১৮ই শ্রাবণের মধ্যে কোন-না-কোন ভ্রাতার চাকুরি লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বন্ধুর দ্বারা অপমানিত করার যোগ রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক কোনরূপ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। বিবাহের ব্যাপারে নানাবিধ ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। সম্বন্ধাদি ব্যাপারে উভয়পক্ষেরই যথেষ্ট বিবেচনা থাকা প্রয়োজন। নচেৎ ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ ঝামেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১০ থেকে ১৪ই শ্রাবণের মধ্যে ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

কর্কট : অশান্তির দাবানলে চারি-দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। নির্বাপিত করবার সাহস ও ভরসা কই। একমাত্র ঈশ্বরই এর প্রতিবিধানের মালিক। যাকে প্রাণ মন দিয়ে বিশ্বাস করা যায় সেই শেষটায় অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলে। কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে উপহার দেয় কৃতঘ্নতা। কর্ম ও ব্যবসাক্ষেত্রে এভাব থাকবেই ১৮ই শ্রাবণ অবধি। ১৮ই শ্রাবণের পর পূর্বে শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে বশ্যতা স্বীকার করবে বলে বুঝা যায়। আর্থিক ব্যাপারে নানাদিক থেকে সু-ব্যবস্থার সৃষ্টি হলেও শেষটায় কার্যকরী হয়ে দেখা দেবে না। ভ্রাতাদের সহিত আর্থিক ব্যাপারে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। ১৫ই থেকে ২০শে শ্রাবণের মধ্যে কোন কুহকার বন্ধুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। বিবাহযোগ্যা কন্যার নিশ্চিত বিবাহযোগ নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যার আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির যোগ পরিলক্ষিত হয়। শত্রুরা যতই প্রবল হোক কর্মক্ষেত্রে কোন-রূপ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। নিকটস্থ কোন বন্ধুর ব্যবহার ৮ই থেকে ১৪ই শ্রাবণের মধ্যে শত্রুবৎ হয়ে দেখা দিতে পারে। নিশ্চিত বিবাহের যোগাযোগ কোন কুহকায় ব্যক্তির প্ররোচনায় নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নীর মনের অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। বিবাহবিষয়ক মামলা-মোকদ্দমায় পত্নী-পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ডাক্তার, কবি, ইঞ্জিনীয়ার ও চিত্রতারকাদের আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রের ঝামেলা ৪ঠা শ্রাবণের পর বহুলাংশে তিরোহিত হবে। চাকুরি-ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় হঠাৎ পদোন্নতির যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ই থেকে ১৪ই শ্রাবণের মধ্যে ছোটখাট ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য, ভ্রাতা ও ভগ্নীর ভাগ্য ও কর্মস্থান সবিশেষ শুভসূচক নয়। নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা ১৪ শ্রাবণের পূর্বে সমীচীন নয়। ৮ই থেকে ১০ই শ্রাবণের মধ্যে কোন না-কোন বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহ : সরল ও স্নেহপ্রবণ মন তখনই ক্রূর ও কঠিন হয় যখন চারপাশের লোকজন প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা বলে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করে, নানাবিধ ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়। ছলচাতুরিমুক্ত সিংহ রাশির মন। সত্য-স্বীকৃতিতে যদি মৃত্যু হয়, সে-মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিকট কাম্য বলে মনে হয়। কর্মক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীর দল একের পর এক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হলেও ভয়ের কারণ নেই। আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রই সর্ববিধ বিপদজালকে ছিন্ন করতে সমর্থ হবে। প্রকাশক, সাহিত্যিক, ইঞ্জিনীয়ার ও জ্যোতির্বিদদের আয়ের পথ ১০ই শ্রাবণের পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সাহিত্যজীবনে সুনামের আশা প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষভাবে ফলবতী হয়ে দেখা দিতে পারে। ভ্রাতাদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর বলে মনে হবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহায়তায় কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কারো-না-কারো কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের যথেষ্ট অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা ১৪ই শ্রাবণের মধ্যে সমীচীন নয়। শত্রুদের ব্যবহার পূর্বা-পেক্ষা অনেকটা হ্রাস পাবে। ২রা থেকে ৮ই শ্রাবণের মধ্যে শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশ্যতা স্বীকার করতে পারে। মাতৃপক্ষ থেকে মানসিক আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভবানা রয়েছে। ১৬ই থেকে ২৬শে শ্রাবণের মধ্যে তীর্থোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীর ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অশো-ভন বলে মনে হবে। ৬ই থেকে ১০ই শ্রাবণ অবধি দিনগুলো স্ত্রীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক মামলা-মোকদ্দমার ফলাফল শুভসূচক। অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে। কিন্তু তা কার্যক্ষেত্রে বড় বিশেষ ফলবতী হয়ে দেখা দেবে না।

সিংহ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ধন, ভ্রাতৃ, মামলা-মোকদ্দমা, ভাগ্য ও ব্যয়স্থান শুভসূচক নয়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই বিব্রত বোধ করতে হবে। বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে মানসিক দুশ্চিন্তা চরম পর্যায়ে উপনীত হতে পারে।

কন্যা : কি করা যায় এই কথাটা বা প্রশ্নটা ঘূর্ণায়মান চক্রের মত বারংবার আবর্তিত হচ্ছে মনের বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। এই চক্রকে কি উপায়েই বাপান্ত করা যায়—এই প্রশ্নের সদুত্তর এ শ্রাবণ মাসেও অবিদিত। রাশির উপর রাহুর স্বাভাবিক কুপিত দৃষ্টি, যদিও বৃহস্পতি, চন্দ্রসংযুক্ত তথাপি এ মাসে স্বাস্থ্যের অবস্থা বড় বিশেষ শুভপ্রদ হয়ে দেখা দেবে না। ফোঁড়া-পাঁচড়াদিতে

কষ্টভোগ উদর-সংক্রান্ত ও গুহ্যদেশের পীড়ায় কষ্টভোগের যোগ ৬ই থেকে ১২ই শ্রাবণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং আহার-বিহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ধনস্থানে শনির দৃষ্টি ভয়াবহ ব্যাপার। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সঞ্চার করবে। প্রাপ্য টাকা আদায় করা কষ্টকর হবে। একমাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রাক্টার ও প্রেস-মালিকদের আয়ের পথ এ-মাসে বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে যে ভ্রাতাদের সাথে মনোমালিন্য রয়েছে, সে মনোমালিন্য মামলা-মোকদ্দমায় পর্য-বসিত হতে পারে। কোন সংবন্ধুর সাহায্যে হঠাৎ আকস্মিকভাবে ভাগ্যের মোড় ফিরে যেতে পারে। ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হবে। বন্ধুর সহায়তায় চাকুরি-প্রার্থীদের চাকুরি লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যাবে। আকস্মিকভাবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভ্রমণযোগ পরিলক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা যতই প্রতিকূল আচরণ করুক না কেন, ভয়ের কোন কারণ নেই; শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশ্যতা স্বীকার করবে। পত্নীর আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই অশোভন বলে মনে হবে। সামান্য কারণেই অতিমাত্রায় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ৮ই থেকে ১৬ই শ্রাবণ অবধি দিনগুলো পত্নীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। আহার-বিহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির ও ধর্মোপলক্ষে গৃহে পূজানুষ্ঠান-যোগ দৃষ্ট হয়।

কন্যা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, অর্থ, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, পত্নী ও মামলা-মোকদ্দমার স্থান সবিশেষ শুভপ্রদ নয়। এ-মাসে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ভ্রাতৃপক্ষ থেকে মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

তুলা : মানসিক সারল্য আর্থিক দুশ্চিন্তার চাপে বারংবার বিঘ্নিত হয়, কিন্তু আর্থিক প্রসারণের ফলে মনের সারল্য পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, চারপাশেই রয়েছে বিশৃংখল পরিবেশ, সুশৃংখল প্রয়াস বারংবার চলছে আপ্রাণ, কিন্তু সুশৃংখলিত হয়ে দেখা দিচ্ছে না কিছুতেই। একটা বিরাট প্রয়োজন মস্ত বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে আবির্ভূত হতে চায়। অর্থ ?—অর্থস্থানে শনির সপ্তম দৃষ্টি বর্তমান ব্যবসামূলক কর্মাদিতে আর্থিক প্রসার সবিশেষ শুভপ্রদ হবে না। ১০ই শ্রাবণের পর থেকে ১৮ই শ্রাবণের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের কারো-না-কারো কর্মলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ভূমি ও বাসস্থান বিষয়ক যে ব্যবসা করবার সংকল্প রয়েছে—সে সংকল্প এ-মাসে ত্যাগ করা কর্তব্য। ভ্রাতাদের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা একটু শুভ হয়ে দেখা দেবে। ১০ই শ্রাবণের পর থেকে ধীরে ধীরে ৮ই থেকে ১২ই শ্রাবণের মধ্যে কোন-না-কোন সদবন্ধু লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নিকটস্থ আত্মীয়স্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা ১৬ই থেকে ২০শে শ্রাবণের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সমীচীন। পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যাবে। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ২রা থেকে ৬ই শ্রাবণের মধ্যে অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়ে তুমুল ঝঞ্ঝাট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল এবং পরাক্রান্ত হোক না কেন, কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। আহার-বিহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় ৪ঠা থেকে ৮ই শ্রাবণের মধ্যে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিত্রতারকাদের নির্ধারিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সঞ্চার হতে পারে। নূতন কোন ব্যবসা আরম্ভ করার আগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক মামলা-মোকদ্দমা জয়লাভের সূচনা করে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা এই মাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। পত্নীর স্বাস্থ্য ১৬ই থেকে ১৮ই শ্রাবণ অবধি ভাল যাবে না।

তুলা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য, অর্থ, পত্নী ও ব্যয়স্থান শুভ-সূচক নয়। নির্ধারিত বিবাহের যোগ নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পূর্বের গণ্ডগোল অনেকটা মীমাংসিত হবে।

বৃশ্চিক : চারিদিকেই যেন চলেছে দানব চক্রান্ত। ব্যবসাক্ষেত্রে চলেছে কর্মচারীদের স্বাধীন মতবাদের ভয়াবহ আক্রমণাত্মক মনোভাব, আর্থিক পরিস্থিতি ও ক্রমশোর অধোমুখী। এই সমস্যার ত্রিভুজে আবদ্ধ আপনার মন অনেকটা হতাশায় মসীলিপ্ত হয়ে উঠেছে। ৬ই শ্রাবণের পর আর্থিক অবস্থার উত্তরোত্তর পরিবর্তন সাধিত হবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ১৮ই থেকে ২২শে শ্রাবণের মধ্যে আকস্মিকভাবে উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ধনস্থান মোটামুটি শুভই বলা চলে। কোন ব্যবসামূলক কাজে জড়িত হয়ে পড়া এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহযোগ ভঙ্গ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রাতা-ভগ্নীর স্থান শুভসূচক নয়। পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। নিকট আত্মীয়ের দ্বারা আর্থিক বিষয়ে বেশ বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হবার ও কনিষ্ঠা কন্যার পায়ে কিংবা মাথায় আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এমন কি আশ্রিত ব্যক্তি গৃহে চুরিও করতে পারে। পূর্বশত্রুরা অনেকেই বশীভূত হবে। বন্ধুস্থানীয় আত্মীয়স্বজন দ্বারা অপপ্রচারের সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহ বিষয়ক; পূর্বে যে ঝামেলা চলেছিল, তার একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যেতে ৮ই শ্রাবণের মধ্যে হবে বলে আশা করা যায়। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের সূচনা করে। আকস্মিক ভাগ্যের পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জি-নীয়ার ও জ্যোতির্বিদদের আয়ের পথ এ-মাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। কনট্রাক্টারদের পক্ষে নূতন কোন কনট্রাক্ট এ-মাসে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ ১৪ই থেকে ১৮ই শ্রাবণের মধ্যে। আয়ের বিভিন্নমুখী পথ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় আয়লাভে বঞ্চিত হবার যোগ পরিদৃষ্ট হয়।

বৃশ্চিক লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, আয়, পুত্র-কন্যা ও পত্নীর শারীরিক অবস্থা ও ব্যয়স্থান সর্বশেষ শুভকর হয়ে দেখা দেবে না। লটারীতে অর্থপ্রাপ্তি আশা করতে পারেন।

ধনু : দৃষ্টির সম্মুখে সরীসৃপের মত একে বেঁকে চলছে যেন আপনার পদতলে। মানসিক দৃষ্টির গভীরতা যেন আর নেই। সাংসারিক পরিবেশে থেকে এসেছে হতাশার ছায়া, স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছে না। ১০ই থেকে ১৬ই শ্রাবণ অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগমুক্তির যোগ ১৮ই শ্রাবণের পর ধীরে ধীরে দৃষ্ট হয়। ধনস্থান পূর্বাপেক্ষা শুভ যাবে বলে মনে হয়। শ্বেতকায় কোন ব্যক্তি দ্বারা আর্থিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাট ঝঞ্ঝাটের সূত্রপাত হলেও তা ক্ষতিকারক হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে না। ভ্রাতার স্থান মোটামুটি শুভই বলা চলে। কর্মহীন ভ্রাতার কর্মলাভের যোগ এ-মাসে দৃষ্ট হয়। নিকটস্থ বন্ধু শত সহস্র অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও নূতন কোন কর্মক্ষেত্রে ১৬ই শ্রাবণ অবধি অর্থব্যয় করা সমীচীন হবে না। শ্বেতকায় বন্ধুর পরামর্শে মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কথা-বার্তায় আলাপ-আলোচনায় যথেষ্ট সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাটের মাত্রা ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যাবে। উদর-সংক্রান্ত ও গুহ্য-দেশের পীড়ায় স্ত্রীর কষ্টভোগ হতে পারে। নিশ্চিত বিবাহের যোগ সামান্য কথাবার্তার অসংলগ্নতার ফলে ভণ্ডুল হয়ে যাবার সম্ভবনা রয়েছে। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। দূরসম্পর্কীয় কোন

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

বন্ধু বা বন্ধুর (আত্মীয়) মৃত্যু সংবাদ ১৬ই থেকে ২০শে শ্রাবণের মধ্যে আসা অমূলক নয়। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ আকস্মিকভাবে দৃষ্ট হয়। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রফেসার, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, প্রকাশক ও গ্রন্থকারদের আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার যোগ রয়েছে। কৃষ্ণকায় ব্যক্তির দ্বারা গৃহে চুরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভূমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে (ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে) যথেষ্ট সতর্ক থাকা সমীচীন।

ধনু লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, অর্থ, বন্ধু, পুত্র-কন্যা, পত্নী ও মামলা-মোকদ্দমার স্থান এ-মাসে শুভকর নয়। অনেক দিনের পুরাতন বন্ধুর আগমনে মন উল্লসিত হয়ে উঠবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। নূতন কোন ব্যবসায়ে যোগাযোগ ১৩ই শ্রাবণের মধ্যে এলেও তা কার্যকরী করা উচিত নয়।

মকর : দিনের পর দিন বিষয়ে উঠছে মন সাংসারিক পরিবেশের পঙ্কিলতা ক্রমবর্ধমান দেখে। চিন্তাও বিক্ষিপ্ত। কি করে আর কেমন করে মনের প্রকাশ্য অথচ গোপন প্রশ্নের সমাধান করা যায় অথচ সে সমাধানের প্রশ্ন স্থায়ী হয়ে দেখা দেয় না। মনের এ আবর্তন আর কতকাল চলবে কে জানে। ৪ঠা শ্রাবণের পর আপনার মনোবল ক্রমোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। চারিদিকের জটিল সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে দেখা দেবে ধীরে ধীরে। স্বাস্থ্য-স্থানে শনির দৃষ্টি থাকাতে গুহ্যদেশের পীড়াদিতে ভোগ হতে পারে। ধন-স্থানে মোটামুটি মন্দ যাবে না। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও কনট্রাক্টারদের আয়ের পথ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে ভ্রাতৃপক্ষের সহিত যে মামলা-মোকদ্দমা চলছে, তা মীমাংসিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত পেতে পারে। নূতন কোন ব্যবসা-ব্যাপারে কৃষ্ণকায় বন্ধুকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত। নূতন ব্যবসায়ে অংশীদার হিসেবে কোন বন্ধুকে নিয়োগ করা উচিত নয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে, এমন কি সম্ভবস্থলে তার বিদেশ ভ্রমণও হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের বুদ্ধির দোষে অর্থক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিন্দাবাদ সহকর্মীর সাথে করা উচিত নয়। পত্নীর স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। পত্নীর ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেকটা শুভ হয়ে দেখা দেবে। নূতন কোন ব্যবসা বৃদ্ধি করা ১৪ই শ্রাবণের পূর্বে উচিত নয়। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভসূচক। শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের বিভিন্ন পথ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত আয়লাভে বাধার সৃষ্টি হবে।

মকর লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, পত্নী, আয় ও কর্মস্থান শুভসূচক নয়। কর্মক্ষেত্রে যাদের দীর্ঘকাল যাবৎ গোলযোগের সৃষ্টি হয়ে চলেছে, ২রা শ্রাবণের পর তা বহুলাংশে তিরোহিত হবে। ভূমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধে প্রথম থেকেই সতর্কত থাকা বাঞ্ছনীয়।

কুম্ভ : কাব্যিক ছন্দে আকৃষ্ট হতে চায় না আর মন। মিথ্যা অজুহাতেও আর মন ভরতে চায় না। কর্মময় জীবনে যখন বারংবার ব্যর্থতার হাতছানি চলতে থাকে তখন সত্যই মন হয়ে উঠে দুর্বার। 'দুর্গমগিরি কান্তার-মরু' এই দুটোই তার নিকট অনেক ক্ষেত্রে সহজ বলে মনে হয়। কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চলতে হবে বাধা-বন্ধহারা গতিতে আর্থিক ক্ষেত্রে অনেক বাধার সৃষ্টি হবে বটে, কিন্তু সে বাধা ২০শে শ্রাবণের পর ধীরে ধীরে তিরোহিত হবে। কনট্রাক্টার ও ইঞ্জিনীয়ারদের নূতন কোন ব্যবসা ১০ই শ্রাবণের মধ্যে করা সমীচীন নয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। ২০শে শ্রাবণের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন কি আর্থিক ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধও হতে পারে। কোন বন্ধুর সাহায্যে ভাগ্যের মোড় ফিরে যেতে পারে। পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য ২২শে শ্রাবণের পর থেকে সবিশেষ শুভ যাবে না। শত্রুরা যতই শত্রুতা করুক না কেন, সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। মহিলা শত্রুর দ্বারা অপমানিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে সহজ সফলতার যোগ রয়েছে। পত্নীর স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। মাঝে মাঝে উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট ভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ ১২ই থেকে ১৮ই শ্রাবণের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। কোন সম্বন্ধুর সহায়তায় চাকুরি লাভের যোগ লক্ষ্য করা যায়। ভাগ্য স্থানে শনির দৃষ্টি থাকায় আকস্মিকভাবে কারো-না-কারো কর্মচ্যুতি হতে পারে। নূতন কোন কনট্রাক্ট-এর কর্মে বিশেষ করে (জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে) ২৪শে শ্রাবণের পূর্বে অর্থব্যয় করা সমীচীন নয়। আয় স্থান মোটামুটি মন্দ যাবে না। ১০ই থেকে ১৪ই শ্রাবণের মধ্যে গৃহে চুরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুম্ভ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ধন, ভ্রাতা ও ভগ্নী, শত্রু, মামলা-মোকদ্দমা ও কর্মস্থান শুভসূচক নয়। কর্মক্ষেত্রে একের পর এক ঝঞ্ঝাটের যোগ রয়েছে। কোন বন্ধুর সহায়তায় চাকুরি ক্ষেত্রে পদোন্নতি বা চাকুরি লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যাপার নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই বিব্রত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন : সীমাহীন দুশ্চিন্তাগুলো একের পর এক অগ্রসর হচ্ছে। আর্থিক কাঠামোও প্রায় ভগ্নদশা। ভ্রাতাদের সাথে শত্রুবৎ ব্যবহার বা ভ্রাতৃপক্ষ থেকে শত্রুবৎ ব্যবহার, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা এই চতুর্ভুজ সমস্যায় আপনি বলতে গেলে প্রায় বন্দী। এই বন্ধনদশা হতে মুক্তিলাভ করতে সময় লাগবে বেশ কিছুদিন। ২০শে শ্রাবণের পর মানসিক অবস্থা ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হতে পারে, তা অভাবনীয় বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ফাটল ধরা সাংসারিক পরিবেশকে সংযুক্ত করবার ইচ্ছায় মন প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যাকুল হয়ে উঠবে। ১০ই শ্রাবণের পর স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে যাবে। প্রাপ্য অর্থ আদায় করতে বেশ বেগ পেতে হবে। কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির পরামর্শানুসারে গচ্ছিত অর্থ ব্যবসায় বা অন্য কোন লাভজনক কর্মে ব্যয় করা সমীচীন হবে না। ভ্রাতাদের মধ্যে যে শ্বেতকায় তার বৃদ্ধি এ-মাসে গ্রহণযোগ্য। অমীমাংসিত সাংসারিক কোন ঝামেলা পত্নীর আত্মীয়স্বজন দ্বারা মীমাংসিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না এবং বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ অশান্তির উদ্রেক হতে পারে। দীর্ঘকাল যে সমস্ত রমণী পুত্রসন্তান হতে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে কারো না কারো গর্ভবতী হবার যোগ এ-মাসে পরিদৃষ্ট হয়। শত্রুরা কর্মক্ষেত্রে একের পর এক নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে ; কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তারা সফলকাম হবে না। পত্নীর বুদ্ধি সাংসারিক জীবনের ক্ষেত্রে এ-মাসে মঙ্গলপ্রদ হয়ে দেখা দেবে না ও স্বাস্থ্য অনেক ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। আচার-আচরণে মাঝে মাঝে অমানুষিক ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে পারে। যানবাহনাদি চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভূমি ক্রয় ও বিক্রয় ব্যাপারে প্রথম থেকেই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে। চিত্রশিল্পী, কনট্রাক্টার ও ডাক্তার-

দের আয়ের পথ ৪ঠা শ্রাবণের পর থেকে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হবে। মীন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, অর্থ, পুত্র-কন্যা, পত্নী, ভাগ্য ও আর স্থান সবিশেষ শুভপ্রদ হবে না। ভূমি সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের সূচনা করে। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির যোগ আশা করতে পারেন।

● পত্রোত্তর ●

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, বিজয়গড় যাদবপুর, ৬৮ বর্ষের পর কাঁড়া, প্রতিকার হিসেবে ৮-১০ রতি রূপোয় ডান হাতের অনামিকাতে ধারণীয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ৬ বছরের মধ্যেই উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীচিররঞ্জন রায়, জব্বলপুর খামারিয়া, সাহিত্যের খ্যাতি ৩২ বর্ষের পর থেকে বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে। বিবাহ ১৯৭০ সালের মধ্যে হবে বলে আশা করা যায়। ৩২-৩৪ বর্ষের মধ্যেই বিদেশ ভ্রমণ যোগ দৃষ্ট হয়। ●রেবারাণী পাল, কেদার বসু লেন, কলিকাতা, রক্তপ্রবাল ৮রতি বা হাতের অনামিকায় এবং গোমেদ ৬ রতি মধ্যমাতে সোনায় ধারণ করুন, তা হলেই সব আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ●শ্রীবনফুল, হাওড়া, সাধারণ বলা চলে, দেরীতে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ●এ কে গুহ, আসাম, সন-তারিখ কোথায়? শুধু জন্মসময়ের মাধ্যমে রাশি বলা যায় না। ●সুনীল সরকার, সরকার ভবন, বিবাহের পর কন্যাপ্রাপ্তি তো হবেই, এমন কি মা-লক্ষ্মীর কৃপা হলে লটারী পেয়েও যেতে পারেন। অতএব আপনার নিকটবর্তী''—'' মহাশয়ের গণনা নির্ভুল। দ্বিতীয়টি না হলেও প্রথমটি তো হবেই। ●শ্রীযুক্তা মহামায়া ঘোষ, গোবরহাটি, ধৈর্য ধরে চেষ্টা করুন, ছেলের চাকুরী ও জীবনে উন্নতি দুইই হবে। ●কমলরঞ্জন দাস, তারা রোড, কলিকাতা, পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ●ছায়া চ্যাটার্জী, রবীন্দ্র সরণী, বাঁকুড়া, আপনি আষাঢ় সংখ্যায় দেখুন। ●মহাদেব, এম, এন, কে, রোড, কলিকাতা, বিবাহে ঝামেলা হতে পারে, চেষ্টা করুন চাকুরী হবে। ●শ্রীপ্রবীরকুমার দে, এস, এন, রায়, রোড, পরীক্ষার ফল বলা হয় না, লেখাপড়ায় উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীনির্মলকান্তি পাল, আই, টি, আই, বহরমপুর, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা ও ভাল চাকরী আপনার হবে। ●শ্রীসৃষ্টিধর কোঁয়ার, বড়বেলুন, বর্ধমান, আপনার চাকরী ও ব্যবসা উভয়েরই যোগ রয়েছে; ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য দূর হবে। ●রাখী সেন, দমদম রোড, কলিকাতা, দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ●নির্মলেন্দু মিশ্র, জামসোলা, সিংভূম, সম্ভাবনা রয়েছে, ৪ থেকে ৬ রতির মধ্যে শ্বেত মুক্তা সোনায় ডান হাতের অনামিকায় ধারণ করে দেখুন। ●শ্রীপঙ্কজকুমার দাস, হাওড়া, চেষ্টা করুন, বর্তমান সময় থেকে ১৯৭০ সনের নভেম্বরের যে-কোন সময় হয়ে যেতে পারে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পুস্তকের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ●শ্রীবীরেনচন্দ্র দে, শ্রীরামপুর, শত্রুরা আপনার বিশেষ কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না, ৫ থেকে ৭ রতির মধ্যে ইন্দ্রনীল সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●স-প-ম-দা, পানাগড়, মকর রাশি, শ্রবণা নক্ষত্র অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশায় জন্ম। ●শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, করিদপুর, বর্ধমান, চন্দ্রকান্তমণি ১০-১৫ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ●শ্রীঅশোককুমার নন্দী, ফারাক্কা, বিবাহে বিলম্ব ও ৩২ থেকে ৩৮ মধ্যে ব্যবসা গড়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীশান্তি ব্যানার্জী, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কুম্ভ রাশি, রাক্ষস গণ মেয়েকে রক্ত প্রবাল ১০ রতি সোনার বা হাতের অনামিকায় পড়িয়ে দিন। ●মৃণালকান্তি ব্যানার্জী, মতিলাল কলোনী, অপেক্ষা করুন, উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীঅভিজিৎ, দুবরাজপুর, বীরভূম, আপনি শ্রীশ্রীদুর্গা এই নাম এক লক্ষবার লাল কালিতে লিখুন, দেখবেন সমস্ত আশার প্রায় পূর্ণ হবে। ●শ্রীযমুনা কর দে, ইন্দাশ, আউশনাড়া, বাঁকুড়া, এটা স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক নিয়মে তিন ভাগ চলে যায় সন্তানের দিকে আর এক ভাগ স্বামীর দিকে। অতএব দুঃখ করার কিছু নেই। ●শ্রীবরেন্দ্রনাথ রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯, নিজেকে বুদ্ধিমান ভাববেন না, তাহলেই সুখী হতে পারবেন। ●দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস, টালিগঞ্জ রোড, ধৈর্য ধরে কাজ করুন, সুফল পাবেন। সম্ভব হলে ৬-৮ রতি গোমেদ সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ●যতীন্দ্র চক্রবর্তী, কাছাড়, আসাম, আপনি চন্দ্রকান্তমণি (উৎকৃষ্ট পৌর) ১০-১২ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করতে পারেন। ●ঊর্মিলা সেন, দমদম, পড়াশুনা হবে, আগামী আড়াই বৎসরের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ●শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ঘোষ, বিষ্ণুপুর, রাজারহাট, রাশি জানতে চেয়েছেন অথচ জন্ম, সন, তারিখ, সময় দেন নি। ●শ্রীমৃণালকান্তি ব্যানার্জী, দমদম, মতিলাল কলোনী, ধনু রাশি, আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালই চলবে। ●মলয় সরকার, জামসেদপুর, চাকুরী আপনার পক্ষে শুভ হবে, সফল হতে পারবেন। ●রমেশ চক্রবর্তী, কলিকাতা, চেষ্টা করুন চাকুরী হবে। ●পরশুরাম শর্মা, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা, বর্তমান সময় আপনার পক্ষে শুভ নয়, সম্ভব হলে ৫-৭ রতি অপরাজিতা নীলা সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ●শ্রীমতী গৌরী পাল, যতীনদাস নগর, কলিকাতা, অতি অল্পসময়ের মধ্যে চাকুরী হবে। ধৈর্য ধরুন, সুসময় নিশ্চয় আসবে। ●শ্রীবিশ্বনাথ দাস, কুটিঘাট রোড, কলিকাতা, আপনার দেয় জন্মসময় ভুল রয়েছে, ভাল করে দেখে লিখে পাঠাবেন। ● এস, গঙ্গোপাধ্যায়,

বিবেকানন্দ রোড, স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে গোলমাল করতে পারে, আড়াই বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে উৎপাত ঘটতে পারে। ● মণীন্দ্রনারায়ণ দেব, হাজরা রোড, কলিকাতা,মাঝে মাঝে উৎপাত করবে, সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ● আর্যকন্যা, একডালিয়া রোড, কলিকাতা, মেষ রাশি, মেষ লগ্ন, ভরণী নক্ষত্র, নরগণ, বর্তমান আড়াই বৎসর আপনার পক্ষে শুভ নয়। ● নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, রাঁচী, বিদ্যার যোগ মোটামুটি শুভই বলা চলে। ● শ্রীকালীকিশোর ভট্টাচার্য, সুরা ইস্ট রোড, বেলেঘাটা, আপনি ও আপনার স্ত্রী উভয়েই শ্রীশ্রীদুর্গা নাম পৃথকভাবে লাল কালিতে ধৈর্য সহকারে এক-লক্ষবার লিখুন, দেখবেন অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো দেখা দিয়েছে। ● শিব-কৃষ্ণ কোলে, বাসনা, হুগলী, আপনার ছক ভিন্ন কাগজে লিখে পাঠাবেন। ● মানসী রায়, ভুবনেশ্বর, ৫ রতি ইন্দ্রনীল বাম হাতের মধ্যমাতে সোনায় ধারণ করিয়ে দিন। ● উষসী সরকার, কটক রক্ত প্রবাল ৮-১০ রতি সোনায় বাম হাতের অনামিকায় ধারণ করুন। ● কল্যাণকুমার ভদ্র, সন্তোষপুর, চন্দ্র-কান্তমণি ১০-১৫ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে এবং রক্তপ্রবাল ৮-১০ রতি সোনায় অনামিকাতে ধারণ করুন। ● শিশিরকুমার সেন, মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড, কলিকাতা, সিংহ রাশি, মঘা নক্ষত্র, রাক্ষসগণ। ● শ্রীমতী স্বপ্না বসু, শিবপুর, হাওড়া, বিবাহে বিলম্বের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীবুদ্ধ, আসানসোল, চেষ্টা করুন, চাকুরী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীসুরজিৎ রায়, বেহালী, আপনার চাকুরী ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ● নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর, টিকর বস্তি, শিলচর, উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে, পড়াশুনা হবে। ● শিবনাথ চ্যাটার্জী, চন্দননগর, ভাল করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ● গৌতমিক জামসেদপুর, টেলকো, ৭ রতি অপরাজিতা নীলা সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে এবং ১০-১৫ রতি চন্দ্রকান্ত মণি রূপোয় অনামিকায় ধারণ করুন। ● এ কে গুহ আসাম, আগে ঠিক করুন কাকে চান, পরে বিচারের প্রশ্ন। ● তপন চৌধুরী, তারাপুর, শিলচর, শ্বেত প্রবাল ৮-১৯ রতি সোনায় ডান হাতের অনামিকায় ধারণ করুন, আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। ● অরুণ চক্রবর্তী বিশ্বাস নাসারী লেন, কলিকাতা, পরীক্ষার ফল ও কুপনবিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীকান্তকুমার দে, চকবাজিত, মেদিনীপুর, আগামী দুই বৎসর আপনার পক্ষে শুভ নয়, সকল দিক দিয়ে সতর্ক হয়ে চলবেন, সম্ভব হলে ৫-৭ রতি ইন্দ্রনীল সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● পদ্মা বিশ্বাস, শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, কলি-কাতা, সিংহরাশি, সতর্ক হয়ে চলবেন। ● সুবীরকুমার বিশ্বাস, সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা, কেটে যান মালক্ষ্মী কৃপা করলে নিশ্চয়ই পাবেন। ● শ্রীরাম রায় ভট্টাচার্য, তিলক রোড, দুর্গাপুর, আপনি ধৈর্য ধরে শ্রীশ্রীদুর্গা নাম এক লক্ষ বার লাল কালিতে লিখুন, দেখবেন, সব আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেছে, কোন বিপদই আর থাকবে না। ● দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হসপিটাল রোড, বানপুর—বিদ্যাস্থান মোটামুটি শুভ বলা চলে, স্বাস্থ্য ও কর্ম সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন হঠাৎ পরিবর্তন ঘটতে পারে। সম্ভব হলে ৮ রতি গোমেদ রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুধীররঞ্জন ব্যানার্জী, বার্নপুর, বর্ধমান—৫—৭ রতি ইন্দ্রনীল সোনার ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীরাধাকান্ত রায়, কালিবাজার, বর্ধমান—অতি শীঘ্রই আপনার ভাল চাকুরী হবে। লাল কালিতে শ্রীশ্রীদুর্গা নাম এক লক্ষ-বার লিখুন। ● শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায়-পাড়া বাই লেন, কলিকাতা—চেষ্টা করুন, সম্ভাবনা রয়েছে। ● বাচ্চি, কলি-৫০—সিংহরাশি, ক্ষত্রিয় বর্ণ, পূর্ব ফল্গুণী নক্ষত্র, নরগণ। শ্রীজয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী, গঙ্গাকান্ত ভাদুড়ী স্ট্রীট, বালী—বর্তমান বৎসরের আশ্বিন মাসের পর হইতে এক বৎসরের মধ্যে আপনার স্থায়ী চাকুরী হবে এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে অতি অবশ্যই উন্নতি হবে। ● শীলা ধর, কৈলাস বসু ৩য় বাই লেন, হাওড়া—মনের মত পাত্র সকলের মেলে না। পাত্রের অবস্থা মোটা-মোটামুটি ভালই হবে। ● শোভনা সোম, বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা—আপনার সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● শ্রীঅরবিন্দ দাশ, টাকাপুরা, মেদিনীপুর—আপনার জন্মছকটা ভুল রয়েছে, ঠিক করে লিখে পাঠাবেন। ● হরিসাধন দাশ, ক্রিস্টফার রোড, কলিকাতা—আগামী তিন বৎসরের মধ্যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। ● শ্রীমতী সুনীতি দাস, আদারপুর, পুরুলিয়া—আপনি ৮-১০ রতি রক্তপ্রবাল সোনায় বা হাতের অনামিকায় এবং গোমেদ ৫-৭ রতি মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীহরেন্দ্রনাথ সরকার, জোনিংস রোড লিলুয়া—আপনি শ্বেতমুক্তা ৬-৮ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে এবং ৮-১০ রতি রক্তপ্রবাল সোনায় অনা-মিকায় ধারণ করুন, ভবিষ্যৎ-জীবন নিশ্চয়ই ভালভাবে কাটবে।

শক্তিময়ী শিল্পী

ক্যারোল লিনলি

জটিল, মনস্তত্ত্বমূলক দুরূহ চরিত্রগুলির প্রাণবন্ত রূপায়ণে পরিপূর্ণ সফলতা হলিউডের যে তরুণী শিল্পীকে আজ এক বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার পুরোভাগে উপনীত করেছে, তাঁর নাম ক্যারোল লিনলি। প্রণয়ধর্মী বা বেদনা-বিধুর চরিত্রগুলির রূপদানের মাধ্যমে নয়, বিশেষত্বপূর্ণ গভীরতাসম্পন্ন চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত গূঢ় বক্তব্যগুলি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে যথাযথভাবে তাদের প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে এই অসাধারণ শিল্পী তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রমাণেও যথোচিত সাফল্য অর্জন করেছেন। এদিক দিয়ে তাঁর সমবয়স্ক শিল্পীদের মধ্যে তিনি সকলের চেয়ে এগিয়ে আছেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রথম শ্রেণীর চিত্রতারকাদের মধ্যে ক্যারোল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থা হয়েছেন। কতই বা আর বয়েস তখন? উনিশ-কুড়ি। আকৃতিগত সৌন্দর্যই এর জন্য

ক্যারোল লিনলি

একমাত্র দায়ী নয়—সৌন্দর্যের বিচারে তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন অনেকখানি এমন অনেক শিল্পীর নামোল্লেখ করা যায়—তাঁর অনুপম অভিনয়-প্রতিভাই এর একমাত্র কারণ।

সাতাশ বছর বয়েস। ১৯৪২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকে অভিনয়কলায় প্রাণ্ড তাঁর আসক্তি। পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়চর্চা তাঁর চলেছে। দশ বছর বয়সে 'মডেল' হতে আরম্ভ করলেন। আগে নাম ছিল ক্যারোল জোন্স। মডেল হওয়ার পর থেকে নাম নিলেন ক্যারোল লি। ছায়াছবিতে আসার আগে বহু নাট্যাভিনয়ে এবং অন্তত একশটি টেলিভিসানের নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এই সময় অসংখ্য পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে তাঁর ছবি স্থান পেতে লাগল একজন মডেল হিসাবে। মডেল হিসাবেও দেখতে দেখতে একদিন তিনি শীর্ষস্থানে উঠলেন।

'এ্যানিভার্সারি ওয়ালজ'-এ অংশগ্রহণ করার সময়ে তিনি জানতে পারেন, ক্যারোল লি বলে আর একজন আছেন—সেইজন্যে তাঁকে আবার নাম বদল করতে হল। ক্যারোল লি এবার হলেন ক্যারোল লিনলি।

ষোড়শী ক্যারোলের 'দ্য পটিং শেড' নাটকে অনবদ্য অভিনয় দেখে সমালোচকরা তাঁকে ডেম সিবিলের নাতনি হিসাবে তুলনা করে অভিনন্দিত করলেন। দু'বছর পরে 'বু ডেনিম' নাটকে তাঁর অভিনয় সমগ্র দর্শক সমাজকে এককথায় আলোড়িত করে তুলল। এই নাটক তাঁকে এনে দিল থিয়েটার ওয়ার্ল্ড এ্যাওয়ার্ড।

প্রথম ছবি 'এ লাইট ইন দ্য ফরেস্ট'। অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে রিটার্ন অফ দ্য পেটন প্লেস, শক ট্রিটমেন্ট, হলিডে ফর লাভার্স, দ্য কার্ডিনাল, আণ্ডার দ্য য়ুম য়ুম ট্রি, শ্যাটার্ড ডোর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার ইউ, সি, এল এ,-তে যোগ দিয়ে সেখান থেকে আধুনিক নৃত্যে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে নিউইয়র্কের প্রেস এজেন্ট মাইকেল সেলসের তিনি সহধর্মিণী। চলচ্চিত্রজগৎ থেকে কিছুকাল পরেই তিনি বিদায় নিচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

—চিত্রপ্রিয়

'শক ট্রিটমেন্ট' চিত্রের একটি দৃশ্যে স্টুয়ার্ট হুইটম্যান ও ক্যারোল লিনলি

কলা কাকলি

কার দোষ

ভ্রাতৃবৃন্দের কৃষ্টি-চক্র তাঁদের প্রথম নাট্যনিবেদন হিসেবে মঞ্চস্থ করলেন অরুণকুমার দে'র নাটক 'কার দোষ'। বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দিরে অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মেলোড্রামা কণ্টকিত এই নাটকটির অভিনয় সহজেই সংসদের শিল্পীরা জমিয়ে দিয়েছিলেন। তীব্র নাট্যাবেগ ও চড়া ভাবাবেগের মুহূর্তগুলিতে শিল্পীদের অভিনয় এককথায় অনবদ্য। প্রযোজনার ছন্দটি সুন্দর। অভিনয়ে গোবর্ধন খাঁ, প্রদ্যোৎ কুণ্ডু, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ দাস, ভীমচন্দ্র প্রামাণিক, সলিল সেন, নবকুমার দাস ও সুবর্ণ আটা দর্শকদের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় যথাযথ, নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু।

পথের শেষে

বৃহস্পতির আসর সম্প্রতি স্টার থিয়েটারে 'পথের শেষে' নাটকটি পরিবেশন করলেন। দলগত শিল্প-কৌশল থাকা সত্ত্বেও ব্যাক্তিগত অভিনয়-নৈপুণ্যে যাঁরা নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন তাঁরা হচ্ছেন পরেশ মল্লিক, জিতেন সেনগুপ্ত, শঙ্কর নারায়ণ ও শিপ্রা সাহা, জমিদারের উপর আনুগত্যের রূপটি অনাদির চরিত্রে যেমন সুন্দর রূপায়িত, তেমনি দুর্গাশঙ্করের অন্তর্নিহিত জ্বালার রূপটি গোপাল শীলের কথায়, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় মর্মস্পর্শী, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় দর্শক-মনকে নাড়া দেয়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়, বিজয় গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, ঋষি রায়, প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ বসু, ছবি রায়-চৌধুরী, সুধাংশু চক্রবর্তী, জগন্নাথ দে, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ইরা মিত্র, শেফালী দে ও কল্পনা মুখোপাধ্যায়।

মসনদ কার ও আর্তনাদ

সম্প্রতি নরোদয় সংঘের চতুর্থ বার্ষিকী প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। দু'দিনের এ সম্মেলনে সংঘ-সদস্যরা অভিনয় করলেন 'মসনদ কার ও আর্তনাদ'। দেবেন্দ্রনাথ নির্দেশিত নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন জয়দেব মাইতি, শ্যাম শাসমল, অনিল বেরা, নিরাপদ সাউ, অজিত দাস, বিজয় সী, নব ঘোষ, মহাদেব পাত্র, নন্দ মান্না, আভা শেঠ, লীলা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে।

বৈকুণ্ঠের খাতা

রং বেরঙ-এর শিল্পিগোষ্ঠী সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। শৈলেন দত্ত ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী, নাট্য-নির্দেশকরূপে ছিলেন অমল হালদার। নাটক ছাড়াও এ দিনের বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল মূকাভিনয়। নাট্য-নির্দেশক অমল হালদার ছিলেন এ অনুষ্ঠানের একমাত্র শিল্পী, রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি অবলম্বনে শিল্পী পরিবেশিত ফিচারটি ছিল মনোমুগ্ধকর।

যাদুবিদ্যায় কে লালের জাপান জয়

যাদুকর কে লাল সম্প্রতি জাপান পরিভ্রমণ শেষে ভারতবর্ষে ফিরেছেন। জাপানে ৫৫টি শহরে তিনি সাড়ে চার মাস ধরে তিন শতাধিক যাদু প্রদর্শনী দেখিয়েছেন। এছাড়া তিনি তিনটি টেলিভিশন প্রদর্শনীতেও অংশ নিয়েছিলেন। যাদুকর লালের সুপুরুষ চেহারা, ভদ্র আচরণ এবং সর্বোপরি তাঁর প্রদর্শিত যাদুবিদ্যার নূতনত্ব জাপানবাসীদের চিত্ত জয় করেছে। যাদুকর লাল বলেছেন সে এক অভূতপূর্ব

যাদুকর কে লাল

আনন্দ। ভারতবর্ষের যাদুকরের একটি অটোগ্রাফ নেবার জন্য শ'য়ে শ'য়ে জাপানবাসী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন। ভারতীয় যাদুর প্রতি শ্রদ্ধা জাপানবাসী-

দের বহু দিনের। যাদুকর লাল শুধু শ্রদ্ধাই পান নি জাপানীরা তাঁকে প্রীতির বন্ধনেও আবদ্ধ করেছেন।

জাপানী সংবাদপত্র যাদুকর লালের খেলাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছেন। শুধু সংবাদপত্রের প্রচার নয়, জাপানী সাংবাদিকরাও যাদুকর লালের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হোয়ে আবার তাঁকে জাপানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এই ভারতীয় যাদুকর এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের কোয়ায়েত ও বাহেরিন সফরও করেছেন। তাঁর বিবিধ খেলার মধ্যে হুডিনী ইলিউসন বক্স, বেড অব এ্যারোস, ইণ্ডিয়ান রোপট্রিক প্রভৃতি খেলাগুলি সাধারণ দর্শকদেরই নয়, যাদুকরদেরও প্রভূত প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হোয়েছে। যাদুকর লাল সমস্ত খেলাতেই ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত দৃশ্যাবলী দিয়ে সেট সাজান এবং ভারতীয় সঙ্গীতেই আবহ রচনা করে থাকেন।

দুই মহল

বৈশাখীর 'দুই মহল' নাটকে শংকর রায়, অমিতাভ অধিকারী ও মন্দিরা দাস

গত ৮ই জুন ১৯৬৯ শিবানী প্রেক্ষাগৃহে বৈশাখীর সভ্যরা পঞ্চম বার্ষিক মিলনোৎসবের আয়োজন করেন। মিলনোৎসবে বৈশাখী সংস্থার সভ্যরা 'দুই মহল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। ইতিপূর্বে বৈশাখীর সভ্যবৃন্দ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাটক পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেন। বর্তমান নাটকটিতে তাঁরা পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। নাটকটি পরিচালনার বিরাট দায়িত্বে ছিলেন শ্রীঅমিতাভ অধিকারী। নাটক সুপরিচালিত। নাটক পরিচালনায় শ্রীঅধিকারী যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও অভিনন্দনীয়। নাটকটিতে শিল্পী নির্বাচনে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এবং তাঁর শিল্পী নির্বাচন সুন্দর। নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার দায়িত্ব পরিচালক ও শিল্পীদের। বর্তমান নাটকটিতে পরিচালক ও শিল্পীরা যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা দর্শকের মনে দীর্ঘদিন গভীরভাবে দাগ কেটে থাকবে। নাটকটিকে সুষমামণ্ডিত করে তুলতে যে সব শিল্পী প্রাণবন্ত অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেন লালুয়ার চরিত্রে শঙ্কর রায়, ছক্কুর ভূমিকায় অমল বিশ্বাস ও ওসমানীর চরিত্রে মিনতি সমাদ্দার ও ভজহরির ভূমিকায় চন্দন চক্রবর্তী। অন্যান্য সহ-ভূমিকাগুলিতে সহযোগিতা করেছেন গৌতম ঘোষ, মন্দিরা দাস, প্রলয় চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণ রায়, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ গুহ নিয়োগী, সত্য মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী সেন, বকুল বসু, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ সাইন, মনু রায়, কালু বসু ও পরিচালক স্বয়ং। বৈশাখী'র সভ্যদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

'সুর-বাহার'-এর রবীন্দ্র ও নজরুল সন্ধ্যা

শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ শহরতলীর জনপ্রিয় সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র 'সুর-বাহার' গত ২৫শে মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মোৎসব উপলক্ষে এক হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন কসবায়। একক কণ্ঠে (সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারিণী সুর-বাহারের দুজন কৃতী শিক্ষার্থিনী) বাণী সমাদ্দার ও নন্দা মুখোপাধ্যায়ের গান মনে রাখবার মত। শ্যামশ্রী বিশ্বাসের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত এই কিশোরী শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে বিমলকুমার মিত্র কৃষ্ণগোপাল ঘোষ এবং কৃষ্ণা সমাদ্দারের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান অনুশীলনকারী স্বাক্ষর রাখে। গীটারে সমবেতভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শেখর সাহা, সুশীল রায়, স্বপন দত্ত, নীলা দাশগুপ্তা, অনিতা সেন, ডলি চক্রবর্তী, নমিতা সেন ও জ্যোৎস্না কর্মকার। সমবেতকণ্ঠে যেসব শিক্ষার্থী রবীন্দ্র ও নজরুল গীতি পরিবেশন করেন, তাঁরা হলেন উর্মিলা দত্ত, প্রতিমা সরকার, সুগতা মৈত্র, জয়শ্রী ঘোষ, আরতি রায়, ডলি ভট্টাচার্য, স্বপ্না চক্রবর্তী, শীলা রায়, সন্ধ্যা সাহা, কল্পনা রায়চৌধুরী, শাশ্বতী সাহা, সুপর্ণা দত্ত, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, ব্রততীছায়া চৌধুরী, বাসনা ঘোষ ও তৃপ্তি মজুমদার। এস্রাজ, শ্রীখোল ও তবলা সঙ্গতে অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলেন রাজকুমার দে, সমরেশ মুখোপাধ্যায়, সুনীল সাহা, প্রশান্ত সমাদ্দার ও মনোরঞ্জন সিংহ। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সংগঠক সুনীল সাহা ও কৃষ্ণা সমাদ্দার।

ব্যক্তিত্বধর্মী পরিচালক জন ফোর্ড

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের চলচ্চিত্রেতিহাসে জন ফোর্ড একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বহু পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে তাঁকে জীবনের আসল ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হয়েছে। কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই তাঁর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে নি। একের পর এক ছবি করে তিনি চলচ্চিত্রসেবী ও দর্শকদের অবাক করে দিয়েছিলেন।

১৮৯৫ সালে কেপ এলিজাবেথ শহরে জন ফোর্ডের জন্ম। কথায় বলে, সংখ্যার দিক থেকে 'ফার্টিন' নাকি খুব 'আনলাকি' কিন্তু ফোর্ড ছিলেন তাঁর পিতামাতার তেরটি সন্তানের পর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ফোর্ডের বাবার নাম শিয়েন ও ফিনি। ফোর্ড উপাধি তাঁর দাদা ফ্রান্সিস নিয়েছিলেন। সেই থেকেই সকলে ফোর্ড উপাধি ব্যবহার করে আসছেন। এরও পিছনে সুন্দর এক কাহিনী আছে। ফ্রান্সিস বিভিন্ন নাটক কোম্পানীর কাজ করার পর নিউইয়র্কে এলেন এবং কোন একটি দলের মঞ্চ-অধিকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ঐ দলটি 'শো' দেখানোর জন্যে আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস যদিও মঞ্চ-অধিকর্তা ছিলেন, তথাপি তাঁর অত্যধিক স্মরণশক্তির জন্য তিনি অনেক গুলি পার্ট মুখস্থ করে রেখেছিলেন। অভিনয়ের প্রথম দিন রাত্রে, যে ব্যক্তির একটি হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল, সে এতই মত্ত অবস্থায় ছিল যে, মঞ্চে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হল না। ফ্রান্সিস সেই ভূমিকায় তার বদলে অভিনয় করলেন এবং এমনই চমকপ্রদ সে অভিনয় যে চারিদিকে জয়-জয়কার পড়ে গেল এবং দলটির খ্যাতি বৃদ্ধি পেল।

কিন্তু ফ্রান্সিস টাকা যা পেলেন, তা তাঁকে নিতে হল ফোর্ড নামে যে ব্যক্তির অভিনয় করার কথা ছিল, সেই নামেই। সেই থেকেই তাকে সকলে ফোর্ড বলে ডাকা শুরু করল। এ থেকে তিনি কিছুতেই রেহাই পেলেন না। এ ঘটনার কয়েক-বছর পর জন ফোর্ডের কাছে এক ব্যক্তি এল এবং জানাল—সে একজন ভাল অভিনেতা এবং সেই হেতু সে একটা কাজ চায়।

জন বললেন, ভাল কথা, কিন্তু আপনার নাম কি?

লোকটি বলল আমার নাম ফ্রান্ক ফিনি।

জন আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ তো ভারি অদ্ভুত কথা। ওইটাই যে, আমার দাদার আসল নাম।

লোকটি বলল, আমি তা জানি। আমিই প্রকৃত ফ্রান্সিস ফোর্ড; প্রথম অভিনয়ের দিন রাত্তিরে সে ব্যক্তি এত বেশী মাতাল হয়ে পড়েছিল যে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙ্গে যায় আর অভিনয় করতেও সে পারে না। এবং আপনার দাদাই আমার সেই ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে। জন তখন তাঁর উপর মমতাবশত তাঁকে একটি কাজ দিয়েছিলেন। তাঁর পিতা আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় এসে বসবাস শুরু করেন। অতি শিশু বয়সেই তিনি তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে পোর্টল্যাণ্ডে উঠে আসেন। সেখানে তাঁর পিতা একটি সেলুন খুললেন। জীবনের বাল্যকাল কাটে তাঁর পোর্টল্যাণ্ডেই। সে সময় বেসবল খেলতে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তাঁর পিতা বহুবার তাঁকে পোর্টল্যাণ্ড থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডে নিয়ে গেছেন।

ফোর্ড বলেন, একবার মাত্র আমার সঙ্গে একটি বোন এসেছিল। আমাদের এ যাতায়াত অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর ছিল। আমরা একটি নৌকা করে সোজা গলওয়েতে আসতাম এবং সেখানে থেকে কয়েক মাইল দূরে ছোট একটা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরা আমাদের পরিচিত লোকজনের মধ্যে এসে পৌঁছে যেতাম।

'অভিমান' চিত্রে ললিতা চট্টোপাধ্যায়

১৯১৩ সালে পোর্টল্যাণ্ড হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর চাকুরীলাভের আশায় তিনি হলিউডে গেলেন। সেখানে তাঁর বড় ভাই ফ্রান্সিস ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে লেখক, অভিনেতা ও পরিচালকের দায়িত্ব সম্পাদনার জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। এবং ১৯১৪ সাল থেকে '২৩ সাল পর্যন্ত তিনি বহু চিত্রের পরিচালনা ছাড়াও কাহিনীকার এবং অভিনেতা হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

জন ফোর্ডের উপর ডি ডবলু গ্রিফি-থের প্রভাব ছিল অতিমাত্রায় প্রবল। এই সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, আমার সঙ্গে গ্রিফিথের পরিচয় না থাকলেও আমি তাঁকে জানতাম। যদিও তাঁর কাছে তখন আমরা শিশু ছিলাম বলা চলে, তবু তাঁর সঙ্গে আমার বেশ সৌহার্দ্য ছিল এবং মাঝে মাঝে তিনি আমার কাঁধ ধরে আদর করতেন।

গ্রিফিথ যদি চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ না করতেন, তা হলে মোশান পিকচার্স আজও শৈশব অবস্থাতেই রয়ে যেত। আজকে যে ক্লোজ আপ শর্ট নেওয়া হয়ে থাকে তা এবং আরো অনেক কিছুই যা কেউ কোনদিন চিন্তাই করতে পারেন নি তা গ্রিফিথেরই আবিষ্কার। এ ছাড়া তিনি তাঁর ভাই ফ্রান্সের কাছেও চলচ্চিত্রে সুনাম অর্জন করার জন্য বিশেষভাবে ঋণী। তিনি একাধারে ক্যামেরাম্যান, সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক, অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। জন ফোর্ড যে কোনদিন চলচ্চিত্রে যোগ দেবেন অথবা অসামান্য প্রতিভাধর পরি-চালক হিসাবে তাঁকে আমরা কোনদিন দেখতে পাব—এ কোনদিনই সম্ভব হোত না, যদি না তিনি সতিাই অভাবে পড়তেন।

প্রথম চিত্র পরিচালনার সুযোগ পেলেন তিনি অতি অল্প বয়সেই। প্রথমে স্টুডিওর শ্রমিক, পরে ঠেকো দেওয়া অর্থাৎ সাহায্যকারী ও শেষে সহকারী পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। কার্ল লিমলি যখন নিউইয়র্ক থেকে প্রথম ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে এলেন তখন তিনি ঘটনাচক্রে পরিচালনার সুযোগ পেলেন। প্রথমদিকে তিনি নিজেই চিত্রনাট্য তৈরী করতেন। শেষে একজন লেখককে পেয়ে গেলেন, যিনি সমস্ত জিনিষটাই সর্টহ্যাণ্ডে নোট করে রাখতেন। এতে ফোর্ডের কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেত।

দু'রিলের ছবি করতে পাঁচ কি ছ'দিন সময় লাগত। লোকেশানের জায়গা পর্যন্ত তাঁরা ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত শুটিং করে যেতেন। তাঁদের ব্যাগের মধ্যে রাত্রি কাটাবার মত সরঞ্জাম থাকত।

ছবি তৈরি শেষ হলে পর তাঁরা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে নিজেদের ডেরায় ফিরে আসতেন। তখনকার দিনে এইভাবে তাঁদের ছবি তৈরী করতে হয়েছে। ১৯২৩ সালে তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'ক্যাসিও কারবি' সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। কাহিনীটিতে জন ফোর্ড যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয় এবং এই প্রথম ছবিতেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ দৃঢ়ভাবে গঠন করেন।

অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, নির্বাক ছবি তোলার সময় আপনি কি অভিনেতাদের রিহারস্যাল দেওয়াতেন। উত্তরে ফোর্ড বলেন, শুটিং চলাকালীনই অভিনেতাদের নির্দেশ দেওয়া হত। কোন অভিনেত্রী হয়তো বললেন তাঁর একটু 'মিউজিক' প্রয়োজন—তখুনিই সুরকারকে বলা হোল এ্যাকোর্ডিয়ানে হালকাভাবে একটু টান দিতে। এখনকার দিনে এটাকে অনেকে হয়তো নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে মনে করবে অথবা হাসবে কিন্তু তখনকার দিনে সকলেই তা করত। ফোর্ড সাধারণত সাদা কালোর মিশ্রণে ছবি তুলতে ভালবাসতেন, তবে মাঝে মাঝে বিপরীতও তিনি যে করতেন না তা নয়। এ বিষয়ে ক্যামেরাম্যানদের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করতেন, কখনও তাদের সঙ্গে কোনরকম তর্কবিতর্কের মধ্যে যেতেন না।

১৯৪১ সালে ফোর্ড যে ছবিখানি উপহার দিলেন তা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালী।' কি রকম মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি

'সমান্তরাল' চিত্রে নায়িকা মাধবী চক্রবর্তী ও জনৈক শিশুশিল্পী

পরিবার ধীরে ধীরে ভেঙে গেল—তারই কাহিনী। বইটি ওসকার ছাড়াও বহু পুরস্কার অর্জন করে। চিত্রখানি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জন ফোর্ড নৌবিভাগে চলে গেলেন। তখন যুদ্ধের সময়। ও এস এস এ'র একটি শাখা ফিল্ড ফটোগ্রাফিক ব্রাঞ্চের প্রধান হয়ে তিনি যোগ দিলেন। সে সময় তার কাজ ছিল বিভিন্ন বিভাগের গোপন কাজকর্মের ছবি তুলে রাখা।

১৯৪২ সালে 'দি ব্যাটল অফ মিডওয়ে'র পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান ছিলেন লেফটন্যাণ্ট কম্যাণ্ডার জন ফোর্ড। সমস্ত রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সোজাসুজি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ছবিটি তোলেন, যদিও তিনি বোমায় আহত হয়েছিলেন তবু তিনি ক্ষান্ত হন নি। ঐ চিত্রটির সবচেয়ে অবিস্মরণীয় যে দৃশ্য, তা হচ্ছে—টাওয়ারের উপর দাঁড়িয়ে সকাল আটটায় যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে বোমা পড়ছে সেখানে আমেরিকান পতাকা উড়িয়ে দেবার ছবি তোলা।

ফোর্ড সিনেমাস্কোপকে যেমন ঘৃণা করেন তেমান একটি দৃশ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা বা দেখানোকেও তিনি পছন্দ করতেন না। কারণ ফোর্ডের মতে অভিনেতারা তাতে ক্লান্তিবোধ করেন, এবং তাতে তাঁদের স্বতঃপ্রবৃত্তির ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়।

কাহিনীকারের সঙ্গে তিনি সন্ধ্যার দিকে বসতেন উভয়ে মিলে ছবির সিকোয়েন্স তৈরী করতেন। ফোর্ড বলেন, বর্তমানে ভাল ভাল গল্প পাওয়া শক্ত। উপন্যাস বা বড় কোন নাটক তিনি পছন্দ করেন না। তার চেয়ে ছোট গল্পকে তিনি পছন্দ করেন। প্রয়োজনবোধে সেই কাহিনীকেই তিনি বিস্তারিত রূপ দেন। অপ্রয়োজনীয় বা একটি দৃশ্য টেক্ করার জন্য বেশীবার শট্ নেওয়া তিনি পছন্দ করেন না কারণ ফিল্মের দাম অত্যধিক বলে তিনি মনে করেন। প্রযোজকদের বেশী খরচ করাতে তিনি ভালবাসেন না। ফোর্ডের প্রথম টকি ছবি 'নেপোলিয়ানস্ বারবার' এ সাউণ্ড টেকিং-এর ঘটনা অত্যন্ত কৌতূহলপূর্ণ। আমার মনে হয়, স্টুডিওর বাইরে শব্দ গ্রহণ-পদ্ধতির এই প্রথম ব্যবহার। কয়েকজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার ছবির মান বর্তমানে কি নিম্নগামী? উত্তরে বহু সার্থক ছবির স্রষ্টা ফোর্ড স্মিতহাস্যে বলেছিলেন, হতে পারে। আমি মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত তো নই। আর বয়েসও তো হয়েছে।

জন ফোর্ড নিজের জীবনকে যতটা ভালবাসেন, চলচ্চিত্রকে ঠিক ততটাই ভালবাসেন। আর ভালবাসেন তাঁর চারপাশে যারা রয়েছে সেইসব কলাকুশলী, অভিনেতা, ও অভিনেত্রীদের। ছবির পর ছবি তৈরী করে গেছেন। কি সম্মান পাবেন, কি পুরস্কার লাভ করবেন—সেদিকে কোনদিন তাকান নি। তাঁর কাছে, প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব একটি না একটা কাজ আছে ছবি তৈরী করাও তাঁর কাছে তেমনি একটা কাজ।

জেমস্ স্টুয়ার্ট ঠিকই বলেছেন, আজ পর্যন্ত যা কিছু দেখেছেন, বা শুনেছেন তাকে একশত দিয়ে গুণ করলেও জন ফোর্ডের মত আর একজনকে পাওয়া যাবে না।

বিভিন্ন ভঙ্গীমায়—ললিতা চট্টোপাধ্যায়

চিত্র : [illegible] বসাক

মুক্তিস্নান

খ্যাতনামা উপন্যাসিক শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে চিত্র-পরিচালক অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 'মুক্তিস্নান' রুপালী পর্দায় প্রতিফলিত করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন শ্রীকার্তিক বর্মণ। চিত্রটির চিত্রনাট্য ও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীলাহিড়ী স্বয়ং। চিত্রটির নেপথ্যে যাঁরা কণ্ঠদান করেছেন, তাঁরা হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকুমার মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে। চিত্রটির অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন, গঙ্গাপদ বসু, শ্যামল ঘোষাল, জহর রায়, সমরকুমার, অমর বিশ্বাস, ছায়া দেবী, শোভা সেন, গীতা দে, মিণ্টু মৃণাল ও নায়িকার ভূমিকায় স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীসাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

কলঙ্কিত নায়ক

সুসাহিত্যিক ডাঃ বিশ্বনাথ রায় রচিত কাহিনী 'কলঙ্কিত নায়ক'-কে চিত্রায়িত করছেন চিত্র-পরিচালক সলিল দত্ত। সঙ্গীতাংশের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। কাহিনীর চিত্রনাট্য করেছেন পরিচালক সলিল দত্ত। চিত্রটি পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এস বি ফিল্ম্‌। চিত্রটিতে যাঁদের দেখা যাবে তাঁরা হলেন অপর্ণা সেন, উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার প্রমুখ। বেবী জুলের চিত্র 'কলঙ্কিত নায়ক'।

'তীরভূমি' চিত্রে বিকাশ রায় ও মঞ্জু দে

নল ও দময়ন্তীর প্রেমকাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত করছেন পরিচালক গোপালকৃষ্ণ রায়। কাহিনীর চিত্রনাট্য-রচয়িতা হলেন মণি বর্মা। সঙ্গীতবহুল চিত্রটির গানে সুর দিয়েছেন প্রবীণ ও প্রখ্যাত কালীপদ সেন। চিত্রটির প্রযোজনায় আছেন সমীরণ মজুমদার ও জয়দেব চৌধুরী। চরিত্রচিত্রণে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, রেণুকা রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দে, মণি শ্রীমানি বীরেন চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। নলের চরিত্রে রয়েছেন অসীমকুমার ও দময়ন্তীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। জে এস প্রোডাকসন্স-এর চিত্র 'নল দময়ন্তী'। চিত্র পরিবেশনায় পারফেক্ট ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটার প্রাঃ লিঃ।

বনজ্যোৎস্না

নতুন পাতার সাফল্যের পর খ্যাতনামা ক্যামেরাম্যান ও চিত্র-পরিচালক দীনেন গুপ্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাহিনী অবলম্বনে বনজ্যোৎস্না চিত্রটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। চিত্রটির সুরকার হলেন নীহার রায়। চিত্রটির নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, শ্যামলকুমার মিত্র। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন কাজল গুপ্ত, সমিত ভঞ্জ, উমানাথ উপাচার্য, দিলীপ ভট্টাচার্য, নির্মল ঘোষ, নিরঞ্জন রায়, কানু মুখোপাধ্যায় ও নবাগতা মীনাক্ষী দত্ত প্রমুখ।

পুষ্পকীট

সুবোধ ঘোষের কাহিনী পুষ্পকীট অবলম্বনে হরবোলা চিত্রটির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন ভাঁনু বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা বসু, নিভাননী, মহুয়া ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, সতু মজুমদার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, অরুণ রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এবং হরবোলার ভূমিকায় অরুণ ঘোষ।

বিচিত্র বোম্বাই

গল্পে — উপন্যাসে — ছায়াছবিতে জিনিষটা তো মুড়ি-মুড়কির সামিল। তুলনাটা হয়তো রামরাজ্যিক হয়ে গেল অর্থাৎ বহু যুগের ফেলে-আসা স্মৃতি নিয়ে কিঞ্চিৎ টান দেয়া হয়ে গেল। মুড়ি আর মুড়কি—সম্পূর্ণ দেশজ এই খাদ্য দুটি তো বর্তমানে বিত্তহীনদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। অথচ ওটাই ছিলো আমার মতো বঙ্গ-সন্তানদের পরম প্রিয়, নিত্যকার মুখ বদলাবার প্রধান সম্বল, তৎকালে। আজ ওটি উপরতলার মানুষদের একচেটিয়া অধিকারে। ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করে রসনানিঃসৃত জলধারাকে উদরসাৎ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাই হোক লাইনচ্যুত বক্তব্যকে আবার সোচ্চার করি—কপোল-কল্পনানির্ভর যে ব্যাপারটা, যেটা সাহিত্য-স্রষ্টাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত, সেহ প্রেম বাস্তব জগতেও মাঝে মাঝে বাধা-বন্ধনহীন হয়ে বিরাজ করতে দেখা যায় কিন্তু। সব জিনিসই তো ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে (মাপ করবেন, এ অভাজন আবার একটু ফেটালিস্ট), কাজেই ভাগ্য-দেবীর করুণা যদি থাকে তাহলে আর ভাবনা কি। বলে—রাজ্যই কতো গড়াগড়ি যায়, তো রাজকুমারী কা কথা।

●

এহেন প্রেমের ক্ষেত্রে ভাগ্যের অকৃপণ কৃপায় নতুন করে ধন্য হতে চলেছেন এখানকার সদাহাসিখুশি শিল্পী কিশোরকুমার। এটা হোলো এখানকার বিশেষ সন্দেশ। আর এটা তাঁর তিন নম্বরী ব্যাপার। ইতিপূর্বে দু'দুবার এ জিনিসে হাতেখড়ি হয়ে গেছে এবং প্রতিবারেই বিজয় করায়ত্ত হয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত দু'জনের কাউকেই ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। শ্রীমতী রুমা চলে এসেছিলেন বোম্বাই ছেড়ে কলকাতায় আর মধুবালা অসমাপ্ত ঘরণী-জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে পা বাড়িয়ে দিলেন বেহেস্তের দিকে। এটা তো সেদিনের ঘটনা। কয়েকটা দিন হয়তো খুবই অসহায় বোধ করেছিলেন কিশোর,

রমেন চৌধুরী

তারপরই সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। লক্ষণ মিলোবার দরকার করলো না কারণ শ্রীমতীর নামেই রয়েছে সে পরিচয়। উনি হলেন সুলক্ষণা পণ্ডিত। কিশোরকুমারের সংগে পরিচয় ওঁর অনেক—অনেক কালের। সেই যখন ববকরা চুলে 'বো' বেঁধে শ্রীমতী ঘুরতেন ফিরতেন (জানি না এভাবে ঘুরতেন কি না এটা নিছক কল্পনা) সেই সময় থেকে। তখন কিশোর ওঁকে নিয়ে অনেক ফাংশানে দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছেন। কতো গান তালিম দিয়েছেন। সুলক্ষণা ইতিমধ্যে কিছু কিছু নেপথ্যে গানে (প্লে-ব্যাক) কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর গাওয়া তকদির ছবির ওই গানটি 'পা পা জলদি আ যানা' তো ওঁর তকদির সহায়ক হয়েছিলো ভূরি পরিমাণ।

অতএব নিজের হাতে গড়া কল্প-

'ঝিকমিক বিজলী' চিত্রে রিতা রাও — চিত্র : আনন্দ বেন্দ্রে

লোকের উর্বশীকে যদি ভক্ত কিশোর বাস্তবে তাঁর শূন্য ঘরে সব অধিকার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন—তাহলে তো সুখের কথাই। এবং সে সুখ সকলে অনুভব করবেন অচিরে। উপস্থিত তাঁরা সাগরপারের কোন মায়ালোকে কনসার্ট ট্যুরে ঘুরছেন। কোন গানের সুর সেখানকার আকাশ-বাতাস মথিত করছে তাও আমার অজানা। তবে সে গানে পিয়া মিলনের কথাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'অভিমান' চিত্রে নবাগতা মীনাক্ষী দেবী
চিত্র : আশু সেনগুপ্ত

পঞ্চান্ন মাস পর আসিফ সাহেব তাঁর থেমে থাকা ছবি 'লাভ অ্যাণ্ড গড' অথবা 'মোহব্বত অউর খুদা'-র দৃশ্য গ্রহণ নব পর্যায়ে শুরু করেছেন। কে আসিফ 'মুঘলে আজম' করে নাম আর দাম সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন কিঞ্চিৎ অতিরিক্তভাবেই। কাজেই স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকারের নতুন ছবির ঘোষণায় তখন যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিলো। নায়ক-নায়িকারূপে গুরু দত্ত ও নিম্মি ছিলেন, আর ছিলেন সহযোগী শিল্পীদের মধ্যে প্রাণ, সিম্মি, জয়ন্ত, নাজির হোসেন, অচলা সচদেব, ললিতা পাওয়ার, নাজিফ প্রভৃতি। তিন-চতুর্থাংশ কাজ ভালো-ভাবেই সারা হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু হঠাৎ গুরু দত্ত মারা গেলেন। অতো বড়ো প্রচেষ্টাই তলিয়ে গেল জলের তলায়। চেষ্টায় নাকি সব কিছু করা যায়, শ্রী আসিফ স্বর্গ মর্ত্য আলোড়নই করেছিলেন—কিন্তু বৃথাই। শেষে ও ছবির বদলে আরেকটা রঙিন ছবি শুরু করলেন এরপর বাধ্য হয়ে। কিন্তু হা হতোস্মি। সে প্রয়াসও ধোপে টিকলো না। সায়রা বানু-রাজেন্দ্রকুমার তারকাখচিত চিত্রও অর্ধপথের অতিরিক্ত এগুতে পারলো না।

'মহব্বৎ অউর খুদা' দীর্ঘকাল পরে আবার চিত্রায়িত হচ্ছে নতুন নায়ককে নিয়ে। সঞ্জীবকুমার হচ্ছেন 'মজনু', 'লায়লা'-র রূপসজ্জায় নিম্মিই রয়েছেন। বাকী চরিত্রে আগেকার শিল্পীরাই আত্মপ্রকাশ করবেন। গতবারের গৃহীত নেগেটিভের সবই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বলা ভালো—আলোচ্য কাহিনী 'লায়লা-মজনু'র অপার্থিব প্রেমের উপাখ্যানকে অবলম্বন করে দ্রুত গড়ে উঠছে।

●

কামাল আমরোহী সাহেব তাঁর 'পাকিজা' ছবির দৃশ্যগ্রহণে ভীষণ তৎপর রয়েছেন। ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে ছবি, আশা করা যায় এইভাবে চললে সামনের সেপ্টেম্বরেই সম্পাদকের হাতে নেগেটিভ পৌঁছে যেতে পারবে। তারপর কাটাই ছাঁটাই ইত্যাদি সারা হয়ে সত্তর সালের গোড়াতেই রূপালী পর্দায় রূপ পরিগ্রহ করবে।

এতো শীগগির কাজ এগিয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে মীনাকুমারীর আন্তরিক সহযোগিতা। মীনাজী অতীতের ভুলকে বোধ হয় এইভাবে শুধরে নিতে চাইছেন। অশোককুমার, রাজকুমারও ডেট দিয়ে শ্রীআমরোহীকে ইনডেটেড করে তুলছেন। এই ধরণটি বজায় থাকলে ভাবনার কিছু নেই।

'পাকিজা-র জন্যে পরিচালক-সাহেব ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে অবিশ্বাস্য রকমের একটা আইল্যাণ্ড গড়ে তুলে-ছিলেন। তার জৌলুষে তামাম মানুষ-জনের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো। দলে দলে দর্শক ভিড় জমাচ্ছিলেন সেটে ব্যাপারটাকে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাজাত করতে। বাইরের লোকের ঝামেলায় শিল্পী কলাকুশলীরা তো খুবই অসুবিধে ভোগ করছিলেন ; কিন্তু তাতে দেখায় বাধা সৃষ্টি হয় নি। এই ধরণের দর্শনীয় একটা সেট এই ছবি তোলার প্রথম পর্যায়েও (বছর পাঁচেক আগে) নির্মাণ করেছিলেন আমরোহীজী। সেটা ছিলো বাইজী-পল্লীর একটা এ ছন্দো ও ছন্দো জোড়া সেট। ঘরে ঘরে গান-বাজনা চলেছে, একই সংগে সেটা দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'পাকিজা'-র বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে দুটি। প্রথম—মীনাকুমারী ছবির একটা গান রচনা করেছেন। দ্বিতীয়—মীনাজী তার মধুঝরা কণ্ঠে গালিবের একটি গান গেয়েছেন।

এ পর্যন্ত ছবির ন'হাজার ফুট এডিট করা হয়ে গিয়েছে।

লাবণ্যময়ী শিল্পী টিউসডে উইল্ড

বর্তমান দশকে পাশ্চাত্ত্য চিত্র-জগতে যে সম্ভাবনাময়ী মহিলা-শিল্পীদের আবির্ভাব হলিউডের গৌরবময় ইতিহাসে আরও অধিকতর গৌরব এবং শ্রী আরোপিত করেছে—সেই তালিকায় টিউসডে উইল্ড একটি উজ্জ্বল নাম।

বর্তমানকালে যে তরুণী শিল্পীরা ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এবং আন্তরিক সাধনায় খ্যাতির ও যশের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার প্রথম সারিতে স্থানলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে টিউসডের নাম আজ উল্লেখ করতে হয়।

একদিকে শিশুসুলভ সারল্য অন্যদিকে যৌবনের উদ্দাম জোয়ার—এই দুয়েরই যেন এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এই শিল্পীর মধ্যে। চপলতা এবং গাম্ভীর্য—দুটোই সমানভাবে তাঁর মধ্যে ধরা পড়ে। ১৯৪৩ সালের ২৬শে আগস্ট তাঁর জন্ম। উপার্জন সুরু হয়েছে মাত্র চার বছর বয়স থেকে। তবে, তখন শিল্পিরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে নি, ঘটেছে মডেল-রূপে। পেশাদারী মডেলের জীবন আজ অবশ্য তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর নিজের মুখেই বলতে শোনা গেছে—আমি অভিনেত্রী, আমি শিল্পী, আমি মডেল নই।

ছায়াচিত্রের দর্শকসমাজ তাঁকে সর্বপ্রথম দেখতে পেলেন "রক, রক, রক" ছবিটিতে। তারপরে এল "র‍্যালি রাউণ্ড দ্য ফ্ল্যাগ বয়েস"। এরপর ড্যানি কের বিপরীতে তিনি অবতীর্ণা হলেন "ফাইভ পেনিজ"-এ। এরপর অসংখ্য ছবি। জগজ্জোড়া নাম। এত অল্পবয়সে এই বিরাট বয়ঃসুলভ পূর্ণতা তিনি ছাড়া আর ক'জনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা ভাববার বিষয়। তাঁর অভিনীত কয়েকটি বিখ্যাত ছবির নাম এখানে দেওয়া হল—রিটার্ন টু পেটন প্লেস ওয়াইল্ড

'টিউসডে উইল্ড' : ব্যাচিলার ফ্ল্যাট

ইন দ্য কান্ট্রি, ব্যাচিলার্স ফ্ল্যাট, হাই টাইম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সমালোচকদের মতে তিনি এমন একজন শিল্পী, যাঁর মধ্যে বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিল্পীর কোন-না-কোনদিক দিয়ে কিছু-না-কিছু ছায়া ধরা পড়ে—এই তালিকায় গ্রেটা গার্বো, শার্লে টেম্পল, ডায়ানে ভার্সি এবং জেন ম্যানসফিল্ডের নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে।

পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চি যাঁর দৈহিক উচ্চতা এবং একশো বারো পাউণ্ড যাঁর দেহের ওজন, সেই টিউসডের সঙ্গে টেলিভিশন জগতের যোগাযোগও দৃঢ়। প্রায় চল্লিশটি টি-ভি নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

টিউসডের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল তিনি সকলের সঙ্গে চেনা-অচেনা—শ্রেণিনির্বিশেষে প্রাণ খুলে মেশেন, কিন্তু কথা বলেন কম। খুব কম। কিন্তু স্বল্পভাষণের মধ্যেই তাঁর আচরণে এমন এক সরল আন্তরিকতা ধরা পড়ে, যা প্রাণকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়।

অভিনেতা জন আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে কিছুকাল আগে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলেন টিউসডে। কিন্তু বিবাহবন্ধ পর্যন্ত সে প্রেম এগোয় নি। টিউসডের বয়েস তখন কুড়ি, আর আয়ার্ল্যাণ্ডের আটচল্লিশ। এই ঘটনার পর কিছুকালের জন্য টিউসডের হৃদয়ের শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন এলভিস প্রেসলে।

—চিত্রপ্রিয়

'ওয়াইল্ড ইন দ্য কান্ট্রি'র একটি বিশেষ দৃশ্যে এলভিস প্রেসলে ও টিউসডে উইল্ড

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)
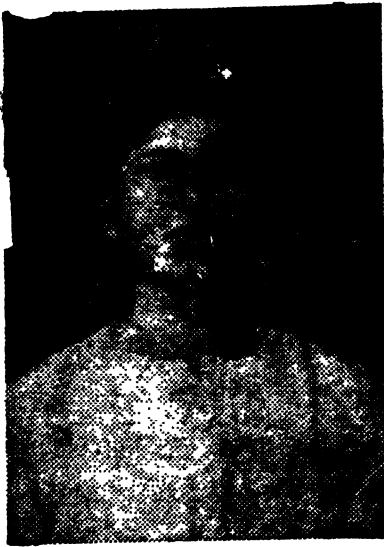
অনিল দাস

শ্রীঅনিল দাস ; শৈলেন রায় ; ক্ষিতীশ রায় ; বারেন রায় ; অনিল ঘোষ ; হরিপদ চক্রবর্তী : জীবন দত্ত ; কমলাকান্ত ঘোষ (কলি:) ; সুধীর নাগ ; শ্রীরেবতী বর্মণ (কুমিল্লা) ; ললিতা বর্মণ (ঐ) বীরেন পোদ্দার ; রাতুল ঘোষ ; নরেন সরকার (পাবনা) ; বীরেন ঘোষ (বাঁকুড়া) ; অশোকানন্দ বসু (কলি:) ; বেণুগোপাল রায় (কলি:) ; শ্রীঅতীন বসু (কলি:) জ্যোতিষ জোয়ারদার ; তেজোময় ঘোষ যতীশ গুহ (কলি:) ; জীতেন সেন সুপতি রায় ; নিকুঞ্জ সেন ; সুধীর নন্দী ; শ্রীঅশোক সেন (বড়-কলি:) ; গোপাল সেন ; কামাখ্যা রায় ; কমেট দাসগুপ্ত ; বিনয় বসু (শহীদ) ; দীনেশ গুপ্ত (ঢাকা-মেদিনীপুর শহীদ) ; বাদল গুপ্ত (শহীদ) ; মণি সেন ; অসিত ঘোষ ; সুনীল দাস : বিনয় বসু (ছোট) ; হেমেন গুপ্ত (ঢাকা-মেদিনীপুর) ; শিশির সেন ; বীরেন ভট্টাচার্য (কুমিল্লা) ; কামাখ্যা ঘোষ (মেদিনীপুর) ; ফণী কুণ্ডু (মেদিনীপুর) ; প্রফুল্ল ত্রিপাঠী (মেদিনীপুর) ; দেবেন ভৌমিক ; মালু বানার্জি

দণ্ডপাণি

(নারায়ণগঞ্জ) ; গিরিজা সেন ; অমূল্য রায় ; নীতিশ মজুমদার ; বীরেন দে ; প্রভাত নাগ ; নীরদ দত্তগুপ্ত (কলি:) ; শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত (কলি:) ; নির্মল বসু ; বীরেন ঘোষ (১) ; বীরেন ঘোষ (২) ; নীতিশ গুহ ; অনিমেষ রায় (কলি:) ; শচীন ভৌমিক ; নির্মল গুহ ; রমণী রায় ; সুবোধ ঘোষ ; বঙ্গেশ্বর রায় ; প্রভাত গুপ্ত : জ্যোতির্ময় সেন ; কামাখ্যা চক্রবর্তী ; ক্ষিতি সেন (মেদিনীপুর) ; অমর চাটার্জি ; ভোলা বসাক ; প্রিয় সেন ; অমিয় সেন ; সমর সেন ; রবি বসু (কলি:) ; কুমোদ দত্ত ; ভূপাল গুহ ; শ্রীনেপাল নাগ ; বকুল দাসগুপ্ত ; অশোক সেন (ঢাকা-কলি : এম পি) ; শান্তি বসু ; সুকুমার দত্ত ; প্রশান্ত সমাদ্দার ; লালু সেন ; বীরেন সেন ; অপূর্ব রায় ; সুশীল রায় ; সুনির্মল দত্ত ; বিনয় দেরায় ; প্রভাস গুপ্ত ; অখিল নন্দী (কুমিল্লা) ; পরিমল রায় (মেদিনীপুর) ; হরিপদ ভৌমিক ; হরিদাস সেন ; ননী চৌধুরী ; বাবীন বসু ; হরিপদ ব্যানার্জি ; সমর গুহ, এম-পি ; অজিত শীল ; ধনেশ ভট্টাচার্য ; বীরেন মুখার্জি ; অমল রায় ; নির্মল রায় (মেদিনীপুর) ; জগদীশ সরকার।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৯ সালের শেষভাগে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে

দীনেশ-বাদল-বিনয়

মীরা দত্তগুপ্ত

মতভেদ দেখা দেয়। হেমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় কর্মী ঐক্যবদ্ধ হন। অপরদিকে অনিল রায় ও লীলা নাগের নেতৃত্বে কিছু কর্মী নূতনভাবে দলগড়ায় মন দেন। ক্রমে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এবং কলিকাতা ও মেদিনীপুরে উভয়দলের সংগঠন দৃঢ়তর হয়। পক্ষান্তরে কিছু কর্মী এই মতভেদ লক্ষ্য করিয়া স্বতন্ত্র-ভাবে কাজ করিতে থাকেন। এই ভাগা-ভাগি অত্যন্ত অল্পদিন স্থায়ী হয়। কারণ ১৯৩০ সালের প্রথম হইতেই বড়রা সবাই জেলে যান এবং কর্মীদের মধ্যে কার্যক্ষেত্রে অনেকটা সহযোগিতা গড়িয়া উঠে। জেলের অভ্যন্তরেও কিছু দিনের মধ্যে নেতারা বিভেদ ভুলিয়া একত্র কাজ করার কথা আলোচনা করিতে থাকেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে জেলের বাহিরে আসিয়া সবাই একত্রে 'ফরোয়ার্ড ব্লকে' যোগ দেন এবং সকল বিভেদের অবসান হয়।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে বিভিন্ন রাজনৈতিক সহযোগে বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী (Bengal Volunteers) গঠন করেন। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির বহু কর্মী এই আন্দোলনে যোগদান করেন।

কলিকাতা কংগ্রেসের পর ১৯২৯ সালে ঢাকায় স্থানীয় বিশিষ্ট কর্মীদের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার' নামে সামরিক কায়দায় একটি স্বেচ্ছসেবক বাহিনী গঠিত হয়। অনিল রায় মহাশয়ের সহকর্মীরাও নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করিয়া লন। কিছুদিনের মধ্যেই এই উভয় গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সারা বাংলায় এক বিরাট উন্মাদনা সৃষ্টি করে। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩২ সালের মধ্যে বহু কর্মী গ্রেপ্তার হন।

সরকার "শ্রীসংঘ" ও "বি, ভি"

হেলেনা বল (দত্ত)

নামে দুই প্রতিষ্ঠানকেই নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। সরকারী নিষিদ্ধতা ভারতীয় বৈপ্লবিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উভয় দলকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হইল বটে : কিন্তু স্বাধীনোত্তরকালে সংগঠনের নাটকীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া অগ্রজ ও অনুজের সম্পর্ক-কে অমলিন রাখিবার উদ্দেশ্যে আজিকার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মতপার্থক্যের মধ্যেও "সতীর্থ সংহতি" নামে একটি সামাজিক প্রতিস্থান গঠন করিয়া সতীর্থরা নিজেদের মধ্যে বাৎসরিক রাখী-বন্ধন উৎসব পালন করিয়া চলিয়াছেন।

১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে দায়িত্ব-শীল কর্মী দুই-চারজন যাঁহারা পলাতক বা আন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টায় ১৯৩২ সালের প্রথমভাগে পুন-রায় উভয় দল ও তাঁহাদের স্বতন্ত্র কর্মীরা অনিল দাসের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে নূতন উদ্দমে বৈপ্লবিক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। শ্রীদাসের এই প্রচেষ্টায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রী প্রভাত গুপ্ত, নেপাল নাগ, অসিত ঘোষ, হেমেন গুপ্ত, অশোক সেন (ছোট—প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী), বীরেন দে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে এই গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের একটি নির্ঘণ্ট উপস্থিত করিতেছি।

নির্ঘণ্ট—

১। ১৯৩০ সালের ২৫শে আগস্ট কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর আক্রমণ হয়। বিচারে ডাঃ ভূপাল বসু দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন

২। এই বৎসরই আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাফের তার কাটার সময় ঢাকার গ্রামে নৃপেন দত্ত ও বীরেন বসু রায় চৌধুরী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

৩। এই বৎসর জুলাই মাসে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে বিনয় বসু মিঃ লোম্যান ও মিঃ হড্‌সন্ সাহেবকে আক্রমণ করে। লোম্যানের মৃত্যু ঘটে। বিনয় পালিয়ে যায়।

৪। ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর গুপ্ত (বাদল) কলিকাতার

উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিতরায়)

ভট্টাচার্য বিল্ডিংস্ আক্রমণ করে। কারাসমূহের আই, জি মিঃ সিমসন্ গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। অপর কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী গুরুতররূপে আহত হয়। বাদল পটাসিয়াম সাইনাইড সেবন করিয়া ঘটনাস্থলে প্রাণত্যাগ করে। বিনয় নিজের মস্তকে গুলিবিদ্ধ করিয়া ও পটাসিয়াম বিষ পান করিয়া আহত হয় এবং হাসপাতালে মায়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পর মস্তিকের ছিদ্রস্থলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রবিষ্ট করাইয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয়লাভ করে। বিচারে দীনেশের ফাঁসীর হুকুম হয় এবং ১৯৩১-সের ৭ই জুলাই ফাঁসীর মঞ্চে তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

৫। ঢাকার টিকাটুলীতে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট্ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেনের গৃহে তাঁহার পুত্র স্বনামখ্যাত শ্রীসুকুমার সেন আই, সি, এস মহাশয়ের রিভলবার চুরি যায়। সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅশোককুমার সেন (ভারত সরকারের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী) ঐ রিভলবার গোপনে তাঁহার বন্ধুদের হাতে তুলিয়া দেন। সন্দেহক্রমে দলের অপর একটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে সে মুক্তি পায়।

৬। ঠিক তার কিছুদিন পরে ঢাকার রাজার দেউড়ী নামক স্থানে অসিত ঘোষ তাঁহার বন্ধুদের সাহচর্যে জনৈক ইংরেজ পুলিশ অফিসারের, কোন বিশেষ ব্যক্তির মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

সুকুমার দত্ত

করিতে যাওয়ার পূর্বে পাশের ঘরে রক্ষিত রিভলবারটি তুলিয়া নেয়।

৭। জুলাই মাসে ঢাকা সহরে ক্যাপটেন বসুর আরমানীটোলার গৃহ হইতে অসিত ঘোষ পুনরায় একটি রিভলবার অপহরণ করে।

৮। এই বছরেই ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী অঞ্চলের মাখন ও ছায়া নামে দুইটি তরুণী জনৈক কোর্ট ইন্‌স্পেক্টারের রিভলবার লইয়া পলায়ন করে।

৯। ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই আলিপুর বিচারালয়ে, দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ডের বিচারক মিঃ গার্লীক যখন

অশোক সেন

কোন এক মামলার সওয়াল শুনিতে-ছিলেন, তখন কানাই ভট্টাচার্য—বিমল গুপ্ত ছদ্মনামে তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে এবং নিজে পটাসিয়াম বিষ পান করিয়া, নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে।

১০। এই বৎসরই ঢাকাতে জি, পি, ও'র ত্রিশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইবার সময় বিনয় বসু (ছোট) ও বঙ্গেশ্বর রায় ধৃত হয়। বিচারে তাঁহাদের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১১। এর কিছুদিন পর পুনরায় ঢাকার জি, পি, ও'তে আর একটি ডাকাতি হয়। ডাকঘরের কয়েকটি মেলব্যাগ ভ্যানে তোলার সময় কয়েকজন যুবক গাড়ির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং চোখের পলকে কয়েকটি ব্যাগ লইয়া

বীরেন দে

পলাইয়া যায়। তাহাতে চার হাজার টাকা ছিল। এই ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে সুকুমার দত্ত, খুসী মল্লিক, সত্য গুহবিশ্বাস ও বকুল দাসগুপ্ত।

১২। ১৯৩২ সালে মেদিনীপুর জিলা বোর্ডের সভায় জেলাশাসক মিঃ ডগ্‌লাস সভাপতিত্ব করার সময় প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়। প্রদ্যুতের সঙ্গে ছিল প্রভাংশু পাল, সে পালিয়ে যায়।

১৩। ঐ সনের জুন মাসে ঢাকার বুকে, নীলক্ষেত লেবেল ক্রসিং-এর নিকট দিন-দুপুরে মেল ট্রেন থামাইয়া এক চমকপ্রদ ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রায় আটচল্লিশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল। বীরেন দে'র গুলীতে এংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড আহত হয়। বীরেন জ্যোতির্ময় সেন ও হেমেন গুপ্তর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। পুলিশ কর্তৃক বীরেনের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ফলে তাঁহার 'ডাইং ডিক্লারেশন' লওয়া হয়। সৌভাগ্যবশত সে বাঁচিয়া যায় ও প্রমাণাভাবে মুক্তি পায়। জ্যোতির্ময়ের দশবৎসর কারাদণ্ড হয়। হেমেন গুপ্ত মেদিনীপুরে পলাতক ছিল বলিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালিত হয় নাই। এই দুঃসাহসিক কাজের পশ্চাদ্ভাগে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনিল দাস, অনিল ঘোষ, বীরেন সেন, রমণী রায়, অপূর্ব রায়, সুকুমার দত্ত, অসিত ঘোষ, শান্তি বসু, সুধীর দত্ত,

প্রভাত গুপ্ত, শিশির সেন, সুধীন্দ্র মুখার্জী, সুবোধ ঘোষ, অশোক সেন (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী) প্রমুখর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৪। ট্রেন ডাকাতির অব্যবহিত পরে প্রায় আড়াই বৎসর পলাতক থাকার পর বহু ক্রিয়াকর্মের 'মধ্যমণি' অনিল দাস বিক্রমপুরের ক্ষুদ্র এক স্টীমার স্টেশনে রাত্রির অন্ধকারে গ্রেপ্তার হয়। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে ঢাকা জেলে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

১৫। ঐ বৎসর আগস্ট মাসে ঢাকার নবাবপুর রেলওয়ে লেবেল ক্রসিং-এর পৃষ্ঠে প্রকাশ্য রাজপথে শ্রীবিনয় দে রায়
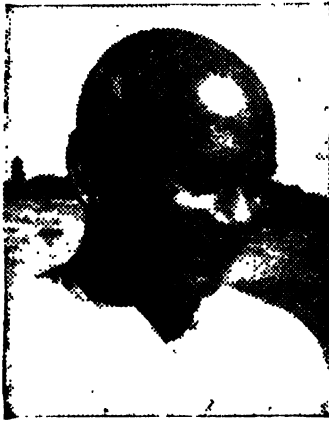
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়

ঢাকার এ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার মিঃ গ্র্যাসবীকে তাঁহার মোটর থামাইয়া আক্রমণ করে। গ্র্যাসবী মৃত্যুর হাত হইতে রেহাই পাইলেও বিনয় পুলিশের গুলিতে আহত হইয়া ঘটনাস্থলের অদূরেই ধরা পড়ে এবং বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। বিনয়ের সঙ্গে ছিল শ্রীহরিপদ রায়। কিন্তু সে ধরা পড়ে নাই।

১৬। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ স্টিভেন্স

নৃপতি রায়

আক্রান্ত হন। শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ অভাবনীয় সাহসে ও নৈপুণ্যে কল্পনার অতীত এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া দেশবাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, তাঁহাদের এতকাল অবলা নারীরূপে যাঁহারা কৃপার চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সেই অবহেলিতা নারীরা আজ তাঁহাদের অংশীদার। বিচারে তাঁহাদের আজীবন কারাবাস হয়।

১৭। ১৯৩১ সনের ৭ই এপ্রিল। মেদিনীপুরের জেলাশাসক মিঃ পেডি বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তাঁহার আততায়ীদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এই কীর্তি যতিজীবন ঘোষ ও বিমল দাস গুপ্তের। তাঁহাদের পলায়নকালে একটি পথচারী বালক বিমলকে চিনিতে পারিয়া "বিমল দা" বলিয়া ডাক দেয়। এই সূত্র ধরিয়া পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পলাতকের পাত্তা পায় নাই। এই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পর মেদিনীপুরের দ্বিতীয় জেলাশাসক মিঃ ডগ্‌লাস নিহত হন। ইতিপূর্বে সে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৮। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরের তৃতীয় জেলাশাসক মিঃ বার্জ বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ইংরেজ-শাসনের জঘন্য হিংস্র প্রবৃত্তির চরম প্রকাশ দেখা যায় এই ঘটনার সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের বিচার-প্রহসনের মাধ্যমে। অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও নির্মলজীবন ঘোষের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে ধিক্কার দিয়া ফাঁসির রজ্জুতে তাঁহাদের দেহ নিশ্চল করিয়া শাসনের চরম জিঘাংসার স্বাক্ষর রাখিয়া যায়।

১৯। ১৯৩৩ সালে ত্রিপুরা অঞ্চলে একটি ডাকাতি প্রসঙ্গে দলের কর্মী সারদা বসু গ্রেপ্তার হয়। বিচারে তাঁহার পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

নিকুঞ্জ সেন

২০। ইহার পর ১৯৩৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জে দেওভোগ স্যুটিং-এ মতি মল্লিকের জীবন দান এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

২১। সর্বশেষে ১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বাংলার গভর্নর স্যার জন এণ্ডার্সনের গুলিবিদ্ধ আর্তনাদ

'আগে কেবা প্রাণ ; করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি'

কবির এই বাণীকে বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাসে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।

[ক্রমশ।

ধান কাটা হ'ল সুরু

স্বরূপ সিংহ

সোনালী ধানের শীষে মাঠ ভরে যায়—
ধান কাটা হল সুরু আয় ছুটে আয়।
আনন্দে পাগল হ'য়ে ধান কেটে যাই ;
সব দুখ সরে যাবে আর ভয় নাই।

দেবতা করেছে কৃপা সে যে সুমহান ;
মাঠে মাঠে ভরে গেছে তাই এত ধান।
বর্ষভরে পরিশ্রম হয়েছে সফল—
আঙ্গিনা ভরেছে তাই সোনার ফসল।

অন্নপূর্ণা এসেছেন আমাদের মাঝে ;
মধু তান বীণা তারে অহরহ বাজে।
আর সবে ভক্তি ভরে প্রার্থনা জানাই—
যতেক অভাব আছে দূরে যাক ঠাঁই॥

সম্পাদকীয়

চীন পাকিস্তানের আর একটি যৌথ অপকীর্তি

অভিজ্ঞ মহল বলিয়া থাকেন যে, কোন বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া অন্যকে অকস্মাৎ চমকাইয়া দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। যে-কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন অপ্রত্যাশিত চমক স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভপ্রদ নয়। এই অভাবিত চমকের ধাক্কার তাল সামলানো সম্ভব না হওয়ার জন্য স্নায়ুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং স্নায়ুতে তাহার যে ধাক্কাটি পড়ে উহা সামগ্রিকভাবে নানাপ্রকার শরীরের ক্ষতিসাধন করে। এই দিক অনুযায়ী বিচার করিলে দেখা যায় যে চীন ও পাকিস্তান সত্যই ভারতের ক্ষতি কামনা করে না।

এই দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সহিত যে কি মধুময় (?) সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেছে তাহা কারও আজ অজানা নয়। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহারা এমন কার্যাদি অতীব সতর্কতা সহকারে করিয়া থাকে যাহাতে ভারতরাষ্ট্রের জনগণ কোনপ্রকার বিস্ময়ের তরঙ্গে ধাক্কা না খান, এমন কিছু তাঁহারা করেন না যাহাতে আশ্চর্যের ধাক্কায় ভারতের কোটি কোটি নরনারী স্নায়বিক আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁহাদের যে স্বরূপ চরিত্র এবং প্রকৃতি আজ ভারতীয়দের মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে সেই আলেখ্যের এতটুকু পরিবর্তন সাধন করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। আজ যদি হঠাৎ দেখা যায় তাঁহাদের স্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ভারতবাসী যে পরিমাণ বিস্ময়ে আবদ্ধ হইবেন বোধ করি পৃথিবীর আর কোন জাতি ঠিক তেমনটি আর হইবেন না। অতএব, ভারতের এই শুভাকাঙ্ক্ষী (?) রাষ্ট্র দুটি এক্ষেত্রে কেমন করিয়া এতগুলি লোককে চমকাইয়া দিতে পারেন কোন যুক্তিতে?

আজ যদি সত্যই দেখা যায় যে এই দেশ দুইটি ভারতের সহিত ক্রমানুয়ে যে নীচতা, শঠতা এবং অসৎ আচরণ করিয়া চলিতেছে তাহার হঠাৎ অবসান হইয়া তাঁহাদের ভারত সম্পর্কিত এক সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ পরিগ্রহ করিল তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আশ্চর্যের কি আছে আমরা জানি না। তাই, ভারত এখন একটি বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে চীন-পাকিস্তান তাহার চমক খাওয়ার মত কাজ কদাপি করিবে না।

উৎপত্তির অত্যল্পকাল পর হইতে পাকিস্তান এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চীন একনাগাড়ে যেভাবে ভারতের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিতেছে সেই জঙ্গী মনোভাবের সহিতই আজ আমরা পরিচিত। তাহাদের এই সর্বগ্রাসী, লোভী, পররাজ্যলিপ্সু মূর্তি আমাদের শিরায়, শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে আজ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, সে কারণেই তাহাদের নিত্য নব ছলাকলায় আজ আমাদের বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ আমরাও এত বুদ্ধিহীন নই যে ঘাতকের নিকট প্রেম-ধর্ম প্রত্যাশা করিব। আমরা এমন নির্বোধ নই যে পররাজ্যগ্রাসীর চরিত্রে উদারতা ও বন্ধুত্বধর্মী মনোভাবের চিহ্ন খুঁজিব। তাই সম্প্রতি ভারতীয় সীমান্তে তাহাদের বেআইনী সড়ক নির্মাণ আমাদের কিছুমাত্র বিস্মিত করে নাই। যাহাদের, ধর্মই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উদারতা, বন্ধুত্ব ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী নীতির সুযোগ লইয়া তাহার ভূমিহরণ, তাহার এক্তিয়ার নিজেদের আওতাভুক্ত করা এবং যেন-তেন-প্রকারেণ ছলে, বলে, কৌশলে তাহার ক্ষতিসাধন, তাহাদের নিকট এ ছাড়া আর আমরা কি পাইতে পারি।

কিন্তু কথা হইতেছে যে বিস্মিত আমরা হই নাই ঠিকই, কিন্তু বিস্মিত না হওয়া আর মুখ বুজিয়া সবকিছু অন্যায় ষড়যন্ত্র, অভিসন্ধি মানিয়া লওয়া এক জিনিস নয়। যে স্থানে চীন, পাকিস্তান পথ কাটিল সে জায়গা তাহাদের নয়। কোনকালেই ছিল না, তাহা ভারতের এবং বরাবরই তাই ছিল। ভারত কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বাস্তুচ্যুত করিয়া আপন মানচিত্রের সীমানা বিবর্ধন করে নাই। শাশ্বতকাল হইতে ঐ ভূখণ্ড ভারতেরই অধিকারভুক্ত।

১৯৬২ সালে চীন এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান অন্যায়ভাবে ভারত আক্রমণ করিয়া যে সমুচিত প্রত্যুত্তর হাতে হাতে পাইয়াছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার স্মৃতি কি তাঁহাদের চিত্তপট হইতে একেবারে অপগৃত হইয়া গেল? এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করিয়া তাঁহারা ভুলিলেন যে অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণেই ভারতের অধিকারে আছে?

বারো হাজার চীনা কর্মী দিয়ে অতি গোপনে যে রাস্তাটি অন্যায়ভাবে চীন ও পাকিস্তানের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হইল সেটি বিশেষজ্ঞদের মতে সামরিক দিক দিয়া এই পথটি ভারতের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। পূরো একটি মরশুম ধরিয়া ইহার নির্মাণ কার্য চলিল অথচ ব্যাপারটি আগাগোড়াই ভারত সরকারের নিকট গোপন রাখা হইল। যেখানে দেখা যাইতেছে ভারতের বুকের উপর দিয়া এমন একটি পথ বাহির করা হইতেছে, যাহা ভারতের পক্ষে এক মারণাস্ত্রস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে এবং

যাহার জন্য সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত বিসর্জিত হইয়া ভারতের বিনানুমতিতেই চীন-পাকিস্তান কার্য সমাধা করিল সেখানে ইহার পশ্চাতে যে ভারত-বিরোধী কোন বিশেষ গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলাই বাহুল্য। ইহাও আজ অস্পষ্ট নয় যে এই পথটি চীনা বাহিনীকে অতি সহজে শিলগিটে উপনীত হওয়ার পথটি প্রশস্ত করিয়া দিবে এবং একমাত্র এই কারণটিকে এই সমগ্র অপপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য বলা যায়।

আশার কথা, এত বড় অন্যায় ভারত সরকার মুখ বুজিয়া হজম করেন নাই। এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে তীব্র-কণ্ঠে সোচ্চার প্রতিবাদ সরকারী দপ্তর হইতে করা হইয়াছে। কিন্তু চীন-পাকিস্তান যে ধাতু দিয়া গড়া সে ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের আরও অধিকমাত্রায় সচেতন এবং তৎপর হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

সঙ্কটের মুখে বাংলার বস্ত্রশিল্প

যে-সকল মাধ্যম শুধু বর্তমানকালেই নয়, সুদূর অতীতেও বিশ্বের দরবারে ভারতকে এক বিশেষ সম্ভ্রম মর্যাদা ও গুরুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল--শিল্প তাহাদের মধ্যে এক বিশেষভাবে উল্লিখিতব্য নাম। শিল্পের নানা শাখা, নানা অঙ্গ, বিভিন্ন মাধ্যমে তাহার আত্মপ্রকাশ। তন্মধ্যে আবার বস্ত্রশিল্প এক অগ্রগণ্য দৃষ্টান্ত। সাহিত্য-সংস্কৃতির ন্যায় বিভিন্ন ধরণের শিল্পের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের দক্ষতা সেদিন সেই সুদূর অতীত যুগেও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, ভারতের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদেশের অভিজাত এবং সাধারণ সমাজেও এক বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া ভারতের ঐতিহ্য ও গরিমা বিবর্ধনে যথোপযুক্ত সহায়তা করিয়াছে।

আলোচনার পরিধি এবার একটু সীমাবদ্ধ করা যাক। ভারতবর্ষ হইতে বাঙলায় আসা যাক। আজকের খণ্ডিত, লাঞ্ছিত, নানাবিধ অবিচারের অসহায় শিকার পশ্চিমবঙ্গ বা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত বর্বরতার লীলাভূমি পূর্ববঙ্গ নয়। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ সব মিলাইয়া অবিভক্ত বঙ্গ বিরাট বিশাল যাহার সীমানা। যাহার সহিত তুলনা করা চলে স্বর্গের। যাহার আর এক নাম ভুবনমনোমোহিনী। সেই বাঙলা আজ বাস্তবে অদৃশ্য কিন্তু ইতিহাসে অমর (এবং ঘটনাচক্রে আজ ইতিহাসই যাহার আশ্রয়)। সেই ইতিহাসের আলোকেই দেখা যায় যে বহু-বহুকাল পূর্বে বাঙলার বস্ত্রশিল্প সেদিন যে জগজ্জোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল তাহার তুলনা মেলা ভার, তাহা আজও রাশি রাশি বিস্ময়েরই উদ্রেক করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সে সময়ে এত ব্যাপক ছিল না, সেই সময় বাঙালীর এই দিগ্বিজয় এবং বিদেশে আপন প্রভাব বিস্তার কোন্ দেশপ্রেমিকের অন্তরলোক আনন্দে উদ্ভাসিত ও গর্বে উদ্দীপ্ত করিয়া না তোলে? সেই সময়ে খোদ রোম সম্রাটের দরবার ও বিলাস-কক্ষে নাকি ঢাকাই মসলীন শোভা পাইয়া সমগ্র আবেষ্টনীর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিত। শুধু রোমেই নয়, বোগদাদ, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙলা দেশের নানাপ্রকার সৌখীন বস্ত্রশিল্প বিপুল জনপ্রিয়তার আস্বাদ লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এ তো গেল অতীতের কথা, সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাঙলার বস্ত্রশিল্পের আজ কি হাল হইয়াছে। এবং যে ধারায় তাহার গতি প্রবাহিত হইয়াছে সেই গতি যে কোন পরিণতিতে গিয়া মিলিত হইবে তাহা জানা যায় না, তবে যাহাই হউক পরিণতিটি যে ভয়াবহ এবং সর্বনাশা এ সম্বন্ধে কিন্তু সংশয়ের কোনপ্রকার অবকাশ থাকে না।

সৌখীন দ্রব্য লইয়া সমস্যা নয়, সমস্যা এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া যাহার গুরুত্ব সভ্য সমাজে অনস্বীকার্য। সভ্য জগতে যে ক'টি বস্তু ছাড়া সমাজে বসবাস অসম্ভব, বস্ত্র তাহাদেরই মধ্যে একটি। বস্ত্র সভ্যতারই একটি প্রধান অঙ্গ। অন্ন, বস্ত্র, জল, খাদ্য এ ছাড়া জীবন ধারণ একেবারে অচল। সেই বিচারে এই নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুটিকে কেন্দ্র করিয়া আজ যে বিরাট সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা এক প্রধান জাতীয় সমস্যারই নামান্তর মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প আজ যে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানী বা তথ্যাভিজ্ঞ মহলে কাহারও কিছু অজানা নেই।

বস্ত্রশিল্পের জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলার স্থান পুরোভাগে হইলেও এবং বাঙলার বস্ত্রশিল্প যে ঐতিহ্যের অধিকারী সেই পরিমাণ ঐতিহ্যের সহিত এ ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি সম্পর্কশূন্য হইলেও দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য রাজ্যগুলি বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রের এ ধরণের ভয়াবহতা এবং অনিশ্চয়তা হইতে এখনও বহু দূরে অবস্থান করিতেছে। সমস্যা সে সব অঞ্চলেও ছায়াপাত করিয়াছে কিন্তু তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই।

শ্রমিকদের সর্বভারতীয় হারে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বস্ত্রশিল্পের মালিকবৃন্দ তাঁহাদের অক্ষমতার বিষয় সরকারের গোচরীভূত করিয়াছেন। এমনিতেই এ রাজ্যের বস্ত্র শিল্পের আর্থিক তহবিল কখনই আশাপ্রদ নয়। জমা-খরচের হিসাব মিলাইয়া তহবিল যখন দেখা হয় তখন তাহা মোটেই আশার সঞ্চার করে না।

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এ ক্ষেত্রের একটি প্রধান সমস্যা। বর্তমানে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির যে দ্রুত মূল্য-বৃদ্ধি হইতেছে এবং বাজারদর ক্রমশই যেভাবে আকাশছোঁয়া হইতেছে, জীবন-যাত্রা নির্বাহ যেভাবে ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছে সাধারণ মানুষের জঠরের

জালা নিরসন যেরূপ দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে সেক্ষেত্রে পূর্ব মজুরীতে কাজ করা আজ শ্রমিকদের পক্ষে সত্যই সম্ভব নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষও অর্থাৎ মালিকবৃন্দ বর্তমান বাজারের অনুপাতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্ত্র-শিল্পের ব্যাপারে তুলা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তুলার প্রাচুর্য ছাড়া এ শিল্পের রূপায়ণ এককথায় অসম্ভব। এই শিল্পের প্রসারকল্পে তুলার সহযোগিতা অপরিহার্য। সেই তুলারই এখনই বিশেষ অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই রাজ্যের কলগুলিতে যতটা তুলা প্রয়োজন সেই অনুপাতে তুলা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। তদুপরি এই সকল কলকারখানার যে যন্ত্রপাতি আছে সেগুলি প্রায় সবই অতি প্রাচীন। এখনকার দিনে এই গতিশীলতার যুগে, বিজ্ঞানের ব্যাপক জয়যাত্রার দিনে সেই সব প্রাচীন আমলের যন্ত্রপাতির দ্বারা কাজ চালানো এখনকার দিনে অসম্ভব বলিলেই চলে।

এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে এই সকল যন্ত্রকে হাতিয়ার করিলে দ্রুত অগ্রসরণ এবং সঙ্কল্পে সিদ্ধিলাভ কোনক্রমেই সম্ভবপর হইবে না। অথচ, দেখা যাইতেছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এই সকল প্রাচীন আমলের যন্ত্রপাতিগুলি বিদায় লইয়াছে। তৎস্থলে নূতন নূতন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাবলীর সমাগম ঘটিয়াছে, ফলে উৎপাদনও তুলনামূলকভাবে অনেকখানি আশানুরূপ হইতেছে। তাহা ছাড়াও গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যসমূহে বস্ত্র-শিল্পের প্রসারের জন্য কলকারখানাগুলিতে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধার প্রবর্তন করা হইয়াছে, যাহার ফলে কলকারখানাগুলির উৎপাদন কার্য নানাবিধ সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পায়।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সমস্যা কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পাওয়াটাই বিশেষরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। একদিকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে আশানুরূপ উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে অন্যদিকে তাহারই অন্যতম ফলশ্রুতিস্বরূপ নিদারুণ আর্থিক অনটনবশত কর্মীদের যথাযথ বেতনদানেও অক্ষমতা বাঙলার বস্ত্রশিল্পের এক শোচনীয় অবস্থা আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে। এই সাঙ্ঘাতিক পরিস্থিতি হইতে বাঙলার গৌরব ও ঐতিহ্য বর্ধণকারী এই মহান শিল্পকে এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রায় পঞ্চাশ হাজার কর্মীকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার যথেষ্ট সময় আজ আর দুয়ার হইতে অদূরে নয়।

নীতির মর্যাদা

যুক্তফ্রণ্টের সমর্থক 'যুগবাণী' বলিতেছেন,—'যুক্তফ্রণ্ট সরকার নীতির মর্যাদা দেবেন ইহা আমরা আশা করি। তাঁহারা জনগণের ক্লেশ কতটা দূর করিতে পারিবেন জানি না, এখন পর্যন্ত কিছুই পারেন নাই। কিন্তু অন্তত নীতির ক্ষেত্রে, আদর্শের ক্ষেত্রে তাঁহারা সততা ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যে যাইবেন ইহা আমরা আশা করি। অথচ এ ব্যাপারে তাঁহারা উদাসীন। নিজেদের জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়া কেহ কেহ গোপনে দুর্নৈতিক ব্যাপারেও লিপ্ত হইতেছেন। কোনো দপ্তরে কয়েকটি পদ খালি হওয়ায় প্রার্থী চাহিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল; কিন্তু মন্ত্রীরা উহাতে অবৈধভাবে নিজেদের লোক ঢুকাইতে চাহিয়াছেন, ইহা আমরা জানি। তবে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীদের তফাৎ থাকিতেছে কোথায়? গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজের অছিলায় মন্ত্রীরা শৈলাবাসে ছুটিতেছেন, দিল্লী-দিল্লী ঘুরিয়া প্রচুর টি-এ বিল টানিতেছেন, স্বজন পোষণে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেছেন, দুর্নৈতিক কাজেও লিপ্ত হইয়াছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন সৎ ব্যক্তি —এবং কংগ্রেসে অতুল্য ঘোষের সঙ্গে এ কারণেই তাঁর বিরোধ বাধিয়াছিল। অথচ বর্তমানে তিনি সবই নীরবে হজম করিতেছেন। ইহা কি মায়া, না মোহ। যুক্তফ্রণ্টের জনপ্রিয়তা বা প্রগতিশীলতার খ্যাতির এই মায়া বা মোহ শেষ পর্যন্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো পরিণাম ডাকিয়া আনিবে।

খাদ্যমন্ত্রী সুধীনকুমার খুবই অদ্ভুত নীতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্য বাহির হইয়াছে এবং সেগুলি অপ্রমাণিত হয় নাই। অথচ তিনি মন্ত্রিত্ব না ছাড়াইলে ছাড়িবেন না জানাইয়াছেন। তাঁর দলের কোনো এম এল এ নাই, তবু তিনি পূর্ণ মন্ত্রীই আছেন, ইহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা তিনি অনুভব করেন না। তিনি মনে করেন যে তিনি শক্ত গাছে খুঁটি বাঁধিয়াছেন। তিনি প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেলা বনিয়াছেন, অতএব তাঁকে হটায় কার সাধ্য? এই কি যুক্তফ্রণ্টের আস্থায়কের চরিত্রের নমুনা?

সুধীন কুমার খাদ্যমন্ত্রিরূপে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন এবং ভূতপূর্ব খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ও প্রফুল্ল ঘোষের অবিকল প্রতিরূপে পরিণত হইয়াছেন। বছরের গোড়ায় তিনি বলিলেন, এবার চালের দাম এক টাকা তিরিশ পয়সার বেশি উঠিবে না, কেন না চালকলের মালিক ও অন্যান্য চাল-ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো কথা বলিয়াছেন। অতএব সুধীনবাবুও সুখী ভদ্রলোকের মতো নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিলেন। এখন যখন চালের দাম হু হু করিয়া বাড়িতেছে, তিনি হাত কচলাইয়া বলিতেছেন, মজুতদার-কালোবাজারীরা ভদ্রলোকের চুক্তি মানে নাই। বেশ, কিন্তু প্রতিকারের উপায় কী? খাদ্যমন্ত্রী সব ব্যবসায়ীকে, বড়বাজারের মাড়োয়ারীদেরও রাইটার্স বিল্ডিংসে ডাকিলেন; তাঁদের প্রকাশ্যে টিপস দিলেন যে আগামী তিন সপ্তাহে

তোমরা যত পার লুটিয়া লও, এ ব্যাপারে কিছুই বলিব না ; কিন্তু তিন সপ্তাহের পর তোমরা ধর্মপুত্র সাজিও। তার অর্থ এই যে, দেখ, আমি যতদিন খাদ্যমন্ত্রী আছি, ততদিন তোমাদের ভয় নাই।

যুক্তফ্রণ্টের আহ্বায়ক ও খাদ্যমন্ত্রীর এ রকম আচরণের কারণ কী? প্রফুল্ল সেনের সম্পর্কে লোকে এ ক্ষেত্রে টাকার গোপন আদান-প্রদানের সন্দেহ করিত। সুধীন কুমার যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রী বলিয়াই ধোয়া তুলসীপাতা এতটা বিশ্বাসের জোর এ যুগের মানুষের নাই। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে উক্ত বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বলিয়াছেন যে সরষের তেল, মসলা, চাল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম গত দুই মাসে অসম্ভব বাড়িয়াছে। এইভাবে দর বাড়াইবার মূলে কে বা কারা আছে তা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। অথচ ক'জন চোরাকারবারী, মজুতদার বা কালোবাজারীকে এ পর্যন্ত তিনি গ্রেপ্তার করিয়াছেন? একজনও কি গ্রেপ্তার হইয়াছে?

অথচ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রকৃত কর্ণধার বিপ্লবী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় গত প্রায় চারমাসের রাজত্বে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন, রাজনৈতিক বিরোধীদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন, তাঁহার পুলিশ কলেজে অনাহূতভাবে ঢুকিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বেও প্রশ্ন করিয়াছি, কালীপদ মুখার্জী বা প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে জ্যোতি বসুর পুলিশ বিভাগ পরিচালনায় কোন পার্থক্যই থাকিতেছে না কেন?

যুক্তফ্রণ্টের সুনাম ও মর্যাদা বাড়িয়াছে মাত্র একজন মন্ত্রীর কর্মতৎপরতায়, যদিও তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তিনি পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়দান হইতে বিদেশী মূর্তি অপসারণ ও পরিবর্তে ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, দেশবন্ধু, বঙ্কিম প্রমুখ জাতীয় নেতাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগরের পৈতৃক বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার দপ্তর লইয়াছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ প্রাচীন মন্দির ও মসজিদগুলিও তিনি রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা লইয়াছেন।

আমাদের জাতীয়বোধের বিকাশ ঘটাইতে একজন মার্কসবাদী মন্ত্রী যে উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন, গত বিশ বছরে কংগ্রেস সরকার তাহার বিন্দুমাত্র দেখান নাই। শুধু সাময়িক জনপ্রিয়তার বদলে জাতির হৃদয়ে যুক্তফ্রণ্ট যদি অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায় তবে তাহাকে সৎ, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শপরায়ণ হইতে হইবে এবং জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকও হইতে হইবে। সস্তায় বাজার গরম করার কৌশল ছাড়িয়া বাঙালীর আশু সমস্যাগুলির প্রতিও তাঁদের মন দেওয়া দরকার।'

রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা

উপন্যাস নয়। তবে উপন্যাসেরই মত। নাটক—কিন্তু সাধারণ নাটক নয়, একটি রীতিমত রাজনৈতিক নাটক। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সংগঠিত দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার ক্রিয়াকলাপ ও হালচাল রাজ্যের সমগ্র রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে আজ সত্যরমত এক নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

সংঘাত নাটকের একটি প্রধান ধর্ম। তাহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি এবং প্রয়োজনীয় গুণসমূহের মধ্যে সংঘাত এক অপরিহার্য অঙ্গ। ঘাত-প্রতিঘাত সংঘাতবিহীন নাটককে নাটকের পর্যায়েই ফেলা যায় না এবং সেই ধরণের নাট্যপ্রচেষ্টা কখনই দর্শকচিত্তে আবেদন আনিতে বা দর্শকের রসপিপাসু মনে খুশীর আমেজটি ধরাইতে সক্ষম হয় না। নাটকের আরম্ভ হইতে একটি প্রত্যাশিত সংঘাতের প্রতীক্ষা দর্শকচিত্তকে আপ্লুত করিয়া রাখে। সংঘাতকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকে রসের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি। সংঘাতের আবির্ভাবই সমগ্র নাটককে প্রাণরসে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

আমাদের রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক নাটক তাই এখন রীতিমত জমিয়া উঠিয়াছে, এক-একটি সংঘাত ক্রমানুয়ে এই নাটকটিকে জমাট করিয়া তুলিতে সহায়তা করিতেছে। এই একটির পর একটি সংঘাত এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপকই শুধু নয়—রহস্য-রোমাঞ্চপূর্ণও।

প্রথমত যুক্তফ্রণ্টের গঠনই হইয়াছে একাধিক দলগুলিকে সম্মিলিত করিয়া। প্রতিটি দলেরই স্বতন্ত্র ভাবধারা, স্বতন্ত্র আদর্শ। ইহা সত্য, ১৯৬৭ সালে তাঁহারা যখন প্রথম ক্ষমতায় আসিলেন সেই সময়ে নয়মাস স্থায়ী তাঁহাদের শাসনকালে কিন্তু পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক নাটক এতটা সংঘাতপূর্ণ হয় নি। এবারে দেখা যাইতেছে, যুক্তফ্রণ্টেরই মন্ত্রীতে-মন্ত্রীতে তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদ, দেখা যাইতেছে মন্ত্রীদের উক্তিগুলি পরস্পর-বিরোধী। দেখা যাইতেছে ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ফ্রণ্ট দলভুক্ত এক মন্ত্রীই রীতিমত সন্দিহান। যতদূর মনে পড়ে, গতবারের যুক্তফ্রণ্ট আমলের ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনাবলি অনুপস্থিত।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের বিবাদ-বিসম্বাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মত। ঘেরাও সম্বন্ধে শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া বলেন তাহার আধিক্য ঘটিয়াছে আবার শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ বলেন উহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। একই বিষয় অবলম্বন করিয়া একই মন্ত্রিসভাভুক্ত দুইজন মন্ত্রীর পরস্পরবিরোধী উক্তি।

অধিকন্তু এই মন্ত্রিসভা যে বেশীদিন স্থায়ী হইবে না—এমন কি গতবারের মত নয়মাস পরমায়ুও এবার আর তাহার ভাগ্যে নাই এমনতরো মন্তব্য যিনি করিয়াছেন তিনি [illegible] সেই জন, যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী-

...র মধ্যেও কেহ ...স, তিনি দ্রুত মন্ত্রিসভারই একজন স্তম্ভস্বরূপ—তিনি শ্রীসুশীল ধাড়া।

বাইরের সমস্যা তো আছেই তাহার আয়তনও তো পর্বতপ্রমাণ। রাজ্যটিও তো বলা বাহুল্য শত সহস্র সমস্যার এক হতভাগ্য শিকার। এখন এই রাজ্যের শাসনতরণীর কর্ণধার যাঁহারা তাঁহারাই সকলেই যদি এই ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন, তাহা হইলে এই নাটক যে কোন অধ্যায়ে অবশেষে পৌঁছিবে তাহা ভাবিতে বিলম্ব হয় না। বাইরের সমস্যা যে রাজ্যকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছে, সেই রাজ্য আবার যদি এই আভ্যন্তরীণ বিরোধের শিকারে পরিণত হয়, তাহা হইলে অবস্থা যে কল্পনাতীত চরমে পৌঁছিবে সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

একে তো রাজ্যের ধ্বংস ঘটাইয়া ছাড়িয়াছে 'ঘেরাও'। এই ভয়াবহ সর্বনাশ বস্তুটি সারা বাঙলা দেশে আজ একটি মারাত্মক ব্যাধিবিশেষ। ইহার ... ঘেরাও খেলায় দেশের শিল্পবাণিজ্য যে আজ ... হইতে চলিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি মানেই উৎপাদন বন্ধ অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রগতির দুয়ারটিকে সযত্নে (?) অর্গলরুদ্ধ করিয়া দেওয়া। একে বাঙলা দেশের চূড়ান্ত অভাব, সেই অবস্থায় দেশের উৎপাদন বন্ধ হওয়া, একে বাঙলা দেশ বেকারীর জ্বালায় জর্জরিত—সেই বাঙলা দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির দরজায় তালা ঝুলাইয়া বেকারের সংখ্যা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করা—কি চমৎকার অবস্থার অসামান্য নিদর্শন

যে-সকল সুযোগ-সুবিধাগুলি আজ পশ্চিম বাঙলার পাওয়ার সম্ভাবনা সবে দেখা দিল ঠিক সেই সময় এমন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিল। কিন্তু সুযোগ অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। পশ্চিম বাঙলার পরিবর্তে অন্য রাজ্যগুলির অধিকারে তাহা চলিয়া যাইবে। ফলে বাঙলা দেশের অবস্থা এখনকার তুলনায় আরও শোচনীয় হইবে এবং অন্য রাজ্যগুলির অবস্থা এখনকার অপেক্ষা আরও বহুগুণ উন্নত হইবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বিবৃতিতে একটি বিষয়ে আলোকপাত ঘটিয়াছে। সেই বিবৃতি অনুসারে—পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমাগমের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা না থাকায় যত্রতত্র স্থাননির্বিশেষে যে-সব বাড়ীঘরগুলি উঠিয়াছে সেগুলির স্বাস্থ্যগত বিচারেও রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

এসব সমস্যা তো আছেই। এখন আপন আপন চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গীসঞ্জাত যে ঘরোয়া মতদ্বৈধতা মন্ত্রিসভার মধ্যে দেখা যাইতেছে ইহার ফলে সত্য সত্যই মন্ত্রিসভার আগামী ইতিহাস এক অভাবনীয় রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া আছে। কোন মূর্তিতে তাহার ভবিষ্যৎ আত্মপ্রকাশ করিবে সে সম্বন্ধে আজ নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমগ্র রাজ্যবাসীর দৃষ্টি আজ সেইদিকেই নিবদ্ধ।

প্রবোধচন্দ্র গুহ

বাঙলার প্রবীণতম নাট্য-প্রযোজক ও পরিচালক প্রবোধ গুহ গত ১৭ই আষাঢ় ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শিশিরকুমারের যুগে প্রযোজক হিসাবে ইনি এক বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করে গেছেন। জীবনের এক দীর্ঘ অংশ ইনি নাট্যজগতের সেবায় করেছেন অতিবাহিত। তাঁর প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে কর্ণার্জুন, রাজা ও রাণী, চিরকুমার সভা, শোধবোধ, গৃহপ্রবেশ, কারাগার, সিরাজদ্দৌলা, পথের দাবী, কালিন্দী প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। দেশ-বিভাগের পর কিছুকাল পাকিস্তানে বাস করার সময় সেখানকার সিনেমা-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন ও সেখানকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক হন।
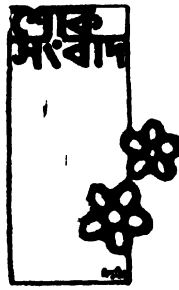
জহর গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৪-এ জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। বাঙলা রঙ্গালয়ের নবযুগ প্রবর্তনের অল্পকাল পরেই তাঁর শিল্পিজীবনের সূচনা হয়। ছায়াছবির নির্বাক যুগ থেকেই তিনি চলচ্চিত্রে অবতরণ করতে থাকেন। এককালে বাঙলা দেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিল্পীর মধ্যে তাঁর আসন পুরোভাগে ছিল। তাঁর অভিনীত চিত্র সংখ্যা প্রায় তিন শ'। তা ছাড়া অসংখ্য স্মরণীয় নাটকে তাঁর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয়-জগতের সঙ্গে তাঁর সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। এ ছাড়া প্রদেশ কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক উপসমিতির সভাপতির পদ, মোহনবাগানের হকি-সচিব, অভিনেতৃ সঙ্ঘের সচিব ও শিল্পিসংসদের সহকারী সভাপতির আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁর মৃত্যু বাঙলা দেশের অভিনয় জগতে অমৃতলাল, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্রের যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের একটি মূল্যবান যোগসূত্র ছিন্ন করে দিল।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

দি সরস্বতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসতকুমার ... কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৭৬

ড়া পাখী

ঙ্কর কুণ্ডু অঙ্কিত

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
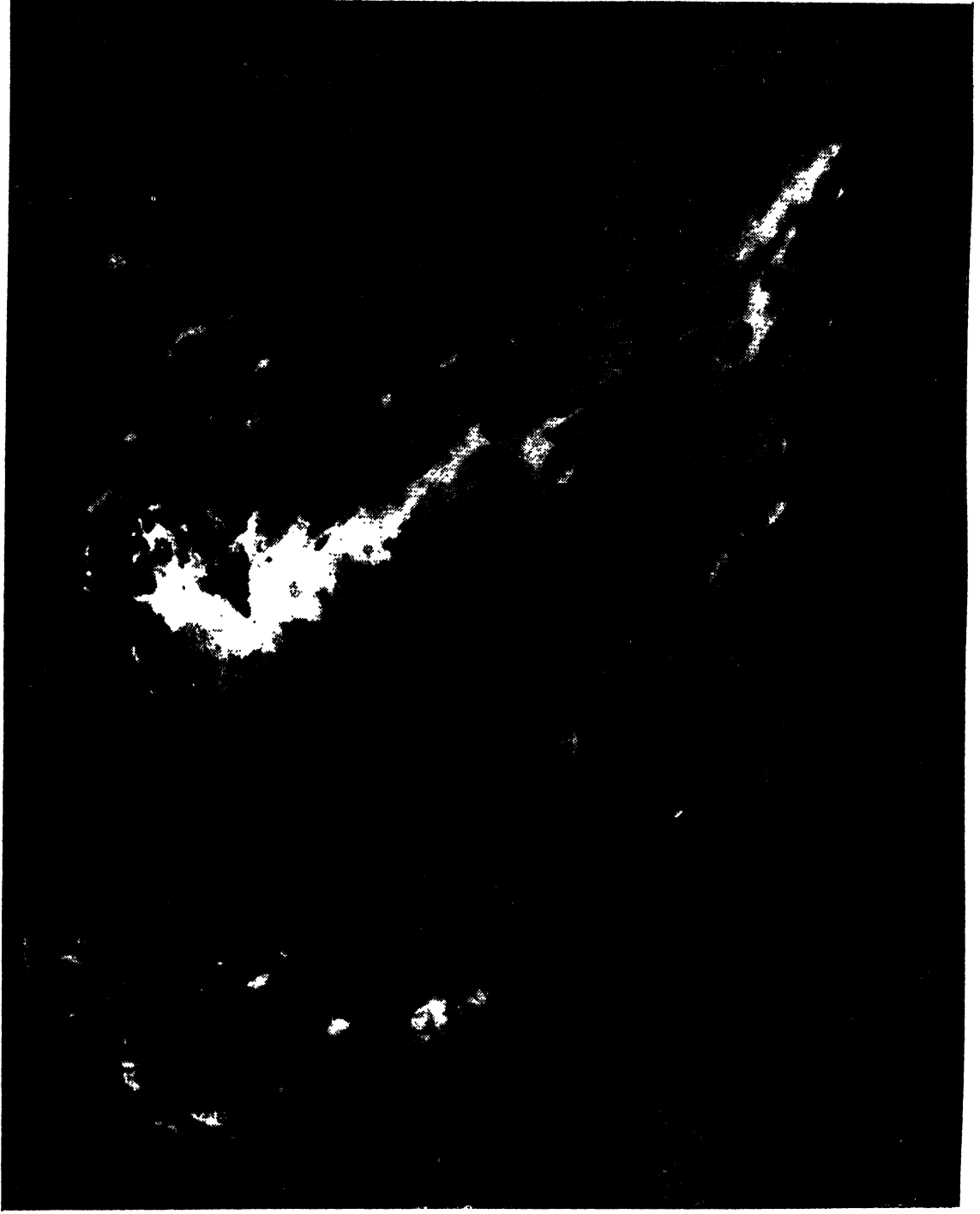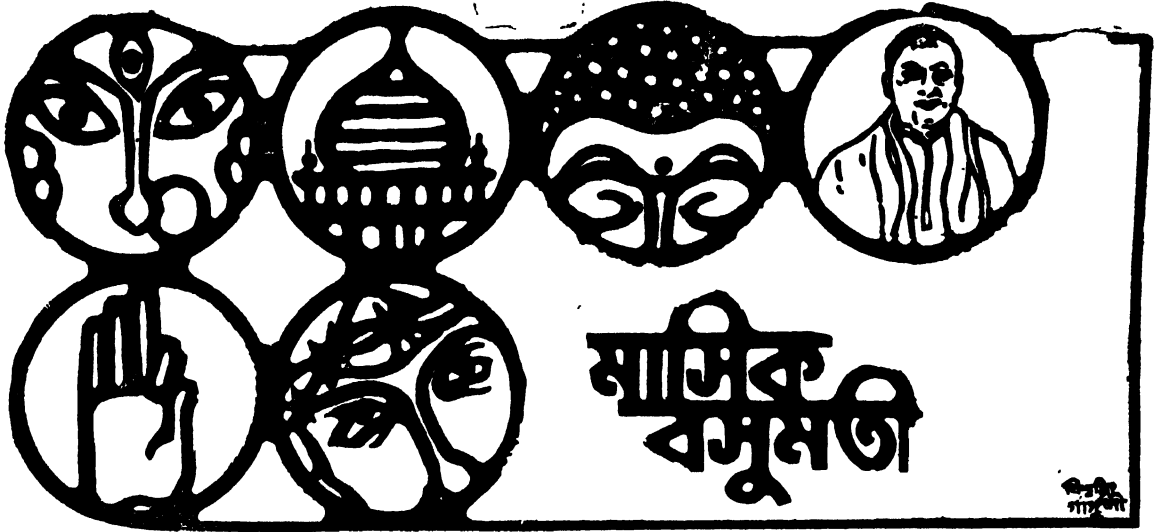
॥ ৪৮ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭৬ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ॥

"মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব। কোন ভোগের গন্ধ নাই। মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা। 'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে'—এই শেষ কথা।

"ভক্তি পাকলে ভাব হয়; তারপর মহাভাব—তার পর প্রেম,—তার পর বস্তুলাভ। ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে—তেমন মাছ হলে জল তোলপাড় করে। তাই, ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে করবে।

"ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে অবাক্ হয়ে যায়। জীবের এই পর্যন্ত। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এ সব হয়। আর দু'-এক জনের মহাভাব—প্রেম হয়। তারা ঈশ্বর-কোটি—অবতারাদি।

"রূপ সনাতনের ভাব কেউ টের পেত না। যদি ডোবাতে হাতী নামে, তাহলে সব তোলপাড় হয়ে যায়; কিন্তু সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে কিছুই হয় না—হয়ত কেউ টেরই পায় না।

"সিদ্ধ অবস্থায় সব রকম ভাবই ভাল লাগে। সে অবস্থায় কামগন্ধ থাকে না। যেমন চণ্ডীদাস ও রজকিনী—তাদের ভালবাসা কামগন্ধবিবর্জিত।

"এ অবস্থায় প্রকৃতি ভাব। আপনাকে পুরুষবোধ থাকে না।"

ভাব-অভাব

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভাব অভাব দুই-ই পথ—ভাব ভক্তি একটি পথ, আর অভাবের একটি পথ। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। ভাবপথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব, তার পরে মহাভাব—প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না।

"অভাবের পথ হচ্ছে জ্ঞানের পথ। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই'। জ্ঞান লাভ হলে গুরু-শিষ্যে ভেদ থাকে না। তাই জনক শুকদেবকে হাসির ছলে বলেছিলেন, আগে দক্ষিণা দিতে হবে।

"তিনি ভাবের বিষয়। ভাব ভক্তিতে তাঁকে সহজে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ গেয়েছেন,—

'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় যে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥"

ভাবগ্রাহী জনার্দন

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তিনি ভাবগ্রাহী। সংসারেই থাক, আর যেখানেই থাক, ঈশ্বর মনটি দেখেন। মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত। বন্ধন থাকলেও আটকাতে পারে না। যে যা মনে করে সাধনা করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ।

"দুই বন্ধু পথে যাচ্ছে।— এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল; একজন বললে—'চল একটু ভাগবত শুনি'—বলে, গিয়ে বসলো। অন্যজন একটু সময় উঁকি মেরে দেখে, সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্যালয় গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বিরক্তি এলো। আপন মনে বলতে লাগলো—'ধিক্ আমাকে! বন্ধু আমার হরিকথা শুনছে, আর আমি কোথায় পড়ে আছি!' এদিকে যে ভাগবত শুনছে, তারও ভাল লাগছে না। সে ভাবছে, 'আমি কি বোকা! কি ব্যাড়্ ব্যাড়্ করে বক্‌ছে—আর আমি এখানে বসে আছি! বন্ধু আমার কত আমোদ-আহ্লাদ করছে!' মৃত্যুর পরে যে ভাগবত শুনছিল তাকে যমদূত নিয়ে গেল; যে বেশ্যালয়ে ছিল তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল।

"ভগবান মন দেখেন। কে কোথায় পড়ে আছে, কি কাজে আছে তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন।"

ভাব-ভক্তি-ভালবাসা আর বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা, আর বিশ্বাস। একটা গানে আছে—

'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়॥

চাই, চিত্ত তদ্গত হওয়া—তাঁকে খুব ভালবাসা। তারও আগে বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকলে ভালবাসা আসে না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁর উপর ভক্তি হয়—ভাব হয়, তাঁকে পাওয়া যায়। এই ভক্তি, ভালবাসা হলে 'তবে পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়'।"

ভাবমুখে থাক্

ঠাকুর যখন সাধনার শেষ অবস্থায় শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরে পূর্ণ নির্বিকল্প ও ঈষৎ সবিকল্প ভূমির মধ্যে নিরন্তর ছয় মাসকাল অবস্থান করেছিলেন, তার পরেই তিনি জগন্মাতার অশরীরী বাণী শুনতে পেয়েছিলেন—*'তুই ভাবমুখে থাক্'* এ ছাড়া আরো কয়েকবার—*বিশেষত যখন হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে একটা সন্দেহের ছায়া* পড়েছিল, তখনও জগদম্বা তাঁকে দর্শন দিয়ে প্রত্যাদেশ করেছিলেন—'তুই ভাবমুখে থাক্'।

ভাবমুখ কাকে বলে? স্বামী সারদানন্দ বলেছেন—জগন্মাতার বিরাট মনের যে অনন্ত ভাবতরঙ্গ এই বিশ্বজগতে *ছড়িয়ে রয়েছে তারই খণ্ড খণ্ড ভাবগুলি মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি'রূপে রূপান্তরিত হয়ে বিরাট মনের বড় আমিটাকে হারিয়ে ফেলছে।* অবিদ্যা ও অজ্ঞানজনিত ভ্রমের ফলে সেই ক্ষুদ্র আমিগুলো মনে করছে 'আমরা স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিমান'। যখন সাধক জগজ্জননীর এই বিরাট আমির উপলব্ধি দ্বারা তাঁর প্রেমে বিভোর হয়, তখন সে প্রত্যক্ষ অনুভব করে যে এই বিরাট 'আমি' থেকেই সকল প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি। তখন সে নিজের ক্ষুদ্র আমির আর পৃথক অস্তিত্ব দেখতে পায় না; অথচ নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া তার আমিত্বও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এই যে বিরাট আমিত্ব, ইহাই ভাবমুখ। ভাবমুখে থাকার মানে হচ্ছে—আমিত্বের পূর্ণ বিলোপ দ্বারা নির্গুণভাবে অবস্থান না করে, যে বিরাট আমি থেকে যাবতীয় বিশ্বভাবের উৎপত্তি, সেই বিরাট আমিতে নিজের ক্ষুদ্র আমিকে মিলিয়ে দেওয়া—তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তাঁর কার্যই আমার কার্য—এই ভাবটি প্রত্যক্ষ অনুভব করে জীবনধারণ করা; অর্থাৎ মনে সকল সময়, সকল অবস্থায়, সকল রকমে ধারণা করা—অনুভব করা যে আমি সেই বিরাট আমি বা পাকা আমি। ভাবমুখ অবস্থায় পৌঁছুলে সব উপাধি চলে যায়—শুধু থাকে 'দাস আমি', তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। তাই ঠাকুর সর্বদা বলতেন—"ওরে, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, ব্রাহ্মণ আমি, শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী, আমি, গুরু আমি—এ সব হচ্ছে 'কাঁচা আমি' ... কাঁচা আমি ছাড়তে হয়।"

ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে থেকে পুরুষের কাছে পুরুষ আর স্ত্রীর কাছে স্ত্রী হয়ে তাদের প্রত্যেকের ভাব ঠিক ঠিক বুঝতে পারতেন। ঠাকুর বলেছেন—"লোকের দিকে চেয়েই—কে কেমন বুঝতে পারি; কে ভাল, মন্দ, কে সুজন্মা, কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী, কে ভক্ত, কার হবে কার হবে না—সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না—তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই।" ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁর কাছে সর্বদাই ভাবময় বলে প্রতীত হত—সব কিছুই যেন বিরাট মনে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবরূপে ভাসছে, আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়ে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হচ্ছে—কোথাও বা সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে আছে। জগন্মাতার আদেশ শিরোধার্য করে, নিরালম্ব অনির্বচনীয় *অদ্বৈত অবস্থাপ্রাপ্ত মনকে সেখান থেকে নামিয়ে সপ্তম ও ষষ্ঠ* ভূমির মধ্যে সর্বদা বিচরণশীল করে রাখতেন যাতে অনন্ত বিরাট মনে যত কিছু ভাবের উদয় হচ্ছে, সবই যেন সেখান থেকে তাঁর নিজস্ব বলে সর্বদা মনে হয়। সেইভাবে তিনি এত সার্থকতা প্রাপ্ত করেছিলেন যে তাঁকে দেখলেই মনে হতো—যিনি মা তিনিই ছেলে, এবং যিনি ছেলে তিনিই মা—উভয়ে কোন ভেদ নাই; অথবা যেমন ঠাকুর বলতেন—'চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক—নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভক্ত, নিত্য ধাম!'

ভাব-সমাধি

শান্ত দাস্যাদি ভাবগুলির কোন একটির সম্পূর্ণ উপলব্ধি-দ্বারা সাময়িক যে তন্ময়তা হয় তাকেই ভাব-সমাধি বা সবিকল্প-সমাধি বলে। এ সকল ভাব-সমাধিতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক-ভাবে শারীরিক বিকার সংঘটিত হয় এবং অপূর্ব দর্শনাদিও হতে দেখা যায়। এই সকল শারীরিক বিকার ও দিব্য দর্শন
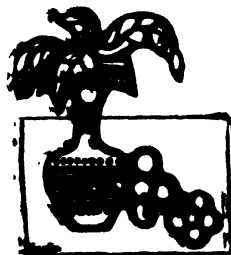
বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন রূপ হয়। ঠাকুর বলতেন—যাঁরা বড় আধার তাদের ভাব বাইরে থেকে সব সময় টের পাওয়া যায় না। গেঁড়ে ডোবায় একটা হাতী নামলে জল তোলপাড় হয়ে যায়, সায়ের দীঘিতে দশটা হাতী নামলেও কিছুই হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভক্তি পথের সমাধিকে ভাব সমাধি (সবিকল্প সমাধি) বলে; ইহা চেতন সমাধি। সবিকল্প সমাধিতে একটু বিকল্প থাকে—ভেদবুদ্ধি থাকে, সম্ভোগের জন্য; আস্বাদনের জন্য রেখার মত একটু অহং থাকে! সে হল সেব্যসেবকের 'আমি'—রসরসিকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক। এইটুকু বিকল্প। চিনি হতে চাই না—চিনি খেতে ভালবাসি! আর, ধ্যাতা ধ্যেয় ভেদ থাকে— নির্বিকল্প সমাধিতে তা থাকে না।"

ভূতাত্মা

সৃষ্টির পূর্বে চিদাত্মা (ব্রহ্ম) নিরুদ্ধবৃত্ত হয়ে এক অখণ্ড তমোরূপে বর্তমান ছিলেন। মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে তিনি লব্ধবৃত্তি হলেন। তাই তমঃ বৈষম্যপ্রাপ্ত হয়ে রজঃ—এবং রজঃ থেকে সত্ত্বের প্রকাশ হল। এই ত্রিগুণের তামস অংশই রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, রাজস অংশ ব্রহ্মা, আর সাত্ত্বিক অংশই বিষ্ণু। এই এক ব্রহ্মই ত্রিধা, অষ্টধা, একাদশধা, দ্বাদশধা —এমন কি জীবাত্মারূপে অগণিতভাবে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত। উদ্ভূত বলেই তিনি ভূতাত্মা—ভূতে ভূতে প্রবিষ্ট হয়ে বিচরণ কচ্ছেন।

দেহাতীত এই যে আত্মা ইনিই ব্রহ্ম—ইনিই দেহকে চেতনবৎ করে প্রতিপুরুষে আপনাকে আংশিকরূপে প্রকাশ কচ্ছেন। এই একমেবাদ্বিতীয়ই আপনাকে প্রথমে বহুরূপে প্রকাশ করে, তাতে প্রাণাপানাদির ক্রিয়া সঞ্চারণ দ্বারা প্রাণময় করে, তারপর মন সঞ্চার করে, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারে বিষয় জগতের ভোক্তা হলেন এবং অচেতন দেহরথের সচেতন রথী হলেন। কর্তাবৎ অবস্থিত হয়েও তিনি কিন্তু অকর্তা।

সদসৎ কর্মফলভোগী আত্মা তবে কে—যিনি কর্মফলে সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, অধঃ বা ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন এবং দ্বন্দ্বাভিভূত হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন? পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, সদসৎ কর্মফলভোগী পঞ্চভূতাত্মক দেহধারী ত্রিগুণাভিভূত শরীরাভিমানী ('আমি', 'আমার', এই অহঙ্কার যুক্ত) আত্মাই এই ভূতাত্মা বা জীবাত্মা। তমঃ ও রজোগুণের কার্যের দ্বারা অভিভূত হয়ে ভূতাত্মা নানাত্ব প্রাপ্ত হয়—কিন্তু পরমাত্মাধিষ্ঠিত এই ভূতাত্মার বহুত্ব প্রাপ্তি বা বিকার সত্ত্বেও পরমাত্মা বিকৃত হন না। (মৈত্রী—তৃতীয় প্রপাঠক)।

পরমাত্মা আপনাকে দুই প্রকারে প্রকাশ করেছেন। (১) প্রাণরূপে দেহে—প্রাণ, আপান, সমান, ব্যান, উদান—এই পঞ্চভাবে অবস্থান করে; আর (২) জ্যোতির্মণ্ডলে আদিত্যরূপে জগৎ প্রকাশক হয়ে অবস্থান করে। যে জ্যোতির্ময় পুরুষ সূর্য-মণ্ডলে অবস্থিত, তিনিই দেহাভ্যন্তরে হৃদয়কমলে অবস্থিত থেকে বিষয়সমূহ ভোগ করেন। (মৈত্রী—৬।১)

সাধন দ্বারা এই ভূতাত্মা ভূতাত্মত্ব পরিহার করে পরমাত্মার সাযুজ্য লাভ করতে পারে। এই সাধন দ্বিবিধ—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ সাধন—যেমন তপস্যাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি—চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মজ্ঞান—তারপর ব্রহ্মসাযুজ্য। আর বহিরঙ্গ সাধন হচ্ছে—ব্রহ্মবুদ্ধিতে যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা ও দেবতার অর্চনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া। উভয় প্রকার সাধনই যুগপৎ করণীয়।

(মৈত্র্যুপনিষদ্ হইতে গৃহীত)

ভূমা

ভূমা শব্দ দ্বারা মহৎ, নিরতিশয়, বহু অধিক—এ সকল অর্থ বুঝা যায়। বৈষয়িক সমুদয়ই অল্প, এবং দুঃখের বীজভূত—সে জানতে সুখ নাই। যাহা নিরতিশয় তাহাই সুখ—ভূমাই সুখ। যাঁর তত্ত্ব জানলে অন্য দ্রষ্টব্য দেখতে ইচ্ছা হয় না, অন্য শ্রোতব্য শুনতে ইচ্ছা হয় না, অন্য জ্ঞাতব্য জানতে ইচ্ছা হয় না—অন্য সব বিষয়ই নামরূপের অন্তর্ভূতমাত্র মনে হয়—তিনিই ভূমা শব্দের প্রতিপাদ্য। এই ভূমাই সর্বব্যাপী পুরুষ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু বিচার করে যে বস্তু একমাত্র নিত্য বলে প্রমাণিত হন, তিনিই ভূমা। যাঁর তুল্য বস্তু নাই, যে বস্তু প্রাপ্ত হলে দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না—যাঁকে পেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না, তিনিই ভূমা। যাঁহাতে চির আনন্দ, যিনি অনাদি অনন্ত তিনিই ভূমা।

দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য বা জ্ঞাতব্য বস্তুর মধ্যে যখন অল্পমাত্র পরিজ্ঞান হয়, তখন নানারূপ জ্ঞান হতে থাকে; কিন্তু যখনই সেই ভূমা-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয় তখন অন্য কিছুই থাকে না,—সকলই সেই ভূমাময় দর্শন করে। সেই ভূমা আপন মহাত্ম্যে বিদ্যমান—তিনি সর্বব্যাপী, তাই অপ্রতিষ্ঠ তিনিই আত্মা।"

—'ছান্দোগ্য' হতে গৃহীত।

ভূমানন্দ

ভোক্তা জীব যে আনন্দ ভোগ করে তাতে ভোগের আলম্বন, ব্যবহারিকভাবে সত্য কোনও ভোগের বিষয় থাকে। উত্তম আহারে আনন্দ, স্ত্রীভোগে আনন্দ, পরোপকারে আনন্দ, সমাধিতে আনন্দ—সর্বত্রই আনন্দ একটা না একটা কিছু বিষয় অবলম্বনেই অনুভূত হয়। কিন্তু এই সকল বিষয়গুলি বাদ দিলে একটি মূল আনন্দ বস্তু থেকে যায়—যা আনন্দমাত্র। ঐ আনন্দমাত্রে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যরূপ ত্রিপুটীবর্জিত আনন্দমাত্র আছে। এই ত্রিপুটী-বর্জিত আনন্দমাত্রই ভূমানন্দ। ত্রিপুটীবর্জিত হওয়ায় আনন্দ-মাত্র চিন্মাত্রে পর্যবসিত হয়; চিন্মাত্র আবার চৈত্যত-বর্জিত হওয়ায় সন্মাত্রেই পর্যবসিত। সুতরাং স্বরূপদৃষ্টিতে 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিনটি নাম একই সত্তামাত্র ব্রহ্ম বস্তুকে লক্ষ্য করেই প্রবর্তিত হয়েছে। ভূমানন্দই চিদানন্দ।

ভেদবুদ্ধি, ভেদবোধ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যতক্ষণ অহংবোধ থাকে ততক্ষণ পূর্ণজ্ঞান হয় না; পূর্ণজ্ঞান না হলে ভেদবোধ যায় না—অভেদবোধ হয় না। পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ যেমন মণি আর মণির জ্যোতিঃ অভেদ; মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ; একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়—তাই অহং-তত্ত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না; তখন 'আমি' 'তুমি' থাকে না।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি'—এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছো, এ জ্ঞানও নিশ্চয়ই আছে, কাজেই ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধও আছে।

"ভেদবোধ কি? তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি মা, আমি ছেলে; তুমি একটি, আমি একটি; এরই নাম ভেদবোধ। এ ভেদবোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই, পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, এ সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মানতে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না—আর তিনি ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে—ভেদবুদ্ধি আছে—ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই; ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণে, তন্ত্রে, কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।

"যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্তা' এই ভুল থাকবে; আমি সৎকাজ করেছি,— অসৎ কাজ করেছি এই সব ভেদবোধ থাকবেই থাকবে। এ ভেদবোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার বন্দোবস্ত। তাঁকে বিদ্যামায়া আশ্রয়ে লাভ করে তবে সেই মায়া পার হওয়া যায়; আর জানা যায়—তিনিই একমাত্র কর্তা, আর আমি অকর্তা।"

ভেদাভেদ বাদ

নিম্বার্ক স্বামী ভেদাভেদ বাদ প্রচার করেন। তাঁর লিখিত বেদান্ত ভাষ্য "বেদান্ত পারিজাত" বিখ্যাত গ্রন্থ। এ মতে জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ দুইই আছে; জীবের সংসার অবস্থায় ভেদ, মুক্ত অবস্থায় অভেদ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপই ইহাদের উপাস্য দেবতা। বৈষ্ণবদের প্রধান চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় একটি; অপর তিনটি হচ্ছে (১) রামানুজ সম্প্রদায়—এ'রা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী; (২) বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়—এ'দের বিখ্যাত আচার্য বল্লভাচার্য; এ'রা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী; আর (৩) মাধ্বাচার্য বা আনন্দতীর্থ সম্প্রদায়—এ'রা দ্বৈতবাদী।

পদ্মপুরাণের মতে শ্রী(লক্ষ্মী) রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে, আর চতুঃসন, হংস ও নারদ নিম্বার্ক মতের সমর্থক।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

দর্শনাচার্য ইমানুয়েল কাণ্ট

পৃথিবীর দার্শনিক প্রতীতি ও দর্শনচেতনার ইতিহাসে নবযুগের সারথি হিসাবে যাঁরা পরম সমাদরে চিহ্নিত হয়ে আছেন, দর্শনাচার্য ইমানুয়েল কাণ্ট সেই তালিকায় একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতে যে দার্শনিক ধারণা ও চেতনার ধারার প্লাবন দেখা দিয়েছিল তার ভগীরথ ছিলেন ইমানুয়েল কাণ্ট।

বাংলা দেশের কাব্য তথা জাতীয় জীবনের নমস্য যুগপ্রবর্তক মহাকবি মধুসূদনের শুভ জন্মপরিগ্রহের ঠিক শতবর্ষ পূর্বে ১৭২৪ সালে জার্মানীর পূর্বভাগে অবস্থিত কোনিগসবার্গে তাঁর জন্ম। বাবার পেশা ছিল ঘোড়ার জিন তৈরি করা। এ পেশাকে অবলম্বন করে অধিক অর্থের মুখ দেখা তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি, তাই স্কলারশিপের টাকার উপর নির্ভর করে পড়াশুনা চালাতে হয়েছে কাণ্টকে।

কোনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিলেন কাণ্ট। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর এই অধ্যাপনার কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তাঁর পঠনীয় বিষয়গুলির মধ্যে শুধু দর্শন ছিল না। যুগপ্রবর্তক দার্শনিক হিসাবে ভাবীকালের পূজা লাভ করলেও অধ্যাপক হিসাবে ইতিহাস এবং ভূগোল—এ দুটি বিষয়েও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়।

জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট ছিলেন একজন উদারমনা এবং বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মানুষ। তিনি প্রগতিবাদের ছিলেন সমর্থক। তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সমর্থন, স্বীকৃতি এবং পৃষ্ঠপোষণা লাভ করেছেন কাণ্ট। তাঁর মৃত্যুর পর ঘটনার স্রোত অন্যদিকে মোড় ফিরল। সমগ্র পরিস্থিতির চেহারা হয়ে গেল অন্যরকম। ফ্রেডারিকের আসনে যিনি বসলেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচেতা মানুষ, তাঁর ভয় হল কাণ্টের প্রভাব সাধারণ্যে আরও অধিক বিস্তৃত হলে শেষ পর্যন্ত হয় তো তাঁকে সিংহাসনও হারাতে হতে পারে। শুধু সেই ভয় তিনি নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করতে থাকেন কাণ্টের উপর। কতকটা চাপে পড়ে, শেষ অবধি সেগুলি মেনে নিলেন কাণ্ট। এর ফলে—নানা প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে।

কাণ্টের জনসমাজে প্রধান শিক্ষা এই যে বস্তুকে যেভাবে আমরা দেখি—তা তার আসল স্বরূপ নয়। বস্তু যেভাবে আমাদের সামনে দেখা দেয় সেই অনুযায়ী সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পোষণ করে নিই। তার আসল রূপ সম্বন্ধে ধারণা এ নয়। তাঁর যুগের প্রচলিত ভাবধারার মূলোচ্ছেদ তিনি করেন নি—শুধু তার রূপকে পরিবর্তিত করেছিলেন মাত্র আপন যুগান্তকারী ভাবধারার প্রয়োগে। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং ভাষ্য তাঁর সমকালীন প্রতিটি দার্শনিকের পুরোভাগে তাঁর আসন করে দিয়েছিল। তাঁর মুখ্য গ্রন্থ—ক্রিটিক অফ পিওর রিসন। অন এভারলাস্টিং পিস—তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

১৮০৪ সালে আশী বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এই আশী বছরের মধ্যে বারেকের তরেও কোনিগসবার্গের বাইরে তিনি যান নি। ব্যক্তিজীবনে তিনি এত নিয়মানুগ ছিলেন যে প্রতিবেশীরা তাঁকে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নিতেন।

মাদাম দ্য ল্যুজি

আমি ভেতরে ঢুকতেই মাদাম দ্য ল্যুজি তাঁর হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমরা এক মুহূর্ত নীরব রইলাম। তাঁর খড়ের টুপি আর শালটা অগোছালভাবে চেয়ারের ওপর রয়েছে। অরফিউসের প্রার্থনার বইটা পিয়ানোর ওপর খোলা।---মাদাম জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে রক্তরাঙা দিগন্তরেখায় অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে চেয়ে রইলেন।---

'মাদাম, মনে পড়ে ঐ নদীর ধারে পাহাড়ের পাদদেশে-- যেদিকে আপনি এখন চেয়ে আছেন, দু'বছর আগে ঐ-খানে দিনের পর দিন আমি আপনাকে কত কথা বলেছিলাম আরো মনে পড়ে আপনি হাত দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের ভয়াবহ দিনগুলির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমি যখন প্রেম নিবেদন করছিলাম আপনি আমায় স্তব্ধ করে দিয়ে বলেছিলেন--স্বাধীনতা এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য বেঁচে থেকে সংগ্রাম করুন।

যেদিন আপনার হাতখানি আমায় পথ দেখিয়েছিল সেদিন কত চুম্বন আর অশ্রুজলে ভিজিয়ে দিয়েছিলাম সেই হাতখানি---এবং সেইদিন থেকে নির্ভয়ে পথ চলছি। আমি আপনার আদেশ পালন করে অনেক লিখেছি অনেক কথা বলেছি।---ক্ষুধার্ত মানুষদের নেতারা গালভরা কথা আর মিথ্যা প্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বিপথে টেনে নিয়ে যায় এবং অশান্তির আগুন জ্বালে। দু'বছর ধরে আমি এদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়েছি।'

তিনি ইশারায় আমায় থামিয়ে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনতে বললেন। বাগানে পাখীর গান আর সুরভিত বাতাসের ভেতর দিয়ে দূরাগত একটা ভীতিপ্রদ চীৎকার আমাদের কানে ভেসে এল---'বুর্জোয়া হতভাগাটাকে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাও---ওর মাথা বর্শা বিদ্ধ কর।'

মাদাম চলচ্ছক্তিরহিত এবং বিবর্ণ হয়ে গিয়ে একটা আঙুল তাঁর মুখের ওপর রাখলেন। 'কোন হতভাগ্যকে ওরা অনুসরণ করছে। পারী শহরের প্রতি গৃহে ওরা দিনরাত তল্লাসী চালাচ্ছে এবং গ্রেপ্তার করছে--হয়ত তারা এই বাড়িতেও আসবে। আমি চলে যাই কারণ আপনার কোন বিপদ ডেকে আনতে চাই না—যদিও এ-তল্লাটে

আনাতোল্ ফ্রাঁস

আমি বিশেষ পরিচিত নই তবুও এই সময়ে আমি একজন বিপজ্জনক অতিথি' —আমি বললাম।

'না থাকুন এখানে।' মাদাম বললেন।

শান্ত সান্ধ্য হাওয়ার বুক চিরে আবার চীৎকার শোনা গেল---পায়ের শব্দ আর বন্দুকের আওয়াজও ভেসে এল ---ওরা এগিয়ে আসছে---কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল--'সমস্ত পথ বন্ধ করে দাও শয়তানটা যাতে পালাতে না পারে।'--- বিপদ যতই এগিয়ে আসছিল মাদামকে ততই শান্ত দেখাচ্ছিল।

'চলুন ওপরে উঠে জানালার খড়খড়ি দিয়ে দেখি বাইরে কি হচ্ছে।' মাদাম বললেন।

দরজা খুলতেই সিঁড়ির প্রশস্ত জায়গায় একটি লোককে দেখতে পাওয়া গেল। তার হাঁটু দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল---দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। ভূতের মত দেখতে লোকটি অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'আমায় লুকিয়ে রেখে বাঁচান। ওরা বলপ্রয়োগ করে আমার বাড়ীতে ঢুকে বাগানের ভেতর দিয়ে এদিকে আসছে।'

মাদাম দ্য ল্যুজি প্রতিবেশী বৃদ্ধ দার্শনিক প্লাঁসঁনেকে চিনতেন। অনুচ্চ-কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন--'আমার পাচিকা জাকোবিন কি আপনাকে দেখেছে?'

---'কেউ আমায় দেখেনি।'

---'ভগবানের কি অসীম করুণা।'

মাদাম তাঁকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। আমিও মাদামকে অনুসরণ করলাম। তিনি এমন একটা গুপ্ত স্থানের খোঁজ করতে লাগলেন যেখানে বৃদ্ধকে কয়েকদিন--অন্ততপক্ষে কয়েক ঘণ্টা তল্লাসীর সময়ে লুকিয়ে রাখা যায়।---ঠিক হল আমি চারদিকে নজর রাখব এবং আমার সংকেত পেলেই বৃদ্ধ বাগানের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন।---বৃদ্ধ দার্শনিকের দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ্য ছিল না। তাঁকে বজ্রাহতের মত দেখাচ্ছিল। তিনি জানালেন যে সংবিধানের বিরুদ্ধে মাদাম দ্য কাজেতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিপ্লবীরা তাঁর বিরুদ্ধে এনেছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে বৃদ্ধ দার্শনিক কসাই লুব্যাঁর কাছ থেকে মাংস কিনতেন কিন্তু লুব্যাঁ ওজন করবার সময় বৃদ্ধকে ঠকাতো। একদিন তিনি লুব্যাঁকে একশ ঘা বেত মারতে চেয়েছিলেন। লুব্যাঁ এখন ওর তল্লাটের বিপ্লবীদলের নেতা এবং প্রতিশোধ নেবার কথা সে মনে রেখেছিল।

দার্শনিক প্লাঁসঁনে অস্ফুট কণ্ঠে লুব্যাঁর নাম উচ্চারণ করতেই যেন তাকে সশরীরে সামনে দেখতে পেয়ে নিজের হাতের ভেতর মুখ লুকোলেন। এই সময়ে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মাদাম দ্য ল্যুজি বৃদ্ধকে পর্দার আড়ালে ঠেলে দিয়ে দরজার হুড়কো আটকে দিলেন।

মাদামের পাচিকা দরজায় করাঘাত

করছিল খুলে দেবার জন্য কারণ জাতীয় রক্ষীদলের সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাড়ী তল্লাসীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পাচিকা মাদামকে বলল— 'এঁরা বলছেন যে মঁসিও প্ল্যাসঁনে এই বাড়ীতেই আছেন। আমি বলেছি যে তাঁর মত শয়তানকে আপনি কখনই এখানে লুকিয়ে রাখতে পারেন না, কিন্তু ওঁরা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।'

'--বেশ ওঁদের ওপরে নিয়ে যাও--গোলাঘর থেকে মাটির নিচের ভাঁড়ার-ঘর পর্যন্ত সমস্ত বাড়ীটা ওঁরা খুঁজে দেখুন।' মাদাম দরজার ফাঁক দিয়ে বললেন।

এই সংলাপ শুনে প্ল্যাসঁনে পর্দার আড়ালে মূর্চ্ছা গেলেন এবং আমি বহু কষ্টে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলাম।---মাদাম বৃদ্ধকে বললেন--'বন্ধু! আমায় বিশ্বাস করুন। মনে রাখবেন স্ত্রীলোকেরা কূটবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়া।'

মাদাম এমন ভাব দেখালেন যেন নিরুদ্বিগ্নভাবে প্রাত্যহিক গৃহকর্ম করে যাচ্ছেন---খাটটাকে প্যাসেজের দিকে টেনে নিলেন। বেডকভারটা তুলে তিনটে তোষক এমনভাবে পাতলেন যে সবচেয়ে ওপর আর সবচেয়ে নিচের তোষকের ভেতর একটা সুড়ঙ্গ হল। ---আমি অবশ্য তাঁকে সাহায্য করলাম।

তিনি যখন এইসব কাজ করছিলেন তখন সিঁড়িতে জুতোর শব্দ আর কতকগুলো কর্কশকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল।---শুধুমাত্র একটি মিনিট সময় আমাদের কাছে সাংঘাতিক মনে হল। ---ক্রমশ আওয়াজটা ওপরে উঠে গেল। বুঝতে পারলাম তল্লাসীর জন্য জাকোবিন রক্ষীদের গোলাঘরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ওদের শাসানি আর অট্টহাসি শুনতে পেলাম---পদাঘাত এবং পার্টিশনের ওপর বেয়নেটের শব্দ হল ---সিলিংটা ধসে পড়ল। ---আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না।--- আমি প্ল্যাসঁনেকে তোষকের সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকতে সাহায্য করলাম।

বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে মাদাম বললেন--'আমি এবার শুয়ে পড়ি।' দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন সন্ধ্যে সাতটা বাজে। এত শীগগির শোওয়া লোকে স্বাভাবিক বলে মনে করবে না। অসুস্থ বললেও জাকোবিন চালাকিটা ধরে ফেলবে। কয়েক মুহূর্ত তিনি চিন্তা করলেন---তারপর নির্বিকারভাবে সহজ সরল মনে আমার সামনেই তাঁর পোষাকটা খুলে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং আমাকে আদেশ করলেন আমার জুতো, কোট এবং টাইটা খুলে ফেলতে।

'মনে করুন আপনি আমার প্রেমিক। ওরা যখন দরজা ধাক্কাবে তখন আপনি এই বেশ আর উস্কখুস্ক চুল নিয়েই দরজাটা খুলে দেবেন--- যেন আমরা একটু অপ্রস্তুত।'---

রক্ষীদল যখন গোলাঘর থেকে গালাগাল দিতে দিতে নিচে নামছিল তখন আমরা তৈরী হয়ে গিয়েছি।--- বেচারী প্ল্যাসঁনে এত জোরে কাঁপছিলেন যে খাটটা নড়ছিল। তাঁর নিশ্বাসের শব্দ বারান্দা থেকেও পাওয়া যাচ্ছিল।

মাদাম দ্য ল্যুজি বিড় বিড় করে বললেন--'কি আফ্‌শোসের কথা! কৌশলটা বার করে আমি বেশ খুশীই হয়েছিলাম। ---শেষে--- না আমরা হতাশ হব না--ভগবান আমাদের সহায় হবেন।'---

---একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজাটা কেঁপে উঠল।

'কে দরজা ধাক্কায়?' মাদাম জিজ্ঞেস করলেন।.

'জাতির প্রতিনিধিরা।'

'এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারবেন না?'

'দরজা খুলুন নতুবা ভেঙ্গে ফেলব।'

'বন্ধু খুলে দাও তো দরজাটা।'

---দৈবক্রমে প্ল্যাসঁনের কাঁপুনি আর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজও থেমে গেল।

এক ডজন বর্শাধারী রক্ষী সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ঘরে ঢুকল লুব্যাঁ--- একবার আমার দিকে আরেকবার মাদামের দিকে চাইল--- 'আরে রামঃ। প্রেমিক-যুগলকে আমরা একটু অসুবিধায় ফেললাম। সুন্দরী। মাফ করবেন আমাদের।'

এই দৃশ্য দেখে একটু কৌতুক অনুভব করল লুব্যাঁ---তারপর বিছানায় বসে রূপসী মাদাম দ্য ল্যুজির চিবুক ধরে বলল-- 'একথা সত্যি যে এই মুখ প্রভুর প্রার্থনা করবার জন্য নয়। ---- এটা দুঃখের কথা।---কিন্তু সবার আগে আমাদের প্রজাতন্ত্র। আমরা বিশ্বাসঘাতক প্ল্যাসঁনেকে খুঁজছি--আমি নিশ্চিত যে সে এখানেই আছে এবং তার ফাঁসি হবে।'

'তাহলে খুঁজে দেখুন।'

রক্ষীদল সমস্ত আসবাবপত্রের নিচে এবং আলমারীর ভেতর খুঁজে দেখল--- খাটের নিচে এবং তোষকের ভেতরে বেয়নেট চালিয়ে দিল। --- লুব্যাঁ কান চুলকোতে চুলকোতে আমার দিকে আড়চোখে চাইল --- মাদাম একটু শঙ্কিত হলেন --- আমায় বললেন--'ওগো বন্ধু! এই বাড়ীর সবকিছুই তোমার আমারই মত ভাল জানা আছে--চাবি নাও, মঁসিও লুব্যাঁকে সমস্ত জায়গা দেখিয়ে দাও। আমি জানি এই দেশপ্রেমিকদের সাহায্য করতে তোমার খুব আনন্দ হবে।'

আমি তাদের মাটির নিচে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে তারা বেশ কয়েক বোতল মদ খেল। লুব্যাঁ বন্দুকের বাট দিয়ে মদের পিপেগুলো ফুটো করে মাটিতে ফেলে দিল --- সমস্ত ঘরটা মদে ভেসে গেল।---লুব্যাঁ চলে যাবার সঙ্কেত জানাল। আমি ওদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত গেলাম এবং ওরা গেটের বাইরে যেতেই গেটটা বন্ধ করে ছুটে এসে মাদামকে জানালাম যে আমরা বেঁচে গিয়েছি।

এই খবর শুনে মাদা[illegible] [illegible] ভেতর ঝুঁকে ডাকলেন--'মঁসিও প্ল্যাসঁনে' মঁসিও প্ল্যাসঁনে.'

জবাবে একটা [illegible] দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলে[illegible]

সেই মহান কুরী পরিবার

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

পারমাণবিক বিজ্ঞানের আজকের অগ্রগতির জন্য যে মহীয়সী মহিলা বিজ্ঞানীর মৌলিক গবেষণা ও তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের মতো অমূল্য অবদান রয়েছে তিনি হলেন মেরী স্কোলোডোয়োস্কা কুরী। ম্যাডাম কুরী, তাঁর স্বামী পিয়ারে কুরী, কন্যা আইরিন ও জামাতা জোলিয়েট কুরী মানবসমাজের কল্যাণসাধনে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার মহৎ প্রচেষ্টার জন্য ইতিহাসের পাতায় দুটি আদর্শসুন্দর দম্পতি হয়ে আছেন।

১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে মেরী কুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শিক্ষকতা করতেন, সুপণ্ডিত ও নিরহংকার মানুষ বলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। অতি অল্পবয়সে মাতৃহারা হয়ে মেরী তাঁর সুপণ্ডিত পিতার স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণায় শৈশব অতিবাহিত করেন। মেরীর জ্ঞান-তৃষ্ণা ও বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা তাঁকে ওয়ারশ গ্রামে ধরে রাখতে পারলো না, তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিসে চলে এলেন।

বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে প্যারিসে এসে মেরী দারুণ দুর্বিপাকে পড়লেন, অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে লেখাপড়াও বন্ধ করতে হলো। এ সময় তাঁর অর্থকষ্ট এত চরম হয় যে, তাঁকে লোকের বাড়ীতে ঝি-গিরি পর্যন্ত করতে হয়েছে।

তরুণী মেরীর অসাধারণ প্রতিভা প্যারিসের সে সময়ের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় ও সাহায্যে মেরী তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেন এবং স্বাধীনভাবে গবেষণা করার সুযোগ পান।

এ থেকে মনে হয় মানুষ যত অসহায় অবস্থার মধ্যেই পড়ুক না কেন আন্তরিক চেষ্টা ও সাধনা থাকলে তার জীবনে সাফল্য আসবেই। ল্যাবরেটরীতে গবেষণার সময় মেরী পিয়ারে কুরীর সংস্পর্শে আসেন।

১৮৯৬ সালে অধ্যাপক হেনরী বেকুইরেল তাঁর ল্যাবরেটরী ঘরে এক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হ'ন। তিনি তাঁর কাজ করার টেবিলের ড্রয়ারে এক-টুকরো ইউরেনিয়াম লবণ ও কয়েকটি সুবেদী ফটোগ্রাফিক প্লেট রেখেছিলেন। পরের দিন অধ্যাপক বেকুইরেল তাঁর ড্রয়ার থেকে ফটোগ্রাফিক প্লেট-গুলো বের করে দেখলেন ওগুলো ইউরেনিয়াম লবণের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বিস্মিত হলেন এ কারণে যে, তিনি প্লেটগুলোকে কালো কাগজ দিয়ে ভালো করে মুড়ে রেখেছিলেন, তা সত্ত্বেও ওগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

অধ্যাপক বেকুইরেল সিদ্ধান্ত করে ছিলেন যে, ইউরেনিয়াম লবণ থেকে এক্স-রশ্মির ন্যায় কোনো অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলিকে প্রভাবিত করেছে। বেকুইরেলের প্রত্যক্ষ করা এই অস্বাভাবিক ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর ঘটনারূপেই চিহ্নিত থাকতো যদি না মেরী কুরী ও তাঁর স্বামী এ ব্যাপারে গবেষণা করে ১৮৯৮ সালে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করতেন। কোনো পদার্থ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম কোনো অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হওয়াকে পদার্থটির তেজস্ক্রিয়তা বলা হয় এবং এই তেজস্ক্রিয়তা ধর্মবিশিষ্ট পদার্থকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলা হয়।

মেরী কুরী ও তাঁর স্বামী দেখলেন পিচব্লেণ্ডি নামক একটি খনিজ পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। এই পিচব্লেণ্ডি থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। কিন্তু তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, পিচব্লেণ্ডিতে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম রয়েছে পিচ-ব্লেণ্ডি তার তুলনায় অনেক বেশী তেজ-স্ক্রিয়। এ থেকে তাঁদের ধারণা হলো পিচব্লেণ্ডিতে ইউরেনিয়াম ছাড়া নিশ্চয়ই অন্য কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ রয়েছে। তাঁদের গবেষণায় পিচব্লেণ্ডি থেকে ইউরেনিয়াম অপেক্ষা দশলক্ষ গুণ বেশী তেজস্ক্রিয় 'রেডিয়াম' আবিষ্কৃত হলো।

পরবর্তীকালে তাঁরা 'পোলোনিয়াম' নামে আর একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন, পোলোনিয়াম নামটি মেরীর জন্মভূমি পোল্যাণ্ডের নামানুসরণে রাখা হয়েছে। মেরী কুরী তাঁর গবেষণার দেখালেন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থসমূহ কিছুকাল রশ্মি বিকিরণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিয়োজিত হয়ে স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এইভাবে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা-বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন অপ-রসায়নবিদদের স্বপ্ন—

মাদাম চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—ভগবানকে ধন্যবাদ। মঁসিও প্লাসঁনে আপনি আমাকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন --- আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি মরেই গিয়েছেন।' --- -তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'বেচারী বন্ধু আমার। আপনি আমায় কত [illegible] বারে বারে কত খুশী হয়ে বলতেন --- আর কখনও বলবেন না?' *

অনুবাদক :—সুবীরকান্ত গুপ্ত

* মূল ফরাসী থেকে অনুদিত

'মৌলিক পদার্থসমূহের পরস্পর রূপান্তর' হয়তো একদিন সার্থক হবে।

তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ সালে মেরী কুরী, তাঁর স্বামী ও অধ্যাপক বেকুই-রেলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার অর্জন করলেন।

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের ফলে জন ড্যালটনের বহু-সমর্থিত মতবাদ 'পরমাণু অবিভাজ্য' ভুল প্রমাণিত হয়ে গেলো।

১৯০৬ সালে পিয়ারে কুরী প্যারিস শহরে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু-বরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুতে মেরী শোকে নিদারুণভাবে ভেঙে পড়েন, বিজ্ঞান-সাধনা ও তাঁর স্নেহের দুটি কন্যা আইরিন ও ইভের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা এসময়ে তাঁকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়।

১৯১১ সালে ম্যাডাম কুরীকে তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য পুনরায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, এবার কিন্তু তিনি এ সম্মানের একক অধিকারিণী হ'ন। ম্যাডাম কুরীই একমাত্র ভাগ্যবতী যিনি একাধিকবার নোবেল পুরস্কার অর্জনের সম্মান লাভ করেছেন।

তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে ম্যাডাম কুরীর বিপুল মৌলিক গবেষণা ও তাঁর দীর্ঘ-দিনের একান্তিক সাধনা পরবর্তী যুগের বৈজ্ঞানিকদের পরমাণুর অভ্যন্তর অনু-সন্ধান করে লুকিয়ে থাকা বিশাল শক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছে। অপ-রসায়নবিদদের স্বপ্ন—ক্ষারধর্মী ধাতব মৌলিক পদার্থ থেকে রূপান্তরের দ্বারা সোনার মতো মূল্যবান ধাতু পাওয়া—আজ প্রায় একরকম সার্থক বলা চলে কারণ পরমাণু বিভাজনের দ্বারা প্রাপ্ত যে বিপুল শক্তিকে বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করেছেন তার মূল্য কয়েক লক্ষ টন সোনার মূল্যের সমান।

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই অসাধারণ প্রতিভাশালী মহিলা-বিজ্ঞানী ম্যাডাম কুরী পরলোকগমন করেন।

ঙ

ম্যাডাম কুরীর প্রথমা কন্যা আই-রিনের সঙ্গে জোলিয়ট কুরীর বিবাহ হয়। মায়ের মতো আইরিনও তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিজ্ঞান-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তেজস্ক্রিয়তাকে মানব-কল্যাণের কাজে আরো কিভাবে লাগানো যায় এবং কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। তাঁদের গবেষণায় প্রমাণিত হয় বেরিলিয়াম মৌলিক পদার্থটিকে বিশ্লিষ্ট করে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তা প্যারাফিনের মতো কোনো হাইড্রোজেন-সম্বলিত পদার্থের উপর আপতিত হলে দ্রুতগতি একপ্রকার কণার সৃষ্টি হয়।

বৈজ্ঞানিক চ্যাডউইক এই কণা সম্পর্কে গবেষণা করে বলেন কণাগুলি ইলেকট্রনের ন্যায় ঋণাত্মক তড়িৎ আধানযুক্তও নয়, প্রোটনের ন্যায় ধনাত্মক তড়িৎ আধানযুক্তও নয়, এগুলি তড়িৎ আধানবিহীন এবং প্রোটনের সমভর সম্পন্ন।

এই গবেষণার পথেই শেষ পর্যন্ত পদার্থের অন্যতম প্রাথমিক কণা নিউট্রন আবিষ্কৃত হলে এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানের এক নূতন যুগ সূচিত হলো।

১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়েছিল আর তার দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে আইরিন কুরী ও তাঁর স্বামী দ্রুতগতি আলফা কণার সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন অংশ বিশিষ্ট করে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে দেখালেন। তাঁরা অ্যালুমিনিয়ামকে ফসফরাসের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা সমস্থানিক মৌলিক পদার্থে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পরে ফসফরাসের এই সমস্থানিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পর স্থায়ী সিলিকন মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়।

এইভাবে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি ও মৌলিক পদার্থসমূহের পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরিত হওয়া যে সম্ভব তা প্রমাণিত হয়েছিল।

মায়ের মতো আইরিন কুরীও তার স্বামীর সঙ্গে ১৯৩৫ সালে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালের ১৭ই মার্চ আইরিন কুরী পরলোকগমন করেন; বিজ্ঞান-সাধিকা মায়ের মতো আইরিনও মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান নিয়ে ফলপ্রসূ গবেষণা করে গেছেন, কল্যাণকর কাজে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার স্বপ্নও দেখে গেছেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাই দুই দম্পতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন পাবেন এবং বিজ্ঞান-সাধনায় উৎসর্গীকৃত এই দুই দম্পতির জীবন-কাহিনী উত্তর-সূরীদের মনে অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দী-পনার সঞ্চার করবে।

মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য

কবি ও রাজনীতি

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে একটি অপূর্ব প্রীতি ও বন্ধুত্ব ছিল, এবং একজন অন্যজনকে সর্বদাই প্রশংসা করতেন। সে প্রশংসা কিন্তু অন্ধ ছিল না। তাঁরা অনেক বিষয়ে একমত হতে পারতেন না, যেমন অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু সেজন্য আজীবন তাঁদের বন্ধুত্বের কোনও হানি হয় নি।

গান্ধীজী যখনই কোনও রাজনীতি সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন - রবীন্দ্রনাথ তখনই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন নিয়ে প্রথম শিক্ষামূলক আলোচনা আরম্ভ করে-ছিলেন গান্ধীজী তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করে ছিলেন। এইভাবে এক ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ আর এক মহাকবির মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ গড়ে উঠে ছিল। তার ফলে মানব-জাতির সমূহ কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়েছে।

য়েরাবেদা জেলে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে যে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে ছিল, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেদিন গান্ধীজীর শয্যার পাশে কবিগুরু এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। সে-সময় প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে মহাত্মাজী যে বিরাট অনশনব্রত নিয়েছিলেন, সেদিন সেটি ভঙ্গ করার দিন ছিল।

১৯৩১ সালে লণ্ডনে যে গোল-টেবিল বৈঠক বসেছিল সেটি সম্পূর্ণ বিফল হয় এবং তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কারারুদ্ধ হন। এই বৈঠকে তিনি জোর করেই বলেছিলেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার দ্বারা ভারতের একতাকে আরও খণ্ডিত করার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আবশ্যক হলে এর জন্য আমরণ অনশনব্রত পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রসিদ্ধ চিঠি

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর উপবাসের উপর কোনও রকম গুরুত্ব না দিয়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করে দিলেন। মহাত্মাজীও তাঁর কথামত সঙ্গে সঙ্গে উপবাস আরম্ভ করে দিলেন এবং তার আগে রবিঠাকুরকে এই মর্মে একখানি চিঠি দিলেন —

'আজ ভোর ৩টায় (মঙ্গলবার) আমি এক অগ্নিপরীক্ষায় প্রবেশ করছি। এই পরিস্থিতিতে আমার চেষ্টার সফলতার জন্য আপনি বরাবরই অকপটভাবে আমার কার্যের সমালোচনা করেছেন বলেই আপনাকে আমার অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধু বলে মান্য করি। আজ আমার এই কার্যের উপর আপনার সপক্ষে বা বিপক্ষে মত জানাবার জন্যে বিশেষ উৎসুক হয়ে রয়েছি, কিন্তু আপনি আমার সমালোচনা করতে রাজী হন নি। এই উপবাসের সময় হয়ত আমায় সমালোচনা করবেন না কিন্তু আমি বিশেষ আশা করে আছি যে, পরে আপনি যেন আমার এই উপ-বাসকে সমালোচনা করেন। এমনকি দরকার হলে এটাকে খুব খারাপ বলতেও যেন দ্বিধা না করেন। আমার নিজের দোষ স্বীকার করতে আমি একটুও কুণ্ঠিত নই আর যদি ভুল করে থাকি তাহলে এই স্বীকারের মূল্য অনেক হলেও তা দিতে অস্বীকৃত নই। যদি আপনি এই কার্যটিকে পছন্দ করেন তাহলে আপনার

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

আশীর্বাদ থেকে যেন বঞ্চিত না হই। এটাতে আমি ধৈর্য পাব। আশা করি আমার মনের আবেগ আপনার কাছে পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে পেরেছি।'

এই পর্যন্ত লেখার পরে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি তার পান ও সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে 'পুনশ্চ' যোগ করেছেন।

"আমি এই চিঠিখানি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের হাতে দেওয়ার ঠিক পূর্বেই আপনার পাঠানো চমৎকার তার বার্তা পেলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার এই বাণী আমার এই ঝঞ্ঝার পথে বিশেষ সাহায্য করবে।"

অনশন ভঙ্গ

রবি ঠাকুর নিচের মর্মে একটি বড় তার বার্তাই পাঠিয়েছিলেন। 'ভারতের একতা অক্ষুণ্ণ রাখার ও সামাজিক দৃঢ়তা রক্ষা করার জন্য মহৎ জীবনের উৎসর্গ খুবই দরকার। কিন্তু এই কার্যটি আমাদের শাসকরা যে কতটা বুঝে উঠতে পারবেন তা ঠিক বলতে পারছি না। আমার মনে হয় ইংলণ্ডের লোকেদের নির্লিপ্ততা হয়ত এই রকম নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গকে একটা অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতিতে পৌঁছাতে দেবে না। আপনার এই পবিত্র ও কষ্টকর আত্মোৎসর্গের পিছনে আমাদের দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অনুসরণ করবে।"

গান্ধীজীর ক্ষীণ শরীরের দ্রুত অবনতিকে সারা পৃথিবী খুবই মনযোগ দিয়ে দেখছিল। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই বৃটিশ সরকারকে পুনর্বিচার করতে হোলো; ম্যাকডোনেল্ড বাঁটোয়ারার বিশেষ অদল বদল করলেন। মহাত্মা তাতে সন্তুষ্ট হয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন।

এই সংবাদ শুনেই কবিগুরু সোজা জেলে ছুটে গেলেন। সেখানে গান্ধীজীকে নিজের লেখা একটি ছোট কবিতা পড়ে শোনালেন। পরাশর নামে একজন কুষ্ঠরোগী (সহবন্দী) কিছু সংস্কৃত মন্ত্রও পড়লেন আর তার পরেই উপবাস ভঙ্গ করা হোলো। সারা পৃথিবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। পরের দিনের এক সাধারণ সভায় রবি ঠাকুর গান্ধীজীর জীবনকে মানবতার আহ্বান ও আত্মোৎসর্গের প্রতীক বলে ঘোষণা করলেন

কৃতজ্ঞতা

গান্ধী ও কবিগুরুর সৌহার্দ্য এই ঘটনার অনেক আগে থেকেই মিলিতভাবে বেড়ে এসেছিল। সি, এস, এণ্ড্রুস্, যিনি এদেশে পাদ্রী হয়ে এসেছিলেন, তিনি রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের দিকে বিশেষ কার্য করেন। ১৯১৪ সালে, জি, কে গোখেলের অনুরোধে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্যে এণ্ড্রুস্ দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে, কেপটাউনের নগর সভাগৃহে তিনি রবিঠাকুরের বিষয় বক্তৃতা দেন। গান্ধীজী এই বক্তৃতার পুরো নকল গোখেলের কাছে পাঠিয়ে তার যথাসম্ভব প্রচারের জন্যে জানান।

এইভাবে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের অনেক আগেই তাঁদের দু'জনের মধ্যে শ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল। গান্ধীজীর ফোনীক আশ্রমের কয়েকজনকে রবিঠাকুর শান্তিনিকেতনে স্থান দিয়েছিলেন। এই উপকার গান্ধীজী কখনও ভুলতে পারেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেই গান্ধীজী ১৫ই এপ্রিল, ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তখন কবিগুরু সেখানে ছিলেন না। গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন ——

'যদিও আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এখানে নেই, তবুও তাঁর অস্তিত্ব আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুভব করছি।-সত্যিই ভারত তার ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে পূর্ব ও পশ্চিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।' পরে ১৯১৫ মার্চ মাসে গান্ধীজী রবি ঠাকুরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা করেন এবং তাঁর সঙ্গে ৬ দিন থাকেন। এরপর শান্তিনিকেতনের ছবি তাঁর মনে মৃত্যু পর্যন্ত আঁকা ছিল। পরে শান্তিনিকেতনের অভাবের সময় গান্ধীজী অর্থ-সাহায্যও করেন আর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃভাব ও গ্রামোন্নয়নের জন্য বিশ্বভারতীর ক্রমবিকাশে বিশেষ সাহায্য করেন।

সত্যাগ্রহ

১৯১৭ সালে ব্রোচে, দ্বিতীয় গুজরাট শিক্ষা সংসদে বক্তৃতা দেওয়ার সময় গান্ধীজী রবি ঠাকুরের কবিতার প্রশংসা করেন। গুজরাটের লোকদের কাছে শান্তিনিকেতনের অর্থ-সাহায্যের জন্যে প্রচার করবার সময় তিনি বলেন, 'এই মহাকবি ভারতের অমূল্য রত্ন। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, তাঁর কবিতা ঐশ্বরিকভাবে আর নৈতিক চিন্তাধারায় ও অন্যান্য সদগুণে পরিপূর্ণ।

১৯১৯ সালে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছিলেন এর কারণ ছিল রাওলাট আইন আর তার পরবর্তী ঘটনাবলী। এই আন্দোলনে গান্ধীজী রবি ঠাকুরের আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। তিনি তখন এণ্ড্রুজের মাধ্যমে কবির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। পরে ১৯১৯-এর ১২ই এপ্রিল কবি গান্ধীজীকে এই মর্মে একটি চিঠি লেখেন---

"আমি জানি আপনার উদ্দেশ্য হোলো ন্যায়ের সাহায্যে অন্যায়কে দূর করা। কিন্তু এরকম যুদ্ধ কেবল বীরের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ লোকে, যারা মানসিক উত্তেজনায় কার্য করে, তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সব সময় ভেবেছি আর বলেছি যে, জাতীয় স্বাধীনতা, দানের ভিতর দিয়ে সম্ভব হয় না। এটা আমাদের জয় করে প্রথমে পেতে হবে, আর, তারপর সেটাকে রক্ষা করতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার সুযোগ তখনই আসবে যখন সে প্রমাণ করবে, যে, জাতি বাহুবলে বিজয়ী হয়ে শাসন করছে, তার শক্তির চেয়ে ভারতের নিজের নৈতিক বল অনেক বেশী। তাছাড়া আপনি দেশের অতি দরকারের সময় তাকে সত্যের পথে থেকে স্বাধীনতা অর্জনে লক্ষ্য রেখে জয়যাত্রার অভিযানে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সচেতন করাতে এসেছেন। আর সেই

দকে দেশকে এটাও বুঝিয়ে দিতে চান যে, রাজনৈতিক অসাধুতার খোলস পরে স্বাধীনতা অর্জন করার দুর্বলতা দূর করা একান্ত কর্তব্য।'

মতের পার্থক্য

কবি বলেছিলেন যে, এরকমের আন্দোলন কেবল বাছা বাছা লোকের দ্বারা করাই সম্ভব। এই আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জায়গায় বিশৃঙখলা দেখা দিয়েছিল। যখন জালিওনাওয়ালাবাগের চরম দুঃখের নাটক শেষ হোলো তখন লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে ১৯১৯ সালের ২০শে মে তারিখে এক বিশেষ চিঠি লিখে রবি ঠাকুর তাঁর 'স্যার উপাধি বর্জন করেন। যদিও গান্ধীজী রবি ঠাকুরের বিষয় কতকগুলি বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন, তবুও এই বিষয় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হয়ে 'স্যার' উপাধি বর্জনের জন্য নীচের মর্মে এই চিঠি লেখেন—'এখন এমন এক সময় এসে উপস্থিত হয়েছে যখন সারা দেশকে অবজ্ঞা দেখিয়ে আব কিছু লোককে সম্মানিত করে আমাদের লজ্জাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। সেইজন্যে আমি স্থির করেছি যে আমার দেশবাসীকে যে অমানুষিক হীনতা ও তুচ্ছতা দেখান হয়েছে, তার প্রতিবাদস্বরূপ আমি আমার স্বতন্ত্র সম্মানের চিহ্ন আ. দূরে ফেলে দিয়ে সকলের সঙ্গে ...য দাঁড়াতে চাই।'

...ধীজী রবি ঠাকুরের আশীর্বাদ না ...ই অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ছেলেদের স্কুল বর্জন ও বিদেশী কাপড় পোড়ানোর প্রস্তাবে রবি ঠাকুরের মনে এক বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল, এই বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধও হয়েছিল এবং সে বিষয় নিয়ে বেশ কিছু লেখালিখিও প্রকাশিত হয়েছিল। রবি ঠাকুর বলেছিলেন—

সহযোগের মনোভাব এক রাজনৈতিক সন্ন্যাস। আমাদের ছেলেরা কিসের জন্য করছে? পূর্ণতর শিক্ষার বদলে অশিক্ষার। এর পিছনে ধ্বংসের একটা চাপা আনন্দ রয়েছে যাকে অন্যভাবে বলতে পারা যায় সন্ন্যাস। এর শেষ সীমায় দেখা যায় বিভীষিকার করাল মূর্তি যেখানে মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস হারিয়ে এক অহেতুক আনন্দে গত মহাযুদ্ধের মত এক বিষময় ধ্বংসে মেতে যায়। এখন মানুষের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক স্বভাবের মধ্যে এক সমতা আনা বিশেষ দরকার। আমি প্রার্থনা করি ভারত পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে সহযোগ করুক। পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের চিন্তা এবং মনকে বিচ্ছিন্ন করার ভাবনা মানে আমাদের আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করার চেষ্টা।' গান্ধীজী কিন্তু রবি ঠাকুরের যুক্তি গ্রহণ করতে পারলেন না। ১৯২১ সালের ১লা জুন ইয়ং ইণ্ডিয়াতে এর প্রতিবাদে 'কবির উদ্বেগ' নামক প্রবন্ধে গান্ধী লেখেন 'অন্যায়ের সঙ্গে অযথা এবং অনিচ্ছাকৃত অংশ গ্রহণ করার প্রতিবাদের নাম অসহযোগ ---- অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহযোগ করা যেমন কর্তব্য, ন্যায়ের সঙ্গে সহযোগ করাও সেইরকম উচিত। কবি যে দেশ-প্রেমের কথা বলেছেন এই অসহযোগ আন্দোলন তারই প্রকৃত সংজ্ঞা। ইয়োরোপের পায়ে পড়া ভারত কারুরই মনে আশার সঞ্চার করতে পারে না। কেবল জাগ্রত এবং মুক্ত ভারত, শান্তির ও শুভেচ্ছার বাণী পৃথিবীর অন্যান্য দলিত জাতিকে শোনাতে পারে। যাইহোক এইভাবে দু'জনে নিজস্ব পথে চলতে রাজী হয়েছিলেন।

১৯৩০শে গান্ধীজী যখন লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছিলেন তখন রবিঠাকুর ইংলণ্ডে এবং সে সময় তিনি ম্যাঞ্চেস্টার গার্জেনে একটি চিঠি পাঠিয়ে নিরীহ লোকদের উপর নিষ্ঠুর কার্যকলাপের নিন্দা করেন এবং স্পেক্টেটর কাগজে গান্ধীজীর এই নূতন ধরণের বিপ্লবের বিষয় লেখেন।

অস্পৃশ্যতা

রবি ঠাকুর ৭০ বৎসর অতিক্রম করার সময় গান্ধীজী তাঁকে এই মর্মে লেখেন যে, রবি ঠাকুর তাঁর কবিত্বের প্রতিভাবলে এবং নিজের জীবনের পবিত্রতায় ভারতকে পৃথিবীর সম্মানের অনেক উচ্চাসনে তুলে দেওয়ায় সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে তিনিও কৃতজ্ঞ। আবার গান্ধীজী যখন অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশ নিয়ে আর সকলের সঙ্গে ঠাকুর-পূজার বিষয় আন্দোলন করেন ও তাদের দুঃখ দূর করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন তখন কবি সর্বসমক্ষে শ্রদ্ধায় চোখের জল ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অসফলতার পর কবি আভিজাত্যবাদীদের দমন-নীতির জন্যে ভবিষ্যতের উপর গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন :—

বর্বরতা

'আজ আমাদের হাজার হাজার দেশবাসী বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কারাগারে রয়েছে তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি কেবল যে শাসনের উপর খরচের ভার বাড়িয়ে দিচ্ছে তাই নয়, তার সম্মানও চিরতরে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। কারাবাসীদের উপর যে ক্রূর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে, সেটা সভ্যতার অজ্ঞাত কোটরে লুকিয়ে থাকা আদিম অসভ্যতার প্রমাণ। এটা চিরকালের জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে আত্মাকে কলুষিত করছ।'

কবি অস্পৃশ্যতার জন্য হিন্দুসমাজকে কেও ক্ষমা করেন নি। তিনি বলেছিলেন যে তোমরা আমাদের দেশের অনেকগুলি লোককে অপরিসর অপমানের গণ্ডির মধ্যে রেখে তাদের চিরকালের মত হেয় করে রেখেছ। কারাগার কেবল ইট আর চূণবালি দিয়েই হয় না, মানুষের আত্মসম্মানের পরিধিতে সীমাবদ্ধ করার নৈতিক বিষ দৈহিক বাঁধনের চেয়ে মারাত্মক, এবং যাঁরা এর পৃষ্ঠপোষক বা যাঁরা একে ধর্মের নামে প্রয়োগ করে তাদের সমূহ নৈতিক অবনতি হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রতিবাদ

কবির মন গান্ধীজীর স্বীকৃত পুণা প্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠেছিল। তিনি এই সন্ধিকে বাংলা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর বলে বলেছিলেন আর ১৯৩৬শে এক জনসভায় এই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ভাষণ দেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে লেখা চালানোর জন্য মডার্ন রিভিউ পত্রিকার স্থান রাখেন। তখন গান্ধীজী রবিঠাকুরকে আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে প্রস্তাব করেন যে প্রধান প্রধান নেতাদের নিয়ে এই বাঁটোয়ারার বিষয় পরামর্শ করে এটার ক্ষতিকারক অংশের অদলবদলের বিষয় তাঁকে জানালে তিনি যতদূর সম্ভব সেটা দূর করার চেষ্টা করবেন।

১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের সময়েও রবি ঠাকুর গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একবার প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই বছর বিহারে এক ভূমিকম্প হয়। তখন গান্ধীজী বিহারে অস্পৃশ্যতা দূর করার আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি বলেন যে অস্পৃশ্যতার পাপের জন্যই ভগবান বিহারের এই দুর্দশা পাঠিয়েছেন। এই ভূমিকম্প আর এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন দুটোই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এর প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, গান্ধীজী যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে নিজের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন তাতে মনে হয় তাঁর প্রতিবাদকারীরা খুবই খুশী হবেন আর হয়ত গান্ধীজীকেই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করবেন। যদিও গান্ধীজী এর প্রত্যুত্তরে জানান যে প্রাকৃতিক বিপ্লব আর মানুষের আচরণ এমনভাবে ঘটেছে যে তাতে তাদের মধ্যের সম্বন্ধ অবিশ্বাস করা যায় না তবুও অনেকে এর প্রতিবাদ করেন। এ বিষয় জওহরলাল নেহরুও তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

গান্ধীজীর মত অনুসারে আত্মসংযমের মধ্যে দিয়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ রবি ঠাকুর একেবারেই সমর্থন করতে পারেন নি। এই বিষয় মার্গারেট স্যাঙ্গারও ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে সংযমের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। গান্ধীজী নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে রবি ঠাকুর লেখেন যে, মানুষের নৈতিক শক্তি যথেষ্ট জোরাল হওয়ার আগেই যে অসংখ্য সন্তান জন্মাবে তাদের অকাল-মৃত্যুতে ফেলা আর বৃথা কষ্ট দেওয়া এক বিরাট সামাজিক অবিচার, যেটা সহ্য করা যায় না।

সদ্ভাব

১৯৩৫ সালে রবিঠাকুরের শরীরের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল আর তিনি শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থার জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারপরই এর অর্থ সংগ্রহের জন্যে বেরিয়ে পড়বেন বলে মনে মনে স্থির করেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের অক্টোবরে গান্ধীজী তাঁকে এই মর্মে এক চিঠি লেখেন।

—'আপনি আপনার এই বয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন এটা একেবারেই ভাবতে পারি না। আপনার যা অর্থ দরকার সেটা আপনার কাছেই পৌঁছবে তার জন্যে আপনাকে শান্তিনিকেতনের বাইরে যেতে হবে না।'

এর কয়েক দিনের মধ্যেই গান্ধীজী এক অজ্ঞাত দাতার কাছ থেকে ৬০,০০০৲ টাকা তুলে রবিঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ১৯-৯-৩৭শে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে লেখেন—

'অনেক দিন নিস্তেজ হয়ে থাকার পর তোমার এই স্নেহের চিন্তা আমার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার এনে দিল। তার আগে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর কষ্ট যেন অফুরন্ত বলে মনে হোত।'

১৯৪০শে-র ফেব্রুয়ারীতে গান্ধীজী ও কস্তুরবা শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন। তখন এক সাধারণ সভায় তাঁদের স্বাগত জানিয়ে রবিঠাকুর বলেন—'আপনাদের আজ আমরা বড় আপনার বলে গ্রহণ করছি। আপনি সত্যই সব মানবজাতির মঙ্গলকামী।'

গান্ধীজী উত্তরে বলেন, 'এই পরিদর্শনকে আমি এক তীর্থভ্রমণ বলে মনে করি, যদিও আমরা এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত নই। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আমার নিজের বাড়ীতে এসেছি — আমি আজ গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছি আর সেইজন্য আমার মন আজ কানায় কানায় ভরে উঠেছে।'

গান্ধীজী শান্তিনিকেতন ছাড়ার সময় রবি ঠাকুর তাঁকে একখানা চিঠি দেন এবং লেখেন—'আপনি যদি এই অনুষ্ঠানকে এক জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচনা করেন তাহলে এটাকে আপনার হাতে নিয়ে নিন আর এর উন্নতির জন্য আশ্বাস দিন। বিশ্বভারতী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্নে ভরা নৌকা। আমি আশা করি এটা রক্ষা করার ভার আমার দেশবাসীর উপর থাকবে।'

উত্তরে গান্ধীজী লেখেন —

"এই অনুষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেওয়ার আমি কে? এ এক মহান আত্মার সৃষ্টি। এর রক্ষা করার ভার ভগবানের উপরেই থাকবে। এটা একটা সাধারণ্য দ্রষ্টব্য নয়। গুরুদেব প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবীর। সেইজন্য তাঁর সব সৃষ্টি সর্বতোভাবে আন্তর্জাতিক আর বিশ্বকল্যাণের আর বিশ্বভারতী তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এতে আমার একটুও সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানের অর্থচিন্তার ভার থেকে গুরুদেবকে মুক্ত করতে হবে। তাঁর আবেদনের উত্তরে আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমার দ্বারা যা সম্ভব তা আমি সম্পূর্ণভাবেই করব।'

কবিগুরুর তিরোধান

বিশ্বভারতী গান্ধীজীর মঙ্গল চিন্তাই করত এবং তাঁকে একবার ভাইসচ্যান্সেলার হওয়ার জন্যে অনুরোধও করেছিল। তিনি সেখানকার কর্মকর্তা ভাবে না থেকে তার বেশী উপকারে লাগাতে পারবেন বলে ভেবে সেটা গ্রহণ করেন নি এবং যখন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সেখানকার ভাইস-চ্যানসেলর

হলেন তখন খুশি হয়ে জানিয়েছিলেন—

'গুরুদেবের আত্মা অমর এবং তিনি বেঁচে আছেন। তিনি ভারতের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর কার্য করছিলেন—এই কার্য্যের মধ্যেই তিনি মারা গেছেন। তাঁর কার্য আজ অসমাপ্ত। তাঁর নশ্বর দেহ আজ নেই, তবে তাঁর আত্মা এখনও জীবিত। এইভাবে বলতে গেলে কেউ মরে না বা নষ্ট হয় না। গুরুদেব আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত। তাঁর চিন্তাধারা সারা বিশ্বের এবং এর অধিকাংশই ঐশ্বরিক এবং এই সবের মধ্যে দিয়ে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন আর বিশ্বভারতী এসবই তাঁর কার্যের প্রতীক। এইগুলি তাঁর আত্মার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, গুরুদেবের পরই ইহজগৎ ত্যাগ করেন। তাঁকে যদি আমরা সত্যিই সম্মান দেখাই তাহলে তাঁর করা এই অনুষ্ঠানগুলিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব। আর তিনি যেখানেই থাকুন না কেন সেখান থেকে তিনি এটা দেখতে পাবেন।'

এর কয়েক বছর আগেও এণ্ড্রুজকে লেখা চিঠি থেকে গুরুদেবের প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধার আর একটি উদাহরণ আমরা পাই। তাতে তিনি লিখেছিলেন—

'সেই সামান্য উপবাস আমার কাছে অভাবনীয় রত্ন এনে দিয়েছিল। তার মধ্যে গুরুদেব সবচেয়ে দামী রত্ন। যদি কেউ বলত যে উপবাস করলে আমি গুরুদেবকে পেতে পারব তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় উপবাস করতাম। আমি তাঁর মনের কোণে স্থান পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। আমি ভগবানের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ যে উপবাস দিয়ে সেটা আমি পেয়েছি।'

যদিও রবিঠাকুর বিখ্যাত কবি তবুও মানুষের উপর ভালবাসা, অসীম দেশপ্রেম ও গভীর ধর্মভাব তাঁকে গান্ধীজীর সঙ্গে অনেকটা সমান করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের সংস্কৃতি একত্র আর মানব আত্মার সার্থকতা দেখতে পয়েছিলেন। তিনি বাংলার সন্তান হয়েও কেবল বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি। তিনি নির্বাণ বা মুক্তিকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে ধরে নেননি। তিনি এক মহান দেশপ্রেমী হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন। রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিরোধ, তাঁকে মোটেই বিচলিত করতে পারত না।

তাঁর বিচক্ষণ মন জানত যে ভারতবর্ষকে কি রকম অপমান সহ্য করতে হয়। কিন্তু তিনি এই বিষয় তাঁর মনের উপর গভীর রেখাপাত করতে দিতেন না। তিনি দৈনন্দিন রাজনীতিতে যোগ দিতেন না সেটা ঠিকই, তবে যখন দরকার হোত তখন তিনি এই ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ করতেন।

আবশ্যকতা

রবি ঠাকুর গান্ধীজীর কাজের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলেন নি। তিনি চরকার স্বপক্ষে এমন কিছু দেখতে পাননি যা দিয়ে স্বাধীনতা আসতে পারে। সেই জন্য একবার চরকার বিষয় সমালোচনা করার সময় তিনি লিখেছিলেন---

'এই পৃথিবীতে ভেল্কিবাজী-ওয়ালাদেরও একটা সম্মানের স্থান আছে ---অবশ্য যদি তারা তেমন চোখ ঝলসানি জিনিষ দেখাতে পারে।

রবি ঠাকুর কবি হলেও, ভারতের সমৃদ্ধির জন্য কৃষির বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্যে তিনি শ্রীনিকেতন স্থাপনা করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক মতে কৃষির উন্নতি শিক্ষার জন্য নিজের ছেলেকে ইংলণ্ডে পাঠান। গান্ধীজী মনকে নিয়মানুবর্তিতায় আনার জন্যে চরকার ব্যবহারের উপরও যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন। তিনি বৈদেশিক কাপড় তৈরীর ব্যাপারেও লক্ষ্য রেখেছিলেন, কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্যে তেমন একটা জোর দেননি।

একই চিন্তাধারা

রবি ঠাকুর গরীবের দুঃখে দুঃখী এক ভগবানের স্বপ্ন দেখেন। তাঁর কবিত্ব আর সৌন্দর্যের স্বপ্ন গান্ধীজীর মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি। মহাত্মাজী পার্থিব সমস্যায় রাজনৈতিক ব্যাপারে আর দৈনন্দিন ঘটনাবলী নিয়েই নিজেকে কবির চেয়ে বেশী চিন্তিত রেখেছিলেন।

দুজনেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে যদি অন্য লোক কেউ তাঁদের কথা না শোনে তাহলে তাঁরা একলাই তাঁদের উদ্দেশ্যর পথে এগিয়ে চলবেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।'—তারা দুজনই জীবন-যাত্রার পথ স্থির করে নিয়েছিলেন, সে পথ সমান্তরাল হলেও একটার সঙ্গে আর একটার মাঝে মাঝে যোগাযোগ ছিল।

রবি ঠাকুরের চেয়ে গান্ধীজী ধর্মের প্রচার বেশি করেছিলেন। গান্ধীজী প্রধানত সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি বাস্তবের কর্মী রবি ঠাকুরের মত, তাঁর মন কল্পনা রাজ্যে বিরাজ করত না কিন্তু তাঁর সমাজ মঙ্গলের প্রেরণার জন্যই গান্ধীজী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—সত্য আর অহিংসার দুটি প্রদীপ গান্ধীজী তাঁর নিজের সারা জীবনে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন আর তাঁর অন্তরাত্মা যা বলত তিনি তাতে অটুটভাবে বিশ্বাস করতেন।

রবি ঠাকুর কখনও গান্ধীজীর মতন অন্তরাত্মার ডাক শুনেছেন বলে বলেন নি, তবে তাঁর একটা অসাধারণ চিন্তাধারা তাঁকে জীবনে যেন নির্দেশ দিত। এই দুজনের অপূর্ব এবং মহান অবদান পৃথিবীতে এবং প্রধানভাবে ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী।

শ্রমিকের কথা

শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আমি মার্কসবাদী, ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরূপে শ্রমিক ইউনিয়নের কাজেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে মার্কসবাদী দলগুলি যেভাবে কাজ করে তাতে আমি দুঃখ বোধ করি। এইসব দলের নেতারা শ্রমিক দরদী সেজে ও শ্রমিক কল্যাণের নামে শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন; কিন্তু পার্টি স্বার্থকে উঁচুতে তুলে ধরতে যেয়ে শ্রমিকদের স্বার্থকে পদদলিত করতে কুণ্ঠিত হন না। যেখানে কোন একটি দল একটি ইউনিয়ন করেছে, সেখানে আর একটি দল একটি পাল্টা ইউনিয়ন করার জন্য ব্যস্ত হয় কেন? দুটি দলই হয়তো মার্কসবাদী, দুটি দলই শ্রমিক আন্দোলনের অংশীদার, দুটি দলই শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন আনতে চায়,—তবু একই সংস্থায় তারা পরস্পর-বিরোধী ইউনিয়ন গড়ে তোলে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এমন কি তুমুল সঙ্ঘর্ষও বাধে। একই সংস্থায় মার্কসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত ইউনিয়নগুলির মধ্যে চাপা বিদ্বেষ ও ক্ষোভ সব সময়ই থাকে—শ্রমিকদের মূল লড়াই, মালিক বা বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই তাতে খর্ব হয়। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, শ্রমিকরা সমস্বার্থে আবদ্ধ থাকে ও তাদের একই শ্রেণী-চরিত্রের জন্য তারা একই রকম দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারীও হয়—মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তারা জোটবদ্ধও হয়। তারা বোঝে যে মালিক তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই শ্রমিকদের কাজে নেয়, মজুরী দেয়; মালিকের লাভের অঙ্কের অনুপাতের সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরির কোন সামঞ্জস্য নেই; বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত শিল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শ্রমিক-শোষণের করুণ ইতিহাসের রেশ ছড়িয়ে আছে। তারা জানে যে লড়াই ছাড়া এ শোষণের প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়, সামান্য ন্যায্য দাবী আদায় করতে গেলেও লড়াই চাই। শ্রমিকের আন্দোলন তথা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োগের গতি যদি মালিকের বিরুদ্ধে যায় তাহলে শ্রমিকরা লাভবান হয়, বিপ্লবের জন্য মানসিক প্রস্তুতিও তাদের ঘটে; কিন্তু যদি তাদের সংগ্রামী চেতনা ও উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থেকে যায় দুটি বিরোধী ইউনিয়নের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে তবে লাভ হয় একমাত্র মালিকের—অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে সে হাসে।

মার্কসবাদী প্রত্যয়মতে ইতিহাসের প্রবাহ বয়ে চলে সমাজের অন্তঃশায়ী শক্তিদের ঘাত-প্রতিঘাতের টানা পোড়েনে। অর্থাৎ ইতিহাসের গতিশক্তি আহৃত হয় ইতিহাসেরই ভিতর থেকে। বাহির থেকে কোনো দেবতা বা নেতা নিজের খুশিমতো ইতিহাসকে চালাতে পারেন না। ইতিহাস সৃষ্টি করে নেতাকে; নেতা স্বয়ম্ভু নন, তাঁর খুশির ইচ্ছায় ইতিহাসের পাতাকে রঙীন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। বস্তুজগতের স্বভাবই হল পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুনকে গড়ে তোলা এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ লালিত পালিত হয়, তারই নিজস্ব দেহরস দ্বারা। তাই যদি মার্কসবাদীরা মনে করে যে, ভারতের বস্তুগত অবস্থা বা শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিতর থেকে তাদের সংগ্রামের শক্তি জন্ম নেয় না, তা জন্ম নেয় মার্কসবাদী নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে বা শিরশ্চালনের মধ্য দিয়ে বা কেতাবী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল বা মার্কসবাদী প্রত্যয় থেকে বিচ্যুতি। মার্কসবাদীরা যদি মনে করে যে তারাই ভারতের মুক্তির দূত ও দেবতা তবে মার্কসবাদকেই তারা এবম্বিধ ধারণার দ্বারা কলুষিত করবে।

❧

কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কী দেখেছি? কমিউনিস্ট পার্টি ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন চালাত (এখনও চালায়)। ট্রামের শ্রমিকরা যখনই কোনো সংগ্রামে জয়লাভ করেছে তখনই সেই বিজয় উপলক্ষে শ্রমিক সভা ডাকা হয়েছে। সে সভায় বলা হয়েছে এই কথা যে কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের পার্টি, এই পার্টি আপনাদের জন্য লড়াই করে, তাই এই পার্টিকে বড় করা দরকার, আর সেজন্য এই পার্টিকে পয়সা দেওয়া শ্রমিকদের কর্তব্য। তাই প্রতিটি ট্রাম শ্রমিকের কাছে মাহিনার দিনে পার্টিফাণ্ডে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত চাঁদা চাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সেই টাকা কোথায় যায়, কীভাবে ব্যয়িত হয় আমরা জানি না; তবে শ্রমিকরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থাকে। তার চেয়েও বড়কথা এই যে, শ্রমিকদের সংহতশক্তির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তাদের এই যে শেখানো হচ্ছে যে বাইরের কিছু নেতা বা দলের ওপরই তাদের নির্ভরশীল থাকা উচিত—এ কি মার্কসবাদসিদ্ধ কাজ? একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একাধিক মার্কসবাদী দল যে নানা বিরোধী ইউনিয়ন গড়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার আসল কারণও এইখানে। কারণ ইউনিয়ন পার্টির ফাণ্ডকে পুষ্ট করে, নেতাদের জলুস জমায়েতে দলে দলে শ্রমিক নিয়ে যেয়ে সমাজে নেতাদের মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে দেয়। ইউনিয়নগুলি তাই শ্রমিক-শ্রেণীর লড়াইয়ের হাতিয়ার না হয়ে, হয়ে পড়েছে নেতাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহন।

—যুগবাণী

কবিগান—বাংলা কাব্যের এক বিস্মৃত অধ্যায়

শ্রীবিজন সরকার

শেক্সপীয়রের কোন কোন নাটকে দেখা যায়—যে দৃশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে, ঠিক তার আগের দৃশ্যটি নিতান্ত হাল্কা, লঘুসুরের। নাটকের দিক থেকে তা হয়ত তত প্রয়োজনীয় মনে হয় না, কিন্তু পরের দৃশ্যের গাম্ভীর্যটুকু স্পষ্ট করে তুলতে তার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে।

এই কথাটাই মনে পড়ে যায়,—যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী এবং ঠিক তার অব্যবহিত-পূর্ব যুগের পর্যালোচনা করি। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়। এর পূর্ববর্তী যুগ—কবিগানের যুগ—বলা যেতে পারে অন্ধকারের যুগ। তাই মনে হয়—এ যেন কারুর সচেতন সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোটিকু উজ্জ্বল করে তুলতে—এই অন্ধকারের অবতারণা।

১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই একশো বছরকেই সাধারণভাবে 'কবিগানের যুগ' বলে ধরা হয়। অবশ্য সূক্ষ্মবিচারে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের আগেও যেমন কবিগানের অস্তিত্ব ছিল, ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের পরেও তার ক্ষীণধারা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। যাই হোক্ শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালাদের আবির্ভাব ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

কবিগান সৃষ্টির একটি প্রধান উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই কার্যকরী ছিল। সেটি হল কিছুটা আমোদের সৃষ্টি। সান্ধ্য আসরে বসে খানিকটা হল্লা করে গান গেয়ে সারাদিনের কাজে পরিশ্রান্ত, রুচির বালাই নেই—এইরকম একদল লোককে পরিতৃপ্ত করা—এই হলেই কবিওয়ালাদের কাজ মিটে যেত। মহৎ কোন কাব্যসৃষ্টির আশা তাদের কোনদিনই ছিল না।

সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা যখন এই, তখন তা যে উচ্চদরের কোন [illegible] পারে না, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই, বৈষ্ণব কাব্য, শাক্তপদাবলী—এদের সঙ্গে কবিগানের তুলনা কখনই করা চলে না। কিন্তু এইটুকুই কবিগানের শেষ কথা নয়। কবিগানের যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হল, সেই উদ্দেশ্যের পরিতৃপ্তি সাধনেই যদি তা সীমাবদ্ধ থাকত—তা হলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার সম্বন্ধে আলোচনার কোন অবকাশ থাকত না।

কাব্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের মুখ চেয়ে রচিত হলেও তা উদ্দেশ্যকে অনেক সময় অতিক্রম করে যায়। সেই কাব্যকে অবলম্বন করে ঘটে কবির মানস উন্মোচন কখনো বা যুগের সার্থক রূপায়ণ। কবিগান সম্বন্ধে এই কথাই বলা চলে।

কবিগান কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গানের সমষ্টি। কোন একটি কাহিনীর সূত্রে তারা বিধৃত নয়। তবে কতকগুলি পর্যায় আছে—যেমন ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ বিরহ ও খেউড় প্রভৃতি। এই পর্যায়গুলি অবলম্বন করে কবিয়ালারা গান রচনা করেছেন।

কবিগানের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা রাধা এবং তার সখীরা। সখীরা এখানে গৌণ চরিত্র নয়। রাধার সঙ্গে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সখীহীন রাধার অস্তিত্ব কবিগানে বেশি নেই। সখীদের এই প্রাধান্যটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখি, তাদেরই নামে কবিগানের একটি পর্যায় চিহ্নিত হয়েছে 'সখী সংবাদ' নামে। কবিগানের নায়িকা নামে রাধা হলেও সে বৈষ্ণব কবির তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে গড়া তিলোত্তমা সুন্দরী শ্রীরাধিকা নয়। প্রৌঢ়া পরিণতা রসবিদগ্ধাও নয়। এ রাধা একান্তই সাধারণ—কিছুটা বা গ্রাম্যও। যার সম্বল শুধু হাহাকার, চোখের জল আর অভিমান। কবিওয়ালারা সেই হাহাকার আর চোখের জলকেই গানে গানে অমর করে রেখেছেন।

কবিগানে শ্রীকৃষ্ণ তথা নায়কের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি খুব বেশি নেই। যা আছে তা যেন নায়িকারই মনোবেদনাটুকুকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে। যেমন—

প্রাণনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করে
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো আজু প্রভাতে।
—রাসু-নৃসিংহ

অথবা

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেক না।
কত নারীর সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁও না।।
—রাসু নৃসিংহ

বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ একটি সক্রিয় চরিত্র। যদিও সেখানে রাধার সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনাই প্রধান, তবু শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেননি বৈষ্ণব পদকর্তারা। বিশেষ করে রাধার রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চোখ দিয়েই রাধার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন।

কিন্তু কবিগান এর ব্যতিক্রম। কবিওয়ালারা তাঁদের নায়িকার অন্তরের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করতেই ব্যস্ত—তার বাইরের সৌন্দর্যের ছবি আঁকবার অবকাশ তাঁদের নেই। সেটুকু আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এই রূপ অসচেতনতা নিঃসন্দেহে তাঁদের একটি মারাত্মক ত্রুটি। এবং এ ত্রুটি নিঃসন্দেহে তাঁদের কাব্য দেহে অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করেছে।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও, একথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সেকালে কবিগান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এখন প্রশ্ন, কোন্ গুণে কবিওয়ালারা

জনসাধারণের মন ভুলিয়েছিলেন? কি তাঁদের উপকরণ?

প্রসঙ্গত, বিখ্যাত কয়েকজন কবিওয়ালার গানের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে—

একে আমার এ যৌবনকাল
তাতে কাল বসন্ত এল।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না॥
—রাম বসু

আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম।
শ্যামেরো পীরিতো গরল মিশ্রিতো
কারো মুখে যদি শুনিতেম॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষো ভকিতেম॥
—হরু ঠাকুর

পীরিতি নগরে বিষমো সখি
মনো চোরেরো ভয়।
বসতি ইহার দায়॥
নয়নে নয়নে সন্ধানো মন
অমনি হরিয়ে লয়॥
—নিতাই

প্রথম গানটি রাম বসুর। বসন্তের আবির্ভাবে আসঙ্গলিপ্সু বিরহিণী নারীর আর্তিটি কয়েক ছত্রে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। কেউ কেউ এতে হয়ত অশ্লীলতার গন্ধ পাবেন। কিন্তু অশ্লীলতার প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে দিয়ে যদি একবার ভেতরে প্রবেশ করি,—তাহলে কি চোখে পড়ে? প্রিয়-বিচ্ছেদকাতরা শাশ্বত নারী-হৃদয়ের নিরাবরণ নিরাভরণ ব্যথা-করুণ মূর্তিটিই কি ভেসে ওঠে না? এই বেদনা নিঃসন্দেহে আধুনিক কবিতার বিষয়। তফাৎ শুধু প্রকাশভঙ্গীতে। কবিগানের কবি যে বেদনাকে সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বাণিবদ্ধ করেছেন,—সেই বেদনাকেই একালের কবি প্রকাশ করবেন রেখে, ঢেকে—কৌশল করে।

এই সরলতাই কবিগানের সাধারণ ঐশ্বর্য। আর কিছু থাক বা না থাক—এ ঐশ্বর্যের অভাব কবিওয়ালাদের কারুরই ছিল না।

কাজেই,—একথা বিশ্বাস করা ভুল হবে না যে,—কবিগান কবিওয়ালাদের সহজ অনুভবেরই সাবলীল প্রকাশ। অন্তর দিয়ে তাঁরা যা-কিছু উপলব্ধি করেছেন—তাই দিয়েই নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। এ নৈবেদ্য তাঁদের প্রতিভার দৈন্য সূচিত করতে পারে—কিন্তু কোথাও আন্তরিকতার অভাব সূচিত করে না। হরু ঠাকুর-এর 'আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম' বা নিতাই এর 'পীরিতি নগরে'—এ সবই তাঁদের নিজস্ব অনুভূতির কথা। কখনো প্রকাশিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের জবানীতে কখনো বা সরাসরি।

কিন্তু ভাব মাত্রই কাব্য নয়। ভাব কাব্যের একটি মৌল উপাদান মাত্র। সেই ভাবকে কাব্য করে তুলতে সেইখানেই কবির অগ্নি পরীক্ষা। এদিক থেকে বিচার করলে বৈষ্ণব কবিতা উৎকর্ষের চরম সীমা স্পর্শ করেছে। ভাবের পারিপাট্য, শব্দ বিন্যাস, ছন্দ পরিকল্পনা সবক্ষেত্রে কবির পরিমিতিবোধ তাকে সুনিয়মিত করেছে।

এই বিষয়টির অভাব পুরোমাত্রায় ঘটেছে কবিওয়ালাদের বেলায়। কোথাও দেখি, রস একটু ঘনীভূত এসেছে—হঠাৎ কোথা থেকে কিছু অকাবিক উপাদান ঝড়ের হাওয়ার মত এসে সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে। কোথাও আবার দেখি, তন্ময় হয়ে কবি অলঙ্কারের পর অলঙ্কার সাজিয়ে চলেছেন,—কাব্যের চঞ্চল বিহঙ্গী যে পলাতকা, সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই।

এসব সত্ত্বেও, উপসংহারে বলব, কবিগানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রথম শ্রেণীর কাব্য হিসেবে না হোক্—অন্তর্মুখীনতার জন্যে, সহজ জীবনাবেদনের জন্যে, সর্বোপরি আধুনিকতার অঙ্কুরটির ধারক হিসেবে তার একটা বিশেষ মূল্য আছেই। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'খাঁটি বাঙ্গালা কথায় খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব তো খুঁজিয়া পাই না।' কবিগান সেই খাঁটি বাংলা কথায় মুখর, খাঁটি বাঙালীর মনের ভাবের যথাযথ প্রতিচ্ছবি—তৎকালীন 'বাংলা দেশের জাতীয় সাহিত্য।'

জিজ্ঞাসা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বের পুঞ্জীত বেদনা, অব্যক্ত ক্রন্দন
সে কি থামিবে না দিন?
ছিন্ন করি দিবে নাকো অভিশাপ ভরা
রজনীর মসীময় কালো অন্ধকার?
ধরণীর বুকফাটা দুঃসহ দহন
থামিবে না কভু?

অবিরাম নিষ্পেষিত করুণ বিলাপ
পাবে নাকো সাড়া?
দুর্লঙ্ঘ্য বাধার পাহাড় করি অতিক্রম
কোনদিন পাইবে না পথ?
আকাঙ্ক্ষিত অপেক্ষায় কেটে যাবে প্রাণ
সৃজনের অন্তরে তুলি
নৈরাশ্যের গভীর হাহাকার?

জাহানারার অভিশপ্ত প্রেম

দেবব্রত ভট্টাচার্য

মোগল সম্রাট শাজাহান-দুহিতা জাহানারার নাম কে না জানে ? হ্যাঁ, জানে সবাই। স্বীকার করি। কিন্তু অনেকের জানার মধ্যেই হয়ত একটু ভুল আছে। সে ভুলটা হল এই যে, আমরা অধিকাংশই জানি, শাজাহানের দুই মেয়ে। জাহানারা আর রৌশন্আরা। কিন্তু তা নয়। কারণ শাজাহান হলেন পঞ্চ কন্যার পিতা এবং পাঁচটি মেয়ের নাম হল যথাক্রমে, আনুজুমন্আরা, গ্যাইতিআরা, জাহান্আরা, রৌশন-আরা ও দহর্আরা। এই শেষ কন্যা-সন্তানটি ভূমিষ্ট হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই, বিশ্ববিশ্রুত রূপরাজ্যের রাণী মমতাজ-মহল তাঁর স্বামীর চরণে শেষ প্রণতি জানিয়ে তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়েন।

সম্রাট তাই তাঁর প্রাণের অধিক প্রিয়-তমা ঐ মৃত পত্নীর কবরের মাটিতে গড়ে তুললেন সারা বিশ্বের বিস্ময় ঐ তাজমহল ; শিল্প ও সৌন্দর্যের এক অবিনশ্বর কীর্তি ; যা আজো মাথা উঁচু করে স্থির ও অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের তাণ্ডবলীলাকে অগ্রাহ্য করে ; আর সে শুধু একটি কথাই যুগ-যুগান্তরের মানুষের কাছে অহরহ শুনিয়ে যাচ্ছে,---'সম্রাটের অনিমেষ ভালোবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।'

যথার্থই তাই। আমরাও না বলে পারি না,---

"প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর !"

এবারে তাহলে বলি, মমতাজের বড় আদরের মেয়ে এই জাহানারা ; যার অভিশপ্ত প্রেম-জীবনের এক করুণ কাহিনী বলতে চলেছি। যে কাহিনী ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় পড়লে আজও আমাদের চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু তার আগে একটু বলা প্রয়োজন যে, জাহানারা ও রৌশনআরা, এই দুই বোনের পরিচয়ই ইতিহাসে আমরা বিশদভাবে পেয়ে থাকি, আর অন্য বোনেদের কথা তেমন জানা যায় নি।

এ ছাড়া আরো একটা কথা। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, পার্শী বা পৃথিবীর যে-কোন জাতের মানুষই হোক না কেন, তারই চোখে জাহানারা নিশ্চয় রূপে-গুণে অতুলনীয়া এক মোগল নারী। তার মত মেয়েকে গর্ভে ধারণ করার জন্যেই আমরা মমতাজকে অবশ্যই বলতে পারি রত্নগর্ভা।

হয়ত আমার এ কথায় অনেক ইতিহাস-পাঠকেরই আপত্তি থাকতে পারে। যদি তা থাকে, থাকুক। ক্ষতি নেই। তথাপি একথা জোরের সঙ্গেই বলব, জাহানারার চরিত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কোন ঐতিহাসিকের হাতে কোনদিনও ম্লান হবে না, কারণ সে এক অমূল্য ধাতু দিয়ে গড়া।

তা যদি নাই-ই হবে, তাহলে জাহানারা সর্বস্বপ-ত্যাগিনী, আদর্শ-ময়ী, সেবাপরায়ণা ও পিতৃভক্তির এক জলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে মোগল ইতিহাসের পাতায়, কবির কাব্যে ও নাটকে বেঁচে থাকত না। জাহানারা, সত্যিই জাহান্আরা। চির-কালের জাহান্আরা। সুতরাং এই জাহান্আরার পাশে যখন আমরা তার বোন রৌশনআরাকে দেখি, তখন আমরা কিছুতেই না ভেবে পারি না যে ঐ বিষকন্যার জন্ম কি করে হল সম্রাজ্ঞী মমতাজের গর্ভে ?

দুই বোনের চরিত্র একেবারে বিপরীত, ইংরেজিতে যাকে বলে 'পোলার অপোজিট,' জাহানারা হল মানবী আকারে দেবী, আর রৌশনআরা হল পিশাচী। তাই দারা-শিকোর দিকে জাহানারা, ও ক্রুর ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে রৌশন্আরা।

কিন্তু হায় ! যে জাহানারা মমতাজের প্রাণের দুলাল ও শাহাজানের চোখের মণি তারই জীবনযৌবন যে চিরকালের মত অভিশাপগ্রস্ত হবে---তা কি সে নিজে কোনদিন ভেবেছিল, না আর কেউ ভাবতে পেরেছিল ?

না ; শকুন্তলাও ভাবে নি দুর্বাসার অভিশাপের কথা। কিন্তু শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার যে অভিশাপ তা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ; কিন্তু জাহা-নারার প্রেম জীবনের প্রতি স্বয়ং তার পিতা শাজাহানের যে অভিশাপ তা একদিকে যেমন নিয়তির নির্মম কৌতুক বলে বোধ হয়, অপর দিকে তেমনি শাজাহান চরিত্রেরও তার পৈশাচিক বা অমানুষিক প্রবৃত্তির এক ভয়ানক নজির। যে ঘটনা শুনলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, চোখের মণি স্থির হয়ে যায়, প্রাণ ডুকরে কেঁদে ওঠে, শাজাহান তাই হাসিমুখে ঘটিয়েছেন ! জাহানারার চোখের সামনে। কি সে এমন ঘটনা তাই এখন দেখা যাক্।

●

যে সময়ের ঘটনা বলছি তখন জাহানারা অসামান্য সুন্দরী এক যুবতী। জীবনে তার কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত কামনা, কত বাসনা। বাইরের জগৎটা তখন তার রঙিন মনের সোনালী রঙে আঁকা। কত কথাই না ভাবে, কত স্বপ্নই না দেখে। কখনো তার সুখের কল্পলোকে আনমনা হয়ে ঘুরে বেড়ায় ; আবার হয়ত কখনো ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথে।

তার এ ভাব দেখে অনেকেই অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু অন্তঃপুরের বা হারেমের কোন বেগম বা অন্য কোন মোগল নারীর বুকের পাটা নেই যে, বেগমসাহেবকে কিছু

জিজ্ঞেস করে। জাহানারাকে সকলেই 'বেগমসাহেব' বলে ডাকত। তবে মুখে কেউ কিছু না বললেও মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসা-হাসি আরম্ভ করল। মেয়েদের যা প্রবৃত্তি তা থেকে তারা নিজেদেরকে সরিয়ে রাখবে কেন? কিন্তু তাদের গোপন হাসির কারণ কি?

কারণ হল, তারা সবাই জেনে গেছে যে বেগমসাহেব একজনকে ভালবাসে। অন্তঃপুরবাসিনী যুবতী জাহানারার জীবনে প্রেমের উদয় হবে তা কি কারো প্রাণে সহ্য হয়? না, কিছুতেই হয় না। কারণ, যে নারী তার পবিত্রতা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে কিংবা যে দ্বি-চারিণী অর্থাৎ, স্বামীর ভালবাসা পুড়িয়ে দিয়ে, দাম্পত্য-জীবনের পবিত্র প্রেমকে পদদলিত করে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে বেঁচে থাকতে চায়, তার চোখে বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি একেবারেই অসহ্যকর, কিংবা বেদনাদায়ক। সুতরাং হারেমের বেগমরা কি করে সহ্য করবে জাহানারার প্রেম?

তাই জাহানারার এই গোপন প্রেমের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হতে খুব বেশী দেরী হল না। প্রথমে হয়ত সম্রাট এটা ঠিক বিশ্বাস করতে চান নি। কারণ মেয়েদের অন্দরমহল, ইংরিজিতে যাকে বলে 'সর‍্যাল্গ্লিয়ো,' সেখানে সর্বদাই কড়া পাহারা। কোন একজন পুরুষেরও সেখানে প্রবেশ সম্ভব নয়, অবশ্য সম্রাট ছাড়া। সুতরাং তাঁর কন্যার অন্তঃপুরে কিভাবে এক অতি সাধারণ স্তরের যুবকের প্রবেশাধিকার হতে পারে?

কিন্তু দিল্লীশ্বরের উর্বর মস্তিষ্কে এ ধারণা কিছুতেই হল না যে, দু'টি প্রাণের ভালবাসা, যদি তা সত্যিকারের ভালবাসা হয়, তাহলে তার নিভৃত মিলনের পথে কোন প্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা বোধহয় দেবতার পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু যা রোধ করা ভগবানের সাধ্য নয়, সম্রাট শাজাহান সে অসাধ্য-সাধন করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

তাই একদিন অকস্মাৎ এক জল্লাদকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন মেয়ের ঘরে, বেশ হাসিমুখে। সম্রাট যে এভাবে আসতে পারেন তা সে স্বপ্নেতেও ধারণা করতে পারে নি।

বাবাকে দেখে জাহানারার মুখ শুকিয়ে যায়। সারা দেহটা ঘেমে উঠল। কারণ তার ভালবাসার লোকটি যে তখন তারই ঘরে। দু'জনে মনের সুখে কত গল্পই না করছিল। দুজন দুজনের মধ্যে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছিল। তারা তখন অন্য এক জগতের মানুষ।

কিন্তু এমন ভাবে যে 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' হবে তা তো তারা ভাবে নি। জাহানারা ঐ বজ্রাহত অবস্থায় তার গোপন মনের মানুষটিকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখল একটা বিরাট 'কল্ড্রন্' অর্থাৎ কটাহবিশেষের মধ্যে; যাতে করে চান করার জল গরম হয়। যুবক তারই মধ্যে বসে রইল প্রাণের দায়ে।

শাহাজাহান সব কিছু বুঝতে পেরেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে মেয়েকে আদর করে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপর মেয়ের বাঁ হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বললেন,—'এ কি মা? তোমার গায়ের চামড়া কিরকম খস্-খসে বোধ হচ্ছে। বোধহয় ক'দিন ভাল করে স্নান করা হয় নি, তাই না?'

জাহানারা তখনো বুঝতে পারে নি যে এ প্রশ্ন তার স্নেহময় পিতার নয়, বরং শয়তানের। তাই সে সরলভাবেই বলল,—'না বাবা, স্নান আমি রোজ খুব ভাল করেই করি।'

বললে হবে কি, তিনি মেয়ের এ কথা বিশ্বাস করবেন কেন? যেহেতু তিনি এসেছেন তাঁর মেয়েকে আজ আর একজনের রক্তে স্নান করাতে।

তাই তার এ কথা না শুনে জল্লাদকে হুকুম দেন কল্ড্রনের তলে আগুন জ্বালতে। হুকুমমত জল্লাদ কল্ড্রনের মুখ আটকে দিয়ে আগুন জ্বালাল। জাহানারার বুকের ভেতরটায় যে কি হল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জবাই-করা মুরগীর মত তার অবস্থা কল্পনা করে নিতে হবে।

কিন্তু মুখে একটু শব্দ করার ক্ষমতাও তার হলো না। নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল ঐ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার পানে। আমরা যেমন ঠায় চেয়ে থাকি প্রিয়জনের সৎকারের সময় রাক্ষুসী চিতার লক্লকে আগুনের দিকে। আমরা ভেবে পাই না, এই কি সেই সম্রাট শাজাহান! যাকে ইতিহাস বলে শিল্প ও সৌন্দর্যের একক পূজারী।

হাঁ তিনিই। যিনি অতিশয় নির্বিকার চিত্তে প্রায় আধঘণ্টা ধরে ঐ মর্মান্তিক দৃশ্যের অভিনয় শেষ করে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

জাহানারা বোধহয় মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় শুধু এইটুকুই বলেছিল—পিতা, তোমার এ কি অভিশাপ!

এ ছাড়া সে আর কি বলবে?

কিন্তু জাহানারার এই ভয়ানক ট্র্যাজেডির সংবাদে তারা আনন্দে উৎফুল্ল, যারা তার সর্বনাশ চেয়েছিল। কিন্তু বেগমসাহেবকে যারা সত্যিই ভালবাসত তারা সম্রাটের এই নৃশংসতার পরিচয় পেয়ে মনে মনে শিউরে ওঠে। ওরা শিউরে উঠলেও শাজাহানের মনে একটুও দাগ কাটল না। তবে আমরা বলব, জাহানারা, তুমি ধন্য। তোমার ধৈর্য দেখবার মত। সত্যিই তাই। ধীর, স্থির, শান্তভাবেই নিজেকে চালিয়ে যেতে লাগল সে। বাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে নি কারো কাছে। আত্মহত্যার পথও খুঁজতে যায়নি। দিনের পর দিন কাটিয়ে যেতে থাকে একইভাবে।

কেটে গেল বেশ কিছুদিন। তারপর আবার একদিন আর একজনকে খুঁজে পেল নতুন মনের মানুষ হিসেবে। নিঃসঙ্গ জীবনের দোসর হিসেবে। এবারকার এ মানুষটি অজ্ঞাতকুলশীল না হলেও মর্যাদাসম্পন্ন নয়। যেহেতু সে হল বেগমমহলের একজন 'খানসামা' মাত্র। কিন্তু পারস্যের এক সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান এবং দেখতে অতি চমৎকার—এককথায় সুপুরুষ। জ্ঞান-বুদ্ধিও প্রখর। তাই রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও

অতি প্রিয়পাত্র। সম্রাটও তাকে ভাল চোখেই দেখেন। নামটিও বেশ, নাজিরকন্।

এরই সঙ্গে জাহানারার মনের আদান-প্রদান ঘটল। এবারে কিন্তু সে খুব সতর্ক। তবে আমাদের কথায় আছে, হাজার সতর্ক হলেও এ জিনিষ চাপা থাকে না। তাই ক্রমশ প্রকাশ পেতে লাগল। রাজদরবারের অনেকেই ঐ গোপন ইতিহাসের পাতা নেপথ্যে উল্টে ফেললেন। বেগমমহলে হাসির ফোয়ারা ছুটল, টীকা-টিপ্পনি সহ।

তবে একটা কথা। রাজদরবারের অনেক পদমর্যদাশীল কর্মচারীই নাজিরকনের সঙ্গে বেগমসাহেবের মিলন ঘটুক তা একরকম চেয়েছিলেন। কারণ প্রথমত, যখন উভয়ে উভয়কেই আন্তরিক ভালবাসে এবং দ্বিতীয়ত, নাজিরকন্ কাজে ছোট হলেও জাতে ছোট নয়। সুতরাং বিবাহের পর সম্রাট নিশ্চয় তাকে কোন এক উচ্চপদেই রাখবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? অর্থাৎ, সম্রাটের সামনে যাবে কে এই প্রস্তাব নিয়ে। যে যাবে তার বুকের রীতিমত পাটা থাকা চাই। বুকে বল নিয়ে এগিয়ে এলেন সম্রাটের দূর-সম্পর্কের এক ভাই শায়েস্তা খাঁন। জাহানারাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তাই তার মুখ চেয়ে গেলেন সম্রাটের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করতে। নানারকমের ভূমিকা করে শেষ পর্যন্ত আসল কথা পাড়লেন।

সম্রাট হাস্যবদনে বললেন, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

শায়েস্তা খাঁন ভাবলেন যাক্ আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু মূর্খ খাঁন বুঝলেন না যে সম্রাট হাসিমুখে বলেছেন---'দেখা যাবে', কিন্তু কি করে কি দেখবেন তা বলেন নি। বলার দরকার নেই। বাদ্‌শা যা দেখাবেন আমরা তাই দেখার জন্যে প্রস্তুত হই। তবে জাহানারা এবং নাজিরকন্, দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা। যেহেতু আর কোন বাধা নেই তাদের মিলনের পথে।

জাহানারা ভাবল, বাবা সত্যিই তাকে ভালবাসেন, তাই এই উপযুক্ত পাত্রের হাতে তাকে দিতে সম্মত হয়েছেন। এতদিনে তার প্রেম-জীবনের অভিশাপ বুঝি কেটে গেল। নাজিরকনের গলায় মালা দিয়ে সে তার প্রেমকে চিরকালের মত জয়যুক্ত করবে। সুতরাং তার মত সৌভাগ্যবতী আর কি কোন মোগল নারী রাজঅন্তঃপুরে আছে? না;—সত্যিই আর কেউ নেই।

আর ওদিকে নাজিরকন্ ভাবল, যে তার মত সৌভাগ্যবান্ পুরুষ মোগল রাজ-দরবারে আর কি কেউ আছে? না;—সত্যিই আর কেউ নেই। দিল্লীশ্বরের সব চাইতে আদরের কন্যার পাণিগ্রহণ করার চাইতে আর কি সৌভাগ্য হতে পারে?

কিন্তু অন্তরীক্ষে কে যেন বলে ওঠল,—হায় রে! কপোত কপোতী---। বাকীটা আর শোনা গেল না। আবার রাতের অন্ধকারে যুবক যেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, সুন্দর এক নারী মূর্তি; তার শুভ্র বেশ, রুক্ষ কেশ। হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল—আয় রে, তুই আমার কোলে আ-য়-য়।

চম্‌কে উঠে যুবক প্রশ্ন করল, তুমি কে?

অট্টহাসি হেসে সে বলল,—'আমি নিয়তি।'

হোল এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন, ভাবী-জামাতার সম্মানার্থে। রাজদরবারের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে যোগদান করলেন। তাঁরা সবাই খুব খুসি, কারণ নাজিরকনের মত সৎ পাত্রের হাতে পড়বেন বেগমসাহেব। তাঁরা কায়মনোবাক্যে এটা চেয়েছিলেন।

আবার শায়েস্তা খাঁনের আনন্দ আরো বেশী। কারণ তিনি ছাড়া এ বিবাহের প্রস্তাব স্বয়ং সম্রাটের কাছে আর কেউ পেশ করতে পারত কি না সন্দেহ। অতএব শুভ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর ঘটক-বিদায়টা নিশ্চয় খুব ভালরকম হবে বলেই আশা রাখেন। কিন্তু এ সভার আয়োজন যার জন্যে, তার আর আনন্দের সীমা নেই। সম্রাট নিজে তাকে খাতির করে নিয়ে এসে উপযুক্ত স্থানে বসিয়েছেন। দিল্লীশ্বরের ভাবী-জামাই বলে কথা। কত রকমের খাবার দাবার। গোস্ত, পোলাও, কোর্মা, কাবাব, বিরিয়ানী, তস্‌মর ইত্যাদি আরো কতরকমের বাদ্‌শাহী খানার ফরমাইস্ তা বলাই বাহুল্য। সকলেই পরম তৃপ্তিসহকারে খেয়ে উঠলেন।

তারপর সম্রাট নিজের হাতে পান দিলেন ঐ খান্‌সামা নাজিরকনের হাতে। নাজিরকন্ একমুখ আহ্লাদের হাসি হেসে পান গালে দিয়ে, সম্রাটকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে পাল্কী করে রওনা দেয়। রাজদরবারের সবার মুখে ঐ এক কথা। কি ভাগ্যবান ঐ যুবক। কি শুভক্ষণেই না খানসামার চাকরীতে লেগেছিল। আমীর ওমরাহগণ ভাবলেন—ক'দিন পরেই ঐ খান্‌সামাকে সেলাম দিতে হবে। এই কথা ভাবতে ভাবতে যে যার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন, নিজ নিজ বেগম সাহেবাদেরকে এই শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্যে।

●

কিন্তু বাড়ী পোঁছল না শুধু নাজিরকন্। বাদ্‌শার দেওয়া বাদ্‌শাহী পান চিবোতে চিবোতে পাল্কীর মধ্যে ঘুমের ঘোরে এলিয়ে পড়ে জাহানারার সুন্দর মুখখানিই ভাবছে। কিন্তু ভাবতে ভাবতে কখন সে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই নিয়তির কোলে, তা সে নিজেও টের পায় নি। তখনো ঐ বিষাক্ত পান সুন্দর ঠোঁটদুটোকে টুক্‌টুকে লাল করে রেখেছে। কেবল চোখের মণিদুটো ঘোলাটে হয়ে ওপরে স্থির হয়ে আছে।

তখনো জাহানারা তার প্রাণের আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কল্পনায় বাসা বাঁধছে। নানা আভরণে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু আর কতক্ষণ?

খবর এল, নাজিরকন্ শেষ। ভেঙ্গে পড়ল তার 'প্রেমের দেউল।' তবু আমাদের জাহানারা তার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে রইল, চিরদিনের কুমারী হয়ে; ঐ নির্মম পিতার শেষ-জীবনের বন্দিশালার 'নন্দিনী' হয়ে।

কবিতাগুচ্ছ

আর একটু পেরুলেই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আর একটু পেরুলেই সন্ধে
কাজে মন দে
শেষ করাটা চাই
হচ্ছে, হবে—ভাই
কথাটা আজকের নয়
নিশ্চয়
তের্সু থেকে ব্যাসি
গলিব-গর্বোর হাসি
বা বিয়ের কনে শাদা...
আজকের দিনটা একটু আলাদা
আর একটু পেরুলেই সন্ধে
কাজে মন দে
শেষ করাটা চাই

তোমার ঘুমের পাশে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার ঘুমের পাশে আমার বিমূর্ত জাগরণ বসে থাকে
তোমার উড়ন্ত চুলে মিশে যায় আমার নিশ্বাস—
হাওয়া নেই, তবু কেন শব্দ আসে, চরাচর নিমেষে কাঁপিয়ে
বিমানের গুরু ধাবমান
শব্দ অকস্মাৎ এসে আমাকে শরীর দেয়—
তোমার ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরা বদলে দেয় রূপের আকার
সব কিছু বড় বেশি মোহময় মনে হয়
তোমার নিদ্রার সঙ্গে আমার বিমূর্ত জাগরণ খেলা করে।

ঝুপসি বটের মাথা ছাড়িয়ে, প্রান্তরময় গ্রাম বাংলায় সুপ্ত
নিশীথিনী অন্তরীক্ষ জুড়ে
বিমানের ধাতু-শব্দ, ঝিল্লি ঐকতার আর নদীর তরঙ্গে
তার ছায়া
পূর্ব গোলার্ধের যাত্রী সঙ্গিনীর কাঁধে রাখে ঘুমমাখা হাত
স্তনের বোঁটায় ঠিক তিনটি বা চারটে ফোঁটা ঘাম
ক্ষয় ক্ষমতার মত সময়ের তাপ কমে আসে—
আবহাওয়া মুর্গী যেন দিকবদলের জন্য ছটফটায়
গীর্জার চূড়োয়
তোমার শরীরখানি আর একবার পাশ ফেরে, কপালের চূর্ণ চুলে
আমার নিশ্বাস
স্বপ্নে কাঁপে ঠোঁট—

আমি জানি
তোমার স্বপ্নের সেই বিমানের আরোহিনী,
গ্রাম বাংলার বুক ছেড়ে উড়ে যায়
আমি জানি, তোমার ঘুমের পাশে আমার বিমূর্ত জাগরণ
[illegible] সমস্ত পায়।

একটি কবিতা

ওসিপ মেন্দেলস্তাম
(১৮৯২—১৯৪০)

জেনো, আমি আর সবার মতোই
সাধবো তোমার সুখ,
সকলের চেয়ে মনোবিনোদনে
ঈর্ষিত, উৎসুক।
আমার এ-তৃষা হিম নিশ্বাসে
নয় শুধু সংবৃত,
সে-অঙ্গীকার মৃত্যুরই মতো
ঘা-পূরণ অর্পিত।
ঈর্ষিত তাই নই, এ-তিয়াস
কী বিপুল জানো কি তা—
ঈর্ষিত সব প্রেমিকই, আমি যে
খুঁজি শহীদের চিতা!
'প্রিয়া' 'মধুমিতা' 'মনোবাঞ্ছিতা'
ডেকে নেই উৎসাহ,
আমার স্তিমিত রক্তে এখন
জ্বলে বর্বর দাহ।
কী দুর্ভাগ্য? একদা কখনো
দোঁহে হয়েছিলো দেখা,
সুখ এ-তো নয়, কেবল পীড়নই
সার, সে রয়েছে একা।
সে-ওষ্ঠাধর নরম, উষ্ণ
ছুঁয়েছে শীতের হিম—
যেন বা খুনের দৃশ্যের টানে
সে-ই ডাকে চিরদিন।
এসো, তুমি এসো, তোমার অভাবে
কাটে না নিমেষও আর
আজকের মতো কোনোদিন মন
করেনি তো অধিকার!
'কাঙ্ক্ষিত কী যে, আমার কাছে তা
স্বচ্ছদিনের মতো :
ছেড়েছি ঈর্ষা—তুমি এসো, ডাকি
দীন অনুনয়ে নত।

অনুবাদক : অরুণাচল বসু

ক্যামাক্ স্ট্রীট

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

তৃষ্ণার চুমুকে জল,
তবু পিপাসা মিটছে না।
স্কাইস্ক্র্যাপার আতঙ্ক,
নিচে অবসিত বিশাল রমণী।
হে পায়রাটুপার, রাজকুমার,
বাঁচাও, বাঁচাও।

কবিতাগুচ্ছ

সূর্যমুখীর জন্যে খেলনা পুতুল

বেলাল চৌধুরী

নির্জনতা থেকে মুক্তি দিতে তাকে উপড়ে এনেছিলুম
বুকের ভিতর রাখবো বলে সংগোপনে নিজের কাছাকাছি
সমস্তক্ষণ বুকের মধ্যে একী ভীষণ দাপাদাপি
সূর্যমুখী আমার সহ্য হয় না সহ্য হয় না

তোমার ঐ প্রচণ্ড তাপ বিষম প্রখর
বুকের ভিতর রক্ত ভাঙে দারুণ তোলপাড়
সমস্তদিন তোমার গন্ধে, গন্ধে আকুল
অন্ধকারে বুকের মধ্যে কেবল প্রবল কলরোল

সূর্যমুখী মুখটি তোলো চুমু খাবো, চুমু খাবো
সূর্য আমার
পাপড়ি মেলো ভেতরে যাবো, ভেতরে যাবো সূর্য আমার
অনেক গভীর অন্ধকারে অন্ধকারে অন্ধকারে
জ্বলবে তোমার মন চেতনা আমার পুড়বে সারা শরীর

সূর্যমুখী তুমি শুনবে অবিরল জীবনের প্রগাঢ় কোলাহল
আমি দেখব মৃত্তিকায় প্রোথিত অংকুরের উদ্দাম উল্লাস ও
বঙ্কিম চঞ্চল উন্মীলন

ভালবেসে

দেবারতি মিত্র

ভালোবেসে আজ আমি জীবন থেকে পলাতক।
তবুও কি যত রক্ত ওষ্ঠে ভেঙে পড়ে,
নিশ্বাসের স্রোতে ওঠে অনন্ত তুফান
চন্দ্রোপম তার সেই মুখচ্ছবির আকর্ষণে।

দেহের বন্দর থেকে
সহসা নোঙর ছিঁড়ে আত্মা ছুটে যায়।
কেন সে এমন করে বাইরে দাঁড়ায়,
পথে পথ ফেলে দেয় প্রতীক্ষার বীজ
তার শুধু চোখ থেকে.

কেন সে ভৎর্সনা করে,
কেন সে লালিত করে অব্যর্থ জীবন
লজ্জিত কুষ্ঠের মত, প্রসন্ন হৃদয়তলে,
স্বর্গ ও নরক—
আজ আমার কাছে ভিন্নমুখ সাপ।

আমাকে কে এমন করেছে।
ভালোবেসে আজ আমি জীবন থেকে পলাতক।

সহসা প্রবল ধ্বস

তুষার রায়

বিদেশী জার্নালে ছাপা রঙিন চিত্রপটে দেখি
বুনো ঘোড়াদের সঙ্গে চাঁদে রাত্রে গলে মিশে একাকার
পায়ের তলায় ডাঙা অস্ট্রেলীয় সিয়েনা প্রান্তর
অথচ সমস্ত রাত শুয়ে আছি মণিকার পাশে
যেমন গাধার সামনে গোলাপের মতো

অথচ মণিকা পাশে তবু যেন মণিকাবিহীন
সেই শুয়ে থাকা দেহটার দুটি মুখে দুজনেই
আহা কতো পাউডার পমেটম মাখিয়েছি ভেবে
সেপ্টির হেলমেটে ধাক্কা খেয়ে নীল মাছি হেন

বোয়িং-এর তীব্র ছুটে বাদ সাধে কাঁটাতার
শুধু টরে টক্কা শব্দ শোনা সাংবাদিক টেলিপ্রিন্টারে
নিষ্পাপ দোলাই সুখে চুইংগাম চিবনো
সহসা তিস্তার ব্রিজ ভেসে যায় স্রোতে আর

ভীষণ প্রবল ধ্বস-কার্সিয়াঙ অবরুদ্ধ হলো

উন্মোচন

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পাপ-পুণ্য কিছুই জানি না,
বেশ্যাপাড়া ছুঁয়ে রোদ চলে যায় গির্জায়, মন্দিরে।

সংসার-বিবাগী যাত্রী
দ্রুত সেরে নেয় দেখা আড়চোখে যাত্রিণীর বুক,
উচ্চণ্ড সন্ধ্যায়
বেশ্‌ইট রমণীর হাতের বাইবেল খোলা পড়ে থাকে হাতে,
বুকে নিয়ে সাধ্বীনারী
প্রাণপণে ভাবে কেউ রাস্তায় যুবতী।

জরি-মখমলে ঢাকা নরম নাগরা খুলে নিলে
সুবাসিত পদতল লক্ষ্য দেখি কর্দমে, পুরীষে।

নটসূর্য ডঃ অহীন্দ্র চৌধুরী

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

যাঁদের কালজয়ী সাধনা এবং দুশ্চর তপস্যা বাঙলার সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাসে এক একটি অমলিন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নটসূর্য ডক্টর অহীন্দ্র চৌধুরী সেই তালিকায় একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নাম। বাঙলা দেশের রূপসৃষ্টির ইতিবৃত্তের প্রথম অধ্যায়ে যে ক'টি নাম গভীর শ্রদ্ধা ও সসম্মানে স্বীকৃতির সঙ্গে লিপিবদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে এই নামটি তাঁদেরই অন্যতম। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের যেদিন নবযুগের সূত্রপাত হ'ল, সেই নতুন যুগের ভোরের আকাশ প্রথম বিহঙ্গের কলগীতিতে যাঁরা মুখরিত করে তুলেছিলেন ইনি তাঁদেরই একজন। শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নবযুগের দ্বারোন্মোচন ঘটার পরই যাঁদের আবির্ভাব বাঙলা দেশের নাট্যজগতের অভিনয়, প্রয়োগকুশলতা, প্রকাশনৈপুণ্য, উপস্থাপনরীতি, আঙ্গিক ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন ভাব, নতুন ছন্দ, নতুন ভাষা, নতুন সুর, তথা সামগ্রিকভাবে নতুন প্রাণসঞ্চার করে এক একজন যুগাচার্যে পরিণতি দিল সেই যুগাচার্যদের তালিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী একটি পুরোভাগে উল্লিখিত নাম।

স্বর্গত চন্দ্রভূষণ চৌধুরীর পুত্র অহীন্দ্রভূষণ চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৫ সালের ১২ই অগাস্ট। শিক্ষালাভ করেন লণ্ডন মিশনারী স্কুলে। অভিনয়ের আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই ছিল। অহীন্দ্র চৌধুরীর যখন ছেলেবেলা বাঙলা রঙ্গমঞ্চে তখন গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরের কাল।

১৯১২ সাল। 'রিজিয়া' অভিনয় হল। অহীন্দ্র চৌধুরী অবতীর্ণ হলেন সমরেন্দ্রের ভূমিকায়। অভিনয়ে শিষ্যত্ব নিলেন দেবেশ্বর ভট্টাচার্যের। জীবনে সেই প্রথম মঞ্চাবতরণ। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নবযাত্রাপথের প্রথম পথিক নটগুরু গিরিশচন্দ্রের দেহান্তর যে বছর হ'ল সেই বছরই পরবর্তীকালের এক দিকপাল অহীন্দ্র চৌধুরীর জীবনের প্রথম মঞ্চাভিনয়। বয়েস তখন সতের।

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর পেশাদারী অভিনেতারূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন নটগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ি—একালের বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নবযুগের ঋত্বিক। তার মাস দুয়েকের মধ্যেই পেশাদারী অভিনেতারূপে প্রথম আবির্ভাব ঘটল নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রের (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২)—বছর দেড়েকের মধ্যেই পেশাদারী অভিনেতার জীবন বরণ করলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তারিখটি ছিল ৩০-এ জুন ১৯২৩। নাটক—কর্ণার্জুন—অর্জুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী (কর্ণ), ইন্দু মুখোপাধ্যায় (শ্রীকৃষ্ণ), নরেশচন্দ্র মিত্র (শকুনি), কৃষ্ণভাবিনী (পদ্মা), নীহারবালা (নিয়তি) এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বিকর্ণ)। এই সময়-পরিধির মধ্যেই শিশির—নরেশ—অহীন্দ্র ছাড়াও আরও অগণিত দিকপাল নট একে একে দেখা দিতে লাগলেন বাঙলা রঙ্গমঞ্চকে তাঁদের আপন আপন প্রতিভায় ও অবদানে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে। এই তালিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নবপর্যায়ের জয়যাত্রা চলতে লাগল অব্যাহত গতিতে। অসংখ্য নাটক পরে অসংখ্য ছায়াছবির মাধ্যমে নটসূর্যের প্রতিভারশ্মি বিকিরিত হয়ে বাঙলা দেশের নাট্যজগতকে আলোয় আলোয় রশ্মিমান করে তুলতে লাগল। তাঁর নানা রূপসৃষ্টি আলোড়ন আনতে থাকল দর্শকসমাজে। নটসূর্য পরিণত হলেন এক বিপুল বিস্ময়ের দৃষ্টান্তে।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশের আগের বছর হেম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত 'সোল অফ এ স্লেভ' নির্বাক চিত্রে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চিত্রটি নির্মিত হয়েছিল তাঁদেরই সংগঠিত ফোটো-প্লে সিণ্ডিকেটের পতাকাতলে। অরোরার শ্রীকৃষ্ণসুদামা এবং কয়েকটি তেলেগু চিত্ররূপ নিয়েছিল তাঁরই পরিচালনায়। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর অবতরণ সম্ভবত ১৯৩২ সালে প্রফুল্ল নাটকে (যোগেশ—শিশিরকুমার, রমেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী)। পরবর্তী প্রায় পঁচিশ বছর অসংখ্য নাটকে এবং ছায়াচিত্রে এই দুই দিকপালের সম্মেলন বাঙলা দেশের দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষ

করেছেন। ১৯৫৭ সালে অভিনয় জগৎ থেকে তিনি অবসর নিলেন। শেষ ছবি—নীলাচলে মহাপ্রভু—শেষ নাটক—সাজাহান।

১৯৫৬ সালে রবীন্দ্র ভারতীর নাট্য-অনুষদের ডীন নিযুক্ত হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রিত করলেন গিরিশ অধ্যাপকরূপে। ১৯৬৩ সালে লাভ করলেন আকাদামী পুরস্কার। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন তিনি। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কমিটির সদস্যপদও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। অভিনেতৃ সংঘের সভাপতির আসনেও তিনি বহুদিন সমাসীন ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে দিলেন 'পদ্মশ্রী'। ১৯৬৮ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানাত্মক 'ডি-লিট' উপাধি দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। 'বাঙলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' এবং 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থ দুটির রচয়িতা তিনি। সক্রিয়ভাবে অভিনয়জগৎ থেকে আজ তিনি বিদায় নিলেও নব নব অভাবনীয় সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের চিত্তপটে তাঁর যে আলেখ্য গাঁথা আছে, সে আলেখ্য যেমনই দীপ্তিমান, সে আলেখ্য তেমনই স্মৃতিভাস্বর।

সুবিমল দত্ত

[অভিজ্ঞ কূটনীতিক, দক্ষ প্রশাসক]

কূটনৈতিক দৌত্যকর্মে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে বঙ্গসন্তানদের কৃতিত্ব এবং প্রতিভা যথেষ্ট স্বীকৃতি ও অভিনন্দনের দাবী রাখে তাঁদের মধ্যে শ্রীসুবিমল দত্তের অধিকারে রয়েছে পুরোভাগের একটি অশেষ মর্যাদাসম্পন্ন আসন। একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এবং ভারত সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে এই অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সিভিলিয়ান যে অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বাঙালির গর্ব ও গৌরববৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়ক।

শিক্ষালাভ তিনি করেছেন কলকাতায় এবং লণ্ডনে। সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় হলেন সসম্মানে উত্তীর্ণ। ছাত্রজীবনেও তিনি যথেষ্ট মেধা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। দেশে ফিরে এসে কর্মজীবন আরম্ভ হল। গৌরবময় অপ্রতিহত জয়যাত্রার শুভসূচনা হল। বাঙলা দেশে কাটল তাঁর ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট, সেসান জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টারের কার্য তিনি সুসম্পন্ন করেছেন যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে। ১৯৩৮ সালে ডাক এল নয়াদিল্লী থেকে।

১৯৪৭ সাল। জাতীয় ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ভারতের ইতিহাসে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় অব্দ বহু বহু বছরের পরিক্রমার মধ্যে আর দ্বিতীয়টি মিলবে না। ভারত সরকারের কমনওয়েলথ যোগাযোগ দপ্তরের সচিব নিযুক্ত করা হল তাঁকে, পরে এই পদেই তাঁকে নিয়োগ করা হল পররাষ্ট্র দপ্তরে।

১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত তাঁকে দেখা গেল ভারতের বৈদেশিক সচিবরূপে, তারপর তাঁকে পাঠানো
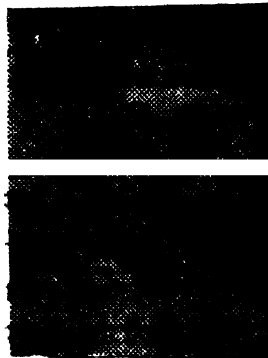
শ্রীসুবিমল দত্ত

হল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা দিয়ে। ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বিদেশে রেখে গেলেন আপন কর্মশক্তি এবং নৈপুণ্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্য আর বিদেশ থেকে নিয়ে এলেন অফুরন্ত শ্রদ্ধা বিশ্বাস-ভালোবাসা। দেশে ফিরে আসায় বিদেশবাস শেষ হল বটে কিন্তু কর্মজীবন থেমে গেল না, সে জীবন তো আজও সমাপ্তিহীন। ১৯৬২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সচিব নিযুক্ত হলেন। ১৯৬৪ পর্যন্ত এই আসনে তিনি ছিলেন সসম্মানে সমাসীন।

তারপর আবার বাঙলা দেশ বিদেশ পরিক্রমা শেষ করে বিপুল অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের পাত্র পরিপূর্ণ করে জীবনের ইতিবৃত্ত আরও ঘটনাকীর্ণ আলোকদীপ্ত করে বাঙলার গৌরব পরিণত বয়সে বাঙলাকেই করলেন আপন কর্মভূমি। বাঙলায় প্রত্যাবর্তনের পর পশ্চিমবঙ্গের ভিজিল্যান্স কমিশনারের আসনটি এগিয়ে দেওয়া হল তাঁরই দিকে। বর্তমানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি এনকোয়ারী কমিটির চেয়ারম্যানের অতীব দায়িত্বপূর্ণ আসনে তিনি সমাসীন।

দীর্ঘকালব্যাপী কর্মজীবনে শুধু প্রতিভা আর দক্ষতারই পরিচয় তিনি দেন নি সেইসঙ্গে রেখে গেছেন সততা এবং আন্তরিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত —যা ভাবীকালের তাঁর উত্তরসূরীদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সততা ও ঐকান্তিকতাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল স্বর্গত লোকনায়ক জওহরলাল নেহরুর অতীব আস্থা এবং নির্ভরতার গভীর মধ্যে।

শ্রীসনৎকুমার লাহিড়ী

[বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞ ও ডানলপের প্রচারসচিব এবং জনসংযোগ অধিকর্তা]

নব্যবাঙলার রূপকারদের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ক্ষণকালের সঙ্কীর্ণতায় নয়, নিত্যকালের প্রসারতায় যে ক'টি পুণ্যনাম হিরণ্যদীপ্তিতে আলোকিত হয়ে আছে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী সেই তালিকায় একটি দৃপ্ত ভাস্বর নাম। বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, উন্মেষশালিনী প্রতিভা, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীজাত জাতীয় উন্নয়নকল্পে সার্থক অবদানের মাধ্যমে যাঁরা সাম্প্রতের সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে শাশ্বতের অন্তহীন প্রাঙ্গণে সমহিমায় সমুত্তীর্ণ—সেই যুগপুরুষদের মধ্যে রামতনু লাহিড়ী একজন। বর্তমান রচনার আলোচ্য শ্রীসনৎকুমার লাহিড়ী তাঁরই সুযোগ্য এবং স্বনামধন্য প্রপৌত্র।

বংশপরিচয়ের সূত্র ধরে নয় আপন প্রতিভা ও নৈপুণ্য সনৎকুমারকে আজ ব্যক্তি থেকে পরিণতি দিয়েছে এক ব্যক্তিত্বে। একালের বিজ্ঞাপন-জগতের অন্যতম দিকপালরূপে তিনি সাধারণ্যে এক ব্যাপক স্বীকৃতির স্পর্শে ভরপুর। আধুনিক যুগে বিজ্ঞাপন-শিল্পের পরিকল্পনায়, উন্নয়নে, উপস্থাপনে তথা সামগ্রিক প্রকাশরীতিতে যে নতুন আঙ্গিকের সূত্রপাত ঘটেছে তার মূলে সনৎকুমারের অবদান এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে অল্পমূল্যের নয়।

১৯২০ সালের ২৬-এ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম। বাবা—স্বর্গত, সন্তোষকুমার লাহিড়ী। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন লব্ধসিদ্ধি (১৯৩৬)। সিটি কলেজের ছাত্র হিসাবে কলাবিভাগের স্নাতক পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন সফলতার সঙ্গে (১৯৪০)। পেলেন ডিস্টিংসন। অর্থনীতিতে এম-এ পড়ছিলেন। পরীক্ষা দেন নি। সিভিল সাপ্লাইয়ের র‍্যাশনিং অফিসাররূপে কর্মজীবনের সূচনা ঘটালেন (১৯৪৩-৪৬)। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ কাটল সার্ভিস এ্যাডভার্টাইসিং এজেন্সিতে। যোগ দিলেন বোম্বাইয়ের হিন্দুস্থান লিভারের বিজ্ঞাপন এজেন্সী লিনটাস-এ। ১৯৫৪ থেকে '৫৫ ছিলেন হিন্দুস্থান লিভারের বিজ্ঞাপন-ম্যানেজার (খাদ্যবিভাগ), আবার ফিরে এলেন লিনটাস-এ পূর্বাপেক্ষা অনেক উচ্চপদের অধিকারী হয়ে। ১৯৬৬ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন লিনটাস-এ। ১৯৫৮-'৫৯ লিনটাসের লণ্ডনস্থ কার্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। এই সূত্রে প্যারিস, জুরিখ, মিলান প্রভৃতি তাঁকে গমনাগমন করতে হয়।

শ্রীসনৎ লাহিড়ী

কলকাতায় এসে ডানলপ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডে যোগ দিলেন প্রচারসচিব এবং জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা হিসাবে। আজও সগৌরবে এই আসনে তিনি অধিষ্ঠিত। এ্যাডভার্টাইসিং ক্লাব অফ বম্বের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। কয়েক বছর তিনি এর অবৈতনিক সচিব ও এক বছর অনুষ্ঠান কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠান ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলেজ অফ মাস কম্যুনিকেশান এ্যাণ্ড মিডিয়ার বিজ্ঞাপনবিভাগের তিনি ছিলেন অবৈতনিক প্রধান। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এ্যাডভার্টাইসার্সের তিনি ভাইস চেয়ারম্যান এবং তার আঞ্চলিক কমিটির তিনি চেয়ারম্যান। অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশানের এবং এ্যাডভাইসিং ক্লাব অব ক্যালকাটার কর্মনির্বাহ পরিষদের তিনি সদস্য। আকাশবাণীর বাণিজ্যিক প্রচারের উপদেষ্টা কমিটির এবং বিভিন্ন রবার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি সদস্য। বিজ্ঞাপন-শিক্ষণ পাঠক্রমের তিনি যুগ্ম-পাঠক্রম-পরিচালক (বিজ্ঞাপনজগতের আর একটি স্তম্ভ শ্রীসুভাষ ঘোষাল সহ)। পাবলিক রিলেশান সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া (ক্যালকাটা চ্যাপ্টার)-র তিনি চেয়ারম্যান। ১৯৬৭ সালে ডানলপ কর্তৃক তিনি কর্মসূত্রে প্রেরিত হলেন লণ্ডনে। সেখানে বিশ্ব বিজ্ঞাপন সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন। ফ্লীট স্ট্রীটের প্রেস ক্লাব অফ লণ্ডন তাঁকে সম্মানিত করলেন তাঁকে তাঁদের সম্মানাত্মক সদস্যের পর্যায়ভুক্ত করে। এই দুর্লভ সম্মান আর পর্যন্ত অন্য কোন ভারতীয় পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নানা ট্রেনিং কোর্স ও সেমিনারে বিভিন্ন স্থানে তিনি নিয়মিত-ভাবে প্রায়শই বক্তৃতাদি দিয়ে থাকেন।

স্বর্গত সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এবং সেকালের প্রসিদ্ধ নেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম দৌহিত্রী শ্রীমতী অঞ্জলি দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম দৌহিত্র।

বিজ্ঞাপনশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শ্রীলাহিড়ীর ন্যায় প্রতিভা এই অপ্রতিহত জয়যাত্রায় আরও বিপুলবেগে গতি সঞ্চার করে চলবে—এ বিশ্বাস আমরা সর্বান্তঃকরণে করে থাকি।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেব

[কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি]

ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে বাঙলা দেশের যে ক'টি পরিবারের খ্যাতি ইতিহাসবিশ্রুত সেই পরিবারগুলির মধ্যে ঠনঠনিয়ার দেব পরিবার নিঃসন্দেহে এই বিশেষ উল্লেখ ও মর্যাদার অধিকারী। রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং আইন-ব্যবসায়ে এই দেবকুলের সন্তানরা পুরুষানুক্রমে যে সক্রিয় এবং অভিনন্দনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছেন, তার গৌরব ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাঁচ পুরুষ আগে এই পরিবারে যে সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল সময়ের দুরন্ত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি অতিক্রম করেও দেখা যাচ্ছে সেই ধারা আজও অব্যাহত। দূর অতীতে যার অঙ্কুরোদ্গম বর্তমানের পটভূমির উপরেও তার আলেখ্য প্রাণ-প্রাচুর্যে দীপ্ত, ভাস্বর, লাবণ্যময়। বিশিষ্ট জননায়ক রাজেন্দ্র দেব, কবি নরেন্দ্র দেব, খ্যাতিযশা এ্যাটর্নি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব ও শচীন্দ্রচন্দ্র দেব, পশ্চিমবাঙলার প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল রথীন্দ্রচন্দ্র দেব এই বংশেরই এক-একটি স্বনামধন্য সন্তান। এককালের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি সমরেন্দ্রচন্দ্র দেবও এই পরিবারেরই আর একটি যশোজ্জ্বলকারী সন্তান।

বয়সের মাপকাঠিতে জীবনের একটি শতাব্দীর অর্ধাংশেও এখনও তিনি অনুপনীত। পূর্বোক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দেব এবং পটলডাঙার বসুপরিবারের কন্যা শ্রীযুক্তা রেণু দেবীর দ্বিতীয় পুত্র তিনি। ১৯৩৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। পরের বছর সুরু হল সর্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ভয়ঙ্করের বিষাণ বেজে উঠল দিকে দিকে, আকাশে-বাতাসে শুধু ধ্বংসের সংকেত, চতুর্দিকে কেবল ভয়াল ভীষণের সমারোহ, সর্বনাশের অন্তহীন অভিসার। সেই পরিবেশে যখন সারা দেশে---সে হেন সময়ে ছাত্র-আন্দোলনে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আহুতি দিলেন সমরেন্দ্রচন্দ্র। সে এমন একটা সময় সেদিন এসেছিল, যেদিন কংগ্রেস কম্যুনিস্ট নির্বিশেষে প্রতিটি দল এসে মিলিত হয়েছিল একটি পতাকায় ছত্র ছায়ে।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের অফিস-সেক্রেটারীর দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন আটমাস। সমরেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বেই স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সংবিধান লিখিতরূপ গ্রহণ করল। তার খসড়াও তৈরী করলেন নিজে। ছাত্ররা তা সানন্দে অনুমোদিত করল তৎকালীন অধ্যক্ষ ভূপতিমোহন সেনও তা গ্রহণ করবেন বলে সম্মতি দিলেন কিন্তু একটি সর্তে-সর্তটি সমরেন্দ্র-চন্দ্রকে কলেজ ছাড়াতে হবে।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেব

এই সর্তকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল। প্রতিবাদসভা আহূত হল। পৌরোহিত্য করলেন একালের দিকপাল সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এযুগের সাংবাদিক- তার অন্যতম পথিকৃত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ধর্মঘট চলল সাত দিন। সুভাষচন্দ্রের পর প্রেসিডেন্সী কলেজে সেই আর একবার রাজনৈতিক ধর্মঘট দেখা গেল। শেষ পর্যন্ত কলেজ ছাড়তে বাধ্য হলেন। কোন কলেজে জায়গা নেই একদিন অধ্যক্ষ প্রশান্ত-কুমার বসু বললেন--যে কলেজের ছাত্র যতীন দাস, সে কলেজে তোমার জায়গা হবেই। এলেন বঙ্গবাসীতে। স্নাতক হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৪২ সালে। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও তাঁকে দেখা গেল এক সক্রিয় অংশ নিতে। পরবর্তী তিন বছর রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

১৯৪৬-এর শেষদিকে বিলাতে গেলেন সমরেন্দ্রচন্দ্র। জীবনেতিহাসের এক অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায়ে উত্তরণ। এক রঙ থেকে অন্য রঙের সমুদ্রে অবগাহন। ১৯৪৮ সালে ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় হলেন সমুত্তীর্ণ। ১৯৪৯ সালে ব্যারিস্টারী সুরু হল বিখ্যাত জননেতা ও ব্যবহারজীবী শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সহকারী হিসাবে। নির্মলচন্দ্র সুপ্রীমকোর্টে চলে যাওয়ার পর সহকারিত্ব নিলেন শ্রীসুবিমল রায়ের। এপ্রসঙ্গে তাঁর মুখ থেকে শোনা যায়---হোয়াট আই এ্যাম টু ডে, আই এ্যাম ফর হিম।

শ্রীরায় ছাড়া আরও একজনের সপ্রীতি সহায়তা বিচারপতি দেব বিশেষভাবে স্মরণ করেন। তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। শ্রীদেবের ভাষায়---হি হেলপড মি এ লট ইন দ্য বার।

স্বাধীনভাবে ব্যারিস্টারী আরম্ভ হল ১৯৫৫ সাল থেকে (আনুমানিক)। ১৯৬৮ সালে হাইকোর্টে অন্যতম বিচারপতির আসনে উন্নীত হলেন।

ফাইন আর্টস সোসাইটি শনিবারের বৈঠকে পরিচয় গোষ্ঠী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কলকাতার প্রখ্যাত এ্যাটর্নি বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ সেন-পরিবারোদ্ভূত স্বর্গত প্রিয়নাথ সেনের পুত্র শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেনের কন্যা শ্রীমতী ইরা দেবীর সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ।

এ যুগের নাট্যকার

টেনেসী উইলিয়ামস

পঞ্চাশ দশকে যে নাট্যকার আমেরিকা আর ইউরোপের মাধ্যমে নাট্যজগতে নিজেকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁর আসল নাম হোল টমাস ল্যানীয়ার উইলিয়ামস, যাঁকে আজ পৃথিবী জানে টেনেসী উইলিয়ামস নামে। জন্ম সাল—২৬শে মার্চ ১৯১১—অর্থাৎ বর্তমান বয়স ৫৮।

টেনেসীর জীবন নিয়ে যাঁরা লিখতে সুরু করেছেন, তাঁদের অনেকে মূলতঃ একটা জিনিষ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন—লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কতটা তার লেখায় আছে। 'গ্লাস মিন্যাজারি'র টম আর টেনেসীর মধ্যে এঁরা অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন।

টম ছিল—জুতোর গুদামের কেরানী। তার কাজের মাঝে, সে জুতোর বাক্সের মাথায় কবিতা লিখতো।

টেনেসী নিজে জুতোর গুদামে কাজ করেছেন—কবিতা লিখেছেন একই সময়ে।

'গ্লাস মিন্যাজারি'র 'টম' এর মা আমাণ্ডা'র সঙ্গে টেনেসীর মায়েরও যথেষ্ট চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। তবে টেনেসীর মা— 'রিমেম্বার মি টু টম' বইএ—যাতে টেনেসীর লেখা অনেক চিঠি আছে—উল্লেখ করেছেন—

'বাট আই অ্যাম নট আমাণ্ডা।'

টেনেসীর প্রথম জীবনে স্থিতিশীলতার অভাব ছিল যথেষ্ট। বাবা ছিলেন—সেলসম্যান্। যাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হোত। তার ওপর স্বভাবে ছিলেন—কৃপণ আর পানাসক্ত। প্রথম সাত বছর টেনিসী তার মা আর বোন 'রোজ'—পাদ্রী দাদামশায়ের সঙ্গে মিসিসিপির বিভিন্ন শহরে থাকেন। বাইরের পৃথিবী—আর নিজের পৃথিবী—এই দুই জগৎ নিয়ে টেনেসী অনেকবার অনেক কিছু বলেছে। শিশু টেনেসী এই দুই জগৎ থেকে নিজের চাওয়া কোন কিছুই পায় নি।

১৮ বছর বয়সে হাইস্কুল শেষ ক'রে টেনেসী মিসৌরীর ইউনিভার্সিটিতে এলো পড়তে, তিন বছর পরে পড়া ছাড়তে হোল—অন্ন-চিন্তা চমৎকারা। বাবা ঢুকিয়ে দিলেন জুতোর গুদামে কেরাণীগিরিতে। সালটাই অবশ্য দায়ী—অনেকখানি। ১৯৩২-এর 'ডিপ্রেশান'। এখানের যাঁতাকলে পড়ে—টেনেসীর স্বাস্থ্য গেল—ছেলেবেলায় প্যারালিসিস ধরণের এক অসুখ করেছিল, সেটা উঠলো মাথা চাড়া দিয়ে। চাকরী

স্পেন্সার সুব্রত দত্ত

হোল ছাড়তে। এ কাজ সে কাজের পর আবার আশ্রয় জুটলো দাদামশায়ের কাছে—মেমফিসে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে—টেনেসী এলো সেন্ট লুই-এর ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। এখানেও পড়া ছেড়ে অবশেষে 'গ্র্যাজুয়েসান' হোল ১৯৩৮ সালে আইওয়া ইউনিভার্সিটিতে।

সাহিত্যচর্চা কিন্তু এর আগেই সুরু হয়ে গেছে, নাম হয় নি। ১৯৩৯ সালে—টমাস ল্যানীয়ার—নাম বদলে হোল টেনেসী। এই সময় থেকেই লেখা—ছোটর গণ্ডী পেরিয়ে এসেছে বড়তে। 'গ্রুপ থিয়েটার'-এর জন্য লেখা নাটক—'আমেরিকান ব্লুস'—লেখক হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিল ১৯৪০ সালে।

এর পরেই অড্রে উড-এর সহায়তায় ব্যাটেল অব এঞ্জেলস-এ নতুন ক'রে লিখে—বোস্টন-এ অভিনীত হয়ে সাংঘাতিকভাবে মার খেল। ১৯৪২ সালে মেট্রো গোলডুইনে নতুন চাকরী হোল ছ'মাসের। গ্লাস মিন্যাজারি লিখে দিলে তা ফেরৎ এলো। যদিও এই গ্লাস মিন্যাজারি ১৯৪৫ সালে টেনেসীর জীবনে আনলো সাফল্য।

'আমি কেন লিখি' এই প্রশ্নের উত্তর টেনেসী নিজেই দিয়েছেন। 'লেখা হোল আমার কাছে এক রকমের 'থেরাপী'। 'আই এ্যাম নট এ গুড রাইটার, সামটাইমস—আই এ্যাম এ ভেরি ব্যাড্ রাইটার ইনডিড'—এ কথাও টেনেসী লিখেছে। বিদগ্ধজন অবশ্য বলেন—এটা টেনেসীর লেখা কবিতা আর উপন্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

'আপনার লেখার বিষয়বস্তু কি?'

'আমি তা জানি না—' এই হোল টেনেসীর উত্তর। 'জ্ঞাতসারে একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে লিখছি, এ ধারণা আমার আসে না। আমি লিখি জীবন নিয়ে। জীবন আমার উপপাদ্য।'

যে-কোনও সার্থক নাট্যকার এই ধরণের জবাব দেবেন। কারণ—কেউই চান না তাঁর লেখার ডানা ভাঙ্গা থাকুক তার গণ্ডী থাকুক। তবে টেনেসীর চরিত্রগুলো নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়, তো আমরা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বলতে পারি যে, টেনেসীর পৃথিবী কাদের নিয়ে।

১৯৫০ সালে 'কারসন মেকিউলার্স'-এর উপন্যাস 'রিফ্লেকসান ইন এ গোলডেন আই'-এর মুখবন্ধে টেনেসী লিখেছে—'আমাদের এই তথাকথিত পৃথিবীর মধ্যে দু'জাতের মানুষ আছে হয় তারা শিল্পী—নয় বিকৃত-মস্তিষ্ক।'

এ কথার পরেই আবার উল্লেখ আছে—'অবশ্য শিল্পী বলতে শুধু তাদের ধরা হচ্ছে না—যারা সার্থক বা যাদের স্বীকৃতি আছে, যে সৃষ্টি করছে আর বিকৃত-মস্তিষ্ক মানে তারা নয়—যারা গারদে আছে অথবা গারদে দেখার মত।' এরা হোল তারা, যাদের মধ্যে কমবেশী যথেষ্ট উপাদান আছে—থাকলে একজন হয় শিল্পী বা উন্মাদ

আর এই উপাদান এদের মধ্যে থাকার দরুণ এরা এই তথাকথিত পৃথিবীকে অন্য আর এক চোখে দেখে।'

এই এরাই হোল—মোটামুটি টেনেসীর নাটকের নায়ক-নায়িকা বা অন্য কুশীলব। উইলিয়ামসের চরিত্রেরা মস্ত শিল্পী নয় বা উন্মাদও নয়—তবে তারা গতানুগতিক না হয়ে এই দুই জাতের সমপর্যায়ে এসে পৃথিবীকে অন্য চোখে দেখে—যে পৃথিবী এদের কাছে ভয়ঙ্কর।

এ ছাড়া আর এক শ্রেণী আছে। তারা হোল—পলাতকের দল—'দি ফিউজিটিভ কাইণ্ড' এরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এরা কার কাছ থেকে পালাচ্ছে? কোথায় পালাচ্ছে?

এই পলাতক দলের—বেদনা হল ত্রিমুখী। এদের দাহ করছে অন্য লোকে। এদের দাহ করছে—বাইরের জগৎ, এদের দাহ করছে এরা নিজে। বহির্জগৎ এদের পীড়ন করছে—এদের চারপাশ থেকে, প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে। আর এদের অন্তর্জগতের দহন আসছে—এদের 'গিল্ট' থেকে—'ফিয়ার কমপ্লেক্স' থেকে। 'গ্লাস মিন্যাজারি'র টম তার বাড়ীকে এড়িয়ে চলছে—অথচ প্রতি মুহূর্তে ভাবছে যে সে তার বোন 'লেনরা'-র কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারে নি। 'এ স্ট্রীট-কার নেম ডিজায়ার'-এর 'ব্লাঞ্চ'-এর 'গিল্ট', 'কমপ্লেক্স' যে তার জন্যে 'এ্যালেন'-কে আত্মহত্যা করতে হয়েছে—'ক্যাট অন এ হট টিন রুফ'-এর 'এ্যালেন'-এর মাথায় খেলছে যে তার বন্ধু 'স্কিপার' এর মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী।

'গ্লাস' মিন্যাজারী'র 'লেনরা'-র পঙ্গুত্ব—তার ভয়ের জন্য না অত্যাধিক নারীসুলভ লজ্জার জন্য এ প্রশ্নও উঠেছে। 'ইউ টাচড্ মি'-র 'ম্যাটিলডা' আর 'পিরিয়ড অব এ্যাডজাস্টমেণ্ট'-এর 'জর্জ'-এর ভয় যৌন-অক্ষমতার, এদের মধ্যে আবার বিশেষ ধরণের ভয় দেখি—'সুইট বার্ড অব ইউথ'-এর 'আলেকজান্দ্রা' তার ভয় যৌবন চলে যাচ্ছে, বার্ধক্য বুঝি বা এলো। আর ভয় দেখি 'দ্য মিল্ক ট্রেন'-এর 'মিসেস গোফোর্থ'-এর মৃত্যুভয়। আর আছে সময়ের জ্বালা। সময়ের 'ব্লেমিং এফেক্ট' নয়। 'সুইট বার্ড অব ইউথ'-এর নায়ক 'চান্স ওয়েনে'র (নামে ইঙ্গিত আছে) শেষ কথা হোল—'দ্য এনিমি-টাইম, ইন আস অল' এই নাটকের প্রাক্তন নাম ছিল 'দ্য এনিমি টাইম', 'গ্লাস মিন্যাজারি' থেকেই সময়, টেনেসীর চরিত্রদের ভাবিয়েছে, জ্বালা দিয়েছে।

টম-কে তার মা 'এ্যামেণ্ডা' সাবধান করে দিয়েছেন—'দ্যাট দ্য ফিউচার বিকামস দ্য প্রেজেণ্ট, দ্য প্রেজেণ্ট দ্য পাস্ট এ্যাণ্ড দ্য পাস্ট ইনটু এভারলাসটিং রিগ্রেট ইফ ইউ ডোণ্ট প্ল্যান ফর ইট।' উইলিয়ামস এ কথার আবার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—'দ্য মনোসিলেবল অব ক্লক ইজ লস, লস, লস, আনলেস ইউ ডিভোট ইওর হার্ট টু ইটস অপোজিসন।'

অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে লড়াই করতে হলে মানুষকে প্রস্তুত হতে হবে—এর জন্যে কাজ করতে হবে। নয় তো এই যা লোকসান হয়ে যাচ্ছে—যা সময় খেয়ে নিচ্ছে—তা আর পুরোতে পারা যাবে না। টেনেসীর অনেক চরিত্রই এই সময়ের সঙ্গে যুঝেছে—'সুইট বার্ড অব ইউথ'-এর 'চান্স' আর 'আলেকজান্দ্রা' 'স্ট্রীট কার'—'ব্লাঞ্চ, 'কামিনো রিয়েল' আর 'মার্গারিট'। 'ক্যাট অন এ হট টীন রুফ-এর বিগ্ ড্যাড তার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভাণ করেছে যে সময় তাকে সময় দেবে। 'অরফেনস, ডিসেনডিং'-এর 'জেব' মৃত্যু যখন তার ওপর দস্তখত দিয়ে গেছে—তখন অন্যকে হত্যা করে জীবনকে আঁকড়ে ধরার মিথ্যা চেষ্টা করেছে।

পলাতকের দলের পালিয়ে যাবার মোটামুটি দুটো ধারা দেখা যায়। মনের জ্বালায় ঠাঁই বদল করা হোল এক-দফা। 'গাস মিন্যাজারি'র টম এ্যাটেম্পটস টু ফাইণ্ড ইন মোশান হোয়াট ওয়াজ লস্ট ইন স্পেস।' প্রতিটি সন্ধ্যা দেখছে সে। 'স্ট্রীট কার' -এর 'ব্লাঞ্চ'-নিউ অর্লিয়েন্সে জুড়োতে এল। জুড়োতে না পেরে সে আবার ঠাঁই বদলের চেষ্টায় ছিল। সব ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল 'স্ট্যানলি' তাকে জোর করে উপভোগ করার পর। 'অরফিনস ডিসেনডিং'—এর 'ভাব'—পরিব্রাজক। 'সাডেনলি লস্ট সামার'—এর 'সেবাস্তিয়ান'ও তাই। 'সুইট বার্ড'-এর 'চান্স' আর 'আলেকজান্দ্রা' দৌড়চ্ছে।

'নাইট অব দ্য ইগুয়ানা'তে দেখি এই তীর্থযাত্রীর দল। যারা বেরিয়ে পড়েছে আর যাদের মধ্যে বিশ্রাম পেল নব্বই বছরের 'ননলো' আর ঈশ্বর-হীন 'লেননন'। দৌড়ে কিন্তু এরা কেউই পার পায় নি। এদের সকলকেই থামতে হয়েছে—হয় মৃত্যুর ডাকে নয় সর্বনাশের। বিকল্প শুধু 'সেননন'।

দ্বিতীয় দফায় এড়িয়ে যাওয়া হোল মনের ব্যাপার। অসীম সমুদ্রের মধ্যে মন একটা দ্বীপ গড়ে নিতে চায়। হয়তো সেখানে শান্তি পাবে—এই আশায়, 'মিন্যাজারি'র 'টম' সাময়িক বন্ধু যোগাড় করে, 'স্ট্রীট-কার'-এর 'ব্লাঞ্চ' প্রেমিক, 'সাডেনলি লস্ট সামার'-এর 'সেবাস্তিয়ান'-এর সমকামী মন চায় তরুণ প্রেমিক, 'আলেকজান্দ্রা' চায় পুরুষ-বেশ্যা। এই ক্ষণিক মুক্তি হোল, পলাতকদের নিজেদের মনকে স্তোক-বাক্য দেওয়া।

টেনেসীর নাটকের কাঠামো হোল এই। এবারে দর্শকের মাপকাঠিতে তাদের বিচার করলে আমরা তার আর্থিক সাফল্যের অঙ্কটা পাব। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শিকাগোতে 'গ্লাস মেন্যাজারি'র প্রথম অভিনয় হয়। এটা এক বছরের বেশী চলেছে, গড়পড়তার দিক দিয়ে দেখতে গেলে—এর পরে প্রতি দেড় বছরে একটা করে নাটক হয়েছে। 'ইউ টাচ্ড মি'—১৯৪৫-এ, 'এ স্ট্রীট কার নেম ডিজায়ার' ১৯৪৭-এ 'সামার এ্যাণ্ড স্মোক' ১৯৪৮-এ, 'দি

রোজ টাটু' ১৯৫১, 'ক্যামিনো রিয়েল' ১৯৫৩, 'ক্যাট অন এ হট টিন রুফ' ১৯৫৫, 'অরফেন্স ডিসেনডিং' ১৯৫৭, 'সাডেনলি লাস্ট সামার' ১৯৫৮, 'সুইট বার্ড অব ইউথ' ১৯৫৯, 'পিরিয়ড অব এ্যাডজাস্টমেন্ট' ১৯৬০, 'দ্য নাইট অব দ্য ইগুয়ানা' ১৯৬১, 'দ্য মিল্ক ট্রেন ডাজ নট স্টপ হিয়ার এনি মোর' ১৯৬৩, 'একসেনট্রিসিটিজ অব এ নাইটিঙ্গেল' ১৯৬৫ — সেপাস্টিয়ান ট্রাজেডিস'ও ১৯৬৫ সালে।

শতরজনী অভিনয়কে যদি মোটা-মুটিভাবে সফল নাটক হিসেবে ধরা হয়, তবে টেনেসীর তিনটে নাটককে সফল বলা চলে না। এগুলো হোল 'ক্যামিনো রিয়েল', 'অরফেন্স ডিসেনডিং' আর 'দ্য মিল্ক ট্রেন'—পয়সার দিক দিয়ে সবচেয়ে সফল হয়েছে 'দ্য গ্লাস মিন্যাজারি', 'এ স্ট্রীট কার নেম ডিজায়ার', 'ক্যাট অন এ হট টিন রুফ' আর 'দ্য নাইট অব দ্য ইগুয়ানা।'

১৯২০ সাল থেকে ধরতে গেলে ইউজীন ও'নীল ছাড়া টেনেসীর মত আর কোনও নাট্যকারকে পাওয়া যায় না—যে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চ আর ফিল্ম, এ দু'য়ের জন্য লিখেছে। টেনেসীর 'গ্ল্যাস মিন্যাজারি,' 'দ্য রোজ টাটু', 'সাডেনলি লাস্ট সামার', 'সুইট বার্ড অব ইউথ', 'ক্যাট অন এ হট টিন রুফ', 'বেবি ডল', 'দ্য ফিউজিটিভ কাইণ্ড', 'এ স্ট্রীট কার নেম ডিজায়ার' আর সবচেয়ে শেষ নাটক যা ছবিতে উঠেছে হোল 'দ্য নাইট অব দ্য ইগুয়ানা'।

যে জ্বালার অন্তর্দাহে টেনেসীর চরিত্ররা তার পুরোনো দিনের লেখায় জলেছে—সে জ্বালা কমে এসেছে তার সাম্প্রতিক লেখায়। 'দ্য নাইট অব দ্য ইগুয়ানা'-তে সেই একই ভঙ্গী—কিন্তু এরা পথ খুঁজে পেয়েছে। 'প্রাকুক পুন্নকো'র সরীসৃপ জাতীয় এই প্রাণীটিকে, এই নাটকে দেখা গেছে বাঁধা অবস্থায়; যারা রাত ধরে বেঁধে রেখে, পরের দিন, একে মেরে খেয়ে ফেলা হবে। এই নাটকের অন্য চরিত্রগুলোও যেন ফাঁদকলে পড়ে আছে—অপরের ভক্ষ্যবস্তু হিসেবে। খাদ্য আর খাদক এই নিয়ে টেনেসী আগেও লিখেছে। 'সাডেনলি লাস্ট সামার'-এর 'সেবাস্তিয়ান'-এর পরিণতি নরখাদকদের হাতে। তারা তাকে খেয়ে ফেলেছে—টুকরো টুকরো করে। যারা খেয়েছে টেনেসী তাদের নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি। যাকে খাচ্ছে—তাকে নিয়েই তার নাটক। 'সেন্নন' আর 'হেননা'র দুজনে জীবনের ফাঁদকলে পড়েছে 'নাইট অব দ্য ইগুয়ানা'-তে। তারা দু'জনে দু'জনের বিপরীত।

'সেন্নন'-এর ঈশ্বর নেই, যাজক-সম্প্রদায়, তাকে সম্প্রদায়ের অনুপযুক্ত বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে ছিল প্রাক্তন যাজক। 'হেন্না'র হোল, সময়কে পেরিয়ে যাওয়া মূর্তিমতী দেবী কিন্তু অপূর্ণ। নাটকে এদের দৈহিক মিলন নেই। তবু এরা দু'জনে দু'জনের কাছে এসেছে আর এদের পরস্পরের কথাই নাটককে 'ক্লাইমেক্স'-এ নিয়ে গেছে।

Hannah—Liquor is not your problem, Mr. Shannon.

Shannon—What is my problem, Miss Jalkes?

Hannah—The oldest one in the world—the need to believe in something, or in some one, almost any one—anything—something.

Shannon—Your voice sounds hopeless about it.

Hannah—No, I am not hopeless about it. In fact, I have discovered something to believe in.

Shannon—Something like—God.

Hannah—No.

Shannon— What?

Hannah—Broken gates between people, so they can reach each other, even if it is just for one night only.*

পথ এরা দু'জনে খুঁজে পেয়েছে। 'হেননা'-র স্বীকৃতিতে তা দেখি, আর 'সেন্নন'-এর বেলায় দেখি যখন সে 'হেননা'-এর কথায় ঐ সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীটির বাঁধন দিলো কেটে। বাঁধন কাটার আগে সে বলেছে—

"We will play God to-night, like kids play house with broken crates and boxes."

সেন্নন মুক্তি পেল জীবনকে গ্রহণ করতে শিখে, যেমন 'মিল্ক-ট্রেন' -এর 'মিসেস গোফোর্থ' শিখেছে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে।

আমেরিকার সমস্যা-সঙ্কুল জীবনের মাঝে টেনেসীর নাটককে অনেকে সমালোচনা করে বলেছেন—যে আমেরিকার জীবনের কুশ্রীতা এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, দুটো শক্তি পরস্পরের সঙ্গে সব সময় লড়াই করছে— টেনেসীর নাটকে। রক্ত-মাংস আর আত্মা, বাস্তব আর স্বপ্ন, আদর্শবাদ আর পাশবিকতা। যে যাই বলুক না কেন এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমেরিকার মঞ্চকে টেনেসী অনেক কুশ্রীতা দিলেও অনেক সৌন্দর্যও দিয়েছে।

নবরত্নের ভূগোল ও বিজ্ঞান পরিচয়

* ইন্দ্রনীল

গাঢ় নীল রং যে নীলাতে বর্তমান, তাকেই ইন্দ্রনীল বলা হয়ে থাকে। নীলার মধ্যে লাল আভা থাকলে বুঝতে হবে উহাই রক্তমুখী নীলা বা পদ্মর্ক। সংস্কৃত রত্নশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে 'মসরেম ইন্দ্রনীলং স্যাৎ পদ্মর্ক পদ্মরাগজ'। এক কথায় রক্তবর্ণযুক্ত নীলার নাম রক্তমুখী নীলা। গাঢ় নীল বা কৃষ্ণবর্ণের নীলার নাম ইন্দ্রনীল। তাছাড়া নীলা শ্রেণীভেদে চার প্রকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইন্দ্রনীলের জন্মস্থান সিংহল, কাশ্মীর ও ব্রহ্মদেশ। স্বচ্ছ ফিকে ইন্দ্রনীল ব্রাহ্মণবর্ণ, রক্তবর্ণ ইন্দ্রনীল ক্ষত্রিয়বর্ণ, হলদে বর্ণ ইন্দ্রনীল বৈশ্যবর্ণ ও গাঢ় নীলবর্ণ ইন্দ্রনীল শূদ্রবর্ণ।

ইন্দ্রধনু স্ফটিক

অনেকটা স্ফটিকের মত। ইন্দ্রধনুর মত বিভিন্ন বর্ণের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় বলেই এই জাতীয় প্রস্তরকে ইন্দ্রধনু স্ফটিক বলে। মুসলমান ফকীর ও পাঞ্জাবীদের নিকট কালেভদ্রে দৃষ্টিগোচর হয়। এই জাতীয় প্রস্তরের ব্যবহার কমে যাওয়ার ফলেই বাজারে বিক্রয়ার্থেও কেউ সংগ্রহ করে না। যাদের ঘৃণিত কামস্পৃহা অত্যধিক, তাদের পক্ষে উক্ত রত্ন সবিশেষ ফলপ্রদ।

ইন্দ্রগোপ

লোহিত বর্ণের স্ফটিক জাতীয় প্রস্তর। অপর নাম রুধিরাখ্য। উক্ত প্রস্তরের প্রচলন বর্তমানে নেই বললেই চলে। হিস্টোরিয়া বা মৃগী জাতীয় রোগ উক্ত প্রস্তর ধারণ করলে নিরাময়ে বহুলাংশে সফল হয়ে থাকে।

* ইয়াকুৎ

পারশ্য দেশের লোকেরা মাণিক্যকে চুনীকে) ইয়াকুৎ বলে। মাণিক্যের -কৃত জন্মস্থান ব্রহ্মদেশ ও সিংহল।

উপল বা উৎপল

সংস্কৃত ভাষায় এর অপর নাম রুধির পাশঙ্ক। পার্শী ভাষায় অ্যাকিক বলে। স্ফটিক জাতীয় প্রস্তর। উপরে বিভিন্ন বর্ণের ডোরা থাকে।

ওপাল

ইংরেজী শব্দ। এই ইংরেজী নামেই এই প্রস্তর সর্বত্র প্রচলিত। এই প্রস্তরের ভিতর থেকে লাল, নীল ও সবুজ বর্ণের আভা বের হয়। পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও অলঙ্কারে বহুল প্রচলন রয়েছে। আপন উজ্জ্বলতার

শ্রীশুকদেব গোস্বামী

গুণে নয়নাভিরাম। অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইনসল্যাণ্ড নামক স্থানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ওপাল পাওয়া যায়। তা'ছাড়া মেক্সিকো ও সিংহলেও ওপাল পাওয়া যায়।

কর্কেতন

হিন্দি ভাষায় হাড়িয়া লসুনিয়া বলা হয়। ফিকে হলদে রং-এর সঙ্গে সবুজ আভা বিদ্যমান থাকে। ইহাকে সূত্রবিহীন বৈদূর্য বলে। উক্ত রত্নের উপর চলমান আলোকসূত্র থাকলে তাকে বৈদূর্য বলে।

* কনকক্ষেত্র বৈদূর্য

অপর নাম স্বর্ণাভ বিড়ালাক্ষ মণি। সোনার মত রং (হলদে রং) থাকলেই কনকক্ষেত্র বলা হয়। হিন্দী ভাষায় কনকক্ষেত্র লসুনিয়া। বৈদূর্য বা ক্যাটস আই বর্ণ হিসেবে চারজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। ১। কনকক্ষেত্র বিপ্রবর্ণ। ২। ঘৃতক্ষেত্র বা ঘিউক্ষেত্র ক্ষত্রিয় বর্ণ। ৩। শ্যামক্ষেত্র বৈশ্য বর্ণ। ৪। ধূম্রক্ষেত শূদ্র বর্ণ।

* কমল হীরক

পরিপূর্ণ গঠনসম্পন্ন যে হীরক তাকেই কমল হীরক বলে। চ্যাপ্টা বা পাতলা হীরককে পলকী হীরা বলা হয়।

* কাহী পান্না

যে পান্নায় সবুজ বর্ণের সাথে কালবর্ণের আভা ছড়িয়ে থাকে তাকে হিন্দীভাষায় কাহীপান্না বলা হয়।

কাহেল মতি

সুডোল গোল মুক্তা পারস্য দেশে বসরা নামক স্থানের উপকূলভাগে পাওয়া যায় বলে এর নাম বসরাই মতি।

কুরুবিন্দ

কুরুবিন্দ জাতীয় প্রস্তর স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ উভয় অবস্থায় পাওয়া যায়। যে প্রস্তর তাকে এ মারি বলা হয়। এই এমারি প্রস্তরকে গুঁড়ো করে রত্নের পল কাটা ও পালিশের কাজ সম্পন্ন করা হয়। কুরুবিন্দ জাতীয় প্রস্তরের মধ্যে যাহা স্বচ্ছ ও লোহিত বর্ণের তাকেই মাণিক্য বা চুনী বলা হয়। শ্বেতবর্ণের কুরুবিন্দকে শ্বেত পোকরাজ, নীল বর্ণে কুরুবিন্দকে নীল পোকরাজ বা নীলা, হলদে বর্ণের কুরুবিন্দকে হলদে পোকরাজ বলা হয়ে থাকে।

কুড়কুড় মতি

ছোট ছোট গোল মুক্তা।

কোড়াদানা

পল-কাটা ও পালিশ করবার পূর্বাবস্থায় প্রাপ্ত রত্নের নাম কোড়া দানা।

কৌরুণ্টক পুষ্পরাগ

হলদে পোকরাজের মধ্যে লাল আভা বিদ্যমান থাকলে তাকে কৌরুণ্টক পুষ্পরাগ বলা হয়ে থাকে। হিন্দীভাষায় উক্ত প্রস্তরের নাম যোগীয়া পুখরাজ। লীভার, হার্ট ও মূত্রাশয়ের উপর উক্ত রত্ন ক্রিয়াশীল। কামলা বা পাণ্ডুর রোগে এবং ব্লাড প্রেসার উপশমনার্থে উক্ত রত্ন ধারণ করা যায়।

কুতবী ঘাট

এর অপর নাম চৌকাঘাট বা টেবিল কাট। উপরদেশ সমচতুষ্কোণ, চতুর্দিব

ঈষৎ ঢালু এবং নীচের দিক ক্রমশ সুরু হয়ে গিয়েছে। যে রত্ন এভাবে কাটাই করা হয় তাকেই কুশ্বী ঘাট, চৌকা-ঘাট বা টেবিল কাট রত্ন বলা হয়ে থাকে।

*** গোমেদ**

এর ইংরেজী নাম জার্কন। জার্কন জাতীয় প্রস্তর নানা বর্ণের হয়। তন্মধ্যে পিঙ্গলবর্ণ (মেটে রং) তাহার নাম গোমেদ।

*** গজমতি**

হস্তীর কুম্ভ মধ্যে বা দন্তকোষে যে মুক্তা পাওয়া যায় বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে, তার নাম গজমতি।

গদর লসুনিয়া

বৈদূর্য জাতীয় কতক প্রস্তরের উপর ডোরার মত সূত্র থাকে। ঐ ডোরাগুলি অস্পষ্ট হলে তাকে 'গদর লসুনিয়া' এবং স্পষ্ট হলে তাকে 'চাদর লসুনিয়া' বলে।

গড়চ হীরা

কাল রং-এর হীরক। ডায়বেটিস রোগে উক্ত হীরক ধারণে উপকার হয়।

গন্ধ সংজ্ঞক

নীল রং-এর স্ফটিক। নীলার বিকল্প হিসেবে ধারণ করা চলে।

গন্ধ

শৈবালের মত সবুজ বর্ণবিশিষ্ট স্ফটিক জাতীয় প্রস্তর বা উপরত্ন। পান্নার বিকল্প হিসেবে ধারণ করা চলে।

গিরিবজ্র

শেতবর্ণের স্ফটিক। তন্ত্র-শাস্ত্রে উক্ত প্রস্তরমালায় আকর্ষণের বীজমন্ত্র জপবার পক্ষে সহায়ক এবং দ্রুত কার্যকরী হয়।

গের্দা ঘাট

রত্নের উপরিভাগ অর্ধ গোলাকার ভাবে কাটা হলে তাকেই গের্দাঘাট বলা হয়।

গিজ্জা ঘাট

যে রত্ন অনেকটা মন্দিরের [illegible] মত কাটাহয় তাকে গিজ্জাঘাট বলে।

গোলাপী কাট

পলকী হীরার উপর গোলাপী কাট হয় বলে তাকে গোলাপী কাট হীরক বলে।

ঘৃতক্ষেত্র বৈদূর্য

ঘৃতের মত হরিদ্রাভ বর্ণবিশিষ্ট বৈদূর্যের নাম ঘৃতক্ষেত্র বৈদূর্য বলে। হিন্দী নাম ঘিউক্ষেত্র লসুনীয়া। (কনকক্ষেত্র বৈদূর্য দ্রষ্টব্য।)

চকমকি প্রস্তর

এই প্রস্তরে অগ্নি-উৎপাদিকা শক্তি বর্তমান রয়েছে বলেই তাকে চকমকি বলা হয়।

চন্দ্রকান্ত মণি

স্ফটিক জাতীয় প্রস্তর। উপরে চন্দ্রের মত স্বচ্ছ ক্রীড়াশীল দীপ্তি দেখা যায় বলে তাকে চন্দ্রকান্ত মণি বলা হয়।

চাদর লসুনিয়া

যে বৈদূর্যের ডোরা বা টানা টানা কতগুলো রেখা বর্তমান থাকে, হিন্দী ভাষায় তাকে চাদর লসুনিয়া বলে।

*** চুনী**

মাণিক্য বা রক্ত পদ্মরাগ মণি। (ইয়াকুৎ দ্রষ্টব্য।)

*** চুনা খাড়িয়া**

ঈষৎ লাল বা গোলাপী আভাযুক্ত মুক্তাকে চুনা খাড়িয়া মতি বলা হয়।

চুম্বক প্রস্তর

এই প্রস্তর লৌহকে আকর্ষণ করে। এই প্রস্তর রত্ন হিসেবে ব্যবহারের কোথাও উল্লেখ নেই।

জার্কন

ইংরেজী শব্দ। জার্কনের মধ্যে যে প্রস্তরবর্ণ শ্বেত তাকে বৈক্রান্ত মণি বা নীচবজ্র বলা হয়। যে প্রস্তর পিঙ্গল বর্ণের হয়, তাকে গোমেদ বলা হয়।

গোলাপফুল কি দীর্ঘায়ু করে

স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর কুর্ট জেরেমিয়াস মনে করেন যে, গোলাপ ফুলের গন্ধ হচ্ছে দীর্ঘ জীবনের গোপন কথা। কড়াগন্ধ গোলাপ রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে যৌনাকাঙখা বৃদ্ধি করে। অর্কিড, পঃ ও টিউলিপ ফুলগুলিরও এই গুণ আছে। অন্য দিকে চন্দ্রমল্লিকা জেরানিয়াম ও লরেল ফুল নিদ্রা উদ্রেক করে। ফুল থেকে নির্গত কণা বাতাসের বহু জীবাণু ধ্বংস করে

প্রাকৃতির রাজ্যে বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সামাজিক জীবনেও যেন একটা বিরাট চঞ্চলতার সাড়া পড়ে যায়। 'বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণপাতা বিপুল নিঃশ্বাসে' উড়িয়ে দিয়ে, 'পুরাতন ক্লান্ত বরষের যত নিষ্ফল সঞ্চয়'কে বিসর্জন দিয়ে, সবাই যখন উদ্‌গ্রীব নতুন দিনের তরে—এ-হেন সন্ধিক্ষণে বসন্তের আবির্ভাব। সে যেন মুখর ক'রে তোলে বাঙালীর প্রেম - প্রীতি - ভালবাসাময় জীবনখানিকে। দিকে দিকে পড়ে যায় পূজাপার্বণ আর উৎসবাদির সাড়া। এককথায় 'আনন্দের প্রতীক' এই বসন্ত।—শিবরাত্রি, দোল, বাসন্তী-পূজা—অন্নপূর্ণা পূজা এই সমস্ত মিলে চঞ্চলিত, মুখরিত হয়ে ওঠে বাঙালী সমাজ। এই বসন্ত মাঝারে বন হতে বনান্তরে যেমন চিত্তচমৎকার নিসর্গ-শোভার মেলা বসে যায়---ঠিক তেমনিভাবে বাঙালীর মনে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায় অনাবিল সৌন্দর্যধারায় স্নাত রঙিন নেশার স্বপ্ন।

আবার বসন্ত-পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের পরস্পর মিলনজনিত যে মনোরম রূপ আমরা দেখতে পাই, তা কি আমাদেরই ঘরের নারী-পুরুষের মনের গোপন কক্ষে যে সৌন্দর্যপিপাসু প্রেমিক মনটি লুকিয়ে রয়েছে, তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? বৈষ্ণব পদাবলীর যে পূর্বরাগ, তা কি আমাদেরই ঘরের কৃষ্ণ-প্রেমাতুরা রাধাভাবে ভাবিতা নারী-হৃদয়ের অসহ্য প্রণয়াবেগ, তীব্র প্রেমানুভূতি তথা 'ফার্স্ট লভ অব লাভ'-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? দোল উৎসবের দিনে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই নিজ নিজ প্রিয়জনের স্নেহে ও মনে রঙ লাগিয়ে পায় পরম তৃপ্তি। এমনি দিনে কালান্তরের সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ---যাঁর নিকট যুগ-যুগান্ত ধরে বাঙালী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভক্তির পুণ্য অর্ঘ্য প্রদান করে চলেছে—তিনিও পর্যন্ত স্থির থাকতে পারেন নি। তাই গেয়ে উঠেছেন—

'ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল,
লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে
লাগল—যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল।'

আবার,—

'লাগিল দোল জলে স্থলে
জাগিল দোল বনে—
সোহাগিনীর হৃদয়তলে
বিরহিণীর মনে।'

বসন্তরাতে বিরহাতুরা প্রেমময়ী রাধা ও কৃষ্ণের মিলনকে মানব-হৃদয়ের অফুরন্ত প্রেমানুভূতির আতিশয্যে রসঘন করে তোলবার জন্য অপ্রাকৃত প্রেমের সৌন্দর্যকে চরিতার্থ করবার জন্য কতভাবেই না বর্ণনা করেছেন কবি।

বসন্ত

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টির আরম্ভ প্রভাতের সেদিনের সেই অরণ্যচারী নারী-পুরুষ থেকে আজকের—টাওয়ার, ম্যানসন আর প্লানাটেরিয়াম সুরম্য কত না সৌধ, অনিন্দ্য অপরূপ---রূপের মিছিলে ভরা ঐ পার্কের ধার-এ বাস করা মানুষের জীবনেও বসন্ত এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, যার ফলে বাংলা সাহিত্যও পর্যন্ত দূরে সরে যায় নি, এর প্রভাব থেকে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কবিরা এই বসন্তকে কল্পনা করেছেন প্রেমময় আনন্দের প্রতীকরূপে। বিশ্ব-প্রকৃতির আনন্দের পরশে যেন নেচে ওঠে এই বসন্ত। সে যে কিভাবে প্রেমময়ীমূর্তিতে, এক অপ্রাপ্ত মাদকতায় পুলকিত, সুরভিত ক'রে দিয়ে যায় আমাদের তৃষিত তাপিত জীবন-যৌবনকে, তা সত্যিই অবাক লাগে ভাবতে। বৈষ্ণব পদাবলীতে যোগিনি দিবে রাধাকৃষ্ণের যে সম্ভোগলীলা তাও এই বসন্তের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। কবি চণ্ডীদাস তাঁর নিজের সুখ-দুঃখ আনন্দ-চেতনা আর কল্পনাকে ছড়িয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।—যাতে রূপায়িত হয়েছে 'বংশীমন্ত্রে বিরহ মিলনে' রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেম-কাহিনী। বসন্তের পটভূমিকায় রাধা-কৃষ্ণের মিলনকে দেখাতে গিয়ে কবি বিদ্যাপতি বলেছেন,—

"আ—এল বসন্ত সকল রসমঞ্জর
কুসুমভেল সানন্দ।
ফুললীমল্লী ভুখল ভ্রমরা
পীবি গেল মকরন্দ ॥"

সমাগত বসন্তে কুসুমরাজি আনন্দোৎফুল্ল। ক্ষুধার্ত ভ্রমরা মধুপান করবার জন্যে ধাবিত হয়েছে সেই আনন্দোৎফুল্ল, প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির দিকে। সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের কবি বিদ্যাপতি ভাষা ছন্দ ও সুরের সমন্বয়ে মৌন বসন্তে রাধিকার অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে আনন্দময়বাণী ভিন্ন ভিন্ন করে প্রকাশ করেছেন,—তাতে আছে ভাবের উল্লাসময় প্রকাশ। যেমন—

"মোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাউক
লাখ উদয় করু চন্দা
পাঁচ বাণ অব লাখ বান হুট
মলয় পবন বহু মন্দা।"

আবার জয়দেবের 'গীত গোবিন্দম্'-এ আছে 'কুহুঃ কুহুরিতি কলোত্তলাঃ পিকানং গিরঃ'—আম্রকুঞ্জে মুকুল মঞ্জরিত হতে দেখে কোকিলগণ হর্ষভরে কুহুকুহু রবে ডাক ছেড়েছে।

বৈষ্ণব কবি প্রেমের কবি। রাধা-কৃষ্ণের দেহমিলনের 'গহণতম শিহরণ' তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। বিদ্যাপতির বাধাবন্ধহারা 'জর্জর কামনা' আর চণ্ডীদাসের 'জ্বালাময় পিরীতি'র নিকট, মিলন বর্ণনায় আত্মশাসিত, জ্ঞানদাসের মানসবিহঙ্গ আহত, ক্ষত-বিক্ষত। জ্ঞানদাসের প্রেম স্বচ্ছ মৃদু—সর্বোপরি অনুভূতির জিনিস। যেমন,—

"কোকিল কুহুরত ভ্রমর ঝংকার।
শারি শুক কত কপোত ফুকার
মলয় পবন বহ মন্দ সুগন্ধ।
দ্বিজকুল সুখদ গীত অনবন্ধ।

"সুখময় শরীর কালিন্দী তীর
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ কুটির॥"

বসন্তবাসরে এই হলো জ্ঞানদাসের রাধাকৃষ্ণের মিলনরূপ। আবার রূপানুরাগ সৌন্দর্যের কবি গোবিন্দদাস। অনুরাগী রাধার লাবণ্য রূপ বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনিও পারলেন না বসন্তকে উপেক্ষা করতে। তাই কল্প-নসের 'তিল তিল সৌন্দর্যের আহারে' প্রয়াসী হয়েছেন তার রূপানুভবের বর্ণনায়—

"মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমর
ঘুরিয়া ফিরিয়া বুলে।।"

কবিশেখর কালদাস তাঁর 'কুমার-সম্ভবে' অকাল বসন্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন---"মধুদ্বিরেফ কুসুমক পাত্রে পপৌপ্রিয়াং স্বামুন-বর্তমানঃ।"

ভাবাচ্ছন্নতায় প্রেম-পরাগের আতিশয্যে আপন প্রিয়াকে যেমন করে দুটি আরক্তিম ওষ্ঠাধরে চুম্বনালিঙ্গন করে তার প্রিয়---মধু-মক্ষিকাগণও তেমনি সুনিবিড় নীর শান্তিতে কুসুমাধার থেকে মধু পান করে চলে মনের আনন্দে।

জয়দেব ও কালিদাস---বর্ণনা উভয়েরই সংস্কৃতে। তথাপি এরা বাংলার প্রভাবমুক্ত নয়। এর মধ্যে আছে জয়দেব ও কালিদাসের অন্তরের কথা; আছে বাঙালীর প্রাণচেতনা।

এ ছাড়া মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'ফুল্লরার বারামাস্যা'তে আছে—

"সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে
পোড়য়ে যুবতীগণ বসন্ত বাতাসে।"

●

"মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।।
অনলসমান পোড়ে চইতের খরা।
চালুসেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।।"

তাৎপর্য খুবই সহজ। আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি বলতে হয় যে, ফুল্লরার শত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও বসন্তের এক সুন্দর পরিবেশ ফুটে উঠেছে। স্বীকার 'করি, ফুল্লরার দুঃখের অন্ত নেই, আর 'অনলসমান চইতের' খরাও তাকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু নববসন্তের সৌন্দর্য-মূর্ছনা আর প্রিয়-সমাগমের ব্যাকুলতা তাকে ম্লান করে দিয়েছে।

পরবর্তীকালে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধে বলেছেন---'যখন দেখিবে, শুভ্রমুখী শুদ্ধশরীরা সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক প্রাখর্যের হ্রাস দেখাইয়া ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে---স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দলরাজি বিকশিত করিবার উপক্রম করিতেছে—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া 'আদরেতে আগুসারি' কণ্ঠভরা গুনগুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ, আবার 'কু-উঃ' বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও।—কুহুরবে সাধা গলায় কোকিল একবার ডাক দেখি রে।"—যুগে যুগে এমনি করেই বসন্ত মজিয়ে রাখে তার বিশ্ব-বাসরকে।—বিমোহিত ক'রে তোলে সকলকে, তার সেই রূপময়ী শোভা আর পিকরাজের মনমাতানো ঘর-ভোলানো স্বরের মাধ্যমে।

'কর্দম - পিচ্ছিল সলিলে' ভরা পৃথিবীর কবি থেকে আজকের পৃথিবীর কবিরাও বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বসন্তের এক স্নিগ্ধ মনোহারিণী গৌরবদীপ্ত রূপ পরিবেশন করবার প্রয়াসী হয়েছেন। আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নববসন্তের আবির্ভাবে গেয়ে উঠেছেন —

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে---।"

কবি কল্পনা করেছেন—

"আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের
পরশ হর্ষ সেই
যুগারম্ভের প্রভাতের আদি উৎসবের
নিমেষেই অবসাদ দূরে গেল---।"

আদিম যুগের আরক্ত প্রভাতে চঞ্চল হিয়ামাঝে যে পুলক জেগেছিল তাকে ফিরে পেয়ে যেন বৃক্ষলতাদির জীবনের সমস্ত অবসাদ নিমিষেই ঘুচে গেল এই বসন্তপ্রভাতে।

বসন্তকে পাওয়ার জন্য তপস্বিনীর হৃদয়েও যে সীমাহীন আকুলতা, গভীর আর্তি, তা প্রকাশ পেল—

"তপস্বিনী কি তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে,
ছাড়ে আভরণ
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল অর্ঘ্য
করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।"

শুধু তপস্বিনীরই প্রাণবসন্তের জন্য আকুল নয়। রূপরসে মুগ্ধ কবি-মনও গেয়ে ওঠে—

পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমার রজনী গন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।

ফাল্গুনীর রূপের মিছিলে, অনিন্দ্য অপরূপ তথা সোনার ভবিষ্যের মাঝে চৈতী-চামেলির মধুরাতে, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়মান কবির ভাবতে ভালো লাগে—

"---আজিকে আসিবে আমার প্রিয়া,
আসিবে উতলা অঙ্গে অঙ্গে
চামেলি গন্ধ নিয়া।'

কিম্বা,—

'রক্ত - ওষ্ঠ পুরি, অফুরাণ পারিজাত
মধু নিয়া।'

শুচিশুভ্র সত্য-সুন্দরের প্রতীক যে প্রেম, তার জন্য আবার 'অন্তরে যে কেন এত সাধ এত ছলাকলা।' আবার ভয়ই বা কেন?

'বহুদূরে এসে গেছি তুমি আর আমি,
দিগন্তে মুছিল লোকালয়;
ফাল্গুনের মধুলগ্নে মধুর মিলনে
অকারণ জাগে কেন ভয়।'

বহুক্ষণের জন্য এমন অনিন্দ্য উজ্জ্বল মুখশ্রী এনে দিতে পারে পণ্ড্‌স ফেস পাউডার

রেশমের মত মোলায়েম পণ্ড্‌স ফেস পাউডার মেখে আপনার মুখখানিকে অনিন্দ্য–সুন্দর আভায় ভরিয়ে তুলুন। এ পাউডার ঘামের সাথে ধুয়ে যায় না, আবার এখানে ওখানে জমেও থাকে না। পণ্ড্‌স ফেস পাউডার সারা মুখে হালকা ভাবে ছড়িয়ে থাকে তাই আপনাকে বহুক্ষণ ধরে অপরূপ সুন্দর দেখায়।

৮ রকম ড্রীমফ্লাওয়ার রঙের মধ্যে যেটা ইচ্ছে বেছে নিন:

ন্যাচেরাল, র‍্যাচেল, গোল্ডেন র‍্যাচেল, পীচ, সান ট্যান, ব্রোন্‌জ, হনি গ্লো ও হোয়াইট।

তিনরকম সাইজে পাওয়া যায়: ছোট, মাঝারি ও বড়।

পণ্ড্‌স ফেস পাউডার–বেশীর ভাগ মেয়েরই অন্য ফেস পাউডারের চেয়ে এটা বেশী পছন্দ

চীজব্রো-পণ্ড্‌স-ইনক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

মালতী লতা

(শেষাংশ)

তপতী রায়

শ্যামবাজার থেকে বড়দা এলেন বিকেল হ'তেই। বড়দা আলাদা থাকেন তাঁর বউ নিয়ে। কাকীমার কর্তৃত্ব নাকি বড়বৌদি সহ্য করতে পারেনা। বড়দা বড় কাজ করেন, একটা বাড়ীর ভাড়া গুণতে হবে বলে চিরকাল কি শাশুড়ীর মুখ নাড়া সহ্য করবে নাকি বড়বৌদি ?

তাই শ্যামবাজারে ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে গেছে বড়বৌদি মালতী আসার আগেই, বিয়ের দু বছরের মধ্যেই, যখন তাদের প্রথম মেয়ে বাব্‌লি জন্মেছে।

এরপর থেকে আসা যাওয়া আছে, ঐ পর্যন্ত।

একরাতও এসে থাকে না বড়-বৌদি এ বাড়ীতে। শুধু ফুলদিকে দেখতে আসবে বলে আজ বড়দা এসেছে। পাত্রপক্ষর বাড়ী বড়দা নাকি নিজে গিয়ে অনুরোধ করে রাজী করিয়েছে, পাত্রর মা দেখতে আসবে।

অফিস থেকে একদম ভিজে ফিরল সোনাবৌদি। ঠাকুর একটু গরম গরম হালুয়া কর তো, চায়ের সঙ্গে খাব।

নিজের ঘর থেকে হেঁকে বলল সোনাবৌদি।

অনেক খাবার করা আছে তো। ঠাকুর একগাল হেসে জবাব দিল।

খাবার করা আছে ? কেন ?

বাবা: কি বলেন, সারাদিন কি বিশ্রাম করেছি একফোঁটা ?

কেন ? ব্যাপার কি ?

বা: জানেন না দিদিমণিকে যে আজ দেখতে আসবে।

তাই নাকি ?

সোনাবৌদি খুশীই হল খবরটা পেয়ে। কাকীমার ওপর রাগ তার বেড়ে গেল।

আমাকে তো বলাও হয়নি, ঠাকুরের মুখে শুনতে হ'ল।

নিজের মনেই গজগজ করল সোনাবৌদি। তা হোক ঠাকুর তুমি একটু হালুয়া কর।

তা পারব না বৌদি।

ঠাকুর স্রেফ জবাব দিল।

এত রান্না বাকী ; এই সন্ধ্যেবেলায় কড়াই নামিয়ে হালুয়া করতে গেলে এই বৃষ্টিতে আটকে যাব যে। রাত হয়ে যাবে।

কতক্ষণ আর লাগবে, থাক দরকার নেই।

তবু রাগতে পারল না সোনাবৌদি। ওঁর সব থেকে রাগ মিতা অর্থাৎ ফুলদির ওপর।

একটা তবু সুসংবাদ। দেখতে পারে না মিতাকে। তবু এ খবরটা ভালই বলতে হবে।

গুন গুন করে গান আরম্ভ করল সোনাবৌদি। মিতার অনুপস্থিতির চিন্তা যেন তাকে উৎফুল্ল করে তুলল।

কি মনে করে আলমারি খুলে নিজের ময়ূর লকেট দেওয়া মুক্তোর মালাটা বার করল, তারপর সোজা কাকীমার ঘরে ঢুকে গেল মালাটা হাতে নিয়ে।

●

বিকেল বেলাই পাত্রর মা উপস্থিত হলেন। তার একটু পরেই সৌমিত্র।

সোনাবৌদির চোখ তো ঠিকরে পড়বার যোগাড়, পাত্রর মা আর সৌমিত্রর মা একই লোক দেখে। সৌমিত্রও কম অবাক নয়। মা তুমি এখানে ?

বারান্দায় ডাকল মাকে সৌমিত্র।

মা।

আমিই তো এখানে থাকব। তুই আজ এসেছিস কেন ?

বা আমি তো রোজই আসি এখানে। কিন্তু তুমি কি করে জানলে এদের ?

ঐ তো মিতার দাদা এনেছেন আমাকে।

আমাকে বলনি কেন ?

তুই তো ট্যুরে গিয়েছিলি। ফের-বার পর আর তোর সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায় ?

তাও তো বটে। তোমাদের আলাপ অবশ্য হওয়া দরকার। কতদিন ভেবেছি।

আলাপ কি রে পাগল ? এবার তো আত্মীয়ই হব।

মানে ঠিক বুঝছি না ব্যাপারটা।

ব্যাপার আর কি মেয়ে দেখতে এসেছি।

এ বাড়ীতে ? কার জন্য ?

আমার কটা ছেলে আছে?

আমার জন্য? না অসম্ভব।

অসম্ভব কি সখী? চ, ঘরের ভেতর চ। এতক্ষণ দুজনে কথা বলছি বারান্দায়, ওঁরা কি ভাববেন বলতো?

ভাববে আবার কি? গিন্নীতো মহাখুশী, হাবভাব দেখছ না? মত দিওনা যেন মা।

আচ্ছা সে হবে'খন, আগে মেয়ে দেখি, এক্ষুণি তো তোকে কেউ পিঁড়িতে বসাচ্ছে না।

●

কাকীমা সত্যিই খুশী।

মেয়ে তো ছেলের পছন্দ করাই, শুধু ছেলের মাকে নিয়মমত দেখিয়ে কথাটা পাকা করে নেওয়া।

সোনাবৌদি শুয়েই ছিল, সৌমিত্রকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে কাপড়টা বদলে গোলাপী একটা কাপড় পরে দরজায় দাঁড়াল। অর্থহীন তবু সোনাবৌদি এমনিই করবে।

মালতী সামনে যায়নি।

কাকীমা বারণ করেছে বলে নয়, শুধু নিজেরই কেমন লজ্জা করছে। অথচ সৌমিত্রর মায়ের স্নিগ্ধ চেহারা ওকে বারবার আকর্ষণ করছে, কি স্নেহময়ী শান্ত চেহারা, চওড়া সিঁদুর জলজল করছে। নিজের শৈশবে হারান, প্রায় ভুলে যাওয়া মাকে মনে পড়ছে, ইচ্ছে হচ্ছে কাছে যায়, প্রণাম করে কিন্তু—কিন্তু পারেনি তার এমন করা স্বভাব নয় বলে।

রান্নাঘরে পাশের ঝিলিমিল দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারাভরা আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল সে। বৃষ্টি থেমে গেছে বর্ষণ শেষের আকাশ যেন আবার নতুন করে নিজেকে বিস্তৃত করে দিয়েছে, আর সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন উদাস হয়ে গেল মালতীর মন।

আজ তার কাজের ছুটি।

কাকীমার নির্দেশমত দুপুর থাকতেই ঠাকুরের সাহায্যে খাবার তৈরীর পর্ব চুকিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু চপগুলো ঠাকুর গরম ভেজে দেবে। ওরাই সব পরিবেশন করবে, তাই আজ মালতীর পরিবেশনের সময়ও দরকার নেই। আজ মালতীর ছুটি। পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

ছোড়দাও নেই কলকাতায়। অফিসের কাজে কদিনের জন্য বম্বে গেছে, রাঙাদা ফেরেনি, এত তাড়াতাড়ি রাঙাদা ফেরে না। বাড়ী নিস্তব্ধ।

কাকীমার চেঁচামেচি নেই, হাঁক ডাক নেই। শুধু কাকীমার শোবার ঘর থেকে হাসির কথা আর টুকরো টুকরো চীৎকার করা কথার টুকরো ভেসে আসছে।

কাকীমা নড়তে পারে না বলে কাকীমার শোবার ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে। সব লোক সেখানেই। সব মানে অবশ্য সৌমিত্র আর তার মা আর শ্যামবাজার থেকে আসা বড়দা—বাড়ীর বড় ছেলে যে নাকি বিয়ে করে বৌ-এর পরামর্শে পর হয়ে গেছে।

সোনাবৌদির সেই অদ্ভুত মাথা ধরাটা বুঝি আবার আরম্ভ হল।

কিছুক্ষণ শুয়ে ছিল সোনাবৌদি আবার অন্ধকারে নিজের ঘরে, তারপর উঠে এসে কাকীমার ঘরের পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। বারান্দাটা একেবারে অন্ধকার। ওখানকার বাল্‌বটা কেটে যাওয়ার পর কেউ নতুন বাল্‌ব দেয়নি সেখানে।

মালতী জানে সোনাবৌদি এই অন্ধকার বারান্দাই বেশী পছন্দ করে। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু সৌমিত্রকেই দেখবে। সোনাবৌদি এমনিই করবে। নিরর্থক জেনেও সৌমিত্রকে দেখবে, তাকে কাছে টানতে চেষ্টা করবে আর ফুলদিকে হিংসে করবে। নিরর্থক তো বটেই, সেদিনের সিনেমার টিকিট দুটো ইচ্ছে করেই সোনাবৌদি ব্যাগে রেখে দিয়েছিল যাতে মালতী দেখতে পায়, ছোড়দা পরে বলেছে সোনাবৌদি আর এক অফিসের মেয়ে গিয়েছিল। পুরুষ বন্ধু জোটে নাকি সোনাবৌদির।

মালতী এসব নিয়ে কিছু ভাবেনি। ওর কি দরকার? সৌমিত্র পেলেই বা কি করত? ও এসব নিয়ে মাথাই ঘামায় না। ও তো ভালভাবেই জানে সোনাবৌদি মালতীকেও হিংসে করে, মালতীর রূপকে।

অনেকবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছে মালতী, সে যে সুন্দর একথা ঠিক, কিন্তু তাতে কি হোল? মুগ্ধদৃষ্টি কি সে দেখেনি। হোসেন সাহেবের বড়ছেলের চোখে? কিন্তু তাতে ও কুণ্ঠিত হয়নি। সে দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা মেশান ছিল। সোনাবৌদি তার দিকে জানি কেমন করে তাকায়। অস্বস্তি বোধ করে ও।

হঠাৎ কাকীমার ঘর থেকে গান ভেসে এল।

ফুলদি গান আরম্ভ করেছে।

সৌমিত্রর মার কাছে সব গুণপনা দেখাতে হবে তো।

পাশে কার নিঃশ্বাস।

সৌমিত্র।

প্রায় চমকে উঠল মালতী। সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে নিঃশব্দে চলে আসা সোনাবৌদিও? তুমি যে এখানে?

কেন? তোমরাও তো এখানে।

বাঃ ঘরে অমন গান হচ্ছে, আমাদের জন্য তো নয়।

এখান থেকেও তো গান শোনা যায়।

যায় কিন্তু প্রয়োজন কি?

অনেকক্ষণ স্মোক করিনি।

ও

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সোনাবৌদি। মালতী যে এখানে?

মালতীর কাছে সরে এল সৌমিত্র কাজ নেই কোন? তোমাকে তো কাজ ছাড়া বিশেষ দেখি না।

আজ ছুটি।

কিসের ছুটি?

এমনিই।

সৌমিত্র শোন।

অন্ধকার থেকে আলোর কাছে সরে এল সোনাবৌদি ঘরের আর সিঁড়ির ঝকমকে আলোর রেখা বারান্দাতেও এসে পড়েছে।

সৌমিত্র সিগারেটটায় একটা জোরে টান দিল তারপর বলল কি বল না, শুনতে পাচ্ছি।

মালতীর দিকে তাকাল সোনা-বৌদি। আধ অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারল মালতী সে চোখ দুটো জলছে। ও তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মালতী যেও না।

না যাক না।

সোনাবৌদি সৌমিত্রর হাত ধরে টানল।

শোন একটা কথা।

বল প্রস্তুত আছি।

তুমি কি মিতাকে বিয়ে করবে নাকি?

কি মনে হয় তোমার?

নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে ঘটা করে ওকে দেখতে আসতে নাকি?

আমি ঘটা করে দেখতে এসেছি? কে বলল?

কে আবার বলবে, এমন ফুলবাবু সেজে মাকে নিয়ে দেখতে আসনি।

এত যখন লক্ষ্য করেছ, এটুকুও বোধহয় তোমার দৃষ্টি এড়ায়নি যে মাকে এখানে দেখে তোমার মতই আমিও অবাক হয়ে গেছি, বরং বলা যায় তোমার থেকেও বেশী।

তাহলে মাকে ওখানে বসিয়ে রেখে গান শোনাচ্ছ কেন? নিয়ে যেতে পারনা? আর মেয়ে নেই?

সেটা ভদ্রতা হবে না বলে। তাছাড়া আমার উদ্দেশ্য তা নয়।

কিসের উদ্দেশ্য?

আছে, ক্রমশ প্রকাশ্য।

সৌমিত্র এভাবে তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতে পার না।

কি ভাবে? মিতা মেয়ে তো ভালই।

জ্বালিও না। মিতার মত মেয়েকে তোমার পছন্দ হ'তে পারে না।

তাহলে হয়নি।

ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল সৌমিত্র।

সমীদা, মা ডাকছে।

মিঠু এসে না ডাকা পর্যন্ত সৌমিত্রর কাছে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলেছে সোনাবৌদি।

ঘরের ভেতর ততক্ষণে আর একটা গান ধরল মিতা। সোনাবৌদি এত রাগের ভেতরও আরাম পেল এই ভেবে যে মিতার গানের মাঝখানে উঠে চলে আসায় সৌমিত্র স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়েছে বলে।

সোনাবৌদি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল তারপর কি মনে করে ঘরের ভেতর ঢুকে হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।

এরও অনেকক্ষণ বাদে মালতী আবার এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

এ ঘরে গান, ওঘরে কান্না, দুটো শব্দই মালতীর কানে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই যেন ওকে স্পর্শ করছিল না।

মালতী দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকাল। জগতে আনন্দ দুঃখ সবই আছে। শুধু যেন যার জন্য যেটুকু মাপা আগে থাকতে ঠিক করা।

তাই কি?

ভাল করে ভাবতে চেষ্টা করল মালতী, তা না হলে তার নদীর মত অমন প্রবহমাণ জীবনে এমন বিবর্ণতা আসবে কেন? দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল মালতীর। সে ভালবাসা চায়, হৃদয়ের উত্তাপ সান্নিধ্য, ভালবাসা পেয়ে সে পূর্ণ হোতে চায়, ভালবেসেও বটে, কাকে ভালবাসবে সে? হঠাৎ নিজের মনেই চমকে উঠল সে। না এ কথা সে কল্পনাতেও আনবে না। জীবনে আজ তার কিছুই নেই, তবু এ রিক্ততা ভাল। অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে পারে না। এ কল্পনা করাও অসম্ভব। দুহাতে মুখ ঢাকল মালতী।

মালতী।

চমকে উঠে মুখ তুলল মালতী। সৌমিত্র।

মালতী। কি হয়েছে?

কিছু না?

ক্লান্ত?

হ্যাঁ।

তাহলে কাঁদছ কেন?

কাঁদছি না তো।

ধরা গলায় মালতী উত্তর দিল। তোমার ঘরে যাও কথা আছে।

না না, দয়া করুন আমাকে?

মালতী প্রায় ছুটে চলে গেল।

সৌমিত্র কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারপর ঘরে ঢুকে এল।

ততক্ষণে বিভাবতীকে বারকয়েক প্রণাম করে মিতা নিজের নম্রতা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

আপনি দিন স্থির করুন।

কাকীমা আবার বললেন।

ছেলের সঙ্গে কথা না বলে?

ছেলের মন কি আমার অজানা?

না তা নয়, তবু আমার ছেলে তো এসব আগে জানত না।

মা থাকতে ছেলের মতামতের আবার মূল্য আছে নাকি?

না না তা কি হয়, ছেলেরা বড় হয়েছে. তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিতা তো অপছন্দের মেয়ে নয়, এমনি নম্র মেয়েই আমি পছন্দ করি। সমী কোথায়?

আমি দেখছি।

এক ছুটে বেরিয়ে গেল মিঠু।

কোথায় যাচ্ছিস?

কাকীমা ডাক দিলেন।

লতাদির ঘরে।

সেখানে কেন?

সমীদা তো সেখানেই গেল।

লতার ঘরে?

এর থেকে অবাক হবার আর কি আছে? রীতিমত নাটকের মত লাগছে যেন ফুলদির।

লতা কে?

সৌমিত্রর মা বিভাবতী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমাদের আশ্রিতা একটি মেয়ে।

ফুলদিই আগে বলল।

আমার সম্পর্কে ভাসুরঝি।

তাকে তো দেখলাম না।

তিনি নিজেই দেখা দেবেন। ঐ তো সৌমিত্রকে কি ছুতোয় ডেকে নিয়ে গেছে ও যা জাঁহাবাজ মেয়ে।

নাক কুঁচকে মিতা বলল। আর বিভাবতী অবাক হয়ে গেলেন, একটু আগের দেখা সেই স্বল্পভাষিণী মিতার সঙ্গে এর পার্থক্য দেখে।

কেন মেয়েটি বুঝি দাঁড়ালাজ—

কথা শেষ হলো না, সৌমিত্র ফিরে এল গম্ভীর মুখে।

কোথায় ছিলি ?

কোথায় ছিলে বাবা ?

লতার ঘরে।

সেখানে কি দরকার ?

কাকীমা প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, দেখেছ মা ?

ফরাদ ঠোঁট ফোলাল।

আমার দরকার ছিল। চল মা। আজ যাই।

বলে যাও কি দরকার।

কাকীমা শক্ত হলেন।

এখন আর সে সবে প্রয়োজন নেই।

তার মানে ? লতা আবার কি মন্তর দিল ?

ও কি মন্তর দেবার মেয়ে ?

কি হোল তাই বলতো।

বিভাবতী আর থাকতে পারলেন না। তোমায় বলব বৈকি মা। চল।

না আমাদেরও বল।

বেশ, ভেবেছিলাম বলে আপনাদের আঘাত দেব না। আমি লতার কাছে প্রস্তাব করেছিলাম।

কিসের প্রস্তাব ?

বিয়ের।

বল কি ?

কাকীমা চোখ কপালে তুললেন।

মা !

প্রায় আর্তনাদ করে সোফার বসে পড়ল মিত্রা। ততক্ষণে সোনাবৌদিও এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে একটা নাটকের হিরোর মত মনে হচ্ছে। চল মা।

না, নাটক করবে আর সব চাপা দিলে তো চলবে না, এ সবের মানে কি ? এ কি বাড়াবাড়ি ?

বাড়াবাড়ি আমার ?

নিশ্চয়ই আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে লতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার মানে ?

আপনার মেয়েকে বিবাহ করব কোনদিনও বলিনি আর ---।

কথায় বলনি, কাজে তো প্রকাশ করেছ।

না তাও না, তবে শুনে রাখুন লতা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমার মাথা কেমন করছে, বাড়ী চ সমী।

চল মা। আমি যাই। মনকে প্রস্তুত করতে পারলে আবার আসব।

তার দরকার নেই, ওসব মনে এই মুখে এক ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিইনা।

ধন্যবাদ।

ওরা বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠল।

গাড়ী যখন বড় রাস্তায় এসে পড়ল বিভাবতী আস্তে আস্তে ছেলের হাত নিজের হাতে নিলেন।

কি ব্যাপার সমী।

কিছু না মা, কিন্তু লতার তুলনা হয় না।

আমাকে দেখালি না কেন ?

দেখাব তো ভেবেছিলাম। কিন্তু লতাই তো সব ভেস্তে দিলে।

এমন ছেলে পাবে কোথায় ?

না মা, ও কারও দয়া চায় না। অন্তত আমার কাছে।

দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল সৌমিত্র।

তা হোক গাড়ী ফেরা।

ড্রাইভারকে গাড়ী ফেরাবার নির্দেশ দিলেন বিভাবতী।

তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

॥ সমাপ্ত ॥

স্মৃতির সৌরভে

বিশ্বনাথ বারিক

বহুদিন পরে তুমি লভিয়াছ চিত্তের প্রসাদ।
স্মৃতির সৌরভে তাই মোর হৃদয়ান্তর বিষাদ
বিস্মিত-ব্যথিত-মুগ্ধ : কি বিচিত্র উত্থানে-পতনে
সৌন্দর্যের পাণ্ডুলিপি ছড়ানো বিস্ময়ে কলসিত মনে

তবু ভাবি স্বপ্নময় পবিত্রতা যদি কিছু পাই
রহস্যের জর্জরিত স্মৃতি-সম্ভার কিছু না ছাই।
গোপনে এঁকেছি যাকে, ভুলে গেছি নিশানা তাহার
কালের নিয়ম ভাঙে, কণ্টকিত কেউ একবার।

বহু প্রতীক্ষার পর কোন এক বিষাদ সন্ধ্যায়
বিকশিত তুমি যেন বনফুল শুচিসত্তা নিয়ে
রহস্যের জাল বোনো নির্বিকার কথায় কথায়
অথচ নিয়ে এলে ফুল-সম্ভার প্রিয়তমা হ'য়ে।

তাই আজ নিবিড় হৃদয়ে জেনেছি হাজার বার
যন্ত্রণায় পুড়ে যাবে আকাঙ্ক্ষিত প্রদীপ, ভাবি
হয়তো আশার স্বপ্নে বুক পাতে কেহ প্রতীক্ষার
পরম স্নেহে ব্যর্থ হবে না জানি অভাগার দাবী॥

মুর্শিদাবাদ

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

মুর্শিদাবাদ। বাঙলার মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির শেষ রাজধানী।

একদা বাঙলার ভাগ্যাকাশের উত্থান-পতনের ইতিহাসজড়িত এই মুর্শিদাবাদ থেকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ হত। এই মুর্শিদাবাদ থেকেই স্বাধীন বাঙলার শেষ সূর্য ইংরেজ-কবলে অস্তমিত হয়েছিল একথা আজ আর কারুর অবিদিত নেই।

মুর্শিদাবাদ বাঙলা দেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি জেলা ও শহর। প্রাচীনকালে মুর্শিদাবাদের সাধারণ অবস্থা কি ছিল তা পৌরাণিক গ্রন্থগুলি হতে জানা যায় না। ইতিহাস বলে গুপ্ত সম্রাটগণ যখন কর্ণসুবর্ণের রাজা তখন এ অঞ্চলে শিব ও শক্তি সাধনার প্রাবল্য দেখা যায়, তার স্বাক্ষর কিরীটেশ্বরীর মন্দির।

তারপর পালবংশীয়দের রাজত্বকালে মহীপাল সাগরদীঘি খনন করেছিলেন। এ সময়ে বৌদ্ধধর্মের বেশ চলন ছিল। বাঙলা দেশে ধর্মরাজের পূজা বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর বলে অনেকে মনে করেন। এখন কিন্তু ধর্মরাজ শিবরূপে পূজিত হন। পাঠান রাজত্বকালে গৌড় দেশ বাংলার রাজধানী হওয়ায়, তারই সন্নিহিত দেশ বলে মুর্শিদাবাদে বহু মুসলমান এসে বসবাস করেন। ফকিরেরাও মুসলিমধর্ম প্রচার করেন। বহু হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। আবার চৈতন্যদেবের সময়ে এখানে বৈষ্ণবধর্মেরও বেশ স্রোতোবেগ দেখা গিয়েছিল। এর দ্বারা দেখা যায় এই জেলা এমন একটি স্থান—যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করেন।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন নাম মুকসুদাবাদ। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী তুলে এনে এখানে স্থাপন করেন ও নিজের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলি খাঁ কিন্তু আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম জাফর খাঁ। ইনি দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে দারিদ্র্যবশত তাঁর পিতা এক মুসলমান বণিকের কাছে তাঁকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করে দেন। সেই বণিকের নাম হাজি সুফি। সেই বণিক তাঁকে ইস্পাহানে নিয়ে গিয়ে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করে সুশিক্ষা দেন। নাম রাখেন মোহম্মদ হাদি। হাজি সুফির মৃত্যু হলে হাদি দাক্ষিণাত্যে বেরারের এক দেওয়ানের অধীনে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হন। সামান্য, হলেও ক্রমে ক্রমে কর্মদক্ষতার ফলে তিনি বাঙলার দেওয়ানি লাভ করেন ১৭০১ সালে কারতলব খাঁ এই উপাধি লাভ করেন।

কিরীটেশ্বরীর ভৈরবরূপী বুদ্ধমূর্তি

সম্রাট অকবরের সময় হতে প্রত্যেক সুবায় দুজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হত। একজন শাসন বিভাগের কর্তা—তার পদবী নাজিম বা সুবেদার আর একজন রাজস্ব বিভাগের কর্তা—তার পদবী দেওয়ান। বাঙলায়ও দুজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন—একজন বাদশাহের পৌত্র আজিমুশ্বান। তিনি নাজিম বা সুবেদার। আর মোহম্মদ হাদি বাঙলার দেওয়ান। সেকালে ঢাকা বাঙলার রাজধানী ছিল। মোহম্মদ হাদি কর্মকুশলতায় সম্রাটের প্রিয়পাত্র হন। নাজিমের সঙ্গে দেওয়ান হাদির মনোমালিন্য হয়। নাজিমের অনুমতি না নিয়েই তিনি ঢাকা থেকে রাজস্ব বিভাগ তুলে এনে মুখসাদাবাদে স্থাপন করেন। প্রচুর রাজস্বের টাকা হাতে নিয়ে বাদশাহের কাছে যান।

সে সময় ঔরঙ্গজেব বাদশা। তিনি দেওয়ান হাদির ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি দেন। মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি পেয়ে তিনি মুখসাদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ রাখেন। ১৭০৪ খ্রীঃ তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবী লাভ করেন ও বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা শাসন করতে থাকেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ নবাবী পেয়ে তাঁর জামাই সুজাউদ্দীনকে প্রথমে উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান ও পরে নায়েব নাজিম পদে উন্নীত করেন। মুর্শিদকুলির কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে তাঁর দৌহিত্র অর্থাৎ সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফ্ খাঁকে উত্তরাধিকারী করে যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর (১৭২৫) পর সুজাউদ্দীন কৌশলে পুত্রকে বঞ্চিত করে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন ও পুত্র সরফ্ খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

১৭৩৭ সালে সুজার মৃত্যু হলে সরফরাজ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অলস ও দুশ্চরিত্র, শাসনকাজে অপটু।

এই সময় অনুষ্ঠিত আলিবর্দি খাঁ পাটনার গদীতে ছিলেন। নবাবীর জন্য তাঁর লোভও ছিল। রাজ্যের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে দিল্লীশ্বরের কাছে গিয়ে সুবেদারির সনদ আদায় করেন। সেই সনদের বলে আলিবর্দি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের পথে যাত্রা করেন। সরফ্‌ খাঁ গতিরোধ করতে অগ্রসর হন। মুর্শিদাবাদে গিরিয়ায় যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন ও আলিবর্দি নবাবী গ্রহণ করেন---সেটা ১৭৪০ সাল।

আলিবর্দি তুর্কবংশীয় ছিলেন। তিনি সুজাউদ্দীনের অনুগ্রহে উড়িষ্যার নবাব সরকারে একশ' টাকা বেতনের কর্মচারী হন। পরে এক সৈন্যবিভাগের ফৌজদার হন। সুজাউদ্দীন নবাব হলে তিনি বেহারের শাসনকর্তা হন। তারপর এই ঘটনা ঘটে। তিনি বাঙলার মসনদে বসেন।

আলিবর্দির কোনও পুত্র ছিল না, ছিল তিন কন্যা। তিনি তিন কন্যার সঙ্গে তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়ে দেন। জ্যেষ্ঠা ঘসেটি বেগমের সঙ্গে ঢাকার নবাব নোয়াজেস মোহাম্মদ, মধ্যমা কন্যার সঙ্গে পূর্ণিয়ার নবাব সৈয়দ আহম্মদ খাঁ আর কনিষ্ঠা আমিনা বেগমের সঙ্গে পাটনার শাসনকর্তা জইন উদ্দীনের বিয়ে হয়। প্রথমার কোনও পুত্র ছিল না, মধ্যমার পুত্র শওকত জঙ্গ ও কনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ।

আলিবর্দি (১৭৪০) সিংহাসনে বসবার কিছুকাল পরেই বিখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। মরাঠারাজ রঘুজী ভোসলে ও মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ সালে বাঙলা আক্রমণ করেন। আলিবর্দি আক্রমণ রোধ করতে পারেন নি। তারা জগৎ শেঠের বাড়ী লুণ্ঠন করে আড়াই কোটি টাকা নিয়ে যান। মাঝে মাঝে বর্গীরা বাঙলা দেশ লুণ্ঠন ও অধিবাসীদের ওপর নানা অত্যাচার করে। আলিবর্দি প্রকাশ্য-যুদ্ধে তাদের হারাতে না পেরে গোপনে গুপ্তঘাতকের দ্বারা ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করেন। বর্গীরা তাতে আরও ক্ষেপে যায়। অবশেষে তাদের সন্ধি হয়---উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়ে বাঙলা ও বিহারের চৌথ হিসেবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় আরও কয়েকটি বিদ্রোহ হয়--(১) সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হন, আলিবর্দির জামাতা জৈনউদ্দীন তাকে পরাস্ত করেন। (২) হাজি আহম্মদের ছেলে সামসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে জৈনউদ্দীন ও হাজি আহম্মদকে হত্যা করে। আলিবর্দি সামসেরকে হত্যা করে (১৭৪৯)। পিতার মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দীন বিহার রাজ্যের প্রার্থী হয়ে পাটনা আক্রমণ করেন। তাতে তিনি কারারুদ্ধ হন, আলিবর্দি তাঁকে মুক্ত করেন। ১৭৫৬খৃঃ আলিবর্দির মৃত্যু হয়।

জাহানকোষা কামান

আলিবর্দির শাসনকালে দিনেমারা শ্রীরামপুরে কুঠি তৈরী করে, ইউরোপীয়দের এদেশে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। বর্গীর হাঙ্গামার পর দিল্লীশ্বরকে ক্ষমতাশূন্য মনে করে আলিবর্দি রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করেন।

আলিবর্দির মৃত্যুর পর বাঙলার শেষ নবাব তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজের বয়স তখন ১৭ বছর। সিরাজের সময় বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থা ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। সিংহাসনে বসেই প্রথমে রাজবল্লভের বহু টাকা আদায় করতে চেষ্টা করেন। রাজবল্লভ পরিবারবর্গ সহ কলকাতায় ইংরেজের আশ্রয় নেন। এই সময় ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়। ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না নিয়েই দুর্গ সংস্কার করতে থাকে। উভয় কারণেই সিরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করে কলকাতায় যাত্রা করেন। ড্রেক সাহেব ভয় পেয়ে প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারী ও মহিলাদের নিয়ে জাহাজে আশ্রয় নেন। নবাব কলকাতায় ইংরেজদের দুর্গ অধিকার করেন। কলকাতার দুরবস্থার খবর মাদ্রাজে পৌঁছুলে সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ওয়াটসন সাহেব ও ক্লাইভকে সসৈন্যে কলকাতা উদ্ধার করতে পাঠান। তাঁরা বজবজ অধিকার করে বসলেন। কলকাতায় ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়ে জাহাজ থেকে দুর্গের ওপর গোলা বর্ষণ করতে লাগলেন, নবাবের সেনারা ভয় পেল ও সন্ধি করল।

সন্ধি হল বটে, কিন্তু গোপনে ইংরেজদের বাঙলা থেকে তাড়াবার জন্য চক্রান্ত চলতে লাগল। এদিকে আবার একদল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে ক্লাইভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। নানারকম কূটকৌশল চলে। অবশেষে পলাশীক্ষেত্রে সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রায় বিনা যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করে। (১৭৫৭, ১৫ই জুন)। সিরাজ পালিয়ে যান। ভগবানগোলায়

কাছে এক ফকিরের আশ্রয় নেন। ফকিরও সিরাজের ওপর নারাজ ছিলেন—তিনি মিরজাফরের পুত্র মীরণের হাতে তুলে দিলে মীরণের অনুচর তাঁকে হত্যা করে। কিছুদিন পরে মীরণও বজ্রাঘাতে মারা যায়।

ইংরেজরা মিরজাফরকে বাঙলার সিংহাসনে বসায়। মিরজাফর নবাব হলেন বটে, কার্যত ক্লাইভই দেশ শাসন করতে লাগলেন। নতুন নবাব কোম্পানীর সমস্ত ক্ষতি পূরণ করে দেন। ইংরেজ কর্মচারীদেরও বহু টাকা দিতে হয়। তাতে রাজকোষ খালি হয়ে যায়। রাজকোষ পূর্ণ করবার জন্য অনেকের ভূসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল। আবার চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্লাইভ নানা কৌশলে সেসব বিদ্রোহ থামিয়ে দেন।

১৭৬০ সালে ক্লাইভ ইংলণ্ডে চলে যান। ক্লাইভবিহীন মিরজাফর অসহায় হয়ে পড়েন। আবার চারদিকে গোলযোগ। এবারে ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভান্সিটার্ট মিরজাফরকে গদীচ্যুত করে তাঁর জামাই মিরকাশিমকে বাঙলার সিংহাসনে বসান (১৭৬০)।

মিরকাশিম একটু স্বাধীনচেতা। ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ ও যুদ্ধ বাঁধল। ইংরেজরা আবার তাঁকে হটিয়ে মিরজাফরকে বসায় (১৭৬৩)। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। ইংরেজরা তখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা মুর্শিদাবাদ থেকে কিছুকাল রাজকার্য চালিয়ে ১৭৭২ খ্রী: হেস্টিংসের আমলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে আসে।

১৭৯০ সালে কর্নওয়ালিসের আমলে রাজস্ব ও সমস্ত বিচার বিভাগ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

এইখানেই মুর্শিদাবাদের উত্থান-পতনের কাহিনী শেষ।

সীমা

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে মালদহ, দক্ষিণে নদীয়া ও বর্ধমানের কিছু অংশ, পশ্চিমে পাকিস্তান। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে বাঙলা দেশকে ১৩ চাকলায় ভাগ করা হয়। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম চাকলা। কোম্পানীর রাজত্বের গোড়ায় মুর্শিদাবাদ একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। ১৮৭৫ খ্রী: মুর্শিদাবাদ বাঙলা দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় জেলারূপে ভাগ হয়। আয়তন—২-০৫৬ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা — ২-২৯০-০১০ (১৯৬১)

মহকুমা—৪টি। (১) বহরমপুর (সদর—৬৫৯ বর্গমাইল), (২) কান্দী (৪৫৪ বর্গমাইল), (৩) জঙ্গীপুর (৪৩৭ বর্গমাইল) ও (৪) লালবাগ (৫২২ বর্গমাইল)।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান

মুর্শিদাবাদ—কলকাতা থেকে ১১২ মাইল দূরে ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত। বর্তমান মোতিঝিলের কাছে উত্তরে সাদেকবাগ ছাড়িয়ে আর পশ্চিমদিকে খোসবাগ হতে উত্তরে বড়নগরের কাছ পর্যন্ত প্রায় ৮মাইল বিস্তৃত তখন নগরী ও রাজধানী ছিল। তখন এত বড় শহর বাঙলা দেশে আর ছিল না। তার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভ ইংলণ্ডে লিখেছিলেন,—

The City of Mursidabad is as extensive populus and rich as the City of London, with this difference, there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city.

মুর্শিদাবাদ নগর লণ্ডনের বিস্তৃত, জনপূর্ণ ও ধনশালী। এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে মুর্শিদাবাদের অধিবাসিগণ লণ্ডনের অধিবাসী অপেক্ষা অসীম সম্পত্তিশালী।

মুর্শিদাবাদ তৎকালীন রাজধানী থাকায় সেখানে বহু প্রাসাদ, সৌধ, হর্ম্যমালে শোভিত ছিল। হাজার দুয়ারী (নিজামত কেল্লা), ইমামবাড়া, মোতিঝিল, মুবারক মঞ্জিল প্রভৃতি আকর্ষণীয় কেল্লার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের বর্তমান প্রাসাদ ১৮৩৭ খ্রী: ইতালীয় স্থপতিকার্যের অনুকরণে তৈরি হয়। প্রাসাদের কাছে ইমামবাড়া আরও চমকপ্রদ। খোবরনালা নামক স্থানে তোপখানা আছে। এখানে জনার্দন কর্মকারের তৈরি জাহানকোষা কামান আছে। এটা তৈরি হয় ১০৪৭ বঙ্গাব্দে। এর মাপ ১৮ ফুট লম্বা ও বেড় ৪॥ ফুট।

ডাহাপাড়া—মুর্শিদাবাদের অপর পারে। এখানে ফর্হাবাগ বা সুজা খাঁর উদ্যান। সুজা খাঁর সমাধি-মন্দির রোশনিবাগ আর প্রধান কানুনগো বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের বাসভবন।

বহরমপুর—এটি এই জেলার সদর মহকুমা। কলকাতা থেকে ১১৬ মাইল। মিরকাশিমের পতনের পর ইংরেজরা নবাবের সমস্ত সামন্ত হস্তগত করে, তখন এই বহরমপুর নামের প্রচলন হয়। এর পূর্বে এর নাম ছিল ব্রহ্মপুর। তা থেকেই বহরমপুর হয়। এখানে কোম্পানীর সেনানিবাস গড়ে ওঠে, ১৭৬৭ খ্রী: গোরাবারিক বা ক্যাণ্টনমেণ্ট তৈরী হয়। সিপাই-বিদ্রোহের সময় বহরমপুরে প্রথম বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহের সূত্রপাতেই তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়, তার ফলে বিদ্রোহ জ্বলে উঠতে পারে নি। এর কিছুকাল পরে এখানকার সেনানিবাস উঠে যায়, সেই বাড়ীতে বর্তমানে বহরমপুরের জেলখানা হয়।

চুনাখালি—চুনাখালি বহরমপুর থেকে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূবে—মুর্শিদাবাদ থেকে ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ও কাশিমবাজারের কাছাকাছি। চুনাখালি মুসলমান রাজত্বের আগে থেকেই প্রসিদ্ধ। আকবরের সময় এটি একটি পরগণা হয়। ১৮ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ নগর চুনাখালি পরগণার অন্তর্গত ছিল।

সৈয়াবাদ—বহরমপুর খাগড়া বাজারের ঠিক উত্তরেই ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। আগে এটি কাশিমবাজারের শহরতলী ছিল। এখানে ফরাসীদের কুঠি ছিল।

ফরাসীদের আবাসস্থানকে ফরাসডাঙা বলত। ফরাসডাঙার পূর্বদিকে আর্মেনীয় বণিকদের বাস ছিল। তারা ফরাসীদের আগে এখানে আসে (১৬৬৫ খ্রীঃ)। আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে ভূমির সনদ পেয়ে তারা এখানে তাদের এক গীর্জা তৈরি করে। আর্মেনীয়রা ফর্সা বা শ্বেত-বর্ণের দেখতে ছিল বলে যে অংশে তারা বাস করত সেই অংশকে শ্বেতা খাঁর বাজার বলত। এখন এই স্থান আর্মেনিগঞ্জ নামে পরিচিত। ১৭৫৮ খ্রীঃ এখানে আর একটা গীর্জা তৈরি হয়।

বড়নগর—মুর্শিদাবাদের সাদেক-বাগের অপর পারে আজিমগঞ্জ রেল স্টেশনের ২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই বড়নগরে রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ও ছোট ছোট অনেক মন্দির আছে, যাতে বড়নগরকে দ্বিতীয় কাশী-ধাম বলা যেতে পারে। কাশীতে যখন ভবানীশ্বর মন্দির তৈরি হয়, এখানেও সেই সময় ভবানীশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়।

ভগবানগোলা—কলকাতা থেকে ১৩৪ মাইল। এই ভগবানগোলা আগে বিখ্যাত বন্দর ছিল। এর একদিকে ভাগীরথী, অপর দিকে জলঙ্গী ও কাছেই পদ্মাপ্রবাহিতা ছিল। বর্তমান স্টেশন থেকে পুরানো ভগবানগোলা প্রায় ৪ মাইল দূরে। সেকালে দেশ-বিদেশ থেকে বাণিজ্য জাহাজ এখানে বন্দরে আসত। ঐতিহাসিক হলওয়েল লিখেছেন—ভগবানগোলায় ধান-চাল প্রভৃতি শস্যের তুলা, রেশম, কাপড়, নীল, ঘী, তেল প্রভৃতির বিরাট ব্যবসায়-কেন্দ্র ছিল। এই ব্যবসা-কেন্দ্র থেকে বার্ষিক ৩০লক্ষ টাকা কর উঠত। তাঁর মতে, সেকালে এত বড় বাজার পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। বর্গীদের আক্রমণের প্রতিশোধে নদীতীর ছাড়া ভগবানগোলার অন্যদিকে পরিখা কাটা হয়। নবাবের সেনাদের এখানে এক আড্ডা ছিল। ভাস্কর পণ্ডিত চারবার এই ভগবানগোলা আক্রমণ করে, ধনরত্ন লুণ্ঠন ও বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন জেলে দিয়ে যায়। এখন ভগবানগোলার পরিখার চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত সিরাজ পালিয়ে ভগবানগোলা থেকে রাজমহলের দিকে যান—পথে নিহত হন।

কাশিমবাজার—কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ১১৮ মাইল। আগে মুর্শিদাবাদ জেলার এটি একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। বাঙলায় ইংরেজদের আসার সঙ্গে সঙ্গে এই কাশিমবাজার সমৃদ্ধিশালী ও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। গঙ্গা, ভাগীরথী ওজলঙ্গী নদী বেষ্টিত এই ত্রিকোণ স্থানটিই কাশিম-বাজার নামে অভিহিত। ইহা বহরম-পুরের উত্তরে ও সৈয়াদাবাদের পূর্বে। কথিত আছে—কাশিম খাঁ নামে এক মুসলমান এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা। সপ্ত-গ্রামের বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় ও কল-কাতায় বাণিজ্যবন্দর হওয়ার আগে কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠে-ছিল। আগে ভাগীরথীর এক বাঁক মুর্শি-দাবাদ ও বহরমপুরের মধ্যে ছিল। এই বাঁকের ওপর কাশিমবাজারে ইংরেজদের কলিকাপুরে ওলন্দাজদের ও সৈয়া-দাবাদে আর্মেনিয়ানদের শ্বেতা খাঁর বাজার ছিল, ফরাসীদেরও কুঠি ছিল। পরে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হলে কাশিমবাজার জলাভূমিতে পরিণত হয় ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। হেস্টিংসের বিশ্বস্ত বন্ধু কান্তবাবু (মুদি) এখানকার রাজবাটির প্রতিষ্ঠাতা। কাশী থেকে পাথর এনে এই রাজবাড়ীর এক অংশ তৈরি হয়। এই পাথরগুলি কাশী চৈৎসিংহের প্রাসাদের অংশবিশেষ এই রাজবাড়ীতে চৈৎসিংহের মায়ের দেওয়া কৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

গয়সাবাদ—আজিমগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৫ মাইল। উত্তর-পশ্চিম ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। গয়সাবাদ অনেক দিন ধরে মুর্শিদাবাদের এক প্রধান শহর ছিল। গয়সাবাদ প্রাচীন-কালের মহীপাল নগরের এক অংশ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। মহীপাল থেকে গয়সাবাদ পর্যন্ত এক প্রাচীন নগরের ধ্বংসবিশেষ বলে মনে হয়। সুলতান গয়েসউদ্দীনের নাম অনুসারে এই গয়সাবাদ নগর স্থাপিত হয়।

ফতেসিংহ—এটিও একটি প্রধান স্থান। ফতেসিংহ সম্ভবত গৌড়ের রাজা ফতেশাহের (১৪৮২-১৪৯০) নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কেউ বলেন, ফতে সিংহ নামে এক হাড়ি রাজা এই স্থানের রাজা ছিলেন। এর রাজধানীর নাম ফতেপুর। কান্দী থেকে ৬মাইল দক্ষিণে বীরভূম জেলায় যাবার পথে ময়ূরাক্ষী নদীর অদূরে ফতেপুর। মান-সিংহের প্রিয়পাত্র সবিতা রায় ফতেসিংহ অধিকার করেন ও রাজা হন।

কান্দি—এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ভাগীরথীর পশ্চিম দিক্ হতে বীরভূমের সীমানা পর্যন্ত কান্দি মহকুমা। সিংহবংশীয় আদিপুরুষ অনাদিবর সিংহ বাঙলায় এসে ময়ূরাক্ষী তীরে বন কেটে কান্দিগ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। কান্দি ও পাইকপাড়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ। কান্দিতে বৃহৎ অট্টালিকা, দেবালয় ও অন্যান্য কীর্তি আছে।

কুঞ্জঘাটা—সৈয়দাবাদের পূর্বাংশে। এখানে মিরজাফরের দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমারের দৌহিত্র রাজা মহানন্দ এই কুঞ্জঘাট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

জিয়াগঞ্জ—কলকাতা থেকে ১২৭ মাইল। ভাগীরথীর পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এর প্রাচীন নাম গাম্ভীলা। বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডা গোস্বামী-দের একবংশীয় 'জিয়া' নামে এক বৃদ্ধা এখানে ভাগীরথীতীরে বাস করেন। তাঁর ভক্তগণ 'গাম্ভীলা' নামের বদলে 'জিয়াগঞ্জ' নাম রাখেন। এখানে নওলাক্ষা, দুধোরিয়া, কোঠারি, নাহার প্রভৃতি উপাধিধারী বহু জৈনদিগের বাস। এই স্থান বৈষ্ণবদের বড় প্রিয় স্থান।

নশীপুর—কলকাতা থেকে ১২৫ মাইল। এখানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা দেবীসিংহ।

মহিমাপুর—নশীপুরের কাছেই। জগৎশেঠেদের বাস।

লালগোলা—কলকাতা থেকে ১৪১ মাইল। লালগোলা থেকে ৪ মাইল দূরে লালগোলা স্টেশন।

এখানের রাজবংশের বহু কীর্তি মুর্শিদাবাদে দেখা যায়।

গিরিয়া—ভাগীরথীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। ১৭৪০ খ্রীঃ এখানে বাঙলার নবাব সরফরাজ খাঁর সঙ্গে আলিবর্দি খাঁর যুদ্ধ হয় ও বিজয়লক্ষ্মী আলিবর্দি খাঁকে আশ্রয় করেন।

জালিমসিংহের মাঠ—গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে খামবার কাছে যেখানে জমাদার বিজয়সিংহ নবাব সরফরাজের মৃত্যুর পর তাঁর শত্রু আলিবর্দির বহু সৈন্যকে নিহত করে নিজেও নিহত হন। সেখানে তাঁর ৯ বছরের ছেলে জালিমসিংহ খোলা তরোয়াল নিয়ে বাবার মৃতদেহ রক্ষা করেছিলেন। কয়েকজন সেনা এই বালককে হত্যা করতে উদ্যত হলে আলিবর্দি খাঁ নিজে বাধা দেন ও এই বালককে তার পিতার দেহ সৎকার করতে অনুমতি দেন। তখন থেকেই এই স্থান জালিমসিংহের মাঠ নামে খ্যাত।

চাঁদপাড়া - - - ইতিহাসবিজড়িত গৌড়ের রাজা হোসেন শার বাল্যকাল কাটে চাঁদপাড়ায়। চাঁদপাড়া জঙ্গীপুরের মধ্যে ও সাগরদীঘি রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে। হোসেন শা সৈয়দবংশীয়। এঁর পূর্বপুরুষেরা মক্কার অধিবাসী ছিলেন। এঁর পিতার অবস্থা হীন হওয়ায় দুই পুত্র হোসেন ও ইসুফকে নিয়ে বাঙলা দেশে চাঁদপাড়ায় এসে বাস করেন। কিছুকাল পরে পিতা ও ভাই বিহারে যান। কিন্তু হোসেন চাঁদপাড়ায় সুবুদ্ধি রায় নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে চাকরী করেন। চাঁদপাড়ায় জলকষ্ট হওয়ায় সুবুদ্ধি রায় এক দীঘি খনন করান, হোসেনকে তার তত্ত্বাবধানে রাখেন। একদিন হোসেনের কাজে ত্রুটি দেখে তাঁকে চাবুক মারেন। সেই চাবুকের দাগ তাঁর গায়ে চিরকাল থাকে। এই সময় চাঁদপাড়ায় এক কাজি হোসেন সৈয়দবংশীয় জেনে তাঁর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। এই সময় হোসেন কাজির বাড়ী থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। কাজি গৌড়ের দরবারে তাঁর জামাতার এক কাজ করে দেন। ক্রমে গৌড়রাজের অনুগ্রহে হোসেন উজীরের পদে উন্নীত হন। কিন্তু গৌড়ের রাজা মজঃফর শা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। রাজপরিষদরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করে ও সকলের ইচ্ছানুযায়ী হোসেন গৌড়ের রাজা হন। হোসেন রাজা হয়ে প্রথম মনিব সুবুদ্ধি রায়কে ভোলেন নি। তিনি তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করেন ও চাঁদপাড়া তাঁকে নিষ্কর দান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি বার যবনের দান নিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এক আনা কর ধার্য হয়। হোসেন শাহের বেগম কিন্তু সুবুদ্ধি রায়ের বিপক্ষে গেলেন। তিনি স্বামীর গায়ে চাবুকের আঘাতের কথা বিস্মৃত হন নি। সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করবার জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করেন, কিন্তু হোসেন শা অস্বীকৃত হন। তখন বেগম তাঁর জাতিনাশের চেষ্টা করতে থাকেন। তাতে সুবুদ্ধি কাজিপাড়া ছেড়ে বারাণসীতে বাস করতে থাকেন, সেখানে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বৃন্দাবন ও মথুরায় ঈশ্বরোপাসনায় কাল কাটান।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশ

জগৎশেঠ বংশ—মুর্শিদাবাদের উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত প্রসিদ্ধ বণিক বংশ। জগৎ শেঠ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়—রাজদত্ত উপাধি।

রাজপুতনায় যোধপুরের অন্তর্গত নাগর নগরে এঁদের পূর্বপুরুষের বাস। এই বংশের হীরানন্দ সা ১৬৫৩ খ্রীঃ প্রথমে পাটনা নগরে আসেন। এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় কুঠি করেন। ঢাকা তখন বাঙলার রাজধানী। এখান থেকেই মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ানী করতেন। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ১৭০৪ খ্রীঃ মুর্শিদকুলি খাঁ যখন মুর্শিদাবাদে রাজধানী নিয়ে আসেন, মাণিক চাঁদও তাঁর সঙ্গে এখানে এসে মহিমাপুরে বাসস্থান তৈরী করেন। এখানে নতুন টাকশাল স্থাপিত হয়। মাণিকচাঁদ তাঁর কর্তৃত্ব পান। দিল্লীর বাদশাহ ফরুকশিয়ার মাণিকচাঁদকে 'শেঠ' উপাধি দেন (১৭১৫ খ্রীঃ)। ১৭২২ সালে অপুত্রক মাণিকচাঁদের মৃত্যু হলে তাঁর ভাগিনেয় ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী হন। ইনিই সম্রাট মহম্মদ শাহের কাছ থেকে 'জগৎশেঠ' উপাধি পান। মুর্শিদকুলি খাঁর পরে (১৭২৫) সুজাউদ্দীনের রাজত্বকালে ফতেচাঁদ তাঁর মন্ত্রী হন। ১৭৩৯ সালে সরফরাজ বাঙলার সিংহাসনে বসেন। সরফরাজের চরিত্র-দোষ ছিল। ফতেচাঁদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। ফতেচাঁদ আলিবর্দি খাঁর সঙ্গে মিলিত হন। আলিবর্দির সময়ে ১৭৪২ সালে ভাস্কর পণ্ডিতের পরিচালনায় বর্গীরা জগৎশেঠের গদি-আক্রমণ করে আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করে। ১৭৪৪ সালে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়।

তাঁর দুই পুত্র দয়াচাঁদ ও আনন্দচাঁদ। দয়াচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদ 'মহারাজা' উপাধি পান আর আনন্দচাঁদ 'রায় জগৎশেঠ' উপাধি পান।

১৭৪৯ সালে নবাব ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করলে ইংরেজরা জগৎশেঠের কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা নিয়ে নবাবকে দিয়ে অব্যাহতি পায়। সেই সময় থেকে ইংরেজরা জগৎশেঠের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পায়। সিরাজ সিংহাসনে বসে মহাতপ জগৎশেঠের কাছ থেকে ৩ কোটি টাকা চান। জগৎশেঠ অসম্মতি জানান, তাতে সিরাজ তাঁর গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন। জগৎশেঠের অবমাননাই সিরাজের অধঃপতনের মূল কারণ। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলে। জগৎশেঠই সর্বপ্রথমে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের উত্তেজিত করেন। মিরজাফরও তাতে যোগ দেন। পলাশীর ক্ষেত্রে সিরাজের পতন হয়। মিরজাফর সিংহাসনে

বসেন। মিরজাফর সিংহাসনচ্যুত হলে মিরকাশিম মসনদে বসেন। মির-কাশিমের সময় জগৎশেঠদের মহাতপ রায় ও স্বরূপচাঁদ বন্দী ও পরে নিহত হন।

ফতেসিংহের রাজবংশ—এই রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সবিতা রায়। ইনি যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে মানসিংহের দ্বারা দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে সনদ পান ও ফতেসিংহ অধিকার করেন। রাজধানী ফতেপুর হয়। সবিতা রায়ের আমল থেকে ফতেসিংহে মাধুনিয়া, কল্যাণপুর, আন্দুনিয়া, জেমো প্রভৃতি স্থানে জিঝোতি ব্রাহ্মণদের বাস। এঁরা কান্যকুব্জের অন্যতম শাখা। জিঝোতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দীক্ষিত, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী, দ্বিবেদী, বাজপেয়ী, উপাধ্যায়, মিশ্র প্রভৃতি আছেন। সবিতা রায়ের বংশধরগণের অনেক সৎকীর্তিতে ফতেসিংহ পূর্ণ। ঘনশ্যাম রায়ের পুত্র জগৎ, কানু শোভাসিংহের বিদ্রোহে যোগ দেন। এই বংশের আনন্দচন্দ্র অপুত্রক মারা গেলে এই বংশের বৈদ্যনাথের ভগিনীপতি দর্পমণি চৌধুরী ফতেসিংহের জমিদারী লাভ করেন। দর্পমণি বাঘডাঙ্গা রাজ-বংশের আদিপুরুষ এবং সবিতার বংশ-ধরগণই জেমোর রাজা। কালক্রমে ফতেসিংহ আবার সভিতার রায়ের বংশীয়দের হাতে আসে। জেমো ও বাঘডাঙ্গা উভয় রাজবংশের মধ্যে ভাগ হয়। ফতেসিংহ জমিদারীর মধ্যে ফতেসিংহ, ইসলামপুর, কীরিতপুর, গাঙ্গলা, চুপাখালি প্রধান।

কাশিমবাজার রাজবংশ—এই রাজবংশের স্থাপয়িতা কান্তবাবু (মুদি)। এঁর আসল নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। কাশিম-বাজারে এঁর সামান্য একখানি মুদির দোকান ছিল, সে সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস কাশিমবাজারের কুঠির সামান্য কর্মচারী। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ হওয়ায় কাশিমবাজারের ইংরেজদের প্রাণ বধ করবার আদেশ দেন। এই বিপদকালে হেস্টিংস কান্ত মুদির দোকানে আশ্রয় পান। তারপর হেস্টিংস বাঙলার শাসনকর্তা হলে কান্তর কপাল ফেরে। কৃষ্ণকান্ত হেস্টিং-সের দেওয়ান হন, বহু জায়গীর পান। কৃষ্ণকান্ত কোন উপাধি নিতে অসম্মত হলে তাঁর পুত্র লোকনাথ দে-কে 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়। লোক-নাথের পুত্র হরিনাথ। হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথের পত্নী মহারানী স্বর্ণময়ী প্রাতঃস্মরণীয়া ও দানশীলা ছিলেন। কৃষ্ণনাথ অপুত্রক থাকায় তাঁর ভাগিনেয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী উত্তরাধিকারী হন। মণীন্দ্রচন্দ্র বহু জনহিতকর কার্য করেছেন। তিনি একাধারে বিদ্যোৎসাহী, পরোপকারী ও দানশীল ছিলেন।

কান্দির রাজবংশ—কান্দি ও পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। ইনি প্রথমে নায়েব নাজির রেজা খাঁর কানুনগো ও পরে হেস্টিংসের দেওয়ান হন। কর্মদক্ষতায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এঁরই পৌত্র প্রসিদ্ধ লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র), ইনি প্রথমে উড়িষ্যায় মহলের দেওয়ানী কাজ করেন, পরে নিজ জমিদারী পরিদর্শন করেন। এই সময়ে তিনি সংসারে বীতরাগ হয়ে সন্ন্যাসী হন। তিনি বৃন্দাবনে "কৃষ্ণচন্দ্রমা' নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ও ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুষ্কোণ মন্দির তৈরী করেন। এঁরা পাইক-পাড়ার রাজা নামে বিখ্যাত।

নশীপুর রাজবংশ—মহারাজা দেবী-সিংহ মুর্শিদাবাদের নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেবীসিংহ পানিপথের বাসিন্দা ছিলেন। ১৭৫৬ সালে দেবী-সিংহ বাঙলা দেশে এসে বাস করেন। ১৭৭৩ খ্রী: বাঙলার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। ইনি প্রজাদের ওপরে অমানুষিক অত্যাচার করে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন ও নিজেও প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করেন। ইনি পূর্ণিয়া, এদরাকপুর, রংপুর ও দিনাজ-পুর জেলার ইজারাদার হন। ১৭৮৩ সালে প্রজারা বিদ্রোহী হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কমিশন বসে। ১৮০৫ সালে তিনি মারা যান।

সৈয়দাবাদের রায়বংশ—মহারাণী স্বর্ণকুমারীর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুর এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আসলে এঁদের পদবী দত্ত।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ঘুম নেই

পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অতন্দ্র প্রহরীর মত—
প্রহরী কথাটা বুঝি ভুল হলো!
জেগে জেগে কাটিয়েছি সারাটা রাত্তির;
পাহারা দিইনি কিছু,
শুধু জেগে থাকা অনন্ত স্মৃতির রাজ্যে;
অন্তর্দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি দূরে—
নিরালা নিভৃত এক আলোময় ভবিষ্যৎ পানে;
কিংবা চেয়ে থাকি—
জর্জরিত অন্ধকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে—
ধ্রুবজ্যোতি লয়ে অরুণের রূপকথা বয়ে।

তারপর?
ছন্দের বন্ধনে
তৃষিতের নিঃশব্দ ক্রন্দনে—
"প্রভাত এসেছে"
বার্তা এলো বাতায়ন পথে,
কিংবা এলো পাখীর কূজনে;
প্রহরী ঘুমায়
ধ্রুবজ্যোতি গেছে মিশে আকাশের বুকে;
ক্লান্ত আমি দিনরাত জাগি—
স্বপ্নময় স্মৃতিদের পাতায় পাতায়—
রঙিন স্বপ্ন এঁকে এঁকে।

সমাজদ্রোহী

তারা দু'জনেই সমাজচ্যুত—আইনের আশ্রয়বঞ্চিত। একজন চাষী, গ্রামের পুরোহিতকে খুন ক'রে জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে। অন্যজন এক ছোকরা, জেলে, একগাছা জাল চুরির অপরাধে অভিযুক্ত।

দু'জনেই পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে জঙ্গলে থাকা শ্রেয় মনে করেছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই তারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে গভীর বনে এক গুহায় বাসা বাঁধল। ত্রস্ত হরিণের কাছ থেকে তারা শিখেছিল অনলস সতর্কতা, হিংস্র জন্তুর কাছ থেকে অতর্কিত আক্রমণ করার কৌশল।

চাষীর পক্ষে জঙ্গল ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব, কিন্তু ছোকরা জেলের অপরাধ লঘু বলে সে সাহস ক'রে মাঝে মাঝে শিকারকরা জন্তুগুলো কাঁধে নিয়ে গ্রামে গিয়ে প্রয়োজনীয় শস্য, নুন ইত্যাদি নিয়ে আসত।

তাদের গুহাটি গভীর বনে ছোট্ট পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। গুহামুখ তারা পাথরের চাঁই আর কাঁটা ঝোঁপে ঢেকে রাখত, ওখানে পৌঁছবার একমাত্র পথ এমনিতেই অত্যন্ত দুর্গম, উপরন্তু একটা পার্বত্য নদীও রয়েছে পথে। এটি অতিক্রম না ক'রে ওখানে যাওয়ার উপায় নেই। তাদের সন্ধান পাওয়া তাই প্রায় অসম্ভব।

প্রথমে পুলিশ তাদের বন্যজন্তুর মত অনুসরণ করত গ্রামের চাষীদের সঙ্গে নিয়ে, গুহায় ত্রস্ত বন্য জন্তুর মত বসে থাকতে থাকতে অসহ্য হয়ে চাষী একদিন বেরিয়ে পড়ায় অনুসরণকারীরা তাকে দেখতে পেয়ে হৈ চৈ ক'রে তার পশ্চাদ্ধাবন করল। এটাই তার অভিপ্রেত এবং সমস্ত জঙ্গল তার নখাগ্রে থাকায় সে সহজেই তাদের বোকা বানিয়ে দিল।

অনুসরণের শেষ পর্যায়ে, যখন লোকগুলো ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেল—তখন সে আকাশচুম্বী এক ওক গাছের সর্বোচ্চ শাখায় বসে মজা দেখছে। যতক্ষণ তারা ছিল, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত আলস্যে বসেছিল, কিন্তু তারা যখন চলে গেল এবং তাদের উপস্থিতির কোন চিহ্নমাত্র আর রইল না, তখন প্রতিক্রিয়ার অবসাদে তার সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করল নিচের দিকে তাকিয়ে। কী ক'রে নামবে, এই চিন্তা তাকে এত ভীত করে তুলল যে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে ডালটি আঁকড়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বহুক্ষণ পরে কোনরকমে হিঁচড়ে নেমে এল।

সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ

●

চাষীর নাম বার্‌গ এবং যুবক জেলের নাম টর্‌ড। বার্‌গ দীর্ঘাকৃতি, সবলদেহী পুরুষ; তার সুদৃঢ় পেশীবহুল দেহের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে টর্‌ড-এর মনে হত যে এমনটি আর সে দেখেনি কোনো দিন। তার কল্পনায় বার্‌গ যেন জঙ্গল ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। সে বার্‌গ-এর সেবা করত, যেমন করে মানুষ—প্রভুকে বা দেবতাকে এবং নীরবে তার তীরধনুক, বর্শা বা শিকার করা জন্তুগুলো বয়ে বেড়াত, জল আনত, কাঠ কাটত, রান্না করত। বার্‌গ অবিচলিতচিত্তে এ সব গ্রহণ করত, যেন এ সব তার প্রাপ্য।

চুরি তারা করত না কখনও, তাদের উপজীব্য ছিল শিকার, বার্‌গ একজন পুরোহিতকে হত্যা না করলে গ্রামবাসীরা কিছুদিন পরেই ক্লান্ত হয়ে অনুসরণ ছেড়ে দিত। কিন্তু পুরোহিতের হত্যাজনিত অপরাধ পাছে রুদ্ররোষ টেনে আনে তাদের গ্রামের ওপর, এই ভয়ে তারা অনবরত বার্‌গ-কে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

টর্‌ড যখন গ্রামে যেত মৃত জন্তু নিয়ে সওদা করতে, তাকে নানা প্রলোভন দেখাত বার্‌গ-এর আস্তানা দেখিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তারা টর্‌ড-এর মন টলাতে পারেনি।

একদিন বার্‌গ তাকে প্রশ্ন করেছিল এ বিষয়ে—কী পরিমাণ পুরস্কার তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ঘোষিত হয়েছে জানতে পেরে সে টর্‌ড-কে 'বোকা' বলে বিদ্রূপ করল। টর্‌ড তার দিকে তখন মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে—এমনভাবে বোধ হয় আর কেউ বার্‌গ-এর দিকে তাকায় নি। হয়তো ভক্ত এইভাবেই ভগবানের দিকে তাকায়, দর্শন পেলে।

এরপর থেকে বার্‌গ ক্রমে ক্রমে টর্‌ড-এর দিকে নজর রাখতে আরম্ভ করল। সে বুঝতে পারল টর্‌ড কর্মকুশল, কিন্তু স্বল্পবাক্‌। মৃত্যুকে সে ভয় করে না—অকুতোভয়ে বরফাবৃত পর্বতগাত্র বেয়ে সে চলে যায়, বিপদ নিয়ে সে খেলা করে। কিন্তু রাত্রে টর্‌ড বড় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, ভূতের ভয়ে। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে।

টর্‌ড কোনদিনই গুহার ভিতরে ঘুমোত না; বার্‌গ ঘুমোলে সে সন্তর্পণে বাইরে এসে দরজার পাশে বড় এক খণ্ড পাথরের ওপর শুয়ে থাকত, জানতে পেরে বার্‌গ তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেও কোনও উত্তর পায়নি।

একদিন রাত্রে খুব ঝড় হয়ে তুষারে ছেয়ে গেল বন। টর্‌ড সেদিন তার প্রস্তর শয্যা থেকে উঠে দেখল যে তার সারা গা তুষারে আচ্ছন্ন। এর দু'একদিন পরে সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল—ফুসফুসে দারুণ ব্যথা। বার্‌গ তাকে জোর ক'রে আগুনের কাছে গরম বিছানায় শুইয়ে দিল। রোগ সে চিনত, কিন্তু

চিকিৎসা কিছুই জানত না—কাজেই; আগুনের সেঁক এবং গরম জল খাওয়ানো, এ ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারেনি।

অবশ্য, কয়েক দিনের মধ্যেই ট্রুড সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু এই ক'-দিনের নিবিড় সান্নিধ্য তাদের পরস্পরকে আরো কাছে টেনেছিল, ট্রুড এখন মাঝে মাঝে বারুগ-এর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলত সাহস করে।

এক অলস সন্ধ্যায় ট্রুড ধীরে ধীরে বলল, 'আপনারা তো খুব বড়লোক। আপনাদের বাড়ীতে বিরাট বিরাট ভোজ হয়, কত গণ্যমান্য লোক আসে, কত সুন্দরী স্ত্রীলোক আপনারা দেখতে পান।'

নিজের সঙ্গে ট্রুড-এর অবস্থার ব্যবধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বারুগ বাঙ্গের হাসি হেসে প্রশ্ন করল: 'তোমাদের বাড়িতে ভোজ হয় না?'

হেসে ট্রুড বলল, 'ঐ পাথর ছড়ানো সমুদ্রের পাড়ের গ্রামে?---বাবা ডুবে যাওয়া জাহাজের মালপত্র লুঠ করে, আর মা ত' ডাইনী, ঝড় উঠলে মা তিমিমাছের পিঠে চড়ে ডুবন্ত জাহাজে যায় মড়ার সন্ধানে।'

'কী ক'রে তোমার মা মড়া পিয়ে?'

'ডাইনীদের সব সময়েই মড়া লাগে---হয়ত তারা মড়া খায়।'

'কী ভয়ানক কথা।'

ট্রুড শান্তভাবে বলল, 'অন্যের কাছে এটা বীভৎস হতে পারে, কিন্তু ডাইনীর কাছে নয়। তার এটা করতেই হয়---এ তার বৃত্তি, তার স্বভাব।'

এমন জীবনাদর্শ বারুগ-এর কাছে সম্পূর্ণ নতুন। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে সে বলল, 'তা হলে তুমি বলতে চাও যে চোরকে চুরি করতে হবেই, যেমন ডাইনীর মড়া ঘাঁটা ছাড়া উপায় নেই?'

'নিশ্চয়ই,' ট্রুড জবাব দিল, 'যে যার জন্য জন্মেছে, তাকে সে কাজ করতেই হয়।'

একটু চুপ করে থেকে সে ম্লান হেসে আবার বলল, 'অবশ্য, এমন 'চোরও' আছে যে কোনোদিন চুরি করেনি।'

'তার মানে?'

ট্রুড মৃদু হাসতে লাগল—যেন সে একটা ধাঁধা বলেছে। সে বলে চলল, 'যেমন অনেক পাখি আছে যারা ওড়ে না, ঠিক তেমনি অনেক 'চোর' আছে যারা চুরি করেনি।'

'তা কী ক'রে সম্ভব?' বোকামীর ভাণ করে বারুগ বলল।---'কিন্তু কারুর বাপ যদি চুরি করে, আর তার মা যদি কেঁদে কেটে তার বাপের কু-কর্মের দায়িত্ব নিতে বলে, তখন ছেলে আর কী করতে পারে বলুন।'

বুঝতে পারল বারুগ ব্যাপারটা। এও বুঝল যে তার জন্য ট্রুড কতখানি করেছে। অসহ্য আত্মগ্লানিতে তার মন ভরে উঠল হায়রে, তার মত একজন দুষ্ট লোকের জন্য নিষ্পাপ এই যুবক তার জীবনটাকে নষ্ট করতে বসেছে। নিজের ওপর আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। চীৎকার ক'রে বেশ কিছুক্ষণ সে নিজেকে 'বোকা, নির্বোধ, গাধা' ব'লে গালা গাল করল।

ট্রুড কোনোটাই গায়ে না মেখে নির্বিকারভাবে বসে রইল।

পাহাড়ের ওপরে বেশ উঁচুতে একটি হ্রদ প্রায় জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। আশে পাশে বিরাট বন—তটরেখা ভেঙে ভেঙে বেশ কয়েকটি পুকুরের মত তৈরী হয়েছে কাশ ও অন্যান্য ঝোপ জংগলে ঘেরা। এ-গুলোয় বেশ মাছ আছে।

এখানে একদিন ট্রুড আর বারুগ মাছ ধরতে এল। একটা পুকুরের দু' পাড়ে দু'খানা পাথরের ওপর বসে তারা ছিপ ফেলে নিশ্চল—আধা আলো, আধা অন্ধকারে জায়গাটা যেন মোহময়; কথা কইতে ইচ্ছাও করে না—প্রয়োজন-বোধও নেই।

হঠাৎ হ্রদের শান্ত জল চঞ্চল ক'রে একটা নৌকা দেখা গেল। নৌকার একমাত্র যাত্রী একটি যুবতী সে মাঝে মাঝে দাঁড় রেখে শাপলা ফুল ছিঁড়ছিল কোনও দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। যতক্ষণ সে দৃষ্টিগোচর ছিল, ততক্ষণ এরা দুজনে প্রস্তরমূর্তির মত স্থির, কিন্তু তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তারা মুখর হয়ে উঠল, যে সহজ, স্বাভাবিক জীবন তারা হয় ত সারা জীবনের মত হারিয়েছে, তারই একটা নিষিদ্ধ ঝলক যেন তাদের চোখ ঝলসে উন্মাদ ক'রে দিল। পাখীদের সচকিত ক'রে তারা বহুদিন পরে প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

বারুগ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে ছোকরা, কেমন দেখলে?--- বেশ সুন্দর, কি বল?'

'কি জানি, ভাল ক'রে দেখিনি; হয় ত সুন্দর কিংবা কুৎসিত।' —বলে ট্রুড নিরর্থক হাসি হাসল।

এই কয়েকটি মুহূর্তেই যেন তারা আরো পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেল।

রাত্রে ট্রুড স্বপ্ন দেখল, যেন হ্রদের বুকে একটা ছোট দ্বীপে ওই ক্ষণিকের দেখা মেয়েটির সঙ্গে সে কথা বলছে এবং সলজ্জ হাসি হেসে তাকে আদর ক'রে চুম্বন করছে। এমন মধুর স্বপ্ন—ট্রুড জোর ক'রে চোখ বুজে রইল, বারুগ-এর জেগে ওঠার সশব্দ প্রস্তুতিকে উপেক্ষা ক'রে। সারাদিন যেন একটা মৃদু শিহরণে তার মন উচ্চকিত।

সন্ধ্যার সময় সে বারকয়েক ইতস্তত ক'রে বারুগকে জিজ্ঞাসা করল যে সে মেয়েটিকে চেনে কিনা।

তীব্রদৃষ্টিতে ট্রুড এর দিকে তাকিয়ে বারুগ বলল,—

'তোমার জানা উচিত বলেই বলছি: মেয়েটির নাম আন, আমার আত্মীয়া।'

শুনেই ট্রুড-এর মনে পড়ল যে এই হচ্ছে সেই যুবতী, যার জন্য বারুগ আজ অরণ্যবাসী। সব ঘটনাই তার মনে পড়ল পড়ল।

মাতৃহীনা, খামখেয়ালী এই মেয়েটির সঙ্গে বারুগ-এর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এ নিয়ে বহু কথা বহু কেলেঙ্কারী হয়েছে। বারুগ-এর স্ত্রী-পুত্র এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে গ্রাম্য পুরোহিতের শরণাপন্ন হলো।

একদিন এক [illegible] পুরোহিত মহাশয় সর্বসমক্ষে বারগ এবং আনকে উপলক্ষ্য করে তিরস্কার-বাণী উচ্চারণ করাতে আন্ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল এবং প্রেমিকার অপমানে উন্মত্ত বারগ পুরোহিতকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হল।

বারগ বলল, 'তখন আন্‌কে যেন দেবীর মত দেখাচ্ছিল। সে আমার কাজের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিল এবং 'সৎভাবে' জীবন যাপনের অনুরোধ জানাল।'

'তোমার মহৎ কাজ আন্‌কে মহীয়সী করেছে'--টর্‌ড মৃদুকণ্ঠে বলল।

বারগ চমকে উঠল। ছেলেটার কি পাপপুণ্য বোধও নেই? পুরোপুরি অদৃষ্টবাদী?

অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বারগ সংগীকে ধর্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করল ---পাপপুণ্য, ভগবানের বিচার, স্বর্গ-নরক, সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা। ভগবান বিশু ও ভগবতী মেরীর কথা বারবার বলল---বলল, ভগবান পাপীদের কী ভয়ানক শাস্তি দিয়ে থাকেন।

সে যতই বলতে লাগল, টর্‌ড এর মুখ ততই ম্লান হতে লাগল এবং ভয়ে তার চোখ বিস্ফারিত হ'ল। কথায় কথায় রাত এল ঘনিয়ে---কালপেঁচার কর্কশ চিৎকারে বনভূমি ক্রমে মুখরিত, তাদের মনে হ'ল যেন শাস্তিদাতা ভগবান তাদের খুব কাছাকাছি এবং প্রতিশোধদাতা দেবদূতেরা বনের ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে পায়ে পায়ে আসছেন।

হেমন্তকালের সঙ্গে এল ঝড়বৃষ্টি বারগ গুহা থেকে বেরোত না, টর্‌ড বনে ঘুরে ঘুরে ফাঁদ পাতত আর ফাঁদে পড়া জন্তু আর শুকনো কাঠ, খাবার জল ইত্যাদি নিয়ে আসত। বনে ঘুরতে ঘুরতে তার কেবলই মনে হত যে কেউ বুঝি তার পিছনে আসছে চুপি চুপি---কিন্তু অনবরত পেছন দিকে তাকিয়েও সে কিছু দেখতে পেত না। অবশেষে দেহে মনে ক্লান্ত হয়ে সে একখানি পাথরের ওপর বসে চারপাশের শুকনো গাছ আর শুকনো পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলত 'তোমরা, আমরা---সবাই পাপী, বারগ বলেছে সে জ্ঞানী, সে জানে। ভগবানের চোখে কেউ পুণ্যাত্মা নয়। কোন উপায় নেই।'

বিভ্রান্ত অবস্থায় গভীর থেকে গভীরতর বনে টর্‌ড ছুটে যেত, কিন্তু এ ধারণা তার কিছুতেই গেল না। সে নিজে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে আরম্ভ করল 'হে ঈশ্বর, বারগ-কে সুবুদ্ধি দাও, সে যেন আপন পাপের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা পায়। আমি জানি, আমার তাকে এ কথা বলা উচিত, কিন্তু আমি তা পারব না।'

বাতাসে ভেসে আসা দেবদূতের কণ্ঠস্বর টর্‌ড শুনতে পেল: 'বার্‌গ কে ধরিয়ে দাও---ধরিয়ে দাও---ধরিয়ে দাও! সে মহাপাপী---তার সঙ্গে থেকো না---সে পাপী---পাপী---পাপী-পাপী।'

টর্‌ড প্রাণপণে দৌড়তে আরম্ভ করল---যেন সে এ কণ্ঠস্বর থেকে অনেক, অনেক দূরে চলে যাবে। কিন্তু যতই দূরে সে যাচ্ছিল ভগবানের নির্দেশ তার কানে যাচ্ছিল অনবরত: 'বারগ পাপী---মহাপাপী। সে ভগবানের উপাসককে নিহত করেছে, অসহায়, নিরস্ত্র অবস্থায়! তার পাপের কোন ক্ষমা নেই---নেই---নেই!!'

উন্মাদের মত টর্‌ড নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে 'হা-হা' করে হেসে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গ্রামের দিকে গেল---যেন কেউ তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

●

বহুক্ষণ পরে শ্রান্ত, ক্লান্ত টর্‌ড গুহায় ফিরে এল। তার মুখের দিকে চেয়ে বারগ চমকে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে তোমার?'

টর্‌ড একদৃষ্টে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। পরে নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর করল, 'বনে আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম; কত কি দেখলাম, কত কি শুনলাম। শ্বেতবস্ত্রপরা সাধুকেও দেখলাম।'

'কি বকছ পাগলের মত।'

'সত্যি বলছি। সারা পথ আমি তাদের দেখেছি, তাদের কথা শুনেছে পেয়েছি; দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করেছি পারিনি। ---মড়ার মত [illegible] পুরোহিতকে বারবার দেখতে পেয়েছি ---তার কাপড়চোপড় রক্তে লাল! কুঠারাঘাতের চিহ্নও দেখছি আমি, স্পষ্ট!'

'টর্‌ড, তুমি কি দেখেছ তা তুমিই জান! কিন্তু আমি পুরোহিতকে ছোরা মেরেছিলাম, কুড়ুল নয়।'

টর্‌ড ভীতভাবে হাত কচলাতে লাগল।

'তারা আমাকে বলেছে তোমাকে ধরিয়ে দিতে।'-- হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই শয়তান পুরোহিতদের প্রেতাত্মারা। তারা আন্-কে এনে আমার চোখের সামনে ধরেছে, অনেক প্রলোভন দেখিয়েছে। চীৎকার ক'রে আমি তাদের বারবার অনুরোধ করেছি আমাকে নিষ্কৃতি দিতে, কিন্তু তারা কিছুতেই তা করেনি, উঃ, কি ভয়ানক দৃশ্য, কি তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর! হাঁ ভগবান।'

টর্‌ড দুহাতে মুখ ঢাকল।

বারগ শান্তভাবে তার কথা শুনল। একটু চিন্তা করে সে বলল, 'টর্‌ড, আমার কথা শোন। তুমি লোকালয়ে ফিরে যাও পুরোহিতের কাছে সব কথা বল খুলে। তা হলেই শান্তি পাবে।'

টর্‌ড্ চীৎকার করে উঠল, 'একা গিয়ে আমি কি করব? তোমার পাপের জন্য আমার এই অবস্থা। বারগ্ আমি নতজানু হয়ে তোমাকে মিনতি করছি, তুমি কেন আমাকে পাপ-পুণ্যের কথা শেখালে? আমি ত কিছু না জেনেই ভাল ছিলাম, তুমিই আমাকে বাধ্য করলে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে। আমাকে এ অন্যায় থেকে বাঁচাও---তোমাকে মিনতি করছি, তুমি নিজে পুরোহিতের কাছে যাও।'

বলতে বলতে টর্‌ড্ তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

বারগ্ তার মাথায় হাত রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। টর্‌ড্-এর ভীতি দিয়ে সে তার পাপের পরিমাপ করতে চেষ্টা করছিল---তার কল্পনায় সে পাপ বাড়তে বাড়তে হিমালয়সদৃশ হয়ে উঠল।

তার মনে হল, সে যেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় তার মন পূর্ণ হয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায়, হায়—আমি কি করেছি, কি ভয়ানক অন্যায় করেছি।'

এই কথা শুনে টরড় লাফিয়ে উঠে বলল, 'তুমি অনুতপ্ত আমার কথায় তোমার হৃদয় গলেছে? তবে চল, চল, শীঘ্র চল। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সময় থাকতে থাকতে চল বারগ্ দোহাই তোমার।'

ভ্রূকুটি করে বারগ্ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি আগেই করে ফেলেছ তোমার ঘৃণ্য কাজ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ করেছি কিন্তু তুমি আর দেরি করো না। এখনও সময় আছে তুমি অনুতপ্ত, কাজেই আর ত তোমার পাপ নেই।—চল, আমরা এখান থেকে পালাই।'

অসহ্য ক্রোধে কাঁপতে লাগল বারগ্ রক্তচক্ষু মেলে সে তার কুঠারের দিকে তাকাতেই টরড় বুঝতে পারল যে তার জীবন সঙ্কটাপন্ন। কোন কিছু ভাববার আগেই সে বারগ্-এর গলা শুনতে পেল 'চোরের ছেলে চোর।—আমি তোকে বিশ্বাস করেছিলাম, ভালবেসেছিলাম।'

ভীত, প্রায় উন্মত্ত টরড় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নিজের কুঠার টেনে নিয়ে সবলে বারগ্-কে আঘাত করল। ছিন্নমূল বনস্পতির মত বারগ্ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, রক্তে ভেসে গেল গুহা। হতবুদ্ধি টরড় প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে দেখল বারগ্-এর মাথায় কুঠারাঘাতের ক্ষত, যা থেকে লাল রক্ত বেরোচ্ছে স্রোতের মত।

এবং গ্রামের লোকের যখন এসে পৌঁছল, তখনও টরড় ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়েছিল। তারা টরড়-কে প্রশংসা করল, তার স্বর্গলাভের নিশ্চয়তা তাকে বলল দৃঢ়ভাবে। টরড় এক মুহূর্তে পলাতক চোর থেকে নাটকীয়ভাবে গ্রামের বীরপুরুষ পদে উন্নীত হল।

বিহ্বল টরড় তার দু'হাত জড়িয়ে ধরল, সে দেখতে পেল রক্ত—তার বন্ধুর রক্তে তার দু'হাত রঞ্জিত। সে তাকিয়েই রইল, কোন কথা বলল না বেশ কিছুক্ষণ।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অতি মৃদুকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'ভগবান সর্বশক্তিমান।'

হাঁটুগেড়ে বসে টরড় মৃদুকণ্ঠে বারগ্-কে কত কথা বলতে লাগল, সাশ্রুনেত্রে তার কাছে ক্ষমা চাইল, তাকে উঠে বসাতে অনুরোধ করতে লাগল; যতক্ষণ না গ্রামবাসীরা মৃতদেহ অপসারিত করল, ততক্ষণ সে সেখানেই বসে রইল।

তারপর, সবাইকে উদ্দেশ্য করে সে দৃঢ়স্বরে বলল, 'আন্-কে বোল তোমরা, বারগ্ তার জন্যই পাপ করেছিল—নিজের জন্যে নয় এবং চোরের ছেলে টরড় তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তারই কাছ থেকে পাপ-পুণ্যের বিচার শিখে।'

অনুবাদকা—বিভা চৌধুরী

ব্যাকুলতা নাহি মোর মনে

ছন্দা

অশান্ত সাগর মাঝে আর্তনাদ করিছে জীবে
পরিত্রাণ পাইবার লাগি
দুষ্টের দমন লাগি শিষ্টের পালন করি
জপিতেছি মন্ত্র দিবানিশি।

পুরস্কার ডাকিছে দৈবেরে মিলন হও আমাসনে
প্রকৃতির রাখিতে সম্মান
ভবে যত নরাধম বাড়িছে অনলসম
জলধরে ডাকি আন ত্বরা।
সুখভক্তির সুখানলে দিক আহুতি সকলে
ব্রহ্মাগ্নির করিয়া বিস্তার
সুধীজন কে আছ সংসারে সুখতারে নিয়ে ক্রোড়ে
এগিয়ে চলো বিশ্বমাঝে।

সুখ দুঃখ পরিহরি মান অপমান পদদলি
করে শুদ্ধ কুমাতৃকা সাথী
জীবত্ব তোমার মাঝে অনুরক্ত হও কাজে
রিপুগণ আপনি দমিবে।
যমদণ্ড তব কাছে মত্ত হইও না কাজে
পুরস্কার বলিছে দৈব
ঘরে বাইরে জীব তুমি আনাগোনা কেন করে
আলস্যে কাটাও কাল

মনোমধ্যে ক্ষণকাল শান্তি করে আছে কার
চিন্তানলে দহিছে সকলে
পাপরিপু প্রবঞ্চনা পরিহরি সর্বজনা
সত্যকে করহ আলিঙ্গন
তখনি জীবত্ব পাবে দুষ্টজনে সংহারিবে
প্রকৃতির পাবে সমর্থন।
জীবনে থেকে আমি পেয়েছি দৈববাণী
মানবেরে করি সমর্পণ।
ব্যাকুলতা নাহি মোর মনে।

'পূর্ব-প্রকাশিতের পর'

লাট-কুঠির পিছনে প্রকাণ্ড বাগান। গভর্নর রেনোর বাগানের সখ, দিশী বিদেশী অনেক ফুলের গাছ সংগ্রহ করে এনেছেন তিনি, এ বিষয়ে অনেক বইও আনিয়েছেন। কোন চারাগাছটির কীভাবে যত্ন করতে হবে সেসব অনেক কিছু মালিরা শিখেছে তাঁর কাছে। ফরাসীরা সৌন্দর্যের উপাসক, তার ওপরে রেনো নিজে অতিমাত্রায় সৌখীন, তার পরিচয় বাগানের প্রতি কোণে।

একটা বড় ফোয়ারার জল পড়ছে ঝিরঝির করে। ফোয়ারাটির পাঁচটি মুখ পাঁচটি হাতির শুঁড়ের মতন, শ্বেতপাথরের তৈরী। একটু দূরে শ্বেত পাথরে বাঁধানো বসবার জায়গা। রৌশন ও রাবেয়া বসে আছে। রৌশন গুনগুন করে একটা উর্দু গজল ধরেছে। কী মিষ্টি গলা, কী মিষ্টি সুর।

পাইক এসে খবর দিল মৈনুদ্দীন সর্দার বাইরের ফটকে দাঁড়িয়ে সেলাম পাঠিয়েছে। কোনো খবর না থাকলে ও আসেনা। হুকুম হলো হাজির হতে।

'সেই সাহেবকে পাকড়াও করে এনেছি, বেগম সাহেব।'

'কোন সাহেব?'

'ফৌজী সাহেব।'

রাবেয়ার বুকের ভিতর ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে শোণিতের বেগ। কতদিন আসেনি এখানে, কিন্তু বারে বারে মনের দরজায় ঘা' দিয়ে যায় তার স্মৃতি। ভুলতে চেষ্টা করলেই কি ভুলে থাকা যায়?

মৈনুদ্দীন ডেকে আনতে গেল। 'সিলভেস্টারকে গ্রেপ্তার করে এনেছে, রাবেয়া, ভালই হলো।'

রাবেয়া বুঝতে পারেনি কথাটা। 'ও ইংরেজ, গ্রেপ্তার করাটা কী ভাল হয়েছে?'

রৌশন হাসে।

মৈনুদ্দীনের পেছনে লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার, তার পেছনে মোটা বাঁশের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা একটি প্রকাণ্ড বাঘের মৃতদেহ, জমাট রক্ত লেগে আছে, গলায় মুখে। সিলভেস্টার টুপি তুলে অভিবাদন জানালো, রাবেয়ার চোখে চোখ পড়তে মাথা নীচু করলো। ওকে সে দেখেছিলো সালোয়ার কামিজ পরা, আজ শাড়ি পরে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

আবার মুখ তুললো সিলভেস্টার। অস্তমান সূর্যের স্বর্ণচ্ছটা মুখে এসে পড়েছে রাবেয়ার, আকর্ণ বিস্তৃত বিলোল নয়নে স্বচ্ছ গভীরতা, রেশমের মত কোমল কৃষ্ণকবরী, মেহেদি রঞ্জিত ওষ্ঠপল্লব, কম্বুজ কণ্ঠ, অনাঘ্রাত যৌবনের স্বর্গীয় লাবণ্যে মণ্ডিত হ্রস্ব কাচুলিবদ্ধ উদ্ধত বক্ষপুট, ভুজঙ্গসম লীলায়িত বাহুবল্লরী। এ তো সেই নদীবক্ষের শঙ্কিতা বিবর্ণমুখী চকিত-হরিণী নয়? সিলভেস্টার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'তুমিই মেরেছো বাঘটাকে?' জিজ্ঞাসা করে রৌশন। বিস্ময় ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে।

'না হলে ম্যাডাম আমাকেই ওর পেটে যেতে হতো। দু'টির একটিকে বাঁচতে হবে, অন্য পথ ছিল না।'

মৈনুদ্দীন উল্লাস চেপে রাখতে পারে না। 'এত বড় বাঘ কখনো দেখিনি আগে। এ-সাহেব ছাড়া আর কেউ সামনে দাঁড়াতে সাহস পেতো না। যাচ্ছিলাম কুমীরডাঙ্গার জঙ্গল দিয়ে, দেখি সাহেব জানোয়ারটা খতম করে চুপ করে বসে কী ভাবছে।'

'ভালই করেছো মৈনুদ্দীন এখানে নিয়ে এসে। যারা এনেছে তাদের মোটা বকশিস দিয়ে দাও। চল আমার সঙ্গে।'

সিলভেস্টার এবং রাবেয়া। আর কেউ নাই। কথা খুঁজে পায়না ওদের দুজনের একজনও। কিছুক্ষণ কেটে যায়।

'তোমার সেই রুমালটি, লেফটেনেণ্ট।' জামার নীচে বুকের কাছে ছিল।

রুমালটি ঘেটি ভিজিয়ে সিলভেস্টার তার কপালে রেখে হাওয়া করেছিল।

'সেদিন ফিরিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

রাবেয়ার নবনীত অঙ্গের সুবাস লেগে আছে রুমালটিতে।

'ধন্যবাদ মিস রাবেয়া।'

'ওখানে কী হয়েছে তোমার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে রাবেয়া। সিলভেস্টারের ঘাড়ের কাছে বাঘের নখের আঁচড়, রক্ত জমাট হয়ে আছে।

'নখ বসাতে পারেনি বাঘটা, ঘুষি দিয়ে ফেলে দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিলাম।

দিব্যদর্শী

রাবেয়ার উদ্বেগ বেড়ে যায়। রুমালটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে দিতে বলে 'একা একা আর জঙ্গলে যেয়ো না, আমার কাছে কথা দাও, রবার্ট।'

রাবেয়ার প্রথম স্পর্শ, প্রথম এই নাম ধরে ডাকা। সিলভেস্টারের দেহের সবটুকু রক্ত যেন আছাড় খেয়ে পড়লো তার বুকে মুখে। হাত রাখে রাবেয়া সিলভেস্টারের কপালে, 'জ্বর আসেনি তো?'

●

নৈশ ভোজের টেবিলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে রৌশন ও রাবেয়া। রেনোও আজ আগের দিনের মত গম্ভীর হয়ে নাই। বাঘটাকে মেপে দেখা হয়েছে, নাক থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত দশ হাত। রেনো বললেন সুন্দরবনের আসল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। সিলভেস্টার শুধু জবাব দিয়ে চলেছে বাহাদুরি দেখানোর কোনো চেষ্টা নাই। বেশ খুশি হলেন রেনো।

সিলভেস্টার বলে জঙ্গল তার ভাল লাগে। জঙ্গলের নির্জন পরিবেশে প্রকৃতির শান্ত গভীরে সে যেন নিজেকে খুঁজে পায়।

'তবে প্রাণী হত্যা কর কেন?' জিজ্ঞাসা করে রাবেয়া। আজ ও বেশী কথা বলছে।

'শিকার উপলক্ষ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। জঙ্গলের একটা রূপ আছে, প্রাণ আছে, ভাষা আছে। চোখ মেলে চেয়ে থাকি, কান পেতে শুনি।'

অল্প সময়ের মধ্যে লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার যেন আপন হয়ে উঠেছে এদের। আপন করে নিতে সবাই পারে না, জানে না। জানলে এবং পারলে আপন হয়ে উঠতে হয়। রাবেয়ার সংকোচ কেটে গেছে। গভর্নর রেনোর একটু সন্দেহপূর্ণ বিরাগ ছিল এই ইংরেজ যুবকের সহসা আবির্ভাবে সেদিন রৌশনের সঙ্গে, সে সন্দেহ ও বিরাগের মেঘ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে। রৌশনের স্নেহপুটে এই বিদেশী ছেলেটি দখল করে নিয়েছে আক্রামৌদ্দৌলার স্মৃতি। 'সিলভেস্টার' বলছে না কেউ, বলছেনা 'লেফটেনেণ্ট', ডাকছে শুধু রবার্ট বলে।

রেনো ছুরি দিয়ে প্লেটে মাংসের টুকরো কাটছিলেন, কাঁটা দিয়ে মুখে তুলবার আগে বললেন, 'জঙ্গলে ভীষণ ভীষণ জানোয়াররা বাস করে, সেকথা ঠিক, কিন্তু, আমাদের মনেও আরও তো ভীষণ জঙ্গল? কামনা বাসনা পরশ্রীকাতরতা লোভ অহংকার যেন গোখ সে জঙ্গলে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। বাঘ ভালুক সাপের চাইতেও ওগুলো বেশী ভয়ঙ্কর, কি বল রবার্ট? কিন্তু বয়স তোমার কম, অভিজ্ঞতা হতে দেরী আছে।'

'কিন্তু জঙ্গলে হরিণও থাকে, সুন্দর সুন্দর পাখীও থাকে, নয়কি?'

'যেমন তুমিও মাঝে মাঝে থাকো, রবার্ট,' বলে উঠলো রৌশন।

হেসে উঠলো সকলে। 'এখন খাবার দিকে মন দাও তো? খেয়ে দেখো বাঘের মাংস রাঁধলে কী চমৎকার আস্বাদ।'

মিটি মিটি হাসে সিলভেস্টার। 'বাঘ যদি মানুষের মাংস খায় তবে মানুষ বা কেন বাঘের মাংস খাবে না? আমাদের দেশে বাঘ নেই, তাই শিখে ওঠেনি যে ও মাংসটাও খাওয়া যায়। কিন্তু এটা কী তা তো বুঝতে পারছি না, খাসা হয়েছে।'

'শজারুর মাংস। শুয়োরের মাংস থেকেও বেশী আস্বাদ।'

'তার উপর ফরাসী রান্না, চমৎকার। আমাদের ফোর্ট উইলিয়ামের খানা কেবল খিদের জ্বালায়ে খেতে পারা যায়। রোজ গরুর মাংস, এত শক্ত যে মনে হয় মোষের মাংস।'

রাবেয়ার চোখ ছলছল করে উঠলো শুনে, কেউ দেখতে পায় ভয়ে মুখ নীচু করে খেতে লাগলো।

রৌশনেরও ভাল লাগলো না। এই বয়েসে সবাই খেতে ভালবাসে, নানারকম খেতে ইচ্ছা করে, বললো, 'মাঝে মাঝে এসো এখানে, লজ্জা করো না।'

সিলভেস্টার মাঝে মাঝে আসে। রাবেয়ার খুব ভাল লাগে, সময়টা বেশ কেটে যায়। সিলভেস্টারের হয়তো আরো বেশী ভাল লাগে, কে জানে? বুঝতে পারে না রাবেয়ার আয়া ঐ সাহেব এলে তোতিবেগম একটু বেশী যত্ন করে সাজগোজ করে কেন, সাজিয়ে দেবার সময় আয়ার কানে ফুসফুস করে কেন।

কথায় কথায় একদিন উঠলো ওর বাপের কথা। একটা কাপড়ের কলের মালিক ছিলেন, বিস্তর টাকা রেখে গেছেন, ও তখন খুব ছোট ছিল, কলটি বেহাত হয়ে যায়।

'খাওয়া পরার ভাবনা নাই, অথচ তুমি বিদেশে বেরিয়ে পড়লে কেন?' প্রশ্ন করে রৌশন।

'নতুন দেশ, নতুন জাত, নতুন ধরণের জীবন দেখবার জন্য।'

বিয়ের কথা ভেবে দেখেছো? তখন তো তোমার আর এখানে সেনাবিভাগে চাকরি করা ভাল লাগবে না? পোষাবেও না?'

'আমাদের দেশে কেউ একুশ বছরে বিয়ের চিন্তা করে না, আমিও এখনো করিনি।'

'তোমাদের দেশের মেয়েরা কেমন?'

'কেবল সাজতে গুজতে ভালবাসে, ঘরকন্নার ও ভোগতৃষ্ণার বাইরে তাদের মন যেতে চায় না। পুতুলের মত তারা, চিন্তাশক্তি উঁচুতে উঠতে চায় না।

'দেশে ফিরে যদি সংসারী হতে চাও তো কী রকমের মেয়ে চাও তুমি?'

'যার হাসির ভিতরে প্রাণের উচ্ছলতা থাকবে, ভাবের স্পন্দন থাকবে, গান ভালবাসবে, কবিতা ভালবাসবে। মনের মিল না হলে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। দুইটি মন এক তালে চলবে, এক সুরে বাজবে, তবেই তো হবে শান্তির সংসার?'

কথাগুলো একনিঃশ্বাসে বলে ফেলে লজ্জা পেলো সিলভেস্টার। রাবেয়া প্রত্যেকটি কথা গভীর মনোযোগে শুনছিলো।

'আমাদের দেশের মেয়েদের তোমার

কেমন লাগে?' আবার প্রশ্ন করে রৌশন।

'বলতে পারি না, ম্যাডাম, তোমাদের দুজনকে ছাড়া আমি কাকেই বা চিনি?'

কেন রবার্ট, কলকাতায় ও জিনিসটার তো অভাব নাই শুনি? আর্মাণি ফিরিঙ্গী মেহেন্দী ইহুদী দিশী রূপোপজীবিনীর ছড়াছড়ি ওখানে?'

কান দুটি লাল হয়ে উঠলো সিলভেস্টারের। 'ও দিকে আমার কোনো আগ্রহ নেই, বরং ঘৃণা আছে। মন যা চায় না সেটা পাওয়ার মধ্যে আছে আত্মার অপমান, আত্মার অপমান হলে মানুষ নিজের কাছেই ছোট হয়ে পড়ে প্রতিশোধ নেয় নিজের উপরে একদিন না একদিন।'

রৌশনের মনে আসে রেনোর অতীত জীবনের কাহিনী। নিজে বড় ঘরের ছেলে, কিন্তু অবস্থা সমান যায় না চিরদিন, ভাগ্য স্রোতে যখন ভাঁটার টান সুরু হয়েছে তখন বিয়ে করলো আরো বড়ঘরের একটি মেয়েকে। ধন গর্বিতা রূপগর্বিতা সেই নারী উচ্চাভিলাষী ভাবপ্রবণ এবং উচ্চশিক্ষিত এই তরুণ হৃদয়ের দিকে তাকালো না, গৃহমধ্যে নিরন্তর গঞ্জনা ও বন্ধুদের সামনে অযথা সমালোচনায় করতো অপমানিত, স্বামীর সকল ইচ্ছায় বাধা দান এবং ইচ্ছামত পরিচালনার প্রয়াস ক্রমে ভালবাসার বদলে বপন করলো তিক্ততার বিষবৃক্ষ। রেনো মর্মাহত হয়ে চলে এলেন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে চন্দননগরে। গভর্নরের পদে এমনি একজনকে চেয়েছিল কোম্পানীর ডিরেক্টররা। রেনোকে ভালবাসা দিয়েছে রৌশন, শান্তি দিয়েছে, তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণমাত্রায় মর্যাদা দিয়েছে; যা দিয়েছে তার চেয়ে হয়তো বেশীই পেয়েছে, রৌশন কৃতার্থ।

দিদিকে অন্যমনস্ক দেখে রাবেয়াই জিজ্ঞেস করলো 'যে কবিতা ভালবাসবে গান ভালবাসবে, ছবি আঁকবে সে তোমার মত স্বামী পছন্দ করবে কেন?'

মিটি মিটি হাসে রাবেয়া।

'হয়তো যা চাইবে তার কিছুটা পাবে, কিছুটা পাবে না। দুজনকেই কিছুটা ছাড়তে হবে, কিছুটা নতুন করে গড়তে হবে। এই চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে ছাড়বার আনন্দ আছে, গড়বার আনন্দ আছে। সৈনিকের জীবন আমার পেশা নয়, হয়তো সাময়িক নেশা।'

'কোনো নেশাই ভাল নয় রবার্ট লেফটেনাণ্টের উর্দীর পেছনে যদি তোমার ভাববিলাসী মনকে বেশী দিন চেপে রাখো তবে তোমার দেহ ও মন দুটিরই ক্ষতি হতে পারে।'

রৌশন কখন উঠে গিয়েছিল ওরা লক্ষ্য করেনি। ইতস্তত করে সিলভেস্টার বলে, 'রাবেয়া দেহের ক্ষতি হচ্ছে কিনা বুঝতে পারি না, কিন্তু মনের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে বুঝতে পারি।'

রাবেয়ার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সিলভেস্টারের চোখে তাকাতে পারে না।

'সে ক্ষতির কারণ ভেবে ঠিক করতে পেরেছো কী, রবার্ট?'

সিলভেস্টারের শরীর যেন কাঁপছে। ভাঙা গলায় বললো 'কারণ তুমি, রাবেয়া।'

॥ চার ॥

গভর্নর রেনো কুঠির আপিসঘরে বসে কাজ করছিলেন। গভর্নরগিরিও চাকরি। বড় চাকরি মোটা মাইনের মাশুলও দিতে হয় বেশী। ঝক্কি ঝামেলা মতবিরোধ দুশ্চিন্তা সেই মাশুল। কোম্পানীর বড়কর্তারা বসে আছেন ছ' হাজার মাইল দূরে, এদেশের সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা নাই। যেটাকে 'হাঁ' বলা উচিত সেটাকে 'না' বলেন, যেটাকে 'না' বলা উচিত সেটাকে হাঁ বলেন। এদিকে নবাব মাথার উপরে বসে আছেন মুর্শিদাবাদে, উদ্ধত অকর্মণ্য ইন্দ্রিয়বিলাসী। হুগলীতে তাঁর ফৌজদার শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে বিদেশী বণিকদের উপরে এবং বাগে পেলে হয়রাণ করছে।

একখানি চিঠি পড়ছিলেন রেনো। পরিচয়পত্র স্বাক্ষরে প্রকাশ পত্রলেখক এই কোম্পানীর একজন বড়কর্তা, রেনোর বিশেষ পরিচিত। লিখেছেন এই পত্রবাহক পিয়েরে অ্যালবার তার বিমাতা কন্যার বিশেষ বন্ধু পরিবারের লোক, চন্দননগরে আসছে চুরুট কোম্পানী অংশীদার হয়ে, মঁশিয়ে-লা-গভর্নরের সঙ্গে পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই এই চিঠি লিখছেন তিনি।

আগন্তুকের চেহারায় দৃঢ়তা ও কর্মশক্তির ছাপ। সুশ্রী বলা যেতে পারে, বোধ হয় ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে। রেনো ভুলে যান যে তিনি নিজেও ত্রিশের কোঠা ছাড়িয়ে যাননি। পদ মূলত গাম্ভীর্য ও দায়িত্বের গুরুভার অন্যের কাছেও তাঁর বয়সকে মেধাবৃত্ত করে রেখেছে। সৌজন্য বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন স্বদেশের বাইরে তাঁর এই প্রথম অভিজ্ঞতা কি রকম লাগছে।

'প্রথম নয় মঁসিয়ে গভর্নর, এদেশে আগেও কয়েকবার এসেছি, চন্দননগরেও আগে এসেছি। তবে কারিকল, মাহে, পন্ডিচেরী ও এখানে দু-তিন দিনের বেশী একসঙ্গে থাকিনি। ফ্রাঙ্কো-ওরিয়েন্টল জাহাজ কোম্পানীতে আগে কাজ করতাম, জাহাজে এসে জাহাজেই চলে গিয়েছি, দেখবার শুনবার সুযোগ হয়নি। এখন সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

স্বদেশের কথা, স্বদেশের আত্মীয় বন্ধুদের কথা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে। সেই প্রসঙ্গে অনেকটা সময় কাটলো। রেনো অ্যালবারের উপর খুশিই হলেন, শিক্ষাদীক্ষা ভালই, চালাকচতুর ব্যক্তিত্ব আছে।

অ্যালবার ভিতরে ভিতরে উসখুস করছিলো। মাদাম রৌশনের কথা জিজ্ঞাসা করলে গভর্নর কী ভাববেন? সম্পর্কটি ধর্মবিরুদ্ধ এবং সত্য বলতে গেলে সমাজ-বিরুদ্ধও বটে, তবে এটাও অ্যালবার জানে যে, এদেশের শ্বেতাঙ্গ সমাজে এটি এমন বিস্তার লাভ করেছে

হে, লজ্জা বা কলঙ্ক বলে কিছু নেই। নির্বিচারে অথবা বিচারবুদ্ধির বাধা অতিক্রম করে যা সকলে একবার গ্রহণ করে সেটাই হয়ে যায় চালু। প্রয়োজনের তাগিদে, বহুর স্বার্থে, যেটা হয়ে যায় চালু—সেটা সমাজের বুকে নিশান উড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে। কিন্তু মাদামের সঙ্গে পরিচয় আছে তাই বা বলা যায় কেমন করে।

বলি-বলি করে বলে ফেললো অ্যালবার 'মাদাম রৌশনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হবে কী এখন?'

রেনো বিস্মিত হলেন। 'তাকে তুমি চেনো?'

ইতস্তত করে অ্যালবার জবাব দিল 'সামান্যই জানি।'

'তোমার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন?'

'তাঁর অভিরুচি।'

বসবার ঘরে সাক্ষাৎ হলো দু'জনের।

'চিনতে পারছো মাদাম?'

'না চিনতে পারলেই বোধ হয় ভাল হতো? কিন্তু আজ এসেছো অতিথি হয়ে, ক্যাপ্টেন অ্যালবার, চিনতে পারা আমার উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার দুঃখও হয় যে, আরো কতগুলি হতভাগা হতভাগিনীর দুঃখের দিন প্রভাত হয়েছে বোধ হয়।'

'সে আশঙ্কার হেতু নেই, মাদাম, জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে এবার আসিনি, এসেছি যাত্রী হয়ে। চলে যেতে আসিনি এবার, এসেছি থাকতে।'

'আগের বার জাহাজ কোম্পানীর দোষ দিয়েছিলে, এখন নিশ্চয়ই নিজেই চালাবে সেই ব্যবসা? খুব বেশী লাভ হয় এ ব্যবসায়, তাই নয়?'

'অকারণে কটাক্ষ প্রয়োগ করছো মাদাম, ব্যবসাই করতে এসেছি বটে, তবে সেটা চুরুটের ব্যবসা। এখন বসতে বলবে কি দয়া করে?'

রৌশন খুশি হয়নি ক্যাপ্টেন অ্যালবারকে দেখে, বসতেও বলেনি, সৌজন্যবোধ লোপ পেয়েছিল ক্রোধের আবেগে, এখন লজ্জিত হলো।

'বোস ক্যাপ্টেন, আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো।'

রৌশন ডান হাত বাড়িয়ে দিতে অ্যালবার অভিবাদন করে সে হাতে ওষ্ঠযুগল স্পর্শ করলো ফরাসী প্রথায়।

'স্যাম্পেন?'

'আপত্তি নেই মাদাম।'

'বলিঙ্গার, পমেরী, ক্লীকো, কোনটা পছন্দ?'

'ধন্যবাদ মাদাম, বলিঙ্গারই স্যাম্পেনের রাজা।'

অ্যালবার কথা বলছিল ধীর-সহজ ভাবে, কিন্তু ভিতরে তার চঞ্চলতা। এক চুমুকে গেলাসটি শূন্য করলে সরাব-বরদার আবার পূর্ণ করে দিল। রৌশন নিজের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'চুরুটের কারখানা তো এখানে রয়েছে একটা, আর একটা খুলতে চাও? জাহাজের চাকরি কি হলো?'

'সেটা ছেড়ে দিয়েছি মাদাম, যা কিছু সঞ্চয় হয়েছিল তাই দিয়ে এখানকার চুরুটের কারখানাটার একটা অংশ কিনেছি।'

'ওটা তো মঁশিয়ে দেলার্দের?'

'দেলার্দ একা মালিক ন'ন, বড় অংশীদার থাকেন মার্শেলস-এ।'

অ্যালবারের গেলাস আবার ভরে দিল সরাব-বরদার।

'একটা অনুরোধ আছে মাদাম, রাখবে কী?'

রৌশন খুশি হয়েছে। ঐ চাকরি ছাড়বার হেতু রৌশন নিজে, কল্পনা করে আত্মপ্রসাদও বোধ করলো সে।

'আমার অনুরোধ একদিন রেখেছিলে মনে আছে?'

'তোমার হাতে ছিল পিস্তল।'

'পিস্তল দেখে তুমি ভয় পাওনি আমি জানি।'

'ভয় পেয়েছিলাম তোমারই ঐ সুন্দর চোখে ঘৃণার বহ্নিশিখা দেখে।'

'তোমার চোখে ফুটে উঠেছে একটা কাতরতা, সত্যি নয় মঁশিয়ে অ্যালবার।'

'মঁশিয়ে অ্যালবার নয়, শুধু পিয়েরে বললে কৃতার্থবোধ করবো।'

'বেশ তাই ভাল, বল পিয়েরে তোমার কি অনুরোধ।'

'তোমার সেই বোন এখানেই আছে আমি জানি, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা জানাতেই আমার আসা। সম্ভব হবে কী?'

'আসবে কিনা জানি না, ডাকবো তবে চেষ্টা করে দেখি।'

রাবেয়া এল। ক'মাস ধরে অ্যালবার যে মুখটি এক দিনের তরেও ভুলতে পারেনি—সেই মুখ, সেই সুষমামণ্ডিত দেহবল্লরী, সেই গতি, ছন্দ। অ্যালবারের জাগ্রত চেতনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে সেই তন্দ্রালোকের স্বপনচারিণী। [illegible]।

'মাদামোয়াজেল,' কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো অ্যালবারের, পারতো, হলো। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

রাবেয়া মুখ ফিরিয়ে নিল।

'এটা তোর অন্যায় রাবেয়া, পিয়েরে এখন এখানে আমাদের অতিথি, অনুতপ্ত হয়ে ছুটে এসেছে ক্ষমা চাইতে, সে চাকরিও ছেড়ে দিয়ে এসেছে, মুখ ফিরিয়ে নিস না।'

দিদির উপরে রাগ হলো রাবেয়ার—হচ্ছে রাগ, হেসে কথা বলতে হবে?

মানুষ যতদিন সভ্যতার আলোক পায়নি ততদিন মনে-মুখে এক ছিল। সভ্যতা আনলো কপটতা প্রতারণা ছলনা অহংকার। রোগের বীজাণুর মত সভ্যতার দেহে এরা ছড়িয়ে পড়েছে। মনের ভাব যা-ই থাকুক না কেন সংসারী মানুষকে কখনো কখনো কপটতার মুখোস পড়তে হয়। যে যে রকম নয়, সাজতে হয় তাকে সেই রকম, ষড়রিপুর প্রায় সব ক'টাকেই ভদ্রতা ও শালীনতার পরিচ্ছদে সেজে-গুজে থাকতে হয়।

রৌশন কৌতুক ভালবাসে, বললো, 'পিয়েরে, ক্ষমা চাইবার রকমটি তুমি জানো না। হাঁটু গেড়ে বসে, মাথা নীচু করে, ছলছল চোখে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে ক্ষমা চাইতে হয় নারীর কাছে।'

রাবেয়া হেসে ফেললো। 'ধোৎ, ও সব ঢং করার দরকার নেই।'

রাবেয়ার কথা বুঝতে পারলো অ্যালবার কারণ সেটা বলেছিল বাঙলায়, পকেট থেকে একটি চামড়ার ছোট বাক্স বার করে ধরলো রৌশনের সামনে। 'মাদামোজেলের জন্য সামান্য একটি উপহার, গ্রহণ করলে বুঝবো ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।'

দুটি হীরার দুল চকচক করে উঠলো বাক্সটি খুলতে। রৌশন বললো, 'বা: কী চমৎকার, নে রাবেয়া তোকে মানাবে ভাল। পিয়েরে তোমার পছন্দ আছে বলতে হবে, হাঁটু গাড়তে আর হবে না, সেটা মাপ করা হলো।'

'মাদামোজেল কানে পড়লে দেখে যেতাম একটু' সাগ্রহে বলে উঠলো অ্যালবার। তার মুখেও এতক্ষণ পরে হাসি ফুটেছে, রাবেয়ার চোখ দুটি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে।

'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন।'

'আর ক্যাপ্টেন নই মাদামোজেল রাবেয়া, সে জীবন ফেলে এসেছি পেছনে, এখন শুধু পিয়েরে, মাদামও এই নামে ডাকছেন এইমাত্র শুনলে।'

'ধন্যবাদ পিয়েরে।' ডান হাত বাড়িয়ে দিল রাবেয়া। ওষ্ঠাধর স্পর্শ করলো অ্যালবার সেই চম্পককলির পল্লবদলে। হাত টেনে নিলো রাবেয়া, এ সর্পদংশনের মত জ্বালাময় স্পর্শ।

●

ফেস্তার উৎসব। ফরাসীদের জাতীয় উৎসব। প্রতীক্ষা করে ফরাসী সমাজ সারা বছর এই দিনটির জন্য। ঘুমন্ত চন্দননগর যেন জেগে উঠেছে।

অসভ্য অর্ধসভ্য সুসভ্য সকল সমাজ, সকল জাতিরই নিজস্ব কয়েকটি উৎসব থাকে। মানুষের মন খোঁজে আনন্দ, ব্যক্তিগত আনন্দ, গোষ্ঠিগত আনন্দ। ধর্মীয় ও জাতীয় স্মরণীয় ও বরণীয় দিনগুলি উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হলো আনন্দ করা, আনন্দ দেওয়া। মানুষ এসেছে খণ্ড আনন্দলোক হতে জন্মমৃত্যুচক্রের অবসানে ফিরে যাবে আবার সেই নিঃসীম আনন্দলোকে, তাই আনন্দের তৃষ্ণা তার চিরন্তনী। মানুষ হাসতে জানে, ইতরপ্রাণীরা হাসতে পারে না। মানুষ আকাশের দিকে সোজা উর্ধ্বে তাকাতে পারে, ইতরপ্রাণীরা পারে না। মানুষের মননশীল চিত্ত আছে, ইতরপ্রাণীর আছে কেবল চেতনা ও সহজাতপ্রবৃত্তি।

সভ্য জাতরা অসভ্য এবং অর্ধ-সভ্যদের ঘৃণা করে, কিন্তু অসভ্য ও অর্ধসভ্যদের ভাবধারার পরিণতিই এই সভ্যতা। অনেক সম্পদ ঐ অসভ্য ও অর্ধসভ্যরা রেখে গেছে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে, যার উত্তরাধিকারী হয়েছে বর্তমানের সভ্যতা। এ যুগের লোকাচরিত উৎসবগুলি সভ্য মানবের উদ্ভাবনী নয়, লক্ষ বছর আগেও আদিম সমাজে উৎসব অনুষ্ঠান ছিল।

লাট-কুঠী, কেল্লা, কোম্পানীর আপিসগুলি ফরাসী ও দেশীয়দের অনেক বাড়ি নিশান ও ফানুস দিয়ে সাজানো হয়েছে। গঙ্গার পারে কেল্লার মাঠে বসেছে মেলা। তাউৎখানার বাগানে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে, কোম্পানীর খরচায় সরবৎ বিলি হচ্ছে। সন্ধ্যার পরে সারি সারি আলো জ্বলে উঠবে সাহেবপাড়ায়। এদিনকার খাজনা সেলামি সব মকুব।

মধ্যাহ্নভোজে শহরের যাবতীয় ফরাসী ভদ্রলোক মিলিত হবেন গভর্নরের কুঠীতে। তারপরে নৌকা-বিহার, রাত্রে আবার গভর্নরের কুঠিতে নৈশভোজ, তারপরে নাচ-গান।

পন্দিচেরীতে গভর্নর জেনারেল দ্যুপ্লের ফরাসী সহধর্মিণী আছেন। ভোজসভায়, নাচের মজলিশে, অনুষ্ঠান পর্বাদিতে গভর্নর জেনারেলের সহকারী বামাবলে যাবতীয় উৎসবে গৃহকর্ত্রী হিসাবে তিনিই অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করেন। আরো কয়েকজন ফরাসী মহিলা আছেন সেখানে, চন্দন-নগরের মত শ্বেতাঙ্গিনী বিবর্জিত নয় পন্দিচেরী। গভর্নর রেনো এবং চন্দন-নগরের অন্যান্য ফরাসীপুঙ্গবদের শামাজিন। জীবনসঙ্গিনীদের এইসব সামাজিক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ হয় না। যা পরোক্ষে অন্তরালে প্রচলিত তার অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়। জাতিগত ধর্মগত এবং সমাজগত সংস্কারের বাধা-নিষেধ ও বর্ণগত কৌলীন্যের দম্ভ সব দেশেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। প্রকৃতিগত ভাবে মানুষ রক্ষণশীল।

ফেস্তার উৎসবে আমন্ত্রিত শ্বেত বর্ণাকাদলে কোম্পানীর দেওয়ান জগন্নাথ চৌধুরী একটিমাত্র কৃষ্ণবারস তুলনাটি অবশ্য আপেক্ষিক। ফরাসী-দের পাশে কৃষ্ণকায় দেখালেও স্বদেশীয়দের পাশে বলা যেতে পারে ঘনশ্যাম। নর-নারায়ণ যে-জন্যে বৃন্দাবনে উদয় হলেন সে-জন্যে তাঁর দেহের বর্ণ কী ছিল ভাল বোঝা যায়-নি। শ্রীদাম সুদাম সখাদের সঙ্গে শ্যাম-স্বরূপ কিন্তু রাধারাণী চন্দ্রাবলী ললিতা-বিশাখাদি সুন্দরী গোপনারীদের কাছে মনে হত কৃষ্ণবর্ণ। এটাও আপেক্ষিক।

জগন্নাথ চৌধুরী সিদ্ধিদাতা গণেশের মত বড় বড় কাজকর্মে মুস্কিল আসান করতে সিদ্ধহস্ত। দষ্প্রাপ্য অপ্রাপ্য কোনো জিনিষ সংগ্রহে, সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন তার সমাধানে ডাক পড়ে চৌধরীর। তাই ফরাসীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর। পদমর্যাদার প্রাপ্য খাতির যত্ন তো আছেই।

চৌধুরী সকাল সকালই রওনা হয়েছেন। এগারোটায় জমায়েত হবে সকলে লাট-কুঠীর সামনে। সেখানে পাদ্রী ভ্যালেরী সাহেবের প্রার্থনা সভার বন্দোবস্ত হয়েছে। বারোটা স্থরু হবে লাটকুঠির বড় হলে সুরাপানের বৈঠক, একটায় ভোজ, তিনটেয় নৌকা-বিহার গঙ্গার বুকে, রাত আটটা থেকে আবার রাত্রের আসরে পান-ভোজন। সাহেবরা অসুরের গোষ্ঠী, অসুররা ছিলেন সুরাপায়ী ও মাংসপ্রিয়। দেবতারা খেতেন নিরামিষ, ক্ষীর ছানা দুধ পিঠে পায়েস মধু। দুগ্ধপায়ী সাত্ত্বিক খাদ্যভোজী দেবতারা বার-বারেই যুদ্ধে হেরে যেতেন সুরাপায়ী রাজসিক খাদ্যভোজী অসুরদের সঙ্গে, তাই কথায় বলে, 'দৈত্যরা কোন দেবতা দিগের হারিয়ে দিত দাদা ? দৈত্য খেত লালপানি, আর দেবতা খেত সাদা।'

চৌধুরীর আলকার পথে পড়ে কেল্লার মাঠ। মেলার ভিড়। নানা রকমের আমোদ-প্রমোদ ও বেচাকেনার মরশুম। দূর দূর থেকে এসেছে দোকানি পশারী জুয়াড়ী বাজীকর খেলোয়াড় গায়েন মহাজন দর্শক খদ্দের বানরনাচ ভাল্লুকনাচ জুয়াখেলা মুর্গীর লড়াই লাঠিখেলা খেমটাগান---আমোদ-প্রমোদের ছড়াছড়ি। নীল উর্দী-পরা গোরা সৈন্য, সবুজ উর্দীপরা দিশী 'তোপাজবা', কালো বুর্খা পরা মুসলমানীরা, ঘোর কালো কাফ্রীবা রঙের ঢেউ তুলেছে সেই ভিড়ে।

চৌধুরীমশাইর তাঞ্জাম থমকে দাঁড়ালো। এলোবার পথ জুড়ে গান করছে একজোড়া খেমটা-খেমটি, বাহবা দিচ্ছে অনেক লোক।

ছুকরী নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে সুর তুলেছে---

'রাগ কইরা ক্যানে বঁধু ঘর ছাইড়া যাও,
মুখ তুইলা চোখ মেইলা আমার পানে চাও
গরম ভাতে ঘেত ঢাইলা ভাজা মাছ দিছি,
মুড়া দিয়া ঘণ্ট রাইন্ধা বইসা আমি আছি।
মাথা খাও শ্বশুর-পুত্তুর আইসা বইসা খাও
অমন কইরা পরাণ ভাইঙ্গা চইলা
নাহি যাও।

ছোকরা মুখ ফুলিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিচ্ছে---

'হাড় জ্বালালি পোড়ারমুখী,
চোখায় বিষের জ্বালা,
তোর সঙ্গে যে ঘর করে সে কুত্তার শালা,
রাঁধা ভাতে পোকা পড়ুক,
গিনিন একা একা
চল্যাম আমি বনবাসে,
আর পাবি না দেখা।

ছুকরী হাতজোড় করে, মাথা নীচু করে নাচছে---

জোড় কৈরলাম হাত,
এই নাকে দিলাম খৎ,
পায়ে ধরি বঁধু আমার ছাইড়া দাও ঐ পথ,
তোমার বাড়ি, তোমার ধান,
আমি পরের মাইয়া,
ঝুলবো গাছে নিজের হাতে
গলায় দড়ি দিয়া।

একটি তোপাজ সিপাই আর্তনাদ করে উঠলো, 'গলায় দড়ি দিও না সুন্দরী, মাথা খাও কখ্খনোই দিও না, বুক আমার ফেটে যাবে, ও শালাই জঙ্গলে যাক।' নেশার ঝোঁকে সে কেঁদে ফেললো।

কয়েকটা গোরা সৈন্য দাঁড়িয়ে নাচ দেখছিলো, তাদের একজন গানে বাধা দেওয়ার তোপাজটির উপর খাপ্পা হয়ে ধমক দিল 'অ্যালেভুয়েন', ইশারায়ও বুঝিয়ে দিল 'ভাগো।'

এবার ছোকরার পালা—

আমি যাব বাঘের পেটে,
তুই ঝুলবি গাছে,
এর চাইতে কেলেঙ্কারি
বেশী কি আর আছে?
ঘরে গিয়ে হবি পত্নী, আমি হব দানা,
গাঁয়ে পড়বে চি-চি?
ছি-ছি না-না-না-না-নানা
লোকে বলবে মধু পাটনী নিব্বংশে হৈলো
পাটনী ভিটেয় বাতি দিতে
বংশে কেউ না রৈলো।

এরপরে দুজনে হাত ধরাধরি করে সুরু করে নাচ—

ছুকরী—ঘরেই কিরা যাই চলো
ঘরেই কিরা চলো,
ছোকরা—চোপা যদি বন্ধ করিস,
সিঁথির সিঁদুর রৈলো,
ছুকরী—ওষ্ঠে দিলাম কুলুপ,
ছোকরা—কানে দিলাম তালা,
ছুকরী—থাকবো কইরা চুপ,
ছোকরা—তোরে গড়িয়ে দেব বালা,
উভয়ে—সেই তো ভাল, সেই তো ভাল,
সেই তো হবে ভাল
হাসির পিদিম জ্বাইলা মোরা
ঘরড়া করবো আলো।

চারধার থেকে ঝুর ঝুর করে বকশিস বৃষ্টি হল। গোরাদের একজন একখানা রেশমী রুমালও ছুঁড়ে দিল মেয়েটার গায়ে। চৌধুরী ছুঁড়ে দিলেন একটা টাকা, তাঁর তাঞ্জাম আবার পথ ধরলো।

●

প্রাচীন বাঙলার বুকে অনেক বিপর্যয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু বাঙালী তার মনের সরসতা বাঁচিয়ে রেখেছে সযতনে। কথকতা পাঁচালী কবিগান ভাসান জারিগান কীর্তন খেউড় পল্লীগীতি লোকনৃত্য যাত্রা বাউল বহুরূপী গ্রামাঞ্চলকে রেখেছিল রসসমৃদ্ধ। বারো মাসে তের পার্বণ ছাড়াও গ্রাম্য বধূ ও গ্রাম্য বালিকারা দল বেঁধে করতো বৈশাখে পুণ্যপুকুর ব্রত, জ্যৈষ্ঠে জয়মঙ্গলব্রত, ভাদ্রে ভাদুরিব্রত, কার্তিকে ইতুপুজা, অঘ্রাণে যমপুকুরব্রত, মাঘে মাঘমণ্ডলব্রত, ফাল্গুনে ইতুকুমারব্রত, চৈত্রে নখছুটের ব্রত। রাঢ় বরেন্দ্র বঙ্গ ও সমতটস্থ বাঙালীর ভাববিলাসী চিত্তের এই ধারা বৈচিত্র্য ভারতের আর কোথাও দেখা যায়নি।

কিন্তু এই ভাবপ্রবণতা ও চরিত্রে দৃঢ়তার অভাবই ডেকে আনলো সর্বনাশ। পরাধীনতা ও বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে যে মনোবল, সমাজশক্তি ও দৃঢ় প্রতিরোধ কামনা থাকা দরকার প্রাচীন বাঙালীর তা ছিল না। সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভরতা বিত্তশক্তিকে করে সীমিত, উদ্ভাবনী শক্তিকে করে দুর্বল, জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে করে শিথিল। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় আদিবাসীদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, বহুধা শ্রেণীবিভাগের অসংহতি, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কঠোর অনুশাসন, ভাগ্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর নির্ভরতা এবং রক্ষণশীলতা প্রাচীন বাঙালীকে অগ্রগতির পথে করলো পথহারা। মাত্র ঘাদশটি তুর্কী অশ্বারোহী নিয়ে বক্তিয়ার খিলজী বাঙলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করেছিলেন, তার কারণ লক্ষণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব, ইহলোকের স্বল্পস্থায়ী জীবনে বীতরাগ এবং জ্যোতিষীদের গণনায় একান্ত নির্ভর। সেই গণনায় উপর বিশ্বাস করেই রাজধানী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে তিনি পলায়ন করলেন পূর্ববঙ্গের সপ্তগ্রামে, বাঙালীর ভাগ্যসূর্য হলো চিরতরে অস্তমিত।

জগন্নাথ চৌধুরী তাঞ্জামে চলেছেন, বহুলোক হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছে, দু-চারজন করছে সেলাম, কারণ

চন্দননগরে মুসলমান খুব কম, অধিবাসীরা বেশীর ভাগই হিন্দু। লোকে ডাকে দেওয়ানমশাই। হিন্দুর ক্ষেত মুসলমান জবরদের হাতে গিয়ে হলো জমি, শস্য হলো ফসল, বাড়ি হলো ইমারৎ, টাকা হল খাজনা, নমস্কার হলো সেলাম। হলো নাজির উজীর কোটাল কাজী পেয়াদা বরকন্দাজ নফর তালুক মুলুক সাহেব। কিন্তু ফরাসী এলাকার আওতায় হিন্দুরা নির্ভয়ে জগন্নাথ চৌধুরীর আখ্যা দিয়েছে দেওয়ানমশাই। বেশ সেজেগুজে চলেছেন আজ দেওয়ানমশাই। পরেছেন মিহি ফরাসডাঙ্গার ধুতি, ফরাসডাঙ্গা মানে ফরাসীদের ডাঙ্গা, এই চন্দননগর, ধুতির উপর রেশমের চাপকান, মাথায় জরিদার শামলা, গলায় জরিদার চাদর, পায়ে জরিদার নাগরাই, গোঁফে মোমের পালিশ, কানে আতরমাখা তুলো।

ঘোড়ার পিঠে, তাঞ্জামে, পালকীতে ব্রাউনবেরী ও ফিটন হাঁকিয়ে সাহেবরা একে একে আসছেন গভর্নরের কুঠিতে। কমান্দান্ত আগোয়ার দুই পাশে ঘোড়সওয়ার ক্যাপ্টেন রেভিয়ার এবং ক্যাপ্টেন ক্লেমেন্ত, পেছনে ক্যাপ্টেন মেনার্দ। চারটি সাদা আরবী ঘোড়া, একতালে টগবগ করে চলেছে। রেভিয়ার আর্তিলারি বা গোলন্দাজ বাহিনীর কর্তা, ক্লেমেন্ত ইনফান্ত্রি বা পদাতিক বাহিনীর কর্তা, মেনার্দের অধীনে 'কমিসারিয়াৎ' বা রসদ এবং সৈন্যদের পোষাক ও সরঞ্জাম, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আসছেন মঁশিয়ে দেলার্দ, মঁশিয়ে দুভাল, মঁশিয়ে সেভালিয়ে, মঁশিয়ে হার্দাকুর, মঁশিয়ে বার্নার্দ, মঁশিয়ে আলবুকার্ক। পিয়েরে আলনার আসছে দেলার্দের ব্রাউনবেরীতে, সাদা ব্রাউনবেরী টানছে কালো ইস্পাহানী ঘোড়া। কোম্পানীর ফরাসী কর্মচারীরাই সংখ্যায় বেশী, পদমর্যাদা অনুসারে তারা আসছে তাঞ্জাম বা পাল্কী চড়ে। পদব্রজে আসেছে এসেছেন মাত্র দুজন, ফাদার ভ্যালেরী এবং সার্জেন্ত-দা-জেন্দার্ম অর্থাৎ পুলিসের কর্তা মঁশিয়ে দুয়াল। বালেশ্বরের কুঠি থেকেও দুজন সাহেব আগের দিন এসে পৌঁছেছেন, লাটকুঠিতেই বন্দোবস্ত ছিল থাকবার।

জগন্নাথ চৌধুরী প্রার্থনা সভার পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেলেন কুঠির ভিতরে। নিষিদ্ধ পানীয় পান এবং নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণে রুচি আছে যথেষ্ট, তাই বলে তিনি বৈষ্ণব হয়ে খৃস্টের ভজনায় যোগ দিতে নারাজ। আজ সকালেও তিনি চৈতন্যচরিতামৃত কিছুটা পাঠ করেছেন অন্য দিনের মত। মেরীর তনয় যদি পরিত্রাতা হয়, ঘোষের তনয় তবে দোষেরও তো নয়? নন্দ ঘোষের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মুক্তি দিতে পারেন না, বলে পাদ্রী সাহেব ভ্যালেরী, কেবল খৃস্টই নাকি একমাত্র পরিত্রাতা। নেহাৎ বাজে কথা। ভ্যালেরীর সম্বন্ধে ধারণা ভাল নয় চৌধুরীর। শিশুদের ব্যাপ্টিসম্ এবং মুমূর্ষদের লাস্ট স্যাক্রামেণ্ট দেওয়া ছাড়া ধর্মের ও কতটুক্ জানে? বিষ নাই সাপের কুলোপনা চক্র গীর্জা নাই, অথচ পাদ্রী।

রৌশন অপেক্ষা করেই ছিল। বছরের এ দিনটি কখনও ভুলে যান না চৌধুরী, কিছু হাতে করে আসেন উপহার দিতে। খুব খুশি নয় দেওয়ানজী তাঁর উপরে, জানে রৌশন, এ ভদ্রতাটুক্ তাই বেশ ভালই লাগে।

'বসুন চৌধুরীমশাই, জানেন তো আজকের দিনটি আমার পর্দানসীন হয়ে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকতে হয়, একমাত্র আপনিই পরপুরুষ—যার মুখ দেখার সৌভাগ্য লাভ হয় আমার।'

চৌধুরী হাসলেন। হাসতে হয় তাই হাসলেন। হাসির সঙ্গে মনের কোনো মিল ছিল না।

'আপনার মত রূপ ঢেকেই রাখতে হয় পর্দার আড়ালে, আজকের মত দিনে, নইলে প্রার্থনাও জমবে না, অনুষ্ঠানের আসরও জমাট হবে না।'

নিজের রূপের প্রশংসা পুরুষের মুখে শুনলে খুশী হয় স্ত্রীলোক। রৌশন খুশি হলো।

'আমার বোহিনকে দেখেছেন আপনি? আমার চেয়েও খুবসুরৎ।'

'আশা আছে দেখবো একদিন, এখনও দেখিনি।'

'আজকেই দেখবেন, এখানে আসতে বলেছি তাকে। একটু স্যাম্পেন?'

'মন্দ কী? যেদিন খাবো, ভাল করেই খাব। নিজের পয়সায় খাই না কখনো। সাদারা ফুর্তি করতে জানে, ফুর্তির মালমশলাও জোগাড় করেছে বিস্তর। খৃস্টের জন্মদিনে ওরা খানাপিনার হুল্লোড় করে। আমরা জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি লক্ষ্মী পূর্ণিমায় দাঁতে দাঁত দিয়ে করি ঠাঁ-ঠাঁ উপোস। আপনাদের রমজানও আসছে সামনের মাসে, পুরো একমাস সারাদিন দাঁতে দড়ি দিয়ে চোঁ-চোঁ করবে পেট উপোস করে। তবে আপনি নিশ্চয়ই 'রোজা' করেন না বিবিসাহেব?'

রৌশনের জবাব দেবার দরকার হলো না, রাবেয়া উপস্থিত হলো।

'সেলাম ছোটবিবিসাহেব।' চৌধুরী উঠে দাঁড়ালো।

'সেলাম দেওয়ান সাহেব, বসুন।'

সত্যিই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি। মুসলমান না হলে আরো ভাল লাগতো চৌধুরীর।

'কেমন দেখছেন আমার বোহিনকে? বেহেস্তের হুরীরা এর কাছে দাঁড়াতে পারে?'

'আপনাদের বেহেস্ত কেমন, হুরী কেমন দেখতে আপনিই জানেন বিবিসাহেব, তবে আমাদের স্বর্গেও উর্বশী মেনকা রম্ভা ইত্যাদি অনেক সবের সুন্দরী সব অপসরা আছে।'

'ভাল করে তাকিয়ে দেখুন চৌধুরী মশাই।'

'চোখে ধান্দা লেগে যাচ্ছে, তাকাতে বেশীক্ষণ পারছি কই?'

রাবেয়া বিব্রত বোধ করছিল, ভাগ্যিস হল স্যাম্পেন এসে গেল।

রাবেয়া বললো, 'সেলাম দেওয়ান সাহেব, বসুন।'

চৌধুরী তাঁর চাপকানের পকেট থেকে বার করলেন একটা সুন্দর কাঁচের শিশি এবং একটি মিনাকরা রূপোর ডিবি।

'বসরার গোলাপী আতর বিবি সাহেব, দিল্লি থেকে আনিয়েছি আপনার জন্যে। এটাও ওখানকার নাম-করা সুর্মা, ছোট বিবি-সাহেব আপনার পছন্দ হবে বোধ হয়?'

দুটি জিনিষই দুষ্প্রাপ্য, চৌধুরীর বেশ কিছু খরচা হয়েছে, ভাবে রোশন।

'বহুৎ মেহেরবানি চৌধুরীমশাই।' রোশন সত্যই খুব খুশি।

চৌধুরী ভাবছিলেন এই যবন-কন্যারা সাজতে গুজতেই জানে, জানে শুধু প্রেয়সী হতে, জানে না হিন্দু নারীর মত সহধর্মিণী হতে। এদেশের মাটিতে এদের জন্ম, কিন্তু এদেশের হবে না কোনদিন এরা, পরগাছার মত আলাদা হয়েই থাকবে।

'আপনার ছেলে কেমন আছে।' জিজ্ঞাসা করে রোশন।

এবার হাসিতে মুখ ভরে গেল চৌধুরীর। 'বাবা ডাকতে শিখেছে এখন তবে ঠিক বাবা নয়, বলে বাব্বা, মাকে ডাকে মাম্মা।'

শেষের কথাটি শুনে রোশনের বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। চতুর্থপক্ষে বিগতযৌবন স্বামীর পত্নী হয়েও সেই মেয়েটি হয়তো মা-ডাক শুনে হাসতে হাসতে ছেলেটিকে কত আদর সোহাগ করে।

জগন্নাথ চৌধুরীর যখন তেরো বছরের তখন তার বিয়ে হয় আটবছরের বালিকা জগত্তারিণীর সঙ্গে। জগত্তারিণীর কুড়ি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল তবু বংশধরের আবির্ভাব হলো না দেখে পিতা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছেলের আবার বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয় নম্বর নৃত্যকালীও শ্বশুরকে করলেন নিরাশ। তৃতীয় নম্বর চণ্ডীবালাকে ইন্দ্রনারায়ণই পছন্দ করে রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু পরপারের ডাক এসে গেল তাঁর। আবার কবচ মাদুলির খোঁজ পড়লো, সোনার ষষ্ঠী গড়িয়ে পুজো দেওয়া হল, কিন্তু চণ্ডীবালার অপত্য সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন এল এই চার নম্বরের শিবশঙ্করী। বছর দুই হলো শিবশঙ্করী চৌধুরী সংসারে এসেছে কিন্তু এত লাজুক যে এখনো পর্যন্ত সে কথা বলেনি স্বামীর সঙ্গে, ঘোমটা দিয়ে থাকে। ছোটোখাটো শ্যামবর্ণ শান্তস্বভাব, রোজ রাত্রে শুতে এসে টিপ করে প্রণাম করে, দুবেলা খাওয়ার সময় কাছে বসে হাতপাখার হাওয়া করে, যখন যা দরকার হাতের কাছে সাজিয়ে রাখে, অথচ বাড়িতে গণ্ডা দুই দাস-দাসী। সেজেগুজে থাকতে জানে না এদের মত, রূপের বালাই নেই এদের মত, কিন্তু সেবায় ও ভালবাসায় মাতা-কন্যা-প্রিয়া একাধারে। হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে স্বামী হওয়ার মত সুখ এ জগতে আর কিছুই নাই।

'ছেলের কথা ভাবছেন চৌধুরী মশাই?'

রোশনের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো, সামলে নিলেন নিজেকে জগন্নাথ চৌধুরী।

'এখন তবে উঠে পড়ি বিবি-সাহেব, সেলাম-আলে-কুম।'

'আলেকুম সেলাম। কত কাজ আপনার বাইরে, কি করে বসতে বলি?'

প্রার্থনা সভা ভঙ্গ হয়েছে। হলঘরে সবাই জমায়েত হয়ে গল্পগুজবে ব্যস্ত, স্যাম্পেন বুর্বন, বার্গাণ্ডি বোঁর্দোর সোত প্রবাহিত। গভর্নর রেনো ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গেই কিছু-না-কিছু কথাবার্তা কইছেন। চার জন সরাব-বরদার রূপোর থালায় সুরা-পূর্ণ গেলাসগুলি একে একে সকলের সামনে ধরছে। দুবাস ভার্তামেস তদারকি করছে, কারু গেলাস শেষ হলেই আবার এক গেলাস সেখানে পৌঁছে যাবার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে, পাইক বরকন্দাজরা হুকুমের অপেক্ষায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, ঝালর দেওয়া টানা পাখা খস্‌খস্‌ করে অবিরাম চলছে।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল কমান্দান্ত মেজর আগ্নোয়া, তার পাশে ক্যাপ্তেন মেনার্দ। নীল সামরিক পোষাক দুজনেরই, আগ্নোয়ার কটিদেশে চামড়ার খাপে তরবারি বুকের বাম-পার্শ্বে গুটি তিনেক পদকের সারি। অভ্যাগতরা সকলেই এসেছেন বেশ-বিন্যাসে উৎসবের মর্যাদা রক্ষা করতে। চৌধুরী সকালেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কেল্লার রসদখানায় রুটি পোলাও মাংস মাছ সরবৎ চাটনির বেবাক মালমশলা, সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ রাম এবং দিশি মদ্য ও চুরুট। ক্যাপ্তেন মেনার্দ ধন্যবাদ দিলেন, কমান্দান্ত রসিকতা করলেন, 'চৌধুরী, একটা জিনিষ ভুলে গেছ, পাঠালে ওরা আরো খুশি হতো।'

কানে কানে বললেন সে দ্রব্যটি, যাতে মেনার্দ শুনতে না পায়।

চৌধুরী হেসে বলেন, 'আপনারও রসজ্ঞান আছে, কমান্দান্ত সাহেব, কিন্তু পাঠালে ঐ হতভাগীরা কেউ জ্যান্ত অবস্থায় ফিরে আসতে পারতো না, কেল্লার ভিতরে শকুনের দল ঠুকরে ঠুকরে মেরে ফেলতো।'

সাদাজাত দৈত্যের জাত। সুরা ওদের প্রত্যেক উৎসবের অঙ্গ, যেমন বিবাহের অঙ্গ পাত্রী। লাল হয়ে উঠেছে সাদামুখগুলি। কে যেন চৌধুরীর হাতে একগ্লাস বার্গাণ্ডি চাপিয়ে দিয়ে বললো, 'বনজুর মঁশিয়ে, একবার দৃষ্টিপাত করই না আমাদের দিকে দয়া করে?'

'বনজুর, মঁশিয়ে দেলার্দ, আপনার সঙ্গীটিকে তো চিনতে পারছি না?'

'মঁশিয়ে অ্যালবার, আমার সহকর্মী, হালে এসেছে, ভাল করে চিনে রাখো একে, এখন থেকে ট্যাক্সের জন্য এর কাছেই যেতে হবে তোমায়, এ-বুড়ো আর ও ঝামেলার মধ্যে নেই।'

'দেশে ফিরে যাচ্ছেন?'

'মোটেই না, চৌধুরী, খাসা আছি তোমাদের দেশে।'

চৌধুরী ভাল করে নিরীক্ষণ করছিলেন দেলার্দকে। বলিষ্ঠ দেহ, উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ পড়েছে মুখে, পুরু ওষ্ঠযুগলের নীচে সূক্ষ্মাগ্র শ্মশ্রুতে শুভ্রতার আধিক্য ক্রমবর্ধমান।

সেভালিয়ে দ্যুভাল বার্নার্দ আল-বুকার্ক হার্দাকুর প্রমুখ অনেকেই এসে চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করলেন। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেন এঁরা, অনেক টাকা ট্যাক্স দেন, আপ্যায়নের প্রয়োজন উভয়ত। [ক্রমশঃ

সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর একাদিক্রমে এক জায়গায় কাটাইয়া নীরদের বদলির হুকুম আসিল। এ হুকুম অপ্রত্যাশিতই বলা চলে।

এতদিন এক জায়গায় থাকার ফলে বন্ধু-বান্ধব তার জুটিয়াছে কম নয়। অল্প পরিচয়ে যেটুকু সহজ সম্বন্ধ জন্মিবার কথা, সে রকম লোকের সংখ্যা বহু। তার অমায়িক সরল ব্যবহারের জন্য প্রিয়পাত্রের মাত্রা আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাড়ার উৎসবে বিলাসে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে সে সব সময় হাজির থাকিত; একমাত্র রাষ্ট্রবিপ্লবে সে উপস্থিত থাকিতে পারিত না। কারণ সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহার গৃহে বিপ্লবের ছায়া পড়িত যেহেতু সে সরকারী চাকুরী করিত। তা ছাড়া, যখনই দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য লোকের অভাব হইত—তখনই তাহার ডাক পড়িত। থিয়েটারের কিছু না জানিয়াও তাহাকে সে সম্পর্কিত কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশে মাথা দিতে হইয়াছে। চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে অথবা বারোয়ারী উৎসবের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার বেলায় তাহার নাম সর্বদা সর্বপ্রথম সারিতে।

বদলির হুকুম যখন সত্যই আসিল তখন নড়িতেই হইবে। অথচ, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতদিন যেখানকার মাটিকে দুই বেলা অসহ্য মনে হইয়াছে, একঘেয়েমিতে মন বিস্বাদ তিক্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সেখানকার মাটি ও মানুষকে ছাড়িয়া যাইবার প্রথম ও সর্বোত্তম সুযোগ হাতের মুঠিতে পাইয়াও তাহার মন যেন বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। এখানকার মাটি ও মানুষ—কেহই তাহার আপন নয়; তবু এতদিনকার দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতায় ঐ মাটি ও মানুষই বুঝি একটা মমতাকরুণ আত্মীয়তায় মর্মে মর্মে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

কল্পপুরুষ

দিনে দিনে তাই বুঝি এখানকার আকাশ বাতাস এমন মধুর হইয়া উঠিয়াছে। সে যে কত বড় আপন তা বোধ হয় বদলির হুকুম না আসিলে—ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে না হইলে, সে টেরই পাইত না দূর দেশও যে এমন করিয়া আপন হয়, সে কথা আজ যেন সে একান্তভাবে অনুভব করিতে পারিল।

দুরন্ত শীতের মধ্যে তার বদলির হুকুম আসে। নানাপ্রকার ঝামেলার জন্য কিছু দিনের মত তাহার যাত্রা স্থগিত হইল বটে; কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্যদিকে।

তাহার বদলি হইয়াছিল শৈলশিখরের এক সহরে। যে সহর একদি সারা পৃথিবীর দর্শকবৃন্দ আকর্ষণ করি ছে; মানুষের বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রে নিদর্শন যে সহরের বুকে প্রতি পদে পদে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত।

মানুষের শক্তির চেয়ে প্রকৃতি শক্তি যে কত সহস্রগুণ বড়, তা বোঝ গেল মাত্র সেদিনই—যে দিন আকা অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি নামিল এবং পরে দিন হইতে সুরু হইল 'ল্যাণ্ড স্লাইড' এ জিনিষটার নাম নীচে হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহার অপরূপ বিরাটত্ব, ধ্বংসরূপী বীভৎসত তাহার ধারণার বাহিরে।

দিন কখনই সমান যায় না; এব মেঘ-ঘন আকাশের অন্তরালেও সূর্য হাসে দুর্যোগের রাত্রি শেষেই থাকে প্রস নবীন প্রভাতের আভাস।

প্রথম হইতে এ পর্যন্ত দেখিলে নীরদের এ সময়টা খারাপ পড়িয়াছে বলিতে হয়। হ্যাঁ, তাই বটে। নহিলে যাত্রার দু-তিন দিন আগে তার বারো চোদ্দ টাকা দামের ছাতাটা চুরি হয়

তবুও এই সময়েই তার সঙ্গে নীরদের দেখা। সেই কথাই বলি।

প্রকৃতির অমানুষিক শক্তির দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির চাপে মানুষের গর্বোদ্ধত দৃ শক্তি নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়াছে; শিখরে শিখরে তাহারই ক্ষতচিহ্নের নগ্নরূপ যে কোন আগন্তুকের মনে ত্রাসে

সঞ্চার করে। মানুষের প্রাণশক্তির ক্ষুদ্রতা ইহাতে একেবারে ন্যায্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এককোঁটা জলের জন্য আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া অন্তঃপুরিকারা পর্যন্ত বাহির হইয়াছেন নগ্নপদে, কলস-কক্ষে কেউবা নেমে আসেন দুশো ফুট নীচে, কেউ বা ওঠেন তিনশো ফুট উঁচুতে। লোক মুখে শুনেছেন, ওখানে গেলে জল পাওয়া যায়।

রাত্রিতে অবস্থা আরও ভয়াবহ দাঁড়ায় নীরন্ধ্র অন্ধকারে উল্লসিত বাধা বন্ধহীন জলধারার অক্লান্ত অশ্রান্ত গর্জন দূরাগত বিভীষিকার বাণী যেন বয়ে আনে। নিথর, নির্জন বনস্থালীর জঠর থেকে যেন হাত বাড়ায় অসংখ্য মৃত্যু-দূত। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই সারা সহরখানির মানুষ যেন আতঙ্কে ম্রিয়মাণ হয়। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে যেখানে দৃষ্টি চলে, কোথাও বা দেখা যায় দু-একটি আলোকবিন্দু।

নীরদের অফিস বিল্ডিং ভাঙিয়াছে কিন্তু কাজ সেজন্য কম নহে। কেরানী কুলের কাজ কম থাকা অপরাধ। এখন এই সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য কাজ আরও বাড়িয়াছে।

পি ডবলিউ ডি পুরাদমে কাজ চালাইয়াছে। কিন্তু তাল সামলানো তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিতেছে, ক্রমশ। কোথায় যে কোন্ পাথর মাটির স্নেহবন্ধন হইতে বিচ্যুত হইয়া বসিয়া আছে, অসহায়ের মত, কোথায় নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে জলের পাইপ, টেলিফোনের টেলিগ্রাফের পোস্ট, কিছুই হদিশ মিলিতেছে না।

এখানে আসিয়াই নীরদ দু-তিন মাস একটি বোর্ডিংয়ে উঠিয়াছিল। তারপরই কর্মস্থলে তাহার জন্য একটি ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়। এখন উপরের দিকে চাহিয়া দেখে, সেখানে ক্ষতির পরিমাণ হয়ত কিছু কম।

বেলা আটটা সাড়ে আটটা। অফিসমুখো চলিয়াছে নীরদ। অফিসের দরজার সামনে পি ডবউি ডি'র কর্মী-দলের একটি পাহাড়ী মেয়ে হঠাৎ নীরদকে দেখিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলিয়া উঠিল—নমস্কার বাবুজী। হত-চকিত হইয়া সেও হাত দুটি জোড় করিয়া প্রতিনমস্কার করিল। তারপরেই একটু চিন্তিত মুখেই প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলিল—কোথায় দেখেছি মনে পড়ছে না তো।

মোহিনী হাসির ঢেউ সর্ব অঙ্গে খেলাইয়া সে উত্তর করিল—সে কি বাবু। আপনার বোর্ডিংয়েই তো কাজ করতাম। মনে নেই।

কিছুটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভঙ্গীতে নীরদ প্রশ্ন করিল—তা ছেড়ে দিলে কবে, আর কেনই বা ছাড়লে? এখানে তো খাটনী খুব।

চোখ-মুখ নাচাইয়া পর্বতকন্যা বলিল—ছেড়ে দিলাম আপনি চলে আসবার পরদিনই। কেন ছাড়লাম?

আবার হাসির লহর যৌবনবতীর দেহে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। তেমনি হাসির মধ্যেই মুখে কাপড় দিয়া ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ বলার ইচ্ছা নাই।

পরের দিনও সেই সময়ে নীরদের সঙ্গে দেখা। আবার সে হাত তুলিয়া নমস্কার জানায়। নীরদও ফিরিয়া প্রতি নমস্কার করে। একদিন তো সে নমস্কারের পরিবর্তে 'জয় হিন্দ' বলিয়া বসিল। বলিবার ভঙ্গিতে নীরদ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গেই তরুণীটির দুইজন সঙ্গিনীও হাসিয়া ফেলিল। নীরদ সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিল।

ইহার পর হইতে নীরদ যতই ঐ নগণ্য পাহাড়ী মেয়েটার কথা মন হইতে দূরে রাখিতে চায়, ততই যেন সে সারা মন আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। ততই তাহার মনে পড়িতে থাকে, বোর্ডিংয়ের দিনগুলোর স্মৃতি। বিশেষ প্রথম কয়েকটি দিনের কথা। দিন-রাতের অধিকাংশ সময় সে যেন তাহার সেবার জন্যই উন্মুখ হইয়া থাকিত। এজন্য ম্যানেজারের কাছে বকুনি ও খাইয়াছে, তবু সে অপ্রত্যাশিত কল্যাণ হস্ত কেন জানি না নীরদের দিকেই প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। যা কোন পরিচারিকা করে না সে তাহাও করিয়াছে। নীরদের জামা কাপড় কাচিয়া দিয়াছে। এমন কি শাসন-কর্ত্রীর সুরে ময়লা জামা গেঞ্জি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে।

নীরদ কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেলেও মুখ খুলিবার উপায় ছিল না। তবু বোর্ডিং ছাড়িয়া আসিবার সময় তাহার হাতে দুইটি টাকা দিতে গিয়া নীরদ অপ্রস্তুত। পর্বতের বক্ষে আলোড়ন জাগিয়াছে, চক্ষে তাই জলধারা। নীরদ হাত বাড়াইয়া দু'টাকার নোটখানি ধরিয়াই আছে। কয়কটি নীরব সঘন ব্যথাতুর মুহূর্ত। অকস্মাৎ নীরদ সেই পর্বতবালার হাত দুটি তুলিয়া ধরিয়া সামনের দিকে আনিল। নোটটি হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া তাহার অঙ্গুলিবদ্ধ হাত দুটি ধরিয়া ভারাক্রান্ত স্বরে বুঝি বলিতে চাহিল কিছু; কিন্তু স্বর ফুটিল না। একরকম ঝড়ের মতই সে বাহির হইয়া গেল।

দু' তিন দিন এমনিভাবে চলিবার পর একদিন আর কর্মী দলের মধ্যে বিষ্ণুমায়াকে দেখা গেল না। নীরদের উৎসুক দৃষ্টি নারী কর্মীদলের মধ্যে কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়—এটা তাহার সঙ্গিনীদ্বয়ের দৃষ্টি এড়াইল না। জিজ্ঞাসা করি করি করিয়াও মুখ ফুটিয়া বিষ্ণুমায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার কেমন যেন লজ্জা আসিল, অথচ মনের মধ্যে বিষ্ণুমায়ার অনুপস্থিতি একটা প্রচণ্ড তোলপাড় সুরু করিয়া দিল। তাহার সংবাদ জানিবার জন্য একটা নিদারুণ আন্তরিক ব্যাকুলতা তাহার সারা অঙ্গে যেন উন্মুখ হইয়া জাগিয়া রহিল। অথচ কি করিয়া তাহার সংবাদ পাওয়া যায়, তাহারও কোন সূত্র মিলিল না।

শেষে একদিন তাহার সঙ্গিনী-দ্বয়কে শুধাইল—বিষ্ণুমায়া আর আসে না কেন?—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মনে হইল, একজন অপরিচিতা নারীর সম্বন্ধে ততোধিক অপরিচিতা নারীর নিকটে এ অহেতুক

কৌতূহল না প্রকাশ করিলেই বোধ করি অসমালোচিত হইত। মনটা তাহার আরও চঞ্চল, আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল।

এর কিছুদিন পরেই বিষ্ণুমায়ার সঙ্গিনীদ্বয়ও হঠাৎ অদৃশ্য হইল। নীরদের মনের উপর হইতে যেন একখানি ভারাক্রান্ত মেঘ সরিয়া গেল। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল যেন। ভাবিল, চোখের আড়াল হইলেই মনেরও আড়াল হইতে বাধ্য।

কিন্তু মন জিনিষটার গতিবিধি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। ভুলিলেও বোঝা যায় না, দৃষ্টির আড়ালে গেলেও মন তাহাকে ধরিয়া রাখে—একদিন দুদিন নয়, চির দিনের জন্য, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় মনের কুঠুরীতে সব জমা থাকে।

তাই দিন সাতেক পর আবার যখন বিষ্ণুমায়ার সঙ্গিনীদ্বয়কে দেখা গেল, অথচ বিষ্ণুমায়ার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, নীরদের মন আবার যেন সুপ্তোত্থিতের মত নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগিয়া উঠিল। যাহাকে ভুলিয়াছি মনে করিয়াছিল, তাহাকেই আবার বেশি করিয়া মনে পড়িল তার। এবং এ ভাবাবেগের প্রারম্ভ এবার এত যে, সেইদিনই সে জিজ্ঞাস করিল বিষ্ণুমায়ার সংবাদ। উত্তরে সঙ্গিনীদ্বয় ম্লানমুখে জানাইল, গত দিন দশ বারো হইতে তাহার জ্বর, শয্যাশায়ী হইয়া আছে।

নীরদ চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কি মনে করিয়া ফিরিল এবং বিষ্ণুমায়ার সঙ্গিনীদের নিকট হইতে তাহার ঠিকানাটি জানিয়া লইল। ঠিকানা যাহা শুনিল, সেখানকার নাম শুনিলে নীতিবাগীশের দল আঁতকাইয়া উঠিবেন।

ঠিকানাটি জানিবার পর নীরদের মনেও সন্দেহ জাগিল। নীতিবাগীশের দলভুক্ত সে নয়, তাই বলিয়া লোকে তাহাকে বৃথা দুর্নাম দিবে, সেটাও সে নির্বিবাদে মানিয়া লইতে রাজী নয়। তবু আজ কিন্তু তাহার সর্বপ্রকার নীতি প্রশ্ন ভাসিয়া গেল; এমন কি তাহার মনে হইল, যদি কখনও নীতির প্রশ্ন বিসর্জন দিতে হয়, তবে ঐ বিষ্ণুমায়ার জন্যই বোধ হয় সে দিতে পারে।

ঐ পাহাড়ী যুবতী, পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যার সর্বাঙ্গ ছাইয়া নামিয়া আসিয়াছে গহন অরণ্যের স্নিগ্ধ শ্যামলিমা, মধুর বাক্যস্রোতে যার পাহাড়ী ঝর্ণার অশ্রান্ত উচ্ছল আনন্দের আভাস, তারই জন্য বোধ করি, আরও অনেক কিছু বিসর্জন দেওয়া যায়।

নীরদ আসিয়া যখন বিষ্ণুমায়ার বাড়ীতে পৌঁছিল, তখনও সন্ধ্যা হয় হয় নাই। কিন্তু দূর গিরিশিখরের ওপারে সূর্য নামিয়া পড়িয়াছে ও তাহার গমনপথের রেখাটির আশে পাশে রক্ত-রাঙা খানিকটা জায়গা জাগিয়া আছে। তা ছাড়া, চারি ধারে নীল ধোঁয়ার মত কুয়াশা পাহাড়ের গায়ে গায়ে নামিয়া ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা পাতাইয়াছে।

নীরদ একেবারে ঘরের মধ্যেই গিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বস্তুত তা ছাড়া দাঁড়াইবার স্থানও ছিল না। ঘরখানি ছোট ও সঙ্কীর্ণ। আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে। তাই কিছুটা স্থান পাওয়া গিয়াছে।

নীরদের উপস্থিতি বিষ্ণুমায়া টের পাইয়াছিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। এবার ইঙ্গিতে একটি চৌকি দেখাইয়া তাহার উপর বসিতে বলিল। একটু ম্লান হাসিয়া শুধাইল—কেন এত কষ্ট করে এলেন? আমি জানতাম আপনি আসবেন।

সর্বনাশ এ নারী কেমন করিয়া জানিল, তাহার আসার কথা। হয়ত তাহার সঙ্গিনীদ্বয় কিছু আভাস দিয়া থাকিবে। হয়ত অনুমান। কত কিছুই তো হইতে পারে। নীরদ আর এ সব লইয়া মাথা ঘামানো পণ্ডশ্রম মনে করিল।

কথাবার্তা বিনিময় যদিও বিশেষ কিছু হইল না তবু প্রায় নীরবতার মধ্যেই শুধু দুজনে পরস্পরের দিকে চাহিয়াই যে এতটা সময় অতিবাহিত করিয়াছে, সে কথা নীরদের খেয়াল হইল নিকটবর্তী একটি ঘণ্টাধ্বনিতে। স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে বসিয়া রাত্রির পদক্ষেপ অনুমান করা আজ তাহার পক্ষে কেন যে সম্ভব হইল না কে জানে।

নীরদ মনে করিয়াছিল —আর ওদিক মাড়াইবে না। কোথাকার কে এক অজ্ঞাতকুলশীলা নারী, তাহার কেহই নহে,—অমন অসুস্থ শহরময় কি কম আছে? তাহার কি দায়, কে কোথায় কোন কুখ্যাত পল্লী এলাকায় রোগ ভোগ করিতেছে সেজন্য সে কেন মনের শান্তি নষ্ট করে?

কার্যত দেখা গেল ঠিক বিপরীতটাই ঘটিতেছে। একদিন তাহার না গেলে চলে না। বিষ্ণুমায়া তাহাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতেছে। সে আকর্ষণ তাহাকে কিছুতেই দূরে যাইতে দেয় না, সে আকর্ষণের বৃত্তের কেন্দ্রে শুধু এক চিরন্তনী নারী। কিছুতেই যেন তাহার ঐ চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

একদিন গোটাচারেক টাকার ফল কিনিয়া দিয়া আসিল নীরদ এবং বলিয়া আসিল পরের দিন তাহার জানাশুনা একজন ভাল ডাক্তারকে লইয়া সে এখানে আসিবে। একথা শুনিয়া বিষ্ণুমায়া তাহার অতল রহস্যময় চোখ দুটি তুলিয়া ধরিল নীরদের মুখের উপর। খানিকক্ষণ পর সে চোখে জল দেখা দিল। ধীরে ধীরে সে শুধাইল—কেন আমার জন্য এত করছেন, আমি আপনার কে?

নীরদের চক্ষু দুটিও সজল হইয়া উঠিল। তবু কণ্ঠে যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বর আনিয়া বলিতে চেষ্টা করিল, —আমি কারো জন্যেই কিছু করছি না; তবে অসুখ হলে ডাক্তার দেখাতে হবে না।

উত্তরে বিষ্ণুমায়া একটু ম্লান হাসিল—এখনও ছেলেমানুষ।

অতঃপর ডাক্তারের আনাগোনা সুরু হইল। ফিয়ের টাকার কোন কথা উঠিত না; কারণ রোগী দেখা সারা

তখনেই নীরদ ঘরের বাহিরে আসিয়া টাকাটা নিজের হাতে ডাক্তারকে দিত। কোন কোন দিন ডাক্তার আপত্তি তুলিতেন, নীরদ বলিত—পয়সা না পেলে ডাক্তারীতে মন বসে না। তারপর দুজনেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিত।

ডাক্তার একদিন কৌতূহলবশত শুধাইলেন, আপনার কেউ হয় নাকি? কারণ, ডাক্তারের চোখে ব্যাপারটি বেশ রহস্যময় বলিয়াই বোধ হইতেছিল। তবু ডাক্তারের রোগিণী, অথবা যাহার হাত দিয়া ভিজিটের টাকা পায়, এ দুয়ের একের সহিত ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে এরূপ প্রশ্ন ভদ্রতাবিরুদ্ধ সর্বকালে এবং সর্বস্থানে। নীরদ আমতা-আমতা করিয়া কি বলিয়াছিল, ডাক্তার তাহা ঠিক অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

কোথা হইতে একদিন দুষ্টগ্রহের মত এক বৃদ্ধার আবির্ভাব হইল। নীরদ তো ঘরের সম্মুখে পা দিয়াই অপ্রস্তুত। বুড়ী নীরদকে দেখিয়াই যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। এ দেশীয় ভাষায় কি যে কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ অবিশ্রান্ত বলিয়া গেল, তাহার একটি বর্ণও নীরদের বোধগম্য হইল না। সে যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি রহিল।

কেবল যখন একগাছা ঝাঁটা হাতে করিয়া বুড়ী তাড়াইয়া আসিল তখনই নীরদ বুঝিল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে এতক্ষণ গালি পাড়িতেছিল। [illegible] এ ব্যাপারের সূচনাতেই বিষ্ণুমায়া সম্ভবত এ পরিণতির আশঙ্কা করিয়াছিল। তাই সে যে কখন বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা [illegible] কোন পক্ষই টের পায় না।

কিন্তু ঝাঁটাটি যে বৃদ্ধা এমন অকস্মাৎ ছুড়িয়া মারিবেন তাহা বিষ্ণুমায়া একেবারেই ধারণা করিতে পারে নাই। তবে, বিষ্ণুমায়ার চীৎকারেই হয়ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঝাঁটাটি গিয়া আঘাত করিল নীরদের পরিবর্তে বিষ্ণুমায়াকেই। আর বৃদ্ধাও হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে কাঠের মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

মিনিট দুই-তিন কাটিল।

তারপর আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। বিষ্ণুমায়ার শরীর দুর্বল হলেও স্বাস্থ্যে তাহার আছে গিরিমালার ঘন সন্নিবিষ্ট প্রস্তরখণ্ডের একাগ্রতা, আর আছে শৈল নির্ঝরের প্রাণবন্যার অফুরন্ত উচ্ছলতা। তাহাই তাহাকে শক্তি ও প্রেরণা জোগাইল। নীরদও মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার নিঃশব্দ বাক্য-বাণীর অনুসরণ করিয়া দুজনে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধাকে আনিয়া শোয়াইয়া দিল একখানি জীর্ণ মলিন কাঁথার উপরে। বিষ্ণুমায়া তখন নিজের ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছে।

ঘটনাটি নীরদের মনে গভীর রেখাপাত করিল। নীরদ পরে জানিতে পারে বৃদ্ধাই বিষ্ণুমায়ার মা। নীরদ আশ্চর্য হইল—মা ও মেয়েতে এ কি রহস্যময় পার্থক্য।

বিষ্ণুমায়া এখন অনেকটা সুস্থ হইলেও আগেকার মত কর্মক্ষমতা এখনও ফিরিয়া পায় নাই। তার উপর অকস্মাৎ আর একটি আঘাত। সেদিন ঐ গোল বালে কেহ লক্ষ্য না করিলেও পরে তো নীরদ লক্ষ্য করিয়াছে, কপালের বাঁ দিকটা বেশ একটা গোল বড় মার্বেলের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

বিষ্ণুমায়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সে বলিয়াছে—ও কিছু না; কিন্তু ঐ আঘাতটা আপনার কপালে যদি লাগত আর ঐ রকম ফুলে উঠত—আপনি কি করে অফিস পেতেন, আর কি-ই বা বলতেন গিয়ে?

—[illegible], তোমার এখানে এসেছিলাম একটু হাসল।

উচ্চ কলহাস্যে ফেটে পড়ল বিষ্ণুমায়া। তার সারা শরীর দুলে দুলে উঠতে লাগল, চোখে নাচল প্রগলভতার ছটা, বলল—সত্যি বলছেন, সত্যি একথা বলতে পারতেন? কখনও পারতেন না। আবার সেই মোহিনী হাসি, আবার সেই দেহের উর্ধ্বাংশে পাগল-করা ঢেউয়ের নাচন।

নীরদের আর উত্তর যোগাইল না। [illegible] যেন কোন অজানা [illegible] [illegible]-ত্ব, তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া, যেন সঞ্চারিণী দুরন্ত হাসি, চোখের সামনে যেন বিদেশের সুদূরপ্রসারী আকাশ, দেহের শিরায় শিরায় রক্ত স্পন্দন যেন অবিশ্রান্ত [illegible] দ্রুত।

বিষ্ণুর কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল নীরদ। তার কপালের আহত ফোলা জায়গাটির উপর হাত বুলাইতে লাগিল। বিষ্ণুমায়া নীরবে চক্ষু বুজিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

কিছু পরে স্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া নীরদ গাঢ়স্বরে ডাকিল—মায়া।

মায়া! ওঃ, তার নামের এত মাধুর্য যে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারে না। প্রিয়জনের কাছে ত আরও মধুর শোনায়। কি আদরের নাম। কোথায় বিষ্ণুমায়া আর কোথায় মায়া। এ-ডাক শুনিলে তার সারা দেহে একটা পলক শিহরণ জাগে। এ-ডাকে সে বোধ করি পরপারের পার হইতেও সাড়া দিবে। বলিবে, আছি আমি তোমারই আছি। সেই ডাক, সেই মায়া প্রাণ-মনের উৎস মুখোৎ চমকানো আহ্বান।

মায়াও একেবারে তার কাছে ঘেঁষিয়া ঘন হইয়া আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ নীরদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল তারপর কি বুঝিল সেই জানে, নীরদের ডানহাতখানি নিজের ডান হাতে তুলিয়া বাঁ হাতে তার গলা বেষ্টন করিয়া কহিল—কি বলছ, বল।

নীরদের চোখের সম্মুখ হইতে তখন ইহকাল পরকাল মুছিয়া গিয়াছে, সারা শরীরে জাগিতেছে অপূর্ব রোমাঞ্চ তাই তাহার মুখে এ প্রশ্নের উত্তর জোগাইল না। মায়া যে এই প্রথম তাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল, এ বোধ হয় তাহার চেতনা নাই।

—দূর, তুমি ভয়ানক ভীতু। বলিয়া মায়া হাত ছাড়িয়া দিল। হাত ছাড়িয়া দিবার ঝাঁকানিতেই হউক, অথবা ভীতু কথাটি মর্মান্তিক হওয়ার জন্যই হউক—কিছুক্ষণ যেন ধাক্কা খাইয়া নীরদের চেতনা ফিরিয়া আসিল।

কথাটা সারাদিন সে ভাবিল। মায়া যে তাহার কত নিকটে আসিয়াছিল, কত সহজে সে যে আপনা হইতেই ধরা দিতে চাহিয়াছিল, অথচ গ্রহণ করিবার সাহস তাহার হয় নাই, সে কথার আভাস পর্যন্ত সে দিতে পারে নাই,---এই চিন্তা তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। মায়ার মত অত স্পষ্ট, অত সহজ-স্বচ্ছন্দ সে কেন হইতে পারে নাই সেই দুর্লভ অনির্বচনীয় ক্ষণে।

সেদিনও সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন। সূর্য গিরিশ্রেণীর ওপারে সবেমাত্র নামিয়াছে, পশ্চিম আকাশ তখন তাহার শেষ বিদায় রশ্মিতে রক্তিমাভ। নীল রঙা ডোরা শৈলমালা বিস্তীর্ণ বাহু প্রসারিত করিয়া কি যেন আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

মায়ার মা আসিয়া দাঁড়াইল নীরদের বাসার সামনে। নীরদ বাসায় ফিরিতেছিল, অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার আসিবার কারণ শুধাইলে সে কিছুই বলিল না। শুধুমাত্র জানাইল, এদিকে তাহার কোন্ আত্মীয় আছে, তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, এখন ফিরিয়া যাইতেছে। কিন্তু একথা নীরদের পুরাপুরি বিশ্বাস হইল না।

ঘণ্টাখানেক পর সে মায়ার বাসায় গেল। সোজা প্রশ্ন করিল, তার মাকে তার বাসায় পাঠাবার কি দরকার ছিল? মায়া বলিল---সে পাঠায় নাই, সে ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানে না। তাহার মা কখন কোথায় যায়, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া যায় না। একটু পরে আবার বলিল---বোধ হয় গিয়েছিল কোন কাজ পাওয়া যায় কি না আমার জন্যে তাই দেখতে। আমাদের সংসারে তো বসে থাকলে চলে না।

নীরদ কি ভাবিল কিছুক্ষণ। তারপর পকেট থেকে তিনখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া বলিল---যতদিন তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, ততদিন তোমাকে কাজে যেতে হবে না। রাখো এই টাকা। ফুরালে আমাকে বলবে, কোনো সঙ্কোচ করবে না। বুঝলে?

মায়া কোন উত্তর দিল না, টাকা নেবার কোন লক্ষণও দেখা গেল না তার।

নীরদ অগত্যা তার হাতের মধ্যে টাকাটা গুঁজিয়া দিয়া চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে।

দিন সাতেক পর। এ কয়দিনে নীরদ আর মায়ার বাড়ীতে যায় নাই।

মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা মেরামতের কাজ চলিতেছে। কর্মী-দলের মধ্যে দেখা গেল মায়াকে। পিঠে তার 'ডোকো' ভর্তি মাটি। অতিকষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই বোঝা লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে। দেখিলেই বোঝা যায়, কিছু দিন আগেকার হাস্যময়ী তরুণীটি আর নাই, রোগের দাপটে তাহার যৌবনপুষ্ট শরীরে একটুখানি বিষণ্ণ কান্তির ছাপ আজও রহিয়া গিয়াছে।

নীরদকে এ-পথে আসিতে দেখিয়াই

তাহার সমস্ত শরীর যেন অবসাদে ভারী হইয়া আসিল। ডোকো-টা নামাইয়া দিয়া সে সেদিনকার মত কাজে ক্ষান্ত দিল। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে পা বাড়াইল। নীরদ তাহার গমন-পথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর অন্য পথ ধরিল।

এ সম্বন্ধে একটি বোঝাপড়া করিবার মনোভাব লইয়া নীরদ বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িল সন্ধ্যার কিছু আগে।

মায়াকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। তাহার মা'র নিকট হইতে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, সে কাছেই কার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছে, এই নীরদ আসিবার একটু আগেই।

মায়ের সঙ্গে কথাবার্তাতেই সে জানিতে পারে, মায়া খুব রাগিয়াছে সেদিন টাকা দেওয়াতে, বলিয়াছে, একটা লোককে আর কতদিন শোষণ করতে হবে। সেই অসুখ হওয়া থেকে আরম্ভ করে আমার পিছনে কম টাকা ঢেলেছে। মা তো তাহাকে অতি কষ্টে থামাইয়াছে, বুঝাইয়াছে এ টাকা না হয় ধার বলিয়াই ধরা যাক। আস্তে আস্তে শোধ করিয়া দিলেই চলিবে; তবে সে থামিয়াছে। তাই সে আজ হইতে পুনরায় অপটু শরীর লইয়াও কাজ করিতে গিয়াছে।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া যখন সে সত্যই বুঝিতে পারিল মায়ার সহিত দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন সে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু ঘরের বাহিরে পা দেওয়া মাত্রই যেন সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিয়াছে, এই ভাবে দুই পা পিছাইয়া আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

দিন দশেক আগে হইলে এ ব্যাপারটা তরল হাস্যপরিহাসের মধ্যেই সমাপ্ত হইত। কিন্তু আজ এ ব্যাপারটাই বড় ভয়াবহরূপে দেখা দিল। অবস্থাটাকে করুণ কিম্বা তার রূপ দিল?

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে অপরিচ্ছন্ন রাস্তার প্রায় উপরে একজন, আর হাত দুয়েক তফাতে ঘরের মধ্যে একজন—কাহারও মুখে কথাটি নাই, দুজনে প্রস্তরমূর্তির মত নীরবে দণ্ডায়মান।

নীরবতা ভঙ্গ করিল নীরদ। মায়ার নিকটে আসিয়া হাত দুখানি ধরিয়া মমতা-কোমল স্বরে প্রশ্ন করিল—মায়া, আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই তুমি কি এখন কাজে নেমেছ? এ শরীরে কাজ করলে ক দিন বাঁচবে?

মায়ার খানিকক্ষণ লাগিল নিজেকে সামলাইয়া লইতে। তারপর অসহায় ও আর্তকণ্ঠে উত্তর দিল—কিন্তু টাকাগুলোর তো একটা উপায় করতে হবে?

হাসিয়া উঠিল নীরদ—আমার টাকার কথা বলছ! এ টাকার কথা ভেবে বোধ হয় তোমার রাত্রিতে ঘুম হয় না—কেমন?

সত্য কথাটাও সব সময়ে সকলের কাছে বলা যায় না। তাই মায়াও এখন সত্য কথাটা নীরদের কাছে বলিতে পারিল না। অথচ সে সত্যটার জ্বালায় সে অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে লাগিল।

মায়ার নীরবতা দেখিয়া নীরদ আবারও প্রশ্ন করিল—কই, উত্তর দিচ্ছ না যে!

এবার গম্ভীর স্বরে মায়া বলিল, আমার যা বলবার তা প্রথমেই বলেছি। —তাহার কণ্ঠস্বরে নীরদ চমকাইয়া উঠিল। অন্ধকার না থাকিলে সে দেখিতে পাইত, মায়ার চোখের কোলে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে।

প্রায় নীরদকে ঠেলিয়া দিয়াই মায়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

নীরদও আর ফিরিয়া চাহিল না, বাসার দিকে রওনা হইল। আজিকার পরিস্থিতিতে এখানে তাহার যেন অতঃপর দম আটকাইয়া আসিতেছিল।

মাসখানেক পরের ঘটনা।

সেদিক সকালে সারা ভুবন আলো করিয়া রোদ উঠিয়াছে। নীল আকাশখানির স্বচ্ছতায় মনে একটা পরিচ্ছন্ন আনন্দের আভাস জাগিয়া উঠে। পাইন গাছের ঋজুভঙ্গিও আজ প্রভাতে যেন নম্র ঊর্ধ্বরেখার মত মনে হইতেছে। চারিদিকে যেন একটা আনন্দের সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য সঙ্গীত নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। অদূর গিরিশ্রেণীকে নীল ও সবুজের একত্র সংমিশ্রণে একটা নয়ন-মনোহর বর্ণসুষমার সৃষ্টি হইয়াছে।

নীরদ আসিয়া দাঁড়াইল মায়ার বাড়ীর সম্মুখে। পিছনে তাহার একজন কুলি; কুলির মাথায় একটি হোল্ডঅল ও একটি চামড়ার স্যুটকেশ।

শুনিল মায়া বাড়ী নাই—কাজে বাহির হইয়াছে। কোথায় কাজে বাহির হইয়াছে, সে তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছে। তাই সে কুলিকে সেইদিক দিয়া চলিতে বলিল।

মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা মেরামতের জন্য কর্মীরা সবেমাত্র আসিয়া সমবেত হইয়াছে, একটু বাদেই কাজ সুরু হইবে। মায়া এখানেই আসিয়াছে।

কর্মীরা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন তাহাদের নাম ডাকা হইতেছে। একজন লোক ঐ সারির সামনে দাঁড়াইয়া ছোট একটা লাল রঙের নোটবুকে কি যেন লিখিতেছে।

নীরদকে আসিতে দেখিয়া মায়া লাইন হইতে বাহির হইয়া আসিল। একেবারে সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করিল—

—এ কি কুলি কেন? স্যুটকেশ—হোল্ডঅল!

জোর করিয়া একটু হাসিয়া নীরদ বলিল—আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছি কি না। চাকরি ছেড়ে দিলাম, মায়া।

সারা অন্তর কি এক অব্যক্ত বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল, একটি কথাও মায়া বলিতে পারিল না। চোখে তার জল আসিয়া পড়িল, দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল।

চোখ মুছিয়া যখন ভাল করিয়া তাকাইল, তখন আর নীরদের চিহ্ন কোথাও নাই।

মায়ার সেদিনের রোজগারের ঘর পড়িল শূন্য।

॥ তেইশ ॥

সেবার এসেছিলাম শীতে, এবার এলাম শরতে।

সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে আকাশখানি এখন আশ্চর্য নীল। থোকা থোকা ভবঘুরে মেঘ সেখানে পেঁজা তুলার মত ছড়ানো। শরতের এই মেঘগুলির মতি চঞ্চল, মন উড়ু-উড়ু। এক জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে নেই; অলস মন্থর গতিতে অবিরত ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একঝাঁক শঙ্খচিল ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে। সব যেন চিত্রার্পিত মনে হয়।

যাদবপুরে যখন পৌঁছলাম, দিনটা সন্ধ্যের দেউড়িতে থমকে আছে। পিসেমশাইকে চিঠি লিখেছিলাম, আমাকে নিয়ে আসবার জন্য স্টেশনে যেন কারুকে না পাঠান। আগের বার কলকাতা ছিল আমার কাছে অজানা মহাদেশ। এবার তো আর তা নয়; অনায়াসেই আমি যাদবপুর চলে আসতে পেরেছি।

দু'বছর পর এলাম। এর ভেতর যাদবপুরের চেহারা অনেকখানি বদলে গেছে। আগে মানুষজন ছিল কম; গাছপালা আর ফাঁকা জায়গাই বেশী। দিনরাত পাখির ডাক শোনা যেত। এখন চারিদিকে কত বাড়ি যে উঠেছে, লেখাজোখা নেই। গাছপালার বংশ নির্মূল হয়ে গেছে; শূন্য মাঠগুলো ভরে উঠেছে; আশপাশের গায়ে ময়দানের ছোঁয়া লেগে গেছে যেন।

এত পরিবর্তন এত নতুনত্বের ভেতরেও এক পলক দেখে নিলাম, বাগানের ঝাড়চা সেই একই রকম আছে। তেমনই ভাঙাচোরা, প্রাচীন, দেওয়াল-ধসা, আস্তরখসা।

সারা গায়ে পাঁচ দিনের ক্লান্তি মাখা। তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে সাঙঘাতিক। ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোন কিছু দেখার মত এককণা উৎসাহও এখন অবশিষ্ট নেই। পায়ে পায়ে গেট পেরিয়ে পিসেমশাইর বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম।

সূর্যটাকে আকাশের কোন প্রান্তেই এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; রোদও নেই তবু পশ্চিমের ভাসমান মেঘে মৃদু রক্তিম আভা লেগে আছে।

একতলায় সিঁড়ির মুখে মঙ্গলের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'আসুন দাদাবাবু'—

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

বললাম, 'কেমন আছ?'

'ঐ একরকম। আপনি?'

'আমার আর থাকাথাকি। তোমরা আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'আজ্ঞে। আপনার তো পরশুতরশু আসার কথা ছিল।'

'তা ছিল। ট্রেন লেট বলে দেরি হয়ে গেল।'

'সেবারও তো দু'দিনের রাস্তা চারদিনে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'যাক গে, জেরবার হয়ে এসেছেন। এখন কথাবার্তা থাক। মালপত্তরগুলো নিন দিকি; আপনার ঘরে রেখে আসি।'

'আমার ঘর।'

'আজ্ঞে। সেই যেখেনে আপনি থাকতেন—'

'সেই ঘর এখনও আমার আছে।'

'ঘরখানা এমনিই পড়েছিল। আপনার চিঠি পাবার পর বড়বাবু ঝাড়পোঁছ করে রাখতে বলেছেন।'

'ও। আচ্ছা মঙ্গলদা —'

'বলুন —'

'কমলের খবর কী? এখানে আসেটাসে?'

মঙ্গল বলল, 'সব খবর জানতে পারবেন। এখন চট করে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসুন। তারপরে চান-টান সারুন। খেতে দেব। ক'দিন গাড়িতে কম ধকল তো যায় নি।'

শুধোলাম, 'পিসেমশাই বাড়ি আছেন?'

—'আছেন। বাড়ি থেকে কোথায় আর যান উনি!' বলতে বলতে আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে পুবদিকের সেই ঘরখানায় চলে গেল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় পিসেমশাইর ঘরে চলে এলাম।

দু'বছর আগে যেমন দেখেছিলাম, প্রায় তেমনটিই আছেন পিসেমশাই। তেমনই নিস্পৃহ, গম্ভীর। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, 'এবারও ট্রেন লেট ছিল বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় তিনদিনের মতো।'

'তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?'

'শরীর ভালই আছে। তবে সব সময় দুর্ভাবনা —'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না পিসেমশাই। একটু ভেবে নিয়ে শুরু করলেন,

'ওখানকার অবস্থা কি আবার খারাপ হয়ে গেছে?'

নির্বাকভাবে মাথা নাড়লাম, 'আজ্ঞে হাঁ।'

'তোমার কি মনে হয় ওখানে থাকা যাবে না?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হলে আর কি আবার চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর। বাবা-মাকে নিয়ে এসো—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর আমার সেই হিসেব টিসেব-গুলো একটু দেখো। তোমাকে তখন যা দিতাম তাই দেব।'

আমি উত্তর দিলাম না।

পিসেমশাই বললেন, যাও, 'চান-টান করে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর গে।'

নিঃশব্দে একতলায় চলে এলাম।

স্নান-টান সেরে খেতে খেতে মঙ্গলের কাছে এ বাড়ির অনেক খবর পেলাম। অমল সেই যে চলে গেছে, তারপর থেকে একবারের জন্যও আর এখানে আসে নি। রাস্তায় দু-তিন দিন মঙ্গলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে; জামা-কাপড়ের এমন হাল যে কে বলবে সে এ বাড়ির ছেলে! গরীবের চাইতেও যারা গরীব তারাও ওর চাইতে ভাল পোশাক পরে। পিসেমশাই এমনই নির্দয়, এমনই পাষাণ যে অমলের কথা একবারও মুখে আনেন না।

রিণ্টু আর বিমল অবশ্য বাড়িতেই আছে। নামেই থাকা; প্রায় সর্বক্ষণই তারা বাইরে বাইরে ঘোরে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শুধু খাবার আর শোবার। রিণ্টু আর দুই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল; দু'বারই ফেল করেছে। এবারও আবার পরীক্ষা দেবে। দেবে তো, কিন্তু সারা দিনে আধঘণ্টার জন্যেও যদি বই খুলে বসে!

বিমল বি-এ পাশ করে বসে আছে। আমি চলে যাবার পর তাকে নাকি আরো অনেকবার বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিয়েছেন পিসেমশাই। কিন্তু বিমলের দু কান কাটা; লজ্জা-টজ্জা। [illegible] বালাই নেই। এখানে থেকে বাপের অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছে।

অমলের জন্য মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'অমল এখন কোথায় আছে জানো?'

দু' বছর আগে দেশে ফিরে যাবার সময় টালিগঞ্জের এক বস্তিতে অমলকে দেখে গিয়েছিলাম। দেশে গিয়ে খান-কয়েক চিঠিও দিয়েছিলাম ঐ ঠিকানায়। অমল এক-আধটার উত্তর দিয়েছিল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গল বলল, 'জানি না দাদাবাবু—'

'ক'দিন আগে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল?'

'এই তো পরশুদিন।'

'তার ঠিকানা জিজ্ঞেস কর নি?'

'করেছিলাম; দিলে না। কত চাপাচাপি করলাম, কিন্তু মুখ থেকে ঠিকানাটা কিছুতেই বার করতে পারলাম না।'

একটু নীরবতা।

তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মঙ্গলদা—'

মঙ্গল চোখ তুলল, কী কইছেন দাদা-বাবু —'

'রিণ্টু আর বিমলদা এখনও রাত করে বাড়ি ফেরে?'

'হ্যাঁ —' ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিল মঙ্গল, 'ওই বদ অভ্যেস কখনও যায়! ওদের জন্যে রাত্তিরের ঘুমটা আমার গেছে।'

●

খাওয়া - দাওয়ার পর নিজের ঘরখানায় এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মাথার দিকে জানালা; তারপর বাগান। বাগান পেরিয়ে উঁচু কাচ-বসানো পাঁচিল। পাঁচিলের ওধারে বিনিদের ভাঙাচোরা বাড়ি।

আশ্বিনের মাঝামাঝি এই সময়টায় বেশ হাওয়া দিয়েছে। শরতের হাওয়া—ঝিরঝিরে, এলোমেলো, সুখদায়ক।

ক'দিন পরেই পুজো। বাগানের কোথায় যেন একটা শিউলি গাছ রয়েছে, ফুলও ফুটেছে অজস্র। বাতাসে শিউলির গন্ধ আলতো করে মাখানো।

আশ্চর্য নীলাকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ। তার তলায় শরতের চাঁদ ডুব-সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

সারা দেহে পাঁচটি দিনের ক্লান্তি মাখা; নরম নিভাঁজ বিছানায় গা ঢেলে দিয়েছি। তবু ঘুম আসছে না। বার বার বাড়ির কথা মনে পড়ছে। মা-বাবা—সবিতা—

তাড়াতাড়ি উঠে চিঠি লিখলাম। নিরাপদে যে কলকাতায় পৌঁছেছি সে খবর বাড়িতে জানানো দরকার।

চিঠি লেখাটেখা হলে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে ঘুমোতেও চেষ্টা করলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, হে নিদ্রা, আমাকে আবৃত কর, আচ্ছন্ন কর। আজকের রাতটার মত আমার ওপর তোমার আবরণ টেনে দাও।

ঘুমোব ভাবলেই কি ঘুমনো যায়! জগতে কোন কিছুই বোধ হয় নিরঙ্কুশ নয়? হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল।

বললাম 'কে?'

দরজার ওধার থেকে গলা ভেসে এলো, 'মে আই কাম ইন?'

এ কণ্ঠস্বর আমার চেনা — বিমল! তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলাম। বিমল ঘরে ঢুকে বলল, 'এইমাত্র বাড়ি ফিরে মঙ্গলের মুখে শুনলাম, তুমি এসেছ। শোনামাত্র তোমার কাছে চলে এলাম। ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ, আপনি?'

'আমি সবসময় ভাল থাকি। এভার ফ্রেশ-তারপর হঠাৎ আবার চলে এলে? দেশের খবর খারাপ নাকি?'

'হ্যাঁ। খুব খারাপ।'

পূব-বাঙলার সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রশ্ন করল বিমল। তারপর বলল, 'শুধু শুধু সেবার চলে গেলে। অলকাদি তোমার চাকরি ঠিক করে রেখেছিল; তখনই যদি নিয়ে নিতে —'

বিষণ্ণ সুরে বললাম, 'তা হলে এই বিপদ ঘটত না।'

একটু ভেবে বিমল বলল, 'যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। অলকাদিকে আবার তোমার কথা বলব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'তুমি তো আবার অলকাদিকে পছন্দ কর না।'

এখন পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়। যেভাবেই হোক, যার কাছ থেকেই হোক, চাকরি আমার একটা চাই-ই। তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'না-না, আপনি বললেন —'

'কালই বলব।'

কৃতজ্ঞ চোখে বিমলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বিমল কী বলতে গিয়ে এবার থেমে গেল। আমার দিকে তকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

তার মনোভাব বুঝে নিয়ে শুধোলাম, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।'

'বলুন না —'

'সেই কথাটা মনে আছে?'

স্মৃতির ভেতর কিছুক্ষণ হাতড়ে বেড়ালাম। তারপর বললাম, 'কোনটা?'

বিমল বলল, 'রাত্রিবেলা সেই যে দরজা খুলে দিতে —'

মনে পড়ল এবং হেসেও ফেললাম। বললাম, 'এবারও খুলে দিতে হবে তো?'

'হ্যাঁ। বড় উপকার হয় ভাই তা হলে। চিরকাল আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। বাবা কী যে নিয়ম করেছে, দশটার ভেতর সদরে তালা লাগিয়ে দেবে। কোন ভদ্রলোকের পোষায় রোজ অত তাড়াতাড়ি ফেরা। তুমিই বল।'

ভদ্রলোকের ঠিক কত রাতে ফেরা উচিত আমার জানা নেই। কাজেই চুপ করে থাকতে হল।

বিমল বলল, 'তা হলে ঐ কথাই রইল।'

'আচ্ছা।'

'আমি এখন যাই ভাই। তুমি টায়ার্ড হয়ে এসেছ; শুয়ে পড়।'

বিমল চলে গেল। দরজা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে আমার বিছানায় এলাম। আমারও তৎক্ষণাৎ ঘুম এল না। অন্ধকারে চারদিক থেকে বাবা-মা-সবিতা-অসংখ্য ভাবনা, অগণিত মুখ ভিড় করে এল।

সবার কথা ভাবতে ভাবতে কখন একসময় দুরন্ত এক ঘূর্ণি আমাকে টেনে টেনে অতল পাতালের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। তারপর আর কিছুই জানি না; বিস্মৃতির মত গাঢ় অন্ধকার আমার সমস্ত চেতনাকে আবৃত করে দিল।

●

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল।

এখনও আবছা অন্ধকার রয়েছে। পাঁচিলের ওপরে গাছগাছালির মাথায় শরতের অল্পস্বল্প হিম জমে আছে। পাখিদের রাজ্যে এরই মধ্যে ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। বাসা ছেড়ে বেরুবার আগে পুরুষ-পাখিরা গাঢ় সোহাগের গলায় মেয়ে-পাখিগুলোর কানে কানে কী যেন বলছে।

জানালা দিয়ে ভোরের যে বাতাস আসছে তার গায়ে শিউলির গন্ধ মাখানো।

আশ্চর্য, সূর্য উঠবার এই আগের মুহূর্তটিতে মা-বাবা বা সবিতার কথা মনে পড়ল না। যে দুজন চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তারা মালতী এবং শ্রীধর।

সেবার শ্রীধর বলেছিল, আমার জন্য জবরদখল কলোনিতে জায়গা রাখবে। তারপর তা আর তার কাছে যাওয়াই হয় নি।

মালতীকেও কতকাল দেখি না। দেশে চলে যাবার পর শিশির মুখুটিকে ক'খানা চিঠি লিখেছিলাম। শিশির মুখুটি নিজে উত্তর দ্যান নি; মালতীই দিত। তার শেষ চিঠি পেয়েছিলাম বছর-খানেক আগে। তাতে লিখেছিল, কাল-বাজারে তাদের আর থাকা হবে না। তার মেসোমশাই রাধামোহন বদলি হয়ে শিলিগুড়িই পাটনায় চলে যাবেন। রাধামোহন বদলি হয়ে যাবার পর মালতীদের কী অবস্থা হয়েছে, তারা কোথায় আছে, কিছুই জানি না। চিঠি লিখেও উত্তর পাই নি।

আজ একবার মালতীদের খোঁজ করব। তার আগে যাব শ্রীধরের কাছে। জবরদখল কলোনিতে যদি একটু জায়গা পাওয়া যায়?

মালতীদের খোঁজে বেলার দিকে বেরুলেও চলবে। এখন বরং শ্রীধরের কাছেই যাওয়া যাক। ভাবামাত্র আর শুয়ে থাকলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখটুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এখনও এ বাড়ির ঘুম ভাঙে নি। এমন কি পিসেমশাই পর্যন্ত ওঠেন নি। সদর খুলে বাগান এবং গেট পেরিয়ে বাইরে চলে এলাম।

বিনিদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে একবার ভাল করে তাকালাম। নাঃ এখানেও ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণ নেই।

শ্রীধরদের জবরদখল কলোনিতে যখন পৌঁছলাম, বেশ রোদ উঠে গেছে। পুব দিকের গাছপালার মাথায় সোনার থালার মত সূর্যটা স্থির হয়ে আছে।

দুবছর আগের মত জবরদখল কলোনির চেহারাটা আর শ্রীহীন নেই। তখন ছিল সারি সারি হোগলার ছাউনি; কদাচিৎ এক-আধটা টিনের দোচালা। এখন হোগলা টোগলার ঘর নেই বললেই হয়। টিনের বাড়িই বেশি; পাকা এক-

জন্য বাড়িও চোখে পড়ে। তবে দু-বছর আগের মত সব বাড়ির সামনেই আনাজের বাগান, মুলাটুলের গাছ। উঠোনের মাচাগুলো লাউগাছে ছেয়ে আছে।
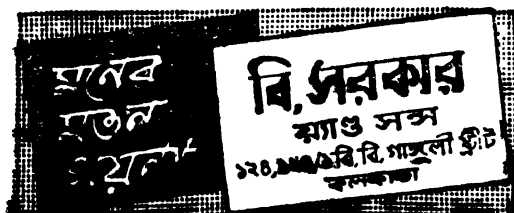
খুঁজে খুঁজে শ্রীধরের বাড়িটা বার করলাম। তার বাড়ির চেহারাও বদলে গেছে। পুব-দক্ষিণের ভিটের বড় বড় টিনের ঘর; উঠোনের একধারে একচালা রান্নাঘর। আরেক ধারে দোল-মঞ্চ, তুলসীমঞ্চ, রাসমঞ্চ।

ডাকলাম, 'নাথ মশায় আছেন?' ডাকাডাকিতে মাঝবয়েসী একটা লোক বেরিয়ে এল। তার চোখেমুখে শ্রীধরের আদলটাই বসানো। দেখেটেখে শ্রীধরের ছেলে কি ভাই বলেই মনে হল।

লোকটি বিনীত অথচ জিজ্ঞাসু সুরে বলল, 'কারে চান?'

'নাথ মশায়কে।'

'কোন নাথ মশায়?'

'শ্রীধর নাথ।'

লোকটি তক্ষুণি উত্তর দিল না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একখানা জলচৌকি বার করে আমাকে বসতে দিল। তারপর বলল, 'তেনি নাই।'

আমি চমকে উঠলাম, 'নেই মানে!'

'মারা গেছে।'

'কবে?'

'বছরদেড়েক আগে।'

অনেকক্ষণ নীরবতা। তারপর বললাম, 'নাথমশাই আপনার কে হতেন?'

বিষণ্ণ ভারী গলায় লোকটা বলল, 'আমার বাবা।' একটু ভেবে শুধলো, 'আপনারে তো চিনতে পারলাম না বাবু—'

হাসলাম, 'চিনবেন কী করে? আগে তো আর কখনও আমাকে দেখেন নি।

'তা ঠিক। তয় —'

'কী?'

'বাবার লগে আপনের কীভাবে আলাপ হইছিল?'

কিভাবে আলাপ হয়েছিল, বললাম। এবং বছর পর দেশ থেকে কাল কলকাতায় এসে আগেই কেন যে শ্রীধরের কাছে এসেছিলাম, তাও জানালাম।

এসব শুনে গম্ভীর চিন্তিত মুখে লোকটি বলল, 'তাই তো, অখন তো জমিন পাওয়া যাইব না বাবু। সব জমিন ভাগজোগ হইয়া গেছে।'

'কিন্তু আপনার বাবা বলেছিলেন আমার জন্য জমি রাখবেন।'

'হে (সে) তো দুই বছর আগে কইছিল। তখন জমিন দেওয়া যাইত; আইজ কাইল কে কারে দিব? দ্যাখেন না, কত ঘর দুয়ার উইঠা গেছে। এক-চিলতা জমিন কোনখানে পইড়া নাই।'

'কোন একটা উপায় হয় না?'

'না বাবু —'

আরো কিছুক্ষণ নানা কথা বলে উঠে পড়লাম। পিসেমশাইর বাড়ির দিকে যেতে হঠাৎ অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। শ্রীধরের ছেলে আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। তবু মনে হল, শ্রীধর বেঁচে থাকলে হয়তো জবরদখল কলোনিতে একটু জমি পেয়েও যেতে পারতাম।

●

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর অকল্যাণ্ডে চলে এলাম।

দু বছর আগে কিছু লোনের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, ফাইলের ভেতর সেগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই।

অগত্যা নতুন করে দরখাস্ত করতে হল। তারপর পায়ে পায়ে ধর্মতলায় চলে এলাম।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক করলাম মালতীদের খোঁজে বাগবাজার যাব। ট্রামে উঠতে যাব হঠাৎ রাজভবনের পুবদিক থেকে অসংখ্য কণ্ঠের শ্লোগান ভেসে এল:

'আমরা কারা?'

'বাস্তুহারা।'

আমাদের দাবী —'

'মানতে হবে।'

খাওয়া - পরা —'

'দিতে হবে।'

কলোনি থেকে উৎখাত করা —'

'চলবে না চলবে না —'

'কলোনির স্বত্ব —'

'দিতে হবে, দিতে হবে —'

'পুলিশ জলুম—'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর।'

শ্লোগানগুলো দূরাগত সমুদ্র-গর্জনের মত শোনাচ্ছে। আমার চোখ সেদিকে ফিরে গেল। দেখলাম বিরাট একটা মিছিল পোস্টার আর ফেস্টুনে সেজে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সুরেশের কথা মনে পড়ে গেল। দুবছর আগে যাদবপুর - গড়িয়া - টালিগঞ্জের উদ্বাস্তু জুটিয়ে এমনি মিছিল করে রাজভবন কি রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দিত সে। তার মিছিলে আমি একদিন এসেছিলাম।

আজকের এই মিছিলটা যাদবপুরের দিক থেকে সুরেশই নিয়ে আসে নি তো। ট্রামে ওঠা আর হয় না। অসীম কৌতূহলে বড় বড় পা ফেলে রাজভবনের কাছাকাছি এসে মিছিলটাকে ধরে ফেললাম।

যা ভেবেছিলাম, সুরেশই নিয়ে এসেছে। মিছিলটার একেবারে মুখে তাকে দেখা গেল। মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করছে:

'আমাদের দাবী—'

বাকি মিছিলটা সম্মিলিত গলায় চেঁচালো, 'মানতে হবে।'

দু'বছর আগের মত এবারও রাজভবনের কাছে পুলিশ সুরেশদের পথ আটকাল। অনেকক্ষণ শ্লোগান দিয়ে মিছিলটা রাস্তার ওপর বসে পড়ল।

এই সুযোগে সুরেশের কাছে চলে এলাম। আমাকে এতকাল পর এখানে, এই পরিবেশে দেখবে তা যেন কল্পনাই করে নি সুরেশ। অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'আরে চিরঞ্জীব যে —'

আমি হাসলাম, 'হ্যাঁ।'

'তুমি না দ্যাশে চইলা গেছিলা?'

'হ্যাঁ'।

'আইলা কবে?'

'কাল বিকেলে।'

'দ্যাশের খবর কী?'

'খুব খারাপ।'

'তখনই কইছিলাম, দ্যাশে যাইও

ফসফোমিন শরীরে
শক্তি যোগায়
খিদে বাড়ায়
কাজ করার
ক্ষমতা যোগায়
সহজে রোগে
কাবু হ'তে দেয়না
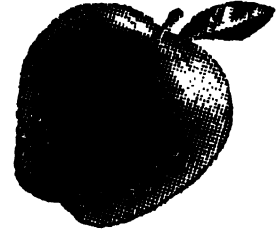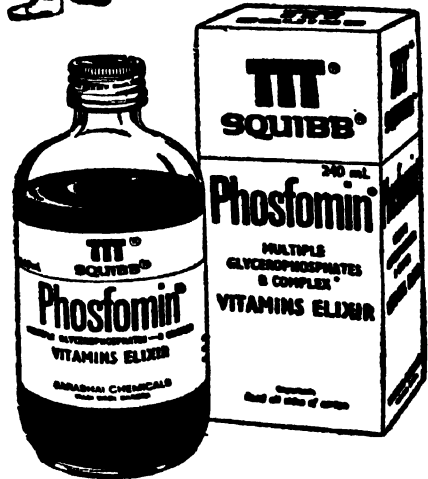
কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর ও সারাদিন দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণঃ একবার মাত্র কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্য্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ার খাওয়ার ঠিক পরেই দাঁত ব্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়—আজ পর্য্যন্ত দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেট এর সেই প্রমাণ আছে!

কী সুন্দর এর পিপারমেণ্টের সুস্বাদ—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে!

পরিচ্ছন্ন নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে…পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেষ্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

যদি পাউডার পছন্দ করেন, কলগেট টুথ পাউডারে এসব গুণই পাবেন… এক কৌটা পাউডার কয়েক মাস চলবে!

শুশ্রূষার কাজ

—সুমন দত্ত

আলোকচিত্র

মাসিক বসুমতী। ভাদ্র / '৭৬

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু		
আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ
পাঠিকা	নায়ক	ধোঁয়া

১ম পুরস্কার কুড়ি টাকা

২য় পনেরো টাকা : ৩য় দশ টাকা

তিন সংগী

—পারুল [illegible]

নীচু থেকে উঁচু
—শিবু দত্ত
(১ম পুরস্কার)

নীচু থেকে উঁচু ...
—বিশ্ববন্ধু বসাক
(২য় পুরস্কার)

প্রভাত সঙ্গীত
—মানসকুমার মুখোপাধ্যায়

-অমিতাভ দাশগুপ্ত

নীচু থেকে উঁচু

—মুরারিমোহন হালদার
(৩য় পুরস্কার)
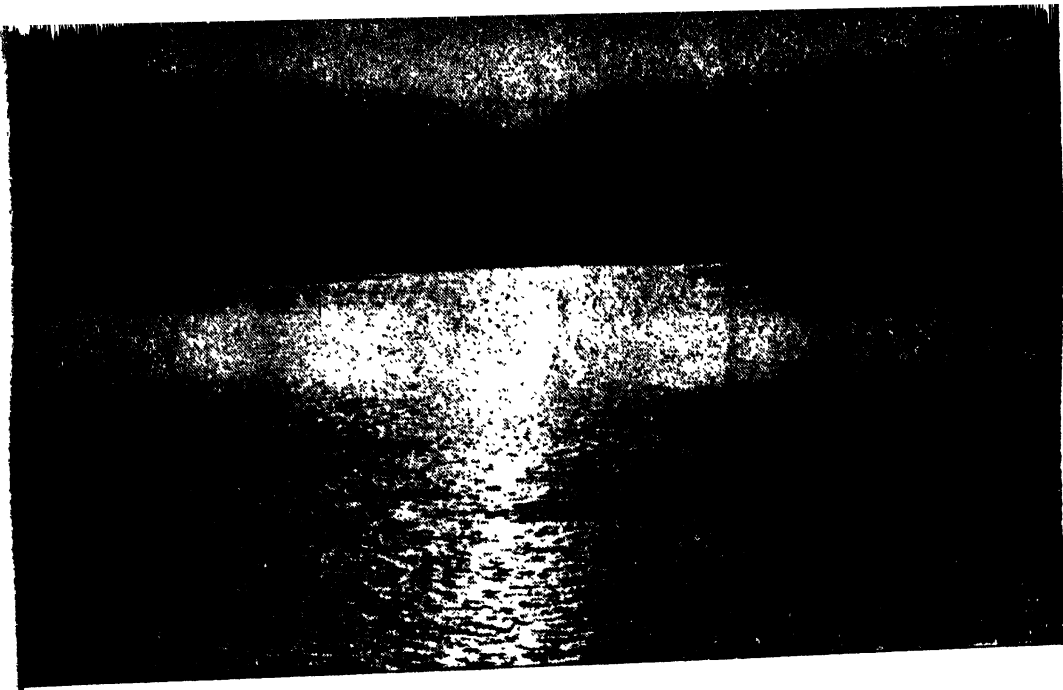
না। অবিজিরাও বাড়িঘর 'এক্সচেঞ্জ' কইরা মা - বাবা- বইনেরে কইলকাতায় লইয়া আস—তা তো করলা না।'

কথাটা ঠিকই বলেছে সুরেশ। আমি চুপ করে থাকলাম।

সুরেশ আবার বলল, 'পাকিস্তান আমাদের পক্ষে কোনদিনই ভাল হইব না। দুই চাইর দিন হয়তো চুপচাপ থাকব। তারপর আবার ধুন্দুমার লাইগা যাইব --

'আচ্ছা সুরেশদা —'

'কও —'

'সেবার আপনি বলেছিলেন, যে এক মুসলমান ভদ্রলোক বাড়িটাড়ি এক্স-চেঞ্জ করতে চায় —'

'হ' —

'তাকে কি এখন পাওয়া যাবে?'

'না; আরেকজনের লগে এক্সচেঞ্জ কইরা স্যায় (সে) কবে পাকিস্তান গেছে গা।'

হঠাৎ বুকের ভেতর নিদারুণ এক থাকক্কা লাগল যেন, একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনার তো কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা। আর কেউ বাড়িটাড়ি এক্সচেঞ্জ করবে কিনা জানেন?'

সুরেশ বলল, 'অক্ষণি (এখুনি) মনে পড়তে আছে না। এক কাম কইরো তুমি আমার বাড়িতে আইসো। অখন আমি বড় ব্যস্ত'—বলেই পুলিশ বেষ্টনীর দিকে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ধর্মতলার ট্রাম টার্মিনাসে এসে বাগবাজারের ট্রাম ধরলাম।

●

মালতীরা যে বাড়িতে থাকত সেখানে যখন পৌঁছলাম পশ্চিম আকা-শের গড়ানে ঢাল বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে।

দরজার কড়া নাড়তে একজন বর্ষীয়সী সধবা মহিলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললাম, 'আচ্ছা, এখানে রাধা-মোহনবাবুরা থাকতেন না?'

মহিলা বললেন, 'থাকতেন। কিন্তু তাঁরা তো বছরখানেক হল পাটনায় চলে গেছেন।'

'আপনি একটা খবর দিতে পারেন?'

'কী?'

'রাধামোহনবাবুর এক ভায়রাভাই শিশির মুখুটি পাকিস্তান থেকে এখানে এসে উঠেছিলেন —'

'যাঁর স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্ম-হত্যা করেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। শিশিরবাবুরা এখন কোথায় বলতে পারেন? রাধামোহন-বাবুদের সঙ্গে পাটনায় চলে গেছেন কি?'

'না। শুনেছি শিশিরবাবুরা সুভাষ কলোনিতে আছেন।'

'আচ্ছা চলি।'

বিদায় নিয়ে যাদবপুরের দিকে যেতে যেতে ঠিক করলাম, দু-একদিনের ভেতরেই দত্তপুকুর যাব। [ক্রমশ।

পুতুল নাচের কাহিনী

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

(শেষাংশ)

ঝর্ণা। ইচ্ছা করে শখ করে কেউ অসুখী হতে চায়। তোমরা সকলে পাগল হয়ে গেছ। আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। শুনছ, বাড়ী চল।

অসীম। অনেক দূর এগিয়ে গেছি ঝর্ণা, আর ফেরা যায় না। এখন আমাদের যা বলার বলতেও হবে, যা শোনার শুনতেও হবে। যা বলছিলাম তখন উর্মিলা, তুমি যতই দার্শনিক তত্ত্ব শোনাও। খুব সহজ সরল ভাষায় আবার বলছি আমি এখনও তোমাকে।

ঝর্ণা। সহজ-সরল ভাষা তুমি বলছ না। এ ভাষা কখনও তোমার নয়। শংকরদার সামনে আমার সামনে নির্লজ্জের মত যা বলছ, তা অস্বাভাবিক, ভুল, মিথ্যা।

অসীম। তুমি কি কেবল বাধা দেবে বলেই প্রতিজ্ঞা করেছ?

ঝর্ণা। হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা করেছি। একশ-বার প্রতিজ্ঞা করেছি। যা হবার নয়, যা অন্যায়, তা আমি তোমাকে করতে দেব না। একটা সামান্য কথা তোমরা কেন কেউ বুঝতে পারছ না। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যা মনে আসে তাই মুখে বলে ফেলার কোন বাহাদুরী নেই। এর পরে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো।

অসীম। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে থাকাটাই কি চরম সার্থকতা।

ঝর্ণা। চরম সার্থকতা কি, তা আমি জানি না। কিন্তু শংকরদা আর উর্মিলাদির জীবন এভাবে নষ্ট করে দেবার তোমার অধিকার নেই। তোমার জন্যেই আমাদের আজকের অভিনয় মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। ভুলে যাওয়া সময়ের পোকায় কাটা পুরান স্মৃতি আবার নতুন করে মনে আনতে তুমিই সবচেয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলে। এখন বল আমাদের কি হবে?

শংকর। তুমি অত মুষড়ে পোড় না ঝর্ণা—আমাদের কিছু হবে না। আমাদের কিচ্ছু হয় না। যতক্ষণ না নাট্যকার ফিরে আসছে, ততক্ষণ যার যা খুশী বলব—একে অন্যকে অনবরত দুঃখ দেব। তারপর ও ফিরে এলে আবার যে যার সাজানো সংসারে ঘরকন্না করব নিয়মমত। এত বড় পৃথিবীতে মানুষের কত সমস্যা. কত যন্ত্রণা। সেখানে কতটুকু জায়গা জুড়ে আমাদের অস্তিত্ব বল তো? কয়েকটা ফাঁপানো-ফোলানো বুদ্‌বুদ্‌ দুদিন বাদেই যা মিলিয়ে যাবে শূন্যে। তাই নিয়ে এত তোলপাড় করার অর্থ কি?

ঝর্ণা। আমিও তো এতক্ষণ ওকে সেই কথাটাই বোঝাতে চাইছিলাম। সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কটা কাটিয়ে যেতে পারলেই হয়। সময়ের কাছে আমাদের কারো কোন দাম নেই।

শংকর। (হাসতে হাসতে) ঝর্ণা, এতক্ষণ উর্মিলা অসীম আর আমি নিজেরা একটা ত্রিভুজ তৈরী করেছিলাম, ভেবেছিলাম এ নাটকে তোমার কোন স্থান নেই, কিন্তু তোমারও যে অনেক কিছু বলার রয়েছে। তোমার গল্প নিয়ে আমরা এতক্ষণ একটুও মাথা ঘামাই নি এটা খুব অন্যায়। বল—তোমার কথা।

ঝর্ণা। আমার কোন কথা নেই। ভুল করছেন শংকরদা।

শংকর। একটুও ভুল করছি না। আচ্ছা, তুমি না বলতে পারো, আমিই বলছি। জানো, এককালে আমি কবিতা, গল্প লিখতাম। উর্মিলা সে সব দেখে হাসত বটে, কিন্তু আমার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারেনি।

ঝর্ণা। আমাকে নিয়ে তাই বুঝে বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখবেন?

শংকর। না, তোমার চরিত্র বিশ্লেষণ করব। তুমি খুব সরল, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। তা ছাড়া অসীমকে তুমি ভালোবাস। ওটা একটা হতভাগা—তোমার ভালোবাসার স্বরূপ ও একটুও বুঝতে পারেনি। আমার তো মনে হয় যেভাবেই হোক, অযাচিত ভালোবাসা পেলে অন্য অনেক দুঃখ, অনেক বঞ্চনাকে ভুলে থাকা সম্ভব হয়। অসীম, তুমি ঝর্ণার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দাম যদি

[illegible]

দিতে না পার, তাহলে জীবন তোমাকে ক্ষমা করবে না।

অসীম। বাঃ, খুব গুছিয়ে কথা বলতে জানো দেখছি। তবে আমার প্রশ্নটাও শোন। জীবন বলতে কি বোঝাচ্ছ? একটু আগেই শুনলাম আমরা অসার, মিথ্যা, বুদ্বুদ। তাই যদি হয়, তাহলে কে ক্ষমা করল আর কে করল না, তাই নিয়ে অশ্রুপাত করে কোন লাভ আছে?

শঙ্কর। অনর্থক তর্ক করেও কোন লাভ নেই অসীম। উর্মিলা, তুমি ঝর্ণাকে কিছু বলবে না?

উর্মিলা। আমি কি বলব? আমার মনে হয় এতক্ষণ আমরা অনেকেই অনেক কিছু বলেছি। কিন্তু কেউ কোন সমাধানের পথ পেলাম না। অথচ যতদিন ধরে রিহার্সেল দিয়েছি, প্রত্যেকেই মনে মনে ভেবেছি নাট্যকারের গল্পটা ঠিক হয়নি। আমি হলে সম্পূর্ণ অন্যভাবে লিখতাম। অথচ দেখো, আজকে স্বাধীনতা পেয়েছি কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু কই, গল্পটাকে তো বদলাতে পারছি না। ভেঙেচুরে তোলপাড় করে দিচ্ছি, কিন্তু মনের মতো হচ্ছে কি? তোমরা বল কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।

শঙ্কর। কোথাও না। চারটে দেওয়ালের মাঝখানে সে একরকম ছিলাম। মাথা কুটে কান্নারও তবু একটা জায়গা ছিল সেখানে। এখন অন্ধকারে পথ হারিয়ে কেবল ঘুরে মরা।

উর্মিলা। অসীম ধরে নিলাম তুমি আমাকে এখনও ভালোবাস। কিন্তু আমি তো তোমাকে ভুলে গেছি। তাহলে আমাদের সম্পর্ক এখন কি দাঁড়াবে? আরও কঠোর তিক্ততা কি জীবনকে অস্থির করে তুলবে না?

শঙ্কর। আমিও জানলাম উর্মিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফাঁকির। এখন তো আর সান্ত্বনা রইল না। তাহলে —আমি—আমরা কি করব?

অসীম। পারলাম না—। হেরে গেলাম আমরা। জীবনকে নিয়ে গল্প লেখা যায় না। ডাকো—ফিরিয়ে নিয়ে এসো নাট্যকারকে। তার কাছে ক্ষমা চাইব। বলব—তুমি যা লিখেছিলে, তুমি যা শিখিয়েছিলে—সেই সব তুচ্ছ সাধারণ ঘটনাগুলিই সত্যি। কোনখানে আমাদের নাটক থেমে গিয়েছিল? মনে আছে উর্মিলা,—আমি তোমাকে কি বলছিলাম।

উর্মিলা। তুমি আমি আগাগোড়াই ভুল করেছিলাম। তবে এখন যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে অনুতাপ করে লাভ নেই। বসন্তকে চা আনতে বলি। ঝর্ণা—তুমি বরং গান শোনাও, যতক্ষণ না নাট্যকার নতুন করে আমাদের জন্য গল্প লিখে নিয়ে আসেন।

(বাইরে চলে যাবে)

শঙ্কর। সেই ভালো—ঝর্ণা তুমি একটা গান কর লক্ষ্মীটি—।

ঝর্ণা। কি গাইব। আমার কোন গান মনে আসছে না।

শঙ্কর। গীতবিতানটা দাও এদিকে—। আমি বেছে দিচ্ছি। (পাতা উল্টোতে উল্টোতে) কবে তোমার প্রোগ্রাম আছে বলত? আমাদের রেডিওটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

ঝর্ণা। পরশুই তো বিকেলে আর রাত সাড়ে দশটায়। আমাদের ওখানে চলে আসবেন। তাছাড়া আমাদের পাড়ায় শিববাবুর বাড়ীতে ঘরোয়া আসর বসবে শুক্রবার। আরও দু'তিনজন আর্টিস্ট আসবেন। শুনছ—শঙ্করদাকে কার্ড পাঠিয়ে দিও।

শঙ্কর। এই যে এই গানটাই খুঁজছিলাম এতক্ষণ। 'সুখে আমায় রাখবে কেন—'।

ঝর্ণা। না, ও গানটা নয়। (অসীমের দিকে তাকিয়ে) তুমি সেদিন কোনটা গাইতে বলেছিলে মনে আছে? সেটাই করছি। (মুখ নীচু করে গান। এর মধ্যে ট্রে হাতে করে উর্মিলা ঘরে ঢুকবে। সকলকে চা দেবে)

শঙ্কর। (গান শেষ হলে) এতক্ষণ আমরা নিজেদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিছিমিছি কষ্ট পেয়েছি। গোড়াতেই যদি ঝর্ণা আমাদের গান শোনাতো তাহলে এত দুর্ভোগ সইতে হোত না। চা খেয়ে নাও ঝর্ণা—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ঝর্ণা। নাট্যকার কখন আসবেন?

শঙ্কর। ওর সময় হলে ও ঠিকই আসবে। তবে আমাদের ব্যবহারে আজ খুবই চটেছে। ভয় হচ্ছে গল্পটাকে অদলবদল করে দেবে খুশীমত। একবার যেন শুনেছিলাম অসীম, তোমার রাঁচীতে বদলি হবার চান্স আছে।

ঝর্ণা। ওসব কথা তুলবেন না শঙ্করদা। আমার গানের তাহলে বারোটা বেজে যাবে।

শঙ্কর। না, আমি তুলব কেন? গল্পটা লেখার ভার তো আমার উপরে নেই। দেখা যাক—অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়— তা নাট্যকার ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। ঐ তো উনি এসে গেছেন—। (নাট্যকারের প্রবেশ) ওঁকে একপেয়ালা চা দাও উর্মিলা।

নাট্যকার। না, আমার চায়ের দরকার নেই। (পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে) সংক্ষেপে একটা ছক ছেটে এনেছি। তোমরা আজ থেকে আবার নতুন করে রিহার্সেল শুরু করে দাও। আমারও দোষ হয়েছিল—তোমাদের জীবনকে বড় বেশী বৈচিত্র্যহীন করে ফেলেছিলাম। উর্মিলা, তোমাকে পাড়ার মন্টেসারি স্কুলে একটা চাকরী নিতে হতে পারে। দুপুরে বারটা থেকে দুটো। আর অসীম, তোমার একটা লিফ্‌ট হবার কথা হচ্ছে। আসছে মাসের মাঝামাঝি রাঁচীতে বদলি হবে, তার জন্যে তৈরী হও।

না ঝর্ণা, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। তোমার গানের কদর ওখানেও হবে, ভয় নেই। শঙ্কর, তোমাকে আমি কি বলব। তোমার অভিনয় নিখুঁত—জীবনকে তুমি মেনে নিতে পেরেছো। তুমি যা ছিলে তাই থাকবে। এ কি এঘরে জানলাটা কে খুলে দিয়েছে ? বন্ধ করে দাও—বন্ধ করে দাও। (শঙ্কর উঠে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেবে) এই ঘর, এই চারটে দেওয়াল, আকাশ ঢাকা ছাদ—এই তোমাদের নিশ্চিন্ত, নির্বিঘ্ন আশ্রয়। কি হবে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। মানুষের আবহমান কাল ধরে ঐ একটি দোষ—কেবল দূরের জিনিষকে হাতের মুঠোয় সে ধরে আনতে চায়। একটা দুধের শিশুকে দেখো—হাত বাড়িয়ে সেও চাঁদকে ডাকছে—'আয় চাঁদ আয় আয়—।' কিন্তু সুখকে কি ওভাবে তোমরা পাবে ? সুখ জিনিষটা কি আমাকে বলতে পারো ?

অসীম। যা চাই—তাকে পাওয়াই সুখ।

উর্মিলা। কখনো না। একবার পেলেই মূল্য ফুরিয়ে যায় আমাদের কাছে। আমার তো মনে হয় চেয়েই আমাদের বরং বেশী সুখ।

ঝর্ণা। না উর্মিলাদি। চেয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। কোনদিন পারেনি। বরং দিয়েই মানুষ চিরকাল সুখী। আপনি কি বলেন শঙ্করদা— ?

শঙ্কর। আমার কাছে সুখ জিনিষটা সম্পূর্ণ মানসিক একটা অবস্থা-মাত্র। চাওয়া, পাওয়া, ত্যাগ, ভোগ—এসব কিছুই নয়। চুপ করে ঘরে বসে একটা ভাল গান শুনতে পেলে, অথবা রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতার কোন লাইন মনে পড়লেও আমি নিজেকে সুখী মনে করি।

অসীম। তোমার ওসব কবিত্ব অর্থহীন—

নাট্যকার। হয়েছে, হয়েছে, এ তর্কের শেষ কোনদিন হয়নি কখনো হবেও না। আচ্ছা সুখের ডেফিনিশন না হয় পাওয়া গেল না—। দুঃখ কি—তা বলতে পার।

অসীম। এখানেও একই উত্তর। চেয়েও যখন পাই না—তখনই আমার দুঃখ।

উর্মিলা। পেয়ে যখন আর চাও না—তার দুঃখ আরও অনেক বেশী।

ঝর্ণা। আমার মতে স্বার্থপর মানুষই দুঃখী।

শঙ্কর। সুখও যা দুঃখও তাই। মনে মনে মানুষ যা হতে চায় সে তাই—।

অসীম। শঙ্কর—আবার হেঁয়ালী করছ। তোমার কোন কথা কোনদিনই স্পষ্ট হোল না।

নাট্যকার। দোষ শঙ্করের একার নয়, তোমাদের সকলের ধারণাই খুব অস্পষ্ট, না-বোঝার মেঘে আচ্ছন্ন। সুখ কি, দুঃখই বা কি, তার উত্তর কেউ দিতে পারলে না। কাজেই স্বাধীনও অথবা তোমাদের মতামতের মূল্য দিতে গেলে আমার নাটক লেখাই হবে না। পুতুল নাচের পুতুল হওয়াই তোমাদের একমাত্র গতি।

ঝর্ণা। কিন্তু আপনার গল্পটা তো সবটা বললেন না। উর্মিলাদি শঙ্করদা ওরা শেষ পর্যন্ত সুখী হবে ? আর—আমরা—আমাদের—

নাট্যকার। হ্যাঁ—সুখী হবে। তোমরা সবাই সুখী হবে। যে যেমন সুখ চেয়েছে সে তাই পাবে। ভেবে দেখলাম নিছক ট্র্যাজেডী লিখে লাভ নেই। শঙ্কর বা হারার তাই নিয়ে অনুতাপ করতে বসে না। যে ফুল ঝরে গেল তার জন্যে হা-হুতাশ না করে আবার ফুল ফোটার অপেক্ষা করে। কাজেই ও সুখী। আর উর্মিলা ; ওর তৃষ্ণা অফুরন্ত। অনুতাপেরও শেষ নেই। কিন্তু তৃষ্ণাকে ও মেটাতে চায় না। যন্ত্রণায় ছটফট করেই ও সুখী। ওদের জীবন এ ভাবেই বেশ কেটে যাবে। তোমার অহেতুক চিন্তার কারণ নেই ঝর্ণা।

অসীম। কিন্তু আমাকে আপনি কি দিলেন ? আমার সুখ কোথায় ?

নাট্যকার। তার উত্তর তো তুমি নিজেই দিয়েছ। হাতের মুঠোয় পেলেই তো তোমার সব সুখ। তাই তো ঝর্ণার মতো রূপে-গুণে এমন নিখুঁত একটি সঙ্গিনী পেলে। তাছাড়া উন্নতি এখন ধাপে ধাপে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। আর কি চাই ?

অসীম। আমি ঠিক এই জীবন চাই নি। এই সাধারণ একঘেয়ে দিনগুলো আমার মনে বোঝার মত চেপে রয়েছে। আপনি ভালো করেই জানেন উর্মিলাকে—

নাট্যকার। আমি ভালো করেই জানি বহুদিন আগে উর্মিলা নামে একটি মেয়েকে তুমি ভালোবাসতে। স্মৃতি মানুষকে দুঃখ দেয় না অসীম। বরং অনেক সময় বোঝার সাধারণ একঘেয়েমির দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবির মত তারা সাজানো থাকে। যখন হঠাৎ চোখ সেখানে গিয়ে পৌঁছয়—সেই সব ফুলে, সূর্যের আলোয়, নদীর জলে অথবা কোনো ভালো লাগা মুখের আদলে—তখন—তখন—কি সুখ তোমার নাগালের বাইরে থাকে। তোমার জন্যে আমি স্মৃতির সান্ত্বনা রেখে দিয়েছি। আর ঝর্ণা—

ঝর্ণা। আমি কোনদিন কিছু চাইনি।

নাট্যকার। বাইরে থেকে বিচার করলে মনে হবে তোমার অনুভূতি এদের তিনজনের মত প্রখর নয়—অতএব তুমিই সবচেয়ে সুখী। কিন্তু আমি তো জানি—

ঝর্ণা। আপনি সব জানেন, সব বোঝেন। আমি কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারিনি। তবু একটা অনুরোধ—আমার রাখবেন ?

নাট্যকার। বল তুমি কি চাও।

ঝর্ণা। এরা তিনজনের মনের মধ্যে যেন আজকের দিনের ছায়াটা

জনে না থাকে। এদের আপনি সুখী করুন।

নাট্যকার। দুঃখ কি, তাও প্রশ্ন করেছিলাম তোমাদের। ঠিক উত্তর পাইনি। ঝর্ণার চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে আমার একটা কথা বার বার মনে হয়েছে—যে ভালোবাসে, সেই দুঃখ পায়। ভালোবাসাই সবচেয়ে গভীর দুঃখের উৎস।

ঝর্ণা। তুমি কি জীবনকে এতখানি ভালো না বেসে পার না। (ঝর্ণা মুখ নীচু করে থাকবে) তাহলে আমিও তোমার কাছে হেরে গেলাম। তোমাকে সুখী করতে পারলাম না। সেজন্যে তুমি আমার উপরে অভিমান করে থেকো না।

ঝর্ণা। আপনার তো কোন দোষ নেই। আর আমাকে নিয়ে দয়া করে আপনারা এত বিচলিত হবেন না। আর সকলে সুখী হলেই আমি সুখী।

নাট্যকার। ঠিক আছে। তাহলে কাল থেকে নতুন নাটকের রিহার্সেল শুরু। আর কারো কিছু বলবার আছে? (সবাই ফিরবার চেষ্টা) বাস, গল্পটা তাহলে মোটামুটিও শেষ হয়েছে। প্রথম দৃশ্য খানিকটা পড়ো শোনাই — অসীম — তুমি এধারে এসো। ঝর্ণা মুখ গম্ভীর করে শঙ্করকে বল—শঙ্করদা, শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়তে হোল।

ঝর্ণা। শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়তে হোল শঙ্করদা—

(নাট্যকার শঙ্করকে ইঙ্গিত করবে)

শঙ্কর। বল কি অসীম—কদলির হুকুমের বদল হোল না।

অসীম। (হাসিমুখে) আপনারা বেড়াতে বেড়াতে চলে আসবেন ওদিকে। বেশ বড় কোয়ার্টার্স—কোন অসুবিধে হবে না। উর্মিলাকে চেঞ্জে পাঠানোর সমস্যা আর থাকলোই না।

উর্মিলা। চেঞ্জ—? বদল—? জীবনকে কি বদলানো যায়।

শঙ্কর। উর্মিলা—জীবনকে মানুষই বদলাতে পারে। যদি—যদি আমরা আর একবার চেষ্টা করি—।

উর্মিলা। (হাসতে হাসতে) অঙ্কগুলো একেবারে সব গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে—তাই না?

শঙ্কর। তবু তো মিলের আভাস আছে—? তাই কি কম?

অসীম। ঝর্ণা—

ঝর্ণা। হ্যাঁ—অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়ী চল। কালকে আমাদের ওখানে আপনাদের নেমন্তন্ন রইল শঙ্করদা। একটু সকাল-সকাল আসবেন—অনেক গান শোনাব—উর্মিলাদি—শঙ্করদাকে একটু তাড়া দেবেন। যা কুঁড়ে মানুষ—। আজ চলি তাহলে—।

অসীম। গুড নাইট—। শুভরাত্রি।

(ওরা চলে যাবে)

উর্মিলা। (খুব ক্লান্ত গলায়) শিবানীর মেয়েকে একবার দেখে এসো। আমি ততক্ষণ খাবার গরম করি—।

নাট্যকার। চলো শঙ্কর—।

উর্মিলা। গায়ে সোয়েটার পরে নাও—ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

(শঙ্কর সোয়েটার তুলে নাট্যকারের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। বন্ধ জানলার সামনে উর্মিলা পেছন ফিরে দাঁড়াতেই—)

॥ যবনিকা ॥

জেগে আছি সীমান্তের ধারে

পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়

বসে আছি সীমান্তের ধারে,
অগ্নিবর্ষী রণক্ষেত্রে মৃত্যুর গহ্বরে।
অরণ্যের অন্ধকার হিমানীর মাঝে,
চলেছে বীরের দল হিংস্র কোন শার্দুলের সাজে
শত্রুর সন্ধানে।
মাঝে মাঝে পাহাড়ের বক্ষভেদ করে
জ্বলন্ত অগ্নির পিণ্ড মূর্চ্ছিত হইয়া এসে পড়ে
এ পারের শত্রুর শিবিরে।
কামানের অট্টহাস্যে পাষাণ কাঁপিয়ে ওঠে নীরব তরাসে
বেদনায় আকাশের বুকে রঞ্জিত হইয়া ওঠে
রক্তবর্ণ লাল,—
নীরবে চাহিয়া আছে শুধু মহাকাল,
মানুষের মূঢ়তার চিরসাক্ষী যিনি, পরমনির্বাক বন্ধু।
পূর্বাকাশে শান্ত সূর্যোদয় ঊষার প্রথম লেখা
পরম নির্ভয়,—
পাহাড়ের শৃঙ্গে কোন বুদ্ধের মন্দিরে, বাজিছে
প্রেমের মন্ত্র তথাগত সুরে,
নিচে কোন দূরে,—
চলেছে বীরের দল মৃত সৈনিকের শবাধার ঘিরে।
জেগে আছি সীমান্তের ধারে,—
মৃত্যুর শিয়রে।—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মেয়েটি বাসের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

সম্মুখের বাড়ীখানায় এখন কে আছে জানা যায় না। চার বৎসরের কুম্ভীপাকে বিগলিতদেহা এই কন্যাটি ফিরেছে। চার বৎসর আগের কাহিনী—কিন্তু অনুধাবন করার মন বা মতি নেই। সেই খাণ্ডবদাহন জ্বালিয়ে গেছে জীবনমুকুল। সেখানে স্মৃতি হয়েছে বিস্মৃতি। তাতেই সুখ।

কিন্তু বর্তমানে নেই ধ্রুব কিছু, সে তো পুরাতন পেটিকা খুলবে। কি নিয়ে মনের সঞ্চয়প্রবণতা অন্য ছকে বহমান করা চলে? আরও আগে চলে যাই।

গভীর ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অতীতের সুড়ঙ্গ। সেখানে আশ্রয় মেলার আশায় পিছু হটছে মন। মন বুঝি ওয়ান লেনের গাড়ী, ব্যাক করা ভিন্ন পথ নেই।

ওখানে যে বিকাশ থাকত একদিন নাকি এরই অভাবে দিনযামিনীবিরস করে তুলেছিল। নিরুপমা দৌত্যে নামত। বান্ধবী বিবাহে বীতরাগা। তাহলেও দেওরের সিনেমার আসন, গঙ্গার ধারে ট্যাক্সিবিচরণ, লোভ ছাড়া শক্ত। চিরকালের বাস্তবধর্মী নিরুপমা।

কিন্তু মেয়েটির একটা নাম চাই তো। নাম থাক তার না হয় পাঞ্চালী। একদিন পাঞ্চালী জীবনের একটা সাদৃশ্য ধরতে হয়েছিল তাকে দু'হাতে, জনারণ্যে তুলে দেখাতে হয়েছিল। সেদিন জনারণ্যে মুখখানা চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল কি?

শ্রীমতী বাণী রায়

আমি লক্ষ্য করিনি। আমি তার অন্তরের আগুন দেখতে নিয়োজিত ছিলাম।

পাঞ্চালীকে না পেয়ে গগন হরকার গান মুখস্থ করেছিল বিকাশ:—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে,
নিভাই কেমন করে।
মরি হায়, হায়রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
ওরে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে।'

কিন্তু মুখস্থের স্থিতি কেবল মুখে, মনে স্পর্শ দিতে পারেনি। কারণ—কটকট করে শব্দ হল যেন অদৃশ্য চাবির, ঘুরে এল ভিউ বক্সে ধানবাদের ছবি অনেক পরে।

শহরটিতে পৌঁছেছিল সেদিন সন্ধ্যায়। একটি দল বাংলা ও বিহারের নানা স্থান ভ্রমণান্তে এসেছিল ধানবাদের আওতায়।

সখের ভ্রমণ নয়।

সোশ্যাল-সার্ভিস বা সমাজসেবা বিভাগে একটি মাঝারীগোছের কাজ পেয়েছে পাঞ্চালী। পিতা মেয়ের বিবাহের জন্য মাতার মত অধীর না হলেও চাকুরি করাটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে প্রতি মাসে অতগুলো টাকা পাবার এবং অহর্নিশ আলস্যের গ্লানিমুক্ত হবার আশায় নিয়ে নিল কাজ। সেই সময়ে বিমলা দত্ত জীবনে এলেন। সে কথা পরে।

তারা বড় বড় মফস্বল শহরগুলি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট তৈরির কাজে লেগেছিল। কোন কোন জায়গায় তাদের সভা করে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন ছিল, নানারূপ স্লাইড ছিল।

উঠবার ব্যবস্থা উক্ত শহরগুলির নাগরিকের হাতে মাত্র। অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই খুব ভাল ব্যবস্থা। দু' একটা স্থানে আবার হাস্যকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সেদিন মনে হয়েছে পাঞ্চালীর দিগন্ত কত বিস্তৃত। কত অজানা নদীর তীরে, অনামা পথের ধারে।

মনে হত ফুলঝরা দিন।

মনে হ'ত ফুলফোটা দিন নয়।

খোঁপায় যদি একটি ফুল চলতি পথের গুল্মলতা থেকে তুলে এনে পরত, ঝরে যেত রাস্তার খরতাপে। কিন্তু এখন বুঝেছে পাঞ্চালী, সে তো ঝরার দিন নয়। কত যে আনন্দ, নিরলস দিনের কর্মবয়নে পেয়েছে সে। মূল্য দেয়নি বলে দুঃখ হয়।

তখন আকাশে মেঘ ছিল না। দিনে ছিল না চিতা। এক আদর্শ ধরে চলেছিল ঝোঁকের মাথায়। তারপর পথের শেষে যা দেখেছে সেই আদর্শ বঞ্চনা করল।

দিন দিনে ধানবাদে এল। সেখান থেকে ওখানকার সামাজিক পরিমণ্ডলের কোন প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ও মহিলা-সদস্যা নামিয়ে নিলেন পাঁচজনকে।

বাবলু, উমা, রণিতাকে ওঠানো হল এক বাড়ীতে। তাদের ওঠানো হল অন্য বাড়ীতে—সে ও নন্দাদিদি।

মালপত্র চাপিয়ে শহর পার হয়ে বাইরের দিকে এলেন ওঁরা গাড়ী নিয়ে চাঁইবাসা যাবার পথে।

'এখানে কোথায়?' ভীতস্বরে নন্দাদি প্রশ্ন করলেন। মনে ভয় ছিল তাঁর মেদিনীপুরের সেই গ্রামের মত দশা না হয়।

সে এক তাজ্জব কাণ্ড।

প্রকাণ্ড মাটির দোতলা বাড়ী। চেয়ার, টেবিল, খাট, রেডিও সব আছে। বিশিষ্ট ক্ষেতী পরিবার তাঁরা, আতিথ্যে নাম আছে। সেখানেই ওরা উঠেছিল।

প্রথমে দেখা গেল বাইরের ঘরের বারান্দায় চৌকির ওপর শীতলপাটি পাতা। গরমের দিন। ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরে তেতে-পুড়ে এসেছে ওরা। সম্মুখে সারি সারি ঝকঝকে পিতলের গাড়ু-ভরা পা ধোবার জল আর নূতন ছোট ছোট লাল গামছা।

পা ধুয়ে দাওয়ায় উঠতেই বড়-ছোট গেলাসে ভরা চিনির সরবৎ। না খেলে হয়তো সর্দিগর্মি হবে এতটা রোদে আসার পরে।

সরবৎ খেলে পর সর্ষের ও নারকেলের তেল এল। দরমাঘেরা বাথরুমে ঠাণ্ডা কুয়োর জল স্নানের। গ্রামটির জামাই তাদের সঙ্গে করে এনেছেন। তাই সকলেই তটস্থ।

স্নানের পরে শক্ত মাটির লেপা-পোঁছা রান্নাঘরে পড়ল বড় বড় পিঁড়ে। কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাস। নানা প্রকার ব্যঞ্জন, মাছ, দই, রান্নায় পাড়াগাঁয়ের বিশেষত্ব রক্ষিত হলেও অতিশয় স্বাদু।

বিকেলে চা, ঘরে তৈরি নিমকি, কাঁচা গোল্লা। দোতলার মাটির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ভারী খুসী হয়ে উঠেছিল পাঞ্চালী ও নন্দা। তারা দুজনে মাত্র সেবার গিয়েছিল ট্যুরে। নন্দাদি ও পাঞ্চালী।

বড় খাটে আধুনিক বেডকভারে বিছানা ঢাকা। ছিটের পরদা, টেবল চেয়ার। টেবল ল্যাম্প ব্যাটারিতে জ্বলে। ব্যাটারিতে রেডিও চলছে।

জীবনে দোতলা মাটির বাড়ীতে থাকেনি তারা। ভারী খুসী হয়েছিল। সম্মুখে চওড়া শক্ত মাটির বারান্দা। এ দেশে মাটি শক্ত পাথরের গাঁথুনির কাজ করে।

বিকেলে চায়ের পরেই প্রকৃতি ডাকলেন। সলজ্জ ভদ্র প্রশ্নের উত্তরে প্রকাণ্ড লাল সিন্দুর টিপপরা গৃহিণী বললেন, 'কলসরে জল রাখা আছে। গা ধোবেন তো?'

নন্দাদি বয়সে বড়, তিনি খুলেই বললেন, 'গা ধোওয়া নয়। একটু—মানে ল্যাট্রিন—মানে হচ্ছে—

'ও, পাইখানার কথা বলছেন? তা আসুন।'

উভয়ে জামাকাপড় হাতে রওনা হলেন গৃহিণীর সঙ্গে। বাড়ীর পেছনে পুকুরপাড়ে মাঠ ও ঝোপ।

দেখিয়ে বললেন গৃহিণী; 'ওই হোথা। পুকুরে জল সরবেন। এই যে, দুটো ঘটি দিয়ে গেলুম। ভয় নেই; হেথায় লোকজন আসবে নি।'

মাথায় বজ্রাঘাত হল উভয়ের। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন পুকুরপাড়ে। গৃহিণী তখন সসম্ভ্রমে চলে গেছেন। উভয়ে বাড়ী ফিরে খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। ভোরবেলা গাড়ী। রাত্রের লুচিমাংস বৃথাই গেল।

পুকুরপাড় থেকে ফিরে খাওয়া বন্ধ দেখে গৃহিণী সকাতরে উভয়কে ঘরে তৈরি হজমিগুলি খাইয়ে দিলেন।

সে কথা বহুদিনের ভীতি ও হাস্যরসসিক্ত হয়ে আলোচনায় নেমেছিল।

এখন নন্দাদি খোঁচা দিলেন গায়ে চওড়া কঙ্কণপরা হাত দিয়ে, 'আবার মেদিনীপুরের সেই গ্রামের দশা না হয়।'

তাঁর কথার মুখের উপর চাবুক মেরে গাড়ী থামল প্রাসাদে।

বিরাট বাড়ী, অতি নব্য ঢং-এ নির্মিত।

'কার বাড়ী?' পাঞ্চালী প্রশ্ন করল সজাগ সচেতনতায়।

সেক্রেটারী বললেন, 'আমাদের বড় অফিসর একজন—মিস্টার চ্যাটার্জী বাড়ীখানা করেছেন।'

নন্দাদি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'চাকুরী করে এতবড় বাড়ী করা যায় না কি?'

'শুধু চাকরি নয়, শ্বশুর মস্তলোক। যৌতুক দিয়েছেন বহু টাকা।'

নন্দাদি ও পাঞ্চালী নামলেন সেক্রেটারীর সঙ্গে। গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে উর্দিপরা বেয়ারা ও চাকর ওঁদের সুটকেশ দুটো নামিয়ে নিয়ে গেল।

অন্য মেয়ে তিনজন সতৃষ্ণ, সঈর্ষ দৃষ্টি মেলে ওদের দুজনের আস্তানাটা দেখতে দেখতে মহিলা-সদস্যদের সঙ্গে রওনা হ'ল। হয়তো ওদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা হবে এই আশায়।

বসবার ঘরের কোণাচে আসরে ওরা বসল। ওপাশে বিরাট খাবারঘর, চিত্রিত কুঞ্চিত পর্দা দুভাগ করেছে। জানালার কার্নিসে রাখা বহুবিধ

ক্যাক্টাস। তাকে সাজানো আলপনা করা পিঁড়ি, কুলো ...। ঘরে উগ্র বিদেশী আসবাব।

চিত্রিত পর্দা দু'হাতে সরিয়ে ওপাশ থেকে এলেন গৃহিণী। এখনও তরুণী বলা চলে, নামানো আধুনিক খোঁপার নীচে চক্‌মক করছে লাল পাথর, গলায় আঙুলেও উক্ত পাথর। এক হাতে ঘড়ি, অন্য হাতে লাল পাথর বসানো পাকা সোনার চুড়। লালপেড়ে শাড়ী ঘুরিয়ে পরা।

নমস্কার। পথে কষ্ট হয়নি?'

চোস্ত ভদ্রতা ভদ্রমহিলার।

পেছনে তক্ষুণি চাকর তামার কাজ করা ট্রে-ভরে চা-এর কাপ নিয়ে এল। সেটা শীতকাল।

'সুধাকরবাবু, চা নিন।'

সেক্রেটারী কৃতার্থ হয়ে চা তুলে বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জী কি ফেরেন নি? আজ শনিবার।'

'এসেছেন। কাপড় ছাড়ছেন। আপনাদের বাথরুমে গরম জল দিয়েছি। আমার গেস্টরুমটা দোতলায়।'

এহেন সময়ে মিস্টার চ্যাটার্জী এলেন অতিথিদের সঙ্গে দেখা করে আপ্যায়ন জানাতে। দায়-সারা ভাবে কাজটা সেরে চলে যাবেন নিজের সীমায় এমনি মুখ নিয়ে।

'আপনি!'

'আপনি?'

এই সম্ভ্রান্ত পদস্থ মিস্টার চ্যাটার্জী সেই নিরুপমার প্রত্যাখ্যাত দেওর বিকাশ। বহু বৎসর আগে তাকে অযোগ্য মনে হয়েছিল। সে জমিদার-দুহিতাকে বিবাহ করেছে, সে প্রকাণ্ড অফিসার হয়েছে, সবি শুনেছিল পাঞ্চালী। একসঙ্গে সবটার মোট বিন্যাস কে যেন মুখের ওপরে কাদার মত লেপে দিল।

পরিচয় পেলেন মিসেস চট্টোপাধ্যায়, তার নাম মীনাক্ষী। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন পাঞ্চালীর, বয়সে সামান্য ছোট হয়েও।

'এই বিদেশে দিদির বন্ধু এলেন, আপনি আমারও দিদি।'

গেস্টরুমে উঠবার আলাদা সিঁড়ি, আর্ট স্টোর নানা রঙের ছকে গাঁথা। বিরাট অতিথির ঘর। এয়ারকণ্ডিশনের মত তৈরি। অবশ্য এখনও বসেনি প্ল্যাণ্ট।

গোলাপী নেটের পরদায় ফ্রস্টেড কাচের জানালা ঢাকা। ডানলোপিলোর বিছানা। কাট্‌গ্লাসের ফুলদানীতে ফুল। গৃহস্বামীর রুচি ও অর্থ উভয়ই আছে।

রাত্রে সেদিন খেটে-খাওয়া মেয়েটির অত আরামেও নিদ্রা হয়নি। নন্দাদি অধেক রাত ধরে হোস্ট ও হোস্টেসের গুণব্যাখ্যা করে তবে ঘুমোলেন। স্কুলের হেড মিস্ট্রেস নন্দাদি এত প্রাচুর্য কম দেখেছেন।

মা পরে বলেছিলেন বটে, 'চালি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছে।'

কিন্তু মা মেয়ের বিবাহে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন না। পানজর্দার সেবা নিয়ে দিন কাটত তাঁর। মিঠেপান নানা মশলা সহযোগে বারে বারে হামানদিস্তায় ছেঁচে এনে দিত চাকর। একসঙ্গে ছেঁচে রাখা চলত না। কারণ তাতে নাকি স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া পানের মশলা দোক্তা সহযোগে হাজাররকম অনুপানে তৈরি করাও এক কাজ ছিল। তাই মেয়ের বিবাহ তাঁর মাথায় শিরঃ-পীড়া ঘটায় নি।

আজ নম্র রাত্রির আকুলতায় হাল্কা নীল বেড্ লাইটে উদ্ভাসিত ঘরে রজনীগন্ধার আবেশে মনে যদি ক্ষোভ হয় কে দোষ দেয়?

বাবা রিটায়ার করেছেন। ভ্রাতৃবধূগণ উগ্র হয়ে উঠেছে। রূপের শিখার এখন অশোককন্যরা দিন। মধ্যবিত্ত কলকাতার ঘরে নিত্য পরিচারক থাকে না, ঠাকুর চলে যায় মুখে মুখে তর্ক করে। কলকাতার বাইরে এই পরিবেশে কলের মত চলছে জীবন। কত সহজ হয়ে যেত জীবন। কত সচ্ছল। অভাব না থাকলেও পাঞ্চালীর জীবনে প্রাচুর্য কোথায়?

মীনাক্ষী দু'হাতে কুড়িয়ে নিয়েছে পাঞ্চালীর ফেলে-দেওয়া সামগ্রী। বাছা-বাছির প্রশ্ন মেয়ের ওপরে ছেড়ে তার অপরিণতবুদ্ধির ওপর ভার চাপান নি। মীনাক্ষীর বাবা-মা। নিজেরা মনোনীত করেছেন।

খাবার টেবলে ভোজ্য দেখার মত, বাসনপত্রও ঠিক তাই।

নন্দাদি আকণ্ঠ খেলেন। অনেক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না করে উনি কিঞ্চিৎ ভোজনবিলাসিনী হয়ে উঠেছেন। স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার অতুলনীয়। এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছেন, একটু বেশী খাবার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

বসবার ঘরে খাবার পরে কফি এল। রূপার পাত্রে।

বিকাশ কি সর্বপ্রকারে আমাকে বুঝিয়ে দিতে চায় আমি ভুল করেছি! এত আড়ম্বর ময়ূরের পেখম মেলার মত যেন ময়ূরীকে মুগ্ধ করার আশায়।

কিন্তু গৃহে মুগ্ধা ময়ূরী আছেই। জোড়াখাটে আছে একই শয্যা আস্তৃত। পরিপূর্ণ হয়েছে দেহমনের চাওয়া উভয়ের, দেখলেই বোঝা যায়।

কই কোথায় বিরহ-বিশীর্ণ অশ্রু-নুপাত মূর্তি? কোথায় মনের মানুষ বিহনে মনের ক্রন্দন?

তার প্রেম, ... তাতেও যদি প্রবঞ্চক হও, কী আর ...

সকালে বেড-টী ও ব্রেকফাস্ট পাঠ ... বিস্কুট। নন্দাদি ...।

'সত্যি, এমন চমৎকার লোক দেখা যায় না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চমৎকার লোক। দেখতেও চমৎকার। তোমাকে চেনেন বলেই বোধহয় এত খাতির যত্ন করছে।'

মাথায় দুষ্ট সরস্বতী খেলা করে গেল পাঞ্চালীর, 'না, নন্দাদি, এমন চেনা কত শত আছে। আসলে যত্ন করছে তোমাকে দেখে।'

'মানে?'

'বিকাশ, মানে মিস্টার চ্যাটার্জি বলছিলেন তুমি কী সুন্দর দেখতে, কত বিদুষী। তোমার মত মেয়ে তিনি দেখেন নি আগে।'

'যাঃ!' নন্দাদির স্বরে প্রীতির, তৃপ্তির উৎস।

'সত্যি বলছি, আমারি সম্মুখে

কথায় তুমি তখন ওর ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ছবির অ্যালবাম দেখাচ্ছিলে।'

নন্দা চুপ করে রইলেও বারে বারে আয়নার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। অতঃপর দু'দিনের স্থিতির বিনোদমেলায় এক অপরূপ নতুন খেলা, এক সময় কাটাবার খেলনা পেল পাঞ্চালী।

সকালে বাড়ীটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালেন ওঁরা। কোনও কথার ইঙ্গিতে বা নয়নের ক্ষণদৃষ্টি-ক্ষেপেও বুঝতে দিল না বিকাশ, একদা যা ঘটেছিল।

হয়তো আত্মপ্রীত সুখী দিনে পূর্ব-স্মৃতি আর নিঃশ্বাস ফেলে না। ও এত পেয়েছে যে আমাকে না-পাওয়া তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ঘরবাড়ী অতি আধুনিক। সামনে ছোট লন, পেছনে বাগান। লনে টেনি-পও।

শোবার ঘরে নিয়ে এলেন মীনাক্ষী। জোড় খাট। দুখানা খাটে এক মাপের নীল কাশ্মীরী ঢাকনা অতি নরম, অতি বিলাসী শয্যা। মেঝেতে পা ডুবে যায়—গালিচায়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—একখানা তক্তপোষ। গেরুয়া চাদর, একটা বালিশ, পাশবালিশবিহীন। পায়ের কাছে মোটা একখানা হাতে-বোনা চাদর।

কত দূরে?

শয্যা সেখানেও। মানষ ভেদে বিছানার ভেদ শুধু। সে মানষ কেন দূরে?

নিজেকে চকিতে সম্বরণ করে নিয়েছিল মীনাক্ষী। মুখ দূরের দেশ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল এদিকে, নতুন বড়লোকীর হালচালে।

নন্দা কেমন অনায়াসে পৌঁছে গিয়েছে!

বিকাশকে ভাল লাগেনি কোন-দিন, সাধারণ বলে মনে হয়েছিল। আজও অর্থসম্পদে মহীয়ান বিকাশ তার কাছে পরপুরুষ, তার মনের মানুষ নয়।

অথচ কি বিশেষত্ব পেল নন্দাদি! শুষ্কপ্রায় জীবনের কালো শাড়ীতে সোনার পাড় বুনেছিল নন্দাদি। গুন্ গুন্ করে নিজের মনে গান গাইছিল চুলে চিরুণী দিতে দিতে—

'একটুক ছোঁয়া লাগে, একটুক্ কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী'—

ঘরে স্বাস্থ্য সকল সমন্বিত সাজ টেবিল রাখা আছে অতিথির উদ্দেশ্যে, সেখানে দুই নারী বিলাসের হাট বসল নন্দাদির। নাইবের গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলল, জানালার কার্নিসে হাসল, মাধবী দুলছে নানা নিষেধে। পাঞ্চালী যেন আরও ইচ্ছা করেই পরল সাদা শাড়ী। দেখাতে চায়: আমি তোমাকে হারিয়ে আপশোষ করছি না। আমি তোমাকে ভোলাতে চাই না। বলতে চাই না, দেখ আমি কত লোভনীয়া।

কিন্তু কী নীচ নিরুপমা! দেওরের এত শ্রীবৃদ্ধির কথা ভ্রমেও জানায় নি আগে। শুধু জানিয়েছিল বিকাশ বড়-লোক হয়েছে। কিম্বা নীচ নিরু নয়। একথা ভেবে নীচ আমি। আমার মনে ব্যথা লাগবে বলে সে জানায় নি হয়তো।

বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে গল্প করামাত্র মা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ সমস্ত তোমারি হতে পারত। তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছ।'

তারপরে আবার পানের বাটায় মন দেবেন। যেন সর্বক্ষোভহন্তারক তাম্বুল।

বাবা বলবেন, 'ভবিতব্য।'

আপন মনের গহনে সে কি বলবে? সেই বিকাশ, ঠিক তেমনি আছে। অথচ নন্দাদির রকম দেখ না।

আপাদমস্তক প্রসাধনে উজ্জ্বল নন্দাদির সঙ্গে সভায় গেল। বিকাশ বিরাট গাড়ী নিজে চালিয়ে নিয়ে গেল, মীনাক্ষীর সঙ্গে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে বসবার ঘরে দীর্ঘ আলাপের পরে নন্দাদি রাত্রের বিছানার বিনিদ্রা। আজ চোখ ভেঙে ঘুম এসেছে পাঞ্চালীর কিন্তু উপায় নেই।

'জানো, চালি, আজ ভদ্রলোক কি বললেন খাবার পরে, মীনাক্ষী যখন মশলা আনতে গেল?'

'কী?' ঘুমে-ভরা চোখ তুলে তাকালো পাঞ্চালী কষ্টে।

'নন্দা, কলকাতায় গেলে চিনতে পারবেন তো, না ভূত বলে চমকে উঠবেন? শুনলে কথা?'

অতি সাধারণ কথা-বার্তার জন্য এক ভদ্রলোকের বাণীর মধ্যে সোনার আছে বিশেষ করে, বুঝল না পাঞ্চালী। চুপ করে রইল।

'ভূত মানে জানো তো? প্রেত নয়, অতীত। উনি আমার অতীত হ'তে ... হাঃ হাঃ!'

পাঞ্চালী হতবাক। নন্দাদির রংঢং বাতুলতা আছে, জানে সে। তাই বিঁ বিদেশে হঠাৎ আক্রমণ করা। এমন ভাব কোনদিন সে দেখেনি নন্দাদির। অবশ্য এত ঘনিষ্ঠভাবে থাকেও নি আগে।

বিকাশকে সে এত চেনে যে কোন কিছু ভেবে বাক্-চাতুর্য প্রকাশ তার চলে না, সেটাও জানে বিলক্ষণ।

'কি অদ্ভুত সুন্দর কথা বলেন ভদ্রলোক। শুনে মুগ্ধ হতে হয়।' গলার হারছড়া টেনে ঠিক করে দিতে দিতে নন্দাদি ছাদের কারুকার্যের দিকে চেয়ে বলল।

নন্দাদি এখনও সুশ্রী। টানা চোখে, টিকালো নাকে, ডিম্বাকৃতি মুখে পুরনো দিনের রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্প্রভ। ফুল ঠিকই, বাসি ফুল।

নারী যখন একজনকে ভালবাসে, তার মধ্যে কত মহত্ত্ব অর্পণ করে থাকে। শেকস্পীয়র 'মিডসামার নাইটস্ ড্রিমে' রাজ্ঞীকে অবধি গাধার প্রেমে নির্বোধ করে তুলেছিলেন। সে গাধা হয়েছিল অতুলনীয় টাইটানিয়ার কাছে।

'দেখেছিলে স্ত্রীকে দেখেই চুপ করছিলেন। স্ত্রী ওঁকে দারুণ চোখে চোখে রাখে। হবে না? অমন স্বামী?'

বেচারী ভদ্র নিরীহ মীনাক্ষীর কথা মনে পড়ে হাসি এল পাঞ্চালীর। বিকাশ একটি গদ্য মানুষ, দুই সন্তানের জনক। তার এখন ফ্লার্টিং করবার সময় বা রুচি নেই।

বুদ্ধিও ছিল না।. ড্যাবড়েবে চোখে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলা ভিন্ন অবদান ছিল না।

আচ্ছা, যদি এখন নন্দাদিকে সে বলে দেয় যে একদা বিকাশকে সে বিয়ে করেনি, তাহলে? নন্দাদি অপ্রতিভ হবে। চমকে উঠবে। অবশেষে বিশ্বাস করবে না।

যদি মীনাক্ষীকে বলে সে, মীনাক্ষী অপমানিত বোধ করবে, 'মাচ-ম্যারেড' পাঞ্চালীকে সন্দেহ করবে।

সুতরাং সে নির্বাক হয়ে মজা দেখছে।

নন্দাদি কী করে ভুল করছে? পাঞ্চালী বিকাশকে এড়িয়ে চলেছে। বিকাশও বোধহয় পূর্ব-প্রত্যাখ্যান স্মরণ করে সজাগ ও বেশী। ভদ্র। তাই নন্দাদি আসরে বেশী প্রাধান্য পায়। স্বাভাবিক। সে বয়োজ্যেষ্ঠা।

কিন্তু এ কী পরিণতি নন্দাদির? ওল্ড মেড হয়েছে বলে কি এমনি হবে?

মনে পড়ে গেল আর একটি এক-বয়সী ওল্ডমেডের মুখ। বিমলাদি। আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তায় উজ্জ্বল মুখ। নির্লিপ্ততায় আকাশবিহারী।

আর একটি উপস্থিতি---বিকাশদের শয্যা দেখে তাঁর কথা মনে হয়েছিল। সেই সান্নিধ্যে থেকেও কেন নন্দাদি হঠাৎ এমন করে বুদ্ধিভ্রংশা হয়ে পড়ল?

ঐশ্বর্য পুরুষের মুগ্ধ করে নারীকে। দাস-মনোভাবে সোনার বেড়ী চায় নারী। নইলে নন্দা নিয়োগীর, হায়, কী পরিণতি!

সেই রাত্রে বহু হাস্যকর কথাই শুনতে হল তাকে। নন্দাদি শুনল না।

সকালের ট্রেনে চলে এল তারা। স্টেশনে স্বামী-স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দু'জন তুলে দিতে এল। অন্য মেয়ে তিনজনও হাজির। ওদের অত ভালো ব্যবস্থা হয়নি। তাই মনঃক্ষুণ্ণ।

বিকাশ পাঞ্চালীর বাবা-মাকে প্রণাম, বৌদি নিরুপমাকে বলে দেবার কথা ইত্যাদি জানাল। সহাস্যে নমস্কার করে বলল, 'চিঠি দেবেন।' এটা দুজনকেই বলা।

মীনাক্ষী বলল, 'আবার আসবেন। আমরা যে এখানে কত কষ্টে পড়ে থাকি দেখলেন তো।'

গাড়ী আকাশে ধোঁয়ার মালা গেঁথে ছেড়ে দিল।

যতক্ষণ দেখা গেল নন্দাদি এক-দৃষ্টে গলা ও বুকের অর্ধেক বার করে চেয়ে রইল। হাত ও রুমাল নাড়লে। অবশেষে প্লাটফর্মের শেষাংশটুকু মিলিয়ে গেলে হাত-পা ছেড়ে বসে পড়ল। অন্য মেয়ে তিনটি দূরে বসে নিজেদের গল্পে ডুবে গেল।

এক স্টেশন পর্যন্ত নীরবতা।

কিছু সপেটা ও কলা কিনে নিল পাঞ্চালী। নন্দাদির দিকে এগিয়ে দিতে সে বলল, 'খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'খাও, নন্দাদি। মন খারাপ?'

'মনে হচ্ছে যেন গতজন্মের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।'

কী সর্বনাশ! সত্যই এতদূর ডুবে গেছে নন্দা? পাঞ্চালী কিছু বলার আগে মুখ খুলল আবার নন্দাদি, 'দেখলে কেমন করে চিঠি লিখবার কথা বললেন—যেন কথা নয়, অনুনয়। স্ত্রী ঘরে গেলে বললেন।'

পাঞ্চালীর আর সহ্য হল না। চুপ করে থাকা আর উচিতও নয়। সে একটু জোরের সঙ্গে বলে উঠল, 'কি যে বল, নন্দাদি। স্ত্রীকে আড়াল দেখেন কেন? স্ত্রীও তো আবার যেতে বললেন বারবার।'

'তুমি চিরদিনই বোকা, চালি। তাছাড়া তুমি প্রেমও করনি। করেছি আমি।' নন্দাদির স্বর শান্ত।

'একটা বাজে ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ নেই।'

এবার নন্দাদি একটু চটে গেল। 'মানে? আমি কিছু বুঝি না---না? এই বলতে চাও তুমি?'

'না, ঠিক তা না।' আমতা-ভাবে পাঞ্চালী বলল। নিরুপায় উদাসে একটা সপেটা কেটে মুখে তুলল।

কি করা যায়?

সময়ে যাবে প্রতিবিম্বটা।

কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল এই অভি-যানটির হয়েছিল। একদিন পাঞ্চালীর জীবনেও বজ্রাঘাত ঘটে গেল।

সে অনেক পরের কথা।

আজকের মেয়েটির মনে জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির জীবনের শেষ দৃশ্যের মত পুরাতন দিনগুলি ফিরে আসছে।

ভ্রমরার মত গুঞ্জন করছে তারা, আবার ভ্রমরার মত হুল ফুটিয়ে দিতে চাইছে।

মেয়েটি বাসের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবন্দনা বরুয়া

উর্মিলার সঙ্গে এ ভাবে হঠাৎ দেখা হবে বলে অনিতা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। বিয়েবাড়ীর উজ্জল আলোক-মালাতে জ্যোতি বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীর বেশে উর্মিলা আসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অনিতার চোখেই পড়েছিলো। অকল্পনীয় আনন্দে অধীরা অনিতা তাড়াতাড়ি হাত ধরে নিয়ে এসেছিল উর্মিলাকে, আদর করে পাশে বসিয়েছিলো। স্কুল-কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ সহপাঠিনীকে এত বছর বাদে দেখা সত্ত্বেও অনিতার কিন্তু চিনে নিতে একটুও অসুবিধা হয় নি।

সুন্দর ব্যক্তিত্ব, অপরূপ মুখশ্রী, আর মধুর ব্যবহারের অধিকারিণী উর্মিলার বন্ধুত্ব ছিলো প্রায় প্রতিটি সহপাঠিনীর একান্ত কাম্য। অবশ্য অনেকের কাছে উর্মিলাকে গোপন ঈর্ষার পাত্রীও হতে হয়েছিলো। কতদিন হাসিঠাট্টার ছলে বান্ধবীরা বলেছিলো, হায়, হায়, ভগবান কি কেবল উর্মিকেই খুঁজে পেলো এতো রূপগুণ একাধারে ঢেলে দিতে। কেন, আমরা শেওলার মতো ভেসে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হলাম। বলতে পারিস?

কিন্তু এ তো অনেক বছর আগের কথা। কালের আবর্তে হারিয়ে-যাওয়া বছরগুলোর সংখ্যা গুণে অনিতা বললো, সত্যি উর্মি, তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারছি না। তুই কিন্তু ঠিক আগের মতোই আছিস। জানিস, সবাইকে পাগল-করা তোর সেই অপূর্ব মুখখানা বদলায় নি। ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগছে আমার। এতোগুলো বছর কত তাড়াতাড়ি চলে গেলো। আজকে বড় বেশী করে অনুভব করছি। উর্মি, তোরা গৌহাটিতে কখন এলি? মাসীমারা সবাই কি এসেছে? — সেই যে ভীষণ নাম করে এম-এ পাস করলি তার পর থেকেই আর তোর কোনো খবর পেলাম না। আর সে খবরটাও তো পেয়েছিলাম সংবাদ - পত্রের মারফত।

এতো কথা একনিঃশ্বাসে বলে অনিতা ক্ষণিকের জন্য চুপ করে থাকে। বহু মূল্যবান বেনারসী চেলির আর অলঙ্কারে পরিহিত উর্মিলার সিঁথিতে সিঁদুরের একটু ছোঁয়া দেখে অনিতা অবাক হয়ে যায়, ভুলে যায় একটি বিয়েবাড়ীতে বসে থাকার কথা। আনন্দে অনিতা বলে ওঠে, উর্মি, কি আশ্চর্য, তুই বিয়ের খবরটাও দিতে পারলি না? এতো সুন্দর খবরটা কেনো লুকিয়ে-ছিলি বল তো? বল না, কোন্ সে ভাগ্য-বান, যার গলায় শেষে তুই মালা দিলি? আঃ আমি কি পাগলের প্রলাপ বকে চলেছি? অনিল চৌধুরীর সঙ্গেই তো তোর বিয়ে কতদিন ধরে ঠিক ছিলো। তোদের সেই সাংঘাতিক প্রেমের কাহিনী কতই যে শুনলাম। আমার বিয়ের পর অলকেশ গৌহাটিতে বদলি হয়ে আসাতে জোড়হাটের সঙ্গে আমার প্রায় সব সম্পর্কই শেষ হয়ে যায়। অন্যান্য বান্ধবীরাও কোথায় যে একটি একটি করে চলে গেলো তা ত' জানি না। উর্মি, তোর মণিমালাকে মনে পড়ে? সেই যে ফর্সা করে মেয়েটি, খুব সুন্দর গান গাইতো। মাঝে সে এসেছিলো গৌহাটিতে, ওর কাছ থেকে তোর কিছু খবর পেয়েছিলাম কিন্তু তুইও শিলঙে চলে যাবার পর থেকে আর সব খবর থেকেই আমি বঞ্চিত।—অনিল আর তোর প্রেমের কথা সে সময় কে আর না জেনেছিলো বল! অবশ্য তোর মতো একটি 'একসেপ-শন্যাল' মেয়ের কথাই আলাদা—সত্যি, আমার কিন্তু কলেজের কয়েকজন প্রফেসার আর আমাদের ক্লাসের রমেন, শৈলেন-দের মনে পড়লে আজো ভীষণ দুঃখ হয়, জানিস। — তোর একটু কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্য তারা যে কতো লালায়িত ছিলো — । আহা বেচারারা —

হঠাৎ অনিতা লক্ষ্য করে, ও একলাই এতক্ষণ ধরে কথা বলে যাচ্ছে। উর্মিলার মন-আকাশে ওর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের পরশ এখন তো লাগেনি? অথচ, এই উর্মিই তো অনিতা একদিন কলেজে না গেলে কি অসম্ভব হৈ-চৈ লাগিয়ে দিতো। আশ্চর্য, সেই উর্মির এ কি পরিবর্তন? মুহূর্তের মধ্যেই অনিতা ভাবে, উর্মি বড়লোকের মেয়ে ছিলই— এখন নিশ্চয় অনিল খুব বড় কাজ করে। বড়লোকের বউ হয়ে ছোটবেলার বান্ধবীর প্রগলভতাকে হয়তো ভালো চোখে দেখছে না!! — অনিতা গম্ভীর হয়ে যায়। নিজের আনন্দের উচ্ছ্বাস এভাবে প্রকাশ করে লজ্জিত হয়ে পড়ে।

কিছু নিয়ে যাবার জন্য অনিতা উঠে দাঁড়ায়।

উর্মিলা এই প্রথমবারের মতন কথা বলে ওঠে, অনু তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হওয়াতে আমিও যে কত খুসী হয়েছি তা আমি ভাষায় প্রকাশ করে তোকে বোঝাতে পারছি না বলে তুই কিন্তু ভুল বুঝবি না। অনু, তুইও কিন্তু একটুও বদলাস নি। আগের মতোই চিরচঞ্চলা, আগের মতোই আছে তোর অন্তরে অনুভূতির মিষ্টি প্রকাশ ভঙ্গিটুকু। — আচ্ছা অনু, তোদের বাড়ীর ঠিকানা বলে দে তো — দিন-কয়েকের মধ্যেই আমরা তোদের বাড়ী আসবো। অনেক গল্প করবো— কেমন?

এর কিছুক্ষণ বাদে অনিতারা বাড়ী ফিরেছিলো। পথে যেতে যেতে স্বামী অলকেশকে উর্মির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাও বলেছিলো। বাড়ী পৌঁছে সংসারের নানা কাজ আর বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। যদিও অনিতার কেবলি উর্মিলার কথাই মনে পড়েছিলো — রাত তখন অনেক। কিন্তু অনিতার চোখে ঘুম ছিলো না। কয়েক বছর আগের অনেক ঘটনা এসে মনের পর্দায় লুকোচুরি খেলছিলো। একটি কথাই বারবার অনিতাকে উন্মনা করে তুলেছিলো -- কেন উর্মিলা ভালো করে কথা বললো না! এতো দিনের অদর্শনের পর অনিতাকে দেখেও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ একটু প্রকাশ করতে কেনো পারলো না উর্মি? অনিতা নিজের আনন্দটুকু তো একটুও ঢেকে রাখতে পারল না! তাহলে? ——

কয়েকদিন ধরে অনিতা উর্মিলার কথাই ভাবছিলো। প্রতিদিন আশা করতো আজ হয়তো উর্মি - অনিল আসবে। কিন্তু একদিন দুদিন করে যখন দশ-পনের দিন কেটে গেলো অথচ উর্মির কাছ থেকে কোনো খবর এল না - তখন বাধ্য হয়ে অনিতা ভেবে নিয়েছিলো -- উর্মির অনেক পরিবর্তন হয়েছে বলে। জীবনে অনেক কিছু পাওয়া উর্মির হয়তো অনিতার সাধারণ অনুভবকে মর্যাদা দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই।। দিনের পর দিন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের গণ্ডীতে আসা-যাওয়া করা উর্মির চিন্তারাশিকে জোর করে অনিতা ভুলতে চেয়েছিলো। অভিমানে ভরে উঠেছিলো ওর সারা অন্তর।

কয়েক দিন ধরে বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করা অনিতাকে শেষ পর্যন্ত আশা ছেড়ে দেওয়া দেখে একদিন অলকেশ ঠাট্টার সুরে বলেছিলো, কি গো, তোমার সেই সর্বগুণবিভূষিতা বান্ধবীটি এলো না যে? আমার কি মনে হয় জানো? নিশ্চয় সে ভীষণ অহঙ্কারী— না হলে ছোটবেলার বান্ধবীর কাছে একটি-বার না এসে কি থাকতে পারতো?—

অলকেশের কথা শুনে অনিতা দুঃখ পায়। কিন্তু সত্যিকথাই সে বলেছে! উত্তর দিতে গিয়েও অনিতা কিছুই খুঁজে পায়নি -- শেষে মাত্র বলেছিলো, নতুন করে ওরা গৌহাটিতে বদলি হয়ে এসেছে, গোছগাছ করতে সময় লেগেছে বলেই হয়তো এতোদিন আসতে পারছে না। না হলে কেনই বা একবার আসবে না। উর্মি কিন্তু কোনদিন অহঙ্কারী ছিলো না।

অলকেশকে একথা বলেছিলো যদিও মনের আনাচে-কানাচে অলকেশের কওয়া কথাই বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো।

●

এ ভাবেই প্রায় এক মাস কেটে গেলো। একদিন দুপুরবেলা সংসারের সব কাজ শেষ করে হাতে পূজোর বিশেষ সংখ্যা একটি নিয়ে অনিতা সবে একটু বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে বলে ভাবছে—এমন সময় হঠাৎ কলিং বেলটা কর্কশ স্বরে বেজে উঠলো। ভীষণ বিরক্ত হলো অনিতা। ভাবলো, কে এলো এই ভরদুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে? পিয়নটাই হবে হয়তো! অনিচ্ছাভরা মন নিয়ে অনিতা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। কিন্তু এ কি? দরোজাটা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হলো অনিতার মনের সকল বিরক্তি, রাগ।।

মুহূর্তে সব বিরক্তি রূপান্তরিত হয়ে যায় নির্মল আনন্দে। অনিতা চিৎকার করে ওঠে, উর্মি, তুই সত্যিই এসেছিস? আমি ভুল দেখছি না তো?

অনু, আমি ভীষণ অসময়ে এসে পড়লাম, না? তুই নিশ্চয় খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলি। তবে, কি জানিস অনু, আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই এই সময়টা আসবার জন্য বেছে নিলাম— জানতাম এই সময়ে এসে তোর সঙ্গে গল্প করতে অনেক সময় পাবো।

অনিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে কি যে করবে ভেবে পায় না। শেষে প্রায় টানতে টানতে উর্মিকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে যায়।

উর্মি, তুই একটু বস, আমি এক্ষুণি আসছি---কেমন? অনিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই উর্মি ঘুরেফিরে চারদিকে দেখে--সুন্দর পরি-পাটি করে সাজানো অনিতার ছবির মত ছোট্ট সুখী সংসারটি। অজানিতে শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে উর্মির অন্তরের অন্তস্তল থেকে।

অনিতা ফিরে এসে দেখে - বহুদিন আগে তোলা কলেজের গ্রুপ ছবিখানা উর্মি একমনে দেখছে।

সত্যি উর্মি, তুই যে আসবি আমি কিন্তু সেই আশা শেষে ছেড়েই দিয়েছিলাম। বিয়েবাড়ীতে তোকে দেখার দিন তুই বলেছিলি দিন দুয়েকের মধ্যেই আমরা আসব, কিন্তু যখন দেখ-লাম একমাস পার হতে চললো, তোরা আর এলি না তখন কি করেই বা আশা রাখি বল? তোর ঠিকানা না জানাতে আমরা যে যাবো তারো উপায় ছিলো না।

আসবো আসবো বলে প্রতিদিন মনে ভাবছি কিন্তু আসা আর হয়ে ওঠেনি এতদিনে। তাছাড়া গৌহাটীতে আসবার পর থেকে রণজিতের শরীরও খুব ভালো ছিল না। আচ্ছা অনু, কি করে তুই ভাবতে পারলি আমি তোর কাছে একটিবারো আসবো না। আশ্চর্য কথা----------

উর্মিকে আর কিছুই বলতে দিলো

মা আনন্দ। কৃত্রিম রাগের সুরে বললো, হ্যারে উর্মি, বিয়ে চুপিচুপি করলি, খবরটাও দিলি না আমাদের, ছেলের মা হলি সে খবর দেওয়া আরো তো দূরের কথা — উর্মি, তোর অপরাধের পোঁটলাটা কিন্তু ভারী হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বল তো, এতোগুলো সুখবর কেনো তুই চেপে রেখেছিলি? তোকে নিতে অনিল নিশ্চয় আসবে আজ—তাই না? আসুক না - ওর সঙ্গে সাংঘাতিক ঝগড়া করবো আমি——

আনন্দে আত্মহারা অনিতার এতোক্ষণ চোখেই পড়েনি মুহূর্তে রূপান্তরিত হওয়া উর্মিলার মুখাবয়বের পরিবর্তন। মুহূর্তের মধ্যে উর্মির মিষ্টি হাসিভরা সুন্দর মুখখানা কেমন যেন অন্ধকারে ভরে গেলো। -- উর্মির মুখখানা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো অনিতা। ভেবে পেলো না কি কথা বলে উর্মিকে আঘাত দিলো। কোথায় কোনখানে ভুল কিছু বললো॥

অনিতা কিছু বলার আগেই উর্মি বাধা দিয়ে বললো, অনু, তুই দেখছি আমার বিষয়ে অনেক ভুল কথাই ভেবে আছিস। সেদিন বিয়েবাড়ীতে শত চেষ্টা করেও আমি কোনো কথা বলতে পারিনি তোকে। কথা বলার শক্তিই যেন আমার হারিয়ে গিয়েছিলো। আমি জানি, আমার সেদিনের মৌনতা তোকে খুব দুঃখ দিয়েছিল, না জানি তুই আমাকে কি ভাবছিলি। কিন্তু ভাই, আমার যে কোনো উপায় ছিলো না। বিয়েবাড়ীতে, চেনা-অচেনা এতো লোকের সামনে আমার অন্তরের এই দৈন্য প্রকাশ করতে আমি সেদিন অপারগ হয়েছিলাম। আর একটা কথা, আজ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, --সেদিন তুই যেসব কথা বলেছিলি, হয়তো আমার সারা অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো একটিবার সেইসব কথা শুনতে। তাই তো আমি মুখ ফুটে তোর কথার কোনো প্রতিবাদ করতে চায়নি সেদিন। রণজিৎ আমার ছেলের নাম নয়। আমি এখনো মা হয়নি। আমার স্বামীর নাম রণজিৎ। সেদিন বিয়েবাড়ীতে তুই আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে অনেকের নাম বলেছিলি কিন্তু রণজিতের নাম বলিস নি, হয়তো সেই নাম তোর মনেও ছিলো না—।

অনিতা উর্মির কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অনুতাপে সারা অন্তর কেঁদে ওঠে তার। অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, উর্মি, তুই আমাকে ক্ষমা কর, আমি না জেনে তোর মনে আঘাত দিলাম ভাই ----

বহুক্ষণ নীরবে বসে থাকা উর্মি একসময় নিজেই বলতে সুরু করেছিলো তার সকল কথা।

অনু, তোর তো জানা ছিল, কলেজে ঢোকবার বহু আগে হতেই অনিলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে ঢোকবার পর হঠাৎ স্বাধীনতা পাওয়া আমার মন যে অনিলকে সর্বসত্তা দিয়ে ভালোবাসতে সুরু করলো তা আমি নিজেই জানতাম না। মনে হয়েছিলো আমার জীবন ধন্য হলো। আমার জীবন ভরে উঠেছিলো যেদিন আমি জানতে পারলাম, সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম, অনিলের বুকভরা ভালোবাসা প্রতিদানে আমিও পেয়েছি। বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত এ চারটে বছরের দিনরাত্রি কেমন করে কোন ফাঁকে যে কেটে গিয়েছিলো আমরা জানতাম না। মনের, প্রাণের মাঝে মাত্র একটি সুরের গুঞ্জরণ শুনতে পেয়েছিলাম অনুক্ষণ, আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি, একজনকে সম্পূর্ণ মন দিয়ে পেয়েছি যে তারো মন॥

অনিলের ভালবাসা পাওয়া আমার এ মন এঁকে চলেছিলো অজস্র রঙ তুলি দিয়ে কতশত মধুর ছবির আল্পনা— তা যে শুধুই আমি জানতাম। আমার এ আনন্দের কণাভাগ তোদেরও দিয়েছিলাম। আমাদের একদিন বিয়ে হবে কলেজে সবাই ধরে নিয়েছিলো। ইতিমধ্যে তোদের অনেকের নিজে ঠিক করা কিম্বা বাবার পছন্দমতো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো। স্বামীর ঘর করবার জন্য একে একে তোরা প্রায় সবাই চলে গেলি। মনপ্রাণ দিয়ে আমিও তো চেয়েছিলাম, স্বপ্নের জাল বুনেছিলাম, কামনা করেছিলাম ছোট

একটু একটি সংসার। — আমার সেই সুন্দর স্বপ্নটাকে রূপ দিতে ব্যাকুল হওয়া আমার মনকে শত চেষ্টায়ও বেঁধে রাখতে না পেরে একদিন আমি নিজেই অনিলকে বলেছিলাম, অনিল, আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

অনিল উত্তরে বলেছিলো এম-এ পাস করে চাকরি-বাকরি একটায় লেগে যেতে পারলেই আমাদের যুগ্ম-জীবন সুরু করবো —।

সময় পার হয়ে যাচ্ছিলো।

মা-বাবা আমার এ বিয়ের খবর পেয়ে ভীষণ আপত্তি করেছিলো। কারণ ওরা ভাবছিলো, অনিল অপেক্ষা বহু গুণে গুণী মানী ধনী ছেলেদের মা-বাবারা আমাকে ছেলের বৌ করতে আগ্রহ করলে। আমি কিন্তু স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলাম মাকে, অন্য কোনোখানে আমার বিয়ের কথাবার্তা যাতে না করে। বাবা আমার ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলো। মা অভিমানে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করেছিলো। একদিন আমার বৌদি বলেছিলো, মা-বাবা ভাবছে, অনিল মাত্র এম-এ পাস করে এমন কি বড় চাকরি পাবে যে তোমার সব দায়িত্ব নিতে সাহস করছে? আমি বৌদিকে বলেছিলাম, সেই চিন্তার ভার আমাকে দিলেই ভালো হয়। কারণ অন্তরের দাবীকে আমি সবচেয়ে বেশি মূল্য দেবো, শারীরিক সুখ-ঐশ্বর্যের দাম আমার কাছে একটুও নেই—

জানি—আমার কথা শুনে মা-বাবা ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলো। কিন্তু আমার আর করবার কিছুই ছিলো না। শুনেছিলাম ইতিমধ্যে অনেক ভালো সম্বন্ধ এসেছিলো, কিন্তু আমার দৃঢ়তাপূর্ণ অসম্মতিতে শেষে মা-বাবা অনিচ্ছুক-ভাবে তাদের সকল আশার ওপরে অনিচ্ছার সীমারেখা এঁকে দিয়েছিলো।—

বি-এ পরীক্ষাতে ভালোভাবে উত্তীর্ণ হলাম আমরা দুজনে এবং এম-এ পড়তে সুরু করলাম। তোরা সবাই তখন সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস। আমি পড়ে রইলাম আমার কলেজ-জীবনকে জড়িয়ে -- সান্ত্বনা ছিলো আমার একমাত্র অনিল। কোনোদিন, ভুলেও কোনো পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকাইনি, অনিলের কথা ছাড়া ভাবিনি কোনোদিন অন্য কোনো কথা। অনিলকে নিয়ে সাত রঙের অজস্র আশাভরা ছবি এঁকে এঁকে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম অভিমানে আমার দুচোখ জলে ভরে উঠেছিলো।— আমাকে কেন বারবার বিয়ের কথা বলতে হবে। বিয়ের আবশ্যকতা কেবল কি আমার একলার!!—

প্রতিদিন আশা করি অনিলের কাছ থেকে একটিমাত্র কথা শুনতে কিন্তু প্রতিদিন আমার সেই আশার কুঁড়ি নিরাশার নির্মম আলিঙ্গনে শুকিয়ে গিয়েছিলো।-- ইতিমধ্যে আমরা দুজনেই সুখ্যাতিতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। এতোদিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছিলাম। পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। কিছুই আর ভালো লাগে না। মা-বাবাকে দেখলেই অপরাধ-বোধে মনটা ভরে উঠতে লাগলো। সবাই একটা প্রশ্নই করতে আরম্ভ করলো আমাদের বিয়েটা কবে হবে।

দিনকয়েকের জন্য তেজপুর থেকে আমার বড়দি এলো বেড়াতে। একদিন মাকে বললো, মা, উর্মির জন্য দেখছি আমরা মুখ দেখাতে পারবো না কাউকে। সবাই জিজ্ঞেস করে বোনের বিয়ে কবে হচ্ছে? আমাদের দু-বোনকে ছোটবেলায় বিয়ে দিয়েছিলে—ভালই করেছিলে, এখন ছোট মেয়েকে অনেক বেশী পড়ানোর ফল তো দেখতেই পাচ্ছ। দুজনে মিলে বিয়ে ঠিক করেছে—ভালোই হয়েছে, এরকম বিয়ে তো হচ্ছেই আজকাল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এতদিনে বিয়ের দিন তারিখ একটা ঠিক কেন ওরা করছে না। এভাবে বছরের পর বছর ধরে কেলেঙ্কারী করার কোনো মানে হয় না---

দিদির কথা শুনে রাগে অপমানে আমার সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। রুক্ষ হয়ে উত্তর দিয়েছিলাম, তোমরা কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ? বিয়ে তো নিশ্চয় হবে এবং বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হলে সবাই জানতে পারবে---

একথা বলেই সেখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে নিজের ঘরে চলে এসেছিলাম। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটি কথাই ভাবছিলাম বারবার---কখন সেই শুভদিনটি আসবে আমার জীবনে, যেদিন আমি সবায়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো।।

ঠিক করেছিলাম অনিলকে আর একবার বলবো বিয়ের কথা।- ইতিমধ্যে সময় কাটাবার জন্যই আমি একটা স্কুলেও চাকরি নিয়েছিলাম। একটি চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে অনিল এসেছিলো সেদিন সন্ধ্যেবেলা। অনেক কথার পর অনিল বলেছিলো, জানো উর্মি, ইন্টারভিউ আমার ভালোই হয়েছে, চাকরিটা যদি হয়ে যায় কোনোমতে।

মনের আনন্দে আরো অনেক কথাই বলেছিলো কিন্তু আমি শুনতে চাওয়া কথা সেদিন শুনতে পেলাম না।
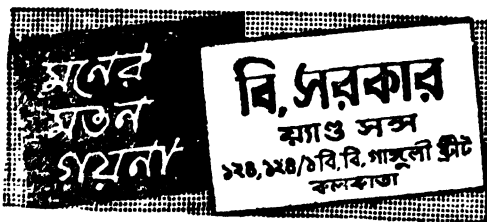
[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

কালের আলাপ

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

তারপর নিধিরামবাবুকে বললেন, নিধু, তাহলে অশোকের নামটা এখনই সভ্যদের খাতায় তুলে নাও।

সুরথ চৌধুরীর বইয়ের র‍্যাকের একপাশ থেকে দাঁড় করানো মোটা একটা বাঁধানো খাতা বের করে নিধিরামবাবু আমার সামনে খুলে ধরলেন। ১৯২০ পর্যন্ত নম্বরে সভ্যের নাম ছিল। নিধিরামবাবু বললেন, আপনার নম্বর হলো ১৯২১, আপনি নিজেই নামটা লিখে এপাশে সইটা করুন।

নাম লিখে সই করে দিলাম।

সুরথ চৌধুরী বললেন, একুশটা বড়ো গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা—একমাসের একুশ তারিখে মানে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একুশ তারিখে ঢাকায় কয়েকটি তরুণ যুবক পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিয়েছিল। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আজ আর তোমাকে আটকে রাখবো না এখন। আমাদেরও স্কুলের সময় হয়ে এলো। অনেকক্ষণ আমার বকবকানি শুনলে। এখন তোমার একটু বিশ্রামও প্রয়োজন। বাড়ী গিয়ে একটু ভেবে দেখো সব ব্যাপারটা, কাল কি পরশু থেকে এসো। প্রথম দু'একটা দিন দেখো আমরা কিভাবে পড়াই, তারপর তুমি তোমার পছন্দমতো বিষয় বেছে নাও। আমরা যারা স্কুলে পড়াচ্ছি বর্তমানে সবার সঙ্গেই তোমার পরিচয় হয়ে গেলো আজ, শুধু একজন বাদ আছেন। আমাদের কাদের সাহেব, কাদেরালী হাওলাদার, উনি থাকেন পার্ক সার্কাসে। বর্তমানে উনি একটু অসুস্থ আছেন বলেই নিয়মিত আসতে পাচ্ছেন না ক'দিন ধরে। উনি যেদিন আসেন সেদিন জীবনী পড়ান। বরিশালে একটা স্কুলে ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন উনি। ৫০-এর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় উনি কয়েকটি হিন্দুকে বাঁচিয়েছিলেন এই অপরাধে ওঁর স্বধর্মীয়রা প্রায়ই ওঁর বাড়ীতে নানা রকম উপদ্রব সুরু করে দেয়। পুলিশের কাছে হাজার আবেদন-নিবেদন করেও কোনো প্রতিকার হয় নি। তারপর একদিন ওঁর ছোট ছেলেটি কলেজ থেকে ফেরবার পথে গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ হারায়। তারপরই উনি সপরিবারে কোলকাতা চলে আসেন। কাদের সাহেব অখণ্ড ভারত সেবাসমিতির একজন সক্রিয় সদস্য।

এরপর চলে আসবার আগে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি বেরুবো এমন সময় সুরথ চৌধুরী বললেন, ঐ দেখো একটা জরুরী কথা ভুলে গেছি। নরেশ-

---

সুনীলকুমার নাগ

বাবুকে বলো, মোহিত এসেছিল। আজকেই, তুমি আসবার একটু আগেই চলে গেছে। আমি সব বলে দিয়েছি মোহিতকে। শীগগিরই ও দেখা করবে নরেশবাবুর সঙ্গে। ওঁকে বলো গিয়ে। এজন্য চিন্তার কিছু নেই।

॥ সাত ॥

বাড়ী ফিরে প্রথমেই বড় মামাকে অধ্যাপক মোহিত রায়ের খবরটা বললাম। উনি আজই সুরথ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শুনে আশ্বস্ত হলেন। বললেন, সুরথদার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কয়েকজনকে যা আমি দেখেছি সকলেই মানুষ হিসেবে খুবই নির্ভরযোগ্য। কবে নাগাদ আসতে পারেন অধ্যাপক রায় তা কি কিছু বুঝতে পারলি?

—না। তবে সুরথমামা বললেন, বিশেষ করেই বললেন যে, যা যা বলবার সব উনি বলে দিয়েছেন এবং দু'-একদিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই আসবেন অধ্যাপক রায়।

—বেশ। ভালো কথা।

মাও শুনলেন সব। তবে বললেন না কিছু।

একবার মনে হয়েছিল আজকের বিকেল এবং সন্ধ্যায় সুরথ চৌধুরীর বাসায় আমার অভিজ্ঞতার কথা বড় মামাকে সব খুলে বলবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বললাম না। মনে হলো একে বড়মামা অসুস্থ, তা ছাড়া একেবারে সোজা ওঁদের সমিতিতে যে ঢুকে পড়লাম তার পেছনে প্রকৃতপক্ষে আমার হৃদয়ের সমর্থন কতটা, আর কতোটাই বা ঝোঁকের মাথায় করেছি তা অন্তত নিজের কাছে আরো একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।

সুরথ চৌধুরী মহৎ ব্যক্তি। মহৎ তাঁর জীবনের আদর্শ। সাফল্যের সম্ভাবনা অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় নেই দেখেও যেভাবে তাঁর সামান্য শক্তি দিয়ে তার রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেটা আমার কাছে যথার্থই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হলো।

কয়েক বছর আগে দেশটা যখন সত্যি সত্যি ভাগ হয়ে গিয়েছিল মনে পড়ে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সব সময় জিনিষটা ঠিক খেয়াল থাকতো না। এই রকম একটা ব্যাপার যে ঘটে গেছে, চোখের ওপরই ঘটে গেছে তা জানা সত্ত্বেও যেন বিশ্বাস হতো না। কিন্তু তারপর ক্রমে ধাতস্থ হয়ে গিয়েছি। আজ ঐ ব্যাপারটাই চরম সত্যি মনে হয়। এখন বরং আবার যে টুকরো দুটো এক হয়ে যেতে পারে সেই চিন্তাটাই একান্ত অবাস্তব, অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলো।

সুরথ চৌধুরী এবং তার অনুরাগী ভক্তগণ মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁরা সবাই প্রকৃতিস্থ ত' ? এই সমস্ত নানা প্রশ্ন আমাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। ঠিক করলাম আগামী কালই আবার যাবো। কারণ, সুরথ চৌধুরীর সঙ্গে মেলামেশার জন্য অন্তরে একটা

দুবার আকর্ষণ যে বোধ করছিলাম অন্তত এটা তো মিথ্যে নয়।

খুব ছেলেবেলায় যদিও, কিন্তু নেতাজীকে দেখেছি। মনে পড়ে আমাদের স্কুলে একবার এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র। অনেক বালকের মধ্য থেকে হেডমাস্টারমশাই আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন ওঁকে মালা পরাবার জন্য। সেদিন মালা পরাবার সময় আমি উপবিষ্ট সুভাষচন্দ্রের প্রায় কোলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। খুব কাছের থেকে দেখেছিলাম ওঁর চোখ দু'টি। ঈষৎ কটা বিস্ফারিত দু'টি চোখ যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছিল আমাকে। রাজনীতির কিছু বুঝবার বয়স তখনো আমার হয়নি। বক্তৃতা যা দিয়েছিলেন তারও একবর্ণ বুঝতে পারিনি। সকলের দেখাদেখি বহুবার হাততালি দিয়েছিলাম। সেই যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তারপর থেকে কখনই একেবারে ভুলতে পারিনি সে দৃষ্টির প্রচণ্ড আকর্ষণের কথা, মনে পড়ে তাঁর অন্তর্ধানের কথা, শুনেছি বার্লিন থেকে তাঁর বেতার বক্তৃতা, টোকিও থেকে রেঙ্গুন থেকে বেতারে প্রচারিত দেশবাসীর প্রতি তাঁর আবেদন। আর কেবলই মনে হতো সেই চোখ দু'টির কথা।

গান্ধীজীকেও খুব কাছের থেকে দেখেছি। স্বাধীনতার কয়েকদিন পূর্বে কলকাতার দাঙ্গা পরিস্থিতি তখন প্রায় শান্ত হয়ে এসেছে। গান্ধীজীকেও দেখেছিলাম বেলেঘাটায়। তাঁর শান্ত, প্রীতিপূর্ণ চাহনিতে মুগ্ধ হয়েছিলাম নিশ্চয়ই।

জওহরলালকে একাধিকবারই দেখেছি, খুব কাছ থেকেই। ওঁর দৃষ্টিতেও আকর্ষণী শক্তি অবশ্যই দেখেছি—তবে সে দৃষ্টিতে সব কিছু ছাপিয়ে একটা ব্যস্ততা, যা প্রায় চঞ্চলতা বলেই মনে হয়েছে, মাঝে মাঝে মনটাকে একটু বিক্ষিপ্ত করে ফেলতো।

এই বিখ্যাত নেতৃবৃন্দের আকর্ষণী শক্তির সঙ্গে সুরথ চৌধুরী হেন ব্যক্তির কথা প্রকাশ্যে আলোচনা করতে হলে নিশ্চয়ই বাধতো। কিন্তু নিজের মনের একান্তে যতই প্রশ্ন করতে লাগলাম কেবলই দেখলাম—সুরথ চৌধুরী—নাম নেই ধাম নেই, এঁদো গলির সুরথ চৌধুরী আমাকে সমানভাবে আকর্ষণ করেছেন—তাঁর তেজস্বী দৃষ্টিতে প্রসন্নতায়। তাঁর আদর্শ-নিষ্ঠায় আমি মগ্ন।

॥ আট ॥

রাত প্রায় আটটা বাজে।

সুরথ চৌধুরীর সবের দরজা ভেজানো। বিপরীত দিকে খানিকটা লাগা একচালাটার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম অনেক লোক। অন্তত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জন হবে। সতরঞ্চি পেতে—এক-পাশে একটা বেঞ্চিতে ক'জন বসেছিলেন। তাঁরা সকলে আমার পরিচিত। বিরাজবাবু, নিখিরাম, শিব গড়াই, মণিবাবু। একপাশে দাড়িওয়ালা একজন মুসলমান ভদ্রলোকও বসেছেন। অনুমানে বুঝলাম ইনিই কাদের সাহেব হবেন। পড়ুয়া যাঁরা সতরঞ্চিতে বসে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ্বও কয়েকজন আছেন মনে হলো।

সুরথ চৌধুরী পড়াচ্ছেন। পাঠ বক্তৃতার মতো উঁচু গলায় সপ্র-চোখের যথাযথ অভিব্যক্তির সঙ্গে স্পষ্ট দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করছিলেন প্রতিটি শব্দ। আমাকে চোখে পড়তে বিরাজবাবু এবং নিখিরামবাবু দু'জনেই হাত নেড়ে ইশারায় ডাকলেন। আমি কাছে এগিয়ে যেতে সবাই একটু একটু সরে বেঞ্চিতে বসবার মতো একটু জায়গা করে দিলেন।

এতক্ষণে কাছে এসে সুরথ চৌধুরীর চোখের দিকে নজর পড়তে চমকে উঠলাম। দু'চোখে যেন আগুন ঝরছে। অন্য সব শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের মতো আমিও ওঁর কথায় মনোযোগ দিলাম :

এতক্ষণ যা বললাম তা হয়তো তোমাদের অনেকের কাছেই কাল্পনিক কাহিনীর মতো লাগলো। কিন্তু এর একটি বর্ণও কাল্পনিক নয়। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি ব্যক্তির নাম, প্রতিটি স্থানের নাম, প্রতিটি তারিখ, দিনক্ষণ পর্যন্ত সত্য। চন্দ্র সূর্যের মতো বাস্তব। বাংলা দেশকে, বাঙালীকে যারা ভীরু মনে করে, সেদিন মেদিনীপুরের কিশোর এবং তরুণদের এই বীর বিক্রম দেখে, তার বিবরণ শুনে চমকে উঠেছিলো। পর পর দু'বছর মেদিনীপুর শহরের বুকে বাঙালী কিশোর এবং তরুণেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সবকিছু পরিকল্পনা করে নিজেদের জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে দু'জন আই সি এস ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সত্যি নিপাত করেছিল। বৎসরাধিক কাল মেদিনীপুর জেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর যে নিরবচ্ছিন্ন উৎপীড়ন অত্যাচার চালিয়েছিল এই ঘটনা দু'টির মধ্য দিয়েই তার বিরুদ্ধে সেদিন সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এ সবের এখানেই শেষ নয়। প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডীর হত্যার পরে মেদিনীপুর শহরের পুলিশের সংখ্যা-সাধারণ পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ এবং সি আই ডি সব মিলিয়ে প্রায় চতুর্গুণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাসকে বাঁচাতে পারলো না ওরা। এর ফলে সেদিন ব্রিটিশ কর্তারা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। স্বয়ং বাঙলার লাট স্যার জন এণ্ডারসন মেদিনীপুর শহরে এক বিশেষ দরবারের আয়োজন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর একপাশে ডগলাসের পরবর্তী মিঃ বার্জ বসে মৃদু মাথা নাড়ছিলেন। ভাবটা যেন : লাটবাহাদুরের কথা ভালো করে কান দিয়ে শোনো। লাটবাহাদুর সেদিন বাঙালী কিশোর এবং তরুণদের সামনে রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জ রেখেছিলেন। বলেছিলেন—'মনে হচ্ছে মেদিনীপুর শহরের সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে যে তারা একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকেও বেঁচে থাকতে দেবে না। আমার গভর্নমেণ্ট সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে। আমাদের সৈন্যবাহিনীর পুরো একটি ব্যাটেলিয়ান শহরে মোতায়েন করা হয়েছে, সন্ত্রাসমূলক আর যদি কোন কার্যকলাপ এ শহরে ঘটে তা হলে অতি কঠোর সামরিক পদ্ধতিতে তা ঠাণ্ডা করা হবে।'

ভাই সব, একবার অনুমান করো

ত এর পরে খোদ বাঙলার লাটের এই হুঁসিয়ারীর পরে সেদিনের বাঙালীর ছেলেরা কি করেছিল? সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের বিপ্লবীদের বলতো সন্ত্রাসবাদী, যেন কেবল সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তা নয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অতি পবিত্র। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসনের বিলোপ ঘটিয়ে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করা, মুক্ত করা, স্বাধীন করা। তারা যথার্থই বিপ্লবী ছিল। প্রকৃতই স্বাধীনতার প্রথম শ্রেণীর সৈনিক ছিল তারা প্রত্যেকেই।

যা বলছিলাম। লাটসাহেবের হুমকীর মুখে কি বাঙালীর ছেলেরা সুড় সুড় করে প্রাণের ভয়ে যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল? না, তা তারা করেনি। সেকথা তারা একবার মনেও ভাবে নি। বরং ক্ষণজন্মা নির্ভীক সৈনিকের মত লাটসাহেবের হুমকীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কথায় নয়, কাজে। সেদিনের মানুষেরা প্রকৃতই কথার চাইতে কাজে [illegible] বেশী।

লাটসাহেবের হুমকীতে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত না হয়ে বীরের মতো তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছিল---মেদিনীপুরের তৃতীয় ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের জীবনলীলা সাঙ্গ করেছিল। এবং ঘটনাটি ঘটেছিল লাটসাহেবের হুমকীর কয়েক মাসের মধ্যেই। এই তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেটটি মিঃ বার্জকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। এই যে পর পর তিনটি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হত্যাকাণ্ড--১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মিঃ পেডী, ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল মিঃ ডগলাস এবং ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মিঃ বার্জ। পৃথিবীর কোনো দেশের দেশপ্রেমের ইতিহাসে এর তুলনা নেই; কারণ এ তিনটি ঘটনারই সংগঠক তথা কর্মী বেশির ভাগই কিশোর বয়স্ক ছিল। সর্বভারতে অবশ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেনি এ কথা ঠিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সে ঘটনার সংগঠক যাঁরা ছিলেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন বয়স্ক, পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন।

মিঃ পেডী এবং মিঃ ডগলাসের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ তোমাদের বলেছি। এবার তোমাদের মিঃ বার্জকে হত্যার বিবরণ বলব। শহরের পুলিশ গ্রাউণ্ডে সেদিন একটা বড়ো ফুটবল ম্যাচ ছিল। তাই দুপুর থেকেই মাঠ ছিল দর্শকে ভর্তি। মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে স্থানীয় টাউন ক্লাবের খেলা হবার কথা ছিল। মিঃ বার্জ টাউন ক্লাবের হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করবেন একথাও ঠিক ছিল। এবং এই উদ্দেশ্যে উনি খেলার মাঠের পাশে গাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি নির্ভীক তরুণ ছুটে গিয়েছিল তাঁর নিকটে এবং দু'জনেই নিজেদের পিস্তল উঁচিয়ে সরাসরি তাঁকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি গুলি ছুঁড়েছিল। পলকের মধ্যে মিঃ বার্জের গুলিবিদ্ধ দেহটি লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। মিঃ বার্জের সঙ্গে যে দেহরক্ষী বাহিনী ছিল তারাও তাদের রাইফেল তুলে অসংখ্য গুলি ছুঁড়েছিল সেই বীর তরুণ দু'টিকে লক্ষ্য করে। একজন সঙ্গে সঙ্গেই শহীদ হয়েছিল, অপরজন পরদিন সকালে। এইভাবে সেদিন বাঙলার ছেলেরা দরাচারী সাম্রাজ্যবাদীদের শয়তানী এবং পাশবিক হুমকীর জবাব দিয়েছিল।

যে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ প্রাণ দিয়েছিল তার নাম ছিল অনাথবন্ধু পাঁজা। অনাথ ছিল সে সময় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। আর দ্বিতীয় জন ছিল মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত। মৃগেন সে সময় মেদিনীপুর কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র ছিল।

মায়ের সেবায় উৎসর্গিতপ্রাণ এই বীর তরুণদের কাছে আজকের দিনের গোটা ভারতবর্ষের মানুষের ঋণ অপরিসীম। যে সত্য ঘটনার সত্য বিবরণ তোমরা আজ শুনলে, শাসনের নামে শোষণ যাদের পেশা, বিচারের ছলে দুর্বলের 'ওপর অত্যাচার করা যাদের নেশা সেই দুর্বৃত্ত, দাম্ভিক উৎপীড়কদের চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের ঐ পন্থাই পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র পন্থা। শক্তি ভিন্ন শয়তান আর কোনো কিছুর কাছে কখনো মাথা নোয়ায় নি। ভবিষ্যতেও নোয়াবে না।

এই পর্যন্ত বলে সুরথ চৌধুরী কোন দিকে না তাকিয়ে একচালা থেকে বেরিয়ে সোজা তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল--কি পড়ুয়ারা কি শিক্ষকগণ--সকলে। আমি দেখেছিলাম সুরথ চৌধুরী সোজা গিয়ে তাঁর ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়লেন।

একটু পরে বিরাজবাবু আমার উদ্দেশ্যে বললেন, কাদের সাহেবের আজকের ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে, আমার ও সুরথদার ক্লাস তো খানিকটা শুনলেন। শিবুখুড়ো, মণিদা, আর নিখিলদার ক্লাস নেই আজ। ওঁরা কাল ক্লাস নেবেন। ক্লাস নেবার পরে সুরথদা একটু বিশ্রাম নেন, বেশি নয়, এই তিন-চার মিনিট।

পড়ুয়ারা একে একে উঠতে লাগলেন। ওঁদের মধ্যে দু'জনে মিলে সতরঞ্চি ক'খানা তুলে ভাঁজ করে একদিকের দেওয়ালের সঙ্গে খাটানো দড়িতে ঝুলিয়ে রাখলেন। শিবুখুড়ো এবং মণিবাবুও পড়ুয়াদের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিলেন। ইতিমধ্যে সুরথ চৌধুরীর ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। তক্তপোষের ওপর উঠে বসে উনি হাঁক দিলেন—ওরে বিশে, ওরে মণ্টা, একটু চা খাওয়া।

বিশ্বনাথদের জানালায় দুটি ছেলেকে দেখা গেলো। একজন আমার পরিচিত বিশে, আর একজন অনুমানে বুঝলাম মণ্টা--ক' কাপ জোটাবার? বিশে জিজ্ঞাসা করলো।

--বিরাজ কাকুকে জিজ্ঞাসা করে নে, বলতে বলতে গায়ের জামাটা খুলে হাতপাখাটা টানতে টানতে সুরথ চৌধুরী বললেন, তোমরা এসো বিরাজ।

মণ্টাকে নিয়ে বিশে কাছে এসে দাঁড়াতেই বিরাজবাবু বললেন, পাঁচ কাপ চা দু'খানা বিস্কুট।

বিশে আর মণ্টা দৌড়তে দৌড়তে গেল চায়ের দোকানের দিকে। বিরাজবাবু আমাদের সবাইকে বললেন, চলুন

আমরা যাই। কিছু কিছু জরুরী আলোচনা আছে আজ।

আমরা এগোতে লাগলাম। কাদের সাহেবের দিকে তাকিয়ে বিরাজবাবু বললেন, রাধেশ ক'টা নাগাদ আসবে বলেছে কাদের সাহেব?

—সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আ' পৌনে ন'টা ত' প্রায় বাজে, পকেট ঘড়িটা বের করে দেখে নিয়ে বললেন কাদের সাহেব।

দোরগোড়ায় পৌঁছুতে আমাকে দেখে সুরথ চৌধুরী খুশীতে ভরে উঠলেন, আরে অশোক, তুমি এসেছ? কতক্ষণ?

আমি কিছু বলবার আগেই বিরাজবাবু বললেন, তা, কিছুক্ষণ হয়ে গেল, আপনি তখন পড়াচ্ছিলেন।

--বেশ। নরেশবাবু কেমন আছেন?

—একটু ভালো আছেন।

--বুঝিয়ে বলেছো ত' সব?

মোহিতকে যা যা বলবার সব বলে দিয়েছি। এ সব বিয়ে-থার ব্যাপার, অনেক খুঁটিনাটি করণীয় থাকে বাঙালীর সংসারে আমি অতশত বুঝিও না, আর তাছাড়া হয়ত সব দিন সময়ও থাকে না। এই ত' দেখো না আজ সকালবেলা কাদের সাহেব খবর পাঠিয়েছেন, গতকাল রাতে রাধেশ ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিল। ঢাকা থেকে রহিম লোক মারফৎ খবর পাঠিয়েছে রাধেশের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব, অন্তত মাসখানেকের মধ্যে দেড় হাজার টাকা তাকে পাঠাতেই হবে। নতুন অনেক সভ্য করেছে ও সেখানে। তাদের কারো মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা চাই, কারো বা ছেলের বই কেনার অভাবে পড়াশুনা বন্ধ। বুঝতেই পারো, এর কোনটাই ফেলে রাখার মতো কাজ নয়। মোহিত আমাদের সমিতির সভ্য নয় তা ঠিক, কিন্তু বন্ধু হিসেবে আমার অন্তরঙ্গ, সীতা কুশল ওদের অভিভাবকের মতো। তাছাড়া বিয়ে-থার ব্যাপারে ও নিজে খুব ভালোভাবে বোঝেও, কারণ নিজের দুই ছেলে এবং এক মেয়ের বিয়ে ত' দিয়েছে। কাজেই নরেশবাবুকে আমারও বলো আমার কথা; চিন্তার কিছুমাত্র কারণ নাই। উনি যেন বরং একটু শীগগির সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। আর তুমি নিজেও বুঝতে পারছো আমাদের সমিতির সভ্যের বোনের বিয়ে বা ভাগনীর বিয়ে এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব কিছু কম নয়।

বড়মামাও যে অখণ্ড ভারত সেবা সমিতির সভ্য ঠিক এটা আগে মনে হয়নি। এবার স্বয়ং সুরথ চৌধুরীর মুখ থেকে কথাটা শুনে প্রকৃতই খুশী হলাম। আমি যে সভ্য হয়েছি সে কথাটা গতকাল রাতে বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত বড়মামাকে বলিনি। কারণ আমার আশঙ্কা ছিল যে এঁদের সঙ্গে ঠিক এতোটা ঘনিষ্ঠ মেলামেশা হয়ত উনি পছন্দ নাও করতে পারেন। আর তা ছাড়া ওঁর সম্মতি না নিয়ে যে আমি চট করে সভ্য হয়ে গিয়েছিলাম এটাও পরে আমার ভালো লাগছিল না। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বড়মামার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করা।

সুরথ চৌধুরী বললেন, কাদের সাহেবের সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছ ত' বিরাজ?

—আজ্ঞে না, আপনি করিয়ে দিন।

—এর নাম অশোককুমার মিত্র, সুরথ চৌধুরী কাদের সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাদের নরেশবাবুর ভাগনে। অশোক আমাদের সমিতির সভ্য হয়েছে। ও বি-এ পাশ করেছে, একটা চাকরীও করে। আমাদের স্কুলের কাজও কিছু কিছু করবে বলেছে। তা অশোক তুমি কি পড়াবে ঠিক করেছো?

আমি বাস্তবিক পক্ষে এ ব্যাপারে কিছুই ভাবিনি আগে। এখন বড়মামাও অখণ্ড ভারত সেবা সমিতির সভ্য হয়েছেন জেনে ঠিক করলাম সর্বান্তঃকরণে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু স্বয়ং সুরথ চৌধুরী যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আধুনিক ইতিহাস পড়ান, কাদের সাহেবের মতো অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং বিরাজবাবুর মতো অধ্যাপক নিয়মিত পড়ান, সেখানে আমি যে কি পড়াবার উপযুক্ত তা হঠাৎ বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সুরথ চৌধুরীই বললেন, বিরাজ অবশ্য ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করে, কিন্তু ব্যাকরণ এবং ভাষার দিকটা পড়িয়ে সবদিন ঠিক সময় থাকে না। তুমি বরং ইংরেজি এবং অন্যান্য বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করো।

আমি সম্মতি জানালাম।

--ইনি হচ্ছেন কাদের সাহেব, আমার দিকে ফিরে সুরথ চৌধুরী বললেন, এঁর বিষয়ে তোমাকে বলেছি। গোটা ভারতবর্ষ, মানে এই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান মিলিয়ে যদি এরকম দশ জন মানুষও থাকেন যাঁরা ভারতবাসীকে কেবল ভারতবাসী বলেই মনে করেন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান বলে গ্রাহ্য করেন না, তবে তাদের মধ্যে একজন এবং হয়ত পয়লা নম্বরের মানুষটিই হলেন উনি। উনি আমাদের স্কুলে প্রধানত জীবনী পড়ান। বিখ্যাত মানুষদের জীবন নিয়ে ত' আলোচনা করেই থাকেন, মাঝে মাঝে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষদের মধ্যে থেকেও যেসব আদর্শ চরিত্রের উনি আলোচনা করেন তা সত্যি অভিনব মনে হয়। একদিন শুনলেই বুঝতে পারবে।

বিশে আর মন্টী চা নিয়ে এলো। বিরাজবাবু চায়ের গেলাসগুলো আমাদের প্রত্যেকের হাতে দিয়ে নিকুটি দুখানা ওদের দিলেন।

বিশে এবং মন্টী চলে গেল।

সুরথ চৌধুরী বললেন, কাদের সাহেব লোক পাঠাবার পরেই আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। সারা দিনের চেষ্টায় আজ এক'শ দশ টাকা কালেকশন হয়েছে। এই নাও নিধু টাকাটা। বলে নিধিরামবাবুর হাতে উনি রুমালে জড়ানো একটা মোড়ক তুলে দিলেন।

নিধিরামবাবু টাকাটা হাতে নিয়ে বললেন, কিন্তু সুরথদা, আপনি সেই সকালবেলা বেরিয়ে গেলেন, সারাদিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, এতে আপনার শরীর খারাপ হয়ে পড়বে যে!

—না হে না। আমার এ রোদে পুড়ে টান হওয়া জলে ভিজে ভিজে ওয়াটার প্রুফ শরীর। মরচে ধরার ভয় করো না।

—কিন্তু আমি যে সারাদিন আপনার বৌমার গজরানি শুনে মরলাম।

—ঐ হয়েছে এক মুস্কিল। বুঝলে অশোক, আরতি মানে নিধুর স্ত্রী. এ রকম মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়; সারাদিন পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হাজার হয়রানির মধ্যেও আমার তাল সামলায়। আমি ইচ্ছে করলেও ওকে একদিন বিশ্রাম দিতে পারি না। ঠিক আছে নিধু, আজ রাতে দু'বেলার খাবার খেয়ে নেবো'খন।

এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

—চলে এসো রাধেশ, ভেতরে এসো। সুরথ চৌধুরী আগ্রহভরে ভেতরে ওঁর বসবার জন্য জায়গা করে দিলেন।

রাধেশবাবু সুরথ চৌধুরীর পায়ের ধুলো নিলেন, তারপর একে একে সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সুরথ চৌধুরী বললেন, এ হচ্ছে অশোক, আমাদের সমিতির নতুন সভ্য, আমাদের স্কুলে বিদেশী সাহিত্য পড়াবে ঠিক হয়েছে। পরিচয় দিলেই চিনতে পারবে, আমাদের নরেশবাবুর ভাগনে।

বড়মামার নাম শুনে রাধেশবাবু স্পষ্টই লক্ষ্য করলাম বেশ খুশীতে ভরে উঠলেন। আমরা নমস্কার বিনিময় করলাম। উনি বললেন, অনেকেই দেখি রয়েছেন, তা নরেশবাবু এলেন না কেন?

—নরেশবাবু একটু অসুস্থ আছেন ক'দিন ধরে, সুরথ চৌধুরী বললেন, সম্ভব হলে একদিন একটু দেখে এসো। তোমাকে পেলে খুবই খুশী হবেন উনি। তা তোমার কি খবর বলো। রহিম নাকি চিঠি দিয়েছে?

—হ্যাঁ চিঠি দিয়েছে। অনেক খবর। চিঠিটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। নিন বিরাজদা, আপনি পড়ুন চিঠিখানা যাতে সবাই শুনতে পান। বলে রাধেশবাবু ভেতরের পকেট থেকে একখানা বড় সাইজের ভাঁজ করা চিঠি দিলেন বিরাজবাবুর হাতে।

বিরাজবাবু পড়তে আরম্ভ করলেন:

ভাই রাধেশ,

আশা করি তুমি শারীরিক সুস্থ আছো। ইদানীং পূর্ব-পাকিস্তানে সব কিছুই, এমন কি ডাক-বিভাগও এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে যে ডাকে চিঠি দিলে তা যে কবে নাগাদ কলকাতা গিয়ে পৌঁছবে বা আদৌ পৌঁছবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেই জন্যই লোকমারফৎ চিঠি দিচ্ছি। যথা শীঘ্র সম্ভব তুমি এ চিঠির মর্ম আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে সুরথদাকে জানাবে।

সেই যে তুমি মাস দুই আগে ঢাকা ঘুরে গেলে, তারপর থেকে ভাগ্যক্রমে সমিতির কাজ আশাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। এই দুমাসে নতুন তিরিশ জন সদস্য বেড়েছে। কাজেই বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে অখণ্ড ভারত সেবা সমিতির সদস্য সংখ্যা দু'শ সাতচল্লিশ জন হলো। সুরথদাকে বলো যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সদস্য করবার আগে আমি আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অনুসারে যাচাই করে নেই। কোন তাড়াহুড়ো করি না। কাউকে কোন মিথ্যা আশা বা আশ্বাস দিই না। এই মুহূর্তেই যে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু করছি না, সে কথাও প্রত্যেককে পরিষ্কার করে বলা হয়। তবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য যে রাজনৈতিক তাও গোপন করি না। ভারতে অনেক কিছুই খোলাখুলি করা বা বলা চলে, কিন্তু এখানে তা চলে না। তাই যতোটা সম্ভব গোপনীয়তার সঙ্গেই আমি কাজ করছি জেনো। ভারতে পাকিস্তান বা পাকিস্তানবিরোধী সাধারণ মানুষ হয়ত অনেকেই আছেন, কিন্তু গভর্নমেন্ট সাম্প্রদায়িক নয়। কিন্তু এখানে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর ভারত বা ভারতীয় বিরোধিতা দেখা যায় তেমনি এখানকার গভর্নমেণ্ট প্রকাশ্যেই ভারতবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক লাইনে কাজ করে, কথা বলে। তাই যখন আমি এখানে আমাদের সমিতির জন্য যাই করি না কেন যথেষ্ট হুঁসিয়ার থেকেই করি। সুরথদাকে একথা ভালো করে বুঝিয়ে বলো। উনি যেন অকারণ আমার জন্য দুশ্চিন্তা না করেন।

এবার নতুন সদস্যদের সম্বন্ধে কিছু বলবো। নতুন তিরিশ জন সদস্যদের মধ্যে ধর্মের দিক থেকে আটজন হিন্দু—আটজনই বাঙালী। আর বাইশ জন মুসলমান। এই বাইশ জনের মধ্যে পাঁচ জন বিহারী, তিনজন পেশোয়ারী এবং বাকী চৌদ্দজন বাঙালী। পেশোয়ারী তিনজনের মধ্যে এক ভদ্রলোক এখানে এসেছেন মাসখানেক হলো। আমার দোকানে এসেছিলেন তাঁর দুই নাতির স্যুটের অর্ডার দেবার জন্য। সেই সূত্রেই প্রথম পরিচয়। ভদ্রলোক পেশোয়ারে ওকালতি করতেন। এখানে এসেছেন মেয়ের বাড়ী বেড়াতে। ওঁর জামাই পাকিস্তান সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। ওঁর বাড়ী লাহোরে। জানোই তো সমগ্র পাকিস্তানে বাঙালীরা সংখ্যায় অর্ধেকের বেশি হলেও সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের উল্লেখযোগ্য পদগুলি শতকরা পঁচানব্বইটিই পশ্চিমীদের কবলে—বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের। পেশোয়ারী ভদ্রলোকের খুবই ইচ্ছে সুরথদার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। আমাদের সমিতির কার্যকলাপ পশ্চিম-পাকিস্তানেও সম্প্রসারিত হোক—উনি আন্তরিকভাবেই এটা চান।

পাঁচজন বিহারী ভদ্রলোকের মধ্যে একজন ডাক-বিভাগের কর্মচারী। চৌদ্দ জন বাঙালী মুসলমানের মধ্যে একজন আমাদের বয়সীই হবেন। এঁর নাম বিলায়েৎ হোসেন। বিলায়েৎ আনসার বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। আনসার বাহিনী বোধ হয় শীগগিরই পাকিস্তানের স্থল-বাহিনীর অঙ্গীভূত হবে। কাজেই বিলায়েৎকে আমাদের সমিতির সদস্য করতে পেরে মনে হচ্ছে একটা বড় সাফল্য আমরা লাভ করেছি। অবশ্য এ কাজটা

একদিনে বা হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বিলায়েৎ করেন নি। দীর্ঘ চার বছর আমি এঁর সঙ্গে মেলামেশা করে আমাদের আদর্শের কথা ধীরে ধীরে সব বলবার পরে তবেই উনি সদস্য হয়েছেন এবং ঠিক বর্তমান সময়ে অখণ্ড ভারত সেবা সমিতির সদস্য হিসেবে আমাদের কারো চাইতে কম উৎসাহী নন। বিলায়েৎও ব্যক্তিগতভাবে সুরথদাকে জানবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একজনের পেশা ডাক্তারী, দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও রয়েছেন।

আমাদের সমিতির সভ্য এ রকম তিনজনের মেয়ের বিয়ে এবং অন্য পাঁচজনের ছেলেমেয়েদের স্কুলের বই সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। হিসেব করে দেখেছি অন্তত দু'হাজার টাকার প্রয়োজন, তবে এর মধ্যে শ পাঁচেক টাকা আমি এদিক থেকে জোগাড় করতে পারবো আশা করছি। কেন্দ্রীয় অফিসের কাছে আমার তাই আবেদন যে, মাসখানেকের মধ্যে আমাকে অন্তত দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করে পাঠান।

সমিতির আগামী বার্ষিক অধিবেশনে আমি অবশ্যই কলকাতা যাব এবং সে উদ্দেশ্যে এদিকেও সব ব্যবস্থাদি করছি। তবে কোন কারণে যদি চার বছর আগে যে রকম হয়েছিল সেই রকম আবার আটকা পড়ে যাই, সেই জন্যই কয়েকটা বিষয় আমি তোমাকে জানাচ্ছি। বিষয়গুলি তুমি নিজে ভালো করে ভেবে দেখবে, সুরথদাকে বলবে এবং আগামী বার্ষিক অধিবেশনে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছু নেওয়া হয় ত খুবই ভালো। আর তা না হয় অন্তত বিশেষভাবে সমস্ত সুবিধা-অসুবিধাগুলি আলোচনা করা দরকার। তোমাদের ওদিকের সদস্যদের মনোভাব তোমরাই ভালো জানো। এদিকের কথা এটুকু আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছি যে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে সংগঠনমূলক কাজকর্ম সুরু হওয়া প্রয়োজন। একথাটা বিশেষ জোর দিয়ে উপস্থিত সদস্যদের বোঝাবার চেষ্টা করবে ও অবিলম্বে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছুবার জন্যে যথার্থ রাজনৈতিক কাজকর্ম আরম্ভ না করলে এক শ্রেণীর সদস্যদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। শুধু দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বই জোগানো, দুঃস্থ এবং পীড়িতদের সেবা করা বা গরীবদের মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করার মধ্যে আমাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখলে আর চলবে না। এ সমস্ত সমস্যার গোড়ায়—একেবারে মূলে হাত দেবার সময় এসেছে—এতদিনে সেটুকু শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস আমরা নিশ্চয়ই সঞ্চয় করতে পেরেছি।

কয়েকজন সদস্যদের সহযোগিতায় আমার অঞ্চলের সমস্ত সদস্যদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে আমি যে সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপা বুলেটিন গত বছর দুই ধরে প্রকাশ করে আসছি তা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তান আজকের দিনে নানা সমস্যার জর্জরিত। প্রত্যহ নতুন নতুন সমস্যা সাধারণ মানুষকে ক্রমশ বিব্রত করে তুলছে। আমাদের অনেক সদস্য প্রায়ই অনুরোধ জানান যে এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক দিয়ে যে পন্থা অবলম্বন করা দরকার সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আরও ঘন ঘন বুলেটিন প্রকাশ করা হোক। কিছু কিছু সদস্য আমাদের নিজেদের একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিনের জন্য অর্থ সংগ্রহেও অগ্রহশীল।

দীর্ঘদিন একটানা জঙ্গী শাসনের অধীনে কাটাবার ফলে আমাদের এদিকের সাধারণ মানুষের অবস্থা যে ঠিক কি রকমটি হয়ে উঠেছে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। সংক্ষেপে বলা যায়: পূর্ব-পাকিস্তান একটা বড়ো আকারের কয়েদখানা। পশ্চিম-পাকিস্তানের কয়েক লক্ষ সশস্ত্র সিপাহী-সান্ত্রী সর্বক্ষণ এ কয়েদখানার সাড়ে ছয় কোটি মানুষকে সঙ্গীন উঁচিয়ে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব বুঝি সমস্ত ভয়ের উর্ধ্বে। কারণ, এ অবস্থায়ও মানুষ বিদ্রোহী হয়—উৎপীড়িত হয়, লাঞ্ছিত হয়, প্রাণ দেয়। সাধারণ মানুষের এ নিষ্কারণ বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে থাকে। এ সবকে সুসংবদ্ধ করে, সমস্ত ক্ষোভকে মুক্তির মহাসমুদ্রের দিকে প্রবাহিত করানোই আমাদের কাজ।

আমার যতোদূর স্মরণ আছে, চার বছর আগে সুরথদা বলেছিলেন যে অন্তত পাঁচশ সদস্য না হলে একটা সর্বভারতীয় অর্থাৎ গোটা পাকিস্তান এবং ভারতে সংগঠনের কাজে হাত দেওয়া যায় না। তখন আমাদের সদস্যসংখ্যা চারশয়েরও কম ছিল একথা ঠিক। ভারত ও পাকিস্তান আবার যুক্ত হয়ে অখণ্ড ভারতের সৃষ্টি না হলে যে এই উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল নাই খুব ধীরে ধীরে হলেও আমাদের এই মূল কথাটা ক্রমে সর্বশ্রেণীর মানুষ নিয়েছে বলেই মনে হয়। তাই আগের তুলনায় অনেক দ্রুত আমাদের সদস্য বাড়ছে। দু'মাস আগে তুমি যা বলেছিলে তাতে মনে হয় যে ঢাকা এবং কলকাতা মিলিয়ে বর্তমানে আমাদের সদস্যসংখ্যা মনে হয় প্রায় আটশ হবে। কাজেই, আশা করি সর্বভারতীয় সংগঠনের কাজে হাত দিতে সুরথদার আপত্তি থাকবে না। এ সম্পর্কে কিছু করতে গেলে গোড়ার দিকে আর্থিক আলোচনা হয়েছিল। আমি তখন যা বলেছিলাম সেই কথাটাই আবারও বলতে চাই। অর্থাৎ পৃথিবীর যে-কোনও বিপ্লবী সংগঠন গোড়ার দিকে যে উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে এসেছে, আমাদেরও ঠিক তাই করতে হবে। তুমি সুরথদাকে পরিষ্কার জানাবে যে এই উদ্দেশ্যে আমি এ অঞ্চলের কর্মীদের সর্বদাই তৈরী রাখি এবং যে-কোনও সময়ে ওঁর নির্দেশ পেলে সর্বভারতীয় সংগঠনের কাজ সুরু করবার উদ্দেশ্যে সাত দিনের নোটিশে আমি একলক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় কমিটিতে পৌঁছে দিতে পারব।

—ইতি তোমার রহিম ভাই।

[ক্রমশ।

বেশ কিছুদিন আগেকার শান্তি-নিকেতনের কথা বলছি। আমার লেখা কবিগুরুর সেই শান্তিনিকেতনের পরিবেশটির আজকের দিনের অশান্ত আবহাওয়ায় দিশেহারা মানুষের চিত্তে সত্যাই শান্তি ও সান্ত্বনার বাণীর প্রলেপ বুলিয়ে মানুষকে সত্য ও আনন্দের পথে চালিত করিবে -- সন্দেহ নাই।

প্রায় চৌদ্দ বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত বিশ্বভারতী এবং কবির আবাসস্থল দেখার জন্যে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতন ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক্। তার শ্রীভবনে আছে শিশু ও নারীর মেলা, তার 'চৈতিতে' আছে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রী-দের নিজেদের তৈরী নানা জিনিসকে ও সাহিত্য ও কলাসৃষ্টিকে প্রদর্শনীর মতো সাজিয়ে রাখার ঔৎসুক্য। তার হিন্দিভবন, চীনাভবন সব কিছুতেই কিছু না-কিছু আছে শিল্পকলার নিদর্শন। তার মাটির ঘরে রচিত কলাভবনের ভাস্কর্য মনকে ভরিয়ে তোলে অপরূপ মাধুরীতে। তার সঙ্গীতভবনের ব্যঞ্জনা ও ঝঙ্কার, নাচ ও গান, কথা ও সুর, তাল ও তান কী এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্নিগ্ধতায়, কী অনির্বচনীয় আনন্দে অভিষিক্ত করে দেয় অন্তরকে, তার লাইব্রেরীতে আছে পুঞ্জীভূত হয়ে শত সহস্র জ্ঞানের উপাদান। তার পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের আম্রকুঞ্জে গাছের ছায়ায় বসে জ্ঞান আহ-রণে আছে - গুরু-শিষ্যপরম্পরা প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান বিতরণ ও গ্রহণ করার পদ্ধতির চর্চ্চা। তার সিংহসদনে বিচিত্র ভাব প্রকাশের ঘণ্টা বেজে যায় প্রহরে-প্রহরে। তার সাহিত্যভবনে নিত্য নব বিদগ্ধজনের হয় সমাগম - যাঁরা বিদ্যার্থী ও বিদ্যার্থিনীদের শুনিয়ে যান -- নব নব জ্ঞানের ইতিবৃত্ত। তার খোলা মাঠে খেলা করে অবাধে শিশু, কিশোর ও বালক এবং যুবক, খেলে যায় কিশোরী, বালিকা ও কুমারীর দল স্বচ্ছন্দগতিতে। তার শালবীথির ছায়ায় ছায়ায় বেড়িয়ে বেড়ায় ছাত্র-ছাত্রীর দল। তার গুরুপল্লী উদ্ভাসিত হয়ে আছে বিভিন্ন শিক্ষাগুরুর বিচিত্র জ্ঞানের আলোতে। দেশ-বিদেশাগত গণ্যমান্য অতিথি দিয়ে সর্বদাই অলঙ্কৃত হয়ে থাকে তার অতিথিভবন।

জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাত্রিতে শ্রীভবনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায় - বেরিয়ে পড়ে পথে পথে মেয়েরা -- তাদের কলহাস্যে

বীণাপাণি সেনগুপ্ত

মুখরিত হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস। স্থল, জল, বনতল আলোড়ন করে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় সঙ্গীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীর কণ্ঠে - সে সঙ্গীতে যোগ দেয় শুরু থেকে সুরু করে পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যা-ভবনের সকল ছাত্র-ছাত্রী। নির্মল আনন্দ-ধারায় সিক্ত হয়ে যায় শান্তিনিকেতনের শুভযামিনী। আবার কখনো কখনো বা প্রভাতের প্রথম আলোয় বেরিয়ে আসে প্রভাত-ফেরীর দল, পথে পথে বন্দনা সঙ্গীত দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যায় শান্তি-নিকেতনের সুপ্ত অধিবাসীদের। সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত কাঁচের তৈরী উপাসনা মন্দিরের আল্পনা অঙ্কিত শুভ্র বেদীমূলে সকাল-সন্ধ্যায় ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সমবেত হয় শান্তিনিকেতনের আবালবৃদ্ধ-বনিতা। শঙ্খধ্বনি দিয়ে আরম্ভ হয় উপাসনা—বেদ-উপনিষদের মন্ত্র পাঠ হয় উদাত্তস্বরে—ব্রহ্মসঙ্গীতের গম্ভীর সুরে মনপ্রাণ হয়—ধ্যানমগ্ন।

তারপর উত্তরায়ণ—কবিগুরুর আবাস-স্থল। উত্তরায়ণ যাওয়ার পথে পড়ে ছাতিম বন। সেই ছাতিমতলায় আছে সিদ্ধাসন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিদ্ধিলাভের স্থান। সেই বেদীতলে দেখা যায় নিভৃত পিয়াসী নরনারীর দল।

চিত্র: সুনীলকুমার চন্দ্র

উত্তরায়ণের ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করলেই প্রথমে চোখে পড়ে তার পুষ্প বনের প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য। তারপর চোখে পড়ে কবিগুরু 'উদীচীর' ঘর—সেখান থেকে শেষ অসুখকে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। দেখলাম তাঁর পুনশ্চ ও শ্যামলীর মাটির ঘর—ওরা যেন শান্তি ও স্নিগ্ধতায় ভরা। দেখলাম বিশ্বকবির 'লতাকুঞ্জ'—যেখানে শীতল পরিবেশের মাঝে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ আলাপ করতেন।

তারপর দেখতে পেলাম কবির উদয়ন—যেখানে বসে করতেন তিনি উপাসনা, যেথায় বসে তিনি রচনা করেছেন অজস্র সাহিত্যসম্ভার—সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব ভাবসম্পদ। কিন্তু কবিগুরুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রধান আবাসগৃহ যে 'উত্তরায়ণ' তাতে প্রবেশাধিকার লাভ করা যেন এক মহা সৌভাগ্যের কথা। বাইরে থেকে যাঁরা কবিগুরুর স্থান ও কীর্তি দেখার অভিলাষ নিয়ে আসেন সেইসব সাধারণ দর্শকদের পক্ষে যেন 'উত্তরায়ণ' অচলায়তনের মতই দুর্ভেদ্য। অনেক হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে-মিটিয়ে অনেক বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে বহু পরিশ্রম স্বীকার করে উত্তরায়ণের প্রধান আবাস মন্দিরের প্রবেশপত্র লাভ করা যায়। তার পরের দেখাশোনাও নির্ভর করে তাঁরই ওপরে—যিনি দয়া করে রবীন্দ্রনাথের সবকিছুই বেশ যত্ন করে দেখান।

যাই হোক-শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমরাও 'উত্তরায়ণে'র অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে আছে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরী বিচিত্র কারুকার্য [illegible] রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা অসংখ্য ছবি আর আছে মাটির নীচে কবির বিশ্রাম-গৃহ এবং তাঁর ব্যবহৃত সামগ্রীর এক প্রদর্শনী কক্ষ।

দেখলাম শান্তিনিকেতনের শিল্পভবন—শ্রীনিকেতন থেকে সেই ভবনে আসে তার তৈরী নানা জিনিসপত্র। শান্তিনিকেতন থেকে কিছু দূরে কোপাই নদীর কাছে এই শ্রীনিকেতনের স্থাপনা। এখানে আছে গো-ভবন, পাখীর চাষ ও দাতব্য চিকিৎসালয়। আছে হলকর্ষণ উৎসব প্রাঙ্গণে নন্দলাল বসুর আঁকা 'ফ্রেসকো পেইন্টিং।' সেখানে আছে গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্যে লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে সুন্দর সেখানকার তাঁতে বোনা পোশাক-পরিচ্ছদ, বাটিকের কাজ ও চামড়ার তৈরী সৌখীন দ্রব্যসম্ভার। আরো আছে শ্রীনিকেতনে তার কৃষি-বিভাগের বিপুল সমারোহ। তার শস্য-সম্পদ, তার ফলসম্ভার ও তার পুষ্প পর্যাপ্তি সব কিছুই শান্তিনিকেতনের ভরণ-পোষণের যোগান দেয়। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সহায়তা করে। কবিগুরুর অভিলাষ অনুযায়ী সৃষ্ট এই শ্রীনিকেতনের রসেই পুষ্ট হয় শান্তিনিকেতন। অনায়াস ও সরল জীবন-যাপনের সুযোগ লাভ করে শান্তিনিকেতনের মানুষ সহজেই মনপ্রাণ ঢেলে দেয় নব নব বিদ্যার্জনের ও জ্ঞান আহরণের গঙ্গাধারায়।

বাণী ও ছন্দে, রেখায় ও লেখায়, গানে ও নাচে, প্রার্থনায় ও বন্দনায়—সহজ প্রাণের আনন্দে পূর্ণ হয়ে সেখানে যেন এক অপরূপ নূতন সমাজ গড়ে উঠেছে, দেখলাম। সে সমাজে কোন ধর্মবৈষম্য বা জাতিভেদ নেই—সেখানে আছে কেবল মানুষ এবং পরকে আপন করে নেওয়ার মানবধর্ম। উপলব্ধি করলাম সনাতন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে চলিষ্ণু পৃথিবীর কৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে যুগ-যুগান্তর ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং থাকবে আমাদের সকলের মিলনক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতন।

মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের ভাষা, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করে দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর-রূপে উপলব্ধি করা।"

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সেই প্রচেষ্টারই সার্থক রূপায়ণের আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছে বলেই নিত্য তার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বকবিরই বাণী। হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

শান্তিনিকেতনের এই স্বরূপটি মনেপ্রাণে অনুভব করে আমার কণ্ঠেও সেদিন ধ্বনিত হয়েছিলো—

মহামানবের মিলনক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা হোক সার্থক—তার সিদ্ধিদানের প্রতীক ওই ছাতিম পাতা হোক অবিনশ্বর—তার বিভিন্ন দেশাগত বিভিন্ন জাতের নরনারী ও ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্বভারতীতে আহ্বান জানিয়ে এক মহান ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে নেওয়ার প্রচেষ্টা ও আদর্শ হোক নিরবচ্ছিন্ন

বিভিন্ন পোষাকে মহিলারা
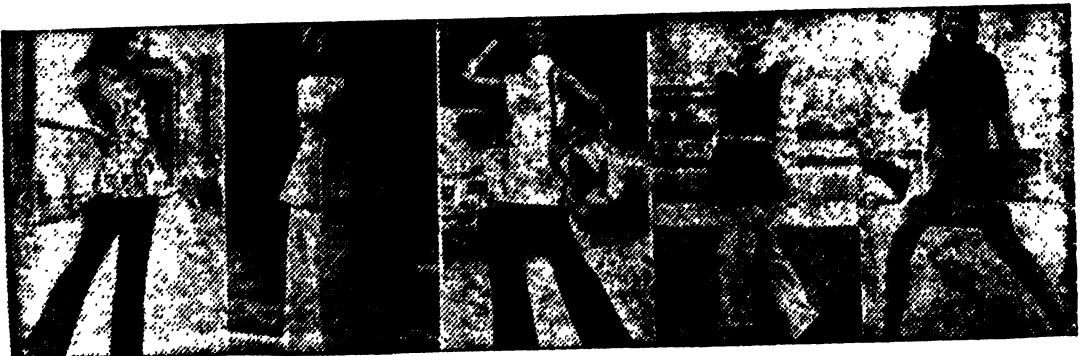
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তৎকালীন নারীসমাজ

মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ, বাঙলা ১২২৭ সন। ভারতের পক্ষে সে সময়কে সবদিক দিয়েই বলা চলে 'নবজাগরণের যুগ'। কি স্বদেশ-চেতনায় সমাজ-সংস্কারে আধ্যাত্মিক-ক্ষেত্রে, নারী-দুর্গতি মুক্তির প্রচেষ্টায়—এক কথায় সব দিক দিয়েই সে-যুগের পূর্বতোরণে নবীন সূর্যের উদয় হয়েছিলো। ভারতভূমি তখন পরশাসিত অবস্থায় থাকলেও শৃঙখলমুক্তির মহামন্ত্র উদ্গীত হয়েছিলো সেই নবজাগরণের যুগেই। দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টায় এগিয়ে এসেছিলেন ভারতমাতার সুযোগ্য বিশ্ববরেণ্য সন্তানগণ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওঁদেরই অন্যতম।

তাঁর কর্মবহুল জীবনচারণ দ্বারা আমরা জানতে পাই তিনি দেশের দশের সমাজের উপকারার্থে অক্লান্তভাবে বহু কাজই করে গেছেন। বিশেষত স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য কল্যাণের জন্য তাঁর অবদান অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়।

পরশাসিত ভারতের তখনকার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

'পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে,
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে।'

কথাটি ছিল অতি সত্য। 'অবলা' 'অসহায়া' সে-যুগের মেয়েদের এই ছিল একমাত্র পরিচয়। সমাজের কঠিন বিধানের বেড়াজালে চরম দুর্দশায় তারা তখন উপনীত—নিপীড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ নিষেধ। সামাজিক পরিবেশে তারা—এককথায় বলা চলে অপাংক্তেয়, নির্যাতিত। গৃহ-পরিবেশও সুখের বা স্বস্তির ছিল না, নারী জাতির উন্নতি বা সুখ-দুঃখের কথা তখন চিন্তার বহির্ভূত বিষয় ছিল। সতীদাহ, সহমরণ প্রথা, বাল্য-বিবাহ, পুরুষের বহু-বিবাহ ইত্যাদির হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কশাঘাতে কত নারী-প্রাণের আকুল আর্তনাদ তখনও বাঙলার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলতো তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করার কেউ ছিল না। সমাজ-কর্ণধার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিষ্পাপ কঠিনতার সঙ্গে বলতেন—এ তো শাস্ত্রের অমোঘ বিধান।

পুরুষের বহু-বিবাহের যূপকাষ্ঠে অবলা অসহায়া কন্যাদের কুমারীত্ব ঘুচাবার জন্য নির্বিচারে বলিদান, গৌরীদানের অজুহাতে ছোট ছোট বালিকাকে

সুচরিতা সেনগুপ্ত

পাত্রস্থ করা অমোঘ সমাজ ব্যবস্থাবলে। কুসংস্কার ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা বিদ্যা শিক্ষার পথ রুদ্ধ। এহেন অচল ও মর্মান্তিক অবস্থার থেকে নারীজাতিকে উদ্ধার করার জন্য যে সব এগিয়ে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এসেছিলেন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নারী-হিতৈষী জনকয়েক জননায়ক। এবার পুরোধা হয়ে এলেন মহাপ্রাণ নারী-দরদী বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

অতি দরিদ্র সংসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। নিরুপায় পিতামহী সুতা কেটে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা করতেন। পিতা ঠাকুরদাস তাঁর জননীর দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আগমন করেন। কালক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রকেও বিদ্যাশিক্ষার্থে পিতার সঙ্গে কলকাতা মহানগরীতে আসতে হয়। সেখানে বড়বাজারের দয়েহাটার অপরিসর গলির এক ক্ষুদ্র কক্ষের মেটে প্রদীপের ক্ষীণ আলোর সামনে বসে যে ছোট্ট বালক সেদিন বিদ্যাভ্যাসে এক মহিমামণ্ডিত অত্যুজ্জ্বল পথের সন্ধান লাভ করেন, পরবর্তী কালে তিনিই বিশ্বসমুখে যশস্বী ও খ্যাতিমান হলেন মহান্ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর রূপে।

ভারত-জননীর এই কৃতী সন্তানই নারীজগতের তমসা দূর করতে আলোকবর্তিকা জ্বাললেন তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, দরদ, দৃঢ়তা, সংস্কারমুক্ত চারিত্রিক বীর্য দিয়ে।

মানবতাবোধের চেতনায় মানুষ হয় দরদী, হৃদয়বান। অপরের দুঃখ বেদনা অভাব অভিযোগ মনপ্রাণ দিয়ে বুঝতে পারে শুধু সেই। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল তেমনি একটি স্নেহকোমল, সহৃদয় সহজ সরল অন্তর। মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, মমত্ববোধ চিরকাল ছিল অপরিসীম। সে কারণেই তিনি শুধু মাতৃভক্ত সন্তানই নন, মমতাময়ী [illegible] রাইমণির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল। মুদির দোকানের সেই [illegible] নারী, যিনি ফলার করিয়ে ঠাকুরদাসের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন, তাঁর প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। এঁদের মধ্যে নারী-অন্তরের চিরকালের স্নেহ মমতা ও করুণাময়ীর পরিচয় ঈশ্বরচন্দ্র লাভ করেছিলেন, সে কথা নিজের জীবনীতেও লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন।

মেয়েদের তৎকালীন জীবনের দুঃখ-দুর্গতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনে গভীর বেদনা জাগিয়েছিলো। তাদের রক্ষা করার প্রচেষ্টা তাঁর জীবনের ছিল অটুট সংকল্প। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও বিধবা বিবাহ তাঁর সমাজ-সংস্কারের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান। নিজের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ভ্রাতাকে লিখেছিলেন—

'বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন

সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই। — সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক হইবে তাহা করিব।'

মেয়েদের বৈধব্য জীবনের অসহ্য দুঃখ-বেদনার তিনি ছিলেন সমব্যথী। গভীর সমবেদনার সঙ্গে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হে অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর বলিতে পারি না।'

প্রাচীন সমাজপতিগণের উদ্দেশ্যে শ্লেষোক্তি করেছিলেন—'তোমরা মনে কর পতি-বিয়োগ ঘটিলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়। দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না। দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।'

বিধবা বিবাহ প্রচলন করার প্রেরণা অনেকাংশে তিনি জননীর নিকট লাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে। জননী ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে ছিলেন মূর্তিমতী প্রেরণা। তিনি নিজে ছিলেন সংস্কার-মুক্ত। পুত্রকে আদেশ দিয়েছিলেন—'যা সত্য বলে মনে করবে সে কাজে এগোতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করবে না।'

সে সময় এ দেশের আর এক দুরূহ সমস্যা ছিল স্ত্রী-শিক্ষা। ঈশ্বরচন্দ্রের মনোযোগ এদিকে গভীরভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলো। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন মানুষেরই উন্নতি সম্ভব নয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে। একাজে অগ্রসর হতে যেমন বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয় তেমনি সাহায্য-সহযোগিতাও লাভ করেছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাছ থেকে।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কালীকৃষ্ণ ঘোষবাহাদুর, বামাপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, বিদেশীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন, হ্যালিডে সাহেব, সিসিল বিডন, মিস কার্পেণ্টার প্রমুখ এ কাজে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার নানা গ্রামে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সময় তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থক্ষতি পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে।

এ বিষয় নিয়ে 'ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' এবং বঙ্গ সরকারের সঙ্গেও তাঁর মতানৈক্য ঘটেছিলো। মতের অমিল হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রের অদ্ভুত কর্মকুশলতা, নিঃস্বার্থ উদারতা ও নারী-হিতৈষণাকে ডিরেক্টর সাহেব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডারে' যথারীতি চাঁদা দিতেন সহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই আনুকূল্য লাভের ফলে স্কুলগুলির কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছিলো।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সুখী ও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। স্যার বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখেছিলেন—'শুনিয়া সুখী হইবেন মফস্বলের যে-সকল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা দিয়েছিলেন সেগুলি ভালই চলিতেছে। লোকেরা স্ত্রী-শিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নতুন স্কুলও খোলা হইতেছে।'

ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা ও ধৈর্য, নির্ভীক তেজস্বিতা ও বলবীর্য স্নেহ মমতা দরদ এবং অপূর্ব কর্মক্ষমতা প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গুণরাশির অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিলো। তাঁর ভাষা ছিল স্পষ্ট। মনে ছিল অপরিসীম মহত্ত্ব ও উদারতা। কোনরকম সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না তাঁর হৃদয়ে। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার ছিলেন তিনি। যা সত্য বলে বুঝেছেন তা থেকে কেউ তাঁকে বিরত করতে পারতো না। বেদান্ত-দর্শন বা শাস্ত্রবাণীকে পর্যন্ত ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন।

বাল্য-বিবাহের বিরোধিতা করতে ভীত হননি। পুরুষের বহু-বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন কঠোরভাবে। বিধবা-বিবাহের প্রথা চালু করার জন্য তাঁকে প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বার নির্বাচিত হন।

ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের আমলে তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়—'বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতারূপে তাঁহার আন্তরিকতা এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের অগ্রগামী দলের নায়করূপে তাঁহার মর্যাদা স্বীকার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইহা দেওয়া হইল।'

মাতৃজাতির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও দরদ ছিল অপরিসীম। জননী ভগবতী ছিলেন পুত্রের কাছে প্রকৃতপক্ষেই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তাঁর অনুমতি ও সমর্থন পুত্রের কর্মব্রতকে সাফল্য ও সার্থকতার পথে এগিয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলো—একথা অতি সত্য।

মেয়েদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা-দুর্গতি তাঁর জীবনের সঙ্গে নিমেষিশে এক হয়ে গিয়েছিলো। অসহায় নারী-জীবনে মুক্তির আলোর সন্ধান যাঁরা এনে দিয়েছেন মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ—এ মহাসত্য পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন প্রত্যেকটি মানুষ তথা চিরকালের নারী-সমাজ।

অজন্তা গুহামন্দির-

শ্রীমতী সবিতা দেবী মুখোপাধ্যায়

মনের যে বাসনাই হোক যখন সে এক উদগ্র বাসনায় পরিণত হয়, তখন তা নিশ্চয় চরিতার্থ হয়, তার প্রমাণ আমারই জীবনে তা প্রমাণিত হয়েছে। একদিন এক অলস মুহূর্তে আমার স্বামী এসে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'যাবে নাকি বাইরে?'

আমি সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

তিনি বললেন, 'ভাবছি কিছুদিনের জন্য বম্বে যাব। তারপর সেখান থেকে অজন্তা ইলোরা ঘুরে আসবো। তোমার কি মত?'

আমি তৎক্ষণাৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে সম্মতি জানালাম। কারণ বহুদিন থেকে আমার সেই গুহাগুলির সৌন্দর্য দেখবার এক দুর্বার বাসনা জেগে উঠেছিল মনে। সুতরাং আমাদের যাত্রার আয়োজন খুব তাড়াতাড়িই সারতে হোল। অবশ্য যখনকার কথা বলছি তা আজ প্রায় কয়েক বছর আগেকার হবে।

মাত্র দুচার দিনের মধ্যেই আমাদের বম্বে রওনা হতে হোল। দু'দিনের পথ বম্বে। কিন্তু দূরত্ব যত না হোক তার থেকে মানুষের জীবনযাত্রার এবং সহরের প্রকৃতির ব্যবধান অনেক। তাই কলকাতা থেকে বম্বে সহরে নেমে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লাম। সারা সহর জাঁকজমকে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, রাতের আলোর আসরে মেরিন ড্রাইভ মালাবার হিল প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ জায়গা আলোর ছটায় এক অপরূপ রূপের সৃষ্টি করে। মেরিন ড্রাইভের সমুদ্রের ধারে ধারে বিরাট সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলি মডার্ন আরকিটেকচারের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। বম্বে যখন তার আলোসম্ভার ও প্রাচুর্য নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন মালাবার হিল থেকে তাকে এক অপূর্ব রমণীরূপে মনে হয়। আর সেখান থেকে মেরিন ড্রাইভের আলোকমালাকে ঐ রমণীর গলার হারের মত দেখতে লাগে। তাই ঐ মেরিন ড্রাইভের সুদৃশ্য আলোকমালাকে অনেককেই 'কুইনস নেকলেস' বলতে শোনা যায়। যাই হোক বিলাসের প্রাচুর্যে নানা বর্ণের আলোকচ্ছটায় সত্যিই এক অভিনব সুন্দর ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই বম্বে সহর।

সেখানে আমাদের আত্মীয় থাকায় ক'দিন সেখানে থেকে আমরা তাঁদের নিয়েই অজন্তা ইলোরায় যাওয়া স্থির করলাম। পরের দিন বম্বে থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে জলগাঁওয়ে রওনা হয়ে গেলাম। ট্রেনে বসে থাকতে থাকতে কেবলই এক অজানা আনন্দ মনকে নাড়া দিয়ে যেতে লাগলো। এই অবস্থায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙ্গলো আমার সেই আত্মীয়াটির ডাকে। জেগে দেখি জলগাঁও এসে গেছি। তখন ভোর ছটা। নতুন পরিবেশে নতুন লোকের সমাগমে এক নতুন আনন্দে মন আমার ভরে উঠলো, সবেমাত্র পৃথিবী রাত্রির নীরবতা ভেদ করে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। উষার মিষ্টি স্নিগ্ধ আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ লাগছিল সেই সদ্য জেগে ওঠা ধরণীর উন্মুক্ত মুখখানি।

জলগাঁও স্টেশনের কাছাকাছি একটি হোটেলে আমরা আমাদের প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে আবার যাত্রার জন্য তৈরী হলাম। এবার অবশ্য ট্রেন নয়, বাসেই যাত্রা করতে হবে। জলগাঁও থেকে একেবারে অজন্তা অবধি বাসই যাতায়াত করে। বাসের সময়ও হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যাণ্ডে চললাম। গিয়ে দেখি পর পর বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার বাসগুলি সব সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরি মধ্যে একটি আমাদের অজন্তাগামী বাস রয়েছে। অগত্যা তারই আরোহী হয়ে চড়ে বসলাম সকলে। বেশ বড় বাস এবং আরামদায়কও বটে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে বাসটিও ছাড়লো।

অজন্তা যাওয়ার রাস্তাটি বড়ই মনোমুগ্ধকর। চারদিকে শ্যামল প্রান্তর। নানা ঝর্ণা অজানা গাছগাছালিতে ভর্তি। সবটা মিলে চারদিকে কোথাও খানিকটা রুক্ষ, আবার কোথাও বা সবুজ আস্তরণে ঢাকা। বাস ছুটে চলেছে, আর আমাদের মনও ছুটেছে। তারি মাঝে চোখ পড়ছে নানা ছোট ছোট দৃশ্যসম্ভারে। কোথাও রাস্তা বহু দূর অবধি সমতল হয়ে চলেছে। তার দু'পাশে বড় বড় গাছগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা ছোট ছোট

শহরের মত জায়গাগুলিতে ঘন বসতি রয়েছে, দোকানপাটও রয়েছে কিছু কিছু। আবার কোথাও বা ফেলে চলেছি ছোট ছোট গ্রামগুলিকে। সেখানে দোকানপাটও নেই, নেই ঘন বসতি। কেবল কতকগুলি মাঝে মাঝে কুঁড়েঘর। খানিকটা চাষ করার জমি। ছোট ছোট উলঙ্গ বাচ্চাগুলি মনের আনন্দে সেখানে রাস্তাঘাটে ছুটোছুটি করছে। গ্রামীণ বধূরা তাদের পরিশ্রমের পণ্য বোঝাই ঝুড়িগুলি মাথায় করে অদূরে কোন সহরে বিকোবার জন্যে চলেছে সেই গ্রামের রাস্তা দিয়ে।

সব মিলিয়ে সেই স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশটি মনকে সত্যিই বেশ নাড়া দেয়। বাইরের সেই শান্ত পরিবেশটি বাসের প্রতিটি যাত্রীকেই যেন শান্ত করে তুলেছে। তারা সকলে নীরব নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে। হঠাৎ অনুভব করলাম বাসটি সমতল জায়গা ছেড়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপরে উঠছে। যতই উপরে উঠতে লাগলো ততই দূরে সহর সেই রাস্তা গ্রাম সব কত নীচে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

এইভাবে বেশ খানিকটা ওঠার পর দূরে আমরা ছোট ছোট আকারে গুহার মুখগুলি দেখতে পেলাম। আর দেখলাম সেই গুহাগুলির পাশেই একটি রূপোর পাতের মত সরু একটি রেখা রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে।

খানিকটা উঠেই বাস গেল থেমে। সকলেই নেমে পড়তে লাগলো দেখে আমরাও নেমে পড়লাম। তারপর জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে বাস আর উঠবে না। অল্পপথটুকু আমাদের হেঁটেই উঠতে হবে। তবে হেঁটে যেতে খারাপ লাগলো না। বহু যাত্রী একসঙ্গে হৈ-চৈ করতে করতে উঠতে লাগলাম। তবে যতই গুহাগুলি আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ততই আমাদের বিস্ময়ও বাড়তে লাগলো। দূর থেকে যেগুলিকে ছোট ছোট পাহাড়ের গর্ত বলে মনে হচ্ছিল সেগুলি এক একটি বৃহৎ গুহামন্দির। মস্ত বড় বড় হাঁ করে

ইংলণ্ডের ডাডলে রোড হাসপাতালে কিম[illegible] মধ্যে শ্রীমতী লিলিয়[illegible] প্যা[illegible] সন্তান প্রসব করেন। নবজাতকসহ প্রসূতিকে দেখা যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে সেই রূপোর পাতের মত রেখাটি একটি স্বচ্ছ কলস্বিনী নদী। দূরে একটি পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে আসছে আনন্দে আত্মহারা হয়ে। আর সেই নিস্তব্ধ নিঝুম গুহাগুলির পাশ দিয়ে আপন মনে ঝির-ঝির করে বয়ে চলেছে। একদিকে গুরুগম্ভীর গুহামন্দির। আর তার পাশেই লাস্যময়ী কলস্বিনী নদী।

একই মধ্যে বহু 'গাইড' আমাদের সামনে এগিয়ে এলো। তাদেরই মধ্যে একজনকে আমরা বেছে নিলাম। এবং একটি আলোও আমাদের ভাড়া করতে হোল। কারণ ভেতরটি নিবিড় অন্ধকার। এখানে মোট উনত্রিশটি গুহা আছে। তার মধ্যে ছাব্বিশটি দেখবার যোগ্য। বাকীগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে গেছে। পাহাড়ের এই অংশটি ঠিক ঘোড়ার নালের আকারে বেঁকে গেছে। গুহা-গুলি অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো। এর মধ্যে উনিশ নম্বরের গুহাটি সব থেকে সুন্দর। গাইডটি আলো ফেলে আমাদের বহু সাহায্য করতে লাগলো। সেই আলোতে দেখলাম অপূর্ব চিত্রকলা, সারা গুহাটি সুন্দর কারুকার্য করা। কোথাও এতটুকু ফাক নেই। এমন কি মাথার উপরের স্থানটুকু পর্যন্ত নানা চিত্রে চিত্রিত। এখানকার বেশির ভাগ গুহাতেই রয়েছে বৌদ্ধমূর্তি। এক একটি বৌদ্ধমূর্তিকে একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়।

এই স্বল্প আলোয় পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে সেই যুগের শিল্পীরা যে কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে এই কারুকার্যময় শিল্পকীর্তি অমর করে রেখে গেছেন তা ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগে। এক নম্বরের গুহায় গাইড আমাদের একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখালো। সেখানে একটি বেশ বড় বৌদ্ধমূর্তি রয়েছে। তার একদিকে আলো ফেললে মনে হয় তিনি হাসছেন কিন্তু ঠিক উল্টোদিকে আবার আলো

ফেলতে সত্যি দেখা গেল যে মুখটি দারুণ গুরুগম্ভীর। এই আশ্চর্য শিল্পকলা দেখতে দেখতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আবার কোন স্তম্ভে বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী উড়ে চলেছে। আবার কোথাও রয়েছে একটি হরিণের চারটি দেহ একটি মাথার সঙ্গে যুক্ত। চিন্তার দিক থেকেও এই ভাস্কর্য নিঃসন্দেহে উন্নত ধরণের এবং একটি বিচিত্র রসের দ্বারা রসসিক্ত। বেশির ভাগ গুহাতেই বৌদ্ধমূর্তি পদ্মাসীন হয়ে রয়েছে। আবার কোথাও রাজা শুদ্ধোদন পাশে শিশু গৌতমকে নিয়ে মাতা গৌতমীর মূর্তি এক অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত রয়েছে। কোন গুহায় রয়েছে জাতকের মূর্তি। একটি গুহায় দেখলাম সেকালের সমাজ ব্যবস্থার নানান ধরণের চিত্রের সমাবেশ।

'গাইড'টি একটি স্থান নির্দেশ করে বললো, দেখুন সেকালেও যে বর্তমান আধুনিক ফ্যাশনের সাজসজ্জা ছিল এটা তারই নিদর্শন।

সত্যিই দেখলাম সারা দেওয়ালের গায়ে নানা ধরণের রমণীর চিত্র, তাদের পোষাক, তাদের কেশবিন্যাস, এ সবই যেন এ যুগেরই প্রতিচ্ছবি। এক অপূর্ব স্থাপত্য ভাস্কর্যের সঙ্গে অতুলনীয় বিচিত্র চিত্রকলার এক বিস্ময়কর সমন্বয় এই অজন্তা গুহামন্দিরগুলি। এই চিত্রকলা দেখতে দেখতে সে যুগের অবিস্মরণীয় শিল্পীদের কথা বারবার মনে পড়ে যায় এবং অজান্তেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। ধীরে ধীরে সব ক'টি গুহা দেখা হলে আমরা ফিরে চলি ইলোরার পথে।

বাসে করেই আমাদের ফিরতে হোল। পাহাড়ের উপর থেকে ঘুরে ঘুরে বাস নেমে চলেছে সমতলভূমির দিকে। চারদিকে বিরাট পশ্চিমঘাট পর্বতমালা স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেদিকে তাকাই পথ আর দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল পাহাড় আর পাহাড়। দেখে মনে হয়, যেন এই পর্বতমালা পথরোধ করে বলছে 'যেতে নাহি দিব।'

একসময় সেই পাহাড় অতিক্রম করে আমরা সমতলভূমিতে নেমে এলাম। চোখে পড়লো শস্যশ্যামল প্রান্তর। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ ঔরঙ্গাবাদে এসে পৌঁছলাম। এই বাস এই অবধি এসেই তার যাত্রা শেষ করলো। আমরা সে রাত্রি একটি হোটেলে কাটিয়ে পরদিন একটি ট্যাক্সিযোগে ইলোরার পথে রওনা হলাম।

প্রথমে পথে পড়লো দৌলতাবাদ ফোর্ট। সেখানে নামা হোল, এই ফোর্ট দেখার জন্য। এই দুর্গকে বাইরে থেকে কেবলই একটি সু-উচ্চ প্রাচীর বলে মনে হয়। কিন্তু ভিতরে নিবিড় অন্ধকার। বিরাট উঁচু সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে
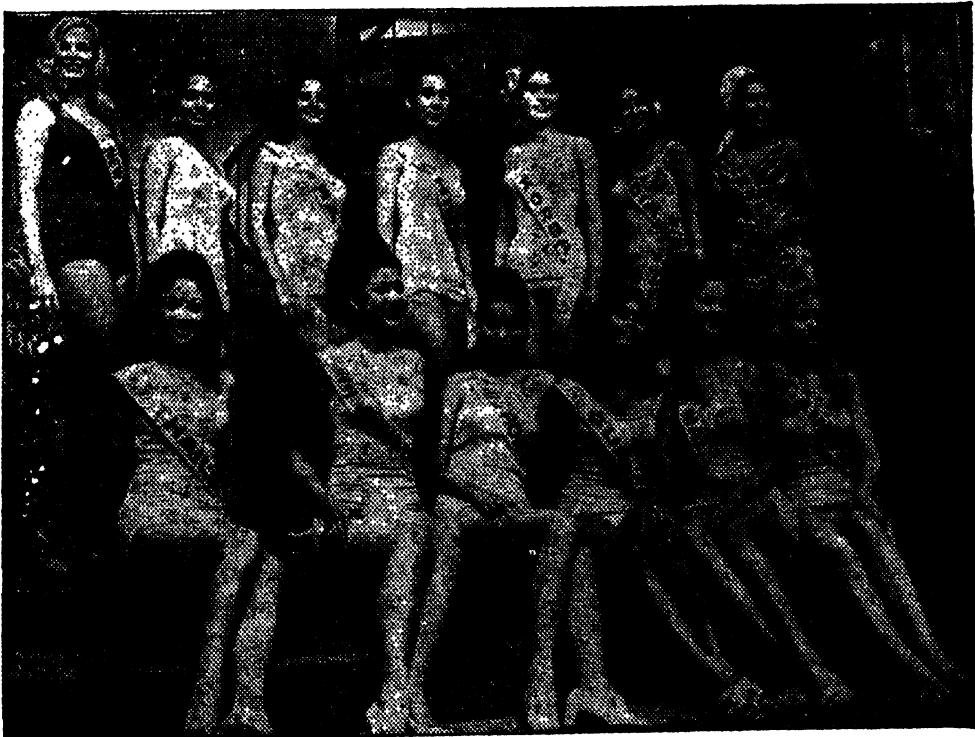
এশিয়া সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারিণীরা—মিস থাইল্যান্ড, মিস ফিলিপাইন, মিস হংকং, মিস পলিনেশিয়া, মিস মালয়েশিয়া, মিস অস্ট্রেলিয়া, মিস নিউজিল্যান্ড, মিস সিঙ্গাপুর, মিস ইসরায়েল, মিস চায়না, মিস কোরিয়া, মিস ইণ্ডিয়া ও মিস সিংহল

হোল। যত উঠি ততই যেন আঁধার ঘন হয়ে আসে; বুকের স্পন্দনও বেড়ে যায়। প্রায় সাড়ে সাতশো ফুট উঁচু এই দুর্গের উপর যখন উপস্থিত হলাম তখন গলা গেছে শুকিয়ে, নিঃশ্বাসও বন্ধ হবার যোগাড়।

যাই হোক যখন এই প্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গটি দেখতে লাগলাম তখন যেন ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা খুলে যেতে লাগল। এই ভেবে সত্যি আশ্চর্য লাগে যে, এই দুর্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় রাজত্বের অস্তিত্বই বর্তমান রয়েছে। পাশেই দেখতে পেলাম কুতুবমিনারের অনুরূপ চাঁদমিনার। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চাঁদবিবির নামানুকরণে এই মিনার। সেখান থেকে আরো কিছু দূরে রয়েছে বিবিকামুকবরা। এই বিবিকামুকবরা তাজমহলের অনুকরণে তৈরী ঔরঙ্গজেবের প্রেমের নিদর্শন। এটিও বিবির উদ্দেশ্যে নির্মিত ঔরঙ্গজেবের কীর্তি। এরপর সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম ইলোরার গুহার পাদদেশে।

এখানে এসে আরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম ভাস্কর্য নিপুণতায় এ আর এক বিস্ময়। এখানকার মন্দিরগুলি পৃথকভাবে সজ্জিত। মন্দিরগুলির ছাদ হোল পাহাড়ের উপরিভাগ। কোনটি একতলা। কোনটি আবার দোতলা। এখানে মোট চৌত্রিশটি গুহামন্দির আছে। তার মধ্যে পনেরটি বৌদ্ধ শিল্পকীর্তি, চৌদ্দটি হিন্দুধর্মের চিহ্নস্বরূপ। আর চারটি জৈন শিল্পকীর্তি। এখানে বেশির ভাগই নটরাজ মূর্তি। কোথাও বিরাট হরপার্বতীর মূর্তি নানা কারুকার্যে খচিত। কোথাও বা রয়েছে পুজোপচারের কতকগুলি রমণীয় দৃশ্য-নানা নারীর বিভিন্ন মূর্তিও চারদিকে দেখতে পাওয়া যায়। কেউ শঙ্খে ফুঁ দিচ্ছে, কেউ বা আরতি করছে। এই মূর্তিগুলিকে একেবারে জীবন্ত বলে ভুল হয়। দেখতে দেখতে এই কথাই বারে বারে মনে হয় যে, সেই সব শিল্পী তাদের অন্তরের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দিয়ে কল্পনাকে কি জলন্ত সত্যেই না রূপায়িত করে গেছেন। কোন কোন গুহায় আবার বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও রয়েছে। একটি মন্দিরের নাম কৈলাস মন্দির। এই মন্দিরটি খুবই উঁচু অথচ চারদিকে রয়েছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এইসব মূর্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু যেগুলি অভগ্ন রয়েছে সেগুলি স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক অভিনব প্রশংসার নিদর্শন। অপূর্ব তার খোদায়ের নিপুণতা। বিভিন্ন গুহামন্দিরের এই বিভিন্ন মূর্তিগুলি সত্যিই প্রশংসনীয়।

সেই সব শিল্পী আজ আর নেই। কিন্তু তাঁদের এই অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তিই তাঁদের যুগ যুগ ধরে অমর করে রেখেছে দর্শকের হৃদয়ে।

এরপর অফুরন্ত আনন্দে ভরা মন নিয়ে ফিরে চললাম, যেখান থেকে একদিন শুরু করেছিলাম এই যাত্রা।

অভিনব আয়না
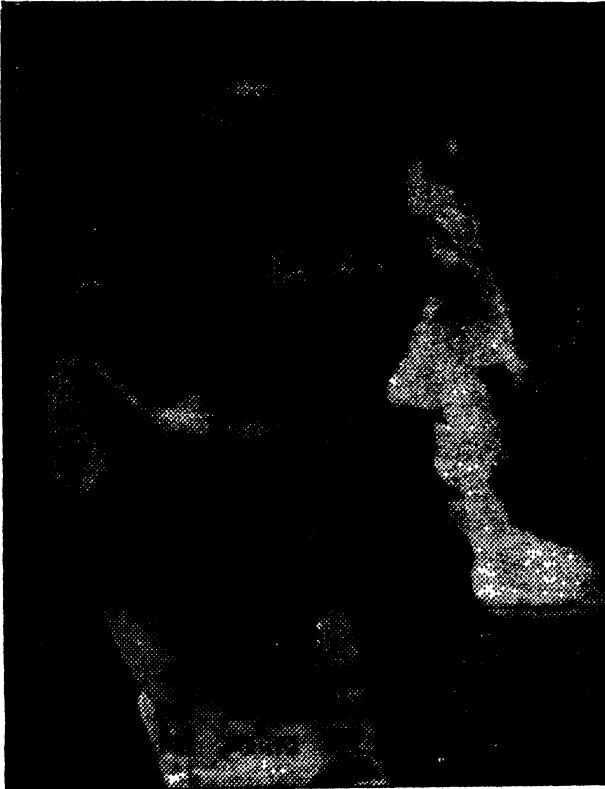
এই আয়না মুখ দেখার জন্য নয়, এটি কম্পিউটারের একটি অংশ। কম্পিউটারের কাজ চলার সময় এই আয়না মুহূর্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করে দেয়। আসলে এই আয়নাটি বালি, রূপা, লোহা ও নিকেলের হাল্কা আস্তর দেওয়া একটি তামার পাত, যার মধ্যে চুম্বকশক্তি সঞ্চিত থাকে। এর উপরের পর্দায় ৩১৫০ অনুপরমাণু কোষ আছে—যার প্রতিটি একটি খবর মনে রাখে। এই সার্দ্দিক ইউনিটের সাহায্যে এক সেকেন্ডের মধ্যে এক কোটি তথ্য নাড়াচাড়া করা যায়।

নিকোলাস আলেকজান্ড্রা ও রাসপুটিন

ইতিহাস মন্থন করলে নানা ঘটনা, অজস্র কাহিনী, বহুবিধ আখ্যান-উপাখ্যানের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নামও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক-একটি দেশের, রাষ্ট্রের, সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ের ও একটি যুগান্তর সৃষ্টির জন্যে এই নামগুলিকে বিশেষভাবে দায়ী করা চলে। এই নামের তালিকায় বহু দেশের বহু বিভিন্ন কালের নাম মিলবে। এই তালিকাতেই পাওয়া যাবে পাশাপাশি তিনটি নাম---জার নিকোলাস-জারিনা আলেকজাণ্ড্রা-রাসপুটিন।

আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে রুশ মহারাজ্যের ভাগ্যাকাশে যে নবযুগের সূর্যের দীপ্তিময় আবির্ভাব ঘটল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত রাজ্য শাসনের গ্লানি মোচন করে---তার মূলে এই তিনজনের অবদান কম নয়। কিন্তু সমাজ-সংস্কারক, যুগত্রাতা, দেশপ্রেমিক--এই তিনটির কোনটির মধ্যেই এ তিনটি নাম পর্যায়ভুক্ত নয়। তবু, রাশিয়ার নবজাগরণের, রাশিয়ার মুক্তির ক্ষেত্রে এঁদের অবদানও উল্লেখযোগ্য।

রাশিয়ার আকাশে বাতাসে মুক্তির গান অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সমগ্র রুশ জাতির মর্মমূলে মুক্তির আকুলতা দানা বেঁধে উঠছিল, বেপরোয়া অত্যাচার আর ব্যাপক অরাজকতার রাহুগ্রাস থেকে রাশিয়ার নরনারী নিরুদ্ধ আবেগে মুক্তির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুণছিল। পূর্বোক্ত তিনজনের ভূমিকায়ই তাদের এই মুক্তিযজ্ঞে তদগতচিত্ত করে তুলল।

জার ও জারিনা এবং রাসপুটিন ইতিহাসে যাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ম্যাড মঙ্ক' বলে---দুটি বিভিন্ন রে... থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই তিনজন একটি বিন্দুতে এসে মিলে গেলেন। বালক জারভিচ (অর্থাৎ জারপুত্র) এই মিলনের উপলক্ষ। ভাবী সম্রাট দুর্দান্ত রোগে আক্রান্ত। কেউ পারছে না তাঁকে সেই রোগের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে। কোথা থেকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে

অসিত মিত্র

মুমূর্ষুর শয্যাপাশে এসে হাজির হল রাসপুটিন। ইন্দ্রজালের মত ঘটনা ঘটল। মৃত্যুপথযাত্রী বালক তার তর্জনীসঙ্কেতে সঙ্গে সঙ্গে একলহমায় সুস্থ হয়ে গেল। দীর্ঘস্থায়ী রোগের কবল থেকে ঘটল তার পরিপূর্ণ মুক্তি। সেই যে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রাসপুটিনের প্রবেশ ঘটল---সেই থেকে তার প্রাধান্য এবং প্রভাব কায়েম হয়ে গেল। এককথায় সেদিন দিগ্বিজয় করল রাসপুটিন---একলহমায় তার

শেষ রুশীয় সম্রাট-দম্পতি

রাসপুটিন

অধিকারে এল জারের আস্থা। আর জারিনার? শুধু আস্থা বা নির্ভরতাই নয়---সেই সঙ্গে হৃদয়টিও।

এ ঘটনা ১৯০৪ সালের। জারের বয়েস তখন ছত্রিশ, জারিনার বত্রিশ আর রাসপুটিন ছিল জারিনার চেয়ে বয়সে মাত্র এক বছরের বড়। প্রায় তিনশ বছর ধরে যে রোমানভ বংশ রাশিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল, নিকোলাসই সেই বংশের শেষ অধিপতি।

মা ডাগমার ছিলেন সপ্তম এডোয়ার্ডের স্ত্রী আলেকজাণ্ড্রার সহোদরা এবং ডেনমার্কের রাজা নবম খ্রিশ্চিয়ানের মেজ মেয়ে এবং নরওয়ের রাজা সপ্তম হাকনের (যিনি আবার সপ্তম এডোয়ার্ডেরই এক জামাতা) পিসি।

জারিনা ছিলেন ভিক্টোরিয়ার মেজ মেয়ে এ্যালিশের ছোট মেয়ে। জার্মানীর কাইজারের মাসতুতো বোন। ভিক্টোরিয়া চেয়েছিলেন সপ্তম এডোয়ার্ডের বড় ছেলের সঙ্গে এই নাতনীটির বিয়ে দিতে। হয়তো তাঁর স্বপ্ন ছিল এই নাতনীটিই একদিন ইংল্যাণ্ডের রাণী এবং ভারতের সম্রাজ্ঞী হবেন।

কিন্তু নাতনী দিদিমার ইচ্ছা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল। বড়মামার বড় ছেলেটিকে কোনদিনই তার ভাল লাগে নি। তার ভাল লেগে গেল নিকোলাসকে অর্থাৎ বড়মামীর ছেলেকে নয়, বড়মামীর বোনপোকে। তারই ঘরণী হয়ে রুশরাজের অন্তঃপুরে তরুণী এ্যালেক্সির প্রবেশ ঘটল। যে নিকোলাস বা নিকির প্রেমে এ্যালেক্সি বিমুগ্ধা,

তার সঙ্গে ...য়ের কয়েক বছর পরেই দেখা গেল ...কোলাসেরই এক দাদার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক আর ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের নয়। শ্রদ্ধা, বাৎসল্য সেখানে অন্তর্হিত, তার পরিবর্তে প্রণয়ের ব্যাপকতা। কিছুদিন যেতে না-যেতেই দেখা গেল ভাসুরের স্থান চলে গেছে এক সৈন্যাধ্যক্ষের অধিকারে।

তারপর রাসপুটিন? এক গ্রামের ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই স্বতন্ত্র জাতের এক অদ্ভুত দৈবশক্তির অধিকারী। বহু বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ তার মধ্যে। এক অনতিক্রম্য আকর্ষণীয় শক্তি তার আয়ত্তে—যে শক্তির কাছে হার মানতে হয়েছে পরবর্তীকালে প্রতিটি অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাকে। রাসপুটিনের দৃষ্টি যে মহিলার উপর পতিত হয়েছে সেই মহিলাই কি এক অমোঘ আকর্ষণে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন রাসপুটিনের কামনার আগুনে।

রাসপুটিন নিজেকে ঘোষণা করলেন ঈশ্বরের মানসপুত্র বলে। তিনি বললেন—পাপের মধ্যেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—আমি তাঁর মানসপুত্র—আমার মনোরঞ্জন করে তাঁকে প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত কর।

রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করার পর রাজ্যশাসনের সকল ব্যাপারেই তিনি পরিচালিত করতেন স্বয়ং সম্রাটকে। কলের পুতুলের মত জার রাজ্য শাসনের ব্যাপারে পরিচালিত হতেন রাসপুটিনের অঙ্গুলিহেলনে।

আর জারিনা? মৃতপ্রায় পুত্রের প্রাণদানের কৃতজ্ঞতার ঋণ একটু অধিক পরিমাণেই শোধ দিয়েছিলেন জারিনা—এই উপকারের বিনিময়ে মহার্ঘ রত্নরাজি বা অন্য প্রত্যুপকারের পরিবর্তে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছিলেন রাসপুটিনের হাতে, আর সেই অঞ্জলিও রাসপুটিন গ্রহণ করেছিলেন পূর্ণমাত্রায়। জারিনার নিজস্ব সত্তা বলতে আর পৃথক কিছু রইল না। এককথায় সবদিক দিয়েই রাসপুটিনের সঙ্গে মিশে গেলেন জারিনা। অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ের সম্পর্ক চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল—যা ১৯১৭ সালের জারের ভাগ্নী-জামাই ইউসুপভ (যিনি গত বছর লোকান্তরিত হয়েছেন) এবং তাঁর সহযোগীদের হাতে রাসপুটিনের মৃত্যু পর্যন্ত অটুট এবং অক্ষুণ্ণ ছিল।

রাসপুটিনকেও হত্যা কি সহজে করা হয়েছিল—মোটেই না। বিষপানে তাঁর কিছু হয় না, বন্দুকের গুলী তাঁকে আহত করতে পারে না—শেষ পর্যন্ত অনেক আয়াসে, যথেষ্ট অধ্যবসায় ও ধৈর্যের বিনিময়ে রাসপুটিনকে পৃথিবী থেকে সরানো সম্ভব হল। রাসপুটিনের মৃত্যুর পর একটি বছরও তখন কাটে নি—যেদিন সপরিবারে জার নিহত হলেন।

এক দৈব অনুগ্রহ লাভ করে-ছিলেন রাসপুটিন; কিন্তু সে শক্তি তিনি নিয়ে গেলেন বিপথে—এই অপরিসীম শক্তিতে তিনি মানুষের এবং সমগ্র রাশিয়ার বিপুল কল্যাণ সাধন করতে পারতেন; কিন্তু নিয়তি তাঁকে নিয়ে গেল অন্যপথে। এখানেই না মেনে উপায় থাকে না—নিয়তি কেন বাধ্যতে?

ব্যাভেরিয়ার রাজা দ্বিতীয় লুডভিককে সবাই বলতো রূপকথার রাজা। বড় খেয়ালী রাজা ছিলেন তিনি। এক শতাব্দী আগে এই খেয়ালী রাজা এক রেলগাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন আর সেটাই ছিল তাঁর দরবার। এই রেল কামরার দরবারে বসে রাজা নিসর্গ দৃশ্য উপভোগ করতেন ও তাঁর দুর্গগুলি দেখে বেড়াতেন। নীল সিংহাসন, সোফা ও মার্বেলের টেবেল সব ২৪ ক্যারেট সোনায় মোড়া। লাল কার্পেট পাতা এই রেল দরবারের সিলিংয়ে অপূর্ব পেন্টিংয়ের সাহায্যে চতুর্ঋতু বর্ণনা করা হয়েছে। এই চলন্ত দরবার এখন মিউনিখ যাদুঘরের সম্পত্তি।

মানুষের চন্দ্রে অবতরণ

শ্রীলেখা গঙ্গোপাধ্যায়

ছিল এমন দিন যেদিন কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে লোকে কলকাতায় এলে সেটা স্থানীয় পরিমণ্ডলে একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হোত। তারপর এল এমন দিন যেদিন পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকের অপর প্রান্তে যাওয়াটা এতটুকু অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত কোন কিছু বলে মানুষের চোখে আর ঠেকল না। কিন্তু প্রগতির রথচক্র এখানেই থামল না, কয়েক বছর আগেও যা এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা হিসাবে গণ্য হোত, সম্প্রতি চন্দ্রলোকে পাড়ি জমাতে সেই বিস্ময়টুকুও বিজ্ঞান মূলোচ্ছেদ করে দিল। চন্দ্রলোকে অভিযানের সাফল্য আজ আলোড়ন ঘটাচ্ছে, যুগ-যুগান্ত ধরে চাঁদকে কেন্দ্র করে কত জল্পনা-কল্পনা, কত অনুমান-নিরূপণের।

মাত্র একযুগ বয়েস এই মহাকাশ যুগের। বারোটি বছরের মধ্যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষ পাড়ি জমাল, এক গ্রহের পর ছুটে গেছে অন্য গ্রহে, একের পর এক অজানা জগতের অনন্ত রহস্যে ভরা দুয়ারগুলি খুলে গেছে তার সন্ধানী চোখের সামনে। একুশে জুলাই, মানুষের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় দিন। এক অপূর্ব প্রত্যাশায় ভরা একটি নিটোল মুহূর্ত—মানুষের ইতিহাস সেদিন পা ফেলেছে একটি সম্পূর্ণ অভাবিত নতুন অধ্যায়ে। মানুষ চাঁদে পৌঁছুচ্ছে।

থাকবে না, ফিরে আসবে সেখান থেকে—সঙ্গে কোন চরকাকাটা মাসী বুড়ী আসবে না। আসবে কিছু উপলখণ্ড যার ভিতর আছে সেই সেকালের তরুণী পৃথিবীর—তন্বী ধরিত্রীর প্রথম যৌবনের অনেক গোপন রহস্য—আজ এই বুড়ো বয়সে তার সামনে আবার তুলে ধরা হবে তার গ্রন্থিগুলির উন্মোচন ঘটিয়ে।

যাত্রা সুরু ফ্লোরিডার কেপকেনেডি থেকে। পথ কি কম? দু'লক্ষ মাইলেরও বেশী। সঙ্গে অবতরণের উপযোগী একটি ছোট যানও থাকবে। বাইশ ঘণ্টা সেখানে থাকা হবে, সমস্ত খবরাখবর তথ্যগুলি এই সময়ের মধ্যে জোগাড় করে নেওয়া হবে। ১৬ই জুলাই যাত্রা সুরু। যাতায়াতে মোট আট দিন।

১৯৬১ সালে এই দশকেই যাতে এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারে সেজন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাবটি কংগ্রেসকে দিয়েছিলেন পরলোকগত রাষ্ট্রনায়ক কেনেডি। এ প্রস্তাব গৃহীত হল কংগ্রেসের কাছে। এই স্বপ্নটি বাস্তবে পরিণত করার জন্য যে পরিমাণ ধনজন উপকরণ সংগ্রহ করা এবং কাজে লাগানো হল একমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে তা করার দরকার হয় নি।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ এইভাবে হবে। যাঁরা পদার্পণ করবেন [illegible]

শুধু কি তাই? বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, পরিচালক, শ্রমিক, করণিক—সব মিলিয়ে চার লাখ লোক ডেকে আনা হল এই মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে। আর এ্যাপোলো-১১ অর্থাৎ এই চন্দ্রযানটি—এরই মধ্যে আছে ত্রিশ লক্ষেরও বেশী যন্ত্রপাতি। শুধু তাই নয়—এতে আরও অনেক কিছু দিতে হয়েছে—আড়াই হাজার বছর ধরে ক্রমানুয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধারায় ধারায় যে জ্ঞান এবং কারিগরি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঞ্চয়ে মানুষ তার ঝুলি পূর্ণ করেছে—সঞ্চয়ের সেই পূর্ণপাত্র আজ নিঃশেষে উজাড় করে দিতে হয়েছে এই মহান উদ্দেশ্যটিকে সফল করে তোলার জন্যে।

এপোলোও হয়েছে ধাপে ধাপে। ১৯৬১ সালে মহাকাশ পর্যন্ত। তারপর পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে পৃথিবী পরিক্রমা ১৯৬৫-'৬৬-তে দশবার মহাকাশ পর্যটন। তেরটি মহাকাশযান চাঁদের খুব কাছে চলে গেল। ছবি তুলে পাঠাল পৃথিবীকে।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে সুরু হল প্রথম চন্দ্রাভিযান। গত মার্চ মাসে সুরু হয়ে গেল চাঁদের বুকে পা রাখার মহড়া। গত মে মাসে এ্যাপোলো-১০ অনেক কিছু পরীক্ষা করে দেখে এল। এই ভাবে এ্যাপোলো-১১—র পূর্বসূরীরা ক্রমশই উত্তরোত্তর চাঁদের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। এ্যাপোলো—১০ যেখানে পৌঁছেছিল চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে তার দূরত্ব ছিল মাত্র ন' মাইল।

হাত বাড়ালে চাঁদ ধরা যায় না সত্যি, তবে আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করল পা বাড়ালে চাঁদের ছোঁয়া পাওয়া আর গল্প-কথা নয়।

৭০,০০০ অফিস-কর্মীদের আইসোমেট্রিক ব্যায়াম

দেখা গেছে অফিসে একনাগাড়ে বসে বসে কাজ করলে সব পেশী ঝুলে পড়ে আর তার ফলে কেরাণী-বাবুদের মাথা ধরে, কাঁধ ব্যথা করে আর শরীর অবসাদে ভরে যায়। তাই তারা এখন পশ্চিম-জার্মানীতে আইসোমেট্রিক ব্যায়ামের সাহায্য নিয়েছে। কেউ টাইপরাইটারে হাত রেখে আঙুলে চাপ দিচ্ছে, কেউ হাত দিয়ে মাথা টিপছে। এই ধরণের আরও অনেক আইসোমেট্রিক ব্যায়াম আছে যা অন্যের অলক্ষ্যে দিব্যি করা যায় আর এতে তবিয়তও বেশ বহাল থাকে।

চিত্রে সংবাদ

মাসিক বসুমতী

॥ ভাদ্র, ১৩৭৬ ॥

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক
প্রচারিত গান্ধী স্মারক ডাকটিকিট

ইংল্যাণ্ডের ডাকঘরগুলিতে যে গান্ধী স্মারক ডাকটিকিট বিক্রয় হবে তার নক্সাসহ শিল্পী শ্রীবিমান
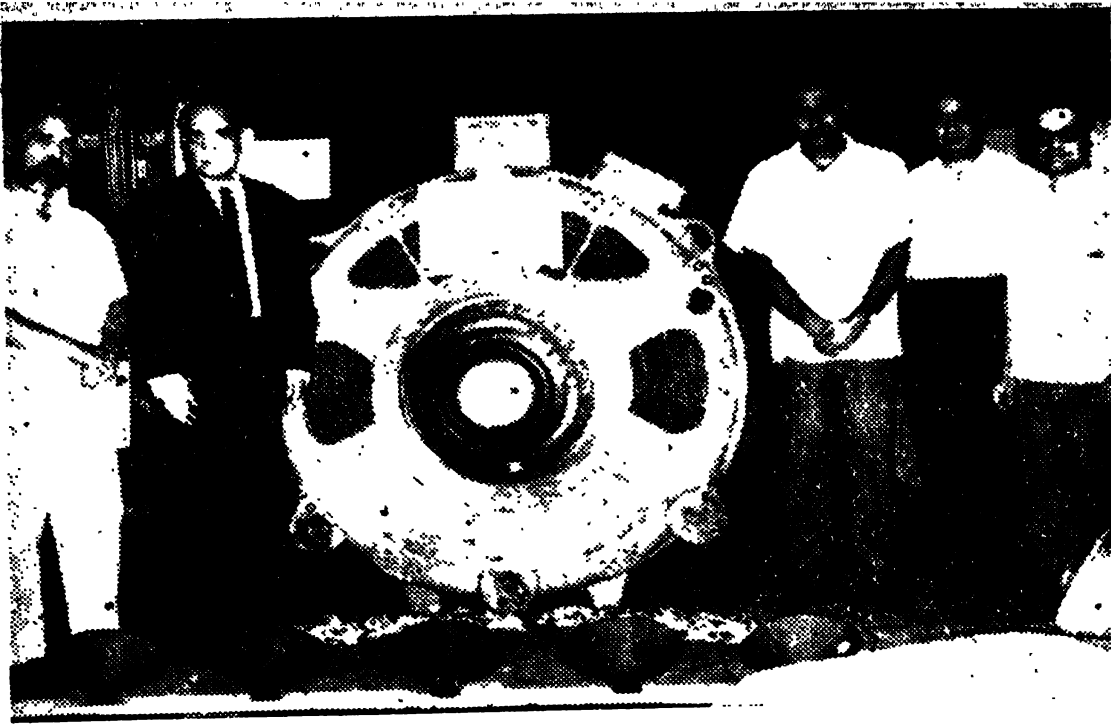
চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভ কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এইচ এম চ্যাটার্জী উক্ত কারখানায় নির্মিত ট্রাকশন মেশিন উপহার দেন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ডঃ জগজিৎ সিংকে

বেতন বোর্ডের রায় কার্যকরী করার দাবীতে কোলিয়ারী শ্রমিকেরা আসানসোলের রিজিওনাল লেবার কমিশনারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ জানান

হাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনারত কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন

নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

মেট্রোপলিটান বিল্ডিং-এ প্রদীপ জ্বালিয়ে কুটিরশিল্পের নতুন শো-রুমের উদ্বোধন করছেন প্রবীণ শিল্পী শ্রীবেগরাজ শাখ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ

বিধানসভার অধিবেশনে সংশোধিত বাজেট উপস্থাপিত করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও পরিষদ মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। স্পীকারের নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছেন বিরোধী নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়

বিলাতের চিঠি

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

শীতটা সবে একটু কমেছে। ইংল্যাণ্ডের গাছগুলিতে সবুজের ইসারা দেখা দিয়েছে। সেই সময় Isle of Man-এর বাহার নাকি অপূর্ব। গিয়েছিলাম সেখানেই মিঃ ও মিসেস ক্লার্কের কাছে বেড়াতে। ভদ্রলোক ফার্মের ব্যবসা করেন, নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রী ঐখানকারই কেশসজ্জা-কারিণী। ভদ্রলোকের বহু দিনের নিমন্ত্রণের সাড়া দেবার এটাই সবচেয়ে ভাল সময় ভেবে তৈরী হয়ে নিলাম। ইংল্যাণ্ড থেকে Isle of Man প্লেন বা নৌকায় যাওয়া যায়।

যখন মিঃ ক্লার্কের কটেজের সামনে উপস্থিত হলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা কিন্তু সূর্যের আলো তখনও উঁকি মারছে। আলু, ফুলকপি, পেঁয়াজ ইত্যাদি নানারকমের তরিতরকারীর ক্ষেতের মাঝখানে সাদা রংয়ের 'ওয়েলকাম' লেখা কটেজটি যেন সত্যিই অতিথিদের স্বাগত করছে। ফার্মের খোঁয়াড়গুলোতে পালিত পশুরা ফিরে এসে বিশ্রাম করছে। ছোট ছোট বাঁশের পার্টিশন দেওয়া ঘরে আছে ভেড়া, শুয়োর, মুরগী আর হাঁস। বাইরে তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য দুটো শিকারী কুকুর জিভ বার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একটু দূরে আরও বড় আকারের খোঁয়াড় ঘরে অর্থাৎ গোয়ালে আছে গরুর দল। ভদ্রলোকের মতে তাঁর ফার্ম বেশী বড় নয়। কিন্তু আমাদের দেখে মনে হল ভারী সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে তিনি ফার্মটি গড়ে তুলেছেন।

মিঃ ও মিসেস ক্লার্কের কাছেই সন্ধ্যাবেলায় ডিনার-টেবিলে শুনলাম তাঁরা মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই 'কনটিনেণ্ট ট্যুরে' যাচ্ছেন। ঘুরবেন বেলজিয়াম, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। শুনেই বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে উঠল। আমাদেরও তো দেশে ফেরার সময় হল। ইচ্ছা তো সকলেরই হয় কিন্তু ক'জনের সম্ভব হয়। আজ আমাদের ভারতবর্ষ থেকে সোজা পথে ইচ্ছা করলেও ধনীলোকের পক্ষেও বিনা কারণে শুধু ছুটি কাটাবার জন্য কোন পাশ্চাত্ত্য দেশে ভ্রমণ সম্ভব নয়। তাই ইংল্যাণ্ডে বসে এ দেশগুলি না দেখেই দেশে ফিরে যাব—ভাবতেও খারাপ লাগে। তাই একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা

ভারতী মুখোপাধ্যায়

করলাম—আপনারা কী নিজেরাই যাচ্ছেন না কোন ট্র্যাভেল এজেন্সীর মাধ্যমে কোন কণ্ডাক্টেড ট্যুরের সঙ্গে যাচ্ছেন।

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন—'কসমস'।

ইংল্যাণ্ডে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে—যারা 'কনডাক্টেড ট্যুর'-এর মাধ্যমে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ ঘুরিয়ে দেয়। একজন অচেনা লোক—যে কোন দেশের ভাষা জানে না, পয়সা চেনে না, সহরের প্রত্যেকটি অলিগলি যাদের কাছে অচেনা তাদের পক্ষে এই ধরণের ট্যুর-এর স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বহু ভ্রমণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কসমস, কুক্‌স, গ্লোবাল, আমেরিকান এক্সপ্রেস ইত্যাদি।

তাই মিসেস ক্লার্ক যখন বলে উঠলেন, 'কস্‌মস্‌', তখন বুঝতে অসুবিধা হল না যে তাঁরাও এই 'কনডাক্টেড ট্যুর'-এর মাধ্যমেই যাচ্ছেন।

সময় বেশী দিন নয়, পনের দিন আর এতগুলি দেশ ঘোরাবে, দক্ষিণাও খুব বেশী নয়, দেড়শ পাউণ্ডেই আমার ও আমার স্বামীর হয়ে যাবে। নিজেকে আর সংবরণ করতে না পেরে বলে উঠলাম—আমরাও যদি তোমাদের সঙ্গ নিই? তাঁরা সাগ্রহে হৈ-হৈ করে উঠলেন—তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আমরাও তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারব ভারতের দেশগুলির সঙ্গে এ দেশগুলির তফাৎ কোথায়? কাম্বারল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েই তোমরা কোন ট্র্যাভেল এজেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো। তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

কাম্বারল্যাণ্ডে অর্থাৎ ওয়ার্কিংটনে ফিরেই খোঁজ নিলাম ভাল ট্র্যাভেল এজেণ্ট কে? এবং কোথায়ই বা তার অফিস?

আমার বন্ধু মার্গারেট সন্ধান দিল ফিঙ্কল স্ট্রীটে 'ডবলিউ স্যাণ্ডউইচ' কোম্পানীই এখন এই তল্লাটের সবচেয়ে ভাল ট্র্যাভেল এজেণ্ট। আমাদের দেশের সঙ্গে এদেশের একটা তফাৎ লক্ষ্য করেছি যে এরা ছোটবড় যে-কোন জায়গাতেই বেড়াতে বা কোন দরকারে যাক না কেন, সব সময় ট্র্যাভেল এজেন্সীর স্মরণাপন্ন হয়। আমাদের দেশের মত ট্রেনের সীট রিজার্ভ করার জন্য ভোর চারটে থেকে লাইন দেবার দরকার হয় না। ট্র্যাভেল এজেণ্ট কোন অতিরিক্ত পয়সাও দাবী করে না। টিকিটের মধ্য থেকেই নিজেদের লভ্যাংশ কেটে নেয়।

একদিন সময়-সুযোগ বুঝে উপস্থিত হলাম 'ডবলিউ স্যাণ্ডউইচ' কোম্পানীতে। 'ক্যান আই হেল্‌প ইউ' বলে সুশ্রী একটি মহিলা এগিয়ে এলেন—তাঁকে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলাতে তিনি বলে উঠলেন: শুধু 'কস্‌মস্‌' কেন, বহু কোম্পানীই তো মে মাসের প্রথম সপ্তাহ

দিকে ট্যুর ছাড়ছে—তুমি তো সবগুলিরই পরিকল্পনা পড়ে ভেবে দেখতে পার কোনটাতে যাবে—বলেই একগাদা বই আমাকে এগিয়ে দিলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে বইগুলি তুলে নিয়ে চলে এলাম বাড়ীতে ওনার সঙ্গে পরামর্শের জন্য।

আমি আগেই যে কোম্পানীগুলির উল্লেখ করেছি এগুলি তাদেরই বই অর্থাৎ তারা কোন তারিখে কোন কোন দেশের উদ্দেশ্যে ট্যুর ছাড়ছে ইত্যাদির তালিকা। ট্যুর অনুযায়ী দক্ষিণা ও কতদিন লাগবে এবং কোথায় কোথায় বেড়ান হবে ইত্যাদির সমস্ত বিবরণ ম্যাপ ও ছবি দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া।

আমরা সমস্ত দেখলাম—একমাত্র কস্মস্ কোম্পানীর এই ট্যুরটির সঙ্গেই আমাদের ইচ্ছা যেন মিলল। পনের দিনে আটটি দেশ দেখিয়ে দেওয়া আর কেউই করছে না। জানি ট্যুরটা খুবই ম্যারাথন ট্যুর হয়ে যাবে কিন্তু বেশী সময় দেওয়া নানা কারণেই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিনই বিকালে মিঃ ও মিসেস ক্লার্ককে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম আমারাও তোমাদের সঙ্গ নিচ্ছি।

●

এরপর চলল নানা রকমের তোড়-জোড়—যদিও সবই স্যাণ্ডুইচ কোম্পানী ব্যবস্থা করতে লাগলেন কিন্তু আমাদের অর্থাৎ যারা ভারতীয় নাগরিক তাদের ইউরোপের যে-কোন দেশ একমাত্র জার্মানী বাদে দেখতে হলে যে ভিসার প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়। কাজেই বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ইটালী, সুইজারলাণ্ড এবং ফ্রান্স এই পাঁচটি দূতাবাসে চিঠি লিখে প্রথমেই ভিসা-ফর্ম আনাতে হল। প্রত্যেকেই মাথাপিছু কমবেশী দক্ষিণা নিয়ে তবেই নিজেদের দেশে ঢুকতে দেয়। যাই হোক, এগুলি করতে একমাসের বেশী সময় লাগেনি।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় দূতাবাস সম্বন্ধে একটি কথা না বলে পারছি না—তা হল তাদের অলসতা আর সামান্য কাজের জন্য প্রচুর সময় নেওয়া। কোন দেশে ঢোকার জন্য ভিসা করাতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন নিজের দেশ থেকে তার জন্য অনুমতি চাওয়া। আমাদের পাশপোর্টে বেলজিয়াম ও অস্টিয়া এ দুটি দেশের 'এনডোর্সমেণ্ট' ছিল না। তার জন্য লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে চিঠি লেখাতে তাঁরা ফর্ম পাঠিয়ে দিলেন এবং ফর্ম সহ পাশপোর্ট ও কিছু দক্ষিণা পাঠিয়ে দিতে বললেন।

আমরা পূর্বে বহু লোকের মুখে শুনেছিলাম ভারতীয় হাই কমিশন সম্বন্ধে নানা সমালোচনা। তার প্রমাণ এইবার পেয়ে গেলাম। ৫ই মার্চ আমরা পাশপোর্ট সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পোস্ট করেছিলাম আর তিনবার ট্রাঙ্ককলের পর পাশপোর্টে ঐ দুটি দেশের নাম 'এনডোর্স্ড' করিয়ে তারা ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন ২৮শে মার্চ।

প্রায় এক মাস। আমাদের ব্যস্ত হবার কারণ ছিল—ট্যুরের জন্য হাতে মাত্র একমাস বাকি, এপ্রিল মাসটা। তার মধ্যে পাঁচটি দেশের ভিসা করাতে হবে পোস্টের মাধ্যমে। তাই আমরা যখন কুড়ি দিন দেরী দেখে দুবার ট্রাঙ্ককল করেও কিছু করে উঠতে পারলাম না, তখন ট্র্যাভেল এজেণ্ট আমাদের হয়ে ফোন করে কিছু কড়া কথা শোনানর পর ঠিক কাজ হল।

পঁচিশ দিন পর পাশপোর্ট ফেরৎ এল। আমি ভারতীয় হাই কমিশনের সমালোচনা করার জন্য এ লেখা লিখতে বসিনি কিন্তু এই ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, মাত্র পনের দিনে পোস্টের মাধ্যমে আমাদের পাঁচটি দেশের ভিসা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভারতের মত এত বড় একটি দেশের হাই কমিশন, যেখানে বহু লোক পরিশ্রম করছে, সেখানে পাশপোর্টে দুটি নাম বসাতে তাদের একমাস লেগে যায়।

যাই হোক, এবার ট্যুরের কথায় চলে আসা যাক। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে নির্দিষ্ট দিনে আমরা উপস্থিত হলাম। মাথাপিছু একটি করে সুটকেশ ও হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে। কস্মস্ কোম্পানীর কোরিয়ার দাঁড়িয়ে আছেন—আরও বহু যাত্রী উপস্থিত। সেখানেই আলাপ হল মিঃ ও মিসেস ইসমাইলের সঙ্গে। ভদ্রলোক অসমীয়া—এদেশে পরিবহন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ট্রেনিং নিতে এসেছেন, ছেলেমেয়েকে আসামে রেখে এসেছেন আরও আলাপ হল দুটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে, তারাও স্কলারশিপ নিয়ে এদেশে এসেছে রিসার্চের জন্য।

সকলে মিলে ট্রেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ডোভার থেকে বোটে করে যেতে হবে বেলজিয়ামের অসটেনডে। সেখান থেকে আমাদের বাস ছাড়বে। ট্রেনে বিশেষ কারুর সঙ্গে আলাপ হল না তবে দেখলাম বিভিন্ন দেশ থেকে যাত্রী এসেছেন—আমাদের সঙ্গে আছেন এক নিগ্রো-দম্পতি, দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ইংরাজ মেয়ে, অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা সব দেশের প্রতিনিধিই আছেন। আর ভারতের প্রতিনিধিটি তো আমরা দু'জন—পূর্বেই যাঁদের উল্লেখ করেছি।

বেলজিয়ামের অসটেনড একটি বন্দর ছোট পরিচ্ছন্ন একটি শহর। আমাদের কোচ কোরিয়ারের মতে অসটেনড আর ইটালীর সেরানো এ দুটি শহর হল ট্যুরিস্টদের বাজার করার সবচেয়ে ভাল জায়গা, কারণ এ দুটি শহরে ট্যুরিস্টরা কম আসে। সে কারণে দাম সস্তা।

যাই হোক, বিকাল পাঁচটায় আমরা অসটেণ্ড পৌঁছুলাম তাই দাম পরখ করার সুযোগ আর ঘটল না। বাস ছাড়ার আগে কোচ কোরিয়ার মিঃ স্যাটি উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করলেন—ভদ্রলোক খুব রসিক। বললেন আমি স্যাটি কতটা স্মার্ট তার পরিচয় তোমরা পাবে আর এই হচ্ছে লুসিয়ান। আমাদের বেলজিয়াম ড্রাইভার, শত-র মধ্যে এক এমনটি মিলবে না।

যাই হোক, বেশ হাস্য-পরিহাসের মধ্যে আমাদের বিরাট বাস কোচ ৫৬ জন যাত্রী নিয়ে চলল। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলসের উদ্দেশ্যে

বেলজিয়ামের প্রথম মোটর ওয়ে যেটা ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে বেলজিয়ামের বিশ্ব-মেলার জন্য তৈরী হয়েছিল সেই বিস্তৃত রাজপথ ধরে। সুরু হল কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণের ডায়েরী—

পথে যেতে যেতেই বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপে এগিয়ে এলেন, আমরাও তাঁদের সঙ্গে ভাব জমাতে দেরী করলাম না। সে লোকচরিত্রের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমাদের সঙ্গে আছে উদ্ভিন্নযৌবনা আমেরিকান মেয়ে লসি, দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা মেয়ে জয়েস আর এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে স্কটিশ মেয়ে রীটা—তিনজনেই প্রায় এক বয়সী। নিজেদের আলোচনা আর হাসাহাসিতেই তারা ব্যস্ত, অন্য কারুর দিকে তাকাবার অবসর নেই—

আমাদের পাশেই স্টীভেনসন্স, সে কারুর সঙ্গে কথাও বলে না—অদ্ভুত ছেলে। সবে পড়াশুনা শেষ করে বেরিয়েছে দেশ দেখতে—চুপচাপ বসে হাসে। নাচের আসরেও সে নীরব। আমাদের সামনে মিঃ ও মিসেস ক্রো—ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে ঘুরতে বেরিয়েছেন। আরও আছেন কতকগুলি বৃদ্ধা মহিলা—সংসারের পাট সমাপ্ত করে স্বামী ছেলে মেয়েকে ঘরে রেখে দল বেঁধে বেরিয়েছেন। আমাদের দেশের সাধারণ সংসারের নারী যারা চিরকালই সংসার করে গেলেন, বয়সকালে হয়তো খবরের কাগজে কুণ্ডু কোম্পানীর ভারততীর্থ ভ্রমণের বিজ্ঞাপন দেখে হাতা খুন্তি ছেড়ে সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়েন। সেই রকমই এ দেশের বৃদ্ধবৃদ্ধারা যাদের একক জীবনের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়—কারণ আমাদের দেশের যৌথ পরিবারের মত ছেলে, বউ, শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকা ভাবতেও পারে না, রোজগারের টাকা জমিয়ে বছরে বছরে তারাও ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। সেই রকমই আমাদের দলে আছেন মিসেস ফার্গুসন, মিসেস চিংহাম আর মিসেস শ'।

যাই হোক, এবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের কথায় চলে আসি। সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত এই শহরটির সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের এক বিরাট শহর বলে পরিগণিত হয়। ইউরোপের শিল্পজগতে এর দান কম নয়—এখান থেকেই শিল্পী রুবেন তাঁর যাদু তুলি বুলিয়ে ইউরোপের পেণ্টিং শিল্পকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন। ব্রাসেলসে বেশীক্ষণ আমরা ছিলাম না তাই জনসাধারণের মনোভাব কেমন, তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারছি না, কিন্তু মিঃ স্মার্ট, আমাদের কোচ কোরিয়ার বললেন দুটি মহাযুদ্ধেই ব্রাসেলস জার্মানীর অন্তর্গত ছিল আর জার্মানীদের মতে সাধারণ জনসাধারণ নাকি অত্যন্ত সহযোগিতা সম্পন্ন।

যাই হোক, ব্রাসেলসে যখন আমরা পৌঁছুলাম রাত তখন প্রায় ন'টা। আমরা উঠলাম হোটেল দুদ ব্রাবাণ্ট। নামটা খুব হিজিবিজি—সেটা খুব স্বাভাবিক। একজন বেলজিয়ানও বউবাজারের বঙ্গলক্ষ্মী হোটেল নাম উচ্চারণ করতে হিমসিম খেয়ে যাবে। কণ্টিনেণ্ট বেড়িয়ে আমাদের সব থেকে যেটা অসুবিধা হয়েছে তা হোল ভাষা—জার্মান ভাষা জানা থাকলে তবু কিছু না-কিছু ভাবে কাজ চালান যায় কিন্তু ইংরাজী ভাষা সব দেশেই প্রায় অচল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ইংল্যাণ্ড থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে আমরা ছোটবেলা থেকে ইংরাজী শিখছি আর ইংল্যাণ্ডের পাশের দেশগুলি ইংরাজীর 'ই' জানে না।

হোটেলটি অবশ্য চমৎকার। ছোট ঘরের মধ্যে 'শাওয়ার'সহ সমস্ত ব্যবস্থা করা। কনটিনেণ্টের আর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু বিছানা—এক এক দেশে এক এক রকম বিছানা দেখলাম। আমাদের দেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রথম এলে বিছানা নতুন লাগে। ইংল্যাণ্ডে লেপ কেউ গায়ে দেয় না। ঠাণ্ডা অনুসারে চার-পাঁচটি কম্বল এক করে বিছানার গদির সঙ্গেই গোঁজা—উপরের বেডকভার সরিয়ে কম্বলগুলি সামান্য বে'র করে তার মধ্যে ঢুকে পড়া। গল্প শুনেছি গান্ধীজী নাকি প্রথম বিলাতে এসে চাদর খুঁজে তার মধ্যে ঢুকে পড়তে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন—সেইরকম দেখলাম বেলজিয়ামে, কম্বল ইংল্যাণ্ডের মতই গোঁজা-বালিশটা এক বিরাট চৌকির মত বিছানার অর্ধেক জুড়ে পড়ে আছে। তাকে দু'পালটা করে আমরা শুলাম। জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডে দেখলাম কম্বলের উপর চৌকো আকারের একটা বিকট মোটা লেপ পড়ে রয়েছে—তুলে নিয়ে গায়ে দাও। প্যারিসে আবার মাথার বালিস চৌকো নয়, পাশবালিসের মত সরু গোল লম্বা আকারের। এদেশের কোথাওই পাশবালিসের চিহ্ন দেখলাম না। সে আবার যে কী হতভাগ্যরা তা জানে না।

ব্রাসেলসে রাত দশটা নাগাদ আমরা সহর দেখতে বেরুলাম, কারণ পরের দিন সকালে আমাদের লুক্সেমবার্গ চলে যেতে হবে। শহরটি বেশী বড় নয় কিন্তু অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। প্রথমেই গেলাম এ্যাটোনিয়াম দেখতে। ১৯৫৮তে ব্রাসেলসে যে বিশ্বমেলা হয়েছিল তার প্রধান আকর্ষণ ছিল এই এ্যাটোনিয়ম। এ্যাটম্ বম্ব-কে স্মরণীয় করার জন্য বিরাট আকারের আটটি বল দিয়ে লোহার ফ্রেমে এক স্মারকস্তম্ভ রাতে আলোর মালা দিয়ে সাজান এই এ্যাটোনিয়াম অপূর্ব—লিফটে করে সবচেয়ে উঁচু বলটিতে উঠে যাওয়া যায়। সেখানে একটি রেস্তোরাঁও আছে তবে তার খাদ্যমূল্য সাধারণের হাতের বাইরে। এ্যাটোনিয়ামের পাশেই বিরাট এক সিমেণ্টের রকেট করা—পৃথিবীর প্রথম রকেটকে স্মরণীয় করার জন্য। তবে এর গায়ে আলো নেই, তাই ভাল দেখতে পেলাম না।

ক্রমশ আমরা বেলজিয়ামের সার্বভৌম রাজার অট্টালিকা ও উদ্যানের ধার দিয়ে চলে গেলাম 'গ্র্যাণ্ড প্লেসে—এটা ব্রাসেলসের মার্কেট স্কোয়ার। জায়গাটি শহরের

অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক নীচু আর তার চারধার বিশাল বিশাল মধ্য-যুগীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনে ভরা অট্টালিকা দিয়ে আবৃত। তার মধ্যে একটি বাড়ীর বারান্দার ছাদ নাকি চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরী। যুগের বিবর্তনে তার রং অনেক মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও কাশী বিশ্বেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়ার মত তা ঝকঝক করে চলেছে। সেখানেই আর একটি প্রাসাদ দেখলাম, তার সর্বোচ্চ গম্বুজটি ৩৬৫ ফিট উঁচু। কথিত আছে শিল্পী নাকি প্রাসাদের প্রত্যেকটি পুতুল, গম্বুজ আর খিলান অঙ্কের মাপে কষে তৈরী করেছিলেন যাতে প্রধান প্রবেশপথের দরজার দুটি পাল্লা ঠিক মাঝখানে হয় কিন্তু সামান্য ত্রুটিতে তা হয়নি। সেই পরাজয়ের লাঞ্ছনায় তিনি ৩৬৫ ফিট উঁচু গম্বুজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

বেলজিয়ামের স্থাপত্য শিল্পের মত লেসশিল্পও নাকি জগদ্বিখ্যাত। মার্কেট স্কোয়ারের পাশেই দোকানগুলির শো-কেশে থরে থরে তার নিদর্শন সাজান —ছুটলাম দেখতে। বেলজিয়ান মেয়েরা নাকি দিনের পর দিন পরিশ্রম করে লেসের এই কভার, (আমাদের দেশের খুঞ্চেপোষ) ছোট থেকে বড় নানা রকমের পুতুলের পোষাক, এমন কি লেসের অলঙ্কারও তৈরী করেন। নানা রকম সুতার মিশ্রণে অপূর্ব এই শিল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব খুঁটিয়ে দেখতে পেলাম না—বেজে উঠল বাসের হর্ন—ছুটলাম। নির্দিষ্ট সময় না মেনে চললে এতটুকু সময়ে সব দেখা সম্ভব হবে না।

আমাদের ড্রাইভার মুমিয়ানের দেশ এই ব্রাসেলস। তাই সে উৎসাহ সহকারে সহরটির প্রতিটি রাস্তায় একটু বেশী সময় দিয়েই আমাদের ঘোরাতে লাগল। দেখলাম ট্রাম চলেছে—তবে কলকাতার ট্রামের মত অত সুন্দর নয়। আকারে অনেক ছোট—মাথায় ইলেকট্রিক দণ্ডটি লম্বা নয়, চৌকা। ট্রামগুলি দেখতে অনেকটা হাওড়া শিবপুর অঞ্চলে যে ট্রাম চলে সেই ধরণের।

ফিরে এলাম হোটেলে। কাল সকাল সাতটায় লুক্সেমবার্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। লুক্সেমবার্গে লাঞ্চ সেরে সেদিনই ফ্রান্সের সীমানা দিয়ে আমাদের জার্মানী চলে যেতে হবে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে ছোট ছোট দেশগুলি—একদিনেই যেখানে তিনটি দেশ পার হয়ে যাচ্ছি, কি ভাবে নিজেদের ভাষা, চালচলন, রীতিনীতি, স্বতন্ত্র মুদ্রামান নিয়ে টিঁকে রয়েছে। আমাদের বোম্বাই থেকে কলকাতা যেতেই দুদিন লেগে যায়। এত বড় ভারতের কাছে তো এরা কিছুই নয়, তবু কিভাবে উন্নতি করে চলেছে।

ঝাড়গ্রামের কমলা

সাধারণ ধারণা এই যে, পশ্চিমবঙ্গে কমলালেবু জন্মায় না; অর্থাৎ সমতল ভূমিতে হয় না। দার্জিলিঙে হয়, কিন্তু দার্জিলিঙ পার্বত্য জেলা এবং ওখানকার লেবু দার্জিলিঙের লেবু বলিয়া খ্যাত। পশ্চিমবঙ্গে আর কমলালেবু হয় বলিয়া জানা নাই। আমি আপনাদের গোচরে এক জাতীয় লেবুর বিবরণ রাখিতেছি; আমার বিশ্বাস বিচার করিলে আপনারা ইহাকে কমলাই বলিবেন। ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা। এই মহকুমা এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে, শরৎ ও শীতকালে হাটে বাজারে এক রকম লেবু পাওয়া যায়; ইহাকে জামির বলে। এই লেবুর চাষ হয় না। লোকের বাড়িতে অযত্নে পালিত ২।১টি গাছ থাকে মাত্র। বীজ হইতে চারা হয়। কেহ কলম করে না। গাছ দেখিতে নাগপুর কমলার বীজের চারার মত তবে কাঁটা আরও স্থূল ও দীর্ঘ। গাছ ১০।১২ ফুট উচ্চ। ফল গোলাকার তবে বোঁটা সাধারণত একটু উঁচু হয়। খোসা নাতিস্থূল। সুপক্ক ফলে খোসা ঢিলা অর্থাৎ কোষ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন (সিলেট বা নাগপুরের কমলার মত Mandarin type) সুপুষ্ট ফলের ওজন ৩।৪ ছটাক। ফল পাকিলে রং জাতিভেদে পীত ও লালের নানা অনুপাতের মিশ্রণ। সুগন্ধি। পাকিলে কোষগুলি পৃথক করা যায়। দোষের মধ্যে এই লেবুর অম্লত্ব কিছু বেশী এবং এই জন্যই ইহার আদর নাই। সে যাহা হউক আমি ইহাকে কমলার সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করি এবং বোধহয় "ঝাড়গ্রামের কমলা" ইহার উপযুক্ত নাম।

পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ

'যে মা আর বারংবার ডাকিস তোরা ভাই,
মায়ের কোল ছেড়ে কেমনে যাই।
যায় যে বেলা আর করবো না খেলা
বুঝি সাঙ্গ হলো, বঙ্গভূমির শ্রীরাস-লীলা।

আমি মা পেয়েছি মা'র হয়েছি
আমাতে আর আমি নাই।

গানটি ভক্তিমূলক। ঐকান্তিক আকুলতায় ভরপুর। রচয়িতার অন্তর উজাড় করা আকৃতি ক'টি পংক্তির মাধ্যমে একটি নিটোল সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করে নিরবচ্ছিন্ন কালের অবিরাম ধারায় ভক্তিরসপিপাসুর চিত্ত প্লাবিত করে তুলেছে।

কিন্তু শুধু অন্তর উজাড় করা এক ঐকান্তিক আকুলতাই কি এই গানটির বৈশিষ্ট্য? না---এক অপূর্ব সমন্বয়ের সুর এই গানের মুখ্য সম্পদ।

শক্তিবাদ ও বৈষ্ণববাদকে দুটি রেখা থেকে যেন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এই গানের মাধ্যমে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বরের যাঁরা মানসপুত্র তাঁরা সমন্বয়ের বাণীই প্রচার করে থাকেন। সমন্বয়ের সূত্রেই মানুষকে গ্রথিত করে সেই পরমের পথে তাদের পরিচালিত করার ব্রত গ্রহণ করেন। অসংখ্য মত অগণিত পথের ভিতরে সেই 'এক' এরই ইঙ্গিত দেখতে পান।

জীবনের চলার পথে আনন্দের মেলায় দুঃখের মিছিলে হাসির ফাল্গুনে কান্নার শ্রাবণে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাঁরা দেখতে পান সেই পরমের সেই পরম সত্য শাশ্বত ও সুন্দরের অনুপম চরণস্পর্শ, শুনতে পান নিরুপম পদধ্বনি। সাধক পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ এঁদেরই একজন। উপরিধৃত সঙ্গীতাংশটির জন্ম তাঁরই লেখনী থেকে।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনা ও ধর্মীয় প্রচারের ইতিহাসে যে অসংখ্য নাম লিপিবদ্ধ আছে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ সেই তালিকায় মহিমান্বিত দীপ্তিতে বিরাজিত, সত্য, শিব, সুন্দরের আলোক-রশ্মিতে উদ্দীপ্ত। মহাকালের ভীষণ ভয়াল ভ্রূকুটি অনায়াসে উপেক্ষাকারী এক শাশ্বত নাম। গত শতাব্দীতে পবিত্র ভারত ভূমির উপর ধর্মান্দোলনের ধর্মসংস্কারের এবং ধর্ম প্রচারণার যে বন্যা নেমে এসেছিল, কৃষ্ণানন্দ সেই বন্যার একটি উল্লেখ-যোগ্য ধারা, এক তীব্র গতিবেগ।

নব্যভারতের ধর্মসমাজে ধর্ম সম্বন্ধে

জর্জ এ্যালেন

যে ব্যাপক নবজাগরণের জোয়ার এল ইনি তারই এক স্মরণীয় অগ্রদূত। প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়, প্রাণস্পর্শী বিশ্লেষণের মাধ্যমে পথভ্রান্ত দিশাহারা মানুষকে ধর্মমুখীন করে তোলার ক্ষেত্রে, যথার্থ প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে ধর্ম-চেতনার বীজ বপন করার ক্ষেত্রে এবং সমগ্র দেশে ধর্মের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধর্ম-নায়ক বা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মের এই মহান ভাষ্যকারের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে অনেক জটিলতা ছিল সে সম্বন্ধে মন ছিল অনেক সংশয়ে আর জিজ্ঞাসায় ভরা---মনের সেই জটিল পরিবেশকে গ্রন্থিমুক্ত, গ্লানিমুক্ত, তমসামুক্ত করান বহুলাংশে সম্ভবপর হয়েছে কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ মহান পুরুষদের উদ্যোগে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে পশ্চিম বাঙ্গলার গুপ্তিপাড়া গ্রাম। এ দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের গর্ব ও গৌরব বিবর্ধনের ক্ষেত্রে গুপ্তিপাড়ার অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই গুপ্তিপাড়ারই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান কৃষ্ণানন্দ। উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে তাঁর জন্ম। জন্মসাল ১৮৪৯। তের বছর আগে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে নরদেহে অবতরণ করেছেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সিমুলিয়া অঞ্চলে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে শৌর্যবীর্যের সংহতি সাধনের মহান নায়ক বিবেকানন্দের আবির্ভাবের তখনও চোদ্দ বছর বাকী।

সংসার-জীবনে নাম ছিল কৃষ্ণপ্রসন্ন। বাবা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ছিলেন একজন প্রবীণ চিকিৎসক। মায়ের নাম ছিল ভবসুন্দরী। অনেকের মত একেবারে নিছক বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখা যায় নি বা তাঁর ভিতর কোন অসাধারণত্বের প্রকাশও পরিলক্ষিত হয় নি। সংসার-তরণী তাঁদের নিরুপদ্রব গতিতে এগিয়ে চলে নি, সেই তরণী পরিচালিত করতে হয়েছে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাধার পাহাড় অতিক্রম করে। নিদারুণ অভাব সমগ্র সংসারটিকে ক্ষতবিক্ষত জর্জরিত করে তুলেছিল। এক ঘোর দুর্যোগের কালোমেঘ ঘনীভূত হয়ে এ সংসারে বর্ষণ করে চলেছে অবিরামধারায় অশান্তি আর দুশ্চিন্তা।

আঠারো-উনিশ বছর বয়সেই ছাড়তে হল পড়াশুনা, উপায় কি? পড়ার খরচ জোগাবারও সঙ্গতি নেই। একদিকে সংসারের এই অচলাবস্থা আর একদিকে অন্তরলোকে সেই অজানার হাতছানি---এই দুয়ের মাঝখানে কৃষ্ণপ্রসন্ন কিন্তু একবারও দিশেহারা হন নি, মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হন নি, কোন পরিবেশই তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। এরই মধ্যে জীবিকার

তাড়নায় তাঁকে অর্থোপার্জনও করতে হয়েছে চাকরীর মাধ্যমে আবার তারই ফাঁকে বচনা করে চলেছেন প্রচুর আধ্যাত্মিক কবিতা—যার উৎস অবর্ণনীয় এক অনুভূতি, যার উৎস এক অবিরাম আনন্দধারা।

চাকরি নিয়েছিলেন জামালপুরে রেলবিভাগে। অফিসে সরকারী কাজ আর বাড়ীতে চলতে থাকে শাস্ত্রপাঠ ও নানা শাস্ত্রের পুঙখানুপুঙখ অধ্যয়ন। ভিতরে ভিতরে প্রায়ই এক আলোড়ন বইছে। সুপ্ত সাধকসত্তা, মুক্ত-আত্মা মাঝে মাঝে ক্ষণিকের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠছে। মধ্যে মধ্যে চেতনায় ঘা মারছে।

১৮৬৯ সালের কথা। অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক শতবর্ষ পূর্বের ঘটনা। ডিসেম্বর মাস। মুঙ্গেরের গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীর মেলায় বিধাতা-পুরুষের নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত গুরুর দর্শন পেয়ে গেলেন উৎকণ্ঠিত শিষ্য। সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছা অনুযায়ী মুঙ্গেরের গঙ্গার ঘাটই যেন চিহ্নিত করে রাখা ছিল গুরু আর শিষ্যের প্রথম মিলন কেন্দ্র হিসাবে, সেদিন সারা ভারতে উচ্চকোটির সাধক সমাজে এক মহান প্রতিভূ ছিলেন দয়ালদাস। মহাযোগী হিসাবে সমগ্র ভারতের সাধকসমাজে তার অটল প্রতিষ্ঠা। দয়ালদাস শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন কৃষ্ণপ্রসন্নকে—নবজন্ম হল কৃষ্ণপ্রসন্নের। তারপর দীর্ঘ একুশ বছর ধরে সাধনার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটল কৃষ্ণানন্দে। কৃষ্ণের চিন্তাই যাঁর আনন্দ, কৃষ্ণের ধ্যান যাঁর জীবন, কৃষ্ণের চরণ যাঁর উপাস্য তিনিই কৃষ্ণানন্দ। যাঁর নয়নে কৃষ্ণ, স্বপনে কৃষ্ণ, ধেয়ানে কৃষ্ণ, মননে কৃষ্ণ, চিন্তনে কৃষ্ণ—তিনি ছাড়া কৃষ্ণানন্দ আর কে?

গুরুর নির্দেশে শিষ্য কাজ সুরু করলেন, শুধু নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাঁর নীতি ছিল না। অধ্যাত্মবাদ প্রচারের দ্বারা লোককল্যাণ হল তাঁর জীবনের ব্রত। সাধারণ মানুষের ভিতর ধর্ম সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা এনে দিয়ে তাকে ধর্মমুখীন করে ভ্রান্ত দিশাহারা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা তখনই সম্ভবপর হবে।

মেতে উঠলেন ধর্মান্দোলনে। ধর্ম সম্বন্ধে প্রচার, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের ভিতর সারা দেশের ধর্মচেতনার এক নতুন রূপ এনে দিলেন মানুষের মনে, এক বিরাট প্রভাবের ছায়াপাত ঘটালেন—অনুভূতির একটি স্নিগ্ধ সুর ভরিয়ে তুলল মানুষের মরুমন।

১৮৭৮ সালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় পুনর্বার গুরুর দর্শন পেলেন। এই ক'বছরে গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে নি। চাকরী অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। মহাতীর্থ বারাণসীতে বসতি স্থাপন করলেন। পুণ্যভূমি বারাণসী হল তাঁর জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র। আমাদের সনাতন ও শাশ্বত ধর্মের পুনঃপ্রাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে গঠিত তাঁর আর্যধর্ম প্রচারণী সভার ধর্মাচার্যরূপে তিনি বরণ করলেন পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণিকে। এ ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা পেলেন মনীষী শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছ থেকেও।

একের পর এক প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং মনীষার অধিকারী সুধীবৃন্দকে কৃষ্ণানন্দ একটি পতাকাতলে সম্মিলিত করলেন—এই সম্মেলনের ফলে যে ধর্মচেতনার এক পুণ্যধারা নামল তা ধুয়ে মুছে দিল যত গ্লানি, অসুন্দর এবং কদর্যতা, সেই সঙ্গে যা কিছু জটিলতা, সংশয় ও অস্পষ্টতাকে। এক নতুন ধর্মদিগন্তের দিকে দিকনির্দেশ করলেন কৃষ্ণানন্দ তাঁর প্রচারণা এবং ধর্মীয় সংগঠন শক্তির মধ্যে দিয়ে। ধীরে ধীরে তাঁর বাণী তাঁর ভাবধারা তাঁর ধর্মানুরক্তি সারা ভারতের হৃৎপদ্ম অধিকার করতে সমর্থ হল।

কলকাতায় এলেন কৃষ্ণানন্দ। নররূপী নারায়ণ ভগবান পরমভট্টারক পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ দর্শন করলেন। বাঙলা দেশের ইংরাজী শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজে ঠাকুরের বাণীদূতের ভূমিকায় যেমন দেখা গিয়েছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে তেমনই সারা উত্তর ভারতে ঠাকুরের দিব্য মহিমার পুণ্যকাহিনী ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণানন্দ তাঁর 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকাটির মাধ্যমে। ঠাকুরের উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করেছেন তা অপূর্ব, তাঁর লেখনিতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিশ্লেষণের আলোয় ঠাকুরের করুণাঘন মূর্তিটি এক অপরূপ দিব্যবিভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তাঁর বর্ণনায়—"যাঁর বাবা পাগল—মা যাঁর পাগলিনী (শিব এবং কালীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন) তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের খেলা, পাগলের হাটবাজার পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যে-কোন গ্রাহক যাউক-না-কেন সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল—ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস।"

১৮৯১ সালে সরকারী নীতির প্রতিবাদে কলকাতার গড়ের মাঠে যে অতুলনীয় ওজস্বিনী বক্তৃতাশক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তা মন্ত্রমুগ্ধ করে অদ্ভুতভাবে প্রভাবান্বিত করে বাঙলার জনগণকে। তাঁর সেই দিক দিগন্তনিনাদী বজ্রনির্ঘোষ সেদিনকার প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশসিংহের ললাটেও দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলেছিল।

কাশীর যোগাশ্রমে অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন কৃষ্ণানন্দ। জাগ্রত দেবী হিসাবে এই মূর্তির মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ল সর্বসাধারণ্যে। দলে দলে লোক আসে, কত দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মায়ের কৃপায় মানুষ মুক্তি পায়, কত জটিলতার জাল থেকে মায়ের করুণা মানুষকে মুক্ত করে আনে।

অপরের জন্যে মায়ের কাছে দরবার করতে কৃষ্ণানন্দ সকল সময়েই এগিয়ে আছেন। কিন্তু নিজের জন্যে নয়। নিজের জন্যে যেন কোন চিন্তাই তাঁর নেই। নিজেকে পরিপূর্ণরূপে মায়ের

কাছে সঁপে দিয়েছেন সুতরাং তাঁর চিন্তা—মায়ের। একজন বক্তে তো একদিন প্রকাশ্যে বলেই দিলেন—দেহ অসুস্থ হলেই কি বুঝতে হবে মায়ের কৃপা কমে গেল? দেহের পরিণতি ক্ষয়, দেহের ধর্ম ব্যাধি—এই ভবিতব্য অখণ্ডনীয়, তা হলে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী শরীর যেদিন চলে যাবে, সেদিন কি বুঝতে হবে যে মায়ের কৃপা তাঁর সন্তান থেকে তিনি ফিরিয়ে নিলেন? ১৮৮৪ সালে মাতৃদেবীর কাছে প্রাপ্তি হল।

মাঝে মাঝে গুরু আসেন। কৃপা করে দর্শন দেন। আবার চলে যান। মন্দিরে এসেই একদিন দয়ালদাস বলে উঠলেন—'এ যে মহাতীর্থ, দেবী এখানে জাগ্রত।'

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। জীবননদী সমাপ্তির সাগরের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যায়। মায়ের চরণে লীন হওয়ার পূর্ণ মুহূর্তটি দেখতে দেখতে এসে গেল। ১৩০৯ সালের ৩রা আশ্বিন (১৯০২ সাল) এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক, ধর্মীয় সংগঠনকারী, ধর্মপ্রবক্তা ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দের নশ্বর দেহলীলা সমাপ্ত হল।

বিশেষ উৎসবের পানীয় বিশেষ চা

আপনার চা পানোৎসবকে সফলতর করে তোলার জন্য বাজারে বহুবিধ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা পাতার সরবরাহ বর্তমান। সুরার মতই চা-ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পানীয়, আপনার কেক প্যাটিস, সিঙাড়া নিমকি প্রভৃতি জল খাবারের সঙ্গে ঠিক কি ধরণের চা'টি হলে জমবে একথা শুধু আপনিই বলতে পারেন আর কেউ না এবং ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ, এই আপ্ত-বাক্যটি স্মরণে রেখেই চা ব্যবসায়ীরা বহুবিধ ও বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চায়ের পসরা সাজিয়ে রেখেছেন আপনার জন্য।

নির্বাচন করে নিন নিজে, নিজের মনের মতনটিকে।

নীচে বিভিন্ন ধরণের চাপাতার পরিচয় দেওয়া হল।

দার্জিলিং এর চা স্বাদ ও গন্ধ বৈচিত্র্যে তুলনাহীন। বহু চা রসিকই এজন্য দার্জিলিংএ-র চাএর প্যাকেটটি হাতে পেলেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

আসামেও বহু চা-বাগান আছে, বিশেষ করে ডুয়ার্স অঞ্চলে, সারা দুনিয়ার চা-এর চাহিদা অনেকটাই মেটে আসামের চা থেকে।

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলের চা-বাগানগুলিও প্রসিদ্ধ এখানকার চা পাতার লিক্যর খুব ভালো হয়।

এছাড়া সিংহলের কয়েকটি জায়গায় চায়ের চাষ হয় নিয়মিত, প্রচুর চা বাগান আছে সিংহলের ডিম্বুলা, ক্যাণ্ডি, উভা প্রভৃতি স্থানে।

নানান অঞ্চলের চা বাগান থেকে থেকে আহৃত চা-পাতা বিশ্বের চা পিয়াসীর তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে নিয়মিত, বিভিন্ন ধরণের চা পাতার পসরা থেকে চা খোর নিজের পছন্দসই চাটিকে স্বচ্ছন্দে বেছে নিতে পারেন। এছাড়া আছে মিশ্রিত চায়ের উপচার, দুতিন রকমের চা পাতার মিশ্রণের ফলে পাওয়া যায় এই ব্লেণ্ড বা মিশ্রিত চা অনেকেই এই ধরণের চা পাতা ব্যবহার করেন।

চা প্রস্তুত করার নিয়ম কানুন যথাযথ ভাবে পালন করা উচিত, নাহলে চায়ের আস্বাদ ভাল হয় না।

পরিষ্কার টাটকা জল ঠিকমত ফুটলে তবেই তাতে চা পাতা ছাড়ুন, চাদানীটি আগে একটু গরম জলে ধুয়ে নিন, না হলে চা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

চামচে করে মেপে চা দিন চাদানীতে সচরাচর প্রতি কাপ-এর জন্য চায়ের চামচের এক চামচ চা-পাতা প্রয়োজনীয়, তবে ব্যক্তিগত রুচি ভেদে মাপেরও হের ফের করা যেতে পারে।

ফুটন্ত জলে চা পাতা ছেড়ে দিয়ে অন্তত তিনমিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর চামচ দিয়ে নেড়ে, পাত্রে পাত্রে পরিবেশন করুন দুধ ও চিনি মিশিয়ে।

চা পাতার পাত্রটি সর্বদা শুকনো জায়গায় রাখবেন, নাহলে ড্যাম্প লেগে চায়ের স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে।

পুলিৎজারের সাংবাদিকতা

সন্দীপ ঘোষাল

শুধু জীবিকা বা পেশার তাগিদে নয়—সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ এবং সুগভীর সহজাত আকর্ষণ যাঁদের পৃথিবীর দিকপাল সাংবাদিক হিসাবে একাধারে প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে বিপুল জনপ্রিয়তায় ভরপুর করে তুলেছে পুলিৎজার তাঁদেরই একজন। জগতের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বহু দিকপাল যুগস্রষ্টা সাংবাদিকের আবির্ভাব ঘটেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিৎজার এক অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যের একটি আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় নিদর্শন।

সাংবাদিকতা তার ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, সাধনা। মানুষটির চরিত্রে এমন কতকগুলো বিশেষত্ব ছিল যা অনেকের চোখেই অস্বাভাবিক ঠেকবে। তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল এই অস্বাভাবিকতার স্পর্শে ভরা। সেজন্যেই হয়তো তাঁর জীবন অন্যের থেকে [illegible] [illegible] তুলনায় পৃথক।

'পোস্ট ডিসপাচ আর 'ওয়ার্লর্ড'-এর প্রকাশক সম্পাদক জোসেফ পুলিৎজারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ডায়েরীর একটি পাতা তুলে ধরলেই তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া যায়। জীবনের মধ্যভাগে তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি, তথাপি এই এতবড় অভাব তাঁর উদ্যমকে এবং তাঁর কর্মশক্তিকে প্রতিহত করতে পারে নি। সকল সময়েই তিনি থাকতেন সচিব পরিবৃত হয়ে। একমাত্র ঘুমের সময়টা ছাড়া একটি মুহূর্তও তাঁকে একা কখনো দেখা যায় নি।

প্রাতরাশ তিনি সমাধা করতেন সাধারণত একজন সচিবকে নিয়ে সচিবের সে সময় কাজ শুধু প্রাতরাশে তাঁকে সঙ্গ দেওয়া নয় অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলির লেখা, নীতি, প্রকাশপদ্ধতি, উপস্থাপনকুশলতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করা।

শুধু তাই নয়—পনের মিনিটের ব্যাপারটি চার মিনিটে শেষ করতে হোত। সুতরাং এই সংক্ষেপের প্রস্তুতি প্রাতরাশে যোগ দেওয়ার আগেই সচিবকে সেরে রাখতে হোত। প্রাতঃরাশের পর অন্য এক সচিবকে তিনি জরুরী ও ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রগুলি লেখার নির্দেশ দিতেন। তারপর তৃতীয় সচিবের পালা। তিনি পৃথিবীর

দিকপাল সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজার

অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রগুলি সম্বন্ধে অবহিত করতেন পুলিৎজারকে। তবে এ ভার কবে কার উপর পড়বে তার কোন স্থিরতা থাকত না, তাই তাঁর ছ'জন সচিবই এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। তারপর একটু বাইরে বেরোতেন। সচিবেরা সতর্ক থাকতেন হাতে নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে। কখন কি লিখতে বলেন বা নোট দেন তার তো কোন হদিশ নেই। মধ্যাহ্নভোজনের আগে মিনিট কুড়ি পায়চারি করতেন। এই সময়ে সচিবের কাজ ছিল সাময়িক পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে তাঁকে জ্ঞাত করা। প্রকাশিত রচনাগুলির লেখকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনীও তাঁকে জানাতে হোত। নৈশভোজের পর কখনো তাঁকে দেখা যেত মস্তে কার্লোর কনসার্টে কখনও বা প্রেক্ষাগারে। এসময়ে তাঁর সচিবরা তাঁকে কথাসাহিত্য পড়ে শোনাতেন আবার কখনও বা পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন।

এক অদ্ভুত খামখেয়ালী মেজাজের তিনি ছিলেন অধিকারী। তাঁকে শান্ত রাখতে তাঁর সচিবদের হিমসিম খেতে হোত। এককথায় সচিবদের কাছে তিনি ছিলেন এক আতঙ্ক। পড়ার সময় যদি সচিব একবার কেসে ফেলতেন বা কিঞ্চিৎ ভুল উচ্চারণ করতেন বা পিয়ানো বাজানোর সময় যদি কোন কিছুর এদিক-ওদিক হয়ে যেত তাহলে আর রক্ষে থাকত না। রসাতল বাধিয়ে বসতেন পুলিৎজার। তাঁর বিচিত্র মেজাজ এবং খামখেয়ালিপনা অনুধাবনে একতিল এদিক-ওদিক হলে আর ক্ষমা থাকত না সেখানে।

সচিবদের কাছ থেকে তার প্রত্যাশা ছিল অনেকখানি। তিনি চাইতেন তাঁর যে সচিব হবে সে সর্ববিষয়ে—সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি থেকে সুরু করে খুন, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতিরও খুটিনাটি বিষয় নখদর্পণে রাখবে। অনেক কাজ তিনি দু'জনের উপর ছেড়ে দিতেন। এইভাবে মিলিয়ে দেখতেন কার যোগ্যতা কতখানি, কে বেশী, কে কম— খুঁটিয়ে বিচার করতেন। তাঁর সচিবদের এরই মধ্যে অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হতো তাঁর মুখোমুখি হওয়ার মানসিক প্রস্তুতির জন্যে। এককথায় গোটা পৃথিবীটা নখাগ্রে রেখে তাঁর সামনে তাদের দাঁড়াতে হোত

এই সচিবদের মধ্যেই আবার বিশেষ একজনের উপর ভার ছিল তাঁর চিন্তাধারাকে সজীব এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে বলিষ্ঠ রাখার জন্য। সময়ে সময়ে তাঁকে হাল্কা হাসির গল্প শোনানোর যার উপর ভার ছিল. এই ভার পালন করতে তার কান্না আসার জোগাড় হত। ঠিক মেজাজ বুঝে গল্পটি পড়তে হবে—সময়ের একতিল এদিক-ওদিক হলে চলবে না। আগে-পরের এখানে কোন স্থান নেই। এক গল্প দুবার বল চলবে না। মেজাজের গভীরতা বুঝে গল্প চয়ন করতে হবে। সেখানেও এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। তারপর সেই গল্প নিয়েই আবার গুরুগম্ভীর আলোচনায় যোগ দিয়ে তাঁর যে-কোন প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ এবং সঠিক উত্তরের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

একতিল ফাঁকি, গোঁজামিল তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আসলে হয়তো নিজে নির্ভেজাল, ছিদ্রহীন মানুষ ছিলেন বলেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'নিখুঁত'-এর জয়যাত্রা দেখতে চাইতেন। তাই দৃপ্তকণ্ঠে তাঁর পক্ষে অনায়াস সম্ভব হয়েছে একথা বলার—যে কথা পৃথিবীর যে কোন সাংবাদিকের কাল-নির্বিশেষে মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—

Accuracy is to a News paper what virtue is to a woman.

চিতোর দুর্গে

শ্রীসুধাংশুভূষণ নায়ক

বীরের রক্তে সিক্ত দেখি যে
চিতোরের ধূলিকণা।
অগ্নিকুণ্ডে দিয়েছেন প্রাণ
হাজার বীরাঙ্গনা॥

চিতোরেশ্বরী আজো বিরাজেন
'মৈঁ ভুখাহুঁ' বাণী।
মন্দির মাঝে দাঁড়াইয়া পুনঃ
কর্ণ পাতিয়া শুনি॥

পদ্মা নয়না পদ্মিনী কোথা
মহল পড়িয়া আছে।
আলাউদ্দিন খিলজী যেথায়
দর্শন তার যাচে॥

পান্নার শুনি কান্নার ধ্বনি
বাজিছে করুণ রাগে।
নিজ সন্তানে দিয়া বলিদান
বিধির করুণা মাগে॥

মীরা নেই সেথা 'মীরা মন্দির'
আজিও বর্তমান।
ভক্ত গায়ক গাহিতেছে হেথা
শ্রীকৃষ্ণ গুণগান॥

জয়স্তম্ভ মাথা তুলি আছে
চিতোরের গৌরব।
এ ভূমির ধূলি মাথায় তুলিনু
শুনিনু ডঙ্কা রব॥

ইতিহাস আজ কত কথা কয়—
চক্ষেতে আসে জল।
রাজপুত বীর কাহিনী করুণ
স্বর্ণ-সমুজ্জ্বল॥

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিপ্লবের দীক্ষা

১৮৮৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে উলিয়ানভ্ পরিবার সিম্বির্‌স্ক্ ত্যাগ ক'রে কিছুদিন কোকুশ্‌কিনো (বর্তমান নাম লেনিনো) গ্রামে লেনিনের দাদুর বাড়িতে থাকার পর কাজান-এ যান। লেনিন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন সুরু করলেন, কেন না তাঁর মতে, বিপ্লববাদ বা সমাজতন্ত্র সফল করতে হলে 'আইন এবং রাজনীতি-বিজ্ঞান পড়া অত্যাবশ্যকীয়।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রবেশাধিকার সহজ হয় নি। ভীত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লেনিন-এর ভর্তি হওয়ার আবেদনপত্রে লিখেছিলেন,---

'আপাতত মুলতুবী থাক---'

এবং সিম্বির্‌স্ক্ বিদ্যালয় থেকে লেনিন সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র পাওয়ার পরই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বে-আইনী সংস্থা ছিল, নাম 'সামারা-সিম্বির্‌স্ক্ সংঘ'। লেনিন এই সংঘর সভ্য হন। জার-তন্ত্র কোনও ছাত্র-সংগঠন বরদাস্ত করত না---১৮৮৪-র বিশ্ববিদ্যালয় আইনবলে যে-কোনও ছাত্রসমিতির সভ্যকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিল আমলাতন্ত্রর গুপ্তচর-বাহিনী।

লেনিন আশপাশের উদার মতাবলম্বী ছাত্রদের নিয়ে 'বিপ্লবী ছাত্র-সমাজ' গঠন করলেন, পুলিশের খাতায় যার বিশেষণ ছিল 'অত্যন্ত বিপজ্জনক'।

পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের তদানীন্তন মনোভাব অত্যন্ত দৃঢ়।

১৮৮৭ খৃস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ছাত্ররা কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে মিলিত হয়ে দাবি জানাল :

---প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্ববিদ্যালয় আইন তুলে নেওয়া হোক্।

---ছাত্র-সংগঠনে আইনের সম্মতি থাক্।

---বিতাড়িত ছাত্রদের ফিরিয়ে আনতে হবে।

সমীরণ চৌধুরী

---এই বিতাড়নের পাণ্ডাদের কৈফিয়ৎ তলব করা হোক।

এই ঐতিহাসিক সভায় লেনিন ছিলেন অন্যতম সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদনে লেখা হল,---

'উলিয়ানভ প্রথম দলের সঙ্গে সভাগৃহে প্রবেশ করেছিল।'

বিশ্ববিদ্যালয়-পরিদর্শক মন্তব্য করলেন, '(উলিয়ানভ্)---অত্যন্ত সক্রিয় কর্মীদের একজন---প্রথম সারিতেই ছিল, অত্যন্ত উত্তেজিত, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ।'

এরপরই কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একদল সৈন্য প্রায় স্থায়িভাবে এনে রাখা হয়।

ছাত্রদের এহেন কাণ্ডকারখানা দেখে আমলাতন্ত্র তখন ভীত এবং সন্ত্রস্ত।

প্রতিবাদস্বরূপ লেনিন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন। ৫ই ডিসেম্বর তিনি রেক্টার-এর কাছে লিখলেন, 'যে-হেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে এখানে আর পড়াশুনো করা অসম্ভব, আপনার কাছে আমার আবেদন এই যে, আমার নাম রাজকীয় কাজান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হোক্।'

এই আবেদনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কাজান-এর গভর্নর-এর আদেশে লেনিন-কে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে যাওয়ার সময় লেনিন-এর সঙ্গে পুলিশ অফিসার-এর কথাবার্তা নিম্নরূপ---

পুলিশ কর্মচারী---ওহে ছোকরা, বিপ্লব ক'রে কী করবে? সামনে দেখছ তো বিরাট দেওয়াল?

লেনিন---হ্যাঁ তা ত দেখছিই। কিন্তু ওই দেওয়াল যে পচা, নড়বড়ে ---একটু শক্ত হাতে ঠেলা দিলেই পড়ে যাবে।

জেলবাসী বন্দী ছাত্ররা ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করত। সঙ্গীদের প্রশ্নোত্তরে লেনিন একটা কথাই বলতেন ---তাঁর সামনে একমাত্র রাস্তা খোলা আছে, সে রাস্তা বিপ্লবের।

৫ই ডিসেম্বর লেনিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন, এমন কি কাজান সহরে তাঁর বসবাসও তখনই নিষিদ্ধ। ৭ই ডিসেম্বর তিনি কোকুশ্‌কিনো গ্রামে নির্বাসিত---ঢাকা গাড়িতে পুলিশ সমভিব্যাহারে তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হল শহরের সীমান্তে।

এইভাবে, সতের বছর বয়সেই, লেনিন-এর বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষাপর্ব সমাপ্ত।

কেবলমাত্র নির্বাসন দিয়েই আমলাতন্ত্র নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। পুলিশ বিভাগের পরিচালক কাজান-এর পুলিশ-প্রধানকে নির্দেশ দিলেন, 'কোকুশকিনো গ্রামে নির্বাসিত ভ্লাদিমির উলিয়ানভ্-এর ওপর কড়া নজর রাখবে।'

নির্বাসনকালে লেনিন অজস্র পড়াশুনো করেছেন—রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং স্বদেশ সম্পর্কিত তথ্যাদি এ সবই তাঁর পাঠ্য ছিল। তাঁর বই আসত কাজান-এর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে, তাঁরা লেনিনকে পাঠাগার থেকে পত্র-পত্রিকাও পাঠাতেন। অনেক পরে লেনিন লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয় গ্রামে নির্বাসনের বছর আমি যত পড়াশুনো করেছিলাম, এত আর কোনদিন নয়—এমন কি সেণ্ট পিটারস্‌বার্গ জেলে বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালেও নয়। ঐ সময় আমি ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করতাম।'

তাঁর পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ ছিল। তিনি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়ে তারপর পড়তেন অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি। চারনিশেভ্‌সকী আর দোব্রোলিউবভ্ ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। এঁদের লেখা তিনি বারবার পড়তেন এবং নোট রাখতেন। বিখ্যাত রুশ গণতন্ত্র-ধার্মী লেখক—চেরনিশেভ্‌সকী—যিনি চাষীবিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন—লেনিন-এর অতিপ্রিয় লেখক। উত্তরজীবনে লেনিন তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে বলেছিলেন আমলাতন্ত্রর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে তিনি খাঁটি বিপ্লববাদীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রচুর।

এই লেখকেরই লেখা উপন্যাস 'কী করা উচিত' হোয়াট ইজ টু বি ডান বড় ভাই আলেকজাণ্ডার-এর মতন তাঁরও খুব প্রিয় ছিল। কাহিনীর মাধ্যমে লেখকের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে ইনিই প্রথম রুশ-লেখক যাঁর উপন্যাসের নায়ক বিপ্লববাদে বিশ্বাসী, যার জীবন জনগণের মঙ্গলার্থে উৎসর্গীকৃত।

এই বই লেনিন-এর এত ভাল লেগেছিল যে ১৮৮৮-র গ্রীষ্মকালে তিনি এটি চার-পাঁচবার পড়ে ফেলেছিলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহর মধ্যে এবং প্রতিবারই তিনি নতুন নতুন চিন্তাধারার সন্ধান পেয়েছিলেন। এ বই তিনি প্রথম পড়েন চৌদ্দ বছর বয়সে—লেখককে তিনি একটি চিঠিও দিয়েছিলেন। উত্তরকালে লেনিন বলেছিলেন এই বই তাঁর মন 'চষা জমির মত' আলোড়িত করেছিল।

মার্কসিস্ট পাঠচক্রে

প্রায় এক বছর নির্বাসনে কাটানর পর ১৮৮৮-র হেমন্তকালে তাঁকে কাজান-এ ফেরার অনুমতি দেওয়া হল; কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন না। ওখানকার শিক্ষা-আধিকারিক তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের বিরুদ্ধে জনশিক্ষা বিভাগে লিখলেন, 'অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হলেও তাকে নৈতিক বা রাজনৈতিক বিচারে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা যায় না।'

জনশিক্ষা বিভাগীয় মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য : 'এ সেই উলিয়ানভ্-এর

ПРАВДА

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.

№ 1. Воскресенье, 22 апрѣля 1912 г ЦѢНА 2 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ „ПРАВДА“

„ЗВѢЗДА“

Отъ редакціи.

Наши цѣли.

На грани.

По независящимъ отъ издателя обстоятельствамъ объявленная продажа № 1 „Правды“ по повышенной цѣнѣ въ пользу семей убитыхъ ленскихъ рабочихъ не можетъ состояться.

"প্রাভদা'র প্রতিলিপি (১৯১২—এপ্রিল'

ভাই ত'? সিম্বির্স্ক বিদ্যালয় থেকে এসেছে?---কোনক্রমেই একে ভর্তি করা চলবে না।'

স্বদেশে শিক্ষালাভে ব্যর্থকাম লেনিন বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়েও নিরাশ হলেন---তাঁকে দেশত্যাগের অনুমতি দেওয়া হল না। কাজান-এর গভর্নর পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন ভ্লাদিমির উলিয়ানভকে যেন জারপত্র না দেওয়া হয়।

এর কিছুদিন পরে নিকোলাই ফেডোসেইয়েভ্ পরিচালিত 'মার্কসিস্ট' পাঠচক্রে লেনিন যোগদান করেন। কাজান-এ বেশ কয়েকটি বিপ্লবী পরিষদ ছিল, সেখানে মার্কস আর এংগেলস-এর হাতে লেখা পুঁথি পাঠ এবং আলোচনা আর প্লেখানভ্ লিখিত নারোদ্নিক্‌দের মতের প্রতিবাদ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলত।

'নারোদনিজ্ম'-এর বয়ান অনুসারে রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের আবির্ভাব আকস্মিক এবং দেশে সমাজতন্ত্র আসবে কৃষক আন্দোলন দ্বারা; ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদেও তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এদের সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন, 'এদের প্রায় সকলেই যৌবনে সোৎসাহে সন্ত্রাসবাদীদের পুজো করেছে এবং এই স্বপ্নময়তা ছাড়তে রীতিমত কষ্ট করতে হয়েছিল।'

নারোদ্নিক্-দের মত বাস্তব-বিমুখ। ১৮৬১-তে ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদ দ্রুত বিস্তৃত হল---সেন্ট পিটার্সবার্গ, মধ্য ও দক্ষিণ রাশিয়া আর উরাল প্রদেশে কারখানার সংখ্যা বেড়ে চলল অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্যভাবে। মধ্য রাশিয়ার সঙ্গে প্রান্তিক অংশগুলোর সংযোগ করতে গড়ে উঠল রেলপথ। ফলত সৃষ্টি হল প্রোলেতারিয়েৎ---সর্বহারা শ্রেণীর; বিপ্লবের মূল রসদ।

নিজেদের অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে তখনও অচেতন শ্রমিক-শ্রেণী কিন্তু ধনী এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু ক'রে দিয়েছিলেন। ধর্মঘট তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে; ১৮৮৩-তে প্রথম রুশ মার্কসিস্ট সংসদ গড়ে উঠল প্লেখানভ্-এর নেতৃত্বে---নাম 'ইমানসিপেশন্ অব্ লেবার' সংসদ। বিদেশে স্থাপিত এই সংস্থা রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রচারে আর ভ্রান্ত 'নারোদনিজ্ম'-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। তৎকালীন মার্কসীয় দর্শন আলোচনাচক্রে প্লেখানভ্-এর লেখার আলোচনা হত ব্যাপকভাবে; বিশেষত তাঁর 'সোশ্যালিজম্ অ্যাণ্ড দ্য পলিটিকাল স্ট্রাগল অ্যাণ্ড আওয়ার ডিফারেন্সেস্' ---'সমাজতন্ত্রবাদ এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং আমাদের পার্থক্য'---বইটি। বিদেশে প্রকাশিত হওয়ায় সেন্সার-এর দৌরাত্ম্য-মুক্ত এই বইগুলো রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারে অনেক সাহায্য করে।

১৯১৭ সালে ছদ্মবেশে লেনিন

লেনিন-এর মতে রাশিয়ায় 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক' আন্দোলনের সূত্রপাত করার কৃতিত্ব প্লেখানভ্ প্রতিষ্ঠিত 'ইমানসিপেশন্ অব্ লেবার' সংস্থার।

মার্কসবাদে প্রথম দীক্ষিত বিপ্লবীদের একজন নিকোলাই ফেডোসেইয়েভ্। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য কাজান-এর আলোচনা পরিষদগুলির সভ্যরা পারস্পরিক মেলামেশা বন্ধ করেছিল, এমন কি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তারা পরস্পরের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করত না, কেবলমাত্র নিজেদের বিশেষ আলোচনাচক্রের সভ্যদের নাম সকলে জানত। এই কারণেই লেনিন কখনও ফেডোসেইয়েভ্-এর দেখা পান নি, সমমতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও। ম্যাক্সিম গোর্কী তখন রুটির দোকানে কাজ সেরে গোপনে আলোচনাচক্রে যোগ দিলেও উপর্যুক্ত কারণে লেনিন-গোর্কী সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় নি।

কাজান-এ কয়েকমাস থাকার সময় লেনিন অনন্যমনে মার্কসইজম্ সম্পর্কে পড়াশুনো করেছিলেন। মার্কসীয় বেদ 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি তিনি অধ্যয়ন করেন খুটিয়ে, খুটিয়ে পুংখানুপুংখরূপে। ধনতন্ত্রবাদের চরম শত্রু প্রোলেতারিয়েৎ-দের বিশ্বব্যাপী অবশ্যম্ভাবী কার্যকলাপের বিশ্লেষণ ক'রে মার্কস দেখলেন তন্ত্রের পতন আর সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় অমোঘ ঐতিহাসিক কারণে ঘটবেই। কেবলমাত্র 'ক্যাপিটাল' পড়া নয়, তার মতবাদগুলি রাশিয়ার তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় কী ভাবে এবং কোথায় প্রযোজ্য সে সম্পর্কেও লেনিন গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন।

আনা ইলিনিচ্না লিখেছেন, 'লেনিন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমার কাছে মার্কসীয় দর্শন আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করতেন, নতুন দিগন্তের কথা শুনতেন তাঁর মুখ থেকে। তাঁর উৎসাহ ছিল ছোঁয়াচে।---লব্ধ জ্ঞান কখনও নিজের মনে না পুষে তিনি তা সকলের সঙ্গে সমান ভাগ ক'রে নিতেন।---কাজান-এ তিনি শীগগির মার্কসবাদে উৎসাহী অনেক তরুণ বন্ধু পেয়েছিলেন।'

মার্কস্ প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদের রুশভক্তদের মধ্যে লেনিনই প্রথম ও প্রধান।

মার্কস পড়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, জাগ্রত হলে শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বজয়ী হবেই। তখনই তাঁর ধারণা হয় জাগ্রত শ্রমিকশক্তির সামনে স্বৈরাচারী জার বা অত্যাচারী ধনী---কেউই দাঁড়াতে পারবে না।

ক্রুপসকায়া লিখেছেন, 'সব অত্যাচারিতের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই লেনিনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের উদ্ধারের উপায় খুঁজতে, এবং তা তিনি পেয়েছিলেন মার্কসীয় দর্শনে। 'মার্কস্'-এর কাছে জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে আগত

লেনিন তাঁর প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাব পেতেন।'

১৮৮৯ খৃস্টাব্দের মে মাসে উলিয়ানভ্ পরিবার সামারাগুবারনিয়ার অন্তঃপাতী আলাকাইয়েভ্কা গ্রামের এক খামারে, এবং শরৎকালে সামারায় (বর্তমান নাম 'কুইবিশেভ্) গেলেন। ইতিমধ্যে পুলিশ কাজান-এর আলোচনাচক্রগুলি খুঁজে বের করার মহান ব্রতে মগ্ন; জুলাই মাসে নিকোলাই ফেডোসেইয়েভ্ কয়েকজন সঙ্গীসহ জেলে আটক হলেন। লেনিন তখন কাজান-এ নেই, বরাতজোরে সেবার তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হল না।

কর্মক্ষেত্রে ডাক পড়ল। অর্থোপার্জনের চেষ্টা আর না করলে নয়। লেনিন তাই মে এবং জুন মাসে 'সামারস্কায়া গেজেতা'য় বিজ্ঞাপন দিলেন :

'পুরনো ছাত্র কর্মপ্রার্থী। দূর হলেও আপত্তি নেই। লিখুন—ভি. ভি. কেয়ার অব্ ইয়েলিজারভ্, ভজনেসেনস্কায়া স্ট্রীট, সাউশকিনার বাড়ি।'

পুলিশের খাতায় লেখা হল, 'উলিয়ানভ সামারাতে ছাত্র পড়াচ্ছে।'

দেশের বা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায়

লেনিনের পার্টি মেম্বারশিপ্ কার্ড

সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ-এ কয়েকজন সহকর্মী সহ লেনিন (১৮৯৭)

'প্রাইভেট' ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করার পর তিনি ১৮৯০-র বসন্তকালে প্রয়োজনীয় অনুমতি পেয়ে গেলেন।

স্বাভাবিক উৎসাহ নিয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি করতে করতে লেনিন স্থির করলেন সহপাঠীদের সঙ্গেই পরীক্ষা দেবেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে চার বছরের পাঠ্যসূচী কোন সাহায্য ছাড়াই আঠারো মাসে শেষ করতে হয়। স্বকৃত কঠোর পাঠক্রমে তিনি তখন মগ্ন—আলাকাইয়েভ্কার খামারের বাগানে দূরে একটি ঘরে অনন্য চিত্তে তিনি পাঠমগ্ন।

কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও অবসর বিনোদন বন্ধ হয় নি। সন্ধ্যাবেলায় আলাকাইয়েভ্কার বাড়ি গান-বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠত—ভগ্নী ওল্গার সঙ্গে তিনি গলা মিলিয়ে গাইতেন, এবং ওল্গা পিয়ানো বাজাতেন। কবি ইয়াজিকভ্ রচিত এই গানটি তাঁর খুব পছন্দ ছিল :

বন্ধু নাই সাগরে মোদের,
ঢেউগুলো তবু নেয় বয়ে
কেবলই সাহসীদের ;
ভাইসব, বুক বাঁধো, এ ঝড়ের দোলে
দ্রুততর বেগে যাক তরণী মোদের॥

তাঁর আত্মীয়রা লিখেছেন লেনিন-এর গান ছিল প্রাণময়; সহজ, সতেজ, উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গাইতেন। একদিন সকালে ওল্গা বাজাচ্ছিলেন ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত 'মার্সেইয়েস্', লেনিন তখন ঘরে ঢুকে 'দ্য ইণ্টারন্যাশনাল' গাওয়ার প্রস্তাব করলেন। সে সময় রাশিয়ায় প্রায় অজ্ঞাত এই গান—তখন ভাইবোন অভ্যাস ক'রে ফরাসী ভাষায় পুরোটা গাইলেন। শৈশবে কিছুদিন গান শেখার পর তা বন্ধ করতে হয়েছিল, এ জন্য লেনিন আজীবন দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন পরম সঙ্গীত-ভক্ত।

১৮৯১-র বসন্ত এবং হেমন্তে লেনিন সেণ্টপিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা দিলেন দু'ভাগে; ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর সবচেয়ে বেশী। সেণ্ট-পিটার্সবার্গে থাকতেই তিনি স্থানীয় মার্কসবাদীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে অনেক বই যোগাড় করেছিলেন।

১৮৯২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আইন-ব্যবসায়ের অনুমতি পেয়ে আদালতে বেরোলেন মার্চ মাস থেকে। তাঁর আদালতে যাতায়াত মাত্র বার পনেরোর মধ্যে সীমিত।

আইন-ব্যবসায় তাঁর খুব সময় লাগত না; তাঁর সমস্ত উৎসাহ ছিল মার্কস অধ্যয়ন এবং বিপ্লবের প্রস্তুতির দিকে। সে সময় সামারাতে বেশ কয়েকটি বে-আইনী মার্ক্সীয় আলোচনা-চক্র ছিল; প্রধানত ছাত্রদের মধ্যে।
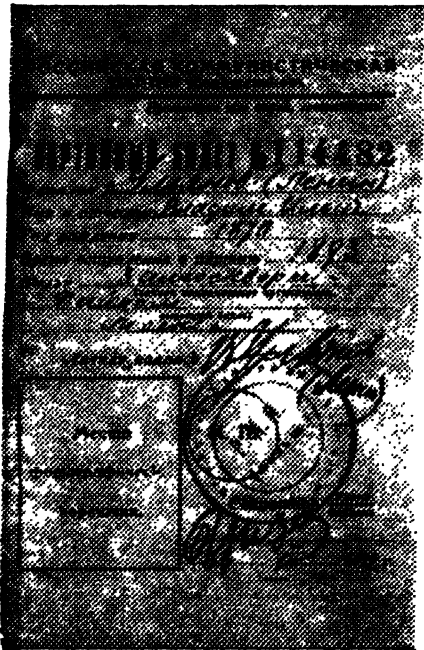
অবশ্য, এদের অধিকাংশই মতবাদে 'নারোদনিক'। স্ক্লিয়ারেংকো পরিচালিত আলোচনাচক্র খুব চালু ছিল—এখানে বে-আইনীভাবে ছাপা পত্র-পত্রিকা বিলনো হত। এঁর সঙ্গে লেনিন-এর পরিচয় হয় তাঁর ভগ্নীপতি ইয়েলিজারভ-এর মাধ্যমে।

অনেক প্রাচীন নারোদনিক তখন সামারায় বাস করতেন। লেনিন-এর অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তাঁকে এঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল অতীতের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার অংশ পেতে। এঁদের মতবাদে বিশ্বাস না করলেও লেনিন এই সাহসী দেশপ্রেমিকদের শ্রদ্ধা করতেন।

সামারায় তাঁর উপস্থিতি মার্কসীয় সমাজে বেশ আলোড়ন এনেছিল। তিনি মার্কসীয় মতবাদ প্রচারে লেগে গেলেন কোমর বেঁধে। ফলে স্ক্লিয়ারেংকো এবং তাঁর অন্যান্য অনেক সঙ্গী 'নারোদনিক' মতবাদ ছেড়ে মার্কস-এর মতবাদে ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সামারায় লেনিন তখন 'নারোদনিক' মতবাদ ভুল প্রমাণে অক্লান্ত—বক্তৃতায় এই অ-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধতা এবং এর বাস্তববিরোধী চরিত্র উদ্‌ঘাটন তাঁর কাছে বৃহত্তর মর্যাদা পেল। সামারা রেলকর্মচারীদের এক গোপন সভায় তিনি 'গ্রাম্য কার্মউন্' এবং বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন।

১৮৯২ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্ম এবং শীতে 'নারোদনিক' মতবাদের প্রধান প্রবক্তা—মিখাইলোভ্‌স্কী, ভোরণ্টসভ্, ইউঝাকভ্ প্রমুখদের মতের বিরুদ্ধে বে-আইনী আলোচনাচক্রে তাঁর দেওয়া বক্তৃতা ছাপাও হয়েছিল। মার্কস এবং এংগেল্‌স সম্পর্কেও তিনি বলতেন। মার্কস-এর 'দ্য পভার্টি অব্ ফিলজফি'—দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা—সম্বন্ধে লেখা তাঁর প্রবন্ধ তদানীন্তন বিপ্লবী সমাজে রীতিমত সমাদৃত হয়।

[ক্রমশ।

ঠিকানা

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

এখনও অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়
আমি
ঠিক চলে যাবো—যেখানে বলো
ঠিকানাটা দাও
এখনও অনেক অনেক পথ-পরিক্রমা বাকী আছে জানি
সুতরাং
ঠিকানাটা দাও আমি ঠিক চলে যাবো
এখনও নিজের অস্তিত্বের কাছে
বিশ্বাসী আমি
যদি এ ঝড়ের চেয়ে আরো বড় ঝড় আসে
ঋজু বৃক্ষের মতন
আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে
এখনও অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়
আমি
ঠিক চলে যাবো—যেখানে বলো
ঠিকানাটা দাও

পরভৃত

চণ্ডী সেনগুপ্ত

আবার ফিরবো ঠিক হেমন্তের স্বর্ণাভ পাকাধানে
উজ্জ্বল পাখির ডাকে, নাড়ী ছেঁড়া অচ্ছেদ্য বাঁধনে
স্বাগত জানিয়ে দেখো আবার আমাকে ডেকে নেবে
মধুপর্ক-ক্ষরিত হবে আমার কথাই শুধু ভেবে
এ ধুলো মাথায় নেবো। বেনে বউ পাথরের কুচি
কাগজের নৌকা চলে গেরুয়া মাটিতে
মন মাঝি দাঁড় বায়, অতর্কিতে কে যে দেয় মুছি
দু'চোখের সব রঙ কখন যে কায়ক্লেশ শীতে॥

বিনশ্বর অভিনেতা কান্নার পালকীতে অভিনয় সেরে
কান্না প্রদীপ হাতে সন্ধ্যাবেলা ফিরে যায় ঘরে
আমি তো বৈশাখী মেঘ, আমি তো দেখেছি মার হাসি
—ঝমঝমি হয়ে বাজে অপার ক্ষমায় রাশি রাশি
চাঁদের কিরণ হয় শত পাপবিদ্ধ ছোট বুকে
ভর্ৎসনায় নিজে কাঁদে দাবদাহ তীক্ষ্ণ শায়কে॥

আবার আসবো আমি পথ চিনে। মধু আশ্লেষে
গোলাপের কাঁটা হবো, আবার তোমাকে ভালবেসে॥

তন্ত্র-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

শক্তির নারীমূর্তি বিশ্লেষণ

এবার দেখা যাক শক্তিকে কেন নারীরূপে কল্পনা করা হলো?

এর প্রথম সূত্রপাত তো মনে হয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'সর্পরাজ্ঞী'র উল্লেখ থেকে। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞান কি সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছে দেহসৃষ্টি সম্বন্ধে তারি একটু খবর নেয়া যাক। এ-প্রসঙ্গে, স্বনামধন্য কেনেথ ওয়াকার সাহেবের রচিত—দি ফিজিওলজি অব সেক্স বইখানির প্রতি সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেই বইখানিতে ওয়াকার সাহেব প্রকাশ করেছেন যে জীবসৃষ্টির আদিপর্বে কেবল নারীবীজ বা ফিমেল ক্রোমোজোম ছিল, নরবীজ বা মেল ক্রোমোজোম ছিল না। কালক্রমে বিবর্তনের ফলে সেই আদিম নারীবীজ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নরবীজ। এ সত্য প্রকাশের ফলে তন্ত্রে প্রকাশিত কাহিনীই প্রমাণিত হয়েছে। তন্ত্র পাই সৃষ্টির প্রথম পর্বে এক আদ্যাশক্তিই ছিলেন নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে। কালে তাঁর তিনটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করলো—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সদাশিব নামে।

এতোকাল তন্ত্রের এ কাহিনী নিছক কাহিনী বলেই ধারণা করতেন অনেকে। কিন্তু ওয়াকার সাহেবের সূত্র থেকে তো বেশ প্রমাণ জাগছে যে, তন্ত্রের সত্য রীতিমত বিজ্ঞানভিত্তিক।

আবার সংবাদ-পত্রসেবীমাত্রেই জানেন যে-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একটি বিচিত্র সংবাদ সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। ইওরোপের একটি সুস্থ-সবল পুরুষ, যে ঐ যুদ্ধে সৈনিক ছিল—যুদ্ধের শেষে নারীজীবন যাপন করার বাসনায় চিকিৎসকের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করিয়ে নারীত্বলাভ করে এবং 'ক্রিশ্চিয়ানা' নাম গ্রহণ করে স্ত্রীজীবন যাপন করতে শুরু করে।

এ কথার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে বাস করে একটি নারী। তাই অস্ত্রোপচার করার দ্বারা পুরুষের পক্ষে নারীত্বলাভ করা আদৌ অসম্ভব নয়। একটি কথার উল্লেখ করা এখানে অবান্তর হবে না যে, ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবেরও পর পর কয়েক মাস স্ত্রীধর্ম দেখা দিয়েছিল। অনেকেই

সত্যবান

একথা বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু ঐ ক্রিশ্চিয়ানা সংবাদ জানার পরে রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীত্বলাভ সম্বন্ধে আর কি তর্ক তোলা যায়?

সাধনার নিগূঢ় রহস্যই তো এই যে-ঠিক ঠিকভাবে সাধন পদ্ধতি মেনে জীবন যাপন করলে স্বাভাবিকভাবেই এই দেহের বিচিত্র পরিণতি ঘটে। এ রহস্য সাধকদের অজ্ঞাত নয়। প্রকৃতপক্ষে সাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে—এই দেহ, প্রাণ ও মনের আমূল বিবর্তন। দেখা যায় যারা ভাবুক বা মনীষী কেবল ভাব নিয়ে মত্ত থাকেন, তাঁরাও ধীরে ধীরে স্ত্রীত্ব-লাভ করেন। কিন্তু সে কথা থাক।

এই বিবর্তনে প্রকৃতি কতখানি সাহায্য করে তার কথাও কিছু বলি। মেডিকেল কলেজ এমন বহু রোগিণী মধ্যে মধ্যে আসে, যাদের প্রথম জীবন কেটেছে নারীরূপে; বিবাহের পর দেখা যায়—তারা ধীরে ধীরে পুরুষত্বলাভ করছে। চিকিৎসকরা বলেন হরমোন ঘটিত বিচিত্র প্রভাবেই এমন হওয়া সম্ভব। আরও এক কথা—নারী ও পুরুষের দেহসংস্থান বিচার করলে দেখা যায় যে—নারীর শরীরের অভ্যন্তরে যে যন্ত্রগুলি সন্নিবিষ্ট, সেই যন্ত্রগুলি দেহের বহিরংশে প্রকাশিত হলেই নারী হয়ে যায় পুরুষ। বিবর্তন মানেই তো অভিব্যক্তি।

ওয়াকার সাহেব যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার সম্বন্ধে আরো একটু আলোচনা করি। তিনি বলেন, স্ত্রীবীজ হচ্ছে এক্স-এক্স ক্রোমোজোম, আর পুংবীজ হচ্ছে এক্স-ওয়াই ক্রোমোজোম। জীব-সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে একটি এক্স-এক্স ও একটি এক্স-ওয়াই ক্রোমোজোম জরায়ুর মধ্যে মিলিত হয়। সেই দুটি বিন্দু বা তন্ত্রের পরিভাষায় নাদ ও বিন্দু একীভূত অবস্থায় স্বভাববশে পুনঃ পুনঃ দ্বিগুণিত হয়ে আঙুরের থোলা বা শামুকের ডিমের মত চাপ বেঁধে জরায়ুর মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে। প্রথমবার দ্বিগুণিত হবার পরে এক্স-এক্স ক্রোমোজোমটির উদ্‌গম হলে, জাতক হয় নারী আর এক্স-ওয়াই ক্রোমোজোমটির উদ্‌গম হলে, জাতক হয় পুরুষ।

কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদ অন্যকথা বলে। আমরা বিশ্বাস করি পিতৃবীজ ও মাতৃবীজ সমশক্তির হলে জাতক হয় নপুংসক, পিতৃ-আধিক্যে পুরুষ আর মাতৃ-আধিক্যে স্ত্রী হয় জাতক। মোটকথা—কি নারী আর কি পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সুপ্ত আছে, উভয় বীজের শক্তি—যাকে জীববিদ্যায় বলা হয় উভয়লিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট। সে-ই তো অর্ধনারীশ্বর শিবের রূপ।

শারীর-বিজ্ঞানের দিক থেকে যা সত্য, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের দিক থেকেও তা অসত্য নয়। প্রাণিজগতের আদি তো হচ্ছে ওই উদ্ভিদরা। দেখা যায়, উদ্ভিদ-মাত্রেই হচ্ছে নারী শ্রেণীর। তাই উদ্ভিদ মাত্রেরই হয় ফল ফোটে নয় ফলফল

দুই-ই হয়। উদ্ভিদদের মধ্যে নরশ্রেণী নেই বললেই হয়—অতি অল্পসংখ্যক বৃক্ষাদি দেখতে পাওয়া যায়, যাদের ফুলফল হয় না। আবার প্রাণী-বিজ্ঞান থেকেও জানতে পাই যে নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে কেবল ওই নারীশ্রেণীই আছে। তার উদাহরণ হচ্ছে মৎস্য, মৎস্যমাত্রেই ডিম্ব প্রসব করে থাকে। পুং-মৎস্য শব্দটি নেহাৎ প্রবাদ বলেই মনে হয়।

এবার একটু আমাদের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পণ্ডিত-জনেরা বলেন যে, সাংখ্যদর্শনের সত্যই ক্রমবিকাশ লাভ ঘটেছে তন্ত্রে। সেই সাংখ্যদর্শনে পাই জগৎ-সৃষ্টির মূলে পুরুষ। তিনি নিরঞ্জন, নিরীহ, নিরাকার নির্গুণ উদাসীন শুধু নন, অবাঙ-মানস গোচর। তাঁরি ইচ্ছা স্ফুরিত হয় প্রকৃতির মধ্যে। সেই প্রকৃতি হচ্ছেন সাকারা সগুণা। অর্থাৎ পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবময়ী প্রকৃতি। কে জানে সেই কারণে তাকে 'বিপরীত রতাতুরা' বলে ধ্যান করা হয় কি না, যদিও বিপরীত রতা-তুরা শব্দটির প্রচলিত অর্থ একেবারেই অশ্লীল পর্যায়ভুক্ত। তাইতো বার বার সন্দেহ হয় যে, আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত ধ্যান বা প্রণাম, মন্ত্র অথবা বীজ বলে যে সমস্ত শব্দগুলি অথবা শব্দাংশ আছে, তার মর্মার্থ অতলে মজ্জিত হয়েছে চর্চা ও সাধনার অভাবে। থাক সে কথা।

পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে যা জানা যায়, সেই সত্যটিকে একবার সহজভাবে বিচার করার চেষ্টা করা যাক। রামকৃষ্ণদেব সন্ত কবীরের নাম করে বলতেন—"নিরাকার আমার বাবা, সাকার আমার মা।" এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, যাঁরা ভারতীয় মতে করকোষ্ঠী বিচার করেন তাঁদের পরিভাষায় করতলস্থ দু'টি রেখার নাম হচ্ছে মাতৃরেখা ও পিতৃরেখা। পিতৃরেখার বর্ণ ও আয়তনাদি বিচার করে জাতকের মননশক্তি বা অনুভূতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় আর মাতৃরেখার বর্ণ ও আয়তনাদি বিচার করে জাতকের বাক্‌শক্তি বা প্রকাশ ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

বাস্তবিকপক্ষেও দেখা যায়, সন্তানকে অনুভূতি যুগিয়ে দেন পিতা, আর প্রকাশ যুগিয়ে দেন মাতা। আবার সন্তানের পালন ও পোষণের দিক থেকেও তো দেখি—পিতা যতটুকু সাহায্য করেন প্রত্যক্ষভাবে, মা তাঁর থেকে ঢের বেশী সাহায্য করে থাকেন। সন্তানকে তো পিতার ঔরসজাত বলা হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিতার মধ্যে সন্তানের বীজগুলি পরমাণুরূপেই থাকে—যা প্রায় অনুভূতিগ্রাহ্য। সেই পরমাণুসত্ত্বাকে রূপদান করে যথাযথভাবে তাকে প্রকাশ করে তোলেন মাতা। তাই তো তাঁর এক নাম গর্ভধারিণী, অন্য নাম প্রসবিনী।

আরো বিবেচনা করার আছে এই যে—দৈহিক গঠনের দিক থেকে স্বাভাবিক সামর্থ্য থাকায়, মা পারেন সন্তানকে স্তন্যদান করে বেশ কিছুকাল ঘনিষ্ঠ সঙ্গ দান করতে। পিতা কিন্তু তা পারেন না, স্বাভাবিক সামর্থ্যের অভাব থাকায়। তাই দেখা যায় শিশুর কাছে পিতা যেন হয়ে পড়েন দূরের জন, প্রায় নিরাকার অনুভূতিস্বরূপ। মা চিনিয়ে দিলে তবেই শিশু ধীরে ধীরে পিতাকে চেনে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সম্ভ্রমের বা ভয়ের স্থানে বসায়। কিন্তু মা সন্তানের অত্যন্ত কাছের জন, সবদিকে সর্বদা তিনি রক্ষা করেন সন্তানকে, তাই তাঁর স্থান পরম ভালবাসার ও পরম ভক্তির। মা কত কাছের আর বাবা কত দূরের জন, তার অতি সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এই বহুপ্রচলিত শ্লোকাংশটিতে—

ভূমের্গরীয়সী মাতা
স্বর্গাদুচ্চতরো পিতা॥

কত গরীয়সী মা? না একেবারে এই ভূমি বা পৃথিবীর মতই, মাটির মতই বা তার থেকেও বড়। এই মাটি কেমন? না, যার ওপর শুয়ে পড়ছি, বসছি, চলাফেরা করছি, গড়াগড়ি যাচ্ছি, এতো কাছের, এতো আত্মীয়তার, ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ এই মাটির সঙ্গে—এইতো মায়ের প্রতীক। কে জানে এই কারণেই মূর্তি-পূজার আদি যুগ থেকে মৃন্ময়ী মূর্তি রচনার আদর্শ জেগে উঠেছে কি না।

অন্যদিকে বাবা কেমন? না, স্বর্গের চেয়েও উঁচু। সেই স্বর্গ কোথায়? না, আকাশের পারে, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু বোঝা যায় কল্পনা বা অনুভূতির মাধ্যমে। বাবা হলেন সেই স্বর্গের চেয়েও উঁচু।

আবার যখন কেবল মায়ের কথা বলা হয়েছে—তখন দেখানো হয়েছে—

জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

—মা ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে মাকে বাবার চেয়েও বড় বলা হচ্ছে। বিশেষ লক্ষ্য করার যে, ঐ শ্লোকাংশটিতে জননী আর জন্মভূমি শব্দ দু'টিকে এক সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মা যে বাবার থেকেও বড় সন্তানের কাছে, তার একটি অপূর্ব প্রমাণ পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানে। ঋষি গৌতম যখন তাঁর গোত্র-পরিচয় জানতে চাইলেন, সত্যকাম ছুটে গেলেন মায়ের কাছে বাবার নাম-গোত্র জানার জন্যে। বাস্তবিক, মা ছাড়া আর কেইবা জানাতে পারেন সন্তানকে তার পিতৃপরিচয়।

তন্ত্রেও তো পাই—মা মহামায়ার কৃপালাভ হলে তবেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তুলসী-দাসের একটি চৌপাই, যার উল্লেখ রামকৃষ্ণদেবও করতেন—সেটি হচ্ছে—

আগে রাম অনজ মুনি পাছে।
মুনিবরবেষ বনে অতি আছে॥
উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বীচ মায়া জৈসী॥

—বনে যাবার সময় আগে চলেছেন রাম, পিছনে চলেছেন লক্ষ্মণ, দু'জনেই ধারণ করেছেন সুন্দর মুনিবেশ, আর তাঁদের উভয়ের মধ্যে চলেছেন সীতা। দেখাচ্ছে যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যস্থিত মায়ার মত।

সীতা চলার সময় পা তুলতে গিয়ে যখন একদিকে হেলে পড়ছেন—তখনি রামের দর্শন পাচ্ছেন লক্ষ্মণ। অর্থাৎ সীতার প্রতিপদক্ষেপেই লক্ষ্মণ রামের দর্শনলাভ করছেন। সেই সীতা বা মায়া যদি ঐভাবে হেলেদুলে চলাফেরা না

করেন লক্ষ্মণ বা জীবের পক্ষে কোন দিনই আর রাম বা ব্রহ্মকে দর্শন করার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সীতা বা মহামায়ার দিব্য জ্যোতি তো অন্ধ করে দেয় লক্ষ্মণ বা জীবকে। তাই মহামায়ার সাধনা না করলে, তাঁকে না চিনলে, কোন উদ্ধারের পথ নেই জীবের। কিন্তু সে অন্য কথা।

যা বলেছিলাম, মাতাই জীবসৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রকাশমন্ত্রী—এ সত্য সেই স্মরণাতীতকালের ব্রহ্মবিদ্‌রাও বুঝতেন। তার বহু প্রমাণই তাঁরা রেখে গিয়েছেন তন্ত্রশাস্ত্রে। মেধস মুনি, যাঁকে পণ্ডিতজনেরা বশিষ্ঠের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন, তিনি যখন রাজা সুরথকে মহামায়ার চরিত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তসতীর মধ্যে, তখন তাই দেখি স্বয়ং ব্রহ্মার মুখে এই স্তব শোনালেন—

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং
স্থিতিরূপা চ পালনে॥

—তুমিই সৃষ্টিরূপিণী হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছো, আবার স্থিতিরূপিণী হয়ে তুমিই করছো সবাইকে পালন।

যে শক্তি সৃজন ও পালনের ক্ষমতা রাখে তাকে নারীমূর্তিতে কল্পনা করার বৈগুণ্য আবার কি থাকতে পারে? আজ তো আমাদের দেশে নারীমাত্রকেই আদ্যাশক্তির অংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। শুধু তাই নয়, কুমারী মেয়ে ও সধবা নারীর পূজা করার বিধানও আছে তন্ত্রে। এখনো শাক্তজনেরা তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন।

প্রসঙ্গত মনে আসে বৈষ্ণবজনদের কিশোরী ভজনার কথা। মূলত যে বৈষ্ণব ও শাক্ত মত একই সাধনপদ্ধতির দু'টি প্রকাশ, সন্ধানীমাত্রেই তা অবগত আছেন।

শক্তির নারীমূর্তি কল্পনায় মাতৃগতকুলের অবদান বা উপাদান

আদ্যাশক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করার আরো একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, শক্তির রূপকল্পনা প্রথম যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মাতৃগত কুলের মানুষ। এমনও হওয়া বিচিত্র নয় যে, নারীরাই প্রথম নারীদেবতা পূজা করার প্রবর্তন করেন। এ সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় সুমেরিয়া দেশের দেবীপূজায় নারী পুরোহিতের বা গ্রীসদেশের দেবীপূজায় নারী পুরোহিতের প্রাধান্যাদির ইতিহাস পাঠ ক'রে। আমাদের দেশেও এখনও পর্যন্ত যেসব ব্রত পার্বণের কথা বা ছড়া প্রচলিত আছে, তার মধ্যেও তো দেবীপূজার পুরোহিত দেখি নারীরা। আবার মঙ্গলকাব্যের যে-সব দেবীকাহিনী পাই, যাঁদের পূজা আজো করি আমরা, যেমন চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি—তাঁদের সবারি পূজা তো সুরু করেছিলেন নারীরা গৃহকোণে বসে, তাই নিয়ে বিষম বিরোধ ঘটেছিল তাঁদের পুরুষদেবতাপূজক স্বামীদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত দেবীদের কোপে পড়েও স্ত্রীদের নির্দেশে স্বামীরাও বাধ্য হয়েছিলেন দেবীদের পুজো করতে।

যাই হোক, এখন মাতৃগত কুলের কথাই বলি। মানব-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা এই তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন যে, মাতৃগত কুলের উদ্ভব ঘটেছিল দুই ক্রান্তিরেখার মধ্যবর্তী পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডল খণ্ডে। এখনো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী ও আদিবাসীরা নারীরূপা শক্তি বা স্ত্রীদেবতার পূজা করেন। আরো লক্ষ্য করার যে, স্ত্রীদেবতামাত্রেরই পূজা হয় চন্দ্রমাসের তিথি অনুযায়ী। এটি বিশেষ করে ওই মাতৃগত কুলের অবদান চন্দ্রমাস গণনা তাঁরাই প্রথম শুরু করেন।

আবার আদ্যাশক্তির পূজার প্রশস্ত সময় হচ্ছে নিশাকাল। শিবও যে ওই মাতৃগত কুলের দেবতা তার বিশেষ প্রমাণ এই যে—শিবের পূজার শ্রেষ্ঠ তিথি হচ্ছে শিবচতুর্দশী বা শিবরাত্রি। গ্রীষ্মমণ্ডলের লোকরাই নিশাজাগরণের পক্ষপাতী, কারণ দিবাভাগে প্রচণ্ড বিষুব-সূর্য গ্রীষ্মমণ্ডলে অগ্নিবৃষ্টি করে—তখন সেই দারুণ দাহে অবসন্ন হয়ে তারা নিদ্রা যেতেই ভালবাসে, সে সময়ে কোন পূজা, উৎসব বা আনন্দ করার স্পৃহাই তাদের জাগে না। কে জানে গ্রীষ্মমণ্ডলের লোকে নিশাযোগেই বেশী ক্রিয়াকর্ম করতো বলেই তারা 'নিশাচর' নামে বিখ্যাত হয়েছিল কি না। তবে এ ধারণা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তা, গ্রীষ্মমণ্ডলের মানুষ রাত্রিচর ছিল বলেই চান্দ্রমাস গণনা করার পথ খুঁজে পেয়েছিল, চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করতে হলে নিশাজাগরণ না করলেই নয়। মনে পড়ে গেল চন্দ্রকে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়—"অত্রিনেত্র সমুদ্ভব"। অর্থাৎ অত্রির নেত্র থেকেই চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। আসলে হয়তো এই সত্য যে, অত্রিই প্রথম চন্দ্রকে দেখতে দেখতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে অত্রি মুনি যে প্রথম জ্যোতির্বিদ্ তার প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে আছে।

নিশাচরদের সম্বন্ধে আরো কিছু বলে নিই। সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাংলাদেশে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বেলে শংখধ্বনি করা হয়। সন্ধ্যাকে এমন সম্বর্ধনা জানানোর অর্থ কি? শাস্ত্রে তো পাই সন্ধ্যার নাম 'রাক্ষসী বেলা'। তাই ঐ সন্ধ্যায় প্রদীপদানের রীতিকে রাক্ষসী রীতি বলেই যেন সন্দেহ হয়। রাক্ষসীদেরই তো অন্য নাম নিশাচর।

অথচ প্রভাতবেলাকে সম্বর্ধনা জানানোর কোনই প্রথা নেই—একথা স্মরণে রাখার। কেন প্রভাতকে এমন সম্বর্ধনা জানান হয় না, তা ভাবতে গেলেই মনে হয় গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্য তো পীড়ার সৃষ্টি করে, চন্দ্রের মত স্নিগ্ধকর সে তো নয়।

আবার পূজার স্থানে মঙ্গলদীপ জ্বেলে দেয়া বা দেবী দুর্গার সন্ধিপূজায় দীপমালা রচনা, আকাশ-প্রদীপ দান, দেওয়ালীর দীপাবলীর প্রথাও মনে হয় ঐ অবৈদিক নিশাচরদের দান, আগুন জ্বালাতে শিখে তাঁরা যজ্ঞ করতেন না তাপের ভয়ে, প্রদীপ জ্বালার জন্যেই আগুনকে ভালবাসতেন।

—শ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশ

॥ চার ॥

একটা ছোট ফটক পেরিয়ে অন্দর-মহল। সেখানে দাঁড়িয়েছিল দু'জন রক্ষী। হাতে খোলা তলোয়ার। কুমার ভোজরাজকে দেখে ওরা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। সামনে অপ্রশস্ত অঙ্গন। সুরেলা গলায় ভজন ভেসে আসছিলো। অঙ্গন পেরিয়ে রুক্ষ পাথরের উঁচু দুটো ধাপ পেরিয়ে ভোজরাজ উঠে এলো পূজোর ঘরের সামনে।

সেখানে কৃষ্ণের একটি ছোট মূর্তি। পিলসুজ জ্বলছে একপাশে। সামনে বসে মীরা নিজের মনে ভজন গাইছে বিভোর হয়ে।

—মায়ী রী ম্যায় তো গোবিন্দ
লীনো মোল---

ওগো মা, আমি তো গোবিন্দকে কিনে নিয়েছি।

দরজার সামনে ভোজরাজ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। গানের এই আঙ্গিক তার কাছে একেবারে নতুন। কিছুদিন আগে চিতোরে কুম্ভশ্যামের মন্দিরে একজন এসে কবীরের ভজন শুনিয়েছিলো, ভালো লেগেছিলো সেই গানের ভাব-মাধুর্য। বারাণসীর সাধক কবি কবীরের নাম তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মেবারের ব্রাহ্মণদের মুখে শোনা যায় তার নিন্দে। কিন্তু রাণা সাঙ্গা হঠাৎ কবীরের অনুরাগী হয়ে উঠেছে। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী রাণাজীর শত্রু। সিকন্দর লোদী নানা-রকমভাবে চেষ্টা করেছে কবীরকে প্রাণে মারবার জন্যে কিন্তু পেরে ওঠে নি। সিকন্দর লোদীকে যারা অবহেলা করতে পারে তাদের সবারই জন্যে রাণার অনুরাগ ও সহানুভূতি। ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করেছিলো। বলেছিলো, কবীর মুসলমানের ছেলে, জোলার ছেলে, তার লেখা গান কুম্ভ-শ্যামের মন্দিরে শোনানো যাবে না।

রাণা সাঙ্গা কুমার ভোজরাজের দিকে তাকিয়েছিলো। একটু হেসে জিজ্ঞেস করেছিলো,—তুমি কি বলো?

ভোজরাজ উত্তর দিয়েছিলো,—সুলতান সিকন্দর লোদীকে যিনি পরোয়া করেন না, তিনি আমাদের নমস্য। তাঁর গান নিশ্চয়ই হবে কুম্ভ-শ্যামের মন্দিরে।

রাণা সাঙ্গা হাসতে হাসতে বললো,—তুমি হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট, তোমার কথার উপর আমাদের কারো কথা চলতে পারে না।

ভোজরাজের সঙ্গে রাণা সাঙ্গা গিয়েছিলো কুম্ভশ্যামের মন্দিরে। রাণাজীর মা রাণী ঝালী আর ভোজ-রাজের মা মহারাণী কুবনবাঈও গিয়েছিলো।

কি যেন সেই কবীরপন্থী গায়কের নাম?---ভোজরাজ ভাবলো,—হাঁা, সুরতগোপাল। সবাই বলছিলো সে নাকি কবীরের মন্ত্রশিষ্য।

সেদিন ছিলো হোলী।

প্যারে শ্যাম ঘর কান্ত সুজন,—গাইছিলো সুরতগোপাল,—ম্যয় খেলুঁ রঙ্গ হোরী। আমার ঘরে এসেছে সুকান্ত পরম প্রিয়। তার সঙ্গে আমার রঙের খেলা। জনম জনম কী মিঠী হ্যায় কল্পনা, পায়ো জীবন প্রাণ রী---

সে এক অপরূপ আত্মনিবেদনের ভঙ্গী। ভোজরাজ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলো।

কিন্তু এখানে মীরার গানে রসের আবেদন একেবারে অন্যরকম।—মায়ী রী, ম্যায় তো গোবিন্দ লীনো মোল। ওগো মা, আমি তো তাকে একেবারে কিনে নিয়েছি।---আত্ম-নিবেদন নয়, আত্মসমর্পণ নয়, তাকে একেবারে কিনে নেওয়া, তাকে একেবারে মনের বাঁধনে বেঁধে ফেলা।

ওখানে পিলসুজের পাশে ছোট্ট একটুখানি কৃষ্ণের বিগ্রহ, ছোট্টো একটি পুতুলের মতো, খেলনার মতো। পিলসুজের সলতেগুলোর আলোয় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার নীলার মতো চোখ দুটো। আর সামনে একটি গানের ফোয়ারা, সুরের অজস্রধারায় ফুর-ফুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

—মায়ী রী, ময় তো গোবিন্দ
লীনো মোল---

স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো ভোজরাজ, চিতোরের যুবরাজ। খেয়াল নেই যে পূজোর ঘরে আরো কয়েকজন মহিলা বসে আছে। তাকে দেখে সবাই মুখের উপর পাতলা ঘুঁঘট টেনে দিয়েছে।

শুধু একজন বাদে। বয়েস হয়েছে সেই মহিলার, কিন্তু এখনো চোখে-মুখে প্রশান্ত সৌন্দর্যের দীপ্তি। সে হাসিমুখে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো ভোজরাজের দিকে, তারপর মীরার দিকে।

মীরা গান গাইছিলো তন্ময় হয়ে, সেও খেয়াল করলো না।

একসময় গান শেষ হোলো। প্রণাম করে উঠে পড়লো অন্যান্য মেয়েরা।

সবার আগে বেরিয়ে এলো সেই বয়স্কা মহিলা। হাসিমুখে বললো,—ভোজরাজ?

পিসী?—সামনে ঝুঁকে প্রণাম করলো কুমার ভোজরাজ।

একটি মেয়ে সামনে নিয়ে এলো একটা বড়ো সোনার থালা। তাতে নারকেল দই লাল রোলী সোনার মোহর এ সব সাজানো। মাঝখানে কর্পূরের প্রদীপশিখা।

সেটি হাতে নিলো ভোজরাজের পিসী, মহারাণা সাঙ্গার ছোটো বোন এবং রাও বীরমদেবের পত্নী কুঁয়রবাঈ। ভোজরাজের সামনে থালাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্বস্তিবচন করে তাকে স্বাগত করলো। মেবারের যুবরাজের অভ্যর্থনার এই রীতি।

কুঁয়রবাঈ বললো,—ভেতরে গিয়ে গিরধরজীকে প্রণাম করে তারপর মহলের ভিতর এসো।

মীরা তখনো উঠে দাঁড়ায় নি। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো ভোজরাজকে।

ভোজরাজ প্রণাম করলো কৃষ্ণের বিগ্রহকে। তারপর উঠে দাঁড়ালো।

তখনো বসে আছে মীরা।

মীরা,—ডেকে বললো কুঁয়রবাঈ,—রাণাজীর বড়ো ছেলে, কুমার ভোজরাজ।

মীরা উপবিষ্ট অবস্থাতেই দু'হাত তুলে অভিবাদন জানালো।

কুঁয়রবাঈ সঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলো। ওরা নিঃশব্দে সরে গেল সেখান থেকে।

ঘরের ভিতর মীরা আর ভোজরাজ। দরজার বাইরে কুঁয়রবাঈ।

আমার দেবর রতন সিং-এর মেয়ে মীরা,—কুঁয়রবাঈ বললো,—একে তুমি আগে দেখ নি।

হ্যাঁ দেখেছি,—একটু হেসে বললো ভোজরাজ,—আজ বিকেলেই দেখা হয়েছে।

মীরা,—বললো কুঁয়রবাঈ,—আমি মহলের ভিতর যাচ্ছি। কুঁয়র-সা'কে নিয়ে তুমিও এসো।

সেখান থেকে চলে গেল কুঁয়রবাঈ।

তখন মীরা আর ভোজরাজ একা।

চারদিক একেবারে স্তব্ধ। এত বড়ো মহলে কোথাও কোনো লোক আছে বলে মনে হয় না। অনেক দূরে একটি ঘোড়ার ডাক শোনা গেল।

কিছু বলবেন?—খুব শান্তকণ্ঠে মীরা জিজ্ঞেস করলো।

ভোজরাজ বললো,—মেবারের যুবরাজের সঙ্গে কেউ মাটিতে বসে কথা বলে না।

মন্দিরের বাইরে হলে আমি নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়াতাম,—মীরা উত্তর দিলো,—কিন্তু আমার গিরধরজীর সামনে আমি রাণাজীর সামনেও উঠে দাঁড়াবো না।

—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবো?

—আপনিও বসুন।

ভোজরাজ পা মুড়ে বসে পড়লো মেঝের উপর। তারপর বললো,—এটা রেওয়াজ নয়।

—কি রেওয়াজ নয়?

—তোমার জ্যাঠাইমা আমার পিসী। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বলছিলাম, আমি এখানে এলাম, আর সবাই আমাকে এখানে একলা রেখে চলে গেল, এটা রেওয়াজ নয়।

মীরা কৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে তাকালো। তারপর ভোজরাজের দিকে ফিরে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো,—

—আমি তো এখানে একলা নই।

তারপর একটু হেসে বললো,—মেবারের যুবরাজ কাউকে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ মেড়তা চলে আসবেন এটাও রেওয়াজ নয়।

—কেন এসেছি জানো?—ভোজরাজ জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ, আমি মায়ের কাছে শুনেছি, অসঙ্কোচে উত্তর দিলো মীরা।

—মা?

—কুঁয়রবাঈকে আমি মা বলে ডাকি। আমার তো মা নেই, মারা গেছেন খুব ছেলেবেলায়।

—হ্যাঁ, আমি জানি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দুজনে।

মীরা অপলক প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভোজরাজের দিকে। ভোজরাজের মনে একটু কুণ্ঠা আসছিলো। সে সোজা তাকাতে পারছিল না মীরার দিকে।

একটু ইতস্তত করে বললো,—রাণাজী আমায় বললেন, তুমি হিন্দুস্তানের ভাবীসম্রাট। আমার কোনো মতামত তোমার উপর চাপিয়ে দিতে চাই না, যদিও আমি জানি তুমি খুব খুশী হয়েই আমার কথা মেনে নেবে। আমি চাই তুমি নিজেই একবার দেখে এসো। যিনি হবেন হিন্দুস্থানের মহারানী, তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে যেন কোন দ্বিধা না থাকে।

—আমাকে এসব কথা কেন বলছেন?—খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলো মীরা।

এবার মীরার দিকে সোজা তাকালো ভোজরাজ। বললো, —আমি মহারাণা সাঙ্গার ছেলে ভোজরাজ। ওঁর মতো আমিও শ্রদ্ধা করি অন্যের মতামতকে। যিনি হবেন হিন্দুস্থানের মহারাণী, তাঁর উপর অভিভাবকেরা নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেবেন, সেটা আমিও চাই না, যদিও আমি জানি তুমি কোনো প্রতিবাদ না করে গুরুজনদের কথা মেনে নেবে। আমি চাই, তুমি নিজেই আমাকে যাচাই করে দেখ। যিনি হবেন হিন্দুস্থানের সম্রাট, তোমাকে পাটমহিষী করার যোগ্যতা তাঁর আছে কি না।

—এত কথা ভেবে চিতোর থেকে এখানে এসেছেন?—মীরা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

—না। ভেবেছিলাম এখানে এসে শুধু তোমাকে একবার দেখবো, তারপর চলে যাবো। আর দশজনের কনে দেখার মতো শুধু আমারও কনে দেখা,—এরকম একটা ঝাপসা ধারণা ছিলো।

তন্ত পথে তোমার সঙ্গে দেখা হোলো, তুমি আমার রথকে, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে, তখনই মনে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল আমি এখানে কেন আসছি।

মীরা নিজের মনে ভাবছিলো। তারপর বললো,—যদি আমি রাজী না হই?

—আমি তক্ষুণি চলে যাবো। রাণাজীকে গিয়ে বলবো, আমিও মীরার যোগ্য নই।

—এ কথা সিসোদিয়ার মুখে মানায়?

—অন্য কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে মানায় না, কিন্তু অন্যদের থেকে তুমি আলাদা।

—আপনার মনে কোনো আক্ষেপ থাকবে না?

—একটুও না। তবে,—কথা শেষ না করেই থামলো কুমার ভোজরাজ।

—তবে কি?

ভোজরাজ চুপ করে রইলো।

—সঙ্কোচ করছেন কেন? বলুন। আমার গিরধরজীর সামনে মনের কথা লুকোতে নেই।

ভোজরাজ বললো,—বলছিলাম, যদি ওভাবে চলে যেতে হয়, তাহলে মনে খুব কষ্ট পাবো।

—হ্যাঁ, আমি জানি,—সহজ গলায় মীরা বললো।

—কি জানো?

—আপনি আমায় ভালোবেসে ফেলেছেন। যেই প্রথম দেখেছেন, অমনি ভালোবেসেছেন।

ভোজরাজ অবাক হোলো। এত অসঙ্কোচে, এত সহজভাবে আর দশটা সাধারণ কথার মতো একথা বলে ফেললো এই আঠারো বছরের অসাধারণ মেয়েটি, ভোজরাজের অভিজ্ঞতায় এ একেবারে নতুন। এত গভীর এই মেয়েটি, অথচ এত সরল।

এই সহজের ছোঁয়ায় ভোজরাজের মনও হয়ে গেল তেমনি। হেসে বললো,—তোমার কাছে গোপন করতে চাই না। তুমি ঠিকই বুঝেছো। কিন্তু কি করে জানলে?

মীরার মুখে ফুটে উঠলো হাসির আলো। বললো,—আমিও যে একজনকে ভালোবাসি। আমার মন, আমার অন্তর আমার সব কিছু দিয়ে ভালোবাসি।

হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল ভোজরাজের মুখখানি।

মীরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো কৃষ্ণের বিগ্রহকে। তারপর খুব মৃদু গলায় গুনগুন্ করে গাইলো,—

মেরে তো গিরধর গোপাল,
দুসরো ন কোই।
জাকে শির মোর মুকুট,
মেরে পতি সোই।।

চুপ করে রইলো ভোজরাজ।

মীরা তাকালো ভোজরাজের দিকে। তারপর খুব মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো—কি রকম লাগলো?

—কি?

—গান?

—কার রচনা?

—আমার।

—সত্যি।

—অন্য কারো গান তো আমি গাই না। আর তো কেউ বলতে পারবে না আমার মনের কথা।

ভোজরাজ হঠাৎ হেসে উঠলো।

—কি হোলো?—জিজ্ঞেস করলো মীরা।

ভোজরাজ হাসতে হাসতে উত্তর দিলো,—মেবারের ভাবী মহারাণা নিজের জন্যে কনে দেখতে এসে শুনছে সে আরেকজনকে ভালোবাসে, আরেকজন তার পতি, এবং তারপর তাকে অভিমত দিতে হচ্ছে তার গান সম্বন্ধে, ইতিহাসে কখনো এরকম হয় নি।

মীরাও হেসে উত্তর দিলো,—ইতিহাসে কি এরকমও কখনো হয়েছে যে মেবারের ভাবী মহারাণা একটি সাধারণ মেয়েকে এসে জিজ্ঞেস করছে সে তাকে বরণ করতে রাজী কি না?

—তুমি সাধারণ মেয়ে নও মীরা। তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি, তুমি

আমার মতো সামান্য লোকের জন্যে নও, তুমি ইতিহাসের।

—আপনি কি করে জানলেন?

—যে হবে মেবারের মহারাণী তার মনে এই দৃষ্টি থাকতে হয়। আমার পিতা রাণা সাঙ্গার কাছে এটুকু আমি পেয়েছি। ওঁর মনের দৃষ্টি অসাধারণ। উনি তো তোমায় দেখেন নি। শুধু তোমার কথা শুনেছেন তোমার পিতা রতন সিংজীর কাছে। কিন্তু উনি শুধু শুনেই তোমায় চিনে নিয়েছেন, তাই তোমাকে যুবরাজ-বধূ করবার জন্যে ওঁর এত আগ্রহ।

মীরা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো গিরধারীর বিগ্রহের দিকে। আর ভোজরাজের দিকে না ফিরেই বললো, —একটা কথা বলবো আপনাকে? আমার মধ্যে যেটুকু অসাধারণ সেটা হলেন উনি,—বলে দেখিয়ে দিলো বিগ্রহকে।

ভোজরাজ উঠে দাঁড়ালো। বললো, —রাণাজীকে গিয়ে বলবো, আপনি ঠিকই খুঁজে বার করেছিলেন এক অসাধারণ কন্যাকে, কিন্তু আমি তার যোগ্য নই।

এবার মীরাও উঠে দাঁড়ালো। বললে,—কুঁয়র-সা সেকথা কেন বলবেন?

—সত্যিকথাই তো বলছি।

—কুঁয়র-সা, যোগ্য হবার না হবার আপনি কে? আমার গিরধরজী যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনি তো আপনার মধ্যেও আছেন। আপনার মধ্যে দিয়ে তিনি যদি আমায় ভালো না বাসেন, তা-হলে কোত্থেকে আসবে আপনার মধ্যে এই ভালোবাসা, এই শ্রদ্ধা? আপনার মধ্যে দিয়ে তিনি আমার ভালোবাসা নেবেন, এবং আমার জীবনও ভরিয়ে দেবেন, তা নইলে তিনি আপনাকে এখানে নিয়ে আসবেন কেন?

ভোজরাজ তাকিয়ে দেখলো মীরার চোখের দৃষ্টি খুব স্নিগ্ধ। জিজ্ঞেস করলো,—রাণাজীকে গিয়ে কি বলবো?

—আমি যা বললাম সবই বলবেন। উনি মহান ব্যক্তি, উনি বুঝবেন।

—তাহলে তোমার অমত নেই?

—একটুও না।

—শুনেছি তুমি গিরধরজীর সেবা নিয়ে পড়ে থাকো সারাদিন। তোমার অসুবিধে হবে না?

মীরা বললো,—আমার গিরধরজীর সেবা কি শুধু মন্দিরে বসে বিগ্রহের পূজো আর ভজন গান? তার জন্যে অনেক লোক আছে। আমার মনই আমার গিরধরজী। আমার মন বলছে, মীরা, দেশের সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট। চারদিকে এত যুদ্ধ, এত দুর্ভিক্ষ, এত অন্যায়, এত অত্যাচার। রাজারা করে শুধু যুদ্ধ, রানীদের শুধু শৃঙ্গার। আমি চাই আপনি হবেন এমন রাজা, যার রাজ্যে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না, কোনো অন্যায় থাকবে না। সেই রাজার রানী হয়ে আমি যদি সাধারণ মানুষের সেবা করতে পারি, তাদের সুখী করতে পারি, তা হলেই বুঝবো আমার পূজো গ্রহণ করলেন আমার গিরধরজী।

ভোজরাজ আস্তে আস্তে দু হাত বাড়িয়ে দিলো মীরার দিকে। মীরা অসঙ্কোচে হাত দুটো নিয়ে নিলো নিজের দু'হাতের মধ্যে।

—তোমার আর আমার একই স্বপ্ন,—বললো ভোজরাজ।

—শুধু স্বপ্ন নয়,—বললো মীরা,—একই পূজো, একই সাধনা।

আজ তোমার কাহিনী লিখতে বসে সেদিনের সন্ধ্যার সেই ছবি আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমার মনের মধ্যে। কিংবদন্তী যাই বলুক, ইতিহাস বলে বড়ো মধুর, ভারী সুন্দর ছিলো তোমাদের প্রণয়, তোমাদের দাম্পত্য-জীবন। আমি জানি না, সংসার বিমুখ ভক্ত কাহিনীপরেরা কেন চেপে গিয়েছিলো তোমার জীবনের এই পরিচ্ছেদ, ওরা কেন রটিয়েছিলো যে তোমার স্বামীর সঙ্গে কোন বনিবনাও তোমার ছিলো না, তুমি অস্বীকার করেছিলে সংসারধর্ম পালন করতে, তুমি পূজো-অর্চা সাধন ভজন নিয়েই পড়ে থাকতে এই বাস্তব পৃথিবীর দিকে পেছন ফিরে। হয়তো ইতিহাসের এক অন্ধকার যুগে সমাজ-নেতাদের কঠোর নির্মম মন গৃহকন্যাদের জন্যে ঠাণ্ডা মার্বেলের তৈরী এক জীবনবিমুখ আদর্শের প্রতিমূর্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলো, এবং তার জন্যে ব্যবহার করেছিলো তোমার নাম।

আমি শুধু জানি, মনের চোখ দিয়ে আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি, পনেরো শ' ষোলো খৃস্টাব্দের এক সন্ধ্যায় মাড়ওয়ার দেশের মেড়তা শহরের ছোটো মহলের পূজোর ঘরে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ সুঠাম তরুণ এক সুদর্শন যার নাম ভোজরাজ। তুমি তার হাতদুটো তুলে নিয়েছো নিজের হাতের মধ্যে।

তোমাদের দু'জনার মাঝখান দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দেওয়ালের কাছে কৃষ্ণের একটি ছোটো বিগ্রহ, যেটি তোমার ছেলেবেলায় তোমায় দিয়েছিলো সন্ত রুইদাস।

পিলসুজের আলো কাঁপছে তোমাদের তিনজনের মুখের উপর।

আর ঠিক সেই সময় বৃন্দাবন ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণ শেষ করে আবার পুরীতে ফিরে গেছেন শ্রীচৈতন্য। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী মারা গেছে কয়েক মাস আগে। নতুন সুলতান হয়েছে ইব্রাহীম লোদী। কাবুলে বাবরের সঙ্গে এসে দেখা করেছে আজমীঢ়ের এক অভিজাত মুসলমান সওদাগর।

—রাণা সাঙ্গা বলছেন আপনি যদি হিন্দুকুশ পেরিয়ে গিয়ে সিন্ধু পর্যন্ত এলাকা নিজের দখলে আনেন, তিনি আপনাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন।

—কি ভাবে?

—সুলতান ইব্রাহীম লোদীর সঙ্গে ওঁর ভাই জৌনপুরের সুলতান জালাল খানের যুদ্ধ বেধে গেছে। রাণা সাঙ্গা পেছন থেকে আক্রমণ করে দখল করবেন দিল্লী থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল।

বাবর কিছুক্ষণ পায়চারী করলো।. তারপর বললো,—না, এখন নয়। এখনো সময় হয় নি।

—তাহলে কখন?

—আরো সাত আট বছর পরে।

॥ পাঁচ ॥

চিতোরগড়ে রাণীদের মহলে একটি ছোটো ঘরের ঝরোকায় দাঁড়িয়েছিলো কুমার ভোজরাজের মা, মহারাণী কুবরণবাঈ। অনেক নীচে বিরাট অঙ্গন। তারপর একটি প্রাচীর, সেখান থেকে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে নীচের দিকে। মাইলের পর মাইল বহু দূর অবধি দেখা যায় এখান থেকে। অনেক নীচে প্রশস্ত সবুজ সমতলভূমি চলে গেছে দিগন্তের দিকে।

এখান থেকে নদীটাকে দেখাচ্ছে রূপালী ফিতের মতো। সাঁকো পেরিয়ে চলে যাচ্ছে একদল অশ্বারোহী। ঠিক যেন ছোটো ছোটো পুতুল।

গম্ভীর মুখে তাকিয়ে দেখলো কুবরণবাঈ। তারপর একবার ঠোঁট কামড়ালো। একটা নিষ্ফল চাপা রাগ ফুটে উঠেছে মুখের উপর। ফর্সা মুখখানি রাঙা, তার খানিকটা মনের রাগ, খানিকটা সকালবেলার রোদ্দুর।

একজন পরিচারিকা এসে ডাকলো পেছন থেকে।

—মহারাণীজী, ঝালীজী তৈরী হচ্ছেন কুম্ভশ্যামজীর মন্দিরে পূজো দিতে যাওয়ার জন্যে। আপনি সঙ্গে যাবেন কি না জানতে চাইছেন।

—বলে দাও আমি যাবো না।

পরিচারিকা চলে যাচ্ছিল।

কুবরণবাঈ ডাকলো পেছন থেকে।

—শোনো।

সে ফিরে এলো।

—রাণাজীকে খবর দেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ মহারাণীজী।

—তাহলে এখনো আসছেন না ন?

পরিচারিকা কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—আচ্ছা যাও।

পরিচারিকা চলে গেল।

কেটে গেল কিছুক্ষণ। কুবরণবাঈ দাঁড়িয়ে রইলো ঝরোকায়। বাইরে মহলের অন্যান্য মেয়েদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালী যাচ্ছেন কুম্ভশ্যামের মন্দিরে পূজো দিতে। সঙ্গে যাবে অনেকেই। মহলে বেশ উৎসব।

রাণীদের মহলের ফটকে হঠাৎ নাকাড়া বেজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল বাইরের মেয়েদের কোলাহল। চারদিকে একটা সন্ত্রস্ত ভাব। মহলের ফটকে নাকাড়া,—রাণাজী আসছেন মহলের ভিতর।

কুবরণবাঈ ঝরোকা থেকে নড়লো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো আগেরই মতো।

মহলের খোজা মহলদার ভেতরে এসে বললো,—মহারাণীজী, রাণাজী আসছেন আপনার মহলে।

কুবরণবাঈ কোনো উত্তর দিলো না।

মহলদার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। সেই পায়ের আওয়াজ এসে ঢুকলো ঘরের ভিতর।

কুবরণবাঈ ফিরে তাকালো না। দরজার দিকে পেছন ফিরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঘোড়সওয়ারেরা সাঁকো পেরিয়ে আরো অনেক দূর চলে গেছে।

সামনে বিরাট আকাশ। অল্প অল্প মেঘ। রোদ্দুর একটু কড়া হয়ে উঠেছে।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে?

গুরুগম্ভীর শান্ত গলা। অনেক দূরে মেঘ ডাকার মতো।

কুবরণবাঈ কোনো উত্তর দিলো না।

—আমার সময়ের অনেক দাম। তুমি যদি আমার কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে না করো, আমি চলে যাচ্ছি।

কুবরণবাঈ না ফিরেই গম্ভীরভাবে বললো,—রতন সিংজী মেড়তা রওনা হোলো?

—হ্যাঁ।

—আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। ওরা খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। বেশ খুশী হয়েছে মনে হচ্ছে।

—রতন সিং আমার খুব স্নেহের পাত্র। ও আর ওর বড়ো ভাই বীরমদেব অনেক লড়াইতেই আমার পাশে পাশে ছিলো।

—তাই বলে একজন সর্দারের মেয়ে হবে মেবারের ভাবী মহারাণী?

—গরীব আহীরের মেয়েও মেবারের মহারাণী হয়েছে, এবং তার ছেলের মতো রাণা এ পর্যন্ত আর হয় নি।

—আমি আশা করেছিলোম রাজার মেয়ের সঙ্গেই ভোজরাজের বিয়ে হবে।

—রতন সিং রাজবংশের ছেলে।

—কিন্তু রাজা তো নয়।

—তাতেই আমার সুবিধে।

—কি সুবিধে?

—সব কথা আমি তোমায় বোঝাতে বাধ্য নই।

—ভোজরাজ আমার ছেলে। তার ব্যাপারে সব কিছু জানার অধিকার আমার আছে। সে সুখী হবে কি না, সেটা আমাকেই ভাবতে হবে।

—রতন সিং-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে ও সত্যিই সুখী হবে।

—আপনি কি করে জানেন?

—আমি জানি।

—সে বলেছে বুঝি? আমায় তো কিছু বলে নি?

—তুমি বুঝবে না বলেই বলে নি।

কুবরণবাঈ হঠাৎ ফেটে পড়লো। বলে উঠলো,—সে কি বোঝে? সে কতোটুকু জানে মেয়েদের সম্বন্ধে? মেবার রাজবংশের যোগ্য বধূ হওয়ার জন্যে কি কি গুণ থাকা দরকার সে

সম্বন্ধে তার কি কোনো ধারণা আছে? সে শুধু রূপ দেখে ভুলেছে, গান শুনে ভুলেছে।

রাণা সাঙ্গা একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

কুবরণবাঈ বলে গেল,—ওখানেই আমার আপত্তি। মীরা নাকি সারাদিন মন্দিরে পড়ে থাকে আর ভজন গায়।

—কে বললো সারাদিন?

—শুনেছি।

—কার কাছে?

—সে কথা আমি জানাতে বাধ্য নই। তবে একথা সবাই শুনেছে।

—আমি জানি তুমি কার কাছে শুনেছো। তোমার বাপের বাড়ির লোকেদের কাছে। সোলাঙ্কিরা যে রাঠৌরদের পছন্দ করে না আমি জানি। তোমার বাবা রায়মলজী সোলাঙ্কির ইচ্ছে ছিলো সোলাঙ্কি পরিবারের একটি মেয়ে দেয় ভোজরাজের হাতে। তোমার মারফতে গোদওয়ারার সোলাঙ্কিরা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ওরা ভাবছিলো যদি ভোজ-রাজের উপর পাবে।

—এসব তোমার মনগড়া কথা। সে তুমি যাই বলো, মন্দিরে বসে কৃষ্ণের ভজন গায় এমন একটি মেয়ে মেবারের যুবরাজবধূ হলে আমাদের কি লাভ হবে, আমি বুঝতে পারছি না।

রাণা সাঙ্গা উত্তর দিলো,—মীরা শুধু ভজন গায় তা নয়, সে ঘোড়ায়ও চড়ে, তীরও ছোঁড়ে, তলোয়ারও ধরতে জানে। সে যে শুধু নাচ-গান শিখেছে তাই নয়, ইতিহাস ও রাজনীতিতেও সে খুব ভালো শিক্ষা পেয়েছে ওর পিতামহ রাও দুদাজীর কাছে। এমন একটি মেয়ে রাণী হলে এদেশের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যাবে।

কুবরণবাঈ বললো,—আমি ইতি-হাসও জানি না, রাজনীতিও বুঝি না। তাতে আমার বা মেবারের কোনো ক্ষতি হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। রাজত্ব করে রাজা,—রাণী নয়।

—রাজ্যটা মেবার বলেই তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু যে রাজ্যের উপর ভোজরাজ রাজত্ব করবে, সেটা সারা হিন্দুস্তান, গঙ্গা থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত, নর্মদা থেকে হিমালয় পর্যন্ত। তার জন্যে নতুন ধরণের রাণী চাই।

—হিন্দুস্তানের উপর রাজত্ব শুধু ভোজরাজ করবে? আপনি করবেন না?

এবার একটু ম্লান দেখায় রাণা সাঙ্গার হাসি। উত্তর দিলো,—আমি? না বাঈ-সা, আমি বোধ হয় করবো না। করলেও বেশীদিন নয়। আমার জীবন যুদ্ধ করেই কেটে যাবে, যুদ্ধ করতে হবে যাতে আর যুদ্ধ না হয়, অন্তত দু-তিন পুরুষ পর্যন্ত। আমি গড়ে যেতে চাই এমন একটি হিন্দুস্তান, যেখানে সাধারণ লোকের মনে আর যুদ্ধের ভয় থাকবে না, কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না। আমি রাজ্য তৈরী করে দিয়ে যাবো। ভোজরাজ সে রাজ্য সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে। তাই দরকার মীরার মতো একটি রাণী, যে ভালোবাসতে জানে।

বাঁকা হাসি দেখা দিলো কুবরণ-বাঈ-এর মুখে।

—আমরা ভালোবাসতে জানি না?

জানো?—রাণা সাঙ্গা হেসে উঠলো। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো,—মীরা সবাইকে ভালো-বাসতে জানে। তোমরা সেটা জানো না।

কুবরণবাঈ ঠোঁট কামড়ালো। বললো,—বেশ আমি এখন আর কিছু বলবো না। পরে দেখা যাবে।

একথার কোনো উত্তর দিলো না রাণা সাঙ্গা। কিছুক্ষণ নিজের মনে পায়চারী করলো ঘরের ভিতর। তারপর ঝরোকার কাছে কুবরণ বাঈয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো, তাকিয়ে দেখলো আকাশের দিকে, দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে। চিতোরগড়ের উপর থেকে চারদিকে তাকালো—মনে হয় যেন মেঘের উপর বসে নীচের পৃথিবীকে দেখছি।

তারপর কুবরণবাঈয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো রাণা সাঙ্গা। বললো,—অনেক কারণে মীরাকে কুলবধূ করে আনছি। সব কারণ তোমাকে বলবো না। বললেও বুঝবে না। তবে একটা খুব স্থূল কারণ যেটা তোমার মস্তিষ্কে সহজে প্রবেশ করবে সেটা শুনতে পারো।

কঠিন হয়ে গেল কুবরণবাঈয়ের মুখ। কোনো উত্তর দিলো না।

রাণা সাঙ্গা বলে গেল,—আমাকে আরো বড়ো হতে হবে, আরো বাড়াতে হবে আমার ক্ষমতা। সব রাজপুতকেই আমার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তা নইলে দিল্লী জৌনপুর ও গুজরাটের সুলতানদের আমি যুদ্ধে হারাতে পারবো না। কিন্তু রাজপুতদের মধ্যে প্রধান হওয়ার সব চেয়ে বড়ো বাধা মাড়ওয়ারের রাঠৌরেরা। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। তাতে আমাদেরই শক্তি ক্ষয় হবে। রাঠৌরদের মধ্যে এখন খুব গোলমাল। রাও জোধার ছেলে রাও বীকার নেতৃত্বে একদল রাঠৌর আলাদা হয়ে বিকানীর রাজ্যের পত্তন করেছে। রাও সাতলের অনু-গামীরা সরে গেছে সাতলমীরে। জোধ-পুরের রাও গঙ্গার সঙ্গে ওদের সদ্ভাব নেই। মেড়তার রাঠৌরদের মেয়ে আমাদের ঘরে এলে মেড়তীয়া রাঠৌর-রাও কোনোদিন আর জোধপুরের পক্ষে যাবে না। এতে জোধপুর একলা হয়ে যাবে। তবে রাও গঙ্গাকে এখন আমি চটাতে চাই না। তাই স্থির করেছি, ওর বোন ধনবাঈকে আমি বিয়ে করবো।

ধনবাঈকে?—কুবরণবাঈ বাঁকা হাসি হাসলো,—সিসোদিয়া রাণার ঘরে যে রাঠৌর-কন্যার ভিড় লেগে যাচ্ছে।

—না, সব রাঠৌর-কন্যা নয়। আরেকটি হাডা কন্যা আসছে বুঁদী থেকে। রাও নরবদ সিং হাডার মেয়ে কারমেতনবাঈ।

আমাদের সুরজমল হাডার বোন? —জিজ্ঞেস করলো কুবরণবাঈ।

—হ্যাঁ।

—কার জন্যে?

—আমার জন্যে। আমিই বিয়ে করছি কারমেতন বাঈকে।

ক্রমশ।

বৃহৎ তন্ত্রসার / বসুমতী
(প্রথম খণ্ড)

তন্ত্রশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় স্বরূপ এই গ্রন্থের মাধ্যমে বোদ্ধা পাঠক, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চবিধ সম্প্রদায়েরই মর্মকথা অবগত হবেন। তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্রসাগর মন্থন করে এই রত্ন সমুদ্ধার ও সঙ্কলন করেছিলেন। অনিবার্য কারণবশত তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত ও নিঃশেষিত হওয়ার পর বহুদিনাবধি এই অমূল্য গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি কাজেই বিলম্বে হলেও এই সুমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণটির আত্মপ্রকাশ যে বিশেষ রূপেই উল্লেখযোগ্য তা বলা বাহুল্যমাত্র। দেবদেবীর উপাসনাই চতুর্বর্গলাভের মূল কারণ, কিভাবে উপাসনা করলে উপাসকের অভীষ্ট লাভ হয় আলোচ্য গ্রন্থে তারই বিধিবদ্ধ নিয়মাদি প্রদত্ত হয়েছে। যে পঞ্চবিধ সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বে, সেগুলির উপাস্য দেবদেবীর মন্ত্র-অর্চনাবিধি ও উপাসনা পদ্ধতি এই মহাগ্রন্থের মাধ্যমে বিবৃত। সকল সম্প্রদায়ের মানুষই যে বর্তমান গ্রন্থটি হাতে পেয়ে উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যকামী। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। সঙ্কলয়িতা—শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, প্রকাশনা—বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—পনের টাকা।

যাত্রাগানে রামায়ণ /
মিত্র ও ঘোষ

অজের চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন অনন্য কথাশিল্পীও ছিলেন, এ সত্য সকলেরই জানা, আলোচ্য রচনাটিও সেই ধারাবাহী। যাত্রাগানের পালার ছকে ফেলে রামায়ণকে এক নতুন রূপে প্রতিভাত করতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক বর্তমান গ্রন্থে। এই পালা গানের শৈলী এককথায় অনবদ্য। বস্তুত এই শৈলীর প্রসাদেই যাত্রা গানের প্রাণসত্তা এখানে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত। অবনীন্দ্রনাথ রেখা ও লেখার অদ্বিতীয় যাদুকর, তাঁর ভাষায় এমন একটা স্বচ্ছতা আছে যা সহজেই বিষয়-বস্তুর বক্তব্যকে পাঠকের মনে উপস্থিত করে দিতে পারে অবলীলাক্রমে। অবশ্য বর্তমান রচনার যে বক্তব্য তা তাঁর নিজস্ব নয় তা রামায়ণের কিন্তু সেই বক্তব্যটিই সরাসরি পাঠকের সামনে হাজির করে দেওয়ার মুন্সীয়ানাটুকু একান্তই তাঁর নিজস্ব। যাত্রাপালার মূল সুর ধ্বনিত এই রচনার প্রতি ছত্রে, আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির অন্যতম বিশিষ্ট ধারক হিসাবে যাত্রাগানের নাম চিরকালীন হয়ে থাকবে; লোকসংস্কৃতির প্রগাঢ়তম সমজদার অবনীন্দ্রনাথ একথা জানতেন ও মানতেন। বর্তমান রচনাটি সেই স্বীকৃতিরই সার্থক ফসল। এই মূল্যবান রচনাটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রকাশক সংস্থাকে বিশেষভাবেই ধন্যবাদ জানাই। প্রচ্ছদশিল্প রুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—ন' টাকা।

দর্শকের ভূমিকায় / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

সহজাত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ভঙ্গীতে কাহিনী পরিবেশন করেছেন জনপ্রিয় লেখিকা নায়ক চিরন্তন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত এক যুবক, নিজের পরিবার ও আশেপাশের পরিচিত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জীবনে বর্তমান সমাজের পটভূমিতে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কারণ নির্ণয়ে সে ব্যস্ত। সব সমস্যাকেই সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ছকে ফেলে সে বিচার করতে চায় এবং সে কারণেই সর্বাঙ্গীণ হতাশা তার মনকে ছেয়ে ফেলে ধীরে ধীরে। চিরন্তনের ভূমিকাও তাই চিরকালীন এক দর্শকের। জীবনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বও প্রতিভাত তার মানস-চেতনায়। বলা বাহুল্য এ ধরণের মানুষের পক্ষে সুখী হওয়া প্রায় অসম্ভব, চিরন্তনও তা জানে, নিরপেক্ষ দর্শকরূপেই তাই সে উপস্থিত কাহিনীর মাঝে। বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে বহু খণ্ড কাহিনীর সংযোগে—যার প্রতিটিই লেখিকার বাস্তবসচেতন মনের পরিচয়-বাহী। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা—আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশনায়—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

পূর্ব-পাকিস্তান / আনন্দধারা প্রকাশনী

আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক পূর্ব-পাকিস্তানের একটি বিরাট চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। দেশ ব্যবচ্ছেদ হলো, স্বাধীনতা লাভ করলো, কিন্তু মারামারি, কাটাকাটি এবং সাম্প্রদায়িকতা দূর হলো না। এই বিরাট জাতি এবং দেশ যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিভক্ত হলো, তা সার্থক হয়নি। উদ্দেশ্য সফল হতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক সমস্যাই বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক

অধিকার, মানুষের অধিকার এবং শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত সমাজের অধিকার সেখানে অবলুণ্ঠিত হয়েছে। তার কোনটাই সফল হয়নি। ধর্ম, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীর উর্ধ্বে রাষ্ট্রকে স্থান দিতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত ও পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেই তা সফল হয়নি। ভারতে তবু ধর্মনিরপেক্ষতা লক্ষ্য করা যায় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচলিত, যার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মূল অধিকারগুলি এখানে আমাদের করায়ত্ত। কিন্তু দশ বছরের অধিককাল পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুবশাহীর একনায়কত্ব চলেছিল। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অধিকার মুছে গেছে। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। পাঞ্জাবীদের আধিপত্য পশ্চিম-পাকিস্তানে এবং পূর্ববাংলা শাসন ও শোষণের একটি উপনিবেশমাত্র। পূর্ববাংলা আজ বিদ্রোহের পথে। লেখক পূর্বপাকিস্তানের নেতা ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে এই সব বিরাট তথ্য সংগ্রহ করেছেন—যা হয়ে উঠেছে সার্থক ও সম্পূর্ণ। ভূমিকা লিখেছেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত হয়েছে। বিদগ্ধ পাঠকসমাজে বইটি আদৃত হবে আশা রাখি। লেখক—শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত। প্রকাশক : আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—ষোল টাকা।

শ্যামাপ্রসাদ / জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান এই বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার আছে, আলোচ্য গ্রন্থটি সে বিষয়ে সহায়করূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। শ্যামাপ্রসাদের অনতিদীর্ঘ জীবন বৈচিত্র্য ও ঘটনাপূর্ণ, এমন সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে যাতে তাঁর ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ সক্রিয়। এই সব ঘটনাবলীর সম্যক আলোচনা দ্বারা লেখক শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ এই মহামানবের জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে গ্রন্থটি পাঠ করলে। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যকামী। প্রচ্ছদ নির্বাচিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—বীরেশ মজুমদার, প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, প্রাঃ, লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩, দাম—পাঁচ টাকা।

হো চি মিন / কিশোর সাহিত্য সংঘ।

ভিয়েৎনামের অবিসংবাদী নায়ক হো চি মিনের এই জীবন কথা শুধু জীবনী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্তই নয় এ এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের ইতিহাসও বটে। এর কারণ হো চি মিন ও ভিয়েৎনাম পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত। প্রখ্যাত এ বিপ্লবী বীরের প্রাণসত্তা হল দেশপ্রেম, দেশকে ভালবাসার জন্য সারা জীবন দুঃখের আগুনে পুড়েছেন হো চি মিন, হেঁটেছেন কণ্টকসমাকীর্ণ পথে, আর এইভাবে চলতে চলতে একদিন নিজেরও অজ্ঞাতসারে কখন যেন পরিণত হয়েছেন খাঁটি সোনায়। এই রচনার ছত্রে ছত্রে উঁকি মারছে সেই সোনার ঝিকিমিকি। রাজনৈতিক মতবাদ যার যেমনই হোক না কেন, জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে মহিমা এই রচনার মাধ্যমে বিধৃত তাকে সম্মান না করে পারা যায় না। সার্থক বিপ্লবীর সফল জীবনায়ন হিসাবেই গৃহীত হওয়ার দাবী রাখে এই রচনা আমরা গ্রন্থটিকে স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বাদল চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—কিশোর সাহিত্য সংঘ, ৭৩, স্বামীজী সরণী, কলিকাতা—৪৮, দাম—৫'৫০।

মধু কুঞ্জ / বাক্ সাহিত্য।

আলোচ্য রচনার বিষয় বস্তুতে মৌলিকত্বের ছাপ আছে। প্রবাসী এক যুবকের সঙ্গে বিদেশিনী বান্ধবীর টেলিফোনালাপের মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে সমগ্র কাহিনীটি। বর্তমান দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লেখক নিউইয়র্ক শহরকে বেছে নিয়েছেন উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে, সেখানে এক বাঙালী পুরুষ ও এক আমেরিকান রমণীর সামান্য পরিচয় ঘটেছিল একদিন, পরে তারই সূত্র ধরে তিনদিন, তিনবার টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের হৃদবিনিময় ঘটলো। তারা জানলো একে অন্যকে শুধু কথার বিনিময়ে, তবু তাতেই জানা হল সব পাওয়া হল সব। পরিবেশন করার বিচিত্র ভঙ্গীর জন্য স্বল্প পরিসর কাহিনীটিকে আকর্ষণীয় বলেই মনে হয়। লেখকের মন্সিয়ানা চোখে পড়বার মত। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—চাণক্য সেন, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র / সারস্বত লাইব্রেরী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত বাঙালী ইতিহাসবেত্তা ও বৈজ্ঞানিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম সুধী সমাজে অপরিচিত না হলেও, সাধারণ পাঠক তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। আলোচ্য গ্রন্থটি এই কৃতী পুরুষেরই জীবনায়ন। সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে জীবন কথাটি পরিবেশন করেছেন লেখক। গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত হওয়ার যোগ্য। লেখক—ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, প্রকাশক—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধানসরণী, কলিকাতা—৬ দাম—তিন টাকা।

অসংলগ্না / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা: লি:

এই গ্রন্থের নামায়ন সার্থক বলতে হয়, বুদ্ধিজীবী প্রৌঢ় এক ভদ্রলোকের অসংলগ্ন চিন্তাধারাকে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক গ্রন্থোক্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে। লেখকের স্বকীয় জীবনদর্শন প্রতিফলিত এই রচনায়, মানুষের মন কত বৈচিত্র্যে ভরা তারও একটা আভাস পাওয়া যায়। লেখকের অনবদ্য শৈলী তাঁর রচনাকে দিয়েছে অনন্যমহিমা। সাহিত্যে মিস্টিসিজমের যাঁরা ভক্ত তাঁদের কাছে আলোচ্য রচনাটি উপাদেয় বলেই পরিগণিত হবে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—বনফুল, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

মন মধুচন্দ্রিকা / প্রকাশ ভবন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প সঙ্কলন। মোট দশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এতে। লেখক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, তাঁর রচনায় এমন একটা বর্ণাঢ্য স্নিগ্ধতা আছে যা সহজেই মনকে টানে, আলোচ্য গল্পগুলিও এই প্রসাদ-গুণ থেকে বঞ্চিত নয়। প্রায় প্রতিটি গল্পই সুখপাঠ্য হলেও 'ভুল ভুলাইয়া' ও 'মনমধুচন্দ্রিকা' নামের গল্প দুটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। মানুষের মনের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক উক্ত গল্প দুটির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত। ভুল ভুলাইয়ায় নারীমনের যে দিকটির আবরণ উন্মোচন করে ধরেছেন লেখক তা যেমন আশ্চর্য তেমনি কৌতূহলপ্রদ, মনে হয় পুরাকালের কোন এক বীর্যশুল্কা রমণীর উপাখ্যান পড়ছি। নারীমনের গহনে পুরুষের অপরাজেয় পৌরুষ সম্বন্ধে যে দুর্বলতা চিরকালীন, তারই প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন লেখক, এই গল্পের মাধ্যমে। 'মনমধুচন্দ্রিকা' স্নিগ্ধ মধুর এক প্রেমের আখ্যান। যে প্রেম চিরবিরহের মাঝে অমলিন দীপ্তিতে বিরাজিত তারই ছবি আঁকা হয়েছে আলোচ্য গল্পটির সাহায্যে। গল্পের বেদনাবিধুর পরিণতি বিশেষ ভাবেই নাড়া দেয় মনকে। লেখকের রোমান্টিক মনটিরও ছায়া প্রতিভাত এই রচনায়। লেখকের শৈলী. এই ধরণের সংবেদনশীল কাহিনীর পক্ষে বিশেষভাবেই উপযোগী। আমরা এই গল্পগ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রমণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনা—প্রকাশভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—পাচটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দ্বিধা / মিত্র ও ঘোষ

জীবনধর্মী এই কাহিনীর প্রতি ছত্রে মানুষের আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনা ও সুখ-দুঃখে ভরা জীবনের কথা বিধৃত। সাধারণ মধ্যবিত্ত তরুণ দম্পতী অরুণ ও শিখা পরস্পরকে ভালবেসে ওরা চায় সুখী হতে, চায় সফল হয়ে উঠতে। কিন্তু চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব যে চিরকালীন, কাজেই তরুণ ও শিখাও থেকে যায় অতৃপ্ত, অতীতের গহ্বর খুঁড়ে উঠে আসা চাপা দেওয়া সত্যের প্রেত তাড়া করে বেড়ায় শিখাকে এবং কিয়দংশে অরুণকেও। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে জীবনের চরম সত্যকে; সে সত্য হল মানবিকতা, বোধ। 'সবার উপর মানুষ সত্য'—এই মহামন্ত্রকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পর সমস্ত দ্বিধা কেটে যায় শিখার; নিজের চরম কলঙ্ককাহিনীও অকম্পিত হৃদয়ে সে তুলে ধরে তার স্বামী তার দয়িত অরুণের চোখের সামনে। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অরুণও হাত ধরে শিখার, সত্যের আলোয় কেটে যায় তাদের যুগ্ম-জীবনের সমস্ত অন্ধকার। এক অভূতপূর্ব জীবনবোধের আস্বাদে স্বাদু হয়ে উঠেছে গ্রন্থোক্ত কাহিনী। লেখক যে কতটা বাস্তবসচেতন শিল্পী তা উপলব্ধি করা যায়, উপন্যাসটি পাঠ করলে। আমরা এই গ্রন্থকে সাদর স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—সাত টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের মানসকন্যা / হিন্দুস্থান লাইব্রেরী

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদামাতার মানসকন্যা ও মন্ত্র শিষ্যা, সন্ন্যাসিনী দুর্গাপুরী দেবীর জীবন-কথা বিধৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘমাতা শ্রীশ্রীসারদামাতার লীলাসঙ্গিনী ও পরম স্নেহাস্পদা কন্যাপ্রতিমা, আজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে লোকহিতার্থে কর্ম করে গেছেন, তাঁর পুণ্য জীবনকথা জানবার আগ্রহ অনেকেরই আছে, বর্তমান রচনাটি সেই কারণেই মূল্যবান বলে গণ্য হবে। দুর্গাপুরী দেবীর জীবনের অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর সমাবেশে রচনাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে, সাধক ও ভক্ত পাঠকমাত্রই যে এই গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, এ এ আশা আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বি বেটা, প্রকাশক—শ্রীবিমল পাল, ২৭।১ এফ, জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা—৩৭, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গল্প লেখা হল না / প্রকাশ ভবন

কয়েকটি সুমধুর গল্পের এই সংগ্রহটি হাতে পেয়ে ছেলে বুড়ো সকলেই খুসী হয়ে উঠবেন। মোট দশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই সঙ্কলনে। গল্পগুলি সরস ও সুখপাঠ্য, কোন রকম সমস্যায় জর্জরিত না হওয়ায় ভারি একটা মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় এগুলির রসাস্বাদন করলে। আমরা এই গল্পগ্রন্থটি হাতে পেয়ে সুখী হয়েছি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি, লেখক—চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশক—প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দুই টাকা।

শামিলো / বাক্ সাহিত্য

সেটারে বহু বজনীর অভিনয়ধন্য আলোচ্য নাটিকাটির নাম সকলেরই সুপরিচিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার এক বিশেষ দিক নিয়ে গড়ে উঠেছে এর বিষয়বস্তু। বর্তমানে বিবাহ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তি ক্রমবর্ধমান এই নাটিকের মূল উপজীব্য সেটাই। এক বর্ধিষ্ণু বাঙালী পরিবারে বধূ এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে, পরিবারের কর্তা গৃহিণী তাতে বিচলিত, এবং বোধকরি কিছুটা বিভ্রান্তও। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বত্র সমান সেই সত্যই শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছে দক্ষিণীবধূ শুভলক্ষ্মীর কল্যাণী রূপটির মধ্যমে। রচনা নাট্যরসাশ্রিত ও সাবলীল। নাট্যকারের লেখনীতে মুন্সিয়ানার ছাপ আছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রকাশনায়—বাক্‌সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

খেলার রাজা ফুটবল /
জ্ঞানতীর্থ

খেলাধুলাকে সাহিত্যের উপজীব্য করে তোলার প্রচেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে, এবং ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রসোত্তীর্ণ রচনা আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান গ্রন্থটিও সেই ধারার বাহক। ফুটবল বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া, আলোচ্য গ্রন্থে ফুটবল সম্বন্ধেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে: প্রায় একশোবছরের ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে এই রচনার মাধ্যমে। বাংলার স্বদেশাত্মক আন্দোলনেও যে ফুটবলের একটা নিজস্ব ভূমিকা রয়ে গিয়েছে সে কথা জানাতেও ভোলেননি লেখক। বস্তুত ফুটবল সম্বন্ধে প্রামাণ্য ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করে এই জনপ্রিয় খেলার নানাদিকে আলোকসম্পাত করে দেখানো হয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায়, রচনার আকর্ষণ আরও বেড়ে গিয়েছে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—জ্ঞানতীর্থ, ১, বিধান সরণী, কলিকাতা—১২, দাম—পাঁচ টাকা।

বিমোহিত সমর্পণ

আইভি রাহা

ভীড় করে ছিল কতজন ; সারাক্ষণ—
        চারিপাশে সমস্ত জীবন ;
সরে সরে গেছি শুধু, নিরুত্তাপ—নিরুত্তর
        কখনও ভাবে নি মন
ওরই মাঝে হবে কেউ প্রিয়জন
        হবে কেউ একান্ত আপন
কিন্তু যেদিন সন্ধ্যার ধূপছায়া
এনে দিল অন্য দুটি চোখ, সম্মুখে আমার—
আকম্পন। নির্নিমেষ। যার মাঝে নিমজ্জিত, নিয়ন্ত্রিত
রাশি রাশি নিরুচ্চার অকথিত বেদনার ভার।
        নির্জন নিমেষ—
বিস্মৃত নিজেকে আমি, বিমূঢ় আবেশ।
ওই দুটি অচঞ্চল দৃষ্টির গভীরে
দিনান্তের রশ্মিসম নির্দ্বিধায় ধীরে
ভীড়িতে চাহিল তরী আশ্বাসের তীরে।
        এত দিনে নির্বাপণ?
চাইলো কি তেজদীপ্ত, মৌনময় সমুন্নত মন?
        চাইলো কি সমর্পণ?
বিস্ময় হলো না তাই আর এ মন
        নিস্পৃহ, উদাসী, নির্মম?

শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্ধান

এই শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কিছু আগে মহারাষ্ট্রে ও বাঙলা দেশে ইংরাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি সুরু হয়ে গিয়েছিল অতি গোপনে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে।

শ্রীঅরবিন্দ সেই সময় বরোদায় থাকতেন।

বরোদার মহারাজা সায়জী রাও গায়কোয়াড়ের অতি প্রিয়পাত্র, তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজের সহকারী শিক্ষক যুবক অরবিন্দ ঘোষ আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। শ্রীঅরবিন্দের পিতা ছিলেন ডাক্তার কে ডি ঘোষ, বিলাতে জ্ঞানডন চিকিৎসক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রায় শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত বিলাতেই কাটিয়েছেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, একবার আই সি এস পরীক্ষাও দিয়েছিলেন; কিন্তু সাহেবিয়ানা বা আভিজাত্যের উগ্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল না, উপরন্তু তিনি ছিলেন, নিষ্ঠাবান পরম হিন্দু, ধীর শান্ত, স্বল্পবাক্, আত্মসমাহিত। কিন্তু এই ব্যক্তির অন্তরে ছিল মহাগ্নি।

সে বিষয় দু'একজন ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে ইনিই সশস্ত্র সংগ্রাম করে ভারতের উৎপীড়ক ইংরাজ-শক্তি ধ্বংস করবার একজন প্রয়াসী ও প্রধান উদ্যোগী।

মহারাষ্ট্রের বিপ্লবপন্থী নেতা ঠাকুর-সাহেবের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের হৃদ্যতা হয় বরোদায় থাকা কালে,—এই দু'জন মহান ব্যক্তির মধ্যে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের বিষয় আলাপ-আলোচনা হত অতি গোপনে। মহারাষ্ট্রের তরুণরা দলে দলে ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ বাঙলার তরুণদের কথা চিন্তা করলেন। তিনি শুনেছেন বাঙলাদেশেও বিপ্লব-প্রস্তুতি চলেছে, ঐ স্থানে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসবাদ প্রচারের জন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্নেহভাজন, বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত ও সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, বরোদা মহারাজের দেহরক্ষী, বাঙালী যুবক যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকে বাঙলা দেশে যেতে নির্দেশ করলেন।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ইতিমধ্যে বাঙলা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচার ও প্রস্তুতি বেশ এগিয়েছিল, বহু যুবক এই কাজে গোপনে যোগ দিয়েছে। নেতা ছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র, ভূপেন দত্ত, সুবোধ মল্লিক প্রমুখ। যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের সহযোগে ঐ কাজ দ্রুত প্রসারিত হতে লাগল।

কিন্তু সুদূর বরোদা-রাজ্যবাসী শ্রীঅরবিন্দ বাঙলা দেশের গুপ্ত বৈপ্লবিক কাজের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারেন না, চিঠিপত্রে সে বিষয় আলোচনা চলে না, উচিত নয়—বিশেষ গোপনীয় ব্যাপার, এ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, শুধু শাসকরা নয় দেশবাসীও অনেকে শ্রীঅরবিন্দ আগ্রহান্বিত হ'য়ে থাকেন জানতে চান—বাঙলা দেশ কতদূর অগ্রসর হল।

সংবাদটা পেলেন বরোদাতেই, ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে; ভগিনী নিবেদিতা শুধু জানালেন না, তিনি শ্রীঅরবিন্দকে ঐ কাজে নেতৃত্ব করবার জন্যে বাঙলায় আসতে বললেন আহ্বান জানালেন।

ভগিনী নিবেদিতার আহ্বানের কথা চিন্তা করতে করতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রতি ভালভাবে দৃষ্টিপাত করছিলেন, ইনি বিদেশীয়া কুমারী কন্যা নয়—যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা—একটি সিংহ-বালিকা। তিনি শুনেছিলেন, ইনি একজন আইরিশ বিদূষী তাঁর দেশে 'সিনফিন' বা স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটি প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন

চিত্র : প্রবীরকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ

পরে তাঁর গুরু—স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ও ভারতের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসেছেন।

ভগিনী নিবেদিতাও শ্রীঅরবিন্দকে ভাল করে লক্ষ্য করছিলেন,—কৃশতনু দিব্যজ্যোতিপূর্ণ ব্যক্তিটি একটি প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি—। এই সাক্ষাৎ বরোদাতেই হয়েছিল, অতি গোপনে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে।

নিস্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশ। ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে বললেন,—'আমি ভারতের বিপ্লব-যজ্ঞের একজন উৎসাহদাতা—আপনি বাঙলায় আসুন, বাঙলা দেশ প্রস্তুত হয়েছে। শীঘ্রই সেখানে আগুন জ্বলে উঠবে। আমি ঐ কাজে আপনার পাশেই থাকবো।'

সংসার-ত্যাগী, সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যার মুখ হ'তে ঐ কথাগুলো শুনে প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ দারুণভাবে বিস্মিত হলেন, কিছুক্ষণ চিন্তার পর মহামানব সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্যার অন্য রূপেরও সন্ধান পেলেন।

বরোদা রাজ্যের প্রায় আটশত টাকা বেতনের সম্মানজনক পদ ত্যাগ করে শ্রীঅরবিন্দ বাঙলা দেশে এলেন।

বৈপ্লবিক কাজে বাঙলা দেশ ইতিমধ্যে কিছু গড়ে উঠেছিল সত্যই। শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় রাজশক্তি উচ্ছেদের প্রস্তুতি ও প্রচারের কাজ দ্রুত গতিতে সুরু হ'ল।

দল সংগঠন বা অর্থের জন্য নেতাদের বিশেষ বা বেশী দিন চেষ্টা করতে হয়নি, বাঙলা দেশের নরনারীর অন্তরে অন্তরে বিপ্লবাগ্নি জ্বলে ছিল 'বঙ্গভঙ্গ' উপলক্ষ করে। গোপনে কিছু অর্থ পেয়েছিল বিপ্লবীরা।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টা শুধু বাংলা দেশ নয়, ভারতের সর্বপ্রদেশের সর্বদলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের ও আন্দোলনের সৃষ্টি করল।

বাঙলার বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণরা ইংরাজ-শক্তির বিরুদ্ধে চরম আঘাতের জন্য প্রস্তুত হল। গোপনে গোপনে মাণিকতলার বাগানে অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা-বারুদ জমা হতে লাগলো—বাঙালী তরুণরা রণকৌশল শিক্ষা করতে সুরু করলেন।

কিন্তু প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার আগেই অকস্মাৎ ঐ গোপন প্রচেষ্টা প্রকাশিত হয়ে গেল, এর ফল দেশের পক্ষে অতি শোচনীয় হ'লেও ইংরাজ শক্তি বুঝলে—দেড়শত বৎসর অত্যাচার-উৎপীড়নে ও শোষণে ভারত আজও মরে নি।

ভারতের বিদেশীয় শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম শস্ত্র নিক্ষেপ করলেন—বাঙালী তরুণ ক্ষুদিরাম। ঘটনাটা মজঃফরপুরে হলেও সারা ভারত কেঁপে উঠলো।

ঐ সংবাদ কলকাতায় পৌঁছুলেই শ্রীঅরবিন্দ মাণিকতলার কর্মীদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন, সতর্ক হবার জন্যে।

বারীন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীরা রাত্রের গভীর অন্ধকারে তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে লাগলেন, কিন্তু ঐ কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই দেখা গেল—সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঐ বাগান দৃঢ়ভাবে বেষ্টন ক'রে ফেলেছে।

বারীন্দ্র ও তাঁর দলের প্রায় ত্রিশজন তরুণ বিপ্লবী ঐ বাগানের মধ্যে পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন।

শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হল তাঁর গ্রে স্ট্রীটের বাসা থেকে।

এরপর চললো সেই ঐতিহাসিক মাণিকতলার বোমার বিচার—আলিপুর কোর্টে।

বিচার আরম্ভের প্রথম হতে গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর শামসুল আলম ও গভর্ণমেণ্ট পক্ষের উকীলরা শ্রীঅরবিন্দকে প্রধান আসামী ব'লে আদালতে প্রমাণ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

আর ছোট নেই

চিত্র : দুর্গা দে

শ্রীঅরবিন্দ নিরীহ, গভর্নমেন্টের উকীলরা দক্ষ, গোয়েন্দা পুলিশরা অত্যুৎসাহী। ইংরাজ সরকার তাঁকে চরম শাস্তি দেবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শ্রীঅরবিন্দ নিঃস্ব, উচ্চ স্তরের উকীল নিযুক্ত করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, কয়েকজন সদাশয় দেশবাসী অতি গোপনে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাঁর মোকদ্দমা পরিচালনার যে ব্যবস্থা করলেন তা সামান্য বলা যায়। কোন বড় উকিল শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করতে রাজী হলেন না ঐ সামান্য অর্থের বিনিময়ে।

মোকদ্দমা চলতে লাগলো। কিন্তু এভাবে চললে শ্রীঅরবিন্দের প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। গভর্নমেন্টের চক্ষে শ্রীঅরবিন্দই বাংলার বিপ্লবের প্রধান নায়ক। সেই জন্য তাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে চরম শাস্তি দিতে চায়। তাঁর বিরুদ্ধে দেশী বিলাতী শীর্ষ শ্রেণীর উকীল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেছে, সি-আই-ডি পুলিশরা সত্য-অসত্য দু'পক্ষই ধরেছে, প্রমাণ করা চাই শ্রীঅরবিন্দই প্রধান আসামী।

বাংলাদেশের নরনারী শ্রীঅরবিন্দের জন্য চিন্তা করেন কিন্তু ভয়ে কেউ প্রকাশ করেন না, গোপনে অশ্রুপাত করেন, কেউ অগ্রসর হয় না তাঁকে সহানুভূতি জানাতে বা কোন রকম সাহায্য করতে।

ঠিক এই মহাসঙ্কটকালে ভগবানের আশীর্বাদের মত এগিয়ে এলেন, নির্ভীক নির্লোভ তরুণ ব্যারিস্টার শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস —তিনি দেশকে অকস্মাৎ একদিনে ভালবাসেন নি। বা যথাসর্বস্ব দান করেন নি—তিনি ছিলেন আজন্ম দেশপ্রেমিক ও মহাত্যাগী—দেবমানব। চিত্তরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয় তবুও তিনি সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করলেন।

আলিপুরের ক্রিমিন্যাল কোর্ট আইনের রণক্ষেত্র হয়ে উঠলো। গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত প্রবীণ ব্যবহারজীবীরা, অপর পক্ষে অখ্যাত তরুণ ব্যারিস্টার। কিন্তু কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যতার। কি অপূর্ব বাগ্মিতা এই তরুণের। প্রধান প্রধান আইনজ্ঞদের সকল যুক্তিতর্কনিমেষে ধূলিসাৎ করে দেন; পুলিশের বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে গঠিত প্রমাণাদি কূট আইন-অস্ত্র দিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। আদালতকক্ষে বিস্ময়কর পরিস্থিতি দেখা যায়। তরুণ চিত্তরঞ্জনের আপ্রাণ পরিশ্রমের ফল শুভ হল।

শ্রীঅরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন।

দীর্ঘ এক বৎসর কারাগারবাসের পর বাইরে এসে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন, বাংলা দেশ প্রায় বিপ্লবী শূন্য সহকর্মী বিপ্লবীরা কারাগারের অন্তরালে থেকে চরম শাস্তির জন্যে দিন গণনা করছেন, যাঁরা মুক্ত, তাঁরা আত্মগোপন-করে আছেন—পাহাড়ে, জঙ্গলে তীর্থ-ক্ষেত্রে—গৃহে বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাঁদের স্থান নেই।

নির্জনতাপ্রয়াসী স্বল্পবাক্ সাধক শ্রীঅরবিন্দ কারও সঙ্গে বেশী আলাপ-আলোচনা করেন না, কক্ষের বাইরেও যান না, দিনরাত নিজের ধ্যানসাধনা ও 'কর্মযোগিন' পত্র পরিচালনায় ব্যস্ত করেন। এক-একদিন সামান্য কিছু-ক্ষণের জন্যে বাগবাজারে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে চলে আসেন। কি কথাবার্তা হয়, কেউ জানতে পারে না।

অন্তরালে থেকে গোয়েন্দারা সবই লক্ষ্য করে। নিবেদিতার উপরও পুলিসের দৃষ্টি ছিল, তিনি যে বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী তাও গভর্নমেণ্ট জানতো।

গুপ্তপুলিসের সদাজাগ্রত দৃষ্টির মধ্যে থেকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন কাজই করতে সক্ষম হচ্ছেন না। 'কর্মযোগিন'পত্র পরিচালনা ব্যতীত সকল বিষয়েই তিনি এখন ব্যর্থ।

প্রিয় সহকর্মীরা প্রায় সকলে কারাগারে, ইতিমধ্যে কয়েকজনের জীবনান্ত ঘটেছে, বিপ্লবী দল ছত্রভঙ্গ, যাতে আবার বাংলা দেশে কোন বৈপ্লবিক কাজ বা প্রচেষ্টা না হয় সে জন্যে গভর্নমেণ্ট এদেশের বহু নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ রেখেছে বা নির্বাসিত করেছে—যে-কোন মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দকেও তারা নির্বাসিত করতে বা অন্য দণ্ড দিতে আগ্রহান্বিত।

একথা বুঝতে পেরে বুদ্ধিমতী ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দের জনৈক ভক্তকে বললেন, tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things (আপনাদের নেতা অরবিন্দকে আত্মগোপন করতে বলুন, গুপ্ত অবস্থায় অন্যের মাধ্যমে তিনি বহু কাজ করতে পারবেন) শ্রীঅরবিন্দকে পলায়নের পরামর্শ নিবেদিতাই প্রথমে দিয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পলায়নের কারণ সম্বন্ধে জানা যায়—এই সময় একটা ব্যাপার ঘটলো—

মাণিকতলা বোমার মোকর্দমার সেই অত্যুৎসাহী গোয়েন্দা ইনসপেক্টর শামসুল আলম একজন বাঙালী তরুণ দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত হলেন।

পুলিস শ্রীঅরবিন্দকে ঐরূপ একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত করে দেবার সুযোগ অন্বেষণ করছিল, তা তাদের এসে গেল। কৌশল, উৎপীড়ন ও অর্থের বিনিময়ে সাক্ষী-সাবুদ, কাগজপত্র পাওয়া পুলিসের পক্ষে অসম্ভব নয়, যার দ্বারা ঐ হত্যাকারীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক আদালতে প্রমাণ করা যেতে পারে, পুলিশ সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে লাগলো।

গুপ্ত পুলিসের গুপ্ততম দপ্তর থেকে ঐ প্রস্তুতির কথা একটু ফাঁস হয়ে গেল, মাত্র দু-একজন জানতে পারলে আকস্মিকভাবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

আমাদের প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

মতী নন্দীর

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান ৪·০০

সমরেশ বসুর

সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা ৪·০০
এপার ওপার ৫·০০
প্রজাপতি ৬·০০
স্বীকারোক্তি ৫·০০
বিবর ৫·০০
ফেরাই ৩·০০
দুই অরণ্য ৬·০০

কালকূটের

কোথায় পাবো তারে ২০·০০

বনফুলের

অসংলগ্না ৩·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

অরণ্যের দিনরাত্রি ৪·০০
আত্মপ্রকাশ ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ভালোবাসার অনেক নাম ৬·০০
ঘরণীর বিকল্প ৩·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২·৫০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

ঘুণপোকা ৪·০০

রূপদর্শীর

ব্রজদার গুল্প-সমগ্র ৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রেমের চেয়ে বড় ১২·০০

সুবোধ ঘোষের

বন উপবন ৪·০০
জিয়াভরলি ৬·০০
বসন্ততিলক ৫·০০
শতকিয়া ৮·০০
ভারত প্রেমকথা ৭·০০

বিমল করের

একদা কুয়াশায় ৬·০০
কুশীলব ৩·৫০
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ৪·৫০
যদুবংশ ৭·০০
পূর্ণ অপূর্ণ ১০·০০
পরিচয় ৪·০০
বালিকা বধূ ৩·০০
গ্রহণ ৪·০০
খড়কুটো ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

সাগিনা মাহাতো ৪·০০
লোকটা ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বেণীসংহার ৪·০০
ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন ৪·০০
শজারুর কাঁটা ৪·০০
তুঙ্গভদ্রার তীরে ৬·০০
ধরণী যখন তরুণী ছিল ৪·০০
শঙ্খকঙ্কণ ২·৫০
কহেন কবি কালিদাস ৩·০০
বহু যুগের ওপার হতে ৩·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের

জল দাও ৩·৫০

রমাপদ চৌধুরীর

পরাজিত সম্রাট ৪·০০
গল্প-সমগ্র ১০·০০
বনপলাশির পদাবলী ৮·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

রূপসী রাত্রি ৬·০০
প্রেমের গল্প ৪·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

লোকারণ্য ৪·০০
ভ্রষ্টলগ্ন ২·৫০
অনাগত ২·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

দর্পণের ভূমিকায় ৫·০০
সময়ের স্তর ৩·০০
সেই রাত্রি এই দিন ৫·০০
রাতের পাখি ৪·০০
দোলনা ৫·০০

বিমল মিত্রের

প্রেম পরিণয় ইত্যাদি ৭·০০
হাতে রইলো তিন ৬·০০
চলো কলকাতা ৫·০০
বেগম মেরী বিশ্বাস ২৫·০০
নিবেদন ইতি ৫·০০
রং বদলায় ৩·৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নুনের পুতুল সাগরে ১০·০০

প্রতিভা বসুর

দ্বিতীয় দর্পণ ৮·০০
রাঙা ভাঙা চাঁদ ৪·০০

বুদ্ধদেব গুহর

নগ্ন নির্জন ৪·০০
হলুদ বসন্ত ৪·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

আগ্রা যখন টলমল ৪·০০
প্রতিধ্বনি ফেরে ৪·০০
পঞ্চশর ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

পিয়ামুখচন্দা ৬·০০
জনম জনম হম ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

দু'হারা ৭·০০
প্রেম ৪·০০

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য ৩·৫০
প্রেমের গল্প ৪·০০

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ ৫·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কুবেরের বিষয়-আশয় ১০·০০

শংকরের

বোধোদয় ৫·০০
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৪·৫০

মনোজ বসুর

প্রেমিক ৬·০০
সেতুবন্ধ ১২·০০
স্বর্ণসজ্জা ৪·০০
রূপবতী ৩·০০

বুদ্ধদেব বসুর

কালসন্ধ্যা (নাটক) ৩·০০
কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক) ৫·০০
গোলাপ কেন কালো ৫·০০
তুমি কেমন আছো ৬·০০
পাতাল থেকে আলাপ ৫·০০
তপস্বী ও তরঙ্গিণী (নাটক) ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সন্ধ্যারাগ ৫·০০
সূর্যসাক্ষী ১৪·০০
সেতুবন্ধন ৫·০০
ময়ূরী ৩·০০
তিন দিন তিন রাত্রি ৬·০০

সুশীল রায়ের

আদ্বিতীয়া ৪·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অমাবস্যার গান ৩·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সারারাত ৫·০০
মনের মানুষ ৩·০০
প্রেমের গল্প ৪·০০

রবি গুহ মজুমদারের

মানুষ দেবতা হবে না ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯ । ফোন ৩৪-৮২৫৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

ফসল

—শ্রীসাধন সেন

মাসিক

ভাদ্র

রাজা-রাণী

অনেকদিন আগে এক দেশে এক রাজা ছিল। খুব সুন্দর সেই দেশ। চারিদিক উঁচু পাহাড়ে-ঘেরা। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বরফের মুকুট। ভোর-বেলায় সূর্যের আলোয় যেন মনে হয় সোনার মুকুট পরে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে যখন রোদ ঝলমল করে তখন পাহাড়গুলো মনে হয় হীরের মুকুট মাথায় ঝলমল করছে। নীচে সবুজ বন। পাহাড়ী নদী রূপোর পাতের মত নেমে এসেছে ওপর থেকে। নদীর দু'ধারে কত ফসল ফলেছে। কোথাও ফসল পেকে সোনার মতই হলুদ রং হয়েছে। কত ফুলের বন। কত ফলের বাগান। যেদিকে তাকাবে চোখ ফেরাতেই ইচ্ছে হবে না। মাথার ওপর নীল আকাশ। সকাল সন্ধ্যায় কত রং বদলায়। সেই সাথে, পাহাড় নদী সবই রং বদ-লাচ্ছে। সে এক অপূর্ব দেশ। সে দেশের রাণীও অপূর্ব সুন্দরী। গোলাপফুলের মত রং। মেঘের মত কালো চুল। চোখ দুটো ঠিক হরিণের মতই।

এত সুন্দর রাণীর মনে কিন্তু সুখ নেই। রাজারও না। কি করে থাকবে? রাজা রাণীর যে একটিও ছেলেমেয়ে নেই। রাজা রাজকর্ম শেষ হলেই পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়ান শিকারের খোঁজে। আর রাণী একা একা জানালায় বসে থাকেন। পাহাড়ের ওপর মস্ত রাজবাড়ী। রাণী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন নীচে কত ছেলেমেয়ে খেলা করে। নদীতে স্নান করে। সাঁতার কাটে যেন হাঁসের মতই। আবার সন্ধ্যে হলে মায়েরা যখন কলসী করে জল নিয়ে বাড়ী ফেরে তখন ওরাও মার সাথে হাসতে হাসতে নেচে-গেয়ে ফিরে যায়।

রাজা সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়ী ফেরেন খালি বাড়ীতে রাজারও ভালো লাগে না একটুকুও। রাণী সব সময়ই মুখ ভার করে আছেন। রাজা ভাবেন কি করলে রাণীর মুখে হাসি দেখতে পাব। তাই কত সুন্দর শাড়ী, গয়না, খেলনা, সুন্দর সুন্দর পাখী এনে দেন। কিন্তু কিছুতেই রাণীকে সুখী করতে পারেন না। রাণী শুধু ভাবেন: যদি আমি কোনরকমে নীচে নেমে নদীর ধারে ওদের সাথে মিশতে পারতাম, আহা, কত ভালই লাগত তাহলে। কি সুন্দর ফুলের মত ছেলেমেয়েরা! ওদের হাসি,

শ্রীমতী কমলা মিশ্র

ওদের গান, কথা ওপর থেকে শোনা যায় কিন্তু কাছে না গেলে, ওদের সাথে খেলা না করতে পারলে ভালো লাগে কখনও?

রাজা একদিন কত আদর করে রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বল রাণী কি করলে তুমি সুখী হও? তুমি যা চাও তাই আমি আনিয়ে দেব।

রাণী একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখ, রোজ আমি জানালা দিয়ে নীচে ঐ নদীর ধারে ফুলের বনে যে সব ছেলেমেয়েরা খেলা করে তাদের দেখি। আমার খুব ইচ্ছে করে ওদের আদর করি, ওদের সাথে খেলা করি। কিন্তু আমি যে রাণী, তাই ওদের কাছে যেতে পারি না।

রাজা বললেন, ও, এই কথা! তক্ষুণি হুকুম করলেন মন্ত্রীকে, রাণী নীচে যাবেন, তার ব্যবস্থা করো।

দুষ্টু হাসি — চিত্র: শ্যামল মজুমদার
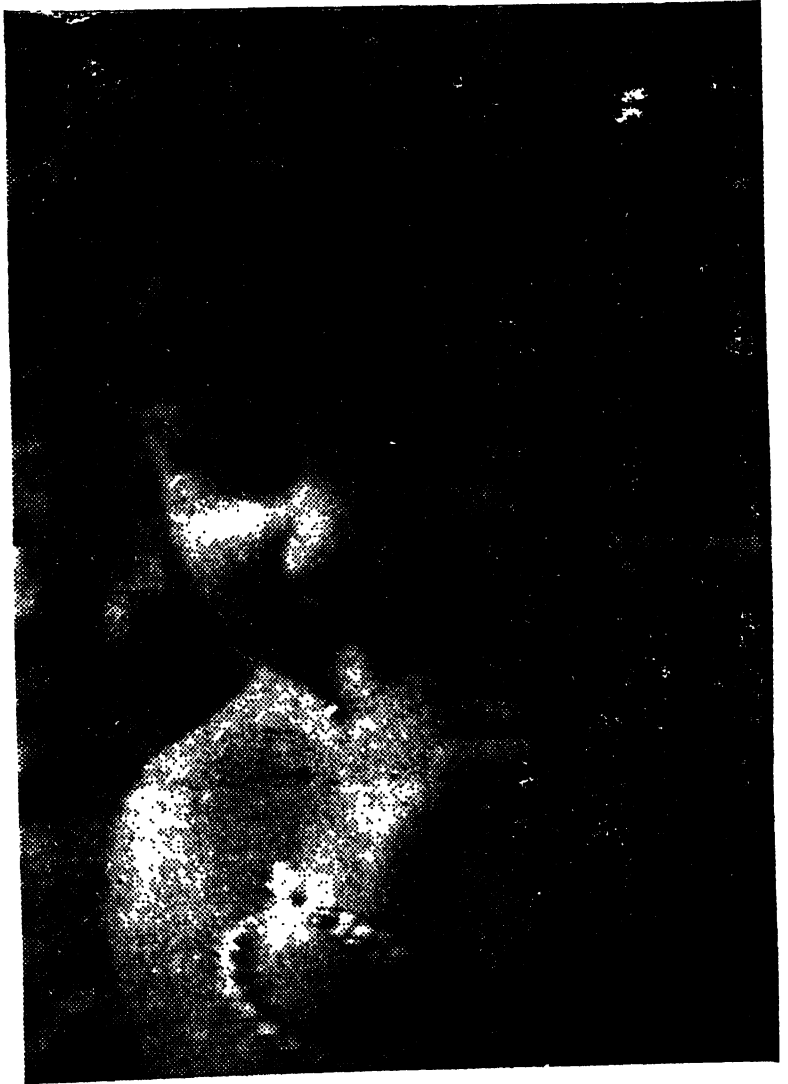
মন্ত্রী তো হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিল। সোনার পাল্কী এলো। মুক্তোর ঝালর দেওয়া ঢাকনা দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে না রাণীকে কেউ দেখতে পায়। ষোলজন বেহারা। আর সেপাই সান্ত্রী, পাইক-বরকন্দাজ বল্লম বর্শা তীর ধনুক সব নিয়ে। রাণীর একটু মুখ বের করে দেখারও উপায় নেই। পাল্কী যখন নিচে নেমে এলো তখন আর নদীর ঘাটে কেউ কোথাও নেই।

দূর থেকেই ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখছিল সোনার পাল্কীটা। ভাবছিল কোনদিন ত' এত সুন্দর পাল্কী এদিকে আসে না। কিন্তু যত কাছে এগিয়ে আসছিল পাল্কী ওরা ভয় পেল সেপাই-সান্ত্রীদের চীৎকার চেঁচামেচিতে, আর ওদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র দেখে পালিয়ে গেল সব বনের পথে।

রাণীর পাল্কী নদীর ঘাটে রেখে সেপাইরা যখন একটু গল্পসল্প করছে রাণী দরজা ফাঁক করে দেখলেন, কই, কোথাও কেউ নেই। তখন নেমে এলেন পাল্কী থেকে। নদীতে নেমে চোখের জল ধুলেন। আহা, একটু আগেই কি সুন্দর সব কচি কচি ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। ভাবলেন, আমি আসাতেই ওদের খেলাটা নষ্ট হয়ে গেল। রাণীর ভারী দুঃখ হ'ল মনে। ফিরে গেলেন সেদিন। মনে মনে বললেন, আর কোনদিন আসব না। এসে কি লাভ। যে জন্য এসেছিলেম তা তো হ'লই না, বরং ওরা ভয় পেয়ে পালালো।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, রাণী আজ তো তোমার খুশী হবার কথা। আজও কেন মুখ ভার করে আছ?

রাণী বললেন সব কথা।

শুনে রাজা বললেন তা হলে কি করা যায়? তারপর খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, ঠিক ঠিক, হয়েছে। রাণী! তোমাকে আর যেতে হবে না। ওদেরই এখানে আনতে বলে দিচ্ছি। মন্ত্রীকে তখুনি হুকুম করলেন, রাণী রোজ রোজ নদীর ধারে যাবেন না। তুমি ঐ বাচ্চাদের আনিয়ে নাও। ওরা এখানে এসে খেলা করবে।

রাণী তো মহা খুশী। বাচ্চাদের জন্য কত খেলার ব্যবস্থা করলেন। খাবারদাবার কত কি করালেন। রাজ-বাড়ীতে হৈ-চৈ কাণ্ড পড়ে গেল। পরদিন সকালে উঠে নিজের হাতেই সব খাবার করতে লেগে গেলেন।

এদিকে মন্ত্রীমশাই খুব চটেছেন। ভাবছেন, কোথাকার এক রাণী এসেছে রে বাবা। এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড কেউ দেখেনি। কোথাকার সব ছোটলোকের ছেলেমেয়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন, তাদের আনতে হবে রাজ-বাড়ীতে। আর তার জন্য এত ধুম কিসের? সেপাইদের হুকুম করলেন, ঐ যে নদীর ধারে সব ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায় ওদের ধরে নিয়ে আসবি। আসতে না চাইলে কান ধরে নিয়ে আসবি।

সান্ত্রীরা মন্ত্রীর আর এক কাঠি ওপরে। নীচে গিয়ে ছেলেমেয়েদের মারধোর করে ভয় দেখিয়ে কাঁদিয়ে, টেনে-হিঁচড়ে ওপরে নিয়ে এলো।

রাণী সকাল থেকে ওদের জন্য কত রকমের খাবার-দাবার করছেন আর ভাবছেন ওরা এগুলো পেলে কত-না-জানি খুশী হবে। ওদের হাসিমুখ কল্পনা করছেন আর ভাবছেন, ওদের হাসির ঝরনায় স্নান করে রাজবাড়ী আজ কতদিন পর হেসে উঠবে।

অবাক চোখে — চিত্র : অদীপনাথ রায়
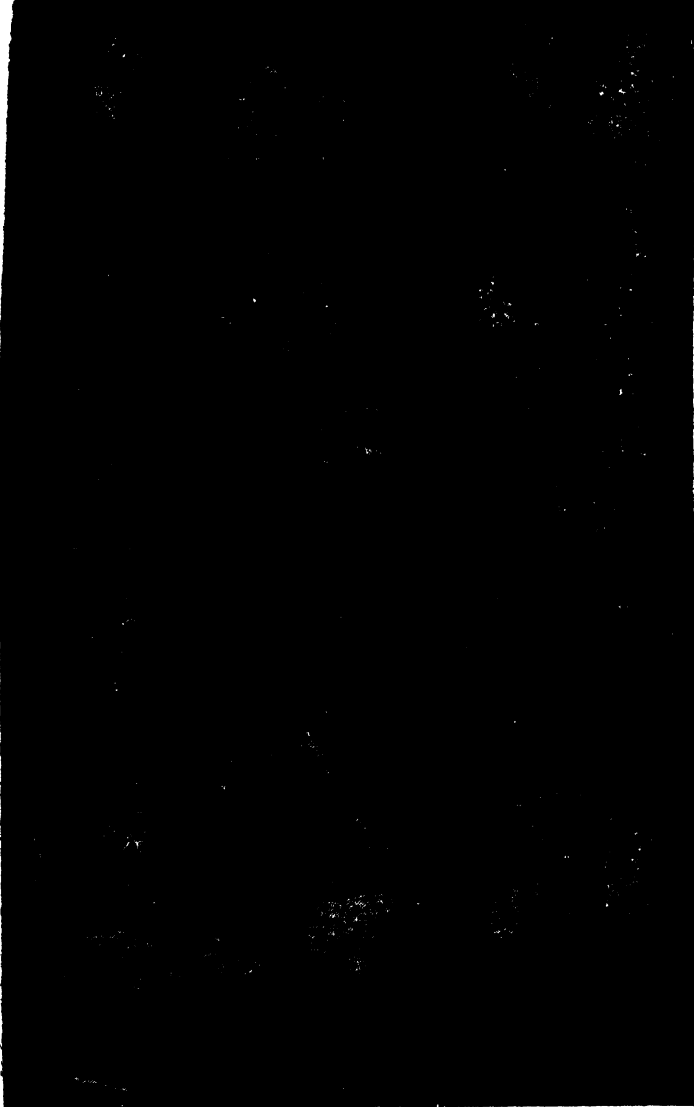
কিন্তু ওদের যখন রাণীর কাছে এনে হাজির করল তখন সকলের চোখেই জল। বাচ্চারা কেউ খুশী হয়নি। সব হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রাণী কত আদর করলেন, খেতে দিলেন কিন্তু অবুঝ ছেলে-মেয়ে কিছুতেই বুঝতে চায় না। জোর করে কাঁদানো যায় কিন্তু হাসানো যায় কখনও? রাণীর চোখেও জল এলো। রাণী নিজের ঝিকে ডেকে বললেন, বাচ্চাদের তুই নীচে নিয়ে যাস, সেপাইর সঙ্গে যেন না যায়।

ঝি ওদের নিয়ে নীচে নামল। রাণী জানালা থেকে দেখলেন ওরা হাসতে হাসতে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ী ঝরনার মতই নীচে নামছে। মনে মনে ঠিক করলেন, ওদের সাথে মিশতেই হবে। ওদের মন পেতেই হবে।

পরদিন খুব ভোরে রাণী নিজের ঝিকে সাথে নিয়ে নিজেরই একটা শাড়ী পরে রাজবাড়ী থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে নদীর ধারে চললেন। আবছা কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। রাণীকে কেউ চিনতেও পারে না। যে সব সেপাই পেটি পাহারা দিচ্ছিল তারাও ভাবল দুজনেই বুঝি ঝি।

রাণী নদীর ধারে গিয়ে জলে নেমে স্নান করছেন। তখন একে একে বাচ্চারা এলো। ওরাও হৈ-চৈ করে জলে নেমে পড়ল। রাণীকে ওরাও চিনল না। রাণী ওদের সাথে সাঁতার কাটলেন, জল ছোঁড়াছুড়ি করলেন, ওরাও মহা আনন্দে রাণীর সাথে খেলা সুরু করল। এ ওর গায়ে জল দেয়, হেসে গড়িয়ে পড়ে। এমনি করে রাণীর সাথে ওদের ভাব হয়ে গেল। রাণী রোজই আসেন। চুপি চুপি ওদের সাথে স্নান করে আবার ফিরে যান। কেউ টেরও পায় না।

বাচ্চারাও এইভাবে রাণীকে খেলার সাথী পেয়ে খুব ভালবাসল। রাণী ওদের জন্য খাবার করে আনেন। ওরা খায়। এভাবেই দিন যায়।

একদিন রাণীর অসুখ করল। রাণী আর স্নানে যেতে পারেন না। জানালা দিয়ে ওদের স্নান করতে, খেলা করতে দেখেন আর বিছানায় শুয়ে কাঁদেন। অসুখ আরও বেড়েই যায়। রাজবাড়ীর বদ্যি রোজ এসে ওষুধ দেয় কিন্তু কিছুই হয় না। রাজাও মহা চিন্তায় পড়লেন। তখন রাণীর ঝি এসে বাচ্চাদের বলল সব কথা। ওরা প্রথমে বিশ্বাস করল না। কিন্তু ওদেরও যে মন খারাপ ওদের খেলার সাথীর জন্য। ওরা তাই রাজী হয়ে চলল রাজবাড়ীতে ঝিয়ের সাথে। এসে দেখে ওরা এতদিন যার সাথে খেলা করত সত্যি সত্যি সে রাণী। রাণী তো মহা খুশী ওদের দেখে, বাচ্চাদের প্রথম একটু ভয় আর সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু রাণী যখন বিছানায় উঠে বসে ওদেরও ডেকে নিলেন নিজের কাছে তখন কত গল্প; হাসি হ'ল। রাণীর অসুখ যেন কমে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

রাজাও মহা খুশী। বললেন বাচ্চাদের, তোমরা রোজ এসো, খেলা করবে এখানে।

ওদের আর ভয় থাকল না। রোজ আসে রাজবাড়ীতে। হাসে নাচে খেলা করে, খায়দায় গান করে।

রাজা-রাণীও আনন্দে থাকেন। রাণীর অসুখ সেরে গেছে। শুধু মন্ত্রীমশাই একটুও খুশী নন। মুখ হাঁড়ি করে থাকেন সব সময়।

ছড়া

দেবব্রত রায়

টাপ্ টুপ্
টাপ্ টুপ্
কার জন্যে বৃষ্টি?
গুড়্ গুড়্
মেঘ ডাকে
খিচুড়ির ফিষ্টি।

শন্ শন্
বায়ু বয়
কন্‌কন্ ঠাণ্ডায়,
ধুক্ ধুক্
ঠুক্ ঠুক্
স্যাতসেঁতে বর্ষায়।

আকাশ জুড়ে
সাত রং
কে ঐ টাঙালো?
কার জন্যে
কোলা ব্যাঙ্
সাপের ঘুম ভাঙালো?

পথে ঘাটে
পায়ের ছাপ,
পায়ের ছাপ দোরে।
বর্ষা রাণী
এসো তুমি
মেঘের ভেলা করে॥

কেমন হাসি

চিত্র : রথীন [illegible]

হাস্যের রাজা সুকুমার রায়

বাংলা সাহিত্যকে সম্পদশালী করে গড়ে তোলার কাজে যাঁরা নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন, সাহিত্যিক সুকুমার রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি যে কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, তা' নির্ণয় করার ক্ষমতা আমার নেই, তবে যে সমস্ত বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে তাঁর রচনা-সম্ভার গড়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একক। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সুকুমার রায় কি দিয়েছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহুমূল্য হীরক উপহার দিয়েছেন আবার স্বল্পমূল্যের মুক্তাও দিয়েছেন, কিন্তু চোখ ধাঁধানো নকল কোন জিনিষ দেননি—

তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সে বংশের সকলেরই প্রায় সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। পিতা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন বাংলা শিশু-সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল। তাঁর ছেলে-ভুলানো মজার তুলনা নেই। বাকা কুলদারঞ্জন রায় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা লোক। সুকুমার রায়ের অপর দুই ভ্রাতা সুবিমল ও সুবিনয় এবং ভাগিনী সুখলতা ও পুণ্যলতা পরবর্তী কালে সাহিত্যিক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন।

ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন কাজ ও ঘটনার মধ্য দিয়েই তাঁর সম্ভাবনাময় জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। প্রিয়দর্শন, মধুর স্বভাব এই বালকটি তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির জন্য বাড়ীর ছোটবড় সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। মাত্র ন' বছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায় 'টিক্ টিক্ টং' নামে কবিতা প্রকাশ করে তিনি সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেন। এর পর তিনি কয়েকখানি নাটক লেখেন আজগুবি বিষয়বস্তু নিয়ে। বাড়ীতে 'ননসেন্স ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে তার সদস্যদের দিয়ে তিনি নিজের নাটিকাগুলি অভিনয় করাতেন। অভিনয় দেখে দর্শকেরা যেমন তৃপ্তি পেত, তেমনি অভিনেতারা আনন্দ পেত অভিনয় করে। অবসর সময়ে ছোট ছোট ভাই-বোনদের এমন আজগুবি জন্তু জানোয়ারের গল্প শোনাতেন, যা শুনে ছোটরা যার-পর-নাই আনন্দ পেত।—

বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর টান। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ম্যাঞ্চেস্টারের স্কুল অব টেক্‌নলজি থেকে উচ্চ ফটোগ্রাফি ও ব্লক নির্মাণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন।

গণেশ দত্ত

বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তিনি সাহিত্যকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন। তাঁর প্রতিভা সাহিত্যের গতানুগতিক পথ ধরে চলে নি। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ভাবভঙ্গী সবই নূতন। অতি সাধারণ জিনিষকে যেমন কথার বুদ্‌বুদ দিয়ে সুন্দর ও সুখপাঠ্য করে তুলেছেন আবার গম্ভীর ও গভীর বিষয়কেও হাসির রঙে রাঙিয়ে সহজগম্য করে সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ রচনাগুলি বড় চমৎকার। কাউকে খোঁচা দিয়ে বা আঘাত করে তিনি কিছু লেখেন নি। তাঁর রচনায় হাস্যরস এমনই প্রবল, এতই নূতন ধরণের যে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর রচিত হ-য-ব-র-ল, ঝালাপালা, পাগলা দাশু, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, প্রভৃতি রচনা বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এ ছাড়া তিনি ছোটদের জন্য অনেকগুলি মজার কবিতা ও গান রচনা করেন।

তাঁর অধিকাংশ রচনা শিশুদের জন্য লেখা। তাঁর লেখাগুলির বেশীর ভাগ 'প্রবাসী' ও 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকায় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং বেশ যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাটি পরিচালনা করেছিলেন। তুলনামূলক প্রবন্ধগুলি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দেয়।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন, উদার, বন্ধুবৎসল ও আমোদপ্রিয়। কাউকে কোনদিন কোন কাজে নিরুৎসাহ করেন নি। আনন্দে উচ্ছল ও বন্ধিতে উজ্জ্বল এই মানুষটি তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সকলের প্রিয় ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্য গগনের এই প্রদীপ্ত ভাস্কর কালরাহুগ্রস্ত হন।—দুরারোগ্য ব্যাধি কৃপায়িত এমন একটি প্রতিভাকে অকালে হরণ করে জগতের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল তা' একমাত্র মঙ্গলময় ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

খুকুর ভাবনা

গৌর মোদক

খুকুমণির দুঃখ ভারী
হারিয়ে গেছে দুল,
পদ্মদীঘির পারে আজ
তুলতে গিয়ে ফুল।
পদ্মদীঘি ভরে আছে
নানা রঙিন ফুলে
খুকুমণির ইচ্ছা ছিল
আনবে কটা তুলে।
দুপুর রোদে নিঝুম বেলায়
একলা চুপিসারে,
খুকুমণি আসে তখন
পদ্মদীঘির পারে।
নানা রঙের হরেক ফুল
হাওয়ায় দোদুল দোলে,
খুকুমণি খুব খুশিতে তা
আঁচল ভরে তোলে।
হঠাৎ কখন গহীন জলে
হারিয়ে গেছে দুল,
খুকুমণির দুঃখ ভারী তাই
ভাবনাতে আকুল।

সিকিম ও তার চৌগিয়াল

ভারতের মানচিত্র খুললে উত্তরপূর্ব দিকে হিমালয় পর্বতের ওপরে দুটি ছোট রাজ্য দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি সিকিম। ভূগোলের পাতায়ও এই রাজ্যের নাম আমরা পাই। বহুকাল আগে যখন এই রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তখন এর আয়তন ছিল অনেক বেশী। কিন্তু কালক্রমে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ভূটান, নেপাল, তিব্বত এবং ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের কাছে কিছু কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হয় বা জোর করে তারা নিয়ে নেয়। তার ফলে বর্তমানে এই রাজ্যের আয়তন দাঁড়িয়েছে ২৮১৮ বর্গমাইল।

চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই ছোট্ট রাজ্যকে সিকিম ভাষায় বলে 'ডেনজং' যার ইংরেজী মানে 'ভ্যালি অব রাইস', (চালের উপত্যকা)। সত্যি এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায় আর পাওয়া যায় ভূট্টা—তার থেকে এরা মদ তৈরী করে (কর্ন হুইস্কি)।

রাজ্যের যিনি রাজা তাঁকে এরা 'চৌগিয়াল' বলে আর রাণীকে বলে 'গিয়ালমো'। যেমন ছোট্ট রাজ্য তেমনি তার ছোট্ট রাজধানী—নাম গ্যাংটক। সুন্দরভাবে সাজানো। পাহাড় কেটে ছোট ছোট রাস্তা বেরিয়ে গেছে চারিদিক দিয়ে। কোনটা ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে গেছে, কোনটা আবার নীচে। রাজপ্রাসাদের ফটক কাঠের তৈরী। নানারকম কারুকার্য করা। সেপাই-সান্ত্রী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে। ফটক পেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলে দেখা যাবে গাছ-পালা দিয়ে ঘেরা অনুপম রাজপ্রাসাদ। সেখানে বাস করেন বর্তমান রাজা—নাম 'পালডেন থনডুপ নামগিয়াল'। আর তাঁর আমেরিকান পত্নী, বর্তমান রাণী, নাম 'হোপকুক্'। আর তাঁদের সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে।

বর্তমান রাজার জন্ম হয় গ্যাংটকে। ১৯২৩ সালের ২২শে মে তারিখে। তিনি পূর্বতন রাজা 'স্যার তাশী নামগিয়াল'-এর দ্বিতীয় পুত্র। ছ'বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন কালিম্পঙ্-এর 'সেণ্ট্ জোসেফ' ইস্কুলে। কিন্তু সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তাঁকে বাধ্য হয়ে ইস্কুল ছাড়তে হয়। তারপর কিছুদিন তিনি তাঁর কাকার অধীনে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁর রোগ ভাল হয়ে যায়।

১২ বছর বয়সে তিনি আবার লেখাপড়া শুরু করেন দার্জিলিং-এ 'সেণ্ট জোসেফ' ইস্কুলে। সেখানে

কল্যাণ মিত্র

কিছুদিন থাকার পর তিনি যান সিমলায় 'বিশপ্ কটন্' ইস্কুলে, এখান থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৪১ সালে। তারপর তাঁর ইচ্ছে ছিল ইংলণ্ডে গিয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উপর উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন। যাবার সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ তাঁর বড় ভাই যুবরাজ 'পালজোর'-এর মৃত্যু হয়। যুবরাজ ছিলেন তখন 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'-এর অফিসার।

তাঁর মৃত্যুর ফলে বর্তমান রাজার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। উচ্চ শিক্ষালাভ আর হয়ে ওঠে না। তিনিই তখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন এবং তার ফলে ১৯৪২ সালে 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং কোর্সে' ভর্তি হন দেরাদুনে। সেখানকার শিক্ষা শেষ করে দেশে ফেরেন এবং সেই অল্প-বয়সেই তাঁকে শাসন-কাজে যোগ দিতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে তিনি বিচার ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে চৌগিয়ালের—অর্থাৎ তাঁর বাবার—প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হন। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি 'সিকিম রাজ্য পরিষদ'-এর সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন এবং ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন।

রাজা ছোটবেলা থেকেই তাঁর দেশ এবং দেশের লোককে ভালবাসেন। যখন তিনি যুবরাজ ছিলেন সরকারের সমস্ত দপ্তর ঘুরে ঘুরে দেখতেন ঠিকমত কাজ হচ্ছে কি না। প্রজাদের সুখ-সুবিধের দিকে সব সময় তাঁর নজর ছিল এবং এখনো আছে।

অপরদিকে তিনি খুব আমোদপ্রিয়। খেলাধূলো ভালোবাসেন এবং সংস্কৃতির প্রতিও অনুরাগ আছে। শুধু সিকিম নয় ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। নিজের দেশে তিব্বতী শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ এবং গবেষণার জন্যে একটি সংস্থা তাঁর বাবার পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপন করেন। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'নামগিয়াল ইন্স্টিটিউট অফ্ টিবেটোলজি'। এটা সিকিমের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

রাজা পালডেন থনডুপ ২৭ বছর বয়সে বিয়ে করেন এক তিব্বতী রমণীকে—নাম সাংগে দেকী। এঁর গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়। পুত্রদের নাম—যুবরাজ তেনজিং নামগিয়াল ও ওয়াংচুক নামগিয়াল আর মেয়ের নাম—রাজকুমারী ইয়াংচেন্ দোলমা। এদের মধ্যে যুবরাজ তেনজিং সকলের বড় এবং সিংহাসনের অধিকারী। কিন্তু বিয়ের মাত্র সাত বছর পরই রাণীর মৃত্যু হয়।

রাজা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ১৯৬৩ সালে একটি আমেরিকান ভদ্রমহিলাকে। তাঁর নাম আগেই বলা হয়েছে। এই দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, তার নাম যুবরাজ পালডেন গুরমেদ। এই হচ্ছে রাজার পারিবারিক পরিচয়। তাঁর বড় দুই ছেলে ইংলণ্ডে থেকে পড়াশুনো করে।

কোলকাতাকে রাজা খুব ভালবাসেন। এখানে তাঁর একটি বাড়ী রয়েছে। মাঝে মাঝে এসে অবসর যাপন করেন। তিনি শেষবার ভারতে এসেছেন স্বর্গীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে। ভারতের তিনি একজন হিতৈষী বন্ধু। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

(শেষাংশ)

॥ চৌত্রিশ ॥

সেদিনটির কথাও বারবারই মনে পড়ে।

১৯৫৫ সালের ২৫শে আগস্ট বৃহস্পতিবার। সকাল সকাল গেলাম ডাঃ বোসকে দেখতে। কয়েকদিন আগে তাঁর দেহে একটি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। দীর্ঘকাল তিনি হাইড্রোসিল রোগে ভুগতেন। সুবৃহৎ স্ক্রোটাম নিয়ে চলাফেরা করতেও কষ্ট হত, তবু এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ ঐ শারীরিক অসুবিধা নিয়েই তিনি অক্লেশে করে গেছেন। তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীও ছিলেন এই আমলাগা পল্লীর অধিবাসী। তিনি কার্তিকচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্নেহ করতেন ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস, ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার।

এঁদের সেরা চিকিৎসকই তাঁর হাইড্রোসিল অস্ত্র করবার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু ডাঃ বোস সম্মত হন নি। ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী একবার এমনও ধরেছিলেন--আমি নিজের হাতে তোমার অস্ত্র করব, তুমি তৈরী হয়ে এসো। ডাঃ বোস সম্মত হন নি। হাইড্রোসিল-জনিত শারীরিক অসুবিধা তাঁর কর্মশক্তি ব্যাহত করতে পারেনি।

অবশেষে ৮২ বছর বয়সে তাঁর মন দুর্বল হয়ে পড়ল, তিন ছেলে ডাক্তার তিন ভাগিনেয় ডাক্তার, অগুণতি আত্মীয়-স্বজন ডাক্তার। তাদের ঐকান্তিক আগ্রহে দেশবরেণ্য শল্যচিকিৎসক ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন।

অস্ত্র করবার পর রোগী ভালোর দিকে যেতে লাগলেন, আমরা রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। বুধবার রাত্রে তিনতলায় ডাঃ বোসের জ্যেষ্ঠপুত্র

সঞ্জয়

শয্যাশায়ী ডাঃ পঞ্চানন বোসের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় ডাঃ বোসের চতুর্থ পুত্র ডাঃ সুনীল বোস এসে বললেন--বাবা এখন আবার খেয়ে বমি করে ফেললেন।

পঞ্চাননবাবু নিজে একজন জার্মানির এম ডি, পরে দীর্ঘদিন শুয়ে শুয়েই পড়াশুনা করে বহু বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি শুনে বললেন--সুনীল, আজ সকালেও বমি হয়েছে শুনেছি। এখন আবার হল। এই বয়সে এই সিচুয়েশানে এই সিমটমটা ভালো লাগছে না।

ভাবাক্রান্ত মন নিয়েই ফিরেছিলাম, তাই পরদিন একটু সকাল সকাল গেলাম। তখন হয়ত ন'টা বাজবে। দরোয়ান শিউধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তারবাবু কেমন আছেন?

শিউধারী জবাব দিল--আপনি একবার বাড়ির ভিতর খবর নিন্, সব কেন জানি একরম চুপচাপ হয়ে গেছেন। কিছু বুঝতে পারছি না।

নতুন বাড়ির নিচের ঘরে ডাঃ বোস থাকতেন। সেখানে গিয়ে দেখি তার দুই পুত্রবধূ বসে চোখের জল ফেলছেন। আমায় দেখে তাঁরা মাথার কাপড় তুলে দিলেন।

ডাঃ সুনীল বোস অদূরেই ছিলেন--এসেই আমার হাত জড়িয়ে বার বার করে কেঁদে ফেললেন--বললেন, মেজদা (পঞ্চাননবাবুকে এরা সবাই মেজদা বলতেন, জাঠতুতো ভাই ঔপন্যাসিক ব্যারিস্টার মণীন্দ্রলাল বসু-ই ছিলেন বাড়ির বড় ছেলে, তাই সবার বড়দা) একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আপনি একবার তাঁর কাছে যান।

কিন্তু আমার পা সরল না। সবুজ মোজাইক করা মেঝের উপর ধবধবে সাদা চাদর বিছানো খাটখানি যেন একটি শ্বেতপদ্মের মত ফুটে ছিল। তার উপর অনন্ত শয়নে শুয়ে আছেন দীর্ঘদেহী উন্নত নাসা, গৌরবর্ণ ডাঃ বোস। তাঁর শুভ্র মণ্ডিত সুপুষ্ট উজ্জ্বল সুন্দরভাবে বদ্ধ চক্ষু দুটি মুদ্রিত। পুরু ভ্রূ। মাথার চুলগুলি কদমফুলের রোঁয়ার মত ছোট করে ছাঁটা। সারাদেহ একখানি সাদা চাদরে ঢাকা, কেবল দক্ষিণ হস্তখানি চিৎ করে পাতা। যে হাতে তিনি হাজারো রকম দুরূহ কাজ একা সমাধা করেছেন সেই হাতখানি শূন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে আছে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
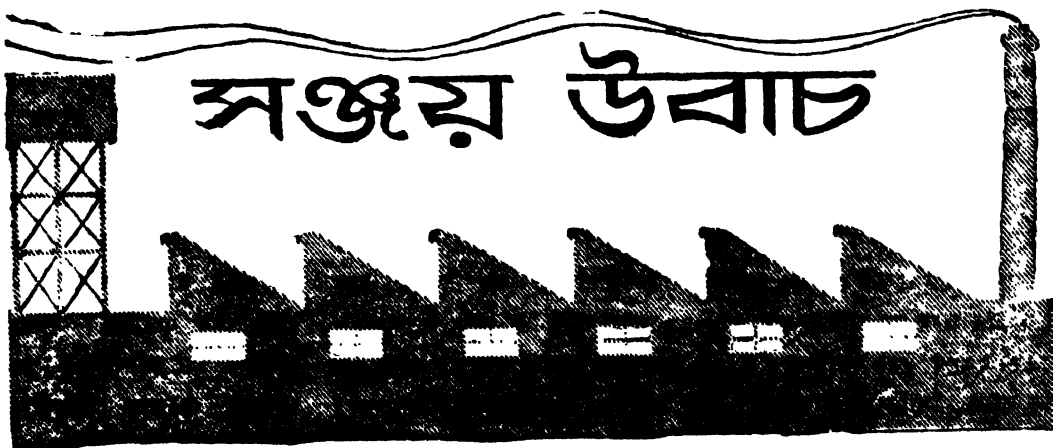
দেখেই আমার মনে হল, ১২৮০ সালে ৩০শে কার্তিক যে যাত্রা সুরু হয়েছিল আজ ৮ই ভাদ্র ১৩৬২ সেই যাত্রা-শেষে পথিক চিরবিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সদাব্রতে যে হাত চিরদিন উপুড় করাই দেখেছি আজ সেই হাত রিক্ত হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যাচঞা করছে প্রশান্ত মনে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন মহাকর্মী কার্তিকচন্দ্র।

তাঁর মুখখানি পরিষ্কারভাবে কামানো, শুনলাম রোজকারমত সেদিনও সকালেই পরামাণিক এসে কামিয়ে দিয়েছিল। মুখে একটু যেন প্রসন্নমধুর হাসির ছাপ ফুটে উঠেছিল।

তাকিয়ে দেখলাম, তার শিয়রে তাঁর চতুর্থ পুত্রবধূ ডাঃ সুশীল বোসের পত্নীর আঁকা বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর একখানা চিত্র জানালার 'পরে ফ্রেমশুদ্ধ বসানো। মনে হল, সরস্বতীর বরপুত্রকে বুঝি জননী নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছেন। বাহির থেকে লোকে তাঁকে ব্যবসায়ীরূপেই দেখেছে, তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তিনি ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসায়ী, বড় বড় কারখানার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তিনি যে আজীবন নানা বিদ্যারই উপাসক ছিলেন, তার চরম স্বীকৃতিই যেন এই শেষ মুহূর্তের পরিবেশে পরমগূঢ়তায় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে মনে হল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

পঞ্চানন বাবুর কাছে গেলাম, কিন্তু একটি কথাও কইতে পারলাম না। চুপচাপ নিচে নেমে টেলিফোন নিয়ে বসলাম।

রাজশেখর বসু তাঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে খবর দিলাম। তিনি বললেন—বেঙ্গল কেমিক্যালে সংবাদ দাও, অফিস কারখানা সব ছুটি ঘোষণা করতে বলে দাও।

আমি এই প্রথম দেখলাম—রাজশেখর যেন বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আমি বললাম, আমার কথায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ছুটি ঘোষণা করবে কেন?

রাজশেখর বললেন—ওঃ তাই তো, আমারই ভুল হয়েছে। আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি।

আধঘণ্টার মধ্যেই বেঙ্গল কেমিক্যালের জেনারেল ম্যানেজার এবং কারখানার প্রধান পরিচালক শাদা ফুলের সুবৃহৎ তারের মালা নিয়ে ডাঃ বসুর শবাধারে মাল্যদান করে গেলেন। বলে গেলেন—বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিস ও কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ডাঃ বোসের ল্যাবরেটারীর সকল বিভাগ, স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স, প্রেস, ক্যালকাটা অপটিক্যাল, এক্সরে বিভাগ, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী—সব কিছুই সকাল থেকেই বন্ধ ছিল। কয়েকজন বড় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীও ডাঃ বোসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠানে সেদিন ছুটি ঘোষণা করেন।

তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁকে যখন টেলিফোনে সরাসরি যোগাযোগ করলাম তখন তিনি বিধান পরিষদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বললেন—ছেলেদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানিও।

একটু পরেই মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে একজন সাদাফুলের স্তবক নিয়ে এলেন, দিয়ে গেলেন ডাঃ বোসের শবাধারে।

পরদিন কাগজে দেখলাম,—ডাঃ রায় টেলিফোন রেখেই বিধানসভা ভবনে-এ ফিরে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—বাংলা দেশ তার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছে। এইমাত্র সংবাদ পেলাম প্রবীণ চিকিৎসক এবং ভারতে রাসায়নিক শিল্পের জনক ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু আজ দেহরক্ষা করেছেন।

সমগ্র সভাসদগণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

॥ ছত্রিশ ॥

যে কলকাতাকে ডাঃ বোস তাঁর সমগ্র চিন্তা চেষ্টা চেতনার কেন্দ্র করেছিলেন, আশৈশব যার বক্ষে তাঁর কর্মসাধনার হোমানল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সেই কলকাতা শহর ভেঙ্গে পড়ল ডাঃ বোসের বাড়িতে। একদিকে যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসতে লাগলেন একের পর এক, তেমনি আসতে লাগলেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা। স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বসুমতী, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, বিশ্বামিত্র, লোকসেবক, আসে জাদিদ—শহরের সব ক'টি দৈনিকের প্রতিনিধি ছুটে এলেন। তখন কলকাতায় 'ফ্রি লান্‌স্' নামে একটি ইংরাজি সান্ধ্য দৈনিক বেরুত, তাঁরা সেদিনের কাগজেই এই দুঃখজনক সংবাদটি বের করলেন এবং আমরা শ্মশানে থাকতে থাকতেই 'ফ্রি লান্‌স্' কাগজে ডাঃ বোসের তিরোধান সংবাদ দেখতে পেলাম। তারপরদিনও আবার সচিত্র জীবনকথা ফ্রি লান্‌স্ পত্রিকায় বেরুল। প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া সারা ভারতে এই সংবাদটি পাঠিয়ে দিল। খবর বলল—রেডিওতে।

ছোটখাটো একটা অফিস বসে গেল টেলিফোন কক্ষে। সব কাগজ থেকে জীবনকথা চায়, ছবি চায়। দু-তিনজন মিলে এই মহৎ কর্তব্য করতে লাগলাম।

এক ফাঁকে বেরিয়ে দেখি উঠানে কাতারে কাতারে দীন-দুঃখীরা এসে ভিড় করেছে। তারা সব নিকট অঞ্চলের বস্তিবাসী চির অবহেলিত সাধারণ মানুষ,—মুচি, মিস্ত্রী, মুটে-মেয়ে মর্দ ছেলে বুড়ো দলে দলে এসেছে। কোনও রিপোর্টার তাদের খবর দেয় নি, কোন মিছিল তাদের ডাক দেয়নি। তারা এসেছে প্রাণের টানে। তাদের অতি আপনজন—বিপদের রক্ষক, দুঃখের দিনে সহায়ক ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক ডাঃ বোস চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন—তারা দেখবে না একবার।

কেউ তাদের বাধা দিলে না। জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই ডাঃ বোসকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। শবাধার যখন শ্মশানের পথে বেরুল, সঙ্গে সঙ্গে চলল শোকাহত মানুষের এক সুদীর্ঘ শবযাত্রা। সেই মৌন মিছিলের উপর ঝরে পড়তে লাগল ভাদ্রের ক্ষণবর্ষণ, যেন শহর কলকাতা তার প্রিয় সন্তানের শোক সামলাতে পারছে না।

শ্মশানেও অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এসেছিলেন। বিশেষ করে মনে পড়ে যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শচীন সর্বাধিকারীর কথা। তিনি থাকেন দূরে, সংবাদ পেয়ে যখন ছুটে এলেন তখন শবযাত্রা আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে নিমতলায় গেলেন, তখন দেহ চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছে। বুঝি তাঁর শেষ দর্শনও সম্ভব হল না।

একটি কালো স্যুটপরা হাতে বড় একগুচ্ছ ধবধবে সাদা রজনীগন্ধা নিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ডাঃ বোসের জ্যেষ্ঠপুত্র পঞ্চাননবাবুর সহপাঠী এবং আবাল্য বন্ধু ছিলেন ডাঃ শচীন সর্বাধিকারী সেই সুবাদে ডাঃ বোস তাঁকে নাম ধরে ডাকতেন, তুমি বলে কথা বলতেন। এমন কি আমরাও যদি কোন রোগী তাঁর কাছে পাঠাতাম তিনি তাদের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করতেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

শ্মশান থেকে আমরা শূন্য মন নিয়ে ফিরে এলাম। পরদিন শুক্রবার কাগজে কাগজে ছবি বেরুল, জীবনকথা বেরুল, সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরুতে লাগল, অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও বেরুল---ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, ফিজিসিয়ান এ্যাণ্ড স্কলার : ডঃ কার্তিকচন্দ্র বোস।

হাজার হাজার চিঠি টেলিগ্রাফ টেলিফোন আসতে লাগল। আমরা যারা নিকটে ছিলাম তারা বোধহয় তাঁর মহত্ত্ব এতখানি বুঝতে পারিনি। সারা দেশের লোক এইভাবে শোক প্রকাশ করতে লাগল তখন আমরাও অভিভূত হয়ে পড়লাম।

কলকাতা করপোরেশনের মেয়র ছিলেন সতীশচন্দ্র ঘোষ। তিনি করপোরেশনের ৩১শে আগস্টের অধিবেশনেই একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে বললেন কেবল একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাই নয়, ভারতবর্ষের রাসায়নিক ও ঔষধ-শিল্পের প্রবর্তক হিসাবেও তিনি আমাদের পূজনীয় হয়ে থাকবেন।

আমাদের কাছে এ খবরটাও এসে পৌঁছালো, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নাকি করপোরেশনকে অনুরোধ করেছেন--অবিলম্বে আমহার্স্ট স্ট্রীটের নাম পালটে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু স্ট্রীট রাখা হোক্।

আমাহার্স্ট স্ট্রীটের বরণীয় বাসিন্দা হিসাবে রাজা রামমোহন রায় এবং রাজা হৃষীকেশ লাহা এ দুজনের নামও অবশ্য স্মরণীয়। যদিও গড়পারে, রামমোহন রায় রোড নামে একটি রাস্তা আছে এবং আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরে লাহাবাড়ির ঠিক বিপরীত দিকের পার্কটি 'হৃষীকেশ পার্ক' নামে পরিচিত, তবু আমহার্স্ট স্ট্রীটের নামটিও এই দুইজন মনীষীর কারো নামে রাখবার আবেদন নাকি করপোরেশনের দপ্তরে আগেই জমা ছিল।

ডাক্তার রায়কে সে কথা জানালে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আদেশের সুরে নাকি বলেছিলেন--কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা তোমরা বিচার করো, মোদ্দা কথা—যে পল্লীতে ডাঃ বোস সমগ্র জীবন বাস করে গেছেন তার ধারেকাছে কোথাও একটা রাস্তা তাঁর নামে করে দাও।

অচিরেই করপোরেশনের সভায় পোস্ট অফিসের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি পূবে আপার সারকুলার রোডের দিকে বৈঠকখানা রোডে গিয়ে মিশেছে সেই রাস্তাটির নতুন নামকরণ হবে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বোস স্ট্রীট, যা আগে ছিল কোরিস চার্চ লেন।

নামমাহাত্ম্যে লেন হয়ে গেল স্ট্রীট এবং দুদিন না যেতেই আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট অফিসের বাড়িটির গায়ে এনামেল করা রাস্তার নামও বসে গেল---কার্তিক বোস স্ট্রীট। কোরিস চার্চ লেন থাকা-কালে অদূরেই একটি কুখ্যাত বস্তি ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একটা অদ্ভুত নিয়ম চালু হয়েছিল। পূবে পাটোয়ার বাগানে দপ্তরী পাড়া থেকে দপ্তরীরা এই কোরিস চার্চ লেনের মুখে এসে দাঁড়াত, ফর্মা বোঝাই ঠেলাগাড়ি আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর এসে দাঁড়ালে তারা হয়ত গাড়িটা ধরেই কোরিস চার্চ লেন দিয়ে পাটোয়ার বাগানে টেনে নিয়ে গিয়ে ফর্মা নামিয়ে নিত। আবার ঐ ঠেলাগাড়ি ভর্তি করে বাঁধানো বই এসে কোরিস চার্চ লেনের মুখে ডেলিভারি দিয়ে যেত।

কোরিস চার্চ লেন দিয়ে ঢুকে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের সাব-স্টেশনের লাগোয়া সেই বস্তি উঠে গিয়ে যেমন সেখানে নতুন একটি শোভন সুন্দর পাড়া গড়ে উঠেছে, তেমনি রাস্তার নাম পরিবর্তন করে করা হল--ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট। ওখানেই প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ কিরণ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের, অদূরের মাসিক বসুমতী সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের বাড়িতেও এই পথেই যেতে হয়। আর ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট ভরে ছোট ছোট কারখানা, কাগজের দোকান, বোর্ডের গুদাম, দপ্তরীর কর্মশালা। দিন-রাত লোকজনের যাতায়াত, চব্বিশ ঘণ্টা অতন্দ্র কর্মপ্রবাহ।

এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেও আমার গায়ে রোমাঞ্চ হয়। যদি কোন পুণ্যবলে আমি ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীটে বাড়ি করবার সৌভাগ্য পেতাম তবে আমি বালিগঞ্জেও যেতে চাইতাম না। আমার যেন মনে হয়, এই কোরিস চার্চ লেন রাস্তাটির নাম পালটে ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট রাখাই সবচেয়ে সমীচীন হয়েছে। কারণ এর একদিক পড়েছে আমহার্স্ট স্ট্রীটে, যেখানে তিনি জীবনের শেষ দিন সুদীর্ঘ ৮২ বছর বয়স পর্যন্ত বাস করেছেন। আর অপরপক্ষে এটি প্রসারিত হয়েছে সেই দিকে---যেদিকে উত্তরে-দক্ষিণে প্রলম্বিত বিখ্যাত রাজপথটির নাম রাখা হয়েছে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রোড। এখানেও তাই কে-সি-র কাছাকাছি রয়েছেন পি সি।

এই নিয়ত কর্মচঞ্চল রাজপথটি পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও পাশের ডাক্তারখানা গৃহের মধ্যেও যেন তার প্রাণপ্রাচুর্যের দ্যোতনা পরিস্ফুট। তা যেন কর্মবীর কার্তিকচন্দ্রেরই সমগ্র জীবনের মূর্ত প্রতীক।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের নাম পরিবর্তিত হয়ে রাজা রামমোহন সরণি হয়েছে, এ কথা সংবাদপত্রেই পড়েছিলাম, রাস্তায় তার নামপত্র পৌঁছাতে বছর পেরিয়ে গেছে এবং জনসাধারণের ব্যবহারে তা আজও প্রচলিত হয় নি। কিন্তু কোরিস চার্চ লেন আজ ইতিহাস, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট শুধু করপোরেশনের নামপত্রেই ঘোষিত নয়, ওখানকার প্রতিটি দোকানের সাইনবোর্ডে, ব্যবসায়ীর চিঠির কাগজে, বিলে-লেবেলে সাগ্রহে সানন্দে গৃহীত হয়েছে। তিনি ছিলেন আপামর জনসাধারণের, কত সহজেই তিনি আবার সবার মধ্যে আপনার ঠাঁই করে নিয়েছেন—তা দেখেও আনন্দ হয়। একদিন আমরা থাকব না, কিন্তু ঐ রাস্তাটি থাকবে, আর তার গায়ে অগুণতি নেম প্লেটে, সাইন বোর্ডে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এক মহান ব্যক্তির নামযুক্ত সেই রাজপথ—ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট।

॥ আটত্রিশ ॥

বন্ধুগণ আজ আপনারা আমাকে যাঁর কথা শোনাতে ডেকেছিলেন তাঁর কথা একটি বক্তৃতায় শেষ করা যাবে না। আজ আমিও বৃদ্ধ হয়েছি, সব কথা হয়ত মনেও নেই। তবু ওই মর্মরমূর্তির মুখের দিকে তাকালেই হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে তাঁর প্রশান্ত হাসি সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, উদার অবহেলায় সব ক্ষুদ্রতা—ক্ষতি ও দুঃখকে এড়িয়ে চলবার অসাধারণ ক্ষমতা। আবার মনে পড়ে তাঁর অল্পে ক্ষিপ্ত, অল্পে তপ্ত, দুর্জ্ঞেয় চরিত্র। দোষেগুণে মানুষটি জীবনভোর অমানুষিক পরিশ্রম করে গেছেন। শেষ অবধি দেখে দেখে, ঠকে ঠকে, ঠেকে ঠেকে আত্মজনের উপরেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন মনে হত। মনে হত, স্যার পি সি রায়ের শেষ জীবনের সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি বোধ হয় তিনি ভুলতে পারেন নি। একদিন আমাকে বলেছিলেন সেই প্রসঙ্গে ক'টি কথা।

যে যুগে তাঁরা ইনডাস্ট্রি গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে যুগে তাঁদের আদর্শ বোধহয় বড় ছিল। ব্যবসায়ের লাভলোকসানটাই মুখ্য বিবেচ্য ছিল না। তাই গবেষণার অর্থ ও শক্তি বিনিয়োগ করবার আগ্রহ কি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কি কর্মবীর কার্তিকচন্দ্রের, উভয়েরই সমান ছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল হতে চলে এসে তিনি আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে ল্যাবরেটরী করে নানা বিষয়ে যেমন গবেষণাও চালিয়েছেন তেমনি নতন নতুন ইনডাস্ট্রিও গঠন করেছেন। জমি কিনে আখ চাষ করেছেন সেই আখ মাড়িয়ে তা থেকে তাঁর স্বগান মিলে চিনি তৈরী করেছেন। যে আখের ছিবড়ে বা বগাসি পড়ে থাকে তা বয়লারে না পুড়িয়ে তা থেকে পেস্ট বোর্ড করবার প্ল্যান করেছেন। যা মোলাসেস বা চিটাগুড় জন্যাত তা থেকে স্পিরিট তৈরী করেছেন। স্পিরিট থেকে স্পিরিচুয়াস প্রিপারেশান তৈরী করেছেন।

আবার সালফার পুড়িয়ে সালফিউরিক এসিড তৈরী করেছেন—যা কিনা সকল রাসায়নিক শিল্পের মূল উপাদান।

বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক সভা থেকে আচার্য দেব সরে এলেন সেখানে যখন লাভলোকসানের হিসাবটাই প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠল। বোসেস ল্যাবোরেটরীতেও অনুরূপ আদর্শের আঘাত লাগবে এই আশঙ্কায় অনেক উপযুক্ত কর্মীকে তিনি হারিয়েছেন। একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে যে সেইসব কর্মীর অভাবে তাঁর ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। আজ আপনারা যে কারখানা দেখছেন এ কারখানা আরো দশ-বিশগুণ বড় হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেই তা হতে দেননি বলেই মনে হয়।

তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে এই পুরাতন কর্মীটিকে ডেকে নিভৃতে নিজের শেষ শয্যার পাশে বসিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর সব কথা বলা চলে না, সব কথা আজ আর আমার মনেও নেই।

শুধু মনে আছে—আক্ষেপ করে বলেছিলেন, দারিদ্রের ঘরে জন্মেছিলাম কঠোর পরিশ্রমে দাঁড়িয়েছিলাম। সারা জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছি, ব্যয়ও করেছি সব। কিছুই সঞ্চয় রাখিনি। কত গড়লাম, কত ভাঙলাম,—কিন্তু করতে চেয়েছিলাম তা তো সব হয়ে উঠল না। চেয়েছিলাম দেশীয় গাছগাছড়ার বিস্তৃত গবেষণা করা হবে। দেশীয় ওষুধে সস্তায় সকল রোগের চিকিৎসা হবে। চেয়েছিলাম দূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সহজ সরল চিকিৎসার প্রসার করা হবে। চেয়েছিলাম দেশে অন্তত বারোটি বিশ্রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে যক্ষ্মারোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে। যক্ষ্মা সেরে গেলে যাতে তারা বিশ্রামের মধ্যে থেকে নানা রকম কাজকর্ম করে ক্রমশ সমাজের প্রয়োজনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে তাই চেয়েছিলাম বিশ্রাম মন্দির গড়তে। চেয়েছিলাম দেশ শুধু স্বাধীনই হবে না। স্বাবলম্বী হবে। পরানুকরণ করবে না, নিজের বৈশিষ্ট্যে আস্থাবান হবে। কিন্তু কি হল—!

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন।

আমি নিঃশব্দে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম।

আপনারা আজ যাঁরা তাঁর স্মৃতি-তর্পণের জন্য এই বৃদ্ধকে এখানে উপস্থিত করেছেন তাঁদের কাছে আমার শেষ নিবেদন জানিয়ে যাই। তিনি শুধু একজন এম্প্লয়ার মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি আদর্শের ধারক, বাহক ও প্রচারক। আপনারা তাঁর মহান উত্তরাধিকারে সেই আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখুন, বাড়িয়ে তুলুন। দেশকে স্বাবলম্বী করুন,—শুধু ভেষজ-শিল্পে নয় ব্যক্তি-জীবনেও স্বাবলম্বী এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ হোন—এইটুকু বলেই আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। আজ বিদায় নেবার আগে আপনাদের সকলের সঙ্গে আমিও আমার প্রণাম রেখে যাই সেই লোকোত্তর প্রতিভার পায়ে—যাঁর মর্মরমূর্তি আমাদের সম্মুখে জ্যোতির্ময়রূপে বিরাজ করছে।

॥ সমাপ্ত ॥

ক্যানসার রোগ

শ্রীসমীরকুমার নিয়োগী

ক্যানসার রোগের নামের সহিত আমরা প্রায় প্রত্যেকেই পরিচিত। এই রোগ 'কর্কট রোগ' নামে আমাদের দেশে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত প্রাচীন ইতিহাস

প্রাচীনকালে আদিমানবদের দেহে এই ব্যাধি দেখা যেত। মিশরীয় মমির হাড়ে ও ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে এর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ছয় কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে যে-সকল প্রাণীরা বাস করত, তাদের এই রোগ হত, পুরাকালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন—মানুষের দেহের ত্বকের ওপর ইহা একপ্রকার বিষাক্ত ধরণের ক্ষতের সৃষ্টি করে। তাই এ-দেশে এর নাম 'কর্কট রোগ'। আর পাশ্চাত্যে 'ক্যানসার' নামে পরিচিত। এই শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Karkinos শব্দ থেকে।

ব্যাধির প্রভাব

ক্যানসার রোগ জীবজন্তুর মধ্যে দেখা যায়। আর দেখা যায় মানুষের মধ্যে। কেবলমাত্র এককোষী প্রাণীদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায় না। যেমন—অ্যামিবা।

ক্যানসারের পরিচয়

ক্যানসার এক শ্রেণীর টিউমার বা অর্বুদ। আমাদের দেহের জীব-কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, জীবকোষের বিভাজনের দ্বারা। ইহার ফলে—একটি জীবকোষ, দুইটি জীবকোষে পরিণত হয়। তারপর ঐ দুইটি জীবকোষ থেকে বিভাজন দ্বারা চারিটি জীবকোষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বিভাজন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত। ছোটবেলায় আমাদের শরীর যখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন এই বৃদ্ধির হার থাকে খুব বেশী এবং এই বৃদ্ধির হার চলে যতদিন না আমাদের শরীর পরিপূর্ণত্ব লাভ করে। কিন্তু ইহার পরেও আবশ্যক ঘটলে, কোষ বিভাজন ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে-সকল জীবকোষসমূহের ধ্বংস হয়, তাদের স্থান পূরণ করবার জন্য জীবকোষ ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া, বিশেষ প্রয়োজনের সময় জীবকোষে বিভাজন ক্রিয়া হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—একটি নিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা জীবকোষের বিভাজন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কোন কারণের জন্য শরীরের কোনও অংশে জীবকোষের বিভাজনের নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটে, তবে সেই অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন ক্রিয়ার ফলে—সেই স্থানে জীবকোষ সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে থাকে। ইহারই জন্য সেখানে একটি টিউমারের সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয় 'ক্যানসার রোগ।'

ক্যানসারের শ্রেণী বিভাগ

বোম্বাই-টাটা-মেমোরিয়াল হাস-পাতালে ১২৫০০০-এর বেশী রোগী-দের পর্যালোচনা করে বিভিন্নপ্রকার ক্যানসার রোগের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের কিছুকালের একটি রেকর্ড থেকে এর সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। তা নীচে দেওয়া হলো—

Name of Cancer	Male	Female
(1) Genital	6.3%	– 5.7%
(2) Mouth or throat	5.8%	–11.1%
(3) Breast	×	–12 %
(4) Gullet or Oesophagus	5.4%	– 3.2%

এরপর ক্যানসারের শ্রেণী-বিভাগের কথায় আসা যাউক। ইহা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে আমাদের দেশে গবেষণা করে কয়েক শ্রেণীর ক্যানসারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা—

(1) Mouth or Throat cancer. (2) Genital cancer. (3) Breast cancer. (4) Heptoma cancer, (5) Carcinoma cancer, (6) Leukemia cancer, ইত্যাদি।

ক্যানসার সৃষ্টি হওয়ার কারণ

ক্যানসার নিম্নলিখিত কারণের জন্য সৃষ্টি হয়। যথা—

১। বিভিন্ন প্রকার রশ্মি :— সূর্যের রশ্মি, এক্স রশ্মি, আল্ফা এবং বিটা রশ্মি ইত্যাদি সকল প্রকার রশ্মি ক্রমাগত মানবের যে-কোন অংশে পড়লে, সেই অংশের কোষগুলো স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। ফলে—মানব দেহে ক্যানসারের সৃষ্টি হয়।

২। ধূমপান :—ধূমপানই ক্যান-সার সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ, অধিকাংশ চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিকগণ নির্দেশ করে থাকেন। ধূমপানের সময় আমাদের ফুসফুসের পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রো-কার্বন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করে এবং এরা ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। যত রকমের ক্যানসার আছে তার দেহের অন্যান্য অংশে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া অপেক্ষা ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ক্ষতিকর।

৩। রাসায়নিক দ্রব্য :—রবার রংয়ের কারখানায় এথিলিন, রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করে, তাদের সাধারণত মূত্রাশয়ে ক্যানসার হয়। নিকেল কারবনিল, ক্রিমায়ম সল্ট প্রভৃতি রাসায়নিক যৌগ শ্বাসনালীতে ক্যানসার করে। বেনজিন রক্তের শ্বেত-কণিকায় ক্যানসারের সৃষ্টি করে।

৪। অন্যান্য কারণ :— ১৯৪৭-৪৮ সালে চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিকগণ ফুস-ফুসের ক্যানসার সম্পর্কে গবেষণা করে বলেন—বিষাক্ত ধূলিকণা ও কার-খানার দূষিত গ্যাস, নিকেলক্লোরাইড, দূষিত গ্যাসে ভাসমান ক্রোমেট যৌগ, কঠিন বা তরল জ্বালানীর ধোঁয়া

ফুসফুসকে ক্যানসার আক্রান্ত হওয়াতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শরীরের কোন স্থানে অত্যধিক আঘাত লাগলে, সেই স্থানে অনেক সময় ক্যানসার হয়ে থাকে। অত্যধিক পান বা সুপারি চিবালে মুখের মধ্যে কোষসমূহ ক্রমাগত উত্ত্যক্ত হতে থাকে। আর তারই ফলে মুখে ক্যানসারের জন্ম হয়। তা ছাড়া, মানুষের দেহের যে সমস্ত অংশগুলি ভীষণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, সেখানে ক্যানসার অনেক সহজে সৃষ্টি হয়ে থাকে। মেয়েদের স্তন ও জরায়ু এই সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। [illegible] বিপদ—দূষিত বাতাস, [illegible] ধোঁয়া, সিগারেটের ধোঁয়া [illegible] ক্যানসার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ক্যানসার সৃষ্টি হবার বয়স

সাধারণত মধ্য বা বৃদ্ধবয়সে [illegible] ক্যানসার দেখা যায়। [illegible] সিমেন্টের ক্যানসার [illegible] দেখা যায়। 'মাউথ অব [illegible] ক্যানসার', 'ব্রেস্ট ক্যানসার', [illegible] ক্যানসার ইত্যাদি মধ্যবয়সে হয়।

ক্যানসারের লক্ষণগুলি

১। বুকে একটি পিণ্ড— 'ব্রেস্ট ক্যানসার-এর সূচনা।

২। এক মাস বা দেড় মাসের মধ্যে স্বরভঙ্গ অসুখ যদি আরোগ্য না হয়।

৩। শরীরের তিল বা মেচেতা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

৪। বিশেষতঃ চল্লিশ বছরের উপর পরিপাক ক্রিয়া এবং মলত্যাগের অনবরত পরিবর্তন ঘটে।

৫। দেহের কোথাও কোন ক্ষত এক মাসের মধ্যে না সারে।

৬। শরীরের মধ্যে ক্রমশ দুর্বলতা বৃদ্ধি।

৭। ক্রমাগত মাথা ধরা, 'সাইনা-সাইটিস' বা দন্তহ্রাস।

৮। কোন স্বাভাবিক ছিদ্রপথে রক্তপাত ঘটে।

৯। ক্যানসার রোগের অস্তিত্ব নির্ণয়ের সহজ এক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির শরীরের যে-কোন অংশ থেকে সামান্য রক্ত নিয়ে, তাতে রুবিডিয়াম মিশ্রিত করা হয়। একটি গ্যামা রশ্মি ও স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ঐ রক্ত কি হারে রুবিডিয়াম শুষে নেয় তা নিরীক্ষণ করা হয়। সুস্থ মানুষের রক্তকণিকার থেকে ক্যানসার রোগাক্রান্ত মানুষের রক্তকণিকা ঐ রুবিডিয়ামকে প্রায় কুড়ি গুণ দ্রুততায় শোষণ করে থাকে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক্যানসারের চিকিৎসা চারিটি পদ্ধতি অবলম্বন করে করা হয়—

১। অস্ত্রোপচার :—ক্যানসার যদি তার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে, তবে অস্ত্রোপচারের সময় আশপাশের জীব-কোষ সমেত দূষিত ক্যানসার কোষকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব।

২। হরমোন চিকিৎসা :—হরমোন হচ্ছে—আমাদের দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি-সমূহ হতে নিঃসৃত রস। হরমোন প্রত্যক্ষ ক্যানসারের আরোগ্য করে না। কয়েক প্রকার ক্যানসারকে কোন কোন হরমোন প্রয়োগ করে, সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

৩। রাসায়নিক চিকিৎসা :—ঔষধের সাহায্যে যে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে, তাকে রাসায়নিক চিকিৎসা বলে। কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ক্যানসারের স্বেচ্ছাচারী জীবকোষদের ধ্বংস করতে সক্ষম।

৪। রশ্মির প্রয়োগ :—অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে যেখানে অসুবিধা হয়, সেই স্থলে রশ্মির সাহায্যে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়। রঞ্জন রশ্মি বা রেডিয়াম নির্গত গামা রশ্মির সাহায্যে অনেক সময় ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়।

ক্যানসারের পূর্বে সতর্কতা

১। সন্দেহ হওয়ামাত্রই চিকিৎসকের সাহায্য নওয়া আবশ্যক।

২। যাদের অল্পেতেই ঠাণ্ডা লাগে বা কাশি হয়। তাদের কম ধূমপান করা উচিত।

৩। জননেন্দ্রিয়ের ক্যানসারের হাত হতে রক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়গুলো পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

৪। ধারলো বা ভাঙা দাঁত থাকলে, যত শীঘ্র সম্ভব তুলে দিতে হয়।

৫। প্রতিদিন মুক্তবায়ুর মধ্যে ভ্রমণ করা উচিত।

৬। ধূমপান কম করা উচিত। নতুবা ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্টি হবে। এই ক্যানসার খুব মারাত্মক।

ক্যানসারের সংক্রামতা

আমাদের অনেকের ধারণা যে, ক্যানসার রোগ সংক্রামক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। গবেষণা করে জানা গেছে—ক্যানসার রোগ মোটেই সংক্রামক নয়।

ক্যানসারের বংশগতি

পুরুষানুক্রমে পিতামাতার দূষিত রক্তই সন্তানের ক্যানসারের কারণ বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেন, 'আর্চিব ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিন ১৯১৬'তে ক্যানসার ব্যাধি আক্রান্ত দুইটি পরিবারের কথা উল্লেখ আছে, তাদের দেহের কয়েকটি অংশে ক্যানসার পর পর বেশ কয়েক পুরুষ ধরে হয়েছে।

ক্যানসার রোগ আধুনিককালে একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাধি নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাদের দেশও এই বিষয়ে সচেতন। আমি আশা রাখি—ভাবীকালের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ সমস্ত মানব সমাজ থেকে এই দুরন্ত ব্যাধিকে নির্মূল করবে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,—আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে স্বচ্ছন্দ, বিলাসময় ও মধুময় করেছে। কিন্তু যে দিন এই মারাত্মক ব্যাধি ক্যানসারের উপর মানুষ তার বিজয়বার্তা ঘোষণা করবে, সেইদিনই আমাদের জীবনে নেমে আসবে সত্যিকার নতুন আলো।

● শ্রী এইচ কে রায়, কোয়ারপুর, বর্ধমান —

আপনার ২।৬।৬৯ তারিখের চিঠি পেয়েছি, কিন্তু ১২।৫।৬৯ তারিখের চিঠি পাইনি। ২।৬।৬৯ তারিখের চিঠিতে কোন রোগের বিষয় উল্লেখ না থাকাতে উত্তর দিতে পারলাম না।

Northern Benji Club, Lower Chitpur Road, Cal.-7.

Q. 1. How to prevent rats and cockroaches without hampering our health ?

Ans. Most of the insecticides are injurious for human health. It is better to kill the rats and other insects with insecticides then wash the place thoroughly before human use.

Q. 2. If any one feels cold and somewhat fever with a strong headache, what to do ?

Ans. Headache is a complication and the patient should be taken to a physician for thorough examination and treatment.

(পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন প্রশ্ন বাংলাতে পাঠান। এ অনুরোধ আমরা পূর্বেও করেছি। এখনও করছি, ভবিষ্যতেও করব।)

● শ্রীভবানী ভট্টাচার্য (ছদ্মনাম), বাপুজী কলোনী, ইছাপুর—

অবহেলা বলছেন কেন? যে রোগের জন্য হাসপাতাল গিয়েছিলেন সে রোগ যখন নিরাময় হয়েছে, তখন বাকী উপসর্গগুলি যে কোন চিকিৎসককে দেখালেই চলে যাবে' এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সাধারণত হাসপাতালের বিশেষ বিভাগগুলি পরিচালিত হয়। তা না হলে সমস্ত রোগী বা রোগিণীর প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব নয়। আপনাকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে ওষুধ হাসপাতাল থেকে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তাতেই উপকার হবে। তবে দীর্ঘদিন খেতে হবে।

● শ্রীমতী গীতা জানা, ম্যাকক্লাস্কীগঞ্জ, বিহার ——

আপনার কন্যার উপসর্গের কথা

পড়লাম। একটি খাবার উল্লেখ করেন নি। আপনার প্রসব স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল, না ফরসেপ্স্ সীজারিয়ান হয়েছিল?

আপনি মেয়েটির যে উপসর্গগুলির কথা লিখেছেন, তা মাথা খারাপের নয়। ওদিকে চিন্তা করবেন না। ওই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গেলে মেয়েটির মানসিক বিকৃতি সত্যই দেখা দেবে।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

আমার মনে হয় মেয়েটি একেবারে একা। নিঃসঙ্গভাবে ছোট বেলা থেকে একা মানুষ হয়েছে বলে সবকিছু বুঝতে পারে না। এগুলি আপনা থেকেই আরও কিছুকাল পরে তৈরি হবে। আপনি ওকে নিয়ে রোজ বেড়াতে বেরোবেন, হসির কথা বলবেন এবং সমবয়সী বান্ধবীদের সঙ্গে মিশতে দেবেন। প্রয়োজন হলে কোন ভাল হস্টেলে রাখবেন।

● শ্রীমহীতোষ চৌধুরী, কাছাড়—

আপনি নিয়মিত কোন হজমের ওষুধ খাবার আগে খান, অন্তত মাস তিনেক। আপনার বাসায় প্রত্যেকে যে উপসর্গে ভুগছেন, আমার মনে হয় গরমের জন্য হচ্ছে।

● শ্রীসিদ্ধার্থ নিয়োগী, জামালদহ, কুচবিহার ——

আপনি ভিটামিন বি ১, ভিটামিন বি ৬, ভিটামিন বি ১২ মিশ্রিত কোন ইনজেকশন একদিন অন্তর, মাংসপেশীর মধ্যে গ্রহণ করবেন। কমপক্ষে ১০টি ইনজেকশন নেবেন।

● শ্রীসীমা চৌধুরী, কলিকাতা—

প্রশ্ন: আমার বয়স ১৮বছর ১ মাস। আমার নীচের দাঁতের মাড়ি নেমে যাচ্ছে—

উত্তর: আপনি দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন। এই ধরণের উপসর্গে সাধারণত একরকমের প্লাস্টার দিয়ে মাড়ি শক্ত করে রাখা হয়। কিছুদিন পরে মাড়ি শক্ত হয়ে গেলে প্লাস্টার খুলে নেওয়া হয়। আপনি যত শীঘ্র পারেন চিকিৎসককে দেখান, কারণ দেরি হলে সারতে অসুবিধা হয়।

● শ্রীহীরালাল দালাল, মদনমোহন পুর, বাঁকুড়া ——

প্রশ্ন: আমার বয়স ২০ বৎসর। নিয়মিত পায়খানা পরিষ্কার হয় না বয়স অনুপাতে রোগা। ঠিকমত হজম হয় না।

উত্তর: আপনি নিয়মিত দুবেলা গ্লুটাজাইম্ জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন।

● শ্রীসতীনাথ ব্যানার্জি, গুসকরা পরিবেশ, বর্ধমান—

আপনি যে উপসর্গের কথা বলেছেন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনা থেকেই সারবে; স্ক্যাবালগিড অথবা অ্যাসকাবিয়ল জাতীয় ওষুধ ক্ষতস্থানে লাগাতে পারেন।

● শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য, রাণাঘাট, নদীয়া—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম, সমস্ত উপসর্গগুলি ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে হচ্ছে। আপনি ছেলেকে নিয়ে কলকাতার কোন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান। আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে বলছি—

প্রশ্ন ১: শরীর সুস্থ ও সবল (মোটা হইবার জন্য), করিবার জন্য কি কি পথ্য ও ঔষধ প্রয়োজন?

উত্তর: দুবেলা পেট ভরে ডাল ভাত

(বা বাড়িতে জোটে) খাবেন, আর খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে অ্যামাইনোজাইম অথবা লিভারজেন খাবেন, অন্তত দু মাস। দুপুর বেলায় খাবার পর অন্তত পক্ষ দু ঘণ্টা ঘুমোতে হবে।

প্রশ্ন ১ : চুল ওঠা ও পাকা বন্ধ করিবার জন্য কি করা দরকার?

উত্তর : মন থেকে দুশ্চিন্তা একেবারে মুছে ফেলতে হবে।

৪ শ্রীআর এন মিত্র, খুরদা, পুরী—

প্রশ্ন ১ : আমার এক আত্মীয়া প্রায়ই অম্বল রোগে ভুগছেন।

উত্তর : দুবেলা খাবার আগে লায়োপ্লেক্স্ এনজাইম আর খাবার পর জেলুসিল বড়ি খেতে বলবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার মায়ের চোখে বরাবর আঞ্জুনি উঠেছে—এক চোখের ভাল হয়ে গেলে, আর এক চোখে হয়।

উত্তর : আপনি কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী স্ট্রেপ্টোমাইসিন্ দেবার অনুরোধ করবেন।

৫ শ্রীমতী অসীমা পান, বেলুড় মঠ, হাওড়া—

টিউমার থেকে ওই উপসর্গগুলো হচ্ছে না। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আপনি এক কোর্স এমোটিন্ এবং লিভার এক্সট্রাক্ট্ নিয়ে দেখুন, উপসর্গগুলি অনেক কমে গেছে। একমাস পরে আবার নেবেন। এইভাবে তিনবার নিলে দেখবেন একদম সুস্থ হয়ে গেছেন।

৬ শ্রীশঙ্কর বিশ্বাস, চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর—

আগের চেয়ে সুস্থ আছেন জেনে সুখী হলাম। ওই একই ওষুধ অন্তত তিনমাস ব্যবহার করুন।

৭ শ্রীমতী চন্দনা চ্যাটার্জি, বালিগঞ্জ প্লেস (ইস্ট), কলি-১৯—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনার মনে অহেতুক ভয় সৃষ্টি হয়েছে। বান্ধবীরা আপনাকে অজ্ঞতাজনিত ভুল কথা বলেছেন। আপনার শারীরিক যে উপসর্গগুলি হয়েছিল, তা বিয়ে না করার জন্য। আপনি নিশ্চিন্তে বিয়ে করুন; আশীর্বাদ করছি আপনি সুখী হোন। ও নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না। তাতে মানসিক অশান্তি আরও বাড়বে।

৮ শ্রীমেঘরাজ (ছদ্মনাম), পশ্চিম দিনাজপুর—

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ষোল বৎসর। কিন্তু এখনই আমার মুখ দাড়ি গোঁফে ছেয়ে গেছে। কোন লোমনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে চাই—

উত্তর : আমার পরামর্শ চাইলে বলব কোন ওষুধ লাগাবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হবে।

প্রশ্ন ১। যদি কারও একশিরা হয় তবে তার ছোট বয়সেই অপারেশন করলে কি ভাল হবে?

উত্তর : একবার অপারেশন করলে জীবনে আর হয় না।

● সোনা (মু), আলিগড়—

আপনি নিয়মিতভাবে সায়োভিনা দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ ধরে খাবেন, অন্তত তিন মাস।

আপনার কাকিমাকে লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন নেবার পরামর্শ দেবেন।

৯ শ্রীসোমেন আচার্য, ঠিকানা দিতে অনিচ্ছুক—

আপনি তো কলকাতাতেই থাকেন। যখন বাইরের চিকিৎসায় উপকার পাননি, তখন একদিন যে কোন বড় হাসপাতালের আউটডোরে দেখিয়ে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করান। এ ধরণের উপসর্গ নিয়ে দেরি না করাই ভাল।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

শ্রীদিলীপ ব্যানার্জি, দুর্গাপুর-৪—
আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলি-১৪—
প্রশ্ন ১: এক বৎসর হইল আমার মুখের কয়েক স্থানে খয়েরী রংয়ের দাগ পড়িয়াছে।
প্রশ্ন ২: ঘিয়ের খাবার খাইলে আমার শরীরের নানাস্থানে লালচে রংয়ের ভুমো মতন বাহির হয় এবং ভীষণ চুলকোয়।
প্রশ্ন ৩: শরীরের চামড়ার নীচে থেকে থেকে জ্বালা করে।
প্রশ্ন ৪: ভাল করিয়া স্নান করিলে শরীর গরমও হয়, ঠাণ্ডাও লাগে।
(২টি কুপন আছে)
উত্তর: সবকটি উপসর্গ অ্যালার্জি-জনিত রোগ থেকে ঘটছে। আপনি রক্ত পরীক্ষা করিয়ে অ্যালার্জির চিকিৎসা দীর্ঘদিন ধরে করুন, দেখবেন উপসর্গ-গুলি কমে গেছে।

শ্রীমতী রীতা ঘোষ, নৈহাটি মিত্র পাড়া রোড, নৈহাটি—
প্রশ্ন: ভাত খেয়েই যখন স্কুলে যাই ওখন বামদিকের বুকটায় ভীষণ যন্ত্রণা করে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চলতে হয়। এর জন্য খুব কষ্ট হয়।
উত্তর: আমার মনে হয় বায়ু হচ্ছে, আর বায়ুর চাপে হৃদপিণ্ডের স্থানে ব্যথা সৃষ্টি করে। খাবার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম করে স্কুলে গেলে এ ধরণের ব্যথা হবে না। তবু হৃদপিণ্ডের জায়গায় যন্ত্রণা হয় বলে একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন।

শ্রীএস কে বর্মণ, আগরতলা, ত্রিপুরা—
যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা কোন রোগ নয়। প্রথম প্রথম ওরকম হয়। তারপর ঠিক হয়ে যায়।

শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলী—
ব্যক্তিগত চিঠি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস, সালকিয়া, আলোর দিকে তাকিয়ে পড়বেন না। বেশি করে ভিটামিন এ, ডি মিশ্রিত কোন ওষুধ ব্যবহার করুন। ডিম খাবেন। খাঁটি মধু দুবেলা খাবেন।

শ্রীআর আর রায়, জামালপুর—
আপনি স্নানের পর চিক্কন অয়েল মাখবেন।

শ্রীবাদলেন্দু বিকাশ নন্দী, সব্রুম, ত্রিপুরা —
দয়া করে পরিষ্কারভাবে উপসর্গগুলি লিখে পাঠান। আমি এক অক্ষরও পড়তে পারিনি।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস, মানা ক্যাম্প, রায়পুর, মধ্যপ্রদেশ—
আপনার উপসর্গগুলি কোন রোগের নয়। এ নিয়ে অযথা কোন ভয় পাবেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৌলিক, উত্তরপাড়া হুগলী—
চিঠির অংশ
'মাসিক বসুমতীর আষাঢ় সংখ্যায় আপনার কথামত আমি 'এ্যানাস্টমসিস এবং ভাস অপারেশন'-এর জন্য ডা: মুরারিমোহন মুখার্জী, এম-এস (কলি), এফ-আর-সি-এস (লণ্ডন ও এডিন)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। কল্যাণী জে, এন, এম হাসপাতাল-এ ফ্রি-বেডে তিনি অপারেশন করতে রাজী হইয়াছেন। তবে হস্পিটাল-এ ফ্রি-বেডে তিনি অপারেশন করতে রাজি হয়েছেন। ওয়েটিং লিস্টে-এ নাম আছে। কবে যে বেড পাইব তার ঠিকানা নাই। হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানলাম কখনও ৫।৬ মাস ওয়েট করিতে হয়—'

আমাদের বক্তব্য—
হাসপাতালে অপেক্ষা করতেই হবে। আপনার মত হাজার হাজার রোগীদের চিকিৎসা করতে হয়। অত্যন্ত জরুরী রোগ না হলে পরপর চিকিৎসা করার নিয়ম হাসপাতালের। এ নিয়ম ব্যতিক্রম হওয়ার বিপক্ষে আমি। আপনার সময় এলে ঠিক ওঁরা খবর দেবেন এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীদুলালচন্দ্র দাস, নন্দরাম সেন স্ট্রীট, কলি-৫—
আপনার উপসর্গ অপারেশন না করলে যাবে না।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশ, কেদার সিংহ রোড, কলি—৫৭—
প্রশ্ন ১: শরীরের সর্বত্র লাল তিল কিছুকাল যাবৎ বেরুচ্ছে, এগুলি হঠাৎ গায়ে দেখা দেয়। কোনও চুলকানি বা ব্যথা করে না। উপযুক্ত দেশীয় ঔষধের নির্দেশ দেবেন।
উত্তর: কেতুপাপড়া, কালমেঘ, গুড়নিয়া, কলমী জাতীয় তেতো ঔষধ ব্যবহার করে দেখতে পারেন।
প্রশ্ন ২: ডান কানের [illegible] জলের মত জমে ও পরে পুঁজের মত হয় ও অপরিষ্কার কান ভারী হয়ে থাকে।
উত্তর: দেরি না করে কানের চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসা করান।

শ্রীসুজিত ঘোষ, [illegible]—
আপনার সমস্ত উপসর্গ দুর্বলতা থেকে হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভাল হলেই ওসব উপসর্গ চলে যাবে।

শ্রীমতী বীণা ঘোষ, অবিনাশ ব্যানার্জি লেন, কলি-[illegible]—
আপনার চিঠি [illegible] পেয়েছি। আপনাদের চিকিৎসক [illegible] চিকিৎসা করছেন, তাতেই আপনি [illegible] হবেন, তবে আপনাকে নিজের [illegible] ভুলে যেতে হবে। [illegible] মনে দুশ্চিন্তা থাকার জন্যেই [illegible] লাগছে না। বেপরোয়া হতে হবে। যে যা বলে বলুক আপনি কানে তুলবেন না, দেখবেন মোটা হতে সুরু করবেন।

শ্রী এ এ মিত্র, শিকারপুর কুচবিহার—
আপনি দুবেলা খাবার আগে এলিকিসর নিয়োগাডাইন চা চামচের দু-চামচ করে খাবেন দুমাস।

শ্রীঅজিতকুমার দাউরী, বেলিয়াতোড় বাঁকুড়া—
আপনি সকাল সন্ধ্যা স্যাবালসিড্ গায়ে মাখবেন একমাস ধরে।

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী, [illegible]—
একটু ব্যায়াম করবেন সকাল

বলায়। হাত মাথার ওপর তুলে দিয়ে হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবেন। তাতে সব উপসর্গ কমে যাবে। হাত কানের সামনে আসবে না এবং হাঁটু ভাঁজ হবে না।

● শ্রীসুশীল ব্যানার্জি, পলাশডাঙা, বাঁকুড়া---

আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ডায়াপেপসিন একমাস খাবেন এবং দিনে তিনটে করে ডেভোকুইন দশদিন খাবেন।

● শ্রীআশিস মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপুর-৮---

ও উপসর্গ নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। দেখবেন আপনা থেকেই কমে গেছে।

● শ্রীমনোজ মিত্র মিডল রোড, কলি--১৪---

প্যানিমিন

শ্রীশরচ্চন্দ্র কুমার মজুমদার, কোহিমা, নাগাল্যাণ্ড---

আপনি 'নিউরোবিয়ন' ইনজেকশন একদিন অন্তর একটি করে ইণ্ট্রা-মাসকুলার নেবেন, দশটি ইনজেকশন, তারপর কেমন থাকেন জানাবেন।

● শ্রীতপনকুমার সিনহা, লেক টাউন, কলি--৫৫---

কিছু ভয় নেই। ওটা কোন সমস্যাই নয়।

● শ্রীমতী বেলা দেবী, তালপুকুর, ব্যারাকপুর---

আপনি ম্যাকালভিট আই-এম ইনজেকশন ব্যবহার করে দেখতে পারেন। স্থানীয় চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ইনজেকশন নেবেন।

● শ্রীএস এন চ্যাটার্জি, খড়দহ---

যখন বিখ্যাত চিকিৎসকগণ অভিমত দিয়ে বলেছেন, আপনার কোন রোগ নেই, তখন ভয়ের কিছু নেই। ভয় থেকে ব্যথা থাকছে। আপনি ওসব ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করুন, দেখবেন সব উপসর্গ চলে গেছে।

● শ্রীমতী বনানী সেন, নর্থ লেক রোড, পুরুলিয়া---

এ বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় না। সংক্ষেপে উপসর্গগুলির উত্তর দেওয়া হয়---

১: আপনি হয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খান অথবা ইনজেকশন নিন। এ ছাড়া প্রাগমাটার মলম মাথায় ঘষে ঘষে একমাস নিয়মিত লাগাবেন।

২: আপনার দিদিকে রোজ রাতে ত্রিফলার জল খেতে বলবেন। মুখে কিছু মাখবেন না। মিষ্টি, চর্বি, পনীর, ঘী, মাখন, বাদাম, চকোলেট খাবেন না। দুমাস পরে জানাবেন কেমন থাকেন।

শ্রীমতী শ্যামলী সরকার, ধানবাদ---

ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে---

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক--মেদিনীপুর, রাজাবাজার---

প্রশ্ন ১: আমার দিদির কয়েক বৎসর যাবৎ বগলে এবং আবৃত অংশে প্রচুর ময়লা জমিয়া কালো হইয়া গিয়াছে। গরম জলে এবং সাবানের দ্বারা কিছুতেই ময়লা অপসারণ করা যাইতেছে না।

উত্তর: হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে প্রত্যহ পরিষ্কার করলে ময়লা চলে উঠে যাবে। একদিন পুরোটা তুলবেন না, ঘা হয়ে যেতে পারে। ময়লা পরিষ্কার হয়ে গেলে রোজ সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন, নইলে আবার ময়লা জমতে পারে।

প্রশ্ন ২: মাসিকের দুই চারি দিন পূর্ব হইতে খুব অল্প পরিমাণে সাদা স্রাব নির্গত হয়। একথা শুনিয়া আমার এক বান্ধবী বলিয়াছে যে উহা নাকি টি বি রোগের লক্ষণ। আমি বড়ই ভীত হইয়া আপনার নিকট হইতে জানিতে চাই যে উহা সত্যই টি বি রোগের লক্ষণ নাকি মাসিক হইবার লক্ষণ?

উত্তর: আমার জ্ঞানানুযায়ী বলছি মাসিক হবার পূর্ব লক্ষণ।

● শ্রীমতী তৃপ্তি সরকার (ছদ্মনাম) শ্যোন পার্ক---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। সমস্ত উপসর্গই মানসিক দুর্বলতা থেকে হচ্ছে। যে ওষুধের নাম লিখেছেন সেই ওষুধ প্রত্যহ ১টি করে বড়ি রাতে শোবার সময় একমাস খাবেন। দ্বিতীয় মাসে একদিন অন্তর, তৃতীয় মাসে সপ্তাহে দু দিন। এইভাবে কমিয়ে আনবেন। তাছাড়া দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে অ্যামাইনোজাইম দুমাস খাবেন।

● শ্রীঅচিন্ত্যতত্ত্ব মিত্র, ছোটনীলপুর রোড, বর্ধমান---

এ বিষয়ে একক মতামত গ্রহণ করা বিধেয় নয়। আমার মতে অন্য চিকিৎসায় যখন কাজ হচ্ছে না, তখন একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে দোষ কি? আপনার প্রেরিত রাশিয়ার ডাক্তারদের প্রেস-কৃপশন হুবহু নীচে ছেপে দিলাম, কারণ Pseudohy pertrophy muscular dystrophy রোগের চিকিৎসা আমাদের দেশে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। যদি এই প্রেসকৃপশন পড়ে কোন চিকিৎসক উৎসাহিত হয়ে চিকিৎসা করেন, আর তাতে কোন রোগী উপকৃত হয়, তাহলে সত্যই সমাজের কল্যাণ হবে।

"In the hospitals during the period under examination of acute condition involving painful symptoms consisting of repeatation or occurrence of symptoms once or twice in a year which last for and takes a course of 4 to 6 weeks of treatment. The treatment start from flow of pouring in donor's blood in 100, 150 to 200 c.c. per day in 6 to 10 days, (Such transfusions should be given for 4 to 5 times). After a short time there will be systemic antibodies formations or application of its analogues, application of these should be taken recourse to along with Vitamin B1, B12 and adeno-phosphoric acid. Internally preparation of strychnine iron and glycerophosphates and like substances and recommended which will be compatible to the body system and also Vitamin E. Evidently

...plication of anabolic steroid hormones e.g. dianobal will be useful. The disease processing in itself specially organic affections will be limited with the adoption of these principles to a large extent. Regular visit for supervision by doctors or regular medical attention coupled with exercise and massage will confer very great relief along with little energising. The symptoms will be greatly obviated thus—"

শ্রীমতী সুদেষ্ণা দেবী, দমদম (সাউথ) কলি-২৮—

প্রশ্ন ১: কি ঔষধ খাইলে একটু মোটা হওয়া যায়?

উত্তর: শুধু ওষুধ খেয়ে মোটা হওয়া যায় না। তার সঙ্গে দুবেলা পেট ভরে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে হবে।

প্রশ্ন ২: কি ঔষধে চুলকানির কালো দাগ সারিবে?

উত্তর: ক্ষতস্থানে সিলোডার্ম জাতীয় মলম লাগাবেন আর গ্রিসিয়োফিন এফ পি বড়ি খাবেন। তার সঙ্গে বহু ভিটামিন বড়ি অথবা সিরাপ ব্যবহার করবেন।

● কোন নাম নেই, ঠিকানা নেই—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি কিছুদিন স্ক্যাবালসিড মলম ক্ষতস্থানে লাগান এবং ক্ষতস্থানে হাওয়া লাগতে দেবেন।

● শ্রীশিশির ধর, তারিণী কুটির, নিউ বুক, নৈহাটি—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আমার মনে হয় পুরনো Sinusitis রোগে ভুগছেন। কোন ই-এন-টি স্পেশালিস্টের অধীনে চিকিৎসা করান, দেখবেন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

শ্রীসুভাষ দাস, আনন্দনগর, বেলঘরিয়া—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীমতী ছন্দা সেন, কলকাতা—

নিষেধ করেছেন বলে প্রশ্ন দিলাম না। আপনি যে ওষুধ ব্যবহার করছেন, তা অন্তত তিনমাস করুন।

● শ্রীশোভন ঘোষ, বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা—

আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে সায়োপেপ্সিন এনজাইম খাবেন তিনমাস।

● শ্রীভগবতপ্রসাদ গড়াই, কালীতলা স্ট্রীট, পুরুলিয়া—

আপনি তিনমাস ধরে দুবেলা ভাত খাবার পর অ্যামাইনোজাইম খাবেন।

● শ্রীনীপা চ্যাটার্জি, হাওড়া—

আপনার দীর্ঘ চিঠি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়লাম। আপনি অকারণে নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছেন। যেসব কথা আপনি লিখেছেন, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অধিকাংশ নারীই করে থাকেন, তাতে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনের বিকাশ হতে বাধা থাকে না। আপনি ওসব ঘটনা নিয়ে উতলা হবেন না। ভবিষ্যত ও বর্তমান যাতে উজ্জ্বল হয়, তারই সাধনা করুন। জীবনের অনেক ঘটনা আছে, যাকে আত্মসাৎ করতে হয়। জীবনে শুধু অমৃত থাকবে, বিষ থাকবে না, এ কখনও হয়? বিষকে হজম করে অমৃতকে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে মানব জীবনের সাধনা। আপনি ইচ্ছে করলে মহামতি হ্যাভলক অ্যালিসের যৌন মনোদর্শনের (বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত) স্বয়ং রতি খণ্ডটি পড়ে দেখতে পারেন। তাতে উপকার হবে।

● শ্রীবিজন পাল, জামসেদপুর—

একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের কখনও তুলনা হয় না। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

● শ্রীকমলকান্তি ঘোষ, ত্রিবেণী—

লম্বা হবার কোন চিকিৎসা আমার জানা নেই।

● শ্রীঅরুণকুমার ব্যানার্জী, চন্দননগর—

প্রশ্ন ১: আমার মাথার চুল কোঁকড়ান করতে চাই।

উত্তর: সোজা চুল দেহের কোন ক্ষতি করছে কি?

প্রশ্ন ২: আমার বোনের চুল আঁচড়ালেই খুব উঠে যাচ্ছে—

উত্তর: ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নিতে বলবেন।

● শ্রীকৃষ্ণ রায়, নীলগঞ্জ বাজার, ব্যারাকপুর—

ব্যক্তিগত উত্তর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ধর, যাত্রাবাড়ী, আগরতলা—

আপনার অসুস্থতার উত্তর চিঠিতে দেওয়া উচিত নয়। আপনি কোন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে ভালভাবে চিকিৎসা করান।

● শ্রীমতী ঝুমু দাস, যাদবপুর—

আপনার মাসীমাকে অ্যাম্বোড্রিন ক্যাপসুল দিনে ২টি করে ১৫ দিন খেতে বলবেন।

● শ্রীমতী সুমিতা রক্ষিত, কাটিহার, পূর্ণিয়া—

প্রশ্ন ১: আমি ওরাল 'কন্ট্রাসেপটিভ' হিসাবে Lyndiol 2·5 ব্যবহার করিতে চাই। কিন্তু গুলি শেষ হয়ে যাবার পর থেকে যতদিন পর্যন্ত না মাসিক সুরু হয়, ঐ মধ্যের দিনগুলিতে মিলিত হইলে কি বাচ্চা হবার সম্ভাবনা থাকে? হ্যাঁ, কি না জানিয়ে বাধিত করিবেন।

উত্তর: সন্তান হবে না। ওই বড়ি খেলে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

● শ্রীপ্রকাশকুমার গুপ্ত, তালাপ, আপার আসাম—

● শ্রীরমানন্দ ব্রহ্মচারী, পুরোহিত-পাড়া লেন, উত্তরপাড়া—

প্রশ্ন: প্রায় মাসাধিককাল যাবৎ সর্বদেহে অত্যন্ত ভার বোধ করছি।

উত্তর: আমার মনে হয় আপনার শরীরে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি ঘটছে। আপনি আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, ইতিমধ্যে লবণ খাওয়া বন্ধ করে দিন এবং জল অত্যন্ত কম খাবেন।

ভোরের কার্কাশ
—শ্রীমতী সাধনা রায়

পঞ্চবটীর হনুমান
—বিশ্বনাথ গোস্বামী

কলকাতার কড়চা
-বিন্দুশেখর বিশ্বাস

সামনে স্কুল
—সুপ্রিয় সেনগুপ্ত

পরিকল্পিত পরিবার
—এন হালদার

মাসিক বসুমতী । ভাদ্র / '৭৬
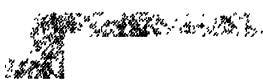
একটি মুহূর্ত
—সুরেন্দ্রকুমার সিংহ

গঙ্গা

—ব্রহ্মচারী সত্যশরণ

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন। ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২

মজার মেলা (ইংল্যাণ্ড)

—শিপ্রা রায়
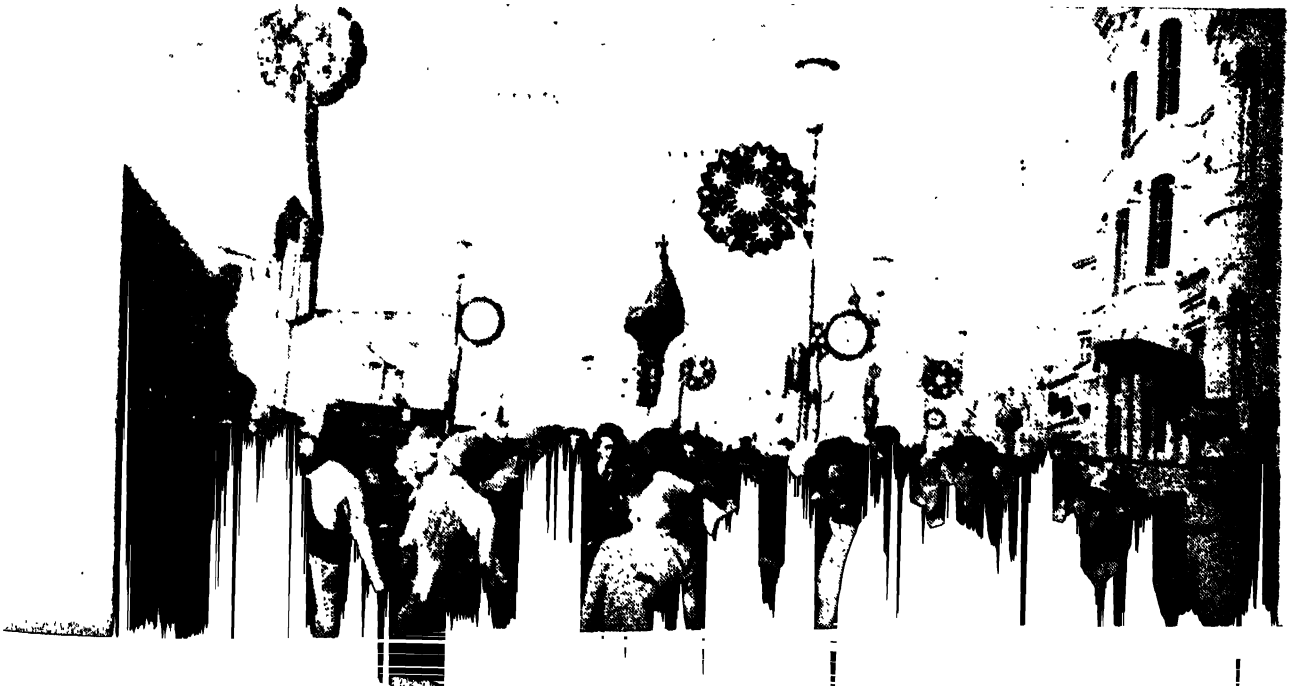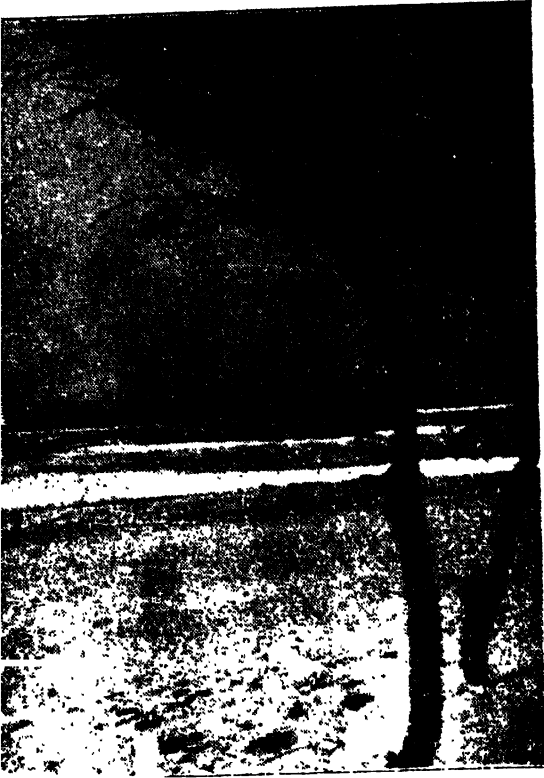
দীঘার সমুদ্র
—দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়

কিশোরী
—চন্দনা বকশী

মাসিক
বসুমতী
ভাদ্র / '৭৬

পথ-সংস্কার
—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

● শ্রীমতী মধুমালতী রায়, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভেন্যু, কলি-৩---

আপনি দুবেলা খাবার আগে এক চামচ করে নিয়োগাডাইন এবং খাবার পর দু' চামচ করে সারকোফেরল দুমাস খাবেন।

● শ্রীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, লেক প্লেস, কলি--২৯---

প্রশ্ন ১: আমার চেহারা অত্যন্ত রোগা। শরীরে চর্বি বিশেষ নেই। আমি ফুটবল খেলি।

উত্তর: আমার মনে হয় পুষ্টির চেয়ে শারীরিক পরিশ্রম বেশি হয়ে যাচ্ছে। মোটা হতে চাইলে খেলা কমিয়ে দিন।

প্রশ্ন ২: দিনে দুবার চা খেলে কি শরীরের কোন ক্ষতি করে?

উত্তর: ভাল চা খেলে করে না।

প্রশ্ন ৩: আমি গানের চর্চা করি, বেশী দৌড় ঝাঁপ চিৎকার বা শারীরিক পরিশ্রম করলে কি গলা নষ্ট হবার ভয় থাকে?

উত্তর: থাকে। গানও একটি অমূল্য পরিশ্রম ও সাধনার শিল্প।

প্রশ্ন ৪: পড়াশুনায় একাগ্রতা আনতে গেলে কি কি করতে হবে?

উত্তর: এ বিষয় নিয়ে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে, তবু আবার বলছি---প্রত্যহ সকালে দু'ঘণ্টা, সন্ধ্যায় তিনঘণ্টা পড়তে হবে। রাতে পড়বেন, দিনে লিখবেন। সন্ধ্যেবেলায় ভাল করে হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসবেন। রাতে যা পড়বেন একদিন পরে বই না দেখে খাতায় লিখবেন। তারপর একদিন পরে বই মিলিয়ে দেখবেন কি ভুল লিখেছেন। ভুলগুলো অন্য রঙের কালি দিয়ে কেটে সংশোধন করবেন। এই ভাবে অভ্যাস করলে দেখবেন সব মনে থাকছে। স্কুল-কলেজে পড়াশুনা হোক আর নাই হোক, নিজেকে নিয়মিত পড়তে হবে।

● শ্রীরবীন্দ্র ভৌমিক, কামাল চৌমুহনী আগরতলা---

আপনার আত্মীয়াকে নিয়মিতভাবে পালমোকড্ খেতে বলবেন। আপনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নেবেন।

● শ্রী এ কে সিন্‌হা, সওগর ক্যাম্প, এম, পি---

আপনাকে ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয়েছে---

● শ্রী এম দাস, অরুন্ধতীনগর, ত্রিপুরা---

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই আপনার ধারণা ঠিক। দু নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আপনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নেবেন।

● শ্রীলক্ষ্মীকান্ত হাজরা, পথভবন, আফতাব ক্লাব, বর্ধমান---

প্রশ্ন ১: কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করে উর্ধ্বরেতা হতে পারলে শ্রুতিধর হওয়া যায় এ মত কি সত্য?

উত্তর: সত্য, তবে গৃহীর পক্ষে নিয়ম পালন করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২: শীতপ্রধান দেশের লোক কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের তুলনায় বেশি স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন ৩: নিরামিষ আহারে স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে কি?

উত্তর: ১৯৫৬ সালে জার্মানিতে Mccance এবং Widowson পরীক্ষা করে বলেছেন কোন আশঙ্কা নেই, কিন্তু ১৯৬৫ সালে Goodman L S, ও Gilman, A তাঁদের গ্রন্থে বলেছেন ক্রমাগত নিরামিষ খেলে শরীরে ভিটামিন বি ১২-এর হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে এবং রক্তাল্পতা (Anemia) রোগ দেখা দেয়।

প্রশ্ন ৪: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের অধিবাসী (নিগ্রোরা বাদে) ইউরোপস্থিত রাশিয়ার, ইংলণ্ড (ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ড বাদে), এদের মধ্যে গড়পড়তায় সবচেয়ে কারা দীর্ঘদেহী হয়? কারা সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান হয়?

উত্তর: সাধারণত যাঁরা সূর্য থেকে দূরে বাস করেন, তাঁরা দীর্ঘদেহী হন, তবে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটে, কারণ সন্তানের দেহ Genes ও Chromosomes -এর ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

● চিঠির অংশ---

'আপনাকে বাংলা ভাষায় শারীরতত্ত্ব বিষয়ে একটি বই লিখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি আপনি আমার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ অবশ্যই রাখবেন।'

উত্তর: আরো অনেক পাঠক-পাঠিকা একই অনুরোধ করেছেন। আমারও ইচ্ছে আছে। যদি কোন প্রকাশক উৎসাহিত হন, আপনাদের অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখবো।

কুমারীদের নীলাম

পশ্চিম জার্মানীর রাইনল্যাণ্ডে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আজও যুবকরা কুমারী মেয়েদের কিনে নেয়। কুমারী মেয়েদের বয়স আঠারো থেকে আশি হতে পারে কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। নীলাম চলে শহরগ্রামের পানশালায়। সুন্দরী মেয়েদের অনেকে ১৫০ মার্ক দিয়ে ডেকে নেয়। বয়স্কা, হতশ্রী কুমারীদের একসঙ্গে নীলামে তোলা হয়। তারপর নীলামের পয়সায় গ্রামে গ্রামে নাচের ব্যবস্থা হয়। যে সবচেয়ে চড়া দামে কোন কুমারীকে নীলামে কেনে সে সাজে রাজা ও মেয়েটি সাজে রাণী ও আর অন্যান্যরা হয় তার আমীর ওমরাহ মন্ত্রী পরিষদবর্গ। দরবার বসে, শোভাযাত্রা হয় আর গ্রামের মানুষজন হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। এই উৎসব মে মাসে হয় বলে একে বলা হয় মে উৎসব। নীলামে ডেকে নেবার পর সারা মাস মেয়েটিকে নীলামদারের প্রতি অনুরক্ত থাকতে হয়, না থাকলে পাঁচ মার্ক জরিমানা। দেখা গেছে অনেক কুমারীই পরে নীলামদারকে সত্যি সত্যি বিয়ে করে বসে।

॥ খেলাধুলো

খেলাধুলোয় বিজ্ঞান

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলারও ঘণ্টায় একশ পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দ্রুত বলের কথা শুনে চমকে উঠবেন, কিন্তু ক্রিকেট বলের সহনক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য যন্ত্র দ্বারা হামেশাই এমন জোরে বল ছোঁড়া হয় ব্যাট লক্ষ্য করে। আধুনিক খেলাধুলার বস্তু প্রস্তুতকারকরা এভাবে প্রত্যেকটি জিনিষের মান পরীক্ষা করে তবে বাজারে ছাড়েন—অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে।

ওদেশে খেলাধুলার জিনিষের ব্যবসা বিরাট কর্মোদ্যোগ। কেবলমাত্র আমেরিকাতেই কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় এই ব্যবসায়ে। প্রত্যেক আমেরিকান গড়পড়তা ২,২২৯ ঘণ্টা অবসর ভোগ করে বছরে এবং এর বহুলাংশই খেলাধুলায় কাটে।

শুধু ১৯৫৭ সালেই আমেরিকায় দু' কোটির বেশী লোকে মাছ ধরার লাইসেন্স নিয়েছিল—যারা লাইসেন্স না নিয়ে ধরেছে, তাদের কথা তো জানা যায় না। গলফ খেলার মাঠ আছে ছ' হাজারেরও বেশী এবং তিন কোটি লোক সাইকেল চড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য।

অতএব, এদের "দিন বহলান"-এর জন্য আয়োজনও রাজসিক। হাজারে হাজারে বৈজ্ঞানিক, বাস্তুবিদ ও অন্যান্য কুশলী খেটে চলেছে এ ব্যবসায়ে।

এক ল্যাবরেটরিতে বাস্কেট বল ও ফুটবলের ওপর বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর প্রলেপ লাগিয়ে পরীক্ষা করা হয়, কেমন করে একে আরো সহজে ব্যবহার করা যায় ঘাম ও ঘর্ষণ সত্ত্বেও। এক্স-রে যন্ত্র দিয়ে গলফ্ বলকে পরীক্ষা করে তবে বাজারে ছাড়া হয়।

ছাত্রদের খেলার ইউনিফর্ম নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়, কেমন করে কাচলে ও ব্যবহার করলে সব চাইতে বেশী টেঁকে।

ওদেশের বেসবল খেলা বড় বিপজ্জনক। প্রতি বৎসর অসংখ্য লোক আহত হয় এ খেলায়। যাতে এটা কমান যায়, তার জন্য নানা ধরণের হেলমেট-দস্তানা ইত্যাদি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দুর্ঘটনা ক্রমেই কমে আসছে।

গলফ্ খেলার ব্যাটের অগ্রভাগ নমনীয় অথচ ঘাতসহ করার জন্য নানা

রকমের কাঠ নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। পাতলা কাঠ পর পর জোড়া দিয়ে নানা রাসায়নিক বস্তু দিয়ে ঢেকে অবশেষে এমন এক মুখপাত পাওয়া গেছে যা নমনীয়, অথচ দৃঢ় এবং অত্যন্ত ঘাতসহ এবং জল লাগলে নষ্ট হয় না। গলফ্-এর লাঠির মুঠিকে হালকা অথচ শক্ত করার চেষ্টাও অনবরত চলছে। এমন কি এজন্য কাচ ও চীনেমাটির সংযোগে "পাইরোসেরাম" নামক বস্তু ব্যবহার করার কথা চিন্তা করছেন অনেক বৈজ্ঞানিকরা।

শিকারও অত্যন্ত জনপ্রিয় ওদেশে। প্রতি বৎসর শিকারের সময়ে দু-কোটিরও বেশী লোক লাইসেন্স নেয়। বেশীর ভাগই অবশ্য পাখী মারার জন্য। এদের প্রয়োজন মেটাতে গুলী লাগে কোটি কোটি—সীসা, ছররা এবং বহু রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন একান্ত প্রয়োজনীয়ক। গুলী সঠিক ওজনের হওয়া চাই (যাতে [illegible] না হয়), ঠিক উপযুক্ত পরিমাণ বারুদ দিতে হবে—বেশী-কম হলেই মুসকিল।

আবার যদি বিলাসী শিকারী ধূম্রবিহীন কার্তুজ চান তবে তার জন্য চাই ইথার, এসিটোন, গ্রাফাইট, নাইট্রো গ্লিসারিন এবং নাইট্রো সেলুলোজ।

পোষাক পরে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে যখন শিকারী মশাই হাঁসের ঝাঁকে গুলী ছোঁড়েন তখন তিনি ভেবেও দেখেন না যে তাঁর মুহূর্তের বিলাসের পেছনে কত শত কলাকুশলীর কত শত ঘণ্টার পরিশ্রম ব্যয়িত হয়েছে।

এবারে তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক কিছুটা। তাসের কাগজগুলো সমস্ত এক মাপের হওয়া চাই, স্বচ্ছ হতে পারবে না একেবারেই (তা হলে বিপক্ষ চিনে ফেলবে আপনার তাসকে) এবং একটুও বেশী কালি ব্যবহার করা চলবে না ঠিক একই কারণে।

বর্তমানে দামী তাসের বেশীর ভাগই কাগজের বদলে প্লাসটিক দিয়ে তৈরী।

মেছুড়েদের জন্য এক ধরণের টোপ-আধার তৈরী হয়েছে, যার ভেতরে তৈরী টোপ সাজান থাকে এবং একটা বার করে নিলেই পরেরটি সরে এসে রেডি হয়ে যায়। ফাতনা করা হয়েছে হালকা এলুমিনিয়াম দিয়ে, যাকে যত খুশী চকচকে করে তোলা যায় রগড়ে।

বর্তমান পারমাণবিক ইঞ্জিনের যুগেও সখের খাতিরে পালতোলা ডোঙার ব্যবহার কমেনি তো বটে, বরং বেড়েছে। গড়ে আড়াই থেকে তিন কোটি মার্কিন সৌখিন সমুদ্রে, নদীতে বা হ্রদে চৌদিকেতে পাল তুলে

[illegible]

বিহার করে বেড়ান। এঁদের সখ মেটাতেও বৈজ্ঞানিকরা এক পায়ে খাড়া। আরো নিরাপদ, আরো দ্রুতগামী নৌকা প্রস্তুত করা, হাল ও পালের ওজন কমিয়ে তাকে আরও ঘাতসহ ও কর্মক্ষম করে তুলতে দিবারাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বর্তমানের পাল হয়েছে ডেক্রনের তৈরী, যা পচে না, ছেঁড়ে না এবং সব অবস্থার মধ্যেই আকৃতি ঠিক রাখতে সক্ষম।

জাহাজ বা নৌকার পাটাতন আজকাল নকল রবার দিয়ে পালিশ করা হয়, ফলে নানা রংয়ের করা যায়, সহজে ধোয়া যায়, সমুদ্রের ক্ষার জলেও কোন ক্ষতি হয় না। একনাগাড়ে তিন-চার বছর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

খেলোয়াড় ও দৌড়বাজদের সহনক্ষমতা নির্ভুলভাবে মাপবার যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর ব্যবহার এখন ব্যাপক ওদেশে। এ যন্ত্রে যেসব খুঁত ধরা পড়ে, শারীরতাত্ত্বিকরা সে সবের চিকিৎসা করে থাকেন, ফলে খেলোয়াড়ের পটুতা বেড়ে যায়। রোজার ব্যানিস্টার—যিনি প্রথম চার মিনিটে এক মাইল দৌড়েছিলেন, তাঁর যেসব খুঁত এই যন্ত্রে ধরা পড়েছিল দৌড়ের আগে, সে সবের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাতে ঠিক এক বৎসর পরে রোজার ৩ মিনিট ৫৯'৭ সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়েছিলেন অক্সফোর্ডে।

বর্তমানে এ ধরণের পরীক্ষা ব্যাপক-ভাবে ইউরোপে ও আমেরিকার ছাত্র ও ক্রীড়াবিদদের জন্য চালু করা হয়েছে। ইলেকট্রো কার্ডিয়োগ্রাফ, এক্স-রে, বায়ো-কেমিক্যাল যন্ত্রাদি,—সবই ব্যবহার করা হয়।

একজন বিখ্যাত শারীরতাত্ত্বিকের মতে, বছরের পর বছর পরিমিত শরীর চালনা করলে, ক্ষয়ের পরিবর্তে শরীরের উপকারই হয়। তিনি বলেন যে, এতে রোগ বাধা পায়। যে লোককে হার্ট-এর 'দুর্বলতার' জন্য ডাক্তারেরা সমস্ত রকম শারীরিক পরিশ্রম করতে নিষেধ করে-ছেন, দেখা গেছে যে নিয়মিত ও পরিমিত শরীর চালনা করে সে কিছু দিন পরে কুড়ি-ত্রিশ মাইল দৌড়েছে, তার কোন ক্ষতি না হয়ে।

শরীর হন মহাশয়, যাহা সওয়াও তাহাই সয়—আমাদের এই সুপ্রাচীন প্রবাদ তাহলে নেহাৎ মিথ্যে নয় বোধ হয়।

—পাঞ্চালী

বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা—ডেবি মেয়ার

অলিম্পিকে পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকার স্থান সকলের শীর্ষে। কি এ্যাথলেট বিভাগ কি সাঁতারে আমে-রিকার এই জয় তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে। বিগত ১৯টি অলিম্পিকের আসরে আমেরিকা মাত্র দুবার সাঁতারে তাদের আন্তর্জাতিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

১৯৩২ সালে জাপানে এবং ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় সাঁতারে পুরুষবিভাগে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী তিনটি অলিম্পিকের সাঁতার অনুষ্ঠানে আমেরিকা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে প্রতিযোগী দেশগুলির শোচনীয় ব্যর্থতা বিশিষ্ট দর্শক, সমালোচক ও ক্রীড়াবিদদের সামনে তুলে ধরেছেন।

১৯৬৮ সালে অলিম্পিক সাঁতারে তিনটি করে স্বর্ণপদক জয় করেছেন মাত্র দুজন সাঁতারু। তার মধ্যে অন্যতম কুমারী ডেবি মেয়ার। আন্তর্জাতিক সাঁতারে নিয়মিত সাফল্যের সূত্রে যাঁরা নিজেদের নামের পৃষ্ঠায় অন্যদের অন্ধকারের আড়ালে ঢেকে রেখেছেন ডেবি মেয়ার তাঁদেরই একজন। নায়ক-প্রভাবান্বিত আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক্‌সের আসরে নায়িকা মেয়ার আজ অনন্যা।

অলিম্পিক ক্রীড়ার বিগত অনুষ্ঠানে ডেবি মেয়ার খ্যাতির যেমন তুঙ্গে উঠেছিলেন আজ সেই মেয়েটিরই নামের জয়ধ্বনিতে সবাই সোচ্চার। বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করা ছাড়াও এই তরুণী অলিম্পিক রেকর্ডও সৃষ্টি করে-ছেন। নিজের রেকর্ড তিনি নিজেই ভেঙ্গেছেন। ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার এবং ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অলিম্পিকের সাঁতারের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে কোন পুরুষ বা মহিলার পক্ষে একই বছরে তিনটি স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ডেবি মেয়ার অসুস্থ শরীর নিয়েই অলিম্পিকে যোগ দিয়ে-ছিলেন এবং অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ডেবি মেয়ারের বর্তমান বয়স মাত্র ষোল বছর। সেদিক দিয়ে তাকে বালিকাই বলতে হবে। কিন্তু তারো আগে থাকতেই তার মনে দৃঢ়প্রত্যয় জাগে খেলাধূলার জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। কিন্তু ফ্রি স্টাইল সাঁতারে যে ডেবি কোনদিন জগদ্বিখ্যাত হবে এ কল্পনা তিনি কোনদিনই করেন নি।

কিন্তু শেরম্যান চেভুর এই অল্পবয়সী বালিকাটির মধ্যেই ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই নিজে থেকেই তিনি তার শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। এই চেভুরের শিক্ষাগুণেই আমেরিক্যান গেমসে আমেরিকার মেয়েরা ১২টি ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে ১০টিতে বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেছিল। চৌদ্দ বছর বয়সেই ডেবি ন্যাশনাল এ্যামেটার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২০০, ৫০০ ও ১৬৫০ গজ ফ্রি স্টাইলে একাধিপত্য লাভ করতে সমর্থ হয়ে-ছিল।

চেভুরের গুণপনাতে এই মেয়েটিই ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে রিলে-তেও বিশ্বের ক্রমপর্যায়ে পঞ্চমস্থান অধিকার করেছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম ও

ব্যক্তিগত বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের ফলেই ডেবি তার পুরোবর্তিনী অনেককেই পিছনে ফেলে আজ এগিয়ে চলেছে। ৪০০মিটার ফ্রি স্টাইলের বিশ্ব-রেকর্ডকে ৪ মিনিট ৩৬'৪ সেকেণ্ড থেকে নামিয়ে এনেছে ৪ মিনিট ৩২'৬ সেকেণ্ডে। ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিশ্ব-রেকর্ডকে ১৪ সেকেণ্ডে বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ১৭ মিঃ ১২'৯ সেকেণ্ডে উত্তীর্ণ পুনরায় ম্লান করে দিয়েছে বিশ্বরেকর্ডকে। ডেবিই বোধ হয় প্রথম মেয়ে যে এত কম সময়ে ১৫০০ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করল।

৫ ফুট ৭ ইঞ্চির উচ্চতা ও ১১৬ পাউণ্ড ওজনের দোহারা চেহারার এই মেয়েটি পরিশ্রম করে থাকে অসাধারণ। সকাল সাতটা না বাজতেই সাঁতারের স্কুলে গিয়ে দাঁড়ায় আর জল থেকে ওঠে যখন, তখন রোদে চারিদিক জ্বলে যাচ্ছে। বেলা তখন ১২টা। ১৯৬৭ সালে এই মেয়েটিই 'সুইমার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড'-এর খেতাব লাভ করে।

ডেবির শিক্ষাগুরু চেভুরের মতে, কোন রকম কঠিন প্রতিযোগীতাতেই ডেবি কোনদিন ভয় পায়নি। অথবা নিজেকে কখনও অসহায় বোধ করেনি। বার বছর যখন বয়েস তখন থেকেই ডেবি প্রতিটি প্রতিযোগিতায় নিজের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে। ডেবির বন্ধু-বান্ধবেরাও বলে থাকে যে ডেবি নাকি তাদের আড্ডাকে গল্পগুজবে মাতিয়ে রাখতে ওস্তাদ। সে না হলে তাদের আসর নাকি জমেই ওঠে না। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেণ্টোর সেই মেয়েটিই আজ বিশ্বের সাঁতারের আসর মাতিয়ে তুলেছে।

—ক্রীড়ারসিক

সে নেশা রয়েছে লেগে

শ্রীমতী হেনা নাগ

চমক লাগার শিহরণ নয় রয়ে গেল
বিরূপ মনের পরিচয় এতে কিবা মেলে,
জীবনজোয়ার যৌবনের দীপ মুছে দিল
তা বলে কি মন সব ভালবাসা ভুলে গেলে?

আজো কি দেখনি নিবিড় সন্ধ্যা ঘনায়
আবীর ছোঁয়া রঙ-এ।
দিন চলে গেছে ভাবনা কি তবে বন্ধ্যা,
হারানো সুরের কিছু কি জাগে না মনে?

এখনও নিবিড় নীল-আকাশ ঘিরে
কত যে কথার মেলা,
নীরব হয়েছে উদাস গভীর চোখে
একটু ছোঁয়ার আমেজ যায় না ভোলা।

এখনও মেদুর আষাঢ়েরই ভেজা
রজনীগন্ধা সাথে,
ভাবের তনিমা ঘুমঘোরে আছে জাগা
বন্ধুবিহীন কত নিভৃত সন্ধ্যা রাতে।

একটু ছোঁয়ার সে নেশা রয়েছে লেগে.
একটু পাবার রঙিন আবেশ মেখে॥

বিচার বিশ্লেষণ অনেক হয়েছে। অজ্ঞান ব্যক্তিদের বিচার-বিশ্লেষণ চলতেই থাকে—সমাধান হয় না। ফসল ফলানো ও আবাদের জ্ঞান না নিয়ে বিশেষজ্ঞ কৃষকের ভূমিকা নিয়ে বাগাড়ম্বর করা মূর্খামি—বীজ নষ্ট হয়—দেশে দভিক্ষের আগমন সহজ হয়। দেশ ধ্বংস হোক। 'প্রতিষ্ঠা ও আনন্দ যথেচ্ছাচারে চলুক। যতদিন চালিয়ে নেওয়া যায়।' এ ভাব মনে পোষণ করা মহা অপরাধ। বরেণ্য দেশনায়ক-গণের শুভবুদ্ধিসঞ্জাত কর্মে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়।—সকলের মন মধুময় হোক, মধুময় হয়ে উঠুক ধীরে ধীরে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ।

ভাদ্রমাসের প্রথম দিন এবার কন্যারাশি অবশ্য উক্ত দিনস বেলা ১০টা ১৬ মিঃ ১৮ সেঃ গতে তুলারাশিতে গমন করবেন। শরতের প্রভাতী-লগ্নে কাশ্যপেয় সূর্যদেব শশিসুত বুধের সঙ্গে অবস্থান করছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তমপতি শনিদেব নবমে অবস্থান করছেন এবং উক্ত শনিদেবকে সিংহিকা সুত রাহু পূর্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করছেন। এক্ষেত্রে পৃথিবীর ভাগ্যস্থানেই সবিশেষ শুভপ্রদ হবে না। স্থানে স্থানে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রে রবি, মঙ্গল চতুর্থে, রাহু অষ্টমে এবং শনি নবমে অবস্থান করছেন। চারিটি পাপগ্রহের সম্মেলন। ভারতের রাশি ও লগ্নের বিচারেও এই ফল সূচিত হয় যে, স্থানে স্থানে দুর্ঘটনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিতে পারে। পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলোতে দলগত বৈষম্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ভাদ্রমাস যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে অনুকূল মাস নয়। মাসিক গোচর হিসেবে বলা হলো।

এবার ইংরেজী ১৮ই আগস্ট থেকে ভাদ্র মাসের প্রথম দিন সুরু হলো। ২রা ভাদ্র দঃ ২।৫৮ পলে বুধ, ১২ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, ৪ঠা ২২।৪৯ পলে বুধ কন্যারাশিতে, ৫ই ১৭।৪৫ পলে শনি বক্রী মেষরাশিতে, ৫ই ৩৫।৩২ পলে শুক্র কর্কটরাশিতে, ৮ই

॥ ভাদ্রের ফলাফল ॥

২৫।১০ পলে শুক্র ৮ পুষ্য নক্ষত্রে, ১২ই ৫১।১৪ পলে বুধ ১৩ হস্তা নক্ষত্রে, ১৯শে ৩৮।১৮ পলে শুক্র ৯ অশ্লেষা নক্ষত্রে, ২২শে ১।১৭ পলে বৃহস্পতি বৃদ্ধ হস্তা নক্ষত্রে, ২৩শে ৩।২৭ পলে রাহু কুম্ভরাশিতে ও কেতু সিংহরাশিতে, ২৩শে ১২।১৮ পলে মঙ্গল ধনুরাশিতে, ২৩শে বুধ বক্রী ১৮।৪৪ পলে, ২৮শে ৩৩।২ পলে বক্রী বুধ পশ্চিমদিকে অস্তমিত হবেন এবং বুধ ৩০শে ৪৫।১৭ পলে শুক্র সিংহরাশিতে গমন করবেন।

ভৃগু-আচার্য

নিম্নে সূর্যের সিংহরাশির সংক্রমণকালীন গ্রহাবস্থান নির্ণায়ক চক্র প্রদান করা হলো।
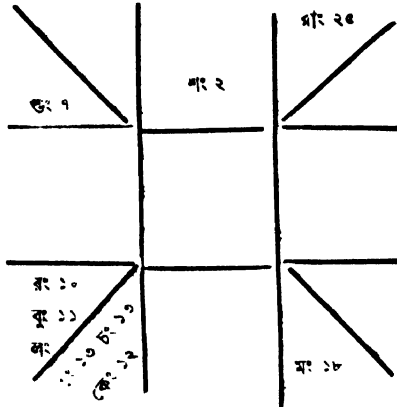
মেষঃ মানসিক অবস্থা ভাল যাবে না ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্র অবধি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। বিশেষ করে ৪ঠা থেকে ৮ই ভাদ্র অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। কন্ট্রাক্টরদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। কোন কুচক্রকারী ব্যক্তির দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কনিষ্ঠভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয় সম্পত্তিমূলক মামলাদিতে জয়ের [illegible] রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্থান [illegible] শুভ। জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্মলাভ বা কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, প্রকাশক, কবি ও সাহিত্যিকদের পক্ষে এমাস শুভসূচক। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। সতর্কতা অবলম্বন না করলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা। মেষলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ধন, শত্রু, নিধন ও ব্যয়স্থান শুভ নয়। ১৪ই থেকে ১৮ই ভাদ্র অবধি দিনগুলো মেষলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে শুভসূচক নয়।

বৃষঃ সঙ্কল্পগুলো একের পর এক ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আর্থিক সমস্যাও বেড়ে চলেছে। এ ভাব থাকবে ১৮ই ভাদ্র অবধি। ১৮ই ভাদ্রের পর ব্যবসায়ীদের ব্যবসামূলক আয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। চিত্রতারকা, প্রকাশক ও ডাক্তারদের আয়ের নিশ্চিত পথ আরো স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিবে। ৪ঠা থেকে ১০ই ভাদ্রের মধ্যে হঠাৎ উদর সংক্রান্ত কষ্টভোগ যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্রের কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট অনেকাংশে তিরোহিত হবে। শত্রুদের মনোভাব অনেকাংশে মিত্রতায় পর্যবসিত হতে পারে। বাসগৃহ
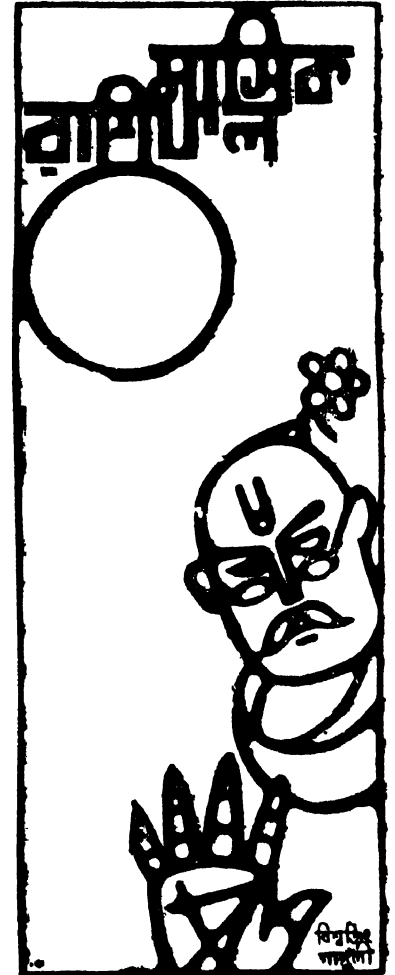
ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নীর মনোভাব প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ থাকবে না। নিশ্চিত বিবাহের যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বৃষ লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের প্রায় ক্ষেত্রে অনেকেরই নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করবে। ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্রের মধ্যে আকস্মিকভাবে কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্চাটের সৃষ্টি হতে পারে। ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

মিথুন : মানসিক উদ্বেগ ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পাবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ৫ই থেকে ৮ই ভাদ্র অবধি দিনগুলোতে আহার বিহারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির সম্ভাবনা কম। ভ্রাতাদের কর্মক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যস্থান মোটামুটি। আকস্মিকভাবে কোন ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে উন্নতির বা কর্মপ্রাপ্তির যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্রের মধ্যে ছোটখাটো ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। কর্মস্থলে কোন বন্ধুর ব্যবহার শত্রুবৎ বলে মনে হতে পারে। কবি, সাহিত্যিক, ইঞ্জিনীয়র ও ডাক্তারদের নতুন কোন কর্মাদিতে অর্থব্যয় করা সমীচীন নয়। পূর্বশত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশ্যতা স্বীকার করবে। কোন-না-কোন বন্ধুর নিকট হতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। মিথুন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ভাদ্রমাস শুভ নয়। ২৩শে থেকে ২৮শে ভাদ্রের মধ্যে ভ্রাতাদের মধ্যে কারো-না-কারো পায়ে বা মাথায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট : কর্মক্ষেত্রে শনির দৃষ্টি থাকায় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। দুশ্চিন্তায় স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সঞ্চার করবে। বাসগৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতৃপক্ষ থেকে নানাবিধ ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভসূচক। গৃহে শান্তির অভাব ঘটবে। পুত্রের আকস্মিকভাবে কঠিন রোগের সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ই থেকে ১৬ই ভাদ্র অবধি দিনগুলো পুত্রস্থানের পক্ষে শুভসূচক নয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপার নিয়ে বিব্রত হতে পারেন। শত্রুস্থান মধ্যম বলা চলে। পত্নীর স্বাস্থ্য ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্র অবধি শুভ যাবে না। বিবাহাদির (সম্বন্ধাদি) ব্যাপারে কথাবার্তা নিশ্চিত থাকলেও ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত নয়। বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যাপার নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। কর্কটলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে নিশ্চিত কর্মপ্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি হবে। ২৩শে ভাদ্রের পর আর্থিক অবস্থার শুভ পরিবর্তন হবে বলে আশা করতে পারেন।

সিংহ : পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১০ই থেকে ১৪ই ভাদ্র অবধি সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কোন কঠিন সমস্যার সমাধান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের গোলযোগ অনেকাংশে তিরোহিত হবে। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ পরিদৃষ্ট হয়। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। অনেক দিনের পুরানো প্রতিষ্ঠিত বন্ধুর সাথে পরিচয় লাভের যোগ রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। ২১শে থেকে ২৫শে ভাদ্র অবধি তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কদৃষ্টি প্রদান করা বিধেয়। ভাগ্যস্থান মোটামুটি শুভ। সাহিত্যিক, কবি, ইঞ্জিনীয়র ও ডাক্তারদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভপ্রদ। আকস্মিকভাবে ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। সিংহলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ২৩শে থেকে ২৫শে ভাদ্র অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। দীর্ঘস্থায়ী রোগগ্রস্ত বৃদ্ধদের পক্ষে এমাস শুভ নয়। মাথায় বা হাতে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা : স্বাস্থ্য ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্র অবধি শুভ যাবে না। ধনস্থান শুভ নয়। আর্থিক ব্যাপারে মাঝে-মাঝেই বিব্রত বোধ করতে পারেন। ধনাদির ব্যাপারে কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির পরামর্শ না নেওয়াই কর্তব্য। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যাপার নিয়ে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১০ই থেকে ১৫ই ভাদ্র অবধি দিনগুলো নানাবিধ ঝঞ্চাটের মধ্যে অতিবাহিত হবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্র অবধি শুভ যাবে না। কর্ম বা ব্যবসাক্ষেত্রে গুপ্তশত্রুর সৃষ্টি হতে পারে। কথাবার্তায় সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ৬ই থেকে ১০ই ভাদ্র অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। কন্যালগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে আকস্মিকভাবে আয়বৃদ্ধির যোগ দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভসূচক নয়। নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত নয়।

তুলা : স্বাস্থ্য সবিশেষ শুভ যাবে না। মাঝে মাঝে উদর-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ৮ই থেকে ১৪ই ভাদ্র অবধি দিনগুলো ধনস্থানের পক্ষে শুভ হবে বলে মনে হয় না। পরম বন্ধু হলেও টাকা-কড়ি ধার দেওয়া উচিত নয়। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ বহুলাংশে তিরোহিত হবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র ও সাংবাদিকদের আয়ের পথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। বন্ধুস্থান মোটামুটি। কর্মক্ষেত্রে সামান্য কারণে সহকারী কর্মচারীর সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্রের মধ্যে আকস্মিকভাবে ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। পত্নীর মানসিক অবস্থা ভাল যাবে না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির সহায়তাকে ভবিষ্যতের বিপদের ইঙ্গিত বলে মনে করা বিধেয়। তুলালগ্নের জাতক ও জাতিকার পক্ষে স্বাস্থ্য, অর্থ, পুত্র ও কন্যা ও ব্যয়স্থান সবিশেষ শুভ থাকবে না। গৃহে আকস্মিকভাবে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ের পথ ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক ঃ চন্দ্র মঙ্গল যুক্ত থাকায় ও পঞ্চমে রাহুর বিদ্যমান থাকায় স্বাস্থ্য সবিশেষ ভাল যাবে না। ৮ই থেকে ২০শে ভাদ্র অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। আর্থিক ব্যাপারে প্রায় ক্ষেত্রেই বিব্রতবোধ করতে হবে। কোন শ্বেতকায় ব্যক্তিকে আর্থিক বিষয়ে ১৬ই ভাদ্র অবধি বিশ্বাস না করাই শ্রেয়। কোন-না কোন বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা শুভ যাবে না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবেন। মামলা-মোকদ্দমার ফল সবিশেষ শুভ হলেও শুভফল আশা করতে পারেন। পত্নীর উদর-সংক্রান্ত কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। নিশ্চিত অর্থভাগ্যের যোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। বৃশ্চিক-লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে অর্থ, ভ্রাতৃ, পুত্র, পত্নী ও ব্যয়স্থান শুভসূচক নয়। নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা অযৌক্তিক হবে না।

ধনু ঃ স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে। আর্থিক উন্নতির নানাবিধ উপায় থাকলেও তা প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হয়ে দেখা দিবে না। ভ্রাতৃস্থান শুভসূচক নয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের পরামর্শানুসারে নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা সমীচীন নয়। ৮ই থেকে ১২ই ভাদ্রের কর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্যের জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। পূর্বের শত্রুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। মামলা-মোকদ্দমার ফল আশানুরূপ হবে না। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। পূর্ব-নির্ধারিত বিবাহ যোগ সামান্য ভুলের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আকস্মিকভাবে অর্থলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ধনু লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে আয় ও ব্যয়স্থান সবিশেষ শুভ থাকবে না। খর্ব ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের নিকট হতে আর্থিক ব্যাপারে যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা সমীচীন।

মকর ঃ চারিদিকেই বিশৃংখল পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে সাংসারিক জীবনযাত্রায় আর্থিক সমস্যায় মন মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে পড়তে পারে। ১লা থেকে ১০ই ভাদ্র অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্য ও বন্ধুস্থানের পক্ষে শুভসূচক নয়। ভ্রাতাদের সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। কোন না কোন আত্মীয়ের দ্বারা অপমানিত হবার যোগ পরিদৃষ্ট হয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি। জ্যেষ্ঠপুত্রের শিক্ষাদি ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। কবি, সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। শত্রুরা কর্মক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শত্রুতার সৃষ্টি করতে পারে। চিত্রশিল্পী, চিত্র-তারকাদের পক্ষে নূতন কোন কন্ট্রাক্ট আসার

সম্ভাবনা। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। যানবাহনাদির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। মকরলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে এ মাস সবিশেষ শুভ যাবে না। ২রা থেকে ৮ই ভাদ্রের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কারো না কারো কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়।

কুম্ভ : স্বাস্থ্য মোটামুটি। আর্থিক ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। পিতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। বন্ধুস্থান শুভ নয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটিই থাকবে। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। পত্নীর স্বাস্থ্যের দিকে যত্ন নেওয়া কর্তব্য। পেটে বা কোমরের বাঁ পাশে নিদারুণ ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভসূচক নয়। আকস্মিকভাবে ১০ই থেকে ১৮ই ভাদ্রের মধ্যে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। অর্থপ্রাপ্তির যোগ আশা করতে পারেন। কুম্ভলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ধনস্থান ও পারিবারিক জীবন শুভকর হয়ে দেখা দিবে না। ২৩শে থেকে ২৬শে ভাদ্র অবধি দিনগুলো যানবাহনাদির পক্ষে শুভসূচক নয়।

মীন : মানসিক অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। পত্নীর দুর্বিনীত ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ২৩শে ভাদ্রের পর আর্থিক যোগাযোগ আরো স্তিমিত হয়ে পড়বে। সাংসারিক পরিবেশ ক্রমোত্তর খারাপ হবার সম্ভাবনা। উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতাদের বিরুদ্ধ মনোভাব ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পাবার যোগ বিদ্যমান। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের স্থল মোটামুটি। সাংসারিক জীবনে ঝঞ্ঝাটের ব্যাপারে স্ত্রী বা মাতুলপক্ষীয় ব্যক্তির দ্বারা মীমাংসা করা সমীচীন নয়। নিজের স্বাধীন মতামতই প্রদান করা উচিত। বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রকাশকদের আয়ের পথ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। গৃহ ও ভূসম্পত্তি ক্রয় ও বিষয়াদির ব্যাপারে প্রথম থেকেই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সমীচীন। মীন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে আর্থিক, পারিবারিক ও মানসিক অবস্থা এ মাসে সবিশেষ শুভ থাকবে বলে মনে হয় না। কর্মস্থানে আকস্মিকভাবে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীআপনজন, (চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা)—শ্বেত মুক্তা ৫-৭ রতি, সোনায় মধ্যমাতে অভাবে চন্দ্রকান্ত মণি ১২-১৫ রতি রুপোয় ধারণ করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ● মণীন্দ্রকুমার দে-চৌধুরী, (সেণ্ট্রাল পার্ক, যাদবপুর)—সাথে ৮ রতি গোমেদ রুপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● বি আর বগুলা, (নদীয়া)—দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রী পি: কু: সা, (সোনামুখী)—শ্বেত প্রবাল ৮-১০ রতি সোনায় ডান হাতের অনামিকায় পরে দেখতে পারেন। ● শ্রীঅনিলচন্দ্র দে, (কামাখ্যাগুড়ি)—বিশেষ দেরী হবে না, সম্ভাবনা রয়েছে। ● সুজাতা চৌধুরী, (কৃষ্ণনগর, নদীয়া)—আগামী তিন বৎসরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। শুভই বলা চলে। অমিতাভ মজুমদার, (ক্রীক রো)—আপনি শ্রীশ্রীদুর্গা এই নাম লাল কালিতে এক লক্ষবার লিখুন। ● ডা: এস কে দাশ, (নদীয়া)—৬-৮ রতি গোমেদ সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● নীলিমা সেনগুপ্ত, (একডালিয়া রোড)—সমগ্র জীবনের ভাগ্যফলের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● রবীন্দ্র ভৌমিক, (আগরতলা, ত্রিপুরা)—চেষ্টা করুন কাজ ভাল হবে। ● শ্রীসত্য সিংহ, (যতীন দাস রোড)—ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, সম্ভব হলে ৬-৮ রতি হলদে পোখরাজ সোনায় ডান হাতের তর্জনীতে ধারণ করে দেখতে পারেন। প্রভা সিংহ, (যতীন দাস রোড)—চন্দ্রকান্ত মণি ১২-১৫ রতি রুপোয় বাঁ হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● [illegible]কুমার দত্ত, (নবাবগঞ্জ, বিহার)—ধৈর্য ধরে চেষ্টা করুন অচিরেই সব সমস্যার সমাধান হবে। ● ললিতা লাহা, (মাণিকতলা, কলিকাতা)—আগামী ২ বৎসরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভব হলে ৫ রতি ইন্দ্রনীল মধ্যমায় এবং ৮ রতি রক্ত প্রবাল বাঁ হাতের অনামিকায় সোনায় ধারণ করুন সুফল পাবেন। ● শ্রীসুশীতল গঙ্গোপাধ্যায়, (ডোভার লেন, কলিকাতা)—আপনি ধৈর্য ধরে শ্রীশ্রীদুর্গানাম লাল কালিতে লিখুন সব ঠিক হয়ে যাবে, একলক্ষ। ● নির্মল সামন্ত, (হাওড়া)—ভবিষ্যতে আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালই হবে। সীতারাম কুণ্ডু, (কেন্দা, বর্ধমান)—৬-৮ রতি গোমেদ সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● এস এল মুখার্জী, (বাবুডাঙ্গা, হাওড়া)—রোগের প্রতিকারের জন্য ৬-৮ রতি হোলদে পোকরাজ সোনায় অনামিকায় ও ৮-১০ রতি গোমেদ রুপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● সমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও অমিয়ারাণী দেবী, (উত্তরপাড়া)—জন্মসময় লেখেন নি কেন? খালি প্রশ্ন করলেই কি উত্তর দেওয়া যায়। দেবব্রত রায়, (মতিলাল রায় লেন, হুগলী)—আপনার আশা অনেকক্ষেত্রেই ফলবতী হতে দেখা যাবে। ● রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, (এ পি সি রোড, কলিকাতা)—আপনি ইন্দ্রনীল ৫-৭ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● শিবকুমার সাউ, (টালিগঞ্জ সারকুলার রোড)—মহর্ষি পরাশরের মতে আপনার গোমেদ ধারণ করা উচিত। ● কুমারী এ বি, (সিঁথি, কলিকাতা)—পরীক্ষার ফল বলা হয় না আপনার জীবনসঙ্গী

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নাও হতে পারে। শ্রীমতী সুচন্দ্রা, (সর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা)—২৮ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। • চন্দ্র রায়, (সুরী লেন)—সম্ভাবনা রয়েছে। ● নাভি, (নাগত্র, কলিকাতা)—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। শ্বেত প্রবাল ৮-১০ রতি সোনায় অনামিকায় ও ইন্দ্রনীল ৫-৭ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমায় ধারণ করুন সুফল পাবেন। • জয়ন্ত দে, (শরৎ বসু রোড, দমদম ক্যাণ্ট)—সিংহ রাশি, উচ্চ শিক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। ● এম দে, (কলিকাতা)—ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন উন্নতি হবে। সাংবাদিকতার ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারেন। ● সেনগুপ্ত, (দেব লেন, কলিকাতা)—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। একসঙ্গে দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● উমারাণী গুপ্ত, (রাজেন্দ্র কুটির, জগাছা)—গোমেদ ৮-১০ রতি সোনায় বাঁ হাতের মধ্যমায় ধারণ করুন। ● আঁখি, (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা)—আপনার মুক্তির একমাত্র পথ ধৈর্য ধরে শ্রীশ্রীদুর্গা এই নাম তিন লক্ষ বার লাল কালিতে লিখুন। ● শ্রীপবিত্রময় বাগচি, (জামসেদপুর)—চাকুরী ও ব্যবসা উভয়েরই যোগ রয়েছে। • সত্যপ্রিয় ভট্টাচার্য, (রাধানগর, বর্ধমান)—স্ত্রীকে ১০-১২ রতি রক্ত প্রবাল সোনায় বাঁ হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিন। মীমাংসা হয়ে যাবে। ● কাজল চৌধুরী, (পণ্ডিচেরী)—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে হইবে। ● অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, (লেক ওয়েস্ট রোড, যাদবপুর)—অপরাজিতা নীলা ৫-৭ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমায় পরে দেখুন। ● রাজকুমার, (ইন্দা, খড়গপুর)—পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ● লোকমাতা দাশগুপ্তা, (জলপাইগুড়ি)—দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● তারক সাঁতরা, (ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ)—পড়াশুনা করুন তাহলেই জানতে পারবেন। ● অসীমা চক্রবর্তী, (ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা)—এ বিবাহ না করাটাই শ্রেয়। • শ্রীমলয় রায়চৌধুরী, (দরং আসাম)—আপনি গোমেদ ৬-৮ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমায় ধারণ করুন। ● রঞ্জিত বাবু, (বলাই মিস্ত্রি লেন, হাওড়া)—শুধু লিখলেই হয় না জন্ম সময় ও তারিখ লিখতে হয়। ● শ্রীপঞ্চানন দে-সরকার, (নিমতা, ২৪ পরগণা)—সতর্ক হয়ে চলবেন, কর্মস্থান শুভ নয়। সম্ভব হলে ৮ রতি গোমেদ সোনায় ও ১০-১২ রতি চন্দ্রকান্ত মণি রূপোয় যথাক্রমে ডান হাতের অনামিকায় ও মধ্যমাতে পরতে পারেন। শ্রীদিলীপকুমার নাগ, (উত্তর হাবড়া)—চেষ্টা করুন তাড়াতাড়িই হবে। পারবেন। • শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায়, (পঞ্চানন চ্যাটার্জী লেন)—বর্তমান বৎসরে আপনার চাকুরী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • ছত্রধর, (পানগ্রাম, আসাম)—চাকুরীতে উন্নতি হবে। ঝোঁকের বশে কিছু করে ফেলবেন না, ভেবেচিন্তে কাজ করুন। • শ্রীকিষণচাঁদ দে, (জোড়াসাঁকো, কলিকাতা)—৬-৮ রতি গোমেদ রূপোয় ডান হাতের মধ্যমায় ধারণ করুন। • পি ৯৪, (বউবাজার)—রক্তপ্রবাল ৮-১০ রতি সোনায় অনামিকায় ও ইন্দ্রনীল ৫-৭ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমায় ধারণ করে দেখতে পারেন। ● ভক্তিপ্রসাদ সরকার, (সুইন হো লেন, কলিকাতা)—আপনি আধরতি হীরক সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● বি ব্যানার্জী, (হুগলী)—একসঙ্গে দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম- ....

ঠিকানা- ....

....

মাসিক বসুমতী

দেওয়া হয় না। ● নীলবরণ ঘোষ, (ট্যাংরা হাউসিং স্টেট্, কলিকাতা)---চাকুরীতে উন্নতি হবে। ● চামেলী ঘোষ, (কলিকাতা)---আগামী তিন বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ● বাবী ঘোষ, (কলিকাতা)---সতর্ক হয়ে পড়াশুনা করা দরকার। বিজ্ঞান নিয়ে পড়া উচিত। ● শ্রীবাঙ্গালী, (দমদম, কলিকাতা)---মোটামুটি শুভই হবে। ওদিকটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। ● শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র, (কাঁথি, মেদিনীপুর)---কোষ্ঠির বিস্তারিত ফলাফলের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● বিমলচন্দ্র বসু, (রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা)---চেষ্টা করুন হঠাৎ যোগাযোগ আসবে। ● অপরিচিতা, (রায়পাড়া)---শুভই হবে। ● শ্রীমান সন্দীপকুমার ভট্টাচার্য, (ভুবনেশ্বর, পুরী)---চেষ্টা করুন পড়াশুনা ভালই হবে। ● শ্রীপিনাকীরঞ্জন সরকার, (ধানবাদ)---বর্তমান সময় আপনার পক্ষে শুভ নয়, ভেবেচিন্তে কাজ করবেন। বাসন্তী দাস, (শ্রীরামপুর, হুগলী)---উভয়েরই যোগ আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে দেখা যায়। সত্য দত্ত, (রাণাপ্রতাপ রোড, দুর্গাপুর)---উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ১২-১৫ রতি চন্দ্রকান্তমণি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী, দুর্গাপুর, বর্ধমান, ইন্দ্রনীল ৬-৮ রতি ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন, সুফল পাবেন। ● কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সালকিয়া, হাওড়া)-৩২ বৎসর বয়সের পর হইতে জীবনে উন্নতির পথ বিশেষ ভাবে প্রশস্ত হয়ে দেখা দেবে। ● জে সেন, (নর্থরোড, কলিকাতা), ধৈর্য ধরুন ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। রক্ত প্রবাল ১০-১২ রতি সোনায় ডান হাতের অনামিকায় ও হোলদে পোকরাজ ৫-৭ রতি মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীদেবব্রত হাজরা, (পঞ্চভবন, বর্ধমান), দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীমুকুল ভট্টাচার্য, (দুর্গাপিথুরী লেন, কলিকাতা), আগামী ২ বৎসরের পর থেকে সময়ের পরিবর্তন হবে। অনুপ কুমার দাশ, (মেদিনীপুর), ভাল চাকুরী পাবেন চেষ্টা করুন। ব্যবসার সম্ভাবনা দেখা যায়। সতর্ক থাকবেন। ● শ্রীরমাকান্ত দাস, (মালিগাও, গৌহাটি, আসাম)---আপনার ভাগ্যের উত্থান ও পতন দুই রয়েছে। রক্তপ্রবাল ৮-১০ রতি ও মুক্তা ৫-৭ রতি ডানহাতের যথাক্রমে সোনায় অনামিকায় ও মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● মৌ, (কলিকাতা), পিতার কাছেই থাকবে। শুভই হবে। ● বিশু, (কলিকাতা), চাকুরীতে উন্নতি ও সরকারী চাকুরীর যোগ রয়েছে, চেষ্টা করে যান। সৌমেন, (কলিকাতা), যেতে পারেন, ধৈর্য ধরে কাজ করুন, তাহলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। ● শ্রীপীযু, ২৫ বৎসরের মধ্যে সম্ভাবনা দেখা যায়, সকল সময় মনের মত পাত্র মেলে না। ● সন্তো, (কলিকাতা), বেশী দেরী হবে না। মোটামুটি ভালই হবে। ● শ্রীভরতকুমার নাগ, (অভয় হালদার লেন, বহুবাজার), শ্বেত প্রবাল ১০-১২ রতি সোনায় ডান হাতের অনামিকায় ধারণ করুন। ● পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (আসানসোল, বর্ধমান), কর্কট রাশি, সিংহলগ্ন, শ্বেত মুক্তা ৫-৭ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করুন। ● সুকৃতি সেন, (টালিগঞ্জ, কলিকাতা), আপনি ধৈর্য ধরিয়া চেষ্টা করুন উভয় ভগ্নীর বিবাহ দিতে পারবেন। ● সরোজকুমার পোদ্দার, (আলিপুর রোড, কলিকাতা), বছর দুয়েকের মধ্যে আপনার সকল ক্ষেত্রে শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীমতী এস রায়, (কলিকাতা), বর্তমান সময় আপনার পক্ষে শুভ নয়, সতর্ক হয়ে চলবেন। ● শ্রীঅনন্তকুমার সেন্তি, (সাঁত্রাগাছি, হাওড়া), বর্তমান বৎসরে চাকুরীর সম্ভাবনা রয়েছে। ● যতীশচন্দ্র, (কালীবাবুর বাজার, হাওড়া), চাকুরীতে উন্নতি যোগ রয়েছে। ছাড়া উচিত হবে না। ● ডি বরণ, (কৃষ্ণনগর), আপনার মনের অনেক আশাই ফলবতী হয়ে দেখা দেবে। ● প্রণয়কুমার নন্দী, (সতীন সেন নগর, ব্যারাকপুর), যতদূর চেষ্টা করবেন। ● হিমাংশুশেখর দেবশর্মা, (খড়গপুর), পড়াশুনার যোগ রয়েছে।

করুণ আনন্দ

মণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অনেক শ্রমের খাঁচা, বহু যত্নে গড়ে,
মায়ার অনেক রঙ্ কাঠিতে কাঠিতে
লাগিয়ে দিয়েছি : সোনা, চাঁদি, গিল্টি করে।
প্রাণের দোসর পাখি! তোকে সব দিতে
সাধনা করেই গেছি। আদরের ঘোরে
গলায় মিলিয়ে গলা জীবন-সঙ্গীতে
কী বিচিত্র ঐকতান গাইলাম জোড়ে।
কত মিঠে কলমন—প্রেম দিতে-নিতে!
অনেক দিনের পরে, দেখি একদিন,
দিনের প্রখর রোদে আলোর উল্লাস ;
বিষণ্ণ বদনে পাখি, আঁখি বড় দীন।
বন্দিত্বের ব্যথা ও কি? খুলে দিই পাশ।
বুক ভাঙে ; তবু বাজে আনন্দের-বীণ
মনোব্যথা-হৃদি-তলে,—অশ্রু-ভেজা-হাস॥

আভা গার্ডনারের জায়ারূপ

শ্রীমতী

আভা গর্ডনার

আজ কিছুটা বিস্মৃতপ্রায় হলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত আভা গার্ডনারের নাম চিত্রামোদীদের মুখে মুখেই ফিরতো, আর এতে বিস্মিত হওয়ারও তো কিছু নেই, কারণ বিলিতি ছায়াছবির এই অনন্যা নায়িকা শুধু প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীই নয় বিলক্ষণ রূপবতীও বটে।

মরকতমণির মত চোখের রং, গায়ের চামড়া টাট্‌কা ক্রীমের মত, মেয়েটিকে রূপালী পর্দায় দেখেই যে কত পুরুষচিত্তে আকস্মিক দোলা লেগেছে তার হিসাবই বা কে রাখে।

মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতির দাক্ষিণ্য-ধন্য, স্বভাবত আশাবাদী আভা জীবনকে দেখতে চেয়েছে বরাবর একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। হয়ত তার এই বৈচিত্র্যের মাঝেই নিহিত ছিল তার জীবনদর্শন।

বৃন্তচ্যুত ফুলের মতই বারবার কাউকে আঁকড়ে ধরে সুখী হতে, সার্থক হতে চেয়েছে আভা, কিন্তু বারবারই বিফল হয়েছে কেন কে জানে।

—'সোজা কথায় বলা যায়, আমি মর্ষকামী,' নিজেই বলেছে সে—'দলিত ও উৎপীড়িত হতেই যেন আমার ভাল লাগে, তবে এই প্রবণতাকে দমাতেই হবে এবার।'

১৯২৩ খৃস্টাব্দে ক্রীস্টমাস্ ঈভের দিন জন্ম হয়েছিল আভা গার্ডনারের, উত্তর ক্যারোলিনা প্রদেশের স্মীথফিল্ড নামে এক ক্ষুদ্র শহরে।

ছোট এক চাষী গৃহস্থের সাতটি সন্তানের অন্যতম সে, পাঁচমেয়ের একটি।

তার মা ছিলেন খেটে-খাওয়া দরিদ্র সংসারের অসংখ্য কর্মনিপীড়িতা গৃহিণী, সরল ধর্মভীরু অত্যন্ত সাধারণ এক নারী।

পঞ্চদশী আভাকে কে এক পুরুষ বন্ধুর দ্বারা চুম্বিত হতে দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এই মহিলা, তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন কন্যাকে—'বিয়ের আগে যে মেয়ে কোন পুরুষের সঙ্গে মাখামাখি করে, তার মরণ হওয়াই ভাল।'

ভীতা সন্তপ্তা আভা বারবার রগড়ে মুছে ফেলতে চেয়েছিল আরক্ত ওষ্ঠাধরের কালিমা-চিহ্ন। তবু মা নন, সতেরো বছরের বড় দিদি বিয়েট্রিস্‌ই তখন আভার সবচেয়ে বড় আদর্শ।

পিতার মৃত্যুর পর ষোড়শী আভাকে যখন পাঠানো হল এক সেক্রেটেরিয়াল স্কুলে টাইপ শেখার জন্য, তখন এই দিদিই তাকে উপদেশ দিয়েছিল আজে-বাজে কাজে কাল না কাটাতে।

'বাড়ী থেকে চলে যাও', বলেছিল বিয়েট্রিস—'তুমি তরুণী ও সুন্দরী, সবই পাবে তুমি জীবনে।'

সেই উপদেশ শিরোধার্য করে আভা এল হলিউডে। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হল তার নিজেকে, নিঃসঙ্গ ও দীন এবং পরেও এইভাব তার কাটেনি কখনও।

'তোমরা জান না নিজেকে ছোট মনে হওয়ার ব্যথা কত গভীর, লোকের সঙ্গে কথা কইতেই ভয় হত পাছে তারা মূর্খ ভেবে অবজ্ঞা করে,' মন্তব্য করেছিল আভা উত্তরজীবনে।

জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল তার প্রবল এবং এই জ্ঞানতৃষ্ণা হলিউড মেটালো নিজস্ব ধরণে।

অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য প্রথম থেকেই কয়েকজন পরিচালকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ওর প্রতি।

পুরুষেরা ওকে বোকাসোকা ও শিশুস্বভাবা এক সুন্দরী মেয়ে হিসাবে গণ্য করতে সুরু করলো। মেয়েরা মুখে গাঁইয়া বলে অবজ্ঞা দেখালো,

মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করতে পারলো, কারণ সহজ চোখের ও অনিন্দ্য দেহশ্রীর অধিকারিণী এই মেয়েকে হঠানো যে খুব সহজ হবে না, সেটুকু আঁচ করার মত বুদ্ধি তাদের ছিল।

প্রথমে স্বামী হিসাবে যে মানুষটিকে বরণ করে নিয়েছিল আভা, সে কিন্তু ছায়াছবির গণ্যমান্যদের দলে পড়ে না মোটেই।

ছোট্ট আকৃতিবিশিষ্ট মিকি রুনীর গলাতেই বরমাল্য পড়লো, মিকি তখন সবেই ছোটখাট পার্ট করত, আভার সুন্দর ছবির পর্যন্ত পৌঁছত না ওর মাথাটা, বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেও। ওদের বিয়ে হল ১৯৪২ খৃস্টাব্দে, আর ঠিক তার পরের বছরই হল বিবাহ-বিচ্ছেদ।

'মিকি খুবই মজার লোক ছিল', বলেছে আভা, 'কিন্তু ওকে বিয়ে করে দেখলাম, আমি ওর স্ত্রীও হতে পারব না, বন্ধুও হতে পারবো না, ওর জীবনে আমার ভূমিকা কেবল দর্শকের।'

১৯৪৫ খৃস্টাব্দে আবার উদ্বাহ বন্ধনে ধরা দিল আভা, এবার তার মালা দুললো বুদ্ধিমান ব্যাণ্ড পরিচালক আর্টিশোর গলায়।

আর্টিএর আগেই বেশ কয়েকবার বিয়ের ফাঁস পরে দেখেছে, এবং তার নিগূঢ়তম জীবন-যন্ত্রণাও অনেকটা আভারই মত।

কর্মজীবনে যশ ও অর্থ প্রচুর পরিমাণে লাভ করলেও, আর্টি নিজের পেশাকে ভালবাসতে পারেনি কখনও, সঙ্গীতেও আসক্তি ছিল না তার।

শেষ পর্যন্ত হলিউডের মুখর জীবন ছেড়ে, স্পেনের এক ছোট্ট পল্লীতে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল আর্টি। সাহিত্য-চর্চাকেই জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছিল সে।

আর্টি সম্বন্ধে আভার মন্তব্য—'ওই আমাকে পড়াশুনোর স্বাদ গ্রহণ করতে শেখায়, এই বিয়ের ফলশ্রুতিস্বরূপ একটা সুন্দর লাইব্রেরীর মালিক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।'

ইতিমধ্যে আভার কর্মজীবনেও লেগেছে সাফল্যের জোয়ার, বড় বড় ভূমিকা পেতে সুরু করেছে সে। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে 'দি কীলারস' নামে ছবিটিতে অভিনয় করার পর তারকা হিসাবে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম সর্বত্র এবং পর পর অনেক উল্লেখ্য চরিত্রের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলো সে।

উল্লেখ্য অভিনয় প্রতিভার সঙ্গে ভূমিকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও ছিল তার সহজাত।

নিজের মধ্যে বরাবরই একটা হীনমন্যতার ভাব ছিল বলেই বোধহয় আভা অভিনয়ের সময় বরাবরই পরিচালক ও নাট্যনির্দেশকের কথামত চলতো, চেষ্টা করতো তাঁদেরই ইচ্ছামত অভিনয় করতে।

যথাযথ স্ক্রিপ্ট অনুসারে চলাটাই তার ধর্ম ছিল।

১৯৫১ খৃস্টাব্দে সুবিখ্যাত গায়ক অভিনেতা 'ফ্রাঙ্ক সিনেত্রার' হাত ধরে আবার নতুন করে জীবনের পথে পা দিল আভা।

এই বিবাহের ফলে সিনাত্রার বিস্ফোরক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হল আভার অবিচল প্রভুত্বপরায়ণতা।

কিছুদিনের জন্য ফ্রাঙ্কের কাজ-কারবার ভাল চলছিলো না এবং সে সময় তার সমস্ত ব্যয়ভারই আভা বহন করেছে অকুণ্ঠে।

এবং আভার মতে এই সময়টাই ছিল ওদের যৌথজীবনের পক্ষে সবচেয়ে সুসময়।

'ওর কাজকর্ম ভাল না চলাকালীন, প্রায়শ ওর মেজাজ থাকতো নরম এবং আমার সঙ্গেও ব্যবহার করতো ভাল, কিন্তু সাফল্যের সময় সে সবই যেন কেমন পাল্টে যেত, তখন সৃষ্টি হত এক নারকীয় পরিস্থিতির,' বলেছে আভা। বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার জন্যও আভা নিজেকেই দায়ী করেছে—'ভালবাসলেই তাকে আমি একেবারে গ্রাস করে নিতে চাইতাম, হয়ত সেজন্যই কেউ টিকলো না শেষপর্যন্ত। যেসব পুরুষকে আমি ভালবেসেছি, তাদের সবাইকেই ঘিরে রাখতে চেয়েছি প্রবল ভালবাসা দিয়ে আর হয়ত তাই কিছু-দিন যেতে না যেতেই তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, হাঁফ ছাড়তে চেয়েছে অন্য নারীকে অবলম্বন করে।'

'আমার স্ত্রী আমাকে বড্ড বেশী ভালবাসে—এ কথা আমার যে যখন স্বামী হয়েছে সেই বলেছে নিজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে।'

'আমি হয়ত খুব বড় অভিনেত্রী নই, কিন্তু আমি যে খুব ভাল স্ত্রী ছিলাম তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।'

সিনাত্রার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর হলিউডের আবহাওয়া আর সহ্য করতে পারল না আভা, ১৯৫৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক হিমশীতল প্রভাতে সে পাড়ি জমালো স্পেনের দিকে, সেখানেই বসবাস করার ইচ্ছেয়।

চোদ্দ বছর অভিনয়শিল্পী হিসাবে হলিউডে অতিবাহিত করলেও; একটি প্রাণীও সেদিন তাকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলনি বিমান-বন্দরে।

মাদ্রিদের কাছে এক শহরতলীতে নতুন করে নীড় বাঁধলো আভা 'লাকুঞ্জা' নামে এক ভিলাতে, সেদিন তার সাথী ছিল নিজের এক সহোদরা ও মরিন নামে এক দাসী। নৈশক্লাব, পার্টি দেওয়া ও মাঝেমধ্যে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমেই অবসর সময় কাটাতো সে।

স্পেনীয় মাতাদোরদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা করা নিয়ে অনেক গুজবও ছড়িয়েছে তখন বাজারে, তারপর

তার জীবনে এল ইটালিয়ান অভিনেতা ওয়াল্টার চিয়ারী।

এর সঙ্গে আভার পরিচয় ঘটেছিল রোমে, চিয়ারী নাকি আভাকে আবার পরিণয়ের জালে জড়াতেও উৎসুক ছিল,—'হাজারটি নিরাপদ মেয়েকে বিয়ে করার চেয়েও আভা সম্বন্ধে ঝুঁকি নিতে আমি আগ্রহী'—বলেছে চিয়ারী স্বমুখে।

আভার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত।

লণ্ডনে সফর করার সময়ে সে একদিন সেভিল রো-এ অবস্থিত এক দর্জির দোকানে ঢোকে, টাইট-ফিটিং প্যাণ্ট কিনতে এবং বিস্ময়াভিভূত দর্জিদের সামনেই অবলীলাক্রমে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায় মাপসই প্যাণ্টটি পরে নেওয়ার জন্য।

যখন যা প্রয়োজন দ্বিধামাত্র না করে তা সম্পন্ন করাটাই আভা গার্ডনারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, প্রেমের ক্ষেত্রেও সে আদিম নারীর মতই সহজ ও সাবলীল, হয়ত বা সেজন্যই পর পর প্রেমের প্রসাদে ধন্য হলেও কোন প্রেমাস্পদকেই সে ধরে রাখতে পারে না কোনোদিন।

উদীয়মান শিল্পী সতীন্দ্র ভট্টাচার্য

পটুয়াটোলা অঞ্চলের রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের সেই বিখ্যাত বাড়ী। রাস্তা থেকে এ বাড়ীর সদর-দরজার মাটিকে প্রণাম করে এ বাড়ীতে পদার্পণ করতেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যতবার বিদ্যাসাগর এ বাড়ীতে পদার্পণ করেছেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম একবারের জন্যেও ঘটেনি। এ যে তাঁর গুরুগৃহ। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়ী। কত ইতিহাস এ বাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে। কত অবিস্মরণীয় কাহিনী এ বাড়ীর প্রতিটি ইটে-পাথরে মিশে আছে মহাকালের ভয়াল ভ্রূকুটিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। শাস্ত্র-অনুশীলন ও নাট্যচর্চায় এ বাড়ীর খ্যাতি দেশজোড়া। এবং এ ধারা যে আজও অম্লান—তার আধুনিকতম একটি দৃষ্টান্ত সতীন্দ্র ভট্টাচার্য।

বাঙলা দেশের অভিনয়জগতের আকাশে সম্প্রতি যে ক'টি সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল তারকার অভ্যুদয় ঘটেছে সতীন্দ্র নিঃসন্দেহে তাদেরই একজন। সুগভীর নাট্যপ্রীতি এবং অফুরন্ত প্রতিশ্রুতি মূলধন করে এ পথে যে তরুণদের যাত্রারম্ভ হল তাঁদেরই সঙ্গে অনায়াসে আজ সতীন্দ্রের নামও করা চলে। প্রখর অনুভূতি, চরিত্রবোধ, গ্রহণধর্মিতার সমন্বয়ে যে শিল্পসাধকদের সাধনার সূত্রপাত সতীন্দ্র তাদেরই স্বজাতি, স্বগোত্র, সতীর্থ।

১৯৩৩ সালের ১৩ই মে নটগুরু শিশিরকুমারের আমেরিকা সফরের বছরে সতীন্দ্রনাথের জন্ম উত্তরপাড়ায় মামার বাড়ীতে। ১৯৪৫ সালে মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সতীন্দ্রনাথ। ১৯50 সালে সিটি কলেজের ছাত্র হিসাবে বাণিজ্যে স্নাতক উপাধি আপন আয়ত্তে আনলেন। এম-কম পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দেননি। ১৯৫২ সালে কর্ম নিলেন বেঙ্গল এনামেল এ্যাণ্ড লেবেল কর্পোরেশানে। ১৯৬৩ পর্যন্ত এই কর্মজীবনের পরিধি।

সতীন্দ্র ভট্টাচার্য
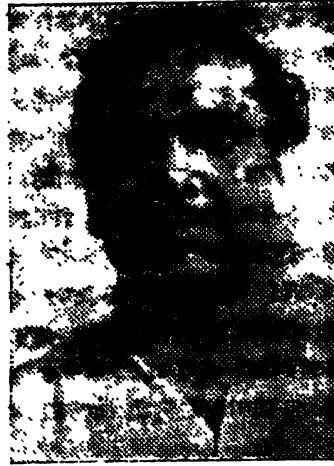
১৯৫০ সালে ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' ছবিতে অভিনয় করলেন। আজও এ ছবিটি মুক্তি পায়নি। ১৯৪৯-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে' একটি ছোট ভূমিকায় তাঁকে দেখা গিয়েছিল। ১৯৫১ সালে মুক্তি পেল 'শ্রীকৃষ্ণলীলা'—নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সতীন্দ্র। শ্রীরাধার ভূমিকায় দেখা দিলেন একালের বিশিষ্টা চিত্রতারকা মালা সিনহা। চলচ্চিত্রে শ্রীমতী সিনহার সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর একে একে বহু ছবিতে কাজ করলেন সতীন্দ্র ভট্টাচার্য—যেমন অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, বাড়ী থেকে পালিয়ে, কোমলগান্ধার, দোলগোবিন্দের কড়চা, কুমারী মন, দ্বীপের নাম টিয়া রং, আলোর পিপাসা, পতি সংশোধনী সমিতি, দেবতার দীপ, অন্তরাল, বাস্তু-বদল, যুগ্মজ্যে পরিবার, হঠাৎ দেখা, সম্রাজ্ঞীর কাঁটা, নববধূ, মায়া প্রভৃতি আগামী দিনের ছবিগুলিতেও তাঁকে দেখা যাবে। স্টার থিয়েটারের 'দাবী'তে তাঁকে নায়কের চরিত্রটি দেওয়া হয়েছিল। 'শর্মিলা'তেও নিয়মিতভাবে তিনি অভিনয় করে চলেছেন। আই পি টি-এর সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র অতি নিবিড়। দু-একদিন অভিনয় সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ শিশিরকুমারের কাছ থেকে পাবার সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন।

অভিনয়ের প্রধান অনুপ্রেরণা এবং অনির্বাণ উৎসাহ তিনি পেয়েছেন বাবা শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্যের ('সুধাদা' নামে সাধারণ্যে সমধিক পরিচিত) কাছ থেকে। তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের এক প্রাচীন সদস্য ও সৌখীন অভিনেতা হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতিমান। বাবার পরেই তিনি উল্লেখ করেন ঋত্বিক ঘটকের নাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করেন নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ মিত্রের নাম।

সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে যিনি প্রকৃত শিল্পী সকল বর্ণের চরিত্রই তাঁর কাছে সমান প্রিয়। আপন শিল্পী-জীবনে এরই মধ্যে তিনি অভূতপূর্ব

পরিতৃপ্তি পেয়েছেন 'দ্বীপের নাম টিয়া রং' ছবিতে অভিনয় করে। চরিত্রে মিশে যাওয়ার তত্ত্বটিতে সতীন্দ্র বিশ্বাস রাখেন না। তিনি নিজে চরিত্রের রূপ দান করেন আপন ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা বজায় রেখে।

এই উদীয়মান প্রতিভার ভবিষ্যতে আরও বিরাট ব্যাপ্তি এবং সর্বাত্মক প্রসার আমরা বিশেষভাবেই কামনা করি।

নাট্যলোক

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের কয়েকটি অনবদ্য নাট্যসৃষ্টি

রবীন্দ্র সদন মঞ্চে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রযোজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা (গীতিনাট্য), তাসের দেশ (নৃত্যনাট্য), শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নাটকগুলি সাড়ম্বরে মঞ্চস্থ হয়। মায়ার খেলা আশ্রমিক সংঘের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। গীতিনাট্যটিতে যিনি সুরের মায়াজাল বিস্তার করে দর্শকদের বিমোহিত করে রাখলেন তিনি হলেন স্বনামধন্যা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। শ্রীমতী মিত্রের অপূর্ব কণ্ঠ কিছুক্ষণের জন্য সমগ্র প্রেক্ষাগৃহকে স্তব্ধ করে রাখে। তাঁর কণ্ঠ দীর্ঘদিন শ্রোতাদের মনে থাকবে। প্রমোদার চরিত্রে শ্রীমতী গীতা সেনের গান নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কুমারের ভূমিকায় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর কণ্ঠদান সুন্দর। পূর্ণিমা ঘোষের নৃত্যনৈপুণ্য মনে রাখার মত। আশ্রমিক সংঘের শ্যামাও অনবদ্য নাট্যসৃষ্টি। সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের অদ্ভুত মিলন আর কখনো ঘটেছে কিনা তা মনে পড়ে না। শ্যামা নৃত্যনাট্য সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যায়। পূর্ণিমা ঘোষের শ্যামা ও বজ্রসেনের চরিত্রে মিহির ঘোষের অভিনয় এককথায় মনোরম। কোঠাল ও প্রহরীর ভূমিকায় শ্যামল বসুর দক্ষতা উল্লেখনীয়। গ্রুপ ব্যালেতে জনা গুপ্তভায়া ও অন্যান্যদের নৃত্য সুন্দর। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসাদ সেনের গান অতুলনীয়। চিত্রাঙ্গদায় নীলিমা সেন, প্রসাদ সেন, কমলা বসু, বেলা ভট্টাচার্য ইন্দুলেখা ঘোষের গান নাটকটিকে প্রাণবন্ত করেছে। চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত সুষ্ঠু অভিনয় করেছেন। তাসের দেশ ও ভানু সিংহের পদাবলীও দর্শকদের যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছে। কয়েকটি অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় নাট্যসৃষ্টির জন্য শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ অবশ্যই দর্শকদের প্রশংসা লাভ করবে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের মায়ার খেলার একটি দৃশ্য

নষ্টনীড় প্রযোজিত 'ছন্দহীন'

বর্তমান যুগে বেকার সমস্যা কি ভয়াবহ তা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য চিত্রনাট্যটি বেকার সমস্যাকে কেন্দ্র করেই রচিত। চিত্রনাট্যটির রচয়িতা সমস্যাটাই দেখিয়েছেন কিন্তু তার সমাধানের ইঙ্গিত দেন নি। চিত্রনাট্যটির নির্দেশনায়ও রয়েছেন শ্রীচক্রবর্তী স্বয়ং। নাট্য-নির্দেশনায় তিনি সফল। চিত্রনাট্যটিতে দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। শিল্পীদের আন্তরিকতা দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করবে। চিত্রনাট্যটিতে যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অমলের ভূমিকায় দেবোত্তম চক্রবর্তীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, তাঁর সাবলীল ও প্রাণবন্ত অভিনয় চিত্রনাট্যটিকে প্রাণদান করেছে বলা যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে যাঁরা দক্ষতার সঙ্গে অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন ও ধন্যবাদার্হ হয়েছেন তাঁরা হলেন সুনীল বসু, হরেন নাথ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, মাণিক সরকার, পরিতোষ সমাদ্দার, নিতাই ঘোষাল, বাদল মজুমদার, পীযূষ মজুমদার, সুনীল কুশারী, বিজন ভট্টাচার্য, শৈলেন মজুমদার পরিমল বসাক, সত্যেন রায় প্রমুখ। শৈব্যার ভূমিকায় দেবমিতা চক্রবর্তীর অভিনয় আমাদের নিরাশ করেছে। অভিনয়ে আড়ষ্টতা, সংলাপ উচ্চারণে

বহু ত্রুটি বিদ্যমান। তাঁর আরও অনুশীলনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আবহসঙ্গীত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। নটনীড় প্রযোজিত 'ছন্দহীন' চিত্রনাট্যটি এক-কথায় সুন্দর। অহীন্দ্র মঞ্চে (বেহালা) পরিবেশিত হচ্ছে। নটনীড় সংস্থার প্রতিটি শিল্পী ও কলাকুশলীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ছন্দহীন চিত্র-নাট্যটির সাফল্য কামনা করি।

তাহার নামটি রঞ্জনা ও রাতের অতিথি

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য নাট্যসংস্থা ইউনিটি থিয়েটার কর্তৃক গত ৯ই জুলাই ১৯৬৯ তারিখে রঙমহল নাট্যমঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত নাটক 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ও উৎপল দত্ত রচিত নাটক 'রাতের অতিথি' মঞ্চস্থ হয়। নাটক দুটির নির্দেশনায় ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। নাটক দুটি সুপরিচালিত ও সুঅভিনীত। নাটক পরিচালনায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাহার নামটি রঞ্জনায় কৌশিকের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন শ্রীনিমাই বসু। রঞ্জনার চরিত্রে সুন্দর মানিয়েছে শ্রীমতী রাণু রায়কে। শ্রীমতী রায়ের অভিনয়ে মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাজমোহন ও পণ্ডিতের চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন দেবব্রত চৌধুরী ও অশোক দে। রাতের অতিথি নাটকটি দর্শকদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। কালীকিংকর-এর ভূমিকায় নিমাই বসুর চরিত্রায়ণ অপূর্ব। চিত্তব্রতের ভূমিকায় অমর পাল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্র-এর চরিত্রে সুজিৎ পালের অভিনয় সুন্দর। সদাশিবের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য অনুপ গঙ্গোপাধ্যায়কে দীর্ঘদিন মনে থাকবে। সদাশিবের ভূমিকায় তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রেবা ও সুলোচনার চরিত্রে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন শিপ্রা সাহা ও রাণু রায়।

আশ্রমিক সংঘ প্রযোজিত 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্ত

স্বামীজী

দক্ষিণ দিল্লীর মাতৃমন্দিরের সাহায্যার্থে চতুরঙ্গের 'স্বামীজী' নাটকটি সম্প্রতি আইফ্যাক্স হলে অভিনীত হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে নির্বাচনী অধিকর্তা শ্রী এস সি সেনবর্মা রাজধানীর নাট্য প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে স্বামীজীর জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিরসের এ নাটক সামগ্রিকভাবে দর্শকদের আবেগে আপ্লুত করেছে। নাম-ভূমিকায় বলরাম ঘোষের অভিনয় উপযুক্ত চরিত্র চিত্রণের স্বাক্ষর। শিবু রায়চৌধুরী রূপায়িত 'রামকৃষ্ণ' দর্শকদের শ্রদ্ধা পেয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন সঞ্জয় দত্ত, ছবি সেন, কণা দেব, মৃণাল দেব, নীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, চুনী রায়চৌধুরী, নির্মল বীট, ফুলকুমার সেন, বাসন্তিকা সেনগুপ্তা ও সব্যসাচী। শীতাংশু মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনা প্রশংসা পাবে। আলোকসম্পাত নাট্যানুগ।

নাকের বদলে নরুণ ও বীর শিকারী

সম্প্রতি জেঠিয়া প্রাঙ্গণে শিশু সম্প্রদায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের 'নাকের বদলে নরুণ' ও সুনির্মল বসু রচিত 'বীর শিকারী' নাটক দুটি অভিনয় করল। প্রথম নাটকের শিল্পীদের মধ্যে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে সুচরিতা ভট্টাচার্য, সীমা ভট্টাচার্য ও অমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এদের অভিনীত চরিত্রগুলি ছিল যথাক্রমে 'শেয়াল', 'নাপিত' ও 'কুমোর'; দুটি নাটকের অন্যান্য চরিত্রে ছিল সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, তপন কর, অমিত বন্দোপাধ্যায় নারায়ণ দে ও দিলীপ কুণ্ডু। নাটক দুটি পরিচালনা করেন রমাপদ ভট্টাচার্য ও দেবী ভট্টাচার্য।

টাকার রং কালো

কল্যাণী রবীন্দ্র ভবনে গোপাল দাশগুপ্তের সম্পাদনায় সম্প্রতি কাঁচরাপাড়া টিবি হাসপাতালের মিলনীর সভ্যবৃন্দ অভিনয় করেছেন সুনীল চক্রবর্তীর টাকার রং কালো, সুঅভিনয়ের জন্য নাটকটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন যতীন বিশ্বাস, সমীর ঘোষ, সুশীল চন্দ, তপন রায়, মিহির ঘোষ, প্রদীপ খাজাঞ্চী, মণি পাল, রবীন সরকার, সুব্রত দাশগুপ্ত, বিপ্লব সাহা, স্বপন সেন, দীপক খাজাঞ্চী, তরুণ রায়, শম্ভু ঘোষ, বিভূতি হালদার, ননীগোপাল দাস, রসরাজ নারায়ণ মজুমদার, কালীপদ পাল, অনীতা ঘোষ, অণিমা বুন্ধ ও অঞ্জলি দাস।

সার্থক পরিচালক লুসিনো ভিসকণ্টি

১৯০৬ সালে লুসিনো ভিসকণ্টির জন্ম ইটালী শহরে। বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একজন দিকপালরূপে ভিসকণ্টি গণ্য হয়ে থাকেন। ইটালীতে তাঁর সমগোত্রীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অতি অল্প অর্থ বিনিয়োগ করে এবং ওয়েলস্ ও রেঁনোস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকদের নিয়োগ করে যে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে ভিসকণ্টি ছিলেম সেই গোষ্ঠীরই অন্যতম। এ্যান্টোনিউনি অথবা ফেলিনির মত স্বীকৃতি অর্জনের জন্য তাঁকে বিশেষ সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। তবে রোসেলিনির মত তিনি শক্তিমান পরিচালকও ছিলেন না' তবে বেশ কিছু ছবি নিয়ে তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ নিজের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর পূর্বেকার সমস্ত ছবি বর্তমান 'ক্লাসিকের' পর্যায়ে পড়ে এবং প্রতিটি নতুন ছবি যা তিনি তৈরী করে থাকেন তা যেমনই রুচিসম্মত তেমনিই মানসিক উন্নতির সহায়ক। কোন কিছু স্বার্থের খাতিরে ছবি করার কথাকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতেন। তাঁর ছবি এমনই সংঘাতপূর্ণ যে তাঁকে একমাত্র ফ্রিজ লঙ্ কিংবা অর্সনওয়েলস্-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

চলচ্চিত্রের প্রতি ভিসকণ্টির আগ্রহ জন্মায় একটু দেরীতেই। ওয়েলস্ যখন 'সিটিজেন কেন' পরিচালনা করছেন এবং বেশীরভাগ উদীয়মান পরিচালকই যখন হয় তথ্যচিত্র পরিচালনায়, না হয় শিল্পে শিক্ষানবীশ অবস্থায় বৃত রয়েছেন ভিসকণ্টি সে সময় নির্জনতার মধ্যেই বাস করছেন এবং তাঁর শৈল্পিক সত্তাকে ভবিষ্যতে কিভাবে নিয়োজিত করবেন তা তখনও স্থিরীকৃত হয়নি। বিশ্বের চলচ্চিত্র দরবারে তাঁর প্রথম প্রবেশ ১৯২৮ সালে 'জি এ ট্রার্ভাসি'র একটি নাটকের সেট ডিজাইনার হিসেবে। ১৯৩৬ সালে যখন তাঁর বয়স ত্রিশ সেই সময় তিনি ইটালী ত্যাগ করেন এবং চলচ্চিত্র শিল্পে নিজেকে যুক্ত করার বাসনায় ইংল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সের পথে পা বাড়ান।

ভাগ্য হয়তো তাঁর সুপ্রসন্নই ছিল তাই কোকো চ্যানেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং আলাপ হয়ে যায়। এবং যার ফলে ফ্রান্সে পৌছুবার পরই তিনি জীন রেনোর প্রডাকশান কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হলেন। প্রথমে সাজসজ্জা পরিচালনা ও পরে রেঁনোর প্রযোজিত

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'লে বা ফণ্ড' চিত্রে (১৯৩৬ সাল) ও 'ইউনি পার্টি ডি ক্যাম্পেন' চিত্রে (১৯৩৭ সাল) সহকারী পরিচালকের গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বি বি সি'র এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করেছেন এবং রাজনৈতিক

লুসিনো ভিসকণ্টি

দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কি ভাবে তিনি একটি ফ্যাসিবাদী দেশ থেকে পলায়নে সক্ষম হলেন এবং কি ভাবে একটি বামপন্থী জোট যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কম্যুনিস্ট তাদের সঙ্গে সমচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কাজে যোগ দিলেন। সন্দেহ নেই যে, এই অভিজ্ঞতাই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং একটি রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করেছিল। যেটা অনুমান করা শক্ত তা হচ্ছে রেনোয়ার প্রভাব তাঁর উপর কতটা প্রবল। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান এবার যদি উপর উপর বিচার করা যায় তা হলেও দেখা যাবে, ১৯৩০'র রেঁনোর মতবাদ এবং ইটালী নিউরিয়ালিজম-এর দশ বছর পরবর্তী যে অবস্থা অর্থাৎ ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্ট ও যুদ্ধ পূর্ববর্তী ইটালীর যে বামপন্থী জোট এরই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভিসকণ্টি। মনে হয় যেন ভিসকণ্টির চরিত্র এই দুয়ের মধ্যখানে একটি সেতু নির্মাণ করেছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই দুই শিল্পীর যে পার্থক্য তা উভয়ের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য আছে তারও চেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক। শিল্প সুচারুতার জন্য ভিসকণ্টি বিশেষভাবে রেঁনোর কাছে ঋণী এবং তা যুদ্ধকালীন অবস্থায় তোলা ভিসকণ্টির প্রথম ছবি 'ওসিসিওনে'তেই সীমাবদ্ধ। এর পর ভিসকণ্টি নতুন পথে চলার সন্ধান পেলেন এবং নিজস্ব ধারায় ছবি করার চিন্তা করতে লাগলেন এবং রেঁনোর প্রভাব ধীরে ধীরে তার উপর থেকে অন্তর্হিত হল।

১৯৪০ সালে রেঁনোর ইটালীতে এসে 'লা টোসকা' ছবি তুলতে শুরু করলেন। এই ছবিতে ভিসকণ্টি প্রথমে অভিযোজনের ও পরে সহকারী পরিচালকের কাজ করেন। কিন্তু রেঁনোর এই ছবি শেষ করতে পারেননি। ১৯৪২ সালে ভিসকণ্টি যখন 'ওসেসিওন' ছবি তুলতে শুরু করেন তখন সাধারণভাবে তাঁকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মেডিটারেনিয়ানকে কেন্দ্র করে ইটালীতে তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ইটালী হারছে।

চিত্রটি শেষ হবার কয়েক মাসের মধ্যেই শত্রুপক্ষ সিসিলি অধিকার করল এবং সেখান থেকে পেনিনসুলার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। যুদ্ধ শেষ হবার বেশ কয়েক বছর পার না হওয়া পর্যন্ত বইটি সাধারণ্যে মুক্তি পেল না। মুক্তি পাবার পর দেখা গেল তাতে অনেক কাটছাঁট করা হয়েছে। যাই হোক, প্রথম

চিত্র পরিচালনার সুযোগ পেয়ে ভিস-কন্টি ঠিক করেছিলেন ভার্গার একটি ছোট কাহিনীকে রূপায়িত করবেন পর্দার বুকে। কিন্তু সেন্সর কর্তৃপক্ষের জন্য তা সম্ভব হয়নি।

এর পর তিনি 'পোস্টম্যান অলওয়েজ রিঙ টোয়াইস' নামে একটি আমেরিকান কাহিনীর চিত্ররূপ দিলেন। ওরই ইটালিয়ান নাম হল 'ওসেসিওনি'। 'ওসেসিওনি' কাহিনীটা হচ্ছে, বুভুক্ষু যৌবনের হতাশা বা ধ্বংসের রূপটি তুলে ধরা হয়েছে। একটি লোক হঠাৎ বলা চলে রাস্তার উপরে শহরের একটি সরাইখানায় গিয়ে শ্রমিকের একটি কাজ পেয়ে গেল। কিছুদিন যেতে-না-যেতে সে সরাইখানার যে মালিক তার স্ত্রীর প্রেমে পড়ল এবং স্ত্রীও তাই করল। তারা দুজনেই বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে মনস্থ করল এবং দুজনেই রাস্তায় রাস্তায় ঘণ্টাখানেক কাটাবার পর সেই মহিলাটি ফিরে এল এবং লোকটিও একা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পর সরাইখানার সেই মালিক ও তাঁর যুবতী স্ত্রী নিকট-বর্তী একটি শহরের কাছে হঠাৎ সেই লোকটির দেখা পেয়ে গেল এবং তাকে ঘিরে ধরল। এবং সেই স্বামীই নিরীহ-ভাবেই চাপ দিতে লাগল সেই লোক-টিকে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ফিরে যাবার সময় ঐ প্রেমিক পুরুষটি, মহিলাটিরই প্ররোচনায় তার স্বামীকে হত্যা করল। তারপর তারা দুজনে মিলে বসবাস করতে লাগল এবং রেস্তোরাঁ চালাতে শুরু করল। কিন্তু অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অবিশ্বাস ধীরে ধীরে বেড়েই চলল, যখন সেই মহিলাটি তার বৃদ্ধ স্বামীর জীবনবীমার টাকা পেল লোকটি তখন তাকে সন্দেহ করতে লাগল যে ঐ মহিলাটি নিজের আর্থিক অবস্থা গুছিয়ে নেবার জন্য তাকে ব্যবহার করছে। এরই প্রতিশোধ নেবার জন্য লোকটি একদিন সমস্ত বিকেলটা কাটাল অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কিন্তু পুলিশ পিছু নিয়েছে সংবাদ পেয়ে তারা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পরে আবার তারা মিলিত হল কিন্তু পুলিশের হাত এড়িয়ে যাবার সময় তাদের গাড়ী গিয়ে ধাক্কা লাগল এবং মেয়েটি মারা গেল তাতে।

প্রতিদান

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় কৃত সামাজিক কাহিনী প্রতিদান রূপালী পর্দায় প্রতি-ফলিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বর্তমান যুগের খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমানে চিত্রটির কাজ শেষ হয়ে মুক্তির জন্য অপেক্ষা-রত। চিত্রটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। প্রতিদান চিত্রটিতে যাঁরা রূপদান করেছেন তাঁরা হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্রীমতী মলিনা দেবী, প্রীতি মজুমদার, অনুভা গুপ্তা, কালী চক্রবর্তী, রুমা গুহঠাকুরতা, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল দাস, সমরকুমার, মাঃ অরিন্দম এবং নবাগতা সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এস বি প্রোডকসন্সের চিত্র প্রতিদান।

আরোগ্য নিকেতন

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-বিজয়ী প্রবীণ সাহিত্যিক ডঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় কাহিনী 'আরোগ্য নিকেতন' বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি

'প্রতিদান' চিত্রে ললিতা চট্টোপাধ্যায়

পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি বর্তমানে মুক্তির দিন গুণছে। 'আরোগ্য নিকেতন' চিত্রটির পরিচালক হলেন প্রবীণ ও স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক বিজয় বসু। আরোগ্য নিকেতন চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, কালী সরকার, রমা দাস, সন্ধ্যা রায়, ইন্দিরা দে, দিলীপ রায়, ছন্দা দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রটিতে সুর-সংযোজনা করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটিতে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে রয়েছে-

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অরোরার ছবি আরোগ্য নিকেতন।

এপার-ওপার

সমরেশ বসুর কাহিনী এপার ওপারকে চিত্রায়িত করার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন 'তিন ভুবনের পারে' চিত্রখ্যাত পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। চিত্রটির মুখ্য ভূমিকাগুলিতে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, অপর্ণা সেন, অরূপ বসু প্রমুখ।

কৃষ্ণলীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংস বধ পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তার। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন শ্রীধর ভট্টাচার্য। চিত্রনাট্য রচয়িতা হলেন মৃণাল ঘোষ। চিত্রটির সঙ্গীত রচনা করেছেন সবল গুহ। গীতিবহুল চিত্রটির সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অনিল দে। চিত্রটির মুক্তি আসন্ন। নেপথ্য কণ্ঠ শিল্পীরা হলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা [illegible], শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎ বাগচী পরিচালিত 'সমান্তরাল' চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়

রূপসী

রূপসী চিত্রটির পরিচালক অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রটির চিত্রনাট্য ও কাহিনী রচনা করেছেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রটির ভূমিকালিপিতে রয়েছেন সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অনিল বাগচী। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন এম এ ফিল্মস। অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত চিত্র 'রূপসী'।

মহাকবি কৃত্তিবাস

বাংলার আদিকবি রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের বিরাট ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনীকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটিতে গান গেয়েছেন সর্বশ্রী মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, পিণ্টু ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অনুপ ঘোষাল। চিত্রটির নৃত্যাংশে রয়েছেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ। রূপায়ণ চিত্রের ছবি মহাকবি কৃত্তিবাস।

'সমান্তরাল' চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী)

বিচিত্র বোম্বাই

বহুকালের কথা। ব্যাপারটা কিন্তু এখনো সবুজ হয়ে আছে স্মৃতির [illegible]ণিকোঠায়। সবে তখন স্টুডিও চত্বরে যাওয়া-আসা করি। অবিশ্যি রবাহূত বা অনাহূতর সে গতিবিধি ছিলো না। কোনো একটি প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ছিলো তৎকালীন অনভ্যস্ত স্কন্ধটিতে।

সে যাই হোক, ছবি তোলার রকমারি কাণ্ডকারখানা তখনো আমার পুরোপুরি জানা নেই। একদিন স্টুডিওতে গিয়ে দেখি কোনো একটি তখনকার নামকরা ছবির দৃশ্য-গ্রহণ চলছে। নায়ক-নায়িকারূপে রবীন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণী (যদ্দুর মনে হচ্ছে) একটি পুকুর ধারে প্রেম-আলাপনে আত্মহারা। দু'চারটি হংস-মিথুন কেলি করছে, সাপলা ফুটে রয়েছে জলে, কুচি কুচি ঢেউ-এর খেলাও চলছে। —ওপাশে প্লে-ব্যাক গান বারে বারে বাজছে। একই গান শুনে শুনে কানের বারোটা বাজার উপক্রম। কিন্তু পুকুর বলে যাকে খাড়া করা হয়েছে সেটা আসলে ওই স্টুডিও ফ্লোরেরই মেঝে, কয়েক হাত জায়গা মাটি দিয়ে ঘিরে কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ জলে ভরা

রমেন চৌধুরী

হয়েছে। আর তাকেই দিব্যি পুকুর বলে যেতে দেখা গেল ছবিতে। এর সঙ্গে আরো কিছু প্রক্রিয়া অবিশ্যিই ছিলো, ছিলো সত্যিকার পুকুরের 'ইনসার্ট' ইত্যাদি ছবিতে কিন্তু ছায়া-ছবিতে দেখতে পাওয়া সবকিছুই নির্ভেজাল যে নয় সে জ্ঞান ক্রমেই পরিপক্ব হোল, সময় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে। 'যা দেখছ তা যে আদপেই ঠিক নয়'—চিত্র রাজ্যেই এটার অবস্থিতি। —ওই যে মেয়েটিকে ডানা-কাটা পরী বলে মনে হ'চ্ছে, চুলের বাহারই বা ওর কতো—কিন্তু সে ধারণা এক মুহূর্তে পাল্টে যেতে পারে যদি সামনাসামনি তাকে দাঁড় করানো সম্ভব হয় (এর ব্যতিক্রমও আছে, তাও এই ফাঁকে বলে রাখি)।

এমনই যখন ছবির রাজ্য, তখন নায়িকা মুমতাজ প্রত্যেকটি ছবিতে সকলকে তাঁর চুলের কেরামতিতে ভোলাবার জন্যে মেতে উঠবেন এতে অন্তত আমি অবাক হইনি মোটেই। বেশ কতকগুলি ছবিতে উনি অংশ নিচ্ছেন. প্রত্যেকটি ছবির জন্যে আলাদা চুল রয়েছে ওঁর। চুলের সংখ্যা তিরিশ। ওঁর নিজস্ব চুল নেই ভাবলে ভুল হবে, মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে অশনি লুকো[illegible] পারে কি না বলতে না

লণ্ডনের বি বি সি কার্যালয়ে 'বিচারসভার' প্রযোজক হিমাংশুকুমার 'বর্তমানে সিনেমার ভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা [illegible] ওয়াহিদা রহমান, নার্গিস ও দলীপ [illegible]

পা'লেও সে চুল যে সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করছে তাতে কোনো ভুল নেই। তবু অতো চুলের উচ্ছ্বাস কেন? সেটা ওঁর প্রযোজক এবং পরিচালকদের ইচ্ছার অত্যাচারও বলা যায়। একটি উইগের দামও তো বড়ো কম নয়, তবু কি না শ্রীমতীর প্রায় অর্ধশত (শ'-এর কোঠায় অচিরে পৌঁছে যেতে পারবে) রকমারি পরচুলা। যে দর্শক বিশেষ খোঁপাটি দেখে অনুরাগের দোপাটি ফুলের মালাটি মনে মনে পরিয়ে দিলেন, হঠাৎ যদি চর্মচক্ষে উইগবিহীন অবস্থায় মুমতাজকে প্রত্যক্ষ করার স্বর্ণ সুযোগ পান তাহ'লে যন্ত্রণায় কাতর হবেন অবিশ্বাস্যভাবেই। কিন্তু সেজন্যে শিল্পীর কোনো অপরাধ হবে না। এ ভাবে পরচুলা পরতে উনি চাননি। নেহাৎ বাধ্য হয়েছেন ঘটনাচক্রে।

এ সম্বন্ধে মুমতাজের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন বারে বারে পোষাক-আসাক বদলাবার পক্ষপাতী তিনি নন। রূপসজ্জা পরিবর্তনেও তাঁর সমান অনীহা। আসলে উনি বাহ্যিক কোনো কিছুরই ভক্ত নন মনে-প্রাণে। অভিনয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ-ভাবে সঁপে দিতে, চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হ'তেই তাঁর অভিলাষ। দর্শকরা যেন সবকিছু বাদ দিয়ে তাঁকে জানতে পারে। মুমতাজ নামে শিল্পীকেই চিনে নিতে পারে।

কথাটা শিল্পিজনোচিত নিঃসন্দেহে।—

●

শ্রীমতী সাধনার স্বদেশপ্রীতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেছে সম্প্রতি। হালফিল লণ্ডনে ছবির দৃশ্যগ্রহণে অংশ নিতে ওঁকে উপস্থিত দেখে বৃটিশ প্রযোজকরা খুবই উৎসাহিত হয়ে ছুটে আসেন। সাধনাকে ইংরিজি ছবিতে অংশ নিতে রাজী করাতে পারবেন—এমনি ধারণা নিশ্চয় ছিলো তাঁদের। সেইমতো আলাপও চালিয়েছিলেন। শ্রীমতী কিন্তু স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর অক্ষমতা। আগে নিজের দেশ, পরে আর কিছু। সে জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় অভিনেত্রী সাগর-পারের মানুষদের কাছে। কিছু আগে হলিউডের কোনো একটি বিখ্যাত ছবিতে স্বনামধন্য অভিনেতা জিম বার্ডনের সঙ্গে অভিনয় করার চুক্তিতে তিনি রাজী হ'তে পারেন নি শুধু বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব নয় বলে।

অবিশ্যি হতাশায় ম্লান অভ্যাগত-দের কিছু আশার বাণী শুনিয়ে দিয়ে-ছেন সাধনা। বলেছেন: এখানে তোলা অনেক ছবিরই আমি বিশেষ অনুরাগী। কাজেই সুবিধেমাফিক আপনাদের ছবিতে অংশ নেবার বাসনা আমার রইলো। দেখবেন, ঠিক এসে হাজির হবো।

অঁদ্রে হেপবার্নকে সাধনার ভারি পছন্দ—সে কথাও একফাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।

স্বামী প্রযোজক-পরিচালক আর কে নায়ার এ ব্যাপারে কিছুটা অনুযোগ করলে সাধনা হাসিমুখে জানিয়েছেন: দোহাই তোমার! এখন ও কথাই নয়। আগে আমার দেশের ছবির রাজ্য জয় করি তবেই না এগুনো যাবে অন্য দেশের দিকে।

লণ্ডনে সাধনাকে নিয়ে খুবই মাতামাতি চলেছে। নামী এবং দামী চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকায় নানা ঢঙের পোজ মুদ্রিত হয়েছে তাঁর। সাংবাদিক-দের সঙ্গেও তাঁর আলাপ আলোচনার বিন্দুমাত্র উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি এটা তারি প্রমাণ।

নবীন শিল্পী। নামটিও তাই—নবীন নিশ্চল। ফিল্ম ইনস্টিটুটের ছাত্র হিসেবে বিশেষ নামের অধিকারী। এখন বোম্বাইয়ের কয়েকটা মারাঠী ও গুজরাতি ছবিতে অংশ নিচ্ছেন। চরিত্রাভিনয়ে—নাকি নবীনের নবীনত্ব বদলে যথেষ্ট মুন্সিয়ানাই দেখা যাচ্ছে, রকমারি চরিত্রে তাঁর অভিনয় ইতিমধ্যে প্রশংসিত হ'তে শুরু করেছে। ফলে মধুলোভী মধুকররা তাঁর দোরে ভিড় জমাচ্ছেন—এঁরা বিশিষ্ট প্রযোজককুল। নবীনকে তাঁরা তাঁদের ছবিতে নিতে আগ্রহী।

নবীনের বিচার-বিবেচনা কিন্তু প্রবীণদেরমতোই। ছবির চুক্তি ইত্যাদির ব্যাপারে যথেষ্ট হুঁসিয়ার। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী সবকিছু যাতে হয় সেদিকে রেখেছেন সজাগদৃষ্টি। খুব ভালো কথা। ছবির রাজ্যে—শুধু এখানেই বা কেন সর্বত্র হিসেবে যেন ভুল না হয়। ভুলের মাশুল গুণতে হবে তাহলে বহুদিন। যাই হোক প্রযোজক-পরিচালক মোহন সায়গাল তাঁর 'সাজন' ছবির পরের প্রচেষ্টায় নবীনকে নায়ক করতে অভি-লাষী। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে নবীনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবেন বলে ঠিক হয়েছে।

●

মা-বাবার দেয়া নাম: বি এম কাউল। কিন্তু সেটা ক'জনেরই বা জানা ছিলো। এক ডাকে তাঁকে চিনতে পারতেন সবাই 'উল্লাস' বলে। শতাধিক ছবির বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীউল্লাস সম্প্রতি বোম্বাইয়ে লোকান্তরিত হয়েছেন। উল্লাসের স্মরণীয় অভিনয় আমরা দেখেছি বম্বে টকিজের 'বসন্ত' ছবিতে মমতাজ শান্তির সঙ্গে, ভি শান্তারামের 'পর্বত পে অপনা ডেরা'-য় বনমালার বিপরীতে রোমাণ্টিক নায়কের চরিত্রে। তারপর যতো দিন গেছে শিল্পীর অভিজ্ঞতা যতো বেড়েছে, পারদর্শিতাও সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। স্বীকৃত হ'য়েছে তা দর্শকদের প্রশংসায়, অভিনন্দনে।

উল্লাস - অভিনীত কয়েকখানি অতিখ্যাত ছবি—'সম্রাট অশোক', 'মীর্জা গালিব', 'কুন্দন', 'সংঘর্ষ' প্রভৃতি। তবে ভিক্টর হুগোর 'হাঞ্চব্যাক অভ নটরদেম' অবলম্বনে তোলা 'বাদশাহ', (পরিচালনা: অমিয় চক্রবর্তী) চিত্রই তাঁর শিল্পি-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'নাইদার ম্যান্ নর বিস্ট' সেই ন্যুব্জ দেহ কুব্জ-কে (কোয়াসিমদো) আপন মনের মাধুরী দিয়ে রূপায়িত করেছিলেন।

শিল্পী অকৃতদার ছিলেন। তাঁর বিদেহী আত্মা পরম পিতার শ্রীপদারবিন্দে বিশ্রাম লাভ করুক।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ঢাকাদলের উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে কত ভগ্নী ও জননীর যে সেবা ও পরিচর্যার কাহিনী বর্তমান, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ দুই একটি কাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করিলাম।

মায়ের কথা যেমন কখনও সন্তানরা বলিয়া শেষ করিতে পারে না তেমনি বিপ্লবীরাও তাঁহাদের স্নেহ ও যত্নের কথা ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। একদিকে মা-বোনরা যেমন তাঁহাদের সেবা ও যত্নে এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন, অপরদিকে এই বিপ্লবীরাও মায়েদের কল্পিত সন্তান-বিয়োগ-ব্যথায় যুক্তি ও কাকুতি দ্বারা প্রলেপ দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

এই উপলক্ষে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় ভবেশ নন্দীর মায়ের কথা। তাঁহার আবাস ছিল বিপ্লবীদের প্রস্তরঘেরা দুর্গের ন্যায়। বিপ্লবীরা ঘর ছাড়িয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া ঘরের প্রচুর স্বাদ পাইতেন। বিপ্লবীদের 'হাতে খড়ি' হওয়া হইতে আরম্ভ হইয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মের 'উপযুক্ততা' অবধি এই আশ্রয়টি ছিল গুরুগৃহের ন্যায়। ভবেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ বন্দী-জীবনের পশ্চাতেও এই গৃহে বিপ্লবীদের আনাগোনা অব্যাহত ছিল। এই গৃহটি ছিল ঢাকার কায়েৎটুলীতে মুসলমান পল্লীর মধ্যে।

১৯৭৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গাকারীদের 'টারগেট' ছিল এই গৃহটি। এইটিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমরা বদ্ধপরিকর হইলাম। সেইদিন হঠাৎ রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় পুলিশ আসিয়া উপস্থিত। গৃহাভ্যন্তরে

দণ্ডপাণি

আমাকে এবং প্রমোদ দত্ত, সুধাংশু আচ্য ও গৃহের একমাত্র পুরুষ অভিভাবক ভবেশচন্দ্রের দাদা বিজেশচন্দ্র ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া গৃহটিকে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যায়।

পরদিন সকাল ৯ ঘটিকায় প্রায় দুই হাজার দাঙ্গাকারী এই সুযোগে গৃহটিকে আক্রমণ করে। ভবেশচন্দ্রের জননীর আদেশে তাঁহার দুই বোন

[illegible] দত্ত

অমিয়া ও অনিন্দিতা অসম্ভব দুঃসাহসিকতায় দাঙ্গাকারীদের রুখিয়া দাঁড়ায় এবং গুণ্ডাদের হাত হইতে নিজেদের মানসম্ভ্রম ও গৃহটিকে রক্ষা করে। সেইদিন 'Nandy sisters'—নন্দী-বহিনদের এই অসীম সাহসিকতার যে কাহিনী সারা ভারতব্যাপী বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

ইহার পরেই মনে পড়ে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের জননীর কথা। ভূপেনবাবু ভবেশচন্দ্রের সহপাঠী। হেমচন্দ্র অনিল রায়ের দলের প্রথম সারির কর্মী। ঢাকায় তাঁহারা যে সময় এতবড় বিরাট সংগঠনের কার্যে ব্যাপৃত; তখন হইতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা দেশ তোলপাড় হইতেছিল। সংগঠনের প্রাথমিক কার্যে যেভাবে ভূপেনবাবুর মা সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মেলা ভার। ভবেশচন্দ্রের মায়ের আশ্রয় যেমন বিপ্লবীদের 'হাতে খড়ি' হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের কর্মকাণ্ডের 'উপযুক্ততা' অবধি গুরুগৃহের ন্যায় ছিল, তেমনি রক্ষিতরায় মহাশয়ের জননী বিপ্লবীদের ব্রহ্মচর্য সাধনার সমস্ত উপচার সংগ্রহের দায়িত্ব বহন করিয়া চলিয়া ছিলেন। তাঁহার গেহ ছিল সমস্ত বৈপ্লবিক প্রেরণার উৎসস্থল;

১৯৪২ সালে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র উত্তাল তরঙ্গ যখন সারা দেশ উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে, তখন একবার প্রেসিডেন্সী জেলে তিনি পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া

একাকীই ঢাকায় ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে কিছু গোপন ও জরুরী কাগজপত্র এবং গাদা গাদা বিপ্লবী ইস্তাহারের প্যাকেট-সম্বলিত একটি ট্রাঙ্ক। পূর্বেই ঢাকা স্টেশন হইতে ঐ ট্রাঙ্কটি লইয়া যাওয়ার জন্য গৌর দত্তকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। স্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল ছদ্মবেশে কয়েকটি আই বি ওয়াচার কামরাগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। একজন ওয়াচারের চেহারা তিনি চিনিতেন। তাহাকে কামরার সন্নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, তুমি আমাকে চেন কি? আমি ভূপেন রক্ষিতের মা। তাহার সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিতেছি। আমার সঙ্গে এই ট্রাঙ্কটি ও দুই-একটা টুকটাক জিনিষ রহিয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া বাবা, একটি ঘোড়ার গাড়ীতে আমাকে উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়। আমি বুড়ো মানুষ বাবা, আমার পক্ষে কি এইসব সম্ভব?'

এই বলিয়া তিনি ওয়াচারটির প্রতি করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর যাহা হইবার তাহাই হইল। এই নিষ্ঠাবতী মহিলার উপস্থিতবুদ্ধি ওয়াচার বেচারার জীবনে গোলামীর ভার লাঘব করিবার যেমন সামান্য সুযোগ সেদিন আনিয়া দিয়াছিল, তেমনি দলের বহু ছেলেকে ঘোরতর বিপদ হইতেও রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

১৯৩০ সালের ৩০শে আগস্ট। আগের দিন মিটফোর্ড হাসপাতালে লোম্যান-হড্‌সন্‌কে গুলী করিয়া বিনয় বসু পালাইয়া ঢাকার পূর্বপ্রান্তে দলের গেণ্ডারীয়ার আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ আস্তানার দায়িত্বভার তখন নেপাল নাগ, সতীশ সরকার, শরৎদাস প্রমুখ বিশিষ্ট কর্মীদের উপর। নেপাল নাগের মায়ের আশ্রয়ে বিনয়কে রাখা হইল। এই নেপাল নাগের মা ইতিমধ্যেই সন্তান সম্প্রদায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতাপে যখন পথচারীদের একফোঁটা পানীয়ের জন্য ভয়ানক আকুল করিয়া তোলে, তখন পথিপার্শ্বস্থ বটচ্ছায়ে জলাধাররূপ কূপের তলদেশে সঞ্চিত অমূল্য বারি-রাশি যেমন তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণ করিয়া পথচলায় জীবনীশক্তি সঞ্চারণ করিয়া থাকে, তেমনি নেপাল নাগের জননী; তাঁহার স্নেহের ছায়ায়, ঢাকা দলের বৈপ্লবিক দুরন্ত পথচারীদের সাধ্যমত আহার্য ও পানীয় দ্বারা পরিচর্যা করিয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কিন্তু বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের এমনি বিধান যে, এ বিনয়ই যে সে বিনয়, তাহা তাহার প্রস্থানের পর মাত্র তিনি জানিতে পারিলেন। সেদিন তাঁহার আর দুঃখের অবধি ছিল না। বৈপ্লবিক দলের এমনই কঠিন নিয়মানুবর্তিতা যে, যশোদা

বাম থেকে ডানদিকে দণ্ডায়মান—সর্বশ্রী বঙ্গেশ্বর রায়, ভূপাল গুহ, বিনয় বসু, অমলরঞ্জন দাশগুপ্ত, বীরেন ঘোষ, জ্যোৎস্না সরকার, বিমল বসু, সুবোধ রায়, গুরুখা সরকার ও বিনয় দেরায়
বাম থেকে ডানদিকে উপবিষ্ট—সর্বশ্রী শৈলেন নিয়োগী, নির্মল বসু, নীরদ হবেগুপ্ত, অমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুশীল রায় ও বকুল দাশগুপ্ত এদের কর্মকাণ্ড নিবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে

হইয়াও নন্দনের পরিচয় জানিতে পারা যায় না। এইসব নন্দনদের জন্য তিনি কত দুঃখ-দারিদ্র্যই না সহ্য করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সবার অলক্ষ্যে' নামক প্রবন্ধে (১৭শ সংখ্যা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)---এই দলের আর একজন মহিলার কথা আমরা জানিয়াছি---বিনোদিনী দেবীর একমাত্র ছেলে। সে ছেলেও বিপ্লবী দলের কর্মী। মা ছেলের সঙ্গে সঙ্গে তার দলের ছেলেগুলোকেও নিজের সন্তানের স্থানে গ্রহণ করে ফেলেছেন। ---ঢাকা ট্রেন ডাকাতি মামলার আসামী তাঁর পুত্র। স্বামী নিবিরোধী লোক। সামান্য তাঁর আয়। দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার। কেও এ পরিবারের এ জননীর

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের মা
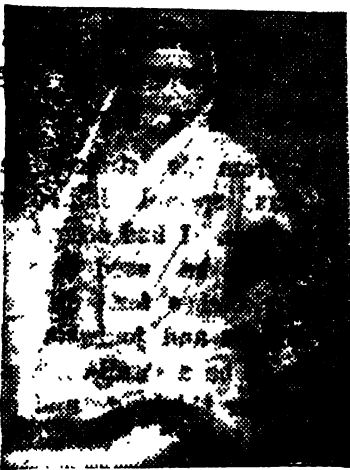
অন্তর কিন্তু ঐশ্বর্যময়। বিপ্লবীদের পালনে তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী। তাঁর চিত্তের প্রসারতা এ প্রসঙ্গে ছিল অতুলনীয়। নিজের মুখের গ্রাস হঠাৎ আগন্তুক পলাতকের মুখের সম্মুখে প্রায়ই তাঁকে তুলে দিতে হত। তাতে তাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না। তাঁর ক্ষুধা নিমেষে মিলিয়ে যেত। পলাতক অবস্থায় অনিল দাস, সুকুমার দত্ত, অসিত ঘোষ, সুশীল মুখার্জি এই মহিলার আশ্রয়ে নানা সময়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। মৈমনসিংহের ডিভিশনাল কমিশনার মিঃ ক্যাসেল---আক্রমণে লিপ্ত নৃপেন মুখার্জিকেও বিনোদিনী দেবী আশ্রয় দান করেছিলেন।

সাহসিনী মহিলার চরিত্র একটি ঘটনার উল্লেখেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। ---ট্রেন-ডাকাতির ব্যাপারে পুলিশের হেপাজতে পুত্র বীরেন বন্দী। বন্দীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। মা গেছেন পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে। পুলিশ অফিসারের সম্মুখেই নির্যাতনক্লিষ্ট পুত্রকে বলে এসেছিলেন এই মহিলা--- 'তোমাকে ওরা অন্যায়ভাবে মেরেছে। তুমি অন্যায় করো নি। কাজেই ওদের কাছে ভালমন্দ একটি কথাও বলবে না।'

সবার অজ্ঞাতে মাতা, ভগ্নী ও জায়ারূপে যাঁরা এইভাবে বিপ্লবীদের দুর্জয় চলার পথে শক্তি সাহস দান করে গেছেন, তাঁদের কথা ভাবতে গিয়েই মনে হয়:

"কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি,
কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে
লিখিয়া রেখেছে কে বা?"

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই দীনেশের ফাঁসির দিন স্থির হইয়াছে। মায়ের বুক-ভাঙ্গা আর্তনাদের সান্ত্বনা নাই। দীনেশই সেইদিন মায়ের কাছে সান্ত্বনার বাণী লইয়া উপস্থিত হইল। সে মাকে লিখিল, 'মা, যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দুইদিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য? যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল।'

ইহাই গীতার কথা :—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং
জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং
শোচিতুমর্হসি ॥২।২৭

কারণ যে জন্মায়, উহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যে মরে উহার জন্মও নিশ্চিত, এইজন্য এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নহে।

এই জননী তো ভাগ্যবতী। কেননা কাহারও মৃত্যু কখনও 'নোটিশ' দিয়া আসে না। অথচ এই জননীর সন্তানের মৃত্যু দিন-মান-ক্ষণ সব জানাইয়া আসিতেছে, তবে শোকের কি কারণ থাকিতে পারে। মাকে প্রবোধ দিবার এই যে যুক্তি ও কাকুতি ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নাই। জীবনের এই পরওয়ানাই বিপ্লবদর্শনের ক্রমিকগতি ও পরিণতি।

কিছুদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরুইনের মধ্যে চুক্তিসাপেক্ষে বহু রাজবন্দী যাঁহারা আবদ্ধ ও অন্তরীণ ছিলেন ১৯৩৭ সালের শেষভাগে মুক্তি লাভ করেন।

বিনোদিনী দেবী

দেখিতে দেখিতে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে। ইংরেজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে সর্বভারতীয় আন্দোলন দ্বারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কংগ্রেস নেতৃত্বে সংশয় ও দোদুল্যভাব দেখিয়া সুভাষচন্দ্র সেই বৎসরেই জুন মাসে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠা করেন। বহু বৈপ্লবিক কর্মী বিশেষভাবে হেমচন্দ্র ঘোষ ও অনিল রায়ের সঙ্গীরা বিনা দ্বিধায় সুভাষচন্দ্রের কর্মের সঙ্গে যুক্ত হন এবং '৪২-এর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দেশবিভাগজনিত স্বরাজ লাভে স্বীকৃত হয়। কিন্ত

বৈপ্লবিক দলগুলি তাহা মানিয়া লইতে পারে নাই। তবে নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, প্রোগ্রামের ভিত্তিতে, বিভিন্ন নূতন দলে অনেকে যোগদান করেন। কতিপয় কর্মী অবশ্য রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন সামাজিক পরিবেশকে কিভাবে পুনর্গঠন করা যায়, তার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে। দেশে তখনও পরাধীনতার রাজনীতি ও রাজনীতিকের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

ইহাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিণতি। কিন্তু স্বাধীন দেশে রাজনীতির স্থান অনেক পশ্চাতে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যই স্বাধীনতা প্রয়োজন। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পর সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই কর্মীদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। রাজনীতির আবশ্যকতা তখন অনেক কমিয়া যায় তাই রাজনীতিকের স্থান জাতিগঠনের কাজে নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাঁহারা বলেন বৃটিশ শাসককে বিতাড়িত করিবার জন্য যে ধরণের কাজ বা প্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছিল—আজ জাতি গঠনের কাজে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কাজ ও প্রতিভার আবশ্যক। কাজে কাজেই কর্মীদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজকর্মে আত্মনিয়োগ করা সমীচীন। সমাজের এক একটা দিক বাছিয়া লইয়া সেই দিকেই তাঁহাদের কর্ম ও প্রচেষ্টা নিযুক্ত করা আবশ্যক। তাহা হইলে দেশের যথার্থ উপকার সাধিত হইতে পারে।

সাংবাদিকতায় আগ্রহ

সংবাদপত্র জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক শিক্ষা দান করে। সমাজের নানা দুর্নীতি ও কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উন্নত করিয়া তুলিতে সহায়তা করে। তাই জাতীয়-জীবন গঠনে, জনসেবায়, লোকশিক্ষাপ্রচারে সংবাদপত্রের দান অসামান্য। অপর দিকে সাংবাদিকের কর্তব্য হইল জনসাধারণকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা। সে জন্যই সাংবাদিকের দায়িত্ব গুরুতর এবং তাঁর কর্তব্য কঠিন। তাঁকে হইতে হয় যথার্থ জনসেবক, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ—দলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত মতবাদের উর্ধ্বে তাঁহাকে উঠিতে হয়। নতুবা তাঁহার সাংবাদিকতা কখনো জনকল্যাণ সাধন করিতে পারে না।

ব্যক্তিগতভাবে শৈশব হইতেই আমার সাংবাদিকতার প্রতি গভীর অনুরাগ বোধ করিয়াছি। আজ অবধি সাংবাদিক সংস্থার সহিত আমার সম্পর্ক অটুট।

এ বিষয় বাংলার কৃতী সন্তান স্বর্গত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ করিতেছি—

অসিত ঘোষ

"Sri Birendra Chandra De acted as U.P.I. representative for Dacca from 1944 to 1948 and gave us complete satisfaction. Since then he has been staying in Calcutta having opted out and maintaining contact with us by supplying occasional reports. He has had on several occasions contributed articles to some local dailies. He is a devoted worker.

—Nov. 26th 1951.

আমার বহু লেখার বিষয়ে স্বর্গত যতীন সেন মহাশয়ের অনুজ প্রখ্যাত সাংবাদিক ও "ইণ্ডিয়া টু-মরো"-র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :

"—his articles on the international situation vis-a-vis India's stand since independence are very much appreciated by political leader and persons who cared for letters. His marshelling of facts and figures coupled with—an inside knowledge of the intricases of day to day problems which followed in the train of the birth of the New India since August 1947 have been a great asset to me."

—6th Dec. 1951.

শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় আমার বহু লেখা পাঠ করিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করিলাম—

"—from his student days he has special liking for journalism. I had occasion to know that he used to write small sketches for different periodicals and journals. He seems to be a well-read man with clear thinking and progressive ideas."

আমার রাজনৈতিক গুরু ঢাকার শ্রী...চন্দ্র নন্দী, এম-এ, বি-এল মহাশয়। তিনি দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান গণপরিষদের প্রাক্তন সভ্য এবং পাকিস্তানে 'আমার দেশ' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি কয়েক বার পৃথিবীর বহু দেশে 'ইণ্টার-পার্লিয়ামেণ্টারী কনফারেন্স'-এ আধুনিক সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থান ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারার ব্যাখ্যান যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে।

তিনি ১৯৬০ সালে আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্তির দিনে আমাকে যেভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এখানে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। [ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব

অনুসন্ধানী

সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও তার বিভিন্ন শাখা এবং কর্মকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সংঘ-পিতা শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে গত ৫ই আগস্ট মঙ্গলবার বিকাল ৫-২৫ মিনিটের সময় ৬৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন।

কলকাতার তদানীন্তন এ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার ধর্মপ্রাণ পিতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মাতা কাশীশ্বরী দেবীর গর্ভে ১৯০২ খৃস্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৩০৮-এর ১১ই ফাল্গুন মাঘী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া) ১৮ নং লালবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। কমার্স বিষয়ে এম-এ (কলিঃ বিশ্বঃ) পাশ করার বহু পূর্বে হিন্দুস্কুলে পড়ার সময় থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগ্রত হয়। এণ্ট্রান্স ও বিদ্যাসাগর কলেজে আই-এ পাশ করার পরই অনার্সসহ স্কটিশচার্চ কলেজে বি-এ পড়ার সময় ১৯২১ সালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান সন্ন্যাসী-সন্তান মহাচার্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষাভিলাষী সত্যব্রত (স্বামী সত্যানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) যাতায়াত ও দীক্ষা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ ধর্মসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর তপস্যা, ধ্যানপরায়ণতা ও অন্তর্মুখী-নতায় বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন হন।

ক্রমে বেদান্ত সাধনায় ও রাজ-যোগ সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেই সময় থেকেই মহেন্দ্র-নাথের বীরভূমের সিউড়ীস্থ ভবনে বারবার নির্জন সাধনায় রত থাকেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের আলোকে মাতৃসাধনায় নিজেকে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'গদাধর-গোপাল' মূর্তিতে সেবা করেন।

১৯৩৮ সাল থেকে কলিকাতা বা সিউড়ীর বাড়ীতে থাকাকালীন তিনি জনসমক্ষে প্রকট হন ও ভক্ত সমাগম সুরু হয়। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ থেকে ধর্মসাধনার ও স্বামীজী প্রবর্তিত কর্মযোগের সাধনার জন্য সিউড়ীর ঐ বাড়ীটিতেই 'সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' নামে সংঘটি গঠিত হয়। ধীরে ধীরে ভক্ত শিষ্যগণ দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন ও সংঘটির কর্মকেন্দ্রের সংখ্যা ও কল্যাণ কর্মের পরিধি বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঋষি-জীবনের মত কয়েকটি পরিবারের

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

সকলেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করায় একটি মাতৃবিভাগও গঠিত হয়।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দে সংঘটি রেজিস্ট্রী-কৃত হয়। ঐ সময় ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণের শেষ স্মৃতিপূত 'কাশীপুর উদ্যানবাটী' শূকর মাংসের কারখানার মালিক এক সাহেবের কাছ থেকে বহু কষ্টে ও অর্থব্যয়ে উদ্ধার করা হয় এবং পরে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেটি ক্রয় করেন।

গত বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণের তপস্যাপূত জীর্ণপ্রায় আলম-বাজার মঠটিও উদ্ধার ক'রে সেটিকে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও স্মৃতি-মন্দিরে পরিণত করার কাজ তিনি সুরু করে গেছেন।

ক্রমশ ১৬টি কর্মকেন্দ্রের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, ডিস্পেন্সারী, লাইব্রেরী, রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করে কল্যাণ ব্রতে তিনি সাধুবৃন্দকে নিয়োজিত করেন। তাঁর লেখা ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, জীবনী, নাটক ও সঙ্গীত পুস্তকের অসংখ্যতার মধ্যে ওয়ার্ল্ড ফিলসফি ওয়ার্ল্ড এথিক্স শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—'যুগে যুগে যাঁর আসা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর দিব্যজীবন সাধনার উদ্বুদ্ধ ক'রে সকলকে নিয়মিত ধ্যান, জপ, তপস্যাদি, পূজা-পাঠের উপদেশ দিতেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত নিজে কঠিন তপস্যা ও নিয়মনিষ্ঠা পালন করেছেন। আবার এরই মাধ্যমে সমস্ত ভক্ত শিষ্য ও সাধু-সন্ন্যাসিবৃন্দের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গঠিত হয় এই আদর্শ জীবনকে কেন্দ্র ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের সাধ-নার চারটি মূল ভাব ছিল—ভালবাসা, পবিত্রতা, তপস্যা এবং সমন্বয়ধর্মী শ্রীরামকৃষ্ণভাব প্রচার। শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মগুরুগণ, অগণিত সুধী, সঙ্গীতজ্ঞ, কল্যাণকর্মী ও ধর্মপিপাসুগণ এবং সর্বস্তরের জনগণ তাঁর কাছে এসেছেন ও তাঁর পূতস্পর্শ পেয়েছেন।

তাঁর কাছে যাঁরা গেছেন—সংঘভুক্ত সন্ন্যাসী বা সংসারী সকলেই তাঁর নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী ধর্মসাধনার নির্দেশ, সম্পূর্ণতার প্রতিমূর্তি এই মহাপুরুষের নিকট পেয়েছেন। জীবনের সমস্ত ৬৩ দিকের —সঙ্গীত, ক্রীড়া, সাহিত্য, অভিনয়, কর্মযোগ ও সর্বোপরি দিব্যজীবন সাধনার প্রেরণার উৎসস্থল ছিলেন এই

নাম বিভ্রাট

ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলির সহিত তিলমাত্র পরিচয়শূন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর দেশের শাসন ও পরিচালনভার সামগ্রিকভাবে অর্পিত হইবে জাতীয় সংস্কৃতির যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে আজ কলিকাতার শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত সমাজ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। কিছুকাল যাবৎ কলিকাতার রাস্তাঘাটের নামকরণগুলি যে এলোপাতাড়িভাবে পরিবর্তিত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া অনেকেরই বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

বৃটিশ আমলে কলিকাতার রাস্তাঘাটের নাম যাঁহাদের নামানুসারে হইয়াছিল তাঁহাদের প্রতিজনের নামই বহাল রাখা আমরা অবশ্যই সমর্থন করি না। ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র এমন অনেকে ছিলেন যাঁহাদের ভারত-বিদ্বেষ, ভারতবাসীর মুক্তি আন্দোলনের কণ্ঠরোধের অপপ্রচেষ্টা এবং ভারতীয় শাশ্বত সভ্যতার মূল্য উপেক্ষা করিয়া তাহাতে কলঙ্কলেপনের কদর্য কাহিনীর পারিতোষিক স্বরূপ সেদিন বিভিন্ন পন্থায় ইংরেজ সরকার তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভারত-শত্রুদের স্মৃতিপরিদর্শনরূপে অবলুপ্তি ঘটানো আমাদের একমহান জাতীয় কর্তব্যের অবশ্যই এক নামান্তর।

ইন্দিরা সরকারের প্রচারদপ্তর ইন্দিরার পিতার নাম ভুলে গিয়ে সেই সনাতন 'চৌরঙ্গী রোড' নামকরণটাই মেনে চলছে

কিন্তু দেখা গেল—যে অনুপাতে তাঁহাদের নামের ফলক বা স্মৃতিস্তম্ভ সরানো উচিত: পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সরকার সে অনুপাতে তাহা না করিয়া উল্টো-পাল্টা কতকগুলি পরিবর্তন বীরদর্পে সাধন করিয়া বসিলেন।

কলিকাতা পৌরসভার তদানীন্তন কর্মকর্তারা ক্ষমতায় আসীন হইয়া মোহের আবেশে বা ক্ষমতা প্রয়োগের রঙীন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া এমন সব নাম পাল্টাইতে আরম্ভ করিলেন যাহা ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদেরই পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া বসিল। প্রকৃতপক্ষে কে ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী? কে উপকারী, কে বন্ধু সেটুকু বাদ-বিচার করা পর্যন্ত তাঁহাদের অভিরুচি হইল না, এইভাবে নিজেদের দেশপ্রেমিক সাব্যস্ত করাই তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কংগ্রেসী স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপদার্থতার পর্বতপ্রমাণ দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরা যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সে কার্যও আমরা ইতঃপূর্বে করিয়াছি। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই কংগ্রেসী অর্বাচীনদের হস্তক্ষেপ যে কি প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহারই এক জ্বলন্ত নিদর্শন চৌরঙ্গী রোডের নাম পরিবর্তন করিয়া ঐ রাস্তার অংশ বিশেষ জওহরলাল নেহরুর নামে উৎসর্গ করা। আরও মজার ব্যাপার যে চৌরঙ্গী কোন বিদেশী নাম নয়। এই নামটির সহিত আধ্যাত্মিকতার বিকাশভূমি এই সনাতন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজগতের এক বিরাট ধারার সংযোগ। ইংরেজ আমলের বহু পূর্বেও এই নামের অস্তিত্ব ছিল। 'চৌরঙ্গী' নামটির তাৎপর্য এবং জাতীয় বিকাশের ইতিবৃত্ত তাহার আসন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্রপরিসর রচনায় সম্ভবপর নয়। বহু দিকপাল গবেষকদের সাধন ও তৎসম্ভ্রান্ত রচনায় এ সম্বন্ধে বহু আলোকপাত হইয়াছে।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই ইতিহাসবিশ্রুত চৌরঙ্গী নামটি পরিবর্তন করিয়া ঐ রাস্তার নাম রাখা নেহরুর নামে। কি বিচিত্র এই দেশ। 'সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা-শস্যশ্যামলা' সুবর্ণপ্রসূ এই বঙ্গজননীর বক্ষ দেশ যাঁহারা ছুরিকা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহাদেরই প্রধান পাণ্ডা জওহরলাল নেহরু। তাঁহারই নামে কলিকাতার এত বড় এক পথ উৎসর্গ করিতে তৎকালীন পৌরপিতারা লজ্জানুভব করেন নাই। তার নাম পরিবর্তিত হইলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত জনগণ সে নাম গ্রহণ করিবে তাহাও নয়। তাই এই পথ লোকের মুখে মুখে আজও চৌরঙ্গী। লোকে গ্রহণ করে যখন নাম পরিবর্তনের সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গভীরের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকে যেমন ক্লাইভ স্ট্রীট আজ সত্যই এক অতীত নাম—লোকের মুখে মুখে আজ নেতাজী সুভাষ রোড।
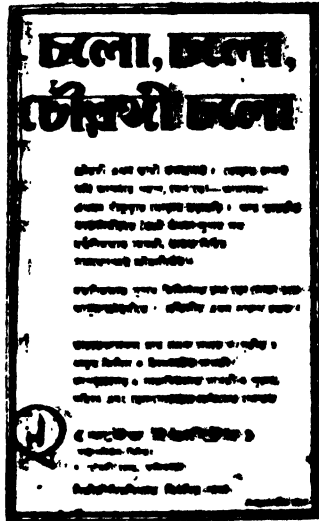
মহাপুরুষ। মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বে তাঁর কুশলে থেকো।' কথা বাহুল্য এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ বাণীটি ছিল—'আমি ঠাকুরকে বেলুড় মহাপ্রয়াণের দিন ও তৎপরদিন কয়েকে কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে কাছে প্রার্থনা করছি, সকলে শান্তিতে সাধু, সন্ন্যাসী ভক্ত ও দর্শনার্থীর উপস্থিত ছিল।

সর্বাপেক্ষা হাস্যকর একটি বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা এই প্রসঙ্গে বোধ করি। সমাজতন্ত্রের হঠাৎ পূজারিণী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যোগ্য প্রচার দপ্তর সম্প্রতি কলিকাতার একটি হস্তশিল্প বিপণির উদ্বোধন উপলক্ষে পত্র-পত্রিকার এক সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। এ বিজ্ঞাপন আমরা আশা করি অনেকেরই চোখেও পড়িয়াছে। ইহার শিরোনামে আছে 'চল, চল, চৌরঙ্গী চল' নিচে ঠিকানার জায়গায় সেই পুরাতন নামই দেওয়া হইয়াছে। ইন্দিরা গান্ধীর বাবার নামে পথনির্দেশ দেওয়া নাই। আমাদের এই বিবরণের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিজ্ঞাপনটির একটি প্রতিলিপি এতৎসহ আমরা পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম।

এক্ষণে মহানগরীর পৌরসভা যুক্তফ্রণ্টের অধিনায়কতায় পরিচালিত হইতেছে। আমরা বর্তমান কর্মকর্তাদের নিকট অনুরোধ করি যে যাঁহার ভাষায় এবং ধারণার বিপুল বিরাট ঐতিহ্যের এবং মহিমার জন্মভূমি —সংস্কৃতির লীলাকেন্দ্র, জাতীয় চেতনার সূতিকাগার এই কলিকাতা মহানগরীর নিছক এক দুঃস্বপ্নের শহর বা মিছিল নগরী ছাড়া আর কিছুই নয় বাঙলা দেশের সেই চিরশত্রু জওহরলাল নেহরুর নাম মুছিয়া দিয়া তাঁহারা পুনরায় চৌরঙ্গীর পূর্বনাম ফিরাইয়া আনিয়া শুভবুদ্ধির এবং সাংস্কৃতিক ধারার পরিচয় দিন।

আমার বলি, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেই তাহার অপ-ব্যবহার যেন পৌরপিতাদের এক মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এ যেন অবচেতন মনের প্রকাশ, যেন মনস্তাত্ত্বিক গণ্ডীতে সমগ্র ব্যাপারটি চলিয়া যাইতেছে। যেমন—পৌরসভার বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তফ্রণ্ট। এই ফ্রণ্টের জনৈক হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে ইতিহাসের আলোয় উজ্জ্বল ধর্মতলা স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করিয়া লেনিন সরণি রাখা হইয়াছে। এ কালের পৃথিবীতে যাঁহাদের দুশ্চর সাধনা এবং অবর্ণনীয় ত্যাগ লাঞ্ছিত-নিপীড়িত-শোষিত মানুষের প্রকৃত মর্যাদা লাভে সহায়তা করিয়াছে, বিপ্লবের তূর্যনাদে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে অধঃপতিত মানবসম্প্রদায়ের জয়গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়াছে। অত্যাচারীর উদ্যত খড়্গ অবনত হইতে বাধ্য করাইয়াছে, তাঁহাদেরই পুরোভাগে মহানায়ক লেনিনের নাম, নক্ষত্রের অক্ষরে জাজ্বল্যমান। সারা বাঙালী জাতির গভীর শ্রদ্ধা এবং বন্দনা নিত্যকালের প্রতিশ্রুতিতে মহামতি লেনিনের উদ্দেশে উৎসর্গিত তথাপি এই প্রয়াস আমরা সমর্থন করিতে পারি না, একটি ঐতিহ্যের গলা টিপিয়া মারিয়া সেই ধ্বংসভূমির উপর কখনও শ্রদ্ধার ভিত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইতে পারে না। আমরা জানি, এই নাম পরিবর্তন দেশের বহু সুধী ও শিক্ষিত সমাজ প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহাও জানি, বেশ কয়েকজন কট্টর কম্যুনিস্টও পৌরসভার এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। এই তালিকায় একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম—বাঙলা সাহিত্যের অত্যন্ত সুপরিচিত লেখক ও খ্যাতিমান সাম্যবাদী অধ্যাপক শ্রীগোপাল হালদার। তিনিও এই সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাইয়াছেন।

মহামতি লেনিনের স্মৃতির আমরাও শ্রদ্ধাশীল পূজারী। কলিকাতার আরও অসংখ্য দীর্ঘতর ও প্রশস্ততর রাজপথের যে কোনও একটির নাম এই যুগনায়কের উদ্দেশে চিহ্নিত করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা চলে। কিন্তু ধর্মতলা স্ট্রীটের ন্যায় এই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইতিহাসসমৃদ্ধ নাম মুছিয়া ফেলা দেশের সংস্কৃতির প্রতি চরম অবমাননারই এক নামান্তর বিশেষ—তাই এই অবিবেচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত আমাদের মতে অবিলম্বে পরিবর্তিত করা উচিত।

পরিশেষে যে একটি কথা উল্লেখ করিয়াই আমরা এই রচনায় সমাপ্তিচিহ্ন অঙ্কিত করিব—তাহা হইল ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুছিয়া দিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না—

মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে হয় না অস্থির
আঘাতে না টলে।

ইন্দিরার ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রহস্য

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আসল রহস্য ক্রমেই বোঝা যাইতেছে। ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও ইহাতে কোনো কোনো বৃহৎ পুঁজিপতির মতলব হাসিলের প্রশ্নও জড়িত রহিয়াছে। আমরা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধী নহি বরং উহা আরও আগেই করা উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। কিন্তু জাতীয়করণের নামে যদি কোনো কোনো বৃহৎ পুঁজি-পতিকে দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করার অবাধ সুযোগ দানের ব্যবস্থা হয় তবে আমরা তার বিরোধিতা করা প্রয়োজন মনে করি।

ইন্দিরা ১৯শে জুলাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অর্ডিনান্সটি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভের জন্য পাঠাইবার আগে দেশের সমস্ত বড় শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসন্ন অর্ডিনান্সের আবশ্যকতা সম্পর্কে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ আমন্ত্রণেই বিভিন্ন রাজ্য হইতে পুঁজিপতিরা দিল্লী ছুটিয়া গিয়াছিলেন। দেখা গেল নিমন্ত্রিতদের তালিকার এক পক্ষ মাত্র বাদ পড়িয়াছেন; বিড়লাদের কেহ প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দিরার লোকেরা বলিলেন, উঁহাদের ডাকি নাই, কেন না উঁহাদের নিকট হইতে কোনো প্রকার বিরোধিতা আশা করি না।

ব্যাঙ্ক অর্ডিনান্স জারি হইলে দেশের সকল প্রান্ত হইতে পুঁজি-পতিরা তারস্বরে উহার প্রতিবাদ করিলেন, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত

ও নীরব থাকিয়াছেন শুধু বিড়লারা। আমরা বিড়লাগোষ্ঠী পরিচালিত সমস্ত সংবাদ ও সাময়িকপত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি। নামকা ওয়াস্তে সমালোচনা একটু আধটু করিলেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধিতা তাঁরা করেন নাই। পার্লামেণ্টে তাঁদের নিজস্ব এম পি যে কয়জন আছেন তাঁরা ইন্দিরাকে সমর্থন করিতেছেন। লোকসভায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিলের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসঙ্ঘ; কিন্তু বিড়লা ভক্তেরা নিজেদের মুখপত্রে ঐ বিলকে সমর্থনা জানাইয়াছেন। রহস্যটি বোঝা দরকার, নতুবা ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক দাবাখেলার চালগুলি বোঝা যাইবে না।

আমরা গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম : 'ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে সব পুঁজিপতিই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এমন মনে করার কারণ নাই। বিড়লা ও মাড়োয়ারীদের ইহাতে প্রচুর লাভবান হইবারই সম্ভাবনা। কারণ সরকার যদি সমস্ত সম্পদ ও অর্থের মালিক হয় তবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া টাকা বাহির করিয়া এক শ্রেণীর পুঁজিপতি ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পক্ষেত্রে মনোপলি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইবে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে টাটা ও পার্শী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা লাভবান হইবে সন্দেহ নাই।' আমাদের আশঙ্কা যে কতদূর সত্য হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা গত সপ্তাহে পার্লামেণ্টের উভয় সভায় শিল্প-মন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলি আমেদ লাইসেন্সিং পলিসি ইনকোয়ারি কমিটির ৪২৯ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ যে রিপোর্টটি পেশ করিয়াছেন তাহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। কমিটিটি দত্ত কমিটী নামেও পরিচিত, কারণ শ্রীসুবিমল দত্ত ছিলেন উহার চেয়ার-ম্যান —হরিকৃষ্ণ পরাঞ্জপে ও এস মোহন কুমারমঙ্গলম ছিলেন উহার অপর দুই সদস্য। কমিটীর রিপোর্টটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার দাবী রাখে —যদিও খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দেশের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি ঐ কমিটীর রিপোর্ট সংক্ষিপ্তভাবেও প্রকাশ করে নাই। বিড়লারা যে কতখানি চালাক ও ইন্দিরাকে সামনে রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারাই যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য অগ্রসর হইয়াছে এই রিপোর্ট পড়িলে তাহা সহজেই বোঝা যাইবে। দত্ত কমিটী ১৯৫৬—১৯৬৬ এই দশ বছর কালে সরকারী লাইসেন্স দান নীতি বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে দেশের বৃহৎ শিল্পপতিরা অধিকাংশ লাইসেন্স পাইয়া থাকেন এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন স্টেট ব্যাঙ্ক, এল আই সি ইত্যাদি ইঁহাদেরই ঋণ দিতে আগাইয়া আসেন। ইহাদের মধ্যে আবার বিড়লাগোষ্ঠীই লাইসেন্স ও সরকারী টাকা বেশির ভাগ আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের একচেটিয়া কারবার বা মনোপলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ১৯৬৭ সালে জহরলাল লোকসভায় তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনার ফলাফল পেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে যোজনাগুলির ফলে যে অতিরিক্ত সম্পদ জমা

বড় বড় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই তাহা আত্মসাৎ করিতেছে। মহলানবীশ কমিটী মনোপলি কমিশন ও আর কে হাজারি তাঁহাদের রিপোর্টে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। দত্ত কমিটী ৫ কোটি টাকার অধিক সম্পদ মালিক আছে এমন ৭৩টি কোম্পানী ও বিশেষভাবে ২০ কোটি টাকার অধিক সম্পদ-সম্পন্ন ২০টি শিল্পগোষ্ঠীর বিষয়ে তাঁহার রিপোর্টে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত দশ বছরে মোট দশ হাজার লাইসেন্স সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন, এবং ইহার মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ পাইয়াছে বৃহৎ শিল্পপতিরা। বিড়লারা পাইয়াছে সবচেয়ে বেশি এবং বহু মূল শিল্পের তাহারা একচেটিয়া কারবারের লাইসেন্স পাইয়াছে।

অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা গিয়াছে তাহারা বহু লাইসেন্স দখল করিয়া রাখিয়াছে শুধু এই কারণে যে অপর কেহ যেন ঐ লাইসেন্স না পায়। বিড়লার সব সময় লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তও করিতে হয় না—সরকার যাচিয়া তাঁহার বাড়িতে লাইসেন্স পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। সরকারী ফাইল হইতে জি ডি বিড়লার লেখা একখানি পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পত্রে বিড়লাজী সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়া লিখিয়াছেন যে, রিহান্দে হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কারখানা খোলার প্রস্তাব ও অনুমতি সরকার তাঁহাকে সাধাসাধি করিয়া দিয়াছেন ইহাতে তিনি খুশি হইয়াছেন। দত্ত কমিটী বলিয়াছেন সরকারী ব্যাঙ্ক ও এল, আই, সি বিড়লাদের ঋণ দিতে যেন উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে। বিড়লাদের পেড-আপ পুঁজি অপেক্ষা লগ্নী-কৃত পুঁজি অনেক গুণ বেশি—কীভাবে তাহা সম্ভব হয়? ঐ বাড়তি টাকাটা লজ্জার মাথা খাইয়া সরকারই বছরের পর বছর জোগাইয়া গিয়াছেন। সরকারের মুখে, বিশেষত জহরলালের মুখে একদিকে ছিল সমাজতন্ত্রের বুলি, আর একদিকে আড়ালে ছিল বিড়লাজীর পৃষ্ঠপোষণা। সে ধারা আজও বদলায় নাই। বিড়লারা ইন্দিরাকে পর পর দুইবার প্রধান মন্ত্রী করিয়া দিয়াছে শুধুমাত্র পরোপকারের বাসনায় নিশ্চয়ই নয়।

বিড়লাদের শোষণকেন্দ্র তথা ব্যবসাকেন্দ্র প্রধানত পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। এ জন্য উহারা যেমন ভারত সরকারকে হাতে রাখিয়া থাকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও তেমনি পকেটে গুঁজিয়া রাখে। পশ্চিমবঙ্গের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়কে ইহারা প্রকাশ্যে কেনা গোলাম বলিয়া উল্লেখ করিত। বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা ইহারা দিতেছে না। রাইটার্স বিল্ডিংসে বি এম বিড়লা ঘন ঘন জ্যোতি বসু মহাশয়ের ঘরে যাইতেছেন—আড়ালে আবডালে আরও সাক্ষাৎ হইতেছে শুনিলে আমরা অবাক হইব না। জ্যোতি বসু বারবার বলিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিপতিরা নতুন পুঁজি বিনিয়োগ করিতেছে। কথাটা সত্য। বিড়লা ও মাড়োয়ারীরাই ঐ পুঁজি বিনিয়োগ করিতেছে—বিদেশ থেকে শিল্পপতিরা এখানে আসিতে

ব্যবসা উঠাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে তাহাদের ধনুস্থান বিড়লা ও তার সাকরেদেরা দখল করিতেছে। ইণ্ডিয়া কপার, ইণ্ডিয়া কেবল এমন কি খোদ স্যাক্সবি ফার্মার কাহাদের দখলে গিয়াছে বসু মহাশয় সে বিষয়ে আলোকপাত করিবেন কি? ঘেরাও ও ধর্মঘট বিড়লার কারখানায় হয় না, টেক্সম্যাকোয় ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াও তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ঘেরাও প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলার একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ও উদ্দেশ্য আছে দেখিতেছি। উহার উদ্দেশ্য অন্য শিল্পপতিদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করিয়া তাহাদের এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া ও বিড়লার মনোপলি কায়েম করিতে দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বিড়লার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত হইতে মুক্ত করা।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যও ঐ একই। টাটাদের ব্যাঙ্কে বিড়লার ইউকো ব্যাঙ্ক অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশি আমানত জমে। ইহাতে বিড়লার বড়ই আপত্তি। এখন কলমের এক খোঁচায় সব সমান হইয়া গেল, তারপর টাকা বাহির করার সময় তো বিড়লাই সিংহ ভাগ পাইবেন। বিড়লার ব্যাঙ্কে যে সম্পদ ছিল তার চেয়ে বহু গুণ বেশি টাকা তো বিড়লাজী রূপান্তরিত করিয়া(?) রাখিয়াছেন ও তাহা মালয়েশিয়া, আফ্রিকা ও যুগোশ্লাভিয়ায় কারখানা প্রতিষ্ঠার নামে বিদেশে পাচার হইয়া গিয়াছে। এখন ঐ ইউকো ব্যাঙ্ক—যাহা অন্তত আরও চারটি বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পিছনে পড়িয়া আছে—তাহা সরকারের হাতে গেলে বিড়লার ক্ষতি কী? উহার ভিতরটা তো আগেই ফোঁপরা করিয়া রাখা হইয়াছে।

টাটা বিড়লাদের এই ধূর্তামির ব্যাপারটা ভালোই জানেন। তাই ইন্দিরার উপর তিনি বেজায় চটিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকেও আর সহ্য করিবেন না জানাইয়াছেন। টাটা কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় জে আর ডি টাটা বলিয়াছেন যে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে এবার একটা চূড়ান্ত মোকাবিলা করিতেই হইবে। কেরলে ও বাংলায় বিড়লা কমিউনিস্টদের গলায় গলায় বন্ধু সাজিয়াছেন, টাটার রাগের আসল উৎসটা সেখানেই।

ইন্দিরা-বিড়লা কোম্পানীর নতুন অংশীদাররূপে জ্যোতি বসুদের যোগদান পাকাপাকি হইবে কিনা তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যেদিন দিল্লীতে জ্যোতি বসু চাঁদবদনী ইন্দিরাকে পাশে লইয়া টেলিভিশনের পর্দায় চন্দ্রাভিযানের ছবি দেখিয়াছেন, তার পরদিনই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জানাইয়া দিয়াছে যে ইন্দিরার প্রতি তাহাদের সমর্থনে ফাটল ধরিবে না। ইন্দিরার সঙ্গে কথাবার্তার ফল কী হইল, সাংবাদিকরা একথা জিজ্ঞাসা করায় জ্যোতিবাবু বলিয়াছেন, নারীর হৃদয়-রহস্য বড়ই দুর্জ্ঞের, তাই ফলাফল তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ইন্দিরা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ মারফৎ সমাজতন্ত্রের সেবা করিবেন, না বিড়লার শিল্প সাম্রাজ্যের ভিত আরও শক্ত করিবেন—জ্যোতি বসুকে তাঁর পার্টি কর্মীদের কথা জিজ্ঞাসা করার সময় কিন্তু আসিয়াছে। অন্তত যারা সত্যই সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবে বিশ্বাসী বর্তমানে ইহার চেয়ে জরুরী প্রশ্ন তাহাদের আর নাই।

—যুগবাণী হইতে সঙ্কলিত

রবীন্দ্র নজরুল একাসনে

বাংলা অব্দের প্রথম দুটি মাস তাহাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা ছাড়াও জাতীয় জীবনের ইতিহাসে আরও দুইটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হইয়া আছে। আমাদের পুরাণে, কাব্যে, সাহিত্যে, গাথায়, গানে নানাভাবে ইহারা উল্লেখিত আছে ঠিকই তথাপি আধুনিক কালের দুইটি বিশেষ ঘটনা জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই মাসটির গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব আরও বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মমাস হিসাবে আজ এই দুটি মাস সসম্মানে চিহ্নিত।

বৎসরের হিসাব নয়, মাস ও দিনের মধ্যে দুটি জন্মদিনের মধ্যে মাত্র সতেরটি দিনের ব্যবধান। একজনের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ আর একজনের জন্মদিন এগারই জ্যৈষ্ঠ।

এই ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি মন্থন করিলে আবার অসংখ্য স্বৈরাচারেরও সন্ধান মেলে। নানাক্ষেত্রে স্বৈরাচারের নিদর্শন [illegible] [illegible] [illegible], বর্তমানে এই দুটি জন্মদিন এই স্বৈরাচারের [illegible] মধ্যে পতিত হইয়াছে এবং এই বিশেষ দিন দুইটিকে [illegible] করিয়া স্বৈরাচার [illegible] সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ছায়া বিস্তার করিল। বর্তমানে একদল সাহিত্য ও সংস্কৃতির তথাকথিত অনুরাগীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে—যাঁহারা এই দুইজনের জন্মোৎসব একত্রে উদ্‌যাপন করিয়া এই কিম্ভূতকিমাকার কার্য করিয়া চলিতেছেন। এই অদ্ভুত কার্য স্বভাবতই কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন স্থিতধী ব্যক্তির সমর্থন ও সাধুবাদ লাভ করিতেছে না। এবং স্বভাবতই এই যুক্তিবিহীন কার্যকলাপ প্রকৃত গুণগ্রাহীসমাজে বিক্ষোভ সঞ্চারিত করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিরাট বলিয়া যে নজরুল মূল্যহীন, এ ধরণের ক্ষমার অযোগ্য মূঢ় উক্তি আমরা কখনই করি না। এবং যদিচ রবীন্দ্রনাথের হিমালয়সদৃশ বিরাট ব্যক্তিত্বের আবরণে অসংখ্য প্রতিভাকে ম্লান বোধ হইয়াছে তথাপি উভয় কি একই আসনের অধিকারী? রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলকে একই সঙ্গে একই পূজার বেদীতে বসানো যায় কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় যৌবনের যে জয়গান গাহিয়াছেন নজরুল যেন এক মূর্তিমান বিগ্রহ, বাঙলা দেশের যৌবনজলতরঙ্গের ভগীরথ নজরুল, নিপীড়িত লাঞ্ছিত শোষিত সম্প্রদায়ের জয়গানে তাঁহার লেখনী উন্মুখ, অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতীক বাঙলামায়ের দামাল ছেলে নজরুল—সত্য, শিব, সুন্দরের

কল্পনা হইতে শতসহস্র ভয়াল ভ্রূকুটি যাহাকে তিলমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই, অসাম্য, অসুন্দর, অবিচারের তিনি বিঘোষিত আতশত্রু, কণ্ঠে তাঁহার যৌবনলক্ষ্মীর বরমাল্য, ললাটে তাঁহার কালরুদ্রের জয়টিকা। তাই নজরুলের নিকট বাঙালীর ঋণও অপরিশোধনীয়। নজরুল বাঙলার একটি মহামূল্য সম্পদ, তথাপি রবীন্দ্রনাথ যেখানে গ্রহপতি সূর্য নজরুল সেখানে গ্রহভূষণ বুধ, যে সাম্রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ মহিমান্বিত সম্রাট নজরুল সে সাম্রাজ্যের দিকপাল সেনাপতি, রবীন্দ্রনাথ যেখানে দ্রোণাচার্য, নজরুল সেখানে অর্জুন, উভয়ের প্রতিভার এবং অবদানের তুলাদণ্ডে তুলনামূলক বিচার অবশ্য এই রচনার উদ্দেশ্য নয় কারণ দু'জনকে তুলাদণ্ডে বসানো একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় অপরাধেরই নামান্তর মাত্র। তথাপি, তাহা না করিয়া সেই অন্যায় হইতে দূরে থাকিয়াও উভয়ের সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্যটি অনায়াসে করা চলে।

শুধু আমাদের দেশে কেন, তামাম পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটিলেও এইরূপ কার্যের নজীর চোখের সামনে ধরা পড়িবে না। সেক্সপীয়ার আর কীটসের অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বায়রনের বা গোর্কি ও মায়াকোভস্কির একত্রে স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে এরূপ বিচিত্র সংবাদ এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোন প্রান্ত হইতেই আমাদের কানে ভাসিয়া আসে নাই। আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধির দিকেও যদি তাকানো যায় সেখানেও দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথ নজরুল অপেক্ষা বহু দূর আগাইয়া আছেন। রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর এমন কোন কোন অঞ্চল আছে যেখানে পরম সমাদরে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষিত কিন্তু নজরুলের নামগন্ধও সেখানে পৌঁছায় নাই।

যাঁহারা অর্থকরী দিকটির দিকে তাকাইয়া এই প্রচেষ্টার স্বপক্ষে রায় দিতেছেন যুক্তির খোপে কিন্তু সে রায়ও টেকে না। ইঁহারা এত মাতোয়ারা যে একবারও এটুকু ইঁহাদের ভাবিয়া দেখিবার সময় মিলিতেছে না যে এইভাবে নজরুলের ন্যায় প্রতিভাধর স্রষ্টা ও শিল্পীকে তাঁহারা শ্রদ্ধা জানানোর নামে ছোটই করিতেছেন। ইঁহারা নজরুলের অনুরাগী নন ইঁহারা তাঁহার শত্রু। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্বে বহু প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের যথাযথ বিকাশ ঘটে না সেক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের পাশে নজরুলকে বসানো কি জাতির প্রিয়তম নজরুলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধক?

আর একটি ধুয়া উঠিয়াছে। যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন পত্রে নজরুলকে তাঁহার পরবর্তী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন তাই তাঁহাদের এই একত্রে পূজা। এই যদি যুক্তি হয় সেখানেও তো তাঁহারা তর্কে জিতিতে পারিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মানিলেও নজরুলকে তাঁহার পাশে বসানো যায় না, তাঁহার পরে বসাইতে হয়।

আমাদের সংস্কৃতি-জগতের কর্ণধার যাঁহারা বা সংস্কৃতির প্রকৃত পূজারী যাঁহারা তাঁহাদের এই অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রতিহত করিতে সর্বপ্রকার শক্তিপ্রয়োগই আশু কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে আজ এ কথাটিও বারবার আমাদের মনে ঘা মারিতেছে যে নজরুল যদি এ সময় সুস্থ থাকিতেন তাহা হইলে সর্বাগ্রে নজরুলই হয়তো আগাইয়া আসিতেন এই বিচিত্র রীতির নিরোধকল্পে, কারণ এই রীতির প্রবর্তক যাঁহারা তাঁহারা কাণ্ডজ্ঞানহীন হইলেও নজরুল কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না।

বিদেশী স্মৃতি অপসারণ প্রসঙ্গে

দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বাধীনতা লাভের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের একাদিক্রমে কুড়ি বৎসরের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটাইয়া যেদিন এই রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইল সেদিন শ্রমদপ্তরের ভার পাইয়াছিলেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। নয় মাসব্যাপী যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে শ্রম-মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথাযোগ্য সমালোচনা এবং বিবরণ এই স্তম্ভে যথাসময়েই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসনকালে তাঁহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল পূর্ত দপ্তরের ভার। পূর্ত-মন্ত্রী হিসাবে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি কার্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

মহানগরী কলিকাতার হৃৎপিণ্ড হইতে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর মূর্তি প্রভৃতি অপসারণে এবং পথ ও ভবনগুলির নাম বিদেশী গোষ্ঠীর নামে এতদিন যাহা চিহ্নিত ছিল তাহাদের দেশীয় নামে চিহ্নিত করিয়া তিনি প্রকৃতই অভিনন্দনযোগ্য কাজ করিয়াছিলেন। পঞ্চম জর্জ হইতে সুরু করিয়া অন্যান্য রাজপুরুষদের মূর্তি অপসারিত করিয়া সেই স্থলে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু প্রমুখের মূর্তি বসানোর সঙ্কল্প সারা জাতির অভিনন্দনে বিভূষিত হইবে ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

এতদিন অর্থাৎ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এই একুশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরেও মহানগরী কলিকাতার বুকের উপর পঞ্চম জর্জ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ইংরেজদের বৃহদায়তন মূর্তি শোভা পাইতেছিল, তাহা ভাবিয়াই আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। স্বাধীন ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কংগ্রেস প্রতিনিধির থাকার সময়ে এইগুলি অপসারণের

এবং তৎস্থলে দেশের মহান সন্তানদের মূর্তি বসানোর চিন্তা কংগ্রেসী কর্তাদের মস্তিষ্কে তরঙ্গিত হয় নাই ইহা যেমনই লজ্জার তেমনই বেদনার। সেই বিচারে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সত্যই প্রশংসনীয়।

দূর অতীতে সেই মোগল বাদশাহ আকবর শাহের আমলে ইংরেজ প্রথম যেদিন ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে তাহার পর দেড়শত বৎসরের মাথায় দেখা গেল তামাম ভারত সাম্রাজ্যটা সেই বণিক সম্প্রদায়ের করতলেই চলিয়া গেল। বেনিয়া ইংরাজ পণ্য ব্যবসায়ী হইতে সাম্রাজ্য ব্যবসায়ী হইয়া পড়িল। তাহার পর রাজশাসনের নামে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে শোষণ চালাইয়াছে, ভারতের ধনসম্পদ যেভাবে জাহাজ বোঝাই করিয়া আপন দেশে লইয়া গিয়াছে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, চূড়ান্ত নির্যাতন করিয়া জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যেভাবে কণ্ঠরোধ করিয়াছে তাহার বিবরণ ইতিহাসে স্থায়ী হইয়া আছে। সে ক্ষেত্রে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আমরা ইংরেজদের মত তাহাদেরই মূর্তি সাজাইয়া রাখিলাম মহানগরীর হৃৎপিণ্ডের উপর। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নরনারীরা এই মধ্যবর্তী সময়ে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন ইহা দেখিয়া কলিকাতাবাসীর আত্মসম্মান এবং মর্যাদা সচেতনতা সম্বন্ধে যে কি ধারণা লইয়া কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়াছেন তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না।

কিন্তু, অনেক ভালর মধ্যে যেমন কিছু খারাপ থাকে, তেমনই অনেক খারাপের মধ্যেও কিছু ভালর সন্ধান মেলে। এইখানেই বৈচিত্র্য এবং এই বৈচিত্র্যই এককথায় পৃথিবীর ভূষণ। ইংরেজ রাজপুরুষদের মধ্যে বা বেসরকারী পুরুষদের মধ্যেও এমন অনেকের আগমন ভারতবর্ষে ঘটিয়াছিল যাঁহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়নই সম্ভবপর হইয়াছিল, যাঁহারা আপন কার্যে, অবদানে, সাধনায় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা ভারতের কতখানি শুভাকাঙ্ক্ষী, এবং কতখানি দরদী বন্ধু। ভারতের শিক্ষাবিস্তারে, নবজাগরণে এবং দুঃস্থ অনাথ, আতুরের অকাতরে সেবায় যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন ইতিহাসের অমলিন আলোয় ভারতবাসীর চিত্তে তাঁহারা উজ্জ্বল হইয়া আছেন। এই প্রসঙ্গে ল্যান্সডাউন, ক্যানিং, বেন্টিঙ্ক, হেয়ার প্রভৃতি এক একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম।

ভারতবর্ষ উদারতার দেশ। প্রেমের মহোচ্চারণের পবিত্র ভূমি। এ দেশের ধর্মে, দর্শনে, ধেয়ানে, মননে, চিন্তনে সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতার স্থান নাই। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ তাহার মৈত্রীবর্ষী বাহু দুটি সম্প্রসারিতই করিয়া রাখিয়াছে সর্বজনের উদ্দেশ্যে। দ্বিধাহীন গ্লানিমুক্ত চিত্তে বিশ্বাসীকে আলিঙ্গনে বন্দী করিয়াছে। সে ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞতার বন্যায় পাপ তাহাকে যেন স্পর্শ না করে। যাঁহারা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালবাসিয়াছেন, যাঁহারা আমাদের দেশবাসীকে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টায় নানা প্রকার বাধাবিপত্তির মধ্যেও হস্তক্ষেপ করিলেন, যাঁহারা এ দেশে প্রকৃত কল্যাণ সাধন ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিলেন তাহারা সকল সময়েই আমাদের নমস্য, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে আমরা চিরঋণী। অই ল্যান্সডাউন ও ক্যানিং-এর স্মৃতি মুছিয়া দেওয়া শুধু অনুচিতই নয়, রীতিমত অপরাধ, অকৃতজ্ঞতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

ক্যানিং ও ল্যান্সডাউন উভয়েই ছিলেন ভারতের বড়লাট। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বড়লাটের আসনে তিনি ছিলেন সমাসীন। বিদ্রোহী যথোচিত শাসনের ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের আশানুরূপ নৈপুণ্য (?) দেখাইয়া তিনি সরকারী মহলে আপন সুনামটুকু অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস করেন নাই। আশানুযায়ী যথেষ্ট কম, নামেমাত্র এবং অতীব উপেক্ষণীয় ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইংরেজ মহলে এই কারণে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তা হারাইয়া 'ক্লিমেন্সী ক্যানিং' নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই আচরণ তাঁহার ভারত প্রীতি এবং ভারতের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতির দ্বারা প্রভাবিত। ল্যান্সডাউনের কার্যকাল ভারতের এক ব্যাপক প্রগতি ও আশু তীক্ষ্ণ উন্নয়নের দৃষ্টান্তে সমাকীর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বড়লাট ও উপরাজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আমলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের অর্থ সংক্রান্ত আলোচনার অধিকার দেওয়া হইল এবং পশু ক্লেশ নিবারণ সংক্রান্ত আইনগুলি আরও মার্জিত করা হইল। পুলিশবাহিনী নূতন করিয়া সংগঠিত হইল—সর্বাপেক্ষা বড় কথা জাতীয় গ্রন্থাগার (তৎকালীন নাম—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) তাঁহারই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তাই, যাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা আমাদের এক পবিত্র কর্তব্যের অঙ্গীভূত বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত।

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতী ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল গত ২৯-এ আষাঢ় ৮৩ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা দীর্ঘদিন করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির আসনেও তিনি একদা সমাসীন ছিলেন। ভারততত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিদেশের পণ্ডিত সমাজেও যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃত কলেজ তাঁকে 'ভারততত্ত্ব শেখর' উপাধিতে সম্মানিত করেন। বহু তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-গ্রন্থের তিনি প্রণেতা।
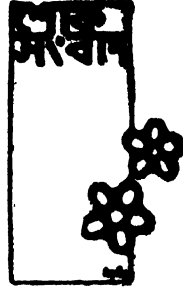
সুখলতা রাও

বর্ষীয়সী শিশু-সাহিত্য রচয়িত্রী সুখলতা রাও গত ২৪এ আষাঢ় ৮৩ বছর বয়সে লোকান্তরিতা হয়েছেন। কবিতা এবং চিত্রাঙ্কনেও তাঁর প্রসিদ্ধি পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাঁর কাব্যগ্রন্থের পরিচিতি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৃটিশ সরকার তাঁকে উড়িষ্যায় তাঁর সমাজসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক দেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর জাতীয় সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের দ্বারা সম্মান জানান। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি বাঙলা শিশু সাহিত্যের এক একটি সম্পদস্বরূপ।

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা

দিকপাল মনীষী ও আজীবন শিক্ষা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ উপাসক ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা গত ২৯-এ আষাঢ় ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃতে অনার্সসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মুসলিম বলে তাঁকে বেদ পড়তে না দেওয়ায় তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এম-এ পাশ করেন। আইন পরীক্ষাতেও তিনি সফলকাম হন। ১৯২৮ সালে প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ইনি ডক্টরেট লাভ করেন। এ ক্ষেত্রেও ভারতীয় মুসল-মানদের মধ্যে সর্বপ্রথম। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষার বিভাগীয় প্রধান, ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের ডীন, বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ প্রভৃতি সম্মানাত্মক আসনগুলি তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। বহু পত্রপত্রিকা এবং প্রাচীন লুপ্ত প্রায় গ্রন্থাদি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি হয়েছিল ও নানা ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সুধীসমাজের একটি বিরাট আসন শূন্য হল।

স্বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও সাহিত্যরথী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র স্বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি ৬২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী এবং জননেতা শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অগ্রজ।

পত্রিকা-উন্নয়ন প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

প্রিয় মাসিক বসুমতীর জন্য আমার অনুরোধ আছে। সেগুলো এইরকম—

১। প্রচ্ছদপটে যে মাসে যাঁর ছবি থাকে সেই মাসে সেই মহাপুরুষের সৃষ্টির প্রকাশ করবেন (অংশবিশেষ হলেও)।

২। প্রতি মাসে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস প্রকাশ করার নীতি সচল রাখবেন।

৩। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত (বাংলা ছাড়া) শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করবেন। (মাঝেমধ্যে হলেও)।

৪। ভারতীয় ভাষায় (বাংলা ছাড়া) প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প থেকে প্রতিমাসে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করবেন।

৫। প্রতি মাসে বিদেশী নাটকের (বাংলা) প্রকাশ বসুমতীতে চাই। (ক্রমশ হলেও)

৬। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিদেশী ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ (ক্রমশ হলেও) প্রকাশ করবেন।

৭। প্রতি মাসে বাংলা নাটক প্রকাশ করবেন। (ক্রমশ হলেও)

৮। প্রতি মাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ সম্পাদনা করবেন।

৯। আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার মত অন্যদিকে প্রতিযোগিতার প্রসার ঘটাবেন।

১০। মাসিক বসুমতীর নিজস্ব বার্ষিক সংখ্যা চাই।

১১। মুদ্রণ পারিপাট্যের উপর আরো বেশি নজর—বর্জাইস টাইপের কম ব্যবহার এবং ছাপার জন্য ভুল আরো কম যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

পরিশেষে, আমি একথাই বলবো যে, মাসিক বসুমতীতে রয়েছে জীবনের প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট আয়োজন তার ধর্ম, মহাপুরুষ জীবন-আলোচনায়, ছোট গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, ছোটদের আসরে, খেলাধুলায়,

চারজন-এ, কলা-কাকলিতে, নাট্য-লোকে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশে, সম্পাদকীয়তে এবং আরো আরো উদার বিস্তৃত তার মনোরম আঙ্গিনায় সকলের রয়েছে আমন্ত্রণ ও সাফল্য-মণ্ডিত সকলের পূর্ণ সহযোগিতায়।

—নগেন্দ্র সূত্রধর, সেওক, পি-ভি নং ৬৭, পোঃ—পাখানজোড়, জেলা—বস্তার, এম-পি।

অহল্যা রাত্রি প্রসঙ্গে

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর আমি একজন দীর্ঘদিনের পাঠিকা। মাসিক বসুমতীর মতো এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা বাংলা দেশে বিরল। আপনার সুযোগ্য নিখুঁত নির্দেশনার গুণে দিনে দিনে মাসিক বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি দেখে, ক্রমশই মাসিক বসুমতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছি। আর অন্যান্য পাঠক-পাঠিকারাও পড়ছেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাসিক বসুমতীর পাতায় যে সব স্বনামধন্য লেখক-লেখিকার উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে—যেমন প্রফুল্ল রায়ের 'বাতাসে প্রতিধ্বনি', 'সঞ্জয় উবাচ', 'তিন পুরুষ', 'গাছের পাতা নীল' পড়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে।

কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছে নমিতা চক্রবর্তীর 'অহল্যা রাত্রি' পড়ে। যার তুলনা হয় না। এর আগে তাঁর লেখা 'শাশ্বতী', 'অশান্তিনী' পড়ে আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। একজন নতুন লেখিকা হিসেবে যে কোন অভিজ্ঞ সুলেখিকাদের তুলনায় তাঁর স্থান—আমার মতে অনেক, অনেক উঁচুতে।

তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ লেখনী, অদ্ভুত এই সৃষ্টি যা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার অন্তরকে নাড়া দেবে, বিমুগ্ধ করবে—এতে কোনই সন্দেহ নেই।

আমার বিনীত অনুরোধ— মাসিক বসুমতীর প্রতি সংখ্যায় তাঁর লেখা যেন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। (যাঁর লেখা পেয়ে মাসিক বসুমতী আবার নতুন করে প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছে।) 'অহল্যা রাত্রির' পরিসমাপ্তির পরে তাঁর পরবর্তী লেখার জন্য চাতকীর মতো উন্মুখ হয়ে রইলাম।

—শ্রীমতী মেহেরুন্নেসা, মেহেরমঞ্জিল মিয়াবাজার, মেদিনীপুর।

পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর আমরা বহু-দিনের একনিষ্ঠ পাঠক, ধনবান ব্যক্তিরা যেমন একটি একটি করে পয়সা সঞ্চয় করেন, 'মাসিক বসুমতী'ও আমরা তেমনি করে বহুদিন ধরে আলমারীজাত করে আসছি। সেই হিসেবে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি সম্বন্ধেও কিছু বলার অধিকার আমাদের আছে (পত্রিকাটি অবশ্য আমাদের নিজেদের মনে করি বলেই)।

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত রচনা-গুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হচ্ছে, ধর্মকাহিনী, চারজন, (এটি মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকার কারণ বুঝলাম না) রাশিফল, নমিতা চক্রবর্তী, বারি দেবী, প্রফুল্ল রায়, আশাপূর্ণা দেবী ও ইন্দ্রসেন-এর লেখা আমাদের খুব ভাল লাগে। কেবল আপনারই কোন লেখা আমরা দেখতে পাই না। বলতে দ্বিধা নেই, ইন্দ্রসেন-এর ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী অনেকটা আপনারই অনুকরণে লেখা।

চলচ্চিত্র সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই এই বিভাগটিকে অতীব আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য। মাঝে মাঝে বিশ্ব-বিখ্যাত পরিচালকদের জীবনী দেখতে পাই। ওটি নিয়মিত দেওয়া যায় না কি? খেলাধূলা বিভাগটি পুনরায় চালু করার জন্যও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

এই পত্রিকাটি যে আজ বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা—একথা অনস্বীকার্য। দুর্বার গতিতে আজও সে তাই এগিয়ে চলেছে। এর জন্য সবটুকু কৃতিত্ব আপনার। 'মাসিক বসুমতী' দীর্ঘজীবী হোক। আপনি দীর্ঘায়ু হোন।

—সুমিতা গুহ ও স্মৃতি সরকার, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২।

বেচিতে চাই

অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকা মারফত আমার নিম্ন-লিখিত অনুরোধ আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য প্রচার করিলে খুবই উপকৃত ও বাধিত হইব।

আমার নিকট ১৩৩৬ হইতে ত্রিশ বৎসরের বাঁধান মাসিক বসুমতী বিক্রয়ের জন্য আছে। এককালীন ক্রয় করিলে অতি অল্প মূল্যেই বিক্রয় করিয়া দিব। যোগাযোগের ঠিকানা:

শ্রীমতী সুভাষিণী ভট্টাচার্য, এ।২৫৬, এইচ বি টাউন, পোঃ সোদপুর, ২৪ পরগণা, রোড নম্বর ৬।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● শ্রী এন, কে, সেনগুপ্ত, হিন্দ ল্যাম্প লিমিটেড, ডাক—সিকোহাবাদ ইউ, পি, ● The Commandant 90 B.N. B. S. F. P. O. Bishalgarh, Tripura. ● শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অবঃ, ডি. পি, মুখার্জী এস্টেট, বি, বি, ঘোষ রোড, ডাক ও জেলা---বর্ধমান ● শ্রীজয়-গোপাল মণ্ডল, গ্রাম ও ডাক---গোচাটী, জেলা—মেদিনীপুর ● শ্রীরবিরঞ্জন ভৌমিক, মেডিক্যাল ওয়ার্ড, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, ডাক---বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া ● প্রধান শিক্ষক, মোধুরা উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক---মোধুরা (নলহাটী হয়ে) বীরভূম ● শ্রীনীলমণি বিশ্বাস, ডাক---চঞ্চল, মালদা।

মাসিক বসুমতীর দেড় বছরের চাঁদা ২৪ টাকা পাঠালাম। শ্রাবণ সংখ্যা থেকে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। এস সি সাহু, ধানবাদ।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৪২ টাকা পাঠালাম। বর্তমান বছরের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে চৈত্র ১৩৭৬ ও ৭৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত সডাক চাঁদা পাঠালাম। পত্রিকা যথারীতি পাঠাবেন। সচিব, বিচিত্রা লাইব্রেরী, বিন্দুপাড়া, ডাক---গোয়াল-খোর, এস পি।

I am remitting here with the sum of Rs.—18—as my annual subscription of Masik Basumati Asharh 1376 to Jyaista 1377 B. S. Please send the magazine regularly. Sri B. Chakrabarty. P. O. Salanpur, Dist. Burdwan.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাদা বাবদ ১৮ টাকা পাঠালাম। অনুগ্রহপূর্বক মাসিক বসুমতী যথারীতি পাঠাবেন। শ্রীমতী উমা রায়, অবঃ--- ডঃ পি সি রায়, ২৫০-ডি, বাগাপার্ক, জয়পুর-৬।

মাসিক বসুমতীর এ বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৮ টাকা পাঠালাম। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠিয়ে বাধিত করবেন। দীনেশচন্দ্র রক্ষিত, নবাবগঞ্জ, পণিয়া।

মাসিক বসুমতীর ১ বছরের চাঁদা ১৮ টাকা পাঠালাম। মাসিক বসুমতীর ১৩৭৬ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত পত্রিকা নিয়মিত পাঠিয়ে বাধিত করবেন। শ্রীমতী কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, 'মৃণালভবন' পাণ্ডাপাড়া রোড, জল-পাইগুড়ি।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

॥ ৪৮ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৭৬ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা ॥

ভোগ

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন—এই পঞ্চপ্রকারের বিষয়-ভোগকে সাধারণত আমরা ভোগ বলে থাকি। এগুলো স্থূল ভোগ। এ ছাড়া কতকগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতিও আছে যা ভোগের পর্যায়ে পড়ে—যেমন অন্তরিন্দ্রিয়ের অনুভূতি কিম্বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। অন্তরিন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেমন সুখ দুঃখাদি ; অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যেমন ভক্তি রসাস্বাদন, ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ।

সাধারণত অধিকাংশ লোকেরই ভোগে অনুরক্তি থাকে ; ভোগে বিরক্তি খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু ভোগের উপায়ে বিরক্তি আবার অনেকের আছে ; তাই ভোগে অনুরক্তি সত্ত্বেও তাদের ভোগ লাভ হয়না। ভোগ কর্মসাপেক্ষ—পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস, মস্তিষ্ক চালনা ইত্যাদি ভোগ লাভের উপায়। এগুলি রজোগুণ। আবার জাড্য, অনুদ্যম, ভয়, বুদ্ধির জড়তা ইত্যাদি তমোগুণজাত বৃত্তিগুলি ভোগ লাভের অন্তরায়।

স্থূল বিষয় ভোগের জন্য যেমন রজোগুণের দরকার, সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্য তেমনি সত্ত্বগুণের প্রয়োজন। সত্ত্বগুণ-জাত বৈরাগ্য থেকেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সঞ্জাত হয়। বৈরাগ্য মানে বিষয় ভোগে আন্তরিক বিরক্তি। মিথ্যাচারীর মত lip-deep বিরক্তি নয়—'grapes are sour'-এর মত বিরক্তি নয়।

মানুষ আনন্দ খোঁজে :—ভাবে, আনন্দ সুখ ভোগেই আছে, আর সুখ একমাত্র বিষয় ভোগেই পাওয়া যায়। তাই সে অতি আগ্রহে ভোগের দিকে এগিয়ে যায়। ভোগ করতে করতে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে—জরার অধিকার সুরু হয়েছে। তখন মৃত্যুভয়ে বলির পশুর মত জড়সড় হয়। তা ছাড়া আছে—শোক, বিচ্ছেদ, বিত্তনাশ, অপমান, আবার আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। তবে সুখ কোথায়? আনন্দ কোথায়?—ক'জনার চোখ আছে তা দেখবার?

বহু ভুগে, বহু ঠকে, বহু নারী-সুরা-অর্থ-বিত্ত ভোগ করে মানুষ ক্রমশ বিষয় ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয় ; ভোগ হয়ে গেলেই নিবৃত্তি আসে। ভগবান তাই শত শত জন্মের মধ্য দিয়ে জীবকে ভোগ আস্বাদ করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। জন্ম-জন্মান্তরের চিতার আগুনে পুড়ে সে ক্রমশ নির্মল, শুদ্ধ, জ্ঞানী হয়ে উঠে। বহু জন্ম ধরে এ সব চলে। তখন জন্মজন্মান্তরীণ স্মৃতি কোন নূতন জন্মে তাকে বলে—'এ থেকে নিবৃত্ত হও ; এ পথ তো দেখলে শত শত জন্ম ধরে ; আবার সেই একই ফাঁদে যদি পড়, তবে আগের মতই কষ্ট পাবে। ভোগ করে করে আত্মাও তখন অনেকটা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছে—তাই সে তখন ভোগ ছেড়ে ত্যাগের পথ খোঁজে। ত্যাগের পথে গিয়ে দেখতে পায় দুঃখের মধ্যেই আনন্দ—বিষয়-সুখে নয়। দুঃখ ভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে উঠে, বীতস্পৃহ হয়, বীত-মন্যু হয়, বীতশোক হয়—ভগবানের দিকে মন যায়। তখন ভাব যদি একজন্মেই ভূমানন্দ লাভ সম্ভব হয়, তবে আবার শত শত জন্ম ধরে আবর্তনের চক্রে পড়ে ঘোরাঘুরি করি কেন? তাই কর্মবন্ধন কাটাবার প্রয়াস জীবকে করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয় সুখ—এই সব ভোগ ; কামিনীকাঞ্চন—ভোগ। এ সবই অনিত্য—জ্ঞান হলেই ত্যাগ হয়ে যায়।

"এক মতে ভোগ শান্তি না হলে চৈতন্য হয় না। কিন্তু ভোগই বা কি করবে? কামিনীকাঞ্চনের সুখ—এই আছে, এই নাই—ক্ষণিক! কি আছে তার ভিতর? আমড়া, আঁটি আর চামড়া ; খেলে অম্লশূল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে, আর নাই!

"তা ছাড়া, ভোগ রাখলেই ভয়—পতন হতে পারে। তাই সন্ন্যাসীর ভোগ রাখতে নাই—নইলে থুথু ফেলে, আবার থুথু চেটে নেওয়া হয়। লোকশিক্ষার জন্য সন্ন্যাসীর ভোগ ছাড়তে হয়। সন্ন্যাসীর দেহধারণ লোকশিক্ষার জন্য।
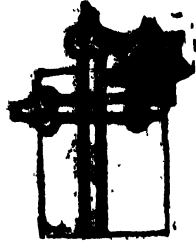
"তবে যাদের ভোগ একটু বাকী আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। তাই নিতাইয়ের ব্যবস্থা ছিল,—

"মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বোল হরিবোল"

ভোগবাসনা

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ ভোগবাসনা থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ভোগবাসনা গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

"ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, 'মা-যাব'। তখন আর সন্দেশ চায় না, খেলা চায় না, যাকে চেনে না, জানে না, সে-ও যদি বলে, 'আয়, মার কাছে নিয়ে যাই'—তারই সংগে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায়, তারই সংগে যাবে।

"সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।

"কামনা থাকতে—ভোগ-লালসা থাকতে মুক্তি নাই। ভোগ-লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অমনি করে নিতাম। খাওয়া-পরা, অন্য অন্য বাসনা, সব একবার পূরণ করে নেবে।

"পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হয়েছে—এরূপ হলেই যোগভ্রষ্ট হয়, সংসারে এসে পড়ে; তারপর, সে ভোগ হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে—আবার সেই যোগের অবস্থা হবে।"

ভোগান্তে চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কামিনীকাঞ্চন ভোগ, টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম, দেহ-সুখ—এই সব ভোগ যদি না হয়ে থাকে তবে ভোগান্ত হয় নাই। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের সংসার ত্যাগ নয়। ভোগান্ত না হলে সকলের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না। ভোগ করে যখন ভোগের ক্ষোভ মিটে যায়, তখন ভোগান্ত হয়।

"এক মতে ভোগশান্তি না হলে চৈতন্য হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্মক্ষয় হয়। তাঁর কৃপা হলে সব হয়। তাই তাঁর কৃপার জন্য প্রার্থনা কর।"

ভোগাসক্তি বনাম শুদ্ধাভক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভোগাসক্তি আর শুদ্ধাভক্তি—এ দুটি বিপরীত ভাব। ভোগাসক্তি বাইরের বিষয়ের উপর—স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, ধন, বিত্ত, মানসম্ভ্রম—এ সবের উপর অনুরাগ—নিচের দিকে ঢালু রাস্তা; শুদ্ধাভক্তির বাইরের বিষয়ের সংগে কোন সম্বন্ধ নাই—বিশুদ্ধ অন্তরের জিনিস—চড়াই পথ।

"ভোগাসক্তি থাকতে শুদ্ধাভক্তি হতে পারে না—শুদ্ধাভক্তি হলে ভোগাসক্তি থাকতে পারে না। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে ভোগাসক্তি চলে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। সর্বদা ভোগাসক্তি ত্যাগের অভ্যাস আর প্রার্থনা—দুই-ই চাই।"

ভোগের আশা ও কর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম।

"একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্কে বসেছিল। জাহাজ গংগার ভিতর ছিল, ক্রমে সমুদ্রে এসে পড়ল। যখন পাখীটার চটকা ভাঙলো, সে দেখলে চতুর্দিকে কূল-কিনারা নাই। তখন ডাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়েও যখন কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন ফিরে এসে আবার মাস্তুলে বসলো।

"অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে অন্যদিকে গিয়েও কিছুই দেখতে পেলে না—চারিদিকে অকূল সমুদ্র। আবার পরিশ্রান্ত হয়ে জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসলো। খানিকক্ষণ জিরিয়ে আবার উড়ে একবার দক্ষিণ, একবার পশ্চিম—এভাবে কোনদিকেই যখন কূল-কিনারা পেলে না—তখন আবার ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসলো—আর উড়লো না: নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলো। তখন তার মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইলো না; আর কোন চেষ্টাও করলো না।

"সংসারী লোকেরা সুখের জন্য চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যখন সে আশায় হতাশ হয়—পরিশ্রান্ত হয়, সকল চেষ্টা, সকল কর্ম তখন ছেড়ে দেয়; তখনই নিবৃত্তি আসে।"

মণিপুর চক্র

মণিপুর চক্র মানব দেহস্থ দশচক্রের তৃতীয় চক্র। ইহা নাভিমণ্ডলের সমসূত্রে মেরুদণ্ড মধ্যস্থ মজ্জানালীর অভ্যন্তরে সুষুম্না মার্গে অবস্থিত। এই চক্রের পদ্মটি দীপশিখান্তসম নীলবর্ণের দশদলযুক্ত; তাতে বিদ্যুৎবর্ণ 'ড' থেকে 'ফ' পর্যন্ত
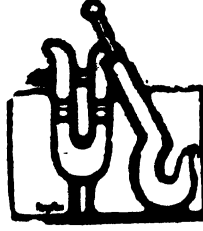
বর্ণমালার দশটি অক্ষর শোভিত। পদ্মের কর্ণিকায় অগ্নিবর্ণ স্বস্তিকাখ্য ত্রিকোণ যন্ত্র বিরাজিত। তার মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ রং বীজ, যার মধ্য থেকে সূর্যকিরণের ন্যায় তেজঃপ্রভা বেরুচ্ছে।

রুদ্র এই পদ্মের দেবতা। তিনি রং বীজাত্মক মেষবাহন অগ্নিদেবতার ক্রোড়ে চতুর্ভুজ বৃদ্ধ 'রুদ্র মহাকাল'রূপে বসে আছেন। তাঁর সূর্যরশ্মিপ্রভ বর্ণ বিভূতিলিপ্ত হওয়ায় শুভ্রাভ। তিনি ত্রিনেত্র। তাঁর নিম্নস্থ বাম বা প্রতিকূল হস্ত 'অভয় মুদ্রা' এবং দক্ষিণ বা অনুকূল হস্ত 'বরমুদ্রাযুক্ত। উপরের দুই হস্তে শান্তিময় পদ্ম ও শাসনরূপ ত্রিশূল। ইনিই তৃতীয় শিব বা রুদ্রশিব। ত্রিশূল, কর্তরী, শঙ্খ ও পদ্মধৃতা চতুর্ভুজা শ্যামবর্ণা লাকিনী শক্তি ইঁহার পার্শ্বে অবস্থিতা; ইনি রুদ্রাণী-রূপা পীতবসনা ও আভরণযুক্তা।

এই মণিপুর কেন্দ্রে ব্রহ্মাগ্নির বাহ্য বিকাশ পূর্ণ হয়ে ক্রমে সূক্ষ্মপথে সাধনের ফলে এই চক্রের সিদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুট হয় এবং বিদ্যাতত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশ হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, নাভিচক্রে চিত্ত সংযত করে দেহতত্ত্ব জানতে পারা যায়।

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই তিন শিবই ব্রহ্মগ্রন্থির অন্তর্গত 'ত্রিশিব'; অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপে ব্রহ্মারই বিরাট ত্রিধা বিকাশ। তাই, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরে ব্রহ্মার অধিকার মধ্যেও সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা, মহালক্ষ্মীসহ মহাবিষ্ণু এবং ভদ্রকালীসহ মহাকালের চিন্তা করতে হয়। এভাবে সকল তত্ত্বের এবং সকল চিন্তার মধ্যেই 'একেই তিন এবং তিনেই এক' এইরূপ ক্রমাগত চিন্তা দ্বারা তিনের একাকার সাধন করতে হয়, যার ফলে লৌকিক ভেদজ্ঞানের (এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতারও) গ্রন্থিভেদ হয়ে যায়।

মত—পথ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মত—পথ। নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন—সকল ধর্মই সত্য। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আশ্রয় করে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। নদী সব নানা দিক থেকে নানাদিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদীই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক। ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। সিঁড়ি দিয়ে, মই দিয়ে, আবার শুধু একটা বাঁশ কি দড়ি দিয়েও উঠা যায়। তবে উঠবার সময় একটা ধরে উঠতে হয়—দু-তিন রকম সিঁড়িতে পা দিলে উঠা যায় না। ছাদে উঠবার পর সব রকম সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করা যায়।

"তাই প্রথমে একটা ধর্ম আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর লাভ হলে সব ধর্মপথ দিয়ে আনাগোনা করতে পারে। যে যে-নামেই ডাকুক, সব ধর্মের লোকেরা একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ GOD, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু। যেমন জলকে কেউ বলে Water, কেউ পানি, কেউ জল, কেউ বা Aqua.

"কিন্তু সবাই মনে করে, আমার মতই ঠিক, আমার পথই ঠিক; আমার ঘড়িই ঠিক চলছে। আর এই নিয়েই ঝগড়া।

"ভুল কোন্ ধর্মে নাই? আর যদিই বা ভুল থাকে, যদি আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তা হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ঈশ্বর কি বস্তু, শুধু আমি বুঝেছি। আর ওরা বুঝতে পারে নি; আমিই তাঁকে ঠিক ডাকছি, ওরা ঠিক ডাকতে পারে নি—অতএব ঈশ্বর আমাকেই কৃপা করবেন, ওদের করবেন না—এরকম যারা মনে করে, তারা জানে না যে ঈশ্বর সকলেরই বাপ-মা, আন্তরিক হলে তিনি সকলকেই দয়া করেন।

"যেমন এক বাপের অনেকগুলি ছেলে—বড়, ছোট—কেউ কথা কইতে পারে, কেউ পারে না—কেউ বলে 'বাবা', কেউ 'বা', কেউ বা শুধু 'পা'। যারা বাবা বলতে পারলো না, তাদের উপর বাপ রাগ করেন না কি? না বাপ সকলকে সমান ভালবাসেন? বরং যার বাপের উপর টান বেশি তাকেই বেশি কাছে টেনে নেন।

"আন্তরিক ভক্তি করে যে কোন একটা মত আশ্রয় করে এগিয়ে চললে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। কোন মতে যদি কিছু ভুল থাকে, আন্তরিক হলে সে ভুল তিনি শুধরে দেন। তিনি চান আন্তরিকতা —তিনি চান, শরণাগতি!"

মতুয়ার বুদ্ধি (*Dogmatism*)

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা, শাক্তরা, বেদান্তবাদীরা, ব্রহ্মজ্ঞানীরা সবাই পাবে, আবার মুসলমান, খৃস্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে।

"অনেকে আছে ঝগড়া করে বসে। তাদের কেউ বলে—'আমাদের কৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না।' আবার কেউ বলে 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না।' কেউ বা 'খৃস্টান ধর্ম ছাড়া অন্য কিছুতে হবে না—পুতুল পূজাতে হবে না'—'ঈশ্বর নিরাকার'—এ সব বলে একে অন্যে পরস্পর ঝগড়া করে।

"এ সব বুদ্ধির নাম 'মতুয়ার বুদ্ধি'—অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এটিই যত অনিষ্টের মূল। এ থেকেই ধর্মের নামে যত মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি।

"এগুলো কানাদের হাতী দেখার মত। কতকগুলো কানাকে হাতীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতীর গা ছুঁয়ে দেখতে বলা হল। সবাই দু'হাতে হাতীটাকে স্পর্শ করলে। একজন বললে—'হাতী একটা থামের মত—সে পা স্পর্শ করেছিল। একজন বললে, 'না, কুলোর মত।'—সে একটা কান স্পর্শ করেছিল। এইভাবে যারা পেট, কি শুঁড় স্পর্শ করেছিল, তারা অন্য রকম বলতে লাগলো। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু বুঝেছে, সে মনে করছে ঈশ্বর তাই; অন্য রকম নয়।

"তোমরা বহুরূপীর গল্পও শুনেছ। জেনে রাখ, যত ধর্মে যত রকম বলা আছে, ঈশ্বর সব রকমই। যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয় [illegible] ঠিক বলা যায়।

তাকে সেই জানে বহুরূপীর সব রকম রঙই হয়, আবার কোনো সময় কোনো রঙই নাই। তেমনি যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার, আবার তিনি নিরাকার। তিনি আরো কত কি হতে পারেন বলা যায় না।

"তাই আমি বলি, সকলেই তাঁকে ডাকছে—দ্বেষা-দ্বেষীর দরকার নাই। যার যা বিশ্বাস সে ঈশ্বরকে সেভাবেই চিন্তা করুক। 'মতুয়ার বুদ্ধি' (Dogmatism) করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো—'আমার বিশ্বাস তিনি এই—এ ছাড়া আর কত কি তিনি হতে পারেন তিনিই জানেন: আমি জানি না—বুঝতেও পারি না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনো দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়—নচেৎ নয়।'

"সকলে এক বস্তুকেই চাইছে। তবে যার পেটে যা সয় সেরূপে ব্যবস্থা করেছেন। বাড়িতে বড় মাছ এলে মা সকলে পোলাউ কালিয়া করে দেন না—সকলের পেট সমান নয়, কারু জন্য শুধু হলুদ আদা দিয়ে ঝোল করে দেন। কি মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

"আমার ভাব কি জান? আমি সব রকম খেতে ভালবাসি। আমি মাছভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি চচ্চড়ি এসবেও আছি, আবার পোলাউ কালিয়াতে, মুড়িঘণ্টে আছি।

"কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানাধর্ম করেছেন অধিকারভেদে, রুচিভেদে। সব মতই তাঁর কাছে যাবার এ একটা ভিন্ন ভিন্ন পথ। মত ঈশ্বর নয়; মত—পথ। এক পথ ঠিক জানলে, অন্যটাও জানা যায়—তিনিই জানি দেন।"

প্রচ্ছদপরিচিতি

ফ্রেডারিক হেগেল

মাসিক বসুমতীর বিগত সংখ্যার প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছে দর্শনাচার্য ইমানুয়েল কান্টের প্রতিকৃতি। বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে মুদ্রিত হ'ল তাঁরই মহান ও সার্থক উত্তরসূরী পৃথিবীর দর্শনমার্গের আর এক মহাদ্যুতিমান জ্যোতিষ্ক জর্জ উইলহেলম ফ্রেডারিক হেগেলের আলেখ্য।

দক্ষিণ জার্মানীর অন্তর্গত স্টুটগার্টে ১৭৭০ সালে হেগেলের জন্ম। স্কুলের পড়া সমাপ্ত হওয়ার পর টিউবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন বাবা-মার ইচ্ছানুসারে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠ নিতে। যে পরিমাণ অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিকতা অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁর কাছে আশা করেছিলেন সে আশা হেগেল সফল করে তুলতে পারেন নি। পরীক্ষায় পাশ তিনি করলেন বটে তবে আশানুরূপভাবে নয়, কোনরকমে। পরীক্ষান্তে যাজকবৃত্তি অবলম্বন না করে গৃহশিক্ষকের কাজ নিলেন, ফলে পড়াশুনো করার মত যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে এল। এই সময়ে তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটল, পরবর্তীকালে যে দর্শনজগতে তিনি দিকপাল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যে দর্শনলোক তাঁর বিপুল অবদানে ভরে উঠল সেই দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন এই সময় থেকে সুরু হ'ল। কান্টের রচনা হেগেলকে ধ্রুবতারার মত পথনির্দেশ দিতে লাগল। অভিজ্ঞ নায়কের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে নবীন যাত্রীর যাত্রা সুরু হ'ল। ১৭৯১ সালে পিতৃবিয়োগের পর তিনি পুরোপুরিভাবে নিজেকে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে নিজেকে সঁপে দিলেন।

বাড়ীতে এ বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান অর্জন করে ১৮০১ সালে জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগ দিলেন বিনা বেতনে বক্তৃতাদানের কাজ নিয়ে। গোড়ায় গোড়ায় তাঁর ক্লাসগুলি একরকম ফাঁকাই পড়ে থাকত ক্রমে তাঁর বক্তৃতার শ্রোতৃসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৮০৫ সালে তিনি নিযুক্ত হ'লেন বিশেষ অধ্যাপক। পরে মহাকবি গ্যেটের প্রচেষ্টায় তাঁর জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের মাসিক বেতন নির্দিষ্ট হ'ল। ১৮০৮ সালে ন্যুরেমবার্গের একটি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ দেন পরে ঐ বিদ্যালয়ের রেক্টরের আসনে উন্নীত হ'ন। ১৮১৬ সালে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক অতীব মূল্যবান গ্রন্থগুলির স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে বরণ করা হ'ল। প্রকৃত দার্শনিক বলতে যা নির্দেশিত হয় তাঁদের মধ্যে হেগেলই প্রথম জন যিনি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এখান থেকে দু'বছর পরে হেগেল আসেন বার্লিনে।

১৮৩১ সালে কলেরায় ৬১ বছর বয়সে তাঁর প্রাণান্ত হয়।

তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'দ্য ফেনোমেনোলজি অফ দ স্পিরিট,' 'অবজেক্টিভ লজিক' (১৮১২), 'সাবজেক্টিভ লজিক (১৮১৬), 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলসফিক্যাল সায়েন্সেস' (১৮১৭), 'ফিলসফি অফ রাইট' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যামবার্গের একটি স্থানীয় সংবাদপত্রও তিনি প্রথমজীবনে কিছুকাল সম্পাদনা করেন।

গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা শুনতে দিগ্বিদিক থেকে মানুষ ছুটে আসত—সেই বক্তৃতায় ছিল এক অমোঘ আকর্ষণ। হেগেলের রচনাবলীর আলোকে বলা চলে—তিনিই বোধহয় সেকালের একমাত্র দার্শনিক যাঁর দর্শনতত্ত্ব—সমকালীন বিশ্ব-রাজনীতির গতি-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে রূপ নিয়েছে। আজ পৃথিবীতে যে-সকল রাজনৈতিক মতবাদ প্রসার লাভ করেছে এদের অনেকেরই জনক হিসাবে তাঁকে অভিহিত করা যেতে পারে।

ভারতীয় ভাবসংহতি ও ভাষাসমস্যা

প্রবোধচন্দ্র সেন
(শান্তিনিকেতন)

ভাবসংহতি ও ভাষাসমস্যাই এখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা। জ্বলন্তই বটে। এই সমস্যা নিয়ে উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে থেকে থেকেই যে আগুন জ্বলে উঠছে তাতে শুধু সংহতি ও সংস্কৃতি নয়, সমস্ত দেশটাই পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে। অথচ মজা এই যে, দেশকে ছারখার করে দেওয়া এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের পরিকল্পিত লক্ষ্য হলেও অধিকাংশ লোকেরই তা কাম্য নয়। না হলেও তারা যে অগ্নিলীলায় মেতে উঠেছে তাতে শুধু ঘর নয়, মুখও যে পুড়বে সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। আগুন নেবাবার দায় যাঁদের হাতে তাঁদের মুখে শুধু তত্ত্বকথার বুলি ও উপদেশ, রোগ নির্ণয়ের ও প্রতিকারের জ্ঞানবুদ্ধি, ক্ষমতা বা ইচ্ছাই তাঁদের নেই।

কিন্তু আমি নৈরাশ্যবাদী নই। সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের বুদ্ধি, ক্ষমতা বা ইচ্ছা আজ না থাকলেও একদিন তা হবেই। দেখে শুনে বা জেনে না শিখলেও একদিন না একদিন ঠেকে শিখতেই হবে। ভারতবর্ষ ভেঙে পড়বে না, সব সমস্যার সমাধানের পথ একদিন দেখা দেবেই, সাংস্কৃতিক সংহতির সত্যরূপ একদিন ভাস্বর মহিমায় প্রকাশ পাবেই। কেন না ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিধাতার অমোঘ অঙ্গুলিসঙ্কেত যে সেদিকেই পথনির্দেশ করছে। তাই কবির এই বাণী আমাদের নিয়ত স্মরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে—

> নিশিদিন ভরসা রাখিস
> ওরে মন হবেই হবে,
> যদি পণ করে থাকিস
> সে পণ তোমার রবেই রবে।

তবে দেশে চারদিকে এই যে প্রায়-নিরন্তর দহনক্রিয়া চলছে, হয়তো তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। সব খাদ পুড়িয়ে নিঃশেষ না করলে খাঁটি সোনা মেলে না। দুঃখের দাবদাহ ছাড়া মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল রূপও প্রকাশ পায় না। যেমন ব্যক্তির পক্ষে, তেমনি জাতির পক্ষেও। ইতিহাস-বিধাতার কাছে আমাদের সমবেত প্রার্থনা ধ্বনিত হোক—

> আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে,
> এ জীবন ধন্য কর দহন-দানে।

আজ দেশব্যাপী ইতিহাসবেদীর সম্মুখে যে বিপুল আত্মদহনের যজ্ঞানল সহস্র শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠেছে তা দেখে ভীত হলে চলবে না। সেই অগ্নিশিখার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হবে—

> সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
> দুখের রক্তশিখা—
> হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে,
> আছে সে ভাগ্যে লিখা।

কবির এই বাণী নৈরাশ্যের বাণী নয়, আশারই বাণী। কেন না এই হোমানল ইতিহাসদেবতার স্বহস্ত-প্রজ্বলিত ঐক্যযজ্ঞের হোমানল। তাই তো কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এই বাণী—

> তপস্যাবলে একের অনলে
> বহুরে আহুতি দিয়া,
> বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
> একটি বিরাট্ হিয়া।

সমগ্র দেশব্যাপী 'একটি বিরাট হিয়া'-কে জাগিয়ে তুলতে হলে ইতিহাসনির্দিষ্ট উদাত্ত ঐক্যমন্ত্রকে অন্তরে গ্রহণ করে সমস্ত বহুত্ববোধকে, সমস্ত ভেদবুদ্ধিকে ঐক্য সাধনার হোমানলে আহুতি দিতে হবে। কিন্তু স্বার্থ-প্রণোদিত ভেদবুদ্ধিকে বিসর্জন দেওয়ায় দুঃখ আছে। কবি বলেন, ঐক্যের আহ্বানে স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধি বিসর্জনের দুঃখকে স্বীকার করতেই হবে, নতুবা লজ্জা আমাদের ঘুচবে না, ভয় আমাদের ছাড়বে না, আর অপমান ঘটবে পদে পদেই। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি কবির এই বাণীকে—

> এ দুখ বহন কর মোর মন,
> শোন রে একের ডাক,—
> যত লাজভয় কর কর জয়,
> অপমান দূরে যাক।

আর ভূমিকা না বাড়িয়ে আসল কথার অবতারণা করা যাক। প্রথমে ভাবসংহতির কথা।

●

জাতীয় ভাবসংহতি চাই, দেশের ঐক্য রক্ষা করতে হবে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষের আদর্শ, এসব বুলি জপমন্ত্রের মতো নিয়ত আওড়ালেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বরং পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে অমোঘ মন্ত্রশক্তিও তার ক্ষমতা হারায়, অতি ব্যবহারে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরেরও ধার ক্ষয়ে যায়।

'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী',—এই নীতি কোনো ক্ষেত্রেই স্বীকার্য নয়, এ ক্ষেত্রেও নয়। তাই শুধু আবৃত্তি না করে কাজে নামা চাই। কিন্তু তারও আগে চাই এই মন্ত্রগুলির অর্থবোধ। অর্থবোধ ছাড়া কর্ম সম্ভব নয়, আর ওরকম অন্ধ কর্মারম্ভের দ্বারা অনর্থ ঘটার আশঙ্কাই থাকে বেশি। বর্তমানে দেশে যেসব অনর্থ ঘটছে তার মূলে আছে অর্থবোধহীন অনুভূতিহীন অন্ধ কর্মপ্রচেষ্টা। জ্ঞানহীন কর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। এমন কি, তাতে স্বার্থসিদ্ধিও হয় না, হয় শুধু স্বার্থের সংঘাত। যথার্থ জ্ঞান থেকে আসে আদর্শের প্রেরণা, পরমার্থ লাভের জন্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থত্যাগের প্রেরণা। পরমার্থ মানে সেই জিনিস যাতে সকলের

স্বার্থই এককালে সিদ্ধ হয়, যাতে একের সিদ্ধিতে অন্যেরও সিদ্ধিলাভ হয়। কিভাবে তা সম্ভব তাই জানতে হবে। দেশে আজ সে জ্ঞানেরই অভাব।

ভাবসংহতি কি বস্তু, তাই জানতে হবে সকলের আগে। বলা বাহুল্য, সমগ্র জাতির সমবেত মানসিক অনুভূতি-সমূহের সমষ্টিগত বিশিষ্টতার মধ্যেই প্রকাশ পায় জাতীয় ভাবসংহতি বা ইমোশনাল ইন্টিগ্রেশন। এই সমষ্টিবদ্ধ অনুভূতির আশ্রয়স্থল হল দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতিসাধনা। একে একে তার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

ঋকসংহিতার যুগেই দেখি তৎকালীন আর্যভূমির ভৌগোলিকরূপ সপ্তসিন্ধুর অধিবাসীদের চিত্তে একটি সুকুমার মমতাবোধকে জাগিয়ে তুলেছিল। তারপরে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এবং কালিদাস প্রমুখ কবিদের রচনায় ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ-বর্ণনায় কখনও বিরাম ঘটেনি। এখানে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক কালের কবিচিত্তেও দেশ-মাতৃকার ভৌগোলিক রূপের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা কম গভীর নয়। আমাদের পূজার মন্ত্রে যেমন দেবদেবীর রূপের বর্ণনার প্রাধান্য দেখা যায়, আধুনিক-কালে দেশমাতৃকার বন্দনামন্ত্রেও তেমনি দেশের ভৌগোলিক রূপবর্ণনা গৌণ বলে গণ্য হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্‌' কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের 'বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা' আমাদের হৃদয়ে সোনার কাঠির স্পর্শ বুলিয়ে দেয় কেন? রবীন্দ্রনাথের—

নীল সিন্ধুজল-ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর চুম্বিত-ভাল হিমাচল
শুভ্রতুষার-কিরীটিনী।
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর
নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীর।

—ইত্যাদি যখন আবৃত্তি করি তখন দেশের মাটির প্রতি আমাদের হৃদয় কি স্বতই ভক্তিতে আনত হয়ে আসে না? তখন কি মৃন্ময়ীর মধ্যেই আমরা চিন্ময়ীকে উপলব্ধি করি না?

ও আমার দেশের মাটি
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচলপাতা।

কবির এই অনুভূতি কি আমাদের সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না?

ছেলেবেলায় যখন যোগীন্দ্রনাথ বসুর
হের বৎস প্রসারিত সম্মুখে তোমার
ভারতের মানচিত্র।

—ইত্যাদি কবিতাটি পড়েছিলাম তখন অন্তরে যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম, হৃদয়ের মর্মমূলে যে অপূর্ব আনন্দোপলব্ধি জেগে উঠেছিল, আজও তা ভুলতে পারি নি। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মনে কি এরকম আনন্দভক্তির উপলব্ধির সঞ্চার করা যায় না? তার জন্য বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায় না কেন? অথচ এই ভৌগোলিক অনুভূতিই তো জাতীয় ভাবসংহতির প্রধানতম না হলেও অন্যতম প্রধান উপাদান:

দেবতাত্মা হিমালয়ের গৌরব মহিমা কার সম্পদ? শুধু কি উত্তর-ভারতের? দক্ষিণ-ভারতের কি কিছুই নয়? বিন্ধ্যপর্বত কি উত্তর-দক্ষিণকে শুধুই বিভক্ত করে? যুক্ত কি করে না? সেই সুদূর অতীতে যে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি দুর্লংঘ্য বিন্ধ্যপর্বতের উত্তুঙ্গ মাথা নত করে দিয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছিল, সে তো চিরকালের জন্যই সেখানে থেকে গেল, তাকে তো পরাস্ত বা নিরস্ত হয়ে উত্তরে ফিরে আসতে হয় নি। বিন্ধ্য আর কখনও মাথা তুলে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে পারে নি। উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির এই অগস্ত্যযাত্রার কাহিনীর মধ্যে যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তার মর্মার্থ উপলব্ধি করা চাই। বিন্ধ্য-পর্বতের মাথা নত করার এই কাহিনীই তো উত্তর-দক্ষিণকে অচ্ছেদ্য, ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই কাহিনী আজ সর্বভারতের সম্পদ, যেমন বাংলা দেশের তেমনি কেরলেরও। গঙ্গা নদী কার? শুধু কি উত্তরপ্রদেশের, না উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব প্রদেশের? তা যদি না হত তাহলে কেরল-সন্তান শঙ্করাচার্য কেন—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে

—ইত্যাদি গঙ্গাস্তোত্র রচনা করলেন? বাঙালি কবি দ্বিজেন্দ্রলালই কেমন করে লিখলেন 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' ইত্যাদি সুবিখ্যাত গানটি? বস্তুত বিন্ধ্যহিমাচলের ন্যায় গঙ্গাযমুনা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র নর্মদা-গোদাবরী-কাবেরীও আঞ্চলিক নয়, সর্বভারতীয়। এ সকল নদী প্রদেশ-বিশেষের জলধারা মাত্র নয়, এগুলি যে আসলে প্রদেশনির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের চিত্তধারার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। এগুলি যে ভারতীয় সংস্কৃতি ধারারই প্রতীক, এজন্যই এসব নদী বিদেশীর কাছে জলস্রোতমাত্র হলেও ভারতীয়ের কাছে এগুলি পুণ্যসলিলা। এজন্যই এসব সলিলে অবগাহনে শুধু যে দেহ ধৌত হয় তা নয়, চিত্তও নির্মল হয়। কেন না তার সঙ্গে যে যুক্ত আছে একটি সুপবিত্র ভারতবোধ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি একটি সুগভীর শ্রদ্ধানুভূতি। শুধু জল নয়, ভারতবর্ষের মাটিও পবিত্র। এই পবিত্রতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এক-একটি তীর্থক্ষেত্রে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, দ্বারকা, কামরূপ, কন্যাকুমারী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রগুলি কি শুধু প্রাদেশিক? প্রত্যেকটি তীর্থক্ষেত্রের রেণুতে রেণুতে মিশে আছে যুগ-যুগান্তের ভারতীয় চিত্তের সুকোমল হৃদয়ানুভূতি। বাঙালির তীর্থক্ষেত্র যেমন ছড়িয়ে আছে সর্বভারতে, কেরলবাসীর কাছেও ভারতবর্ষ তেমনি তীর্থময়। আধুনিক কবির কাছেও তাই সমগ্র ভারতভূমিই পুণ্যতীর্থরূপে প্রতিভাত হয়েছে।—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতবাসী যখন পদব্রজে ভারত-ব্যাপী তীর্থভ্রমণে যাত্রা করত তখন তারা প্রতি নিশ্বাসে ভারতের পবিত্র

বায়ুকে অন্তরে গ্রহণ করত, প্রতি পদক্ষেপে ভারতভূমির পুণ্যস্পর্শ লাভ করত, ভারতব্যাপী পুণ্যসলিলা নদীসমূহে অবগাহন করে দেহমনকে নির্মল করে নিত। এভাবে তারা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করত ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস-জলবায়ুকে, সর্বচিত্ত দিয়ে গ্রহণ করত ভারত-সংস্কৃতির বিচিত্র রূপকে। তাদের দেবভক্তি মিশ্রিত হত দেশ-ভক্তির দেবভক্তি মিশ্রিত হত দেশভক্তির সঙ্গে। তারা উপলব্ধি করত, দেশের মাটিতেই বিশ্বময়ীর বা বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা রয়েছে। এভাবে তখন আমাদের জীবনোপলব্ধি ও ভারতোপলব্ধি অঙ্গাঙ্গিরূপে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পেত।

এখনও কি শিক্ষার সহায়তায় আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে নূতন করে ভারতোপলব্ধি সঞ্চার করা যায় না? অবশ্যই যায়, বরং আরও ভালো করে আরও গভীর করেই যায়। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে উত্থাপন করা যাবে।

পূর্বে বলেছি স্বদেশবোধের তিন অঙ্গ—ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উপলব্ধি। ভৌগোলিক উপলব্ধির কথা সংক্ষেপে বলা গেল। এবার ঐতিহাসিক উপলব্ধির একটু ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

যথার্থ ইতিহাসবোধের অভাবই আমাদের জাতীয় ভাবসংহতিকে সবচেয়ে দুর্বল করে রেখেছে। এ বিষয়ে সচেতন হওয়া চাই। নতুবা আমাদের ভাবসংহতি ও জাতীয় ঐক্য কখনও দৃঢ়ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। কেন না ইতিহাসই একদিকে ভূগোল ও অন্যদিকে সংস্কৃতিকে তাৎপর্য দান করে। ঐতিহাসিক স্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেলে প্রসিদ্ধ স্থানগুলিও তার যথার্থ গৌরব হারায়, অন্য দশটা স্থানের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকে না। লুপ্ত স্মৃতি গৌরবস্থলগুলি কালক্রমে ইতিহাসের মূক নিদর্শনরূপে বিদ্যমান থাকে অথবা মূঢ় কিংবদন্তী ও অন্ধ আসক্তির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সমস্ত ভারতবর্ষে এরকম কত নিদর্শন ও কত কেন্দ্র আছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ ইতিহাসের তাৎপর্যে মণ্ডিত হলে এগুলি আমাদের জাতীয় হৃদয়ে নূতন অনুভূতির স্পন্দন জাগাতে পারে। স্থান সম্বন্ধে যা বলা গেল, ব্যক্তি সম্বন্ধেও তাই প্রযোজ্য। কত ঐতিহাসিক মহাপুরুষ যে আজ আমাদের জাতীয় স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়ে গেছেন কিংবা নানা অসংবদ্ধ কিংবদন্তীর আশ্রয় হয়ে আছেন তা অনুমান করাও কঠিন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সমুদ্র গুপ্ত, হর্ষবর্ধন প্রমুখ ভারতগৌরব নৃপতিরা তো জনস্মৃতিতে অস্তিত্বহীন, আর শ্রীকৃষ্ণ, বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস প্রমুখ অনেকেই অবাস্তব জনশ্রুতিতে পর্যবসিত। আর বুদ্ধদেব অশোক প্রভৃতি অধুনাবিশ্ববিশ্রুত ও মহিমান্বিত চরিত্রগুলি এক সম্প্রদায়ের কাছে অলৌকিক কাহিনীর জালে আচ্ছন্ন এবং অপর সকলের কাছে একেবারেই অস্তিত্বহীন। অথচ এসব ঐতিহাসিক মহিমামণ্ডিত স্থান ও ব্যক্তিচরিত্র সম্বন্ধে পুরুষানুক্রমিক গৌরববোধ ভারতীয় ভাবসংহতির চিরন্তন ভিত্তিভূমিতে পরিণত হতে পারে। কেন বা হয় নি বা এখনও হয় না? তার কারণ জাতীয় চেতনায় ইতিহাসবোধের অভাব এবং বর্তমানে সে বোধকে জাগিয়ে তোলবার প্রয়াসহীনতা। শিক্ষার সহায়তায় এদিক্ থেকেও জাতীয় ভাবসংহতি সাধনের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, শুধু যে সমবেত গৌরববোধই জাতীয় চেতনাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে এক করে বাঁধে তা নয়। এ ক্ষেত্রে সমবেত লজ্জাবোধ ও কলঙ্কচেতনার শক্তিও কম ক্রিয়াশীল নয়, বরং গৌরববোধের চেয়েও জাতিগত লজ্জা ও কলঙ্কের চেতনাই জাতীয় চিত্তকে সংহত শক্তিদানের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। জাতীয় ভাবসংহতি চাই বলে অবিরত প্রচারকার্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে জাতিকে ইতিহাসের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবার ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করা চাই।

শুধু ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বোধ নয়, ভাবসংহতি সাধনার জন্য সমবেত সাংস্কৃতিক বোধ জাগানোও একান্ত আবশ্যক। এই সাংস্কৃতিক অনুভূতিও ইতিহাসবোধ-নিরপেক্ষ নয়। বেদ এবং রামায়ণ-মহাভারতের কথা সকলেই জানে, বিভিন্ন পুরাণ এবং শাস্ত্রও জনসাধারণের শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু নিরাকার নির্বিকল্প জ্ঞানভিত্তিহীন শ্রদ্ধা মূঢ়তারই পরিচায়ক। মূঢ়তাজনিত সংহতি জাতিকে কখনও শক্তি দিতে পারে না, বরং তার দুর্বলতাকেই বাড়িয়ে তোলে। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে চাই জ্ঞান, প্রধানত ইতিহাসের জ্ঞান। ইতিহাসের জ্ঞান ছাড়া বেদ, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা ভারত-সংস্কৃতির কোনো অঙ্গ সম্বন্ধে যথার্থ শ্রদ্ধানুভূতি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যেও অনেকেরই বেদ-উপনিষদ্ বা রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে শুধু একটা ভাসা-ভাসা জ্ঞানই আছে, তাতে মনের মধ্যে যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হতে পারে না। আর ভারতীয়-সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গ তো একেবারেই অন্ধকারময়। বাংলার ইতিহাস ও বাংলার সংস্কৃতি বলে কোনো বস্তু যে আছে, অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির মনে এই বোধটুকুও নেই, তার জন্য শ্রদ্ধা বা লজ্জা থাকা তো দূরের কথা। এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? এ অবস্থায় জাতীয় চেতনায় সাংস্কৃতিক ভাবসংহতি প্রত্যাশা করা যাবে কি করে? ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প-সঙ্গীত ইত্যাদি সর্ববিধ সাংস্কৃতিক জ্ঞানের বিস্তার করতে হবে দেশ জুড়ে। তবে তো সাংস্কৃতিক ভাবসংহতি দেখা দেবে।

এই বোধ যখন জাগবে তখন দেশের এক অঙ্গ নিজেকে অন্য অঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে পারবে না। আমাদের এক হাত বা এক চোখ যেমন অপর হাত বা চোখ থেকে স্বতন্ত্র নয়, বরং তার পরিপূরকমাত্র, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের এক প্রদেশ ও অপর প্রদেশ নিরপেক্ষ নয়। আমাদের প্রত্যেক

যেমন সমগ্র দেহের জীবনক্রিয়ার সহায়ক, তেমনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশই তার সামগ্রিক জীবনবিকারের অপরিহার্য অঙ্গ, সমগ্র দেহ যদি রুগ্ন-দুর্বল হয় তবে তার কোনো অঙ্গই নীরোগ-বলিষ্ঠ থাকতে পারে না, তেমনি ভারতবর্ষই যদি দুর্বল-হতমান হয় তবে কোনো প্রদেশই নিজের শক্তি ও সম্মান বজায় রাখতে পারবে না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে (১৯৩৯) তাঁর ভারতবোধকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন এই ভাষায়—

'ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে।'

—'কালান্তর', দেশনায়ক।

এ বিষয়ে বিশেষ করে বাঙালির উদ্দেশে তিনি যে দেশনায় বাণী উচ্চারণ করেছেন তা এই—

'বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক্, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি-সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।'

—'কালান্তর', মহাজাতি-সদন।

ভারতপথিক কবির এই বাণী শুধু বাঙালির নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশবাসীর পক্ষেই সমভাবে নিত্য স্মরণীয়। এই বাণীর তাৎপর্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হলে চাই সমগ্র ভারতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা ও বিশিষ্টতার প্রতি আন্তরিক মমতাবোধ। প্রদেশ ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে আমাদের অনুভব করতে হবে—ভারতের সব তীর্থ সকলের পক্ষেই পুণ্যস্থান, ভারতের সব প্রসিদ্ধ স্থান সকলেরই গৌরবের বিষয়, ভারতভূমিতে যুগে যুগে যেসব মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন আমরা প্রত্যেকে তাঁদের সকলেরই উত্তরাধিকারী, আমরা সকলেই ভারতের সমস্ত গৌরব ও লজ্জার সমান অংশভাক্। কাশী কি শুধু উত্তরপ্রদেশের, দ্বারকা কি গুজরাটের, কন্যাকুমারী কি তামিল প্রদেশের পুণ্যস্থান, সমগ্র ভারতের নয়? উজ্জয়িনী, অজন্তা বা তাঞ্জোরের গৌরব কি শুধু প্রদেশ-বিশেষের, সমগ্র ভারতের নয়? বুদ্ধ-অশোকের সাহিত্য কি শুধু কোশল-মগধের সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ? তাঁদের মহিমাজ্যোতিতে কি আসমুদ্র ভারতভূমিই উজ্জ্বল হয় নি? বস্তুত তাঁদের আবির্ভাবে বিশ্বমানবের ইতিহাসই ধন্য ও গৌরবান্বিত হয়েছে। অবন্তী প্রদেশের কবি কালিদাসকে নিয়ে কি সব প্রদেশই গর্ববোধ করে না? শিবাজি কি শুধু মহারাষ্ট্রীয় বীর, ভারতীয় নন? রাণা প্রতাপ কোন্ দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে? শুধু কি রাজপুতানার? দিল্লী-আগ্রা হায়দরাবাদ-লক্ষ্ণৌ-এর গৌরব কি শুধু মুসলমানের? আমাদের সকলের নয়? তাজমহল কি কোনো সম্প্রদায় বা প্রদেশ-বিশেষের সম্পদ? কবীর-রজ্জব কি শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার ধন, সকলের নয়? নানক কি শুধু শিখদের? আর চৈতন্য শুধু হিন্দু বাঙালির? স্বামী বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র কি শুধু বাংলারই গৌরব বৃদ্ধি করেছেন? তাঁরা কি পুণ্যতীর্থ ভারতভূমির জন্যই জীবন-উৎসর্গ করেন নি? বালগঙ্গাধর তিলক জন্মে মরাঠি হলেও তিনি সর্বভারতেই লোকমান্য ছিলেন না? মহাত্মা গান্ধীকে কি শুধু গুজরাটি নেতা বলেই স্বীকার করি? বিশ্বের লোক তো তাঁকে ভারত-স্রষ্টা বলেই স্বীকার করে। পলাশী যুদ্ধের কলঙ্কও কার কলঙ্ক? শুধু কি মুসলমান বা বাংলার কলঙ্ক? সে কলঙ্কের লজ্জায় কি সব ভারতবাসীরই মাথা হেঁট হয় নি?

আমি বাঙালি। কিন্তু আমার মানস-সত্তা শুধু বাংলার উপাদানে গঠিত নয়। আমার চিত্তসত্তায় মিশে আছে বেদ-উপনিষদের বাণী, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, বুদ্ধ-অশোকের চরিত্রমহিমা, সাংখ্যবেদান্তের তত্ত্ব, কালিদাস-ভবভূতির কাব্যরস, অজন্তা-ইলোরার শিল্পশোভা, কুতুবমিনার ও তাজমহলের প্রতি মমতাবোধ, শিবাজি ও গুরু গোবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধানুভূতি, আকবর-শা জাহানের উত্তরাধিকার, শঙ্কর-রামানুজের ব্রহ্মবাদ এবং নানক-কবীরের উদার বিশ্বমানবিকতার বাণী, আমার মধ্যে নিছক বাংলার উপাদান অতি সামান্যই। বস্তুত বাংলার ছাঁচে ভারতীয় উপাদানেই আমার হৃদয়-মন গঠিত। তাই আমি বাঙালি হয়েও ভারতীয়, আবার ভারতীয় হয়েও বাঙালি। তাই বলতে হবে ভারতকে বাদ দিয়ে বাঙালির চলে না, তেমনি বাঙালিকে বাদ দিলে ভারতেরও চলবে না।

বাঙালির সম্বন্ধে যা বলা হল, প্রত্যেক প্রদেশবাসী সম্বন্ধেই তা খাটে। যদি শিক্ষার সহায়তায় প্রত্যেক প্রদেশবাসীর অন্তরেই ভারতীয় ভূগোল ইতিহাস ও সংস্কৃতির এসব চিরন্তন উপাদানগুলি সঞ্চারিত করা যায় এবং যদি এগুলির প্রতি প্রত্যেকের মনেই মমত্ববোধ জাগানো যায়, তাহলে ভারতবর্ষের ভাবসংহতি সাধনের নিরন্ত উপদেশবাণী উচ্চারণ করে বেড়াতে হবে না। শিক্ষা বলতে পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান অবশ্যই বোঝায়, কিন্তু তার চেয়েও কিছু বেশি বোঝায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভূগোল ইতিহাস এবং সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতির যোগে যদি শিক্ষার্থীদের আগ্রহোন্মুখ চিত্তে এসব ভাবসংহতির বীজ বপন করা যায় তা হলে আকাঙ্ক্ষিত ফল পেতে বেশি বিলম্ব হবে না। ঊষর ভূমিতে শুধু প্রচার বর্ষণ করলে সংহতির অঙ্কুরোদ্গম হবার কল্পনাও করা যায় না। আমাদের শিক্ষানীতির আমূল সংস্কার না হলে বহু প্রচারিত ভাবসংহতি লাভের কোনো আশা নেই।

প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাদ দিয়ে যেমন দেহের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না, তেমনি প্রদেশনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের কল্পনাও অলীক ও অবাস্তব। প্রাদেশিক সংস্কৃতিকে বাদ দিলে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে কিছু থাকে না। বাংলার সংস্কৃতি বা তামিল দেশের সংস্কৃতিও ভারতীয় সংস্কৃতি, এ কথা স্বীকার করতেই

॥ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কিন্তু এই প্রাথমিক সত্যটাই আমাদের শিক্ষানীতিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। এখানেই আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল। বাঙালি ছাত্র বাংলার ইতিহাস পড়ে না, কর্নাট বা গুজরাটের ইতিহাস পড়ে না, পড়ে প্রদেশনিরপেক্ষ 'ভারতবর্ষ' নামক একটা কল্পিত দেশের ইতিহাস। বাংলার বিদ্যালয়ে তামিল বা মরাঠি সাহিত্য পড়ানো হয় না, কেরলে বা পাঞ্জাবে বাংলা সাহিত্য পড়াবার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষানীতির এই ব্যবস্থায় তামিল দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির মনে কোনোপ্রকার শ্রদ্ধা বা অনুরাগ জন্মাবার কোনো উপায় থাকে কি? তাই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি যদি অবাঙালির কোনো মমতাবোধ না থাকে তবে তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আঞ্চলিক সংস্কৃতিজ্ঞানের অভাবে আমাদের ভারত-সংস্কৃতিজ্ঞান হয়েছে খণ্ডিত, আর জাতীয় ভাবসংহতি হয়েছে প্রায় লুপ্ত। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষাশাসকদের অবহিত হওয়া চাই। কেন না ঠিকমতো রোগ নিরূপণ না হলে রোগীর প্রাণ রক্ষাও সম্ভব নয়।

বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরে যে দেশব্যাপী গাঢ় অন্ধকার বিরাজ করছে, সেই অন্ধকারের মধ্যেই তো দেশের অকল্যাণ নিয়ত পরিবর্ধমান হচ্ছে। এই নিত্য বর্ধমান অকল্যাণকে নিরস্ত করতে হলে বিদ্যালয়ের বাইরেও সর্বত্র জ্ঞানের বিস্তার করতে হবে। বিদ্যাবিস্তারের আধুনিক উপায়গুলিও তো কম শক্তিশালী নয়। ট্রেন-প্লেন রঙ্গ-মঞ্চ সিনেমা-রেডিও (টেলিভিশনের আবির্ভাবও দূরবর্তী নয়) ইত্যাদির সহায়তায় অতি অল্পকালের মধ্যেই দেশ ও দেশের সংস্কৃতিকে সর্বসাধারণের কাছে মূর্ত করে তোলা কঠিন নয়, অবশ্য যদি দেশনায়কদের সে বোধ ও সে সদিচ্ছা থাকে। দেশের বর্তমান যুযুৎসু দল বা সম্প্রদায়সমূহের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে হলে ভারত-সংস্কৃতির বিশ্বরূপ দর্শন করানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই। তার জন্য যে কোনো ব্যবস্থাই হয় নি তা নয়, কিন্তু দেশ দেখাবার ব্যবস্থা থাকলেও কেউ দেশের বিশ্বমূর্তি দেখছে না; কারণ আমাদের দেশ-দেখা চোখ ফোটে নি। দুটো করে চোখ আমাদের সকলেরই আছে এবং অনেকেই নানা দেশ দেখেও বেড়ায়। তবু দেখা হয় না। কারণ আমরা তো শুধু চোখ দিয়ে দেখি নে, দেখি জ্ঞান দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, মমতা দিয়ে। সমগ্র দেশে এই দেশ-দেখা চোখ ফোটানো চাই। জ্ঞানাঞ্জন শলাকাই হৃদয়-দিয়ে-দেখা চোখ ফোটাবার একমাত্র উপায়। যে জ্ঞানে দেশের প্রতি হৃদয় উন্মুখ হয়, মমতা বিকশিত হয়, সে জ্ঞানের প্রধান অবলম্বন ইতিহাস ও সাহিত্য। দেশের প্রত্যেক অংশের ইতিহাস ও সাহিত্যের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় না হলে সমগ্র দেশের প্রতি মমতা জাগতে পারে না, জাতীয় ভাবসংহতিও সাধিত হতে পারে না। যেদিন এই আন্তরিক পরিচয় সাধিত হবে সেদিন আমরা আমাদের স্বদেশকে আমাদের ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারব—

আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর;

কিংবা

তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর
প্রাণে।

তখনই আমাদের জাতীয় ভাবসংহতি-সাধনা চরিতার্থ হবে। তার পূর্বে নয়।

দেশের সর্বাংশের ইতিহাস ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করতে হলে দেশের প্রত্যেকটি সাহিত্যিক ভাষাকে আয়ত্ত করা চাই। এখানেই আসে ভাষাসমস্যার কথা। এবার এই সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের প্রসঙ্গে আসা যাক

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

অথচ এখনও সূর্য

অনুপপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

এ এক বিষণ্ণ দিন
জলভরা ঘনমেঘে ঢাকা,
চারিদিকে নিরালোক,
নিষ্প্রদীপ গভীর আঁধা
মসীলিপ্ত কালিমায়
শূন্যতার জলছবি আঁকা।
অথচ এখনও সূর্য
আনমনে ছড়ায় কিরণ
এখনও রাতের আকাশ
চাঁদের আলোয় ভরা,
কোথা থেকে ভেসে আসে
স্নিগ্ধশীতল সমীরণ।
এই রিক্ত উদাসীন প্রাণে
তোমার প্রসন্ন প্রেম ঢালো
হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর,
তোমার সুন্দর পৃথিবীতে
স্বর্গ থেকে দাও গো ছড়িয়ে
একরাশ জ্যোতির্ময় আলো।
সবই তো তেমনিই আছে,
সোনাঝরা উজ্জ্বল দিন,
সমুদ্রের নীল জলে
এখনও কুড়োয় ঝিনুক
শিশুর দল। উড়ে যায়
সাগরের পাখী, বয়সে নবীন।
তবুও বিষণ্ণ দিন
যন্ত্রণার কালোমেঘে ঢাকা,
চারিদিকে হাহাকার,
নিপীড়িত অমৃতসন্তান,
মসীলিপ্ত কালিমায়
রিক্ততার জলছবি আঁকা।

বাংলার নবজাগরণে সংস্কৃত চর্চা

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক পরম শুভলগ্ন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রভাবে সাংস্কৃতিক পরাধীনতার (Cultural Slavery) মোহনিদ্রায় জাতি ছিল আচ্ছন্ন। তামসিক নিষ্ক্রিয়তা এবং অশুভ পরানুচিকীর্ষা তখন আমাদের স্বধর্মে পরিণত হয়েছে। জাতীয় জীবনে চিন্তাশক্তি বন্ধ্যা এবং সৃষ্টিশক্তি পংগু হয়ে গেছে। ইতিহাসের ধারাপথে একদল প্রতিভাধর মনস্বীর সমবেত আবির্ভাবে এই উনবিংশ শতকে আমাদের জাতীয় জীবনের মরাগাঙে নতুন জোয়ার এসেছিল। তাঁদের বিচিত্র কর্মকোলাহলে জাতির সুপ্তিভংগ হল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরম্ভ হল নব নব কর্মান্দোলন। নবীন চিন্তা এবং অদম্য কর্মৈষণার দ্বারা ঘোষিত হল প্রসুপ্ত জাতির নবজাগরণের বার্তা। তাই, এই শতক আমাদের ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণরূপে চিহ্নিত।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে ঘটে গেছে শিল্প-বিপ্লব। ফলে, প্রতীচ্য জগতে চিন্তায় ও কর্মে সংঘটিত হয়েছে এক বিরাট রূপান্তর। প্রতীচ্যের নবোত্থিত জীবন-জিজ্ঞাসা এবং নবলব্ধ আত্মপ্রত্যয়ের তরংগাঘাতেই উনিশ শতকে প্রাচীন প্রাচ্যের সুপ্তিভংগ হল, নবজীবনের অরুণোদয় হল প্রাচীর চিন্তাকাশে। এই নব জাগৃতির অব্যবহিত-পূর্ব সময়ে বহির্বিশ্বের সম্বন্ধে আমরা যেমন অন্ধ ছিলাম, তেমনি ভুলে গিয়েছিলাম আমাদেরো নিজেদের গৌরবময় প্রাচীন অতীতকে। তাই, নবজাগরণের যুগে বাংলার মনীষিমণ্ডলী অন্তরের দুয়ার খুলে প্রতীচ্যকে যেমন স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনি স্বীয় অতীত সংস্কৃতির মণিকোঠায়ও করেছেন আত্মানুসন্ধান। কালান্তরে বর্তমানে উনিশ শতকের জীবনধারা বিশ্লেষণে প্রতীচ্যের আবাহনকে অসামান্য স্থান দান করলেও প্রাচ্যের অতীতচারণা তথা আত্মানুসন্ধানকে সামান্য স্থান দানেও আমরা কুণ্ঠিত। এই সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে মনে করেই বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে দিগদর্শনের প্রয়াস।

ঐতিহাসিক-মূর্ধন্য টয়েনবীর মতে আত্মবিসর্জন নয়, নিজের গৌরবময় হারানো অতীতকে নবজীবনের পরি-

অধ্যাপক জ্ঞানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

প্রেক্ষিতে নতুনভাবে গ্রহণ করাই হল জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। অর্থগত তাৎপর্যের দিক দিয়েও আত্মবিস্মরণ এবং নবজাগরণ অনেকটা পরস্পরবিরোধী। বরং, আত্মসমীক্ষাই হচ্ছে নবজাগরণের ফলশ্রুতি। এই প্রসংগে আবার মনে রাখা দরকার যে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ছাড়া ভারতাত্মার যথার্থ পরিচয় কখনো লাভ করা যেতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষার নিবিড় সম্বন্ধের কথা বিশ্লেষণ করে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডঃ লুই রেনো বলছেন—

"There is no living culture without a living tradition. If India is beloved and cherished among the elite of the West— it is on account of her traditional culture. And this culture is embedded above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians."

তাই, উনিশ শতকে বংগভারতের নবজাগরণ তথা রেনেসাঁর মূলে আত্মসমীক্ষার ধারাপথে সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারকে গৌণ করা চলে না।

ভারতীয় সামগ্রিক সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী বিশ্বনন্দিতা সংস্কৃত ভাষা। বাংলার সরস মননভূমিতে এই দেবভাষার অধিষ্ঠান স্মরণাতীতকাল হতেই বলা চলে। বাংলা দেশে বাংলা ভাষার উদ্ভবের পূর্বেও সংস্কৃতই ছিল সাংস্কৃতিক ভাষা। এই দেশে যুগযুগান্তরব্যাপী সারস্বতসাধনার ধারাপথে সংস্কৃতচর্চার মন্দাকিনী কখনো বিশুষ্ক হয় নি। তাই, উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনেও বাংলা দেশে সংস্কৃতচর্চা বিলুপ্ত হয় নি, বরং স্বাধীনোত্তর ভারতের চেয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠ ছিল। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রশক্তির প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেদিন সমাজের অধিকাংশ নরনারীর সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ছিল এই সংস্কৃত ভাষার প্রচার এবং প্রসারের দিকে। বিশেষত বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় ছিল তখনো পর্যন্ত সংস্কৃত। এই সেদিনও আধুনিক মনীষার মহান প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—

'পণ্ডিত নয়, কেবল Cultured হতে হলেও একটা Classics জানা চাই। আর আমাদের পক্ষে একমাত্র Classical ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, ভাসের নাটক, বাণভট্টের

কাদম্বরী, ভর্তৃহরির শতক—ভারতীয় সাহিত্যে এ সবের কি তুলনা আছে?'
(প্রমথ চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথ)
শ্রীরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত, পৃ-১৪।

উনবিংশ শতাব্দী আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। এই সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন এবং নবীনের সংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল, তেমনি সমন্বয়ের মন্ত্রও বহু ক্ষেত্রে হয়েছিল উদ্‌গীত। আজকের মতো হঠাৎ আমদানী করা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্লাবনে তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল অথচ আত্মোপলব্ধিসহায়ক সংস্কৃত চর্চাকে সেদিন ভাসিয়ে দেওয়া হয় নি। তাই, সনাতন ভাবধারার ধাত্রী সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠনে অনাদর ও অবহেলার আজকের মতো সর্বনাশা রূপ সেদিন প্রকটিত হয়ে ওঠে নি। যে সকল চতুষ্পাঠীকে অবলম্বন করে আবহমানকাল ধরে সংস্কৃত শিক্ষার রথচক্র আবর্তিত হচ্ছিল, সেই চতুষ্পাঠীগুলি সেদিন বিলুপ্ত হয় নি এবং তার ছাত্রসংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম এ্যাডামের রিপোর্টে বাংলা ও বিহারে সেদিন একলক্ষ চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব মেলে। কোন কোন চতুষ্পাঠীতে শতাধিক ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্নদান করা হ'ত। গণ-শিক্ষারও সেদিন মুখ্য অবলম্বন ছিল এই আবাসিক এবং অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যায়তনগুলি। ধনিক শ্রেণী এবং জমিদারগোষ্ঠী এই চতুষ্পাঠীগুলি সংরক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করতেন যথেষ্ট অর্থানুকূল্য। টোলের পণ্ডিত এবং ছাত্রদের জন্য নানাবিধ বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর, সাময়িক দান প্রভৃতির দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তাঁরা একদিকে যেমন সমাজে সম্মানের অধিকারী হতেন, তেমনি অন্যদিকে নিজেরাও লাভ করতেন পরম আত্মপ্রসাদ। সমাজের ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকল নর-নারীরই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল এই টোলের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তাঁদের অন্তেবাসীদের প্রতি। সংস্কৃত শিক্ষার স্বাভাবিক মহিমা এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সেদিন সকলেই ছিল অবহিত। তখনো সংস্কৃতই ছিল এই দেশে সর্বজনীন উচ্চ-শিক্ষার প্রধান বাহন। তাই, উনবিংশ শতকে বাংলা দেশে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রপাতে একমাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজীরই শিক্ষার বাহনরূপে যোগ্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। কাকে গ্রহণ করা হবে এই নিয়ে তাই দ্বন্দ্বটিও সেদিন সীমিত ছিল এই দুটি সমৃদ্ধ ভাষার মধ্যেই। মেকলে যেমন ছিলেন ইংরেজীর পক্ষে সেনাপতি, তেমনি উইলসনের মতো মহামনা মনীষী ছিলেন সংস্কৃতের পক্ষে নায়ক। রাজনৈতিক পরাধীনতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রয়োজন ভারতবাসীর মনে সাংস্কৃতিক পরাধীনতার (Cultural Slavery) বীজ বপন। আর সংস্কৃতের বিস্মৃতিই হচ্ছে তার প্রধান উপায়। সংস্কৃত ভুলে গেলে ভারতের অতীত গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আর ভারতীয়দের থাকবে না। দূরপ্রসারী রাজনৈতিক বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে সেদিনের শাসকগোষ্ঠী সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজীকে সেদিন শিক্ষার বাহনরূপে স্থির করেন। লর্ড মেকলের ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত 'Minute'-এ তাই এমন মানুষই তৈরী করার নির্দেশ রয়েছে, যারা হবে—

"A class of persons, Indian in blood and colour; but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."

তাই, লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে সরকারী 'Communqiue'-এ এই কথাই বলা হয়েছে---

"The great object of the British Government ought to be the promotion of European Literature and Science among the natives of India and all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয় English education alone কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই নিতান্ত বিজাতীয় একপেশে শিক্ষার মাশুল দেশব্যাপী অনৈক্য এবং চরম আত্মবিস্মৃতির মাধ্যমে আজ আমাদের বিশেষভাবে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সুফল যা পেয়েছি, সেটা অনেকটা তার by product বা উপজাতের মতো এবং তা শিক্ষা-নিয়ন্তাদের ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।

আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে উনবিংশ শতকে যাঁরা ছিলেন আমাদের নবজাগৃতির নায়ক, তাঁদের অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার সংগে সংগেই সংস্কৃতও অধ্যয়ন করেছিলেন গভীরভাবে। তাই, তাঁরা নোঙরহীন নৌকার মতো দেশের সাংস্কৃতিক তটভূমি হতে নূতন চিন্তার ঝড়ে দূরে ভেসে যান্ নি। বরঞ্চ, প্রতীচ্যাগত নূতন জ্ঞানের আলোকে আমাদের সনাতন সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন ও অনুশীলনে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সত্যটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তাই, তাঁদের প্রধান কয়েকজনের সংস্কৃত-সাধনার কথা অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচিত হচ্ছে।

প্রাচ্যজগতে রেনেসাঁর অগ্রদূত-রূপে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, সর্বজনবন্দিত এবং স্বীকৃত। প্রথমে তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতেই ছিলেন যথেষ্ট অধিগতবিদ্য। পরে অন্যান্য ভাষায় হন সুনিষ্ণাত। সংস্কৃত ভাষণ ও রচনায় ছিল তাঁর অপূর্ব নৈপুণ্য। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সংগে তাঁর ধর্মবিচার সংস্কৃতেই নির্বাহিত হয়ে, গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

"গায়ত্র্যাঃ পরমোপাসনা বিধানম্" এবং "আত্মানাত্মবিবেক" তাঁরই রচিত দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ। এ ছাড়া বেদান্ত এবং উপনিষৎ নিয়ে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। যথা—বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার, তলবকারোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, বজ্রসূচী, গীতার পদ্যানুবাদ প্রভৃতি

তিনি রচনা করেন। ব্রাহ্মণদের দিয়ে বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়ে বিশুদ্ধভাবে বেদপাঠের ব্যবস্থা তিনি করিয়েছিলেন। সংস্কৃত তন্ত্রশাস্ত্রেও ছিল তাঁর গভীর প্রবেশ।

সেদিনের আর একজন মনীষী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃতে ছিলেন বিশেষভাবে নিষ্ণাত। "বেদের" প্রচারে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। সংস্কৃতের বহু অধ্যাপক তাঁর দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন এবং তাঁর অর্থানুকূল্যে বিদ্যাচর্চা করেছেন। তিনি বৃত্তি দিয়ে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে বারাণসী পাঠিয়েছিলেন বেদ অধ্যয়নের জন্য, যাতে পরে তাঁরা বাংলা দেশে বেদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। ধনীর দুলাল সংস্কৃতজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ বিলাস-জীবন ত্যাগ করে আর্ষ জীবন-চর্চা গ্রহণ করেছিলেন ঈশোপনিষদের একটি ছিন্নপত্রের নাটকীয় প্রভাবে। সংস্কৃত জানতেন বলেই ঐ ছিন্নপত্রের শ্লোক তাঁর মনের গতি পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থে উপনিষদের প্রিয় শ্লোকগুলিকে তিনি পরম আগ্রহভরে সংগ্রহ করে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করেন। তাঁর জীবন-বোধ এবং অধ্যাত্ম-চেতনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐ সংস্কৃত শ্লোকরাজিতে। সন্তানদের সংস্কৃত শেখাবার জন্য তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। সংস্কৃতে বিদুষী গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন বাড়ীর অন্তঃপুরিকাদের নিয়মিতভাবে সংস্কৃত পড়ানোর জন্য—এই কথা বলেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। সে-যুগে বাড়ীর কন্যা ও বধূদেরো সংস্কৃত শেখাবার এমন সক্রিয় আগ্রহ আর কারো ছিল কি না জানি না। শৈশবেই পুত্রদের ভালো করে সংস্কৃত শেখাবার জন্য তিনি হেরম্ব তত্ত্বরত্ন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবধন বিদ্যার্ণব প্রমুখ পণ্ডিতকে একের পর এক নিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি"তে তাঁদের সংস্কৃত শেখাবার জন্য মহর্ষিদেবের বহুবিধ প্রয়াসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ, উপনিষদের মন্ত্রগুলির বিশুদ্ধ রীতিতে আবৃত্তি তাঁদের অবশ্য-করণীয় ছিল। একটি "গীতা" গ্রন্থে মহর্ষি মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করে বাংলা অনুবাদসহ সেইগুলির প্রতি-লিপির জন্য রবীন্দ্রনাথকে আদেশ দিয়ে সুকৌশলে পুত্রকে গীতায় অভ্যস্ত করিয়ে নেন। কিছুটা মুগ্ধবোধ পড়িয়ে তারপর ঋজুপাঠ ২য় ভাগ এবং তারপর উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করতে মহর্ষি পুত্রকে আদেশ দেন। সংস্কৃত ভাষায় রচনা লেখার জন্য তখন থেকে পিতা পুত্রকে উৎসাহিত করতেন। পিতার সংগে হিমালয়ে অবস্থানের সময় বারো বছরের বালক রবীন্দ্রনাথকে রাতের অন্ধকার ফিকে হওয়ার পূর্বেই উপক্রমণিকার শব্দরূপ নিয়ে বসতে হত এবং তারপর সূর্যোদয়ে পিতার সংগে দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতে হত। বলা বাহুল্য, ঠাকুরবাড়ীর সন্তানেরা প্রথমেই সংস্কৃতে হতেন নিষ্ণাত। ফলে, বাংলা ভাষায় তাঁদের অধিকার জন্মেছিল বিস্ময়কর। মহর্ষিদেবের সকল পুত্রেরই সংস্কৃতজ্ঞান ও প্রীতি দেখে বলা চলে—"প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি তরুণ বয়সেই করেন "মেঘদূতের" অপূর্ব পদ্যানুবাদ। তিনি গীতার ওপর রচনা করেন অনবদ্য গ্রন্থ "গীতাপাঠ"। ভারতীয় দর্শনে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ করেন গীতা এবং মেঘদূতের পদ্যানুবাদ। বৌদ্ধসংস্কৃতে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় সংলাপেও তিনি ছিলেন অতিশয় দক্ষ। সতেরোটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের রসমধুর মূলানুগ অনুবাদের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ প্রদর্শন করেছেন সংস্কৃত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

আর, রবীন্দ্রনাথের নিজের সংস্কৃত-জ্ঞান এবং সবাইকে সংস্কৃতের পুণ্যস্পর্শে সঞ্জীবিত করার অকুণ্ঠ প্রয়াসের কথা তো সর্বজনবিদিত। তিনি নিজেকে সংস্কৃতেরই ছাত্র বলে কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করতেন। সারা জীবন ধরে সংস্কৃতের চর্চা করেছেন তিনি। পুত্র-কন্যা-পত্নী এবং অনুগামীদের সংস্কৃত শেখাবার জন্য তিনি কত বিচিত্র প্রয়াসই না করেছিলেন। উপনিষৎ, মনুসংহিতা, সংস্কৃত মূল রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি ও বাণভট্টের কাব্যাবলী তিনি গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংস্কৃত ভাষা এবং তদাশ্রিত সমাজ তাঁকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো সেই প্রসংগে "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে। সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার ভূমিকা হ'ক এইখানে।"

শান্তিনিকেতনে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নির্বাচনে তাঁদের সংস্কৃত-জ্ঞানের ভিত্তি তিনি যাচাই করে নিতেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আশ্রমের সকল অধ্যাপক এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের আবশ্যিকভাবে "পাণিনি" পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কবি। পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র অধ্যাপনা করতেন। টোলের অনাড়ম্বর শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রাত্যহিক সমবেত উপাসনা এবং

উৎসবাদির প্রারম্ভে বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র গানের তিনি প্রবর্তন করেন। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানাত্মক "ডি-লিট" উপাধিপ্রাপ্তিকালে তিনি প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন অনবদ্য সংস্কৃতে।—

"ভবন্ত উৎকর্তীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিভুবঃ।

এষোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য।

তং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রভুা বিদ্যাভূমির্নূনমাত্মনো মানবধর্মাম্নায়মেব মহাত্মাবিকর্তুম্ ইহতে যস্য খলূর্ধ্বঃ প্রাংশুতম অতিতরাং গম্ভীরশ্চ অনতিপাতাশ্চ সংবৃত্তঃ। গর্বোত্থানং মে চিত্তং প্রতিপদ্য অস্য বাচিকং প্রতিপত্তিং চৈত্তাং প্রহিতাং প্রতীকমিব অনশ্বরং মানবধর্মাত্মনঃ। সভাজয়ামি ভবতোত্র শান্তিনিকেতনে। যদ্ এতদ্ অনর্ঘম উপায়নম্ আনীতং ভবদ্ভির্দর্ঘং [illegible], চিরং তদ্ অবস্থাস্যতে অস্মদহৃদয়েষু, [illegible] চ তদ্ ভবতাম্ অস্মাকঞ্চ সাধারণ সংস্কৃতি সম্পত্তয় ইতি প্রতিমন্ত্র ভবন্তঃ।

স খল্বয়ং কালঃ প্রবর্ধতে যত্রাঙ্কঃ, তিরোধত্তে গুণঃ। প্রজয়তি অশিষ্টং নিরংকুশম্। প্রবর্ততে চ পশূচিতা স্পৃহা ভোগে সমুপচীয়মানা ভুভুক্ষিতা।

অস্মিন্ হি ব্যতিকরে কস্যাপি ভুবনব্যাপিনঃ সম্বন্ধস্য বীজসমুদ্গমোক্তির্নাম কদাচিৎ কবিজনোচিতেব প্রতীয়তে। তথাপি তু সংযমতো কালস্তর্জয়ন্নপি নিরন্তরম্। কিন্তু যে নাম বয়ং অতীত্যাপি এবং জীবামঃ প্রতীদশ্চ যদার্য ধর্মশ্চরমার্থ সম্পত্তয়ে বর্ধেতৈব নিত্যমিতি তৈরস্মাভিঃ সেয়ং প্রতীতিরবশ্যং প্রত্যগ্রীকরণীয়া।

ক্ষেমং বতেদং নিমিত্তং কস্যাপি অনাগতস্য সময়স্যেতি প্রতিগৃহ্যতে ময়া এষা প্রতিপত্তিবিহিতা উৎকর্তীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়েন। নূনং ন জীবিষ্যামি অহম্ অবলোকয়িতুম্ এবং প্রতিষ্ঠিতম্।

সভাজনীয়স্ত্র এষ তস্য সম্প্রদয়ঃ সংকেতঃ সঙ্গর ইব দিবসানাং প্রশস্যতরাণামিতি শিবম্॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ"

শান্তিনিকেতনম্

শকাব্দা ১৮৬১। ৪। ২২

তাঁর সংস্কৃতপ্রীতি ও জ্ঞানের কথা জেনে ইটালীর বিদগ্ধমণ্ডলী ১৯২৬ খৃস্টাব্দে জুনমাসে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে কবিকে সেখানে স্বাগত ও বিদায়-সম্ভাষণ জানান। সংস্কৃত শেখাবার জন্য তিনি নিজে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন "সংস্কৃত পাঠঃ"। বিশ্বভারতীর মর্মাদর্শ সংস্কৃত ভাষাতেই কবি প্রকাশ করেছেন—"অথেয়ং বিশ্বভারতী, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"---ইত্যাদি। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলকাতা সংস্কৃত কলেজে বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে "কবি সার্বভৌম" উপাধিতে ভূষিত করলে তিনি তাঁর প্রতিভাষণে সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে বাংলা ভাষার শক্তিলাভের কথা ঘোষণা করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে সংস্কৃত মহাভারতের আখ্যানাংশকে "কুরুপাণ্ডব" নামে সংকলিত করিয়ে তার ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে-বাংলা-রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভা.ার প্রভাবান্বিত, তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলা ভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

এইভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতানুশীলনের গুরুত্বের কথা সর্বদাই স্বীকার করে গেছেন। ফলে, তাঁর কাব্যসাধনায় ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত রসধ্বনিই মর্মরিত হয়ে উঠেছে। তাই, প্রতীচ্য জগৎ সংস্কৃতাশ্রিত ভারতীয়-সাধনার প্রমূর্ত বিগ্রহ রূপেই রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করেছে। তাঁর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মনীষী Sten Konow-র শ্রদ্ধাঞ্জলিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"It was an Indian poet who at last opened the eyes of the West. Through William Jones' translation of Kalidasa's Sakuntala Europe came to know something about India's soul, about the ideals, the aims, and the aspirations of the people of India. And this led to a keen in interest in India, her history and civilization.

It was, however, chiefly ancient India which attracted the interests of the West. Kalidas was the poet, and the ancient seers and thinkers were the last and noblest product of India's genius.

Even when modern Indians come to play a role in the spiritual development of the West, it was chiefly as interpreters of the wisdom of the past that they were greeted and admired.

Then came the day when another Indian poet conquered the West. This time it was not one of by gone times, but one who lived and sung in modern India, whose tune was that of the Indian landscape, the Indian river, the Indian forest and the Indian village of to-day.

Again the West listened and marvelled. It found the same authentic beauty, the same sublime flight of thought as in Kalidasa's immortal works: the old spirit was still alive."

(The Golden Book of Tagore, P. 130)

সে যুগের অপর মনীষী স্বামী বিবেকানন্দেরো ছিল "বেদ" প্রচারে এবং "সংস্কৃত" শিক্ষায় গভীর আগ্রহ। শৈশবে মুগ্ধবোধের শ্লোক কণ্ঠস্থ করে তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন। মৃত্যুর দিনও সকালে অসুস্থ অবস্থায় তিনি গুরু

তাঁদের পড়িয়েছেন পাণিনি। সংস্কৃত ভাষণে এবং রচনায় তিনি ছিলেন সুদক্ষ। সর্বজনীন শিক্ষায় সংস্কৃতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেবার জন্য তিনি বহুবার কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। চিঠিপত্রও অনেক সময় তিনি সংস্কৃতেই লিখতেন। স্বরচিত স্তোত্রাবলী এবং পত্রাবলিতে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক রচনা শক্তির দুর্লভ স্বাক্ষর বিদ্যমান। এই সম্বন্ধে স্বামীজীর রচনার দুয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। অনবদ্য শ্লোকে তিনি পরমহংসদেবকে বন্দনা করছেন—

"আচণ্ডাল-প্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ
লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকী
প্রাণবন্ধো।
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া
যো হি রামঃ॥ ১
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং।
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতি সহজামন্ধ
তামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ
সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো
রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥"

সুন্দর সংস্কৃতে তিনি শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে পত্র লিখছেন—

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শুভমস্তু। আশীর্বাদ প্রেমালিঙ্গন-পূর্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরম্। অচলগুরোহিমনিমণ্ডিত শিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাঽপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতা ইত্যনুভবামি।------
তব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্নৈব কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত। সম্মুখে শত্রবো মহামোহরূপাঃ। ---অগ্রগাঃ ভবত অগ্রগাঃ হে বীরাঃ; মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপম্ অজ্ঞানাম্ অভীরভীতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি।

—তবৈকান্ত শুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ
(পত্রবলী ২—১০০)

স্থিতধী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগে বংকিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর গুরুস্থানীয় যূথপতি। ইংরেজী বিদ্যায় নিষ্ণাত এবং ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার তৎকালীন নিয়ামক এই মনীষী (প্রথম ভারতীয় ডি-পি-আই) তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ উৎসর্গ করে যান শুধু সংস্কৃত শিক্ষার জন্য। বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড, বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী তাঁরই দানে এখনো পরিচালিত হচ্ছে। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় বিদ্যায় তিনি ছিলেন সুনিষ্ণাত। সমাজশাস্ত্রী ভূদেবের "সামাজিক প্রবন্ধের" সমালোচনা করে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৩ সনের বার্ষিক অধিবেশনে তৎকালীন লেফ্টানেণ্ট গবর্নর Sir Charles Elliot বলেছিলেন—

'Not a single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a brahmin of the old class in the formation of whose mind the Eastern and Western philosophy have had an equal share.'

অজ্ঞতাবশত আজকাল ভূদেবকে কেউ কেউ প্রগতিবিমুখ মনে করলেও বিনয়কুমার সরকারের মতো খাঁটি প্রগতিবাদী মনীষীর ভূদেব সম্বন্ধে অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

"ভূদেবের সঙ্গে আমার প্রাণে প্রাণে মিল আছে। তাঁকে আমি খাঁটি স্বদেশসেবক, স্বাধীনতার পূজারী, স্বরাজসাধক বিবেচনা করি। ভূদেব চিরকাল আমার প্রণম্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোন বাঙালীর পক্ষে যতদূর চরমপন্থী হওয়া সম্ভব ভূদেব প্রায় ততদূর গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকেও আমি ভূদেবের কোঠায় ফেলি। সেই যুগের কোন বঙ্গসন্তানকে এই দুজনের চেয়ে বড় বিবেচনা করা আজও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই দুজনই আমার সমানভাবে পূজাস্থান।"

—বিনয় সরকারের বৈঠকে—২য়-৬৮।

এমন প্রগতিবাদী দূরদর্শী ভূদেবের সংস্কৃত জ্ঞান এবং সংস্কৃত প্রচারের আগ্রহ চিরস্মরণীয়। তিনি প্রায়ই সংস্কৃতেই পুত্রদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে "অধি-ভারতী" নামে অন্নদানরতা মাতৃরূপে তিনি বন্দনা করেছেন সংস্কৃতে।

"মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থাম্।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতসমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাম্॥
—হিন্দুকণ্ঠহার।

হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে
নীলাম্বুলীলাঙ্কিতা
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরংগিণী সুরধুনী
পীযূষনিঃষ্যন্দিনী।
সূর্যেন্দুপ্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎ
প্রালেয় মৌলিস্বনা
সৌম্যা স্যাদ"ধিভারতী" ভয়হরা
নিত্যান্নদা শান্তয়ে॥"
—পুষ্পাঞ্জলি।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের বীজ এই স্তোত্রেই রয়েছে নিহিত। বঙ্কিমচন্দ্রেরও সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র", "অনুশীলন" এবং সর্বোপরি "গীতার" অনুবাদে প্রকটিত। শেষজীবনে তো তিনি সংস্কৃতশাস্ত্র মননেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

Society for higher training of young men"-এ ১৮৯৪ সনে তিনি "বেদের" ওপর দান করেন গবেষণামূলক এক দীর্ঘ ভাষণ।

আই-সি-এস রমেশচন্দ্র দত্ত অনলস পরিশ্রমে সংস্কৃত শিখে অনুবাদ করেন

সংস্কৃতের আদি গ্রন্থ "ঋগ্বেদ," নয় খণ্ডে সম্পাদনা করেন "হিন্দুশাস্ত্র"। অপরিমেয় সংস্কৃত জ্ঞান এবং অসীম প্রীতি ভিন্ন এইসব দুরূহ কর্ম কখনো সম্ভব নয়। পদার্থবিজ্ঞানী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈদিক সাহিত্য মন্থন করে রচনা করেন অনবদ্য গ্রন্থ "যজ্ঞকথা", অনুবাদ করেন "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"।

সেকালের হিন্দুসমাজের বিখ্যাত নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন সংস্কৃতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও সংরক্ষক। বহু চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিপুল অর্থ ব্যয় করে চল্লিশ বৎসর ধরে অনলস অধ্যবসায়ে তিনি সম্পাদন করেন "শব্দকল্পদ্রুম" নামক বিশাল সংস্কৃত অভিধান। এই মহান্ সারস্বত কর্মের জন্য মহামনস্বী মোক্ষমুলার তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

"সারদামঙ্গলের" কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে "বিহারীলাল খুব ভাল সংস্কৃতজ্ঞ"। "পলাশীর যুদ্ধের" কবি নবীনচন্দ্র সেন "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" এবং "গীতার" পদ্যানুবাদ করেন। সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণে "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" - "প্রভাস" মহাকাব্যত্রয় তিনি রচনা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ, সেকালের একমাত্র তিব্বতবিশেষজ্ঞ শরৎচন্দ্র দাসের ভ্রাতা নবীনচন্দ্র দাস সংস্কৃত মহাকাব্যাবলীর বাংলা পদ্যে অনুবাদ করে "চট্টলধর্মমণ্ডলী"র দ্বারা "বিদ্যাপতি" উপাধিতে ভূষিত হন। সেকালের শিক্ষানেতা এবং সমাজ-সংস্কারক রাজনারায়ণ বসুরও সংস্কৃতজ্ঞান লক্ষণীয়। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা সুবিদিত।

পুরাতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত। চৈতন্যচন্দ্রোদয়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, অগ্নিপুরাণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, ললিতবিস্তর, বায়ুপুরাণ, নীতিসার, বৃহদ্দেবতা প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ এই মনীষী ছিলেন বাংলা দেশে প্রাচ্যতত্ত্বগবেষণার অন্যতম পুরোধা।

আর এক তরুণ মনীষী রাজা কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর "বিদ্যোৎসাহিনী" রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় করান সংস্কৃত নাটক "বেণীসংহারের" অনুবাদ। স্বয়ং অনুবাদ করেন গীতা, বিক্রমোর্বশীয়ম্ এবং মালতীমাধবম্। সংস্কৃত মূল মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়ে তিনি অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।

যে-সকল ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী মনীষী সে যুগে আমাদের দেশে নবজাগরণের নায়ক ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের সংস্কৃত জ্ঞান ও প্রীতির কথা উল্লিখিত হ'ল। এছাড়া ইংরেজীবিদ্যায় অপ্রবিষ্ট, সনাতন ধারায় শিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিরাট গোষ্ঠী সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের ক্ষুরধার মনীষা এবং অনন্যসাধারণ অবদানের কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেছি। বিশেষত, সেদিন বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম এবং সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধনার কথা বিস্মৃত হ'লে অকৃতজ্ঞতাজনিত অপরাধ হবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

লিখে রাখো

ছন্দা গুহরায়

ইতিহাস স্তব্ধ যেন আজ ;
অতীতের স্বর্ণাক্ষর অসাবর্ণ। ঐতিহ্য পড়েছে খ'সে।
ঘটনাবহুল এদিন, তবু শ্লথগতি তার—নেই কোন কাজ।
বসন্তের প্রমূর্ত রজনী কাঁদে জনতার রোষে!
মৃত্যু সে—মৃত্যুর নিশানা শুধু দেখি চারিধার ;—
প্রাণহীন দেহটাকে শকুনিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
সারমেয়র দল লোলুপ দৃষ্টি মেলে চায় বার বার ;
বোবা কান্না গুমরে মরে ব্যর্থ নিরাশায়!
ন্যায়-নীতি হয়েছে ভ্রষ্ট। সত্য ও সততা সে পায় না স্বীকৃতি।
জীবনের পেলব পলিতে আজ দেখি রুক্ষ প্রস্তরের সমারোহ।
মনে মনে সবুজের আলপনা গেছে মুছে—এই বুঝি চরম প্রগতি।
প্রাণের প্রণয় সে অন্ধকারে অরণ্যে ঠিকানা হারায় অহরহ।

অজন্তা ইলোরা [illegible] কিংবা কোণারক বন্ধনহীন কাহিনী
পুড়ে হয় ছাই।
সংকীর্ণ দেওয়ালের মাঝে কাঁপে বন্দী রুদ্ধ যত শ্বাস ;
অমৃতের ভাণ্ডে [illegible] তুলিকা দিয়ে কালের [illegible]
লিখে রাখো নতুন ইতিহাস।

পোর্সিলেন ও ফ্রেডারিন ব্যুটগার

পোর্সিলেন বস্তুটির সঙ্গে সভ্যসমাজে অপরিচয় কারোরই নেই, কিন্তু তার স্রষ্টার বিচিত্র জীবনকাহিনী হয়তো অনেকেরই অজানা। সে এক বিচিত্র জীবন। আলো আর হতাশার এক অদ্ভুত সমন্বয়। সফলতা আর যন্ত্রণার বৈচিত্র্যময় সঙ্গম। সেই জীবনের অধিকারী যিনি তাঁর নাম আজ ইতিহাসে অমর। তিনি জোহান ফ্রেডারিন-ব্যুটগার। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর উদ্দেশে অবিরাম ধারায় কৃপাবর্ষণ করেন নি। অসংখ্য ফাল্গুনের সুরভি নেওয়ার, অজস্র শ্রাবণের ধারাস্নাত হওয়া। অগণিত বৈশাখের উত্তাপে জীবনকে তাপদগ্ধ করে তোলা তাঁর ললাটলিপিতে ছিল না।
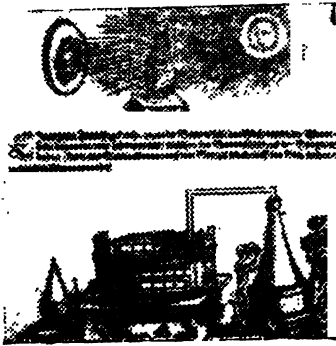
পোর্সিলেন উৎপাদক যন্ত্র—সেকালে

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সময় হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে এসে গেল পরপারের ডাক। সে ডাকে সাড়া না দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। স্বল্পপরিসর জীবনে যে সৃষ্টির নিদর্শন তিনি রেখে গেলেন সেই সৃষ্টি শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধান অতিক্রম করেও আজও ইতিহাস তাঁকে অমর করে রেখেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশ। ১৬৮৫ সাল। কলকাতা মহানগরীর জন্ম হতে তখনও পাঁচ বছর বাকী। ময়ূর সিংহাসন তখন বাদশাহ আলমগীরের অধিকারে। প্লেজ অঞ্চলে তাঁর জন্ম। খুব অল্প বয়সে দেখা গেল রসায়নশাস্ত্রে তাঁর

জোহান ফ্রেডারিন ব্যুটগার

অনুরাগ ক্রমশই দানা বেঁধে উঠেছে। ব্যুটগারের পিতা ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার। তিনি অফুরান উৎসাহ যোগাতেন ব্যুটগারকে গণিতজ্ঞ হওয়ার জন্য বিরাট বিরাট কল্পনায় ডুবে থাকতেন ব্যুটগার। তাঁর উজ্জ্বল নীল চোখ দুটিতে মেশানো থাকত রাশি রাশি স্বপ্ন।

বারো বছর বয়েস হল। বার্লিনে এসে এক চিকিৎসকের কাছে শিক্ষানবীশ হলেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত গবেষণা করতেন, লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ধাতু থেকে সোনা সৃষ্টি করা। অবশ্য এ লক্ষ্য তাঁর সফলতার স্পর্শ শেষ পর্যন্ত পায় নি।

ব্যুটগারকে পালিয়ে থাকতে হল সম্ভ্রান্ত সমাজ থেকে। মানুষের লোভের শেষ নেই। লোভীর দল উত্যক্ত করতে থাকে—সোনা তৈরী করে দাও, পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া উপায় কি ব্যুটগারের। স্যাক্সনিতে ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা আরম্ভ হয়ে গেল। আগস্ট দ্য স্ট্রং তাঁকে কয়েদ করলেন। ১৭০২ সালে একটি দুর্গে তাঁকে বন্দী করে রাখা হল। কড়া

পোর্সিলেন নির্মিত দ্রব্যের একটি নিদর্শন

পাহারায় রাখা হল তাঁকে। আদেশ হল হয় সোনা তৈরী করার ফর্মুলা দাও নয়তো তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে। কাজের জন্য সহকারী দেওয়া হল, তাদের উপর নির্দেশ দেওয়া হল সতর্ক দৃষ্টি রাখবে যাতে কোনরকমে পালাতে না পারে।

এরই মধ্যে একদিন প্রকৃত ব[...] একজনকে পেয়ে গেলেন ব্যুটগার। তিনি ছিলেন কাউণ্ট ওয়ালথার এরেনফ্রে[...] শারনহাস। ইনি ছিলেন একজন উঁ[...]দরের বৈজ্ঞানিক, প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞ প্রখ্যাত পদার্থবিদ। তাছাড়া একটি কাঁ[...]

পোর্সিলেন উৎপাদক যন্ত্র—একালে

ও লোহার কারখানার মালিক ছিলেন তিনি। সুপার-ডাইমেনসাল কনকেভ মিরর এবং লেনসের আবিষ্কর্তা হিসাবে ইনি ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সংবন্ধুটিই তাঁর মাথায় পোর্সিলেনের চিন্তার বীজ বপন করেন। এক নতুনের দিকে কাউণ্ট তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কাউণ্ট মারা গেলেন ১৭০৮ সালে।

ব্যুটগার সফল হলেন 'রেড স্টোনওয়্যার' সৃষ্টিতে। এই বস্তুর পরবর্তীকালে নাম হল 'ব্যুটগার স্টোনওয়্যার'। লালমাটি আর অতি সূক্ষ্ম পাউডারের সংমিশ্রণে এর সৃষ্টি। জিনিষটি খুব দৃঢ় এবং লোহাতে এর ঘায়ে দাগ কাটে না। এই বস্তুর সঙ্গেই

ওটেন ও সুভাষচন্দ্র

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

য-কোন যোদ্ধার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি স্থিরীকৃত হয় তাঁহার প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য ও চরিত্রবলের অনুপাতে। যিনি যতবড় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে পারেন তিনি তত বেশি যশস্বী হন। অধ্যাপক ওটেনের সহিত সুভাষচন্দ্রের যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র নেতাজীর ব্যক্তিগত জীবনে নহে, পরন্তু জাতীয় জীবনেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি ধীর গম্ভীর ও সংযত প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন। হঠকারিতার প্রভাবে একটা অন্যায় কাজ করিবার মতন পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি যখন কলেজে পড়েন তখন ভগিনী নিবেদিতার Aggressive Hinduism-য়ের বাণী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছিল। নীরবে বিদেশীর কাছ হইতে অপমান সহ্য যে শুধু কাপুরুষতা নহে, পরন্তু নৈতিক মেরুদণ্ড বিহীনতার পরিচায়ক, সে কথা তরুণ সুভাষচন্দ্র মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অধ্যাপক ওটেনের গায়ে হাত তুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই অধ্যাপকটির পুরা নাম হইতেছে এডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন তিনি গ্রীক্ ও রোমান্ সাহিত্যে এবং ইতিহাসে সমান পারদর্শিতা দেখাইয়া ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে প্রবেশ করেন ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ লইয়া কর্মজীবন সুরু করেন। পরে তিনি শিক্ষাবিভাগের অধিনায়ক, ডাইরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত Anglo-Indian Literature, Glimpses of India's History এবং European Travellers in India গ্রন্থগুলি দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে উচ্চস্তরের কবিও একথা আমার জানা ছিল না। আর ইহাও আমি অবগত ছিলাম না যে তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন।

আমার আচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডি· লিট্· এল্· এল. ডি বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়ের নিকট ঐ দুইটি খবর পাইলাম। তিনি আরও বলিলেন যে, ওটেন সাহেবের তিনি প্রথম ভারতীয় ছাত্র, এবং তিনি ওটেনকে বাংলা ভাষা শিখাইয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবার কয়েক মাস পূর্বে ওটেন তাঁহাকে বাংলা ভাষায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহাও আমাকে তিনি দেখাইলেন। সুন্দর বাংলা হস্তাক্ষর, সাধুভাষায় লেখা আন্তরিকতাপূর্ণ পত্র কিন্তু নামটি সই ইংরাজীতে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন এখন ওটেনের বয়স ৮৫ বৎসর, আর তাঁহার বয়স ৭৬। ষাট বছর আগে উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইলেও আজও তাঁহারা বছরে দুই-তিনখানি পত্র বিনিময় করেন, আর এক-একখানি চিঠি প্রায় কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী হয়, উভয় পক্ষেরই। আজকালকার দিনে ছাত্র-অধ্যাপকের মধ্যে এমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক কল্পনা করাও কঠিন।

শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু বলিলেন গত বৎসর ওটেন সাহেব তাঁহাকে তাঁহার স্বরচিত এক কবিতার বই উপহার পাঠাইয়াছেন ও তাহাতে সুভাষচন্দ্র বসু শীর্ষক একটি কবিতা আছে। এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত কৌতূহল জাগিল। যাঁহার হাতে সাহেব মার খাইয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে তিনি সুদীর্ঘকাল বাদে কি লিখিয়াছেন দেখিবার জন্য আকুল হইয়া আমার আচার্য-

সুভাষচন্দ্র

দেবকে সেই কবিতাগ্রন্থ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। তিনি নিজে যখন খুঁজিয়া পাইলেন না তখন তাঁহার সহকারীকে ডাকাইলেন। কয়েকটি চামড়ার স্যুটকেস্ হাতড়াইবার পর ছোট্ট বইখানি মিলিল। নাম Song of Aton and Other Verses. ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সেকেন্দ্রাবাদে মুদ্রিত। ওটেন সাহেব ইংলণ্ডে বসবাস করেন, অথচ তাঁহার বই এদেশে কেন ছাপা হইল তাহার কোন কারণ আচার্যদেব বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি বইখানি বিলাত হইতে জাহাজী ডাকে পাঠাইয়াছেন ও বইয়ের সঙ্গে পাঠানো চিঠিও তাঁহার সাক্ষ্য দিল।

ঐ কাব্যগ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কবিতাটি আছে-

কাওলিন মিশিয়ে যার সৃষ্টি হল তারই পরিণতি পোসিলেন। দৃঢ় এবং শাদা।

১৭০৯ সালে স্যাক্সবিতে এই বস্তুর জন্ম। রাজার কাছে খবর গেল। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াতে হল না বৃ্যটগারকে। রাজাদেশ এল—কাজ চালিয়ে যাও, আরও অনেক কিছু দাও জাতিকে। তোমার সাধনায় দেশের প্রগতিকে উৎকর্ষে নিয়ে যাও। কিন্তু রাজার এ আদেশ পালন করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। কারণ রাজার— রাজার ডাক যে ইতিমধ্যে পৌঁছে গে তাঁর কাছে। সে তারিখটি হল ১৭: সালের ১৬ই মার্চ। 'তের' সংখ্যাটা অপয়া—সেই ধারণাটাই যেন আ একবার প্রমাণিত হল। —সুরা

Subhas Chandra Bose
Obiit 1945

Did I once suffer, Subhash, at your hand?
Your patriot heart is stilled! I would forget!
Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty, Icarus—like your courage planned
To meet the skies, and storm in battle set
The ramparts of high Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.
High Heaven yielded, but in dignity
Like Icarus, you sped towards the sea
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire that brightly glowed
In India's mighty heart and flamed and flowed
Forth from her Army's thousand victories won!

কবিতাটির প্রতি ছত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি গ্রীক্‌ আখ্যায়িকার আইক্যারাসের সহিত সুভাষচন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। আইক্যারাস ছিলেন ডিডালাসের পুত্র। তিনি যখন ক্রীট দ্বীপ হইতে উড়িয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পিতা তাঁহার গায়ের সঙ্গে গালা দিয়া তৈয়ারী দুইখানি পাখা জুড়িয়া দিয়া বলিয়াছিলেন তিনি যেন বেশী উপরে উঠিবার চেষ্টা না করেন। আইক্যারাস পিতার এই উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এত উপরে উঠিয়াছিলেন যে, সূর্যের তাপে তাঁহার পাখা দুইখানি গলিয়া গিয়াছিল ও তিনি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ঐ সমুদ্র তাঁহার নাম অনুসারে আইকেরিয়ান সাগর নামে এখন পরিচিত। সমুদ্র হইতে তাঁহার মৃতদেহ যখন তীরে ভাসিয়া আসিল তখন হিরাক্লিস স্বয়ং তাহা কবরস্থ করেন। গ্রীক্‌ উপকথা অনুসারে আকাশে উড়িবার প্রথম উদ্যম করেন আইক্যারাস্‌।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ওটেন যখন সংবাদপত্রে পড়িলেন যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতা সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন তখন তাঁহার স্মৃতিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা ভাসিয়া উঠিল। তিনি প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করিলেন—"সুভাষ! তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম? তোমার সেই স্বদেশভক্ত হৃদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! একথা যে ভুলিতে পারিলেই ভাল হইত। আজ মনে পড়ে যে তোমার দেশে তুমি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলে তাহা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সহিত আইক্যারাসের মতন আকাশে উঠিয়া অমরাপুরীর দুর্গ-প্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙিয়া ফেলিবার দুর্জয় সাহসময় সংকল্প করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক এবং রূঢ় রক্তাক্ত দাবি করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট মিশন পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি তোমাদের দাবি মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছিল: কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে আইক্যারাসের মতন সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল। তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলিয়া গেল। ঐ তাপ হইতেছে ভারতমাতার বিশাল হৃদয়ের যে স্বদেশভক্তির আগুন প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে ঐ দীপ্তি ভাস্বররূপে প্রবাহিত হইয়াছিল।

ভারতবাসীর মুক্তি অভিযান ও তাহার অদ্বিতীয় অধিনায়কের প্রতি কি অকপট শ্রদ্ধার্ঘ্য একদা নির্যাতিত ওটেন সাহেব প্রদান করিয়াছেন। যে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র ওটেনকে ধাক্কা মারিয়া ভূপাতিত করিয়াছিলেন সে সময় একজন উচ্চপদস্থ খাস ইংরাজের গায়ে প্রকাশ্যে হাততোলা শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক ছিল। সেই লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও ওটেন যে কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক। বোধ হয় সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব ত্যাগ, অনন্যসাধারণ সংগঠনী প্রতিভা ও অভূতপূর্ব সাহস ওটেনের ভাবরাশিকে উদ্রেক করিয়া কবিতার আকার পরিগ্রহ করিয়াছে।

—কাল ও কলম

নিবেদন

কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মিথ্যেই আমি ভাগ্যের দ্বারে
মাথা কুটে কুটে মরেছি।
বুঝি না পাওয়ার যাহা তাই চেয়ে চেয়ে
দু'হাতে ভিক্ষা মেগেছি।
কবে বাসনা-রঙীন কামনা-মুকুল
ধরার ধূলায় ফুটে হবে ফুল
তারি প্রত্যাশে আশা-তরঙ্গে
নয়নের বারি ফেলেছি।
অমোঘ নিয়তি,
অলক্ষ্যে বসি অকরুণ হাসি হেসেছে,
আর্ত, আকুল অন্তরে মোর
ব্যর্থতা-শর হেনেছে।
তীব্র-কঠিন আঘাতে তোমার
মম মুগ্ধ চেতনা জেগেছে,
স্বপ্ন-বিলাস ভেঙে গেছে তার
রূঢ় বাস্তবে জেনেছে।
এবে নীরব নম্র-নিবেদন শুধু
হে মোর রাজাধিরাজ—
তব দক্ষিণ-পাণির প্রসন্ন-পরশে
ভরুক রিক্ত আমার

রামায়ণে বানরসংস্কৃতি

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই বিশ্রুত মহাকাব্যে প্রাচীন ভারতের অন্তরাত্মার অন্তরঙ্গ উন্মোচন ঘটেছে। প্রাচীন ভারতের আর্যসংস্কৃতির চিত্রাঙ্কনে এই দুই মহাকাব্য অমূল্য দলিল স্বরূপ। কিন্তু শুধুই আর্যসংস্কৃতি নয়, তার পাশাপাশি অনার্য এবং অন্যান্য উপজাতিদের সমাজ-সংস্কৃতিও এই দুই মহাকাব্যের আধারে অমর চিত্ররূপ লাভ করেছে। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত বানরসংস্কৃতি প্রাচীন আর্যকবির এই উপজাতীয় সংস্কৃতি-চিত্রণেরই নিদর্শন।

রামায়ণের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বানর সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বনবাসী রামচন্দ্রের সহচর হিসাবে তাদের ক্রিয়াকলাপ অতি ব্যাপক ও আন্তরিকতাপূর্ণ। লঙ্কার রাক্ষসদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় রামায়ণ থেকে পাওয়া যায়, ততটা না হলেও বানরদের জীবনধারণ পদ্ধতি ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নিখুঁত বিবরণ বাল্মীকির লেখনী অতি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে রামায়ণই প্রধান এবং প্রথম পথপ্রদর্শক। বানর বলতে বর্তমানে আমাদের মনে যে অদ্ভুত জন্তুটির ছবি প্রতিভাত হয়, রামায়ণের বানর সম্প্রদায় তার থেকে সবদিক থেকেই ভিন্ন। চেহারা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি সকল দিক থেকেই তারা তৎকালীন মানবসমাজের সমকক্ষতার দাবী করতে পারে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে বলা হয়েছে—ভগবান বিষ্ণু দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করে রামরূপে জন্মগ্রহণ করলে, ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাদের বললেন—বিষ্ণুকে সাহায্য করার জন্য তোমরা বানররূপী পুত্রদের সৃষ্টি কর। ব্রহ্মার আদেশেই দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলেই বলবান ও বনচারী বানরদের সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারে তারা হল মায়াবী, বীর, বায়ুর মত গতিশীল, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিষ্ণুর মত পরাক্রমশালী, অন্যের অবধ্য, বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে সচেতন, দিব্যশরীরধারী এবং দেবতাদের মত সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ। বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান যে দুজন—বালী ও সুগ্রীব—তাঁদের সৃষ্টি করলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। আর হনুমান সৃষ্ট হলেন বায়ুর ঔরসে। বানরদের সকলেই হাতী ও পর্বতের মত বিশাল শরীরবিশিষ্ট। তাদের 'কামরূপী' বলেও অভিহিত করা হয়েছে, কারণ, তারা ইচ্ছামত শরীর ধারণ করতে পারত। তাদের গায়ের রঙ সোনার মত বলে অনেক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে।

বানর সম্প্রদায়কে রামায়ণে 'হরিগণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'হরি' বানরের সমার্থবাচক শব্দ। এদের তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল—ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল ও বানর। গোলাঙ্গুল শ্রেণীর বানরদের 'গোপুচ্ছ'ও বলা হত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বানর সম্প্রদায়ই ছিল সভ্য ও উন্নত। আবার 'স্খাঃ' নামে একধরণের বানরের কথা বলা হয়েছে—যাদের গায়ের রঙ ছিল কালো। পুরুষ-বানরদের লাঙ্গুলের উল্লেখ আছে কিন্তু স্ত্রী-বানরদের সম্বন্ধে এ রকম কোনও উল্লেখ নেই।

বিভীষণ এক জায়গায় বানরদের এই লাঙ্গুল সম্বন্ধে বলেছেন, 'কপীনাং কিল লাঙ্গুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্'—বানরদের এই লাঙ্গুল একপ্রকারের 'অলঙ্কার'। এ থেকে অনেকে অনুমান করেছেন প্রকৃতপক্ষে বানরেরা লেজহীন ছিল, কিন্তু অলঙ্কার হিসাবে পুরুষ-বানরেরা কৃত্রিম লাঙ্গুল ধারণ করত। সুগ্রীবের রাজ্যের বানরদের মধ্যে প্রচলিত আচার-ব্যবহার বর্তমান কালে গঞ্জাম প্রদেশের শবর জাতিদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এই শবরদের মধ্যে এক শ্রেণী অলঙ্কার হিসাবে কৃত্রিম লাঙ্গুল ব্যবহার করে।

এই শবরদের লাঙ্গুল সম্বন্ধে মিঃ এডগার থার্সটন বলেছেন—

"A tribe of Savaras is called Arsi or Arisi which means a monkey in the Savara language. Their Oriya neighbours call them 'Lambo Lanjiya' (long-tailed) which is the Oriya translation of the Savara word 'Arsi'." (Castes and Tribes of South India).

বানরদের স্বভাবের চঞ্চলতার কথা রামায়ণের অনেক জায়গায় আভাসে-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। হনুমান নিজেই নিজের জাতি সম্বন্ধে বলেছেন—'নিত্যমস্থিরচিত্তা হি কপয়ঃ'—অর্থাৎ বানরেরা সর্বদাই অস্থির চিত্ত। আবার তাদের স্বভাবের প্রচণ্ডতার কথাও বলা হয়েছে। মানুষের মত বানরেরাও ছিল অনুভূতিপ্রবণ। সুখ ও দুঃখের প্রকৃত অনুভূতি তাদের মধ্যেও ছিল গভীর। হনুমান লঙ্কা থেকে যখন সাফল্যের সঙ্গে ফিরে এল বানরেরা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। তারা সকলে হনুমানকে ঘিরে বসল এবং নানা ফলমূল সংগ্রহ করে এনে তাকে উপঢৌকন দিল। আবার ইন্দ্রজিতের দ্বারা নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে রাম ও লক্ষ্মণ যখন অচেতন হয়েছিলেন তখন বানরদের শোকাকুল অবস্থার দৃশ্য অতি করুণ। রাম-লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে ভীত সুগ্রীবের চোখ দুটি বাষ্পাবেগে অবরুদ্ধ হয়েছিল। বানরেরা ভীত-চঞ্চল হয়ে পরস্পর কানে কানে এই বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা

আরম্ভ করেছিল। তারপর বিভীষণের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে তারা শান্ত হয়েছিল।

—যুদ্ধকাণ্ড : ৪৬ অধ্যায়।

বানরেরা যূথবদ্ধ হয়ে চলতে ভালবাসত। সীতার অন্বেষণের সময় তারা দলবদ্ধ হয়েই বনে বনে ঘুরে বেড়াত। তাদের দলপতি অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতির নির্দেশ তারা সশ্রদ্ধচিত্তে মেনে চলত। দলপতি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে চালিত হয়ে তারা অনেক দুষ্কর কাজ সাধন করতে পারত।

বিভীষণ রাবণকে সাবধান করে বলেছিলেন—'পর্বতসদৃশ দেহধারী বানরেরা যদি একসঙ্গে লঙ্কা আক্রমণ করে, তবে খুব বিপদের সম্ভাবনা। অতএব রামচন্দ্রকে সীতা ফিরিয়ে দিন।'

—যুদ্ধকাণ্ড : ১৪ সর্গ।

সারণ রাবণের কাছে বানর সেনাদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"বৃতঃ কোটি সহস্রেণ হরীণাং সমবস্থিতঃ।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং সেনানীকেন মর্দিতুম্।।

—যুদ্ধকাণ্ড : ২৭ সর্গ : ২৪ শ্লোক।

এই (ক্রথন নামক) বীরবানর সহস্রকোটি বানর পরিবৃত হয়ে নিজের সেনাদের দ্বারাই লঙ্কানগরী দলন করতে ইচ্ছা করছে।

কিষ্কিন্ধ্যা প্রদেশই ছিল বানরদের প্রধান বাসস্থান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বানর বিভিন্ন স্থানে বসবাস করত। সুনির্মিত ঘরবাড়ী ছাড়া পাহাড়, বন, নানাপ্রকার বড়বড় গাছ প্রভৃতির উপরও তাদের বাস ছিল। সুগ্রীবের অধীনে প্রচুরসংখ্যক বানর-সচিব ছিল। এদের সংখ্যা—এক হাজার শঙ্কু, একশ' বৃন্দ ও একশ' হাজার কোটি। এরা সবাই কিষ্কিন্ধ্যাবাসী এবং দেবতা ও গন্ধর্বদের ঔরসে জাত।

—যুদ্ধকাণ্ড : ২৮ সর্গ।

রামায়ণে বর্ণিত বানর সম্প্রদায় কয়েকটি 'যূথে' বিভক্ত ছিল। এই যূথের যিনি নেতা তাঁকে যূথপতি বা যূথপ বলা হত। গবাক্ষ, নীল, ক্রথন প্রভৃতি বানরকে যূথপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এঁরা আবার যাঁদের অধীনে তাঁদের বলা হত 'যূথপযূথপ'। সন্নাদন নামে বানরকে এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। এদের উপর যাঁর আধিপত্য থাকত তাঁকে বলা হত—'মহাযূথপযূথপ'। জাম্ববান এই পদে আসীন ছিলেন।

—যুদ্ধকাণ্ড : ২৭ সর্গ।

এঁদের সবার উপরে ছিলেন রাজা, রাজার কাছে সব বানরই আনুগত্য স্বীকার করত। রামায়ণের বানররাজ ও বানর সম্প্রদায়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে ডঃ শান্তিকুমার নানুরাম ব্যাস বলেছেন—

"Every Vanara owed personal allegiance to the king. In times of peace he worked for him in the homeland, while in times of war he was called upon to fight for him in far-off lands, personal element being constantly maintained between the ruler and the ruled. This system is reminiscent of the feudal age of later times, and in this respect the Vanara society resembled ancient Germal society." (India in the Ramayana Age).

বানরদের নৃপতিনির্বাচনের পদ্ধতিটা ছিল প্রধানত বংশানুক্রমিক। বালী বড় ছেলে ছিলেন, তাই তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনিই রাজা হন। বালীর মৃত্যুর পর প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের অনুমতিক্রমে বৈধ উপায়ে সুগ্রীবের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল।

—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড : ২৬ সর্গ।

আবার সুগ্রীবের পুত্র না থাকায় রামের আদেশে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদ যুবরাজপদে বৃত হয়েছিলেন।—

রামস্য তু বচঃ কুর্বন্ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অঙ্গদং সম্পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।।

—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড : ২৬ সর্গ।

সে যুগের বানরদের খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। তবে তারা প্রধানত ফলমূলভোজী ছিল।—

বয়ং বনচরা রাম মৃগমূলফলাশিনঃ।

তা ছাড়া ধান্য জাতীয় এক ধরণের শস্যেরও উল্লেখ আছে। উত্তেজক পানীয় দ্রব্য পান করার প্রথা বানরদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা এই পানীয় আস্বাদন করত। বালী-পত্নী তারার সুরা পান করার পর মত্তাবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে কয়েক যায়গায়। এক যায়গায় তাঁকে বলা হয়েছে— 'সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী প্রলম্বকাঞ্চী—মদ পান করার পর পদস্খলন হচ্ছে, চোখ দুটো বিহ্বল এবং কাঞ্চী ঝুলে পড়েছে। আর এক যায়গায় তাঁকে মদ্য পান করার জন্য লজ্জাহীনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।—

'সা পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা'।

—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড : ৩৩ সর্গ।

রামায়ণে বর্ণিত বানরদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর বানরেরা অলঙ্কার ও জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরত। একসঙ্গে তারা একাধিক পোষাক পরত বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে, রামের কাছে সুগ্রীব বালী সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন।

এবমুক্ত্বা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ।
তদা নির্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ।।

—কিষ্কিন্ধ্যা : ১০ সর্গ।

বালী এই কথা বলে নির্ভয়ে আমাকে একবস্ত্রে নির্বাসিত করেছিল। সীতা যখন অশোকবনে প্রথম হনুমানকে দেখলেন তাকে 'অর্জুন বস্ত্র' (সাদা পোষাক) পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলেন। রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বানরেরা বহুমূল্য অলঙ্কার ধারণ করত। বালী ও সুগ্রীবের গলায় সোনার হার ছিল এবং অন্যান্য অঙ্গে বহু বিচিত্র অলঙ্কারের সমাবেশ

ছিল। রাজপ্রাসাদের নারীরাও ছিল মূল্যবান অলঙ্কারভূষিতা। বানরেরা নিজেদের পোষাক নিজেরাই পরত। জুতোর ব্যবহারও তাদের জানা ছিল। সুগ্রীবের অভিষেকের সময় যে যে জিনিষের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের মধ্যে একজোড়া জুতাও ছিল।

অক্ষতং জাতরূপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুং মধুসর্পিষী।
দধি চর্ম চ বৈয়াঘ্রং পরার্ধ্যৌ চাপ্যুপানহৌ॥

—কিষ্কিন্ধ্যা : ২৬ সর্গ।

'আতপ চাউল, স্বর্ণ, প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম ও মূল্যবান পাদুকাযুগল—এই সকল দ্রব্য অভিষেকের জন্য সংগ্রহ করা হইল।'

আচার-ব্যবহারের দিক থেকেও তৎকালীন বানরসমাজ ছিল খুব উন্নত। সম্মানীয়কে সম্মান দেখানো তাদের চরিত্রের একটি অঙ্গ ছিল। সুগ্রীবের আদেশে রাম-লক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা করার জন্য হনুমান প্রেরিত হলে তিনি ভিক্ষুরূপ ধারণ করে খুব বিনীত হয়ে রামচন্দ্রের সামনে এলেন এবং মনোজ্ঞবাক্যে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, তারপর বিধি অনুসারে রাম-লক্ষ্মণের পূজা করলেন। সীতার কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় হনুমানের ব্যবহার ছিল অতি ভদ্র ও মার্জিত। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৪২ সর্গে দেখি সুগ্রীব করজোড়ে ও অবনত মস্তকে তাঁর শ্বশুর সুষেণের সামনে উপস্থিত হলেন এবং অন্যান্য বানর-শ্রেষ্ঠের কাছে নম্রভাবে এগিয়ে গিয়ে সীতার অনুসন্ধানের জন্য তাঁদের কাছে নিবেদন জানালেন। রাম-লক্ষ্মণের প্রতি সুগ্রীবের আচরণও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অভিষেকের পর সুগ্রীব উত্তমবেশে সজ্জিত হয়ে রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত হলেন এবং হাতজোড় করে অবস্থান করলেন। তাঁকে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়াতে দেখে তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরাও ঐভাবে দাঁড়ালো।

বানরদের নানারকম আচার-অনুষ্ঠান দেখে অনেকে অনুমান করেছেন তারা রামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধ্যায় আসার বহু আগেই আর্যসংস্কৃতির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের বাসস্থান ছিল আর্যদের মতই। বানররাজের প্রাসাদকে ইন্দ্রের প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বড় বড় অট্টালিকা ও সুদৃশ্য রাজপথে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী ভূষিত ছিল। রাজপ্রাসাদের চারিপাশ সু-উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, বড় বড় ফলভর্তি গাছ নগরীর শোভাবৃদ্ধি করত। প্রাসাদের চারিদিকে অস্ত্রসজ্জিত বানরেরা প্রহরী নিযুক্ত ছিল। সুগ্রীবের অন্তঃপুর সোনা ও রূপা নির্মিত বহু খাট ও আসনে ভূষিত ছিল। সেই অন্তঃপুরে সকল সময়েই সুশ্রাব্য সংগীত ও মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা যেত। অন্তঃপুরের মধ্যে রূপযৌবনগর্বিত বহু স্ত্রী শোভা বৃদ্ধি করত। তারা ছিল মালা গাঁথায় নিপুণ এবং নিজেরাও মাল্য ভূষিত ও মূল্যবান পোষাক পরিহিত ছিল।

—কিষ্কিন্ধ্যা : ৩৩ সর্গ।

বানরদের আগুনের ব্যবহারও জানা ছিল। রামের সাথে যখন সুগ্রীবের মৈত্রী হয় তখন অগ্নিসাক্ষী করে তাদের মিত্রতা স্থাপিত হয়েছিল, ঔষধপত্রের ব্যবহারও তারা জানত। ওষুধ হিসাবে তারা গাছের শিকড় প্রভৃতি ব্যবহার করত। তৎকালীন বানরসমাজে সুষেণ ও জাম্ববানকে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণের বানরসমাজ সংস্কৃত ভাষা জানত। হনুমান বেদজ্ঞ ও ব্যাকরণভিজ্ঞ ছিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে হনুমানের কথা শুনে রাম মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—'ইনি বেদজ্ঞ। এঁর কথায় একটিও অশুদ্ধপদ নেই। এঁর বাক্য সন্দেহহীন অর্থ ও অক্ষরযুক্ত এবং শ্রুতিকটু দোষশূন্য। এঁর বাক্য সংক্ষিপ্ত ও সরল এবং স্বরও শ্রুতিমধুর। এইরকম দূতই শ্রেষ্ঠ। কারণ, এইরকম দূত যে রাজার না থাকে তার কাজ কখনো সিদ্ধ হয় না।'

অশোকবনে সীতার সাথে পরিচয়ের আগে ইনি তাঁর সাথে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবেন কি না—মনে মনে চিন্তা করে-ছিলেন। কারণ, সংস্কৃত ভাষায় কথা বললে সীতা হয়তো তাঁকে ছদ্মবেশী রাবণ বলে মনে করতে পারেন। হনুমানকে 'সংস্কারসম্পন্ন' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। তা ছাড়া হনুমান 'সচিবোচিত গুণাবলীতে ভূষিত' ছিলেন। বানরেরা সঙ্গীতের ব্যবহার জানত। রামচন্দ্র বানররাজ পুরীতে "মৃদঙ্গ বাদ্যের সহিত গীতকারী বানরজনের গীত ও বাদিত্র শব্দ" শুনেছিলেন। শরভ নামে বানর অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। জাম্ববান ছিলেন শাস্ত্রবুদ্ধিসম্পন্ন। বানর-স্ত্রীদেরও নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল। বালী-পত্নী তারা অতি বুদ্ধিমতী ও মার্জিত-স্বভাবা ছিলেন। তৎকালীন বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি 'লোকশ্রুতা' বা লোকপ্রসিদ্ধা ছিলেন। তিনি লক্ষ্মণের ক্রোধ শান্ত করার জন্য যেসব কথা বলেছিলেন তা 'বাক্যং মহার্থং পরিসান্ত্বরূপম্'—অর্থাৎ মহান্ অর্থযুক্ত বাক্য এবং লক্ষ্মণের ক্রোধের উপশমের উপযোগী। লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে তারার দীর্ঘ বক্তৃতা তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় দেয়।

যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে তৎকালীন বানরসমাজ ছিল অনেকটা স্বেচ্ছাচারী। সুগ্রীবকে পরাজিত করে বালী সুগ্রীবের স্ত্রী রুমার সাথে একসঙ্গে বসবাস করেছিলেন।

রামচন্দ্র বালীকে আহত করে তাঁকে বলেছিলেন—'এই মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুতরাং ইহার পত্নী তোমার পুত্রবধূসদৃশী। তুমি সুগ্রীবকে জয়করত কামবশবর্তী হইয়া ইহার ভার্যাতে উপগত হইয়াছ। হে বানররাজ, তুমি নিতান্ত কামপরতন্ত্র, সনাতন ধর্মভ্রষ্ট ও পাপাচারী হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা-গমন করিয়াছ। সেই অপরাধে আমি তোমাকে এইরূপ দণ্ড প্রদান করিয়াছি।

—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড : ১৮ সর্গ।

অপরপক্ষে দেখা যায় বালী নিহত হওয়ার পর সুগ্রীব সমস্ত রাজ্যের অধিকারী তো হলেনই, উপরন্তু বালী-পত্নী তারাকেও নিজের করে পেলেন। এই ধরণের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা আন্তরিক

সম্পর্কেরও অভাব ছিল না। বালীর মৃত্যুর পর শোকার্তা তারার করুণ বিলাপ সহজেই মনকে আর্দ্র করে।

বানরেরা সীতার অন্বেষণে যখন নিযুক্ত অঙ্গদকে উদ্দেশ্য করে হনুমানের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়---

'এই বানরগণ স্বীয় পুত্রকলত্রাদির কথা চিন্তা করিতে করিতে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিবে। যখন ইহাদের ভোজন কষ্টকর হইবে, দুঃখদায়ক শয্যায় শয়ন করিবে এবং এই দুরবস্থার জন্য মনের মধ্যে খেদ উপস্থিত হইবে তখনই তোমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।'

---কিষ্কিন্ধ্যা : ৫৪ সর্গ।

বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব তারার ভার গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু বালীপুত্র অঙ্গদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শুধুমাত্র সুগ্রীবের উপরই ন্যস্ত হয়েছিল। পিতৃহীন অঙ্গদের উপর তারার আর কোনও অধিকার ছিল না। এ থেকে মনে হয় যে, তৎকালীন বানরসমাজের মধ্যে বিধবা নারীদের মৃতস্বামীর সম্পত্তি বা সন্তানের উপর কোনও অধিকার থাকত না। বালীর মৃত্যুর পর তারা নিজেই এক জায়গায় বলেছেন---

ন চাহং হরিরাজ্যস্য প্রভবাম্যঙ্গদস্য বা।
পিতৃব্যস্তস্য সুগ্রীবঃ সর্বকার্যেষ্বনন্তরঃ ॥

---এখন বানররাজ্য ও অঙ্গদের উপর আমার কোনও অধিকার নেই। অঙ্গদের পিতৃব্যই সকল বিষয়ের কর্তা।

বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস, বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর ছোট ভাইয়ের উপর তার পুত্রের সর্বময় দায়িত্ব এবং মৃতস্বামীর সম্পত্তিতে ও পুত্রের উপর পত্নীর অধিকারহীনতা প্রভৃতি বিষয়ে তৎকালীন বানরসমাজের সাথে বর্তমান শবরজাতির সমাজের প্রচুর ঐক্য দেখা যায়। সেই কারণে কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন, সুগ্রীব ও তাঁর সম্প্রদায় শবর জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে জি রামদাস তাঁর 'The Aboriginal Tribes in the Ramayana' প্রবন্ধে বলেছেন---

"Since the Vanaras of the Ramayana resemble in dress, customs and manners the **Savaras of to-day, and many of the names of persons, places and objects existing between the Ganges and Lanka are of Savara Origin, it is clear that Sugreeva and his men were Savaras or of tribes allied to them."**

রামায়ণে বানরদের ধর্মানুষ্ঠানেরও উল্লেখ আছে। আর্যদের দেবদেবীই তাদের উপাস্য ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও ছিল অনুরূপ। বালী যখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্যত তখন সরল-হৃদয়া তারা বালীকে আলিঙ্গন করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে-ছিলেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে স্বস্ত্যয়ন করেছিলেন। সুগ্রীবের অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পাদিত ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ আছে। ঋষি ও বানরবৃদ্ধদের প্রতি বানরদের মনে ছিল অসীম শ্রদ্ধা। হনুমান যখন সাগরলঙ্ঘনে উদ্যত তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বানরদের বলতে শুনি---

ঋষি ও বৃদ্ধ বানরদের কল্যাণ কামনার ফলে এবং গুরুজনদের আশীর্বাদে তুমি এই বিরাট সমুদ্র উত্তরণ করবে। তুমি যতদিন পর্যন্ত না আবার ফিরে আসবে ততদিন আমরা একপায়ে অবস্থান করে তপস্যাচরণ করব।

---কিষ্কিন্ধ্যা : ৬৭ সর্গ।

লঙ্কায় প্রবেশের আগে এবং অশোকবনে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে হনুমান তাঁর পূজনীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করেছিলেন। এ থেকে বানরদের ধর্মানুগত্য প্রমাণিত হয়। বালী তাঁর সমস্ত জীবন ধরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে গিয়েছেন।

বানরদের মৃতের সৎকার পদ্ধতি আর্যদের মতই। তাদের মধ্যে মৃতের দাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বালীর মৃত্যু হলে তাঁকে যখন দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হল তখন দাহের অব্যবহিত আগের ও দাহকালীন যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তা আর্যদেরই অনুরূপ।

এই সময় সুগ্রীব বলেছিলেন---'পৃথিবী মধ্যে রাজাগণের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া যেভাবে সম্পন্ন হয় বানরদিগেরও তদনুসারেই তাহাদের প্রভুর শরীর সৎকার করা কর্তব্য।'

---কিষ্কিন্ধ্যা : ২৫ সর্গ।

বালীর শোকে তাঁর স্ত্রী তারা যখন শোকাচ্ছন্না হয়ে বিলাপ করছিলেন, অন্যান্য শোকার্তা বানরীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। সেই সময় বালীপুত্র অঙ্গদ সুগ্রীবের সাথে কাঁদতে কাঁদতে বালীকে চিতায় আরোহণ করাল। তারপর অঙ্গদ ব্যাকুলচিত্তে বিধি অনুসারে মৃতপিতার শরীরে আগুন দিয়ে দগ্ধচিতা পরিভ্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। বালীর সৎকার কাজ শেষ হলে অঙ্গদ অন্যান্য বানরদের সাথে তুঙ্গভদ্রা নদীর জলে তর্পণ করতে গেলেন।

---কিষ্কিন্ধ্যা : ২৫ সর্গ।

যুদ্ধক্ষেত্রে বানরেরা নখ ও দাঁতের ব্যবহার বেশী করত। দাঁত ও নখ দিয়ে তারা শত্রুশরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করত। কিন্তু দূরস্থিত শত্রুদের উদ্দেশ্যে তারা নিক্ষেপ করত বড় বড় পাথর ও গাছ। তারা কুস্তিতেও ছিল দক্ষ। লঙ্কাকাণ্ডে সুগ্রীব ও রাবণের মধ্যে কুস্তি-যুদ্ধের একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে। শত্রুদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সেই অস্ত্র তাদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার ব্যাপারে বানরেরা ছিল খুব নিপুণ। বানরেরা ব্যবহার জানত না এমন অনেক মারাত্মক অস্ত্রের প্রয়োগের কুফলসম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল। তাই রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ নিক্ষিপ্ত দুর্ধর্ষ অস্ত্রের প্রতাপ দেখে তারা প্রয়োজন মত আত্মগোপন করতে ইতস্তত করত না।

রামায়ণে বর্ণিত উন্নতধরণের বানরসংস্কৃতির উপর নির্ভর করে আধুনিক সমালোচকেরা অনুমান করেছেন যে, ঐ সমস্ত বানরেরা প্রকৃত অর্থে বানর ছিল না--- মানুষ-ই ছিল। তবে তাদের চেহারার মধ্যে বানর-আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। তাদের এই আকারের জন্যও তাদের লম্ফঝম্ফ-প্রিয়তা ও দাঁত-নখের ব্যবহার দেখে তৎকালীন আর্যসমাজ হয়তো তাদের 'বানর' আখ্যা দিয়েছিলেন।

এই বানরসম্প্রদায় সম্বন্ধে কে এস রামস্বামী শাস্ত্রী বলেছেন---

"It is thus clear that the Vanaras must have been an Aryan colony which settled down in South India and were cut off from their brothers who were living in North India. These were in the seat and centre of Aryan culture and were achieving remarkable progress. Such progress was due to the fact that they lived in fertile low-lands and had a prosperous environment and to the further fact that they lived in large numbers which was itself a factor stimulating progress by their means of approval and criticism." (Indian Culture. Vol.—IV).

গোরেসিও, হুইলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বানরেরা মূলত অনার্য পার্বত্য জাতি। এদের বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতে। তবে অন্যান্য অনার্যজাতিদের থেকে অনেক আগেই তারা আর্যসংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং সেই সংস্কৃতিকে একেবারে নিজেদের করে নিয়েছিল।

কিন্তু বানরেরা মূলত মানুষই হোক বা আর্যপ্রভাবিত অনার্যই হোক, জাতি হিসাবে তারা ছিল সভ্য ও উন্নত। রামায়ণে বর্ণিত বানরসমাজ ছিল মানবের মতই গোষ্ঠীবদ্ধ। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক সম্পর্ক, সুখ-দুঃখের অনুভূতি সব-ই ছিল মানবসমাজের মতই নির্খুত। বালীর মত বিক্রমশালী বীর, নলের মত দক্ষশিল্পী, সুষেণের মত নিপুণ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ বানরসমাজের অলঙ্কার। তা ছাড়া, বালীর পুত্রবাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম, বালীর প্রতি তারার প্রবল অনুরাগ, অঙ্গদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, হনুমানের প্রভুভক্তির আদর্শ ও সুগ্রীবের রামের প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুত্ব—আজও রামায়ণ-পাঠকের মনকে সবেগে আকর্ষণ করে ও কিষ্কিন্ধ্যা-অধিবাসীদের প্রকৃত বানরত্ব সম্বন্ধে ভাবিত করে তোলে।

পূর্ণতা

[illegible]

পূর্ণতার স্বপ্ন অপূর্ণতাকে ভুলিয়ে রাখে।
আমরা আমাদের অভিলাষকে
সম্মানিত করার জন্য ভাবি :
মৃত্যুর পর স্মৃতিসর্বস্ব জীবন
চাঁদের ষোলকলায় পূর্ণ হবে
পৃথিবীর বুকে কতকাল
সৃষ্টি ও প্রলয়ের, জন্ম ও মরণের, মিলন ও বিরহের
সহ অবস্থান।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে—
তোমাকে যখন বুকের মধ্যে পাই,
তোমার মধ্যে যখন পূর্ণ হই,
তখন
বহিরঙ্গ দিনের জগৎকে বলি :
আমাকে জড়িয়ে থাকা প্রিয়ার বাহুবন্ধনকে
আমাকে জড়িয়ে থাকা প্রিয়ার বহুবন্ধনকে
দিও না সূর্যদগ্ধ শৈথিল্য,
আমাকে কুণ্ঠিত কোরো না সংকোচ আর লজ্জার রৌদ্রময়তায়।

আমার আত্মহারা হৃদয়ে যখন তুমি পূর্ণতার স্বাদ জাগাও
তখন আমি নিবিড় করে পাই
তোমার দুটি পলকহারা চোখকে
তোমার দুটি রক্তিমকম্প্র ঠোঁটকে
দ্বিতীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রমা আঁকা তোমার দুটি ভুরুকে,
যেমন করে চন্দ্রবিলাসিনী পদ্ম
জ্যোৎস্নার অমৃত আস্বাদ পায়।

তোমার শরীরের সৌরভ
আমার পূর্ণতার গৌরবকে মহিমান্বিত করে।

তেজস্বী বাঙালী অধ্যক্ষ

ললিত হাজরা

জন্ম : ১২ই আশ্বিন, ১২২৭ সাল
মৃত্যু : ১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮ সাল

প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতার দুইটি খ্যাতনামা সরকারী কলেজের দুই অধ্যক্ষের মধ্যে সৌজন্য লইয়া তুমুল লড়াই বাধিয়া যায়। এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের কারণ হইল—একদিন কলেজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজের বাঙালী অধ্যক্ষ মহাশয় হিন্দু কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। হিন্দু কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বাঙ্গালী অধ্যক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বুটজুতা সমেত পদযুগল টেবিলের উপর বিছাইয়া দিয়া এবং চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুই নহে ভাবিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় বাঙ্গালী অধ্যক্ষকে বসিতেও বলিলেন না।

এই ব্যাপারে বাঙালী অধ্যক্ষ মহাশয় অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হইলেন। প্রয়োজনীয় কার্যাদি সমাধা করিয়া গম্ভীর মুখে বাঙ্গালী অধ্যক্ষ মহাশয় নিজ কলেজে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু এই অশালীন আচরণে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অপমানের প্রতিশোধ লইতেই হইবে—মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন। কেবলমাত্র সুযোগের প্রতীক্ষায় তিনি রহিলেন।

কিছুদিন পরে বহু-প্রতীক্ষিত সুযোগ মিলিয়া গেল। হিন্দু কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ কার্যোপলক্ষে একদিন সংস্কৃত কলেজের বাঙ্গালী অধ্যক্ষের নিকট আসিলেন। ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া বাঙালী অধ্যক্ষ মহাশয় নিজ অফিসে বসিলেন এবং ইউরোপীয় অধ্যক্ষের অনুকরণে চটিজুতা সমেত পদযুগল টেবিলের উপর বিছাইয়া এবং চেয়ারে হেলান দিয়া ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে অফিসের ভিতরে আসিতে বলিলেন।

বসিবার আর দ্বিতীয় চেয়ার না থাকায় ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। একজন নেটিভ অধ্যক্ষের উদ্ধত আচরণে তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। প্রয়োজনীয় আলোচনা সমাপ্ত করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও একজন নেটিভ অধ্যক্ষের

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন।

কলেজে ফিরিয়া আসিয়া ইউরোপীয় অধ্যক্ষ মহাশয় শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মিঃ ময়েটকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের অশিষ্ট আচরণের কথা জানাইয়া প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করিলেন।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের অভিযোগ পাইয়া শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে তাঁহার অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি করিতে বলিলেন।

সংস্কৃত কলেজের বাঙালী অধ্যক্ষ মহাশয় কৈফিয়ৎ দিয়া শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তাকে লিখিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম আমরা অসভ্য, সুসভ্য ইংরাজী মতে লোকের অভ্যর্থনা করিতে হইলে বুঝি ঐরূপই করিতে হয়। আমি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের নিকট ঐরূপ শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং অবসর পাইয়া কার সাহেবের প্রতি সে সম্মান দেখাইতে কার্পণ্য প্রকাশ করি নাই। এটি যদি আমার দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে এরূপ ব্যবহারের শিক্ষাদাতা কার সাহেবই সেজন্য দায়ী। ঐ ঘটনায় আমার বিন্দুমাত্র দোষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

এই উত্তর পাইয়া ময়েট সাহেব তৎক্ষণাৎ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট যাইয়া আপন অশিষ্ট আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হিন্দু কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ কার সাহেবকে নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পাইয়া অধ্যক্ষ কার সাহেব সংস্কৃত কলেজে উপস্থিত হইয়া নেটিভ অধ্যক্ষের নিকট স্বীয় আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন উভয় অধ্যক্ষই করমর্দন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

●

এই তেজস্বী স্বাধীনচেতা বাঙালী অধ্যক্ষ হইলেন প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। ১২২৭ বঙ্গাব্দে ১২ই আশ্বিন তাঁহার জন্ম হয়। শুভ জন্মদিনে আমরা এই 'অখণ্ড সৌরভ'-এর মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

বাংলা দেশে ক্রীতদাস প্রথার একখানি দলিল

[এই প্রবন্ধে প্রকাশিত দলিলখানির কথা আমরা আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল শাখার মাসিক অধিবেশনে পঠিত শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের রচনা থেকে জানতে পারি। এই শাখা-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীরাইচরণ গুহ তাঁর গৃহে রক্ষিত কয়েকখানি প্রাচীন দলিলের সঙ্গে সর্বপ্রথম এই দলিলখানি পরিষদকে দান করেন। কলিকাতা মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগে এই রকমের অনেকগুলি দলিল সংগৃহীত হয়েছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজে দলিলখানি মূল্যবান উপাদান।—সম্পাদক]

আমাদের দেশে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। শুধু আমাদের দেশে নয়,—সর্বদেশের মানব-সমাজের আনুপূর্বিক ইতিহাসই অনুন্নত, অস্পৃশ্য, অনার্য, শূদ্র ও দাসজাতির ওপর প্রভু-জাতির ঘৃণ্য বর্বরোচিত অত্যাচারের ইতিহাস। সুপ্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ 'নারদস্মৃতি'তে আমরা 'দাসঃ পঞ্চদশবিধঃ' অর্থাৎ পঞ্চদশ প্রকারের দাসের উল্লেখ পাই—

"গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।
অন্নকাল ভৃতস্তদ্বৎ আহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধোপ্রাপ্তঃ পণেজিতঃ।
তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবাসিতঃ কৃতঃ॥
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয় স্তথৈব বড়বা কৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাপঞ্চদশস্মৃতাঃ॥

প্রাচীন ভারতে গৌরবর্ণ আর্যরা কৃষ্ণকায় অনার্যদের যুদ্ধে পরাভূত করে দাসে পরিণত করতেন, তার অসংখ্য প্রমাণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যগ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। শূদ্রের আভিধানিক অর্থই দাস। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সমাজে শূদ্ররা সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। যুগের পর যুগ এই জঘন্য বর্বর-প্রথা আমাদের দেশে চলে এসেছে। এই দাসপ্রথা পেনাল কোডের আগে পর্যন্ত এ দেশে শাস্ত্রসম্মত ও আইনসম্মত বলে গণ্য হ'ত। সেকালের বাঙালী সমাজ-সংস্কারকগণের চেষ্টায় ইংরাজ সরকার আইনের সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করেন। আলোচ্য দলিলখানি বাংলা দেশে দাস-প্রথার প্রমাণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

"ইয়াদি আত্মবিক্রয়পত্রমিদং—
শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত
সাকিম চান্দশী পরগণে বাজরৌড়া

সুচরিতেষু:—শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইশ বরিষ রঙ্গস্যাম জওজে রাম রত্নতে সাকিন পিজনাকাঠি পরগণে আজিমপুর অস্য লিখনঞ্চাগে আমি মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গস্যাম এহার ও অন্ন বস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্ন বস্ত্র দিয়া পর বিষ করে এমত না রাছে অতএব আপন রাজির-কবতে সচ্ছেন্দ আকেলবহাল তবিয়তে সেইচ্ছাপূর্বক আমিও আমার কন্যা বহায় আপনার স্থানে মবলগ ৩ রূপাইয়া পুরো-ওজন দহমাসী চলন সহী দস্তবদস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্রী বরিষ দাসী অর্থ কর্ম দান বিক্রীয়াধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈর্দে আচাদ হইতে চাহি তবে ১। সোয়া মন হলদি সিদা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম—ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পচানবৈ শাল তেরিখ চৌদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ।"

নিশানসহি—
শ্রীকুঞ্জমালা

চিঠিখানির মধ্যে থেকে সেকালের ভাষা, লিখনপ্রণালী ও বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

'নারদ-স্মৃতিতে' উল্লিখিত পঞ্চাশ প্রকারের দাসের মধ্যে আত্ম ও সন্তান বিক্রয় দ্বারা দাসত্ব অঙ্গীকারের প্রথা প্রতিপন্ন হ'ল।

কুঞ্জমালা সধবা কি বিধবা সে কথা অঙ্গীকার-পত্র থেকে জানা যায় না। সম্ভবত বিধবা। যদিও দলিলে 'জওজে' মৃত লেখা হয়নি তবুও লেখার ভঙ্গী থেকে বিধবা বলেই মনে হয়। সংসারে তাকে অন্নবস্ত্র দিয়ে রক্ষা করে এমন কেউ নেই। চরম দারিদ্র্যের জন্য মাত্র তিন টাকা পেয়ে সাত বছরের শিশুকন্যার সঙ্গে আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হ'ল। সত্তর বছরের জন্য আত্মবিক্রয়। তখন তার বয়স মাত্র ২৭ ("সাতাইশ বরিষ") সুতরাং এই আত্মবিক্রয় চিরকালের জন্য বলেই বুঝতে হবে। "১। সোয়া মণ হলদি সিদা দিয়া" যে মুক্তি-লাভের ব্যবস্থা দেখা যায় তা' যে কোনদিন কার্যে পরিণত হবে সে কথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সংসারে এত জিনিষ থাকতে সোয়া মণ হলুদের ব্যবস্থা কেন? হলুদ বোধহয় তখন বাংলা দেশে দুষ্প্রাপ্য কিম্বা দুর্মূল্য ছিল। অভাগিনী কুঞ্জ-মালা ও তার মেয়ে মহামায়া যে কোন দিন স্বাধীনতা লাভ করেছিল কিম্বা পরিণামে তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে কথা জানবার উপায় নেই।

এই পত্রের অপর একখানি দলিল থেকে জানা যায় কুঞ্জবালার এক 'ভ্রাতুর' গ্রামরায়েতে তাঁর জীবিত ছিল এবং এই নিদারুণ আত্মবিক্রয়ে তাঁর পূর্ণ সম্মতি ছিল। সেই দলিলখানি এই—

"শ্রীদুর্গা

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ

সাকিন চান্দসী সুচরিতেষু—

শ্রীরামদাস দাস সাকিম বটোয়াযোড়

পরগণে খাসারোড়া অস্য লিখনং আগে

শ্রীমতী কুঞ্জবালা জওজে রামরত্নতে সাকিন পিপীলাপাটি পরগণে আজিমপুর এবং উহার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া এই দুইজন সেইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার স্থানে আত্ত বিক্রী হইল এহার দুর দুইজনকে আমি আনিয়া দিলাম এহার ভাসুর শ্রীরাম রামতে ইসাদি করেন দুই তঙ্কা আমি দিলাম এহার আর কওলায় লিখাইয়া দিব যদি না লিখাইয়া দিতে পারি তবে এই জৈল্যে কিছু খেলারত আপনার হয়ে তাহার দিসা আমি করিব ইতি—সন ১১৯৩ তেরিখ ১৪ অগ্রহায়ণ"।

নিশানসহি—

শ্রীরামলাল দাস

একখানি দলিলের রসিদ। কুঞ্জবালা যে তিন টাকা নিয়েছিল, তার থেকেই কি দালাল দু'টাকা পেল? থাকলে কথা। এই রসিদ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই জাতীয় জঘন্য আত্মবিক্রয়, বা দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা সেকালের সমাজে প্রচলিত ছিল। সমাজের বা রাজদ্বারের ভয় থাকলে এই জাতীয় অঙ্গীকার-পত্র লেখা সম্ভব হ'ত না; তবে অন্যান্য দলিল থেকে জানা যায়, দালাল বা আড়কাঠিদের কুপ্রায় কোনো নারী কোনো গৃহস্থের বাড়ী দাসীবৃত্তি অবলম্বন বাধ্য হ'লে, পরে যদি সেই নারীর আত্মীয়স্বজনরা তাকে উদ্ধারের জন্য রাজদ্বারে বা সমাজে প্রার্থনা জানাতো, তবে অনেক সময় তাকে মুক্তি প্রদান করা হ'ত।

পাশ্চাত্ত্য দেশে দাসদাসীর সংজ্ঞা এইভাবে নিরূপণ করা হ'ল :—

"A slave is a creature without any right or status whatever, who is, or may become, the property of another as a mere chattel, the owner having absolute power of disposal by sale, gift or otherwise over the slave without being responsible to any legal authority.

In the 'East' there is a modified kind of slavery, for children are purchased from their parents or strangers and are brought up as domestic servants, having little or no personal liberty conceded to them and though they are not ordinarily sold, yet they are transferred from one member of a family to another by way of gift." —Sec. 370 I.P.C. 39 & 40 Vict, Ch. 46.

পাশ্চাত্ত্য দেশে দাসের সংজ্ঞা এই :—

দাসের কোন প্রকারের স্বত্ব বা অধিকার ছিল না। জড়-পদার্থ ও পশুাদির মত দাস প্রভুর সম্পত্তি। প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে দান-বিক্রয় ইত্যাদি দ্বারা হস্তান্তরিত হতে পারতো এবং প্রভু দাসের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারতেন। (এমনকি দাসকে নির্বিচারে হত্যা করলেও প্রভু রাজদ্বারে দণ্ডিত হতেন না)।

প্রাচ্যদেশে দাসত্বের সংজ্ঞা :—

পিতামাতা কি অপর যে-কোন ব্যক্তির কাছ থেকে শিশু ক্রীত হয়ে গৃহকার্যে নিয়োজিত হত। ক্রীত শিশুদের কোন রকমের স্বাধীনতা ছিল না। যদিও সচরাচর দাসদাসী বিক্রয় হত না, পরিবারের এক ব্যক্তি অপরকে কি আত্মীয়-স্বজনকে দাস-দাসী দান করতে পারতো।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পেনাল কোডের দণ্ডবিধির ৩৭০ ধারায় ঘোষিত হল :—"যে ব্যক্তি অপর কাহাকেও দাসস্বরূপে রপ্তানি, আমদানী, স্থানান্তর, ক্রয়-বিক্রয় অথবা অন্যপ্রকারে হস্তান্তর করে অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও দাসস্বরূপে গ্রহণ বা আবদ্ধ করে, তাহার সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কি বিনাশ্রম কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

এই বিধান আমাদের দেশে দাসপ্রথার মূলোৎপাটনের জন্য বিহিত হয়েছিল।

—প্রবা পত্রিকা থেকে সংকলিত

দু'টি অসমীয়া গীতিকা

পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবী

তোমার অসীম আকাশে

তোমার অসীম আকাশে
অযুত শিখার দ্বীপ জ্বলিছে
আমার হিয়ার গহন গুহায়
প্রেমের প্রদীপ এক জ্বলিছে।
তোমার প্রেমের মহাসঙ্গীতে
বিশ্ব-আকাশ ধ্বনি উঠিছে
আমার প্রাণ-বীণার তারে
একটি মাত্র সুর বাজিছে।
ধরণীর পুষ্প-কাননে
সুরভি মালতী যূথী ফুটিছে
আমার প্রাণের পদ্ম-কোরকে
তোমার প্রেমের দল মেলিছে।

মন উপবন স্বপন মগন

মন উপবন স্বপন মগন
তুমি চির অনুপম
রূপ মালঞ্চ বনভূমি শোভা
সুরভি মনোরম।
বন লতিকার কোমল কলিকা
পুষ্প সুরভি গন্ধ
মধু মূর্চ্ছনা ললিত লয়ের
সঙ্গীত মৃদু মন্দ।
মধুমালতীর রূপমঞ্জরী
মুগ্ধ মধুপ গুঞ্জন
মন মানসের কল্প কানন
অনুভূতি অনুপম
তুমি চির নিরুপম।

অনুবাদ : সুজাতা প্রিয়ংবদা

[এই দু'টি গীতিকা প্রখ্যাত অসমীয়া নারী কবি পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবীর কবিতা গ্রন্থ 'অলকানন্দা' (সাহিত্য একাদেমী পুরস্কৃত, ১৯৬৮) থেকে —অনুবাদিকা]

রুশবিপ্লব ও পিটার ক্রোপোটকিন

An anarchist among aristocrats - - - an aristocrat among anrchists- - - -

বর্তমানের পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে এই বিশেষণটি অতীতে পরিণত যাঁদের প্রতি অনায়াসে নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করা যায় সেই তালিকার প্রথমেই ভেসে ওঠে প্রিন্স পিটার ক্রোপোটকিনের নাম। দীর্ঘকাল পূর্বে যে নৈরাজ্যবাদিতার ধ্বজা তিনি তুলে ধরেছিলেন তারই মাধ্যমে ইতিহাসে তাঁর আসনটি স্থায়ী হয়ে গেল। সে সময়ে সারা রাশিয়ায় জারের শাসন যে কী বীভৎস ভয়াবহ এবং শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা আজ কারোরই অজানা নয়। জারের অত্যাচার যখন চরমে উঠল---সম্ভাব্য সীমারেখাও অতিক্রম করল সেই সময় সেই স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করে তার অবসান ঘটিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করলেন তাঁদেরই মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম ক্রোপোটকিন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রাজশক্তির বিরুদ্ধে আহূত সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ, সেই রাজপরিবারের সঙ্গেই তিনি সম্বন্ধযুক্ত। এইখানেই তিনি আপন কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ দিলেন তাঁর কাছে ঐশ্বর্য বিলাস সম্ভোগ এবং আত্মীয়তার বন্ধন থেকে মানুষের স্বার্থ এবং সত্যের আহ্বান অনেক বড়।

ক্রোপোটকিনের প্রথম জীবনও অন্যান্য রাজপুঙ্গবদের মতই আমোদ-প্রমোদে, বিলাসে-সম্ভোগে এবং রাজকীয় বৈভবের মধ্যে কেটেছে। ছেলেবেলা থেকে ছিলো ভূগোলের প্রতি সহজাত আকর্ষণ। এই ভূগোলপ্রীতিই তাঁর দৃষ্টির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। নানা দেশের, নানা সমাজ, নানা মানব-গোষ্ঠীর পরিচয় নিতে নিতে এক স্বতন্ত্র জীবনভাষ্য তাঁর মধ্যে রূপ দেয়। তাঁর চিন্তাধারা এক বিচিত্র জনকল্যাণকর ধারায় প্রবাহিত হতে আরম্ভ হ'ল। তদানীন্তন জারিনার তিনি ছিলেন স্নেহের পুত্তলী। তথাপি সম্রাজ্ঞীর স্নেহচ্ছায়া এবং অফুরন্ত সহায়তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিও তাঁকে তাঁর কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। রাজরোষ হতে শেষ পর্যন্ত তাঁর অব্যাহতি পাওয়া হল না। বন্দী অবস্থাতে শুধু দিনের বেলাটা ভৌগোলিক গবেষণার অনুমতি তাঁর মিলল। পরমায়ুলক্ষ্মীর প্রচুর কৃপা অবশ্য তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছিল। উনআশী বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। রাশিয়ার সেই অতীব তাৎপর্যপূর্ণ যুগসন্ধির বিশেষ লগ্নে

পিটার ক্রোপোটকিন

নৈরাজ্যবাদের প্রাঙ্গণে যিনি প্রধান ভূমিকা নিয়ে ধ্বনিতরঙ্গ নিনাদিত করলেন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ভাবধারা চিন্তাশৈলী ও প্রকাশরীতি বর্তমানের সঙ্কটপূর্ণকালে বিশেষভাবে আলোচ্য বস্তু বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর নানা দেশে এ আন্দোলন আজও দানা বেঁধে উঠে থাকে। বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী কিন্তু আজ তার যে আলেখ্য এবং প্রকাশধারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার মূলের সঙ্গে কিন্তু তার তফাৎ আকাশ-পাতাল। রুশ সাম্যবাদের গোড়াপত্তন যখন হয়েছিল, তখন সে সম্পর্কে যে নীতি ও পন্থা অবলম্বিত হয়েছিল দেখা যাচ্ছে আজকের দিনের রুশ সাম্যবাদ তা থেকে অনেকখানি সরে এসেছে'

ক্রোপোটকিন ধ্বংসবাদের সমর্থক ছিলেন না, তাঁর নীতি ছিল সামগ্রিকতাকে অক্ষুন্ন রাখা। তার ভিতর যা আবিল, যা কলুষ, যা ক্লেদযুক্ত শুধু সেইগুলোকে অপসৃত করে সেই শূন্য-স্থানগুলি যা শুভকর, যা মঙ্গলের পরিচায়ক, যা কল্যাণপ্রদ—তাদের দ্বারা পূর্ণ করা। পুরোপুরি ধ্বংসবাদের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাঁর প্রশ্নই ছিল সামগ্রিক ধ্বংসের পরবর্তী পদক্ষেপ কি?

কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, সম্প্রতি এ্যালব্যানিয়া, রোম্যানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় যা ঘটল তার ভিতর দিয়ে ক্রোপোটকিনের ভাবধারার প্রতিফলন কতটুকু আজকের দিনের সাম্যবাদী রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের কর্মে তা ভাবতে গেলে পার্থক্যটা প্রকট হয়েই দেখা দেয়। ক্রোপোটকিন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। কিন্তু আজকের দিনের রুশ লেখককে বাসা বাঁধতে হয় ইংল্যাণ্ডে, নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করতে হয়। কেন না তার মাতৃভূমিতে তার লেখক হিসাবে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নেই। বর্ষীয়ান লেখক বোরিস পাস্তারনাককেও ডক্টর জিভাগোর জন্যে যথেষ্ট লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। মানুষের স্বাধিকারের এ-এক আশ্চর্য নিদর্শন বটে।

—সন্দীপ ঘোষাল

জনগণের মহাত্মা গান্ধী

দেশরঞ্জন দাস

অনবদ্য সাধনায়, বিপুল কীর্তিতে, অসামান্য অবদানে ভারতের যে মহান্ সন্তানেরা বিশ্বব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন সেই তালিকায় মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটি দীপ্তভাস্বর নাম। ভারতের এই পূজ্য পুরুষের পূজার আয়োজন আজ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকেই আজ উৎসর্গিত হচ্ছে তাঁর উদ্দেশে ভক্তি-শ্রদ্ধার নিটোল অঞ্জলি। তাঁর শতবার্ষিকীবর্ষে আজ প্রায় সারা পৃথিবী অপরিসীম উদ্যমে তাঁর বন্দনায় অংশ নিয়েছে।

মনীষী রোম্যা রোলাঁ থেকে আরম্ভ করে বিদেশের বহু মনীষী, গবেষক, লেখকের লেখনী থেকে গান্ধীজীর সম্বন্ধে বহু মূল্যবান রচনা উৎসারিত হয়েছে। বহির্ভারতে তাঁকে কেন্দ্র করে নানা আলোচনা, বিশ্লেষণ, চরিত্রচিত্রণ সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে এসেছে। এরিক এরিকসান আজকের দিনের প্রখ্যাত মনোবিশ্লেষকদের একজন— যিনি সংশ্লিষ্ট দরবারে একটি পুরোভাগের আসন দাবী করতে পারেন। সম্প্রতি এরিকসানের গান্ধীজী সংক্রান্ত একটি মূল্যবান গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে। গান্ধীজী সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থের মেলায় নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থটি এক বিশেষ বিশেষত্ব দাবী করতে পারে। এক অভিনব আঙ্গিকে তিনি গান্ধীকে চিত্রিত করেছেন। গ্রন্থটি জীবনীগ্রন্থ বা সামগ্রিক কর্মের কোন বিস্তারিত বিবরণ নয়। এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজীকে বিশ্লেষিত করা হয়েছে।

আধুনিক ভারতবর্ষে অহিংসার প্রবক্তা—গান্ধী। যে ক্ষমাশীলতা এবং সত্যের সাধনায় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত তারই উৎস এখানে অন্বেষণ করেছেন লেখক তাঁর নিজস্ব অনুপম চিন্তাধারার সার্থক প্রয়োগে। স্বচ্ছ প্রসন্ন আলোকে এবং সত্যের প্রদীপ্ত জ্যোতিতে যে জীবন সমুদ্ভাসিত তার উৎস অন্বেষণ করতে গিয়ে লেখক গান্ধীজীবনের এক বৈচিত্র্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

লেখক বলছেন গান্ধীজীবন এক বৈচিত্র্যের স্পর্শে উজ্জ্বল। করদ-রাজ্যের রাজকর্মচারীর সন্তান তিনি। পাশ্চাত্যে উচ্চশিক্ষালাভ করে হলেন ব্যারিস্টার, কিন্তু পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে পূজিত হলেন ঋষির মহিমায়। গান্ধীর জননী ছিলেন অতি ধর্মনিষ্ঠা এবং সত্যের প্রতি অবিচল অনুরাগ এক আত্মিক মহিমায় শাশ্বত

মহাত্মা গান্ধী

ভারতের সনাতন ভাবধারায় তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত। মায়ের এই সত্যনিষ্ঠাই আমরণ সত্যাশ্রয়ী গান্ধীর মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্তেছিল এবং সময়ের পরিসরে তা প্লাবিত হয়ে উঠেছিল। এই সত্যনিষ্ঠা গান্ধীকে পরিচালিত করেছিল বৃহত্তর মানবকল্যাণের পথে তাঁর সমগ্র জীবনে ধ্রুবতারার মত তাঁর পথনির্দেশক হয়ে। এই সত্যানুরক্তি তাঁর সমগ্র কর্মে এত বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিল যার প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। জগতের অন্য প্রান্তে যে মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় অহিংস আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের মধ্যেও গান্ধীজীর আদর্শ ও ভাবধারার প্রতিফলন দেখা গেছে। এই ধারণার একটি অতি সাম্প্রতিক নিদর্শন লুথার কিং।

অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে ১৯১৮ সালে নিম্ন বেতনের মিল শ্রমিকদের উচ্চ বেতনের দাবীতে গান্ধী তাদের স্বপক্ষে যে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন তাই সত্যাগ্রহ বলে প্রসিদ্ধ। এই সত্যাগ্রহের অঙ্গ হিসাবে গান্ধীজী জাগতিক ও ইন্দ্রিয়বন্দনাদির আকর্ষণ জয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদিচ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে অবরুদ্ধ করে তার বহিঃপ্রকাশকে আটকালে তা ক্ষতিরই সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রাখে তথাপি অবিচল সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের আলোকে সে সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করা যায়।

গ্রন্থকার এরিকসান ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। আহমেদাবাদে অবস্থান করেছিলেন। এই গ্রন্থ পরিকল্পনা ও তার ভারতে আগমন, দুটোই আকস্মিক ঘটনাচক্রের পরিণতি। এই বিশেষত্বপূর্ণ ও মূল্যবান আলোচ্য গ্রন্থটির নাম—Gandhi's truth—on the origins of militant non violence.

সিম্বার প্রতিশোধ

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

সরকারী চাকরিতে আফ্রিকার নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে আমায়। সার্ভে ডিপার্টমেন্টের কাজ পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল যেখানে যখন কাজের তলব পড়েছে সেখানেই হাজির হয়েছি। সে বার আমাদের ক্যাম্প পড়েছিল টাঙ্গানিকা হ্রদের নিকটবর্তী এক অঞ্চলে। আমাদের সঙ্গে লোকজন ছিল যথেষ্ট, তবু যে ক'মাস ওখানে ছিলাম আমরা মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারিনি। এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, মানুষ নাকি মন্ত্রবলে সিংহের রূপ ধারণ করতে পারে আর ঐ সিংহরূপী মানুষ সাধারণ সিংহের চেয়ে ঢের বেশী নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। প্রায়ই শুনতাম, সিংহ এসে ঘর থেকে মানুষ টেনে নিয়ে গেছে, অথচ অনেক চেষ্টা করেও সিংহের সন্ধান পাওয়া যেত না।

বর্ষাকালেই সিংহের উপদ্রব হত বেশী। বর্ষা শুরু হলেই ওরা বেরিয়ে পড়ত জঙ্গল ছেড়ে এবং গ্রামের আশে পাশে ঘোরাফেরা করত শিকারের লোভে। দু'একটা গরু ছাগল প্রায়ই খোয়া যেত মাঠ থেকে। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বেশী দূরে গেলে মানুষেরও নিস্তার নেই গরু চরাতে গিয়ে কত রাখাল যে নিরুদ্দেশ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এ ধরণের ঘটনায় গ্রামে অবশ্য বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত না। প্রকৃতির শাসন যেখানে দুর্লংঘ্য, দুর্বলের পরাজয় সেখানে ঘটবেই তো! কিন্তু পশুরাজ যখন গরু-ছাগল উপেক্ষা ক'রে প্রতি রাত্রে গ্রামে হানা দেয় নর-মাংসের সন্ধানে, তখনই গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয় আর তারা সভয়ে বলাবলি করে, সিম্বা মাটুর (সিংহরূপী মানুষ) আবির্ভাব হয়েছে গ্রামে।

●

সে বছর বর্ষাকালটা যে রকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, তা সহজে ভোলবার নয়। প্রতি রাত্রে নিকষকালো মেঘে আকাশ যেত ছেয়ে, মেঘের গর্জন হত শুরু, আর কালো আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝে ঝলসে উঠত বিদ্যুতের লক্‌লকে শিখা। তারপর বৃষ্টি নামত মুষলধারায় আর ঝড় বইত শন্ শন্ করে। আর সেই প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সিংহের ভয়াল আক্রমণ হত শুরু।

নিঃশব্দে কুটীর-প্রাঙ্গণে ঢুকে ঘরের দেয়ালে গর্ত ক'রে সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ত শিকারের ওপর। ঝড়ের গর্জনে চাপা পড়ে যেত অসহায় মানুষের আর্তনাদ। শিকার মুখে করে সিংহ সরে পড়ত সবার অলক্ষ্যে।

আতঙ্কে গ্রামবাসীরা অভিভূত হয়ে পড়ত। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মানুষ শিকার করতে সিংহ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এল কি করে, এ তারা ভেবে পেত না। কোন জানোয়ারই তো এমন দুর্যোগে আশ্রয় ছেড়ে বেরুতে সাহস করে না—বিপদের ভয় শুধু মানুষেরই নয়, পশুদেরও আছে যথেষ্ট। এ যে সত্যিকার সিংহ নয়, এ যে 'মাচাউই', ডাইনীর মন্ত্রে সিংহে রূপান্তরিত কোন হতভাগ্য মানুষ, এ ধারণা বদ্ধমূল হয় তাদের।

পাহাড়ের উপর একটা টিনের 'শেডে' থাকতাম আমি। সঙ্গে জনকয়েক চাকর-পেয়াদা। পাহাড়ের ওপর ঝড়ের প্রকোপ হত তীব্র, রাত্রে অনেক সময় চোখে ঘুম আসত না—বাতাসের শোঁ-শোঁ গর্জন মনে কেমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করত। পাহাড়ের নীচে বহুদূর বিস্তৃত কলাবন, তারই মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আবাহাদের কুঁড়ে ঘর।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম গেল ভেঙে। বাতাস শন্-শন্ করে বইছে, পাহাড়ের নীচে থেকে ভয়ার্ত চীৎকার ভেসে এল কানে। আবাহারা প্রায়ই চীৎকার করে রাত্রে—কখনো চেঁচামেচি করে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে, কখনো বা পশু-চোরের ভয়ে। কাজেই গোলমাল শুনলে আমরা বড় একটা চঞ্চল হতাম না। কিন্তু সে রাত্রির চেঁচামেচির মধ্যে যেন একটা অসাধারণত্ব ছিল। মিনিট দুই-তিন পরেই ঢাক বাজতে শুরু হল। বুঝতে পারলাম, গ্রামের মোড়লরা প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম ব্যস্তভাবে। পূর্ব-আকাশে তখন উষার অস্ফুট আলো দেখা দিয়েছে। কাদা-ভরা পিচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করলাম। ঝড়-বৃষ্টির দাপটে চারা গাছগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—বজরার ক্ষেত বিপর্যস্ত।

কুঁড়েঘরগুলির কাছাকাছি হতেই দেখলাম, একদল লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে যোদ্ধার বেশে—কোমরে গাছের ছালের চিত্রিত আবরণ, হাতে লম্বা বর্শা। গম্ভীর মুখে আমায় তারা অভিবাদন করলে। রাত্রে গোলমাল হয়েছিল কেন জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'বাওয়ানা, কাল রাত থেকে বুড়ো মাপারিগোয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না', জবাব দিলে তারা, 'সম্ভবত কোন সিংহ তার ঘরে ঢুকে বিছানা থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেছে। দেয়ালে শুধু একটা গর্ত রয়েছে, তা'ছাড়া আততায়ীর আর কোন নিশানা নেই।'

'এ দুর্ঘটনা ঘটল কখন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

তারা বললে, ভোরের কিছুক্ষণ আগে চীৎকার শুনেছে তারা—চীৎকার শুনেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি।

'এ যে কেমনতর সিংহ বুঝতে পারছি না,' ভীত-মুখে মন্তব্য করে তারা—'এ কোন চিহ্নই রেখে যায়নি। সিংহ সাধারণত কাছাকাছি কোথাও শিকারটা রাখে অবসরমত তার সদ্ব্যবহার করবার জন্য। কিন্তু এত খোঁজাখুঁজি করলাম, কোথাও রক্ত বা হাড় নজরে পড়ল না।'

আধঘণ্টা আমরা বৃথা ঘোরাঘুরি করলাম। কোথাও রক্তের দাগ নেই—মানুষটা যে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে এ নিঃসন্দেহ; কিন্তু ঘাস বা কাদার ওপর তার কোন নিদর্শন নেই। নিরাশ হয়ে যখন ফিরছি, সেই সময় হঠাৎ আমার পা ঠেকল কাদায় অর্ধমগ্ন কি একটা শক্ত জিনিষের গায়ে। আমি থামলাম সেখানে, জিনিষটা কী ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, ওটা একটা মানুষের মুণ্ড, তখনো স্থানে স্থানে মাংস লেগে রয়েছে।

কিন্তু করবার কিছুই ছিল না। ঐ সামান্য খাদ্যের লোভে সিংহ যে ওখানে ফিরে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। আহার্যের পরিমাণ যদি বেশী থাকত—যদিও সেটা মোটেই প্রীতিকর হত না—তবে আমরা হতভাগ্যের দেহাবশেষের উপর ফাঁদ পেতে ওখানে অপেক্ষা করতে পারতাম সিংহ ফিরে না আসা পর্যন্ত।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই আগুন জ্বালা হল ঘরে ঘরে, ঢাক বাজাতে লাগল ডুম্ ডুম্ করে আর অন্ধকারের মধ্যে গ্রামবাসীদের হাঁক শোনা যেতে লাগল মাঝে মাঝে। ভয় পেলে আবাহারা নিজেদের আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে। সবাই সজাগ আছে এ ভরসাটুকু কম নয়।

রাত্রি একটু গভীর হতেই আকাশে মেঘ ডাকতে লাগল আর বৃষ্টি নেমে এল ঝম্-ঝম্ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন গেল নিবে আর লোকজনের কলরবও গেল থেমে। চোখে কখন্ ঘুম নেমে এসেছিল জানি না, হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম গেল ভেঙ্গে। মনে হল যেন কার চীৎকার শুনলাম আমি, কান খাড়া করে রইলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু টিনের ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

পরদিন সকালে ভীত বিবর্ণ মুখে একদল গ্রামবাসী এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। দলপতি বললে, 'বাওয়ানা, সিম্বা আবার এসেছে। মিরেম্বির ঘরে ঢুকেছিল কাল রাতে—মাপারিগোয়ার ঘর থেকে মাত্র বিশ হাত দূরে। ঝড় বইছিল খুব জোরে, তবু মিরেম্বির আওয়াজ কানে এসেছিল আমাদের, কিন্তু যখন আমরা বর্শা ও জলন্ত কাঠ নিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন মিরেম্বিকে পেলাম না ঘরে—বুঝলাম, আমরা পৌছুবার আগেই সিম্বা তাকে টেনে নিয়ে উধাও হয়েছে।'

মাপারিগোয়ার ঘরের দেয়ালে যেমন একটা গর্ত দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি একটা গর্ত দেখলাম মিরেম্বির ঘরে। এবারও মৃতব্যক্তির দেহ নিকটে কোথাও পাওয়া গেল না, অনেক সন্ধানের পর, একটা কলাগাছের নীচে শুধু তার রক্তাক্ত মুণ্ডটা দেখতে পাওয়া গেল।

এবার অবশ্য আততায়ীর অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কুঁড়েরের কাছেই। পায়ের ছাপ যে সিংহেরই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না—আর এও নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, সিংহ একা আসেনি, সঙ্গে ছিল আরেকটি সিংহ।

●

পর-পর আরও তিন রাত্রি সিংহ দু'টো গ্রাম থেকে লোক নিয়ে গেল টেনে। তারপর ওদের সাহস গেল বেড়ে—হানা দিলে পাহাড়ের উপর কুলি-বস্তিতে। একজন কুলি ঘুমুচ্ছিল ঘরের বারান্দায়, তাকে তুলে নিয়ে ওরা নিঃশব্দে প্রস্থান করলে। কুলি-বস্তির চতুর্দিকে সাতফুট উঁচু মাটির দেয়াল। কুলিদের সর্দার বললে, মাঝরাত্রে সে দেখলে প্রকাণ্ড কি একটা জানোয়ার দেয়াল টপ্‌কে ভিতরে এসে পড়ল—তার পর আর একটা জানোয়ার চকিতে এসে জুটল তার সঙ্গে—অন্ধকারে কোথায় যে সে এতক্ষণ লুকিয়েছিল, তা সে দেখতে পায়নি। পাছে হাঁক-ডাক করলে কুলিরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে বিপন্ন হয়, এই ভয়ে সে চেঁচাতে পারেনি।

বেলা হতেই লোকজন এসে জড় হল আমার কোয়ার্টার্সের সামনে। এবার সিংহের পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেল—পাহাড় থেকে নেমে সিংহ দু'টো দূরে জঙ্গলের দিকে গেছে। জনকতক শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম সিংহের সন্ধানে। সিংহ দু'টোকে মারতেই হবে; নইলে রোজই এসে ওরা উপদ্রব করবে। আধ মাইল পথ আমরা খুব সাবধানে চললাম, ভিজে মাটিতে সিংহের পায়ের ছাপ সুস্পষ্ট। আমরা সকলেই লক্ষ্য করলাম, পথে কোথাও এখন চিহ্ন নেই যাতে মনে হয় সিংহ শিকারসমেত জঙ্গলে এসেছে। তবে মানুষটার দেহ গেল কোথায়? কুলি-বস্তির কাছে সিংহ যে তাকে ভক্ষণ করেনি এ একেবারে নিঃসন্দেহ—কোথাও মানুষের রক্ত বা দেহাবশেষের চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ আমাদের দলের একজন চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কে, তারপর নীচু হয়ে কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল। একমুহূর্ত পরেই মাটি থেকে রক্তমাখা একটা নরমুণ্ড তুলে নিয়ে সে উঁচু করে ধরল আমাদের সামনে।

একটু পরেই শুরু হল বৃষ্টি, সিংহের পায়ের ছাপ গেল মিলিয়ে, কাজেই আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না।

কাদা মন্থন করে যখন আমরা ক্লান্তপদে বাড়ী ফিরছি, সেই সময় একজন গরীব স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলে। কোলে তার তিন বছরের একটি শিশু। স্ত্রীলোকটি জঙ্গলের ধারে একটা জীর্ণ কুঁড়েঘরে একা বাস করে। আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে শুনে সে যেন একটু উদ্বিগ্ন হল। সঙ্গীদের একজনকে বললাম, স্ত্রীলোকটিকে যেন যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রামে এনে রাখা হয়—সিংহের আস্তানার এত কাছে থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে একজন কর্মচারী ছুটে এসেছে আমার কাছে। জরুরী ব্যাপার—এখনই একবার হাসপাতালে যেতে হবে আমাকে। গিয়ে দেখি, একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক পাশাপাশি দুটি খাটিয়ায় শুয়ে রয়েছে—দু'জনেরই হাত ক্ষত-বিক্ষত। তাদের মুখে যা শুনলাম তা অত্যন্ত ভয়াবহ।

ওরা স্বামী-স্ত্রী ঘরের মধ্যে আগুন জ্বেলে গভীর রাত পর্যন্ত জেগেছিল, হঠাৎ একসময় বাইরে থেকে কে ওদের দরজায় একটা ঘা দিলে ভয়ানক জোরে। ভয় পেয়ে ওরা তাকাল দরজার দিকে। বাইরে তখন প্রচণ্ডবেগে ঝড় বইছে। ওরা লক্ষ্য করলে, আগল ঠেলে দরজার ঝাঁপটা ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে ভিতর দিকে। তারপর হঠাৎ আগুনটা যেই একবার দপ করে জ্বলে উঠেছে, ওরা সেই আগুনের আলোয় লক্ষ্য করলে, সিংহের একটা থাবা ঝাঁপের পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। দুটো শক্ত কাঠ—একটা আরেকটার উপরে আড়াআড়ি করে বাঁধা—আগলের কাজ করছিল, হঠাৎ প্রচণ্ড চাপে তার একটা গেল ভেঙে। আগুনের ভিতর থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠ তুলে নিয়ে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে গেল দরজার দিকে, আর তার স্বামী দরজায় পিঠ দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল দরজাটাকে রক্ষা করবার জন্য।

কয়েক মুহূর্ত সংগ্রাম চলল ভীষণভাবে, সিংহ থাবা দিয়ে তাদের দুজনকেই আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করলে। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হচ্ছে, এইবার বুঝি দরজা ভেঙে পড়বে। এদিকে বিদ্যুতের আলোয় ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে তারা দেখলে, দুটো প্রকাণ্ড সিংহ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে ঢোকবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। সিংহের নখের আঘাতে হাত দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকটি জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে খোচা মারলে জানোয়ার দুটোর মুখে আর সেই আঘাতে ওরা ছুটে পালাল অন্ধকারের মধ্যে।

'মানি', আহত লোকটিকে উদ্দেশ করে বললাম আমি, তুমি যে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ এর জন্য ংগু (ঈশ্বর) ও তোমার সাহসী স্ত্রীকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সিংহ দুটোকে যে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছ এতে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছি। ওরা হয়তো আর আসবে না এদিকে। কিন্তু এতবড় একটা কাজের জন্য তোমাদের ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় নি—হাতটা জখম হয়েছে শুধু।'

এক মুহূর্ত ওরা চুপ করে রইল। তারপর স্ত্রীলোকটি কথা কইল। 'বাওয়ানা,' ম্লানমুখে সে বললে, 'আমরা রক্ষা পেয়েছি সত্য, কিন্তু সবাই আমাদের মত ভাগ্যবান নয়। আমাদের কাছে বাধা পেয়ে সিংহ দুটো—সিংহ বলা ওদের সঙ্গত হবে না, সিংহের আকারে ওরা মানুষ—হানা দেয় আমাদের পাশের ঘরে।'

আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। 'বল কি? কাকে ওরা টেনে নিয়ে গেল?'

'সেই গরীব স্ত্রীলোকটি ও তার শিশু—যাদের আপনি গ্রামে এনে রাখতে বলেছিলেন,' বিষণ্ণ সুরে জবাব দিলে স্ত্রীলোকটি—'দুজনেই ঘুমুচ্ছিল সেই ঘরে, আর দুজনকেই ওরা টেনে নিয়ে গেছে।'

এবার গ্রামে সত্যিকার আতঙ্ক দেখা দিল। সবার মুখেই উদ্বেগের ছায়া—সবাই ফিস্ ফিস্ করে আলোচনা করে সিম্বা-মটু সম্বন্ধে। গ্রামের একজন মাতব্বর এসে গম্ভীরমুখে আমায় বললে, গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা নির্জন জঙ্গলে একজন মায়াবী থাকে, রাত্রে কাউকে একা পথ চলতে দেখলে সে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় নিজের ঘরে এবং সিংহে রূপান্তরিত করে তাকে ছেড়ে দেয় নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করবার জন্যে।

নরমাংস-লোলুপ মায়াবীদের সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। গ্রামবাসীদের সন্দেহ একাধিক লোকের উপর, কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। আদিম সংস্কার যেন তাদের মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; সর্বত্র ভয় ও উদ্বেগের ছায়া।

এ অবস্থায় আমি গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে একদিন সভা বসালাম। আমি তাদের বললাম, সিংহের উপদ্রব থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো, কিন্তু ঐ সিংহ সম্বন্ধে তারা যেসব অদ্ভুত ধারণা পোষণ করছে তা নিতান্ত অমূলক—অলৌকিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন না করাই ভাল। কিন্তু আমার কথা তাদের মনের উপর কোন রেখাপাত করল না, কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে তারা বসে রইল। খানিক পরে তারা বললে, ঐ সিংহ যে সাধারণ সিংহ নয় এ বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ—ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে স্থানীয় ওঝার সাহায্য নিতে হবে, আর ওঝার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তবে গ্রামবাসীদের মৃত্যু অনিবার্য।

দু' একদিন পরেই খবর এল, গ্রামের নিকটে একটা জঙ্গলের মধ্যে সিংহ দুটোকে দেখা গেছে। আবার আমি লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সন্ধানে। অতি সন্তর্পণে আমরা এগোতে লাগলাম, প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি এইবার হয়তো ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর, কিন্তু কোথাও ওদের দেখা গেল না। বর্শাধারী শিকারীদের ব্যূহ ভেদ করে ওরা নিঃশব্দে কখন সরে পড়েছে! সেই রাত্রেই ওরা আবার গ্রামে ঢুকে একজন স্ত্রীলোককে টেনে নিয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে।

ফাঁদ পাতা হল গ্রামের নিকটে। ফাঁদে গোটাকতক ছাগল আর ভেড়া রাখা হল সিংহকে প্রলুব্ধ করবার জন্য। একজন সরকারী প্রহরী এসে বসল খানিকটা তফাতে—বন্দুক হাতে করে। কিন্তু সিংহেরা এসবে প্রলুব্ধ হল

ভেড়া, ছাগল উপেক্ষা করে নিকটস্থ একটি কুঁড়েঘর থেকে ওঝা টেনে নিয়ে গেল একটি মানব-শিশুকে।

হতাশ হয়ে আমি ডেকে পাঠালাম গ্রামের মোড়লকে। বললাম, 'দেখো মাতোয়ালি, আমরা তো যথেষ্ট চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই সিংহের উপদ্রব দমন করতে পারলাম না। গ্রামের লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে—আমরা তাদের আর ভরসা দিতে পারছি না। বড় আপিসে খবর দিয়েছি—সেখান থেকে সরকারী কর্মচারীরা আসবার আগে তোমরা তোমাদের প্রাচীন ব্যবস্থা যা কিছু আছে তা একবার প্রয়োগ করতে পারো।'

আমার কথায় উৎসাহী হয়ে মাতোয়ালি বললে, একজন অভিজ্ঞ ওঝার সঙ্গে পরিচয় আছে তার—মানুষকে সকল রকম বিপদ থেকে মুক্ত করবার বিদ্যা তার জানা আছে। দুটো গরুর বিনিময়ে সে এমন একটা প্রক্রিয়া করতে পারে যার ফলে সিংহ আর কখনো গ্রামবাসীদের কাউকে স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

সরকারী চাকরি করি বলে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আমি সমীচীন মনে করলাম না, তবে দূর থেকে কিছুটা লক্ষ্য করলাম। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে দলে দলে গ্রামবাসীরা অগ্রসর হতে লাগল একটা জলাভূমির দিকে। এক-একজন কাছে আসে আর জলার ধারে দাঁড়িয়ে সেই ওঝা একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার কপালটা চিরে মন্ত্র পড়ে কি একটা ওষুধ ঘসে দেয় ভিতরে।

সেই রাত্রে গ্রামে আর কোন বিপদ ঘটল না এবং তারপর থেকে সিংহের উপদ্রব একেবারে থেমে গেল গ্রামে।

আমি তো ভারি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মন্ত্রতন্ত্রের যে এত শক্তি থাকতে পারে এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

●

দিনকয়েক পরে যে খবর এল তা আরও অদ্ভুত। শুনলাম, ওঝার উপর সিংহ প্রতিশোধ নিয়েছে ভীষণভাবে। চল্লিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে বাস করত ওঝা।

গ্রামের নাম মাকারি। যে রাত্রে আমাদের ওখানে ওঝা ভয়ার্ত স্ত্রী-পুরুষের দেহে ওষুধ প্রয়োগ করছিল সিংহের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করবার জন্য, ঠিক সেই রাত্রেই সিংহ হানা দেয় মাকারি গ্রামে। এর আগে ঐ গ্রামে সিংহের উপদ্রব নাকি কোনদিনই হয় নি।

বাড়ী পেঁছুতে ওঝার দুদিন লেগেছিল। পৌঁছে দেখে, বাড়ী-ঘর একেবারে লণ্ডভণ্ড—যেন কোন দুর্দান্ত দানব হিংস্র তাণ্ডবে চতুর্দিকে প্রকম্পিত করে সবেমাত্র বিদায় নিয়েছে। উঠোনে পা দিতেই তার স্ত্রী এসে আর্তকণ্ঠে বললে, 'মগংগা, দু' রাত্রি প্রচণ্ড ঝড় হয়েছে এখানে—এরকম ঝড় এর আগে কেউ কখনো দেখে নি। ঝড়ের বেগ যখন ভীষণ হয়ে উঠেছে সেইসময় কোন দুশমন আমাদের উঠোনে ঢুকে ঘরের দেয়ালে গর্ত করে তোমার মা আর বোনকে টেনে নিয়ে গেছে। অনেক খোঁজা হয়েছিল কিন্তু দুশমনের পাত্তা পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে শুধু তোমার মা আর বোনের আধ-খাওয়া মুণ্ড। আজ সকালে জনকতক লোক বলাবলি করছিল, দুটো সিংহ নাকি ভোরের দিকে জঙ্গলে ফিরছিল, তারা দেখেছে।'

রৌদ্রদগ্ধ মন

বন্দে আলী মিয়া

দিনের প্রান্তদেশে দাঁড়ায়েছি এসে—প্রদোষের মলিন আকাশ
বেদনা পান্ডুর আঁখি বন্ধ্যা ধরিত্রী—স্দানি তার করুণ নিশ্বাস।
নিভৃত রূপালি সাধ মূর্ছাহত প্রায় বাষ্পাতুর নীল হলাহল
কাঁপিছে বিদগ্ধ নভ চির উপবাসী—ফুটিল না নিশীথ কমল।

আমার জীবনতৃষ্ণা আজো হায় কাঁদে—সিন্ধুসম ফুঁসে বার বার
ধূসর বিষণ্ণ মেঘ ফেলিয়াছে ছায়া শেষ হয় ক্ষুব্ধ কামনার।
তোমার দীপের দাহে পুড়িল আমার পুষ্পিত সোনালি কানন—
লৌহ নিগড় তব ক্ষুব্ধ করে হায় নন্দনের মাধবী স্বপন।

একটি নাগিনী আজ লক্ষ ফণা তুলি অবিরাম রোষে গরজায়
অশনি চমকে তার ভ্রূকুটি কুটিল অগ্নিশিখা আঁখির তারায়।
আমার সৌরলোক কুহেলী আঁধার—জনশূন্য মরু প্রান্তর
শ্মশানের বিষধূমে মোর রাত্রিদিন অশ্রুলিপ্ত ধূলায় কাতর।

মিথ্যার বেসাতি দিয়ে মঞ্জুষা ভরি—পদে পদে মোর পরাজয়
একটি হৃদয়ে তব ছিলো যেই ঠাঁই—আজি তার হয়েছে বিলয়।
এবারে বিদায় বাঁশী বাজিতেছে হায় সাড়াহীন রৌদ্রদগ্ধ মন
আমার আঁখির জলে ছিন্ন হলো বুঝি জীবনের নিবিড় বাঁধন।

-দুলাল দত্ত

-স্নেহাংশু দে

-দীপ্ত ঘোষ

পা
ঠি
কা

-বিশ্বনাথ গোস্বামী

-অদিতি রায়

দুই বন্ধু
—পবিত্রকুমার বসু
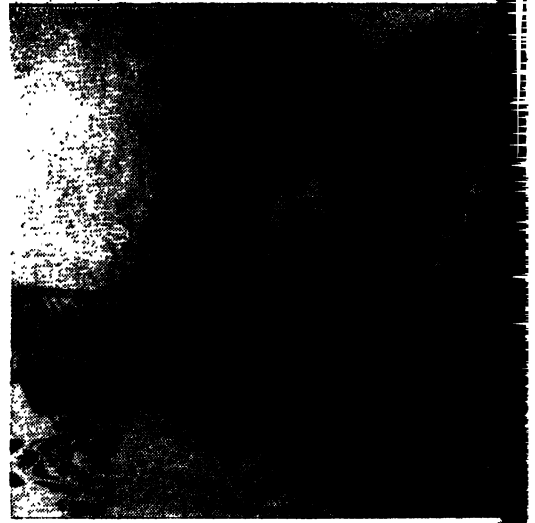
মাসিক বসুমতী। আশ্বিন / '৭৬

—নারায়ণ চক্রবর্তী

—হিমাংশু ভট্টাচার্য
(২য় পুরস্কার)
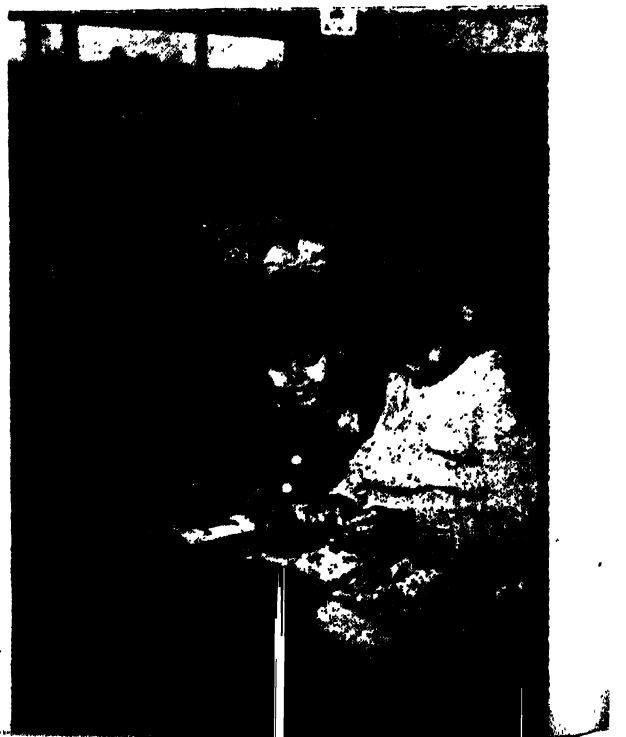
★ পা ঠি কা ★

—দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়
(৩য় পুরস্কার)

★ পাঠিকা ★

—বিশ্ববন্ধু বসাক

মাননীয়া পাঠিকা
—মীরেন অধিকারী

-প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু

১ম পুরস্কার কুড়ি টাকা
২য় পনেরো টাকা : ৩য় দশ টাকা

"কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী–"

রবীন্দ্রনাথ

লক্ষ্মীবিলাস শুধু 'কেশপাশ' সুরভিত করে না, মাথার ত্বককে সজীব করে, চুলের গোড়া শক্ত রাখে এবং পরিণতিতে চুল হয় চিকণ-কালো।
বংশপরম্পরায় পরম রমণীয় হয়ে বাংলাদেশে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

লক্ষ্মীবিলাস

✻ শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত গুণসম্পন্ন তৈল ✻

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ ■ লক্ষ্মীবিলাস হাউস–কলিকাতা-৯

...
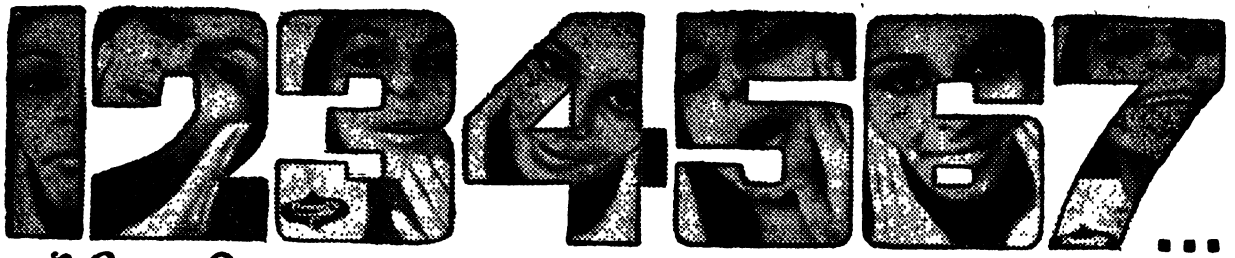
আট দিনের দিন আমার মুখখানি আশ্চর্য কোমল ও লাবণ্যময় হয়ে উঠল !

পণ্ড্স-এর '৭-দিনে রূপলাবণ্য' পরিকল্পনা

এই অঘটন ঘটিয়ে দিল

আমার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখ নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, অথচ সুনীলের সঙ্গে বিশেষ ডিনারে বসতে হবে আর মোটে ৮ দিন বাকি। ভেবে কূল পাইনা, এমন সময় সুনীতার কথা মনে পড়ে গেল ! ও বলেছিল, পণ্ডস-এর ৭ দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনায় ও দারুণ কাজ পেয়েছে ; ঠিক করলাম, আমিও তাই করব !

পরিকল্পনা ও তার কাজ

এক সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাত্তিরে একবার নয়, দুবার ক'রে পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম মাখতে লাগলাম। প্রথমে ওপরকার ময়লা ও মেক-আপ উঠে গেল।

দ্বিতীয়বার ক্রীম লাগানোর সময়ই ফুটে উঠল রূপ !

দ্বিতীয়বার মুখে ক্রীম মাখলাম—রূপলাবণ্যের যেন ঘুম ভাঙল ! এই ক্রীম চামড়ার খুব ভেতরে গিয়ে এমন সব লুকনো ময়লা বের ক'রে দিল, জল ও সাবান যার নাগাল পায়না। মুখশ্রী হ'য়ে উঠল কমনীয় উজ্জ্বল !

বিশেষ সন্ধ্যাটি আমার স্মরণীয় হ'য়ে রইল···সুনীল বলল, আমার মুখের দিকে চেয়ে নাকি পলক পড়ে না !

পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম আমি রোজ রাতে দুবার মাখি।

আজ রাত থেকেই পণ্ড্স-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা কাজে লাগান—আপনার মুখখানিও হয়ে উঠবে আশ্চর্য কোমল আর লাবণ্যে ভরা !

পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম—পৃথিবীর এই মুখশ্রী নির্মলকারী ক্রীমই কাটতিতে সবার ও

P 4958A

চীজব্রো-পণ্ড্স ইনকর্পোরেটেড (সীমিত দায়ে মার্কিন

(শেষাংশ)

এভাবেই আবার কেটে গিয়েছিলো কয়েক মাস। বাড়ীতে আর একটুও ভালো লাগে না ; কখনো রাগে দুঃখে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করতো, বিয়ে তো হবেই, হয়তো দু'দিন দেরি হচ্ছে তাই বলে আমি এমন কি অপরাধ করছি যার জন্য তোমরা---

জানিস অনু, নিজের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিলো। আমার প্রতি অনিলের প্রেমেও কখনো সন্দেহ করিনি। কল্পনাতেও ভাবিনি সে কথা কোনোদিন। কিন্তু কিছুদিন পর একটু একটু করে আমি কোনোদিন কল্পনা না-করা অনেক কথাই শুনতে আরম্ভ করলাম। আমি কিন্তু কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারিনি, করতে চাইনি। একদিন হঠাৎ শুনলাম বৌদি আমার দাদাকে বলছে, অনিল উর্মিকে নিয়ে ভালো খেলাই খেলছে। জানো, আমার মনে হয় অনিলের বিয়ে করবার ইচ্ছেই নেই, তা না হলে এতদিন ধরে কিছু একটা ঠিক করছে না কেন? আমি কেবল ভাবছি উর্মির কথাই, সত্যি যদি বিয়েটা না হয় উর্মির অবস্থাটা কি হবে---

একমিনিটও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। বৌদির কথা শুনে মনে হলো আমার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেলো মুহূর্তে। জানি না কেমন করে ঘরে এসে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়েছিলাম। বোধশক্তিটুকু আমার সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিলো। বিরাট শূন্যতার হাহাকার আমার সর্বসত্তাকে গিলে ফেলতে চেয়েছিলো। জানি না কতক্ষণ আমি অবসন্নের মত বিছানায় পড়েছিলাম।---হঠাৎ শুনেছিলাম চাকরকে বলা, দিদিমণি অনিলবাবু এসেছে।---অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিলাম বসবার ঘরের দিকে।

অনিলকে দেখেছিলাম বারবার। সুন্দর, স্বাভাবিক ভাবে অনিল [illegible] ধরে আমার সঙ্গে কথা [illegible]। অজিত বলে যাচ্ছিল, উর্মি, এবারে তোমাকে একটা খুব ভালো খবর দেবো---

হাসিমুখে অনিল অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হয়তো আশা করেছিল আমি আগ্রহ প্রকাশ করে অনেক কিছু বলবো। আমি কিছুই বলতে পারিনি, অভিমানে আমার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গিয়েছিল যেন। আনন্দে আত্মহারা অনিল কিন্তু এ সব কিছুই লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। আবার সুরু করেছিলো বলতে, কি---

শ্রীবন্দনা বড়ুয়া

বলতে পারলে না তো? আচ্ছা আমিই বলি শোনো, সেই চাকরিটা আমিই শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম, দিনকয়েকের মধ্যেই 'জয়েন' করতে শিলংয়ে যেতে হবে---

ভালো খবরটা পেয়েও আমি একটুও আনন্দ প্রকাশ করতে পারলাম না---। অনিল বলেই যাচ্ছিল তখনো। হঠাৎ শুনেছিলাম---উর্মি, কাজে 'জয়েন' করার দিনকয়েক বাদেই পূজোর জন্য প্রায় দিন দশ-বারো হাতে পেয়ে যাবো। তাই আমার কি ইচ্ছা জানো, ছুটির কয়েকটি দিনের মধ্যেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক, কি বলো তুমি---

অনু, অনিলের আর কোনো কথাই আমি শুনতে পাইনি। আমার কানে মাত্র একটি কথাই তখন বার বার বেজে চলেছিল। আমার সর্বসত্তার মাঝে আনন্দের শিহরণ বয়ে চললো। এ আনন্দ আমি কোথায় রাখবো, কাকে জানাবো? কোনো উত্তর আমি অনিলকে দিতে পারিনি---মাত্র অনিলের দুটি হাত আমার বুকের মাঝে চেপে ধরেছিলাম অনেকক্ষণ---

কিছুক্ষণ বাদে আমি চলে গিয়েছিলাম ভেতরে---আমি একলা হতে চেয়েছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। ---যখন আবার বসার ঘরের দিকে এগিয়েছিলাম চোখে পড়েছিলো দাদা আর অনিল দুজনের কথা বলাটা।---ভীষণ লজ্জা হয়েছিল ওদের সামনে যেতে। মনে হয়েছিল এই প্রথম আমি যেন অনিলকে দেখলাম।।

সে রাত আমি একটুও ঘুমাই নি। সারা রাত ধরে নতুন করে মিষ্টিমধুর অনেক ছবিই আঁকছিলাম। মনের কোণায় জমে থাকা অনেক অভিমান কোন ফাঁকে ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে গিয়েছিল।---এর পরের কয়েক দিন

দিন ধরে আমি যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেছিলাম সারাক্ষণ।

যাবার আগের দিন অনিল এসেছিলো আবার। বিদায়ের মুহূর্তে অনেক প্রতিশ্রুতি জানিয়ে একসময় আমার কাছ থেকে অনিল চলে গিয়েছিলো দূরে, অনেক দূরে শিলং পাহাড়ে।

বাড়ীতে বিয়ের যোগাড় হতে সুরু হয়েছিলো। পূজোর অনেক আগেই তুই দিল্লিকে আসতে মা বার বার চিঠি লিখলো। বিয়ের বাজার করতে মা-বৌদি ঘনঘন দোকানে যাওয়া-আসা করতে লাগলো।—

●

এ পর্যন্ত বলেই উর্মি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। তন্ময় হয়ে শোনা অনীতা একটু পরে কান্নাভরা সুরে গলায় জিজ্ঞেস করলো, তার পর?

উর্মি উত্তর দিয়েছিলো, তার পর? তারপরে আর কিছুই নেই। কারণ আমার জীবনে সেই মধুলগ্ন আর কোনোদিন এলো না। অনিল শিলংয়ে গিয়ে কাজে যোগদান করলো। প্রথম প্রথম নিয়মিতভাবে চিঠিও লিখছিলো।—তারপর হঠাৎ একদিন চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেলো।—দুর্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পর পর কয়েকখানা চিঠি লিখলাম। উত্তর কিন্তু একটাও পেলাম না।—আমার এই অপমানে দাদা ভীষণ রেগে গেলো। খুব কড়া একখানা চিঠি লিখলো অনিলকে, দিনকয়েকের ভেতর সেই চিঠির উত্তর এসেছিলো। সংক্ষেপে লেখা ছিলো, বাড়ীর প্রত্যেকের অমতে এ বিয়েতে মত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হল না—

অনু, আমার চাঞ্চল্যকর প্রেমের অভিযানের ইতি এখানেই, হাল্কা সুরেই এটুকু বলতে চেষ্টা করে উর্মির গলাটা শেষে কিন্তু ভেঙে গেলো। দু'হাতে মুছে নিলো জলভরা দুটি চোখ।

অনীতা কি বলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। নীরবে বসে থাকা অনীতাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে উর্মিই আবার বলতে সুরু করে। অনু, আমি আজো বুঝতে পারি না অনিল কেন আমার সঙ্গে এতোদিন ধরে ভালবাসার অভিনয় করলো। আমার কোথায় ভুল হলো? যাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলাম, প্রতিদানে কেন তার কাছ থেকে পেলাম বঞ্চনা! আজো ভাবি—আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এভাবে তার কি একটুও দ্বিধা হলো না? আমি যে একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে গেলাম। অন্তরের নিভৃততম কোণে সযতনে একজনের মূর্তি গড়ে আমার সমস্ত উজাড় করে দিয়ে প্রতিদানে আমি একি পেলাম?—

অনু, তুই বোধহয় ভাবছিস তাহলে আমার বিয়ে রণজিতের সঙ্গে হলো কি করে? তাই না?—

অনিলের সেই চিঠিটা পাওয়ার পর বাড়ীতে কি অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তুই একবার নিজেই অনুমান কর। কোনো উপায় আমার ছিলো না। সকল লাঞ্ছনা, সকল অপমান আমার প্রাপ্য বলে মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। মা-বাবাকে বলেছিলাম, বিয়ে আর আমি কোনোদিন করবো না।—

কলেজে একটি চাকরিও পেয়েছিলাম।

কয়েক বছর কেটে গেলো। তোরা সবাই মা হয়েছিস, গৃহিণী হয়েছিস। আমি কিন্তু মার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না—বাবার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়লো। সুযোগ পেলেই বৌদি বাঁকা বাঁকা কথা বলতে সুরু করলো। আমার চিন্তায় পাড়া-প্রতিবেশীর চোখের ঘুমও অদৃশ্য হলো।

দশ-বারো বছর আগে রণজিৎ চৌধুরীর মা-বাবা একবার বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আমার মা-বাবারও খুব আগ্রহ ছিল এই বিয়েতে কিন্তু আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য শেষে এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। মনে আছে, এই সম্বন্ধের কথা হাল্কাস্বরে একবার অনিলকেও বলেছিলাম।—কিছুদিন বাদ খুব বড় চাকরি নিয়ে রণজিৎ ডিব্রুগড়ে চলে গিয়েছিল। বৌদিই এই সকল খবর আমায় দিয়েছিল। ইতিমধ্যে ছোট দু-ভায়ের বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলাম, রণজিৎ নাকি মা-বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিল বিয়ে কোনদিন করবে না বলে। শুনে অপরাধবোধে আমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার তো করবার কিছু ছিলো না।—

চিরদিনের মত প্রবঞ্চনা করে অনিল চলে যাওয়ার পর, দু'তিন বছর পর একদিন কলেজে যাবার সময় হঠাৎ পথে দেখা হয়েছিল আমার রণজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে। নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন আছেন, বহুদিন বাদে দেখা হলো?—

মনের সমস্ত জড়তা কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে আমিও উত্তর দিয়েছিলাম।—

অনু, এর পরের ঘটনা একেবারেই সংক্ষেপ। কয়েকদিন বাদে বৌদি জানতে চেয়েছিল আমার মতামত। বলেছিলো, রণজিৎ চৌধুরী নাকি বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তাব আবার পাঠিয়েছে, জানতে চেয়েছে আমার মতামত।

বৌদির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম প্রথমে। অনেকক্ষণ বাদে বলেছিলাম, মতামত দেওয়ার আগে রণজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

আমার নির্ভীক, নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনে বৌদি হয়তো ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, তাই আর কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এই ঘটনার দিনকয়েক বাদেই রণজিৎ এসেছিল প্রথমবারের জন্য আমাদের বাড়ীতে।

আমার অন্তরের মাঝে সেদিন যে কি ঝড় বয়েছিল তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না অনু। বার বার কেবল ভাবছিলাম, এ আমি কি করতে যাচ্ছি! একজন নিরপরাধ লোককে চিরদিনের জন্য ফাঁকি দিয়ে বঞ্চিত করবার আমার কি অধিকার আছে? অথচ আমার জন্যই তো রণজিৎ এতোদিন বিয়ে করে নি, এ খবর আমার থেকে বেশী ভালো আর কেই বা জানবে

মা-বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলো রণজিৎ। আমাকে ডাকতে বৌদি অনেকবার এসেছিলো, কিন্তু আমি অতো সহজে যেতে পারিনি। অবশেষে মনস্থির করেছিলাম, আমার জীবনের সকল ব্যর্থতার কাহিনী তাকে খুলে বলবো। হয়তো সেই কাহিনী শুনে দুঃখে-লজ্জায় রণজিৎ চৌধুরী নিজেই একসময় আমার কাছ থেকে চলে যাবে—বহু দূরে।

ধীর পায়ে আমি বসবার ঘরে গিয়েছিলাম। ভীষণ অসহায় লাগছিলো নিজেকে। অশান্ত মনের প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝাকে ঢেকে রেখে শান্ত মনে নিজেকে একটি চেয়ারে সমর্পণ করেছিলাম। তখন ঘরে রণজিৎ আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। মনে মনে কেবলি ভাবছিলাম কি ভাবে আরম্ভ করবো আমার সমস্ত কথা। রণজিৎ কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছিলো।—

কিছু বলতে চাওয়া আমার উসখুস ভাবটা ধরা পড়ে গিয়েছিল রণজিতের চোখে।—আমি বুঝতে পারছিলাম।—তাই হঠাৎ একসময় বলে উঠেছিলাম, শুনলাম আপনি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনি কি কিছুই, কোনো কথাই জানেন না? অনিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার অনেকদিনের বন্ধুত্বের কথা? সব জেনেশুনেও আপনি কেমন করে—

আমাকে অর্ধপথেই থামিয়ে দিয়ে রণজিৎ বলছিলো, আরে, আপনি যে অনেক কিছু বলতে সুরু করে দিলেন, আগে আমাকেও কিছু বলতে দিন।

আর কিছু না বলে রণজিৎ আমার দিকে অপলকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো।-আমি কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ আমার খুব কাছে সরে এসে আমার একটি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে রণজিৎ বললো, শোনো উর্মিলা, তুমি যদি একজনকে সারা অন্তর দিয়ে দশ বছর ভালোবাসতে পারো, তাহলে আর একজন কি তোমাকে তারো অনেক বেশীদিন ভালোবাসতে পারে না? তুমি তো জানো, ভালোবাসার ওপর কোনো জোর, কারো প্রভুত্ব খাটে না, ভালোবাসা কোনো আইন-কানুন মানে না।—উর্মিলা, আমি মাত্র একটি কথাই বলতে চাই তোমাকে। আমি সব কথাই জানি। সব জেনে-শুনেও আমি তোমাকেই চাই আমার একান্ত আপনার জন রূপে। তোমার অতীত তোমার কাছেই থাকুক। অতীতের সকল কথা কেবল তোমার মনের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাক। কোনদিন আমি জানতে চাইবো না তোমার সেই অতীতের কথা।—আমি মাত্র একটি অনুরোধ তোমায় করবো, বর্তমান আর ভবিষ্যতকে নিয়ে আমার জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পেতে দাও। আমার অনেক, অনেক দিনের আশাভরা কল্পনা সম্পূর্ণতা খুঁজে পাবে—যেদিন তুমি এসে আমার অসম্পূর্ণ জীবনকে ভরিয়ে তুলবে।

●

অনু, এর মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো, তাও আজ দু'বছরের আগের কথা।—

সকল কথা শেষ করে উর্মি নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বসে থাকে। অনীতা একসময় উঠে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যাওয়া ঘরটার আলোটা জ্বালিয়ে দেয়।—কখন যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছিলো ওদের দুজনের খেয়াল হয়নি এতক্ষণ। আলোটা জ্বলে উঠতেই এতোক্ষণ অন্ধকারের বুকে বসে অন্তরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা উজাড় করে ফেলা উর্মি লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাই লাজুক গলায় বলে উঠলো, ইস্, রাম, সারা দুপুরবেলা বকবক করে তোকে বিরক্ত করলাম, না রে অনু? এবারে কিন্তু যেতে হবে আমার। শরীর ভালো নেই বলেই রণজিৎ আজকে আর আসবে না।—অনু, চা দিবি তো দে, তাড়াতাড়ি। শোন, পরশু, অলকেশ, তুই বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের বাড়ীতে পরিচয় করে আসবি, কেমন? না এলে কিন্তু ভীষণ রাগ করবো।—

খুব স্বাভাবিক হয়ে, মুখে হাসি নিয়ে উর্মি সকল কথাই বলে যায়। অনীতা কিন্তু বোঝে সব। মর্মে মর্মে অনুভব করে উর্মির মনের সকল ব্যথা।

কিছুক্ষণ বাদে উর্মি অনীতার কাছে বিদায় নিয়ে বাচ্চাদের আদর করে তার বিরাট গাড়ীটায় করে চলে গিয়েছিলো। হাসিমুখে যাবার আগে আবার মনে করিয়ে দিয়েছিলো অনীতাকে।

●

উর্মির বিরাট গাড়ীখানা বড় রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ব্যথায় ভারী হয়ে থাকা মনটা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে অনীতা। অনেক দিনের আগের অনেক কথাই মনের চারপাশে আনাগোনা করে। একটি প্রশ্ন বারবার মনের মাঝে এসে উঁকি দেয়— অগাধ ঐশ্বর্য, মান-সম্মান, প্রতিপত্তি, একটি সুন্দর সংসার সর্বোপরি অতুলনীয় হৃদয়ের অধিকারী, রণজিতের মতন একজনকে স্বামিরূপে পাওয়া উর্মিলা সত্যিই সম্পূর্ণ সুখী কি? জীবনের নব-প্রভাতে প্রথমবার উর্মি সর্বসত্তা দিয়ে অনিলকে ভালোবেসেছিলো, সেই প্রথম ভালোবাসার স্মৃতি উর্মির মন-সমুদ্রের বুকে উর্মিমালার সৃষ্টি কোনোদিন কি করে না?*

---

* মূল অসমীয়া গল্প হইতে অনূদিত।

সুন্দরবন অতীত ও বর্তমান

নরোত্তম হালদার

পাতালপুরের ঐতিহ্য

রামায়ণ ও মহাভারত থেকে জানা যায়—মহর্ষি কপিল যখন পাতালপুরে প্রথম আসেন, তখন এই স্থান ছিল নির্জন। সগরসন্তানগণের পাতাল অধিকার এবং কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত হওয়ার পর পুনরায় ইহা নির্জন দ্বীপে পরিণত হয়। অতঃপর পুরাণকারের উক্তি থেকে আমরা এই স্থানকে আর্যজনপদরূপে দেখতে পাই। মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও পাঠান আমলের বিশেষ গৌরবমণ্ডিত এই স্থান উত্থান-পতন ও নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়, কিন্তু মোগল আমলের (১৭শ শতাব্দী) এই স্থান পুনরায় জনমানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। ইংরাজ আমলে ১৯শ শতকের প্রথম দিক থেকে সুন্দরবন হাঁসিল হয়ে আবার বসতি স্থাপন সুরু হয়।

জঙ্গল হাঁসিলের সময় সাগরদ্বীপের সর্বত্র উঁচুপাড় বিশিষ্ট বড় বড় দীঘি, কূপ ও অসংখ্য মন্দির, মূর্তি ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রাফ (৪ নং) গ্রন্থে স্বর্গত কালিদাস দত্ত কৃত 'সাউথ-ওয়েস্ট সুন্দরবন' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, এই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হুগলী নদীর মোহনার সন্নিকটে খনন কালে সাগর-লাইটহাউসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ম্যানুয়েল এক অভিনব স্বর্ণবলয় পেয়েছিলেন; তাতে একটি মনুষ্যমূর্তি ক্ষোদিত ছিল। পশ্চিমে হুগলী নদীর তীরে মন্দিরতলা নামক স্থানে দুটি দুর্গপ্রাচীর (ইহার একটি চল্লিশ ফুট উচ্চ ছিল) ও একটি ভগ্নমন্দির আবিষ্কৃত হয়। ইহার উত্তরে একটি বিরাট দীঘির মধ্যে কিছু প্রাচীন মুদ্রা ও স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যায়। জমিদার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী সেগুলি রেখেছিলেন। আদিগঙ্গার পূর্বদিকে ধবলাট নামক স্থানে প্রাপ্ত বিষ্ণু ও জৈন তীর্থঙ্করের প্রস্তরমূর্তি জমিদার শ্রীপুলিনবিহারী দত্তের কাছারীতে আছে।

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর-খুলনার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড—২২৮ পৃঃ) থেকে জানা যায়—

'যেখানেই কোন কারণে লক্ষ্মণ সেনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, সেখানেই তিনি কোন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা সে সম্বন্ধ চিরস্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনিই গঙ্গা-সাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপে এক পৃথক মন্দিরে একটি গঙ্গামূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সুন্দরবনের বিপ্লবে যশোরেশ্বরীর প্রতিমার মত সে মূর্তিও জঙ্গলাবৃত হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সাগরদ্বীপ অধিকারকালে উক্ত গঙ্গামূর্তি আবিষ্কৃত হন। পুরাতন যশোরেশ্বরী দেবী সত্যযুগ হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার কথা জানিত। গঙ্গামূর্তি আবিষ্কারের পর প্রতাপাদিত্য ঐ অপূর্ব মূর্তি নিজ রাজধানীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উহার সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

এ মূর্তি অতি সুন্দর; যে অপূর্ব ভাস্করশিল্পী এই মূর্তি গড়িয়াছিল, পাঠান আমলের তামসযুগে তাহার কোন চর্চা না থাকায়, পরবর্তী আমলে এমন প্রতিমা প্রস্তুত করা অসম্ভব হইয়াছিল। এই মকরবাহনা মাল্যহস্তা দেবীর দেহ হইতে যে দিব্য লাবণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের মনে হয় এই অপূর্ব মূর্তি সেনরাজগণেরই সম্পত্তি।

ভূমিকম্পে সাগরদ্বীপের সুবিস্তৃত অঞ্চল অধিক পরিমাণে বসে যাওয়ায় অট্টালিকাদি প্রাচীন নিদর্শন সমূহ ভূপ্রোথিত হয়ে যায়; সেজন্য, নদীতে যখন ভাঙ্গন নামে, তখন নৌকা থেকে ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষগুলি এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

দস্যু, বাঘ, সাপ, কুমীর, বন্যা ও ভূমিকম্পের গ্রাসে এখানকার প্রাচীন কীর্তিসমূহ বারংবার এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, নিম্নবঙ্গের প্রাচীন জনপদের ইতিহাস উদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নাই—তাই সুন্দরবনের কোন ইতিহাস নেই। আর এজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, এই সুন্দরবন বঙ্গোপসাগরের তলা থেকে উত্থিত সম্পূর্ণ নূতন ভূভাগ এবং জঙ্গল হাঁসিলের পূর্বে এখানে জনবসতি ছিল না।

এই অভিমত সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিকগণ এখানকার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছেন। স্বর্গত কালিদাস দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে বহু পরিশ্রম করে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে, বিশেষ ক'রে 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রাফে' 'দি এ্যান্টিকুইটিজ অব সুন্দরবন' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন।

বর্তমানকালে সাগরদ্বীপের নূতন জনপদ ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার সাগর থানা ও সাগর উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত। ঘোড়ামারা ও লোহাচড়া দুটি ছোট দ্বীপ সহ এই বৃহৎ সাগরদ্বীপ সুন্দরবনের দক্ষিণসীমান্তবর্তী অঞ্চল, ডায়মণ্ডহারবার থেকে বাসে কাকদ্বীপ অথবা নামখানা হয়ে নৌকা অথবা লঞ্চে মড়িগঙ্গা অথবা বারাতলা নদী পেরিয়ে সাগরদ্বীপে পৌঁছানো যায়। ইহার পশ্চিমে

হুগলী নদীর মোহনা, উত্তরে ও পূর্বে বারাতলা বা মড়িগঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। মেদিনীপুর জেলা থেকে সরাসরি সাগরদ্বীপে যাতায়াতের জন্য নৌকা পথই একমাত্র পথ। সাগরমেলার সময় কোন বছর কয়েকদিন ধ'রে কলকাতা থেকে এখানে বিমান চলাচল করে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের অসংখ্য পুণ্যার্থী নরনারী যুগ যুগ ধরে পৌষ সংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমে গঙ্গাস্নান করতে আসেন।

পূর্বে ইহা কুলপী থানা এবং পরে কাকদ্বীপ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে সাতটি অঞ্চল পঞ্চায়েতে বিভক্ত—এই দ্বীপের লোকসংখ্যা প্রায় চুয়াত্তর হাজার, আয়তন প্রায় একশত চল্লিশ বর্গমাইল। এখানে শতাধিক প্রাইমারী স্কুল, পাঁচটি জুনিয়র হাইস্কুল, আটটি উচ্চ ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল এবং দুটি হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। বহুকাল পূর্বে এই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সমুদ্র-কূলে একটি লাইটহাউস ও আবহাওয়া অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। সাগরথানার অন্তর্ভুক্ত মনসাদ্বীপে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত মিশন কর্তৃক আশ্রমসংলগ্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, পাঠাগার, সমাজশিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতির কার্য পরিচালিত হয়। শ্রীধাম গঙ্গাসাগরে—মেলার সন্নিকটে কপিল আশ্রম (সর্বধর্ম সমন্বয় ও বিশ্বমানব মহামিলন কেন্দ্র), কপিলানন্দ আশ্রম (কপিল কুটির সাংখ্য যোগাশ্রম), পঞ্চমগিরির আশ্রম (শিবালয়) প্রভৃতি কয়েকটি স্থায়ী আশ্রমে প্রত্যহ পূজার্চনা ও সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সময় সারা ভারতের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করে।

উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত 'কচুবেড়িয়া গঙ্গাসাগর' রোডে বাস চলাচল সুরু হওয়ায় বর্তমান কালে গঙ্গাসাগর যাত্রা একেবারে নিরাপদ বলা যায়। কাকদ্বীপের 'হার্ড-উড্-পয়েণ্ট' পর্যন্ত বাসযোগে এবং তারপর বোট অথবা লঞ্চযোগে খেয়াপার হয়ে কচুবেড়িয়ার পথে গঙ্গাসাগরে যাওয়াই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, কিন্তু নামখানা ঘুরে গঙ্গাসাগরে যাওয়ার যে সরকারী ব্যবস্থা চালু আছে, তাতে যাত্রিসাধারণের বিশেষ অসুবিধা ও বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। কাকদ্বীপ থেকে খেয়া পেরিয়ে কচুবেড়িয়ার পথে এ পর্যন্ত কোন বিশেষ দুর্ঘটনার সংবাদ শোনা যায় নি; সুতরাং সব তীর্থের চূড়ামণি গঙ্গাসাগর মহাতীর্থ আজ আমাদের অতি নিকটের বলা যায়।

পূর্বকালে নিম্নবঙ্গে অবস্থিত এই দুর্গম দ্বীপ পাতাল ও রসাতল নামে পরিচিত ছিল। আবহমান কাল অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত এই পাতাল-প্রদেশ বা সুন্দরবনের সাগর দ্বীপ অঞ্চল বিশেষ ঐতিহ্যের অধিকারী।

●

"কামাতীর্থ সাগর-সঙ্গম সেই স্থান।
স্নান-দান-মরণেতে বিষ্ণুপদে স্থান॥
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে মৃত্যু হয় যার।
চতুর্ভুজ হয় সেই জন্ম নাহি আর॥"

—গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।
(দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ)

পৃথিবীর নতুন অধ্যায়

নিখিলরঞ্জন মাইতি

ইতিহাস আজ বুঝি খুঁজে পেল পথ
অমরাবতীর চন্দ্র হাতের মুঠোয়—
জল-স্থল-ব্যোমে আর নেইকো দিগন্ত
চাঁদের দেশের মাটি পায়েতে লুটায়।

কে জানিত কোথা কবে নিখিলের 'পরে
আর এক পৃথিবী আছে অপেক্ষমাণ—
তপস্যায় সিদ্ধিলাভ—বিজ্ঞানের বরে
আগামী দিনের কাছে চির আয়ুষ্মান।

বিস্ময়ে অবাক বিশ্ব আমেরিকা নাম
দেশের সংকট দিনে উদ্ঘাটিল দ্বার—
মর্তের মানুষ যাবে—সেই স্বর্গধাম
রচিবে সংসার মেলা—অপূর্ব বাহার।

পুরানে কোরানে আর কিবা প্রয়োজন
ভাংগা ও গড়ার খেলায়—মানুষই অমর
এদিনের কলম্বাস—
আর্মস্ট্রং, আরডলি এবং কলিন্স
ইতিহাস রেখে যাবে জলন্ত স্বাক্ষর।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ঢং-ঢং-ঢং ঘণ্টা পড়লো। মধ্যাহ্ন ভোজের ঘণ্টা। গভর্নর রেনো অনেক আগেই ভিতরে চলে গিয়েছিলেন, অভ্যাগতরা একে একে প্রবেশ করলেন ব্যাঙ্কোয়েট হলে। বড় ভোজসভা এখানেই বসে।

প্রকাণ্ড লম্বা টেবিল, দুপাশে সারিসারি চেয়ার, টেবিলের দুই মাথায় দুটি চেয়ার। একসঙ্গে বত্রিশ জন বসতে পারে। টেবিলের এক মাথায় গভর্নর ও আরেক মাথায় কেল্লার কমান্দান্তের স্থান নির্দিষ্ট, আর সকলের আসন টেবিলের দুপাশের লম্বা সারিতে।

সকলে যার যার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেছেন, নাম লেখা রয়েছে, সুরাপানের প্রগলভ্ সংলাপ এবং চঞ্চল পদ সঞ্চরণের পরে পরিপূর্ণ শৃঙখলতা। ঢং-ঢং-ঢং আবার ঘণ্টাধ্বনি। পিছনের দরজায় কমান্দান্ত আগেুয়ার গম্ভীর কণ্ঠের ঘোষণা শোনা গেল 'মঁশিয়ে লা-গভর্নর কমতে জুলিও রেনো, ডেপুতে মার্শাল-দ্য-রয়।'

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন গভর্নর রেনো, তার পশ্চাতে মেজর আগেুয়া। 'বমজুর' 'বমজুর' সমবেত ধ্বনির সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালো, গভর্নর এবং কমান্দান্ত স্থান গ্রহণ করলে সকলে আবার বসে পড়লো। সুরু হলো ভোজ, জন-আটেক খানসামা লেগে গেল পরিবেশনে।

খাদ্যের ব্যবস্থাও প্রচুর। অর্দোভ, ক্যাভিয়ার, কনসোম ব্রিতানি, বেক্তী-মেয়নেজ, কেপাট-বোর-এন-টাউট, ফিলে-দ্য-বুফ, সিকেন-প্যাতি, পিচ-মেলবা, চীজ, ক্যাফে,

দিব্যদর্শী

স্যাভোরি, নানা রকম ফল। এখানে তদারকি করছে গভর্নরের ফরাসী পাচক ফস্তেবেঁ্যা, সাদা পোষাক সাদা দস্তানা সাদা জুতো সাদা কাপড়ের চুল-ঢাকা নরম টুপী। বাহবা পাচ্ছে সে সকলের কাছে, উত্তরে বারে বারে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে 'মেসি মঁসিউ, মেসি মঁসিউ।'

অ্যালবারের কাছে এ সবই নতুন। ভেবেছিলো এ কুঠীতে এলে রাবেয়ার দর্শন মিলবে। কিন্তু সে আশা দুরাশায় পরিণত হলো। নিরাশার সঙ্গে বিস্ময়। দেশের বাইরে এলে ফরাসীরা এত সুরাপান করতে পারে, এত খেতে পারে?

'ভাইভ্-লা-রয়, ভাইভ্-লা-রয়' ধ্বনির সঙ্গে সকলে দাঁড়িয়ে উঠে ফরাসী সম্রাটের স্বাস্থ্যপান করলো। পানাসক্ত ইউরোপীয়দের পরস্পরের স্বাস্থ্যপান, রাজারাণীর শুভ কামনায় তাদের স্বাস্থ্যপান ভারতীয়দের কাছে শ্রুতিকটু, যেটা পান করা হলো সেটার তো ক্ষয় হলো, বৃদ্ধি হলো না? কিন্তু বৈপরীত্যের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে এ-জগতে, এক ভাষার বুলি অন্য ভাষার গালি, এক জাতের খাদ্য অন্য জাতের অখাদ্য, একজাতের ধর্ম অন্য জাতের কাছে অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র।

প্রকাণ্ড এক বজরায় নদী বিহারের ব্যবস্থা হয়েছিল, চিত্তবিনোদনের জন্য বাঈজীর নৃত্য। গভর্নর এবং কমান্দান্ত গেলেন না, জরুরী কাজ আছে বললেন। ফাদার ভ্যালেরীও গেলেন না, হয়তো যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আগুল্ফ-লম্বিত সাদা 'ক্যাসকে' ভূষিত পাদ্রীকে বাঈজীর আসরে দৃষ্টিকটু দেখাবে বলেই বোধ হয় যেতে সংকোচ বোধ করলেন। আর সকলের সঙ্গে অ্যালবারও বজরায় গিয়ে উঠলো।

কয়েকবার এসেছে গিয়েছে অ্যালবার এই পথে। আসা-যাওয়া করেছে বড় জাহাজের উঁচুতলায় নিজস্ব ক্যাবিনে, সর্বময় কর্তৃত্বের পরিচালক হয়ে। সে জাহাজের তুলনায় এ-বজরা কত ক্ষুদ্র, যাত্রীদের একটি নগণ্য অংশ হিসাবে তার উপস্থিতি কত অকিঞ্চিৎকর। তার জগৎটা কত ছোট হয়ে এসেছে।

কিন্তু এটাও তো অস্বীকার করা যায় না যে বাইরের জগৎটা ছোট হয়ে এলেও ভিতরের জগৎটা যেন তার বড় হয়ে উঠেছে, এ-জগৎটার খোঁজ আগে সে পায় নি। চলেছিল সে যন্ত্রের মত, যন্ত্রের কোনো অনুভূতি নাই, চঞ্চলতার স্পন্দন মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে না হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে, দেখে না স্বপ্ন ভবিষ্যতের কোনো

রঙিন স্বপ্ন, আশার-নিরাশার আলো-ছায়া খেলা করে না কোনো রেখাপাত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জল-হাওয়া কী তার দেহকে স্পর্শ করতে না পেরে দুর্বল করে ফেলেছে তার মনকে?

দুটি বাঈজী নাচছে গানের তালে তালে, জন-তিনেক ওস্তাদ বাজাচ্ছে বাঁশী বেহালা তবলা। বাঈজীদের পরিচ্ছদ অঙ্গভঙ্গী হাবভাব কদর্য কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত। বাঈজী হলেও ওরা নারী, সুন্দরীও বটে, কিন্তু দেহসৌষ্ঠবকে এভাবে পুরুষের সামনে লালসার পরিবেশনে নারীদেরই করা হয় লাঞ্ছনা। অ্যালবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো শান্তশ্রী গঙ্গার বুকে। একজনের মুখ বারে বারেই মনে এসে যায়। সহযাত্রীরা বাহবা দিচ্ছে, ইতর মন্তব্য নিক্ষেপ করছে কপোল পরিপাদন উদ্দেশ্যে, ঘৃণা হলো অ্যালবারের।

নৈশ ভোজের বৈঠক আরো বর্ণাঢ্য। সকলেরই পরিধানে সান্ধ্য পরিচ্ছদ— গলায় ঝালর দেওয়া সাদা ক্রাভাট, কালো ভেলভেটের কোট, কালো ব্রীচেস, সাদা রেশমী মোজা, বকলেস-আঁটা চকচকে জুতো। পার্সি ডালেনীর একেলা কালো কাসক, কালো কাসকের ওপর গলা থেকে ঝুলছে রুপার ক্রুশ-ফলক। মেজর ও কেল্লার তিনজন ক্যাপ্টেন নীল সামরিক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে পরিধান করেছেন সাদা-কালো সান্ধ্য পোষাক। খানাপিনার পুনরাবৃত্তি এবং উৎসবের শেষ অঙ্গেও পুনরায় বাইজ উৎসবের শেষ অঙ্গে পুনরায় বাঈজী নৃত্য। ব্যাঙ্কয়েট-সেলনের ছাদ থেকে আলোর ঝাড় ঝুলছে, কেল্লার ব্যাণ্ড পার্টি মাঝে মাঝে ঝমঝম বেজে উঠছে। কিন্তু এসব ভাল লাগছে না অ্যালবারের।

॥ পাঁচ ॥

রৌশনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার রাবেয়া চলেছে কলকাতায়। বকরীদ এসে পড়েছে, ভগ্নীর জন্য শাড়ি কিনতে যাচ্ছে রৌশন। এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, আরো একটি গোপন উদ্দেশ্য আছে। দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছে লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার, সঙ্গে-জমিনে ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লার ভিতরটা দেখে আসার এ সুবর্ণ সুযোগ। সৈনুদ্দীন ইংরেজদের অনেক গোপন খবর আনে, কিন্তু কেল্লার প্রাচীর বেষ্টনী তার ভেদ করবার উপায় নাই।

খেতে খেতে রাবেয়ার মনে পড়ছে সেই প্রথমবারের কথা। সঙ্কটের সম্ভাবনা আবির্ভাব এবং সে সংকটের ত্রাণকর্তারূপে এই ইংরেজ যুবকের সঙ্গে অভাবনীয়রূপে সেই প্রথম দর্শন। সেই অপরিচিত আগন্তুক দূরত্বের সীমা লঙ্ঘন ক'রে আজ বহু কাছে এসে পড়েছে তার, কিন্তু রাবেয়ার কী জানি কেন মনে হয় তাদের দুটি জীবনের অক্ষরেখার মাঝে রয়েছে অনেক ব্যবধান। এই 'কেন'র উত্তর সে জানে না।

প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্য এখানেই। রাবেয়া সে ব্যবধানের অস্তিত্ব অনুভব করে সিলভেস্টারের সঙ্গে নিজেকে তুলনা ক'রে সে, ব্যবধান জাতি-ধর্ম বর্ণেরই নয় শুধু, পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃতিগত সমাজগত লক্ষ্যগত পরিণামগত মৌলিক ব্যবধান।

বাল্যের রঙমহলের খেলা একসঙ্গে শেষ করে বালক ও বালিকারা যখন দাঁড়ায় কৈশোর ও যৌবনের শিসমহলের সামনে তখন দেখে বালকদের প্রবেশ দ্বার ও বালিকাদের প্রবেশ দ্বার আলাদা। আবার হয়তো দেখা হবে, আবার হয়তো সংসারের খেলা খেলতে হবে, তবু কোথায় যেন একটু 'কী' 'কেন' 'কিন্তুর' রেশ থেকে যায়।

দেহের ক্রমপরিণতি ছেলেটির কাছে নিয়ে আসে পৌরুষের গর্ব, শক্তির অহংকার, আত্মপ্রত্যয়, কর্ম-জীবনের আহ্বান। দৈহিক পরিণতির গোপন রহস্য মেয়েটির কাছে নিয়ে আসে দ্বিধা সংকোচ লজ্জা সন্দেহ ভীতি বাধা-নিষেধ, হঠাৎ সে উপলব্ধি করে সমকক্ষতার দাবি সে হারিয়ে ফেলেছে, এ-জগৎটা মুখ্যত পুরুষের, পুরুষই হবে তার অবলম্বন, রক্ষক প্রতিপালক, ভাগ্য-নিয়ন্তা, পুরুষের অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া তার গত্যন্তর নাই, তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রমূলে থাকবে পুরুষ, সে হতে চলেছে পুরুষের সম্পত্তি, নিজের ব্যক্তিত্ব বলে স্বতন্ত্র কিছু থাকবে না তার। পুরুষের অহমিকা পোষণ করতে তাকে হতে হবে শান্তশিষ্ট আজ্ঞাবহ দুর্বলা অবলা। পুরুষ স্বাধীন, নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যত নিজের চেষ্টায়, নিজের ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারবে, কিন্তু সে-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে সে নারী হয়ে জন্মেছে বলে। যৌবনে পুরুষ স্বপ্ন দেখে যে-নারীর সাহচর্য, সে-নারী তার জীবনের হবে একটি অংশমাত্র কিন্তু নারী যে পুরুষের সাহচর্য স্বপ্ন দেখে সে-সাহচর্য হবে তার সর্বস্ব সম্বল, পুরুষ করবে তাকে জয় বিজেতার কন্দর্পে, নারীর করতে হবে আত্মসমর্পণ নিয়তির বিধানে। যদি সে পুরুষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ না হয়ে মুক্ত থাকতে চায় তবে তার মূল্য স্বরূপে স্বীকার করে নিতে হবে অবহেলা অনিশ্চয়তা নিঃসঙ্গতা অসহায়তা। পুরুষের জৈব আবেগ তার পৌরুষের সহজাত প্রেরণা হিসাবে প্রশ্রয় পাবে সমাজের কাছে কারণ সমাজে, পুরুষেরই প্রাধান্য, নারীর পক্ষে সেই জৈবিক অনুভূতি নিন্দিত হবে আর সকলের কাছে এবং ক্ষণিকের ভুলও ক্ষমা লাভ করবে না।

●

বজরা এসে থেমেছে বড়বাজারের ঘাটে। রৌশন ও রাবেয়ার মুখ ছিল বোরখায় ঢাকা, লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার ইতস্তত করে এগিয়ে এল। ওরাও প্রথমে চিনতে পারে নাই সিলভেস্টারকে, এর আগে যতবারই দেখেছে সিল-ভেস্টারকে, তার বেশ থাকতো এলোমেলো, ভাঁজবিহীন অর্ধ-মলিন

ছাই রঙের ট্রাউজার, গলা-খোলা শার্ট, কাদামাখা জুতো, টুপীহীন মাথায় একরাশ সোনালী রঙের চুল হাওয়ায় বিশৃঙখল। কিন্তু আজ তার পরিধানে ধোপ-দুরস্ত লাল রঙের ট্রাউজার, চকচকে পিতলের বোতাম-আঁটা লালরঙের কোট, টাই চকচকে জুতো, কোমড়ে সাদা চামড়ার খাপে পিস্তল, হাতে চামড়া বাঁধানো 'বেটন।'

খিলখিল করে হেসে উঠলো রাবেয়া। 'লেফটেনেণ্ট সিলভেস্টার নামে একজনের আসার কথা ছিল, তুমি কে?'

'আমি তার মৃত আত্মা।' মুচকি হেসে বললো সিলভেস্টার।

'তাই একটু অন্য রকম লাগছে তোমার, না?'

'ছিঃ, এ রকম ঠাট্টা করতে নেই, রবার্ট' বলে ওঠে রৌশন। সিলভেস্টার মাথা সামনে হেলিয়ে স্বাগত জানালো 'গুড মর্নিং ম্যাডাম, এস আমার সঙ্গে, ঐ ছ'টি বন্দুকধারী দেহরক্ষীর একটিও দরকার হবেনা এখানে, আমার মত একজনই যথেষ্ট।'

জুতোর উপর জুতোর খট্ করে ঠোক্কড় দিয়ে সিলভেস্টার ফৌজী কায়দায় সেলাম করলো। 'কলকাতা সহরে আমাদের এ-পোষাক ছাড়া কেল্লার বাইরে বেরোবার হুকুম নেই।'

'তোমাকে কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় লেফটেনেণ্ট?' আবার পরিহাস করে রাবেয়া।

'তোমার আসল মতলব তো জানি না?'

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দেয় সিলভেস্টার 'কাউকেই বিশ্বাস করা ঠিক নয়, কার কি মতলব কে জানে?'

সিলভেস্টারের অনুরোধে রৌশন ও রাবেয়া বোরখা খুলে বজরায় পাঠিয়ে দিল। সুতোনুটির হাটের চাইতেও বড়বাজারের বাজারে ভিড় বেশী। সুতোনুটির হাটে কাপড়-জামার রকমারি বাহার দেখে তাক লেগে যায়. এ-বাজারে ও-ছাড়াও কতরকমের মালা, চুড়ি, দুল, নাগড়াই, গন্ধদ্রব্য কুঙ্কুম, আলতা, সুরমা, লাঠি-ছোরা, টুপী, আরশী, কৌটো, বাক্স, বাঁশী, খেলনার ছড়াছড়ি।

রৌশন ও রাবেয়ার আবির্ভাবে বাজারে যেন সাড়া পরে গেলো। সাহেব, মেমসাহেব, ফিরিঙ্গী, আর্মানী বারে বারে চোখ ফিরিয়ে দেখছে, দোকানীরা ডাকাডাকি করছে 'ইধার আইয়ে বেগম সাহেবা,' 'আসুন বিবিসাহেব,' 'একবার দয়া করে এখানে আসুন মা-জননী।' সঙ্গে একজন কেল্লার সাহেব আছে, এটাও যেন অদ্ভুত লাগছে তাদের কাছে।

'দামী পাথরের মালা হুজুরাণী, চুনী, পোকরাজ, পান্না, গোমেধ, মুক্তো, নীলকান্ত যেমন আপনার মর্জি।'

থামলো রাবেয়া দোকানের সামনে। সবুজ রঙ বেশী ভালো লাগে তার, একটা পান্নার মালা হাতে নিয়ে দেখলো। বড় বড় পান্নার চৌকো সবুজ রেশমে গাঁথা, সবুজের সঙ্গে মিল ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

সিলভেস্টার বললো, 'এটা কিন্তু আমার চাই, ম্যাডাম, রাবেয়াকে অন্য একটা পছন্দ করতে বলো।'

'কার জন্যে চাই রবার্ট? তোমার কোনো বান্ধবী আছে বিলেতে নিশ্চয়ই' জিজ্ঞাসা করে রৌশন।

'কলকাতায়ই বা ওর বান্ধবীর অভাব কী? ঢের ঢের জানা আছে ইংরেজদের এখানে কতখানি সুনাম।'

সিলভেস্টার কোনো প্রতিবাদ জানালো না, অন্যদিকে মুখ ফেরালো। সত্যিই অনেক কিছু চলে এখানে যা ও নিজেও সমর্থন করতে পারে না, কিন্তু রাবেয়া কী তাকেও ঐ দলের ভেবেছে, না ঠাট্টা করছে? কিছুক্ষণ বাদে ও বললো 'ওহে লাল রঙ মাখানো কাঠের পুতুলটি যুদ্ধ করতে জানো, না বন্দুক ফেলে দৌড় দেবে আসল সময়?'

রৌশন ধমক দেয় 'থাম রাবেয়া, তুই বেচারীর পেছনে বড্ড লাগিস।'

কেল্লার ব্যারাকে সিলভেস্টারের থাকবার জায়গাটি দেখে দুই বোনই বেশ নিরাশ হলো। একতলায় তিনটি ছোট্ট ঘর, একখানি বসবার, একখানি শোবার, একখানা গোসলখানা। একই রকম পাঁচটি ভাগ, উপর-নীচ মিলিয়ে দশ জনের ব্যবস্থা। সামনের লম্বা-বারান্দা কারো নিজস্ব নয়। পূর্বদিকে লালদীঘি এবং পশ্চিমে গঙ্গা ঢাকা পড়ে গেছে কেল্লার উঁচু পাঁচিলে, হাওয়া চলাচলও গেছে আটকে সেই পাঁচিলে।

'চন্দননগরের গভর্নর কুঠীর সঙ্গে তুলনা করো না ম্যাডাম, এটা কুঠী নয়, ব্যারাক, প্রথম প্রথম আমারও কষ্ট হতো, কিন্তু সবই ক্রমে সহ্য হয়ে যায়।'

কথায় কথায় রৌশন অনেক কথা জেনে নিলো। লম্বা লম্বা ব্যারাকগুলিতে সাধারণ সিপাইরা থাকে, এখন আছে দুশো তেলেঙ্গী সেপাই, একশো গোরা সেপাই। বড় বড় ঘরগুলি গুদোম, কোম্পানীর মাল থাকে, নবাবের মর্জি কখন কী হয় কে বলবে? তাই বাইরের গুদামগুলি ভিতরে আনা হয়েছে। ব্যারাক ও ও গুদামগুলির ছাদ মাটির সঙ্গে পাথরের গুড়ো দিয়ে তৈরী, যাতে কামানের গোলা আগুন ধরিয়ে না দিতে পারে। লেফটেনেণ্ট ক্যাপ্টেন মেজরদের জন্য খানা-বাড়ি আলাদা, সেখানে সুন্দর একটি নাচঘর ও বসবার ঘরও আছে। আরো দক্ষিণে গঙ্গার একেবারে গা ঘেঁসে একটি নতুন কেল্লার ভিত্তি গাঁথা হচ্ছে, তার দেওয়াল হবে ষোল ফুট পুরু, হাজারের বেশী সিপাই ও অফিসার-দের থাকার বন্দোবস্ত থাকবে ওখানে। তখন সেটাই হবে ফোর্ট উইলিয়াম, এটাকে আগাগোড়া গুদাম বানান হবে ঠিক হয়েছে।

রৌশনের বিবেক বারে বারে বাধা দিচ্ছিল, 'এটা ভাল হচ্ছে না তোমার, ছেলেটি তোমাকে বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাসের অপলাপ করে তুমি নিজের মতলব হাসিল করছো

অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন কর কেন হে বাপু?'

রৌশনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি হিসেব করে দেখলো কেল্লার আটটি বুরুজে আটটি বড় কামান বসানো আছে, গঙ্গার দিকে মাত্র দুটি, আর তিনদিকে দুটি করে, মনে হয় জলপথে নবাবের অভিযান এরা আশঙ্কা করে না, তাই বেশীর ভাগ তাক্ করে আছে স্থলপথের দিকে। বন্দুক ছুড়বার ছিদ্রগুলিও শহরের দিকে বেশী।

জমির দিকে ভাল করে তাকালো রৌশন। ছোট ছোট কতগুলো জানালা দেখা যাচ্ছে মাটির ঠিক উপরেই, বড় রাস্তা চালু হয়ে গেছে ওদিকে। ওগুলো নিশ্চয়ই তোপখানা বারুদখানা রসদখানা। চারটে চকচকে কামান পড়ে আছে ওখানে, বোধ হয় সবে এসেছে, এখনো ভিতরে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত হয়ে ওঠেনি। এদের সাজসরঞ্জাম বিলেত থেকে আসবার কামাই নাই, আর আগন্তুক ফরাসী কোম্পানীর খবরই নেই।

বসবার ঘরে ফিরে এল তিনজন। কৌচ নেই, হেলান দিয়ে আরামে কাৎ হবার জন্যে ছোট ছোট গদী নেই, কেবল কাঠের চেয়ার। একটি ফিরিঙ্গী সেপাই তিন গেলাস সরবৎ নিয়ে এসে সেলাম করলো। 'ম্যাডাম বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঘরে এর চেয়ে তেজস্কর পানীয় আর কিছু নেই, যদি বল তবে, পাশের ঘরের লেফটেনেণ্ট ম্যাকের কাছ থেকে কিছু হুইস্কী এনে দিতে পারি।'

'কিছু দরকার নাই রবার্ট, সরবতে দরকার ছিল না, শুধু ঠাণ্ডা জল হলেই হতো।'

'আমার একটু দরকার ছিল।' হেসে বলে রাবেয়া সরবতের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে।

'বাজে কথা, রাবেয়া, তুমি খাও না দেখেছি, এখানে নেই বলেই খেতে চাইছো আমাকে জব্দ করতে।'

'চটে যাচ্ছ?'

'দেখলে কী মনে হয় চটেছি?'

'তোমার মুখের ভাবে কখনই তো বোঝা যায় না তুমি খুশি হয়েছ না বিরক্ত হয়েছ, হাসি পাচ্ছে না রাগ হচ্ছে, ভাল লাগছে না মন্দ লাগছে। যেন কাঠের পুতুল।

রৌশন তিরস্কার করে, 'তোকে নিয়ে আর পারিনে, রাবেয়া, ফের ওর পেছনে লাগছিস।'

ফিরিঙ্গী সেপাইটি এসে খবর দিলো গোসলখানায় চানের জল তৈরী।

'এ লোকটি কে রবার্ট, তোমার দুবাস?' প্রশ্ন করে রৌশন।

'এখানে কোন দুবাস নেই, ও আমার 'ব্যাটসম্যান', মানে কাজকর্ম সব করে দেয়, ও সিপাই আমি ওর অফিসার এই যা তফাৎ, দু'জনেই আমরা কোম্পানীর নোকর।'

রাবেয়াকে আগে স্নান করতে পাঠানো হলো, কারণ রৌশনের সময় বেশী লাগে। রাবেয়া ফিরে এলে রৌশন গোসল ঘরে ঢুকলো।

সদ্যস্নাত রাবেয়ার দিকে তাকাতে পারছে না সিলভেস্টার। হ্রস্ব ও স্বচ্ছ কাঁচুলির আবরণ ভেদ করে তরঙ্গিত হয়েছে নবনীত দেহবল্লরী ও উদ্ধত বক্ষপুট, ক্ষীণকটিতট আলিঙ্গন করে আছে সূক্ষ্ম সবুজবর্ণ শাড়ির অঞ্চল, সে অঞ্চলে যেন আবদ্ধ হতে চাইছে না গুরুভার শ্রোণিদেশ ও রম্ভাবিনিন্দিত উরুযুগল। বিম্বাধরে মেহেদীর চুম্বন রাগ, নখকমলে ভ্রমরকৃষ্ণ সুর্মার নিবিড়-চ্ছায়া, বৃন্তচ্যুত কিশলয়ের মত চূর্ণ কুন্তলের গুচ্ছ স্খলিত হয়ে পড়েছে ললাটের এক কোণে।

'রবার্ট কলকাতার গরম চন্দননগরের চাইতে বেশী।'

'হুঁ।'

'এখানে তোমার ভাল লাগে।'

'হুঁ।'

'কোটটি খুলে বসতে পার।'

'হুঁ।'

'তোমাকে কী ভূতে পেয়েছে, রবার্ট? কেবল হুঁ আর হুঁ? কী ভাবছো বলতো?'

'কিছু না তো?'

'তবে কী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছো? কাঠের পুতুলটির মুখটি অত লাল দেখাচ্ছে কেন? গরমের মধ্যে ঐ আঁটোসাঁটো লাল পোষাকটি পরে? কোট খুলে ফেলে আরাম করে বসো।'

সিলভেস্টার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করলো সবুজ পাথরের মালাটি।

'ঐ সবুজ শাড়ির সঙ্গে মানাবে, রাবেয়া।'

'তোমার সেই বান্ধবী?'

'কাঠের পুতুল কথা বলতে জানে না, জানলে এর জবাব পেতে।' রাবেয়া মালাটি নিয়ে বুকে চেপে ধরলো, তারপর গলায় পরলো। কিন্তু সিলভেস্টার কোথায়? সে তো সামনে আর দাঁড়িয়ে নেই?

রৌশন এখনো চান করে আসেনি, সিলভেস্টার হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে, রাবেয়া চেয়ারে বসে পড়লো। সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে তার, কান দুটি গরম হয়ে উঠেছে। রৌশন এখনি হয়তো এসে যাবে, তাই সে শান্ত হতে চায়, অন্যমনস্ক হতে চায়। সামনে একটা কাঠের সেলফে কতগুলো বই দেখে তার একটা টেনে নিল।

খেতে বসে অবাক হলো দুই বোন। এতো ইংরেজীখানা নয়, পোলাও, মুর্গীমশল্লম, ভেড়ার মাংসের দোপিঁয়াজী, শিক-কবাব, চাটনি-মহব্বৎ, কাশ্মীরী, দিলখুশ সরবৎ, মালাই-গুলাবি। রৌশনের চোখে জিজ্ঞাসা, রাবেয়ার চোখে হাসি এই আয়োজন দেখে।

সিলভেস্টার কৈফিয়ৎ দেয়, 'রাবেয়া একদিন বলেছিলো মোগলাইখানা খেতে ইচ্ছে করে, তাই বাইরে থেকে বাবুর্চি আনিয়ে এখানেই রান্না করিয়েছি, দোকানের কেনা খাবার নয়।'

রৌশন কী যেন ভাবে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে, রাবেয়ার গলার দিকে। 'ও কী রাবেয়া, তুই পরেছিস কেন মালাটা?'

জবাব দেয় সিলভেস্টার ইতস্তত ক'রে 'ওর পছন্দ হয়েছিলো।'

দুজনের মুখের দিকে তাকাতেই সহসা একটা পর্দা সরে যায় রৌশনের

চোখের সামনে। প্রকাণ্ড একটা ভুল করে ফেলেছে সে, এই ইংরেজ যুবকটিকে বারে বারে চন্দননগর আনতে বলা ঠিক হয় নি, এ-ভুলের মাশুল হয়তো দিতে হবে একদিন না একদিন।

রাবেয়া ধারনা তুললো সে হাত দিয়ে খাবে, ছুরি-কাঁটা দিয়ে নয়, এবং সিলভেস্টারকেও খেতে হবে। যে যুদ্ধ করতে শিখেছে, ছবি আঁকতে শিখেছে তার পক্ষে হাত দিয়ে খাওয়াটা তেমন শক্ত নয়, রাবেয়া ও রৌশন কীভাবে খাচ্ছে তা দেখে দেখে খেলেই হলো।

কাঁটা-চামচ সরিয়ে নেওয়া হল। মাংসের টুকরো, পোলাওয়ের গ্রাস কিছুটা ছিটকে পড়লো সিলভেস্টারের কোলে।

'যেটা কোনদিন করা হয়নি সেটা করতে গেলে নাকাল হতে হয়, হতে রাজী আছি, কিন্তু আর কেউ নাকাল করতে চাইলে রাজী নই, বলে দিচ্ছি। আমি ছবি আঁকতে জানি কে বললো?'

মন্তব্য ও প্রশ্নটি তারই উদ্দেশ্যে বুঝতে পারে রাবেয়া, বলে 'নাকাল করার চাইতে নিজে নিজেই নাকাল হচ্ছে দেখলে আরো ভালো লাগে।'

ঠেলে ফেললেও পড়ে যেতে হয়, পা পিছলে গেলেও পড়ে যেতে হয়, শেষেরটাই দেখতে বেশী মজা লাগে। ছবি যে তুমি আঁকতে জানো তার প্রমাণ দিতে পারি, তবে নেহাৎ আনাড়ি হাতের ছবি।'

'না জানার চাইতে কিছুটা জানা ভালো, নাই-টাকার চাইতে বোবা টাকা ভালো। যে আনাড়ি তাকে আনাড়ি বললে তার লজ্জা পাওয়া ঠিক নয়, জলে না নামলে কেউ সাঁতার দিতে শেখে না।'

খাওয়া দাওয়ার পরেই রওনা হবার কথা। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কেল্লার ফটকে। রৌশন একটু আগে আগে চলেছে ব্যস্ত হয়ে। সিলভেস্টার ফিস ফিস করে বললো 'কাঠের পুতুলের বড্ড ইচ্ছে করছে সোনার পুতুলের সঙ্গে যেতে।'

রাবেয়া মুখ নীচু করে জবাব দেয় 'সোনার পুতুল বলতে চায় কাঠের পুতুল সঙ্গে গেলে মন্দ হোত না।'

যতক্ষণ না বজরা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল ততক্ষণ সিলভেস্টার দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। রাবেয়া একটিবারও জানালা দিয়ে মুখ বার করলো না। পালে হাওয়ার জোর, হংসবলাকার মত পাখা মেলে উড়ে চলেছে বজরা, উড়ে গেছে সিলভেস্টারের মন উদাস হাওয়ায়।

ঘরে ফিরে সে ভাবলো ছবি আঁকতে বসলে তার মন বোধ হয় ভাল লাগবে। কিন্তু ছবির খাতাটা কোথায়? বারে বারে, খুঁজেও সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, আর সবকিছুই জায়গামত আছে, শুধু এটিই নাই। ওটা কী তবে রাবেয়াই নিয়ে গেল?

মঁশিয়ে দেলার্দ অনুযোগ করলেন, 'তোমার এত পরিশ্রম সহ্য হচ্ছে না, পিয়েরে, রোগা হয়ে যাচ্ছ। হয়তো আমারই দোষ, তোমার উপরে সব ছেড়ে দিয়েছি।'

অ্যালবার প্রতিবাদ করে, 'না মঁশিয়ে, এ-বয়সে পরিশ্রম করলে শরীর খারাপ হয় না।'

মৃদু মৃদু হাসেন দেলার্দ অ্যালবারের দিকে তাকিয়ে। 'এ-বয়সে তোমার একটু ফুর্তি-টুর্তিও করার দরকার। কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে মানসিক আনন্দ না করলে বোঝা একদিকে ভারী হয়ে পড়ে। দেহ ও মন এদুটির একটিকেও অবহেলা বা বঞ্চিত করা চলে না। প্রকৃতি সহ্য করে যান কিছুকাল, কিন্তু যখন শাস্তি দেন তখন বেশ ভালো হাতেই আদায় করতে জানেন তার প্রাপ্য।'

দেলার্দ কী ইঙ্গিত করছেন বেশ বুঝতে পারে অ্যালবার। বৃদ্ধ বয়েসেও উনি বেশ ইন্দ্রিয় বিলাসী, ভোগের নানাবিধ উপকরণে যথেষ্ট অভিরুচি। কারখানার পাশে নতুন বাড়িতে উঠে আসবার আগে তিন মাস অ্যালবার দেলার্দের কুঠীতে থাকতো, দেখেছে নতুন নতুন তরুণীর আবির্ভাব, শুনেছে গভীর রাত্রে দেলার্দের শয়ন কক্ষে নতুন নতুন কণ্ঠস্বর, চাপাহাসি সুরার গ্লাশের ঠুন-ঠুন আওয়াজ। অ্যালবারের শয়ন কক্ষেও কয়েকবার যৌবনধন্যা নারীর সহসা উদয় হয়েছে, সম্ভবত এই বৃদ্ধের কারসাজী, কিন্তু ফাঁদে পা দেয় নি অ্যালবার।

'প্রকৃতি বলতে কী বোঝাতে চান, মঁশিয় ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি? প্রকৃতির দোহাই দিয়ে আমরা অনেক কিছুই তো করি? অনেক সময় সেগুলি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায় না কী?'

'হয়তো যায়, হয়তো যায় না। কিন্তু প্রকৃতি যে প্রবৃত্তিগুলি আমাদের দিয়েছেন সেগুলির কী কোন সার্থকতা নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে মঁশিয়ে, কিন্তু সে-সার্থকতা নির্ভর করে ক্ষেত্রের উপর।'

'ক্ষেত্রও তো আমাদের যোগাড় করে নিতে হবে?'

'ওখানেই রয়েছে একটা মস্ত 'কিন্তু'। না মঁশিয়ে আমার জন্য চিন্তিত হবেন না, শরীর আমার বেশ ভালই আছে, এ-কাজও ভাল লাগছে।'

দেলার্দ আপিস-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কারখানার গুদাম ঘরের দিকে। না, এ ছোকড়াটিকে তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। ঘুরে বেড়াতো জাহাজে জাহাজে, কত কেলেঙ্কারি করেছে কে জানে? বয়েসের ধর্ম যাবে কোথা? হঠাৎ চন্দননগরে এসে কায়েম হয়ে বসলই বা কেন, এমন সাধু সাজলোই বা কেন?

দেলার্দ বিয়ে করেন নি। বলেন জল যে-পাত্র থেকেই খাওয়া যাক না কেন আস্বাদ একই। সাদা কালো পাটকিলে সব গরুরই দুটো ক'রে শিঙ একটা ক'রে লেজ থাকে। আর ভালবাসা? প্রেমে পড়ে বিয়ে করা? ওটা মিঠে মিঠে চাঁদের আলোতে গাছের ছায়াকে ভূত ভেবে থমকে দাঁড়ানোর মতো। বিয়ে করলেই ভালবাসার হয় অপমৃত্যু দুদিন পরে, সেই ভূত বোঝার মত ঘাড়ে চেপে থাকে বাকী জীবন। পাপ-পুণ্য? মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্যে মানুষেরই কল্পনা এটা। পশুপক্ষীরা ও-সব

আজগুবী কল্পনায় মাথা ঘামায় না, তাই ওদের পাপও নেই পুণ্যও নেই।

অ্যালবার মোটা হিসেবের খাতাটা টেনে নেয়। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যায়, কিন্তু টাকার অঙ্কগুলো যেন মাথার ভিতরে ঢুকছে না, বাইরে থেকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে। লাভ-লোকসানের এই টাকা-আনা-কড়ির যোগ-বিয়োগে তার নিজের ভাগে কী পড়ছে? অতীতকে সে ছেড়ে এসেছে, বর্তমান তাকে এড়িয়ে চলছে, ভবিষ্যৎ কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। অতীতকে সে মুছে ফেলে এসেছে স্বেচ্ছায়, কিন্তু বর্তমানকে সে আঁকড়ে ধরতে চায় দুহাত দিয়ে, ভবিষ্যৎকে সে গড়ে তুলতে চায় স্বপ্নকে বাস্তব-রূপদানের সুযোগ পেলে, কিন্তু সে সম্ভাবনার কোনো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না।

মানুষ অনেক সময়ে নিজের সঙ্গেই করে প্রবঞ্চনা। মনকে শান্ত করতে চায় সত্যকে অস্বীকার ক'রে। কিন্তু এই ফাঁকি ধরা পড়ে যায় অন্যের কাছে। অ্যালবার প্রবোধ দিচ্ছে মনকে যে তার এ-কাজ ভালই লাগছে কিন্তু মন বলছে ওটা ঠিক সত্যি কথা নয়, ভাল লাগছে না তোমার। ভালই যদি লাগবে তবে কাজকর্মে ঢিলে দিচ্ছো কেন আজকাল, গঙ্গার পারে যখন রোজ বিকেলে বেড়াতে যাও তখন যাবার সময় তোমার পা দুখানা যেমন জোরকদমে চলে, আসবার সময় সে পাদুটো অমন ঝিমিয়ে পড়ে কেন, লাঠকুঠীর দিকে অমন বারে বারে তাকিয়ে থাকো কেন?

•

ফাদার ভ্যালেরীর সঙ্গে অ্যালবারের প্রথম পরিচয় হয় ফেস্তার উৎসবে। তার পরেও কয়েকবার দেখা হয়েছে। ভ্যালেরী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার অনেক বই আছে, অ্যালবার যদি পড়তে চায় তবে খুশীই হবেন তিনি। পাদ্রী যে রাবেয়াকে ফ্রেঞ্চভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন তাও সে জানে। ফ্রেঞ্চভাষাটি ভারী মিষ্টি, রাবেয়ার মুখে হয়তো আরো মিষ্টি শোনায়।

হাঁটতে হাঁটতে চললো সে ফাদারের বাসস্থানের দিকে। গভর্নরের কুঠী, কোম্পানীর আর দুজন বড় কর্মচারীর কুঠী, জেলমার অর্থাৎ পুলিশ-চৌকি, কোম্পানীর রসদখানা খাজাঞ্চিখানা আপিস, বিচারালয়, কয়েদখানা ছাড়িয়ে একটু দূরে অনাথাশ্রম, তার পেছনে একটি আমবাগানের ভিতর পাদ্রীর আবাসস্থান, সে শুনেছিলো।

বেশ ভাল লাগলো অ্যালবারের এই শান্ত পরিবেশ। বাগানের বাঁশের খিড়কিটি বন্ধ, কিন্তু-কাঠের হুড়কোটি সহজেই খোলা যায়। অ্যালবার ঢুকে ভিতরে এগিয়ে গেলো। কোনো মালি কাছেপিঠে দেখা যায় না, কী করে খবর পাঠানো যায় ফাদারের কাছে ভাবছে অ্যালবার, হঠাৎ শুনতে পেলো নারী-কণ্ঠে, 'ছেড়ে দাও হাত, ছেড়ে দাও বলছি ভণ্ড পাষণ্ড, আমি চিৎকার করবো না হলে।' আর কিছু শোনা গেলো না, কণ্ঠস্বর হঠাৎ থেমে গিয়েছে।

অ্যালবার একছুটে ভিতরে ঢুকলো দরজা লাথি মেরে খুলে। চোখের সামনে যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হলো, তা দেখে হলো স্তম্ভিত। রাবেয়া ও পাদ্রী। রাবেয়ার মুখ পাংশুবর্ণ, থর থর করে কাঁপছে, শাড়ির আঁচল খুলে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। পাদ্রী ভ্যালেরী একহাতে সবলে আকর্ষণ করছে রাবেয়াকে, অন্য হাতে রোমাল চেপে রেখেছে অসহায় তরুণীর মুখ। লুব্ধ দৃষ্টিতে পৈশাচিক উন্মাদনা।

ক্রোধে জ্বলে উঠলো অ্যালবার। 'ভগবানের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে জানি না, ফাদার, কিন্তু চন্দননগরের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমি কৈফিয়ৎ চাই।'

অ্যালবারকে দেখে ভ্যালেরী রাবেয়ার হাত ছেড়ে দিল। 'তার আগে আমি কৈফিয়ৎ চাই মঁশিয়ে, কার হুকুমে তুমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছো, মাদামোজেল আমার ছাত্রী।'

'ছাত্রীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার বটে, নরপিশাচ, তুমি মেষচর্মে আবৃত একটি ব্যাঘ্র, ঐ পবিত্র ক্যাসকের তুমি অপমান করেছো, চার্চের অপমান করেছো, ধর্মের সঙ্গে বেইমানি করেছো।'

'সে চিন্তা আমার, তোমার কাছে উপদেশ নিতে, আমি প্রস্তুত নই।'

'উপদেশের অপব্যয় হবে, তাই শিক্ষা দিতে চাই, যা তোমার সারা জীবন মনে থাকবে।'

অ্যালবার সার্টের হাতা গুটিয়ে নিল। সুপুষ্ট বাহুর পেশীমণ্ডল স্ফীত হয়ে উঠেছে, রাবেয়া দৌড়ে এসে তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলো, চরম বিপদে পরম আশ্রয় সেই বলিষ্ঠ বাহু। তার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত।

'তোমার ভাগ্য ভালো, ফাদার, তোমার শাস্তি মুলতুবি রইলো, আপাতত আমার কর্তব্য একে সুস্থ ক'রে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া।'

আমবাগানের পরে, আরেকটা ছোট ফলের বাগান। রাবেয়া অ্যালবারের বলিষ্ঠ স্কন্ধে মাথা রেখে স্বপ্নচালিতের মত চলছে শ্লথচরণে। অ্যালবার দাঁড়িয়ে পড়লো।

প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে চেতনা একেবারে বিলুপ্তি না হলেও হতভম্ব হয়ে যেতে হয়, বাক্‌শক্তি লুপ্ত হয়ে যায় তখনকার মত। রাবেয়ার দেহের সমস্ত ভারটুকু এলিয়ে পড়েছে অ্যালবারের দেহের উপর, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন আঘাত করছে অ্যালবারের বক্ষতটে, চঞ্চল নিশ্বাসের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগছে অ্যালবারের গণ্ডস্থলে। একটি দেহের তরঙ্গাঘাতে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আরেকটি দেহ।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেলো। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো রাবেয়া। অস্ফুটস্বরে বললো--'ধন্যবাদ মঁশিয়ে'—

'ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, মাদামোজেল, আমাকে নয়। এখন কেমন লাগছে?'

'একটু ভালো'—

'তবে আরো একটু দাঁড়িয়ে নাও, তোমার গাড়ি কোথায়?'

'গঙ্গার পারে।'

নিবিড় স্পর্শসুখ ভালো লাগছিলো

অ্যালবারের, এ যেন অনির্বচনীয়। কিন্তু এতো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, নেহাৎ আকস্মিক, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের ক্ষণিক দুর্বলতা, সঙ্কট-মুহূর্তে আত্মবিস্মরণ।

রাবেয়া ছেড়ে দিল হাত, বললো 'চলো মঁশিয়ে, এবার যেতে পারবো। যেতে যেতে ঘটনাটি বললো রাবেয়া— তার ভগ্নী আজ দুপুরের পরেই কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে। একা একা ভালো লাগছিলো না, তাই ও নিজেও বেরিয়ে পড়লো গাড়ি ক'রে। গঙ্গার ধারে ফ্যাদার ভ্যালেরীর সঙ্গে দেখা, তিনি আগ্রহ করলেন তাঁর অনাথ আশ্রমটি দেখাতে, তারপর একটু বিশ্রাম করে যেতে বললেন তাঁর দীনহীন কুটিরে। ওখানে সে আর কোনো দিন যায় নি, তাই ভদ্রতার অনুরোধে না বলতে পারলো না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে রাবেয়া উঠতে যাচ্ছে তখন ভ্যালেরী কেমন যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। 'তার পরে বাকিটুকু তুমি নিজের চোখেই দেখেছো, মঁশিয়ে।'

'কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস করা যায় না, মাদামোজেল, সে শিক্ষা হলো তোমার আজ। রূপই হয়ে ওঠে নারীর শত্রু। রূপই হয়ে ওঠে কখনো কখনো অভিশাপের মত তাদের কাছে।'

'তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না, মঁশিয়ে।'

অ্যালবার রাবেয়ার দক্ষিণ করপল্লবটি তুলে নিয়ে ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করে বললো, 'আমার সৌভাগ্য, সময় মত গিয়ে পড়েছিলাম।'

রাবেয়াকে নিয়ে গাড়ি চলে গেলে অ্যালবার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো গঙ্গার দিকে। জোয়ারের স্রোত নদীর বুকে তুলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা। অ্যালবার কান পেতে শুনতে পায় তার ধমনীতে ধমনীতেও এসেছে স্রোতের বেগ, জাগিয়ে তুলেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ। সন্ধ্যার ললাট স্পর্শ করেছে চাঁদের আলোক, অ্যালবারের অন্তরও স্পর্শ করেছে এক প্রত্যক্ষ অনুভূতির সোনার কাঠি।

●

ওদিকে রৌশন গিয়েছিলো আবার খিদেটির জঙ্গলে কৌলবাবার কাছে। রোদের আলো আলো ফেলতে পারে না ওখানটায়, ফেলে শীতলঘন ছায়া।

কৌলবাবা চোখ বুজে বসেছিলেন ধ্যানে। রৌশন নিঃশব্দে শালপাতায় সারি সারি সাজিয়ে দিলো পরোটা কচুড়ি কাবাব ভাজি আম আনারস নাসপাতি আপেল।

চোখ মেলে দেখে কৌলবাবা প্রসন্ন হলেন, ভাবে বিভোর হয়ে স্তব পাঠ করলেন 'নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগৎব্যাপিকে বিশ্বরূপে, নমস্তে শরণ্যে পদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণী এহি দুর্গে। মা, সর্ববিজয়ী কাল তোর চরণের দাস তাই তুই কালী, এক হাতে তোর খড়গ অন্য হাতে বরাভয়, তুই জীবের দুর্গতিহারিণী—তাই তুই দুর্গা, ত্রিলোকের, অন্নদায়িনী, তাই তুই অন্নপূর্ণা জগৎকে ধারণ ক'রে আছিস—তাই জগদ্ধাত্রী, সকলকে মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছিস—তাই মহামায়া, প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে অসুর নিধন করছিস তাই চণ্ডী, অপার তোর লীলা কে বুঝতে পারে? এ অধমকে তুই কখনো অনাহারে রাখিস নি।'

'আজ ইদের পরব, বাবা, সামান্য কিছু এনেছি।'

কৌলবাবা, হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, তারপর তিনবার বিকট হুঙ্কার করে উঠলেন, বনস্থল কেঁপে উঠলো সেই হুঙ্কারে। বাইরে অমনি সুরু হলো শিয়ালের হুক্কাহুয়া এই অসময়ে, কুটিরের ভিতর ফিস ফিস কথা, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রৌশন ভয়ে চোখ বুজলো।

'ভয় পাস নে, বেটি, ভূত-বলি শিবা-বলি না দিলে আমি খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না। ওরাও মায়ের সন্তান, শ্মশানে মশানে মায়ের সাথী, ওরাও এখন ক্ষুধার্ত, আগে ওরা পা'ক তারপর আমি।'

কৌলবাবা জানলা দিয়ে খানিকটা মাংস ফেলে দিলেন বাইরে, জানোয়ারদের হুটোপুটি শোনা গেল। খানিকটা খাবার ছুঁড়ে দিলেন উঁচুতে, তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর খেতে বসলেন নিজে।

'বেটি, বীজ-প্রাধান্যে তুই যবন-কন্যা, কিন্তু ক্ষেত্র-প্রাধান্যে তুই ব্রাহ্মণ-কন্যা, দুটি ধারা, দু'রকমের সংস্কার মিশে আছে তোর মধ্যে। তাই এই ইদের পরবে তোর স্মরণ হলো আমার কথা। আল্লাও যিনি ভগবানও তিনি। তোরা বলিস পানি, আমরা বলি জল, তফাৎ কোথায়? তোদের পরব আমাদের পার্বন, তোদের নেমাজ, আমাদের পূজো—সবই তো এক? হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ইহুদী সবাই তো তাঁরই সন্তান? আমার জগন্ময়ী মা সর্বভূতেই বিরাজ করছেন? তিনি ভয়ঙ্করী পাপীর চক্ষে, আবার ক্ষেমঙ্করী তাদের কাছে,— যারা তাঁর চরণে শরণ নেয়। শিব কথাটির অর্থ মঙ্গল, মঙ্গল-দায়িনী আমার মা সেই মঙ্গলের উপরেই অধিষ্ঠিতা। পাপ ও অমঙ্গলের বিনাশ করে তিনি সেই মুণ্ডমালা ধারণ করেন কণ্ঠে। দুই রূপে খেলা করছেন তিনি, জয় মা মোক্ষ দায়িনী।

রৌশন এসব কথার অনেকটা বুঝতে পারে, কিছুটা পারে না। কিছুটা যে বোঝে তাও এঁর কাছেই শুনে শুনে। মুর্শিদাবাদে মৌলবীসাহেব এসে বেগমদের ও বেগমজাদীদের কোরান পড়িয়ে যেতেন মাঝে মাঝে, মৌলবীসাহেব বসতেন পর্দার বাইরে, আর সকলে বসতো পর্দার ভিতরে। কাফেরদের ধর্ম হারাম, কাফেররা হারাম, ওদের দেবদেবী কতগুলো পুতুল—এসবই শুনে এসেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই হিন্দু ফকির পাগল, মাঝে মাঝে মনে হয়—তা নয়, ইনি হয়তো দুনিয়ার গণ্ডীর সকল গণ্ডীর এত উপরে উঠে গেছেন যে এঁর কাছে সকল ধর্ম সকল মানুষ একেবারে একাকার হয়ে গেছে।

কৌলবাবা প্রায়ই কালী কালী বলে চেঁচিয়ে ওঠেন, জিজ্ঞেস করলো 'বাবা ঐ কলকাতা শহরের নামটা কী আপনার কালী থেকেই হয়েছে, ওখানে তো কালীঘাট বলে একটা জায়গা আছে?'

স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন কৌলবাবা।

'কেউ হয়তো বলে নি তোকে, কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিস, বেটি, হিন্দুর সংস্কার প্রচ্ছন্ন রয়েছে তোর ভিতরে। 'ঘাট' কথাটা পরে এসেছে, আসল নাম ওর কালীক্ষেত্র, মহাপীঠস্থান, মায়ের দেহের একটি অংশ পড়েছিল। ওখানে, যখন দক্ষরাজের কন্যা হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। সবই তাঁর লীলা।

ওখানে তখন ছিল সমুদ্র, কিন্তু দেবীর দেহাংশের তেজ সহ্য করতে না পেরে সমুদ্র শুকিয়ে গেলো, আস্তে আস্তে উঠে এল স্থলভূমি কালীক্ষেত্র। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, ক্রমে সাতটি দ্বীপ সাগরগর্ভ থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসে ঐ কালীক্ষেত্রকে বেষ্টন করে একাকার হয়ে গেল সেই পুণ্যভূমির সংস্পর্শে।

কিন্তু হায়, যবন ও ম্লেচ্ছরা সেই পবিত্রতাকে নষ্ট করে ফেলেছে। তবে এখনো ইংরেজরা স্বার্থসিদ্ধির আশায় কালীঘাটে মাঝে মাঝে পুজো পাঠায় ছাগ বলি দেয়।

কলকাতায় ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের কালীঘাটে পাঁঠাবলি দেওয়ার কথা রৌশন আগেই শুনেছে, শুনে হেসেছেও। চন্দননগরের ফরাসীরাও বিশালাক্ষী ও বোড়াইচণ্ডীর মন্দিরে পুজো পাঠায় চুঁচড়োয় ওলন্দাজরা সেখানকার ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরে পুজো দেয়। খৃস্টানদের ধর্মটা সে ভালো বুঝতে পারে না। সাতটি দ্বীপের কথা শুনেও তার সন্দেহ হলো বাবার মাথা হয়তো এখন একটু গরম হয়েছে, কই আর কেউতো জানে না?'

'কোথায় ঐ সাতটা দ্বীপ উঠেছিল, এখনই বা সেগুলো কোথায়? কখনও তো শুনি নি?'

সাধারণ লোক জানে না সত্যি, ভেবেও দেখে না ওদের পূর্ব-পূর্ব পুরুষরা কী কারণে কোন জায়গার কী নাম দিয়েছিলো। কিন্তু নামের মধ্যেই অতীতের আভাস পাওয়া যায়। ঐ সাতটি দ্বীপের পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের পুরাণে—শৃগালদ্বীপ, খড়গদ্বীপ, আর্দ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ মৎস্যদ্বীপ, নবদ্বীপ।

ভাষা বদলায়, ভাবার্থ বিকৃত হয়, এখন ওগুলোর নাম দিয়েছে শিয়ালদহ খড়দহ আড়িয়াদহ চাকদহ আগড়পাড়া মেছেদহ নদীয়া। জলভাগ মজে গিয়ে যে স্থলভাগের সৃষ্টি হয় তা এখনকার লোকের গ্রাম্যভাষায় হয়েছে 'দহ', দ্বীপ শুদ্ধভাষা তাই ওদের কাছে ভালো লাগে না, চলতি ভাষায় দ্বীপ হয়েছে 'দহ।'

অকস্মাৎ কৌলবাবার দৃষ্টি যেন বহুদূরে, চলে গিয়েছে। কী যেন দেখতে পেয়েছেন তিনি, জটা থেকে একটি চুল ছিঁড়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বললেন 'চলে যা, চলে যা, শীঘ্র চলে যা।'

তারপরে স্বাভাবিক হলো তাঁর দৃষ্টি, রৌশনের দিকে তাকিয়ে বললেন 'আর দেরী করিস নে, বেটি, বাড়ি ফিরে যা। ওটা হয়েছে ওর মায়ের মত, সোজাসিধে, তোর মত চালাক-চতুর নয়।' বুঝতে পারে না রৌশন' কার কথা বলছেন কৌলবাবা।

[ক্রমশ।

আমি

শান্তশীল দাশ

এ আমার মাঝখানে বাসা বেঁধে আছে দুইজনা,
পাশাপাশি, তবু তারা অচেনা অজানা : কারো সাথে
মিল নেই কারো, যেন দুদেশের দুই অধিবাসী :
চেনা নেই, জানা নেই—শুধু বাস একটি পাথারে।

একজনা বারবার আকাশের পানে দৃষ্টি মেলে
চায় কিছু পায় নি যা—সে-পাওয়ার আলোকে সার্থক
হবে তার এ-জীবন : সীমা ভেঙে দিয়ে অসীমায়
নিয়ে যাবে : সে-জীবন কত না আনন্দ-দিয়ে-ঘেরা।

আর জনা কোনমতে টেনে টেনে দিন যাপনের
গ্লানি নিয়ে চলে ক্লান্ত : তবু সেই চলার বিরতি
চায় না, অভ্যস্ত বড়। দিন রাত আসে আর যায়
কখন-সে থাকেনাক হিসাব-নিকাশ কিছু তার।

এই দুই সত্তা এক দেহের ভিতরে বাস করে :
কোনটা যে আমি ঠিক, মাঝে মাঝে বড় ভুল হয়।
মনে হয়, হয়তো বা দুজনার কেউ-ই নই আমি,
আমি সে আর-একজনা—উদাসীন সে শুধু দর্শক।

মুর্শিদাবাদ

(শেষাংশ)

চোঁয়া বহরমপুরের বসুসর্বাধিকারী বংশ — গৌরকিশোর বসু-সর্বাধিকারী কৃষ্ণনগর থেকে এখানে এসে বসবাস করেন। এই বংশের রাজকিশোর ও হরিপ্রসাদ উভয়েই সিল্ক ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই বংশের জয়নারায়ণ চোয়াতে ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং কালাচাঁদ বহরমপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠায় বহু অর্থ দান করেন।

বহরমপুরের সেনবংশ —বিখ্যাত জমীদার বংশ। দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেনের পৌত্র ও লালমোহন সেনের পুত্র রামদাস সেন এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। জ্ঞানবান বিদ্বান জমীদার হিসেবে তাঁর নাম বিদ্বজ্জন সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বঙ্গাধিকারী বংশ —দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বর্ধমানের লোক। বাদশাহ সরকারের প্রধান কানুনগো পদে নিযুক্ত হয়ে ইনি মুর্শিদাবাদে ডাহাপাড়ায় বাসস্থান করেন। ইনি কানুনগো ও খালসা দেওয়ানী উভয় পদ পেয়ে সরকারের আয় প্রচুর বৃদ্ধি করেন।

জানকীরামের বংশ —জানকীরাম চুঁচুড়ার সোমবংশীয়। আলিবর্দি খাঁর একজন বিশ্বাসী কর্মচারী। ইনি প্রথমে উড়িষ্যার ও পরে বিহারের নায়েব নাজিম হন। মহারাজা খেতাব

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পান। এঁর ছেলে দুর্লভরাম। ইনি নবাবের বক্সী পদ পান। ইনি সিরাজের ওপর বীতরাগ হয়ে মিরজাফরের বন্ধু হন, মিরজাফর নবাব হলে ইনি মুখ্যমন্ত্রী হন। মিরজাফরের পতন হলে ইনি কলকাতায় পালিয়ে আসেন। এঁর পুত্র রাজবল্লভ ইংরেজ-মহলে দহরম-মহরম করেন।

কিরীটেশ্বরী মহাপীঠ —ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কিরীটেশ্বরী একটি পুরাণো স্থান। এর প্রাচীন নাম ছিল কিরীটকণা। কিরীটকণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিরীটেশ্বরী। বর্তমানে এই স্থান শহরের অপর পারে ডাহাপাড়া গ্রাম থেকে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে। এটি ৫১ পীঠের অন্যতম। এখানে দেবীর কিরীট পাত হয়েছিল বলে কিরীটকণা মহাপীঠ। এখানে দেবী বিমলা ও ভৈরব সম্বর্ত। গৌড়ের পাঠান-রাজের সময়ে কিরীটেশ্বরীর গৌরবের কথা জানা যায়। হোসেন শা'র আমলেও এর গৌরব বিস্তৃত ছিল। বঙ্গাধিকারিগণ বাঙলার রাজস্ব বিভাগের প্রধান কানুনগো ছিলেন—এই বংশের দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর অনেক উন্নতিসাধন করেন এবং তাঁর সেবার ভার প্রাপ্ত হন। দর্পনারায়ণ মন্দির সংস্কার করেন ও বিরাট মেলার প্রচলন করেন পৌষ মাসের মঙ্গলবারে। কথিত আছে মুর্শিদাবাদের নবাবগণও কিরীটেশ্বরীর মহিমার সম্মান করতেন। নবাব মিরজাফর অন্তিমসময়ে মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত খেয়েছিলেন। (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৭৭)। বর্তমান কালে কিরীটেশ্বরীর প্রায় সমস্ত মন্দির ধ্বংসপ্রায়।

সর্বমঙ্গলা ও সোমেশ্বর —মুর্শিদাবাদের যজান গ্রামে। সোমেশ্বর ঘোষ ঃ ' প্রতিষ্ঠাতা। সোমেশ্বর-নির্মিত মন্দির বহুবার সংস্কৃত হয়ে বর্তমান আকারে উপনীত হয়েছে। চৈত্রমাসের সংক্রান্তি ও শারদীয়া চতুর্দশীতে দেবীর পূজা খুব ধূমধামের সঙ্গে হয়। মন্দিরের দক্ষিণে সোমেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরটি অষ্টভুজাকৃতি ও প্রায় ৫০ হাত উঁচু। সোমেশ্বরের গাজন চৈত্র সংক্রান্তিতে ধূমধামের সঙ্গে হয়।

কেদারেশ্বরের মন্দির —কাশিমবাজার স্টেশনের কাছে ব্যাসপুরীতে রামকেশব মিশ্র কর্তৃক ১৭৩৩ শকে

মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধি

স্থাপিত এই মন্দির। সমগ্র মন্দিরটি কারুকার্যময় ইঁটকে খোদিত নানা পৌরাণিক চিত্র আছে। সামনের ডান-দিকে—মহিষমর্দিনীর চিত্র, কালীমূর্তি, দুটি হাতির ওপর চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি, ষোড়শী রাজরাজেশ্বরী মূর্তি, কমলা মূর্তি, পদ্মের ওপর চতুর্ভুজা মূর্তি, পদ্মাসীনা চতুর্ভুজা মূর্তি—এই ৮টি। সামনের দিকে—কালী মূর্তির দু'পাশে কার্তিক ও গণেশ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-চিত্র, দশাবতারের মূর্তি—এই ৩টি।

রুদ্রদেবের মন্দির—জেমো। জেমোর রাজগণ এঁর সেবায়েৎ। কামদেব ব্রহ্মচারী সিদ্ধপুরুষ। তাঁর কাছে কালরুদ্র ও অগ্নিরুদ্র নামে দুটি বিগ্রহ ছিল। শিষ্য রুদ্রকণ্ঠ সিংহের সেবার ভার থাকে। জেমোর রাজবাড়ীর গৃহ-দেবতারূপে পূজিত।

দক্ষিণ কালিকা পীঠ—কান্দি হতে প্রায় ১ মাইল দূরে নিভৃত স্থানে এই মন্দির। এই স্থানে রুদ্রদেবের প্রতিষ্ঠান বহু পূর্বে শক্তি মন্ত্রের বীজ উপ্ত হয়েছিল।

বাইচণ্ডী দেবী—কান্দিতে।

গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের ঠাকুর-বাড়ী—কান্দিতে।

তুলসী বিহার মন্দির—গয়সাবাদ। নশীপুর রাজবংশ নির্মিত বিশাল মন্দির। তার চূড়া গগনস্পর্শী। বর্তমানে ভগ্নপ্রায়।

কৃষ্ণরায় ও মোহন রায়ের বিগ্রহ-মন্দির—সৈয়দাবাদ।

কপিলেশ্বর মন্দির—শক্তিপুর।

ভূতেশ্বর মন্দির—ভীমের গদা নামে এক স্তম্ভ আছে। বৌদ্ধ যুগের বলে অনুমিত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বহরমপুর-খাগড়ার অপর পারে।

রাধামাধব মন্দির—কুমারপুরে। মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলে পূর্বদিকে কুমারপুর বা কোঁয়ারপাড়া একটি বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম। শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া বৃন্দাবন থেকে রাধা-মাধবের বিগ্রহ এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন।

মসনদ আউলিয়া ফকিরের সমাধি—চুনাখালিতে।

নেমিনাথের মন্দির (জৈন)—এতে ২৪ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে। —মহাজনটুলিতে।

মেলা ও পর্ব

রামমেলা—বহরমপুর থেকে ১ মাইল দক্ষিণে চালতিয়া-মালতিয়া গ্রামে প্রতি বছর ৯ই চৈত্র হতে আরম্ভ হয়ে ১ মাসব্যাপী রামের পুজো উপলক্ষে মেলা বসে।

রাধামাধবের স্নানযাত্রা মেলা—১৭শ শতাব্দীর জীবগোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়ার বিগ্রহের স্নানযাত্রা মেলা হয়—কোঁয়ারপাড়া বা কুমারপুরে।

ব্যারা বা বেরা পর্ব—প্রতি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খাজা খিজিরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোকমালায় বিভূষিত হয়ে বাঁশ ও কলাগাছের শত শত ছোট নৌকা ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

নরোত্তম ঠাকুরের তিরোধান উৎসব—জিয়াগঞ্জে কোজাগরী লক্ষ্মী-

পূজার পরবর্তী পঞ্চমী তিথিতে উৎসব ও মেলা হয়। এ ছাড়া জৈনদের উৎসব ও নানা দেব-দেবীর পূজা অর্চনাদি হয়ে থাকে।

কতকগুলি দ্রষ্টব্যস্থান

মহিমাপুরে জগৎ শেঠের ইন্দ্রতুল্য বাসভবন, ডাহাপাড়ায় বঙ্গাধিকারিগণের প্রাসাদ, কাটরার মসজিদ, মুর্শিদকুলি-খাঁর সমাধি, বহরমপুরে ঘড়িঘর, কৃষ্ণনাথ কলেজ, কাশিমবাজারে ইংরেজ রেসিডেন্সীর ধ্বংসাবশেষ, হেস্টিংসের প্রথমা পত্নী ও কন্যার সমাধি, চাঁদপাড়া থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে সেখের দীঘি হোসেন শা'র তৈরি। প্রায় ১১০০ গজ উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩৮৫ গজ এই দীঘি। সাগর দীঘি, মহেশপাল দীঘি; কালিকাপুরে ওলন্দাজদের কুঠি, সৈয়দাবাদে আর্মেনীয়দের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা, মুর্শিদাবাদে ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার, জাহানকোষা কামান, সরফরাজ খাঁর সমাধি, ইমামবাড়া, মোতিঝিল, নিজামৎ কেল্লা বা হাজার দুয়ারী, মনি-বেগমের তৈরি সুবৃহৎ মসজিদ মুবারক মঞ্জিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সাহিত্যিক প্রভৃতি

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—পণ্ডিত ও বৈষ্ণব-ভক্ত ১৭শ শতাব্দী (সৈয়দাবাদ), নরহরি দাস—ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা, (পানিশালা নশীপুর গ্রামের কাছে রেঁয়াপুরে), বৈষ্ণবকবি রাধামোহন ঠাকুর-পদামৃত সমুদ্র রচয়িতা (মালিহাটি গ্রামে), হৃদয়ানন্দ গোস্বামী—এঁদের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর চিহ্নিত গীতা রক্ষিত আছে (ভরতপুর), বৈষ্ণব-ও কবি দ্বিজহরিদাস, বৈষ্ণবদাস, উদ্ধব দাস (টেঁয়া গ্রামে), কৃষ্ণদাস কবিরাজ (ঝামটপুরে), সৈয়দ মর্তুজা-মুসলমান ফকির, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, প্রত্নতাত্ত্বিক রামদাস সেন, সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (বহরমপুরে), রাজা পৃথ্বিচন্দ্র ত্রিবেদী (পাকুড়ে), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (কান্দি), শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর—জঙ্গিপুরে), প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (বহরমপুরে), নাট্যকার ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী (টেঁয়া গ্রামে), কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বহরমপুরে), নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (বহরমপুরে), সরোজকুমার রায় চৌধুরী (মালিহাটি), ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প

হাতির দাঁতের শিল্প—মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের শিল্পের কথা সুপ্রসিদ্ধ। এককালে এই শিল্পীরা ভারতের সব স্থানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবী আমল থেকে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। নানা রকম দেবদেবীর মূর্তি, জন্তু-জানোয়ার, যানবাহন, নৌকা প্রভৃতি এই শিল্পের ঐতিহ্য বহন করেছে।

বস্ত্রশিল্প—মটকা ও চেলী ধুতি ও শাড়ী, রেশমের তাজপাড়, কলকা পাড়, পদ্মপাড়, ভোমরা পাড়, ধানী, কট্‌কাপাড়, ফিতাপাড়, মুন্সীপাড়, চুড়িপাড়, বালুচর, বুটিদার, প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাপড় তৈরি হয়। রেশম শিল্পের জন্য সরকার-প্রতিষ্ঠিত সেরি-কালচারাল ফার্ম বহরমপুরে স্থাপিত হয়েছে। কান্দী, মির্জাপুর, খাগড়াবাজার প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের কেন্দ্র আছে। নবাবী আমলে অতুলনীয় কারুকার্যময় বিখ্যাত বালুচর শাড়ির প্রচলন হয়। এখন আবার সেই শিল্পের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

কাঁসার বাসন—খাগড়া বাজার বহরমপুরে বিখ্যাত।

কাগজের শিল্প—চুনাখালিতে।

আমের জন্য বিখ্যাত—চুনাখালি। এখানে কাহিতুর, রাণীপসন্দ, শাদোল্লা, বোম্বাই, নাক্কি প্রভৃতি আম জন্মায়।

বাণিজ্যপ্রধান স্থান—আজিমগঞ্জ, ভগবানগোলা, বেলডাঙ্গা, লালগোলা প্রভৃতি।

কেন ?

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সেদিন একা কাজ কিছু না পেয়ে,
দাঁড়িয়েছিলেম ঘরের জানালায়;
দিনটা ছিল সজল মেঘে ভরা,
বাতাস মাতাল কি এক বেদনায়॥

ঠিক তখনি পাশের বাড়ির ঘরে
দেখেছিলেম জোড়হারা এক পাখি,
লোহার শিকে মুখখানিকে চেপে
কারে যেন খুঁজছে থাকি থাকি।
বাতাসে তার আঁচল গেছে খসে,
চুলগুলো সব পড়ছে এসে মুখে
চিরদুঃখী খাঁচায় মাথা রেখে
খুঁজছে কারে চোখের জলে ভেসে॥

ঠিক তখনি আবার দেখেছিনু
তারই জোড়া পুরুষ পাখিটাকে,
রয়েছে এমন আকুল ভাবে চেয়ে—
পারলে যেন ভাঙেই খাঁচাটাকে।
চোখে নিয়ে আকুল বিহ্বলতা
গুমরে মরে ব্যাকুল দু'টি মন,
এমন মধুর বাদল দিনে তারা
পায়নি কেন পরম সুখধন?

সেদিন একটা বিয়ে দেখলাম ... কিন্তু না, আগে বোধহয় আপনাদের বড়দিনের ব্যাপারটা বলা দরকার। বিবাহোৎসবে সমারোহ হয়েছিল বর্ণনাতীত। আমি অতীব মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু অন্য ঘটনাটি আরো চমৎকার। আমি জানি না কেন এই বিবাহদৃশ্য সেদিনকার বড়দিনের কথা আমার মনে করিয়ে দিল। কি হয়েছিল বলি— ---ঠিক পাঁচ বছর আগে, নববর্ষের আগের দিন সন্ধ্যায়, একটি ছোটদের আসরে আমার নিমন্ত্রণ হল। উদ্যোক্তাটি বেশ উঁচুদরের ব্যবসায়ী; ভদ্রলোকের একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে, আছে অনেক পরামর্শদাতা, অনেক স্বজন-বান্ধব। এই যে ছোটদের মিলনী-সভা এটা একটা অছিলামাত্র; এই উপলক্ষে বাপ-মা'রাও জমায়েৎ হয়ে পরস্পরে বেশ ঘরোয়াভাবে নানারকম আলোচনার সুযোগ পাচ্ছেন; অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি হচ্ছে।

আমি একেবারেই বাইরের লোক। আমার কোন বিশেষ জ্ঞাতব্যও নেই, কাজেই অন্যের মনোরঞ্জন না করে স্বেচ্ছায় সন্ধ্যাটা কাটাবার সুযোগ পাচ্ছি এই গার্হস্থ্য সুষমা প্রত্যক্ষ করতে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছেন আমারই মতন আরো এক ভদ্রলোক। ওঁর দিকেই আমার প্রথম নজর গেল।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে, উনি উচ্চবংশ-সম্ভূত বা ধনী, কোনোটাই নন। ভদ্রলোকটি লম্বা, রোগাটে গড়ন, অতি গম্ভীর এবং সুসজ্জিত। এই পারিবারিক উৎসবে ওঁর মনোযোগ আছে বলে মনে হল না। যে মুহূর্তে উনি পাশ কাটিয়ে একধারে একা আসতে সক্ষম হলেন, সে মুহূর্তেই ওঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মোটা কালো ভ্রূতে দেখা দিল কুঞ্চনরেখা। বাড়ীর মালিক ছাড়া আর কারো সাথেই ওঁর পরিচয় নেই; মুখে বিরক্তির প্রতীতি চিহ্ন সুস্পষ্ট, যদিও শেষ পর্যন্ত বেশ আনন্দিত হবার সু অভিনয় করলেন। পরে শুনেছি উনি গ্রামীণ; কি একটা বিশেষ জরুরী গোলমেলে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে উনি রাজধানীতে এসেছেন ও আমাদের বন্ধুর জন্য একটি পরিচয়পত্র আনায়, উনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের জিম্মাদারীতে ওঁকে গ্রহণ করেছেন। নিছক ভদ্রতার খাতিরেই কেবল উনি আমন্ত্রিত হয়েছেন এই শিশু সম্মিলনীতে।

ওঁর সাথে কেউ তাস খেলছে না বা সিগার দিতে এগিয়ে আসছে না; কথা বলা তো দূরের কথা। পালক দেখেই

ডস্টয়ভস্কি

যেমন পাখী চেনা যায়, তেমনি দূর থেকেই ওঁকে সবাই চিনে ফেলেছে। কি কাজে লাগবেন বুঝে উঠতে না পেরে ভদ্রলোকটি সারা সন্ধ্যাবেলা বসে বসে খালি গোঁফ চুমড়ালেন। ভদ্রলোকের গোঁফজোড়াটি বড়ই খাসা, তবে এমন মনোযোগে তিনি গোঁফে তা দিচ্ছেন যে, দেখে মনে হয় গোঁফজোড়াটিই আগে এসেছে পৃথিবীতে, আর মানুষটি এসেছে তারপরে গোঁফে তা দিতে।

আরেকটি অতিথিও আমাকে আকৃষ্ট করল, যদিও ইনি একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী। ভদ্রলোকটি উঁচু মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তি, নাম জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় অতিথি হিসাবে উনি অতি মাননীয় এবং গোঁফেশ্বর ভদ্রলোক উদ্যোক্তার কাছে যে পর্যায়ের, উদ্যোক্তা ভদ্রলোকটি আবার এঁর কাছে প্রায় সেই শ্রেণীর মত ব্যবহার পাচ্ছেন। মালিক এবং মালিকানী ওঁর মনস্তুষ্টির জন্যে কত কথাই যে বলছেন তার আর শেষ নেই। ওঁর কি লাগবে, কিসে উনি খুশী হবেন, কাছাকাছি ঘুর ঘুর করে তাই কেবল দেখছেন; অভ্যাগতদের ডেকে এনে ওঁর সাথে পরিচয় করাচ্ছেন কিন্তু ওঁকে কোথাও ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

'এমন সুন্দর সন্ধ্যা খুব অল্পই আসে'--জুলিয়ান মাস্তাকোভিচের এই উক্তিতে উদ্যোক্তার চোখে আনন্দাশ্রু দেখলাম। কি কারণে জানি না এই বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ বাচ্চাদের সাথে আনন্দ করলাম; এদের মধ্যে

হৃষ্টপুষ্ট পাঁচটি শিশু উদ্যোক্তা মশাইয়ের। এবার একটা ছোট খালি বসার ঘর দেখে–সেখানে ঢুকে পড়লাম। কক্ষটির অর্ধেকে সংরক্ষিত নানারকম গাছ গাছড়া, বিভিন্ন প্রকারের অর্কিড। এধারটা মনে হয় গ্রীন হাউস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানেই নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে বসলাম।

ছোট ছোট কিশোরেরা সত্যিই তুলনাহীন। মা এবং গভর্নেসের হাজার চেষ্টাতেও ওরা বড়দের অনুকরণ করে না। পলকের মধ্যেই 'খ্রীস্টমাস ট্রী'র শেষ মিষ্টিটি পর্যন্ত অন্তর্হিত। কোন খেলনাটি কার সেটি ভাল করে স্থিরীকৃত হবার আগেই অর্ধেক খেলনার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটল।

ওদের মধ্যে একটি কাজলনয়ন, কুঞ্চিতকেশ সুন্দর ছোট ছেলে কাঠের বন্দুক উঁচিয়ে কেবলি আমাকে তাক করছে। কিন্তু সব থেকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওর বোনটি; বছর এগারোর এই মেয়েটি যেন পঞ্চশরের সকল মাধুরী নিয়ে গড়ে উঠেছে। মেয়েটি শান্ত ও চিন্তাশীলা, বড় বড় টানা চোখে স্বপ্নজড়িমা। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গ কি কারণে পছন্দ হয় নি, তাই ওদের ছেড়ে, যে ঘরে আমি বসেছিলাম সে ঘরে ঢুকল; পুতুলটি নিয়ে বসে পড়ল এক কোণায়।

সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে অতিথিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'ওর বাবা অতি বিত্তবান ব্যবসায়ী; মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসেবে তিন লক্ষ রুবেল এখনই আলাদা করে রেখেছেন।'

এই বিশেষ সংবাদ পরিবেশনকারী মণ্ডলটির দিকে তাকাতেই জুলিয়ান মাস্তাকোভিচের সাথে আমার চোখচোখি হল। দুটি হাত পিছনে পরস্পরসম্বদ্ধ, মাথাটি একপাশে হেলিয়ে সুগভীর মনোযোগে উনি এই চলতি কথাবার্তা শুনছেন।

ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধুপ্রবরটির উপহার বণ্টনের বিবেচনা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। ভাবীকালের যৌতুকবতী ছোট মেয়েটি পেয়েছে সব থেকে সুন্দর একটা পুতুল। অন্য সব উপহারের মূল্যায়ন হয়েছে বাপ-মা'র সামাজিক পদমর্যাদা ও শ্রেণী অনুসারে।

সব শেষ ছেলেটি--রোগা, দুর্বল, লাল চুল-অলা একটা পুঁচকে ছোঁড়া--পেয়েছে প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধীয় ছোট একটা বই, তাতে ছবিতো দূরের কথা, সামনে পিছনের মলাট পর্যন্ত নেই। ছেলেটি ওদের গভর্নেসের। বেচারী গরীব বিধবা; ওর বাচ্চাটির জামাকাপড়ের অবস্থা শোচনীয় বটেই, তাছাড়া চারিদিক থেকে ধাঁতানি খেয়ে খোকাটি ভয়ে কেমন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। প্রকৃতি পুস্তকটি নিয়ে বাচ্চাদের খেলনার মধ্যে দিয়ে ও আস্তে আস্তে ঘুরছে। ওগুলো নিয়ে খেলা করতে পারলে, ও নিজের সব কিছুই বোধ হয় দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সে সাহস ছেলেটির নেই। নিজের স্থান সম্বন্ধে এখনই ও যথেষ্ট সচেতন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিরীক্ষণ করতে আমার ভাল লাগে। ওদের অন্তর্নিহিত যে ব্যক্তিত্বটা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মুক্তির উপায় খুঁজছে, সেটার সান্নিধ্যে আসা সত্যিই এক বিস্ময়কর দর্শন। দেখতে পাচ্ছি, অন্য ছেলেমেয়েদের খেলনাগুলো এই লালমাথা ছেলেটিকে মুগ্ধ করেছে; বিশেষ করে একটি খেলনা থিয়েটার ওর ভারি পছন্দ আর এ খেলায় অংশ নিতে ও এত আগ্রহী যে, অন্য ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাতে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হৈ হৈ করে খেলা আরম্ভ হল। ছেলেটির একটিমাত্র আপেল ও ধরিয়ে দিল একটা উদ্ধত প্রকৃতির দুষ্টু ছোকরাকে, যদিও তার পকেট মিষ্টিতে একেবারে বোঝাই; আর একটি সমবয়স্ক ছেলেকে ঘুরিয়ে আনল পিঠে করে; সমস্ত উদ্যমেরই একটিমাত্র উদ্দেশ্য যাতে ও থিয়েটারটি নিয়ে খানিকক্ষণ থাকতে পারে।

অল্প সময়ের মধ্যেই অবাধ্য প্রকৃতির একটা ছেলে ওর সাথে ঝগড়া করে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। বেচারীর কাঁদারও সাহস নেই। গভর্নেস এসে ছেলেকে বলে, অন্য বাচ্চাদের খেলায় মধ্যে এসে বিরক্ত না করতে; যে ঘরে আমি আর সেই ছোট মেয়েটি বসেছিলাম ও আস্তে আস্তে সেখানে উপস্থিত হল। মেয়েটি ওকে পাশে বসাল, আর দু'জনে মিলে সেই দামী পুতুলটার সাজগোজে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আধঘণ্টা মত হয়েছে ওখানে বসে বসে লালমাথা ছেলে আর বিত্তশীলা সুন্দরীর বকবকানি শুনতে শুনতে ঝিমুনি আসছে, এমন সময়ে সেখানে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচের আকস্মিক প্রবেশ। ছেলেমেয়েদের গোলমাল অসহ্য লাগার অজুহাতে বসার ঘর থেকে উনি সরে পড়েছেন। আমার প্রচ্ছন্ন কোণাটি থেকে লক্ষ্য করছি, কয়েক মিনিট আগেই ধনবতী মেয়েটির বাবার সাথে উনি অতি আগ্রহভরে কথাবার্তা বলছিলেন। ভদ্রলোকের সাথে এইমাত্র ওঁর পরিচয় হল। খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে নিজের মনে কি বিড়বিড় করলেন, তারপর কিসের হিসাবে ব্যস্ত হয়ে কর গোণা আরম্ভ করলেন।

'তিনশ-তিনশ-এগার-বার-তের ষোল-পাঁচ বছরে! ধরা যাক শতকরা চার হিসাবে -- বারর পাঁচগুণ -- ষাট, আর ওই ষাটের উপরে---। ধরে নেওয়া যাক পাঁচ বছরে সবটা গিয়ে দাঁড়াবে -- নিশ্চয়ই চারশত। হাঁ। হাঁ। কিন্তু এই ধূর্ত বুড়ো শিয়ালটা নিশ্চয়ই চার পার্সেন্টে সন্তুষ্ট, হবে না। আট কিংবা দশও হতে পারে হয়ত। ধরা যাক পাঁচশ, পাঁচলাখ নিশ্চয়ই, সেটা নিঃসন্দেহ। এর বেশী যেটা হবে, সেটাই ইচ্ছাসুখে খরচ করা যাবে-হুঁ--'

নাকটা ঝেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মেয়েটিকে নজরে পড়ায় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। লতাপাতার আড়ালে আমাকে উনি দেখতে পেলেন না। মনে হল উত্তেজনার আধিক্যে উনি কাঁপছেন। ওঁর হিসাব নিকাশই নিশ্চয়ই ওঁকে এরকম অস্থির করে তুলছে। হাতে হাত ঘষতে ঘষতে এধার থেকে ওধারে উনি নেচে বেড়াতে লাগলেন, আর ক্রমশ আরো উত্তেজিত

হয়ে উঠলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে একটু শান্ত হলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে ভাবী কনেকে একবার দেখে নিলেন, তারপর ওর দিকে অগ্রসর হবার আগে চারিদিকে তাকালেন। এবারে যেন দূষণীয় কিছু করছেন এইভাবে পা পা করে মেয়েটির কাছে গিয়ে, হাসতে হাসতে নীচু হয়ে মাথায় একটা চুমো দিলেন।

ওঁর আসাটা এতই অভাবিত যে মেয়েটি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। চারিদিকে তাকিয়ে ওর গালটা টিপে দিয়ে নীচু গলায় ভদ্রলোক বলেন, 'এখানে তুমি কি করছ সোনা?'

'আমরা খেলা করছি।'

'সেকি! ওর সাথে?' জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ বীতরাগভরে গভর্নেস পুত্রটির দিকে তাকালেন। 'খোকা, তুমি বসার ঘরে যাও।'

ছেলেটি নিঃশব্দে চোখ বড় বড় করে ভদ্রলোকের দিকে তাকান।

জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ সতর্কতার সঙ্গে আবার চারধার দেখে নিয়ে মেয়েটির উপর নুয়ে পড়লেন।

'তুমি কি পেয়েছ মিষ্টি মেয়ে, পুতুল?'

'আজ্ঞে হঁ্যা' ভুরু কুঁচকে অস্ফুটে মেয়েটি সম্মতি জানাল।

'পুতুল। তুমি কি জান সোনা, কি দিয়ে পুতুলেরা তৈরী হয়?'

'না', দুর্বলস্বরে বলে ও মাথা নামাল।

'ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সোনামণি। এই খোকা, তুমি বসার ঘরে বাচ্চাদের কাছে যাও না।' ছেলেটির দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ নির্দেশ দেন।

'তুমি কি জান কেন ওরা তোমায় পুতুলটা দিয়েছে?' গলার স্বর মৃদু থেকে মৃদুতর করে মাস্তাকোভিচ প্রশ্ন করেন।

'না।'

'কারণ তুমি সারা সপ্তাহ ভাল—খুব ভাল মেয়ে হয়েছিলে।'

এই বলেই জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ অতি উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এধার ওধার দেখে, খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট স্বরে, উত্তেজিত ও অধৈর্যভাবে বলে উঠলেন:

'আমি যদি তোমার বাবা-মা'র সাথে দেখা করতে তোমাদের বাসায় যাই, তুমি কি আমাকে ভালবাসবে মণি?'

সেই ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটাকে উনি চুমো দিতে চেষ্টা করলেন; লালচুলো ছেলেটি দেখে মেয়েটির চোখের কোণে জল টলমল; সে মেয়েটির হাত ধরে সমবেদনাভরে জোরে কেঁদে উঠল। ভদ্রলোকের রাগ দেখে কে। 'চলে যা, চলে যা, ও ঘরে তোর বন্ধুদের কাছে চলে যা।'

'আমি ওকে ছাড়তে চাই না, আমি ওকে ছাড়তে চাই না। আপনি

চলে যান।' মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে। 'ওকে ছেড়ে দিন! ওকে ছেড়ে দিন!' কান্নাভেজা গলায় ও বলে।

দরজায় পদশব্দ। চমকে উঠে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ নিজের সম্মানিত শরীরকে খাড়া করলেন। এতে লাল চুল-ওলা ছেলেটি আরো ঘাবড়ে গেল। মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসার ঘরের মধ্যে দিয়ে একেবারে খাবার ঘরে পালিয়ে গেল।

সকলের দৃষ্টি এড়াবার উদ্দেশ্যে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচও খাবার ঘরের দিকে এগোলেন। ওঁর মুখ একেবারে চিংড়ি মাছের মত লাল টকটকে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মনে হল যেন হতচকিত। নিজের উদ্দীপনা ও অধৈর্যে এখন যেন নিজের উপরেই ক্রোধান্বিত। হিসেবের মোহ ওঁকে আত্মসম্মান ও পদমর্যাদা ভুলিয়েছে। ছোট ছেলে যেমন কাম্য বস্তুর আশায় লুব্ধ ঔৎসুক্যে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে, উনিও তেমন প্রলুব্ধ হয়েছেন, ভবিষ্যতের হিসাব ওঁকে উস্কিয়ে দিয়েছে। এখনো ত বাস্তব কিছুই তৈরী হয় নি, পাঁচবছর বাদেই কেবল তা হবে। আমি এই প্রশংসনীয় মহাজনের পন্থা অনুসরণে খাবার ঘরে এসে চমৎকার একটা নাটক দেখলাম।

বিব্রত জুলিয়ান মাস্তাকোভিচের মুখ লাল, দৃষ্টিতে বিষ -- লালচুলো ছেলেটাকে বকাবকি সুরু করলেন। ছেলেটা ক্রমাগত পিছু হটছে, শেষে আর পিছোবার জায়গা রইল না। এই আসন্ন ভয় থেকে কি করে উদ্ধার পাবে ছেলেটা বোঝে না।

'এখান থেকে দূর হয়ে যা। এখানে কি করছিস? গেলি, অপদার্থ কোথাকার! ফল চুরি করছিস নাকি? নিশ্চয়ই ফলচুরি। যা পোড়ারমুখো, তোর জাতভাইদের কাছে যা।'

হতাশ ভীত ছেলেটা শেষ আশ্রয় হিসাবে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকে গেল। ওর ক্রুদ্ধ শাস্তিদাতা নিজের সিল্কের বড় রুমালটি টেনে, চাবুকের মত সেটা দিয়ে ছেলেটাকে ওর জায়গা থেকে বার করতে প্রবৃত্ত হলেন।

এখানে একটা কথা বলি। জুলিয়ান মাস্তাকোভিচকে স্থূলকায় বলেই ধরে নেওয়া যায়; ভারী দেহ, হৃষ্টপুষ্ট, ফুলো ফুলো গাল, একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ি আর পায়ের গাঁটগুলো বাদামের মত গোল। ঘামে, দমবন্ধ হয়ে উনি হাঁপাতে লাগলেন। ছেলেটাকে এতই অপছন্দ হয়েছে, (একে কি হিংসে বলব?), যে সত্যিই উনি উন্মাদের মত করতে লাগলেন।

প্রাণ ভরে হাসছি, মাস্তাকোভিচ ফিরে তাকালেন। একেবারে বুদ্ধিভ্রষ্ট, আর ক্ষণিকের জন্য মনে হল যেন নিজের অসীম মর্যাদাও বিস্মৃত হয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে উল্টোদিকের দরজার সামনে আমাদের উদ্যোক্তা মশাইকে দেখা গেল। ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু আর কব্জির ধূলো ঝাড়ছে। জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ যে রুমালটা কোণায় ধরে নাচাচ্ছিলেন, সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নাকের ডগায় ধরলেন। আমাদের বন্ধুটি সবিস্ময়ে আমাদের তিনজনের দিকে তাকালেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সব অবস্থায়ই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, উদ্যোক্তা মশাইও এ সুযোগ হারালেন না। অতি মাননীয় অতিথিটিকে এই মওকায় ধরে কাজ গুছিয়ে নেওয়াই বুদ্ধির পরিচায়ক হবে।

'এই ছেলেটির কথাই আপনাকে আমি বলছিলাম,' লালমাথা ছেলেটির দিকে নির্দেশ করেন উনি। 'ওর উপর আপনার দয়া যে হবেই, এটা আমি আগেই আন্দাজ করে নিয়েছি।'

'তাই ত', জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ এখনো নিজেকে সংযত করিতে সক্ষম হন নি।

'এটি আমার গভর্নেসের ছেলে', আমাদের বন্ধুটি প্রার্থনার স্বরে বলে যেতে লাগলেন। 'বেচারী অতি গরীব, একটি সৎ কর্মচারীর বিধবা। কাজেই যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়—'

'অসম্ভব, অসম্ভব।' জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে ওঠেন। 'অ-আমাকে তোমায় ক্ষমা করতে হবে ফিলিপ আলেক্সীভিচ, আমি সত্যিই নিরুপায়। আমি খোঁজ নিয়েছি; জায়গা ত নেই-ই, উপরন্তু দশজন অপেক্ষার্থীর তালিকায়। এদের কথা আগে বিবেচনা করা হবে, কারণ ওর থেকে তাদের অধিকার বেশী। আমি দুঃখিত।'

'কি দুঃখের বিষয়।' বন্ধুপ্রবর বলেন, 'ছেলেটা অতি ভদ্র ও শান্ত।'

'আমার ত মনে হয় একটি ক্ষুদে বদমাইস'; জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ শুষ্কস্বরে মন্তব্য করেন। 'যাও খোকা, এখনো এখানে কেন? অন্য বাচ্চাদের কাছে কেটে পড়।'

নিজেকে সংযত করতে অসমর্থ হয়ে অন্যের অলক্ষ্যে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমিও নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। ওঁর মুখের উপরেই হো হো করে হেসে উঠলাম। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি আমাদের আমন্ত্রিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন -- যদিও আমি সেটা স্পষ্টই শুনতে পেলাম --'এই অভদ্র যুবকটি কে।'

ওঁদের মধ্যে ফিসফাস কি কথাবার্তা হল, তারপর আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ওঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

৮

হাসির আবেগে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। তারপরে আমিও বসার ঘরে গেলাম। মাননীয় মহাশয়টি সেখানে আমন্ত্রিতা ও আমন্ত্রয়িত্রী সহ বন্ধ মাতাপিতৃপরিবৃত হয়ে সাগ্রহে সদ্য পরিচিত এক ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ করছেন। বিত্তবতী মেয়েটির হাত ভদ্রমহিলার হাতে ধরা। মাস্তাকোভিচ মেয়েটির প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। প্রিয়দর্শনা মেয়েটির রূপ, গুণ, চলন-বলন ব্যবহার সব তাতেই উনি উচ্ছ্বসিত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নিজের তোষণ-ক্ষমতাটা উনি মায়ের উপর উজাড় করে দিচ্ছেন। শুনতে শুনতে মা আর আনন্দাশ্রু গোপন করতে পারেন না; বাপ একটু

কৃতজ্ঞ হাসি হেসে আনন্দ প্রকাশ করেন।

আনন্দটা বোধহয় সংক্রামক; সকলেই এই আনন্দের ভাগীদার হল। এমন কি বাচ্চারা পর্যন্ত ওদের খেলা বন্ধ রাখতে বাধ্য হল, যাতে বড়দের কথাবার্তার সময়ে কোন গোলমাল না হয়। সমগ্র পরিবেশটাই কেমন থমথমে। বিশিষ্ট খুকীটির মা, অন্তরে বীণার ঝঙ্কার নিয়ে, জুলিয়ান মাস্তাকোভিচকে অতি বিনীত ভাষায় বাড়ীতে এসে ওদের সম্মানিত করতে প্রার্থনা জানালেন। আন্তরিক ঔৎসুক্যে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন শুনলাম।

এরপরে স্বভাবতই অতিথিরা কক্ষের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর শুনলাম সসম্ভ্রমে ব্যবসায়ী মহাশয়, তস্য স্ত্রী, তস্য কন্যা এবং বিশেষভাবে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ সম্বন্ধে নানা আলোচনা করছে।

'উনি কি বিবাহিত?' মাস্তাকোভিচের পাশে দাড়ান আমার এক পরিচিতকে বেশ জোরেই প্রশ্ন করি।

জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। 'না', আমার এই ইচ্ছাকৃত অভদ্রতায় পরিচিতটি অতীব আহত।

●

এর কিছুদিন পরেই আমি ঐ চার্চটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটি বিবাহ দর্শন করতে এত জনসমাগম দেখে আমি বিস্ময় বোধ করি। দিনটা সুবিধের নয়। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হল। জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে চার্চে ঢুকে পড়লাম। বরটি বেশ গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট, ভুঁড়িওলা ছোটখাট মানুষ; সাজগোজে যেন কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্য। ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে, এটা সেটা নির্দেশ দিয়ে তিনি সব বন্দোবস্ত করাচ্ছেন।

অবশেষে শোনা গেল যে কনে আসছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে দেখি কি অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী, জীবনে সবে সুরু হতে চলেছে প্রথম বসন্তের আনাগোনা। কিন্তু এই অপরূপা অবসন্ন, দুঃখিত, হয়ত বা হতবুদ্ধি। মনে হল সদ্য অশ্রু মোচনে ওর আঁখিতারা রক্তবর্ণ। ওর মুখের প্রতিটি রেখার নিদারুণ গাম্ভীর্য ওর সৌন্দর্যকে এক অদ্ভুত বিশিষ্টতা ও দৃঢ়তায় মণ্ডিত করে তুলেছে। এই গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা আর বিষাদের মধ্যে দিয়ে একটি অপাপবিদ্ধা সুকুমারীর মুখ ফুটে উঠছে। ওর এই অনির্বচনীয় সরলতামাখা দিগভ্রান্ত কচি মুখটি যেন নিঃশব্দে একটু কৃপাকণার ভিখারী।

সবাই বলাবলি করছে ওর বয়স মাত্র ষোল। আমি বিশেষভাবে বরটিকে লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ, যে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচকে পাঁচ বছরের মধ্যে আর দেখি নি, তাকে চিনে ফেললাম। এবারে আবার কনের দিকে তাকাই। হে ভগবান! আমি যত দ্রুত সম্ভব পথ করে চার্চের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলাম। ভিড়ের ভিতর কানে এল কনের সম্পত্তি সম্বন্ধে কানাকানি চলছে--পাঁচলাখ রুবেল যৌতুক, তাছাড়া হাতখরচের জন্য এত টাকা।

'ওঁর হিসাব তাহলে একেবারে নিখুঁত ছিল', রাস্তায় বেরিয়ে আসার সময় মনে মনে ভাবলাম।

অনুবাদিকা—কৃষ্ণা সেন

--The Christmas tree and the Webding-এর বঙ্গানুবাদ।

কোথা সে রাধাশ্যাম?

কমলাকান্ত

"একদা স্বরগ হইতে এসেছিল নেমে,
যশোদার কোলে বৃন্দাবনে—নন্দ গোপধামে,
শ্রীকৃষ্ণ রূপে সে চতুর বংশীধারী।
সে ব্রজকিশোর-ননীচোর-নন্দনন্দন,
মজেছিল রাধিকার প্রেমে বাজায়ে বাঁশরী
ডাকিতে রাধা বলি সে মুরলীধারী।
যমুনাজল যেতো উজান সে বেণুরবে,
উথলি উঠিত-আনন্দ-কল্লোল-প্রেমবারি,
পাগল হইত ব্রজের গোপনারী।
একদা রাধারাণীর রাঙা চরণতলে,
রেখেছিল রসময় মোহন মুরলীখানি,
রসিক চূড়ামণি সে রাসবিহারী।
লিখেছিল দাসখত সে প্রেমিক নাগর,
"দেহি পদপল্লবম্ উদারম্" নববাণী,
প্রেমের দায়ে দিয়ে প্রেমাশ্রু বারি।
হায়, কোথা সে যমুনাতট, কোথা বংশীবট,
কোথা সে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, বলরাম;
(কোথা) সে রাধাশ্যাম কন্দর্পদর্পহারী?"

চাঁদে যারা মানুষ পাঠালো

অধীরকুমার রাহা
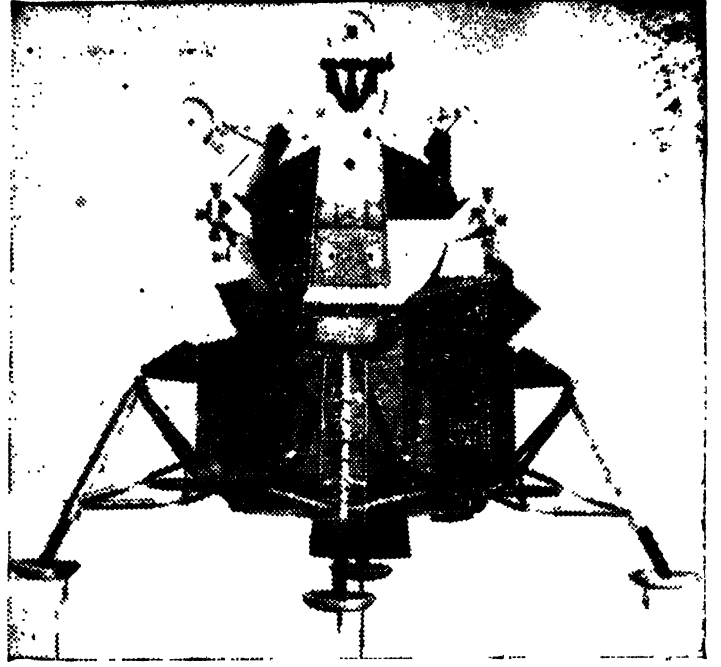
যে যানটি চাঁদে নেমেছিল

মানুষ চাঁদে গেল। ফিরে এল। কিভাবে এটা সম্ভব হল, কারা এটা সম্ভব করল এ প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে এখন।

চাঁদে যাবার আগে দরকার হয়েছিল জানা, আকাশের গায়ে ঐ যে সুন্দর রূপালী গোলকটা, কেন ওটা নিয়মিত দেখা দেয়, কি ও জিনিষটা, কেন ওটা পৃথিবীর বুকে ভেঙ্গে পড়ে না?

এসব প্রশ্ন জেগেছিল মানুষের সভ্যতার পত্তনের আগে থেকেই। নানা সভ্যতার নানা দেশের মানুষ, নানাভাবে চেষ্টা করেছে এসব প্রশ্নের জবাব বার করতে।

আদি মানুষ জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিল দেবতার লীলা মাহাত্ম্য দিয়ে। চাঁদ ছিল দেবতা। পূজা পেয়ে এসেছে নানা দেশে, নানা কারণে।

মানুষের মঙ্গলদাত্রী এই চন্দ্রের রূপপরিবর্তন ঘটতে শুরু করে প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে, গ্রীক পণ্ডিতেরা যখন চাইলেন কার্য-কারণের ভিত্তিতে চাঁদ সূর্য ও গ্রহসমেত, আকাশপটের গোটা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থিতি, আচার-আচরণের ব্যাখ্যা দিতে।

খৃস্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ শো বছর আগে পিথাগোরাস বললেন পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ গোলাকার। খৃস্টপূর্ব আনুমানিক সাড়ে তিনশো বছর আগে হিরাক্লিডস ইঙ্গিত দিলেন---পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। খৃস্টপূর্ব আড়াইশো বছরে ইরাসটোথেনস বার করলেন পৃথিবীর পরিধি। খৃস্টপূর্ব দেড়শ বছরে হিপার্কাস আবিষ্কার করলেন সূর্যের অয়ন চলন। অ্যানকসাগোরাস অনেক আগেই বলেছিলেন সূর্য এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড। অন্য গ্রীক পণ্ডিতেরা চন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে বললেন, চাঁদের নিজস্ব কোনও প্রভা নেই। সূর্যের আলোয় সে উজ্জ্বল।

গ্রীকদের আগে, মিশরীয় ও সুমেরীয় পুরোহিতরা পূজা-পার্বণ আর চাষের সময়ের হিসাব রাখতে আকাশপটে সূর্য গ্রহ ও চাঁদের চলাচলের, গ্রহণের, পূর্ণিমা অমাবস্যার হিসাব লিখে রাখত। গ্রীক পণ্ডিতেরা তার ভিত্তিতে চেষ্টা করতে লাগলেন গ্রহগণের পরিক্রমণ পথের রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

ইউডোকসাস বললেন, চাঁদ সূর্য গ্রহগণ বসান এক একটি গোলকের গায়ে। গোলকগুলির গতির জন্যই এদের গতি। এই সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত টলেমি সৃষ্টি করে গেলেন সূর্যসমেত গ্রহ ও চাঁদের পৃথিবীকেন্দ্রিক চক্রাবর্তনের তত্ত্ব।

হাজার বছর এইভাবে পৃথিবী ছিল গ্রহাধিরাজ। তার সে আসন থেকে তাকে নামিয়ে আনলেন পোলাণ্ডের কোপারনিকাস। সে ইতিহাস বলা চলে সাম্প্রতিক কালের। মাত্র পৌনে চারশ' বছর আগে প্রকাশিত হল পুস্তকাকারে তার সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহ-জগতের মতবাদ।

কোপারনিকাসের গ্রহগণ ঘুরত বৃত্তপথে। তাতে জ্যোতির্বিদরা লক্ষ্য করতেন কক্ষপথের অসঙ্গতি। এ অসঙ্গতি দূর করলেন জার্মান কেপলার উপবৃত্তপথের তত্ত্ব প্রচার করে।

সৌরজগতের সঠিক রূপটি ধরা পড়ল এতদিনে। তবু আরও প্রশ্ন রয়ে গেল: কেন গ্রহগণ ঘোরে সূর্যের চারিদিকে? কেন চাঁদ ভেঙ্গে পড়ে না পৃথিবীর বুকে?

এ ব্যাখ্যা দিলেন ইংরাজ নিউটন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে। সেই সঙ্গে দিলেন তিনটি গতিসূত্র, যার মধ্যে পরে মিলেছিল মহাকাশযাত্রার মন্ত্রগুপ্তি।

তখনও গ্রহগণ স্থূল বস্তুপিণ্ড--দেখা না-দেখায় মেশা কল্পলোক। এ দুনিয়ার সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হতে

শুরু হল ইতালীর গ্যালিলিওর দূরবীণে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরে শুরু হয়েছিল তার চাঁদের দুনিয়ার ভূদৃশ্য পরীক্ষা করার কাজ। তার পদরেখা অনুসরণ করে চাঁদের দুনিয়ার মানচিত্র আঁকতে, তার পাহাড় পর্বত সাগর-গহ্বরের নতুন ভূগোল রচনা করতে এগিয়ে এলেন হল্যাণ্ডের হেভেলিয়াস, ইতালীর রিকিকওলি শেষে জ্যোতি-বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা গড়ে উঠল জার্মান শ্রোয়টার, লোরম্যান, বীয়ার ও ম্যাডলারের হাতে। শেষের দু'জন চন্দ্র-ভূবিজ্ঞানী চাঁদ সম্বন্ধে জানিয়ে গেলেন শেষ কথা। চাঁদ জলবায়ুহীন, শব্দ হীন, প্রাণহীন এক মৃত জগৎ।

যাঁরা চাঁদে গিয়েছিলেন—নীল আর্মস্টং, কলিন্স, অলড্রিন

এরপর পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শরীর বিদ্যায় অনেকগুলি বড় বড় আবিষ্কার হয়ে গেল। গ্যাসের ধর্ম জানালেন ইতালীর টরিসেল্লি, আয়র্ল্যাণ্ডের বয়েল, ইংলণ্ডের কেভেনডিস্, ফ্রান্সের লভয়সিয়েঁ। দুজন পোলিশ বিজ্ঞানী, রোবেস্কি ও ওবলেস্কি অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন তরলীকৃত করে প্রমাণ করলেন, সব গ্যাসই তরলীকরণসাধ্য। একালের মহাকাশগামী রকেটের জন্য প্রয়োজন হল তরল আসিডাইজার,।

তারপর ধর্ম উদ্ঘাটন করলেন ইংরাজ বেঞ্জামিন টমসন, আলোর রহস্য ইংরাজ নিউটন, ফরাসী লিও ফুকো, মার্কিন মিচেলসন। পদার্থের ভিত্তিতে যে অণু, তার মর্মোদ্‌ঘাটন করলেন ইংরাজ ডালটন, রুশ মেনডেলেফ, ইংলণ্ডের জে জে টমসন, নিউজিল্যাণ্ডের রাদারফোর্ড।

শরীর যে শিরা ধমনী হৃৎপিণ্ড, যকৃত অন্ত্রকোষ অণুকোষে গড়া একটি জটিল যন্ত্র—পৃথিবীর বাতাস, চাপ তাপ ও মহাকর্ষের মাঝে বাঁচবার জন্যই তৈরী একান্তভাবে—এর বাইরে এ যন্ত্রটি অচল—এ তত্ত্ব আবিষ্কার শুরু হয় শারীর-বিদ্যা ও ভেষজ বিজ্ঞানের। এশিয়া মাইনরের গ্যালেন থেকে যা শুরু, পুষ্টি ইংরাজ উইলিয়াম হার্ভের রক্ত-সঞ্চালন তত্ত্ব থেকে, পরিণতি ফ্রান্সের পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্বে। তারপর শারীর বিদ্যায় দান রেখে গেছেন অসংখ্য দেশের অসংখ্য বিজ্ঞানী, যাঁদের দেহ-যন্ত্রটির প্রকৃতি কিছুটা জানতে পেরেছে মানুষ। বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীর বাইরের বিরূপ পরিবেশে একে বাঁচানোয় দরকার কি ধরণের ব্যবস্থা।

পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তরে যাবার জন্য দরকার হয়েছিল আরও একটা জ্ঞান। মহাশূন্যের পরিচয়। ঘন বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি যে মাত্র পাঁচ মাইল, আর মহাশূন্য যে শুধুই শূন্য নয়, এখানে রয়েছে আয়নমণ্ডল, রয়েছে বায়ুমণ্ডলের আবরণহীন স্থানে সূর্যের মারাত্মক বিকিরণ-রশ্মি, সেকেণ্ডে ৫ থেকে ২০ মাইল বেগে ছোটা উল্কাপিণ্ড—এসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে গত একশ' বছরের বহু দেশের বহু বিজ্ঞানীর সাধনায়। মহাকাশের বিকিরণ-রশ্মি নিয়ে মূল্যবান গবেষণা হয়েছে এক সময় বসু বিজ্ঞান-মন্দিরেও।

তবু চাঁদে যাওয়া কবি-কল্পনাই থেকে যেত, যদি না ফরাসী জুল ভার্নের 'চন্দ্রলোক যাত্রা' পড়ে উদ্বুদ্ধ হতেন রুমানীয় হারমান ওবার্থ, বধির গণিত-শিক্ষক এজিওলকভস্কি আঁকজোক কষে বার করতে না বসতেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে ভিন্ন লোকে যাবার রকেট তৈরির সূত্র, ওবার্থের লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কিন গডার্ড হাতে-কলমে মহাকাশগামী তরল জ্বালানী-চালিত রকেট নির্মাণের পরীক্ষায় না-নামতেন। গ্রহান্তরে যাবার রকেট তৈরির পরীক্ষা করে গেছেন ওবার্থও। পরে এ শতকের তৃতীয় দশকে জার্মান গ্রহান্তরযাত্রী সমিতির সভ্যরা। যাঁদের একজন হলেন ভন ব্রুন।

এতেও মহাকাশযান তৈরির চেষ্টা সফল হত না, যদি না জার্মান পদার্থবিদ হার্ৎসের তরঙ্গ থেকে ইতালীর মার্কনী আর ভারতের জগদীশ বসু সন্ধান পেতেন বেতার তরঙ্গের। সেই বেতার তরঙ্গ বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তিবিদ্‌দের হাতে পড়ে এল তারুণ্যে। সম্ভব হল তার সাহায্যে দূরনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপরিচালনার।

এরপর সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন পথে পাওয়া গেল মহাকাশ যাত্রাপথের রকেটের মূল নক্সা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হিটলার তৈরি করালেন জার্মান গ্রহান্তরযাত্রী সমিতির প্রাক্তন সদস্য ভন ব্রুন ও ক্যাপ্টেন ড্রোন বার্জারকে দিয়ে উড়ন্ত বোমা—। আসলে যা মাথায় একটন দেয় ভারবাহী তরল জ্বালানী চালিত রকেট। সেকেণ্ডে একমাইল গতি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেটে আসে বায়ুস্তর—তারপর দূরনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে রকেট চালিয়ে দেওয়া যায় লক্ষ্যমুখে।

সেকেণ্ডে এক মাইল গতিবেগ, যাকে বাড়িয়ে সাত মাইল করতে

দেবীপুরের জমিদার বাড়ীটা থম্‌থম্‌ করছে। রাতের অন্ধকারে যেন বাড়ীটাকে প্রেতপুরী বলে মনে হয়। যারা কিনে নিয়েছে, এখনো সারায় নি অথবা কেউ বসবাস করে না।

বাইমহলের বর্তমান গৃহকর্ত্রী স্বর্ণময়ীর, সকালটা তবুও কোনরকমে কেটে যায়। সন্ধ্যে নামলেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন গুমরে ওঠে। রাত বাড়লে, নিজেকে বড় একা একা মনে হয়। তবুও অপর্ণা যতো দিন বেঁচে ছিল—মনে হতো শূন্য পুরীতে তবুও একটা মানুষ আছে। যদিও সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোলা-সতের ঘণ্টা ঠাকুরঘরেই থাকতো। ইদানীং টি, বি রোগে ভুগছিল সে। কটা বছর বড় কষ্ট গেছে তার। যমের কাছে গিয়ে সে শান্তি পেয়েছে। হয়তো তার অতিপ্রিয় মানুষটার সঙ্গে তার মিলন ঘটেছে।

রায়বাড়ীর যে এই দুর্দশা হবে—কেউ ভাবতে পেরেছিল? যেখানে ছ-সাতটা পাচক ব্রাহ্মণ, পঁচিশ-তিরিশ জন দাস-দাসী, নায়েব-গোমস্তা, বরকন্দাজ

অর্চনা মিত্র

দরোয়ান—সব মিলিয়ে দু'বেলা দু'শো খানা পাত পড়তো।

আর আজ? স্বর্ণময়ীর—একজন দাসীমাত্র। দাসীও ঠিক বলা যায় না। বন্ধু ছাড়া আর কিছু নয়। তার নাম মোক্ষদা। এ বাড়ীতে আছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। এ বাড়ীতে তো কম বিপর্যয় ঘটে নি। লক্ষ্মী চলে গেছেন—অর্থাৎ এ বাড়ী থেকে লক্ষ্মী চলে গেছেন। মোক্ষদাই শুধু রয়ে গেছে। তাও বাই-মহলে উঠে আসতে হয়েছে। একী কম দুঃখের?

স্বর্ণময়ীর শ্বশুর, পুরোন দিনের মহাপ্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ—শশিশেখর রায়ের আমলে জমিদারীর আয় ছিল বছরে প্রায় ছত্রিশ লক্ষ টাকা। শশিশেখর রায়কে বিদেশী শাসকেরা রাজা উপাধি প্রদান করেছিল। স্বর্ণময়ীর দাদাশ্বশুরের আমলে কয়েকটি সম্পত্তি বাঁধা দিতে হয়। কারণ—জমিদারেরা ভোগ করেছেন সীমাহীনভাবে—আয়ের দিকে লক্ষ্য করেন নি। শুধু ব্যয় করেছেন—অর্থ—জলের মত।

স্বর্ণময়ীর শ্বশুরের আমলে স্বর্ণময়ী দেখেছেন প্রাচুর্য, আকণ্ঠ ভোগ এবং প্রচণ্ড বিলাসিতা। তাঁর শ্বশুর রাজশেখর নাম তাঁদের বনেদী বংশের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে গিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি-গুলো বাঁধা দিয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরও তার স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী রায় বংশের রীতি-নীতি-আচার, পাল-পার্বণ সব কিছু ঠাট-বাট বজায় রাখলেন। কিছুই কমাতে দেন নি বা চান নি। উপরন্তু ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর কাছে বেশ কিছু ধার-দেনাও করে ফেলেছিলেন।

স্বর্ণময়ী বাধা দিতে পারেন নি। কারণ প্রথমত স্বর্ণময়ীর সংশাশুড়ী হেমপ্রভাকে খুব ভয় করতেন। খরচ-পত্র সম্বন্ধে তাঁর কোন কথা বলার অধিকারই ছিল না।

পারলেই পাওয়া যাবে পৃথিবীর মহাকর্ষ কাটিয়ে গ্রহান্তরে যাবার পথ, উৎক্ষেপের পরও পৃথিবী থেকে রকেটের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা—এ দুটি ব্যাপারের মধ্যেই নিহিত ছিল উড়ন্ত বোমা ভি-টু কে মহাকাশ যাত্রার রকেটে পরিণত করার সম্ভাবনার বীজ।

ভি-টু থেকে চন্দ্রযান—এই অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হতে প্রয়োজন ছিল মহাকাশ-গবেষণায়, রকেট নির্মাণে, মহাকাশযান পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল উদ্ভাবনের গবেষণায়, ও সত্যিকারের নির্মাণকার্যে বিপুল অর্থ-নাক্ষত্রিক সংখ্যায় অর্থ বিনিয়োগ গত দুই দশকে ইলেকট্রনিক বিদ্যার বিপুল উন্নতি, যন্ত্রপাতি ক্ষুদ্রীকরণ ব্যবস্থা নানা ধরণের গণনযন্ত্র কমপিউটার তৈরি হওয়ায় এই গবেষণা ও নির্মাণ কার্য এগিয়ে দিয়েছে।

চাঁদে পৌঁছবার জন্য পৃথিবীর দুই বিরাট দেশের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলেছিল, তাতে দুই দেশকেই উৎপাদন ক্ষমতার একটা বিরাট অংশ নিয়োগ করতে হয়েছে দ্রুত চাঁদে যাবার উপযোগী টেকনোলজি উদ্ভাবন করতে।

মানুষের সভ্যতার আড়াই হাজার বছরের বিজ্ঞান-সাধনা আত্মীকরণ করেই সম্ভব হল আজকের মানুষের চন্দ্রলোক অভিযানের টেকনিকাল ব্রেকথ্রু।

হেমপ্রভা যতদিন বেঁচেছিলেন—স্বর্ণময়ী ঠিক যেন যেন নববধূর মতই থেকেছেন। দ্বিতীয়ত, ভেতরের কথাগুলো, হেমপ্রভা তাঁকে জানতে দেন নি। স্বর্ণময়ীর প্রথম দিকে ধারণা ছিল তাঁদের প্রচুর অর্থ। স্বর্ণময়ীর স্বামী—চন্দ্রশেখরের মা সর্বাণী দেবী মারা যাবার পর, রাজশেখর বিয়ে করেছিলেন হেমপ্রভাকে। হেমপ্রভা সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন রায়বাড়ীর।

এমনিতে রাজশেখর চিরদিনই পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিলেন। হেমপ্রভা কিছু মনে করতেন না। তাঁর হাতে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, অর্থ সব কিছুই ছিল। প্রচণ্ড দাপট ছিল তাঁর রায়বাড়ীর অধিবাসীদের ওপর। ইদানীং, শরীরের অসুস্থতার জন্য রাজশেখর বাইমহলে যেতে পারতেন না। পক্ষাঘাতে পড়ে থাকতেন বিছানায়। তখন হেমপ্রভাই সব কিছু পরিচালনা করতেন।

ছেলে চন্দ্রশেখর বাপকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। নিত্য-নতুন সুন্দরী স্ত্রীলোক তাঁর চাই-ই। কতকগুলো মোসাহেব জুটিয়ে আরো নীচে নেমে যাচ্ছিলেন তিনি। বাইমহলে সারা রাত-দিন পড়ে থাকতেন। হেমপ্রভার এ জন্য কোন চিন্তা ছিল না। স্বর্ণময়ীর মনের অবস্থা যে কী হতো, বলা কঠিন। একবার স্বামীর সম্বন্ধে অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন শাশুড়ীর কাছে।

সেদিন, হেমপ্রভা অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন। বলেছিলেন—তুমি গরীবের মেয়ে, রায়বাড়ীর চাল-চলন জানো না, তাই একথা বলছো। বাড়ীর বৌয়েরা কোনদিনও পুরুষদের পরিতৃপ্ত করতে পারে না। সে-সব মেয়েদের জাত আলাদা। আমরা রাণীদের মতন, যারা বাইমহলে থাকে, ওরা দাসীদের মতন। ভবিষ্যতে এ ধরণের কথা বলবে না।

বিয়ের পরেই, স্বর্ণময়ীকে, হেমপ্রভা যেন কিনে নিয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে কথা বলা, তার ঘরে যাওয়া, হেমপ্রভা চাইতেন না আর স্বর্ণময়ীও কখনোও এই ধরণের গর্হিত কাজগুলি করতেন না। সে-যুগে এই ধরণের কাজগুলি যদিও বিশেষ নিন্দনীয় ছিল, তবুও স্বর্ণময়ীর এখন মনে হয়—হেমপ্রভা যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে গেছেন তাঁর ওপর। রাত বারোটা পর্যন্ত শ্বশুরের ঘরে থাকতে হতো। তারপরে শাশুড়ীর চুল বেঁধে দিতে হতো পরিপাটি করে। সাজতে ভালবাসতেন খুব হেমপ্রভা।

কিশোর চন্দ্রশেখর আকারে-ইঙ্গিতে কয়েকবার নববধূকে ঘরে ডেকেছিলেন—কিন্তু স্বর্ণময়ীর সাহসে কুলোয় নি। স্বর্ণময়ীর এখন মনে হয় চন্দ্রশেখরের অধঃপাতে যাবার মূল কারণ হেমপ্রভা। খানিকটা অবশ্য, রক্তের ধারারও দোষ। স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক তাঁর গড়ে ওঠার সুযোগ হয় নি, কোনদিন।

হেমপ্রভার আমলে, স্বর্ণময়ীর কাজও ছিল না, কামাইও ছিল না। কর্তব্য ছিল—হাজার রকমের। হেমপ্রভার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ সুমিত্রা বিধবা হয়ে রায়বাড়ীতে এলো একদিন। পিসশাশুড়ী অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন তাঁকে। পাকাপাকিভাবে বাস করতে লাগলো সে—রায়বাড়ীতে।

চন্দ্রশেখর নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর অস্তিত্ব অনায়াসে ভুলে বসলেন। যে পথে সুখ, আনন্দ, সেই পথেই নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন—বিলাসিতার স্রোতে। উচ্ছৃঙ্খলতা দিনের দিন বেড়েই চললো।

অপর্ণা—হেমপ্রভার একমাত্র গর্ভজাত সন্তান। হেমপ্রভার নিষ্ঠুরতায় ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা শুকিয়ে ঝরে গেলো। স্বর্ণময়ীর এখন মনে হয়—নিজের সন্তানকেই যিনি এতো কষ্ট দিলেন, সৎছেলে ও ছেলের বৌকে এর চেয়ে এমন কি বেশী কষ্ট দিয়েছেন হেমপ্রভা?

হেমপ্রভার দম্ভ ছিল প্রচণ্ড। তাঁর অমতে কেউ কিছু করবে, তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অপর্ণা কুক্ষণে ভালবেসেছিল ললিতকে। সাধারণ ঘরের ছেলে। বাবার সঙ্গে সে আসতো রায়বাড়ীতে প্রায় রোজই। ললিতের বাবা টোলে পড়াতেন। ললিতও লেখা-পড়া শিখেছিল। এদিকে বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগলো অপর্ণার। বিয়ে করতে অস্বীকার করলো অপর্ণা। সতেরো বছরের তরুণীর জেদে বিস্মিত হলেন হেমপ্রভা। তার এই স্পর্ধা সহ্য করতে পারলেন না। মেয়েকে বন্ধ করতে হলো ঘরের মধ্যে। অনেক অত্যাচার সহ্য করলো অপর্ণা; কিন্তু তার জেদ ভাঙ্গতে পারলেন না হেমপ্রভা। স্বর্ণময়ীর খুব কষ্ট হতে লাগলো অপর্ণার জন্য। কিন্তু উপায় কী?

হেমপ্রভা কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। তখনকার দিনের জমিদার-গৃহিণী। জমিদার স্বয়ং পক্ষাঘাতে পঙ্গু। সব কিছুর দায়-দায়িত্ব হেমপ্রভার ওপরেই। বুধন সিংকে ডেকে পাঠিয়ে, ঘরের মধ্যে চুপিচুপি কি সব হুকুম দিলেন তাকে। বুঝিয়া মোটা টাকা হাতে নিয়ে চলে গেলো রায়গৃহিণীকে নমস্কার করে।

ললিতের মৃতদেহটা পাওয়া গেলো
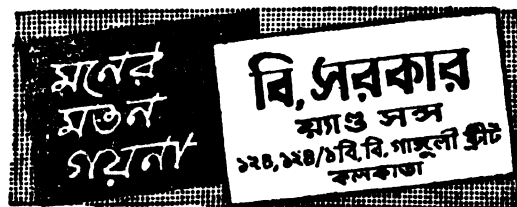
বাপুকুরের ধারে। কে যেন মাথায় বাড়ি মেরে মাথাটা তার ফাটিয়ে দিয়েছিল। কালো রক্ত জমাট বেঁধে ছিল সানবাঁধানো সিঁড়িগুলোর ওপরে।

পাটনা থেকে এসেছে—নতুন বাইজী—রোশনীবাই। চন্দ্রশেখর তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। রায়বাড়ীতে কতো দিন আসেন না। রায়বাড়ীতে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তিনি জানেন না।

অপর্ণা বিধবার বেশ ধারণ করলো। আশ্রয় নিলো ঠাকুরঘরে। মেয়ের ওপর মা'র কোন জুলুমই খাটলো না। তাঁর সাধ্য হল না মেয়ের বিয়ে দেওয়ার। মেয়ের কাছে হেরে গেলেন।

একটা পুজোর মানত ছিল হেমপ্রভার। কাশী গেলেন তিনি। সঙ্গে গেলো দাস-দাসী, পাচক, দরোয়ান, নায়েব প্রভৃতি। প্রচুর অর্থ নিয়ে গেলেন সঙ্গে। সুমিত্রাকে নিতে চাইলেন। সে গেল না।

স্বর্ণময়ীর কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায়, শ্বশুরের সেবা করতে করতে, নিজেও টের পান না। হঠাৎ একটা অবৈধ সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন—সুমিত্রা এবং চন্দ্রশেখরের মধ্যে। না—বিস্মিত হওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে এ বাড়ীতে এসে। তাই স্বর্ণময়ীর বিস্ময় জাগে না। তবুও একটু আশ্চর্য বোধ করেন—সুমিত্রার স্পর্ধা দেখে। রোজই সন্ধ্যায় সাজসজ্জা করে সুমিত্রা বাইমহলে যায়—হেমপ্রভা জানলে, কী হবে? আতঙ্কিত হন স্বর্ণময়ী।

একদিন হেমপ্রভা ফিরে এলেন। সুমিত্রা, হেমপ্রভার মন যুগিয়ে চলে, সুমিত্রাকে সন্দেহ তিনি কোনদিনও করবেন? না। সে রকম স্বর্ণময়ী মনে করেন না। খুব চালাক সুমিত্রা।

স্বর্ণময়ীর মনের ভাবটা অদ্ভুত। নিজের প্রতি এক ধরণের উদাসীনতা তাঁর। শাশুড়ীর ভয়ে ভয়ে, দীর্ঘদিন কাটিয়ে সব সময় তাঁর মনে হতো—ঐ বুঝি মা বকবেন, তিরস্কার করবেন, অপমান করবেন। মা হয়তো ডাকছেন। ঘুমের ঘোরে—যাই মা' বলে স্বর্ণময়ী বিছানা ছেড়ে উঠে যেতেন। শাশুড়ীকে সাক্ষাৎ 'যমদূতী' মনে হত তাঁর।

রায়বাড়ীতে এতো রকমের দুর্লভ খাদ্য-দ্রব্য অথচ স্বর্ণময়ী গ্রহণে সব সময়েই বীতস্পৃহ। এতো ভোগের উপকরণ, অথচ স্বর্ণময়ীর কখনোও ভোগের ইচ্ছা জাগে নি—যেমন সুমিত্রার জেগেছে। সত্যিই কী জাগে নি? না—ভয়েতে প্রকাশ করেন নি?

চন্দ্রশেখরের হয়েছে সীরোসীজ অব লীভার। কঠিন রোগ। অনিয়মে এবং অসংযমে ভাঙন ধরেছে শরীরে। বাড়ীর সকলেই চিন্তিত। হেমপ্রভা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর কাছে মানত করেছেন। বাড়ীতে পণ্ডিতরা যাগ-যজ্ঞ করছেন দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। নিয়মিত পুরুতঠাকুর চণ্ডীপাঠ করছেন। তুলসী দেওয়া হচ্ছে নারায়ণকে।

স্বর্ণময়ীর ভাববার দরকার নেই। ভাববার জন্যে আছেন—হেমপ্রভা। একদিন, চন্দ্রশেখরকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল, রায় জমিদারদের প্রাসাদে, বাইমহল থেকে। হেমপ্রভা অষ্টপ্রহর ছেলের শিয়রের কাছে, পালঙ্কের ওপরে বসে আছেন। দাস-দাসী, ঠাকুর, নায়েব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই উদ্বিগ্ন। অপর্ণা পর্যন্ত ঠাকুরঘর থেকে নেমে এসেছে। রাজশেখরকে সেবকেরা কেদারায় চড়িয়ে, দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেকে। শুধু স্বর্ণময়ীর অধিকার নেই, স্বামীর সেবা করবার। ঘরের বাইরে থেকে দেখে চলে যেতে হয়। ঔষধ-পত্র, খাওয়ায়—সুমিত্রা। বহু লোকের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ বলে, স্বর্ণময়ী শুধু চোখের দেখা দেখে চলে যেতেন। স্বামীও কোনদিন কাছে ডাকতেন না।

চন্দ্রশেখরের একদিন দিন শেষ হল। শোকের ছায়া নামলো গোটা বাড়ীটাতে। স্বর্ণময়ীর একটা বড় পরিবর্তন হল। বৈধব্যের বেশে সর্বহারার মতই দেখাতে লাগলো তাঁকে। হেমপ্রভা দেবী শোকে কিছুদিন মুহ্যমান হয়ে রইলেন। তার পরেই আবার কর্তৃত্ব আরম্ভ হল। একদিক থেকে তিনি নিশ্চিন্ত। বাইমহলের খরচটা উঠে গেছে।

রাজশেখর বড় একটা আঘাত পেলেন। এমনিতেই পঙ্গু এবং অসহায় অবস্থা তার ওপর আধিক অনটন সংসারের ওপর নেমে এসেছে। তালুকগুলো বন্ধক দিয়ে প্রচুর টাকা কর্জ নিয়েছেন—খুব শীঘ্রই হয়তো রায়বাড়ীটা নীলাম হয়ে যাবে।

হায় জগদীশ্বর। রাজশেখরকে যেন দেখতে না হয় সেটা। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে অবশেষে একদিন তাঁরও পরপারের ডাক এসে গেলো।

হেমপ্রভাও দমে যাওয়ার পাত্রী নন। নিজের গহনাগুলো দিয়ে একরাশ টাকা আনলেন মহাজনের কাছ থেকে। বনেদী ঘরের ঠাট-বাট বজায় রাখতে হবে তো।

সুপুরুষ যুবক—আদিত্য রায়, এস্টেটের নতুন নায়েব। হেমপ্রভার খুব প্রিয়পাত্র। কতক দলিল-পত্র যা-ও বাকী। তবুও তাদের ঠেকিয়ে বেশ কিছু টাকা এনে গৃহিণীকে দিতো আদিত্য। কতকটা সম্পত্তি এখনোও আছে তো।

স্বর্ণময়ী লক্ষ্য করলেন—সুমিত্রা নতুন লোক পেয়ে গেছে। যথানিয়মে সাজগোজ করে সুমিত্রা নায়েববাড়ীতে আদিত্যর ঘরে যায়। গভীর রাত্রে একমাত্র স্বর্ণময়ী ছাড়া কারো জেগে থাকার কথা নয়, সুতরাং—সুমিত্রার গভীর রাতের অভিসারের সাক্ষী—স্বর্ণময়ী। হেমপ্রভা রাত করে শোন না এখন।

হেমপ্রভার জীবদ্দশায় রায়বাড়ীর চারখানি মহল শুদ্ধ প্রাসাদটা নীলাম হয়ে গেলো। অবশিষ্ট বাই-মহলটা রয়ে গেলো। সেখানে উঠে আসতে হল হেমপ্রভাকে। পাঁচটি স্ত্রীলোক এবং একজন দরোয়ান। স্বর্ণময়ী, সুমিত্রা, অপর্ণা, হেমপ্রভা এবং মোক্ষদা। দরোয়ান বাজার হাট করে দেয়। মোক্ষদা যোগাড় দেয়, রান্না করেন স্বর্ণময়ী।

বেশ কাটছিল সুমিত্রার। হঠাৎ

মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে গেলো।---অলঙ্কার বিক্রী করে বেশ কিছু টাকা এসেছে। হেমপ্রভা গেলেন তারকেশ্বরে তাঁর বোনের বাড়ীতে বেড়াতে। সুমিত্রা কিছুতেই যেতে চাইলো না। হেমপ্রভার সঙ্গে গেলো---একজন ঝি, মোক্ষদা, দরোয়ান এবং আদিত্য। মাস-খানেক থাকবেন হেমপ্রভা। বাপ-বাড়ীতে হাঁপিয়ে উঠেছেন। রাজ-শেখরের মৃত্যুর পরে এই প্রথম বেরোচ্ছেন। মনটাকে সুস্থ করে ফিরবেন।

হঠাৎ উপস্থিত হল---সুমিত্রার এক সম্পর্কের ভাই---সিদ্ধেশ্বর। রাণীমার অতিথিশালায় তার জন্যে ঘর খুলে দিলেন স্বর্ণময়ী। সুমিত্রা আপত্তি করলো। বললে---আমার আত্মীয়, ওভাবে রাখলে, অপমান করা হবে---ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং একেবারে ভেতর মহলেই তার স্থান হল। সুমিত্রার রাত্রের যা নিয়ম, তার কিছু ব্যতিক্রম হল না। স্বর্ণময়ী বুঝলেন সে কি রকম সম্পর্কের ভাই। আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল নিশ্চয়ই। এরা যেই চলে গেলো অমনি সুমিত্রার ভাই এসে গেলো। ঘৃণা বোধ করলেন স্বর্ণময়ী, সুমিত্রার প্রতি। মা যদি একবার দেখতেন।

সাতদিন পরে হঠাৎ, আদিত্য ফিরে এলো। স্বর্ণময়ী লক্ষ্য করলেন কী রকম যেন অপ্রতিভ ভাব সুমিত্রার। আদিত্যর তো ফিরে আসার কথা ছিল না। হেমপ্রভা দেবীর সঙ্গেই ফেরার কথা। হেমপ্রভা দেবী নাকি নিজেই পাঠিয়েছেন। টাকাগুলো খরচ হয়ে গেছে। কিছু টাকা প্রজাদের কাছ থেকে অগ্রিম আদায় করে পাঠাতে বলেছেন হেমপ্রভা। টাকা-কড়ি যোগাড় করবার জন্যই সে ফিরে এসেছে।

দু-চার দিন কেটে গেলো। টাকা যোগাড়ের চেষ্টায় খুব ঘোরাঘুরি করছে আদিত্য। অভয়পুরে যাচ্ছি বৌ-রাণী ওখানের জমিটায় কয়র প্রজা টাকা দেবে বলেছে। আদিত্য বললো স্বর্ণময়ীকে। স্বর্ণময়ীর তখনো মনে হয় নি যে, সেদিনই রাত্রে কী একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে। কে ভাবতে পেরেছিল ?

নিশুতি রাত। মাঝে মাঝে কয়েকটা নিশাচর পাখী যেন কেঁদে উঠছে।---স্বর্ণময়ী খাওয়া-দাওয়া সেরে পালঙ্কের ওপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে বসে পান চিবোচ্ছেন। মোক্ষদা মাটিতে ঘুমোচ্ছে। একটা কুকুর ডেকে উঠলো কেউ কেঁউ করে। স্বর্ণময়ীর ঘুম আসতে দেরী আছে। নীল আলোটা জ্বলছে ঘরে। জানালা দিয়ে একটা গাছের ছায়া এসে দেয়ালে এবড়ো-খেবড়ো ভাবে পড়েছে। বাগানের খেজুর গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় মাঝে মাঝে হা-হা করে শব্দ করছে। সব মিলিয়ে যেন কীরকম একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মনটা যেন কি রকম করে উঠলো স্বর্ণময়ীর।

অপর্ণা তো ঠাকুরঘরেই শোয় তিনতলায়। ওর কাছে অবশ্য পুরনো ঝি মোহিনী আছে। সুমিত্রা কী করছে ? নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে---সিদ্ধেশ্বরের বুকে। আদিত্য তো চলে গেছে। কম সাহস নয় সুমিত্রার। চন্দ্রশেখর থাকলে এ সাহস ওর হতো না।

হঠাৎ---দুম্ দুম্ দুম্। সমস্ত বাড়ীটাকে কাঁপিয়ে শব্দগুলো হল। মোক্ষদা-মোক্ষদা। ভীত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন---স্বর্ণময়ী। মোক্ষদাও তখন উঠে বসেছে। বাইরেও চেঁচামেচি করছে দরোয়ানরা। দরজা খুলেই বেরোতে গেলেন স্বর্ণময়ী। মোক্ষদা বাধা দিলো। খুলবেন না---বৌ-রাণী। ডাকাত পড়েছে বোধহয়। মিনিট কয়েক কেটে গেলো এভাবে। বাগানেও হৈ-হৈ হচ্ছে।

ওপরে দরোয়ানরা এসে পড়েছে। তেওয়ারীর গলা শোনা গেলো। বৌ-রাণী শীগ্গির আসুন। বিপদ হয়েছে। বৌরাণী-বৌরাণী।
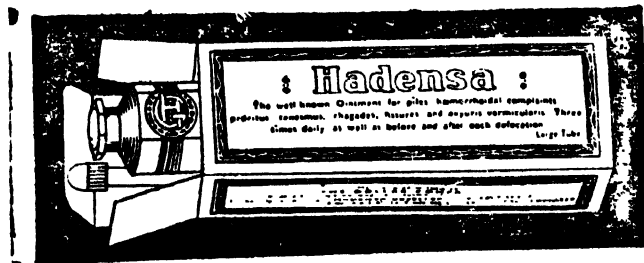
স্বর্ণময়ী শোনামাত্রই হিম হয়ে গেলেন—মোক্ষদাই চট করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো। বড় দালানটা পেরিয়েই সুমিত্রার ঘর। ঘরের কোলে ছাদ। ঘরের দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে, খোলা। ও কি ঘরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে কেন? ঘরের সামনে সকলে জড়ো হয়েছে কেন? স্বর্ণময়ী দালান পেরিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখ থুবড়ে মাটিতে কে পড়ে? সিদ্ধেশ্বর। খাটের ওপরটাও রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সুমিত্রার অর্ধনগ্ন দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা খাটের শেষ সীমায় এসে ঝুলছে। স্বর্ণময়ী একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। কে যেন পুলিসে খবর দিয়েছে। ডাক্তারও এসে গেছে।

আততায়ী যে ঘরের ভেতরেই ছিল, পুলিশ নিঃসন্দেহ, সে বিষয়ে। খুন করেই দরজা খুলে পালিয়েছে। আততায়ী কে? পুলিশের তাই নিয়ে মাথাব্যথা।

নতুন কতকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হল স্বর্ণময়ীকে। পুলিশের রকমারী প্রশ্ন এবং উৎপাতের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। খবর দেওয়া হল হেমপ্রভাকে।

●

হেমপ্রভা, এ ধরণের ঘটনা যে ঘটবে আশা করেন নি। সুমিত্রাকে যে এরকম মেয়ে—বিশ্বাসই হয় না। অথচ ঘটনাটা ঘটেছে যখন বিশ্বাস তো করতেই হবে।

স্বর্ণময়ী ভাবছেন—এ ধরণের মেয়েদের শেষ পরিণতি এই রকম হয়েই থাকে। বাইমহলের গুম ঘরে কতো এ-ধরণের মেয়েদের মৃতদেহ পুঁতে রাখা হয়েছে। এতে, আশ্চর্য হওয়ার তো কিছুই নেই। তাঁর মনে হল—হেমপ্রভা কিছুটা তো বিস্মিত নিশ্চয়ই হয়েছেন—তবে খানিকটা ভাণ করছেন। এতো কাল ধরে সুমিত্রা এ-বাড়ীতে এসেছে, কিছুই কি হেমপ্রভার চোখে পড়ে নি? নেহাৎ পিতৃকুলের সম্মান বাঁচাতেই, কিছুতেই সুমিত্রাকে ঘাঁটাতে চায় নি। সুমিত্রা তো আর স্বর্ণময়ী নয়। দাসীর মতো ব্যবহার তো সুমিত্রা পায় নি। সে পেয়েছিল প্রকৃত আদর হেমপ্রভার কাছে। একমাত্র সুমিত্রার কথা তিনি শুনতেন।

বাই-মহলে এসে হেমপ্রভা যেন একটু দমে গিয়েছিলেন। অনমনীয় মনের ভাবটা কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছিল। হয় তো অনুতাপ এসেছিল মনে। খরচ-পত্র করতে পারলেন না, আগের মত, সে জন্য মনে বড় কষ্ট পেতেন। শেষের ক'টা বছর বড় কষ্টে কেটেছে তাঁর। দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে পারছিলেন না।

আততায়ী কিন্তু ধরা পড়লো না। পুলিশ অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছিল। অকৃতকার্য হয়েছিল। হেমপ্রভাও পুলিশকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—আততায়ীকে ধরবার জন্য।

প্রায় তেরো বছর পরে, আততায়ী আদিত্য মণ্ডল ধরা পড়লো বেনারসের এক কুখ্যাত গলিতে। ইতিমধ্যে হেমপ্রভা স্বর্গবাসিনী হয়েছিলেন। অপর্ণাও দেহরক্ষা করেছিল।

বাই-মহল থেকে স্বর্ণময়ীকে সনাক্ত করতে যেতে হয়েছিল কোর্টে। আসামীকে দেখে, ঠিকই চিনেছিলেন তিনি। প্রধান সাক্ষী হিসাবে এসেছেন তিনি।

আপনার নাম কি? বিপক্ষের উকিল প্রশ্ন করেছিলেন।

স্বর্ণময়ী রায়চৌধুরাণী।

আসামীকে কি আপনি চেনেন? একটু চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিলেন স্বর্ণময়ী—না। একে আমি কোনদিনও চিনি না।

এ কি আদিত্য মণ্ডল নয়? দেখুন ভালো করে। ভুল হচ্ছে আপনার। উকিল জেরা করেছিলেন।

না। এ সে লোক নয়। তাঁকে আমি খুব ভালো করে চিনি। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন স্বর্ণময়ী।

মোক্ষদা সাক্ষী দিতে এসে অবাক হয়ে গেলো। প্রমাদ গণলো সে। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে স্বর্ণময়ীর অনুরূপ সাক্ষী দিলো সে। সত্যি কথা বললে স্বর্ণময়ীকে মিথ্যাবাদী ভাবতো সকলে।

ছাড়া পেলো আসামী। স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন স্বর্ণময়ী। মেয়েরাই তো পুরুষদের নীচে টেনে নামায়। এ ধরণের মেয়েদের শাস্তি হওয়াই উচিত।

স্বর্ণময়ীর নিজের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্যটুকু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন তিনি। এরা শুধু আদিত্যরই দোষ দেখছে। সুমিত্রার কি কোন দোষ নেই? সুমিত্রার শাস্তি হওয়ার দরকার ছিল। তা না হলে কতো লোকের ঘর আরো ভাঙতো—কে জানে।

স্বপ্নে

মোহনানন্দ গুপ্ত

রাতের স্বপ্নে হয়ে কুতূহলী,
ঘুমের মাঝারে আমি ছুটে চলি
ধূসর-ধূমল গগন-প্রান্তে—
কুয়াশার মত [illegible]।

নিঝুম রাত্রি, তারায় তারায়
[illegible] যেন ডাকে ইসারায়,
স্বপ্নে [illegible] আমি ফিরি ওরে
অসীম খুঁজিয়া সীমার রেখা।

মনপাখি মোর উড়ে বেগভরে,
পক্ষীরাজের পৃষ্ঠের পরে
চড়ে যেন আমি করি কশাঘাত
বজ্রে বাঁধিয়া বল্গামুঠি।

মেঘে মেঘে ভরা আকাশের প্রায়
কল্পনা মোর নয়ন জড়ায়,
আলেয়ার পিছে, ছুটে চলি মিছে,
পাইনাকো [illegible]।

তৈল-সম্রাট ইবন সৌদ

তেল বা গ্যাসোলিন্ বা[illegible] দামে বিকোবে, আর পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলবে কি না, তা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী তৈল-সম্রাটের মর্জি-নির্ভর। ইনি ইবন সৌদ---তাঁর জীবনযাত্রা ঐতিহাসিক চেংগীস্ খান্, আটিলা দ্য হুন এবং আলেক্জান্দার-এর ধাঁচে গড়ে উঠেছে। এঁর পুরো নাম: আবদ অল্-আজিজ্ ইবন আবদ অল্-রাহাম অল্ অল্-ফইজল্ অল্ অল্-সৌদ---ইবন সৌদ। পার্থিব তৈল-সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ তাঁর অধিকারে; ঐশ্বর্য অপরিমেয়—বস্তুত ইনি পৃথিবীর অন্যতম ধনকুবের। ১৯৫২-র তাঁর রোজগারের হিসেব ১৮৫,০০০,০০০ ডলার---প্রতিদিন পাঁচ লক্ষ ডলার। স্বয়ং কুবেরও বোধ করি এঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত।

অক্ষরপরিচয়হীন, সময় সম্বন্ধে অজ্ঞ ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত অনুর্বর তৃণভূমি সৌদি আরবের রাজা ইবন সৌদ। এঁর রাজ্য কেবল মধ্য প্রাচ্যে বৃহত্তমই নয়, পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহরও এখানে।

রাজা মশাইর চেহারা জবরদস্ত। জয় করেছেন তরবারি আর আগুন দিয়ে; অথচ কেবল নিজের গোঁয়ার প্রজাপুঞ্জকেই বশীভূত রাখা নয়, বিক্ষুব্ধ মধ্য প্রাচ্যের প্রধান শক্তি পাশ্চাত্য দেশীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কূটনীতিকদেরও তিনি বাগে রাখতে পেরেছেন।

নারী, অশ্ব, উষ্ট্র, দুধ, খেজুর, আক্রমণ আর যুদ্ধ---আরব ঐতিহ্যের এই আ[illegible]তিতে। হঠাৎ-ক্ষেপে-ওঠা মেজাজের জন্য তাঁর খ্যাতি আছে, অবশ্য দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে সে মেজাজ খপ্ ক'রে নিভে যায়। ইনি স্বৈরতন্ত্রী, আকর্ষণীয় এবং কখনও কখনও আধুনিক পৃথিবী সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে অজ্ঞ।

বসুবন্ধু

সেন্ট জন ফিল্বী তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। এই ছিটেল ইংরেজ পণ্ডিত এবং যোদ্ধা মরুভূমির প্রেমে এমনই মজেছিলেন যে পৈতৃক খৃস্টধর্ম ত্যাগ ক'রে মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করেন।

অনেক দিক দিয়ে ইবন সৌদ প্রাচীন ভ্রাম্যমাণ আরব-জীবন এবং

আধুনিক শিল্প সভ্যতার সেতুস্বরূপ। আজকের যুগে যতখানি সম্ভব ইনি ততখানিই কোরান মেনে চলেন। প্রায় অক্ষরে অক্ষরে। ধূমপান করেন না। মদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তাঁর সামনে সঙ্গীতাদি নিষিদ্ধ। নিজের ছেলেদের শিক্ষার জন্য মিশরে যেতে দেন নি। কারণ ওখানকার নৈতিক শৈথিল্য সম্পর্কিত অনেক কথা তাঁর কানে এসেছিল।

তবুও তাঁর ধনবৃদ্ধি অকল্পনীয়। চূড়ান্ত বিলাসিতার মধ্যে তিনি দিন কাটান। সুষম ব্যবসায়িক সূত্রে আমেরিকান্দের সঙ্গে আবদ্ধ ইবন সৌদ নিত্য নতুন তৈলকূপ আবিষ্কারের আর্থিক সুবিধা দু' হাত ভরে নিয়েও শেষ করতে পারছেন না। তাঁর পরিবারের বসবাসের জন্য মরুভূমির মাঝখানে নির্মিত হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বহু রাজপ্রাসাদ; স্বর্ণখচিত চাকা মোটর গাড়ি, সোনার পাত মোড়া টেলিফোন ইত্যাদি না হলে তাঁর চলে না।

অথচ রাজামশাই রীতিমত প্রাচীনপন্থী, ঐতিহ্যানুসারী। স্বৈরতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তুচ্ছতম উট-চালকও তাঁর দেখা পেতে সক্ষম। সবরকম বিচার তিনি নিজে করেন।

শৈশবেই আরবীয় প্রতিহিংসা এবং ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে। এঁদের প্রধান শত্রু সালিম গোটা সৌদ পরিবার ধ্বংস করতে গিয়ে এঁর বাবার কৌশলে স্বজনসহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন। ছিন্ন

পরিচয়। ইনি সমগ্র আরবিয়া একসূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছেন, মুসলমানদের ধর্মগুরু মহম্মদের পর আর কেউ একাজ করতে সক্ষম হন নি।

তাঁর যৌবনে ওদেশ ছিল ডাকাত আর চোরের অত্যাচারে পর্যুদস্ত। গোষ্ঠীগত মারামারি, কাটাকাটি লেগে-ছিল। তিনি বললেন, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, গোষ্ঠীগত আনুগত্য নয়। এই মত প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'বিদ্‌রেন্‌' গড়ে তুললেন। সেই সময়েই তিনি জমি ভাগ এবং অন্যান্য কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্যকর করায় যাযাবর হওয়ার প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

'বিদ্‌রেন্‌'-দের উটের পিঠে চড়িয়ে তিনি দেশে আইন এবং শৃঙখলা স্থাপন করতে পাঠিয়ে দিলেন। কঠোর হস্তে তারা আইনী-শাসন প্রতিষ্ঠা করল: খুনের শাস্তি মস্তক ছেদন, নীতিহীনতার দণ্ড বেত্রাঘাত।

অনেক দিক দিয়ে তাঁর ধর্মগুরু মহম্মদের সঙ্গে ইবন সৌদের মিল রয়েছে। মহম্মদের আত্যন্তিক আসক্তি ছিল নারীর প্রতি, অন্য দু'টি সুগন্ধী আর খাদ্যের তুলনায় তা ঢের বেশি। এ ব্যাপারে ইবন সৌদ নিষ্ঠাবান মহম্মদপন্থী। সানন্দে তিনি বহু নারী-সংসর্গের কথা স্বীকার করেন। সবাই তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। শ' দুয়েক স্ত্রী তাঁর, যদিও গোঁড়া মুসলমানের মত একই সময়ে চারজনের বেশি কখনও নয়। বড় সরল ইসলামীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রণালী। সাক্ষীর সামনে স্ত্রীকে তিনবার 'তালাক' দিলেই কার্যটি বিধিসম্মতরূপে সম্পন্ন। সুতরাং একবারে চারজনের বেশি স্ত্রী না রাখলেও, লেলিহান অগ্নিশিখার স্বভাবে তিনি মরুভূমিতে লভ্য অসংখ্য মরুকুমারীকে নিজের ভোগে লাগিয়েছেন।

তাঁর সাহস আর ক্ষমতা প্রবাদে পরিণত। একবার উরুতে গুলীবিদ্ধ হয়েও তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনৈক যোগ্য কুমারীকে বিবাহ ক'রে সেই রাত্রেই তাঁবুতে ভোজ লাগিয়ে মনমরা স্বপক্ষীয়দের মনে সাহস ফিরিয়ে এনেছিলেন।

ইবন সৌদের পুত্রসংখ্যা ছিল চল্লিশ (এখন বেড়েছে, ঠিক কত বলা যাচ্ছে না) এবং কন্যারত্ন আরও বেশি। এঁদেরই একজন ফইজল রাষ্ট্রসংঘে সুপরিচিত, উনি সেখানে স্বদেশের প্রতিনিধি।

তিনি যে পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন তাঁর নাম সৌদ ইবন আবদুল আজিজ, চেহারায় ইনি বাপ-কা-বেটা, তবে ইবন সৌদ ক্ষমতার তক্তে দৃঢ়ভাবে বসার পর এঁর জন্ম হওয়ায় চরিত্রটি ঠিক বাপের মত অগ্নিসম ঝলসি উঠে না। ফলত ভাবী হানাহানির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। ওদেশে ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্য, চড়া মেজাজ, ষড়যন্ত্রে নিপুণতা ইত্যাদি ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য সহচর কি না!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে ছানি পড়েছে, উদরী হয়েছে; রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট উপহৃত একটি চাকাঅলা চেয়ার-এ চড়ে তিনি সব দেখাশুনো করেন।

তবে পুরনো ইবন সৌদ ফুরিয়ে যান নি। মিতব্যয়িতার জন্য তিনি কুখ্যাত। প্রাসাদের বিপুল বিলাসিতার মধ্যেও তিনি লৌহশয্যায় শোওয়া পছন্দ করেন। রাত্রে ঘুমোন বড় জোর ঘণ্টা চারেক।

সকালে তাঁর খাদ্য মিষ্টি পিঠা, কাটানো দুধের সঙ্গে। রাত্রে একপাত্র মাংস-ভাত, সঙ্গে থাকে রুটি আর খেজুর। সারাদিন চলে কফি আর চা।

তবে বিদেশীদের প্রতি তাঁর আপ্যায়ন রাজকীয়। খাদ্য-পানীয় কেবল অসংখ্যরকমের নয়, পরিমাণেও সুপ্রচুর। সব শেষে বহুমূল্য উপহার।

তৈল-সম্পদের নতুন নতুন ঠিকানা ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছে। এই আবিষ্কারের ফলে ইবন সৌদের রাজত্বের অন্তর্নিহিত শক্তির দিগন্ত ক্রমপ্রসারমাণ। আগে ছিল সম্পদের অভাবে লভ্য জনশক্তি কাজে লাগানোর সমস্যা, এখন সম্পদ অঢেল, কিন্তু তা মুড়িয়ে খাওয়ার লোক কই!

এই সম্ভবত প্রথম একজন স্বৈরতন্ত্রী রাজা তেল-বিক্রির রয়্যালটি বাবদ এত অর্থ পেয়েছেন যে তা দিয়ে কী করতে হবে তা তিনি জানেন না।

তাঁর বাৎসরিক রোজগারের এক ভগ্নাংশ দিয়ে গোটা আরব উপদ্বীপে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। আমেরিকা-য় আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতির সাহায্যে সমুদ্রজলকে মিঠা পানীয় জলে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ফলত অনুর্বর অঞ্চলে প্রচুর ফসল ফলানো যেতে পারে। কিন্তু আরবিয়ায় তা কি কখনও হবে?

ইবন সৌদ ব্যক্তিটির অন্তরঙ্গ পরিচয় কেউ জানে না। মুষ্টিমেয় দু'-চারজন জানলেও তা প্রকাশ করার প্রয়োজন তাঁদের কেউ অনুভব করেন নি। সব কীর্তি, অপকীর্তি, বিশেষণের অন্তরালে রাজা ইবন সৌদের মানবিক সত্তাটি চাপা পড়ে গেছে।

মধুর ঋতু

॥ ফরাসী কবিতা ॥

জাক প্রেভ্যর

উপবাসী রিক্ত শীতার্ত
একলা, একটি কানাকড়িও নেই
ষোল বছরের একটি মেয়ে
ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে
ক'ঙ্কর্দ সরণিতে
পনেরোই আগস্ট দুপুর বেলায়।

অনুবাদক—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়েন্দা কাহিনী—উদ্ভব ও বিবর্তন

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রেণী-বিচার

একটি মর্মান্তিক সত্য এই যে, পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলিতে 'গোয়েন্দাকাহিনী' নামে সাহিত্যের কোন স্বতন্ত্র বিভাগ নেই, অথচ, মুখ্যত জনরুচির ফলে, এই সব গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকায় এই ধরনের গ্রন্থ ক্রমশ এক বিশাল স্থান জুড়ে বসেছে। সুতরাং গোয়েন্দাকাহিনীকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক ধারা হিসাবে স্বীকার না করার সততার পরিচয় আছে—একথা মেনে নেওয়া শক্ত। সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য-পাঠকের কাছে এই ধারাটি পরিচিত এবং এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন নি, বা অন্যান্য শাখার সাহিত্য থেকে একে পৃথক করে নিতে পারেন নি—এমন পাঠক যে-কোনও দেশেই খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তাহলে গোয়েন্দা কাহিনী কি ধরণের রচনা? এ সম্বন্ধে অধিকাংশ গ্রন্থাগার একটি সাধারণ সূত্র অবলম্বন করেছেন। তাঁরা একে বিশেষিত করেছেন 'অপরাধমুখ্য সাহিত্য' নামে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কি দর্শনের ভাষায় অতিব্যাপ্ত নয়? অপরাধের প্রকৃতির সীমা-সংখ্যা নির্ণয় করা যে কি দুরূহ ব্যাপার—শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল মহাশয়ের 'অপরাধ-বিজ্ঞান' নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই সে কথা বোঝা যাবে। এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য Encyclopedia of Criminology-র(১) Criminal Law and Procedure পর্বটিও দেখা যেতে পারে, এমন বহু অপরাধ আছে, যা সমাজ বা রাষ্ট্রের চোখে অপরাধ বলে স্বীকৃত নয়, অথচ দেশভেদে তার গুরুত্বও ওঠানামা করে অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া, একদিন যাকে রাজ-দ্রোহী বলে দণ্ড পেতে হয়েছে, পরে তাকে শহীদের সম্মানে অমর করে রাখার চেষ্টা হয়েছে—এ ঘটনাও কোন দেশেই বোধহয় নতুন নয়। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধ-প্রবণ। সভ্যতা এবং নিজের কৃষ্টি তাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের মনের এই অপরাধ-প্রবণতা অনেকখানি জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ একেবারে সুস্থ সমর্থ মানুষের নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবন নিয়ে সাহিত্যের—অধিকার সীমিত নয়—সেই জীবনে যে-কোন ধরণের বিক্ষেপই সাহিত্যিকের মনে সৃষ্টির স্পৃহা জাগায়। তাহলে পৃথিবীর বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকেই তো স্বীকার করে নিতে হয়—অন্তত সূক্ষ্মতম অর্থে, অপরাধমুখ্য সাহিত্য হিসাবে; গোয়েন্দা কাহিনীর বিভাগ যাঁরা নির্বাচন করেছেন তাঁরা কি এতে তৃপ্ত হবেন।

শুধু তাই নয়—অপরাধমুখ্যতার সংজ্ঞা গোয়েন্দা কাহিনীর ক্ষেত্রে অব্যাপ্ত হলেও কয়েক ক্ষেত্রে প্রমাণ করা যায়, বিন্দুমাত্র অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও যে সার্থক গোয়েন্দা কাহিনীর আস্বাদ পাওয়া যায়, সে প্রমাণ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ Arthur Conan Doyle-এর Yellow face গল্পটির কথা স্মরণ করা যাক। একটি অপরাধী কল্পনার ভ্রান্ত Hypothesis-এ ঘুরপাক খেয়ে অবশেষে Sherlock Holmes তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু এ তো সূক্ষ্ম আলোচনা, যাক। অপরাধ মুখ্য সাহিত্য হিসাবে যে ধরণের সাহিত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনী একাত্ম কি না—অর্থাৎ সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করলে গোয়েন্দা কাহিনীর নামোল্লেখ বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায় কি না, সেইটেই প্রথমে বিচার্য।

প্রধানত দু' ধরণের সাহিত্য এই অপরাধমুখ্যতার আওতায় পড়ে—Supernatural এবং Horror ব Shoker গল্প।

Supernatural গল্পের সঙ্গে অপরাধের কিছুটা সম্বন্ধ অবশ্যই আছে; ভৌতিক জগতের প্রতি আস্থা বা অনাস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও বলা যায়, এই ধরণের কাহিনীর পেছনে অনেকক্ষেত্রেই অসুস্থ মনোবিকার বা পাপবোধ এবং অপরাধ চাপা দেবার প্রবণতা কাজ করে।

এই ধরণের গল্পের ঐতিহ্যও বেশ পুরনো ধরণের। উপনিষদের 'সোইবিভেৎ তস্মাদ্ একাকী বিভেতি'র মিতভাষিণী এই উক্তিতে যে সেই

১। Vernon C. Branham এবং Samuel B. Kutash সম্পাদিত এই গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অনির্দেশ্য ভীতির মূল আছে—সমালোচক তা ব্যাখ্যা করেছেন। (২) তিনি আরও দেখিয়েছেন, বৃহদারণ্য উপনিষদে বিদেহরাজ জনকের সভায় এই ধরণের একটি ভূতের গল্প পাওয়া যায়, অর্বাচীন সংস্কৃতেও এ-জাতীয় কাহিনী আছে।

বাংলায় প্রথম সুস্পষ্ট ভূতের গল্প যে ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' কাব্যে পাওয়া যায়—একথা সমালোচক (৩) বেশ জোর দিয়ে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসমাপ্ত ভূতের গল্প লিখেছিলেন। তারপর নগেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বা রাজশেখর বসুর ভূত-রসিকতা তো আছেই।

কিন্তু এই Supernatural-এর সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পর্ক কতটুকু। একথা অবশ্য ঠিক যে পুরোপুরি ভৌতিক পরিবেশ আশ্রয় করে গড়ে ওঠা গোয়েন্দা কাহিনী খুব বিরল দৃষ্টান্ত নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শৈলরহস্য' এই জাতীয় একটি গল্প।(৪)

তা হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে, সঠিক গোয়েন্দা কাহিনীর রস খাঁটি ভৌতিক গল্পে বিঘ্নিত হয়। কারণ, অপরাধীকে সনাক্ত করবার যে বুদ্ধির দৌড় গোয়েন্দা কাহিনীর উপজীব্য অনির্দেশ্য রহস্যের ইঙ্গিতে সেই বুদ্ধিবৃত্তি বাধা পায়। সেই জন্যই Sherlock Holmes-এর গল্পসমগ্রের মধ্যে এক জায়গায় দেখি Sherlock Holmes বলছে—'The world is big enough for us. No ghosts need apply.'

এমনকি একটি প্রায়-ভৌতিক গল্পের নায়ক (Carrados) ভৌতিক পরিবেশকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাদ দিতে চেয়েছেন। (৫)

'Do you believe in ghosts, Man'—queried Mr. Carlyle.

'Only as ghosts,' replied Carrados with decision.

সুতরাং, যে কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায় সেটি এই — ভৌতিক বা Supernatural কাহিনী গোয়েন্দা কাহিনী থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র।

এবার দেখা যাক Horror গল্পের প্রকৃতি। এই ধরণের রোমাঞ্চকর গল্পের আকর্ষণ বহুদিনের। বিশেষ করে শিশু-মনকে চঞ্চল করে তুলতে বিখ্যাত দস্যুদের বিচিত্র কার্যকলাপের গল্প অতুলনীয়। জনপ্রিয়তায় এরা কেউ কম যায় না— দস্যু মোহন থেকে 'Robinhood', এমন কি রঘু ডাকাত বা Gil Blas কিম্বা Dick Turpin সবাই-রোমাঞ্চ জগতে এক-একটা স্থায়ী আসন নিয়ে রেখেছে।

একথাও অবশ্য সত্য যে, এই ধরণের গল্পে যে সব মারাত্মক অপরাধীর সন্ধান আমরা পাই—গোয়েন্দা কাহিনীতেও সেই জাতীয় অপরাধীই গোয়েন্দাকে উত্যক্ত করে। কিন্তু তবুও এদের তফাৎ অনেক, সেই পার্থক্যটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক W. S. Maugham (৬)।

গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক গোয়েন্দা নিজে। বিচিত্র বিশ্লেষণী শক্তিতে এবং বুদ্ধিচাতুর্যে সে শেষ পর্যন্ত অপরাধীকে ধরে ফেলে। কিন্তু রোমাঞ্চ কাহিনীতে নায়ক অপরাধী নিজে। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে আমাদের হৃদয়বৃত্তি এখানে অনেক বেশী সক্রিয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীর motive ভাল থাকে, যদিও যে উপায় সে অবলম্বন করে, সেটি আইনত দণ্ডনীয়। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখি এইসব কাহিনীর নায়ক ধনীর ধন ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়—নিজের জন্য কোন কাজ করে না। ফলে, এইসব কাহিনীতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে অপরাধীরই পক্ষ সমর্থন করতে থাকি। শৈশব-কল্পনায় হৃদয়ানুভূতির প্রাবল্যে দস্যু মোহন বা Robinhoodকে মহান দেশ-প্রেমিকের আসনে বসাতে আমরা এতটুকু কুণ্ঠিত হই না। এই ধরণের romantic admiration যে এখনও আমাদের মধ্যে পুরোমাত্রায় সক্রিয় — সাম্প্রতিক কালের তথ্যমূলক 'অভিশপ্ত চম্বল' গ্রন্থখানি তার সাক্ষ্য দেবে। এই যুক্তিহীন ভাবাবেগ গোয়েন্দা কাহিনীতে নেই। গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক গোয়েন্দা নিজে, নীতি এবং নিয়ম তার অস্ত্র, বুদ্ধি তার উপজীব্য—চমকপ্রদ লোমহর্ষক ঘটনা সেখানে নাও ঘটতে পারে।

সুতরাং, কেবলমাত্র অপরাধমূলক সাহিত্য বললে গোয়েন্দা কাহিনীর পরিচয় দেওয়া হয় না। গোয়েন্দা কাহিনীর স্বাদ সম্পূর্ণ পৃথক। অপরাধীকে সনাক্ত করবার জন্য গোয়েন্দাকে প্রায় সর্বতত্ত্ব-বিশারদ হতে হয়। অপরাধী সনাক্ত করবার একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে—যার নাম দিয়েছিলেন Hans Gross নামে সেই বিখ্যাত ভদ্রলোক Criminastics, এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে Nicholas Atlas (৭) বলেছেন—

২। শ্রীসুকুমার সেন—আমাদের ভূতের গল্প (বিশ্বভারতী পত্রিকা; ১৯৪৭)।

৩। শিশিরকুমার দাস: বাংলা ছোটগল্প।

৪। প্রসঙ্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই অদ্ভুত সুন্দর গল্পটি মনে পড়ে যেখানে চোরের দলের একজন ভূত সেজে রাত্রে 'কংকাল' গল্পের নায়িকার মত ভৌতিক গল্প বলে অধ্যাপককে ব্যস্ত রেখেছে এবং ইত্যবসরে দলের অন্যান্যরা কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে। অবশ্য এই ভৌতিক রসিকতা—বলা চলে ভূত-ভূত খেলা।

৫। Bramah রচিত The Ghost of Masingham Mansions গল্প।

৬। The Vagrant Mood-এর অন্তর্গত প্রবন্ধ The decline and fall of the detective story.

৭। পূর্বোল্লিখিত Encyclopedia of Criminology.

শান্তিনিকেতনের বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ ও চীনা ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তান্ উন্ সান্ বৃক্ষ রোপণ করছেন

চিত্রে

বা

মাসিক

বসুমতী

।। আশ্বিন, ১৩৭৬ ।।

ভারতের নবনির্বাচিত চতুর্থ রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহ গিরি ভেংকট গিরিকে শপথ পড়াচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রী জি সি শা
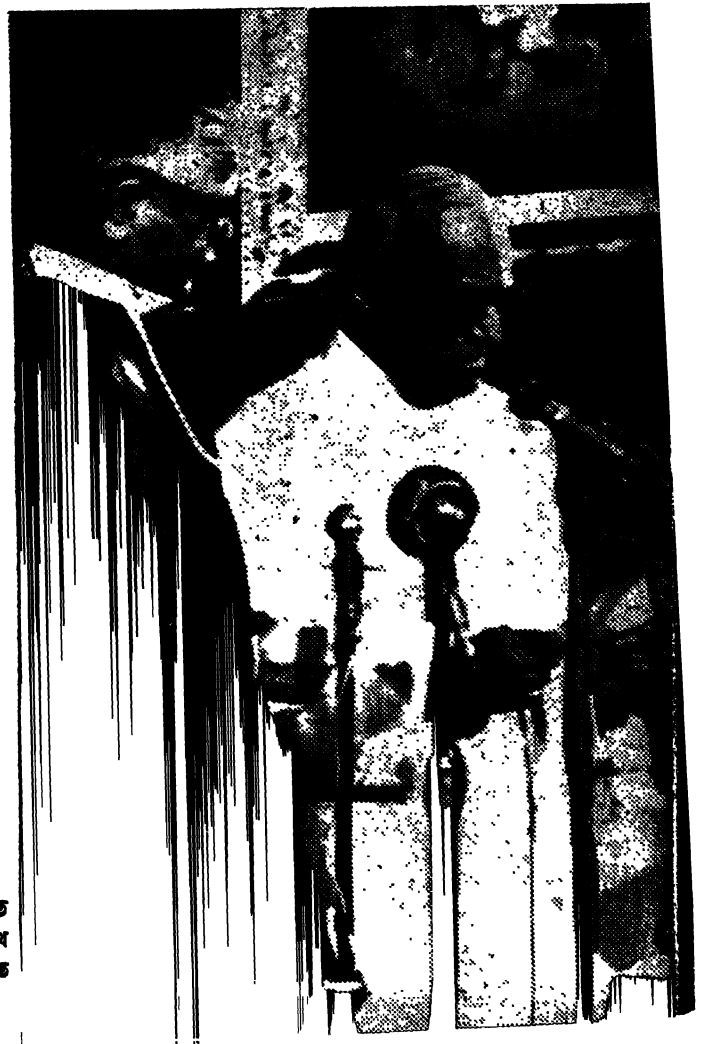
অটোপেনি বিমানবন্দরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মিঃ নিকসনকে চুম্বন করে বিদায় জানাচ্ছেন রুমানিয়ার সুন্দরীরা

ব্রেজিলে গেরিলা দমন কর্মসূচী হিসাবে ছত্রীবাহিনীর অফিসাররা নির্যাতন সহ্য করার ট্রেনিং নিচ্ছেন
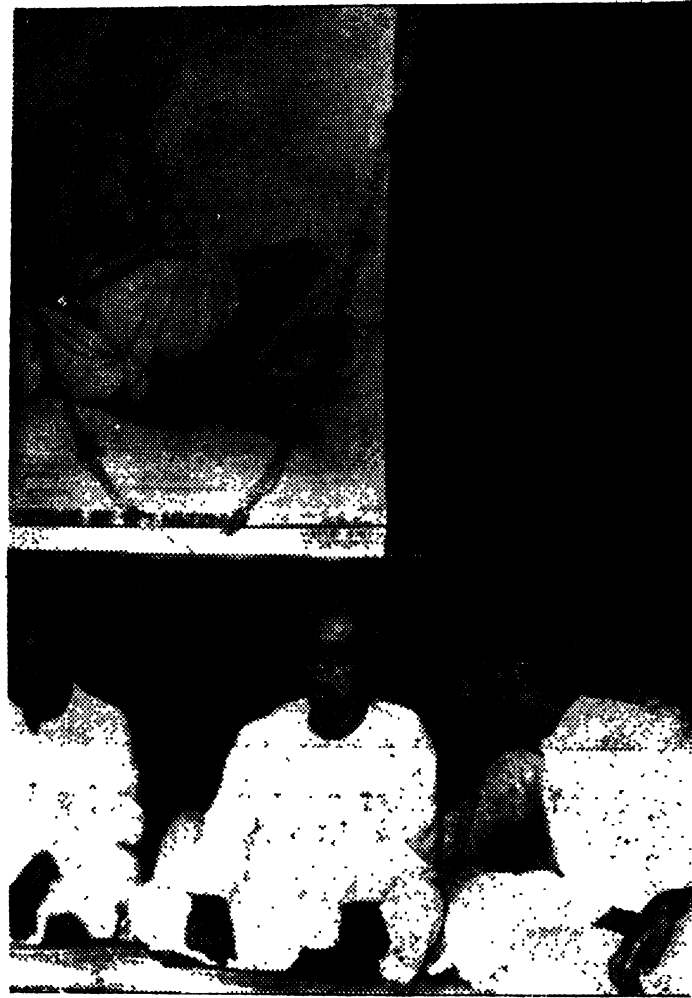
গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গের
প্রাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ' উৎসবে উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য সভাপতির ভাষণ দেন।
পার্শ্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য

প্রাগে রুশ-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের পথরোধ করার জন্য সামরিক ট্রাকগুলি রাজপথ অবরোধ করে রয়েছে

উলুবেড়িয়া কলেজে শিক্ষামূলক এক আলোচনাচক্রে সভাপতির ভাষণরত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ রমা চৌধুরী, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ও নির্মল ঘোষ

পারমানবিক ভস্মপাতের বিপদ

বৃষ্টি পড়লেই সঙ্গে নেমে আসে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভস্ম। পরিমাণে পার্থক্য থাকলেও একথা ঠিক যে, রেডিও অ্যাক্টিভ্ পার্টিক্‌ল' থাকবেই। এটা দু'রকমের—'স্থানীয়' বা বহুবিস্তৃত।

পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত বৃহত্তর কণাগুলো স্থানীয় ভস্মপাত ঘটায়। বিস্ফোরণের কয়েক শ' মাইল বৃত্তমধ্যে রেডিও অ্যাক্টিভ্ আবর্জনা পৃথিবীতে পড়ে।

বিস্ফোরণের ফলে বহু উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রতর কণা বহুবিস্তৃত ভস্মপাত ঘটায়। এই আবর্জনার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার-এ কয়েক বছর থাকার প্রবণতাযুক্ত, এবং এই সময় এর রেডিও অ্যাক্টিভিটি কিছু পরিমাণে কমে যায়।

এইসব বোমা-বিস্ফোরণ থেকে যেসব রেডিও অ্যাক্টিভ্ কণা নেমে আসে, তা থেকে মানুষ বিকিরণ গ্রহণ করে। গৃহীত খাদ্য এবং পানীয় থেকে সে রেডিও অ্যাক্টিভিটি সঞ্চয় করতে থাকে। মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর গ্রহণীয় খাদ্যে কণাগুলো থিতোয়। জান্তব কিছু খেলে জান্তব রেডিও অ্যাক্টিভিটি মানবদেহে প্রবেশ করে। দুধ সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

স্থানীয় পারমাণবিক ভস্মপাতের ফলে বিকিরণজনিত অসুস্থতা, চামড়ায় পোড়া ঘা, এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটা সম্ভব। এইসব তীব্র ফল বিকিরণের মাত্রা-নির্ভর। স্থানীয় ভস্মপাতের মাত্রার ওপর কর্কটরোগ, অল্পে কাহিল হওয়া, অকালবার্ধক্য এবং মৃত্যু ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী ফলও নির্ভরশীল।

বিজ্ঞানীরা আজও অবিরাম গবেষণা করছেন 'নিরাপদ' মাত্রার বিকিরণ সম্পর্কে। আর একটি বিতর্কিত বিষয় পৃথিবীতে পতিত ভস্মপাতের পরিমাণ।

সাধারণ মানুষের জন্য 'দ্য ন্যাশনাল কমিটি অন রেডিওলজিক্যাল প্রোটেক্‌শন্ নির্দিষ্ট করেছেন সর্বোচ্চ ১০০ স্টেরেনটিয়াম একক। ইতিমধ্যে 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন রেডিওলজিক্যাল প্রোটেক্‌শন্' এই মাত্রা পরীক্ষামূলকভাবে ৬৭-তে নামিয়ে দিয়েছেন। এতে মানুষের মোট খাদ্যে (কেবল দুধে নয়) স্টেরেনটিয়াম-৯০-এর সামগ্রিক হিসেব অন্তর্ভুক্ত।

এই নির্দিষ্ট মাত্রার অর্থ এই নয় যে, এর চেয়ে মাত্রা বাড়লেই মৃত্যু হবে, কিংবা নিম্নতর মাত্রা নিরাপদ। এতে কেবলমাত্র সারা জীবনে হাড়ে ঐ বস্তু সঞ্চয়ের উপযুক্ত মাত্রার কথা বলা হয়েছে।

১৯৫৯-এ বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকাবাসীদের

'It is based upon the application of Psychology, Physics, Chemistry, Physiology, and other sciences.

কত রকম পদ্ধতি যে বাস্তবেই গড়ে উঠেছে, তা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। যেমন ধরা যাক, Finger Printing (৮) অর্থাৎ কিনা আঙুলের ছাপ মিলিয়ে অপরাধী নির্ণয়ের চেষ্টা। Lie detector (৯)—যে যন্ত্র মিথ্যাকথা বললেই ধরে ফেলতে পারে। এছাড়াও আছে Poroscopy-আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ওপর এটি দেহের কিছুটা নির্ভরশীল। পদ্ধতির অবশ্য শেষ নেই—যেমন, moulage অর্থাৎ প্লাস্টার করার বিবিধ প্রক্রিয়া, Forensic ballastics—বৈজ্ঞানিক প্রথায় বন্দুক থেকে ছোড়া গুলির খুঁটিনাটি সন্ধান, এইরকম আরো অনেক কিছু।

এখনকার গোয়েন্দা কাহিনী কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যমূলক— যেখানে তা নয় সেখানেও লেখকরা উন্নত ধরণের আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে সচেতন। ফলে, গোয়েন্দা-কাহিনীতে আমরা যে স্বাদ পাই তা নিছক বুদ্ধিবৃত্তির স্বাদ—অপরাধের চেয়ে এবং অপরাধীর চেয়ে গোয়েন্দার বিশ্লেষণী শক্তিই আমাদের আকৃষ্ট করে বেশী। মনে মনে সেই বিচিত্র চিন্তাধারা আমরা অনুসরণ করতে থাকি। বর্তমান যুগের প্রবণতা যদি হয় বুদ্ধিবৃত্তিমূলক তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে—গোয়েন্দা কাহিনী বুদ্ধিবৃত্তির স্বাদবাহী একান্ত আধুনিক মননের উপযোগী। এই মৌলিক ধারাটিকে স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে স্বীকার করলে সাহিত্যের Absolute value এবং Historical value উভয়কেই সম্মানিত করা হবে- এই আমাদের বিশ্বাস। [ক্রমশ।

৮। অসলে চেহারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে অপরাধী খোঁজার এই পদ্ধতির নাম Bertillon পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বিশ্বাস করে, পূর্ণবয়স্ক লোকের আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলো কখনই মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

৯। অবশ্য এর জন্য একরকম ঔষধ খাওয়ানো হয় অপরাধীকে যার নাম Scopolamene-র এ প্রয়োগ ঔচিত্য সম্বন্ধে এখনও ঠিক নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নিন।

একমন বয়ে বিকিরণের মাত্রা দ্বিগুণিত হবে। তখনও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার-এ সঞ্চিত সেসিয়াম্‌-১৩৭-এর পতন শুরু হলে এমনটা ঘটবে।

একথা য়ুরোপীয় এবং রাশিয়ার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। গত দশকের শেষ বছরেই এই মাত্রা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলবাসীদের তুলনায় আড়াইগুণ হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেছিলেন না ভে:। এইটা সর্বোচ্চ অনুমোদন-যোগ্য মাত্রা। বেশি নয়।

জেনারেল অ্যাড্ভাইসরী কমিটি টু দ্য অ্যাটমিক এনার্জী কমিশন-এর প্রতিবেদনের একাংশে বলা হয়েছে, ভস্মপাত থেকে আমেরিকায় যে বিকিরণ হয় তার গড়ের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি বিকিরণের পশ্চাৎ-পটের মধ্যে মানুষ পৃথিবীর নানা অংশে পুরুষের পর পুরুষ বাস ক'রে আসছে।

সে যাই হোক্‌, এইসব মাত্রা যে নিরাপদ তার প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নি। এইসব উচ্চতর মাত্রায় জৈবিক প্রতিক্রিয়ার ফল মাপার জন্য কোনও গবেষণা হয় নি।

কিন্তু একথা আজ তর্কাতীত যে, অতি মাত্রায় বিকিরণের মধ্যে থাকলে মানুষের লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তবে নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় —প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে—অল্প মাত্রায় বিকীরণ হলেই লিউকেমিয়া বা কর্কট রোগীর সংখ্যা কম হবে, অল্প মাত্রা গড় আয়ু সংক্ষিপ্ত করে কিনা তাও নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না।

মনে হয় একটা ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকরা একমত: 'রেডিয়েশন এক্সপোজার'-এর সব থেকে বেশি সম্ভাব্য শিকার হবে অ-জাত শিশু এবং শিশুরা। এর কারণ বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের থাইরইড্‌ গ্ল্যানড-এ রেডিও অ্যাক্টিভ্‌ আয়োডিন্‌ ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি আকৃষ্ট হয়।

তাছাড়া এই বয়সেই হাড় সব থেকে বেশি দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে; স্ট্রনশিয়াম্‌-৯০ হাড়ে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, এবং এটি আর রেডিও অ্যাক্টিভ্‌ আয়োডিন্‌ দুধে থাকায় (দুধ শিশুদের প্রধান খাদ্য), এটা স্বাভাবিক যে শিশুদের থাইরইড্‌ এবং বোন-ক্যান্সার—হাড়ে কর্কট রোগ, হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

এখন চেষ্টা চলছে এমন ঊর্ধ্বে বিস্ফোরণ ঘটান সেখান থেকে পৃথিবীতে পারমাণবিক ভস্মপাত না ঘটে। 'অ্যাটমিক এনার্জী কমিশন'-এর মতে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যস্থল কিংবা চাঁদের আরও কাছাকাছি মহাশূন্য সবচেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় জায়গা।

মানুষ ইতিমধ্যেই পারমাণবিক ভস্মপাতের কুফল ভোগ করছে। যুদ্ধোন্মাদ অতি-শক্তিশালী দেশগুলো এই বীভৎসতম অস্ত্র নিয়ে খেলা যদি বন্ধ না ক'রে, তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ নেই।

গুরু-শিষ্য

রবীন্দ্রনাথ মিত্র

চলেছে নরেন অধীর হইয়া
দেখেছে ঈশ্বর কে দেবে বলিয়া
যাহারে শুধায় কহে সে হাসিয়া
ঈশ্বর আছেন জেনো।
কেহই কহে না দেখেছে তাঁহারে
সকলে তাঁহার মহিমা প্রচারে
কতনে মিলিবে কেহ কয় তারে
এইটুকু শুধু জেনো॥

নরেনের মন ভরে হতাশায়
কোথা গেলে হায় তার দেখা পায়
যে তারে কহিবে সঠিক উপায়
দেবে না তাহারে ফাঁকি।
সবশেষে আসি দক্ষিণেশ্বরে
শুধায় পঞ্চবটের ঠাকুরে
স্পষ্ট করিয়া কহগো আমারে
তাঁহারে দেখেছ কী?॥

শুনিয়া ঠাকুর হাসিয়া কহেন
এ কী কথা তুই কহিস নরেন
তিনি মোর মা, পর তো নহেন
নিতুই দেখি যে মা'রে।
মান অভিমান সুখ দুঃখ ব্যথা
তাঁর সাথে মোর হয় কত কথা
তিনি যে সবার বিশ্বের মাতা
ডাকিলে পাইবি তাঁরে॥

শুনি সে বাণী বিপুলে আনন্দ
ঘুচে গেল যত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব
নরেন হইল বিবেকানন্দ
ত্যাগী বীর সন্ন্যাসী।
মহান গুরুর অসীম কৃপায়
যে সত্য লভিল তুলনা কোথায়
প্রচার করিল জগৎসভায়
শুনিল বিশ্ববাসী॥

জগতের সবে সত্য শুনিল
সব ধরমের মর্ম বুঝিল
পূবে পশ্চিমে আসিয়া লুটিল
সন্ন্যাসী পদমূলে।
তাইতো আজিকে জগতের জনে
গুরু শিষ্যের লীলা নিকেতনে
প্রণাম জানায় অশ্রু নয়নে
পঞ্চবটের মূলে॥

প্রাচীন যৌন উৎসব

আধুনিককালে অবশ্য যৌনচর্চার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রাচীনকালে জীবনের উৎসরূপে যৌনচর্চার সম্মান ছিল সমাজে প্রচুর।

প্রাচীন রোমানদের জীবনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন রোমে যৌন-চর্চাকে ধর্মের পরিপন্থী না ভেবে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ধরা হত। বর্তমানের জীবনধারণ এত পালটে গেছে যে এখন সে সব মনে হবে বর্বরতার চরম বলে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

এ কথাটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে রোম সাম্রাজ্যে কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল না, পরন্তু বহু ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত চালু ছিল। তৎকালীন রোমানরা যেসব দেশ জয় করত সেখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন জীবনচর্চা শিখে নিয়ে এসে নিজেদের সমাজে প্রসার করত।

আদি রোমক ধর্মে যৌনচর্চার ব্যাপকতা ছিল না—বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক দেব-দেবীদের নিয়ে তারা একরকম সুখেই ছিল। প্রথম রোমক যৌনচর্চার দেবতার নাম কিন্তু ভেনাস নয়, তাঁর নাম ছিল মুটুনাস্ টুটুনাস্ এবং তিনি পুরুষ। (নামটার উৎপত্তি কেমন করে তা সঠিক না জানা থাকলেও, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে লাতিন শব্দ 'Mentula'—পুরুষাঙ্গ থেকে এর জন্ম)। এঁর পূজাপদ্ধতি এত গোপনীয় ছিল যে তা লুপ্ত হয়ে গেছে একেবারে; শুধু এইমাত্র জানা যায় যে স্ত্রীলোক যারা পূজায় যোগদান করত তারা আগাগোড়া তাদের মুখ ঢেকে রাখত।

খৃস্টীয় সাধু অগস্টিন্ (চতুর্থ শতাব্দী) এই মুটুনাস্-এর পূজা সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীরা কেমন করে করতেন তা লিখে রেখে গেছেন—

'সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীরা এই দেবতার পুরুষাঙ্গের উপর বসে তাদের কুমারিত্ব প্রথম বিসর্জন দিত।'

একাজ করতে হত স্বামীকে নিজে। অবশ্য এসব বিলুপ্ত হয়েছে খৃস্টজন্মের বহু পূর্বেই। রোমানদের বিশ্বাস ছিল যে এই উপচারে খুসী হয়ে প্রভূত সন্তান উপহার দেবেন দম্পতিকে।

সাধু অগস্টিনের লেখা থেকে:—

'ভার্জিনিয়েনেসিস্ দেবী নববধূর কোমরের কাপড় খোলার কাজে আছেন; সুবিগাস্ দেবতা নববধূকে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করান; প্রেমা দেবী এমন ব্যবস্থা করেন যাতে করে লাজুক নববধূ বেশী আপত্তি না করে।'

আরও আছেন। জানুস্ দেব রয়েছেন 'গর্ভাধান সরল করার জন্য', এবং সেটার্ন স্বামীর 'বীর্যরক্ষণ করে থাকেন।'

সুপ্রাচীন রোমে এই প্রথা অনেক-দিন ছিল। জীবনের উৎসমূলকে দেবতার আশীর্বাদপূত করার কেমন সহজ, সরল আকৃতি। পরবর্তী উন্মত্ততা তখনও আসে নি।

কিন্তু যখনি রোম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হতে সুরু করল, সেই সঙ্গে বহু দেশের বিচিত্র ধর্মীয় আচার-ব্যবহারও আমদানী হতে লাগল রোমে।

এর প্রথম হচ্ছে ভেনাসের উপাসনার উদ্দামতা। প্রাচীন রোমক ধর্মে ভেনাস ছিলেন ফুল ও বাগানের সামান্য দেবী। গ্রীক এবং সাইরাকিউস্-এর প্রভাবে ভেনাসকে এ্যাফ্রোদিতে রূপান্তরিত করল এবং তিনি হলেন প্রেম এবং সৌন্দর্যের দেবী। স্বাভাবিক-ভাবেই ভেনাস ক্রমে যৌন আবেদনের অধীশ্বরী দেবী হয়ে দাঁড়ালেন।

ভেনাস-এর পূজার আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল অপরিমিত মদ্যপান, চিৎকার এবং অবাধ যৌনমিলন।

ঠিক এইভাবেই প্রাচুর্যের দেবতা লাইবার রূপান্তরিত হলেন যৌন মিলনের দেবতা রূপে। (Liber থেকেই ইংরাজী Libertine কথাটা এসেছে)। এঁর প্রতীক ছিল কাষ্ঠনির্মিত লিঙ্গ, শিব-লিঙ্গের অনুরূপ—কিন্তু শিবের শান্ত সমাহিত ভাব মোটেই ছিল না রোমান কল্পনায়। লাইবারের পূজায়ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও মদ্যের বন্যা বয়ে যেত।

লাইবার এত জনপ্রিয় ছিলেন যে ছোট ছোট লিঙ্গ-প্রতীক শিশুদের গলায় ঝোলান হত সৌভাগ্য আনয়ন করার জন্য।

ঠিক একই প্রতীক চিহ্নে পূজিত হতেন প্রায়াপাস্ নামক দেবতা, যাঁর শুভাগমন হয়েছিল এশিয়া মাইনর থেকে। এঁর পূজার শেষ কৃত্য ছিল সর্বসমক্ষে কোন লৌহ বা কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা একটি কুমারীর কৌমার্য হরণ।

এরও বহুদিন পরে যখন রোম সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ, তখন বাককুস্ দেবতার পূজা, খৃস্টপূর্ব দুই শতাব্দীতে। রোমান ঐতিহাসিক লিভি লিখছেন যে, বাককুস-এর পূজায় 'ঢাক ঢোল ও চিৎকার শব্দ এত হত যে, যে নারীকে পূজার অঙ্গ হিসেবে ধর্ষিতা করা হত তার চিৎকার কেউ শুনতে পেত না।'

এঁর ভক্তবৃন্দ প্রায়শই নারীরা। পূজার দিনে তাঁরা প্রায়ই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শহরের রাস্তা দিয়ে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াতেন। প্রায় অর্ধ রোম এঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এঁর আর এক নাম ডায়োনিসাস্। ইনি ছিলেন মদ্যের দেবতা এবং অবাধ মদ্যপান পূজার আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। ভক্তরা উন্মত্তাবস্থায় কত লোকের যে কত ক্ষতি করত, তার ইয়ত্তা নেই।

শেষ পর্যন্ত, যখন এমন অবস্থা দাঁড়াল যে রোম শহর বিপন্ন, তখন রোমের সেনেট আইন করে এঁর পূজা একেবারে বন্ধ করে দিল। তাঁর মন্দির ভেঙে ভক্তদের কারাগারে আবদ্ধ করল।

মিশরীয় দেবী আইসিস-ও কিছুদিনের জন্য রোমে পূজা পেয়েছেন। ইনিও সমধর্মী দেবী। এঁর পূজা বন্ধ করেছেন সম্রাট টিবেরিয়াস—একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাকে সকল 'ভক্ত' মিলে ধর্ষণ করার পরই।

খৃস্টজন্মের একশো বছর পরে সম্রাট ডোমিটিয়ান আবার আইসিস্‌কে এনে বসালেন সুন্দর মন্দিরে।

আইসিস্‌ দেবীর পূজা করত নারীরা। এরা প্রায় আমাদের সেবাদাসীদের মতই। পূজা দিবসে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে নারী-পুরোহিতের দল শহর পর্যটন করত।

আইসিসের মতই আর এক দেবী ছিলেন, তাঁর নাম 'বোনা দিয়া'—মহাদেবী। এঁর উপাসনায় পুরুষের কোন স্থান ছিল না, এমন কি তাদের প্রবেশাধিকার পর্যন্ত ছিল না।

'সিবেল' নামক এক দেবীও এসেছিলেন এশিয়া মাইনর থেকে। এঁর পুরোহিতরা মতের ঝিজড়ে। এঁর উপাসকেরা নিজেরা নিজেদের কশাঘাতে জর্জরিত করতেন। আত্মপীড়ন ছিল পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। পম্পীনগরের ধ্বংসাবশেষ দেওয়ালে ছবি পাওয়া গেছে যাতে দেখা যায় উলঙ্গ নারীবৃন্দ নিজেরা নিজেদের কশাঘাত করছে 'সিবেল' দেবীর পূজাস্থলে।

শেষ পর্যন্ত 'সিবেল' দেবীর উপাসকেরা সমকামী হয়ে উঠেছিল।

ধর্মের ভাণ করে উদ্দাম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাই ছিল উপরোক্ত সব রোমক পূজার।

খৃস্টধর্মের উত্থানের সাথে সাথে এ সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

—বৈশম্পায়ন

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

এ ব্যাপারটা যে জরুরী সে সম্বন্ধে আজ আর মতদ্বৈধ নেই। যে পরিমাণ ঢক্কানিনাদ হচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের দেশে, তাতে কোন ক্ষীণ প্রতিবাদ থাকলেও তা' আজ আর শুনতে পাওয়া যায় না।

আমেরিকাতে এ নিয়ে অনেক বিবাদ, অনেক বিসংবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে, তবে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ বর্তমান কালে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে।

বিজ্ঞানীরা সংখ্যাতত্ত্ব দেখান—তাঁরা বলেন যে, সভ্যতার প্রথম বিকাশ থেকে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচ হাজার বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা এক বিলিয়ন হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী একশো বছরে এই সংখ্যা বেড়ে তিনগুণ হয়েছে। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যে, আগামী ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে ছয় বিলিয়ন দাঁড়াবে।

অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্‌সলের মতে, আমাদের দুটো জিনিষের ভেতর একটা বেছে নিতে হবে—

এক: আমরা সজ্ঞানে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে নির্দিষ্ট সীমাতে রাখব।

দুই: অথবা, জননী বসুন্ধরার বক্ষসুধা নিংড়ে শুষে নিয়ে জনসমষ্টির চাপে দশ বিশ হাজার বছর আগেকার অবস্থায় ফিরে যাব।

হাক্‌সলের মত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেছেন, কেবলমাত্র কমিউনিস্ট এবং রোমান ক্যাথলিকরা ছাড়া। রোমান ক্যাথলিকরা জনসংখ্যাবৃদ্ধির কথা স্বীকার করেও বলেন—

'খাদ্যের চাইতে লোক বেশী হলে তার সমাধান লোক খুন করা নয়, পরন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়ান।'

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল বারান এবং বৃটিশ অধ্যাপক বার্নাল উপরোক্ত মতের সমর্থক।

ভবিষ্যতের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব হবে কিনা সে তর্কের ভেতরে না গিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতবর্ষের মত দেশে অগণিত জনসংখ্যা অত্যন্ত শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা জগতের কাছে। এবং ভারতের মত দেশের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য সাহায্য করার আশু প্রয়োজন সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। আমেরিকায় রোমান ক্যাথলিকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্যের ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্থাসমূহ প্রচুর সাহায্যের পক্ষপাতি।

আমেরিকা সম্বন্ধে বলা যায় যে, অধিকাংশ বিবাহিত নরনারী কোন-না-কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থার অনুসারী। সংখ্যাতত্ত্ব বলছে যে, দশজোড়ার মধ্যে নয়জোড়া আমেরিকান দম্পতি—যাদের গড় বয়স তিরিশ এবং যাদের গড়ে একজন সন্তান—তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এমন কি রোমান ক্যাথলিকধর্মীদের মধ্যেও গড়ে দশজোড়ার মধ্যে আট জোড়া দম্পতি পোপের মতের বিরোধিতা করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১৮৭৩ সালে আমেরিকায় এক আইন অনুসারে জন্মনিরোধ সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এ্যানটনি কমস্টক্‌ নামক একজন আমেরিকান ছিলেন এই আইনের গোঁড়া সমর্থক এবং প্রধানত তাঁর 'পাপ নিবারক সংস্থা'র চাপে পড়েই এই আইন রচিত হয়েছিল। জন্মনিরোধক বিষয়কে সুনীতিবিরোধী বলে ধরা হত।

কম্‌স্টককে পরে পোস্ট অফিস থেকে উপরোক্ত বিষয়ের বিশেষ এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তেতাল্লিশ বছর ধরে তিনি বহু গ্রেপ্তার ও শাস্তিবিধান করে জন্মনিরোধক তথ্যাবলীর প্রচারকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

১৯৩৬ সালে এলেন মিসেস মার্গারেট স্যাঙ্গার জলন্ত উৎসাহ নিয়ে। বহু আন্দোলনের পর সে বছরেই জাতীয় কোর্ট নির্দেশ দিলেন যে, দুর্নীতিমূলক অভিসন্ধি প্রমাণিত না হলে জন্মনিরোধ সম্পর্কে তথ্যাদি ডাকে বা অন্য কোন উপায়ে পাঠান বে-আইনী নয়।

এরপর থেকে দ্রুত জন্মনিরোধ-

মূলক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার বেড়ে গেল। কিন্তু সেদিন পর্যন্তও কয়েকটা রাজ্যে ডাক্তারদের এ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ দিতে দেওয়া হত না। ১৯৫৯ সালেও বৃটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন ইংলণ্ডের জন্মনিয়ন্ত্রণ সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে রাজী হয় নি।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিকরা একটা নিয়মের বিরুদ্ধতা করেন না—সেটা হচ্ছে 'রিদ্‌ম্‌' বা চান্দ্রিক-নিয়ম। অর্থাৎ, ঋতুমতী হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যৌন-মিলন সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, এ সময়টি যে ঠিক কোন সময়, তা' সঠিক করে কেউ বলতে পারে নি আজও পর্যন্ত। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক বা মানসিক অবস্থার ওপর এটা নির্ভরশীল।

আবার, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, 'নিরাপদ' সময় জানা আছে। তা' হলেও এমন অসংখ্য নরনারী আছেন, যাঁদের কাছে এই বাধ্যতামূলক নিবৃত্তি কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই।

১৯৬০ সালের মে মাসে 'বার্থ কণ্ট্রোল পিল' আইনসিদ্ধ হ'ল—অবশ্য ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র চাই।

জন্মনিরোধ করতে হলে স্ত্রীকে পঞ্চম দিবস থেকে অন্তত কুড়ি দিন প্রত্যহ একটা করে পিল খেতে হবে। একদিনও বাদ গেলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। ঠিক নিয়মে যাঁরাই পিল খেয়েছেন, তাঁরাই নিরাপদ হয়েছেন।

দাম কিন্তু অত্যন্ত এখনও—আমেরিকায়ই এক ডলারে মাত্র দুটো পাওয়া যায়।

আবার, অনেক ক্ষেত্রে পিল খেলে বমি, মাথাঘোরা, মাথাধরা ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। কাজেই, পিল গ্রহণকারীদের উচিত সর্বদা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে।

যৌনস্পৃহার কোন ব্যতিক্রম হয় না পিল খেলে। অবশ্য দেখা গেছে যে, পিল যাঁরা খান, তাঁদের সুরতক্রিয়ার সংখ্যা বেড়ে যায় দ্রুতগতিতে—বোধ হয় গর্ভাধানের ভীতি থাকে না বলেই।

সব দিক বিবেচনা করলে এটা অন্তত পরিষ্কার হচ্ছে যে, এই অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যবস্থায় ভারতের কোন উপকার হবে না। ১৯৬০ সালে আমেরিকাস্থিত ভারতের রাষ্ট্রদূত মিঃ চাগলা বলেছিলেন, 'ভারতের জন্য এমন পিল দরকার যা কুইনিন বা এ্যাসপিরিনের বড়ির মত সস্তা হবে এবং তত পরিমাণ সহজলভ্য হবে।'

জাপান অবশ্য প্রমাণিত করেছে যে, সরকারী শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে জন্মনিরোধ—ব্যবস্থা সার্থক করে তোলা যায়। ১৯৪৭ সালে জাপানের জন্মহার ছিল এক হাজারে ৩৪.৪; দশ বছর পরে এই হারকে কমিয়ে হাজারে মাত্র ১৭ করা হল, অর্থাৎ অর্ধেক কমে গেল। ফলে, জাপানের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আমেরিকার চাইতেও কম।

জাপানে অবশ্য প্রধানত গর্ভপাতের সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়েছে—গর্ভপাত সেখানে বেআইনী নয়।

১৯৫৭ সালেদশ লক্ষ গর্ভপাতের খবর জানা গেছে, অজ্ঞাত যে কত হয়েছে তার বোধ হয় সীমা-সংখ্যা নেই।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ফিলিপ হসার বলছেন: 'আমাদের বর্তমানে জন্মহারদৃষ্টে মনে হয় যে, ৮০০ বছরের মধ্যে আমেরিকায় প্রত্যেক বর্গফুটে একজন করে মানুষ হবে। মহাকালের কাছে ৮০০ বছর তো মুহূর্তমাত্র।'

ডঃ হসার আরও বলেন, 'আসলে সমস্যাটাকে স্বীকার করে নেওয়াটাই হচ্ছে বড় কথা।'

সত্যিই তাই। সমস্যাকে স্বীকার করে নিলে মানুষ তার সমাধান খুঁজে পাবেই। তার বিবর্তনের ইতিহাস সেই কথাই বলে।

—শ্রীঅরুণ চৌধুরী

রঙ্গমঞ্চ ও কুশালব

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইচ্ছার পুতুল হয়ে হেসে কেঁদে অভিনয় করে
আকাশে ছোঁয়ায় মাথা খ্যাতিমান হিমাদ্রি-নায়ক।
মনোরম প্রেক্ষাগৃহ। নীরব দর্শককুল যেন
সহসা কিছু হয়ে স্তাবকের ভূমিকায় নামে।

সূর্যের শৈশব ফোটে, কেলি করে যৌবন-জৌলুষে;
তারপর জরাজীর্ণ—বৃদ্ধের বিষণ্ণ হাসি হাসে;
অন্ধকার সাম্রাজ্যের এককোণে লুকিয়ে সে দ্যাখে:
অগ্নি-গিরি-বুক সদা-হাস্যময় এক বিদূষক!

অথচ আশ্চর্য এই ছলনা ও মিথ্যার মহিমা।
এই দৃশ্য-দৃশ্যান্তর, করতালি, নৃত্য ও সংগীত;
একসাথে নাটকের কাহিনীর শূন্য-শেষ হওয়া,
শূন্য-মুঠি ঘরে ফেরা। প্রকৃত প্রত্যাশা ম্রিয়মাণ।

নদীটির নাম লান

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

সেদিনের কথাটা বেশ মনে আছে। মেনসা থেকে রুডল্ফ প্লাৎসের দিকে ফিরছি। বরফ পড়ার একঘেয়েমি প্রায় ঘণ্টা দুই হ'ল বন্ধ হয়েছে, লম্বা ছুটির বিশ্রামক্ষণটি নিতান্ত স্বল্পায়ু হয় না। কাজেই ভরসা ইতিমধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারবো, ভায়ডেনহয়জারের মোড় পেরিয়েই লানের পোল। সেই সবে বোধ হয় সূর্যদেব অস্তমিত হয়েছেন। লানের জলে অস্তগামীসূর্যের শেষ রশ্মিটুকু প্রতিফলিত। বুকে অসংখ্য ছোটো ছোটো ঢেউ। রূপোলী জল, পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ে আছে নিতান্ত অবহেলিত ও অনাদৃত। (কোলকাতায় বরফ পয়সা খরচ করে কিনতে হয় এই সংবাদটি ওরা আমেরিকার বা রাশিয়ার স্পুটনিকের থেকেও আগ্রহভরে শোনে—বাচ্চাদের শুনে সে কি হাসি।) শীতের প্রচণ্ড আস্ফালন গাছগুলোকে পত্রপুষ্প স্তবক থেকে বঞ্চিত করেছে। কাজেই তারাও বরফকে আশ্রয় দিতে পারে নি। তার আশ্রয় এখন লান। নদীবক্ষে তুষার—কে কার অলঙ্কার। দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকার মতো: কর্মক্লান্ত পথচারীর পিপাসা নিবৃত্ত হবে না এতে। বাঁ পাশের কাফেটায় চেয়ে দেখলাম, সামনে ফেনিল পানপাত্র, পাশে কার্টোফেল সালাডের প্লেট প্রায় নিঃশেষ। ব্রাট ভুর্স্টে কামড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা চলেছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। অনেকেরই আলোচনার বিষয় সামনে ভাইনাক্টেনের লম্বা ছুটি; বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ প্রায় দিন পনের বন্ধ, কোথায় কিভাবে কাটান যায়। বহু ছাত্র-ছাত্রীই অবশ্য রওনা হবে বাড়ির দিকে—বহুদিন বাপ মার কোলছাড়া—বুড়ো দাদু-দিদিমাও হয়ত আগ্রহভরে প্রতীক্ষায় আছেন আদরের নাতি-নাতনীর প্রত্যাবর্তনের। ভিলহেল্ম অথবা হাইডি এদের তো জন্মই হোল সেদিনে—এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে—এই কথা চিন্তা করার সাথে নিজেদের জীবনদীপ আর কতদিন প্রজ্জ্বলিত থাকবে সে ভাবনাটাও মনকে মাঝে মাঝে দোলা দেয়: ভাবেন নিজেদের বেএর্ডেগুঙ্গ ঠিকমতো সম্পন্ন হবে তো।

কোন কোন ছেলেমেয়ে স্কী করতে যাবে দক্ষিণে আল্পসে অথবা অষ্ট্রিয়ার তিরোলে। এই মারবুর্গে স্কেটিং করার নেই খুব সুবিধে। অন্যত্র যেতে হবে। বুণ্ডেসবান অথবা ওমনিবুসে দেবে দূর-পাল্লার লম্বা পাড়ি। তাদের জন্য প্রচুর কম ভাড়া করে দিয়েছেন বুণ্ডেস রিপুবলিক।

এইসব ছেলেমেয়েতেই কাফে সরগরম, অপিস, দোকান এবং কলকারখানারও ছুটি হ'ল, ফ্রাঙ্কফুর্টার স্ট্রাসের এপার থেকে ওপার যাওয়ার উপায় নেই। অবিশ্রান্ত ধারায় চলেছে ফাউভে, ওপেল রেকর্ড আর মার্সিডিজ। ছোটো লানের ছোটো এই সেতু এদের গৃহে পৌঁছে দেবে। উনিভার্সিটাট আর আমগ্রুনের মোড় ছাড়িয়ে এদিকে আসতেই হবে, আমগ্রুনের দিকটা তো আইনবান্ — ঢোকার উপায় নেই। ভরসা ছোটো নদীর এই ছোটো সাঁকো। চারিদিক দেখলাম তাকিয়ে—যান্ত্রিক নিয়মে চলেছেন প্রায় অশীতিপর ওমা। ডান হাতে ছোট একটা কারুকার্য করা বেতের ঝোলা—এক পাউণ্ড তো রিণ্ড ফ্লাইস—এতেই ধরে যাবে। বাঁ হাতে শক্ত করে ধরা গোল্ড বয়টেল—কয়েকটা পাঁচ মার্কের নোট আর কিছু খুচরো ফেনিগ আছে তাতে। এখন সামনে উপস্থিত হয়ে গুটেন্ আবেণ্ড বললে ঈষৎ হেসে প্রত্যুত্তর দেবেন কিন্তু মনে মনে হয়ত বোধ করবেন কিঞ্চিৎ বিরক্তি। স্বভাবসুলভ ধীর পদক্ষেপ পরিত্যাগ করতে হয়েছে—খুব ব্যস্ত। ঠিক সময়ের মধ্যে পৌঁছুতে না পারলে মেট্সগেরাই বন্ধ হয়ে যাবে যে। লানের এপারের রক্তপলাশের সৌন্দর্য অনুভব করবেন কি? এইতো স্বল্পতোয়া বিশুষ্কপ্রাণা উপলসমাকীর্ণা স্রোতস্বিনী লান, কোলনের ঊর্মিচঞ্চলা রাইন, হাইডেলবার্গের সুসমাহিত নেকার অথবা ফ্রাঙ্কফুর্টের অতলস্পর্শী মাইনের ঐশ্বর্য এই এক ফোঁটা লান পাবে কি করে? কোথায় এর জাঁকজমক, আড়ম্বর, চাঞ্চল্য। ঘ্রাণ আছে কিন্তু প্রাণ কই। প্রাচুর্য কোথায়? পথ ছাড় হে বাপু। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বাড়ি—সেই বিসমার্ক স্ট্রাসে। প্রায় এক কিলোমিটার দূর ছোটো নদী লান তার গ্লানযান দূর করতে পারবে না। হের বয়ম একদিন ফ্রয়লাইন হককে বেশ গর্বভরে লান দেখিয়ে আনন্দ অনুভব করেছিল। পূর্ববাংলার মেয়ে সেরিফা হক—পদ্মা মেঘনার কোলে পিঠে মানুষ—খিল খিল করে হেসে উঠেছিল লানের বিস্তৃতি আর কলেবর দেখে। 'হ্যাডা মোর গোপাল—দ্যাখছস্ আড়িঅল খা, পরাণপক্ষী পিনজর ছাইড়া পলাইবো',—বুঝতে পারে নি

'ভজরামের নৌকো শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী' পর্যন্ত পড়া বৈকি বয়ম। পূর্ববঙ্গের টান সে আয়ত্ত করবে কি উপায়ে। তাকে সটাক ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিল ঝর্ণা। তুমি বরং ডালিমের সঙ্গে বাংলা কথা বলা আরম্ভ কর। সেরিফা বাংলা না শেখালে কি তুমি শিখতে পারবে না। ডালিম তোমাকে বেশ শেখাতে পারবে। শুনে হেসেছিল বয়ম। সেরিফাকে বলেছিল, তুমি যে কথাগুলো বললে সেগুলো আমাদেরই কথা—আমরা পরিতৃপ্ত হই ডোনাউ দেখে। হামবুর্গের এল্বে আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু টৈগোরের শিশিরবিন্দুর গোড়ার দিকটা কি নল তো? ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হয়ত ঝগড়াতেই পরিণত হ'ত। ঝর্ণাই মাঝে থেকে মিটিয়ে দেয়।

ভাল করে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাই। আজ এ্যাপোথেকের পাশের সেই মোটা পোলিৎসাইটিনও দেখা পেলাম না। খাটো লাঠি ঘুরিয়ে অন্যদিন প্রবলবেগে যান নিয়ন্ত্রণ করে। আজ তার স্থানে অন্য একজন খাড়া আছে, লানের পোল থেকে দাঁড়ালে এ সবই নজরে আসে। আর দেখা যায় মারবুর্গের সর্বোচ্চ গীর্জার শীর্ষতম চূড়াটি। সেখানে এখনো ঝলমলে রোদ—শীতভীত রৌদ্রলোলুপ নর-নারীর সমাবেশ। সোমার—সেতো দূর অস্ত। সেই জুনি, জুলি, অগুস্ট। তখন তো আউফ ডের ভাইডের পাশে সোমার বাড তার দ্বার উন্মুক্ত করে স্বাগত জানাবে স্নানার্থী পুরুষ আর মেয়েকে। ঘাট ফেনি দিলেই যথেচ্ছ স্নান। আজ দুর্যোগ বলে কি কোনদিন সুযোগ আসবে না। আর সেদিন লানেতেই কত ভীড় হবে তার কে হিসেব রাখে। এক মার্ক ফেললেই এক ঘণ্টা নৌকো চালানোর সুযোগ। একেবারে হাউপট-পোস্টের কাছ বরাবর চলে গেলেই বা কে নিষেধ করে। প্যাডেল চালিয়ে যদি পা ব্যথা করে—বন্ধ করে দিয়ে ভেসে বেড়াও। তীর মানেই তো ধীর। এখন খানিক সাদা পালটি তুলে লানের জলে ছোটাছুটি করে নাও না কেন। পায়ে টান ধরলে হাতের দাম তো আছেই; লগি ঠেলো—দাঁড় নাও, ইচ্ছে করলে দু'মিনিটের ভেতরেই হালেম বাডের সামনে দিয়ে ঘাটে এসে পৌঁছে যাবে। কিছু বিশ্রাম করে ইচ্ছে হয় আবার নাও ভাসাও। সব সময়ে না'ও পেতে পারো—ইতিমধ্যে হয়ত ভোটার্থীর মত বোটার্থীরও লেগেছে লম্বা লাইন। সকলেই আজ জলতরঙ্গের সাথে রঙ্গ করতে চায়। মারবুর্গ লানেতেই মিশেছে। আজ সত্যই মারবুর্গ আম্ লান, আম্ লান তাই অম্লান, অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। ক্লেশ মোচনের জন্য প্রথমে ক্লেশ স্বীকার ক'রে নাও।

তাকিয়ে দেখলাম—সে তো এখন স্বপ্ন—কবে সেই ফিংগস্টনে আসবে—তার পরে সোমার, লানের জলে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলেও মাছের সাড়া পাই না। কিন্তু কোন কোন মৎস্য বিলাসী অসীম ধৈর্যভরে ছিপ হাতে সেই অদৃশ্য মৎস্যকুল নিধনে দাঁড়িয়ে আছেন সারাদিন। শবরীর প্রতীক্ষা। পরিশেষে রামচন্দ্র এঁর কাছে এসেছিলেন, কিন্তু মীনচন্দ্র এদের আশার ছলনে ভোলে না। তাহলেও কি সুগভীর আগ্রহ—কি অকৃত্রিম উন্মাদনা। দিনান্তে যদি এক-আধটা কাপ্ফেল জুটে যায় তো মহাভাগ্যের কথা—আর যদি দৈবক্রমে ওঠে ফ্লোরেলে (এক কিলোর দাম দশ-বার মার্ক—দোকানে আধাটি ভর্জিত মৎস্যের দক্ষিণা সাত মার্ক) সেদিন তো মোচ্ছোব—মৎস্যোৎসব তো বটেই, পাশের চার পাঁচটা পাড়া জেনে যাবে আজ হের ভিঙ্কেল্ তাঁর শেলে এক ফ্লোরেলে বিদ্ধ করেছেন, ফ্রাউ বাঙ্গেলের রেভে দোকান থেকে সলেন্ বু মেন্ তেল নিয়ে এসো। তা না হলে রান্নার কি হবে, গরম জলে সেদ্ধ—ছো: ছো: ওসব ঐ সেল্ফিসের বেলায় চলে। ফ্লোরেলে আর সেল। কাঞ্চন আর কাচ। এ কি পাণিনির সূত্র? কোথায় দেবরাজ ইন্দ্র আর পথতাজ পুন্দ্র। হের ভিঙ্কেল্ আজকের হিরো, রিহার্সাল দিচ্ছেন ভোনৎসিমারে বসে। আগামীকাল অপিসে হের কোলেগের কাছে কিভাবে ফ্লোরেলে ধরার গভীর রহস্যটি উদ্ঘাটিত করবেন ধীরে ধীরে। হের কোলেগের সেই বিস্ময়ব্যায়ত বদন। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে শরীর বেপথুমান। এসব কল্পনা করে উল্লসিত হচ্ছেন। আজ তিনি উদার। পাশের ফ্লাটের হের ভাইলারকে ডেকে হয়ত বা কোনিয়াক পান করতে বলবেন।

চমক ভেঙ্গে গেল, আজতো সবে ডেৎসেম্বরের ১৮ তারিখ। দুরন্ত জানুয়ার আর ফেব্রুয়ার আগে উত্তীর্ণ হোক, টেম্পরেচারের পারা এখন শূন্যের কাছাকাছি—ওটা আরও ১৫।২০ ডিগ্রী নীচের দিকে নামুক তার পরে তো আসবে স্নানের পালা। শীতের পালাগান শেষ হোক আগে; তবে না দেখা দেবে সুন্দরকান্তি গ্রীষ্ম। লানের ঘাটে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটারও অনেক দেরি। ক্লোৎসের দোকানের পেছনে লানের বাঁধটা একেবারে এপারে এসে ঠেকেছে। সত্যই ক্ষুরস্য ধারা। কিন্তু সে কোন বাধাই নয়। বাঁধতো স্রোতকে বজায় রাখার জন্যে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে বাধা কি। অনায়াসে পার হয়ে যায় অনেক কচি কচি ছেলেমেয়ের দল,

জাতার কাট৩ে এসে জুটেছে গানৎসে ফামিলিয়ে--বাপ, মা, ভাই, বোন সকলে। বেশ করে খানিকটা তেল মেখে নিয়ে তোয়ালে বিছিয়ে শুয়ে আছে লানের ধারে, কাটিয়ে দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে মারছে লানের জলে ঝাঁপ। বাচ্চারা আরেনস্ থেকে কিনে এনেছে রবারের ছোট বড় পেঙ্গুইন--মহানন্দে সেইটে ধরেই ভেসে বেড়াচ্ছে। একমুখ সকোলাডে; ডাঙ্গাতে উঠেই বাপ মায়ের কাছে আইসক্রীম খাওয়ার বায়না জুড়েছে। সকলেই হাসিখুশী। সকলেরই মুখে বেশ পরিতৃপ্তির ছবি। সমাজ সংসার সব মিছে—গ্রীষ্মকে বরণ করতে না পারলে স্মরণের মণিকোঠায় কোন্ প্রদীপ শিখাটি বিচ্ছুরিত করবে শান্ত নির্মল তাপ।

কিন্তু সে সব আগামী দিনের কথা। আজ অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর তুষারাঘাতে যে পদ্মকুঁড়ি ঝরে পড়েছে পরের দিনের তার নূতন সত্তায় নবরূপে আবির্ভাবের কথা স্মরণ করে বরণের জন্য কেউ অগ্রসর হয় নি। শৈত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কঠোরতার সকল প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করছে লান। মাল্য চন্দন-যোগে সুসমারোহে স্বাগতমকে সে প্রত্যাশা করে না। হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল এক চেনামুখের দিকে। পাশের ফ্লাটের বুড়ো কোপপ্। গত ২রা ডিসেম্বর ৮৪তম গেবুরৎস্টাগ পালিত হয়েছে। কাসেল থেকে নাতনীরা আর স্টুটগার্ট থেকে ছেলে ও নাতি এসেছিল। আমরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, বয়সের প্রশান্তি সহ্য করে না আনুষ্ঠানিক ক্লান্তি, সান্নিধ্যই সুখ, পরিণামে নামী দামী না আসুক। পৌত্র-পৌত্রীরাই তো হীরের হার, এখন হার স্বীকার করলেই বা ক্ষতি কি—চিন্তা করেন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের যুবক যোদ্ধা কোপপ্। জীবন-মধ্যাহ্নেই হারিয়েছেন সীমন্তিনীকে —তারপর থেকেই চির একাকী। আর কাউকে বেছে নেন নি। পথে-ঘাটে কোনদিনই তাকে দেখিনি; নিজের ঘরে চুপটি করে বসে থাকেন। নীচর দোকান থেকে একবেলা খাবার আসে। সকালে আর বিকেলে কাপ চারেক কফি খান। জন্মদিনে ঝর্ণার কাছ থেকে ক্রুকবণ্ডের চা উপহার পেয়ে খুব খুসী। এই নিভৃত পিয়াসীকে এখানে দেখে অবাক হলাম। ধূসর পথের আহ্বান আজ কি দুর্বার। পৌষ কি সত্যই তাকে ডাক দিল। পাশে লাঠিটায় ভর দিয়ে একদৃষ্টিতে লানের দিকে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ। কাছে গিয়ে গুটেন্ আবেণ্ড জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম অসময়ে ঘরছাড়ার কারণ। কখনই পথে দেখি না। আজ কিসের আকর্ষণ? মৃদু হেসে লাঠিটা তুলে লানের এক অংশের দিকে দেখালেন। গুটিপাঁচেক ছোট পাখী। বুকের কাছটা গোলাপী আর ঈষৎ নীল। ডানাগুলো হলুদ রঙে ছোপানো। চক্কর খেয়ে লানের জলে ডুব দিয়েই উঠে পড়ছে। আবার পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরছে, আবার ডুব দিচ্ছে। একটার পর একটা। পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম আভা, লানের রূপোলী জল, পাখীগুলোর বিচিত্র বর্ণালী। কারিগরের আর কোন রঙ বোধ হয় মজুত নেই—সর্বস্ব এতে ঢেলে দেওয়া হয়েছে উজাড় করে। ডানার জলগুলো ঝাপট দেবার সময় সূর্যের আলোতে সৃষ্টি করেছে এক নূতন ইন্দ্রধনু; ছড়িয়ে দিয়েছে এক মোহমদির স্বপ্নজাল। প্রতি বৎসর মাত্র এই ডিসেম্বর মাসের ১০।১৫ দিন এই সাত রঙ্গা পাখীরা বহুদূর থেকে আসে, হাসে ঝাঁপ দেয়, খেলা করে এই লানের জলে। অশীতিপর বৃদ্ধ দীর্ঘপথ হেঁটে আসেন এই মধুরিমার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। আত্মহারা হন লানের এই স্বর্ণালী সন্ধ্যায়। বৎসরের মাত্র এই কটা দিন তাঁকে পথে দেখা যায়। এই দিনগুলোতে দুর্নিবার লানের এই আকর্ষণ। কথা শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। বৃদ্ধের রসময় সত্তাকে নূতন করে চিনলাম। কোটিকে গোটিক। লান তো সকলকেই ডাক পাঠিয়েছে। কিন্তু সবার কানে সে ডাক পৌঁছোয় কই? এই বৃদ্ধই তা শুনেছেন, বুঝেছেন নিজ মনের মাধুরী দিয়ে আঁকছেন তার ছবি। আজও তাকিয়ে তন্ময় হয়ে। দিশেহারা, অপরূপ পিপাসু। কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। কখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে টের পাই নি। পাখীগুলো আর দেখা গেল না। লানের নূপুরনিক্কণ গেল হারিয়ে। 'চল প্রফেসর' বললেন বৃদ্ধ। ফিরে এলাম। লানের নূতন রূপটি মনের মণিকোঠায় জমা রইল। এটি আমার নিজস্ব সম্পদ—একান্ত গোপনীয়।

সান্ত্রী, জেগে থাকো

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

আমার নয়নে সান্ত্রী, জেগে থাকো অতন্দ্র নিশায়
নির্বিকল্প আলোর তিয়াসে।
আমার হৃদয়ে ইচ্ছা ব্যাপ্ত হয় সকল দিশায়,
ক্ষীরের মতন স্নিগ্ধ, ঘন হয়ে আসে,

তোমার রূপের হয় মায়াময় ছায়াচিত্রকর—
চিরসুন্দরের ছবি সাবলীল গুহার দেয়ালে
মূর্ত করে। মন-মধুকর
সত্তার পাদপদ্মে শুয়ে থাকে দুর্নিবার তোমার খেয়ালে।

চেতনা-স্ফটিকে প্রার্থনা মন্ত্র তাই, বসে আছি আলোর তৃষায়—
নয়নে হে মোর সান্ত্রী, জেগে থাকো সৃষ্টির নিশায়।

জননায়ক অশ্বিনীকুমার / দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী

বরিশালের বিখ্যাত জননায়ক অশ্বিনীকুমারের নাম বাঙালীমাত্রেরই সুপরিচিত, কিন্তু তাঁর মহৎ জীবন-কর্মধারার সম্যক্ পরিচয় আজও আমাদের অধিগত নয়, এই গ্রন্থ সে প্রয়োজন মেটাবে। এতে মানুষ অশ্বিনীকুমার ও কর্মী অশ্বিনীকুমার এতদুভয়েরই সম্যক্ পরিচয় বিধৃত। বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে মহৎ মানুষের জীবন ও কর্মধারার পরিচয় যেন ঘোর অন্ধকারের রাজ্যে পথ-নির্দেশক আলোকরেখা সম, পথহারা দিগভ্রষ্ট মানুষ এর মাধ্যমে খুঁজে পায় পথ, লাভ করে প্রেরণা। আলোচ্য রচনাটিকেও বিচার করতে হবে এরই পটভূমিতে। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত। প্রকাশক—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২. দাম—দুই টাকা।

প্রেসিডেণ্ট নিক্সন / গ্রন্থ আণ্ড কোম্পানী

আলোচ্য গ্রন্থে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধার প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের রাজনৈতিক জীবনের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক জীবনী বলতে যা বোঝায় এই গ্রন্থ তা নয়. এতে রিচার্ড নিক্সনের মনের দুক্ষ্ম তারতম্যগুলিকেও দেখাবার প্রচেষ্টা করা হয়নি, এ শুধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রামাণ্য দলিল। এতে দেখানো হয়েছে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী। মূল লেখকদ্বয় নিক্সনের কর্মজীবনের ঘটনা পরম্পরার পরিচয় দিয়েছেন নাটকীয় ভঙ্গীতে এবং সেজন্যই তত্ত্ব ও বাস্তব উপস্থাপিত আকর্ষণীয়ভাবে। বইটি পড়লে আজকের দিনের এই বহু বিতর্কিত চরিত্রটি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হওয়া যায়। এই বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে যথেষ্ট শ্রম ও অনুশীলনের স্বাক্ষর বর্তমান, অনুবাদ হৃদয়গ্রাহী ও সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই কয়েকটি মূল্যবান আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় রচনার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, অপরাপর আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। লেখকদ্বয়—আর্ল মেজো ও স্টিফেন হেস, অনুবাদক—দীপক চৌধুরী. প্রকাশক- গ্রন্থ আণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

International Military Tribunal For the Far East

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখ্য ঘটনা-বলীর মধ্যে আণবিক বোমার আবির্ভাব ও যুদ্ধকালীন অপরাধসমূহের বিচার বিশেষভাবেই ইঙ্গিত পূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ্ আমেরিকা অ্যাণ্ড আদার এ্যালায়েড পাওয়ার্স ভার্সাস অ্যারাকি সাদাও অ্যাণ্ড আদার্স, সচরাচর যাকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে 'টোকিও ওয়ার ক্রাইমস্ ট্রায়াল' বলে, যে মামলার বিচার চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে জাপানের টোকিও শহরে তারই বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত। এই মামলাকে ভিত্তি করে সুপ্রসিদ্ধ জাস্টিস রাধাবিনোদ পাল মহাশয়ের ভিন্ন-মতাবলম্বী অভিমতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য রচনায়। গণতন্ত্রের স্বার্থে এই মূল্যবান জাজমেণ্টের পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই। উক্ত অভিমত যে শুধু মূল্যবান তাই নয় এর তাৎপর্য যৌক্তিকতা ও আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। বিভিন্ন অধ্যায়ে আইন ও বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখকের গভীর জ্ঞানগর্ভ অভিমত সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রচনার মর্ম উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না। আইন ও বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ তার মধ্যে বিশিষ্ট বলে গণ্য হওয়ায় যোগ্যতা রাখে। আমরা এই মহতী গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক - জাস্টিস রাধাবিনোদ পাল, এম এ, এল এল ডি, প্রকাশক - সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, ১-১এ, কলেজ স্কোয়ার(ইস্ট) কলিকাতা-১২, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন।

শতবর্ষের আলোয় / চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা চিরস্মরণীয় এমন কজন মনীষীর কর্মধারা ও জীবনদর্শনের পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে এই মহতী গ্রন্থে। বাংলা দেশের সৌভাগ্যক্রমে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বহু প্রতিভাধর পুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের দানে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে ক্রমশ। যাঁদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা সকলেই শতবর্ষের পারে দাঁড়িয়ে আছেন, শতবর্ষ পরে আজকের কজন বিদগ্ধ মানুষ পূর্বসূরীদের ঋণ পরিশোধের আয়োজন করেছেন শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে। প্রতিটি রচনার মধ্যেই তাই শুধু বৈদগ্ধ্য ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয়ই সুস্পষ্ট নয়,

অকৃত্রিম প্রচার আন্তরিকও সমুজ্জ্বল ভাবেই উপস্থিত। জীবনে উদ্দীপনা ও প্রেরণা লাভের জন্য মহৎ জীবনীগ্রন্থ পাঠ করার প্রয়োজন খুব বেশী, প্রখ্যাত মনীষী ও সাধকবর্গের জীবনকথা তাই চিরকালই বোদ্ধা পাঠক সমাজের সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে। এই মূল্যবান সংকলন কথাটি অবশ্য শুধুই জীবনকথা নয়, সংক্ষেপে একটি শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে এর মাধ্যমে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও সুলিখিত। আমরা এই মূল্যবান সংকলন গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। সম্পাদিকা — অসীমা মৈত্র, প্রকাশনায় - চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, ৮। সি, টেমার লেন, কলিকাতা—৯, দাম—পনেরো টাকা।

বসন্তবহ্নি (কাব্যগ্রন্থ) / জিজ্ঞাসা

কবি পরমানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসী। এঁর গার্হস্থ্য জীবনের নাম ছিল মৃণালকান্তি দাশ। শ্রীহট্টনিবাসী মৃণালকান্তির বহু কবিতা একদা বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। 'কবিতা ভবন' থেকে এঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। সুতরাং নামের ও আদর্শের রূপান্তর হলেও পরমানন্দ সরস্বতীর কবিপ্রতিভা বিকাশের ব্যাপ্তিতে ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে কবির দশ-বারোখানি কবিতার বই রসিক সমাজে সমাদর লাভ করেছে। 'বসন্ত বহ্নি' কবির সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রেম। দেহাত্মবাদী প্রেম নয়। বাসনাতীত পরম প্রেম। দুঃখের ও যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে পুড়ে যে প্রেম ভাস্বর কনকদ্যুতিতে অকৃত্রিম। বৰাকুল নিশীথিনীর অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে বসন্তবহ্নি। প্রেম রসলোকের আলোকতীর্থে সিদ্ধির অমৃত লাভ করেছে। কবি সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভে করেছিলেন দুশ্চর তন্ত্রসাধনা। এই কঠিন সাধনার মধ্যে দিয়ে লাভ করেন বৈকুণ্ঠের প্রসাদ। তাই তাঁর এই কবিতাগুলির মধ্যে বহু ক্ষেত্রে তন্ত্রধর্মী। যার ফলে এগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে জটিল মনে হবে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই মনোরম। প্রচ্ছদপটটি কবির নিজের আঁকা। লেখক—পরমানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক: অনিরঞ্জন সিংহ। প্রাপ্তিস্থান: জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯/৯, দাম: তিন টাকা।

স্বয়ংবৃতা / মিত্র ও ঘোষ

আলোচ্য উপন্যাসে দৃঢ় নিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারিণী এক আত্মস্থা নারীর প্রেম আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাগ্যতাড়িত যে যুবক ধন্য হল এই প্রেমের প্রসাদে সেই সুশান্তর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন কথাই এই কাহিনীর মূল উপজীব্য। অর্থ লোভে সুশান্তর একমাত্র আত্মীয়া বিমলা যে চক্রান্তের জাল বুনেছিলেন সুশান্তর চারদিকে, তাতে বন্দী হয়ে পাপকেই উপাস্য বলে চিনতে শিখলো সুশান্ত, নোংরামির ঘূর্ণি হাওয়ায় বুঝিবা উড়ে যেতে বসেছিলো তার সামগ্রিক সত্তাটাই। এইভাবে কেটে গেলো অনেকগুলো দিন, হঠাৎ দেওঘরে বেড়াতে এসে দেখা হল গার্গী দত্তর সঙ্গে, সে এক অনন্যা অনবদ্যা নারী। নারীলোভী সুশান্ত সরকারের জীবনে সে এক পরম ও চরম আবির্ভাব, ধীরে ধীরে মহৎ প্রেমের আস্বাদে ধন্য হল সার্থক হল আত্মবিস্মৃত সুশান্ত সরকারের জীবন, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে গার্গী ক্রমেই আকৃষ্ট হল তার প্রতি, তারপর ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে দুজনের মিলিত চরণধ্বনি শোনা গেল জীবনের পথে। পরিণত ও মধুর শৈলীর মাধ্যমে বিবৃত কাহিনী আপন শক্তিতেই জয় করে নেয় পাঠকের মন। একটি পরিচ্ছন্ন মানসিকতার ছোঁয়ায় কাহিনী উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা।

কুবেরের বিষয় আশয় / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

বিষয়-বৈভবে আসক্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিবিশেষ, সালকের কুবের সাধুখাঁরও ছিলো এই প্রবৃত্তি, জঙ্গলে পতিত জায়গা কেনাবেচা সুরু করেছিলো সে স্বল্প সঞ্চয় ভাঙিয়ে। তারপর দেখা না দেখা ক'বছরেই সে হয়ে পড়ল লক্ষপতি ব্যবসায়ী, জমি জায়গা বাড়ী সব সবই হল আশাতীত পরিণামে, তবু সুখী হতে পারে না কেন কুবের সাধুখাঁ, কিসের অভাব তার? অত বিষয়-আশয়ের মালিক কুবের সাধুখাঁর বুকের একটা কোণ রয়ে গেল খালি, বুঝি চিরতরেই ফাঁকা, সে ফাঁক ভরতে পারলে না আদরের স্ত্রী বুনু; সে জ্বালা কমলো না পরকীয়া আভার কোমল দেহের আশ্রয়েও। সবকিছুর মালিক কুবের সাধুখাঁ রয়ে গেল চির তৃষিত। মানুষের অন্তরের এই তৃষ্ণার আকৃতিই রূপ পরিগ্রহ করেছে আলোচ্য কাহিনীর ছত্রে ছত্রে। লেখকের জীবনবোধ অতি বলিষ্ঠ। প্রচ্ছদ শিল্পরুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের, লেখক— শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯, দাম—দশ টাকা।

ঘেরাও / ডি এম লাইব্রেরী

সাম্প্রতিক রাজনীতির ছায়ায় রচিত বিষয়বস্তু, জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কাহিনী মনোরঞ্জন করে না, শুধু নিষ্ঠুর বাস্তব সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করে তোলে, আমরা মানি বা না মানি, এযুগ ফ্রাস্ট্রেটেড, বিকৃতির কবল থেকে মুক্তি বুঝি বা কারুরই নেই, এই যুগযন্ত্রণাকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসের পাতায় পাতায়। লেখক বাস্তবসচেতন, শুধু তাই নয় বুঝি

না কিছুটা নির্মমও হয়ত, তা না হলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা শুধুই সাহিত্য হয়ে উঠতো সত্য হত না ; এবং সেজন্যই এই রচনাকে নবিড করে তুলতেও তিনি সঙ্কুচিত হননি। যুগবিকৃতির নিপুণতম নিদর্শন হওয়ার যোগ্য এই রচনা আর লেখকের সত্যনিষ্ঠার চরম দলিলও। আমরা এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিসঙ্গত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দীপক চৌধুরী, প্রকাশনায়—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম—পাঁচ টাকা।

আনন্দ ভৈরবী / ডি এম লাইব্রেরী

বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমা যাঁদের হাতে ক্রমবর্ধমান, আলোচ্য উপন্যাসের লেখক তাঁদেরই অন্যতম বর্তমান গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীও বাঙ্গালী নয়, সুদূর দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর প্রদেশের নিকটবর্তী মেলাটুর নৃত্য-গীতের পীঠস্থানস্বরূপ সেখানে নৃত্যকলা শিখতে এসেছিলো একদা দুটি তরুণী মৈত্রেয়ী ও রত্না—মৈত্রেয়ী মাদ্রাজ প্রবাসী এক বাঙ্গালীর দুহিতা, রত্না বেনারসের এক দক্ষিণ দেশীয়া বাইজীর কন্যা। ওরা দুজনেই প্রেমে পড়লো তরুণ নৃত্যশিক্ষক বা নটুভানার নারায়ণমের সঙ্গে। মৈত্রেয়ী জাতশিল্পী, ছলাকলায় সে আকর্ষণ করতে চাইলে না নারায়ণম-কে, তার চোখে মহতী স্বপ্ন, বিখ্যাত মাদ্রাজী নৃত্যকলাকে আচার-আচরণের শৃঙ্খলমুক্ত করে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় জনমানসে। এই উদ্দেশ্যে নারায়ণমকে পাশে নিয়ে সে সুরু করে দিলো কাজ, দক্ষিণী নৃত্যের অপরূপ শিল্পকৃতি নিয়োজিত হোক মানুষের কল্যাণে এই ছিলো তার সাধনা, এই ছিলো তার স্বপ্ন। কিন্তু নারায়ণম্ হাঁপিয়ে ওঠে এই পরিবেশে, ফেলে-আসা জন্মভূমি তাকে হাতছানি দেয় বারে বারে, তাছাড়া দেশতার লীলাবর্ণন যে নৃত্যের মর্মকথা, সেই নৃত্যকে মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার বাহক করতেও সাড়া দেয় না তার অন্তর। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হৃদয় নারায়ণম্ ফিরে যায় স্বদেশে কিন্তু মৈত্রেয়ী ভোলে না তার ব্রত, একলাই পথ চলে সে আজীবন। রত্নাকে বরণ করে সাধারণ গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করে চলে নারায়ণম্, তার অন্তরলোকে মৈত্রেয়ীর ধ্যানমূর্তির পূজা চলে অনুক্ষণ। প্রেমের এক বৈচিত্র্যময় রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে কাহিনীর মাধ্যমে। দক্ষিণী নৃত্যশিল্পের এক অন্তরঙ্গ পরিচয়ও বিধৃত রচনার মাঝে। অজানাকে জানতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কাছে যে এই রচনা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আমরা বইটি পড়ে খুশী হয়েছি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক-শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

অ-কৃ-ব'র বিচিত্র গল্প সংকলন / বিহার সাহিত্য ভবন

অ-কৃ-ব বাংলা কৌতুকরসাশ্রিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সুপরিচিত নাম। আলোচ্যগ্রন্থে এঁর বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি গল্প একত্র সংকলিত হয়েছে। মোট ছাব্বিশটি গল্প স্থান পেয়েছে এই সংগ্রহে। গল্পগুলি সবই যে কৌতুকরসাশ্রিত তা নয়, ভিন্ন ধর্মী গল্পও কয়েকটি আছে, কিন্তু এদের মেজাজে একটা সমতা আছে, এক অনাবিল প্রসন্নতার ছোঁয়ায় সবগুলিই মনোরম। আলোচ্য গল্পগুলির সবচেয়ে বড় প্রসাদগুণ হল এরা নিছক গল্প বলার তাগিদেই দুষ্ট, কোন ইজম্ বা যুগযন্ত্রণার ভারে ভর্জরিত নয়। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব) প্রকাশক—বিহার সাহিত্য ভবন, প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।—

মুদ্রণ পরিচয় / জেনারেল

বাংলা ভাষায় মুদ্রণ-গণিত ও অক্ষর-বিন্যাসের রীতি-নীতি সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই বললেই চলে। আলোচ্য গ্রন্থটিকে সে কারণেই মূল্যবান বলতে হবে, এতে মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বহুবিধ তথ্যই সন্নিবেশিত হয়েছে। মনে হয় মুদ্রণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রই এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখকদ্বয় — দীপঙ্কর সেন ও সুপ্রিয়চন্দ্র দাস, প্রকাশনা—জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স—প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, দাম—চার টাকা

সম্রাট / বাক্-সাহিত্য

অমৃতসন্ধানী মানুষের মর্মকথা প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য নাটকটির মাধ্যমে। যুগ যুগ ধরে মানুষ অমৃত লাভের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যেপে এই সংগ্রামের পরিসর, তিনটি পর্যায়, সম্রাট এই ট্রিলজির প্রথম নাটক। নাটকটির বক্তব্য সোচ্চার ও সুস্পষ্ট, ভাবাবেগের প্রাবল্যে তা কখনও নিষ্প্রভ নয়। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—রতনকুমার ঘোষ। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—দুই টাকা পঁচিশ পয়সা

কালি কলম

দ্বিতীয় বর্ষের বৈশাখ সংখ্যাটি হাতে পেয়ে আমরা খুশী হলাম। এই সাহিত্য পত্রিকাটিতে বরাবরই উঁচু মানের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদির সমাবেশ ঘটে থাকে, বলা বাহুল্য আলোচ্য সংখ্যাটিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সম্পাদক— বিমল মিত্র, দাম—পঁচাত্তর পয়সা।

বিলাতের চিঠি

ছুটি, ছুটির পরে

সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত আর সপ্তদশ শতাব্দীতে রূপে রসে গন্ধে ফুলে ওঠা শহর বেলজিয়ামের কথা গতবার বলেছি। এবার চলে যাব লুক্সেমবার্গ শহরের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের সীমানা ধরে পশ্চিম জার্মানী—তারপর ইটালীতে মেরানো শহরের পাহাড়ী আবহাওয়ার মধ্যে দুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে।

কনটিনেণ্টে এসেই প্রথম শুনলাম কনটিনেণ্টাল ব্রেকফাস্টের কথা। যখন প্রথমে ইংল্যাণ্ডে আসি, তখন দেখেছিলাম ইংরাজরা স্বভাবতই খুব ভারী প্রাতরাশ করে—এরপর তাদের কাজ হয় আরম্ভ। আর সে তুলনায় দ্বিপ্রাহরিক ভোজন বা লাঞ্চ খুবই সামান্য ও হালকা। স্যাণ্ডুইচ ও চা জাতীয় ছোট ছোট স্ন্যাক্স ও কোন গরম পানীয়। প্রাতরাশে প্রথমেই এরা এক-গ্লাস যে কোন ফলের জুস্, তারপর কর্নফ্লেক্স বা ওইটমিল ঐ জাতীয় কিছু। ক্রমশ টোস্ট, মাখন বা জেলী দিয়ে। ডিমের কোন পদ তো থাকবেই, তারপর বেকন। অবশেষে চা।

বেকন জিনিসটা আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত নাম। খেতেও প্রথম প্রথম অনেকের ভাল লাগে না। এটা হোল গরু বা শূয়রের মাংস-র সরু পাতলা একটা করে স্ল্যাবের মত। ভেজে বা সেঁকে নিয়ে খেতে হয়।

যাই হোক, ইংল্যাণ্ডে এই ধরণের ব্রেকফাস্ট যেখানে, কনটিনেণ্টে তার কিছুও অন্তত বর্তমান থাকবে, সেটা আশা করেছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় কনটিনেণ্টের প্রাতরাশ একেবারেই মনোমত নয়। সেখানে জুস বা ডিম ও বেকনের কোন চিহ্নই নেই। ফ্রেঞ্চ ব্রেডের সঙ্গে আশা করি, পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় আছে। সেই রকম শক্ত, গোল গোল পাঁউরুটির সঙ্গে মাখন বা জেলী। আর জলের মত পাতলা লিকারের চা বা কফি।

যাই হোক, প্রাতরাশের পর আমাদের বাস যখন যাত্রা করল। তখন সকাল সাড়ে সাতটা। রাস্তায় রাস্তায় জল দেওয়া হচ্ছে, ট্রাম-বাস-গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে। দিনের আলোয় দেখলাম ব্রাসেল্‌স্ সাধারণ এক ছোট্ট নগরী।

ভারতী মুখোপাধ্যায়

বাসের মধ্যে দেখি আমাদের দলে আরও দুটি নতুন মুখ। তারা আগের দিন ডোভারে ঠিকমত পৌঁছুতে পারেনি। ফলে জাহাজ ও বাস দুটিই মিস্ করে অবশেষে ভ্রমণ তালিকা অনুযায়ী ব্রাসেলসের হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দুটি ছেলেই আমেরিকান। স্কটল্যাণ্ডে কী কারণে দু'মাস ট্যুরে এসেছিল। ফেরার সময় কনটিনেণ্টে বেড়িয়ে যাচ্ছে। ভালই হল, দুজন প্রতিনিধি আমাদের দলে বেড়ে গেল—আরও দেখলাম লুসি জয়েস, বীটা তারাও খুব উৎফুল্ল। এতক্ষণ ঠিক তাদের মনোমত সঙ্গী কেউ জুটছিল না। সকলেই নয় বিবাহিত অথবা বয়স্ক তাই প্রায় সমবয়সী বয়ফ্রেণ্ড পেয়ে তারাও মিঃ ক্লার্কের ভাষায় 'হ্যাপি অ্যাণ্ড চিয়ারফুল।'

বেলজিয়াম থেকে লুক্সেমবার্গ পর্যন্ত দু'ধারেই দেখলাম গভীর বন, আর মাঝে মাঝে আঙুরের ক্ষেত। কোরিয়ারের মুখে শুনলাম 'সয়েগনেস' বনের মধ্য দিয়ে আমরা মাস্ ও সম্বর নদীর ধারে নামুর শহরের দিকে যাচ্ছি। নামুর শহরটি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে দেখলাম কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী এক ড্রাগন মূর্তি। ব্রাসেল্‌স্ শহরে বিশ্বমেলার সময় এই ধরণের সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম কাঠমূর্তি প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছিল। তারপর সেগুলি দেশের বিভিন্ন শহরে বিতরণ করে দেওয়া হয়। নামুরের ভাগে পড়ে এই ড্রাগন মূর্তি।

এগিয়ে চললাম। সকাল দশটায় 'নাটস' শহরে একটি ছোট্ট সরাইখানায় আমাদের চা খাবার জন্য আধঘণ্টা সময় দেওয়া হল। ট্যুরের নিয়মানুযায়ী প্রাতরাশ, দ্বিপ্রাহরিক ভোজন বা লাঞ্চ এবং নৈশিক ভোজন বা ডিনার ছাড়া বাকী সমস্ত খাবারের খরচ যাত্রীদের নিজেদের বহন করতে হবে। তাই এই সমস্ত খরচার জন্য এবং প্রতি দেশে স্যুভেনির ইত্যাদি কেনার জন্য আমরা প্রত্যেক দেশে ঢোকার আগে বর্ডার থেকে বা কোন ব্যাঙ্ক থেকে পাউণ্ডের নোট বা ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙ্গিয়ে স্থানীয় কারেন্সী কিছু করে নিয়ে যেতাম। সাধারণত একজন বৃটিশ বা নাগরিক বা বসবাসকারী বিদেশী বৃটেন ছেড়ে কোথাও ট্যুরে বেরুলে ৫০ পাউণ্ডের বেশী নিতে পারে না। যাই হোক, এবার নাট্‌স্ শহরে আবার চলে আসি। স্কৃ যার গাছে ঘেরা এই ছোট্ট শহরটির যে ইতিহাস শুনলাম তা হোল, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের বাল্জের যুদ্ধ এই শহরেই হয়। তখন এর নাম ছিল বাসটোন কিন্তু পরে নাটস শহরে রূপান্তরিত হয়।

কথিত আছে আমেরিকান জেনারেলের সঙ্গে জার্মান জেনারেলের যখন এই শহরে সাক্ষাৎ ঘটে; আমেরিকান জেনারেল তখন সারেণ্ডার না করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন এবং

জার্মানীদের উত্তর দেন, 'আই এ্যাম নট গোয়িং টু স্যারেণ্ডার' আমেরিকানরা নটকে নাট বলে তাদের এ্যাকসেণ্টে উচ্চারণ করে, সেই থেকে এই শহরের নাম হয় নাটস ক্যাণ্টি। এর সত্য মিথ্যা জানি না কিন্তু শহরটিতে একটা যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে বেশ রোমান্স লাগছিল। কে জানে হয়ত আমাদেরই দলের কেউ সেই আমেরিকান জেনারেল ছিলেন। আমিই নই তো?

যাই হোক, নাট্‌স শহর ছাড়িয়ে এ্যারলন শহরের মধ্য দিয়ে আমরা পড়লাম, গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ লুক্সেমবার্গে। শহরটি স্বাধীন ও রাজতান্ত্রিক---আয়তন মাত্র এক হাজার স্কোয়ার মাইল ও জনসাধারণের সংখ্যা মাত্র তিন লক্ষ। বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যাণ্ড এই তিনটি রাজ্য একত্রে বেনুলাক্স কান্ট্রি বলে পরিচিত। তাই একটি দেশের ভিসা করালেই অন্য যে কোন দেশে ঢোকা যায় আর বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ দুটি শহরেরই মুদ্রামান এক—ফ্রাঙ্ক। তবে লুক্সেমবার্গের অর্থ অন্য দেশে পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু বেলজিয়াম ফ্রাঙ্ক সব দেশেই পরিবর্তিত হয়।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানীর মধ্যে স্থাপিত এই ছোট্ট সহরটিতেও দুটি ভাষা ---ফরাসী ও জার্মানী। দেশের সমস্ত কাজ খবরের কাগজ---সবই এই দুই ভাষায় ছাপা হয়। রাজধানী লুক্সেমবার্গের একটি হোটেলে আমাদের লাঞ্চ সারা হল---স্যুপ, হ্যাম, আলুভাজা, বীন আর আনারস দিয়ে।

আমাদের বাংলা দেশে একটা কথা আছে, মুড়ি আর ভুঁড়ি ঠাণ্ডা থাকলেই সব ঠাণ্ডা। কথাটা যে কতখানি সত্যি তা এই ট্যুরে বেরিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম। যে-কোন কারণে খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে বা দেরী হলে দলের সকলেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কসমস্ কোম্পানীর শাপ-শাপান্ত করতেন কিন্তু পেটে খাবারটি পড়ে গেলেই সব ঠাণ্ডা— আবার হাসি, গল্প, গান দিয়ে যাত্রা হত সুরু।

জার্মানী

এবার আমরা জার্মানীতে চলে যাব। বেনুলাক্স কান্ট্রিকে শুভ বিদায় জানিয়ে ইউরোপের অন্যতম প্রধান দেশ জার্মানীতে হবে শুভ প্রবেশ। ছোটবেলায় ভূগোল যখন পড়তাম, তখন মানচিত্রের মাধ্যমে জার্মান দেশটার যে-রূপ চোখে ফুটে উঠত, আজ জার্মানীর মধ্যে ঢোকার আগে সেই রূপটাই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

একটা সাধারণ মানুষের কাছে একটা দেশের রূপ কি ভাবে ভাষা নেয়, যখন বসে বসে ভাবি,---মনে হয় সেটাও তো একটা গবেষণার বিষয়। জ্ঞান হবার সাথে সাথে শুনতাম অমুক আত্মীয় প্যারিসে আছে, কিংবা তার মেয়ে বার্লিনে হয়েছে অথবা সে যখন অস্ট্রিয়াতে ছিল---তখনই তার বিয়ে হয়।

সেই সময় মায়ের মুখে শুনে মনে হোত আমাদের নাগালের বাইরে হাত বাড়ানো জগতের আড়ালে প্যারিস, বার্লিন বা লণ্ডন একটা করে স্বপ্নের দেশ বুঝি। আমরা কোন দিনও যেখানে যেতে পারব না। রামায়ণের সীতা যে লঙ্কায় বন্দিনী হয়েছিলেন, সে লঙ্কাকে যেমন কোনদিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না, তেমনি এই দেশগুলিও বুঝি না দেখা, না শোনা জগতেরই দেশ।

কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে ভুল ভেঙ্গে গেল—স্কুলের নীচু ক্লাসে বার্লিন বা লণ্ডন একটা রূপ নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠল---আরও পরে ভূগোল যখন বিশেষ বিষয় হল, তখন শহরগুলির রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সবই যেন বুঝতে পারলাম। মনে হল রাবণ-বন্দিনী সীতা যে লঙ্কায় ছিলেন, যে অশোক বনে অশ্রু বিসর্জন করতেন, তা হয়ত কাব্য ইতিহাস হয়ে গেছে কিন্তু এ দেশগুলি পৃথিবীরই অন্য দিকে আমাদের শহর কলকাতার মতই বিরাজমান---কলম্বাসের নাম স্মরণ করে একদিন বেরিয়ে পড়লে শহরগুলি সবই দেখতে পাব। তাই সেই ছোটবেলার কল্পনার জগৎ আজ যখন চোখের সামনে দেখা জগৎ রূপে ফুটে উঠতে চলল, তখন একটা বিস্ময় ও রোমান্সের আনন্দে যেন মূক হয়ে গেলাম।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর বাস যখন ছাড়ল সকলেই যেন একটু ক্লান্ত। আগের দিন সারাদিন ভ্রমণের পর আজ ভোরে ৬টায় উঠে আবার যাত্রা তাই মনে হল চোখ দুটো যেন বেশ ভারী হয়ে গেছে, একটু বাসের সীটে হেলান দিলে বেশ হয় কিন্তু যতটুকুই ঘুমুব, ততটুকুই তো পথের দৃশ্য চলে যাবে ---দেখতে পাব না। তাই নিজের মনের সঙ্গে রফা করলাম---একঘণ্টা বাদেই তো আমরা ফ্রান্সের সীমানায় পৌঁছুব, সেই একঘণ্টা একটু চোখ বুজে বিশ্রাম নিয়ে নিই।

আমরা যে রাস্তা ধরে পশ্চিম জার্মানীতে প্রবেশ করব, তার জন্য ফ্রান্সের স্ট্র্যাসবুর্গ শহরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে আর সেখানেই এ্যালক্যাম স্টেশনে আমাদের চায়ের বিরতি পড়বে। স্ট্র্যাসবুর্গ শহরটি একশত বছরের মধ্যে চারবার স্বাধীনতা হারিয়েছে---দুবার ফ্রান্সের কাছে, দুবার জার্মানীর কাছে। বর্তমানে শহরটি পূর্ব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। শুধু তাই নয় এর বিশ্ববিদ্যালয় ও বন্দর ইউরোপ বিখ্যাত। স্ট্র্যাসবুর্গের মাঝামাঝি এক জায়গায় দেখলাম মাটি ভীষণ লাল— আমাদের দেশের বীরভূমের মত। তবে এটা মাটি নয়, পাথর---লাল পাথর। এই পাথর দিয়েই স্ট্র্যাসবুর্গের প্রধান গৌরব ত্রয়োদশ শতাব্দীর রেড স্যাণ্ড স্টোন ক্যাথিড্রাল (ক্যাথিড্রাল অব নোথরদম) গঠিত। তবে দেখলাম গির্জার চূড়াটি মোজেইক করা। এই শহরেরই আর একটি গ্রামে

দেখলাম একটি গীর্জার মাথায় বাবুই পাখীর বাসা—কোরিয়ার মিঃ স্মার্ট বললেন সারা বছরই ওই বাসা থাকে, তার মধ্যে পাখীরাও সন্তান-সন্ততি নিয়ে আরামেই বাস করে। ফ্রান্সের যে স্টেশনটিতে আমরা সেদিন বৈকালিক চা খেলাম—সেটি দেখে ফ্রান্সের সম্বন্ধে ধারণা মোটেই ভাল হল না। এত নোংরা স্টেশন আমাদের দেশে কোথাও চোখে পড়ে না, এমন কী বাথরুমেরও দরজা নেই। সেখানেই এক কাপ চায়ের দাম আট শিলিং অর্থাৎ ভারতের মানে আট টাকা।

বাসে উঠে মিঃ স্মার্ট বললেন,—এটাই শহরের সবচেয়ে সস্তা রেস্তোরাঁ, এখানে চা কফির চাইতে এক বোতল বীয়ার সস্তা, চার শিলিং।

শুনে মনের যা অবস্থা হল—বলাই বাহুল্য। প্যারিসে আমাদের দুদিন থাকার কথা—সর্বস্বান্ত হয়ে লণ্ডনে ফিরতে হবে। যাই হোক, মনের ভাবনা মনেই নিয়ে বাসে উঠলাম। সকলে তো একসঙ্গেই আছি। যা হবার একসঙ্গেই হবে।

এবার আমরা ফ্রান্সের সীমানা পেরিয়ে জার্মানীর সীমানায় ঢুকব রাইন নদীর উপরের ব্রীজ দিয়ে। এই সীমানাগুলিতে চেকিং-এর কথা বলা হয়নি। ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের বর্ডার বা সীমান্তে হেলমেট পরা রাইফেল হাতে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে-কোন পদচারী বা যান থাক না কেন, পাসপোর্ট চেক না করিয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ঢোকা যায় না এবং আমরা বাসের মধ্যে, কয়েকজন যাদের বৃটিশ পাশপোর্ট নয় তাদের ভিসাও চেক্ করা হয়। তাই চেকিং পয়েন্টে-এ বাস থামতেই প্রহরী বাসে উঠে সকলের পাশপোর্ট চেক করে কেবল আমাদের অর্থাৎ কানাডীয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, ভারতীয় পাশপোর্টগুলি নিয়ে নেমে যত। অফিস থেকে সেগুলির উপর স্ট্যাম্প লাগিয়ে তবে আমাদের ফেরৎ দিত। অবশ্য জার্মানীতে আমাদের ভিসা লাগে না।

জার্মানীর কেল শহরে আমাদের দাঁড়াতে হল চেকিং-এর জন্য। পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট সুন্দর এই শহরটিতে বহু কলকারখানাও অবশ্য আছে। রাস্তায় ব্রাসেলসের মতই ট্রাম চলছে। দেখলাম ফ্রান্সের নম্বর প্লেট লাগান, যার শেষ দুটি অক্ষর ৬৭, বহু গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কারণ শুনলাম ফরাসী শহর স্ট্র্যাসবুর্গের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উঁচু এবং জিনিষপত্রের দামও প্রচণ্ড—তাই বহু ফরাসী এক-বেলার জন্য কেলে আসে বাজার করতে ও রেস্টুরেণ্টে খাওয়া সারতে। কেলে দেখলাম বহু ট্রাক ও ভ্যান জিনিষপত্র নামাচ্ছে—রুমানিয়া বুখা-রেস্ট ইত্যাদি শহর থেকে গাড়ী এলে তাকে মাল নামিয়ে চেক করে আবার মাল তুলে তবে ছাড়া হয়। শুধু তাই নয়, জার্মানীতে প্রথম যখন ঢোকা হয়, তখন ড্রাইভারকে স্পীডোমিটার রিডিং করে বলতে হবে। আবার বেরুবার সময় মিটার রিডিং করে কত কিলোমিটার মোট ভ্রমণ হয়েছে তার হিসাব দিতে হবে—তার উপর এরা একটা চার্জ ধরে নেয়।

যাই হোক, এক ঘণ্টা ধরে এসব সেরে আমরা কেল ছাড়লাম যখন তখন প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা।

পূর্ব জার্মানীতে আমাদের এরা নিয়ে যাচ্ছে না। পশ্চিম জার্মানীর বন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ভেনজলিংজেন এবং ফ্রাইবার্গ এই শহরগুলি এরা দুদিন ধরে ঘোরাবে। সেদিন রাত্রে আমাদের ভেনজলিংজেনের একটি হোটেলে থাকা—পরের দুদিন পশ্চিম জার্মানী ভ্রমণ—কেল থেকে ভেনজলিংজেন তিন ঘণ্টা লাগে। শহরটি রাত্রের অন্ধকারে যা দেখলাম, মোটামুটি ছোট পরিচ্ছন্ন একটি শহর বলে মনে হল তবে আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট।

পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে সাধারণত লোকে ফ্রাঙ্কফুর্ট আসে বাজার করতে এখানকার জিনিষপত্রের দাম সস্তা বলে। সত্যিই ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মানীর যে-কোন শহরে ইলেক-ট্রিকাল গুড্স অপেক্ষাকৃত অনেক কম দাম। ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার ট্রানজিস্টার, রেফ্রি-জারেটর, এগুলি দেখলাম অনেক উঁচু দরের অথচ দাম অনেক কম। আরও একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে ভারতীয় বিশেষত সিন্ধী ব্যবসায়ীর দল কিভাবে জার্মানীতে ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছেন। শুধু যে ইলেকট্রিক্যাল গুডস-এর জিনিষপত্রই তাঁরা লেনদেন করছেন তা নয়, কাপড় জামা খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি যে কোন দিকেই তাঁরা আছেন।

যাই হোক, পশ্চিম জার্মানীতে দুদিন কাটাবার পর জার্মানীর বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেস্ট দিয়ে আমরা যাত্রা করলাম ইটালীর উদ্দেশ্যে। ব্ল্যাক ফরেস্টের নাম সত্যিই সুন্দর। সারাটা বন বা অরণ্য বিশাল বিশাল গাছ ও কালো কালো পাথরে আবৃত। যে মাসেও দেখলাম সেখানে বরফ পড়ে আছে। শীতকালে এখানে ৬ ফুট করে বরফ জমে। সেইজন্যই নাকি এই অঞ্চলটি স্কী জাম্পিং অভ্যাস করার একটি চমৎকার জায়গা। মাঝে মাঝে বাস থামিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে ছবিও তুলে নিলাম। সকাল ১০টা নাগাদ আমরা যে জায়গায় পৌঁছুলাম তার নাম Donaeschingen. এখান থেকেই দানিয়ুব নদী তার সমুদ্র যাত্রা আরম্ভ করেছে। এখানেই হল আমাদের চায়ের বিরতি।

লেক কনস্ট্যান্স জার্মানী সুইজার-ল্যাণ্ড যার কাছে মিলিত হয়েছে, জনজীবনে তার ভূমিকা বিরাট। এই লেকেই তিনটি দেশ এক সাথে এসে মিলেছে। লেকটি ৮২৭ ফিট গভীর এবং প্রায় ২২৯ স্কোয়ার মাইল জুড়ে এর অবস্থিতি। লেকটি লম্বায় ৪০ মাইল এবং এর সবচেয়ে চওড়া অংশটি ৯ মাইল।

আমাদের কোচ কোরিয়ার চার্টার করে

বললেন, জার্মানরা তো সমুদ্র দেখে দেখেনি, তাই লেককেই তারা সমুদ্র ভাবে।

লেকটিতে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও সুইজারল্যাণ্ড প্রত্যেকের নিজস্ব অংশ আছে, এমনি মাছ ধরার জায়গা অবধি নির্দিষ্ট করা। লেকটির মাছ নিয়ে এরা বেশ ব্যবসাও করে। লেকটিতে দেখলাম বহু ট্যুরিস্টদের ভিড়—এর সুন্দর দৃশ্য, জনসাধারণের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং মৃদু আবহাওয়া বহু ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করে।

সেদিন আমরা ফেলডরিক শহরে যেটা গেট ওয়ে টু অষ্ট্রিয়া বলে পরিচিত সেখানে থামলাম লাঞ্চের জন্য। এরপর ৫,৯১২ ফিট উঁচু আর্লবার্গ গিরিপথ ধরে আমরা যাব ৪,২৭৫ ফিট উঁচু সেণ্ট এ্যাণ্টন শহরে। এই গিরিপথটি রাইন ও দানিয়ুব এবং অষ্ট্রিয়ার ভোরারলবার্গ ও টিরলকে দুভাগ করে দিয়েছে।

যখন আমরা আর্লবার্গ গিরিপথের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় উঠছি তখন মনে হয়েছিল এই বোধহয় আমাদের শেষ বিদেশ ভ্রমণ। অত ঘুর-পথ, তার ধারে অন্তহীন গভীর খাদ বরফে সাদা হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের ড্রাইভার লুসিয়ান অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে সেই দুর্গম গিরিপথ সুন্দরভাবে পার করে নিয়ে এলেন।

এই গিরিপথ ধরে আমরা চলে এলাম ইনসব্রুক শহরে। শহরটি অনেকটা দার্জিলিং-এর মত। এর বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্যালোকের জন্য সরকার এখানে বহু স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইনসব্রুক শহরে আরও দেখলাম বাড়ীগুলিরই সাদা রং—মিঃ স্মার্ট বললেন সাদা রংয়ের বাড়ীই নাকি অস্ট্রিয়ার ঐতিহ্য বা 'ট্রাডিসন'।

সেখানে পৌঁছুতে আমাদের রাত ৯টা বেজে গিয়েছিল। পথের মধ্যে একটি ব্রিজ দেখিয়ে মিঃ স্মার্ট বললেন, এটি এ্যানা নদী থেকে ৩৬০ মিটার উঁচু—অস্ট্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ব্রীজ—নদাচ গবয়েল একটি সুন্দর গল্প শোনালেন রোমানা ও ট্রিমানার। এই দুটি নদী বোনের মত এক সাথে গিয়ে মিশেছে এ্যানা নামে, তারপর ইন নদীতে মিশে সব জল তারা গিয়ে পড়েছে দানিয়ুব নদীতে। সেই গ্রামেরই দুটি বোন নাকি একটি ছেলেকে ভালবাসত। কিন্তু ছেলেটি উভয়ের কোন বোনেরই প্রেমে সাড়া না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়—বোন দুটি নদীতে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে। তাদের স্মৃতিকে স্মরণ করার জন্য গ্রামবাসীরা তাদের নামানুসারে নদী দুটির নামকরণ করেছে রোমানা ট্রিমানা। পথে বহু হাইড্রো ইলেকট্রিক ওয়ার্কস দেখলাম—এগুলি সব আধুনিক, নবনির্মিত। বর্তমানে অস্ট্রিয়া এদের দ্বারা জার্মানী ও ইটালীতে বহু বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে। পথের মধ্যে আরও দেখলাম একটি গীর্জা, তার জানালা ৩৬০টি। আমাদের মিঃ স্মার্ট ঠাট্টা করে বললেন, একজন নান রোজ একটি করে জানালা পরিষ্কার করেন। তাই বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে তার ছুটি মাত্র ৫ দিন। গীর্জাটির পাশেই একটি দুর্গ—পাঠক-পাঠিকারা 'সাউণ্ড অফ মিউজিক' ছবির নায়ককে নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন। এটি সেই ভনট্র্যাপ ফ্যামিলিরই অধিকারে ছিল, এখন অবশ্য দ্রষ্টব্য বস্তু বলে পরিগণিত হয়েছে।

যাই হোক, অনেক ক্লান্তি-শ্রান্তির পর অবশেষে আমরা এসে উপস্থিত হলাম—মেরানো। ইটালীর ও অস্ট্রিয়ার সীমান্তের একটি শহর যাকে বলা হয় সাবজেরো এরিয়া। সেই জন্যই এখানে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা যেমন রয়েছে, তেমনই জিনিষপত্রের দামও অত্যন্ত সস্তা। তাই কসমস্ কোম্পানী এই শহরটিকেই আমাদের বাজার করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। রাত্রে কিছু দেখতে পেলাম না, তবে আমরা যত দেশ ঘুরেছি, তার মধ্যে ভ্রমণকারীদের দেখে জনসাধারণের এত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ অন্য কোথায়ও দেখি নি। বিশেষত শাড়ী পরা বলে দলের মধ্যে আমরা দুজন যেন বিশেষ অতিথিরূপে পরিগণিত হলাম। শুধু যে রাস্তার ছেলেবুড়ো দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁ করে দেখতে লাগল তাই নয়, ভাষা না বুঝলেও হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে আমাদের কত যে ছবি তুলল, তার ঠিক নেই। শহরটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে তুলনাহীন। পাহাড় আঙুরক্ষেত আর অর্কিড ফুলের গাছ—তার সঙ্গে প্রাচীন দুর্গ। এর ফ্রেমে বাঁধানো মেরানো একটি রঙীন ছবি। ইটালীর চামড়া, ছাতা, কাঁচের জিনিষ আর যাবতীয় মদ্য এই শহরটিতে খুব সস্তা। আমি ইটালীর ভেনিস, ব্রিনিডিসি এ দুটি শহরও দেখেছি কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যে মেরানো তুলনাহীন। জলে ঢাকা ভেনিস একটি দ্বীপ কিন্তু ফুলে ঢাকা মেরানো নিজেই একটি ফুল।

পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এবারের মত বিদায় নিলাম। এবার চলে যাব অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টীন ও সুইজারল্যাণ্ড হয়ে প্যারিস। পরের বারে তাই বলার ইচ্ছা রইল।

[ক্রমশ।
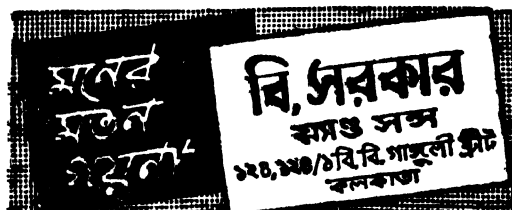
জ্ঞান বিজ্ঞান কোন পথে?

হীরালাল দাশগুপ্ত

জ্ঞান—পরোক্ষ বা শাস্ত্রাদিলব্ধ জ্ঞান।
বিজ্ঞান—প্রত্যক্ষ বা নিজ অনুভবলব্ধ জ্ঞান। —শঙ্কর

মানুষ হাত-পা গুটিয়ে একা-একা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আপনাকে আবদ্ধ রাখতে চায় না। মানুষ চায় আপনাকে প্রকাশ কোরতে—আপনাকে উপলব্ধি কোরতে। তার শরীরের এবং মনের সমস্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন (বঙ্কিমচন্দ্র) কোরে নিজেকে বহুধা বিভক্ত কোরতে। মানুষ—সভ্য মানুষ—চায় অদেখাকে দেখতে—অজানাকে জানতে—অশোনাকে শুনতে—অনাঘ্রাতাকে ঘ্রাণ কোরতে—অনাস্বাদিতকে আস্বাদন কোরতে। রংয়ে-রংয়ে — -রেখায়-রেখায়— আলোতে- ছায়াতে—বর্ণে-বর্ণে গন্ধে-গন্ধে, ছন্দে-ছন্দে—ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে-সঙ্গীতে আর ভাবে, ভাষায়, বৈচিত্র্যে এক মানুষ চায় বহু হোতে।

সোহকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েযেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্তা ইদং সর্বস্বজত।

ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষও তেমনি কাময়ত ইচ্ছা করে, কামনা করে। আমি বহু হবো। শিল্পে-সাহিত্যে জ্ঞানে- বিজ্ঞানে। কিন্তু শুধু ইচ্ছে থাকলেই তো হয় না—সাধনা ছাড়া সৃষ্টি হয় না। সুতরাং "স তপহোতপ্যত"—তিনি তপস্যা করিলেন। সুতরাং বহু হোতে হোলে—নিজেকে চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রকাশ কোরে আত্মোপলব্ধি কোরতে হোলে, চাই—একান্তভাবে চাই—তপস্যা। কোথায় সেই তপস্যা? কোথায় সেই যোগসংসিদ্ধ-জ্ঞানী? কোথায় সেই সংযতেন্দ্রিয়: বৈজ্ঞানিক? আজ জ্ঞান অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। বিজ্ঞান ব্যভিচারে বিবর্ণ।

এই বহু হবার বাসনার আধুনিক পরিভাষা সভ্যতার অগ্রগতি। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই এগিয়ে যাবার ইতিহাসে—বিপথ চালিত বিজ্ঞানের এই তথাকথিত জয়যাত্রার ইতিবৃত্তে অভূতপূর্ব আত্মপ্রসাদ চন্দ্র বক্ষে পদক্ষেপ। আশ্চর্য—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পত্র ও পত্রিকায় সকলে এক সুরে গেয়ে উঠলেন—গেলো—এবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো চন্দ্রের সৌন্দর্য—তার রহস্য-ধূসরতা—তার অনির্বচনীয় ইন্দ্রিয় আবেদন—তার রূপকথা, তার পৌরাণিক ঐতিহ্য বিলীন হোলো জড়পদার্থের বাস্তবতায়। আর কেউ কোনোদিন লিখবে না—"সেদিন আকাশে আছিলো ছড়ানো? তোমার হাসির তুলনা" কিংবা "চাঁদের হাটের বাঁধ ভেঙ্গেছে" কিংবা এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো"—অথবা "বৈশাখী পূর্ণিমা এলো, বৈশাখী পূর্ণিমা এলো, বৈশাখী পূর্ণিমা এলো আজ" কিংবা "চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো" কিংবা; "বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্" ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়—অভিযান সম্বন্ধে এই ধারণা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক কারণ মানুষ কোনো কিছুরই আরম্ভও জানে না, শেষও জানে না যে সত্যিকারের জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী সে যতোই জানে ততোই উপলব্ধি করে যে সে কিছুই জানে না। এ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মহামতি নিউটনের উক্তি উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টি ও ধ্বংস বা রূপান্তর-রহস্য চিরদিন রহস্যেই ঢাকা থাকবে। তার ঘোমটা কোনোদিন একেবারে খসে খুলে যাবে না—মাঝে মাঝে অবিশ্যি ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে তার হাসি দেখা যাবে।

আমরা হিমালয় মহাপর্বতের নির্মাণ-কৌশল জানি বোলে তা কি মানুষকে মুগ্ধ করে না? ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র কি মানুষকে আজও অজানার ইঙ্গিত দেয়না ফুলের সৌরভ কি আজও মানুষের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেনা? আর এই নারী? এই রমণী? নারীদের এনাটমি বিজ্ঞানীর নখদর্পণে। তাই বোলে কি প্রেম পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রহান্তরে আশ্রয় নিয়েছে?

কিন্তু, তথাপি এই অমূলক ধারণার কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়—কারণ, উপধর্ম। চন্দ্র যে সে-কোনো সৃষ্ট বা নির্মিত বস্তুর মতো জড়পদার্থ বিশেষ এ কি মানুষ আগে জানতো না? এ কি মানুষ প্রথম মানুষের চন্দ্রবক্ষে পদক্ষেপের পর জানতে পারলো? উপধর্মের প্রধান লক্ষণ জড়ে চৈতন্য আরোপ। মানুষ বিশ্বাস কোরতো যে চন্দ্র দেবতা—যেমন দেবতা মিত্র, বরুণ, সূর্য ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, পর্জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল চৈতন্য, আরোপিত জড়পদার্থের শক্তিমত্তায় মানুষ ভয়ে হোতো অভিভূত। এবং—অতএব মানুষ বিশ্বাস কোরতো যে মানুষের ভাগ্য ইহাদের কোপও কৃপাদৃষ্টিসাপেক্ষ।

রূপকথা কতোদূর যায় দেখুন। ক্ষীরোদ সমুদ্র থেকে চন্দ্র উঠলেন। রাহু দেবতার ছদ্মবেশে অমৃত পান করলেন। চন্দ্র ও সূর্য গিয়ে বিষ্ণুকে বলে দিলেন। শুধু কি এই? চন্দ্রের স্ত্রী সাতাশটা নক্ষত্র। কিন্তু আসক্তি রোহিণীর প্রতি। ফল অভিশাপ। পরিমাণ যক্ষ্মা। প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত পূর্ণিমা-অমাবস্যার প্রাকৃতিক অপব্যাখ্যা। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে ও পুরাণে এ-রকম

উপপর্ব, উপকথা ও উপন্যাস আছে চন্দ্র কেবল সৌন্দর্যগুণেই দেবতা। এবং এ-সৌন্দর্য তার বহুকাল থাকবে।

কিন্তু আসল কথা এ নয়। আসল কথা এই যে বিভিন্ন ও বিচিত্র মারণাস্ত্র নির্মাণ ও চন্দ্রাভিযানের জন্যে বিপুল অর্থের অপচয়, এর কি কোনো অর্থ, কোনো মূল্য, কোনো সার্থকতা আছে? সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই টাকার মালিক কে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী? একবার টাকার অঙ্কটা কল্পনা করুন। 'The spending rate now has reached a level of £ 5,400,000 per day...the mission will be burning up money at the rate of £ 12,440 per minute or £ 207 per second.' এ তো গেল পরের। এর আগে 'the Apollow moon landing programme alone has cost a massive £ 10,000 million.' জ্ঞান ও বিজ্ঞানের তথাকথিত অগ্রগতির ফলে যে-দেশ আজ material prosperity-র তুঙ্গতম শীর্ষে সমাসীন, সেখানে বস্তি কেন? বেকার সমস্যা কেন? বর্ণবিদ্বেষ-হিংসা-হত্যা কেন? কেন প্রথম মহাযুদ্ধ? কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ? জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হোয়েছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। রেলগাড়ী থেকে টেলিভিসান---বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কিন্তু কী এর ফলশ্রুতি? কী এর যোদ্ধা ফল? মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ মনুষ্যত্বহীন মানুষের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপকরণ সরবরাহ আর ব্যাঙ্কের লেজারে লেজারে তিন-তিরিক্কে নাচের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে Credit balance-এর অতিকায় বৃদ্ধি। সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, শিল্প, বাণিজ্য কিংবা কাব্য-সাহিত্য-বিজ্ঞান কিসের জন্য? কাদের জন্য? একমাত্র জনসাধারণের জন্য। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কী দেখ্‌তে পাওয়া যায়? দেখতে পাওয়া যায় যে কবি কাব্য রচনা করে নামের জন্য---সাহিত্যিক অসাহিত্য সৃষ্টি করে নাম (দুর্নাম) আর টাকার জন্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠার জন্যে, কিংবা নেহাৎ নেশার জন্যে। কিন্তু এই মৌলিক সত্য ও সমস্যা নিয়ে কি বর্তমান যুগের জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন? তাঁরা ভুলে যান যে, 'a creature must live before it can act.' আগে মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে হবে, তার পরে সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান গবেষণার সবচেয়ে বড়ো বিষয় মঙ্গলগ্রহ নয়---এই পৃথিবী আর এই পৃথিবীর মানুষ। বৈজ্ঞানিকের শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং শিল্পপতি ও রাষ্ট্রপতিদের একমাত্র কর্তব্য সেইসব উপায় ও প্রণালী, তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার কোরবার চেষ্টা করা যাতে কোরে পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষ পেতে পারে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সুখ-শান্তি এবং দীর্ঘ পরমায়ু।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী? সত্যের অনুসন্ধান ও উপলব্ধি। আর জ্ঞানের উদ্দেশ্য পরম শান্তি লাভ। সুতরাং সেই গবেষণায়ই নিযুক্ত থাক্‌বে যার ফল প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতকর। যেহেতু "যদ্‌ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম" (শান্তিপর্ব)। সভ্য-জগৎ কি এই সত্যের সন্ধান পেয়েছে? আর জ্ঞান। "জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেনাধি গচ্ছতি" (জ্ঞানযোগ)। কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই জ্ঞান অর্জন করে শান্তি লাভ করতে পারে?

"বিহায় কামান যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"
(সাংখ্যযোগ)।

পৃথিবীতে এই শান্তি আছে কি?
সুতরাং প্রশ্ন: জ্ঞান ও বিজ্ঞান কোন্ পথে?

চন্দ্রলোকে মানুষ

রীনা মুখোপাধ্যায়

নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ অবস্থায়
আলোর বিকিরণ ছিটিয়ে
যে ছিল, আকাশে বিরাজমান
বহু শতাব্দী ধরে আপনকক্ষে
শুধুমাত্র সৌন্দর্য লয়ে।

আজ কোন্ পরম লগনে সেখানে
পড়ল মানুষের পদধূলি
থাকল না আর নিস্তরঙ্গতা
রইল না সৌন্দর্যের গোপন রহস্য
ধ্বনিত হল মানুষের কলকাকলি।

যে আমেরিকা কোরল অভীষ্ট সাধন
পাঠায়ে মহাকাশচারী ত্রয়,
সফল হল বিজ্ঞান সাধনা
আজ, ধন্য হল, সারা বিশ্বের লোক
লয়ে অনুভূতি ও বিস্ময়॥

বনলীনা

সংকর্ষণ

মিরহাউলি পাহাড়। গাছপালা লতাগুল্ম দিয়ে আবৃত। বনের নিবিড় বেষ্টনী ভেদ করে এখানে পৌঁছানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। পাহাড়ের নীচের দিকে একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ আছে। এই সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছানো যায়। স্থানীয় বনের প্রাণীরা ছাড়া এই সুড়ঙ্গ পথের খবর কেউ রাখে না।

এখানকার বনের সঙ্গে মুকুর নিবিড় পরিচয় আছে বলে সুড়ঙ্গ পথটির সন্ধান পেয়েছিল সে। জেনী, সুগত ও মুংনীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উপস্থিত হল। পাহাড়ের ওপরটা বিস্তীর্ণ একটা সমতলভূমির মত। মাঝখানে ছোটখাট একটা হ্রদ, হ্রদের চারপাশে নিসিন্দা, শিরীষ, কদম, অর্জুন, শাল, মহুয়া প্রভৃতি গাছের বন। শিরীষ গাছকে জড়িয়ে উঠেছে মালতী ও কুন্দলতা। গাছ ও লতার সবুজ পাতার সমারোহ ফুলের ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে। বন নয়, যেন বাগান। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

জেনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললে, এ যেন রামায়ণের সেই চিত্রকূট পর্বত। রামায়ণের বর্ণনার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে। আমার কী মনে হয় জান সুগত? আমার মনে হয় শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চয়ই সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে এসেছিলেন এখানে। এখানকার বনের মধ্যে অরণ্য কাণ্ডের শ্লোকগুলো যেন সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

জেনীর উচ্ছ্বাস স্পর্শ করে না সুগতকে। মিরহাউলির পাহাড়ের সঙ্গে চিত্রকূটের সাদৃশ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি নেই তার। মধ্যপ্রদেশের এই বনের মধ্যে জেনী চায় রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চিহ্ন উদ্‌ঘাটন করতে। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে যে পথ দিয়ে দণ্ডকারণ্য হয়ে পঞ্চবটী গিয়েছিলেন, সেই পথের সন্ধান নিচ্ছে সে। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কাজ করলেও রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড বা শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস সম্বন্ধে উৎসাহ নেই সুগতর। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনী এদেশে এসেছে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে। সুগত সিংরৌলির বনক্ষেত্রে জরীপের কাজ করছে জেনে তার সঙ্গে পরিচয় হতেই তার ক্যাম্পে চলে এসেছিল জেনী। আর্যসভ্যতার আদিম রূপটিকে চিনে নেবার জন্য অরণ্যের মধ্যে পর্যটন করে জেনী। জেনীর ধারণা আর্যদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রই প্রথম দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। বনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন তাঁর পায়ের চিহ্নকে অনুসরণ করে অনার্যদের ওপরে আর্যদের প্রভাবের প্রথম স্বাক্ষরকে চিনে নিতে চায় সে। সিংরৌলির বনক্ষেত্রে নতুন কয়লার ক্ষেত্রের সীমানা জরীপ করছিল সুগত, বনের মধ্যে আর্যসভ্যতার প্রথম প্রতিফলনের প্রতি মনোনিবেশের সময় ছিল না তার।

সুগতর বন-জরীপের সঙ্গে জেনীর বন পরিক্রমার কোন সম্পর্ক না থাকলেও দু'জনের সম্পর্ক সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন সুগতর ওপরওয়ালারা। বিদেশী মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাকে তাঁরা অনিষ্টকর বলে মনে করে সুগতকে নির্দেশ দেন জেনীকে তার ক্যাম্প থেকে বহিষ্কৃত করার জন্য। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকার করায় সুগতর চাকরি যায়।

সুগতর চাকরি যেতে জেনী তার বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখে সুগতর জন্য একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ না থাকলেও জেনীর সঙ্গে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আর্যসভ্যতার পুরা চিহ্নগুলিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে সুগত।

পুরাতত্ত্বে ঝোঁক না থাকলেও বন ও বনের মানুষদের ভালবাসত সুগত। কাজেই জেনীর সঙ্গে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার খারাপ লাগত না।

বনের মধ্যে শবর শ্রেণীর নরনারীরা বাস করত। বন জরীপ করে বন কেটে বসত গড়ার উদ্যোগ করলেও সুগতকে তারা ভালবাসত। কিন্তু জেনীকে তারা সুনজরে দেখেনি।

তাকে তারা ডাইনী বলে সাঁওতাল এবং বেয়ে কেজার ষড়যন্ত্র করল।

বনের মানুষদের মধ্যে মুকু নামে একজন আধবুড়ো লোক ছিল। যৌবন অতিক্রম করলেও অসাধারণ শক্তিমান ছিল সে। তাকে দেখে জেনীর মনে হত যেন পাথর কুঁদে গড়া একটি মূর্তি। জেনী ও স্বগতর একান্ত অনুগত ছিল সে। জেনীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা টের পাওয়ামাত্র স্বগত ও জেনীকে নিয়ে পালিয়ে এল সে মিরহাউলি পাহাড়ে। বনের মানুষেরা মিরহাউলি পাহাড়কে অপদেবতার স্থান বলে মনে করত এবং পাহাড়টির ধারেকাছেও ঘেঁষতে চাইত না। কাজেই এই পাহাড়টিকেই বনের মধ্যে একমাত্র নিরাপদ জায়গা বলে মনে করল মুকু।

●

জেনী ও স্বগতকে নিয়ে মুকুর মিরহাউলি পাহাড়ের দিকে যাত্রা বনের মানুষদের নজরে না এলেও মুংনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শবর সম্প্রদায়ের মেয়ে সে। দেহের দুকূল ছাপিয়ে যৌবন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও হরিণের চোখের মত কালো চোখ দুটিতে শিশুসুলভ সরলতা আছে পরিস্ফুট হয়ে। মুকু, জেনী ও স্বগতর সঙ্গে সেও চলল মিরহাউলি পাহাড়ের দিকে।

তাকে নিবৃত্ত করার জন্য মুকু বললে, মিরহাউলি পাহাড় অপদেবতার ঠাঁই—বনের মানুষেরা ওখানে যায় না।

মুকুর মুখের ওপরে কালো চোখের কটাক্ষ হেনে মুংনী বললে, বনের মানুষেরা যায় না তো তুমি যাচ্ছ কেন?

মুকু জবাব দিল, আমি যাচ্ছি ওদের পৌঁছে দিতে। ঐ পাহাড় ছাড়া অন্য কোন জায়গা তো নিরাপদ নয় ওদের পক্ষে।

—কিন্তু ওদের ওখানে পেঁাছে দিয়ে তুমি কী পারবে ফিরে আসতে?

—না, তা পারব না।

—তা আমি জানি। তাই আমি তোমাদের সঙ্গ নিয়েছি।

মুংনীর হাত ধরে তার কানের কাছে মুখ এনে জেনী চাপা গলায় বললে, মুকু ফিরে আসবে না জেনে আমাদের সঙ্গ নিয়েছ তুমি। একজন আধবুড়ো মানুষের ওপরে এত টান!

চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মুংনীর কালো মুখ—তার কালো চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায়। ফিসফিসিয়ে সে বললে, আধবুড়ো কাকে বলছ মেমসাহেব। অনেক জোয়ান পুরুষ তো দেখলাম, কিন্তু ওর মত দেখিনি কাউকে।

মিরহাউলি পাহাড়ে এসে জেনীর মত মুংনীও খুশি হল। সে বললে, এখানে আর কেউ নেই, কেউ কখনো আসবেও না—এ আমাদেরি রাজত্ব। মুকুকে এখানকার রাজা করে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করব আমরা।

জেনী হেসে ফেলে বললে, মুকু তোমার মনের রাজা হতে পারে, কিন্তু এই বনের রাজা হবে কোন অধিকারে?

গম্ভীর মুখে মুংনী বললে, এই বনকে ওর মত কেউ ভালবাসে নি—সেই অধিকারে। ও ছাড়া এই পাহাড়ে আমাদের কে নিয়ে আসতে পারত বল। ওর সাহায্য ছাড়া এই পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ারও উপায় নেই। পাহাড়টার চারপাশ একেবারে খাড়া হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে—বনের পশুরাও কোথাও পা রেখে দাঁড়াতে পারবে না। ঐ সুড়ঙ্গপথটি ছাড়া আর কোন যাতায়াতের পথ নেই। এই পথটি একমাত্র মুকুরই চেনা। হাজার চেষ্টা করলেও আমরা এই সুড়ঙ্গর মধ্যে ঢুকে বেরোবার পথ খুঁজে পাব না।

মুকু বললে, তা ছাড়া সুড়ঙ্গটা তোমাদের পক্ষে নিরাপদও হবে না। সুড়ঙ্গের মধ্যে কয়েকটি গুহা আছে। গুহাগুলির মধ্যে সাদা বাঘ থাকে। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে অনেকবার এখানে আমি এসেছি বলে তারা আমাকে চেনে এবং আমার দ্বারা ওদের কোন ক্ষতি হবে না এ বিশ্বাস থাকাতে আমাকে কিছু করবে না ওরা। তোমরা আমার সঙ্গে আছ বলে ওরা তোমাদের মেনে নিয়েছে, কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা সুড়ঙ্গে ঢুকলে তোমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবে না। মুংনী বলছিল আমাকে এখানকার রাজা করবে সে। কিন্তু এখানকার আসল রাজা হল এই সাদা বাঘেরা ওদের ভয়ে বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, হাতি, বুনো শুয়োর কেউই সাহস পায় না এই পাহাড়ে আসতে।

চোখ বড় বড় করে জেনী বললে, তা হলে আমাদেরও এখানে আসা উচিত ছিল না। সাদা বাঘ মানে তো মূর্তিমান বিভীষিকা। চিড়িয়াখানাতেই দেখতে ভাল, তার পাশাপাশি থাকাটা নিশ্চয়ই স্বস্তিজনক হবে না!

মৃদু হেসে মুকু বললে, তার পাশাপাশি থেকেই সত্যি-কারের স্বস্তি পাবে। তার ভয়ে বনের পশু বা মানুষ কেউই এখানে ঘেঁষবে না। বনের মানুষেরা ওকে অপদেবতা বলে মনে করে যমের চেয়েও বেশি ভয় করে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে মুকুর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে জেনী বললে, এই ভয়ঙ্কর জীবটির সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হল কী করে জানতে পারি কী।

—মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব যে ভাবে হয়, ঠিক সেই-ভাবে। ওদের আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে, ওদের আমি ভালো চাই, বাঁচতে দিতে চাই। ওদের ভয়ে বনের অন্যান্য পশুরা ওখানে ঘেঁষতে চায় না বলে ইদানীং ওদের পক্ষে শিকার জোটানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে। শুধু এই পাহাড় নয়, পাহাড়ের আশেপাশেও কোন শিকার মিলছে না ওদের। নিজেদের আস্তানা থেকে বেশি দূরে যেতে অভ্যস্ত না হলেও ক্ষিদের জ্বালায় মিরহাউলি পাহাড় ছেড়ে অনেক দূরের বনে যেতে বাধ্য হচ্ছে ওরা। নিয়মিত যেতে অবশ্য চায় না, কাজেই মাঝে মাঝে ওদের অনাহারে থাকতে হচ্ছে। বারকয়েক এখানে এসে ওদের এই অসুবিধেটা লক্ষ্য করে আমি প্রায়ই

হরিণ ও বুনো শুয়োর শিকার করে এনে দিতে শুরু করেছি। আমার শিকার করা পশু পেয়ে ওদের শিকার করার প্রয়োজন কমেছে ও আমাকে ওদের সত্যিকারের বন্ধু বলে ভাবতে শুরু করেছে।

জেনী বললে, তুমি এখানে থাকতে শুরু করলে ওদের জন্য শিকার জোটাবে কী করে?

মুকু জবাব দিল, যেখানে শিকার মেলে সেখানে গিয়ে শিকার করে নিয়ে আসব। সুগতবাবুকেও নিয়ে যাব আমার সঙ্গে, আমি ভাবছিলাম সিধি থেকে দুটো ঘোড়া কিনে আনব। ঘোড়ায় চেপে শিকারে যেতে খুব সুবিধে হবে। যাকগে, সে পরের কথা---এখন নিজেদের আস্তানা তৈরী করে ফেলা যাক, এস চারজনে মিলে চটপট আমাদের ঘর গড়ে তুলি।

●

হ্রদের ধারে শাল ও মহুয়া গাছ দিয়ে বেষ্টিত একটি ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে ঘর তৈরী করার আয়োজন করে মুকু; মাটি, বাঁশ, গাছের শাখা, কুশ, কাশ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে দুটো ঘর তৈরি হল দুদিনের মধ্যে।

ঘর দেখে খুশি হল জেনী। সুগতকে সে বললে, ভারি সুন্দর ঘর হয়েছে, তাই না? গাছপালাগুলিকে যেন ঘরের আকার দেওয়া হয়েছে। ঘরের চেয়ে বাইরেটা অবশ্য আরও সুন্দর। এই দেখ না বনের মধ্যে কত ফুল ফুটেছে ও ঝরে যাচ্ছে, বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। বনের মধ্যে যে এত ফুল ফোটে তা আমার ধারণাই ছিল না। আমাদের দেশের সেরা বাগানেও আমি এত ফুল ফুটতে দেখিনি।

সুগত বললে, ঘরের চেয়ে বাইরেটা যখন ভাল লাগছে তোমার, বাইরে থাকলেই তো হয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুগতর মুখের দিকে তাকিয়ে জেনী বললে, কেন, ঘরে থাকতে আপত্তি কিসের তোমার?

আমতা আমতা করে সুগত বললে, ঘরে থাকতে আপত্তি হবে কেন---শুধু ভাবছিলাম তোমার আমার একই ঘরে থাকাটা---

সুগতর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জেনী বললে, তোমাকে ও আমাকে একই ঘরে থাকতে হবে সুগত, নইলে একঘরে করে দেবে আমাদের মুকু---এই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে। এই পাহাড় ছেড়ে চলে যাওয়া মানে যে সিংরোলির বনের মানুষদের হাতে প্রাণ হারানো তা নিশ্চয়ই অজানা নয় তোমার কাছে।

জেনীর কথার ওপরে কোন কথা বলতে পারে না সুগত ---নীরবে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু।

সুগতর মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জেনী বললে, তোমার সঙ্গে একই ঘরে থাকার কথা ভাবতে আমি কিন্তু অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ বোধ করছি। নতুন সংসার শুধু নয়, নতুন একটা সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টি করতে চলেছি যেন আমরা।

বলে সুগতকে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে বেষ্টন করে জেনী। তার পুষ্পিত যৌবনের কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করে সুগত।

●

দেখতে দেখতে মিরহাউলি পাহাড়ের ওপরে বর্ষা নামে। আকাশে মেঘ জমতে জমতে পাহাড়ের আকার নেয়---সূর্যতাপে পরিক্লিষ্ট মাটির তৃষ্ণা মেটায় বৃষ্টির ধারা। নতুন বৃষ্টি দেখে মন মেতে ওঠে জেনীর, সে তার পোষাক খুলে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে বৃষ্টির মধ্যে এসে দাঁড়ায়। বৃষ্টি দেখে মুংনীও বেরিয়ে আসে। জেনীর দেখাদেখি সেও তার পরনের কাপড় খুলে নবজলধারায় সিক্ত করে নিজের দেহকে।

মুকু ও সুগত দুজনেই তখন বনের মধ্যে মধু ও ফল সংগ্রহ করতে গিয়েছে। দিন দুই আগে তারা হরিণ শিকার করে এনেছিল। সেই হরিণের মাংস ঝলসে রেখেছে মুংনী ও জেনী। ফল ও মধু নিয়ে মুকু ও সুগত ফিরলেই তারা খেতে বসবে।

বৃষ্টির ধারায় স্নাত মুংনীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল জেনী। এ কী আশ্চর্য রূপান্তর! নতুন যৌবনের কুঁড়িটি কোন মন্ত্রবলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের আকার নিল!

কী দেখছ অমন করে!---সলজ্জ হেসে বললে মুংনী।

জেনী বললে, দেখছি তোমাকে---শুধু তোমাকে নয়, মুকুর আশ্চর্য ক্ষমতাকেও।

সঙ্গে সঙ্গে বেগুনী হয়ে উঠল মুংনীর কালো মুখখানা। চোখ নামিয়ে নিয়ে সে বললে, ভারি অসভ্য তুমি মেমসাহেব।

জেনী হেসে ফেলে বললে, অসভ্য তো সকলেই---এই গাছপালা, ফুলফল, সভ্যতা কোথায় আছে বল! এই পাহাড়টা সভ্য হয়ে বসে থাকলে শুকনো পাথর ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকত! শিষ্টাচার মেনে নিয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকলে ঐ আকাশটাও হয়ে থাকত রিক্ত। রামায়ণ পড়েছ মুংনী?

---লেখাপড়া তো জানি নে মেমসাহেব, পড়ব কী করে?

---পড়ো নি! ঠিক আছে, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি তোমাকে রামায়ণের গল্পটা আগাগোড়া বলব ক্রমে ক্রমে। এখন শোন, বৃষ্টি সম্বন্ধে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কী লিখেছে। লিখেছে সূর্যের কিরণের সাহায্যে সমুদ্রের রস পান করে আকাশ গর্ভধারণ করে---তারপর প্রসব করে জলরূপ রসায়ন।

চোখ বড়ো বড়ো করে জেনীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুংনী, কী বলছ তুমি মেমসাহেব, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে জেনী বললে, বুঝতে পারবে মুংনী, বুঝতে পারবে। নিজের দিকে তাকাও, নিজের চারদিকে চোখ মেলে দেখ---তা হলেই বুঝতে পারবে তিলে তিলে সকলে যেমন সঞ্চয় করছে, তেমিনি দিচ্ছেও, এখন বল, দেবার পালা কী আসে নি তোমার? মুকু তোমার শরীরে ফুল ফুটিয়েছে, ফল কী ফলায় নি।

মুংনী অস্ফুট কণ্ঠে বললে, ফলিয়েছে মেমসাহেব, আশ্চর্য ওর ক্ষমতা!

বলে সে চোখ তুলে তাকায় জেনীর দিকে। দেখে চমকে ওঠে। বৃষ্টিধোয়া একরাশ শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে যেন। অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গ যেন সংহত হয়ে আছে। দেখে চোখে পলক পড়ে না মুংনীর।

নীরব বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুংনী বললে, সার্ভেয়ারবাবুর ক্ষমতাও তো কম নয় মেমসাহেব। রাশি রাশি ফুল ফুটিয়েছে তোমার সারা শরীরে।

স্নিগ্ধ হেসে জেনী বললে, ফুল আগেই ফুটেছিল—অনেক পুরুষের সোহাগ আদরে পুষ্ট হয়েছে আমার যৌবন। তোমাদের সার্ভেয়ারবাবু অবশ্য জীবন দিয়েছে আমার যৌবনকে ফল ফলিয়েছে আমার দেহের মধ্যে।

সত্যি বলছ'— জেনীকে জড়িয়ে ধরে সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে মুংনী।

—সত্যি নয় তো কী! দিতে ও চায় নি, আমিই জোর করে আদায় করে নিয়েছি।

খুশিতে গদগদ স্বরে মুংনী বললে, জানো মেমসাহেব, এই পাহাড়ে চাষ করে ফসল ফলাবে ঠিক করেছে মুকু, আমার গর্ভে সন্তান এনে দিয়ে তার নিজের ওপরে বিশ্বাস জন্মেছে, উৎসাহের সঙ্গে জমি তৈরি করে বীজ বুনতে শুরু করেছে সে। সার্ভেয়ারবাবুর ক্ষমতার কথা জানলে সে নিশ্চয়ই তাকেও লাগিয়ে দেবে চাষের কাজে।

মৃদু হেসে হেসে জেনী বললে, তোমাদের সার্ভেয়ারবাবুর ক্ষমতার কথা বলে দিও তুমি মুকুকে। সে তাকেও লাগিয়ে দিক চাষের কাজে। ওরা দুজনে মিলে এখানকার মাটিকে শস্যশালী করে তুলুক—গড়ে তুলুক নতুন দেশ, নতুন রাজ্য। আমরা ওদের সন্তানদের লালন পালন করে গড়ে তুলব নতুন সমাজ; নতুন সভ্যতা।

জেনীর কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না মুংনী, কিন্তু শুনে খুশি সে, নতুন পরিবেশ, নতুন সৃষ্টির আনন্দ বিচিত্র এক আনন্দ শিহরণের তরঙ্গ তোলে তার মনের মধ্যে।

৩

বৃষ্টি থামল। গা মুছে কাপড় পরে একটি কালো পাথরের ওপরে বসল দুজনে পাশাপাশি। মেঘের ছায়াঢাকা বনের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে তারা সুগত ও মুকুর জন্য। অদূরে একটি কদমগাছে ফুল ফুটেছে। ফুল ফুটেছে একটি নিসিন্দা গাছকে জড়িয়ে ওঠা কুন্দলতায়। বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশে যায় ফুলের মিষ্টি গন্ধ। এই গন্ধের মধ্যে জেনী যেন সুদূর অতীতের স্পর্শ পায়—মাল্যবান পর্বতে বর্ষা দেখে সীতাহারা রামের ব্যাকুলতা যেন এই গন্ধ বেয়ে ভেসে আসে। মাল্যবান পর্বতে রামের দুঃখ যেন সজীব হয়ে ফুটে ওঠে মিরাডুরি পাহাড়ের বর্ষাপ্লুত বনের মধ্যে।

অতীতের মধ্যে মগ্ন দেহ বর্তমানের কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিল জেনী, হঠাৎ তার সম্বিৎ ফেরে মুংনীর কণ্ঠস্বরে।

ও কী মুকু যে একাই ফিরে আসছে!—আর্তস্বরে বলে উঠল মুংনী।—ওর সঙ্গে সার্ভেয়ারবাবুকে দেখছি না তো।

চমকে উঠে সামনের দিকে তাকিয়ে জেনী দেখল মুকু একাই আসছে, তার সঙ্গে সুগত নেই।

জেনী ছুটতে ছুটতে মুকুর কাছে ছুটে গিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তুমি একা ফিরে এলে যে! সুগত কোথায়?

মুকু মুখ নীচু করে বললে, সার্ভেয়ারবাবু পাহাড় থেকে নেমে গেছেন, একা সুড়ঙ্গ পেরোতে পারবেন না বলে তাঁর সঙ্গে সুড়ঙ্গের শেষ পর্যন্ত গিয়েছি।

তুমি ওকে সুড়ঙ্গ পার করিয়ে দিলে মুকু!—আর্তস্বরে বলে ওঠে জেনী।—কিন্তু ওকে ছেড়ে আমি থাকব কী করে।

মুকু চমকে উঠে তাকাল জেনীর মুখের পানে। সুগতর জন্য তার এই ব্যাকুলতা যেন সে প্রত্যাশা করেনি।

জেনী নিজের ঘরে এসে মেঝের ওপরে বসে পড়ে। তার ফ্যাকাশে মুখে একটা চরম রিক্ততাবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, মাত্র কয়েক মাসের পরিচয় তার সুগতর সঙ্গে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন গভীর ভালবাসা সম্ভব হল কী করে ভেবে পায় না সে। আমেরিকায় একাধিক পুরুষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে, দৈহিক সংসর্গও হয়েছে—কিন্তু তার অস্তিত্বের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে মিশে যায় নি কেউ, দেহতটে দুটি সত্তার রাসায়নিক সংমিশ্রণে যেন এক অসীম সুন্দরের সৃষ্টি হয়েছিল। সুগত চলে গেলেও সেই সুন্দরের স্বাক্ষর রয়ে গেছে তার দেহের কোষে কোষে, গর্ভে নিহিত ভ্রূণের মধ্যে।

সুগত চলে গেলেও অমর হয়ে রইল তার মধ্যে, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে সে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত, নিষ্প্রাণ প্রতিমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুগতকে হারাবার দুঃখ তার দুর্বিষহ, কিন্তু তার চেয়েও দুঃসহ মনে হয় সুগতর তার ভালবাসা সইবার অক্ষমতা। সেদিন গাছপালা ফুলফলের নানা রঙের বর্ণালীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুগতর কানে কানে সে বলেছিল, আমার জীবন তোমাকে পেয়ে পূর্ণ হল, সার্থক হল। তোমার সঙ্গে এই বনের মধ্যে সারাজীবন নির্বাসিত হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

সে তার নিজের হৃদয়কে এমনি উন্মোচিত করেছে বলেই বুঝি সুগত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। অন্ধকারের জীব যেমন আলো সইতে পারে না, তেমনি তার ভালবাসাকে সইতে পারেনি সুগতর কুণ্ঠিত মন।

সুগতর হৃদয়ের দৈন্য তার মনকে দীর্ণবিদীর্ণ করে—তার জীবনের প্রত্যয়কে করে বিপর্যস্ত। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে এক নিরালম্ব শূন্যতা অনুভব করে সে।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ হল। কে যেন খুব দ্রুতবেগে কুটিরের দিকে ছুটে আসছে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে বেগ সঞ্চার করে। হঠাৎ ঘরের মাঝখানে হাঁফাতে হাঁফাতে

এসে দাঁড়াল সুগত। তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, পোষাক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

সুগতকে দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল জেনী।

—ফিরে এসেছ তুমি!—রুদ্ধশ্বাসে বললে জেনী।

হাঁফাতে হাঁফাতে সুগত বললে, হ্যাঁ ফিরে আসতে হল। পালাতে চেষ্টা করেও পারলাম না পালাতে।

—কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে একা একা ঐ সুড়ঙ্গপথটি পেরিয়ে এলে কী করে!—জেনীর গলার স্বরে উত্তেজনা।—আশ্চর্য সাহস তো তোমার!

—প্রাণের দায়ে পেরিয়ে আসতে হল।

প্রাণের দায়টা কী প্রশ্ন করে না জেনী। সুগতকে ফিরে পেয়ে তার সব অভিমান ও ক্ষোভ দূর হল, ঘুচে গেল মনের শূন্যতাবোধ। সুগতকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে নিজের ভেতরকার নির্জীব প্রতিমার মধ্যে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সে আবার।

জেনীকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বস্তিবোধ করে সুগত। কারণ জেনী আরও বেশি জানতে চাইলে বাধ্য হত সে মিথ্যা জবাব দিতে।

কারণ সে স্বেচ্ছায় ফিরে আসেনি। মুকু তাকে সুড়ঙ্গ পার করিয়ে দিয়ে ফিরে আসতেই তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল এক জোড়া সাদা বাঘ। সন্ধ্যার আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে মূর্তিমান বিভীষিকা যেন।

বাঘদুটি তাকে এগিয়ে যেতে দেয়নি, বাধ্য করেছে সুড়ঙ্গের মধ্যে ফিরে আসতে। তাকে তাড়া করে নিয়ে এসেছে আবার পাহাড়ের মাথায় তার ঘরের সামনে। সে ঘরে ঢোকার পর তারা ফিরে গিয়েছে।

জেনীর অনাবৃত যৌবনের শুভ্র আবর্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে সুগতর মনে হল জেনীর দুর্বার কামনাই যেন সাদা বাঘের রূপ ধরে তাকে টেনে এনেছে আবার তার দেহের তটে। তার দেহের আশ্রয়ের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ বোধ করে সে।

মিছিলে

বুদ্ধদেব পণ্ডা

মিছিলে মুখ খোঁজা আমার বহুদিনের অভ্যাস,
তাই মিছিলের আওয়াজ শুনলেই ছুটে যাই,
খুঁজি আমার সেই প্রিয় মুখ—
হাজারো মানুষের ভীড়েও দূরে থেকে চোখে পড়ে যার
স্বাতন্ত্র্য

সেই মুখ:
উদ্ভাসিত স্বপ্নমাখা ত্যাগে, প্রতিজ্ঞা ও পৌরুষের দার্ঢ্যে;
সেই বজ্রমুষ্টি:
স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আপোষহীন সংগ্রামের শপথে
আন্দোলিত।

সেই অন্তর:
প্রেমে ভালবাসায় ভরপুর;
সেই চরণ:
সমস্ত মিছিলকে টেনে নিয়ে যাবার মতো বলিষ্ঠ।
খুঁজি সেই তাঁকে,
যাঁর একটিমাত্র আহ্বানে স্তব্ধ অরণ্যেও জাগে মর্মর,
যাঁকে প্রণাম ক'রে বলা যায়
বন্ধু, আজ থেকে তুমি হও আমাদের নায়ক,
গড়ে নাও আমাদের একলক্ষ যথার্থ সৈনিক ক'রে।
কিন্তু আজও আমি তাকে পেলাম না।
খুঁজতে খুঁজতে
একদিন হয়তো তাকে পাব-ই।

জেনারেল আইসেনহাওয়ার

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

গত ৯ই এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস্ রাজ্যে অবস্থিত অ্যাবিলীন নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের পাঞ্চভৌতিক দেহ ভূ-সমাধিস্থ করিবার দৃশ্য যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা পরলোকগত রাষ্ট্রনেতার প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। পাঁচ হাজার যেখানকার লোকসংখ্যা সেখানে রাতারাতি প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সমাগম অ্যাবিলীনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আইসেনহাওয়ার দিগ্বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, আট বৎসর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক ছিলেন—কিন্তু জনগণ ঐ দিন যাঁহার কথা বিষণ্ণ হৃদয়ে ভাবিতেছিল তিনি ঐ সকল ভূমিকার আইসেনহাওয়ার নন, তিনি হইলেন মানুষ আইসেনহাওয়ার—যাঁহার সততা, নির্ভীক কর্তব্যনিষ্ঠা, উদার সহানুভূতি, স্বচ্ছ সরলতা এবং নিরভিমান তাঁহার ব্যক্তিত্বকে একটি আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় মন্ডিত করিয়া রাখিত।

আইসেনহাওয়ার ছিলেন একজন আদর্শনিষ্ঠ খাঁটি মানুষ, মানব-দরদী মানুষ। তাই আমেরিকার পথের লোক ছয়দিন ধরিয়া তাঁহার জন্য চোখের জল ফেলিয়াছে। ৭৮ বৎসর বয়স্ক প্রাক্তন সেনানায়ক ও রাষ্ট্রপতি সুদীর্ঘ এক বৎসর ওয়াশিংটন মিলিটারী হাসপাতালে রোগশয্যায় কাটাইয়া ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃতদেহ ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথীড্রালের বেথলিহেম চ্যাপেলে একটি প্রারম্ভিক ধর্মকৃত্যের পর ২৪ ঘন্টা শয়ান রাখা হয়। বহু সহস্র নরনারী দলে দলে এখানে আসিয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করেন। ৬ই এপ্রিল রবিবারে দেহ রাজধানীর প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহ ক্যাপিটল হর্ম্যের গম্বুজের অভ্যন্তরে উপনীত হয়। ২৪ ঘন্টা এখানে হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পরলোকগতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পান এবং সজল চোখে শবাধারের পাশ দিয়া হাঁটিয়া যান। ৭ই এপ্রিল সোমবার বিকালে শবদেহ ন্যাশনাল ক্যাথীড্রালে জাতীয় পারলৌকিক কৃত্যের জন্য আনা হয়। এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের অনেক রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাষ্ট্র-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সোমবার রাত্রে ওয়াশিংটন হইতে ১২টি বগিযুক্ত একটি স্পেশাল ট্রেন জেনারেল আইসেনহাওয়ারের দেহ লইয়া অন্তিম সংকারের জন্য ত্রিশ ঘন্টা পরে অ্যাবিলীনে উপস্থিত হয়। এই স্থানে তাঁহার বাল্যকাল কাটিয়াছিল। অ্যাবিলীনের উপর বরাবর তাঁহার গভীর মমতা ছিল। প্রাকৃতিক শোভা পরিবেষ্টিত ঐ ক্ষুদ্র
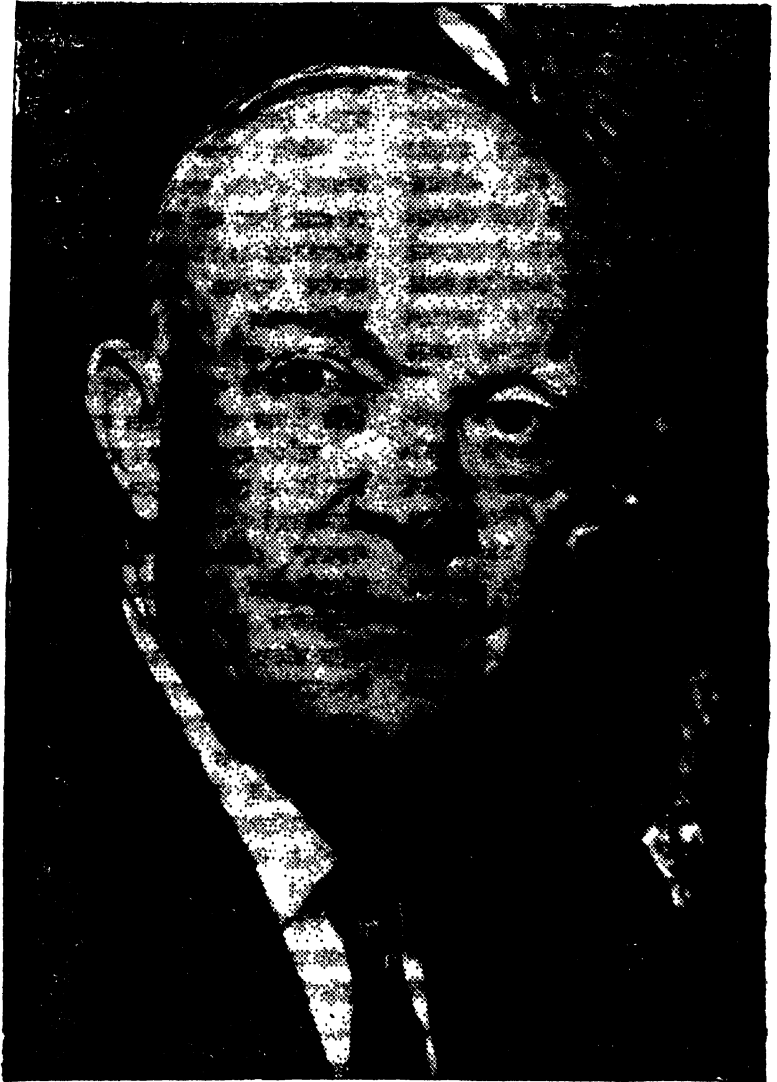
আইসেনহাওয়ার

জায়গাটির গল্প বন্ধুবান্ধবদের নিকট করিতে তাঁহার কখনও ক্লান্তি ছিল না। চার বৎসর আগে তিনি নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ যেন ওখানেই সমাধিস্থ করা হয়। অ্যাবিলীনে আইসেনহাওয়ার পরিবারের পৈত্রিক গৃহের সন্নিকটে একটি বিস্তৃত জায়গায় আইসেনহাওয়ার সেন্টার ও লাইব্রেরী কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ জমির একপ্রান্তে জেনারেল আইসেনহাওয়ার একটি অনাড়ম্বর উপাসনালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। নাম দিয়াছিলেন 'ধ্যানের স্থান' (PLACE OF MEDITATION)। ঐ ক্ষুদ্র গির্জার অভ্যন্তরেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সামরিক খ্যাতি হিটলারের কবল হইতে অধিকৃত ইয়োরোপের পুনরুদ্ধারের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন তাঁহার নেতৃত্বে মিত্রশক্তিচয়ের একটি বিপুল বাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলে উপনীত হয় এবং জার্মানদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বস্তুত হিটলারের পরাজয় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সূত্রপাত এই নরম্যান্ডি অভিযান হতেই। ইতিহাসে ঐ দিনটিকে বলা হইয়াছে D-day। বহু শাখাযুক্ত যে বিরাট অভিযান হিটলারের সেনাদলকে পশ্চিম ইয়োরোপের রণাঙ্গনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়াছিল উহার নাম 'অপারেশন ওভারলর্ড'। জেনারেল আইসেনহাওয়ার ছিলেন ঐ যুদ্ধের প্রধান পরিচালক।

১৯৫৩ সালে আইসেনহাওয়ার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ৪ বৎসর মেয়াদ অতিক্রান্ত হইলে বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি দ্বিতীয়বারও নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের পদে সমারূঢ় থাকেন। আট বৎসরের বেশী কেহ ঐ পদে থাকিতে পারিবেন না যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এই নিয়ম না থাকিলে তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তৃতীয়বার নির্বাচিত হইতে পারিতেন, কেন না তাঁহার জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল।

হোয়াইট হাউসে আইসেনহাওয়ারের যুগকে আমেরিকার প্রভূত সমৃদ্ধি, শান্তি ও সামঞ্জস্যের যুগ বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে তাঁহাকে পাইয়া জনগণের মনে স্বতই একটা আশ্বাস, সাহস এবং কর্মোদ্যম সঞ্চারিত হইত। সকলের চিত্তে তাঁহার ব্যক্তিত্বের যে ছবি জাগিত উহা ছিল দয়ার্দ্রহৃদয় অথচ সংঘর্ষে দায়িত্বসম্পন্ন বলিষ্ঠ চরিত্র এক নেতার প্রতিচ্ছবি।

আট বৎসর প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাঁহার কোনও কোনও কার্যকলাপের সমালোচক যে ছিল না তাহা নয়—কিন্তু প্রধানত তিনি ছিলেন আমেরিকাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বহু সমাদৃত প্রিয় বন্ধু। তাঁহার পুরা নাম ছিল ডোয়াইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার (DWIGHT DAVID EISENHOWER)। লোকে তাঁহাকে 'আইক' ঐ সংক্ষিপ্ত চলতি নামে উল্লেখ করিতে ভালবাসিত। আইসেনহাওয়ার ইহাতে খুশীই হইতেন।

জেনারেল আইসেনহাওয়ার ধুরন্ধর সেনানায়ক হইলেও যুদ্ধ তাঁহার স্বভাবগত প্রবৃত্তি ছিল না। বস্তুত অহিংসাই যেন ছিল তাঁহার ধাতুগত বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সমস্ত মুখজোড়া সরল হাসিটি কেহ ভুলিতে পারিবে না। মানুষের প্রতি সৌজন্য ও সহানুভূতি ছিল তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইয়োরোপীয় রণক্ষেত্রে তাঁহার অন্যতম সহকারী ব্রিটেনের ৮১ বৎসর বয়স্ক ফিল্ড মার্শেল মন্টগোমারি আইসেনহাওয়ারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"তিনি যখন স্মিতহাস্যে তোমাকে সম্ভাষণ করিতেন তখন তোমার বোধ হইত যে এমন কিছু নাই যাহা তুমি তাঁহার জন্য করিতে পার না। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল হইতে জার্মান যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তাঁহার অধীনে আমি কাজ করিয়াছি। ইহাতে আমি গর্ববোধ করি। তাঁহার মৃত্যু আমার জীবনে একটি শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি ছিলেন অতি মহাপ্রাণ মানব।"

আইসেনহাওয়ার যেমন সুকৌশলী যুদ্ধবিদ্ ছিলেন তেমনি ছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার পরমোৎসাহী অগ্রদূত। "শান্তির জন্য পরমাণু" (Atoms for peace)—তাঁহারই প্রথম পরিকল্পনা। ১৯৬১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্টপদ হইতে অবসর লইয়া তাঁহার বিদায় সম্ভাষণে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিপুলাকার সমর সংস্থা এবং ক্রমবর্ধমান সমরোপকরণের ব্যবসায়ের নিন্দা করিয়া জনগণকে এই দুই-এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। জনকল্যাণকর অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আইসেনহাওয়ারের নামে গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকার বাহিরে ইয়োরোপে এবং এশিয়াতেও আইসেনহাওয়ারের শতসহস্র গুণগ্রাহী অনুরাগী ভক্ত ছিল। দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ঊর্ধ্বে তিনি মানুষকে মানুষ বলিয়া মর্যাদা দিতে পারিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমরবিধ্বস্ত ইয়োরোপে শান্তি ও শক্তি স্থাপনে আইসেনহাওয়ারের অবদান ছিল প্রচুর। তাই তাঁহার মৃত্যুতে ইয়োরোপের নানা স্থান হইতে যে ব্যাপক শোক প্রকাশের সংবাদ আসিয়াছিল তাহা আশ্চর্যের নয়।

আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আইসেনহাওয়ারের প্রসংগে বলিয়াছেন—"জেনারেল আইসেনহাওয়ার ও আমি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার আগে আমরা এক উদ্দেশ্যে সমরসহচর ছিলাম। দেশের এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য তাঁহার সেবার কথা কখনও ভুলিব না।"

"পশ্চিম ইয়োরোপকে নাৎসী-দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি বৃহত্তম সমরাভিযান চালিত করিয়াছিলেন এবং বিজয়ের পর মুক্ত দেশসমূহে স্বাবলম্বন, সাহস ও শক্তি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বিপুল ধৈর্য লইয়া পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষকরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।"

আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলিয়াছেন—"আমি তাঁহাকে অভিনন্দন করি একজন বীর সৈনিকরূপে, দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়করূপে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাতারূপে। শতাব্দীর এক-চতুর্থকাল তাঁহার সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমেরিকার জীবনে একটি অভূতপূর্ব নৈতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল।"

ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জনসনের উক্তি—"তাঁহার অভাবে আমেরিকা যেন বন্ধুহীন দেশ বলিয়া মনে হইবে। তিনি সত্যই ছিলেন আমাদের যুগে একজন অতি-মানুষ। রণাঙ্গনে সৈনিকরূপে তাঁহার কর্মজীবনের আরম্ভ, আর শান্তির একনিষ্ঠ প্রচারকরূপে উহার অবসান। তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তাঁহার অধীনে কাজ করিয়া আমি গর্ববোধ করিয়াছি, আর আমার রাষ্ট্রনায়ককালে তাঁহার মূল্যবান সুপরামর্শ পাইয়া প্রভূত উপকৃত হইয়াছি।"

জর্জ ওয়াশিংটন এবং এব্রাহাম লিঙ্কনের সহিত তুলনা না চলিলেও ডোয়াইট আইসেনহাওয়ার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একজন শক্তিমান মহানুভব রাষ্ট্রপতিরূপে এবং বিশ্ব-ইতিহাসে একজন ন্যায়বান সমরনেতা ও শান্তিসংস্থাপকরূপে সম্মানিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশ

॥ ছয় ॥

রাণা সাঙ্গার মা মহারানী রতন-কুঁয়র ঝালী সৌরাষ্ট্র দেশের এক ছোটো রাজ্যের অধিপতি রাও রাজধন ঝালার মেয়ে। রাঠোরদের সঙ্গে রাজধন ঝালার সদ্ভাব ছিলো না। এ জন্যে রাঠোরদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা ছিলো না রতনকুঁয়রেরও। পুত্রবধূদের মধ্যে রানী ধনবাঈ রাঠোর রাজকন্যা, তাকেও পছন্দ করতো না। ভালোবাসতো বড় রানী কুবরন বাঈকে। দরবারের কয়েকজন প্রভাব-শালী সর্দার রাঠোরদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় একথাও রতনকুঁয়র জানতো। রাণা সাঙ্গা তৈরী হচ্ছে দিল্লীর সঙ্গে এক চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্যে। তাই রাণা সাঙ্গাও রাঠোরদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে চায় এবং এজন্যেই নিজে বিয়ে করেছে, রাঠোর রাজকন্যা ধনবাঈকে, যুবরাজ ভোজরাজের সঙ্গেও বিয়ে দিয়েছে এক রাঠোর কন্যার। এই নীতিও খুব পছন্দ করেনি মহারানী রতনকুঁয়র ঝালী।

কিন্তু ছেলেকে মানা করেনি। ছেলের উপর খুব বিশ্বাস। তার দ্বারা মেবারের স্বার্থ কোনোরকমে ক্ষুণ্ণ হবে একথা কোনোদিন মনে হয়নি।

বড়রানী কুবরনবাঈ এসে বোঝাতো রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালীকে, তার কথায় সায় দিতো। তাকে সান্ত্বনা দিতো। কিন্তু তার হয়ে কিছু বলতে যেতো না রাণা সাঙ্গাকে।

কুবরনবাঈ বলেছিলো, রাণাজীর ভালোবাসা এখন ধনবাঈয়ের জন্যে অনেক বেশী। ওর ছেলে রতনকে আজকাল চোখের আড়াল করতে চায় না। যে সব সর্দার রাঠোরদের পক্ষে, ওরা এখন থেকেই রাণাজীর মন ভোজরাজের উপর বিরূপ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

প্রথমে একথা বিশ্বাস করতে চায়নি রতনকুঁয়র। ভোজরাজকে খুব ভালোবাসে রাণা সাঙ্গা। তাকে নিজের হাতে তৈরী করেছে, সেই তো মেবারের টিকায়েৎ,—ভাবী মহারাণা।

কিন্তু বার বার বলে বলে কুবরনবাঈ রতনকুঁয়র ঝালীর মনে কথাটা ঢুকিয়ে দিলো। ভোজরাজের বৌ মীরা রাঠোর কন্যা হলেও জোধপুরের রাঠোরদের সঙ্গে তার সম্পর্ক একটু দূর। মেরতার রাঠোরদের সঙ্গে তেমন বনিবনাও নেই জোধপুরের রাঠোরদের সঙ্গে। কিন্তু রানী ধনবাঈ জোধপুরের রাজকন্যা।

এ পর্যন্ত বলে কুবরনবাঈ থেমে গিয়েছিলো কথা শেষ না করেই।

—সুতরাং? জিজ্ঞেস করেছিলো রতনকুঁয়র ঝালী।

কুবরনবাঈ সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকিয়েছিলো। তারপর উত্তর দিয়েছিলো,—খুব গোপনে একটা দল তৈরী হচ্ছে দরবারে। ওদের টাকা-কড়ি দিয়ে সাহায্য করছে জোধপুর। কয়েক বছরের মধ্যেই এরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

—উদ্দেশ্য?

—এখন মনে হচ্ছে অসম্ভব। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তেমন অসম্ভব মনে নাও হতে পারে। ওরা ভোজরাজকে বঞ্চিত করে ধনবাঈয়ের ছেলে রতনকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করবে।

প্রথমে বিশ্বাস করেনি রতন-কুঁয়র, কিন্তু পরে অনেক কিছু লক্ষ্য করে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো। কুবরনবাঈয়ের কাছে বেশী আসে না রাণা সাঙ্গা। নতুন বিয়ে করেছে বুঁদীর রাজকন্যা কারমেতন বাঈকেও, কিন্তু তার জন্যেও যেন তেমন ভালো-বাসা নেই। রাণার বেশী যাওয়া আসা ধনবাঈয়ের মহলে।

একটি ছেলে হয়েছে কারমেতন বাঈয়েরও,—নাম তার উদয়। কিন্তু তার জন্যেও রাণা সাঙ্গার তেমন স্নেহ দেখা যায় না। অথচ আজকাল সঙ্গে সঙ্গে রাখে শিশু রাজকুমার রতন সিংহকে।

যুবরাজবধূ মীরাকেও বড়ো রানী কুবরনবাঈয়ের খুব পছন্দ নয়।

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ভোজ-রাজও কি রকম যেন বদলে গেছে, কুবরনবাঈ বলেছিলো রতনকুঁয়রকে।

ভোজরাজ আজকাল আর শিকার করতে যায় না। এবার আহেরিয়া উপলক্ষে রাণার সঙ্গে যায়নি। আগে মহলের ভিতর তাকে দেখা যেতো না। আজকাল সন্ধ্যে হতে না-হতেই মহলের ভিতর চলে আসে মীরার কাছে।

একথা শুনে একটু হেসেছিলো রতনকুঁয়র ঝালী। নতুন বিয়ে করেছে, ভালোবাসে নিজের বৌকে। তাতে করে কি বলার আছে।

—শুধু ভালোবাসা নয়,—উত্তর

দিলো কুবরনবাঈ।—মীরা ওকে জাদু করেছে।

—এককালে তো তুমিও করেছিলে, সাঙ্গাকে,—রতনকুঁয়র ঝালী মনে মনে বললো,—এবং সেদিন আমিও পছন্দ করিনি।

—মীরা তো তার ভজন পূজন নিয়েই আছে,—বললো কুবরনবাঈ,—গান গাইছে সব সময়। আর ভোজরাজও সেই গান শুনে পাগল।

রাণা সাঙ্গাকেও বুঝিয়েছিলো কুবরনবাঈ।

—শুনেছন একটা কথা? মহলে সবাই বলাবলি করছে।

—কি?

—বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় মীরা ভোজরাজকে প্রদক্ষিণ করতে চায়নি। বলেছিলো, গিরধরজীই আমার স্বামী, আমার বিয়ে হবে তার সঙ্গেই।

বিয়ের অনুষ্ঠান মহলের ভিতর, —পর্দার মধ্যে, সেখানে কোনো পুরুষ যেতে পারে না। অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে রাণা সাঙ্গাও বসেছিলো বাইরের মহলে। এখান ওখান ঘুরে কথাটা উঠেছিলো রাণার কানেও।

—ব্যাপারটা আসলে কি হয়েছিলো আমি জানি,—বললো রাণা সাঙ্গা,—মীরা প্রথমে গিরধরজীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে, তারপর ভোজরাজকে প্রদক্ষিণ করেছিলো মাল্যবদল করার আগে।

তখন মহলের মেয়েরা নানা রকম কথা বলেছিলো। কেউ বললো,—মীরাকে যখন বলা হোলো মাল্য বদলের আগে প্রদক্ষিণ করতে হবে, সে ভুল করে ভেবেছিলো প্রদক্ষিণ করতে হবে গিরধরজীর মূর্তিকে। তারপরে ভুল শুধরে নিলো। আবার কয়েকজন বললো,—মীরা বলছে, গিরধরজীই আমার স্বামী, আমার বিয়ে হবে তার সঙ্গেই।

—এমন কথা তো আমি কোনোদিন শুনিনি,—কুবরনবাঈ গালে হাত দিয়ে বলেছিলো।

আমি বিশ্বাস করিনি, এ সব কথা, বললো রাণা সাঙ্গা।

—কেন? সবাই বলাবলি করছে, কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি। গিরধরজীর বিগ্রহ থাকবে মন্দিরে। বিয়ের সময় মহলের ভিতর কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সেই বিগ্রহ?

কুবরনবাঈয়ের কথা শুনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিলো রাণার। বলেছিলো, —দেখ বাঈ-সা, এ সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর আমার নেই, ওদের বিয়ে হয়ে গেছে, ওরা সুখে ঘর করছে, আমার কাছে তাই যথেষ্ট। তখন কি হয়েছিলো ও সব কথা নিয়ে এখন আলোচনা করে কি লাভ?

কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি সত্যি হয়েছিলো তো? মেবারের টিকায়তের পত্নীকে নিয়ে মহলের অন্যান্য মেয়েরা যে এসব আলোচনা করবে, সেটা ঠিক নয়।

—সত্যি সত্যি কি হয়েছিলো আমরা কেউ জানি না। আমার ধারণা মেরতার মহলে বিয়েতে এসেছিলো যে সব রাঠোর মেয়েরা তারা ইচ্ছে করে রটিয়েছে এ সব কথা।

—কেন?

—মেরতার এক ছোটো সর্দার, যে চাকরি করে আমারই দরবারে, তার মেয়ে যে মেবারের ভাবী মহারাণী, এটা পছন্দ হয়নি অনেক রাঠোরের। মীরা যখন খুব ছোটো, তখন সে তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আমার বর কোথায়, সব বাচ্চা মেয়েই এরকম বলে থাকে। তার মা তাকে বলেছিলো —ওই গিরধরজীই তোমার স্বামী। খুবই স্বাভাবিক উত্তর। হয়তো এখন বিয়ের সময় একথা নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করে থাকবে। তারপর এ সব কথা ফেনিয়ে ফেঁপে ফুলে তোমাদের মুখে এ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাণা সাঙ্গার নামেও রতনকুঁয়রের কাছে নালিশ করেছিলো কুবরনবাঈ। —মীরার সুন্দর ঢলঢলে মুখ। তাই দেখে গলে গেছে রাণাজীর মন। বড় বেশী স্নেহ পুত্রবধুর জন্যে। সব সময় তার জন্যে গয়না আসছে, ঘাগরা চুনরী আসছে। আমরা শ্বশুরের সামনে পর্দা করতাম। সামনে বেরোতাম না। পুজো-পার্বণের সময় প্রণাম করতে যেতে হবে মাথা বুকের উপর ঘুঁঘট টেনে তারপর যেতাম। মীরা পর্দা করে না। ঘুঁঘট টেনে মুখ ঢাকে না। সে বলে, বাবার সামনে মেয়ের মুখের উপর ঘুঁঘট থাকবে কেন? মীরা ভজন গেয়ে শোনায় রাণাজীকে। পুত্রবধূ শ্বশুরকে গান শোনাচ্ছে, এমন কথা কেউ কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছে চিতোর-গড়ের মহলে?

তার কথায় সায় দিয়েছিলো রতনকুঁয়রী। রাণার কাছে মীরার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করা যায় না। রাগ করে রাণা সাঙ্গা।

বিয়ের পর যখন নতুন বৌ এলো চিতোরগড়ে, তখন চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তাকে মহলের বাইরে কালীজীর মন্দিরে ঢুকে দেবীকে প্রণাম করে আসতে বলা হোলো। সে রাজীই হোলো না মন্দিরে ঢুকতে। মহারানী কুবরনবাঈ, রাজমাতা রতনকুঁয়র কারো আদেশই সে শুনলো না। সবাই বললো,—কী উদ্ধত নতুন যুবরাজবধূ।

রতনকুঁয়রী নিজে গিয়ে নালিশ করেছিলো রাণা সাঙ্গার কাছে। একথা শুনে রাণাও রাগ করেছিলো। ভোজরাজকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলো।

ভোজরাজ বললো,—মীরা বলেছে, আপনি যদি জানতে চান, মীরা নিজের মুখেই আপনাকে বলবে।

রাণা সাঙ্গার অনুমতি পেয়ে মীরা যখন প্রণাম করতে এলো, তখন কুমার ভোজরাজ ছাড়া আর কেউ সামনে ছিলো না।

দেখা গেল, এরপর রাণার মুখে কোনো কথাই শোনা গেল না এ ব্যাপারে। মীরা কি কৈফিয়ত দিয়েছে রাণাকে তাও কেউ জানতে পেলো না। শুধু মনে হোলো তার উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলো রাণা সাঙ্গা।

আবার একটা গুঞ্জন সুরু হোলো মহলের মধ্যে। নিশ্চয়ই মীরা জাদু

জানে। শোনা যায় সে নাকি সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব সেবাযত্ন করতো মেরতার রাজমহলে। হয়তো কারো কাছ থেকে তুকতাক কিছু শিখেছে।

—তা নইলে এ কি করে হয়, কুবরনবাঈ বলতো রতনকুঁয়রকে,—রাণাজীর মতো, একজন বিচক্ষণ লোক মীরার বশ। ভোজরাজের মতো, একজন কর্তব্যপরায়ণ রাজপুত রাজকুমার মীরার বশ। মহলের অন্য কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে না এই রাঠোর কন্যা, মহলের অন্যান্য রাজপুতানীদের উৎসব তেঁওহারে যোগ দেয় না বড় একটা। নিজের মহলে আলাদা করে পুজোর জায়গা করেছে তার গিরধরজীর বিগ্রহের জন্যে। তারই সেবা, তারই পুজো নিয়ে পড়ে থাকে সব সময়। অথচ তাকে কিছু বলা যায় না, রাণাজী রাগ করে, কুঁয়র-সা রাগ করে।

অন্য রাস্তা ধরেছিলো কুবরনবাঈ, রাণা সাঙ্গাকে বলেছিলো,—ভোজরাজের আরো একটি বিয়ে দেওয়া দরকার।

—কেন?

—শুধু একটি বৌ থাকলে, তার বশ হয়ে পড়ে থাকে যে কোনো লোক সিসোদিয়া রাজপুত্রের জন্যে এটা ঠিক নয়। এতে কর্তব্যে অবহেলা হতে পারে।

—তাই নাকি?—কুবরনবাঈয়ের কথা শুনে হেসেছিলো রাণা সাঙ্গা।

—আরো একটি কারণ আছে।

—কি?

কথাটা বলার আগে একটু ইতস্তত করার ভাণ করেছিলো কুবরনবাঈ। তারপর বলেছিলো,—আপনিও সেদিন বিয়ে করেছেন কারমেতনবাঈকে। এরই মধ্যে আপনার ছেলে হয়েছে। আমার সঙ্গে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই ভোজরাজের জন্ম হয়েছিলো। কুমার রতন সিংএর জন্মও ধনবাঈয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। কিন্তু আমার ধারণা। অন্যান্য স্বামী-স্ত্রী যে ভাবে থাকে। সেভাবে বসবাস করে না ভোজরাজ আর মীরা।

রাণা সাঙ্গা চোখ তুলে তাকালো কুবরনবাঈয়ের দিক।—তোমার তাই ধারণা? কেন?

—ওদের বিয়ের পর এক বছরেরও বেশী হতে চললো। এখনো মীরার ছেলে হবার কোনো লক্ষণই নেই।

কথাটা রাণা সাঙ্গা কানে তুললো বলে মনে হোলো না। বললো,—অনেকেরই ছেলেমেয়ে হতে দেরি হয় তাতে আমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না।

রতনকুঁয়রের কাছে কুবরনবাঈ অনুযোগ করে বলেছিলো, —রাণাজী বিশ্বাস করলেন না। আমার কিন্তু তাই ধারণা। মহলের অন্যান্য মেয়েরাও তাই বলছে। প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি এই মেরতানী রাঠোর মেয়েটিকে আমাদের কুলবধূ করে আনা ভুল হয়েছে।

এমন একটা সন্দেহ রতনকুঁয়রের মনেও ছিলো। নিজেই একদিন কথাটা পাড়লো রাণা সাঙ্গার কাছে।

—ভোজরাজ যদি রাজী হয়, আমার আপত্তি নেই,—বললো রাণা সাঙ্গা।

ডেকে পাঠানো হোলো ভোজরাজকে। তাকে বলা হোলো সিসোদিয়া রাজকুমারের শুধু একজনই পত্নী থাকবে। মেবার রাজবংশের এটা রীতি নয়।

ভোজরাজ উত্তর দিলো,—তাই যদি আপনার আদেশ হয়, আমি আপত্তি করবো না; কিন্তু আমার নিজের এতে সম্মতি নেই।

হাসলো রাণা সাঙ্গা, জিজ্ঞেস করলো,—কেন?

ভোজরাজ কোনোরকম কুণ্ঠা

না করেই উত্তর দিলো,—মীরার পাশে আর কোনো মেয়ে দাঁড়াতে পারে না। আমি আর কাউকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারবো না।

রাগে লাল হয়ে গেল রানী কুবরনবাঈয়ের মুখ। রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালীও বিস্মিত হোলো ভোজরাজের উত্তরের ধরণ শুনে। শুধু প্রশান্ত হাসি দেখা গেল রাণা সাঙ্গার মুখের উপর, যেন মনে মনে সায় দিচ্ছে যুবরাজের কথায়।

তবু রাণা সাঙ্গা একবার বললো,—রাজবংশের কোনো কুমারকে, বিশেষ করে যুবরাজকে আরো কয়েকটা বিয়ে করতে হয় শুধু সংসার করবার জন্যে নয়, আরো অনেক রাজনৈতিক কারণে। যে সব রাজবংশের সঙ্গে আমরা একটা মিত্রতার সম্পর্ক তৈরী করতে চাই। তাদের কোনো কন্যাকে কুলবধূ করে আনা আমাদের রীতি।

ভোজরাজ একটু ভাবলো, তারপর বললো,—এখন তো তেমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। যখন প্রয়োজন হবে, দেখা যাবে।

ভোজরাজ চলে যাওয়ার পর রাণা সাঙ্গা রতনকুঁয়র ঝালী আর কুবরনবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে বললো,—তোমাদের ধারণা ভুল। আমি বিশ্বাস করি না যে ভোজরাজ আর মীরা আর দশজন স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে না। ওটা মহলের মেয়েদের বানানো কথা।

—কেন বিশ্বাস করেন না? কুবরনবাঈ চটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রাণা সাঙ্গা উত্তর দিলো,—ভোজরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছো? যে স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখী নয়, তার মুখের চেহারা ও রকম হতে পারে না।

—সে যাই হোক,—কুবরনবাঈ বললো—আমার ছেলের আরো একটি বিয়ে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

—আমি মনে করি না, উত্তর দিলো রাণা সাঙ্গা।

—কেন?

—রামচন্দ্রজীর একটিমাত্র স্ত্রী ছিলো। সীতা। আমি চাই তাঁরই মতো আদর্শ নৃপতি হবে আমার ছেলে ভোজরাজ। আমি চাই রাম-সীতার মতো মীরা আর ভোজরাজকেও আদর্শ দম্পতি মনে করবে হিন্দুস্থানের সাধারণ মানুষ। ভুলে যেও না, একদিন হয়তো সারা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র অধিপতি হবে তোমার ছেলে ভোজরাজ।

—কিন্তু অন্যান্য রাজবংশের সঙ্গেও তো আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

—তার জন্যে কুমার রতন সিংহ আছে, কুমার উদয় সিংহ আছে।

কুবরনবাঈয়ের হাসি পেলো রাণার কথা শুনে। ধনবাঈয়ের ছেলে রতন সিংহের এখন মোটে বছর বারেক বয়েস, কারমেতনবাঈয়ের ছেলে উদয় সিংহের মোটে কয়েক মাস।

—সে তো অনেক পরের কথা।

—তদ্দিন আমরা অপেক্ষা করতে পারি। আমাদের কোনো তাড়া নেই।

মীরার নামে অভিযোগ করে কোনো লাভ হয় না। স্বয়ং মহারাণা ওকে স্নেহ করেন। ভোজরাজ ওকে আগলে রাখে। ওকে কারো কিছু বলার সাহস নেই।

—মীরা আমাকেও মানতে চায় না,—কুবরনবাঈ চোখের জল ফেলে জানায় রতনকুঁয়র ঝালীকে।

—কেন, তোমায় কি কোনোদিন কিছু বলেছে? সে তো কোনোদিন কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে শুনি নি।

কুবরনবাঈ বললো,—না, কোনো-রকম অসঙ্গত ব্যবহার সে করেনি; কিন্তু আমার দরবারে যখন সর্দারদের বৌয়েরা আসে নজর নিয়ে, মীরাকে একদিন উপস্থিত থাকতে বলেছিলাম। সে বলে পাঠিয়েছিলো, একমাত্র তার গিরধরজীর দরবার ছাড়া আর কারো দরবারে সে যায় না। মেবারের মহারাণীর পক্ষে এর চাইতে বড়ো অসম্মান আর কি হতে পারে।

অন্দরমহলের সর্বেসর্বা রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালী। তার নির্দেশেই সব কিছু চলে। কিন্তু এখন বয়েস হয়ে যাচ্ছে। তাই কারো কোনো ব্যাপারে নিজে আর বেশী আগ্রহ বোধ করে না। প্রথম বয়েসেই কাশীতে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলো সন্ত রবিদাসের কাছে, এখন সাধন ভজনেই সময় কাটে। নিজের মহলে পুজো ভজন শাস্ত্রপাঠ এ সব লেগেই থাকে সব সময়। কিন্তু মীরাকে কোনোদিন ডাকে নি সেখানে। মীরা চিতোরগড়ের পুজো উৎসব কোনো কিছুতে কোনোদিন যোগ দেয় না। তাই রতনকুঁয়রও কোনোদিন তাকে আমন্ত্রণ জানায় নি। যদি না আসে, তাহলে অসম্মান হবে রাজমাতার। এই বয়েসে এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নালিশ দরবার করার উৎসাহ আর নেই। তাই মীরার কাছাকাছি আসার উপলক্ষও হয়নি।

কিন্তু একটা কৌতূহল আছে মীরার সম্বন্ধে সবাই মুখে শোনে মীরার পূজোর বিগ্রহ গিরধরজীর কথা। মীরার পূজোয় কেউ যায় না। তার ওখানে যখন ভজন হয়, তাতেও কেউ উপস্থিত থাকে না। মহারাণী কুবরনবাঈ ওকে পছন্দ করে না। রাণী ধনবাঈ, রানী কারমেতনবাঈ এরাও ওর ওপর খুব সদয় না,—সুতরাং মহলের অন্য মেয়েরাও মীরার সম্বন্ধে দুটো ভালো কথা বলার আগ্রহ দেখায় না। রাণীদের বিরাগভাজন হবে বলে তার সঙ্গে বিশেষ মেলামেশাও করে না।

কিন্তু ওদের মুখে মাঝে মাঝে শোনা যায় মীরার ভজনের একটি পংক্তি। ওরা বলে, মীরা কাউকে মানে না,—যুবরাজ স্বামীকে নয়, শ্বশুর মহারাণাকে নয়, রানাদের কাউকে নয়। ওরা বলে, মীরা বড় দাম্ভিক, মহলের কাউকে সে মেলামেশার যোগ্য মনে করে না। এ সব কথা বলে ব্যঙ্গ করে সুর করে শোনায় মীরার গান,—

মেরে তো গিরিধর গোপাল,
দুসরো ন কোঈ—

গানটা শুনে কিন্তু রতনকুঁয়র

রানীর ভালো লেগেছিলো। ভারী মিষ্টি সুর, ভারী মিষ্টি প্রথম পংক্তির ভাষা জিজ্ঞেস করেছিলো।—তারপর ?

রাজমাতার এই অপ্রত্যাশিত আগ্রহ দেখে অবাক হয়েছিলো মেয়েটি, বললো,—তারপর তো আর জানি না। ওর মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে শুনতে পাই। গানটা শুনলে আমার হাসি পেতো। তাই ওই প্রথম পংক্তিটা মনে আছে,—বলে হেসে ফেললো মেয়েটি।

কিন্তু যখন দেখলো রতনকুঁয়র রানী হাসছে না, গম্ভীর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন হঠাৎ সে হাসিটা বন্ধ করে চুপ করে রইলো।

কয়েক দিন ধরেই কথাটা ঘুরঘুর করছিলো রতনকুঁয়রের মনের মধ্যে। মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরো ন কোঈ---। নিজের দৈনন্দিন পূজো-আহ্নিকের মন্ত্র আর শাস্ত্রের শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করে উঠছিলো একটা মিষ্টি সুর,—মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরো ন কোঈ।

সেদিন হঠাৎ খুব ইচ্ছে হোলো একবার মীরা ও তার বিগ্রহকে দেখবার।

তখন সন্ধ্যে হয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছে কুম্ভশ্যাম মন্দিরের আরতি।

রতনকুঁয়র রানী আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মীরার মহলের দিকে। ধারেকাছে মহলের অন্যান্য মেয়ে যারা ছিলো ওরা অবাক হোলো। রতনকুঁয়র রানী রাজমাতা, তিনি অন্য কারো মহলে কোনোদিন যান না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে [illegible] সবাই তাঁর মহলে যাবে, এমন [illegible] স্বয়ং মহারানীও, এই ছিলো চিতোরগড়ের রেওয়াজ।

সে সময় ভিতর থেকে ভেসে আসছে মীরার গান,—

মেরে তো গিরধর গোপাল,
দুসরো ন কোঈ।
জাকে সির মোর মুকুট,
মেরে পতি সোঈ।---

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকলো রতনকুঁয়র।

ওর শোয়ার ঘরটি খুব বড়ো নয়। শোয়ার ঘরের পাশেই আরেকটি ছোটো ঘর। গিরধরজীর আসন বসানো হয়েছে সেখানেই।

ঘরের ভিতর বসেছিলো রাণা সাঙ্গা আর ভোজরাজ। অন্য কারো মহলে যাওয়া রাণারও রেওয়াজ নয়। তাকে দেখে অবাক হোলো রতনকুঁয়র। রাজমাতাকে দেখে অবাক হোলো রাণা আর যুবরাজও। ওরা উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু মীরা উঠলো না। শুধু একবার তাকিয়ে দেখলো। মুখে ফুটে উঠলো খুশির হাসি। তার খুব ভালো লেগেছে রাজমাতা মহারাণী রতনকুঁয়র রানীর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি।

মীরা নিজের ভজন গেয়ে চললো নিজের মনে।

—তাত মাত ভ্রাত বঁধু আপনো ন কোঈ---

রতনকুঁয়র রাণা সাঙ্গা ও ভোজরাজকে ইঙ্গিত করলো বসবার জন্যে। নিজেও বসলো পাথরের মেঝের উপর।

গান গেয়ে যাচ্ছে মীরা। রতনকুঁয়র রানী চারদিকে তাকিয়ে সামনে দেখছিলো। হঠাৎ চোখ পড়লো সেখানে গিরধরজীর বিগ্রহের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে বসলো। মীরা এ বিগ্রহ কোথায় পেলো ?

—অঁসুয়ন জল সীঁচি সীঁচি
প্রেম-বেলি বোঈ।
অবতো বেল ফ্যারল গঈ,
আনন্দ ফল হোঈ।

রাণা সাঙ্গা লক্ষ্য করলো রতনকুঁয়র রানীর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে গেছে।

মীরা গান গেয়ে যাচ্ছে নিজের মনে। এক হাতে তানপুরো। অন্য হাতে খঞ্জনী। খুব মিষ্টি গলা,---এবং তৈরী গলা। পিতামহ রাও দুদাজী বড় ওস্তাদ রেখে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখিয়েছিলেন মীরাকে।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে কুমার ভোজরাজ আর রাণা সাঙ্গা। রতনকুঁয়র রানী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে।

—ভগত দেখ রাজী হুঈ,
জগত দেখ রোঈ।
দাসী মীরা লাল গিরধর,
তারো অব মোহী॥

গান শেষ হোলো।

মা, তুমি এখানে?—রাণা সাঙ্গা জিজ্ঞেস করলো রতনকুঁয়র রানীকে।

—তুমি এখানে?—ভেজা গলায় জিজ্ঞেস করলো রতনকুঁয়র।

—আজকের তিথিতে মীরা দীক্ষা নিয়েছিলো। তাই ভজন শোনবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে।

মীরা উঠে এসে রতনকুঁয়র রানীকে প্রণাম করে পায়ের কাছে বসলো।

রতনকুঁয়র আরেকবার তাকালো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—এই বিগ্রহ তুমি কোথায় পেলে?

—আমার গুরু দিয়েছেন আমায়,—মীরা উত্তর দিলো।

—তোমার গুরু?—রতনকুঁয়র যেন একটু বিস্মিত হোলো।

—আমি তখন খুব ছোটো। আমাদের মহলে এসেছিলেন এক সাধুজী। তিনি তখন খুব বুড়ো। বোধ হয় একশোর উপর বয়েস হবে। তিনিই দিয়েছিলেন।

—সন্ত রইদাসজী?

—আপনি কি করে জানেন?

—আগে বলো, রইদাসজী তোমার গুরু? তিনি তোমার দীক্ষা দিয়েছিলেন?

মীরা একটু হাসলো। বললো,—দীক্ষা আর কি। আমার তখন তিন-চার বছর বয়েস। তিনি আমার হাতে গিরধরজীকে তুলে দিলেন। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—গিরধর গোপাল। ব্যস, আর কিছু বললেন না। আর কিছু আমি জানি না। আমার মনেও নেই। ওই আমার দীক্ষা, ওই আমার মন্ত্র।

রতনকুঁয়র রানী দুহাত বাড়িয়ে মীরাকে হঠাৎ বুকে টেনে নিলো। অনেকক্ষণ কিছু বললো না। শুধু জলে

। চোখে তাকিয়ে রইলো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো,—ওই বিগ্রহ আমি দিয়েছিলাম আমার গুরু সন্ত রুইদাসজীকে, যখন আমি কাশীতে ছিলাম।—তারপর ফিরে তাকালো রাণা সাঙ্গার দিকে।

রাণা সাঙ্গা হেসে বললো,—হ্যাঁ মা, তুমি যা চাইছো, তাই হবে।

এবার হাসলো রতনকুঁয়র ঝালী। জিজ্ঞেস করলো, —আমি কি চাইছি, তুমি কি করে জানো?

রাণা সাঙ্গা উত্তর দিলো,—আমি তোমারই ছেলে, তোমার মন আমি বুঝবো না?

—মীরাকে বলো।

মীরার দিকে ফিরলো রাণা সাঙ্গা, বললো—মহলের এককোণে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না গিরধরজীকে, কালী-জীর মন্দিরের কাছে যেখানে আতার বাগান, সেখানে মন্দির তৈরী হবে গিরধরজীর জন্যে।

রতনকুঁয়র বললো,—সেই মন্দিরে প্রত্যেক সন্ধ্যায় তুমি ভজন গাইবে, আর আমি নিজে আরতি দেখতে আর তোমার গান শুনতে যাবো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা।

॥ সাত ॥

—ব্যাপার কি?—কুবরনবাঈ জিজ্ঞেস করলো রাণা সাঙ্গাকে।

—কেন?

—মহলের বাইরে মন্দির হোলো মীরার গিরধরজীর জন্যে। সেখানে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় যাচ্ছেন ঝালী রাণী। আর উনি যাচ্ছেন বলে মহলের অন্য মেয়েরাও যাচ্ছে।

—মাঝে মাঝে আমিও যাবো, তুমিও যাবে,—বললো রাণা সাঙ্গা।

—কক্ষণো না,—রাগে ফেটে পড়লো কুবরনবাঈ,—মেবারের মহরানী এসবের প্রশ্রয় দিতে পারে না।

কিসের?—শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো রাণা সাঙ্গা।

—মেবারের যুবরাজবধূ মন্দিরে বসে সাধারণ সাধিকার মতো ভজন গাইবে আর সবাই বসে শুনবে?

—সবাই আর কে? মহলের মেয়েরাই তো।

—না।

—আমি তো অনুমতি দিয়েছি।

—মহলের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার দায়িত্ব আমার।

—না বাঈ-সা, তোমার নয়। আমার মা, মহারানী ঝালী এখনো বেঁচে আছেন। তিনি তো অনুমতি দিয়েছেন মীরাকে।

—তাই তো জিজ্ঞেস করছি ব্যাপারটা কি?

—কেন?

—আপনাকে তো চিনি। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া তো আপনি কিছু করেন না। কিন্তু মীরার জন্যে একটা মন্দির বানিয়ে দিয়ে, তাকে সেখানে ভজন গাইতে দেওয়ার অনুমতি দিয়ে আপনার কোন্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হবে সেটাই আমি জানতে চাইছি। মেবারের রাজমহিষী হিসেবে নয়, ভোজরাজের জননী হিসেবে আমার জানার অধিকার আছে আমার পুত্রবধূকে সংসার থেকে দূর করে মন্দিরে এনে বসিয়ে আপনার কোন রাজনৈতিক অভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে। আমি যদ্দুর জানি আপনার শত্রুতা গুজরাটের সুলতানের সঙ্গে, দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে, আমার সঙ্গে তো নয়।

রাণা সাঙ্গা হাসতে লাগলো কুবরনবাঈয়ের কথা শুনে।

কুবরনবাঈয়ের চোখ দিয়ে জলের ধারা নামলো। বললো,—আপনি বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ওই মেরতানী মীরা সংসার করবে না। আস্তে আস্তে সরে যাবে সংসার থেকে।

তোমার ছেলে কি বলে?—রাণা সাঙ্গা জিজ্ঞেস করলো।

—ভোজরাজ আমার কাছে আসল কথাটা খুলে বলে না বলেই আমার ধারণা।

—ও কি কখনো তোমার কাছে মিছেকথা বলে?

—ভোজরাজ একদিন রাজা হবে। প্রয়োজন হলে সে যে মিছেকথা বলতে পারবে না একথা আমি বিশ্বাস করি না।

রাণা সাঙ্গা আবার হেসে উঠলো কুবরনবাঈ-এর কথা শুনে। তারপর বললো,—ভোজরাজকে দেখে কি মনে হয় ও অসুখী?

—ওর সুখের কথা তো আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি মেবারের রাজবংশের ভবিষ্যতের কথা।

রাণা সাঙ্গা জিজ্ঞেস করলো,—মেবারের রাজবংশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি তোমার ভাবনা আমার চাইতে বেশী?

—আপনার উদ্দেশ্য অন্য। আপনি গুজরাট জয় করতে চান, আপনি দিল্লী দখল করতে চান, আপনি সারা হিন্দুস্তানের মহারাজাধিরাজ হতে চান। তার জন্যে যে কোন দাম আপনি দিতে পারেন। তাই তো জিজ্ঞেস করছি, আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি? আজ মীরাকে মহলের বাইরে মন্দিরে ভজন গাইবার অনুমতি দিচ্ছেন। কাল চিতোরগড়ের সাধারণ প্রজাদের গান শোনাবার হুকুম দেবেন। হিন্দুস্তানের ভাবী মহারানীর কাজ কি হবে কাশী বৃন্দাবন প্রয়াগ এসব দেশে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের গান শোনানো?

রাণা সাঙ্গা এবার একটু গম্ভীর হোলো। তারপর উত্তর দিলো,—হিন্দুস্তানের ভাবী মহারানী যদি সাধারণ প্রজাদের মধ্যে একটু মেলামেশা করতে পারে, যদি সে মহলের ঐশ্বর্যের কয়েদী হয়ে বসে না থাকে তোমাদের মতো, তাহলে আমি বুঝবো আমার সমস্ত জীবনের সাধনা কোনোদিন ব্যর্থ হবে না। সাধারণ প্রজাকে যে শান্তি ও নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্যে আমি সারা হিন্দুস্তানকে এক করতে চাই, সে চেষ্টায় সফল হবে আমার উত্তরাধিকারী।

[ক্রমশ।

প্যানপেনে-ঘ্যানঘেনে বৌকে শায়েস্তা করতে হলে

শ্রীমতী

'তোমার মত স্বার্থপর পুরুষমানুষ আর দুটি নেই দুনিয়ায়, আমার কথা একেবারেই ভাব না তুমি, নিজের দিক ছাড়া আর কোনদিকেই নজর নেই তোমার।

আমাদের বিয়ের পর থেকে এইভাবেই কেটে গেল দিনগুলো, ছেলেমেয়েদের কথাও একটু ভাবো না, সবই আমাকে একা সামলাতে হয়।'

উপরোক্ত কথাক'টিকে মোটামুটি এক ধরণের দাম্পত্য সংলাপের নির্ভুল উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা চলে; প্রায় প্রতিরাত্রে অসংখ্য হতভাগ্য পুরুষকে এই কথাগুলো শুনতে হয় তাদের অর্ধাঙ্গিনীর কাছ থেকে।

এই ধরণের ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে বৌদের শায়েস্তা করা যায় কিভাবে?

মনস্তাত্ত্বিকের মতে প্রথমে এই ধরণের মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পুরুষের কর্তৃত্বমূলক মানসের পেছনে থাকে বৈচিত্র্যের স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার প্রতি আসক্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব, অপর পক্ষে মেয়েরা ঠিক এর বিপরীত—তারা শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার পক্ষপাতী।

অতএব দেহগত আসক্তির ঠিক নীচে দিয়ে দম্পতির মধ্যে একটা পারস্পরিক শত্রুতার স্রোত বয়ে চলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর স্রোতোধারার মতই।

এর জন্য নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত বৈষম্যই দায়ী। আর এই বৈষম্যকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না বলেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দেখা দেয় এত বিভেদ এত তিক্ততা।

এ সমস্যা আজও যেমন আছে, আদিযুগের গুহাবাসী মানবের সময়েও তেমনি ছিল, শুধু তখনকার নারী পুরুষের বাহুবলের ভরসাটা একটু বেশী পরিমাণে রাখতো বলেই সমস্যাটা পুরুষের কাছে অন্তত খুব তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি—কোনদিনই।

আজকের যুগে পুরুষের বাহুবলের খুব একটা প্রয়োজন নেই, সমাজ ও রাষ্ট্রই সে নিরাপত্তা এনে দিয়েছে মেয়েদের, কাজেই সে বাবদ পুরুষের প্রত্যাশী হওয়ার আর প্রয়োজন নেই।

তবু এখনও মেয়েরা সামাজিক রীতি অনুযায়ী একজন পুরুষকে নিজের বলে দাবী করতে পারে, বলা বাহুল্য মাত্র যে বৈবাহিকসূত্রেই এই অধিকার তারা পায়, আর নিরাপত্তার অভাব না থাকাতে তাদের সমস্ত উৎসাহ অন্যপথে প্রবাহিত হয়।

বাস্তব কোন বিপদের অভাবে কাল্পনিক অভাব অভিযোগের শিকড়গুলো জট ছড়ায় মেয়েদের ভাবপ্রবণ মনে।

স্বামীর অমনোযোগিতার লক্ষণ আবিষ্কারে তাই এত তৎপর আধুনিকা স্ত্রী।

বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক এতই স্বাভাবিক যে প্রায়শ স্বামীর গভীর ভালবাসা থাকলেও তা হাবে-ভাবে প্রকাশ করতে উৎসুক হয় না, এদিকে নারীর সহজাত ভাবপ্রবণতার ফলে স্ত্রী চায় উচ্ছ্বাস, চায় সোচ্চার প্রেমনিবেদন।

'আমি শপথ করে বলতে পারি, ওর কাছে আমি এখন একটা প্রয়োজনীয় আসবাবের বেশী আর কিছু নই। আমাকে নিশ্চয় ওর আর আগের মত ভাল লাগে না। বাইরে থেকে ঘরে আসার পরেও ও এত উদাসীন থাকে কেন? আমাকে আদর সোহাগ কিছুই তো করে না দেখি আজকাল। নিশ্চয় ও আর ভালবাসে না আমায়। বোধহয় নতুন কারুকে জুটিয়েছে। মেয়েটা কে হতে পারে?'

এই ধরণের চিন্তাধারার প্রশ্রয় অনেক সময়ই দিয়ে থাকে ভার্যাবৃন্দ, যদিও বেচারা স্বামীরা তা কল্পনাও করতে পারে না অধিকাংশ সময়।

অবশ্য প্রায়শ এসব চিন্তায় লাভ হয় না কিছুই, মনের সন্দেহ মনেই থেকে যায়, কারণ অধিকাংশ বিবাহিত পুরুষই স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও একনিষ্ঠ, তবু মনের কোণে কোথাও একটা কাঁটা থেকেই যায় স্ত্রীর।

নিরুপায় সন্দেহের এই জ্বালা থেকেই মেয়েরা হয়ে ওঠে অশান্তিপ্রিয়, ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানির পালা সুরু হয়ে যায়, বেচারা স্বামীর প্রাণ হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত।

স্ত্রীর মধ্যে এই ধরণের প্রবণতা দেখা দিলেই সেটাকে শক্তভাবে দমন করা উচিত স্বামীর, নচেৎ বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

যে-কোন ছুতোতেই ঘ্যানঘেনে স্ত্রী তার আক্রমণ সুরু করতে পারে, কখনওকখনও এই আক্রমণ সোজাসুজি আসে, কখনও বা একটু ঘুরপথ নেয়—যথা - - - -

"বাবা - - - বাবা একহাতে সব সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, ছেলেটা আবার চেঁচাতে সুরু করেছে, ওকেই দেখি না অফিসের ভাত নাবাই"—

এর পেছনে যে কথাটি উহ্য থাকে তাহল প্রভাতী সংবাদপত্রে নিমগ্নপ্রায় স্বামীকে নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা এবং বলাই বাহুল্য মাত্র যে এতেও যদি স্বামীর চৈতন্য না হয় তাহলে গৃহিনীর বিলাপ ক্রমেই আরো সোচ্চার হয়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় আক্রমণের ধারাটি একটু অন্য ধরণের। শারীরিক অসুস্থতার ভাণটিই এক্ষেত্রে সচরাচর প্রযোজ্য, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অর্থপূর্ণ স্বগতোক্তি—"উঃ - - - মাথাটা যেন খসে

খাচ্ছে" অথবা "পিঠে যে কেন হঠাৎ একটা ফিক ব্যেথার মত হচ্ছে কদিন ধরে" কিম্বা—"উঠতে বসতে কেনই যে এত হাঁপ ধরে আজকাল বুঝিনে বাপু"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষোক্ত ধরণের মনোযোগ আকর্ষণ করাটা বেশীর ভাগ স্বামীই খুব অপছন্দ করে এবং ফলে স্ত্রীর কোন অসুস্থতাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার দরকার বোধ করে না।

এই রকমভাবে স্বামীকে বিরক্ত না করে সোজাসুজি বলাই ভাল যে—'আমি চাই তুমি এখন আমার দিকে একটু মন দাও'—তাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই অস্বস্তিবোধটা অনেক হালকা হয়ে যায়।

এইসব আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে, অর্থাৎ স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে স্বামীরও হওয়া উচিত আক্রমণোৎসুক।

গুহা-নিবাসিনী আদিম নারী তার সাথীকে যে এভাবে জ্বালাতন করতে সাহস পেতো না তার কারণ সে ভালভাবেই জানতো যে এ ধরণের আচরণ করতে গেলে বেশ ঘা-কতক খাওয়ার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু হায় সুসভ্য যুগের সংস্কৃত মানুষের সে সুযোগ কোথায়?

স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আজকের পুরুষকে তাই সবেগে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হয়, রেগে-মেগে বড়-জোর কয়েকটি সিগারেট ধ্বংস করতে হয়।

কিন্তু এটা ঠিক পথ নয়, কাপুরুষের প্রতি মেয়েদের একটা সহজাত ঘৃণা আছে, তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বামী স্ত্রীর আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ করে দেয়, যার ফলে মনে মনে সে আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করার আসল উদ্দেশ্যই হল স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করা, সামনে থেকে সরে পড়ে সে সেই উদ্দেশ্যেরই গোড়ায় কোপ মেরে দেয়।

স্বামীরা আর একটা ভুল প্রায়শ করে থাকে সেটা হল স্ত্রীর মুখের কথাটাকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া, কিন্তু একথা তাদের মনে রাখা উচিত যে স্ত্রীর মন্তব্য অনেক সময়ই অলীক কল্পনাপ্রসূত, মেয়েরা অনেক সময়ই যা বলে তার কোন গুরুত্ব অনুভব করে না, এমন কি কখনও কখনও সে কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতও হয়।

বহু গবেষণার ফলে মনস্তাত্ত্বিকেরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছেন, কাজেই এই মতবাদকে প্রামাণ্য বলেই মনে করা যেতে পারে।

পুরুষের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর হল এই ধরণের স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তিতর্কের অবতারণা করা, এতে বিবাদ তো মেটেই না উপরন্তু গৃহের শান্তি চিরতরে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

তাহলে স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিভাবে?

প্রথম স্ত্রীর স্বভাব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা দরকার, যাতে ঝড় ওঠার সঙ্কেত পেতে পারে স্বামী পূর্বাহ্ণেই।

দ্বিতীয়ত স্ত্রীর দিকে তার চাহিদামত মনোযোগী হওয়াটা প্রয়োজনীয়।

বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ স্বামী এই বস্তুটির আভাস পেলেই চকিতের মধ্যে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারে, যেমন স্ত্রীর মুখে বিরক্তির আভাস পেলেই নিজের সান্ধ্য আড্ডাটির লোভ সম্বরণ করে বলতে পারে—'ইস্ তাই তো তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে, চল খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আস যাক'—

কিম্বা—

'কি মিষ্টি দেখাচ্ছে আজ তোমাকে, এস, কাছে এস লক্ষ্মীটি।'

কিন্তু এসবে যদি কাজ না হয়, স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা হয়ে ওঠে তীব্র থেকে তীব্রতর। তখন স্বামীকে হতে হবে কঠিন অনমনীয়। শক্ত হাতে রাশ টানলে দুর্দান্ত অশ্বকেও যেমন বশীভূত করা যায়, বেয়াদপ বেপরোয়া নারীকেও তেমনি সজুত করা যায় স্থৈর্য ও কাঠিন্যের মাধ্যমে।

এবং এমনও চরিত্রের নারী আছে যারা ভদ্র ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অশান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেও যারা নিজেদের সংযত করতে পারে না কিছুতেই, এ ধরণের স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে মাঝে-মধ্যে দৈহিক বল প্রকাশ না করে উপায় নেই; অর্থাৎ সোজা কথায় সেক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষে একমাত্র করণীয় হল স্ত্রীকে বেশ কয়েক ঘা দেওয়া।

পশুবলের দ্বারা শাসিত হতে মেয়েরা যুগ-যুগান্ত ধরেই অভ্যস্ত—হয়ত তাই আজও সব দেশে সব সমাজে দেখা যায় এমন ক'জন মেয়েকে যারা পুরুষের বাহুবলকেই সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে থাকে।

তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে; এরা সংখ্যায় খুবই কম। কাজেই আজকের সভ্য মার্জিত পুরুষকে সহসা এই সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখা যায় না।

পরিশেষে এটুকুই বক্তব্য যে ঘ্যানঘ্যানে প্যানপেনে স্ত্রীকে শায়েস্তা করতে হলে স্বামীকে হতে হবে ধৈর্যশীল অথচ দৃঢ়, সহানুভূতিসম্পন্ন অথচ কঠিন।

বজ্রাদপি কঠোর, কুসুমাদপি কোমল, এই দ্বিবিধ গুণের মিশ্রণ আছে যে পুরুষের চরিত্রে, এই ধরণের স্ত্রীর পক্ষে সেই আদর্শ স্বামী

পৃথিবীর আদিপর্ব

(বাইবেলের অনুসরণে)

জ্ঞান যেখানে সীমিত: অনন্তকে পাওয়ার আকাঙক্ষা সেখানে বাতুলতা। প্রেম যখন অতলস্পর্শী, ক্ষুদ্র স্বার্থের গোষ্পদে যারা ডুবে মরছে সেই প্রেমের স্পর্শ পাওয়া সেখানে দুঃসাধ্য; কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে যে মহাকাশচারী মহাতেজা সূর্য, ক্ষুদ্রতম বুদ্বুদেও তো তার প্রতিবিম্ব পড়ে, কেন না ক্ষুদ্র হলেও সে যে মহাপারাবারের ক্ষুদ্র অণু। তাই হে মহাতেজা, পবিত্রতম যুগযুগান্তব্যাপী মহান পরমাত্মা, তোমার পদধূলির আকাঙক্ষায় তোমাকেই পাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছি। গোষ্পদ হয়ে তোমার প্রতিচ্ছায়া বক্ষে ধরবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করছি। তোমার অনন্তকালের পরিক্রমার পথে হঠাৎ যদি এক মুহূর্তের জন্যও তোমার প্রতিচ্ছায়া আমার বক্ষে স্পর্শ করতে পাই; আমি ধন্য হয়ে যাব, আমি অমর হয়ে থাকব---আমি সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করব।

●

অসীম অনন্ত অখণ্ড জলরাশি উঠল উত্তাল হয়ে, নূতন জাগরণের স্বপ্ন তার চক্ষে---নূতন জন্মের বেদনায় সে কাতর। বিরাট সূর্যের বক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন এক অংশ ক্রন্দন করছে আকুল হয়ে, তার ভাষা নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, আছে কেবল এক বেদনার্ত অনুভূতি, আর অবিশ্রাম কাতরোক্তি। সহস্র বাহু সে নিক্ষেপ করছে উর্ধ্বে, উত্তাল হয়ে উঠছে জাতক। মহা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সেই ঘন বাষ্পরাশি ভেদ করে নবজাতকের আকুল ক্রন্দন পৌঁছাল অনন্ত আত্মার কর্ণে। পুলকে বিকশিত হয়ে উঠলেন মহাশক্তি; এই তো আমার সৃষ্টি আমাকে জানবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে---তাহলে তো আমার সৃষ্টি বিফল হয় নি। নবজাতক স্তন্যের আশায় অনুসন্ধান করছে প্রসূতির। সন্তান জননীকে আঁকড়ে ধরতে চায়, বাঁচতে চায়, অমৃতের স্বাদ চায়।

সৃষ্টিলাভ করে। মহান স্রষ্টা জলদ-গম্ভীর স্বরে মহান আদেশ পাঠালেন, 'দীপ্তি হউক'।

ঘনান্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হতে লাগল। স্নিগ্ধ মৃদু আলোকে ভরে গেল চতুর্দিক। অন্ধ পেল জ্যোতির আভাস, শান্ত হয়ে এল আকুলতা। ক্রমে ক্রমে ভরে গেল চারিদিক অখণ্ড উজ্জ্বল তেজে। জাতক অনুভূতি লাভ করছে জননীর। প্রশান্তি নেমে এল বক্ষে, থেমে গেল অস্থিরতা।

শ্রীমতী সুহাস পালুই

জাতক আবার আকুল হয়ে উঠছে, দীপ্তির অনুভূতি পেয়েছি কিন্তু স্পর্শ কই? গন্ধ কই? বেদনার আবেগে মথিত হচ্ছে দেহ, ফুলে ফুলে ক্রন্দন করছে সাগর; নিজের আর্তিতে কখন অজ্ঞাতে সে সৃষ্টি করেছে প্রাণ। ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র প্রাণের স্পন্দন জেগেছে ক্ষুদ্রতম আধারে। তরঙ্গে তরঙ্গে প্রাণের অঙ্কুর স্পর্শ করে তীরভূমি। মাটি সযত্নে আঁকড়ে ধরে ক্ষুদ্র ভাবীকালের মহা-পরিণতির বীজ; শক্তির অণুকে, সযত্নে ঢেকে রাখে আপন জঠরে।

মহাশক্তির তেজঃপুঞ্জ স্পর্শ করে তাকে, আহ্বান জানায়।

সুপ্তি ভাঙে বীজের, ক্ষুদ্র শ্যামল দুটি হাত ছড়িয়ে দিয়ে উদাত্ত আহ্বান জানায় অনন্ত মহাকাশকে; অনন্ত রশ্মিমান সবিতাকে। পৃথিবীতে প্রথম বর্ণের উন্মোচন হয়। অনন্ত নীলিমার নিচে অসংখ্য শ্যামল পল্লবের করতালি দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বনস্পতি বেড়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন অন্তরে তার বেদনা জাগে। আনন্দ ও দুঃখের মিশ্রিত অভিব্যক্তি। প্রকাশ করতে চায় মহীরুহ আপনাকে; কিন্তু কেমন করে সে নিজেকে অনন্তের কাছে তুলে ধরবে? স্মিতহাস্যে পরমশক্তি তার অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশিত করেন পুষ্প মুকুল। বৃক্ষ নিজের দেহসৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, বিস্মিত হয়; অন্তরে এক অদ্ভুত পুলক অনুভব করে; ক্রমে মুকুল বিকশিত হয় পুষ্পে। আপন বর্ণে, আপন গন্ধে বৃক্ষ আকুল হয়ে ওঠে, মহাশক্তির কাছে আবেদন জানায়; এই যে গন্ধ, এই যে রূপের বিকাশ, একে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখবে কে? কে এই রূপের পূজা করবে? আমাকে

[illegible]তে আহ্বান করবে, এমন প্রণয়ী কোথায়?

আবার আলোড়িত হ'ল পারাবার। শান্ত হয়ে এল তরঙ্গ—সৃষ্টি হল প্রাণ। ক্রমে সেও নীরের আশ্রয় ছেড়ে অনুসন্ধান করতে লাগল নীড়ের। প্রাণী অল্প বুদ্ধি ও জড়তা নিয়ে খুঁজলো পৃথিবীর বুকে আশ্রয়। পল্লবিত ও পুষ্পিত মহীরুহ তখন আকুল আবেগে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে, তার সমস্ত আভরণ। পুষ্পে পুষ্পে ছেয়ে গেছে ধরাতল। ধরণী বাসক-শয্যা পেতেছে। বৃক্ষকে আঁকড়ে ধরে লতা কাঁপছে সোহাগে; বর্ণে বর্ণে রাঙা ধরাতল উন্মুখ হয়ে আছে নূতন অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

প্রথম স্খলিত চরণ ফেলে সে উঠে এল—কিন্তু তার চক্ষে অনুরাগের অঞ্জন কই? উদগ্র বন্য ক্ষুধা নিয়ে সে আহার্য অন্বেষণ করছে, ব্যাদান করছে তার বিশাল মুখগহ্বর। এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল পুষ্পরাজি, কোমল পল্লব। যন্ত্রণায় শিহরিত হতে লাগল মহীরুহের অঙ্গ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে লতা মহীরুহের পদতলে লুটিয়ে পড়ল।

মৃতলতা মহীরুহের পদতল জড়িয়ে পড়ে রইল, বৃক্ষ রোদন করছে যন্ত্রণায়। এই সৃষ্টি। উন্নততর প্রাণী? এর দন্তে পিষ্ট হওয়ার জন্য তার জন্ম?

সৃষ্টির দেবতা পরম ঈশ্বর অধীর হয়ে উঠলেন,—আরও উন্নততর প্রাণী চাই—আরও মহৎ, আরও সুন্দর—যে স্রষ্টার বন্দনা করবে, সৌন্দর্যকে প্রচার করবে—পরম শক্তিকে জানবার ও জানাবার জন্য আকুল হবে। ক্ষুধার্ত পশুর মধ্যে মহাশক্তি সঞ্চার করেন নূতন প্রেরণা।

বৃক্ষের কোটরে, আবাস মধ্যে এক মহাবংশের জন্ম হল। কোটর পরিত্যাগ করে সে যখন নেমে এল, তখন তার ক্ষুধার চেয়েও প্রবল হয়ে উঠেছে অপর এক বেদনা—সে বেদনা, সে আকাঙ্ক্ষা যে কি, তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। বিশাল দুটি চক্ষু অনন্ত আকাশের দিকে তুলে সে চেয়ে থাকে, পলক পড়ে না তার। দুই হাত ভরে রক্তবর্ণ পুষ্প তুলে অঞ্জলি দেয় বনস্পতির পদতলে। অদ্ভুত এক ধ্বনি নির্গত হয় তার কন্ঠ হতে। প্রথম সঙ্গীত। মহাসাগরের তীরে বসে সেই বিচিত্র স্বর তুলে সে যেন কার আহ্বান করে। ধ্বনি মন্ত্রিত হয় অনন্ত আকাশে, অনন্ত সমুদ্রের কল্লোলে।

অদ্বৈত শক্তির অন্তরে দ্বৈত হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। দ্বৈতের সৃষ্টি কেমন করে সম্ভব হবে? নিদ্রা নেমে এল প্রথম মানবের চক্ষে—গভীর নিদ্রার মধ্যে স্রষ্টা তুলে নিলেন প্রথম মানবের একটি অস্থিময় পঞ্জর, সৃষ্টি করলেন নারী।

মহাসুপ্তি থেকে জাগরণ এল। প্রথম মানবের চক্ষে অদ্ভুত দৃষ্টি। একি তার প্রতিচ্ছায়া? অথবা অন্য প্রাণী তার সমস্ত সম্পদ গ্রাস করতে চায়। চক্ষু [illegible] [illegible]—প্রথম ঈর্ষার বিকাশ।

মধুর করে হাসল নারী—প্রথম দর্শনের আবেগে সে মুগ্ধা। অবাক হয়ে সে দেখছে মহীরুহের পুষ্পিত শাখা, শ্যামল পত্ররাজি, নীল চন্দ্রাতপ, আর সূর্যাস্তের সোনালী রশ্মি। তার বামাকণ্ঠ হতে নির্গত হল কোমল মধুর স্বর। বংশীধ্বনি যেন আকুল করে তুলল শূন্য পৃথিবীকে।

নারী তার কোমল হস্তে পুষ্পিত শাখা হতে তুলে নিল রক্তবর্ণ পুষ্প, তার কেশরাশি, তার পেলব বাহু, গ্রীবা, বক্ষ আবৃত হয়ে গেল রাশি রাশি পুষ্পস্তবকে। বৃক্ষ তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য শতহস্ত প্রসারিত করল, নুয়ে পড়তে চাইল নারীর পদতলে।

হঠাৎ প্রথম নর দু'বাহু দিয়ে আকর্ষণ করলো তাকে এ আমার, আমার একান্ত নিজস্ব। প্রথম মানবের মুখে প্রথম নাম উচ্চারিত হল 'Eve' (হবা)। নারী পুলকিত হয়ে উচ্চারণ করল 'Adam' (আদম)।

তরঙ্গ দুই বাহু তুলে তাদের অভিনন্দিত করল—বৃক্ষ শতহস্ত আন্দোলিত করে পুষ্পবৃষ্টি করলো তাদের মস্তকে। প্রথম নারী ও প্রথম নর পরস্পরের বাহু আশ্রয় করে এগিয়ে চলে আশ্রয়ের সন্ধানে। পরম স্রষ্টা পরমেশ্বর পুলকিত হন তাঁর সৃষ্টির সাফল্যে।

ফেরিওয়ালা

সোনালী গঙ্গোপাধ্যায়

হরেক রকম জিনিষ আছে
হাজার রকম দাম,
নূপুর, চুড়ি, নোলক বিছে
বিদেশ-যাওয়া-থাম।
গলির গলি তারও পরে
হরেক দুয়ার জুড়ে
হাঁকিছে জিনিষ সস্তাদরে
এ-পথ ও-পথ ঘুরে।
রঙের জিনিষ ঢঙের জিনিষ
কথারই চুনকাম,
[illegible] কিতে বাহারী [illegible]
[illegible] [illegible] নাম।

চুলের কাঁটা, মাথার বেণী,
মা-মনসার টিপ,
মুখের কথায় বিকিকিনি
আছে মাথার ক্লিপ।
দরকারী সব, দরবারী সব,
নয়কো কিছু ফেলনা।
সাইজে বড়, জিনিষ বেঢপ
এমন রকম হয় না।
মাথায় ঝাঁকা পথটি বাঁকা,
চলছে নতুন দেশ
ছাড়িয়ে যেতে ছড়িয়ে যেতে
নেইকো কোন ক্লেশ।

অনেক দায়িত্বের আরও একটি-

মায়ের দায়িত্ব কথা শুনলেই কবির কথা মনে হয়—

মা হওয়া কি মুখের কথা।

সত্যিই মুখের কথা যে নয়—তা যাঁরা মা হয়েছেন সকলেই বুঝতে পারেন। যাঁরা বোঝেন না বা এড়িয়ে যেতে চান বা সব ভারটাই পরিচারিকার উপর ন্যস্ত করেন—তাঁদের সন্তান পালনের সব কাজটুকু কি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়?

অবশ্য একথা শুনলে যথেষ্ট প্রতিবাদ আসবে—কি করবো বলুন। ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে, সেই পাঁচটা পর্যন্ত অফিস বা স্কুলের মাস্টারমশাইগিরি।

এই কথাগুলো সব বাড়ীতেই সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ বাইরের কাজ তো সকলে করেন না, তবে করতে হয় প্রায় অনেককে। যাঁদের বাইরে বেরোতে হয়, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা মায়ের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়, পরিচারিকা বা বুদ্ধিহীনা কারুর, পরে এ দায়িত্ব দিতে হয় উপায়ান্তর থাকে না, তবে বাড়ীতে যদি গৃহিণী পদবাচ্য অথবা ঐ রকম কেউ থাকে তাহলে তাঁর নির্দেশে পরিচারিকারা চালিত হলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

কিন্তু ক'জনের ঘরে এ সুযোগ আছে, ভরসাই বা কই? এইসব কারণে বেশীর ভাগ সংসারে অনিচ্ছায় সন্তানরা অবহেলিত হয়ে পড়ে। একটু বড় হয়ে তারা যখন স্কুলে যায় তখন কয়েক ঘণ্টার জন্য মা কিছুটা স্বস্তিতে থাকতে পারেন, তাও যদি যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা থাকে।

এক সহকর্মী বান্ধবী একদিন চিন্তিত মুখে বললে: আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী যাবো ভাবছি মেয়েটার বড্ড শরীর খারাপ।'

বললাম, কি হয়েছে?

জয়তী বললে: জানো কি কি করেছে, একখানা কোয়াটার পাউণ্ড গোটা রুটি দুই বছরের মেয়েকে খাইয়ে দিয়েছে।

আঁতকে উঠে বললাম: বলো কি? সবটা একসঙ্গে?

জয়তী বললে: হ্যাঁ, ঝিকে বললাম এইটুকু মেয়েকে তুমি একখানা রুটির গোটাটা খাওয়ালে?

উত্তর দিল: ও খেতে চাইলো যে।

জয়তী তখন প্রায় কেঁদে ফেলে বললে: এই ক' ঘণ্টা বাচ্চাকে দেখবে বলে ওকে রেখেছি পঞ্চাশ টাকা মাহিনা আর খাওয়া পরা দিয়ে। কি করবো বল উপায় নেই।

তারপর সখেদে বললে, মা, মাসী, জেঠী খুড়ীও একটা যদি থাকতো আমার।

বললাম: তারজন্য তোমার দুঃখ করা উচিত নয় ভাই, যদি এঁরা থাকতেন, তাহলে তাঁরা যে নিজেদের সংসার ফেলে আসতেন, তার কি মানে আছে?

ইন্দিরা দেবী

●

এই ঘটনা প্রায় প্রতি পরিবারে ঘটে, যতদিন না তারা স্কুলে যেতে শেখে। কিন্তু মায়ের দায়িত্ব পড়ে শিশুটি জন্মাবার পর থেকেই। একটু অসাবধান হলেই প্রমাদ ঘটে। সে তার স্বাস্থ্য রক্ষার কথাই বলুন, শিক্ষাদীক্ষা, লেখাপড়া, আচার-ব্যবহার সব দিকেই। বাবারা কিছুই করে উঠতে পারেন না, সময় নেই। অনেক সময় সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলোও হয়ে ওঠে না।

তাই আজকাল যে মায়েরা বাইরে কাজ করেন না, তাঁদেরও সময় নেই। সকাল থেকে সংসারের দাবী মিটিয়ে, বাড়ীর কর্তার অফিসের সব গুছিয়ে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে নিজের ঘর কাজ ও স্নানাহার সেরে উঠে বিশ্রামের আর বিশেষ সময় থাকে না। কারণ স্কুল থেকে আবার ছেলেমেয়েদের আনতে হবে। সময়বিশেষে—বাসের ভিড়ে, গরমে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়। তারপর আবার সুরু হয় বৈকালিক পর্ব। সন্ধ্যায় তাদের লেখা-পড়া দেখা। পড়তে বসানো ও অন্য কাজ আছেই। তাই সবাই সোচ্চারে বলে ওঠেন: সময় কই আর? হিসাব করলে তাই। কিন্তু এইটুকু করেই তো সন্তান পালনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, যাবেও না। এসব ছাড়া আরো কাজ তাঁদের জন্য আছে। যার সময় মায়েদের খুঁজে বার করতে হবেই। এর থেকে—এই কাজের ঠাস বুনানীর মাঝখান থেকেই বার করতে হবে।

সন্তান পালনের অনেক দায়িত্বের মধ্যে একটি—তাদের নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন বেড়াতে যেতে হবে। সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ এসবে যেমন তাঁদের পরিচ্ছন্নতা শেখাতে হবে, লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী করে তুলতে হবে। ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে হবে—তেমনি বাইরের পাঁচটা জিনিষের সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। যেমন ফুল, পাখী জীবজন্তু বা নানাবিধ খেলাধূলা দেখান শেখানো প্রভৃতি।

এগুলো ঠিক চার দেওয়ালের মধ্যে বসে গল্প কথায় হয় না। অন্তত সপ্তাহে একটি দিন তাদের নিয়ে বেরোতে হবে। শীতকালে কত জায়গায় ফুলের প্রদর্শনী হয়। কোন ফুল কোন সময়ে ফোটে। দেখতে কেমন, এসব তাদের বোঝানো দরকার। সহরে যাঁরা থাকেন। তাঁরা চিড়িয়াখানার জীবজন্তু দেখাবেন। খেলাধূলা, গঙ্গার ধার। সেখানে কতরকম জাহাজ, তারা কোথায় কতদিনে যায়, জাহাজগুলির ভিতরে কি আছে। কেমন করে চলে। নৌকাভ্রমণ।

নদী ও সমুদ্রে কত মাছ থাকে। তাদের কেমন করে তুলে আনা হয়। ট্রেন চলে কিন্তু কেমন করে। বেড়াতে নিয়ে যদি দেখান হয়। তবেই সাধারণ জিনিসের জ্ঞান কল্পনা সবই তাদের মনে আসবে। কোথাও বেড়াতে যাবার নাম হলে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত থাকে না। ভাবলে কত যে আনন্দ হয়। কত না আগ্রহ তাদের অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার---তার হিসাব করা যায় না। এই দেখানো, বোঝানো ও জানানোর বেশী দায়িত্ব মায়েদের। চোখের সামনে, হাতের কাছে মাথার উপরে, আকাশের মাঝে, বা হাতের নাগালের মধ্যে কত কি রয়েছে---তার থেকে তাকে বোঝানো, দেখানো, পরিচয় করানোই তো হচ্ছে মায়ের কাজ।

আজকাল যেখানে যা উৎসবের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়---প্রদর্শনী, সাহিত্যসভা যা কিছু---তাতে ছোটদের জন্য কিছু না-কিছু ব্যবস্থা থাকে, যা আগের দিনে ছিল না। ম্যাজিক সিনেমা এসব ছাড়া তথ্যবহুল কিছু থাকেই, যা তাদের দেখা দরকার। সম্ভবস্থলে চেষ্টা করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মায়েদের ঘুরিয়ে আনা দরকার শরীরের ক্লান্তি, মনের অবসাদ দূর করার জন্য গৃহস্থালির অনেক কাজ এসব তো আছেই, দেখাবেন, শোনাবেন---তাছাড়া তাদের Outing দরকার---অর্থাৎ দৃষ্টি মন সব দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। একদিন দু'দিন, যেদিন যখনই পারা যায় এসব দেখা, চেনা ছাড়াও তাদের স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াতে নিয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্যের একটি।

দেশ বিদেশে বেড়াতে যারা পারে তাদের পাহাড় পর্বত নদী-সমুদ্র-উপত্যকা, বিখ্যাত স্থান এসবের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারা সৌভাগ্যবান সন্দেহ নেই, এই সৌভাগ্যের অধিকারী সকলে হয় না। তবু সেজন্যও চেষ্টা থাকা উচিত আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাপ্তাহিক বেড়াতে যাওয়া, সবকিছুর সঙ্গে পরিচয় করানো, তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়ে দেওয়া, জানবার ইচ্ছাকে জাগ্রত করে তোলা---এসব মায়েরই কাজ, তাই তাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া সব কর্তব্যের মধ্যে আরো একটি।

আসছে বছরের জন্যে ঠাণ্ডা মেজাজের পোশাক

[illegible]—ইন্টারস্টফ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বস্ত্র প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত নাম। এবার এই প্রদর্শনী হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে। সতেরটি দেশের প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি পোশাক নির্মাতা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সত্তর সালে নারী ও পুরুষেরা কি রকম পোশাক পরবেন তারই বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল এখানে। রেশমী, পশমী ও সিনথেটিক কাপড়ের পোশাকগুলি সবই বেশ হালকা রঙের ও মিঠে ঢঙের। বসন্ত ও গ্রীষ্মে পরার জন্যে যে ১৬০ রকমের জার্সি ছিল এখানে তার মধ্যে ফরাসী পোশাক নির্মাতা জ্যাকুইস এস্থেরের কার্মিজ লুক জার্সি সকলের মনে ধরেছে। অসংখ্য নারী পুরুষের মডেল দিয়ে প্রদর্শনীটিকে খুব চিত্তাকর্ষক করে তোলা হয়েছিল

সামাজিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে অশ্লীল সাহিত্য

খুব বেশিদিনের কথা নয়। আজ থেকে মাত্র সাতাশি বছর আগে আনন্দমঠের ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ, মহেন্দ্রর পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার তিনটি রূপের সঙ্গে। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখ' মা যা হইয়াছেন।'

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, 'কালী। ব্রহ্মা। কালী---অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনি পদতলে দলিতেছেন। —হায় মা।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধের বাংলা সাহিত্য, যাকে একদিন তিনি পাঠকের রুচি, চিন্তা ও ধ্যানকে মার্জিত এবং পরিশীলিত করবার কাজে অদ্ভুতরূপে ব্যবহার করেছিলেন, মাত্র সাতাশি বছর পরে তার পরিণতি লক্ষ্য করে কি বলতেন তিনি আজ বেঁচে থাকলে, তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। তিনি শুধু সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না, একই সঙ্গে পাঠকের রুচিকে সুস্থ রাখবার এবং কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করবার দায়িত্ব সাহিত্যিকের মহৎ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুরুচি এবং সুস্থ কল্পনা-শক্তির এই মন্বন্তরের যুগে তাঁকে মনে না পড়ে পারে না।

সাহিত্যের প্রায় সব জনপ্রিয় শাখাগুলোতেই আজ হৃতসর্বস্ব নগ্নিকার নৃত্য,—আপনার শিব আপন পদতলে দলিত করছে শ্মশানকালী। এও দেশমাতৃকার এক রূপ—যে রূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনায় ভেসে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের সামনে।

বলা নিষ্প্রয়োজন বঙ্কিমোত্তর এবং রবীন্দ্র ভাবধারায় অনুষ্ঠিত যুগের পরিণত মননশীলতা ও রুচির অধিকারী আমরা, সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা বর্তমানকালের সম্প্রসারিত ও ক্রমবর্ধমান এই সাহিত্যিক রুচি বিকারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। একধরণের বাজার-চলতি ব্যবসায়িক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সাহিত্য আমাদের যা সরবরাহ করে, প্রায় ভ্রূক্ষেপহীন নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা তা-ই গলাধঃকরণ করি। সোচ্চার আলোচনা এবং সমালোচনার মর্যাদা দিই এমন সব তথাকথিত সাহিত্য-কর্মকে, বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ ছাড়া আর কোন সম্পদই যার সম্বল নেই। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অপাঠ্য সাহিত্যের সংখ্যা তাই দিন দিন বেড়েই

কণা সেন

চলেছে। অপাঠ্য সাহিত্যের মধ্যে আবার অত্যন্ত সহজে চুম্বকের মতো চিন্তা এবং মনকে আকর্ষণ করে যে সাহিত্য—সেই অশ্লীল সাহিত্যের প্রসার ঘটছে সবচেয়ে বেশী।

সাধারণভাবে অশ্লীলতা বলতে আমরা বুঝি যৌনবিকার এবং রুচির বিকৃতি। এই বিকার ও বিকৃতি নানাভাবে প্রতিফলিত হতে পারে সাহিত্যে। প্রতিফলিত হতে পারে ভাষায়, নর-নারীর যৌন জীবনের উলঙ্গ ফটোগ্রাফিতে, উৎকট পাশবিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন চরিত্র-চিত্রণে এবং তার উপযোগী পরিবেশ রচনায়। আরও অনেক রকমভাবেই হতে পারে এবং কতরকম ভাবে যে হতে পারে তা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইদানীংকালের অতি জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকাগুলোর পাতা মাঝে মাঝে ওলটালে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

অবশ্য সাহিত্যে অশ্লীলতা বলে যে কিছু আছে এ কথা অশ্লীল সাহিত্যের রচয়িতারা স্বীকার করেন না। তাঁদের যুক্তি বড় অদ্ভুত। তাঁরা বলেন, 'বাস্তবে যা দেখি তাই-ই আমার সাহিত্য, যা দেখব যা বুঝব অবিকল তাকেই প্রকাশ করব—সেই হলো আমার সাহিত্যিক-সততা—।'

মনে হয় কতকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই বাস্তবতার নামে সাহিত্যে তাঁরা অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে ইচ্ছুক, নচেৎ পাঠকের চিন্তায় যথেচ্ছ এবং মাত্রা ছাড়া যৌনচিন্তার আমদানি অথবা রুচির ব্যভিচারের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কতখানি ক্ষতি করে সমাজ-মানসের, তা তাঁদের না বোঝবার কথা নয়। যেখানে ইঙ্গিতই যথার্থ সুন্দর সেখানে অনাবশ্যকভাবে ক্লেদাক্ত পরিবেশ রচনা করে পাঠকের রুচিকে শুধু অসুস্থ করে তোলার প্রচেষ্টা এবং তার চিন্তায় আবিলতা সঞ্চারের চেষ্টাকে

আর যাই হোক বাস্তবধর্মী সাহিত্য সাহিত্য বলা চলে না। বাস্তবধর্মী সাহিত্য বলতে যদি বুঝি বাস্তব-জীবনের নিখুঁত চিত্র তবে তা কেবল যৌন-চিন্তা-সর্বস্ব নয়। জীবনের সংগ্রামী চেতনা বহুমুখী এবং বহুতর সমস্যায় আকীর্ণ ও জর্জরিত বিবরের সংকীর্ণ-গর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কিংবা ইঙ্গ-মার্কিন সভ্যতার অনুকরণে প্রজাপতির বিলাস-সজ্জার উৎকট প্রদর্শনী কখনই তার মর্মকথা হতে পারে না। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর এই অপরাহ্নে যখন ইতিহাস-বিধাতা বাঙালীর ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের দুই কূল ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করছেন, যখন জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করাই সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত, ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে অসুস্থ নেশার রসদ যুগিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখা, তার বীর্য-ক্ষয়ের কুখাদ্য তাকে গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করা—কোন যথার্থ বাস্তব-নিষ্ঠ সাহিত্যিক কল্পনা করতে পারেন কি?

সাহিত্য সৃষ্টির প্রসূতা সমাজ ছাড়া নয়। সমাজ ছাড়া জীব নিয়ে কখনো কখনো সাহিত্য সৃষ্টি চলে বটে কিন্তু সমাজকে ছেড়ে দিলে সাহিত্যের চলে না। বনের জীবজন্তু সাহিত্যের পাঠক হতে পারে না।

সমাজে যাঁরা পঞ্চাশ পেরিয়েছেন তাঁদের কথা আপাতত থাক কিন্তু যারা পনেরোয় পা দিয়েছে তাদের ভাবনা এড়াবার যো কই। ছাপার অক্ষরে যে উত্তেজনা ও রুচির বিকার এবং অসুস্থ কল্পনার প্রতিফলন তারা দেখতে পায় সাহিত্যের পাতায়, অপরিণত মনে তার প্রভাবের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। আজকের হবু সাহিত্যিক-দের কাছে বাস্তবধনিষ্ঠ সাহিত্য মানে যদি হয় কতগুলো এলোমেলো, বিশৃংখল, অপরাধ-প্রবণ মানসিকতার খুঁটিনাটি চিত্র অঙ্কন আর হবু পাঠক-পাঠিকাদের রুচি গড়ে তোলে শ্লীলতা-বর্জিত ভাষায় রচিত নর-নারীর নিছক দৈহিক কামনা আর যৌন-বিলাস, তবে কথাটা ভয়ের এবং ভাবনার নয় কি?

অনেক সময় দেখা যায় বাজার-চলতি কিছু পত্র-পত্রিকার একমাত্র মূলধন অসুস্থ যৌন-উত্তেজনার সৃষ্টি। এক ধরণের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন প্রকাশকের দল এই ধরণের পত্র-পত্রিকাগুলোতে নানা ধরণের অশ্লীল-চিন্তার আমদানি করে বাজার ছেয়ে ফেলেছেন। এ পত্রিকাগুলো না বেরোলেও বাংলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি ছিল না, এমন কি বছরে এক-আধখানা বেরোলেও বিশেষ ক্ষতি হতো না। কিন্তু মাসে মাসে বেরোনোর ফলে সমাজ-মানসের উপর চোট পড়ছে বিস্তর। নানাধরণের বিকৃত যৌন-আবেদনমূলক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ,

ডঃ ফিলিপ ব্লেবার্গ গত ১৭ই আগস্ট লোকান্তরিত হয়েছেন। আজ থেকে ১৯ মাস আগে ডঃ ব্লেবার্গের হার্ট অপসারণ করে তথায় এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তির হার্ট বসান হয়। চিত্রে ডঃ ব্লেবার্গের পত্নী শ্রীমতী এলিন ব্লেবার্গ ও কন্যা শ্রীমতী জিলকে শোকস্তব্ধ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে

প্রণ্ডীজন ইত্যাদির উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের দলে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া—কেউ বড় বাদ থাকেন না।

সাহিত্যে অশ্লীলতার আতিশয্য ঘটলে তার দরুণ ভুক্তভোগী জনপাঠক-সমাজ। তাঁরা তো শুধু সাহিত্যের পাঠকমাত্র নন, সামাজিক কল্যাণেরও সমান অংশীদার। সুতরাং আজকের এ যুগটার—যেখানে 'এ' মার্কা সিনেমা-ছবি থেকে সেক্স্ মার্কা বাস্তব সাহিত্য পর্যন্ত—সর্বত্রই প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের একত্রে অবাধ বিচরণ, সে যুগে জনগণেশের নীতি কিছু দৃঢ় ও কঠোর হওয়াই উচিত।

একটা জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করে গড়ে তুলতে, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে, তার ব্যক্তি-জীবনের সর্বাঙ্গ মূল্যায়ন করতে সুস্থ সমাজ-চেতনা, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, নির্ভুল নৈতিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—এগুলো চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। আজকের যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের সাহিত্যে যদি তার কোন প্রতিফলন না ঘটে তবে বুঝতে হবে, জাতির অধঃপতনের পথে সাহিত্যও হয়েছে তার মৃত্যু-সঙ্গী।

কিন্তু—কতগুলো অশ্লীল নগ্ন যৌন-চিন্তার পশরা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই; যৌন-বিকৃতির কাদা ঘাঁটা ছাড়া বাঙালীর সমাজ-জীবনে নেই আর কোন চেতনা—এ কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। কারণ এ কথা সত্য নয়।

একজন শক্তিমান লেখক একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য যে পরিমাণ গবেষণা-ব্যাকেজ পরিশ্রম স্বীকার করেন, একখানা ভাল বাস্তব-উপন্যাস রচনার জন্য বাঙালীর জীবন ও বাংলা দেশের মাটিকে সেভাবে তিনি অধ্যয়ন করেন কি? এমন অনেক প্রকাশক আছেন উচ্চ মূল্য দিয়ে যাঁরা লেখককে দিয়ে সেক্সধর্মী রচনা লিখিয়ে নেন। বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনার জন্য তেমন কোন প্রকাশক কোনদিন কি কোন লেখককে আহ্বান জানিয়েছেন উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে?

সাহিত্যে অশ্লীলতা বর্জন এবং যুগোপযোগী জাতীয় সাহিত্য রচনায় এবং পরিবেশনায় জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের কারো দায়িত্বই কম বলে আমরা মনে করি না।

মধ্যমচরিত কথা

সুচরিতা সেনগুপ্ত

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'

গীতার এ বাণী নিগূঢ় তাৎপর্যবাহী। এর নিহিতার্থ এবং উদ্দেশ্য আমাদের জীবনচর্যার মূল ভিত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থপাঠে আমরা জানতে পাই দুষ্ট রাবণবধের কারণে রঘুপতি রামের জন্ম। মহাভারতের দুরাচারী, দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা তৎসহ পাপে নিমগ্ন কুরুবংশ ধ্বংস করার মূলে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহ ও সাহস প্রেরণা-সম্বলিত অমূল্য উপদেশ ও নির্দেশের বাণী আমরা গীতাপাঠে অবগত হই।

'যথা ধর্মঃ জয়োস্তথা'—ধর্ম যদি রক্ষা পায় তবেই ত্রি-জগতের কল্যাণ সম্ভব। পবিত্র 'চণ্ডী'র কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি দেবী দুর্গা মহিষাসুর প্রভৃতি মহাপরাক্রমশালী দৈত্য দমন করে স্বর্গের শান্তি, পবিত্রতা, সুশৃঙ্খলা রক্ষা করেন। 'দেবী পুরাণে' আছে—

'স্মরণাদভয়ে দুর্গাত্তারিতা রিপুসঙ্কটে
দেবাঃ শক্রদয়ো যস্মাত্তেন দুর্গা প্রকীর্তিতা।'

যিনি চণ্ডী তিনিই দুর্গা। ত্রিজগতের মূলাধার পরমাশক্তি, পরমব্রহ্ম তিনিই।

'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি। ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।'

'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' ধর্মীয় নীতির বিশেষ অঙ্গ। শিষ্টের পালনার্থ ত্রিদিবেশ্বরী মহামায়াকে বার বার বিবিধরূপ ধারণ করতে হয়েছে। কখনো তিনি মধুকৈটভবিনাশী 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান শ্রীহরি, (প্রথম চরিত), কখনো মহিষাসুরদলিনী শ্রীশ্রীদুর্গা (মধ্যমচরিত), তিনিই আবার রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভনিশুম্ভ নিধনকারী সর্বশক্তিস্বরূপিণী শ্রীচণ্ডিকা।

একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহের অপূর্ব আখ্যান আমাদের মনকে যেমন ভক্তিপ্লুত, হর্ষোৎফুল্ল করে—তেমনি প্রতিটি বীরত্ব-গাথা অন্তরে সঞ্চার করে আশ্চর্য অনুপ্রেরণার, শৌর্য-বীর্যবর্ধক অদ্ভুত উদ্দীপনার।

পুরাকালে অধার্মিক দুর্ধর্ষ অত্যাচারী দানবের উৎপীড়নে স্বর্গরাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বার বার বিঘ্নিত হয়েছে। দেবতারা বিচলিত হয়েছেন। চূড়ান্ত বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে ত্রিভুবনে। পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা সর্বেশ্বরী মহাকারণিকার শরণাপন্ন হয়েছেন। অবশেষে বীর্যবতী মহাশক্তি তাঁদের রক্ষা করেছেন।

চণ্ডীর প্রথম চরিতে মধুকৈটভ নিধনের কথা বিবৃত হয়েছে। 'উত্তরচরিত' পাঠে জানা যায় শুম্ভ-নিশুম্ভবধের কাহিনী আর আমাদের আরাধ্য দুর্গাপূজা, চণ্ডীর মধ্যম

[illegible]তে মহিষাসুর বধকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ঐ কাহিনী যেমন চমৎকার তেমনি ভয়ঙ্কর।

মাহিষ্মতী ও রম্ভাদানবের পুত্র মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গরাজ্যে দেবতাগণের মধ্যে নিদারুণ আতঙ্ক ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। সেই ভীষণ অরাজকতা থেকে উদ্ধারকল্পে পরাজিত ভীত ত্রস্ত দেবতারা ব্রহ্মাকে অগ্রভাগে নিয়ে শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি সকল দেবতার শরীর থেকে অপূর্ব তেজরাশি বিনির্গত হয়ে তা থেকে উদ্ভূত হয় এক অতুলনীয় জ্যোতি,—যা ক্রমে পরিণত হয়েছিলো ত্রিলোকপরিব্যাপ্ত এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তিতে। ইনিই মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা।

স্বর্গের সমস্ত দেবদেবী, মুনি-ঋষিগণ, অষ্টবসু, দশপ্রজাপতি, দ্বাদশ আদিত্য, গন্ধর্ব, বরুণ, যম, ক্ষীরসমুদ্র হিমালয় প্রভৃতি নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী আভরণ, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা দুর্গাকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করেন। দেবীর সেই রূপ তখন ভয়ঙ্কর।

'অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ।
চুক্ষুভুঃ সকলালোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।

সালঙ্কারা সম্মানিতা সশস্ত্রা মহাদেবীর অট্টহাসির ভয়ঙ্কর গর্জনে সমুদ্র বসুন্ধরা কম্পিত হতে লাগলো। বিচলিত হলো সকল ভুবন। দেবতাগণের জয়ধ্বনি ও মুনিগণের স্তব দ্বারা তিনি পূজিতা হতে লাগলেন।

শুরু হলো প্রলয়ঙ্কর সংগ্রাম।

'ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধা মুক্তৈরাদীপিত দিগন্তরম্।'

যুদ্ধে তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি (শল্য), মুষল, খড়্গ, কুঠার, পট্টিশ ইত্যাদি নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিলো। মহিষাসুরের সেনাধ্যক্ষ চিক্ষুর, অসিলোমা, উদগ্র, বাস্কল-নামধারী দৈত্যগণ যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মহাদেবীকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে লাগলো।

'সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রান্যস্ত্রানি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজ-শস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।'

যুদ্ধরতা দেবীর পক্ষ হয়ে দেবতা ঋষিগণ অসুরদের প্রতি অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অম্বিকার [illegible] সাথে সাথে [illegible] হতে লাগলো। মহাদেবী স্বয়ং—

'ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান।'

ত্রিশূল, গদা, খড়্গাদি দ্বারা মহাবলবান দানবদের ধ্বংস করতে লাগলেন।

প্রলয়ঙ্কর এই যুদ্ধে মহাপরাক্রমশালিনী বীর্যবতী অম্বিকার অস্ত্রাঘাতে অতি বলদর্পী দৈত্যগণ ক্রমে ক্রমে নিধনপ্রাপ্ত হতে লাগলো।

'নিরন্তরাঃ শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দনাঃ।'

ভীষণাকায় মহিষাসুর কখনো 'সিংহরূপ', কখনো 'খড়্গহস্তপুরুষ', কখনো 'গজরূপ' ছদ্মবেশ ধারণ করে দুর্গাদেবীকে প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। ভয়ঙ্কর সেই আক্রমণে দেবী কুপিতা হলেন। আরক্ত হলো তাঁর মুখমণ্ডল। মহিষাসুরের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করে শূল দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত হানলেন তিনি। মহিষের মুখবিবর থেকে অসুরের অর্ধদেহ নিষ্ক্রান্ত হলো। বলদর্পিত প্রবলপরাক্রান্ত যুধ্যমান মহিষাসুরের মস্তক দুর্গার অসির আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

স্বর্গে আনন্দের ঢেউ বয়ে চললো। দেবতাগণ, মুনি-ঋষিগণ ভক্তিনম্র চিত্তে সহর্ষে জগন্মাতার বিবিধ স্তবগান করতে লাগলেন।

'দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণশক্তি-সমূহ-মূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেব মহর্ষিপূজ্যাং,
ভক্তিনতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।

দুষ্ট দুঃশীল দুরাচারকে শক্তিশালিনী দেবী দমন করেন।

'দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি। শীলং
রূপং তথৈতদ বিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।

পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা, সংহতি রক্ষা পায় তাঁরই অযাচিত কৃপা করুণায়। দেবী দুর্গার কৃপাধন্য ত্রিভুবন সেদিন তাঁর মহিমা কীর্তনে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো—

'ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারি ভবান্নমস্তে।'

কাল বাগবাজার থেকে ফেরার সময় ঠিক করেছিলাম, দু-চারদিন পর দত্তপুকুরে মালতীদের খোঁজ করতে যাব। কিন্তু ফেরার পর অনুভব করেছি, মনটা খুব অস্থির হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে আগের সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলেছিলাম। দু'চার-দিন পর না, সকালবেলা উঠেই দত্ত-পুকুর যাব।

●

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেরুতে যাব, বাধা পড়ল। ঘরের বাইরে আসতেই রিণ্টুর সঙ্গে দেখা। পরশু দিন এসেছি। প্রায় দু'রাত দু'দিনের মত কেটে গেছে। অথচ এই প্রথম রিণ্টুকে দেখলাম।

রিণ্টু আবার বলল, 'অবশ্য বলবেই বা কখন। পরশু বাড়িই ছিলাম না। কাল সকালবেলা এসেই বেরিয়ে গিয়ে-ছিলাম ; ফিরেছি মাঝ-রাত্তিরে। তখন আর কে বলছে! সে যাক গে, কেমন আছেন বলুন—'

'ঐ একরকম—'

'মামা-মামীমা ?'

'এমনি ভালই। তবে—'

'কী ?'

'দেশের অবস্থা খুব খারাপ।'

'খারাপ কেন ?'

'আবার দাঙ্গা-টাঙ্গা, এ্যাবডাকসন শুরু হয়েছে।'

'নাঃ, ইস্টবেঙ্গলে কেউ থাকতে পারবে না।'

আমি নিরুত্তর।

রিণ্টু বলতে লাগল, 'সেবার না

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

গেলেই ভাল করতেন চিরঞ্জীবদা। বড়দা আপনার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছিল না ?'

'হ্যাঁ।'

'সেই চাকরিটা আপনার নেওয়া উচিত ছিল।'

অন্যমনস্কের মত উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।' তারপরেই বললাম, 'কিন্তু কী করব, বাবা দেশ থেকে চিঠি লিখলেন। চলে গেলাম।'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ভালো কথা—'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম, 'কী ?'

রিণ্টু বলল, 'চাকরির ব্যাপারে বড়দাকে ধরুন না ; অনেক লোকের সঙ্গে ওর আলাপ। ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে।'

'বিমলদার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

এই সময় মালতীর কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললাম, 'আচ্ছা রিণ্টু—'

'কী বলছেন ?'

'এখান থেকে দত্তপুকুর কিভাবে যেতে হয় ?'

রিণ্টু বলল, 'শিয়ালদা থেকে ট্রেনে যেতে পারবেন। তা ছাড়া শ্যাম-বাজার থেকে বাসেও যাওয়া যায়।'

'কতক্ষণ লাগবে ?'

'আমাদের বাড়ি থেকে ঘণ্টা দুয়েকের মত।'

এখন প্রায় সাতটা বাজে। এক্ষুণি যদি বেরুতে পারি, পৌঁছুতে পৌঁছুতে তা হলে ন'টা বেজে যাবে। ঘণ্টাখানেকও যদি মালতীদের ওখানে থাকি, ফিরতে ফিরতে বারোটা। দুপুরবেলা ফিরতে পারলে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে বিকেলে একবার অমলের কাছে যাব।

রিণ্টু বলল, 'দত্তপুকুর যাবেন নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'সেখানে কেউ আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের দেশের একজন লোক।' ইচ্ছে করেই মালতীদের নাম-টাম বললাম না।

দু'বছরে বেশ বড় হয়ে উঠেছে রিণ্টু। কৈশোরের সেই কচিভাব আর নেই ; এখন সে পরিপূর্ণ যুবক।

যাই হোক, সূর্য মাথার ওপর না এলে এ. বাড়ির ছেলেরা বিছানা ছাড়ে না ; আগেই আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এত ভোরে রিণ্টুকে দেখে তাই অবাক হয়ে গেলাম।

রিণ্টুও আমাকে দেখে প্রথমটা খুব অবাক ; তারপর খুশী হয়ে উঠল। বলল, 'আ রে চিরঞ্জীবদা! কবে এসেছেন!'

'পরশু সন্ধ্যেবেলা।'

'পরশু! কই আমাকে তো কেউ বলে নি!'

আমি কী বলব, চুপ করে রইলাম;

রিণ্টুর কৌতূহল অদম্য। সে বলল, 'আত্মীয়-টাত্মীয় ?'

'না ; এমনি জানাশোনা।'

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ নিজের অজান্তে বলে ফেললাম, 'এবার এসে তোমার একটু পরিবর্তন দেখলাম।'

রিণ্টু সাগ্রহে শুধলো, 'কী বলুন তো ?'

'আজকাল বেশ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠছ।'

'কই না তো।'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'কিন্তু আজ—'

রিণ্টু বলল, 'ও, আজকে দেখে মনে করেছেন আমার অভ্যেস বদলে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আজকের ব্যাপারটা এ্যাকসিডেণ্ট।'

'কিরকম ?'

হাসতে হাসতে রিণ্টু বলল, 'কাল একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। খুব হৈ-চৈ হয়েছে। গার্ল ফ্রেণ্ড-ট্রেণ্ড ছিল। বুঝলেন না—' বলে চোখের তারা নাচিয়ে বিশেষ ইঙ্গিত করল।

এই দু'বছরে রিণ্টুর বেশ উন্নতি হয়েছে। পার্টি-টার্টি করছে ; মেয়েবন্ধু নিয়ে বাইরে হুল্লোড় চালাচ্ছে।

রিণ্টু বলতে লাগল, 'অত রাত্তিরে ফিরে আর ঘুম হল না। বিছানায় শুয়ে ইনসমনিয়ায় ছটফট করেছি। সক্কালবেলা বিছানায় পড়ে থাকতেও ভাল লাগল না ; বাইরে বেরিয়ে এলাম ; বেরিয়েই দেখি আপনি।'

এতক্ষণে রিণ্টুর 'প্রাতরুত্থানে'র কারণটা জানা গেল। অস্ফুটে বললাম, 'ও—'

রিণ্টু বলল, 'হ্যাবিট বদলাবার কোন কারণই নেই। নো চেঞ্জ—সে যাক গে, চলুন আপনার ঘরে যাই। একটু গল্প করা যাক—'

কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমি এখন একটু বেরুব।'

'এই সক্কালবেলা কোথায় যাবেন ?'

'দত্তপুকুর।'

'এক্ষুণি যাওয়া দরকার ?'

'হ্যাঁ।'

'ফিরছেন কখন ?'

'দুপুরবেলা।'

কি ভেবে রিণ্টু বলল, 'ঠিক আছে। পরেই আপনার সঙ্গে গল্প করা যাবে। তবে একটা কথা—'

আমি তাকালাম, 'কী ?'

'সেই ব্যাপারটা মনে আছে ?'

'কোন্‌টা বলুন তো ?'

'ঐ যে মাঝরাত্তিরে ফিরতাম ; আপনি দরজা খুলে দিতেন।'

'আছে—'আমি হাসলাম।

রিণ্টু হাসল, আপনি দেশে চলে যাবার পর ভারি অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিলাম। যাক, এসে গেছেন। আমার দুশ্চিন্তা কাটল। রাত্তিরে একটু কষ্ট করে দরজা-টরজা খুলে দেবেন।'

'দেব। আচ্ছা এখন তা হলে বেরিয়ে পড়ি—'

'যাবেনই যখন আর আটকাব না।'

●

দত্তপুকুরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। ভেবেছিলাম, মালতীদের ঠিকানাটা স্টেশনের কাছাকাছিই হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সুভাষ কলোনি এখান থেকে পাক্কা আড়াই মাইল রাস্তা।

একবার ভাবলাম, ফিরে যাই। পরক্ষণেই মালতীর মুখ মনে পড়ল। নাঃ, এতদূর এসে ফিরে যাওয়া যায় না।

স্টেশনের বাইরে এসে হাঁটতে শুরু করলাম। মাঠের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। লোককে জিজ্ঞেস করে করে যখন বিবেকানন্দ কলোনিতে এলাম তখন দুপুর হতে বেশি বাকি নেই। আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে সূর্যটা প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে।

চারধারে ধানখেত, নীচু জলা জায়গা, হোগলাবন। মাঝখানে টিন কিংবা টালি-ছাওয়া নতুন নতুন খান-কতক ঘর নিয়ে সুভাষ কলোনি।

এর ভেতর থেকে শিশির মুখুটির বাড়িটা অনায়াসেই খুঁজে বার করতে পারলাম। বাড়ি আর কি ; দু'খানা মাঝারি টালির ঘর, তাদের গায়ে পূর্ব-বাঙলার ধরণে কাঁচা বাঁশের বেড়া, মাটির মেঝে। সামনের দিকে ঢালা উঠোন। উঠোনের একধারে লাউয়ের মাচা, দু-চারটে রোগা চেহারার গাঁদা গাছ। সন্ধ্যামালতী, পঞ্চমুখী জবা আর মান-কচুর গাছও চোখে পড়ে।

উঠোনে দাঁড়িয়েই ডাকলাম, 'শিশিরবাবু, শিশিরবাবু—'

একটু পর দক্ষিণদিকের ঘরটার দরজায় যে এসে দাঁড়াল সে মালতী। কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'আপনি।'

দু'বছরে অনেক রোগা হয়ে গেছে মালতী। গায়ের রঙ ছিল রৌদ্রঝলকের মত উজ্জ্বল, গনগনে। তার ওপর মলিন ছায়া পড়েছে। চোখমুখ ক্লান্ত। মালতীকে ঘিরে নিরানন্দ বিষণ্ণ কিছু একটা অনড় হয়ে আছে।

সামান্য হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি। কেমন আছ তোমরা ?'

উত্তর না দিয়ে মালতী বলল, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের দিকে যেতে যেতে শুধোলাম, 'তোমার বাবা কোথায় ? বাড়িতেই আছেন ?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল মালতী, অর্থাৎ আছেন।

ঘরের ভেতর আসতেই মালতী বলল, 'ঐ যে বাবা—'

একধারে জানলার কাছ ঘেঁষে একটা তক্তপোষ পাতা। তার ওপর শিশির মুখুটি শুয়ে আছেন ; ঘুমুচ্ছেন। পা থেকে গলা পর্যন্ত ময়লা চাদরে ঢাকা।

একটা চেয়ার দেখিয়ে মালতী বলল, 'বসুন।' তারপর শিশির মুখুটির কাছে গিয়ে ডাকতে লাগল, 'বাবা—বাবা—'

আমি বাধা দিলাম, 'উনি ঘুমুচ্ছেন ; ডেকো না—'

কিন্তু ততক্ষণে চোখ মেলেছেন শিশির মুখুটি। বললেন, 'ডাকছিস কেন ?'

'দ্যাখো কে এসেছে—'

এবার আমার দিকে নজর পড়ল শিশির মুখুটির। বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'আ রে তুমি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেশ থেকে কবে এলে?'

'পরশু।'

'আমাদের এখানকার ঠিকানা পেলে কোথায়?' বলতে বলতে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন শিশির মুখুটি।

কার কাছ থেকে ঠিকানাটা সংগ্রহ করেছি, বললাম।

'আমাদের জন্যে তা হলে বাগ-বাজারেও গিয়েছিলে।'

আগে খেয়াল করিনি, এবার ভাল করে লক্ষ্য করলাম। শিশির মুখুটির চেহারাও খুব খারাপ হয়েছে। এমনিতে বেশ সুপুরুষ ছিলেন। গায়ের রঙ জ্বলে তামাটে হয়ে গেছে। গাল বসে গেছে। কণ্ঠার হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। চোখের কোলে শ্যাওলার মত কালচে দাগ। দু'বছর আগে আমি যাঁকে দেখে গেছি, এ যেন তাঁর প্রেত। শরীরে হাড় ছাড়া দর্শনীয় আর কিছুই প্রায় নেই।

বললাম, 'বাগবাজারে না গেলে আপনাদের ঠিকানা পাব কোথায়! আপনার নাম করে মাঝে মাঝে মালতী আমাকে চিঠি লিখত। বছরখানেক আগে তার চিঠিও বন্ধ হয়ে গেল। শেষ চিঠিতে মালতী লিখেছিল, রাধামোহনবাবু বিহারে বদলী হয়ে যাচ্ছেন। আপনারা কোথায় যাবেন ঠিক নেই। মালতীর চিঠি পেয়েই উত্তর দিলাম কিন্তু তারপর থেকে আপনাদের কোন খোঁজই নেই।'

শিশির মুখুটি বললেন, 'আমি তো মালতীকে চিঠি লিখতে বলতাম। ও লেখেনি?'

'কই, আমি তো পাই নি।'

শিশির মুখুটি এবার মেয়ের দিকে তাকালেন, 'কি রে, লিখিস নি কেন?'

মালতী উদাসীন স্বরে বলল, 'নিজেদের দুঃখের কথা জানিয়ে জানিয়ে লোককে ব্যতিব্যস্ত করে কী লাভ।'

একটু নীরবতা।

তারপর শিশির মুখুটিই শুরু করলেন, 'কেমন আছ বল—'

বললাম, 'ঐ একরকম—'

'দেশের অবস্থা কেমন?'

'খুব খারাপ।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ স্বরে শিশির মুখুটি বললেন, 'আবার তা হলে লেগেছে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

'ওখানে আর থাকা যাবে না, কি বল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এবারও কি একলাই এসেছ না মা-বাবাও এসেছেন?'

'একলাই এসেছি। চাকরি-বাকরির একটা ব্যবস্থা না হলে ওঁরা এসে কী করবেন?'

'সে তো ঠিকই।' শিশির মুখুটি মাথা নাড়তে লাগলেন, 'তা চাকরির কিছু ব্যবস্থা হল?'

'সবে তো কাল এলাম। এবার চেষ্টা করব; যেমন করেই হোক, দশ-পনের দিনের ভেতর একটা কিছু যোগাড় করে ফেলতেই হবে।'

শিশির মুখুটি কি ভেবে বললেন, 'যাদবপুরে তোমার সেই পিসেমশাইর এখানেই উঠেছ তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

একটু চুপ।

তারপর আমিই বললাম, 'এতক্ষণ আমার কথাই তো হল। এবার আপনাদের কথা কিছু বলুন।'

শিশির মুখুটি মলিন হাসলেন, 'আমাদের কথা আর কী শুনবে! বাগবাজারে বড় ভায়রার ওখানে ছিলাম। হঠাৎ উনি পাটনায় বদলি হয়ে গেলেন।'

'এ খবরটা পেয়েছিলাম। মালতী চিঠিতে জানিয়েছিল। সে-ই তার শেষ চিঠি।'

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'ভায়রা পাটনায় চলে গেলেন। আমরা তো আর তাদের সঙ্গে যেতে পারি না। তা ছাড়া এই সময় খানিকটা সুবিধাও হয়ে গেল; রিফিউজি হাউস বিল্ডিং লোন পেয়ে গেলাম।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'মাণিক আর খোকনকে তো দেখছি না।'

মাণিক-খোকন মালতীর দুই ভাই।

শিশির মুখুটি বললেন, 'মাণিক এখানে নেই। বড় ভায়রা ওকে পাটনায় নিয়ে গেছেন। সেখানেই স্কুলে ভর্তি হয়েছে।'

'আর খোকন?'

'খোকন এখানেই আছে।'

'পড়াশোনা করছে তো?'

'ঐ নামেই। গেল বছর প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল, ফেল করেছে। এবছরও দেবে-দেবে বলছে। কিন্তু পড়ে কই? দিনরাতই তো আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে। একদণ্ড যদি বাড়িতে থাকে!'

আমি আবার আগের প্রসঙ্গে চলে গেলাম, 'রিফিউজি হাউস বিল্ডিং লোনের কথা কী বলছিলেন?'

শিশির মুখুটি বললেন, 'ও হ্যাঁ বিল্ডিং লোন পাবার পর এখানে বাড়ি তৈরি করলাম।'

'আচ্ছা—'

'বল।'

'আপনাদের এটা কি জবরদখল কলোনি?'

'না-না। গভর্নমেণ্ট এই জায়গাটা আমাদের কাছে প্লট প্লট করে বিক্রি করেছে। অবশ্য টাকাটা এক্ষুণি দিতে হয়নি; ইনস্টলমেণ্টে শোধ দিতে হবে।'

'ক'টা ইনস্টলমেণ্টে?'

'পনেরটা।'

হঠাৎ আমার মনে হল, এখানে একটা জমিটমি নিলে কেমন হয়? যাদবপুরে সেই জবরদখল কলোনিটায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটুও জায়গা নেই। সুরেনদাও এতদিন পর বাড়ি-টাড়ি এক্সচেঞ্জ করিয়ে দিতে পারবে কি না কে জানে। বললাম, 'আপনাদের এখানে জমিটমি পাওয়া যাবে?'

শিশির মুখুটি মাথা নাড়লেন, 'না। যেটুকু জমি গভর্নমেণ্ট এ্যাকোয়ার করেছিল সব ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর শিশির মুখুটিই আবার শুরু করলেন, 'বাড়ি-টাড়ি করবার পর এখানে চলে এলাম।'

আমি শুধোলাম, 'এখন কাজকর্ম কিছু করছেন? মানে চাকরি-টাকরি?'

'করছিলাম। শিয়ালদার কাছে একটা বড় রেডিমেড পোশাকের দোকানে সেল্‌সম্যানের চাকরি জুটেছিল। কিন্তু—'

লক্ষ্য করলাম, সমস্ত ঘরখানায় অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছে। মালতী একধারে দাঁড়িয়ে আঙুলে কাপড় জড়াচ্ছিল। তার হাত এখন স্থির। চোখের পাতা নড়ছে না।

বিভ্রান্তের মত বললাম, 'কিন্তু কী?'

অদ্ভুত হাসলেন শিশির মুখুটি, 'চাকরিটা কপালে টিকল না।'

'কেন?'

উত্তর না দিয়ে হঠাৎ পায়ের দিক থেকে চাদরটা টেনে তুলে ফেললেন শিশির মুখুটি। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম। হাঁটুর তলা থেকে ডান পা'টা নেই। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'এ কি!'

শিশির মুখুটি নিজের কপাল দেখিয়ে বললেন, 'অদৃষ্ট—'

'কি করে এমন হল?'

'রোজ দশটায় দোকানে হাজিরা দিতে হত। ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা। দশটায় এ্যাটেনডান্স দিতে হলে এখান থেকে ন'টার ট্রেন ধরতে হয়। ন'টায় সময় অফিসের ভিড়। ভেতরে জায়গা পেতাম না; বাইরে ঝুলে ঝুলে যেতে হত। এভাবে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করার অভ্যাস নেই। একদিন—'

রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'একদিন কী?'

'কিভাবে যে হাত ফসকে গেল, বলতে পারব না। এটুকু শুধু মনে আছে, কেউ যেন ধাক্কা মেরে আমাকে চাকার তলায় নিয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি হাসপাতালে শুয়ে আছি। আর—আর আমার এই ডান পা'টা নেই—' বলতে বলতে হঠাৎ শিশুর মত কেঁদে উঠলেন।

কী বলব, কোন্ ভাষায় এই বর্ষীয়ান মানুষটিকে শান্ত করব, ভেবে পেলাম না। দিশেহারার মত একবার মালতী, আরেকবার শিশির মুখুটির দিকে তাকাতে লাগলাম।

এদিকে মালতী তক্তপোষের দিকে এগিয়ে গেছে। শিশির মুখুটির বুকে-পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কেঁদো না বাবা, কেঁদো না—'

শিশির মুখুটি থামলেন না, 'এর চাইতে যদি জ্ঞান না ফিরত, হাসপাতাল থেকে বাড়ি না আসতে হত। সে অনেক ভাল ছিল। এভাবে বেঁচে থাকব, কোনদিন কি ভেবেছিলাম। কেন যে আমার মৃত্যু হল না।'

মনে মনে ভাবলাম, যাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে, যাঁর মেয়েকে দস্যুরা লুট করে নিয়ে যায় আর দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়ে সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ঘরে নির্বাসন নিয়েছেন, মৃত্যুই তো তাঁর কাছে সব চাইতে কাম্যবস্তু।

মালতী বলতে লাগল, 'ওসব কথা বোলো না বাবা, বোলো না—'

অনেকক্ষণ কান্নার পর স্থির হলেন শিশির মুখুটি। তারপর হাতের পিঠে চোখ মুছে শান্ত গলায় বললেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব—'

আমি উন্মুখ হলাম।

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'মনের দুঃখে একেক সময় মৃত্যুর কথা বলি। কিন্তু আবার ভাবি, যদি মরে যেতাম, মালতীকে কে দেখত? খোঁড়া হই, অথর্ব হই, তবু তো আগলে আছি।'

উত্তর দিলাম না।

শিশির মুখুটি কি ভেবে আবার বললেন, 'আমি ঘরে বসার পর সংসার যে কি ভাবে চলছে, ভগবানই জানেন—একটানা গোঙানির মত দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে যেতে লাগলেন তিনি।

আরো কিছুক্ষণ পর বললাম, 'দুপুর হয়ে গেল, এখন উঠি।'

'এক্ষুণি যাবে!'

'এককাপ চা-ও তো খেলে না?'

'আরেক দিন এসে খাব।'

'ঠিক তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কবে আসছ?'

'শীগ্‌গিরই—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম। মোট কথা, এই ঘরে বসে থাকতে আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এখানে বাতাস নেই। চারধারের দেয়ালগুলো ক্রমশ এগিয়ে এসে আমাকে যেন ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল।

আমি বেরিয়ে এলাম। পিছু পিছু মালতীও এল।

উঠোনে এসে মালতী বলল, 'কেমন দেখলেন আমাদের?'

আমার উত্তর দেবার কিছু ছিল না।

মালতী আবার বলল, 'বাবাকে মিথ্যে স্তোক দিলেন কেন?'

'স্তোক!' আমি হকচকিয়ে গেলাম।

'নয় তো কী?'

'কখন স্তোক দিলাম?'

'ঐ যে বাবাকে বললেন, আবার আসবেন—সত্যিই তো আর আসছেন না।' বিচিত্র হাসল মালতী।

দিশেহারার মত বললাম, 'আবার নিশ্চয়ই আসব।'

খুব আস্তে করে মালতী বলল, 'দেখা যাবে।'

একটু চুপ।

তারপর মালতীই বলল, 'আসুন আর না-ই আসুন, আমার একটা উপকার করবেন?'

'কী?'

'নিজের জন্যে তো চাকরির চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে আমার জন্যেও করবেন?'

'তুমি চাকরি করবে!'

'সব তো দেখে গেলেন। চাকরি না করলে না খেয়ে মরতে হবে। বাড়ি করার পর বিল্ডিং লোনের যে টাকাটা বেঁচেছিল, তাই ভেঙে ভেঙে এতদিন চলেছে। হাতে আর কিছুই নেই। আমাদের জানাশোনা কেউ নেই এ দেশে। চাকরির জন্য কাকেই বা ধরব? আপনাকে পেলাম। তাই বললাম।'

[ক্রমশ।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ক্রিয়ারেংকো পরিচালিত আলোচনাচক্রের কাজকর্ম চলত অত্যন্ত গোপনে। সভা করতে বা বক্তৃতাদি শুনতে হলে সভ্যারা ভল্গা নদীতে নৌকো চড়ে 'বেড়াতে' যেত অনেক দূর পর্যন্ত, ফিরত বেশ কয়কদিন কাটিয়ে। ফলে আলোচনায় উপদ্রবের বিপত্তি ঘটত না। বহুদিন পরে বাধ্য হয়ে বিদেশবাসী লেনিন এই নৌকোবিহার এবং তার আনন্দর কথা সকলকে বলতেন।

সামারা-তেই লেনিন নিজে মার্কস এবং এংগেলস রচিত 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' জারমান ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর হাতে-লেখা এই পাণ্ডুলিপি সামারায় আলোচনাচক্রের সভ্যরা পড়ত এবং হাতে হাতে পাচার হত অনেক দূর পর্যন্ত। দু:খের বিষয় পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে।

১৮৯২-তে লেনিন সামারায় প্রথম মার্কসীয় দর্শন আলোচনা-সভা স্থাপন করেন। এর সভ্য ছিলেন ক্রিয়ারেংকো, লালাইয়ান্‌তস্‌ (১৮৯৩ থেকে), সেমিয়োনভ্‌, কুজনেত্‌সভ্‌, মেডিক্যাল ছাত্রী লেবেদেভা, বেলিয়াকভ্‌ প্রমুখরা। এই সভায় মার্কস এবং এংগেলস-এর 'ক্যাপিটাল', 'Anti Duhring' এবং প্লেখানভ্‌-এর লেখার আলোচনা হত। সাহিত্য পাঠ এবং আলোচনা ছাড়াও সভ্যরা প্রচার চালাতেন।

এইসব আলোচনাচক্রে লেনিন বক্তৃতা দিতেন এবং স্বলিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। সামারায় বাসকালে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন—

সমীরণ চৌধুরী

মার্কস সম্পর্কে তো বটেই, ভরোন্‌টসভ্‌ লিখিত 'দ্য ডেস্টিনি অব্‌ ক্যাপিটালিজম্‌ ইন রাশিয়া'র ওপরেও।

নিজের অনুগামীদের কাছে লেনিন অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। লালাইয়ান্‌তস্‌ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'সারল্য, বিচক্ষণতা, জীবন উপভোগের সহজ প্রাবল্য—এই সব গুণ এই তেইশ বছরের যুবকদের মধ্যে আলৌকিকভাবে মিশে ছিল। এর সঙ্গে ছিল গাম্ভীর্য, সুগভীর জ্ঞান, প্রখর যুক্তি এবং সুবিচারবোধ।'

লেনিন-এর প্রচণ্ড স্বাধীন মতামত তখনই পরিণত। কোনও মতই তাঁর চোখে অপরিবর্তনীয় নয়—পঠিত

ক্রেম্‌লিন ভবনে লেনিন ও কালিনিন (৭ই মার্চ, ১৯২০)

সব কিছু স্বদেশের সাময়িক পরিস্থিতির কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে তবে তিনি গ্রহণ করতেন।

মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেনিন রুশ অর্থনীতি যাচাই ক'রে দেখলেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। চাষবাস এবং চাষী সম্পর্কে স্বগৃহীত অসংখ্য তথ্য মন্থন ক'রে তিনি আলোচনাচক্রে প্রথম বক্তৃতা দিলেন, এবং পরে, ১৮৯৩-তে, লিখলেন 'নিউ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টস ইন পীজ্যাণ্ট লাইফ্' নামে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ।

লেনিন লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এইটিই প্রথম প্রাপ্ত প্রবন্ধের সম্মান পেয়েছে। এতে মার্কসীয় মতবাদে তাঁর পূর্ণ অধিকারের অভ্রান্ত ছাপ লক্ষণীয়। পোস্টনিকভ্-এর 'পীজ্যাণ্ট ফার্মিং ইন সাউথ রাশিয়া' লেনিন-এর প্রিয় বই, এবং এই বইতে সংগৃহীত তথ্যাদি তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন।

তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে লেনিন চোখে আঙুল

ИСКРА
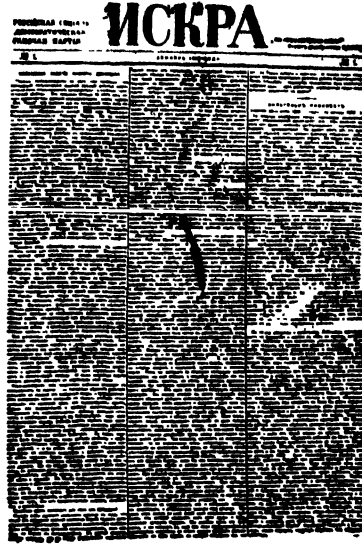
'ইসক্রা' (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) পত্রিকার প্রথম পাতা (ডিসেম্বর, ১৯০০)

দিয়ে দেখিয়ে দিলেন 'নারোদ্‌নিক্'-রা অস্বীকার করলেও রাশিয়ায় ধনতন্ত্র ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বগামী এবং চাষীরা সুস্পষ্ট তিন শ্রেণীতে ক্রমবিভাজমান—দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী চাষী Kulak।

উপর্যুক্ত প্রবন্ধটি উদারনৈতিক পত্রিকা 'রুশকায়া মীস্‌ল' 'পত্রিকার মতবাদের বিরুদ্ধে' বলে এটি ফিরিয়ে দেন। পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি—পরে নিজের 'দ্য ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব্ ক্যাপিটালিজম্ ইন রাশিয়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি এর তথ্যাদি ব্যবহার করেছিলেন। এটি পৃথকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খৃস্টাব্দে।

রুশ গ্রাম্যজীবন এবং রুশ চাষী প্রেমিক লেনিন সময় পেলেই গ্রামে ঘুরতে যেতেন। আলাকাইয়েভ্‌কা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নারোদ্‌নিক্ খামারের প্রধান প্রিয়োব্রাজেন্‌সকীর সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিল—সেখানে তিনি সবদা চাষীদের সংগে মিশতেন।

কিস্‌লিকভ্ নামে এক চাষীর সংগে এইখানে লেনিন-এর আলাপ হয়। এই লোকটি তিরিশ বছর বয়সে অক্ষর পরিচয় অন্তে কবিতা লেখা সুরু করেছিল; সে বৈপ্লবিক মতবাদও প্রচার করত। গ্লেব উস্‌পেন্‌সকী তাঁর 'থ্রী ভিলেজেস্' বইতে কিস্‌লিকভ-এর চরিত্র ব্যবহার করেছেন। একে খুব ভাল লাগায় ১৯০৫-এ প্রিয়োব্রাজেন্‌সকী-কে চিঠি লিখে লেনিন-এর খবরাখবর নিয়েছিলেন। ১৯০৫-৭ খৃস্টাব্দের আপাত ব্যর্থ বিপ্লবের সময় . উক্ত কিস্‌লিকভ্ চাষীদের মধ্যে প্রচার চালিয়েছিল।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে লেনিন প্রিয়োব্রাজেন্‌সকীর কাছে যে-কোনও একটা গ্রামের সম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রস্তাব পাঠালে, নির্দেশমত—সেন্‌সাস কার্ড এবং লিখিত প্রশ্নাবলীর সাহায্যে—তা সেণ্ট পিটার্সবার্গ-এ লেনিন-এর কাছে পৌঁছল। জনৈক বিচারকের সহায়ক স্কুরিয়াবেংকোও তাঁকে চাষীদের সম্পর্কে বহু তথ্যাদি পাঠিয়েছিলেন।

উত্তরকালে সুপ্রচুর এই তথ্যসম্ভার

দ্বিতীয় কমিন্টার্ন ইন্টারন্যাশনাল-এ লেনিন (১৯২০)

লেনিন-এর খুব কাজে আসে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে 'নারোদ্‌নিক-দের ধূলিসাৎ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সামারা ছাড়া ভল্‌গা তীরের অন্যান্য বহু গ্রাম ও সহরে তখন লেনিন-এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। ইয়েলিজারভ্‌, আয়োনোভ্‌, এবং ইয়েরামাসভ্‌—এই তিনজনই তাঁর প্রভাবে মার্‌কসীয় পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। অন্যান্য অনেকেই সামারায় আসতেন, মার্‌কসীয় দর্শন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। এইভাবে রাশিয়ায় মার্‌কসবাদ প্রচারে ভল্‌গা অঞ্চল একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়ে উঠেছিল।

ফেডোসেইয়েভ্‌-এর সংগে লেনিন-এর পত্রালাপ চলত। ১৮৯৩-তে কারারুদ্ধ ফেডোসেইয়েভ্‌-এর কাছ থেকে তিনি রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার পতনসম্বন্ধীয় হাতেলেখা প্রবন্ধ পান। লেনিন-এর পাদটীকা সম্বলিত এই প্রবন্ধটি মার্‌কসীয় আলোচনাসভায় পঠিত হয়েছিল। এঁদের পত্রালাপের কাল কয়েক বছরে বিস্তৃত, এবং লেনিন ফেডোসেইয়েভ্‌-কে খুব ভালবাসতেন। অনেক বছর পরে তিনি লিখেছিলেন, 'ভল্‌গা এবং মধ্য রাশিয়ার বহু অঞ্চলে ফেডোসেইয়েভ্‌-এর অবদান প্রচুর, এবং তাঁর প্রভাবে মার্‌কসীয় দর্শন প্রসারলাভ করেছিল।'

কাজান এবং সামারা লেনিন-এর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌চিহ্ন। এখানেই তাঁর মার্‌কসীয় মত দৃঢ়মূল হয়। এই সময় তাঁর ভাবী বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব। পরবর্তীকালে সমগ্র দেশে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে গেল। বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্র-সন্ধানে তিনি সেণ্ট পিটার্‌সবার্গ-এ গেলেন ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে।

পুরুষকার বলিছে দৈবেরে

ভক্তদা

একদা শরৎকালে ঘনঘটা মেঘ ভরে
প্রকৃতিকে সাজাইল কালো আভরণে।
শরৎকালে আশ্বিন মাসে, শুনি দেবী আগমন
ভীষণা মূরতি নিয়া তিনি করিলেন পদার্পণ।
বঙ্গাব্দ ১৩২৬ সাল বাঙ্গালীর নিকট বিখ্যাত
সব বাঙ্গালীর মনে ভীষণ সাধিল প্রমাদ।
(যেমতি) বিবাহবাসর রাতে যদি সতী হারায় পতিরে
সে শোকের স্তুতিবাক্য কে দিবে তাহারে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান মূর্চ্ছায় বিভোর প্রাণ
তন্দ্রা ভাঙ্গি বলে নারী এই তো জগৎ হায়।
দুর্জয় ঝটিকা সে-রাত্রি, প্রলয় আনিল ডাকি
দশমীর ঢাকঢোল বাজি, যেমন আগমনী উঠিল সাজি।
আনন্দের আলো-ছায়া ক্ষণিকেতে হল সারা
নিরাশার আশা নিয়া ফিরিল ঘরে তারা।
নিয়তির লিখন ভালে কে খণ্ডাতে পারে তারে
চিত্রগুপ্তের চিত্র-পটে যখনি তাগিদ পড়ে।
কালস্রোতের স্থিরতা নাই যেমতি ইচ্ছা আসে যায়
বাধ্যবাধকতা ছাড়া কেবলি ঘুরিয়ে বেড়ায়।
কি আশ্চর্য জগতে আছে! বল ত জীব এ সংসারে
যতক্ষণ জীবিত আছ, অত্যাশ্চর্য রয়েছে তব সাথে।
শৈশবে মায়ের বাণী কৌতূহলে শুনিয়াছি আমি
দুর্জয় ঐ প্রলয়কালে জন্মিয়াছি ভাগ্যহীন হয়ে;
দুর্যোগকে করিয়াছি জয় নাম রাখিল জনমেজয়
সামান্য নয় তো শিশু ধরাধামকে করিবে জয়
পঞ্চমবর্ষ যবে মোর ব্যাধি মোরে করিল ঘোর
বাঁচিবার আশা নাই প্রাণে বড়ই সংশয়।
হেনকালে পুরুষকারে আসিল এক সন্ন্যাসীর সাজে
চিন্তা নাহি কর মাতঃ আমিই ব্যাধির বিধাতা।
সন্তান তব নীরোগ হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও মোর স্থানে
সন্তান তব অধিকারে নাহি রবে কোনোকালে।
জীবত্ব ধরিয়া দেহে ঘুরিবে এই ধরাতলে
দুর্বোধ্য এই সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার তরে।
গৃহবাসী যদিও হবে, সংসারক্ষেত্রে নাহি রবে
দৈবের সাথে পুরুষকারের হইবে যখন মিলন।
সিংহসম কেশর তুলি করিবে হুংকার ধ্বনি।
অনাসৃষ্টির সৃষ্টিকে করিয়া পদদলিত।
শুদ্ধ ভক্তির চাষ করি সত্যের বীজ রোপণ করি
অনুসরণকারীদের প্রহরায় নিমগ্ন রাখিয়া।
সুখ দুঃখ পরিহরি যে জন রহিয়াছে পড়ি
প্রত্যক্ষ করাইয়া তাদের জীব হতে করিবে অন্তর্ধান।
তখনি হইবে কালস্রোতের অবসান
ধর্মধরায় হবে অধিষ্ঠান
ভেদাভেদ যাবে দূরে একধর্মে ধ্বনি উঠিবে মাতিয়া
পুরুষকার বলিছে দৈবেরে।

এ দেহটা 'আমি' নয়। এই নানা প্রত্যঙ্গের সমষ্টি যে অঙ্গ তার উদ্ভব পঞ্চভূত থেকে আবার বিলয়ও পঞ্চভূতেই। 'আমি'র বিলয় নেই, তার লয় নেই। ক্ষয় নেই, লয়কে সে ভয় করে না, ক্ষয়কে সে জয় করেছে; দেহ নশ্বর, 'আমি' অবিনশ্বর। দেহ মহাকালের অমোঘ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মহাকালের গ্রাসধর্মী বাহুবন্ধনের সীমানা 'আমি' থেকে যোজন যোজন দূরে। 'আমি' শাশ্বত, নিত্য, অভঙ্গুর; দেহ রোগ, শোক, জরার নিত্য শিকার—'আমি' ঔজ্জ্বল্যে, অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে আলোকভাস্বর।

তা হ'লে আমি কে, কে এই আমি? সকল সাধকের, সকল সাধনার মূলসূত্রটিই এখানে কেন্দ্রীভূত, এই চিরন্তন শাশ্বত প্রশ্নই প্রতিটি সাধককে অনাদ্যন্তকালের যুগ-যুগান্তের প্রবহমান ধারায় যেন একটি নির্দিষ্ট সূত্রে গেঁথে রেখেছে।

এই 'আমি'র অন্বেষণেই সকল কালের, সকল সমাজের, সকল মতের সাধকরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, এই অন্বেষণেরই ভাষ্য দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরকে অন্বেষণরূপে। এ আমি আত্মা।

পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেহ মৃত্যুর অধীন, কিন্তু আত্মাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা মৃত্যুর কোনও দিনই ছিল না, আজও নেই। প্রতিটি দেহে আত্মারূপেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। ঈশ্বর বাইরে নন, ঈশ্বর ভিতরে। আত্মারূপে তিনি নিত্য অধিষ্ঠিত। তাই, দেহের মেয়াদ যখন শেষ হয়, আত্মা তখনই সে খোলস ত্যাগ করে অসীমের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত-পরিব্যাপ্ত করে তোলে। এই আত্মাকে উপলব্ধি কর, এর স্বরূপ, এর মহিমা, এর ব্যাপ্তি, এর দীপ্তি—সর্বোপরি এর বিরাটত্ব সম্বন্ধে মনের মধ্যে এক গভীর সচেতনতা আন। যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণে নয়, ভক্তি, সমর্পণের প্রণতি দিয়ে একে উপলব্ধির প্রয়াস কর, এর উপলব্ধিতে সার্থকতা ঈশ্বর প্রাপ্তিরই এক নামান্তর।

এই পরম সত্যের প্রচারের মাধ্যমেই পথভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, দিকভ্রষ্ট মানবসমাজকে অন্ধকারের ভয়াল গ্রাস থেকে মুক্ত করে এনে আলোর নিশানায় পরিচালিত করার জন্যে যুগে যুগে কালে কালে ধূলার ধরণীতে পতিত হয় ঈশ্বরের মানসপুত্রদের পবিত্র পদরজ। তখনই ভ্রান্তির হয় নিরসন, সংশয়ের জাল হয় ছিন্ন, জটিলতার হয় অবসান, তখনই মনের গভীর গহন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিশ্বাসের শাশ্বত আলোকনির্ঝরে, হৃদয়-নদী উদ্দাম ধারায় বাঁধনহারা গতিতে ধেয়ে চলে সমর্পণের সরোবর অভিমুখে, অন্তরের অন্তঃপুরে তখন সত্যের, ধ্রুবের, পরমের নাদগম্ভীর মন্ত্রের নিয়ত অনুরণন।

উনবিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অধ্যাত্মসাধনার লীলাভূমি—এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র এই ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষে ঈশ্বরের একাধিক মানসপুত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।

আজ থেকে ঠিক নব্বই বছর আগে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে এক শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, সম্পন্ন পরিবারে প্রেম, মৈত্রী, করুণার অমৃতকণা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরেরই এক মানসপুত্র। উত্তরকালে সারা ভারতবর্ষের শ্রদ্ধার বিনম্র অঞ্জলি তাঁরই উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হতে লাগল এক যুগপুরুষের মহিমায়। সারা ভারতভূমি তাঁর চরণপ্রান্তে অর্ঘ্য রাখল বন্দনার, বিশ্বাসের, সমর্পণের। ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে তিনি আবাধিত চন্দ্র লাগলেন রমণ মহর্ষি মাঝে। এ দূর অতীতের কোন বিস্মৃতপ্রায় কিংবদন্তী নয়, অতি হাল আমলের এক বাস্তব, অকাট্য ও ঐতিহাসিক সত্য। বুদ্ধ-চৈতন্য যুগের কাহিনী নয়—রামকৃষ্ণ-যুগের ঘটনা।

মাদুরা থেকে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম তিরুচুঝিতে ধর্মপ্রাণ, নীতিনিষ্ঠ হিসাবে সুন্দরম আইয়ার এবং তাঁর স্ত্রী আলাগাম্মালের খ্যাতি যথেষ্ট। তা ছাড়া স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের এক ধুরন্ধর আইনজ্ঞ হিসাবেও সুন্দরম আইয়ারের প্রসিদ্ধির অন্ত নেই।

দেবাদিদেব মহাদেবের এক পবিত্র উৎসবের মহাসমারোহঘন আনন্দদীপ্ত লগ্নে ১৮৭৯ সালের ৩০-এ ডিসেম্বরে সুন্দরম আইয়ার এবং আলাগাম্মালের দ্বিতীয় পুত্র বেঙ্কটরমণের জন্ম। বিশেষ তাৎপর্যময় দিনের ভারতের এক বিরাট মানবের শুভ-আবির্ভাব কি ইঙ্গিত বহন করেছিল আজকের দিনে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার আর ফাঁক থাকে না।

সুখের সংসার হঠাৎ এক দমকা ঝড়ো হাওয়ায় অকস্মাৎ তাসের ঘরের মত ভেঙে গেল। দুঃখের নিত্য অভিসার সেখানে সুরু হ'ল। ১৮৯১ সালে অকস্মাৎ সুন্দরম আইয়ারের দেহান্ত হ'ল। পিতৃব্যের গৃহে বসবাস করে লেখাপড়া শিখতে থাকলেন বেঙ্কট রমণ।

গৃহে এক আত্মীয় এসে উপস্থিত। বালক বেঙ্কট রমণ প্রশ্ন করেন—আপনি কোথা থেকে এখন আসছেন।

খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে উত্তর আসে অরুণাচল।

অরুণাচল—অরুণাচল। কোথা থেকে কি হয়ে গেল বালকের মনে। এই একটি নাম সমস্ত সত্তায়, সমস্ত চৈতন্যে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এ কোন যাদুকরী ঝঙ্কার জাগিয়ে তুলল, এ কোন অলৌকিক সোনার কাঠিতে দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠল সমগ্র হৃদয়রাজ্য। এ কোন ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত খেলা! এই নামটি যেন শততন্ত্রী বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বালকচিত্তকে মুখরিত করে তুলল, অন্তরে জ্বালিয়া দিল নবচেতনার

লক্ষ প্রদীপ, মনোভূমি যেন পরিপ্লাবিত করে দিয়ে গেল এক অদ্ভুত অনুভূতির অপ্রতিরোধ্য প্লাবনে। এই নামটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত সত্তা যেন বিলীন হয়ে গেল।

কে পড়বে? কে স্কুলে যাবে? আহারে, নিদ্রায়, ধ্যানে-ধারণায় অরুণাচল ছাড়া আর কিছু নেই। দাদার তিরস্কার, মা-কাকার নীরব অভিমান, শিক্ষকদের শাসন—কিছুতেই কিছু হয় না। সব কিছু ছাপিয়ে অরুণাচলের আহ্বান অলক্ষ্য থেকে যেন দিবারাত্র তাঁর কানে ভেসে আসে—ওরে আয়—ওরে আয়—ওরে আয়।

১৮৯৬ সালের ২৯-এ অগাস্ট (প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় এই রচনাটি যেদিন লেখা হচ্ছে সে তারিখটিও ২৯-এ অগাস্ট)। এই অমোঘ আহ্বান উপেক্ষা করা আর সম্ভব হ'ল না কিশোরের পক্ষে। গৃহত্যাগ করে যাত্রা করলেন অভীষ্টের অভিমুখে। পিছনে পড়ে রইল সংসার-জীবন, গৃহস্থাশ্রম—সামনে যেন দিকদিগন্ত জুড়ে অরুণাচল। নানা ক্লেশ স্বীকার করে, প্রচুর শ্রমের মধ্যে দিয়ে ১লা সেপ্টেম্বরে উপনীত হলেন অরুণাচলে।

গৃহত্যাগের পূর্বে সুবিখ্যাত তামিল ধর্মগ্রন্থ 'পেরিয়াপুরাণম' বেঙ্কটরমণের হাতে পড়ে। এই গ্রন্থই তাঁর মধ্যে জীবনের এক নতুন অর্থবোধ এনে দিল, তাঁর মানসদৃষ্টি উন্মোচন ঘটাল, তাঁকে এক নতুন ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মুখীন করল। এক কথায় এই গ্রন্থ তাঁকে এক নতুন দিগন্তের দুয়ার প্রান্তে পৌঁছে দিল।

সুরু হ'ল সাধনা। ধ্যান। সে কি দীর্ঘ, বিরামবিহীন, অনলস ধ্যান। এতটুকু ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। পেটে খাদ্য নেই, বিষাক্ত কীটপতঙ্গের তীব্র দংশনে সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত, রক্তারক্তি ব্যাপার। কিশোর সাধকের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। ধ্যানে তিনি তখন সমাধিস্থ।

তারপর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে গেল তাঁর অমৃতবারতা। তেজলিঙ্গ অরুণাচল দর্শনে যাঁরাই আসেন তাঁরাই—সেই অসংখ্য তীর্থযাত্রীর দল কাতারে কাতারে পদধূলি নিয়ে যান বয়সের বিচারে এই সদ্য-সাবালক সন্ন্যাসীর। ধীরে ধীরে তিনি খ্যাত হলেন ব্রাহ্মণস্বামী নামে। চরণপ্রান্তে একদিন এসে আশ্রয় নিলেন উদণ্ডী নাইবার। তাঁর শিষ্য ও সেবকদের মধ্যে যিনি প্রথমজন। তারপরই এলেন আন্নামালাই তম্বীরণ।

সাধকের সাধনার অমল-আলোকরশ্মি ভক্তশিষ্য হৃদয়ের আকাশকে আলোকিত করে তুলতে থাকে। তরুণী শিষ্যা এ চাম্মল একদিন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পাহাড়ের উপরে চলেছেন। পাহাড়ের একেবারে নিচে দেখলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে রমণ মহর্ষি বাক্যালাপ করছেন। পাহাড়ে উঠে এ চাম্মল হতবাক। ভক্তবৃন্দের মধ্যে রমণ উপবিষ্ট। তারও থেকেও বিস্ময়কর এই যে, এ চাম্মল জানতে পারলেন যে, সকাল থেকে এক নাগাড়ে রমণ এই ভাবেই বসে আছেন। বারেকের জন্যেও তিনি স্থানত্যাগ করেন নি।

এক বিদেশী রাস্তা হারিয়ে বিপদে পড়েছেন। কোথায় পথ, কোথায় আলো-দিশাহারা হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, কিছুতেই লক্ষ্য পথে পৌঁছতে পারছেন না। হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলেন রমণ মহর্ষির। মহর্ষি রমণ তাঁকে পথ দেখিয়ে বিপদ আপদের সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে অভীষ্টে পৌঁছে দিলেন। কিছুকাল পর জানা গেল যে, ভদ্রলোক যে দিন এবং যে সময় বলছেন—সেইদিন এবং সেই সময় ভক্তবৃন্দের মধ্যেই রমণ বিরাজ করেছেন।

রমণের ভক্তদের মধ্যে বিজয়-রাঘবাচারিয়া অন্যতম। রমণের সামনে অনেকের মতই সেদিন তিনিও বসে। সেখানে শোভা পাচ্ছিল এক দক্ষিণা-মূর্তিচিত্র। সেখানে দেখলেন রমণ অদৃশ্য, ছবিটিও অদৃশ্য, আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। সামনে শুধু অনন্ত অসীম মহাশূন্য। খানিক পরে আবার সব কিছু যথাযথ দেখতে পেলেন। তফাতের মধ্যে এই তখন রমণের দেহের চার-দিকে এক অকল্পনীয় দিব্যজ্যোতির বিচ্ছুরণ।

রমণের কৃপাপ্রাপ্তদের মধ্যে একটি বিশেষ নাম পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী। কাব্যকণ্ঠ গণপতি শাস্ত্রী বেদবেদান্ত পুরাণ, দর্শন, ইতিহাসে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর খ্যাতিও সুপরিব্যাপ্ত, তেমনই আবার অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রেও এই মহা-পুরুষের কৃপায় তিনি বহু দূর এগিয়ে ছিলেন। গণপতি শাস্ত্রীই তাঁকে সর্বপ্রথম 'রমণ মহর্ষি' আখ্যায় শ্রদ্ধা জানান।

ঈশ্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে রমণ কোনদিন জটিলতা বা দুরূহতার প্রতি সমর্থন জানান নি। তাঁর ভাষ্য সহজ, সরল পথেই তাঁর করুণা মিলবে। স্মরণে, মননে, চিন্তনে এবং প্রেমে-করুণায়-ভালবাসায় হৃদয়সরোবরে তাঁর করুণার শতদল বিকশিত হয়ে উঠবে।

দেহরক্ষার মাধ্যম হিসাবে বরণ করে নিলেন টিউমার। এরই প্রকোপে ১৯৫০ সালের ১৪ই এপ্রিল তাঁর নশ্বরলীলার অবসান ঘটল। সহযোগী শ্রীঅরবিন্দ যে বছর প্রথম বিলাতযাত্রা করলেন সেই বছর রমণ মহর্ষির জন্মপরিগ্রহ আর যে বছরে শ্রীঅরবিন্দ মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেলেন—সেই বছরই রমণ মহর্ষিরও নশ্বর-লীলার অবসান ঘটল।

শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্ধান

(শেষাংশ)
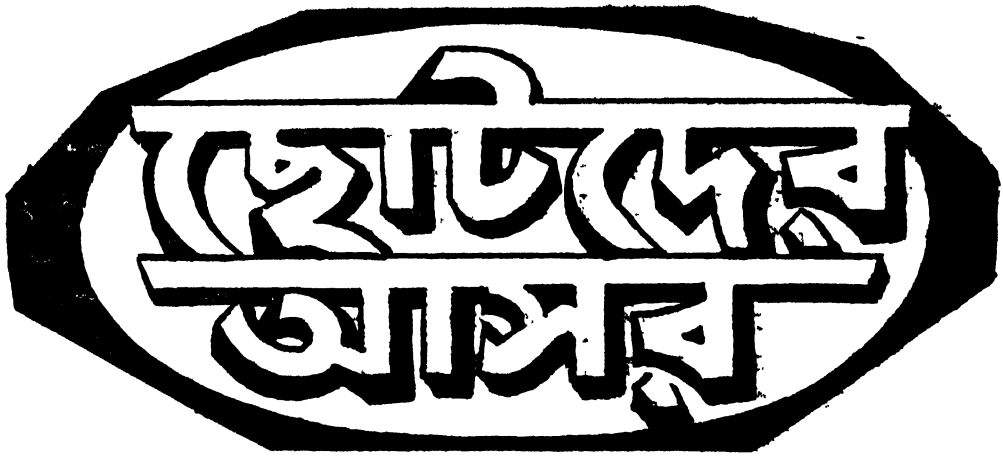
'রামকৃষ্ণ মিশনের' মুখপত্র 'উদ্বোধন' কার্যালয়, বাগবাজারের একটি বাড়ীতে, ঐ বাড়ীর এক অংশে থাকেন, 'শ্রীশ্রীমা' বা সারদামণি, তাঁকে সেবা করেন, আশ্রমবাসিনী 'যোগীন-মা' নামে একটি মহিলা। যোগীন-মা'র এক আত্মীয় গোয়েন্দা পুলিসের এক ব্যক্তির কাছে শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার কথা শুনে তাঁকে জানান। যোগীন-মা শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তিও করেন, তাঁর মনে আছে শ্রীঅরবিন্দ কয়েক-দিন আগে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছিলেন, তিনি পদধূলি নিতে সারদামণি শ্রীঅরবিন্দের মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন 'এসো, আমার বীর ছেলে'; তারপর তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি লক্ষ্য করতে করতে মন্তব্য করে-ছিলেন, 'এই এতটুকু মানুষকে ইংরাজের এত ভয়!'

যোগীন-মার সে সব কথা মনে আছে, সেই শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হবেন যোগীন-মার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, অবিলম্বে তিনি যা জেনেছেন আশ্রমের সকলকে জানিয়ে দিলেন। শান্ত পরি-বেশের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। গগন মহারাজ সংবাদটা শ্রীঅরবিন্দকে জানালেন।

নিবেদিতা এ সংবাদ শুনে শঙ্কিত হলেন, তিনি স্থির থাকতে পারলেন না—শ্রীঅরবিন্দকে পলায়নে বাধ্য করতে ব্যস্ত হলেন। নিবেদিতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে এলেন, ঐ স্থানে অরবিন্দকে পাওয়া গেল না, আরও দু' তিন স্থানে অনুসন্ধান করে শেষে শ্যামপুকুরে 'কর্ম যোগিন' কার্যালয়ে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ মিললো।

শ্রীঅরবিন্দ ইতিমধ্যে সব কথাই শুনেছেন, কিন্তু তিনি নির্বিকার। নিবেদিতা ঝটিকার মত শ্রীঅরবিন্দের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে বললেন,—

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

'আপনি এই মুহূর্তে বৃটিশ-ভারত ত্যাগ করার ব্যবস্থা করুন, দেশের হিতের জন্যে বর্তমানে আপনার আত্মগোপন করে থাকা অবশ্য প্রয়োজন; কারাগারের মধ্যে থেকে কোন কাজই করতে পারবেন না, পুলিশ আপনার সেই ব্যবস্থা করছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে, এক্ষুণি অন্তত কলকাতা ত্যাগ আপনাকে করতেই হবে। টাকার জন্যে ভাববেন না, আমি জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে যথেষ্ট অর্থ এনেছি, আপনাকে দিচ্ছি। আপনি এখনি প্রস্তুত হোন, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকবো না, থাকলে পুলিশ এখানে এসে পড়বে, কারণ ওরা আমাকে সর্বদা অনুসরণ করে আমি যাচ্ছি।'

নিবেদিতা অদৃশ্য হতেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সহকর্মীদের বললেন,—

All right arrange...it is mother Kali through sister Nevedita ordered me to hide. (তোমরা ব্যবস্থা কর—মা কালী, সিস্টার নিবেদিতার মাধ্যমে, আমাকে গুপ্তভাবে থাকার আদেশ করেছেন) দক্ষ সহকর্মীরা যথাসম্ভব দ্রুত সকল ব্যবস্থা করবেন।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। বাগবাজারের রাস্তার আলোগুলোতে কেরোসিন তেল দেওয়া হচ্ছে। এখনও আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে শ্রীঅরবিন্দ নিরুদ্দেশ যাত্রা পথে একবার কিছুক্ষণের জন্যে নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ করে পুনরায় গন্তব্য পথ ধরলেন।

বাগবাজারের গঙ্গাতীর নির্জন নিস্তব্ধ—দূরে দূরে দু' একটা আলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু গভীর অন্ধকারে সেগুলো প্রভাহীন বলে মনে হচ্ছে।

চারজন সহকর্মীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ঐ স্থানে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে বাগবাজার ঘাট থেকে সোজা ফরাসী চন্দননগরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছানুসারে বাগবাজার ঘাট হতে দক্ষিণেশ্বর হয়ে চন্দননগরে যাবার স্থির হল।

গোয়েন্দা পুলিস নিশ্চেষ্ট ছিল না। তারা শ্রীঅরবিন্দকে 'কর্মযোগিন' অফিস হতে অনুসরণ করছিল। বাগবাজার বোসপাড়া লেনের নিবেদিতার বাড়ীতে গেলেন তাও পুলিশ লক্ষ্য করল; মনে ভাবলে এখানে কিছুক্ষণ শ্রীঅরবিন্দ

থাকবেন, সেই জন্যে বোধহয় সাময়িকভাবে তাদের দৃষ্টি সরিয়েছিল, কিন্তু তাদের আসামী যে অকস্মাৎ এ স্থান ত্যাগ করবে বা তারপর কর্মযোগিন কার্যালয়ের দিকে না এসে অন্য দিকে যাবে, তা তারা চিন্তাও করতে পারে নি। কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় অনুচরদের কাছে গুপ্তপুলিশ জানতে পারলে, আসামী বোসপাড়া থেকে গঙ্গার দিকে গিয়েছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পুলিসের দল যখন বাগবাজার গঙ্গারঘাটে পৌঁছল ঠিক তার আগে শ্রীঅরবিন্দের নৌকা গঙ্গার মাঝ পথ ধরে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেছে।

শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রীশ্রীমার মন্তব্যটি অতি সত্য। ইংরাজের পক্ষে ভীতিজনক অতটুকু মানুষটি শত শত গোয়েন্দা পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি, প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজশক্তির কঠোর বেষ্টনী তুচ্ছ করে পলায়নে সক্ষম হলেন। সত্যই তিনি 'বাঁধ ছেলে' ছিলেন।

রাত শেষ হয়ে এসেছে পূর্ব-আকাশের গায়ে তার আভাস অল্প অল্প দেখা দিয়েছে।

চন্দননগরের গঙ্গার ঘাট হতে কিছু দূরে একটা নির্জন স্থানে—তীরে, শ্রীঅরবিন্দের নৌকা নিঃশব্দে নোঙ্গর ফেললে, কিছু দূরে ফরাসী এলাকা।

এক রাজ্যের রাজনৈতিক ফেরারী আসামী অপর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলে, আশ্রয়দাতা রাজ্য ঐ আসামীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে থাকে এটা আন্তর্জাতিক বিধান। সে-কারণে শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী চন্দননগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

চন্দননগরবাসী শ্রীমতিলাল রায় শুধু বিখ্যাত দেশপ্রেমিক নন, তিনি উচ্চ স্তরের একজন সাধক। শ্রীঅরবিন্দকে স্বেচ্ছায় তিনি আশ্রয় দিলেন নিজের একটি কাঠের আড়তে।

দিন কতকের মধ্যে মতিলাল রায়ের ঐ ব্যবসা-স্থানটি বাংলা দেশের পলাতক বা আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের একটা গোপন মিলনের কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

কাঠের আড়তে বহু লোকের যাতায়াত হয়, শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু নির্জন স্থানে থাকতে ইচ্ছা করেন, যেহেতু তিনি চান গভীরভাবে সাধনা করতে।

সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা দেশ স্বাধীন হতে পারে—এ কথা যেমন শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, ঐশ্বরিক কৃপাতে দেশ মুক্ত হবে সেকথাও মনে করতেন।

কিন্তু ঐশ্বরিক কৃপা পেতে হলে চাই গভীর ধ্যান, আরাধনা, সাধনা কঠোর তপস্যা। কয়েকটি কারণে চন্দননগরের ঐ স্থানটি সাধনার উপযুক্ত নয়, সেজন্য শ্রীঅরবিন্দ স্থির করলেন পণ্ডিচেরীতে যাবেন।

মাদ্রাজের ঐ পণ্ডিচেরী অঞ্চলও ফরাসীদের অধিকৃত পল্লী। সমুদ্র-উপকূলে নির্জন-নিস্তব্ধ, শান্ত স্নিগ্ধ-মনোরম সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ।

কিন্তু পণ্ডিচেরী যেতে হলে শ্রীঅরবিন্দকে চন্দননগর থেকে বার হতে হবে, কলকাতায়ও আসার প্রয়োজন হতে পারে।

কলকাতায় আসা আর বাঘের গুহায় প্রবেশ করা শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সমান ব্যাপার। তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে, শত শত গুপ্তচর তাঁকে ধরবার জন্যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানে দিন কাটাচ্ছে—যে ধরে দিতে পারবে—তার ভাগ্যে মোটা টাকার পুরস্কার ও পদোন্নতি ঘোষিত হয়েছে।

কোথায় বাংলা দেশের চন্দননগর আর কোথায় সেই মাদ্রাজ প্রদেশের পণ্ডিচেরী। তখন ট্রেনে যেতে লাগতো তিন দিন দু'রাত সময়। ফেরারী আসামীর পক্ষে ট্রেনে যাতায়াত করা পদে পদে বিপজ্জনক।

অরবিন্দ স্থির করলেন, জলপথে সেখানে যাবেন জাহাজে করে। তাঁর অনুরক্ত সহকর্মীরা সেই ব্যবস্থাই করতে লাগলেন, অতি গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে।

শ্রীঅরবিন্দকে জাহাজে যেতে হলে একবার কলকাতায় আসতেই হবে।

স্থির হল, শ্রীঅরবিন্দ একটা ছোট ডিঙ্গি করে চন্দননগর থেকে জলপথে কলকাতার দিকে আসবেন, সোজা সে ডিঙ্গিখানা কলকাতায় আসবে না, মাঝপথে অপর একখানা ডিঙ্গি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে, তিনি যান বদল করবেন, তারপর সব দিক বুঝে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করবেন। ঐ দু'টি জলযানে যে সকল লোক থাকবে তারা পরস্পর কিছু বলবে না, আকার ইঙ্গিত করবে না; উভয় যানে একটা করে নিশান থাকবে তাই দেখে বদলের ব্যবস্থাদি করতে হবে।

চন্দননগর হতে বার হবার সময় যদি গুপ্তপুলিশবা কেউ অরবিন্দের পিছু নেয়, তাহলে প্রথম ডিঙ্গির উপর তাদের দৃষ্টি থাকবে, যান বদল করার কথা তারা জানতেও পারবে না, সেই জন্যে ঐরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের কলকাতার দলীয় লোকরা কেউ কেউ গোপনে জানতে পারলেন তিনি পণ্ডিচেরী যাবেন স্থির হয়েছে, সে কারণ কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাঁরা ঐ বিষয়ে ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

ফরাসী জাহাজটার নাম 'ডুপ্লে' কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে নোঙ্গর ফেলে অপেক্ষা করছে, কলম্বোয় যাবে। শ্রীঅরবিন্দের জন্যে দুখানা কলম্বোর টিকিট কেনা হল। হঠাৎ দু'খানা পণ্ডিচেরীর টিকিট কেনা হলে কারুর সন্দেহ হতে পারে, তখন ঐ স্থানে খুব কম লোকই যাতায়াত করতো। তবে জাহাজটা পণ্ডিচেরীতে যখন গিয়ে থামবে, তখন যাত্রীরা সেখানে নামতে পারে, একথা শ্রীঅরবিন্দের অনুরক্তরা জেনেছিলেন।

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তখনকার বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন এখনকার মত ছিল না। গৃহস্থের বাড়ী বা রাস্তার আলোগুলোর

অধিকাংশই ছিল কেরোসনের। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলোও ছিল বেশ দূরে দূরে, সে জন্যে অন্ধকার একেবারে সরে যেত না।

অন্ধকারে আত্মগোপন করে শ্রীঅরবিন্দ কলেজ স্কোয়ারের একটা ঝোপের নীচে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গী বিপ্লবী অমর চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ঐ স্থানে রেখে সুকুমার মিত্রের বাড়ীতে গেলেন। সুকুমার মিত্র শ্রীঅরবিন্দের মাসতুত ভাই ও একজন ভক্ত।

শ্রীঅরবিন্দের আগমন-সংবাদ শুনেই সুকুমারবাবু একখানা ঘোড়ার গাড়ীর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা করে দিলেন, তিনি সঙ্গে গেলেন না, তাঁর উপরও পুলিসের দৃষ্টি ছিল।

ঘোড়ার গাড়ীখানা যথাকালে চাঁদপাল ঘাটে পৌছল, কিন্তু জাহাজ ঘাটে গুপ্ত পুলিসের দৃষ্টি সর্বদা জাগ্রত, একথা চিন্তা করে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীরা অন্য ব্যবস্থা করলেন, তাঁকে আবার নৌকায় উঠানো হল ঐ নৌকাটি ঘাটের কিছু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

'ডুপ্লে' জাহাজের ক্যাপ্টেনকে লম্বা সেলাম দিয়ে অমরবাবু বললেন অর্থাৎ আবেদন জানালেন, তাঁর এক আত্মীয় কলম্বো যাবার জন্যে টিকিট কিনেছেন, তিনি ম্যালেরিয়াতে ভীষণ ভুগেছেন, ডাক্তারের পরামর্শে সমুদ্রের হাওয়া সেবন করার জন্যেই কলম্বো যাচ্ছেন, কিন্তু তাকে নদীর পাড়ে উঠনো বিপজ্জনক—তিনি কিছু দূরে নৌকাতেই আছেন। কাপ্তেন যদি ঐ রোগীর প্রতি দয়ালু হন, তাহলে তাঁকে নৌকা থেকে ধরাধরি করে আপনার জাহাজের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে ডেকে তুলতে পারি---।

'ডুপ্লে' জাহাজের ক্যাপ্টেন সত্যিই অতি সজ্জন ব্যক্তি, তিনি বিশেষ চিন্তা না করেই অমরবাবুর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের অনুরক্তরা তাঁকে ধরাধরি করে ডুপ্লে জাহাজে তুলে দিয়ে নেমে এলেন।

কলম্বোগামী 'ডুপ্লে' জাহাজখানা শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল দাসপ্রথা। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পীঠভূমি ভারতবর্ষেও দাসপ্রথা বর্তমান ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এই দাসদের সম্পর্কে নানারকম নিয়মাবলী তৈরী করে গেছেন।

পাশ্চত্য দেশে বেশীর ভাগ দাসই ছিল যুদ্ধবন্দী আর না হয়তো দাসদেরই বংশধর। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দাসব্যবস্থার রূপ ছিল একটু স্বতন্ত্র। যুদ্ধবন্দী ছাড়াও নানাভাবে মানুষকে এদেশে দাসে পরিণত করা হ'ত। এই পরিণতির ব্যাপারে শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনও ছিল।

পাওনাদারের টাকা দিতে না পারলে অনেক সময় নিজেকে পাওনাদারের কাছে বা অন্য কোথাও বিক্রয় করে টাকা পরিশোধ করতে হ'ত। ধর্মের নিয়মকানুন কেউ না মানলে, তাকে স্থানীয় শাসনকর্তার দাসে পরিণত হতে হ'ত। অবৈধ যৌন-সংযোগের অপরাধে অনেকে সমাজে পতিত হয়ে দাসপর্যায়ে নেমে যেত। দাসীর গর্ভজাত সন্তানও ছিল দাস। তার উপর প্রভুর অধিকার ছিল। দাসীকে কেউ বিবাহ করলে সেও দাসীর প্রভুর দাসে রূপান্তরিত হ'ত।

দাসপ্রথার কঠোরতা থাকলেও এই থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় ছিল না ভাবলে ভাল হবে। প্রভুকে বা প্রভুর সন্তানকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলে দাসের কপালে মুক্তি জুটে যেত। অনেক সময় প্রভুকে একটি গর্ভিণী গরু উপহার দিতে পারলে মুক্তি সুনিশ্চিত ছিল।

তবে কোন ব্যক্তি যদি দয়াপরবশ হয়ে তার দাসদের মুক্তি দিতে চাইত, তবে তাকে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেতে হ'ত। কোন এক শুভদিনে মুক্তিকামী দাসের স্কন্ধে একটি কলসী রেখে, সেই কলসীর জল তার গায়ে ছিটিয়ে প্রভুকে বলতে হ'ত, 'আজ থেকে তুমি মুক্ত।' তারপর দাসের মুখ পূবদিকে ঘুরিয়ে গৃহের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হত।

পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অন্যান্য অংশের মত পুত্ররা দাস-দাসীও ভাগ করে নিত। তবে মনে রাখতে হবে, দাসের উপর প্রভুর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকলেও তাকে মেরে ফেলার অধিকার আর ছিল না। স্মৃতিকার বৃহস্পতি দাসের দণ্ডের সীমাও নির্দেশ করেছেন। বড়জোর দাসকে কোন অন্যায় কার্যের জন্য বেত্রদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই বেত দাসের মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে মারা বিধেয় ছিল। এই নির্দেশের অন্যথা হলে দণ্ডদাতাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। নারী দাসকে চুরি করলে পা কেটে ফেলা হত।

কিন্তু দাসের কোনপ্রকার আইনগত অধিকার ছিল না। এমন কোন ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী হলেও তার সাক্ষ্যের কোন মূল্য ছিল না।

তাদের কাজের মধ্যে ছিল, গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ, প্রভুর গাত্রমর্দন, প্রয়োজনবোধে প্রভুর গোপন অঙ্গ ধৌত করা। ক্ষেত্রের ফসল কাটতে এবং সেগুলি গৃহে আনতে প্রভুকে সাহায্য করাও দাসের অন্যতম কাজ ছিল।

অনেক লোক দাসেদের ভাড়া খাটিয়ে দু'পয়সা কামিয়েও নিত। গুপ্তদের শাসনকালে এই প্রথা ভীষণভাবে দেখা দেয়। অনেক সময় অনেক ব্যক্তি সুন্দরী নারী-দাসদের যৌন-সম্ভোগের জন্য ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগার করত। গুপ্তযুগে রক্ষিতা, বারবনিতা ও নারী দাসদের মধ্যে তফাৎ করা খুব মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। নারী-দাসদের প্রভুর সন্তান ধারণ করতে হত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর

ছিলেন এক দাসীপুত্র। প্রাচীনকালে অনুগত বোঝাতে 'দাস' কথাটা ব্যবহৃত হত। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে হরিষেণ নিজেকে সমুদ্রগুপ্তের দাস বলে বর্ণনা করেছেন। তবে সমসাময়িক ইউরোপীয় দাসদের চেয়ে ভারতের দাসদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে দাসদের ব্যবহার করা হত, কিন্তু ভারতবর্ষে দাসকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া শাস্ত্রবিরোধী ছিল।

হাবুলদার ক্রিকেট খেলা

আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে হাবুলদা একটা মোক্ষম হাই তুলে তিনবার তুড়ি দিয়ে বললো, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুম পাচ্ছে!

আমরা সবাই বিস্মিত হলাম। কেননা হাবুলদা চিরকাল আসরে এসে আমাদের সবাইকে জমিয়ে রেখেছে। গল্প বলেছে। সেই গল্প শুনে আমরা সবাই থ হয়ে গিয়েছি। ভেবেছি হাবুলদা কি বিরাট শক্তিমান পুরুষ — দিনকে রাত করে রাতকে দিন। অথচ সেই হাবুলদার আসরে এমন ঘুম পায় তা আমরা কোনদিন দেখিনি।

বললাম, কেন হাবুলদা রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি?

হাবুলদা বললো, না।

আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আশ্চর্য! নাইনটিন ফিফটি টুতে আমরা যখন সবাই বোর্ডিং-এ থাকতাম তখন বোর্ডিং-এর ম্যানেজার হাবুলদাকে চিলেকোঠার ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলো। কারণ হাবুলদার নাসিকা-গর্জনে নাকি আর কারও ঘুম হতো না। নিদ্রাদেবীর আরাধনায় হাবুলদা চিরকাল সবাইকে টপকিয়ে গিয়েছে। যে রামভজুয়া টুলে বসে চব্বিশঘণ্টা ঝিমুতো, সেই রামভজুয়াকেও হাবুলদা ঘুমের কম্পিটিশানে হারিয়ে দিয়েছে। অথচ আজ কিনা হাবুলদার রাত্রে ঘুম হয়নি এও আমাদের শুনতে হলো!

গণশা আমাদের মধ্যে চিরকাল একটু বোকা। বললো, কেন হাবুলদা চোখে তোমার অসুখ করেছিলো বুঝি?

হাবুলদা বললো, না। অসুখটা চোখের নয় — ব্রেনের।

—ব্রেনের! সে কি!

হাবুলদা বললো, হ্যাঁ, পাঁচদিন আমি শুধু চিন্তা করেছি।

—চিন্তা করেছো! কি চিন্তা করেছো হাবুলদা? থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা কোন পথে এগুবে?

হাবুলদা বললো, না। তার চেয়েও জটিল।

—জটিল! পটলা এতক্ষণ চুপ করে-ছিলো কোন কথা বলেনি। এবার মুখ খুললো। বললো, তবে নারলিকারের সেই থিয়োরীটা বুঝি?

হাবুলদা হাসলো। বললো, উর্হু চিন্তা করছি ইণ্ডিয়া জিতবে না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতবে?

রথীন সরকার

কথা শুনে আমরা সবাই তাজ্জব বনে গেলাম। আশ্চর্য এতদিন হাবুলদা আমাদের নানা গল্প শুনিয়েছে। হাবুলদা কীর্তিমান পুরুষ। মানুষের সাইকো-লজী নিয়ে কানাডায় সাতবছর ড্রিল করেছে, পর্বত বিজয় করেছে, কেনেডিকে গাড়ি চড়িয়েছে, মিশরে একরাত্রি নবাব সেজেছে — অথচ সেই হাবুলদা যে একজন মস্তবড় ক্রীড়ারসিক তা আমাদের কারও জানা ছিলো না।

বললাম, চিন্তা করে আর কি লাভ হলো বলো শেষ পর্যন্ত তো সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজই জিতলো?

হাবুলদা এবার প্রায় তেড়ে এলো। বললো, তা জিতবে না তো কি তোর ইণ্ডিয়া জিতবে? যারা জীবনে কোনদিন ব্যাট ধরেনি তাদের মাঠে নামালে এমনিই হয়। আরে ক্রিকেট খেলাটা স্রেফ চোখের আর হাতের খেলা বুঝলি?

আমরা সবাই চুপ করে থাকতে হাবুলদা এবার একটা সিগারেট ধরালো। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।

বুঝতে পারছি হাবুলদা কি বলতে চায়। এতক্ষণ ভূমিকা করবার হেতু কি। আসলে হাবুলদা যে ক্রিকেট খেলার গল্প শোনাতে চায় ততক্ষণে তা আমা-দের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

পটলা বললো, কিন্তু হাবুলদা এই টিমই তো সেবার ইংল্যাণ্ডে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় রেকর্ড করেছে।

হাবুলদা বললো, না। যা শুনেছিস ভুল শুনেছিস। ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় রেকর্ড হয়েছিলো সেভেনটিন সেভেনটি নাইনের থার্ড জানুয়ারী নর্দাম্পটনে যে খেলা হয়েছিলো সেটাই হলো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রেকর্ড।

বললাম, বলো কি!

হাবুলদা বললো, হ্যাঁ। অথচ আশ্চর্য কি জানিস মানুষ তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। আর আজ তার কোন ডকুমেণ্টও নেই। সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে হিরোসিমা নাগাসাকির সঙ্গে তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

হাবুলদা একমুহূর্ত চুপ করলো। তারপর আবার আরম্ভ করলো, অথচ মজা কি জানিস ইতিহাস ভুল করলেও মানুষের মেমারী তা কখনও ভুল করে না। যেমন আমি আজও ভুলতে পারিনি। তোরা ব্রাডম্যান, ওরেল এর কথা বলবি কিন্তু এঁদের সৌভাগ্য যে নাইনটিন সেঞ্চুরীতে জন্মে এঁরা পার পেয়ে গেল। কাউকে মোকাবিলা করতে হলো না।

গণশা মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলো। আর সহ্য করতে পারলো না। বললো, তা তোমার আসল ঘটনা-টাই বলো না নাইনটিন সেভেনটি নাইনে নর্দাম্পটনে কি হয়েছিলো।

হাবুলদা এবার কটমট করে তাকালে গণশার দিকে। বললো, ভাবছিস এসব গাঁজা। কিন্তু জেনে রাখ বাগবাজারের হাবুল সান্যাল কখনও গাঁজাখুরি গল্প

করে না। প্রমাণ যদি পেতে চাস তবে নর্দাম্পটনের জুবিলি মাঠে গিয়ে দেখে আসিস আজও সেখানে আমার নামে স্মৃতি-ফলক পোঁতা আছে।

বললাম, সত্যি হাবুলদা ওর চিরকাল ঐ রকম বড্ড সন্দেহবাতিক মন। ভাবে সবাই বুঝি মিথ্যেকথা বলে। তুমি কিছু মনে কোর না হাবুলদা।

হাবুলদা বললো, হ্যাঁ তাই দেখছি।

পটলা বললো, কিন্তু জুবিলি মাঠে তোমার স্মৃতিফলক পোঁতা হলো কেন? তুমি বুঝি সেই মাঠে খেলেছিলে?

হাবুলদা হাসলো। বললো, আরে সেই কথাই তো বলছি। আমিই কি জানতাম যে শেষ পর্যন্ত আমাকে ক্রিকেট খেলতে হবে। ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় রেকর্ডটা করে বসবো। অথচ মজা কি জানিস ইণ্ডিয়ার রি-প্রেজেন্‌টেটিভ হয়ে আমি গিয়েছি তখন নর্দাম্পটনে এগ্রিকালচারের উপর গবেষণা করতে। কি করে আরো কৃষির প্রভূত উন্নতি হয়, কি করলে আরো ফলন বৃদ্ধি করা যায়। সঙ্গে আছে মিঃ বেরিংটন-শাস বিলিতি সাহেব। পাঁচ বছর সুইডেন, সাতবছর কানাডা এবং সাড়ে তিনবছর ফিলিপাইনে কাটিয়েছে শুধু আবহাওয়ার উপর গবেষণা করে।

সেই বেরিংটন একদিন সকাল-বেলায় একখানা কাগজ এনে বললো, ছিঃ ছিঃ তোমরা এবারও হেরে গেলে মিঃ সানিয়েল?

—হোয়াট! আমি চিৎকার করে উঠলাম।

বেরিংটন বললো, এই দেখো না তোমাদের ইণ্ডিয়ান টিম থার্ড টেস্টেও হেরে গেলো --একেবারে গো-হারা।

— মানে?

বেরিংটন এবার হাসলো। বললো, দেখছি তুমি সারাজীবন শুধু গবেষণাই করে গেলে। কোন কিছুর খোঁজ রাখলে না। আরে তোমাদের ইণ্ডিয়ান টিম যে ওয়ার্ল্ড টুর করতে বেরিয়েছে। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে তিনটিতেই একেবারে— গো-হারা হেরে গেলো।

—বলো কি!

শুনে আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম। ছিঃ ছিঃ এতবড় অপমান! বেরিংটনের মতো একজন লোক কিনা শেষ পর্যন্ত আমাকে অপমান করতে সাহস করে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

--হ্যালো হ্যালো - - -

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, আপনি কাকে চান?

বললাম, এটা কি ইণ্ডিয়ান রেস্ট হাউস?

--ইয়েস। কিন্তু আপনি কে?

বললাম, আমি হাবুল স্যান্যাল, এম-এ, পি এইচ ডি, এফ আর সি এস, আর জি ডি ও, এল এল ডাবু এক্স মিঃ যোশীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

কথা শুনে ওপারের লোকটা এবার ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পরে মিঃ যোশীর গলা ভেসে আসতেই আমি এবার ধমকে উঠলাম, ছিঃ ছিঃ তুমি কি ভেবেছো মিঃ যোশী? ভেবেছো এভাবে চুণকালি মাখলে দেশের লোক তোমাকে ছেড়ে দেবে?

যোশী এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, আমি তো চেষ্টা করছি।

বললাম, অমন চেষ্টা করে লাভ কি? যে চেষ্টায় সফল হতে পাববে না? তার চেয়ে দেশে ফিরে যাও।

শুনবো না, বলবো না, দেখবো না   চিত্র : বিন্দুশেখর বিশ্বাস

যোশী এবার বললো, না না মিঃ সানিয়েল তুমি কিছু ভেবো না। এবার আমরা নিশ্চয়ই জিতবো। তুমি দেখে নিও এবার মুখের মতো জবাব দেব।

সত্যিই তাই। বুঝলি সেই জুবিলি মাঠে ফোর্থ টেস্টে একটা মুখের মতো জবাবই হলো বটে। ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় রেকর্ড।

হাবুলদা একমুহূর্ত্ত চুপ করলো। তারপর পোড়া সিগারেটটার গোটা-কয়েক টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, অথচ আমিই কি জানতাম সেই ইতিহাসের নায়ক হবো আমি। গবেষণা ছেড়ে ব্যাট নিয়ে মাঠে নামতে হবে শুধু ইণ্ডিয়ার প্রেস্টিজ বাঁচাতে।

সারা নর্দাম্পটনে তখন সেকি হৈ চৈ। একমাস আগে থেকে জুবিলি মাঠ সাজানো হচ্ছে। ঘন ঘন পিচ পরীক্ষা করা হচ্ছে। মাঠের ঘাস ছাঁটা হচ্ছে। সারা নর্দাম্পটনের কাগজে কাগজে প্লেয়ারদের নাম ছাপা হয়ে গেছে। এমনি যখন কণ্ডিশন ঠিক তখনই অঘটনটা ঘটে গেল। অর্থাৎ এম এন যোশী একদিন হন্তদন্ত হয়ে আমার চেম্বারে এসে হাজির হলো। বললো, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে সানিয়েল, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

—সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?

যোশী বললো, জানো আমাদের একজন প্লেয়ারকে আজ দুদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কি!

যোশী বললো, হ্যাঁ। অথচ জানো পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ' তিতাল্লিশ লক্ষ টাকার এদিকে টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে এখন উপায়?

বললাম, এতে আর চিন্তা করবার কি আছে। একজন এক্‌স্ট্রা কাউকে নামিয়ে দাও না। যোশী এবার ম্লান হাসি হাসলো। বললো তাহলে তো কোন চিন্তাই ছিলো না। কিন্তু থার্ড টেস্ট ম্যাচে যে তারা সবাই উন্মাদ হয়ে পড়ে আছে।

বললাম, তাহলে তুমি কি করবে ঠিক করেছো?

যোশী এবার ঢোক গিলে বললো, তুমি এক কাজ কর না সানিয়েল?

—কি?

—তুমি নিজেই মাঠে নেমে পড়।

—আমি!

—হ্যাঁ তুমি। জানি এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। তোমার উপর ইণ্ডিয়ার সমস্ত প্রেসটিজ নির্ভর করছে, তুমি আর না কোর না সানিয়েল। আমি যে অনেক ভরসা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বিজ্ঞানের খেলা

কাগজের বাক্সে জল ফোটানো

পাতলা কাগজ দিয়ে একটা পাত্র তৈরি করো। ঐ পাত্রে কিছুটা জল নাও। একটি ত্রিপদ স্ট্যাণ্ডের ওপর তার জালি রেখে তার ওপরে জলশুদ্ধ কাগজের পাত্রটা বসাও। তার জালির নীচে একটি জলন্ত 'স্পিরিট ল্যাম্প' অথবা 'বুনসেন দীপ' রেখে তার সাহায্যে কাগজের পাত্রটাকে তাপ দাও। দেখবে যে কেটলীতে যেমন চায়ের জল ফোটে, ঐ কাগজের পাত্রের জলও তেমনিভাবেই ফুটছে। জল ফুটছে অথচ কাগজের পাত্রটা কিন্তু পুড়ছে না। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার বটে, তবে সত্যি।

এখন বলি শোন---কিভাবে এ ব্যাপারটা সম্ভব হয়।

অমরনাথ রায়

তোমরা হয়তো জান যে, পাতলা কাগজ তাপের সুপরিবাহী আর পুরু বা মোটা কাগজ তাপের কুপরিবাহী। তাই পাতলা কাগজের মধ্যে দিয়ে তাপ খুব তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে চলে যায়। আর সেই তাপ পেয়ে জল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে শেষে ফুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঐ সময়টুকুর মধ্যে পাতলা কাগজের বাক্সটা যথেষ্ট গরম হয় না এবং পোড়েও না। তবে হ্যাঁ, পাত্রটা যদি পুরু বা মোটা কাগজে তৈরি হতো তাহলে কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই পুড়ে যেতো। কারণ —আগেই তো বলেছি যে পুরু বা মোটা কাগজ তাপের কুপরিবাহী। মোটা কাগজের বাক্স নিলে তার মধ্যে দিয়ে তাপ তাড়াতাড়ি জলে পৌঁছুতে পারতো না। ইতিমধ্যে পুরু কাগজ খুব তেতে উঠে পুড়ে যেতো। তোমার পরীক্ষাটাই যেতো বানচাল হয়ে।
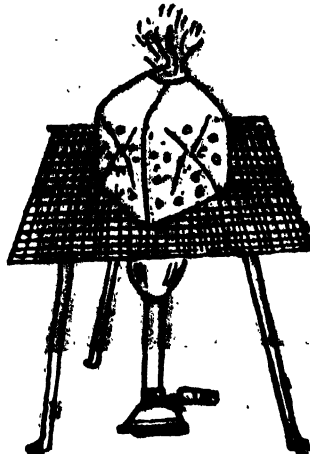
লিচু

গ্রীষ্মকালীন প্রথম শ্রেণীর ফলের মধ্যে আম-আনারসের সঙ্গে লিচুরও নামোল্লেখ করা হয়ে থাকে। বাস্তবিকই লিচু একটি অন্যতম প্রধান ফল। এর স্বাদ ও গুণ যে-কোন ফলের থেকে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। শোনা যায় কোন এক ইংরাজ-পত্নী এই লিচুর স্বাদে এত মোহিত হয়ে পড়েন যে তিনি স্রেফ লিচু খেতে পাওয়া যাবে বলেই ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।

লিচু কিভাবে মনুষ্যসমাজে পরিচিতি লাভ করল সে সম্বন্ধে একটি মজার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একদা দক্ষিণ চীনের কোনও এক জঙ্গলে জনকয়েক শিকারী পথ হারিয়ে ফেলে। সে প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বের কথা। সারাদিন তাদের বাড়ি ফেরার রাস্তা খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চলল। কিন্তু বিধিবাম! তাদের সব চেষ্টাই সেদিনকার মত ব্যর্থ হল। অবশেষে অনুপায় হয়ে তারা রাত্রিটুকু কোনও গাছের ডালে কাটান ঠিক করল।

কিন্তু এদিকে ক্ষুধাতৃষ্ণা ও সারাদিনের পথক্লান্তির জন্য তাদের অবস্থা সঙ্গীন। সুতরাং গাছে আশ্রয় নেওয়ার আগে তারা ক্ষুধা মেটানর জন্য কিছু ফলমূলের সন্ধান সুরু করল। সঙ্গে ত' কিছুই রসদ আনেনি যে খাবে। দুর্ভাগ্যবশত তারা একপ্রকার ক্ষুদ্র লাল ফল, যেগুলিকে তারা বিষাক্ত বলেই জানত, ছাড়া আর কোন ফলের চিহ্ন দেখতে পেল না।

যে সময় তারা ফল পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, হঠাৎ তাদের একজন লক্ষ্য করল যে সেই তথাকথিত বিষাক্ত ফলগুলিকে কয়েকটি বানরে স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ করছে।

শ্রীনীলমণি মিত্র

সে তখন উপস্থিত বুদ্ধিবলে সঙ্গীদের বোঝাল যে, যেহেতু ফলগুলিকে খেয়ে বানরে বহাল তবিয়তে আছে সুতরাং ওগুলি আদৌ বিষাক্ত হতে পারে না।

তার এই যুক্তি মেনে নিয়ে যেই একজন একটি লাল ফল খেয়েছে, অমনি ফলটির সুমধুর মিষ্ট স্বাদ পেয়ে উল্লাসে 'লি: কে:' বলে উঠল, যার মানে হল 'এটি অতি মিষ্ট!'

এরপর, বলাই বাহুল্য তারা এই ফল খেয়েই ক্ষুধা মেটাল; এবং সেই দিন থেকে ফলটিও আর 'বিষাক্ত' নামধারী রইল না। এই ঘটনাটির জন্য ফলটির চৈনিক নাম অনায়াসেই 'লিচে' রয়ে গেল, যার ইংরাজি অপভ্রংশ 'লিচি' এবং বাংলা 'লিচু' হল।

রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ের (৬৩৩-৪৫ খৃ:) চৈনিক পর্যটক হুয়েন সাঙের আগে পর্যন্ত লিচুর ফলন দক্ষিণ চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল পরে, এটি পর্যটকদের দ্বারাই ইন্দোচীনে যায় ও সেখান থেকে ভারতে আসে। ভারতে লিচুর আদি ফলন ক্ষেত্র হল বিহারের পাটলীপুত্র ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি। বর্তমানে অবশ্য সারা ভারতেই এর চাষ হয়ে থাকে, তবে মুজফফরপুর ও দেরাদুনের লিচু স্বনামখ্যাত। এর ফলন বিহারেই প্রাথমিকভাবে সুরু হওয়ার কারণ হল সেকালে পর্যটকরা বৌদ্ধতীর্থ বিহারেই বেশী আসতেন।

চীন ও ভারত ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতেও এর প্রচুর ফলন হয়। ইউরোপ অথবা আমেরিকার শীতপ্রধান আবহাওয়া এর ফলনের উপযোগী নয় বলে সেখানে এর চাষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। গাছ হয় কিন্তু ফল ধরে না তাতে। দক্ষিণ আমেরিকায় এর ফলন দেখা যায় অবশ্য। ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মত 'লিচিনাট' (লিচু-শুষ্ক) খেয়েই পরিতৃপ্তি লাভ করতে হয়--- যা নকি সেদিককার অতি সৌখীন খাদ্য!

লিচুগাছ সাধারণত এক ফসলী হয়ে থাকে। এর উচ্চতা ৬---১২ ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। এর জামপাতা সদৃশ্য পাতাগুলি কম জলেতেও খুব সতেজ ও সবুজ হয়ে থাকে। গাছগুলি বিরূপ আবহাওয়াতে শীঘ্র মরে না। এই গাছ পোঁতার জন্য বর্ষাকাল পর্যাপ্ত সময়। কলম লাগিয়ে অথবা বিচি পুতে গাছ পোঁতা যেতে পারে। পোঁতার ৫।৬ বৎসরের মধ্যে গাছগুলি ফলবতী হয়ে যায়। বীজ গাছের ফল আকারে ছোট ও কলমী গাছের আকারে বড়

[illegible] চিত্র: [illegible]

হয়ে থাকে। লিচুগাছে [illegible] ছোট ছোট লিচু লেগে থাকে। যে মাসের মাঝামাঝি ফলগুলি যথেষ্ট বড় হয়ে যায় সেই সময়ে এগুলিকে গাছ থেকে পেড়ে আগ দিয়ে রেখে পাকাতে হয়। কাঁচা অবস্থায় লিচুর রঙ Pea-green থাকে। যেমন যেমন এ পাকতে থাকে তখন এ সিঁদুরে রঙ পায় এবং সুপরিপক্ব অবস্থায় এ গাঢ় খয়েরী রঙ ধারণ করে।

লিচুর বৈজ্ঞানিক নাম—'নেফেলিয়াম লিচি'। বনস্পতি বিশারদদের মতানুসারে লিচু সাবি রীঠে (Soap-berry) জাতীয় ফল। এর ৪।৫টি জাতি আছে। এতে শতকরা ৫০ ভাগ জলীয় পদার্থ থাকে। স্নেহপদার্থের মধ্যে এতে পাওয়া যায় প্রোটিন, শর্করা ও নানাবিধ খনিজ —যার মধ্যে লৌহের পরিমাণ যথেষ্ট।

লিচুতে লৌহের পরিমাণ বেশী থাকায় এ রক্তবর্ধক, [illegible] ও যাবতীয় মস্তিষ্ক রোগের প্রতিষেধক। লিচু কোষ্ঠবদ্ধতা ও মন্দাগ্নিতে খুবই ফলপ্রদ। কোন দুর্বল ব্যক্তি ভাল টনিকের বিকল্প হিসাবে দৈনিক ১০টি লিচু খেতে পারেন। স্মরণশক্তি কোন কারণে হ্রাস পেলে নিয়মিত লিচু খেলে সুফল পাওয়া যায়। ২।৩ মাসের শিশুকে দৈনিক ২।১ চামচ লিচুর রস দিলে শিশুর পরিণতবয়সে স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হয়।

অতল সমুদ্রগভীরে অতুল সম্পদ

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

ভূ-পৃষ্ঠের দুয়ের তিন-অংশ জল-নিমগ্ন, অবশিষ্ট একের তিন অংশ স্থলভূমি বিভিন্ন মহাদেশে বিভক্ত। বৈজ্ঞানিকের সদা-অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি যেমন মহাশূন্যের চরম সীমানায় অজানার সন্ধানে নিযুক্ত রয়েছে তেমনি সমুদ্রের গভীরেও তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি সঞ্চালন শুরু হয়েছে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিশ্বাস করে আসছে যে, সমুদ্রের অতলান্তে প্রোথিত সম্পদরাশি রয়েছে। স্থলভূমি অপেক্ষা সমুদ্রের গভীর তলদেশে নিঃসন্দেহে বিভিন্ন খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থে সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে ও সুনির্দিষ্ট নিষ্কাশন-পদ্ধতি অনাবিষ্কৃত হওয়ায় সমুদ্রের গভীর তলদেশকে বৈজ্ঞানিকগণ সহজে উন্মোচিত করতে পারেন নি। সেইজন্য সমুদ্র-তলদেশের বিভিন্ন উৎস দীর্ঘদিন অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

পৃথিবীর জন-সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৈজ্ঞানিকগণ আশংকা করছেন স্থলভূমির খাদ্য-সঞ্চয় নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনায়। তাছাড়া বিভিন্ন নিত্যব্যবহার্য ধাতু যেমন লোহা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম এবং অধাতু কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সামগ্রী দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কয়েকশো বছরের মধ্যে এগুলির দুষ্প্রাপ্যতা লক্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এই সব কারণে সমুদ্রের অনাবিষ্কৃত তলদেশ বৈজ্ঞানিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এ-সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে জানা যায় সমুদ্রের গভীর তলদেশ বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ পদার্থ ও খাদ্য-সামগ্রীর সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক উৎস।

খাদ্য ও খনিজ পদার্থের পরই প্রয়োজনীয় হলো জ্বালানি। আমরা সাধারণত জ্বালানি হিসেবে কয়লা ও কোন গ্যাস ব্যবহার করে থাকি। এগুলি জীবাশ্ম জ্বালানি (fossil fuels)। পৃথিবীর কয়লা ও কোন গ্যাসেব পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এখানেও সমুদ্রের কাছে আমাদের হাত পাততে হবে। সমুদ্রের তলদেশে তৈল-সমৃদ্ধ এমন সব পাহাড় রয়েছে, যা থেকে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি পাওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যেই মেক্সিকো উপসাগর, পারস্য উপসাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরে সাফল্যের সঙ্গে তৈল নিষ্কাশন-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করছেন সমুদ্রগভীরে আট লক্ষ টন সোনা, আশী লক্ষ টন নিকেল, একশো চৌষট্টি লক্ষ টন রূপো আটশো লক্ষ টন মলিবডিনাম এবং আশীহাজার লক্ষ আয়োডিন দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। সমুদ্র-গভীরের এই বিপুলসম্পদ পৃথিবীর মানুষকে প্রলুব্ধ করে তুলেছে।

পারমাণবিক শক্তির যুগে কয়েকটি ধাতু যেমন জিরকোনিয়াম, টাইটেনিয়াম এবং থোরিয়াম বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এইসব ধাতুগুলি সমুদ্রজলের গভীরে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তীরভূমির জলে এইসব ধাতুগুলি মৌলিক ও যৌগিক আকারে ভেসে আসে। ব্রেজিল, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ এবং অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উপকূলে এইসব ধাতু সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। পারমাণবিক শিল্প, তাপ-সহ বস্তু নির্মাণে, অতি কঠিন (Super-hard) ইস্পাত *নির্মাণে টাইটেনিয়াম, জিরকোনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতু অপরিহার্য উপাদান।*

সমুদ্রের তলদেশে বিভিন্ন আকৃতির অগণিত নুড়ি রয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, নুড়িগুলি প্রধানত ফেরো ম্যাঙ্গানীজ যৌগ, তাছাড়াও ওগুলি কোবাল্ট, নিকেল ও তামায় সমৃদ্ধ। এই আকরিক গুলির পরিমাণ কয়েকশো কোটি টনেরও অধিক। ভারত মহাসাগরের উপকূলসমূহ ক্রোমিয়ামের অফুরন্ত আকরিকে সমৃদ্ধ।

সমুদ্রতলদেশের জীবন্ত উৎস অর্থাৎ মাছের কথায় এবার আসা যাক। সমুদ্রের মাছের মোট পরিমাণ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ঋতুতে এই পরিমাণ বিভিন্ন হয়। সারাবিশ্বে সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহের পরিমাণ ১৯৬৬

সালে আঠারো লক্ষ টন থেকে ১৯৬৪ সালে একান্ন লক্ষ টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্ত সাগর ও উপসাগর মৎস্য-সম্পদে সমান সমৃদ্ধ নয়। কোনো কোনো সাগর মৎস্য সম্পদে সুসমৃদ্ধ আবার কোনো কোনোটি একেবারেই মৎস্যহীন। সমুদ্রজলে মাছের অস্তিত্ব কয়েকটি বিশেষ কারণের উপর নির্ভর করে। এগুলি হলো—সৌরকিরণ (Solar radiation), উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি, স্রোতের উষ্ণতা, জলের রাসায়নিক গঠন এবং জলের সঞ্চালন (Circulation of water)। গালফ উপসাগরের স্রোত ও উত্তরের ঠাণ্ডা স্রোতের সংযোগস্থল হেরিং ও সী-বেস মাছের পক্ষে উত্তম জায়গা। উত্তরের প্রশান্ত মহাসাগরের ঠাণ্ডা স্রোত ও জাপানের উষ্ণস্রোতের সংযোগস্থল সমূহে স্যালমন (Salmon) ও সরি (Saury) মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে। তীরভূমির নিকটবর্তী স্থানে ভারত মহাসাগরে কোনো মাছ থাকে না। ক্রান্তিরেখার অবস্থিতির জন্য জৈবিক প্রক্রিয়া (Metabolism) দ্রুত সংঘটিত হওয়ায় প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন।

কিন্তু ভারত মহাসাগরে স্থানে স্থানে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায়—এইজন্যই ভারত মহাসাগরের বহুস্থানে মরা মাছ ভেসে ওঠে। সারাবিশ্বে প্রতিবছর যেখানে পঞ্চাশ লক্ষাধিক সামুদ্রিক মাছ সংগৃহীত হয়, সেখানে ভারত-মহাসাগর থেকে সংগ্রহের পরিমাণ মাত্র আড়াই লক্ষ টন। ভারত-মহাসাগরের পৃষ্ঠস্তরে মাছ থাকে, এই পৃষ্ঠস্তরেই মাছেদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বায়ু রয়েছে। ভারত-মহাসাগরে মাছের প্রাচুর্যহীনতার অন্যতম কারণ হলো পৃষ্ঠস্তরটি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও পরবর্তী স্তরটি ঠাণ্ডা, কিন্তু সঞ্চালনের অভাবে স্তর দুটি মিশ্রিত হতে পারে না। এডেন, সিংহলের তীর, জাভার দক্ষিণ উপকূল, সুমাত্রার উপকূল সোমালি-অ্যারাবিয়ান তীর প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরের মাছ ধরার নির্দিষ্ট স্থান।

নকল মানুষ

শল্য-চিকিৎসায় আজ পৃথিবী-ব্যাপী এক যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নকল দাঁতের ব্যবহার আমরা বহু যুগ থেকেই দেখে আসছি, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন মোটরগাড়ী, রেডিও, সেলাই মেশিনের মত মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের 'স্পেয়ার পার্টস'-এর ব্যবহার একটা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলে ওষুধের সাহায্যে তাকে মেরামত করা যেতে পারে। কিন্তু সেটাকে বাদ দিয়ে নতুন অংশ জুড়ে দেওয়াটা অনেক সহজ এবং আর্থিক দিক থেকেও সুবিধাজনক। বিজ্ঞানী-দের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে বহুযুগ ধরে তাঁদের অক্লান্ত সাধনা। শরীরের বিভিন্ন ক্ষুদ্রতম অংশের জটিল কার্য পদ্ধতি—সমস্ত খুঁটিনাটি বহুদিন ধরে অনুশীলন করতে হয়েছে। যে হৃৎপিণ্ড রক্তকে পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেয় তার কর্ম-পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল—বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও রয়ে গেছে রহস্য। বিজ্ঞানীদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজ হাজার হাজার লোক ধাতব উরুসন্ধি (হিপ-জয়েণ্ট) ডেক্রনের তৈরী ধমনী, প্লাস্টিকের চোখের তারা, অচ্ছোদ পটল (Cornea) শ্বাসনলী (Trachea) কানের কোমল অস্থি, রবারের হৃৎপিণ্ডের ভালভ ব্যবহার করে সুস্থসবল জীবনযাপন করছেন। সব থেকে আশ্চর্য হোল এগুলো শরীরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায়। যে, এগুলো যে কৃত্রিম

মলিনা নিয়োগী

সেটা কিছুতেই ধরা যায় না, আর স্বাভাবিক কাজকর্ম স্বচ্ছন্দে করা চলে।

প্লাস্টিকের অচ্ছোদ পটল বা কর্নিয়া বসান থাকে চোখের তারার ওপরে আর ছিদ্রযুক্ত চাকতিটা থাকে চক্ষুগোলকের মধ্যে। চোখের মাংস-পেশীগুলো ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বেড়ে গিয়ে একে আঁট করে ধরে রাখে। ধমনী নষ্ট হয়ে গেলে রয়েছে ডেক্রনের ধমনী। ডেক্রনের ধমনী ব্যবহার হয়ে আসছে ১৯৫৫ সাল থেকে। এ-গুলো এমন সুন্দরভাবে তৈরী যে, সহজেই বাঁকান চলে, ভাঁজ হয়ে যাওয়ারও কোন ভয় নেই। ধাতব উরুসন্ধি হালকা কিন্তু শক্ত ও ক্ষয়-নিরোধী পদার্থ দিয়ে তৈরী। হৃৎপিণ্ডের ভালভ ১৯৬০ সাল থেকে মানুষের শরীরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তা ছাড়া আছে রবারের কান—চামড়া দিয়ে ঢেকে দিলেই আসল কান।

বিজ্ঞানীদের যাত্রাপথের এটা হোল প্রাথমিক পর্যায়। ভবিষ্যতে শরীরের বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস-এর সাহায্যে হয়তো এক নতুন ধরণের মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে—যার শারীরিক দক্ষতা, স্নায়ু-মানসিক অবস্থা সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রিত হবে বিজ্ঞানীর খেয়াল-খুশী মত—"মানুষ" ও "নকল মানুষ" এদের মধ্যে এটাই হবে তফাৎ।

'স্পেয়ার পার্টস' তৈরীর কাজে চাই আরও উন্নত শ্রেণীর উপাদান। বিজ্ঞানীরা আজ সেই সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছেন। কিছুদিন কাজ করার পর দেখা গেল সেটা আর ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। তাই বিজ্ঞানীদের আজ লক্ষ্য সেই শ্রেণীর উপাদান যাদের কাজ হবে আরো নিখুঁত, আরো স্থায়ী।

টুনটুনি ও বনপরী-

অতীন মজুমদার

পূব আকাশে সূয্যিমামা উঠি উঠি করে সবেমাত্তোর মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। তাই দেখে রং-বেরংয়ের ফলের, নাম-না-জানা হরেকরকম ফুলের সবুজ গাছ-গাছালি ভরা চোখ জুড়ানো সোঁদর বনে পাখ-পাখালির জলসা সুরু হয়েছে। কাক ডাকছে কা-কা-কা। চড়াই সুর ধরেছে কিচির-মিচির-কিচ। চোখ-গেল গাইছে চোখ গে—ল—চোখ গে—ল। বৌ কথা কও বলে উঠছে মিঠে গলায়,—বৌ কথা ক'—বৌ কথা ক'। কোকিল ডাকছে কুহু—কুহু—কুহু।

জমে উঠেছে পাখ-পাখালির জলসা। গাছে গাছে খুশির হুল্লোড় সোঁদর বন জম-জমাট।

টুনটুনির কিন্তু কোনো সাড়া নেই। তার মিঠে গলার সেই টুইক্ টুইক্ ডাক শোনা যাচ্ছে না।

তাই ত'—হলো কি টুনটুনিটার ?—ওর ডালিম গাছটার দিকে চেয়ে দেখল সবাই—কই, টুনটুনি তো নেই। কি ব্যাপার—কি ব্যাপার ? সবাই অমনি ধাঁ করে ডালিম গাছটার কাছে এসে শুধোলো :

টুনটুনি টুনটুনি হয়েছে যে ভোর,
ডাকিসনে কেন তবু হয়েছে কি তোর ?

আর কি হয়েছে ? টুনটুনির মনটা ব্যথায় ভরে উঠেছে,—বাসায় ও চুপটি করে বসে ওর ছোট্ট বাচ্চাটির দিকে চেয়ে আছে। বাচ্চাটার অসুখ করেছে—খায় না দায় না, নড়েও না চড়েও না। হায় হায় হায়—বাচ্চাটা বুঝি আর বাঁচবে না।

পাখিদের ডাক শুনে জল-ছল-ছল চোখে ওর ছোট্ট বাসা থেকে বেরিয়ে এসে কাঁদ কাঁদ সুরে বলল —

বল্‌ব কি আর, পোড়া-কপাল,
অসুখ ছেলেটার,
মনের দুখে বসে আছি
তাই যে কাছে তার।

এই কথা শুনে পাখিরা বললে, আহা, বলি কারুর আর ছেলে নেই না কারুর ছেলের অসুখ করে না। তা' বলে কেউ বাসা ছেড়ে আর বেরোয় না নাকি ; না ভোর হলে ডেকে ওঠে না ? তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি।

মনের দুঃখে টুনটুনি কোনো জবাব দেয় না। টুনটুনিকে চুপ করে থাকতে দেখে পাখিরা বলে ওঠে,—

এমন সোনার ভোরে,—
থাক্‌রে তবে ঘরেই বসে
মুখ গোমড়া করে।

তারপর ওরা ওদের ডানা মেলে দিয়ে ঐ নীল থই-থই আকাশের বুকে উড়ে যায়।

সূয্যিমামা চারিদিকে চিক্‌চিকে সোনালী রোদ ছড়িয়ে একেবারে মাথার ওপর তখন,—ভর দুপুর সোঁদর বনে টুনটুনি, ওর বাচ্চা আর সামনের হিজল গাছটায় শালিকের বাচ্চা দুটো ছাড়া আর কেউ নেই। খুব গরম পড়েছে। গরমে টুনটুনির খু-উব পিপাসা পেয়েছে কি করে—ও তাই টুক করে ওর বাসা থেকে বেরিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পদ্মফোটা দীঘির পাড়ে এসে

আমাদের দাবী মানতে হবে

চিত্র : দুলাল দত্ত

চুক চুক করে জল খাচ্ছে। এমন সময় 'গেল রে আমার বাছাটা —গেল গেল' বলে কে যেন চীৎকার করে কেঁদে উঠল। পিছন ফিরে টুনটুনি চেয়ে দেখল ঘাসের ওপর একটা ঘাস-ফড়িং তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে আর কেঁদে কেঁদে ঐ বলে চীৎকার করছে। টুনটুনি বলল,—কি হয়েছে গা, অমন করে কাঁদছো কেন?

কাঁদ কাঁদ স্বরে ফড়িং বলল,—ঐ দ্যাখো না, আমার ছেলেটা জলে পড়ে গেছে—হায় হায়, কি হবে।

টুনটুনি মুখ ফিরিয়ে দেখলে, একটা বাচ্চা ফড়িং জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। দেখে ওর মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। ও চট ক'রে ঠোঁটে ধরে বাচ্চাটাকে জল থেকে পাড়ে তুলে দিল। তারপর ফুড়ুৎ—সোজা নিজের বাসার দিকে। কিন্তু বাসায় যেই না ঢুকতে যাবে, অমনি কার যেন চিঁ চিঁ আওয়াজ কানে এল। কে? কে—এমন করছে? —ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে, সামনের হিজল গাছের ডাল থেকে শালিকের একটা বাচ্চা মাটিতে পড়ে গেছে সেই চিঁ-চিঁ করে কাঁদছে আর ছটফট করছে। আহা—অনাহারে।— তার কান্না শুনে টুনটুনির মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। কিন্তু কি করে—কি করে—বাচ্চাটাকে ডালে তুলে দেবার শক্তি তো নেই ওর। অথচ না তুললে কে কখন বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে—তাই তো তাই তো।—টুনটুনি কি ভাবল। তারপর ফুড়ুৎ—উড়ে চলল বাচ্চাটার মা—শালিককে খুঁজতে।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে সোজা বনের একেবারে শেষ প্রান্তে এক ফলসা গাছে মা-শালিককে দেখতে পেয়ে তাকে তার বাচ্চার গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার কথা বলল।

তাই শুনে 'ওমা—সেকি!' বলে ধাঁ করে উড়ে এসে সে ঠোঁটে করে বাচ্চাটাকে মাটি থেকে তুলে নিলে বাসাতে।

গভীর রাত। গা ছম্ ছম্ আঁধার। ঝিঁঝি ডাকছে। টিপ্ টিপ্ জ্বলে ওঠা জোনাকিরা উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। পাখিরা সব নিজের নিজের বাসায় ঘুমুচ্ছে। জেগে আছে শুধু টুনটুনিটা। জল-ছল-ছল, চোখে তার ছেলের দিকে চেয়ে আছে ছেলেটা নড়েও না চড়েও না। সাড়াও দেয় না।

হঠাৎ ডালিম গাছটা নড়ে উঠল, টুনটুনির বাসাটাও দুলে উঠল। ভয়ে ভয়ে টুনটুনি বাসা থেকে মুখ বাড়াতেই অবাক। বন আলো করা সুন্দর ফুট-ফুটে একটা মেয়ে গাছের ডালে বসে পা দোলাচ্ছে আর তার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছে। টুনটুনিকে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল,—

আমি যে এই বনের পরী,
ফুলের বুকে থাকি,
তোমায় চিনি, তুমি বনের
সবার সেরা পাখি।
আজকে ভোরে ডাকলে নাক,
গাইলে নাক গান,
জানতে এলাম তাইতো',
বল কিসের অভিমান?

টুনটুনি অমনি কেঁদে বলে উঠল,—
নয় অভিমান নয়, পরী আজ
গাইনি মনের দুখে,
ছেলের অসুখ, শেল বাজে গো
তাই তো' আমার বুকে।

বনের পরী শুনে বলল,—
তাই নাকি গো, দেখি দেখি
তোমার ছেলেটাকে,
একনিমেষে ভালো করে
দিচ্ছি আমি তাকে।

—এই বলে বনের-পরী টুনটুনির বাসায় এসে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে তার কচি মুখে একটা চুমু দিয়ে আদর করে গায়ে হাত বুলোতেই ওমা, অমনি ধড়ফড় করে বাচ্চাটা তার হাতে উঠে বসল। বনের পরী তখন বাচ্চাটাকে বাসাতে রেখে টুনটুনিকে বলে উঠল,—

পরের যারা ভালো করে,
ভালো তাদের হয়,
দুঃখ তাদের মনে
চিরকাল না কভু রয়।—

এই বলে বনের-পরী উড়ে চলে গেল।

পরদিন ভোর না হতেই খুশিতে সারা বন জেগে উঠল টুনটুনির টুইক টুইক ডাকে। অন্য সব পাখিরা তো অবাক্। এতো খুশি টুনটুনিটা কোথায় পেল? তারা কেউ জানল না, শুনল না, বুঝল না যে, যারা পরের ভালো করে, দুঃখ ওদের চিরকাল থাকে না, খুশিই ওদের মনের নিত্যকালের সাথী।

আজব জীব

সুলেখা [illegible]

ঘড়ি চলে সর্বদা টিক্ টিক্ টিক্।
সময়টি বলে দেয় একেবারে ঠিক।
আছে তার দুটো হাত ঘোরে বন্‌বন্।
সময় দেখাবে খালি এই তার পণ।
থামে নাকো একবারও দিনরাত চলে।
রাত্তিরে গায়ে তার আলো দেখি জ্বলে।
এক দুই থেকে বারো আছে গায়ে লেখা।
দিনরাতি পড়ে আছে টেবিলেতে একা।

নেই কোন ভয় ডর চলে টক্ টক্।
হরদম দেখি ঘড়ি করে বক্ বক্।
রোগ ব্যাধি নেই তার ভোগেনাক জ্বরে।
তাই তো দেশের লোকে ভালবাসে তারে।
খায় নাকো কোন কিছু নেই খিদে-তেষ্টা।
ঘড়িতে ঘড়িতে তাই ছেয়ে গেছে দেশটা।
এমন আজব জীব পাবে কোথা বল?
ঘড়ি যদি কিনবে তো ঘড়িঘরে চল।

দ্বন্দ্বীর রেষারেষি বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অষ্টমে কর্কট রাশিতে মঙ্গলের দৃষ্টি পতিত; এক-কথায় ভারতের রাশির বাণিজ্যস্থানে। যে রাহু এতদিন মীনে অবস্থান করে ভারতের বিক্রমস্থানে থেকে রাজ-নৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতম করে তুলেছিলেন সে রাহু পূর্ণ শক্তিতে আরো জটিল হয়ে অবস্থান করবেন তাঁর আনন্দভবনে-মূল ত্রিকোণে। ভারতের কন্যালগ্ন, সপ্তমে পুরোপুরি দৃষ্টি বর্তমান রয়েছে রবি, বুধ ও বৃহস্পতির। মঙ্গল ধনুতে অবস্থান করে ঐ সপ্তম ঘরে তাঁর চতুর্থ দৃষ্টি প্রদান করে চলেছেন এবং তদুপরি রাহুর দৃষ্টি বিদ্যমান থাকায় এ মাসে এমন কি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে দেখা দিতে পারে, যার কল্পনা করা যায় এক-মাত্র মিলিটারী শাসনে। চন্দ্র ও আদিত্যকে বিমর্দন করার শক্তি রাহুরই রয়েছে। মঙ্গল যোদ্ধা, সামরিক শক্তিতে শক্তিমান। তদুপরি রাহুর দৃষ্টি। দৈত্য ও দেবগুরু। লগ্নের দ্বাদশে থেকে শুক্রদেব রাহুকে যোগ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, করে তুলবেন আরো শক্তিমান। অষ্টমে শনিদেব এক্ষেত্রে মীমাংসাকারক হিসেবে গণ্য হবেন। কেন-না-শনিদেব তৃতীয়ে মিথুনে দৃষ্টি প্রদান করছেন এবং সে দৃষ্টির বিপরীত সপ্তমে মঙ্গলেরও সজাগ দৃষ্টি বর্তমান। শনিদেবের নিজস্ব ঘর মকর ও কুম্ভ। দৃষ্টি পূর্ণই রয়েছে মকরে। কুম্ভে বসবাস করছেন রাহু। এক্ষেত্রে কুটিল চক্রান্তকারী হিসেবে শনিদেবের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। এক কথায় আশ্বিন মাস থেকেই মিলিটারী শাসনের আবির্ভাব ও প্রস্তুতি চলতে পারে। তা' ছাড়া আমাদের প্রক্ষেমা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে উক্ত মাস শুভসূচক নয়। তাঁর রাশির উপর ও কর্মস্থানের উপর শনির দৃষ্টি বর্তমান তা ছাড়া তাঁর বাণিজ্য-স্থানের (রাজ-নৈতিক আলোচনাদি বিষয়ের) উপর মঙ্গলের দৃষ্টি বর্তমান। ভারতের স্থানে স্থানে বিক্ষোভ, দাঙ্গা, বন্যা ও

॥ আশ্বিনের ফলাফল ॥

ছাত্র- আন্দোলনাদির সম্ভাবনা রয়েছে। ইংরেজী ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা আশ্বিনের সূর্যোদয় হলো। ২রা আশ্বিন দং ২৪।৪৫ পলে বুধ বক্রগতি দ্বারা ১২ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে যাবেন। ১০ই ৪৫।৫৯ পলে শুক্র ১১ পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে যাবেন। ১৪ই ৪২।২৭ পলে বক্রী বুধ পূর্ব দিকে অস্তমিত হবেন। ৬ই ১।১৭ পলে বৃহস্পতি পশ্চিম দিকে অস্তমিত হবেন। ১৪ই ২১।৩১ পলে মঙ্গল ২০ পূর্বষাঢ়া নক্ষত্রে যাবেন। ১৫ই ৫।৪৬ পলে বুধ বক্রত্যাগ করবেন। ১৫ই ৫৭।১৩ পলে শনি বক্রগতি

ভৃগু-আচার্য

দ্বারা ১ অশ্বিনী নক্ষত্রে যাবেন। ১৯শে ১১।২ পলে বৃহস্পতি ১৪ চিত্রানক্ষত্রে ২১শে ৪২।৪১ পলে শুক্র ১২ উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে, ২৪শে ২৫।৪৪ পলে শুক্র কন্যা রাশিতে এবং ২৬শে ১৩।৪২ পলে বুধ পুনঃ ১৩ হস্তানক্ষত্রে যাবেন।

নিম্নে সূর্যের কন্যা রাশির সংক্রমণ-কালীন গ্রহাবস্থান নির্ণায়ক চক্র প্রদান করা হলো।
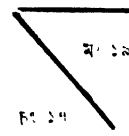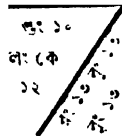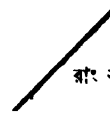
মেষঃ অপেক্ষা করা আর সইছে না। কর্মক্ষেত্রের ঝঞ্ঝাট ও ক্রমোত্তর বেড়েই চলেছে। স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছে না। এককথায় সব দিক থেকেই অসুবিধার অক্টোপাশের দল দলবদ্ধ ভাবেই এগিয়ে আসছে। ১৪ই আশ্বিনের পর বৃহস্পতি চিত্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। একের পর এক অসুবিধার অক্টোপাশের দল ক্রমোত্তর দলহীন হয়ে পড়বে। দালাল, কণ্ট্রাক্টর ও ইঞ্জিনীয়রদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। পুত্রের কর্মস্থানে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। বাস-গৃহ ও বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯শে থেকে ২৩শে আশ্বিনের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই চাকুরী-যোগ বিদ্যমান রয়েছে। ৮ই থেকে ১৪ই আশ্বিনের মধ্যে নিশ্চিত অর্থ প্রাপ্তিতে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রুরা যতই প্রবল হয়ে দেখা দিক না কেন, সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। গুপ্ত বিষয়ক (ব্যবসায় বা সাংসারিক) আলোচনা ১২ই আশ্বিন অবধি যতটা সম্ভব প্রকাশ না-করাই শ্রেয়। নিশ্চিত বিবাহের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। মেষ

লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য, ভ্রাতৃ ও পুত্রস্থান শুভসূচক। অর্থের আয়ের ব্যাপারে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। ২০শে থেকে ২৮শে আশ্বিনের মধ্যে কর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়।

বৃষঃ চারদিকেই বলতে গেলে কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুরা ছড়িয়ে রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে অপপ্রচারের চেষ্টা চলেছে। যাক যতই বাধা বিঘ্ন হোক মনোবল নিয়ে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চলতে হবে কণ্ট্রাক্টরদের নিশ্চিত আশাপ্রদ কণ্ট্রাক্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২রা থেকে ৬ই আশ্বিন অবধি দিনগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। উদর-সংক্রান্ত ব্যাপারে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়। ৬ই থেকে ১২ই আশ্বিনের মধ্যে গুরুস্থানীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। মামলা-মোকদ্দমার ফলাফল শুভ যাবে না। ১২ই থেকে ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে হঠাৎ পায়ে কিংবা মাথায় আঘাত লাগতে পারে। ২রা থেকে ৮ই আশ্বিনের মধ্যে অর্থকড়ির ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। ১৫ই থেকে ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের আয় বৃদ্ধির যোগ দৃষ্ট হয়। বৃষলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে অর্থ, ভ্রাতৃ, বন্ধু ও পত্নীস্থান শুভপ্রদ নয়। পত্নীর উদর-সংক্রান্ত ব্যাপারে আকস্মিকভাবে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের ঝঞ্ঝাট অনেকাংশে তিরোহিত হবে।

মিথুনঃ চন্দ্রের উপর শনির দৃষ্টি থাকায় এবং সপ্তমে ধনুরাশিতে মঙ্গল থাকায় স্বাস্থ্যস্থান শুভ যাবে না। উদর-সংক্রান্ত ব্যাপারে কষ্টভোগ-যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মস্থানের দুশ্চিন্তায় স্বাস্থ্য খারাপ হবার সম্ভাবনাই বেশী। ধনস্থানের জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই বিব্রত হতে হবে। ভ্রাতাদের সঙ্গে পূর্ব মনোমালিন্য অনেকাংশে তিরোহিত হবে। জ্যেষ্ঠপুত্রের কর্মস্থানে উন্নতির যোগ দৃষ্ট হয়। ৮ই থেকে ১০ই আশ্বিনের মধ্যে কোন বন্ধুর সহায়তায় আকস্মিকভাবে উন্নতির যোগ রয়েছে। জ্যোতিষী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ইঞ্জিনীয়রদের আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুতার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। মামলা-মোকদ্দমার ফল আশানুরূপ হবে না। ধর্মোপলক্ষে ১৪ই থেকে ২২শে আশ্বিনের মধ্যে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। আয়ের অনেক পথের সৃষ্টি হবে বটে; কিন্তু তা প্রায় ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়ে দেখা দেবে না। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ফাটকা বা লটারীতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। মেজর অপারেশন করতে হলে ৬ই থেকে ১৪ই আশ্বিনের মধ্যেই করে ফেলা উচিত। মিথুন লগ্নের ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য ও অর্থস্থান এ-মাসে সবিশেষ শুভ থাকবে না। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় শুভ যাবে। নূতন ব্যবসায়ীদের পক্ষে এ মাস অনুকূল নয়।

কর্কটঃ স্বাস্থ্যস্থানে মঙ্গলের দৃষ্টি থাকায় আহার, বিহার ও শয়নে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত করে চলা উচিত। ১০ই থেকে ১৬ই আশ্বিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ধনস্থানের উপর রাহুর দৃষ্টি পতিত হওয়ায় নিশ্চিত প্রমোশনের যোগ বা অর্থপ্রাপ্তিতে বাধার সঞ্চার

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম- -

ঠিকানা- -

- -

মাসিক বসুমতী

হতে পারে। কন্ট্রাক্টরদের [illegible] বড় রকমের কণ্ট্রাক্ট নষ্ট হতে বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ অনেকাংশে তিরোহিত হবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মক্ষেত্রে সুনামের যোগ রয়েছে। ১০ই থেকে ১৪ই আশ্বিনের মধ্যে কোন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা উন্নতি হবার যোগ রয়েছে। অপর দিকে কৃষ্ণকায় ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ই থেকে ১৬ই আশ্বিনের মধ্যে কোন বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করে ব্যবসায়মূলক কর্মে অর্থনিয়োগ করা সমীচীন নয়। শত্রুরা যতই প্রবল হোক তেজস্বী মঙ্গলের বলে সবিশেষ ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। পত্নীর স্বাস্থ্য ৮ই থেকে ১৬ই আশ্বিন অবধি ভাল যাবে না। কর্কট লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ধনস্থান, পুত্রস্থান কর্মস্থান ও ব্যয়স্থান সবিশেষ শুভপ্রদ হবে না। ৮ই থেকে ১৪ই আশ্বিনের মধ্যে কোন-না-কোন বন্ধুর দ্বারা অপমানিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহ : চন্দ্রের সঙ্গে শুক্র ও কেতু এবং অপর দিকে রাহুর সপ্তম দৃষ্টি পতিত হওয়ায় শ্লেষ্মাজাতীয় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। কোমরে বা পায়ে ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। কর্মের চাপ বৃদ্ধি পাবার জন্য স্বাস্থ্য-ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক যোগাযোগ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এ-মাস শুভপ্রদ। ১০ই থেকে ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই কর্মলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। কবি, সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। নূতন কোন প্রকাশিত পুস্তকের দ্বারা সবিশেষ সুনাম অর্জনের যোগ দৃষ্ট হয়। ভ্রাতাদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ থাকবে না। বিষয়-সম্পত্তি বিষয়ে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হতে পারে। কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা আকস্মিকভাবে উপকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন বন্ধুর সহায়তায় আকস্মিকভাবে অর্থ-[illegible] [illegible] হয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। ৮ই থেকে ১২ই আশ্বিনের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের পায়ে কিংবা মাথায় আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আকস্মিকভাবে ভ্রমণের যোগ দৃষ্ট হয়। সিংহলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, অর্থ, বন্ধু ও পত্নীস্থান শুভপ্রদ হয়ে দেখা দিবে না। বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয়।

কন্যা : একের পর এক সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ক্রমোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও পাচ্ছে। ভয় নেই, ৬ই আশ্বিনের পর সর্ববিধ ঝঞ্ঝাট কিছুটা তিরোহিত হতে থাকবে ক্রমোত্তর। আর্থিক যোগাযোগ প্রায় ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যাবে। কনট্রাক্টর, ইঞ্জিনীয়র ও সাহিত্যিকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে স্বাস্থ্যের দিকে যত্ন নেওয়া কর্তব্য। হঠাৎ ফোড়া-পাঁচড়াদিতে কষ্টভোগ বা ছোটখাটো অপারেশান যোগ দৃষ্ট হয়। কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হলেও ভয়ের কারণ নেই। কোন বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এমন কি উক্ত বন্ধুর সহযোগিতায় ভবিষ্যতে ভাগ্যের মোড় পর্যন্ত ঘুরে যেতে পারে। পুত্র ও কন্যাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার ফল শুভসূচক। কোনরূপ ভূসম্পত্তির যোগাযোগ সম্ভব হলে---ক্রয় করাই সমীচীন। ব্যবসায়ীদের পক্ষে নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ না-করাই সমীচীন। পত্নীর স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। পায়ে বা কোমরে ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। ৮ই থেকে ১৪ই আশ্বিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে ধর্মোপলক্ষে ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। কন্যা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে এ-মাস মোটামুটি মন্দ যাবে না। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কারো-না-কারো চাকরী লাভের যোগ দৃষ্ট হয়।

তুলা : মন প্রায় ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। আশা-ভরসা একের পর এক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রেও ঝঞ্ঝাট লেগেই রয়েছে। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তিতেও বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছে না। গুহ্যদেশের পীড়ায় কষ্টভোগ চলেছে কারো না কারোর। ১০ই আশ্বিনের পর এসব অশান্তির যোগ কিছু-না-কিছু পরিমাণে তিরোহিত হবে। ৬ই থেকে ১২ই আশ্বিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রাপ্য টাকা আদায় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রাতাদের ব্যবহার ও স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিকট হতে সুনাম লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ১০ই থেকে ১৪ই আশ্বিনের মধ্যে কোন কৃষ্ণকায় বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। কর্মক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনায় যথেষ্ট সংযমতা অবলম্বন করা বিধেয়। গুপ্ত শত্রুর সৃষ্টি হলেও ভয়ের কোন কারণ নেই। গুপ্ত প্রেম থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তুলা লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে ধনস্থান, পত্নীস্থান ও পুত্রস্থান শুভপ্রদ নয়। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও যশোলাভের যোগ রয়েছে। বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা এ মাসে প্রবল হয়ে দেখা দিবে। সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিকদের এ মাসে সুনাম লাভের যোগ দৃষ্ট হয়।

বৃশ্চিক : আশাহত হয়ে উঠছে মন। বারংবার বাধা ও বিঘ্ন চলেছেই কর্মক্ষেত্রে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই মনুষ্যোচিত মনে হয় না। স্বাস্থ্যের অবস্থাও এ মাসে ভাল যাবে না। উদর সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং শিরঃপীড়ায় কষ্ট ভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। আর্থিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে শুভ হবে বলে আশা করা যায় ১৪ই আশ্বিনের পর ধীরে ধীরে। দার্শনিক, সাহিত্যিক ও চিত্রতারকাদের

শহর-ইয়ার ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৮·০০

লেখকের প্রথম মৌলিক উপন্যাসের প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি 'ঘটনা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ; এই দ্বিতীয় উপন্যাসটির প্রকাশও তা-ই হবে আশা করা যায়। প্রথমটির মত এটিরও কেন্দ্রবিন্দু এক অসামান্যা রমণী। রূপে,গুণে, বিদ্যায়, জনন্যশীলতায়, এবং সর্বোপরি, মৌলিকতায়, বিশিষ্টা এই নারীচরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে একটি উজ্জ্বলতম সৃষ্টির মর্যাদা পাবে।

প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধ-সংগ্রহ ॥ ৫·০০

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার মশায় যদিও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের সঙ্গে সন্তরণ করেছিলেন, তবুও প্রবন্ধ-রচনার হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রচিত তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধাবলি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

ঝড় ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ ৮·০০

অবিবাহিত, ব্যবসায় খাতিরে বনবাসী সীতাংশু ; তার বন্ধু চা-বাগানের ডাক্তার রণধীর ; রণধীরের শিক্ষিতা যুবতী স্ত্রী ব্রততী ; এবং রূপসী স্বামী-পরিত্যাগিণী সুখী—এই চারজন মানুষের জীবনে ঝড় উঠল একদিন অকস্মাৎ। অতঃপর সেই প্রবল ঝড় চার নরনারীর জীবনকে কোন্ অচিন্ত্যপূর্ব জটিলতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন্ অকল্পনীয় পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তার এক উপভোগ্য কাহিনী এই সুবৃহৎ উপন্যাস।

সামান্য-অসামান্য ॥ সুশীল রায় ॥ ৫·০০

সামান্য দুটি রমণী—নর্তকী গোলাপসুন্দরী আর নটী বনবিহারিণী—জন্ম এবং জীবন যাদের মর্যাদাময় ছিল না, বরঞ্চ পাতিত্য এবং বহুবল্লভতার গ্লানিতে ছিল ঘৃণ্য—অসামান্যতা অর্জন করেছিল তারা নিজ কৃতিত্বে ; সেই অতি সামান্য অথচ অতিশয় অসামান্য দুটি নারীর নিরন্তর তীব্র সুরে বাঁধা মর্মদাহী জীবনসংগীত এই উপাখ্যান। দীপক রাগের মত এ কাহিনীর দাহ এর নায়িকা-যুগলের সঙ্গে সঙ্গে একই সাথে পাঠকগণকেও দগ্ধ করে।

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান ॥ মতি নন্দী ॥ ৪·০০

কলকাতা শহরের এক নোংরা অন্ধ গলিতে এক অনুজ্জ্বল সন্ধ্যায় সিনেমা-জগতের জনপ্রিয়তম নায়কের হঠাৎ-আগমনকে উপলক্ষ করে এই শহরের নিম্নবিত্ত বাসিন্দাদের অন্ধকার অবক্ষয়ী জীবনের এক ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছেন তরুণ লেখক তাঁর এ উপন্যাসে। এ কাহিনীটি বর্তমানকালের নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিকজীবনের চরম ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে হারতে হারতেও হার না মানার এক অনবদ্য আলেখ্য।

একদা কুয়াশায় ॥ বিমল কর ॥ ৬·০০

সচরাচর বাজার-চলতি যে-সমস্ত রহস্যকাহিনী আমাদের কালহরণের খোরাক, এ উপন্যাসটি তার থেকে পুরোপুরি ভিন্ন স্বাদের, অন্য ধাঁচের। তৎসত্ত্বেও এর কাহিনী গভীর মনস্তত্ত্বমূলক, অপরাধ ও রহস্য আচ্ছাদিত। অপরাধ-কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও তা যে নিখুঁত সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে, বিমল কর তাঁর এই নতুন অপরাধ-মনস্তত্ত্বমূলক রহস্য-উপন্যাসটিতে তা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছেন।

দর্শকের ভূমিকায় ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৫·০০

এ উপন্যাসের নায়ক চিরন্তনের লেখকসত্তা মহত্তর কোনও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের জন্য অহরহ ছটফট করতো ; কিন্তু সে কাতরতাই বুঝি তার সার—সৃষ্টি তার আর হয়ে ওঠে না। দর্শকের ভূমিকাই যেন তার বিধিনির্দিষ্ট—শিল্পীর নয়, স্রষ্টার নয়। বহু বিচিত্র চরিত্র এবং তাদের জীবনের সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার তরঙ্গভঙ্গের মাঝে তীব্র আন্দোলিত এক লেখকসত্তার অনুপম কাহিনী এ উপন্যাস।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৪০

বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

কুক্কুট

—শ্রীঅবনী সেন অঙ্কিত

LIFEBUOY
for health
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

পক্ষে এ মাস শুভসূচক হয়ে দেখা দিবে বিশেষ করে আয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে। ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ব্যবহার মোটামুটি মন্দ থাকবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার চাকুরী লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। কোন বন্ধুকে বিশ্বাস করে আর্থিক উন্নতি বিষয়ক কোনরূপ অর্থ প্রদান করা সমীচীন নয়। ৮ই থেকে ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে কোন-না-কোন বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। শত্রুরা শত্রুতা করতে চেষ্টা করলেও সফলকাম হবে না। পত্নীর স্বাস্থ্য মোটামুটি। গুপ্ত রোগ বাড়াবার সম্ভাবনা বেশী। কর্মপ্রার্থীদের নিশ্চিত চাকুরী প্রাপ্তির যোগ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকারী কন্ট্রাক্ট গ্রহণে [illegible] ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। বৃশ্চিকলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে আশ্বিন মাস মোটামুটি শুভই বলা চলে। কর্মস্থানে নানাবিধ উপায়ে গোলযোগের সৃষ্টি হলেও কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা নেই। ধর্মোপলক্ষে গৃহে ব্যয়ভার যোগ দৃষ্ট হয়।

ধনুঃ রাশি সংলগ্ন মঙ্গল থাকায় ও শনির দৃষ্টি রাশির তৃতীয়ে থাকায় স্বাস্থ্য ৪ঠা আশ্বিনের পর বড় বিশেষ শুভ যাবে না। লীভার বা উদর সংক্রান্ত রোগে কষ্টভোগের যোগ দৃষ্ট হয়। যানবাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। আর্থিক ব্যাপারে প্রায় ক্ষেত্রেই বিব্রত বোধ করতে পারেন। কর্মপ্রার্থীদের অনেকেরই নিশ্চিত যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে ৮ই থেকে ১৬ই আশ্বিনের মধ্যে। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ অনেকাংশে তিরোহিত হতে পারে। বিষয়সম্পত্তি-মূলক ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। ১৮ই থেকে ২২শে আশ্বিনের মধ্যে ভ্রমণযোগ দৃষ্ট হয়। কোন সৎ বন্ধুলাভের যোগ দৃষ্ট হয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না ৫ই থেকে ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে। শত্রুরা কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ উপায়ে অশান্তির সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সাহিত্যিক ও কন্ট্রাক্টরদের আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। ধনুলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে আর্থিক বিষয়ে এ মাস সবিশেষ শুভপ্রদ হবে না। যানবাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

মকরঃ চন্দ্রের উপর শনির দশম দৃষ্টি বর্তমান থাকায় শারীরিক অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ যাবে না। ধনস্থানে রাহু থাকায় আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য কল্পে। ভ্রাতৃস্থান শুভপ্রদ। সাংসারিক অশান্তি আর্থিক ব্যাপারে বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুরা প্রতিষ্ঠাদি বিষয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুতার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। কৃষ্ণকায় কোন বন্ধুকে বিশ্বাস করে নিজের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে গুপ্ত রহস্যাদি

বর্জন করা সমীচীন নয়। ৮ই ১২ই আশ্বিনের মধ্যে কোন-না-কোন সূত্রে আর্থিক বিষয়ের কিছুটা সমাধান হতে পারে। শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই নিন্দা প্রচারের চেষ্টা করবে। ১০ই থেকে ১২ই আশ্বিনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। ১০ই থেকে ২০শে আশ্বিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রমোশনের যোগ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায় ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হতে পারে। ৪ঠা থেকে ৮ই আশ্বিনের মধ্যে কন্ট্রাক্টারদের মধ্যে কেউ-না-কেউ বড় রকমের কন্ট্রাক্ট করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রের ঝঞ্ঝাট প্রায় ক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু বর্তমান থাকবে। মকর লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, ধন, বন্ধু, শত্রু ও কর্মস্থান শুভসূচক। কর্মক্ষেত্রে আলাপ ও আলোচনায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কর্মপ্রার্থীদের কর্ম লাভের আশা কম।

কুম্ভ : চন্দ্রযুক্ত রাহু ও সপ্তমে শুক্র-কেতু অবস্থান করায় শারীরিক অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল যাবে না। ১০ই থেকে ১৪ই আশ্বিনের মধ্যে উদর সংক্রান্ত এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় কষ্টভোগ যোগ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়ে ধনস্থানে রবি, বুধ ও বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় ৫ই আশ্বিনের পর ধনস্থান ক্রমোন্নত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ভ্রাতাদের ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই স্বার্থপর বলে মনে হবে। কর্মস্থানে কনিষ্ঠ ভ্রাতার আর্থিক বিষয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশীদার হিসেবে কাউকে নিয়োগ করা সমীচীন নয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ থাকবে না। কনিষ্ঠ পুত্রের চাকুরীর ক্ষেত্রে গোলযোগ দৃষ্ট হয়। সহকারী কর্মীর সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ দৃষ্ট হয় ৮ই থেকে ১২ই আশ্বিনের মধ্যে শত্রুরা প্রায় ক্ষেত্রেই বশীভূত হবে। ১০ই থেকে ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কারো-না-কারো চাকুরী লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ভাগ্যস্থানে শনির দৃষ্টি থাকায় ভাগ্যস্থান শুভসূচক নয়। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এ মাসে মন প্রায় ক্ষেত্রেই চঞ্চল হয়ে দেখা দিবে। আয়স্থানে মঙ্গল থাকায় জমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থভাগ্য যোগ কন্ট্রাক্টরদের দৃষ্ট হয়। কুম্ভলগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য ভ্রাতৃ, পত্নী ও কর্মস্থান সবিশেষ শুভসূচক নয়।

মীন : এ মাসে শরীরের দিকে যত্ন নেওয়া কর্তব্য। শ্লেষ্মা সংক্রান্ত রোগে কষ্টপাবার যোগ দৃষ্ট হয়। ৫ই থেকে ১০ই আশ্বিনের মধ্যে ব্যবসায়মূলক ব্যাপারে অর্থ ক্ষতির যোগ দৃষ্ট হয়। নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ পিছিয়ে যেতে পারে। ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ এ মাসে অনেকাংশে তিরোহিত হবে। কোন বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোন খর্ব কৃষ্ণকায় ব্যক্তির সহযোগিতা নেওয়া কর্তব্য নয়। পুত্র ও কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ থাকবে না। চিত্রতারকা, প্রকাশক ও ইঞ্জিনীয়ারদের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুরা যতই প্রবল হোক ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। মামলা মোকদ্দমার ফল আশানুরূপ হবে না। গৃহস্থাপন ও ভূমি ক্রয় ও বিক্রয়াদি ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। পত্নীর স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না। দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত পত্নীর স্বাস্থ্য ৬ই আশ্বিনের পর ধীরে ধীরে শুভ হয়ে দেখা দিতে পারে। পুরাতন সম্বন্ধ বা ভেঙ্গে যাওয়া সম্বন্ধ পুনরায় বিবাহের প্রস্তাবনা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে। যানবাহনাদিতে চলাচলের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। ৮ই থেকে ১২ই আশ্বিনের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে কারো-না-কারোর চাকুরী লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। মীন লগ্নের জাতক ও জাতিকাদের স্বাস্থ্য, অর্থ, পত্নী, ভাগ্য ও ব্যয়স্থান সবিশেষ শুভ যাবে না।

পত্রোত্তর ৬

● শ্রীঅনলকুমার ধর (আসাম), চেষ্টা করুন, চেষ্টা করুন চাকুরী হবে। ● শ্রীঅনিলচাঁদ মিত্র, (কালীঘাট রোড), এখন থেকে আগামী সাড়ে সাত বৎসর একটু সতর্ক হয়ে চলবেন। ● শ্রীরামসুন্দর চক্রবর্তী, (ধরণীধর মল্লিক লেন), তিন বৎসরের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীমতী স্নেহলতা বিশ্বাস, (হাজরা রোড, কলিকাতা), জন্মসাল লেখেন নি কেন? ● অমিয়কুমার ভট্টাচার্য, (রহড়া, ২৪-পরগণা), সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীযুক্ত রণেশচন্দ্র দত্ত, (পদ্মা রোড, [illegible]), বিবাহ সম্ভাবনা রয়েছে, সতর্ক হয়ে চলবেন। ●: অপরিচিতা (রায়পাড়া), পড়াশুনা হবে, চেষ্টা করুন। ● শ্রীঅর্চনা ব্যানার্জী (বড়বাজার), ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে চলুন কাজে সাফল্য ও সুখী হতে পারবেন। ● শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (আড়িয়াদহ নগর, ২৪ পরগণা) ভবিষ্যৎ জীবনের বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়, বর্তমান সময় আপনার পক্ষে শুভ নয়। ● [illegible] দাশ (দত্তপুলিয়া, নদীয়া), মেষরাশি, ধৈর্য ধরুন। ● শ্রী[illegible] (কাঁচড়াপাড়া, ২৪-পরগণা). আপনি ধৈর্য ধরে শ্রীদুর্গা এই নাম লাল কালিতে এক লক্ষ বার লিখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ● শ্রীশিবনাথ চ্যাটার্জী (চন্দননগর, হুগলী), শুধু নামের উপর নির্ভর করে রাশি বলা যায় না। ● শ্রীপ্রদ্যুৎকুমার সাহা (রাণাঘাট, নদীয়া), কুপন বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীকালীন (হাতিবাগান, রাজারহাট), দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● তপনকান্তি শিকদার (মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা), আপনি শ্বেত মুক্তা ৬ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● সুশীলকুমার দাশ (বাগআঁচড়া, নদীয়া), গোমেদ

৬-৭ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● গৌরীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশবন্ধু রোড, পশ্চিম), আপনি ইন্দ্রনীল ৫-৭ রতি সোনায় বাঁ হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● আশুতোষ ভট্টাচার্য (হাইলাকান্দি কাছাড়, আসাম), চন্দ্রকান্তমণি ১০-১২ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করতে পারেন। ● রাম মজুমদার (বৈদ্যবাটী), উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে, সম্ভব হলে ৬-৮ রতি গোমেদ সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করতে পারেন। ● শ্রীদীপককুমার দাশ, (আর কে চ্যাটার্জী রোড), আপনি ৭ রতি গোমেদ সোনায় অথবা রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে পড়াশুনা ও চাকুরীর ব্যাপারে অগ্রসর হউন। ● এ বসু (সিলি, কলিকাতা) সতর্ক হয়ে পড়াশুনা করবেন, এম-এ পড়তে পারেন। ● শ্রীচন্দ্রশেখরী (বীরভূম), মোটামুটি শুভই বলা চলে। শ্রীসমরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (কালীচরণ শেঠ লেন), তুলারাশি, আপনি শ্রীশ্রীদুর্গা এই নাম লাল কালিতে এক লক্ষবার লিখুন। ● প্রদীপকুমার ঘোষ, (বৈদ্যবাটী), ৫-৭ রতি গোমেদ সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● সুশান্ত বাগচী (সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা), দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর ও পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ● শ্রীনবগোপাল মুখোপাধ্যায়, (এডিসন রোড, বর্ধমান), এক বৎসরের মধ্যে আশা করতে পারেন, চেষ্টা করুন পড়াশুনা হবে। ● ভবানীসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশবন্ধু রোড, পশ্চিম, আলমবাজার). আপনার বাড়ী ও জমির সম্ভাবনা রয়েছে। ● বাবুল ঘোষ (কলিকাতা), ২৮ থেকে ৩২ মধ্যে প্রকৃত উন্নতির সময়। ● শিশিরকুমার সেন (মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড, কলিকাতা), উন্নতির ও কর্ম পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ● মালবিকা দে (বিজয়গড়, যাদবপুর), গোমেদ ৫-৭ রতি সোনায় বাঁ হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● দেবব্রত রায়, (মতিলাল রায় লেন), এখন থেকে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে আশা করতে পারেন। ● শ্রীপ্রিয়রঞ্জন ব্যানার্জী (ইস্টাং রোড আসানসোল), আপনার প্রশ্নের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● শ্রীসুনীল ব্যানার্জী (পলাসডাঙ্গা, বাঁকুড়া), দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীকপিলকুমার ভট্টাচার্য, (কাছাড়, আসাম), ইন্দ্রনীল ৫-৭ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ও চন্দ্রকান্ত মণি ১০-১২ রতি রূপোয় অনামিকায় ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (রশোড়া, মুর্শিদাবাদ), হলদে পোকরাজ ৬-৮ রতি সোনায় ডান হাতের তর্জনীতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীদেবীপ্রসাদ দস্তচৌধুরী (ডাঃ হাঃ রোড, বড়িষা), ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা করুন যথানীঘ্র আপনার চাকুরী হবে। ● আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (চন্দননগর হুগলী) ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিন তিনিই আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবেন। ● শ্রীসুনীলকুমার গোস্বামী, (গুপীনাথপুর, বর্ধমান), পরীক্ষার ফল বলা হয় না, দাম্পত্য জীবন মোটামুটি ভালই হবে। ● শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, (তানসেন রোড, দুর্গাপুর)---শ্বেত মুক্তা ৫-৭ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করতে পারেন। শ্রীঅঞ্জনকুমার ঘোষ, (রাধাবল্লভ মন্দির রোড, শিউড়ী), চেষ্টা করুন পড়াশুনা হবে। ● শ্রীআর্যকুমার বসু (শিউড়ী) রক্তপ্রবাল ১২ রতি সোনায় ডান হাতের অনামিকায় ও চন্দ্রকান্তমণি ১৫ রতি রূপোয় মধ্যমাতে ধারণে সব ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। ● শ্রীমতী মঞ্জু বোস, (শিউড়ী) সন্তান হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সম্ভব হলে রক্ত প্রবাল ১০-১২ রতি সোনায় বাঁ হাতের অনামিকায় ধারণ করতে পারেন। ● শ্রীপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় (হালদারপাড়া রোড), এখন থেকে দেড় বৎসরের মধ্যে হঠাৎ আপনার চাকুরী পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● দিলীপকুমার মণ্ডল (বাটানগর), ১৯৭১ সনের মধ্যে। ● সরিৎমোহন অধিকারী (বেলঘরিয়া, কলিকাতা) গোমেদ ৫-৭ রতি সোনায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে চাকুরীর চেষ্টা করুন, পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ● বিকাশচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা-১৭), বিশ্বাস করুন আর নাই করুন ধৈর্য ধরে লাল কালিতে শ্রীশ্রীদুর্গা এই নাম একলক্ষবার লিখুন ফল লাভ হবেই। সম্ভব হলে চন্দ্রকান্ত মণি ১০-১২ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করতে পারেন। ● তরুবালা (শ্যামনগর) ধৈর্য ধরুন অনতিবিলম্বেই আপনার বিবাহ হবে ও ভবিষ্যৎ জীবনে মোটামুটি ভালই হবে। ● শ্রীপরশুরাম শর্মা। (কলিকাতা) আপনার প্রশ্নের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● দিলীপকুমার সিংহরায় (যশোর রোড, কলিকাতা) আগামী বৎসর আশা করতে পারেন। ● দ্রৌপদী (দমদম পার্ক) ১লা ডিসেম্বর বা ১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার হয় ঠিক করে কুপন সহ লিখে পাঠাবেন। ● শীলা চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর, হুগলী) চেষ্টা করুন বিবাহের যোগ শুরু হয়ে গেছে। ● দীপিকা বসু (সুমিয়া রোড, কলিকাতা) বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● শ্রীমতী স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায় (কালীঘাট রোড) পরিচিতের মধ্যে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● বসুমতী (কলিকাতা-২৬) পিতামাতার মত মেনে নেওয়াটাই যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়। ● শ্রীঅশোককুমার বসু (মাধবপুর, ২৪ পরগণা) গোমেদ ৬-৮ রতি রূপোয় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● প্রণবেন্দ্রনাথ বসু (সুকিয়া রো, কলিকাতা) পরীক্ষার ফল বলা হয় না, ছকের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● সৌমেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা-৬) বর্তমান সময় আপনার পক্ষে শুভ নয় সতর্ক হয়ে কাজ করবেন। ● পবিত্রকুমার চ্যাটার্জী (নিউ টালিগঞ্জ, কলিকাতা) আর্থিক অবস্থা ও চাকুরী ক্ষেত্র সাধারণ পর্যায় বলা চলে। ● দোলা

চক্রবর্তী ও রবিন বিশ্বাস (কালীঘাট) একসঙ্গে দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার ফল বলা হয় না। ● মেঘনাথ সিংহ (বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ) চেষ্টা করুন চাকুরী হবে। ● সুভাষচন্দ্র রায়, (সুরী লেন, কলিকাতা), আপনি শ্রীশ্রীদুর্গা এই নাম লাল কালিতে একলক্ষবার লিখুন, তা হলেই দেখবেন সর্বদিকের অন্ধকার দূর হয়ে আলো দেখা দিয়েছে। ● শ্রীমেধা তিথি (ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা) শ্বেত জাতীয় ব্যবসা করুন, উন্নতি হবে। ● রীনা হালদার (কৈলাসচন্দ্র লেন, হাওড়া) অপনার জন্মসময় লেখাতে ভুল রয়েছে কুপন সহ ঠিক করে লিখে পাঠাবেন। ● প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বিলাসপুর, আর এস মধ্যপ্রদেশ)—আপনি ৫-৭ রতি গোমেদ সোনার ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করতে পারেন। ● অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, (বালি, হাওড়া) লেখক ও বক্তা দুইই আপনার পক্ষে হওয়া সম্ভব। ● কেপ কেনেডি (হাওড়া)—ধৈর্য ধরে চেষ্টা করুন, চাকুরী হবে। ● সুস্মিতা (দার্জিলিং) ভবিষ্যতের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ● শ্রীসুবীরকুমার দে (প্রকাশ কুটির, মালঞ্চ রোড)—আপনার উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতির যোগ রয়েছে। ● শ্রীশচীশ-কুমার সান্যাল (হরনাথ মিত্র লেন, নদীয়া)—৫-৭ রতি অপরাজিতা নীলা অঙ্গুলায় ডান হাতের মধ্যমাতে ধারণ করে দেখুন। ● গৌরী মিত্র (গাউথ সিঁথি রোড) অর্থভাগ্য আপনার রোজ-গার খুব শুভই হবে। ● শ্রীহরিবোল পাল (আইগ্রাম, বীরভূম) আপনার জীবনে ২৮ বৎসরের পর থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি দেখা দেবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীকমলেশ রায় (নামকুম, রাঁচী) চেষ্টা করুন নোতুন কর্মপ্রাপ্তি ও পদোন্নতি উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীমতী ইন্দুবালা পাল ও শ্রীসুশীলকুমার পাল (ভুম রোড, সোদপুর)—আপনারা উভয়ে ধৈর্য ধরে শ্রীশ্রীদুর্গা এই নাম লাল কালিতে একলক্ষ করে দুজনে মোট দু'লক্ষ নাম লিখুন দেখবেন আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কবিতার অবসর

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

জানি না ; এখন কেমন করে
কবিতার অবসর তুমি পাও

কিন্তু দ্যাখ, এখন পেঁজা তুলোর মতন আকাশ
খরস্রোতা নদী, পাহাড়ী ঝরণা এবং
শ্যামল-ঘন বন, এর কোনোটাই আমার
আর তত কাছে নয়, কালও ছিলো।

জানি না ; এখন কেমন করে
কবিতার অবসর তুমি পাও
অফুরন্ত সময় যেমন নদীর—

কিন্তু দ্যাখ, যমুনার জীবন-যৌবন
কালও যেমন ছিলো, আজ আর তেমন নেই।

জানি না ; এখন কেমন করে
কবিতার অবসর তুমি পাও

কিন্তু দ্যাখ, তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েও
আজ আমি কেমন নিস্তেজ (অনেক যে বয়েস হোলো)!
কিন্তু মনে পড়ে, তুমি একদিন বলেছিলে, 'ছিঃ
অমন দামাল হতে নেই!'

জানি না ; এখন কেমন করে
কবিতার অবসর তুমি পাও
অফুরন্ত সময় যেমন নদীর—

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

মেয়েটি রাস্তায় বাসের পথে দাঁড়িয়ে আছে।

ধানবাদের ঘটনার পরে নিত্য নন্দাদির বাড়ী যাওয়া ছিল তখন। মনে পড়ছে।

নন্দাদির বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়। এক পৈত্রিক বাড়ী বালিগঞ্জের পাড়ায় রেখে গেছেন বাবা। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে।

নন্দাদিরা দু'ভাইবোন। বড়দাদা নন্দাদির থেকে সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও গাম্ভীর্যে অনেক উর্ধ্বের লোক।

নন্দা সেনের মা-বাবার যথাকালে মৃত্যু হয়েছে। বাড়ীর বিভিন্ন অংশ ফ্ল্যাট করে দিয়ে কলিকাতার উচ্চ দামের বাড়ী ভাড়ার আমলে অর্থ আসে, ব্যাঙ্কের সুদ থেকেও টাকা আসে। নন্দা নিজের কর্ত্রী নিজে।

তবু প্রয়োজনানুসারে যা পাওয়া উচিত পায় না বলে ক্ষোভ জানায়। পরলোকগতা জননীর ছিল বিলাসিনী স্বভাব। নন্দা সেন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে স্বভাবটি।

পিতা ছিলেন পণ্ডিত। উচ্চপদের কর্মজীবন হলেও তিনি পুরাতত্ত্বের পুস্তকে ডুবে থাকতেন। স্বয়ং কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন।

কার্যব্যপদেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে হত মুরারি সেনের। অবস্থানও করতে হ'ত। এই জীবনে একদা বাংলা এবং উড়িষ্যার মন্দির তাঁকে আকৃষ্ট করে। তারপরেই সেটা খেয়াল হয়ে দাঁড়াল। প্রচুর অর্থব্যয় করে করে তথ্য সংগ্রহ, আলোকচিত্রের ব্যবস্থা তিনি আরম্ভ করলেন।

শ্রীমতী বাণী রায়

উদ্দেশ্য সাধ। বাংলা দেশের অখ্যাত মন্দিরে যে অপরূপ শিল্পকলা অনাদরে পরিলুণ্ঠিত, জ্ঞানীগুণিজন সকাশে তুলে ধরবার ব্রত নিলেন উনি। বই লিখতে বসলেন ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়।

শ্রীমতী সেন বিপদ গণনা করলেন। স্বামী টেবিলের কাছে কলম নিয়ে বসলেই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে যেত শ্রীমতীর। ওই সময়টুকু পতিসঙ্গ অভাবজনিত বিরহবিষাদে নয়। পণ্ডিত স্বামীকে অত ভালবাসবার মত মানসিক প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। তিনি শুধু স্বামীর ঔদাসীন্যকে প্রতিহত করার আশায় নানা রূপসজ্জা, অঙ্গসজ্জার চর্চা করে যেতেন।

ছোট সন্তান একমাত্র কন্যাকে মা নিজের অতি ঘনিষ্ঠ পরিবেশে মানুষ করেছিলেন। প্রাচুর্য দিয়ে জীবনের একটা দিকই পরিস্ফুট করে তুলে ধরেছিলেন তার নূতন দৃষ্টির প্রান্তভাগে।

ছেলে গেল বাবার আওতায়। মুরারি সেন পত্নীর স্বভাবের লঘুতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রথম থেকেই পুত্রের সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে নেন। সবাইকে সতর্ক করার হেতুই হোক কিম্বা নিজের তৃপ্তি হেতুই হোক, ছেলের এক অসাধারণ নাম রেখে দিলেন, 'গৈরিক।'

শ্রীমতী সেন আপত্তি জানালেন, 'রংয়ের নাম কেন? রংয়ের নামে মানুষের নাম হয় না কি?'

'কেন হবে না? রাখলেই হয়। 'সুনীল' নাম নেই না কি? তোমার ছেলের নাম 'গৈরিক' একটা নতুন পথ দেখানো হয়ে যাবে।'

হেসে উঠে একখানা মোটা বই খুললেন মুরারি। কথাটার বিষয়ে আর আলোচনায় উনি রাজী নন।

কিন্তু 'গৈরিক' নামধারীকে মানুষ করা শুরু হল গৈরিকের মত করেই।

আড়ম্বর, ফিকে জীবনে অভ্যস্ত হল গৈরিক। মুরারি স্ত্রীর আওতা থেকে যত্নে সরিয়ে নিয়ে এলেন পুত্রকে। পাশের ঘরে নিজের শয়নের ব্যবস্থা, পড়াশোনার ব্যবস্থা সমস্ত করলেন ছেলের। লেখাপড়ার ভার নিলেন নিজে।

গৈরিক হল রূপে মায়ের মত। দীর্ঘ, ছন্দোবদ্ধ দেহ, অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণে তাকে বাঙালী ঘরের ছেলে বলে ঠিক বোঝা শক্ত। নামানুযায়ী পিতা তার বসনে এনে দিলেন গৈরিক বর্ণ। বিছানার চাদর, জানলা-দরজার পর্দা পর্যন্ত উক্ত রঙে রঙীন হল। শাদা এবং গেরুয়া, দুই রং ভিন্ন গৈরিক অন্য রং পরল না জীবনে। যে ভাবে তাকে মানুষ করা হ'ল, সেই প্রভাব পড়তে বাধ্য তার অন্তর্জীবনে।

বাবা আরকেওলজির পুস্তক হাতে দিলেন। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের টেরা-কোটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। তমলুকের বর্গভীমার মন্দিরের বিশেষত্ব বর্ণনা করলেন। দেখালেন বিষ্ণুপুরের মন্দিরের ছবি।

কিন্তু, বিছানার পাশে ছেলের একদিন 'অগ্নিযুগের' নানা বই আবিষ্কার করে পিতা বুঝলেন, ছেলে ওঁর পথে বা মতে চলার নয়। পুত্রকে সর্বশিক্ষায় বিকশিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। কোনও বাঁধাধরা পথ ধরে তাকে চালানো যাবে না।

বিষণ্ণ মনে পিতা বই লিখতে বসলেন আবার টেবলে। পত্নী ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। ওই ধরণের বই-এর কোন প্রকাশক মেলে না। নিজে খরচ করে ছাপাতে হয়। নানা আর্টপ্লেটে শোভিত পুস্তক প্রকাশনার ব্যয় প্রচুর। যে অর্থ পরিবারের জন্য সঞ্চিত থাকবে, সে অর্থ কতকগুলো ভাঙাচোরা নোংরা মন্দিরের প্রচারে ব্যয় করা হচ্ছে কেন শ্রীমতী বোঝেন না।

এ হেন কালে মুরারি চোখ বুজলেন একদিন। দেশে বোন বাড়ীতে ভাড়া খাটাতে হবে। মোটা পেনসন বন্ধ হয়ে গেছে।

গৈরিক সেইবার এম-এ পাশ করেছে—প্রথম শ্রেণীর প্রথম। মুরারি প্রীত হয়েছেন, কিন্তু কোন পথে ছেলেকে দেওয়া যাবে ভাবছেন। খদ্দর ছাড়া পরে না সে, দুধ দই ঘি খায় না। যৌবনসুলভ কোন শখেও রুচি নেই। কি চায় সে, কেউ জানে না।

শ্রীমতী সেন স্বামীকে দোষ দেন, 'একটা মাত্র ছেলে, তাকেও অদ্ভুত তৈরী করলে? এখন ছেলে নিয়ে কি করা যাবে? পড়াশোনায় ভাল, অথচ আই-এ-এস্ দেবে না। চাকুরি করার দিকে মন নেই। বিলেত যেতেও চায় না। বিয়ের কথা শুনলে মহাবিরক্ত। বেশ করেছ, বাবা হয়ে 'গৈরিক' নাম রেখে একদম ওর মনটা গেরুয়াতে চুপিয়ে দিয়েছ। ধন্য তুমি।'

কিন্তু অনুযোগ-অভিযোগের হাত এড়িয়ে মুরারি সেন পরকালে পা দিলেন। পত্নী আরও চটে গেলেন।

'অবিবাহিতা মেয়ে, বেকার ছেলে আমার গলায় গেঁথে দিব্যি সরে যাওয়া হল বাবুর।'

পতিবিয়োগে দুঃখ থেকে আক্রোশ বেশী হ'ল তাঁর। মেয়ে নন্দাকে তিনি নিজের মত করে গঠন করেছেন। দেখতে সে মায়ের মত বা দাদার মত সুন্দর নয়। দাদা মায়ের চরিত্র না পেলেও রূপ পেয়েছিল। নন্দা মায়ের চরিত্র পেলেও রূপ পেল না। বাবার শ্যামাভ বর্ণ দিয়ে ঈশ্বর অবশ্য মায়ের মুখের কাটটা দয়া করে দিলেন। প্রসাধনে উৎফুল্ল হলে নন্দাকে যথেষ্ট শ্রী লাগে, কেউ বা সুন্দরী বলে থাকেন।

নন্দা বি-এ পাশ করে বাড়ী বসে মুরারির ভালবাটা সব সহযোগে রাখছিল, বিবাহের উদ্দেশে রূপের ময়ূর পাখা মেলে বিস্তার করে। বাবার অর্বাচীনতার জন্য তাদের পরিবার আশানুরূপ স্টাইলে থাকতে পারছে না। অর্থশালী ঘরে অথবা বড় চাকুরের ঘরে তাকে জুড়ে দিয়ে মা জীবনে কাম্যধন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করবেন। যা পাওয়া উচিত পাবে সে।

ইতিমধ্যে বিপরীত ঘটে গেল।

পিতৃবিয়োগে যেটুকু ছিল, তা-ও গেল। সে দেখল অভিজাত শ্রেণীতে উড়ডীন পক্ষ দুইটি ছেঁটেকেটে নেহাৎ মধ্যবিত্ত ঘরে নেমে এল তারা।

গৈরিক কাজকর্মে গেল না।

স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়া মিটে গেলে মা ছেলের ঘরে হানা দিল। মোটা-মোটা বই নিয়ে এলোমেলো বিছানায় আধশোয়া হয়ে সে রয়েছে। অন্যমনা—তবু পুস্তকে তন্ময়।

পাশ থেকে চেয়ে দেখলেন শ্রীমতী সেন। দীর্ঘ-আয়ত চোখ, খগরাজ নাসিকা, অতুলনীয় দীপ্ত রং।

মেয়েটা যদি ছেলের রূপ পেত। তাহলে হয়তো বিবাহের জন্য চেষ্টা করতে হত না মোটে। আপনা থেকে পক্ষিরাজ-আরূঢ় রাজকুমার এসে যেতেন দরজায়। আমার ভাগ্যে মেয়ে হল কালো।

মাতার প্রশ্নজালের উত্তরে গৈরিক একটা কথাই বলল, 'হিসাব করে দেখেছি বাড়ীভাড়া আর সুদের টাকায় তিনটি প্রাণীর ভালভাবে খাওয়া-পরা চলে যায়।'

মাতা চমৎকৃত, 'খাওয়া-পরা ছাড়া অনেক কিছুও তো আছে।'

'অবশ্য যদি তোমরা বিলাসিতা করতে চাও, সে কথা আলাদা।'

মা জ্বলে উঠলেন, 'বিলাসিতা?'

'নয় তো কি? দুটো চাকরের দরকার কি তিনটি প্রাণীর? আমার কাজ আমি করে নেব।'

'আশ্চর্য। রোজগার করে আয় না বাড়িয়ে বসে বসে খেয়ে খরচ কমাবার কথা কেউ ভাবে না কি?'

'কেন ভাববে না? সকলেই যদি প্রয়োজনের বেশী টাকা রোজগারের যুদ্ধে নামে, তবে বেকারসমস্যা ঘুচবে কি করে? অবস্থার চেয়ে বেশী জাঁক-জমকের চেষ্টায় সকলেই জর্জরিত।'

গৈরিক একখানা বই খুলল।

শ্রীমতী সেন আর থাকতে পারলেন না, 'বেকার সমস্যা তুমি বেকার বসে থাকলেই ঘুচবে না কি? তোমার লজ্জা করে না? কোথায় একটা বড় চাকুরি করবে, মা-বোনের দুঃখ দূর করবে, বিয়ে করে বংশরক্ষায় মন দেবে, তা দিনরাত্রি বইকাগজ নিয়ে বসে আছ!'

গৈরিক বইখানা নামিয়ে রাখল। মুক্তার প্রভায় উজ্জ্বল রং-এ ক্রোধ ক্ষণ-স্থায়ী প্রবাল আভা এনে দিল না। কিন্তু কণ্ঠের বিদ্রূপ বোঝা গেল।

'যদি তোমাদের খেতে-পরতে দিতে হ'ত অবশ্য চাকুরি আমি করতাম। কিন্তু সাহেব সেজে ওপরওলার মনো-রঞ্জন করতে গেলেই লজ্জা করত। নিজের বাড়ী নিজের আয়ের মধ্যে সাদাসিধে জীবন কাটাতে আমার লজ্জা নেই। আর, বংশরক্ষার কণ্ট্রাক্ট করে তো আমাকে পৃথিবীতে আনা হয়নি। আমার সে দায় নয়। মা-বোনের দুঃখ কিছুই তো দেখছি না আমি। মণে-মণে পাউডার মেখে বসে থাকলে দুঃখও ঢাকা থাকে। বোনের খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব অস্বীকার করছি না, কিন্তু তার রং-পাউডার যোগানো আমার কর্তব্যে পড়ে না।'

স্বল্পভাষী গৈরিকের মুখে কাটা-কাটা ধারালো কথায় মা কুণ্ঠিত হয়ে শান্ত হয়ে গেলেন।

আড়াল থেকে শুনে ক্ষেপে উঠল নন্দা।

'মণে-মণে পাউডার যদি মাখি, তার খরচও আমি যোগাড় করতে পারব।'

তখন প্রভাবশালী পিতৃবন্ধুরা সহৃদয় ছিলেন। ওঁদের ধরে সমাজ-সেবার মধ্যে একটা কাজ পেয়ে গেল নন্দা সেন।

মাতা প্রথমে হা-হুতাশ করলেন। কোথায় মেয়ে বড়ঘরে পড়বে, পাড়া কাঁপিয়ে, গাড়ী করে পিত্রালয়ে আসবে, তা নয় চলল ব্যাগ হাতে দশটা-পাঁচটায়। দেলবতো কবে যাবে যে নিত্য অফিসে কলম পিষতে হ'লে। একে পিতৃহীনা, বিয়ে করবে কে? ছেলেটাও মানুষ হল না যে দেখেশুনে ছোটবোনের একটা বিয়ে দেবে।

মা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে পত্র লিখলেন, ছবি পাঠালেন। একজন ঘটক নিযুক্ত করলেন।

সমস্ত মেয়ের সহযোগিতায়।

কিন্তু প্রার্থিত পাত্র ধরা দিল কই? এল যারা, তাদের মা-মেয়ের পছন্দ হল না। অবশ্য পছন্দের দোষ দেওয়া চলে না। মেয়ের নাক উঁচু হওয়ায় মা নিজে সাগ্রহ প্রশ্রয় দিয়েছেন এতদিন। এখন নাসিকা কর্তন করা ভিন্ন উপায় নেই। তা-ও লক্ষ্মণ জুটলে তো।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীমতী সেনের স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী মনে সত্য উদয় হল। নন্দার বিয়ে না হওয়াতে ভালই হয়েছে। হাতে রইল নন্দা। স্বামী নেই, ছেলে একদম অমানুষ, তাঁর ভবিষ্যৎ কী? বারবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর নেই। বিবাহিতা মেয়ে বা জামাই যে দেখবে এমন আশা দুরাশা।

অতএব থাক না নন্দা। তিনি তো চেষ্টা করেছেন মেয়ের বিবাহের, স্বামীর জীবিতকাল থেকে। না হলে কী করা যায়, বল?

অনেক আত্মপরায়ণ বৃদ্ধের মত শ্রীমতী সেন ধরে নিয়েছিলেন, তিনি চিরজীবী। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা গত হলেও তিনি থাকবেন অজর-অমর। সুতরাং ভবিষ্যতের বিষম চিন্তা করতে ছাড়তেন না তিনি। সংসার খরচের টাকা বাঁচিয়ে নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাবার অভ্যাস বেড়ে গেল। ছেলে পৃথিবীর অর্ধেক বস্তু মুখে তোলে না। চেয়েও দেখে না কি খাচ্ছে। কিন্তু মেয়ে ভোজনবিলাসী, ক্রমেই বেড়ে চলছে তার 'নোলা'। অতএব ভেবে-চিন্তে চালাতে হ'ত। সস্তায় বাজারকরা নিজে দেখে দেখে আরম্ভ করলেন মা। শেষ বাজারে চাকরের হাতে ধামা, থলে দিয়ে বাজারের সস্তা পটল-বেগুন কিনতেন। মরকুটে ঝিঙে, ঢ্যাঁড়শ, বিছনের সস্তা আলু ইত্যাদি আনতেন। মেয়ে বলতে পেত না কিছু, কারণ তরকারী, মাছ সবই সজ্জিত। কিন্তু এমন নিকৃষ্ট যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেও রসনা তৃপ্তি হয় না।

নন্দা আরও অতৃপ্ত খাদ্যরসিক হয়ে উঠল। এমনি ভাবে কতদিন চলত কে জানে? শ্রীমতী সেন লোক-দেখানো উপরি-উপরি মেয়ের বিবাহের চেষ্টা দেখালেও হয়ে পড়লেন নিশ্চেষ্ট। সকরুণ স্বরে নন্দাকে বোঝাতেন, 'মা, দিনরাত তোর চিন্তায় আমার আহার-নিদ্রা নেই। আমি গেলে তোকে দেখবে কে?'

পুত্র বিবাহে অস্বীকার করেছে, তায় বেকার। তাকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আছে, সেটুকুও থাকবে না আজকালকার আধুনিক বউ ঘরে এলে। চুপ করে ছেলেকে দোষ দিয়ে বসে রইলেন মা।

আত্মারাম স্বভাবে মেয়ে ভিন্ন নিকটজন কেউ ছিল না। যদি আত্মীয়-স্বজন আসত বেড়াতে, প্রতিদানে তিনি যেতেন না, বিনা প্রয়োজনে। তাই আত্মীয়স্বজন বিরল হয়ে গেল ক্রমশ। স্বামী থাকতে প্রয়োজনে যারা আসত, তারা আসা ছেড়ে দিল একে একে।

তারপর একদিন অসুস্থ হলেন শ্রীমতী সেন। তিনি বুঝতে পারেন নি এত শীঘ্র বিদায় নিতে হবে।

তখন নন্দা বাড়ী চালাতে বাধ্য হল। আহার ও অন্যান্য দিকে ব্যয় সংক্ষেপ করলেও মা ঝি-চাকর দুটিই রেখে দিয়েছিলেন। লোকে সেনবাড়ীর ঠাট কম দেখে অনুকম্পায় বিগলিত না হয়।

নন্দা পুরনো রাঁধবার লোকটিকে রেখে ঠিকে ঝি চালান। রাঁধুনী দুহাতে চুরি সুরু করল। ফলে নন্দার রসনা রইল পূর্বের মত অতৃপ্ত। নিজের বহু কাজ নিজেকে করে নিতে হ'ল। নন্দার আয়েসী-বিলাসী স্বভাবে ঘা লাগল। চিরকাল শুনে এসেছে ঐশ্বর্য চরম বস্তু জীবনে, পাবে সে বিবাহ দ্বারা একদিন। নিজের যোগ্যতার কথা ভেবে দেখেনি। ঐশ্বর্যময় যে ভাবী-শ্বশুরের ঐশ্বর্য

দেখতে চাইতে পারে বা উপযুক্ত যৌতুক প্রাপ্তির অভিলাষী হতে পারে, হেন বোধ নন্দার এল না। অপরূপ রূপ বর ছিল না। কেন সে কুবেরের গলায় মালা দিতে সমর্থ হবে না ভেবে কূল না পেয়ে অসন্তুষ্ট রইল সে।

অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট চিত্তে বিকাশের জীবনযাত্রার প্রাচুর্য ইন্দ্রধনুর ছটা বিস্তার করল। দশজনের সঙ্গে মিশে চলতে শেখেনি নন্দা। বাইরে কাজ করলেও বাড়ীতে ছিল নিতান্ত একা। দিনরাত্রি কি পাওয়া উচিত ছিল, চিন্তায় ডুবে থাকত। এই অস্বাভাবিক মনোবিকাশ যেন ভেসে এল কি---পাওয়া —উচিতের রূপ ধরে।

পাঞ্চালীকে কর্মস্থলে পেয়েছিল নন্দা। বয়সে ছোট হ'লেও পাঞ্চালীর সামাজিক ভদ্রতার জন্য নন্দার তুষার গলেছিল। একঘরে পাশাপাশি বসত, একসঙ্গে ছুটির পরে ট্রামে-বাসে বাড়ী ছুটত, কাজেই পাঞ্চালীকে অতিক্রম করা সাধ্যাতীত। পাঞ্চালীর স্বভাব-মাধুর্যে তাকে ভালও লাগত। বিশেষত নন্দার আত্মসর্বস্ব চরিত্রের নির্লজ্জ চাহিদা হাসিমুখে পাঞ্চালী মিটিয়ে দেবার প্রয়াস পেত।

একদিন। হঠাৎ রাস্তায় বা'র হয়ে দেখা গেল গোলমাল চলছে, মারামারি, বোমা ইত্যাদি, যা শহরের জীবনে হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাস-ট্রাম বন্ধ।

'বাড়ী যাওয়া চুকে উঠল,' পাঞ্চালী বলল।

'কি করা যায় এখন?' নন্দা চিন্তিত।

পথচারী লোকেরা বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন। এক্ষুণি ট্রাম-বাস চলবে।'

'কিন্তু এতক্ষণ থাকি কোথায়?'

ইতস্তত চেয়ে তারা একটা রেস্টু-রেন্ট কাছেই দেখল।

'যা ক্ষিধে পেয়েছে! ওখানে খেলে হত। কিন্তু সঙ্গে পয়সা বেশী নেই,' নন্দা বলে উঠল।

চল না, নন্দাদি, আমার কাছে বেশী আছে। একজোড়া চটি কিনব বলে সঙ্গে টাকা এনেছিলাম। তা আজ যা দেখছি, সম্ভব হবে না।' পাঞ্চালী বলল।

চা আর কত খাওয়া যাবে? ভাবল পাঞ্চালী। কিন্তু নন্দার খাওয়া দেখেনি' সে তখন বেশীদিন।

নন্দাদি খেতে ভালবাসে, জানে পাঞ্চালী। পিক্‌নিকে ইলিশমাছ এলে পরিবেশনের সময়, 'কোলের মাছ, কোলের মাছ', বলে উত্ত্যক্ত করে তোলে পরিবেশনকারীকে। মাংস পেলে খাওয়া খুলে যায় চারগুণ। মিষ্টান্নের থালা পেলে বেছে-বেছে বড় সাইজ তোলে নিজের পাতে। অন্যেরা খাবে না-খাবে ভ্রূক্ষেপ করে না। বস্তুত নিজেকে এবং নিজের প্রয়োজনকে নিয়ে এমন তন্ময়তা দেখা যায় না।

নন্দাদি দিলদরিয়া মেজাজে কাট্‌-লেট অর্ডার দিল। ফিশফ্রাই আর

'কাট্‌লেট্ প্লেটভর্তি একটার পর একটা খেতে লাগল। মোগলাই পরোটা নিল, সঙ্গে মাংস। 'ডেভিল্' পাওয়া যাবে কি না খবর নিল।

প্রাসাদ গগন পাঞ্চালী। সস্তার ভোজনালয় নয়, তাছাড়া বর্তমান মহার্ঘতায় খাদ্যের দামও প্রচুর। নন্দাদির নিজের সম্বল টাকা দেড়েক মাত্র হাত-ব্যাগে।

চায়ের খাওয়া বিয়েবাড়ীর খাওয়ার পরিগণিত করে তুলল নন্দাদি।

এত মাংসাদি খাওয়ার পরে আবার কেক চেয়ে নিল।

শূন্য ব্যাগ হাতে পাঞ্চালী নামল। প্লাটটা আটেক টাকা ছিল চটি বাবদ। একটি টাকা বাঁচাতে পেরেছে মাত্র।

রাস্তায় বা'র হয়ে দেখা গেল ট্রামবাস চলছে না। একটা রিক্সা চলছিল সম্মুখ দিয়ে। নন্দাদি বলে উঠল, "চল, ওটাই ধরি।'

'কিন্তু নন্দাদি, তোমার বাড়ী পর্যন্ত ভাড়া কুলোবে হয়তো। কিন্তু আমার বাড়ী আরও একমাইলের বেশী। এত খাওয়ার পরে হাঁটা চলবে না। বাবা, যা খেয়েছি আজ।'

নন্দা বেশী খেলেও স্বীকার করে না কখনও। বলল, 'বা, এতেই এই? পোলাউ-কালিয়া খেলে করবে কি?'

পাঞ্চালীর জীবনে এখনও চাপল্য ছিল, কৌতুক ছিল। বলে উঠল, 'তা কি করব বল? বিয়ে করে কালিয়া-পোলাউ খাওয়ালে কই? তখন দেখা যাবে।'

নন্দাদি এখনও বিবাহের কথা শুনতে ভালবাসে, জানে পাঞ্চালী। পরিহাসপ্রিয় তরুণমন তার বহু বয়োজ্যেষ্ঠা নন্দাকে নিয়ে পরিহাস করতে ভালবাসে। পাঞ্চালীর গোপন আমোদ।

নন্দা সহৃদয় হয়ে বলে উঠলেন, 'তাহলে আমার বাড়ীই চল। ওখানে খরচা দেব গাড়ীভাড়ার। গল্পও করা যাবে।'

তবু সহজ কাছের বাড়ী ডাকে না।

লোক এলেই বাড়াবাড়ি। রাঁধুনী বুড়ো, বেশী কাজ ওর দ্বারা চলে না। নিজেকে আপ্যায়নের চা করতে হয়। খাবার আনানো দায়। খরচপত্র তো আছেই।

সুতরাং লোকের বাড়ী খেয়ে বেড়ানো সহজ। অনেকবার পাঞ্চালীর বাড়ী গেলেও পাঞ্চালীকে বাড়ীতে ডাকেনি কখনও নন্দা।

আজ পাঞ্চালী খাইয়েছে। পাঞ্চালী অবশ্য অনেকদিন খাওয়ায়। নন্দা খেতে ভালবাসে বলে ভোজের আসরে ভালটা বেছে বেছে দেয় নন্দাকে। কিন্তু আজ যেখানে দু'জনের খরচে খাবার কথা, সেখানে একজনের ওপর খাওয়াটা হল। নন্দা সুখী।

উপায়ান্তর নেই, তাছাড়া পাঞ্চালীর সদা-উৎসুক মন চেয়েছিল নন্দার পরিবেশ দেখতে। একা-একা থাকে নন্দাদি। এক দাদা ছাড়া কেউ নেই। দাদার সম্পর্কে দারুণ বীতরাগ। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'কিম্ভূতকিমাকার।'

৩

ঠুনঠুন রিক্সার লণ্ঠনকান্ত লেনে থামল ভাড়া।

'কিম্ভূতকিমাকার' দেখার জন্য প্রস্তুত চক্ষে দরজা খুলে সন্ধ্যার মৃদু আলোকে পাঞ্চালীর সম্মুখে প্রতিভাত হলেন—গৈরিক।

এই নন্দাদির দাদা।

সাদা-সুশ্রী মেয়ে নন্দার এত রূপবান ভ্রাতা কেমন করে উদয় হল?

প্রদীপ্ত গাত্রবর্ণ, প্রদীপ্ত চোখ। একটু বাদামী চুলের একটি গোছা লুটিয়ে আছে প্রশস্ত ললাটে। দীর্ঘদেহের সর্বাঙ্গে লেখা আছে ঔদাসীন্য।

কোন্ পঞ্চম আকাশে মধুময় চন্দ্রের আলোয় ফুলবনে কোন্ প্রিয়তমাকে নিঃশেষ আত্মনিবেদনে মিলিত প্রজাপতি এমন মনসিজ গড়ে তুলেছিল? [illegible] মরণে, অথচ বসনে বিরাগ?

এ কি মদনভস্মকারী [illegible] শিব?

'পৌরুষরূপে জীবনে প্রথম [illegible] হয়ে গেল পাঞ্চালী। নন্দা বললু করে উঠল, 'এ পাঞ্চালী, আমাদের অফিসে কাজ করে। জানো দাদা, আজ আমরা সমস্ত খেয়ে উড়িয়েছি। গাড়ীভাড়া নেই।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে পাঞ্চালীকে দেখে নিয়ে শিবপ্রতিম বললেন, 'খাওয়াটা বোধ হয় তোমারি দিকে বেশী হয়েছে।'

চমৎকৃত পাঞ্চালী। নিলিপ্ত পর্যবেক্ষণ আছে তাহলে? এঁকে 'কিম্ভূতকিমাকার' বলার মানে?

নন্দা বিরক্ত হয়ে পাঞ্চালীকে নিয়ে সরে এল। চা তৈরি করল আবার। গৈরিক নিজের ঘরে বই হাতে মগ্ন।

নন্দার দাদার বিচিত্র 'গৈরিক' নাম শুনে এবং তিনি পরীক্ষায় শীর্ষে গেছেন জেনে পাঞ্চালী আগ্রহী আরও চিনতে, জানতে।

গৈরিকের ঘরের পাশ দিয়ে বাথরুম। ফ্লাট করে বাড়ী ভাগ দেওয়াতে স্থান সঙ্কীর্ণ হয়েছে। পাঞ্চালী যাতায়াতে তাই আসার পথে একটু উঁকি দিল। অমনি নন্দা ছুটে এল।

'ওটা দাদার ঘর, কেউও যায় না।'

ছোট তক্তপোশে সামান্য বিছানা একটা বালিশ। চেয়ারে বসে টেবিলের কাছে গৈরিক বই নিয়ে ব্যস্ত। চোখ তুলে তাকিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

'আপনি ইংরেজির ছাত্র? আমিও যেটুকু পড়েছি, আমার ছিল তাই।' পাঞ্চালীকে কে যেন কথা বলাল জোর করে।

শুনি একটু গলার স্বর। একটা কথামাত্রে শোনা হয়েছে।

'ভালো।' উত্তর এল।

'এস না, ভালি, দেখবে বই?' নন্দা হাত ধরে টেনে ঘরে আনল। বিচিত্র স্বভাব হলেও অপরিচিতাকে দাদা লাঞ্ছিত করবে না, জানা আছে।

'এই বইখানা কত খুঁজেছি।' হাতে [illegible] তুলল পাঞ্চালী টেনেসি উইলিয়ামসের [illegible] একখানা।

[ক্রমশ।

● শ্রীবিজন গুপ্ত, মাথাভাঙা, কুচবিহার থেকে প্রশ্ন করেছেন ২টি কুপন দিয়ে—

প্রশ্ন ১ : আমার ৮ বছরের ছোট ছেলের উপরের সারির সামনের ২টি দাঁত প্রায় ২ বছর আগে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় আর দাঁত বেরোচ্ছে না ----

উত্তর : অনেক সময়ে ক্যালসিয়মের অভাবে দাঁত উঠতে দেরি হয়। আপনি নিয়মিতভাবে ক্যালসিয়ম খেতে দিন এবং দুধ বেশি করে খাওয়ান।

প্রশ্ন ২ : আমার বড়ছেলের বয়স ১৪ বছর। গত দু বছর হতে বাঁদিকের নাকের ডগায় ফুলকপির মত আঁচিল বেরোচ্ছে।

উত্তর : চিঠিতে এর চিকিৎসা সম্ভব নয়। আপনি কুচবিহার হসপিটালে দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আঁচিলটি যদি আকারে বড় হয়ে থাকে, তাহলে অপারেশন করিয়ে নিন।

প্রশ্ন ৩: আমার বয়স ৪৩ বছর। ১৮ বছর বয়স হতে ২।৩ বছর অন্তর 'অর্কাইটিস' আক্রান্ত হয়ে থাকি। মাঝে ৮ বছর সুস্থ ছিলাম। গত জানুয়ারী মাসে শেষবার অর্কাইটিসে আক্রান্ত হবার মাস দুই পর হতে ঝুলে পড়েছে। অপারেশন ছাড়া একরম এ শিরা সারাবার অন্য কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা ওষুধ খাবার, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর : অণ্ডকোষের মধ্যে যদি জল জমে থাকে, তাহলে অপারেশন ছাড়া কোন উপায় নেই। জল যদি না জমে থাকে, তাহলে 'নন-স্পেসিফিক প্রোটিন ইনজেকশন নিলে কমতে পারে।

● শ্রী এন রায় (নরেশ রায়), আমগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে জানতে চান----

প্রশ্ন : চার বৎসর পূর্বে হ্যাজাকের আগুনে পুড়ে গিয়েছিলাম। সুস্থ হয়েছি, কিন্তু ঘায়ের দাগ শরীরে এখন আছে।

উত্তর : আপনি কলকাতার এস্ এস্ কে এম হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টে দেখান।

● শ্রীপার্থ সেন, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯—

কয়েকটি প্রশ্নে ব্যক্তিগতভাবে জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভব হল না বলে জানাচ্ছি, স্বাস্থ্য ভাল করতে হলে নিয়মিতভাবে পেটভরে খাওয়া এবং বিশ্রামের প্রয়োজন। এছাড়া কৃমির জন্য

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

এ্যান্টিপার বা 'হেলমেসিড' অথবা 'এ্যাডিপিন' ব্যবহারকরতে পারেন। কৃমির উপদ্রব নষ্ট হলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

● শ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তী, হরিণাভ, ২৪পরগণা—

পোস্টকার্ডে জানতে চেয়েছেন কুড়ি বছরের পুরনো হাঁপানি রোগ সারে কি না?

এর উত্তরে বলব, এত পুরনো হাঁপানি রোগ সারাবার চিকিৎসা আমার জানা নেই। যাতে হাঁপানির উদ্রেক না হয়, সাবধানে থাকতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে জানতে চেয়েছেন, চোখের কোণে উপরে ও নীচে সাদা সাদা স্পট পড়ছে। কি করলে এই দাগ মিলিয়ে যাবে?

উত্তর : মাখনে মিলোবে বলে মনে হয় না। চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খেয়ে বা পরিহার করে, কিছুদিন দেখুন।

● শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্টুপুর, জামসেদপুর-১—

দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন, তার সঙ্গে ঠিকানাযুক্ত খাম দিয়ে ব্যক্তিগত চিঠি প্রত্যাশা করেছেন। তাঁকে ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীশিবনাথ চ্যাটার্জী, চন্দননগর, হুগলী—

২টি কুপন সহ চারটি প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্নগুলি ছাপতে নিষেধ করেছেন, তাই কেবল উত্তর দিচ্ছি—

আপনি নিয়মিতভাবে দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দুচামচ করে লাইসিনেক্স (ঈগল ল্যাবরেটরীজ) খাবেন, তিনমাস। দেখবেন উপসর্গগুলি কমে গেছে।

● শ্রীমতী দেবযানী রায়, কলি-২৫

প্রশ্ন : আমার বয়স ১৯। বেশ লম্বা, কিন্তু ভীষণ রোগা—আমার কোন অসুখ নেই।

উত্তর : এর জন্যে চিন্তার কি আছে? আপনি নিয়মিতভাবে চা চামচের ২চামচ করে ফেরাডল (পার্ক-ডেভিস) দুবার খাবেন। তারপর ওজন নিয়ে দেখবেন বেড়েছেন কি না।

● শ্রীএস কে সেন, ত্রিপুরা—

লিখেছেন, যেন তাঁর চিঠিটি যত্ন করে পড়ে উত্তর দিই। প্রথমেই বলি, প্রত্যেকটি চিঠি যত্নসহকারে পড়ে তবে উত্তর দিই। আপনার চিঠি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে পড়েছি। আপনি অভ্যাস কমিয়ে এনে সপ্তাহে একবার করুন এবং তার জন্য কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, দেখবেন উপসর্গগুলি চলে গেছে।

● শ্রীভদ্রেশ্বর আদক, বৈদ্যবাটি—

ব্যক্তিগত চিঠিতে কিছু প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন এবং তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীমতী সুপ্রিয়া বাগচী, সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলি-৪—

২টি প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন দুটি ইচ্ছে করে ছাপলাম না কারণ যার বিষয়ে প্রশ্ন, সে লজ্জায় পড়তে পারে। প্রতিকারার্থে তাকে 'লিভার এক্সট্র্যাক্ট' ইনজেকশন নিতে পরামর্শ দিই।

●শ্রীশক্তিনাথ বসু, তারকগুহায়বার রোড, বেহালা—

দুটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তিনি অজীর্ণ রোগী, দ্বিতীয় প্রশ্নে লিখেছেন স্নায়ুদৌর্বল্যের বিষয়।

সমস্যার সমাধান করতে হলে, নিয়মিতভাবে পেটভরে খেয়ে বিশ্রাম এবং ব্যায়াম অভ্যাস করা দরকার। ওষুধে স্বাস্থ্য ভাল করে না, ভাল করতে করে।

●মূর অ্যাভেনু থেকে জনৈক অথবা ভদ্রমহিলা—

'অজানা পথ' ছদ্মনামে একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন।

প্রশ্নটি যৌনজ্ঞান বিষয়ক। নিজের শরীরের বিষয় হলেও আলোচনা করতাম, কিন্তু প্রশ্নটি নিছক জানবার অভিপ্রায় করেছেন। প্রশ্নটি সমস্যামূলক নয়, প্রত্যেকেই যথাসময়ে উত্তর নিজে থেকেই পেয়ে যান। তবুও আলোচনা করতাম যদি প্রশ্নকর্তা বা প্রশ্নকর্ত্রী নিজের নাম ঠিকানা দিতে সাহস করতেন।

●চৌধুরী বাগান, হাওড়া থেকে বি এস বাড়া—

জানাচ্ছেন, তাঁর ২৬।২৭ বছর বয়সেই মাথার চুল উঠে যাচ্ছে।

উত্তর : অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বেশ কিছুদিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নিলে চুলের পুষ্টি আবার ফিরে আসে।

●শ্রীশ্যামল সিংহ, লেক টাউন, পাতিপুকুর—ব্যক্তিগত পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

●শ্রীহরিময় পাল, আটগ্রাম, বীরভূম থেকে প্রশ্ন করছেন—

প্রশ্ন ১ : তিনবৎসর হইল বামগণ্ডে, কাল দাগ দেখা দেয়। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম কিছু নয়, এখন এই কাল দাগ আকারে অনেকটা বড় হয়েছে এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

প্রশ্ন ২ : হঠাৎ উঠতে গেলে, চোখে আঁধার লাগে ও মাথা ঘুরে ওঠে।

উত্তর : আপনি দেরি না করে কোন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করুন। এ ব্যাপারে দেরি করবেন না, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

●শ্রীরতন ব্যানার্জি, নটুয়াপাড়া লেন, কান্দী, মুর্শিদাবাদ—

জানতে চান তাঁর এক বন্ধুর (বয়স ১৬ বৎসর) চুল পেকে যাচ্ছে, কি করবেন।

উত্তর : এত অল্পবয়সে চুল হয়ত বংশগত কারণে পেকে যাচ্ছে। তবু ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স খেতে বা ইনজেকশন নিতে বলবেন।

●শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাকড়দহ, চৌধুরীপাড়া, হাওড়া—

হাঁপানী রোগের প্রতিকার জানতে চেয়েছেন। অ্যালোপ্যাথ প্রথায় হাঁপানী রোগের ভাল চিকিৎসার কথা আমার জানা নেই।

●কুলটি থেকে পাপিয়া শর্মা জনৈকা অবিবাহিতা মেয়ে—

একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। অধিকাংশই তাঁর জীবনের কথা। সারাংশে জানিয়েছেন তাঁর শ্বেতস্রাব (লিকুইরিয়া) হয়।

উত্তর : আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ফেরোচিলেট সিরাপ (এ্যালবার্ট ডেভিড) দুমাস

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম- ....

ঠিকানা- ....

....

মাসিক বসুমতী

খাবেন, এছাড়া একদিন অন্তর এক সাস করে লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন নেবেন দশটি। তারপর জানাবেন কেমন থাকেন।

শ্রীতারাপদ মাকুড়, মেদিনীপুর—

আপনি অত উতলা হয়ে পড়েছেন কেন? রোগা কি আর কেউ হয় না? মনটাকে শক্ত করুন, তা না হলে কোন চিকিৎসাই সফল হবে না। এছাড়া দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে অ্যামাইনোভাইব (স্ট্যাডমেড) দুমাস ধরে খাবেন। খাবার পর দুপুরে ঘুমোবেন।

শ্রীমতী ইলোরা দত্ত, বনমালী শঙ্কর রোড, বেহালা—

লিখেছেন, 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার নতুন আরোগ্য বিভাগটি দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তারপর তিনি দুটি প্রশ্ন করেছেন—প্রশ্ন ১: আমার বাঁ চোখের নীচে নাকের পাশে কিছুটা জায়গা বছর দুয়েক ধরেই কালো হয়ে আছে—অনেকটা ছাতা পড়ার মত।

উত্তর: এক ধরনের তিল। প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া পুরোপুরি যাবে বলে মনে হয় না। যদি চুলকোয়, তাহলে কোন ক্যামবিসান মলম ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছাপলাম না, শুধু উত্তরে বলছি বৃটিশ মেডিকেল জার্নালেও অনুরূপ একটি সমস্যার কথা উল্লেখ আছে এবং প্রতিকার হিসাবে মালিশ করতে উপদেশ দিয়েছেন। দুবেলা ভিটামিন এ-ডি (স্যানিজ ল্যাবোরেটরী) তেল দিয়ে জায়গা দুটিতে মালিশ করলে ফল পেতে পারেন।

শ্রীসমীর বোস, কর্ণেল বিশ্বাস রোড, কলি-১৯—

এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা লিখেছেন। ব্যক্তিগত উত্তর চেয়েছেন, দিতে না পারার জন্য দুঃখিত। সমস্যার উত্তরে জানাই যে চিকিৎসা তিনি করিয়েছিলেন, তা অসম্পূর্ণ। সেইজন্যে আবার উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আবার গোড়া থেকে পুরো চিকিৎসা করালেই উপসর্গ দূর হয়ে যাবে।

শ্রী এ এন ঘোষ, মাচালতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলী—

দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছেন ইংরাজীতে। সম্পাদক মশায় ইংরাজী পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই বাংলাতেই উত্তর দিচ্ছি। চিঠিতে শ্রীঘোষ যে সব উপসর্গের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সাধারণত স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্য ঘটে। নিয়মিত ভিটামিন বি-১২ খেলে বা ইনজেকশন নিলে অনুরূপ উপসর্গগুলি দূর হয়ে যায়।

এস এ এন, সুজুটিপাড়া, বীরভূম—

দুটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। প্রকৃত নাম ঠিকানা দিয়েছেন, কিন্তু ছাপতে নিষেধ করেছেন বলে দিলাম না। প্রশ্নগুলিও দিতে চান না, তাই শুধু উত্তরেই জানাই প্রথম যে প্রশ্নটিতে আপনার ধারণা বলেছেন, তা ঠিক নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, যৌনকেশ পরিষ্কার করে বেটনোভেট্ সি মলম (গ্লাক্সো) দিনে দুবার করে লাগাবেন, দেখবেন, কমে গেছে।

শ্রীবরুণকুমার ব্যানার্জী, গৌহাটি, আসাম থেকে জানতে চান—

প্রশ্ন ১: আমি কোনদিন চেষ্টা করিয়াও পায়খানা চাপিয়া রাখিতে পারি না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই পায়খানা ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারি না—

উত্তর: অনেকটা অভ্যাসের জন্য হয়, তবে দিনে তিনটে করে (সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি) ভায়াকুইন বড়ি খাবেন।

প্রশ্ন ১: আমার পুরুষাঙ্গ খুব ছোট।

উত্তর: এর জন্য অযথা চিন্তা করবার কিছুই নেই।

শ্রীমনোজকুমার বড়ুয়া, কুমারগ্রাম দুয়ার, জলপাইগুড়ি—

একটি আবেগময়ী চিঠি দিয়েছেন। সংক্ষিপ্তসার হল, তাঁর সহজে কিছু মনে থাকে না। তাছাড়া দাঁতের কষ্ট পাচ্ছেন, এবং ছুলির মত গায়ে হয়েছে।

উত্তরে জানাই স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ করার জন্য অভ্যাস করতে হয়। বার বার মনে রাখার চেষ্টা করতে করতে মনে থাকার অভ্যাস হয়। দাঁতের কষ্টের জন্য চিকিৎসক দেখিয়ে দিন। দাঁত নিয়ে অবহেলা করবেন না। ছুলির বিষয়েও তাই বলি।

শ্রীমতী মীরা সরকার, বিধান সরণী, কলি-৪

লিখেছেন—'আমি মাসিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠিকা। আপনার আরোগ্য বিভাগের আকর্ষণই আমার সবচেয়ে বেশী।

তিনি দুটি প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন দুটিতে মেদ কি করে কমবে জানতে চেয়েছেন। চিকিৎসার চেয়ে নিয়মিত ব্যায়ামে মেদ শরীর থেকে স্থায়িভাবে তাড়াতাড়ি কমে। দ্বিতীয় প্রশ্নে যা জানতে চেয়েছেন, তাও ব্যায়ামে কমবে। ব্যায়মটি নিম্নরূপ—

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে মাটিতে বা শক্ত বিছানায় চিৎ হয়ে শোবেন। হাত দুটি মাথার ওপর তুলে দেবেন, তারপর হাত দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবেন। হাত কানের সামনে আসবে না এবং হাঁটু ভাঁজ হবে না। প্রতিদিন আধঘণ্টা করে করবেন। দুমাস পরে ফলাফল জানাবেন।

শ্রীডি বসু, রাঁচী—২ থেকে জানতে চান—

প্রশ্ন ১: (চল্লিশ বছর বয়স) এই বয়সে সম্ভোগ্ কতদিন অন্তর করা উচিত?

উত্তর: সপ্তাহে দুবারের বেশি উচিত নয়।

প্রশ্ন ২: কোন ঔষধ সেবন (স্টিম্যুলাণ্ট) দরকার কি না?

উত্তর: সাধারণত নয়। মাঝে মাঝে যে স্তিমিত ভাব আসে তা সাময়িক এবং আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, খানাকুল, হুগলী—

২টি কুপনসহ প্রশ্ন পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন ১: পরিবার পরিকল্পনায় ক্ষেত্রে পুরুষের অবলম্বনোপযোগী সবাপেক্ষা সাফল্যপ্রাপ্ত পদ্ধতি কোনটি?

উত্তর: ভাসেকটমি অপারেশন।

প্রশ্ন ২ : মুখে ব্রণ জাতের ছোট একটি উপসর্গ ভীষণ জন্মায়। কোনরূপ ব্যথা বা বেদনা হয় না। মাথার চুলও ভীষণভাবে উঠে যাচ্ছে।

উত্তর : আমার মনে হয় আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। নিয়মিত জোলাপ নিয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। তাছাড়া ভিটামিন বি-কমপ্লেকস্ খান অথবা ইনজেকশন নিন।

প্রশ্ন ৩ : আমার চার বছরের একটি একটি মেয়ের মাথায় ঘুঙ্কি ধরণের চর্মরোগে ভর্তি।

উত্তর : আপনি স্নানের পর কন্যার মাথায় প্রাগমাটার মলম ঘষে ঘষে লাগাবেন। তাছাড়া বহু ভিটামিন চূর্ণ নিয়মিতভাবে দুবেলা খেতে দেবেন।

প্রশ্ন ৪ : আমার ভাই-এর বয়স ২৪। খুব রোগা। এখনও মুখে ভাল করে দাড়ি গোঁফ গজায় না কেন?

উত্তর : পুরুষজনোচিত হরমোনের অভাবে।

প্রশ্ন ৪ (ক) প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজন হলে পুরুষ হরমোন ব্যবহারে ফল পেতে পারেন।

● শ্রীসুবিমল রায়, নলপুর, হাওড়া—

একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তিনি প্রায়ই আমাশয় রোগে ভোগেন, ফলে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সুবিমলবাবু, আমাশয় একেবারে সারিয়ে তোলা খুবই কষ্টকর, কারণ বার বার দূষিত জলের জন্য আমাশয় হয়। আপনি জল ফুটিয়ে খান। শাক এবং চর্বিজাতীয় খাদ্য বেশি খাবেন না; ছানা, মাছ (ছাল ফেলে দিয়ে) মুরগীর মাংস বেশি করে খাবেন। এ ছাড়া সকালে একটি, দুপুরে একটি, রাতে একটি ভায়াকুইন বড়ি দশদিন খাবেন।

ম চ, মালিগাঁও, গৌহাটি-১১—

পুরো নাম ঠিকানা জানাতে অনিচ্ছুক ... খামও দিয়েছেন ব্যক্তিগত চিঠির জন্য, কিন্তু কি পরামর্শ চান তা লেখেন নি। আমার মনে ... তিনি কি জানতে চেয়েছেন। যে রোগের বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন, তা অত্যন্ত জটিল এবং শুধু চিঠি লিখে তার সমাধান সম্ভব নয়। কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

● এ বি এন, পুরুলিয়া—

দুটি কুপনে প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন ১ : খাবার আগ্রহ আছে, খেতেও পারি, কিন্তু হজম হয় না।

উত্তর : খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে গু টাজাইম অথবা সায়ো-প্লেক্স এনজাইম খাবেন একমাস।

দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নেরই অংশ-বিশেষ।

প্রশ্ন ৩ : কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

উত্তর : নিয়মিত শাক খাবেন।

● শ্রীবিশ্বনাথ রায়, আলকশাহী, মুর্শিদাবাদ, আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীসুনীলবরণ মণ্ডল, চৌরাশী, ফরিদপুর, পূর্ব-পাকিস্তান—

প্রশ্ন : আমার মাতার বয়স ৩৪।৩৫ বৎসর। তাঁহার এক বৎসর যাবৎ পেটে বেদনা হইয়াছে—

উত্তর : পেটের ব্যথা এত কারণে হয়, যে রোগী বা রোগিণী পরীক্ষা না করে, মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি আপনার মাকে কোন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা করান।

● শ্রীএন সি ভট্টাচার্য, সন্তক, শিব-সাগর, আসাম—

আপনার চিঠি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস, জামালপুর, মুঙ্গের—

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীশুভ্রজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ-টাউন, কুচবিহার—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়েছি। কোন ভয় নেই। দুবেলা খাবার পর পাকুমোজম (প্লেন) চা চামচের দু চামচ করে একমাস খাবেন।

● শ্রীমতী মৌসুমী মুখার্জী, বিলাসী টাউন, দেওঘর—

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ১৯ বছর। চোখের দুই পাতার কালো দাগ পড়েছে—

উত্তর : আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে অ্যামাইনোজাইম খাবেন, আর যাতে রাতে সুনিদ্রা হয়, তার ব্যবস্থা করবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার ছোট বোনের বয়স ১৫। ও দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে—খাওয়া কম করেও কোন লাভ হচ্ছে না।

উত্তর : খাওয়া কম করে সাময়িক উপকার পেতে পারেন। স্থায়ী ফল পেতে হলে ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়ামের নিয়ম এই সংখ্যাতেই আলো-চিত হয়েছে।

● শ্রীঅধীরকুমার কর্মকার, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

প্রশ্ন ১ : আমার পায়খানা পরিষ্কার হয় না।

উত্তর : নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করতে হলে পেটভরে খেতে হয় এবং একটু বেশি করে শাক খেতে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা লিখেছেন, ও কোন রোগ নয়। স্বাভাবিক এবং প্রত্যেক পুরুষেরই হয়।

● শ্রীসনৎকুমার পাল, ওল্ড জুর রোড, সোদপুর।

প্রশ্ন : আমার নাক হইতে সর্বদা চাপ চাপ সর্দি বাহির হয়। মাঝে মাঝে নাকের মধ্যে জমিয়া থাকে

উত্তর : আমার মনে হয় অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে। অ্যালার্জির চিকিৎসা হলে সেরে যাবে।

● শ্রীকাজল গুহ (ছদ্মনাম), এন এন হস্টেল, কুচবিহার।

প্রশ্ন : আমার স্তন দুটি মেয়েদের মত উঁচু।

উত্তর : ও নিয়ে ভাববেন না। ছেলেদের একটি বয়সে ও রকম হতে পারে, আবার আপনা থেকেই কমে যায়।

রায়বাহাদুর অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেতুবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ]

সভ্যতার এই ব্যাপক প্রগতির দিনে জাতীয় জীবনে এক একটি সেতুর গুরুত্ব এবং মূল্য যে কতখানি সে সম্বন্ধে আজ নতুন করে বলার কিছু নেই। সারা ভারত আজ অসংখ্য সেতুতে সুশোভিত এবং এই সেতুগুলির নির্মাণ যে দেশবাসীকে কতখানি লাভবান করে তুলেছে, তা দেশবাসী-মাত্রেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবেন। ভারতবর্ষের সেতু-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে কয়টি নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকার মত, বিশিষ্ট সেতুবিজ্ঞানবিশারদ রায়বাহাদুর শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই তালিকায় একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নাম।

১৮৯৮ সালে ৭ই মে তাঁর জন্মদিন। জন্মস্থান ইতিহাসখ্যাত জয়পুর শহর। মা স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা দেবী। বাবা স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন জয়পুর মহারাজা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। সারা জয়পুর জুড়ে ছিল তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার আসন। অমূল্যচন্দ্রের শিক্ষা শুরু হয় জয়পুরেই। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে প্রবেশ করেন গভর্নমেণ্ট কলেজ অফ্ আজমীর-এ। সেখান থেকে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে বি এস সি ডিগ্রী লাভ করেন 1918 সালে। এর পর রুরকী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী নিয়ে ১৯২১ সালে বিশাল কর্ম-জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন যুবক অমূল্যচন্দ্র।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি ইণ্ডিয়ান সার্ভিস অফ্ ইঞ্জিনীয়ার্স-এর অন্তর্ভুক্ত পি ডবলু ডি বিল্ডিংস এ্যাণ্ড রোড বিভাগে যোগদান করেন। উত্তরকালে ঐ বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন। সেই সময় উত্তর প্রদেশে যতগুলি বিমানঘাঁটি ও রাস্তা তৈরী হয়, তার সবগুলিই তাঁর সুপরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করে। তখনকার দিনে তুষার-তীর্থ কেদারবদ্রী-যাত্রীদের কাছে খরস্রোতা গঙ্গার বুকে লছমন ঝুলার সঙ্কীর্ণ

রায়বাহাদুর অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সেতুটি ছিল একটি অন্যতম বিভীষিকা। বর্তমানে তার স্থানে যে সুরম্য ও সুদৃঢ় সেতুটির উপর দিয়ে প্রত্যহ অগণিত মানুষ নির্ভয়ে যাতায়াত করে, সেটা তাঁরই পরিকল্পনাপ্রসূত। তাঁর এই বরণীয় কাজের একটি বিরাট কীর্তি কাশীর মালব্য সেতু। তাঁর কর্মদক্ষতার পুরস্কার হিসাবে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৯৩৯ সালে রায়বাহাদুর ও ১৯৪৩ সালে ও-বি-ই উপাধিতে সম্মানিত করেন।

১৯৪৬ সালে শ্রীমুখোপাধ্যায় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের প্রথম বিদেশ সফরের দলীয় নেতা হিসাবে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আলোচনাচক্রে যোগদান করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে তিনি পি ডবলু ডি-এর চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের পদ গ্রহণ করেন এবং ছয় বছর ঐ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯৫০ সালের ইণ্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর কাছে দেশের প্রয়োজন তখনও মেটে নি। তাই ১৯৫৫ সালে তাঁকে আবার যোগদান করতে হল রৌরকেল্লা ইস্পাত কারখানাতে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে। তাঁর সুদীর্ঘ কর্ম-জীবনে কোন ফাঁক ছিল না। যা-কিছু করেছেন তাঁকে দিয়েছে পূর্ণতা আর সেই সঙ্গে নিজেও হয়েছেন পূর্ণ অভিজ্ঞতায়, দক্ষতায় ও যশে।

তাঁর জীবনের আর একটি দিক তাঁর শিকারী জীবন। যখনি কোন হিংস্র জন্তুর উপদ্রবে সুস্থ সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে; তিনি ছুটে গেছেন আর্ত মানুষের ডাকে। এই মানব-দরদই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করে তাদের পরিপূর্ণ করে তুলতে।

শ্রীসুভাষ ঘোষাল

[ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পের এক অগ্রণীর ব্যক্তি]

এ দেশের বিজ্ঞাপনশিল্পের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ইতিহাসে যে ক'টি নাম অল্পকালের চুক্তিতে নয়, দীর্ঘকালের মেয়াদে সোনার অক্ষরে সগৌরবে লিপিবদ্ধ থাকবে—শ্রীসুভাষ ঘোষাল নামটি সেই তালিকার প্রথম পর্বেই সসম্মানে বিরাজিত। বাঙলাদেশের বিজ্ঞাপনশিল্প আজ যে যথেষ্ট উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির দীপ্ত আলোকে এবং অফুরন্ত ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে, তার মূলে শ্রীযুক্ত ঘোষালের দুশ্চর সাধনা এবং অনবদ্য অবদান সসম্মানে স্বীকৃতির দাবী রাখে।

আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মহানগরী কলকাতায় তাঁর জন্ম। ১৯২৪ সালের সমাপ্তির আর মাত্র ২টি দিন যখন বাকী সেই সময় শ্রীঘোষালের জন্ম। তাঁর বাবা চক্টর শরদিন্দুমোহন ঘোষাল ও শ্রীমতী নলিনী ঘোষাল তাঁর মাতৃদেবী।

১৯৪৪ সালে পাটনা থেকে স্নাতক হলেন শ্রীঘোষাল। ইতিহাস এবং অর্থনীতি ছিল তাঁর পঠিতব্য বিষয়। ছাত্রজীবনে ও পরবর্তীকালের কর্মজীবনের ন্যায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও মেধার পরিচয় দেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে বোম্বাইয়ে জে ওয়াল্টার, টমসন কোম্পানীতে যোগ দিলেন একজন শিক্ষানবীশ (এক্সিকিউটিভ) হিসাবে। কলকাতায় বদলী হয়ে এলেন ১৯৪৮ সালে। ন'বছর পর ১৯৫৭ সালে ওয়াল্টার টমসনের ম্যানেজারের আসনটি তাঁর অধিকারে এল। সেই বছরই তাঁর অসামান্য কর্মদক্ষতার এক অভাবনীয় স্বীকৃতি এল তাঁর জীবনে। ভাগ্যলক্ষ্মী ললাট লেপিত করে দিলেন জয়তিলকে, কৃপার পাত্র উজাড় করে দিলেন একরাশ নিটোল প্রগল্ভ হাসির স্নিগ্ধতার সঙ্গে। শ্রীঘোষালকে ঐ প্রতিষ্ঠান বরণ করে নিলেন তাঁদের অন্যতম পরিচালকরূপে। এই দুর্লভ স্বীকৃতি তাঁর পূর্বে আর কোন ভারতবাসী লাভ করেন নি। এ সময়ে তাঁর বয়েস মাত্র তেত্রিশ।

শ্রীসুভাষ ঘোষাল

ভারতের কোম্পানী আইন-সমূহের বিধি-নিয়ন্ত্রণাদির ফলে ভারতবর্ষে পুনর্গঠিত টমসন কোম্পানীর পরিচালকের আসনে আর তিনি অধিষ্ঠিত না থাকলেও প্রতিষ্ঠানের কর্মনির্বাহক পরিষদের অন্যতম সদস্যের আসনে সমহিমায় সমাসীন।

তাঁর কর্মজীবনের পরিধি এর মধ্যে অবশ্যই সীমাবদ্ধ নয়। আরও বৃহত্তর পরিসরে তাঁর কর্মদক্ষতা এবং সাংগঠনিক শক্তির ছায়া প্রসারিত হয়েছে। কলকাতার এ্যাডভার্টাইসিং ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ১৯৬৫-৬৭ সালে তিনিই সমাসীন ছিলেন এই সংস্থার সভাপতির আসনে। ১৯৬০ সালে প্রথম ভারতীয় বাণিজ্য মহাসম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটির তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। পাবলিক রিলেশানস সার্কেলের কর্মনির্বাহক পরিষদেরও তিনি ছিলেন সদস্য (১৯৬৭-৬৮)। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ এ্যাডভার্টাইসারস এবং এ্যাডভার্টাইসিং এজেন্সিস এ্যাসোসিয়েশান অফ ইণ্ডিয়ার সহযোগে কলকাতার এ্যাডভার্টাইসিং ক্লাব পরিচালিত বিজ্ঞাপন শিক্ষণ পাঠক্রমের তিনি ছিলেন যুগ্ম ক্রমপরিচালক (১৯৬৮)।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ এ্যাডভার্টাইসার্সের দ্বারা বিজ্ঞাপন-জগতে ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি সম্মানিত হলেন আই এস এ—খাটাউ স্বর্ণ পদকে। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ এশীয় বিজ্ঞাপন সম্মেলনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। কর্মব্যপদেশে ১৯৫১, ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে তিনি লণ্ডন ও নিউইয়র্ক পরিভ্রমণ করেন।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপনশিল্প এই কর্মবীরের সক্রিয় চিন্তাধারায় এবং সুযোগ্য নেতৃত্বে উত্তরোত্তর আরও উৎকর্ষের সম্মুখীন হবে, এ বিশ্বাস আমরা দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করি।

শ্রীতরুণকুমার বসু

[কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি]

বাংলা দেশের সুপ্রসিদ্ধ পরিবারগুলির মধ্যে মাহীনগরের বসুপরিবার অন্যতম। এই পরিবারের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সসম্মানে উল্লেখিত। এই বংশের ঐতিহ্য এবং ঔজ্জ্বল্য যাঁদের কর্মে, প্রতিভায় ও নৈপুণ্যে বিশেষভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছে সেই তালিকায় শ্রীতরুণকুমার বসু একটি মুখ্য নাম। শ্রীতরুণকুমার বসু—বাংলার আইন জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সংবিধান সংক্রান্ত আইনের একজন সর্বসম্মত বিশেষজ্ঞ কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতিদের অন্যতম।

স্বর্গত তুলসীচরণ বসুর পুত্র

শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির (কামারপুকুর)
—এস: অধিকারী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
—নারায়ণ চক্রবর্তী

[illegible]কুমার সেন

পেলিকান
—স্নেহাংশু দে

মাসিক বসুমতী
আশ্বিন / '৭৬

বক দেখেছেন?
—সূর্যনারায়ণ দাস

কর্মক্লান্তি
—অনিমেষ রায়
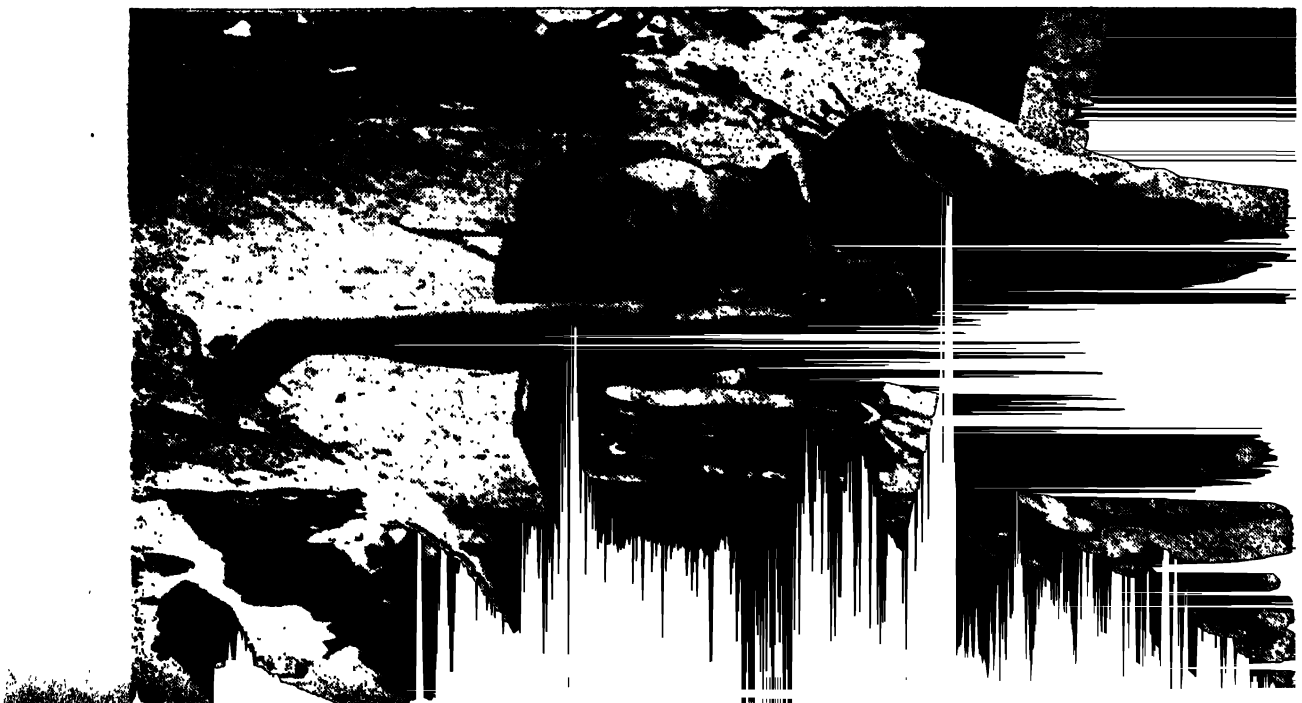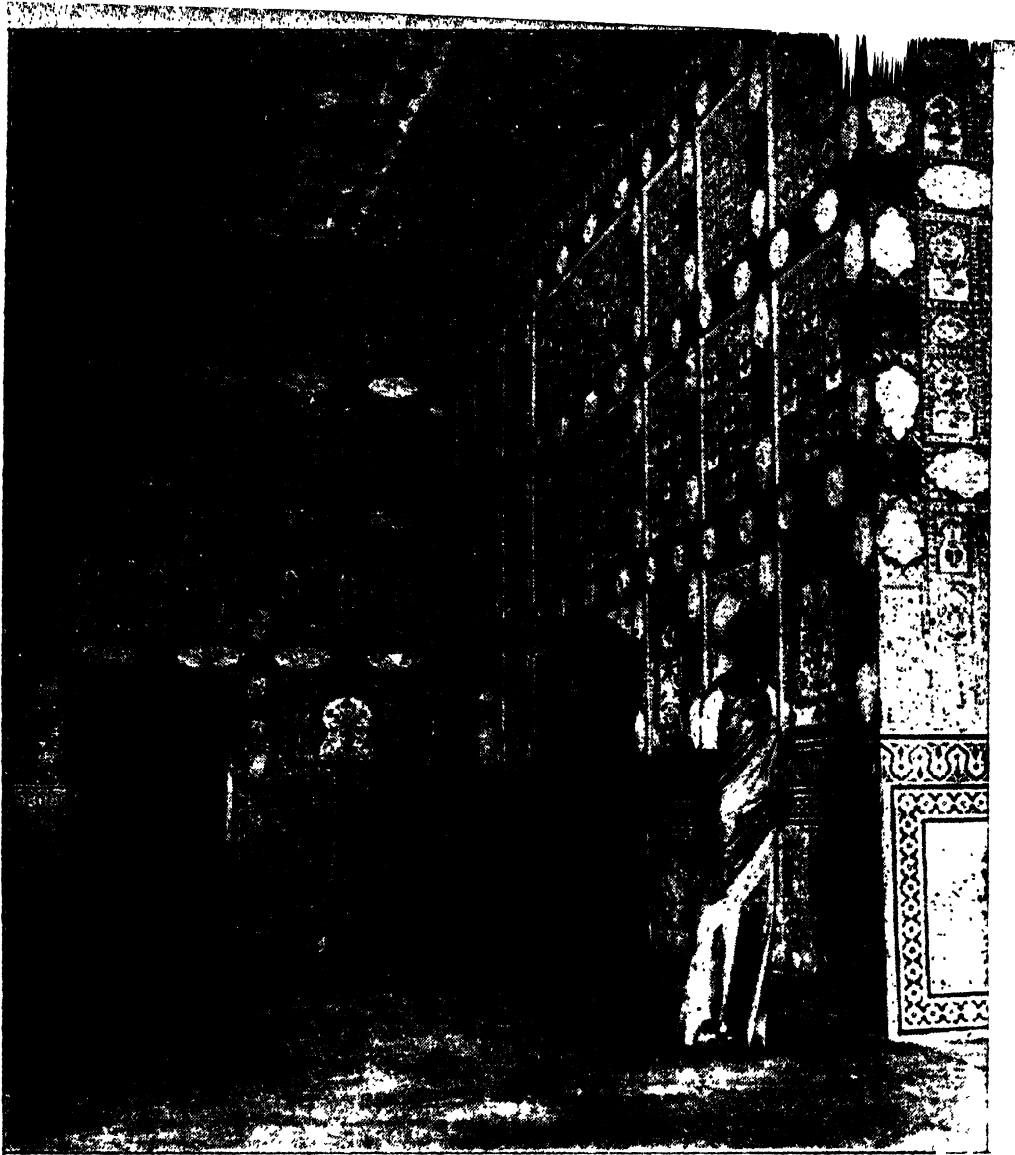
শিল্পসৃষ্টি
—চঞ্চল সরকার
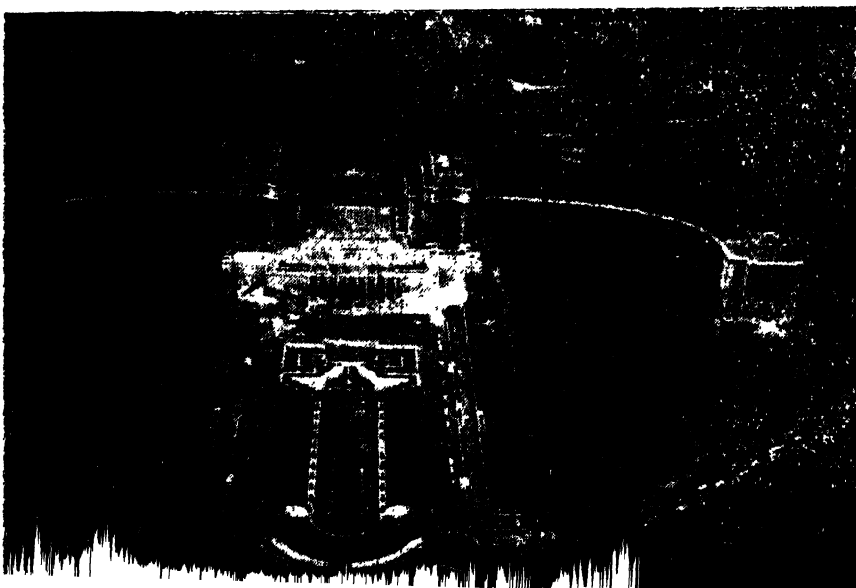
মাসিক বসুমতী আশ্বিন / '৭৬

ইফেল শীর্ষ থেকে প্যারী
—সুকৃতি মুখোপাধ্যায়

তরুণকুমারের জন্ম উলুবেড়িয়ায় মাতুলালয়ে ১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে। সত্যভামা ইনস্টিটিউশানের ছাত্র হিসাবে ১৯৩৯ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন। প্রাকস্নাতক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করলেন আশুতোষ কলেজের ছাত্র হিসাবে। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯৪৫ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। তাঁর সমগ্র ছাত্রজীবন তাঁর অতুলনীয় মেধার পরিচয় বহন করছে। আই-এতে তিনি অধিকার করেন দ্বিতীয় স্থান। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এই পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি আপন আয়ত্তে এনে ছাত্র হিসাবে তাঁর অসাধারণ মেধার প্রমাণ দেন।

শিক্ষকরূপে এ সময়ে তিনি লাভ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে এবং সহপাঠীরূপে যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মাসিক বসুমতী ও দৈনিক বসুমতীর রবিবাসরীয় সাময়িকী বিভাগের সম্পাদক প্রখ্যাত কথাশিল্পী প্রাণতোষ ঘটক, স্বর্গত সাহিত্যিক, সমালোচক, দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল, কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র গোবিন্দ দে, ইণ্ডোমেডারের কমিশনার কমলাল শ্রীকল্যাণ সেন প্রমুখকে।

১৯৪৬ সাল। উচ্চতর শিক্ষালাভার্থে বিলাতযাত্রা করলেন তরুণকুমার। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের ছাত্র হিসাবে অর্থনীতিতে এম-এস-সি উপাধি অর্জন করলেন ১৯৫০ সালে। লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সফলকাম হলেন ১৯৪৯ সালে। ভারতে ফিরে এলেন ১৯৫১ সালে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের কাছে শিক্ষানবিশী সুরু হ'ল। কিছুকাল শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গেও আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। স্বাধীনভাবে ব্যারিস্টারী সুরু করলেন ১৯৫৭ সাল থেকে। ১৯৬৮ সালে নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী শ্রীবসু শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রেও কম উৎসাহী নন। দেশের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি অংশ নিয়েছেন। 'পাঠভবন' বিদ্যালয়টির তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সচিব। উলুবেড়িয়া কলেজের কর্মনির্বাহক পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য।

১৯৫১ সালে তিনি স্বর্গত যাদবপ্রসাদ চালিহার কন্যা এবং আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রেখা দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী রেখা দেবী এম এস সি পরীক্ষায় থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। লেডী ব্রেবোর্ন, বেথুন, গোখলে প্রভৃতি মহাবিদ্যালয়সমূহে শ্রীমতী বসু বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনা করেছেন।

অধ্যয়নে এবং সঙ্গীতে বিচারপতি বসুর প্রবল অনুরাগ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

বিনয় ঘোষ

[প্রথিতযশা গবেষক]

যাঁদের দুরূহ সাধনা এবং অক্লান্ত গবেষণা বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতের এক নবদিগন্ত উন্মোচনে সহায়তা করে সামগ্রিকভাবে এক বিশেষ ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে সেই তালিকায় শ্রীবিনয় ঘোষ একটি অশেষ গৌরবে বিভূষিত নাম।

সুধীসমাজে এ সত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত যে তাঁর অমূল্য অবদান বাঙলার সংস্কৃতির আকাশকে এক অপরিসীম আলোকরশ্মিতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। তাঁর মূল্যবান গবেষণা ভাবীকালের গবেষক সম্প্রদায়কে ধ্রুবতারার মত পথ দেখাবে এ নিছক উচ্ছ্বাসগত উক্তি নয়, যুক্তি ও বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে সমুত্তীর্ণ এক গভীর সত্য।

আদিনিবাস যশোহর জেলায়। ১৯১৭ সালের ১৪ই জুন বিনয় ঘোষের জন্ম। কলকাতার পাঠশালায় তাঁর শিক্ষারম্ভ। স্কুলের শিক্ষা লাভ করেছেন ক্যাথিড্রাল মিশন স্কুলে।

শ্রীবিনয় ঘোষ

আশুতোষ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও নৃতত্ত্বে আয়ত্তে আনলেন স্নাতকোত্তর উপাধি।

ছাত্র-জীবন থেকে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম জীবনে ছোট গল্প এবং কবিতাই লিখতেন বেশীর ভাগ। 'কালপেঁচা' ছদ্মনামে বহু রচনা লিখেছেন। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসের মধ্যে যে গ্রন্থগুলি তিনি রচনা করেন তন্মধ্যে বোধন (গল্প সংকলন), ল্যাবরেটোরী (নাটক), শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ, নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শ্রীবৎসের নানা প্রসঙ্গ, ভারত ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত

আসর-বাসর ও কর্কেন্দানা

(একটি বিদেশী গ্রামীণ গল্প)

একদা একটি লোক ছিল যার বউ হঠাৎ মারা গেল তিনদিনের একটি ছোট্ট ছেলে রেখে।

ছেলেটি ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে লাগলো এবং সে যখন বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ একদিন তার বাপের মনে হল যে ছেলের যত্ন-আত্তির জন্য আর একজন মায়ের প্রয়োজন, কথাটা মনে হওয়ামাত্র বাপ আবার বিয়ে করে নতুন বউ ঘরে আনলো।

কিন্তু তাতে কোন সুফল দেখা গেল না, সৎমা ছেলেটিকে যত্ন-আত্তিতো করতই না, উপরন্তু তার সঙ্গে বিশেষ খারাপ ব্যবহার করতে সুরু করে দিল।

ছেলেটি যতদিন পারলো মুখ বুজে সৎমার অত্যাচার সহ্য করে গেল, শেষে নিতান্তই অপারগ হয়ে একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সময় ছেলেটি তিনটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে গেল, যাদের সে নিজের হাতে পেলেছিল বাচ্চাবেলা থেকে।

একটা ভেড়াচরানো কুকুর বা শিপডগ---যার নাম আসর, একটা ধূসর রং-এর যার নাম কর্কেন্দানা এবং একটা কালো রং-এর যার নাম বাসর।

ছেলেটা তার কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে চলে গেল আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে, মস্তবড় লাল পাহাড়ের ওপর দিয়ে নীচের সবুজ সুন্দর উপত্যকায় এসে মিশেছে যে পথ।

চলতে চলতে একদিন এক মেষ-পালকের সঙ্গে দেখা হ'ল ছেলেটির।

নমস্কার—মহাশয়, বিনীত কণ্ঠে বলে উঠলো ছেলেটি—আপনার জয় হোক, আমাকে আর আমার কুকুর-গুলোকে আপনার ভেড়া চরাবার কাজে লাগাবেন কি?

মেষপালকের সত্যিই লোকের দরকার ছিল, সুতরাং সে ওদের কাজে লাগিয়ে দিল।

এইভাবে তিনবছর কেটে গেল, ছেলেটির বয়স হল প্রায় চৌদ্দ বছর, ততদিনে সে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে অপরের তাঁবে কাজ করতে করতে।

কাজেই একদিন মনিবকে সে বললো—আমার মাইনেটা চুকিয়ে দিন, আমার আর আপনার কাছে কাজ করার ইচ্ছা নেই।

আমার টাকা নেই, উত্তর দিল ওর মনিব—কিন্তু তুমি খুব বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করেছ এ কয়বছর, সেজন্য তোমাকে একপোটা ভেড়া আর এই বাদাম দুটো দিচ্ছি, সব সময় বাদাম দুটোকে নিজের কাছে রেখ, কারণ এ দুটো অলৌকিক বাদাম, যদি কখনও কোন বিপদে পড় তাহলে বাদাম দুটোকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিও, বিপদ কেটে যাবে।

ঠিক আছে, এ তো বেশ ভাল মজুরীই পেলাম, ছেলেটি উত্তর দিল হাসিমুখে, তারপর নমস্কার করে বিদায় নিল মনিবের কাছ থেকে।

নিজের কুকুর তিনটে ও মনিবের দেওয়া একপোটা ভেড়া নিয়ে ছেলেটি চলে গেল পাহাড়ের অপর পাশে।

এর পর সুন্দর বসন্তকাল এসে পড়ল দেখতে দেখতে, সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেল মাঠঘাট, ছেলেটির ভেড়াগুলো পেট ভরে খেয়ে খেয়ে খুব মোটাসোটা হয়ে উঠলো।

বসন্ত কেটে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘন নরম পশমে ছেয়ে গেল তাদের শরীর। আর সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, ধারে কাছে নেকড়ে বাঘের উৎপাতও ছিল না।

কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই ছেলেটির ভেড়ার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো হাজারে। কুকুরগুলো না থাকলে হয়ত আরও লোকের প্রয়োজন হত, কিন্তু ওদের সাহায্যে ছেলেটি নিজেই দেখা-শুনো করতে লাগলো ভেড়াগুলোর।

এতদিনের মধ্যে নিজের বাপের কথা একবারও ভোলেনি ছেলেটি, এবার সে স্থির করলো যে, বাপের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

কিছু ভেড়া বেছে নিয়ে ও তিনটে ঘোড়ার পিঠে প্রচুর খাবারদাবার বোঝাই করে নিয়ে সে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হল।

আসর, বাসর আর কর্কেন্দানা শোন আমি কিছু ভেড়া নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, বাকিগুলো এখানেই থাকবে, তোমরা তাদের দেখাশুনো করবে, বুঝলে? সাবধানে থেকো আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো।

কুকুর তিনটে ঘেউ ঘেউ করে সম্মতি জানালো। বাপের বাড়ী পৌঁছে ছেলেটি দেখলো যে চারিদিক কেমন নিস্তব্ধ—যেন কেউ বহুদিন বাস করে না বাড়ীতে।

উঠানে কোন গাছপালা নেই, রান্নাঘরের চিমনী থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না।

সে বাড়ীতে ঢুকলো।

ওর সৎমা টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসেছিল, তার সামনে টেবিলের ওপর রাখা ছিল একটা খালি খাবার থালা।

বাঃ—বাঃ—বেশ বেশ, ওকে দেখেই বলে উঠলো ওর সৎমা—এত-দিনে নতুন খাবার জুটলো কপালে, তোমার বাপকে তো কোনকালেই খেয়ে ফেলেছি' জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একবার চেটে নিল সে।

আমার সঙ্গে তিনটে ঘোড়া আছে

সৎমার কথায় ভয় পেয়ে বলল উঠলো ছেলেটি—ঘোড়াগুলোর পিঠে খাবার দাবার বোঝাই করা আছে"।

আসলে ছেলেটার সৎমা ছিল ডাইনী আর তা বুঝতে পেরেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল ছেলেটি।

ওর কথা শুনে বাইরে চলে গেল ওর সৎমা, একটা ঘোড়া ও তার পিঠের সব খাবার-দাবার খেয়ে ফেললো মুহূর্তের মধ্যে, তারপর রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বীভৎসভাবে হেসে উঠলো—"তুমি ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছো।" বললো সে।

"আমি খুব আনন্দিত হলাম এ কথা শুনে" খুব নম্রভাবেই উত্তর দিল ছেলেটি—"দাঁড়াও সব গোছগাছ করে বাকি ঘোড়া দুটোকে একটু চরিয়ে আনি, অনেকক্ষণ ওদের পেটে দানাপানি পড়ে নি।"

এই ছুতো করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে কিছুদূর গিয়েই একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ছেলেটি।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ফিরে আসতে না দেখে ওর ডাইনী সৎমাও বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে এবং বাকি ঘোড়াটার পিঠে চেপে অনুসরণ করলো তাকে।

"যতই চালাকী করুক না কেন আমার হাত এড়াতে পারবে না বাছাধন" —নিজের মনেই বলে উঠলো ডাইনীটা।

ছেলেটা ওদিকে ঘোড়ায় চেপে ততক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে, কিন্তু শীগ্রই সে বুঝতে পারলো যে, ডাইনী সৎমাটাও ঘোড়ার পিঠে তার পেছু নিয়েছে, আর ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

এখন, সেই যাদুকরা বাদাম দুটো ওর পকেটেই ছিল, বিপদ বুঝে সে দুটো বার করে নিয়ে এইবার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দেখতে না-দেখতে দুটো তালগাছ দাঁড়িয়ে উঠলো সেখানে।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে একটা তালগাছে উঠে পড়লো ছেলেটি।

"নেমে এস," ঘোড়ার পিঠ থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো ডাইনীটা—"আজ হোক কাল হোক তোমাকে আমি খাবোই"।

"কক্ষণো না"—ছেলেটিও চেঁচিয়ে উঠলো।

"ঠিক আছে"—জবাব দিল ওর সৎমা, মুখ থেকে দাঁত বার করে নিয়ে যাদুবলে সেগুলোকে সে কুঠারে পরিণতিত করলো—"দাঁড়া এইবার এই কুঠার দিয়ে তোর গাছটা কেটে ফেলবো"।

ছেলেটি প্রমাদ গুণলো, আর বুঝি বাঁচার কোন আশাই নেই, হঠাৎ কুকুরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল তার, বুকভরে দম নিয়ে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো সে—"-আসর, বাসর এবং কর্কেদ্দানা শীঘ্র এস, আমার বড় বিপদ"।

দূরে বহুদূরে যেখানে কুকুর তিনটে তাদের মনিবের ভেড়ার খবরদারী করছিলো সেখানে গিয়ে পৌঁছলো সে ডাক, শোনামাত্র তারা দৌড়তে সুরু করে দিল। চলার পথে কাঁকরে তাদের থাবা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, নদীর স্রোতে তাদের গায়ের লোম ভিজে সপসপে হয়ে উঠলো কিন্তু তারা থামলো না, তিনজনে একসঙ্গে ছুটে চললো।

ততক্ষণে ডাইনীটা গাছ কাটতে সুরু করে দিয়েছে। গাছটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা ছুটে গিয়ে অন্য গাছটায় চড়ে বসলো।

"ভাল, ভাল একটু দেরী হবে বটে কিন্তু তুমি রেহাই পাবে না"—বলে উঠলো ডাইনী সৎমা, তার পর সে অন্য গাছটাও কাটতে সুরু করে দিল।

ছেলেটি আবার চেঁচিয়ে উঠলো—"আসর, বাসর, কর্কেদ্দানা তাড়াতাড়ি এস, না হলে তোমাদের প্রভুকে আর দেখতে পাবে না"।

কুকুরগুলো এসে পড়েছে ততক্ষণে, ছেলেটি আবার চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"আসর, বাসর, কর্কেদ্দানা শীঘ্র এই ডাইনীটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল, দেখো যেন কিছু পড়ে না থাকে"।

কুকুরগুলো অক্ষরশঃ মনিবের হুকুম তামিল করলো, তখন সাহস করে ছেলেটি নেমে এল গাছ থেকে।

মাটির ওপর পড়েছিল ছোট্ট এক-টুকরো হাড়, ডাইনীটার শরীরের সামান্য অবশিষ্ট অংশ।

"আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল," হাড়ের টুকরোটা বলে উঠলো—"সঙ্গে নিয়ে চল আমাকে"।

ছেলেটি রাজী হল না, কিন্তু হাড়ের টুকরো একেবারে নাছোড়বান্দা—"সঙ্গে নিয়ে চল আমাকে, নিয়ে চল লক্ষ্মীটি," ক্রমাগত মিনতি করতে লাগলে সেটা।

শেষে দয়াপরবশ হয়ে সেটাকে মাটি থেকে তুলে নিল ছেলেটি, রেখে দিল নিজের জামার বুকপকেটে।

কিন্তু ওটা তো ডাইনীর হাড়, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির শরীরে কেমন একটা যন্ত্রণা হতে লাগলো যেন।

ওর ওপর হাতের নীচে গর্ত হয়ে গিয়েছিল ওই হাড়টার ছোঁয়ায়।

তাড়াতাড়ি ওটাকে পকেট থেকে বার করে নিয়ে, একেবারে পুড়িয়ে ফেললো সে নিঃশেষে।

"যাক এতক্ষণে ডাইনীটা সত্যিই ধ্বংস হল"—স্বস্তির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলো ছেলেটা। আসর, বাসর ও কর্কেদ্দানা আনন্দে লাফালাফি সুরু করে দিল।

আর এই থেকেই সব মানুষের বগলে চাপু গর্ত দেখা দিল, যার ইংরাজী নাম হল আর্মপিট।

—অনুবাদিকা: রেবা দেবী

॥ খেলাধূলা ॥

বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে অরণীয় যাঁরা—বিল টুমে

অলিম্পিকে সোনার মেডেল পাওয়া কত না সম্মান। রাতারাতি জগজ্জোড়া খ্যাতি অর্জন ঐ মেডেল অর্জনের মধ্যে দিয়েই। কিন্তু রাতারাতি সম্মান অর্জনের পেছনে কত বিনিদ্র রজনী যে দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কত না সংযম অবলম্বন করতে হয়, কত না কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে ১৯৬৮ সালে মেক্সিকোতে যে অলিম্পিকের অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তাতে যে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে আমেরিকার বিশিষ্ট কোচ জর্জ হেনস তা পূর্বে থেকেই সন্দেহ করেছিলেন এবং সেইমত সতর্কও করে দিয়েছিলেন।

ডেকথালনে আমেরিকা গত ১৯৩২ সাল থেকে একনাগাড়ে প্রতিটি অলিম্পিক থেকেই স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে—পারে নি শুধু টোকিও অলিম্পিকের বেলায় '৬৪ সালে। জার্মানীর উইলি হলডর্ফ সেবার স্বর্ণপদকের অধিকারী হয়েছিলেন। তাই আমেরিকা তাদের পূর্বখ্যাতিকে যাতে পুনরুদ্ধার করতে পারে, তারই জন্য উপযুক্তভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছিল এবং আমেরিকার এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত ডেকথালন প্রতিযোগিতায় পর পর চারবারের বিজয়ী ট্রাক এবং ফিল্ড ইভেনটের বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বিল টুমেকেই পাঠালেন মেক্সিকোতে। উনত্রিশবৎসর বয়স্ক দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠচেতনা সম্পন্ন এ্যাথলেট বিলই যে ডেকথালনে একমাত্র ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে এ্যাথলেট মহলে আর দ্বিরুক্তি রইল না। সেই একমাত্র দেশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে।

বিলও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৪৮ এবং '৫২ সালের অলিম্পিকে বব মথিয়াস এবং রাফ্যার জনসন-এর মত তিনিও স্বর্ণপদক অর্জন করবেনই।

অলিম্পিকের ঠিক আগে এ্যামেচার এ্যাথলেট ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত এক প্রতিযোগিতায় বিল টুমে দশটি বিষয়ে ৮০৩৭ পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময় ও দূরত্ব ছিল নিম্নরূপ: ১০০ মিটার—১০'৬ সেঃ, লঙ জাম্প ২৪ ফুট ৯ ইঃ, শটপুট ৪৬ ফুট ৩½ ইঃ, হাইজাম্প ৬ ফিট ৩½ পোল্ট, ভল্ট ১৩ ফুট ৫½ ইঃ ১০০ মিটার হাই হার্ডলস ১৫ সেঃ ডিসকাস ১৩৪ ফুট ৫ ইঃ জাভেলিন, ২০৮ ফু ১½ ই, ১৫০০ মিটার ৪'৩১ এবং ৪০০ মিটার ৪৭'৬ইঃ।

বিল যখন অলিম্পিকের মাঠে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন তাঁর অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন, পশ্চিম জার্মানীর হ্যানস ওয়ালডি অনেকেই ভেবেছিলেন বিল হয়তো নার্ভাস বোধ করবেন কিন্তু মোটেই নয়। স্বদেশের কথা চিন্তা করে এবং তাঁর উপর দেশবাসীর আস্থার কথা ভেবে তাঁর হাতের মুষ্টি দৃঢ় হয়ে উঠল। জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল চোখ দুটো। মেক্সিকোর স্বর্ণপদক তাকে অর্জন করতেই হবে। হলোও তাই। ডেকথালনের স্বর্ণপদকটি তাঁর গলায় ঝলমল করে উঠল। শুধু তাই নয়, ৮১৯৩ পয়েন্ট অর্জন করে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করলেন। দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে বিল টুমে ফিরলেন দেশে। আশা আছে বিল আগামী মিউনিক অলিম্পিকেও যোগদান করবেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

'ইতিহাসের বুকে তোমার জীবন-যাত্রার যে কয়েকটি বৎসর প্রতিবাহিত হয়েছে, তোমার জীবনের প্রতিটি ছত্রে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তুমি তোমার আদর্শের জন্য প্রচুর সংগ্রাম করেছ। দুঃখ পেয়েছ অজস্র, কিন্তু সাফল্যের তৃপ্তি তোমাকে সহস্র দুঃখপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যেও শক্তি দিয়েছে, অদম্য

ডঃ শৈলেশচন্দ্র রায়

গতিবেগ সৃষ্টি করেছে। তোমার অক্লান্ত সংগ্রাম সফল হোক, সুন্দর হোক, মধুর হোক, এই কামনা করি।'

নির্ঘণ্ট (২য় পর্যায়) :—

২২। ঢাকার বক্সীবাজারের ধীরেন ও জিতেন মুখার্জী ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতুল ১৯৩১-৩২ সালে তমলুকের ডিপুটি মেজিস্ট্রেট ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে দুই ভাই বেড়াইবার ছলে মাতুলালয়ে উপস্থিত হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় মাতুলের রিভলভার ও বন্দুক অপহরণ করিয়া আনে।

২৩। ঐ বৎসরই ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের সিরাজদীঘা নামক গ্রামে সেখানকার ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের রিভলভার তাহারই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার কর্তৃক অপহৃত হয়।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৯২৯ সালের শেষভাগে অনিল রায় ও লীলা

দণ্ডপাণি

নাগের নেতৃত্বে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের দল সংগঠিত হয়। সে সময় আসামেও দলের সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তার লাভ করে। কয়েকটি স্থানে সুধীর নাগের নেতৃত্বে ও সন্তোষ চন্দের সহায়তায় অনিল দাস (রেণু), দেবেশ

ডাঃ এ কে নন্দী

ভট্টাচার্য ও রমা দত্ত প্রমুখের চেষ্টায় সংগঠন আরও প্রসারিত হয়।

২৪। ১৯৩৩ সালে আসামের তিনসুকীয়াতে ঢাকার বিমল বসুর সহায়তায় ও রেণু দাসের নেতৃত্বে একটি ট্রেন ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাস্থলে রমা দত্ত ধরা পড়ে এবং বিচারে তাহার কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনার পর রেণু দাস ভারতের বাহিরে পলায়ন করে এবং শ্যাম দেশের ব্যাঙ্ককে অবস্থান

শ্রীঅনল ঘোষ

করিয়া বহির্ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। বৃটিশ সরকার সেখানে তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিফল হয়। ইহার পরে স্বনামখ্যাত দেবনাথ দাসের মাধ্যমে নেতাজীর সান্নিধ্যলাভ করে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যাঙ্ককের সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। নেতাজী ব্যাঙ্কক হইতে অন্যত্র যাওয়ার পূর্বে ইঁহাদের হস্তে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিবিধ অর্পণ করিয়া যান।

হেমচন্দ্র ঘোষ ও অনিল রায়ের দলীদের সুভাষচন্দ্রের কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিছুকাল পরে সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্ধান হওয়ার ইচ্ছানুযায়ী শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী, যতীশ গুহ, শান্তি গাঙ্গুলী প্রমুখেরা সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং তাঁহার পরবর্তী কার্যক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন।

অপরদিকে ঢাকার বিমল বসু, সুধাংশু চন্দ্র (পল্টন) ও জিতেন মুখার্জীদের অন্তরঙ্গ ভূতপূর্ব রাজবন্দী শ্রীস্বদেশরঞ্জন বসু জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে জার্মানী হইতে সুভাষচন্দ্রের প্রস্থানের পর ইউরোপের রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে ১৯৩৭-৩৮ সালে সে ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সামরিক বিভাগে গ্রহণ করা হয় এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরণ করা হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই মিত্রপক্ষের পরাজয়ের ফলে সে রোমেলের সৈন্যবাহিনীর হাতে বন্দী হইয়া ফ্রান্সের বন্দিনিবাসে আবদ্ধ থাকে। ফ্রান্স জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করার পর সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে উপস্থিত হইয়া ইউরোপে ভারতীয়দের সংগঠনকার্যে মনোনিবেশ করেন, ক্যাপ্টেন স্বদেশচন্দ্র তখন অপরাপর ভারতীয়দের সঙ্গে মুক্তিলাভ করিয়া সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করে। পুনরায় মিত্রপক্ষের জয়লাভের পর সে বন্দী হয় এবং সামরিক বিচারের জন্য দিল্লীর লালকেল্লায় প্রেরিত হইয়া থাকে। আন্দোলনের ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের সঙ্গে পরে মুক্তিলাভ করে।

২৫। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট ঢাকা শহরের ইংলিশ রোডের মোড়ে জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে ফরোয়ার্ড ব্লক-কর্মী হৃষীকেশ সাহা প্রাণ হারায়।

২৬। আজাদ হিন্দ হোম ফ্রণ্ট গঠন করিয়া কলিকাতা হইতে গভীর রাত্রে

বীণাপাণি রায়
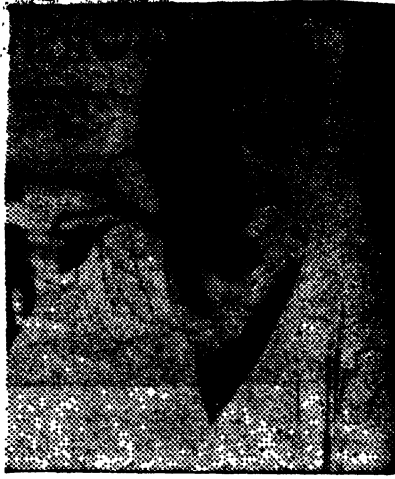
নেতাজীর নিকট গোপন সংবাদ পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৪৪ সালের ২২শে জুলাই শিবঠাকুর লেন হইতে পলাতক বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা হইতে নারী কর্মী দীপ্তি ও হেনা ঘোষ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে রেডিও-প্রচার কার্য সমাপন করে, শেষ রাত্রে হঠাৎ পুলিশ আসিয়া হানা দেয়। গোপাল সেন টের পাইয়া একটা জরুরী কাগজের বাণ্ডিলে আগুন ধরাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে পুলিশ ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। অর্ধদগ্ধ বাণ্ডিলের জন্য গোপালের সঙ্গে পুলিশের সংগ্রাম সুরু হয়। পলায়নের শেষ চেষ্টায় সে উপর হইতে নিচে পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আহত হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে সে প্রাণত্যাগ করে।

২৭। ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারী ভিয়েৎনাম-দিবসের গুলী-

উষারাণী রায়

চালনায় প্রতিবাদসভায় পুলিশের গুলীতে ময়মনসিংহে নিহত হয়।

২৮। ঐ বৎসরই শচীন কর জাতীয় পতাকা রক্ষার্থে ঢাকা ময়মনসিংহ লাইনে চলন্ত ট্রেনে আত্মাহুতি দেয়।

প্রথম সারির কর্মীদের চেষ্টায় কি ভাবে সংগঠন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহার কথা ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঢাকার পূর্বপ্রান্তে কলেজিয়েট স্কুল ও পশ্চিম প্রান্তে নবকুমার ইনস্টিটিউশন ছিল তরুণদের মনোনয়ন কেন্দ্র। মনোনয়ন কেন্দ্র হইতে গৃহীত তরুণদের শারীরিক ও মানসিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য বিভিন্ন ক্লাব ও সংঘগুলিকে ব্যবহার করা হইত। ঢাকেশ্বরী বাড়ী, রমনার কালীবাড়ী ও পুরানা পল্টনের চাঁদামারী নামক বিশিষ্ট প্লটগুলিই ছিল বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তির পীঠস্থান। বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর তরুণদের সুবিন্যাস কেন্দ্র। বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীর নিষ্ঠাবান ছাত্রদের প্রতিও মনোযোগসহকারে দৃষ্টি রাখা হইত।

অপরদিকে উল্লেখিত তীর্থস্থানগুলিতে তরুণদের আনা-গোনার প্রতিও নজরের অভাব ছিল না। এমন কি মন্দিরের পুরোহিত পরিবারের সন্তানদেরও অবহেলা করা হয় নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বনামখ্যাত ঢাকেশ্বরী বাড়ীর 'জটুভাই' ও রমনা কালীবাড়ীর কৃতী ছাত্র কিঙ্কিঙ্কর ভট্টাচার্যও বাদ পড়ে নাই। দলে কখন প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তেমনি ময়মনসিং-এর উদীয়মান তরুণ গায়ক প্রখ্যাত সুখেন্দু গোস্বামীও দলে ভিড়িয়া গিয়াছিল। এমন কতকগুলি পরিবারও দেখা গিয়াছে যেখানে বাড়ীর প্রায় সকল তরুণজনরাই দলভুক্ত। কিন্তু কেহ কাহারও কথা জানিতেন না এমনই ছিল নিয়মানুবর্তিতা। এই প্রসঙ্গে গেণ্ডারীয়ার সরকার বাড়ী, কাঙেৎটুলীর মতিলাল বসুর পরিবার, বক্সীবাজারে অনিল রায় মহাশয়ের নিভৃত নিলয়ের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

ঢাকার অদূরে ভাওয়াল পরগণা অবস্থিত। ভাওয়ালের জমিদাররা জয়দেবপুরে অবস্থান করিতেন। বিরাট জমিদার পরিবার। আত্মীয়-স্বজন ও জমিদারীর কর্মচারীদের পরিজন লইয়াই এই সহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচুর্যের মধ্যেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত। নৈতিক চরিত্রের প্রতি ততটা দৃষ্টি ছিল না। এইরূপ পরিবেশে বক্সীবাজারের কামাখ্যা রায় চাকুরী উপলক্ষ করিয়া ১৯২৯ সালে তথায় আগমন করেন। শ্রীরায় নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। শৈশব হইতেই পড়াশুনায় সুনাম অর্জন করেন। ছাত্রবৃত্তি দ্বারাই তাঁহার পড়াশুনা চলিত। এই ব্যাচটি খুবই কমঠ ও জটুভাই ও কবিকিঙ্কর তাঁহার সহপাঠী সক্রিয় ছিল।

শ্রীরায় জয়দেবপুরে নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগঠনে মন দিলেন। শহীদ ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র চট্টাচার্য ও আরও দুই চারজন সজীব সহায়তায় জয়দেবপুরের সংগঠন জোরদার হইয়া উঠে। ফলস্বরূপ ১৯৩০-এর বৈপ্লবিক আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে বাংলার কুখ্যাত গভর্ণর স্যার জন্য এণ্ডারসনের জীবননাশের চেষ্টায় তাহাদেরই জয়দেবপুর সংগঠন ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লয়। সেইজন্যই জয়দেবপুরের শহীদ ভবানীর নামানুসারেই আজ কলিকাতার 'এণ্ডারসন হাউস'-এর নাম পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে দুইটি কথা

পিতার দেওয়া নামেই আমার পরিচয়। ভারত আমার দেশ। বঙ্গদেশ আমার জন্মভূমি। সুতরাং ভারতীয় হইয়া ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্তব্য। সেইজন্যই আমার অনুভূতি ও জ্ঞান দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি সেই বিষয়ে দুই-একটি কথা উল্লেখ করিলাম। ভারতীয় ধর্ম হিন্দুধর্ম নামেই খ্যাত। এই সনাতন ধর্মের কোন প্রবর্তক নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে মুনি-ঋষিদের উপলব্ধ সত্যসমূহের সঙ্কলনই হইতেছে বেদ। এই বেদই হিন্দুধর্মের উৎপত্তিস্থল। হিন্দুধর্মের বহু মত ও বহু সাধনার ধারার মধ্যেই হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য। জগতের প্রত্যেক মানুষের রুচি, প্রকৃতি, শক্তি পৃথক। সেইজন্যই হিন্দুধর্ম বিভিন্ন সাধকের জন্য যথাযোগ্য বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। অসংখ্য নদনদী নানা খাতে প্রবাহিত হইয়া যেমন একই সমুদ্রে মিলিত হয়, তেমনি বিভিন্ন সাধক সাধনার পথে চলিয়া চরম লক্ষ্য এক ভগবানে পৌঁছিয়া থাকেন। ভগবানের শক্তি ও গুণ অনন্ত। হিন্দুরা যে বহুসংখ্যক দেব-দেবীর পূজা করে তাহা এক অদ্বিতীয় ভগবানের অনন্ত গুণ ও শক্তির এক-একটি প্রতীক বা প্রতিমূর্তি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুরা পৃথক পৃথক বহু ভগবানের পূজা করে না। একই পরমেশ্বরের বহু শক্তি ও গুণের পূজা করে।

হিন্দুধর্ম ঘোষণা করে যে প্রত্যেক নরই নারায়ণ। প্রত্যেক জীবই শিব। একজন জ্ঞানী ও একজন অজ্ঞানীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তারতম্য শুধু প্রকারে। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। নিজেই নিজের সৎ ও অসৎ কর্মের সুফল বা কুফল ভোগ করিয়া থাকে। মানুষ জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্তিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ সৎ ও অসৎ কর্মের ফলভোগের মাধ্যমে আত্মশোধনপূর্বক পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় ইহাই ভারতীয় ধর্মের সার কথা।

আত্মতত্ত্ব

মানুষের আমরা কি দেখি? আমরা দেখি চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত-পদ ইত্যাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়-যুক্ত শরীরটি। বাহ্যত মনে হয় শরীরটিই মানুষ। কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যায় যে, মানুষ যখন মরিয়া যায় তাহার দেহটি পড়িয়া থাকে। তবে চলিয়া যায় কে? সেই বস্তুটি চলিয়া গেলে দেহটির বিনাশ হয়। সুতরাং দেহই মানুষ নয়।

মনে হইতে পারে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকে। তাহাও ঠিক নয়। এমন একটি বস্তু আছেন যাহাকে চোখে দেখা যায় না। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, মনোবুদ্ধির দ্বারাও যাহাকে বুঝা যায় না। সেই বস্তুটি যতক্ষণ দেহে বর্তমান

ঢাকায় পণ্ডিত নেহরু। (দক্ষিণ হইতে বামে দণ্ডায়মান—পণ্ডিত নেহরু, 'ধীরেন্দ্রমোহন পোদ্দার—ক্যামেরার দিকে ও শ্রীবীরেন দে—সামরিক পোষাক পরিহিত)

থাকে, ততক্ষণ দেহ সচল ও কর্মতৎপর। মন, বুদ্ধি ও চিন্তা বিচারশীল। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর গতাগতি নিয়মিত হইতে থাকে। সেই বস্তুটি শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলেই দেহটি অচল হইয়া পড়ে। প্রাণ-অপান বায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হয়। মন, বুদ্ধি ও চিন্তার বিচারকার্য শুব্ধ হইয়া যায়। সেই অলক্ষ্য বস্তুটিই আত্মা। সেইটাই মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আত্মবস্তু যদি মন ও বুদ্ধির অগোচর হয় অর্থাৎ চিত্তের বিচারের অতীত হয়, তবে তাহাকে উপলব্ধি করা যাইবে কিরূপে। উপনিষদে এই বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়সংযম ও রিপুদমন দ্বারা ভোগবাসনার বিলয় ঘটিলে মন ও বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধ মনোবুদ্ধির দর্পণে সেই আত্মবস্তুকে দর্শন ও উপলব্ধি করা যায়। মানুষ জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্তিত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কর্মের ফলভোগের মাধ্যমে আত্মশোধনপূর্বক পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পৌরাণিক যুগে সামাজিক ব্যবস্থা

মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীর পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামী হউন বা সকামী হউন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্তী হইবেন। এই ঘটনার বিষয় সকলেই অবহিত আছেন। স্বভাবতই এই মন্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য কুমারী কুন্তির হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার যৌবনোচিত প্রগলভতা, পৌরুষবাঞ্ছিত হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্যই তাঁহার প্রচ্ছন্নশক্তির, তেজস্বী শৌর্যের প্রতীক দিবাকরকে তিনি অবিলম্বে আহ্বান করিলেন। দিবাকরের আকস্মিক আবির্ভাবে তাঁহার হৃদয়ে চাঞ্চল্যের ঝড় উঠিয়া গেল। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, তদানীন্তন সমাজে কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণে সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। এমন কি দেবতার তুষ্টির জন্যও নয়। সেই জন্যই কুন্তী তাঁহার যাচঞার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া নিজেই লজ্জা ও অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। তাহা হইলেও তিনি সামাজিক কর্তব্যে এতটুকুও অবহেলা করেন নাই। সামাজিক বিধানানুযায়ী তিনি অভীপ্সিত সৎকারের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেন।

[illegible] 'রোজগারী [illegible]'
'[illegible]' ও [illegible]

এদিকে নারীর রূপলাবণ্যে দিনমণির সমস্ত অস্তিত্বই কামোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি মানুষের সামাজিক বিধানকে অস্বীকার করিয়া দেবোচিত চিন্তার দ্বারা কুমারী দেহকে কামের লালসায় ক্রীড়নক করিয়া তুলিলেন। এখানে দেবতাও রিপুর কবলে তাহাই প্রমাণ করে। তিনিও রিপুর প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইলেন। সেইজন্যই তাঁহার ঔরসজাত সন্তান মহান শক্তির অধিকারী হইয়াও মাতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। সমাজদেহে গুণ ও কর্মের প্রতি বর্ণবিভাজনিত অবহেলা, কর্মারম্ভ বৃত্তিভেদজনিত ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনাস্বরূপ। সেই জন্যই এই প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সূর্যনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম।

এই পটভূমিকায় পরবর্তীকালে, ভারতে ইংরেজ-শাসনের আমলে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' ফলে, 'জমিদারী প্রথার' উচ্ছৃঙ্খল আচরণে সামান্য মধ্যবিত্তের জীবনে যে অবিচার, অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা দেখা গিয়াছে এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ফলে এই সম্প্রদায় যে কিভাবে প্রবঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণস্বরূপ আমার ক্ষুদ্র জীবনকাহিনী।

মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি ও তাহার পরিণতি

কত দিনের কত কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে। গত পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে আমার পরিচয়। শুধু পরিচয় কেন সম্পর্কও। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া যখন অতীতের কথা ভাবিতেছি তখন প্রথমেই মনে পড়িতেছে সাম্রাজ্যবাদ তার বন্ধু পায় জমিদার, পুঁজিপতি ও উপরতলার সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে। ভারতেও বৃটিশ আধিপত্য সম্ভব হইয়াছিল এইভাবেই। এই জন্যই মহামতি তিলক ১৯১৯ সালে কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের সরকারী চাকুরী নিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের 'Made in England' অর্থাৎ 'ইংলণ্ডে প্রস্তুত' ছাপ হইলেই তখন আর তাহাদের নিজেদের দেশের কথা ভাবিবার সময় থাকিবে না। ভারতে আসিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারিরূপে নিজেদের তথা পরিবারবর্গের এমন কি আত্মীয়-স্বজনদেরও ভবিষ্যতের উন্নতির কথা ভাবিয়া ইংরেজের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিবে। কি ভাবে চাকুরী জুটাইবে সেই চিন্তায়ই ব্যস্ত থাকিবে। তাহাদের প্রগতিশীল চিন্তা যে তখন শুধু কথার চাতুরীতেই পর্যবসিত হইবে, ভিতরে থাকিবে স্বার্থসিদ্ধির লোভ তাহা সেইদিন সুভাষচন্দ্রের চোখকেও ফাঁকি দিতে পারে নাই। তিনি ইহাকে 'ট্রাজিক' আখ্যা দিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছিলেন "তোমরা এদেশে যারা রয়েছ, তোমাদের ভাবতে হবে দেশের মানুষকে কিভাবে মুক্তি দিতে পারো। সর্ববিষয়ে তাদের মুক্তি দিতে হবে। দিতে হবে রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার অর্থ যদি হয় জমিদার, পুঁজিপতি, অভিজাতশ্রেণী

শ্রীকামাখ্যা রায়

বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তার জন্য তৈরী থেকো।"

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে বাঙ্গালিসমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এই দেশে ইংরেজ-আগমনের পর। বস্তুত মধ্যবিত্ত বাঙালি ইংরেজ বণিকও ইংরেজ সরকারের সৃষ্টি। স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের আত্মসর্বস্ব শাসননীতি আমাদের কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। নাগরিক সভ্যতার পত্তন করিয়াছে।

লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা বাঙ্গলার প্রাচীন ভূমি-ব্যবস্থাকে ওলট-পালট করিয়া দিয়াছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাবাহী লর্ড মেকলের শিক্ষা-সংস্কার মানসিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাইয়া গ্রাম্য বাঙ্গালিসমাজের বৃহত্তর অংশকে শহরমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারতন্ত্রের সৃষ্টি হইল। পশ্চিমের শিল্প-বিপ্লবের ফলে কৃষি-আশ্রয়ী ও কুটির-শিল্পাশ্রয়ী পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আর তাহার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়িয়া উঠিল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ। আমরা যে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি বিমুখ হইলাম তাহার জন্য দায়ী জমিদারী প্রথা। এই জমিদারী প্রথাই মধ্যবিত্ত সমাজের এক অংশকে তাহাদের প্রতি নির্ভরশীল হইবার জন্য নানাভাবে জীবিকা-অর্জনের উপায় করিয়া দিয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে, এই ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষে জন্মায়ত্ত জাতিভেদের পরিবর্তে কর্মায়ত্ত বৃত্তিভেদ দেখা দিল অর্থাৎ যেকোন লোক তাহার ইচ্ছা, শক্তি ও সুযোগ অনুসারে যে-কোন বৃত্তি বা জীবিকা গ্রহণ করিতে পারিত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-প্রসারের ফলে একটি ধনিক শ্রেণীরও উদ্ভব হইল। আর যাহারা উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত রহিল তাহারাই অভিজাত শ্রেণী বলিয়া পরিচয় লাভ করিল। ফলে ভারতীয় জন্ম-কৌলীন্যের স্থলে অর্থকৌলীন্য দেখা দিল। সমাজে জাতিভেদ শিথিল হইল বটে, কিন্তু যৌথপরিবারের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামের লোকেরা শহরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ক্রমশ নূতন শহরও গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

শশাঙ্ক দাশগুপ্ত (কমেট)

অপরদিকে উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, চিকিৎসক ও নিম্ন চাকুরীজীবীদের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হইল এইকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই শ্রেণীই অবশ্য পরে ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার মূলাধাররূপে পরিগণিত হয়। এই পরিস্থিতির পটভূমিকায়ই আমার জীবন কাহিনী রচিত।
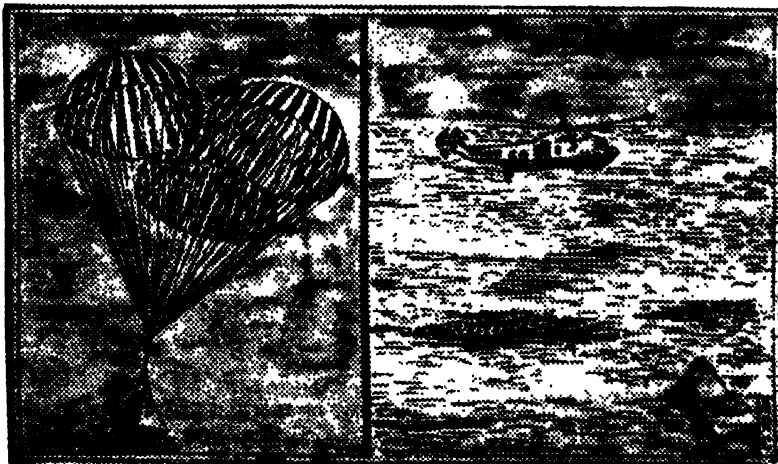
শিল্পীর দৃষ্টিতে

চন্দ্রচারীর প্রত্যাবর্তন

—অশোক রায়চৌধুরী

আর হবে না দেরি

উমা দেবী

তোমারি নামে।
তোমারি নামে সেই প্রতিশ্রুতি এসেছিল
—"আর হবে না দেরি।"
নিশীথের ছায়া যখন জীবনে নেমেছিল
নক্ষত্রের কম্পমান কিরণসূচী বিঁধতে পারেনি সেই অন্ধকার।
বিন্দু বিন্দু শিশিরের হিমস্পর্শ নেভাতে পারে নি সেই মর্মদাহ।
ছায়ায় শরীর ডুবিয়ে—ডুবিয়ে—ডুবিয়ে—
যখন অতলের তলে এসে ছুঁয়েছি—সেই
"মরণরে, তুঁহু মম শ্যামসমানকে"—
যখন ভেবেছি—অরুণ-আলোকের গোলাপি দ্যুতি
আর কোনোদিনই স্পর্শ করবে না এই নয়ন-কণীনিকা।
তখনই তোমার কণ্ঠস্বরে বেজে উঠেছে—
"আর হবে না দেরি"—
সূর্যোদয়ের দেরি আর নেই—
রৌদ্রের স্পর্শে অশরীরী ছায়াদেহীরা মিলিয়ে যাবে,
সোনালি ফসলে ভরে উঠবে প্রাণের ক্ষেত—
পাখি উড়বে, ফুল ফুটবে, হাওয়া বইবে—
আবার জীবনস্রোত বইবে উজানে—
তোমারি নামে।
তোমারি নামে সেই প্রতিশ্রুতি এসেছিল—
"আর হবে না দেরি।"
খরায় যখন জ্বলে গেল সমস্ত স্বপ্নের কুসুম,
যখন বুকফাটা মাটির হাঁ-মুখে কৃষ্ণান্ধকার ছাড়া
আর কিছুই দেখা যায় নি—
বন্ধ্যা মাতার শুষ্ক স্তনের উপমা ছিল খাদাচটা ডোবাগুলি
সমার্তে জীবনের স্রোত শ্রান্ত পাথরগুলি—
ইচ্ছার রক্ত-ঝরা-ওঠা প্রাণের পথগুলি—
যখন হারিয়ে গিয়েছিল তেপান্তরের মাঠে—
যখন ঘূর্ণিঝড়ের ধুলোয় অন্ধ হয়েছিল নয়ন-কণীনিকা,
মনে হয়েছিল—আর কোনোদিনই শ্যামল মেঘের সুনীল
সুষমায়
জীবন জুড়াবে না—তখন তখনই তোমার কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছিল
"আর হবে না দেরি"—
মেঘ জমবে, মেঘ উড়বে—ছড়াবে আকাশের এক প্রান্ত থেকে
আর এক প্রান্ত পর্যন্ত—
বিদ্যুৎ চমকাবে—স্ফটিক তরলের মতো স্বচ্ছ ও সুন্দর—
হাওয়ার আবর্তে উড়বে সুন্দরী নটীর
ফোঁটা-পাতা-ফুল-আঁকা নানাবর্ণ অঞ্চল—
বৃষ্টি নামবে—নামবে—নামবে—
ভরিয়ে দেবে খাল-বিল-ডোবা-নদী-নালা—
বাদলা হাওয়ায় নিবু-নিবু দীপের ছায়ায় আসরে এসে
উত্তীর্ণ হবে
ফুরিয়ে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া যুগযুগান্তরের কাহিনী,
আর জীবনের নদীটি ফুলে ফেঁপে দূরে দূরে ছুটে যাবে
অকূল সাগরের বুকে।
"আর হবে না দেরি"—
তোমার নামের এই প্রতিশ্রুতি গেঁথে নিয়েছি মনে।
জপ করছি তোমার নামের মালা—
দিন ঘুরিয়ে, রাত ঘুরিয়ে, মন ভরিয়ে, প্রাণ ভরিয়ে।
ইতিমধ্যে কত কুঁড়ির পুষ্পজীবন শেষ হয়ে গেল—
পাপড়ি পড়ল ছড়িয়ে হলদে পাতার মতো—
বিশীর্ণ হলো কত তরুণ দেহের চিক্কণ লাবণ্যতরু
সূর্য উঠল—চাঁদ ডুবল—তারা ছুটল—
যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে—
কিন্তু তবু মনে হয় এইবার হবে অরুণোদয়—
এইবার খরায় নামবে সজল মেঘ থেকে উদার বৃষ্টিধারা,
ফুল ফুটবে, হাওয়া বইবে—আর—আর
জীবনের নদীটি এবার যাবে ভরা প্রাণে
সমুদ্রের দিকে:—
দেরি হোলো? তাতে কি! এবার কিন্তু
"আর হবে না দেরি"—তোমারি নামে প্রতিশ্রুতি এসেছে

উপবাস

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে দুঃখ-সুখ এত দূরে সরে সরে যায়
চোখের এ-পার থেকে ওপারের বাগানে লুকোয়।
হৃদয়ের পাশ থেকে ঝরে পড়ে অনন্ত কুয়াশা—
সেই সব পাখিদের ভাষা
পুরোজন ঘর ভেঙে ভেসে যায়
বুকের আড়ালে
এইসব ঘটে যায় চৈত্রের জালে।

আনন্দের মুঠি তবু কিছু ধরে রাখে
বাতাস ফিরিয়া যায় তবুও বাতাস বুকে থাকে।
সেটুকুই ভালো
যেটুকু নেভার আগে হৃদয়ে হঠাৎ চমকালো।
চিরকাল থাকে পরবাস
মাঝে মাঝে ঘর চাই, এ-সময় ভাঙে উপবাস।

সব সময়

তারাপদ রায়

সব সময় তোমাদের কথা মনে পড়ে।
সেই পুকুরের ধারে গাছের নিচে,
বোধ হয়, নিমফুল ঝরে পড়তো
কিছু জলে, কিছু জলের কিনারে;
ঝরে পড়তো দু' একটা তিতকুটে ছেঁড়া সবুজ পাতা।
নিমফুলের কি একটু গন্ধ ছিলো?
কি জানি এখনো চোখ বুজলেই
তোমাদের কথা:
ক্ষীণ গন্ধময় স্মৃতির অন্ধকারে
হাজার হাজার নিমফুল কেবলই ঝরে পড়ে
স্বপ্নে, ঘুমে
চোখের পাতার নিচে কিছু জলে, জলের কিনারে।
আর কখনো কখনো জিভের ডগায়
খুব তীব্র, খুব স্পষ্ট নিমপাতার তিক্ত স্বাদ।

ভোট

অমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

হাত তুলেই বলেছিলাম--আমি রাজী আছি।
প্রায় তেপান্তর কোন মাঠের বিশালে
হু হু হাওয়া আর জনশূন্য দিগন্তের নিচে
জীবনের কিংবা বলা ভাল যৌবনের
প্রথম বয়স্ক ভোট তোমাকে দিয়েছিলাম নারী।
অথচ কখনো, কোনদিন, আমি একা নই—এক
আকুল জননীছায়া ওতপ্রোত মিশে আছে সর্বাঙ্গ শরীরে।
ছিল প্রাতঃস্মরণীয় ফুল, ছিল তমোহর সূর্য, স্বাধীনতা,
আমি তবু হাত তুলেই ইন্দ্রনিনাদে তোমাকে বলেছিলাম
রাজী আছি, আমি রাজী আছি
তোমার সকল স্বেচ্ছা, প্রতিটি প্রবেশপথ,
নিশ্বাসের উৎসবের দিক
সাগ্রহ গ্রহণে রাজী আছি। শুধু তুমি অক্ষরের স্বাধীনতা
রোগা লণ্ঠনের মতো সামান্য শিখার
সীমাবদ্ধ করোনা কুটিরে।
তাতে মুখ থেকে স্বপ্নাদেশ সরে যাবে
আর আমি
আকাশ শাসিয়ে ভোট দিতে পারবোনা তোমাকে।

পৃথিবীর ভাষা থেকে দূরে

সুব্রত চক্রবর্তী

আমার সম্মুখে তুমি, তোমার সম্মুখে মাঠ—
মাঠের দক্ষিণে
ভাঙা-ট্রেন, লোকোশেড—প্রোথিত গম্বুজ।
মাঠের ভিতর দিয়ে আড়াআড়ি আমাদের
পরামর্শ ছোটে—
আঁধার, তোমার চুলে......
অন্ধকার থেকে যেন অবিরাম
ঝরে যাচ্ছে জল!
মানুষের মুখ দেখলে বোঝা যায় মানুষের ভাষা...!
এমন ধারণা ছিলো—ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়—
প্রতিটি মুখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে প্রত্যেকের মুখ!
কত ভাষা পৃথিবীতে? পৃথিবীর ভাষা থেকে প্রতিদিন
দূরে চলে যাই......
লোকের বগল থেকে যতদূরে যাই
তবু লোকেরই বগল—
বিশাল তাঁবুর মতো—সার্কাসপার্টির, ছেঁড়া, ফুটোফাটা
ফুলে ঢোল
আমাদের গিলে নিয়ে ঝিম মেরে বসে।

পৃথিবীর ভষা ভুলে তোমার সম্মুখে খাড়া—
প্রতিশ্রুতিহীন কবি, তোমার সম্মুখে
হা-হা মাঠ, ভাঙা ট্রেন, লোকোশেড, প্রোথিত গম্বুজে—
আঁধার, তোমার চুলে......অন্ধকার থেকে যেন
অবিরাম ঝরে যাচ্ছে জল—

কলকাতা দাঁড়িয়ে থাকে সারা কলকাতায়।

সভ্যতার মুক্তি

শংকর চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ে প্রকৃতির দান
এই সংসারের যাবতীয় পুতিপুঞ্জ রাঁধবে বলে
দেখি রৌদ্ররশ্মি জ্বলছে
অবিরল শবের গন্ধে টলে যাচ্ছে কাশবন।
'হে আনন্দময় আত্মা, এবারে ইন্দ্রিয়ের গল্প শোনো
ঝরে গেল মানুষের মাথার ওপর মহাকাশ
পায়ের তলায় অনাথ মাটিতে লুটিয়ে কাঁদল শিশুরা
ফাটল বা ফোকর থেকে হাওয়া দিল ভীষণ।'
শূন্যে দু'হাত তুলে মৃত মানুষেরা চীৎকার করে উঠল
'হে জন্মহীন, তুমি প্রসন্ন হও
আমরা বিজয় চাইনা।'

সমস্তই পড়ে রইল

শান্ত লাহিড়ী

সমস্তই পড়ে রইল, সাজানো সংসার—পুতুলেরা,
সখের তোরঙ্গখানি, লতাপাতা আঁকা বেড কভার,
গ্রীষ্ম থেকে বসন্তের সব অত্যাচারগুলি নিঃশব্দ হৃদয়ে
একা অঙ্কুরিত করে
যখন ফসল পাকবে তারই প্রতীক্ষায়।

সমস্তই পড়ে রইল সে কেন রইল না চিরকাল,
তার শেষ সহবাস-মাখা অন্তর্বাস
এখনো রয়েছে আলনায়,
আমার বাহুতে রক্ত সিঁদুরের দাগ।
এ সব কিসের কথা, কোন পুতুলের ঘরে এত আন্দোলন!

সে যদি না রইল চিরকাল
সোনালী খামারে আমি একা কাকতাড়ুয়ার মতো।

দুটি কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

যদি ফুল ফোটে

যদি ফুল ফোটে, দাবি করি চাঁদ।
চাঁদ ওঠে যদি, চাইবো শরাব;
আর এই সব একখুনি পেলে
কী যেন নেই কী যেন নেই...গুমরে মরবে সাধ।
চাঁদ ফুল মিতার মিলন মেলে
কবে যে নিঃশেষে পান করবো রাত্রি?

হায়, তারা আমার

হায়, তারা আমায় ঠকালে—
শরৎ-পূর্ণিমা, দখিন বাতাস।
তারা এসেছিল দূরে দূরে প্রীতি সম্ভাষণে
ভেবেছিলাম নির্ভরযোগ্য তারা, খাঁটি।
তারা যে আমায় ফেলে গেল সাথিহারা
গেল চলে অই বালকদলের পিছে-পিছে।

শিশিরকুমারের সঙ্গে পুডভ্‌কিন ও চেরকাশভের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থান—শ্রীরঙ্গম। সময়—১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫১ সাল

বিখ্যাত রুশ অভিনেতা 'চেরকাশভ' এবং প্রখ্যাত মঞ্চপরিচালক 'পুডভকিন' যখন ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক দল নিয়ে রাশিয়া থেকে আসেন তখন কলকাতায় এসে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বাধীনচেতা নির্ভীক শিশিরকুমারকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী নির্দেশে কিছু করান যাবে না কারণ তিনি সরকারের উপর খড়্গহস্ত। তাই অনেক চিন্তা করে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (মুখ্যমন্ত্রী) শ্রীরঙ্গমে নিজে এসে নাট্যাচার্যকে অনুরোধ করেন। শিশিরকুমার বিধানচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। শিশিরকুমার অভিনয় করেছিলেন 'ষোড়শী' শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনার নাট্যরূপ। শিশির প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।
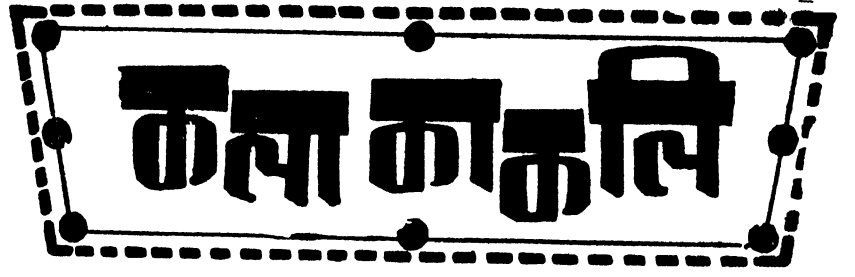
১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা শ্রীরঙ্গমে ষোড়শী দেখতে এলেন চেরকাশভ ও পুডভ্‌কিন। নাটকীয় ঘটনা-বৈচিত্র্য, শিশিরকুমারের অভিনয়-নৈপুণ্য তাঁদের এতই অভিভূত করে যে তাঁরা অভিনয় শেষে সাজঘরে শিশিরকুমারের কাছে আসেন অভিনন্দন জানাবার জন্য। রুশ ভাষায় তাঁরা শিশিরকুমারকে যে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তাঁদের দোভাষী তার ইংরাজী তর্জমা করে দেন।

বাংলা অনুবাদ দেওয়া হ'ল। 'ষোড়শী' নাটকাভিনয় তাঁদের কত মুগ্ধ করেছিল তা বোঝা যাবে কথাগুলি পড়লে।

চেরকাশভ করমর্দন করে বলেন,—

আপনি একজন বিরাট অভিনেতা। আমাদের অভিনয়ের ধারার সঙ্গে আপনার অভিনয়ের মিল আছে, কারণ উভয়েই বাস্তবধর্মী। মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা "স্ট্যান-স্লভস্কীর" সমতুল্য আপনি। আপনার অভিনয়ের মাধুর্যে নাটকের চরিত্র রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে চোখের সামনে হাজির হয়। আপনি যখন কথা বলেন আমরা বশীভূত হই—আপনার অভিনয় আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। আপনার পরিচালনার নৈপুণ্যে প্রতিটি শিল্পী, কি ছোটো কি বড়ো, নিখুঁত অভিনয়কলা প্রদর্শন করেছেন। আপনাদের অভিনয়ে যে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির এবং জাতীয়তাবাদের রূপারোপ প্রত্যক্ষ করেছি, তা যেন অবিকল বজায় থাকে আপনার কাছে এই অনুরোধ; আরো একবার বলি আপনি একজন বিরাট অভিনেতা এবং সার্থক শিল্পী। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে আমরা গর্বিত। আপনার অভিনয়-শিল্প উপভোগ করার জন্য আপনাকে মস্কো যাবার আমন্ত্রণ জানাই। সেখানে আপনাকে

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

আমরা যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতে পারবো।
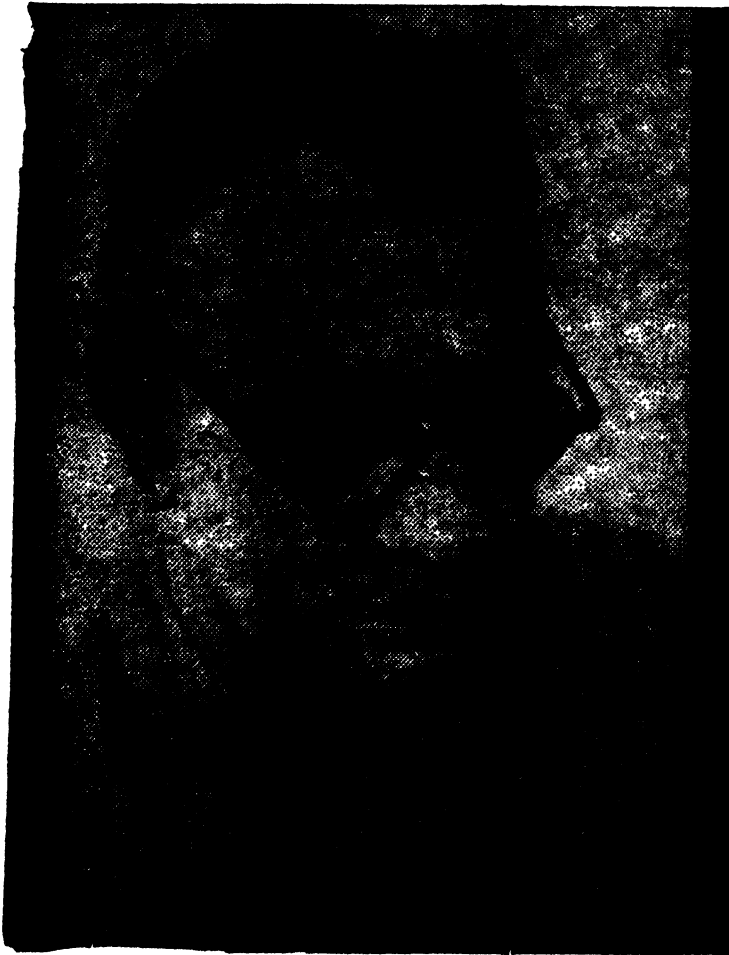
পুডভ্‌কিন বলেন—

অভিনেতা আমি নই। আমি এক-জন পরিচালক। পরিচালকের চোখ দিয়ে আপনাকে বিচার করেছি। আপনার অভিনয়ে আপনাকে অত্যন্ত সমাহিত মনে হয়। আপনার অনন্যসাধারণ অভিনয়-প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনার অভিনয়-গুণে ছোটোখাটো ঘটনাগুলি অদ্ভুত ভাবে রূপায়িত হয়। আপনি শুধু অভিনেতা মাত্র নন। আপনি শিল্পের প্রাণকেন্দ্র, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বহু দিন পরে আপনার অভিনয় আমার মনে জাগ্রত হয়ে থাকবে। বিরাট অভিনেতা আপনি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সৌভাগ্যে গর্ব অনুভব করছি। আপনি মস্কোয় গেলে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে এই আশা মনের মধ্যে পোষণ করব।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলেন—

আপনাদের স্বাগত জানাই। আমার অভিনয় দেখতে এসেচেন তার জন্য আমিও গর্বিত। আপনারা যেটা বললেন যে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির এবং জাতীয়তা-বাদের রূপারোপ প্রত্যক্ষ করেছেন এই কারণেই আমি আমার দেশের খাঁটি জিনিষের অভিনয় দেখিয়েছি। এটি শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর উপন্যাসের নাট্যরূপ। রাশিয়া আজ যা চিন্তা করছে শরৎচন্দ্র তথা বাঙ্গালাও তাই চিন্তা করে, জমিদারী যায়, মহাজন (ক্যাপিটালিস্ট) যায় কিন্তু থাকে জমি আর প্রজা। আমার অভিনয়ধারার সঙ্গে আপনাদের মিল আছে বোধ হয়। প্রবাদ বাক্য—'গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক'

তাই এখানেও বোধহয় 'গ্রেট এ্যাক্টরস এ্যাক্ট লাইন।'

বর্তমানে চলচ্চিত্রের আবির্ভাবে ও সংঘাতে মঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান কিন্তু এটা সাময়িক রঙ্গমঞ্চ—সর্বযুগের সর্বজাতির এবং সর্বসময়ের। আপনাদের আন্তরিকতার আদর্শ গ্রহণ করলাম তবে কতদূর সক্ষম হব, তা বলতে পারি না। আবার আপনাদের দুইজনকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, যে আপনারা আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক নাট্যকলা দেখতে ও বুঝতে এসেছেন।*

*দোভাষীর ইংরেজীর তর্জমা হইতে শ্রীকিরণ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

ইন্দর সেন পরিচালিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদমফুল'

সার্থক পরিচালক লুসিনো ভিসকন্টি

এক্ষেত্রে আসল কাহিনী থেকে অনেক সরে আসতে হয়েছে ভিসকন্টিকে। তাঁর মতে চলচ্চিত্রের ভাষা ও উপন্যাসের ভাষা এক নয়। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত। 'ওসেসিওনি'কে কেহ বলেন, প্রাক 'নিওরিয়েলিস্ট' ছবি। অনেকে বলেন, রিয়েলিজম্ থেকে নয়া কথাটি বাদ দিতে। এর ছ'বছরের মধ্যে তিনি আর কোন বই করেন নি। ১৯৪৭ সালে 'লা টেরা ট্রেমা' যখন তুললেন ভিসকন্টি তখন সম্পূর্ণরূপে নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন এবং নতুন চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে। সেখানে নিও-রিয়েলিজম-এর কোন ব্যাপারই নেই।

ভিসকন্টির অন্যতম বিখ্যাত চিত্র, 'রোকো এ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স'-এ একটির পর একটি উপাখ্যানকে উন্মোচিত করা হয়েছে এবং একের পর এক রোসারিয়া পফলডির পাঁচ সন্তানকে মঞ্চের মধ্যিখানে আসতে দেখা যায়। পাঁচটি ভাইকে দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে আগত তীর্থযাত্রীদের কিছু না কিছু সমস্যার সমাধান করতে দেখা যায়। ছবিটির শুরু রোসারিয়া ও তাঁর চারপুত্রের সিমোন, রোকো, ফিরো এবং লুসার মিলান শহরের স্টেশন সেণ্ট্রালে উদভ্রান্তের মত আগমন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিসেনজো আগে থেকেই সেখানে বসবাস করছে এবং অন্য একটি প্রবাসী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে সখ্যতা যাপন করে। এখানেই পফোনডির সঙ্গে ভিসেনজোর সাক্ষাৎ ঘটে এবং দু'জনের মধ্যে সেখানেই কলহের সূত্রপাত ঘটে। ভিসেনজোর একদিকে সংসারের প্রতি আনুগত্য অন্যদিকে গিনেটার প্রতি ভালবাসা ও আপন ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্পতা তাঁকে যেন উদ্বিগ্নতার জালে জড়িয়ে ফেলল।

সহজ আপোষের জন্য ভিসেনজো একটি প্রস্তাব আনলো। কিন্তু রোসারিয়া পারিবারিক ব্যাপারে যেখানে জড়িত সেখানে কোন আপোষের মধ্যে আসতে রাজী হল না। এরপর নানান সংঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবার পর ভিসেনজো কিভাবে গিনেটাকে ফিরে পেল এবং সব বাদবিসম্বাদ ভুলে আপন পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হল সুন্দর ভাবে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পের কাহিনীকে আরো নানান-ভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, ভিসকন্টি কিভাবে এখানে সঙঘর্ষকে উপস্থাপিত করেছেন এবং সম্ভবানুযায়ী তার সমাধানও দেখিয়েছেন।

সন্ধ্যা রায়—হামাহবির বাইরে

চিত্র : চিরজিৎ ঘোষ

চলচ্চিত্রে ভিসকন্টির গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল এবং কখনও বা সার্থক। সর্বোপরি তাঁর চিত্রে শিল্পকলার উচ্চ নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভিসিকা ও ভিসকন্টি কোন সময় একই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনের অবসানে ভিসকন্টির খ্যাতি একটুও ম্লান হয়নি যদিও ভিসিকার যশ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাগুলিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তবুও তিনি বুদ্ধিদীপ্ত পরিবর্তনের অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

তবে সম্প্রতি তাঁর এই অনন্য-সাধারণ খ্যাতি অবনতির মুখে কারণ তাঁর দুর্বলতা এই তিনি তাঁর স্বকীয় পথ থেকে জগতের বৃহৎ দর্শকসমাজের কাছে তিনি যেন একজন অসাধারণ নয়া বাস্তববাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তবে বাস্তবিকই এই নয়া বাস্তববাদের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সার্থক। যতক্ষণ পর্যন্ত এর সমালোচনা বাস্তব সৌন্দর্য-বাদের উপর করা হয় ততক্ষণই তাঁর ছবিগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিসকন্টিকে বিচার করেন। তবে এক বিষয়ে সকলেই একমত যে তিনি এই মতবাদ অতিক্রম করে এক নতুন পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী যুগের ছবি দর্শকের কাছে সে রকম কোন আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। কারণ সেগুলি প্রথম দিকের ভাবধারার পুষ্ট---তবে একথা ঠিক যে, তাঁর পরিচালিত ছবি সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ও বৈপ্লবিক ভাবধারায় পুষ্ট।

সকল পরিচালকদের চক্রের ন্যায় কখনও যশের তুঙ্গে, কখনও অবহেলিত ইঁহা যেমন রেঁনোর অথবা জনফোর্ডের ক্ষেত্রে ঘটেছিল ভিসকন্টির ক্ষেত্রেও তার পরিবর্তন ঘটেনি। ভিসকন্টি সামাজিক বাস্তববাদ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইজন্য তিনি এই আন্দোলনের বিশ্লেষণে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এক্সপ্রেসনিজম্ ছাড়া যেমন 'লাভ'কে বোঝান যায় না। ফরমালিজম্ ছাড়া যেমন কিছু জানতে পারা যায় না, সেইরকম নয়া বাস্তববাদ ছাড়া ভিসকন্টি-কেও বোঝা যায় না। আমরা ভিসকন্টিকে অতীতের ভাবধারার প্রতীক রূপে যদি না দেখি তাহলে তাঁর প্রথম

দিকের ছবিসমূহকে গতানুগতিকতার দ্বারা রুদ্ধ বাস্তববাদের এবং তার পরের ছবিগুলিকে অতীতের অবনতির প্রতীকরূপে দেখব না। অর্থাৎ তাঁর প্রথমদিকের ছবিসমূহকে অবনতির চোখে দেখব এবং পরবর্তী কার্যাবলীকে বেশী প্রাধান্য দেব এ যেন না হয়। তাঁর সমস্ত কার্যাবলীকে একই চিন্তাধারার ফলস্বরূপ দেখা উচিত। কারণ তাঁর পরিচালিত ছবিসমূহের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের ভাবগত ও শিল্পগত দুইদিক থেকে একই সম্পর্ক বিদ্যমান। সেই জন্য তাঁর ছবিগুলি ছটি হলেও সুসংবদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক।

১৯৫৪ সাল থেকে বাস্তব-সৌন্দর্যবাদ ত্যাগ করে এক নতুন পথের যাত্রী হলেন। এই সময়ের অল্প কয়েক বৎসর আগে ভিসকণ্টি এক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এই আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য হল ছোটগল্প ও উপন্যাস থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তৈরি করা এবং যা বাস্তব তারি চূড়ান্ত রূপ দেওয়া। ভিসকণ্টি এই সব চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েও নতুন ভাবধারায় এবং সাবলীলভাবে এক সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন।

যে সব ছবি তিনি পরিচালিত করেছিলেন তাদের মধ্যে ওসেসিওনি লা টেরা, ট্রামা, বেলেসিমা, সেনসো, লা নোটে বিনায়কি, রোকো এ্যাণ্ড হিজ ফোর ব্রাদার্স, গাটোপার্ডো, ভগ স্টেল ডেল ওর্সা, অন্যতম। ওসেসিওনি যুদ্ধ যৌবন আবেগের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বিশ্বাসঘাতকতার এক অংশ। চিত্র লা টেরা ট্রেসা তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি।

নিখুঁত সৌন্দর্য, সরল ও সাবলীল রচনা ও সমাজসচেতনতা ইহাকে এক অপরূপ সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে।

বেলিসিমার সুখপূর্ণ সমাপ্তির পর ভিসকণ্টি বিবাহবিচ্ছেদ সমস্যাকে সেনসো ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর সমস্ত ছবির মধ্যে বাস্তবতাই বেশী প্রাধান্য। তাঁর ছবিগুলি যেন এক বিরাট সাহিত্য যার মধ্যে সমাজ ও শিল্পের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

ভিসকণ্টি এবার যে ছবিতে হাত দিচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে সেটি এক ধনী পরিবারের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে নাজিজমের জন্ম ও হিটলারের পুনরুত্থানের কাহিনী বর্ণিত হবে। ছবির নাম জার্মান ভাষায় 'গোতর-ডামেরাঙ্গ'। এসেন্-এর ইস্পাত কারখানা অধ্যুষিত জার্মানী ও বাকি অংশ সিসিয়ার লোকেশনে গৃহীত হবে। প্রধান দুটি ভূমিকায় থাকবেন সম্ভবত ডার্ক বোগেড ও ইনগ্রিড থুলিন।

'শান্তি' চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়গুণে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনল হালদারের সুপরিচালনা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। আবহসঙ্গীতের নির্দেশকরূপে ছিলেন অজিত কর, কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন পলাশ চক্রবর্তী, বাসুদেব ঘোষ, মণীন্দ্র ঘোষ, বিধান রায়, লক্ষ্মণ সরকার, তপন ঘোষ, প্রদীপ দাস, গোবিন্দ প্রামাণিক, সন্তোষ হাজরা ও ঈশ্বরলাল ঠাকুর।

শাজাহান

রাষ্ট্রীয় পরিবহন বেলঘরিয়া ডিপোর কর্মীরা এই ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করলেন বিশ্বরূপা মঞ্চে। যে পরিমাণ নিষ্ঠা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এ নাটকের সাফল্য আনা যেতে পারতো সেই বোধটুকু এদিনের শিল্পীদের মধ্যে অনেকাংশে অনুপস্থিত ছিল। ফলত চরম নাটকীয় মুহূর্তগুলি কোন সময়েই দানা বাঁধতে পারেনি। একক অভিনয়ে দু'একজন সাফল্যের নজীর রাখলেও অনেক প্রত্যাশার তুলনায় সে আর কতটুকু। [illegible] দাসের নির্দেশনায় বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন কমল সাধু, শিবনাথ দাস, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সাহা, প্রসূন চট্টোপাধ্যায়, মদন সমাদ্দার, [illegible], ভোলানাথ দ্বারিক, সুনীল মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ভোলানাথ দে, সুকুমার দত্ত, রাত্রা দে, [illegible] ভৌমিক, মিত্রা দাশগুপ্তা, [illegible] রায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও নির্দেশক শ্রীদাস [illegible]।

[illegible]

বালী[illegible] [illegible] শিল্পীগোষ্ঠী এ নাটকটি অভিনয় করলেন, যদিও [illegible] বৈশিষ্ট্য[illegible] নাটকের [illegible] তবু পরিবেশন-বৈচিত্র্য এঁদের এ দিনের [illegible] রসিকজনের অভিনন্দন লাভ করেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন কল্যাণ রায়, [illegible] ভাদুড়ী, সতীশ দাশগুপ্ত, হেমাঙ্গশঙ্কর, [illegible] চৌধুরী, ধীরা রায়, বনশ্রী দাস, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী বাগচী, লক্ষ্মী গুপ্তা, সুদেষ্ণা বসু প্রমুখ আরও অনেকে। নাটকটি পরিচালনা করেন সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়, দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জায় ননী দাশগুপ্ত, সঙ্গীতপরিচালনায় ছিলেন হিমাংশু রায়চৌধুরী।

বিদিশ

রঙ-বেরঙের অভিনয়শিল্পীরা সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'বিদিশ' নাটকটি। এ অভিনয় অনুষ্ঠানের উপলক্ষ ছিল স্থানীয় এন সি সি'র বাৎসরিক উৎসব। কুশলী

[illegible] বহু [illegible] পরিবেশন [illegible] লাভ করেছেন। [illegible] ও [illegible]সঙ্গীত [illegible] প্রথম স্থান [illegible]। [illegible] ঘোষাল বহু ছায়াচিত্রে ও নেপথ্যে কণ্ঠদান করার গৌরব অর্জন করেছেন

জালিয়ানওয়ালাবাগ

সম্প্রতি দুর্গাপুরের প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থা সংহতি এঁদের নতুন নাটক 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন সংস্থার নিজস্ব প্রাঙ্গণে। অভিনব বিষয়বস্তু, বলিষ্ঠ বক্তব্য ও মনোগ্রাহী সংলাপে সমৃদ্ধ এ নাট্য-কাহিনীর রচয়িতা রজত রায়চৌধুরী। প্রয়োগ-পরিকল্পনা এবং দলগত অভিনয়-নৈপুণ্যে উপযুক্ত নাট্যাঙ্কণ [illegible] সহায়তা করেছে। বিশিষ্ট একক অভিনয়ের জন্য সুচিহ্নিত হবেন অরুণ দত্ত, নির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন আচার্য ও রমেন চক্রবর্তী।

'সপ্তপর্ণী'র বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ২৬শে জুলাই (শনিবার) ৪৬।২ গড়িয়াহাট রোডস্থ 'সপ্তপর্ণী' ও 'সুরশৃঙ্গার'-এর পরিচালনায়, স্বর্গত অরিন্দম বড়ুয়ার বাৎসরিক জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীঅজিত দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন অভিনেতা শ্রীসৌমিত্র চ্যাটার্জী।

কণ্ঠসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন বাংলার প্রখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনি চট্টোপাধ্যায়, অদিতি ঘোষ, প্রভাত ভট্টাচার্য, সুখেন দাস, পান্না দাস ও ডঃ সন্তোষ মুখার্জী।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনার ভার ছিল প্রফেসর বি চৌধুরী, শ্রীমতী অর্তী [illegible] ও শ্রীঅরবিন্দ বড়ুয়ার উপর।

এই দায়িত্ব তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

ঝিঁঝিপোকার কান্না

গত ১০ই আগস্ট মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে 'প্রতিবিম্ব' গোষ্ঠী অগ্নিদূতের 'ঝিঁঝিপোকার কান্না' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। মেণ্টাল হসপিটাল পটভূমিকায় রচিত একটি রাজনৈতিক নাটক। একটি রাজনৈতিক নাটকের মঞ্চরূপকে সার্থকভাবে উপস্থিত করার জন্য যে শিল্প-বোধ, দলগত গঠনশক্তির প্রয়োজন হয়, এ অভিনয়ে তার অধিকাংশ গুণই বর্তমান ছিল। নাটকটির মঞ্চসজ্জা, পরিবেশ রচনার দিকটি উচ্চ প্রশংসা পাওয়ার মতন। বিশেষ করে আলো-ছায়ায় রচিত মঞ্চমায়ার সঙ্গে আবহ-ছন্দের সহযোগিতা কয়েকটি অপূর্ব মোহ-মুহূর্ত রচনা করেছিল।

চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ করার মতন অভিনয় করেছেন কুমারেশ বন্দোপাধ্যায়-রূপী অসিত সেনগুপ্ত। প্রমোদ কুণ্ডুর 'পরিমল' নাটকের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্রায়ণ। শিল্পী চরিত্রটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করেছেন। পিলু মুখোপাধ্যায়ের 'সহদেব' মনোমুগ্ধকর। 'রবি'-রূপী প্রসাদ কুণ্ডুর অভিনয় ছিল স্বচ্ছ ও সাবলীল। রবীন পণ্ডিত, সজল দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল ঘোষ, অশোক চক্রবর্তী, মৃন্ময় চৌধুরী, ললিল মজুমদার, নেপাল দে, বেণু মল্লিক, দেবদাস রায়চৌধুরী ও প্রকাশ নন্দী অন্যান্য চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন।

তুলনায় স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয়াংশ যথেষ্ট আশাপ্রদ নয়। চন্দ্রকলা শ্রীবাস্তব 'সরমা' চরিত্রে কোনক্রমে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছেন। তাপসী মুখোপাধ্যায়ের 'নূপুর' মোটামুটি উত্তীর্ণ।

নাটকের সঙ্গীত ও পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে দিলীপ ঘটক ও প্রকাশ নন্দী।

অধ্যাপিকা ডঃ সুপ্তি সেন

অধ্যাপিকা ডক্টর সুপ্তি সেন বর্তমান সঙ্গীত জগতের একটি সুপরিচিত নাম। শ্রীমতী সেন শিশুবয়স থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুণিসমাজে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। সঙ্গীতের প্রাথমিক প্রেরণা পান বাবা এবং মায়ের কাছ থেকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি গীতভারতী উপাধি লাভ করেন।

শ্রীমতী সুপ্তি সেন

১৯৬৭ সালে এ্যাবসার্ড নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের উপর থিসিস লিখে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের টপ্পা গান স্পেসালাইজ করতে আরম্ভ করেন। বর্তমানে তিনি উদীচীর অন্যতম শিল্পী। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেশ ভদ্রের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহযোগিতা লাভে ধন্য হয়েছেন। বর্তমানে তিনি নিয়মিতভাবে বেতারের সঙ্গে যুক্ত আছেন। উদীচীর চিত্রকলা বিভাগের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

স্মৃতিরা উজানে

গত ২০শে আগস্ট ১৯৬৯ বিশ্বরূপা নাট্যমঞ্চে রূপাঙ্কন প্রযোজিত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় রচিত 'স্মৃতিরা-উজানে' নাটকটি সাড়ম্বরে মঞ্চস্থ হয়। নাটক পরিচালনায় তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকনাটকে সুপরিচালিত করার জন্যে তিনি যে কঠোর শ্রম স্বীকার করেছেন তা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ, আবহ সঙ্গীতে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন নালু মিত্র। বীণার চরিত্রে শ্রীমতী মায়া ঘোষ সুন্দর অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করতে পেরেছেন। যাদুকরের ভূমিকায় তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা সু-অভিনয়ের অধিকারী তাঁরা হলেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, আশীষ ভট্টাচার্য, তাপসী গুহ, পান্না ঠাকুর, ধীরেন ঘোষ, তারাচাঁদ ভাদুড়ী, দিলীপ দত্ত ও স্বপন রক্ষিত, বিজনের ভূমিকায় শ্যামল রায়চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয়, আলোকসম্পাতে দিলীপ ঘোষ ও বংশী সাউ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্মারক প্রচ্ছদটি অঙ্কিত করেছেন শ্রীকাশীনাথ, প্রচ্ছদ চিত্রটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে।

গোধূলিবেলায়

সম্প্রতি চন্দননগর থিয়েটার সেণ্টারের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে সংঘের তরুণ নাট্যকার শ্রীদিলীপ দে রচিত 'গোধূলি বেলায়' নাটকটি শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে গেল।

নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে যাঁরা দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দুজনার নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য---এঁরা হলেন নাট্যকার দিলীপ দে ও গীতা দে। বিয়োগব্যথাতুর দৃশ্যে এঁদের দুজনার অভিনয় অনবদ্য। এছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কল্পনা ভট্টাচার্য, পান্নালাল চ্যাটার্জী, মৃণাল দত্ত, শৈলেন মুখার্জী, উদয় রায়, অসিত পাল, তপন নন্দী, হারাধন হালদার ও নিতাই দত্ত। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা সন্তোষজনক।

দু'টি মন

বিনয় চট্টোপাধ্যায় কৃত কাহিনী 'দু'টি মন'-এর চিত্ররূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক পীযূষ বসু। কাহিনীর চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীবসু স্বয়ং। চিত্রটির পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছেন অপ্সরা ফিল্মস, মুখ্য দু'টি দ্বৈত ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন। অন্যান্য সহ-চরিত্রে রয়েছেন অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, ছায়া দেবী প্রমুখ। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন নায়িকা স্বয়ং। সঙ্গীতাংশের ভার গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এস এস ফিল্মস-এর চিত্র 'দু'টি মন'।

যদুবংশ

চিত্রপরিচালক শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী বর্তমানে বিমল করের কাহিনী যদুবংশ চলচ্চিত্রায়িত করার ও কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করার ভার অর্পিত হয়েছে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর উপর। একবিত মুভিজের চিত্র যদুবংশ। চিত্রটির প্রধান দু'টি চরিত্রে দেখা যাবে অপর্ণা সেন ও সমিত ভঞ্জকে। চিত্রটির কাজ চলছে। অন্যান্য সহ-ভূমিকাগুলিতে থাকছেন খ্যাতনামা ও স্বনামধন্য শিল্পীরা।

টাকা লোভে

বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা সহ পরিচালক, নৃত্য-পরিচালক এবং সঙ্গীত রসিক রবীন সরকার কিশোরদের জন্য চিত্রটি আকর্ষণীয় করার সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাচ্ছেন। চিত্রটিতে যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁরা হলেন নৃপেন সরকার, ব্রজেন সরকার, শৈলেন সরকার, রবীন ভট্টাচার্য, সুধাংশু সরকার, ডঃ বিরল মল্লিক, শ্রীমতী লক্ষ্মী ভট্টাচার্য, মধুমিতা সরকার, শিশির চক্রবর্তী, ভূপেন সরকার, মাবু চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মিশ্র, দীনেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত লাহিড়ী, বাপ্পা সরকার, অসিত ঘোষাল, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো বহু শিশু-শিল্পী চিত্রে অংশ নিয়েছে। রবীন সরকারের চিত্রটির নাম 'টাকা লোভে।'

মল্লিক পরিচালিত 'এখানে পিঞ্জর' চিত্রের নায়িকা অপর্ণা সেন
চিত্র : [illegible]

মন নিয়ে

সলিল সেন পরিচালিত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুর-সংযোজিত সামাজিক প্রেমের চিত্র 'মন নিয়ে'। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় বিকাশ রায়, তরুণ-কুমার, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল ও দ্বৈত-চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবী ও উত্তম-কুমার। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস। চিত্রটির প্রযোজনায় আছেন গিরীন্দ্র সিংহ। এস এস ফিল্মসের চিত্র 'মন নিয়ে।'

এখানে পিঞ্জর

স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের সামাজিক কাহিনী রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন যাত্রিক গোষ্ঠী, চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ডঃ ভূপেন হাজারিকা। চিত্রটির প্রযোজনায় কলামন্দির। চিত্রটির পরিবেশনায় মিতালী ফিল্মস। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন উত্তম-কুমার, অপর্ণা সেন, ছায়া দেবী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

অপরিচিত

সমরেশ বসুর কাহিনী অপরিচিত চিত্রায়িত করেছেন সলিল দত্ত। চিত্রটিতে সুর দিয়েছেন প্রবীণ সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। চণ্ডীমাতা ফিল্মস চিত্রটির পরিবেশক। চিত্রটির চরিত্র-চিত্রণে বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, অপর্ণা সেন, সন্ধ্যা রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হারাধন ও উত্তমকুমার।

অগ্নিযুগের কাহিনী

মঞ্জুশ্রী বসু ও ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত চিত্র অগ্নিযুগের কাহিনী। চিত্রটির পরিচালনায় ভূপেন রায়। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালক হলেন গোপেন মল্লিক। চিত্রটির কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন বীরেন রায়। চিত্রটির রূপদানে রয়েছেন গীতা দে, বিজন ভট্টাচার্য, জহর রায়, দিলীপ রায়, সুলতা চৌধুরী, বিকাশ রায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ও মাধবী চক্রবর্তী প্রমুখ। চিত্রটির মুক্তি আসন্ন। চিত্রটির নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

ক্যারোল বেকার

—চিত্রপ্রিয়

একরাশ ঘন সোনালী চুল, হৃদয়ে আকুলতা জাগানো মাদকতাময় দৃষ্টি, চিত্তস্পর্শী হাসি—এরই সমষ্টি ক্যারোল বেকার। অঙ্গে প্রত্যঙ্গের উদ্ভ্রান্ত উদ্দাম যৌবনের স্পর্শে যে শিল্পী লাবণ্যময়ী—রূপালী পর্দায় যাঁর আবির্ভাবমাত্রেই দর্শকচিত্তে জাগে হিল্লোল, সেই ক্যারোল বেকার শিল্পী হিসাবে শুধু ছায়াছবিতেই নয়, ছায়াছবির বাইরে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সর্বসাধারণ্যে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অভিনয়ে যে ধারা তিনি বেছে নিয়েছেন, তাতে তাঁকে মেরিলীন মনরো বা জেন ম্যানসফিল্ডের উত্তরসূরী হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। দর্শকচিত্তে এক বিশেষ আবেদন জাগানোর অপূর্ব ক্ষমতা যে ক'জন মোহময়ী শিল্পীর অধিকারভুক্ত, ক্যারোল বেকারের নাম আজ সেই তালিকার পুরোভাগে।

বয়সের বিচারে এখনো চল্লিশের নিচেই আছেন ক্যারোল। ১৯৩১ সালে তাঁর জন্ম। সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মমাস। পড়াশুনাতেও ভালই ছিলেন। সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ। ছোট গল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশী। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে আকর্ষণ। 'কার্পেট বেগার'-এ তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। হ্যারল্ড রবীনসনের বহুজনপঠিত এবং পাঠকসমাজে আলোড়নকারী এই দীর্ঘায়তন উপন্যাসটির নায়িকার ভূমিকায় ক্যারোলের অভিনয় এককথায় অতুলনীয় চরিত্রটিকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর অতুলনীয় অভিনয়ে। 'হার্লো' তাঁর আর একটি অবিস্মরণীয় অভিনয়কীর্তি। বিগতযুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেত্রী স্বর্গতা জীন হার্লোর জীবন-কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত চিত্রে হার্লোর ভূমিকাটি রূপায়ণের ভার তাঁরই উপর পড়ে। এই চরিত্রটিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অনুপম অভিনয়-নৈপুণ্যে। তাঁর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে চেইন অটাম, সিলভিয়া, মিস্টার মোসেস, হাউ দ্য ওয়েস্ট ওয়াজ ওয়োন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী বেকারের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। শিল্পজীবনে তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মানাদি লাভ করেছেন। এই পুরস্কারগুলি তাঁর শিল্পি জীবনের ইতিহাসের বহুলাংশে গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। সঙ্গীতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি উপেক্ষণীয় নয়।

তিনি বিবাহিতা এবং সন্তানের জননী, বর্তমানে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে।

চিত্রাভিনেত্রী ক্যারোল বেকার

বিচিত্র বোম্বাই

রমেন চৌধুরী

নতুনের মোহ যাবার নয়। কিন্তু শুধুই কি মোহ? ওটা যে অপরিহার্য। নতুন না হলে কাঁহাতক পুরোণোকে আঁকড়ে থাকা যায়। সে যে ভারি অসহ্য। একমাত্র রাত্রি কেটে গিয়ে দিনের আলো ফুটে ওঠাটা খুবই পুরোণো জিনিষ, কিন্তু তার প্রকাশটি নিশ্চয় নয়। আজকের প্রভাত গত দিনের সঙ্গে যেমন কোনোদিক দিয়েই এক নয়, আগামী দিনেও তার কোনো সাদৃশ্য থাকবে না। মান্ধাতার আমলের (কতো সহস্র মান্ধাতা যে এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন তার হিসেব কোথায়?) সূর্যদেবই একমাত্র পুরোণো যা পরিত্যক্ত হবার নয়। খাবার-দাবারের কথা যদি ধরা যায় তা হলেও বলা চলে গুরুদেবের উক্তি স্মরণ করে—ফজলি তর আমের বদলে নতুন বাজার থেকে আতা সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ, যতোই কেন কুলীন খাদ্য চিকেন রয়েল পাতে পড়ুক না, পর পর মাসখানেক গলাধঃকরণ তার সম্পর্কেও ঔদাসীন্য আসতে বাধ্য। তখন নাকে রুমাল চাপা দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সেই রকম একই চেহারা ছবিতে দেখে দেখে আমাদের চোখ যখন ক্লান্ত, মন বেশ কিছুটা উত্ত্যক্ত তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগায় নতুন মুখশ্রী। ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। বাংলা দেশে ক্বচিৎ কখনো নবাগতের পদধ্বনি শোনা যায়। কখনো তা বাতাসে ভর ক'রে ভেসে যায় কোন দূরান্তে। মানে—যদিই বা নতুনের আগমন সূচিত হোলো তাকে ধরে রাখা গেল না। জনতার আদালতের রায় তার বিরুদ্ধাচরণ করলো। নতুন হলেই তো হবে না, যোগ্যতা থাকা চাই যে সর্বাগ্রে।

বোম্বাই এ ব্যাপারে কিন্তু খুবই ভাগ্যবান। সেখানে নায়িকা আবিষ্কার যেন প্রাত্যহিক ঘটনা হ'য়ে উঠেছে। পর পর এসে দাঁড়াচ্ছে নতুন মুখ, জয় করেও নিচ্ছে বৈকি দর্শকচিত্ত। অভিনয়েচ্ছুর দল ওখানে নিশ্চয় খুবই আছে, তারা মাকালফল নয়, এই যা তাই তো সহজেই বিকল্প ব্যবস্থা চালু হ'তে পারছে। আজ বোম্বাইয়ে বৈজয়ন্তীমালা, ওয়াহিদা, মালা, নূতন সাধনা, আশা পারেখের দেখা মিলছে ক'টা ছবিতে? তাঁরা যে একেবারে গুডবাই করেছেন তা বলছি না, তাঁরা আছেন, কিন্তু তাঁদের সে রমরমা আর নেই। ক' বছরের হিসেব মিলেই সত্যটা ধরা পড়বে সহজেই। এখন তাঁদের সুখের শরৎকাল শেষ হয়ে এসেছে। তাঁদের জায়গায় নবাগতার কতোই না হুড়োহুড়ি—ববিতা, লীনা, চন্দ্রভারকার, জাহিদা, বৈশালী, অঞ্জনা, বন্দনা, সুরেখা, আশা নাদকারনি, হেমা মালিনী, রাখী, অপর্ণা, সুমিতা প্রমুখ। শেষের তিনজন অবিশ্যি বাংলার নায়িকা, বোম্বাইয়ে এখন পসার জমানোর সোনার সুযোগের সন্ধানী। কিন্তু হেমা মালিনী তো সবাইকে টেক্কা

বাইরের [illegible] চিত্রে অশোক বাগচী, সুচিত্রা রায় ও [illegible] দেবী

মেরেছেন, তাঁর ছবি তখনো স্টুডিওর চার দেয়ালের বাইরে বেরুতে পারেনি তখন থেকেই তিনি স্টার বনে গেছেন। এটা দুর্লভ সৌভাগ্য সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি যে দরের শিল্পী তার প্রমাণ দিয়েছেন 'সপ্নোঁ কা সওদাগর'-এ। তাঁর চেহারায় বৈজয়ন্তীর ছাপ থাকলেও প্রকৃতই তিনি অসাধারণ হতে পারবেন অবিলম্বে।

ওদিকে নায়কের রাজ্যে দৃষ্টিপাত করলে ঠিক অতোটা না হলেও সেখানেও দৃশ্যটা আশাব্যঞ্জক। ওখানে নিউ ফাইও রয়েছেন জিতেন্দ্র, সঞ্জয়, সঞ্জীব, বিশাল, আনন্দ, দেব মুখার্জী, ডাব্বু (রণধীর), সোম দত্ত। হালফিল বাঙলার মনীষ (অসীমকুমার) যোগ দিয়েছেন ম্যারাথন রেসে। দূরপাল্লার এই দৌড়ে কয়েকজন বাজী জিতবেনই —এটা অবধারিত। দেখা যাক তাঁরা কারা।---

এখানে একটা কথা আছে— নায়িকাদের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারছে তার কারণ তারা ছবিতে যে ভাবে এক্সপোজড হতে পারে, ছেলেদের সে সুযোগ কোনোদিনই নেই। যে নায়িকা যতো এ ব্যাপারে দরাজ হাতে সহযোগিতা করছে তার প্রসপেক্ট ততো বেশী। এখন আবার খোসলা কমিটির বদান্যতায় নগ্নতার বাধাবন্ধহীন উপস্থিত ঘটবে ছবিতে। সেই চুম্বনের চুম্বক কতো অপরিণত-পরিণত দর্শক চিত্তকে লোহার মতো আঁকড়ে ধরবে তার হিসাব এখনি দিতে পারছি না।

তবে আর সাগরপারের মুখ চেয়ে থাকার দিন অস্তে গেল বলা যায়। ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা সিনে ক্লাবের পসারেও ভাটা নামবে কিছুটা, ভারতীয় সেন্সার প্রথার হাস্যকর কাণ্ডকারখানা এবারে নতুন খাতে বইতে পারবে।

বেশ মনে পড়ে বছর সতেরো আগের একটি ঘটনা। ব্যাপারটা ঘনঘটা হয়েছিলো একটা ছবিকে নিয়ে। সেটি শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলে। বিন্দু গভীর মমতায় ছেলেকে এক জায়গায় আশীষ চুম্বন দিচ্ছেন—পকেটমারের কাঁচির চেয়েও নির্মম সেন্সারের কাঁচি এগিয়ে এলো মা-ছেলের এই স্বর্গীয় অভিব্যক্তিতে বাধা দিতে। জল তোলপাড় হয়ে উঠলো। রিলিজের ঠিক মুখেই এই ঘটনা, আমরা তো সবাই নিদারুণ বিপন্ন (বলা বাহুল্য, ও ছবির সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিলো), শেষ কালে একটা রফায় রাজী হ'তে হোলো। সেন্সার কর্তৃপক্ষ চুম্বন দেখাতে দিলেন কিন্তু উদ্যোক্তাদের জব্দ করতে শব্দটা বাদ দেয়ালেন। আর আজ? তার চেয়ে কতো ন্যক্কারজনক দৃশ্যই তো এখানকার ছবিতে অবাধে দেখানো চলছে। তার ওপর যত্রতত্র চুম্বন, নগ্নমূর্তিও দেখতে পাওয়া যাবে। কি বললেন, এখনও তো ওটা সুপারিশের আকারে রয়েছে? রহ ধৈর্যং। ওটা পার্লামেণ্টের সনদ পেল বলে। অবিশ্যি একটা আশা আছে—বাঙলা দেশের জলহাওয়ায় এই দুটি জিনিষই সহ্য হবে না। রুচিবান দর্শককুল এবং শিল্পীরা জীবনপণে লড়বেন। লেট আস ওয়েট এণ্ড ওয়াচ।---

●

ধর্মেন্দ্র, অনুজ, কুমার অজিত এবার চিত্রলোকে দর্শন দিতে আসছেন। যে-সে ভূমিকায় নয়—একেবারে নায়ক

মমতাজ

হুপে। দাদার সহায়তা পেলে এবং ভগবানের জোর থাকলে প্রথম দর্শনেই অসাধ্যসাধন করা কিছু দুরূহ কর্ম নয়।

মুভি ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনালের রঙিন ছবি 'মিঠে বোল'-এ তাঁর সুর আর বোল দুই-ই দেখা শোনা যাবে। তাঁর বিপরীতে নায়িকা হচ্ছেন কানন কৌশল। কাহিনী রচনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন সুখদেব। নতুন সুরকার কমল রাজস্থানীরও আত্মপ্রকাশ হচ্ছে এ ছবিতে।

●

প্রতিভা ইলেকট্রিসিটির মতোই —আলো জ্বালায়, ট্রেন চালায়, পাখা ঘোরায়, আরো কতো কী-ই না ক'তো থাকে। প্রতিভার অবদানও সর্বঘটে দেখা যায়। দেখুন না প্রতিভাময়ী লতা মুঙ্গেশকরকে—শ্রীমতীর সুকণ্ঠের তুলনা সহজে দেওয়া যায় না। সে চেষ্টা না করে বলি ওঁর সর্বাধুনিক কৃতিত্বের কথা। আপনারা অনেকেই বোধ হয় জানেন না মারাঠি ছবির সুর-সংযোজনায় সম্প্রতি 'আনন্দঘন' নামে যে সুর-সংযোজক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পর্যন্ত করায়ত্ত করেছেন—তিনি আসলে শ্রীমতী লতাই। ইতিমধ্যে চারখানা ছবিতে সুর দেওয়া হয়ে গেছে, সবগুলিই দর্শকদের উচ্চ প্রশংসার ধন্য হয়েছে। তার মধ্যে 'সাধী মানসি'র প্রশংসা এতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হোলো যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এসে ধরা দিলো। অবশ্য ছদ্মনামের আবরণ অনেক আগেই খসে গেছে উৎসাহী ফ্যানদের কাছে। এবারে লতা স্বনামে হিন্দী ছবিতে সুর দিতে সম্মত হয়েছেন। একাধিক খ্যাতনামা প্রযোজকের অনুরোধেই শ্রীমতীর এই সিদ্ধান্ত।

ভালো কথা, খুব ভালো কথা। লতা মুঙ্গেশকর সুর-সরস্বতীর অকৃপণ করুণায় কৃতার্থ হোন—তার প্রত্যক্ষ ফল দেশের সঙ্গীত-উৎসাহী মানুষরা লাভ করুন সদা সর্বদা কামনা জানাই।

●

কারুর মৃত্যুর গুজব রটলে শুনেছি তাঁর পরমায়ু অনেক বেড়ে যায়। আশা করি দেব আনন্দের ক্ষেত্রে তার পরম শুভ ফল পাওয়া যাবে। শিল্পীরা তো অমর, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 'কীর্তির্যস্য স জীবতি' তো আর মিথ্যে নয়। কিন্তু দৈহিক-মৃত্যুও এ শিল্পীর বহু যুগ পরে যেন আসে।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সেদিন মাঝরাতে বোম্বাইয়ে খবরের কাগজের দপ্তরে দপ্তরে একের পর এক ফোনের ঝঙ্কার। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চান দেবআনন্দের কথা যাঁর সম্পর্কে সে-রাতে সকলের অতো হাঁপা-

রাখি চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে
চিত্র : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঁপি তিনি অর্থাৎ শ্রীদেব আনন্দ মহান ভবিষ্যতে মস্কোয় বসে আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবের জুরির কাজ করে চলেছেন।

●

কওয়ানা ফিল্মস লিমিটেড—এক চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান। সব গঠিত যে তাতে কোনো ভুল নেই। এটি গড়ে উঠেছে লণ্ডনে। উদ্যোক্তা কয়েকজন ভারতীয় ও পাকিস্তানী যুবক। এঁরা নানান ছবি তুলবেন। অচিরে যে ছবি এখান থেকে তোলা তার নাম : 'ভাগরে ভাগ'। উর্দু ভাষায় গৃহীত হবে। এই কমেডি চিত্রের নায়িকা হবেন ঢাকার স্বনামখ্যাতা অভিনেত্রী সুশ্রী। অন্যান্য চরিত্রে দেখা দেবেন শীরা, চিনা, সাধনা, ওয়াজিদ এবং হরবিন্দু। আবদুল কয়ুম ছবিটির পরিচালক।

●

শ্রীকামাল আমরোহী স্বনামধন্য ব্যক্তি এখানকার চিত্রজগতে। তাঁর 'পাকিজা'র কাজ নতুন করে এগিয়ে চলেছে মীনাকুমারীর বদান্যতায়। তাঁর খেয়ালেই কয়েক বছর আগে ছবিটি কিছু পথ পাড়ি দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো, আবার তারি সুমতিতে নতুন উত্তেজনায় শেষ হবো-হবো করছে।

এ-হেন কামাল আমরোহী সম্প্রতি আবার অখ্যাত হয়েছেন। বোম্বাইয়ের এসপ্ল্যানেড কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এন এম ধ্রুব মহল পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও পাকিজা ছবির নির্দেশককে (শ্রীকামাল আমরোহীকে) মোটা অর্থ জরিমানা করেছেন। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার চেষ্টার জন্যেই এই অর্থদণ্ড। কর্মচারীদের বেতন আংশিক কেটে সরকারকে পুরোপুরি দেখাতে গিয়েছিলেন শ্রীআমরোহী। সে প্রয়াস সফল না হওয়ার এই বিপত্তি। তবে তথাকথিত খ্যাতনামাদের এতে কিছু আসে যায় না। এ-ও তো এক ধরণের নাম।

●

অসিত সেন এবার বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তাঁর প্রথম বাংলা ছবি 'চলাচল'-এর হিন্দী রূপ দেবার উদ্যোগ আয়োজন সমাধা করেছেন। ওখানকার কয়েকজনকে নিয়েই সফল করে তুলছেন তাঁর বহুদিনকার সাধ। ছবির নামকরণ হয়ে গেছে—'সফর'। চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে খুব শীগগিরই। চরিত্রলিপিতে থাকছেন অশোককুমার, শর্মিলা ঠাকুর (?), রাজেশ খান্না, ফিরোজ খান, আই এস জোহর প্রমুখ।

ডীন মার্টিন

সহজাত অভিনয়-প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরদত্ত এক অসামান্য কণ্ঠসম্পদও যাঁদের সাধারণ্যে বিপুল প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এবং যাঁদের শিল্পিখ্যাতি এক সুদৃঢ়-ভিত্তিক করে তুলেছে, ডীন মার্টিন সেই তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। অভিনেতা হিসাবেও যেমনই তিনি অনন্য, গায়ক হিসাবেও তেমনই তিনি অতুলনীয়। অভিনয়রসিকদেরও যেমন তিনি প্রকৃপণধারায় আনন্দ যুগিয়েছেন, আর সুরপিপাসুদের মনও তেমনি ভরিয়ে তুলেছেন কানায় কানায়।

বাহান্ন বছর বয়েস হল। এখনও তারুণ্যের উজ্জ্বল ছোঁয়ায় ভরপুর। বার্ধক্য এখনও যেন যোজন যোজন দূরে। জীবনের সুদীর্ঘকাল একটি জুটির অন্যতম হিসাবে ছায়াচিত্রজগতে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর দোসর ছিলেন বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা জেরি লিউইস। মার্টিন লিউইস বহুকাল ধরে চিত্রামোদীদের প্রাণ ভরিয়ে এসেছে। জুটির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাঁর আপন প্রতিভা ও মেধার স্ফুরণে কোন প্রতিবন্ধকতা আসে নি। আপন ব্যক্তিত্বেই তিনি যেন উজ্জ্বল। তাঁর একক বৈশিষ্ট্য জুটির মধ্যে কোনদিনই হারিয়ে যায় নি।

১৯১৭ সালে তাঁর জন্ম। প্রথম যৌবনেই অভিনয়-জগতে পদার্পণ। লিউইসের সঙ্গে জুটি ভেঙে যাওয়ার পর কিছুকাল ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার জুটি হিসাবে তাঁকে ছবির রাজ্যে দেখা গেল। একক হিসাবে তিনি যা রোজগার করছেন দেখা যাচ্ছে জেরির বা সিনাত্রার আয়ের তুলনায় অনেক বেশী। সারা বছরে আজ তাঁর রোজগার পঞ্চাশ লক্ষ ডলার।

এক দুর্দান্ত গতির অধীশ্বর ডীন। থেমে থাকা তাঁর অভিধানে নেই। এক অদম্য গতিবেগে তিনি ভরপুর। এখানে তাঁর সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র সর্বগ্রাসী প্রচণ্ড ঝড়ের। কি কথোপকথনে, কি পানভোজনে, কি রমণীয় নারীসঙ্গে সব ক্ষেত্রেই তাঁর ভিতর এই দুর্বার গতির প্রাচুর্য লক্ষণীয়।

ডীন মার্টিন
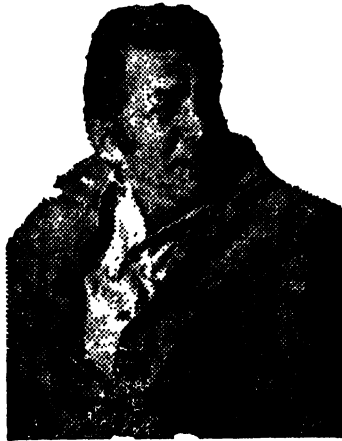
ভোর ছ'টায় ওঠেন ডীন মার্টিন। উঠেই চললেন বেল এয়ার কান্ট্রি ক্লাবে গলফ খেলতে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা তাঁকে প্রতিহত করতে পারে না। এ নিয়ম থেকে একদিনও তাঁকে বিচ্যুত দেখা যায় নি। কাজ সেরে যখন বাড়ী ফেরেন—কখনও একা থাকেন না। কোন কোন বন্ধু থাকবেনই—এ বাঁধা নিয়ম। কাজের সময় ছাড়া অন্য সব সময়ে তাঁকে দেখা যায় হয় গান গাইতে, নয় জমিয়ে গল্প-গুজব করতে। চুপচাপ থাকার লোকই তিনি নন।

তাঁর অভিনীত অসংখ্য ছবির মধ্যে ফোর ফর টেক্সাস, ব্যাণ্ডেলেরো, কাইণ্ড কার্ড স্টাড, হাউস অফ সেভেন জয়েস প্রভৃতি উল্লেখনীয়। তাঁর গাওয়া 'এভরিবডি লাভস সামবডি' এক কথায় অবিস্মরণীয়।

জিনি তাঁর দীর্ঘকালের সহধর্মিণী। বহু সন্তানের তিনি জনক। সম্প্রতি অভিনেতা রবার্ট মিচামের ছেলের সঙ্গে ডীন এবং জিনি তাঁদের বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

ডীন স্বপ্নবিলাসী। অবসরের কথা উঠলে রেগে ফেটে পড়েন—তাঁর বক্তব্য ৯৬ বছর তিনি বাঁচবেন এবং অভিনয়রত অবস্থাতেই মরবেন। জীবন-পিপাসু রসের পূজারী শিল্পীর এই নিটোল স্বপ্ন আক্ষরিকভাবে কতখানি বাস্তবে পরিণতি লাভ করবে, তা একমাত্র জিনি জানেন—তিনি অন্তর্যামী।

—চিত্রমিত্র
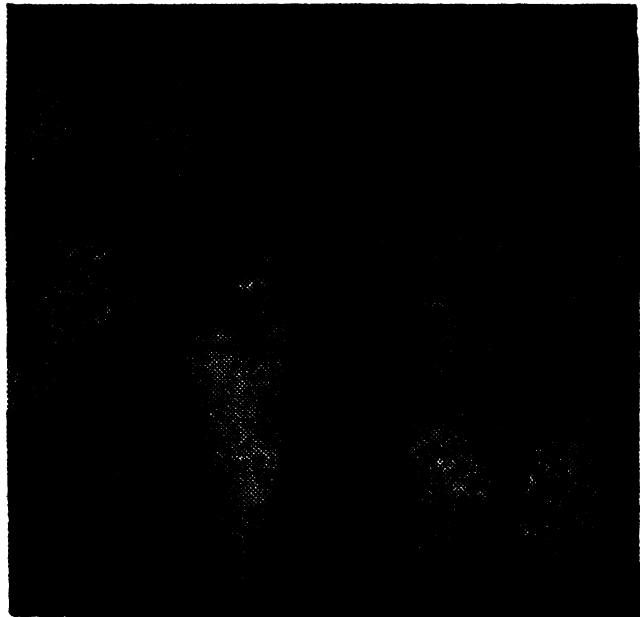
সহধর্মিণী জিনির সঙ্গে ডীন মার্টিন

মোহময়ী শিল্পী জেন ফণ্ডা

শিল্পী পরিবার : হেনরি, জেন, পিটার

সেকালের ব্যারিমুররা, একালের কণ্ডারা পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র জগৎ সামগ্রিকভাবে যে কটি পরিবারের সাধনায় সমৃদ্ধ—এ দুটি পরিবার সেই তালিকায় বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। ফণ্ডা পরিবারের একাধিক প্রতিনিধি বিদেশের চিত্রজগৎকে সেবা করে জগৎজোড়া যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই তালিকায় প্রথম নাম হেনরি ফণ্ডা। এই বিখ্যাত শিল্পীর পুত্রকন্যা—পিটার ও জেন—পরবর্তী-কালে দেখা গেল দিকপাল পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। হেনরি কন্যা জেন একালের জনপ্রিয় এবং লোকচিত্তরঞ্জিনী শিল্পীদের মধ্যে পুরোভাগেই আজ নিজের আসন করে নিয়েছেন।

নিউইয়র্ক শহরে ১৯৩৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। হেনরির দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জেন ও পিটারের জন্ম। বারো বছর বয়সে জেনের মা এক স্যানিটোরিয়ামে আত্মহত্যা করেন। বাবার আদুরে মেয়ে জেন—বাবা ডাকেন 'লেডী' বলে। ছোট বয়সে জেন জেদ ধরলেন একটি ভালো পোষাকী নাম চাই। 'লেডী'। তিনি বাবার কাছে এবং বাবা যে নামে তাঁকে ডাকেন সেই নামে সকলে তাঁকে ডাকবে। এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না। নাম হল—জেন। আজ পৃথিবীর অসংখ্য লোকে এই নামেই তাঁকে চেনে। স্কুলের পড়া ভাল লাগল না জেনের। তিনি ঢুকলেন এক আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখতে। তারপর ফ্যাশান মডেলের কাজ নিলেন।
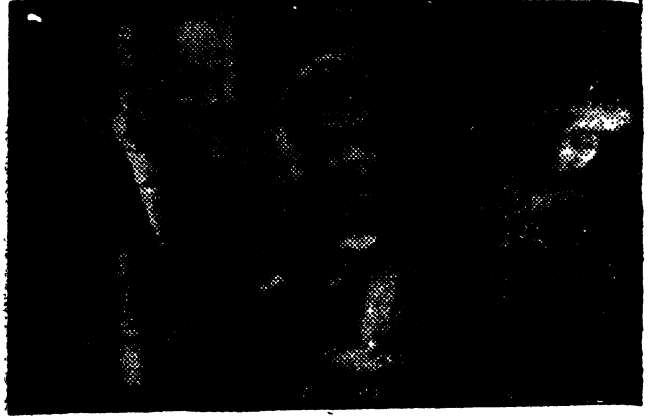
পারিবারিক বন্ধু যশ লোগান 'স্টল স্টোরি'-তে জেনকে চিত্রাবতরণের সুযোগ দিলেন। ১৯৫৭ সালের জুন থেকে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী জেনের কাটল প্যারিসে। স্টল স্টোরির পর অনেকগুলি ছবিতে আজ পর্যন্ত যাঁকে দেখা গেছে এবং ভবিষ্যতেও আরও বহু ছবিতে এই সাড়াজাগানো, মোহময়ী শিল্পীকে দেখা যাবে। তাঁর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে দ্য চ্যাপম্যান রিপোর্ট, এ ওয়াক অন দ্য ওয়াইল্ড সাইড, পিরিয়াড অফ এ্যাডজাস্টমেন্ট, ফান কাপল লাভ কেজ লা রন্দে (সার্কেল ইন লাভ), বারবারেলা প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়।

কিছুকাল অভিনেতা এ্যাফ্রেন জিম্বলিস্টের সঙ্গে তিনি গভীর প্রণয়ে মেতেছিলেন। 'ফান কাপল'-এর পরিচালক আঁদ্রে ভসিনাকে তাঁর ভাবী স্বামী বলে অনেকেই অনুমান করে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিজিত বার্দোর ভূতপূর্ব স্বামী রজার ভাদিমকেই তিনি স্বামীরূপে বরণ করলেন, বিয়ে হল ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে। কিন্তু ভাদিমের সঙ্গে একত্রে বসবাস তিনি সুরু করেছেন দুবছর আগে। ভাদিমের অনেক ছবিতে নায়িকারূপে তাঁকে দেখা গেছে। বর্তমানে জেনের পারিশ্রমিক প্রতি ছবিতে দশ লক্ষ ডলার।

—চিত্রপ্রিয়

স্বামী রোজার ভাদিমের পরিচালনায় অভিনয়রতা শিল্পী জেন ফণ্ডা

অরণ্য-দেবতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোন লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারিদিকে অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ সুযোগে বনলক্ষ্মী তার দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারিদিকে তার তৃণশস্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হ'ল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হ'ল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন ক'রে। তখনো জীবের আগমন হয় নি; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড় দান অগ্নি, সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে হরণ করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজো সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হতে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী; যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হ'ল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন ক'রে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরী করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন, যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণ-পাঠকমাত্রেই জানেন যে, এককালে এই অঞ্চলটি ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর-ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল।

মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে,—এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না; এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য
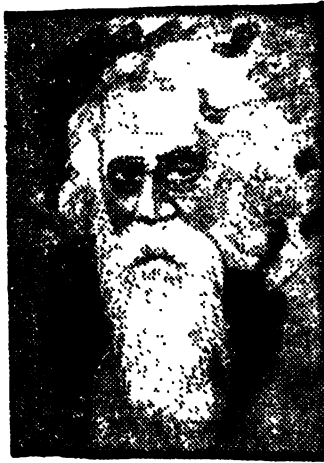
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল দিন তাঁর ছায়া।

এ-সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্য-সম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড় বড় বন ধ্বংস করা হয়েছে, তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারিদিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন—মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস ক'রে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে, বায়ুকে নির্মূল করবার ভার যে গাছ-পালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয় তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ—হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন, অন্নের জন্য শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।

শ্রীনিকেতন

১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৫, [বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]

সম্পাদকীয়

যুক্তফ্রণ্টের অবদান—বাঙালী নিধনযজ্ঞ

যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াদি কেবল পুরাকালেরই অনুষ্ঠানাদির অঙ্গভুক্ত বলিয়া এখনকার দিনে যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে গুরুতর ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি তৎকালীন ধর্মগ্রন্থ বা সমাজচিত্রগুলির মধ্যে এই জাতীয় যজ্ঞক্রিয়ার বহু উল্লেখ পাওয়ায় ইহাই প্রতিভাত হয় যে, এই জাতীয় ক্রিয়াদি সেকালের জাতীয়-জীবনে সবিশেষ প্রচলিত ছিল এবং আমাদের সমাজে এক বিশেষ মূল্য বহন করিত। একালে ইহা প্রায় অবলুপ্ত বলিলেই চলে, কখনো কখনো সাধু-সন্তদের সমাজে এই জাতীয় ক্রিয়া বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—এ-জাতীয় ধারণারই বশীভূত আমরা এতদিন ছিলাম, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মর্মোদ্ধার করিয়া এখন সেই ধারণায় আমাদের পরিবর্ত্তনের রঙ লাগাইতে বাধ্য হইতে হইতেছে। দেখা যাইতেছে সেকালের রাষ্ট্রনায়কদের ন্যায় একালের রাষ্ট্রনায়করাও (বিশেষত এই হতভাগ্য পশ্চিম বঙ্গের) রীতিমত যজ্ঞক্রিয়ায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ-যুগের চেহারা ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, ভাবধারা ভিন্ন। কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-অনুভূতি প্রভৃতি সহজাত বৃত্তিগুলি যেমন চিরন্তন—নানা যুগের সেতু, সন্ধিলগ্ন অতিক্রম করিয়াও মানুষ হৃদয়ের এই চিরন্তন বৃত্তিগুলি অটুটই থাকে, তেমনই যজ্ঞাদিক্রিয়াও দেখা যাইতেছে একালের রাষ্ট্রনায়কদের দ্বারাও (আবার বলি, বিশেষত পশ্চিম বাঙলায়) সমপরিমাণেই উৎসাহিত হইয়া চলিতেছে। শুধু প্রকার-ভেদ মাত্র। নামটুকুই বা পরিবর্তিত।

সেদিন ছিল অশ্বমেধ, রাজসূয়, এখনকার যজ্ঞের নাম লিখিতভাবে ঘোষিত না হইলেই তাহা নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। এই যজ্ঞের নাম বাঙালী নিধন। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে এই যজ্ঞ যে এমন চরমে উঠিবে বা এতখানি ব্যাপকতা লাভ করিবে কিছুকাল পূর্বে তাহা হয়তো স্বপ্নেও অনুমিত হয় নাই। নানা ক্ষেত্রে, নানা পরিসরে এই যজ্ঞের পরিব্যাপ্তি কল-কারখানা, জমি, ভেড়ী প্রভৃতি আজ প্রকৃতপক্ষে বাঙালী নিধনের এক একটি যজ্ঞমঞ্চে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম বাঙলার রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার যাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষণতায় এই যজ্ঞ ক্রমশই আজ স্ফীতিলাভ করিতেছে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আজ যে সকল কার্যাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার মূল পরিণতি বাঙালী নিধন। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমন অবস্থার চাপে পড়িতেছে, যাহার ফলে তাহাদের দ্বার বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে, কারবার গুটানো ছাড়া আজ তাহাদের সম্মুখে অন্য কোন পন্থা মিলিতেছে না। এই কারবার গুটানোর সামগ্রিক ক্ষতির কোপটা বাঙালীর স্কন্ধেই পড়িতেছে। তাহার ধাক্কা সামলানো বাঙালীর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

জমি দখল লইয়া সমগ্র ঘটনা যে গতিপথে আজ পরিচালিত হইতেছে তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। দরিদ্র চাষীরা জমি পাক এ-কামনা আমরা নিশ্চয়ই করি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া সহস্র দুর্ভোগের মধ্যে কঠোর শ্রমের মাধ্যমে যাহারা আমাদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলিয়া দিতেছে—তাহাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আমাদের নিয়ত কাম্য কিন্তু সেই কল্যাণ সাধনের দোহাই পাড়িয়া রক্তক্ষয় এবং লোকনাশ কোন যুক্তিতে সমর্থন করা যায়? ইউনিয়ন দখল লইয়াও যে বিপর্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহাও এই নিধন-যজ্ঞকে আরও তেজোদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

বাঙালী জাতির দুর্ভাগ্য অবশ্য নিত্য সঙ্গী। যেদিন থেকে তাহার ইতিহাসের উদ্ভব দেখা যাইতেছে শত-সহস্র গৌরবমুখরিত পথে তাহার পদক্ষেপণ ঘটিলেও দুর্ভাগ্যের ধারা-স্নান তাহার ভাগ্যে কখনও বন্ধ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে শত-সহস্র দুর্ভাগ্যের পুঞ্জ অতিক্রম করিয়াও বাঙালী তাহার কীর্তির এবং গৌরবের মশালটি উচ্চে বিরাট মহিমায় প্রজ্বলিতই রাখিয়াছেন। চরম সর্বনাশের ভয়াল হুংকারী এই মহিমান্বিত জাতিকে অবলুপ্তির গর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ছাড়াও বহু প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় এই দেশের উপর ধ্বংসের তুফান বহাইয়া দিয়াছে। তথাপি বাঙালী জাতির অস্তিত্ব আজও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। বিধাতার অসীম করুণায় সকল দুর্যোগই সে কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে।

বাঙলার অবিস্মরণীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি বিখ্যাত কবিতার দু'টি পংক্তি এই প্রসঙ্গে আজ বিশেষভাবে আমাদের স্মৃতিতে ঝড় তুলিতেছে।

'মন্বন্তরে মরি নি আমরা
মারী নিয়ে ঘর করি।
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশীষে
অমৃতের টিকা পরি।'

ললাটে লেপিত বিধাতার আশীর্বাদের অমৃত টিকার কল্যাণে যে জাতি মন্বন্তরেও মরে না, মহামারী লইয়া যে নিত্য ঘর করে তাহার একেবারে অবলুপ্তি হওয়া পর্যন্ত সেই জাতিভুক্তই কতিপয় রাজনীতিকদের সম্মেলনে গঠিত যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে আদৌ পারিবেন কি না—সে প্রশ্নের উত্তর দাবী করিলে আশা করি নিশ্চয়ই আমাদের কোন গর্হিত মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে না।

যুক্তফ্রণ্টের অবদান—খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য

ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুধাবন করিলে বর্তমানের পটভূমি হইতে দেখা যায় যে, কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্বে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হইল যাহাতে দেশবাসীর নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম করিল। রাজ্য লাভের একটি বৎসরও পূরে অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই তিনি এমন ভয়াবহ অত্যাচারের নজীর রাখিতে লাগিলেন, যাহার জন্য দেশবাসী বাধ্য হইয়া এই পঁচিশ বৎসর বয়স্ক অত্যাচারী স্বৈরাচারী শাসনের হাত হইতে কোনপ্রকারে নিষ্কৃতি পাওয়ার লোভে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার হইতে আগত বণিক ইংরাজকে রাজদণ্ড গ্রহণে সহায়তা করিতে বাধ্য হইল।

সিরাজের অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসেও অনুপস্থিত নয় এবং সেদিন যাঁহারা ইংরাজকে গদীনসীন হইতে সহায়তা করিয়াছিল তাহা ইংরেজ-প্রীতির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নয়, বরং এই অপরিণতবয়স্ক স্বেচ্ছাচারী নবাবের অত্যাচার হইতে যে-কোন প্রকারে রক্ষা পাওয়ারই উদ্দেশ্যে—একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই তাহা বোঝা যায়।

কিন্তু ইংরাজ গদী লাভের পরই [illegible] যে অত্যাচারে এবং শোষণে সিরাজের তুলনায় তাহাদের রেকর্ডও কোন অংশে কম নয়। তাহার পর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইল—বহু সংগ্রাম, বহু রক্তপাত, বহু সাধনার বিনিময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিল, কংগ্রেস ক্ষমতালাভ করিল। কংগ্রেসী শাসনও ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। কংগ্রেসের অযোগ্যতায়, অপদার্থতায়, অনাচারে হতভাগ্য পশ্চিম বাঙলার আবার যখন নাভিশ্বাস উঠিতে আরম্ভ হইল তখন পুনর্বার রাজনৈতিক জগতে ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তিই ঘটিতে আরম্ভ হইল।

সেদিনও যেমন সিরাজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বাধ্য হইয়া নিরুপায়ে ইংরাজকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, সেই পরিস্থিতিতেই বাঙালী কংগ্রেসী কুশাসন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার লোভে যুক্তফ্রণ্টের প্রসারিত কণ্ঠে জয়মাল্য দুলাইয়া দিল।

ইতিহাসের বারবারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। এখানেও আবার তাহা ঘটিল। জয়লাভের পূর্বে যুক্তফ্রণ্টের প্রার্থী জনকল্যাণের যে সব বড় বড় বুলি আওড়াইয়াছিলেন, উত্তেজক বক্তৃতার বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, নানা সুখের স্বপ্ন দেখাইয়া আসর মাৎ করিয়াছিলেন, সে সব প্রতিশ্রুতি রক্ষার অভিপ্রায় ক্ষমতা-প্রাপ্তির পরমুহূর্তেই তাঁহাদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আর হতভাগ্য জনগণ, তাহাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে বলিলেও সব বলা হয় না—বরং তাহারা যে অত্যাচারের শিকার ছিল দেখা গেল যুক্তফ্রণ্টের কল্যাণে তাহারা আরও চতুর্গুণ অত্যাচারের নাগপাশে আবদ্ধ হইল। তবে, ইহা সুদীর্ঘকালের কথা নয়, এমন কি পাঁচ বৎসর পূর্বেরও কথা নয়। তাই গদীপ্রাপ্তির পূর্বে যুক্তফ্রণ্টের নায়করা যে সব গালভরা স্তোকবাক্য শুনাইয়াছিলেন তাহার কণামাত্রও যদি তাঁহারা পালন করিতেন তাহা হইলেও অন্ততঃ বলা চলিত কিছুটা তাঁহারা করিয়াছেন।

কিন্তু বাঙালীর সে আশাতেও তাঁহারা ছাই দিলেন। বরং কংগ্রেসের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচার বাড়াইয়া তাঁহারা যে কংগ্রেসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেইদিক দিয়া এই কথাটি প্রমাণ করিলেন।

লজ্জার কথা, বেদনার কথা, মানুষের ক্ষুধার জ্বালা ইঁহাদের জনদরদী (?) মনে তিলমাত্র রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় না। তা যদি হয়, তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের এ অগ্নিমূল্য কেন? এই আকাশচুম্বী বাজার দর ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা নামাইতে পারেন না—এই মন্তব্য যদি কেহ করেন তবে তাঁহাকে [illegible] বিকৃত-[illegible], না [illegible] [illegible] দালাল

বলিয়া অভিহিত করিলে অন্যায় বা ভুল কোনটাই হয় না। সেই সব গাল-ভরা আশার বুলি এখন কোথায় গেল। এত রকম জনকল্যাণমূলক প্রতিশ্রুতি কি কর্পূরের মত উবিয়া গেল? প্রতিদিন জঠরাগ্নি নিবারণের জন্য মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে যে ভয়ঙ্কর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় জানি না বহু প্রহরীবেষ্টিত রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সুরক্ষিত কক্ষে আরামদায়ক গদীআঁটা কেদারায় উপবিষ্ট মন্ত্রীমহোদয়দের কর্ণকুহরে উপনীত হয় কি না। মূল্যবান এবং ধনিক সম্প্রদায়ের খাদ্য ছাড়িয়াই দিতেছি, যাহাদের সংখ্যা সর্বাধিক—সেই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের আজ শাক-সব্জী সংগ্রহ করাও যে কি দুরূহ ব্যাপারে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা কি কোন মহল হইতে এই জনগণেরই ভোটে বিজয়ী মন্ত্রী-মহোদয়ের নিকট পৌঁছাইতেছে না। মাছ, মাংস, ডিম পরের কথা। শাকপাতা সংগ্রহ করিতে যদি মানুষের কাছে আজ বিরাট বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অনাহার, অরন্ধন আর কতদূরে?

ঠিক দুইশত বৎসর পূর্বে ১৭৬৯ সালে বাংলা ১১৭৬ অব্দে বাঙালীকে উপবাস বরণ করিতে হইয়াছিল, সেদিন খাদ্য ছিল না, তাই উপবাস—কিন্তু আজ, চোখের সামনে খাদ্য অথচ আকাশচুম্বী দর—সাধারণ মধ্যবিত্তের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সভ্যতার ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বড় ট্র্যাজেডি আর কি থাকিতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনার বাইরে।

সারা দেশে যখন এই ভীতিপ্রদ অবস্থা—আশ্চর্যের বিষয় মন্ত্রীমহোদয়-দের মধ্যে ইহার কোন প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইতেছে না। জনগণের সেবক বলিয়া যাঁহারা নিজেদের পরিচিত করিয়া থাকেন, জনগণের এই অবস্থা হয় তো তাঁহারা স্বাভাবিক বলিয়াই গণ্য করেন, তাই হয় তো মানুষের এই ঘোর দুর্দিন তাঁহাদের সুখনিদ্রার কোন প্রকার ব্যাঘাতই ঘটাইতেছে না। বিবেক বস্তুটি আজ বোধ হয় সত্যই অভিধানের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া রহিল। বিরাট বিশাল জনগণের সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জঠরের জ্বালা নিবারণের দায়িত্ব যাঁহাদের, সংশ্লিষ্ট বিষয়েই তাঁহাদের এই চরম ঔদাসীন্য ও উপেক্ষাজনিত মহাপাপের কোন ঘোরতর শাস্তি নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহা একমাত্র ঈশ্বরই অবগত।

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই

পশ্চিমবাঙলার সমকালীন পরিস্থিতি দেখিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রে ও প্রভাতে' নামক সেই সুবিখ্যাত কবিতাটি আজ বিশেষভাবে আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক হইতেছে। রবীন্দ্র-কাব্যের ভরন্ত সমুদ্রে অনন্ত আগ্রহে যে দুরন্ত নাবিকের দল অবগাহন করিয়াছেন তাঁহারা আশা করি নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনবগত নন যে, এই অপূর্ব কবিতাটির মাধ্যমে এক ব্যাপার-বৈপ-রীত্যের আলেখ্য অসাধারণ অনন্যতা-সহ উপস্থাপিত। রাত্রে প্রেয়সী প্রাণে-শ্বরীর গরিমায় যাহার আবির্ভাব প্রভাতে দেবীর স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল মহিমায় তাহারই অভ্যুদয় রজনীর গাঢ় রোমাঞ্চকর জ্যোৎস্নামণ্ডিত পরিবেশে যাহার ওষ্ঠাধরে ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা তুলিয়া দেওয়া হইলে সে হাসিয়া সেই চুম্বনসুরা আকণ্ঠ পান করিয়া লয় তাহাকেই শুচিশুভ্র শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে স্নানাবসানে শুভ্রবসনে সজ্জিত হইয়া বামহস্তে সাজি ধরিয়া পূজার পুষ্প চয়ন করিতে দেখা যায়। রাত্রি ও প্রভাতের প্রকৃতিগত ব্যবধান এই। বর্তমানের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের চরিত্রের মধ্যেও এই ধরণের এক বিরাট বৈপরীত্য আজ সূর্যালোকের ন্যায় আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সমগ্র সময়টিকে দুইভাগে ভাগ করা যাক। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকাল। গদীনসীন হইবার পূর্বে দেশবাসীকে তাঁহারা যে কত গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কত উজ্জ্বল স্বপ্ন তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, একবার কোনক্রমে তাঁহারা গদীতে আসিলেই সকল দুঃখ-দুর্দশা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের শক্তিতে তাঁহারা ঘুচাইয়া দিবেন—এই জাতীয় আশ্বাসের ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলেন গদীলাভের পর তাঁহাদের কার্যকলাপ একেবারে বিপরীত ধারায় বহিতে আরম্ভ করিল।

কংগ্রেসের অযোগ্যতা, অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা দূরীকরণ তো দূরের কথা, বরং কংগ্রেসের আমলে যেটুকু আইন-শৃংখলা দেশে ছিল ইঁহারা সেটুকুরও মূলোচ্ছেদ ঘটাইয়া ছাড়িলেন। একটি রাজ্যকে কতখানি অরাজক এবং মগের মুলুক বানানো যায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা অবতীর্ণ হইলেন এবং বলা বাহুল্য সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সগৌরবে প্রথম স্থানটি অধিকারে আনেন। কংগ্রেসের আমলে আরক্ষাবাহিনী যে পরিমাণ সজাগ এবং কর্মরত ছিল, ইঁহাদের আমলে সেই গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব প্রয়োজনীয় বাহিনীকে অকর্মণ্য এবং অকেজো করিয়া সারা রাজ্যে চুরি-ডাকাতি-নরহত্যা-ছিনতাই-গুণ্ডামী-ডাকাতির ব্যাপক প্রসারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিলেন। এই ধরণের সমাজ-বিরোধী অপকর্মগুলি ইঁহাদের আমলে যে পরিমাণ ঘটিতেছে তাহার নজীর সংবাদপত্রের মাধ্যমেই মেলে। অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে যে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আজ একেবারেই শূন্য, যে কোন মুহূর্তে যে-কোন পরিবেশে সমাজবিরোধীদের কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা তাহার পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এখানেই শেষ নয়, সেই ভয়াবহ বিপদ হইতে তাহার

রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনার দ্বারগুলিও একেবারে অবরুদ্ধ।

এই জাতীয় অপবৃত্তিগুলি অবশ্য যে কেবল এই দেশেই অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহা সব কিছুরই মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে এবং এত বেপরোয়াভাবে প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে যে সব ঘটনা আজ এ-রাজ্যের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে ইহার অনুরূপ নজীর বোধ করি আর কোথাও মিলিতে পারে না। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই সময় রাজ্যে যখন এই অরাজকতা, চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, ছিনতাই, রাহাজানির ব্যাপক সমারোহ সেখানে সেগুলির অবসান ঘটানোর চিন্তা তো দূরের কথা, তাহার পরিবর্তে যুক্তফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিকগণ এখন শরিকীকলহে লিপ্ত, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় তাঁহাদের নিকট দলীয় কলহই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বহন করে। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখার অভিযোগ শুধু আমাদেরই নয়, এ বর্ষেই এই দলীয় কলহে যুক্তফ্রণ্টের শরিকরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, এই জাতীয় শরিকী সংঘর্ষও যেন আজ শুধু পশ্চিমবাঙলারই এক নিজস্ব ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই জাতীয় নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার এই—যুক্তফ্রণ্টের কট্টর সমর্থকদের মধ্যেও অনেকেই আজ এই দলীয় কলহকে কেন্দ্র করিয়া যাহা বলিতেছেন তাহা মোটেই যুক্তফ্রণ্টের স্বপক্ষে নয়।

তারুণ্যের সংজ্ঞা

ভারতীয় রাজনীতির প্রশস্ত অঙ্গনে বর্তমানে তারুণ্যের জয়যাত্রা যেভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে 'তারুণ্য' কথাটির প্রকৃত সংজ্ঞা সম্বন্ধে আজ আমাদের অন্তর রীতিমত সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান হইতেছে।

আবহমানকাল ধরিয়া 'তারুণ্য' সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল এখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সে ধারণা আমাদের বদলাইবার উপক্রম হইতেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে—সেই সংস্থাটি 'তরুণ তুর্কী' নামে পরিচিতিলাভ করিয়াছে। যে শব্দ দুটির সমন্বয়ে এই বাক্যটি গঠিত, আজ বহু চেষ্টাতেও সেই অভিহিতির অধিকারীদের কার্যকলাপ ও প্রকৃতির সহিত বাক্যটির কি সম্বন্ধ তাহার মর্মোদ্ধার করিতে পারিতেছি না। ভারতীয়রা কি ভাবে তুর্কী হইলেন তাহা আমাদের বোধের বাহিরে

তারুণ্য অর্থে এক প্রচণ্ডতা, এক সীমাহীন প্রাচুর্য, একরাশ স্পন্দন, মুঠো মুঠো উত্তাপ এবং জীবনের এক ব্যাপক সমারোহ। যে অর্থে এখানে সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে 'তারুণ্য' কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে তাহার প্রয়োগ কি সার্থক? অন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদ তারুণ্যউত্তীর্ণদের কি ক্ষমতা বা অধিকারের বাহিরে? এবং কার্যক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে যাঁহারা আজ তারুণ্যের বিগ্রহ বলিয়া সমাহৃত হইতেছেন তাঁহারা সকলেই পঞ্চাশোর্ধ্বে (অর্থাৎ বনগমনের সময়)। যেমন—ফকরুদ্দীন আলী আমেদ—চৌষট্টি, জগজীবন রাম—বাষট্টি, অর্জুন অরোরা—সাতান্ন। ইঁহাদের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তিনিও আগামী নভেম্বরে তিপ্পান্ন-এ পদার্পণ করিবেন।

যে-কোন বিষয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে সংজ্ঞায়িত করা ভাষার ও ব্যাকরণের আদ্যশ্রাদ্ধ করার পিছনে কি যুক্তি আছে এবং এ অধিকারও কোথা হইতে আসিল তাহাও আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

হো-চি-মিন স্মরণে

উত্তর ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হো-চি-মিন সম্প্রতি পরিণতবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হো-চি-মিনকে শুধু একটি রাষ্ট্রের কর্ণধার বলিলেই তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে বর্ণনা করা হয় না---উত্তর ভিয়েতনামের তিনি হৃৎপিণ্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানের পতন ঘটিলে তিনি ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের পত্তন করেন ও প্রাণপণ সাধনায় সেই দেশের কল্যাণসাধন করিতে থাকেন। তাঁহার সমগ্র জীবন আত্মত্যাগ ও কঠোর শ্রমবরণের এক অনন্ত ইতিহাস। জাতীয় মুক্তির দুর্বার সাধনায় জগতের যে কটি মহান নায়ক ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম-বিলাসের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সর্বস্বপণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন সেই তালিকায় হো-চি-মিন একটি অবিস্মরণীয় ও অম্লান নাম। তাঁহার সমগ্র জীবন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটি গৌরবময় ইতিহাসেরই নামান্তর। ফরাসী শাসন হইতে স্বীয় মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনে তিনি যে

জননায়ক হো-চি-মিন

বিরাট নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যে-কোন দেশপ্রেমিকের হৃদয় অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে।

ভারতবর্ষের সহিতও তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। এ দেশের মাটিতে তাঁহার পদার্পণ ঘটিয়াছে, ভারতের সুমহান ঐতিহ্য ও শাশ্বত সভ্যতার প্রতি ইনি চিরদিনই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

সর্বজনবরেণ্য মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে তাঁহার---I and others may be revolutionaries but we are disciples of Mahatma Gandhi directly or indirectly---এই উক্তিটি ভারতীয় রাজনীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রমাণ করে।

বর্তমান জগতে যে বিরাট আসনের তিনি অধিকারী ছিলেন----সেই শূন্য আসন আজ সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তাঁহার লোকান্তর ঘটিল ঠিকই কিন্তু তাঁহার আদর্শ এবং ঐতিহ্য উত্তর-ভিয়েতনামীদের ধ্রুবতারার মত পথ দেখাইবে।

মানবদরদী, মানবতার অন্যতম মহান প্রবক্তা, নিপীড়ন, অত্যাচার-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মূর্তিমন্ত প্রতিবাদ এই মহান নেতার স্মৃতির উদ্দেশে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি ও তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

হুমায়ুন কবীর

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ হুমায়ুন কবীর গত ১লা ভাদ্র অকস্মাৎ ৬৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন ও শিক্ষাবিদ হিসাবেও সুনাম অর্জন করেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং বিশিষ্ট বাগ্মী হিসাবেও ইনি সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানাত্মক ডক্টরেট দেন এবং একাধিক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

পশ্চিমবাংলার ত্রাণ ও উদ্বাস্তু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত গত ১৮ই ভাদ্র ৬৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ছাত্রজীবন থেকে ইনি বিপ্লবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও বৃটিশ সরকারের হাতে নানা নির্যাতন ভোগ করেন।

হিমাংশুকুমার বসু

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিমাংশুকুমার বসু গত ১লা ভাদ্র ৬৫ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। ব্যবহারজীবিরূপে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৯ সালে ইনি বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯৬১ সালে প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হন। ১৯৬৬ পর্যন্ত এই পদে তিনি সমাসীন ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রী[illegible] মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।